"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

১লা
জানুয়ারী
১৯৭৬

ধনধান্য
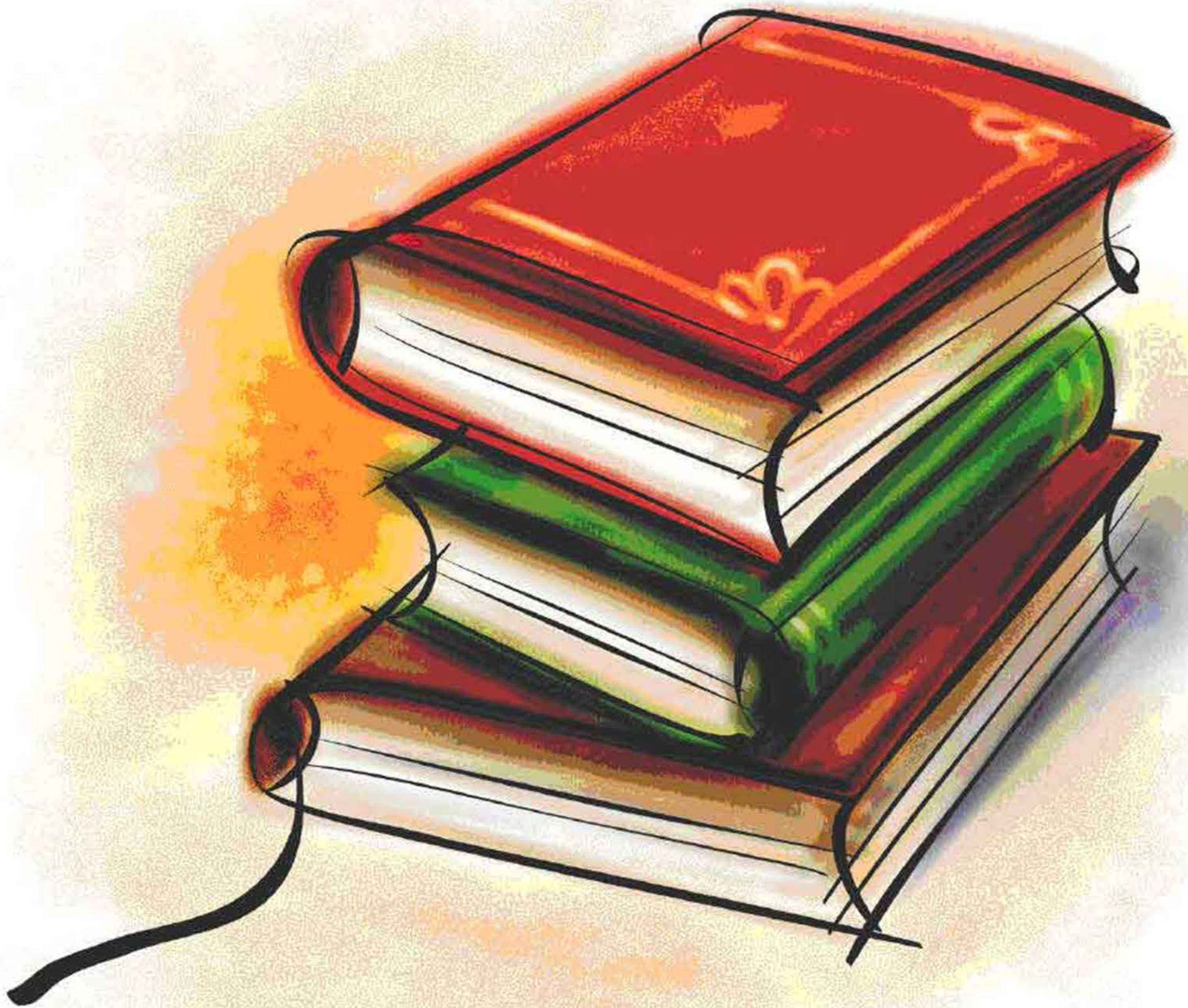
পল্লী উন্নয়নে বিদ্যুৎ

এদেশের শতকরা পঁচাত্তর জনের জীবিকার সংস্থান কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষি থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। আয়ের প্রায় অর্ধেক ভাগই কৃষি থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর ২০-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে তাই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার প্রশ্নটি। দেশের অগ্রগতির একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হল বিদ্যুৎ। সেচের কাজে ভূগর্ভস্থ জলের সদ্ব্যবহার করতে গেলে চাই বিদ্যুৎ। গ্রামগুলিতে এজন্যই বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে গ্রামীণ শিল্পগুলিতেও নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা গড়ে উঠবে।

এক্ষেত্রে পল্লী বৈদ্যুতীকরণ সংস্থার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ১.৭ লক্ষ গ্রামে বিদ্যুৎ এসে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দশ হাজার গ্রামে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। দেশের মোট গ্রামের সংখ্যা ৫.৫০ লক্ষের ৩০ শতাংশে এখন বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কয়েকটি রাজ্যে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের হিসেব ১০০ শতাংশে পৌঁছেছে।

দেশে এখন বিদ্যুৎচালিত পাম্পের সংখ্যা ২৭ লক্ষ। ১৯৫১ সালে ঐ সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ হাজার। পঞ্চম যোজনা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সংখ্যা ৪০ লক্ষে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়।

পঞ্চম যোজনায় অতিরিক্ত এক লক্ষ দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ১৫ লক্ষ পাম্প সেট বিদ্যুৎ চালিত করার প্রস্তাব আছে। এছাড়া, বহু সংখ্যক গ্রামীণ শিল্পেও বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রস্তাব রয়েছে। এইসব কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনে কর্মসংস্থান, অগ্রগতি, কল্যাণ ও নিরাপত্তার নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

ধনধান্যের পাঠকপাঠিকা ও হিতৈষীদের ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :

বিজনেস ম্যানেজার/পাব্লিকেশনস ডিভিশন, ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

গ্রাহক মূল্যের হার :

বার্ষিক-৬ টাকা, দুবছর ১০ টাকা এবং তিনবছর ১৪ টাকা।

প্রতিসংখ্যার মূল্য ৩০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :

EXINFOR, CALCUTTA

বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :

অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ১৪/১ জানুয়ারী ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদশিল্পী—মলয়শংকর দাশগুপ্ত

আলোকচিত্র—অরুণ দাস/পি. আই. বি.

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

উপসম্পাদক
দিলীপ ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'-অর্থাৎ অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা এ সম্বন্ধে আজও কোন তর্কের অবকাশ নেই। যুগের পরিবর্তনে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন হতে পারে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকবর্গের স্বার্থে রচিত হয়েছিল, সে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে অচল হবে তাতে আর বিচিত্র কী। তাই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ভাল বলে আজ যেটাকে গ্রহণ করা হল কাল সেটার ত্রুটি দেখা দিলে নিশ্চয়ই সেটা পাল্টানো প্রয়োজন। প্রচলিত দশ শ্রেণীর মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যন্ত চার বছরের কলেজী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে চালু করা হল একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষা ও তিন বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রম। কয়েক বছরের মধ্যে সেটারও পরিবর্তন ঘটিয়ে সুরু করা হল নতুন শিক্ষাব্যবস্থা। এই নয়া পাঠ্যক্রমে মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর আরও দুই বছর ঐ মাধ্যমিক স্তরে সাফল্যের সঙ্গে পড়াশুনা শেষ করে তিন বছর কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত হলেই স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ। আশা করবো এ ব্যবস্থা আমাদের আশাআকাঙ্খা পূরণে সমর্থ হবে।

আজ শিক্ষাজগতে নানাদিকে বিশৃংখলা। শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হলে আপনা থেকেই শিক্ষাজগতে ফিরে আসবে শৃংখলা। তবে আজকের শিক্ষাকে যারা আগামীকালে কাজে লাগাবে সেই ছাত্রসমাজের দায়িত্ব যে সবচেয়ে বেশী এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিছুকাল হল পড়াশুনা না করেই অধিকাংশ ছাত্র বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসছে। পরীক্ষায় টোকাটুকি ছাত্ররা তাদের অধিকার বলে ধরে নিয়েছে। যেখানে একটু কড়াকড়ি সে পরীক্ষা হল থেকে ছাত্ররা দল বেধে বেরিয়ে আসছে, কখনো খাতাপত্র ছিঁড়ে ফেলে এক বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে।

পরীক্ষায় গণ টোকাটুকি এমন এক ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছিল যে একে যে কোন প্রকারে বন্ধ করা আশু প্রয়োজন ছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা হলে অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। পরীক্ষার হলে পুলিস ব্যবস্থায় এই টোকাটুকি বন্ধ করা খুবই লজ্জার বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এই পুলিসের হস্তক্ষেপ দরকার? ছাত্ররা যদি নিজেরাই নিজেদের আচরণ বিধি মেনে চলে তবে এসবের কোন দরকারই হবে না। কোন অসদুপায় অবলম্বন না করে পরীক্ষা দিয়ে যে শুধু সৎভাবে ডিগ্রী অর্জন করা যাবে তাই নয়, ভবিষ্যতে ছাত্রদের চরিত্রে একটা সুস্থ মূল্যবোধও গড়ে উঠবে। আর আজকের ছাত্ররাই তো দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এবং এই সব কর্ণধার গড়ে তোলার জন্যইতো ব্যয় করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী যে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ঘোষণা করেছেন তাতেও ছাত্রদের জন্য কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী রয়েছে। ছাত্ররা যখন তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে এর পূর্ণ মর্যাদা দেবে তখনই গড়ে উঠবে আগামী দিনের সুখী ভারত স্বপ্নের ভিত।

এস·ভি·রাঘবন
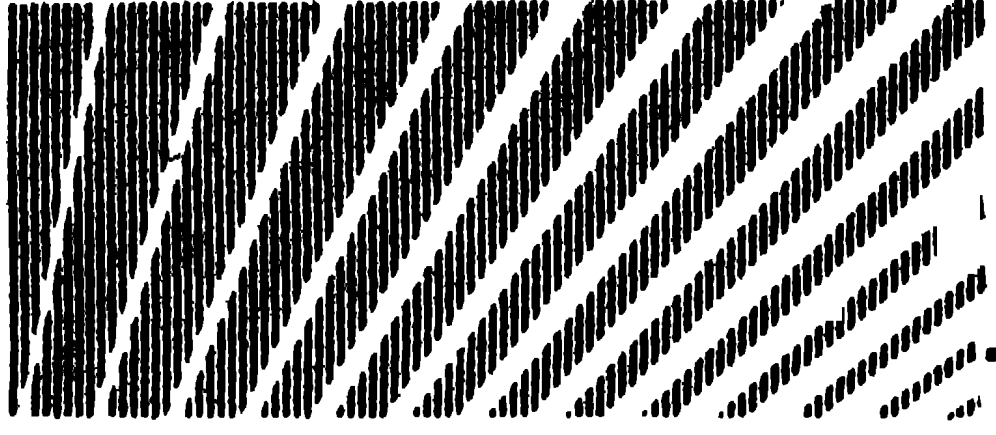
সাফল্যের এক দশক

গত দশক কষ্টের ও সাফল্যের দশক। জাতির সংগ্রাম করবার এবং বাঁচবার ইচ্ছা অগ্রগতিকে তরান্বিত করেছে। এই দশকে শিক্ষণীয় যেমন অনেক কিছুই আছে তেমনি আছে এমন সব সাফল্য, যার জন্য গর্বিত হওয়া যায়।

আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি বা ব্যর্থতার কারণ না খুঁজেই অনেক সময় হতাশার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করবার একটা অভ্যাস অনেক দিন ধরে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এরই ফলে বড় বড় সাফল্যও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়—ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ আরও গঠনমূলক এবং সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে আমরা যা চাই ততদূর না হলেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি ঘটতো।

দুশো বছরের পুরোনো একটা উপনিবেশবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য আমরা সময় পেয়েছি স্বাধীনতা পরবর্তী মাত্র তিরিশ বছর। স্বাধীনতার পর পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়েছি। পুরোনো বাধাগুলো তো আছেই—নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহিরাক্রমণের ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়েছে। পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়াসের গোড়ার দিকে যে বিরোধী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সেগুলো আবার সক্রিয় হয়েছে। তাছাড়া খরা বন্যা এসবও লেগেই রয়েছে। সম্পদের অভাব—কারীগরি জ্ঞানেরও অভাব ছিল। জনসংখ্যার বিস্ফোরণও ভয়াবহ। তবুও আমরা থেমে যাই নি। ধীরে ধীরে এগিয়েছি, বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, অনেক বড় রকমের সাফল্য আমরা অর্জন করেছি। একটু পিছু ফিরে তাকিয়ে বিশেষ করে গত দশকের সাফল্যগুলো স্মরণ করা যাক।

কৃষি ক্ষেত্রে

১৯৬৫, '৬৬ এবং '৬৭ সালে দেশে পরপর খরা হ'ল। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের অভাব দেখা দিল। এসময় সরকারের খাদ্যনীতি তীব্র পরীক্ষার সন্মুখীন হ'ল। এক সময় তো ৯ কোটি মানুষ খরাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। ব্যাপক ত্রাণ কার্য সুরু করা হ'ল। ১৯৭২-৭৩ সালে আবার খরা। দেশের ৩৫০টি জেলার মধ্যে ২৩০টি জেলার ২০ কোটি মানুষ তীব্র অভাবের মুখোমুখি হলেন। সরকার হাল ছাড়লেন না। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করা হ'ল—ত্রাণ অভিযান জোরদার করা হ'ল—বণ্টন ব্যবস্থা দৃঢ় করা হল। একটি মানুষকেও মরতে দেওয়া হ'ল না অনশনে। যারা ভেবেছিলেন খরার চাপে দেশ ধ্বংস হয়ে পড়বে তাঁরা সরকারের সাফল্যে বিস্মিত হলেন।

কিন্তু এই দুর্ভাগ্যই আমাদের সাফল্যের সূচনাবিন্দু হ'ল। ১৯৬৭-৬৮ সালে নতুন কৃষিকৌশল গ্রহণ করা হ'ল। ফলে গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব ঘটে গেল। ১৯৭০-৭১ সালে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টন গমের ফলনে এক সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি হ'ল।

নতুন কৃষি কৌশলে জোর দেওয়া হ'ল কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ-বৃদ্ধির উপর। এর মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল—উচ্চফলনশীল বীজের সাহায্যে আবাদ, সেচের সম্প্রসারণ ও সদ্ব্যবহার, অধিক পরিমাণে সার, কীটনাশক ব্যবহার, কৃষি প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর ব্যাপক রূপায়ণ, কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা এবং কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের জন্য ন্যায্যমূল্য দান। লক্ষ্য স্থির হ'ল চতুর্থ যোজনার শেষে ৩ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত জমি চাষের আওতায় আনার।

কৃষি উৎপাদন

	মিলিয়ন টন	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৭৩-৭৪
খাদ্যশস্য (মোট)	,,	৮২.৩৩	৭২.৩৫	১০৩.৬১
চাল	,,	৩৪.৬০	৩০.৫৯	৪৩.৭৪
গম	,,	১১.০০	১০.৩৯	২২.০৭
জওয়ার	,,	৯.৯০	৭.৫৮	৮.৯৯
বজরা	,,	৩.২৯	৩.৭৫	৭.০৯
অন্যান্য শস্য	,,	১০.৮১	১০.০৯	১১.৯৭
তৈলবীজ	,,	৬.৯৭	৬.৪০	৮.৬৮
আখ	,,	১১.৪১	১২.৭৭	১৪.০৫
তুলো	মিলিয়ন গাঁট	৫.২৪	৪.৫৮	৫.৮২
পাট	,,	৪.১৪	৪.৪৮	৬.১৮

১৯৭০-৭১ সালে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এটা রেকর্ড।

এছাড়াও সরকার আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী রূপায়িত করলেন—ক্ষুদ্র কৃষি-জীবী উন্নয়ন সংস্থা এবং প্রান্তিক কৃষি-জীবী ও ক্ষেতমজুর উন্নয়ন সংস্থা। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষিজীবীদের উন্নয়নই-এই দুটি সংস্থার কাজ। চতুর্থ যোজনার গোড়ার দিকে সুরু হয়ে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত এগুলির সাহায্যে ৮৭টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে-আর তাতে উপকৃত হয়েছেন ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার ক্ষুদ্র চাষী, ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার প্রান্তিক কৃষিজীবী এবং চার লক্ষ ক্ষেত মজুর। সুসংহত এলাকা উন্নয়নের উপরেও জোর দেওয়া হ'ল। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে নজর দেওয়া হ'ল ক্ষুদ্র সেচ কর্ম-সূচীর রূপায়ণে, দুগ্ধশাখা স্থাপন এবং হাঁস-মুরগী শুকর-ছাগল পালনের উপর।

১৯৭০-৭১ সালে খরা প্রবণ এলাকা-গুলির জন্যেও সুরু হ'ল বিশেষ কর্মসূচী। ১৩টি রাজ্যের ৭৪টি জেলার ৬ কোটি মানুষকে খরার শিকার বলে চিহ্নিত করা হ'ল। সেচ ভূমি সংরক্ষণ বনজ সম্পদ সৃষ্টি এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হ'ল। চতুর্থ যোজনায় খরা প্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ কর্মসূচী রূপায়ণের সুফল নিম্নরূপ:—

সেচ—২ লক্ষ হেক্টর।
ভূমি সংরক্ষণ—৪.৭ লক্ষ হেক্টর।
বন সৃজন—১.৭ লক্ষ হেক্টর।
সড়ক নির্মাণ—৬০০০ কিলোমিটার।

খরার বছরগুলির অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই সরকারী বণ্টন ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়েছে। কৃষি সমস্যা ও গ্রামাঞ্চলের বেকারত্ব দূর করবার ব্যাপারে সুপারিশ করবার জন্য গঠন করা হয় জাতীয় কৃষি কমিশন। নির্দিষ্ট সেচ এলাকায় নিবিড় কৃষি কর্মসূচীর রূপায়ণের ব্যবস্থাও করা হ'ল। ফলে যে খরা দেশের জনগণ ও সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল সেই খরাই আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি-ভিত্তিকে জোরদার করবার কাজে সহায়ক হ'ল।

শিল্পক্ষেত্রে

খরার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হ'ল। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নূতন প্রকল্প চালু করা গেল না। বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতাও পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হ'লনা। শিল্প তৎপরতা মন্থর হ'ল—কিন্তু অর্থনীতিকে ভেঙ্গে পড়তে দেওয়া হ'ল না। তৃতীয় যোজনার শেষ দু'বছরের কাজের গতিবেগ বজায় রাখা হ'ল। বিশেষ সাফল্য অর্জিত হ'ল ইস্পাত ক্ষেত্রে। ভিলাই, দুর্গাপুর ও রূরকেল্লার ইস্পাত কারখানাগুলি সম্প্রসারিত হ'ল—উৎপাদন বহুমুখী হ'ল। আগে আমরা মিশ্র ইস্পাত তৈরী করতাম না। গত দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মিশ্র ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত উৎপন্ন হতে লাগলো। এখন বছরে ৪ লক্ষ টন মিশ্র ইস্পাত উৎপন্ন হচ্ছে। অন্যান্য মৌল শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে। আর এই সময় খনিজ তৈল পরিশোধন ক্ষমতাও সম্প্রসারিত হয়েছে। মাদ্রাজ শোধনাগার সহ কয়েকটি নতুন

সমৃদ্ধির নবদিগন্তের দিশারী

বিশাখাপত্তনমে দেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ কারখানা

তৈল শোধনাগার গড়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চিনি, বস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্পে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৬০-'৬১ সালকে ভিত্তি বছর এবং ঐ বছর উৎপাদন ১০০ ছিল ধরলে দেখা যাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৪ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ২০১। নীচের তালিকা থেকেও বোঝা যাবে মৌল শিল্পের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে।

শিল্প উৎপাদন

উৎপন্ন সামগ্রী	একক/মিলিয়ন টন	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৭৪-৭৫
কয়লা	,,	৫৬	৭০	৬১
পেট্রোলিয়াম (অপরিশোধিত)	,,	৪.৫	৩.০২	৭.২
আকরিক লৌহ	,,	১১	১৮	৩৪
সিমেণ্ট	,,	৮.০	১০.৮	১৪.৭
প্রস্তুত ইস্পাত	,,	২.৪	৪.৫	৪.৭
সার	হাজার টনের হিসেবে	১৫২	৩৪৪	১৫৯৬
মেসিন টুলস্	১০ লক্ষ টাকার হিসেবে	৭০	২৯৪	৬৯২ (৭৩-৭৪)
চিনি	মিলিয়ন টন	২.৭	৩.৪	৩.৮
সুতী বস্ত্র	মিলিয়ন মিটার	৬৭০০	৭৪০০	৭৮০০
বিদ্যুৎচালিত পাম্প	হাজার	১০৮	২৪৪	৩২৭
বৈদ্যুতিক মোটর	হাজার/অশ্বশক্তি	৭২৮	১৭৫৩	২৯০৮
বাইসাইকেল	হাজার	১০৭১	১৫৭৪	২৫৭৭
বৈদ্যুতিক পাখা	হাজার	১০৫৯	১৩৫৮	২৩২০
বিদ্যুৎ	মিলিয়ন কিলোওয়াটস	১৭০০০	৩৩০০০	৬৭০০০
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুতের ব্যবহার	কিলোওয়াটস	৩৮.১৫	৬১.৫	৬৭ (৭৩-৭৪)

সরকারী উদ্যোগ

অর্থনৈতিক ক্ষমতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সরকারী উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের এই সরকারী উদ্যোগের সাফল্যও কিন্তু কম প্রশংসনীয় নয়। ১৯৫০-৫১ সালে ৫ টি শিল্প সংস্থা নিয়ে এই সরকারী উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল। সে সময় এর মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২৯ কোটি টাকা। আজ সরকারী উদ্যোগে রয়েছে ২০০টি সংস্থা আর এগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৬ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা। খনি ও ধাতু শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৮২০ কোটি টাকারও বেশী। পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৩৬০ কোটি টাকা, রাসায়নিক শিল্পে ৮১০ কোটি টাকারও বেশী। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৮২০ কোটি টাকারও বেশী।

গত ৮ বছরে উৎপাদন কি হারে বেড়েছে তা বোঝা যাবে পর পৃষ্ঠার সারণী থেকে।

সরকারী উদ্যোগের বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় করে ১৯৭৩-৭৪ সালে পাওয়া গিয়েছে ৬ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। এর আগের বছর পাওয়া গিয়েছিল ৫ হাজার ১২৪ কোটি টাকা অর্থাৎ বিক্রয় বেড়েছে এক-তৃতীয়াংশ। রপ্তানী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়েও সরকারী উদ্যোগ পিছিয়ে নেই। ১৯৬৬-৬৭ সালে রপ্তানী থেকে আয় ছিল ৭৩ কোটি টাকা। ১৯৭৩-৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯৩ কোটি টাকা। সরকারী উদ্যোগ স্থাপনে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করবার বিষয়টিও মনে রাখা হয়েছে।

নতুন সঙ্কট

খরা ও বিদ্যুৎ সংকট কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের দু'টি বড় ঘটনা আমাদের উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। সত্তর দশকের আন্তর্জাতিক মুদ্রা

উৎপাদন বৃদ্ধি—আট বছরে

পণ্য	একক হাজার টন	১৯৬৬-৬৭	১৯৭৩-৭৪
ইস্পাত পিণ্ড	,,	৩৫৬১	৩৮০৬
আকরিক লৌহ	,,	১৮৮৬	৬০১৯
কয়লা	,,	৯৪৯০	৭৫,১০৮
দস্তা পিণ্ড	,,	—	১০.৮২৪
তামা	,,	—	১২.৮৯৯
পেট্রোলিয়াম			
পরিশোধিত	,,	৩২৬৯	১১,৬১৬
অপরিশোধিত	,,	২,৫২৫	৭.১০৭
সার			
নাইট্রোজেন	,,	২০০.৭৫	৫২৩.৭০
পি-২০৫	,,	১৪.৩৬	১০১.০০
এ্যন্টিবায়োটিক্স			৭৩.৮২
IDPL			
পেনিসিলিন	MMU	৬৯.৭৮	৭৫.৭১
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	টন	৬৪.৭২	৬৪.১৭
টেলিফোন	হাজার	২২২	২৫৮
মেশিন টুলস	১০ লক্ষ টাকার হিসেবে	১৪১	৪১২

সঙ্কট ও পেট্রোলের দাম বাড়ানোর ফলে গোটা দুনিয়ায় যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল আমাদের অর্থনীতিকেও তা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই আঘাতে আমরা যে ভেঙ্গে পড়িনি—তা আমাদের অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তি ও জনগণের অদম্য মনোবলেরই পরিচয় বহন করে।

সরকার বহুমুখী প্রয়াস চালিয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছেন। পৃথিবীর অনেক দেশ কিন্তু এখনও মুদ্রাস্ফীতিকে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। ঋণ নিয়ন্ত্রণ, চোরাচালানকারী, মুনাফাখোর, মজুতদারদের গ্রেপ্তার—সেই সঙ্গে উৎপাদন বাড়িয়ে ও বণ্টন ব্যবস্থা জোরদার করে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করা সহজ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ পড়েছে আমাদের আমদানীর উপরও। এতে বৈদেশিক বাণিজ্যে কিছুটা বৈষম্য ঘটেছে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমদানীও মহার্ঘ হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার প্রকাশ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশের সামনে এসেছে নানা ধরণের সমস্যা। এর প্রত্যেকটিকেই চরম ধৈর্য্য ও পরম দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হয়েছে। এই সব সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল বাংলাদেশ সংকট। এই সংকট আমাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। একদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ১ কোটি শরণার্থীর আশ্রয় ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, অপরদিকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার দায় বর্তেছিল। ভারত পাকিস্তান লড়াই স্বল্প সময় হলেও তা ভারতীয় অর্থনীতির উপর একসময়ে এমন নতুন চাপ সৃষ্টি করেছিল যখন আমরা এই ধরণের বড় রকমের কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। রণক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের পর যে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব হল তা শুধু ভারতের শক্তিরই নয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক বিচক্ষণতারও প্রমাণ বহন করছে।

আমাদের তৈরী রেলওয়ে ওয়াগন এখন বিদেশ যাচ্ছে

খনিজ তেলের সন্ধানে বম্বে দরিয়ায় সাগর সম্রাট
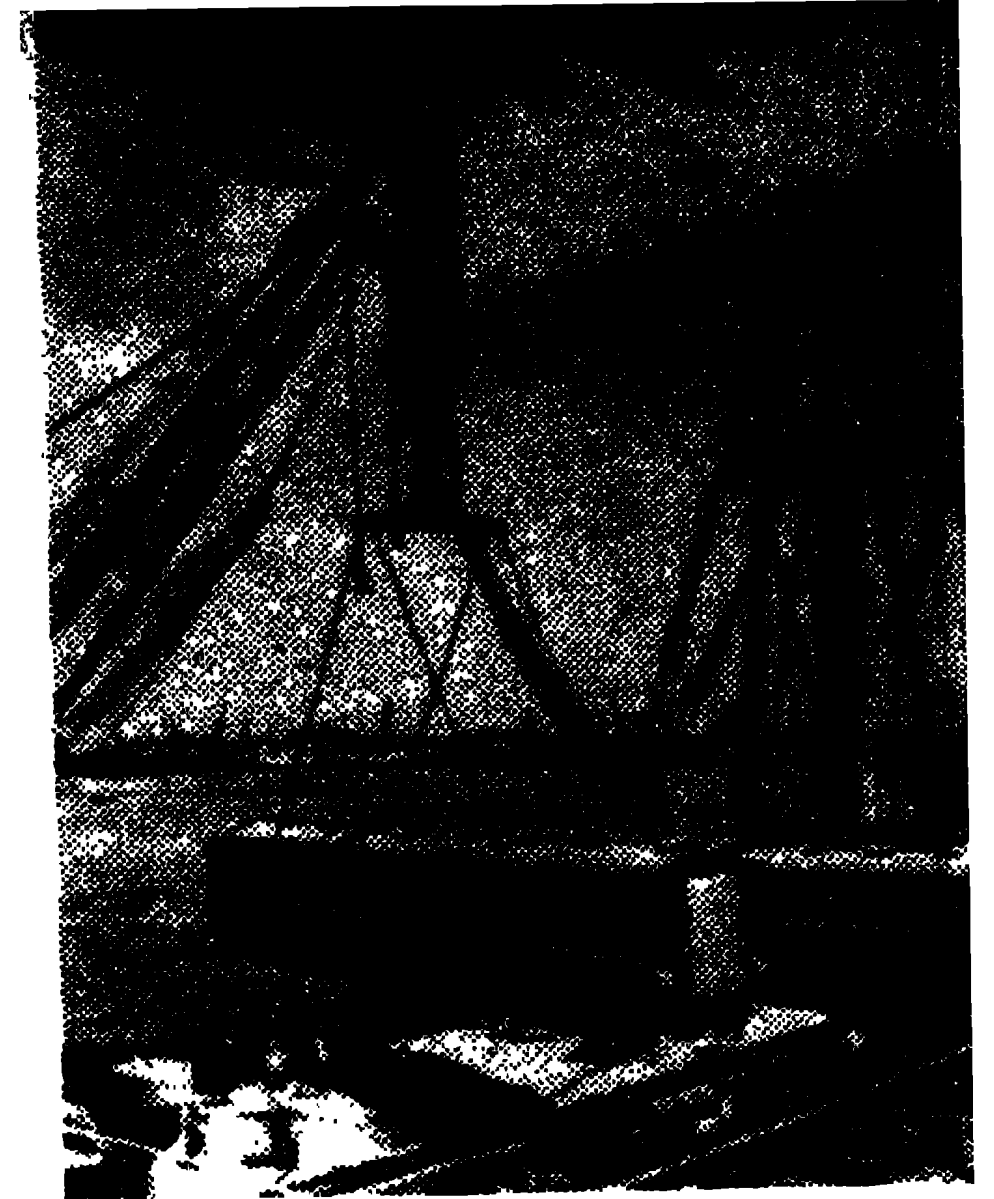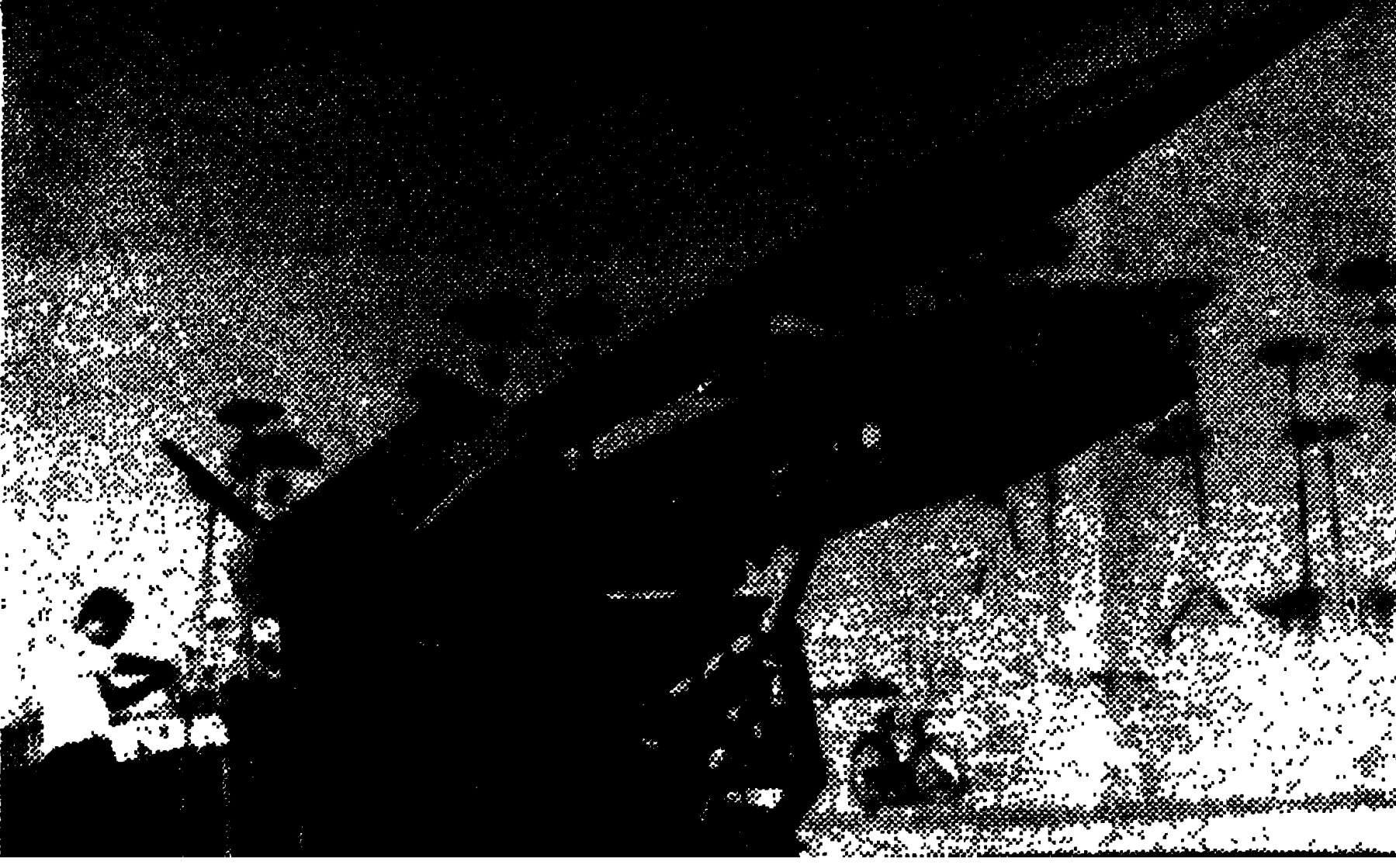
থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র আমাদের মহাকাশযুগে প্রবেশের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ পদক্ষেপ

পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার রাজ্য পুনর্গঠন, উত্তরপূর্ব পার্বত্য এলাকার জনগণকে অধিকতর স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেবার জন্য এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করবার জন্য যেভাবে নতুন রাজ্য ও অঞ্চল গঠন করা হ'ল তাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। তেলেঙ্গানা প্রশ্নটির সমাধান অনেকদিন হচ্ছিল না। কিন্তু সকলের পক্ষে সন্তোষজনকভাবে তারও নিষ্পত্তি ঘটেছে। নিষ্পত্তি ঘটেছে সরকারী ভাষা প্রশ্নের। অহিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যগুলিকে বিধিবদ্ধভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজীও সরকারী ভাষার মর্যাদা পাবে।

শেখ আবদুল্লা এবং শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিনিধিদের দৌত্য কাশ্মীর প্রশ্নেরও স্থায়ী সমাধান সম্ভব করেছে। কয়েক যুগের পুরোনো সমস্যা আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ভারতের দ্বাবিংশ রাজ্য হিসাবে সিকিমের আত্মপ্রকাশ এ যুগের আর এ দশকের আর একটি বড় সাফল্য। এতে ঐ সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক ও পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার সুনিশ্চিত হয়েছে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতি

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এর মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্য শিক্ষা পরিবহণ, যোগাযোগ প্রভৃতির মত মৌল ক্ষেত্রগুলি। জন্মের হার ১৯৬৫ সালে ছিল হাজারে একচল্লিশ, ১৯৭৩-৭৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে হাজারে ছত্রিশ; মৃত্যুর হারও ঐ সময়ে হাজারে উনিশ থেকে কমে পনেরোয় দাঁড়িয়েছে। ১৯৬১ সালে শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজারে একশো ছেচল্লিশ। এক্ষেত্রে তা কমে দাঁড়িয়েছে একশো বাইশে। লোকের আয়ুও ১৯৬১ সালের ৪১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৫০-এ দাঁড়িয়েছে।

চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে শহর ও গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলের জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য ১৪ হাজার ২০০ হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি রয়েছে। এগুলিতে মোট শয্যাসংখ্যা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৯০০। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ৫ হাজার ৩০০টি আর সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৬০০। ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত, কুষ্ঠর মত রোগ প্রায় নির্মূল করা হয়েছে। ডাক্তার, নার্সদের সংখ্যা বেড়েছে, সংখ্যা বেড়েছে মেডিকেল কলেজেরও।

ভারত সরকারই বিশ্বের প্রথম সরকার যে সরকারী ভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর রূপায়ণ সুরু করে। ১৯৫২ সালে এই কর্মসূচীর সূচনা। শহরাঞ্চল ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে ৩৬৫ হাজার কেন্দ্রে প্রায় ৮০ হাজার কর্মী এই কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে। এরই সঙ্গে গবেষণা চলছে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ পদ্ধতি উদ্ভাবনের। সম্প্রতি নয়াদিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে জন্মনিরোধক টীকাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাথমিক থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার যে সম্প্রসারণ ঘটেছে তাকে অসাধারণ বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৬ থেকে ১৭-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৬০ লক্ষ। ১৯৭৩-৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ। ভারতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হ'ল ৩০ লক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া আর কোন দেশে এত বেশী সংখ্যক কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী নেই। বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরেই।

সমস্ত রাজ্যেই ৬ থেকে ১১ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক। ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে এই বয়সের ৮৬ শতাংশ ছেলেমেয়ে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা পাবে। ১২টি রাজ্যে ১১ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক ছেলে মেয়েরা অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান

এই দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির কাজ হ'ল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যায়ণ করা। এই মূল্যায়ণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরিকল্পনা।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

হিসেব

সুনীল জানা

মানব বড়ুয়া

একটাকা দিয়ে একটা লটারির টিকিট কেটে বাড়ি ফিরে বললাম, কার কি চাই বলো এবার। পরশুই আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যেতে পারি এক লাখ টাকা।

আমার স্ত্রী আমার যাবতীয় বদঅভ্যাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিরস্কারের সুর তুলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে দিয়ে উঠলেন, আবার টাকা গচ্চা দিয়ে টিকিট কেটেছো? এক টাকায় ছেলেমেয়ের জন্য ডিম কেনা যেত এক জোড়া।

ওর হিসেবের বহর দেখে হেসে ফেললাম। বললাম, সে তো অনেক কিছুই হতে পারতো তাহলে। ডিম একজোড়া কেন, কলা হতো এক ডজন, বিস্কুট হতো গোটা পনেরো, বোঁদে হতো সংখ্যায় অন্তত হাজার খানেক। তেমনি আবার টাকাও হতে পারে এক লাখ।

ছাই হবে! —সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন।

আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটো এবার পেয়ে বসলো আমাকে। ছেলে তক্ষুণি ছুটে এসে জানতে চাইলো একলাখ টাকা কত টাকা বাবা?

হাসতে হাসতে দু'হাত দিয়ে অনুমানে বিরাট একটা টাকার স্তূপ দেখিয়ে বললাম অনেক টাকা—এই অ্যাতো টাকা।

অতো টাকা পাবে তুমি?—বিস্ময়ে ছেলের চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো।

তবে আর কি বলছি কি! বলতে বলতে ওর পিঠটা চাপড়ে দিলাম। কয়েক-বার উৎসাহ পেয়ে ছেলেটা অমনি বায়না ধরে বসলো, টাকা পেলে আমাকে কি কিনে দেবে বাবা?

বললাম তোকে পুরো টিকিটটাই দিয়ে দেব খেলার পরের দিন। ছবির খাতায় অাঁটিয়ে রাখিস্।

আমার কথা বোধহয় বিশ্বাস করলো না। ঘাড় নেড়ে নেড়ে সমানে তেমনি বলতে লাগলো, না-না, বলো না কি কিনে দেবে? এক ডজন ঘুড়ি কিনে দেবে তো।

মেয়েটাও কিছু কম যায় না। দাদার দেখাদেখি সেও আবদার ধরে বসলো, আমাকে একটা লাল পুতুল কিনে দাও না, বাবা। দাদা আমার পুতুল ছিঁড়ে দিয়েছে।

আমি তাদের বোকামি দেখে হাসতে লাগলাম। বললাম, দূর বোকা, ঘুড়ি পুতুল কিরে—কতো সব ভালো ভালো জিনিস কিনে দেব তখন।

কি কিনে দেবে, বলো না?

চট্ করে কিছু ভালো দামী জিনিসের নাম মনে পড়লো না। বললাম, আচ্ছা, তোকে আর বোনকে পাঁচহাজার করে টাকাই দিয়ে দেব একেবারে। যা তো, তোর খাতা পেন্সিলটা নিয়ে আয় এখানে। কাকে কতো দেব একটা হিসেব কষে ফেলি।

ছেলে বেশ মজার খেলা পেয়ে দৌঁড়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে এলো। আমি জমিয়ে বসে কাগজ কলমে হিসেব কষতে শুরু করলাম, ঠিক আছে—পাঁচ হাজার নয়, তোকে দশ হাজার আর বোনকে পনেরো হাজার দেবো, কেমন?

ছেলে ভারি সেয়ানা। অমনি চেঁচিয়ে উঠলো, কেন বোনকে বেশি কেন?

বললাম, বারে বোনের বিয়ে দিতে বেশি টাকা লাগবে না? আচ্ছা, তোর লেখা পড়া বিলেত যাওয়া ইত্যাদির জন্যে

পনেরো হাজার আর বোনের পড়াশুনা বিয়েটিয়ে নিয়ে কুড়ি হাজার রইলো, ব্যস্‌।

আর মার জন্যে?

তোর মার জন্যে দিলাম পনেরো হাজার। মাঝে মাঝে শাড়িটাড়ি কিনবে, গয়না টয়না গড়াবে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত দিব্বি চলে যাবে ওতে।

ওদের মা এই সময় ঘরে ঢুকলেন, কথাটা কানে যেতেই মুখ বাঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ—দিনরাত শাড়ি গয়না কিনবো, সেই কপালই করে এসেছি কিনা।

উদার গলায় বললাম, ঠিক আছে, কপাল ভালো করে দিচ্ছি তোমার। ওটা তাহলে কুড়ি হাজারই করে দিলাম। শাড়ি গয়নার সঙ্গে সঙ্গে একটা ফ্রিজও কিনে নিও—অনেকদিনের সখ তো তোমার।

তোমার ঐসব আষাঢ়ে গালগল্প শোনার সময় নেই এখন। বলেই উনি বিরক্ত মুখে নিজের কাজে মন দিলেন।

আমি মুচকি হেসে বললাম, মোটেই গালগল্প নয়। যাকে যা দেবার, সব হিসেব নিকেশ করে দায়দায়িত্ব চুকিয়ে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবো এবার। কেউ আর কিছু বলতে পারবে না আমাকে।

ভদ্রমহিলা নিরুত্তর রইলেন। আমি খাতা কলমে পাকা হিসেব কষতে লাগলাম, তাহলে এ পর্যন্ত গেল পঞ্চান্ন হাজার। ইস্‌, এতেই তো অর্ধেক পেরিয়ে গেল দেখছি। যাক্‌গে, এরপর বাবাকে দেব দশ হাজার, মাকে দশ হাজার।—

তোমার মা আবার দশহাজার টাকা নিয়ে কি করবেন এই বয়সে?

স্ত্রীর প্রশ্নে মনে মনে মজা পেলাম। বললাম, তাহলে বাবা-মাকে একসঙ্গেই হাজার পনেরো দিয়ে দিই, কেমন?

তাহলে বুড়ো বয়সে ওঁরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

ওঁদের অবর্তমানে কি হবে টাকাটা তখন?

ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে হাসতে বললাম, ওঁরা ইচ্ছে করলে তোমাকেও দিয়ে যেতে পারেন।

ভদ্রমহিলা চটলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। ওর দিক থেকে আর কোনো সাড়া না পেয়ে আমি আবার হিসেবের দিকে মন দিলাম, এরপর ছোটো ভাইটাকে দিতে হবে পাঁচ হাজার। ছোটো বোনের বিয়ের জন্যেও লাগবে হাজার দশেক। আর হ্যাঁ—জ্যাঠামশাইকে দিতে হবে অন্তত হাজার পাঁচেক। তাহলে মোট হলো—

যোগফল কষার আগেই আমার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ কন্ঠস্বর বেজে উঠলো, জ্যাঠা-মশাইকে পাঁচহাজার কেন? তাঁর কি ছেলে পুলে নেই নাকি?

বললাম, জ্যাঠামশাই ছেলেবেলায় ভীষণ ভালোবাসতেন আমাকে। তিনি চেষ্টা না করলে আমি এতদূর পড়াশুনো করতেই পারতাম না। বরং আরো একটু বেশি তাঁকে দিতে পারলে ভালো হয়।

হ্যাঁ, টাকাকড়িগুলো সব ফুটিয়ে দাও এমনি করে। পাড়ার সব খুড়ো দাদাদেরও বাদ দিও না যেন। রাগে গজগজ করতে করতে হাতের একটা কৌটো প্রায় আছড়ে ফেললেন আমার স্ত্রী।

আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, পাড়ার লোকের কথা তুলছো কেন? জ্যাঠামশাইর কাছে সত্যি অনেক ঋণী আমি। তিনি ছেলেবেলায় আমার জন্যে যা করেছেন—

সবাই তোমার জন্যে সব করেছেন, আমিই শুধু কিছু করিনি। সারাজীবন নিজের জন্যেই তো খেটে মরছি কেবল

বলতে বলতে উনি বোধহয় বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন আমার দিক থেকে।

আমার মুখখানা অমনি শক্ত হয়ে উঠলো। বললাম, আমার আত্মীয় স্বজনদের বেলাতেই তোমার যতো আপত্তি। তাদের প্রতি তোমার কোনো টান না থাকতে পারে, কিন্তু আমার একটা কর্তব্য আছে।

সকলের বেলাতেই তোমার কর্তব্য আছে, শুধু আমার বেলায় ছাড়া!!

বাজে কথা বোলো না। তোমার প্রতি কোন্‌ কর্তব্যটা করিনি আমি?

থাক্‌, আর বলে কাজ নেই। দাও তো বাড়ির দাসী বাঁদীর মতো দু'বেলা দুটো খেতে পরতে. কিন্তু মুখে বড়ো বড়ো কথার কামাই নেই।

রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। অত্যন্ত তেঁতো গলায় বলে উঠলাম, তোমার মনেও যেমন ময়লা, মুখেও তেমনি। আমার সঙ্গে তুমি কথা বোলো না।

গলার সমস্ত বিষ ঢেলে আমার স্ত্রী উত্তর দিলেন, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না করে।

ছেলেমেয়ে দুটো অবাক চোখে আমাদের ঝগড়া দেখছিল। আমার সেদিকে খেয়াল নেই। প্রচণ্ড রাগে হাতের টিকিটটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিতেই ছেলেটা ছুটে গিয়ে তুলে আনলো টিকিটখানা। বললো, টিকিট ফেলে দিচ্ছ কেন, বাবা? তুমি টাকা নেবে না?

ছেলের কথায় খেয়াল হতেই আমি হঠাৎ হো হো করে হেসে ফেললাম। সাহস পেয়ে ছেলে অমনি বলে উঠলো, তাড়াতাড়ি হিসেবটা কষে ফেল। তোমার আর কত থাকলো, বাবা?

হিসেব আমার ইতিমধ্যেই কষা হয়ে গেছে। হাতের পেন্সিলটা নাড়তে নাড়তে তাকে উত্তর দিলাম, আমার হাতে রইলো পেন্সিল।

স্বদেশী বিদেশী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে পুজো করার বাসনার মধ্যে স্বাজাত্যবোধের এমন একটা অহমিকা আছে যেটা বোধ হয় আজকের দুনিয়ায় ঠিক মানায় না। আমাদের পৃথিবীতে দূর যখন ক্রমশই নিকট হচ্ছে তখন পরস্পরের প্রতি নির্ভরতাও ক্রমশ বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এক দেশের ক্ষেতে ফলানো গম খেয়ে অন্য দেশের মানুষ বাঁচছে, অপর দেশের তৈরি পোষাক গায়ে চড়িয়ে আর এক দেশের মানুষ উৎসবে মাতছে। আরব দেশের মাটির নিচের তেল না মিললে ইউরোপ-আমেরিকার যন্ত্রসভ্যতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আবার উন্নত দেশের তৈরি যন্ত্রপাতি না পেলে মাটির নিচের তেল মাটির নিচেই থেকে যায়। এই ধরনের লেনদেন আগেও ছিল, এখন আরো বাড়ছে।

যে-সব জিনিস না-হলে চলে না তার জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করা এক কথা, কিন্তু বিদেশী জিনিস দেখলেই জিভে জল এসে যাওয়া একেবারেই অন্য ব্যাপার। বিদেশী পণ্যের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকই বলতে হয়। দেশী জিনিসতো আমরা রোজই দেখছি, বিদেশী জিনিসটা কেমন তা পরখ করে দেখতে তো মন চাইবেই। কিন্তু এই কৌতূহল যখন নিতান্ত কৌতূহল না-থেকে একটা মাতামাতি হয়ে মারামারির পর্যায়ে পৌঁছয় তখনই তা হয়ে ওঠে দৃষ্টিকটু। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, আমাদের দেশে বিদেশী জিনিস নিয়ে এই মাতামাতিটা অনেক সময় সেই পর্যায়েই পৌঁছয়।

এই ক্রেজ বা মাতামাতির মধ্যে স্বদেশী জিনিস সম্বন্ধে এমন একটা হীনম্মন্যতার ভাব আছে যেটা উগ্র স্বাজাতিকতারই উল্টো দিক। আসলে, যারা এই ধরণের মাতামাতি করে তারা বোধ হয় জানেই না যে এটা হীনম্মন্যতারই প্রকাশ। এই ধরণের হীনম্মন্যতা যে কোনো স্বাধীন দেশের মানুষকেই মানায় না, সেটাও তারা ভুলে যায়। কিন্তু বিদেশী জিনিস নিয়ে এই মাতামাতির আরো অনেক দিক আছে যার ফলে নানা রকম বড় বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়। আজকাল আমাদের দেশে নিতান্ত দরকারি পণ্য ছাড়া আর কিছুই আমদানি হয় না সরকারিভাবে। মোট আমদানির বড় বখরাই চলে যায় অশোধিত পেট্রোলিয়াম, সার আর খাদ্যশস্য আমদানীতে করতে। বাকিটায় হয় প্রধানত অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি বা কাঁচা মাল আমদানী। কিন্তু বিদেশী জিনিসের জন্যে যারা লালায়িত তারা তো আর এই ধরণের জিনিস চায় না, তারা সাধারণত চায় ভোগ্যপণ্য। জামা কাপড়, রেডিও-টেলিভিশন-ঘড়ি, প্রসাধনের জিনিস অথবা সোনাদানা। এখন এই সব জিনিসের আমদানী এক রকম বন্ধ। তবু কিন্তু অনেকেরই বাড়িতে বা গায়ে দেখবেন বিদেশী জিনিস। কেমন করে এটা সম্ভব হচ্ছে? যারা বিদেশে যাচ্ছেন তারা সঙ্গে করে বৈধভাবে কিছু জিনিস আনতে পারছেন, এ-কথা ঠিক। কিন্তু সে-পরিমাণ খুব বেশি হতে পারে না। এই সব বিদেশী পণ্যের বড় অংশই আসছে চোরাচালানের সাহায্যে। অর্থাৎ বিদেশী জিনিসের জন্যে কাড়াকাড়ি একটা সমাজবিরোধী কাজের জন্ম দিচ্ছে।

চোরাচালান বন্ধের জন্যে সরকার গত বছর খানেক খুবই তৎপর। প্রধান-মন্ত্রীর কুড়ি-দফা কর্মসূচিতেও চোরাচালান বন্ধের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির মতো চোরাচালানও শুধু সরকারি আইন বা ব্যবস্থার দ্বারা দূর করা যাবে না। এখানে জনসাধারণেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। জনসাধারণ যদি স্থির করেন স্বদেশী জিনিস যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে বিদেশী জিনিস তাঁরা কখনোই ব্যবহার করবেন না তবে চোরাচালান বন্ধের লড়াইয়ে সেই সংকল্প হবে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার! বিদেশী সার না হলে যদি আমাদের ফসল মার খায় তবে সেই সার আমদানি না করা বোকামি, কিন্তু আমাদের দেশে তৈরি রেডিওতে যখন দুনিয়াজোড়া অনুষ্ঠান শোনায় কোনো অসুবিধেই নেই তখন আমরা কেন কান পাততে যাবো বিদেশী রেডিওয়? এই মনোভাব যদি প্রসার পায় তবে চোরাচালান যেমন বাধা পাবে, তেমনই বাঁচবে বিদেশী মুদ্রা। তবে স্বদেশী-প্রীতি মানেই এই নয় যে, প্রত্যেককে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরতে হবে। আজকে আমাদের দেশে যে-ধরণের কাপড়চোপড় তৈরি হচ্ছে তাতে সর্বাধুনিক ইউরোপীয় পোষাক তৈরিতেও কোনো বাধা নেই।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠবে যে, বিদেশী জিনিস ফেলে যে আমরা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করবো, তা আমাদের স্বদেশী জিনিস কি মানের দিক থেকে বিদেশী জিনিসের সঙ্গে পাল্লা দিতে

পারবে? প্রশ্নটা অবান্তর বলছি না। কিন্তু প্রশ্নটার মধ্যেই যেন একটা হীনম্মন্যতার ভাব আছে। তা ছাড়া এই প্রশ্ন যাঁরা করবেন ধরে নিতে হবে কারিগরি বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বদেশের অগ্রগতির সঠিক খবর তাঁদের কাছে পৌঁছয় নি। এটা আজ সর্বত্রই স্বীকৃত যে, জাপানের বাইরে এশিয়ার মধ্যে আর কোনো দেশে শিল্পের এত শক্তিশালী বুনিয়াদ গড়ে ওঠে নি যেমন উঠেছে ভারতে। প্রয়োগবিদের সংখ্যার হিসেবে ভারতের ঠাঁই দুনিয়ার মাত্র দুটি দেশের পরেই। শিল্পক্ষেত্রে এই ধরণের রূপান্তর ঘটেছে এমন একটা দেশে যাকে স্বাধীনতার সময় বিদেশ থেকে একটা সামান্য সূচও আমদানি করতে হতো। পোখরানের মরুভূমিতে শক্তির কাজে পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং আর্যভট্টের পৃথিবী পরিক্রমা আমাদের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের দু'টো উজ্জ্বল উদাহরণ,। কিন্তু একটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত শিল্প বুনিয়াদ না থাকলে এবং প্রয়োগবিদ্যা একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে না পৌঁছুলে এই কৃতিত্ব সম্ভব হতো না।

আমাদের দেশে তৈরি পণ্যের মান কেমন, তা যাচাই করার সেরা উপায় বোধহয় বিদেশের বাজারে তার চাহিদা কেমন তার খোঁজ নেওয়া। এমন একটা দিন ছিল যখন আমরা নেহাৎই চা, পাট, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি করতাম। এমন একটা দিনও ছিল যখন আমাদের দেশে যে কোনো কল-কারখানা বসাবার জন্যে বিদেশী সহযোগিতার দরকার হতো। আজ কিন্তু অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে। চা-পাট-চিনি ইত্যাদি আমরা রপ্তানী করছি ঠিকই, সেই সঙ্গে করছি অনেক তৈরি জিনিসও। বিদেশে তৈরি পোষাক নিয়ে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক হৈচৈ করেন। কিন্তু ভারতীয় পোষাকের চাহিদাও বিদেশে কিছু কম নয়। খাদি বা তাঁতের জিনিসই শুধু নয়, আমাদের দেশে তৈরি সুতি বা কৃত্রিম কাপড়ের শার্ট বা ট্রাউজার্সও আজ বিদেশে বিকোচ্ছে। সেই রকমই যাচ্ছে বাইসাইকেল, বৈদ্যুতিক পাখা, স্কুটার বা ট্রানজিস্টর রেডিও। এইসব জিনিস যে শুধু কয়েকটি পিছিয়ে পড়া দেশেই রপ্তানি হচ্ছে তা নয়। ভারতীয় বাইসাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে বহু মার্কিন তরুণতরুণী। থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া বা নাইজেরিয়ার মতো পশ্চিম জার্মাণীর রাস্তাতেও দেখা যাচ্ছে ভারতীয় স্কুটার।

অবশ্য শুধু ভোগ্যপণ্য নয়, নানা ধরণের যন্ত্রপাতিও রপ্তানী হচ্ছে এদেশে থেকে। ছোট-খাটো মেশিন টুলস্ তো আছেই, তাছাড়া এই রপ্তানীর তালিকায় রয়েছে কাপড়ের কল, চিনি কল প্রভৃতি কল বসানোর জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। এই সেদিন তেলের কূপ খোঁড়ার জন্যে দশটা রিগ কিনেছে ইরাক আমাদের দেশ থেকে। দুনিয়ার আরো দশটা দেশের তৈরি রিগের পাশে যাচাই করে তবেই ইরাক ভারত থেকে ঐ যন্ত্র কিনেছে। ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপাতি আমরা এখন শুধু তৈরিই করছি না, রপ্তানীও করছি এবং রপ্তানী করছি জাপান, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানীর মতো শিল্পোন্নত দেশে। এখনও এদেশে কোনো বড় ধরণের প্রকল্প রূপায়ণে হয়ত আমাদের বিদেশী কারিগরি বিদ্যার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এখন ভারতীয় প্রয়োগবিদেরাও বিদেশে গিয়ে কল-কারখানা তৈরি করে দিচ্ছেন। সেগুলো শুধু ছোটখাটো কারখানা নয়। দস্তুরমতো ইস্পাত কারখানা তৈরি করে দিয়ে আসছেন ভারতীয় এঞ্জিনিয়াররা। আর অন্যান্য অগ্রসর দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই তাঁদের এই সব কাজের বরাত পেতে হচ্ছে।

এই সব তথ্য থেকেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের দেশে তৈরি পণ্যের মান বা আমাদের দেশের প্রয়োগবিদদের ক্ষমতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের অভ্যাস যে শুধুই স্বদেশাভিমানের ব্যাপার, তা মনে করা ভুল। এর একটা নিতান্ত ব্যবহারিক দিকও আছে। আমরা যতো বেশি স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করবো আমাদের কল-কারখানার ততোই বাড়বাড়ন্ত হবে, ততোই আরো বেশি লোক কাজকর্মের সুযোগ পাবে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেওয়ার যে একটা স্বাভাবিক আনন্দ তা তো আছেই। অবশ্য মা এখন যে কাপড় (বা অন্যান্য জিনিস) দিচ্ছেন তা মোটেই মোটা নয়।
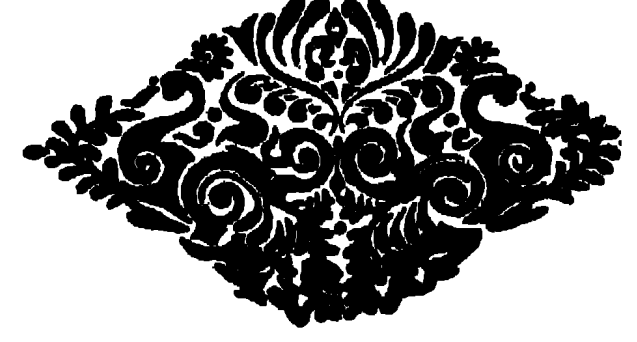
সেচ ও বিদ্যুতের বরাদ্দ বৃদ্ধি

পরিকল্পনা কমিশন কয়েকটি নির্বাচিত সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণের জন্য চলতি বছরে অতিরিক্ত ৭৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। এর মধ্যে ৪৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সেচ প্রকল্প ও ২৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য খরচ করা হবে।

অতিরিক্ত বরাদ্দের দ্বারা যে সব সেচ প্রকল্পগুলি মঞ্জুর করা হয়েছে তার মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গের কংসাবতী প্রকল্প। এছাড়া অন্যান্য প্রকল্পগুলি হল গণ্ডক (বিহার), ডেল্টা (ওড়িশা), মালপ্রভা (কর্ণাটক), কাদনা ও মহী বাজাজসাগর (গুজরাট), জহরলাল নেহেরু লিফট ইরিগেশন স্কীম (হরিয়ানা)। এছাড়া যে সব বিদ্যুৎ প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে তার মধ্যে আছে সুবর্ণরেখা (বিহার), অমরকণ্টক ও সৎপুরা (মধ্যপ্রদেশ), হৃষিকেশ—হরিদ্বার (উত্তরপ্রদেশ), ইদিক্কি (কেরালা), কালীনদী (কর্ণাটক) প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্য সরকারগুলিকে প্রতিটি প্রকল্পের পরিবর্তিত কর্মসূচী গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে চলতি বছরেই লক্ষ্য পূরণ করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। কাজের প্রকৃত অগ্রগতি অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

মুখোমুখি

আমি তো আকাশের কথা লিখিনা, আমি তো নদীর কথাও লিখিনা, আমি তো মানুষের কথাও লিখিনা। আকাশ নদী ও মানুষ আমার চিত্তে যে ভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আমি সেই কথাটাই লিখি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক কালের জনপ্রিয়তম বাংলা কবিতা কোনটি? জিজ্ঞেস করলেই প্রতিটি সাহিত্য-রসিক একবাক্যে রায় দেবেন, 'কলকাতার যীশু।'

'ট্রৈবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের
দাঁতের ঘষটানি
কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই;
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত-মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টালমাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে
চলেছ।'

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতাটির ব্যঞ্জনা ও সাবলীলতা নাড়া দেয় প্রতিটি পাঠকের চিত্তে। তাঁর অননুকরণীয় রচনাশৈলী তাঁকে তাই অসমান্য জনপ্রিয়তা দিয়েছে।

'আধুনিক কবিতার লেখক যত, পাঠক তত নয়।' আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার প্রতি কটাক্ষ করা এই উক্তিটিকে মিথ্যে প্রমাণিত করেছেন শক্তিমান জনপ্রিয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জন'। সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬১ বঙ্গাব্দে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়—'অন্ধকার বারান্দা', 'নীরক্ত করবী', 'নক্ষত্র জয়ের জন্য', 'উলঙ্গ রাজা' প্রভৃতি। কবিতা বিষয়ক আলোচনার অনবদ্য গ্রন্থ 'কবিতার ক্লাস' কবিতার আঙিনায় প্রবেশে উৎসাহী-দের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয় সহজ করে বোঝাবার বিশেষ ভঙ্গিমার জন্য। স্মৃতি-চারণমূলক তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পিতৃ পুরুষ' নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিশেষ সংযোজন।

নীরেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় শব্দ ও ছন্দের বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখতে পাই। সে সময় তাঁর কবিতা এগিয়েছে একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথে। নিজের মনের আয়নায় মুখোমুখি বসে তিনি উপলব্ধি করেছেন জীবনলোকের জটিল অসহায় রহস্যময় অস্তিত্ব। শব্দচয়ন, ছন্দবদ্ধতা ও সাবলীলতায় প্রথম দিকের কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে শক্তিমান লেখকের অনবদ্য রচনাশৈলীর স্বাক্ষর বহন করে।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কবিতাতে দেখতে পাই জীবন পর্যবেক্ষণের নিখুঁত প্রয়াস। কবিতার নিজস্ব মহিমাকে অবিকৃত রেখে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি কবিতার ভাষা ও আঙ্গিককে করে তুলেছেন সহজ-সরল। তাঁর লেখার অননুকরণীয় ভঙ্গি তাঁকে অনন্য কবির আসনে বসিয়েছে। স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। ১৯৭৫-এর অ্যাকাডেমি পুরস্কার যে শক্তিমান বাঙালী কবিকে স্বীকৃতি জানাল, তিনি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
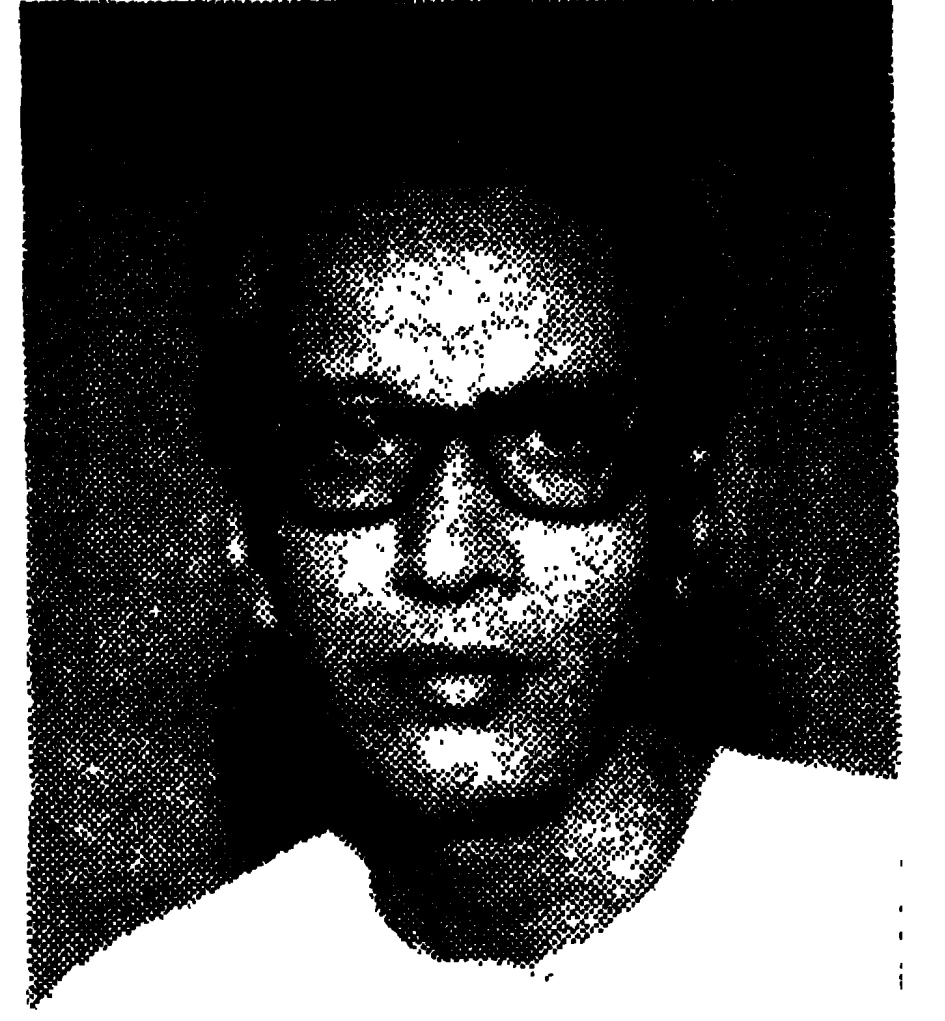
সমকালীন বাংলা কবি ও কবিতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন নিয়ে কদিন আগে গিয়েছিলাম এই বিশিষ্ট কবির কাছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বর্তমানে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হলেও সব কবিই নিশ্চয় আধুনিক কবি নন, এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

—আধুনিকতা আসলে বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, বললেন নীরেন্দ্রনাথ। এমন বিষয় অনেক দেখবেন, যা নিয়ে আজ থেকে পাঁচ-সাত'শ বছর আগেও কবিতা লেখা হয়েছিল, এখনও হচ্ছে। যেমন ধরা যাক প্রেম। বিষয় হিসেবে প্রেম কখনও পুরোনো হয়না। মানুষের আশা আকাংখা, স্বপ্ন, যন্ত্রণা, সুখ, দুঃখ, কিছুই বিশেষ করে একটা কোন যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু সেগুলিকে প্রকাশ করবার ধরণ ধারণ যুগে যুগে

চিঠিপত্র
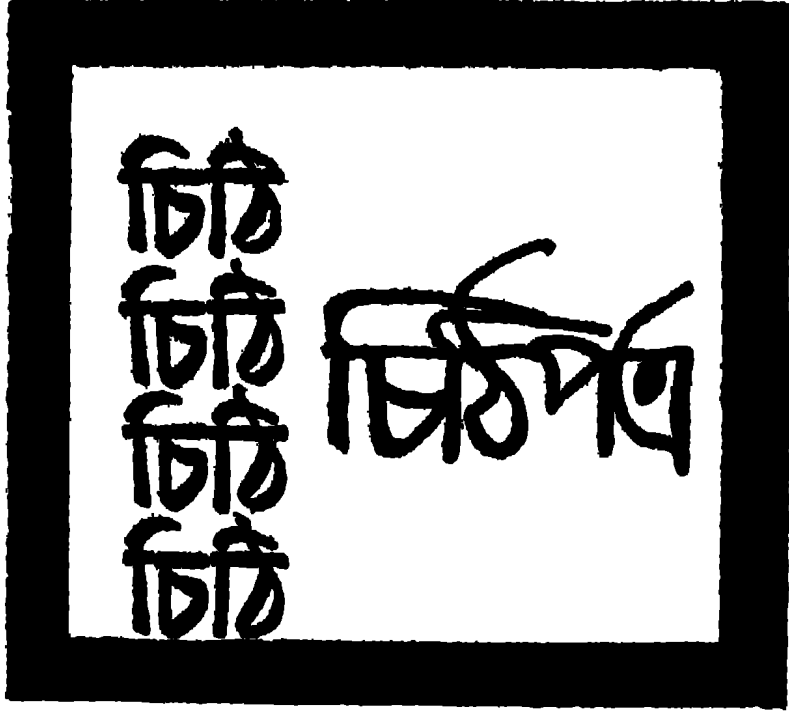
মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত "ধনধান্যে"র স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা সৌভাগ্যবশত আমার হস্তগত হয়েছে, এবং আদ্যোপান্ত পাঠ করে সবিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। সত্যিই এ'পত্রিকাখানি "উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক"। প্রত্যেকটা রচনা নিছক বস্তুগত হলেও সাহিত্য-রস বঞ্চিত নয়। 'সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত' রচনাটিতে সমস্যার মাঝে সমাধান খোঁজার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে।

আপনার সুললিত পত্রিকাখানি দুর্দশা-গ্রস্ত মানুষের কল্যাণের প্রেক্ষিতে কাজ করে যাচ্ছে। "ধনধান্যে"র অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়।

সরকারী ও বেসরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়সাধনার্থক পর্যালোচনায় আপনার পত্রিকাখানি যে নোতুন দিগন্তের অবতারণা করে চলেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

"পশ্চিমবঙ্গ : পর্যটন উন্নয়ন" শীর্ষক নিবন্ধটি নাতিদীর্ঘ হলেও বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা আছে। আলোচনাটার একটা স্বতন্ত্র চেহারা আছে। উক্ত রচনাটিতে পশ্চিমবঙ্গ যেন কথা বলেছে।

মুহাম্মদ হারুণ-উর-রশীদ
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

পালটায়। প্রেমের কথা আগেও লেখা হত, এখনও হয়, কিন্তু আগে যেমন করে লেখা হত এখন ঠিক তেমন করে আর হয় না। এ পরিবর্তনকে যিনি মেনে নেন, আমি তাঁকেই বলি আধুনিক কবি।

—আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, এ বিষয়ে কিছু বলুন।

—এটা আসলে খুব মস্ত বড় ব্যাপার। এই নিয়ে যদি সার্বিকভাবে আলোচনা করতে হয় তো অনেক জায়গা লেগে যাবে। খুব সংক্ষেপে বলি। দুর্বোধ্যতা হয় দু রকমের। প্রথমত ভাষাগত, দ্বিতীয়ত ভাবগত। ভাষাগত দুর্বোধ্যতার একটা কারণ এই যে, কিছু কবি কিছু শব্দকে সেই সেই অর্থে ব্যবহার করতে চান, যেগুলি তাদের মৌলিক অর্থ, কিন্তু যে অর্থের আশ্রয় তারা আগেই পরিত্যাগ করেছে। যেমন ধরা যাক 'সচরাচর' কিম্বা 'সামান্য' এই দুটি শব্দের কথা। তাছাড়া আছে অ-প্রচলিত কিম্বা অ-পরিচিত শব্দাবলী। কিন্তু কবিরা যে সেই সব শব্দ কেন ব্যবহার করতে চান সেটাও আমাদের বোঝা দরকার। আর ভাবগত দুর্বোধ্যতার ব্যাপারে বলি, কবিরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের পাঠকদের চাইতে কিছুটা পথ এগিয়ে থাকেন, ফলে এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁরা কবিতা লেখেন যার তাৎপর্য ঠিক সেই সময়কার পাঠকের কাছে ততটা স্পষ্ট নয়। বস্তুত এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায় যে, সমকালের যে কবি দুর্বোধ্য বলে ধিকৃত হয়েছেন, পরবর্তী-কালের পাঠকদের পক্ষে তাঁকে বুঝতে পারা তেমন কিছু শক্ত হয়নি। কিন্তু সে কথাও থাক। মূল সমস্যাটা হচ্ছে এইখানে যে আমরা একই সঙ্গে কবির কাছে পরস্পরবিরোধী দুটি প্রার্থনা পেশ করছি। আমরা আশা করছি তিনি নতুন কিছু লিখবেন, কিন্তু লিখবেন আমাদের পুরোনো চেনা ভঙ্গিতে, যাতে নতুন কিছুর মর্ম উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। আমরা ভেবেও দেখছিনা যে, নতুন কিছু যিনি লিখবেন, প্রকাশের ভঙ্গিতেও তাঁর পক্ষে নতুন হতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

—অনেকে প্রগতিশীল কবিতার নামে বক্তব্যমুখর কবিতা লেখেন, জীবন বিচ্ছিন্ন কোন শুদ্ধ কাব্যের আদর্শে বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

—আমি প্রগতির ব্যাপারটা ভাল বুঝিনা। তবে এইটে বুঝি, যেটাকে সর্বজনে যেমন দেখছে, ঠিক তেমনি করে সেটাকে দেখতে গেলে কবিতা না লিখে কবিকে কিছু পদ্য লিখতে হবে। আমার কথাই বলি। আমি তো আকাশের কথা লিখি না, আমি তো নদীর কথাও লিখিনা, আমি তো মানুষের কথাও লিখিনা। আকাশ নদী ও মানুষ আমার চিত্তে যে ভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আমি সেই কথাটাই লিখি।

—বর্তমানে যাঁরা লিখছেন তাঁদের মধ্যে আপনার প্রিয় কবি কারা?

—আলাদা করে কারো নাম করতে চাই না। তবে অনেকেই আমার প্রিয় কবি ও তাঁরা অনেকেই বয়সে আমার চেয়ে ছোট।

—ইহ জগতে আর নেই, এমন কোন্ কবি আপনার সবচেয়ে প্রিয়?

—কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস।

—আপনি আর কোনও উপন্যাস লেখার কথা ভাবছেন কি?

—'পিতৃপুরুষ'-এর জের টেনে হয়-তো একটা লিখতে পারি।

—অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার কথা জানার পর আপনার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

—মনে হয়েছিল আমার চাইতে প্রবীণ, আমার চাইতে যোগ্য অনেকে রয়েছেন, তাঁদের কেউ পেলেই ভাল হত। আমার দিকে নজর পড়ল কেন জানিনা।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে যখন বেরুলাম তখন রাত প্রায় দশটা। রাস্তায় নেমে ভাবছিলাম এ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিনয়-নম্র কথা কটি। মানুষ নীরেন দা, বন্ধু বৎসল নীরেন দা, দীর্ঘদেহী সু-বক্তা নীরেন দাকে আমি চিনতাম, আজ পরিচিত হলাম তাঁর সহজ-সরল নিরহংকার শুভ্র মনের সঙ্গে।

সাক্ষাৎকার : **প্রবীর ঘোষ**

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

সমগ্র দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশ দফা কর্মসূচির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় যথাক্রমে রয়েছে কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা কার্যকর করা, উদ্বৃত্ত জমি দ্রুত বণ্টন এবং ভূমি-সংক্রান্ত রেকর্ড সংকলিত করা ও ভূমিহীন তথা দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য বাস্তুজমির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই বিশ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হবার আগে থেকেই এসব দিকে নজর দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর স্বভাবতই সেই কর্মধারা আরো জোরদার করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন (১৯৫৫) এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৭১—এই দুটি আইন অনুসারে এ রাজ্যে সরকারে ন্যস্ত কৃষি জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দশ লক্ষ একরের কিছু বেশী, আদালতের ইনজাংশনের আওতায় রয়েছে আরও ৯১,০০০ একর জমি। ন্যস্ত কৃষিজমির মধ্যে সরকারের অধিকারে এসেছে ৮.৪০ লক্ষ একর, এর মধ্য থেকে ইনজাংশনের আওতায় ৬৮,০০০ একর ও বিলি করার পক্ষে অনুপযুক্ত ১.৫ লক্ষ একর জমি বাদ দিলে বিলি-যোগ্য জমি দাঁড়ায় ৬.২২ লক্ষ একর। এ পর্যন্ত, রাজ্য সরকারের হিসেব মতে, প্রকৃত পক্ষে বিলি হয়েছে মোট ছয় লক্ষ একরেরও বেশী কৃষিজমি—তার মধ্যে ৫.৬ লক্ষ একর পেয়েছেন ভূমিহীন কৃষক কিংবা ক্ষুদ্র চাষী। এই জমি বিলির ফলে মোট উপকৃত কৃষিজীবির সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ২.৮ লক্ষ মানুষ, তপশীলভুক্ত ১.৭ লক্ষ আদিবাসী এবং ১.৩ লক্ষ মুসলমান।

জমিতে ফসল থাকলে ন্যস্ত কৃষি জমির অধিকার গ্রহণ এবং সে-জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণে বাধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে অনেক সময় কাজের গতি প্রতিহত হয়ে থাকে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, জমির ফসলের কোন ক্ষতি না হয় এভাবে যেন তাড়াতাড়ি জমি অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। আদালতের মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টাও সরকার করছেন যাতে ন্যস্ত জমির অধিকার নেওয়া ও তা' বিলি করার কাজ আরও ত্বরান্বিত হয়।

প্রচলিত জমির খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছিল ১৯৬৩-এর পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন অনুসারে। ঐ আইন এখন অনেকাংশে কালের সঙ্গে সংগতি-হীন হয়ে যাওয়ায় ভাল করে তার সংশোধন দরকার। সেইমত, পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা বাদে রাজ্যের সর্বত্র সংশোধিত ভূমি বন্দোবস্তের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা এবং ইসলামপুর মহকুমায় এই বন্দোবস্তের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। গত কয়েকমাসে নতুন ৮,৪০০-রও বেশী মৌজায় জমি বন্দোবস্তের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এ বছর আগষ্ট অবধি যে ৮,৪০০-টি মৌজায় জমি বন্দোবস্তের কাজ শেষ হয়েছে সেখানে মোট দেড় লক্ষেরও বেশী বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে আরও ৩০,০০০ মৌজায় জরিপ ও জমি রেকর্ডের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ১৮,০০০ ব্যক্তি কর্মনিরত রয়েছেন। আদিবাসী জনগণ ও সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষ যাতে জমির ব্যাপারে তাঁদের আইন-সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

ভূমিহীন ও গৃহহীন ব্যক্তিদের মধ্যে বসত জমি বিলি করার পরিকল্প পশ্চিম-বঙ্গে চালু হয় ১৯৭৩-৭৪ সালে। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রারম্ভে এই পরিকল্প রাজ্যের এক্তিয়ারে অর্পিত হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এই বিলির কাজকর্ম বিশেষ ভাবে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার স্থির করেন, গ্রামীণ এলাকায় বাস্তুজমি বিলির কাজ ১৯৭৫-এর ২ অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। এই অঙ্গীকার পালিত হয়েছে। বাস্তুজমি পাওয়ার যোগ্য সকল গৃহহীন পরিবারই মোটামুটিভাবে বসত জমি পেয়ে গেছেন। এরূপ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২.৭ লক্ষ। এঁদের মধ্যে তফশীল সম্প্রদায়ভুক্ত-পরিবার ১.২ লক্ষ, আদিবাসী পরিবার ৪৬,০০০ এবং মুসলমান পরিবার ৪৪,০০০। বিলিকৃত বসতজমির মোট পরিমাণ ৮,৫৮১ একর। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে বাস্তুজমি দখল সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করেছেন। আইনটির উদ্দেশ্য—গ্রামাঞ্চলে ভাড়া বাড়ি বা ঘরের সংখ্যা কমান। গত ২৬ জুন যেসব ব্যক্তি বা পরিবার যে জমি বা বাড়ীতে বাস করছিলেন তাঁদের উচ্ছেদ করা চলবে না। ভাড়াটিয়াই জমি, বাড়ি বা ঘরের মালিক হবেন। সরকার পুরনো মালিককে সংশ্লিষ্ট জমি, বাড়ি বা ঘর থেকে বার্ষিক মোট আয়ের দশগুণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেবেন। সাধারণভাবে কৃষিমজুর, গ্রামীণ কারিগর এবং মৎস্যজীবিরা এই আইনের সুবিধা পাবেন।

গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার কাজে ভূমি-সংস্কারের কোন বিকল্প নেই, কারণ সে-অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা কৃষিকেন্দ্রিক। ভূমিহীন কৃষককে যদি যে-জমিতে তিনি চাষ করেন তার উপর মালিকানা স্বত্ব না দেওয়া হয় তবে স্বাভাবিক কারণেই সে-জমি চাষে তাঁর আগ্রহ কমে যায়। আর চাষের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ না দিতে পারলে রাজ্যের পক্ষে যেমন খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি সহজ নয় শিল্পে কাঁচা মাল যথেষ্ট পরিমাণে যোগান দেওয়া। রাজ্য সরকার তাই তাঁদের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন: কৃষিজমির মালিকানায় উর্দ্ধসীমা নিম্নতর স্তরে নির্ধারণের পরবর্তী স্তরের কার্যাবলী; প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও ছোটছোট চাষীদের মধ্যে বিতরণ; এবং অপরের জমি যাঁরা চাষ করেন (বর্গাদার), জমিতে তাঁদের স্বার্থ সর্বাধিক—এই নীতির স্বীকৃতি স্বরূপ জমি চাষ করার ব্যাপারে এবং উৎপন্ন ফসলের অংশে তাঁদের অধিকার সংরক্ষণ।

জমিদারী উচ্ছেদ আইন বলবৎ হবার পর গত ২০ বছরে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত কৃষিজমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাসদখলে এসেছে তার অর্দ্ধেকও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা সম্ভব হয় নি নানা কারণে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর কীভাবে এই কাজ আরও জোরদার করা হয়েছে তা প্রথমেই বলা হয়েছে।

আইনে ভূস্বামীদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাঁরা তাঁদের উদ্বৃত্ত জমি যেখানে ইচ্ছা, যেরকম ইচ্ছা সরকারকে দিতে পারেন। তবে মোট উদ্বৃত্ত জমি দিতেই হবে। অনেক সময়ই দেখা গেছে, ভূস্বামীরা ছোট ছোট টুকরা চাষের অযোগ্য জমি সরকারকে দিয়ে থাকেন। ফলে ও জমি সরকারে ন্যস্ত হলেও বিশেষ কোন কাজে আসে না। অবশ্য রাজ্য সরকার সম্প্রতি ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে ভূম্যাধিকারীর হাত থেকে বদৃচ্ছ জমি ছাড়বার অধিকার নিয়ে নিয়েছেন। সংশোধিত আইনটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে ভূমি সংস্কারের জন্য জমির হালফিল স্বত্বলিপি প্রয়োজন। হালফিল স্বত্বলিপি (রেকর্ড অব্ রাইট্স্) থাকলে কৃষি উন্নয়ন মূলক প্রকল্প রূপায়ণেও সুবিধা হয়। এখন যে স্বত্বলিপি রয়েছে তা জমিদারী দখল আইন কার্য্যকরী করার সীমিত উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল। তাছাড়া সরকারের ভূমিসংস্কার নীতি কার্যকর করার জন্যও অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন। তাই প্রায় ১৪ টি জেলায় রিভিশন্যাল সেটেলমেণ্টের কাজ সুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাগুলিতে "পতিত" জমির পরিমাণ অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশী, কারণ ও অঞ্চলে ডাঙ্গা জমির ভাগ সমধিক। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও সেচ বিস্তারের সহায়তায় অনেক উষর জমি উর্বর হয়েছে কিন্তু সরকারী নথীপত্রে তাদের শ্রেণী-বিন্যাস বদলায় নি। এ ব্যাপারেও রাজ্য সরকারের ল্যাণ্ড রেকর্ড ডাইরেক্টার তদন্ত সুরু করেছেন।

হাইকোর্টে যে ১০,৬০০ মামলা ঝুলছে তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার কলকাতায় একটি সিভিল রুল সেল তৈরী করেছেন।

উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতি ব্লকে পরামর্শদাতা কমিটি রয়েছে। এই ৩৩৫ টি কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ব্লক ডেভেলপ্-মেণ্ট অফিসার, সিনিয়ার রেভেনিউ অফিসার এবং জুনিয়ার ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অফিসার; তাছাড়া আছেন জন প্রতি-নিধি যথা স্থানীয় এম. এল. এ. ও পঞ্চায়েতের সদস্য। পরামর্শদাতা কমিটি-গুলিতে বেসরকারী সদস্যের আধিক্য রাখা হয়েছে যাতে জনপ্রতিনিধিগণই একদিকে ভূস্বামীকে ও অপরদিকে ভূমিহীনদের প্রতি প্রকৃত সুবিচার করতে পারেন।

এবছরের জুন মাস পর্যন্ত হিসাব করে রাজ্য সরকার দেখেছেন, সরকারে ন্যস্ত মোট প্রায় ১৩৬,০০০ একর জমি ভূমি-হীনদের মধ্যে বিলি করা সম্ভব হয় নি কারণ সরকারী নথীপত্রে এ জমি "কৃষির অনুপযুক্ত"। সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে এই সব জমিকে দেখান হয়েছে সেচের পুকুর, খাল, বাস্তভূমি প্রভৃতি হিসাবে। ভূস্বামীগণ কিন্তু এই জমিই তাঁদের উদ্বৃত্ত কৃষিজমি বলে সরকারকে দিয়েছেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের বলবেন তদন্ত করে দেখতে এই জমির কতখানি চাষে আনা যায়। তদন্তের ফলে যদি দেখা যায় যে বেশ কিছু জমি হাসিল করে চাষে আনা সম্ভব তবে রাজ্য সরকার ঠিক করবেন জমি হাসিল করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কাছে অর্থ সাহায্য চাইবেন। রাজ্য সরকার আরও ঠিক করেছেন, এই জমি হাসিলের কাজ সুরু হবে আদি-বাসী অধ্যুসিত অঞ্চলে যাতে এই প্রকল্পের সুযোগ সর্বাগ্রে দুর্গত ও দুর্বল শ্রেণীর জনগণ পেতে পারেন। তাছাড়া জমি হাসিলের দুঃসাধ্য কাজে কঠোর পরিশ্রমী আদিবাসী যুবকই বেশী উপযুক্ত। অনুরূপ জমি বেশী রয়েছে মেদিনীপুর (৫৯,০০০ একর), পুরুলিয়া (১৭,৫০০ একর) এবং মালদা (১১,০০০ একর) জেলা-গুলিতে। এইসব জেলাতেই আবার আদিবাসীদের সংখ্যা তুলনীয়ভাবে বেশী।

রাজ্য সরকার ২৩শে মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ভূমি সদ্ব্যবহার সংস্থা (ল্যাণ্ড ইয়ুজ বোর্ড) স্থাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই সংস্থার সভাপতি এবং সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ভূমি সদ্ব্যবহার, কৃষি, সেচ ও বন বিভাগের মন্ত্রীগণ। কেন্দ্রের নির্দেশে রাজ্যে রাজ্যে এই সংস্থা স্থাপিত হচ্ছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার একটি ল্যাণ্ড ইয়ুজ কমিশন আগেই গঠন করেছেন।

১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

রবিমরশুমে উৎপাদনের লক্ষ্য

নীলমণি মিত্র

পশ্চিমবাংলায় খাদ্য-শস্য উৎপাদনে রবি শস্যের ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল, একথা সন্দেহাতীত। রাজ্যের মোট খাদ্য-শস্য উৎপাদনে যদিও রবি শস্যের অবদান শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ, তবু একথা সত্য যে, রবি শস্যের ফলনে অনিশ্চয়তা খুবই কম। তার কারণ সেচ ব্যবস্থা। রাজ্যের যে সমস্ত এলাকায় নিশ্চিত সেচের সুযোগ রয়েছে, সেই সব এলাকায় রবিখন্দে শস্য-সম্ভার সৃষ্টি করা যাবে। এই সেচের নিশ্চয়তার জন্যেই অধিক ফলনশীল ধান, গম ইত্যাদি থেকে অধিক ফলনের সুযোগ নেয়া যাবে। তা ছাড়া আরো ভরসা হ'ল, রোগ-পোকার উৎপাত রবিখন্দে খুব কম। ফলে একদিকে যেমন চাষে ওষুধের খরচ, ওষুধ দেয়ার মজুরী ইত্যাদি বাঁচে তেমনি অন্যদিকে রোগ-পোকায় শস্য নষ্ট হবার কারণ না থাকায় ফলনও ভালো হয়। এই সমস্ত কারণে আমাদের খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে রবি মরশুম এক উজ্জ্বল আশা-ভরসা।

আসন্ন রবি মরশুমের অধিক উৎপাদনে রাজ্যের সেচ-সুযোগের ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য। বৃহৎ সেচ প্রকল্প ছাড়া ক্ষুদ্র সেচের মধ্যে গভীর নলকূপ নদী সেচ প্রকল্প, অগভীর নলকূপ, সাধারণ কূপ, পুকুর খনন ও সংস্কার, বিল ইত্যাদির মাধ্যমে সেচ শক্তির প্রসার ঘটানো হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। ১৯৪৭ সালে রাজ্যের মোট সেচ-সুযোগ ছিল মাত্র ১৯ লক্ষ একর জমিতে। তা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে প্রায় ৫৩ লক্ষ একর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া, এ বছরের জরুরী খাদ্যোৎপাদন প্রকল্পে ৪১৬৬টি অগভীর নলকূপ বসানো, ৬২৫টি কূপ খনন এবং ৫০০টি পুকুর খনন বা সংস্কার করা হবে। এই প্রকল্পে আরও কিছু গভীর নলকূপ, নদী সেচ প্রকল্প ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। আশাকরা যায়, এর ফলে আরও প্রায় ৫৬ হাজার একর জমিতে সেচের সুযোগ বাড়ানো যাবে।

রবিখন্দে গুরুত্বপূর্ণ ফসল গমের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে মাত্র ২২ হাজার টন গমের উৎপাদন ছিল এ রাজ্যে। কিন্তু আজ একর প্রতি গড় ফলনে গম উৎপাদনে শীর্ষ স্থানাধিকারী রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়াণা প্রভৃতির সমমর্যাদা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের। গত বছরে গমের জমি ছিল প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ একর এবং ফলন হয়েছিল প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টন। এ বছর এই উৎপাদনের লক্ষ্যসীমা বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টন স্থির করা হয়েছে। গমের জমির লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ একর। সম্প্রতি রাজ্য সরকার জেলা কৃষি আধি-কারিকদের এক সম্মেলনে এই মর্মে এক নির্দেশ দিয়েছেন যে এ বছর সেচের সমস্যার জন্যে বোরো ধানের চেয়ে গমের জমি বাড়ানোর দিকে অধিকতর লক্ষ্য দিতে হবে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পো-রেশন এ বছরে রবিখন্দে কৃষকদের দশ হাজার টন এন-এস-সির সার্টিফায়েড বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া, তরাই ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন আরও ৩,৬০০ টন সার্টিফায়েড গম বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। আশা করা যাচ্ছে, সার সরবরাহও মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন সোনালিকা জাতের গম খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু জনক ও অন্যান্য উন্নত জাত কৃষকদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবছর ৮৮ হাজার গমের মিনিকিট প্রদর্শন ক্ষেত্র কৃষকদের নিজের জমিতে স্থাপন করা হবে। এর ফলে কৃষকরা নিজেদের জমিতে ঐ সব উন্নত জাতের ফলাফল দেখতে পারবেন।

রবিমরশুমে বোরো ধানের গুরুত্ব অনেক। এরাজ্যে বোরো ধানের জমির পরিমাণ খুব বেশী না হলেও, উৎপাদনের আশ্চর্য শক্তিতে বোরো ধানের অবদান অভাবনীয়। ১৯৪৭ সালে এ রাজ্যে বোরো ধানের এলাকা ছিল মাত্র ২৫ হাজার একর এবং উৎপাদন ছিল মাত্র সাড়ে ন হাজার টন। গত বছরে এলাকা বেড়ে হয়েছে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ একর এবং উৎপাদন দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টন। ১৯৭৫-৭৬ সালে বোরোর এলাকা ও উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছিল যথাক্রমে ১১ লক্ষ একর এবং ১১ লক্ষ টন। কিন্তু সেচের জল পাওয়ার ব্যাপারে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় এখন বোরোর চাষ এলাকার লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ১০ লক্ষ একর। গমের মতন বোরো ধানেরও ৬৮ হাজার মিনিকিট প্রদর্শন ক্ষেত্র কৃষকদের জমিতে স্থাপন করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় সরষের। কিন্তু সেচের সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গমের জমিও বেড়ে যাচ্ছে বলে সরষের জমি তেমন বাড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই উন্নত জাত ব্যবহার করে একর প্রতি ফলন বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। বহরমপুরের ডাল-শস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে টোরি বি-৫৪, রাই বি-৮৫, টি-৫৯, এ্যাপ্রেষ্ট মিউটাণ্ট, শ্বেত সরষে বি-৯ ইত্যাদি জাত কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। তৈল বীজের সমস্যা মেটাতে তিলের কিছু অবদান স্বীকার করতে হয়। বর্তমানে আলুর জমিতে ব্যাপক হারে তিল চাষ করা হচ্ছে।

শ্রী মিত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, কৃষি বিভাগ।

তিলের মোট জমির পরিমাণ এখন ৩৫ হাজার একর। সম্প্রতি রাজ্যে সূর্যমুখীর চাষ বাড়ানো হচ্ছে। সুন্দরবনে যে সব জমি আমন ধান কাটার পর পাওয়া যায় সেখানে বিনা সেচে রবিতে সূর্যমুখী চাষ হচ্ছে। দেখা গেছে একরে প্রায় ২ কুইণ্টাল তৈলবীজ পাওয়া যায়। এ বছর ১২ হাজার একরে সূর্যমুখী চাষের লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে। ডালের একর প্রতি ফলনও বাড়ানো দরকার। তাই কোন্ জমিতে কোন্ জাত উপযোগী তা দেখতে এ বছর কৃষকদের উন্নত জাতের ডালবীজ এবং জীবাণু সার সহ প্রচুর মিনিকিট বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ একর জমিতে বর্তমানে মাত্র ৩.৭৫ লক্ষ টন ডাল উৎপন্ন হচ্ছে, এরাজ্যে যা আমাদের চাহিদার মাত্র অর্ধেক পরিমাণ।

রবি মরসুমে ফসলের মধ্যে আলুর গুরুত্ব যথেষ্ট। বলাবাহুল্য আলুর উৎপাদন বেড়েই চলেছে। গত বছরে ২ লক্ষ একর জমি থেকে আলুর ফলন হয়েছে প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টন।

রাজ্যের খাদ্য-সংকট ও ঘাটতি মেটাতে খাদ্য শস্য উৎপাদনে এবারা বছরের লক্ষ্যসীমা নেওয়া হয়েছে ৭০ লক্ষ টন। এই খাদ্য-শস্যের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ উৎপন্ন হবে রবি মরশুমে। আশা করা যায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে রবি মরসুমের উৎপাদন অনেকখানি সহায়ক হবে।

গ্রন্থ আলোচনা
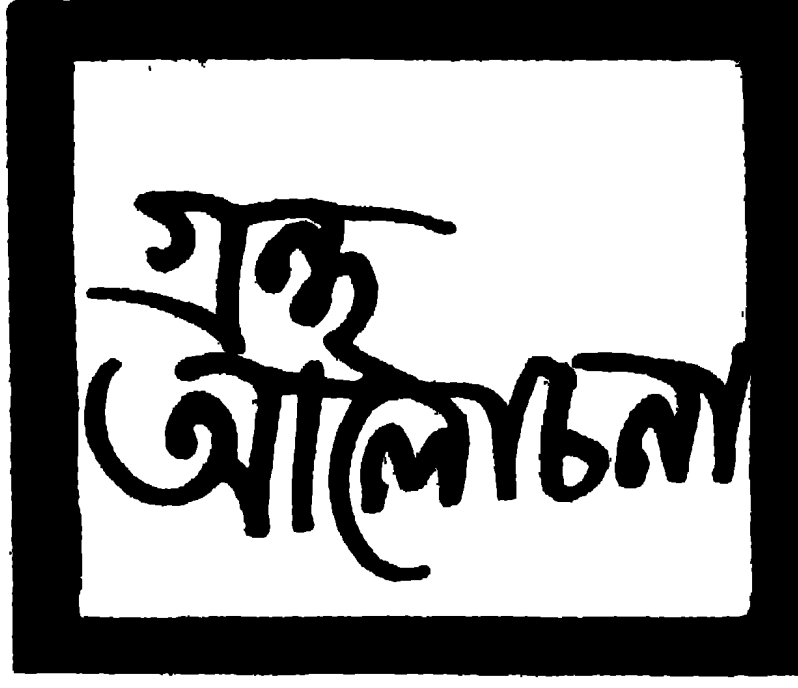
স্মৃতি সান্ত্বনা ও অভীষ্ট সংলাপ

শান্তি রায় ও শিবদাস চট্টোপাধ্যায়। কোতুলপুর বাঁকুড়া। দাম দু'টাকা।

স্মৃতি সান্ত্বনা ও অভীষ্ট সংলাপ একটি যুগল কাব্য গ্রন্থ। এই কাব্য গ্রন্থটি শান্তি রায়ের কিছু তির্যক সান্ত্বনা আর শিবদাস চট্টোপাধ্যায়ের কিছু স্মিতিঃরক্ত নিয়ে গড়া।

কবি পাঠককে তাঁর গোপন সিন্দুকের চাবিকাটিও দিতে ভোলেন নি। 'চির হরিৎ সান্ত্বনার পাখিগুলি নিমগ্ন উড়ালের কাছে হৃদয়ের চাবি খুঁজে পায়।' শান্তি রায় প্রেমে খুবদুরন্ত। এবং দীর্ঘ জীবনসাঁকোয় একবার এপার ওপার করেছেন। অথবা শঙ্কাহীন হৃদয়ের বনে নিজেই পায়চারী করেছেন সকালে বিকালে। 'রূপকথা বলো, মশাইরা, তোমাকে নিয়ে কবিতাগুলি ভালো মানের। জীবনে হতাশা থাকলে বিন্দু খুঁজে পাওয়া যায় না।' কিন্তু কী জানি শান্তি রায় ''মারা গেছেন শান্তি রায়' কবিতাটি কেন লিখলেন। তিনি কী আর জাগবেন না? তাহলে তাঁর 'নিবেদন' আনন্দের '....না আমার আর কোন অবিবেকী বাঁচার সঞ্জীবনী সান্ত্বনা নেই....। কবিতাগুলির মাঝে মাঝে শব্দ বসানোর কিছু গোলযোগ আছে। কবিতায় ওইভাবে বানান 'ভাংগা' আপত্তিকর। শিবদাস চট্টোপাধ্যায়— সাগর জয়ে যাওয়া ভালো। কিন্তু শৈবাল পুষে রেখে নয়। কবি দারুণ উচ্ছ্বাস প্রেমিক 'সবুজ হৃদয়াবেগে ছড়িয়ে পড়েছি। ফেনিল অবয়বে'। 'আমার ক্যালেণ্ডারে লাল অক্ষরও নেই। আমার সময় ক্রমাগত পালিয়ে যায়।' 'ভালোবাসা দাও' কবিতায় কবি পথ চেয়েছেন। কিন্তু কেউ কাউকে পথ দেখান নি। নিজেকেই খুঁজতে হবে কবিতার মত করে। 'মনে হয়' কবিতাটি সুন্দর। তবে থামবার চিহ্ন কোথাও দেওয়া হয়নি। রক্তের হাতে হাত রেখে; দু'টি কবিতা, স্থাণু, কবিতাগুলি মনে রাখার মত। তবে কবিতা বইটির বাঁধাই এবং কাগজ কবিতার মান হানি করে।

মলয় সিংহ

পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ

গত ১৫ই ডিসেম্বর থেকে দেশের সর্বত্র 'জাতীয় পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা পক্ষ' পালন করা হচ্ছে। এই পক্ষে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ভ্যাসেক্টমী ও টিউবেক্টমির কাজ সবচেয়ে জোরদার করা হবে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের বস্তী অঞ্চলে। নির্বীর্যকরণ। কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অধিকাংশ রাজ্যই অনেক পিছিয়ে আছে। তাই সমবায় সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, পঞ্চায়েৎ, বিভিন্ন নারী সংস্থা, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগগুলির কর্তৃপক্ষ ও কর্মী ইত্যাদি সকলেরই সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এই পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা পক্ষকে সফল করে তোলার জন্য। সমস্ত জেলাশাসককে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ও জনসহযোগিতা নিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে সমস্ত রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে উৎসাহ ক্রমশই বেড়ে চলে ও আরও বেশী সংখ্যক লোক এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালেই পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন যে যাঁরা নির্বীর্যকরণ অস্ত্রোপচার করবেন তাদের প্রত্যেককে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর এক টাকার একটি করে টিকিট ও ৪২ টাকা দেওয়া হবে। বন্ধ্যাকরণের জন্য ঐ লটারীর টিকিট ও ২০ টাকা দেয়া হবে এবং নির্বীর্যকরণ ও বন্ধ্যাকরণ করবার জন্য যারা লোক জোগাড় করবেন, তাদের লোকপিছু ৫ টাকা করে দেওয়া হবে।

একটি বিস্মৃত তিব্বতী মঠ

স্নেহময় সিংহরায়

বাংলার প্রাচীনতম মঠগুলির মধ্যে একটি ভোটবাগান মঠ। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ৫৬ নম্বর বাসে ঘুষুড়ি বাজারে নামবেন। ওখান থেকে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেলেই ভোটবাগান মঠ পাবেন। ভোট অর্থ তিব্বতদেশ, ভুটিয়া বা তিব্বতী। সুতরাং এর সঙ্গে তিব্বতীদের যোগাযোগ প্রথমেই লক্ষণীয়। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই প্রতিষ্ঠানের এক সুবৃহৎ চতুষ্কোনাকার দ্বিতল অট্টালিকা ও তিনপাশে কয়েকটি মন্দির অবশ্যই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গঙ্গার পশ্চিমতীরে নৌকা বা ষ্টিমারে ঘুষুড়ির পাশ দিয়ে গেলেও এই দৃশ্য চোখে পড়ে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল। শঙ্করাচার্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম 'গিরি'। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম সন্ন্যাসী কান্যকুব্জবাসী পুরাণ গিরি। তিনি এবং তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাশী লামা ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে কিছু কাজ করায় তাঁর কাছ থেকে এঁরা মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০ বিঘা জমি পান। এটি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের কেন্দ্র ছিল। এই প্রতিষ্ঠান প্রথমত ব্যবহৃত হত তিব্বত থেকে আগত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিশ্রামকেন্দ্র ও আবাসস্থল হিসেবে। কালক্রমে তিব্বতীরা এখানকার আস্তানা ত্যাগ করে এবং এটি সম্পূর্ণ হিন্দুদের ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই মঠের প্রতিষ্ঠার যুগ থেকেই পুরাণ গিরি সম্পর্কে নানা কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায়। শোনা যায়, আজ থেকে দু'শ বছর আগে এই হিন্দু সন্ন্যাসী পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, বিশেষভাবে ভুটান, তিব্বত, চীন এবং এমনকি রাশিয়ার সুদূর মস্কো শহর পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তিব্বতের পাঞ্চেন লামা ও বোগ্‌লে প্রমুখ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর সঙ্গে বৃটিশ-তিব্বত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে বহু কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ করেন। এর ঐতিহাসিক সূত্রটি হচ্ছে এই: ভুটান ও তিব্বতের উপর ওয়ারেন হেষ্টিংসের ছিল প্রবল লুব্ধ দৃষ্টি। কোচবিহার তখন ছিল ভুটানের অধীন। ভুটান ও কোচবিহারের মধ্যে একদা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ভুটানের রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান হেষ্টিংস। ভুটানরাজ পরাজিত হয়ে তিব্বতের পাঞ্চেন লামাকে মধ্যস্থ করে সন্ধি স্থাপন করতে চান। পাঞ্চেন লামা ছিলেন তিব্বতের শাসনকর্তা অল্পবয়স্ক দালাই লামার অভিভাবক। তাশী লামা সন্ধিপত্র ও প্রতিনিধি পাঠান হেষ্টিংসের কাছে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল সন্ধি স্থাপিত হয়। হেষ্টিংসও জর্জ বোগ্‌লে ও ডাঃ হ্যামিলটনকে প্রতিনিধি পাঠান। এই উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধি দলে ছিলেন পুরাণ গিরি। বলতে গেলে, উভয় পক্ষেই তাঁর প্রতিপত্তি ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা ছিল ব্যাপক। বোগ্‌লে মিশনের পর ভোটবাগান মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। তাশী লামার উদ্দেশ্য কি ছিল তা পূর্বেই বলেছি। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে তিব্বতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্পর্কেও তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। ইংরেজ ও তিব্বতী এই উভয় পক্ষের বিশ্বস্ত দূত পুরাণ গিরিকেই এই মঠের সর্বময় কর্তারূপে মনোনীত করা হয়।

পুরাণ গিরি চীন ও তিব্বত থেকে 'মহাকাল ভৈরব' প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের মূর্তি নিয়ে আসেন এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁদের পূজা আজও চলছে। তারকেশ্বর মঠ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত চিন্তাধারা অনুশাসিত। ভোট-বাগান মঠ বা 'শ্রীশঙ্কর মঠ' এই তারকেশ্বর মঠের অধীন। এখানে একজন মোহন্ত কর্তা হন। তিনিই এর পরিচালনা করেন। বর্তমান মোহন্তের নাম দন্ডীস্বামী দিব্যাশ্রম। পরিচালনার কাজে সহায়তার

ভোটবাগান মঠ
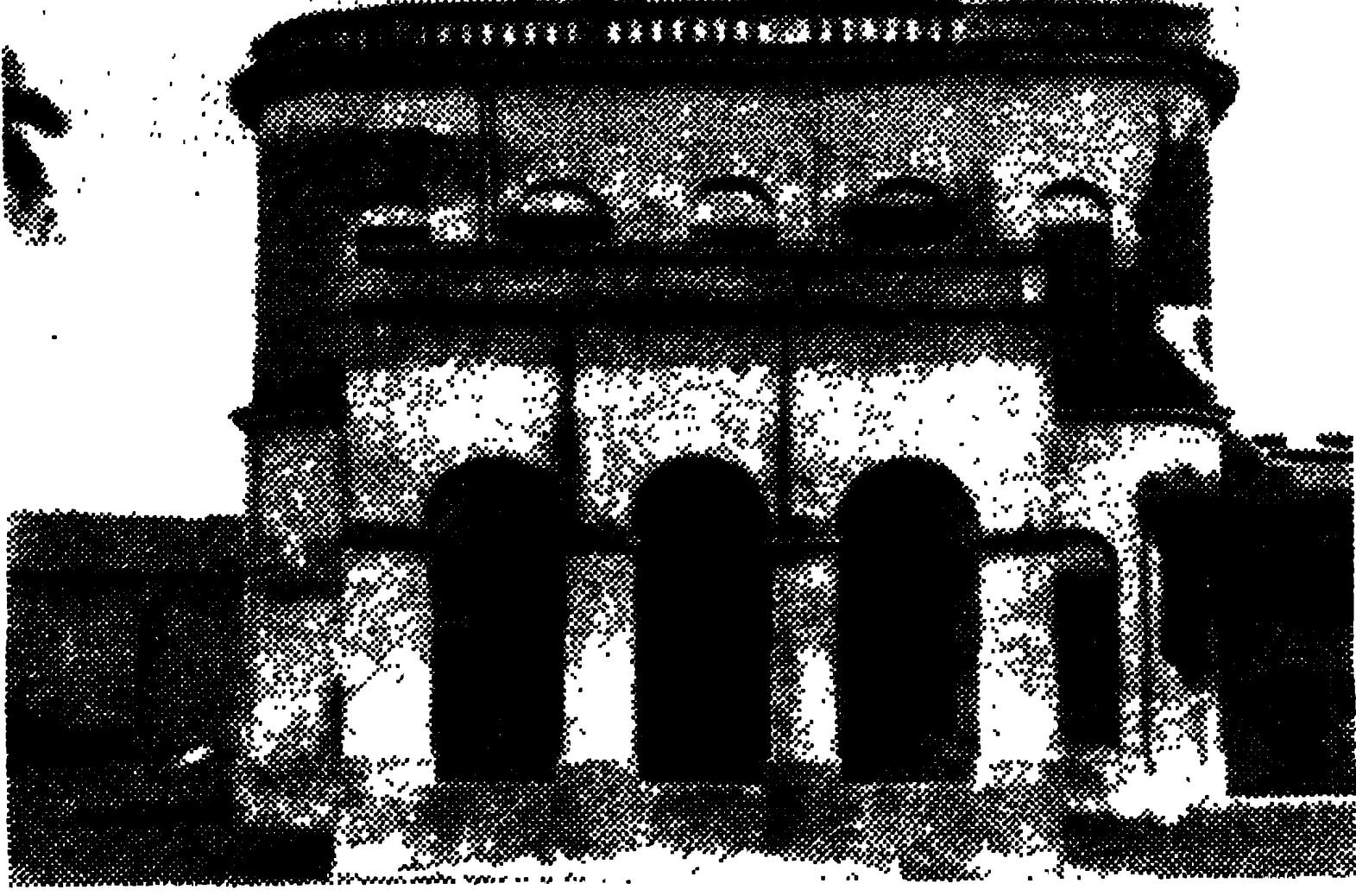
জন্য হাওড়ার বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি ট্রাষ্ট বোর্ড আছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সংখ্যা বিশজন। ঠিক লৌকিক ধর্মচর্চা, উৎসব, মেলা ও জনসমাবেশ বলতে যা বোঝায় এখন এখানে তা আর হয় না। তবে ৬০।৭০ বছর আগেও তা হত। একজন প্রবীণ কর্মী আমাকে বললেন, ৬০।৭০ বছর আগে এখানে চড়ক উপলক্ষে বিরাট মেলা বসত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখানে জনমানসের আকর্ষণ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সমাজ বিরোধীদের অত্যাচার বেড়েছে। তাদের দৌরাত্ম্যে সুন্দর ফুলের বাগান নষ্ট হয়েছে, ফলের বাগানও বিনষ্ট। কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ বললেন, এই প্রতিষ্ঠানের আয়ও কমে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠানের জমিতে স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি কারখানা। তাদের দেওয়া খাজনাতেই এর ব্যয় নির্বাহ হয়।

প্রথমে বড়ো গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে সামনে এক উদ্যানের স্মৃতি চিহ্ন বহন করে ছড়িয়ে রয়েছে একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। তারপর এক দ্বিতল বৃহৎ অট্টালিকা। অট্টালিকার পূর্বে ৩ টি, পশ্চিমে ২ টি ও দক্ষিণে ৫ টি মন্দির। তিব্বতীরা প্রথমে যে ভাবে মঠ নির্মাণ করেছিলেন, কালক্রমে তা বিনষ্ট হয়েছে, এবং অনেক কিছু পুনর্নির্মিত হয়েছে। বাংলার মন্দিরের গঠনপ্রণালীকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে—(১) শিখর, (২) রত্ন, (৩) চালা। প্রধানত চালারীতি অনুসৃত হলেও ভোট-বাগানের মন্দিরগুলিতে শিখর ও রত্নরীতির দু'একটি বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আদি মন্দিরটি পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত—এটি পুরাণ-গিরির সমাধিমন্দির।

মঠের মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ। মন্দিরে তিনটি ঘর। বাইরে একটি ঘণ্টা টাঙানো আছে। সকালে, বিকালে ও সন্ধ্যায় এখানে পূজা হয়। গ্রীষ্মের বিকেল। সময় ৫টা। মন্দির খোলা হচ্ছে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে ভেসে উঠল মাঝারি আকারের একটি পিতলের তৈরী সিংহাসন ও সেই সিংহাসনে আরূঢ় নানা সুপ্রাচীন মূর্তির সমাবেশ। প্রথমেই 'মহাকাল ভৈরবে'র মূর্তি। মহাকাল ও মহাকালী একই মূর্তিতে মুখোমুখি ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। মধ্যে অবস্থিত 'বজ্রভ্রূকুটি' মূর্তির প্রথম মুখ সিংহাকৃতি, তার উপরে ৩ টি মাথা, চতুষ্পার্শে আরও দুটি মাথা—মোট মাথার সংখ্যা দশ। এঁর ৩৪ টি হাত—দুপাশে ৩২টি ও মহাকালীকে অলিঙ্গন করে ২ টি। হাতে বহুবিধ অস্ত্র। দুপাশে বিস্তৃত ৮+৮=১৬টি পা। কটিদেশে বেষ্টনী ও ভূষণাদি। মহাকালীর ২ টি হাত, ২ টি পা। পদতলে ৮ জন দেবতা। এর পাশে 'পদ্মপাণি' মূর্তি মুকুটধারী। এঁর মুখ ৩ টি। মহাকালীর মুখ ৩ টি। এখানেও দেব ও দেবী আলিঙ্গনাবদ্ধ। পদ্মপাণির হাত ৬ টি, পা ২ টি। মহাকালীর হাত ৬ টি, পা ২ টি। দেবদেবীর ৬+৬=১২ টি হাতে ১২ টি অস্ত্র বা আয়ুধ। এখানে দেবদেবী পদ্মাসনে আসীন। আরও একটি মূর্তি আছে ডানদিকে। এঁর মাথায় মুকুট। মাথা ৪ টি। হাত ১২ টি। ইনি দণ্ডায়মান, পদতলে দুটি মূর্তি। মহাকালীর মাথা ১ টি, হাত ২ টি, পা ২ টি। দেবদেবী পরস্পর মুখোমুখি আলিঙ্গনাবদ্ধ। এই মূর্তিগুলির উচ্চতা ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি। সবগুলি পিতলের তৈরী। এই মূর্তিগুলি ছাড়া রয়েছেন 'আর্যতারা'। এই মূর্তিটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। আবার পাওয়া গিয়েছে। এটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষায়। এ মূর্তির গঠনবৈচিত্র্য ও কারুকার্যও আকর্ষণীয়। সম্প্রতি আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সমস্ত দেব দেবীর মূর্তি—গণেশ, দুর্গা, বালগোপাল, নাড়ুগোপাল, লক্ষ্মী, সিংহাসন-আরূঢ় নারায়ণ, চারটি মুখবিশিষ্ট শিবলিঙ্গ ইত্যাদি।

এখানকার পূজাপদ্ধতি বর্ণাশ্রম ধর্মানুযায়ী। বৈদিক মতানুযায়ী পূজা-পদ্ধতিই এখানকার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক দিন ৭ জন দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে—(১) নারায়ণ (২) যোগানন্দ (৩) বাণেশ্বর শিব (৪) তারকেশ্বর (৫) দুর্গা। (৬) মহাকাল (৭) মধ্যস্থ দেবতা। মহাকালের পূজা বৌদ্ধদের সময় থেকে চলে আসছে। ইনিই আদি বা মূল আরাধ্য দেবতা। পূর্বে মহাকালের পূজা হত বৌদ্ধমতে—বর্তমানে হিন্দুমতে। মঠের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক শ্রী বীরেশ্বর চক্রবর্তী আমাকে বললেন, হিন্দু মহাকাল

মূর্তি কল্পনার সঙ্গে বৌদ্ধদের এই সমস্ত মূর্তির মিল নেই। সেজন্য পূজার সময় ধ্যানমন্ত্রে ও মূর্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই মঠে সারা বৎসরে বিশেষ বিশেষ যে সমস্ত পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে তা হচ্ছে দুর্গাপূজা, রটন্তী কালীপূজা, শিবরাত্রি, শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উৎসব প্রভৃতি। শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ হাওড়া পণ্ডিত সমাজ ও হাওড়া সংস্কৃত সমাজের পণ্ডিতেরা এখানে আসেন। একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহন্ত মহারাজ পণ্ডিতগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া এখানে গুরু পূর্ণিমা উৎসব ও জন্মাষ্টমীও অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান লোকজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এখন এখানকার আদিদেব মহাকাল শূন্যতার নীরবতায় সমাসীন। তবু সুশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মনে এখানকার অতীত সম্পর্কে কৌতূহল আছে। পণ্ডিতগণের মধ্যে এখানকার প্রচলিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্মাচরণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাও আছে।

বর্তমান যুগে বহু লোকের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দেবদেবী ও মঠ-মন্দিরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও অবশ্যই লুপ্তপ্রায়। তবু গঙ্গার পশ্চিমতীরে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে ও অসংখ্য খদ্যোতের মতো আলোকপুঞ্জ গঙ্গার উভয়তীরে জ্বলতে ও নিভতে থাকে, ভোটবাগান মহাকাল মঠের বৃহৎ প্রাঙ্গণ তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে। গঙ্গা থেকে দু'এক ঝলক শীতল বাতাস ছুটে এসে এর দেওয়ালে বাতায়নে ও অলিন্দে ছড়িয়ে পড়ে, বৃক্ষশাখায় তরঙ্গকম্পন তোলে। তখন মহাকাল মন্দিরের নিভৃত কোণে কোণে স্মৃতিময় অতীত যেন এক একবার ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠে—'আমি আছি, আছি, আছি।'

ভোটবাগান মঠের মন্দিরে মহাকাল ও অন্যান্য দেবদেবী

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার

১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এই সংস্থাগুলির প্রধান কাজ হবে মোট ভূমির বিভিন্ন ব্যবহার প্রণালীর মধ্যে সমন্বয় সাধন।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৩৭ লক্ষ একর কৃষিজমি রয়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেখানে বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট জমির শতকরা ২৫ ভাগ, এই রাজ্যে মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমির গুণগত পার্থক্যও যথেষ্ট বলে ফসল নির্বাচনে জেলায় জেলায় পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করা আবশ্যক। কতখানি জমি কৃষিতে কতখানিই বা শিল্পোদ্যোগে আর কতটুকুই বা গৃহনির্মাণে ব্যয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়; অন্যদিকে গ্রাম ও শহর মোট ভূমির কতখানির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে; নিবিড় চাষের চাপে ভূমির উর্বরতা শক্তি কতখানি ক্ষয়িত হচ্ছে; বন ও শ্যামলিমা বিস্তার কতখানি প্রয়োজন- এই সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ভূমির সংস্কার ও সদ্ব্যবহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৯৬৭ সালের পর বিভিন্ন বৎসর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একদিকে খরা ও অন্যদিকে বন্যার প্রকোপে দেশের অল্পবিত্ত জনগণ দুর্গতির সম্মুখীন হন। অভাবের তাড়নায় ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁদের অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র সম্বল জমিটুকু হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। এই সকল হস্তান্তরিত জমির মালিকানা মুখ্যত মহাজন শ্রেণীর লোকদের হাতে চলে যায়। এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে বিধান সভায় ১৯৭৩ সালে হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাবার জন্য একটি বিল পাশ হয়েছে। বর্গাদারদের অধিকার সম্প্রসারণ ও সুরক্ষণের জন্য ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন আগেই করা হয়েছে। আইনে প্রদত্ত অধিকার বর্গাদারগণ যাতে নিঃশঙ্কচিত্তে ও অবাধে ভোগ করতে পারেন তার জন্য সকল প্রকার স্বতঃপ্রণোদিত ও নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বর্গাদারদের নাম রেকর্ডভুক্ত করার জন্যও এক বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্গাদারদের উচ্ছেদ রোধের জন্য রাজ্য-সরকার সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তবু স্বীকার করতে হবে যে ভূস্বামী ও বর্গাদারদের মধ্যে বিরোধে বর্গাদারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বল পক্ষ বলে পরিগণিত হয়ে থাকেন। এর প্রকৃত প্রতিকার নিহিত রয়েছে বর্গাদারদের সংঘশক্তির মধ্যে।

সাফল্যের একদশক

৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

জাতীয় অর্থনীতির জ্বালানী থেকে আরম্ভ করে কৃষি পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রের উন্নয়নে এই পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়বে।

গত দশকে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে। মহারাষ্ট্রের তারাপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হওয়া এবং রাজস্থানের কোটাও তামিলনাড়ুর কালাপক্কমে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজের অগ্রগতি ছাড়াও ১৯৭৪ সালে মে মাসে পোখরানে ভারত তার প্রথম শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালো। বিদেশের সমালোচকরা যাই বলুক জ্বালানীর উৎস সন্ধানে ভারতের এটা দৃঢ় প্রয়াস এবং সেই গোড়া থেকে ভারত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এসেছে।

আর্যভট্ট উৎক্ষেপণ প্রমাণ করেছে, মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারত যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক সম্পদ জরীপ করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে।

১৯৬৯ সালে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হ'ল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটা একটা উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ব্যাংকের বিনিয়োগ ও ঋণের সুবিধাদি দরিদ্র জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

১৯৭৪ সাল থেকে বোম্বে হাই-য়ে তৈলানুসন্ধান সুরু হ'ল। তারপর এই ৭৫-এ তেলের সন্ধান মিললো বাংলা-ওড়িশ্যার উপকূলবর্তী দরিয়ায়। আন্তর্জাতিক তৈল সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। এই তেলের সম্ভাবনা এই মৌল জ্বালানীর ক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্ভরতার ইংগিত বহন করছে।

কর্মসংস্থান ও যুবকল্যাণের ক্ষেত্রেও জোর প্রয়াস চালিয়ে ফল পাওয়া গেছে। গ্রামাঞ্চলের দুর্বলতর শ্রেণীর এবং দরিদ্র কৃষিজীবীদের জন্য যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মূল লক্ষ্য হ'ল অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা। এই কর্মসূচী আরও জোরালো করা হ'ল—১৯৭১-৭২ সালে গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রবর্তনের মাধ্যমে।

ঐ একই বছর শিক্ষিত বেকারদের জন্য নানা ধরণের কর্মসূচীর রূপায়ণ শুরু হয়। বহু শিক্ষিত বেকার শিল্প, কৃষিসেবাকেন্দ্র, ক্রেতা সমবায় স্থাপন প্রভৃতির সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৭২-৭৩ সালে ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের জন্যেও বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ। অথচ গত কয়েক বছর ধরে যুব সমাজে অশান্তি দানা বেধেছিল। শিক্ষিত তরুণদের ক্রমবর্ধমান বেকারী ও নিরাপত্তার অভাববোধ সাধারণভাবে এক নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে যুব কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থির হয় ১০০টি নেহরু যুবকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ১৯৭২ সালের ১৪ই নভেম্বর এই যুবকেন্দ্র স্থাপনের কাজ সুরু হয় এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যেই ৮৪০টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির কর্মসূচীও বিস্তৃত। তরুণ জীবনকে অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে নেহরু যুবকেন্দ্র আন্দোলন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এত সব চাপ ও কষ্টের মধ্যেও যদি এত কাজ হয়ে থাকে এবং তাও যদি জনগণের কাছে যথেষ্ট বলে মনে না হয় তাহলে একথা কখনোই বলা যাবে না যে আমাদের অর্থনীতি কোনো সময় তার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল বা উৎপাদন চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। যদি আজ যথেষ্ট পরিমাণ জিনিসপত্র না পাওয়া যায় তবে তার কারণ হ'ল—উৎপাদন যেমন প্রচুর বেড়েছে—তেমনি তার ভোগও। এটা কি সত্য নয় যে খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের বাছ বিচার বেড়েছে? আজ কত লক্ষ মানুষ (Gruel) খিচুড়ি খেয়ে থাকেন? অথচ এক সময় এই ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান খাবার। কফি ও চাপায়ীদের সংখ্যাও কি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় নি? লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ প্রত্যেকদিন যা খান আগে শুধু উৎসবের সময়েই তা মিলতো। দু'দশক আগের তুলনায়—আজ তো অনেকবেশী মানুষ ট্রেনে বাসে যাতায়াত করছেন। গ্রামের কত বাড়ীতে আজ বিদ্যুৎ জ্বলছে, কত মানুষ আজ ট্রানজিস্টার রেডিও, ঘড়ি, সাইকেল ও কৃত্রিম তন্তুর পোষাক ব্যবহার করছেন তাও কি একবার ভেবে দেখবেন? ভোগ যত বাড়ছে কর্মসংস্থানের নূতন নূতন সুযোগ যত সৃষ্টি হচ্ছে—জনগণের আশা আকাংখাও তত বাড়ছে হয়তো উন্নয়নের হারের চেয়েও কিছু বেশী দ্রুতগতিতে। এসব কি আমাদের অর্থনীতির গতিশীলতার প্রমাণ নয়?

ইতিমধ্যে ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণার ছয় মাসের মধ্যেই, অর্থনীতি যে তার নিজস্ব পথে চলতে সুরু করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দেশের দরিদ্রতর ও উপেক্ষিত শ্রেণীর জনগণের অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। এ বছর ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা যাবে। শিল্পগুলো কয়েকবছর পর আবার তেজী হয়ে উঠছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। দরিদ্র মানুষের জন্যে ৬টি আঞ্চলিক ব্যাংক স্থাপিত হওয়ায়-ব্যাংকিং তৎপরতায় নূতন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। এখন যা করতে হবে সে কাজ দেশের প্রতিটি মানুষের,—জাতীয় ইচ্ছা শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ, স্বাভাবিক অবস্থাতেই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা নিয়ে অর্থনীতি প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

জেলা থেকে

নদীয়ার শিল্প সংগঠন

নির্মল দত্ত
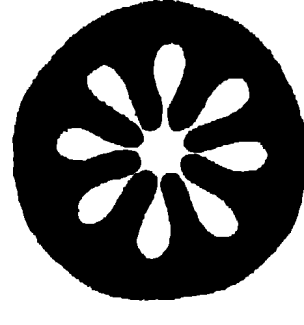
নদীয়া মূলত কৃষিভিত্তিক জেলা। গ্রামবাংলার অন্যান্য জেলার মত এ জেলাতেও কিছু গ্রামীণ শিল্প, কুটিরশিল্প এবং বংশপরম্পরাক্রমে অন্যান্য কিছু শিল্পের উন্মেষ ঘটেছিল। এর মধ্যে মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, শোলাশিল্প, ডাকেরসাজ শিল্প, কাঁসাপিতল শিল্পের সাথে কিছু হস্তশিল্পের ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা লাভের আগে এই শিল্পগুলিও মৃতপ্রায় হ'য়ে ছিল বল্‌লেই চলে। কিন্তু দেশের পটপরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্পের পালা-বদলও সুরু হ'ল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনস্রোতের চাপ ও কর্মসংস্থানের তাগিদ নদীয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাকে কৃষি থেকে শিল্পমুখীন ক'রে তুলতে থাকে। একদিকে সরকারী প্রচেষ্টা ও অন্যদিকে জনসাধারণের আগ্রহ বিভিন্ন শিল্প-সংগঠনকে সম্ভাবনাময় ক'রে তোলে। প্রথম পাঁচসালা যোজনাতেই এই জেলায় শিল্প-সংগঠনের এই প্রচেষ্টা সুরু হয়।

এই জেলার শিল্প সংস্থাগুলিকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়—যেমন, বৃহৎ, ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রায়তন, কুটির এবং গ্রামীণ শিল্প। এই জেলার শিল্প-বিকাশে দেখা যায় যে, প্রাচীন ও গ্রামীণ শিল্পগুলি এক একটি এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে। আবার আধুনিক ও ইন্‌জিনিয়ারিং শিল্পগুলি বিশেষভাবে কৃষ্ণনগর রাণাঘাট ও কল্যাণী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। জেলার উত্তরাংশে বৃহৎ-শিল্পের মধ্যে পলাশীতে রামনগর কেন্ এণ্ড সুগার মিল নামে একটি চিনির কল আছে। কল্যাণীতে আছে সূতো কল, সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরী, মদের কারখানা, লোহার রড তৈরী ও চা-বাগানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা, রেডিও সেট তৈরী প্রভৃতি। ১৯৭১-৭২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এ জেলায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মোট সংখ্যা ৪৭,৮৯৩ এবং তার শ্রমিক সংখ্যা ১,০৩,৩২১। সাড়ে বাইশ লক্ষ লোক অধ্যুষিত নদীয়ার এ সংখ্যা নিতান্ত নগণ্যই বলা যেতে পারে।

বেকার সমস্যা এই জেলার একটি অন্যতম সমস্যা। তাই এই জেলায় ১৬ দফা শিল্প কর্মসূচী অনুযায়ী যে শিল্প গড়ে উঠেছে আজ পর্যন্ত তার সংখ্যা হ'ল ৫৯৫ টি এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে প্রায় ৪ হাজার লোকের। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ১৬ দফা শিল্প কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি নিতান্ত উপেক্ষার নয়। যে-সব ধরনের শিল্পসংস্থা এই কর্মসূচীর মাধ্যমে এই জেলায় স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল: গ্রিল, মোমবাতি, কাঠের আসবাবপত্র, এ্যালুমিনিয়ম কাষ্টিং, ইটভাঁটা, প্লাষ্টিক, সাবান, কালি, চীনামাটির কাজ, জুতো তৈরী, ঘড়ি তৈরী, খড়ের মোড়ক, কৃত্রিম অলংকার, বাদ্যযন্ত্র তৈরী, সার্জিক্যাল গজ ও ব্যাণ্ডেজ, হাতে তৈরী কাগজ, ছুরি কাঁচি সূচ নিপ তৈরী, কাঁচের এ্যাম্পুল, বালতি, চিরুণী, ফাউন্টেন্ পেন, কাতার দড়ির ফিলটার, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি।

রাজ্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তর পরিচালিত কল্যাণী শিল্প এষ্টেট্ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি বৃহত্তম শিল্প এষ্টেট্। এই এষ্টেটে ৩৩ টি শিল্পসংস্থায় প্রায় ১৭০০ শ্রমিক নিযুক্ত আছেন এবং বছরে উৎপাদন আনুমানিক দেড় কোটি টাকা। কল্যাণীতে রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অধীনে যে রেডিও তৈরীর কারখানা আছে তা সম্প্রসারণ ক'রে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে পারলে পল্লী এলাকায় বেতার প্রচার অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

নদীয়ায় অতিরিক্ত কর্মসংস্থান পরিকল্পনায় প্রান্তিক অর্থ বিনিয়োগ প্রকল্পে ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২,৪৩,০০০ টাকা প্রান্তিক অর্থ লগ্নীর জন্য ২৯৮ টি শিল্পসংস্থার প্রকল্প ব্যাঙ্কের কাছে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে ১৩৪ টি শিল্পসংস্থার আবেদন মঞ্জুর হয়। এই বাবদ প্রান্তিক অর্থ বিনিয়োগ করা হয় ৩,৪০,৪২১ টাকা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় ৫৬৪ জনের। এর মধ্যে পরিবহণ শিল্পও রয়েছে। এই অর্থে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্যে তেলকল, করাতকল, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বেকারী, এ্যাম্পুল তৈরী, দড়ির কারখানা, টেলারিং প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প সংস্থা স্থাপিত হয়। উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের অধীনেও ১৭ টি স্কিমে ১৬,৩৫০ টাকা প্রান্তিক অর্থ বিনিয়োগ ক'রে ১৮ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের ট্রেনিং স্কিমেও ৪১৯৫ জন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৯,০৬,৫২১ টাকা ব্যয়ে ৪২ টি স্কিমে এই বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত ৪৯২৬০ জন কাজ পেয়েছেন।

এই জেলায় কয়েকটি শিল্প সমবায় সমিতিও রয়েছে। এই শিল্প সমবায়ের মাধ্যমে অলংকার, পেনের কালি, দেওয়াল ঘড়ি, শীতলপাটি, মাদুর, তাঁতবস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিষ, কাঁসাপিতলের বাসন প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। তা ছাড়া কয়েকটি অনুদান-পুষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। কয়েকটি মহিলা সমিতি শিল্প শিক্ষা ও

DHANADHANYE YOJANA **REGD. No. D(D) 78**
Price 30 Paise **(Bengali)** **January 1, 1976**

নদীয়ায় ডনবস্কো পরিচালিত শিল্প-কারখানার একটি দৃশ্য

উৎপাদন কাজের পরিচালনা করছেন। এর মধ্যে আছে তাঁতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, মাদুর তৈরী, খেস তৈরী প্রভৃতি। ক্ষুদ্রশিল্পাধিকার এই সব মহিলা সমিতিগুলিকে শিক্ষণের ব্যাপারে অনুদান দিয়ে থাকেন।

বেথুয়াডহরির যুগপুরে একটি সমবায় পাটের দড়ির কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। এই টাকার মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন কর্পোরেশন দেবে ৪৮ লক্ষ টাকা, ৬ লক্ষ দেবে রাজ্য সরকার এবং ৬ লক্ষ টাকা দেবে এই শিল্পসংস্থার উদ্যোক্তা পাটশিল্প সমবায় সমিতি।

বিশেষ সংবাদ
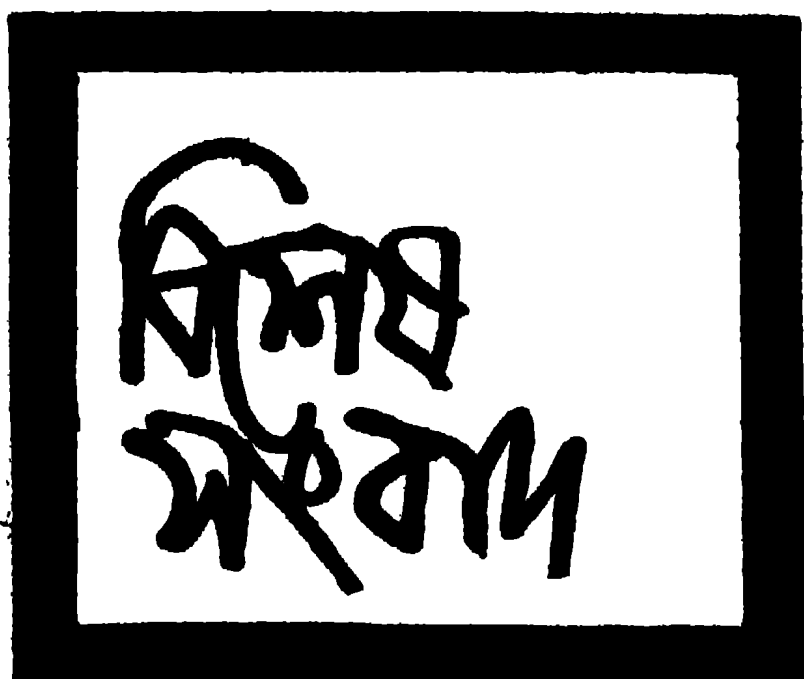
চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে শুল্ক বিভাগের ক্রমাগত অভিযানের ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের চোরাই সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। জরুরী অবস্থা গ্রহণের ফলে চোরাচালানীরা এখন সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বহু সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লী এই চারটি শহরে জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১০,৮০০০ টির বেশী

নদীয়ায় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা যে না রয়েছে তা নয়, সেই সমস্যাগুলি দূরীভূত হ'লে শিল্প-সংগঠনের আরও অগ্রগতি যে ঘটতে পারে, সেকথা জোর দিয়েই বলা যায়। এ জেলার সমগ্র এলাকাই শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত নয়। শিল্প স্থাপন করতে হ'লে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবেশও সেই রকম হওয়া দরকার। এ সব ব্যবস্থা সীমিত। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের অভাবও এই জেলার শিল্প বিকাশে এক বিশেষ অন্তরায়। শিল্প সম্প্রসারণে কাঁচামালের যোগান যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, সে দুষ্প্রাপ্য কাঁচামালের যোগানও অত্যন্ত সীমিত। দুষ্প্রাপ্য ও

অভিযান চালানো হয়েছিল। আটক করা হয়েছে ৪.৩ কোটি টাকারও বেশী মূল্যের চোরাই সামগ্রী।

* * *

জরুরী অবস্থা ও ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষিত হবার পর থেকে প্রত্যক্ষ করের সংগ্রহমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনমাস সময়ে এপ্রিল–জুন সময়ের তুলনায় কর আদায়ের পরিমাণ ২২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সময়ের আদায়ের পরিমাণ ১৫৩ ৬৯ কোটি টাকা থেকে ৫০১.৫২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। গত বছরের দ্বিতীয় তিন মাসে প্রথম তিন মাসের তুলনায় ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ হল ১৬৭ শতাংশ।

* * *

দেশের সমস্ত বৃহৎ সরকারী ও বেসরকারী ইস্পাত কারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের এক বিস্তৃত প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

আমদানীকৃত কাঁচামালের ব্যবস্থা সরকারী তরফে অধিকতর বেশী এবং সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজনীয়। সর্বোপরি শিল্পস্থাপনে যে বড় অসুবিধা রয়েছে তা হ'ল প্রয়োজনীয় ও যথাযথ আর্থিক সাহায্যের অভাব। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ের স্বার্থের দিকেই অধিক দৃষ্টি দিচ্ছেন। নতুন শিল্প সংগঠনে ঝুঁকি কিছু নিতেই হয়। তাই শিল্প সম্প্রসারণে আর্থিক বাধা যথেষ্টই রয়েছে। ব্যাঙ্কের নীতিতে তাই কিছু সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন, যাতে নতুন নতুন শিল্প সংস্থা গড়ে উঠতে পারে।

এ জেলায় নতুন শিল্প সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও রয়েছে অনেক। এখানে যথেষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। কাজেই পাটের দড়ি ছাড়াও চট তৈরীর কারখানাও স্থাপন করা যেতে পারে। তাছাড়া নদীয়ায় গমের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। কাজেই উদ্বৃত্ত গম ব্যবহার ক'রে এখানে দু'তিনটি ময়দার কল স্থাপিত হ'তে পারে। কৃষ্ণনগরের কাছে বেসরকারীভাবে একটি ময়দার কল স্থাপনের কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতি ও অন্যান্য অনেক অসুবিধার দরুণ কলটি আজও চালু হ'তে পারে নি। চালু হলে' বেশ কিছু সংখ্যক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ'য়ে যেতে পারে।

কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, চাপড়া, রাণাঘাট, চাকদহ প্রভৃতি স্থানে গরু ভেড়া ও ছাগলের চামড়া সংগ্রহের কয়েকটি কেন্দ্র আছে। মাসে প্রায় ৮।৯ হাজার টাকার এই কাঁচা চামড়া এখান থেকে কলকাতায় রপ্তানী হয়। এই চামড়া ট্যানিংএর কাজে লাগিয়ে এই জেলায় চামড়া পাকাইয়ের কারখানা চালু করা যেতে পারে। তাছাড়া পেরেক ও নাটবোল্টুর কারখানা, দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনাও এই জেলায় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ক'রে তুলতে হ'লে নতুন নতুন শিল্প সংগঠনের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১৫ জানুয়ারী ১৯৭৬

এলো শীতের বেলা

শীতের কাতরতা এড়াতে মানুষ হঠাৎই কেমন যেন অকাতর হয়ে ওঠে। শীতের প্রহরে সেজন্য মেতে ওঠেন খ্রিশ-মাসে, নববর্ষে। কিছু অবকাশ আর কিছু সঙ্গতি এবং সেই সঙ্গে কিছু ইচ্ছেকে এক সুতোয় গেঁথে শীতের প্রহরে শহরবাসীরা বেরিয়ে পড়েন এখানে-ওখানে। ছুটি কাটাতে যান কাছাকাছি চোখ-মেলে-না দেখা কোনো জায়গায় কিংবা চিড়িয়াখানা, বোটানিকস, দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় কিংবা অবাধ রৌদ্রের প্রাঙ্গণ ময়দান কিংবা ভিক্টোরিয়া। কেউ নিভৃতে সময় কাটাতে আগ্রহী হন হরটি-কালচারে—যেখানে প্রাণখুলে হেসে উঠেছে, পরিবেশ মাতিয়ে আলো করে ফুটে আছে অজস্র মরশুমী ফুল এবং গোলাপ, চন্দ্র-মল্লিকা। শীতের প্রহরে শহর অতঃপর মেতে উঠবে বনভোজনে, গানে-গানে, সংস্কৃতি উৎসবে এবং বহুবিচিত্র প্রদর্শনীতে। শীতের উপহারকে দূরে সরিয়ে রাখবেন সে সাধ্য আপনার কোথায়—শীতের সোনা রোদ্দুর আপনার কানে কানে কী কথা বলে যে আপনাকে দুলিয়ে ভুলিয়ে দেবে তা বুঝবার আগেই দেখবেন যে কোথাও না কোথাও আপনি বেরিয়ে পড়েছেন।

শীতের চাদরে সারা অঙ্গ মুড়ে গেছে গ্রাম বাংলার। কুয়াশাকে ছিন্নভিন্ন করে সোনালী ধানের হাসি ছড়িয়ে পড়েছে প্রান্তরে প্রান্তরে। রৌদ্রে কেমন যেন সম্পন্ন হাসি। শীতের প্রহরে শহরের প্রাকৃতিক রূপটাই বা কেমন? ভোরে কুয়াশা আর প্রদোষে ধোঁয়াশা। কুয়াশার খবরই যেন পত্রিকার কলমে এবং লোকের মুখে।

পরিবেশ জুড়ে এখন আবহাওয়ার অন্য মুহূর্ত। 'এলো যে শীতের বেলা'। শীত যে এসে গেছে সে খবর প্রকৃতিই পৌঁছে দিয়েছে আপনার কাছে। হিমেল স্পর্শ এড়াতে সেজন্যই আপনার এতো রৌদ্রের সন্ধান। পরিবেশ জুড়ে শীতের প্রভাব আপনার মনকে কেমন আলস্যে ভরিয়ে না দিলে কি এক মুঠো রোদ্দুরের জন্য আপনি-আমি এতো উৎসাহী হতাম।

প্রকৃতির পাশাপাশি শীতের আগমনী-বার্তা জানিয়ে দেয় শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ধুনকরেরা। বাতাসে শীতলস্পর্শ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই ওরা ছড়িয়ে পড়েন সর্বত্র। গৃহস্থ সচকিত হন, তাইতো, শীত আসছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শীতের মুখোমুখি হবার প্রস্তুতিপর্ব সুরু হয়। ঋতু বদলে আশ্চর্যভাবে পরিবেশেরও রূপবদল হয়। শহর-গ্রামের দোকানে দোকানে শীতবস্ত্রের কেমন সমারোহ। শহরের 'শো-কেস' জুড়ে গরম পোশাকের রঙিন মিছিল। যত না কেনা-বেচা ততোধিক দেখা-শোনায় সুখ। ঘ্রাণে যদি অর্ধভোজনং স্পর্শে তাহলে তিন পোয়া।

শীতের মাতনে সব কিছু কেমন যেন রঙিন হয়ে উঠতে চায়। হাট-বাজারের চেহারায়ও যেন অন্যতর সবুজবিপ্লব। দেখেশুনে মন ভরে উঠতে চায়।

৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-৬ টাকা, দুবছর ১০ টাকা এবং তিনবছর ১৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৩০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ১৫/১৫ জানুয়ারী ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদশিল্পী—প্রণবেশ মাইতি

আলোকচিত্র—শেখর তরফদার

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

উপসম্পাদক
দিলীপ ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক কয়েকটি বড় সাফল্যের মধ্যে একটি হল গত নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত নাগাল্যাণ্ড মীমাংসাচুক্তি। পূর্ব সীমান্তের এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটিতে গত বিশ বছর ধরে যে হিংসাত্মক ঘটনা এ অঞ্চলের শান্তি এবং প্রগতিকে ব্যাহত করছিল এই চুক্তির ফলে তার অবসান ঘটল। যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে সমস্যাটির সুরাহা করা হয়েছে তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাগাল্যাণ্ডের একদল ভ্রান্তপথচালিত লোক ভারতের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন কিছু বিদেশী শক্তির মদত পেয়ে ঐ এলাকায় এতদিন ধরে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। এখন তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের এই বৈরীমূলক আচরণ কত ভ্রান্ত এবং নিরর্থক। তারা এও বুঝতে পেরেছে, তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল এমন একটি সরকারের সঙ্গে যে সরকার প্রকৃতই তাদের মঙ্গল চান এবং আত্মগোপনকারী নাগাদের এই বৈরিতা সত্ত্বেও যে সরকার রাজ্যের অগ্রগতির জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই মীমাংসাচুক্তিটি এমন এক সময়ে সম্পাদিত হয়েছে—যখন সমস্ত ভারত শ্রীমতী গান্ধীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের ভেতরের এবং বাইরের শক্তিগুলির দেশের সংহতি ও সুশৃঙ্খল অগ্রগতি বানচাল করে দেবার সমূহ বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। নাগা শান্তিচুক্তিতে বিশেষভাবে যা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে আত্মগোপনকারী নাগা ছয়টি দলের সব পক্ষের নেতারাই আলোচনায় অংশ নিয়েছে এবং তারা সর্বসম্মতভাবে ভারতীয় সংবিধানকে মেনে নিয়েছে। সংঘর্ষের পথ ত্যাগ করতেও তারা সম্মত হয়েছে। নাগাল্যাণ্ডের তীব্র সশস্ত্র বৈরিতার দিনগুলিতে সরকার কখনো প্রতিশোধাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেননি। আত্মগোপনকারী নাগা সংস্থাগুলির প্রতি সরকার খুব উদার মনোভাব গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে যে আলোচনা হবে তার ফলে হয়তো আটক বৈরী নাগাদের মুক্তি এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। অবশ্য যাদের অপরাধ গুরুতর তারা শাস্তি পাবেই।

এই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে নাগা শান্তি পরিষদের সংযোগরক্ষাকারী কমিটির ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মগোপনকারী নাগা নেতাদের সহযোগিতামূলক মনোভাবের অবদান অসামান্য। এই নাগা নেতারাও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, সংঘর্ষের পথে না আসে শান্তি না আসে তাদের প্রার্থিত নাগাভূমির জনগণের সমৃদ্ধি। গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে অগ্রগতি অর্জনে আমরা আজ বদ্ধপরিকর। এদেশের ছোট বড় সব সম্প্রদায়কেই তাই মুক্ত এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশীদার হিসেবে দেশের সমৃদ্ধির কর্মযজ্ঞে ব্রতী হতে হবে। গত নভেম্বর মাসে বৈরী মিজোদের গণ-আত্মসমর্পণ যুক্তিহীনতার ওপর সুবুদ্ধির বিজয়ের ইঙ্গিতই বহন করছে।

খাদ্য ও কৃষি: এক দশকের নিরিখে

প্রনবেশ সেন

এই তো কদিন আগে যেতে হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের দিকে। যে দিকে তাকিয়েছি চোখে পড়েছে দিগন্ত বিস্তারিত সবুজ সোনার সমারোহ। ছবিটা শুধু আমাদের এই এলাকারই নয়—দু একটা জায়গা বাদ দিলে গোটা ভারতের। ভারত এবার সত্যই শস্যশ্যামলা।

হিসাবে দেখেছি এ বছর মোট খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টনের মতো। এর মধ্যে খরিফ ফসলের পরিমাণ হ'ল ৭ কোটি টনের মতো আর রবি ফসলের পরিমাণ ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টনের মতো। ঐ ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টনের পরিমাণটা গত বছরের মোট খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণের চেয়ে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টন বেশী এবং ১৯৭০-৭১ সালে যে রেকর্ড পরিমাণ ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টন ফসল ফলেছিল তার চেয়ে ৮০ লক্ষ টনের মতো বেশী।

খাদ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই যে সাফল্য তা কি হঠাৎ হয়ে যাওয়া কিছু? নাকি, কৃষি পদ্ধতিতে যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে এটা তারই পরিণতি। অবশ্যই আমাদের কৃষি ব্যাপারটা এখনো প্রকৃতির মর্জির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এবারের সাফল্যও ঐ সুবর্ষায় নিহিত-এমন কথাও বলতে পারেন কেউ কেউ। সত্যি—কিন্তু পুরো সত্যি নয়। সুবর্ষণ নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ, কিন্তু অন্য কারণও আছে। এই অন্য কারণগুলো মনে রাখলে জানবো শুধু প্রকৃতির কারুণ্যের উপর নির্ভর করে নয়—কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের সমৃদ্ধি আসছে সুপরিকল্পিত-ভাবে। ভরসার কথা এইটেই।

দশ বছরের সময়-সীমার নিরিখে বিষয়টাকে দেখা যাক। ১৯৬০-৬১ সালে আবাদ হয়েছিল ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে। ১৯৬৫-৬৬ সালে আরও ৩০ লক্ষ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে আবাদ হয়েছে মোট ১৪ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে। অর্থাৎ ১০ বছরে আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছে ৮০ লক্ষ হেক্টর। একই জমিতে একাধিক ফসল ফলেছিল ১৯৬০-৬১ সালে ২ কোটি হেক্টর জমিতে, ১৯৬৫-৬৬ সালে কিছু কমে দাঁড়ায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ হেক্টরে এবং ১৯৭৩-৭৪ আবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টরে। অর্থাৎ গত ১০ বছরে দুই বা তিন ফসলী জমির পরিমাণ বেড়েছে—৬০ লক্ষ হেক্টর। এবার দেখা যাক সেচের সুবিধার বিষয়টি। ১৯৬০-৬১ সালে সেচ সেবিত জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর। ১৯৬৫-৬৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ালো ২ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টরে। আর ১৯৭৩-৭৪-এ তা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টরে। অর্থাৎ গত ১০ বছরে ৭০ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় এসেছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় সারের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেখা যাক এক্ষেত্রে আমাদের কতটা অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৬০-সালে সার ব্যবহার করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬ হাজার টন, ১৯৬৫-৬৬ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ২৮ হাজার টন আর ১৯৭৩-৭৪ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টন, অর্থাৎ ১০ বছরে সার ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে ২৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টন। আর এসবের ফলে ১৯৬০-৬১ সালে আমাদের মোট খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল ৮ কোটি ২০ লক্ষ টন ১৯৭৩-৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০ কোটি ৩৬লক্ষ টন। আর এবার দাঁড়াবে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টনের মত।

এই পরিসংখ্যানের ভীড়ের মধ্যে একটা সত্য কিন্তু সুস্পষ্টভাবে উঁকি দিচ্ছে তা হ'ল—আমরা শুধু আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু মেঘের অপেক্ষায় বসে নেই। আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ছে, সেচের সুযোগ সুবিধা বাড়ছে, সারের ব্যবহার বাড়ছে—ট্রাক্টর পাওয়ার টিলার-এর ব্যবহার বাড়ছে। কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের ব্যবহারও বাড়ছে—তাই ফসলের পরিমাণও বাড়ছে। কাজেই এই উৎপাদন বৃদ্ধি কাকতালীয় নয়। এটা আমাদের শ্রমেরই ফসল।

ফলে কৃষিক্ষেত্রে আজ যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে তাতো আমাদের এই রাজ্যের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে। সেই দূর-অতীত থেকে জেনে এসেছি এ রাজ্যে ধান আর পাট ছাড়া বড় রকমের আর কোনো ফসলের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আজকাল দেখেছি সেচের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উচ্চফলনশীল বীজের দৌলতে চাষ আর ফসল তোলার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান কমে যাওয়ায় নূতন ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেদিন একটা হিসেবে দেখেছিলাম, যে রাজ্যে আগে তেমন গম হ'তনা সেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান আজ সারা ভারতে নাকি তৃতীয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫৪ হাজার হেক্টর জমিতে ৪৪ হাজার টন গম হয়েছিল। হেক্টর প্রতি গমের ফলন হয়েছিল ৮৫৪ কিলোগ্রাম। ১৯৭৪-৭৫ সালে সেখানে গমের চাষ হয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে—আর গম ফলেছে ৯ লক্ষ ৮০ হাজার টন আর কল্যাণসোনা, সোনালিকা, জনক প্রভৃতি উচ্চফলনশীল গমবীজ ব্যবহারে হেক্টর প্রতি ফলন

দাঁড়িয়েছে—২ হাজার ৭২২ কিলো-গ্রাম।

বিগত দশ বছরে কৃষি ফলন বৃদ্ধির যে নিরলস প্রয়াস চলছিল দেশজুড়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সেই প্রয়াস পেল নতুন উদ্যম ও গতি। বিশদফা কর্মসূচীতে সরকার যে নতুন কৃষিকৌশল গ্রহণ করেছেন তার মূল কথাই হল—অল্প সময়ে অধিক ফসল এবং একাধিক ফসল ফলানো। এই লক্ষ্য মনে রেখে সরকার দেশের বেশ কয়েক লক্ষ প্রান্তিক কৃষি-জীবীদের মধ্যে মিনি কিট বণ্টন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই মিনি কিট পেয়েছেন প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষক। বিনামূল্যে দেওয়া এই মিনিকিটে রয়েছে কিছু পরিমাণ উচ্চফলনশীল বীজ—কিছু সার এবং চাষের পদ্ধতি। এতে ফসল তো বাড়বেই তাছাড়া কৃষকরা উচ্চফলনশীল আবাদে উৎসাহিত হবে। জাতীয় বীজ করপো-রেশণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন—নানা ধরণের বীজ উৎপাদনে। কৃষি গবেষণা পর্ষদ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এ ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছে। স্থির হয়েছে রবি মরশুমে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল জাতের গম বোনা হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি আবাদের আওতায় আনা হবে।

সেচের সুবিধা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কিন্তু তা আরও বাড়ানো দরকার। কিছুদিন আগের সমীক্ষায় দেখেছি—১৯৫১ সালের পর থেকে দেশে ৯৯ টি বড় এবং ৫১৩ টি মাঝারী ধরণের সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৪ টি বড় এবং মাঝারি সেচ প্রকল্পের রূপায়ণ শেষ হয়েছে। বাকীগুলো মধ্যপথে রয়েছে। ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের ১ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ায় বিদ্যুৎচালিত-পাম্পের সংখ্যা বেড়ে ২৭ লক্ষ দাঁড়িয়েছে। এর উপরেও স্থির হয়েছে এ বছর অন্তত ৩০ লক্ষ একর জমি সেচের আওতায় আনা হবে। বর্তমান সেচ প্রকল্পগুলি যাতে আরও ভালোভাবে কাজ লাগানো যায় তারও চেষ্টা চলবে। এ বাবদ অতিরিক্ত ১২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আধুনিক কৃষি পদ্ধতির আর একটি বড় উপাদান হ'ল সার। এর আগে দেশে সারের মোট ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ টন। এ বছর তা ৩৬ লক্ষ টন করবার লক্ষ্য ধার্য্য করা হয়েছে। দেশে সারের উৎপাদন এবার ভাল হয়েছে। তাই বিদেশের বাজারে সারের দর চড়া হলেও সরকার দেশে বিভিন্ন ধরণের সারের দাম ৭৫ থেকে ২০০ টাকা টন প্রতি কমিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিজীবীদের সার ব্যবহার সম্পর্কেও সচেতন করার চেষ্টা চলছে।

এদেশে কৃষি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিসংস্কার ছিল একান্ত জরুরী। এ ক্ষেত্রেও বিগত দশ বছরে অনেক কাজ হয়েছে। জমির সর্বোচ্চ সীমা আইন কার্যকর করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন-কৃষি-জীবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। সম্প্রতি ২০ দফা কর্মসূচীতেও এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। হিসেবে দেখা গেছে ঐ আইন কার্যকর করার ফলে প্রায় ৪০ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে। এর মধ্যে পাওয়া গেছে ৫ লক্ষ ৩ হাজার একর জমি। এগুলি বণ্টনের কাজ চলছে। এছাড়া ৫০ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেত মজুরকে বাস্তজমি দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটা সঙ্গত যে, নিজের জমি পেয়ে এবং মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে ভূমিহীন ক্ষেত মজুরেরা চাষে আরও বেশী আগ্রহ বোধ করবেন। তাছাড়া ক্ষেত মজুরদের মজুরীর পরিমাণও আগের চেয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়নের ১৬০ টি প্রকল্পও রূপায়িত হচ্ছে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা কিছুটা ব্যয়-সাপেক্ষ। কৃষিজীবীরা যাতে সহজ সর্তে ঋণ পেতে পারেন তারজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি তাদের শাখা সম্প্রসারণ করেছেন। গত ৬ বছরে গ্রামাঞ্চলে অন্তত ৫ হাজারটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্কগুলি যেখানে ১৬২ কোটি টাকা আগাম দিয়েছিল—এবছর সেখানে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৬৭ কোটি টাকা। কৃষিজীবী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যাও ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ২১ লক্ষ দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ২০ দফা কর্মসূচীতে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষি পরিবারের মহাজনী ঋণ পুরা অথবা অনেকাংশে মকুব করা হয়েছে। ফলে কৃষিজীবীরা আর মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ পাবেন না। এই অভাব মেটাতে দেশে ৫০ টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হচ্ছে। ৬ টি ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। প্রান্তিক কৃষিজীবীরা স্বল্প সুদে এই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারেন। সমবায় কৃষি ঋণ সমিতিগুলি ইতিমধ্যে অবশ্য গত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।
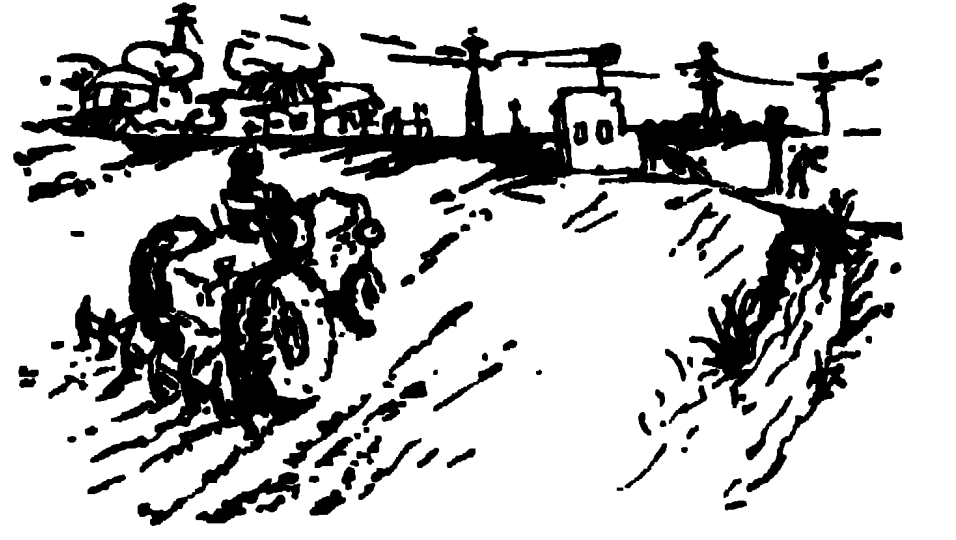
কাজেই সব মিলিয়ে বলতে পারি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে একটা স্থায়িত্ব এনে দেবার চেষ্টা চলছে। আর এবছর যে রেকর্ড পরিমাণ ফসল ফলতে চলেছে—তাতে ঐ সম্ভাবনাই আরও জোরদার হয়েছে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যৌথ প্রশাসন

সুর দাস

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা এবং পরিচালন ব্যবস্থার প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, সাফল্য নিশ্চিতভাবে নির্ভর করে সুষ্ঠু এবং হৃদ্যতাপূর্ণ শ্রম-সম্পর্কের ওপর। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের পরিচালকগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কর্মীর পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা, মমতাবোধ, বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসার পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রম-সম্পর্কের সুপরিবেশ গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ভুলত্রুটি যতই থাকুক না কেন শ্রম-সম্পর্কের সুপরিবেশই সংস্থাগুলির সাফল্যের অন্যতম নির্দ্ধারক।

পরিচালকমণ্ডলী ও শ্রমিক-কর্মীবৃন্দ যখন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল একমাত্র তখনই সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির উন্নতিকল্পে একটি অভিন্ন আদর্শের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। আর এই আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি পর্যায়ের প্রতিটি সৈনিক-কর্মী হয়ে ওঠে এক অভিন্ন লক্ষ্যের শরিক।

কেন্দ্রীয় সহকারী শ্রমমন্ত্রীর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, শ্রম-সম্পর্কের টানাপোড়েনের দরুণ গত ১৯৭৪ সালে সারা দেশে মোট ৩১০,০০,০০০ কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে ২৩০,০০,০০০ কাজের দিন বেসরকারী উদ্যোগে এবং ৮০,০০,০০০ কাজের দিন সরকারী উদ্যোগগুলিতে নষ্ট হয়েছে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে কী ভাবেই না উৎপাদনের গতি ব্যাহত হচ্ছে আর তার ফলে পরোক্ষভাবে অর্থনীতির উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে। কাজেই দেশের শিল্পাঞ্চলের পরিবেশটি এখনই যদি কলুষমুক্ত করা না যায় তাহলে কেবল অর্থনৈতিক প্রগতিই ব্যাহত হবে না, ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধাঁচে রূপায়িত করার সমস্ত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সরকারের যেমন একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে ঠিক তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে দেশের শ্রমিকসংস্থা এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দের। তাই শ্রমিক সংস্থাসমূহ বা তাদের প্রতিনিধিদেরও নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নয়ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প স্থাপনের এবং জাতীয়করণের নিশ্চিত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। বলা বাহুল্য, শ্রমিক-কর্মচারীদের কিছু আর্থিক প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেওয়া বা শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব করাই নেতৃবৃন্দের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। দায়িত্ব কর্তব্যের সুবৃহৎ পরিমণ্ডলটি রয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, তার পরিচালকগোষ্ঠী এবং শ্রমিক-কর্মীবৃন্দের মধ্যে একটি অভিন্ন আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যে। অন্যভাবে বলা যায়, সুস্থ শ্রম-সম্পর্কের মাধ্যমে কি ভাবে শিল্পাঞ্চলের সামগ্রিক কর্মপ্রবাহ অব্যাহত এবং উর্দ্ধমুখী রাখা যেতে পারে তা-ই হওয়া উচিত শ্রমিক সংস্থা তথা নেতৃবৃন্দের মুখ্য ভূমিকা।

দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি সাধনে সরকারী এবং বেসরকারী উভয়গোষ্ঠীর পরিচালকমণ্ডলী ও শ্রমিক-কর্মীবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য মূলত এক ও অভিন্ন। তাই শ্রম-সম্পর্কের ধারাটির মধ্যেও সেই অভিন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবু স্মরণ রাখা দরকার যে মিশ্র অর্থনীতির দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব আছে। কারণ, রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কেবলমাত্র আর্থিক লাভই নয়, শ্রমিক-কর্মীবৃন্দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানের মাধ্যমে জনসাধারণের সার্বিক উন্নতিসাধনও। একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের মত উন্নতিকামী দেশে যদি রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগগুলি এ ব্যাপারে পথিকৃৎ না হয় তবে কদাচিৎ বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় প্রচেষ্টার সূত্রপাত হবে।

শ্রম-সম্পর্কের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার পরিচালকগোষ্ঠীর দায়িত্ব এবং কর্তব্যই সর্বাধিক। কিন্তু তাই বলে শ্রমিক কর্মীবৃন্দের দায়িত্ব-কর্তব্যও কিছু অকিঞ্চিৎকর নয়। তবে সুপরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনে পরিচালকগোষ্ঠীকেই প্রধানত অগ্রণী হতে হবে। উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে পরিচালকগোষ্ঠীকে—সর্বস্তরের প্রতিটি পরিচালক বা কার্য-নির্বাহককে। আইনগত এবং নীতিগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে বা নিস্পৃহ থাকলে চলবে না। সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-আস্থা-একাত্মতাবোধের সূচনা করতে হবে যাতে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই হয় প্রতিষ্ঠানের দুই শরিকের অভিন্ন মূল লক্ষ্য। ফলে প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই এই দুই শরিকের একটি অভিন্ন সত্তায় পরিণত হবে।

একটি অভিন্ন মূল লক্ষ্য এবং একটি মাত্র সত্তার সূচনা তখনই হবে যখন শ্রমিক-কর্মীবৃন্দের অভিজ্ঞতা-প্রসূত মনোভাবকে স্বীকৃতি দেবেন পরিচালকগোষ্ঠী। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শ্রমিক-কর্মীবৃন্দের মতামতকেও স্বাগত জানান দরকার। খোলা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই পরিচালকগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। তাহলে একদিকে যেমন পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিনিময়

টবে এবং সহযোগিতার পথ হবে সুপ্রশস্ত অন্যদিকে পরিচালন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়াও হবে সহজসাধ্য।

বলা বাহুল্য, দেশের শ্রমিক-কর্ম-কর্মচারীগোষ্ঠী বরাবরই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-গুলির পরিচালন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক রূপ দেবার জন্য সোচ্চার হয়েছেন। শ্রমিক-কর্মীবৃন্দের অনেক অনেক দাবীর মধ্যে যৌথ প্রশাসনও অন্যতম। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্রমিক-কর্মীবৃন্দের অংশ-গ্রহণের ব্যবস্থা বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে বহুদিন আগে থেকেই প্রচলিত। বৃটেনের জাতীয় উদ্যোগগুলির পরিচালক-গোষ্ঠীতেও একজন করে শ্রমিক নেতা নির্বাচিত করা হয়। ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু আছে। এদেশেও ভারতীয় শ্রম সম্মেলন ১৯৫৭ সালে শিল্পপরিচালনায় শ্রমিক-কর্মচারীর অংশগ্রহণের প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেন এবং নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি শিল্প কারখানায় স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে যৌথ পরিচালনপর্ষদ গঠনের পরিকল্পনা করেন। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যাধিক্যের দরুণ এইসব পর্ষদে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বেসরকারী বেশ কিছু শিল্পে তাই প্রকল্পটি চালু হ'তে পারেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে প্রকল্পটি চালু করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মধ্যে অন্যূণ ৫০০ শ্রমিক কর্মচারী-বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যৌথ পরিচালন পর্ষদ প্রকল্পটি চালু হয়। কিন্তু নানা কারণে এই পর্ষদ কার্যকরী হতে পারেনি। ফলে পর্ষদের সংখ্যা অচিরেই ৮০-তে নেমে যায়। আন্ত-ইউনিয়ন সংঘর্ষ অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের পর্ষদ সার্থক করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে চালু করা হয়। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে রেল, ইস্পাত, প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৮০ টিরও বেশী এধরণের পর্ষদ কাজ করছিল। কিছু সরকারী শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন পর্ষদে শ্রমিক-কর্মচারীর অংশগ্রহণের একটি প্রকল্পও সরকার এসময় চালু করেন। ১৯৭৩ সালে ১৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদে একজন করে কর্মী প্রতিনিধি নেয়া হয়।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত বিশ-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারও যৌথ প্রশাসন ব্যবস্থাকে আইনত চূড়ান্ত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে চালু করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। গত ৩০ শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে যে প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তাতে যে কোন প্রতিষ্ঠানে ৫০০ বা তার বেশি কর্মচারী নিযুক্ত থাকলে অবশ্যই যৌথ প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এবং পরিচালন ব্যবস্থার এই গণতন্ত্রীকরণ সুরু হবে প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন স্তর বা Shop/Department পর্যায় থেকে। প্রথম দিকে উৎপাদন ও খনি শিল্পে (সরকারী বেসরকারী ও সমবায় সবক্ষেত্রেই), এই প্রকল্পটি চালু হবে। সর্বাধিক ১২ জন প্রতিনিধি নিয়ে প্রতিটি বিভাগে যৌথ পরিচালন ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই প্রতিটি বিভাগের প্রতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আর সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য যে Joint Council এর ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানেও থাকবেন শ্রমিক প্রতিনিধি। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের এই পরিকল্পনা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণতান্ত্রিক রূপ দেবার প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য। কারণ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কেবলমাত্র শ্রমিক-কর্মচারী গোষ্ঠীকেই পরিচালন-ব্যবস্থার অন্যতম শরিক করে নেওয়া হল না উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শরিক হিসেবে শ্রমিক-কর্মচারীগোষ্ঠীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হল। সরকারের এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানগুলির দুটি শরিকের ওপরই। যৌথ প্রশাসন ব্যবস্থাকে সফল করে প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উভয় শরিককেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকল্পটি বিধিবদ্ধ নয়। এব্যাপারে উদ্যোগী হবেন উল্লিখিত শিল্পসংস্থাগুলিই। আশা করা যাচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থাগুলিতে প্রকল্পটি তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যেই চালু হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও শীঘ্রই প্রকল্পটি চালু করবেন।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় সরকার এবং শ্রম দপ্তরকে আরও অনুরোধ করব ভেবে দেখতে যে বিভিন্ন সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ও ঋণপত্রের একটা অংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী-গোষ্ঠীর মধ্যে বিলিবণ্টন করা যায় কিনা। কারণ মালিকানাবোধের ফল সুদূরপ্রসারী। মালিকানাবোধই শ্রমিক-কর্মীগোষ্ঠীকে কাজে উদ্বুদ্ধ করবে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সার্বিক সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছুতে অনুপ্রাণিত করবে। সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নিজেদের মধ্যে একটা অভিন্ন আদর্শ ও লক্ষ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে অন্যতম সহায়ক হবে প্রতিষ্ঠানের মালিকানাবোধ।

এলো যে শীতের বেলা

দ্বিতীয় কভারের শেষাংশ

প্রভাতী সংবাদপত্রে শীতের খবরে বলছে, ঘন কুয়াশার জন্য ভোরের দিকে শহর ও শহরতলীতে প্রায় ঘণ্টা কয়েক যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত। আবহাওয়া দপ্তরের সংবাদে প্রকাশ, ঘন কুয়াশা কাল ভোরেও দেখা দেবে। সমস্ত শহরটাই যেন ছিল এক কুয়াশানগরী। ট্রেন চলাচলও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক কুয়াশার জন্যে। এবং অমুক জায়গায় কাল শৈত্যে প্রবাহ চলেছে ; তমুক স্থানে কাল শীতের প্রকোপে ঐ পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি। এবারে বরফ পড়েছে এইখানে, তাপাঙ্ক অতো ডিগ্রিতে নেমে গেছে সেইখানে ইত্যাদি।

তবু শীতের প্রহরে মন কেমন যেন করে। নাকি বসন্ত আসছে বলে রোদ্দুর মেখে নিয়ে প্রকৃতির ভিতরে ভিতরে এতো খুশি। শীতের প্রার্থনার উত্তর তো বসন্তের অকৃপণ সমারোহ।

—মলয় শঙ্কর দাশগুপ্ত

ত্রিপুরায় রাবার চাষ

প্রণব বক্সী

ভারতের মানচিত্রে ত্রিপুরার একটা বিশেষ স্থান আছে। একথা শুধু ভৌগোলিক দিক থেকেই সত্য নয়, অন্যান্য দিক থেকেও। এর তিনদিক থেকে বাংলাদেশে ঘেরা এবং একদিকে আসাম। ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়ে ভরা এই ত্রিপুরার মাটিতে অনেক সম্পদ লুকানো রয়েছে। এখানকার সুন্দর বনবীথিতে রয়েছে অফুরন্ত বনজ সম্পদ।

বছর দশেক আগের কথা। নিছক শখ করে নয় রাজ্যের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে বনদপ্তর ত্রিপুরার বনাঞ্চলে রাবার বীজ বপন করা সুরু করেন। সামান্য কয়েক একরে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, আজ তা কয়েক'শ একর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরো কয়েক'শ একর জমি রাবার চাষের আওতার আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

রাবার উৎপাদকের তালিকায় ত্রিপুরা একটি নতুন নাম হলেও কয়েক বছরেই এখানকার রাবার বাগান রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছে। রাজ্য-সরকার, বনদপ্তর, রাবার বোর্ড সবাই রাবার চাষের এলাকা বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছেন। ভারতবর্ষের রাবার উৎপাদক রাজ্য বলতে কেরালাকেই বোঝায়। সেই কেরালা থেকে আমদানী করা বীজ থেকে নতুন করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ত্রিপুরায় যে রাবার বীজ উৎপাদিত হচ্ছে তার মান নাকি কেরালার থেকেও ভালো। রাজ্য বনদপ্তর নিজেদের উদ্যোগে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে রাবার উৎপাদন অব্যাহত রেখে চলেছেন।

ত্রিপুরার পতিছড়িতে রাবার নার্সারী

রাজ্যে রাবার গাছের এলাকা যেভাবে বেড়ে চলেছে—তেমন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা না ঘটলে আগামী '৮২ সাল নাগাদ ত্রিপুরায় একটি রাবার কারখানা গড়ে উঠতে পারে।

রাবার গাছ লাগানো কিন্তু খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। স্থান নির্বাচনের পর জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর জঙ্গল পোড়াতে হবে। ২১ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত করে আবার ভরাট করে দিতে হবে। এরপর একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চারা লাগাতে হবে। আমদানী করা বীজগুলিকে লাগানোর ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই অঙ্কুর বের হয়। ১৮ ইঞ্চি লম্বা শেকড় হলে চারা লাগানো হয়। দুই সারির মাঝখানে 'পিউরোরিয়া' নামক লতাগুল্ম লাগানো হয় যা ভূমিক্ষয় রোধ এবং রাবার উৎপাদনে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। গাছ বেড়ে উঠলে সাতফুট পর্য্যন্ত ছেঁটে দেওয়া হয়। গাছ লাগানোর সাত বৎসরের মধ্যেই রাবার নিষ্কাশনযোগ্য হয়।

নিষ্কাশিত রাবারকে 'ল্যাটেক্স' বলা হয়। একদিন পর পর প্রত্যেক গাছ থেকে 'ল্যাটেক্স' সংগ্রহ করা হয়। এই সংগ্রহকে 'টেপিং' বলা হয়ে থাকে। প্রতি 'টেপিং-এ তিন থেকে চার আউন্স 'ল্যাটেক্স' পাওয়া যায়। একটা গাছ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত 'টেপিং' করা চলে। প্রথম ২০ বছর নীচে থেকে এবং পরবর্তী ২০ বছর ওপর থেকে 'টেপিং' করা হয়। রাবার তৈরীর ব্যাপারটা খুবই আকর্ষণীয়। গাছ থেকে সংগৃহীত 'ল্যাটেক্স' পরিষ্কার করে ছেঁকে সম-পরিমাণ জলের সঙ্গে ফরাসিক এসিড মেশানো হয়। মিশ্রিত 'ল্যাটেক্স' সারা-রাত একটা পাত্রে রাখার ফলে মাখনের মত কোমল আঠালো আকার ধারণ করে। সেখান থেকে যন্ত্রঘরে এনে প্লেন রোলারে চালান হয়। তার পর খাঁজ কাটা রোলারের মধ্য দিয়ে চালিয়ে সম্পূর্ণ সীট রাবারে পরিণত করা হয়। তারপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধোয়ার পর শুকিয়ে 'স্মোক হাউসে' পাঠানো হয় চূড়ান্তভাবে বাজারজাত করার জন্য।

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মুখোমুখি

আমি গল্প পড়ুয়াদের কথা জানিনে, যাঁরা মাঝে মধ্যে এ গল্প সে গল্প ওলটান। তবে যাঁরা প্রকৃত পাঠক, লেখক ধরে ধরে যাঁরা পড়েন, তাঁরা কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ লেখককে চিনে নেন। জেনে ফেলেন। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে লিখছি। এতদিনে আমার আর কতটাই বা অজানা?

আমার প্রথম দিকের গল্পগুলিতে যতটানা আমার তৎকালীন প্রতিবেশ তার চেয়ে অনেক বেশি করে খুঁজে পাই বাল্য কৈশোরের থিতিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞতা। ভবকাকার গার্ড সাহেবের পোষাক ছাড়াও বগলে থাকত গুটোনো লাল সবুজ ফ্লাগ আর হাতে ঝুলোনো থাকত গার্ড সাহেবের বাতিটা। বিকেলের দিকে ভবকাকা এলে ফেরার সময় তাঁর বাতিটা নিয়ে আমায় খেলা দেখাতেন। এইছিল লাল তারপর হয়ে গেল সবুজ। আবার লাল, আবার সবুজ। আমি খুব অবাক হয়ে নিবিষ্ট মনে দেখতাম। আর অবাক হতাম। ভবকাকা আমাকে বলতেন, নে তুই এবার কর দেখি। আমার ছোট হাতে অতটা শক্তি ছিলনা যে আমি রঙ পালটে ফেলি (অসময়)। স্বপ্নে যেমন মানুষ সবসময়েই নিজের ফেলে আসা বাড়িটায় ঘটনা ঘটতে দেখে। —আমি যখন ভিতরে ভিতরে হয়তো এই লেখক জীবনের জন্য, কিংবা সিরিয়াস পাঠক হবার জন্য তৈরী হচ্ছি তখন অবশ্য অবশ্যই সুবোধ ঘোষ (আর তৎকালেই আমার সমকালীন এবং ঈষৎ বয়োকনিষ্ঠদের মধ্যে কেইবা নন?) ছিলেন আমার অন্যতম লেখক আপন জন। অনেক সময় আমাদের গল্পের পরিপার্শ্বেও মিল ঘটে গেছে, কারণ সুবোধ ঘোষ ও আমার বাল্য কৈশোর যৌবনের বিচরণ অঞ্চলও ছিল প্রায় এক। বিহার বাংলা সীমান্তের কয়লাখনি অঞ্চল, রেল কলোনী, আধা মফস্বল পরিবেশ, আর সেখানকার নানা ধরণের মানুষ—এই-ই তো বার বার ফিরে এসেছে আমার প্রথম দিককার বহু গল্পে।

—কলকাতা? এখানে এসেছি কলেজে পড়বার সময়। স্থায়ী হয়েছি, যে বছর দ্বিতীয় গল্প বেরোল সেই—১৯৪৬-এ। বছরটা ছিল দাঙ্গার। কলকাতাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু সব গল্পেই আমি ঠিক তন্মুহূর্তিক হতে পারিনে। 'দেওয়াল' তিনখণ্ড লেখার পর কলকাতাও আমাকে লেখায় ততটা টানতে পারছেনা। আমার গল্পের চরিত্রগুলিকে যখনই আমি মাথা থেকে তুলে নিয়ে কলম দিয়ে গড়িয়ে দিতে চাই, তখনই তাদের জন্য যে জগত বানাই সে জগত এই পাগলা শহরটার বাইরে।

—আমি কিন্তু প্রথম দিকে খুব একটা একবেলা-ওবেলা গল্প লিখিনি। কখনও বছরে একটিও না। দশ বছরে গুটি ছয়েক গল্প, একটা খুঁৎখুঁতে লেখককেই চিত্রিত করে, তাই না? আমি তাই-ই। প্রথম আঁচড়েই প্রেসে?—নাঃ। আমার সব সময়েই একটু ছেঁড়া খোঁড়া, কাটা বদলানো, খসড়া করার দিকে ঝোঁক।

—প্রথম দশ-বছর গল্প লেখার পর সাগরময় ঘোষ আমাকে মনে রাখেন 'ইঁদুর' আর 'পীয়ারী লালবাঈ' পড়ে। আর দেশে আমার প্রথম গল্প ১৯৫২-তে 'বরফ সাহেবের মেয়ে'।

[বিমল কর বসেছিলেন তাঁর চেয়ারে। কাজের টেবিলের পাশে। তিনি সব সময় শাদা পোষাক পরে। লম্বা একহারা চেহারা। হাসেন সব সময়। চোখের চশমার কাঁচ পুরু। এবং কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুন্দর। বাচনভঙ্গী লক্ষ্যণীয়।

বর্তমান সাক্ষাৎকারের একটি প্রশ্ন ছিল, একজন লেখক ক্রমাগত একটি বিষয় নিয়েই লিখে যান, যতক্ষণ না তিনি তাঁর, জাল থেকে মুক্তি পান। বিমল কর কি তাই?......]

—হ্যাঁ। মৃত্যু, মৃত্যুভয়, মৃত্যুকে পুড়িয়ে নানাবিধ জটিল বোধ, যা শিকড় নাড়া দিয়ে ক্রমাগত সম্পর্ক, আসক্তি, উপভোগ থেকে মনকে আলগা করে এনে তার ডালে ডালে ফুটিয়ে তোলা পাতা, ফুল ও ফলগুলিকে—হতে দেয়,—কিন্তু কেমন যেন মৃত্যুবর্ণ করে তোলে। আমার প্রথম গল্প থেকেই তার সুরু। বিচিত্র-ভাবে আমার এই নিয়তি এই মৃত্যুভীতির

আমার শেষ বাঁক কোথায় তা আমি জানিনা।

তবে বলেছি তো, খোঁজ যখন সুরু হয়েছে.........তখন বার বার বাঁক নিতেই হবে।

বিমল কর

সংগে বিচিত্র রমণ। একটা বাইশ তেইশ বছরের যুবকের পক্ষে প্রথম লেখাতেই কি করে যেন চলে এলো অম্বিকানাথ,- এক বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মানুষের মৃত্যু বিষয়ে ধারণা এবং সহসা জীবনের শেষ-বিন্দুতে এসে জাগতিক মায়া বিষয়ে তীব্র ব্যাকুলতা। কেন? কেন?

—এখন যখন সচেতন হয়ে নিজেই নিজের গল্পের শব্দগুলো সরিয়ে সরিয়ে খুঁজতে সুরু করি তখন একটা সূত্র খুঁজে পাই। সূত্র বলব, না একটা জট,—যার ভিতর মিশে গেছে অনেকগুলো সুতোর গেঁট। অনেকগুলি সুতো! পৃথিবীর বহু অমানবিক ভয়ঙ্কর ঘটনা, আমার ব্যক্তি জীবনের বহু ছবি, যা প্রতিদিনের চলচ্চিত্র থেকে বের করে এনে যেন 'ষ্টিল' করে রেখেছি। যেমন ধরুন বৃষ্টি,—মেঘগর্জন জল মৃত্যু, তীক্ষ্ণ চেহারার সেই সদ্যহাঁটতে শেখা বোনটি আমার, মায়ের কোলের ছোট্ট ভাইটি আমার, তারপর ব্ল্যাক-আউট, বোমা, যুদ্ধ, দাংগা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মানুষে-মিলিটারিতে উদ্বাস্তুতে ফুলে ওঠা কলকাতা....একদিকে সমগ্রভাবে একদিকে একলা এই সভ্যতার শিখরে এসে দাঁড়িয়ে, একবিংশের দ্বারদেশে এসে অমানুষিক অমানবিক অভিজ্ঞতা, অজানা যুক্তির বাইরে যে নিয়তি তার যবনিকা.... আমি ক্রমশ তাই ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে উঠছিলাম। অস্থির এবং দেহে মনে অসুস্থ।

—হ্যাঁ, সেই অসুস্থতার ধাপ আমি পেরিয়ে এসেছি। 'সুধাময়' গল্পটি আমার সেই শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর একটি সুরুর উজ্জ্বল বিন্দু। আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে 'সুধাময়', ধন্যবাদ 'সুধাময়'—সুধাময় আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

—সুধাময়ের আগে পর্যন্ত আমার ভিতর খোঁজ ছিলনা। ছিল শুধু জমে থাকা মৃত্যুর উৎসরণ। এখন আমার মধ্যে জেগে উঠেছে খোঁজ। খোঁজ মানেই চলন। গতি।

—এই গতিপথেও আমি জনম দিতে দিতে গিয়েছি গ্লানি ও পাপের কথা, পথ খোঁজার পথে আমার Obsession-ই বলুন আর যাই-ই বলুন তার স্বীকারোক্তি বলবনা উপলব্ধিকে বিলিয়ে বিলিয়ে যাওয়া। 'পূর্ণ ও অপূর্ণ' লেখার পর এখন আমি সহজ বোধ করছি।

....সুরেশ্বর মৃদুস্বরে বলল, মানুষ তার সমস্ত অভাব, ব্যর্থতা, অপূর্ণতা অক্ষমতার কথা নিজে যত জানে আকাশের ভগবান তত জানেনা। ঈশ্বর আমার কাছে মানুষের কাম্য ও প্রার্থিত সমস্তগুণের সমষ্টি। আমার ঈশ্বর নির্গুণ নয়।.....

এবছর সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন বিমল কর। 'অসময়' উপন্যাসের জন্য। জন্ম ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ চব্বিশ-পরগণার শাখাচূড়া গ্রামে। বাল্য কৈশোর ও যৌবন কেটেছে বিহারের বিভিন্ন জায়গায়।

লেখাপড়া সুরু ধানবাদে, তারপর কুলটি আসানসোলে কিছুদিন পড়াশুনা করেছেন।

কলকাতার কারমাইকেল কলেজ (আর. জি. কর) থেকে আই. এসসি. পাশ করে শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজে ভর্তি হলেও পড়া শেষ না করেই চলে আসেন বিদ্যাসাগর কলেজে। ১৯৪০-এ বি. এ. পাশ করেন।

প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ প্রবর্তকে। 'অম্বিকানাথের মুক্তি'।
প্রথম উপন্যাস 'হ্রদ'।
জীবীকার অভিজ্ঞতা বিচিত্র।
বর্তমানে 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।
আনন্দ পুরস্কার: ১৯৬৭।

মানুষ তার দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম, শৌর্য, সৌন্দর্য সমস্ত কিছুর চরম কল্পনা ঈশ্বরের ওপর আরোপ করেছে; তাই ঈশ্বরের চেয়ে মমতাময়, প্রেমময় আর কিছুকে বলিনা। অপূর্ণ মানুষের ধারণায় ঈশ্বরই তাই পূর্ণ। ....অবনী জানেনা এতে কিছু পাওয়া যায় কিনা। তার বিশ্বাস হয়না। সুরেশ্বর নির্দ্ধেশের মত সমস্ত প্রাপ্তিগুলোই একে একে ফেলে দিয়েছে। এখন, সে অন্যকিছুর অপেক্ষায় আছে......অবনীর বিশ্বাস করতে বাধাছিল, এতে কিছু পাওয়া যায়। তবু কী এক বেদনায়, সহানুভূতি ও করুণায় অবনী প্রার্থনা করল: ওই মানুষটি যেন কিছু পায়! কিছু পায়! (পূর্ণ ও অপর্ণ)

—পুরস্কার? নাঃ আমি এ পুরস্কার আশা করিনি। কথাটা এই জন্যেই বলেছি যে আদৌ পুরস্কার টুরস্কার পাওয়ার কথা আমার ঠিক মাথায় আসেনি। মাথায় না এলে আর কি করে আশা করি বলুন?

—নতুন রীতির প্রবর্তন? ছোটগল্পে? হ্যাঁ এ আন্দোলন আমাদের। আমরা গল্পের গল্পত্বকে ঠিক ফেলে দিতে চাইনি। প্লটহীন গল্পও জোর করে লিখতে চাইনি, আমরা সেই গল্পত্বর সংগে আরো একটি ডাইমেনসন যোগ করতে চেয়েছি। অর্থাৎ মানবজীবনের অত্যাবশ্যক কোনো পয়েন্টকে, ধারণাকে যুক্তকরে 'মাত্রা' বাড়িয়ে দিতে চেয়েছি। অর্থের দিক থেকেও গভীরতা যুক্ত করতে চেয়েছি।

—হ্যাঁ কথাগুলো খুব চলে আসছে বটে। বাংলা গল্পে উপন্যাসে 'পাপবোধ' নাকি আমারই সংযুক্তি। এটা বিদেশীর ধারণা। অর্থাৎ ক্রিশ্চান ধারণা। কিন্তু না। আমিকি আমার চিন্তাধারার সংগে যে বিশালতার বহির্জগত এবং তার ধর্মীয় বোধের অন্তর্জগতকে আমার মতন করে মেশাতে পারিনা?

শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ভুলি নাই ■ অন্নদা মোহন বাগচী

কাল শুভময়ের চিঠি পেয়েছি। আজ বিকালের ট্রেনে ও আসছে—বৌ নিয়ে।

ওর বিয়েতে যেতে পারিনি। অনেক করে লিখেছিল যেতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি। তাই ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম কয়দিন আগে। আর ঐ সাথে ওর বৌর জন্য উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম একটা লেডিজ রিষ্টওয়াচ। শুনেছি কলেজে পড়া মেয়ে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত ঘড়িটাই উপযুক্ত উপহার বলে মনে করেছিলাম। কাল ওর চিঠি পেলাম। ওর বৌর নাকি ঘড়িটা দারুণ পছন্দ হয়েছে। শুভময় লিখেছে: পর্বত মহম্মদের কাছে না এল তো বয়েই গেল। মহম্মদই যাচ্ছে পর্বতের কাছে। রবিবারে যে ট্রেনটা তোদের ষ্টেশনে বিকেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে পৌছয়, এটাতে যাচ্ছি সুতপাকে নিয়ে—তোকে দেখাতে। বাড়ীতে থাকিস কিন্তু।......

কিন্তু বাড়ীতে থাকতে পারলামনা, ষ্টেশনে যাওয়াই ঠিক করলাম। একে তো শুভময় এই প্রথম আসছে এখানে। তার উপরে সঙ্গে নতুন বৌ। পাড়াগাঁয়ের এই ছোট্ট ষ্টেশনটায় ট্রেন নামমাত্র দাঁড়ায়। নতুন মানুষ, নতুন জায়গায় অসুবিধায় পড়তে পারে ভেবে, ট্রেনের সময়ের কিছুটা আগেই ষ্টেশনে গেলাম ওদের নামিয়ে নিতে।......

ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে খোঁজ নিলাম, ট্রেন আসতে দেরী আছে।.....তাই ওয়েটিং রুমের বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চটাতে হেলান দিয়ে একটু আরাম করছি, হঠাৎ সারাটা ষ্টেশন জুড়ে খুব একটা সোরগোল উঠল। নিস্তরঙ্গ শান্ত পুকুরের জলে কেউ যেন হঠাৎ একটা বড় ঢিল ছুঁড়ে দিল।

ঝমঝম বাজনা আর বহুকণ্ঠের সম্মিলিত কোলাহলের মধ্য দিয়ে একটা বিয়ের দল এসে ষ্টেশনে ঢুকল। সঙ্গে বাক্স, পেটরা, মোটঘাট প্রচুর। সবই আনকোরা নতুন। দেখে মনে হল বিয়েরই যৌতুক এগুলো সব।

ওরাও এই ট্রেনেই যাবে। কয়েক-মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা হৈচৈ পড়ে গেল চারদিকে। প্রায় জনবিরল ষ্টেশনটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা মেলার মত মুখর হয়ে উঠল. কেউ ছুটল টিকিট কাটতে। কেউ বা গেল মালপত্র লাগেজ করতে। আবার কেউ বা অনাবশ্যক ছুটোছুটি করে আজ পাড়াগাঁয়ের এই ছোট্ট ষ্টেশনটা সরগরম করে তুলল।

প্ল্যাটফর্মের উপরে পাশাপাশি দুটো ট্রাঙ্কের উপর গাঁটছড়া বাঁধা বরকনে বসল। তাদের ঘিরে দাঁড়াল—ষ্টেশন কোয়ার্টারের ছোটছোট ছেলে মেয়েদের একটা কৌতূহলী দল। আশে পাশে থেকেও এল আরও অনেকে।

একা একা বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। এক পা দুই পা করে ঐ দিকেই এগিয়ে গেলাম—বৌ দেখব।

দেখলাম পরণে লাল টকটকে বেনারসী শাড়ি, কপাল পর্যন্ত টেনে দেওয়া ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মুখখানা ঠিক যেন একটা আধফোটা গোলাপ। হয় তো বা তার চেয়েও সুন্দর, তার চেয়েও মনোরম। এক নজরে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কতদিন যে এমন স্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিত মুখশ্রী চোখে পড়েনি। বয়স বছর পনেরো কী ষোল। দুধে আলতা গায়ের রঙ।

টানাটানা একজোড়া ডাগর চোখ—যেন কত মায়া মাখানো। কত স্বপ্ন দিয়ে গড়া। একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায়না।

এমনি একটা সত্যিকারের লাবণ্যবতী ষোড়শী বহু দিন চোখে পড়েনি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ঐ ঢলঢলে মুখখানি জুড়ে কিসের যেন একটা বিষাদ-মলিন ছায়া ছড়িয়ে আছে। মনে হল যেন পূর্ণিমার চাঁদে গ্রহণ লেগেছে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার কেন যেন মনে হতে লাগল ঐ দীর্ঘায়ত হরিণ চোখ দুটি একটা অসহায় দৃষ্টি মেলে এই জনাকীর্ণ ষ্টেশনের আনাচে কানাচে কী যেন খুঁজে ফিরছে।......

মনে মনে ভাবলাম—আত্মীয় পরিজন, বাবা, মা, ভাই, বোন, আবাল্যের খেলার

সাথী আর আজন্মের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা পরিবেশ, সব কিছু পিছনে ফেলে চির-দিনের মত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, তাই বুঝি আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় চোখ দুটি তার চিক্‌চিক্ করছে। বিদায়ের পূর্ব-মুহূর্তে শেষবারের মত একবার সব কিছুর উপরে চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যই বুঝি দুই চোখে তার এত চঞ্চলতা। এত আকুলতা!

বর দেখে কিন্তু মন ভরল না।

বয়সে—যৌবন বহুদিন গত হয়ে গেছে। গায়ের রঙ রীতিমত কালো। সামনের কয়েকটা দাঁত অস্বাভাবিক উঁচু। কথা বলতে বা হাসতে গেলে বড়ই বিসদৃশ দেখায়। আর সর্বোপরি সরু ছুঁচালো চিবুকটি—তার মুখের সম্পূর্ণ চেহারাটাই কেমন যেন বিকৃত করে ফেলেছে।

তাই বরকে বড়ই বেমানান লাগল অমন অপরূপ সুন্দরী বধূটির পাশে।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? তার সব রূপের অগৌরব ঢেকে দিয়েছে রূপেয়া। তার পরিচয়—দেখলাম হাতের সব কয়টি আঙ্গুলই ভারী ভারী সোনার আঙটিতে ভরা। এগুলো সবই তার সম্পদের সাক্ষী। তার ডানহাতের অনামিকাটিতে অপরাহ্নের বিদায়ী সূর্যের রশ্মিচ্ছটা লেগে যেভাবে মুহুর্মুহু রঙ বেরঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে—তা দেখে জহুরী না হয়েও নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় ওটা হীরা। আর শুধু হীরাই নয়—রীতিমত বিলাতী কাটিংএর দামী হীরা। অন্যমনস্ক ভাবে মেয়েটির মুখের দিকে আর একবার তাকালাম। এবং দেখে আশ্চর্য হলাম—তার ক্ষণ-পূর্বের ব্যথাভরা ছলছল চোখদুটি সহসা কী যেন দেখতে পেয়ে এক যাদুমন্ত্রে হেসে উঠেছে। ঠোঁটের কোন দুটিতে তারই সুস্পষ্ট ইংগিত। একটা চাপা উল্লাসের অস্ফুট প্রতিফলন।

তার দুই চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে লক্ষ্য করলাম যে, বছর আঠারো বয়সের দিব্যদর্শন এক কিশোর করুণ বিষাদ-ক্লিষ্ট। এদের এই ডামাডোল এড়িয়ে-বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে—ছলছল উদাস দৃষ্টি মেলে এই দিকেই চেয়ে আছে। মেয়েটির ওষ্ঠের প্রচ্ছন্ন খুশির প্রতিফলন বুঝি এরও ঠোঁটে ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়ে তুলল এক অপূর্ব সুন্দর লালিমা। এনে দিল—যেন অসীম প্রত্যাশার এক পরম প্রশান্তি। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ বিদায় রশ্মির স্পর্শ বুঝি রাঙিয়ে দিল ওর গাল আর মুখ। আর ঐ সঙ্গে বুঝি মনও।

পায়চারি করতে করতে ক্রমশ প্ল্যাটফর্মের প্রান্তদেশে এগিয়ে গেলাম। সমস্ত মনটা জুড়ে সুন্দর আর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। সংসারে কেন এমন হয়?

: ফের তুমি ষ্টেশন পর্যন্ত পিছু নিয়েছ? বেহায়া নির্লজ্জ কোথাকার! এততেও তোমার আক্কেল হল না?

চমকে পিছন ফিরে তাকালাম।

একটা ল্যাম্পপোষ্টের আড়ালে ঐ ছেলেটির সামনে দাঁড়িয়ে চাপাগলায় তম্বি করছে এক ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ আগে তাকে বরের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। কন্যাপক্ষেরই কেউ হবে হয়তো।

ছেলেটি অধোবদনে নিরুত্তর রইল। মনে হল তার সমাহিত অন্তরের বর্মে লেগে—তিরস্কারের সবগুলি বিষাক্ত নিষ্ঠুর শরই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। কিন্তু আক্রমণকারীকে তা প্রতিহত করতে পারল না।

: এখনও বলছি—ভাল চাও তো ষ্টেশন ছেড়ে এখনই চলে যাও। বরকনে আগে বিদেয় হোক—তারপর তোমার মত কুকুরকে কী করে চাবকে শায়েস্তা করতে হয়—তা আমি ভাল করেই জানি। কী আস্পর্ধা শেষ পর্যন্ত ষ্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করেছ! কলেজে পড়াশুনা করে এই সব বিদ্যাই শিখছ বুঝি? পরের মেয়ের পিছু নেওয়া?

কেমন যেন একটা অস্বস্তির চাপে মুহূর্তের মধ্যে মনটা বিষিয়ে উঠল। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগে অপমানহত ছেলেটির মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

একটু আগে যেখানে দেখেছিলাম—পরম পরিতৃপ্তির এক অম্লান দীপ্তি, সেই উজ্জ্বল আকাশ এখন যেন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। বিষণ্ণ ব্যথার ভারে চোখ দুটি ছলছল করছে।

নতমস্তকে ছেলেটি ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। দেখে মনে হল—যেন পারছেনা, তবুও জোর করে তাকে চলতে হচ্ছে। হাঁটু দুটি যেন এক অপরিসীম ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। এখনই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে—ষ্টেশনের ধুলোকাঁকরের মধ্যে মুখ গুঁজে।

ধীরে ধীরে এক সময়ে সে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশেষে ট্রেন এল। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে বরকনে বিদায় নিল। আমি শুভময়কে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হলাম। তারা আসেনি।......

হতাশ চিত্তে প্রায় জনবিরল প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলেছি, আবছা আলোতেও দেখতে পেলাম-পায়ের সামনে সাদামত কী যেন একটা পড়ে আছে।

ঝুঁকে পড়ে কুড়িয়ে নিলাম।...... একটা রুমাল।

ভাঁজ খুলে এক নজর দেখেই চমকে উঠলাম। এই রুমালটিই ঐ নব বধূটির হাতের মুঠোতে ধরা দেখেছি খানিক আগে। হাতের মুঠোতে রুমালটা চেপে ধরে গাড়ীর জানালা দিয়ে, একটা অসীম প্রত্যাশার আকুলতা নিয়ে, কাকে যেন খুঁজে ফিরছিল তার অশ্রুসজল চঞ্চল চোখ দুটি।

মৃদু সুরভিত রুমালটি কেমন যেন ভেজা ভেজা। বিদায়বেলার চোখের জলের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

আলোর সামনে রুমালখানা ভাল করে মেলে ধরলাম। এক কোণে রেশমী রঙিন সুতোয় লেখা—'রবিদাকে—রেণু।'

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বর্ণমান

নির্মল সেনগুপ্ত

স্বর্ণমান কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত আছি। অর্থনীতিবিদদের পরিচয় আরও বেশী। সবাই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন স্বর্ণমানের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে স্বর্ণের প্রচণ্ড রকমের মান অভিমানের পালা চলেছে। বলতে গেলে স্বর্ণমানের সঙ্গে স্বর্ণের বিচ্ছেদ প্রায় আসন্ন। স্বর্ণের বিচ্ছেদ মানে স্বর্ণ নামক ধাতুটির বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ কিভাবে ঘটতে যাচ্ছে, তা বোঝা যাবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক তহবিলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ অনুধাবন করলে। শিল্পায়িত প্রধান দশটি দেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সোনার কোনো সরকারী দাম থাকবে না। বিভিন্ন মুদ্রার মতো এবং বিভিন্ন পণ্যের মতো বিশ্বের বাজারে সোনা থাকবে ভাসমান, অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে 'ফ্লোটিং'।

অর্থের বাজারে এর ফলাফল কি হবে, তা এখনই সম্ভবত জোর করে বলা যাবে না। এর জন্য মাথা ঘামাতে হয়, অর্থনীতিবিদরা মাথা ঘামান। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বেশী মাথাব্যথা না থাকাই ভাল। ভাসমান হবার সঙ্গে সঙ্গেই খবর এসেছে ইওরোপের বাজারে সোনার দাম খানিকটা পড়ে গেছে। তার দরুণ অবশ্য কলকাতার সোনার বাজারে তেমন হেরফের হয় নি। কিই বা হেরফের হবে? যাঁরা কিলোগ্রাম হিসাবে সোনার বেচাকেনা করেন, তাদের কথা আলাদা। সোনার সঙ্গে অধিকাংশেরই দু'দশ গ্রামের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যাদের ভবের হাটের বেচাকেনা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা হবার কথা নয়। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি যদি তাদের তরল সোনা অর্থাৎ কিনা তেল বেচে ইওরোপ আমেরিকার আসল সোনাগুলি নিজেদের পকেটস্থ করে, তবে তাতেও ইতরজনের আনন্দিত হবার কারণ নেই, যদিও কলকাতার ব্যাপারীরা হয়তো ভাবছেন, কিছু বাড়তি সোনা এদিকে এলেও আসতে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থের বাজারে থেকে সোনাকে যতই 'দূর' দূর' করা হোক না কেন, সোনা তার প্রতিশোধ নেবে কিনা, নিলে কিভাবে নেবে, তা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল মহম্মদ বিন তুঘলকের কথা। ঘটনা চতুর্দশ শতাব্দীর। সে সময়টাতে চীন দেশে কাগজের নোট চালু ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক তারই অনুকরণে তামার নোট চালু করলেন। জাল তামার নোটে দেশ ছেয়ে গেল। মহম্মদকে শেষ পর্যন্ত তার গুনাগারি দিতে হ'ল সোনারূপায়। ফলে রাজকোষ একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। মহম্মদ বিন তুঘলকের পাগলা রাজা বলে বদনাম ছিল। এযুগের অর্থনবিশদের সেই বদনাম নেই।

এই দৃষ্টান্ত এ যুগে কারো কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। কারণ সে যুগের দুনিয়া আর এযুগের দুনিয়া এক নয়। কিন্তু সব যুগেই যেটা অপরিবর্তিত, তা হলো স্বর্ণ কামনা আর স্বর্ণমর্যাদা। শুনতে পাই সৌদি আরবের হাতে নাকি অজস্র সোনা। সেখানকার রাজারা মুঘল সম্রাট সাজাহানের মণিমুক্তা স্বর্ণ খচিত ময়ূর সিংহাসনের মতো কোনো সিংহাসনে বসেন কিনা, অথবা সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যান কিনা জানিনা, তবে খবরে এইটুকু দেখেছি যে, রাজার হত্যাকারী রাজপুত্রের প্রাণনাশ করা হয়েছিল সোনার তরবারির আঘাতে। তাতে মৃত্যুটা কিছু মধুর হয় নি বটে, কিন্তু রাজকীয় মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সোনার তরবারির আঘাতে রক্তধারা বইবার ঘটনা আমাদের দেশে কোনো কালে ঘটতো কিনা জানি না, কিন্তু অশ্রুধারা বইবার ঘটনা অজস্র ঘটেছে। শহর কলকাতার বণিক সম্প্রদায়ের পুত্রকন্যাদের বিয়ের অন্যতম প্রধান আলোচ্য হ'ল, কত ভরি সোনা লেনদেন হবে, আশী ভরি, না সোয়া শ' ভরি, না দুশো ভরি? এমনি একটি বাড়ীর কথোপকথন শুনেছি—'আশী ভরির বেশী দেওয়া গেল, না, যে দিনকাল।' দিনকাল খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আশাভরি দিতে পারছেন চোখের জল না ফেলেই। কিন্তু দু'দশ ভরি দিতে গিয়ে অনেক কন্যার পিতাকেই অশ্রু মোচন করতে হয়। 'অমুক বাবু তার ভদ্রাসনটুকু বিক্রি করিয়া কন্যাকে সালঙ্করা করিয়া বিবাহ দিলেন'—এই ধরণের বর্ণনা কিছু দিন আগেকার গল্প উপন্যাসে যথেষ্টই পাওয়া যেতো।

এসব হ'ল সত্যিকারের সোনার কথা, কল্পিত সোনার কথা নয়। এবারে বলি কল্পিত সোনার কথা এবং অন্যতর স্বর্ণমানের কথা। স্বর্ণমোহ বোধকরি আদিকাল থেকে মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে। উপমা হিসেবে স্বর্ণের জুড়ি নেই। কৃতী রাজা মহারাজা, নবাব বাদশা অথবা মহান পুরুষদের কাহিনী উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে—'এই কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে'। সোনার চাইতে হীরা মুক্তা চুনি পান্না যদিও বেশী দামী, তবু কারো কখনই

ইচ্ছা হয় নি কোনো কাহিনী 'হীরাক্ষরে' বা 'পান্নাক্ষরে' লিখে রাখতে। 'মুক্তাক্ষর' কথাটি চালু আছে বটে, কিন্তু সেটি সুন্দর হস্তাক্ষরের অতিরিক্ত কিছু নয়। 'গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর'-এর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন।

সুতরাং যেখানেই 'তম', সেখানেই স্বর্ণের অনুপ্রবেশ। শ্রেষ্ঠতম, বলিষ্ঠতম বা সুন্দরতম যা কিছু তার সবই উল্লেখ করতে হবে স্বর্ণাক্ষরে, তা'নইলে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না। কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণমানের মধ্যমানও আছে। মানুষের চরিত্র বা তার কাজকর্মের বর্ণনায় এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন ধরুন, আমরা বলি কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ঠিক নয়, আমাদের চলতে হবে ভাল মন্দের বিচার ক'রে এবং মধ্য পথটি অনুসরণ ক'রে। ভালমন্দকে তুলাদণ্ডে ওজন করে মধ্যপথটি খুঁজে বার করতে হবে। সেই মধ্যপথটির নাম হ'ল মধ্যমান, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'গোল্ডেন মীন'। যেখানে 'গোল্ডেন মীন'-এর প্রশ্ন, সেখানে কিছুতেই 'সুপারলেটিভ' হওয়া চলবে না।

এ আবার আরও অন্য রকমের এক স্বর্ণমান। অজ্ঞাতসারে সবাই আমরা আমাদের আচার ব্যবহারে এই স্বর্ণমান বা গোল্ডেন মীনের অনুগামী। আমরা সংযত হয়ে কথা বলি পাছে কেউ ব্যথা না পায়। আমরা সংযত হয়ে পথ চলি পাছে দুর্ঘটনা না হয়। বিপদ আপদে আমরা এগিয়ে যাই, আবার অতিরিক্ত সাহস দেখাবার আগে পরিস্থিতি বিবেচনায় পিছিয়েও আসি। এককথায় আদর্শ আচরণের ভিত্তি হবে গোল্ডেন মীন বা স্বর্ণমান তথা মধ্যমান। এমনি আদর্শ আচরণের ব্যাখ্যা করেছেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল। অ্যারিষ্টটলের সেই মানুষটি 'খামোখা বিপদের সামনে যাবে না, কিন্তু প্রয়োজন হলে আত্মবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে। সে অপরকে সাহায্য করবে। কিন্তু অপরের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত থাকবে। সে কারোকে দয়া করবে না, কারণ সেটা হবে তার অহমিকা। কারোর দয়া সে নেবে না, কারণ সেটা হবে হীনমন্যতা। তার বাইরের চাকচিক্য থাকবে না। কাজে ও কথায় সে হবে খোলাখুলি। সে কারো প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে না, কারণ কোনো কিছুই তার চোখে বিরাট বড় নয়। বন্ধুর সঙ্গে তার দহরম মহরম থাকবে, কিন্তু সে কারো মোসাহেবী করবে না, কারণ সেটা হবে দাস্যতা। কারো প্রতি সে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। আঘাত বেদনা সব কিছুই সে ভুলবার চেষ্টা করবে। সে অপরের নিন্দা করবে না, অপরের প্রশংসাও চাইবে না। প্রয়োজনের বেশী কথা সে বলবে না। সে হবে গম্ভীর, সংযত ও উত্তেজনাবর্জিত। আত্মমর্য্যাদা ও সাহসের সঙ্গে সে জীবনের দুর্ঘটনাগুলির সম্মুখীন হবে। সে নিজেই হবে নিজের সবচেয়ে বড় বন্ধু। নিজের মধ্যে সীমিত থাকতেই সে আনন্দ পাবে সবচেয়ে বেশী।'
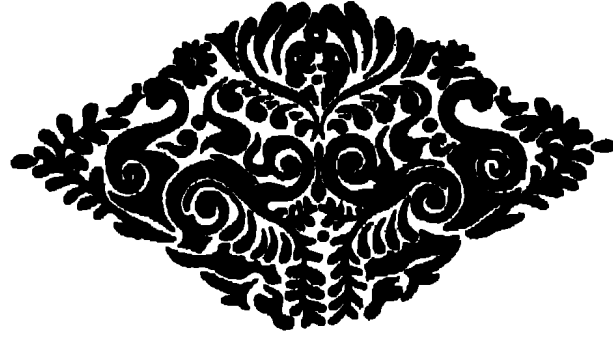
ত্রিপুরায় রাবার চাষ

৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ত্রিপুরায় উৎপন্ন রাবারের মান এত ভালো যে রাবারের দাম যেখানে কেজি প্রতি ৫ টাকা থেকে সোয়া ৫ টাকার মধ্যে—সেখানে ত্রিপুরার রাবারের দাম উঠেছে ৮ টাকা। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যেই রাবার বিক্রী থেকে একটা বিরাট অংকের অর্থ তুলে নিচ্ছেন। ত্রিপুরায় রাবার বীজ উৎপন্ন হচ্ছে রেকর্ড পরিমাণে। মণিপুর এবং মিজোরাম সরকার ত্রিপুরা থেকে রাবার বীজ কিনছেন। রাজ্য দপ্তরের আশা—আগামী কয়েকবছরের মধ্যে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে তারা রাবার বীজ সরবরাহ করতে পারবেন।

মুখোমুখি : বিমল কর

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

—হ্যাঁ, রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র এসেছে আমার লেখায়। যেমন 'যযাতি' গল্পটির নাম তো এক্ষুনি মনে পড়ছে। আমার 'অসময়' উপন্যাসে ভীষ্ম, সীতা, প্রভৃতি চরিত্রকে নতুন এক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছি।

—বাংলা সাহিত্যে প্রথম Angry youngman? যদুবংশ? আমিই প্রথম নাকি? সমরেশ না? ঠিক জানিনা।

—না, গদ্যকে আমি ধাঁধাঁ লাগানো গয়না পরাতে চাইনা। সংবাদিকতার গদ্যে অলঙ্কার হয়ত চলে। সাহিত্যের গদ্যে গয়না বড় সযত্নে বাছাই করে নিতে হয়। সাহিত্য প্রাণপণে একটা যোগসূত্র খুঁজতে চায়। Communicate করতে চায়। Communication–এর জন্যই আমার সব আয়োজন। আমি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে গদ্য লিখি। প্রতিটি লেখাই ঘষামাজা করি। লিখতে লিখতে একটা ষ্টাইলও তৈরী হয়ে যায়।

—আপনি সেই সরল প্রেমের কথা বলছেন? প্রেম আদৌ আছে কিনা? প্রেম? তারই তো খোঁজ। আমি নানা রকম প্রেমের গল্প লিখেছিতো। সরল, সাধারণ, জটিল, অবাধ ঈশ্বরকে নিয়েও। 'দংশন' বলুন অন্য লেখাতেও বলুন চরিত্রগুলির পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাস্তবতার ভাঁজে ভাঁজে সে এসেছে। কিংবা কখনো শেষ অবলম্বনকেই মনে হয়েছে প্রেম, বিশ্বাসকে—শ্রদ্ধাকে। আমার শেষ বাঁক কোথায় তা আমি জানিনা। তবে বলেছি তো খোঁজ যখন সুরু হয়েছে তখন বার বার বাঁক নিতেই হবে।

সাক্ষাৎকার : **কবিতা সিংহ**

সারা বিশ্বে চায়ের উৎপাদন প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ভারতের উৎপাদনই বেশী, ৪ লক্ষ ৯০ হাজার মেট্রিক টন। শ্রীলঙ্কার স্থান এখন দ্বিতীয়। তবে শ্রীলঙ্কার উৎপাদন ভারতের অর্দ্ধেকের সামান্য কম, ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টনের মত। তারপর চীনের স্থান—তবে চীনের উৎপাদন শ্রীলঙ্কার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন, জাপানের উৎপাদন চীনের প্রায় কাছাকাছি প্রায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন, ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদন ৭৫ হাজার মেট্রিক টন। সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎপাদন বেড়ে চলেছে। বর্তমান উৎপাদন প্রায় ৭৫ হাজার মেট্রিক টন।

চা শিল্পে শ্রীলঙ্কাই ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রীলঙ্কার আভ্যান্তরীণ চাহিদা কম। শ্রীলঙ্কার উৎপাদন যদিও ভারতের অর্দ্ধেক—তবু ভারতের জনসংখ্যা যেখানে ৬০ কোটি—শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা সেখানে মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ। চীনের জনসংখ্যা ৮০ কোটির উপর। কাজেই চীন নিজের দেশের অভ্যান্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি চয়নে

চা শিল্প প্রসঙ্গে

ধীরেন ভৌমিক

চা রপ্তানী করতে পারেনা। ভারতের উৎপাদিত চায়ের প্রায় ৭৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানি হতে পারে। ১৯৭৪ সালে আমরা প্রায় ১৮৮ কোটি টাকা মূল্যের চা বিদেশে রপ্তানী করেছি। বৃটেন ভারতীয় চায়ের প্রধান ক্রেতা। ভারতের চায়ের উৎপাদন কেজি. হিসাবে বর্তমানে ৪৯০ মিলিয়ন কেজি। ১৯৭১ সালে ছিল ৪৩৫ মিলিয়ন কেজি. ১৯৭২ সালে ৪৫৬ মিলিয়ন কেজি. এবং ১৯৭৩ সালে ৪৭২ মিলিয়ন কেজি.।

আসামে উৎপাদিত হয় ২৬৬ মিলিয়ন কেজি. পশ্চিমবঙ্গে ১১৮ মিলিয়ন কেজি. দক্ষিণভারতে ১০০ মিলিয়ন কেজি. ত্রিপুরায় ৬ মিলিয়ন কেজি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রধানত দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স অঞ্চলেই চা উৎপন্ন হয়। দার্জিলিংয়ের চা পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু —স্বাদে গন্ধে এই চা অতুলনীয়। দক্ষিণভারতে কেরালা, তামিলনাড়, মহীশূর এবং নীলগীরিতে চা উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের কাংড়া ও মাণ্ডি এলাকায় সামান্য চা উৎপন্ন হয়। আসামে ৬৩২ টি চা বাগান আছে। ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে ২০১ টি চা বাগান রয়েছে। কাছাড় ও ত্রিপুরায় আছে ১৬৯ টি, দার্জিলিংএ ৯৮ টি, দক্ষিণভারতে ৪৭৫ টি, দেরাদুনে ৩৩ টি, কাংড়া ও মাণ্ডিতেও কয়েকটি ছোট ছোট বাগান আছে। রাঁচি এবং দেরাদুনেও কিছু মাত্রায় চা উৎপাদন হয়। ভারতের চা শিল্পে ১০ লক্ষের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত আছে।

গত বৎসর ভারত বিদেশে যে ১৮৮ কোটি টাকার চা রপ্তানী করেছে— তার মধ্যে বৃটেনে প্রেরণ করেছে ৪৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার চা। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন গত বৎসর বৃটেনকেও ছাড়িয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রয় করেছে ৪৮ কোটি টাকার চা। সোভিয়েত ইউনিয়ন টাকার হিসাবে মূল্য দেওয়ায় বৃটেনের

চেয়ে কম চা ক্রয় করেও অধিক মূল্য দিয়েছে। এক সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চায়ের ক্রেতা হিসাবে বৃটেনের পর দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিল। এখন আমেরিকা সিংহলের চা অধিক পরিমাণে ক্রয় করে এবং চীনের নিকট থেকেও সামান্যমাত্রায় চা ক্রয় করে। ভারতের অন্যান্য বড়ক্রেতা হল যথাক্রমে নেদারল্যাণ্ড, ইরান, আরব রিপাবলিক, আফগানিস্থান, পশ্চিম জার্মাণী, পোলাণ্ড, আমেরিকা, আয়ারল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইরাক, জর্ডন, জাপান ইত্যাদি। যুগোশ্লাভিয়া, সৌদি আরব, কুবায়েত, বাহারিন, মস্কাট ওমানও ভারতীয় চা আমদানী করে। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্বইউ-রোপের পোলাণ্ড এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ ভারতীয় চায়ের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেড়ে চলেছে। ডেনমার্ক, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডও সামান্য মাত্রায় ভারতীয় চা ক্রয় করে। ১৯৭৫ সালে ২১৭ মিলিয়ন কে. জি. চা রপ্তানী করার কথা এবং তাতে ২১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। ১৯৭৪ সালে ১৮৮ কোটি টাকার চা রপ্তানী করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। এর এক এক অঞ্চলের চায়ের এক এক রকম স্বাদ—কাজেই শ্রীলঙ্কার মত ছোট দেশ ভারতের বাজারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু হটতে বাধ্য। তবে শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা যেহেতু খুবই কম-তাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণও কম। বৃটেন ভারতীয় চায়ের রপ্তানির শতকরা ৩৩ ভাগ ক্রয় করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় ৩০ ভাগ ক্রয় করে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন দার্জিলিং ও আসামের চায়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়। আফ্রিকার কেনিয়াও চায়ের বাজারে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে। ১৯৭২ সালে কেনিয়া ৪৭.৬ মিলিয়ন কে. জি. চা রপ্তানি করেছে। ১৯৭৩ সালে এর পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫৭.৫ মিলিয়ন কে. জি.। এর শতকরা ৫০ ভাগ রপ্তানি হয়েছে বৃটেনে, বাকীটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যাণ্ড, পাকিস্তান ও কানাডায়। ১৯৭৪ সালের প্রথম নয় মাসেই কেনিয়া ৩৩.২ মিলিয়ন কে. জি. চা রপ্তানি করেছে।

ভারতের চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য এখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রচেষ্টা চলছে-আসামে, নীলগিরিতে এবং কেরালায় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নেরও প্রচেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকায় এবং হিমাচল প্রদেশের কাংড়া অঞ্চলেও গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। রাঁচিতে চায়ের উৎপাদনের মাত্রা কম হলেও-রাঁচির চায়ে গুণগত উৎকর্ষ দার্জিলিংয়ের চায়ের মত। মুখ্যত কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দর দিয়ে চায়ের রপ্তানী চলছে। ভারত তার চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীলঙ্কাকে পশ্চাতে ফেলে এখন প্রথম রপ্তানীকারী দেশ। তবে শ্রীলঙ্কাও আবার প্রথম স্থান দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আসামের চায়ের রং উত্তম, দার্জিলিংয়ের চায়ের গন্ধ ও স্বাদ অধিক। কিন্তু শ্রীলঙ্কার চাও সুগন্ধিযুক্ত। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।

ভারতের চা শিল্পে উত্তরবঙ্গের অবদানের কথা সকলেই জানেন। পশ্চিম-বঙ্গে চা শিল্পের সূচনা হয় জলপাইগুড়ি টি কোম্পানী লিমিটেডের মাধ্যমে। ১৮৭৯ সালে এই কোম্পানী মাত্র ৫০ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে কারবার সুরু করে। ১৯৬৫ সালে কারবারের মূলধন ৭ লক্ষ টাকায় এসে ঠেকে। পশ্চিমবঙ্গে ২৯৯ টি চা বাগান আছে। ১৯৭০ সালে কয়েকটি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, তরাই অঞ্চল আর পশ্চিম দিনাজপুরেই পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ইণ্ডিয়ান টি প্লান্টার্স এসোসিয়েশন ২৯৯ টি চা বাগানকে ৮০-টি টি এষ্টেটে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলাতেই রয়েছে ১৫১ টি। জলপাইগুড়ি জেলার ১৫১ টি চা বাগানকে ৬১ টি টি এষ্টেটে ভাগ করেছেন আই. টি. পি. এ। তরাই অঞ্চলে টি এষ্টেটের সংখ্যা ১৯টি। পশ্চিম দিনাজপুরে রয়েছে ১ টি টি এষ্টেট, কোচবিহারে ১টি টি এষ্টেট। পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্পের আরও বিকাশ সম্ভব। আসামে চা বাগান ৬৩২ টি আর পশ্চিমবঙ্গে ২৯৯ টি। অর্দ্ধেকের অনেক কম কিন্তু চায়ের উৎপাদন প্রায় অর্দ্ধেক-তাছাড়া দার্জিলিংয়ের চায়ের চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্রই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে চা-এর ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। প্রতি বছর ৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। ভারতের চা শিল্পের মালিকরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে ও শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নে ততটা আগ্রহ দেখায়নি। সুখের কথা, সরকার বর্তমানে এবিষয়ে দৃষ্টি দিচ্ছেন।

ভুলি নাই

(১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

: দেখুন। চমকে উঠে পিছনে তাকালাম। ঐ ছেলেটিকে যে আবার দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি।

: দয়া করে রুমালটা আমাকে দেবেন?

চোখে মুখে তার আকুল আকুতি। কণ্ঠে আবেদনের আর্তি। একবার ভাল করে দেখে নিলাম ওকে। বললাম: তোমারই নাম বুঝি রবি?

চমকে উঠল ছেলেটি। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল : আপনি জানলেন কি করে?

একটু হাসলাম—রুমালটা দেবার জন্য সেই কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি।.....

শীতের সেই অতিথিরা

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আমরা সকলেই জানি, শীতের মরসুমে নানা জাতের পরিযায়ী (Migratory) পাখি বাঙলার ঝিলে জঙ্গলে এসে সাময়িক-ভাবে ডেরা বাঁধে। আবার শীত কমতে সুরু করলে তারা প্রায় সকলেই দল বেঁধে ফিরে যায় পুরানো আস্তানায়। কিন্তু এরা ঠিক কোথা থেকে আসে এবং কেনই বা আসে সে বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন কম জনেই। অথচ বেশ কিছু দিন ধরে পক্ষী বিশারদ বা ওরনিথো-লজিষ্টরা পাখির এই যাযাবরত্ব সম্পর্কে নানা রকম গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের কারও কারও মতে পাখির প্রব্রজন-শীলতার মূলে আছে বংশানুক্রমিক অভ্যাস। আবার কেউ বলেন, ডিম পাড়ার সময় এরা অপেক্ষাকৃত শীতল ও নির্জন স্থানই বেছে নিতে চায়; তাই বিশেষ ঋতুতে প্রজননের তাগিদে এরা হয় দেশান্তরী। পাখীর যাযাবরত্ব সম্পর্কে এসব যুক্তির কোনটিই প্রমাণনির্ভর নয়। কিন্তু পাখিরা কোন্ সময়ে বা কোথায় গিয়ে ডেরা বাঁধে এ সম্পর্কে অনেক কথাই জানা গেছে; এই ভ্রমণ পথ অনুসারে বাঙলার দেশান্তরী পাখিদেরও ভাগ করা যায় তিন ভাগে। যথা, খাঁটি যাযাবর, আংশিক যাযাবর এবং ভ্রমণশীল। যে সব পাখি (যথা, কড় হাঁস) বিশেষ ঋতুতে সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা কি মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে হাওয়া খেতে আসে তারাই খাঁটি যাযাবর; আর যে সব পাখি (যথা, চকাচকি) মানস সরোবর, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে বেড়াতে আসে তারা আংশিক যাযাবর; এছাড়া ভারতের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যারা ঋতু চক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা ফেরা করে সেই সব পাখিদের (যথা হলদে পাখি) বলা যায় ভ্রমণশীল।

বাঙলার যাযাবর পাখিদের কথা বলতে বসে প্রথমেই মনে পড়ে কালিদাস বন্দিত মরালের (বা গ্রে ল্যাগ গুজের) কথা। চলতি বাঙলায় একেই বলে কড় হাঁস। এরা শীতের অতিথি; আসে সাইবেরিয়া থেকে। বাঙলার চরে, বিলে এ সময় যে সমস্ত বুনো হাঁস দেখা যায় তারা প্রায় সকলেই আংশিক যাযাবর; এদের মধ্যে সরাল বা হুইস্-লিং টিল, চকাচকি, ম্যালার্ড হাঁস আসে মানস সরোবর বা তিব্বত থেকে। চিড়িয়াখানার জলাশয়ে এদের অনেককেই এখন দেখতে পাওয়া যাবে। কান ঠোঁটি বা ফ্লেমিঙ্গোও শীতের অতিথি। এরাও আংশিক যাযাবর; আসে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চল থেকে; বর্ষার আগে এরা সকলেই ফিরে যায় নিজের নিজের আস্তানায়।

সারস বা সর্টর্কদের মধ্যেও কেউ কেউ খাঁটি যাযাবর; এরা আসে সুদূর উত্তর-এশিয়া থেকে; তবে দূর পাল্লায় পাড়ি দিতে 'ইউরেশিয়ান গোল্ডেন প্লোভার' বা সোনালী বাটান পাখির জুড়ি নেই। তারা আমেরিকা, ইউরোপ পার হয়ে এই শীতের মরসুমে ভারতেও হাওয়া খেতে আসে। বাঙলার বনে খামারে তাদের দেখাও পাওয়া যায় কখনও কখনও। বাতাসিয়া (বা সুইফট) পাখিদের মধ্যে 'ইউরোপীয় সুইফট' আংশিক যাযাবর। কিন্তু 'এলপাইন সুইফট' খাঁটি যাযাবর; এরা আল্পস পাহাড়ের থেকে প্রতি বছর শীতের গোড়ায় বাঙলার গ্রামাঞ্চলে হাওয়া খেতে আসে। বেশ কয়েক হাজার মাইল পথ এরা পাড়ি দেয় মাত্র তিন সপ্তাহে। ডুবুরী গয়ার ও জলপিপি পাখিও আংশিক যাযাবর। এরাও হিমালয়ের স্থায়ী বাসিন্দা। শীতের মরসুমে বেড়াতে আসে।

শালিক জাতীয় পাখির মধ্যে পুরোপুরি যাযাবর হচ্ছে গোলাপি ময়না (বা রোজ কালারড ষ্টারলিং) এবং তিলে ময়না (বা ইণ্ডিয়ান্ ষ্টারলিং)। এদের বসতি মধ্য এশিয়ায়; এই গোত্রের অন্য দু'টি পাখি কিন্তু আংশিক যাযাবর; তাদের নাম কালো ঝুঁটি ময়না ও পাহাড়ী ময়না (হিমালয়ান স্টারলিং); হিমালয় সান্নিধ্যেই এরা নীড় বাঁধে; শীতের সূচনায় এরা উত্তর ভারতে এবং উত্তর বঙ্গেও মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসে।

আমাদের প্রিয় পাখি খঞ্জনও (ওয়াগ্‌টেল) শীতের অতিথি; এই গোত্রের অন্তত আটটি পাখি খাঁটি যাযাবর; এদের মধ্যে সাদা মুখ খঞ্জন, নীল মাথা খঞ্জন, হলুদ ঝুঁটি খঞ্জন, কালো মাথা খঞ্জন আমাদের বিশেষ পরিচিত। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এরা শীতের মরসুমে এদেশে বেড়াতে আসে। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ হিমালয়ের কোলেও নীড় বাঁধে; তাদের মধ্যে ধূসর খঞ্জনের (গ্রে ওয়াগ্‌টেলের) নাম উল্লেখযোগ্য; এরা আংশিক যাযাবর; এছাড়া দুচার রকম ভ্রমণশীল খঞ্জনও আছে; এদের মধ্যে বড়ো ছিটদার খঞ্জন (লার্জ পাইয়েড ওয়াগটেল) দক্ষিণ ভারত থেকে বাঙলার হাওয়া খেতে আসে। বেনে বউ, এদের মতই শীতের অতিথি। আবার, লাবক (কোতুরনিক্স গোত্রের) পাখিদের মধ্যে বটের (কমন কুয়েল) শরৎ কালেই হিমালয় পার হয়ে বাঙলার মাঠে ঝোঁপে চরতে আসে; এরা খাঁটি যাযাবর; কিন্তু এই গোত্রেরই 'ইণ্ডিয়ান বাটন কুয়েল' ভ্রমণশীল; তারা বিহার, ওড়িশা থেকে বাঙলায় নিয়মিত যাতায়াত করে। পরভৃত পাখিদের মধ্যে পাপিয়া, শা-বুলবুলি বা কোকিলও ভ্রমণ বিলাসী; ভারতের মধ্যেই এরা প্রধানত ঘুরে বেড়ায়।

গ্রীষ্মের গোড়ায় ছোট ছোট যে ফুটকি (ওয়ার্বলার) পাখি এদেশ ছেড়ে সাইবেরিয়ায় ডিম পাড়তে যায় তারাই আবার শীতের সূচনায় ফিরে আসে বাঙলার বনে জঙ্গলে; এদের মধ্যে 'বুটেড্‌ ট্রি ওয়ার্বলার', ও 'ইস্টার্ণ বুশ ওয়ার্বলারে-র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য; এই ফুটকি পাখি আকারে খুবই ছোট; তাই ডালপাতার আড়ালে এরা সহজেই আত্মগোপন করে থাকে। কিন্তু এদের কাকলি শুনতে পাওয়া যায় দূর থেকেই। এদের মধ্যে 'গ্রে ব্যাক্‌ড ওয়ার্বলার' আবার আংশিক যাযাবর। এরা হিমালয় সান্নিধ্যেই নীড় বাঁধে; সেখানেই কাটায় বছরের অর্দ্ধেক সময়।

ঘুঘু বা পায়রা জাতীয়পাখির মধ্যেও যাযাবরের অভাব নেই; যেমন, তিলে ঘুঘু (ইণ্ডিয়ান্‌ টারটল ডাভ) মাঝারি ধরণের যাযাবর আর শ্যাম ঘুঘু (রেড টারটল ডাভ) মোটামুটি ভ্রমণ বিলাসী। শ্যেণ জাতীয় পাখির মধ্যেও বহেরি বাজ, স্যাকার, তুরমতি পুরাদস্তুর যাযাবর পোকামারা (কেস্ট্রিয়েল) আংশিক যাযাবর; কিন্তু শিকরে ভারতের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে অনেকেই শীতকালে বাঙলায় হাওয়া খেতে আসে। আসলে শীতের মরসুমে যে সব পাখির কল কাকলিতে আমরা মুগ্ধ হই তাদের অনেকেই ক্ষণিকের অতিথি।

এইসব অতিথি বা পরিযায়ী পাখীর আকর্ষণ কম নয়। পাখি দেখার পক্ষে শীত ও বসন্ত কালই সবচেয়ে ভালো সময়। বনে, পাহাড়ে, খাল বিলের ধারে, ক্ষেত খামারের কাছে এমনকি শহরের মধ্যেও নানা প্রজাতির পাখি বাস করে। কলকাতার বিভিন্ন পার্কে, গঙ্গার ধারে চিড়িয়াখানায়, ময়দানে, শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অথবা শহরতলীর ছোট বড়ো বাগানগুলিতে ঘুরলে অনেক প্রজাতির পাখির দর্শন মিলবে।

অবশ্য যাঁরা পাখির স্বাভাবিক বাস্ত-সংস্থানটি দেখতে চান তাঁদের বনে পাহাড়ে বা খালেবিলে না ঘুরে উপায় নেই। বিশেষত পাখির জীবনেতিহাস, পারি-পার্শ্বের সঙ্গে তাঁর অভিযোজন কৌশল, প্রজনন রীতি, প্রব্রজনের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করতে হলে দেশ ভ্রমণ করতেই হবে। কিছুকাল যাবৎ দেশান্তরী পাখিদের জাল পেতে ধরে তাদের পায়ে সন-সাকিন ইত্যাদি লেখা বিশেষ ধরণের হাল্কা প্লাস্টিকের বা অ্যালুমিনিয়ামের বেড়ি পরিয়ে দিয়ে সেগুলিকে আবার উড়িয়ে দিচ্ছেন পক্ষী পর্যবেক্ষকেরা। ঐ পাখি অন্য দেশে গিয়ে আবার যখন ধরা পড়বে তখন তাদের প্রজননের পথ, ঋতু, উদ্দেশ্য ইত্যাদি জানা যাবে অনেক কিছুই। লুই সিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা মিলে বছর সাতেক আগে চন্দ্রালোকে পক্ষীপর্যবেক্ষণ ও তাদের প্রব্রজন কৌশল সম্পর্কে যে গবেষণার উদ্যোগ করেছিলেন আজ সেই পদ্ধতিটিও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিটির সাহায্যে পেঁচা প্রভৃতি রাতচরা পাখিদের সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়।

বিভিন্ন প্রজাতির (জীব-বিজ্ঞানীর মতে যার সংখ্যা ৮,৬০০) পাখির মধ্যে শারীরসংস্থানগত তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও পাখির বাস্ত নির্বাচনে কিন্তু যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায়। একমাত্র পৃথিবীর উচ্চতম স্থান আজিজিয়া এবং শীতলতম স্থান ভাখোয়নস্ক ছাড়া প্রায় সর্বত্রই পাখিদের দেখা মিলবে। মেরু প্রদেশে, মরুভূমিতে, পর্ব্বত কন্দরে, গহন অরণ্যে, জলাভূমিতে, সমুদ্র বক্ষে কোথায় না তারা হাজির নেই। এছাড়া এরা যে শুধু উড়তেই পটু তাই নয়, তীর বেগে দৌড়াতে (যেমন, উটপাখি,) মাইলের পর মাইল সাঁতার দিতে (যেমন, পেঙ্গুইন,) দক্ষ ডুবুরীর মত ডুব দিতেও (যেমন, পানকৌড়ি) পটু। আবার কোন কোন প্রজাতির পাখি হয় সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে (যেমন কস্তুর শকুন) নয় সমুদ্র বক্ষে (যেমন এলবাট্রস) প্রায় সারা জীবনই কাটিয়ে দেয়। কেউ কেউ পছন্দ করে উন্মুক্ত চারণ ভূমি (যেমন এমু), আবার কেউ গহন অরণ্যের অন্তরালে (যেমন, অষ্ট্রেলিয়ার বীণা পাখি Menura)। তবে সাধারণ ভাবে অধিকাংশ পাখিই নির্জনতা ও গোপনতা প্রিয়।

পাখির ডাকের মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে; কয়েক প্রজাতির পাখি একেবারে মূক হলেও অধিকাংশ পাখিই নানা বিচিত্র শব্দ করতে সক্ষম। তবে তাদের কারও স্বর কর্কশ (যেমন, কাক), কারও অনুনাদী (যেমন, হামিং বার্ড), আবার কারও সুমধুর (যেমন, কোকিল)। আবার পাহাড়ী-ময়না, ভীমরাজ, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখি

অবিকল মানুষ বা অন্য পশুপাখির স্বর নকল করতে পারে। এছাড়া পাখির শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি বেশ প্রখর হওয়ায় তাদের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই তারা পর্যবেক্ষকের অবস্থান অনেক সময় টের পেয়ে যায়।

জীববিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীতে ২৭ টি বর্গের এবং ১৫৪ টি গোত্রের প্রায় সাড়ে আট হাজার রকম পাখির বাস। আমরা তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখি খুবই কম। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার মানুষের অবহেলায় ও অত্যাচারে বেশ কয়েক প্রজাতির পাখি পৃথিবীর বুক থেকে হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নয়তো নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। ভারতের বন, মাঠ, নদী পাহাড় এখনও পাখি দেখার পক্ষে আদর্শস্থানীয়; এদেশে এখনও বাস করে প্রায় ১,২০০ প্রজাতির পাখি; পক্ষী পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক সর্ত ও অভ্যাসগুলির কথা এবার উল্লেখ করি। বনে পাহাড়ে মাঠে ময়দানে ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে পাখির ডাক শুনুন; তারপর সেই ডাকটি অচেনা হলে তার বৈশিষ্ট্য একটি খাতায় লিখে নেওয়া ভালো। এইবার ডাক অনুসরণ করে খুঁজে বার করুন পাখিটিকে। প্রথমে তার ঠোঁট, পা, ল্যাজ ও ডানা থেকে প্রজাতি, গোত্র বা বর্ণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা ভালো। যদি পুচ্ছটি আগে দেখা যায় তবে তার বর্ণ, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বিশেষত্ব নোট বই-এ লিখে নিন। এই পুচ্ছ ওড়বার সময় পথ নির্দেশ ও গতি নিরোধের ব্যাপারে পাখিকে সাহায্য করে। সাধারণ ভাবে চেনা জানা পাখিদের মধ্যে দোয়েল, বেনে বৌ, শ্যামা প্রভৃতি পাখির পুচ্ছ বেশ বিচিত্র ও দীর্ঘ। পুচ্ছের পালক বিন্যাসটিও ভালোভাবে দেখা চাই। সেই সঙ্গে দেখতে হবে ডানার রং, বিস্তার, গঠন। পাখী ওড়ার পর দেখুন তার ডানা লম্বা না চওড়া; যদি চওড়া হয় তবে বুঝতে হবে অনেকক্ষণ বাতাসে ভর করে ভেসে থাকার ক্ষমতা আছে তার (যেমন, শকুন); আর অপ্রশস্ত অথচ লম্বা হলে বুঝতে হবে দূর পাল্লায় পাড়ি দেবার স্বভাব আছে তার (যেমন, আলবাট্রস, গাঙচিল)। পাখির ঠোঁটের গঠন, দৈর্ঘ্য দেখেও তার জাতি ও খাদ্যাভ্যাস নির্ণয় করা যায়। যেমন, চিল, শিকরে প্রভৃতি যারা মাংস ছিঁড়ে খায় তাদের ঠোঁট বাঁকা ও তীক্ষ্ণ, নীচের ঠোঁট ধারালো। ছোট, শক্ত বীজ গুঁড়াবার জন্য বাবুই-এর ছোট্ট ঠোঁটটি বেশ কঠিন ও ত্রিভুজাকার। গাছে ঠোকর মেরে পোকার বাসা বার করবার জন্য কাঠ-ঠোকরার ঠোঁট সরু অথচ ভোঁতা; আবার কাদার মধ্যে থেকে গুগলি বা পোকা খুঁটে খাবার জন্যে কাদা খোঁচা জল পিপি প্রভৃতির ঠোঁট ছুঁচালো ও দীঘল। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাখি হামিংবার্ডের ঠোঁট লম্বা ও সামান্য বাঁকা। কারণ সে ফুলের থেকে মধু চুষে খায়। এছাড়া বিশেষ লক্ষ্যণীয় ঠোঁট হচ্ছে ধনেশ, পেলিকান, টিয়া ও ফ্লেমিঙ্গোর। ঠোঁটের পর দেখা চাই ঝুঁটির বর্ণ ও দৈর্ঘ্য; সিপাহি বুলবুলি, হুপো প্রভৃতি পাখির চমৎকার ঝুঁটি আছে। সাধারণভাবে জলচর পাখির ঠোঁট ও পায়ের দিকে নজর দিতে হয় বেশি করে; যে সব জলচর পাখি কাদার মধ্যে পোকা ইত্যাদি সন্ধান করে ফেরে তাদের অধিকাংশেরই পা বেশ লম্বা; যেমন গো বক, জলফেপি কাদা খোঁচা, কুচবক, সারস, ফ্লেমিঙ্গো ইত্যাদি। আবার যারা সন্তরক বর্গের পাখি তাদের পা খাটো এবং পাতা হাঁসের মত জোড়া। যেমন আলবাট্রস, পেলিকান, পানকৌড়ি, দিগহাঁস, ইত্যাদি। এছাড়া লম্বা পায়ের সঙ্গে লম্বা গলারও বুঝি একটা যোগ আছে; যেমন বক, জলফেপি, ফ্লেমিঙ্গো, সারস প্রভৃতির গলাও বেশ লম্বা।

পাখিদের বাস্ত ও আহার সন্ধান, সঙ্গিনী খোঁজা, ডিম পাড়া, ডিমে তা দেওয়া ও শাবক প্রতিপালনের খবরও মজার। এরপর দেখা চাই বাসা বাঁধার কৌশলটি। গাছের ডালে বা কোটরে, ঘরের কার্ণিসে, পাহাড়ের গায়ে, ঝোঁপ-ঝাড়ে, মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটে, খড়কুটো লালা দিয়ে কত বিচিত্র রকম বাসাই না তৈরী করে তারা। প্রধানত ডিম পাড়া ও শাবক প্রতিপালনই এই বাসা বাঁধার উদ্দেশ্য; তবে কেউ কেউ প্রণয় কুঞ্জ হিসাবেও বাসা বাঁধে (যেমন, নীল বাওয়ার পাখি,) বাবুই, বাওয়ার পাখি প্রভৃতির বাসা নিপুণ কারুশিল্পের মতই সুন্দর। এছাড়া, ডিম দেখে পাখি চিনতে শেখাও দরকার। অধুনা পাখির খাদ্যাভ্যাস নিয়েও অনেক গবেষণা চলছে; পাখির খাদ্য তালিকায় আছে পশুমাংস, মানুষের উচ্ছিষ্ট সব রকম খাবার, মাছ, কীটপতঙ্গ, ঝিনুক, গুগলি, ছোট পাখি, অন্য পাখির বা সরীসৃপের ডিম, সাপ বা অন্য সরীসৃপ, মধু, বীজ, শস্য, ফল, বাদাম, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি।

পাখি দেখা সুরু করে অনেকেই একটা ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করেন; সেটি হচ্ছে কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে চেহারার অমিল; তাই স্ত্রী-পুরুষকে ভিন্ন প্রজাতির বলে ভ্রম হয়। সাধারণ ভাবে পুরুষ পাখির আকার বড়ো ও পালকের বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে থাকে; এছাড়া পুচ্ছটিও হয় চটকদার (যেমন, ময়ূর, ফেঝান্ট, বীণা পাখি)। শুধু তাই নয়, মিলন ঋতুতে সঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পুরুষপাখি অনেক সময় পেখম মেলে অন্য রূপ ধরে। তবে সব থেকে কঠিন পক্ষীশাবক দেখে তার প্রজাতি নির্ণয় করা; কারণ প্রায় একবছর পর্যন্ত শাবকের ঠিকমত পালক গজায় না; এছাড়া মা-বাবার সঙ্গে তার চেহারার মিল থাকে সামান্যই। পক্ষী পর্যবেক্ষক হিসাবে বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর শুধু দিনে নয় চন্দ্রালোকেও রাতচরা পাখিদের (যেমন, ঠুকঠুকিয়া), গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারেন। তাতেও যথেষ্ট আনন্দ আছে।

সাদা বীট থেকে চিনি

প্রবীর মুখোপাধ্যায়

চিনি ও গুড় উৎপাদনের জন্য ভারতে বর্তমানে মোট চাষের জমির দেড় শতাংশ জমিতে আখ উৎপাদন হয়। আখের জমি বাড়াতে হলে দানা শস্য, ডাল, তৈলবীজ, আঁশ প্রভৃতি ফসলের-জমির পরিমাণে টান পড়বে। আর এভাবে আখ চাষ খুব সামান্যই বাড়ানো যায়। অথচ রপ্তানী ও দেশের প্রয়োজন মেটাতে আনুমানিক ৭৫-৮০ লক্ষ টন চিনি প্রয়োজন। এ অবস্থায় চিনি উৎপাদন বাড়াবার একটি সহজ উপায় হল একই জমিতে আখ ও চিনিবীট একই সঙ্গে চাষ করা। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আখ মাড়াই চলে। মে মাসের পর থেকে আখ মাড়াই বিশেষ লাভজনক নয় এবং তাই মিলগুলোকে অকেজো হয়ে থাকতে হয়। সাদাবীট চাষ করলে কারখানা আরও দেড় দুই মাস চালু রাখা যায়। একসঙ্গে দুটো চাষে জলের সাশ্রয় হবে, আখের সারির মাঝখানটা বীট ফসলে ঢাকা থাকলে আগাছা নিড়ানী খরচ কমে যায়। বীট ফসল তোলার সময় আখের দুই সারির মাঝখানের মাটিটা গভীরভাবে আলগা হয় এবং সেটা আখের পক্ষে ভাল। সাদাবীট এবং আখ আলাদা ভাবে চাষ করার চেয়ে এক সঙ্গে চাষ বেশী লাভজনক।

চিনি উৎপাদন বাড়ানো ছাড়াও সাদাবীটের অনেক ব্যবহার রয়েছে। সাদাবীটের মাথাটা ভাল গো-খাদ্য। ভারতে এপ্রিল-মে মাসে সবুজ গো-খাদ্যের সাধারণত অভাব দেখা যায়। এই সময় গো-খাদ্যের অভাব এটা মেটাতে সাহায্য করে। হেক্টরে পাঁচ দশটন এরকম গো-খাদ্য পাওয়া যেতে পারে। পাতা টাটকা অবস্থায় খাওয়ানো গবাদি পশুর পক্ষে ক্ষতি কারক। পাতার সঙ্গে ভাল ভাবে মেশানো গুড়া করা চুন (প্রতি কুইন্টাল পাতার সঙ্গে একশ গ্রাম) ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। বীটের মাথাগুলো টাটকা খাওয়াতে হলে খড় প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। মাথাগুলোর পরিমাণ কোনও সময়েই খড়ের পরিমাণের সিকি ভাগের বেশী হবেনা। বিদেশে এগুলো থেকে সাইলেজ করে রাখা হয়। বীটের মাথা-গুলোতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে। তাই এগুলো জমিতে সবুজ সার হিসেবে ব্যবহার করলে হেক্টরে একশ কেজির মত নাইট্রোজেন দেওয়া হয়। রস বের করে নেবার পর বীটের মণ্ড বিদেশে গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শুকনো মণ্ড সংরক্ষণ করে রেখে শুকনোভাবে অথবা জলে ভিজিয়ে খাওয়ানো যায়। বীটের গুড় (Molasses) গো-খাদ্য হিসাবে অথবা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার হয়।

চিনিবীট চাষে মোটামুটি ঠাণ্ডা আব-হাওয়া দরকার। সবচেয়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা গড়ে ২০ সেন্টিগ্রেডের মত। ফসল বৃদ্ধির সময় উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণ সহ ভাল বৃষ্টি পাতে অথবা সেচ ব্যবস্থা ফসল বৃদ্ধির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সাদা বীট অপেক্ষাকৃত লোনা সহনশীল। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের রবি মরসুমে মোটামুটি এই ফসল চাষের উপযুক্ত। শীতকাল যখন মৃদু হয় এবং মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হয় সে ক্ষেত্রেই এই ফসল ভাল জন্মায়।

সামান্য ক্ষারত্ব অথবা সাধারণ PH সহ দোঁয়াশ অথবা এটেলী দোঁয়াশ মাটিতেই চিনিবীট সবচেয়ে ভাল জন্মায়। অন্যান্য ফসল অপেক্ষা বীট যথেষ্ট লোনা এবং ক্ষারত্ব সহ্য করতে পারে।

বীট জল দাঁড়ান সহ্য করতে পারে না। বীট চাষে মাটি গভীর করে তৈরী এবং উত্তম জল নিকাশী ব্যবস্থা থাকা দরকার। ইরো টাইপ ই. ইউ. এস. ৩৫, ইউ. এস. ৭৫, রামোনস্কোয়ার মেরিবো এংলো পলি, মেরিবো রেজিষ্টা পলি, মেরিবো মেগনা পলি, ট্রি প্লেক্স এবং বুশ'ই' প্রভৃতি নানা জাতের বীট রয়েছে।

জমি তৈরী ও বীজ বোনা:

ভালভাবে লেভেল করা বীজতলার যথেষ্ট রস থাকা চাই। ঢেলা, গর্ত ও আগেকার ফসলের গোড়া থাকা উচিত নয়। ভারতের অন্যান্য রবি ফসলের চেয়ে চিনিবীট বীজের অঙ্কুর বের হবার জন্য মাটিতে অনেক বেশী রস দরকার। চিনিবীট বীজ অঙ্কুর বের করে বোনাই ভাল।

চিনিবীটের চারা দুর্ব্বল ও ছোট হয়। যথেষ্ট পরিমাণ গাছ মাঠে রাখতে হলে বেশী করে বীজ ফেলতে হবে। উত্তর ভারতে হেক্টরে দশ কেজি বীজ বুনতে হবে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বীজ বোনা চলে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ ও সোহাগ (বোরণ) দিতে হবে। অর্দ্ধেক নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য সারগুলো বীট বসাবার ১৫-৩০ দিন আগে জমিতে দিতে হবে। সিকি ভাগ গাছের ৯০ দিন বয়সে জমিতে দিতে হবে। ভেলি করে অথবা সমতলে বীজ লাগান যেতে পারে। সমতলে বুনলে বোনার পর ভেলী করে দিতে হবে। নজর রাখতে হবে বোনার পর থেকে ভেলী করে মাটি ঠেসে দেওয়ার কাজটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হয়, যাতে মাটি থেকে বেশী পরিমাণ রস শুকিয়ে না যায়। ১৬ ইঞ্চি দূরে দূরে লাইন করে ১-২ ইঞ্চি দূরে দূরে বীজ বুনতে হয়। মিশ্র চাষে দুইসারি আখের মাঝখানে এক লাইন বীট লাগাতে হবে। এক থেকে সওয়া ইঞ্চি গভীরে বীজ ফেলতে হবে। ভেলীতে বুনলে ৬-৮ ইঞ্চি উঁচু ভেলীতে বীট লাগিয়ে নালীতে সেচ দিতে হবে।

পর পৃষ্ঠায় দেখুন

বেকারী নিরসনে

দেশে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দীরা গান্ধী যেসব অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে বেকারত্ব দূর এবং আরো বেশী সংখ্যায় নিয়োগের প্রতিশ্রুতি ছিল। কুড়িদফা কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যসরকার বেকার সমস্যা নিরসনে কতকগুলো কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষানবিশী নিয়োগ, অতিরিক্ত নিয়োগ প্রকল্প, স্বনিযুক্তি প্রকল্প, ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করছেন। তেমনি সারাদেশে বেকার সমস্যার উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটিও গঠিত হয়েছে।

এই কমিটি সারাদেশে বেকার সমস্যা পুরোপুরি খতিয়ে দেখবেন এবং এই সমস্যা সুরাহার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করবেন। যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এই স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয় সেই সভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগের বিষয়ে সরকারী নিয়োগ সংস্থার (এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের) ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগ যথেচ্ছভাবে হয়। এই প্রথার বিলোপ সাধন করে বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় যাতে নিয়োগ হয় সেজন্য বেসরকারি ক্ষেত্রেও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ নিয়োগ বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে যোগদানকারী সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীতে প্রবেশের উর্ধ্বতন বয়ঃসীমা ত্রিশ বৎসর করার সুপারিশের কথা বলেন। বিভিন্ন পরীক্ষা সময়মতো না হওয়ায় এবং তাদের ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই সরকারি ক্ষেত্রে চাকরীর বয়স এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়সের উর্ধ্বসীমা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করলে বহু ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে এবং অন্যান্য সাধারণ চাকরীতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

দিনদিন শিক্ষিতের হার বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে চাকরী প্রার্থীর সংখ্যাও বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে গ্রামের বেকার যুবকযুবতীদের নিয়োগের কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে সেখানে হাজার হাজার ছদ্মবেকার রয়েছেন। সরকার এই সময় বিভিন্ন ট্রেনিং-এর প্রতি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন রাজ্যসরকারকেও সেই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নতিবিধায়ক পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সহায়তায় অচিরেই গ্রামের বেকার যুবকযুবতীদের হাতেকলমে ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু হবে। স্থানীয় শিল্প সংস্থার চাহিদা ও কর্মপদ্ধতি অনুসারে স্থানীয় যুবকদের সেইভাবে কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী করা হবে। বিভিন্ন বৃত্তিতে কারিগরি শিক্ষায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবকেরা স্থানীয় প্রয়োজনে নিয়োজিত হতে পারবে। শ্রমমন্ত্রী আরো আশ্বাস দিয়েছেন যে সরকারের ইচ্ছা আছে কিছু মূল ট্রেনিং কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ভ্রাম্যমান ট্রেনিং কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, যাতে পল্লীর যুবকদের আরো বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে নারী প্রসংগ ও বাদ যায়নি। সারাদেশে বিভিন্ন বৃত্তিতে নারীদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে কর্মোপযোগী করার জন্য জাতীয়সংস্থা গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া ভারতীয় কারিগরী দক্ষ কর্মীরা যাতে ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আরো বেশীমাত্রায় নিযুক্তির সুযোগ পান সেজন্য 'ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব এমপ্লয়মেণ্ট এবং ট্রেনিং'-কে বলা হয়েছে। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এসব কাজ যদি সঠিকভাবে করেন এবং আন্তরিকভাবে বেকারি নিরসনে সচেষ্ট হন তবে অনেক বেকার যুবকযুবতীর মুখেই হাসি ফুটে উঠবে।

অমর দাশ

সাদা বীট থেকে চিনি

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরিচর্যা :

নজর রাখতে হবে সেচের জল কোনও ভেলীর উপর পর্যন্ত না ওঠে। তাহলে ভেলী বসে ঢেলা পাকিয়ে যায়। ফলে অঙ্কুর বের হতে ব্যাঘাত ঘটে। সেচ দিতে দেরী হলে বীজ কেবল জায়গায় জায়গায় বের হয়। চারা গাছে যখন চার পাতা বের হয়, তখন ৮" দূরে দূরে একটি করে পুষ্ট চারা রেখে বাকী গুলো তুলে ফেলতে হয়। এভাবে একরে ৪০,০০০ গাছ থাকবে। গাছ পাতলা করার সময় আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আবার দিন কতক পরে আরও একবার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। প্রায় ২২ সপ্তাহ পরে নীচেকার পাতাগুলি শুকিয়ে গেলে ফসল তুলতে হয়। বীট তোলার সময় জমিতে যথেষ্ট রস থাকা চাই। ফসল একরে ২৫-৩০ কুইণ্টালের মত।

সিনেমা

ভোরের আলোয় রাঙানো 'নিশান্ত'
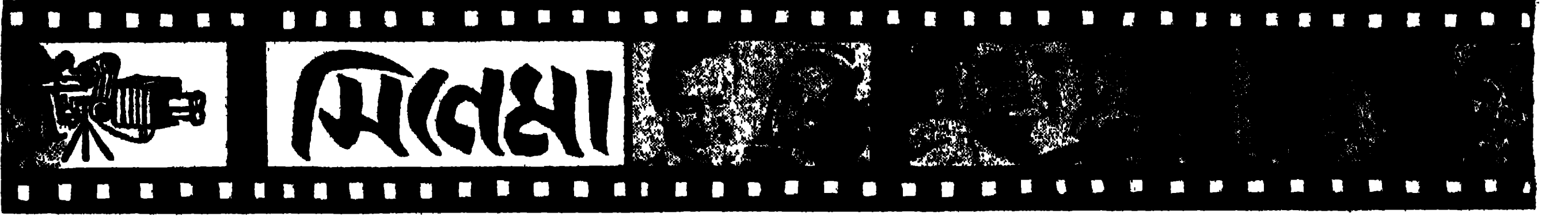
শোষণের রূপ শোষিতের কাছে আমাদের মত আধাউন্নত দেশে খুব পরিষ্কার নয়। ধর্ম সংস্কার ইত্যাদির মোড়কে নানা চেহারায় শোষণ চলে আসছে। ফলত শোষকের পক্ষে প্রতিরোধের বেড়াজাল তুলে আত্মরক্ষার কোনো চিন্তাই আসেনা।

পরিচালক শ্যাম বেনিগাল সেই শ্রেণীর চলচ্চিত্রকার যিনি এই সব মানুষের কথা অর্থাৎ শোষক আর শোষিতের ইতিহাসকে বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সংগ্রামের পক্ষে রায় দেন। কোনো ধোঁয়াটে আবরণ নয়, স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে বলে দেন অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের মাঝে আপোষহীন সংগ্রাম ছাড়া কোনো পথ নেই।

'অঙ্কুর' ছবিতে যে বক্তব্যের সূচনা হয়েছিল পরবর্তী ছবি 'নিশান্ত'-এ সেই বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটেছে। সেই ছোট্ট কিশোরের ঢিল ছোঁড়া এখানে রূপ নিয়েছে শত সহস্র অত্যাচারিতের সংগ্রামে।

সামন্ততান্ত্রিক, সমাজব্যবস্থার শোষণ আর নিপীড়নের চেহারাটা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে এ ছবিতে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান, ধর্ম নিয়ে বণিক বৃত্তি, কুসংস্কার—কোনো পর্য্যায়কেই শ্রী বেনিগাল এড়িয়ে যাননি। অত্যন্ত বাস্তব ভঙ্গীতে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন প্রতিটি ঘটনাকে, চরিত্রকে।

এক জমিদার ও তার তিন দুশ্চরিত্র ভাই-এর দৌরাত্মে গ্রামের সবাই সন্ত্রস্ত, শোষণের পাশবিক চেহারাটা এঁদের চোখে এবং চেহারাতেই বেশ স্পষ্ট। গ্রামে আগত নতুন স্কুল মাষ্টারের যুবতী স্ত্রীকে চুরি করে

বিশেষ সংবাদ

জরুরী অবস্থার পর বিনা টিকিটের যাত্রীদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালানোর ফলে রেল টিকিট বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল–সেপ্টেম্বর মাসে সব কটি আঞ্চলিক রেলপথেই ১১৬ কোটি টাকারও বেশী টিকিট বিক্রী হয়েছে। গত বছরের ঐ একই সময়ের তুলনায় টিকিট বিক্রয়ের হিসেব ৫৬ কোটি টাকা বেশী। চলতি বছরে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ২৪৮ কোটি টাকার রেল টিকিট বিক্রয় হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ঐ একই সময় টিকিট বিক্রীর পরিমাণ ছিল ১৯২ কোটি টাকা।

২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে রেলে আয় ফাঁকি বন্ধ করার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। কঠোর হস্তে সমাজবিরোধী ও বিনা টিকিটের যাত্রীদের মোকাবিলা করা হচ্ছে। আলোচ্য সময়ে ৮৩,৪৩৬ টিকিটবিহীন যাত্রীকে হাজতবাস করতে হয়েছে। এছাড়া এপ্রিল-সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত জরিমানা বাবদ আয় হয়েছে ১৬,১০,১৫০ টাকা যা গত বছর ঐ একই সময়ের আদায়ের তুলনায় ১০ লক্ষ টাকা বেশী।

* * *

খড়গপুর আই. আই. টি. এর অধিকর্তা শ্রী সি. এস. ঝার নেতৃত্বে একটি দল মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের ব্যাপারে আঞ্চলিক সমীক্ষার কাজে হাত দেবেন বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বীরভূমের 'মূলক বিল জলনিকাশী প্রকল্পের' কাজে শীঘ্রই হাত দেওয়া হবে। প্রকল্পটি থেকে ৪০০ একর রবি ও খরিফ শস্যের জমিতে সেচের জল পাওয়া যাবে। এইসঙ্গে জহরাবাদে কানা-অজয়ের ওপর একটি স্লুইস গেট, কোপাই সাউথ মোহন খালের জল বিভাজিকা এবং ডিহিপাড়ার কাছাকাছি ঐ খালের ওপর সড়ক সেতু তৈরীর জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

* * *

অনুন্নত শ্রেণীর লোকজনদের বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের জন্য স্বনিযুক্তির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি তপশীলভুক্ত জাতি উন্নয়ন এবং অর্থ সংস্থা (কর্পোরেশন) গঠনের কথা বিবেচনা করছেন। এই সংস্থা তপশীলভুক্ত জাতির লোকজনদের ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে আর্থিক সাহায্য দেবে। এই সংস্থার মূলধনী শেয়ারের অন্তত ৫১ শতাংশই থাকবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে।

নিয়ে যাওয়া থেকে সংগ্রামের চেহারাটা দানা বাঁধতে থাকে। মন্দিরের পুরোহিত এবং স্কুল মাষ্টারের যৌথ চেষ্টায় মেরুদণ্ড-হীন শোষিতের দল ওঠে জেগে। এক উৎসবের দিনে সুরু হয় মুক্তিযজ্ঞ।

আহুতি হয় শুধুমাত্র জমিদার পরিবার নয়, আরও অনেকে। শোষিতের এই জাগরণে আলোড়ন ওঠে সারা গ্রামে।

পরিচালকের আন্তরিকতার ছোঁয়া ছবির সারাটি দেহ জুড়ে। সুরুতে দেবী পুজা মাত্র দিয়ে ভোরের আলো ফুটিয়ে নতুন দিনকে স্বাগত জানানো হয়েছে। মন্দিরের গহনা চুরির সংবাদে শেষ দৃশ্যে দেখা গেছে বিফল দৃষ্টিতে কিশোর ছাত্ররা মন্দিরের দরজায় বসে।

মাঝখানে চিত্রগ্রাহক গোবিন্দ নিহালনির অপূর্ব কুশলতায় চোখে পড়েছে অন্ধ্র প্রদেশের সুন্দর একটি গ্রামকে। বনরাজ ভাটিয়ার সঙ্গীত প্রতিটি দৃশ্যকে দিয়েছে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা।

আর আছে চোখ ভরে দেখার মতো শাবানা আজমি, অনন্ত নাগ, অমরেশ পুরি, নাসিরুদ্দিন শাহ, স্মিতা পাতিল, মোহন আগাসে, গিরিশ কানরাড, সত্যদেব দুবের অভিনয়। শাবানা অবশ্য একমাত্র মন্দিরের দৃশ্যটি ছাড়া কোথাও অভিনয়ের সুযোগ পাননি।

প্রশংসার ঝুড়ি উল্টে দেবার পরও মনে হয় কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেল একটু। শোষক আর শোষিতের চেহারায় অর্থনৈতিক শোষণ তেমন বিশ্লেষিত ভঙ্গিতে এলোনা কেন? বা জমিদার পরিবারে, বিশেষ করে ছোটভাইএর প্রতি সুশীলার দুর্বলতার কারণ কি খুব স্পষ্ট? কিংবা শোষিতের জাগরণ অত্যন্ত আয়াসেই সংগঠিত হলো কিভাবে? যদিও বা হলো ঐ ধরণের হিংস্র জনতা পাহাড় পর্যন্ত আসতে পারে কিনা? স্কুল মাষ্টারের আচরণ কতখানি বাস্তবসম্মত ইত্যাদি নিয়ে বহু প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। আর সবচাইতে বড় প্রশ্ন হোল, যে পুরোহিতকে দিয়ে সংগ্রামের মন্ত্রোচ্চারণ করানো হোল, ছবির শেষ দৃশ্যে তাঁর অমন বিহ্বল মূর্তি কেন? নির্দোষীর মৃত্যু দেখে না কৃতকর্মের অনুশোচনায়? (স্মার্তব্য: নামাবলী দিয়ে মৃতদেহ ঢাকা দেবার দৃশ্য) এটা বিপ্লবী প্রতিপাদ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

তবুও দর্শনীয় ছবিটুকু দেখে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে 'নিশান্ত' নতুন সূচনার ছবি, নতুন পথের দিশারী। আশার কথা সেই পথে তিনি নতুন নন, মৃণাল সেন সত্যজিৎ রায় অন্তত আছেন। একই বক্তব্য নিয়ে ভিন্ন পথের যাত্রী সবাই। 'নিশান্ত' সেই পথকে আরও আলোকিত করবে বলা যায়।

নির্মল ধর

নিশান্ত

আজকের নাটক
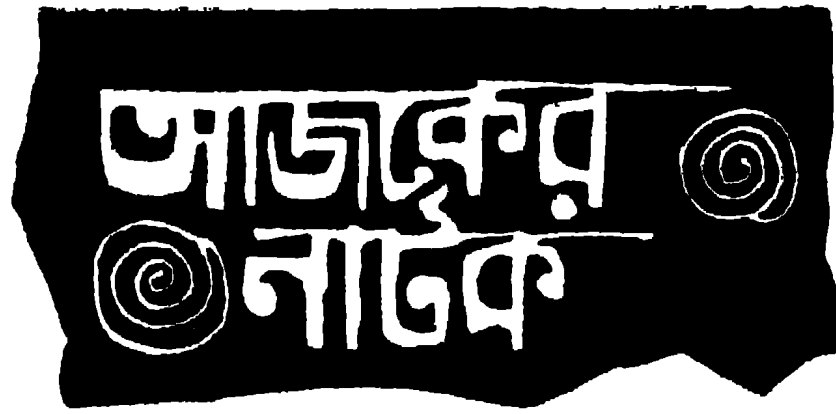
চেতনার প্রথম প্রযোজনা 'মারীচ সংবাদ' আদৃত হয়েছিল সবার কাছে। আবার চতুর্থ প্রযোজনা এরই দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 'রামযাত্রা' এদের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। তবে, দুটি পর্বের তুলনামূলক বিচারে এটিকে কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হতে পারে। আলোচ্য নাটক 'রামযাত্রা' অবশ্য নতুন পটভূমি ও আঙ্গিকে নির্মিত। এটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়।

এ নাটকের বিশেষত্ব হল রামায়ণের ঘটনাকে বাস্তবজীবনে পরিচালক হাজির করেছেন। তাই ঘটনার বিন্যাসে নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বক্তব্যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে, নাটকের পরিবেশনার চমৎকারিত্ব প্রশংসা করা যায়, এখানে দর্শক একই সঙ্গে যাত্রা ও নাটককে উপভোগ করার মজা পাবেন।

গ্রাম্যজীবনের এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এই নাটক। সেখানকার প্রজারা ক্ষয়িষ্ণু পথে দিন যাপন করছে। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফসল পাচার করছে জমিদার। এর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম—প্রতিবাদ। যে সংগ্রামের কাহিনী রামায়ণেও লিপিবদ্ধ। ঠিক এই গ্রামেই পালা বসছে 'রামযাত্রার'। এই মহাকাব্যের পালা আসরের চরিত্রগুলো যেভাবে সাজানো ঠিক তারই বাস্তবরূপ ও কঠোর মানসিক দ্বন্দ্ব একই ভাবে ফুটে ওঠে (পালার) অভিনেতাদের জীবনে যা গোটা সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

'রামযাত্রা'-র এক দৃশ্যে দিলীপ সরকার ও শিবশঙ্কর ঘোষ

শুধু পরিবেশ স্বতন্ত্র। রামায়ণের এরূপ বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাকে মানবজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পরিচালক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

চেতনার 'রামযাত্রা'

বস্তুত স্যাটয়ারধর্মী এই নাটক যে মেজাজ নিয়ে সুরু হয়েছিল তা সবসময় বজায় ছিল না। এছাড়া মাঝে মাঝে এর গতিবেগ শ্লথ হওয়ায় নাটক জমে উঠতে পারে নি। নাটকের খাতিরে তিনটি সেট ব্যবহৃত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সেটটি যেভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় এগিয়েছিল—সেই তুলনায় তৃতীয় সেটটিকে খঞ্জ ঘোড়ার মত পেছনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অথচ তৃতীয় সেটেরই প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নাটকে বেশী ছিল। এরফলে নাটক ঝুলে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশ্য তা কিছুটা রক্ষা পায় অভিনয়ের গুণে।

আগেই বলেছি, এ নাটক স্যাটায়ার-ধর্মী এবং এর বলার ভঙ্গি সহজ ও সাবলীল। তবু, প্রশ্ন থেকে যায়, নাটকে যেভাবে বিভিন্ন জটিল সমস্যা জাঁকিয়ে বসে, তা কি শেষ দৃশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে?

অভিনয় ভাল লাগে শিবশঙ্কর ঘোষ (ভূষণ) ও দিলীপ সরকারের (ভালা)। এদের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় নাটকের শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এছাড়া অভিনয় যে একটি নাটককে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারে, তা এই নাটক দেখে মনে হয়নি। তবু এরমাঝে, যারা চরিত্রকে বলিষ্ঠভাবে রূপদানে সচেষ্ট ছিলেন, তারা হলেন, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় (পরাশর-রাবণ), গৌতম চক্রবর্ত্তী (রাম-বৃন্দাবন), অলোক দত্ত (জটায়ু), সমীর মুখোপাধ্যায় (পালবাবু)।

উৎপল সেনগুপ্ত

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮,এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রসাদ

১৫ ফেব্রুয়ারী
১৯৭৬

কলকাতায় পাতাল রেলের কাজ এগোচ্ছে

কলকাতায় পাতাল রেলের পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। কাজ এগোচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে কলকাতায় পাতাল রেল স্থাপনের আলাপ আলোচনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পের কাজে ব্যয় হবে ২৫০ কোটি টাকা। বেলগাছিয়া থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সতেরো কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে থাকবে সতেরোটি ষ্টেশন।

এপর্যন্ত এই প্রকল্পটির ৮ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। দমদম-বেলগাছিয়ায় কাজ অনেকদিন আগেই সুরু হয়েছিল। এখন ময়দানে বারো নম্বর সেক্টরে ভূগর্ভে দেয়াল গাঁথার কাজ সুরু হলো। কংক্রীটের এই দেয়াল ৫০ ফুট গভীর পর্যন্ত থাকবে। পাতাল রেলের কাজ শেষ হলে উপকৃত হবেন বৃহত্তর কলকাতা মহানগরীর ৯০ লক্ষ নাগরিক। প্রকল্পটিতে এপর্যন্ত ১৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য বাজেট বরাদ্দ রয়েছে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিশেষজ্ঞ দল পাতাল রেল নির্মাণে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিছু সাজসরঞ্জামও সোভিয়েত রাশিয়া থেকে এসেছে।

ডায়াফ্রাম দেওয়াল তৈরীর জন্য কংক্রীট ঢালা হচ্ছে

'ধনধান্যে'র আগামী বিশেষ সংখ্যায় থাকছেঃ

বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এক দশকঃ
প্রগতির নব দিগন্ত/সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
নতুন যুগের ভোরে/নির্মল সেনগুপ্ত
শ্রমিক স্বার্থে বোনাস/উৎপল সেনগুপ্ত
ক্রেতাস্বার্থে ভোগ্যপণ্য বন্টন/এ. সি. জর্জ
সুখী গৃহকোণ/শরমাপ্রসাদ সরকার
বিদ্যুৎ বৃত্তান্ত/দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-৬ টাকা, দুবছর ১০ টাকা এবং তিনবছর ১৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৩০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ১৭/১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—স্বপন মণ্ডল

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

উপসম্পাদক
দিলীপ ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

গ্রামই ভারতের প্রাণকেন্দ্র। শতকরা আশিজনের মত লোক ভারতের অসংখ্য গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি হলেই গ্রামে বসবাসকারী আশিভাগ দেশবাসীর উন্নতি। এই বৃহত্তর জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে, উপেক্ষা করে দেশ কখনও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হতে পারেনা। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ গ্রামবাসী দারিদ্র্যের চরম নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত। এদের দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের উন্নতি সাধনের উপায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সেই মত বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ চলছে সারা দেশে।

সম্প্রতি ওয়ালটেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৬৩ তম অধিবেশনের উদ্বোধনকালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য 'বিজ্ঞান ও অখণ্ড পল্লী উন্নয়ন' কে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে আবার উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিজ্ঞানীদের তিনি আহ্বান জানান। বারটি দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীসহ প্রায় তিনহাজার প্রতিনিধির এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কারিগরের অভাবে পল্লী অঞ্চলে বর্ত্তমানে বহু সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গ্রামীণ যন্ত্রবিদ্যার উন্নয়নের দ্বারা এর প্রতিকার ও গ্রামবাসীদের কর্ম-সংস্থান সম্ভব। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি বিধানে কৃষি, বিদ্যুৎশক্তি ও ধাতুবিদ্যার উন্নয়নে বিজ্ঞানীদের কার্যকরী ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

ভারত এক বিশাল দেশ। এর সমস্যাও অসংখ্য। তা সত্ত্বেও ভারত দারিদ্র্য দূরীকরণে কৃতসংকল্প। এই কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিজ্ঞানীদের অবশ্যই সহযোগিতা করা উচিত। মানব কল্যাণে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর যে প্রয়াস চলছে সারা বিশ্বে তাকে শান্তিকামী প্রতিটি দেশের লোকই স্বাগত জানাবে। ভারতও বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহারে শপথবদ্ধ। ভারতবর্ষের গ্রামীণজীবনে দারিদ্র্য একটা অভিশাপ। এই অভিশাপ দূরীকরণের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান খুবই যুক্তিসংগত। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের আহৃত প্রযুক্তিবিদ্যা পল্লী উন্নয়নের নানা সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করবেন আমাদের আশা। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য দেশব্যাপী যে বিপ্লব সুরু হয়েছে বিজ্ঞানীরাও তার সামিল হবেন দেশবাসীর এটাই তাদের কাছে প্রত্যাশা। আমরা আশা করব বিজ্ঞান কংগ্রেসে গ্রাম ভারতের উন্নয়নের যে শপথ ঘোষিত হল তার বাস্তব রূপায়ণের ফলে অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে সুখী ভারত-সমৃদ্ধ ভারত।

ইন্দিরা দশক

বিষ্ণু দত্ত
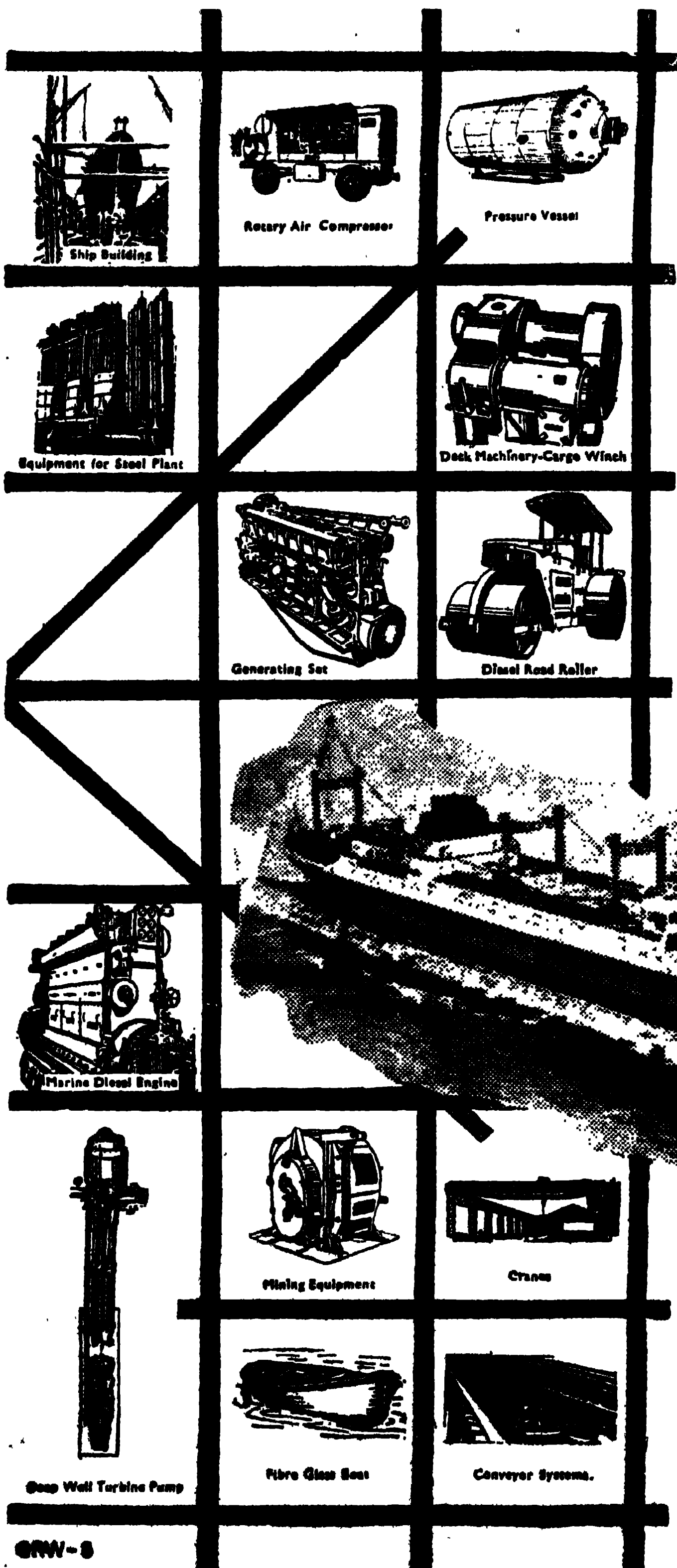
ইতিহাসে গান্ধীজী এবং নেহেরুর পরেই যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্থান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত, তাঁর ভূমিকা ছিল গান্ধী নেহেরুর চেয়েও দুঃসাধ্য। গান্ধীজী চেতনাহীন এক অনগ্রসর দেশে নিজ জীবন-সাধনায়, চিন্তা ও বাক্যে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর আবেগকে সুস্পষ্ট ভাষা দিয়ে যান এবং তাঁদের সকলকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত করেন। জনগণের জন্য নেহেরুরও ছিল অগাধ ভালোবাসা। কিন্তু তিনি তাঁদের সমস্যা মূলত বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর মন ছিল বিশাল, স্বপ্ন ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন এবং সেই লক্ষ্যেরই তিনি এক বিরাট কাঠামো রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষত, তাঁর মহৎ অবদান ছিল পররাষ্ট্র নীতিতে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় এই ক্ষেত্রে তাঁর জোট নিরপেক্ষ নীতির মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তিনি যে ধারণা দিয়ে গেছেন, তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি

দেশের অভ্যন্তরে নেহেরুজী নব ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করে গেলেও তার ওপর সার্থকরূপে ইমারত গঠনের কাজ শুরু হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ নেহেরুজী কর্তৃক আরব্ধ তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানার কথা উল্লেখ করা যায়। অন্যান্য বহু বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার ন্যায় এই তিনটি কারখানায়ও বিঘ্ন-বিপর্যয় দেখা দিল এবং তা পরবর্তী দশকের শিরঃপীড়ার কারণ হলো। অর্থনৈতিক নীতি সঙ্কট-মুখী হলো এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সঞ্চিত স্টার্লিং-এর মোটা অংশ ভোগ্যপণ্য আমদানীতে খরচ হয়ে গেল। ফলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝপথে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটের সম্মুখীন হলো। সেই সঙ্কট এখনো কাটেনি।

১৯৬২ সালে মুখ্যত চীনা আক্রমণের পর ষাট দশকের মাঝামাঝি কংগ্রেস ও সরকারের ওপর দেশবাসীর আস্থা হ্রাস পায়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে এটি প্রতিবিম্বিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেসকে ছয়টি রাজ্যে বিরোধী দল ও গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। প্রধানমন্ত্রী পদে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর কার্যকাল ছিল অতি অল্প। কিন্তু, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে আর এক অর্থ-সঙ্কট সৃষ্টির কারণ ঘটলো।

ঈর্ষার বস্তু নয়

১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন ক্ষমতাসীন হন, সত্যি তখন প্রধানমন্ত্রীর পদ মোটেই ঈর্ষার বস্তু ছিল না।

আরও দুইটি গুরুতর সমস্যা তাঁর সামনে দেখা দিল। প্রথমে এল পাঞ্জাবী সুবার দাবিতে আকালি আন্দোলন। এই আন্দোলন এক দশক ধরে চাপা ছিল। আর এক সঙ্কট হচ্ছে ১৯৬৬-৬৭ সালের ভয়াবহ খরা। এর সমাধান ছিল আরও কঠিন। গরীবদের মধ্যে ব্যাপক দুঃখ-কষ্ট দেখা দিল এবং দেশকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল হতে হলো। সাধারণ মানুষ কার্যত কোন প্রকারে দিন যাপন করতে লাগল। মৌসুমী শস্য বিনষ্ট হওয়ায় তুলা, পাট ও তৈলবীজের অভাব দেখা দিল। ফলে, শিল্পেরও ক্ষতি হলো।

চূড়ান্তরূপে চূড়ান্ত

শ্রীমতী গান্ধীর চরিত্রে এমন কতগুলো গুণের সমাবেশ ঘটল, যার ফলে পরবর্তী-কালে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি ও বিরোধী পক্ষ এই দুটিরই মোকাবিলা করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অনেক পুরুষের মধ্যেও দুর্বল। একজন বিখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পূর্বে (শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যার সদস্য ছিলেন।) তামাসা করে বলতেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে ২২ জন মহিলা

সদস্য এবং ১ জন পুরুষ সদস্য আছেন। এইক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর পা দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে থাকে এবং আশ্চর্য সমাহিত চিত্তে তিনি বিভিন্ন সঙ্কট ও পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্রতী হন।

আকালি আন্দোলন তাঁর প্রথম পরীক্ষা এবং তিনি সাহসিকতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করেন। পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা দুই ভাগে বিভক্ত করার তিনি সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে কি? কলমের এক খোঁচায় এক দশকের ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল। তার প্রভাব এখনো লক্ষ্য করা যায়। গুরু তেগ বাহাদুরের আত্মবলির ত্রিশতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখা গেল, পূর্বে এমনটি কখনো দেখা যায় নি। এই নতুন রাজ্য দুটি এখন দেশে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির আদর্শ পীঠস্থানে রূপান্তরিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী

এমন দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া চলে। ওয়ার্কিং কমিটি মারফৎ দশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রবর্তন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, ডঃ জাকির হোসেনকে এবং পরে ডঃ ভি. ভি. গিরিকে রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচন, রাজ্যসভা কর্তৃক রাজন্যবর্গের ভাতা নাকচের বিল গৃহীত হওয়ার পর সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া, বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা এসব সিদ্ধান্তই সময় নষ্ট না করে ঝটিতি গৃহীত হয় এবং এসবের প্রচণ্ড প্রভাবও লক্ষিত হচ্ছে।

১৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়নে রাজী হওয়ায় তাঁকে অনেক অবিজ্ঞ জনের পরামর্শে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেন বলে সমালোচনা করা হয়। বস্তুত প্রকৃত ঘটনা এ নয়। প্রথম কথা হচ্ছে, ওটা ছিল তাঁর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের সূচনাকাল। প্রকৃতপক্ষে তখন তাঁর কোন অর্থনৈতিক পটভূমিকা ছিল না। যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ওপর তিনি নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁরা সকলে একবাক্যে ঐ সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তা ছাড়া, ওটা এমনই একটা বিষয়, যা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা চলে না বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে দীর্ঘকাল ফেলে রাখাও চলে না।

এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়, তার মূল্য আছে। কিন্তু, এটা কতকটা পশ্চাৎচিন্তার মত। অবমূল্যায়নের উপকারিতা দুই কারণে ব্যর্থ হয়। প্রথম এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ১৯৬৬ সালের মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অভাবে ফসল নষ্ট হওয়া। এর ফলে শুধু খাদ্য সমস্যার তীব্রতাই বৃদ্ধি পায়নি, সঙ্গে সঙ্গে সূতী বস্ত্র, পাট ও বনস্পতি শিল্পে সঙ্কট দেখা দিল। রপ্তানী কার্যসূচীতে যে অবমূল্যায়নের সুফল দেখা দেওয়ার কথা ছিল, তা ব্যর্থ হলো। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ঐ সময়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি। যার ফলে, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য তহবিলের অর্থ সামরিক কার্যসূচীতে চলে গেল। বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থবণ্টন ব্যবস্থাও ক্ষুণ্ণ হলো।

অটল সাহস

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণের সঙ্গে ইন্দিরাজীর আর একটি গুণ হচ্ছে অটল

সাহস। এই সাহস তাঁকে সঙ্কটকালে শুধু মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই সাহায্য করে না, জাতির মনোবলও বৃদ্ধি করে। চীনা আক্রমণের সময় আমাদের সৈন্যবাহিনী যখন পশ্চাৎ অপসরণ করছিল এবং এমন কি, অসামরিক প্রশাসনও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিল, তখন তিনি প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তেজপুর সফরে যান। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীরূপে তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রচণ্ড হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের সময় সেখানে সফরে যান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তিনিই একমাত্র সদস্য যিনি সেই সময় মাদ্রাজ সফর করেন। উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে তখন সেখানে তীব্র বিদ্বেষভাব বর্তমান ছিল। পাকিস্থানের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় অসংখ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে ইন্দিরাজী সৈন্যবাহিনীর পরিখা থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং পরমুহূর্তে অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ

তাঁর চরিত্রে আর একটি মহৎ গুণ হচ্ছে পরিস্থিতি ও সাধারণ মানুষের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করার স্বভাবজাত ও অপার্থিব ক্ষমতা। গান্ধীজী হৃদয় দিয়ে জনগণকে ভালবেসেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন, তাঁদের ভাষায় তিনি কথা বলতেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য দেখে সহানুভূতি পরবশ হয়েছিলেন বলেই নেহেরু জনগণকে ভালবাসতেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে জনগণের যে সম্বন্ধ, তা মন ও হৃদয়ের। এজন্যই তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে এতটা বিচক্ষণ।

সুসম্পূর্ণ রাজনীতিক

মানবতাবোধ ও ব্যক্তিগত সম্ভ্রম-বোধ তাঁকে রাজনীতিক করেছে। তাঁর এই ভূমিকায় তিনি একজন সুসম্পূর্ণ রাজনীতিক। স্পষ্টতই তিনি একজন সংগ্রামী হলেও, অতিশয় প্রতিকূল মুহূর্তেও সতর্কতা সহকারে সংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং সময় বেছে নিতে তিনি ভুল করেন না।

ঘটনাবহুল বৎসরগুলিতে রাষ্ট্রের নেত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৬৯ সালে ওয়ার্কিং কমিটির বাঙ্গালোর অধিবেশনে তাঁর কল্পিত "যূথভ্রষ্ট চিন্তা" যেভাবে জোর করে বিরোধের ক্ষেত্র খুলে দিয়েছিল, তা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর এই কাজ ছিল 'সিণ্ডিকেটের' ওপর বর্শার ফলা নিক্ষেপের তুল্য। তখন বোঝা গিয়েছিল যে, 'সিণ্ডিকেট' তাঁকে পরাস্ত করার মতলবে ছিল। বিরোধীরা অবিরাম ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধিতা করছিল। কিন্তু তাই ছিল তাঁর মুখ্য নীতি এবং বিরোধীদের তিনি তা দিয়েই আঘাত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞানীদের সংগে কৃত্রিম উপগ্রহ পরিদর্শন করছেন

তিনি যে সব সুযোগ পেলেন, তা দিয়ে তিনি কি কি কাজ করলেন, এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তর হচ্ছে, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে গোটা জাতি যে বেঁচে রয়েছে সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা। কংগ্রেস দলের ভিতর যে সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের দৃঢ় চালেঞ্জকে পরাভূত করা সোজা কাজ নয়। এই লড়াই চলার সময় কোন গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব ছিল। এর পর এল বাংলা দেশের ঘটনা। সামরিক বাহিনী যুদ্ধে রত হওয়ায় যে অর্থব্যয় হয়েছে, তা ছাড়াও, এই ঘটনায় এক কোটি উদ্বাস্তুর জন্য বেশ কয়েক মাস বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তা ছাড়াও ছিল এক লক্ষ যুদ্ধ-বন্দী।

তিনি উদ্বাস্তুদের বাংলা দেশে ফেরৎ পাঠাবার দৃঢ়সঙ্কল্প না নিলে তারা আমাদের দেশের ওপর একটা স্থায়ী বোঝা হয়ে দাঁড়াত।

মুদ্রাস্ফীতি রোধ

এরই মধ্যে দেখা দিল দ্রুত গতিশীল মুদ্রাস্ফীতি। সেই সঙ্গে আমদানীকৃত অপরিশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি। শুধু তেলের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ভারতের আমদানী ব্যয়ের অঙ্ক ২৫০ কোটি টাকা থেকে

বোকারো ষ্টীল প্ল্যাণ্ট

বেড়ে প্রায় ১ হাজার ২ শ' কোটি টাকা হয়ে গেল। দু' বছর আগে শতকরা ৩০ ভাগ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এমন দেশগুলোর মধ্যে ভারত একমাত্র না হলেও, অন্যতম। এখন যে তা রোধ করা গেছে, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার ফলে এবং ভালো বৃষ্টির দরুণ ফসল ভালো হওয়ায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিবর্তন হয়েছে। জরুরী অবস্থা প্রবর্তনের ফলে শৃংখলাবোধ জেগেছে এবং তা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। চলতি বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোতে যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তাতে সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

চাতুর্যপূর্ণ মতলব ও প্রচারসর্বস্ব উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের নিন্দা করা হয়েছিল। আগে থেকেই এসব নিন্দা ও নালিশ প্রচারের কাজ কি হাস্যকর? উন্নয়নকার্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি আজ এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ঠিক এই দায়িত্বই তাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল। তাদের কাছে যেসব প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, সবই তারা পূরণ করেছে, এমন দাবি কেউ করেন না। কিন্তু, আজ ক্ষুদ্র শিল্প-মালিক ও চাষীরা যে সহজে এবং বিনা বন্ধকে ঋণের টাকা যোগাড় করতে পারছে, তার কারণ সরকারের দূরদৃষ্টি। দেশের নানা জায়গায় যেসব আঞ্চলিক পল্লী ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে, সেগুলো উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং মহাজন ও চড়া সুদ আদায়কারী ভূস্বামীদের খপ্পর থেকে ঋণগ্রস্ত ক্ষেত-মজুরদের উদ্ধার করবে।

গুপ্তধন উদ্ধার

প্রাক্তন রাজন্যবর্গের ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা লোপের জন্য শ্রীমতী গান্ধী উদ্যোগী হলে এর বিরুদ্ধে চারদিকে কলরব ওঠে। প্রাক্তন রাজারা শুধু ভাতা নয়, বিনা শুল্কে অপরিমেয় দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারতেন এবং আয়-কর ও বিত্ত-কর থেকে এঁরা মুক্ত ছিলেন। রাজন্যবর্গের পক্ষ থেকে দাবি করা হলো যে, উপযুক্ত সুবিধাগুলোর বিনিময়ে তাঁরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা ত্যাগ করে ভারতীয় ইউনিয়নে তাঁদের রাজ্যসমূহের সংযুক্তিতে রাজী হয়েছিলেন। এখন তাঁদের সুবিধাগুলো কেড়ে নিয়ে বিশ্বাস-ভঙ্গের কাজ করা হচ্ছে। আয়কর কর্তৃপক্ষ গোয়ালিয়র ও জয়পুরে প্রচুর পরিমাণ গুপ্তধন উদ্ধার করার পর আজ প্রাক্তন রাজাদের অভিযোগ শূন্যগর্ভ মনে হচ্ছে। রাজারা এই বিত্তের জন্য কোন কর দিচ্ছিলেন না। দারিদ্র্যের বিশাল সাগরে সমৃদ্ধি ও সুবিধাভোগের দ্বীপের অব্যাহত অস্তিত্ব অসন্তোষের জন্ম দেবেই।

রাজনৈতিক লাভ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুফল ফলেছে। দেশবাসী আজ সুসংবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে গত বারো মাসে দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমত এই সময়ে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছে। এর ফলে, শেখ সাহেবের ন্যায় একজন জনপ্রিয় নেতা কাশ্মীর রাজ্যের দারিদ্র্যক্লিষ্ট নরনারীর ভাগ্য পরিবর্তনে তাঁর প্রভাব ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। দেশের অপর প্রান্তে অবস্থিত সিকিম জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ভারতরাষ্ট্রের পরিবারভুক্ত হলো। ভারতের অপর এক দ্বার নাগারাজ্যে বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে। তারা প্রকাশ্যে ভারতর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে এবং অবশিষ্ট সমস্যাবলীর সমাধানে সচেষ্ট হতে রাজী হয়েছে। মিজোরামেও অনুরূপ সমাধান হবে, এরূপ সম্ভাবনা আছে এবং সেই দিন হয়ত খুব দূরে নেই। দেশের উত্তর পূর্ব সীমান্তের এইসব ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল তিব্বত সংলগ্ন। প্রতিবেশী বাংলাদেশের ক্রমাগত অস্থিরাবস্থা নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যাপারে উদ্বেগজনক হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে উপযুক্ত ঘটনাবলী বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

চোরাই মাল ও কালো টাকা

সাফল্যের এক ঝলক

এই দশকেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
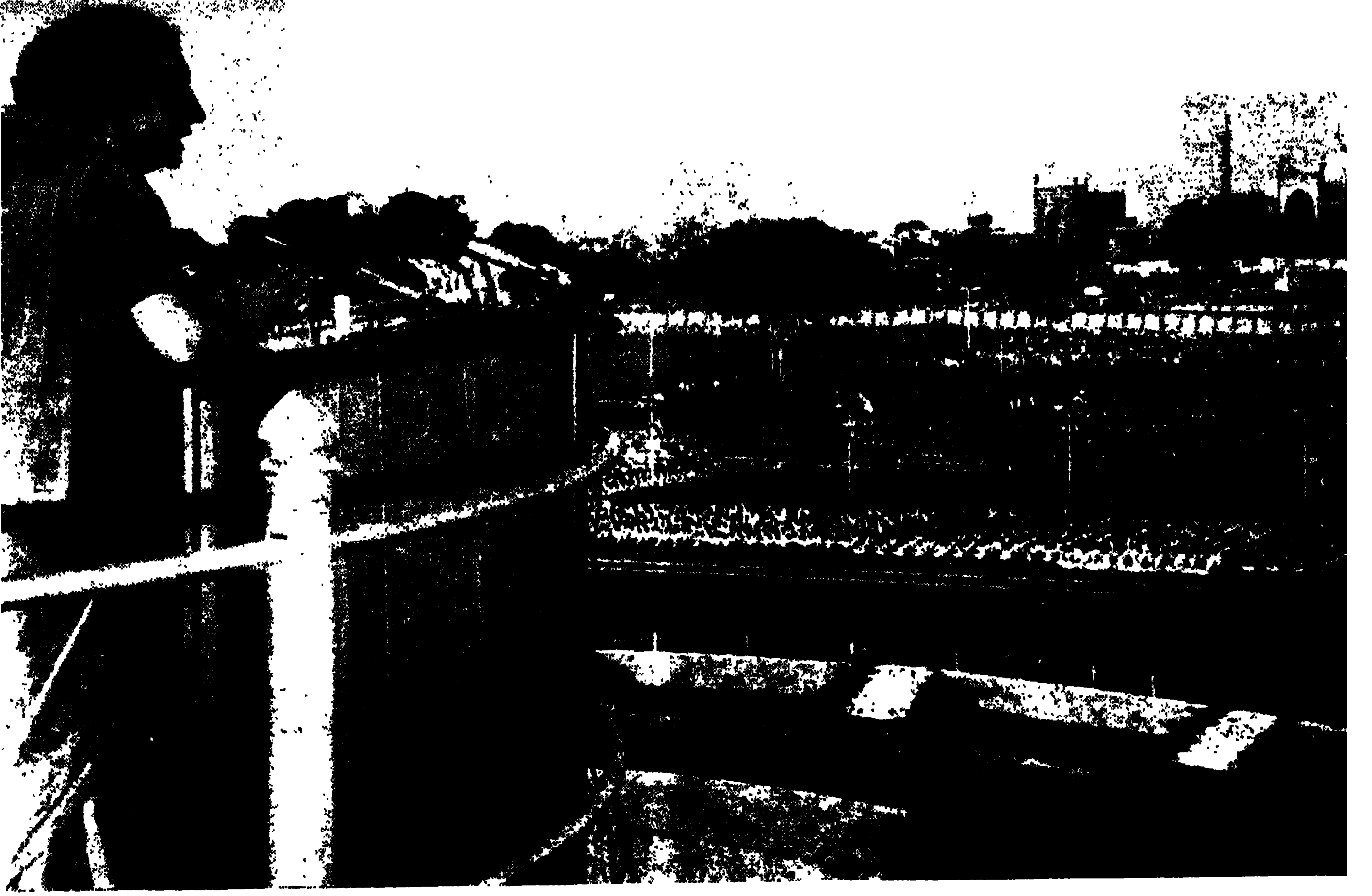
চাই জনগণের সহযোগিতা

একজন পরিপক্ক নেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন; মুহূর্তের মধ্যে তিনি জনগণের মনের ভাব ধরতে পারেন; স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে এবং প্রশাসন ক্ষেত্রে যেমন ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন, তিনি তা করেন।

গভীর আস্থা নিয়ে তিনি তাঁর কাজ করেন ও কথা বলেন। অর্থনীতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি নবাগতা ছিলেন বটে, কিন্তু, অদ্ভুত সাবলীলতা সহকারে এখন তাঁর মুখ থেকে সেসব সিদ্ধান্তও উচ্চারিত হয়। তাঁর বিবৃতি ও কার্যাবলীতে প্রশংসনীয় শিষ্টতা লক্ষিত হয়।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার দ্বারা গণতন্ত্র নিরোধ করা হয়েছে বলে প্রচুর অভিযোগ শোনা গেছে। কেউ কেউ মনে করেন যে যথেষ্ট বিপরীত যুক্তিও আছে। কিন্তু, সম্পূর্ণ সরল প্রকৃতির কিছু ভারতীয় সহ এমন অনেকে আছেন, যাঁরা এবিষয়টি বুঝে ওঠতে পারেন নি। পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে লালিত সংসদ ও সংবাদ পত্রের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে এবং এটা সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই ফল। তাঁরা ভুলে যান যে, এরূপ স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ববোধও জড়িয়ে রয়েছে এবং এই দেশের বিরোধীদের মধ্যে তা একেবারেই নেই। শ্রীমতী গান্ধীর সমালোচকরা যে ধরণের গণতন্ত্র পছন্দ করেন, তার সমর্থনে তাঁরা সকাময় নেহরুজীর কথা উদ্ধৃত করেন। কিন্তু তিনি কিভাবে তা রক্ষা করতেন, সেই সর্তগুলো তাঁরা ইচ্ছা করেই ভুলে যান। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য :

"গণতন্ত্র শৃঙ্খলার রূপ বদলে দেয়। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৃহত্তর ভাবে আরোপিত হয় আত্মশৃঙ্খলা রূপে। আত্মশৃঙ্খলার মানে হচ্ছে, এমন কি, যে সব লোক তা মানতে চায়না সেই সংখ্যাল্পরাও যে সমাধান গ্রহণ করেন। কারণ, সংঘর্ষ বাধানো অপেক্ষা তা গ্রহণ করা ভালো। এটা মেনে নিয়ে পরে দরকার হতো শান্তিপূর্ণ পথে তার পরিবর্তন করা ভালো।"

অন্যত্র নেহরু বলছেন—

"গণতন্ত্র ব্যক্তিকে বিকাশের সুযোগ দেয়। এই সুযোগের অর্থ অরাজকতা নয়, অর্থাৎ যার যা খুশী, তাই করা নয়। একটি সামাজিক সংগঠনের পক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলা অবশ্য পালনীয়। এই নিয়ম শৃঙ্খলা বাইরে থেকে আরোপ করা চলে, আবার তো আত্মশৃঙ্খলাও হতে পারে। প্রকৃত গণতন্ত্রে শৃঙ্খলা বাইরে থেকে আরোপ করা হয় না। শৃঙ্খলা যেখানে নেই, সেখানে গণতন্ত্রও নেই।"

সহজ সরল স্বাভাবিক

সমর দে

মলয়শঙ্কর

ঠিক অফিস টাইমেই বৃষ্টিটা নামল। মুষলধারে। খাওয়া-দাওয়া সেরে জামা-প্যান্ট পরে ফিট-ফাট হয়ে গেছি। বেরোতে পারছিনা। বৃষ্টির জন্যে। যখন থামল, তখন রাস্তাঘাট জলকাদায় দারুণ অপরিষ্কার হয়ে গেছে। ট্রাম নেই। বাসগুলো জন্তু-জানোয়ারের মত মানুষ ভর্তি করে হুস্‌হুস্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা বন্‌বন্‌ করে এগোচ্ছে। দশটার দিকে। কিছুক্ষণ বাস ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে হাল ছেড়ে দিলুম। সামনে ট্রাফিক সিগনালের জন্যে একটা প্রাইভেট্‌ কার দাঁড়িয়েছিল। গলাটা ভিজিয়ে বিনীতভাবে বললুম, Kindly একটা লিফট্‌ দেবেন?' ভদ্রলোক জবাব দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন না। গ্রীন সিগনাল পেয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেলেন। হঠাৎ ঠিক সামনেই একটা স্কুটার দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে স্বর্গ পেলুম। 'আরে শঙ্করদা। উফ্‌, কি ঝঞ্ঝাটেই না পড়েছি। চলুন।' স্কুটারে চেপে বসলুম। জল কেটে কেটে স্কুটারটা এগিয়ে চলল। জলকাদায় ছেলে মেয়ে সকলে হেঁটে চলছে। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হল। কিন্তু এত করেও লেট-মার্ক ঠেকানো গেল না। ১০-১০। অর্থাৎ দশ মিনিট লেট হয়ে গেছে। কী আর করা যায়। মনটা খিঁচড়ে গেল।

দুপুরে লাঞ্চের সময় ও ফোন করল। ভীষণ আর্জেন্ট দরকার নাকি। পার্ক-স্ট্রীটের গান্ধীর ষ্ট্যাচুটার কাছে দাঁড়াতে বলে ফোনটা রেখে দিলুম। অফিসে বসে আজকাল আবার ফোনে দুমিনিটের বেশী কথা বললে লাইন কেটে দেয়।

দূর থেকেই ওকে দেখতে পেলুম। গান্ধীমূর্তির ঘেরাটোপের পাশে দাঁড়িয়ে। একটা হালকা চাঁপা রঙের শাড়ী পরেছে। মানানসই ব্লাউজ, ঝোলানো ব্যাগ, ফোল্ডিং ছাতা। ব্লাউজের স্বল্পতার জন্যে কোমরের কাছে অনেকখানি মাংস দেখা যাচ্ছে মাখনের মত। লুকিয়ে থাকা ছোট্ট নাভিটা উঁকি দিচ্ছে। আলতোভাবে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললুম, 'কি ব্যাপার ম্যাডাম, একেবারে জরুরী তলব?' কথার উত্তর না দিয়ে ও এগিয়ে চলল, আমি পাশে পাশে। একটু আকর্ষণ করে বললুম,' কি হল দেবী মুখ গোমড়া কেন? আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল 'তোমার তো আজকাল দেখা পাওয়াই ভার।'

এতক্ষণ বাদে বুঝলুম ওর রাগের কারণ। বললুম, কি করব বল এমার্জেন্সী ডিক্লেয়ারের পর থেকে অফিসে যা কড়াকড়ি করেছে—।

—তা বলে একটা ফোনও করতে পারনা বুঝি?

—সত্যিই পারিনা। আমাদের অফিসের ফোনগুলোতে লেবেল সেঁটে দিয়েছে 'জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ।'

—সত্যি?

—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

—থাক হাতটাকে আর নামাতে হবেনা। বিশ্বাস করছি। তা এই ভরাসন্ধ্যেতেও সানগ্লাসটা পরে আছ কেন?

—জয় বাংলা হয়েছে।

—এমা, আবার হচ্ছে নাকি?

—ইয়েস্‌ ম্যাডাম্‌। তোমায় এখনো ধরেনি বুঝি?

—না। আমার আগের বার হয়ে গেছে।

—তাতে কি? অনেকের দুবারই হচ্ছে।

—আমার হবেনা মশাই। মেয়েদের একটা ন্যাচারাল্‌ ইমিউনিটি আছে, জানো তো?

—জানি।

আমরা মিউজিয়ামের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলেছি। সিপ্‌সিপ্‌ করে বৃষ্টি নামল। ও ঝট্‌ করে ফোল্ডিং ছাতাটা খুলে ফেলল। আমাকেও টেনে নিল। আমি আর একটু বেশী করে ওর গায়ের উত্তাপ পাচ্ছিলুম। তার সঙ্গে ওর শরীরের গন্ধ। রাস্তাঘাট এমনিতেই কাদামাখা। তার ওপর বৃষ্টি। ওর শাড়ীর ভাঁজ-ফাঁজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বিরক্তির সুরে ও অনুযোগ করল, 'দূর ছাই, এই এক বৃষ্টি হয়েছে। ভাল লাগে কারো।' আমি বৃষ্টির সাপোর্টে বললুম, 'এই বৃষ্টিতেই কাতর দেবী। পাটনায় কি হয়েছে জান তো?' ও বেশ স্মার্টভাবে জবাব দিল 'খুব জানি। কাগজে ছবি দেখলুম, দোকান পাট বাজারহাট গাড়ীঘোড়া সব জলে ডুবে গেছে।' ভুরু নাচিয়ে আমি বললুম 'তবে?' ও কথা বাড়ালো না।

আমরা ছাতা মাথায় পাশাপাশি ঘন হয়ে বেশ সাবলীল ভাবেই এসপ্ল্যানেডের দিকে এগোচ্ছিলুম। হঠাৎ ওর লোটানো-শাড়ির ফাঁসে আমার পাটা জড়িয়ে গেল। ও আর একটু হলেই একেবারে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত। আমার ব্যায়াম-পুষ্ট পেশীবহুল দুটো প্রসারিত হাতে ওর নরম শরীরটা আশ্রয় পেয়ে গেল। একটু মৃদু চাপও দিলুম। ও ঝট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'অসভ্য' বলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ফু-উ-উ করে ওর মুখের ওপরেই ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন অসভ্যতার কি দেখলে?' মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ও বলল, 'তুমি দিনদিন যা হচ্ছ না! সুযোগ পেলেই'— আমার স্মৃতিশক্তি খুব একটা ভাল না। কিন্তু তা হলেও হঠাৎ মনে পড়ে গেল দু-একটা লাইন। কোথায় যেন পড়েছিলুম। বলে ফেললুম, 'জানো তো, কামনাবাসনাকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের শরীর সেটা সহজে মেনে নেয় না। অনেকে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়।

'তাই বুঝি?' চোখদুটো নাচিয়ে ও জিজ্ঞেস করল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ও ছাতাটা মুড়ে ফেলেছে। আমরা রিজ হোটেলের পাশ ঘেঁষে চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে চলেছি। ও জিজ্ঞেস করল,

—কোথায় যাবে?

—অনাদি কেবিনে।

—জায়গা পাবে না।

—খুব পাব।

—আমার মন কিন্তু বলছে হাউস ফুল।

—দেখনা, আমাদের দুজনের ঠিক হয়ে যাবে।

অনাদি কেবিনে ঢুকতে গিয়ে আমরা থমকে গেলুম। ম্যানেজার জানাল, নো সীট্। অতএব এরকম বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয়? চল না, আমেরিকান লাইব্রেরীতে একটা আর্ট এগ্‌জিবীশন্ হচ্ছে, দেখে আসি।

—ক্ষেপেছ? ওই সব এ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের আমরা কিছু বুঝি নাকি?

—নাই বা বুঝলুম?

—ধ্যাৎতেরি আর্ট এগ্‌জিবিসন। চল চল, খালি হয়ে গেছে।

আমরা অনাদি কেবিনে ঢুকে দুটো মোগলাই-এর অর্ডার দিয়ে পাশাপাশি চেয়ার টেনে বসে পড়লুম। কাঁটা চামচ দিয়ে মোগলাই-এর সদ্‌গতি করতে করতে ও কি-একটা বলল। আমি ঠিক খেয়াল করি নি। কেননা, আমি তখন কোণের বেঞ্চে একজন মেক্-আপ্ যুবতী ও একটি ফুলবাবুকে নিরিক্ষণ করছিলুম। মেয়েটির স্বচ্ছ শাড়ী এবং ততোধিক স্বচ্ছ ভয়েলের ব্লাউজের বাঁধা অতিক্রম করে বুকের মাঝের ফাঁকে একটা পেন্‌ডেন্ট দুলতে দেখতে পাচ্ছিলুম।

—এই কি হচ্ছে কি?—ও হাতে চিমটি কেটে মৃদু ধমক দিল।

—দেখছি।

—কি দেখার আছে?

—অনেককিছু। তবে, আপাততঃ...

—ড্যাট্। কি অসভ্য!

তারপরেই আমাকে অমনোযোগী করে তোলবার জন্যে হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেলল, —এই জানো, মেজদা ফিরে এসেছে।

—কবে?

—এই তো দিনকুড়ি হল। আবার কলেজে ভর্তি হবে বলছে।

—তাই নাকি? ও তো প্রেসিডেন্সীতে পড়ত, না?

—হ্যাঁ। ওযে কবে পাশ-টাশ হয়ে যেত বল তো? এতদিনে হয়তো ভাল চাকরী-বাকরীও জুটে যেত। কি যে ছাই মাথায় ঢুকল। পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে—।

চায়ের কাপে সিপ্ করতে করতে আমি সেই মেক্-আপ্ সুন্দরীকে খুঁজছি। ও কড়ে আঙুলের অল্প-একটু লেগে-থাকা নেল্-পালিসের রেশটুকু খুঁটছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, এই সেদিন কলকাতায় দানিকেন এসেছিল, তুমি দেখেছ?

—হুঁ।

—যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি। আমায় নিয়ে গেলে না কেন?

—আরে নারে বাবা, আমি চাক্ষুষ দেখিনি। টেলিকাস্ট করেছিল, সেটাই দেখেছি।

—টেলিভিসন কোথায় পেলে?

—আমার বৌদির বাড়ীতে। টালায়।

—টালা!

—হ্যাঁ, তাতে কি হল?

—বাপ্‌রে। টালায় তো সেদিন সকালের বৃষ্টিতে দারুণ জল জমে গিয়েছিল।

চা খাওয়া শেষ করে ও কোমর থেকে একটা চাঁপা রঙের ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিল। বিলটা মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে আমি একটা প্রস্তাব দিলুম, 'চল না, একটা সিনেমা দেখে আসি।'

—যাওয়া হবে না? রাত্তির হয়ে যাবে।

—কেন, বাড়ীতে বলে আস নি?

—মাথা খারাপ? আমাদের বাড়ী এখনো কিরকম কনজারভেটিভ্ তুমি জান না তো?

—তাহলে তো মুশকিল।

—সেজন্যেই তো মশাই বারবার অন্তত রেজেষ্ট্রীটা করে রাখতে বলছি। পরে আর কোন আপত্তি কার্যকরী হবে না।

—আরে বাবা, ওসব তো আর পালাচ্ছে না। পরে এক সময় করে নিলেই হবে। আর তাছাড়া দেশের বর্তমান অবস্থায়!

ও ঝট্ করে কলকাতার বুকে নতুন-সাঁটা একটা পোষ্টার দেখিয়ে দিল, "হাতের কাজ সারুন। দেশের কাজ আপনি এগোবে।"

স্বাস্থ্য: এক দশকের নিরিখে

গোপালকৃষ্ণ রায়

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী ডা: করণ সিং-এর কথায় নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় গত চারটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প গড়ে তুলেছেন।

যদিও প্রকল্পটি সামগ্রিকভাবে রূপ পরিগ্রহ করেনি, তবে শহর থেকে সুরু ক'রে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও এর ভিত্তি গত এক দশকে রচিত হ'য়ে গেছে।

চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রক তিনদফা উদ্দেশ্য নিয়ে যে জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেছিলেন বর্তমান পরিকল্পনায় ব্যাপক সংযোজনের মাধ্যমে তাই জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পে রূপায়িত হ'তে চলেছে। যা ছিল কিশলয় আর কুঁড়ি--আজ তা পল্লবিত ও কুসুমিত।

বিগত চারটি পাঁচশালা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে সংক্রামক রোগ নির্মূল করা। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ক'রে আরোগ্য-সাধক ও প্রতিষেধক স্বাস্থ্য-সেবা সম্প্রসারিত করা এবং মন্ত্রক-সংশিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে উন্নততর ক'রে জন-জীবনকে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান ক'রে তোলা।

এখানে বর্তমান পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপরেখার কিছু উল্লেখ না করলে গত দশ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্রটি খুঁজে পাওয়া যাবেনা। গত চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে জোরদার ক'রে পল্লীভিত্তিক রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনায় প্রতিটি মানুষের জন্য ন্যূনতম সুসংহত স্বাস্থ্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান পরিকল্পনায় ভেষজ বণ্টন সম্পর্কিত আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কাঠামোকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরজন্য নিম্নোক্ত ছ'টি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে: (১) সুদূর ও দুর্গম পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসাদির সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, (২) ভেষজ বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, (৩) জেলা ও সদর হাসপাতালগুলিকে আধুনিক ক'রে "রেফারাল সার্ভিস" সম্প্রসারণ, (৪) ম্যালেরিয়া সহ সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল করা, (৫) চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের উন্নতি সাধন ও বহুমুখী কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং (৬) পল্লী অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার।

সংক্ষেপে গত চারটি পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দের বিষয় উল্লেখ না করলে স্বাস্থ্য প্রকল্প সম্পর্কে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় সারা দেশে স্বাস্থ্য প্রকল্পে ব্যয় হয়েছিল ১৪৬ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় বেড়ে হল' ২২৫.৮৬ কোটি টাকা আর চতুর্থ পরিকল্পনায় খরচ ৪৩৩.৫৩ কোটি টাকা। বর্তমান পরিকল্পনায় ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৯৬ কোটি টাকা।

১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত সমগ্র দেশের ৫২২২-টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে ৫২৮৩-টি প্রাথমিক ও ৩৩৫০৯-টি সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনার মাধ্যমে প্রায় ৪৫ কোটি পল্লীবাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জনসংখ্যা অনুসারে এবং রাজ্যের আয়তন বড় হওয়ায় উত্তর প্রদেশে সব-চেয়ে বেশী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা হল ৮৭১, তার পরেই বিহার—৫৮৭ এবং মধ্য প্রদেশের সংখ্যা হল ৪৫৭। বর্তমান পরিকল্পনায় সারা দেশে আরও ১৪২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম-বঙ্গে হবে ৪৯টি, আসামে ৩১টি, মেঘালয়ে ১৫টি ও নাগাল্যাণ্ডে হবে ১১টি।

আবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং-এর কথায় ফিরে আসি। সম্প্রতি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে তিনি বলেছিলেন, দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের মজবুত বনিয়াদ রচিত হয়েছে।

দেশের লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক ও কোটি কোটি মানুষ বর্তমানে প্রায় ১,৩৮,০০০ চিকিৎসকের তত্বাবধানে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। দেশের অগণিত গরীব হাজার হাজার ডিসপেনসারীর মাধ্যমে বিনামূল্যে শুধু ওষুধের সুযোগই পাচ্ছেন না বিশেষজ্ঞদের দ্বারাও পরীক্ষিত ও চিকিৎসিত হচ্ছেন।

আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পকে ইংরেজীতে কেউ যদি Cafetaria of modern and indigenous medicine ব্যবস্থা ব'লে আখ্যায়িত করেন—সেটাই হবে তার সুস্পষ্ট পরিচয়। সরকার আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে আয়ুর্বেদ, ইউনানী, সিদ্ধা ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা সহ ভারতীয় পদ্ধতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের

টীকা দেওয়া হচ্ছে

সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করায় গত এক দশকের মধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের এক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই দশকে সরকার ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি পুনরুজ্জীবন ও জনপ্রিয় ক'রে তোলার জন্য বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে গ্রামাঞ্চলে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি ও অন্যান্য আরও চারটি ভারতীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রসারের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে বলেছেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সহ কয়েকটি রাজ্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও গত এক দশকে একটি 'যুগ্ম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' দেশের জনসাধারণের এক বৃহদংশের চিকিৎসা চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এই যুগ্ম স্বাস্থ্য প্রকল্পটির একটি হল সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হেল্‌থ স্কীম ও অপরটি এমপ্লয়ীজ ইনসিওরেন্স স্কীম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার অধীনে দেশের আটটি বৃহৎ শহরের প্রায় ১৩ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার বর্গ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এইসব ডিসপেনসারী-গুলিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য গুলির প্রায় দু' কোটি সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্যে ষ্টেট ইন্সিওরেন্স করপোরেশন প্রায় আট শতাধিক ডিসপেনসারী ও ৫৬ টি হাসপাতাল পরিচালনা ক'রে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

রেল দপ্তর গ'ড়ে তুলেছেন তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য প্রকল্প। এই দপ্তরের অধীনে রয়েছে প্রায় ৬৫০ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আর শতাধিক আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত হাসপাতাল। ডাক্তারের সংখ্যা ২৩,০০০ আর প্যারা মেডিকেল ষ্টাফের সংখ্যা প্রায় ১৮০০০। উপকৃত হচ্ছেন প্রায় ১৯ লক্ষ রেল কর্মী ও তাদের পরিবার বর্গ।

এইতো গেল জাতীয় সেবা স্বাস্থ্য প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এই রূপরেখায় বড় বড় শহরের আধুনিকতম হাসপাতালগুলির কথা বলা হল না। আরও বলা হল না, স্কুল হেল্‌থ স্কীমের কথা।

যেহেতু আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি সহ ভারতীয় পদ্ধতি জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের অঙ্গীভূত, সেইহেতু আয়ুর্বেদ সম্পর্কে দু'চার কথা বলছি। সারা দেশে প্রায় ৪ লক্ষাধিক চিকিৎসক আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে ১,৫৬,০০০ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ষ্টেট বোর্ড অব ইণ্ডিয়ান মেডিসিন কর্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত।

আরও প্রায় চার লক্ষাধিক হোমিও-প্যাথি চিকিৎসক ছাড়াও সিদ্ধা ও ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রেজেষ্ট্রীকৃত ২৫০০০ চিকিৎসক।

সারাদেশে আধুনিক চিকিৎসা মহা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৫। গড়ে প্রতি-বছর ১২৫০০ ডাক্তার সেখানে থেকে পাশ ক'রে বেরুচ্ছেন। আয়ুর্বেদ কলেজের সংখ্যা ৯৯। বছরের প্রায় দু'হাজার ছাত্র আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা ও ইউনানি চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতক হচ্ছেন। জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পে এদের সংযোজন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের সংগে সমগ্র দেশের অর্থনীতির প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরিবার পরিকল্পনার জন্মদিন থেকে সুরু করে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিন পর্যন্ত সরকারী হিসাব মত ২ কোটি ৩০ লক্ষ জন্ম রোধ করা সম্ভব হয়েছে। জন্মহারের তুলনায় এই "জন্মশাষণ" নিতান্ত নগণ্য হলেও একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়।

দেশের প্রায় সাড়ে দশ কোটি 'প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন' দম্পতির জন্য গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে ৫২৫৫ টি মূল পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১৯০০০ সহযোগী কেন্দ্র। শহরাঞ্চলে এর সংখ্যা ১৯১৯। কেন্দ্রগুলির বেশীর ভাগই স্থাপিত হয়েছে গত এক দশকে। তাই গত দশক "স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প দশক" হিসাবে চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে।
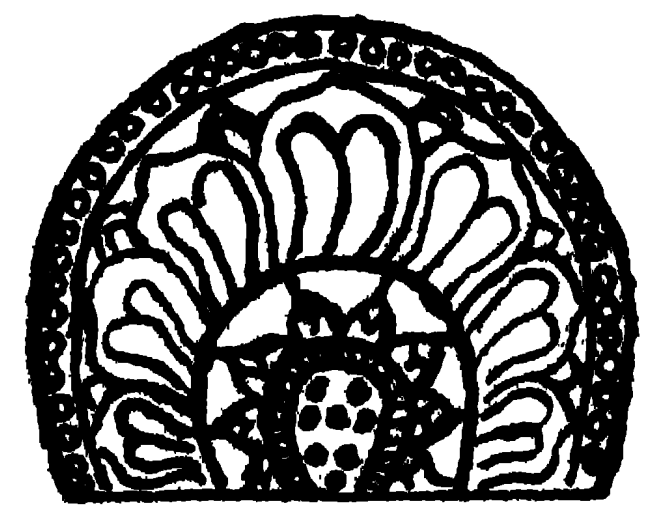
ধানী জমিতে শেওলা সার দিন

পরিতোষ ভট্টাচার্য

আমাদের প্রধান খাদ্য হিসেবে আমরা ধানচাষের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ভারতে ধানচাষের জমির পরিমাণ প্রায় ৭৮০ লক্ষ একর আর ঐ জমি থেকে প্রায় ২৭০-২৮০ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হয়।

ধানচাষে ভাল ফল পেতে হ'লে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা দরকার—বিশেষত নাইট্রোজেন জাতীয় সার। অথচ সমস্যাটা ঐ নাইট্রোজেন জাতীয় সার পাওয়া নিয়েই। আমাদের বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী—প্রায় শতকরা আশিভাগ। তা হ'লে সমস্যাটা কোথায়?

আসলে এই নাইট্রোজেন রাসায়নিক ভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয়। তাই গাছ (একমাত্র শুঁটি বা শিম্বিজাতীয় গাছ ছাড়া) ঐ নাইট্রোজেনকে বাতাস থেকে সরাসরি নিতে পারে না। নাইট্রোজেন পেতে হ'লে গাছকে মাটিতে থাকা নাইট্রোজেন ঘটিত অজৈব লবণের ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য বাতাসের নাইট্রোজেন জমিতে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশতে পারে না, আর ঠিক এই না মেশার কারণে মাটিতে নাইট্রোজেন ঘটিত অজৈব লবণ তৈরী হয় না। ফলে বাতাসে এত যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও নাইট্রোজেন গাছের কাছে হ'য়ে ওঠে দুষ্প্রাপ্য! সুতরাং সমস্যাটা এইখানেই।

নাইট্রোজেনের এই অভাবটা আমরা মেটাই বাইরে থেকে জমিতে অজৈব রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে যেমন ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি। কিন্তু চাহিদা অনুপাতে এর যোগান খুবই কম। কেননা আমাদের দেশে রাসায়নিক সার কারখানা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প এবং সারের প্রয়োজন যেখানে বার্ষিক ৬০ লক্ষ টন সেখানে আমাদের উৎপাদন মাত্র ১২ লক্ষ টন। এদিকে বর্তমানে আমরা উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনের দিকে নজর দিয়েছি এবং জমিকে গতানুগতিক এক ফসলা রাখার পরিবর্তে দো-ফসলা বা তে-ফসলা করার উদ্যম নিয়েছি। সুতরাং সে ক্ষেত্রে চাহিদা যে ভাবে বাড়ছে বা বাড়বে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা আমাদের দেশের রাসায়নিক সার কারখানাগুলির পক্ষে হয়তো আগামী বেশ কয়েক বছরের মধ্যে সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। যদিও এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গোবর সার, পচানো পাতা, কম্পোষ্ট ইত্যাদি জৈব সার মাটিতে প্রয়োগ করে অভাব মেটাবার চেষ্টা করছি কিন্তু তা-ও চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত সামান্য। অতএব প্রশ্ন—এ সমস্যা মিটবে কি করে?

সমস্যা কাটাবার কিন্তু একটা বিকল্প পথ পাওয়া গিয়েছে। তা হচ্ছে জীবসার (Bio-fertilzer)। জীবসার দু' রকমের; প্রথমত জীবাণুসার (Bacterial fertilizer) এবং দ্বিতীয়ত, শ্যাওলা সার (Algal fertilizer)।

শুঁটি বা শিম্বিজাতীয় গাছের শেকড়ে যে গুটি থাকে তাতে 'রাইজোবিয়াম' নামে একরকমের জীবাণু বাস করে যারা ঐ গাছের সঙ্গে সংযুক্তভাবে (mutually বা Symbiofically) বাতাসের নাইট্রোজেন মাটিতে বাঁধতে পারে যার পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৫০ থেকে ১৫০ কিলোগ্রাম। এই পরিমাণ ২০০-৭০০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান।

এ ছাড়া মাটিতে একক এবং স্বাধীনভাবে অ্যাজোটোব্যাকটার (Azotobacter) ও নীলাভ সবুজ শ্যাওলা (Blue-green algae) বাতাসের নাইট্রোজেন মাটিতে বাঁধতে পারে।

রাইজোবিয়াম জীবাণু যেহেতু শুঁটি বা শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদের সাথে সংযুক্তভাবে কাজ করে, তাই এই জীবাণুঘটিত সার ধানীজমিতে প্রযোজ্য নয়। এদিকে অ্যাজোটোব্যাকটার অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। অথচ ধানীজমিতে যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকায় সেখানে অক্সিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপ্রবেশ খুবই সামান্য। সুতরাং সেই কারণে ধানী জমিতে অ্যাজোটোব্যাক্টার সার প্রয়োগ করেও সফল হওয়া যাবে না।

তাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প উপায়—নীলাভ সবুজ শ্যাওলা। এ বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর কাছে প্রথম জানান আমাদেরই দেশের একজন কৃষি বিজ্ঞানী—ডঃ প্রাণ কুমার দে, যাঁর পরিচিতি ডঃ পি. কে. দে নামে। সালটা ১৯৩৯। সেই সময়ে লণ্ডনে "প্রসিডিংস্ অব্ দ্য রয়াল সোসাইটি" পত্রিকায় তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার মূল বক্তব্য—"নীলাভ সবুজ অ্যালগী বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ ক'রে ধানী জমিকে উর্বর করতে পারে।"

অ্যালগী কি ?

'অ্যালগী-র বাংলা (Algae) নাম শ্যাওলা। স্যাঁতসেঁতে জমিতে বা পুকুরে বা জলাশয়ের ধারে কাছে আমরা যে সমস্ত শ্যাওলা দেখে থাকি তার মধ্যে নীলাভ সবুজ শ্যাওলা উদ্ভিদ জগতের সবচেয়ে পুরাতন এক ধরণের উদ্ভিদ যার পরিচিতি জীবাণু (Microorganism) হিসেবে। এই ধরণের শ্যাওলার কোষে দু-রকম রং থাকে—সবুজ ও নীল—যথাক্রমে ক্লোরোফিল ও ফাইকোসায়ানিন-এর উপস্থিতির জন্য। তাই এদেরকে নীলাভ সবুজ শ্যাওলা বলে। অন্যান্য জীবাণু থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য-এরা "সালোক সংশ্লেষ" পদ্ধতিতে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে নেয়। নাইট্রোজেন বাঁধতে

পারে এমন যে সমস্ত নীলাভ সবুজ শ্যাওলা আমাদের দেশের জমিতে ভালো জন্মায়--তারা হ'ল আলোসিরা (Aulosira), অ্যানাবেনা (Anabena) এবং নসটক (Nostoc) ইত্যাদি।

শ্যাওলাকে কি ভাবে সার করা যায়

শ্যাওলাকে সার হিসেবে পেতে হ'লে দুটো জিনিষ মনে রাখতে হবে: (১) যে শ্যাওলা মাটিতে প্রয়োগ করা হবে তাকে প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা, এবং (২) যে শ্যাওলা তৈরী করা হ'ল তাকে ঠিকতম বাঁচিয়ে রাখা।

শ্যাওলা প্রচুর পরিমাণে তৈরী করার অনেকগুলো নিয়ম আছে কিন্তু চাষী ভাইদের জন্য সহজ (খরচও কম পড়ে) একটি পদ্ধতি হ'ল—

(ক) একটি বড় টিনের পাত্র নিন যার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় দুই মিটার এবং প্রস্থ এক মিটার।

(খ) ঐ টিনের তলায় দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ মাটি বিছিয়ে দিয়ে জল জমিয়ে রাখুন এবং তার উপর শ্যাওলা ছড়িয়ে সূর্য্যালোকের নীচে রেখে দিন।

(গ) কয়েকদিন পর দেখবেন শ্যাওলা বেশ তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করেছে। জলের ওপর শ্যাওলার একটি আস্তরণ পড়েছে।

(ঘ) এবার ঐ শ্যাওলার আস্তরণ সংগ্রহ করে ধানক্ষেতে ছড়িয়ে দিন। তা হলেই আপনার কাজ হবে।

এই সার ব্যবহার করার সময় চাষী-ভাইকে কয়েকটি জিনিষ বিবেচনা করতে হবে। যেমন—(১) ধান রোপণের আগে মাটি তৈরী করবার সময় এই সার ছড়িয়ে দেবেন ; (২) দু'টি ধান গাছের মধ্যে যেন বেশ একটু ফাঁক থাকে। কেননা নুয়ে পড়া ধানগাছ রোদ আটকায় আর রোদ না পেলে শ্যাওলা খাদ্য তৈরী করতে পারবে না যার ফলে শ্যাওলা মরে যেতে পারে ; (৩) শ্যাওলা সাধারণত ক্ষারীয় মাটি পছন্দ করে। সুতরাং আপনার মাটি যদি অম্লাত্মক হয়, একটু চুন প্রয়োগ করলে ভাল ফল পেতে পারেন।

সার সংরক্ষণের ব্যবস্থা

এই সার সংরক্ষণের জন্য আমাদের দেশের একজন কৃষি বিজ্ঞানী, নাম ভেঙ্কটরমণ, ১৯৬১ সালে একটি পদ্ধতি বের করেন। পদ্ধতিটি হল :— সাধারণ বালিকে পাতিত জল দিয়ে বারবার ভাল করে ধুয়ে ঐ বালিকে নাইট্রোজেন মুক্ত মাধ্যমে ভিজিয়ে নিয়ে এবং শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত (Sterilized) করা হয়। এইবার ঐ বালিতে ঘন শ্যাওলাযুক্ত দ্রবণ মিশিয়ে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যালোকে শুকানো হয় এবং বালির সাথে এই শ্যাওলা কালচার পলিথিন প্যাকেট করে সরবরাহ করা হয়।

এদেশে শ্যাওলা সার

নাইট্রোজেন বন্ধনকারী এই নীলাভ সবুজ শ্যাওলা সাধারণত বেশী তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। সুতরাং এই দেশে শ্যাওলা সারের সাফল্যজনক ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এ ধরণের শ্যাওলা সার একর প্রতি ১০ থেকে ২০ কিলোগ্রাম বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে বাঁধতে পারে যা ৫০ থেকে ১০০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান। আর ঐ শ্যাওলা সারের সঙ্গে পরিমিত পরিমাণ ফসফেট্ ও মলিবডেনাম যদি দেওয়া হয় তখন নাইট্রোজেন বাঁধবার পরিমাণ আরো অনেক বেড়ে যায়। মোট কথা শ্যাওলা-সার এই নাইট্রোজেন বন্ধন করে' ধানের ফলন অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় যা এ দেশে খুবই দরকার। আর খরচও খুব কম একরে মাত্র সাত থেকে দশ-টাকা। সুতরাং অন্য রাসায়নিক সার পরিমাণে কম ব্যবহার করে সঙ্গে শ্যাওলা সার প্রয়োগ করলে আমাদের সমস্যা অনেকখানি কমবে আর এইটাই হবে বর্তমানে এদেশে ধানী জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার প্রয়োগ সমস্যার অন্যতম সম্ভাব্য সমাধান।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
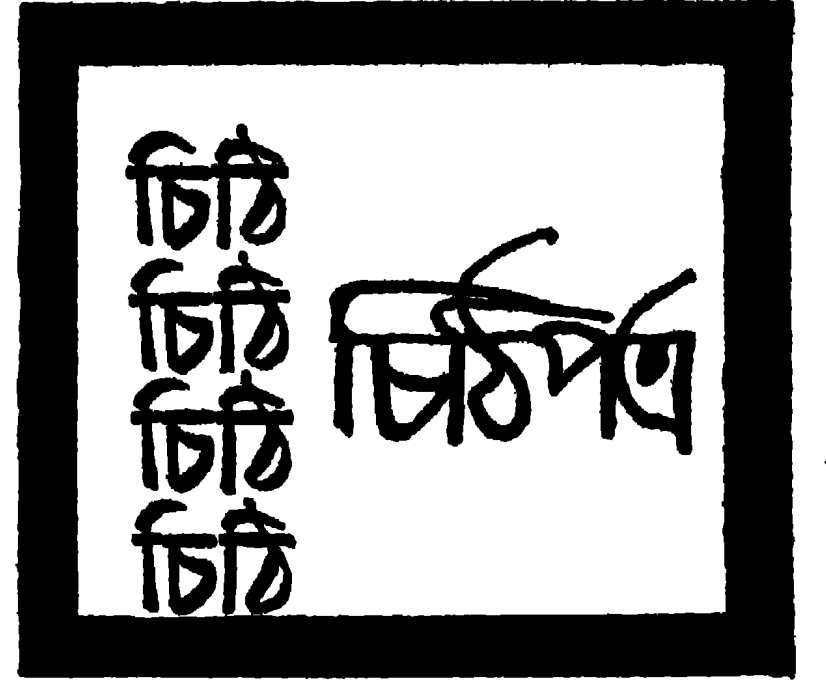
মহাশয়,

ভারতীয় তথ্য অফিসে গিয়ে নিয়মিত আপনার 'ধনধান্যে' পাঠ করি। বেশ ভাল লাগে। খেলাধূলার জন্য একটা পাতা রাখলে আপনার ধনধান্যে আরও আকর্ষণীয় হবে। আমি ভারতীয় ছেলে মেয়েদের সাথে পত্র মিতালী করতে চাই। আশা করি পূর্ণনাম ঠিকানা সহ আমার চিঠি ছাপবেন।

ইকরাম হোসেন বেলাল
বাংলাদেশ

মহাশয়,

এই সেইদিন আপনার সম্পাদিত ১লা নভেম্বরের সংখ্যা 'ধনধান্যে' পত্রিকাটি জনৈক তীর্থ বন্ধুর কল্যাণে চোখে পড়ল। আমার ব্যক্তিগতভাবে পত্রিকাটি মার্জিত, রুচিসম্মত ও স্বকীয়তার দাবীদার। এ মুহূর্তে কলকাতার বাংলা-ভাষাভাষী তরুণ-তরুণী ভাইবোনদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা আমায় 'পত্রমিতা' ভেবে উক্ত পত্রিকাটির স্বাদ আস্বাদনে সাহায্য করুন। বিনিময়ে আমি নির্মল বন্ধুত্বের মায়াবী পরশের সওগাত দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যাশী। আমার বয়স বাইশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন (Dept. of Public Administration) বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের পাঠার্থী। বিশেষত কলকাতা, বিশ্বভারতী, কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী-বিদ্যা-বিদ্যার্থীনীদের প্রতি আমার এ আবেদন।

মোঃ রফিকুল্লাহ এমবাম (এফ)
ঢাকা, বাংলাদেশ

শরৎ প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা

ডঃ নিতাই বসু

স্বভাবের দিক থেকে শরৎচন্দ্র আশৈশব ভাবপ্রবণ ছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় উত্থানপতনে যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি আঘাতপ্রাপ্ত হলে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কখনো ছিল না। মূলত তিনি গ্রামবাংলার রূপদক্ষ শিল্পী, বাৎসল্য ও মধুর রসের জোয়ারে তাঁর সাহিত্যভূমি প্লাবিত। একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা সাধারণত অন্তর্মুখিনতায় পর্যবসিত। কিছু সামাজিক ব্যবস্থাপনায় তখনই তিনি বিরুদ্ধতা করেছেন.—কুলীনের বহুবিবাহ-প্রথা, পণপ্রথা, জাতিভেদ, ধর্মভেদ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলি তখনই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তবু সেকালে নগর-জীবনের কলঙ্কপঙ্কিল আবহাওয়ায় তিনি পদচারণা করেননি এবং সামাজিক প্রয়োজনে নাগরিক পরিপার্শ্বে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করিনা। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের প্রধানতম অংশে সমকালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ চিত্রটি সম্পূর্ণ উপস্থিত থাকলেও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তালতার কোনো চিহ্ন নেই।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মাত্র নয় বছর আগে শরৎচন্দ্রের জন্ম, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ঠিক একই সময় ব্যবধানে তাঁর তিরোধান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক বছর আগে পুস্তকাকারে তাঁর প্রথম রচনার প্রকাশ ঘটেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক এক বছর আগে তাঁর সাহিত্যজীবনের পরিসমাপ্তি। জনপ্রিয়তার বিচারে যিনি বাল্মীকি ও বেদব্যাস ছাড়া ভারতীয় সাহিত্যে পাঠকের কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইতিহাসের ছাত্রের কাছে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা নিশ্চয়ই কৌতূহলের উদ্রেক করে। সাহিত্যের নিরালা আঙিনা থেকে রাজনীতির উতরোল প্রাঙ্গণে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন 'কংগ্রেসের শক্তিস্তম্ভ'।

শরৎচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান অংশ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আগে রচিত। ঐ সময় তিনি রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে স্থায়ী-ভাবে কলকাতায় চলে আসেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল এবং ইংরেজ সরকার ঐ সময়ে ভারতবর্ষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল-যুদ্ধে সম্পূর্ণ সহযোগিতার বিনিময়ে যুদ্ধান্তে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ইংরেজ সরকার মেনে নেবে। কিন্তু বিনিময়ে দিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও দ্বৈতশাসন। ইংরেজের এই নির্লজ্জ ঘৃণ্য আচরণে সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠলো। আবেগপ্রবণ দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র যেন অকস্মাৎ নির্জনতার প্রাচীর ভেঙে জনতার সরণীতে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, অতঃপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হলেন। তাঁর স্বদেশানুরাগে গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন সুভাষচন্দ্র এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন চিরকাল অটুট ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বড়ো ইংরেজ ও ছোট ইংরেজ, সংস্কৃতিবান ইংরেজ ও শাসক-শোষক ইংরেজের দ্বিমুখী চেহারা ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অতটা বিশ্লেষণ-ধর্মী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাগ্রত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ দেশবাসীর সামনে তিনি তাদের ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য রূপটিকেই সোৎসাহে প্রকাশ করেছেন। 'পল্লীসমাজ'-এ মিথ্যা মামলায় রমেশকে যখন জেলে যেতে হলো তখন তিনি বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি, 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে অবিনাশ জানতে চেয়েছে 'ইংরেজদের আদালতে' 'সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল কবে জয়ী হয়েছে', 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে একজন ব্যক্তি রূঢ় মন্তব্য করেছে 'কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না', 'পথের দাবী'তে সুমিত্রা বলেছে, 'যে দেশে গভর্ণমেণ্ট মানেই ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং সমগ্র দেশের রক্তশোষণের জন্যই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা' মাত্র এই কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় শরৎচন্দ্র কী প্রচণ্ড ইংরেজ-শাসন-বিরোধী ছিলেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির বেদনা নিরসনে জীবনের উত্তর-পর্বে তিনি যেন সৈনিকের মতো সংগ্রাম করেছেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে

রুদ্ররোষানলে তাঁর শিল্পীমানস তখন বহ্নিমান। তাই 'পথের দাবী' না লিখে তাঁর তখন আর কোনো উপায় ছিল না, রামদাস তলোয়ারকরের জ্বলন্ত অগ্নিস্রাবী ভাষণ ইংরেজ শোষকের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের সুস্পষ্ট সতর্কবাণী।

পরিণত বয়সে তিনি হাওড়ার শিবপুরে কয়েকজন বন্ধু ও অনুরাগীকে নিয়ে 'সোস্যালিষ্ট নিউক্লিয়াস' গঠন করেন। তিনি প্রখ্যাত চিন্তাবিদ না হলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের পূর্বাভাস দিতে কার্পণ্য করেননি নিজের সাংগঠনিক প্রচেষ্টায়। তাঁর চেতনাকে তখন পরিপুষ্ট করেছিলেন বিশ্বের তিন প্রখ্যাত মনীষী—রাসেল, ইবসেন ও বার্ণাড শ। সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গ্রামীণ জীবনের রূপান্তরের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ব্যগ্রতা সহজেই চোখে পড়ে। কৃষিপ্রধান ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে গান্ধীজির সোৎসাহ অনুপ্রেরণাদীপ্ত নেতৃত্ব শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, তাই 'পথের দাবী'তে ভারতী সব্যসাচীর বিপরীতে গান্ধীজির নীতি ও কর্মপন্থাকে দাঁড় করাতে দ্বিধাবোধ করেননি। মহাত্মাজির খদ্দর-প্রচলন ও চরকা-কাটার যৌক্তিকতার বিপক্ষে শরৎচন্দ্র বহুবার বিদ্রূপ মন্তব্য করেছেন, স্বভাবসুলভ পরিহাসরসিকতায় স্বাধীনতা-আন্দোলনের ঐ দুটি অমোঘ অস্ত্রকে নিজে কখনো প্রয়োগ করতে চাননি। কিন্তু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন, অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ' বা 'বিপ্রদাস'-এর পাতায় যথাক্রমে অমরনাথ ও দ্বিজদাসকে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন, 'জাগরণ' উপন্যাসে গান্ধীজির সম্পর্কে বলেছেন, 'হঠাৎ মনে হইল, এই ভয়লেশহীন শুদ্ধ শান্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপস্যা হইতে যে 'অদ্রোহ' অসহযোগ নিমেষে বাহির হইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতিবেগ রোধ করিবার কেহ নাই। যেথায় যত দুঃখ দৈন্য, যত উৎপাত অত্যাচার, যত লোভ ও মোহের আবর্জনা যুগ যুগ ব্যাপিয়া সঞ্চিত আছে, ইহার কিছুই কোথাও আর অবশিষ্ট থাকিবে না, সমস্তই এই বিপুল তরঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যাইবে।' অসহযোগ আন্দোলনের প্রথা ও প্রকরণ সম্পর্কে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র মতপার্থক্য ছিল। শরৎচন্দ্র তখন গান্ধীজির অনুরক্ত শিষ্য হিসেবে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং সেজন্যই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন 'শিক্ষার বিরোধ' নামক তীব্র আবেগধর্মী এক বক্তৃতায়।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে স্বগ্রামে জনদরদী হিসেবে তিনি কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে কখনো জমিদার মোহিনী ঘোষালের অন্যায় জলকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কখনো ধর্মঘটী ধাঙড়দের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, কখনো বা প্রখ্যাত বিপ্লবীদের গোপনে অর্থসাহায্য করেছেন, এমন কি, একবার দেশবাসীর তরফ থেকে ত্যাগব্রতী বিপ্লবীদের প্রতি সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর শিল্পীসত্তার যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা গভীরভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'পল্লীসমাজ' ও 'দেনাপাওনা'র পাতায়। 'দেনাপাওনা'য় ষোড়শীর নেতৃত্বে সাগর সর্দার প্রমুখ কৃষিজীবী প্রজারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জেগে উঠে অনেকখানি ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিয়েছে। এই বইটি পড়ে প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করে অভিনন্দিত করতে চেয়েছিলেন। 'পল্লী-সমাজ-'এ রমেশকে কেন্দ্র করে সনাতন প্রভৃতি প্রজাদের রমা ও বেণী ঘোষালের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধতা একই প্রাণস্পন্দনের পরিচায়ক। এই বইটিতে শরৎচন্দ্রের গ্রাম অভিজ্ঞতা ও কৃষিজীবীদের উন্নতি বিধানের ঐকান্তিকতার প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আকৃষ্ট হন এবং বইটিকে ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থান দিয়ে প্রত্যহ বইটিতে শ্রদ্ধায় মাথা ঠেকাতেন।

শরৎচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল সমাজ-চিন্তারই পরিপূরক তাঁর সাহিত্যে নারীর সম্ভাব্য চারটি রূপ—কুমারী, সধবা, বিধবা ও বারবণিতা পাঠকদের কাছে পৌনঃপুনিক ক্লান্তিহীনতায় তিনি তুলে ধরেছেন। ভস্মীভূত হয়ে গেলেও যে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তিনি 'নারীর ইতিহাস' সংগ্রহ করেছেন, তথাকথিত আত্মসম্মানের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে পতিতাদের সঙ্গে তাঁর প্রয়োজনীয় যোগাযোগের কদর্থক ভাষ্য হজম করেছেন, 'চরিত্রহীন' লিখে রক্ষণশীল সমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তাঁকেই সাহিত্যজীবনের শেষপ্রান্তে এসে লিখতে হলো 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস, কারণ নারীমুক্তির জরুরী দিকটা সর্বদাই তাঁর মনোজগতে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করতো। পক্ষান্তরে, 'পথের দাবী' লিখে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এক প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করলেও এবং বইটি তদানীন্তন রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সমান্তরাল মর্যাদা পেলেও উপন্যাসটির পটভূমি বিশ্লেষণ করলে 'ঘরেবাইরে' বা 'চার অধ্যায়'-এর মতো চিরন্তন আলোকদীপ্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। গান্ধীবাদ বা সন্ত্রাসবাদ, কোনোটাতেই তিনি পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেননি। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিলনা। তাই তাঁর জাতীয় চেতনার চলমানতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'কালের যাত্রা' নামক নাটিকাটি উৎসর্গ করেছেন। মানুষে মানুষে অসাম্য দূর হবে, মনুষ্যত্বের অধিকারে যারা বঞ্চিত তারাই মহাকালের রথের সামনে এসে অচল রথকে সচল করবে, এই হল 'কালের যাত্রা'র মর্মবাণী। আমাদের জাতীয় জীবনে পতিতের পক্ষাবলম্বী হিসেবে শরৎচন্দ্র নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছেন—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত করতে না পারলে তা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না।

পল্লী অর্থনীতির নবরূপায়ন

বি. শিবরামন

এখনো এ দেশের আশি শতাংশ অধিবাসী গ্রামে বাস করেন। বিভিন্ন কাজের সুযোগ ইত্যাদির কারণ ধারণা করা হচ্ছে ২০০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ শতকরা ২৯ জন চলে আসবেন শহরাঞ্চলে। তবে এর মধ্যে জনসংখ্যা তো আরো বাড়বে। কাজেই সে সময়ে পল্লী অঞ্চলে থাকবেন মোটামুটি ৬৬.২০ কোটি লোক এবং তাঁরা পুরোপুরি নির্ভর করবেন পল্লীর ওপরেই।

বর্তমানে পল্লী এলাকার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশী লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছেন। পল্লী এলাকার উন্নয়ন ঘটিয়ে এদের উপার্জন বৃদ্ধি একটা বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে স্থির করেছেন ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে, এই দারিদ্র্য জনগণের খাদ্যের জোগান অন্তত এক শতাংশ বাড়াতেই হবে। অবশ্য এতে খাদ্যের ওপর চাপ বাড়বে ভেবে ভীত হবার কোন কারণ নেই। পঞ্চম যোজনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য রাখা হয়েছে। দারিদ্র্য সীমার একটু ওপরে যারা রয়েছে তাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ এলে সেটা ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়াবে।

কাজেই আমাদের পল্লী উন্নয়নের মূল চিন্তাই হবে এই এলাকার লোকদের আরও রোজগার বাড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া। তাদের দারিদ্র্যসীমার ওপরে টেনে তোলা। তার ফলে দেশের সর্বাঙ্গীণ চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধির একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হবে। কৃষি বিষয়ক জাতীয় কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ সালে দেশে ১৩.৮৬ কোটি কৃষি শ্রমিক ছিলেন। ২০০০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫ কোটি। পল্লী অঞ্চলের বেকারী এবং অর্দ্ধবেকারী সম্বন্ধে এক সমীক্ষা চালিয়ে ভগবতী কমিশন জানিয়েছিলেন, ১৯৬৯ সালে পল্লী অঞ্চলে বেকার সংখ্যা ছিল ৯১ লক্ষ ২০ হাজার। তার মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার পুরো বেকার। এছাড়া ২০০০ সাল নাগাদ নতুন মোট ১ কোটি ১১ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ তৈরী করতে হবে।

জাতীয় কৃষি কমিশনের আশা, উন্নততর প্রথায় চাষ এবং দ্বি-ফসলের মাধ্যমে ১৯৭০-৭১-এর ১৪০ মিলিয়ন হেক্টরের জায়গায় ২০০০ সালে ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ হবে। বর্তমানে ৩৮.৫ মিলিয়ন হেক্টরের জায়গায় ৮৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বর্তমানে সেচের জল যোগান সম্ভব হবে। উন্নত প্রথায় চাষের ফলে উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাবে। এই সব কারণে কাজের সুযোগ বাড়াবে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের। এর সঙ্গে বন, মৎসচাষ ও পশুপালনের মাধ্যমে কাজ নিয়োগের সুযোগ পাবে দুই কোটি মানুষ। অবশ্য এত করেও ২০০০ সালে সমস্যার সমাধান হবে না।

এর জন্য দৃষ্টি দিতে হবে গ্রামীণ শিল্পের দিকে। এক হস্তচালিত তাঁত শিল্পেই ৪৫ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ রয়েছে। রেশম চাষের ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ আছে আরও ৬৫ লক্ষ লোকের। তাছাড়াও কার্পেট এবং চামড়া শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে আরও বেশ কিছু কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে তবে তাতেও কিন্তু পুরো সমস্যার সমাধান হবে না।

কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধিতে বিশাল সংখ্যক লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বাড়বে ভোগ্য পণ্যের এবং সেই ধরণের দ্রব্য গ্রামাঞ্চলেই ছোট ছোট ইউনিটে উৎপাদন করা যেতে পারে তার জন্য দরকার কারিগরি জ্ঞান সহ আরও বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা। এবং এর জন্য সেখানে শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে উপযুক্ত কেন্দ্র খুলতে হবে যাতে করে অন্তত পল্লী অঞ্চলের ৩০ শতাংশ মানুষকে এই ধরণের কাজে নিয়োগ করা যায়।

আগামী ২০০০ সাল নাগাদ শহরাঞ্চলে তৈরী করা খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এবং এর জন্যও গ্রামে ছোট ছোট শিল্প সংস্থাপন করে অনেকেরই কাজের জোগাড় হবে। সমবায় সমিতি গঠন করে এই সব উদ্যোগগুলোকে দিতে হবে উপযুক্ত সহায়তা এবং এই সবক্ষেত্রে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারলে তবেই আমরা পল্লী অঞ্চলের ৩০ শতাংশ লোককে কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করতে পারবো যেটা জাতীয় কৃষি কমিশনের ভাষায় পল্লী বেকারত্ব দূর করার একমাত্র উপায়।

কৃষি এবং সেই সঙ্গে পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। বর্তমানে এই টাকাটা আসে প্রধানত মহাজনদের কাছ থেকে। মোট প্রয়োজনের ৪০ শতাংশ পাওয়া যায় সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন ঋণদান সূত্র থেকে। কিন্তু বর্তমান ঋণমকুব অডিন্যান্স এর ফলে মহাজনদের কাছ থেকে ধার পাওয়ার সুযোগ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে ঋণ, যোগাবার পুরোপুরি দায়িত্ব বর্তাচ্ছে ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ওপর। জাতীয় কৃষি কমিশন এক সমীক্ষায় বলেছেন ১৯৮৫ সাল নাগাদ পল্লী এলাকার পুরো ঋণএর চাহিদা দাঁড়াবে ১৬,৫৪৯ কোটি টাকা। কমিশন এটাও স্বীকার করছেন রাতারাতি এই বিপুল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে ধাপে ধাপে এই লক্ষ্যে পৌঁছুতেই হবে। তাঁরা বলেছেন ১৯৮৫ নাগাদ স্বল্পমেয়াদী ঋণের ৪৫ শতাংশ এবং মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রীশিবরামন ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

কয়লা থেকে খনিজ তেল

নিশীথ চৌধুরী
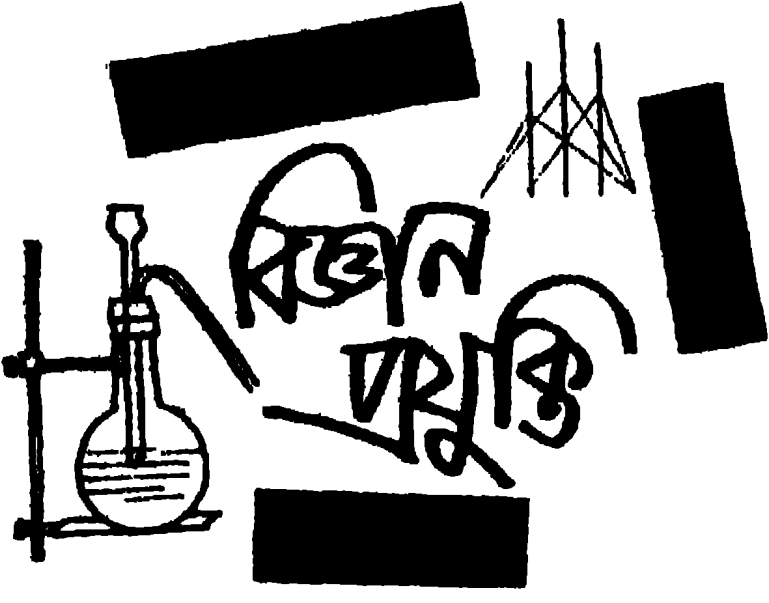
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে খনিজতেলের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। আমাদের ব্যবহার্য্য সব কিছুর সাথেই একটা না হয় আর একটা সম্পর্ক আছে এই খনিজ তেল পেট্রোলিয়ামের। বিদ্যুৎ, খাদ্য, পরার কাপড়, ওষুধপত্র ও অন্যান্য অনেক ভোগ্য পণ্যের শিল্প উৎপাদন নির্ভর করে এরই ব্যবহারের উপর। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় তেলের ব্যবহার তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

বিগত শ'খানেক বছর ধরে আমাদের সভ্যতার বিকাশ দ্রুততর করার চেষ্টায় খনিজ তেলের ব্যবহার বাড়িয়েই চলেছে সবাই। ভবিষ্যৎ সঙ্কটের কথা ভেবে কোন বিকল্প পথের সন্ধান ততটা জোর দিয়ে কিন্তু করা হয়নি। এই অবস্থায় খনিজ তেল পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক সভ্যতার চাপে পৃথিবীর তলার 'তৈল-ভাণ্ডারে' রীতি মত টান পড়বার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে বিভিন্ন দেশ একটা কোন বিকল্প পথের খোঁজ শুরু করে দিয়েছে।

১৯৭৩ সালের আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের সময় থেকে "তৈল-সঙ্কট" আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। বছর দুয়েক আগের এক হিসেব থেকে জানা যায় যে বিশ্বের নীচে তেলের ভাণ্ডার থেকে প্রায় ৭৯.৭ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন=১০০ মিলিয়ন) মেট্রিক টন পরিমাণের উপযোগী খনিজ তেল পাওয়া যেতে পারে। এর প্রায় ৬০ শতাংশই আছে প্রাচ্যের দেশগুলোর মাটির তলায়। আরব ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলি 'তৈল অস্ত্র' প্রয়োগ করার ফলে তেলের দাম বেড়েছে হু হু করে। উন্নয়নশীল ভারতবর্ষকে বেশীর ভাগ তেল আমদানী করতে হয়। এই জন্য আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার প্রায় সবটাই শেষ হয়ে যাবার আশঙ্কা আমদানী করা তেলের দাম মেটাতে।

ভারতবর্ষে বাৎসরিক খনিজ তেলের প্রয়োজন প্রায় ২২.৫ মিলিয়ন টন। এর থেকে প্রায় ৪৭ শতাংশ ব্যয়িত হয় শিল্পে ও তাপ উৎপাদনের জন্য, প্রায় ১৭ শতাংশ ব্যবহার হয় রাসায়নিক সার উৎপাদনের ব্যবস্থায়, আর ১০ শতাংশ মত খরচ হয় গাড়ী চালানোর খাতে। দেখা যায় যে বর্দ্ধিত তেলের দামের জন্যই বাজারের প্রতিটি ভোগ্য-পণ্যেরই দাম বেড়েছে বেশ কয়েক দফায়। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় শিল্পে ব্যবহার্য ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পেট্রোলিয়াম জাত তেলের। শিল্পে ব্যবহারের জন্য ও তাপ শক্তি উৎপাদনের জন্য-পারমাণবিক শক্তির কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু জ্বালানী তেলের সমমূল্যেও পারমাণবিক শক্তি পেতে হলে এখনও আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

এই অবস্থায় আমাদের দেশের মাটির তলায় যে "কালোহীরা' (কয়লা) সঞ্চিত আছে তার থেকে তেল তৈরীর সহজ ও স্বল্পব্যয়ী পথ উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। ধানবাদের সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটুট এই নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে উৎসাহজনক ভাবে।

পেট্রোলিয়াম জাত জ্বালানী তেলের মধ্যে থাকে প্রধানতঃ ১২ থেকে ১৪ শতাংশ হাইড্রোজেন আর খনির অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণের সালফার। বাকীটা থাকে কার্বন। কয়লার মধ্যে থাকে ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ কার্বন আর ৫ শতাংশ মত হাইড্রোজেন। বিশেষ করে আমাদের দেশের কয়লার মধ্যে প্রচুর অজৈব অশুদ্ধি (ক্লে) থাকে। কয়লার মধ্যে অক্সিজেন, সালফার প্রভৃতিও থাকে বিভিন্ন পরিমাণে। অক্সিজেন ও অজৈব অশুদ্ধি দূর করে কয়লাকে খনিজ পেট্রোলিয়ামের সমতুল্য করা যেতে পারে। অবশ্য এর মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কিছুটা কম থাকে। তাই কয়লার ভিতর হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১২-১৪ শতাংশ করে দেবার ব্যবস্থার পর অক্সিজেন ও অজৈব অশুদ্ধি দূর করলে পেট্রোলিয়াম জাত জ্বালানী তেলের মত এক পদার্থ পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ তিন উপায়ে কয়লা থেকে তেল উৎপন্ন করা যেতে পারে:—

(১) বার্জিয়াসের হাইড্রোজেনেশন পদ্ধতি :—

হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে কয়লার মধ্যেকার হাইড্রোজেনের শতাংশ বাড়িয়ে তরলীকরণের ভিত্তিতে কয়লা থেকে তেল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন জার্মান বিজ্ঞানী বার্জিয়াস—বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সাধারণতঃ হাইড্রোজেন গ্যাসকে উচ্চ চাপে (২০০°-৭০০° বায়ুমণ্ডলের চাপ) ও ৪৫০° থেকে ৮৪০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কয়লার সাথে বিক্রিয়া ঘটানো হয়। বিক্রিয়ার গতি দ্রুততর করবার জন্য লোহা, টিন ও মলিবডেনামের মত প্রভাবক ব্যবহার করা হয়। কয়লা, প্রভাবক ও প্রয়োজনমত খনিজতেলের একটা কাদার মত মিশ্রণ হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়াকক্ষে পাঠিয়ে কয়লাকে তেলে পরিণত করা হয়। হাইড্রোজেনের সংস্পর্শে অক্সিজেন, সালফার ও নাইট্রোজেন অপসারিত হয়।

এই পদ্ধতিতে মোটামুটি দু'টন কয়লা থেকে এক টন পেট্রোলিয়ামের মত সংশোধিত তেল পাওয়া যেতে পারে। এই ভাবে প্রস্তুত তেল থেকে অজৈব অশুদ্ধি অপসারণ করে অপরিশোধিত খনিজ তেলের মত একাধিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতি তেল ও ন্যাপথা পাওয়া যায়। এক মূল্যায়ন কার্যসূচী থেকে জানা যায় যে প্রতিদিন ৩০,০০০ ব্যারেল তেল এই ভাবে তৈরী করার কারখানা শুরু করতে প্রায় ১৮০ থেকে ২০০ কোটি টাকা নিয়োগ করতে হবে। এই পদ্ধতির মোট খরচের প্রায় এক তৃতীয়াংশ যায় প্রভাবকের দাম মেটাতে। কম খরচে কার্যকর প্রভাবকের উপযুক্ত সন্ধানের চেষ্টা সফল হলে সত্যি সত্যিই এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী হতে পারে।

নিম্ন উষ্ণতায় কয়লার তাপ-বিয়োজন ঘটালে প্রায় ৬ থেকে ১০ শতাংশ আলকাতরা পাওয়া যায়। এই আলকাতরার মধ্যে ৮ শতাংশ মত হাইড্রোজেন থাকে। তাই আলকাতরাকে হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ করতে জ্বালানী তেল তৈরী করা যেতে পারে। এই আলকাতরা থেকে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত কেরোসিন, ডিজেল এর মত জ্বালানী তৈরী করা সম্ভব। অবশ্য এই পদ্ধতির বাণিজ্যিক সাফল্য নির্ভর করে সস্তায় আলকাতরা সংগ্রহের উপর।

(২) তাপ বিয়োজন পদ্ধতি :— কয়লাকে সোজাসুজি উত্তপ্ত করেও তেল (আলকাতরা) ও গ্যাসীয় পদার্থ তৈরী করা যায়। তবে এই পদ্ধতিতে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ কয়লা কঠিন অবশেষ রূপে পড়ে থাকে। ৪৭৫°-৫৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তরল মাধ্যমে কয়লাকে উত্তপ্ত করে ক্রমাগত উৎপন্ন তেল অপসারিত করা হয়। কয়লা থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণে তেল পাবার জন্য হাইড্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতিতে কয়লার তাপ বিয়োজন করা হয়। তাহ'লেও কিন্তু এই পদ্ধতিতে মাত্র ৭.৫ থেকে ১৫ শতাংশ মত কয়লা অপরিশোধিত তেলে পরিণত হতে পারে।

(৩) ফিশার-ট্রপস পদ্ধতি :— উত্তপ্ত কয়লার উপর বাষ্প পরিচালিত করে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। এই গ্যাসের মিশ্রণকে উপযুক্ত প্রভাবকের উপস্থিতিতে ও বিক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী নানা রকমের রাসায়নিক যৌগে পরিণত করা যায়। এই পদ্ধতিতে জ্বালানী তেল তৈরী করা গেলেও তা খুব ব্যয়সাপেক্ষ হয়। সেই জন্য কৃত্রিম সুতো, প্লাস্টিক, পলিথিন, মবিল তেলের মত পদার্থ ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনের জন্য ইথিলিন, প্রপাইলিন প্রভৃতি হাইড্রোকার্বন উৎপাদন ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হয়।

আমাদের দেশে তরল সোনা (খনিজ-তেল) উপযুক্ত পরিমাণে আছে কিনা জানা না থাকলেও কিন্তু মাটির তলার কালোহীরা (কয়লা) রয়েছে প্রচুর। গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশের উপযোগী ব্যবস্থা করতে পারলে এই কয়লা থেকে তেল তৈরী করে আমরা তেল সঙ্কট এড়িয়ে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় করতে পারব।

পল্লী অর্থনীতির নবরূপায়ণ

১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

৪০ শতাংশ যোগান দিতে হবে পঞ্চম যোজনার শেষে। ১৯৭৯ নাগাদ মোট ঋণের দুই পঞ্চমাংশ যোগান দেবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো। ১৯৮৪-৮৫ নাগাদ এর পরিমাণ দাঁড়াবে অর্দ্ধেক এবং এই দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রামীণ ব্যাংকের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। কেননা শুধু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে এই বিরাট সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো ইতিমধ্যেই কৃষির প্রয়োজনে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বনজ সম্পদের ব্যাপারেও সুরু হয়েছে ঋণ দেওয়া। তবে মুস্কিল হয়েছে গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা সর্বাঙ্গীণ পল্লী উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। প্রয়োজন পল্লী অঞ্চলের শিক্ষিত বেকারের জন্য স্বনিয়োজিত কর্মপ্রকল্পের। কিন্তু তাদের প্রায়ই দিন আনে দিন খায় অবস্থা। ফলে ব্যাঙ্কের কাছে ধার পাবারও অসুবিধা। একমাত্র বয়নশিল্পের ক্ষেত্রেই রিজার্ভ ব্যাংক ঋণ দানের কিছুটা ব্যবস্থা করেছে কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রায়শই সুযোগগুলো তাঁতিদের কাছে পৌছোয়না। এরা অধিকাংশ আজও মহাজনদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এদের সুদ বেশী। বাজারে নিজেদের ফলানো ফসল বিক্রি করতে যাবার স্বাধীনতা থাকেনা চাষীদের। এবং এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে গড়তে হবে প্রথম থেকে ছোট ছোট ইউনিট।

এই রকম ছোট ছোট ইউনিটকে সহায়তা দিয়ে ব্যাঙ্ক খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবে কিনা সেটাও প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠবে পরিদর্শনের। এই অসুবিধা কাটানোর জন্য প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা সমবায়ের মত সমিতি গঠন করা যেতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কাজ হবে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলা। কৃষি সেবা সমিতি জাতীয় সমিতির প্রসার ঘটানো যেতে পারে। তবে এর সংগঠন খুব সহজ নয়। অবশ্য জাতীয়করণের পর কাজটা একটু হালকা হয়েছে। সরকারি তরফ থেকে অনেক সহায়তা পাওয়া যাবে। ক'দিন আগে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রীদের সমাবেশে শ্রী পাই বলেন, ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ীদের ঋণ দিলে সঞ্চয়ের কাজও অনেক এগিয়ে যাবে। সাধারণত তরি-তরকারি ব্যবসায়ী, মুচী এরা সকালে দশটাকা ধার নিয়ে সন্ধ্যাতে এগারো টাকা শোধ করে। কিন্তু ব্যাংক ধার দিলে দিনে একপয়সা সুদও লাগবে না অর্থাৎ রোজ সঞ্চয় হবে প্রায় একটাকা। এখন এদের রোজ যদি পঞ্চাশ পয়সা জমা দিতে বলা হয় তবে একটা ভাল টাকা সঞ্চয়ের খাতে উঠবে যেটা এতদিন যেত মহাজনদের ঘরে। সেই সঙ্গে শস্য গোলা করেও আমরা সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুরূপভাবে বাড়াতে পারি। শুধু শ্লোগান না দিয়ে গাঁয়ের লোকদের সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য এখনই কাজে লাগতে হবে। এবং এই দায়িত্বই এসেছে এখন ব্যাঙ্কগুলির সামনে।

সিনেমা

প্রায় তেরো বছর বাদে গত মাসে এক বিরাট আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার আসর বসেছিল বোম্বাইয়ে। চল্লিশটি দেশের সত্তরখানি ছবি দেখানো হয়েছিল চৌদ্দদিন ধরে শহরের বিশিষ্ট পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে।

পূর্ব - পশ্চিম ইউরোপ - আমেরিকা-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ ছাড়াও উৎসবে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিল পাকিস্তান ও জাপান। সংখ্যার দিক থেকে শুধু নয়, গুণের বিচারেও বম্বের উৎসব উল্লেখের দাবী রাখে। যে উৎসবে ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আন্তোনিওনি, ফোস্তা গার্ভাস মিকলোস জাঁকাসা, আঁদ্রে ওয়াইদা, ক্রিস্তফ জানুসি, হিরোশি তেশিহাগারা, লুসিনো ভিসকন্তির মত বিখ্যাত পরিচালকদের ছবি দেখানো হয় তার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভাব ও স্বার্থান্বেষী চক্র কিভাবে কাজ করে তা প্রামাণিক বাস্তবতার স্তরে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর সেই সঙ্গে নির্দেশকের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে চলচ্চিত্র ব্যাকরণের আধুনিক বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে। রীতিমত উত্তেজক ছবি এই 'স্টেট অফ্ সিজ্'।

তুলনায় মিকলোস্ জাঁকসোর দুখানি ছবিতেই (ইলেক্ট্রা ও কনফ্রনটেশন্) রাজনৈতিক বক্তব্য অনেক বিলম্বিত লয়ে প্রকাশিত। নাচে-গানে-ব্যালে নৃত্যের প্রয়োগ পরিকল্পনায়, ক্যামেরা মুভমেণ্টের শৈলিতে শোষক আর শোষিতের রক্তঝরা কাহিনী, বিপ্লবের বাণী সম্পূর্ণ অন্যস্তরে উপনীত। জাঁকসোর নির্দেশনা-ভঙ্গীই অবশ্য স্বতন্ত্র। তিনি চরিত্র ও ঘটনার গতির সঙ্গে ক্যামেরাকে সর্বদাই অ-স্থির

যাত্রী বলতে পরিচালক এই জীবনের যাত্রীর কথা বলেছেন যার কাছে জীবনও মৃত্যু পাশাপাশি চলছে। দুটোর মধ্যে প্রভেদ নেই। সুতরাং সেক্ষেত্রে নামের পরিচয়তো পরিচয়ই নয়। যাত্রা পথের যাত্রী হিসাবেই তাঁর পরিচয় প্রথম এবং শেষ। এই নোংরা পৃথিবী সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত গভীর।

লুসিনো ভিসকন্তির 'কনভারসেশন পিস্' ছবিতে ওপরতলার রাজনীতির মুখোস খুলে পড়েছে। যেখানে রাজনীতির নামে ব্যক্তিক স্বার্থসিদ্ধির খেলা চলে, যাঁরা ভদ্রতার আড়ালে যৌনতাকে নিয়ে বিকৃত আশা মেটান। বক্তব্যের গভীরতায় যদিচ এই ছবি ভিসকন্তির যথাযথ পরিচয় বহন করেনা, কিন্তু বার্ট ল্যাঙ্কেস্টার সিলভানা মানগানোর অভিনয় এবং পরিচালকের প্রয়োগ শৈলীর অভিনবত্বে ছবিখানি উৎসবের অন্যতম সেরা ছবির আখ্যা পেতেই পারে।

বোম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক ছবির মেলায়

তবে কিনা বোম্বের উৎসবে বহু বিতর্কিত পরিচালকের ভীড় থাকলেও তাঁদের সব ছবিই আশানুরূপ হয়নি।

প্রদর্শিত ছবির অধিকাংশেই রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাকার বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা আছে। দৈনন্দিন বেঁচেবর্তে থাকার মধ্যেও যে রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রভাব কিরূপ সীমাহীন তা কয়েকজন পরিচালকের ছবিতে নগ্নভাবে প্রকট, কারও ছবিতে একটু বিলম্বিত লয়ে।

'স্টেট অফ্ সিজ্' (ফ্রান্স) ছবিতে ফোস্তা গার্ভাস লাটিন আমেরিকার একটি দেশের রাজনীতি ও পুলিশ বাহিনীতে

করে রাখেন এবং কখনই তিন ফুটের বেশী উচ্চতায় ওঠান না যন্ত্রটিকে। ছবি ও ঘটনার গতির সঙ্গে তাঁর এই বিশিষ্ট প্রয়োগ-পদ্ধতির এত সুসমঞ্জস মিল যে পরস্পরকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

বোম্বে উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আন্তোনিওনির 'প্যাসেঞ্জার' ছবি এবং পরিচালক স্বয়ং। অনিবার্য কারণে পরিচালক অনুপস্থিত থাকলেও ছবিখানি হতাশ করেনি বলতে পারি! আত্মপরিচয় গোপন রেখে আফ্রিকার এক সশস্ত্র মুক্তিকামী দলের অস্ত্র যোগান-দারের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে আত্মত্যাগ করা, এই নিয়ে ছবির কাহিনীর বিস্তার বটে, কিন্তু ছবির বক্তব্য অন্যত্র।

অসংখ্য পোলিশ ছবির ভিড়ে ক্রিস্তফ জানুসির দুখানি ছবিই (দি ব্যালান্স ও স্ট্রাকচার-অফ্ ক্রিস্টালস্) মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সবার। প্রথম ছবিখানি অত্যন্ত সূক্ষ্ম মানসিক বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বিবাহিতা স্ত্রী-স্বামীর সঙ্গে অবনিবনা ও নতুন প্রেমিক নিয়ে দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন, স্ত্রীর সেই মানসিক ও আত্মিক সংকটের ছবি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশিত এবং অন্তিমে পরিচালক যদিও সমস্যার সরলীকৃত সমাধান দেখিয়েছেন কিন্তু তা যুক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিতও বটে। দ্বিতীয় ছবিখানি পরিচালকের প্রথম ছবি। এবং ঐ ছবি থেকেই তিনি ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতার বীজ বপন করেছিলেন।

যাদু একটাই—

★ **কঠিন পরিশ্রম**

★ **দূরদৃষ্টি**

★ **দৃঢ়-সংকল্প**

★ **কঠোরতম শৃংখলা**

ইন্দিরা গান্ধী

পরবর্তী সংখ্যায়

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯

গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-৬ টাকা, দুবছর ১০ টাকা এবং তিনবছর ১৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৩০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA

বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

বিশেষ সংখ্যা

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ১৮/১ মার্চ ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—মলয়শংকর দাশগুপ্ত

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

বিগত দশক জাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় জাতিকে সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেক সংকটময় মুহূর্ত্তের। তা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূল অবস্থার সংগে লড়াই করে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করে দেশের অগ্রগতি রয়েছে অব্যাহত। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যয়দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতি জনগণের অকুন্ঠ সহযোগিতার ফলে।

একদিকে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরা-অজন্মার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রপীড়িত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের গতি ব্যাহত ও রুদ্ধ, অন্যদিকে কালো-বাজারী, মুনাফা-খোর চোরাকারবারীদের মত সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্যে দেশের আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত হওয়ার উপক্রম ও কতিপয় রাজনৈতিক নেতার দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট করে এক অরাজক অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস। এ সমস্ত অশুভ শক্তির মোকাবিলা করার জন্য যে বলিষ্ট নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল প্রধান-মন্ত্রী সেই নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে শুধু এক বিশৃংখল অরাজক অবস্থার থেকে রক্ষা করেছেন তাই নয়, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে দেশকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথও প্রশস্ত করেছেন।

১৯৬৬ সালে ২৪ শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী রূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শপথ গ্রহণ করেন এক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে। তাশখন্দে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকস্মাৎ পরলোক–গমনে যে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয় সে স্থান পূরণে নির্বাচিত হন শ্রীমতী গান্ধী। দেশ তখন যুদ্ধোত্তর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। দেশের নানা অঞ্চল খরা পীড়িত। সেই সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় এক বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী গ্রহণের। ব্যাংক জাতীয়-করণ তারই প্রথম পদক্ষেপ। পরে আসে দেশের বৃহত্তম রাজ-নৈতিক দল কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্তি। সৃষ্টি হয় অস্থির রাজ-নৈতিক অবস্থা। এমনি সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে জলোচ্ছ্বাসের মত আসে অগণিত শরণার্থী। সে সমস্যার সমাধান হয় এক অনভিপ্রেত যুদ্ধের ফলে। তাছাড়া অন্ধ্রতে তেলেঙ্গানা সমস্যা, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবীসুবা সমস্যা, সুদীর্ঘদিনের কাশ্মীর সমস্যা, উত্তর-পূর্বসীমান্তের নাগা সমস্যা, সিকিমের অন্তর্ভুক্তি সর্বোপরি অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির দরুন দেশ যে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, সে সবের একে একে সমাধান করে প্রধানমন্ত্রী দেশে এক সুশৃংখল পরিবেশের সৃষ্টি করেন এবং দেশকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশে এখন সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির এক অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য সকলের সহযোগিতা করবে দেশকে সমৃদ্ধ—গণতন্ত্রকে করবে সুদৃঢ়-পূর্ণ করবে জনগণের আশা আকাংখা-গড়ে উঠবে এক উন্নত শক্তিশালী ভারত।

“পরিবার ছোট হলে প্রত্যেকটি সন্তানের আরও একটু যত্ন করা, আরও একটু প্রয়োজন মেটানো মা বাবার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। আর তাতে সমগ্র দেশও তার সহায়-সম্পদ আরও একটু ভালো ভাবে কাজে লাগাতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন সূচীর অত্যাবশ্যক অঙ্গ। আমরা সর্ব প্রকারে এই কার্যসূচী রূপায়িত করতে কৃতসংকল্প।”

ইন্দিরা গান্ধী

davp 75/596

বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এক দশক: প্রগতির নতুন দিগন্ত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভবিষ্যতের জন্যেই মানুষ ভবিষ্যত তৈরি করে। বিগত একটি দশক ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হতে চলেছে। অতীতের সীমানা চিহ্ন থেকে যে পথিক যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি আজ বর্তমানের কূলে এসে বলছেন, এই দেখ সংকল্পের আগুনে যে মশাল জ্বেলে অনেক অন্ধকার রাত্রির পথে পথ চিনে চিনে বিভেদের বিষাক্ত সাপের নীল মৃত্যুর ছোবল উপেক্ষা করে আমি এসেছি, সে মশাল আমি এলোমেলো বাতাসে নিভে যেতে দিইনি। পেছনে তাকিয়ে দেখ সামনের পথে এগিয়ে চলেছে আরো কোটী মানুষ।

প্রগতির এই দশকের স্রষ্টা এক প্রত্যয়দৃঢ় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ। মানুষের বিশ্বাস, মানুষের তিল তিল কর্মের ফলে এই দশক উজ্জ্বল। এই দশক আমাদের শুভবুদ্ধি, শুদ্ধ সংঘ শক্তি, ঐক্য, স্বচ্ছ দৃষ্টি আর গঠনের ঐকান্তিক ইচ্ছার ভাণ্ডারী।

ভ্রান্তি বিভ্রান্তি

বারেবারে ভ্রান্তি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে বিভ্রান্তির ঘূর্ণিপাকে। এই দশকের সবচেয়ে বড় দান বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি। মহান নেতৃত্বের ছায়ায় জীবন আজ দ্রুত প্রবাহিত।

সমৃদ্ধির নবদিগন্তের আলোক-বর্তিকা

২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৬ঃ দায়িত্বভার গ্রহণ
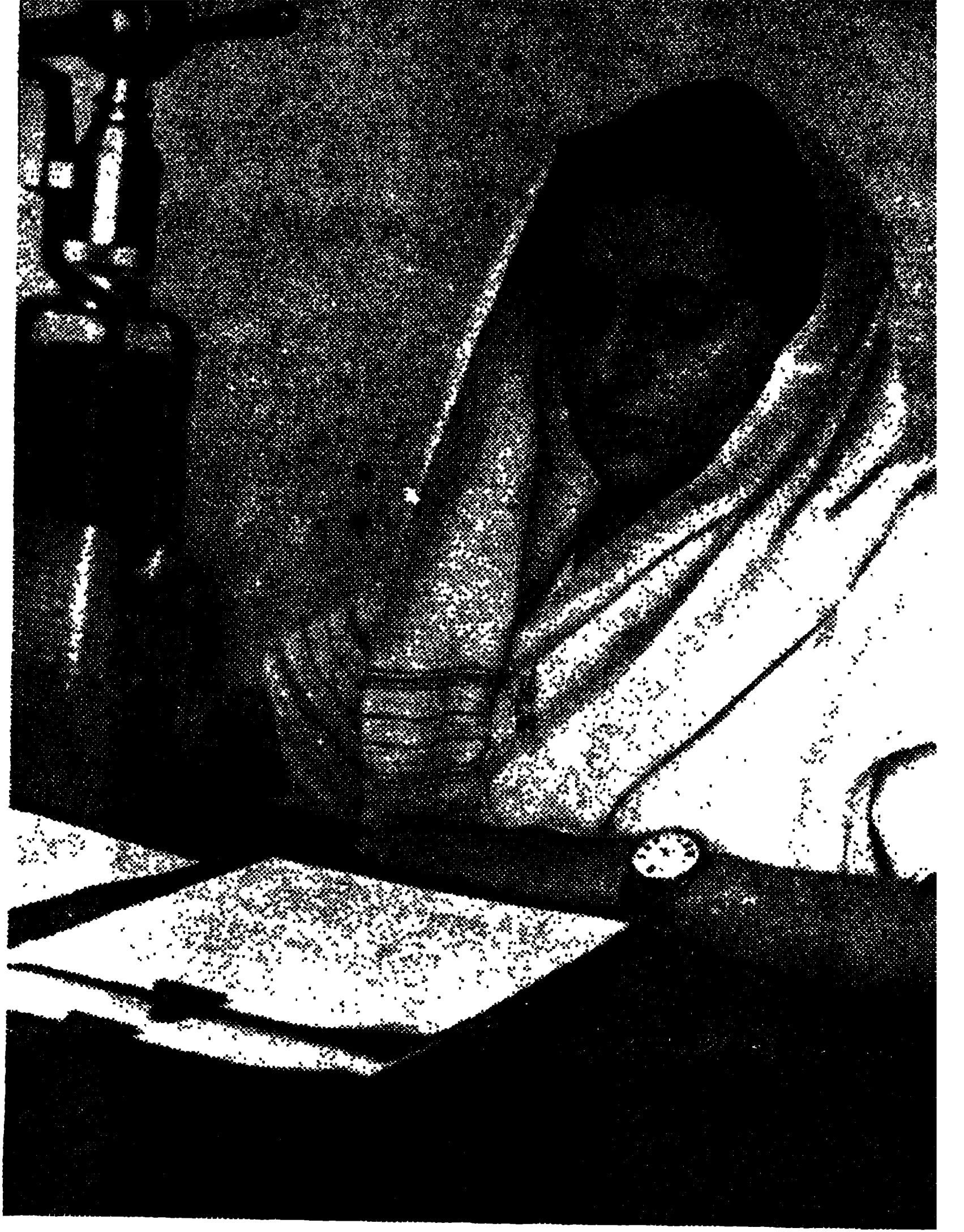
সংহত রাজনীতি

১৯৬৬ সাল। জানুয়ারী মাস। সারা ভারতের মানুষ উদ্‌গ্রীব। সংবাদ তৈরি হতে চলেছে তাশখন্দে। '৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। শীর্ষ বৈঠক বসেছে তাশখন্দে। ভারত চায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি, সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। ভারতের প্রধান-মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর হাতে আমাদের দেশের সম্মান, দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভবিষ্যত। খবর এল শেষরাতে, প্রধান মন্ত্রী পরলোকে। যাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'After Nehru who' তাঁরা আবার কিছু জল্পনার খোরাক পেলেন। দেশের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপর। জানুয়ারী ২৪, ১৯৬৬ সাল।

বিপর্যস্ত ভারত

ভারতের এই নতুন নেত্রী কোন্ ভূমির উপর এসে দাঁড়ালেন। পাক যুদ্ধে অর্থনীতি ক্ষত বিক্ষত। খরায় ভারতের অধিকাংশ শস্যক্ষেত্র দগ্ধ। দগ্ধ কৃষকের ফসলের স্বপ্ন। উদগ্র কোটি জঠরের দাহ। অন্যদিকে রাজনীতির অশুভ শক্তির ছায়া নেতৃত্বের আসনের চারপাশে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে। লোভী হাত আঘাতের সুযোগে উদ্যত। সাধারণ মানুষের স্বার্থ নয় ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির স্বপ্নে নেতৃত্বের অংশ ক্ষিপ্ত।

তোমার পতাকা যারে দাও

শ্রীমতী গান্ধী প্রথমেই হাতে তুলে নিলেন দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ। তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন, সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের তিনি ভাণ্ডারী। মানুষের কল্যাণের শপথে তিনি শক্তিশালী। তৃতীয় পরিকল্পনা বিপর্যস্ত। প্রগতির তরণীর চারপাশে যত কচুরিপানার অবরোধ। বাৎসরিক পরিকল্পনার সঙ্গে পরিকল্পনা জুড়ে অভিজ্ঞ কাণ্ডারীর মত বছর থেকে বছরে উত্তীর্ণ করে দিলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ১৯৬৯-এ শুরু হল চতুর্থ পরিকল্পনা।

শুভ অশুভ

১৯৬৬ সাল ছিল তৃতীয় লোকসভার শেষ বছর। দেশের বিভিন্ন অংশে দানা বেঁধে উঠল অশুভ শক্তির উল্লাস। ক্ষমতা দখলের বিচিত্র সব প্রয়াস। একের পর এক বাধার প্রস্তর স্তূপ গতির পথে গড়িয়ে দেওয়া হল। গোহত্যা নিবারণ আন্দোলন অনেক দিনের একটা ধর্মীয় ব্যাপার। আর ধর্মকেই তো ধর্ম বিশ্বাসী দেশে যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন হিসেবে চিরকাল ব্যবহার করার নজির আছে। সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সেই খেলাই খেললেন ১৯৬৬-র নভেম্বরে।

২৪ অক্টোবর, ১৯৬৬ : গোষ্ঠীনিরপেক্ষ শীর্ষসম্মেলনে

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্ককর্মী সমাবেশে।

তাজ্জব তাণ্ডব

সাধুদের মিছিল চলেছে দিল্লীর রাজপথে। মিছিলের দাবী—গোহত্যা নিবারণ কর। গোহত্যা বন্ধ কর। নিমেষে গোমাতার স্বার্থ চুলোয় গেল, অদৃশ্য প্ররোচনায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দল তাণ্ডব শুরু করে দিলেন রাজপথে। শুরু হয়ে গেল ভাঙনের উল্লাস। জাতীয় সম্পত্তির খণ্ডখণ্ডাংশ ছড়িয়ে পড়ল রাজপথে। দৃঢ়চিত্ত নেত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী গুলজারীলাল নন্দকে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় দিলেন।

চতুর্থ নির্বাচন

ফেব্রুয়ারী-মার্চ '৬৭। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে একটা অস্থির স্বার্থ সংঘর্ষ রাজনৈতিক চিত্র ফুটে উঠল। লোকসভা এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। আর অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতায় বসলেন রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভিন্নতায় ভরা যুক্তফ্রন্ট অথবা সংযুক্ত বিধায়ক দল।

শরিকী সংঘর্ষ

রক্তারক্তি হানা হানিতে এতকালের শান্ত রাজনৈতিক মঞ্চ বীভৎস হয়ে উঠল। এই রাজনীতির সঙ্গে মানুষের পূর্ব পরিচয় ছিল না। আতঙ্কিত মানুষের চোখে রাজনৈতিক ব্যভিচারের চিত্র স্পষ্ট থেকে সুস্পষ্ট। পশ্চিমবাংলার মানুষ সেই হানাহানির রক্তাক্ত রাজনৈতিক আলো নিভে আসা দিনের কথা এখনও ভোলেনি। নক্শাল আন্দোলনের নামে অসংখ্য হত্যা, অসংখ্য নাশকতামূলক কাজ সাধারণ মানুষের শান্ত জীবন চুরমার করতে চেয়েছে। ঘড়ির কাটা পিছিয়ে দিতে চেয়েছে কয়েক হাজার বছর।

দুই কংগ্রেস

কংগ্রেসের প্রাচীন ইমারতে ফাটল ধরছিল। একেবারে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর। ১৯৬৯ সাল। দুজন প্রার্থী সংগ্রামে মুখোমুখি হলেন। কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী প্রধান অংশ সমর্থন করলেন ডাঃ সঞ্জীব রেড্ডীকে। নির্বাচনে বিজয়ী হলেন নবীন সমর্থিত শ্রী ভি. ভি. গিরি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবয়ব মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল নতুন শক্তি, নতুন ভাবনার শরিক, শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দল। কোন্‌টি আসল জাতীয় কংগ্রেস? রায় দিলেন সুপ্রীম কোর্ট। নতুন দল জাতীয় কংগ্রেসের মর্যাদা পেল।

দ্রুত সমাধান

এর আগের আগে দু'তিনটি ঘটনা স্মরণীয় যা ছিল শ্রীমতী গান্ধীর বলিষ্ঠ নেত্রীরূপে আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়। ১৯৬৬ সালেই একটি কঠিন সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হ'ল প্রধানমন্ত্রীকে। পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব ও হরিয়াণা এ দু রাজ্যে ভাগ করে জনমতকে মেনে নিলেন তিনি। অনুরূপ আর একটি দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন সমস্যা ছিল তেলেঙ্গানা। দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয় নিয়ে এ সমস্যারও সমাধান করলেন তিনি। ছ'দফা সূত্রে স্থায়ী শান্তি ফিরে এল অন্ধ্রপ্রদেশে।

১৭ ডিসেম্বর: ১৯৭১ ভারতরত্নে ভূষিত।

রাজন্যভাতা লোপ

১৯৭০ সাল লোকসভার শরৎকালীন অধিবেশনে গৃহীত হল রাজন্যভাতা বিলোপ বিল। স্বাধীন ভারতের আপামর মানুষ যখন কর্মের আর ধর্মের মন্ত্রে দীক্ষিত তখন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ পরাধীন ভারতের বৈষম্য সৃষ্টিকারী বিশেষ এক সুবিধের বলে দিনের পর দিন অজস্র অনুপার্জিত সুবিধে ভোগ করে চলবেন, বিশেষ একটি শ্রেণী বলে বিবেচিত হবেন তা হতে পারবেনা। সাম্যবাদী ভারতের জনতার সাধারণ মঞ্চে সকলেই সমান। এই দশকেই ঘটে গেল সেই যুগান্তকারী ঘটনা।

আয়ারাম-গয়ারাম

ইতিমধ্যে রাজনীতির শোভন মঞ্চে শুরু হল 'আয়ারাম,-গয়ারাম'দের খেলা। দল ভাঙাভাঙি, ভোট কেনা বেচার কালোবাজারী ব্যবসা। রাজ্যে রাজ্যে ঘনঘন পট পরিবর্তন। শান্তি আর শৃঙ্খলার গঙ্গাযাত্রা। শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙে দিলেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনসাধারণের

১৭ মার্চ, ১৯৭২ : ইন্দো-বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর।

রায় চাইলেন। ১৯৭১। মধ্যবর্তী নির্বাচনে লোকসভা থেকে কংগ্রেস (অর্গানাইজেশান) প্রায় মুছে গেল। বিভ্রান্তির স্রোত যেন কিছুটা স্তিমিত হল। নেতৃত্বের হাত কিছু শক্ত হল। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার সুযোগ পেলেন।

মেঘ তবু কাটেনা

মেঘ উঠল পূব আকাশে। প্রতিবেশী দেশে। একটি নতুন রাষ্ট্র তখন জন্মের আকৃতিতে ছটফট করছে। পূর্বপাকিস্তান থেকে আকৃতি নিচ্ছে বাঙলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তান সমস্ত নৃশংসতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিকামী একটি দেশের উপর। আক্রমণ করল ভারতকেও।

২৫ শে মার্চ ১৯৭১। সীমান্ত পেরিয়ে কাতারে কাতারে আসছেন শরণার্থীর দল। সংখ্যায় তাঁরা অসংখ্য। কোটির অঙ্ককেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। অপূর্ব দক্ষতায় মোকাবিলা করলেন এই সমস্যার আমাদের প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক দরবারে আমাদের দৌত্য একটি মুক্তি আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করল। স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করল।

'৭১ এর ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করল বাংলা দেশে। মুক্তি যোদ্ধারা সমর্থন পেলেন, শক্তি পেলেন। ষোল দিনের যুদ্ধে একটি নতুন রাষ্ট্রের মানচিত্র তৈরী হয়ে গেল। বাংলাদেশ হল স্বাধীন।

প্রকৃত নেতৃত্ব তখনই প্রমাণিত হয় যখন সেই নেতৃত্ব দেশকে সঠিক পথে চালনা করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দেশকে এই সঙ্কটে সঠিকপথেই চালনা করলেন। সারা বিশ্বে অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে পেলেন স্বীকৃতি।

রোগীর স্বাস্থ্যের জন্যই তাকে তেতো বড়ি খাওয়াতে হয়। জাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেও অনুরূপভাবে কিছু কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই সুযোগে আমাদের জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিকগুলিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে। জাতীয় জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে সৌন্দর্য ও সজীবতা।

১৯৭২ সাল। শরণার্থীদের চাপ, লক্ষাধিক পাক সমরবন্দীদের চাপ এবং আবার খরা পীড়িত দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন হল। পাল্টে গেল দেশের '৬৭-র রাজনৈতিক চিত্র। বিভেদকামী, বিরোধী শক্তির ফণা মৃত্তিকা লগ্ন হল। সুস্থতার সীমা স্বর্গ খুঁজে পেল ভারত রাজনীতি।

সে তো সাময়িক? তবু নেতৃত্ব লক্ষ্যে স্থির। সংকল্পে অটল। চলনে দ্বিধাহীন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জমা হয়েছে সমাজ অর্থনীতিতে। খাদ্য কোথায়? কৃষিজাত কাঁচামাল কই? বিদ্যুত কেন পলাতক।

মুদ্রাস্ফীতি

সমস্যায় কোটি প্রাণ যখন ক্লিষ্ট, সমাধান চাই আরো দ্রুত। বাড়তি অর্থ ঢুকিয়ে বাজারে টাকার চল বাড়াতেই হল। দেখা দিল মুদ্রাস্ফীতি। সামলে ওঠার আগেই আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম গেল বেড়ে। কি ভাবে মেটানো যাবে এই বাড়তি দাম। বাজারে জিনিসের দাম উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধতর মুখী। টান পড়ল আমাদের বিদেশী মুদ্রার মজুত তহবিলে। আমদানী রপ্তানীর এতদিনের সুস্থ ভারসাম্য নষ্ট হল। কৃষি আর শিল্পের উৎপাদন প্রয়োজনের জিনিসে ঘাটতি দেখা দিল। ভোগ্য পণ্যের অভাবে জনজীবন কিছু বিপর্যস্ত হল।

এই তো সুযোগ। সুযোগ সন্ধানীদের লোভী হাত এগিয়ে এল ষড়যন্ত্রের অন্ধকার সব ফোকর দিয়ে। মজুতদার, কালোবাজারী আর চোরাচালানকারীদের উল্লাসের দিন। বিব্রত সাধারণ মানুষ তাদের মুনাফার শিকার।

শেষ চাল

উৎপাদন যন্ত্রকে স্তব্ধ করতে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আবার তৎপর হলেন। অস্ত্র তাদের সেই পুরোনো ঘেরাও আর বন্ধ। স্বার্থকামী পুঞ্জীভূত শক্তি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল দলের কাঁধে চেপে, বিকৃত বিপ্লবী আর গোলযোগকারীদের সাহায্যে বিভেদের হাতিয়ারকে শানিত করে ক্ষমতা দখলের শেষ লড়াইয়ে নামলেন।

আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

জন্ম—এলাহাবাদে, ১৯শে নভেম্বর, ১৯১৭ পিতামহ মতিলাল, পিতা জওহরলাল, মা কমলা নেহরু। আনন্দভবনে নেহরু পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্যে লালিত।

অসহযোগ আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসকে সাহায্য করার জন্য বারো বছর বয়সেই একটি শিশুসংস্থা প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষা প্রথমে পুনায়, পরে শান্তিনিকেতনে। শান্তি নিকেতনে থাকার সময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নেহরুকে লিখেছিলেন, "ইন্দিরা আমাদের এখানকার মস্ত বড় সম্পদ"। কিন্তু শিক্ষার বড় উৎস ছিলেন পিতা জওহরলাল।

একুশ বছর বয়সে কংগ্রেসে যোগদান। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য যুদ্ধের সময় ভারতে প্রত্যাবর্তন। বিবাহ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২। স্বামী ফিরোজ গান্ধী। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বামীসহ কারারুদ্ধ। এরপর কারাকক্ষে দীর্ঘ তেরো মাস কাটে।

১৯৪৭। এলো স্বাধীনতা।

গান্ধীজি আহ্বান জানালেন ইন্দিরাকে দিল্লীর দাঙ্গা-পীড়িত এলাকায় কাজ করতে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা হ্রাস করতে অনেকটা সফল হলেন।

১৯৫৫ সাল থেকে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য। নারী ও যুব বিভাগ ছিল তাঁরদপ্তর। ১৯৫৯ সাল। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বৃত হলেন ইন্দিরা। পরে কংগ্রেসের জাতীয় সংহতি কমিটির চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় সরকারের গঠিত জাতীয় সংহতি পরিষদের সদস্যা।

রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও শিশু ও নারী কল্যাণে ব্যয় করতেন তিনি তাঁর সময়ের একটা বড় অংশ। নারী ও শিশু কল্যাণের অসংখ্য সংস্থার তিনি সভানেত্রী।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পর্ষদ ও ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহক পর্ষদের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

১৯৬২ সালে ঘটল চীনা আক্রমণ। গঠিত হল কেন্দ্রীয় নাগরিক পরিষদ। অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং জওয়ানদের কল্যাণের কাজের সমন্বয়ের দুরূহ দায়িত্ব। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যাও তিনি তখন থেকে। এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান তথ্য ও বেতারমন্ত্রী হিসাবে।

পাক-ভারত যুদ্ধ। তাশখন্দ ঘোষণা। শাস্ত্রীজির মৃত্যু। কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রীপদে নির্বাচিত হলেন ইন্দিরা।

স্মরণীয় ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬৬। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এক দশকের হল শুভ সূচনা। এই দশক অভূতপূর্ব অগ্রগতি, স্থায়িত্ব, সংহতি, দৃঢ় সিদ্ধান্ত, শৃঙ্খলা ও অবিস্মরণীয় সাফল্যের দশক।

১৯৭৪—জ্বলে উঠল গুজরাট; বিহার টুকরো টুকরো হতে চাইল তামসিক আন্দোলনে।

১৯৭৫—নিহত হলেন রেলমন্ত্রী শ্রী এল. এন. মিশ্র।

১৯৭৫, মার্চ—প্রাণনাশের চেষ্টা হল ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীঅজিত নারায়ণ রায়ের।

ফ্যাসিস্ট শক্তির পৈশাচিক তাণ্ডব শুরু হল সারা দেশে।

১৯৭৫-এর জুন, এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিলেন প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচন মামলার। ঢিল পড়ল যেন ভিমরুলের চাকে। পাঁচটি বিরোধী দল জোটবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এমনকি আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার উপর আঘাত হেনে ভারতীয় জনজীবনের পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও যেন ছিনিয়ে নিতে চাইল।

জরুরী অবস্থা

আর নয়। এবার রাশ সংযত করার সময় এসেছে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন জরুরী অবস্থা—২৬শে জুন, ১৯৭৫।

শান্ত-ভারত-জনসমুদ্রে যে উড়ো ঝাপ্টা ঢেউয়ের অশান্তি চলছিল তাকে এইভাবেই শান্ত করার প্রয়োজন ছিল। বিগত দশকের পদযাত্রার পথিক ভারত সীমানার বহুপ্রান্তরে জন জীবনের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখে এসেছে জরুরী অবস্থার অপর নাম—সংহতি, গতি, আত্মবিশ্বাস।

অর্থনীতি

বিগত দশকের প্রস্তুতি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে উজ্জ্বল অর্থনীতির স্বপ্ন সম্ভাবনা, প্রগতির নতুন দিগন্ত। স্বাধীনতার পর গত দশক তার আগের দুটি দশকের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধতর ভবিষ্যতের দরজা আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে। সম্ভাবনার রূপকার দেশের মানুষ, দেশনেত্রীর প্রতি মানুষের অপরিসীম আস্থা।

৩ জুলাই, ১৯৭২: সিমলা চুক্তি।

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে শূন্যসীমায়। '৭২-'৭৩ সালে এই হার ছিল ২২.৬ শতাংশ। '৭৪ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩২ শতাংশ। যে কৌশলে এই বৃদ্ধির চাকাকে উল্টো দিকে ঘোরানো সম্ভব তার মধ্যে আছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা—মুদ্রাসংক্রান্ত, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রথমেই টাকার চল কমিয়ে দেওয়া হল। তারপর সমস্ত প্রকার সম্পদকে গুছিয়ে আনা হল এক জায়গায়। সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান বাড়ান হল। জনসাধারণের মধ্যে পণ্যের বিলি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হল। মজুতদার, কালো-বাজারী আর চোরাচালানকারীদের সায়েস্তা করা হল শক্ত হাতে। বন্ধ করা হল কর ফাঁকি দেবার সমস্ত প্রবণতা। ফলে উর্দ্ধমুখী

৩ জুন, ১৯৭২: ভারতে তৈরী প্রথম যুদ্ধ জাহাজ নীলগিরির উদ্বোধন।

জিনিসের দাম নিম্নমুখী হল। পণ্যের পাইকারি মূল্যসূচী নেমে এল। ৬১-৬২ সালের মূল্যকে ১০০ ধরলে '৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মূল্য সূচী যেখানে ছিল ৩৩০.৭, '৭৫ সালের ডিসেম্বরে সেখানে নেমে এসেছে ২৯৮-এর সীমায়। জনসাধারণের কাছে নেতৃত্ব আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এ এক অসাধারণ সাফল্য।

১ ডিসেম্বর, ১৯৭৪: রাজস্থানের পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ স্থলে।

অগ্রগতির দশ বছর

সুনিপুণ কাণ্ডারীর অসাধারণ পরিচালন দক্ষতায় বিগত একটি দশক ভারতীয় জনগণের সামনে সমৃদ্ধির এক নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিল। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘটল অসামান্য অগ্রগতি।

কৃষি

কৃষির উন্নতি মাপা যায় উৎপাদন দিয়ে। গত এক দশকে উৎপাদন বহুলাংশে বেড়েছে। বর্তমানের উৎপাদন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্যে আমাদের ভাণ্ডার এখন পূর্ণ। দশকের শুরুতে উৎপাদন ছিল মাত্র ৭ কোটি ২৩ লক্ষ টন। গমের উৎপাদন '৭২ সালেই দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছিল। ১৯৬৬-'৬৭ সালে ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টন, '৭২ এ হয়েছিল ২ কোটি ৬১ লক্ষ টন। বিভিন্ন রাজ্যের সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার আলপনায় এই সাফল্য।

পশ্চিমবঙ্গে দশকের শুরুতে উৎপাদন ছিল ৫৪ লক্ষ টন। সেই উৎপাদন আরো ২৫ লক্ষ টন বেড়ে মোট উৎপাদন এখন দাঁড়িয়েছে ৮০ লক্ষ টন। কি ইন্দ্রজালে সম্ভব হল এই অভূতপূর্ব প্রগতি। ইন্দ্রজাল একটাই—উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত উৎপাদন সামগ্রীর সুষ্ঠু প্রয়োগ আর সচেতন একমুখী প্রচেষ্টা।

সেচ পরিকল্পনা

বড় এবং মাঝারি সেচ প্রকল্পের সাহায্যে '৬৫-'৬৬ সালে যেখানে ১.৬১ কোটি হেক্টর জমিতে জল সেচ হত এখন সেখানে সেচের আওতায় এসেছে ২.১৮ কোটি হেক্টর। লক্ষ্য সীমা ৫.৭ কোটি হেক্টর। এই ক্ষমতা ২৫ বছর আগে যা ছিল তার দ্বিগুণের চেয়েও বেশী।

পশ্চিম বাংলায় '৪৭ সাল থেকে '৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত অগভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ২৩। সে তুলনায় শুধুমাত্র ১৯৭২ সালেই সরকার এ রাজ্যে ১৮ হাজার ৯৪৫টি অগভীর নলকূপ বসিয়েছেন। '৪৭ থেকে '৬৯ সালের মধ্যে যেখানে ১৫ হাজার ৪৬৩টি পাম্প সেট বিতরণ করা হয়েছিল সেখানে শুধুমাত্র '৭২-'৭৩ সালেই ২০ হাজার

১ আগষ্ট, ১৯৭৫: উপগ্রহবাহী শিক্ষামূলক টেলিভিসনের উদ্বোধন।

৪৩৫ টি সেট বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। '৭১'-৭২ সালে সেচের আওতায় ছিল সাড়ে ষোল লক্ষ হেক্টর জমি। '৭৩-'৭৪ সালে সেই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩.১৬ লক্ষ হেক্টর।

শিল্প সামগ্রী	উৎপাদন	
	যা ছিল	যা হয়েছে
কয়লা	৭০ মিলিয়ন টন	৯৮ মিলিয়ন টন
খনিজ লোহা	১৮ মিলিয়ন টন	৩৫.৫ মিলিয়ন টন
চিনি	৩.৩৯ মিলিয়ন টন	৪.৭৩ মিলিয়ন টন
সুতী বস্ত্র	৭৪০ কোটি মিটার	৭৮০ কোটি মিটার
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩.০২ মিলিয়ন টন	৭.৫ মিলিয়ন টন
নাইট্রোজেন ও ফসফেট সার	৩৫৪০০০ টন	১৪৯৫০০০ টন
ইস্পাত	৫৩ লক্ষ টন	৬৬ লক্ষ টন

বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ টন থেকে ১২০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। মিশ্র ও বিশেষ ধরণের ইস্পাত এক দশক আগেও কিছু উৎপন্ন হতনা। সেই শূন্য অবস্থা থেকে আমরা একটি দশকেই পূর্ণ অবস্থা পেতে চলেছি। বাৎসরিক বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ ৩.৫ লক্ষ টন। ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন ১৪৮ শতাংশ বেড়েছে, বিক্রয় যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন বেড়েছে ১৪৭ শতাংশ।

বিদ্যুত

বিদ্যুত উৎপাদনেও গত দশকের প্রগতি উল্লেখযোগ্য। আমাদের প্রতিদিনের বিদ্যুতের চাহিদা ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ইউনিট। সেই তুলনায় দৈনিক সরবরাহ ২২ কোটি ১২ লক্ষ ১০ হাজার ইউনিট। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কিঞ্চিৎ মাত্র কম। বিদ্যুত সংকট থেকে এই দশক দেশকে মুক্তি দিতে পেরেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদন এই এক দশকে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটি ১ লক্ষ ৭০ হাজার কিলো ওয়াট থেকে ২ কোটি ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলো ওয়াট হয়েছে। প্রকৃত উৎপাদন বেড়েছে ৩৮৮২ কোটি ৫০ লক্ষ কিলো ওয়াট আওয়ার থেকে ৭৫৭০ কোটি ৪০ লক্ষ কিলো ওয়াট আওয়ার। উৎপাদনে ভূমিকা নিয়েছে- জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুত, ডিজেল উৎপাদন ব্যবস্থা এবং পারমাণবিক বিদ্যুত।

গ্রামীণ বিদ্যুত প্রকল্পের অগ্রগতিও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৬৬ সালে বিদ্যুৎ পৌঁছেছিল ৪৫ হাজার গ্রামে। '৭৫ এর শেষে বিদ্যুত পেয়েছে মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রাম। ক্ষেত খামারে '৬৫-'৬৬ সালে চলত ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৪০০ বিদ্যুত চালিত পাম্প—এখন চলছে ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার পাম্প। পশ্চিম বাংলায় '৪৭ থেকে '৭২—এর মার্চ পর্য্যন্ত বিদ্যুত পেয়েছিল ৩ হাজার ৩২৮ টি গ্রাম। ১৯৭৫ সালের সংখ্যা ১০ হাজার ২৩২।

আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি গত কয়েক বছরে আমরা জনসাধারণকে এত বেশী সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি যা তারা আগে কখনো পাননি। আমরা তাদের দিয়েছি নতুন এক আত্মবিশ্বাস যাকে আমি খুব বড় জিনিস বলে মনে করি। তাদের আমরা মুখ ফুটে বলবার সাহস যুগিয়েছি। এটাও খুব বড় জিনিস।

শিল্প

শিল্পেও আজ প্রগতির পদক্ষেপ। '৫১ সাল থেকে শিল্প উৎপাদন ২৬৪ শতাংশ বেড়েছে। '৬০ সালকে তুলনার বছর ধরলে '৬৬ সালের উৎপাদন সূচক ১৫৩.২ থেকে বেড়ে '৭৫ সালের জানুয়ারী জুলাই মাসে হয়েছে ২০১.৮। শিল্প প্রগতির সবচেয়ে বড় দিক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বা লোক উদ্যোগের অর্থকরী আত্ম-প্রকাশ। দশকের শুরুতে ছিল ২৪১৫ কোটি টাকার ৭৪ টি উদ্যোগ। আজ উদ্যোগের সংখ্যা ১২২, অর্থলগ্নীর মোট পরিমাণ ৬২৫৭ কোটি টাকা। ভারি শিল্পে '৭১-'৭২ সালে উৎপাদনের মূল্য ছিল ২০৮ কোটি টাকা, সঙ্গে ছিল কিছু লোকসানের ছিটে। '৭৪-'৭৫ সালে উৎপাদন উঠেছে ৫৫৭ কোটি টাকায়, সঙ্গে ৩১ কোটি টাকার মত লাভ।

ক্ষুদ্র শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্পের সার্বিক উন্নতি এই দশকের আর একটি দান। '৬৪ সালের মার্চ মাসের শেষে দেশে ক্ষুদ্রশিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ২৮ কোটি টাকা। '৭৪ সালে ওই একই মাসের শেষে বাৎসরিক উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩৫২ কোটি টাকা। কর্মীর সংখ্যা ২৯ হাজার ২২৭ থেকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭০০ তে উঠেছে।

প্রযুক্তি ও ভারত

প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারত আজ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের শীর্ষে। গত পাঁচ বছরে আমরা ৪৫০ টিরও বেশি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রাসায়নিক সামগ্রী তৈরির ব্যবস্থা সম্ভব করে তুলেছি।

কোচিনের জাহাজ নির্মাণ কারখানায় ১৫০ টনের একটি জাহাজ তৈরির নতুন

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর জনগণের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন

ক্রেন তৈরি হচ্ছে, যে ক্রেনের নিয়ামক ব্যবস্থার ভূমিকায় আছে ইলেকট্রনিকস। সম্পূর্ণ দেশীয় উৎপাদনে এই ক্রেন তৈরি হচ্ছে। বহু উন্নত দেশেও এমন ক্রেন নেই।

ইলেকট্রনিকসের আর একটি দিক, রেডিও, টেলিভিসন। '৭১ সালে ইলেক-ট্রনিকস কমিশন বসানোর পর ১৪০ কোটি টাকার উৎপাদন '৭৪ সালেই ৩৩৩ কোটি টাকায় উঠেছে। বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ। দেশে এখন তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের ট্রানস্-মিটার ও মাইক্রোওয়েভ লিংক, যার ব্যবহার টেলিকমিউনিকেশনে, টেলি-ভিসানে।

ইলেকট্রনিকসে অগ্রগতি এখন এমন একটা স্তরে গেছে যেখানে 'সাইট' এক্সপেরিমেণ্টের গ্রাউণ্ড সেগমেণ্টের সব কিছু যেমন টি. ভি. সেট, অ্যানটেনা প্রভৃতি আমাদের দেশেই দেশীয় ডিজাইনে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ

এই দশকেই ভারত পারমাণবিক শক্তিপুঞ্জের অন্যতম হতে পেরেছে। ১৮ মে, ১৯৭৪, রাজস্থানের পোখরানে ভূগর্ভে আণবিক বিস্ফোরণ সাফল্যের সঙ্গে ঘটানো হল। এই শক্তি ব্যবহার করা হবে ধ্বংসের কাজে নয়, ওষুধ তৈরিতে, কৃষিতে, শিল্পে, খনির কাজে। উৎপাদন করা হবে বিদ্যুৎ।

তারাপুরে আমাদের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪০০ মেগাওয়াট। একই ক্ষমতার আর একটি উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে। আরো দুটি বসছে, তামিল নাড়ুতে কলাপক্কমে, উত্তর প্রদেশের নারোরায়।

পরীক্ষাগারের গবেষণা স্তর থেকে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি এবং যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু শক্তির শিল্প ব্যবহার সম্ভব করে প্রযুক্তি বিদ্যার এক উত্তুঙ্গ শিখরে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই দশকেই। যে কোন দেশের পক্ষেই এ এক অসাধারণ কৃতিত্ব। ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের সহযোগিতায় ভারতীয় শিল্পে তৈরী হচ্ছে প্রধান প্রধান আণবিক যন্ত্রাংশ।

আর্য্যভট্ট

'আর্য্যভট্ট'ও তো আমাদের প্রযুক্তি প্রগতির একটি বিস্ময়কর দিক।

বিজ্ঞানীদের সংগে আর্যভট্ট পরিদর্শনে

১৯ এপ্রিল, ১৯৭৫। ভারতে তৈরি পৃথিবীর উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপিত হল। ভারতের নাম যুক্ত হল মহাকাশ বিজয়ী দেশের তালিকায়।

'৭৫ সালের আগষ্ট মাসে আমাদের প্রযুক্তিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে আকাশবাণীর সহযোগিতায় স্থাপিত হয়েছে—সাইট, স্যাটেলাইট ইন্‌স্ট্রাকশানাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেণ্ট সেন্টার। উপগ্রহ বাহিত শিক্ষামূলক টেলিভিসন।

বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক থেকে গত দশক ভারতের অর্থনীতিকে সাহায্য করেছে। মাত্র এক বছরে রপ্তানীর পরিমাণ মূল্য ৩৩০০ কোটি টাকার মাত্রা ছাড়িয়েছে। তার মানে '৬৫–'৬৬ সালের ৮০৫ কোটি টাকার চারগুণেরও বেশি। তাছাড়া বিদেশে ভারতের সহযোগিতায় স্থাপিত হয়েছে যৌথ সংস্থা বিশ্বের ২৮টি দেশে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

বিশৃঙ্খলার বলি হবার ঠিক সন্ধিক্ষণে এই দশকের ভাগ্য নির্ধারণের ভার যিনি হাতে নিয়েছিলেন তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল, ইতিহাস সৃষ্টি করার বলিষ্ঠ ক্ষমতা ছিল। ১৪টি প্রধান ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আওতায় এনেছিলেন বলেই, ক্ষুদ্র কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প অসংখ্য বৃত্তিজীবী খেটে খাওয়া মানুষ আজ ব্যাঙ্ক ঋণের কথা ভাবতে পারছেন। ধনীদের আরো ধনী হবার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। একচেটে পুঁজির মূলোচ্ছেদ হয়েছে।

কয়লা খনি জাতীয়করণ

এই দশকে আমাদের মহান নেত্রীর আর একটি দান, কয়লাখনি জাতীয়করণ। জানুয়ারী, ৩০, ১৯৭৩। ভারতের সাতটি রাজ্যের আড়াই লক্ষ কয়লা খনি শ্রমিকের বিপদসঙ্কুল, শোষিত, অবহেলিত জীবনে নতুন সূর্যোদয় হল। সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানার কয়লাখনি সরকার নিজের হাতে তুলে নিলেন। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রয়োগ এবং দেশের সীমিত কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ ছিল আর একটি উদ্দেশ্য। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে হলে যুক্তিসংগত সজ্ঞবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন, প্রয়োজন উৎপাদনকে সাধ্যসীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবার। কয়লা খনির জাতীয়করণ দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যত পদক্ষেপ।

যাদের আমরা সর্বহারা বলে দায় সেরে দিতাম, সেই সব ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, দিনমজুর সমাজের সমস্ত দুর্বল অংশের মানুষ আমাদের এই প্রগতির শরিক হয়েছে কিভাবে। বহু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এঁদের জন্য যেমন—ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষেতমজুর উন্নয়ন প্রকল্প।

জন স্বাস্থ্যে, কৃষি উৎপাদনে, গ্রামীণ শিল্পে, শিক্ষায় গ্রাম আজ দ্রুত জেগে উঠছে। জোর করে শ্রমদানে বাধ্যকরা আজ সর্বত্র বে-আইনী। গ্রামের মানুষকে আজ ঋণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মহাজনী কুপ্রথার অবসান ঘটানো হয়েছে। ভূমি-হীনকে ভূমি বন্টন করা হয়েছে, গ্রামীণ গৃহ প্রকল্প গৃহহীনদের মাথার উপর আচ্ছাদনের প্রতিশ্রুতি এনেছে। সারা-দেশে উদ্বৃত্ত ১১.৫ লক্ষ হেক্টার কৃষি জমির ৬.৩ লক্ষ হেক্টার ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। ৫৭ লক্ষ বাস্তু জমি গৃহ নির্মাণের জন্যে বিভিন্ন রাজ্যের ভূমিহীন শ্রমজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নতুন রাজ্য নতুন চুক্তি

এই দশকে জন্ম নিয়েছে একাধিক নতুন রাজ্য। আমরা শান্তিতে আমাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে এই ভারত-জন-সমুদ্রে বাস করতে চাই। সেই, চিন্তারই প্রতিফলন নতুন রাজ্যের জন্মে, সীমান্ত চুক্তিতে। তাইতো আজ হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, তাই আছে মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরাম, তাই মণিপুর ও ত্রিপুরার নতুন রাজ্য হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি।

নাগাল্যাণ্ড ঃ কাশ্মীর ঃ সিকিম

ধৈর্য্য আর দূরদৃষ্টি এই দশকেই নাগা সমস্যার মত কঠিন একটা সমস্যার সমাধান সম্ভব করেছে। কাশ্মীর সম্পর্কে একটা সর্বজন স্বীকৃত চুক্তিতে পৌছোতে পারা গেছে। সিকিমকে আমাদের প্রগতির সঙ্গী করেছি। পাকিস্তানের সঙ্গে সিমলার শীর্ষ বৈঠকে এশিয়া ভূখণ্ডে পারস্পরিক শান্তি খুঁজেছি। বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ

শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসি এমন কিছু

ইন্দিরা গান্ধী

ভালোবাসা ব্যাপারটা যদি গভীর গোপন থাকে তাহলে অপরে আর তা জানবে কি করে? এ ধরণের বিষয় অবশ্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে থাকে। শুরুতে আমাকে বেশ ভাবতে হয়েছে—ভাবতে হয়েছে আমি কি ভালবাসি। প্রথমেই বলে রাখি, এখানে গোপনীয়তা কিছু নেই। অনেকে হয়তো দারুণ কিছু আশা করে থাকতে পারেন। যেহেতু সাধারণ ব্যাপারগুলি অনেক সময় নজর এড়িয়ে যায়। যাহোক পরিপূর্ণ তালিকা পেশ না করে এক্ষেত্রে ইংগিতমাত্রই করা হলো শুধু।

ভালো লাগার পূর্ণ তালিকা পেশ করা কঠিন কিছু নয়—তবে তুচ্ছ অনেক কিছু থেকেই আমি আনন্দ পেয়ে থাকি। সব কথা উল্লেখ করতে গেলে তালিকাটি অবশ্য দীর্ঘতর হয়ে পড়বে। খাওয়ার ব্যাপারটা প্রীতিপদ হলেও উপস্থিত মতো এই প্রসঙ্গ 'ভালোলাগা'র বিবরণ থেকে উহ্য রাখছি। যখন যে অঞ্চল বা দেশে পরিভ্রমণে গিয়েছি, তখন সেখানকার খাবারদাবার খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে। তবে বেশি মশলাদার খাদ্য আমি এড়িয়ে চলি। অনাড়ম্বর, সাধারণ আহার্যের প্রতিই আমার বেশি ঝোঁক।

জীবজন্তু বা পাখির কথা এখানে উল্লেখ করছি না যদিও তাদের প্রতি আমার মমতা বা সম্পর্ক কারো অজানা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে সময় কাটাতে প্রায়শ নানারকম ছেলে-মানুষী খেলায় মেতে থাকতে হতো। এতে অনেকেই অংশ গ্রহণ করতো, যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই থাকতো অজানা-অচেনা। ফলে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি এড়িয়েও পরস্পর পরস্পরকে জানাশোনার বেশ সুযোগ ছিল। একবার আমার

কারুশিল্পীর সন্তানকে আদর করছেন

কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোন্ জন্তু সাজতে আমার ইচ্ছে করে। জবাবে আমি বলেছিলাম, ভারতীয় কালো হরিণ। আমার আয়ত চোখ, সরু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ছোটাছুটিতে রীতিমতো ওস্তাদ ছিলাম বলেই সম্ভবত আমি যে এই ধরণের ইচ্ছে প্রকাশ করেছি—কেউ কেউ সেদিন এরকম মন্তব্যই প্রকাশ করেছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনে বইয়ের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। নানা রকম অভিধান আমাকে উদ্দীপিত করে; বিশেষত শব্দ প্রকরণ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

বৃষ্টি আমার ভালো লাগে। ভালোবাসি, বৃষ্টির ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে, বৃষ্টির সজীব স্পর্শ চোখেমুখে অনুভব করতে। যখন প্রথম বৃষ্টি নামে তখন মাটি থেকে যে গন্ধ ভেসে ওঠে তা বেশ লাগে—হিন্দিতে আমরা যাকে বলি সৌন্ধা। বৃষ্টি কেমন রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ির ধূলি-ধূসরতা ধুয়ে মুছে দেয়, পত্রপুষ্পে আনে সজীবতা। কচি কচি নতুন পাতা আমার ভীষণ ভালো লাগে—কি কোমল, যেন ফুলের মতো। ভালো লাগে বিচিত্র বর্ণের নানা ধরনের ফুল, বিশেষত বনফুল—যা প্রকৃতির ভিন্ন পরিবেশের মধ্যেও আপনি ফুটে থাকে, উঁকি দেয় ফাটল, গর্ত প্রভৃতির ভিতর থেকে। আরো ভালো লাগে প্রাচীন বনস্পতি—গাছের ঝুরি এবং বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা। বৃক্ষের ছায়া সুনিবিড় পরিবেশে কি প্রশান্তি! কেমন ঋজু স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল! তাদের ঘিরে না জানি কতো কাহিনী।
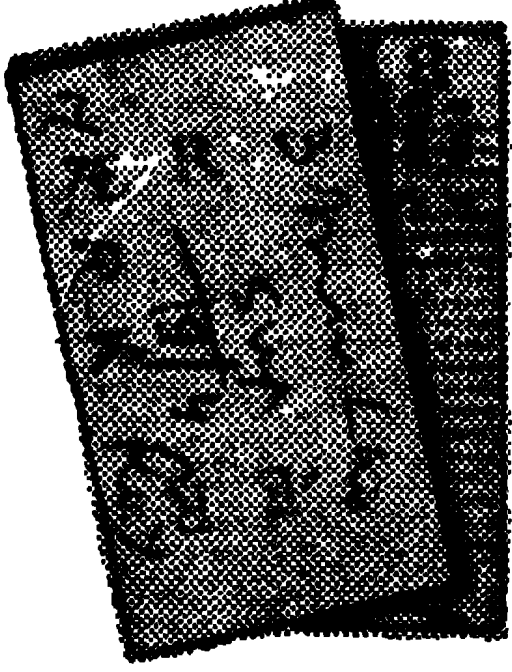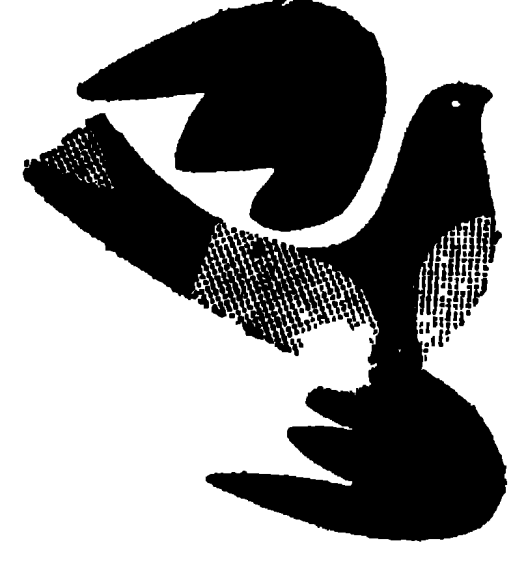
যে পর্বতশ্রেণীর সানুদেশ পাইনে মর্মরিত, অরণ্যে বিজড়িত, চির তুষার-কিরীটে যার তুঙ্গশীর্ষ আচ্ছাদিত এবং ভীতিজনক হিমবাহের সঙ্গে যে একাকার হয়ে গিয়েছে সেই পর্বতের কথায় কেমন যেন আবেগ অনুভব করি। ঊষর বালুকাবেলাও আমার বেশ পছন্দ। ভালো লাগে বন্ধুর পথ-ও। এ সমস্ত কিছুই দৃঢ়তা এবং পারম্পর্য সম্পর্কে অন্যতর ধারণা দেয়।

পাহাড়ে হাঁটতে চলতে আমার খুব ভালো লাগে। পথহীন অরণ্যে তো কথা নেই। বেশ ভালো লাগে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ের উঁচু অঞ্চলে উঠতে। আর ভালো লাগে গরমকালে সাঁতার। আমার ছেলেরা যখন স্কুলে পড়তো তখন গ্রীষ্মের দু'মাস ছুটি কাটাতে প্রত্যেক বছর তাঁরা পাহাড়ে যেতো। যদিও সরকারী বা অন্য সেরা আস্তানায় থাকতে আমাদের অসুবিধার কিছু ছিল না তবু আমরা পছন্দ করতাম শহর থেকে যথাসম্ভব দূরে শ্যামল পাইন-বীথিকার মধ্যে টেন্টে থাকার। স্নান করতাম বরফ-শীতল পাহাড়ী স্রোতধারায়। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সে যেন এক নব উদ্দীপনা লাভের অভিজ্ঞতা।

জল—বিশেষত আমাদের এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে—কি শীতল, ক্লান্তিহর। স্থির, মণিকান্ত পাহাড়ী হ্রদ আমার ভালো-লাগে। ভালো লাগে পাগল পারা দুরন্ত পাহাড়ী ঝর্ণা, সমুদ্রের গর্জন—যা গতানুগতিক শব্দকে আড়াল করে দেয়। প্রশান্ত কিংবা দুরন্ত যাই হোক না কেন, নদী আমার খুব প্রিয়। আমার আর ভালো লাগে সমুদ্রের সীমাহীনতা। বহতা জলধারার কুলকুল ধ্বনি এবং বৈঠার ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ সব ধ্বনির মধ্যে বুঝিবা মনোরম। তেমনি ভালো লাগে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। যদিও শ্রুতিমধুর নয় তবু ট্রেনের হুইস্‌ল এবং জাহাজের ভেঁপু কাছে টানে। বলতে গেলে রেলগাড়ি আমি ভালোবাসি এবং সেই সঙ্গে জাহাজ-ও।

দারিদ্র্য এখনো দূর হয়নি একথা সত্যি। কিন্তু যেখানেই আমরা যাই দেখি কি বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। ট্রেনে ভারতের যে কোন জায়গা ঘুরে দেখুন। দেখবেন, প্রায় সব লোকই আগের থেকে অনেক ভালো জামাকাপড় পরেন। দশ-পনের বছর আগে গ্রামের দিকে একটি দুটির বেশী সাইকেল দেখা যেত না। এখন শ'য়ে শ'য়ে সাইকেল চলে। প্রায় সব গ্রামেই ট্রাক্টর ও চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখা যায়।

সফরকালে পুরনো দুর্গ দেখতে পেলে উৎসাহিত হই। কতো উত্থান-পতনের চিহ্ন তাদের ঘিরে। একদা কতো আকাঙ্ক্ষা এবং শঙ্কার শরিক যে সেগুলি ছিল, সেসব কাহিনী জানতে ইচ্ছে করে।

ভালোলাগে মাটিতে ঘাসের উপর বসতে (অবশ্য সেখানে যদি না গা-শির-শির্ করা কোনো প্রাণী থাকে।) মনে হয় যেন মাতা বসুন্ধরাকে স্পর্শ করতে পারছি।

শিশির ভেজা ঘাসে খালি পায়ে চলতে বেশ আনন্দ পাই। ছোটবেলায়, গাছের উঁচু ডালে বসে প্রকৃতিকে অনুভব করার কেমন যেন প্রেরণা পেতাম।

ঢিলেঢালা পোশাক, বিশেষত শাড়ি যারা পরেন, বাতাস অনেক সময় তাঁদের কাছে অস্বোস্তির কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে ঘাস কিংবা শস্যক্ষেত্র যখন ধীরে দুলে দুলে ওঠে তখন তা দেখবার মতো।

ভালো লাগে পুরাতন রীতিতে তৈরী আবাসগৃহ, অনাড়ম্বর সহজ জীবন প্রণালী। সনাতন আসবাব। ভালো লাগে তাম্রপাত্র এবং ঐতিহ্যবাহী ঘর-কন্নার জিনিসপত্র। পুরনো বই, ছবি, মানচিত্র এসব দেখতেও ভালো লাগে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রতিটি ঋতুর সঠিক চরিত্র সহজে বোঝা যায় না। যদিও প্রত্যেক ঋতুরই তার স্বকীয় সৌন্দর্য বর্তমান, তথাপি একের রেশ কাটতে না কাটতে আর এক জন যেন আসরে এসে বসে। ভারতীয় সমতলে সেজন্য সোনালী হলুদ কিংবা হেমন্তের রক্তিম ব্যঞ্জনা অথবা রাত্রির রহস্যের শেষে শুভ্র আচ্ছাদনে মোড়া প্রভাতের রূপময় ঔজ্জ্বল্য আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এমন কিছু ভালো-লাগা দৃশ্য আছে যা অনির্বচনীয়, চির তুষারের মতো অমলিন।

প্রধানমন্ত্রীর ২০-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী সরকারী চাকরি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংরক্ষিত শূণ্যপদগুলিতে তপশিলী জাতি ও আদিবাসী কর্মপ্রার্থীদের নানাভাবে সুযোগসুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তপশিলী জাতি ও আদিবাসী কর্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে 'অভিজ্ঞতা' সংক্রান্ত চাহিদাগুলি আরো শিথিল করতে পারবেন। সংরক্ষিত শূণ্যপদগুলির বিজ্ঞাপনেও ঐ কথা উল্লিখিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির নির্দেশানুসারে ঐসব সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত পিওন, ঝাড়ুদার ও ফরাশদের অন্য কাজে লাগানোর কর্মসূচীটিও রূপান্তরিত হচ্ছে। এছাড়া, পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তাদের আরো সুবিধা দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

নতুন যুগের ভোরে

নির্মল সেনগুপ্ত

ছাব্বিশে জুন থেকে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী আট মাস। এই আট মাসে ভারতের জনজীবনে এবং সমাজজীবনে যে পরিবর্তন হয়েছে, আঠাশ বছরেও বোধ করি ততটা পরিবর্তন হয় নি। এই কথাতে আপত্তি করতে পারেন কেউ কেউ। বলতে পারেন, আঠাশ বছরের ইতিহাসটা কি তা হলে কিছুই নয়? এই আঠাশ বছরের মধ্যে জাতীয় জীবনে সমস্যা তো কিছু কম আসে নি; এসেছে অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি, এসেছে অন্নাভাব, এসেছে রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজ্যে রাজ্যে। জাতীয় সংহতিও বিপন্ন হয়েছে মাঝে মাঝে, সর্বোপরি এসেছে বহিরাক্রমণ। প্রচণ্ড দৃঢ়তা এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভারতবাসী সবকিছুরই মোকাবিলা করেছে। শুভে অশুভে মেশানো এই বছরগুলিতেও বিশ্বের কাছ থেকে তারা কমশ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নি।

তবু বলছি আঠাশ বছরের অভিজ্ঞতা আট মাসের অভিজ্ঞতার সমতুল্য নয়। বিগত বছরটিতে ভারতীয় জনগণ দেখেছে এমন অনেক কিছু যা আগে কখনও দেখা যায় নি। বহিরাক্রমণের সময় আমরা জাতীয় সংহতির রূপটি দেখে নিঃসংশয়ে ধরে নিয়েছিলাম যে, এই সংহতি নিশ্ছিদ্র। কিন্তু গত বছরের শুরু থেকেই দেখা গেল সংহতি একেবারে নিশ্ছিদ্র নয়। বছরটি আরম্ভ হয়েছিল রেলমন্ত্রী ললিত নারায়ণের হত্যা দিয়ে। তারপর সারা দেশে দেখতে দেখতে সৃষ্টি হল ব্যাপক হিংসাশ্রয়ী পরিবেশ। উচ্চ মার্গের রাজনীতিতে এই দেশে কোনো দিন সহিংস আক্রোশের স্থান ছিল না। সেই আক্রোশও সেখানে অনুপ্রবেশ করলো। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে বানচাল করে দেবার জন্য চলল কয়েকটি গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ প্রয়াস। সবচেয়ে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে বিশ্বের চক্ষে হেয় করবার জন্য চলল অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা। সুস্থ বুদ্ধির পথে তাদের ফিরিয়ে আনবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। আভ্যন্তরীণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়লো। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বৃহত্তর জনসমাজে শোনা গেল আশঙ্কিত প্রশ্ন—আমরা চলেছি কোথায়? আমাদের গতিপথ কি অতল গহ্বর অভিমুখে?

এমনি অবস্থায় ২৬শে জুন ঘোষিত হ'ল আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ শক্তহাতে রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরলেন। নৈরাশ্য মুহূর্তে অতীতের বস্তু হয়ে গেল। যে নৈরাজ্য মনোবৃত্তি আপন কলেবর বৃদ্ধির জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, প্রথম আঘাতেই দেখা গেল সেটা ছিল দর্দুর জাতীয় প্রাণীর স্ফীতির মতো। সশব্দে সেটা ফেটে যেতে বিলম্ব হ'ল না।

ধ্বংসাশ্রয়ী শক্তিগুলির আঘাতের ফলাফলের মাধ্যমে পাওয়া গেল নতুন শক্তির সন্ধান। চেনা গেল সমাজের পুরানো শত্রুদের, যে শত্রুরা প্রকাশ্যে এবং গোপনে বসবাস করছিল বিশাল ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কোথাও তারা ছিল দৃশ্যমান, কোথাও বা অশরীরী। এই শত্রুরা ছিল আমাদের অবহেলিত অজ্ঞাত উপেক্ষিত সমাজের স্তরে স্তরে। রক্তচোষা জীবের মতো তারা পচন ধরিয়ে দিয়েছিল সমাজ দেহের অভ্যন্তরে। দারিদ্র্য, ব্যাভিচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সবই ঈশ্বর নির্দিষ্ট—লক্ষকোটি বঞ্চিত মানুষের মনে এই বিশ্বাসটাকে সঞ্জীবিত রেখে রক্তলোভাতুরের দল স্ফীত হচ্ছিল যুগ যুগ ধরে। সমাজের এই বৈরী মানুষরা বাস করছিল বোম্বাই-দিল্লী—কলকাতার গগনচুম্বী অট্টালিকা থেকে দূরতম পল্লী প্রান্তর পর্যন্ত।

রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টি ক্রমশ রাজনৈতিক স্তর থেকে অর্থনৈতিক স্তরে বিস্তৃত হল। পয়লা জুলাই তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বেতার-মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন: 'আইন লঙ্ঘন করার, জাতীয় ক্রিয়াকর্ম অচল করে দেবার এবং নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর শৃঙ্খলা ও আনুগত্যে ফাটল ধরাবার যে অভিযান চালানো হচ্ছিল তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারতো এবং দেশ তখন বিভেদপন্থী মানসিকতা ও বহির্বিপদের শিকার হতে পারতো। ঘৃণার কালো ধোঁয়া এখন খানিকটা সরে গেছে। আমরা এখন আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলি। সেই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছুবার প্রয়াসে জরুরী অবস্থা আমাদের নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বললেন: 'অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতিকারে কেউ যেন যাদু আশা না করে, কেউ যেন নাটকীয় ফল লাভের আশায় প্রবুদ্ধ না হয়। **দারিদ্র্য দূর করার ম্যাজিক একটা মাত্রই আছে—তা' হ'ল কঠিন শ্রম, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, লৌহ-দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং কঠোরতম শৃঙ্খলা।'**

★ দুঃস্বপ্নের একদিন . . . . !

"আশমান হইল টুভাটুভা
জমিন হইল ফাডা,
ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে
পানি দিব ক্যাডা।"

চাষের জন্যে অসহায় কৃষককে একদিন আকাশের এক চিলতে মেঘের দিকে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকতে হোত। বিপন্ন কৃষকের সে ছিল দুঃস্বপ্নের দিন।...

★ আর আজ . . . . ?

সেচের আশ্চর্য অফুরন্ত জলধারার বিপ্লব এসেছে কালান্তরে। সোনালী ফসল গড়ে তুলতে রূপালী অনন্ত জলধারার আমরা আজ ভগীরথ নতুন দিনে।

ক্ষুদ্র সেচের ক্রমবর্ধমান এলাকা
(লক্ষ একরে)

★
★★
★

বছর	এলাকা
১৯৪৭-৪৮	১৬.২৬
১৯৭১-৭২	২৬.৪৪
১৯৭৩-৭৪	৩০.৫১
১৯৭৪-৭৫	৩১.৩৮

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

বর্তমান এবং নিকট ও দূর ভবিষ্যতকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী একে একে বর্ণনা করলেন অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলি। প্রথম লক্ষ্য হ'ল পণ্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা এবং তাকে নীচের দিকে নামিয়ে আনা। এই আটমাসের মধ্যে পণ্যমূল্য অনেক নীচে নেমে গেছে একথা বলব না। পণ্যমূল্য বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেটা আরও বেশী লক্ষ্যণীয়, তা হ'ল কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসেছে অনেক বেশী স্থিতিশীলতা। খাদ্য ও পণ্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বন্দী কালোবাজারী মুনাফাশিকারী ও চোরাকারবারীদের সংখ্যা আগের চাইতে এখন অনেক বেশী। খুশীমতো কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির প্রবণতা এখন অনেক পরিমাণে স্তিমিত।

পণ্যমূল্যের সমস্যা হ'ল আশু সমস্যা। বহুকালের এবং বহু শতাব্দী কালের সমস্যা হ'ল পল্লী অঞ্চলের মানুষের সমস্যা যে মানুষরা ভারতীয় জনসংখ্যার বৃহদংশ। সেখানে আছে অসংখ্য ভূমিহীন মানুষ, এবং প্রচুর জমির মালিক অল্পসংখ্যক মানুষ। সমস্যার সমাধান হ'ল জমির উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া এবং নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সঙ্গে ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করা। তপশিলী, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর সমাজের কারোকেই তাদের জমি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, উৎখাত করা চলবে না। উৎখাত করার প্রচেষ্টাকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। যে সব ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক কোনো বাস্তজমি ভোগ করছে একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য, আইন ক'রে তাদের সেই জমির মালিকানা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মহাজনী ঋণের কবল থেকেও মুক্ত করতে হবে।

পয়লা জুলাই তারিখে ঘোষিত এই কর্মসূচীর অনেকটাই রূপান্তরিত হয়েছে তিন চার মাসের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে রাজ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে—ভূমিহীনদের বাস্তু জমির অধিকার অর্পণের জন্য, ঋণভারগ্রস্ত মানুষকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে জমির উর্দ্ধসীমা নির্দ্ধারণ ও ন্যস্ত জমি বণ্টনের জন্য। বস্তুত পক্ষে এখন দেশের কোথাও ভূমিহীন কৃষক বা কৃষি শ্রমিক বিশেষ নেই, থাকলেও তাদের সংখ্যা খুবই কম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, পল্লীর এই সমস্যাগুলির প্রতি বৃটিশ আমলেও দৃষ্টি পড়েছিল। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ভূমি সংস্কারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এই উদ্দেশ্যে সংবিধানও সংশোধন করা হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত সমস্যাগুলির তুলনায় ব্যবস্থাগুলি ছিল অপ্রচুর এবং সেগুলি রূপায়ণে বিভিন্ন স্তরে ছিল শৈথিল্য। তার ফলে আকাঙ্খিত ফললাভ করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সবগুলিই একেবারে নতুন নয়। পুরানোতে নতুনেতে মিশিয়ে রচিত হয়েছে এই কর্মসূচী। প্রধানমন্ত্রী বারংবার বলেছেন, ব্যবস্থা গ্রহণ এখানেই শেষ নয়। যতই দিন যাবে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে এই কর্মসূচী। নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী এখন জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত। বলা যেতে পারে, জরুরী অবস্থা এবং বৈষয়িক কর্মকাণ্ড এখন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এতবড় কর্মকাণ্ড আগে আর কখনও দেখা যায় নি। সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ভারতের প্রতি।

আমরা এখন জাতীয় জীবনের এক মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি।

চোরাইমাল ও কালো টাকা

এই পরিবর্তনের ফলাফলগুলি আমাদের চোখের সামনে। বিষধর সাপের মতো কালোবাজারী, মুনাফা শিকারী এবং চোরাই চালানকারীদের উদ্যত ফণা ধরাশায়ী হয়েছে প্রচণ্ড আঘাতে। গোপন উপার্জনের অনেকটাই আত্মপ্রকাশের রাস্তা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। হাল্কা চালের হাল্কা আওয়াজ জাতীয় জীবন থেকে নির্বাসিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষ বুঝতে পেরেছে বিশৃঙ্খল জীবনে ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। শৃঙ্খলার ছোঁয়া এখন সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে—সরকারী পর্যায় থেকে শুরু করে অতি সাধারণ পর্য্যায় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ডাক এসেছিল সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের প্রতি, কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেত মজুরদের প্রতি, স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষকদের প্রতি বড় থেকে ছোট পর্য্যন্ত সকল ব্যবসায়ীর প্রতি ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি, রাজনৈতিক ও সমাজ কর্মীদের প্রতি, সর্বোপরি প্রতিটি নারী ও পুরুষের প্রতি এবং আপামর জনসাধারণের প্রতি। গত আট মাসের নীট ফল হ'ল সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে প্রতিটি মানুষ। তারা উপলব্ধি করেছে, মানুষের মিলিত শক্তিই হ'ল জাতীয় শক্তি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কর্মসূচীকে সকল শ্রেণীর জনগণ গ্রহণ করেছে নিজেদের কর্মরূপে। তারা বুঝেছে পেতে হলে দিতেও হবে। জাতির সামগ্রিক জীবনের সর্বস্তরে এতবড় সংহতি বোধকরি এর আগে কখনও দেখা যায় নি। আমরা এখন জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক বিরাট রূপান্তরের মুখে, নতুন যুগের ভোরে দাঁড়িয়ে আমরা তারই প্রতীক্ষায় সংযত, সংহত।

ক্রেতাস্বার্থে ভোগ্যপণ্য বন্টন

এ. সি. জর্জ

১৯৭৩ এবং '৭৪ সালে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য দেখা যায়। এর ফলে বেশ কয়েক মাস ধরে মাসিক ২ শতাংশ হারে দ্রব্য-মূল্য চড় চড় করে বেড়ে যেতে থাকে। দ্রুত ধাবমান এই মুদ্রাস্ফীতি বাজারে বেশ কিছু সংখ্যক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর তীব্র সংকট সৃষ্টি করে। সাবান, বনস্পতি এবং বেবি ফুডের জন্য সারা দেশেই দোকানগুলিতে ভীড় পড়ে যায়। অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, কালোবাজারী এবং সমাজ বিরোধীরা এই কৃত্রিম অভাবের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার বাধ্য হয়েই কিছু প্রশাসনিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে জনসাধারণকে ভোগ্যপণ্য সরবরাহে নিশ্চয়তা দেওয়া ও সেই সঙ্গে সমাজের শত্রু চোরাকারবারী, মজুতদার এবং কালোবাজারীর দলকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মজুতদারী, কালোবাজারী প্রভৃতি সমস্যা-গুলি দূর করবার জন্য ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে একটি পৃথক অসামরিক সরবরাহ এবং সমবায় বিভাগ খোলা হয়। এই নতুন বিভাগটির মূল লক্ষ্যই ছিল বিভিন্ন স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা এবং ভোগ্যপণ্যের সরবরাহের ব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। বহুমুখী কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই বিভাগটি যেসব বিষয়ে দৃষ্টি দেবে তার মধ্যে রয়েছে (১) বিভিন্ন এলাকায় অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য খুচরা বন্টন কেন্দ্র স্থাপন (২) সংগঠিত শিল্পগুলি যাতে সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রী বণ্টন করে তার সুব্যবস্থা (৩) গণ-বণ্টন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপযুক্ত এলাকার নির্বাচন (৪) গণবণ্টন কেন্দ্র এবং সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলা (৫) ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়মিত এবং নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। এই প্রতিনিধিদের কাজ হবে গণ-বণ্টনকেন্দ্রগুলি এবং ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে দ্রব্যের গুণাগুণ এবং মূল্যমান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। এবং (৬) উপরের ব্যবস্থাগুলি যাতে যথাযথভাবে কার্যকর করা যায় সে ব্যাপারে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা। সবচেয়ে বড় কথা হল ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থের দিকে যথার্থ লক্ষ্য রাখা।

জরুরী অবস্থা জারির পর প্রধানমন্ত্রী যে বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন—তার সুদূরপ্রসারী সুফলগুলি এখন যথার্থই প্রতীয়মান হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ মূল্যে স্থিতিশীলতা এবং ভোগ্যপণ্যের চালাও সরবরাহ এখন সর্বত্রই পরিদৃশ্যমান। জরুরী অবস্থার সুফল শুধু মুদ্রাস্ফীতি রোধেই দেখা যায়নি—সেই সঙ্গে উৎপাদনেও এসেছে নতুন জোয়ার। ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ এখন অবাধ। এমনকি মূল্যমানও পূর্বের চেয়ে কমে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া, মজুতদার, কালো-বাজারী, মুনাফাবাজ এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের দৌরাত্ম্যও এখন স্তব্ধ করা গেছে।

গণবণ্টন সংস্থাগুলির ব্যাপক প্রসারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতি-মধ্যেই নগর এলাকাগুলিতে, ঘাটতি গ্রামীণ এলাকাগুলিতে, পার্বত্য অঞ্চলে এবং খনি অঞ্চলগুলিতে ভোগ্যপণ্য বণ্টনে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান ২.১৩ লক্ষেরও বেশী ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া, প্রধানত দেশের উত্তরাঞ্চলে ৬ হাজারটি খুচরো কয়লার দোকান, ১.৬৬ লক্ষ খুচরো কেরোসিন তেলের বণ্টনকেন্দ্র খোলা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে আরো বেশী পরিমাণে খুচরো বণ্টন কেন্দ্র খোলার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর কি শহরে কি গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতিগুলি তাদের উৎপাদন এবং কাজকর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে সমবায় সমিতিগুলির মোট ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকা। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭৫-৭৬ সালে এই ব্যবসায়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৫০০ কোটি টাকায়। সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়ন এবং প্রসারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি-গুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিতমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ ব্যবস্থারও যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে।

নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ছাত্রাবাসগুলিতে অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী

৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিদ্যুৎ-বৃত্তান্ত

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নতুন করে রাশিয়াকে গড়ে তোলার জন্যে লেনিন একবার এই সূত্র দিয়েছিলেন —সোভিয়েট আর সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডা: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই সূত্রটাই একটু বদলে নিয়ে আমাদের দেশ সম্পর্কে বলেছিলেন—উন্নতির জন্য চাই পঞ্চায়েৎ আর সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ। যেভাবেই কথাটা বলা হোক না কেন, দুই দেশনেতাই দেশের উন্নয়নে বিদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেশের উন্নয়নের ছক তৈরির সময়েও বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর তাই যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। তার ফলে উৎপাদনক্ষমতাও বেড়ে চলেছে বছরের পর বছর। আগে মনে করা হতো, বিদ্যুতের দরকার শুধু বুঝি কলকারখানার, এখন কিন্তু আমরা ক্রমশ বেশি করে দেখতে পাচ্ছি, চাষের ক্ষেতে ফলন বাড়ানোর ব্যাপারেও বিদ্যুতের ভূমিকা কম বড় নয়। মাঝখানে বিদ্যুতের উৎপাদন প্রয়োজন মতো না-হওয়ায় আমাদের যে-সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার ফলে বিদ্যুতের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আরো সচেতন হয়ে উঠেছি, এ-কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

এক দশকের অগ্রগতি

একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫১ সালে আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজ সুরু হওয়ার পর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সামর্থ্য প্রায় দশ গুণ বেড়েছে। এই অগ্রগতির বেশীটাই ঘটেছে গত এক দশকে। চতুর্থ যোজনার শেষে (অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের মার্চে) বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা দাঁড়ায় ১৮,৪১০ মেগাওয়াট। তারপর পঞ্চম যোজনার প্রথম বছরে (১৯৭৫ সালের মার্চ পর্যন্ত) আরো ১৭২০ মেগাওয়াট অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ঐ সময় পর্যন্ত ছিল ২০,১৩০ মেগাওয়াট। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের। মোট উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকেরও বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রেই (১১,৯৯০ মেগাওয়াট)। তারপরেই স্থান হলো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের। এই সব কেন্দ্রের ৭২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে কয়েক বছর আগে যুক্ত হয়েছে নতুন এক ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র—পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। মহারাষ্ট্রের তারাপুরে এবং রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা এখন যথাক্রমে ২০০ এবং ২২০ মেগাওয়াট।

দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আরো বেড়ে যেত যদি চতুর্থ যোজনায় এই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করা যেত। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৭৪-৭৫ সালের বৈষয়িক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ঐ সময় এক দিকে জিনিসপত্রের দাম চড়ে যায়, অন্যদিকে টাকাকড়ির টানাটানি দেখা দেয়। তার ওপর ইমারতী মালমশলার অভাবে নির্মাণকার্য বাধা পায়, সব যন্ত্রপাতিও সময়মতো এসে পৌঁছয় না। সে যাই হোক, পঞ্চম যোজনায় এখন এই ত্রুটি পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং চতুর্থ যোজনার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার উদ্যোগ চলছে। চলতি যোজনার পাঁচ বছরে উৎপাদন ক্ষমতা আরো ১৪ হাজার মেগাওয়াটের মতো বাড়াবার চেষ্টা করা হবে।

কিন্তু দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন সামর্থ্য বৃদ্ধি আর প্রকৃত উৎপাদন এক কথা নয়। কথাটা দুঃখের হলেও সত্যি যে, আমরা আমাদের দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন সামর্থ্যকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। তার ফলে মাঝে-মাঝেই আমাদের বিদ্যুৎ সংকটে ভুগতে হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালের বিদ্যুৎ সংকটের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। উৎপাদন সামর্থ্যকে পুরোপুরি কাজে না-লাগাতে পারার কারণও একাধিক। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পন্থ সম্প্রতি কলকাতায় এক ভাষণে এই সব কারণের কয়েকটি উল্লেখ করেন। আমরা আগেই
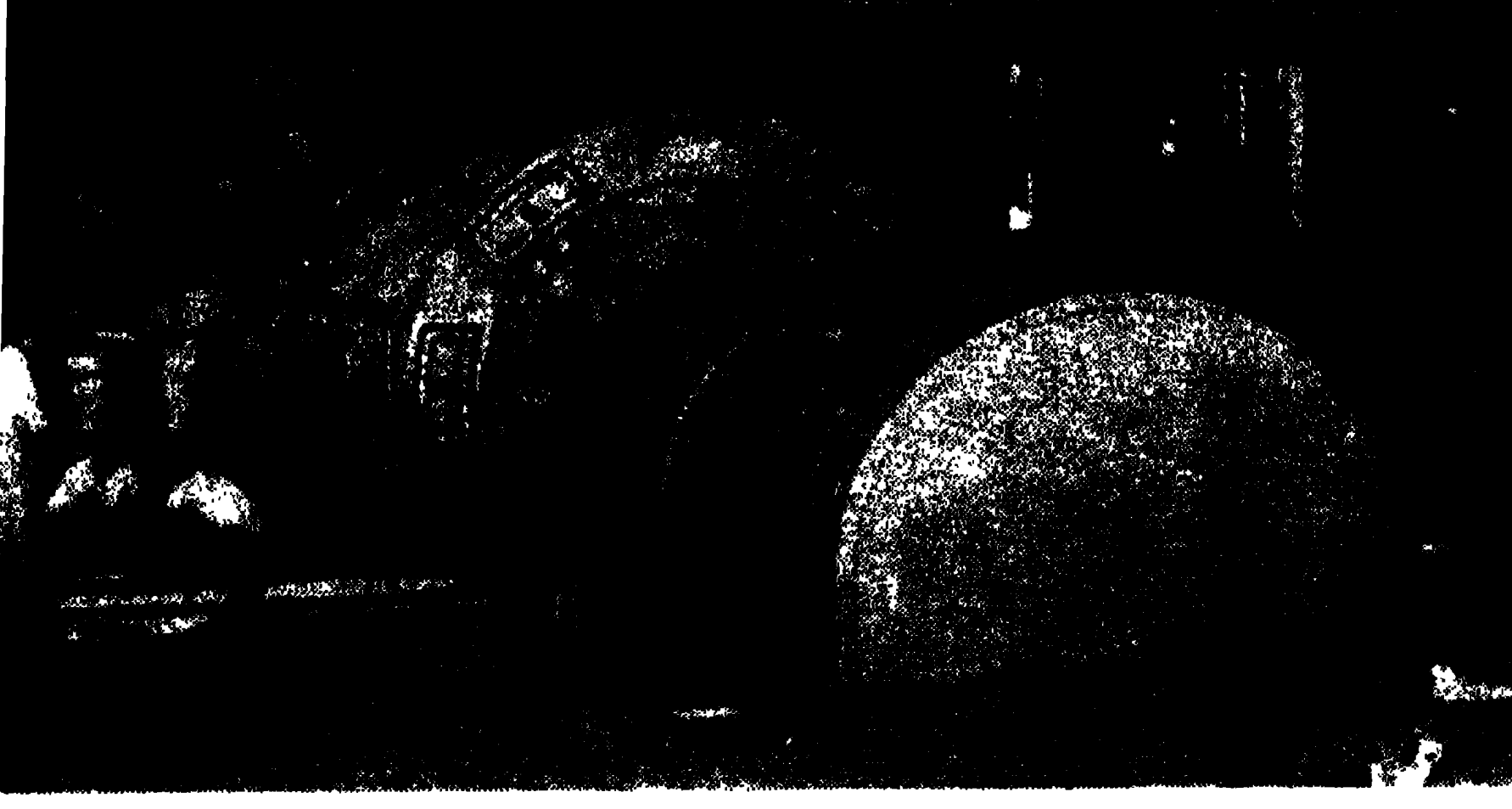
সাঁওতালডিহির সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় ইউনিট (১২০ মেগাওয়াট)

দেখেছি, দেশের মোট উৎপাদন সামর্থ্যের একটা বড় অংশ হলো জলবিদ্যুৎ। কিন্তু পূর্বোক্ত দু'বছরে আকাশ যথেষ্ট কৃপা না-করায় চাষ-বাসের মতো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও মার খায়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কয়লার নিম্নমান, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি এবং যন্ত্রাংশ সময়মতো না-পাওয়ার ফলে যথেষ্ট বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় নি।

কিন্তু যেটা আশার কথা তা হলো, বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্যে গত বছর থেকেই চেষ্টা সুরু হয়েছে এবং তার সুফলও মিলতে সুরু করেছে। চতুর্থ যোজনায় নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির লক্ষ্য পূরণে যে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিল তা যেমন পুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তেমনই চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতেও আরো বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা গেছে। একটি হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৭৪-৭৫ সালের শেষ সাত মাসে উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার আগের বছরের ঐ সময়ের তুলনায় শতকরা বারো ভাগ বেড়ে যায়। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর অবশ্য অবস্থার আরো উন্নতি হয়েছে। আগে যেখানে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ছিল শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ, এখন সেটা শতকরা দু ভাগের বেশি নয়।

কিন্তু শ্রীপন্থ কিছু দিন আগে ঠিকই বলেছেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে আত্ম-তুষ্টির মনোভাব গ্রহণ করলে শেষ পর্যন্ত তা হবে রীতিমতো বিপর্যয়কর। বাড়তি বিদ্যুৎ চাইলেই পাওয়া যায় না। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে রীতিমতো সময় লাগে। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে এক দিকে যেমন দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী দরকার তেমনই দরকার যথেষ্ট লগ্নী। উল্লেখযোগ্য যে, চলতি বছরের যোজনায় বিদ্যুৎ খাতে লগ্নীর পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে রীতিমতো, গত বছরের তুলনায় শতকরা ৪৬ ভাগ। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন, বণ্টন এবং উৎপাদন কেন্দ্রের সংগঠনের ব্যাপারটাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার উদাহরণ বিশালাকার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পরি-কল্পনা। এই ধরনের চারটি কেন্দ্র তৈরি হবে (একটি হবে পশ্চিমবাংলার ফারাক্কায়)। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভবিষ্যৎ নক্সা তৈরির সময় একটি বিশেষ রাজ্যের কথা ভাবা হচ্ছে না, ভাবা হচ্ছে কয়েকটি রাজ্যকে নিয়ে গঠিত এক-একটি অঞ্চলের কথা। এই জন্যে গোটা দেশকে ভাগ করা হয়েছে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার জন্যে গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ পর্ষদ। এর ফলে বিদ্যুতের সমবণ্টনের পথ প্রশস্ত হবে এবং এক এলাকায় বিদ্যুৎ ঘাটতি পড়লে অন্য এলাকা থেকে তা যোগানোর চেষ্টা করা যাবে। এই যে প্রক্রিয়ার সুরু হয়েছে তার সার্থক পরিণতি হবে সেই দিন যেদিন একটি জাতীয় গ্রিড (ন্যাশনাল গ্রিড) তৈরি হবে, অর্থাৎ দেশের যাবতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা একটি সূত্রের দ্বারা সংযুক্ত হবে।

গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্পর্কে কিছু না-বললে অবশ্য বিদ্যুৎ-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ হয় না। গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার প্রধান লক্ষ্য শুধু গ্রাম-ভারতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করা নয়, গ্রামের উন্নয়নে সাহায্য করা। গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সহায় বিদ্যুৎ, কারণ বিদ্যুতের সাহায্যে কূপ বা নলকূপ থেকে জল তুলে চাষের ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে ফলন না বেড়ে পারে না। সেই সঙ্গে এর ফলে কুটীর শিল্পেরও প্রসার ঘটতে পারে। চতুর্থ যোজনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ কিছুটা ব্যাহত হলেও গ্রাম বৈদ্যুতীকরণ কর্মসূচী রূপায়ণে কিন্তু কোনো শিথিলতা দেখা দেয় নি। বিদ্যুৎ-প্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ঐ যোজনার পাঁচ বছরে দু'গুণ হয়ে যায় এবং পাম্প সেটে বিদ্যুৎ-সংযোগের সংখ্যাও বাড়ে একই হারে। চতুর্থ যোজনার শেষে দেখা যায় বিদ্যুৎ পৌঁছেছে এক লাখ ৫৬ হাজার গ্রামে এবং প্রায় ২৫ লাখ পাম্প সেট বিদ্যুৎচালিত হয়েছে। পঞ্চম যোজনায় গ্রাম বৈদ্যুতীকরণের কাজ আরো জোরদার করার চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা সফল হলে, ১৯৭৯ সাল নাগাদ দেশের প্রায় আড়াই লাখ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে এবং প্রায় ৪০ লাখ পাম্পসেট বিদ্যুৎচালিত হবে। গ্রাম বৈদ্যুতীকরণের ব্যাপারে সব রাজ্য অবশ্য সমান সফল হতে পারে নি। পশ্চিম বাংলার মতো যে-সব রাজ্য কিছু দিন আগে পর্যন্তও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল সেখানেও নতুন উদ্যমে এই কাজ সুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রামে পৌঁছানোর ফলে গ্রামাঞ্চলে নতুন সমৃদ্ধি দেখা দিলে তাতে পরোক্ষভাবে শহরেরও লাভ. কারণ তখন আর গ্রামের মানুষ কাজের আশায় দলে-দলে এসে শহরে ভিড় জমাবে না।

মহিলাবর্ষে গ্রামীণ নারী

সুলেখা ঘোষ

সম্প্রতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে দেশের উন্নতি গ্রামীণ উন্নতির ওপর নির্ভর করে। কাজেই দেশের উন্নতি করতে গেলে গ্রাম ভারতের সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। গ্রামের উন্নতিতে তাই সাধারণ লোকের আত্মনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে একান্ত ভাবেই।

প্রধানমন্ত্রীর কথার রেশ টেনে বলতে চাই যে গ্রাম ভারতের সামগ্রিক সমস্যাগুলি সমাধানে পুরুষ এবং মহিলার যুক্ত প্রচেষ্টার দরকার। একজনকে বাদ দিয়ে সমাজ এগিয়ে যেতে পারেনা। হাজার হাজার ঘর নিয়েই আমাদের সমাজ। সেই ঘরের ঘরণী হলেন মেয়েরা। ঘরকে সুন্দর করে গড়ার দায়িত্ব মেয়েদেরই। গ্রামবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা সবই সফল করে তোলা সম্ভব যখন তা ঘর থেকে আরম্ভ হবে।

সমাজ উন্নয়ন কাজের যারা উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা এ সত্য বুঝেছিলেন। তাই ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সমাজ উন্নয়ন কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের মধ্যেও কাজ আরম্ভ করা হয়।

সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারবর্ত সঙ্কীর্ণ পথে এই মেয়েরা আলোক বর্তিকা হাতে প্রথম গ্রামের ঘরে ঘরে আসে। সে আজ ২০ বছরেরও ওপর হয়ে গেলো। নানা বাধা বিপত্তি যেমন তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, আবার অনেক তরুণী আনন্দে এগিয়েও এসেছিলেন তাঁদের ডাকে। নতুন কথা, নতুন চিন্তা ও নতুন জগতের স্বাদ গন্ধ নেওয়ার জন্য।

সমিতির কাজের মধ্যে রয়েছে কুটির শিল্প হিসাবে নানা রকম হাতের কাজ, রান্না গৃহের সংস্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তাছাড়া সবজি বাগান করা ইত্যাদি। সমিতির সভ্যরা সবাই মোটামুটি শিক্ষিত। গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েরাও যাচ্ছেন। নিজেদের জ্ঞান বাড়িয়ে তাঁরা নিজেদের উন্নতি করছেন। কিন্তু গ্রামের এই মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের বাইরে আরও মা ও মেয়েরা আছেন, যাঁদের নেই কোন আক্ষরিক জ্ঞান, পরিচ্ছন্নতা শিশুর যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে ধারণা। এদের সংখ্যাও অবহেলার নয়।

এদের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজের দরকার এখন খুব বেশী। এই সমিতির মধ্য দিয়ে এই মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা এইসব মেয়ে ও শিশুদের সাহায্য করতে চান। এই অতি দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের স্কুলের সুযোগ সুবিধা নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ এদের মধ্যে অনেকেই এখন জানতে শিখতে আগ্রহী। এইসব মেয়েদের সমিতির সদস্যরা লেখাপড়া শেখাতে চান। বয়স্কদের জন্য অক্ষর পরিচয়। সেই সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।

এই সবের জন্য তাদের দরকার কিছু অর্থের। যেমন বই, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল ইত্যাদি কেনার জন্য সামান্য অর্থ সাহায্য। বর্তমানে মেয়েদের মধ্যে কাজের জন্য বাজেটে কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। এই সামান্য খরচটুকু করার কোন সংস্থান না থাকায় এই সব মেয়েরা তাদের কাজ সমিতির বাইরে ছড়িয়ে দিতেও পারছেন না।

আজকের এই মহিলা বর্ষে মহিলাদের উন্নতি করা বলতে শুধু যারা আলো-পেয়েছেন তাদের জন্য আরও আলো, আরও সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা করাই নয়, যারা কিছু পাননি যাদের কিছুই নেই তাদের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের জন্য নতুন করে কার্যসূচী নিয়ে শিক্ষার আলোক তাদের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তবেই হবে সত্যিকার গ্রামীণ সমাজের উন্নতি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছোট ছোট কৃষকদের উন্নতির জন্য চিন্তা করছেন। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য নানা পরিকল্প নিয়ে এগিয়ে আসছেন। সেই সঙ্গে এই সব ছোট ছোট ঘরে মা ও শিশুদের উন্নতির জন্য প্রকল্পও রয়েছে!

ছোট ছোট কৃষকদের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্ত্রী ও সন্তানরাও যদি শিক্ষা পেয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার করার সুযোগ পান—তখনই সমগ্র সমাজ এগিয়ে যাবে এবং দেশেরও উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে।

সম্প্রতি সুযোগ এলো মেয়েদের মধ্যে উন্নয়ন কাজের প্রসার দেখার। গিয়েছিলাম মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর ১ নং ব্লকের উদ্যোগে গঠিত চাঁদরা গ্রামের মহিলা সমিতি দেখে এলাম।

সদর শহর থেকে ১২ মাইল দূরে, গ্রামের বেশ ভেতরে এই সমিতি। যে রাস্তা ধরে আমরা চললাম তা অতি সুন্দর। নীচু পাহাড়ের গা ঘেসে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাকা সড়ক। লাল পাথুরে মাটি। চোখের তৃপ্তিদায়ক হলেও তার নিঃস্বতাই বেশী করে প্রকাশ করে।

১২ মাইল পথের দুপাশে ঘন জঙ্গল পেরিয়ে শেষে যে ঘরটিতে আমাদের নিয়ে তোলা হলো সেটি একটি সুন্দর মাটির বাড়ী, খড়ে ছাওয়া চাঁদরার মহিলা সমিতির কেন্দ্র, নাম নিবেদিতা মহিলা সমিতি। সমিতির সেক্রেটারী স্থানীয় স্কুল শিক্ষকের স্ত্রী। তিনি সমিতি গড়ার প্রেরণা পান গ্রামসেবিকার কাছে। সমিতিতে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসেন গ্রামের অনেক মেয়ে ও বৌ। গ্রামের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের বাইরের খবর জানতে ও নিজেদের জীবনে তা গ্রহণ করতে। তাঁদের আগ্রহ জানার। নিজেদের জ্ঞান সবাইয়ের মধ্যে বিলিয়ে কারও অভিজ্ঞতা বাড়ানো।

সুখী গৃহকোণ

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

'ধরণীর এককোণে রহিব আপন মনে, ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা করেছিনু আশা।' সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন আজ কে না দেখে এই পৃথিবীতে? প্রতিদিনের কাজের শেষে মানুষের আন্তরিক আশ্রয় তার গৃহকোণ।

নবীন ভারতের রূপকার পণ্ডিত জহরলাল নেহরু জাতির গড়ে ওঠার পিছনে আবাসনের ভূমিকার কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এক বাণীতে তিনি বলেছেন, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের তালিকায় আহার্য ও পরিধেয়ের পরই আবাসনের স্থান। যৎসামান্য ব্যয় করেও সুন্দর পরিবেশ রচনা করা চলে। যে পরিবেশে মানুষ বাস করে, শিশু বড় হয়ে ওঠে, তাদের উপর সে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। তাই জনগণের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধিতেই সরকারী উন্নয়ন প্রয়াস সীমিত থাকবে না, তাঁদের জীবনের ধ্যানধারণায় মনোরম পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা বোধ সঞ্চারিত করতে হবে।

কিন্তু পরিকল্পিত গৃহনির্মাণ না হলে মনোরম পরিবেশে মনোমুগ্ধকর গৃহকোণ কোনভাবেই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ভারতের বিপুল জনসংখ্যার কথা মনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রীয় ও সকল রাজ্যসরকারকে সাধারণ মানুষের সুস্থ ও সুখী পরিবেশে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহনির্মাণের ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তাই গত এক দশকে দেশে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটছে।

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জাতীয় গৃহনির্মাণ সংস্থা যে হিসাব তৈরী করেছেন সে অনুযায়ী পঞ্চম পরিকল্পনার গোড়ার দিকে দেড়কোটি বাড়ির প্রয়োজন।

শহরে এবং গ্রামে কম আয়ের জনগণের আবাসন গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ মন্ত্রক ১৯৫২ সাল থেকে ন'টি গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। এগুলি হল, শিল্পশ্রমিক দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণের জন্য পূর্ণসাহায্যপ্রাপ্ত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, স্বল্প আয়বিশিষ্ট জনগণের জন্য গৃহনির্মাণ, চা-বাগানের কর্মীদের জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা, পল্লী গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, মধ্যম আয়ের জনগণের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য ভাড়ার গৃহনির্মাণ যোজনা, জমি অধিকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পল্লীঅঞ্চলে ভূমিহীন কর্মীদের জন্য গৃহনির্মাণের জমি দেওয়ার পরিকল্পনা।

চা-বাগানের কর্মীদের জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত আবাসন পরিকল্পনা ছাড়া অন্য সবরকম গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাই এখন রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্ব। উপরিউক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ-মন্ত্রক রাজ্য-সরকারকে সাহায্য করছেন। চা-বাগানের কর্মীদের জন্য গৃহনির্মান প্রকল্পটি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও গৃহনির্মাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ সারোগী দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চলের চা-শ্রমিকদের গৃহ-সমস্যা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার চা-শ্রমিকদের গৃহনির্মাণ বিষয়ে যে কল্যাণমুখী পরিকল্পনা রচনা করেছেন তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বদ্ধপরিকর। এ বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলে গৃহহীনদের জন্য রাজ্যসরকার ৩০,০০০ গৃহনির্মাণ করবেন। এ বছরে অন্যান্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে এটিকেই রাজ্য সরকার সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজ্য গৃহ-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ সারোগী সাংবাদিকদের বলেছেন, ইতিমধ্যে পাঁচ-হাজার গৃহনির্মাণ বিভিন্ন জেলায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। গৃহহীনদের পাঁচশত টাকার গৃহনির্মাণ দ্রব্যাদি সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে আরও অন্যান্য সাহায্য। এছাড়া উত্তরবঙ্গের নিউ-জলপাইগুড়ি স্টেশনের কাছে রাজ্য সরকার গড়ে তুলছেন একটি উপনগরী। এর জন্য ২৭২ একর জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। এখানে তৈরী হবে সমাজ কল্যাণ পরিকল্পনায় তিরিশ হাজার বাড়ি, সুপার মার্কেট, ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা, শহরতলী এবং বিভিন্ন জেলায় গৃহনির্মাণের কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে মধ্য ও নিম্নবিত্তরা যাতে নিজেরাই নিজেদের ফ্ল্যাটের মালিকানা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য বিশেষ সুযোগ আবাসন পর্ষদের বাড়িগুলিতে দেওয়া হচ্ছে।

নববঙ্গের রূপকার স্বর্গত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের স্বপ্ন দিয়ে গড়া লবণ হ্রদ উপনগরীতে সরকারী গৃহনির্মাণ উদ্যোগ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। সরকারী ফ্ল্যাট ছাড়াও নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষদের গৃহনির্মাণে ওয়েষ্ট-বেঙ্গল স্টেট হাউসিং ফিনান্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড বিশেষভাবে এগিয়ে আসে। রাজ্য সরকার উদারহাতে মূলধন বিনিয়োগে অংশ গ্রহণ করে ও জীবন-বীমা কর্পোরেশন থেকে ঋণের জামিনদার হয়ে সোসাইটির গৃহনির্মাণ কর্মসূচীর সাফল্যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনে সাহায্য করে বা গঠিত সমবায় সমিতিগুলিকে সহজ শর্তে বাড়ি তৈরীর ঋণদান করে সোসাইটি গৃহনির্মাণ প্রকল্পকে রূপায়িত করে চলেছে। গৃহনির্মাণে এর ঋণ দানের

ক্ষেত্রে শহর থেকে পল্লী সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—এপর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ১৩০৫টি গৃহনির্মাণে সোসাইটি ঋণ মঞ্জুর করেছে আর কলকাতার ক্ষেত্রে এ গৃহের সংখ্যা ১১৭০। বাড়ির জমিসংগ্রহের ব্যাপারেও সোসাইটির উদ্যোগ প্রসারিত হয়েছে—সোসাইটি সম্প্রতি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪·৭৫ একর জমি কিনেছে, এ জমিতে ২০টি প্রাথমিক সমবায়ের মাধ্যমে ৬৪০টি ফ্ল্যাট তৈরী করা হবে। এছাড়া লবণ হ্রদ উপনগরীর মুখে কেন্দ্রীয় গৃহ ও নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন মধ্য ও নিম্নবিত্তদের জন্য একটি গৃহনির্মাণ প্রকল্প সম্পূর্ণ করেছে।

উল্টাডাঙ্গায় গৃহ ও নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন নির্মিত আবাস

কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক গৃহনির্মাণ প্রকল্পের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগ পর্যন্ত মোট ৪৬৯.৯১ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। পঞ্চম পরিকল্পনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির যুক্ত উদ্যোগে গৃহনির্মাণ বাবদ ৫৮০.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব আছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে গৃহনির্মাণ বাবদ ৭৬.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা আছে। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন জনগণের গৃহনির্মাণের জন্য জমি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৬.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। চা বাগানের কর্মীদের জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায় কেন্দ্রের পক্ষে ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

বিভিন্ন সামাজিক গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার মাধ্যমে যে ৮৮২৬৬১টি গৃহনির্মাণ প্রস্তাবিত হয়েছিল তার মধ্যে ৬৪৩৮২২টি গৃহ সম্পূর্ণ হয়েছে। পল্লীঅঞ্চলে ভূমিহীন কর্মীদের ভূমি দেওয়ার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাইয়ের বেতার ভাষণে ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উল্লেখ করতে গিয়ে এই পরিকল্পনার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই উক্তি স্মরণীয় : পল্লীঅঞ্চলে গৃহনির্মাণের জন্য ভূমি দেওয়ার যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা আরও বিপুলভাবে সম্প্রসারিত করা হবে। ভূমিহীন যে সব কর্মী তাঁদের জমিদারের জমিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহনির্মাণ করে আছেন তাঁদের সেই ভূমির অধিকার দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। তাঁদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা কঠোরভাবে দমন করা হবে। পঞ্চম পরিকল্পনার মধ্যে ভূমিহীন কৃষিকর্মীদের গৃহনির্মাণের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ ভূমি দেয়া হবে। রাজ্য সরকারগুলি এপর্যন্ত ৩২ লক্ষ ৪২ হাজার ৪০৬টি গৃহনির্মাণের ভূমি বণ্টন করেছেন। এর মধ্যে ২৯ লক্ষ জমি পেয়েছেন অনুন্নত শ্রেণীর লোক।
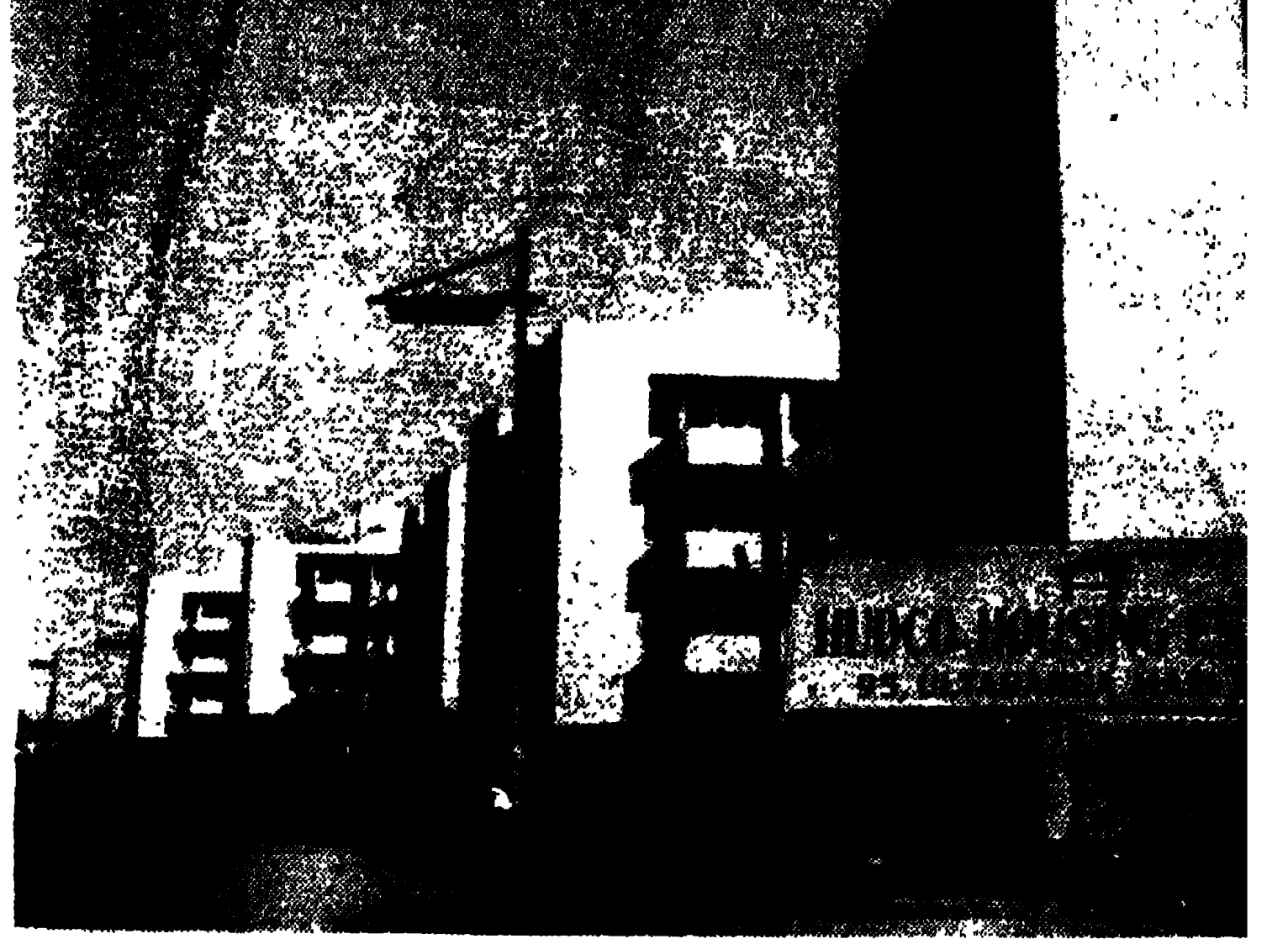
সারাভারতব্যাপী সরকারী উদ্যোগে গৃহনির্মাণের যে বিপুল কর্মকাণ্ড চলছে তাকে সার্থক করে তুলতে চারটি প্রধান সংস্থা কাজ করছে। এগুলি হলো : জাতীয় গৃহনির্মাণ সংস্থা, জাতীয় গৃহনির্মাণ কর্পোরেশন লিমিটেড, গৃহনির্মাণ এবং নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন ও হিন্দুস্থান গৃহনির্মাণ কারখানা।

কেন্দ্রীয় সরকার কল্যাণমূলক পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের গৃহনির্মাণে অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করতে সুরু করেছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে এই পরিকল্পনা চালু রয়েছে। যে সব কেন্দ্রীয় কর্মচারী কর্মে স্থায়ী হয়েছেন অথবা ১০ বছর যাবৎ কাজ করছেন তাঁদের বাড়ি তৈরী করা বা তৈরী বাড়ি কেনার জন্য অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অগ্রিম দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় কর্মীর ৭৫ মাসের মাইনে অথবা ৭০,০০০ টাকা যেটা কম হয়। বর্তমান বাড়ি আরও বাড়ানোর জন্য ৭৫ মাসের মাইনে অথবা ২৫ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। কম মাইনের সরকারী কর্মচারী, যাঁদের ৭৫ মাসের মাইনে ৪০,০০০ টাকার বেশি নয় তাঁদের জন্য সর্ব্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। ২৪০টি কিস্তি অথবা আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের আগে এই টাকা আদায় করা হয়।

মেট্রোপলিটন নগর উন্নয়ন ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা পঞ্চম পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে।

সুসংহত নগর উন্নয়নের কাজে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৪.৫১ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে সি. এম. ডি. এর কর্মসূচীর জন্য সাড়ে সাত কোটি টাকাও মঞ্জুর করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে রাজ্যে সাধারণ মানুষকে সুস্থ আশ্রয় দেবার মানসে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে সুরু করে গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষককেও মাথা গোজার আশ্রয় দিতে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি সাফল্যের দশক রচনা করে চলেছে।

গ্রন্থ আলোচনা

মধ্যযুগীয় ভারতে গেরিলা সংগ্রাম ও অষ্টাদশশতকে মুঘল শাসন পদ্ধতির স্বরূপ—জগদীশ নারায়ণ সরকার, রত্ন প্রকাশন, ১৪-১, পিয়ারী মোহন রায় রোড, কলকাতা-২৭

আজকের বিজ্ঞান জগতে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রের আবিষ্কার ঘটলেও—এখনো পৃথিবী থেকে গেরিলা বাহিনীর কার্যকলাপ নিঃশেষিত হয়ে যায়নি—তার প্রমাণ মধ্যপ্রাচ্য, ভিয়েতনাম, এঙ্গোলা কিংবা আফ্রিকার কয়েকটি মুক্তিকামী দেশ। প্রতিপক্ষ শত্রু যে যত বড়ই হোক না কেন তাকে ঘায়েল হতে হয়েছে গেরিলা বাহিনীর কাছেই। এতে সুফল যে পাওয়া গেছে, তার জলন্ত উদাহরণ ভিয়েতনাম। এছাড়া আরো অন্যান্য বহু দেশেও বৃহৎশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে গেরিলা কার্যকলাপকেই। সাধারণভাবে, শত্রু যখন আক্রমণ করে তখন গেরিলারা গা ঢাকা দেয় অর্থাৎ সম্মুখ সমরে মোকাবিলা করার সাধ্য তাদের নেই—আবার শত্রুর বিশ্রামের সুযোগে এরা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে একটি পুরোবাহিনীকে নিঃশেষ করে দেয়।

ভারতের মধ্যযুগেও এই গেরিলা-বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তখনকার প্রবল মুঘল বাহিনীকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল শিবাজীর বাহিনীর কাছে। এছাড়া "সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আজমীরে প্রত্যাবর্তনের পর (১৬৮০) মাড়াবারের রাজপুতগণ আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে মুঘলদের সরবরাহ শকটগুলি বন্ধ ও দলভ্রষ্ট ব্যক্তিদের বিনষ্ট করে দিত"। "জয়সিংহের নেতৃত্বে বিজাপুর অভিযানে (১৬৬৫) বিজাপুরবাসীরা মুঘলবাহিনীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সামনের ও পিছনের দিকে আক্রমণ চালিয়ে মুঘলবাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।" এইসব ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যায় যে, গেরিলা কার্যকলাপ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী হলেও এর উৎপত্তি কিন্তু ভারতেই। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে এর ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

লেখক একজন ইতিহাসের অধ্যাপক। তাই ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই বিভিন্ন তথ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন তিনি। তবে, একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, এই গ্রন্থ সর্ব-সাধারণের চেয়ে ইতিহাস-শাস্ত্রের ছাত্রদের কাছেই আদৃত হবে—লেখাও হয়েছে ঠিক সেভাবেই। এতে ভাষার গোলমালও অনেক পরিলক্ষিত হল।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থে মুঘল শাসন-ব্যবস্থা (অষ্টাদশ শতকের) বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীকে মুঘল শাসনের অন্ধকারের যুগ বলা যায়। বাবর-আকবরের সুনিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ় শাসন কাঠামো কিভাবে বালির বাঁধের মত ধসে গেল তারই ইতিবৃত্ত বিভিন্ন ঘটনাসহ লেখক প্রকাশ করতে যত্নবান হয়েছেন।

বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল রাজতন্ত্রের এক বিরাট পরিবর্তনের ফলে পূর্বযুগের সম্রাটদের সার্বভৌম স্বৈরতন্ত্র চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়। বলা যায় বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের (১৭০৭-১২) থেকেই মুগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদে পচন লাগে। এই সম্রাট শান্ত-প্রকৃতি ও বদান্য হলেও রাজকার্যে অমনোযোগী ছিলেন বলে তাকে অবজ্ঞাভরে শাহ-ই—বেখবর বলা হত। তৎকালীন মুঘল সম্রাটদের অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতার নানা কীর্তিকলাপকে এমন সুনিপুণভাবে লেখক বিবৃত করেছেন যে, ইতিহাস গবেষকদের কাছে এর মূল্য অনেকখানি।

উৎপল সেনগুপ্ত

ক্রেতা স্বার্থে—ভোগ্যপণ্য বন্টন

২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

নিয়ন্ত্রিতমূল্যে সরবরাহ সুনিশ্চিত হয়েছে। দেশের ১৬টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের ৪ হাজারের মত ছাত্রবাস-গুলিতে প্রায় ৩ লক্ষ ছাত্র এখন উপকার পাচ্ছেন। কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রথা বাতিল করা হয়েছে। যেমন চিনি, বনস্পতি, সিমেণ্ট এবং কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে এখন থেকে কোন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান খোলা যাবেনা।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার সফল পদক্ষেপ-গুলির মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়ীদের এখন থেকে মূল্যতালিকা এবং মজুতমালের পরিমাণ সম্পর্কে তালিকা ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ। ভোগ্যপণ্যের ওজন এবং পরিমাপের ক্ষেত্রেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে প্যাকেটজাত সামগ্রীর উপরে জিনিষের ওজন, পরিমাণ, উৎপাদনের তারিখ এবং মূল্য আবশ্যিক-ভাবে লেখার নির্দেশও জারি হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যারা এখন থেকে এই নির্দেশ লংঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও আগেকার আশা আকাংখাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। উৎপাদনে নতুন জোয়ার দেখা দেওয়ায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও দিন কে দিন বেড়েই চলেছে। এখন ভোগ্যপণ্যের কোন প্রকার সংকট নেই। বরং উৎপাদন অব্যাহত থাকায় পণ্য সামগ্রীর দাম কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাস পাচ্ছে। বাস্তবিক এটা খুব আশার কথা যে, আজ যখন পৃথিবীর বহু উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশ কমবেশী মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন তখন আমরা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির চাপকে রোধ করতে সমর্থ হয়েছি। এটা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে কম বড় কৃতিত্ব নয়।

বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এক দশক

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে, উদারতার মাধ্যমে প্রতিবেশী রাজ্যের সৌহার্দ্য জয় করেছি।

এই তো সুর এই তো শুরু

আমাদের পর্বতে, প্রান্তরে, শস্যক্ষেতে, শিল্পে, কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্খা আর স্বপ্ন আমাদের প্রিয় নেত্রীর নেতৃত্বের পরিকল্পনা আর বিশ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে পাকা ফসলের সুগন্ধে উৎপাদনের আনন্দে ন্যায় বিচার আর সকলের জন্যে সমান সুযোগের নিরাপত্তায় সফল হতে চলেছে। ভারত আজ এক। লক্ষ্য আজ এক। লক্ষ্য আছে সকলের সমান প্রগতি। রাজ্যে রাজ্যে প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতা। এই দেশ, দেশের সম্পদকে ভাগ নয় সমান ভোগ—এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। গোদাবরী আজ বয়ে চলেছে পাঁচটি রাজ্যের মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে, বইছে নর্মদা, কৃষ্ণা গঙ্গা। নদী ধুয়ে নিয়ে গেছে প্রাদেশিক বিরোধ। নদী চুক্তির সহজ সমাধান এই দশকেরই দান।

দুটো কারণে আমরা শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে চাই। প্রথমত আমরা যাতে আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি সেজন্য। দ্বিতীয়ত, আমরা চাই আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়িত করতে। স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে যে দারিদ্র্য রয়েছে লড়াই করে আমরা তাকে হটাতে চাই।

আমাদের শক্তিই আমাদের প্রগতি

আমাদের শক্তিই আজ আমাদের প্রগতি। আমাদের আনন্দই আজ একমাত্র আন্দোলন। আমাদের প্রান্তরে সোনালী চাঁদের আলো ফসলের ক্ষেতে, আমাদের সব স্বপ্ন আজ শস্য দানার আনন্দে ছড়ানো থাক। দশক থেকে দশকে প্রগতির গতি প্রবাহিত হোক এই ভাবে।

শ্রমিক স্বার্থে বোনাস

উৎপল সেনগুপ্ত

হরিপদ কয়াল এবার খুব খুশি। কেননা, এবার সে কোম্পানী থেকে বোনাস পাবে। আগে সে কোনদিনই বোনাস পাবার কথা কল্পনা করতে পারে নি। কারণ তার কোম্পানী ছোট। তারপর আবার সবমিলিয়ে মাত্র এগারোজন শ্রমিক। সেজন্য মালিক মুনাফা করলেও তাদের প্রত্যাশা কিছুই থাকত না। এবার আর তা হওয়ার উপায় নেই। সরকার ঘোষণা করেছেন, ন্যূনতম দশজন কর্মী থাকলে এবং কোম্পানীর মুনাফা হলে প্রত্যেক শ্রমিক এবার থেকে বোনাস পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শুধু হরিপদ কেন? এরকম ঘোষণায় দেশের আরো কয়েক লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ এবার উপকৃত হবে,—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত অর্ডিনান্সের বলে। গত ২৫ সেপ্টেম্বরের (৭৫) ঘোষিত অর্ডিনান্সে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৫ সালের প্রদত্ত বোনাস আইন অনুসারে প্রত্যেক শিল্প ইউনিট শতকরা ৪ ভাগ বোনাস দিতে বাধ্য থাকবে। এই অর্ডিনান্সটির বদলে সম্প্রতি একটি বিলও সংসদে পাশ হয়েছে।

বোনাসের গোড়ার কথা

বোনাস ব্যবস্থা আমাদের দেশে নতুন নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমিকদের এদেশে প্রথম বোনাস দেওয়া হয় 'এক্স-গ্রাসিয়া' হিসাবে। দীর্ঘদিন এটা কোন আইনানুগ ব্যবস্থা ছিল না। মূলত এটি সাম্য, ন্যায় ও শ্রমে শান্তি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বোনাস' রীতিমত চালু হয়। অবশ্য সেই সময়েও নির্ধারিত ছিল যে, কোন কোম্পানীর মুনাফা যথেষ্ট না হলে শ্রমিকরা সেখানে বোনাস পাবে না। এখন গণতান্ত্রিক ভারতে শ্রম বিরোধের ক্ষেত্রে বোনাসের সমস্যা বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। বোনাস ও শ্রম সংক্রান্ত বিরোধই এদেশে অনেক শ্রমমূল্য নষ্ট করেছে। তাই শিল্পে শান্তি ও বোনাস সমস্যার সমাধানকল্পে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিযুক্ত সমাধানের জন্য ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে শ্রী এম. আর. মেহেরের সভাপতিত্বে সাতজন সদস্য বিশিষ্ট একটি বোনাস কমিশন গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বলা যায় যে এই রিপোর্টের সংশোধনই হল সংসদে পাশ হয়ে যাওয়া বর্তমান বিলটি।

কেন এই সংশোধন

এই অর্ডিনান্সটি এবং এটির মূল উদ্দেশ্য, বোনাসকে উৎপাদন ও মুনাফার সঙ্গে জড়িত করা। উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল কিংবা মুনাফায় অংশ নেবার পক্ষে এই অর্ডিনান্সটি শ্রমিকদের কাছে একটি অধিকার বা এক্তিয়ারও বলা যায়। শুধু তাই নয়, আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে এই অর্ডিনান্স রচিত। এবং এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন, স্বল্প বেতনভোগী বিরাট-সংখ্যক শ্রমিক। বোনাস আইনের সংশোধনের ফলে বর্তমান হার ৪০ ও ২৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে নতুন সর্বনিম্ন বোনাসের হার যথাক্রমে ১০০ ও ৬০ টাকা করা হয়েছে। এমনকি যেসব সংস্থার ১০ বা ততোধিক কর্মী আছেন সেগুলিকে অর্ডিনান্সের আওতায় আনা হয়েছে। আগে এই আইনের (বোনাস আইনের) অধীনে আনা হত একমাত্র সেইসব সংস্থা, যেখানে শ্রমজীবীর সংখ্যা কুড়ির বেশী।

শিল্পে অশান্তি আমাদের দেশে এক চিরকালীন রোগ। সেই রোগকে নিরাময়ের জন্য এবার এই অর্ডিনান্সের সাহায্য নিয়ে বোনাস পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, **নতুন বোনাস আইনের ফলে ভোগ্য-পণ্যের দাম আরো কমবে ও শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনাও বাড়বে।**

এই অর্ডিনান্স অনুযায়ী ন্যূনতম বোনাস ধার্য হবে সেখানেই যেখানে অন্তত চারবছরের উদ্বৃত্ত মুনাফা হবে। অবশ্য উদ্বৃত্ত সামান্য হলেও বোনাস দেওয়া চলবে। কিন্তু উদ্বৃত্ত না হলে বোনাস পাওয়া যাবে না।

সম্প্রতি ভারতীয় জাতীয় শ্রমিক সংঘ কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণদানকালে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, কোন শ্রমিকের যদি বোনাস, বেতন কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়, তাহলে দেশের অন্যান্য অংশের ওপর তার যে প্রভাব পড়বে তার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। কেননা দেশের বৃহত্তর অংশের আর্থিক অবস্থা সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশী খারাপ। তাছাড়া রয়েছে অসংখ্য বেকার এবং গ্রামের গরীব মানুষ যারা সংগঠিত কর্মীদের তুলনায় কোন সুবিধাই পান না। সরকার শ্রমিকদের জন্য যা করছেন তার সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসীর প্রতি সরকারী কর্তব্যের সঙ্গতি থাকা দরকার। তিনি বলেন, "বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে কোন সংস্থা নিজের লোকসান দিয়েও বোনাস দেয়। আমি কম্যুনিষ্ট দেশের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা জোরের সঙ্গে আমায় বলেছেন, 'আপনি কি করে এটা করছেন, কি করে আপনি আশা করছেন শিল্পে উন্নতি হবে, যদি আপনি এটি করেন, তাহলে কি করে সমাজ পরিবর্তনের আশা রাখেন........?"

সংশোধনের কারণ

একথা ঠিক যে, দেশ এখন দুটি মূল প্রশ্নের সম্মুখীন। সেটি হচ্ছে, কি করে বিনিয়োগ বাড়িয়ে উৎপাদনকে বৃদ্ধি করা যায় এবং কি করে আমাদের খরচা কমিয়ে মূল্যমান স্থির রাখা যায়। শ্রমিকদের বোনাসের প্রশ্নসহ অন্যান্য সমস্যা এই দিক থেকেই পর্যালোচনা করা হয়েছে। গত তিন বছর যাবৎ বিভিন্ন সংস্থা নিজেদের লোকসান স্বীকার করেও এক মাসের মাইনের পরিমাণে 'বোনাস' দিয়েছে। কিছু কিছু সংস্থা প্রাপ্যের চেয়েও বেশী বোনাস দিয়েছে। কিন্তু এতে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? সরকারী শিল্পোদ্যোগে এটা সরকারের ঘাটতি বাড়িয়েছে এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জনসাধারণ। বেসরকারী ক্ষেত্রে মূল্যমান ঊর্দ্ধগতি করা হয়েছে, এবং শ্রমিকসহ প্রত্যেককেই এর ফলভোগ করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় এতে অনেক শিল্প ইউনিট দুর্বল হয়েছে ও সরকারকে বাধ্য হয়েই এদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। তার ফলে সরকারের ঘাটতি অনর্থকভাবে বেড়ে গেছে। এর জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমে গেছে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

যে সব সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা দশজনের কম নয় এই আইন সেই সব সংস্থার ওপরে প্রয়োগ করার ক্ষমতা এই অর্ডিনান্সের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে যে সনের উল্লেখ থাকবে—সেই সন থেকে এটা প্রযোজ্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে দুইমাসের নোটিশ দেওয়ার পর এই আইন প্রয়োগ করা হবে। কোম্পানীগুলির কার্যাবলীর ওপর কড়া নজর রাখার জন্য সরকার যে সংশোধিত কোম্পানী আইন প্রয়োগ করবেন তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

শ্রমিকদের বুঝতে হবে যে, জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণীর মত দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের ব্যাপারে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমিকদের নিজ নিজ সংস্থায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে তাদের 'বোনাস' অর্জনের সুযোগ বোনাস অর্ডিন্যান্সে দেওয়া হয়েছে। যদিও অর্ডিন্যান্স দ্বারা বোনাসের পরিমাণ সীমিত করে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে, তাদের বোনাসের পরিমাণ হ্রাস হয়েছে—কিন্তু, শেষ পর্যন্ত অধিকতর উৎপাদন এবং কোম্পানীর পরিধি বিস্তারের জন্য এই সঞ্চিত অর্থ অধিক মজুরী এবং আরো বেশী সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেবে। অধিকন্তু, মূল্যের স্থিতিশীলতা এলে এবং প্রকৃতই নিম্নমুখী (যেমন এখন হয়েছে) হলে শ্রমিকদের আসল মজুরী বেড়ে যাবে। কাজেই বোনাস আইনের সংশোধন শেষ পর্যন্ত শ্রমিক স্বার্থেরই অনুকূল।

এই বোনাস অর্ডিনান্সের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বে-আইনী লে-অফ, ছাঁটাই, কিছু শ্রেণীর সংস্থার ক্লোজার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার কথাও ঘোষণা করেছিলেন সেই ব্যবস্থাও ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও সরকার শ্রমিক স্বার্থে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তারমধ্যে অন্যতম একটি হল শ্রমিকদের শিল্পসংস্থার পরিচালন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ। এই প্রকল্প বেশ কিছু সরকারী সংস্থায় চালু হয়েছে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের সংস্থাগুলিতেও এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শ্রমিকরা যাতে তাদের সমস্যা সম্পর্কে যথোচিত ভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারেন—তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এরফলে একদিকে শিল্পে শান্তি যেমন আসবে, তেমনি উৎপাদন ব্যবস্থাও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলবে। সুযোগ হবে নতুন কর্মসংস্থানের। নয়া শিক্ষানবিসী প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় কাজ শেখানোর জন্য রাজ্য সরকারগুলি ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারী করেছেন।

শিল্প সংস্থায় ছাঁটাই লে-অফ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের শিল্পে-বিরোধ আইনের সংশোধনী বিলটি সম্প্রতি রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেছে। এই বিলে বলা হয়েছে, ৩০০ বা তার বেশী কাজ করেন এমন শিল্পসংস্থার লে-অফ ছাঁটাই ও বন্ধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হবে। কর্মীদের পুনর্বাসনের স্বার্থে এবং অত্যাবশ্যক পণ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে এই বিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। তা হল—মালিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন অপরিহার্য অবস্থায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর যেসব শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে আছে সেগুলো আবার চালু করতে হবে।

শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোপ-যোগী উপযুক্ত আবাসন নির্মাণ প্রকল্প এবং ও ন্যায্যমূল্যে জিনিষপত্রের সরবরাহের ক্ষেত্রেও সরকার নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এই ব্যবস্থায় বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ উপকৃত হবেন।

ক্ষেত মজুরদের কল্যাণেও প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা অর্থনীতি প্রকল্প অনুযায়ী নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি মজুরদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে ন্যূনতম কৃষি মজুরী আইন। সরকার বেগার শ্রম বিলোপের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছেন।

আজ শ্রমিকদের প্রত্যেকেরই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব এসেছে। উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে জিনিষপত্রের দাম কমাতে হবে। দেশে জিনিষপত্রের দাম স্থিতিশীল রাখা এবং বিদেশে আমাদের তৈরী জিনিষের রপ্তানী বাড়ানোর জন্য এ ব্যবস্থা দরকার। নতুন বোনাস ব্যবস্থা কার্যকরী হলে উৎপাদন বাড়বে এবং দ্রব্যমূল্য কমবে। এতে সুখ-সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ এক সুন্দর জাতীয় জীবন গড়ে উঠবে—যা প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বপ্ন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

এক নজরে কেন্দ্রীয় বাজেট

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৭৫-৭৬ বাজেট	১৯৭৫-৭৬ সংশোধিত	১৯৭৬-৭৭ বাজেট
রাজস্ব			
আয়	৭০৯২	৮০২৩	৮১৭৯
			(+) ৪৮ ঃ
ব্যয়	৬৪৯১	৭১১৭	৭৬৯০
	(+) ৬০১	(+) ৯০৬	(+) ৪৮৯
			(+) ৪৮ ঃ
মূলধন			
আয়	৩৪২৯	৪১৩০	৪৪২৩
ব্যয়	৪২৭৭	৫৫২৬	৫২৮০
	(–) ৮৪৮	(–) ১৩৯৬	(–) ৮৫৭
সামগ্রিক ঘাটতি	২৪৭	৪৯০	৩৬৮
			(–) ৪৮ ঃ
	ঘাটতি		৩২০

ঃ বাজেট প্রস্তাবের ফলে

ঘোষণা

আগামী ১ মে, ১৯৭৬ সংখ্যা থেকে 'ধনধান্যে'র গ্রাহকমূল্যের হার নিম্নরূপ হবেঃ

প্রতি সংখ্যার মূল্য — ৫০ পয়সা
বার্ষিক — ১০ টাকা
দুই বছর — ১৭ টাকা
তিন বছর — ২৪ টাকা

পরবর্তী সংখ্যায়

সার সন্দেশ
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

তাঁত শিল্প প্রসঙ্গে
বীরেন সাহা

যুব আন্দোলন ঃ কিছু ভাবনা
ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ফসলের অপচয় রোধে
গোপাল কৃষ্ণ রায়

পাট নিয়ে ভাবনা
ডঃ দিলীপ মালাকার

শরৎচন্দ্রের সমাজসমীক্ষা ও চরিত্রহীন
সুশোভন দত্ত

দেবাংশুর ভাবনা চিন্তা (গল্প)
দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এছাড়া সিনেমা, জেলা থেকে ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের বর্তমান হার ঃ
বার্ষিক-৬ টাকা, দুবছর ১০ টাকা এবং তিনবছর ১৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৩০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা ঃ
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন ঃ
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ২০/১ এপ্রিল ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—
[illegible] ঘোষ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], কলিকাতা-৭০০০৬৯
[illegible]

[illegible] জারিপদের পক্ষে প্রকাশিত
[illegible] সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

গত পনরই মার্চ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মনাম সংসদে ১৯৭৬-৭৭ সালের যে বাজেট পেশ করেন তাকে উৎপাদনমুখী ও জনকল্যাণকর বাজেটরূপে অভিহিত করা যায়। এই উন্নয়ন-ভিত্তিক বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত এবং অর্থনীতিতে নতুন গতিশীলতা আনার জন্য বর্তমান বছরের বাজেটে পরিকল্পনা খাতে সব চেয়ে বেশী অর্থ ৭৮৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

দেশের কৃষি ও শিল্পের ভিত শক্ত করার জন্য ইস্পাত ও সারের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সমাজ কল্যাণ খাতে অধিকতর বরাদ্দ, শিল্প শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও পেনসন ভোগীদের জন্য নতুন সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বাজেটে। তাছাড়া শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়নের খাতেও বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের তুলনায় অনেক বেশী করা হয়েছে। আদিবাসী প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের হার সর্বস্তরে কমানো এবং সম্পদকরের হার হ্রাসের ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়বে। উৎপাদন শুল্ক হ্রাসের ফলে মন্দার কবলিত শিল্পগুলি পুনর্জীবন লাভ করবে। তৈরী পোষাক, সাবান, ব্লেড, ব্যাটারি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য পণ্যের শুল্ক হ্রাসের ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ উপকৃত হবেন। সুতির কাপড়ের উপর করের পুনর্বিন্যাসে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। লেখক, নাট্যকার, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য কিছু সুবিধার কথাও ঘোষিত হয়েছে বাজেটে। গৃহনির্মাণ প্রকল্পে যে সুবিধার কথা বলা হয়েছে তাতে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা উপকৃত হবেন।

এবছরের উদ্বৃত্ত রেল বাজেটও সাধারণ মানুষের স্বস্তির কারণ। যাত্রীভাড়া না বাড়িয়ে এবং মালের মাশুলের পুনর্বিন্যাস করে রেলবাজেটে ৯ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত হবে আশা করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, তৈলবীজ, লবণ ইত্যাদি বাড়তি মাশুলের আওতা থেকে বাদ পড়ায় সাধারণ মানুষ সকলেই উপকৃত হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের তিন কোটি টাকার উন্নয়ন ভিত্তিক উদ্বৃত্ত বাজেট রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম। পরিকল্পনা খাতে ২৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগের ফলে উন্নয়নের পরিধি অনেক বেড়ে যাবে। সারা ভারতের মধ্যে এ রাজ্যের পরিকল্পনার আয়তন সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে—পাঁচ বছরে ৩৫২ শতাংশ। এটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যত সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই। উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনীতির যে সব ক্ষেত্রে আরও বেশী করে সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব এবং সমাজের যে সব অংশ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অবহেলিত এই বাজেটে সেই সব ক্ষেত্রে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

এক নজরে কেন্দ্রীয় বাজেট

(কোটি টাকার হিসাবে)

	১৯৭৫-৭৬ বাজেট	১৯৭৫-৭৬ সংশোধিত	১৯৭৬-৭৭ বাজেট
রাজস্ব			
আয়	৭০৯২	৮০২৩	৮১৭৯
			(+) ৪৮ :
ব্যয়	৬৪৯১	৭১১৭	৭৬৯০
	(+) ৬০১	(+) ৯০৬	(+) ৪৮৯
			(+) ৪৮ :
মূলধন			
আয়	৩৮২৯	৪১৩০	৪৪২৩
ব্যয়	৪২৭৭	৫৫২৬	৫২৮০
	(−) ৮৪৮	(−) ১৩৯৬	(−) ৮৫৭
সামগ্রিক ঘাটতি	২৪৭	৪৯০	৩৬৮
			(−) ৪৮ :
	ঘাটতি		৩২০

: বাজেট প্রস্তাবের ফলে

পরবর্তী সংখ্যায়

সার সন্দেশ
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

তাঁত শিল্প প্রসঙ্গে
বীরেন সাহা

যুব আন্দোলন : কিছু ভাবনা
ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ফসলের অপচয় রোধে
গোপাল কৃষ্ণ রায়

পাট নিয়ে ভাবনা
ডঃ দিলীপ মালাকার

শরৎচন্দ্রের সমাজসমীক্ষা ও চরিত্রহীন
সুশোভন দত্ত

দেবাংশুর ভাবনা চিন্তা (গল্প)
দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এছাড়া সিনেমা, জেলা থেকে ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ ।

ঘোষণা

আগামী ১ মে, ১৯৭৬ সংখ্যা থেকে 'ধনধান্যে'র গ্রাহকমূল্যের হার নিম্নরূপ হবে :

প্রতি সংখ্যার মূল্য	—	**৫০ পয়সা**
বার্ষিক	—	**১০ টাকা**
দুই বছর	—	**১৭ টাকা**
তিন বছর	—	**২৪ টাকা**

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের বর্তমান হার :
বার্ষিক-৬ টাকা, দুবছর **১০ টাকা** এবং তিনবছর ১৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৩০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক
সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ২০/১ এপ্রিল ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—
অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : এস- শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

গত পনরই মার্চ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম সংসদে ১৯৭৬-৭৭ সালের যে বাজেট পেশ করেন তাকে উৎপাদনমুখী ও জনকল্যাণকর বাজেটরূপে অভিহিত করা যায়। এই উন্নয়ন-ভিত্তিক বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত এবং অর্থনীতিতে নতুন গতিশীলতা আনার জন্য বর্তমান বছরের বাজেটে পরিকল্পনা খাতে সব চেয়ে বেশী অর্থ ৭৮৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

দেশের কৃষি ও শিল্পের ভিত শক্ত করার জন্য ইস্পাত ও সারের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সমাজ কল্যাণ খাতে অধিকতর বরাদ্দ, শিল্প শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও পেনসন ভোগীদের জন্য নতুন সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বাজেটে। তাছাড়া শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়নের খাতেও বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের তুলনায় অনেক বেশী করা হয়েছে। আদিবাসী প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের হার সর্বস্তরে কমানো এবং সম্পদকরের হার হ্রাসের ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়বে। উৎপাদন শুল্ক হ্রাসের ফলে মন্দার কবলিত শিল্পগুলি পুনর্জীবন লাভ করবে। তৈরী পোষাক, সাবান, ব্লেড, ব্যাটারি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য পণ্যের শুল্ক হ্রাসের ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ উপকৃত হবেন। সুতির কাপড়ের উপর করের পুনর্বিন্যাসে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। লেখক, নাট্যকার, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য কিছু সুবিধার কথাও ঘোষিত হয়েছে বাজেটে। গৃহনির্মাণ প্রকল্পে যে সুবিধার কথা বলা হয়েছে তাতে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা উপকৃত হবেন।

এবছরের উদ্বৃত্ত রেল বাজেটও সাধারণ মানুষের স্বস্তির কারণ। যাত্রীভাড়া না বাড়িয়ে এবং মালের মাশুলের পুনর্বিন্যাস করে রেলবাজেটে ৯ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত হবে আশা করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, তৈলবীজ, লবণ ইত্যাদি বাড়তি মাশুলের আওতা থেকে বাদ পড়ায় সাধারণ মানুষ সকলেই উপকৃত হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের তিন কোটি টাকার উন্নয়ন ভিত্তিক উদ্বৃত্ত বাজেট রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম। পরিকল্পনা খাতে ২৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগের ফলে উন্নয়নের পরিধি অনেক বেড়ে যাবে। সারা ভারতের মধ্যে এ রাজ্যের পরিকল্পনার আয়তন সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে—পাঁচ বছরে ৩৫২ শতাংশ। এটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যত সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই। উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনীতির যে সব ক্ষেত্রে আরও বেশী করে সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজন, যেসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব এবং সমাজের যে সব অংশ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অবহেলিত এই বাজেটে সেই সব ক্ষেত্রে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

অর্থনীতিতে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ঃ প্রাক বাজেট সমীক্ষা

বিশেষ প্রতিনিধি

দেশের অর্থনীতি দুর্যোগ কাটিয়ে অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনার মুখে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রাক-বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আগামী আর্থিক বছরের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই আশাপ্রদ।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৯৭২ থেকে ৭৪ সাল অবধি জাতীয় অর্থনীতিতে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, গতিহীনতা ও মুদ্রাস্ফীতি যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, তাকে সাফল্যের সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে পারা গেছে। মূল্যমান নিম্নমুখী হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষত নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হবার পর থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে লক্ষণীয় শৃঙ্খলাবোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

চলতি আর্থিক বছরের সবচেয়ে উল্লেখনীয় কৃতিত্ব হল মূল্যমানের নিম্নমুখী গতি।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি

এবছরের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কৃতিত্বের উল্লেখ করে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে চলতি বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫.৫ শতাংশ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হারও দাঁড়াবে আগের তুলনায় বেশি এবং খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টনে যে লক্ষ্য স্থির হয়েছিল তার কাছাকাছি পৌঁছাবে। শিল্পে উৎপাদন ৪.৫ শতাংশ বাড়বে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের ও উৎপাদনের যে বিপুল উন্নতি হয়েছে সেকথাও সমীক্ষায় বলা হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে—সব সংস্থায় নীট লভ্যাংশ আগের বছরের ১৪৮.৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩১২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

চলতি বছরে রাজস্ব আদায় ও জনসাধারণের কাছে ঋণপত্র বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আয় ও সম্পত্তির স্বেচ্ছাঘোষণা কর্মসূচী সফল হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নখাতে বাজেটের অতিরিক্ত বরাদ্দ এবং সরকারী কর্মচারীদের পাঁচ কিস্তি মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দরুন ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে অনুমিত পরিমাণের চেয়ে ঘাটতি বেশি হবে।

বিনিয়োগে উন্নতি

সমীক্ষায় মূল্য পরিস্থিতিতে উন্নতির উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মূল্য স্থিতিশীলতা ব্যাহত না করেই সরকার ১৯৭৬-'৭৭ সালে পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার সাফল্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের সন্তোষজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণের কথাও সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

সমীক্ষায় আরো বলা হয়েছে যে, কর নীতি অথবা আর্থিক বিধিনিষেধ শিথিল করে শিল্পোৎপাদনের হার বাড়ানো সম্ভব নয়। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি বজায় রাখতে হলে বিনিয়োগ যেমন বাড়াতে হবে তেমনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানীর উন্নয়ন চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। বিদ্যুৎশক্তি, সার, উচ্চফলনশীল বীজ, প্রভৃতির উৎপাদনবৃদ্ধি লক্ষ্য করে আশা করা যায় যে, আগামী আর্থিক বছরে কৃষির উৎপাদন ভালোই হবে। তাছাড়া, সেচ ব্যবস্থা ও পল্লী বৈদ্যুতীকরণের কর্মসূচী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

শিল্প ও কৃষি

গত দশ বছরে যে হারে শিল্পোতপাদন বেড়েছে তার দ্বিগুণ হারে না বাড়লে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির হার কোনমতেই সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় শতাংশে বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, রপ্তানী উন্নয়ন, আমদানীর উপযুক্ত বিকল্প উদ্ভাবন এবং উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থার উপর সমীক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্য দূর করার জন্য কঠোর অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রয়োজন। এজন্য নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী বিশেষ করে মাঝারি মেয়াদের কর্মসূচীর উপর জোর দিতে হবে। পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের উপর বিশেষ করে স্থানীয় চাহিদা, সম্পদ ও অন্যান্য সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে রচিত কর্মসূচীর রূপায়ণের উপর সমীক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। সেচ প্রাপ্ত এলাকায় কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ, উৎপাদন-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং চাষীরা যাতে উৎসাহিত হয় সেরকম ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপরও সমীক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব জাগিয়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বিনিয়োগের উপর যথেষ্ট লভ্যাংশ পাওয়া যায়। দেখতে হবে যাতে কালো টাকা আবার জমা হতে শুরু না করে এবং উদ্বৃত্ত আয় যাতে উৎপাদনশীল পথে নিয়োজিত হয়।

মুদ্রাস্ফীতি রোধ

স্বনির্ভরতা যখন আমাদের জাতীয় লক্ষ্য তখন রপ্তানী বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৮ থেকে ১০ শতাংশ না বাড়লে লক্ষ্যে পৌঁছানো দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। রপ্তানীর ক্ষেত্রে গত দু বছরে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেলেও আমাদের করণীয় এখনও অনেক রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধে গৃহীত নানা ব্যবস্থার ফলেই মূল্য রেখা নিম্নমুখী হয়েছে। মূল্য পরিস্থিতিতে

এই সন্তোষজনক অবস্থা বজায় রাখতে হলে গত জুলাই মাসে যে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী কঠোর অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ১৯৭৩–৭৪ সালে ১৩.৬ ও ১৪.৪ শতাংশ থেকে কমে ১৯৭৪–৭৫ সালে যথাক্রমে ১৩.২ ও ১৪.২ শতাংশে নেমে আসে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির চাপেই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কমে গিয়েছিল। তবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসারের সংগে সংগে ১৯৭৫–৭৬ সালে এটা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ঠিক সেই মত ১৯৭৫–৭৬ সালে বিনিয়োগের হারও যথেষ্ট বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃষি উৎপাদন

১৯৭৪–৭৫ সালে কৃষি উৎপাদন ৩.১ শতাংশ হারে কমেছিল। কিন্তু আশার কথা এবার খরিপ শস্য ৭ কোটি টন হবে বলে অনুমিত হচ্ছে এবং রবি শস্য যে যথেষ্ট হবে তারও আভাস পাওয়া গেছে। কাজেই ১৯৭৫–৭৬ সালে খাদ্যোৎপাদনের যে ১১.৪ কোটি টন লক্ষ্যস্থির হয়েছিল তা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। কাঁচা পাট ছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্যের সম্ভাবনা বেশ আশাপ্রদ। কৃষি উৎপাদন আশাপ্রদ হলেও সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের অসমাপ্ত কাজ অচিরেই সম্পন্ন করা দরকার। সেচ ব্যবস্থা ও আধুনিক সারের ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সমীক্ষায় অবিলম্বে ভূমি সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট আইনের সার্থক রূপায়ণ এবং সেই সঙ্গে কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে কৃষির উন্নতিতে পল্লীব্যাঙ্কগুলির কার্যকারিতা, ব্যাঙ্ককর্মীদের মনোভাব ও কর্মক্ষমতার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করবে।

বলা হয়েছে, শিল্পোৎপাদন ১৯৭৩–৭৪ সালে ০.২ শতাংশ কমে গেলেও ১৯৭৪–৭৫ সালে ২.৫ শতাংশ বেড়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে ১৯৭৫–৭৬ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৪.৫ শতাংশ। কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট এবং নাইট্রোজেন সার, অ্যালুমিনিয়াম, বনস্পতি, ও বিদ্যুৎ শক্তি উল্লেখনীয় হারে বেড়েছে।

শিল্পে শ্রম পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হবার পর থেকে শিল্পে শান্তি বিরাজ করছে।

দ্রব্য মূল্য ও বিতরণ ব্যবস্থা

সমীক্ষায় মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা সম্ভব হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা এক বছর আগের তুলনায় ৮ শতাংশ কম ছিল। ১৯৭৫–৭৬ সালে প্রথম তিন মাসে মূল্যমান উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছিল কিন্তু চোরা চালান, কালোবাজারী ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে মূল্য আবার স্থিতিশীল হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ অভিযান ও বণ্টন ব্যবস্থার সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ৪৬ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তার বেশী চাল সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

কর নীতি

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার মতন গুরুদায়িত্ব সাফল্যের সংগে পালনের পর সরকারের ১৯৭৫–৭৬ সালে প্রধান দায়িত্ব হবে এমন কর নীতি ও আর্থিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা—যাতে উৎপাদনের হার বেড়ে চলে আর সেই সংগে বিনিয়োগও অধিকতর হারে হতে থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৯৭৫–৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সঞ্চয় বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এবং বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশী করা হয়েছে। ১৯৭৫–৭৬ সালের প্রথম নয় মাসে আয়কর কর্পোরেশন কর, শুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক বাবদ সরকারী আয় যথেষ্ট হয়েছে। বাজেট অনুমানের তুলনায় ১২৮ কোটি টাকার বেশী ঋণপত্র বিক্রি হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যও অনুমানের তুলনায় বেশী পাওয়া গেছে। আয় ও সম্পত্তির স্বেচ্ছা ঘোষণা কর্মসূচী থেকে ২৪৮.৭ কোটি টাকার কর আদায় হয়েছে।

রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক অবস্থা-পর্যালোচনা করতে গিয়ে ১৯৭৪–৭৫ ও ১৯৭৫–৭৬ সালে সম্পদ সংগ্রহ অভিযানের প্রশংসা করা হয়েছে। এই সময় রাজ্যগুলি যথাক্রমে ৩৫৮ এবং ১৯৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। তবে রাজ্যগুলির ব্যয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষায় তাদের আরো আর্থিক সংযম পালনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ঋণ নীতি ও আর্থিক শৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধি যেন কর নীতির মূল লক্ষ্য হয়। টাকার যোগানের হার ১৯৭৩–৭৪ সালের ১৫.৪ শতাংশ থেকে ১৯৭৪–৭৫ সালে ৬.১ শতাংশ হয়েছিল এবং এ বছর তা কিছু বেশী হবে বলে আশা করা যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্য

যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির উল্লেখ করে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, সার ও খাদ্যদ্রব্যের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ১৯৭৩–৭৪ সালে ৪০২ কোটি টাকা থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ১৯৭৪–৭৫ সালে ১১৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে ভারতকে আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ৪৪.৭ কোটি টাকা ধার নিতে হয়। ১৯৭৫–৭৬

১০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট পরিক্রমা

বিশেষ প্রতিনিধি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মন্যম ১৯৭৬-৭৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ৩১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আগামী আর্থিক বছরে পরিকল্পনাখাতে মোট ব্যয় হবে ৭৮৫২ কোটি টাকা। শ্রীসুব্রহ্মন্যম জানিয়েছেন, দেশে পরিকল্পিত উন্নয়নপ্রয়াস সুরু হবার পর থেকে কোন বছরই পরিকল্পনাখাতে এত বেশী বরাদ্দ হয়নি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতে ব্যয় হবে ৪০৯০ কোটি টাকা এবং রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ৩৭৬২ কোটি টাকা। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে ২৪৭ কোটি টাকার যায়গায় প্রকৃত ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪৯০ কোটি। চলতি করের হারে আয় ও ব্যয়ের হিসেব ধরলে ১৯৭৬-৭৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৩৬৮ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান।

এবছরের বাজেটের লক্ষ্য হল অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এই অগ্রগতিসাধনের কাজে বেশী করে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থমন্ত্রী তাই ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা খাতে বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৫৬ কোটি টাকা করেছেন।

শ্রীসুব্রহ্মন্যম জানান, আগামী বছরে পরিকল্পনা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মুদ্রাস্ফীতি যাতে আর না দেখা দেয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার স্থির করেছেন যে, ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসের পরও মহার্ঘভাতা বাবদ বৃদ্ধির অর্ধেক অংশ এক বছরের জন্য জমা থাকবে। তবে সরকার তার পূর্ব আশ্বাস পালন করে যাবেন এবং ইতিমধ্যে যে মহার্ঘভাতা ও অতিরিক্ত মজুরী বাবদ কয়েক কিস্তি বৃদ্ধি হয়েছে এবং জমা রয়েছে সেগুলি চলতি নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধ করে দেবেন। কাজেই ১৯৭৬-৭৭ সালে কর্মচারীরা ২৭০ কোটি টাকার মত ব্যয়যোগ্য আয় করবেন।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প

এবারের বাজেটে শিল্প শ্রমিকদের জন্য নতুন এক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যসূচী ঘোষিত হয়েছে। এই বীমা কর্মসূচী অনুযায়ী শ্রমিকদের নিজের তরফ থেকে কিছু জমা দিতে হবেনা। চাকুরিকালে কোন শ্রমিক মারা গেলে তাঁর পোষ্যরা মৃত্যুর আগের তিন বছরে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমার গড়পড়তা সমান টাকা পাবেন। তবে এই টাকা দশ দশ হাজারের বেশী হবে না।

অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের জন্য বিশেষ সুবিধা

শ্রীসুব্রহ্মন্যম অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করেছেন। ইতিপূর্বে জীবন ধারণের ব্যয়বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে তাঁদের ১ কিস্তিতে বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। এবার তাঁদের অতিরিক্ত এ্যাডহক সাহায্য দেওয়া হবে অবসর ভাতার দশ শতাংশ হারে। এই সাহায্য কমপক্ষে ১০ টাকা এবং খুব বেশী হলে ৫০ টাকা দেওয়া হবে। আরো প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যাঁরা পারিবারিক পেনসন পান তাঁরা ইতিপূর্বে যে অতিরিক্ত সাহায্য পেয়েছিলেন তা বজায় থাকবে এবং এখন পেনসন ভোগীদের যে অতিরিক্ত সাহায্য দেবার কথা বলা হয়েছে—তাও দেওয়া হবে। এইসব সুযোগ সুবিধা ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে কার্যকর হবে এবং আগামী বছরের বাজেটে এজন্য ৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সারের দাম হ্রাস

অর্থমন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন যে, সরকার দেশে তৈরী ফসফেটজাত সার এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা কয়েক শ্রেণীর ফসফেট সারের দামে টন প্রতি ১২৫০ টাকা কমাবেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, চলতি মূলধন সংগ্রহ (ছাড়) অনুযায়ী শুধু বোনাস শেয়ার এবং এম আর টি পি অনুযায়ী কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূলধন নিয়ন্ত্রকের অনুমতি দরকার হয় যদি সংগ্রহের লক্ষ্য ২৫ লক্ষ টাকার বেশী হয়। এখন ৫০ লক্ষ টাকা অবধি বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়াস

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটের আনুমানিক হিসেব করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, এই বাজেটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। এই লক্ষ্য অনুযায়ী কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ৩২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কৃষিখাতে মোট বরাদ্দ ৪৭৩ কোটি টাকার মধ্যে ১৪৮ কোটি টাকা নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়েছে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির জন্য। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মোট ৬৭৩ কোটি টাকার বরাদ্দ আছে। কুড়ি দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী এই পরিকল্পনা কালে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পভুক্ত হবে বলে স্থির হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যেই ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

পারমাণবিক শক্তির জন্য ৫৫ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ কেন্দ্রীয় বাজেটে বিদ্যুৎ

শক্তির উন্নয়নের জন্য মোট ১২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই খাতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ সালের ৯৮৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯৭৬-৭৭ সালে ১২৯০ কোটি টাকা করা হয়েছে। আগামী বছর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য ২৫০০ মেগাওয়াট নির্ধারিত হয়েছে। চলতি বছরে অতিরিক্ত ১৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে।

শক্তি ও জ্বালানী

শক্তি ও জ্বালানী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিক্যাল খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ সালের ১৭০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ১৯৭৬-৭৭ সালে ২৭৪ কোটি টাকা করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম শিল্পের জন্য ১৯৭৬-৭৭ সালের মোট বরাদ্দ ৪৮৫ কোটি টাকা দাঁড়াচ্ছে। চলতি বছরে এইখাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৬৮ কোটি টাকা।

কয়লা শিল্পের জন্য ১৯৭৬-৭৭ সালে বাজেট বরাদ্দ আগের বছরের ২২৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে সার শিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের ২৯০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে আগামী বছর ৪৩৪ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ইস্পাত শিল্পে দ্বিগুণ বরাদ্দ

ইস্পাত শিল্পের বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে (মোট ৪৩২ কোটি টাকা) এবং আগামী বছরে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৫৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের জন্য ৩৬ কোটি টাকা এবং সিমেন্ট কর্পোরেশন প্রকল্প সমূহের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অনুন্নত এলাকায় বিনিয়োগ বাবদ ১০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ সেবা এবং নগর উন্নয়ন খাতেও বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের তুলনায় অনেক বেশী করা হয়েছে। আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৪০ কোটি টাকা এবং পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৩৬ কোটি টাকা করা হয়েছে।

রাজস্ব খাতে আয়

অর্থমন্ত্রী জানান যে, চলতি করের হারে মোট রাজস্ব ১৯৭৫-৭৬ সালের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৩৬৭ কোটি টাকা বেশী অর্থাৎ মোট ৭৪০৭ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই অতিরিক্ত ৩৬৭ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রের প্রাপ্য হবে ৩৪৬ কোটি টাকা। বাণিজ্যশুল্ক বা কাষ্টমস্ বাবদ ১১৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ চলতি বছরের তুলনায় ২৬১ কোটি-টাকা বেশী আয় হবে বলে আশা করা যায়। তবে আয় ও সম্পত্তির স্বেচ্ছা-ঘোষণা অনুযায়ী বেশীর ভাগ আদায় চলতি বছরে হয়ে যাওয়ায় আগামী বছর আয়কর বাবদ আয় ১০৩ কোটি টাকা হবে।

চলতি বছরের তুলনায় (৪৫৩ কোটি টাকা) আগামী বছর ঋণপত্র বাবদ ৫৩৫ কোটি টাকা আয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্বেচ্ছা ঘোষণা কর্মসূচী অনুযায়ী যে টাকা বিনিয়োগ হবে তার হিসেব অবশ্য এর মধ্যে ধরা হয়নি। আগামী বছর ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ এ বছরের তুলনায় ৪০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। ঐ সময়ে বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ১৩৪১ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়

প্রতিরক্ষা খাতে ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট বরাদ্দের (২৪১০ কোটি টাকা) তুলনায় ব্যয় কিছু বেশী—২৫৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

খাদ্য ভরতুকি

চলতি বছরের ২৫০ কোটি টাকার পরিবর্তে আগামী বছর খাদ্য বাবদ ভরতুকির জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৭৫-৭৬ সালের সংশোধিত হিসাব

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে অনুমিত ঘাটতির তুলনায় বেশী ঘাটতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। ফলে রপ্তানী উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপায়ণে ৭১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের পরিবর্তে ৮৮ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। এই সময় জাতীয় বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশনের মতন পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় খাতে ১৭০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের পরিবর্তে ২১০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনের জন্য ১৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। সার লেনদেন করতে গিয়ে ১৭৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ১৩৬ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করতে হয়েছে। রেলওয়ের রোলিং স্টক কেনার জন্যও বাজেট বহির্ভূত ৫৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় বাজেট অনুমানের তুলনায় ২৭০ কোটি টাকা বাড়তি খরচ হবে।

এছাড়া নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণে রাজ্যগুলিকে ৮৫ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ করতে হয়েছে। তাছাড়া অগ্রিম পরিকল্পনা খাতে ৩৭ কোটি টাকা পাবার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে।

শ্রী সুব্রহ্মন্যম তাঁর বাজেট ভাষণে বলেন যে, নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী চালু হওয়ার সংগে সংগেই অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ অভাবনীয়ভাবে দেখা দিয়েছে। ফলে অর্থনীতির প্রধান প্রধান উদ্যোগে—কৃষি, শিল্প, খনি, বিদ্যুত, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাফল্যের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। মূল্যরেখা নিম্নমুখী হওয়ায় দেশ আজ এক নতুন গৌরবের অধিকারী হয়েছে।

কোথায় কমল কোথায় বাড়ল

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৭৬–৭৭ সালের বাজেট ব্যক্তিগত আয়ের সর্বস্তরে আয়করের হার কমাবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সংসদে ১৯৭৬–৭৭ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে শ্রী সুব্রহ্মন্যম ঘোষণা করেন যে, সারচার্জ সহ আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হার বর্তমানের ৭৭ শতাংশের পরিবর্তে ৬৬ শতাংশ হবে। ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রান্তিক আয় বর্তমানের ৭০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকার উপরে ধার্য হবে।

অতিরিক্ত সম্পত্তিকর লোপ

অতিরিক্ত সম্পত্তিকর তুলে দেয়া ছাড়াও অর্থমন্ত্রী সর্বস্তরে করযোগ্য সাধারণ সম্পত্তি করের হার কমাবার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর বাজেট প্রস্তাবে সংগঠিত উদ্যোগ এবং সাধারণ ব্যবহারকারী সকলের জন্যই অনেক সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। নানা জিনিষের উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নতুন কর প্রস্তাব থেকে অতিরিক্ত আয় দাঁড়াবে ৮০ কোটি টাকা। ফলে নীট রাজস্ব আয় দাঁড়াবে কেন্দ্রের ভাগে ৪৮ কোটি টাকা এবং রাজ্য সমূহের ভাগে ৩২ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় কর প্রস্তাব থেকে এই ৪৮ কোটি টাকা আয়ের দরুণ বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৩৬৮ কোটি টাকা থেকে কমে ৩২০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এই ঘাটতি পূরণের কোন প্রস্তাব শ্রীসুব্রহ্মন্যম করেন নি।

শুল্ক হ্রাস

অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত উৎপাদন শুল্কে যে সব ছাড় ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তার থেকে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। তিনি গার্হস্থ্য ব্যবহারের জিনিষপত্র, গায়ে মাখার সস্তা সাবান, স্টেনলেস ষ্টিলের ব্লেড, ছোট আকারের টেবিল ও পেডেস্ট্যাল ফ্যান, টর্চ ও ট্রানজিষ্টারের ব্যাটারির ওপর কিছু ছাড়ের প্রস্তাব করেছেন। যেসব টেলিভিশন সেটের ইউনিট প্রতি মূল্য ১৮০০ টাকার কম তার উপর তিনি শুল্কের হার ২০ শতাশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার (সমমূল্য) প্রস্তাব করেছেন। ১৬৫ লিটার পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতার মাঝারি ফ্রিজের শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪০ শতাংশ করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। হিমঘর প্রভৃতি কাজে ব্যবহারের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও রেফ্রিজারেটিং যন্ত্রপাতির উপরও—কুড়ি শতাংশ হারে শুল্কের প্রস্তাব করা হয়েছে। ওয়াটার কুলার যন্ত্রের উপরও শুল্ক কমানো হয়েছে। ১৬ অশ্বশক্তি পর্যন্ত যাত্রাবাহী গাড়ীর উপরও শুল্ক ৫ শতাংশ হারে কমাবার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং টায়ার, টিউব ও ব্যাটারি—যেগুলি গাড়ী কেনার সময় সরবরাহ করা হবে—সেগুলির উপরও ছাড় দেওয়া হবে। ১৬ অশ্বশক্তির কম জীপ, এম্বুলেন্স, পিকআপ ভ্যান ও অন্যান্য গাড়ীর ক্ষেত্রেও ৫ শতাংশ হারে শুল্ক হ্রাস করা হবে। মোটর চালিত সাইকেল রিক্সা উৎপাদন শুল্ক থেকে রেহাই পাবে।

প্রসঙ্গত পরোক্ষ কর ব্যবস্থার চলতি কাঠামো পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একটি কমিটি নিয়োগ করারও প্রস্তাব করেছেন।

সূতীবস্ত্রের উপর উৎপাদন শুল্ক সম্পর্কে শ্রী সুব্রহ্মন্যম কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন। তিনি জানান, এখন থেকে উৎপাদকরা কাপড়ের প্রতি মিটারে সর্বোচ্চ পাইকারী দামের ছাপ মারতে বাধ্য থাকবেন। সরকার সুতী বস্ত্রের উপর শুল্ক নির্ধারণে সমমূল্য নীতি মেনে চলার সিদ্ধান্ত করেছেন। এরফলে সমাজের দুর্বল শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হবে এবং শুল্কের বোঝা তাঁদের উপরই পড়বে যাঁরা বেশী দামের কাপড় ব্যবহার করবেন।

সুতোর উপর উৎপাদন শুল্কের হারেরও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে হস্তচালিত তাঁত ও বিদ্যুৎ চালিত তাঁত শিল্প বিশেষভাবে উপকৃত হবে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য জন্য অর্থমন্ত্রী বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের উপর শুল্কের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন। তবে ছোট বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের মালিকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।

বাধ্যতামূলক জমা

আয়কর দাতাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্প আরো এক বছর চালু থাকবে। ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জমার হার বর্তমানের ৪ শতাংশেই অপরিবর্তিত থাকবে। তবে ২৫০০১ টাকা থেকে ৭০০০০ টাকা অবধি আয়ের ক্ষেত্রে জমার হার ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হবে এবং ৭০ হাজারের বেশী আয়ের ক্ষেত্রে জমার হার ৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ করা হবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৯৭৬–৭৭ সালে রাজস্ব আয় হবে ৮০ কোটি টাকা।

পরিবারের এক অথবা বেশী সদস্যের স্বতন্ত্র সম্পত্তি এক লক্ষ টাকার বেশী হলে ব্যক্তিবিশেষের এবং যৌথ হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পত্তির উপর নতুন সম্পত্তি করের হার দাঁড়াবে আধ শতাংশ। ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেড় শতাংশ; দশ লক্ষ এক টাকা থেকে পনের লক্ষ টাকা পর্যন্ত ২ শতাংশ এবং ১৫ লক্ষ টাকার বেশী হলে আড়াই শতাংশ সম্পত্তি কর ধার্য হবে। এই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, যৌথ হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে সম্পত্তি কর ছাড়ের পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হবে।

শহরাঞ্চলে জমির আয়কর

শহরাঞ্চলে জমি ও বাড়ির উপর অতিরিক্ত সম্পত্তি কর ধার্যের ব্যাপারে

তিনি বলেন যে, শহরাঞ্চলীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ও অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে সম্পত্তি কর চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা আর নেই। তিনি যৌথ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যের স্বতন্ত্র আয় ছাড়ের সীমার অতিরিক্ত হলে যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে প্রস্তাব করেন।

লেখক ও শিল্পীদের জন্য সুবিধা

অন্যদিকে তিনি লেখক, নাট্যকার, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করেছেন। এঁদের ক্ষেত্রে জীবন বীমা, কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট, পাবলিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতিতে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

তিনি ঘোষণা করেন, ১৯৭১-৭২ সালে বা তার পরে যারা বাড়ী তৈরী করেছেন বা বাড়ী অধিকার করেছেন সেই সময়ে সেই বাড়ীর তখনকার মূল্য বিবেচিত হবে।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন সরকার কয়েকটি শিল্পে অগ্রাধিকার দেবার জন্য নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই নতুন প্রকল্প পুরাতন প্রকল্পের পরিবর্তে বলবৎ হবে।

এই প্রকল্প অনুযায়ী চলতি বছরের ৩১ শে মার্চের পরে কোন নতুন মেশিনপত্র বা প্রকল্প চালু করলে ২৫ শতাংশ হারে বিনিয়োগ ভাতা দেওয়া হবে। তিনি আরো আটটি অগ্রাধিকার সম্পন্ন বা রপ্তানী-কারক শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ ভাতা দেবার কথা বলেন। কিন্তু এই সব শিল্প যদি সরকারের নির্দেশ মত কাজ না করে তাহলে সরকারের দেওয়া সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, যে সমস্ত কোম্পানী শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকে পাঁচ বছরের জন্য সমপরিমাণ টাকা জমা দেবেন তাদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে বাংলাদেশ সারচার্জ মকুব করা হবে। কোম্পানী সারট্যাক্স (১৯৬৪) আইন অনুযায়ী বিনিয়োগ করা টাকা থেকে যে লাভ হবে তার উপর কর ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হবে।

চলতি বছরের ৩১ শে মার্চের পরে ভারতীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যদি কোন বিদেশী কোম্পানী মোটা টাকার রয়ালটি পায় তাহলে ফ্ল্যাট রেটে তাদের কাছ থেকে ৪০ শতাংশ আয়কর আদায় করা হবে। যেসব বিদেশী কোম্পানী চুক্তি অনুযায়ী প্রযুক্তি বিদ্যা দেবার জন্য ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা চাইবে তাদের কাছ থেকে ফ্ল্যাট রেটে ২০ শতাংশ কর আদায় করা হবে।

যদি বিদেশী কোম্পানী ডিভিডেন্ড পায় তাহলে তার উপর ২৫ শতাংশ কর দিতে হবে তাদের। যেসব ভারতীয় বিদেশ থেকে ফিরে আসবেন তাদের ৭ বছরের জন্য কোন সম্পত্তি কর দিতে হবে না যদি তাঁরা তাদের বিদেশে জমানো টাকা ভারতে নিয়ে আসেন।

দরিদ্রদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প

আগামী বছরের বাজেটে সমাজের দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ১লা এপ্রিলের পরে ৮০ বর্গ-মিটার পরিমিত আয়তনের বাসগৃহকে পাঁচ বছরের জন্য সম্পদকর মুক্ত করা হবে। যে সমস্ত নিম্নবেতন ভোগী কর্মচারীর বার্ষিক আয় ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হবে তাদের জন্য গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে মালিক পক্ষকে ২০ শতাংশ মূল্যহ্রাস ছাড় দেয়া হবে।

যেসব খাতে কর বাড়ছে কমছে

অর্থমন্ত্রী উৎপাদন শুল্কে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন। কাগজ বা কাগজের বোর্ড প্রভৃতির উপর ৩০ শতাংশ মূল্যানুপাতিক কর বসবে। ছাপার কাগজ বা লেখার কাগজের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ মূল্যানুপাতিক কর বসবে। পড়ার বই বা লেখার খাতার ক্ষেত্রে বর্তমান ছাড় বজায় থাকবে। এই সুবিধার পরিমাণ ১৫ শতাংশ।

পেটেণ্ট এবং অন্যান্য ঔষুধের ক্ষেত্রে কর অবশ্য সাড়ে সাত শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে সাড়ে বার শতাংশ করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। তবে জীবনরক্ষা-কারী ওষুধের ওপর বর্তমান কমহারের ২.৫ শতাংশ এবং সিরাম, টীকা ও ভেষজ জন্ম-নিরোধক দ্রব্যের করমুক্তি বহাল থাকবে।

কম দামের সিগারেটের ক্ষেত্রে দাম কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু দামী সিগারেটের দাম একটু বাড়বে। সুগন্ধী পানীয় জলের ওপর শুল্ক বাড়ালেও সাদা সোডা মিশ্রিত পানীয় জলের দাম বাড়ানো হয়নি। রঙ, বার্ণিস, আক্রিলিক তন্তু ও কয়েকটি ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জামের উপর যে কর আছে তার কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। সিমেণ্টের উপর যে কর ছিল সে কর অব্যাহত থাকবে। এ্যালুমিনি-য়ামের দাম প্রতি টনে ১২০০ টাকা কমানো হয়েছে। প্লাষ্টিক দ্রব্যের ওপর কৃত্রিম রজনের কর ৫৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। তামার দাম কমানো হয়েছে টনপ্রতি ১৪০০ টাকা।

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় উৎসাহ যোগানোর উদ্দেশ্যে সরকার উৎপাদন শুল্কে নতুন এক সাহায্যসূচী প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই নতুন কার্যসূচী অনুযায়ী কয়েকটি নির্বাচিত পণ্যের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি বছরের তুলনায় উৎপাদন বেশী হলে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে। আমদানী শুল্কে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে:

স্টেনলেস ষ্টীলের চাদরের উপর আমদানী শুল্ক ২২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩২০ শতাংশ (সমমূল্য): স্টেনলেস

১০ পৃষ্ঠায় দেখুন

সমীক্ষা: কেন্দ্রীয় বাজেট

পঞ্চানন চক্রবর্তী

বর্ত্তমান বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেট মোটামুটি যে রকম প্রত্যাশা করা গিয়েছিল সে ভাবেই রচিত হয়েছে। বাজেট সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রত্যাশার পিছনে ছিল বিগত আর্থিক বৎসরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমবিকাশের ধারা বা Trend এবং সরকারপক্ষের সাম্প্রতিক কয়েকটি উক্তিতে বাজেট সম্পর্কে কিছু পূর্বাভাস। এই প্রত্যাশা সমর্থন লাভ করেছে অল্পদিন পূর্বে সংসদে উপস্থাপিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে দেশে অর্থনীতির প্রায় সবগুলি সূচকই অবস্থার ক্রমোন্নতির পরিচায়ক এবং সরকার যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় অবস্থাকে অনেক বেশী আয়ত্তাধীনে আনতে পেরেছেন এটা নিঃসন্দেহ। যে যে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অবস্থা আয়ত্তাধীনে এসেছে সেগুলি সুবিদিত; "সমান্তরাল অর্থনীতি" এখন অতীতের দুঃস্বপ্ন। অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা ছাড়া আর একটা বিশেষ লক্ষণীয় ঘটনা-প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচী। এর মাধ্যমে সরকারী কর্মপদ্ধতি, তথা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিকে কতকগুলি স্পষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে চালনা করার সংকল্প সরকার গ্রহণ করেছেন। অবশ্য প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রগতির কতকগুলি মোটামুটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে যে পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য প্রভৃতি বর্ণিত হয় সেগুলি অর্থনীতির পরিভাষায় Macro-economic পর্যায়ের। ২০-দফা কর্মসূচী ওই Macro-economic উদ্দেশ্যগুলি রূপায়ণে কোন্ কোন্ বিষয়ের অগ্রাধিকার হবে মূলত সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছে।

বর্ত্তমান বাজেটে আশা করা গিয়েছিল যে এই সব দিকে লক্ষ্য রেখেই মোট বিনিয়োগের পরিমাণ, বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পরিবর্তন সাধন করা হবে। ফলত বাজেটে অনেকাংশেই তা করা হয়েছে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য সাধারণের আশা ফলবতী হয়নি। সেটা হল বাজেটে ৩২০ কোটি টাকার ঘাটতি। এই ঘাটতির কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে তা নিয়ে অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারী বাজেটে মূলত fiscal নীতিই অনুসৃত হতে পারে। অপর যে নীতি, অর্থাৎ Monetary নীতি, সরকার অবলম্বন করেন সেটা বাজেট বহির্ভূত এবং সরকার যে সম্বন্ধে খুবই সচেতন। অতি সম্প্রতি Reserve Bank সুদের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সেটা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন। বাজেটে ঘাটতির ফলে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা এই ভাবে রোধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

গত বৎসরে আশা করা গিয়েছিল যে খাদ্যোৎপাদন আশানুরূপ হ'লে মূল্যমানের ঊর্দ্ধগতি রোধ করা যাবে। সরকারের অবলম্বিত নানা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সেই ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ তো হয়েছেই বরং মূল্যস্তরের নিম্নাভিমুখীনতা বেশ সুস্পষ্ট হয়েছে। এটা খুবই শুভ লক্ষণ। এই শুভ লক্ষণকে স্থায়ী করা এখন প্রধান কর্ত্তব্য। মনে রাখা দরকার যে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার তার তুলনায় খুবই কম। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার দ্রুততর করার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে অনেকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—তার মধ্যে কতকগুলি হ'ল নূতন Capacity creation সম্পর্কিত,—পণ্য উৎপাদনের উপর যার সুফল বিলম্বিত হবে; আর কতকগুলি হ'ল Capacity utilization সংক্রান্ত যার ফলে পণ্য উৎপাদন অল্প কালের মধ্যেই বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলির বিশেষ ভাবে উল্লেখ না করেই এখানে বলা যেতে পারে যে বাজেট প্রস্তাবিত পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ করের হ্রাস এই উৎসাহবর্দ্ধক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আবগারী শুল্ক জাতীয় পরোক্ষ করের হ্রাস অবশ্যই কাম্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ করের হ্রাস সম্বন্ধে বিতর্কের অবসর আছে। কারণ, প্রথমত দেখা যাচ্ছে যে সরকার পরিচালিত এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই Capacity utilization, ও উৎপাদন, এবং সঙ্গে সঙ্গে লাভের পরিমাণ গত বৎসর যে রকম উল্লেখনীয়ভাবে বেড়েছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেরকম ভাবে বাড়েনি। অথচ গত বৎসর পূর্বের তুলনায় কাঁচামাল প্রাপ্তি বিষয়ে, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ে এবং শ্রমিক বিক্ষোভ নিরসনের দিক থেকে সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ প্রতিষ্ঠান সমান সুবিধা লাভ করেছে। লাভের অঙ্কেও বিশেষ টান পড়েনি। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে তো ওই অঙ্ক রীতিমত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা সাধারণত স্বীকৃত যে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ fiscal বা monetary ব্যবস্থা অপেক্ষা অনুকূল অর্থনৈতিক আবহাওয়ার ওপরেই বেশীরভাগ নির্ভর করে। বিগত দুই বৎসর এই আবহাওয়া খুবই প্রতিকূল ছিল। তার প্রধান কারণগুলি ছিল,

খনিজ তেলের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতা, রেল ধর্মঘট, বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তা, শ্রমিক ধর্মঘট, এবং চোরাকারবারী। এই সবগুলি সমস্যার বলিষ্ঠ সমাধান করে সরকার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছেন ব'লে দাবী করতে পারেন। তদুপরি কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সম্ভাবনা উজ্জলতর হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, জাতীয় আয় আশানুরূপ ৫½ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক সম্প্রদায় ও ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ শিল্পজাত পণ্যের বাজার ও চাহিদা এখন সর্বাংশে অনুকূল। এই অবস্থায় Company-র আয় ও ব্যক্তিগত উঁচু আয়ের ওপর প্রত্যক্ষ কর লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস করার যৌক্তিকতা অনেকাংশে কমে গেছে। তাছাড়া প্রত্যক্ষকর বিন্যাসের দ্বারা শিল্পে কর্মসংস্থান প্রসার করার নীতি বাজেটে অনুসৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলশ্রুতি হিসেবে কর্মসংস্থানও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। তবে বিশেষত Labour intensive শিল্পগুলির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ নজরের অভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রতি আনুকূল্য দেখানো হয়েছে। কিন্তু সমবায় ক্ষেত্রের প্রতি উল্লেখযোগ্য কোন অনুগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

আজকাল অর্থনীতিবিদরা মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণ এই দুটির পারস্পারিক সম্বন্ধের বিষয়ে Phillips Curve নামক যে রেখা-চিত্রটি ব্যবহার করেন তাতে দেখা যায় যে সাধারণত মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমে যায়, অর্থাৎ বেকারী বৃদ্ধি পায়। দুটির মধ্যে এই সম্পর্ক দূর করতে হ'লে দরকার অর্থনৈতিক কাঠামোর এমন পরিবর্তন সাধন করা যাতে আয়গত বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস পায়। প্রধানমন্ত্রী বিঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ হলে এই আয়গত বৈষম্য গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং অশিক্ষিত বেকারের ক্ষেত্রে অনেকটা দূরীভূত হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থমন্ত্রী গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার যে সুদূরপ্রসারী পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা সংসদে পেশ করেছেন সেটা কার্যকর হলে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে প্রচ্ছন্ন বেকারী ব্যক্ত বেকারীতে আত্মপ্রকাশ করার প্রবণতা কমে যাবে। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত বেকারের সমস্যা নিরসন এতে বেশীদূর অগ্রসর হচ্ছে না। আমরা আশা করব যে ২০ দফা কর্মসূচীকে প্রথম পদক্ষেপ ক'রে, নূতনতর কর্মসূচী অবলম্বনের যে আভাস প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার দিয়েছেন তাতে এই সমস্যাগুলির প্রতি সুস্পষ্ট নজর দেওয়া হবে।

উপসংহারে বলা যায়, অর্থমন্ত্রী সাহসিকতার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার সুযোগ নিয়ে যোজনার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যত অগ্রগতির দিক্‌নির্দেশ করতে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে "ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

প্রাক বাজেট সমীক্ষা

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সালের প্রথম ৯ মাসে ২৬৯০ কোটি টাকার রপ্তানী হয়। রপ্তানীর হার ১৪.৬ শতাংশ হারে বাড়লেও আমদানী করতে হয় ৩৮০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৩.১ শতাংশ বেশী। ১৯৭৫-৭৬ সালে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করে সমীক্ষায় আশা করা হয়েছে যে, এ বছর রপ্তানী আগের বছরের তুলনায় আরো ৭ থেকে ৮ শতাংশ বাড়বে। আন্তর্জাতিক লেনদেনে আমাদের ঘাটতি মেটানোর জন্য গত নভেম্বরে গৃহীত কর্মসূচীর উল্লেখ করে সমীক্ষায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা এবার দেশে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত হবেন। সম্ভাব্য বৈদেশিক সাহায্য ও এইসব ব্যবস্থার ফলে চলতি বছরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত পরিস্থিতিতে কোন আশংকার কারণ ঘটবে না বলে আশা করা হয়েছে।

কোথায় কমল ঃ কোথায় বাড়ল

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ষ্টীল প্লেট ও ষ্ট্রেপের উপর আমদানী শুল্ক ৭৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২০ শতাংশ (সমমূল্য) এবং কার্বন ও মিশ্র ইস্পাতের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করা হয়েছে। তামার আমদানী শুল্ক ৬০ শতাংশে ধার্য হয়েছে। কার্যকরী শুল্ক এখন মেট্রিক টন প্রতি ৫ হাজার টাকা ধার্য হয়। আগামী বছর তা ৫৬০০ টাকা ধার্য হবে। ডি. এম. টি. এবং ক্যাপরোল্যাক্টার-এর উপর আমদানী শুল্ক ৭৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২০ শতাংশ এবং একরিলিক সুতার উপর প্রতি কিলোগ্রামে কুড়ি টাকা বেশী শুল্ক ধার্য হয়েছে।

ভারতীয় শুল্ক আইনের প্রথম তপশীলে বর্ণিত পণ্যের উপর যে ছাড় দেওয়া হতো তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আমদানী শুল্কে কিছু কিছু ছাড় ও সুবিধার কথা ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, নতুন সার কারখানা ও নিউজপ্রিণ্ট কারখানা স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানীর উপর শুল্কের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করা হবে। রক ফসফেট আমদানীর উপর শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

কমপিউটার ও কমপিউটার সাব সিস্টেম যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর মৌলিক আমদানী শুল্ক ৬০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া পলিস্টার ফিলম, প্ল্যাস্টিক ফিলম ও খেলাধূলার সামগ্রীর উপর আমদানী শুল্ক কমানো হয়েছে।

যেসব কাষ্টমস শুল্ক (সহায়ক) বলবৎ আছে সেগুলি ১৯৭৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং তার হারও অপরিবর্তিত থাকবে।

অর্থমন্ত্রী ১৯৭৬ সালের ১ জুন থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাড়াবার প্রস্তাব করেছেন। যেসব প্রসাধন সামগ্রী এবং ওষুধে এ্যালকহল বা নারকটিক্স আছে সেগুলির উৎপাদন শুল্কের হার কিছু কিছু বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট : কর প্রস্তাবনা

সুব্রত গুপ্ত

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেট অনেকাংশে গতানুগতিক বাজেট থেকে ভিন্ন। দেশে যখন স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে, তখন উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়াটাই হল সবচেয়ে জরুরী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আগামী আর্থিক বছরের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে উন্নয়নমুখী বাজেট আখ্যা দেওয়া যেতে পারে; কেননা, শিল্পের প্রসার, ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি, কর আদায় আরও সহজ করা এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করা, প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটটি তৈরি করা হয়েছে।

এবছরের বাজেটে যে সব কর-প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত আয়-করের হার হ্রাস করা। ১৯৭৫-৭৬ সালে আয়করের সর্বোচ্চ হার ছিল সারচার্জ সহ ৭৭ শতাংশ। আয়কর থেকে আরও বেশি করে রাজস্ব আদায় করতে হলে এই করের সর্বোচ্চ হার আরও কমাতে হবে। ১৯৭৫-৭৬ সালে এজন্য আশাতীত রাজস্ব আদায় করাও সম্ভব হয়েছে। এজন্য বাজেটে আয়-করের সবচেয়ে বেশি হার হয়েছে সারচার্জ সমেত ৬৬ শতাংশ। তাছাড়া ১৯৭৫-৭৬ সালের নিয়ম অনুযায়ী ৭৭ হাজার টাকার বেশি আয় হলে সর্বোচ্চ হারে আয়কর দিতে হয়; এখন সেটা বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে শুধু যে ব্যক্তিগত আয়-করের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হারই কমানো হয়েছে তা নয়, সব স্তরেই আয়করের হার কমাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবিভক্ত হিন্দু যৌথ পরিবারের আয়ের হিসাবের ব্যাপারে যে সব সুবিধা দেওয়া হত সেগুলি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আয়করের হার কমাবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ করেরও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্পদ করের ক্ষেত্রে প্রথম ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পদের উপর আধ শতাংশ, ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ২ শতাংশ এবং ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পদের উপর ৪½ শতাংশ হারে সম্পদ কর কমানোর প্রস্তাব বাজেটে রয়েছে।

ব্যক্তিগত করের ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে রয়েছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে সময়োচিত হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন ভাল হওয়ায় বর্ধিত আয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এবছর উন্নয়ন-হারও পাঁচ শতাংশের বেশি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে কর-হার কমে যাওয়ায় সরকারের রাজস্ব কমে যাবে বলে মনে হয় না। সামগ্রিকভাবে কর-রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষ করে কর ফাঁকি বন্ধ করার ক্ষেত্রে সরকার সম্প্রতি যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে উপরোক্ত কর-হ্রাসের প্রস্তাবগুলি।

শিল্পক্ষেত্রে বর্ধিত বিনিয়োগের ধারা যাতে বজায় থাকে সেজন্য ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বাজেটের প্রস্তাব অনুযায়ী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে লগ্নীর ব্যাপারে কোম্পানি কর বাবদ কিছু ছাড় দেওয়া হবে। ১৯৭৬ সালের ৩১ মার্চের পর এধরনের শিল্প সংস্থাগুলি নতুন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য যা খরচ করবে তার জন্য ২৫ শতাংশ হারে রেহাইয়ের ব্যবস্থা হবে। বে-সরকারী শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বর্ধিত মূলধনী খরচ (Capital Cost) দ্রুত বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করছে। পুরাতন ধরণের জীর্ণ যন্ত্রপাতিগুলির পরিবর্তে নতুন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করতে পারলে এবং শিল্পের আধুনিকীকরণ না করতে পারলে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াবার জন্যই এই বিনিয়োগ ছাড় (Investment allowance) প্রদান করার প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন। যে শিল্পগুলি এই সুযোগ লাভ করবে তার তালিকা আরও বড় করা হয়েছে,—বিশেষ করে রপ্তানিবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক এমন আটটি শিল্প এই তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু যদি দশ বছরের মধ্যে শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের জন্য যে ছাড় দেওয়া হবে তার

সদ্ব্যবহার করা না হয় তবে এই সুযোগ প্রত্যাহৃত হবে। এই টাকা কখনই লাভের অংশ হিসেবে বণ্টিত করা যাবেনা। সম্প্রতি সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানিগুলির নিরাপদ বিনিয়োগ থেকে অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। কোম্পানি (মুনাফা) সার ট্যাক্স আইন, ১৯৬৪ অনুযায়ী কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে কর ধার্যের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ-যোগ্য মুনাফা নিরূপণে প্রারম্ভিক হার ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তাতে মূলধনী লাভ কর (Capital gains tax) খানিকটা কমবে।

বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে তার সুফল আমরা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখতে পাব বলে আশা করতে পারি। ব্যাংকগুলি ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করলেও শিল্পক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে বাজেটের প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি প্রশংসনীয়।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বাজেটের প্রস্তাবগুলি কোন কোন মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে যত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে, পরোক্ষ করের হার কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ কিছু সুবিধা পাবে সন্দেহ নেই। তৈরি জামা কাপড়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর রেহাই, ক্ষুর ও ষ্টেনলেস ষ্টিলের ব্লেডের, কাপড় কাচার সাবানের, কম দামের গায়ে মাখা সাবানের গুঁড়া সাবানের এবং ছোট টেবল পাখা ও পেডেষ্টাল পাখার করহার হ্রাস সাধারণ মানুষকে নিশ্চয়ই খুসী করবে। তবে কমদামের টেলিভিসন সেট, ১৬ অশ্বশক্তির কম যাত্রীবাহী মোটরগাড়ী, জল ঠাণ্ডা করার যন্ত্র, ছোট ও মাঝারি ধরনের রেফরিজারেটার মোটর সাইকেল রিক্সা, প্রভৃতির ক্ষেত্রে করভার লাঘব করায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণী উপকৃত হলেও সাধারণ গরীবদের কিছু যায় আসে না। তবে ভোগ্য-সামগ্রী উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্য এই কর হ্রাসেরও প্রয়োজন ছিল। বাজেটে সুতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে বর্তমান শুল্ক ব্যবস্থার পরিবর্তে মূল্যানুপাতিক শুল্ক ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। তার ফলে কম দামের কাপড় যাঁরা কিনবেন তাঁরা খানিকটা সুবিধা পাবেন—তবে মিহি কাপড়ের ক্ষেত্রে শুল্কের বোঝা বাড়বে। বিদ্যুৎচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে শুল্কের হার বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। —তবে বলা হয়েছে ছোট বিদ্যুৎচালিত তাঁত মালিকদের উপর চাপ পড়বেনা। যে সব জিনিসের ক্ষেত্রে শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলি হল ছাপা ও লেখার কাগজ, অন্যান্য সব ধরণের কাগজ ও কাগজের বোর্ড পেটেন্ট ও প্রপ্রাইটারি-ওষুধ প্রভৃতি। পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও লেখার খাতার জন্য ব্যবহার্য কাগজের ক্ষেত্রে যে সুবিধা দেওয়া হয় তা বহাল থাকছে। নিউজ প্রিন্টের উপর কর রেহাইয়ের ব্যবস্থাও বহাল থাকছে। সিগারেটের ক্ষেত্রে শুল্ক হারের পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব বাজেটে রয়েছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কমদামের সিগারেট আরও সস্তা হবে; আবার বেশি দামের সিগারেটের উপর ও চুরুটের উপর শুল্ক বাড়বে। সিগারেটের মিশ্রচারের জন্যও সমান হারে শুল্ক দিতে হবে। সোডা বা ঠাণ্ডা পানীয়ের উপর শুল্কের হেরফের হচ্ছেনা। অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে শুল্কহার কমছে। ভারত এখন বিদেশে অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানি করছে। এই শিল্পের ভবিষ্যৎও খুব উজ্জ্বল। অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে শুল্কহার হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে তা সহায়ক হবে। প্লাষ্টিক ও কৃত্রিম রং, প্রভৃতির উপর শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাবে ঐ শিল্পগুলির প্রসার ঘটবে। এই বাজেটে বাণিজ্য শুল্কেরও কিছু হেরফের করা হয়েছে। ষ্টেনলেস ষ্টিলের পাতের উপর মূল্যানুপাতিক আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ৩২০ শতাংশ করার প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়েছে। হাই কারবণ ও মিশ্র ধাতুর উপর আমদানি শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করা হবে। সার কারখানা ও নিউজ প্রিন্ট কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি বাবদ শুল্ক ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

কোন বাজেটের কর প্রস্তাবগুলি মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য বিষয় হবে—সাধারণ মানুষের উপর তার কী প্রতিক্রিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার কী প্রতিক্রিয়া এবং নতুন কর প্রস্তাব থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যেতে পারে তা কিভাবে ব্যবহৃত হবে। আলোচ্য বাজেটে যে সব কর প্রস্তাব করা হয়েছে সাধারণ মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া বিশেষ প্রতিকূল নয়। তবে ওষুধের দাম বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় ও মিহি সূতীবস্ত্র, লেখার ও ছাপার কাগজ, একটু বেশি দামের সিগারেট প্রভৃতির দাম বেড়ে যাবার সম্ভাবনায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই একটু অসুখী। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে যে-সব ব্যবস্থা গৃহীত হতে যাচ্ছে তাতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যেতে পারে। এ-বছর নতুন করের বোঝা সৃষ্টির তুলনায় করভার লাঘবের পরিমাণ বেশি একথা অস্বীকার করা যায়না। ১৯৭৫-৭৬ সালে যোজনার জন্য বরাদ্দ ছিল ৫৯৬০ কোটি টাকা, ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে এইখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৮৫২ কোটি টাকা। আমাদের দেশে যোজনার যুগ আরম্ভ হওয়ার পর এটাই একটি বছরে উন্নয়নখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ। আমরা আশা করতে পারি যে বিভিন্ন কর প্রস্তাব থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তার একটি বিরাট অংশ যোজনার রূপায়ণে ব্যবহার করা হবে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বাজেটটি নিশ্চয়ই

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাধারন মানুষের বাজেট

কল্যান চক্রবর্তী

পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রগতির নীতি গ্রহণ করার পর থেকে গত দুই দশকে কেন্দ্রীয় বাজেটে মোটামুটি একটি নীতিই অনুসৃত হয়েছে। সেটা হল কর নীতি এবং নোট ছাপানর মাধ্যমে সরকারী অর্থ ভাণ্ডার পূর্ণ করার নীতি। সে জন্য প্রতি বৎসরই সংসদে বাজেট পেশ করার সন্ধিক্ষণে সাধারণ মানুষ তার সম্ভাব্য অতিরিক্ত করভার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করেছে। কেন্দ্রীয় বাজেট এতদিন অনেকটা নিয়ম মাফিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ বছর বাজেট পেশ করার পূর্ব লগ্ন কিন্তু ঠিক সে রকম ছিল না। এর কারণ গত এক বৎসরে ভারতের অর্থনৈতিক দিগন্ত এক নতুন সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেট সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় এই যে, এই বাজেটে সমাজের প্রতিটি মানুষই কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়েছেন। উচ্চবিত্তদের এতদিন প্রধান অভিযোগ ছিল আয়করের হার পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত উঁচু নয়। সংপথে অর্জিত আয়ের উপর উচ্চ হারে কর নির্দ্ধারিত হলে সৎপথে থাকার প্রবণতা কমে আসে এ কথা সুবিদিত। এতে সরকারী কোষাগারে অর্থ আগমনের পথও কণ্টকিত হয়। আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্র (শ্রীলঙ্কা এবং মিশর) আয়কর হ্রাস করে ইতিমধ্যেই বেশ সুফল পেয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন, আয়করের হার কখনই শতকরা ৫০-৫৫ ভাগের অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় হঠাৎ শতকরা ৭৭ ভাগ থেকে শতকরা ৫৫ ভাগ করা কখনই উচিত হত না। সুতরাং নতুন হার শতকরা ৬৬ ভাগ আরোপ করা সব দিক থেকেই যুক্তি যুক্ত হয়েছে। এতে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে সরকার আয়কর ভিত্তিক করনীতি পরিত্যাগ করতে চাইছেন এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এই হার আরও কমে আসবে। এখন শুধু লক্ষণীয় যে উচ্চ বিত্ত শ্রেণী কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছেন কিনা। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রে আয়করের হারের হ্রাস অবশ্য অতটা চমকপ্রদ নয়। যাদের আয় বার্ষিক ৮০০০ টাকার ভেতর তাদের আগের মতই আয়করের সীমা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। যাদের আয় ৮০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকার ভেতর এবং ১৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকার ভেতর তাদের আয়করের হার শতকরা ২ ভাগ হ্রাস করা হয়েছে। আয়কর বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়কর হ্রাসের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়করের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের ততটা সুবিধা না দেওয়া হলেও এরা সুবিধা পাচ্ছেন অনেকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর পরোক্ষ করের হারের হ্রাসের মাধ্যমে। এগুলির ভেতর সাবান, ব্যাটারি, তৈরি জামা কাপড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের সমস্যা বলতে গেলে অবশ্য কেবল মাত্র আয়করের হ্রাস বৃদ্ধি বা পরোক্ষ করের পরিবর্ত্তন সাধন বললেই হবে না। এখানে দেখতে হবে সরকার এই শ্রেণীর সামগ্রিক আয় বৃদ্ধির জন্য কি প্রচেষ্টা করছেন। এবং এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে দেশের শিল্প কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য সরকার যা যা করছেন তার কথা। সে জন্য বাজেটের ভেতর দেখতে পাচ্ছি যে শিল্প-গুলিকে বিনিয়োগের বৃদ্ধির দিকে নজর দেবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিশেষ করে ভারি শিল্প গুলিকে। অর্থবিজ্ঞান বলে, নূতন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য নূতন বিনিয়োগ এই দুই-এর সমন্বয়ের ফলেই অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভবপর হতে পারে। বর্ত্তমান বাজেটে দেখতে পাচ্ছি এই দুইয়ের প্রতিই সরকার দৃষ্টি রেখেছেন। এতদিন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের গুরুত্ব আমরা ততটা উপলব্ধি করিনি। ফলত, অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে পণ্যের মূল্য উর্দ্ধগতি হলেও বিভিন্ন কল-কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা জমে থেকেছে। এর ফলে কর্মসংস্থান আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নি এবং বিনিয়োগের পথও রুদ্ধ হয়েছে। বর্ত্তমানে মালিক শ্রেণীকে যে সুবিধাগুলো দেওয়া হল তাতে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার না করবার পথে কোন অর্থনৈতিক বাধা আর থাকল না। তদুপরি কোম্পানি গুলির উদ্বৃত্ত আয়কে বিনিয়োগমুখী করার পথও সুগম হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় যে জাতীয় আয়ে শ্রমিকের অংশ কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। এটা আশা করার কারণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে যে সরকার ইতিমধ্যেই নূন্যতম মজুরী সংক্রান্ত আইনকে আরও ব্যাপক করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

গত কয়েক বৎসর ধরে সরকারের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল মুদ্রাস্ফীতি রোধের উপায় উদ্ভাবন। এই উদ্দেশ্যে গত বৎসর থেকে "বাধ্যতা মূলক জমা প্রকল্প" চালু করা হয়। এ প্রকল্পের ফলে মুদ্রাস্ফীতির আরও ব্যাপক ভাবে আত্ম-প্রকাশের সম্ভাবনা বন্ধ হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তদের কিছুটা অসুবিধা

হয়েছে এ কথা সত্যি। কিন্তু ভুললে চলবে না যে মোটা জাতীয় সঞ্চয়ে মধ্যবিত্তদের অবদান তুলনাগত ভাবে কম। সুতরাং বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্প আরও এক বৎসর চালু রাখার প্রস্তাব মোটেই অযৌক্তিক নয়। বিশেষ করে বর্ত্তমান সময়ে যখন মূল্যস্তর নিম্নাভিমুখী হয়েছে, সে সময় ভোগ প্রবণতা থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখবার পক্ষে এ ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হবে বলে মনে হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অতিরিক্ত সম্পদকরের লোপসাধন সাধারণ মানুষের স্বার্থের অনুকূল হবে কিনা। গোড়াতেই বলেছি যে বর্ত্তমান বাজেটকে সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে। ইতিমধ্যেই সরকার সহরাঞ্চলে বাস্তুজমির সীমারেখা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা নিয়েছেন। বসতবাড়ীর ওপর অতিরিক্ত সম্পদ কর যে সাধারণ মানুষ সঞ্চিত অর্থ বা লগ্নীকৃত অর্থে বাড়ী তৈরী করেছেন তাঁদের পক্ষে বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ঠিক যে কারণে আয়করের বোঝা হাল্কা করা হয়েছে সেই একই কারণে সম্পদ কর হ্রাস করাও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এবার আশা করা যায় যে বসতবাড়ীর সঠিক মূল্যায়ন হবে এবং তার যোগান বৃদ্ধি পাবে। তবে মনে হয় সহরাঞ্চলে বাড়ীভাড়া যে ভাবে গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে তাতে সম্পদকর বিলোপের সাথে এ দিকেও সরকারী দৃষ্টিপাত হওয়া উচিত ছিল। কালো টাকা উপার্জনে এবং কালোটাকা ব্যয়ে বাড়ী ভাড়ার ফলাও কালো বাজারী ব্যবসায়ের অবদানও নেহাৎ কম নয়। এদিকে দৃষ্টি পড়লে নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কৃতজ্ঞতা সরকার আরও বেশী করে পেতে পারতেন।

বর্ত্তমান বাজেটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কতকগুলি বিকাশমুখী শিল্পের প্রতি সরকারী বদান্যতা। এর ভেতর আছে কতকগুলি ইলেট্রনিক্স্ শিল্প এবং কতকগুলি স্বল্প মূলধনী শিল্প। যদিও এর ভেতর কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলোকে বিলাস বহুল পণ্য বলা যায় যেমন টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি, তবুও এগুলির প্রসার দেশের সামগ্রিক অর্থোন্নতির স্বার্থে করার প্রয়োজনীয়তা আছে। চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন, বিভিন্ন দেশের ভেতর যে অর্থনৈতিক উন্নতির বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় এর প্রধান কারণ তাদের ভেতরকার Technological gap। সুতরাং উন্নত দেশগুলির পর্য্যায়ে আমাদের পৌছাতে হল একেবারে আধুনিক শিল্প পদ্ধতি আমাদের অবলম্বন করতেই হবে। অতএব এই জাতীয় শিল্পের প্রতি সরকারী কৃপা দৃষ্টি দেশের প্রযুক্তিবিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। আরও একটা কারণ হল যে উদ্ভাবনশীল বুদ্ধিজীবী উৎপাদকদের এই ধরণের শিল্পের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। সরকারের Self employment Scheme এই ধরনের শিল্পের বিকাশের ফলে খুবই কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সকল পণ্যের ক্রেতা হয়ত সাধারণ মানুষ হবে না, কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধির পথ এদিক দিয়ে খুবই সুগম হবে।

যদিও সরকার কতকগুলি হাল্কা শিল্পের প্রতি তাঁদের আনুকূল্যের কথা বলেছেন, তথাপি লক্ষণীয় এই যে সরকার Labour intensive technology প্রভৃতির কথা বলছেন না। বিগত দুই দশক ধরে Labour intensive technology বনাম Capital intensive technology --এই বাদানুবাদ ভারতীয় অর্থনৈতিক আলোচনাকে বিপথগামী করেছে। সরকার বুঝতে পেরেছেন যে এই বিতর্কের কোন মূল্য নেই। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় সরকার মূল শিল্প বা core sector এর উন্নতির সাথে সর্বাঙ্গীন গ্রামীণ উন্নতির যে সমন্বয় সাধন করতে চলেছেন তার চেয়ে সঠিক কোন ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়। এতদিন যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছিল তাতে গ্রাম এবং শহরের অর্থনৈতিক ব্যবধান দূরীভূত হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ফলত গ্রামের প্রচ্ছন্ন বেকারী সহরাঞ্চলে খোলা বেকারীতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। গ্রাম এবং শহরের অর্থনৈতিক ব্যবধানও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গ্রামগুলির অর্থনৈতিক রূপান্তরই প্রধান লক্ষ্য হবে। এর জন্য সরকার যে কর্মপন্থা ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমস্যাকে শহরাঞ্চলে চালান না করে গ্রামের সীমারেখার ভেতর তার সমাধান খুঁজে বার করবার চেষ্টায় সরকার নূতন ধরণের এক অর্থনৈতিক বিপ্লবের পথ ত্বরান্বিত করলেন।

উপসংহারে এ কথা বলা যেতে পারে, বর্ত্তমান বাজেট সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করেছে। কর ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য ব্যবস্থায় যে সংখ্যাগত পরিবর্তন আনা হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ কতটা অতিরিক্ত উপকার পেয়েছেন সেটা বড় কথা নয়। বর্ত্তমান বাজেট সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর এক গুণগত পরিবর্ত্তনের পরিচায়ক। বর্ত্তমান অবস্থায় সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

কেন্দ্রীয় বাজেট– কর প্রস্তাবনা

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। তবে যে জিনিষটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ আরও অনেক কিছু আছে যেগুলির উপর কর ভার আরও লাঘব করা যেত; তাতে রাজস্বের যা ক্ষতি হত তা পূরণ করা যেত বিলাস-সামগ্রীর উপর করের হার কিছু বাড়িয়ে। তবুও এই বাজেটে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। অন্তত: সরকারের বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে উন্নতির সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে বর্ত্তমান বাজেট তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে সহায়ক হবে আশা করা যায়।

জনতার দর্পণে এবারের বাজেট

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় 'এবারের বাজেটে করের চাপ খুব কম-গৃহস্থালীর জিনিষ, ব্লেড, ব্যাটারী, কমদামী সাবান, মাঝারি ফ্রিজ, পাখার ওপর কর ছাড়' ইত্যাদি শিরোনাম গৃহিনীদের মুখে মুখে খুশির আমেজ এনেছে, একথা বলাই বাহুল্য।

তিরিশ বছরের ওপর সংসার করছেন বরাহনগরের মৃণালপার্কের উমা ভৌমিক। বড় মেয়ে কানপুর আই, টি, আই, তে পি, এইচ, ডি, করছে, ছোটমেয়ে স্কুলে এবং একমাত্র পুত্র যাদবপুরের ছাত্র। স্বামী বেশ কিছুদিন সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রশ্ন করলাম, এবারের বাজেট আপনার কেমন লাগল উমা দেবী? একগাল হেসে শ্রীমতী ভৌমিক উত্তর দিলেন, বড্ড ভয় ছিল গৃহস্থালীর কি হাল হয় এবার। কিন্তু না, সরকার মুখ তুলে চেয়েছেন আমাদের দিকে। সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিষের দাম বিশেষ বাড়েনি। একটু থেমে শ্রীমতী ভৌমিক আবার বললেন, এই তো কর্তার কথাই ধরুন না। ফি দিন দাড়ি না কামালে তাঁর চলেনা। অথচ ব্লেডের দাম বাড়লে, ভাবুনতো, কুলোনো কত মুশকিল। কলকাতার রাস্তাঘাটে চলাফেরা করলে জামাকাপড়ে কেমন ধুলোবালি লাগে আন্দাজ করতে পারেন নিশ্চয়। কমদামী সাবানের দাম বাড়লে সত্যি মুশকিলে পড়তাম। না, সেদিকেও সরকারের নজর আছে, এবারের বাজেট সত্যি আমাদের বিপদে ফেলেনি।

বঙ্গলক্ষী কটন মিলসের একাউণ্ট্যাণ্ট রবীন্দ্রনাথ নন্দীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মিল শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে শ্রীনন্দীর। তাদের সুখ দুঃখের নিত্যসঙ্গী তিনি। শ্রীনন্দীকে প্রশ্ন রাখলাম, এবারের বাজেট দেখে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? শ্রীনন্দীর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, এক নজরেই বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ভেবে চিন্তে এই বাজেট তৈরী করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছু টাকা জোর করে তুলে নেবার উদ্দেশ্য এ বাজেটে নেই। গতবছরের তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিবাদী বাজেট। নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন জিনিষের দাম সরকার বাড়াতে দেবেননা--এদিকে সতর্ক দৃষ্টি আছে। টেলিভিশন কিংবা ফ্রিজের কথাই ধরুননা—বিক্রীর অভাবে ওই সব কোম্পানির তো পাততাড়ি গোটাবার অবস্থা। এখন দামটাম কমিয়ে যদি কিছু মানুষ ও কিনতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর কুড়িদফা কর্মসূচী যে সমাজের সর্বস্তরে পালিত হচ্ছে একথা আমায় বুঝিয়ে দিলেন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের কর্মী শুভঙ্কর ব্যানার্জী। তিনি বললেন, দেখুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়কর কমানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি ১৯৭৬-৭৭-এর বাজেট পেশ করে বলেছেন, সবচেয়ে বেশি আয়করের হার হবে সারচারজ সমেত বর্তমান শতকরা ৭৭-এর জায়গায় ৬৬।

কথা হচ্ছিল ফুড কর্পোরেশনের এক কর্মী প্রীতিভূষণ চাকীর সঙ্গে। প্রীতিবাবুর হাতে তখন কাগজ। সহকর্মীদের সঙ্গে জটলা করছিলেন বাজেট নিয়ে। প্রশ্ন করতেই বললেন, দেখেছেন গতবারে নতুন কর ছিল ২৮৮ কোটি টাকার; এবার নতুন কর ৮০ কোটি টাকার। এবারের কর প্রস্তাবনায় যে সব জিনিষের শুল্কের হার কমবে বা সম্পূর্ণ রেহাই পাবে সেগুলো লক্ষ্য করেছেন? রেডিমেড পোশাক, মোটা কাপড়, খুর, স্টেনলেস স্টীলের ব্লেড, কাপড় কাঁচার সাবান, দন্তাদরের গায়ে মাখার সাবান, ছোট টেবল ও পেডেস্ট্যাল ফ্যান, মাঝারি রেফ্রিজারেটার, ছোট টেলিভিশন সেট, যাত্রীবাহী ছোট মোটর গাড়ি, কম দামের সিগারেট, অ্যালুমিনিয়াম, প্ল্যাসটিক, কৃত্রিম রজন, ফিল্ম, টরচ ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের দিকে যে সরকারের নজর আছে এবারের বাজেট সত্যি তা প্রমাণ করে দিল। শ্রীচাকীর সঙ্গে একইভাবে মাথা নাড়লেন তাঁর সহকর্মীরা।

পুরুলিয়ার নডিহা গ্রামে দেখা মিললো অধ্যাপক সঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায়ের। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় এতদিনে বেশ খুশি। তাঁর মতে এবারের উন্নয়নভিত্তিক। বাজেটে অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মন্যম গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গ্রামীণ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান কৃষি-শিল্পসংস্থাগুলির- উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি গ্রামীণ অধিবাসীদের কর্মশক্তি বৃদ্ধি করার দৃষ্টিভঙ্গী সত্যি মনে রাখার মতো। সমাজকল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি সর্বত্র প্রতিফলিত একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

দুই পুত্র-কন্যা ও স্বামীর সংসারে হিমসিম খাচ্ছেন সাউথ পয়েণ্ট স্কুলের শিক্ষিকা চিত্রা রায়। তাঁর কাছে আমার প্রশ্ন ছিল বাজেট নিয়েই। শ্রীমতী রায় বললেন- বড়লোকদের ওপর করের বোঝা চাপুক আপত্তি নেই এতটুকু। ওদের টাকা তো কর দেবার জন্যই। আমরা যারা সবাই মিলে কাজকরে কোন রকমে নিজেদের ছোট্ট সংসারটুকু চালাবার চেষ্টা করি তাদের বাজেটে ক্ষতি হলেই আমাদের বড় গায়ে লাগবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ। এবারের বাজেট কল্যাণমুখীই হয়েছে। সাধারণ মানুষের হিতার্থে নজর আছে সরকারের।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধিরোধে কেন্দ্রীয় বাজেট

কল্যাণ দত্ত

সত্তরের দশকের প্রথম ভাগে ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। ১৯৪৭ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসেই মূল্যমান ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য মূল্যবৃদ্ধির এই অস্বাভাবিক গতি চলতে থাকলে সমগ্র অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে মজুতদারি, চোরাকারবার ও কালোবাজার। তাতে একদিকে যেমন মূল্যমান আরও দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে, অন্যদিকে দেশের জনজীবনে নেমে আসে অপরিসীম দারিদ্র্য। সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলি বন্ধ রাখতে হয় কেননা যে প্রকল্পের জন্য যত টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল সেই প্রকল্পের খরচ এত বেড়ে যায় যে তাতে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে সামগ্রিক ভাবেই অর্থনীতি চরম সংকটের সম্মুখীন হয়।

১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কল্পে সরকার কতকগুলি বলিষ্ঠ-নীতি গ্রহণ করেন। সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়া, বেতন ও মহার্ঘ ভাতার একাংশ আঞ্চলিক সঞ্চয় প্রকল্পে জমা রাখা, লভ্যাংশ বিতরণের উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়া এবং সর্বোপরি কালোবাজার ও চোরাকারবার কঠোর হাতে দমন করা ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে ১৯৭৪ সালের শেষের দিক থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মূল্যমান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ১৯৭৫ সালে ভালো বৃষ্টি হওয়ায় কৃষি উৎপাদনও যথেষ্ট বাড়ে এবং আগামী মরশুমে রবিশস্যের ফলনও আশাপ্রদ। আশা করা যাচ্ছে যে এবছর ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে এবং বছরের শেষের দিকে সরকারের হাতে ১ কোটি টনের মতো খাদ্য মজুত থাকবে। ফলে আগামী বছর মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে এমন আশা করা যায়।

তাই কেন্দ্রীয় বাজেটে মূল্যমান স্থিতিশীল করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং মূল্যমান কমার সঙ্গে সঙ্গে নতুন যে বিপদ দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করার উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। গত একবছরে কৃষি উৎপাদনের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে শিল্পের উৎপাদন ০.২ শতাংশ কমে গিয়েছিল। পরের বছর উৎপাদন বাড়লেও বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.৫ শতাংশ। আবার এই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রায় সবটাই ঘটেছে সরকারী শিল্পে। বেসরকারি শিল্পগুলিতে উৎপাদন বাড়েনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে কমেছে।

বেসরকারি শিল্পের মন্দা কী ভাবে রোধ করা যায় তাই এবারের বাজেটের মুখ্য লক্ষ্য। এবছর উৎপাদন কমার প্রধান কারণ চাহিদার হ্রাস। বিদ্যুৎ, কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট ইত্যাদির অভাব এখন বড় কারণ নয়। ব্যবসায়ীদের মতে সুদের হার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এবং আবশ্যিক জমা প্রকল্পে আয়ের বিরাট একটা অংশ জমা থাকায় ক্রেতারা তাঁদের খরচ কমাচ্ছেন এবং তারই ফলে বাজারে মন্দা এসেছে। সুতরাং চাহিদা কিভাবে বাড়ানো যায় তাই এখন প্রধান সমস্যা।

চাহিদা বৃদ্ধি করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল উন্নয়নমূলক কাজে সরকারি খরচ বাড়ানো। নতুন নতুন কলকারখানা, রাস্তাঘাট, রেলপথ, বন্দর, সেচপ্রকল্প ইত্যাদি তৈরি করলে একদিকে যেমন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান বাড়বে অন্যদিকে বেসরকারি শিল্পগুলিও কাজের নতুন নতুন অর্ডার পাবে। অর্থমন্ত্রী তাই সঙ্গতভাবেই এবছর উন্নয়ন খাতে খরচ যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৮৫২ কোটি টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ৩১.৬ শতাংশ বেশি। উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে কৃষি ও তার আনুষঙ্গিক শিল্প, ইস্পাত, কয়লা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এই শিল্পগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই বাড়তি খরচের টাকা কোথা থেকে আসবে। বৈদেশিক সাহায্য থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না কারণ যে সাহায্য আমরা পাব তার বড় একটা অংশই চলে যাবে বৈদেশিক ঋণ ও তার সুদের টাকা ফেরত দিতে। তাই দেশের ভিতর থেকেই টাকা সংগ্রহ করতে হবে। অর্থমন্ত্রী কিন্তু অতিরিক্ত কর বাবদ বেশি টাকা আদায়ের চেষ্টা করেন নি। এ বাবদ মাত্র ৪৮ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। ফলে বাজেটে ঘাটতি পড়বে ৩২০ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য এ টাকা নতুন নোট ছাপিয়ে সৃষ্টি করা হবে।

কর থেকে অতিরিক্ত আয় যে বাড়েনি তার কারণ আয়করের হার কমানো হয়েছে। নিম্নআয় বিশিষ্ট লোকেদের তুলনায় উচ্চ আয় সম্পন্ন লোকেদের উপর আয়কর অধিক হারে কমানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর আশা যে এরফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়বে, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কমবে। আবার অনেক জিনিসের উপর উৎপাদন শুল্কও কমানো হয়েছে। যেমন সাবান, কাপড় কাচা গুঁড়া সাবান, ইলেকট্রিক পাখা, টেলিভিশন, এয়ার কণ্ডিশনার, ইত্যাদি।

করভার লাঘব করার মধ্য দিয়ে অর্থমন্ত্রী আশা করছেন যে বেসরকারি শিল্পগুলিকে চাঙ্গা করা যাবে। বেসরকারি শিল্পগুলি যদি উৎপাদন বাড়ায় এবং

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অন্যচোখে বাজেট

মঞ্জুলা বসু

গত চারবছরের মধ্যে যে সমস্যাটি ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সবচেয়ে বিব্রত করেছে তা হল মূল্যস্তরের অভূতপূর্ব ঊর্দ্ধগতি। এটি একটি সর্বদেশীয় সমস্যা নিশ্চয়ই, কিন্তু ভারতবর্ষের মত উন্নতি-কামী দেশে এই সমস্যার গুরুত্ব আরও বেশী এইজন্য যে মূল্যস্তর বৃদ্ধি উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি বড় প্রতিবন্ধক। মূল্যস্তর বৃদ্ধির গতিকে প্রশমিত করে অর্থনীতিতে অনেকটা স্থিতিশীলতা আনাই ছিল ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের মার্চ থেকে নভেম্বরের মধ্যে পাইকারী মূল্যস্তর ০.৪% নেমেছে। পূর্ববর্তী বছরে ঐ সময়ের মধ্যে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় ১২%। খাদ্যশস্য, কাপড়, শিল্পের কাঁচা-মাল ইত্যাদি দ্রব্যের মূল্যস্তর কমে যাওয়াতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। শুধু পাইকারী বাজারেই নয়, খুচরা বাজারের মূল্যস্তরও কমেছে। অর্থনীতির অন্যান্য আশাপ্রদ খবরের মধ্যে আছে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের হার বৃদ্ধি, রপ্তানি বাণিজ্য ও বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধি।

কিন্তু এইসব আশাব্যঞ্জক তথ্যের পাশাপাশি কতকগুলি অপ্রীতিকর তথ্যও মনে রাখা দরকার। সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫-৬% হবে আশা করা হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির হার মাত্র ২% হবে বলে মনে করা হচ্ছে, এর মধ্যেও যেটুকু উল্লেখযোগ্য উন্নতি তা প্রধানত সরকারী শিল্পোদ্যোগেই হয়েছে, বেসরকারী উদ্যোগে নয়। দ্বিতীয়ত, পঞ্চম পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ ও তার সার্থক রূপায়ণ সম্বন্ধে এখনও অনিশ্চয়তা আছে। সব মিলিয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুদিন ধরে একটা স্থিতাবস্থা এসে গেছে। মূল-ধনের বাজারেও অনুরূপ উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে অগ্রগতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবে এটাই সকলের প্রত্যাশা ছিল এবং বাজেট সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছে। উন্নয়ন খাতে এবার রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ ৩১.৬% ব্যয় বৃদ্ধি ধার্য করা হয়েছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাবার জন্য প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যেমন, সর্বস্তরে আয়কর কমানো হয়েছে, বিশেষ করে উর্দ্ধতম স্তরে সর্বোচ্চ করের মাত্রা ৭৭% থেকে কমিয়ে ৬৬% করা হয়েছে। সর্বস্তরে সম্পদ করও কমানো হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা বসানোর খরচ বাবদ কোম্পানীগুলিকে কর থেকে একটা রেহাই দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটের ঘাটতিকে খুব নিম্নস্তরে বেঁধে রাখার চেষ্টা হয়নি।

প্রশ্ন হল এই যে, সাধারণ মানুষ তাহলে এই বাজেটে কি সুবিধা পাচ্ছে? আয়কর বা সম্পদকর কমলে তার সুবিধা দরিদ্র-শ্রেণীর লোকেরা পায় না, পায় অপেক্ষা-কৃত সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকে বাজেটে কতটা নজর দেওয়া হয়েছে তা নির্ভর করে কতকগুলি বিষয়ের উপর। প্রথমত বাজেটে পরোক্ষ করের বোঝা কতখানি চাপানো হয়েছে। বেশী আয়ের লোকেদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের হার বেশী। কিন্তু পরোক্ষ করের হার ধনীদরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে দরিদ্রদের উপর বেশী বোঝা এসে পড়ে। তার উপরে পরোক্ষ কর যদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ধার্য হয় তাহলে তো কথাই নেই দ্বিতীয়ত দেখতে হবে বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ কিভাবে বণ্টন করা হয়েছে। যদি নিম্ন আয়ের লোকেদের সুবিধার জন্য ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করা হয় তাহলেও সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। তৃতীয়ত দেখতে হয় বাজেটে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা আছে কিনা। বাজেটের অন্য ব্যবস্থা সাধারণ লোকের স্বার্থের অনুকূল হলেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে তার জীবনযাত্রার মান নেমে যায়।

পরোক্ষ কর নিয়ে কিছু বলার আগে প্রথমেই একথা বলা দরকার যে অন্যান্য করের তুলনায় এবছর রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন ধার্য করের পরিমাণ অনেক কম। ১৯৭৫-৭৬ সালে নতুন কর আদায়ের প্রস্তাব ছিল ২৮৮ কোটি টাকার। এ বছর নতুন কর আদায়ের প্রস্তাব আছে ৮০ কোটি টাকার। সুতরাং জনসাধারণের উপর খুব বেশী নতুন করের বোঝা চাপছে না। প্রস্তাবিত বাজেটে পরোক্ষ করের মধ্যে যেসব উৎপাদন শুল্ক বসানো হয়েছে তাতে সাধারণের ব্যবহার্য ভোগ্য-পণ্যের দাম বাড়বার বিশেষ সম্ভাবনা নেই বরং কিছু কিছু জিনিষের দাম কমবার সম্ভাবনা। এর মধ্যে আছে সস্তা দামের গায়ে মাখা, কাপড় কাচা ও গুঁড়ো সাবান, তৈরী পোষাক (এক্ষেত্রে উৎপাদন-শুল্ক ১০% থেকে একেবারে তুলে দেওয়া হয়েছে)। টায়ার, টিউব, গাড়ী, এ্যাম্বুলেন্স, ভ্যান, অটোরিক্সা ইত্যাদির উপর ধার্য কর কমিয়ে দেওয়ার ফলেও পরিবহণের খরচ কমে গিয়ে সাধারণ মানুষের কিছুটা সুবিধা হবার সম্ভাবনা। কিন্তু জ্বালানীর খরচ না কমলে পরিবহণের খরচ খুব

কমাবার উপায় নেই। নিম্নবিত্ত ছাড়াও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কতকগুলি ছাড় দেওয়া হয়েছে, যেমন টর্চ ও ট্র্যানজিস্টারের ব্যাটারী, টেলিভিশন ও রেফ্রিজারেটার (মাঝারী সাইজের), ওয়াটার কুলার, কোল্ড স্টোরেজের সরঞ্জাম ইত্যাদি। মনে হতে পারে এগুলো তো অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরাই ব্যবহার করে, সুতরাং এসব জিনিষে শুল্ক রেহাই সাধারণ মানুষের কি উপকারে আসবে? প্রত্যক্ষ-ভাবে সাধারণ মানুষ উপকৃত না হলেও টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটার ইত্যাদি দীর্ঘ-স্থায়ী ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের পরোক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের উপর। এই সব দ্রব্যের উৎপাদন ও চাহিদা বাড়লে সামগ্রিকভাবে চাহিদা ও উৎপাদন বেড়ে যায় কেননা ইস্পাত, লোহা, কয়লা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অনেক শিল্পেরই উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। একদিকে যেমন দার্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা অত্যধিক বাড়লে একটা মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে তেমনই আবার দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্য-পণ্যের চাহিদায় ঘাটতি দেখা দিলে সামগ্রিকভাবে একটা মন্দার পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। গত দেড় বছরে মোট চাহিদায় একটা স্থিতাবস্থা এসে গিয়েছিল যার ফলে অনেক শিল্পে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের উপর বেশী হারে কর ধার্য করার ফলে এইসব শিল্পের অনেকগুলিতেই মন্দা দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও ছাঁটাই, লে-অফ শুরু হয়েছে। শিল্পের চাহিদা ও উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্যই এই ছাড়গুলি দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য উৎপাদন শুল্কের মধ্যে দামী সিগারেট ও সরেস কাপড়ের উপর করের চাপ উচ্চবিত্ত লোকের উপরই বেশী পড়বে। কিন্তু কিছু কিছু ওষুধের উপর কর বসানোর ফলে প্রয়োজনীয় ওষুধও সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। গত কয়েক বছর ধরেই ওষুধের দাম প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় জনসাধারণকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলেও সর্বস্তরের মানুষকেই অসুবিধাগ্রস্ত হতে হবে। অবশ্য খাতার কাগজ ও পাঠ্য-বইয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা-জনক শুল্ক হার বজায় রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা চলে যে দীর্ঘকালের মধ্যে এই প্রথম বাজেট, যে বাজেটে সাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যস্তর খুব বাড়াবার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। আরও লক্ষণীয় এই যে এই বোধহয় প্রথম বাজেট যা পেশ করবার আগেই জিনিষের দাম বাড়তে শুরু করেনি।

ব্যয় বরাদ্দের দিক থেকে উন্নয়ন খাতে ৭৮৫২ কোটি টাকা ধার্য করা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদি অর্থনীতির অচল অবস্থা কাটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায় তবে জনসাধারণ উপকৃতই হবে। সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগ বাড়ানো, বিশেষ করে ইস্পাতের জন্য ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ করার প্রস্তাব আছে। নিম্ন আয়ের লোকেদের অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি ও আনুষঙ্গিক কর্মসূচীর জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ ৩২০ কোটি টাকা। সারের জন্য ব্যয় দ্বিগুণ করার কথা আছে। সারের দাম টন প্রতি ১২৫০ টাকা কমিয়ে কৃষকদের সাহায্য করার প্রস্তাব আছে। খাদ্যশস্যের ভরতুকি বাবদ ৩০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বস্তরে সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির প্রকল্প আছে। অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে পেনসনধারীদের জন্য বাড়তি সুবিধা ও শিল্পশ্রমিকদের বিশেষ বীমা প্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের স্বার্থের সহায়ক হবে।

তবে বাজেটের প্রভাব ভাল কি মন্দ হবে তার অনেকটাই নির্ভর করবে মূল্যস্তরে সমতা বজায় রাখার ক্ষমতার উপর। ঘাটতি বাজেটে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। বর্তমান বাজেটে নীট ঘাটতির পরিমাণ ৩২০ কোটি টাকা। ঘাটতির পরিমাণ যে এতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই কেননা গত বছরের বাজেটে প্রস্তাবিত ঘাটতি ছিল ২৪৭ কোটি টাকার, কার্যত তা হয়ে দাঁড়ায় ৪৯০ কোটি টাকা। তবে ঘাটতির পরিমাণ বাড়লেও গত বছরে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়নি। মূল্যস্তরে সমতা বজায় রাখা যাবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করবে উৎপাদনের হার অব্যাহত থাকার উপর। এ বছর কৃষির উৎপাদন যথেষ্ট হওয়ার ফলেও মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি রোধ করা অনেকটা সম্ভব হয়েছে। তবে কৃষির উৎপাদন এদেশে একেবারেই আকস্মিক ঘটনা, সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিপাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বাজেট সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাবে বলে মনে হয় এবং কোনও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় না ঘটলে সাধারণ মানুষ উপকৃতই হবে।

কুড়িদফা অর্থনৈতি কর্মসূচী ঘোষিত হবার পর থেকে চাকুরীর সুযোগ সুবিধা বাড়াতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে দেশে এখন কর্মহীন বেকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। সম্প্রতি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলি থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ১৯৭১-৭৩ সালের ৩০ শতাংশের তুলনায় বেকার সংখ্যা বিগত দু বছরে ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

আপনার আয়কর কত হবে

অমলেন্দু রায় চৌধুরী

আয়কর সমস্যা নিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকেই বিব্রত—বিব্রত উচ্চবিত্ত সমাজও। আয়কর দপ্তর থেকে চিঠি পেলে ভীত হয়ে ওঠেন শতকরা আশি ভাগ আয়করদাতা। অথচ এই ভীতিকে কাটিয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়। আপনার আয়কর কত হবে এটা যদি আপনি জানতে পারেন এবং সঠিকভাবে কর দিয়ে দেন তাহলে আর কাউকেই আপনার ভয় পাবার প্রয়োজন নেই।

প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচী অনুযায়ী বার্ষিক আটহাজার টাকা পর্যন্ত উপায়ীরা এখন আয়করের আওতার বাইরে রয়েছেন।

বাৎসরিক আয় আট হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলে সেই অতিরিক্ত আয় আয়করের আওতায় পড়বে। সঞ্চয়ে উৎসাহ দেবার জন্য যাঁরা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, জীবন-বীমা, ডাকঘরের দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা বা ইউনিট ট্রাষ্টের জীবনবীমায় টাকা জমান তাঁদের জমার প্রথম চার হাজার টাকার আয়কর দিতে হবে না।

বার্ষিক দশহাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের বেতনভুক্ত কর্মচারীরা যাতায়াত, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ কুড়ি শতাংশ হারে ছাড় পাবেন। এই ছাড় দেওয়ার সময় বাড়ীভাড়া ভাতাকে বেতনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে না। আয় বার্ষিক দশহাজার ছাড়িয়ে গেলে পরবর্তী ধাপের আয়ের জন্য এটা হবে শতকরা দশভাগ। এই বাবদ যে রেহাই দেওয়া হবে তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৩৫০০ টাকা। কিন্তু মালিকপক্ষ কোথাও যদি তার কর্মচারী বা অফিসারকে মোটরগাড়ী বা স্কুটার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেন তাহলে সেই কর্মচারী বা অফিসার এই বাবদ এক হাজার টাকার বেশী রেহাই পাবেন না।

এবারের বাজেট অনুযায়ী আয় আট হাজার এক টাকা থেকে পনের হাজার টাকার মধ্যে হলে আয়করের হার হবে (আট হাজার বাদ দিয়ে) শতকরা ১৫ ভাগ। এর ওপরে বিভিন্ন আয়ের হার অনুযায়ী আয়কর নিম্নরূপ:

আয়	আয় করের হার
১৫,০০১–২০,০০০ টাকা	১৮ শতাংশ
২০,০০১–২৫,০০০ টাকা	২৫ শতাংশ
২৫,০০১–৩০,০০০ টাকা	৩০ শতাংশ
৩০,০০১–৫০,০০০ টাকা	৪০ শতাংশ
৫০,০০১–৭০,০০০ টাকা	৫০ শতাংশ
৭০,০০১–১,০০,০০০ টাকা	৬৬ শতাংশ

করহার অনুযায়ী যতটা আয়কর ধার্য্য হবে তার উপরে শতকরা ১০ ভাগ সারচার্জ দিতে হবে।

ওয়াংচু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন প্রথমে আয়করের সর্ব্বোচ্চ হার ৯৭.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭৫ শতাংশ করে দিলেন। করের হার বেশি হলে করফাঁকি দেবার প্রবণতা বাড়ে। সব ফাঁকিবাজদের ধরা সম্ভব হয় না বলে কর আদায়ের পরিমাণ কম হয়। তাই কর হার কমিয়ে ফাঁকি দেবার প্রবণতা রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই চেষ্টায় সুফল পাওয়া গেছে বলে বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রী সর্ব্বোচ্চ করহার কমিয়ে ৬৬ শতাংশ করেছেন। এর ফলে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

আয়কর দাতাদের মধ্যে যারা আয়কর রিটার্ণ ফর্ম পূরণ করতে ভয় পান এবং আয়কর উকিলদের সাহায্য ছাড়া তা যথাযথ ভাবে করতে পারেন না—তাদের আর আয়কর রিটার্ণ দাখিলের ঝামেলা পোয়াতে হবে না। অবশ্য এদের আয় বেতন বাবদ বৎসরে ১৮,০০০ টাকার বেশি হবেনা এবং এই ধরণের কর-দাতাদের ডিভিডেণ্ড, সুদ ও ইউনিট ট্রাষ্ট বাবদ বাৎসরিক আয়ের অংক ৩,০০০ টাকার বেশি হতে পারবে না।

অবশেষে একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করুন মাসিক ৭৫০ টাকার মূল বেতনের একজন কর্মচারীর বার্ষিক আয় নিম্নরূপ:

বেতন—	৯,০০০ টাকা
বাড়ীভাড়া ভাতা—	১,৩৫০ টাকা
শহর ক্ষতিপূরণ ভাতা—	৫৪০ টাকা
মাগ্‌গী ভাতা—	৩,৬৪৫ টাকা
মোট—	১৪,৫৩৫ টাকা

অর্থমন্ত্রীর নূতন বাজেট অনুযায়ী আয় আটহাজার টাকা ছাড়ালেই আয়কর দিতে হয়। কিন্তু এই ভদ্রলোকের আয় ১৪,৫৩৫ টাকা হলেও তিনি একপয়সাও আয়কর না দিয়ে পারেন। অবশ্য তাঁকে সঞ্চয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। কিভাবে বলছি:

মোট আয়— ১৪,৫৩৫ টাকা
বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ
বাদ— ১,৩৫০ টাকা
অফিস যাতায়াত, বই
কেনা প্রভৃতি বাবদ বাদ— ২,৩২৩ টাকা
(১০,০০০ টাকা পর্যন্ত
২০০০ অর্থাৎ— ২,০০০ টাকা
বাকী ৩,২৩০ টাকার জন্য
১০০০ অর্থাৎ— ৩২৩ টাকা

মোট— ২,৩২৩ টাকা

এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়াকে মোট আয় থেকে বাদ দিতে হয়। (গ) জীবন বীমা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ডাকঘরে দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় ইত্যাদি বাবদ বাদ— ৪,০০০ টাকা

মোট ছাড়— ৭,৬৭৩ টাকা

ভদ্রলোকের আয়ের ১৪,৫৩৫ টাকা থেকে ৭,৬৭৩ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ৬,৮৬২ টাকা। যেহেতু এই টাকা ৮,০০০ টাকার কম অতএব তাঁকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হবে না।

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল গত বাজেটে—এবারেও তা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

স্বেচ্ছা ঘোষণা অনুযায়ী অনেকেই গোপন আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন। যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেনি তাদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। ভারতবর্ষে করের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখন এমন উন্নত পর্য্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে এরা কিছুতেই কালো টাকার মালিক হয়ে আগের মত শান্তিতে বাস করতে পারবে না। এদের কর ফাঁকি ধরা পড়লে জরিমানা হবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, এদের ব্যাংকে রাখা টাকা আয়কর বিভাগ আটকে দিতে পারবেন এবং এদের কারাবাসও করতে হবে।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে আয়কর প্রদান একটি অবশ্য কর্তব্য এবং এই কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন আয়করদাতারা সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জনগণও উপকৃত হবেন।

জনতার দর্পণে এবারের বাজেট

১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

বিশ্বভারতী হাসপাতালের রেডিও-লজিস্ট ডা: পান্নালাল মুখোপাধ্যায় বললেন দামী সিগারেটের ওপর কর বসছে এতে আমি খুশি হলাই। সরকার তো বলেই দিয়েছেন সস্তা দরের সিগারেটের ওপর রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। সুগন্ধযুক্ত সোডা লেমনেডের ওপর কর বাড়ছে। তা বাড়ুক। যারা ভালো জিনিষের দিকে নজর দেবে তাদের একটু বেশি পয়সা দিতে হবে বৈকি।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রী রোমানী জেটলি এবারের বাজেটে বেশ খুশি। তার মতে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট উন্নয়নভিত্তিক ও কল্যাণমূলক বাজেট। এবারের বাজেটে গ্রাম সমাজ ও শ্রমিক কল্যাণের প্রতিও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে কর ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এক কথায় দুচোখ খোলা রেখে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজেট পেশ করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য।

একটাকা আয়—কোথায় কত

অর্থমন্ত্রী আগামী বছরে যে টাকাটি আদায় করবেন, তারমধ্যে ২৪ পয়সা আসবে উৎপাদন শুল্ক থেকে, ১২ পয়সা আসবে শুল্ক থেকে, ৮ পয়সা আসবে পৌরকর থেকে, ২ পয়সা আয়কর থেকে, এবং ২ পয়সা আসবে অন্যান্য কর থেকে। কর বহির্ভূত রাজস্ব পাওয়া যাবে ১৫ পয়সা, ঋণ আদায় ১২ পয়সা, বাজার ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় এবং প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ৯ পয়সা, বাইরের ঋণ ৩ পয়সা এবং অন্যান্য খাতে পাওয়া যাবে ৮ পয়সা। ২ পয়সা ঘাটতি অপূর্ণই থাকবে।

একটাকা ব্যয়—কোথায় কত

এইভাবে আদায়কৃত প্রতি টাকা থেকে সরকার পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় করবেন ৩৭ পয়সা এবং ১৯ পয়সা ব্যয় হবে অন্যান্য উন্নয়নমূলক খাতে। প্রতিরক্ষা ব্যয় ১৯ পয়সা, সুদ দান ১১ পয়সা, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলিতে বিধিসম্মত-ভাবে অন্যান্যভাবে হস্তান্তর করা হবে ৬ পয়সা এবং অন্যান্য ব্যয় ৮ পয়সা।

এবারের রেল বাজেট

বিশেষ প্রতিনিধি

এবছরের (১৯৭৬-৭৭) রেল বাজেটে ৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে এবং যাত্রীভাড়া রদবদলের কোনরকম প্রস্তাব করা হয়নি। তবে রেলমন্ত্রী মালের ভাড়ায় সামান্য পরিবর্তন করেছেন যার ফলে ৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত আয় হবে। তবে মালের ভাড়ায় এই পরিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের গার্হস্থ্য বাজেটে যাতে কোনরকমে চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, খাদ্যদ্রব্য, আহার্য্যতেল, গুড়, শর্করা ইত্যাদি এই প্রস্তাবিত মাশুল পরিবর্তনের আওতায় পড়েনা। তাছাড়া কৃষি পণ্যের দামে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, সার, তৈলবীজ জাতীয় এমনসব পণ্যের মাশুলেও হাত দেওয়া হয়নি—অর্থাৎ ঐসব পণ্যের মাশুলও অপরিবর্তিত আছে।

এছাড়া এই বাজেটে ৫০০ কিলো-মিটার দূরত্ব পর্যন্ত ওয়াগন-ভর্তি মালের উপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ মাশুল ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ৫০০ কিলো-মিটারের বেশী দূরত্ব হলেও অন্যান্য সব ছোট মালের উপরও ১০ শতাংশ অতিরিক্ত মাশুল ধার্যের প্রস্তাব রয়েছে।

এই অতিরিক্ত মাশুল ১ এপ্রিল, ১৯৭৬ থেকে চালু হবে এবং সারা বছরে অতিরিক্ত মাশুল বাবদ ৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

রেলমন্ত্রীর আশা, আগামী বছর যাত্রী চলাচল ৪ শতাংশ বাড়বে এবং অন্যান্য কোচিং ট্রাফিক বাড়বে ৫ শতাংশ। রাজস্ব আয়কারী মাল চলাচল বাড়বে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৭৬-৭৭ সালে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন বিভাগীয় মাল সহ মোট ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টন মাল ভারতীয় রেলপথে চলাচল করবে অনুমান করা যাচ্ছে।

যাত্রী ও মাল চলাচলে এই সম্ভাব্য বৃদ্ধির দরুণ চলতি যাত্রী ভাড়া ও মালের মাশুলের হার বজায় থাকলেও মোট আয় দাঁড়াবে ১৮৬৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। যাত্রীভাড়া বাবদ ৫১৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা, অন্যান্য কোচিং ট্রাফিক বাবদ ৮৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, মালের মাশুল বাবদ ১২৪০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য খাতে আয় বাবদ ৪৩ কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে।

এই বছরে রেলওয়ের কাজ চালাতে খরচ ১৫৫১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কর্মীদের বেতন প্রভৃতি বাবদ ক্রমবর্ধমান ব্যায়ের কথা চিন্তা করেই ঐ হিসেব করা হয়েছে এবং সেই সংগেই লোকো ষ্টাফের দশঘন্টা কাজ সংক্রান্ত আশ্বাসের রূপায়ণ, মিয়াভাই কমিটির রায় রূপায়ণ, বেতন কমিশনের সুপারিশে যে গলদ রয়েছে তা' দূর করা এবং কিছু কিছু নন-গেজেটেড পদের উন্নয়নের কথা মনে রাখা হয়েছে।

তাছাড়া রেলওয়ে কনভেনশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে দেয় অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৩৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। অবসর ভাতা তহবিলেও দেয় টাকা বাড়িয়ে ৩০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ওপেন লাইন ওয়ার্কস ও বিবিধ খাতে ২২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। সাধারণ রাজস্ব খাতে ডিভিডেণ্ড বাবদ দেয় টাকার অঙ্ক ২০৭ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়াচ্ছে। এইসব ধরে মোট ব্যয় যা দাঁড়ায় তাতে রাজস্ব ঘাটতি পড়ছে এবং এই ঘাটতি ৭৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াবে বলে অনুমিত হচ্ছে। প্রস্তাবিত অতিরিক্ত মাশুল বাবদ ৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গেলে ঘাটতি ৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকায় উদ্বৃত্তে পরিণত হচ্ছে।

মালবহনে নতুন রেকর্ড

১৯৭৫-৭৬ সালটি ছিল রেলওয়ের প্রসার, উন্নতি আর স্থায়িত্ব অথবা শান্তির বছর। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার পর কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় রেলওয়ের কাজকর্মে অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে রেলওয়ে নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছেন বলা যায়। বর্তমানে যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় রেলওয়ের ১৯ কোটি টন মাল বহনের লক্ষ্য পূর্ণ তো হবেই, এমন কি সে লক্ষ্য ছাড়িয়েও যাওয়া সম্ভব হতে পারে। বিভাগীয় মাল সহ মোট মাল বহনের পরিমাণ বাজেট পূর্বাভাসের (২১ কোটি টন) চেয়ে ৪০ লক্ষ টন বেশি হতে পারে। সেক্ষেত্রে এটাই হবে ভারতীয় রেলওয়ের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড।

বাজেট অনুমানের তুলনায় যাত্রী চলাচলও অনেক বেশী হয়েছে এবং বিনা টিকিটে ভ্রমণের বিরুদ্ধে কড়াকড়ির জন্য টিকিট বিক্রিও অনেক বেড়ে গেছে। ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে মোট আয় এখন ১৭৬২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাজেট অনুমানের (১৬৭৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা) তুলনায় আয় ৮৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বেশি হবে বলে ধরা যায়। তবে প্রকৃত আয় এর থেকে ১৯ কোটি টাকা কম হবে কেননা মাশুল বাবদ টাকা আদায় করতে যথেষ্ট সময় লাগে—বিশেষ করে সরকারী উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে। কাজেই নীট আয় বাড়বে ৬৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

এর ফলে রেলওয়ের উদ্বৃত্ত বাজেট অনুমানের (২০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা) তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি (অর্থাৎ

৮৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা) হয়। কিন্তু দিন যতই এগোয় রেলওয়ের উপর আর্থিক চাপ ততই বেশি পড়তে থাকে। কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি বাবদ খরচই ১১১ কোটি টাকা বেড়ে যায় (পাঁচ কিস্তি মহার্ঘভাতা এবং অবসর ভাতার হার বৃদ্ধির দরুন)। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় আরো চাপ সৃষ্টি হয়। এক জ্বালানী বাবদই বাড়তি খরচ হয় ১৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। অন্যান্য জিনিষ বিশেষ করে ইস্পাতের দর বাড়ার ফলে আরো ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বাড়তি খরচ করতে হয় রেলওয়েকে। বকেয়া মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতি করতেও ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা লেগে যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন প্রভৃতির পুনঃস্থাপনেও বাড়তি ৪ কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়।

রেলমন্ত্রী বলেন, বাজেট পরবর্তী এই আর্থিক দায় দায়িত্বের জন্যে সাধারণ রাজস্ব তহবিলে লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যাপারে রেলওয়ে ৬২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকায় পিছিয়ে পড়ে। তবে আরো রাজস্ব আয়ের আপ্রাণ চেষ্টা রেলওয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, বাজেট অনুমানের তুলনায় ৩০ লক্ষ টন অতিরিক্ত মাল পাওয়া যাবে এবং ঘাটতি পূরণে তা অনেকটা সহায়ক হবে।

১৯৭৫ সালের ৩১ মার্চ উন্নয়ন তহবিল ও সংরক্ষিত রাজস্ব তহবিল বাবদ সাধারণ রাজস্ব খাতে রেলওয়ের দেনা দাঁড়িয়েছিল ৩৭৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বছরটি ছিল রেলওয়ের সাফল্য ও কৃতিত্বের বছর। রেলওয়ের পরিবহণ ক্ষমতার অকল্পনীয় উন্নতি, নিয়ম ও সময়মত ট্রেন চলাচল, কর্মীদের নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ—এসবই এবছর রেলওয়ের উৎপাদনশীলতাকে নতুন শিখরে পৌঁছুতে সাহায্য করেছে।

মূল্যবৃদ্ধিরোধে কেন্দ্রীয় বাজেট

১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সরকারি প্রকল্পগুলি যদি তাদের গত বছরের দক্ষতা বজায় রাখতে পারে তাহলে ঘাটতি বাজেট সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে না, এটাই অর্থমন্ত্রীর আশা।

হয়ত অর্থমন্ত্রীর এ আশা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ কৃষি উৎপাদনের স্বল্পতা। আবার কৃষি উৎপাদন নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের উপর। এ বছর বৃষ্টিপাত আশানুরূপ হবে কি হবে না তা কেউ বলতে পারে না। ভাগ্য প্রতিকূল হলে দাম অবশ্যই বাড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাটকাবাজী ও চোরাবাজারের শক্তিগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠবে। এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে দুটি কাজ এ বছরেই করা উচিত। প্রথমত, সেচ প্রকল্পগুলিকে, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ জলকে কাজে লাগানোর প্রকল্পগুলিকে যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করা দরকার। দ্বিতীয়ত, এমন একটি মূল্যনীতি উদ্ভাবন করা দরকার যাতে কৃষকেরা অধিক ফসল ফলাতে ও তা বিক্রি করতে উৎসাহিত হয়।

দুর্ভাগ্যবশত গত কয়েকমাসে মূল্যমানের যে নিম্নগতি দেখা দিয়েছে তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মধ্যবিত্ত ও গরিব চাষী। গত বছরের তুলনায় তারা কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু যে দরে তাঁরা শিল্পসামগ্রী কেনেন, তা একই আছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেড়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী মরশুমে তাঁরা অধিক ফলন ফলাতে পারবেন এ আশা করা যায় না।

যেটা প্রয়োজন তা হলো এই বছরই সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য, তুলা, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি কৃষি পণ্য আরও অধিক পরিমাণে কিনে কৃষিপণ্যের মজুত ভাণ্ডার বাড়ানো। সঙ্গে সঙ্গে গরিব ও মধ্যচাষী যাতে উপযুক্ত দাম পায় তার জন্য তাদের বোনাস দেওয়াও উচিত। এর ফলে আগামী মরশুমে বৃষ্টিপাত আশানুরূপ না হলেও কৃষকেরা নিজের টাকায় এবং নিজের উৎসাহে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। বর্তমান বাজেটে সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

গ্রামাঞ্চলে সরকারী বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হওয়ার প্রয়োজন। নানাধরণের শিল্প সামগ্রী (যেমন কাপড়, কেরোসিন, কয়লা, সার, সাবান, ঔষধ, গৃহনির্মাণের মালমশলা ইত্যাদি) যদি নিয়ন্ত্রিত দরে গ্রামে গ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় তবে গ্রামবাসীদেরই শুধু সুবিধা হবে না, শিল্পসামগ্রীর বাজারও বহুগুণ বিস্তৃত হবে। শিল্পে যে মন্দা দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পথ। উচ্চ আয়সম্পন্ন লোকেদের উপর বোঝা কমানো ও তাদের ভোগ্যপণ্য সুলভ করা সঠিক পথ নয়।

ভ্রম সংশোধন

ধনধান্যের ১৫ মার্চ সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠায় 'রাজ্যের নাম তামিলনাড়ু' শীর্ষক নিবন্ধের তৃতীয় কলমের দ্বাদশ লাইনে মুদ্রাকর প্রমাদবশত 'ডি. এম. কে' শব্দটি ছাপা হয়েছে।

উদ্বৃত্তের নতুন রেকর্ড—পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

বিশেষ প্রতিনিধি

গত ১ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রী শঙ্কর ঘোষ এরাজ্যের ১৯৭৬-৭৭ সালের যে বাজেট পেশ করলেন তাতে ২.৯২ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছে। এই পরিমাণ উদ্বৃত্ত এক নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে। ১৯৬২-৬৩ সালের পর প্রায় এক যুগ পরে গত বছর প্রথম এরাজ্যের বাজেটে সংশোধিত হিসেবে ৬৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এবার এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেড়ে প্রায় তিনকোটি টাকায় পৌঁছানোর ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই বর্ধিত উদ্বৃত্তের মূলে রয়েছে অধিক পরিমাণে কর আদায়, অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিচালনব্যবস্থায় উন্নতি।

এইসঙ্গে নতুন বাজেটে ১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ব্যয়বরাদ্দও গত বছরের তুলনায় ৬১ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২৩২ কোটি টাকা করা হয়েছে। পরিকল্পনার এই আয়তন বৃদ্ধির দরুণ অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের দরকার হয়েছে নতুন কর বসিয়ে। কিন্তু এই নতুন করের পরিমাণ এবার গত বছরের তুলনায় কম। ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মাত্র। ১৯৭৪-৭৫ সালে যখন রাজ্য পরিকল্পনার আয়তন ৯০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১৫০ কোটি করা হয়েছিল তখন নতুন করের পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি টাকা। গত বছর যখন পরিকল্পনা বরাদ্দ ছিল ১৭১ কোটি তখন ১২ কোটি টাকার নতুন কর বসানো হয়েছিল।

আয়ব্যয়

১৯৭৬-৭৭ সালের রাজ্য বাজেটে রাজস্বখাতে আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৫৭৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। রাজস্বখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৫৬৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। মূলধনী খাতে আগামী বছরে ব্যয় দাঁড়াবে ৮২.১৫ কোটি টাকা।

কর প্রস্তাব

রাজ্য অর্থমন্ত্রী যেসব ক্ষেত্রে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার নতুন কর ধার্য করেছেন সেগুলি হল, মোটরযান কর, শহরের জমির ওপর কর ও ভূমি রাজস্বের সারচার্জ, সিনেমা স্লাইড ও বিজ্ঞাপন চিত্রের ওপর কর, স্ট্যাম্প শুল্কের হার বৃদ্ধি এবং পল্লী কর্মসংস্থান সেস।

ভূ-সম্পত্তির লেনদেনের ওপর ষ্ট্যাম্প-শুল্কের হার বাড়ানো হয়েছে। তবে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের লেনদেনে শুল্ক বৃদ্ধি হবেনা।

পথের সংস্কার এবং সংরক্ষণের জন্য বাজেটে একটি বিশেষ ভাণ্ডার গড়ে তুলবার প্রস্তাব করা হয়েছে। মোটরযান করের ওপর অতিরিক্ত সারচার্জ বসিয়ে। এই বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কেবল পথ মেরামত ও সংরক্ষণের জন্যই ব্যয় করা হবে। এই করবৃদ্ধির ফলে অবশ্য যাত্রীবাহী বাস, ট্যাক্সি কিংবা কোম্পানী ছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানার মোটরগাড়ির ওপর কোন চাপ পড়বেনা এবং এইসব যানকে এই অতিরিক্ত সারচার্জ আদায়ের আওতার বাইরে রাখা হবে। গ্রামাঞ্চলে পুনর্বিনিয়োগের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের প্রস্তাবও এবারের রাজ্য বাজেটে রয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে বিজ্ঞাপন বিষয়ক চলচ্চিত্র ও স্লাইড প্রদর্শনের ওপব বিজ্ঞাপন কর বসানো হবে।

শহরাঞ্চলের খালি জমি

শহরাঞ্চলে খালি জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে সম্প্রতি শহরাঞ্চলীয় জমি (সর্ব্বোচ্চ সীমা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৬ পাশ হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই সব জমিতে গৃহনির্মাণের ওপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার একটি সময়সীমার পর খালি জমির ওপর শহরাঞ্চলীয় ভূমিকর এবং একটি নির্ধারিত সীমার উর্দ্ধে জমি ও গৃহের ওপর কর বসানোর প্রস্তাব করেছেন। এছাড়া শহরের জমি যখন একটি নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে বেশী ব্যয়ে উন্নয়ন করা হয় তখন তার ওপর উন্নয়ন কর এবং যখন একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্দ্ধে সংশ্লিষ্ট জমি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছিল তার পরিবর্তে অন্য এবং অধিকতর লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয় তখন একটা পরিবর্তন কর আদায়েরও প্রস্তাব রয়েছে।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী এইসঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রে করের ছাড় দেবার কথাও ঘোষণা করেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে ছাড়

ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহ দানের জন্য বঙ্গীয় অর্থ বিক্রয়কর আইনের আওতায় প্রস্তুতকারকদের করযোগ্য কারবার ১৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হবে। রাজ্য সরকার এমন একটি পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব করেছেন যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইনের (১৯৫৪) আওতাভুক্ত আগ্রহী ব্যক্তিরা নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য কর না দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কিনতে পারেন। যেসব ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিট এবছরের ১লা এপ্রিল থেকে প্রথম উৎপাদন সুরু করবে তাদের প্রথম বিক্রয় আরম্ভের তারিখ থেকে তিন বৎসরের জন্য বিক্রয় কর দিতে হবে না। বাঁশ, বেত ও শাঁখের তৈরী জিনিষপত্র এবং কাঁচের চুড়ি

বিক্রয়কর মুক্ত হবে। কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে জৈব সার এবং বায়ো-গ্যাস প্ল্যাণ্টকে বিক্রয়কর মুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবহণের ক্ষেত্রে ছাড়

পরিবহণ শিল্পকে উৎসাহিত করবার জন্য এবারের রাজ্য বাজেটে বাণিজ্যিক যানের ওপর চুঙ্গিকর শতকরা ৩ থেকে কমিয়ে শতকরা ½ ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভেষজ ও ঔষধ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত নির্জল অ্যালকোহলকে চুঙ্গিকরমুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে।

রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবন এবং বিনোদনের স্বার্থে সঙ্গীত, নৃত্য, ব্যালে, সার্কাস, পুতুলনাচ ও সবরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে অর্থমন্ত্রী প্রমোদকর মুক্ত করবার প্রস্তাব করেছেন। অবশ্য যে প্রমোদানুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্যাবারে দেখানো হয় সেগুলির ক্ষেত্রে বা সিনেমা বা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই কর রেহাই প্রযোজ্য হবেনা।

রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পকে উৎসাহ দানের জন্যও বর্তমান বাজেটে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রাজ্যে যেসব নতুন স্থায়ী চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ গড়ে উঠবে এবং যে প্রেক্ষাগৃহগুলি এরাজ্যে প্রস্তুত চলচ্চিত্রের জন্য বার্ষিক প্রদর্শন সময়ের একটা নির্দিষ্ট শতাংশ সংরক্ষণ করে রাখবে সেগুলিকে রাজ্যের চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী চিত্র প্রদর্শন আরম্ভের তারিখ থেকে ৩ বছরের জন্য প্রমোদকরের মোট পরিমাণের সমান অঙ্ক ভর্তুকী দেয়া হবে।

রাজ্যের টেলিভিশন শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য দুই বছরের জন্য টেলিভিশন সেটের ওপর স্থানীয় বিক্রয়কর শতকরা ১৫ থেকে কমিয়ে শতকরা ৭ ভাগ করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়ে বিক্রী করা এরূপ সেটের ওপর আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কর শতকরা ৪ থেকে কমিয়ে শতকরা ২ ভাগ করা হয়েছে। টেলিভিশন সেটের উপাদান ও যন্ত্রাংশকেও চুঙ্গিকর মুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়া খেলাধুলাকে উৎসাহ দানের জন্য রাজ্য বাজেটে সর্বপ্রকার ক্রীড়ানুষ্ঠানকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট, ১৯৭৬-৭৭

(হাজার টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত	সংশোধিত	বাজেট
আদায়	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭
প্রারম্ভিক তহবিল—	—৫,১৭৯	৭০,০৮১	৬,৯০৮
রাজস্ব আদায়	৪৬,০১,৮৭৯	৫৫,৭৪,৪২১	৫৯,৬২,৩২৮
ঋণ খাতে আদায়			
ঋণ	২০,৫৬,৮৮৮	২৪,৩২,৪০০	২৩,৭০,৯৯৭
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব থেকে আদায়	৬৯,৭৪,১৮৪	৮১,৯৮,৬৯৪	৮২,৮৯,০১০
মোট	১,৩৬,২৭,৭৭২	১,৬২,৭৫,৫৯৬	১,৬৬,২৯,২৪৩
ব্যয়			
রাজস্ব খাতে ব্যয়	৪৫,১৮,০০৮	৫৪,১৯,৪১৭	৫৬,৯৮,৫৯০
মূলধন খাতে ব্যয়	৪,৮০,০৮৮	৬,৪২,৯৯১	৮,২১,৫৩২
ঋণ খাতে ব্যয়—			
ঋণ	১৭,৯৫,২৬৭	২০,৯৮,০৩৩	১৯,০০,৪৩১
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব থেকে ব্যয়	৬৭,৬৪,৩২৮	৮১,০৮,২৪৭	৮২,৮৫,৪৬১
সমাপ্তি তহবিল	৭০,০৮১	৬,৯০৮	—৭৬,৭৭১
মোট	১,৩৬,২৭,৭৭২	১,৬২,৭৫,৫৯৬	১,৬৬,২৯,২৪৩
নীট ফল			
উদ্বৃত্ত (+)			
ঘাটতি (—)			
(ক) রাজস্ব খাতে	+ ৮৩,৮৭১	+ ১,৫৫,০০৪	+ ২,৬৩,৭৩৮
(খ) রাজস্ব খাতের বাইরে	— ৮,৬১১	— ২,১৮,১৭৭	— ৩,৪৭,৪১৭
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	+ ৭৫,২৬০	— ৬৩,১৭৩	— ৮৩,৬৭৯
(ঘ) অতিরিক্ত কর			+ ১,০৬,০০০
(ঙ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে কিছু অতিরিক্ত করসহ নীট			+ ২২,৩২১
(চ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট			+ ২৯,২২৯

রাজ্য বাজেট প্রসঙ্গে

বাসব সরকার

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ গত ১ লা মার্চ বিধান সভায় ১৯৭৬-৭৭ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে পশ্চিম বাংলার অর্থনীতির একটা আশা-ব্যঞ্জক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ছবি ফুটে উঠেছে। আর এই আশা ও প্রত্যয়ের বাস্তব ভিত্তিও রয়েছে ।

দেশে পরিকল্পিত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, পশ্চিম বাংলায় ১৯৭৬-৭৭ সালে পরিকল্পনার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৩২ কোটি টাকা। সারা দেশের বিচারে এই রাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ এবং সত্তরের দশকে পরিকল্পনার আকারে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধির হার দেখে, পরিকল্পনা কমিশন এতো বড়ো আকারের ব্যয় বরাদ্দে সম্মতি দিয়েছেন।

স্বল্পসঞ্চয় সংগ্রহে পশ্চিম বাংলার স্থান সারা দেশে প্রথম। এমন কি ১৯৭৪-'৭৫ সালে যখন দেশে স্বল্প সঞ্চয়ের হার ছিল কমতির দিকে, সেই বছরে এই রাজ্য ৮৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করে একটি সর্বকালীন নজীর সৃষ্টি করেছে। এই হার অব্যাহত আছে বলে, মোট সংগ্রহের যে দুই-তৃতীয়াংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসেবে পাওয়া যায় তা এবং আরো অতিরিক্ত সাহায্য এই খাতে পাওয়া যাবে। গত বছরের তুলনায় পরিকল্পনার ব্যয় এবারে ৬১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করার ভরসা কিছুটা এসেছে সেকারণেই।

ভরসার দ্বিতীয় কারণ হলো, পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। এযাবৎ পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল বছরে ৪৫ কোটি টাকা। আগামী আর্থিক বছর থেকে তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে আরো ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। তার সঙ্গে রয়েছে বাজার থেকে বর্ধিত ঋণ সংগ্রহ। এখাতেও ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বেশি ঋণ তোলা যাবে।

ভরসার তৃতীয় কারণ, রাজ্যের আয় বৃদ্ধি। বাজেটে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে গত বছরে আয় বৃদ্ধির ধারা এ বছরও অব্যাহত থাকবে।

বর্তমান বাজেটে কর প্রস্তাব অনুযায়ী, ভূ-সম্পত্তির লেনদেনের পরিমাণ দশ হাজার টাকার বেশি হলে বর্ধিত হারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হবে। বলা বাহুল্য এই আয় আসবে সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তবান শ্রেণীর কাছ থেকে। মোটরযান করের উপরে একটি অতিরিক্ত সারচার্জ বসানো হবে। অবশ্য এর আওতা থেকে যাত্রী-বাহী বাস, ট্যাক্সি, ও ব্যক্তিগত মালিকানার মোটরগাড়ী বাদ যাবে। ভূমি রাজস্বের উপর সারচার্জ ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উপর সেস্ বসানো হবে। সিনেমা হলে বিজ্ঞাপন বিষয়ক চলচ্চিত্র ও স্লাইড প্রদর্শনের উপরে বিজ্ঞাপন কর বসানো হবে। একটি সময় সীমার পরে খালি জমির উপরে শহরাঞ্চলীয় ভূমিকর এবং একটি নির্ধারিত সীমার উর্দ্ধে জমি ও বাড়ীর উপরে কর বসানো হবে। তাছাড়া একটি নির্ধারিত সীমার উর্দ্ধে খরচ করে জমির উন্নয়ন করা হলে উন্নয়ন কর এবং একটি সীমার উর্দ্ধে কোন জমি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছিল তার বদলে বেশি লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে পরিবর্তন কর ধার্য করা হবে।

পরিকল্পনা খাতে ৬১ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করার জন্যে, এই সমস্ত অতিরিক্ত কর ধার্যের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা থেকে আদায় হবে ১১ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত লক্ষ্যণীয় যে বড়ো মাপের পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও, অতিরিক্ত কর ধার্য করে সরকার সম্পদ সংগ্রহের উপরে তুলনামূলক ভাবে কম জোর দিয়েছেন। বরং বাজেটে চলতি করগুলি থেকে আদায় বৃদ্ধির উপরেই ভরসা করা হয়েছে বেশি।

আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, রাজ্যের অর্থনীতিতে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে, তারই ওপর ভরসা করে ১৯৭৬-'৭৭ সালের বাজেটে, পুরানো দিনের সমস্ত ঘাটতি ও প্রারম্ভিক তহবিলের ঘাটতির অঙ্ক মিটিয়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ধার্য হয়েছে ২.৯২ কোটি টাকা।

বাজেটের এই উদ্বৃত্ত টাকা যে ভাবে ব্যয় করার প্রস্তাব হয়েছে তার মধ্যে সমাজ কল্যাণের বহুমুখী লক্ষ্যের উপরে জোর পড়েছে সবচেয়ে বেশি। যেমন বলা যায়, উদ্বৃত্ত টাকার ৭৫ লক্ষ বরাদ্দ করা হবে গ্রামের সেই সব বাস্তুহীনদের মধ্যে, যাঁরা সবে বাস্তুজমি পেয়েছেন, যাতে মজবুত কুটীর নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ফলে এই খাতে মোট বরাদ্দ দাঁড়াবে দেড় কোটি টাকা।

DHANADHANYE
Price-30 Paise

YOJANA (Bengali)

REGD. NO. D(D) 78
April 1, 1976

দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা উত্তর বাংলার জেলাগুলির জন্যে উদ্বৃত্ত টাকা থেকে আরো ৬৭ লক্ষ দেওয়ার ফলে তাদের জন্যে মোট বাজেট বরাদ্দ দাঁড়াবে এক কোটি টাকা।

তৃতীয়ত, যে সব ভূমিহীন কৃষক জমি পেয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে উদ্বৃত্ত টাকার ৫০ লক্ষ ব্যয় করা হবে।

চতুর্থত, জেলা শহরগুলির উন্নয়নের যে কর্মসূচী গত কয়েক বছর থেকে চালু করা হয়েছে, সেই খাতে উদ্বৃত্ত টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ফলে, মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৩ লক্ষ টাকা।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার জনগণের আকর্ষণ সুবিদিত। বাজেট উদ্বৃত্তের ৫০ লক্ষ টাকা এই খাতে ব্যয় করার প্রস্তাবের ফলে, এখানে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৪.৭০ লক্ষ টাকা।

কিন্তু এবারের বাজেট মানেই কেবল সম্পদ সংগ্রহ আর খরচের তালিকা নয়। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমাজের দারিদ্র্যতর অংশকে উৎসাহ দান ও ছাড়ের ব্যবস্থাও বাজেটের অঙ্গ। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই বলা যায় পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে বাজেটে প্রতিফলিত সরকারী মনোভাবের কথা। নাট্য আন্দোলন এই রাজ্যের সংস্কৃতির একটি প্রধান দিক। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাট্যানুষ্ঠানের উৎকর্ষের বিচার করে এখন থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে যেমন আছে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। তাছাড়া সঙ্গীত, নৃত্য, ব্যালে, সার্কাস, পুতুলনাচ ও সবরকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে প্রমোদ-করের থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কেবল সাধারণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও যেখানে ক্যাবারে নাচ দেখানো হয়, সেগুলি এই রেহাই পাবে না।

দ্বিতীয়ত চলচ্চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের জন্যে যে পর্ষদ গঠন করা হয়েছে, তার হাতে থাকবে ২৫ লক্ষ টাকার এক উন্নয়ন তহবিল। এই রাজ্যে প্রতি ৬৯ হাজার লোকের জন্যে আছে একটি সিনেমা। অথচ তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে প্রতি ২৮৷২৯ হাজার লোকের জন্যে আছে একটি সিনেমা। সুতরাং পশ্চিম বাংলায় সিনেমা গৃহের সংখ্যা দ্বিগুণ করা দরকার। তাতে এই রাজ্যে প্রযোজিত ছায়াছবির বাজার সম্প্রসারিত হবে। সরকার তাই নতুন সিনেমা হল নির্মাণের উৎসাহ দেওয়ার জন্যে প্রস্তাব করেছেন যে এই সব নতুন হলে যদি বছরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় এই রাজ্যে প্রযোজিত ছবি দেখানো হয় তাহলে তারা প্রথম প্রদর্শনের দিন থেকে ৩ বছর যে পরিমাণ টাকা প্রমোদকর সংগ্রহ করবেন, তার সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য হিসেবে পাবেন। এই কর্মসূচী সফল করা গেলে এই রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্প এবং সংস্কৃতি দুইই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে উৎসাহিত করার জন্যে বঙ্গীয় অর্থবিক্রয় কর আইনের নিম্ন সীমা ধার্য করা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। ফলে অনেক ছোট ইউনিটকে আর বিক্রয়কর দিতে হবে না। তেমনি ভেষজ, ঔষধপত্র, কাগজ, প্রসাধন সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারীরা যাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কিনতে পারেন তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন ১৯৫৪-এর আওতাভুক্ত পণ্যগুলিকে করমুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৬ সালের ৩১ শে মার্চের পরে যে সব ছোট শিল্প ইউনিট প্রথম উৎপাদন করবে তাদের আগামী ৩ বছর প: ব: বিক্রয়কর ১৯৫৪-এর দায়ে পড়তে হবে না। এ ছাড়া বাঁশ, বেত, শাঁখের তৈরী জিনিস, কাঁচের চুড়ি, জৈব সার ও বায়োগ্যাস প্লান্ট গুলিকে বিক্রয়কর মুক্ত করার প্রস্তাব হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের সম্ভাবনা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগের পূর্ণতর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাজেটের এই সব ছাড় প্রস্তাবের ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটের বক্তব্য থেকে যে কথাটি পরিষ্কার তা হলো, এই রাজ্যের সুযোগ ও সম্ভাবনার যথাযথ ব্যবহার করলে যে পশ্চিম বাংলার সমাজ-জীবন সুস্থ ও বিকাশমুখী হতে পারে সে ব্যাপারে সরকারের একটা আশাবাদী মনোভাব।

কুড়িদফা কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্য সরকার কৃষি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী হার সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কার্যকর করেছেন।

শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে আগেই স্থির হয়েছিল যে, যেসব রাজ্যে তুলনামূলকভাবে সর্বনিম্ন মজুরী হার এখনো কম—তাদের ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে মজুরী হার সংশোধন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও মজুরী হার সংশোধন করে বয়স্কদের দৈনিক ৬.৫০ টাকা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দৈনিক ৪.৪৫ টাকা বেঁধে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ সালের সর্বনিম্ন মজুরী আইন ১৯৭৫ সালে পুনরায় সংশোধন করা হয়। বর্তমানে বয়স্কদের জন্য দৈনিক মজুরী হল ৬.৬৩ টাকা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৪.৭৪ টাকা। এছাড়া দুই বেলা আহার ও বাসস্থান সহ বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মাসিক মজুরী হবে যথাক্রমে ১০৭.২৬ টাকা এবং ৫৭.৩৫ টাকা।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রধানমন্ত্রী দেশের নির্মীয়মাণ বৃহত্তম মালবাহী জাহাজের কিল স্থাপন করছেন। বামে ক্রেনের সাহায্যে কিল নামানো হচ্ছে।

বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণের কাজ চালু হল

দেশের বৃহত্তম মালবাহী জাহাজটির কাঠামোর নির্মাণ কাজ সম্প্রতি কোচিন শিপইয়ার্ডে শুরু হয়েছে। দেশে এ পর্যন্ত নির্মিত জাহাজের মধ্যে এটাই বৃহত্তম মালবাহী জাহাজ। জাহাজটির ওজন পচাত্তর ডি ডবু টি। আশা করা যাচ্ছে জাহাজটির নির্মাণ কাজ আগামী উনিশ'শ আটাত্তর সালের মধ্যেই শেষ হবে।

কোচিন শিপ ইয়ার্ডটি দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র। বিশ্বের আধুনিকতম জাহাজ নির্মাণ সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কোচিন শিপ ইয়ার্ড। এই জাহাজ নির্মাণ সংস্থার কাজ পুরোদমে চালু হলে এখানে পঁচাশি হাজার ডি ডবু টি ওজনবিশিষ্ট জাহাজ নির্মাণের কাজ সম্ভব হবে। তাছাড়া এক লক্ষ ডি ডবু টি ওজনবিশিষ্ট জাহাজও এই জাহাজ নির্মাণ কারখানায় মেরামত করা সম্ভব হবে।

পরবর্তী সংখ্যায়

ইন্দিরা গান্ধী
উমা সচদেব

পণ প্রথার অবসান চাই
উৎপল সেনগুপ্ত

গোপন কারুকাজ (গল্প)
শংকর দাশগুপ্ত

এই অপচয় বন্ধ হোক
আনন্দ ভট্টাচার্য্য

শিল্পে নতুন পরিবেশ
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

এছাড়া থাকছে সিনেমা, মহিলা জগৎ, খেলাধুলা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

ঘোষণা

আগামী ১ মে, ১৯৭৬ থেকে 'খেলাধুলা' ও 'মহিলা' বিভাগের জন্য 'ধনধান্যে'র চার পৃষ্ঠা বাড়ানো হবে। ফলে পরিবর্ত্তিত গ্রাহকমূল্যের হার নিম্নরূপ হবে :

প্রতি সংখ্যার মূল্য — ৫০ পয়সা বার্ষিক — ১০ টাকা
দুই বছর — ১৭ টাকা তিন বছর — ২৪ টাকা

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের বর্ত্তমান হার :
বার্ষিক-৬ টাকা, দুবছর ১০ টাকা এবং তিনবছর ১৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৩০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA

বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ২০/১৫ এপ্রিল ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—
মলয়শংকর দাশগুপ্ত

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

কতদিন থেকে নানা সামাজিক কুসংস্কার আমাদের সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে সেটা সঠিক বলা না গেলেও হাজার হাজার বছর ধরে সমাজের এই ব্যাধিগুলি সমাজকে পলে পলে ধ্বংসের দিকে যে ঠেলে দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যুগে যুগে বহু সমাজ সংস্কারক মহাপুরুষ সমাজকে এই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেছেন। কিছু কিছু সফল হলেও এখনও অনেক সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের সমাজ। এই সমস্ত কুসংস্কার সমাজকে এমন আষ্টেপিষ্টে আকড়ে ধরে আছে যে ঐ সব মনীষীদের অক্লান্ত চেষ্টা ও আন্দোলন সত্ত্বেও এখনও ঐসবের মধ্যে অনেকই সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছে এবং সমাজের অগ্রগতি, দেশের প্রগতির পক্ষে প্রবল বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যতদিন এই সব সমাজদেহ থেকে দূরীভূত না হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে, ততদিন সুস্থ মানুষের মত সমাজও সবল পায়ে দাঁড়িয়ে অগ্রসর হতে পারছেনা।

বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদের মত পণ ও যৌতুক প্রথা আমাদের পরম শত্রু। এই কুপ্রথার কুফল ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। কতশত নিরীহ অভাগিনী এই কুপ্রথার শিকার হয়েছে তার হিসেব নেই। নীরবে কত নববধূর চোখের জলে ধুয়ে মুছে গেছে তাদের ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্ন তার ইয়ত্তা নেই। এমনকি কত নারী-যে আত্মাহুতি দিয়ে চরম অপমানের ও লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছে তারও কোন লেখাজোখা নেই। কত দরিদ্র মা বাপ কন্যার সুপাত্রের জন্য ভিটেমাটি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে গেছে তার খোঁজ কজন রাখি আমরা ? অন্যান্য কুপ্রথার মত এই দুঃসহ ব্যাধির বিরুদ্ধে তেমন কোন আন্দোলন এতদিন গড়ে উঠেনি, আশ্চর্য্য লাগে। যদিও কিছু কিছু বরণীয় সাহিত্যি-কের সাহিত্যে এদের চোখের জলের প্রতিফলন ঘটেছে, তথাপি কোন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক তেমনি করে এর মূলোৎপাটন করতে কেন এগিয়ে আসেন নাই, অবাক হতে হয়।

সম্প্রতি এই প্রথার বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। সরকারও এটাকে বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে সারাদেশে রাজ্যে রাজ্যে আইনও প্রণীত হচ্ছে। কেবল মাত্র আইনের সাহায্যে এই কুপ্রথাকে দূর করা যাবেনা, তার নজীর বাল্যবিবাহ রোধ আইন, অস্পৃশ্যতারোধ আইন প্রভৃতি। যারা এর মূলোচ্ছেদ করতে আগ্রহী নিঃসন্দেহে আইন তাদেরকে সাহায্য করবে। আইনের সহায়তায় তারা তাদের আন্দোলনকে জোরদার করতে পারবেন। কিন্তু এটা এমন একটি রোগ যে, যে দেহে এর অবস্থান তার অস্ত্রোপচার না করলে এ রোগ দূর করা যাবেনা। অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণীর লোককেই এগিয়ে আসতে হবে। গড়ে তুলতে হবে এর বিরুদ্ধে এক সার্বিক আন্দোলন। তবেই দূর করা সম্ভব হবে সমাজদেহ থেকে এই দুষ্টক্ষত।

শহরের জমির সীমা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শহরে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে তার সামাজিকীকরণের দাবিকে আর যাই হোক নতুন বলা চলে না। নানা রাজনৈতিক দলের, তাদের মধ্যে শাসক দলও আছে, কর্মসূচী আর নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই দাবি ঠাঁই পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে চাষের জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার কাজ স্বরু হয়েছে অনেক আগেই। শহরে সম্পত্তির সীমা নির্ধারণের যে দাবি ওঠে তা ঐ চাষের জমির সীমা বেঁধে দেওয়ার দাবিরই পরিপূরক। চাষের জমি যাতে মুষ্টিমেয় বড় চাষীর কুক্ষিগত হয়ে না-থাকে, যাতে ভূমিহীন চাষীর হাতে চাষের জমির মালিকানা পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই জন্যেই গ্রামাঞ্চলে চাষের জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্চে। শহরের জমিতে চাষ হয় না, কিন্তু সেখানেও জমির একটা বড় অংশই ধনীদের কুক্ষিগত। সেই জমি নিয়ে চলে ফাটকাবাজি আর মুনাফাবাজি। গ্রামে যেমন ভূমিহীন চাষীর কাছে এক টুকরো জমির মালিকানা একটা স্বপ্ন, শহরের মানুষের কাছে তেমনই শহর এলাকার মধ্যে একটুকু বাসার মালিকানাও একটা স্বপ্ন। কিন্তু শহরে জমির চড়া দাম সেই স্বপ্ন সার্থক হতে দেয় না। শহরে বড় বড় বাড়ি ওঠে, বহু ফ্ল্যাটও তৈরি হয়। কিন্তু তা থেকে যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

অবশ্য শহর এলাকায় শুধু জমির নয়, সামগ্রিকভাবে শহরে সম্পত্তিরই সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের দাবি ওঠে। শহরে সম্পত্তি বলতে জমি এবং বাড়ি দুইই। সত্যি কথা বলতে কি, এত দিন পর্যন্ত এই দুই ধরণের সম্পত্তিরই সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কমিটি বিষয়টি যখন বিবেচনা করেছেন তখন শহর এলাকার জমি ও বাড়ির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কথাই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এই সব বিবেচনার সময় ক্রমশই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো—তা হলো, শহরের বাড়িঘরের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে আইন তৈরি করে তারপর সেই আইন কার্যকর করা বড় সহজ হবে না। বাড়িঘরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের মাপকাঠি কী হবে? তার দাম? কিন্তু দাম তো এক-এক এলাকায় এক-এক রকম। তারপর দাম যে সব সময় এক থাকে তাও নয়, কখনও ওঠে, কখনও পড়ে। বাড়ি ঘরের মালিকানার সীমা বেঁধে দেওয়ার পর যা উদ্বৃত্ত হবে তা কী ভাবেই বা অধিগ্রহণ করা হবে অথবা অধিগ্রহণের পরেই বা কীভাবে তা কাজে লাগানো হবে? এই ধরণের নানা অনিশ্চয়তা নিয়ে একটা আইন তৈরি করা যায় না। তাই শহর এলাকার খালি জমির মালিকানার সীমা বেঁধে দেওয়ার কথাই ভাবা স্বরু হলো।

প্রধানমন্ত্রী যখন তার বিশ-দফা কর্মসূচীতে এই প্রসঙ্গের কথা বললেন তখন তিনিও শুধু খালি জমির কথাই বললেন। শহরে জমি নিয়ে মুনাফাবাজী করে কিছু লোক বহু টাকা কামিয়েছে। জমি নিয়ে ফাটকাবাজি চলতে থাকায় আর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে জমি গিয়ে পড়ায় নিদারুণ বৈষম্য দেখা দিয়েছে। শহর এলাকার ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে নিতান্ত এলোমেলোভাবে। প্রধানমন্ত্রী তাই জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে নতুন যে-সব বাড়ি তৈরি হবে তার ভিতের মাপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাবও করলেন।

প্রধানমন্ত্রীর ঐ ঘোষণার মাস আষ্টেকের মধ্যেই নতুন আইন তৈরি হয়ে গেল। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর আইনটি এখন ১১টি রাজ্যে চালু হয়েছে। আসলে জমি নিয়ে আইন করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে আইন তৈরি করতে পারেন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যে সব রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ক্ষমতা দিয়েছে সেই সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু হয়েছে এই আইন। ঐ সব রাজ্যের মধ্যে রয়েছে পশ্চিম বাংলা, অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা ও উত্তর প্রদেশ। অন্যান্য রাজ্যেও আইনটি চালু হবে ক্রমশ।

শহর এলাকায় খালি জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। শহর এলাকাকে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন স্তরে। তারপর এই স্তর অনুযায়ী ঠিক করা হয়েছে সর্বোচ্চ সীমা। সবচেয়ে বড় শহর, যেমন কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই আর মাদ্রাজে এই সীমা ৫০০ বর্গ মিটার। আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, কানপুর আর পুনা পড়েছে 'খ' শ্রেণীতে। এই সব শহরের সর্বোচ্চ সীমা হাজার বর্গ মিটার। ৩৫টি শহর পেয়েছে 'গ' শ্রেণীর মার্কা। সেখানে সীমা দেড় হাজার বর্গ মিটার। আর 'ঘ' শ্রেণীর ২৯টি শহরে সর্বোচ্চ সীমা হবে ২০০০ বর্গ মিটার। এখানে শহর বলতে অবশ্য শুধু মূল শহরটিকেই ধরা

হয় নি। সংশ্লিষ্ট শহরের সন্নিহিত এলাকাকেও ধরা হয়েছে।

এই সর্বোচ্চ সীমার আওতায় যে-সব খালি জমি আসবে তার সংজ্ঞাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, শহর এলাকায় যে-সব জমিতে চাষ হয় না সেই সব জমিই আসবে এর আওতায়। নির্দিষ্ট সীমার বাড়তি জমি যাবে রাজ্য সরকারের হাতে। এই বাড়তি জমি অধিগ্রহণের জন্যে অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের হার হবে এই রকম: যে-সব জমি থেকে আয় হয় সেই সব জমির ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের ঠিক আগের পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক আয়ের আট ও এক তৃতীয়াংশ গুণ; যে সব জমি থেকে কোনো আয় হয়না সেখানে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর শহরে বর্গ মিটার পিছু দশ টাকা এবং 'গ' ও 'ঘ' শ্রেণীর শহরে বর্গ মিটার পিছু পাঁচ টাকা হারে। ক্ষতিপূরণ বাবদ জমির মালিকের পাওনা টাকা অবশ্য পুরোটা নগদে দেওয়া হবে না। মোট পাওনার সিকি ভাগ অথবা পঁচিশ হাজার টাকা (দুটোর মধ্যে যেটা কম হবে) নগদে দেওয়া হবে। বাকিটা দেওয়া হবে বণ্ডে। অধিগ্রহণের বিশ বছর পরে ঐ বণ্ডের টাকা পাওয়া যাবে। এই টাকার ওপর বছরে শতকরা পাঁচটাকা হারে সুদ দেবেন সরকার। তবে কোনো ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ বাবদ দু' লাখ টাকার বেশি দেওয়া হবে না।

এই আইন চালু হওয়ার পর অনেকেই জমি কিনবেন, কেউ উত্তরাধিকার হিসেবে অথবা আদালতের আদেশে জমির মালিকানা পাবেন। তাদের এই নতুন জমি আর পুরোনো জমি মিলিয়ে যদি নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে সরকারকে অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে সেই খবর জানাতে হবে। এই খবর গোপন করলে সাজা পেতে হবে। সাজা হিসেবে আদায় করা হবে ঐ জমির দামের সমান টাকা। দামের দ্বিগুণ টাকা পর্যন্ত আদায় করা যেতে পারে। শহরে সম্পত্তির হস্তান্তরের আগেও এখন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। জমির লেন-দেনের নামে যে ফাটকাবাজি এবং কালো টাকার খেলা চলে, তা বন্ধ করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। বিলাসবহুল বাড়িঘর, তৈরি যাতে বন্ধ হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চালু করা হয়েছে ভিতের মাপ সম্পর্কে কড়াকড়ি। এই আইন অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আপত্তি থাকলে অবশ্য বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইবুনালের কাছে আবেদন করা চলবে। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টেও আপীল করা যাবে।

শহরের খালি জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা এই যে বেঁধে দেওয়া হলো, এর ফলে কি ঘরবাড়ি তৈরিতে বাধা পড়বে? তা মনে হয় না। মুষ্টিমেয় লোকের জন্যে বিলাসবহুল বাড়ি তৈরিতে আগ্রহ নিশ্চয়ই কমবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে বাড়ি তৈরির পথ প্রশস্ত হবে। কারণ, শহর এলাকায় নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষের জন্যে যে যথেষ্ট বাড়ি তৈরি হচ্ছে না তার একটা কারণ জমির চড়া দাম। সরকারি গৃহনির্মাণ কর্মসূচি রূপায়ণও এর ফলেই বাধা পেয়েছে। এখন সরকারের হাতে বাড়তি জমি আসবে। তা ছাড়া, নতুন আইনেই ব্যবস্থা রয়েছে যে, যদি কোনো জমির মালিক অল্প-আয়ের লোকের জন্যে বাড়ি তৈরির কাজে এগিয়ে আসেন তবে তার জমিকে এই আইন থেকে রেহাই দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় আইন তৈরি হওয়ার পরেই অবশ্য কাজ ফুরোয় নি। সেই আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা তো আছেই, তা ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে এই প্রসঙ্গে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই দায়িত্ব অনুসারে পশ্চিম বাংলায় ইতিমধ্যেই আইন তৈরি হয়ে গেছে। এই আইন অনুসারে তিন শ' বর্গ মিটারের ওপর জমি থাকলে বাড়তি খালি জমির ওপর কর দিতে হবে। তবে এই কর আপাতত দু'বছর আদায় করা হবে না। জমির মালিকেরা যাতে ঐ সব জমিকে ঠিকমতো কাজে লাগাবার সুযোগ পান, সেই জন্যেই আপাতত এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তৈরি বাড়ির ভিতের মাপও একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে কর দিতে হবে। কোনো জমি যে-উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছিল সে-উদ্দেশ্যে কাজে না-লাগিয়ে অন্য কাজে লাগালে তার জন্যেও কর (কনভারসান চার্জ) দিতে হবে।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে এখন এমন একটা ব্যবস্থা গৃহীত হলো যার ফলে শহরের জমি নিয়ে ফাটকাবাজি-মুনাফাবাজি করা চলবে না। বিলাসবহুল অট্টালিকা তৈরিও প্রশ্রয় পাবে না। আর সেই সঙ্গে গৃহহীন মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার পথও প্রশস্ত হলো। ভুললে চলবে না, দেশ জুড়ে শহর এলাকায় গৃহ সমস্যা খুবই তীব্র। অন্তত এক কোটি একটুকুবাসা এখনই দরকার।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সত্তর কোটি টাকার একটি নতুন প্রকল্প পঞ্চম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শূকর গোপালন পোলট্রি ও মেষ পালন কর্মসূচী এই নতুন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যে। চলতি আর্থিক বছরে এই সব কর্মসূচীর জন্য ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

একুশটি জেলায় শূকর গোপালন, ১৮টি জেলায় পোলট্রি ও ১০টি জেলায় মেষ পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

গোপালন বনাম ডেয়ারী প্রকল্প ছাড়াও এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। দেশের ৬টি রাজ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্য করবেন।

সার সন্দেশ

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

গত দশকে ভারতে রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও ব্যবহার অনেকগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৫২-৫৩ সালে যেখানে আমাদের দেশে মাত্র ৫৩ হাজার ১০০ টন নাইট্রোজেন সার উৎপন্ন হয়েছে সে জায়গায় ১৯৭৪-৭৫ সাল নাগাদ দেশে নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত টন। এই একই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারের পরিমাণ ৫৭ হাজার ৮ শত টন থেকে বেড়ে ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ২ শত টন হয়েছে। অর্থাৎ এই ২২ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে ২২ গুণের বেশি এবং ব্যবহারের পরিমাণ ৩০ গুণের বেশি হয়েছে। ১৯৫২-৫৩ সালে আমাদের দেশে ফসফেট সার তৈরি হত ৭,৪৫০ টন আর ১৯৭৪-৭৫ সালে ঐ সারের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ২ শত টন। এই সময়ের মধ্যে ফসফেট সারের ব্যবহার ৩৩০০ টন থেকে বেড়ে ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৫০ টন হয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যে পটাশ সারের ব্যবহার ৩৩০০ টন থেকে বেড়ে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ২০০ টন হয়েছে। পটাশ সার আমরা যতটুকু ব্যবহার করি তার সবটাই অবশ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

আমাদের দেশে সার শিল্পের বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলির যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি বেসরকারি কারখানাগুলির এবং সমবায় সমিতিগুলির মালিকানায় পরিচালিত কারখানাগুলিরও বিশেষ অবদান রয়েছে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই সারের উৎপাদন গত কয়েক বছরে বহু গুণ বেড়েছে।

কৃষির উৎপাদন বাড়াতে এবং খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে সার শিল্পের প্রসারের যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা আমাদের পরিকল্পনার প্রথম দিক থেকেই পরিকল্পনাকাররা বুঝেছিলেন। উন্নয়নের যে কয়টি ক্ষেত্রকে আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়নের কেন্দ্রবস্তু বলে গণ্য করা হয় সার শিল্প সেগুলির অন্যতম।

কিন্তু সার শিল্পে এই চমকপ্রদ অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত সারের ব্যবহারে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায়, এমনকি কোন কোন উন্নতিশীল দেশের তুলনায়ও অনেক পিছিয়ে আছি। যেমন, হল্যাণ্ডে যেখানে প্রতি হেক্টরে আবাদী জমিতে ৭১৭ কিলোগ্রাম, নিউজীল্যাণ্ডে ৬০২ কিলোগ্রাম, বেলজিয়ামে ৫০৯ কিলোগ্রাম, পশ্চিম জার্মানিতে ৪০০ কিলোগ্রাম, জাপানে ৩৮৭ কিলোগ্রাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮৫ কিলোগ্রাম, সোভিয়েৎ রাশিয়ায় ৪৯ কিলোগ্রাম, এমনকি চীনেও ৩৮ কিলোগ্রাম সার ব্যবহার করা হয় সেখানে ভারতে ব্যবহার করা হয় হেক্টর পিছু মাত্র ১৬ কিলোগ্রাম সার।

অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বল্প পরিমাণ যে সার আমাদের দেশে ব্যবহার করা হয় তারও একটা বড় অংশ আবার আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সারের উৎপাদন যে হারে বেড়েছে সারের ব্যবহার বহু বৎসর যাবৎ বেড়েছে তার চেয়ে দ্রুততর হারে। সারের যোগানও চাহিদার মধ্যে ফারাক ভরাট করতে হয়েছে আমদানি করা সার দিয়ে। একদিকে যেমন আমাদের দেশের ভিতরে উৎপাদন বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি বাইরে থেকে আমদানিও বলতে গেলে প্রতি বছরেই বাড়তির দিকে চলেছে। ১৯৫২-৫৩ সালে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ মিলিয়ে মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৭,৬০০ টন। ১৯৭৪-৭৫ সালে আমদানি করা হয়েছে মোট ১৬,০৭,৭০০ টন। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৩ গুণেরও বেশি। সার আমদানি করতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার খরচ যে হারে বেড়েছে সেটা আরও অনেক বেশি। ১৯৭৩-৭৪ সালে আমাদের মোট ১৭৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা খরচ করে ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ শত টন সার আমদানি করতে হয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালে আমাদের সার আমদানির পরিমাণ সামান্য বেড়ে ১৬ লক্ষ ৭ হাজার ১ শত টন হল। অথচ, আমদানি খরচের পরিমাণ এক লাফে বেড়ে দাড়াল ৫৭৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। ঐ এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারের দামও প্রচণ্ড চড়ে গিয়েছিল। ভারতকে তারই গুণাগার দিতে হয়েছে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে।

শুধু যে বিদেশী সারের বাবদই এখন পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমাদের পরনির্ভরশীলতা রয়ে গেছে তা নয়, দেশের ভিতরে আমরা যে সার তৈরি করছি তার কাঁচামালের ব্যাপারেও আমাদের পরনির্ভরশীলতা আমাদের সার শিল্পের একটি প্রধান দুর্বলতা হয়ে রয়েছে। সার-শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব কাঁচামালের ব্যাপারে আমারা পরমুখাপেক্ষী সেগুলির মধ্যে প্রধান হল খনিজ তেল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভরতার প্রশ্নের সঙ্গে সারের ব্যাপারে স্বয়ংনির্ভরতার প্রশ্নটি যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তেমনি সারের ব্যাপারে স্বয়ং নির্ভরতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে খনিজ তেলের যোগানে স্বয়ংনির্ভরতার প্রশ্নটি।

যদি শুধু উৎপাদনের সুবিধা ও খরচ কমাবার দিক থেকে বিবেচনা করা হয় তাহলে নাইট্রোজেন তৈরির প্রকৃষ্টতম কাঁচামাল হল ন্যাপথা। কিন্তু, যতদিন ন্যাপথা আমদানির জন্য আমাদের বিদেশী তৈলক্ষেত্রগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে ততদিন পর্যন্ত অন্য বিকল্প কাঁচামাল থেকেও সার উৎপাদনের পথ খোলা রাখা দরকার। আমাদের পরিকল্পনাকারেরা একথা বুঝেই কয়লা থেকে সার তৈরির জন্য কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন। কয়লা থেকে সার তৈরির পদ্ধতিটা অবশ্য ব্যয়সাপেক্ষ এবং এই পদ্ধতি এখনও কতকটা পরীক্ষামূলক। কিন্তু পৃথিবীর অন্তত একটি জায়গায় বেশ কয়েক বছর যাবৎ সাফল্যের সঙ্গে কয়লা থেকে সার তৈরি করা হচ্ছে। সেই জায়গাটির নাম সাসোল। জায়গাটি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত।

কয়লা থেকে সার তৈরির জন্য যে অর্থ নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে সেটা আপাতত খুব বেশি মনে হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে পরিণামে এই ব্যয় মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে করা যায় না। ভারতীয় সার কর্পোরেশনের ড: সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে একটি হিসাব দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আমাদের যে ৫০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে সেটা তেল থেকে উৎপাদন করতে হলে (তখনকার মূল্যহার অনুসারে) তেল আমদানির খরচ পড়বে ৫০০ কোটি টাকা। ঐ পরিমাণ নাইট্রোজেন সার যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব হয় তাহলে সেজন্য খরচ করতে হবে ৩০০০ কোটি টাকা। আর, কয়লা থেকে এপরিমাণ সার তৈরির জন্য কারখানা করতে হলে যে বিনিয়োগের দরকার হবে তারও পরিমাণ ঐ ৩০০০ কোটি টাকা। কিন্তু তফাত হচ্ছে এই যে বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করে ঐ টাকাটা তুলতে পারলে কারখানার উৎপাদন থেকে ১২ বছরের মধ্যে ধারটা শোধ করে দেওয়া যাবে।

স্বয়ংনির্ভরতার এই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই কয়লা থেকে সার তৈরির চারটি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা এক সময়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ঐ ধরনের কারখানা স্থাপনের জন্য দেশের মধ্যে আরও কয়েকটি স্থান বাছাই করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং এবিষয়ে একটা দ্বিতীয় চিন্তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তার কারণ হল, বোম্বাই হাইয়ে তেলের সন্ধান করতে গিয়ে যে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করা গেছে তার ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তেল উৎপাদনে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেকারণে কয়লা থেকে সার তৈরীর প্রশ্নটা এখন তার আগেকার গুরুত্ব অনেকখানি হারিয়েছে। ভারতীয় সার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী কে সি শর্মা গত ডিসেম্বর মাসে বলেছেন, ভবিষ্যতে যেসব সার কারখানা স্থাপন করা হবে সেগুলিতে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে প্রাকৃতিক গ্যাস। তিনি আরও বলেছেন, বোম্বাই হাই ও বঙ্গোপসাগরে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার "ভাল সম্ভাবনা" দেখা যাওয়ায় ইতিমধ্যে ট্রম্বের পাঁচ নম্বর ইউনিটটিকে গ্যাস ভিত্তিক করা হয়েছে। আগে এটি ফুয়েল অয়েল—ভিত্তিক হবে বলে স্থির ছিল।

শ্রী শর্মা অবশ্য বলেছেন, রামাগুণ্ডম্ ও তালচেরে যে দুটি কয়লা-ভিত্তিক সার কারখানা তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে সেই দুটি কারখানা তৈরীর কাজ চলবে।

আমাদের সার শিল্পে সম্প্রতি আর একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা হল চাহিদা কমে যাওয়ার সমস্যা। সার কারখানাগুলিতে উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু চাহিদা সেই অনুপাতে বাড়ছেনা, এবং সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, ফসফেট ও পটাশ সারের ক্ষেত্রে চাহিদা কমে যাচ্ছে। ১৯৭৫ সালের শেষের দশ মাসে নাইট্রোজেন সারের চাহিদা মাত্র ১৪ শতাংশ বেড়েছে, আর ফসফেট ও পটাশ সারের চাহিদা ২০ শতাংশের মতো কমে গেছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ সার শিল্পে যোগান-বেশি—চাহিদা কম পরিস্থিতি চলছিল। তখন বলতে গেলে সরাসরি কারখানা থেকে মাঠে সার চলে যাচ্ছিল।

সার রাখার জন্য গুদামের কোন প্রয়োজনীয়তাই এতদিন অনুভব করা যায় নি। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন কারখানায় উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু চাহিদা মন্দা। গুদামে গুদামে যখন সার মজুত হয়ে রয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে, তৈরী সার রাখার মতো যথেষ্ট গুদাম দেশে নেই।

ফসফেট ও পটাশ সার বাদ দিয়ে শুধু নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত ব্যবহার করার যে ঝোঁক প্রকাশ পাচ্ছে সেটা পরিণামে জমির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে বলে বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। আশা করা যাচ্ছে, এবারের বাজেটে ফসফেট সারের দাম যথেষ্ট কমানোর ফলে নাইট্রোজেন সারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দূর হবে এবং ফসফেট সারের চাহিদা বাড়বে।

ইতিমধ্যে দেশে সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বড় খবর তৈরী হয়েছে। এবছরে নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ লক্ষ টন। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ছদিন আগেই গত ২৫শে মার্চ সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

ধনধান্যের পৃষ্ঠপোষক ও পাঠক পাঠিকাদের বাংলা নববর্ষের শুভকামনা জানাই

ধীরেন সাহা

তাঁত শিল্প প্রসঙ্গ

গ্রাম থেকে সমৃদ্ধির ভিত পাকা করে তুলবার যে প্রয়াস সম্প্রতি সুরু হয়েছে তাঁতশিল্পের উন্নয়নের প্রশ্নটি তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এদেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক বাস করেন এই গ্রামাঞ্চলে। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবী, মজুর ও কারিগর-সহ গ্রামের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীকে দীর্ঘকালের দারিদ্র্য থেকে সচ্ছলতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য কুড়ি-দফা কর্মসূচীতে নেয়া হয়েছে কয়েকটি যুগান্তকারী ব্যবস্থা। যাদের জমি নেই তাদের জমি দেয়ার কাজ চলছে। যাদের বাসস্থান নেই তাদের বাস্তুজমি এবং সেই সঙ্গে বাড়ী তৈরীর অর্থ দেয়া হচ্ছে। ঋণভারে জর্জরিত ছোট চাষী, খেত মজুর ও গ্রামীণ কারিগরদের মহাজনী ঋণ মকুব করা হয়েছে। তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেবার জন্য স্থাপিত হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। খেত মজুরদের মজুরী বাড়িয়ে তাদের শ্রমের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও চলছে।

কৃষির পরেই গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা হল তাঁত। প্রায় এক কোটি লোক দেশের সবচেয়ে বড় এই কুটীর শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এবং শুধু জীবিকার প্রশ্নই নয়, আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বহন করছে তাঁতশিল্প। আমাদের তাঁতবস্ত্রসামগ্রী স্মরণাতীত কাল থেকে বিদেশে সমাদর পেয়ে আসছে তার বাহারী রঙ, সুন্দর নকশা ও অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের জন্য। নানা বাধাবিপত্তি এবং আর্থিক দুর্যোগের মধ্যেও দেশের তাঁতশিল্পীরা এই ঐতিহ্য ও নৈপুণ্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ফলে আজও দেশে বিদেশে ভারতের তাঁত সামগ্রীর কদর বাড়ছে বই কমছে না। একটি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, ১৯৭৪-৭৫ সালে তাঁতবস্ত্র রপ্তানী করে আমরা ১০৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছি। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই আয় আরো বেড়ে ১১১ কোটি টাকা দাঁড়াবে। সুতরাং দেশের অর্থনীতিতে তাঁতশিল্পের যে অসামান্য অবদান রয়েছে তা অস্বীকার করবার নয়।

বর্তমানে যারা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই পল্লী ও আধা-শহর এলাকার অসংখ্য মানুষই দরিদ্র। তারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করছেন। অথচ এই সম্ভাবনাময় শিল্পকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারলে শুধু এদের জীবনকেই নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির ভিতটাই সুদৃঢ় করা যাবে। বিশদফা কর্মসূচীতে তাই এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ওপর দেয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। গ্রহণ করা হয়েছে এক নতুন কর্মসূচী—এক নতুন উদ্যোগ।

সারা ভারতে এখন প্রায় ৩০ লক্ষ হস্তচালিত তাঁত রয়েছে। এই তাঁত অথচ ২৫ শতাংশ সূতী বস্ত্রের চাহিদা মেটায়। ২২০ কোটি মিটার কাপড় হস্তচালিত তাঁত শিল্পীরাই তৈরী করেন। অথচ এত বড় দায়িত্ব যাদের হাতে তাদের অধিকাংশই আর্থিক ও অন্যান্য নানা সমস্যায় পীড়িত। ন্যায্য দামে ভালো মানের সূতা, সুবিধাজনক সর্তে ঋণ বা বিক্রীর বাজার—এসব সমস্যা তো তাদের রয়েছেই। তাছাড়া এক বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে বয়ন শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিতে। দেশের বেশীর ভাগ লোক এখন মিলের বা শক্তি-চালিত তাঁতের কাপড় পরেন। তাই মিল ও শক্তিচালিত তাঁত এখন এই বৃহৎ কুটীর শিল্পের বড় প্রতিযোগী। এই প্রতিযোগীদের হাত থেকে তাঁতশিল্পকে রক্ষার জন্য শাড়ী, ধুতি, তোয়ালে, বেড কভার প্রভৃতি কয়েকটি জিনিসের উৎপাদন শুধু তাঁতশিল্পের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার অভিযোগ মিল ও বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতের বিরুদ্ধে প্রবল। তাঁত-শিল্পকে বাঁচাবার জন্য রিবেট দেবার প্রথাটি অনেক দিন ধরে চলছে। কিন্তু রিবেট এবং বাড়তি রিবেট তো দীর্ঘদিন চলতে পারে না। তাই এইসব সমস্যার সমাধানই হবে বর্তমান উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্য।

নতুন কর্মসূচীটি রূপায়ণের কাজ ইতি-মধ্যেই সুরু হয়েছে। হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন একজন উন্নয়ন কমিশনার। তাঁর কাজ হবে নিবরাময়
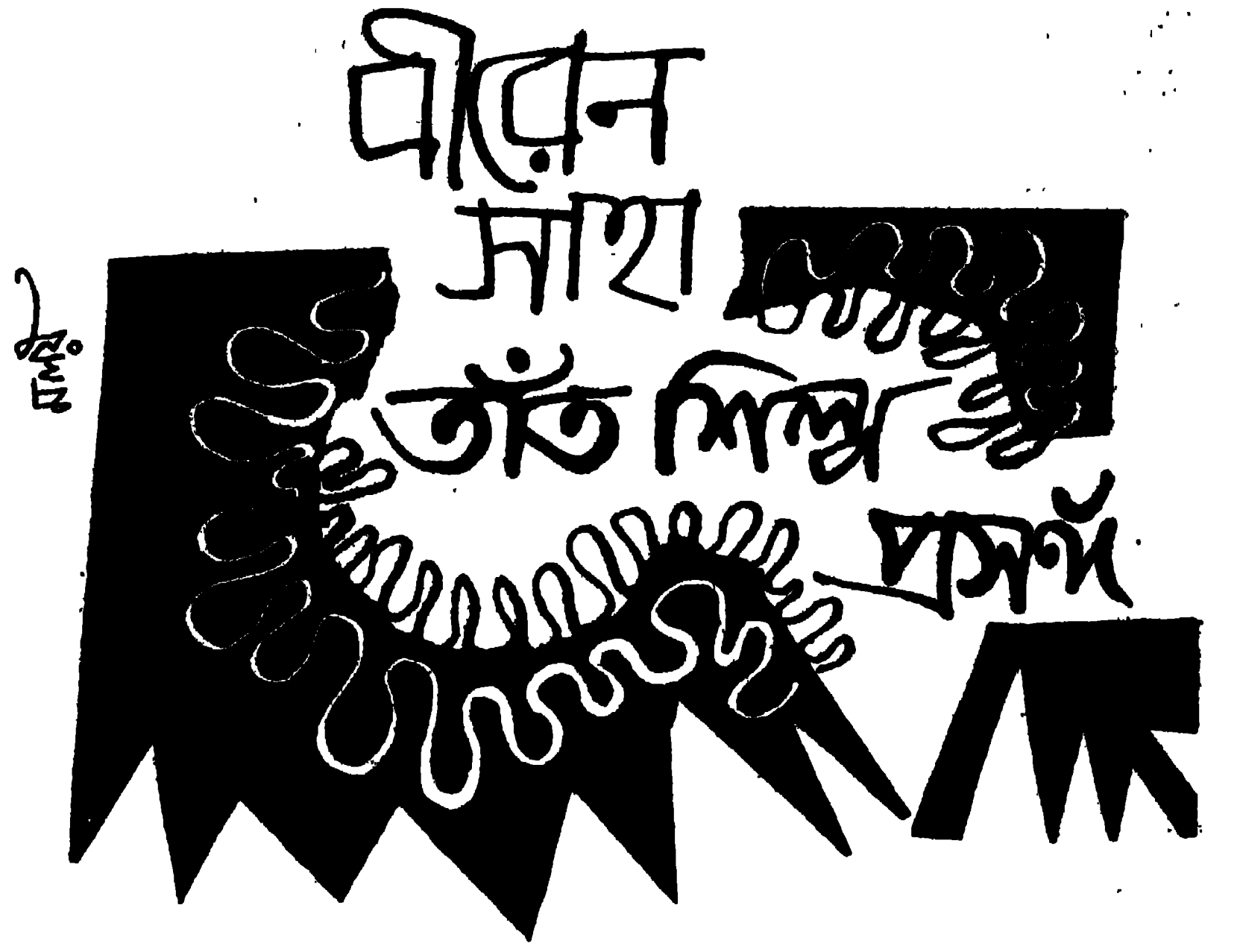
কমিটির ওপর ভিত্তি করে রচিত হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচীটিকে বাস্তবে রূপায়িত করা। সম্প্রতি নতুনদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্য তাঁতশিল্প মন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনেই উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপারেখাটি স্থির হয়ে গেছে। তিনশ' কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচ বছর মেয়াদী এই কর্মসূচীতে অর্থ যোগাবেন বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার। প্রতিটি রাজ্যে তাঁত শিল্পীরা যে সব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ সে সব এলাকার ৪০ হাজার তাঁত শিল্পীকে নিয়ে একটি করে নিবিড় উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হবে। এছাড়া প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে রপ্তানীমুখী প্রকল্প চালু করা হবে। প্রতিটি রাজ্যে একটি করে মোট ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটিতে ব্যয় হবে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা করে। এ প্রকল্পে মোট ১০০ কোটি টাকা মূল্যের ২০ কোটি বর্গ মিটার কাপড় তৈরী হবে। আর কুড়িটি রপ্তানী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটিকে ব্যয় হবে ৪০ লক্ষ টাকা করে। রপ্তানী উন্নয়ন প্রকল্পের এই অর্থের পুরোটাই বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

তাঁত শিল্পীদের সস্তাদরে ভালোমানের সুতা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই নেয়া হয়েছে। সুতাকলগুলিকে পর্যায়ক্রমে তাদের উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদনমূল্যে তাঁতশিল্পকে সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। তাঁত শিল্পীদের ন্যায্য দরে সুতা সরবরাহের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিটি নিবিড় উন্নয়ন এলাকায় একটি করে কেন্দ্রীয় সুতা ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। সুতার উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাও এই সঙ্গে জরুরী। সুতাকলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পঞ্চম যোজনায় তাই অতিরিক্ত ষোল লক্ষ টাকুর_ লাইসেন্স অনুমোদিত হয়েছে। সুতাকলগুলিকে লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে এই শর্তে যে তারা ৬৫ শতাংশ সুতা হ্যাংকে তৈরী করবে। বর্তমান সুতা কলগুলিকে ১০ শতাংশ সুতা হ্যাংকে তৈরী করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সুতার ওপর কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় তাঁতশিল্পে সুতা-সরবরাহের ক্ষেত্রে বেশ সুফল পাওয়া গেছে।

কিন্তু তাসত্ত্বেও ন্যায্য এবং সর্বভারতীয় দরে দেশের সর্বত্র তাঁত শিল্পীদের সুতা সরবরাহের সমস্যা রয়েছেই। এজন্য ফেটী (হ্যাংক) সুতার উৎপাদন বর্তমানে বছরে ২৩ কোটি কিলোগ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৩০ কোটি কিলোগ্রাম করা হচ্ছে। নতুন সুতাকল স্থাপনে উৎসাহ দেবার জন্য একচেটিয়া মালিকানা বহির্ভূত সুতাকলগুলিকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে স্থির হয়েছে যে ৫০ হাজার পর্যন্ত টাকুর সুতাকলগুলির লাইসেন্স লাগবেনা। সমবায়ক্ষেত্রের সুতাকলগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে।
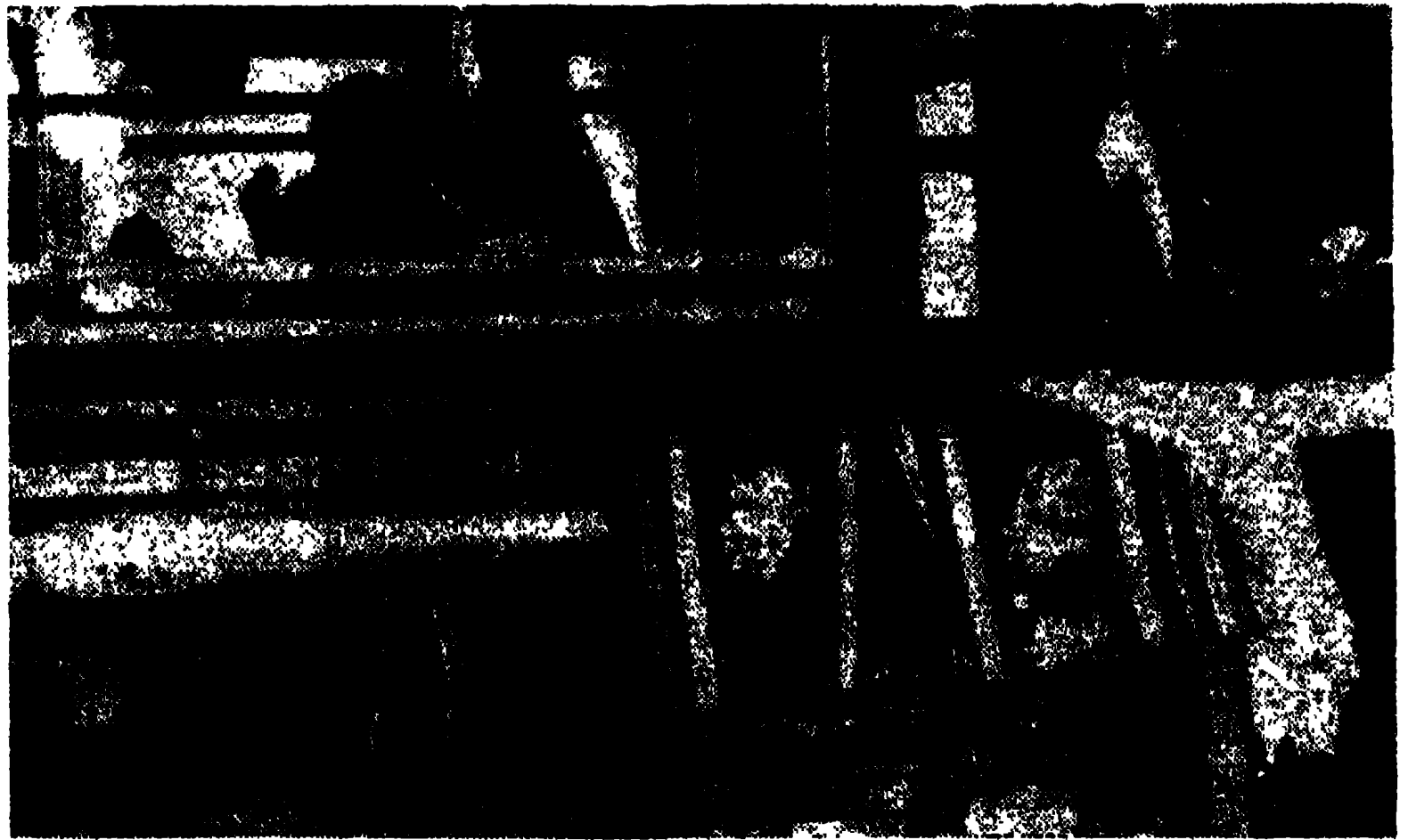
সুতা ছাড়া তাঁত শিল্পীরা আর যেসব অসুবিধা বর্তমানে ভোগ করছেন তা হল বিশেষ করে ঋণ ও বিপণন সংক্রান্ত। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান তাঁত কেন্দ্র শান্তিপুরের কিছু তাঁতশিল্পীর আর্থিক দুর্দশার খবর অনেকেই হয়ত পড়েছেন। সারা দেশে এরকম আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত তাঁত শিল্পীর সংখ্যা কম নয়। সুতা কেনা, উৎপাদনের মূলধন যোগাড় করা এবং বাজারে তৈরী জিনিস বিক্রী করার মত আর্থিক সঙ্গতি তাদের অনেকেরই নেই। এসবক্ষেত্রে তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির মাধ্যমে যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় দেশের অধিকাংশ তাঁতশিল্পী তা এখনো পাচ্ছেন না। কারণ বর্তমানে দেশের মাত্র ৩০ শতাংশ তাঁতশিল্পী সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত। সমবায়ের বাইরে এই যে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র তাঁতশিল্পী রয়েছেন নতুন উন্নয়ন কর্মসূচীটি রচিত হয়েছে মুখ্যত তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই। এইসঙ্গে পঞ্চম যোজনার শেষ নাগাদ দেশের ৬০ শতাংশ তাঁতশিল্পীকে সমবায়ের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির এই প্রসারের সঙ্গে বর্তমানে যে সব তাঁত সমবায় দুর্বল বা বন্ধ হয়ে আছে সেগুলো চালু করবার কাজও চলেছে রাজ্যে রাজ্যে।

তাঁতশিল্পীদের সুবিধাজনক সুদে ঋণ দেবার জন্য সেই ১৯৫৮–৫৯ সাল থেকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি পরিকল্পনা চালু আছে। এই পরিকল্পনার দরুণ এখন রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের তাঁতশিল্প সমবায়গুলি কম সুদে মূলধনী ঋণ পান। এক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত সমবায় ব্যাঙ্কের ঋণদান শুধু তাঁত সমবায় সমিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সমবায়

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

দেবাংশুর ভাবনা চিন্তা

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কিছুক্ষণ আগেও একটা দোতলা বাসের পেছনের দরজা থেকে ঝুলছিল দেবাংশু। অফিস থেকে ছুটির পর বাড়ি ফিরছে ও। বাড়িতে অনেক কাজ, তাই অফিস ছুটির একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

দেবাংশুর বড় ছেলে সীতাংশুর বয়স ছয়ের কাছাকাছি। সামনের জানুয়ারীতে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অবশ্যই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি ওর। যে কোন মুহূর্তে ভারতের যে কোন প্রান্তে বদলি হতে পারে। সুতরাং ইংলিশ মিডিয়াম ছাড়া নান্য পন্থা। সেই সীতুর কাল স্কুলে ভর্তির অ্যাডমিশন টেষ্ট। অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই সীতুকে নিয়ে বসতে হবে। পড়াশোনাগুলো একটু ঝালাই করিয়ে নিতে হবে। যদি এই শেষ মুহূর্তের বটিকায় অ্যাডমিশন টেষ্টের বিপদসংকুল পরিখা পার হতে পারে সীতাংশু। কিন্তু যদি না পারে, তবে কি হবে। হঠাৎ দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় দেবাংশু।

দুশ্চিন্তা কি এক ধরনের! আজকালকার দিনে সংসার করবার হাজার রকম ঝামেলা। সপ্তাহখানেক আগে লাইফ ইনসিওরেন্স থেকে একখানা চিঠি পেয়েছে, ওর পনেরো হাজার টাকার পলিসিটার জন্য দু'বছর আগে দেওয়া একটা প্রিমিয়াম নাকি জমা পড়েনি, মিসিং ক্রেডিট হয়ে গেছে। সুতরাং দৌড়ও এখন এল, আই, সি, অফিসে, সব কিছু পাত্তা লাগিয়ে হিসেবপত্তর ঠিক করা। না হলে ওর নিজেরই ঝামেলা। অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে, ও নিজের হাতে কাউন্টারে প্রিমিয়াম বাবদ চেক জমা দিয়েছে, তখনো পর্যন্ত পাকা রসিদ ওর নামে হয়নি বলে চেক কাউন্টার থেকে কাঁচা রসিদ নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর এমনই ভাগ্য যে, কেবল ঐ রসিদটাই ওর নিজস্ব ফাইলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন চেকের কাউন্টারে ফয়েল ধরে ওকে পুরোপুরি ব্যাপারটার ফয়সালা করতে হবে। কিন্তু এত সব করবার সময় কোথায়। অফিস এবং নিজের অন্যান্য এত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে, যে ছোটাছুটি করবার মত সময় পাওয়াই মুশকিল। অথচ লাইফ ইনসিওরেন্সের এই পলিসিটা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক না করে নিলে মুশকিল। কারণ ও ঠিক করেছে, সল্ট লেকে কেনা তিন কাঠা জমিটার ওপর এবার একটা বাড়ি তুলবে লাইফ ইনসিওরেন্সের কাছ থেকে ধার নিয়ে। লাইফ ইনসিওরেন্সের কাছ থেকে ধার পেতে হলে ইনসিওরেন্স পলিসিগুলোর হিসেবপত্তর ঠিকঠাক মত থাকা দরকার। সুতরাং যতক্ষণ না ওর 'মিসিং ক্রেডিটের' একটা কোন সুরাহা হচ্ছে, ততক্ষণ লাইফ ইনসিওরেন্স থেকে কোন টাকাই পাওয়া যাবে না। এবং সল্ট লেকের ওই সবুজ চিলতে জমিতে মনের মত একটা বাড়ি তুলবার পরিকল্পনা স্বপ্নই থেকে যাবে। শীতাংশু তৃণাংশু এবং স্ত্রী ঝুমুরকে নিয়ে একটা সুখী গৃহকোণ গড়ে তোলা যাবে না। এসব কথা ভাবতে ভাবতে অস্থির, আকুল হয়ে পড়ে দেবাংশু। দুশ্চিন্তায় কপালের রগে টান পড়ে।

ইদানিং মায়ের শরীরটা একদম ভাল যাচ্ছে না। এমনিতেই শরীরে নানারকম রোগ তার ওপর সপ্তাহখানেক আগে চান করতে গিয়ে বাথরুমে পিছলে পড়ে একবারে শয্যাশায়ী। বিছানা থেকে বিশেষ উঠতে পারে না। বাড়িতে ডাক্তার এনে দেখানো হয়েছিল। শুধু গরম সেঁক ও মালিশের কথা বলে গেছেন। কিন্তু ব্যথা কিছুতেই কমছে না। এখন মনে হচ্ছে, বলা যায় না, হয়তো ভেতরে কোন ছোট খাট হাড় ভেঙেটেঙে গিয়ে থাকতে

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফসলের অপচয় রোধে

গোপালকৃষ্ণ [illegible]

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যি যে আমাদের দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে এক কোটি টন খাদ্যশস্য নানা কারণে প্রতি-বছর নষ্ট হয়ে যায়। এই বিনষ্ট হ'য়ে যাওয়া খাদ্যশস্যের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে এক বছরে যা ফলন হয় তার চেয়ে প্রায় ২০ লক্ষ টন বেশি। অর্থাৎ এই অপচয় বন্ধ করতে পারলে অন্তত চার কোটি মানুষের অন্নের সংস্থান সম্ভব হতে পারে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন যে এই ক্ষতি খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার পথে এক বিরাট অন্তরায়। এই অপচয় বন্ধ হ'লে ঘাটতির পরিমাণ পাঁচ শতাংশের নীচে সহজেই নেমে আসবে। অবশ্য খাদ্য ও কৃষি-বিজ্ঞানিগণ এই ক্ষতি বন্ধের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন বিনষ্ট হ'য়ে যাওয়া এক কোটি টনের এক বৃহৎ অংশ নষ্ট হয় পরিবহণ ও গুদামজাতকরণের ত্রুটির জন্য। দেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে প্রায় সাত কোটি টন খাদ্যশস্য সংরক্ষিত হয় কৃষিজীবীদের ঘরে। সেখানে ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য খাদ্যশস্য যথেষ্ট বিনষ্ট হয়। সংরক্ষণ ত্রুটির জন্য অনেক সময় খাদ্যশস্যের পুষ্টিও নষ্ট হয় এবং গুণাগুণের তারতম্য ঘটে।

দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে চালের পরেই গমের স্থান। বিশেষজ্ঞরা হিসেব ক'রে দেখেছেন অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত গমের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। এঁরা সমীক্ষা করে দেখেছেন সাধারণত চারটি কারণে এই ক্ষতি হয়ে থাকে। (১) তাপ (২) আর্দ্রতা, (৩) অক্সিজেনের অভাব এবং (৪) পোকা-মাকড়-পাখীর জন্য।

সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, মোট ক্ষতির শতকরা ১.৬৮ ভাগ ক্ষতি হয় ঝাড়াই-এ, ০.১৫ ভাগ যান-বাহনে, ০.৯২ ভাগ রূপান্তরণে এবং সবচেয়ে বেশী ২.৫০ ভাগ ইঁদুরের জন্য। এছাড়া ০.৮৫ ভাগ খায় পাখী, পোকা-মাকড়ে ধ্বংস করে ২.৫৫ ভাগ ও আর্দ্রতার জন্য নষ্ট হয় শতকরা ০.৬৮ ভাগ। এই ক্ষতিকে ব্যাপক জাতীয় ক্ষতি বলেই ধরা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে ইঁদুর হ'ল মানুষের একটি বড় শত্রু। এই ক্ষুদে প্রাণীটির দৌরাত্ম্য সারাদেশের শহর ও গ্রামে। মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের শতকরা ২.৫০ থেকে ৫ ভাগ এই ক্ষুদে প্রাণীরা প্রতি বছর ধ্বংস করে। দেশে ইঁদুরের সংখ্যার কোন প্রামাণ্য হিসাব হয়নি। এরা শুধু খাদ্যশস্যই ধ্বংস করছে না—মানুষের মধ্যে নানারকম মারাত্মক ব্যাধির জন্ম দিচ্ছে। এবং প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে ইঁদুর থেকে সংক্রমিত ব্যাধিতে হাজার হাজার মানুষ মারাও যাচ্ছে।

ইঁদুরবিদ্‌গণ মনে করেন প্রায় দশ হাজার মিলিয়ন থেকে পনেরো হাজার মিলিয়ন ইঁদুর গোটা দেশটাকে নিজেদের বাসস্থানে পরিণত ক'রে ফেলেছে। এবং প্রতিদিন তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। এঁরা আরও মনে করেন, ইঁদুর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য খায়—প্রায় সম পরিমাণ শস্য বিষ্ঠা ও মূত্র দ্বারা বিষাক্ত ও কলুষিত করে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন গত দু' দশকে ইঁদুরেরা "ইঁদুর নাশক ওষুধ" প্রতিরোধক্ষম হয়ে উঠেছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা অন্য পথের সন্ধান করছেন। কেউ কেউ ভাবছেন পুরানো যুগের পদ্ধতি অনুসরণ করলে ব্যাপক বংশবৃদ্ধি অন্তত বন্ধ করা যাবে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রক খাদ্য-শস্য ক্ষতি বন্ধ করার জন্য "শস্য বাঁচাও" প্রচার জোরদার করেছেন। ১৯৬৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই প্রচারকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। বিশেষজ্ঞ ও কুশলী দ্বারা গঠিত কয়েকটি দল কি ভাবে খাদ্য-শস্যকে সংরক্ষণ করা যায় তার জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কৃষকদের হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।

* কৃষি মন্ত্রক গত বছর থেকে পাঁচটি 'স্বর্ণ নিয়ম' (Golden rules) অনুযায়ী খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। স্বর্ণ নিয়মগুলি হল (১) আপনার শস্য গোলায় তোলার আগে ভাল করে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিন, (২) আর্দ্রতা থেকে ক্ষতি রোধ করতে আপনার শস্যে ডানেজ (Dunnage) ব্যবহার করুন, (৩) ধাতু বা অন্যকিছু দ্বারা নির্মিত আধার বা বিন ব্যবহার করুন অথবা আপনার সংরক্ষণ আধারটিকে উন্নত করুন, (৪) ই-ডি-বি অ্যাম্পুল মিশিয়ে আপনার শস্যকে ধোঁয়া অথবা ভেপার দিন এবং (৫) ইঁদুরের হাত থেকে আপনার শস্যকে বাঁচাতে এ্যাণ্টিকওয়াল্যাণ্ট বাড়িতে ব্যবহার করুন।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশনের মাধ্যমে উন্নত মানের ধাতু নির্মিত বিন্ নির্মাণের জন্য। বর্তমানে তিন থেকে দশ কুইণ্টাল ধান বা অন্য খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য ধাতু-নির্মিত বিন্ এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ-এর মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। ই-ডি-বি এ্যাম্পুলস্ ও এ্যাণ্টিকওয়াল্যাণ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারী তথ্য অনুসারে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ বিন্ কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য তবুও এই প্রচেষ্টা জোরদার করা হ'লে "শস্য-বাঁচাও" প্রচার অভিযান আগামী দশকের মধ্যে সম্পূর্ণ সফল না হলেও সার্থক হবে।

হাপুরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান গ্রেন্ ষ্টোরেজ ইনস্টিটিউট সম্প্রতি নূতন ধরণের ইঁদুর দৌরাত্ম্য-মুক্ত শস্য সংরক্ষণাগার উদ্ভাবন ক'রেছেন। এই নূতন ধরণের প্রতিটি সংরক্ষণাগারে প্রায় দশ-টন খাদ্য-শস্য সন্তোষজনকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ সহ দেশের বহু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা খাদ্যশস্যের অপচয় বন্ধ করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের গবেষণা-লব্ধ ফল অচিরেই দেশের খাদ্য সংরক্ষণে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

"শস্য বাঁচাও" প্রকল্প অনুযায়ী প্রায় ১৭০০০ ব্যক্তিকে (সরকারী কর্মচারী, কৃষক ও ব্যবসায়ী) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'আধুনিক সংরক্ষণ কৌশল' শিক্ষাদানের জন্য প্রায় ৪০০০ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত এক বছরে এই প্রকল্প অনুসারে প্রায় ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) গৃহ ও প্রায় ১৭,০০০ (সতেরো হাজার) জমি থেকে ইঁদুর মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় আধুনিক শস্য সংরক্ষণাগার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। 'ফুড ফর ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশন অব দি নেদারল্যাণ্ডস' নামে একটি সংস্থার অর্থসাহায্যে মধ্যপ্রদেশে ৫০০০ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য তিনটি আধুনিক সংরক্ষণাগার নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে ৪০০০ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের দু'টি সংরক্ষণা-গারের নির্মাণ কার্য্য শেষ হ'য়ে গেছে। বাকি এক হাজার টনের সংরক্ষণাগারটির কাজ প্রায় সমাপ্ত।

খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত বছর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত করপোরেশন প্রায় ৭৫ লক্ষ টন খাদ্য শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এর মধ্যে করপোরেশনের নিজস্ব সংরক্ষণের ক্ষমতা হল প্রায় ৫৪ লক্ষ টন। ২১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভাড়া করা সংরক্ষণাগারে মজুত করা হয়ে থাকে।

গত কয়েক বছর থেকেই করপোরেশন সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে জোরদার ও আরও বিজ্ঞান-ভিত্তিক ক'রে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। গত ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে আরও ৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হলেও আর্থিক কারণে পরিকল্পনাকে পুনর্বিন্যাস ক'রে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টন ক্ষমতায় আনতে হয়েছে। এর মধ্যে ১.৫০ লক্ষ টন ক্ষমতার সংরক্ষণাগারের নির্মাণ কার্য্য ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন সংরক্ষণা-গারের নির্মাণকার্য্য শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হ'চ্ছে। এ কাজ সম্পন্ন হ'লে খাদ্য সংরক্ষণে করপোরেশনের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠবে।

এছাড়া, সুইডেন ও ইনটারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সির ঋণ-সহযোগিতায় গম সংরক্ষণের জন্য চিরাচরিত গুদাম তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। সমগ্র পরিকল্পনায় খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গম উৎপাদন প্রধান রাজ্যে চিরাচরিত অথচ বিজ্ঞান-ভিত্তিক কয়েকটি সংরক্ষণা-গার গড়ে উঠছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক সহযোগিতা প্রকল্পানুসারে মোট নয়টি চিরাচরিত গুদামের মধ্যে সাতটির কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। বাকি দুটির মধ্যে একটি সুলতানপুর লোধি ও অপরটি উদয়পুরে স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্প অনুসারে পাঁচ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন ছ'টি শস্যাধার বা "সিলো"র কাজও প্রায় সমাপ্ত। এই পরিকল্পনায় খরচ হয়েছে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ফুড করপোরেশনের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কিভাবে আরও সুসংহত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক করা যায়—তার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সংরক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও পরিবহণজনিত ক্ষতি রোধ করার জন্য এই সংস্থা প্রযুক্তিবিদ্‌দের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এঁরা সরকারের কাছে শীঘ্রই তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য-প্রযুক্তি বিভাগ একটি নূতন ধরণের শস্য সংরক্ষণা-গার উদ্ভাবন ক'রেছেন। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এই সংরক্ষণাগারকে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রযুক্তিবিদ্‌গণ মনে করেন এই সংরক্ষণাগারটি জনপ্রিয় ক'রে তুলতে পারলে "শস্য বাঁচাও" আন্দোলন অনেকাংশে সফল হবে।

কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার করপোরেশনও শস্য সংরক্ষণে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ ক'রে চলেছেন। অবশ্য এই সংস্থা শুধু শস্যই সংরক্ষণ করেন না—কৃষি সরঞ্জাম ও সার ইত্যাদিও সংরক্ষণ ক'রে থাকেন।

এই সংস্থা চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে ৬০,০০০ হাজার টন ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়ারহাউস নির্মাণের কাজ শেষ করতে পারবেন বলে মনে করছেন। এই নির্মাণ-কার্য্য শেষ হ'লে এই সংস্থার প্রায় ১৫০ টি কেন্দ্রে মোট ১৬ লক্ষ ১৯ হাজার টন শস্য ও কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণের ক্ষমতা লাভ করবেন।

কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রকের অধীন ষ্টোরেজ ইকনমিক ডিভিশন তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা ক'রছেন: (১) বাজারে গমের আমদানীর পরিমাণ ও তার গুণাগুণ পরীক্ষা, (২) বিভিন্ন মাপের ধাতু নির্মিত বিনের চাহিদা এবং (৩) আধুনিক শস্য সংরক্ষণে অর্থনৈতিক সুবিধা।

সর্বস্তরে এইসব প্রকল্প ও প্রচেষ্টা যত শীঘ্র কার্যকর হবে তত তাড়াতাড়ি দেশ খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে যাবে।

পাট নিয়ে ভাবনা

ড: দিলীপ মালাকার

বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানী বাণিজ্যের যে সব দ্রব্যের অবদান আছে তার মধ্যে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে সব চেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করেছিল কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য। কাঁচা পাট রপ্তানী ও আভ্যন্তরীণ বাজারে পাট শিল্পের ক্রমোন্নয়নের সঙ্গে একদল ব্যবসায়ী প্রভূত পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলেন গত এক শতাব্দী ধরে। সেই পুঁজি পরে বিভিন্নশিল্প প্রসারে নিয়োজিত হয়। যে হারে পাট শিল্পপতিরা গত একশ বছরে স্ফীত হয়েছেন তার এক শতাংশ হারেও পাট চাষীরা মুনাফা পাননি। তার ওপর গত দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক পাটের বাজারে চলছে মন্দা। চটের থলে ও কার্পেট ব্যাকিং-এর চটের চাহিদা সাংঘাতিক ভাবে কমে গেছে বিদেশে। ফলে আমাদের চটকলগুলো ঢিমে তালে কাজ করে চলেছে। পাট জাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় এবং ধানের দাম বেশী হওয়ায় পাট চাষীরা পাটের চাষ কমাতে শুরু করে গত বছর পাঁচ ধরে। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে যে পাট উৎপন্ন হয় তার পঁচাশি ভাগ হয় পশ্চিম বঙ্গে। এক পশ্চিম বঙ্গে বিশলাখ চাষী পাট চাষ করেন। সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, এক কোটি মানুষ পশ্চিম বঙ্গে পাট চাষ, শিল্প ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত।

পাট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা গত পঞ্চাশ বছরে পাট শিল্প ও চাষের উন্নয়নে মনোযোগ দেননি। ফলে আমাদের পাট শিল্প ও চাষ পিছিয়ে পড়ে। তার ফলশ্রুতি হিসেবে পাট চাষীরা দুর্ভোগে পড়েছেন। তাই বছর কয়েক হল ভারত সরকার পাট চাষী, পাটশিল্প ও পাট চাষের সাহায্য-কল্পে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে বছর তিনেক আগে ভারত সরকার জুট কর্পোরেশান অব ইণ্ডিয়া নামে একটি সংস্থা খুলেছেন।

আন্তর্জাতিক পাটের বাজারে এখন ভারতীয় পাটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে বাংলাদেশ ও থাইল্যাণ্ড। বাংলাদেশ কম দামে পাট বেচছে বিদেশে। ফলে ভারতীয় পাট মার খাচ্ছে। উপরন্তু কৃত্রিমতন্তু পাটজাত দ্রব্যের স্থান গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্পেট ব্যাকিং এ যত পাট কাপড় লাগত তার চাহিদা কমিয়ে দেয় পেট্রলজাত কাপড়। এরফলে বহু চটকল অলস হয়ে পড়ে। অবস্থার প্রতিকারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ সালে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করেন। পাট ব্যবসায়ীরা পাটের ওপর সব রকমের শুল্ক কমান বা একেবারে তুলে দেওয়ার দাবী জানান, পাটচাষীদের কথা ভেবে নয়। অভাবের তাড়নায় পাটচাষীরা অনেকেই নির্দ্ধারিত মূল্যের বহু নিচে পাট বেচতে বাধ্য হন। তাই পাট চাষীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ভারত সরকার।

১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেন যে, নির্দ্ধারিত দামের নিচে পাট বেচা-কেনা চলবে না। তাহলে শাস্তি দেওয়া হবে। সরকার দর বেঁধে দেন, দেড়শ টাকার নিচে কোনো রমকেই পাট কেনা চলবে না। এবং জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার পাট কেনার কেন্দ্রে গেলেই সরকারী মূল্যে পাট বেচা যাবে। ফলে পাট চাষীরা জুট কর্পো-রেশানের পাট গুদামে ভীড় জমাতে থাকে।

পাট বেচা-কেনা ও রপ্তানীর বাজারে কেন্দ্রীয় সরকার অবতীর্ণ হওয়ায় পাট চাষীর বুকে এখন বল এসেছে। পাট বেচার মরশুমে পাট ব্যবসায়ী, মহাজন ও দালালরা যা খুশী দাম হাঁকত। পুজো ও ঈদের আগে পাট চাষীর টাকার প্রয়োজন। সুযোগ বুঝে মহাজন ও দালালরা জলের দামে পাট বেচতে বাধ্য করত চাষীদের। চাষী বাজারে পাট নিয়ে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহস পেত না। যা দাম পেত সেই দামে পাট বেচে, সেই অর্থে ধান, চাল, নুন, তেল, কিনে বাড়ী ফিরত। এখন বহু হাটে-বাজারে জে. সি. আইয়ের গুদাম অথবা ক্রয় কেন্দ্র গড়ে ওঠায় সরকারের নিম্নতম দরে যা মহাজনের দরের চেয়েও অনেক বেশী সেই দামে পাট বেচে খুশী মনে বাড়ী ফেরে। জে. সি. আই. গুদাম অথবা ক্রয় কেন্দ্রে দালালের হাঙ্গামা নেই। এক দেড় কেজি পাট বেচতেও আমি দেখেছি কোচবিহার-জলপাইগুড়িতে। ওজনে কম দেওয়ার উপায় নেই। তার ওপর যত কমই হোকনা কেন পাট বিক্রি করলে জে. সি. আই. একটা রসিদও দেয়। যা মহাজনরা দেয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে বহু চাষী। বহু পাট চাষী আমায় বলেছেন যে, সব জেলায়-গঞ্জের হাটে-বাজারে যদি জে. সি. আইয়ের ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয় তাহলে তাঁদের খুব সুবিধে হয়। থাকেনা মহাজনদের কাছ থেকে বঞ্চনার সম্ভাবনা।

এদিকে পাট চাষ ও শিল্পে আর্তনাদ উঠেছে পশ্চিম বঙ্গে। দেশে পাট উৎপাদনে সব চেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ। সেখানেই তাই বাধা-বিপত্তি এবং সংকট বেশী

পাট চাষ প্রতি বছরে কমছে। পাট চাষ ও শিল্প দুইই এখন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে। ১৯৭৩ সালে পাট উৎপাদন হয়েছিল ৭৬ লাখ বেল, কিন্তু ১৯৭৪ সালে উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ৫১ লাখ বেল-এ। আর ১৯৭৫ সালে নেমে দাঁড়ায় পঁয়তাল্লিশ লাখ বেল। ১৯৭৪ সালের পাট চাষের পরিধি ১১.৬৩ লাখ হেক্টার

মালদহের বুলবুল চণ্ডীহাটে জুট কর্পোরেশন পাট কিনছে

থেকে ৭.৮৭ লাখ হেক্টারে নেমেছে। ধান চাষের চেয়ে পাটচাষে লাভ কম হচ্ছে বলে চাষীরা পাট চাষ কমিয়ে দিয়েছেন। তার ওপর উন্নত ধরণের বীজেরও অভাব। অভাব সারের এবং ঋণের।

পাট চাষের অবস্থা যতখানি খারাপ তার চেয়েও খারাপ পাট শিল্প ও রপ্তানী বাণিজ্য। ১৯৬৪ সালে পাট ও পাট জাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল পাঁচ লাখ টন। রপ্তানী কমে ১৯৭৪ সালে এসে দাঁড়ায় দু লাখ ষাট হাজার টন। ভারত সরকারের তহবিলে প্রতি বছরে বিদেশী মুদ্রা আসে পাট জাত দ্রব্য বেচে আড়াইশ কোটি টাকা। দশ বছর আগে এই অংক ছিল আরও বেশী। প্রতি বছরে এই অংক কমছে।

কিন্তু কেন এই সংকট। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে আমার উত্তর বঙ্গ সফর কালে। উত্তর বঙ্গের পাটচাষীরা আমায় যা বলেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। মালদহের বুলবুল চণ্ডি হাটের সুবোধ দাস দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের রহিম মিঞা থেকে আরম্ভ করে জলপাইগুড়ির বেলকোনা কিম্বা কোচবিহারের তুফানগঞ্জের হাটে পাট চাষীর অভিযোগ—পাট চাষে লাভ নেই। চাষের খরচ ওঠেনা। আগে এক মন পাটে দুমন ধান কিনতাম। এখন দুমন পাটে এক মন ধান কিনি। এত লোকসান দিয়ে পাটের চাষে লাভ নেই। তার ওপর আছে মহাজনদের বঞ্চনা। গ্রামে ফড়েদের কাছে এক তরফা ঠকতে হয়। তারপর হাটে এলে ঠকতে হয় আড়ৎদারের কাছে। তারা ওজনে মারে। ঠকায় পাটের মানে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে যখন পাট ওঠে তখন আড়ৎদাররা পাট কিনতে চাননা। ঈদ ও পুজোর আগে পাট বেচতেই হয়। ছোট চাষী তার দু'মন তিন মন পাট নিয়ে এলে আড়ৎদার ও ফড়েরা সুযোগ বুঝে দাম কমিয়ে দেয়। তখন আমরা উপায়ান্তর না দেখে জলের দামে পাট বেচি। প্রতি বছর একই নাটক দেখি আমরা। তবে আজকাল জুট কর্পোরেশনের ক্রয় কেন্দ্র হওয়ায় অনেক সুবিধে হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয় ভারত সরকারের বছরে তিনশ কোটি টাকা। কলকাতায় শহরতলীতে জুট মিলে কাজকরে আড়াই লাখ শ্রমিক। চাষীরা কেন পাট চাষ বন্ধ করছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান বিভাগ এক সমীক্ষা চালিয়েছেন মালদহ ও দিনাজপুরে। তাঁদের সমীক্ষায় জানা গেছে কিভাবে পাট চাষ কমছে ওই দুই জেলায়।

উত্তরবঙ্গের পাট চাষীরা আমায় হিসেব করে বলেছেন, মন প্রতি পাট চাষে খরচ হয় সত্তর টাকা কিন্তু পাটের বাজারে দাম হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা থেকে পয়ষট্টি টাকা মন। ১৯৭৫-৭৬ সালে সরকার ন্যূনতম দর বেঁধে দেন মন প্রতি পঞ্চান্ন টাকা। ওই দামের বেশীতে কিনছেন জে. সি. আই. কিন্তু আড়ৎদাররা কেনে পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চান্ন টাকায়। সুতরাং পাটচাষীর কাছে জে. সি. আই. লোভনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর বঙ্গের বহু এম. এল. এ এবং মন্ত্রীরা বলেছেন পাট চাষীর স্বার্থে জে. সি. আইয়ের ক্রয় কেন্দ্র আরও বাড়ান দরকার। জে. সি. আইয়ের প্রতিবিধান যত বাড়বে ততই পাট চাষীর মঙ্গল।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রতিটি রাজ্যকে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে কাজে পরিণত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে রাজ্যগুলির মুখ্যসচিব ও কমি-শনারদের নিয়ে আদিবাসী উন্নয়ন সংক্রান্ত যে আলোচনা বৈঠক বসেছিল—এই নির্দেশ তার ফলশ্রুতি। এই নির্দেশে আরও বলা হয়েছে আগামী তিন মাসের মধ্যে আদিবাসীদের প্রয়োজনীয় ঋণ কিভাবে দেওয়া যেতে পারে তার খুঁটিনাটি বিচার করে কেন্দ্রকে জানাতে হবে। এবং সেই সঙ্গে এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত করার জন্য উপযুক্ত কর্মীদল খুঁজে বের করার জন্যও বলা হয়েছে।

যুব আন্দোলন : কিছু ভাবনা

ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ইদানীং গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের কল্যাণকর্মে নিয়োগের জন্য গভীর ভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। বিশেষ করে নেহরু যুবক কেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প ইতিমধ্যেই ভাল কাজ কর্ম আরম্ভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে একটি যুব কল্যাণ দপ্তরে খোলা হয়েছে। সব দিক থেকে কিছু একটা করার মত পরিবেশ গড়ে উঠছে।

স্বাধীনতার আগের কথা বলতে চাইনা, তখন দেশ পরাধীন ছিল। স্বাধীনতা অর্জনই ছিল প্রথম কথা। যুবশক্তির সামনে সেদিন বড় করে রাজনৈতিক কর্মসূচী রাখা হয়েছিল। খেলাধূলা ক্লাব সংগঠন সব কিছুর মধ্যদিয়ে তরুণ স্বাধীনতা যোদ্ধার জন্ম হয়েছে। এক একটি আন্দোলন হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ প্রাণ বলি দিয়েছে।

দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন ভাবা-গিয়েছিল এবার রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সামাজিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হবে। দলমত নির্বিশেষে তরুণদের সামনে অরাজনৈতিক প্রোগ্রাম রাখা হবে। কিন্তু তা বড় একটা হলনা। আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা যুব আন্দোলন বলতে রাজনৈতিক আন্দোলনই বুঝে এসেছি। যথা এক একটা রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে যাবতীয় রাজনৈতিক কাজকর্ম লিপ্ত থাকা। মহাকরণ অভিযান। সত্যাগ্রহ। কারাবরণ। মাঝে মাঝে ট্রাম বাস পোড়ানো। এই ট্রাম বাস পোড়ানোর যুব নীতি চলেছে সেদিনও পর্যন্ত। তারপরে এই যুব আন্দোলন একদল পথভ্রষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সেই অন্ধকার দিনগুলি কথা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। বাঙালী যুবক সেদিন অন্য রাজ্যে আতঙ্ক। সবাই সন্দেহের চোখে তাদের দেখে। সামাজিক পরিবর্তন আনার জন্য দীর্ঘ-দিনের প্রস্তুতি আর নিরলস সাধনার দরকার হয় এটা তারা বোঝেন নি।

সে যাই হোক, ইতিহাসের মোড় ঘোরাবার দরকার ছিল। রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন মেটালেন আর একদল তরুণ। দেশকে তাঁরাও ভালবাসেন। শুধু তফাৎটা ছিল তারা কোন প্রতিবেশী দেশের চেয়ে আপন দেশের নেতৃত্বের ওপরেই বেশী আস্থা রেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটেছে ১৯৬৭ সাল থেকে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এসে এখন সমস্ত কিছু একটা স্থিতাবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ১৯৬৯-৭০ সালের ধাক্কায় এখন বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হচ্ছে যুবকদের জন্য অরাজনৈতিক কর্মসূচীর কথা। অরাজনৈতিক মানে পুরো সামাজিক আন্দোলনের কথা। নেহরু যুব কেন্দ্রের কথা আমি শুনেছি। ওখানে যুবকদের কাজকর্ম শিখিয়ে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করাটা মুখ্য। তবে তাছাড়া খেলাধূলো ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীও ওদের আছে। কমনওয়েলথের সাহায্যে চণ্ডীগড়ে নেতাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এসবতো আগে ছিলনা।

সবচেয়ে ভাল কাজ করছেন জাতীয় সেবা প্রকল্প। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রকল্পের একজন অবৈতনিক প্রশিক্ষক হিসাবে আমি গত বছরখানেক ধরে এদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে যাচ্ছি। যত দেখছি ততই আশান্বিত হচ্ছি। প্রতি ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা নিয়মিত গ্রামে কিংবা শহরের বস্তি এলাকায় গিয়ে টীকা দিচ্ছেন, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন। সাফাইর কাজ করছেন। আবার বৃক্ষরোপণেও সাহায্য করছেন। এর আগে ভারত সেবক সমাজের কাজ দেখেছি। কিন্তু ভারত সেবক সমাজের কাজে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিলনা। কেমন এলোমেলো ব্যবস্থা। অনেক টাকা অপচয় হয়েছে। কোন ইপ্সিত পরিবর্তন ঘটেনি।

কিন্তু জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজে ধারাবাহিকতা আছে। পরিকল্পনা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যা দেখতে পাই তা হল, এটা একটা সজীব সংগঠন। ছেলেমেয়েরা খুব উৎসাহ দেখাচ্ছে। মাস্টার মশাইদেরও কম বেশী উৎসাহ আছে। পরিচালকের আন্তরিকতা আছে। এখন এটি একটি আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। ওঁরা শীঘ্রই কয়েকটি গ্রামে সমীক্ষা চালাবেন কতখানি পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখার জন্য।

সেদিন ভারত সরকারের যুব দপ্তরের ডিরেক্টর লে: জে: ক্যানডেথের সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনি বললেন : ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের সমাজ সেবা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

বিদেশে সোস্যাল ওয়ার্কের নানান তত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এদেশেও কিছু ইনস্টিটিউট তৈরী হয়েছে। সমাজ সেবার তাত্ত্বিক দিক জানবার দরকার আছে। কিন্তু এবিদ্যা তত্ত্বসর্বস্ব হলে চলবেনা। ভারতবর্ষের জন্য সর্বাগ্রে কিছু কর্মকেন্দ্রিক (অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড) প্রকল্প দরকার। বিচ্ছিন্ন কর্মসূচী নয়, সমগ্র রাজ্য জুড়ে সর্বাত্মক কর্মসূচী। এব্যাপারে দুটো দিক ভাবতে হয়। আমাদের সমাজ অর্থনীতির পটভূমিকায় কোন্ কর্মসূচী জরুরী এবং কোন কার্যসূচী সফল করা সহজ-সাধ্য। আমরা যে শ্লোগান দেব তার সারগর্ভতা সম্পর্কে ও বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের নি:সন্দেহ হতে হবে। এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ নয় যা পালন

করা দুঃসাধ্য। সুতরাং যুব আন্দোলনের প্রথম কার্যসূচী খুব উচ্চাশাপূর্ণ না হয়ে ন্যূনতম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাহলে ন্যূনতম কর্মসূচী কী হতে পারে? বিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে যুব ও ছাত্র কল্যাণের কিছু কিছু কথা আছে। কিন্তু ছাত্র ও যুবরা দেশের জন্য কী করবেন? সম্প্রতি সঞ্জয় গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের তথা সারা ভারতে যুবকদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কয়েকটি সামাজিক কর্মসূচী এদের সামনে রেখেছেন। সঞ্জয়বাবু, প্রধানত সংস্কার আন্দোলনের কথা বলেছেন। ওর প্রথম লক্ষ্য পণপ্রথা। বিধবা বিবাহ বহু বিবাহ কবে রদ হয়েছে। পণপ্রথাও সম্প্রতি আইন দ্বারা তিরোহিত। কিন্তু শুধু আইন করলেই যে চলেনা যত্রতত্র পণ গ্রহণ তার প্রমাণ। সুতরাং আইনের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলা চাই। এ কাজতো তরুণদেরই। তারা নিজেরাই বিবাহে পণ বর্জন করতে পারেন এবং পণ যেখানে নেওয়া হয় তাদের প্রকাশ্যে নিন্দা করতে পারেন। এরপরের বড় কথা পরিবার পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে আরও কঠোর আইন আসছে।

কিন্তু আইনের চেয়েও বড় দরকার লোকদের শিক্ষিত করে তোলা। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি এবং সেই সঙ্গে পুঁথির বাইরে যে শিক্ষা অর্থাৎ সমাজ শিক্ষা তার প্রচারের জন্য সামগ্রিক কর্মসূচী নিয়ে যুব সংগঠনগুলিকে নেমে পড়তে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুবকরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন বলে তাঁর বিশ্বাস। দেশে এসব কাজে বিঘ্ন অনেক। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এদেশে ভীষণ শক্তিশালী। এটা উন্নতিশীল দেশের নিয়ম। যারা আন্দোলনে নামবেন তাদের বহু কলঙ্কের ভাগী হতে হবে। কিন্তু শুধু যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে সমাজের সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস দূর করতে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজ এখন হওয়া উচিত দলমত নির্বিশেষে সামাজিক পরিবর্তনের কাজকে সাহায্য করা।

সম্প্রতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সর্বত্র শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সংগঠনমূলক কাজের ও উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থার যুব ও ছাত্র সমাজের মধ্যে যে কাজ করার উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশে যে আর্থিক অগ্রগতির আন্দোলন ও প্রগতিমূলক সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছে যুব ও ছাত্রদের অংশগ্রহণ সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে। আর তার ফলে দেশও দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
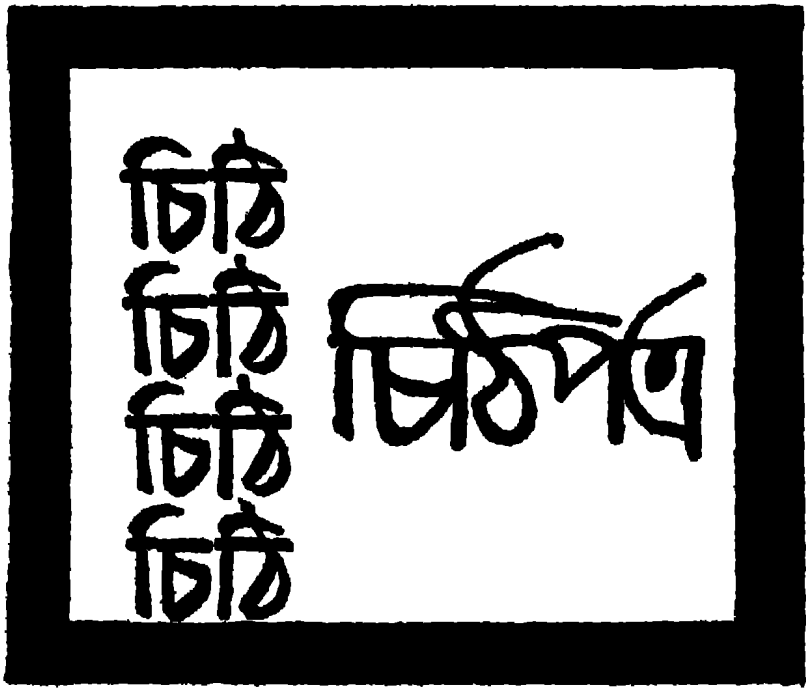
মহাশয়,

আপনার 'ধনধান্যে'র ১৫ই জানুয়ারী সংখ্যায় শ্যাম বেনেগালের 'নিশান্ত' ছবির সমালোচনা পড়লাম। লিখেছেন নির্মল ধর। পড়ে আনন্দ পেলাম কিন্তু নির্মল বাবুর কয়েকটি বক্তব্য সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। যেমন এক জায়গায় লিখেছেন, 'শাবানা অবশ্য একমাত্র মন্দিরের দৃশ্যটি ছাড়া কোথাও অভিনয়ের সুযোগ পাননি'।

নির্মল বাবু অভিনয় বলতে কি বোঝেন? তিনি—কি পঞ্চাশ দশকের নাটুকে অভিনয়কে অভিনয় হিসেবে জানেন? এ কথা সত্যি একমাত্র ওই দৃশ্যে শাবানা তাড়াতাড়ি অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু সারা ছবিতে তাঁর মৌন অভিনয় কি অভিনয় নয়? নির্মল বাবুকে ভুললে চলবে না, তিনি একটি উঁচু দরের ছবি দেখতে এসেছেন। আর এক জায়গায় লিখেছেন শোষিতের জাগরণ অত্যন্ত আয়াসেই সংগঠিত হলো কিভাবে? যদিও বা হলো ঐ ধরণের হিংস্র জনতা পাহাড় পর্যন্ত আসতে পারে কিনা? স্কুল মাষ্টারের আচরণ কতখানি বাস্তবসম্মত—'

প্রথম লাইন সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ জাগরণ আয়াসে হয় নি। মনে রাখা দরকার একটি দৃশ্যে পুরোহিত ও মাষ্টারের জনতার বিরাট শোভাযাত্রার বিপরীতমুখী হাঁটা ও নেপথ্যে ব্যঙ্গাত্মক যন্ত্রসঙ্গীত, যা জনগণের অবিশ্বাস্য ব্যঙ্গই প্রকাশ করেছে। প্রকৃত জাগরণ তার অনেক পরে যাত্রার দৃশ্যে দেখা দেয়। ফিল্ম মাধ্যমে এর থেকে বিস্তার সম্ভব কি?

আর হিংস্র জনতাকে পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ায় এটাই প্রমাণ করা গেছে যে অত্যাচারীর কোন নিস্তার নেই। তাকে বিপ্লবের বলি হতেই হবে। সেখানে বাস্তবতার থেকে বক্তব্যের মূল্য অনেক বেশী, নইলে সুশীলাকে তার স্বামীর সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে পালাবার ব্যবস্থা পরিচালক করতে পারতেন। সেটা অধিক বাস্তবসম্মত হত। কিন্তু শ্যাম বেনেগাল সমস্যার মুখোমুখি হতে চেয়েছেন।

এ ধরণের ছোটখাটো বহু অবান্তর যুক্তিতে লেখাটি ভরা। ধনধান্যের মত প্রগতিশীল পত্রিকায় এ ধরণের সমালোচনা বেশ কষ্ট দিল।

আশীষ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-১২

ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এমন একদিন ছিল যখন সারা ভারত জুড়ে বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য ছিল। এবং বৈচিত্র্যেও তা ছিল গর্ব করবার মতো। বলাবাহুল্য, নানা কারণে প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে এবং শিকারীর নির্বিচার পশুপাখি শিকারের কারণে আজ বহু উল্লেখ্য প্রাণীকুল নিঃশেষিত কিংবা নিঃশেষিত প্রায়। কিন্তু এভাবে জাতীয় সম্পদকে তো আর বিনষ্ট হতে দেয়া চলে না। সেজন্য বিলুপ্তপ্রায় এবং দুষ্প্রাপ্য পশু পাখিদের রক্ষা করবার জন্য শিকার সংক্রান্ত নানা রকম আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশ-জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে ন্যাশনাল পার্ক, অভয়ারণ্য ইত্যাদি।

করবেট ন্যাশনাল পার্কের নৈসর্গিক শোভা তুলনারহিত। প্রকৃতি যেন তার রূপের ডালি উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে এখানে। কুমায়ুন হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত এই অরণ্যভূমি নানা কারণেই অরণ্যপ্রেমীদের কাছে টানে। উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল এবং গাড়োয়াল জেলার মোট প্রায় ১২৫ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে অনুপম শোভামনোহর করবেট ন্যাশনাল পার্ক। করবেট ন্যাশনাল পার্কের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলে রামগঙ্গা নদী। পাহাড়ের ঘন নীল ছায়া পড়ে জলে; পল্লবিত অরণ্যের নৈঃশব্দকে ভেঙ্গে দিতে চায় কুলু কুলু শব্দ।

ভারতের দুষ্প্রাপ্য বন্য পশুপাখিদের বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে প্রথম ন্যাশনাল পার্ক স্থাপন করা হয় উত্তর প্রদেশে। ১৯৩৫ সালে। তদানীন্তন গভর্ণর হেইলি-র নামে ন্যাশনাল পার্কটির প্রথমে নামকরণ করা হয়। পরে পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় রামগঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক। কিন্তু সর্বশেষে গাড়োয়াল হিমালয়ের অরণ্য-প্রকৃতির বন্ধু বিখ্যাত শিকারী জিম্ করবেটের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে এই ন্যাশনাল পার্ক—যার জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে গাড়োয়াল হিমালয়ের এই রূপভয়ঙ্কর আরণ্যক পরিবেশে।

বন্যপ্রাণী প্রকৃতির অমূল্য অবদান। দেশের এই সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ আরণ্যক এলাকায় ন্যাশনাল পার্ক স্থাপন, অভয়ারণ্য তৈরী এবং চিড়িয়াখানার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

বসন্তে ফুটে ওঠে রডোডেনড্রন। মোহময় করবেট ন্যাশনাল পার্কে তখন যেন আগুনের বন্যা বয়ে যায়। ডালে ডালে নাচে ময়ূর। ডেকে ওঠে নানা পাখি। সোয়াম্প ডিয়ার এক বুক কচি ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। সম্বর উৎকর্ণ হয় চকিত আওয়াজে। ও পাশের উপত্যকা বেয়ে হাতির দল বুঝিবা নেমে যায় জলাশয়ের দিকে। বাঘ সন্তর্পণে চোখ রাখে শিকারের দিকে। বসন্তে অরণ্যাঞ্চলের নানাবিধ ফুলের সৌরভ প্রকৃতি জুড়ে এক আশ্চর্য পরিবেশ বিস্তার করে। জ্যোৎস্নাস্নাত পূর্ণিমায় পাহাড় পেরিয়ে যখন চাঁদ জেগে ওঠে তখন করবেট ন্যাশনাল পার্কের রমনীয়তার বুঝি তুলনা পাওয়া যায় না। শিকারের কথা ভুলে গিয়ে দুরন্ত শ্বাপদ-কুলও বুঝিবা আরণ্যক জ্যোৎস্নায় আনমনা হয়ে যায়। এমনই আকর্ষণ জিম্ করবেট ন্যাশনাল পার্কের।

করবেট ন্যাশনাল পার্কে পশুপাখির বৈচিত্র্য অসাধারণ। গাড়োয়াল হিমালয়ের ঘন অরণ্যের ভয়ালতার মধ্যে ভারতের বহু বিচিত্র বন্য প্রাণীর একত্র সমাবেশ পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণীয় বস্তু। বাঘ, হাতি, প্যান্থার, ভালুক, সম্বর, বন্য শূকর, বন্য কুকুর, বারা শিঙ্গা বা সোয়াম্প ডিয়ার, অ্যান্টিলোপ, হনুমান, সজারু, কালো তিতির, ফেজেন্ট, চিতল, কাকর, ঘুরাল, ক্যারাকেল জাতীয় বন্য বেড়াল, লাল রঙা বন্য মুরগী, কুমীর, অজগর, তা ছাড়া বহু বিচিত্র রকমের পাখি, ময়ূর এবং অজস্র মাছ, বিশেষ করে মহাশের ইত্যাদিতে ভরপুর করবেট ন্যাশনাল পার্ক। এক সময়ে এই অঞ্চলের চিতার খুব খ্যাতি ছিল। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ ও ফুলের সমাহারও এই পার্কের নিজস্ব সম্পদ।

আরণ্যক পরিবেশে নিসর্গকে অনুভব ও বন্যপ্রাণী প্রত্যক্ষ করবার জন্য করবেট ন্যাশনাল পার্কের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে 'ওয়াচ টাওয়ার' আছে—যেগুলির সঙ্গে নাকি একমাত্র আফ্রিকার ট্রি-টপের তুলনা করা চলে। পর্যটকদের কাছে এগুলির আকর্ষণও খুব বেশি রকমের। করবেট ন্যাশনাল পার্কে আধুনিক ব্যবস্থায় সুসজ্জিত বিশ্রামাবাসের ব্যবস্থা আছে। সুলতান, দিখালা, সার্পদুলি বকসার, গজপানি ও পাথর পানিতে। পশুপাখি শিকার কিংবা শিকারের চেষ্টা বা অন্য কোনো ভাবে অভয়ারণ্যের প্রাণীদের উত্যক্ত করা এখানে আইনত নিষিদ্ধ। গাড়িতে ঘুরে ঘুরে পার্কের অনুপম সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য বেশ কিছু গাড়ি-পথও রয়েছে। ট্রেন-পথে বা সড়কযোগে বেশ সহজেই আসা যেতে পারে এখানে। কাছাকাছি রেল ষ্টেশন রামনগর। ভরা বর্ষার দীর্ঘ প্রহরে অর্থাৎ জুন মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত করবেট ন্যাশনাল পার্কের দুয়ার খোলা থাকে না। ঐ সময়ে কুমায়ুনে নামে দারুণ ঢল। তখন উপায় থাকে না ঘরের বার হবার। অতএব।

তাঁতশিল্প প্রসঙ্গ

৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সমিতির বাইরে যেসব তাঁতশিল্পী আছেন তাদেরও মূলধন দেবার চেষ্টা হচ্ছে। অনগ্রসর জেলার এরকম তাঁতশিল্পীরা যাতে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পান তার জন্য চালু হয়েছে একটি পার্থক্যমূলক সুদের হার প্রকল্প। সমবায় বহির্ভূত তাঁতশিল্পীদের ঋণের চাহিদা মেটাবার মূল দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য পর্য্যায়ের তাঁতশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের। নতুন উন্নয়ন কর্মসূচীতে তাঁতশিল্পীর এই ঋণ পাওয়ার সমস্যা মেটাবার কথাও ভাবা হয়েছে। সম্প্রতি পল্লী এলাকায় মহাজনী ঋণ মকুবের পর ঋণদানের ক্ষেত্রে মহাজনদের জায়গায় সরকারী ব্যাঙ্ক বিশেষত পল্লী ব্যাঙ্ক এক বড় ভূমিকা নেবে।

তাঁতশিল্পজাত সামগ্রীর বিপণন ব্যবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত দুর্বল। বিপণনের ব্যাপক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে সমবায়ভুক্ত তাঁতশিল্পীদের তৈরী সামগ্রীও অনেক সময় গুদামে জমে যায়। রিবেট দিয়ে অবশেষে সেগুলো বিক্রী করতে হয়। আর সমবায়ের বাইরে যেসব তাঁতশিল্পী রয়েছেন তারাও ন্যায্য দাম পাননা বিক্রীর সুব্যবস্থার অভাবে। ফলে তাদের কঠিন পরিশ্রমের জিনিস অল্পদামে চলে যায় আড়তদার বা মহাজনের ঘরে। তাই বিপণনের জন্য সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তোলা যে আশু প্রয়োজন সেকথা প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি তাঁতমন্ত্রী সম্মেলনেও উল্লেখ করেছেন। ফলে বিপণনের ব্যাপারে তাঁতশিল্পীদের সাহায্যদানের বিষয়টিরও উন্নয়ন প্রকল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। স্থির হয়েছে বর্তমানে বিপণন সমিতিগুলিতে শক্তিশালী করা এবং আরো বেশী তাঁতবস্ত্র বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হবে।

মিল ও শক্তিচালিত তাঁতের অনুপ্রবেশের হাত থেকে হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে রক্ষা করবার জন্য তাঁতশিল্পের জন্য বস্ত্রশিল্পের কয়েকটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। রঙীন শাড়ী, ধুতি, তোয়ালে, গামছা, বিছানার ঢাকনা প্রভৃতি জিনিসের উৎপাদন তাঁতশিল্পের জন্যই সংরক্ষিত। এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তার জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক সম্প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। বিদ্যুৎ চালিত তাঁত যাতে হস্তচালিত তাঁতের কাপড় হিসেবে বিক্রী না হতে পারে তারজন্য বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের কাপড়ের ওপর উৎপাদকের পারমিট নম্বরের ছাপ থাকবে—এই মর্মে এক বিধিবদ্ধ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিদ্যুৎচালিত তাঁতের ওপর শুল্ক বসিয়ে এই সংরক্ষণ দৃঢ় করা হয়েছে।

এই সঙ্গে হস্তচালিত তাঁত শিল্পজাত সামগ্রীর নক্সা ও কারিগরী উৎকর্ষ উন্নত করবার দিকেও নজর দেয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, অ-ভারতীয় নক্সা আমদানীর বিরুদ্ধে হুশিয়ারী করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁত শিল্পমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে বলেছেন, তাঁত শিল্পে তৈরী আমাদের এমন কিছু জিনিস আছে দেশে বিদেশে যার মূল্য অপরিসীম। এই ঐতিহ্য ও নক্শা রক্ষা করতে হবে। এদিকে লক্ষ্য রেখে একটি নক্সা কেন্দ্র স্থাপনও উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই নতুন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁতশিল্প পর্ষদকে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবস্থা আগেই নেয়া হয়েছে। তাঁত শিল্পীদের কারিগরী সহায়তা দানের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪ টি তাঁতশিল্পী সেবা কেন্দ্র কাজ করছে। তামিলনাডুর সালেম ও উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে দুটি তাঁতশিল্প প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। কর্ণাটকের বেলগাঁওয়ে একটি তাঁতশিল্প উন্নয়ন প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচীটি রূপায়ণের মূল দায়িত্ব বিভিন্ন রাজ্য সরকারের। পশ্চিমবঙ্গের মত কয়েকটি রাজ্যে এজন্য একটি পৃথক তাঁত দপ্তর খোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক তাঁতশিল্পে নিযুক্ত। তাঁতের সংখ্যা দু লক্ষ। রাজ্য তাঁত দপ্তর তাঁত শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচীটি রূপায়ণের জন্য ইতিমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছেন। হস্তচালিত তাঁত শিল্পে সুতার যোগান বৃদ্ধির জন্য শ্রীরামপুরের সমবায় সুতাকলটির টাকুর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পঁচিশ হাজার টাকুর একটি নতুন সুতাকল স্থাপিত হবে। তাঁতশিল্পীদের সুতা সরবরাহ ও বিপণনের ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে একটি তাঁতশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।

কুঁড়ি দফা কর্মসূচী অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়নে নতুন প্রকল্পটি রূপায়িত হলে এ রাজ্যের দরিদ্র তাঁতশিল্পীদের ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গের আরো ৩৬৯টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য নতুন করে তিনটি প্রকল্প অনুমোদিত হল। এজন্য পল্লী বৈদ্যুতীকরণ সংস্থা ৫৬টি কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন। ঐ গুলির মধ্যে দুটি প্রকল্প ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচীর আওতায় থাকবে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার প্রতিটিতে একটি করে প্রকল্প রূপদান করা হবে। সম্পূর্ণ হবার পর ঐগুলি থেকে ২১৯ টি পাম্পসেট ও ২৫২ টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা বিদ্যুতচালিত হবে। এছাড়া, প্রকল্প এলাকাগুলিতে ৪,৩০৪ টি গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক লাইন ও ৩৬ টি সড়ক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আসবে। তৃতীয় প্রকল্পটির ফলে নদীয়া জেলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে।

জেলা থেকে
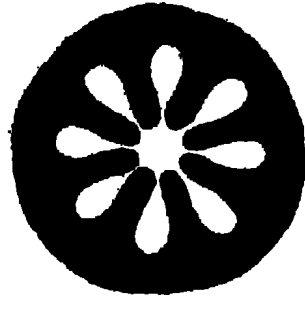
আত্মনির্ভরতা কথাটা হামেশাই শোনা যায়—অথচ এটির প্রকৃত রূপদান করতে ক'জনই বা সক্ষম হয়েছেন। দার্জিলিং-এ কিন্তু এমনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। নাম তিব্বতী শরণার্থী স্বয়ংসেবা কেন্দ্র। এঁরা দেয়া নাম স্বার্থক করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন কাজে-কর্মে-দক্ষতায়। এই কেন্দ্রের তৈরী হস্তশিল্প, বিশেষ করে কার্পেট রপ্তানি করে তাঁরা গত বছর আড়াই লক্ষ টাকার উপর বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা আয় করেছেন। এ বছর অঙ্কটি আরও বাড়বে বলে তাঁরা আশা রাখেন। পৃথিবীর ১৬টি দেশে তাঁরা হস্তশিল্প রপ্তানি করেন—তাছাড়া ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে তাঁরা ফরমাস পান। এঁদের তৈরী সামগ্রী রাজভবন থেকে

দার্জিলিংএ তিব্বতী স্বয়ংসেবা কেন্দ্র

দিলীপ বসু

সুরু করে বহু সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বাড়ীতে সমাদৃত হয়েছে। কার্পেটের চাহিদা এত বেশী যে তা পূরণ করতে এঁরা সব সময় পেরে ওঠেন না। এঁদের আরেকটি বিশেষত্ব এঁরা কিছুতেই নিম্নমানের সামগ্রী প্রস্তুত করতে রাজী নন, প্রত্যেকটি বস্তু তাঁরা নিখুত-ভাবে ও অতি সযত্নে তৈরী করেন। তাঁদের বিশ্বাস এই উচ্চমানই তাঁদের শ্রেষ্ঠ মূলধন। দার্জিলিং থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এঁদের কারখানাটি দেখতে বছরে প্রায় চল্লিশহাজার দেশী বিদেশী পর্যটকের সমাবেশ হয়। এটি এখন দার্জিলিং-এর অন্যতম পর্যটক আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

তিব্বতী ঐতিহ্যের হস্তশিল্প ছাড়া এরা নতুন চাহিদা অনুযায়ী নানা রকমের জিনিষ প্রস্তুত করেন, এগুলোর চাহিদা পাশ্চাত্য দেশেই বেশী। যেমন নানা নক্সার জামা, চামড়ার কাজ, জুতো, কাঠের খোদাই, মুখোস, ধর্ম্মীয় পট, চাঁদি-পিতলের উপর কারুকার্য ইত্যাদি এখানে তৈরী হয়। তবে কার্পেট বোনাই হচ্ছে এঁদের প্রধান কাজ। এই বিভাগটিতে প্রায় সত্তরজন মেয়ে-পুরুষ কর্ম্মী নিযুক্ত আছেন।

কার্পেট বোনার কাজ চলছে

এবার একটু গোড়ার কথায় আসা যাক। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে যখন তিব্বতী ধর্মযাজক মহামান্য দালাই লামা তাঁর দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন, তাঁর পিছু পিছু হাজার হাজার তিব্বতী শরণার্থী এদেশে এসে আশ্রয় নেন। তাঁদের পুনর্বাসন একটি বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়। ভারত সরকারের আনুকূল্যে এবং বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যে এঁদের বেশীর ভাগের পুনর্বাসন সম্ভবপর হয়েছে—তবু অনেক তিব্বতী নেতারা মনে করছেন এই উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হলে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না। এঁদের নিজেদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। তাই দালাই লামার অগ্রজ-পত্নী শ্রীমতী ইয়ালো (Yyalo Thandup) থাণ্ডুপের নেতৃত্বে একটি হস্ত ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল ১৯৫৯-এর পয়লা অক্টোবর হিল সাইড এলাকায় সাড়ে চার একর জমিতে। একটি চা-বাগানের উপর এটি অবস্থিত। স্থানটি অতি মনোরম। পরিষ্কার দিনে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যটি চোখে পড়ে আর দেখা যায় সিকিম, ভুটান, নেপালের পর্ব্বতমালা। তবে তিব্বতীদের কাছে যে দৃশ্যটি সব চেয়ে প্রিয়, সেটি হচ্ছে তিব্বতে ফেরার গিরিপথ। এই স্থানটির আরেকটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। ১৯১০ সালে যখন মাংচু সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী তিব্বত আক্রমণ করে তখন প্রবল প্রতাপশালী ত্রয়োদশ দালাই লামা এই হিলসাইডে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রায়

পেইন্টিং বিভাগে কর্মরত কর্মীরা

দু বছর ধরে। ১৯১২ সালে তিনি তিব্বতে সসম্মানে ফিরে গিয়ে তিব্বতী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এই বাস্তব সত্যটি আজকের তিব্বতীদের সব চেয়ে অনুপ্রেরণা দেয়। কাজেই স্থানটি তিব্বতীদের নিকট অতি পবিত্র।

মাত্র চারজন কর্ম্মী নিয়ে একটি ভাঙ্গা গোয়ালঘর মেরামত করে প্রতিষ্ঠানটি কাজ সুরু করেন। পূর্ব্বতন দালাই লামা যে বাড়ীটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেটি ধস নেমে বহুদিন আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই নিজেদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠতে লাগল। বর্তমানে প্রায় পাঁচশত তিব্বতীয় বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়েছে। তবুও কর্ম্মীদের থাকার স্থানের অভাব। কর্তৃপক্ষ আরও দুটি বাসগৃহ নির্মাণের প্রকল্প তৈরী করেছেন।

বাসগৃহ ছাড়া আরও বহু গৃহ নির্ম্মিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিভাগগুলি অবস্থিত। তাছাড়া আছে শো-রুম, বিরাট রান্নাঘর, স্নানাগার, সমবায় ভাণ্ডার, প্রার্থনা মন্দির বা গোম্ফা, একটি ক্রেশ, শিশুদের পাঠশালা, তাদের শয়নকক্ষ, বৃদ্ধদের আবাস গৃহ, গরু, শুকর, মুরগীর খোঁয়াড়, একটি কুড়ি-শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। সব মিলে পল্লীটি একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য—তিব্বতীয় ঐতিহ্যের হস্তশিল্প ও চারুকলার ও কারিগরি বিদ্যার সংরক্ষণ ও প্রসার। উদ্বাস্তুদের মধ্যে এইসব বিদ্যায় নিপুণ কিছু কারিগর আছেন। তাঁদের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের তালিম দেওয়া হয় এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের কারবার সুরু করে স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবার পর থেকে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষানবিসদের তালিম দেওয়া হয়েছে।

বর্ত্তমানে এখানে কর্মীর সংখ্যা দুশোর কিছু বেশী কিন্তু এঁদের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল প্রায় পাঁচশ প্রাণী—এর মধ্যে আছে অনেক ছোট ছেলেমেয়ে—কয়েকটি আবার অনাথ আর আছে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাঁরা সব খুইয়ে এদেশে এসেছেন। এদের সকলের ভরণ পোষণ চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠানেরই দায়িত্ব। হাস-পাতালটিতে দৈনিক গড়ে প্রায় একশজন রোগী আসেন। অনেকেই কাছের গ্রাম বা চা-বাগান থেকে। নামমাত্র 'ফি' নিয়ে এঁদের চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও তাদের পরিবার-বর্গের মনোরঞ্জনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। কাজেই হাট বাজার ছাড়া সহরে এঁদের আনাগোনা কম।

গত বছরের গোড়ার দিকে, প্রতিষ্ঠানের শ্রী গিয়াটসো, তাঁর কাঠের খোদাইয়ের জন্য জাতীয় মাষ্টার ক্রাফটসম্যান পুরস্কার রাষ্ট্র-পতির কাছ থেকে গ্রহণ করেন। এটি তাঁর পক্ষে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। শ্রীগিয়াট-সোর জন্ম লাসায়। এগারো বছর বয়সে তালিম নিতে সুরু করেন। পরে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তিব্বতী সরকারের অধীনে স্থাপতির কাজ করেন। সেই সময় বহু গোম্ফা ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণে তিনি সাহায্য করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ভারতে চলে আসেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হ'ন।

দেবাংশুর ভাবনা চিন্তা

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পারে। দিন কয়েকের মধ্যেই পলিক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে পুরোপুরি চেক আপ করাতে হবে। কিন্তু ওর নিজের সময় কোথায়?

মাঝে মাঝে এই কারণে ঝুমুরের ওপর এত রাগ হয় বলবার নয়। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে ঝুমুরের মত ঘরকুনো মেয়ে পাওয়া মুশ্কিল। ঘরকন্নার কাজ ও খুব ভাল করতে পারে। কিন্তু বাইরে বেরোনোর কথা বললে ওর মাথায় বাজ পড়ে। অথচ ও বেশ বুদ্ধিমতী, চটপটে। এই তো মাস কয়েক আগে ঝুমুর এবং ওর নিজের নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করিয়েছে যাতে ওর ভরসায় না থেকে ঝুমুর নিজেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারে। কিন্তু কোথায় কি, ব্যাংক থেকে টাকা তুলবার ব্যাপারে ঝুমুরের কোন রকম উৎসাহ নেই। বারবার করে ঝুমুরকে শিখিয়েছে কি করে চেক লিখতে হয়, কোথায় সই করতে হয়, কোথায় জমা দিতে হয়। কিন্তু তবু ব্যাংক যাওয়ার কথায় ঝুমুরের সারা মন জুড়ে আলসেমির ঢল নামে।

হেসে হেসে বলে, 'না বাপু, ওসব চেক টেক লেখা আমাকে দিয়ে হবে না। ওসব তুমিই করো।'

ঝুমুরের কথায় দেবাংশুর গাল ঝুলে পড়ে। ভাবে, এই ঝুমুরই না একদিন কলেজে পড়ত, কলেজ স্পোর্টসে প্রাইজও পেয়েছিল একবার। মনে মনে ভাবে দেবাংশু, বাইরের কাজগুলি ও যদি খানিকটা গুছিয়ে করতে পারত, তবে ওর নিজের সুবিধে হত অনেক। মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কিংবা শীতাংশুকে নিয়ে স্কুলে পরীক্ষা দেওয়ানো অথবা লাইফ ইনসিওরেন্স অফিসে গিয়ে মিসিং ক্রেডিটের তদ্বির তদারক করতে পারত, তবে অনেক কাজের সুবিধে হত ওর।

দোতলা বাসের রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে চিন্তা করে দেবাংশু, ওর নিজের যদি ভাল মন্দ কিছু হয়ে যায়, তবে চলবে কি করে ওদের। ওকে বাদ দিয়ে সামাল দেবে কি ভাবে। এই চিন্তা ওর মনের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হতে হতে থেমে যায় হঠাৎ। কুয়াশার মত ভবিষ্যতের জন্য কোন জাগতিক চিন্তাই আর ওকে ব্যাকুল করে তুলতে পারে না। করা সম্ভবও নয়। কারণ এইমাত্র বিশাল দৈত্যের মত আর একটা বাস দোতলা বাসের পেছনের দরজায় ঝুলন্ত দেবাংশুকে পিষে থেতলে একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করে দিয়েছে।

আম সংবাদ

শেখ আজিজুর রহমান

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এ বছর আমগাছে প্রচুর 'মুকুল' বা 'বোল' বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আম ব্যবসায়ীদের তৎপরতাও বেড়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে ফলন এবার ভালোই হবে আশা করা যায়, তবে কাল বৈশাখী এখনো শুরু হয়নি। কাজেই ফল শেষ পর্যন্ত কতটা গাছে থাকবে তা এখনি বলা মুশকিল। তাছাড়া রোগপোকার ভয়তো আছেই। এই আমের 'কলম' বা 'চারা' রোয়া বা পোতা থেকে শুরু করে সেই গাছকে ফলবতী করে তোলার দায়িত্ব চাষীরা নিলেও গাছে মুকুল ফোটা এবং তাতে ফল ধরাবার ও সেই ফলের পরিচর্যার বিষয়টি এখনও বেশীর ভাগ চাষী দৈবানুকূল্যের ব্যাপার বলে মনে করে থাকে। আমচাষের বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে পরিচয় না ঘটায় গ্রামের সাধারণ চাষীরা সবুজ বিপ্লবের তালিকায় আম চাষকে এখনো স্থান দেয়নি। যদিও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী এবং ভাল জাতের আম আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। আম চাষ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে লাভবান হচ্ছি আমরা সেই ১৮৯৬ সাল থেকে। তবু আজও এই আম চাষকে আর পাঁচটা চাষের মতো কৃষি হিসেবে আমাদের দেশের চাষীরা আদর করে কাছে টেনে নিতে পারেনি। খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার সিন্ধু উপত্যকায় সর্বপ্রথম আম বাগান লক্ষ্য করেন। সম্রাট আকবর দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে বিখ্যাত লাখবাগ নামে যে আমের বাগান প্রতিষ্ঠা করেন তাতে একলক্ষ আমের গাছ ছিল। জনৈক হাসানের বিখ্যাত আমের বাগানের উল্লেখ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে আছে। ইবন বতুতা আম সম্পর্কে বলেছেন, 'এই ফল কমলার মতো দেখতে।' আম-বাগান রাজানুকূল্য থেকে এখনো পর্যন্ত ধনী লোকেদের আনুকূল্য পেয়ে আসছে। অথচ এই লাভজনক আমচাষ সম্পর্কে অনেকের সম্যক জ্ঞান না থাকার ফলে এই চাষে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চারশো জাতের আম পাওয়া যায়। তার মধ্যে দু-একটি জাতের আম ছাড়া প্রায় সব জাতের আম অল্প-বিস্তর প্রায় একই সময়ে ফলে থাকে। আঁটির আম এবং কলমের আম এই দুই শ্রেণীর আমের মধ্যে কলকাতায় হিমসাগর, ভুতো, কিষেনভোগ, বোম্বাই, সুরত, ফজলী, ন্যাংড়া আম গুণাগত কারণে খুবই সমাদর পেয়ে থাকে। কিন্তু কলকাতার এক প্রদর্শনীতে সাড়ে তিনশত জাতের আমের মধ্যে 'বিমলী' নামের এক আম প্রথমা হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে আমের নামও হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। স্থানের নামে আমের নাম হয়েছে, কলকাতা আমীন, বম্বে গ্রীণ, মালদা, চুনাখালি, নিস্থাপুরী, বেজলী গোলা ইত্যাদি। ব্যক্তির নামে আমের নাম হয়েছে সিতার পসন্দ, রহমৎ খাস, হুমায়ুনুদ্দিন প্রভৃতি। রোমান্টিক আইডিয়া নিয়ে কিষেন ভোগ, দিল পসন্দ হুসানারা, ইত্যাদি। আকার অনুসারে হাতীঝুল, চ্যাপটা, পাঁচসেরী ইত্যাদি। গন্ধ অনুযায়ী নামের আম হয়েছে গুলাব খাস, গোলাব জাম, আনারস ইত্যাদি। আবার মাসফলন হিসাবে বৈশাখিয়া ভাদুরিয়া, কাতিকী, শ্রাবণী, আষাঢ়ে ইত্যাদি, নানান ধরণের আম ছাড়া কলকাতায় হিমসাগর, ভুতো, ফজলী, ন্যাংড়া প্রভৃতি আম সমধিক প্রসিদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত ইংরেজি বছরের প্রথম মাসে আমগাছে মুকুল দেখা যায়. এপ্রিল-মে মাসে পাকা আমে বাজার ছেয়ে যায়। আমগাছে বোল বা মুকুল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত এর শত্রুর উৎপাত শুরু হয়। আমের শোষক পোকা, আঁশপোকা, এরিওফাইড, মাইট, উইভিস, পাতা খাওয়া ইত্যাদি নানান ধরনের আমের মুকুলের পোকা ছাড়াও আছে কুয়াসার আক্রমণ। গুটি ধরার আগে রস কুয়াসা বা আঠাযুক্ত কুয়াসার আক্রমণে আমের মুকুল ঝরে যায়। বর্তমানে আমের পোকার বিভিন্ন ধরনের প্রতিশোধক, কীটনাশক ঔষুধ বেরিয়েছে। ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি. পাউডার ছাড়া বিভিন্ন ধরনের বিষ তেলও আছে।

পশ্চিমবঙ্গে সেভিন ৫০ ডবলু কীটনাশকই বেশী প্রচলিত। স্প্রে মেশিনের সাহায্যে পোকার আক্রমণ ও গাছের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে হেক্টর প্রতি জলে ১ কেজি থেকে আড়াই কেজি এই কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। অথবা প্রতি লিটার জলে দুই গ্রাম করে সেভিন ডবলু ভাল করে মিশিয়ে গাছ অনুযায়ী এর পরিমাণ বাড়িয়ে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা দেওয়া মাত্র

শেষাংশ চতুর্থ কভারে

ঘুরে ঘুরে মেলা দেখাচ্ছিল কিশোর বাউল। মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করে গাইছিল সে—

"খাচার ভিতর বন্দী পাখী
কেমন উইড়্যা যায়.... "

মন উদাস করা গান। গাইতে গাইতে আনমনা হচ্ছিল কিশোর বাউল। প্রশ্ন করলাম-'কবে থেকে এই তীর্থ মেলার শুরু?

কিশোর বাউল মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—'তা' তো' জানিনে। তবে—মকর সংক্রান্তিতে অজয় নদে স্নান গঙ্গা স্নানের মত পুণ্য স্নান—এই বিশ্বাস নিয়ে মানুষ আসে জয়দেব কেঁদুলীতে। কথিত আছে—মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে গঙ্গাই অজয় নদে প্রবাহিত হয়; পুণ্যলোভাতুর নরনারী অজয়ে স্নান করে রাধাবিনোদের মন্দিরে পুজো দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করেন।

জয়দেব কেন্দুলী

দীপক সেনগুপ্ত

রাধাবিনোদের মন্দিরের বেশ সুন্দর ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসও শোনালো কিশোর বাউল।

রাধামাধবের বিগ্রহ পেয়েছিলেন কবি জয়দেব মিশ্র। গীত গোবিন্দের রচয়িতা রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি, কবি জয়দেব অজয়তীরে কদম্বখণ্ডী ঘাটে পাওয়া রাধামাধব বিগ্রহটি কেন্দুবিল্ব গ্রামের এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এর কিছুদিন পরে কবি জয়দেব বৃন্দাবনে চলে যান এবং সঙ্গে নিয়ে যান রাধামাধবের বিগ্রহটি। মন্দির শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে।

এই পর্যন্ত বলে কিশোর বাউল আমার হাত টেনে বললে—'ইদিকে আসুন।' নদীর দক্ষিণ তীরে শ্যামরূপার গড়ে ছিল এই রাধাবিনোদের বিগ্রহ। শ্যামরূপার গড় জনবসতিহীন হ'য়ে পড়লে বিনোদ নামে এক রাজা শ্যামরূপার গড়ের বিগ্রহটিকে কেন্দুবিল্বের শূন্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা ঠিক কোন সময়ের জানা যায়নি, তবে বর্তমানের মন্দিরটি আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগে বর্ধমানের মহারাণী নৈরানী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন বলে জনশ্রুতি। মন্দিরের সামনের দিকে পোড়ামাটির কাজ। 'চলুন না দেখিয়ে আনি,' মন্দিরের সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে কিশোর বলল—'এই দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, যম ও বায়ুদেবের মূর্তি। এপাশে দেখুন—দশাবতার, তার নিচে এই ইদিকে দেখুন সীতা উদ্ধার। জটায়ু সীতা উদ্ধারে ব্যস্ত। এখানে দেখুন রামায়ণের চিত্র পোড়ামাটিতে উৎকীর্ণ। আর এইখানে—এই যে, ইদিকে কৃষ্ণলীলা, তার পাশে সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতিকৃতি। এ সবই পোড়ামাটির কাজ।'
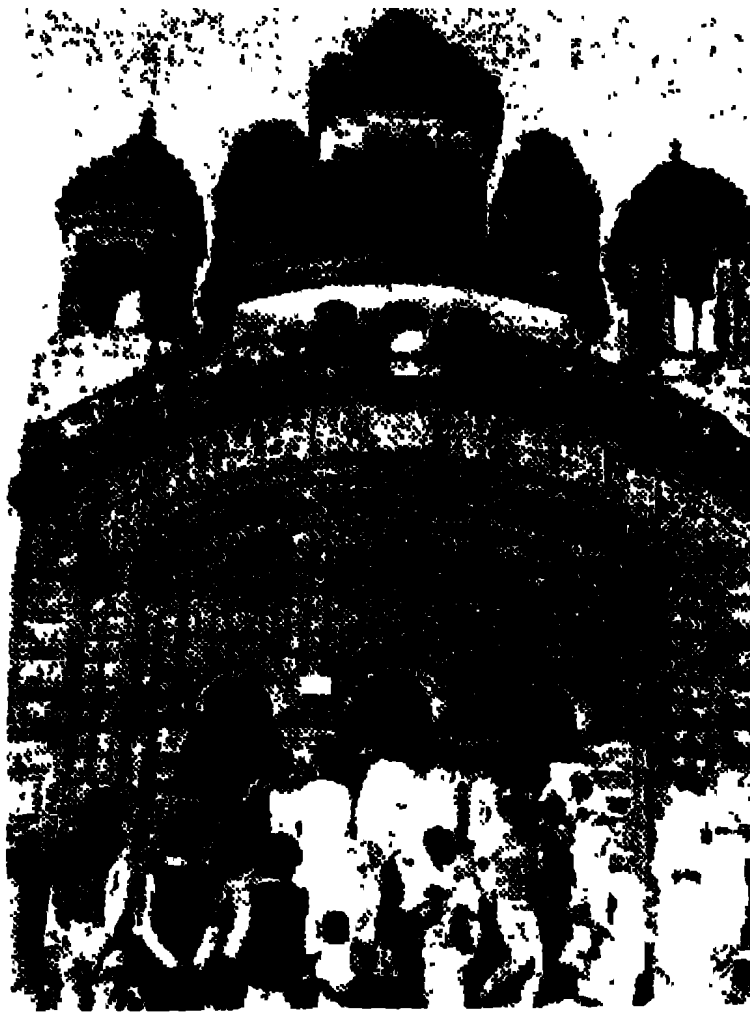
রাধাবিনোদের মন্দির

পোড়ামাটির কাজ দেখছিলাম। বীরভূমের পুরাকীর্তি। মন চলে গিয়েছিল অনেক পিছনে। সেই সুদূর অতীতে। কিশোর বাউলের কথায় ফিরে এলাম বর্তমানে।

'চলুন কবির বাসস্থান দেখে আসি। এই কাছেই মন্দিরের পাশেই থাকতেন কবি। এই মেলা তারই স্মরণে।'

কিশোর বাউল এগিয়ে নিয়ে চলল আমাকে।

—কেমন লাগছে মেলা? কিশোর প্রশ্ন করল।

—মেলার চেহারাতো সর্বত্র সমান।

—তা' ঠিক। তবে এমন বাউলের সমাবেশ কোন মেলায় দেখেছেন কি?

—তা' অবশ্য দেখিনি—সেই আকর্ষণেই তো আসা।

কবি জয়দেবের বাড়ী দেখে এবার আমরা চললাম মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রম দেখতে। যাওয়ার পথে দেখলাম কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ভিখারীর দল।

—জানেন তো,—জয়দেব কেঁদুলীর মেলা বাংলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা?

বললাম—কাগজে পড়েছি।

—আচ্ছা আপনি আসছেন কোথা থেকে?

বললাম—কলকাতা।

খানিক চুপ করে থেকে সে বলল—'আমি ইখানকারই লোক। ছিটে ফোঁটা জমি আছে। বছরের ধানটা উঠে আসে। সময় সুযোগ মত গান গাই। আসুন না, আজ রাত্তিরে ঐ সামনের আখড়ায়। শুনে যাবেন আমার গান। নিশ্চয়ই যাব—এই বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

মেলার একাংশ

সিনেমা

জনঅরণ্য শিল্পীর কমিটমেণ্ট

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। আজকের দিনে কিন্তু এই বিশ্বাস হারানোর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শুধু মানুষের প্রতি নয়, কোনো আদর্শ বা বিশ্বাসের প্রতি মানুষ আর আস্থা রাখতে পারছে না। মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাবার কারণও এটা।

এক কথায় বলা চলে এটি আত্ম-বিক্রয়ের যুগ। এ আত্মবিক্রয় কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নয়।

সত্যজিৎ রায়ের নবতম ছবি 'জনঅরণ্যে' এই (কাহিনী : শঙ্কর) গণ-আত্মবিক্রয়ের এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা, আদর্শহীনতা ইত্যাদি সমাজের নানা সমস্যার প্রতি পরিচালক আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই ঘুণধরা সমাজ বেঁচে বর্তে থাকার একমাত্র উপায় সব কিছু মেনে নেওয়া বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া-এধরণের মানসিকতার যে বিস্তার ঘটেছে আমাদের সমাজে তার একটা অতি বাস্তব চিত্রের সঙ্গে এই অবস্থার বিরুদ্ধে কঠিন পায়ে দাঁড়াবার ইঙ্গিতও তিনি রেখেছেন।

ছবির নায়ক সোমনাথ সেকেণ্ড ক্লাস গ্রাজুয়েট। চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে সে বিফলমনোরথ প্রায় হঠাৎই একজন পরিচিতের (বিশুদা : উৎপল দত্ত) পরামর্শে ও চেষ্টায় সে ব্যবসা শুরু করে। দালালীর ব্যবসা। ইতিহাসের স্নাতক কোটেশন কমিশন অর্ডার সাপ্লাই-এর গোলকধাঁধাঁয় হারিয়ে যায়। এই কনজুমার ওয়ার্ল্ডের বেচা কেনা বেচার ভিড়ে সোমনাথ তখন শুধু 'বস্তু' ছাড়া কিছু নয়। সেখানে ছল চাতুরী আর কমিশনের বাইরে কোনো চিন্তা নেই। এমনকি মোটা টাকার এক কেমিক্যাল অর্ডার পাবার জন্য তাকে প্রিয় বন্ধুর (সুকুমার : গৌতম চক্রবর্ত্তী) বোনকে (কনা : সুদেষ্ণা দাস) উপঢৌকন দিতে হয় এক ওপরওয়ালা অফিসারকে। সোমনাথ এই কাজ করতে গিয়ে বিবেক জর্জরিত বটে—কিন্তু এই মেনে নেওয়ার যুগে তাকে এই ব্যবস্থা মেনে না নিলে বদনাম নিতে হতো। দম বন্ধ হওয়া গলিঘুঁচিতে তাকে বিবেক আর চেতনা বিসর্জন দিয়ে যেতে হয় লক্ষ মানুষের ভিড়ে, জনঅরণ্যে।

অন্যদিকে রয়েছে সোমনাথের বয়স্ক পিতা। যিনি ভেতরে বাইরে সমাজের এই পরিবর্তন মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না। নিজের ভেতরে প্রতিবাদের জ্বালা নিয়ে বসে আছেন অসহায় ভাবে। বড় ছেলে ভোম্বলের (দীপঙ্কর দে) এই পরিবর্ত্তনের প্রতি অনায়াস সাবমিশন পিতাকে বিচলিত করলেও তিনি যেন নিরুপায়। চোখের সামনে সোমনাথের ব্যবসার নামে আত্মবিক্রয়ের পরিণতি দেখেও তাকে তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে দেখি। 'সহজে না ছাড়ার' লোকটিকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে দেখে কষ্ট হয়।

সত্যজিৎ রায় এখানেই সফল। আজকের এই পচনশীল সমাজের যে অবিকৃত চেহারাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোনো নাটকীয় গিমিকের আশ্রয় ছাড়াই বলে দিয়েছেন তাব জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা তার প্রাপ্য। কোনো কমিটমেণ্ট নেই, নেই কোনো সমাধানের ইঙ্গিত। শুধু একটি ইম্প্রেশনিষ্টিক চিত্র।

ছবি শুরু হয়েছে একটি পরীক্ষা হলে গণটোকাটুকির দৃশ্য দিয়ে। পরিদর্শকের পেছনে কালো ব্ল্যাকবোর্ড। সারা দেওয়াল জুড়ে উত্তেজক কিছু শ্লোগান। সোমনাথও সেখানে পরীক্ষার্থী। সে একটু প্যাসিভ চরিত্রের, শান্ত, গোলমাল পছন্দ করে না।

সোমনাথের হাতের লেখা ছোট হওয়ায় বৃদ্ধ পরীক্ষক খাতা দেখতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়েন, বিরক্তও হন। ফলত তার মাত্র সাত নম্বরের জন্য ফার্ষ্ট ক্লাস হাত ছাড়া হয়ে যায়।

এর পরেই শুরু তার জীবন সংগ্রাম। বিজ্ঞাপন দেখে চাকরীর দরখাস্ত ছাড়া আর এপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে কার্ড রিনিউ করতে করতে ক্লান্ত সোমনাথের সঙ্গে দেখা হয় 'খেলার মাঠে'র বিশুদার। চাকরীর আশা ছেড়ে ব্যবসায়ে তার আসা শুরু।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ বাবাকে এই কথা জানাতে তিনি উপরোধ মেনে নেন সব কিছু। এবং পরবর্ত্তী পর্যায়ে সোমনাথের আত্মবিক্রয়।

মহৎ ও সৎ শিল্পীর কাছে দর্শকের চাহিদা চিরদিনই বাড়তি কিছু দাবী করে। উপরন্তু শিল্পীর বিষয়বস্তু যদি তৎকালীন সমস্যাদি নিয়ে হয়। সুতরাং সত্যজিৎ রায় যখন আজকের জীবন আর জীবন সমস্যা নিয়ে ছবি করছেন তখন তাঁর কাছ থেকে সেই অতিরিক্তের দাবী অযৌক্তিক নয় নিশ্চয়ই।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে ঘুণের সন্ধান তিনি দিয়েছেন এই ছবিতে তা যদিও নতুন কিছু নয়, কিন্তু যে সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বলেছেন তা লক্ষণীয়।

'জনঅরণ্য' ছবিতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাভারতের যুগের উৎকোচ আজ ঘুষের রূপ নিয়েছে। কোথাও অর্থের আকারে কোথাও দ্রব্যের আকারে, কখনও বা জলজ্যান্ত মানুষরূপে।

যে সত্যটির প্রতি শ্রী রায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তীক্ষ্ণভাবে সেটি হল এই সমাজের প্রতিটি অবস্থাকে আমরা সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি। মেরুদণ্ড যেন ভেঙ্গে গেছে আমাদের। বয়স্ক বাবা প্রতিবাদের আগ্নেয়গিরি বুকে নিয়ে মানছেন সব কিছু, পুত্রেরা মানছেন বিবেক যন্ত্রণার বিনিময়ে। কিন্তু প্রশ্ন, এই মেনে নেওয়া কতদিন চলবে?

নির্দেশক এই প্রশ্নটা সরাসরি ছবিতে কোথা[illegible] রাখেননি, প্রচ্ছন্নভাবেও এমন কোনো জিজ্ঞাসা কখনও নেই। কিন্তু ছবির পরিণতিতে দর্শকের মধ্যে এই প্রশ্ন জেগে ওঠে। মানবিকতা-সততা মূল্যবোধ সব বিসর্জন দিয়ে গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ কি নেই? এই তীব্র প্রশ্নের মুখোমুখি দর্শককে দাঁড় করানোতেই ছবির সার্থকতা।

'জনঅরণ্যে' আর যে বস্তুটি আকর্ষণীয়, সেটি হচ্ছে শট্ কম্পোজিশন্ ও আলো আঁধারির ব্যবহার। গ্রিলের আলো-ছায়ায় বৃদ্ধ পিতা ও সোমনাথের মুখ বা মোমের আলোয় স্মৃতিচারণারত পিতার ক্লোজ-আপ, কিংবা শেষ দৃশ্যে হোটেলের দরজায় 'ডোন্ট ডিসটার্ব' ফ্রেমের ওপর চিন্তাক্লিষ্ট পিতার মুখের মণ্টাজ সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ শিল্পকীর্তির পরিচয়। চলচ্চিত্রে প্রয়োগ কলার ব্যবহারে তিনি যে ভারতের শ্রেষ্ঠতম তা এছবি আবার প্রমাণ করল। কোনো গিমিক নয়, একবারে সহজ সরল ভঙ্গিতে জীবন ও যন্ত্রণার কথা যে প্রচণ্ড তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশ ছবির কয়েকটি দৃশ্যে তা প্রশংসনীয়।

এ সত্ত্বেও অভিযোগ উঠতে পারে উপসংহার নিয়ে। বক্তব্যের গভীরতা যেখানে এতবেশী, সমস্যার তীব্রতা যখন পরিস্ফুট তখন এই অবস্থা পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত কেন নেই ছবিতে? সত্যজিৎ রায়ের মত একজন মানবিক চেতনাসম্পন্ন শিল্পীর কাছে এইটুকু চাওয়া হয়তো অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু যে বিশ্লেষণ ও দৃঢ়তার সঙ্গে ছবিখানি পর্দায় উপস্থিত তা ইতিপূর্বে শ্রীরায়ের কোন ছবিতে লক্ষ্য করাযায়নি। এই ছবিতে তিনি কাব্য বিলাসী পলায়নমুখী নন, সমস্যার গভীরে অন্তরের জ্বালা নিয়ে উপস্থিত।

—নির্মল ধর

রসাল সংবাদ

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রয়োগ করা উচিত। তারপর দু সপ্তাহ অন্তর প্রয়োজন মতো আবার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া আমগাছে বিভিন্ন ধরণের পরগাছা যেমন গইলে, আলোকলতা, বট, চিলে গাছ ইত্যাদির জন্যও ফল ধরে না। ২৪-পরগনার গোবরডাঙ্গার সাইন্স ক্লাব পরীক্ষা করে দেখেছে অনেক বছরের পুরানো গাছ যাতে মুকুল ধরলেও ফল ধরত না সেই গাছের আগাছা নষ্ট করে দেওয়ার পর আবার যথারীতি ফল ধরছে। বাগানে ঘন গাছ থাকলে ফল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। প্রতি বর্ষার আগে গাছের গোড়া দুই থেকে আড়াই হাত জায়গা জুড়ে কোদাল কুপিয়ে খইলের গুঁড়ো এবং বিভিন্ন প্রকার জৈব সার প্রয়োগে আইল বেঁধে দিলে গাছ সতেজ থাকে।

পরিপক্ক আমফলকে উপযুক্ত সময়ে গাছ থেকে পেড়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হলে বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড় এবং পাখীতে খেয়ে নষ্ট করতে পারে। বিঘা প্রতি আম-বাগানে বছরে তিন থেকে চার হাজার টাকা আয় করা যায়।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

কবি প্রণাম

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর
১১৫-তম জন্ম জয়ন্তী
পালিত হল সারা দেশ জুড়ে।
নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।
কলকাতায় হাজার হাজার
রবীন্দ্রানুরাগী কবিপ্রণাম
জানালেন জোড়াসাঁকোর
ঠাকুর বাড়ীতে, রবীন্দ্রসদনে
এবং অন্যান্য উৎসবমঞ্চে।
জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে
সকাল সাতটায় অনুষ্ঠানের
সূচনা। রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণেও
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে
শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়।
সকাল দশটার পর থেকে
অঝোর বৃষ্টি ধারায় অনুষ্ঠানের
অসুবিধে হয় বটে। কিন্তু
এই বৃষ্টি ছিল বিশ্বকবির
প্রিয় ঋতু বর্ষার শ্রদ্ধানিবেদন।
প্রতিবারের মত এবারও রবীন্দ্রকাননে
এদিন পক্ষকালীনব্যাপী রবীন্দ্র মেলার
সূচনা হয়। রবীন্দ্র জয়ন্তী
উপলক্ষে এদিন কিছু লিটল
ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে এবারও বিশেষ
রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশিত হয়।

বিশেষ রচনা ১৯ পৃষ্ঠায়

পরবর্ত্তী সংখ্যায়

এছাড়া খেলাধুলা, মহিলামহল, সিনেমা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR. CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক
সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ২২/১৫ মে ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—
প্রদীপ দাস

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এস্‌প্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

১৯৫৬ সালে শিল্পনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা ও এক্তিয়ার সুচিহ্নিত করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে মিশ্রঅর্থনীতির প্রবর্ত্তনের ফলে শিল্পোন্নয়নের গতি সুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। এরই ফলস্বরূপ বেসরকারী উদ্যোগের পাশে পাশে সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় শুধু যে বৃহদায়তন মৌলিক শিল্পই গড়ে ওঠে তাই নয় ছোট ছোট শিল্পেরও বিস্তার ঘটতে থাকে। তা ছাড়া জাতীয় স্বার্থে অনেক রুগ্ন শিল্পকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে শিল্পোদ্যোগ সমূহ প্রথম দিকে আশানুরূপ ফলপ্রদর্শন করতে না পারায় তাদের সবদিক থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আশার কথা এই শিল্পগুলি ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে দুর্দিন কাটিয়ে সুদিনের মুখ দেখতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন শিল্পোদ্যোগ সমূহের ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বিবরণ সম্প্রতি সংসদে উপস্থাপিত করা হয় তাতে দেখা যায়, ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায় ১২০ টি শিল্প সংস্থায় লাভের পরিমাণ এক বছরে ৬৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৮৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছে। এই শিল্পগুলি ১৯৭২-৭৩ সালে যখন প্রথম লাভ করতে আরম্ভ করে তখন সেই লাভের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮ কোটি টাকা।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করার অন্যতম কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগগুলির উৎপাদন ক্ষমতার আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার। ১৯৭৪-৭৫ সালে ৫৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প তাদের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। আগের বছরে ৪৫ টি শিল্প এটা করতে পেরেছিল। তাছাড়া, আগের বছরে যেখানে ২২ টি শিল্প সংস্থা শতকরা ৫০ থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেছিল, সেখানে আলোচ্য বছরে ২৭ টি শিল্প সংস্থা এটা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই সাফল্যের আরেকটি চাবিকাঠি হচ্ছে এই সব শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সংস্থা সমূহের এই উজ্জ্বল চিত্রের জন্য আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই। পাবলিক ব্যুরো অব এন্টার-প্রাইজের ডিরেক্টর জেনারেলের মতে ১৯৭৫-৭৬ সালে লাভের হার হয়ত ১৯৭৪-৭৫ সালের মত বজায় রাখা যাবে না। প্রধানতঃ উক্ত বছরে প্রথম অর্দ্ধে অভাবনীয় দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির দরুন। কিন্তু গত বছর জুন মাসে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর মূল্যমানে স্থিতিশীলতা এসেছে, শিল্পে শৃংখলা ফিরে এসেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আর বিশদফা নতুন অর্থনৈতিক কার্যসূচীর মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যূনতম বোনাস আইন, শিল্প কারখানায় পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্য রোধের ফলে শ্রমিক অসন্তোষ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কথায় কথায় ধর্মঘট সর্বত্র বন্ধ হয়েছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি আগামী দিনে উৎপাদন বাড়িয়ে লাভের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে পারবে এবং দেশের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করতে পারবে বলে আমাদের আশা।

গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

ইন্দিরা গান্ধী

বিষয়টি সম্পর্কে আমি বহুবার বলেছি—তাই নতুন করে এ সম্পর্কে বলার কিছু নেই। তবে এই ধরণের আলোচনাচক্রের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এককারণেই যে এর মাধ্যমে আরো অনেক লোক তাদের মতামত ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাবেন এবং তারা এ বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। গত মাসে বোম্বাইয়ে 'শৃঙ্খলাপূর্ণ গণতন্ত্র' –এ পর্যায়ের এক আলোচনাচক্র বসেছিল। আমি এর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলাম 'গণতন্ত্রে শৃঙ্খলাবোধ'। আবার যদি এর নাম সম্পর্কে আমি পরামর্শ দিই তাহলে বলব এর নাম 'গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের' বদলে 'গণতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ' হওয়া উচিত।

আমরা ভারতীয়রা গণতন্ত্রকে পছন্দ করেছি অন্য কোন দেশকে খুশী করার জন্য নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে একমাত্র গণতন্ত্র ব্যবস্থাই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ উন্নত ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে আধুনিক বিশ্বের কাছে। একটি দেশ কী ধরণের সরকার গ্রহণ করবে তা একান্তই সেদেশের জনগণের নিজেদের ব্যাপার। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের বলার কিছুই নেই। কেননা আমাদের দেশ গণতন্ত্রকে পছন্দ করে নিয়েছে। যে সব শক্তি এই ব্যবস্থাকে হেয় করে তুলবার পরিকল্পনা করছে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেই আমাদের গণতন্ত্রকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে হবে।

আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করা হয় যে পশ্চিমী গণতন্ত্র ভারতের কাছে কি বিদেশী নয়? দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশ কি ঠিকমত গণতন্ত্রকে চালাতে পারে? আমার উত্তর, ব্রিটিশরা আমাদের গণতন্ত্র দিয়েছে—এই কারণে আমরা মোটেই গণতন্ত্রী নই। মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে বলেই এটা আমাদের বস্তু। গণতন্ত্র কারুর একচেটিয়া নয়। অন্যান্য দেশ এর স্বরূপ প্রকৃতির কোন প্যাটেন্ট বের করেনি। আর আমাদের গণতন্ত্র কোন বিদেশী লাইসেন্সের অধীনও নয়।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও কম্যুনিজম দুটি পরস্পর বিরোধী প্রথা এবং দুটোরই জন্ম পশ্চিমে। কিন্তু, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এগুলোকে গ্রহণ করেছে নানাভাবে সংস্কার করার পর—নিজস্ব মতে।

এমনকি একই দেশে গণতন্ত্রের ধারণার পরিবর্তন ঘটছে। গ্রীক গণতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। এটা সকলেরই জানা যে, এথেন্সে মহিলা ও দরিদ্রদের রাজনীতিতে কোন অধিকার ছিল না। এ সত্ত্বেও গ্রীক গণতন্ত্র দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে টিঁকে ছিল। তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের দুর্গ বৃটেনেও গত শতাব্দীতে গণতন্ত্র ছিলই না। অথচ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা সেখানে ছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ার পরেই বৃটেনে গণতন্ত্রের সূত্রপাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের মহিলারা রাজনৈতিক অধিকারের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে এবং ভোটাধিকার আদায় করে। তাও আজ ৬০ বছর আগে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রথম প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে সহ্য করার ক্ষমতা। গত কয়েক মাসে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা

দ্বিতীয়ত, যতই এর গুণগত উৎকর্ষ থাকুক না কোন ব্যবস্থাই নিরাকার অবস্থায় বাঁচতে পারে না। গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয় হলেও, দেশ আরো বড়। দেশের একতা ও সংহতি রক্ষার পক্ষে কোন্ শাসন ব্যবস্থা কতটা কার্যকর তার ওপরেই নির্ভর করছে সেই ব্যবস্থার উপযোগিতা।

আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আমাদের দেশের ভাষা, ধর্ম ও প্রথার বিভিন্নতাকে একভাবে ধরে রাখতে পারে। এর কারণ, গণতন্ত্রই সকল জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়।

দেশের শাসন ব্যবস্থার তৃতীয় প্রয়োজন হল তা দেশের সমস্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

'গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনা চক্রে প্রধানমন্ত্রী

স্বার্থের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। ইতিহাস কখনোই এই ধারণাকে সমর্থন করে না যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে দ্রুত মানুষের উন্নতি ঘটাতে পারে। এমনকি যারা চীনের উন্নতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারাও উপলব্ধি করতে পারছেন, গণতান্ত্রিক ভারত যা উন্নতি করেছে তার তুলনায় চীনের উন্নতি ততটা চমকপ্রদ নয়। অবশ্য একথা সত্যি শ্রেণীবৈষম্য সেখানে কম।

ভারতীয় পরিবেশ গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছে। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ঠিক এজন্যই অগণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক নয় এমন কিছু বিষয়কে অনেক সময় গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভুল করা হয়। অ্যাংলো-স্যাক্সন আইনব্যবস্থায় আইনকে কি প্রধানত সম্পন্ন শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা হয়নি? রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ইংলণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের আইনে এই ধরণের অনেক ত্রুটিই রয়ে গেছে। এগুলোকে সংশোধন করতে হবে যাতে সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে কাটিয়ে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। জনগণের সার্বিক কল্যানের সঙ্গে যখন ব্যক্তির সুযোগসুবিধার সংঘাত ঘটে তখন বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ স্পষ্টতই প্রাধান্য পাবে।

এখন আমরা এক বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, ভারত গণতন্ত্রকে বর্জন করেছে। দুঃখের বিষয়, কিছু ভারতীয় আবার এই অপপ্রচারে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে গত বছর জুন মাসে কিছু বিরোধীদল যৌথভাবে এক অভিযান চালায়। এই গণতন্ত্র-রক্ষাকারীদের খুব সহজেই চেনা গেছে। এরা হল, জনসংঘ ও তার সশস্ত্র শাখা আর-এস-এস, আনন্দ-মার্গ, নকশাল, সি-পি-এম, ডি-এম-কে, স্যোস্যালিষ্ট দল সংগঠন কংগ্রেস এবং বি-এল-ডি।

এদের প্রত্যেকের পূর্ব রেকর্ড কি? প্রথম চারটি দল পুরোপুরি হিংসায় বিশ্বাসী; তাদের মতাদর্শকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে চালিয়ে সন্ত্রাস ও ভয় প্রদর্শন করাই হল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে ডি-এম-কে'র আগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। গণতান্ত্রিক এবং অহিংস পদ্ধতির প্রতি সোসালিষ্ট পার্টি'র আস্থাও যথেষ্ট নয়। এই দলটি সর্বদাই নাশকতামূলক কাজ ও চরিত্রহননের মাধ্যমে জনজীবনকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছে।

সাংগঠনিক কংগ্রেস ও বি-এল-ডি হয়ত সত্যিই সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী কিন্তু এই দলের নেতারা গুজরাট ও বিহারে সর্বাধিক সংবিধান বহির্ভূত ও অগণতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করতে দ্বিধা করেনি। ঘেরাও, ভীতিপ্রদর্শন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জোর করে পদত্যাগে বাধ্য করানো, বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য অনশন এইসব আচরণ সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী।

আর যেসব বিদেশী শক্তি ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন তাদের কেইবা নিষ্কলঙ্ক? তারা যে একনায়কতন্ত্রী ও সামরিক শাসনের পক্ষে ওকালতি করেছে তা কি এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়?

বড় বড় কাগজ তাদের পক্ষে। দেশেও বড় বড় কাগজগুলি কঠিন আর্থিক সংকটের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করে আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে চেয়েছিল।

লণ্ডনের একটি সংবাদপত্র আমাদের তথাকথিত আত্মগোপনকারী নেতাদের সম্পর্কে নানারকমের গাঁজাখুরি গল্প প্রচারে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। অথচ নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা লিখতে চান তাদের লেখা ছাপানোর জন্য তাদের জায়গা নেই।

অনেক দেশই আমাদের বিপক্ষে, একথা ভাববার কোন কারণ নেই। প্রত্যেক দেশেরই সরকারের নিজস্ব নীতি আছে। কিন্তু যেসব দেশের সংবাদপত্রে আমাদের নিন্দা করা হয় সেসব দেশেও বেশ কিছু সংখ্যক লোক ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

লোকসভার নির্বাচন কেন স্থগিত হল

বিশেষ প্রতিনিধি

বর্তমান লোকসভার মেয়াদ এক বৎসর বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে সংবিধানসম্মতভাবেই সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। গত বছর ২৫শে জুন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হবার পর থেকে স্বল্পকালীন সময়ে যে অর্থ-নৈতিক প্রগতি ঘটেছে তাকে সংহত করার জন্য দেশ যাতে উপযুক্ত সময় পায় সেজন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

সাংবিধানিক বিধি

বর্তমান লোকসভার মেয়াদ এক বৎসর বৃদ্ধির জন্য আনীত একটি বিল সংসদের উভয় সভাতেই অনুমোদন লাভ করে। এবছর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিপুল ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হয়। রাজ্যসভায় ৬ই ফেব্রুয়ারী বিলটি অনু-মোদিত হয়। এবছর ১৮ই মার্চ পঞ্চম বৎসর অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যে লোক-সভার মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল তা সংবিধানের ৮৩নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারা বলে স্থগিত রাখা হয়েছে। অনু-বিধিতে বলা হয়েছে, দেশে যখন জরুরী অবস্থা চলবে তখন লোকসভার মেয়াদ সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধভাবে এক সঙ্গে এক বছর পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। কিন্তু জরুরী অবস্থা অবসানের পর ছ'মাসে-এর বেশী বাড়ানো চলবে না। সংবিধানে এরকম বিধি থাকার কারণ সংবিধান রচয়িতাদের দূরদর্শিতা।

স্বাভাবিক অবস্থায় পাঁচবছর বাদে লোকসভার নির্বাচন হওয়া যেমন সংবিধান-সম্মত বিধি, তেমনি এও সংবিধানসম্মত বিধি যে দেশে যখন জরুরী অবস্থা থাকবে তখন সংসদ লোকসভার নির্বাচন স্থগিত রেখে তার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু একটি প্রস্তাব বিলের আকারে পেশ করেছিলেন। আর সংসদ পুরো বিতর্কের পর সব দিক বিবেচনা করে বিলটি অনুমোদন করেন।

জরুরী অবস্থার আগের পরিস্থিতি

কথাটা আজ কারোরই অজানা নেই যে গতবছর ২৬শে জুন জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে দেশের পরিস্থিতি কতখানি ঘোরালো ছিল। এখন যাঁরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে নির্বাচনের ধুয়ো তুলছেন তখন তাঁরাই আবার দেশের গণতন্ত্রকে বানচাল করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সরকার যখন অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তখন কিছু বিরোধীদল ও নাশকতাকারী প্রতিষ্ঠান সুযোগ বুঝে বিশৃঙ্খলামূলক আন্দোলন ও বিক্ষোভের মাধ্যমে অশান্তির বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন

১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে গুজরাটে নির্বাচিত বিধানসভাকে ভেঙ্গে দেবার দাবী তুলে এবং বিধানসভার সদস্যদের পদত্যাগে বাধ্য করে এক হিংসাত্মক আন্দোলন সুরু হয়। ঠিক অনুরূপ ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং হিংসাত্মক আন্দোলন বিহারেও দেখা দেয় যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরে বিরোধী দলগুলি এবং অন্যান্যরা যে ধ্বংসাত্মক ও সংবিধানবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা এখনো অনেকের স্মৃতিপটে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে। ঐসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ যদি অব্যাহতভাবে চলতে দেওয়া হত তাহলে শান্তিপ্রিয় ও আইনমান্যকারী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন তো বিপন্ন হতই,—সেই সঙ্গে জাতির নিরাপত্তাও যথেষ্ট ক্ষুন্ন হত। গণতন্ত্রের নামে এই গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলি গণতন্ত্রকে বানচাল করে দেবার চেষ্টায় ছিল। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগোষ্ঠী জেনে শুনেই স্বাধীনতাকে একটা যা খুশী তাই করবার ক্ষমতা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন, নিজেদের অধিকার অপব্যবহার করে অন্যের অধিকারে যা দিয়ে হিংসার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করছিলেন। তাদের ক্রিয়াকলাপ এমন কিছু ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে প্ররোচনা যুগিয়েছিল যারা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী শ্রী এল.এন.মিশ্রের হত্যা, ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী এ.এন. রায়কে' হত্যার চেষ্টার মত ভয়ানক অপরাধের জন্য প্রত্যক্ষভাবে—দায়ী।

দেশে তখন সর্বত্র—বিশৃঙ্খলা, শ্রমিক অসন্তোষ এবং একটা শৈথিল্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

লোকসভার মেয়াদবৃদ্ধি সম্পর্কিত বিলের বিতর্কের জবাবে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিছু বিরোধী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার দাবীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, একথা কি ঠিক যে ২৬শে জুনের আগে পর্যন্ত যা ঘটেছে তা স্বাভাবিক অবস্থা? এবং তা কি আবার ফিরিয়ে আনা উচিত?

বিরোধীদলগুলি যে স্বাভাবিক অবস্থার দাবী করেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে পর্যন্ত তার অর্থ ছিল বিশৃঙ্খলা, শিল্প-অশান্তি এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে শৈথিল্য। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী একে অস্বাভাবিক অবস্থা আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করেন, "প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘকাল যে অ-স্বাভাবিক অবস্থা দেশে বিরাজমান ছিল তা যদি আবার ফিরিয়ে আনা হয় তবে তার অর্থ হবে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু।"

এই গণতন্ত্রের অপমৃত্যু রোধ করতে, সংকটপূর্ণ অবস্থার হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়ে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলতে এক বৃহত্তর সংবিধানসম্মত পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা এই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছে। নিঃসন্দেহে আজ একথা বলা চলে যে জরুরী অবস্থা দেশের সাধারণ বাতাবরণে একটা পরিবর্তনের হাওয়া এনেছে। প্রকৃতপক্ষে, স্বাভাবিক অবস্থা বলতে যা বুঝায় জরুরী অবস্থাই সেটা আমাদের দিয়েছে। দেশবিরোধী এবং সমাজ বিরোধী-দের দমন করা হয়েছে কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ-ভাবে উৎখাত করা যায়নি। তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা দরকার। এ অবস্থায় নির্বা-চনের অর্থ জরুরী অবস্থায় প্রাপ্ত স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির ব্যাঘাত হওয়া। যদি এই বাতাবরণের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলতে ও সমাজ-বিরোধীদের কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেকথা বিবেচনা করেই সংসদকে বর্তমান লোকসভার মেয়াদ একবৎসর বাড়াতে হয়েছে। এখন চাই প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ। একটি নির্বাচন সংঘটিত করার জন্যে শক্তি, অর্থ ও সময় ব্যয় করার মত উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি। জরুরী অবস্থা আনয়নের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁরা এখনো সমূলে বিনষ্ট হয়নি। শৃঙ্খলা, কঠিন পরিশ্রম, অধিক উৎপাদন এবং প্রগতির বর্তমান বাতাবরণকে দেশ কখনই ব্যাহত হতে দিতে পারেনা।

বিশদফা কর্মসূচী ও নবদিগন্ত

গত বছরের ১ লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়-বিচারকে ত্বরান্বিত করেছে তা সর্বজন-বিদিত। এই কর্মসূচী অর্থনৈতিক অসাচ্ছন্দ্যতার কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে এক বিরাট অস্ত্রোপচারের কাজ করেছে। এর আওতায় বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে গ্রামাঞ্চল যেখানে রয়েছে সত্যিকারের ভারতবর্ষ। জমির নথিপত্রাদি সমাপ্তি-করণ, উদ্বৃত্তজমির দ্রুত সুষ্ঠু বণ্টন, কৃষিঋণ স্থগিতকরণ, অতিদরিদ্রের ঋণভার লাঘব, ও ক্ষেত্রবিশেষে মকুব, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ দান, বেগার প্রথার অবসান, বাস্তহীনদের লক্ষ বাস্তজমি দান, ন্যূনতম কৃষি মজুরী সংশোধন ইত্যাদি ব্যবস্থা নেবার ফলে আজ গ্রামের মানুষরা আশার আলো নিয়ে ভবিষ্যতের পানে তাকাতে পারছেন। এই কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। শিল্পক্ষেত্রে এক সুন্দর শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ভোগ্যপণ্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা কেটে গিয়েছে। সবকিছুই সহজপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাবাজ ও আয়কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থা নেবার ফলে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই যেসব অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাকে সংরক্ষণ করা দরকার। নির্বাচন ব্যয় বহুল ব্যাপার। একে এক বছর স্থগিত রেখে অর্থনীতিতে যে শৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে তাকে রক্ষা করা দরকার। এখন নির্বাচন হলে আর্থিক শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হতে পারে, শিল্পে শান্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই চলমান ঘটনা প্রবাহ থেকে এটাই সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে বর্তমান লোক-সভার মেয়াদ এক বৎসর বৃদ্ধি শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থের কারণেই হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু কিছু বিরোধীদল এই অভিযোগ তুলছেন যে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হতে ভয় পেয়েই এ পথে পা বাড়িয়েছেন। বলাবাহুল্য এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসার। কারণ আমাদের সাধারণ জীবন-ধারায় এতো শান্তি ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তি ঘটেছে যে যদি এখনই নির্বাচন হয় তাহলে ক্ষমতাসীন দল যে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই বড় কথা নয়, তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জরুরী অবস্থায় আমরা যা পেয়েছি তার সংহতিসাধন। নির্বাচনের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিয়ে তার চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত দেশের অর্থনীতি যাতে জোরদার হয়, অভ্যন্তরীণ নাশকতাকারীর হাত থেকে দেশ যাতে মুক্ত হয়, বহিরাক্রমণের যাতে উপযুক্ত মোকাবিলা হয়—ইত্যাদির উপর।

পরিশেষে আরেকটা কথা বলা যেতে পারে যে এই নির্বাচন স্থগিত মোটেই নতুন নয়, কারণ ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশেও জরুরী অবস্থায় নির্বাচন স্থগিতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কঠোর পরিশ্রম, প্রশাসনিক দক্ষতা, শৃঙ্খলাময় এক প্রগতির নবদিগন্তের সূচনা করে জরুরী অবস্থা অনুঘটক শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস ফিরে আসছে। যেসব সমস্যাদি জরুরী অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী তার সমাধানের তাগিদেই জাতীয় শক্তিকে সুদৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত করার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। এ সময় হবে, কাজের মাধ্যমে এগিয়ে চলার নীতিকে ফলবতী করার। বৃথা বাক্যব্যয় বা হৈ হুল্লোড়ের নয়। তাই বর্তমানে নির্বাচন স্থগিত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতই হয়েছে।

ভূদানের রজত জয়ন্তী

শান্তিকুমার মিত্র

বিঘা কাঠা শতক, এসব অঙ্কে ভূদানযজ্ঞের হিসাব নিকাশ করতে গেলে খুব একটা ভরসা পাবেন না। একজন প্রবীণ সর্বোদয় পদযাত্রী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন। ভূদানযজ্ঞের রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে নানা স্থানে পদযাত্রা চলছে। 'আমাদের মন্ত্র—জয় জগৎ', 'আমাদের তন্ত্র—গ্রাম দান', এই সব ধ্বনি-সম্বলিত ফেষ্টুন, পোষ্টার নিয়ে ছোট ছোট দল শান্তি সুশৃঙ্খল পদযাত্রায় বেরিয়েছেন। তাঁদের ধরেছি। ধরেছি মানে প্রশ্ন রেখেছি, ভূদানে কি এমন সাড়া মিললো? প্রশ্নে আমার সংশয় প্রকাশ পেয়ে থাকবে। তাতে প্রবীণ সর্বোদয় কর্মীর ঐ প্রত্যুত্তর। তাঁর কথা, দেখুন, ভূদান একটা ভাব, একটা আদর্শ—বৈপ্লবিক আদর্শ। কোনও মেডইজি নেই এর। সময় লাগে। তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, ভূদান আন্দোলনের ফলে একটা বাতাবরণ, একটা অনুকূল হাওয়া কি সৃষ্ট হয়নি দেশে? ভূমিহীনদের সমস্যাটা কি গুরুত্ব পায়নি? সম্ভবতঃ ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারী জমি বিলি, পাট্টা বিতরণের প্রতিই তাঁর ইঙ্গিত। সম্ভবতঃ কেন, নিখিল ভারতীয় ক্ষেত্রের অনেক নেতাই বলেছেন, ভূদান আদর্শের প্রেরণা থেকেই ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিলির প্রকল্প নেওয়া।

তবু একটা হিসাবনিকাশ প্রাসঙ্গিক তো বটেই। তা সে প্রশ্নে পশ্চিমবাংলার ভূদান আন্দোলনের পুরোধা, নেতা শ্রী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী আশাবাদী। রজত জয়ন্তী বৎসরের আগে পর্যন্ত এরাজ্যে ভূদান হিসাবে ১৬ হাজার একর জমি পাওয়া গিয়েছে; তার মধ্যে ৮ হাজার একর জমি বিতরণ করা হয়েছে। আর এই রজত জয়ন্তী বর্ষে এখন পর্যন্ত শ' চারেক একর জমি বিলি সারা হয়েছে। চারুবাবু বয়সে প্রবীণ। এক সময় এ রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তারপর যেদিন থেকে ভূদান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন, রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। ভাণ্ডারী মশাই বলছিলেন, পরিসংখ্যান বলে যা উল্লেখ করা হচ্ছে, তা কিন্তু কিছুটা বিভ্রান্তিকর। একটা গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামদানের সঙ্কল্প নিলেন, অতএব সঙ্গে সঙ্গে সেটি গ্রামদানী পল্লী হয়ে গেল, এটা ভাবা কিন্তু ভুল। সঙ্কল্প বাস্তবে রূপ নিলেই তবে পূর্ণতা। পশ্চিমবঙ্গে ৭০০ গ্রাম দানের কথা বলা হয়, আসলে ৩০-৩৫ টি স্বত্বাধিকারের উৎসর্গীকৃত গ্রাম। বাকি গ্রামগুলি প্রস্তুতির পথে।

সারা ভারতে তো লাখ খানেকেরও বেশী গ্রামদান হওয়ার কথা শুনি, তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন করি। চারুবাবু বললেন, ঐ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত গ্রাম। অর্থাৎ ভাবটা জেগেছে। তবে পুরোপুরি গ্রামদানী পল্লী হওয়া অনেক কৃতসাপেক্ষ। যেমন, গ্রামের বিশভাগের এক ভাগ জমি গরীবদের দিয়ে দিতে হবে। গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রতি বছর ফসলের ৪০ শতাংশ বা তার কিছু কম গ্রাম-তহবিলে দিতে হবে। সব প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গ্রামসভা হবে। না না, পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার সে গ্রামসভা নয়। পাছে এই ভুল বোঝাবুঝি হয়, সেজন্য এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে গ্রাম পরিষদ। গ্রাম পরিষদে যা সিদ্ধান্ত হবে, সর্বসম্মত হওয়া চাই, ভোটাধিক্যে নয়। গ্রামের জমির শতকরা ৭৫ জন মালিক রাজি হলেই তবে গ্রামদান করা যায়। এজন্য গ্রামদান আইন আছে।

ভূদান, গ্রামদান, এসব সংজ্ঞা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সত্যই কি এবারে আমাদের দেশের ভূমিসমস্যা মিটবে, বা ভূমিহীনদের ভূমি ক্ষুধা? সরাসরি প্রশ্ন ছিল আমার। সেই সঙ্গে যোগ করি, এ অভিযোগ কি অস্বীকার করবেন, ভূদান যজ্ঞে যা জমি আসছে তার বেশির ভাগই অনুর্বর, পতিত জমি? চারুবাবু স্বীকার করেন, হাঁ, এরকম হয়েছে। যেখানে হয়েছে, বুঝতে হবে সেখানে মানুষ ভূদানের আদর্শটা বোঝেন নি, প্যার করেন নি। তবে পশ্চিমবঙ্গে একটিও খারাপ জমি দেখাতে পারবেন না, চারুবাবুর কণ্ঠে গভীর আত্মবিশ্বাস। ওঁর কাছেই শুনি কবে কোথায় ভূদান আন্দোলনের সূত্রপাত; বিনোবাজীর পাদ-পরিক্রমার ইতিবৃত্ত।

আচার্যভাবের কথায়ই বলি। ১৯৫১র ১৮ই এপ্রিল অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় তিনি পদযাত্রা শুরু করে ভূদান আন্দোলনের সূচনা করেন। তখনই তিনি বলেন, ভূদান যজ্ঞ হল অহিংসার প্রয়োগে জীবনের রূপান্তর সাধনের এক পরীক্ষা। তিনি ভূমিদানের উদারভাবে ও প্রীতিবশে ভূমিহীনদের জন্য জমি ছাড়তে আবেদন জানান। সেই সূত্রপাত। সেই বিচারে ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তী বৎসর চলছে। বিনোবাজী এই বৎসর সীমা ১৯৭৬র ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছেন। সারা বৎসর সর্বোদয় আদর্শের ব্যাপক প্রচার চলার আয়োজনও এ উপলক্ষে। এক নজরে গোটা দেশে ভূদান আন্দোলনের ফলাফলটা এই: সারা দেশে ভূদানে ৪২,০৬,৭৫৪ একর জমি পাওয়া গিয়েছে। এর ভিতর ১২,৯৬,২৫৯ একর জমি বিলি সারা। ভূদান-গ্রামদানে বিহার প্রথম। দান মিলেছে ২১,১৭,৪৫৭ একর জমি। গ্রাম দানের সংখ্যা বিহারে ৬০,০৬৫।

পৌণার আশ্রমে আচার্যভাবে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন

সারা দেশে গ্রামদান ১,৬৮,১০৮টি। পশ্চিমবঙ্গে এ আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৫২র ২৬শে মে। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় হটুগঞ্জে এ নিয়ে প্রথম গঠনকর্মী সম্মেলন হয়। শ্রীমতী প্রভানলিনী ভাণ্ডারী তার ৮০ বিঘা জমির এক চতুর্থাংশ ২০ বিঘা জমি ভূদানযজ্ঞে দেন। ভূদান কর্মীদের ভাষায় এরাজ্যে সেই 'ভূদান গঙ্গোত্রীর' উদ্ভব হল।

তা পশ্চিমবঙ্গে ভূদান আন্দোলনের অনেকটা নিঃশব্দ পদচারণা। কোনও দিনই সংবাদে তেমন শিরোনামা পায়নি। কিন্তু একদল নিষ্ঠাবান কর্মী এ নিয়ে 'মেতে' রয়েছেন। মেদিনীপুরের ক'জন কর্মীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তারা বলেছেন হাঁ, 'মেতে থাকা' বলতে পারেন, তবে সদর্থে। হাঁ, তারা আনন্দে রয়েছেন। এই রজতজয়ন্তী বর্ষেই সেদিন তমলুকের নন্দীগ্রাম থানার 'জামবাড়ি' গ্রামদানী পল্লীর তালিকাভুক্ত হয়েছে। জমি বিতরণ শেষ। কিন্তু এই যে পাদপরিক্রমা করছেন, কিছু সাড়া পাচ্ছেন? জামবাড়ি না হয় ব্যতিক্রম। আমার সংশয় কাটে না কিছুতেই। ওদের উত্তর, সব রকম অভিজ্ঞতাই হচ্ছে। ধীরে ধীরে জাগৃতি আসছে। চারুবাবুদের বিশ্বাস, বা ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান এই ভূদানের পথ ছাড়া উপায় নেই। 'সর্বোদয়' পত্রিকায় সুদিন ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী যে বিশদফা কর্মসূচী দিয়েছেন, তার অনেকগুলি সর্বোদয় লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি। যেমন, দরিদ্রকে ভূমিদান, তার জন্য বসতবাড়ি বা কুটির সংস্থান, দাসপ্রথা বিলোপ ইত্যাদি। অর্থাৎ ভাবগত ঐক্য যথেষ্ট। তা কিছু অস্বীকার করি না। অন্য এক প্রবীণ পদযাত্রী বলেন, বুঝেছি, মন খুঁৎ খুঁৎ করছে ভূদানের এই মন্থর গতিতে, তাই না? সঠিক শব্দটা পেয়ে সায় দিই, তাই। তিনি বলেন, সব অভিজ্ঞতাই তো ঘটছে। এই দেখুন না এবারের পদযাত্রায় হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রায় ২৮ বিঘা ধানী জমি পাওয়া গেল। আবার ভিন্ন অভিজ্ঞতাও ঘটে। অনঙ্গ বিজয় বাবুর অভিজ্ঞতা দেখুন। পশ্চিমবঙ্গ সর্বোদয় মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীঅনঙ্গ বিজয় মুখোপাধ্যায় তার জেলা হুগলির গ্রামের অভিজ্ঞতা লিখছেন: পঞ্চম দিন একটি গ্রামে গেলাম। সেখানের গ্রামসভার অধ্যক্ষ ৭২ বছর বয়স, গ্রামের সকলের সঙ্গে পরামর্শ না করে ঝোলা কাঁধ থেকে নামাতে দিলেন না। একজন উৎসাহী যুবক এসে জানালেন, গ্রামের যুবশক্তি কোন অচেনা, অজানা লোকের কাছ থেকে, যে জিনিষ সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, সে নিয়ে জানতে শুনতে চায় না। আপনি পথ দেখুন। অনঙ্গবিজয় বাবু অবশ্য হতাশ হন নি, তাঁর কথা 'দোষ তো নিশ্চয়ই আমার'। ঐ প্রবীণ পদযাত্রীর সঙ্গে কথায় কথায় চলে এসেছি। উনি বলছেন তখন, বিশ্বাসটাই বড় কথা। তাদের কর্মী কম, তাতে কী? এটা তো ঠিক, ভূমি সমস্যার সমাধান না হলে গ্রামে স্থায়ী শান্তি আসবে না। চারুবাবুরও সেই কথা। জমি সমস্যার মিটমাট হবে কী করে? তিনটি পথ আছে। এক, হিংসার পথে। দুই, আইনী পথে। তা জমির মালিকানার ঊর্দ্ধসীমা কত কমানো যায়? কাজেই কতই বা উদ্বৃত্ত জমি মিলবে? তিন, স্বেচ্ছা দানে। নিশ্চয়ই হিংসার পথ নেওয়ার কথা ওঠে না। আইনের পথের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছা দানের পথও নিতেই হবে। সেটাই তো ভূদান। 'হাঁ, সময় লাগবে। সর্বোদয় একটা মানসিক বিপ্লব। বিশ্বাস জাগাতে হবে।' তা ওঁরা বিশ্বাস নিয়েই পদযাত্রায় বেরিয়েছেন। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা অবান্তর, ওঁদের পাগলই বলি বা দুরাশাবাদীই বলি, নিঃসন্দেহে ওঁরা আলাদা জগতের স্বপ্ন দেখছেন, 'জগৎ' সৃষ্টি করে নিতে চাইছেন। মহাত্মা গান্ধীর পদাঙ্ক ধরেই বিনোবাজী এসেছেন, বিনোবাজীকে ঘিরে ওঁরা এসেছেন। হোক কম, ত্যাগে, বিশ্বাসে, নিষ্ঠায় 'জগৎ জয়' করতে বেরিয়েছেন। ওদের মন্ত্র 'জয় জগৎ'। দ্বিধান্বিতদের ওঁরা জবাব দেবেনই। সেই সঙ্কল্পই ওঁদের।

সময়, দুঃসহ সময়

বিদ্যুৎ মল্লিক

"........ওরে নক্ষণ রে, তুই কোথায় গেলি বাপ্, একবার কথা বল। ও নক্ষণ, নক্ষণ রে........"

সেই সকাল থেকে শিয়ালদা স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে বসে লক্ষণের মা ক্রমাগত কেঁদে চলেছে। কারণ আজই ভোরবেলা তার বড় ছেলেটা মারা গেছে। একটা ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে লক্ষণের মৃতদেহটা জড়িয়ে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখেছে। পাশেই লক্ষণের মা পা দুটো ছড়িয়ে বসে অঝোর নয়নে কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ-মুখ সব ফুলে গেছে।

লক্ষণের বাবা পাশে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করা মন্ত্রের মত ক্রমাগত বলে চলেছে, "বাবু, দয়া করে কিছু দিয়ে যান বাবু; ছেলেটা মরে গেছে, গতি করতে হবে।"

ক্রমাগত কথাটা বলতে বলতে তার চোয়াল ভারি হয়ে এসেছে। গলা ধরে গেছে। তবু বলে চলেছে। তার চোখে কিন্তু একটুও জল নেই।

অসংখ্য ট্রেনযাত্রীর ভীড়। কেউ নিতান্ত ব্যস্ততায় হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছে। কেউ ছুটছে, কেউ ধাক্কা খাচ্ছে, একে অন্যের সঙ্গে। তারই মাঝ থেকে কেউ কেউ বিশেষ কৌতুহলে মৃতদেহটার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে কিছুক্ষণ; তারপর যাবার সময় দু'দশ পয়সা করে মৃতদেহটার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে।

একজন বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর হঠাৎ এক সময় ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না তিনি; একটা টাকা মৃতদেহটার ওপর ফেলে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ভিখারী বৌ ছুটে এসে লক্ষণের মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কি যেন বলে চলে গেল। লক্ষণের মা অমনি আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

লক্ষণের বয়েস কতই বা হবে? খুব বেশী হলে বছর চারেক। কিন্তু দেখে মনে হত বছর দেড়েক কি দু'য়েকের বেশী হবে না। হাড় বার করা রোগা ঝিরঝিরে কঙ্কালসার চেহারা; পেটটা বুকের নিচে থেকে হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম বড় হয়ে গেছে। পাটকাঠির মত সরু সরু পা দুটো দেখে মনে হত যেন দুটো সারসের ঠ্যাং। একখানা ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে হলদে রঙের ছোট্ট দুটো পায়ের পাতা বেরিয়ে রয়েছে। ময়লা কাপড়টার ওপর অসংখ্য মাছি ছেঁকে ধরেছে। মাছিগুলো কাপড়ের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। লক্ষণের মায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কোলের মেয়েটা কোথায় ছিল, টলতে টলতে এগিয়ে এসে মৃতদেহটার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তাই দেখে পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক লক্ষণের মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই যে, মেয়েটাকে টেনে নাও না, দেখতে পাচ্ছ না?"

লক্ষণের মা অমনি মেয়েটার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে নিজের কাছে টেনে নিল। মেয়েটা পরম নিশ্চিন্তে মায়ের বুকের দুধ খেতে লাগল।

এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লক্ষণের মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ছেলের কি হয়েছিল?"

লক্ষণের মা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "জানি না মা কি হয়েছিল। কাল সারা দিন সারা রাত বমি করেছে। বাছা আমার চোখ তুলে চায়নে, কিছু খায়নে, দাঁতে বাড়ি দিয়ে চলে গেল। গরীব মানুষ মা, খেতে পাই না, বাছাকে তাই ওষুধ খাওয়াতে পারলুমনি। বাছা আমার রাগ করে চলে গেল। কোথা যাই মা, আমি এখন কি করি, আমার বুকটা যে শূন্য হয়ে গেল মা।"

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বলতে পারলেন না; দশটা পয়সা ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তখনো লক্ষণের মা বসে, আর লক্ষণের বাবা সেই মুখস্ত করা কথাগুলো একটানা বলে চলেছে।

হঠাৎ জায়গাটা একটু ফাঁকা হতে লক্ষণের বাবা লক্ষণের মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এই, আরও জোরে জোরে কাঁদ, নইলে লোকে পয়সা দেবেনি।"

লক্ষণের মা তাই আবার চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

লক্ষণ যখন ভোরবেলা মারা যায় তখন বিশুর মা-ই লক্ষণের বাবাকে মতলবটা দিয়েছিল। বলেছিল,—"ও নকার বাপ্, এই ফাঁকে কিছু কামিয়ে ন্যাও। মরা ছেলেটাকে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে বস, লোকে অনেক পয়সা দেবে।"

বিশুর মায়ের কথাটা লক্ষণের বাপের মনে ধরেছিল। সে তাই তক্ষুনি মরা ছেলেটাকে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে বসে পড়ল।

লক্ষণের মা মুখে কিছু বলেনি, তবে মনে মনে কথাটাকে উপেক্ষা করতেও পারেনি। সেই মুহূর্তে তার চোখের সামনে কতগুলো জ্বালাময় দিনের ছবি ফুটে উঠেছিল। প্রতিদিন প্রতি পল গুণে গুণে এই দুঃসহ ফুটপাথ-জীবন ভোগ করতে করতে, আঘাত সইতে সইতে, আর হোঁচট্ খেতে খেতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এই রুক্ষ মরুময় জীবনের মাঝে যেমন করে হোক একটুখানি সুখের আলো দেখার জন্যে তার মন-প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। সেখানে এই মৃত্যু তার কাছে শত বেদনার হলেও জীবন আর জীবিকার দাবি তার কাছে আরও বড় হয়ে দেখা দিল। তাই এই হিংস্র সময়টা তাকে, তার মাতৃত্বকে, তার দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা-বাৎসল্য, সব কিছুকে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করে নিল। একটা বিরাট শোকের পাহাড় ভেঙে জীবন-ধারণের কুৎসিত দৈত্যটা ওদের সমস্ত মানবিকতার ফুলগুলোকে দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে গেল।

এক সময় লক্ষণের মা ক্লান্ত স্বরে লক্ষণের বাবাকে বলল, "ওগো, এবার চল, বাছাকে নে'যাই। বাছা আমার সেই সকাল থেকে পড়ে রয়েছে।"

লক্ষণের বাবা অমনি রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, "থাম্ না, যাই এই; আর কিছু পয়সা হলেই উঠে পড়ব।"

তারপর দেখতে দেখতে বিকেলও গড়িয়ে গেল। তখনো লক্ষণের বাবার খেয়াল নেই। আজ যেন একটা নেশা তাকে পেয়ে বসেছে—মুঠো মুঠো পয়সার নেশা, এক থালা ভাতের নেশা, অনেকগুলো রুটির নেশা, ছোট মেয়েটার মুখে এক ঝলক হাসির নেশা।

মেয়েটার কথা মনে হতেই লক্ষণের মুখটা মনে পড়ে গেল তার। সে যেন দেখতে পেল, অসংখ্য মানুষের ভিড়ে তার চার বছরের রোগা উলঙ্গ ছেলেটা ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

কথাটা মনে হতেই লক্ষণের বাবার চোখের পাতা দুটো ভিজে এল। এতক্ষণে যেন সে সম্বিত ফিরে পেল।

এমন সময় বিশুর বাবা এসে বলল, "এই শালা, তোর কি আক্কেল রে! এখনো মড়াটাকে এখানে ফেলে রেখেছিস্! তুই কি মানুষ না জানোয়ার? চল্ শিগ্‌গীর, ছেলেটাকে গতি করতে হবে না?" বলে সে লক্ষণের মৃত দেহটা তুলে নিল দু'হাতে।

লক্ষণের বাবা অমনি ছুটে এসে কাপড় সরিয়ে লক্ষণের মৃত মুখটা একবার দেখল। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "ওরে লক্ষণ রে, আমি জানোয়ার হয়ে গেছি; আমি আর মানুষ নেই রে, মানুষ নেই......।" বলতে বলতে বিশুর বাবার কোমরটা জড়িয়ে ধরে সে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল।

লক্ষণের মা ইতিমধ্যে পয়সাগুলো সব কুড়িয়ে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। এবার সে এগিয়ে এসে লক্ষণের বাবার হাতটা ধরে তুলে বলল, "ওগো আর কেঁদে কি করবে? চল, বাছাকে এবার নে'যাই।"

ওরা দু'জনে বিশুর বাবার পেছন পেছন আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে লক্ষণের মা যেন দেখতে পেল: লক্ষণ ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, "মাগো, তুই আমাকে সকাল থেকে এমনি করে কষ্ট দিলি?"

মুহূর্তের মধ্যে লক্ষণের মায়ের সমস্ত শোকের বাঁধন যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ল।

লক্ষণের বাবা তাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। সে তখন দেখছে, লক্ষণ প্রচণ্ড ক্ষোভে তাকে মুঠো মুঠো পয়সা ছুঁড়ে মারছে।

মহিলাকর্মীদের বাসস্থানের জন্য ১৯৭৬–৭৭ সালে দেশে ৩৬টি নতুন হস্টেল তৈরী হবে। এই ৩৬টি নতুন হস্টেল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত মোট মহিলা হস্টেলের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৬টি। এই সব নতুন হস্টেলে আড়াই হাজারেরও বেশী কর্মরত মহিলা বসবাস করতে পারবেন। হস্টেলগুলি নির্মাণে ১.১৯ কোটি টাকার সাহায্য দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। প্রস্তাবিত হস্টেলগুলির একটি কলকাতায় হবে।

বছর শেষ হওয়ার ছ দিন আগে ১৯৭৫–৭৬ সালে নাইট্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রী শ্রী পি. সি. শেঠি সার শিল্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সার কারখানার সর্বস্তরের কর্মীদলকে এই লক্ষ্য পূরণে সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি তার অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বানে সবাই মিলে সাড়া দেওয়াতেই এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়েছে।

নতুন বসত

মানিক সরকার

ঐ যে বাড়িটা, ওটা আমার ভাইয়ের। ওর পরের বাড়িটাই আমার ছিল। ধুলো ভরা গাঁয়ের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তারাপদ বললেন, এই ক'বছর আগে পঞ্চাশ টাকায় ভিটেটা বিক্রি করেছি।

তিনি চেয়ে রইলেন ভিটেটার দিকে। কত স্মৃতি জড়ান ওই ভিটে। ওখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল, একে একে আটটি ছেলেমেয়ে ওই ভিটেতেই প্রথম পৃথিবীর মুখ দেখেছিল। আগে একান্নবর্তী পরিবার ছিল। পরে তা ভাগাভাগি হয়—দু' ভায়ের মধ্যে ভাগাভাগি।

ফণিভূষণের ছেলে তারাপদ আবার বললেন, 'ভিটে বিক্রির ক'বছর আগে চাষের জমিটাও হাত ছাড়া হয়। ধার কর্জে আড়াই শ টাকায় দু'বিঘে দু' কাঠা জমি বিক্রি হয়।'

কে যেন প্রশ্ন করলেন—'এত সস্তায় বিক্রি করলেন কেন?' তারাপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, বোকার হাসি হেসে ওঠেন। তারপর উত্তর দিলেন, 'না বেচে উপায় ছিল না।' নীরবে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন 'পেটের বড় তো কিছু নয়।'

ছোট কথা। বড় মূল্যবান কথা। জীবনের জন্যই জীবিকা। জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে জীবন রক্ষার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। তারাপদ আর কী করেছেন? পৈত্রিক ভিটেটাই বিক্রি করেছেন।

এ বিক্রির পেছনে অনেক অব্যক্ত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস বড়ই করুণ। পরপর ক'বছর ফলন হল না, কাজও কিছু পাওয়া গেল না। আরম্ভ হল মাঝে মাঝে অর্ধাহার, পরে ঘরে এল অনাহার। অনাহারের যন্ত্রণার মুখেই ধার আরম্ভ হল, ধার থেকে এল হস্তান্তর, হস্তান্তর থেকে সাফ্ কবুলা।

এসব কথা তারাপদ বলতে চান না, কপালকে দায়ি করেন। 'ভাগ্যে নেই, তাই রইল না,' বলে সান্ত্বনা পেতে চান।

তারাপদ বললেন, 'সব কিছু বেচেবুচে বর্ধমানে চলে গেলাম। কালনায় উঠলাম, বারুইপাড়ায় ক'বছর রইলাম। কিন্তু সেখানেও বেশী দিন থাকতে পারলাম না। কে রাখবে আমাদের?'

গ্রাম বাংলায় তারাপদর মত এমনি ভেসে বেড়ান পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। এরা জমিচ্যুত, বাস্তুচ্যুত, কৃষি বাংলার মানুষ। প্রথম প্রথম এঁরা নিজের গ্রামেই থাকতেন। ওই সেই পেটের দায়। পেটের দায়ে অন্যগ্রামে যেতেন। ভাবতেন ও গ্রামে গেলে কিছু একটা হবে। কিন্তু গিয়ে দেখতেন, ওই গ্রামেরও একই হাল। আজকাল ওঁরা দেখছেন বহু পরিবারের তারাও একটি।

এই তো গড়ে ওঠা এই পল্লীতে প্রায় তেত্রিশটি গ্রামের বাস্তুচ্যুত মানুষ ভেসে ভেসে এসে জড়ো হয়েছেন। এরমধ্যে ঢাকা, ফরিদপুর, যশোরের পরিবারও আছেন। দ্বিখণ্ডিত বাংলার নীরব যন্ত্রণা সীমান্ত জেলাগুলিতে গেলে অতি সহজেই ধরা পড়ে। যন্ত্রণাই সব নয়। মিলে মিশে নতুন সম্পর্ক পাতিয়ে এক হয়ে থাকারও একটা তৃপ্তি, একটা আনন্দ আছে। সেই আনন্দের ছাপও এখানে দেখেছি।

ভেসে বেড়ানর এক পীড়াদায়ক মানসিকতা আছে। যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, ভেসে বেড়ান তাঁদের মধ্যে সমাজ বন্ধনের প্রাথমিক ভিৎ যে পরিবার, সেই পরিবারের পারিবারিক বন্ধন বড় শিথিল হয়ে পড়ে।

তারাপদর ছোট ছেলে দেখছে তারা ভেসেই বেড়াচ্ছে—কখনও বর্ধমানে, কখনও বা কালনায়, কখনও বা শান্তিপুরে। তাদের না আছে বন্ধুবান্ধব, না আছে আত্মীয়। এ দিক সেদিক ঘুরে বেড়ান তার অভ্যাস হয়ে উঠেছে। এর উপর বড় হয়ে যদি কাজ না পায় তবে ওর যে ভবিষ্যত কী হবে। ছিন্নমূলের ছন্নছাড়া জীবনের ভয়াবহতা শুধু পারিবারিক সমস্যা নয়, দেশের সমস্যা, সমাজের সমস্যা।

সমস্যাটি গভীর। ধনবিত্ত বৈষম্যের বহুকালের পুঞ্জিভূত পাপ একে গভীরতর করে তুলেছে। সেই ব্রিটিশ আসার পর থেকেই আমাদের গ্রাম দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করে।

গ্রামের কৃষি সংস্কারের মৌলিক কাজ ব্রিটিশ শাসনে হয়নি, বরংচ স্বাভাবিক সংস্কারের যে দেশীয়-রীতি ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারই ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে। গ্রামের অবক্ষয় ব্রিটিশ শাসনের অবশেষ হিসাবেই গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবশ্য এ অবক্ষয়ের সঙ্গে দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তিরও অবদান আছে।

স্বাধীনতার পর গ্রামে কোন সামন্ত-নেই, কিন্তু তার চেলাচামুণ্ডারা আছে। একজন সামন্তের স্থলে হয়তো দশজন চেলা-চামুণ্ডা উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সেই দশজনের প্রতাপ কম নয়। প্রতিপত্তি তো আছেই।

সমস্যা জটিল হলেও সমাধান করতেই হবে। তারই জন্যে কুড়ি দফা কর্মসূচী ঘোষণা হয়েছে। কুড়ি দফার রূপায়ণ শুধু জমি পাওয়ার মধ্যে সীমিত নয়।

হরিপুরে গড়ে ওঠা নতুন পল্লীতে নতুন সংসার

নতুন বসত হরিপুর সামনের দিকে পা ফেলতে চাইছে, পল্লীটিকে সাজানোর আয়োজন চলছে। 'একটা সমবায় করে কিছু করা যায় কিনা' তা নিয়ে ওরা ভাবনা-চিন্তা করছেন। ভাবনা চিন্তা করছেন পরিবার পরিকল্পনা নিয়েও।

নতুন কৃষি ব্যবস্থায় গ্রামকে সাজিয়ে তোলার এ এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

রাস্তাটির এক পাশে তারাপদর ঐ পৈতৃক ভিটে অপর পাশে হরিপুরের খাস জমিতে গড়ে ওঠা নতুন পল্লী। এখন এই নতুন পল্লীরই একজন অধিবাসী তারাপদ দাস। বাস্তহীন তারাপদ বাস্তর জন্য সরকারী জমি পেয়ে ওই পল্লীতে ঘর তুলেছেন।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার হরিপুর মৌজায় রাজ্য সরকারের খাস জমিতে তারাপদর মতো ৯৫ টি পরিবার বসেছে। প্রতিটি পরিবার বাস্তজমির জন্য রাজ্য সরকার থেকে তিনশতক করে জমি পেয়েছেন। ৯৫ টি পরিবারের ধরতে গেলে একটি নতুন গ্রামই গড়ে তোলা হয়েছে। পল্লীটির মাঝে দু'টো ১২ ফুট রাস্তা গেছে। রাস্তার দু' পাশে নতুন ঘরগুলো মাথা তুলে দাড়িয়েছে। পল্লীর মাঝখানে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি ক্লাব ঘরের জন্য স্থান রাখা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষারও একটি কেন্দ্র হবে। এখানে এ সব কাজ ওঁরা নিজেরাই করছেন। ৯৫ টি পরিবারের মোট মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৭৮ জন, এরমধ্যে শিশুর সংখ্যা ৮৮ জনের মতো। তারাপদর পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৮ জন। নেহাৎ ছোট পরিবার নয়। ৮ জনের এই পরিবারে আয় করেন দু'জন—তিনি নিজে এবং ছেলে সুকুমার। ওঁরা তাঁতে প্রাত্যহিক মজুরীতে বোনার কাজ করেন। দু'জনে ৮ টাকার মতো পান। তারাপদর স্ত্রী অবসর সময়ে সূতো কাটার কাজ করেন, তাতেও কিছু আয় হয়।

তাঁতের কাজ, মাছ ধরা, কাঠের কাজ, মাঠের কাজ, জনমজুরী, পথে পথে ফেরি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার নর-নারী এখানে আছেন। জমি পেয়ে ঘর তোলাই নয়, ইতিমধ্যে পল্লী উন্নয়নের জন্য একটা সমিতি তৈরী করেছেন। উন্নয়নের সমস্যাও আছে। প্রতিটি পরিবার 'গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের' রূপায়ণে বিনা পয়সায় বসত জমি ও ঘর তোলার জন্য ১৭৫ টাকা করে পেয়েছেন—ঘরও উঠেছে। কিন্তু তাকে আরও মজবুত করার প্রয়োজন আছে। আছে ঝড় জলের হাত থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা। ওরা নিজেরা শ্রম দিতে পারেন, কিন্তু অর্থ দেবার সামর্থ্য ওঁদের নেই। সকলেই দিন আনেন, দিন খান।

তারাপদ তার নতুন ঘরের সামনে দাড়িয়ে বললেন, 'বাঁশের খুঁটি দিয়ে মজবুত না করতে পারলে, কমপক্ষে ভাল ছনের ছাউনী না দিলে আগামী বর্ষায় এ ঘর রাখা যাবেনা।'

কুঁড়েঘর উঠেছে, তাকে এখন ভাল করবার, সুন্দর করবার প্রশ্ন ওদের মধ্যে এসেছে। উন্নয়নের দর্শনই এটা। একটা হলে সামনের আর একটির দিকে সে যেতে চায়।

চিঠিপত্র

চিঠি
চিঠি
চিঠি
চিঠি

মহাশয়,

আমি "ধনধান্যে" পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক। অনেকগুলি গুণসম্পন্ন ভাল রচনা আপনার পত্রিকা মারফৎ পাঠকবর্গকে আপনি উপহার দিয়ে থাকেন, তজ্জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ

১৫ই ডিসেম্বর '৭৫ 'সংখ্যাটি পড়লাম; সমস্ত রচনা সুন্দর ও সাবলীল। জ্যোতির্ময় দাশের লেখা "জাতিস্মর কথা" খুবই ভাল লেগেছে আমার। এই ধরণের বিজ্ঞান ভিত্তিক আরো কিছু লেখার ব্যবস্থা রাখবেন।

সবশেষে জানাই আমার অনুরোধ, "খেলাধুলা" এবং "প্রশ্নোত্তর" সম্পর্কে আরো দু'টি বিভাগ রাখলে খুব ভাল হয়।

দিবাকর মণ্ডল,
গ্রামদিঘী, মুর্শিদাবাদ

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত 'ধনধান্যে' পত্রিকাটি মাঝে-মাঝে পড়বার সুযোগ হয়। লেখা-রেখা এবং সম্পাদনার আভিজাত্যে মুগ্ধ হতে হয়। চমৎকার নয়নসুখকর অলংকরণ, প্রয়োজনীয় রচনাসম্ভার পত্রিকার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

পলাশ মিত্র
কলকাতা-২৬

রাজ্যে রাজ্যে

গুজরাট

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

ভারতের মানচিত্রে পৃথক রাজ্য-হিসাবে গুজরাটের আবির্ভাব খুব বেশীদিন নয়, মাত্র ১৯৬০ সালের মে মাসে। কিন্তু এরই মধ্যে বর্তমান ভারতের শিল্প, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল রাজ্যসমূহের মধ্যে গুজরাট নিজের স্থানটি পাকা করে নিয়েছে। গুজরাট কৃষিপ্রধান রাজ্য নয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়াতে গুজরাট চিরকালই খাদ্যে ঘাটতি রাজ্য হিসাবে পরিচিত। ফলে রাজ্যের উন্নয়নে শিল্পকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন গুজরাটবাসীরা। অবশ্য তাদের এই উন্নয়ন প্রয়াসের পটভূমিতে রয়েছে দেশের অমূল্য সম্পদ তেল ও গ্যাস এবং কেন্দ্রের সাহায্য।

গুজরাট রাজ্যের বিস্তৃতি বাহাত্তর হাজার একশ-সাইত্রিশ বর্গমাইল। গুজরাটের গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ও সমৃদ্ধশালী বন্দর আকৃষ্ট করেছে প্রতিটি দেশী-বিদেশী শাসকের ইতিহাসের সেই আদিকাল থেকে। পশ্চিমদিকে আরবসাগর, উত্তর ও পূর্বে ইতিহাসখ্যাত রাজস্থান, দক্ষিণে শিবাজীর স্মৃতিজড়িত মহারাষ্ট্র আর দক্ষিণপূর্বে মধ্যপ্রদেশ বেষ্টিত গুজরাটের সমৃদ্ধির খ্যাতি এতই বহুধা বিস্তৃত ছিল যে, গুজরাট বার বার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছে দেশী এবং বিদেশী শক্তির দ্বারা। মোগল থেকে বৃটিশ সকলেই চেয়েছে গুজরাটকে আপন অধীনে এনে পশ্চিম উপকূলে নিজের রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করতে, গুজরাটের বন্দরগুলি নিজেদের হাতে এনে দেশ বিদেশের সাথে গুজরাটের বাণিজ্যিক লেনদেন করায়ত্ত করতে। এত অত্যাচার, এত শোষণও কিন্তু গুজরাট-বাসীদের অবদমিত করে রাখতে পারেনি। ধাপে ধাপে তারা নিজেদের দেশকে অগ্রসর করেছে শিল্প সমৃদ্ধির পথে।

গুজরাটের অমূল্য তৈল সম্পদের আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশীদিন আগে নয়। গুজরাটের আধুনিক শিল্পের বিকাশ বস্ত্রশিল্পের সাথে—১৮৫৯ সালে। বস্ত্র-শিল্পে ঐতিহ্যমণ্ডিত গুজরাটের আমেদাবাদ, বরোদা ও অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সুতীবস্ত্র কারখানা ও কাপড়কল তৈরীর যন্ত্রপাতির কারখানা। কিন্তু বর্তমান দশকে তামিলনাড় সহ অন্যান্য রাজ্যে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটায় গুজরাটকে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কাঁচামালের অপ্রাচুর্যও শিল্পে আধুনিকী-করণের অভাবে অনেক কাপড়কলেই উৎপাদন কমে যায় ও এগুলি রুগ্নশিল্পের আওতাভুক্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রুগ্ন-শিল্পকলগুলি জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন-এর গুজরাটস্থিত শাখাটি ১৯৭৪ সালে গুজরাটের এগারটি কাপড়কলের মালিকানা ও পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এছাড়া ১৯৭৪-৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়-ভিত্তিতে ২৫,০০০ টাকু বিশিষ্ট সুতো তৈরীর কল স্থাপনের ১১ টি শিল্প লাইসেন্স অনুমোদন করেন। এরফলে রাজ্যের প্রতিটি অনুন্নত জেলায় একটি করে সুতোকল স্থাপিত হবে এবং প্রতিটি সমবায় প্রতিষ্ঠানে হস্ত ও তাঁতচালিত শিল্পকে সাহায্য করার জন্য বরোদাতে 'পেট্রোফিলস্ কো-অপারেটিভ লিমিটেড' নামে একটি পৃথক সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এর কাজ হল হস্ত ও তাঁত চালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কৃত্রিম সুতো সংরক্ষণ করা।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাস অবধি কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাটে তাদের অধি-গৃহীত শিল্প সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন মোট ২২০ কোটি টাকা। এর অধিকাংশই অবশ্য বরাদ্দ ছিল রাজ্যের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে ও উৎপাদনে। গুজরাটে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার যে কটি শিল্প-সংস্থা স্থাপন বা অধিগ্রহণ করেছেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বরোদার জহর নগরের 'দি ইণ্ডিয়ান পেট্রো-ক্যামিক্যালস্ কর্পোরেশন', তেল ও গ্যাস কমিশনের বিভিন্ন প্রশাখাগুলি, বরোদার নিকটবর্তী কয়ালীর 'দি ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারী)', 'দি হিন্দুস্থান সল্টস্ লিমিটেড', 'দি এলকুক অ্যাসডাউন এণ্ড দি মডার্ণ বেকারীস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড'। এছাড়াও রাজ্যে পাঁচটি পাইপলাইন আছে। সেগুলি হল—

(১) কাম্বে-ধুভারাম গ্যাস লাইন
(২) আংকলেশ্বর—উটারান গ্যাসলাইন,
(৩) আমেদাবাদ—বরোদা গ্যাসলাইন,
(৪) বরোদা ইণ্ডাষ্ট্রীজ গ্যাস লাইন ও
(৫) আংকলেশ্বর—কয়ালি ক্রুড অয়েল পাইপলাইন।

এই পাঁচটি পাইপলাইনই তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের অধীনে। এছাড়া ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পো-রেশন বরোদাতে একটি প্ল্যাণ্ট স্থাপন করেছেন তেল পরিশোধন এবং শহরের তেল ও গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য।

ইণ্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস্ কর্পো-রেশনের কমপ্লেক্সটি হল গুজরাটের শিল্প-গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এটি একই সাথে রকমারী পেট্রোলিয়াম-জাত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম, যেগুলি জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের চাহিদাপূরণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ভারতে পেট্রোকেমিক্যালস্—এর প্রয়োজন বিবিধ। সামান্য শার্টের বোতাম থেকে আরম্ভ করে জটিল আকাশী পরিবহণ ব্যবস্থায় এর ব্যবহার হয়। তাছাড়া প্যাকেজিং, তাপ পরিবহণে, কৃত্রিম সুতোতে, বাল্বের

গাছগাছালি

সকলের বন্ধু

এদের যত্ন করুন

গাছপালা

ভূমি ক্ষয় □ বন্যা □ খরা নিবারণ করে

শস্য রক্ষা করে —

দূষিত বায়ু শুদ্ধ করে —

বনরাজি হল বন্যপ্রাণীর আশ্রয় □ প্রকৃতির সৌন্দর্য □ দর্শকের আনন্দ —

মানুষের আহার □ পশুপাখীর খাদ্য □ ইন্ধন □ কাঠ শিল্পের উপকরণ

সবই এদের দান —

এরই স্মরণে বিশ্ব অরণ্য দিবস উদ্‌যাপন

আজই একটি কি দুটি চারা রোপন করুন

davp 79/745

ফিলামেণ্টে, ফিল্মে, গাড়ীর যন্ত্রপাতিতে, রেডিওর ট্রান্সমিটারে, টেলিভিসনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশে, পাইপ ও ফিটিংসে, বিবিধ জাল তৈরীতে কৃত্রিম পশম, টায়ার ও জুতো তৈরীতে এবং গৃহস্থালী দ্রব্যে এর বিবিধ ব্যবহার হয়।

তবে পেট্রোকেমিক্যালস্-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হয় কৃষি ও জল সরবরাহে, ঔষুধ তৈরীতে, শক্তি উৎপাদনে, পরিবহনে, বাড়ী ও জামাকাপড় তৈরীতে এবং প্রতিরক্ষায়।

ভারতীয় পেট্রোকেমিক্যালস্ কর্পোরেশনের হাতে এখন অনেকগুলি প্রকল্প আছে। এরমধ্যে এরোম্যাটিক প্রকল্পটির ভিত্তিস্থাপন হয় ১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে। এতে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। নিকটবর্তী রিফাইনারী থেকে যে সব ন্যাপথা পাওয়া যাবে তা থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে জৈব রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হবে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত ডি. এম. টি. প্ল্যান্টটিতে ১৯৭৩-এ উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং এটি বছরে ২৪,০০০ হাজার টন ডাইমেথিল টেরেপথালেট উৎপাদনে সক্ষম। এছাড়া অন্য দুটি প্লান্টে ও-জাইলেন এবং মিশ্র ডি-জাইলেন উৎপাদিত হয়।

অলেফিন প্রকল্প যেটি ন্যাপথা ক্র্যাকার প্রকল্প নামেই সমধিক জনপ্রিয়—তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৭২-এ। এর জন্য খরচ হয় ৩১.৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটি এবছরেই চালু হবে বলে মনে হয়। ১৭ কোটি টাকার একরিলোনিট্রাইল প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ ১৯৭৫-এর ৫ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছে। ১৬ কোটি টাকার কৃত্রিম রাবার তৈরীর প্রকল্পটি নির্মাণের পথে। ন্যাপথা ক্রাকার প্রকল্পটির সাথেই এই দুই প্লান্টেও উৎপাদন শুরু হবে বলে মনে হয়।

এছাড়া পেট্রোকেমিক্যালস্ কমপ্লেক্সটির অধীনে কতকগুলি প্রকল্প চালু থাকবে। এরমধ্যে ২৪ কোটি টাকার এক্রিলিক ফাইবার প্রজেক্টটির কাজ ১৯৭৩-এর আগেই শুরু হয়েছে। ১৩ কোটি টাকার 'ডিটার জেণ্ট এলকাইলেট' প্রজেক্টটির নির্মাণ কাজ চলছে ও ৯ কোটি টাকার 'এথিলিন গ্লাইকোল প্রজেক্ট' ও ১৯ কোটি টাকার 'পলিপ্রপাইলিন প্রজেক্ট'টি ১৯৭৪-এর ১৪ ই জুন কাজ শুরু করেছে।

কয়ালিতে 'গুজরাট রিফাইনারী'র তেল পরিশোধনের কাজ শুরু হয় ১৯৬৫-র অক্টোবরে। এর তেল পরিশোধনের ক্ষমতা হল ১০ লক্ষ টন, এর দ্বিতীয় ইউনিটটি কাজ শুরু করে ১৯৬৬তে, এর পরিশোধনের ক্ষমতাও প্রথমটির সমপরিমাণ। এর 'ক্যাটালিটিক রিফাইনারী'র ইউনিটটি উৎপাদন শুরু করে ১৯৬৬তে। ১০ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় 'এটমোসস্পেরিক ইউনিটটি' (নং ৩) স্থাপিত হয় ১৯৬৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। ঐ একই সময় এটি পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু করে। ১৯৬৭ সালে প্ল্যান্টটির পরিচালনায় স্থিতাবস্থা আসে।

এই শোধনাগারটির জন্য ৯.৬১ কোটি টাকার বৈদেশিকমুদ্রা সহ মোট ২৬.১৫ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করা হয়।

বেনজিন ও টলুইন উৎপাদনের জন্য যে 'ইউডেক্স প্ল্যান্টটি' ১৯৬৮ সালে তৈরী হয় সেটি ১৯৬৯ সালের জানুয়ারীতে নিয়মিতভাবে উৎপাদন শুরু করে। এটির জন্য খরচ হয় ২.৪২ কোটি টাকা, তার মধ্যে ১.২৫ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক মুদ্রা।

এই শোধনাগারটি বছরে ৩,০০০,০০০ টন অশোধিত তেল শোধনের ক্ষমতাসহ নির্মিত হলেও ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩.৫৪ মিলিয়ন টন তেল পরিশোধন করে। কিন্তু বর্তমানে এটির পরিশোধন ক্ষমতা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪,৩০০,০০০ টন।

এদিকে কয়ালি রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা ৩,০০০,০০০ টন আরও বাড়িয়ে যাতে ৭,৩০০,০০০ টন করা যায় তারজন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন সরকারের 'এঞ্জিনীয়ার্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড'-এর কর্মীরা। আশা করা যায় ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসেই সম্প্রসারণের কাজ শেষ হবে। সম্প্রসারণের মোট খরচ ধরা হয়েছে ২৮.০৮ কোটি টাকা। সম্প্রসারিত হলে রিফাইনারীটি শুধুমাত্র গুজরাটের অপরিশোধিত খনিজ তেলই নয় আমদানীকৃত অশোধিত তেলও শোধন করতে সমর্থ হবে।

গুজরাটের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হল লবণ। এই অমূল্য সম্পদকে কাজে লাগাতে আমেদাবাদ জেলার খারাগোদাতে তৈরী হয়েছে হিন্দুস্থান সলটস্ লিমিটেড নামে প্রতিষ্ঠানটি। এটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে খারাগোদা ও হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডির লবণ সম্পদকে। খারাগোদাতে অবশ্য শুধু সাধারণ লবণ উৎপন্ন হয়। রাজস্থানের সম্বরে 'সম্বর সল্টস্ লিমিটেড্' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে সেটি গুজরাটের 'হিন্দুস্থান সল্টস্ লিমিটেড্'-এরই প্রশাখা।

১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত খারাগোদাতে সাধারণ লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বেশীই ছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে অতিবৃষ্টির ফলে উৎপাদন কমে যায়। ১৯৭২-৭৩-এ উৎপাদন ছিল ৯৭,০০০ টন। এর থেকে সরকারের মোট কর আদায় হয় ৩৮.৪৮ লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানটির হাতে এখন তিনটি অনুমোদিত প্রকল্প আছে—সম্বরে সোডিয়াম সালফেট এবং লবণ শোধন প্রকল্প এবং খারাগোদার বোমাইন প্রকল্প।

হিন্দুস্থান সল্টস্ লিমিটেড্ এখন দেশের চাহিদাপূরণ করেও নেপালের সল্ট ট্রেডিং কর্পোরেশনের সাথে নেপালে লবণ রপ্তানী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ও লবণ রপ্তানী শুরু করেছে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বরোদার নিকটবর্তী

হরনীতে একটি কাগজকল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং কালোলে প্রধানমন্ত্রী—দি ইণ্ডিয়ান ফার্মারস্ ফার্টিলাইসার কো-অপারেটিভের একটি সার প্রকল্পের ভিত্তিস্থাপন করেছেন ১৯৭৪-এ।

শুধুমাত্র শিল্পক্ষেত্রেই নয় গুজরাটের গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার জন্য দি রুর‍্যাল ইলেক্ট্রিফিকেশান কর্পোরেশন ১.৬০ কোটি টাকার ৯টি বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এছাড়া মেসানা, বরোদা ও বনসকন্ট জেলায় বিদ্যুৎ পরিবহণ ও বিতরণে অপচয় কমাবার জন্য ৯১.৩৩ কোটি টাকার অন্য পাঁচটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। বাকী প্রকল্পগুলিতে হরিজন বস্তীগুলিতে বিদ্যুত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে।

গোবর গ্যাস প্লান্ট স্থাপনে গুজরাট ভারতের অগ্রণী রাজ্য। ভারত সরকারের নীতি অনুসারে এই প্লান্ট স্থাপনে শতকরা ২৫ ভাগ ভরতুকী দেওয়া হয়। এপর্যন্ত এজাতীয় ৩৪০৪ টি প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে এবং ১৯৭৫-৭৬ আরও ২০০০ টি স্থাপিত হবে।

১৯৭৬-এর ১২ মার্চ গুজরাটে জনতা ফ্রন্ট সরকার পদত্যাগ করায় গুজরাট রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে আসে। ফলে রাজ্যের বাজেট ২৪ মার্চ লোকসভায় পেশ করা হয়। বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে তা কেবলমাত্র রাজ্যের উন্নয়নে ৩২.১৭ কোটি টাকার স্বাভাবিক কেন্দ্রীয় সাহায্যই নয়, এটা হল বাজারে ঋণ করার পদক্ষেপে এক সহায়তা। এতে বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে সাহায্যের জন্য আগামী ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাড়াও উপজাতীয় কল্যাণের জন্য ৩ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্যও দেওয়া হয়।

বাজেটে পরবর্তী বছরের জন্য ১৯৩.২৫ কোটি টাকার খরচ ধরা হয়। এরমধ্যে দুই তৃতীয়াংশ (প্রায় ১২৯.৪৩ কোটি টাকা) বিশদফা কর্মসূচী রূপায়ণ প্রকল্পে ব্যয় হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাটের পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নতিকল্পেও সাহায্য করছেন। ভিরামগাম থেকে আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট, বালাসার হয়ে বম্বে পর্যন্ত যে ব্রডগেজ রেললাইনটি রয়েছে সেটির বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ লাইনটির বৈদ্যুতিকীকরণের ফলে রাজ্যের শিল্পাঞ্চল সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপ্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। সেটি হল রাজ্যের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে অপ্রশস্ত রেলপথটিকে প্রশস্ত করা। এর ফলে এই অঞ্চলের সাথে রাজ্যের অন্য অঞ্চল এবং ভারতের বহু জায়গার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে ও ভিরামগাম বদলের অসুবিধা দূর হবে।

গুজরাটের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রের এই বিপুল ও নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যে এবং অনুকূল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গুজরাট খুব শীঘ্রই এক বিরাট শিল্পোন্নয়নের স্বপ্নকে সার্থক ও সফল করে তুলতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

গত কয়েক মাসে বহু পশ্চিমী দেশ ও সরকার আমাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরো বেশী সমবেদনা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছে।

সোভিয়েত ও অন্যান্য পূর্ব ইওরোপের দেশ এবং জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি আমাদের চিরকাল বন্ধুত্বের সম্পর্কসূত্র বজায় রেখে চলেছে।

আমরা সব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু আমাদের জনগণের আত্মবিশ্বাস এবং ঐক্যবোধই শেষ পর্যন্ত আমাদের সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। নিজেদের শক্তি এবং প্রয়াসের মাধ্যমেই কেবল আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে আমরা জয়ী হতে পারবো।

গণতন্ত্র আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় সর্বশ্রেণীর জনগণের এরকম বিপুলভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। আর এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে একটি দেশের প্রকৃত শক্তি। শ্রী অরবিন্দ সেই ১৯০৮ সালে যা বলেছিলেন তা আজকের দিনেও প্রযোজ্য,—"কোন দেশ যদি আধুনিক যুগসংগ্রামে বেঁচে থাকতে চায়, যদি তার স্বরাজ অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে চায় তাহলে সেই দেশকে জাগাতে হবে তার জনগণকে। জাতীয় জীবন সম্পর্কে তাকে সজাগ করে তুলতে হবে যাতে করে সেই দেশের প্রতিটি মানুষই ভাবতে পারে যে জাতি বাঁচলে সে বাঁচবে, জাতির উন্নতি হলে তারও সমৃদ্ধি আসবে এবং জাতি স্বাধীন থাকলে সেও স্বাধীন থাকবে।" ভারতে আমরা এটাই করতে চেষ্টা করছি। একাজে আমরা কতটা সক্ষম হবো তা নির্ভর করবে লক্ষলক্ষ দেশবাসীর ওপর, আমাদের গণতন্ত্রকে তারা কতটা শক্তিশালী করতে চান তার ওপর। এ ব্যাপারে বর্তমান আলোচনা-চক্রটি নতুন ধ্যান ধারণার আলোকসম্পাত করে পথনির্দেশ দেবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

(সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ" বিষয়ক আলোচনা-চক্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের ভাষান্তর)

পশ্চাতে রেখেছ যারে

অমিতাভ চক্রবর্তী

আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা বলছি। সকালে প্রাতরাশ করার সময় খবরের কাগজে চোখে পড়ল একটি সংবাদ শিরোনাম। চমকে ওঠার মত। গান্ধী শতবর্ষে পুনর্বার গান্ধীহত্যা! খবরটি হল: এক হরিজন বালক উচ্চবর্ণের জন্যে সংরক্ষিত নলকূপ থেকে জলগ্রহণ করায় ক্ষিপ্ত জনতা বালকটিকে হত্যা করেছে।

খবরটি পড়ে স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবার পর দুটি জিনিস চোখে পড়ল। প্রথমত, সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার স্বল্প প্রয়োগ-ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়ত হরিজন সমাজের মধ্যেই স্বজাতিচৈতন্যের অভাব। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় কারণটি বেশী ভাবিয়ে তুলেছিল সেদিন আমাকে। আজ ১৯৭৬ সালের মে'মাসে এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সেই সমস্যাটি নতুন করে দেখছি।

জাতীয় দুর্যোগের মোকাবিলা করতে যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা হ'ল গত ২৬শে জুন সেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উৎসাহে, নির্দেশে এবং দূরদর্শিতায় জাতির বিশদফা কর্মসূচীর রূপায়ণে অনুন্নত ও দুর্বল শ্রেণীর বিকাশ একটি বিশেষ স্থান দখল করল। এই কর্মসূচীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'ল অসাম্য দূরীকরণ-অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে। অর্থনীতি, সমাজনীতির যে ঠাসবুনিনিতে তৈরী আমাদের জীবন সেই জীবনের আবহাওয়ায় ভরে রয়েছে অসাম্য। ভারতীয় সমাজে Social stratification-এর এক চরম এবং ভয়াবহ রূপ হ'ল Caste system বা বর্ণাশ্রম নীতি বা কালক্রমে সমাজে বর্ণবৈষম্যের আকার ধারণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানে বলে caste অর্থাৎ জাতি একই বর্ণের অন্তর্গত ভিন্ন গোত্রীয়, একই বৃত্তি অবলম্বী গোষ্ঠী। এবং এই ধরণের নানান গোষ্ঠী যখন পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব এবং আনুগত্যের বন্ধনে বাঁধা পড়ে তখনই সৃষ্টি হয় বর্ণাশ্রম। হিন্দু ধর্মের আচার বা রীতি-নীতি অনুযায়ী চতুর্বর্ণের বাইরে যে শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল সম্ভবত কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে তারই ফলশ্রুতি দেখা গেল আধুনিক ভারতবর্ষে তপশীলি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এরা অনুন্নত কেন?

অবহেলিত অনুন্নত শ্রেণীর কথা বলতে গেলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রায় ১২ কোটি মানুষ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল এরা যাবতীয় সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুত। যার ফলে অর্থনৈতিক, সমাজ-নৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনের প্রবেশা-ধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাংবিধানিক সুযোগ সৃষ্টি করে এই বঞ্চনার জাল থেকে এদের উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এদের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে এদের চাকুরী, শিক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার কথা নতুন করে ভেবে দেখার সুযোগ এসেছে। শিক্ষা যেহেতু সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র সেহেতু শিক্ষাদানের কর্মসূচীতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে প্রাক্-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রাপকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষে এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ম্যাট্রিকোত্তর স্কলারশিপ প্রাপকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৪ হাজারের কিছু বেশী। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃত্তি খাতে মোট টাকার অংক রাখা হয়েছে ১৮৭ কোটি। সারা ভারতে ৪৫০০টি সংরক্ষিত হোস্টেল গড়ে তোলা হয়েছে। কেবলমাত্র স্কলারশীপই নয় নেফার অরণ্যে বা বস্তার-ছোটনাগপুরে অথবা সমুদ্র তীরবর্তী অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে পৌঁছুচ্ছে শিক্ষার আলো। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে তপশীলি শ্রেণীর মধ্যে ৪ শতাংশ এবং আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে ৩ শতাংশ নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছে। শিক্ষিত মানুষ দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজে সুযোগ পাচ্ছে চাকরির। সেই সঙ্গে লাভ করছে বড় শহরের, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার অধিকার। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা যেতে পারে ভারতীয় কৃষি-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধারায় বৃত্তিজীবনের সঙ্গে বদলে গেছে বর্ণ-গত গঠনের বা Caste structure-এর কাঠামো। আজ অনুন্নত শ্রেণীর ঘরে

জন্মেও সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকরীতে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। উচ্চপদস্থ সরকারী পদে আসীন অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের হাতের মধ্যে থাকছে সমাজের নানাবিধ সুযোগসুবিধা বিশেষত যা তাদের প্রপিতামহেরা কোনওদিন পান নি। সন্তানসন্ততিরা পড়তে পারছেন পাবলিক স্কুলে এবং সমাজের সেরা অংশের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারছেন সমাজের শীর্ষে। গত এক দশকে প্রথমশ্রেণীর কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরিতে অনুন্নত শ্রেণীর চাকুরের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। আই. পি. এস-এ চতুর্গুণ।

বিশেষ কর্ম্মসূচী প্রণয়ন

বিশেষ সমস্যার সমাধান বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেই সম্ভব। তাই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিটি রাজ্যের অনুন্নত এলাকার আদিবাসীদের জন্য উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এইখাতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ব্যয় করা হবে ১৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে এবছর বিভিন্ন রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এই সব কর্ম্মসূচীতে রয়েছে অনুন্নত এলাকায়, যেখানে জলাভাব সেখানে বিশেষ সেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন; যেখানে শিল্প সম্ভাবনাময় অঞ্চল সেখানে ব্যবসায়ীদের বিশেষ ছাড় দিয়ে তাদের অনুন্নত অঞ্চলে কারখানা তৈরীতে আগ্রহী করে তোলা; যেখানে দেনায় নিমজ্জিত হয়েছে তপশীলি সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে তাদের মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। মহাজনীপ্রথার অবসান এনে দিয়েছে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে এক স্বস্তির আবহাওয়া। এগিয়ে এসেছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ফসল তোলার সময়।

মোটামুটিভাবে এই বহুমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণের নীতি ত্রিমুখী। প্রথমত, যেসব অঞ্চলে ৫০০০-এরও বেশী আদিবাসী বাস করেন সেইসব অঞ্চলের কর্ম্মসূচী একধরণের। দ্বিতীয়ত, এইসব আদিবাসীদের ঘনবসতির বাইরের অঞ্চলের জন্য পরি-পরিকল্পনা এবং তৃতীয়ত যেসব আদিবাসী এখনও প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বে আবদ্ধ তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা। এইসব কর্ম্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অগ্রসর জীবনের প্রগতির পদক্ষেপের সাথে একাত্ম করে তোলা। সমাজবিজ্ঞানে বলে প্রতিটি সমাজে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার নিয়ামক থাকে। Force Theory অনুযায়ী অতীতে সমাজের বিবর্তনের প্রথম স্তরে বা hunting stage-এ ক্ষমতার নিয়ামক ছিল বাহুবল। পরবর্তী অধ্যায়ে নিয়ামক বদলে গিয়ে হল জমির মালিকানা। কেননা এইস্তর ছিল কৃষি। তৃতীয় স্তরে বা industrial stage এর শক্তির নিয়ামক হচ্ছে উৎপাদনের উপায়। এই আধুনিক শিল্পযুগের সমাজ শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবলম্বন। শিক্ষার সুযোগ, সর্বভারতীয় সার্ভিসে সংরক্ষিত আসন, স্কলারশীপ, শিক্ষানবীশী ইত্যাদি দিয়ে এদের টেনে আনা হচ্ছে সামাজিক স্রোতের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আগের সারিতে।

বেগার শ্রমিকপ্রথার অবসান এবং গ্রামাঞ্চলে ঋণ মকুব করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে এসেছে কর্ম্মক্ষমতা বিকাশের সুবর্ণসুযোগ। এই সুযোগ কেবলমাত্র খাতায় কলমেই পৌঁছে দিলে চলবে না সর্বস্তরের মানুষকে ভেবে দেখতে হবে অনগ্রসরদের অসুবিধার কথা; হাজার বছরের গ্লানিবহনের ক্লান্তির কথা। অগ্রসরতার অর্থ প্রগতির লক্ষ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন। এই সামাগ্রিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে দেশকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষকে দেশের সামগ্রিক উন্নতির সমান অংশীদার করে তুলতে হবে। পঞ্চায়েতীরাজ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে democratic decentralisation বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে রূপ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের শাসনক্ষমতার কাঠামো সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। তারা পাচ্ছে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ। দেখতে হবে এ সুযোগ যাদের প্রাপ্য তারা যেন পায়। অনগ্রসরদের অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবানেরা বঞ্চিত করতে স্বভাবতই উৎসুক। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আলো এদের কাছে পৌঁছুলে নিজের অধিকার নিজে দখল করে নেবে তারা অর্থাৎ সেই ১২ কোটি মানুষ যারা আজ পিছিয়ে রয়েছে।

তপশিলী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে আশা-ব্যঞ্জক সাফল্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আইনের চূড়ান্ত রূপদানের ক্ষেত্রে নয়া-অর্থনৈতিক কর্মসূচী সবিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে এবং এরফলে তপশিলী ও আদিবাসী ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরণের কাজ সহজতর হয়েছে। আমাদের জনগণের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে থাকেন। সেক্ষেত্রে তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত ভূমিদান একান্তভাবেই অপরিহার্য। আসামে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার বিঘা জমি তপশিলী ও আদিবাসীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। বিহারে অনুরূপ ১২ হাজার একর, রাজস্থানে এক লক্ষ ৫৮ হাজার এবং ওড়িশায় ৩৫ হাজার একর ভূমি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও এ পর্যন্ত ৬.০৮ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত ভূমি তপশিলী ও আদিবাসী জনগণের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। তপশিলী এবং আদিবাসী ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বিতরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অন্যতম অংগ বিশেষ।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন চিন্তা

স্নেহময় সিংহরায়

রবীন্দ্রনাথ 'রায়তের কথা' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তিনি লক্ষ্য করেছেন দেশের যারা আন্দোলনকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা, কিন্তু দেশের যে বৃহত্তম অংশ দুর্গত পল্লী-বাসীদের নিয়ে—তাদের চিন্তা তাঁদের মনে নেই। দেখেছিলেন 'দেশের সেই পোলিটিশিয়ান আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব'। পল্লীবাসী জনসাধারণের কথা বক্তৃতামঞ্চে ধ্বনিত হলেও কার্যত তাদের উন্নতির প্রচেষ্টা হয়েছিল কমই। 'লোকহিত' প্রবন্ধে এই জন্যই তিনি বলেছিলেন, 'যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারত-বর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ

বলিয়াই জানি'। এজন্য তিনি কতকগুলি বক্তব্য রেখেছিলেন যার গুরুত্ব আজও সমান ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, দেশের সর্বস্তরে দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি ও যন্ত্রের সাহায্যে। এজন্য তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য দ্রুত শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। আমাদের ভারতবর্ষ পল্লী-প্রধান—পল্লী কৃষিপ্রধান—কিন্তু কৃষিব্যবস্থা প্রাচীনপন্থী। এইজন্য তিনি গ্রামবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে কৃষিব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্র প্রবর্তনের সক্রিয় প্রচেষ্টা করেছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে আমাদের জাতীয় নীতি গ্রহণে বিশেষভাবে বলা হয়েছে 'ডিমোক্র্যাটিক সোসালিজম্' ও 'সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটি'র কথা। বিস্মিত হতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূল শক্তি কর্মসাধনা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যে সামাজিক সংগঠন সমূহের কার্যপ্রণালীর মধ্যে নিহিত আছে তা উপলব্ধি করেছিলেন। এ সমস্ত কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন তার 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক পল্লীবাসী। এজন্য পল্লীবাসীদের জীবন ধারার পুন-র্গঠন চিন্তা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বারংবার আন্দোলিত করেছে। নির্বাচিত সহযোগী-দের সাহায্যে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি পল্লী সংস্কারমূলক কর্মধারাকে সার্থক-ভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কৃষি-বিজ্ঞান শিখে পল্লীসংস্কারে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠান। কৃষকদের ঋণমুক্তির জন্যে নোবেল প্রাইজের টাকা তিনি কৃষি ব্যাঙ্কের কাজে লাগান। এথেকে প্রমাণ হয়, তিনি পল্লীর পুণর্গঠন জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলক কর্মযজ্ঞে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। কবি শ্রীনিকেতনে পল্লী-শিক্ষার এক আদর্শ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ওখান কার শিক্ষাকেন্দ্রের সব দিক থেকে পরিপূর্ণতা ও সাফল্য ছিল তার কাম্য। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, ওখানকার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানচর্চ্চা করবে, যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করবে এবং প্রধানত সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব তাদের শিক্ষণীয় বিষয় হবে। শ্রীনিকেতনে শিক্ষাদান সম্পর্কে এল্‌মহার্স্ট কে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেছিলেন—

'Our people need more than anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation.'

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ছাত্রী। তিনি ১৯৭১ এ দেশে 'গরিবী হটানো'র আহ্বান জানান এবং ১৯৭৫ এ ঘোষণা করেন বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী। এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিশদফার বেশীর ভাগ দফায় পল্লীবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধা রয়েছে তা অপসারণের প্রস্তাব রয়েছে। দেখা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ যে কর্মধারার প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর পল্লীসংস্কার পরিকল্পনায় তা কেমন সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যে এই কর্মপরিকল্পনায় উপস্থিত। বিস্মিত হতে হবে, যখন দেখা যাবে যে দীর্ঘ কয়েকদশক পরেও আমরা তাঁর পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টিকে কেমন আমাদের সুচিন্তিত জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দ্বিধাদ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সন্ধিলগ্নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজে লাগাতে পারছি। পল্লী পুনর্গঠনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে যে চিন্তা, প্রস্তাব ও কর্ম-প্রণালীকে কাজে লাগিয়েছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে:- (ক) মানবশক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি এবং সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং সবকিছুর অপচয় রোধ। (খ) কৃষি এবং পল্লীজীবনে বৈজ্ঞানিক শক্তিকে গ্রহণ। (গ) সমবায় পদ্ধতিতে পল্লীর সকলে একত্রিত হয়ে চাষবাস এবং জীবন যাত্রায় ও কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার—(এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন আখের কল, পাট-বাঁধাই কল, ডেয়ারী ও বস্ত্র শিল্পের কথা)। (ঘ) প্রদেশে প্রদেশে উৎকৃষ্ট বীজের ভাণ্ডার স্থাপন, জমির প্রকৃতি-পরীক্ষা ও উপযুক্ত সার জোগাবার প্রতিষ্ঠান স্থাপন। (ঙ) সমবায় ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন। কারণ, সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে কাজে লাগান সম্ভব। (চ) বৈজ্ঞানিক সার

২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহিলা মহল

সাশ্রয়ের নানা পথ

বেলা দে

"অপচয় করো না, অভাবও হবে না" এমন প্রবাদ আমরা ছোট বয়স থেকেই শুনে আসছি। তবু সব সংসারেই প্রচ্ছন্ন-ভাবে অভাব কথাটা বেশ জড়িয়েই থাকে সাধারণত। অতএব মুক্তির উপায় কি ভাবতে বসেন সুগৃহিণীমাত্রই। আয়ের ভারটা সেকালের গৃহিনীদের ছিলো না। একালেও অনেকের নেই, কিন্তু সংসারের ব্যয়ভারটা আধুনিকতার আগমনে মেয়েদের হাতেই এসে পড়েছে। আয়ের কম বা বৃদ্ধির গ্রাফের উপর মেয়েরা বেশী না তাকিয়েই তৎপর হয়েছে কেমন করে ব্যয় কমানো যায়। বাজারে জিনিষপত্র কিনতে গিয়ে তারা দেখেছেন দাম তো বেশ আকাশছোঁয়া। বাজেটের খরচ থেকে কিছুই কাটছাট করা যাবেনা। তবে, উপায় কি? অপচয় বন্ধ করতে হবে। বাহুল্য বর্জন করতে হবে, বিলাসিতার বিলয়সাধন করতে হবে। অনভ্যস্ত গৃহিণীরা অস্ফুটস্বরে নিভৃতে আপনমনে বলেও ফেলেন--"বাব্বা, এত মেপে কি জীবন চলে?" কিন্তু চলেনা বলে তো বসে থাকলে চলবে না গৃহিণীদের। সংসারের চাকা চালাতেই হবে, সবকিছু অভাব অনটন ঢেকে রেখে। কথামালার সেই তৃষিত কাকের গল্পটা মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে। কলসীর তলানি জলটা খাবার জন্য যেমন সে কতকগুলো ছোট ছোট ঢিল ফেলে বুদ্ধির সহায়তায় তৃষ্ণা মিটিয়ে-ছিলো তেমনি গৃহিণীদের মাথায় কিছু কিছু বুদ্ধি ভীড় করে আসে সময় সময়।

সংসারে সেলাইবোনার দপ্তরটি একান্ত-ভাবেই থাকে নারীদের হাতে। বাড়ীর পরিবারের সবার ড্রেস তৈরীর মজুরীতে অনেকগুলো টাকা চলে যায়। গৃহিণী পড়েন ভাবনায়। তাই আস্তে আস্তে তিনি যদি তুলে নেন নিজের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ড্রেস তৈরীর ভারটা নিজের হাতে, তাহলে খরচ কিছুটা কমবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া হাতেও এসে জমবে কিছু কিছু টুকরো কাপড়। সেগুলো অপচয় না করে রং মিলিয়ে জোড়া দিয়ে সুন্দর টেবলক্লথ বা বেডকভার তৈরী করা যেতে পারে। হ্যাণ্ডব্যাগও করা যায়। ছোটদের জামায় বা কোন 'কভারে' 'এপলিকের' কাজের জন্যও ব্যবহার করা যায়। পুরানো শাড়ী দিয়ে অনায়াসেই পর্দা, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরী করে বাড়তি খরচের পথটা বন্ধ করে দেওয়া যায় না কি? শীতকালে গরম জামা-কাপড়ের দামের সাথে সবাই কম বেশী পরিচিত আছেন—উল কিনে বাচ্চাদের সোয়েটার, কার্ডিগান বুনেও দেন অনেকে। বাড়ীতে বুনলে নানারঙের ছোট ছোট উদ্বৃত্ত উল জমা হয়ে যায়, সেগুলো ফেলে না দিয়ে গায়ের স্কার্ফ, ষ্টোল ইত্যাদি বোনা যায়। এতে পরিশ্রম আছে মানি, কিন্তু লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে কয়েকটা টাকা যদি অজান্তেই জমে যায় তাহলে মনটা সুখী হ'বে না কি? সেই উদ্বৃত্ত টাকায় মনের আরো দু'একটা সখ, সাধ যা খরচের পাহাড়ের আড়ালে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তাও পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ঠিক নয় কি?

আধুনিকতা মানুষের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিলেও সখ আর সাধের পরিমাণ কি হারে বাড়িয়ে দিয়েছে তা প্রতিমাসে নানারঙের নিমন্ত্রণ পত্র এলেই বোঝা যায়, কি বলুন? নিমন্ত্রণ কারীর সখ—সাধের বাড়-বাড়ন্ত হোক এ কামনা আমরা সবাই করবো কিন্তু যিনি নিমন্ত্রণ পেলেন তার পার্স যে সদাই বাড়ন্ত এ খোঁজ কি কেউ রাখেন? তাছাড়া এই অতিথি নিমন্ত্রণ আইনের প্রবর্তনে স্রেফ্ মার খাচ্ছেন এই নিমন্ত্রণ-গ্রহণকারীর দল। তবু, সামাজিকতা রক্ষা করতে হবেই। মনোমত প্রেজেন্টেশন কিনতে গিয়ে চমকে উঠেন পুরুষেরা। মাসে পাঁচ, সাতটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে দামী জিনিষ দেওয়া কি সম্ভব?

গৃহকর্তারা সাধারণত নারীদের মতের কোন মূল্য দিতে চান না, কিন্তু প্রেজেন্টেশন দেওয়ার ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে এক একবার গৃহিণীর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কারণ তারা দেখেছেন নারীবুদ্ধি এসবক্ষেত্রে প্রলয়ঙ্করী না হয়ে শুভঙ্করীই হয়ে দাঁড়ায়। নারীরা কখনো টুকরো কাপড়ে তৈরী সূচীকার্যে ভরা বটুয়াব্যাগ, কখনো বা হাতে বোনা স্কার্ফ, কখনো বা ছেঁড়া কাপড়ের বদলে কিছু বাসন জোগাড় করে রাখেন কোন নিমন্ত্রণ পাবার আভাস পেলেই। তাই কিছু অপচয়ও এড়ানো যায়। আজকাল জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ বার্ষিকী এসব অনুষ্ঠানেও যোগদানের নিমন্ত্রণ আসে। বাচ্চারা খেলতে ভালো-বাসে। তাদের যদি খেলবার উপযুক্ত কিছু হাতে তৈরী উপহার দেওয়া যায় তাহলে তারা খুশিই হয়। সবার বাড়ীতেই দেশলাইয়ের অনেক খালি বাক্স জমে। সেগুলো ফেলে না দিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে তুলো ভরে দিয়ে কোন রঙ-বেরঙের কাপড় বসিয়ে সোফাসেট তৈরী করে দেওয়া যায়, বা ট্যাঙ্কবু

পাউডারের লম্বা কৌটায় জামা কাপড় পড়িয়ে উপরে ডিমের খোলায় মুখ এঁকে যদি মনিপুরী পুতুল তৈরী করে উপহার দেয়া যায় তাহলে তারা মনমত জিনিষ পেয়ে যথেষ্টই আনন্দ পায়।

এই সুযোগে রান্নাঘরের দিকটা একটু ঘুরে এলে কেমন হয়? এটা তো নারীদের সংসার রাজত্বের রাজধানী। দৈনন্দিন রান্নার আয়োজন করতেই আয়ের বেশ খানিকটা মোটা অংশ চলে যায়। আর রন্ধন প্রস্তুত করতে চলে যায় নারীদের সারাদিনের অধিকাংশ সময়ই। সেদিন এক বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে এলাম এক নতুন রান্না। খেতে কিন্তু বেশ সুস্বাদু লাগলো। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেই বসলাম—"এ জিনিষটা কি বুঝলাম নাতো?" অফিসার পত্নী বান্ধবীটি আমায় হাসতে হাসতে বললো এটা হলো "দুখী চচ্চড়ি"—অর্থাৎ নানারকম সবজীর সাথে কিছু কিছু তরকারীর খোসাও স্থান পেয়েছে ঐ রান্নাটাতে। বুঝলাম সুগৃহিণী বান্ধবীটি আমার অপচয় কমাতে তৎপর। মাঝে মধ্যে বাজারের বাজেট শর্ট থাকলে করে দেখতে পারেন। মন্দ লাগবে না খেতে। সংসার চালাতে গেলে মাঝে মাঝে গৃহিণীদের এমন জোড়াতালিতো দিতে হয়, ঠিক নয় কি? সংসারের অপচয় কমাতে গেলে গৃহিণীদের আরো একটা বিষয়ে আগ্রহী হলে ভালো হয় তা হলো 'কিচেন গার্ডেন'। 'কিচেন গার্ডেনের' মাঝে দুটি জিনিষ চরিতার্থ হয়। এক হলো এটা একটা সুন্দর 'ছবি'। দ্বিতীয়ত পরোক্ষভাবে কিছু ব্যয়বাহুল্য কমায়। অবশ্য সবাই তো হাতের কাছে জমি পায় না, যাদের আছে, তাদের জন্যেই বল্লাম।

বেশ-ভূষায় ও প্রসাধনের জন্যে কিছু খরচ আছে মেয়েদের। সেক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাটাই যেন প্রথম ও প্রধান জায়গা পায়। বিলাসিতার জন্য বেশী অর্থ অপচয় না করে যদি স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগী হওয়া যায় তাহলে সৌন্দর্য্য যে আপনিই প্রকাশ পাবে, তা সমঝদার মাত্রই জানেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী চিন্তা

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সম্বন্ধে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রথার আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা। (ছ) আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করবার দিন নেই, আজ তার সঙ্গে 'বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে' হবে। পল্লীবাসীদের জন্য উন্নত ধরণের কৃষিকার্য ও পশুপালন-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন। (জ) পল্লী অঞ্চলে স্বদেশ-শিল্পজাত জিনিষের প্রচলন। সেই সব জিনিষ যাতে সুলভ ও সহজ প্রাপ্য হয় তার ব্যবস্থা করা। (ঝ) প্রতি পল্লীতে চিকিৎসা ও ঔষধের সুবন্দোবস্ত করা। (ঞ) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি। (ট) বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পল্লীর অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে সার্বিক সংবাদ রাখা। (ঠ) পাবলিক ওয়ার্কস্ সম্বন্ধে পল্লীবাসীদের সজাগ করে তোলা—এতে রয়েছে পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা তৈয়ারি ও মেরামত, জঙ্গল সাফ ইত্যাদি। অর্থের অভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পল্লীবাসী দেবে 'কায়িক পরিশ্রম রূপ চাদা'। (ড) গ্রামে গ্রামে পল্লীবাসীদের উপযোগী যন্ত্রশিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা। কুটির শিল্পের প্রসার। (ঢ) খাদ্য-শিল্প গড়ে তোলা। (ণ) কৃষকদের ঋণমুক্তির জন্য এবং আর্থিক অবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজনে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন। (ত) পল্লী-শিক্ষার এক আদর্শ কেন্দ্ররূপে শ্রীনিকেতন-এর প্রতিষ্ঠা। (থ) জীবনধারার মান উন্নয়নে-অভিজ্ঞতার সংযোগ। পল্লীবাসীর মধ্যে গভীরভাবে আত্মশক্তিতে আস্থা ও আত্ম-নির্ভরতার ভাব জাগিয়ে তোলা। (দ) অকৃত্রিম পল্লীপ্রীতি, পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা। (ধ) প্রত্যেক জেলায় মেলার মাধ্যমে নতুন নতুন যাত্রা, কীর্তন ও কথকথা, বায়স্কোপ, ম্যাজিক, লণ্ঠন ও ব্যায়াম ইত্যাদির আয়োজন। আনন্দানুষ্ঠানের সমন্বয়ে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক এবং কৃষি ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা। (ন) পল্লী সমাজ স্থাপন। পল্লী সমাজ গ্রহণ করবেন কৃষি ও পল্লী সংস্কারের বিভিন্ন দায়িত্ব।

বিশদফা কর্মসূচীর মধ্যে আমরা রবীন্দ্রভাবনার প্রচুর অনুসরণ ও অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করি। নির্যাতনমূলক বেগার শ্রমিক প্রথাকে বে-আইনী ঘোষণা করা; ভূমিহীন ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য বাস্তুজমির বিলি ত্বরান্বিত করা; উদ্বৃত্ত জমি দ্রুত বন্টন; গ্রামীণ ঋণ বিলোপের পরিকল্পনা, ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্রচাষী ও কারিগরদের ঋণ মকুবের মাধ্যমে আমরা দুর্গত পল্লীবাসীদের ভাগ্য পরিবর্তনের আভাস দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা এই তিনটি প্রধান বিষয়ের সমস্যার উপর গুরুত্ব দিতেন। আলোচ্য কর্মসূচির মধ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা; জন সাধারণের জন্য বস্ত্রের সরবরাহ, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বই ও খাতাপত্র সরবরাহ ইত্যাদি রবীন্দ্র নাথের সাধারণ মানুষের জন্য ত্রিবিধ সমস্যার সমাধানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

পল্লীব্যাঙ্ক গঠনের যে ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন আজকের সরকারী কর্মসূচিতেও সে ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর উন্নয়নের অন্যতম মূলকথা ছিল, পল্লীবাসীদের আর্থিক উন্নয়ন এবং তাদের দারিদ্র্যসীমার উপরে টেনে তোলা। আমাদের জাতীয় কর্মসূচিতে সে ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে। শ্রীনিকেতনের পল্লী শিক্ষাকেন্দ্রে যে বিজ্ঞান শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে জনসমবায়ের মূলতত্ত্ব রবীন্দ্র-অনুধ্যানে নিহিত ছিল, বর্তমানের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের কর্ম-সূচিতে সেই অনুধ্যানের আশ্চর্য প্রতিফলন লক্ষ্য করলে তার সার্থক ও সুদূরপ্রসারী পল্লী পুনর্গঠন চিন্তা সম্পর্কে সন্দিহান হবার অবকাশ থাকে না।

১৯২৫ সালে সম্ভবত শান্তিনিকেতনে প্রথম বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছাব্বিশে ফাল্গুন পূর্ণিমার রাতে বসন্ত উৎসবকে স্বাগত জানানোর জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি হল। অনুষ্ঠান আর আম্রকুঞ্জে হল না। কলাভবনের ঘরে বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হল।

স্বপনকুমার ঘোষ

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন: বৎসরে বৎসরে আশ্রমের এই আম্রকুঞ্জে দোল উৎসবের দিনে আমাদের নৃত্যে গানে কাব্যে ছন্দে সুন্দরের অভ্যর্থনা করে থাকি। বসন্তের যে দৈববাণী মর্মলোক থেকে আসছে এই ধরণীর ধুলোয়, তাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত করে নেবার জন্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

১৯৩৫ সালের ২০শে মার্চ শান্তিনিকেতনে এমনি এক বসন্ত উৎসবে বিশ্বভারতীর আচার্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাচের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইন্দিরা নেহরু তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। অম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত, বসন্ত উৎসবে 'কে দেবে গো চাঁদ তোমায় দোলা' ও 'তোমার বাস কোথা যে পথিক' এই দুটি গানের সঙ্গে ইন্দিরা নেহরু সমবেত নাচের দলে নেচেছিলেন।

পরের বছর ১৯৩৬ সালের ৮ই মার্চ শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বভারতীর আচার্য স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা নেহরুর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছয়। গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করলেন। সেদিন উপাসনা সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারিদিকে শুষ্ক পাতা ঝরে পড়বে তার মধ্যে নব কিশলয়ের অভিনন্দন। আজ জরাবিজয়ী নতুন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের ঋতুরাজ জওহরলাল। আর আছেন বসন্ত লক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য সত্তায় সম্মিলিত। তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসন্ত সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন সে তো অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেননি। সাংঘাতিক বিরুদ্ধতার প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তাঁরা দেশের শুভসূচনা করেছেন। এই জন্যে আমাদের আশ্রমের এই বসন্ত উৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিনরূপে গ্রহণ করেছি। তাঁরা আপন নির্ভীক বীর্যের দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক।

প্রতিবারের মতন এবারেও ষোলই মার্চ সকালে বসন্ত উৎসব অনষ্ঠিত হল- "ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল"—সমবেত কন্ঠে গানের সঙ্গে নৃত্য সহযোগে শালবীথি হয়ে মাধবীকুঞ্জর মধ্য দিয়ে আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা। নাচের দলের গায়ে বাসন্তী রংয়ের জামা আর কমলা রংয়ের উত্তরীয় শোভা পাচ্ছিল। কপালে ছিল আবীরের প্রলেপ হাতে কাঁচা তালপাতার ঠোঙা। তাতে ছিল পলাশ আর শালফুল। আম্রকুঞ্জ ছিল সুচিশুভ্র মনোরম অনুষ্ঠানের সুসজ্জিত রঙ্গভূমি।

ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—গানটি গেয়ে ভোরে বৈতালিক দল, আশ্রম পথ পরিক্রমা করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর মহামিলন ক্ষেত্র বিশ্বমৈত্রীর মহান তীর্থ ঐতিহাসিক আম্রকুঞ্জ ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন ছাত্র-ছাত্রী-কর্মী বহিরাগত অতিথি ও বহু বিদেশী। ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা নাচ গান পাঠ ও আবৃত্তি করেন। আম্রকুঞ্জ ও তার আশে পাশের প্রাঙ্গণে ছিল হাজারো হাজারো মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠান শেষে আরম্ভ হল আবার খেলা। শান্তিনিকেতনের নীল নির্মল আকাশের নীচে মুক্ত প্রাঙ্গণে আবীর খেলায় ছিল সীমাহীন আনন্দের মহাকল্লোল।

খেলাধুলা

ফুটবলে দল বদল

কলকাতার ফুটবল লীগ শুরু হতে' আর দেরী নেই। ময়দান উত্তেজনায় ফেটে পড়তে তার সব সাজগোজ শেষ করে ফেলেছে। দলবদলের পালাও চুকেছে। খেলোয়াড়রা যে যার মনোমত দলটি বেছে নিয়েছেন ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করে। ফুটবল লীগ সুরুর আগে এ পর্বটিও কম উত্তেজনার নয়। অস্থির উত্তেজনায় কতো ফুটবল পাগল গ্রীস্মের খরা মাথায় নিয়ে আই, এফ, এ-র অফিসের সামনে তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষায় থেকেছে। শিকারী চোখ খুঁজে ফিরেছে চেনা খেলোয়াড়ের মুখগুলি। তারা এলেই বুকে কাঁপন ধরেছে। বুকটা গুঁড়িয়ে গেছে যখন খবর হয়েছে অমুক দলের অমুক খেলোয়াড় এবার অমুক দলে সই করেছেন। কখনও কখনও অবশ্য অন্তর্জলী অবস্থটা কেটে গেছে যখন শোনা গেছে —না: যা আশঙ্কাটা করা গিয়েছিল তা নয়। অমুক খেলোয়াড় এবার অমুক দলের খেলোয়াড়ই রয়ে গেছেন—একটা ছোট দলের পক্ষে উনি সই করে তা আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন। এবারের দল বদলের সুযোগে প্রায় রেকর্ডসংখ্যক খেলোয়াড় ছাড়পত্র নিয়ে দল পাল্টেছেন। ১৮৪৮ জন খেলোয়াড় দল বদলেছেন। প্রায় ১০০ খেলোয়াড় ছাড়পত্রে সই করে পরে তা ফিরিয়ে নিয়ে পুরোনো দলেই থেকে গেছেন। শুধু খেলোয়াড়ই নয় এবছরের জবর খবর কলকাতার দুই প্রধানের কোচও দল বদলাবদলি করেছেন। ফিফার শিক্ষণ-প্রাপ্ত কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী ইষ্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের গড়াপেটার দায়িত্ব নিয়েছেন। মোহন-বাগানের কোচ অমল দত্তও মোহনবাগান ছেড়ে ইষ্টবেঙ্গলে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই কোচ বদলাবদলি ঘিরে কিছুটা জেদ যে দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কাজ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ছাড়পত্রের শেষ তারিখ উৎরে যাবার পর মাঠ ময়দান যখন আসন্ন ফুটবলের আবহ রচনার কাজ সমাধা করছে তখনই দলীয় সমর্থকের দল যে যার দলের আসা যাওয়ার হিসাব কষে শক্তির পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকল তা হিসাব করতে বসে গেছেন। তবে ক্রিকেটের মত ফুটবলের চরিত্রও তুলনায় কম অনিশ্চিত নয়। নামী দামী খেলোয়াড়ে দল সাজালেও সে দলকে লীগ পাল্লায় হামেশাই পিছিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কাজেই আসল খেলা শুরু না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের কোন্ দল শক্তসমর্থ আর কোন্ দল কমজোরী তা বোঝা সহজ হবেনা। তবু চক কাটা হিসেবে দলের শক্তি পর্যালোচনা করার রেওয়াজ যেহেতু প্রচলিত আছে তাই লীগ আরম্ভের ঠিক মুখোমুখি দল-বদলের পর কোন্ দলের অবস্থা কেমন—সাধারণভাবে তার একটা আলোচনা করা যেতে পারে।

মোহনবাগান দল গত বছর মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। দলের আক্রমণ এবং রক্ষণ ভাগে কিছু ফাঁক ফোকর থাকায় লীগ দৌড়ে তাদের অবস্থা মোটেই সুবিধেজনক ছিল না। আর তা ছাড়া নামীদামী খেলোয়াড়রাও তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। এবছর সেই দিকে নজর রেখেই কর্ম-কর্তারা মোহন বাগানের দল গড়ার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা এবার মোহনবাগান দল ছেড়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ভাস্কর গাঙ্গুলী—গতবছর মোহন-বাগানের ৫—০ গোলে শোচনীয় পরাজয়ের দুর্গরক্ষক। এবার তিনি ইষ্টবেঙ্গলের দুর্গ দরজায় পাহারা দেবেন। গত বছরটা তরুণ ভাস্করের কাছে ভালো বছর ছিল না। গতবছর তার ক্রীড়া কীর্তির ইতিহাস মোটামুটি ব্যর্থতারই ইতিহাস। তবুও একথা স্পষ্ট ভাবেই বলা যায় ভাস্করের মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে। ইষ্টবেঙ্গল দুর্গরক্ষায় সেই প্রতিশ্রুতি হয়তো প্রতি-ফলিত হবে এমন আশা সমর্থকদের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। এছাড়া রক্ষণ ভাগের চিন্ময় চ্যাটার্জী, বিজয় দিকপতি, রতন দত্ত, বরুণ মিত্র দল ছাড়লেও সেই অভাব পূরণ করতে এসে গেছেন ভারতীয় দলের নির্ভর যোগ্য ষ্টপার প্রদীপ চৌধুরী। ইনি বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের খেলোয়াড়। কলকাতার দর্শক অনেক প্রত্যাশায় প্রদীপের দিকে চেয়ে আছে। প্রদীপ ছাড়াও রক্ষণ ভাগের বিভিন্ন পজিসনে যোগ দিয়েছেন খিদিরপুর আর কালীঘাটের দিলীপ সরকার এবং উত্তম ঘোষ। ইষ্টবেঙ্গলের থেকে এসেছেন সেরা লিংকম্যান সমরেশ চৌধুরী। খিদিরপুর আর রাজস্থান থেকে এসেছেন শ্যাম মান্না আর সুকুমার মুখার্জী। আক্রমণ ভাগের অভিজ্ঞ কাপ্তান দল ছেড়ে গেছেন। দল ছেড়ে গেছেন শিশির গুহ দস্তিদার, কৃষ্ণ মিত্র এবং শিবব্রত নাথও। আক্রমণের শক্তি বাড়াতে যাঁরা এসেছেন দলত্যাগীদের তুলনায় তাদের শক্তি আর দক্ষতা দুই-ই বেশী। এরা হলেন সুভাষ ভৌমিক, হাবিব, আকবর এবং বিদেশ বসু। এরিয়ান্সের তরুণ তাজা খেলোয়াড় বিদেশের কাছে এবার সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেক।

গত বছরে ইষ্টবেঙ্গলের ভাগ্যে ছিল তুঙ্গে বৃহস্পতি। চারদিকেই তাদের

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস পুরুষ কিংবদন্তীর মহানায়ক ভারতীয় ফুটবলের দিশারী দুরন্ত গোষ্ঠপাল আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে' পঁচিশে চৈত্রের ভোররাতে তিনি

পরলোকে গোষ্ঠপাল

চিরকালের ইতিহাস হয়ে গেলেন। মাত্র সতের বছর বয়সে ফুটবলকে সখা করে কলকাতা ময়দানে যে তরুণ মেরুণ-সবুজের নিশান উড়িয়ে পাল তোলা নৌকোর হাল শক্ত মুঠোয় ধরেছিলেন—দীর্ঘ তিরিশ বছরে কোনদিন তা এতটুকু শিথিল হয়নি। ১৯১৩ সালে সতের বছরের যে গোষ্ঠ পাল শক্তপায়ে মাটি কামড়ে মোহনবাগানের জালঘেরা দুর্গের সামনে পাঁচিল তুলেছিলেন ১৯৩৫ পর্যন্ত সে পাচিলে এতটুকু চিড় ধরেনি। গোরা খেলোয়াড়দের খ্যাপা আক্রমণ তুরন্ত ছুটে আসত মোহন বাগানের দুর্গ বিজয়ে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সব জারিজুরিই হিম হয়ে যেত গোষ্ঠপালের পায়ের তলায়। ১৯১৩ থেকে '৩৫-এর ভেতর সংখ্যাতীত লড়াইয়ে মোহন বাগানের দুর্গ ঘিরে ছিল এমনই দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের পাঁচিল। যে পাঁচিলের দুর্ভেদ্যতায় মুগ্ধ হয়ে 'ইংলিসম্যান' কাগজ ঐতিহাসিক চীনের প্রাচীরের রূপকে তাঁর দুর্ভেদ্যতাকে চিহ্নিত করেছিল। গোষ্ঠপাল হয়েছিলেন—'চাইনীজ ওয়াল' গোষ্ঠপাল। লোকমুখে মুখে গ্রাম গঞ্জ ছাড়িয়ে বায়ুরও আগে ছুটে যেত সেই নাম। তাই অজ গ্রামেরও কোন কিশোরের সামনে জাগতিক বহু বিস্ময় এবং মহা-রহস্যের মধ্যে এক রহস্য ছিলেন কিংবদন্তীর গোষ্ঠপাল।

ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর গ্রামের ছেলে গোষ্ঠপালের জন্ম ১৮৯৬ সালে। কলকাতায় আসেন ১৯০৪ সালে। বাড়ির কাছাকাছি ছিল কুমারটুলি পার্ক সেখানেই ফুটবল দেখতে দেখতে ভালো-বেসে ফেলেন তাকে।

১৯১৩ সালে মোহনবাগানের হয়ে প্রথম সবুজ মেরুণ জামা গায়ে তুলে সেকালের দুঁদে ফুটবল দল ডালহৌসির বিপক্ষে খেলতে নামেন। অবশ্য আগের বছরই মোহনবাগানে খেলার জন্য ডাক এসেছিল তাঁর কাছে। উনিশশো তেরোয় সতের বছরের যে তাজা তরুণ ডালহৌসীর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ইতিহাস শুরু করে-ছিলেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ-এ ক্যালকাটার বিরুদ্ধে খেলে মেরুণ-সবুজ জামা গা থেকে নামিয়ে দিলেন। ছেদ রেখা পড়লো সেই ইতিহাসে। কিন্তু সব কিছু থামলো কই? তেইশ বছরের দুরন্ত ক্রীড়াকীর্তি তাঁকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় জীবন্ত করে রাখল মাঠে ময়দানে। মাঠ ময়দানই বা বলি কেন,—সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে।

জয়-জয়কার। সব প্রতিযোগিতাতেই বিজয়ীর সম্মান। প্রদীপ ব্যানার্জীর উন্নত শিক্ষায় ইষ্টবেঙ্গল দল গতবছর ভারতের অন্যতম সেরা দল হয়ে উঠেছিল। এবছর সুভাষ ভৌমিক, সমরেশ চৌধুরী, মোহন সিং, কাজল চালি, বিনয় পাঁজা, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার দল ছাড়ায় তাদের অবস্থা যে কিছুটা কাহিল হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। অবশ্য ইষ্টবেঙ্গল সাধ্যমত তরুণ খেলোয়াড় এনে দলের যতটা সম্ভব শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। দলে এসেছে মোহন বাগানের তরুণ গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী, জাতীয় ফুটবলে বাংলার প্রতিনিধি এরিয়ান্সের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় শ্যামল ব্যানার্জী। এছাড়াও ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগে শক্তি যোগাতে এসেছেন মোহনবাগানের চিন্ময় চ্যাটার্জী, আর রতন দত্ত, কালীঘাটের প্রশান্ত ব্যানার্জী, বি. এন. আর-এর বলাই চক্রবর্তী এবং এরিয়ান্সের সত্যজিৎ মিত্র। আক্রমণ-ভাগও ইষ্টবেঙ্গল কমজোরী রাখেনি। মোহনবাগানের কেষ্ট মিত্র, কান্নান, খিদিরপুরের বিভাস সরকার এবং এরিয়ান্সের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড় অনু চৌধুরীকে এনে আক্রমণ শানিয়েছে।

মূলত অন্যরাজ্যের খেলোয়াড়েই দল সাজায় মহমেডান স্পোর্টিং দল। গত কয়েক বছর সেই ধারা পরিবর্তন হয়েছে। এখন স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়েই তাদের দল গড়া চলে। প্রায় সমস্তই অবাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে এক সময় যে মহমেডান দল গড়তে অভ্যস্ত ছিল তার দল এখন সেখানে অধিকাংশই বাঙ্গালী খেলোয়াড়। এবছরও তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়েই মহমেডান দল সাজানো হয়েছে। দল বদলের সুযোগে দল ছেড়েছেন আক্রমণের মূল ভরসা হাবিব আর আকবর। প্রবীণ নঈমও এবছর হয়তো খেলবেন না। কাজেই মহমেডানের শক্তিতে যে কিছুটা ঘাটতি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবু যথাসম্ভব অন্য দলে খেলোয়াড় এনে দলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন কর্মকর্তারা। রক্ষণভাগ তো কাজল চালি, বিজয় দিকপতি প্রতীস চক্রবর্তীর যোগদানে বেশ কিছু শক্ত সমর্থ হয়েছে। এঁরা এসেছেন ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের এবং এরিয়ান্স থেকে। ইষ্টবেঙ্গলের লিংক ম্যান মোহন সিং তাঁর শক্তির তুঙ্গে না থাকলেও হয়তো সাধ্যমত সাহায্য করতে পারবেন আক্রমণ ভাগকে। এছাড়া মোহনবাগানের শিশির গুহ দস্তিদার, রাজস্থানের মহম্মদ নাজিম, ইষ্টার্ণরেলের আল্লারাখা আর টালিগঞ্জের শ্যামসুন্দর দেও সাধ্যমত শক্তি যুগিয়ে আক্রমণের ধার বাড়াবেন বলেই বিশ্বাস।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনেমা

বাংলা ছবির সমস্যা

বাংলা ছবির সমস্যা নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। তার আগে এ শিল্পের সুস্থ চেহারাটা কী ছিল তা জেনে নেওয়া দরকার। উনিশশো সাতচল্লিশে আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন কলকাতায় ষ্টুডিও ছিল চৌদ্দটি। যেমন: নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর এবং দুনম্বর, ক্যালকাটা মুভিটোন, ইন্দ্রলোক, কালী ফিল্মস, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, ইন্দ্রপুরী, রূপশ্রী, ভারতলক্ষ্মী, ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও, বেঙ্গল ন্যাশনাল ইস্টার্ন টকীজ, রাধা ফিল্মস ও অরোরা ষ্টুডিও। এইসব স্টুডিও থেকে তখন বছরে বাষট্টি খানা বাংলা ছবি তৈরি হয়ে বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পেত।

সে আমলে হাতীমার্কা নিউ থিয়েটার্স একাই একশো ছিল শুধু বাংলা নয় হিন্দীতেও এখান থেকে ছবি তৈরি হোত। দু-দুটো স্টুডিও চালাতেন নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার। এ সংস্থার নিজস্ব শিল্পী এবং কলাকুশলীর দল ছিল। মাস-মাইনেয় এঁরা কাজ করতেন। আজকের মত এত সমস্যা সেদিন ছিল না। বাংলা ছবির বাজার বেশ রমরমা ছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এ শিল্পের অচল অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হল সেটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর অনেক বছর কেটে গেছে। এরমধ্যে এক সময় নিউ থিয়েটার্সের যুগও শেষ হল। কলকাতা থেকে হিন্দী ছবি তৈরি বন্ধ হয়ে গেল। এখানকার শিল্পী এবং কলাকুশলীরাই বম্বের হিন্দী ছবিতে যোগ দিলেন। সর্বভারতীয় ছবির বাজার পেতে হিন্দী ছবির রঙে-রসে রঙিন হল। চিত্তবিনোদনী-চিত্রের প্রতিযোগিতায় বাংলা ছবি ক্রমশ হটে যেতে লাগল। একমাত্র শিল্প চিত্র (Art Film) ছাড়া বাংলা ছবির আর কিছু রইল না। উনিশশো পঞ্চান্নয় সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করল। ভারতের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তিত হবার পর বাংলা ছবিই বারবার সর্বোচ্চ পুরস্কার বিজয়ী হয়েছে। বলতে গেলে বিদেশে যেসব ভারতীয় ছবি পুরস্কার ধন্য হয়েছে সেগুলোর বেশীর ভাগই বাংলা ছবি। কিন্তু এণ্টারটেনিং চিত্র হিসেবে হিন্দী ছবির কদর সব থেকে বেশি। ছবির বাজারে হিন্দী ছবি বাংলা ছবিকে কোণঠাসা করে দিয়েছে। ফলে বাংলা ছবির সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

চৌদ্দটির জায়গায় আজ কলকাতায় মাত্র ছ'টি স্টুডিও চলছে। স্টুডিওর সংখ্যা কমে গেলেও এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন প্রায় তিন হাজার কলাকুশলী। এঁদের মধ্যে আবার শতকরা পঞ্চাশজন বেকার। সারা বছর ছবিতে কাজ করেন শতকরা দশজন। সুতরাং কী ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে এ জগতের মানুষেরা সংগ্রাম করে চলেছেন তা এ পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়। ছবি তৈরির কাজ কমে যাওয়ায় এমন রূপ ধারণ করেছে। ছবি কমতে কমতে এখন বছরে গড়ে পঁচিশখানা বাংলা ছবিও মুক্তি পায় না। অথচ এমন একদিন গেছে যখন সারা বছরে বাষট্টিখানা ছবি তৈরি হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় মোট ৩৮০টি প্রেক্ষাগৃহ আছে। এরমধ্যে কিছু নতুন চিত্রগৃহও নির্মিত, হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মাত্র ১৬টি প্রেক্ষাগৃহে কেবল বাংলা ছবি দেখানো হয়। কলকাতায় শুধু বাংলা ছবি মুক্তি পায় এমন প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা মাত্র চারটি। বাংলা এবং হিন্দী মিশিয়ে ১৮৬টি চিত্রগৃহে ছবি দেখানো হয়। আর বাকি সব প্রেক্ষা-গৃহে চলে শুধু হিন্দী ছবি।

বাংলা ছবির সমস্যা এত সংকটময় যে হঠাৎ করে এর সমাধান করা দুঃসাধ্য। তবে বাংলা চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে গেলে এই মুহূর্তে প্রতিকারের উপায় ভেবে নিয়ে কাজে নেমে পড়তে হবে। প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বলিষ্ঠ বিশদফা কর্মসূচীকে সামনে রেখে এগিয়ে গেলে বাংলা ছবিকে এখনও বাঁচানো যায়। কারণ কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা থাকলে সমস্যার মোকাবিলা করা অসাধ্য নয়।

এ শিল্পের ব্যবসার দিকটা প্রধানত প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রদর্শকের ওপর নির্ভর করে। ছবি তৈরী করার সময় থেকে মুক্তি পর্যন্ত সব দায়দায়িত্ব প্রযোজককে নিতে হয়। এককথায় প্রযোজকের ভূমিকাটা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত। আর ব্যবসার মধ্যমণি হলেন পরিবেশক। মালিক হলেন প্রদর্শক। এঁর অবস্থাটা প্রযোজক এবং পরি-বেশকের মত নয়। অনেক নিরাপদ। কোন ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্য দেখা দিলে লোকসানের ঝুঁকি তাঁকে নিতে হয় না। সুতরাং প্রযোজককে বাঁচাতে হলে সরকারের মধ্যস্থতায় প্রদর্শক ও পরিবেশকের মধ্যে একটা নতুন লাভজনক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

নিউ থিয়েটার্সের মত কলকাতা থেকে আবার হিন্দী ছবি নির্মাণের কথা ভাবতে হবে। প্রথম দিকের প্রচেষ্টাকে সরকারের সাহায্য দেওয়া উচিত। সর্বভারতীয় ছবির বাজার ধরতে হলে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ছবি তৈরি করা ছাড়া কোন পথ নেই।

তৃতীয়ত, শুধু হিন্দী ছবি দেখানো হয় এমন প্রেক্ষাগৃহগুলোতে বাধ্যতামূলক-ভাবে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুখের কথা, রাজ্য সরকার এব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। বাংলা ছবির রিলিজ চেন যতক্ষণ না বাড়ছে ততক্ষণ এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। ছবিঘর বেড়ে গেলে ছবি তৈরির সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। আর এই সঙ্গে স্টুডিওরও উন্নতি হবে। বন্ধ স্টুডিওগুলো আবার খুলবে। ফলে কলাকুশলীদের কর্মসংস্থানের একটা পাকাপাকি রূপ নেবে। ন্যূনতম বেতন এবং চাকরির নিরাপত্তা এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে।

চতুর্থত, সেন্সরের তারিখ অনুযায়ী ছবির মুক্তি ব্যবস্থা নির্ধারিত করা প্রয়োজন। তা নাহলে যেসব ছবিতে নামকরা চিত্র-তারকা নেই সেগুলো রিলিজ করানো সম্ভব হয়ে উঠবে না। এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ খুবই প্রয়োজন।

আশার কথা এই শিল্পকে বাঁচাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষৎ গঠন করেছেন।

বাংলা ছবির সমস্যা প্রসঙ্গে নানা আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলেও যেটা সবার আগে বলা দরকার তা হল ভাল ছবি এবং পরিচালকের। এ দুটির অভাব আজ সব থেকে বেশি। আজকের বাংলা ছবি দর্শকদের যে মন ভরাতে পারছে না তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। অথচ নতুন ছবির পাশেই পুরণো বাংলা ছবিগুলো দিব্যি চলছে। এর কারণ আগেকার ছবিতে গল্পের টান ছিল। এখনকার ছবিতে গল্প মোটেও জমছে না। বেশিরভাগ চরিত্র অ্যাবসার্ড। ঘটনাগুলোও অবাস্তব মনে হয়। যুক্তিগ্রাহ্য কাহিনী নিয়ে ছবি করলে তা চলতে বাধ্য। সেই সঙ্গে ছবিকে চিত্রগ্রাহী করে তুলতে পারলে তো কথাই নেই। ছবির উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেলে রঙিন হিন্দী ছবির পাশ কাটিয়ে দর্শকরা আবার বাংলা ছবির দিকে ঝুকবেন। ব্যবসায়িক সাফল্যে তখন নানা সমস্যার মেঘ কেটে যাবে।

আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

পূর্বরাগের সরস ছবি

সব ছবিই শিল্প-চিত্র হবে এমন কোন কথা নেই। ব্যবসায়িক-চিত্রও যে সুরুচি-পূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন চিত্র হতে পারে তা বাসু চ্যাটার্জির সাম্প্রতিক হিন্দী ছবি 'ছোটি সী বাত' দেখে বোঝা গেল।

ছবির প্রাক্‌কথনে নতুনত্ব আছে। প্রামাণ্য চিত্রের আঙ্গিকে পরিচালক ধারাভাষ্যের মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকাকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পরিচয়-পর্বে দেখা গেল প্রেমিক অরুণ এবং প্রেমিকা প্রভা দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। কিন্তু একই বাস-ষ্টপের কিউয়ে ওদের রোজ দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই পূর্বরাগের শুরু। প্রভাকে অরুণের ভাল লাগে। কিন্তু অরুণ এতই লাজুক যে মুখফুটে সেকথা প্রভাকে কিছুতেই জানাতে পারছে না। তাই প্রভাকে নীরবে অনুসরণ করা ছাড়া অরুণের আর কোন উপায় ছিল না। প্রেম পর্বের এই প্রাত্যহিকতায় অরুণের নানা কল্পনা এবং স্বপ্নের মধ্যে প্রভাময় জগতের ছবি ফ্ল্যাশব্যাক এবং ফ্যাশ ফরোয়ার্ড-এর মাধ্যমে সুন্দর ব্যক্ত করতে পেরেছেন বাসু চ্যাটার্জি। অনেক না বলা কথা

'ছোটি সী বাত'-এ বিদ্যা সিনহা

শুধু প্রকাশভঙ্গির ব্যঞ্জনায় চিত্রটি প্রাণবন্ত হতে পেরেছে। সেই সঙ্গে নানা অবিস্মরণীয় কৌতুক মুহূর্ত ছবির উপভোগ্যতাকে শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

ছবির দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইচ্ছাপূরণের প্রয়াস দেখা যায়। অরুণ এবং প্রভা ঘটনাচক্রে পরস্পর যখন ঘনিষ্ঠ হতে চলেছে সেসময় প্রভার এক বন্ধুকে দিয়ে যেভাবে ত্রিকোন প্রেমের দ্বন্দ্ব গড়ে তোলা হয়েছে তা এ ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। চরিত্রটি খল-নায়কের রূপ নিয়েছে। এছাড়া লাভ-মেকিং-এর ট্রেনর হিসেবে অভিজ্ঞ এক কর্ণেলের ভূমিকায় অশোককুমারকে যেভাবে অরুণের আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে দেখা গেল তা কৌতুকজনক হলেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বাস্তবে এ ধরণের চরিত্র কি দেখা যায়? ছবির অভিনয়াংশে অরুণ ও প্রভার চরিত্রে অমল পালেকর ও বিদ্যা সিনহার অভিনয় বেশ স্বাভাবিক। অশোক কুমার ও আসরাণী প্রশংসনীয়।

ছবির কলাকৌশল কর্মের মান উন্নত। বিশেষ করে আলোকচিত্র এবং সম্পাদনায় দক্ষতার পরিচয় মেলে। সঙ্গীত পরিচালনায় সলিল চৌধুরী সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছবির দুটি গান সুপ্রযুক্ত।

—চিত্রবিদ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

প্রতি সংখ্যা মাত্র ৫০ পয়সা

ধনধান্যের

পড়ুন ও পড়ান ধনধান্যে

কবি প্রণাম

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর
১১৫-তম জন্ম জয়ন্তী
পালিত হল সারা দেশ জুড়ে।
নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।
কলকাতায় হাজার হাজার
রবীন্দ্রানুরাগী কবিপ্রণাম
জানালেন জোড়াসাঁকোর
ঠাকুর বাড়ীতে, রবীন্দ্রসদনে
এবং অন্যান্য উৎসবমঞ্চে।
জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে
সকাল সাতটায় অনুষ্ঠানের
সূচনা। রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণেও
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে
শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়।
সকাল দশটার পর থেকে
অঝোর বৃষ্টি ধারায় অনুষ্ঠানের
অসুবিধে হয় বটে। কিন্তু
এই বৃষ্টি ছিল বিশ্বকবির
প্রিয় ঋতু বর্ষার শ্রদ্ধানিবেদন।
প্রতিবারের মত এবারও রবীন্দ্রকাননে
এদিন পক্ষকালীনব্যাপী রবীন্দ্র মেলার
সূচনা হয়। রবীন্দ্র জয়ন্তী
উপলক্ষে এদিন কিছু লিটল
ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে এবারও বিশেষ
রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশিত হয়।

বিশেষ রচনা ১৯ পৃষ্ঠায়

পরবর্ত্তী সংখ্যায়

এছাড়া খেলাধূলা, মহিলামহল, সিনেমা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা:
**সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার:
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা**

টেলিগ্রামের ঠিকানা:
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন:
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ: সংখ্যা ২২/১৫ মে ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—
প্রদীপ দাস

পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন: ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক: এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

১৯৫৬ সালে শিল্পনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা ও এক্তিয়ার সুচিহ্নিত করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে মিশ্রঅর্থনীতির প্রবর্ত্তনের ফলে শিল্পোন্নয়নের গতি সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। এরই ফলস্বরূপ বেসরকারী উদ্যোগের পাশে পাশে সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় শুধু যে বৃহদায়তন মৌলিক শিল্পই গড়ে ওঠে তাই নয় ছোট ছোট শিল্পেরও বিস্তার ঘটতে থাকে। তা ছাড়া জাতীয় স্বার্থে অনেক রুগ্ন শিল্পকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে শিল্পোদ্যোগ সমূহ প্রথম দিকে আশানুরূপ ফলপ্রদর্শন করতে না পারায় তাদের সবদিক থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আশার কথা এই শিল্পগুলি ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে দুর্দিন কাটিয়ে সুদিনের মুখ দেখতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন শিল্পোদ্যোগ সমূহের ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বিবরণ সম্প্রতি সংসদে উপস্থাপিত করা হয় তাতে দেখা যায়, ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায় ১২০ টি শিল্প সংস্থায় লাভের পরিমাণ এক বছরে ৬৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৮৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছে। এই শিল্পগুলি ১৯৭২-৭৩ সালে যখন প্রথম লাভ করতে আরম্ভ করে তখন সেই লাভের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮ কোটি টাকা।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করার অন্যতম কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগগুলির উৎপাদন ক্ষমতার আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার। ১৯৭৪-৭৫ সালে ৫৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প তাদের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। আগের বছরে ৪৫ টি শিল্প এটা করতে পেরেছিল। তাছাড়া, আগের বছরে যেখানে ২২ টি শিল্প সংস্থা শতকরা ৫০ থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেছিল, সেখানে আলোচ্য বছরে ২৭ টি শিল্প সংস্থা এটা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই সাফল্যের আরেকটি চাবিকাঠি হচ্ছে এই সব শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সংস্থা সমূহের এই উজ্জ্বল চিত্রের জন্য আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই। পাবলিক ব্যুরো অব এন্টার-প্রাইজের ডিরেক্টর জেনারেলের মতে ১৯৭৫-৭৬ সালে লাভের হার হয়ত ১৯৭৪-৭৫ সালের মত বজায় রাখা যাবে না। প্রধানতঃ উক্ত বছরে প্রথম অর্দ্ধে অভাবনীয় দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির দরুন। কিন্তু গত বছর জুন মাসে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর মূল্যমানে স্থিতিশীলতা এসেছে, শিল্পে শৃংখলা ফিরে এসেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আর বিশদফা নতুন অর্থনৈতিক কার্যসূচীর মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যূনতম বোনাস আইন, শিল্প কারখানায় পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্য রোধের ফলে শ্রমিক অসন্তোষ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কথায় কথায় ধর্মঘট সর্বত্র বন্ধ হয়েছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি আগামী দিনে উৎপাদন বাড়িয়ে লাভের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে পারবে এবং দেশের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করতে পারবে বলে আমাদের আশা।

সাফল্যের একটি দশক

দূরত্ব করায়ত্ব সময় পরাজিত

বিগত দশকে যোগাযোগের সুবিধা প্রচুর বেড়েছে
ভ্রমণের ও জ্ঞানার্জনের পথে বিঘ্নগুলি ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে.

কয়েকটি আভাষ

পূর্বাপেক্ষা তিনগুণেরও বেশি বাড়ীতে রেডিও

2,400টি গ্রামে টি. ভি. অনুষ্ঠান

অন্তর্দেশীয় বিমান চলাচল দ্বিগুণ সম্প্রসারিত

রাস্তায় যানবাহন চলাচল পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ
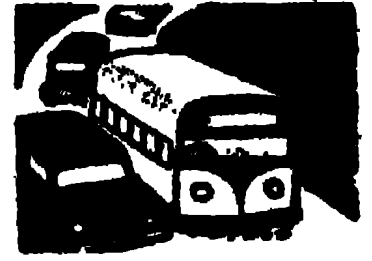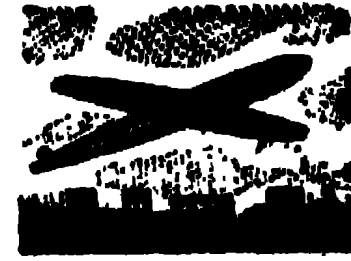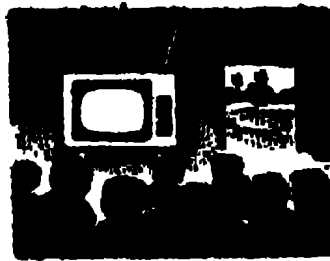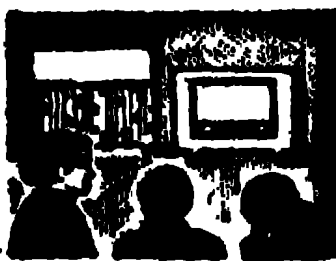
টেলিফোনের সংখ্যা দ্বিগুণ

প্রগতির পরিসংখ্যান

	1965 (মিলিয়ন)	1974 (মিলিয়ন)
রেডিও লাইসেন্স	4	14
টি. ভি. লাইসেন্স	শুধু দুশটি	.16
অন্তর্দেশীয় বিমান চলাচল (যাত্রী কিলো মিটার)	935	1991
রেলে ভ্রমণ (যাত্রী কিলো মিটার)	97.000	1.36.000
যানবাহন	1.1	2.1
টেলিফোন	.86	1.63
সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা	25	33

উপগ্রহ টি.ভি. ও আর্যভট্ট গত বছরের সাফল্য। দেশ আরও আস্থা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে 1976এ পদার্পণ করেছে।

গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

ইন্দিরা গান্ধী

বিষয়টি সম্পর্কে আমি বহুবার বলেছি—তাই নতুন করে এ সম্পর্কে বলার কিছু নেই। তবে এই ধরণের আলোচনাচক্রের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে একারণেই যে এর মাধ্যমে আরো অনেক লোক তাদের মতামত ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাবেন এবং তারা এ বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। গত মাসে বোম্বাইয়ে 'শৃঙ্খলাপূর্ণ গণতন্ত্র' -এ পর্যায়ের এক আলোচনাচক্র বসেছিল। আমি এর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলাম 'গণতন্ত্রে শৃঙ্খলাবোধ'। আবার যদি এর নাম সম্পর্কে আমি পরামর্শ দিই তাহলে বলব এর নাম 'গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের' বদলে 'গণতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ' হওয়া উচিত।

আমরা ভারতীয়রা গণতন্ত্রকে পছন্দ করেছি অন্য কোন দেশকে খুশী করার জন্য নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে একমাত্র গণতন্ত্র ব্যবস্থাই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ উন্নত ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে আধুনিক বিশ্বের কাছে। একটি দেশ কী ধরণের সরকার গ্রহণ করবে তা একান্তই সেদেশের জনগণের নিজেদের ব্যাপার। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের বলার কিছুই নেই। কেননা আমাদের দেশ গণতন্ত্রকে পছন্দ করে নিয়েছে। যে সব শক্তি এই ব্যবস্থাকে হেয় করে তুলবার পরিকল্পনা করছে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেই আমাদের গণতন্ত্রকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে হবে।

আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করা হয় যে পশ্চিমী গণতন্ত্র ভারতের কাছে কি বিদেশী নয়? দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশ কি ঠিকমত গণতন্ত্রকে চালাতে পারে? আমার উত্তর, ব্রিটিশরা আমাদের গণতন্ত্র দিয়েছে—এই কারণে আমরা মোটেই গণতন্ত্রী নই। মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে বলেই এটা আমাদের বস্তু। গণতন্ত্র কারুর একচেটিয়া নয়। অন্যান্য দেশ এর স্বরূপ প্রকৃতির কোন প্যাটেণ্ট বের করেনি। আর আমাদের গণতন্ত্র কোন বিদেশী লাইসেন্সের অধীনও নয়।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও কম্যুনিজম দুটি পরস্পর বিরোধী প্রথা এবং দুটোরই জন্ম পশ্চিমে। কিন্তু, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এগুলোকে গ্রহণ করেছে নানাভাবে সংস্কার করার পর—নিজস্ব মতে।

এমনকি একই দেশে গণতন্ত্রের ধারণার পরিবর্তন ঘটছে। গ্রীক গণতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। এটা সকলেরই জানা যে, এথেন্সে মহিলা ও দরিদ্রদের রাজনীতিতে কোন অধিকার ছিল না। এ সত্ত্বেও গ্রীক গণতন্ত্র দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে টিঁকে ছিল। তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের দুর্গ বৃটেনেও গত শতাব্দীতে গণতন্ত্র ছিলই না। অথচ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা সেখানে ছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ার পরেই বৃটেনে গণতন্ত্রের সূত্রপাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের মহিলারা রাজনৈতিক অধিকারের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে এবং ভোটাধিকার আদায় করে। তাও আজ ৬০ বছর আগে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রথম প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে সহ্য করার ক্ষমতা। গত কয়েক মাসে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছি।

দ্বিতীয়ত, যতই এর গুণগত উৎকর্ষ থাকুক না কোন ব্যবস্থাই নিরাকার অবস্থায় বাঁচতে পারে না। গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয় হলেও, দেশ আরো বড়। দেশের একতা ও সংহতি রক্ষার পক্ষে কোন্ শাসন ব্যবস্থা কতটা কার্যকর তার ওপরেই নির্ভর করছে সেই ব্যবস্থার উপযোগিতা।

আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আমাদের দেশের ভাষা, ধর্ম ও প্রথার বিভিন্নতাকে একভাবে ধরে রাখতে পারে। এর কারণ, গণতন্ত্রই সকল জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়।

দেশের শাসন ব্যবস্থার তৃতীয় প্রয়োজন হল তা দেশের সমস্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

'গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনা চক্রে প্রধানমন্ত্রী

স্বার্থের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। ইতিহাস কখনোই এই ধারণাকে সমর্থন করে না যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে দ্রুত মানুষের উন্নতি ঘটাতে পারে। এমনকি যারা চীনের উন্নতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারাও উপলব্ধি করতে পারছেন, গণতান্ত্রিক ভারত যা উন্নতি করেছে তার তুলনায় চীনের উন্নতি ততটা চমকপ্রদ নয়। অবশ্য একথা সত্যি শ্রেণীবৈষম্য সেখানে কম।

ভারতীয় পরিবেশ গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছে। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ঠিক এজন্যই অগণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক নয় এমন কিছু বিষয়কে অনেক সময় গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভুল করা হয়। অ্যাংলো-স্যাক্সন আইনব্যবস্থায় আইনকে কি প্রধানত সম্পন্ন শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা হয়নি? রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ইংলণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের আইনে এই ধরণের অনেক ত্রুটিই রয়ে গেছে। এগুলোকে সংশোধন করতে হবে যাতে সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে কাটিয়ে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। জনগণের সার্বিক কল্যাণের সঙ্গে যখন ব্যক্তির সুযোগসুবিধার সংঘাত ঘটে তখন বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ স্পষ্টতই প্রাধান্য পাবে।

এখন আমরা এক বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, ভারত গণতন্ত্রকে বর্জন করেছে। দুঃখের বিষয়, কিছু ভারতীয় আবার এই অপপ্রচারে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে গত বছর জুন মাসে কিছু বিরোধীদল যৌথভাবে এক অভিযান চালায়। এই গণতন্ত্র-রক্ষাকারীদের খুব সহজেই চেনা গেছে। এরা হল, জনসংঘ ও তার সশস্ত্র শাখা আর-এস-এস, আনন্দ-মার্গ, নকশাল, সি-পি-এম, ডি-এম-কে, স্যোস্যালিষ্ট দল সংগঠন কংগ্রেস এবং বি-এল-ডি।

এদের প্রত্যেকের পূর্ব রেকর্ড কি? প্রথম চারটি দল পুরোপুরি হিংসায় বিশ্বাসী; তাদের মতাদর্শকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে চালিয়ে সন্ত্রাস ও ভয় প্রদর্শন করাই হল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে ডি-এম-কে'র আগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। গণতান্ত্রিক এবং অহিংস পদ্ধতির প্রতি সোসালিষ্ট পার্টির আস্থাও যথেষ্ট নয়। এই দলটি সর্বদাই নাশকতামূলক কাজ ও চরিত্রহননের মাধ্যমে জনজীবনকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছে।

সাংগঠনিক কংগ্রেস ও বি-এল-ডি হয়ত সত্যিই সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী কিন্তু এই দলের নেতারা গুজরাট ও বিহারে সর্বাধিক সংবিধান বহির্ভূত ও অগণতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করতে দ্বিধা করেনি। ঘেরাও, ভীতিপ্রদর্শন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জোর করে পদত্যাগে বাধ্য করানো, বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য অনশন এইসব আচরণ সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী।

আর যেসব বিদেশী শক্তি ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন তাদের কেইবা নিষ্কলঙ্ক? তারা যে একনায়কতন্ত্রী ও সামরিক শাসনের পক্ষে ওকালতি করেছে তা কি এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়?

বড় বড় কাগজ তাদের পক্ষে। দেশেও বড় বড় কাগজগুলি কঠিন আর্থিক সংকটের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করে আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে চেয়েছিল।

লণ্ডনের একটি সংবাদপত্র আমাদের তথাকথিত আত্মগোপনকারী নেতাদের সম্পর্কে নানারকমের গাঁজাখুরি গল্প প্রচারে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। অথচ নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা লিখতে চান তাদের লেখা ছাপানোর জন্য তাদের জায়গা নেই।

অনেক দেশই আমাদের বিপক্ষে, একথা ভাববার কোন কারণ নেই। প্রত্যেক দেশেরই সরকারের নিজস্ব নীতি আছে। কিন্তু যেসব দেশের সংবাদপত্রে আমাদের নিন্দা করা হয় সেসব দেশেও বেশ কিছু সংখ্যক লোক ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

বর্তমান লোকসভার মেয়াদ এক বৎসর বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে সংবিধানসম্মতভাবেই সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। গত বছর ২৫শে জুন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হবার পর থেকে স্বল্পকালীন সময়ে যে অর্থ-নৈতিক প্রগতি ঘটেছে তাকে সংহত করার জন্য দেশ যাতে উপযুক্ত সময় পায় সেজন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

সাংবিধানিক বিধি

বর্তমান লোকসভার মেয়াদ এক বৎসর বৃদ্ধির জন্য আনীত একটি বিল সংসদের উভয় সভাতেই অনুমোদন লাভ করে। এবছর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিপুল ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হয়। রাজ্যসভায় ৬ই ফেব্রুয়ারী বিলটি অনু-মোদিত হয়। এবছর ১৮ই মার্চ পঞ্চম আর সংসদ পুরো বিতর্কের পর সব দিক বিবেচনা করে বিলটি অনুমোদন করেন।

জরুরী অবস্থার আগের পরিস্থিতি

কথাটা আজ কারোরই অজানা নেই যে গতবছর ২৬শে জুন জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে দেশের পরিস্থিতি কতখানি ঘোরালো ছিল। এখন যাঁরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে নির্বাচনের ধুয়ো তুলছেন তখন তাঁরাই আবার দেশের গণতন্ত্রকে বানচাল করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সরকার যখন অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তখন কিছু বিরোধীদল ও নাশকতাকারী প্রতিষ্ঠান সুযোগ বুঝে বিশৃঙ্খলামূলক আন্দোলন ও বিক্ষোভের মাধ্যমে অশান্তির বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

এই গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলি গণতন্ত্রকে বানচাল করে দেবার চেষ্টায় ছিল। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগোষ্ঠী জেনে শুনেই স্বাধীনতাকে একটা যা খুশী তাই করবার ক্ষমতা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন, নিজেদের অধিকার অপব্যবহার করে অন্যের অধিকারে ঘা দিয়ে হিংসার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করছিলেন। তাদের ক্রিয়াকলাপ এমন কিছু ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে প্ররোচনা যুগিয়েছিল যারা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী শ্রী এল.এন.মিশ্রের হত্যা, ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী এ.এন. রায়কে হত্যার চেষ্টার মত ভয়ানক অপরাধের জন্য প্রত্যক্ষভাবে—দায়ী।

দেশে তখন সর্বত্র—বিশৃঙ্খলা, শ্রমিক অসন্তোষ এবং একটা শৈথিল্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল।

লোকসভার নির্বাচন কেন স্থগিত হল

বিশেষ প্রতিনিধি

বৎসর অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যে লোক-সভার মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল তা সংবিধানের ৮৩নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারা বলে স্থগিত রাখা হয়েছে। অনু-বিধিতে বলা হয়েছে, দেশে যখন জরুরী অবস্থা চলবে তখন লোকসভার মেয়াদ সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধভাবে এক সঙ্গে এক বছর পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। কিন্তু জরুরী অবস্থা অবসানের পর ছ'মাসে-এর বেশী বাড়ানো চলবে না। সংবিধানে এরকম বিধি থাকার কারণ সংবিধান রচয়িতাদের দূরদর্শিতা।

স্বাভাবিক অবস্থায় পাঁচবছর বাদে লোকসভার নির্বাচন হওয়া যেমন সংবিধান-সম্মত বিধি, তেমনি এও সংবিধানসম্মত বিধি যে দেশে যখন জরুরী অবস্থা থাকবে তখন সংসদ লোকসভার নির্বাচন স্থগিত রেখে তার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু একটি প্রস্তাব বিলের আকারে পেশ করেছিলেন।

১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে গুজরাটে নির্বাচিত বিধানসভাকে ভেঙ্গে দেবার দাবী তুলে এবং বিধানসভার সদস্যদের পদত্যাগে বাধ্য করে এক হিংসাত্মক আন্দোলন সুরু হয়। ঠিক অনুরূপ ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং হিংসাত্মক আন্দোলন বিহারেও দেখা দেয় যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরে বিরোধী দলগুলি এবং অন্যান্যরা যে ধ্বংসাত্মক ও সংবিধানবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা এখনো অনেকের স্মৃতিপটে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে। ঐসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ যদি অব্যাহতভাবে চলতে দেওয়া হত তাহলে শান্তিপ্রিয় ও আইনমান্যকারী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন তো বিপন্ন হতই,—সেই সঙ্গে জাতির নিরাপত্তাও যথেষ্ট ক্ষুন্ন হত। গণতন্ত্রের নামে

লোকসভার মেয়াদবৃদ্ধি সম্পর্কিত বিলের বিতর্কের জবাবে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিছু বিরোধী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার দাবীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, একথা কি ঠিক যে ২৬শে জুনের আগে পর্যন্ত যা ঘটেছে তা স্বাভাবিক অবস্থা? এবং তা কি আবার ফিরিয়ে আনা উচিত?

বিরোধীদলগুলি যে স্বাভাবিক অবস্থার দাবী করেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে পর্যন্ত তার অর্থ ছিল বিশৃঙ্খলা, শিল্প-অশান্তি এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে শৈথিল্য। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী একে অস্বাভাবিক অবস্থা আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করেন, "প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘকাল যে অ-স্বাভাবিক অবস্থা দেশে বিরাজমান ছিল তা যদি আবার ফিরিয়ে আনা হয় তবে তার অর্থ হবে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু।"

এই গণতন্ত্রের অপমৃত্যু রোধ করতে, সংকটপূর্ণ অবস্থার হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়ে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলতে এক বৃহত্তর সংবিধানসম্মত পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা এই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছে। নিঃসন্দেহে আজ একথা বলা চলে যে জরুরী অবস্থা দেশের সাধারণ বাতাবরণে একটা পরিবর্তনের হাওয়া এনেছে। প্রকৃতপক্ষে, স্বাভাবিক অবস্থা বলতে যা বুঝায় জরুরী অবস্থাই সেটা আমাদের দিয়েছে। দেশবিরোধী এবং সমাজ বিরোধীদের দমন করা হয়েছে কিন্তু তাদের সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করা যায়নি। তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা দরকার। এ অবস্থায় নির্বাচনের অর্থ জরুরী অবস্থায় প্রাপ্ত স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির ব্যাঘাত হওয়া। যদি এই বাতাবরণের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলতে ও সমাজবিরোধীদের কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সেকথা বিবেচনা করেই সংসদকে বর্তমান লোকসভার মেয়াদ একবৎসর বাড়াতে হয়েছে। এখন চাই প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ। একটি নির্বাচন সংঘটিত করার জন্যে শক্তি, অর্থ ও সময় ব্যয় করার মত উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি। জরুরী অবস্থা আনয়নের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁরা এখনো সমূলে বিনষ্ট হয়নি। শৃঙ্খলা, কঠিন পরিশ্রম, অধিক উৎপাদন এবং প্রগতির বর্তমান বাতাবরণকে দেশ কখনই ব্যাহত হতে দিতে পারেনা।

বিশদফা কর্মসূচী ও নবদিগন্ত

গত বছরের ১ লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে ত্বরান্বিত করেছে তা সর্বজনবিদিত। এই কর্মসূচী অর্থনৈতিক অসাচ্ছন্দ্যতার কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে এক বিরাট অস্ত্রোপচারের কাজ করেছে। এর আওতায় বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে গ্রামাঞ্চল যেখানে রয়েছে সত্যিকারের ভারতবর্ষ। জমির নথিপত্রাদি সমাপ্তিকরণ, উদ্বৃত্তজমির দ্রুত সুষ্ঠু বণ্টন, কৃষিঋণ স্থগিতকরণ, অতিদরিদ্রের ঋণভার লাঘব, ও ক্ষেত্রবিশেষে মকুব, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ দান, বেগার প্রথার অবসান, বাস্তুহীনদের লক্ষ বাস্তুজমি দান, ন্যূনতম কৃষি মজুরী সংশোধন ইত্যাদি ব্যবস্থা নেবার ফলে আজ গ্রামের মানুষরা আশার আলো নিয়ে ভবিষ্যতের পানে তাকাতে পারছেন। এই কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। শিল্পক্ষেত্রে এক সুন্দর শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ভোগ্যপণ্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা কেটে গিয়েছে। সবকিছুই সহজপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাবাজ ও আয়কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থা নেবার ফলে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই যেসব অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাকে সংরক্ষণ করা দরকার। নির্বাচন ব্যয় বহুল ব্যাপার। একে এক বছর স্থগিত রেখে অর্থনীতিতে যে শৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে তাকে রক্ষা করা দরকার। এখন নির্বাচন হলে আর্থিক শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হতে পারে, শিল্পে শান্তি ক্ষুন্ন হতে পারে। তাই চলমান ঘটনা প্রবাহ থেকে এটাই সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে বর্তমান লোকসভার মেয়াদ এক বৎসর বৃদ্ধি শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থের কারণেই হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু কিছু বিরোধীদল এই অভিযোগ তুলছেন যে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হতে ভয় পেয়েই এ পথে পা বাড়িয়েছেন। বলাবাহুল্য এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসার। কারণ আমাদের সাধারণ জীবনধারায় এতো শান্তি ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তি ঘটেছে যে যদি এখনই নির্বাচন হয় তাহলে ক্ষমতাসীন দল যে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই বড় কথা নয়, তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জরুরী অবস্থায় আমরা যা পেয়েছি তার সংহতিসাধন। নির্বাচনের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিয়ে তার চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত দেশের অর্থনীতি যাতে জোরদার হয়, অভ্যন্তরীণ নাশকতাকারীর হাত থেকে দেশ যাতে মুক্ত হয়, বহিরাক্রমণের যাতে উপযুক্ত মোকাবিলা হয়—ইত্যাদির উপর।

পরিশেষে আরেকটা কথা বলা যেতে পারে যে এই নির্বাচন স্থগিত মোটেই নতুন নয়, কারণ ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশেও জরুরী অবস্থায় নির্বাচন স্থগিতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কঠোর পরিশ্রম, প্রশাসনিক দক্ষতা, শৃঙ্খলাময় এক প্রগতির নবদিগন্তের সূচনা করে জরুরী অবস্থা অনুঘটক শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস ফিরে আসছে। যেসব সমস্যাদি জরুরী অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী তার সমাধানের তাগিদেই জাতীর শক্তিকে সুদৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত করার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। এ সময় হবে, কাজের মাধ্যমে এগিয়ে চলার নীতিকে ফলবতী করার। বৃথা বাক্যব্যয় বা হৈ হুল্লোড়ের নয়। তাই বর্তমানে নির্বাচন স্থগিত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতই হয়েছে।

ভূদানের রজতজয়ন্তী

শান্তিকুমার মিত্র

বিঘা কাঠা শতক, এসব অঙ্কে ভূদানযজ্ঞের হিসাব নিকাশ করতে গেলে খুব একটা ভরসা পাবেন না। একজন প্রবীণ সর্বোদয় পদযাত্রী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন। ভূদানযজ্ঞের রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে নানা স্থানে পদযাত্রা চলছে। 'আমাদের মন্ত্র—জয় জগৎ', 'আমাদের তন্ত্র—গ্রাম দান', এই সব ধ্বনি-সম্বলিত ফেস্টুন, পোষ্টার নিয়ে ছোট ছোট দল শান্তি সুশৃঙ্খল পদযাত্রায় বেরিয়েছেন। তাঁদের ধরেছি। ধরেছি মানে প্রশ্ন রেখেছি, ভূদানে কি এমন সাড়া মিললো? প্রশ্নে আমার সংশয় প্রকাশ পেয়ে থাকবে। তাতে প্রবীণ সর্বোদয় কর্মীর ঐ প্রত্যুত্তর। তাঁর কথা, দেখুন, ভূদান একটা ভাব, একটা আদর্শ—বৈপ্লবিক আদর্শ। কোনও মেডইজি নেই এর। সময় লাগে। তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, ভূদান আন্দোলনের ফলে একটা বাতাবরণ, একটা অনুকূল হাওয়া কি সৃষ্টি হয়নি দেশে? ভূমিহীনদের সমস্যাটা কি গুরুত্ব পায়নি? সম্ভবতঃ ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারী জমি বিলি, পাট্টা বিতরণের প্রতিই তাঁর ইঙ্গিত। সম্ভবতঃ কেন, নিখিল ভারতীয় ক্ষেত্রের অনেক নেতাই বলেছেন, ভূদান আদর্শের প্রেরণা থেকেই ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিলির প্রকল্প নেওয়া।

তবু একটা হিসাবনিকাশ প্রাসঙ্গিক তো বটেই। তা সে প্রশ্নে পশ্চিমবাংলার ভূদান আন্দোলনের পুরোধা, নেতা শ্রী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী আশাবাদী। রজত জয়ন্তী বৎসরের আগে পর্যন্ত এরাজ্যে ভূদান হিসাবে ১৬ হাজার একর জমি পাওয়া গিয়েছে; তার মধ্যে ৮ হাজার একর জমি বিতরণ করা হয়েছে। আর এই রজত জয়ন্তী বর্ষে এখন পর্যন্ত শ' চারেক একর জমি বিলি সারা হয়েছে। চারুবাবু বয়সে প্রবীণ। এক সময় এ রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তারপর যেদিন থেকে ভূদান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন, রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। ভাণ্ডারী মশাই বলছিলেন, পরিসংখ্যান বলে যা উল্লেখ করা হচ্ছে, তা কিন্তু কিছুটা বিভ্রান্তিকর। একটা গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামদানের সঙ্কল্প নিলেন, অতএব সঙ্গে সঙ্গে সেটি গ্রামদানী পল্লী হয়ে গেল, এটা ভাবা কিন্তু ভুল। সঙ্কল্প বাস্তবে রূপ নিলেই তবে পূর্ণতা। পশ্চিমবঙ্গে ৭০০ গ্রাম দানের কথা বলা হয়, আসলে ৩০-৩৫ টি সত্যিকারের উৎসর্গীকৃত গ্রাম। বাকি গ্রামগুলি প্রস্তুতির পথে।

সারা ভারতে তো লাখ খানেকেরও বেশী গ্রামদান হওয়ার কথা শুনি, তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন করি। চারুবাবু বললেন, ঐ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত গ্রাম। অর্থাৎ ভাবটা জেগেছে। তবে পুরোপুরি গ্রামদানী পল্লী হওয়া অনেক কৃতসাপেক্ষ। যেমন, গ্রামের বিশভাগের এক ভাগ জমি গরীবদের দিয়ে দিতে হবে। গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রতি বছর ফসলের ৪০ শতাংশ বা তার কিছু কম গ্রাম-তহবিলে দিতে হবে। সব প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গ্রামসভা হবে। না না, পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার সে গ্রামসভা নয়। পাছে এই ভুল বোঝাবুঝি হয়, সেজন্য এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে গ্রাম পরিষদ। গ্রাম পরিষদে যা সিদ্ধান্ত হবে, সর্বসম্মত হওয়া চাই, ভোটাধিক্যে নয়। গ্রামের জমির শতকরা ৭৫ জন মালিক রাজি হলেই তবে গ্রামদান করা যায়। এজন্য গ্রামদান আইন আছে।

ভূদান, গ্রামদান, এসব সংজ্ঞা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সত্যই কি এবারে আমাদের দেশের ভূমিসমস্যা মিটবে, বা ভূমিহীনদের ভূমি ক্ষুধা? সরাসরি প্রশ্ন ছিল আমার। সেই সঙ্গে যোগ করি, এ অভিযোগ কি অস্বীকার করবেন, ভূদান যজ্ঞে যা জমি আসছে তার বেশির ভাগই অনুর্বর, পতিত জমি? চারুবাবু স্বীকার করেন, হাঁ, এরকম হয়েছে। যেখানে হয়েছে, বুঝতে হবে সেখানে মানুষ ভূদানের আদর্শটা বোঝেন নি, প্যার করেন নি। তবে পশ্চিমবঙ্গে একটিও খারাপ জমি দেখাতে পারবেন না, চারুবাবুর কণ্ঠে গভীর আত্মবিশ্বাস। ওঁর কাছেই শুনি কবে কোথায় ভূদান আন্দোলনের সূত্রপাত; বিনোবাজীর পাদ-পরিক্রমার ইতিবৃত্ত।

আচার্যভাবের কথায়ই বলি। ১৯৫১র ১৮ই এপ্রিল অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় তিনি পদযাত্রা শুরু করে ভূদান আন্দোলনের সূচনা করেন। তখনই তিনি বলেন, ভূদান যজ্ঞ হল অহিংসার প্রয়োগে জীবনের রূপান্তর সাধনের এক পরীক্ষা। তিনি ভূমিদানের উদারভাবে ও প্রীতিবশে ভূমিহীনদের জন্য জমি ছাড়তে আবেদন জানান। সেই সূত্রপাত। সেই বিচারে ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তী বৎসর চলছে। বিনোবাজী এই বৎসর সীমা ১৯৭৬র ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছেন। সারা বৎসর সর্বোদয় আদর্শের ব্যাপক প্রচার চলার আয়োজনও এ উপলক্ষে। এক নজরে গোটা দেশে ভূদান আন্দোলনের ফলাফলটা এই: সারা দেশে ভূদানে ৪২,০৬,৭৫৪ একর জমি পাওয়া গিয়েছে। এর ভিতর ১২,৯৬,২৫৯ একর জমি বিলি সারা। ভূদান-গ্রামদানে বিহার প্রথম। দান মিলেছে ২১,১৭,৪৫৭ একর জমি। গ্রাম দানের সংখ্যা বিহারে ৬০,০৬৫।

পৌণার আশ্রমে আচার্যভাবে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন

সারা দেশে গ্রামদান ১,৬৮,১০৮টি। পশ্চিমবঙ্গে এ আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৫২র ২৬শে মে। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় হটুগঞ্জে এ নিয়ে প্রথম গঠনকর্মী সম্মেলন হয়। শ্রীমতী প্রভানলিনী ভাণ্ডারী তার ৮৫ বিঘা জমির এক চতুর্থাংশ ২০ বিঘা জমি ভূদানযজ্ঞে দেন। ভূদান কর্মীদের ভাষায় এরাজ্যে সেই 'ভূদান গঙ্গোত্রীর' উদ্ভব হল।

তা পশ্চিমবঙ্গে ভূদান আন্দোলনের অনেকটা নিঃশব্দ পদচারণা। কোনও দিনই সংবাদে তেমন শিরোনামা পায়নি। কিন্তু একদল নিষ্ঠাবান কর্মী এ নিয়ে 'মেতে' রয়েছেন। মেদিনীপুরের ক'জন কর্মীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তারা বলেছেন হাঁ, 'মেতে থাকা' বলতে পারেন, তবে সদর্থে। হাঁ, তারা আনন্দে রয়েছেন। এই রজতজয়ন্তী বর্ষেই সেদিন তমলুকের নন্দীগ্রাম থানার 'জামবাড়ি' গ্রামদানী পল্লীর তালিকাভুক্ত হয়েছে। জমি বিতরণ শেষ। কিন্তু এই যে পাদপরিক্রমা করছেন, কিছু সাড়া পাচ্ছেন? জামবাড়ি না হয় ব্যতিক্রম। আমার সংশয় কাটে না কিছুতেই। ওদের উত্তর, সব রকম অভিজ্ঞতাই হচ্ছে। ধীরে ধীরে জাগৃতি আসছে। চারুবাবুদের বিশ্বাস, জমি বা ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান এই ভূদানের পথ ছাড়া উপায় নেই। 'সর্বোদয়' পত্রিকায় সুদিন ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী যে বিশদফা কর্মসূচী দিয়েছেন, তার অনেকগুলি সর্বোদয় লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি। যেমন, দরিদ্রকে ভূমিদান, তার জন্য বসতবাড়ি বা কুটির সংস্থান, দাসপ্রথা বিলোপ ইত্যাদি। অর্থাৎ ভাবগত ঐক্য যথেষ্ট। তা কিছু অস্বীকার করি না। অন্য এক প্রবীণ পদযাত্রী বলেন, বুঝেছি, মন খুঁৎ খুঁৎ করছে ভূদানের এই মন্থর গতিতে, তাই না? সঠিক শব্দটা পেয়ে সায় দিই, তাই। তিনি বলেন, সব অভিজ্ঞতাই তো ঘটছে। এই দেখুন না এবারের পদযাত্রায় হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রায় ২৮ বিঘা ধানী জমি পাওয়া গেল। আবার ভিন্ন অভিজ্ঞতাও ঘটে। অনঙ্গ বিজয় বাবুর অভিজ্ঞতা দেখুন। পশ্চিমবঙ্গ সর্বোদয় মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীঅনঙ্গ বিজয় মুখোপাধ্যায় তার জেলা হুগলির গ্রামের অভিজ্ঞতা লিখছেন: পঞ্চম দিন একটি গ্রামে গেলাম। সেখানের গ্রামসভার অধ্যক্ষ ৭২ বছর বয়স, গ্রামের সকলের সঙ্গে পরামর্শ না করে ঝোলা কাঁধ থেকে নামাতে দিলেন না। একজন উৎসাহী যুবক এসে জানালেন, গ্রামের যুবশক্তি কোন অচেনা, অজানা লোকের কাছ থেকে, যে জিনিষ সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, সে নিয়ে জানতে শুনতে চায় না। আপনি পথ দেখুন। অনঙ্গবিজয় বাবু অবশ্য হতাশ হন নি, তাঁর কথা 'দোষ তো নিশ্চয়ই আমার'। ঐ প্রবীণ পদযাত্রীর সঙ্গে কথায় কথায় চলে এসেছি। উনি বলছেন তখন, বিশ্বাসটাই বড় কথা। তাদের কর্মী কম, তাতে কী? এটা তো ঠিক, ভূমি সমস্যার সমাধান না হলে গ্রামে স্থায়ী শান্তি আসবে না। চারুবাবুরও সেই কথা। জমি সমস্যার মিটমাট হবে কী করে? তিনটি পথ আছে। এক, হিংসার পথে। দুই, আইনী পথে। তা জমির মালিকানার উর্দ্ধসীমা কত কমানো যায়? কাজেই কতই বা উদ্বৃত্ত জমি মিলবে? তিন, স্বেচ্ছা দানে। নিশ্চয়ই হিংসার পথ নেওয়ার কথা ওঠে না। আইনের পথের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছা দানের পথও নিতেই হবে। সেটাই তো ভূদান। 'হাঁ, সময় লাগবে। সর্বোদয় একটা মানসিক বিপ্লব। বিশ্বাস জাগাতে হবে।' তা ওঁরা বিশ্বাস নিয়েই পদযাত্রায় বেরিয়েছেন। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা অবান্তর, ওঁদের পাগলই বলি বা দুরাশাবাদীই বলি, নিঃসন্দেহে ওঁরা আলাদা জগতের স্বপ্ন দেখছেন, 'জগৎ' সৃষ্টি করে নিতে চাইছেন। মহাত্মা গান্ধীর পদাঙ্ক ধরেই বিনোবাজী এসেছেন, বিনোবাজীকে ঘিরে ওঁরা এসেছেন। হোক কম, ত্যাগে, বিশ্বাসে, নিষ্ঠায় 'জগৎ জয়' করতে বেরিয়েছেন। ওদের মন্ত্র 'জয় জগৎ'। দ্বিধান্বিতদের ওঁরা জবাব দেবেনই। সেই সঙ্কল্পই ওঁদের।

সময়, দুঃসহ সময়

বিদ্যুৎ মল্লিক

"........ওরে নক্ষণ রে, তুই কোথায় গেলি বাপ্, একবার কথা বল। ও নক্ষণ, নক্ষণ রে........"

সেই সকাল থেকে শিয়ালদা স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে বসে লক্ষণের মা ক্রমাগত কেঁদে চলেছে। কারণ আজই ভোরবেলা তার বড় ছেলেটা মারা গেছে। একটা ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে লক্ষণের মৃতদেহটা জড়িয়ে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখেছে। পাশেই লক্ষণের মা পা দুটো ছড়িয়ে বসে অঝোর নয়নে কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ-মুখ সব ফুলে গেছে।

লক্ষণের বাবা পাশে দাঁড়িয়ে মুখস্ত করা মন্ত্রের মত ক্রমাগত বলে চলেছে, "বাবু, দয়া করে কিছু দিয়ে যান বাবু; ছেলেটা মরে গেছে, গতি করতে হবে।"

ক্রমাগত কথাটা বলতে বলতে তার চোয়াল ভারি হয়ে এসেছে। গলা ধরে গেছে। তবু বলে চলেছে। তার চোখে কিন্তু একটুও জল নেই।

অসংখ্য ট্রেনযাত্রীর ভীড়। কেউ নিতান্ত ব্যস্ততায় হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছে। কেউ ছুটছে, কেউ ধাক্কা খাচ্ছে, একে অন্যের সঙ্গে। তারই মাঝ থেকে কেউ কেউ বিশেষ কৌতূহলে মৃতদেহটার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে কিছুক্ষণ; তারপর যাবার সময় দু'দশ পয়সা করে মৃতদেহটার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে।

একজন বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর হঠাৎ এক সময় ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না তিনি; একটা টাকা মৃতদেহটার ওপর ফেলে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ভিখারী বৌ ছুটে এসে লক্ষণের মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কি যেন বলে চলে গেল। লক্ষণের মা অমনি আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

লক্ষণের বয়েস কতই বা হবে? খুব বেশী হলে বছর চারেক। কিন্তু দেখে মনে হত বছর দেড়েক কি দু'য়েকের বেশী হবে না। হাড় বার করা রোগা ঝিরঝিরে কঙ্কালসার চেহারা; পেটটা বুকের নিচে থেকে হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম বড় হয়ে গেছে। পাটকাঠির মত সরু সরু পা দুটো দেখে মনে হত যেন দুটো সারসের ঠ্যাং। একখানা ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে হলদে রঙের ছোট্ট দুটো পায়ের পাতা বেরিয়ে রয়েছে। ময়লা কাপড়টার ওপর অসংখ্য মাছি ছেঁকে ধরেছে। মাছিগুলো কাপড়ের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। লক্ষণের মায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কোলের মেয়েটা কোথায় ছিল, টলতে টলতে এগিয়ে এসে মৃতদেহটার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তাই দেখে পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক লক্ষণের মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই যে, মেয়েটাকে টেনে নাও না, দেখতে পাচ্ছ না?"

লক্ষণের মা অমনি মেয়েটার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে নিজের কাছে টেনে নিল। মেয়েটা পরম নিশ্চিন্তে মায়ের বুকের দুধ খেতে লাগল।

এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লক্ষণের মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ছেলের কি হয়েছিল?"

লক্ষণের মা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "জানি না মা কি হয়েছিল। কাল সারা দিন সারা রাত বমি করেছে। বাছা আমার চোখ তুলে চায়নে, কিছু খায়নে, দাঁতে বাড়ি দিয়ে চলে গেল। গরীব মানুষ মা, খেতে পাই না, বাছাকে তাই ওষুধ খাওয়াতে পারলুমনি। বাছা আমার রাগ করে চলে গেল। কোথা যাই মা, আমি এখন কি করি, আমার বুকটা যে শূন্য হয়ে গেল মা।"

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বলতে পারলেন না; দশটা পয়সা ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তখনো লক্ষণের মা বসে, আর লক্ষণের বাবা সেই মুখস্ত করা কথাগুলো একটানা বলে চলেছে।

হঠাৎ জায়গাটা একটু ফাঁকা হতে লক্ষণের বাবা লক্ষণের মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এই, আরও জোরে জোরে কাঁদ, নইলে লোকে পয়সা দেবেনি।"

লক্ষণের মা তাই আবার চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

লক্ষণ যখন ভোরবেলা মারা যায় তখন বিশুর মা-ই লক্ষণের বাবাকে মতলবটা দিয়েছিল। বলেছিল,—"ও নকার বাপ্, এই ফাঁকে কিছু কামিয়ে ন্যাও। মরা ছেলেটাকে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে বস, নোকে অনেক পয়সা দেবে।"

বিশুর মায়ের কথাটা লক্ষণের বাপের মনে ধরেছিল। সে তাই তক্ষুনি মরা ছেলেটাকে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে বসে পড়ল।

লক্ষণের মা মুখে কিছু বলেনি, তবে মনে মনে কথাটাকে উপেক্ষা করতেও পারেনি। সেই মুহূর্ত্তে তার চোখের সামনে কতগুলো জ্বালাময় দিনের ছবি ফুটে উঠেছিল। প্রতিদিন প্রতি পল গুণে গুণে এই দুঃসহ ফুটপাথ-জীবন ভোগ করতে করতে, আঘাত সইতে সইতে, আর হোঁচট্ খেতে খেতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এই রুক্ষ মরুময় জীবনের মাঝে যেমন করে হোক একটুখানি সুখের আলো দেখার জন্যে তার মন-প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। সেখানে এই মৃত্যু তার কাছে শত বেদনার হলেও জীবন আর জীবিকার দাবি তার কাছে আরও বড় হয়ে দেখা দিল। তাই এই হিংস্র সময়টা তাকে, তার মাতৃত্বকে, তার দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা-বাৎসল্য, সব কিছুকে মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রাস করে নিল। একটা বিরাট শোকের পাহাড় ভেঙ্গে জীবন-ধারণের কুৎসিত দৈত্যটা ওদের সমস্ত মানবিকতার ফুলগুলোকে দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে গেল।

এক সময় লক্ষণের মা ক্লান্ত স্বরে লক্ষণের বাবাকে বলল, "ওগো, এবার চল, বাছাকে নে'যাই। বাছা আমার সেই সকাল থেকে পড়ে রয়েছে।"

লক্ষণের বাবা অমনি রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, "থাম্ না, যাই এই; আর কিছু পয়সা হলেই উঠে পড়ব।"

তারপর দেখতে দেখতে বিকেলও গড়িয়ে গেল। তখনো লক্ষণের বাবার খেয়াল নেই। আজ যেন একটা নেশা তাকে পেয়ে বসেছে—মুঠো মুঠো পয়সার নেশা, এক থালা ভাতের নেশা, অনেকগুলো রুটির নেশা, ছোট মেয়েটার মুখে এক ঝলক হাসির নেশা।

মেয়েটার কথা মনে হতেই লক্ষণের মুখটা মনে পড়ে গেল তার। সে যেন দেখতে পেল, অসংখ্য মানুষের ভিড়ে তার চার বছরের রোগা উলঙ্গ ছেলেটা ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

কথাটা মনে হতেই লক্ষণের বাবার চোখের পাতা দুটো ভিজে এল। এতক্ষণে যেন সে সম্বিত ফিরে পেল।

এমন সময় বিশুর বাবা এসে বলল, "এই শালা, তোর কি আক্কেল রে! এখনো মড়াটাকে এখানে ফেলে রেখেছিস্! তুই কি মানুষ না জানোয়ার? চল্ শিগ্‌গীর, ছেলেটাকে গতি করতে হবে না?" বলে সে লক্ষণের মৃত দেহটা তুলে নিল দু'হাতে।

লক্ষণের বাবা অমনি ছুটে এসে কাপড় সরিয়ে লক্ষণের মৃত মুখটা একবার দেখল। তারপর ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বলল, "ওরে লক্ষণ রে, আমি জানোয়ার হয়ে গেছি; আমি আর মানুষ নেই রে, মানুষ নেই......।" বলতে বলতে বিশুর বাবার কোমরটা জড়িয়ে ধরে সে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল।

লক্ষণের মা ইতিমধ্যে পয়সাগুলো সব কুড়িয়ে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। এবার সে এগিয়ে এসে লক্ষণের বাবার হাতটা ধরে তুলে বলল, "ওগো আর কেঁদে কি করবে? চল, বাছাকে এবার নে'যাই।"

ওরা দু'জনে বিশুর বাবার পেছন পেছন আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে লক্ষণের মা যেন দেখতে পেল: লক্ষণ ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, "মাগো, তুই আমাকে সকাল থেকে এমনি করে কষ্ট দিলি?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষণের মায়ের সমস্ত শোকের বাঁধন যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ল।

লক্ষণের বাবা তাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। সে তখন দেখছে, লক্ষণ প্রচণ্ড ক্ষোভে তাকে মুঠো মুঠো পয়সা ছুঁড়ে মারছে।

মহিলাকর্মীদের বাসস্থানের জন্য ১৯৭৬-৭৭ সালে দেশে ৩৬টি নতুন হস্টেল তৈরী হবে। এই ৩৬টি নতুন হস্টেল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত মোট মহিলা হস্টেলের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৬টি। এই সব নতুন হস্টেলে আড়াই হাজারেরও বেশী কর্মরত মহিলা বসবাস করতে পারবেন। হস্টেলগুলি নির্মাণে ১.১৯ কোটি টাকার সাহায্য দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। প্রস্তাবিত হস্টেলগুলির একটি কলকাতায় হবে।

বছর শেষ হওয়ার ছ দিন আগে ১৯৭৫-৭৬ সালে নাইট্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রী শ্রী পি. সি. শেঠি সার শিল্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সার কারখানার সর্বস্তরের কর্মীদলকে এই লক্ষ্য পূরণে সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি তার অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বানে সবাই মিলে সাড়া দেওয়াতেই এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়েছে।

ভেসে বেড়ান

ঐ যে বাড়িটা, ওটা আমার ভাইয়ের। ওর পরের বাড়িটাই আমার ছিল। ধুলো ভরা গাঁয়ের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তারাপদ বললেন, এই ক'বছর আগে পঞ্চাশ টাকায় ভিটেটা বিক্রি করেছি।

তিনি চেয়ে রইলেন ভিটেটার দিকে। কত স্মৃতি জড়ান ওই ভিটে। ওখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল, একে একে আটটি ছেলেমেয়ে ওই ভিটেতেই প্রথম পৃথিবীর মুখ দেখেছিল। আগে একান্নবর্তী পরিবার ছিল। পরে তা ভাগাভাগি হয়—দু' ভায়ের মধ্যে ভাগাভাগি।

ফণিভূষণের ছেলে তারাপদ আবার বললেন, 'ভিটে বিক্রির ক'বছর আগে চাষের জমিটাও হাত ছাড়া হয়। ধার কর্জে আড়াই শ টাকায় দু'বিঘে দু' কাঠা জমি বিক্রি হয়।'

কে যেন প্রশ্ন করলেন—'এত সস্তায় বিক্রি করলেন কেন?' তারাপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, বোকার হাসি হেসে ওঠেন। তারপর উত্তর দিলেন, 'না বেচে উপায় ছিল না।' নীরবে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন 'পেটের বড় তো কিছু নয়।'

ছোট কথা। বড় মূল্যবান কথা। জীবনের জন্যই জীবিকা। জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে জীবন রক্ষার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। তারাপদ আর কী করেছেন? পৈত্রিক ভিটেটাই বিক্রি করেছেন।

এ বিক্রির পেছনে অনেক অব্যক্ত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস বড়ই করুণ। পরপর ক'বছর ফলন হল না, কাজও কিছু পাওয়া গেল না। আরম্ভ হল মাঝে মাঝে অর্ধাহার, পরে ঘরে এল অনাহার। অনাহারের যন্ত্রণার মুখেই ধার আরম্ভ হল, ধার থেকে এল হস্তান্তর, হস্তান্তর থেকে সাফ কবুলা।

এসব কথা তারাপদ বলতে চান না, কপালকে দায়ি করেন। 'ভাগ্যে নেই, তাই রইল না,' বলে সান্ত্বনা পেতে চান।

তারাপদ বললেন, 'সব কিছু বেচেবুচে বর্ধমানে চলে গেলাম। কালনায় উঠলাম, বারুইপাড়ায় ক'বছর রইলাম। কিন্তু সেখানেও বেশী দিন থাকতে পারলাম না। কে রাখবে আমাদের?'

গ্রাম বাংলায় তারাপদর মত এমনি ভেসে বেড়ান পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। এরা জমিচ্যুত, বাস্তুচ্যুত, কৃষি বাংলার মানুষ। প্রথম প্রথম এঁরা নিজের গ্রামেই থাকতেন। ওই সেই পেটের দায়। পেটের দায়ে অন্যগ্রামে যেতেন। ভাবতেন ও গ্রামে গেলে কিছু একটা হবে। কিন্তু গিয়ে দেখতেন, ওই গ্রামেরও একই হাল। আজকাল ওঁরা দেখছেন বহু পরিবারের তারাও একটি।

এই তো গড়ে ওঠা এই পল্লীতে প্রায় তেত্রিশটি গ্রামের বাস্তুচ্যুত মানুষ ভেসে ভেসে এসে জড়ো হয়েছেন। এরমধ্যে ঢাকা, ফরিদপুর, যশোরের পরিবারও আছেন। দ্বিখণ্ডিত বাংলার নীরব যন্ত্রণা সীমান্ত জেলাগুলিতে গেলে অতি সহজেই ধরা পড়ে। যন্ত্রণাই সব নয়। মিলে মিশে নতুন সম্পর্ক পাতিয়ে এক হয়ে থাকারও একটা তৃপ্তি, একটা আনন্দ আছে। সেই আনন্দের ছাপও এখানে দেখেছি।

ভেসে বেড়ানর এক পীড়াদায়ক মানসিকতা আছে। যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, ভেসে বেড়ান তাঁদের মধ্যে সমাজ বন্ধনের প্রাথমিক ভিৎ যে পরিবার, সেই পরিবারের পারিবারিক বন্ধন বড় শিথিল হয়ে পড়ে।

তারাপদর ছোট ছেলে দেখছে তারা ভেসেই বেড়াচ্ছে—কখনও বর্ধমানে, কখনও বা কালনায়, কখনও বা শান্তিপুরে। তাদের না আছে বন্ধুবান্ধব, না আছে আত্মীয়। এ দিক সেদিক ঘুরে বেড়ান তার অভ্যাস হয়ে উঠেছে। এর উপর বড় হয়ে যদি কাজ না পায় তবে ওর যে ভবিষ্যত কী হবে। ছিন্নমূলের ছন্নছাড়া জীবনের ভয়াবহতা শুধু পারিবারিক সমস্যা নয়, দেশের সমস্যা, সমাজের সমস্যা।

সমস্যাটি গভীর। ধনবিত্ত বৈষম্যের বহুকালের পুঞ্জিভূত পাপ একে গভীরতর করে তুলেছে। সেই বৃটিশ আসার পর থেকেই আমাদের গ্রাম দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করে।

গ্রামের কৃষি সংস্কারের মৌলিক কাজ বৃটিশ শাসনে হয়নি, বরংচ স্বাভাবিক সংস্কারের যে দেশীয়-রীতি ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারই ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে। গ্রামের অবক্ষয় বৃটিশ শাসনের অবশেষ হিসাবেই গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবশ্য এ অবক্ষয়ের সঙ্গে দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তিরও অবদান আছে।

স্বাধীনতার পর গ্রামে কোন সামন্ত-নেই, কিন্তু তার চেলাচামুণ্ডারা আছে। একজন সামন্তের স্থলে হয়তো দশজন চেলা-চামুণ্ডা উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সেই দশজনের প্রতাপ কম নয়। প্রতিপত্তি তো আছেই।

সমস্যা জটিল হলেও সমাধান করতেই হবে। তারই জন্যে কুড়ি দফা কর্মসূচী ঘোষণা হয়েছে। কুড়ি দফার রূপায়ণ শুধু জমি পাওয়ার মধ্যে সীমিত নয়।

হরিপুরে গড়ে ওঠা নতুন পল্লীতে নতুন সংসার

নতুন কৃষি ব্যবস্থায় গ্রামকে সাজিয়ে তোলার এ এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

রাস্তাটির এক পাশে তারাপদর ঐ পৈতৃক ভিটে, অপর পাশে হরিপুরের খাস জমিতে গড়ে ওঠা নতুন পল্লী। এখন এই নতুন পল্লীরই একজন অধিবাসী তারাপদ দাস। বাস্তহীন তারাপদ বাস্তর জন্য সরকারী জমি পেয়ে ওই পল্লীতে ঘর তুলেছেন।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার হরিপুর মৌজায় রাজ্য সরকারের খাস জমিতে তারাপদর মতো ৯৫ টি পরিবার বসেছে। প্রতিটি পরিবার বাস্তুজমির জন্য রাজ্য সরকার থেকে তিনশতক করে জমি পেয়েছেন। ৯৫ টি পরিবারের ধরতে গেলে একটি নতুন গ্রামই গড়ে তোলা হয়েছে। পল্লীটির মাঝে দু'টো ১২ ফুট রাস্তা গেছে। রাস্তার দু' পাশে নতুন ঘরগুলো মাথা তুলে দাড়িয়েছে। পল্লীর মাঝখানে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি ক্লাব ঘরের জন্য স্থান রাখা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষারও একটি কেন্দ্র হবে। এখানে এ সব কাজ ওঁরা নিজেরাই করছেন। ৯৫ টি পরিবারের মোট মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৭৮ জন, এরমধ্যে শিশুর সংখ্যা ৮৮ জনের মতো। তারাপদর পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৮ জন। নেহাৎ ছোট পরিবার নয়। ৮ জনের এই পরিবারে আয় করেন দু'জন—তিনি নিজে এবং ছেলে সুকুমার। ওঁরা তাঁতে প্রাত্যহিক মজুরীতে বোনার কাজ করেন। দু'জনে ৮ টাকার মতো পান। তারাপদর স্ত্রী অবসর সময়ে সুতো কাটার কাজ করেন, তাতেও কিছু আয় হয়।

তাঁতের কাজ, মাছ ধরা, কাঠের কাজ, মাঠের কাজ, জনমজুরী, পথে পথে ফেরি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার নর-নারী এখানে আছেন। জমি পেয়ে ঘর তোলাই নয়, ইতিমধ্যে পল্লী উন্নয়নের জন্য একটা সমিতি তৈরী করেছেন। উন্নয়নের সমস্যাও আছে। প্রতিটি পরিবার 'গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের' রূপায়ণে বিনা পয়সায় বসত জমি ও ঘর তোলার জন্য ১৭৫ টাকা করে পেয়েছেন—ঘরও উঠেছে। কিন্তু তাকে আরও মজবুত করার প্রয়োজন আছে। আছে ঝড় জলের হাত থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা। ওরা নিজেরা শ্রম দিতে পারেন, কিন্তু অর্থ দেবার সামর্থ্য ওঁদের নেই। সকলেই দিন আনেন, দিন খান।

তারাপদ তার নতুন ঘরের সামনে দাড়িয়ে বললেন, 'বাঁশের খুঁটি দিয়ে মজবুত না করতে পারলে, কমপক্ষে ভাল ছনের ছাউনী না দিলে আগামী বর্ষায় এ ঘর রাখা যাবেনা।'

কুঁড়েঘর উঠেছে, তাকে এখন ভাল করবার, সুন্দর করবার প্রশ্ন ওদের মধ্যে এসেছে। উন্নয়নের দর্শনই এটা। একটা হলে সামনের আর একটির দিকে সে যেতে চায়।

নতুন বসত হরিপুর সামনের দিকে পা ফেলতে চাইছে, পল্লীটিকে সাজানোর আয়োজন চলছে। 'একটা সমবায় করে কিছু করা যায় কিনা' তা নিয়ে ওরা ভাবনা-চিন্তা করছেন। ভাবনা চিন্তা করছেন পরিবার পরিকল্পনা নিয়েও।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র

মহাশয়,

আমি "ধনধান্যে" পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক। অনেকগুলি গুণসম্পন্ন ভাল রচনা আপনার পত্রিকা মারফৎ পাঠকবর্গকে আপনি উপহার দিয়ে থাকেন, তজ্জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ

১৫ই ডিসেম্বর '৭৫ সংখ্যাটি পড়লাম; সমস্ত রচনা সুন্দর ও সাবলীল। জ্যোতির্ময় দাশের লেখা "জাতিস্মর কথা" খুবই ভাল লেগেছে আমার। এই ধরণের বিজ্ঞান ভিত্তিক আরো কিছু লেখার ব্যবস্থা রাখবেন।

সবশেষে জানাই আমার অনুরোধ, "খেলাধূলা" এবং "প্রশ্নোত্তর" সম্পর্কে আরো দু'টি বিভাগ রাখলে খুব ভাল হয়।

দিবাকর মণ্ডল,
গ্রামদিঘী, মুর্শিদাবাদ

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত 'ধনধান্যে' পত্রিকাটি মাঝে-মাঝে পড়বার সুযোগ হয়। লেখা-রেখা এবং সম্পাদনার আভিজাত্যে মুগ্ধ হতে হয়। চমৎকার নয়নসুখকর অলংকরণ, প্রয়োজনীয় রচনাসম্ভার পত্রিকার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

পলাশ মিত্র
কলকাতা-২৬

রাজ্যে রাজ্যে

গুজরাট

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

ভারতের মানচিত্রে পৃথক রাজ্য-হিসাবে গুজরাটের আবির্ভাব খুব বেশীদিন নয়, মাত্র ১৯৬০ সালের মে মাসে। কিন্তু এরই মধ্যে বর্তমান ভারতের শিল্প, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল রাজ্যসমূহের মধ্যে গুজরাট নিজের স্থানটি পাকা করে নিয়েছে। গুজরাট কৃষিপ্রধান রাজ্য নয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়াতে গুজরাট চিরকালই খাদ্যে ঘাটতি রাজ্য হিসাবে পরিচিত। ফলে রাজ্যের উন্নয়নে শিল্পকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন গুজরাটবাসীরা। অবশ্য তাদের এই উন্নয়ন প্রয়াসের পটভূমিতে রয়েছে দেশের অমূল্য সম্পদ তেল ও গ্যাস এবং কেন্দ্রের সাহায্য।

গুজরাট রাজ্যের বিস্তৃতি বাহাত্তর হাজার একশ-সাইত্রিশ বর্গমাইল। গুজরাটের গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ও সমৃদ্ধশালী বন্দর আকৃষ্ট করেছে প্রতিটি দেশী-বিদেশী শাসকের ইতিহাসের সেই আদিকাল থেকে। পশ্চিমদিকে আরবসাগর, উত্তর ও পূর্বে ইতিহাসখ্যাত রাজস্থান, দক্ষিণে শিবাজীর স্মৃতিজড়িত মহারাষ্ট্র আর দক্ষিণপূর্বে মধ্যপ্রদেশ বেষ্টিত গুজরাটের সমৃদ্ধির খ্যাতি এতই বহুধা বিস্তৃত ছিল যে, গুজরাট বার বার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছে দেশী এবং বিদেশী শক্তির দ্বারা। মোগল থেকে ব্রিটিশ সকলেই চেয়েছে গুজরাটকে আপন অধীনে এনে পশ্চিম উপকূলে নিজের রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করতে, গুজরাটের বন্দরগুলি নিজেদের হাতে এনে দেশ বিদেশের সাথে গুজরাটের বাণিজ্যিক লেনদেন করায়ত্ত করতে। এত অত্যাচার, এত শোষণও কিন্তু গুজরাট-বাসীদের অবদমিত করে রাখতে পারেনি। ধাপে ধাপে তারা নিজেদের দেশকে অগ্রসর করেছে শিল্প সমৃদ্ধির পথে।

গুজরাটের অমূল্য তৈল সম্পদের আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশীদিন আগে নয়। গুজরাটের আধুনিক শিল্পের বিকাশ বস্ত্রশিল্পের সাথে—১৮৫৯ সালে। বস্ত্র-শিল্পে ঐতিহ্যমণ্ডিত গুজরাটের আমেদাবাদ, বরোদা ও অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সুতীবস্ত্র কারখানা ও কাপড়কল তৈরীর যন্ত্রপাতির কারখানা। কিন্তু বর্তমান দশকে তামিলনাড়ু সহ অন্যান্য রাজ্যে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটায় গুজরাটকে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কাঁচামালের অপ্রাচুর্যও শিল্পে আধুনিকী-করণের অভাবে অনেক কাপড়কলেই উৎপাদন কমে যায় ও এগুলি রুগ্নশিল্পের আওতাভুক্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রুগ্ন-শিল্পকলগুলি জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন-এর গুজরাটস্থিত শাখাটি ১৯৭৪ সালে গুজরাটের এগারটি কাপড়কলের মালিকানা ও পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এছাড়া ১৯৭৪-৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়-ভিত্তিতে ২৫,০০০ টাকু বিশিষ্ট সুতো তৈরীর কল স্থাপনের ১১ টি শিল্প লাইসেন্স অনুমোদন করেন। এরফলে রাজ্যের প্রতিটি অনুন্নত জেলায় একটি করে সুতোকল স্থাপিত হবে এবং প্রতিটি সমবায় প্রতিষ্ঠানে হস্ত ও তাঁতচালিত শিল্পকে সাহায্য করার জন্য বরোদাতে 'পেট্রোফিলস্ কো-অপারেটিভ লিমিটেড্' নামে একটি পৃথক সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এর কাজ হল হস্ত ও তাঁত চালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কৃত্রিম সুতো সংরক্ষণ করা।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাস অবধি কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাটে তাদের অধি-গৃহীত শিল্প সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন মোট ২২০ কোটি টাকা। এর অধিকাংশই অবশ্য বরাদ্দ ছিল রাজ্যের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে ও উৎপাদনে। গুজরাটে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার যে কটি শিল্প-সংস্থা স্থাপন বা অধিগ্রহণ করেছেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বরোদার জহর নগরের 'দি ইণ্ডিয়ান পেট্রো-ক্যামিক্যালস্ কর্পোরেশন', তেল ও গ্যাস কমিশনের বিভিন্ন প্রশাখাগুলি, বরোদার নিকটবর্তী কয়ালীর 'দি ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারী)', 'দি হিন্দুস্থান সল্টস্ লিমিটেড', 'দি এলক্ক অ্যাসডাউন এণ্ড দি মডার্ণ বেকারীস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড'। এছাড়াও রাজ্যে পাঁচটি পাইপলাইন আছে। সেগুলি হল—

(১) কাম্বে-ধুভারাম গ্যাস লাইন
(২) আংকলেশ্বর—উটারান গ্যাসলাইন,
(৩) আমেদাবাদ—বরোদা গ্যাসলাইন,
(৪) বরোদা ইণ্ডাষ্ট্রীজ গ্যাস লাইন ও
(৫) আংকলেশ্বর—কয়ালি ক্রুড অয়েল পাইপলাইন।

এই পাঁচটি পাইপলাইনই তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের অধীনে। এছাড়া ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পো-রেশন বরোদাতে একটি প্ল্যাণ্ট স্থাপন করেছেন তেল পরিশোধন এবং শহরের তেল ও গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য।

ইণ্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস্ কর্পো-রেশনের কম্‌প্লেক্সটি হল গুজরাটের শিল্প-গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এটি একই সাথে রকমারী পেট্রোলিয়াম-জাত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম, যেগুলি জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের চাহিদাপূরণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ভারতে পেট্রোকেমিক্যালস্—এর প্রয়োজন বিবিধ। সামান্য শার্টের বোতাম থেকে আরম্ভ করে জটিল আকাশী পরিবহণ ব্যবস্থায় এর ব্যবহার হয়। তাছাড়া প্যাকেজিং, তাপ পরিবহণে, কৃত্রিম সুতোতে, বাল্বের

ফিলামেণ্টে, ফিল্মে, গাড়ীর যন্ত্রপাতিতে, রেডিওর ট্রান্সমিটারে, টেলিভিসনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশে, পাইপ ও ফিটিংসে, বিবিধ জাল তৈরীতে কৃত্রিম পশম, টায়ার ও জুতো তৈরীতে এবং গৃহস্থালী দ্রব্যে এর বিবিধ ব্যবহার হয়।

তবে পেট্রোকেমিক্যালস্-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হয় কৃষি ও জল সরবরাহে, ঔষুধ তৈরীতে, শক্তি উৎপাদনে, পরিবহনে, বাড়ী ও জামাকাপড় তৈরীতে এবং প্রতিরক্ষায়।

ভারতীয় পেট্রোকেমিক্যালস্ কর্পোরেশনের হাতে এখন অনেকগুলি প্রকল্প আছে। এরমধ্যে এরোম্যাটিক প্রকল্পটির ভিত্তিস্থাপন হয় ১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে। এতে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। নিকটবর্তী রিফাইনারী থেকে যে সব ন্যাপথা পাওয়া যাবে তা থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে জৈব রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হবে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত ডি. এম. টি. প্ল্যান্টটিতে ১৯৭৩-এ উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং এটি বছরে ২৪,০০০ হাজার টন ডাইমেথিল টেরেপথালেট উৎপাদনে সক্ষম। এছাড়া অন্য দুটি প্লান্টে ও-জাইলেন এবং মিশ্র ডি-জাইলেন উৎপাদিত হয়।

অলেফিন প্রকল্প যেটি ন্যাপথা ক্র্যাকার প্রকল্প নামেই সমধিক জনপ্রিয়—তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৭২-এ। এর জন্য খরচ হয় ৩১.৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটি এবছরেই চালু হবে বলে মনে হয়। ১৭ কোটি টাকার একরিলোনিট্রাইল প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ ১৯৭৫-এর ৫ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছে। ১৬ কোটি টাকার কৃত্রিম রাবার তৈরীর প্রকল্পটি নির্মাণের পথে। ন্যাপথা ক্র্যাকার প্রকল্পটির সাথেই এই দুই প্লান্টেও উৎপাদন শুরু হবে বলে মনে হয়।

এছাড়া পেট্রোকেমিক্যালস্ কমপ্লেক্সটির অধীনে কতকগুলি প্রকল্প চালু থাকবে। এরমধ্যে ২৪ কোটি টাকার এক্রিলিক ফাইবার প্রজেক্টটির কাজ ১৯৭৩-এর আগষ্টে শুরু হয়েছে। ১৩ কোটি টাকার 'ডিটার জেণ্ট এলকাইলেট' প্রজেক্টটির নির্মাণ কাজ চলছে ও ৯ কোটি টাকার 'এথিলিন গ্লাইকোল প্রজেক্ট' ও ১৯ কোটি টাকার 'পলিপ্রপাইলিন প্রজেক্ট'টি ১৯৭৪-এর ১৪ ই জুন কাজ শুরু করেছে।

কয়ালিতে 'গুজরাট রিফাইনারী'র তেল পরিশোধনের কাজ শুরু হয় ১৯৬৫-র অক্টোবরে। এর তেল পরিশোধনের ক্ষমতা হল ১০ লক্ষ টন, এর দ্বিতীয় ইউনিটটি কাজ সুরু করে ১৯৬৬তে, এর পরিশোধনের ক্ষমতাও প্রথমটির সমপরিমাণ। এর 'ক্যাটালিটিক রিফাইনারী'র ইউনিটটি উৎপাদন শুরু করে ১৯৬৬তে। ১০ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় 'এটমোসস্পেরিক ইউনিটটি (নং ৩) স্থাপিত হয় ১৯৬৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। ঐ একই সময় এটি পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু করে। ১৯৬৭ সালে প্ল্যান্টটির পরিচালনায় স্থিতাবস্থা আসে।

এই শোধনাগারটির জন্য ৯.৬১ কোটি টাকার বৈদেশিকমুদ্রা সহ মোট ২৬.১৫ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করা হয়।

বেনজিন ও টলুইন উৎপাদনের জন্য যে 'ইউডেক্স প্ল্যানটটি' ১৯৬৮ সালে তৈরী হয় সেটি ১৯৬৯ সালের জানুয়ারীতে নিয়মিতভাবে উৎপাদন শুরু করে। এটির জন্য খরচ হয় ২.৪২ কোটি টাকা, তার মধ্যে ১.২৫ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক মুদ্রা।

এই শোধনাগারটি বছরে ৩,০০০,০০০ টন অশোধিত তেল শোধনের ক্ষমতাসহ নির্মিত হলেও ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩.৫৮ মিলিয়ন টন তেল পরিশোধন করে। কিন্তু বর্তমানে এটির পরিশোধন ক্ষমতা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪,৩০০,০০০ টন।

এদিকে কয়ালি রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা ৩,০০০,০০০ টন আরও বাড়িয়ে যাতে ৭,৩০০,০০০ টন করা যায় তারজন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন সরকারের 'এঞ্জিনীয়ার্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড'-এর কর্মীরা। আশা করা যায় ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসেই সম্প্রসারণের কাজ শেষ হবে। সম্প্রসারণের মোট খরচ ধরা হয়েছে ২৮.০৮ কোটি টাকা। সম্প্রসারিত হলে রিফাইনারীটি শুধুমাত্র গুজরাটের অপরিশোধিত খনিজ তেলই নয় আমদানীকৃত অশোধিত তেলও শোধন করতে সমর্থ হবে।

গুজরাটের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হল লবণ। এই অমূল্য সম্পদকে কাজে লাগাতে আমেদাবাদ জেলার খারাগোদাতে তৈরী হয়েছে হিন্দুস্থান সলটস্ লিমিটেড নামে প্রতিষ্ঠানটি। এটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে খারাগোদা ও হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডির লবণ সম্পদকে। খারাগোদাতে অবশ্য শুধু সাধারণ লবণ উৎপন্ন হয়। রাজস্থানের সম্বরে 'সম্বর সল্টস্ লিমিটেড্' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে সেটি গুজরাটের 'হিন্দুস্থান সল্টস্ লিমিটেড্'-এরই প্রশাখা।

১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত খারাগোদাতে সাধারণ লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বেশীই ছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে অতিবৃষ্টির ফলে উৎপাদন কমে যায়। ১৯৭২-৭৩-এ উৎপাদন ছিল ৯৭,০০০ টন। এর থেকে সরকারের মোট কর আদায় হয় ৩৮.৪৮ লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানটির হাতে এখন তিনটি অনুমোদিত প্রকল্প আছে—সম্বরে সোডিয়াম সালফেট এবং লবণ শোধন প্রকল্প এবং খারাগোদার বোমাইন প্রকল্প।

হিন্দুস্থান সল্টস্ লিমিটেড্ এখন দেশের চাহিদাপূরণ করেও নেপালের সল্ট ট্রেডিং কর্পোরেশনের সাথে নেপালে লবণ রপ্তানী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ও লবণ রপ্তানী শুরু করেছে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বরোদার নিকটবর্তী

হরনীতে একটি কাগজকল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং কালোলে প্রধানমন্ত্রী--দি ইণ্ডিয়ান ফার্মারস্ ফার্টিলাইসার কো-অপারেটিভের একটি সার প্রকল্পের ভিত্তিস্থাপন করেছেন ১৯৭৪-এ।

শুধুমাত্র শিল্পক্ষেত্রেই নয় গুজরাটের গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার জন্য দি রুর‍্যাল ইলেক্ট্রিফিকেশান কর্পোরেশন ১.৬০ কোটি টাকার ৯টি বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এছাড়া মেসানা, বরোদা ও বনসকন্ট জেলায় বিদ্যুৎ পরিবহণ ও বিতরণে অপচয় কমাবার জন্য ৯১.৩৩ কোটি টাকার অন্য পাঁচটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। বাকী প্রকল্পগুলিতে হরিজন বস্তীগুলিতে বিদ্যুত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে।

গোবর গ্যাস প্লান্ট স্থাপনে গুজরাট ভারতের অগ্রণী রাজ্য। ভারত সরকারের নীতি অনুসারে এই প্লান্ট স্থাপনে শতকরা ২৫ ভাগ ভরতুর্কী দেওয়া হয়। এপর্যন্ত এজাতীয় ৩৪০৪ টি প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে এবং ১৯৭৫-৭৬ আরও ২০০০ টি স্থাপিত হবে।

১৯৭৬-এর ১২ মার্চ গুজরাটে জনতা ফ্রন্ট সরকার পদত্যাগ করায় গুজরাট রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে আসে। ফলে রাজ্যের বাজেট ২৪ মার্চ লোকসভায় পেশ করা হয়। বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে তা কেবলমাত্র রাজ্যের উন্নয়নে ৩২.১৭ কোটি টাকার স্বাভাবিক কেন্দ্রীয় সাহায্যই নয়, এটা হল বাজারে ঋণ করার পদক্ষেপে এক সহায়তা। এতে বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে সাহায্যের জন্য আগাম ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাড়াও উপজাতীয় কল্যাণের জন্য ৩ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্যও দেওয়া হয়।

বাজেটে পরবর্তী বছরের জন্য ১৯৩.২৫ কোটি টাকার খরচ ধরা হয়। এরমধ্যে দুই তৃতীয়াংশ (প্রায় ১২৯.৪৩ কোটি টাকা) বিশদফা কর্মসূচী রূপায়ণ প্রকল্পে ব্যয় হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাটের পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নতিকল্পেও সাহায্য করছেন। ভিরামগাম থেকে আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট, বালাসার হয়ে বম্বে পর্যন্ত যে ব্রডগেজ রেললাইনটি রয়েছে সেটির বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ লাইনটির বৈদ্যুতিকীকরণের ফলে রাজ্যের শিল্পাঞ্চল সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপ্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। সেটি হল রাজ্যের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে অপ্রশস্ত রেলপথটিকে প্রশস্ত করা। এর ফলে এই অঞ্চলের সাথে রাজ্যের অন্য অঞ্চল এবং ভারতের বহু জায়গার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে ও ভিরামগাম বদলের অসুবিধা দূর হবে।

গুজরাটের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রের এই বিপুল ও নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যে এবং অনুকূল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গুজরাট খুব শীঘ্রই এক বিরাট শিল্পোন্নয়নের স্বপ্নকে সার্থক ও সফল করে তুলতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

গত কয়েক মাসে বহু পশ্চিমী দেশ ও সরকার আমাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরো বেশী সমবেদনা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছে।

সোভিয়েত ও অন্যান্য পূর্ব ইওরোপের দেশ এবং জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি আমাদের চিরকাল বন্ধুত্বের সম্পর্কসূত্র বজায় রেখে চলেছে।

আমরা সব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু আমাদের জনগণের আত্মবিশ্বাস এবং ঐক্যবোধই শেষ পর্যন্ত আমাদের সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। নিজেদের শক্তি এবং প্রয়াসের মাধ্যমেই কেবল আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে আমরা জয়ী হতে পারবো।

গণতন্ত্র আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় সর্বশ্রেণীর জনগণের এরকম বিপুলভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। আর এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে একটি দেশের প্রকৃত শক্তি। শ্রী অরবিন্দ সেই ১৯০৮ সালে যা বলেছিলেন তা আজকের দিনেও প্রযোজ্য,—"কোন দেশ যদি আধুনিক যুগসংগ্রামে বেঁচে থাকতে চায়, যদি তার স্বরাজ অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে চায় তাহলে সেই দেশকে জাগাতে হবে তার জনগণকে। জাতীয় জীবন সম্পর্কে তাকে সজাগ করে তুলতে হবে যাতে করে সেই দেশের প্রতিটি মানুষই ভাবতে পারে যে জাতি বাঁচলে সে বাঁচবে, জাতির উন্নতি হলে তারও সমৃদ্ধি আসবে এবং জাতি স্বাধীন থাকলে সেও স্বাধীন থাকবে।" ভারতে আমরা এটাই করতে চেষ্টা করছি। একাজে আমরা কতটা সক্ষম হবো তা নির্ভর করবে লক্ষলক্ষ দেশবাসীর ওপর, আমাদের গণতন্ত্রকে তারা কতটা শক্তিশালী করতে চান তার ওপর। এ ব্যাপারে বর্তমান আলোচনা-চক্রটি নতুন ধ্যান ধারণার আলোকসম্পাত করে পথনির্দেশ দেবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

(সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ" বিষয়ক আলোচনা-চক্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের ভাষান্তর)

পশ্চাতে রেখেছ যারে

অমিতাভ চক্রবর্তী

আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা বলছি। সকালে প্রাতরাশ করার সময় খবরের কাগজে চোখে পড়ল একটি সংবাদ শিরোনাম। চমকে ওঠার মত। গান্ধী শতবর্ষে পুনর্বার গান্ধীহত্যা! খবরটি হল: এক হরিজন বালক উচ্চবর্ণের জন্যে সংরক্ষিত নলকূপ থেকে জলগ্রহণ করায় ক্ষিপ্ত জনতা বালকটিকে হত্যা করেছে।

খবরটি পড়ে স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবার পর দুটি জিনিস চোখে পড়ল। প্রথমত, সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার স্বল্প প্রয়োগ-ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়ত হরিজন সমাজের মধ্যেই স্বজাতিচৈতন্যের অভাব। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় কারণটি বেশী ভাবিয়ে তুলেছিল সেদিন আমাকে। আজ ১৯৭৬ সালের মে'মাসে এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সেই সমস্যাটি নতুন করে দেখছি।

জাতীয় দুর্যোগের মোকাবিলা করতে যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা হ'ল গত ২৬শে জুন সেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উৎসাহে, নির্দেশে এবং দূরদর্শিতায় জাতির বিশদফা কর্ম্মসূচীর রূপায়ণে অনুন্নত ও দুর্বল শ্রেণীর বিকাশ একটি বিশেষ স্থান দখল করল। এই কর্ম্মসূচীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'ল অসাম্য দূরীকরণ-অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে। অর্থনীতি, সমাজনীতির যে ঠাসবুননিতে তৈরী আমাদের জীবন সেই জীবনের আবহাওয়ায় ভরে রয়েছে অসাম্য। ভারতীয় সমাজে Social stratification-এর এক চরম এবং ভয়াবহ রূপ হ'ল Caste system বা বর্ণাশ্রম নীতি যা কালক্রমে সমাজে বর্ণবৈষম্যের আকার ধারণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানে বলে caste অর্থাৎ জাতি একই বর্ণের অন্তর্গত ভিন্ন গোত্রীয়, একই বৃত্তি অবলম্বী গোষ্ঠী। এবং এই ধরণের নানান গোষ্ঠী যখন পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব এবং আনুগত্যের বন্ধনে বাধা পড়ে তখনই সৃষ্টি হয় বর্ণাশ্রম। হিন্দু ধর্ম্মের আচার বা রীতি-নীতি অনুযায়ী চতুর্বর্ণের বাইরে যে শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল সম্ভবত কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে তারই ফলশ্রুতি দেখা গেল আধুনিক ভারতবর্ষে তপশীলি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এরা অনুন্নত কেন ?

অবহেলিত অনুন্নত শ্রেণীর কথা বলতে গেলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রায় ১২ কোটি মানুষ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল এরা যাবতীয় সামাজিক কর্ম্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুত। যার ফলে অর্থনৈতিক, সমাজ-নৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনের প্রবেশাধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাংবিধানিক সুযোগ সৃষ্টি করে এই বঞ্চনার জাল থেকে এদের উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এদের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। নতুন অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীতে এদের চাকুরী, শিক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার কথা নতুন করে ভেবে দেখার সুযোগ এসেছে। শিক্ষা যেহেতু সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র সেহেতু শিক্ষাদানের কর্ম্মসূচীতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে প্রাক্ ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রাপকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষে এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ম্যাট্রিকোত্তর স্কলারশিপ প্রাপকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৪ হাজারের কিছু বেশী। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃত্তি খাতে মোট টাকার অংক রাখা হয়েছে ১৮৭ কোটি। সারা ভারতে ৪৫০০টি সংরক্ষিত হোষ্টেল গড়ে তোলা হয়েছে। কেবলমাত্র স্কলারশীপই নয় নেফার অরণ্যে বা বস্তার-ছোটনাগপুরে অথবা সমুদ্র তীরবর্ত্তী অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে পৌঁছুচ্ছে শিক্ষার আলো। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে তপশীলি শ্রেণীর মধ্যে ৪ শতাংশ এবং আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে ৩ শতাংশ নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছে। শিক্ষিত মানুষ দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল শিল্পকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজে সুযোগ পাচ্ছে চাকরির। সেই সঙ্গে লাভ করছে বড় শহরের, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার অধিকার। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা যেতে পারে ভারতীয় কৃষি-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ধারায় বৃত্তিজীবনের সঙ্গে বদলে গেছে বর্ণ-গত গঠনের বা Caste structure-এর কাঠামো। আজ অনুন্নত শ্রেণীর ঘরে

জন্যেও সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকরীতে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। উচ্চপদস্থ সরকারী পদে আসীন অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের হাতের মধ্যে থাকছে সমাজের নানাবিধ সুযোগসুবিধা বিশেষত যা তাদের প্রপিতামহেরা কোনওদিন পান নি। সন্তানসন্ততিরা পড়তে পারছেন পাবলিক স্কুলে এবং সমাজের সেরা অংশের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারছেন সমাজের শীর্ষে। গত এক দশকে প্রথমশ্রেণীর কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরিতে অনুন্নত শ্রেণীর চাকুরের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। আই. পি. এস-এ চতুর্গুণ।

বিশেষ কর্ম্মসূচী প্রণয়ন

বিশেষ সমস্যার সমাধান বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেই সম্ভব। তাই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিটি রাজ্যের অনুন্নত এলাকার আদিবাসীদের জন্য উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এইখাতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ব্যয় করা হবে ১৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে এবছর বিভিন্ন রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এই সব কর্ম্মসূচীতে রয়েছে অনুন্নত এলাকায়, যেখানে জলাভাব সেখানে বিশেষ সেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন; যেখানে শিল্প সম্ভাবনাময় অঞ্চল সেখানে ব্যবসায়ীদের বিশেষ ছাড় দিয়ে তাদের অনুন্নত অঞ্চলে কারখানা তৈরীতে আগ্রহী করে তোলা; যেখানে দেনায় নিমজ্জিত হয়েছে তপশীলি সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে তাদের মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। মহাজনীপ্রথার অবসান এনে দিয়েছে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে এক স্বস্তির আবহাওয়া। এগিয়ে এসেছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ফসল তোলার সময়।

মোটামুটিভাবে এই বহুমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণের নীতি ত্রিমুখী। প্রথমত, যেসব অঞ্চলে ৫০০০-এরও বেশী আদিবাসী বাস করেন সেইসব অঞ্চলের একধরণের। দ্বিতীয়ত, এইসব আদিবাসীদের ঘনবসতির বাইরের অঞ্চলের জন্য পরিপরিকল্পনা এবং তৃতীয়ত যেসব আদিবাসী এখনও প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বে আবদ্ধ তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা। এইসব কর্ম্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অগ্রসর জীবনের প্রগতির পদক্ষেপের সাথে একাত্ম করে তোলা। সমাজবিজ্ঞানে বলে প্রতিটি সমাজে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার নিয়ামক থাকে। Force Theory অনুযায়ী অতীতে সমাজের বিবর্তনের প্রথম স্তরে বা hunting stage-এ ক্ষমতার নিয়ামক ছিল বাহুবল। পরবর্তী অধ্যায়ে নিয়ামক বদলে গিয়ে হল জমির মালিকানা। কেননা এইস্তর ছিল কৃষি। তৃতীয় স্তরে বা industrial stage এর শক্তির নিয়ামক হচ্ছে উৎপাদনের উপায়। এই আধুনিক শিল্পযুগের সমাজ শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবলম্বন। শিক্ষার সুযোগ, সর্বভারতীয় সার্ভিসে সংরক্ষিত আসন, স্কলারশীপ, শিক্ষানবীশী ইত্যাদি দিয়ে এদের টেনে আনা হচ্ছে সামাজিক স্রোতের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আগের সারিতে।

বেগার শ্রমিকপ্রথার অবসান এবং গ্রামাঞ্চলে ঋণ মকুব করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে এসেছে কর্ম্মক্ষমতা বিকাশের সুবর্ণসুযোগ। এই সুযোগ কেবলমাত্র খাতায় কলমেই পৌঁছে দিলে চলবে না সর্বস্তরের মানুষকে ভেবে দেখতে হবে অনগ্রসরদের অসুবিধার কথা; হাজার বছরের গ্লানিবহনের ক্লান্তির কথা। অগ্রসরতার অর্থ প্রগতির লক্ষ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন। এই সামাগ্রিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে দেশকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষকে দেশের সামগ্রিক উন্নতির সমান অংশীদার করে তুলতে হবে। পঞ্চায়েতীরাজ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে democratic decentralisation বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে রূপ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের শাসনক্ষমতার কাঠামো সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। তারা পাচ্ছে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ। দেখতে হবে এ সুযোগ যাদের প্রাপ্য তারা যেন পায়। অনগ্রসরদের অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবানেরা বঞ্চিত করতে স্বভাবতই উৎসুক। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আলো এদের কাছে পৌঁছুলে নিজের অধিকার নিজে দখল করে নেবে তারা অর্থাৎ সেই ১২ কোটি মানুষ যারা আজ পিছিয়ে রয়েছে।

তপশিলী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক সাফল্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আইনের চুড়ান্ত রূপদানের ক্ষেত্রে নয়া-অর্থনৈতিক কর্মসূচী সবিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে এবং এরফলে তপশিলী ও আদিবাসী ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরণের কাজ সহজতর হয়েছে। আমাদের জনগণের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে থাকেন। সেক্ষেত্রে তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত ভূমিদান একান্তভাবেই অপরিহার্য। আসামে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার বিঘা জমি তপশিলী ও আদিবাসীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। বিহারে অনুরূপ ১২ হাজার একর, রাজস্থানে এক লক্ষ ৫৮ হাজার এবং ওড়িশায় ৩৫ হাজার একর ভূমি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও এ পর্যন্ত ৬.০৮ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত ভূমি তপশিলী ও আদিবাসী জনগণের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। তপশিলী এবং আদিবাসী ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বিতরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অন্যতম অংগ বিশেষ।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন চিন্তা

স্নেহময় সিংহরায়

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ 'রায়তের কথা' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তিনি লক্ষ্য করেছেন দেশের যারা আন্দোলনকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা, কিন্তু দেশের যে বৃহত্তম অংশ দুর্গত পল্লীবাসীদের নিয়ে—তাদের চিন্তা তাঁদের মনে নেই। দেখেছিলেন 'দেশের সেই পোলিটিশিয়ান আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব'। পল্লীবাসী জনসাধারণের কথা বক্তৃতামঞ্চে ধ্বনিত হলেও কার্যত তাদের উন্নতির প্রচেষ্টা হয়েছিল কমই। 'লোকহিত' প্রবন্ধে এই জন্যই তিনি বলেছিলেন, 'যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি'। এজন্য তিনি কতকগুলি বক্তব্য রেখেছিলেন যার গুরুত্ব আজও সমান ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, দেশের সর্বস্তরে দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি ও যন্ত্রের সাহায্যে। এজন্য তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য দ্রুত শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। আমাদের ভারতবর্ষ পল্লী-প্রধান—পল্লী কৃষিপ্রধান—কিন্তু কৃষিব্যবস্থা প্রাচীনপন্থী। এইজন্য তিনি গ্রামবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে কৃষিব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্র প্রবর্তনের সক্রিয় প্রচেষ্টা করেছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে আমাদের জাতীয় নীতি গ্রহণে বিশেষভাবে বলা হয়েছে 'ডিমোক্র্যাটিক সোসালিজম্' ও 'সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটি'র কথা। বিস্মিত হতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূল শক্তি কর্মসাধনা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যে সামাজিক সংগঠন সমূহের কার্যপ্রণালীর মধ্যে নিহিত আছে তা উপলব্ধি করেছিলেন। এ সমস্ত কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন তার 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক পল্লীবাসী। এজন্য পল্লীবাসীদের জীবন ধারার পুনর্গঠন চিন্তা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বারংবার আন্দোলিত করেছে। নির্বাচিত সহযোগীদের সাহায্যে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি পল্লী সংস্কারমূলক কর্মধারাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কৃষি-বিজ্ঞান শিখে পল্লীসংস্কারে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠান। কৃষকদের ঋণমুক্তির জন্যে নোবেল প্রাইজের টাকা তিনি কৃষি ব্যাঙ্কের কাজে লাগান। এথেকে প্রমাণ হয়, তিনি পল্লীর পুণর্গঠন জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলক কর্মযজ্ঞে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। কবি শ্রীনিকেতনে পল্লী-শিক্ষার এক আদর্শ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ওখানকার শিক্ষাকেন্দ্রের সব দিক থেকে পরিপূর্ণতা ও সাফল্য ছিল তার কাম্য। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, ওখানকার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানচর্চ্চা করবে, যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করবে এবং প্রধানত সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব তাদের শিক্ষণীয় বিষয় হবে। শ্রীনিকেতনে শিক্ষাদান সম্পর্কে এল্‌মহার্স্টকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেছিলেন—

'Our people need more than anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation.'

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ছাত্রী। তিনি ১৯৭১ এ দেশে 'গরিবী হটানো'র আহ্বান জানান এবং ১৯৭৫ এ ঘোষণা করেন বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী। এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিশদফার বেশীর ভাগ দফায় পল্লীবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধা রয়েছে তা অপসারণের প্রস্তাব রয়েছে। দেখা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ যে কর্মধারার প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর পল্লীসংস্কার পরিকল্পনায় তা কেমন সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যে এই কর্মপরিকল্পনায় উপস্থিত। বিস্মিত হতে হবে, যখন দেখা যাবে যে দীর্ঘ কয়েকদশক পরেও আমরা তাঁর পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টিকে কেমন আমাদের সুচিন্তিত জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দ্বিধাদ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সন্ধিলগ্নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজে লাগাতে পারছি। পল্লী পুনর্গঠনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে যে চিন্তা, প্রস্তাব ও কর্ম-প্রণালীকে কাজে লাগিয়েছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে:- (ক) মানবশক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি এবং সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং সবকিছুর অপচয় রোধ। (খ) কৃষি এবং পল্লীজীবনে বৈজ্ঞানিক শক্তিকে গ্রহণ। (গ) সমবায় পদ্ধতিতে পল্লীর সকলে একত্রিত হয়ে চাষবাস এবং জীবন যাত্রায় ও কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার—(এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন আখের কল, পাট-বাঁধাই কল, ডেয়ারী ও বস্ত্র শিল্পের কথা)। (ঘ) প্রদেশে প্রদেশে উৎকৃষ্ট বীজের ভাণ্ডার স্থাপন, জমির প্রকৃতি-পরীক্ষা ও উপযুক্ত সার জোগাবার প্রতিষ্ঠান স্থাপন। (ঙ) সমবায় ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন। কারণ, সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে কাজে লাগান সম্ভব। (চ) বৈজ্ঞানিক সার

২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহিলা মহল

সাশ্রয়ের নানা পথ

বেলা দে

"অপচয় করো না, অভাবও হবে না" এমন প্রবাদ আমরা ছোট বয়স থেকেই শুনে আসছি। তবু সব সংসারেই প্রচ্ছন্নভাবে অভাব কথাটা বেশ জড়িয়েই থাকে সাধারণত। অতএব মুক্তির উপায় কি ভাবতে বসেন সুগৃহিণীমাত্রই। আয়ের ভারটা সেকালের গৃহিনীদের ছিলো না। একালেও অনেকের নেই, কিন্তু সংসারের ব্যয়ভারটা আধুনিকতার আগমনে মেয়েদের হাতেই এসে পড়েছে। আয়ের কম বা বৃদ্ধির গ্রাফের উপর মেয়েরা বেশী না তাকিয়েই তৎপর হয়েছে কেমন করে ব্যয় কমানো যায়। বাজারে জিনিষপত্র কিনতে গিয়ে তারা দেখেছেন দাম তো বেশ আকাশছোঁয়া। বাজেটের খরচ থেকে কিছুই কাটছাট করা যাবেনা। তবে, উপায় কি? অপচয় বন্ধ করতে হবে। বাহুল্য বর্জন করতে হবে, বিলাসিতার বিলয়সাধন করতে হবে। অনভ্যস্ত গৃহিণীরা অস্ফুটস্বরে নিভৃতে আপনমনে বলেও ফেলেন—"বাব্বা, এত মেপে কি জীবন চলে?" কিন্তু চলেনা বলে তো বসে থাকলে চলবে না গৃহিণীদের। সংসারের চাকা চালাতেই হবে, সবকিছু অভাব অনটন ঢেকে রেখে। কথামালার সেই তৃষিত কাকের গল্পটা মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে। কলসীর তলানি জলটা খাবার জন্য যেমন সে কতকগুলো ছোট ছোট ঢিল ফেলে বুদ্ধির সহায়তায় তৃষ্ণা মিটিয়েছিলো তেমনি গৃহিণীদের মাথায় কিছু কিছু বুদ্ধি ভীড় করে আসে সময় সময়।

সংসারে সেলাইবোনার দপ্তরটি একান্তভাবেই থাকে নারীদের হাতে। বাড়ীর পরিবারের সবার ড্রেস তৈরীর মজুরীতে অনেকগুলো টাকা চলে যায়। গৃহিণী পড়েন ভাবনায়। তাই আস্তে আস্তে তিনি যদি তুলে নেন নিজের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ড্রেস তৈরীর ভারটা নিজের হাতে, তাহলে খরচ কিছুটা কমবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া হাতেও এসে জমবে কিছু কিছু টুকরো কাপড়। সেগুলো অপচয় না করে রং মিলিয়ে জোড়া দিয়ে সুন্দর টেবলক্লথ বা বেডকভার তৈরী করা যেতে পারে। হ্যাণ্ডব্যাগও করা যায়। ছোটদের জামায় বা কোন 'কভারে' 'এপলিকের' কাজের জন্যও ব্যবহার করা যায়। পুরানো শাড়ী দিয়ে অনায়াসেই পর্দা, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরী করে বাড়তি খরচের পথটা বন্ধ করে দেওয়া যায় না কি? শীতকালে গরম জামা-কাপড়ের দামের সাথে সবাই কম বেশী পরিচিত আছেন—উল কিনে বাচ্চাদের সোয়েটার, কার্ডিগান বুনেও দেন অনেকে। বাড়ীতে বুনলে নানারঙের ছোট ছোট উদ্বৃত্ত উল জমা হয়ে যায়, সেগুলো ফেলে না দিয়ে গায়ের স্কার্ফ, ষ্টোল ইত্যাদি বোনা যায়। এতে পরিশ্রম আছে মানি, কিন্তু লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে কয়েকটা টাকা যদি অজান্তেই জমে যায় তাহলে মনটা সুখী হ'বে না কি? সেই উদ্বৃত্ত টাকায় মনের আরো দু'একটা সখ, সাধ বা খরচের পাহাড়ের আড়ালে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তাও পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ঠিক নয় কি?

আধুনিকতা মানুষের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিলেও সখ আর সাধের পরিমাণ কি হারে বাড়িয়ে দিয়েছে তা প্রতিমাসে নানারঙের নিমন্ত্রণ পত্র এলেই বোঝা যায়, কি বলুন? নিমন্ত্রণ কারীর সখ—সাধের বাড়-বাড়ন্ত হোক এ কামনা আমরা সবাই করবো কিন্তু যিনি নিমন্ত্রণ পেলেন তার পার্স যে সদাই বাড়ন্ত এ খোঁজ কি কেউ রাখেন? তাছাড়া এই অতিথি নিমন্ত্রণ আইনের প্রবর্তনে স্রেফ্ মার খাচ্ছেন এই নিমন্ত্রণ-গ্রহণকারীর দল। তবু, সামাজিকতা রক্ষা করতে হবেই। মনোমত প্রেজেন্টেশন কিনতে গিয়ে চমকে উঠেন পুরুষেরা। মাসে পাঁচ, সাতটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে দামী জিনিষ দেওয়া কি সম্ভব?

গৃহকর্তারা সাধারণত নারীদের মতের কোন মূল্য দিতে চান না, কিন্তু প্রেজেন্টেশন দেওয়ার ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে এক একবার গৃহিণীর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কারণ তারা দেখেছেন নারীবুদ্ধি এসবক্ষেত্রে প্রলয়ঙ্করী না হয়ে শুভঙ্করীই হয়ে দাঁড়ায়। নারীরা কখনো টুকরো কাপড়ে তৈরী সূচীকার্যে ভরা বটুয়াব্যাগ, কখনো বা হাতে বোনা স্কার্ফ, কখনো বা ছেঁড়া কাপড়ের বদলে কিছু বাসন জোগাড় করে রাখেন কোন নিমন্ত্রণ পাবার আভাস পেলেই। তাই কিছু অপচয়ও এড়ানো যায়। আজকাল জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ বার্ষিকী এসব অনুষ্ঠানেও যোগদানের নিমন্ত্রণ আসে। বাচ্চারা খেলতে ভালোবাসে। তাদের যদি খেলবার উপযুক্ত কিছু হাতে তৈরী উপহার দেওয়া যায় তাহলে তারা খুশিই হয়। সবার বাড়ীতেই দেশলাইয়ের অনেক খালি বাক্স জমে। সেগুলো ফেলে না দিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে তুলো ভরে দিয়ে কোন রঙ-বেরঙের কাপড় বসিয়ে সোফাসেট তৈরী করে দেওয়া যায়, বা ট্যালকম্

পাউডারের লম্বা কৌটায় জামা কাপড় পড়িয়ে উপরে ডিমের খোলায় মুখ এঁকে যদি মনিপুরী পুতুল তৈরী করে উপহার দেয়া যায় তাহলে তারা মনমত জিনিষ পেয়ে যথেষ্টই আনন্দ পায়।

এই সুযোগে রান্নাঘরের দিকটা একটু ঘুরে এলে কেমন হয়? এটা তো নারীদের সংসার রাজত্বের রাজধানী। দৈনন্দিন রান্নার আয়োজন করতেই আয়ের বেশ খানিকটা মোটা অংশ চলে যায়। আর রন্ধন প্রস্তুত করতে চলে যায় নারীদের সারাদিনের অধিকাংশ সময়ই। সেদিন এক বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে এলাম এক নতুন রান্না। খেতে কিন্তু বেশ সুস্বাদু লাগলো। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেই বসলাম—"এ জিনিষটা কি বুঝলাম নাতো?" অফিসার পত্নী বান্ধবীটি আমায় হাসতে হাসতে বললো এটা হলো "দুখী চচ্চড়ি"—অর্থাৎ নানারকম সবজীর সাথে কিছু কিছু তরকারীর খোসাও স্থান পেয়েছে ঐ রান্নাটাতে। বুঝলাম সুগৃহিণী বান্ধবীটি আমার অপচয় কমাতে তৎপর। মাঝে মধ্যে বাজারের বাজেট শর্ট থাকলে করে দেখতে পারেন। মন্দ লাগবে না খেতে। সংসার চালাতে গেলে মাঝে মাঝে গৃহিণীদের এমন জোড়াতালিতো দিতে হয়, ঠিক নয় কি? সংসারের অপচয় কমাতে গেলে গৃহিণীদের আরো একটা বিষয়ে আগ্রহী হলে ভালো হয় তা হলো 'কিচেন গার্ডেন'। 'কিচেন গার্ডেনের' মাঝে দুটি জিনিষ চরিতার্থ হয়। এক হলো এটা একটা সুন্দর 'ছবি'। দ্বিতীয়ত পরোক্ষভাবে কিছু ব্যয়বাহুল্য কমায়। অবশ্য সবাই তো হাতের কাছে জমি পায় না, যাদের আছে, তাদের জন্যেই বল্লাম।

বেশ-ভূষায় ও প্রসাধনের জন্যে কিছু খরচ আছে মেয়েদের। সেক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাটাই যেন প্রথম ও প্রধান জায়গা পায়। বিলাসিতার জন্য বেশী অর্থ অপচয় না করে যদি স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগী হওয়া যায় তাহলে সৌন্দর্য্য যে আপনিই প্রকাশ পাবে, তা সমঝদার মাত্রই জানেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী চিন্তা

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সম্বন্ধে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা। (ছ) আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করবার দিন নেই, আজ তার সঙ্গে 'বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে' হবে। পল্লীবাসীদের জন্য উন্নত ধরণের কৃষিকার্য ও পশুপালন-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন। (জ) পল্লী অঞ্চলে স্বদেশ-শিল্পজাত জিনিষের প্রচলন। সেই সব জিনিষ যাতে সুলভ ও সহজ প্রাপ্য হয় তার ব্যবস্থা করা। (ঝ) প্রতি পল্লীতে চিকিৎসা ও ঔষধের সুবন্দোবস্ত করা। (ঞ) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি। (ট) বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পল্লীর অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে সাবিক সংবাদ রাখা। (ঠ) পাবলিক ওয়ার্কস্ সম্বন্ধে পল্লীবাসীদের সজাগ করে তোলা—এতে রয়েছে পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা তৈয়ারি ও মেরামত, জঙ্গল সাফ ইত্যাদি। অর্থের অভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পল্লীবাসী দেবে 'কায়িক পরিশ্রম রূপ চাঁদা'। (ড) গ্রামে গ্রামে পল্লীবাসীদের উপযোগী যন্ত্রশিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা। কুটির শিল্পের প্রসার। (ঢ) খাদ্য-শিল্প গড়ে তোলা। (ণ) কৃষকদের ঋণমুক্তির জন্য এবং আর্থিক অবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজনে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন। (ত) পল্লী-শিক্ষার এক আদর্শ কেন্দ্ররূপে শ্রীনিকেতন-এর প্রতিষ্ঠা। (থ) জীবনধারার মান উন্নয়নে-অভিজ্ঞতার সংযোগ। পল্লীবাসীর মধ্যে গভীরভাবে আত্মশক্তিতে আস্থা ও আত্ম-নির্ভরতার ভাব জাগিয়ে তোলা। (দ) অকৃত্রিম পল্লীপ্রীতি, পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা। (ধ) প্রত্যেক জেলায় মেলার মাধ্যমে নতুন নতুন যাত্রা, কীর্তন ও কতকথা, বায়স্কোপ, ম্যাজিক, লণ্ঠন ও ব্যায়াম ইত্যাদির আয়োজন। আনন্দানুষ্ঠানের সমন্বয়ে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক এবং কৃষি ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা। (ন) পল্লী সমাজ স্থাপন। পল্লী সমাজ গ্রহণ করবেন কৃষি ও পল্লী সংস্কারের বিভিন্ন দায়িত্ব।

বিশদফা কর্মসূচীর মধ্যে আমরা রবীন্দ্রভাবনার প্রচুর অনুসরণ ও অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করি। নির্যাতনমূলক বেগার শ্রমিক প্রথাকে বে-আইনী ঘোষণা করা; ভূমিহীন ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য বাস্তুজমির বিলি ত্বরান্বিত করা; উদ্বৃত্ত জমি দ্রুত বন্টন; গ্রামীণ ঋণ বিলোপের পরিকল্পনা, ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্রচাষী ও কারিগরদের ঋণ মকুবের মাধ্যমে আমরা দুর্গত পল্লীবাসীদের ভাগ্য পরিবর্তনের আভাস দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা এই তিনটি প্রধান বিষয়ের সমস্যার উপর গুরুত্ব দিতেন। আলোচ্য কর্মসূচির মধ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা; জন সাধারণের জন্য বস্ত্রের সরবরাহ, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বই ও খাতাপত্র সরবরাহ ইত্যাদি রবীন্দ্র নাথের সাধারণ মানুষের জন্য ত্রিবিধ সমস্যার সমাধানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

পল্লীব্যাঙ্ক গঠনের যে ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন আজকের সরকারী কর্মসূচিতেও সে ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর উন্নয়নের অন্যতম মূলকথা ছিল, পল্লীবাসীদের আর্থিক উন্নয়ন এবং তাদের দারিদ্র্যসীমার উপরে টেনে তোলা। আমাদের জাতীয় কর্মসূচিতে সে ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে। শ্রীনিকেতনের পল্লী শিক্ষাকেন্দ্রে যে বিজ্ঞান শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে জনসমবায়ের মূলতত্ত্ব রবীন্দ্র-অনুধ্যানে নিহিত ছিল, বর্তমানের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের কর্ম-সূচিতে সেই অনুধ্যানের আশ্চর্য প্রতিফলন লক্ষ্য করলে তার সার্থক ও সুদূরপ্রসারী পল্লী পুনর্গঠন চিন্তা সম্পর্কে সন্দিহান হবার অবকাশ থাকে না।

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব

স্বপনকুমার ঘোষ

১৯২৫ সালে সম্ভবত শান্তিনিকেতনে প্রথম বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছাব্বিশে ফাল্গুন পূর্ণিমার রাতে বসন্ত উৎসবকে স্বাগত জানানোর জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি হল। অনুষ্ঠান আর আম্রকুঞ্জে হল না। কলাভবনের ঘরে বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হল।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন: বৎসরে বৎসরে আশ্রমের এই আম্রকুঞ্জে দোল উৎসবের দিনে আমাদের নৃত্যে গানে কাব্যে ছন্দে সুন্দরের অভ্যর্থনা করে থাকি। বসন্তের যে দৈববাণী মর্মলোক থেকে আসছে এই ধরণীর ধূলোয়, তাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত করে নেবার জন্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

১৯৩৫ সালের ২০শে মার্চ শান্তিনিকেতনে এমনি এক বসন্ত উৎসবে বিশ্বভারতীর আচার্য্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নাচের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইন্দিরা নেহরু তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত, বসন্ত উৎসবে 'কে দেবে গো চাঁদ তোমায় দোলা' ও 'তোমার বাস কোথা যে পথিক' এই দুটি গানের সঙ্গে ইন্দিরা নেহরু সমবেত নাচের দলে নেচেছিলেন।

পরের বছর ১৯৩৬ সালের ৮ই মার্চ শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বভারতীর আচার্য স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা নেহরুর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছয়। গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করলেন। সেদিন উপাসনা সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারিদিকে শুষ্ক পাতা ঝরে পড়বে তার মধ্যে নব কিশলয়ের অভিনন্দন। আজ জরাবিজয়ী নতুন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের ঋতুরাজ জওহরলাল। আর আছেন বসন্ত লক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য সত্তায় সম্মিলিত। তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসন্ত সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন সে তো অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেননি। সাংঘাতিক বিরুদ্ধতার প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তাঁরা দেশের শুভসূচনা করেছেন। এই জন্যে আমাদের আশ্রমের এই বসন্ত উৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিনরূপে গ্রহণ করেছি। তাঁরা আপন নির্ভীক বীর্যের দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক।

প্রতিবারের মতন এবারেও ষোলই মার্চ সকালে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হল- "ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল"—সমবেত কন্ঠে গানের সঙ্গে নৃত্য সহযোগে শালবীথি হয়ে মাধবীকুঞ্জর মধ্য দিয়ে আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা। নাচের দলের গায়ে বাসন্তী রংয়ের জামা আর কমলা রংয়ের উত্তরীয় শোভা পাচ্ছিল। কপালে ছিল আবীরের প্রলেপ হাতে কাঁচা তালপাতার ঠোঙ্গা। তাতে ছিল পলাশ আর শালফুল। আম্রকুঞ্জ ছিল সুচিশুভ্র মনোরম অনুষ্ঠানের সুসজ্জিত রঙ্গভূমি।

ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—গানটি গেয়ে ভোরে বৈতালিক দল, আশ্রম পথ পরিক্রমা করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন ক্ষেত্র বিশ্বমৈত্রীর মহান তীর্থ ঐতিহাসিক আম্রকুঞ্জ ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন ছাত্র-ছাত্রী-কর্মী বহিরাগত অতিথি ও বহু বিদেশী। ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা নাচ গান পাঠ ও আবৃত্তি করেন। আম্রকুঞ্জ ও তার আশে পাশের প্রাঙ্গণে ছিল হাজারো হাজারো মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠান শেষে আরম্ভ হল আবীর খেলা। শান্তিনিকেতনের নীল নির্মল আকাশের নীচে মুক্ত প্রাঙ্গণে আবীর খেলায় ছিল সীমাহীন আনন্দের মহাকল্লোল।

খেলা ধূলা

ফুটবলে দল বদল

কলকাতার ফুটবল লীগ শুরু হতে' আর দেরী নেই। ময়দান উত্তেজনায় ফেটে পড়তে তার সব সাজগোজ শেষ করে ফেলেছে। দলবদলের পালাও চুকেছে। খেলোয়াড়রা যে যার মনোমত দলটি বেছে নিয়েছেন ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করে। ফুটবল লীগ সুরুর আগে এ পর্বটিও কম উত্তেজনার নয়। অস্থির উত্তেজনায় কতো ফুটবল পাগল গ্রীষ্মের খরা মাথায় নিয়ে আই, এফ, এ-র অফিসের সামনে তীর্থের কাকের মত প্রতীক্ষায় থেকেছে। শিকারী চোখ খুঁজে ফিরেছে চেনা খেলোয়াড়ের মুখগুলি। তারা এলেই বুকে কাঁপন ধরেছে। বুকটা গুঁড়িয়ে গেছে যখন খবর হয়েছে অমুক দলের অমুক খেলোয়াড় এবার অমুক দলে সই করেছেন। কখনও কখনও অবশ্য অন্তর্জলী অবস্থাটা কেটে গেছে যখন শোনা গেছে —না: যা আশঙ্কাটা করা গিয়েছিল তা নয়। অমুক খেলোয়াড় এবার অমুক দলের খেলোয়াড়ই রয়ে গেছেন—একটা ছোট দলের পক্ষে উনি সই করে তা আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন। এবারের দল বদলের সুযোগে প্রায় রেকর্ডসংখ্যক খেলোয়াড় ছাড়পত্র নিয়ে দল পাল্টেছেন। ১৮৪৮ জন খেলোয়াড় দল বদলেছেন। প্রায় ১০০ খেলোয়াড় ছাড়পত্রে সই করে পরে তা ফিরিয়ে নিয়ে পুরোনো দলেই থেকে গেছেন। শুধু খেলোয়াড়ই নয় এবছরের জবর খবর কলকাতার দুই প্রধানের কোচও দল বদলাবদলি করেছেন। ফিফার শিক্ষণ-প্রাপ্ত কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী ইষ্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের গড়াপেটার দায়িত্ব নিয়েছেন। মোহন-বাগানের কোচ অমল দত্তও মোহনবাগান ছেড়ে ইষ্টবেঙ্গলে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই কোচ বদলাবদলি ঘিরে কিছুটা জেদ যে দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কাজ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ছাড়পত্রের শেষ তারিখ উৎরে যাবার পর মাঠ ময়দানে যখন আসন্ন ফুটবলের আবহ রচনার কাজ সমাধা করছে তখনই দলীয় সমর্থকের দল যে যার দলের আসা যাওয়ার হিসাব কষে শক্তির পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকল তা হিসাব করতে বসে গেছেন। তবে ক্রিকেটের মত ফুটবলের চরিত্রও তুলনায় কম অনিশ্চিত নয়। নামী দামী খেলোয়াড়ে দল সাজালেও সে দলকে লীগ পাল্লায় হামেশাই পিছিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কাজেই আসল খেলা শুরু না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের কোন্ দল শক্তসমর্থ আর কোন্ দল কমজোরী তা বোঝা সহজ হবেনা। তবু ছক কাটা হিসেবে দলের শক্তি পর্যালোচনা করার রেওয়াজ যেহেতু প্রচলিত আছে তাই লীগ আরম্ভের ঠিক মুখোমুখি দল-বদলের পর কোন্ দলের অবস্থা কেমন—সাধারণভাবে তার একটা আলোচনা করা যেতে পারে।

মোহনবাগান দল গত বছর মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। দলের আক্রমণ এবং রক্ষণ ভাগে কিছু ফাঁক ফোকর থাকায় লীগ দৌড়ে তাদের অবস্থা মোটেই সুবিধেজনক ছিল না। আর তা ছাড়া নামীদামী খেলোয়াড়রাও তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। এবছর সেই দিকে নজর রেখেই কর্ম-কর্তারা মোহন বাগানের দল গড়ার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা এবার মোহনবাগান দল ছেড়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ভাস্কর গাঙ্গুলী—গতবছর মোহন-বাগানের ৫—০ গোলে শোচনীয় পরাজয়ের দুর্গরক্ষক। এবার তিনি ইষ্টবেঙ্গলের দুর্গ দরজায় পাহারা দেবেন। গত বছরটা তরুণ ভাস্করের কাছে ভালো বছর ছিল না। গতবছর তার ক্রীড়া কীর্তির ইতিহাস মোটামুটি ব্যর্থতারই ইতিহাস। তবুও একথা স্পষ্ট ভাবেই বলা যায় ভাস্করের মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে। ইষ্টবেঙ্গল দুর্গরক্ষায় সেই প্রতিশ্রুতি হয়তো প্রতি-ফলিত হবে এমন আশা সমর্থকদের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। এছাড়া রক্ষণ ভাগের চিন্ময় চ্যাটার্জী, বিজয় দিকপতি, রতন দত্ত, বরুণ মিশ্র দল ছাড়লেও সেই অভাব পূরণ করতে এসে গেছেন ভারতীয় দলের নির্ভর যোগ্য ষ্টপার প্রদীপ চৌধুরী। ইনি বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের খেলোয়াড়। কলকাতার দর্শক অনেক প্রত্যাশায় প্রদীপের দিকে চেয়ে আছে। প্রদীপ ছাড়াও রক্ষণ ভাগের বিভিন্ন পজিসনে যোগ দিয়েছেন খিদিরপুর আর কালীঘাটের দিলীপ সরকার এবং উত্তম ঘোষ। ইষ্টবেঙ্গলের থেকে এসেছেন সেরা লিংকম্যান সমরেশ চৌধুরী। খিদিরপুর আর রাজস্থান থেকে এসেছেন শ্যাম মান্না আর সুকুমার মুখার্জী। আক্রমণ ভাগের অভিজ্ঞ কান্নান দল ছেড়ে গেছেন। দল ছেড়ে গেছেন শিশির গুহ দস্তিদার, কৃষ্ণ মিত্র এবং শিবব্রত নাথও। আক্রমণের শক্তি বাড়াতে যাঁরা এসেছেন দলত্যাগীদের তুলনায় তাদের শক্তি আর দক্ষতা দুই-ই বেশী। এরা হলেন সুভাষ ভৌমিক, হাবিব, আকবর এবং বিদেশ বসু। এরিয়ান্সের তরুণ তাজা খেলোয়াড় বিদেশের কাছে এবার সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেক।

গত বছরে ইষ্টবেঙ্গলের ভাগ্যে ছিল তুঙ্গে বৃহস্পতি। চারদিকেই তাদের

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস পুরুষ কিংবদন্তীর মহানায়ক ভারতীয় ফুটবলের দিশারী দুরন্ত গোষ্ঠপাল আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে' পঁচিশে চৈত্রের ভোররাতে তিনি

পরলোকে গোষ্ঠপাল

চিরকালের ইতিহাস হয়ে গেলেন। মাত্র সতের বছর বয়সে ফুটবলকে সখা করে কলকাতা ময়দানে যে তরুণ মেরুণ-সবুজের নিশান উড়িয়ে পাল তোলা নৌকোর হাল শক্ত মুঠোয় ধরেছিলেন—দীর্ঘ তিরিশ বছরে কোনদিন তা এতটুকু শিথিল হয়নি। ১৯১৩ সালে সতের বছরের যে গোষ্ঠ পাল শক্তপায়ে মাটি কামড়ে মোহনবাগানের জালঘেরা দুর্গের সামনে পাঁচিল তুলেছিলেন ১৯৩৫ পর্যন্ত সে পাচিলে এতটুকু চিড় ধরেনি। গোরা খেলোয়াড়দের খ্যাপা আক্রমণ তুরন্ত ছুটে আসত মোহন বাগানের দুর্গ বিজয়ে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সব জারিজুরিই হিম হয়ে যেত গোষ্ঠপালের পায়ের তলায়। ১৯১৩ থেকে '৩৫-এর ভেতর সংখ্যাতীত লড়াইয়ে মোহন বাগানের দুর্গ ঘিরে ছিল এমনই দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের পাঁচিল। যে পাঁচিলের দুর্ভেদ্যতায় মুগ্ধ হয়ে 'ইংলিসম্যান' কাগজ ঐতিহাসিক চীনের প্রাচীরের রূপকে তাঁর দুর্ভেদ্যতাকে চিহ্নিত করেছিল। গোষ্ঠপাল হয়েছিলেন—'চাইনীজ ওয়াল' গোষ্ঠপাল। লোকমুখে মুখে গ্রাম গঞ্জ ছাড়িয়ে বায়ুরও আগে ছুটে যেত সেই নাম। তাই অজ গ্রামেরও কোন কিশোরের সামনে জাগতিক বহু বিস্ময় এবং মহা-রহস্যের মধ্যে এক রহস্য ছিলেন কিংবদন্তীর গোষ্ঠপাল।

ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর গ্রামের ছেলে গোষ্ঠপালের জন্ম ১৮৯৬ সালে। কলকাতায় আসেন ১৯০৪ সালে। বাড়ির কাছাকাছি ছিল কুমারটুলি পার্ক সেখানেই ফুটবল দেখতে দেখতে ভালো-বেসে ফেলেন তাকে।

১৯১৩ সালে মোহনবাগানের হয়ে প্রথম সবুজ মেরুণ জামা গায়ে তুলে সেকালের দুঁদে ফুটবল দল ডালহৌসির বিপক্ষে খেলতে নামেন। অবশ্য আগের বছরই মোহনবাগানে খেলার জন্য ডাক এসেছিল তাঁর কাছে। উনিশশো তেরোয় সতের বছরের যে তাজা তরুণ ডালহৌসীর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ইতিহাস শুরু করে-ছিলেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ-এ ক্যালকাটার বিরুদ্ধে খেলে মেরুণ-সবুজ জামা গা থেকে নামিয়ে দিলেন। ছেদ রেখা পড়লো সেই ইতিহাসে। কিন্তু সব কিছু থামলো কই? তেইশ বছরের দুরন্ত ক্রীড়াকীর্তি তাঁকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় জীবন্ত করে রাখল মাঠে ময়দানে। মাঠ ময়দানই বা বলি কেন,—সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে।

জয়-জয়কার। সব প্রতিযোগিতাতেই বিজয়ীর সম্মান। প্রদীপ ব্যানার্জীর উন্নত শিক্ষায় ইষ্টবেঙ্গল দল গতবছর ভারতের অন্যতম সেরা দল হয়ে উঠেছিল। এবছর সুভাষ ভৌমিক, সমরেশ চৌধুরী, মোহন সিং, কাজল ঢালি, বিনয় পাঁজা, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার দল ছাড়ায় তাদের অবস্থা যে কিছুটা কাহিল হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। অবশ্য ইষ্টবেঙ্গল সাধ্যমত তরুণ খেলোয়াড় এনে দলের যতটা সম্ভব শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। দলে এসেছে মোহন বাগানের তরুণ গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী, জাতীয় ফুটবলে বাংলার প্রতিনিধি এরিয়ান্সের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় শ্যামল ব্যানার্জী। এছাড়াও ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগে শক্তি যোগাতে এসেছেন মোহনবাগানের চিন্ময় চ্যাটার্জী, আর রতন দত্ত, কালীঘাটের প্রশান্ত ব্যানার্জী, বি. এন. আর-এর বলাই চক্রবর্তী এবং এরিয়ান্সের সত্যজিৎ মিত্র। আক্রমণ-ভাগও ইষ্টবেঙ্গল কমজোরী রাখেনি। মোহনবাগানের কেষ্ট মিত্র, কান্নান, খিদিরপুরের বিভাস সরকার এবং এরিয়ান্সের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড় অনু চৌধুরীকে এনে আক্রমণ শানিয়েছে।

মূলত অন্যরাজ্যের খেলোয়াড়েই দল সাজায় মহমেডান স্পোর্টিং দল। গত কয়েক বছর সেই ধারা পরিবর্তন হয়েছে। এখন স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়েই তাদের দল গড়া চলে। প্রায় সমস্তই অবাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে এক সময় যে মহমেডান দল গড়তে অভ্যস্ত ছিল তার দল এখন সেখানে অধিকাংশই বাঙালী খেলোয়াড়। এবছরও তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়েই মহমেডান দল সাজানো হয়েছে। দল বদলের সুযোগে দল ছেড়েছেন আক্রমণের মূল ভরসা হাবিব আর আকবর। প্রবীণ নঈমও এবছর হয়তো খেলবেন না। কাজেই মহমেডানের শক্তিতে যে কিছুটা ঘাটতি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবু যথাসম্ভব অন্য দলে খেলোয়াড় এনে দলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন কর্মকর্তারা। রক্ষণভাগ তো কাজল ঢালি, বিজয় দিকপতি প্রতীস চক্রবর্তীর যোগদানে বেশ কিছু শক্ত সমর্থ হয়েছে। এঁরা এসেছেন ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের এবং এরিয়ান্স থেকে। ইষ্টবেঙ্গলের লিংক ম্যান মোহন সিং তাঁর শক্তির তুঙ্গে না থাকলেও হয়তো সাধ্যমত সাহায্য করতে পারবেন আক্রমণ ভাগকে। এছাড়া মোহনবাগানের শিশির গুহ দস্তিদার, রাজস্থানের মহম্মদ নাজিম, ইষ্টার্ণরেলের আল্লারাখা আর টালিগঞ্জের শ্যামসুন্দর দেও সাধ্যমত শক্তি যুগিয়ে আক্রমণের ধার বাড়াবেন বলেই বিশ্বাস।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনেমা

বাংলা ছবির সমস্যা

বাংলা ছবির সমস্যা নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। তার আগে এ শিল্পের সুস্থ চেহারাটা কী ছিল তা জেনে নেওয়া দরকার। উনিশশো সাতচল্লিশে আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন কলকাতায় ষ্টুডিও ছিল চৌদ্দটি। যেমন: নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর এবং দুনম্বর, ক্যালকাটা মুভিটোন, ইন্দ্রলোক, কালী ফিল্মস, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, ইন্দ্রপুরী, রূপশ্রী, ভারতলক্ষী, ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও, বেঙ্গল ন্যাশনাল ইস্টার্ন টকীজ, রাধা ফিল্মস ও অরোরা ষ্টুডিও। এইসব স্টুডিও থেকে তখন বছরে বাষট্টি খানা বাংলা ছবি তৈরি হয়ে বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পেত।

সে আমলে হাতীমার্কা নিউ থিয়েটার্স একাই একশো ছিল শুধু বাংলা নয় হিন্দীতেও এখান থেকে ছবি তৈরি হোত। দু-দুটো স্টুডিও চালাতেন নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার। এ সংস্থার নিজস্ব শিল্পী এবং কলাকুশলীর দল ছিল। মাস-মাইনেয় এঁরা কাজ করতেন। আজকের মত এত সমস্যা সেদিন ছিল না। বাংলা ছবির বাজার বেশ রমরমা ছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এ শিল্পের অচল অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হল সেটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর অনেক বছর কেটে গেছে। এরমধ্যে এক সময় নিউ থিয়েটার্সের যুগও শেষ হল। কলকাতা থেকে হিন্দী ছবি তৈরি বন্ধ হয়ে গেল। এখানকার শিল্পী এবং কলাকুশলীরাই বম্বের হিন্দী ছবিতে যোগ দিলেন। সর্বভারতীয় ছবির বাজার পেতে হিন্দী ছবির রঙে-রসে রঙিন হল। চিত্তবিনোদনী-চিত্রের প্রতিযোগিতায় বাংলা ছবি ক্রমশ হটে যেতে লাগল। একমাত্র শিল্প চিত্র (Art Film) ছাড়া বাংলা ছবির আর কিছু রইল না। উনিশশো পঞ্চান্নয় সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করল। ভারতের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তিত হবার পর বাংলা ছবিই বারবার সর্বোচ্চ পুরস্কার বিজয়ী হয়েছে। বলতে গেলে বিদেশে যেসব ভারতীয় ছবি পুরস্কার ধন্য হয়েছে সেগুলোর বেশীর ভাগই বাংলা ছবি। কিন্তু এণ্টারটেনিং চিত্র হিসেবে হিন্দী ছবির কদর সব থেকে বেশি। ছবির বাজারে হিন্দী ছবি বাংলা ছবিকে কোণঠাসা করে দিয়েছে। ফলে বাংলা ছবির সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

চৌদ্দটির জায়গায় আজ কলকাতায় মাত্র ছ'টি স্টুডিও চলছে। স্টুডিওর সংখ্যা কমে গেলেও এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন প্রায় তিন হাজার কলাকুশলী। এঁদের মধ্যে আবার শতকরা পঞ্চাশজন বেকার। যারা বছর ছবিতে কাজ করেন শতকরা দশজন। সুতরাং কী ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে এ জগতের মানুষেরা সংগ্রাম করে চলেছেন তা এ পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়। ছবি তৈরির কাজ কমে যাওয়ায় এমন রূপ ধারণ করেছে। ছবি কমতে কমতে এখন বছরে গড়ে পঁচিশখানা বাংলা ছবিও মুক্তি পায় না। অথচ এমন একদিন গেছে যখন সারা বছরে বাষট্টিখানা ছবি তৈরি হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় মোট ৩৮০ টি প্রেক্ষাগৃহ আছে। এরমধ্যে কিছু নতুন চিত্রগৃহও নির্মিত, হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মাত্র ১৬ টি প্রেক্ষাগৃহে কেবল বাংলা ছবি দেখানো হয়। কলকাতায় শুধু বাংলা ছবি মুক্তি পায় এমন প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা মাত্র চারটি। বাংলা এবং হিন্দী মিশিয়ে ১৮৬ টি চিত্রগৃহে ছবি দেখানো হয়। আর বাকি সব প্রেক্ষাগৃহে চলে শুধু হিন্দী ছবি।

বাংলা ছবির সমস্যা এত সংকটময় যে হঠাৎ করে এর সমাধান করা দুঃসাধ্য। তবে বাংলা চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে গেলে এই মুহূর্তে প্রতিকারের উপায় ভেবে নিয়ে কাজে নেমে পড়তে হবে। প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বলিষ্ঠ বিশদফা কর্মসূচীকে সামনে রেখে এগিয়ে গেলে বাংলা ছবিকে এখনও বাঁচানো যায়। কারণ কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা থাকলে সমস্যার মোকাবিলা করা অসাধ্য নয়।

এ শিল্পের ব্যবসার দিকটা প্রধানত প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রদর্শকের ওপর নির্ভর করে। ছবি তৈরী করার সময় থেকে মুক্তি পর্যন্ত সব দায়দায়িত্ব প্রযোজককে নিতে হয়। এককথায় প্রযোজকের ভূমিকাটা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত। আর ব্যবসার মধ্যমণি হলেন পরিবেশক। মালিক হলেন প্রদর্শক। এঁর অবস্থাটা প্রযোজক এবং পরিবেশকের মত নয়। অনেক নিরাপদ। কোন ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্য দেখা দিলে লোকসানের ঝুঁকি তাঁকে নিতে হয় না। সুতরাং প্রযোজককে বাঁচাতে হলে সরকারের মধ্যস্থতায় প্রদর্শক ও পরিবেশকের মধ্যে একটা নতুন লাভজনক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

নিউ থিয়েটার্সের মত কলকাতা থেকে আবার হিন্দী ছবি নির্মাণের কথা ভাবতে হবে। প্রথম দিকের প্রচেষ্টাকে সরকারের সাহায্য দেওয়া উচিত। সর্বভারতীয় ছবির বাজার ধরতে হলে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ছবি তৈরি করা ছাড়া কোন পথ নেই।

তৃতীয়ত, শুধু হিন্দী ছবি দেখানো হয় এমন প্রেক্ষাগৃহগুলোতে বাধ্যতামূলক-ভাবে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুখের কথা, রাজ্য সরকার এব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। বাংলা ছবির রিলিজ চেন যতক্ষণ না বাড়ছে ততক্ষণ এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। ছবিঘর বেড়ে গেলে ছবি তৈরির সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। আর এই সঙ্গে স্টুডিওরও উন্নতি হবে। বন্ধ স্টুডিওগুলো আবার খুলবে। ফলে কলাকুশলীদের কর্মসংস্থানের একটা পাকাপাকি রূপ নেবে। ন্যূনতম বেতন এবং চাকরির নিরাপত্তা এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে।

চতুর্থত, সেন্সরের তারিখ অনুযায়ী ছবির মুক্তি ব্যবস্থা নির্ধারিত করা প্রয়োজন। তা নাহলে যেসব ছবিতে নামকরা চিত্র-তারকা নেই সেগুলো রিলিজ করানো সম্ভব হয়ে উঠবে না। এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ খুবই প্রয়োজন।

আশার কথা এই শিল্পকে বাঁচাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষৎ গঠন করেছেন।

[illegible]ংলা ছবির সমস্যা প্রসঙ্গে নানা [illegible]না করা যেতে পারে। কিন্তু [illegible] সত্য হলেও যেটা সবার আগে বলা দরকার তা হল ভাল ছবি এবং পরিচালকের। এ দুটির অভাব আজ সব থেকে বেশি। আজকের বাংলা ছবি দর্শকদের যে মন ভরাতে পারছে না তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। অথচ নতুন ছবির পাশেই পুরণো বাংলা ছবিগুলো দিব্যি চলছে। এর কারণ আগেকার ছবিতে গল্পের টান ছিল। এখনকার ছবিতে গল্প মোটেও জমছে না। বেশিরভাগ চরিত্র অ্যাবসার্ড। ঘটনাগুলোও অবাস্তব মনে হয়। যুক্তিগ্রাহ্য কাহিনী নিয়ে ছবি করলে তা চলতে বাধ্য। সেই সঙ্গে ছবিকে চিত্রগ্রাহী করে তুলতে পারলে তো কথাই নেই। ছবির উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেলে রঙিন হিন্দী ছবির পাশ কাটিয়ে দর্শকরা আবার বাংলা ছবির দিকে ঝুঁকবেন। ব্যবসায়িক সাফল্যে তখন নানা সমস্যার মেঘ কেটে যাবে।

আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

পূর্বরাগের সরস ছবি

সব ছবিই শিল্প-চিত্র হবে এমন কোন কথা নেই। ব্যবসায়িক-চিত্রও যে সুরুচি-পূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন চিত্র হতে পারে তা বাসু চ্যাটার্জির সাম্প্রতিক হিন্দী ছবি 'ছোটী সী বাত' দেখে বোঝা গেল।

ছবির প্রাক্কথনে নতুনত্ব আছে। প্রামাণ্য চিত্রের আঙ্গিকে পরিচালক ধারাভাষ্যের মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকাকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পরিচয়-পর্বে দেখা গেল প্রেমিক অরুণ এবং প্রেমিকা প্রভা দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। কিন্তু একই বাস-স্টপের কিউয়ে ওদের রোজ দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই পূর্বরাগের শুরু। প্রভাকে অরুণের ভাল লাগে। কিন্তু অরুণ এতই লাজুক যে মুখফুটে সেকথা প্রভাকে কিছুতেই জানাতে পারছে না। তাই প্রভাকে নীরবে অনুসরণ করা ছাড়া অরুণের আর কোন উপায় ছিল না। প্রেম পর্বের এই প্রাত্যহিকতায় অরুণের নানা কল্পনা এবং স্বপ্নের মধ্যে প্রভাময় জগতের ছবি ফ্ল্যাশব্যাক এবং ফ্যাশ ফরোয়ার্ড-এর মাধ্যমে সুন্দর ব্যক্ত করতে পেরেছেন বাসু চ্যাটার্জি। অনেক না বলা কথা শুধু প্রকাশভঙ্গির ব্যঞ্জনায় চিত্রটি প্রাণবন্ত হতে পেরেছে। সেই সঙ্গে নানা অবিস্মরণীয় কৌতুক মুহূর্ত ছবির উপভোগ্যতাকে শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

'ছোটী সী বাত'-এ বিদ্যা সিনহা

ছবির দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইচ্ছাপূরণের প্রয়াস দেখা যায়। অরুণ এবং প্রভা ঘটনাচক্রে পরস্পর যখন ঘনিষ্ঠ হতে চলেছে সেসময় প্রভার এক বন্ধুকে দিয়ে যেভাবে ত্রিকোন প্রেমের দ্বন্দ্ব গড়ে তোলা হয়েছে তা এ ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। চরিত্রটি খল-নায়কের রূপ নিয়েছে। এছাড়া লাভ-মেকিং-এর ট্রেনার হিসেবে অভিজ্ঞ এক কর্ণেলের ভূমিকায় অশোককুমারকে যেভাবে অরুণের আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে দেখা গেল তা কৌতুকজনক হলেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বাস্তবে এ ধরণের চরিত্র কি দেখা যায়? ছবির অভিনয়াংশে অরুণ ও প্রভার চরিত্রে অমল পালেকর ও বিদ্যা সিনহার অভিনয় বেশ স্বাভাবিক। অশোক কুমার ও আসরাণী প্রশংসনীয়।

ছবির কলাকৌশল কর্মের মান উন্নত। বিশেষ করে আলোকচিত্র এবং সম্পাদনায় দক্ষতার পরিচয় মেলে। সঙ্গীত পরিচালনায় সলিল চৌধুরী সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। ছবির দুটি গান সুপ্রযুক্ত।

—চিত্রবিদ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লি: হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত

ধনধান্য

১ জুন
১৯৭৬

পরবর্তী সংখ্যায়

ধনধান্যের আগামী সংখ্যার বিষয় জাতীয় জীবনের এক বছরের সাফল্য ও অগ্রগতি। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে পয়লা জুলাই। লেখক-সূচীতে রয়েছেন জ্যোতি সেনগুপ্ত, ডঃ অমরনাথ দত্ত, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বহ্নি রায়, প্রণবেশ সেন, গোপাল কৃষ্ণ রায় নির্মল সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ রায়, কবিতা সিংহ এবং আরো অনেকে।

এই যুগ্ম সংখ্যার (১৫ জুন ও ১লা জুলাই) দাম হবে এক টাকা। অতিরিক্ত কপির জন্য এজেন্টরা সম্পাদকের নিকট আগেই লিখুন।

এছাড়া খেলাধূলা, মহিলামহল, সিনেমা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

এশিয়ার বৃহত্তম ড্রেজার 'মহাগঙ্গা'

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপের তৈরী এশিয়ার বৃহত্তম ড্রেজার 'মহাগঙ্গা' সম্প্রতি জলে ভাসল। কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের জন্য ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ড্রেজারটি তৈরী হয়েছে। এর ৮০ শতাংশ সাজসরঞ্জামই দেশজ। তৈরীর কাজ পুরো শেষ হয়ে গেলে এই ড্রেজারটি সাগর-হলদিয়া পথে মাটি কাটার কাজ সুরু করবে। মহাগঙ্গার দৈর্ঘ্য ১৪০ মিটার এবং ৭৫ মিনিটে ২০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সাড়ে সাত হাজার টন মাটি কাটার ক্ষমতা এর আছে।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯

গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতিসংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA

বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

সপ্তম বর্ষ : সংখ্যা ২৩/১ জুন ১৯৭৬

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—
মনোজ বিশ্বাস

পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার

সম্পাদকের কলমে

১৯৭২ সালের জুলাই-এ সিমলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার পরবর্তী অধ্যায় দুইদেশে প্রতিনিধিদের মধ্যে বার বার আলোচনা। কখনও সে আলোচনা সার্থকতায় মণ্ডিত কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কিন্তু হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে যে সব সমস্যারই সমাধান সম্ভব সেটা প্রমাণিত হল গত ১২ই মে থেকে ১৪ ই মে ইসলামাবাদে দুই দেশের বিদেশ সচিবদের আলোচনান্তে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে। এতদিন পরে ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সুরু হতে চলেছে।

গত ১৮ই মে সংসদে এই যুক্ত ইস্তাহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ওয়াই. বি. চ্যবন বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংগে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করাই ভারত সরকারের নীতি। সিমলা চুক্তির পর এই ক'বছরে বেতার ও ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত স্বাভাবিক করার জন্য ভিসা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জাহাজে পণ্য পরিবহণ ও ব্যবসা বাণিজ্য স্বাভাবিক করার জন্য উভয়দেশ সম্মত হয়েছে। কিন্তু বাকী ছিল আকাশ পথে বিমান চলাচল, স্থলপথে রেল ও সড়ক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন। দু দু'বার আলোচনা সত্ত্বেও কোন চুক্তি সম্ভব হয় নি। পরে সম্প্রতি দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে মত বিনিময়ের ফলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ে দু'দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনান্তে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই এই চুক্তি রূপায়িত করা হবে বলেও উভয় দেশ রাজী হয়। ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি শান্তি, মৈত্রী ও গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে সকল প্রকার সমস্যার সমাধান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব বলে ভারত বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কঠিনতম সমস্যারও সমাধান করা যায়। পাকিস্তানের সংগে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এই সদিচ্ছারই ফলশ্রুতি।

শুধু পাকিস্তান কেন প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব-পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে ভারত আগ্রহী ও সচেতন। সম্প্রতি চীনের সংগে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রদূত নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বেশ ক'বছর আগে চীনের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর ভারতের এই সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ উভয়দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ প্রশস্ত করবে। বাংলাদেশের সংগে আলোচনার মাধ্যমে উভয়দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে ফরাক্কা সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বার বার বলেছেন। এব্যাপারে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা ও সদিচ্ছার প্রকাশ সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সংগে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা। তা ছাড়া নেপাল, ভূটান, সিংহল, বার্মা, শ্রীলংকা ও আফগানিস্থানের সংগে সব সমস্যাই সমাধান করা হচ্ছে এই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। এর ফলে ভারত আশা করে এই উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

ফসল ফলানোর কারিগর

গোপালকৃষ্ণ রায়

যাদের ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য আছে, যাদের শ্রমে মাঠে ফসলের ঢেউ ওঠে আর যাদের জীবনের অবক্ষয়ে সমাজের কোন এক প্রান্তে বেলাভূমি গড়ে ওঠে—তারাই ক্ষেতমজুর—তারাই আমাদের মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলানোর কারিগর। তাদের দিনান্তের শ্রম কোটি মানুষের ক্ষুধার অন্ন যোগায়। অথচ নিজেদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটেনা। এদের সংখ্যা কত সারা দেশে? পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, এদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৫১ সালে সারা দেশে এদের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯০ হাজার। ১৯৭১ সালের হিসাবে পাচ্ছি তাদেরই সংখ্যা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ১০ হাজার। সরকারী সমীক্ষায় প্রকাশ, শুধু জন্মসূত্রেই এদের সংখ্যা বাড়েনি—বেড়েছে আরও অনেক কারণে, বেড়েছে—অর্থনৈতিক কারণেও।

সারাদেশে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় ১৯৬১ সালে ছিল ১৬.৭১ শতাংশ। ১৯৭১ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ২৫.৭৬ শতাংশ। কারণ হিসাবে, সরকারী বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ভূমি সংস্কার আইন বলবৎ ও কার্য্যকর হবার পর—বহু জমির মালিক বর্গাদারের কাছ থেকে নিজেদের জমি ফিরিয়ে নেবার ফলে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ন্যাশনাল স্যাম্পল্ সার্ভের পঁচিশতম বৈঠকে প্রকাশিত তথ্য থেকে ভূমিহীন ও স্বল্পভূমির মালিক ক্ষেত মজুরদের ছবি স্পষ্ট। উড়িষ্যায় এক একরের নীচে জমির মালিক এমন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (৭২.২%), তার পরের স্থান যথাক্রমে উত্তর প্রদেশ (৭৩.৭%), তামিলনাড়ু (৭০.৭%) এবং মধ্য প্রদেশ (৫৩.১%), পাঞ্জাবে এই শ্রেণীর ক্ষেত মজুরের সংখ্যা সবচেয়ে কম (৬.৪%)।

যারা সারাদেশের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের বেশী—তারা আজও অসংঘবদ্ধ। এদের সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার বিশেষ কোন রাজনৈতিক বা শ্রমিক সংগঠন খুব যে বেশী তৎপর হয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ সংঘবদ্ধ করতে পারলে এরা শুধু অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও জোতদারের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেত না, দেশের কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি কুসুমে কুসুমে আস্তীর্ণ হ'ত।

একটি সরকারী অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সারা দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যার ২৬.৩৩ শতাংশই হল কৃষি মজুর। সারা দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে ১৮,০৩,৭৩,০০০। এর মধ্যে চাষী হচ্ছে ৭,৮১,৭৭,০০০ এবং কৃষি মজুরের সংখ্যা নিরূপিত হয়েছে ৪,৭৪,৮৯,০০০।

ভারতবর্ষে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী অন্ধ্র প্রদেশে (৬৮,২৯,০০০), তার পরেই গুজরাট (৬৮,০৬,০০০)। তৃতীয় স্থান হচ্ছে উত্তর প্রদেশের। এই রাজ্যে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হল ৫৪,৫৪,০০০। সবচেয়ে কম হল নাগাল্যাণ্ডে মাত্র ৪,০০০, মণিপুরে ১৩,০০০, জম্মু ও কাশ্মীরে ৪২,০০০, হিমাচলে প্রদেশ ৫৩,০০০ এবং ত্রিপুরায় ৮৬,০০০। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হল ৩২,৭২,০০০।

এবার কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুর পরিবারের বার্ষিক আয়ের দিক দেখা যাক। ১৯৫০-৫১ সালে প্রতি কৃষি শ্রমিক পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ছিল ৪৪৭ টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে গড় আয় বেড়ে হল টা ৪৭৩.৪৭ পয়সা এবং সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা নেবার ফলে ১৯৬৩-৬৪ সালে এদের আয় কিছু বেড়ে হল টা. ৬৬০.১৯ পয়সা। ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রতি কৃষি শ্রমিক পরিবারে গড়ে লোক-সংখ্যা ছিল ৪.৪৭ জন।

দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৬৩.৮ ভাগ কৃষি শ্রমিকই ঋণগ্রস্ত। পরিবার প্রতি গড় ঋণের পরিমাণ ১৪১ টাকা। ১৯৬৪-'৬৫ সালে একটি পুরুষ কৃষি-শ্রমিক লাঙ্গলের কাজের জন্য পেতেন টা. ১.৩৯ পয়সা, আর মেয়ে শ্রমিক পেতেন টা. ১.০২ পয়সা। রোয়া কার্য্যে যেখানে পুরুষ শ্রমিক পেতেন টা. ১.৫১ পয়সা—মেয়ে শ্রমিককে দেওয়া হত মাত্র ৯৭ পয়সা। শষ্য কাটার মজুরী ছিল পুরুষ শ্রমিকের টা ১.৪৩ পয়সা—মেয়েদের ছিল মাত্র ৯৫ পয়সা। সমগ্র কৃষি কার্য্যের জন্য একটি পুরুষ শ্রমিক গড়ে দিনে মজুরী পেতেন টা. ১.৪৩ পয়সা ও মহিলা শ্রমিক পেতেন ৯৫ পয়সা।

রাজ্য শ্রমসংস্থার একটি সমীক্ষায় বাঁকুড়া জেলা কৃষি শ্রমিকদের একটি করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। ঐ জেলার কৃষি শ্রমিকের দৈনিক গড় আয় মাত্র ২৬ পয়সা। সমীক্ষক ধারণা করছেন, যদিও ধরে নেওয়া যায় কৃষি শ্রমিকরা অন্য কোন উপায়ে আরও কিছু আয় করেন, তাহলেও তাদের দৈনিক আয় মাথাপিছু ৫০ পয়সার বেশী হবে না। সমীক্ষক এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন—'the fact that he exists is a miracle.' কৃষি কার্যে বেকারী ও আংশিক বেকারী একটি বিরাট সমস্যা। এই সম্পর্কে খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, কৃষি শ্রমিক বছরে ১৮০ দিন কাজ পায়।

কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুরদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে পঞ্চম পরিকল্পনায় নূতন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ ক'রে কৃষি শ্রমিকদের আয় বাড়িয়ে দেওয়ার

ব্যবস্থা করাই হয়নি গ্রামাঞ্চলের চিরায়ত দুঃখ দুর্দশাকে দূরীকরণের জন্য ব্যাপক বাস্তব পরিকল্পনা বর্তমানে রূপ পরিগ্রহ ক'রে চলেছে।

সর্বনিম্ন মজুরী আইন অনুসারে, একটি প্রাপ্ত বয়স্ক কৃষি শ্রমিক নারী পুরুষ নির্বিশেষে মূল বেতন টা. ৫.৫৬ ও মহার্ঘভাতা টা. ১.০৩ পয়সা-মোট ৬.৬৩ পয়সা পাবেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃষি শ্রমিকদের জন্য মূল বেতন ৪.০০ টাকা ও মহার্ঘ ভাতা ৭৪ পয়সা, মোট টা. ৪.৭৪ পয়সা নির্ধারিত ক'রে দেওয়া হ'ল। ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে কৃষি শ্রমিকদের মান উন্নয়নের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে প: বঙ্গ সরকার সহ অন্যান্য রাজ্য সরকার কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর হার পুনর্বিন্যাস করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক খেতমজুরের মজুরীর হার ধার্য হয়েছে ৮ টাকা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ৫ টাকা ৮২ পয়সা। সর্বোচ্চ মজুরী ধার্য হয়েছে কেরালায় ৮ টাকা ১০ পয়সা। তারপরেই পশ্চিমবঙ্গের হার। সব রাজ্য সরকারই সর্বনিম্ন মজুরী বেধে আইনই শুধু করলেন না—তা সব জায়গায় কার্য্যকর করার জন্যেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। প: বঙ্গ সরকার ব্লক পর্যায়ে এই আইন বলবৎ করার জন্য তদারকী ব্যক্তি নিয়োগ ক'রেছেন। প্রতি ব্লকে একজন পরিদর্শক ও মহকুমা পর্যায়ে এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার নিয়োগ ক'রেছেন। এরা দেখবেন কৃষি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন ঠিক মত কার্য্যকর হচ্ছে কিনা। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার কৃষি শ্রমিকদের অন্যান্য সমস্যার দিকেও নজর দিতে সুরু ক'রেছেন। কৃষি মজুরদের সংঘবদ্ধ করার জন্য "প্রতিষ্ঠানিক" সমর্থনের চেষ্টাও করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার ৬০তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে রাজ্য শ্রম দপ্তর গত বছর "গ্রামীণ-নিঃস্ব" কনভেনশন ক'রেছিলেন। এই ধরনের কনভেনশন ভারতে প্রথম।

রাজ্য শ্রমদপ্তর সর্বনিম্ন মজুরী আইন বলবৎ করার পর, কয়েকটি জেলায় সমীক্ষা ক'রেছেন। এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কৃষি মজুর সর্বনিম্ন মজুরীর খবর রাখেন না। এই অবস্থার অবসানের জন্যেই ব্লক পর্য্যায়ে তদারকী ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি আশা করেন "শ্রমিক সংস্থা"গুলি তৎপর হ'য়ে উঠলে কৃষি শ্রমিকদের শতবর্ষের নিপীড়নের গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

পরিকল্পনায় শুধু আইনসিদ্ধ মজুরী বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়নি, অসমতা কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্দশা লাঘবের বাস্তবোচিত পরিকল্পনা রূপদান করা হচ্ছে। নারোরা কংগ্রেস শিবিরে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছিল, আজ সেগুলোও রূপায়ণের পথে। নারোরা ক্যাম্প মনে করেন, বর্তমান ভূমি সংস্কার আইন, ভূমির সর্বোচ্চসীমা আইন, এবং কৃষি শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী আইন যথাযথ ভাবে বলবৎ করতে পারলে—শুধু গ্রামাঞ্চলে থেকে গরিবী হটবে না—যারা ফসল ফলায় তাদের জীবনেও আশার আলো জ্বলে উঠবে। সরকার নীরব থাকলেন না। আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা হল। কুঁড়ি দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী হল আইন পাশ। ক্ষেত মজুর বা কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রায় সব রাজ্য সরকারগুলিই সর্বনিম্ন মজুরী বেঁধে দিয়ে আইন পাশ করলেন। সারাদেশের ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮০ হাজার ক্ষেত-মজুরের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৪ সালে ক্ষেতমজুরদের সর্বনিম্ন মজুরী বেঁধে দিলেন। সেই সংগে প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরীর তারতম্য তুলে দিয়ে মজুরীর হার সমান ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়, মূল বেতন ছাড়াও কৃষি শ্রমিকদের জন্য মহার্ঘ ভাতাও প্রদান আইনসিদ্ধ করলেন। কোন সরকারের পক্ষে একটি অসংঘবদ্ধ শ্রমজীবীদের জন্য বেতন ও মহার্ঘভাতা নির্ধারণ, অবশ্যই একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
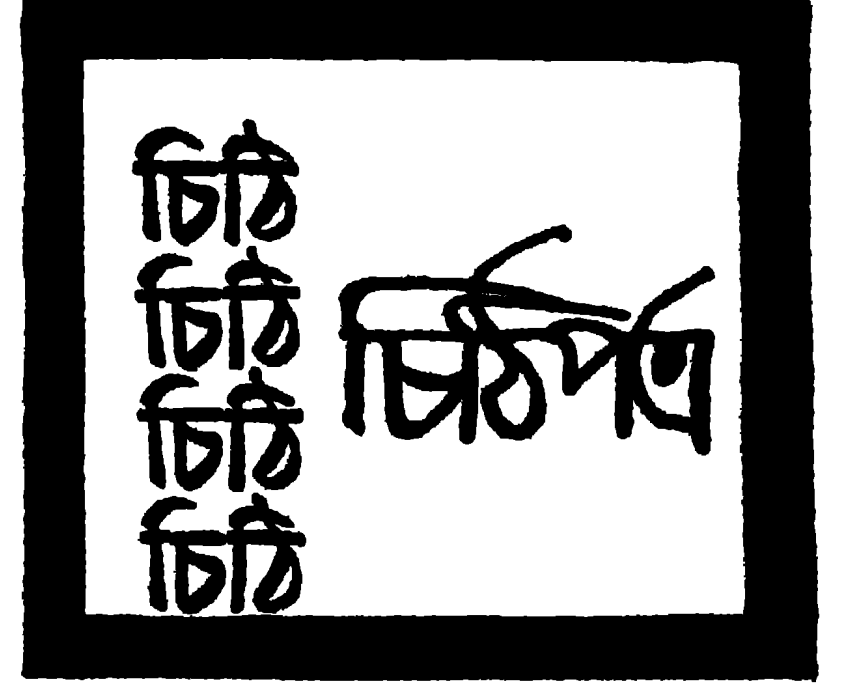
মহাশয়,

আমি 'ধনধান্যে' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক। এই পত্রিকাটি আমাকে নানা দিক দিয়ে আনন্দ দান করে থাকে। পত্রিকাটি সব দিক দিয়েই সুন্দর।

রাজারাম খাঁড়া
গোড়াবাড়ী, বাঁকুড়া

মহাশয়,

আমি 'ধনধান্যে' পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাটি নানা কারণে আমার ভাল বলে মনে হয়েছে। কয়েকটি বক্তব্য পত্রিকাটি সম্বন্ধে আছে। আশা করি চিন্তা করে দেখবেন।

(১) পত্রিকাটিতে কবিতা রাখা যায় কিনা চিন্তা করতে অনুরোধ করছি।

(২) প্রত্যেক সংখ্যাতে বিশেষ প্রদর্শনীর খবর রাখতে পারেন কিনা চিন্তা করবেন। বা কোনো সংখ্যাতে যদি পুরোনো মন্দির সম্পর্কে লেখানোর ব্যবস্থা করেন তাহলে পত্রিকাটি আরো পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে বলে মনে হয়। প্রচ্ছদের জন্য সম্পাদক মশায়কে একাধিক বার ধন্যবাদ।

শ্রীশুভ্র বরণ বসু
বাসন্তীতলা, বোলপুর

ন্যাশনাল পারমিট

শিশির ভট্টাচার্য

রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে মালবোঝাই অনেক লরী ট্রাকই তো আমাদের চোখে পড়ে। তাদের দিকে আমরা সদাব্যস্ত শহরবাসীরা কদাচিৎ ফিরে তাকাই। তবু আমাদের মধ্যে অনেকেরই চোখ হয়ত কিছুক্ষণ থমকে গেছে শহরের রাস্তায় নতুন এক ধরণের লরীর দিকে। তাদের সামনে লটকে দেয়া বড় একটি বোর্ডে লেখা কয়েকটি শব্দের দিকে আপনার দৃষ্টি পড়েছে,—ন্যাশনাল পারমিট ভ্যালিড ইন দি ষ্টেট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বভাবতই ভাবছেন ব্যাপারটা কি। যারা খবর রাখেন তারা অবশ্য আপনাকে তক্ষুনি বলে দেবেন, এই লরীটি ন্যাশনাল পারমিটের কল্যাণে কয়েকটি রাজ্যে মাল বয়ে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি এই ন্যাশনাল পারিমিট কেন তার উত্তর দিলেন রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের সহকারী কমিশনার শ্রী দেবদাস চক্রবর্তী। "ঠিক এক্ষুনি 'ন্যাশনাল পারমিট ব্যবস্থায় কতটা সুফল পাওয়া গেল বলা সম্ভব নয়। তবে সুবিধা যে অনেক হয়েছে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট' বললেন শ্রী চক্রবর্তী। একই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতার একটি সুবৃহৎ পরিবহণ সংস্থার পরিচালকের মন্তব্য হলো ন্যাশনাল পারমিট ব্যবস্থা আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে সতেজ করেছে। বিশেষ করে পণ্যসামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে বলা চলে। ফলে সারা দেশে বর্ধিত উৎপাদনের সুফল দ্রুত পৌঁছে দেয়া সহজতর হয়ে উঠেছে।

কুঁড়িদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী এবছরের জানুয়ারী মাসে ন্যাশনাল পারমিট ব্যবস্থা চালু করা হয়। দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে গত এক বছরে শৃঙ্খলা ফিরে আসার ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে এসেছে নতুন জোয়ার। আর জোয়ারের স্রোতকে গোটা দেশে প্রবাহিত করে না দিতে পারলে জাতির জীবনে প্রগতি সম্ভব নয়। উৎপাদিত সামগ্রীকে সমগ্র দেশে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন উন্নততর পরিবহণ ব্যবস্থা। ন্যাশনাল পারমিট এদিক থেকে আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করে তুলতে পেরেছে। বিশেষ করে উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে দেশের চাহিদা রয়েছে এমন এলাকায় এখন অনেক দ্রুত ও অনেক সহজে পণ্য-সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা দ্রুত মেটানোই শুধু হচ্ছে না, দেশের সর্বত্র মূল্যমান স্থিতিশীল রাখাও সম্ভব হচ্ছে।

ন্যাশনাল পারমিট ব্যবস্থা সর্বপ্রথম চালু হয় পশ্চিমবঙ্গে। এপর্যন্ত এরাজ্যে দেশের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মোট ২৩৭ টি পার-মিটটি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের মোট ২৫০ টি পারমিট দেবার পরি-কল্পনা রয়েছে। সারা দেশে এপর্যন্ত ৫০০টি ন্যাশনাল পারমিট দেয়া হয়েছে। এরাজ্যে ন্যাশনাল পারমিটের প্রচণ্ড চাহিদা। কেননা পশ্চিমবঙ্গে রেজিষ্টার্ড পণ্যবাহী লরির সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশী। শিল্পের দিক থেকেও এরাজ্যের স্থান প্রথম সারিতে। বিশেষ করে এরাজ্য থেকে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পণ্যসামগ্রী চালান যায়। আর আন্তঃরাজ্য পরিবহণে স্থলপথ সবচেয়ে উপযোগী।

ন্যাশনাল পারমিট চালু হবার আগে আন্তঃরাজ্য পরিবহণের জন্য শুধুমাত্র মাসিক পারমিট, পাঁচবছরের স্থায়ী পারমিট এবং আঞ্চলিক পারমিট ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু এসব ব্যবস্থায় খরচ হতো অনেক বেশী। পণ্যসামগ্রীর শুল্ক, কাউন্টার সিগনেচার ফী, প্রতি রাজ্যের জন্য পৃথক পৃথক আঞ্চলিক শুল্ক এবং পরিবহণ শুল্ক ইত্যাদি দেওয়ার ফলে পরিবহণ সংস্থা-গুলিকে কোন কোন রাজ্যে শুল্ক বাবদ পাঁচ হাজার টাকারও বেশী দিতে হতো। আর এই খরচের একটা বড় অংশ বহন করতে হতো ক্রেতাদের। কেননা পরিবহণে ভাড়া বেশী পড়ায় পণ্যসামগ্রীর মূল্যও বেড়ে যেত। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ভেতরে ও বাইরে চেকপোষ্টে পণ্যবাহী যানকে শুল্ক আদায়ের জন্য থামানো হয়ে থাকে। এতে পণ্য চলাচলে বিলম্বও ঘটে থাকে। মাসিক পারমিট ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিমাসেই নতুন পারমিট নিতে হয়। সব রকম শুল্কই এই পারমিট ব্যবস্থায় দিতে হয়।

আঞ্চলিক পারমিট ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ অঞ্চলে। এই আঞ্চলিক পারমিট ব্যবস্থা অনুযায়ী সমগ্র দেশকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও মধ্য এই চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় পণ্যবাহী লরী এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবেনা। প্রতিবছরেই নতুন পারমিট নিতে হবে। পশ্চিম বঙ্গ থেকে এপর্যন্ত উত্তর অঞ্চলের জন্য ৭৪ টি ও মধ্য অঞ্চলের জন্য ৬৫ টি পারমিট বিলি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল পারমিট চালু হওয়ায় পরি-বহণের বহু সমস্যারই সমাধান হয়েছে। পূর্বে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একরাজ্য থেকে অন্যরাজ্যে যাওয়ার জন্য শুধু যে খরচই বেশী পড়ত তাই নয়—এজন্য প্রচুর সময়ও নষ্ট হতো। এরফলে পণ্য-সামগ্রী পথে আটকে থাকতো—সৃষ্টি হতো কৃত্রিম সংকট। সময় মতো এই সব সামগ্রী খালাস না হওয়ার ফলে কিছু কিছু নষ্টও হতো।

কিন্তু নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী তাদের আর বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ শুল্ক দিতে হবেনা। নির্বাচিত প্রতি

কলকাতার রাস্তায় ন্যাশনাল পারমিটধারী ট্রাক

কেন্দ্রশাসিত এলাকার জন্য বছরে ১৫০ টাকা এবং প্রতিরাজ্যের জন্য বছরে ৭০০ টাকা এবং authorisation fee বাবদ ৫০০ টাকা দিতে হবে। এব্যবস্থায় অন্য কোনরকম শুল্ক দিতে হয়না। পাঁচটি রাজ্যের কমে ন্যাশনাল পারমিট পাওয়া যাবেনা। আর এই পারমিটের মেয়াদ হলো পাঁচ বছর। প্রতিটি রাজ্যকে ২৫০টির বেশী ন্যাশনাল পারমিট দেয়া হবে না। মোট ৫,৩০০টি ন্যাশনাল পারমিট দেয়া হবে।

ন্যাশনাল পারমিটধারী লরী বা ট্রাককে এখন আর তার স্বরাজ্যে বা অনুমতিপ্রাপ্ত অন্যরাজ্যের চেকপোষ্টে থামতে হবেনা। শুধু তার সামনে একটি বোর্ডে লেখা থাকবে তার পরিচয়। যান-বাহনগুলো নতুন হওয়া চাই, অন্তত চার বছরের বেশী পুরোনো নয়। ন্যাশনাল পারমিটধারী যানবাহনকে নিজের রাজ্য ছাড়া আরো অন্তত চারটি পড়শী রাজ্যকে বেছে নিতে হয়। তিনটি বা চারটি জাতীয় বা আন্তঃরাজ্য পারমিট রয়েছে এমন কোন পরিবহণকারীকে ন্যাশনাল পারমিট দেয়া হবেনা। পরিবহণ কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই পারমিটের সীমা হল সাত।

রাজ্য সরকারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে অন্তত ২৫ শতাংশ ন্যাশনাল পারমিট নতুন উদ্যোগীদের দেয়া হয়। এই নতুন উদ্যোগীর মধ্যে আবার প্রাক্তন প্রতিরক্ষা কর্মী এবং শিক্ষিত বেকারদের প্রাধান্য দেয়া হবে। মোট ৫০ শতাংশ ন্যাশনাল পারমিট দেয়া হবে আন্তঃরাজ্য পারমিটধারী পরিবহণকারীকে এবং ২৫ শতাংশ দেয়া হবে রাজ্য বা আঞ্চলিক পারমিটধারীকে।

ন্যাশনাল পারমিটধারী নতুন উদ্যোগী পরিবহণকারীকে অর্থ সাহায্য দেবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় পণ্যপরি-বহণে কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত সময় বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। কেননা নতুন করে আন্তঃরাজ্য পারমিট নিতে না হওয়ায় আর সময় নষ্ট হচ্ছে না। এরফলে যানবাহন যাতায়াত অনেক সহজতর হয়েছে। লরির চালকও আরো বেশী অবকাশ উপভোগ করতে পারছেন। যাতায়াতের বারও বেড়েছে। সময়মতো পৌঁছে যাওয়ার জন্য পণ্য নষ্ট হচ্ছেনা, কোন ক্ষতিপূরণও দিতে হচ্ছেনা। এছাড়া একটি নিয়মিত পরিবহণ ব্যবস্থা চালু থাকায় বে-আইনী পরিবহণের সম্ভাবনাও কমে গিয়েছে। আর ক্রেতারাও এর ফলে বিশেষ লাভবান হচ্ছেন। নতুন ব্যবস্থায় পরিবহণে খরচ কম হওয়ায় জিনিষপত্রের দামও কমেছে।

বর্তমানে ঘোষিত বিশদফা কর্মসূচী অনুসারে সরকার বিশেষ করে অনুন্নত এলাকায় নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের এবং সমগ্র দেশে মূল্যমান স্থির রাখার ওপরে জোর দিচ্ছেন। সেদিক থেকে ন্যাশন্যাল পারমিট ব্যবস্থা বিশেষ সহযোগী হবে বলে আশা করা যায়। কেননা এই পারমিট একটি সুশৃঙ্খল, বৈজ্ঞানিক ও উন্নততর পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে।

ছাত্রী আবাস

কেন্দ্রীয় সরকার তপশীলিভুক্ত ছাত্রীদের জন্যে একশটি ছাত্রী আবাস গড়ে তুলবার প্রস্তাব করেছেন। এই প্রকল্পে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে এবাবদ বিভিন্ন রাজ্যকে ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ৭০টি ছাত্রী আবাস গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালে তপশিলীভুক্ত ছাত্রীদের জন্য ২৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০টি নতুন ছাত্রী আবাস গড়ে তোলা হয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় তপশীলি ছাত্রীদের জন্য আবাস তৈরীর উদ্দেশ্যে যে ২ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে উল্লিখিত প্রকল্পটি তারই অঙ্গ।

নাম তার রূপসী বাংলা

দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিক

'রূপসী বাংলা'—জীবনানন্দ দাশের কবিতার দুটি অমর শব্দ। যেকোনো বাঙ্গালী হৃদয়ে এই শব্দ দুটি অপূর্ব ব্যঞ্জনার অনুরণন তোলে।

'রূপসী বাংলা' ছলছলিয়ে চলছে এই মুহূর্তে ইছামতী-কালিন্দীর বুক বেয়ে—গন্তব্যস্থল তার এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপ। 'এম, ভি 'রূপসী বাংলা' শুধুমাত্র লঞ্চ নয়। 'রূপসী বাংলা' বুক ভরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অপূর্ব সম্পদ। গ্রাম বাংলার নব রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি।

গত ২১ মার্চ এর জন্ম। রাষ্ট্রায়ত্ত ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নবতম প্রয়াস, ভাসমান ব্যাংক—'রূপসী বাংলা'। সুন্দরবনের গহীন নদীর বুকে জেগে রয়েছে বেশ কয়েকটি দ্বীপ। সেখানে বাস করে গরীব নিম্নবিত্ত কৃষক, জেলে। হঠাৎ কখনো যাত্রীবাহী লঞ্চ এদের নিয়ে আসে মূল ভূমিতে। ধরতে গেলে এটুকু ওদের যোগসূত্র।

কিন্তু এদের দূরে সরিয়ে রাখলে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির রূপায়ণ শ্লথ হয়ে পড়বে। বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য, অবহেলিতদের উত্থানের সিঁড়ি তৈরী করা। আর সেই পথেরই একটি পদক্ষেপ, গ্রাম বাংলায় ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ। স্বভাবতই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে এই দায়িত্বপালনে বহুমুখী কর্মসূচী নিতে হচ্ছে।

'রূপসী বাংলার' কথায় ফিরে আসি। এই মোটর লঞ্চ ব্যাংকটি ৫৫ ফুট দীর্ঘ, ১৪ ফুট প্রশস্ত। এতে একটি ব্যাংকের কাজের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে টাকা জমা দেওয়ার ও টাকা তোলার কাউন্টার। রয়েছে ঋণ গ্রহণ করার বিভিন্ন পর্যায়ের বহুবিধ ব্যবস্থার সুযোগ।

কর্মীদের জন্যে শোয়া, থাকা ছাড়াও মনোরঞ্জনের জন্যে রয়েছে 'দূরদর্শন'। লঞ্চটির প্রহরায় রয়েছেন, সশস্ত্র প্রহরী এবং বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র।

'রূপসী বাংলা' প্রতি সপ্তাহে একদিন করে সন্দেশখালি, রামপুর, ছোটমোল্লা-খালি, সাতজেলিয়া, দুর্গামণ্ডপ ও গাব-বেড়িয়া দ্বীপগুলির ঘাটে ঘাটে নোঙর করবে। হবে লেনদেন—তাছাড়া সন্ধ্যায় কিছুটা ভাবের আদান প্রদান।

সুন্দরবন—২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণে বিরাট বদ্বীপ অঞ্চল। একদা যেখানে ছিল ঘন জঙ্গল—আজ সেখানে বহু জনপদ। কিন্তু অধিকাংশই দরিদ্র নিম্নবিত্ত। তিন হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এই এলাকার প্রায় ৭ ভাগ জলময়। একদিকে হুগলী নদী, অন্যদিকে ইছামতী-কালিন্দী। বিদ্যাধরী আর পিয়ালী এখন মৃতপ্রায়।

লোকসংখ্যা ২০ লক্ষাধিক। আর এই সংখ্যার অর্ধেক তফশীলি শ্রেণী অথবা আদিবাসী বাসিন্দা। প্রতি বর্গমাইল এলাকায় ৯৭০ জনের বাস। অবশ্য সুন্দরবন এলাকায় সবই গ্রাম নয়। এখানেও শহর রয়েছে—রয়েছে পৌরসভা। টাকি ও জয়নগর দুটি পৌরসভা বেশ প্রাচীন বলা যায়। ক্যানিং একটি বড় ব্যবসা-কেন্দ্র।

এখানকার জমি এক-ফসলী। অধিকাংশের জীবিকাই চাষবাস অর্থাৎ শতকরা ৮৫ ভাগ অধিবাসীর পেশা কৃষি। তবে চাষ এখানে সহজসাধ্য নয়। নোনা-জল এক বড় বাধা। মাটির নীচে এক হাজার ফুট গভীরে গেলে মিষ্টি জলের সন্ধান মেলে। আয়াসসাধ্য এই ব্যবস্থা পানীয় জলেরই অভাব দূর করতে পারে না, সেচ ব্যবস্থা এই অবস্থায় আরো কষ্টসাধ্য। বহু নদী বিধৌত এই এলাকায় জল ব্যবহারোপযোগী নয়, এটাই অদৃষ্টের এক নির্মম পরিহাস।

এখানে রেল বা সড়কপথ খুবই অপ্রতুল। একমাত্র নদীপথই এই এলাকার প্রাণস্পন্দন জীইয়ে রাখে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি যখন থেকে দরিদ্রদের জীবনধারণের মানোন্নয়নের সাহায্যে এগিয়ে আসার কর্মসূচী গ্রহণ করে, তখন থেকেই সুন্দরবন এলাকার দায়িত্ব পড়ে ইউনাইটেড ব্যাংকের ওপর। ওদের ভাষায় ইউনাইটেড ব্যাংক ঐ এলাকার লীড ব্যাংক। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সুন্দরবনে আর কোনো ব্যাংকের কর্মপ্রয়াস নেই। ওখানে রয়েছে স্টেট ব্যাংক, রয়েছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক। তবে এ পর্যন্ত যে ষোলটি শাখা স্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে ইউনাইটেড ব্যাংকের ন'টি এবং স্টেট ব্যাংকের তিনটিই উল্লেখযোগ্য।

দুটি ব্যাংকই কাজে নামার আগে, ঐ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তবমুখী এক সমীক্ষা করে। ঐ সমীক্ষার ভিত্তিতে এদের কর্মপ্রয়াস বিভিন্ন ধারায়। একদিকে যেমন দুটি ব্যাংক জোর দিচ্ছে কৃষির উন্নতির জন্য ঋণ ব্যবস্থার ওপর, অপরদিকে অন্যান্য কর্মসংস্থানের দিকেও সমান

গুরুত্ব দিয়ে চলেছে দুটি ব্যাংকই। ইউনাইটেড ব্যাংক এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং স্টেট ব্যাংক ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ সাহায্য করেছে।

সুন্দরবনের ক্যানিং এলাকা থেকে প্রচুর মাছ প্রতিদিনই কলকাতায় আসে। অথচ এই ব্যবসার সিংহভাগ ভোগ করত দালালরা। ইউনাইটেড ব্যাংক প্রায় আড়াইশো মাছের ব্যাপারীর কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও ক্যানিং এলাকায় মাছ চাষের জন্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার বিষয়েও অগ্রগতি সন্তোষজনক বলা যায়। সুন্দরবনের কোথাও কাঠ চেরাইয়ের মেশিন ছিল না। অথচ বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ এই সুন্দরবন। একজন শিক্ষিত যুবক ইউনাইটেড ব্যাংকের সহযোগিতায় ক্যানিংয়ে একটি কাঠ চেরাইয়ের কল স্থাপন করেছেন। এই ইউনাইটেড ব্যাংকের সহযোগিতায় নদীপথে চলাচলের জন্য দুটি মোটর লঞ্চ চালু হয়েছে। এদের একজন 'মনোরমা', অন্যজন 'মা রাসমণি'—নিবাস ক্যানিং বন্দর। এই দুটি লঞ্চের জন্য ইউনাইটেড ব্যাংক-দিয়েছে ৭৮ হাজার টাকার মত। অনুরূপ-ভাবে কুটীর শিল্পের জন্য এই ব্যাংকের সহায়তার পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার বেশী। সুন্দরবন এলাকায় প্রথম যন্ত্রচালিত তাঁত ইউনাইটেড ব্যাংকের সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে।

শাকসব্জী, ফল-বাগান করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাংক শিক্ষিত যুবকদের এক সমবায়কে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছে গত কয়েক বছরে। আর ছাগপালন চালু করতে জনপ্রিয় করতে এই ব্যাংকের অবদান কম নয়। কাঁকনদীঘির ৪৯ জন ভূমিহীন কৃষককে মাথাপিছু এক হাজার টাকা সাহায্য করে ইউনাইটেড ব্যাংক এদের জীবিকার এক নতুন উৎসের সুযোগ করে দিয়েছে।
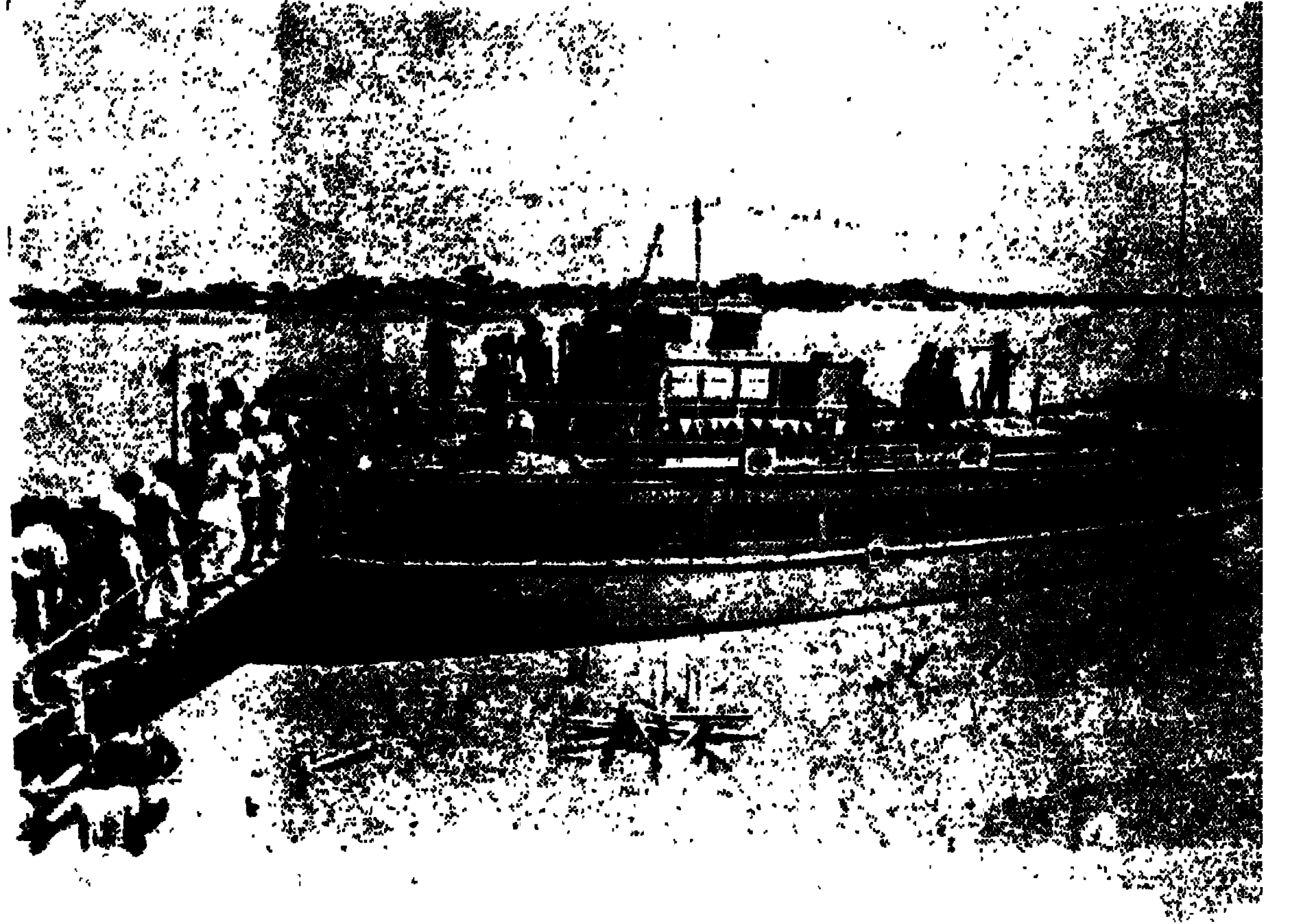
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ভাসমান 'ব্যাঙ্ক রূপসী বাংলা'

কি নেই—হাতের কাজ, শোলার কাজ, তৈরী পোশাক, গুঁড়ো মশলা, ব্রাশ তৈরী থেকে শুরু করে 'নিজ নিজ রিক্সা' সমস্ত দিকেই ব্যাংকের কাজের পরিচয় পরিব্যাপ্ত। সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে আজ আর ব্যাংক অপরিচিত কোনো সংস্থা নয়।

এক সময়ে সুন্দরবনের মানুষ মাটির নীচে টাকা রাখত। চোর ডাকাতের উপদ্রবে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে যেত। আজ ব্যাংকের উপস্থিতিতে এদের সঞ্চয় নিরাপদ। তাই দেখা যায়, স্টেট ব্যাংক ১৯৭৬ সালে তাদের কাকদ্বীপ, গোসাবা আর ক্যানিং শাখায় কৃষি খাতে ১১ লক্ষ টাকারও বেশী, আর ক্ষুদ্রশিল্প ব্যবসায় মালিকদের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা হবে বলে আশা করছে। অনুরূপ-ভাবে তাদের ঋণ দেওয়ার পরিমাণ হবে, যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ও পৌনে ৬ লক্ষ টাকা। মোট অ্যাকাউন্টের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৪ শোর ওপর। বর্তমানে অ্যাকাউন্ট-সংখ্যা ৮ শোর কাছাকাছি। এ পর্যন্ত কৃষিখাতে ঋণ দেওয়া হয়েছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী। ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসায়ে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, যথাক্রমে ৯১ ও ৯৮ হাজার টাকা আর অন্যান্য খাতে সাড়ে ৭১ হাজার টাকা। সুন্দরবনের ৬৮টি গ্রামে স্টেট ব্যাংকের কর্মযজ্ঞ চলছে। এ পর্যন্ত মোট আমানত দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার মত।

ইউনাইটেড ব্যাংকের মোট ৯টি শাখা—হাসনাবাদ, মথুরাপুর, রায়দীঘি, বাসন্তী, নামখানা, মীনাখা, ক্যানিং, ন্যাজাত এবং নতুন ভাসমান ব্যাংক 'রূপসী বাংলা'। 'রূপসী বাংলা' অবশ্য ন্যাজাত শাখাকে কেন্দ্র করে কাজ করবে।

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইউনাইটেড ব্যাংক দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের সাহায্যে ২২ লক্ষ টাকা লগ্নী করেছে। অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৪,৬৮৪টি।

১৯৭৬ থেকে '৭৮ সালের মধ্যে

১০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কর্মশিক্ষার কাজে

মধু বসু

'এসব কাজ করে দারুন মজা পাচ্ছি। আপনারা যখন কাজ দেখে ভাল বলেন, তখন আরও ভাল লাগে।'

কেউ বল্লে: 'বই পড়ার এক ঘেয়েমী থেকে এ কাজ খুবই আনন্দের।' ছাত্র-ছাত্রীরের মুখ থেকে এ ধরনের নানান মন্তব্য শুনেছি সম্প্রতি স্কুলে স্কুলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়ার্ক এ্যাডুকেশন বা কর্ম শিক্ষা পরীক্ষার সময়। হাতে কলমে কে কতটুকু কাজ কর্ম করতে পারল তারই একশো নম্বরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এর মধ্যে আছে শারীরশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, কর্ম-শিক্ষা, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, জীব-বিজ্ঞান এবং ফিজিক্যাল সায়েন্স। পরীক্ষাও যেমন আনকোরা নতুন, পদ্ধতিও মৌখিক। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুলাখ।

এই ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ প্রাণ সঞ্চার করেছে। আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকরা যে কেউ ফেলনা নয় তার প্রমাণ আপনি পেয়ে যাবেন, শহর বা গ্রামের যে কোন স্কুল ঘুরে এলে। যার যেমন অবস্থা তার তেমন ব্যবস্থা। কিন্তু প্রশংসা করতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের অপরিসীম আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও কর্তব্যবোধ এবং সৃষ্টি করার অদ্ভুত ক্ষমতার।

গার্ডেনরিচ এলাকার মেটিয়াবুরুজ স্কুলে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৮ জন। প্রধান শিক্ষক বদরুদ্দিন আহমেদ বললেন—আমার ছাত্ররা স্কুল রুম চুনকাম করেছে, বুক বাইণ্ডিং ও আঁকা-জোকার কাজ করছে।

দেখলাম দুখানা পেল্লাই স্কুলরুম ছাত্ররা চুনকাম করেছে! ঘর ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। ছাত্ররা দক্ষ মিস্ত্রিকে হার মানিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম—এসব করে তোমাদের কি লাভ হল? ওরা উত্তর দিল; 'নিজেদের উপর বিশ্বাস বাড়ল, স্কুল ঘরটা পরিষ্কার হল। আমরাও যে কিছু করতে পারি তাও দেখাতে পারলুম।'

ছুঁচ, কাঁচি, সিরিস কাগজ ও মলাটের কাগজের সাহায্যে চমৎকার বই বাঁধিয়েছে। জানিয়ে দিল ভবিষ্যতে একাজ করে তারা দু পয়সা রোজগার করবে। শের সকলের মুখে মুখে:

"ভঁমর সে লড়ো, তুন্দ লহরোঁ পে উলঝো,
কহা তক্ চলোগে কিনারে কিনারে।"

ঘূর্ণীর সঙ্গে লড়াই কর, তীব্র তরঙ্গের বুকে ঝাপিয়ে পড়ো। কতদিন আর কিনারে কিনারে হাঁটবে?

এরপর গেলাম বড়িষা বিবেকানন্দ হাইস্কুলে, ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে এ স্কুলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৯ জন। সত্যি অবাক করে দেবার মত কাজ এরা করেছে। মেয়েরা কেম্ব্রিকের টেবিল ক্লথ, পাপোস, রিপু, কাগজের উপর ছবি আঁকা ও বাণী লেখা, প্লাষ্টার অফ প্যারিস, ব্লাউজের কাজ ইত্যাদি করেছে। ছেলেরা শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে জাতীয় পতাকা, সুতোকাটা, পাপোস, ও চেয়ার টেবিল তৈরী ইত্যাদি কাজ শিখেছে।

এরপর একটি গ্রামের স্কুল। কলকাতার দক্ষিণে বলরামপুর গ্রামে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাট এলাকা নিয়ে বিরাট এই স্কুল। চারদিকে সবুজ গাছ-গাছালি, ধানক্ষেত। বড় মনোরম পরিবেশ। কৃষি পদ্ধতি এখানে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।
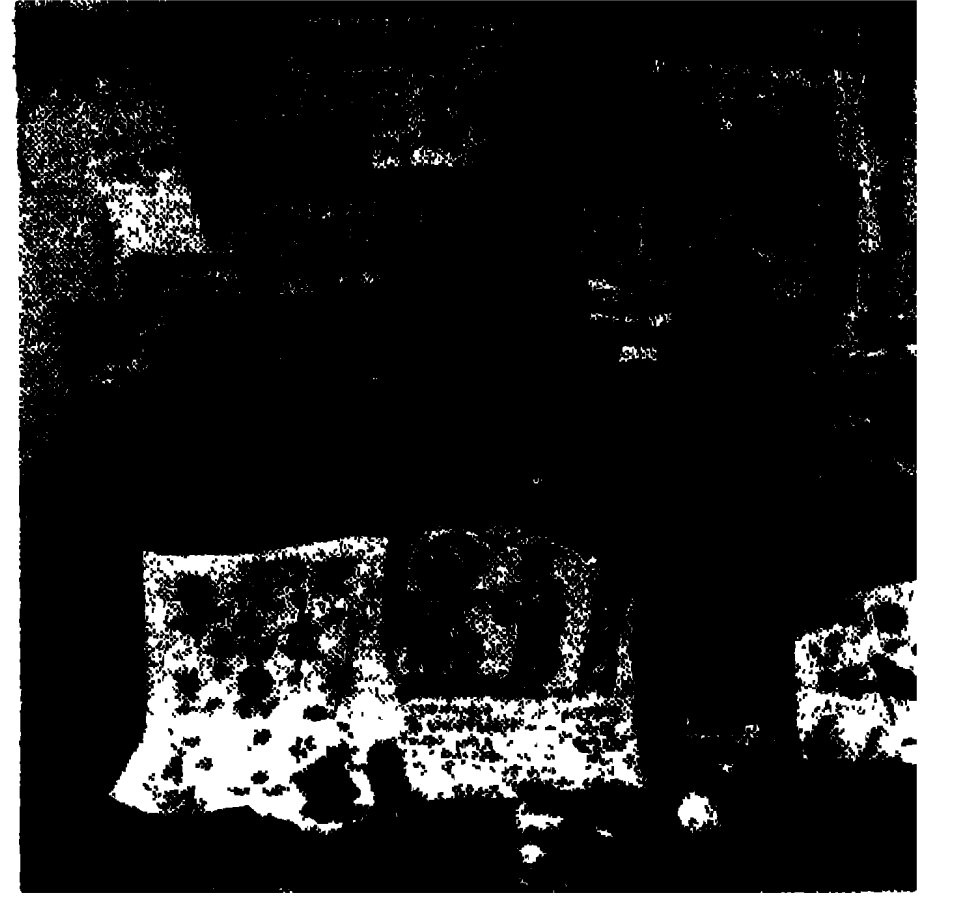
বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী কর্মশিক্ষার নানা মডেল

এই কৃষি এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা বেশীর ভাগই দুঃস্থ পরিবারের। নানা-রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও এরা যে সমস্ত কাজকর্ম করেছে, তা'তে তাক্ লেগে যাবার মত। স্কুলের চত্বরে কিচেন গার্ডেন ছাড়াও ওরা হলঘর জুড়ে চমক লাগাবার মত প্রদর্শনী করেছে। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শহরের জল সরবরাহ, দাঁতের মাজন ও সাবান প্রস্তুত, ইত্যাদি।

এরপরে গেলাম গ্রাম ও শহর ঘেঁষা স্কুল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে। স্বামীজীর আদর্শে পরিচালিত এই আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কর্মশিক্ষার এলাহি ব্যাপার। বিদ্যাপীঠের জন্মলগ্ন (১৯৫৮) থেকেই এখানে কর্মশিক্ষার শুরু। পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ার কাজে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য্য। স্কুল ফাইনাল নয়া সিলেবাসে এবার পরীক্ষা দিয়েছে ১১৫ জন। ছাত্ররা কিচেন গার্ডেন, ফারমিং গার্ডেন, বিদ্যুতের কাজ, ও বুক বাইণ্ডিং-এর কাজ করেছে। অন্ধ ছাত্ররা তৈরী করেছে অদ্ভুত সুন্দর বেতের চেয়ার, মোড়া ইত্যাদি।

সব দেখে শুনে মনে হল শহর বা গ্রাম যে কোন স্কুলই হোকনা কেন, ছাত্র-ছাত্রীরা অসম্ভব সচেতন হয়েছে। ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের খবরের জন্য সাংবাদিক ছুটে আসছেন।

অধিকারের সীমা

তারকনাথ চৌধুরী

সংবিধানে আমাদের অধিকারের কয়েকটিকে মৌলিক অধিকার এবং কতকগুলিকে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ-মূলক নীতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই দুই অধিকারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু নির্দেশমূলক নীতি-গুলিকে বলবৎ করার ক্ষমতা কোনো আদালতের নেই।

মৌলিক অধিকারগুলি আদালত বলবৎযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও গত ৮ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকার নিয়ে আদালতে যাওয়া রহিত করে যে আদেশ জারি করলেন তা কোনো সংবিধানবিরোধী হয়নি। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫৯ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন মাত্র। ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী ভি. পি. রমন গত ৯ই জানুয়ারী সুপ্রিম কোর্টে হেবিয়াস্ করপাস মামলায় পাঁচ বিচারপতির কনস্-টিটিউশন বেঞ্চের উপর্যুপরি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে জরুরী অবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বা সংবিধানের সাহায্য নেওয়ার অধিকার কোনো নাগরিকের থাকে না।

দেশে যখন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলে তখন তার মোকাবিলার জন্য কিছু অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকেনা। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার আরেক নাম হ'ল মৌলিক অধিকার সীমিতকরণ। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর জাতির স্বার্থে যা করতে হয়েছে।

হয়তো কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে মৌলিক অধিকারগুলি যদি সরকার কর্তৃক যখন তখন পরিবর্তিত হতে থাকে তাহলে এর আর মূল্যই বা রইল কী, আর সেই সংবিধানেরই বা কী মর্যাদা রইল যার বিধি আমরা না মেনে তার জায়গায় আমাদের খুশীমত কিছু একটা বসাতে পারি? এর উত্তরে বলতে হয় প্রয়োজনমাফিক্ পরিবর্তনের বিধি কিন্তু আমাদের সংবিধানেই আছে। সংবিধান রচয়িতাগণ স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও শর্তহীন ব্যক্তি স্বাধীনতা যা মৌলিক অধিকার কর্তৃক স্বীকৃত—তা এবং জাতির নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং জনগণের সামাজিক ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে সে বিষয়ে তারা সচেতন ছিলেন। তাই বিভিন্ন সময়ে কনষ্টিটিউয়্যান্ট অ্যাসেম্বলীতে বিভিন্ন বিতর্কে খসড়া আকারে যে মৌলিক অধিকারগুলি এসেছিল তা সংশোধিত হিসেবে গৃহীত হয়ে সংবিধান বিষয়ে তাদের সতর্কতাকে প্রতিফলিত করেছে।

কনষ্টিটিউয়্যান্ট অ্যাসেম্বলীর একজন অন্যতম উপদেষ্টা শ্রী বি. এন. রাউ বলেন যে মৌলিক অধিকারগুলি শর্তনিরপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত নয়। অনিয়ন্ত্রিত আবেগের জাতীয় স্বাধীনতা শুধুমাত্র অসভ্য গুহামানবেরই থাকতে পারে।

স্বাধীনতা হচ্ছে কিছু অধিকারকে বোঝাবার একটি সুবিধাজনক সংজ্ঞা। কিন্তু শর্তহীন স্বাধীনতা, যা বিশৃঙ্খল মানসিকতায় কাজ করার স্বাধীনতা বোঝায়, তা একমাত্র অসভ্য গুহামানব বা জঙ্গলের পশুদেরই থাকতে পারে। অধিকার হচ্ছে কিছুটা বাধ্যবাধকতা ও নাগরিক কর্তব্যের সহাধ্যায়ী, অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যার উপর অধিকতর জোর দেওয়া উচিত। বিভিন্ন অধিকারের পবিত্রতম অধিকার—বাঁচার অধিকার—তার মর্যাদা, পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতাও শর্তহীন নয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য অন্যের অধিকার যাতে খুন্ন না হয় তা দেখারও কিছুটা বাধ্যবাধকতা আছে।

খসড়া রিপোর্টে সংবিধান সাব কমিটি পাঁচটি সুনির্দিষ্ট নাগরিক অধিকার উল্লেখ করেছেন: (১) স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার, (২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে একত্র হবার স্বাধীনতা, (৩) ইউনিয়ন বা সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, (৪) ভারতবর্ষের যেকোনো স্থানে ভ্রমণের, বসবাসের ও সম্পত্তি অর্জনের অধিকার, (৫) যে কোনো বৃত্তি বা পেশা বা বাণিজ্য অবলম্বনের অধিকার। এদের মধ্যে শেষোক্তটি ১৪ নং ধারায় কিছুটা আইনগত নিয়ন্ত্র-ণাধীন এবং অন্যান্য চারটি ৯ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত।

ব্রজেশ্বর প্রসাদ মনে করেন যে, বর্তমান কালের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব পরগাছা শ্রেণীর হাত থেকে যদি বিপন্মুক্ত করতে হয় তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের হাতে ব্যাপক সুবিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা থাকা উচিত। যেখানে ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন লোক নিদারুণভাবে দারিদ্র, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার গভীর তলদেশে ডুবে আছে সেখানে শর্তহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক।

ব্যক্তিস্বাধীনতা যে অবাধ হতে পারে না তা সহজেই বোঝা যায়, কারণ আত্মবিকাশের

জন্য যেমন একদিকে ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজন তেমনি অপর দিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে সমাজের প্রতি তার কর্তব্যও রয়েছে।

মৌলিক অধিকার খর্ব করার ক্ষমতা কায়েমকে সমর্থন করে আইন সভায় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রী আলুগি রাই শাস্ত্রী বলেছেন যে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আইন সভায় বসবেন তারাই শুধু জনগণের স্বার্থে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করতে পারেন।

সর্বশ্রী গোবিন্দ দাস, কে হনুমন্তিয়া, আলুগি রাই শাস্ত্রী, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী প্রমুখ মনে করেন যে অবস্থা অনুযায়ী নীতি-গতভাবে মৌলিক অধিকার বলবতের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা উচিত। তা বিচার বিভাগের থাকা উচিত নয়, কারণ আদালত শুধু আইন ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে না।

১৯৪৭ সালে ৪ঠা এপ্রিল শ্রী বি. এন্. রাউ'কে লেখা এক চিঠিতে শ্রী এ. কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেছেন যে সংবিধানের মৌলিক অধিকার জনস্বার্থে, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলাধীন হওয়া উচিত। শ্রী এন. জি. রঙ্গ দৃঢ়ভাবে ঐ বিধি সমর্থন করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত অধিকারের মত সমাজেরও সামগ্রিকভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মুখোমুখি কিছুটা অধিকার আছে অর্থাৎ সমাজের স্বার্থেই সমাজ ব্যষ্টির মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে।

জরুরী অবস্থার উল্লেখে খসড়া অনুচ্ছেদ ২৮০ তে জরুরী অবস্থায় যে মৌলিক অধিকার খর্ব করার বিধি আছে তা সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন মন্তব্য পর্যবেক্ষণ করে শ্রী আম্বেদকর অনুচ্ছেদটি সংশোধিত আকারে ১৯৪৯ সালে আগষ্টে আবার সংসদে উত্থাপন করেন। সংশোধিত অনুচ্ছেদটি তবুও মৌলিক অধিকার কার্যকরী করার জন্য আদালতে যাওয়া রহিত করার ক্ষমতা প্রশাসনকে দিয়েছে। অনুচ্ছেদটি সমর্থন করে শ্রী এ কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন যে—বিপুল সংখ্যক জনগণ সহ কোনো দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে কিছুলোক যারা রাষ্ট্রানুগত নয় তারা দেশকে বিপন্ন করতে ও দেশের সম্পদকে নষ্ট করার জন্য আত্মপ্রকাশের অধিকারকে কাজে লাগাতে পারে। তিনি আরো মনে করেন যে যদি আমরা চাই যে আমাদের দেশের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং স্বাধীনতা ও অন্যান্য বিষয় নিশ্চিত থাকবে তাহলে এই অনুচ্ছেদটির প্রতি কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। শ্রী আম্বেদকরও মনে করেন যে মৌলিক অধিকার খর্ব করার অধিকার রাষ্ট্রের অবশ্যই থাকা উচিত, নাহলে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

খসড়া সংবিধানের ২৮০ অনুচ্ছেদ তথা সংবিধানের ৩৫৯ অনুচ্ছেদের উপর জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার স্থগিতের আলোচনায় যোগ দিয়ে শ্রী আর কে. সিধবা বলেছেন যে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে জাতির অনেক শত্রু আছে। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বা প্ররোচনা সৃষ্টি করার মত বাইরে অনেক লোক আছে শয়তানি করাই যাদের ধর্ম। তাদের কবল থেকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই। এবং সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সামান্যতম অংশ বিসর্জন দিতে রাজী যাতে দেশের স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে বজায় থাকে। জরুরী অবস্থার অর্থ এই নয় যে সরকার তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করবেন না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই এই আইন, সুবিধা ও অধিকার যা জনগণকে দেওয়া হয়েছে তা যদি, দেশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তাহলে তা স্থগিত রাখা দরকার এবং তা উচিতও।

সংবিধান হচ্ছে একটি অস্ত্র। কোনো কিছুতে মরচে পড়লে তাকে যেমন মাঝে মাঝে শানিয়ে নিতে হয়, তেমনি প্রত্যেক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রেরই উচিত মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা যে সংবিধান কালোপ-যোগী হয়েছে কিনা।

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বিবর্তিত হয়। আইনের উচিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনগণের মানসিকতা ও মেজাজের বিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলানো, তাই আইনসভার উপরই এই পরিবর্তন তথা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে জনস্বার্থের খাতিরেই সংবিধান পরি-পরিবর্তন করা উচিত।

জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই আমাদের মৌলিক অধিকার সীমিতকরণ সংবিধানবিরোধী নয়। সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধি পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারেন, প্রয়োজনে নতুন কোনো বিধিরও সংযোজন করা যেতে পারে।

নাম তার রূপসী বাংলা

৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ইউনাইটেড ব্যাংক আরো চারটি শাখা খুলবে সুন্দরবন এলাকায়। এর মধ্যে তিনটি অঞ্চলে কোনো ব্যাংকের কোনো শাখা নেই।

এইভাবে অনগ্রসর সুন্দরবনের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র নতুন করে সাজানোর দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি বিশেষ করে লীড ব্যাংক হিসাবে ইউনাইটেড ব্যাংক এবং স্টেট ব্যাংক যেভাবে এগিয়ে চলেছে, আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে দরিদ্র সুন্দরবন তার দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে পারবে। বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণ সার্থক করতে যে কর্মকাণ্ড চলছে, সুন্দরবন তার ফলে সত্যি সত্যিই সুন্দর হয়ে উঠবে।

একটা সুখবর দিয়ে শেষ করা যাক। 'রূপসী বাংলা' শীঘ্রই আরেকটি সাথী পাবে। ওর কর্মস্থল হবে, নামখানাকে কেন্দ্র করে সাগরদ্বীপ আর পাথরপ্রতিমা অঞ্চলে। জলবেষ্টিত ঐ দুটি অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে নিশ্চয়ই এটা সুখ-সংবাদ।

কুয়াশার গভীরে আলোর ঝর্ণা

সুশোভন দত্ত

বাতি নিবে গেল। লোড শেডিং। সায়ম মোমবাতি জ্বালাল। শমিত হাতের তাসগুলো চিত ক'রে দিল। শুভ্র চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে ব'লল,

—কি হ'ল?

—ধুস্ শালা, রোজ রোজ তাস পেটাতে আর ভাল লাগে না।

—খবরদার ও'কথা বলিসনে, স্পেডের রাণী গোসা ক'রবে। সায়ম চোখ সরু করল।

—সবে তো ছ'টা, রাত দশটা পর্যন্ত কাটাবো কি ক'রে? শুভ্র কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। সায়ম ছড়ানো তাসগুলো গুছিয়ে বার বার শাফ্ল করতে লাগল। শুভ্র ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'লল,

—কাল কলেজ স্ট্রীটে দীপাঞ্জনের সঙ্গে দেখা হ'ল

—কোন্ দীপাঞ্জন? তোর সেই য়ুনিভার্সিটির বন্ধু? সায়ম শাফলিং বন্ধ করল।

—হুঁ, য়ুনিভার্সিটিতে পড়বার সময় ওর সঙ্গে দারুণ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

—তাহলে কাল তো তোর খুব খুশির দিন গেছে। শমিত একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে ব'লল। অনেকদিন বাদে হঠাৎ কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে রবি ঠাকুরের 'পুরানো সেই দিনের কথা' গানটাই আমার প্রথমে মনে পড়ে।

—আজকাল সবাই কেমন যেন হ'য়ে গেছে। বুকের মেঘ শুভ্রর মুখে ছায়া ফেলল।

—হঠাৎ একথা' বললি কেন? অবাক হ'ল সায়ম।

—আজকাল রাস্তাঘাটে পুরানো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলে সবাই যেন কেমন রাস্তার লোকের মতো ব্যবহার করে।

শমিত গোল্ড ফ্লেকের মোড়ক খুলে একটা সিগারেট তুলল। আধপোড়া বিড়িটা ঠোঁট থেকে ফেলে দিয়ে সায়ম চিলের মতো ছোঁ মেরে প্যাকেটটা টেনে নিল। সায়মের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে শুভ্র একটা সিগারেট বের ক'রল। সায়েম মোমবাতিটা মুখের সামনে তুলে ধ'রে ব'লল।,

—কি ব্যাপার রে শমি, চারুর সঙ্গে হঠাৎ ছাড়াছাড়ি।

—ফালতু কিছু টাকা হাতে এসে গেল। শমিত চোখ বুজে ধোঁয়ার ছোট ছোট মালা গড়ল।

—ফালতু টাকা? শুভ্র বড় বড় চোখ ক'রল।

—একটা গল্প লেখার মজুরী। শমিত শব্দ ক'রে হেসে উঠে ব'লল, সম্মান দক্ষিণা।

—ওসব ছাইপাস লিখে তুই টাকা পাস! সায়ম আলগোছে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ল।

—তার মানে? চোখ দিয়ে সায়মকে জরিপ করল শমিত।

—টাকা দেওয়ার বদলে আজকালকার লিখিয়েদের মিসায় দেওয়া উচিত।

—বেচারীদের শুধু শুধু মিসায় দিবি কেন? শমিত কৌতুকে মুচকি হেসে ব'লল, লেখকরা তো চোরাকারবারে নামেনি, খাদ্যে ভেজালও দিচ্ছে না, ডাকাতি-রাহাজানি বা খুন-জখম ক'রেছে ব'লেও শুনিনি।

—তার চেয়েও জঘন্য কাজ ওরা ক'রছে। রীতিমত রাগী গলায় সায়ম ব'লল, অন্ধকারের বিষ ছড়িয়ে গোটা সমাজটাকে তোরা সিনিক ক'রে তুলছিস। এযুগের লেখকরা ঝলমলে রোদ্দুর পছন্দ করে না, অমাবস্যার সঙ্গেই তাদের মিতালি।

—যুগের ঘুণপোকা আমাদের ফুসফুসে অগুন্তি ডিম পেড়েছে সায়ম। পোকাকাটা

অস্তিত্ব নিয়ে দূরগামী কাফিনবাহকের মতো আমরা ধুঁকতে ধুঁকতে পথ চলেছি।

—ও'সব বস্তাপচা সিনিক বুকনিতে আমি বিশ্বাস করি না। শমি, চোখে স্পাইপারস্কোপ লাগিয়ে তোরা জীবনটাকে দেখ।

সায়ম আড্ডা ভেঙে দিয়ে উঠে পড়ল। শমিতের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যে রাতেই ভরা কোটালের জ্যোৎস্না। আজ কি পূর্ণিমা? শমিত আর শুভ্র একটা চা খানায় ঢুকল: চুপচাপ কাপ খালি ক'রে শুভ্র ব'লল।

—শমি, আমি নয়ানদার কাছে যাব।

—নয়ানদার কাছে আবার কি দরকার পড়ল তোর? ট্যুশানি নাকি?

—নারে, ট্যুশানির কোনো ব্যাপার নয়। নয়ানদার অপিসে একজন টাইপিষ্ট নেবে, দেখি একটু চেষ্টা ক'রে।

শমিত একা একা কিছুক্ষণ মুখর চা-খানায় ব'সে থাকল। দেওয়ালে সাঁটা রেহানা সুলতানার রঙিণ ছবিটা মাঝে মাঝেই ওকে দেখে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। রাস্তা থেকে মিহি গলায় কে যেন ওর নাম ধরে ডাকল। শুনতে ভুল হ'ল না তো?

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই এক পাল দুষ্টু হাওয়া শমিতের চুলে বিলি কেটে গেল। আবছা অন্ধকারের ওড়না খুলে বেরিয়ে এলো রুমনি। শমিতের মনে হ'ল, কোথায় যেন একঝাঁক খুশিয়াল মুনিয়া গান গেয়ে উঠল। রুমনি অনুযোগ ক'রল,

—তুমি হঠাৎ ডুমুরের ফুল হ'য়ে গেলে কেন শমি?

সংসারে এমন কিছু অনুযোগ আছে নীরবে মেনে নিলে যা ভাল লাগার টগর হয়ে ফুটে ওঠে। শমিত তাই চুপচাপ হাসল। রুমনির শাড়িতে পলাশের আগুন। শমিত বলল,

—ফুলটুসি লাল পরী সেজে কোথায় চলেছ?

—শাখীদের বাড়ি যাচ্ছিলাম, আর যাব না।

—কোথায় যাবে তাহলে?

—যে কোনো কোথাও। রুমনির দু'চোখে চেরাগ জ্বলল।

কালী মন্দিরে আরতির কাসর ঘন্টা বাজছে। সরু রাস্তা ধ'রে ওরা যমুনার কাছে চ'লে এলো। বাতাসে বাতাবী ফুলের সুগন্ধ। শীত শেষের মরা নদী। দু'পাশে ফসলতোলা ধানসিঁড়ির ক্ষেতে রুমনি দুধের জ্যোৎস্নায় চান ক'রতে ক'রতে ব'লল,

—শমি চলো মাঠে নামি।

একজোড়া যুবক-যুবতী চকিতে কৈশোর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে এলো। হাত ধরাধরি ক'রে ছুটতে ছুটতে শমিত আর রুমনি ফাল্গুনের রিক্ত ফসল ক্ষেতে কিছুক্ষণের জন্যে একটি অপার্থিব ছবির জন্ম দিল। রূপালী আলোর শাল গায়ে জড়িয়ে ছোট্ট নদী রূপসী হ'য়েছে। ছপ ছপ জাল ফেলে ফেলে একটা জেলে-ডিঙ্গি এগিয়ে যাচ্ছে। ছুটে রুমনি ক্লান্ত হ'য়েছে। ভিজে মাটির ওপরেই ও ধপ করে বসে পড়ল। ওর সিন্থেটিক নাইল্যাক শাড়িতে অনেকটা মাটি লেগে গেল। শমিও অনেকক্ষণ ধ'রে নাক টেনে টেনে মাটির গন্ধ নিল। তারপর রুমনির পাশে গিয়ে বসল।

—এতদিন ডুব মেরে ছিলে কেন শমি? আধবোজা বিষণ্ণ গলায় রুমনি ব'লল।

—ভাল লাগে না, আমার আর কিছুই ভাল লাগে না রুমু। একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে শমিত অসহিষ্ণুভাবে ছুড়ে দিল। ঝুপ ক'রে ঢেলাটা জলে পড়ল।

—একটা সাধারণ ব্যাপারে তুমি এত ভেঙ্গে পড়লে?

—ব্যাপারটা মোটেই সাধারণ নয়। রুমু, পুরুষ মানুষের জীবনে এ'যে কত সমস্যা তুমি ঠিক বুঝবে না।

—যে দেশে প্রতি বছর একটা অস্ট্রেলিয়া জন্মায় সেখানে সবাই কি ক'রে চাকরি পাবে ব'লতে পারো?

—তাহলে? শমিতের বিমূঢ় প্রশ্ন।

—চাকরি ছাড়া কি আর কিছু করবার নেই?

শমিত কোন উত্তর দিল না। নদীতে জল বাড়ছে। জোয়ার আসছে। মাটির ওপরে রাখা শমিতের বাঁ হাতের ওপর নিজের ডান হাতখানা আলতো ক'রে রে'খে রুমনি ব'লল।

—তুমি ছোট খাট ব্যবসায় নামতে পারো, নিজস্ব উদ্যোগে কুটির শিল্প শুরু করতে পারো, কোনো ছোট কোম্পানীর জিনিষপত্তর বিক্রির এজেন্সি নিতে পারো, ইচ্ছে করলে অনেককিছুই তুমি ক'রতে পারো শমি।

—অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার সাহস আমার নেই রুমু। শমিত রূঢ় হ'ল।

—তুমি পুরুষ হয়েছ কেন? রুমনি হেসে উঠল। নেপথ্য চুরমার করা হাসি।

ওর হাসি শমিতের শরীরের শিরায় শিরায় অপমান আর পৌরুষের আগুন ছড়িয়ে দিল। রুমনি আকাশের দিকে তাকাল। একটাও তারা নেই। আমের বোলের সুরভি মেখে এক দঙ্গল বাসন্তী হাওয়া দক্ষিণ থেকে ছুটে এসে ওদের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রুমনি ব'লল,

চতুর্থ কভারে দেখুন

চাষবাসের সালতামামী

নীলমণি মিত্র

খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা আসবে—আসছে ইত্যাদি ধ্বনিকে অবিলম্বে বাস্তবে রূপায়িত করতে আজ চাই নিশ্ছিদ্র ভাবনা, নিখাদ পরিকল্পনা, নিটোল পদক্ষেপ এবং নিবিড় রূপায়ণ। কিন্তু তারই জন্য সবচেয়ে আগে চাই আমাদের কৃতকার্যের বিচার, গতবছরের সাল তামামী। কেননা, এই বিচারই আমাদের ভবিষ্যৎ কৃষি ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ কৃষি পদক্ষেপকে সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ করে তুলবে।

এই আলোচনায় সে-অর্থেই রয়েছে কিছু কিছু কৃতকর্মের এবং ভবিষ্যৎ ভাবনার বিচার-বিশ্লেষণ।

রাজ্যের কয়েকটি এলাকা ছাড়া গত বছর খরিফ শস্যের জন্যে খুব ভাল বৃষ্টি হয়েছে। মরসুমের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত পরিমাণমত হয়েছে এবং পুরো মরসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে সমতাও ছিল। তার ফলে প্রায় ৬০ লক্ষ টন খরিফ চালের (আউশ ও আমন) ফলন গত বছর পাওয়া গেছে। গত বছরের খরিফ চালের ফলনকে রেকর্ড ফলন বলা যায়। এতদিন নানা কারণে আমন হিসেবে অধিক ফলনশীল জাতের চাষ খুব সাফল্যজনক বলে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু গত বছর এ রাজ্যের কৃষকদের ১৪ লক্ষ একরে অধিক ফলনশীল আমন ধান চাষে আগ্রহী করে তোলা সম্ভবপর হয়েছিল। মাঝারি-নীচু জমির জন্য পঙ্কজ উপযোগী বলে দেখা গেছে। আই-আর-২০ জাতও কৃষকদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে গেছে।

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চের শুকনো মাসগুলিতে যে সব এলাকায় সেচের সুযোগ রয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা দ্বিতীয় ফসল হিসেবে রবিতে গম চাষে আগ্রহী। গত বছর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে গমের এলাকা বাড়িয়ে তুলতে এক সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ফলে ১৯৭৪-৭৫ সালে যেখানে মাত্র ১০.৪ লক্ষ একরে গম চাষ হয়েছিল, সেখানে গত বছর ১৪ লক্ষ একরে গম বোনা হয়েছিল। অনুমান করা যায় যে গত বছরে ১১ লক্ষ টন ফলন হয়েছে এবং এই ফলনের পরিমাণ এখন পর্যন্ত সর্বাধিক। রাজ্যের পুরো গমের এলাকায় এখন অধিক ফলনশীল গমের চাষ হয়। গত বছর বোরো ধানের ফলন হয়েছিল রাজ্যে ৮.৫৬ লক্ষ টন। এবছরও ঐরকম ফলন আশা করা যায়। তাছাড়া, বোরো ধানের সম্পূর্ণ এলাকাতেই এখন অধিক ফলনশীল বোরো ধানের চাষ হচ্ছে।

চাল, গম, ভুট্টা, যব, তণ্ডুল—জাতীয় অন্যান্য অপ্রধান শস্য এবং ডাল শস্যে গত বছরের মোট উৎপাদন মাত্রা ৯০ লক্ষ টন হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র সেচের সুযোগ বৃদ্ধি উন্নত জাতের চাষেও বেশী অনুকূল হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে আলুর রেকর্ড ফলন হয়েছিল ১৩.৫০ লক্ষ টন। গত বছরে উৎপাদন আরো বেশি হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

চলতি বছরে ৯৪ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যসীমা স্থির করা হয়েছে। যোজনা পর্ষদ অবশ্য গত বছরের মত এই বছরের লক্ষ্য সীমা ৯০ লক্ষ টনে ধার্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবহাওয়া বিশেষ প্রতিকূল না হলে এই লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাতে অসুবিধা হবে না।

বিগত দশ বছরে রাসায়নিক সারের বিশেষত নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার বেড়ে গেছে। চাহিদার অনুপাতে যোগান কম থাকায় এই ক' বছরে সারের বিক্রি ভালই হয়েছে। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে অকস্মাৎ সারের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু এই রাজ্যে দর বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৫-এর জুলাই মাসে এবং আরেকবার নভেম্বর মাসে সারের দর কিছুটা কমে। এখন সারা রাজ্যে সার সুলভ এবং কৃষকদের সার সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই।

১৯৭৬-৭৭ সালের খরিফের (ফেব্রুয়ারী-জুলাই) জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৫০ হাজার টন নাইট্রোজেন, ১০ হাজার টন ফসফেট এবং ১৪ হাজার টন পটাশের জন্যে চাহিদা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিমাণ সার সরবরাহে রাজী হয়েছেন। ১৯৭৬-৭৭ সালের পুরো বছরে পশ্চিমবাংলায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টন নাইট্রোজেন, ৩০ হাজার টন ফসফেট এবং ৩০ হাজার টন পটাশ ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা যায়।

খরিফ, রবি ও বোরো মরসুমে শস্যের উৎপাদন বাড়াতে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে বাড়তি সেচ সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনুমান করা হয়, গত বছরে বিভিন্ন ধরণের সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়তি মোট প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমি

সেচের আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া বোরো বাঁধ থেকেও প্রায় এক লক্ষ একর জমি মরসুমী সেচ পেয়েছে। চলতি বছরে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমি অতিরিক্ত সেচের সুযোগ পাবে। তাছাড়া বোরো বাঁধ থেকেও দেড় লক্ষ একরে মরসুমী সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র সেচের স্বাভাবিক কর্মসূচী ছাড়াও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় রাজ্যে কৃষি উন্নতির জরুরী প্রয়োজনে বাড়তি সেচ সুযোগ সৃষ্টি করার এক ব্যাপক কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। দ্রুত খাদ্য উৎপাদন প্রকল্প বাবদ ৬২৫ লক্ষ টাকা সহ গত বছরে ক্ষুদ্র সেচের জন্যে ১২৩৩.৩০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। এই বছরে ক্ষুদ্র সেচের জন্যে যোজনায় ধরা হয়েছে ১২৬০ লক্ষ টাকা।

সংক্ষেপে এরাজ্যের ক্ষুদ্র সেচের অগ্রগতি উল্লেখ করছি। ২২১৮টি নদী সেচ প্রকল্প এই রাজ্যে রূপায়িত হয়েছে। রাজ্যে ২২৫৫টি গভীর নলকূপ রয়েছে। বেশিরভাগ নলকূপই বিদ্যুৎ চালিত। অসম্পূর্ণ বা আংশিক-সম্পূর্ণ নদী সেচ কেন্দ্র এবং গভীর নলকূপগুলির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৬০০টি নদী সেচ কেন্দ্র এবং গভীর নলকূপের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ করে দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং একেবারে পশ্চিমাঞ্চলের উঁচু-নীচু এলাকার ওপর থেকে নেমে আসা বর্ষার জলকে ধরে রেখে সেচের কাজে লাগাতে স্লুইস-গেটসহ, বাঁধ তৈরির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এইসব এলাকায় সাধারণত বেশির ভাগ জায়গাতেই পাথরের স্তর থাকায় গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানোর অসুবিধা রয়েছে। কাঁথি, তমলুক, হাওড়া জেলার দাক্ষিণাঞ্চল এবং ২৪-পরগণা জেলার খুব নীচু এবং সমতল এলাকার বহু জায়গায় জল নিকাশের সঙ্কট রয়েছে। জল-নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া ভাল উৎপাদনও সম্ভব নয়। এই বছরের যোজনা বরাদ্দে ৭০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এসব জমির জল-নিকাশী কাজ এবং সেচ কর্মসূচীর জন্যে।

সম্পূর্ণ পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমভাগের সাতটি থানা (কংসাবতী সেচ এলাকার বাইরে) এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার স্থায়ী খরা-পীড়িত এলাকা নিয়ে ১৯৭০-৭১ সালে খরা-পীড়িত অঞ্চল প্রকল্প (ডি-পি-এ-পি) তৈরি হয়েছিল। সেচ, ভূমি সংরক্ষণ, গো-পালন, মুরগীপালন, শূকরপালন প্রভৃতি কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে খরা-পীড়িত অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন এই কার্যসূচীর মধ্যে রয়েছে। পঞ্চম যোজনায় ডি-পি-এ-পি প্রকল্প ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৫০ : ৫০ অনুপাতে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। ফলে পঞ্চম যোজনায় এই প্রকল্প রূপায়ণের মোট খরচ ১২ কোটি টাকার ব্যয়ভার ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সমভাবে বহন করবেন। পঞ্চম যোজনার প্রথম দু বছর এই প্রকল্পের কাজকর্ম মূলত ক্ষুদ্র সেচের বকেয়া কাজের জন্যই ব্যয়িত হয়েছিল। গত বছরে তার জন্য রাজ্য ব্যয়বরাদ্দে ১২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার কথা ৮৯ লক্ষ টাকা। এবছরে রাজ্যে ব্যয় বরাদ্দে এ বাবদ ধরা হয়েছে ৮৬ লক্ষ টাকা।

রাজ্যের ৬টি জেলা—বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর আই ডি এ'র (বিশ্বব্যাঙ্ক) সাহায্যে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ১ নং পর্যায় রূপায়িত হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্যে মালদহের সামলি, নদীয়ার করিমপুর ও বর্ধমানের কাটোয়ায় ৩টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের উন্নয়ন করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পে ক্ষুদ্র সেচের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীতে ঋণের সাহায্য যারা পাবে তারা হল :

(১) কৃষকরা বা কৃষক গোষ্ঠীসমূহ বা কৃষকদের সমবায় সমিতি পাম্পসেট সহ ১৮,০০০ অগভীর নলকূপ বসানোর জন্য এবং ২০০ গভীর নলকূপের জন্য ঋণ পাবে।

(২) ১০০ গভীর নলকূপ বসানোর জন্য রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ কর্পোরেশন ঋণ পাবে।

(৩) অসম্পূর্ণ ৬০০ নদী সেচ কেন্দ্র এবং গভীর নলকূপ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকার ঋণ পাবে।

(৪) শিক্ষিত যুবকরা ঋণ পাবে ২০০ কৃষি সেবা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

পুরোপুরি কৃষি সম্প্রসারণ কাজের জন্য গ্রামসেবক থেকে কৃষি অধিকর্তা পর্যন্ত প্রশাসন চালু করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের কৃষি সম্প্রসারণের কাঠামো বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে নতুন করে সংগঠিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহকুমা পর্যায়ের কৃষি প্রশাসন কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। গ্রাম-সেবকরা কৃষকদের ছোট ছোট দলের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। মহকুমা পর্যায়ের প্রশাসন কাঠামো এবং প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যসূচী শুধু বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের ৬টি জেলাতেই চালু হয়নি, প্রকল্পের বাইরের জেলাগুলিতেও হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প রূপায়ণে মোট খরচ পড়বে ৫৩.৩০ কোটি টাকা (৬৭ মিলিয়ন ডলার)। এই প্রকল্পভুক্ত এলাকায় সমবায় সমিতি-গুলি গত বছরে প্রায় ১০০০ অগভীর নলকূপ বসিয়েছে।

খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষি সামগ্রীতে স্বয়ম্ভরতার পথে আমাদের অগ্রগতিতে ২০ দফা অর্থনৈতিক কার্যসূচীর পরি-প্রেক্ষিতে কৃষির গুরুত্ব এবং সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সরকার পূর্ণ সচেতন। নানা প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার চেষ্টা করছেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাদারদের কাছে আধুনিক কৃষি প্রথাকে পৌঁছে দিতে, যাতে গ্রামীণ সমাজের এই অনুন্নত শ্রেণী অর্থনৈতিক সঙ্গতি লাভ করতে পারে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই সব অব-হেলিত এবং অবদমিত সম্প্রদায়কে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মূল প্রবাহে নিয়ে এসে দেশ থেকে দারিদ্র্য হটিয়ে দেওয়া।

শ্রমের দাসত্ব আর নয়

আনন্দ ভট্টাচার্য

আজ থেকে ১৯০ বছর (১৭৮৫ খৃ:) আগে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট যখন আমাদের এই কলকাতায় তখন তার প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস্ একটি মামলার রায়দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন: "ক্রীতদাস রাখাটা যেন সমাজের একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এই ক্রীতদাস প্রথাই পরবর্তী কালে এদেশে বেগার শ্রমপ্রথায় পরিবর্তিতরূপে দেখা দেয়।

সেই আবহমান কাল থেকেই আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষে দাসপ্রথা চালু ছিল। বেদ ও পুরাণেও এর উল্লেখ আছে। মহাভারতেও তৎকালীন দাসপ্রথার নিদর্শন-স্বরূপ বহু কথা কাহিনীর উল্লেখ আছে। যেমন: অম্বিকার দাসী নিয়োগ—দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবদের দাসত্ববরণ ও পরে মুক্তিলাভ—কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান ইত্যাদি।

জাতকের গল্পে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দাসপ্রথা ও দাস বিষয়ে বহু উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার ও তাদের মুক্তিদান সমাজে স্বীকৃত হয়।

কোরাণে দাসের প্রতি সদয় ব্যবহার বিহিত হয়েছে এবং দাসমুক্তি পুণ্যকর্ম বলা হয়েছে। মুসলিম ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—কুতুবুদ্দীন, ইলতুতমিস সেনাপতি মালিক কাফুর, বিজাপুর আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিলশাহ প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন।

এতো গেল আমাদের দেশের কথা। পৃথিবীর ইতিহাসেও দেখা যায় বিশ্বের নানা দেশে প্রাচীন যুগেই দাস ও দাসত্বের উদ্ভব ঘটেছিল। কৃষি ও শিল্পকার্যের কিছুটা বিকাশের পর সভ্যতার প্রত্যুষলগ্নেই এই দাসত্ব প্রথা ও বেগার শ্রম প্রথার ক্রমশ উদ্ভব ও বিকাশ হয়। বলপূর্বক কঠোর কায়িকশ্রমে এই দাসদের নিযুক্ত করা হত এবং পরিশ্রমের মূল্য তারা কিছুই পেতনা।

প্রাচীন যুগে সুমের মেসোপটেমিয়া ব্যাবিলন, গ্রীস এবং মধ্যযুগে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলি বিশেষ করে ইংলণ্ডে, স্পেনে, আমেরিকায় এই দাস প্রথা অনুন্নত অনগ্রসর গরীব জাতের লোকদের বিনা পারিশ্রমিকে জোর করে খাটানো ব্যবসায়রূপে প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত দেশেই বেগার শ্রমিক ও দাসদের ওপর নানান কারণে অকথ্য অত্যাচার চালানো হত। আর্থিক ও দৈহিক নিপীড়ন ছিল যার অন্যতম।

আমাদের দেশে যদিও আবহমান কাল থেকে দাস নিয়োগ সমাজস্বীকৃত ও আইন-সিদ্ধ ছিল। তবু এই প্রথায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির ওপর অত্যাচার চালানো হত না। কারণ, এখানে ধর্মের সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা যুক্ত থাকায় তাদের প্রতি ধনী মালিকদের ব্যবহার চরম নিষ্ঠুরতায় পৌঁছয় নি। সত্যি বলতে কি, আমাদের দেশে দুর্বল এই শ্রেণীর ওপর নিষ্ঠুর আচরণ ও অত্যাচারের সূত্রপাত করে ইংরেজরা।

এদেশে বেগার শ্রম দাসত্ব প্রথার মূল কারণ হল অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। অর্থনৈতিক অসাম্য বিশেষভাবে প্রকট রূপ ধারণ করে মধ্যযুগ থেকে—কারণ, সে সময় ভূমিদাসত্ব মানেই ছিল বেগারশ্রম বা পুরোপুরি দাসত্ব। বৃত্তিটি অচিরেই অসৎবৃত্তি ও অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যাপকহারে প্রযুক্ত হতে থাকল। কারণ, ঋণদাতারা সবাই ছিলেন জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর বিত্তবান ব্যক্তি আর ঋণগ্রহীতারা হলেন সমাজের বেগার শ্রমিক, ভূমিহীন শ্রমিক, অথবা আদিবাসী। এরা কোনদিনই ঋণশোধ করতে পারতেন না। বরং আসল ঋণের চেয়ে চড়াহারে সুদের মাত্রা ক্রমাগত জমতে থাকত। ফলে, কখনো কখনো নিজের সন্তানসন্ততিদের বন্ধক রাখতে এরা বাধ্য হতেন কিংবা পরিবারের অন্য কাউকে বন্ধক রেখে পুনরায় ঋণ গ্রহণ করতেন। যতদিন না এই ঋণমুক্ত তাঁরা হতেন ততদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র আহারের বিনিময়ে প্রভুর সেবা করে যেতেন।

দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের দুর্বল অর্থনীতিই এজন্য দায়ী ছিল এবং এর কুপ্রভাব বিশেষভাবে এসে পড়ে তপশীলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষি-শ্রমিকদের ওপর। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই বেগার শ্রমিকেরা ১০।১৫ বছর কিংবা বংশ পরম্পরায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে যেতেন। বিত্তবান মনীবেরা এইসব বেগার শ্রমিকদের দিয়ে উদয়াস্ত গৃহস্থালীর যাবতায় কাজকর্ম করিয়ে নেন। অনেক-সময় মনিবেরা এদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করে তাদের স্ত্রী ও ভগিনীদের কিনে নিয়ে নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যবহার করতেন। দাসত্ব প্রথার এটাই সবচেয়ে কলঙ্ক ও লজ্জার দিক, যদিও কুফল সর্বস্তরে ছিল।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হতে থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দাস-প্রথা, বেগার শ্রম প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে—আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইংলণ্ডের অ্যাডাম স্মিথ, ব্যাক্সটার, জনসন, ব্রুহাম, মেকলে, কুপার প্রভৃতি বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮৩৩ খৃ:-এ দাসপ্রথার অবলুপ্তি ও দাসমুক্তি আইন বিধিবদ্ধ হল।

"আঙ্কল টমস্ কেবিন" (Uncle Tom's Cabin—১৮৫২ খৃ:) এমনি এক

বিশ্ববিখ্যাত দাসবিরোধী উপন্যাস—আমেরিকার শ্রীমতী হ্যারিয়েট 'বীচার স্টাও' যার স্বনামধন্যা লেখিকা। অবশেষে আমেরিকাতেও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দাসত্বের অবসান ঘটে।

দুঃখের বিষয় বৃটিশ সরকার আমাদের দেশ শাসনপর্বে ভারতের প্রধান আদিবাসী ও উপজাতীয় অঞ্চলগুলিকে "বহির্ভূত এলাকা" (Excluded area) নামে চিহ্নিত করে বৃহত্তর ভারতীয় জনজীবনের সম্পর্ক থেকে এদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। তার কারণ ছিল। এদের বৃটিশরাজ নিজেদের ব্যবসার কাজে লাগাতেন। কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকার এই কুৎসিত দাসপ্রথা ক্রীতদাস প্রথা ও বেগার শ্রমিক খাটানোর ব্যাপারে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন নি। তাই বিলম্বে হলেও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ইংরেজ শাসনের আমলে কিছু কিছু রাজ্যে আইনের মাধ্যমে এই বেগার শ্রম প্রথা অবসানের চেষ্টা চলে এবং বিহার ও ওড়িশাতে এর প্রয়োগ হয়। তারপর দীর্ঘ বিরতি এবং স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৬১ সালে ডেবর কমিশন এ সমস্যার প্রতি নজর দেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কোন কোন রাজ্যে এই ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করলেও কুপ্রথাটির অবসান হয়নি।

ইতিমধ্যে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত সোচ্চার হয়ে ওঠায় ১৯২৬-এর রাষ্ট্রপুঞ্জের (League of Nations) দাসত্বচুক্তি (Slavery Convention) ও ১৯৩০-এর বাধ্যতামূলক শ্রমচুক্তি (Forced Labour)-এর আরব্ধ কাজগুলি রাষ্ট্রসংঘ (United Nations Organisation) গ্রহণ করে পৃথিবীর সভ্য ইতিহাস থেকে মানুষের প্রতি মানুষের এই কদর্য প্রথা নির্মূল করার মানসে কর্মসূচী গ্রহণ করেন। গতবছর (১৯৭৫) আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ২০ দফা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে এই বেগার শ্রমপ্রথার উচ্ছেদ ও বিলুপ্তি অন্যতম আশু কাজরূপে মান্যতা লাভ করে।

আশার কথা এই যে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে যে আইনবলে "যে কোন মানুষকে দাস করা যেত" সেই আইনটি ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছিল—ফলে সেই সনাতনী রীতি প্রথা বিলুপ্তির পথে ছিল। অবশ্য দেশের কোন কোন প্রত্যন্ত প্রান্তে-যেখানে সভ্যতার আলো পৌঁছায়নি যথেষ্ট সেখানে এই প্রথাটির বিশেষ কোন হেরফের হয়নি। সমগ্র ভারতে এই দাস ও বেগার শ্রমিকদের শোষণ ও অধীনতার রীতিনীতি নিয়ম ও আইন কানুন বলতে গেলে এক ধরণের ছিল। তবে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রাজ্যে এদের বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হত। বলা বাহুল্য এই বেগার শ্রমিকদের প্রধান ও বড় অংশ হল তপশীলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অনগ্রসর মানুষেরা। এদের দুঃখদারিদ্র্যের কথা একদা সর্বজনবিদিত ছিল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এদের বলা হয়—নীট মজুর; বিহারে—হারিয়া, বারমাসিয়া ও কাথিয়া; ওড়িশায়—হালিয়া মুলিয়া ও নাগমুলিয়া; মধ্যপ্রদেশে—হারবাসি; উত্তরপ্রদেশে—সেবক ও হরিস; অন্ধ্রপ্রদেশে—পালেরাম; মাদ্রাজে পান্নাল; গুরজাটে—হালি; মহীশূরে—জাঠা; রাজস্থানে—সাগরী এবং পাঞ্জাবে—সের ও সন্ধি ইত্যাদি।

যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাদের ক্রমবর্দ্ধমান ও অন্তহীন দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতি সরকার কখনই উদাসীন ছিলেন না কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে সাংবিধানিক ছোটখাটো ত্রুটি এমনই ছিল যে এদের সার্বিক মুক্তি-কল্পে তেমন বলিষ্ঠ কোন পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। তবু ১৯৪০ সালে মাদ্রাজে (স্বাধীনতা লাভের আগে) বেগারপ্রথা উচ্ছেদকল্পে আইন চালু হয়। ১৯৬০ সালে রাজস্থান সরকার সাগরীপ্রথা রদকল্পে আইন করেন। উত্তর প্রদেশ সরকারও অনুরূপ আইন করেন ১৯৭৪ সালে। কেরালা সরকারের ১৯৭২ সালের বেগার শ্রম নির্মূল আইন এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। কিন্তু এতসব করা সত্বেও আশানুরূপ তেমন সুফল পাওয়া যায় নি।

এই সমস্ত দৃষ্টিকটু বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এবং বেগার শ্রম দেশ থেকে নির্মূল করার জন্য এগিয়ে এলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং। ২৪ শে অক্টোবর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি একটা অর্ডিনান্স বলে এই জঘন্য কুৎসিত প্রথাটিকে অবৈধ ও বেআইনি বলে ঘোষণা করলেন। পরে এটি আইনে পরিণত হয়। আইনে বলা হয়েছে: বেগার শ্রম প্রথায় কাউকে নিয়োগ, নিয়োগে সাহায্য করা, বাধা দান অথবা যে কোন প্ররোচনা-মূলক কাজ কঠোর দণ্ডনীয় অপরাধ।

শুধুমাত্র আইন বলে বেগার প্রথার সমস্যার সমাধান কষ্টকর ব্যাপার। এজন্য চাই আইনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে পুনর্বাসন দেয়া। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি রাজ্যে বেগার শ্রমিকদের গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করা ও তাদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাদান এবং যথাযোগ্য নাগরিকের মর্যাদা দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যার ফলে এখন সামান্য হলেও কিছু কিছু রাজ্য যেমন বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে বেশ কিছু বেগার শ্রমিক তাদের মালিকের কাছে ঋণমুক্ত হয়েছেন—সরকার এদের সকল বকেয়া ঋণ শোধ করে দিয়ে উপযুক্ত জমির মালিকানাসহ তাদের চাষবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্যান্য জীবিকারও সুযোগসুবিধা করে দিয়েছেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে তাদের টাকা লগ্নী করার ব্যবস্থাও এর মধ্যে অন্যতম।

চিল্‌কীগড়ের ছো নাচ

ধীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদিনীপুর জেলার শালবন ঘেরা একটি চোখ জুড়ানো এলাকা চিল্‌কীগড়। পশ্চিম বাংলা ও বিহারের প্রায় সীমান্তে। চিল্‌কীগড়ের ওপর দিয়ে একটি ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। নদীর নাম—ডুলুং (বা ডুলঙ)। প্রায় সারা বছর বালির চর আর পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটুজলে পার হওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে ডুলুং বিরাট আকার ধারণ করে। দু-পাশের অনেকটা জমি ও ঝোঁপজঙ্গল ভাসিয়ে দেয়।

এহেন অখ্যাত গ্রাম চিল্‌কীগড়ের খ্যাতি তার ছো-নাচ বা মুখোশনৃত্য নিয়ে। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে ছো-নাচের আসর বসে। পুরুলিয়া অঞ্চলে মুখোশ নৃত্য 'ছৌ' নামে পরিচিত। কিন্তু এখানে সকলে মুখোশ নৃত্যকে 'ছো' বলে উল্লেখ করলেন। চিল্‌কীগড়ে মুখোশকে বলা হয়—'মহড়া'। ছো-নাচকে গাজন উৎসবও বলা হয়।

চিল্‌কীগড়ের কাছে আর একটি গ্রাম নাম—'দুবড়া'। চৈত্র মাসে এই গ্রামেও এক রাত ছো নাচ হয়। বাঁশের চোঙায় কেরোসিন অথবা অন্য কোন তেল দিয়ে, কাপড়ের মোটা পলতে করে মশাল জ্বালানো হয়। 'ছো' নাচের সামনে দু-জন মশাল ধরে ঘুরতে থাকে। তারপর সাত থেকে দশবার ছো-নাচ হয় চিল্‌কীগড়ে। দু জায়গায় ছো নাচের আয়োজন করা হয় চিল্‌কীগড় রাজবাড়ী থেকে।

পূর্বে চিল্‌কীগড়ে একমাস ছো নাচ হতো। আয়োজন করতেন চিল্‌কীগড় রাজপরিবার। ছো নাচের আজও আসর বসে চিল্‌কীগড় রাজবাড়ীর প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গণে। এই অনুষ্ঠানে সকলে যোগদান করে। ছো-নাচ দেখার জন্য রাজবাড়ীর লোহার দরজা খোলা থাকে।

হাজার হাজার নরনারী ছো-নাচ দেখতে আশে-পাশের গ্রাম থেকে এসে রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে সমবেত হয়।

চিল্‌কীগড়ের সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মানুষ এই উৎসবের প্রাণ। গ্রামের মানুষ ছো-নাচের আসর জমজমাট করে তোলেন। রাজপরিবারের লোকেরাও ছো-নাচে অংশ গ্রহণ করেন। ছো-নাচের সঙ্গে বাজে ঢাক, ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র।

চিল্‌কীগড়ের ছো-নাচের আর একটি বৈশিষ্ট্য 'পরভা' (বা প্রভা)। এক একটি দেব-দেবীর কাঠের তৈরি মূর্তি (মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত)। পিছনে থাকে অভিনেতা। তাকে সামনে 'পরভা' বেঁধে বাজনার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নাচতে হয়। এই মূর্তি চিলকীগড়ে 'পরভা' (বা প্রভা) নামে পরিচিত। 'পরভার' সঙ্গে বাজে প্রধানত ঢাক ও সানাই। 'পরভার' সামনে এবং দু-পাশে চার থেকে দশজন ছেলেমেয়ে সেজে বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়। এদের বলা হয়—'কনিয়া ছো' (বা কনে ছো)। অর্থাৎ কনে সেজে চলেছে। চিলকীগড়ে 'ছো' অর্থে সঙ সাজা বা ঢং করা বোঝায়। প্রতি নাচের তাল ও বাজনা পৃথক।

'ছো' নাচের আসর চলে সারারাত। অনেকে আসরে ঘুমিয়ে পড়ে। একদল 'ছো' নাচের অভিনেতা বাঁদর, বাঘ ইত্যাদি মুখোশ পরে ঘুমন্ত মানুষের পা-ধরে তুলে দেয়। দর্শকদের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়া আসরে একটা হাসির ঢেউ খেলে যায়।

চিল্‌কীগড় রাজবাড়ীতে ছো নাচ প্রায় ১০০ বছর ধরে হয়ে আসছে। ছো-নাচের মুখোশ পূর্বে ঝাড়গ্রামের পটুয়ারা তৈরি করতেন। 'পরভা' পূর্বে ধলভূমগড় রাজবাড়ীতে ছিল। কোন এক বছর ধলভূমগড় রাজবাড়ীতে যেখানে 'পরভা' থাকতো সেই ঘরে আগুন লাগে। আগুনে কয়েকটি 'পরভা' নষ্ট হয়। তারপর চিল্‌কীগড়ে 'পরভা' ছো-নাচে ব্যবহার করার প্রথা হয়ে দাড়ায়।

চাঙ্গু নাচের শিল্পীদল

শুনলাম, পূর্বে ধলভূমগড়ে (সিংভূম, বিহার) ছো-নাচ হতো। বর্তমানে হয়না। ধলভূমগড়ের রাজারা ওখানে ছো-নাচের আয়োজন করতেন। বর্তমানে শুধু চিল্‌কীগড়ে এবং দুবড়াতে ছো-নাচ হয়। চিল্‌কীগড়ে 'ছো' অর্থে বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করা। এক এক ধরণ অভিনয় ভঙ্গিকেও 'ছো' বলা হয়। যেমন—নাপিত ছো = নাপিতের অভিনয়। শিকারী ছো = শিকারী নাচ অথবা অভিনয়। জেলে ছো = জেলের মাছ ধরা নাচ অথবা

অভিনয়। এই ভাবে, ধানকাটা ছো, বাবু ছো ইত্যাদি ধরণের নাচ এখানে দর্শকদের সামনে দেখানো হয়।

চিল্কীগড়ে মুখোশ পরে কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, বলরাম, পরশুরাম ইত্যাদি একক নৃত্য যেমন দর্শকদের সামনে দেখানো হয় ঠিক তেমনি বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়েও মুখোশ পরে অভিনেতারা নানা ভাবে নৃত্য করেন। আশে-পাশের বন-জঙ্গলের কথা স্মরণ করে শিল্পীরা বাঘ-ভালুক, বানর, হনুমান, কাক, পাখি ইত্যাদি মুখোশ নাচের ব্যবস্থা করেন। গ্রামজীবনের নানা পেশার কথা চিন্তা করে চিল্কীগড়ের 'ছো' নাচের শিল্পীরা নানারকম 'ছো' নাচের ব্যবস্থা করেন। যেমন: তাঁতি, নাপিত, শিকারী, ধোপা, বাবু, মেথরানী, ঝাড়ুদার ইত্যাদি মুখোশ পরে গ্রামজীবনের নানা ঘটনা সুখ-দুঃখের কথা লঘু করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান ইত্যাদি জীবনযাত্রা নিয়েও ছো-নাচের একটি পালা আছে। এই পালাটির নাম—'ছাসোহাগী'।

শোনা যায়, 'পরভা' পূর্বে ধলভূমগড়ে—ছিল ১৬টি, বহড়াগোড়ায়—৮টি, বর্তমানে চিলকীগড়ে ১২ টি 'পরভা' আছে। আরও শুনলাম, ঝাড়গ্রামে রাজবাড়ীতে বাহন ছাড়া কয়েকটি 'পরভা' আছে।

চিল্কীগড় রাজবাড়ীতে শেষ দু-দিনের অনুষ্ঠান (১) মেল বা সতী এবং (২) জাগরণের রাত নামে পরিচিত। প্রথম রাত মেল বা সতী অনুষ্ঠানে একটি মৃতদেহের প্রতীক হিসাবে, আসরে মৃতদেহের মতো সাজিয়ে, কাপড় চাপা দিয়ে রাখা হয়। এর কারণ যে কি তার সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যায় না। হয়তো, সতীদাহের স্মৃতিচিহ্ন আজও এঁরা বহন করছেন। দ্বিতীয় রাত—জাগরণের রাত, অর্থাৎ সারারাত ছো-নাচ চলে। চিল্কীগড়ে পুরুষেরা ছো-নাচে অংশ গ্রহণ করেন।

ছো নাচের মুখোশ ও পরভা

চিল্কীগড়ের আর একটি লোকনৃত্যের নাম চাঙ্ বা চাঙ্গু নাচ। এই নাচ 'মাঝি' জনগোষ্ঠীরা করেন। জনৈক গ্রামবাসী বলেন, পূর্বে মাঝিদের পেশা ছিল মাছধরা। বর্তমানে সকলে কৃষক। চাঙ্ নাচের সঙ্গে গানও গাওয়া হয়। চাঙ্গু নাচ তিন থেকে দশ জনের অধিক শিল্পী এক সঙ্গে তালে তালে পা-ফেলে, গান গেয়ে নৃত্য করেন। কখনও একটি যুবককে মেয়েদের শাড়ীপরে ঘোমটাদিয়ে ওদের সঙ্গে নাচতেও দেখা যায়। নাচের সঙ্গে বাজে বাদ্যযন্ত্র যা চাঙ্ বা চাঙ্গু নামে পরিচিত। চাঙ্গু গানের কিছু অংশ হলো এই:

(১)

বঁধু পিরীতি কেমনে হয়,
কথাটি শুনিয়া মরমে পশিল,
কহিতে বাসি যে ভয়,
পিরীতে কেমন কেবা সে আনিল।
ইত্যাদি।

(২)

নদী করে ছল ছল যারে জড়া ঢেউ,
নবীন বয়সে তার সঙ্গে নাইরে কেউ।
—ইত্যাদি।

(৩)

ছিঁড়া জালে মাছ ধরে ধলভুঁয়ানি।—১
চুন দক্তায় ভুলেই রাখে চিল্‌কীগড়্যানি।।—২
ঘরে ভাত নাই পান খায় ঝাঁড়গাগড়্যানি।৩
উঁচকপালি সিঁদুর পরে বেল্যাবেড়ানি।।—৪

[১। ধলভূম (বিহার), ২। চিল্‌কীগড়, ৩। ঝাড়গ্রাম, ৪। বেলেবেড়া (গোপী বল্লভপুর, মেদিনীপুর)]

চিল্‌কীগড়ের চাঙ্গু নাচ ছাড়া সাঁওতালী নাচ—ভুয়াং নাচও একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্য। ভুয়াং নাচের শিল্পীরা মাথায় পালক বেঁধে, বাঁশি ও কাঁসর বাজিয়ে নৃত্য করে। ২০থেকে ২৫ জনকে এক সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করতে দেখা যায়। তা'ছাড়া প্রত্যেকের হাতে থাকে 'ভুয়াং'।

চিল্‌কীগড়ের কাঠিনাচও দেখার মতো। এই নাচ দুর্গাপূজার অষ্টমী থেকে দশমী পর্যন্ত হয়। চিল্‌কীগড়ের ডুলুং (বা ডুলঙ্) নদী পার হয়ে গভীর বনের মধ্যে কনক দুর্গা মন্দির। কনক দুর্গা মন্দিরের পাশে বিষ্ণু মন্দির। বিষ্ণু মন্দিরের গায়ে এক কালে পোড়ামাটির কয়েকটি মূর্তি ছিল বলে শোনা যায়।

দুর্গাপূজার সময় প্রচুর লোকের ভিড় হয়। কনকদুর্গার মন্দিরের সামনে বিরাট হোম কুণ্ড। এখানে দুর্গাপূজার পূর্বে হোম ও চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে ১৬ দিন ধরে নিয়মিত ভাবে দেবীর পূজা আরাধনা চলে। সেই সঙ্গে চলে কাঠি নাচ।

চিল্‌কীগড়ে কাঠিনাচের সঙ্গে মাদল বাজে। ছেলেরা পরস্পর হাত ধরে নাচে। অনেক সময় গানও গাওয়া হয়।

চিল্‌কীগড়ের ছো-নাচের সঙ্গে পাইক নাচও হয়। রাজবাড়ীর লোকেরাও পাইক নাচে অংশ গ্রহণ করেন।

চতুর্থ কভারে দেখুন

পান বিচিত্রা

॥ অমর নাথ বসু ॥

সত্যিই পান আমাদের কৃষ্টির অঙ্গ। তবে পান খাওয়ার প্রথা শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও চালু আছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অতিথি আপ্যায়নে পানের সমকক্ষ আর কিইবা আছে। সম্বর্দ্ধনা অভ্যর্থনা প্রীতি সম্ভাষণ সবেতেই পান চাই। সেই সঙ্গে এ বাড়ি ও বাড়ির বয়স্কা মহিলারা নিজে পান খেয়ে অন্যকেও পান খাওয়াতে বিশেষ আগ্রহী। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে পান খেতে ভালোবাসেন। এক খিলি পান সেজে শুধু নিজে খাওয়া নয় অন্যকেও খাওয়াতে ভালো লাগে তাদের। বয়স্কদের পাশাপাশি স্বল্প বয়সীরাও পানের রসে ঠোঁট চুবিয়ে অধর রাঙাতে ভালোবাসেন ওঁরা। এমন দৃশ্য শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলাতে নয়—পশ্চিম বাংলার বাইরে বিশেষ করে রায়পুর, গেণ্ডিয়া, এলাহাবাদ, নেপালের বাজার ছাড়িয়ে ব্যাপারটা গড়িয়েছে—সুদূর পশ্চিম মুলুকেও। কেউ মশলা ব্যাতিরেকে, কেউবা সুগন্ধি মশলার সমাবেশ ঘটিয়ে পান চিবোন। সেকালে ঘরের কুলবধূরা পানের রসে ঠোঁট রাঙাতেন। শাড়ী ব্লাউজ সুন্দর ম্যাচ করিয়ে মুখে পানের রস লাগিয়ে নিজেকে অধিক সুন্দর করে সাজাতে অনেকেই ভালো-বাসেন। সেইসঙ্গে বয়স্ক মহিলারা যতই গল্পের ফাঁকে ডুব দেন ডিবে খুলে পান খেতে কিন্তু কেউই ভোলেন না। এ এক দারুণ নেশা। সেই ফাঁকে পানের এমন মজাদার চমৎকার স্বাদ সহজে কেই বা ভুলতে পারেন। রেওয়াজ সেই প্রাচীন কাল থেকেই। পান নিয়ে প্রাচীন গ্রন্থেও অনেক কথা লিখিত হয়েছে। একটি পানের খিলিতে থাকে সুপারি খয়েরর মৌরি যোয়ান শুকনো নারকেলের কুচি ইত্যাদি। এছাড়া দোক্তা বা জর্দার পান খেয়ে শরীরে যে গুণ পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে প্রাণ জুড়িয়ে ক্লান্তি দূর হয় ও উদ্দীপনা আসে। বিপরীত ভাবে পান না মিললে মন মেজাজ বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীদের মতে, পানের পাতায় রয়েছে শর্করা, ফেনোল এবং তারপিন প্রমুখ কিছু দরকারী তেল। সেইসঙ্গে পানে কিছু পুষ্টিও মেলে। এবার ১০০ গ্রাম পানে কি কি পরিমাণ প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে তার হিসেবটা একবার দেখা যাক্। ৩.১ গ্রাম প্রোটিন, ০.০৮ গ্রাম স্নেহ, ৬.১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। ১০০ গ্রাম পান থেকে ২৩০ ক্যালোরি মিলতে পারে। পানের পাতায় 'এ' ভিটামিন থাকে। সুপারিতেও লোহা এবং সামান্য 'এ' ভিটামিন রয়েছে। এতে ক্যালসিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আসলে এক পোয়ার বেশী দুধে যে ক্যালসিয়াম থাকে ততটা ক্যালসিয়াম আমরা পান থেকে পেতে পারি। আমাদের দেশের গর্ভবতী মেয়েদের ক্যালসিয়ামের অভাব হয়। সারাদিনে তিন চারটি পান খেলে সে অভাব অনেকটা দূর হয়। দুধের দাম বেড়ে যাওয়ার দরুণ—গর্ভবতী মেয়েরা দুধ পান না। কাজেই সন্তান জন্মের আগে ও পরে দু-চারটে পান খাওয়া ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় সেবন হিসাবে অনন্য। ছোট ছেলেমেয়েদের পেটে ব্যথা হলে পানের পাতার ক্যাষ্টর অয়েল মেখে ব্যথার উপশম হয়। পান যে উপকারই করে—অপকার করে না এমন ধারণা অনুচিত। ছোট ছেলেমেয়েকে পানের অভ্যাস করাবেন না। পান খেলে ভালো করে দাঁত পরিষ্কার করবেন—না হলে দাঁতের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। দোক্তা থেকে গলা ও মুখের নানান রোগ হয় বলে শোনা যায়। পান সাজার ব্যাপারে খয়ের ও চুন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহিলা মহল

বর্তমানের বাজার তো দুর্মূল্যের। এই দুর্মূল্যের বাজারের সঙ্গে সংসারের আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক গৃহিণীর। যদিও স্বামীস্ত্রীর উভয়েরই দায়দায়িত্বে একটা সুখী সংসার গড়ে ওঠে, তথাপি স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর উপরের সাংসারিক দায়িত্ব বেশী ন্যস্ত থাকে। এই দায়িত্ব যে গৃহিণী যত ভালো পালন করতে পারবেন সেই সংসারে তত পারিবারিক শান্তি ও প্রগতি গড়ে উঠবে।

মেয়েদের সংসারে শুধমাত্র মা বা গৃহিণী হওয়াই বড় কথা নয়। সাংসারিক শান্তি বা সুখের জন্য তাদের সুগৃহিণী হতে হবে, অর্থাৎ সংসারের অর্থনৈতিক সাশ্রয় তাদের নানাভাবে করতে হবে। এই অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের অপর নাম অপচয় নিরোধ।

সংসার সুখের হয়

আয় করা পুরুষের দায়িত্ব। তাই প্রতি মাসে গৃহকর্তারা যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী সংসারের ব্যয়ের টাকাটা তাঁদের গৃহিণীদের হাতে তুলে দেন। সেইজন্য প্রথমেই গৃহিণীর উচিত সেই মাসের একটা বাজেট রচনা করা। যদিও বাজেট অনেকসময় ছাড়িয়ে যায় তবু একটা বাজেট করা থাকলে সব রকম ব্যয়ই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়।

গৃহিণীদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় রান্নাঘরে। সুতরাং রান্নার খরচটা গৃহিণীরা অনেকভাবে সাশ্রয় করতে পারেন।

প্রথমে সকাল বিকালের জল খাবারের কথাই ধরা যাক্। অনেকে বিশেষ করে ধনী গৃহিণীরা সকাল বিকালের খাবার বাইরে থেকে কিনে সারতে চান। এতে একদিকে যেমন সংসারে অর্থনৈতিক চাপ বেশী পড়ে তেমনি অন্যদিকে বাইরের খাবার সুস্বাস্থ্যের অন্তরায়। গৃহিণীরা যদি বাইরের খাবার না কিনে নিজ হাতে খাবার তৈরী করেন তবে তা একদিকে যেমন তৃপ্তিদায়ক ও সুস্বাদু হয় তেমনি অপরদিকে অর্থের সাশ্রয় হয় অনেক বেশী। আবার অনেক রান্নার তরিতরকারী আছে যা তেলে না ভেজে ভাপেও করা যায়। ভাপে করলে তেলের সাশ্রয় হয়। তাছাড়া আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে তেল বা মশলা বেশী না হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। এছাড়া আলু ও অন্যান্য তরিতরকারীর খোসা দিয়ে প্রয়োজন বোধে একটা মিশ্র তরকারী করা যায়।

এতো গেল রান্নার দিক দিয়ে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের কথা। মেয়েদের ঘরকন্নার দিকেও প্রচুর দায়িত্ব আছে। অনেক গৃহিণী আছেন যে পুরোনো জামা কাপড় দিয়ে ঝুড়ি, কুলো রাখেন। এগুলি একেবারে অহেতুক, যদিও সংসারে ঝুড়ি কুলোর প্রয়োজন আছে। তথাপি তিন চারটি কাপড় দিয়ে যে দুই একটি ঝুড়ি কুলো রাখা হয় তার চেয়ে ঐ কাপড় গুলো দিয়ে অনায়াসে সুন্দর সুন্দর কাঁথা তৈরী করা যায়, যা কম্বলের বিকল্প হিসাবে অল্প শীতে ব্যবহার করা যায়। একদা বাংলায় এইসব কাঁথার খুব কদর ছিল। তাছাড়া এইসব পুরানো কাপড় দিয়ে বাচ্চাদের কাঁথা, বাক্সের ঢাকনা, বালিশের ওয়ার ও তৈরী করা যায়। ঘর সাজাবার ঝোঁক মেয়েদের চিরন্তন বাসনা। তাই দামী কাপড়ের পরিবর্তে নানা রঙের সুতো দিয়ে নানারকমের টেবিলক্লথ বা পর্দা তৈরী করে ঘর সাজান যেতে পারে।

সংসারে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের আরও নানান দিক আছে। এমন অনেক মহিলা আছেন যারা সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে সাধারণ আটপৌরে শাড়ী ধোপার বাড়ীতে কাচতে দেন। এর জন্য ধোপাকে বেশী টাকা দিতে হয় এবং শাড়ীও বেশীদিন টেঁকে না। তার পরিবর্তে যদি আটপৌরে শাড়ীগুলো মেয়েরা নিজের হাতে কাচেন তবে কাচার খরচ অনেক কম হয়।

সব গৃহিণীদের মনে রাখা উচিত যে প্রতি মাসে যত টাকা বাজেটে ধরা হয়ে থাকে তার চেয়ে অপ্রয়োজনে বেশী খরচ করা অর্থাৎ সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে সংসারে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবে সংসারে ঋণ হয়ে পারিবারিক অশান্তি ও কলহ দেখা দিতে পারে। তাই সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করা সুগৃহিণীর পরিচয় নয়।

এছাড়া অনেক গৃহিণীর মধ্যে অহেতুক স্ট্যাটাস বজায় রাখার প্রবণতা দেখা দেয় অর্থাৎ কোন বিবাহে বা সামাজিক উৎসবে তারা সাধ্যাতীত উপহার কিনতে চান। এতেও সংসারে ঋণ হয় এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। পারিবারিক কলহের ফলে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই লোক দেখানো বাহাবাপ্রীতি থাকা উচিত নয়। তার মূল্য দিতে হয় ঋণের মাধ্যমে এবং তার পরিণাম কলহ ও অশান্তি। বরঞ্চ বাজেটে প্রতি মাসে খরচের জন্য যত টাকা ধরা হয়ে থাকে তার থেকে গৃহিণীরা নানাদিক দিয়ে সাশ্রয় করে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে যোগ দিতে পারেন যা অসময়ে অনেক কাজে লাগবে এবং সংসারে সঞ্চয়ও বৃদ্ধি করবে। এবং সেই সঙ্গে দেশেরও সমৃদ্ধি বাড়বে। প্রবাদ আছে—'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। আমরা মেয়েরা সংসার করতে গিয়ে একথা যেন ভুলে না যাই।

স্বপ্না রাহুত

শরৎচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত ছবি

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' বলেছিল, দোহাই শরৎবাবু আমায় নিয়ে একটা গল্প লেখো। তেমনি অর্ধশতাব্দী আগের একখানি ছবি আমাকে অনুপ্রাণিত করে ব'লল— শরৎবাবুকে নিয়ে একটা গল্প লেখো। ছবিখানির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো অসাধারণত্ব নেই। পল্লীগ্রামের গাছের আলোছায়ার তলায় গাঁয়ের সব বয়সের নানা পোশাকের অনেক মানুষ সমবেত হয়েছেন। সম্ভবত কোনও বিশেষ একটি উৎসবকে স্মরণীয় ক'রে রাখার মানসে এই ফোটোখানি তোলা হয়েছিল। সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে বা বসে তোলানো এরকম কতো ছবিই ত আমরা দেখি। এই ছবিখানি কোনো পারিবারিক উৎসবের দলিল যে নয় তার প্রমাণ ফটোর মাঝখানে সাহেবী পোশাকের জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আপন পদমর্যাদায় মালা পরে' বসে আছেন আর তাঁর পাশের চেয়ারে শাদা জামা চশমা পরা শুভ্রকেশ অপর প্রৌঢ় ব্যক্তিটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁর কোলে ফুলের তোড়ার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে যে বালিকাটির মুখ সে আর কেউ নয়, শরৎ-চন্দ্রের ভাইঝি পুতুল। অতএব অনুমান করা চলে এটি একটি 'সভার' ছবি।

সভার পিছনের কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়েতে বসবাসের যোগসূত্র আছে। তখনকার পল্লীসমাজের কাঠামোর সঙ্গে আজকের গ্রামীণ জীবনে বিস্তর ব্যবধান কল্পনা সাপেক্ষ ব্যাপার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রূপনারায়ণের ধারে নিভৃত শান্ত পরিবেশে বসেই তিনি 'বামুনের মেয়ে' 'পল্লীসমাজ' রচনা করেছিলেন এমন কথা যেমন শোনা যায় তেমনি এও জনশ্রুতি যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু মোড়ল-মাতব্বরের বিরাগভাজনও তিনি হয়েছিলেন পল্লীজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আচার-আচরণের নির্ভুল চিত্রকে পাঠক-মহলের গোচরে এনে তার বেদনাকরুণ দশা সম্পর্কে সচেতন করার অপরাধে। শিল্পীর জীবনে এধরণের বিড়ম্বনাভোগ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পরবর্তী কালে তারাশঙ্করেরও দৈহিক লাঞ্ছনা জুটেছিল। তবে মানুষ যেমন ভুল করে তেমনি সেই ভুলটা ধরা পড়ে যখন তখন অনুতাপের দহনে খাঁটি সোনা হয়ে শিল্পীর ভাগ্যে পুরস্কার হয়ে ফিরে আসে অতীতের লাঞ্ছনা এও সত্যি। পানিত্রাসের মানুষ আজ শরৎবাবুর স্মৃতিকে কি ভাবে ধরে' রাখবে সেই ভেবেই আকুল।

ওসব থাক আমরা ছবিটির প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

বিরামপুরে একটি সভার মাঝে শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের লেখালেখির সময়টুকু ছাড়া বাদবাকী সময় কেমন করে কাটাতেন তা নির্ণয় আজ সম্ভব নয়। তবে তিনি যে ঘরে বসেই কাটাতেন না তার প্রমাণ অনেক মেলে। পানিত্রাস থেকে পায়ে হাঁটা পথ গিয়েছে বিরামপুর গাঁয়ে। সেখানেও রূপনারায়ণ আছে, আছে নদীর ধারে কালী মন্দির। শরৎবাবু মাঝে মাঝে চলে যান, কালীমন্দিরের চত্বরে নিরিবিলিতে বসে থাকেন। কখনো একা—কখনো বা সঙ্গে থাকে তাঁর ছোট্ট ভাইঝি পুতুল। মন্দিরের কাছেই মান্নাদের বাড়ী। বর্ধিষ্ণু মান্না পরিবারেও তাঁর যাতায়াত হামেশা। নারায়ণ মান্নার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা গড়ে' ওঠে। বৈঠকখানায় বসে তামাক টানতে টানতে গল্পের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যায় কোথা দিয়ে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এমনি এক আড্ডার মধ্যে শরৎবাবু বললেন,—দ্যাখো বাপু লেখাপড়া না শিখলে আমাদের দেশের মেয়েদের কোনো উন্নতি হবে না। ওটা দরকার। আমার মনে হয় এখানে মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল করলে ভালো হয়।

নারাণবাবুর মনে ধরল কথাটা। তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি করিৎকর্মা মানুষ। স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপার খানিকটা এগিয়ে যাবার পর তিনি কথায় কথায় বললেন, স্কুলের নাম হবে শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়।

শুনেই শরৎবাবু হাঁ-হাঁ করে মাথা নাড়ালেন। —খবরদার ওসব ছেলে-মানুষী মতলব মনে ঠাঁই দিয়ো না।

অবাক বিস্ময়ে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করেন কেন? এতে আপনার আপত্তির কি থাকতে পারে।

—আরে অমন ভুল করতে যেয়ো না। ইস্কুল ত আর একটা ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। দেশে গাঁয়ে মেয়েদের ইস্কুল করলে তার নিত্যি খরচপত্তর আছে সেটা কোথা থেকে জুটবে সেকথাওত ভাবতে হবে তোমায়। আমাদের দেশে ঠাকুর দেবতার পুজোর নামে লোকের ধার করতে একটুও আটকায়না—তা ছাড়া দেবদেবীর ভোগ একরকম ক'রে জোগাড় হয়েই যায়। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে ক'জনই বা এগিয়ে আসবে। আর উৎসাহও জুড়িয়ে যেতে দেরি লাগে না—। আমি বলি কি যাতে সরকারী মহলের আনুকূল্য আদায় করা যায় সেটাই ভাবতে হবে।

—সেটা কি ভাবে হবে?

—সেও আমি ভেবে রেখেছি হে। আমাদের এস, ডি. ও. সাহেবের এসব দিকে খুব উৎসাহ আছে। তাঁকে ধরলে কাজ হবে, বুঝলে। টাকাপয়সার দিক দিয়ে সরকারী সাহায্য থাকলে ইস্কুল ঠিক চলবে।

একেবারে পাকা মাথার অব্যর্থ সন্ধান।

তখন উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক কুমুদবিহারী মল্লিকের নামেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। মল্লিক মশাই ৫০১ টাকা দিলেন। আর শরৎবাবু সর্বতোভাবেই সহায়তা করলেন যার নিজের বাড়ির দুখানি চেয়ার যা ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

রূপনারায়ণের বুকের ওপর দিয়ে তারপর পাঁচটি দশকের বন্যা-খরার পরি-বর্তনের স্রোত বয়ে গেছে। আজ সেই কুমুদবিহারী বালিকা বিদ্যালয়ও কালের কবলে অবলুপ্ত।

তবে আর রইল কি?

কেন, গ্রামবাসীর জন্যে তন্ময়ভাবে-ভাবিত শরৎচন্দ্রের মানবিকতার পরিচয়, নারীশিক্ষার জন্য শুধু কলম চালিয়েই সেই মানুষটি থেমে থাকতে পারেন নি। প্রগতির পথ তৈরীর কাজে দস্তুর মত নেমে পড়েছেন সেই পরিচয়। যা ইতিহাসে প্রায় উপেক্ষিত।

পান বিচিত্রা

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রস্তুত হওয়া দরকার। যে জলে পান ধোবেন সে জল পরিষ্কারভাবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রস্তুত করবেন। পান পরিষ্কার জলে ধুয়ে ব্যবহার করা দরকার। পচা পানের পাতা খাওয়া ভালো নয়। বিজ্ঞানীদের মতে পানের সঙ্গে যে এলাচ দানা থাকে তাতে প্রচুর ক্যালোরি জোগায়—শরীর গরম রাখে।

এবার পান চাষীদের হাতে গড়া পান বরজের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। পান চাষীদের কাছে এ বরজ একটি দেবতুল্য স্থান। অন্য কোনো চাষের ব্যাপারে এত নিয়ম নিষ্ঠা বা পবিত্রতা বজায় রাখা হয় না। পান বরজের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য চাষীরা কখনো বাসী বা নোংরা কাপড় পরে অথবা জুতো পায়ে দিয়ে বরজে প্রবেশ করে না। মেয়েদের ব্যাপারে এ নিয়ম কঠোর। সিঁদুর আলতা পরবার অব্যবহিত পরে অথবা এলোচুলে পান বরজে প্রবেশ নিষেধ। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বিশেষ ভাবে পালন করা হয়। এদের লৌকিক ধ্যান ধারণায়—বরজের অধিষ্টাত্রী দেবী হলেন বিন্ধ্যবাসিনী কালী বা বরজ কালী। বরজের শ্রীবৃদ্ধির কামনায় প্রতি বছর চৈত্রমাসের প্রথম রবিবারে বরজ-কালীর পূজা হয়—কোনো পশুবলী হয় না। পূজা শেষে বরজের মধ্যে শান্তিজল ছড়ানোর প্রথা তো রয়েছেই। মেদিনীপুর জেলার কোন কোন গ্রামে চাষীরা সমবেত-ভাবে বরজকালীর পূজা করেন। বহু পান রসিকের কাছে এসব কথা অজানা।

বংশানুক্রমে বারুজীবী শ্রেণীর লোকেরাই পান চাষে নিযুক্ত। পানচাষীদের মতে বাঙলা মিঠে সাচা পানের প্রত্যেকটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্ভর করে কোন অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ও চাষীদের অভিজ্ঞতার ওপরে। সেই যাই হোক, গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে ব্যাগ থেকে ডিবে খুলে মুখে এক খিলি পান পুরে দেওয়ার রেওয়াজ আজও যথারীতি রয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পান খাওয়া একটা রোগে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে চাকুরীজীবী মেয়েরাই পুরোভাগে। বয়স্করা যতই গল্পের ফাঁকে ডুবে যান ডিবে খুলে পান খেতে কেউই ভোলেন না। কাজ কিংবা কথার ফাঁকে ফাঁকে পানের রসের আস্বাদ নিতে সেকাল একাল উভয় কালের মহিলারাই বেশ তৎপর। ইদানীং কালের সুন্দরীরা সুন্দর মুখে পান নিয়ে চিবোতে একটুও ভোলেন না।

গ্রন্থ আলোচনা
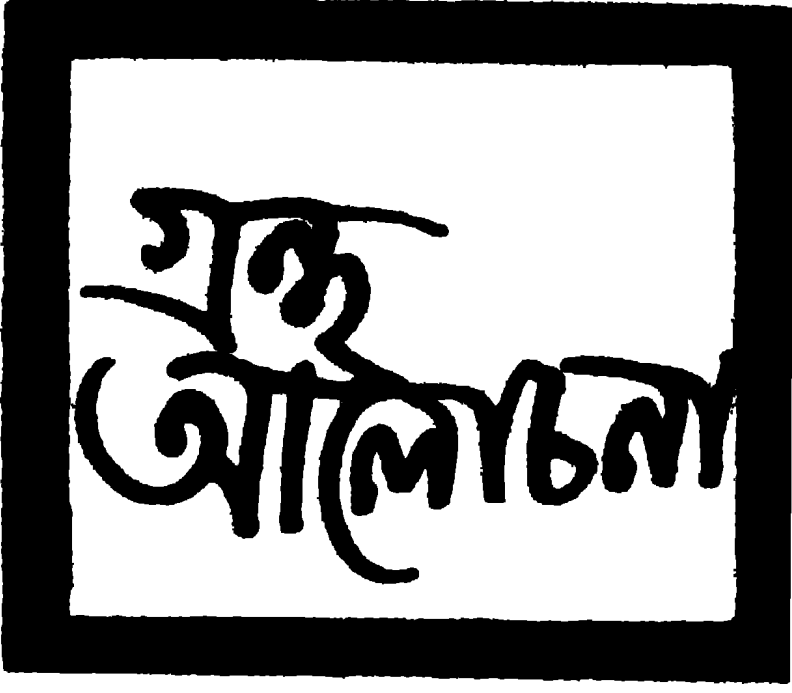
অন্য কোন নামে—সুগত বড়ুয়া
বুক নিউজ—কলকাতা-৬
দাম তিন টাকা

কিছুকাল আগেও নানা লিটিল ম্যাগাজিনের পাতায় সুগত বড়ুয়ার কবিতা পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন। 'অন্য কোনো নামে' বোধকরি এই তরুণ কবির প্রথম মিলিত কবিতার সংকলনগ্রন্থ। মূলত ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে রচিত সুগত বড়ুয়ার মোট ছেচল্লিশটি কবিতা বর্তমান সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে পরবর্তী কালেরও কিছু রচনার স্বাদ পাঠক এই সংকলনে অনায়াসে পেতে পারবেন.

তরুণ কবি সুগত বড়ুয়ার কবিতার মেজাজ উৎসাহী পাঠককে কাছে টানে। তার বিনতনম্র উচ্চারণ, লিরিকধর্মী প্রকরণ বেশ ভালো লাগবার মতো। সুগত বড়ুয়া কোমল স্নিগ্ধ, তার কবিতায় জ্বালা নেই কিন্তু সেই সঙ্গে ঋজু বক্তব্য রাখার প্রচেষ্টায় তিনি বেশ পরিশ্রমী: "দুঃখে স্মৃতি খুঁজি। নিভৃতে পুরাতনের পাশে স্থির/হয়ে দাড়াই; যন্ত্রণা নির্জনতার শিকড় ধরে/সময় ফুরায়; হৃদয়ের চাপা কণ্ঠস্বরে/দুঃখ সমাহিত; ঢেউ এসে ছোঁয় সাগরের তীর।' (দুঃখে স্মৃতি খুঁজি), কিংবা 'আজকাল মুহূর্তকে সঙ্গে নিয়েই চলাফেরা করি/দীর্ঘকাল সংসারের শৃঙ্খলায়/আবর্তিত রাখতে হয়। তাই/মুহূর্তকে আজকাল সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করি।' (কলকাতার জন্য)।

সুগত বড়ুয়ার কবিমন লিরিক ধর্মী। লক্ষ্য করা গেল, লিরিকের স্নিগ্ধতাকে তার কবিতায় আনতে তিনি বেশ যত্নবান। তবু যেহেতু এখনো তার দুরন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল সেহেতু আরো নিটোল অনুভাবনার কবিতার জন্য উৎসাহী পাঠকের আরো অপেক্ষা করতে হবে। তবু এরই মধ্যে, বর্তমান কাব্যগ্রন্থের 'আলোর বিকেলে দূরের সূর্য কাঁপতে কাঁপতে ডুবে যাচ্ছে,' 'আকাশে/অনেক মেঘের উপর/কিছু রোদ্দুর ফেলে/সূর্য কাঁপতে কাঁপতে ডুবছে। (তিনটি স্কেচ) কিংবা 'তোমার মনের গন্ধ আলোছায়ার শিকড় ছুঁয়েছে আজ/যেন/দুপুরের রোদে প্রজাপতির ওড়ার আনন্দ (মুকুরে) ইত্যাদি পংক্তি-গুলিতে কবির চোখের আলোর এক অন্যতর পরিচয় পাওয়া যায়। 'দুঃখসুখ', 'মৃত্যুর পর' 'একা এবং অন্যান্য', 'চৈত্রের কবিতা', 'কত পরিচিত নাম' ইত্যাদি কবিতাবলীতে কবির ঋজু ভাবনা এবং জীবনের বাস্তব ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিবেদন উৎসাহী পাঠক আবিষ্কার করবেন।

কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে কবির আরো কিছু সতর্ক হবার প্রয়োজন ছিল—তাহলে। মনে হয়, কিছু তথাকথিত অবেগব্যাকুল দুর্বল রচনার অনধিকার প্রবেশ ব্যাহত হয়ে 'অন্য কোনো নামে' কাব্যগ্রন্থটিকে আরো সুনির্বাচিত করে তুলতো। তবু এই কবির কাছে নানা কারণেই উৎসাহী পাঠকের প্রত্যাশা থেকে যায়। গ্রন্থসজ্জা রুচিশোভন।

ইন্দ্রনীল সেন

পত্র পত্রিকা

এবং

এবং পত্রিকার আধুনিক বাণীই হল—'আধুনিক কবিতার ফাঁসি হোক'। হঠাৎ এ ধরণের মত সম্পাদক মশাই কেন পোষণ করলেন এই মুহূর্তে ভাবা যায়না। তবে ভারতবর্ষের জলবায়ুজনিত এটা একটা বিদঘুটে ব্যারাম এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এপ্রিল সংখ্যাটি হল আধুনিক কাব্য এবং সর্বসাকুল্যে সাহিত্যের একটা মনগড়া মান নির্ণয় করতে চেয়েছেন সম্পাদক বিপ্লব চট্টো-পাধ্যায়, হাওড়া-৪০।

ঝিনুক

গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা, সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাস, ১৮।১ হরেন মুখার্জি রোড, শিলিগুড়ি।

সুরুচিসম্পন্ন ছোট পত্রিকা। তরুণ কবি ও গল্পকারদের প্রাধান্য বেশী। কবিতায় মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত গভীর রেখাপাত করেন। আর সত্যিইতো যা কিছু গোপন তা'তো হৃদয়ের কপাটের ভাজে। এছাড়া কাঞ্চন-কুন্তলা মুখোপাধ্যায় জ্যোৎস্না মণ্ডলের কবিতা, রতন বিশ্বাস এদের কবিতাগুলি কিছু দাবি রাখে।

অনুভব

সম্পাদক 'সাহিত্যের অনুভব'। চব্বিশ পরগণা।

অনেকগুলি কবিতা আছে। সুচিস্মিতা দাশগুপ্ত, শ্যামাদে, শ্যামল রায়ের কবিতা তুলনায় মোটামুটি। গল্পটিও—'আকালীর দুর্গা দর্শন।' তবে ছোট পত্রিকায় উপন্যাস স্থান পেলেই বোধ হয় ভাল হত।

গ্রাম বাংলা

সম্পাদক—নকুল মল্লিক। এটি মূলত একটি (ত্রৈমাসিক) ছোট গল্পসংকলন। পাতা ওল্টালেই প্রথমেই ঊষা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে দেখা যায়। সম্পাদক যে ফাঁকি মেরেছেন এটা স্পষ্ট। কারণ ঊষা বাবু ছোট গল্প লিখেছেন কী? লেখার সময় শুধু বইয়ের জ্ঞান ছাড়া অভিজ্ঞতাটাও খুব বেশি দরকার কিনা। গল্পগুলি মোটামুটি সুপাঠ্য।

গ্রাম্য

সম্পাদক—বিশ্বনাথ ভক্ত ও জীবন বিশ্বাস। (ত্রৈমাসিক) শ্লোগানটি ভাল 'যে কোনশিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটান গোলাপ'। কবিতা শিবাজী কুণ্ডু, শংকর মজুমদার, জগবন্ধু ভক্ত। প্রবন্ধটি ভাল। লিখেছেন বিমান বিহারী রায়।

মলয় সিংহ

খেলা ধুলা
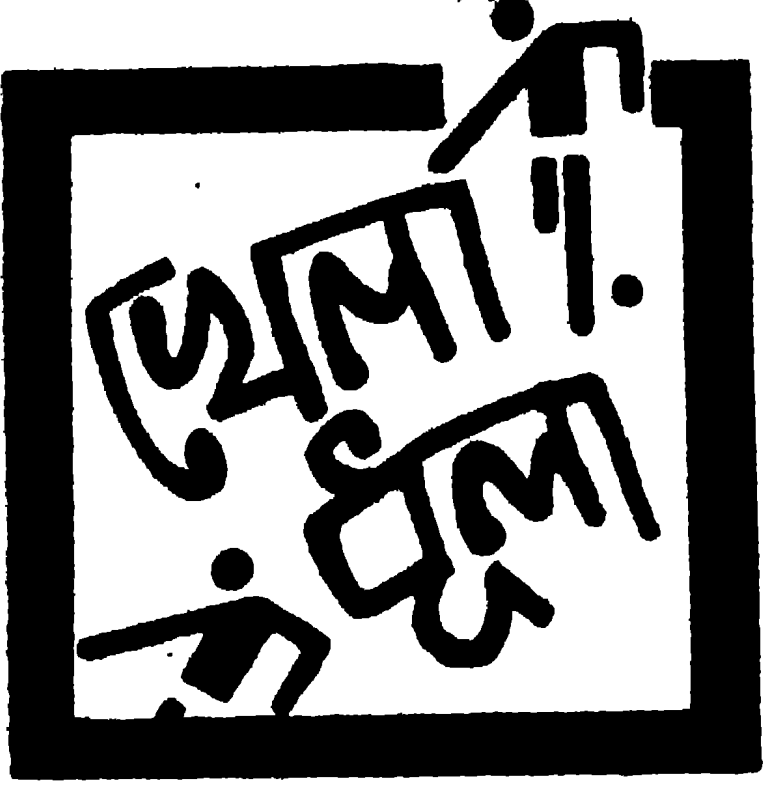
এবারের ফুটবল মরশুম একটি বিদেশী দলের খেলা দিয়ে সুরু হলো। দলটি আহামরি গোছের না হলেও স্থানীয় তিনটি বড় ক্লাব—মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলোয়াড়রা মরশুমের সুরুতেই নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য কিছুটা যাচাই করে নিতে পেরেছেন। সেটিও কিন্তু কম বড় লাভ নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এই খেলাগুলি তাদের কাছে অযাচিতভাবে পেয়ে যাওয়া কিছুটা বাড়তি পাওনাই।

এই বাড়তি পাওনার ভাগ কিন্তু কলকাতার দর্শকরা পান নি। ইংলণ্ড থেকে আসা দলটি—ক্রুক টাউনের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সহর কলকাতার ফুটবল উৎসাহী মানুষ অনেক বেশী কিছু আশা করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি তাদের প্রত্যাশা একেবারেই মেটে নি। ক্রুক টাউনের খেলোয়াড়রা তাদের খুশী করতে পারেন নি।

ক্রুক টাউন আমাদের প্রত্যাশা মেটাতে পারে নি

ইংলণ্ডের নর্দান লীগের একটি দলই এই ক্রুক টাউন। কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গ সফরে আসার আগে তাঁরা বিভিন্ন ক্লাব থেকে কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিয়ে দলটা শক্তিশালী করে গড়তে চেয়েছিলেন। তারা আনতে চেয়েছিলেন ববি চার্লটন, টেরি পেইন প্রভৃতির মতো খেলোয়াড়দের। এঁদের নাম শুনেই আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ওঁরা শেষ পর্যন্ত আসেন নি। ওঁরা এলে অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। পেইন অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে সফরের শেষ খেলাটিতে অংশ নিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একটি বিদেশী দলের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি? এর উত্তর সহজ এবং সরল। ফুটবল খেলার আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে আমাদের দেশের খেলার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে বিদেশে ফুটবল খেলাকে যখন অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমরা তখনো আঁকড়ে ধরে আছি সেই পুরোনো পদ্ধতি। যেমন ধরা যাক ৪-২-৪ প্রথায় খেলার অনেক ত্রুটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্রেজিল প্রভৃতি দেশগুলি এই পদ্ধতি উল্টে-পাল্টে নিয়েছে, কেউবা আবার এই পদ্ধতিতে খেলছেই না। এই পদ্ধতিতে খেলার ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে নজর দিয়ে অনেক দেশে অন্য পদ্ধতিতে খেলা হচ্ছে। ফুটবল খেলার সর্বশেষ এবং আধুনিকতম পদ্ধতি হলো বাস্কেটের মতো সকলের এক সঙ্গে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফুটবল খেলা যখন এতদূর এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা সবে কয়েক বছর হলো ৪-২-৪ প্রথায় খেলতে সুরু করেছি।

তাই বিদেশী দলগুলোর কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকে ভালো খেলা দেখার এবং আধুনিক ফুটবলের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। কিন্তু ইংলেন্ড থেকে আসা দল ক্রুক টাউন আমাদের সেই আশাতো মেটাতে পারেই নি বরং অতি সাধারণ দল হিসেবে তারা তাদের পরিচয় তুলে ধরেছে কয়েকটি খেলার মাধ্যমে। আমরা ক্রুক টাউনের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলাম, বল ধরা ও দেওয়ার আধুনিক কায়দা, বল নিয়ে দ্রুত লয়ে তালে ছুটে যাবার ভঙ্গী এবং চকিতে নেওয়া সটে চমকে দেবার প্রচেষ্টা। আরো কিছু প্রত্যাশা ছিল আমাদের। কিন্তু এই বিদেশী দলটি তার কানাকড়িও মেটাতে পারেনি। অতি সাধারণ দল
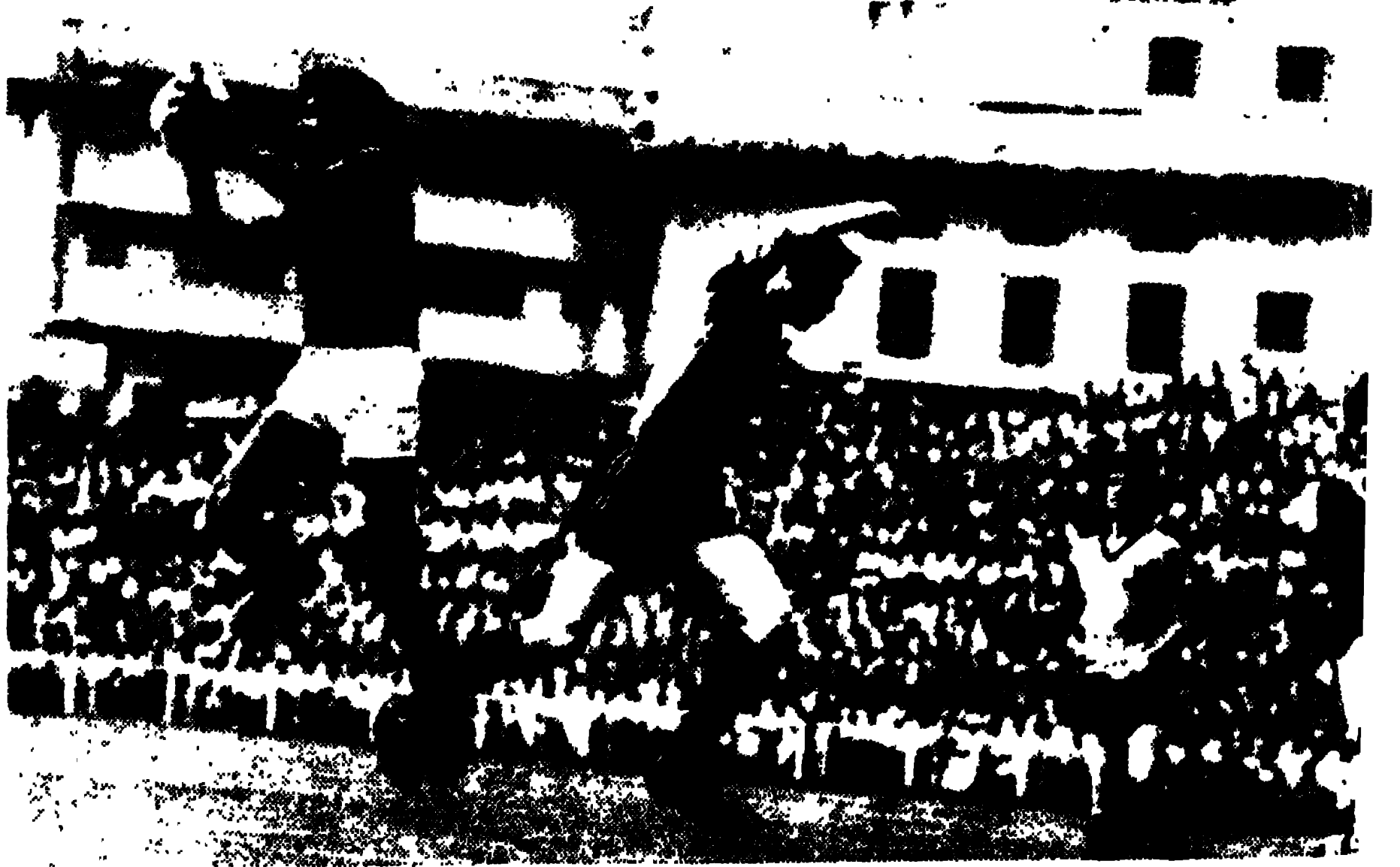
ক্রুকটাউনের পিয়ারসন মরিসনের গোল করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন মহামেডান স্পোর্টি দলের গোলরক্ষক আমেদ কয়া

হিসেবে ক্রুক টাউন পরিচিত হয়ে থাকবে। এই দলটির সফরের উদ্যোক্তা মোহনবাগান ক্লাবও এই দলটির কাছে আরো অনেক বেশী কিছু আশা করেছিল বলেই মনে হয়।

এই সফরে ক্রুক টাউন দল মোট ছ'টি খেলায় অংশ নিয়েছে। জিতেছে একটিতে এবং হেরেছেও একটিতে। জিতেছে মহামেডান স্পোর্টিংদলের বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে। আর আই. এফ. এ. একাদশ ১-০ গোলে তাদের হারিয়ে দিয়েছে। এছাড়া মোহনবাগানের সঙ্গে দুটি (একটি ইডেনে, অপরটি দার্জিলিংয়ে), ইষ্টবেঙ্গল এবং মুখ্যমন্ত্রীর দল অর্থাৎ সর্বভারতীয় একাদশের সঙ্গে খেলাগুলির সব কটিই ১-১ গোলে অমীমাংসিত থেকে গেছে।

গত ১৫ই মে ইডেনে মুখ্যমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে খেলার সময় রাষ্ট্রপতি শ্রী ফকরুদ্দীন আলি আমেদ মাঠে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আশি মিনিট তিনি খেলা দেখেছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বিশ্ব কাপ দলের খেলোয়াড় (১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে ইংলণ্ডের হয়ে লীগের খেলায় খেলেছিলেন) টেরি পাইনের হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মাঝে মধ্যে জ্বলে ওঠা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নি।

ক্রুক টাউনের খেলা আমাদের প্রত্যাশা মেটাতে না পারলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কিন্তু ক'দিন যথেষ্ট আনন্দ দিয়ে গেছে। শুধু কলকাতা নয় শৈলসহর দার্জিলিংয়ে খেলে তারা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পেরেছিল।

গল্প হলেও সত্যি

অনেক অনেক দিন হয়ে গেলো। সেই দিনটির কথা ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে চিরকাল জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা থাকবে। ঘটনাটা আজ থেকে ১২২ বছর আগের। ঘটনাস্থল কলকাতার ময়দান অঞ্চল।

কিন্তু সেদিনের ময়দানের সঙ্গে আজকের গড়ের মাঠের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড় জোর দু চারটে গাছ, সেদিনের শিশুবৃক্ষ আজ প্রবীণ হয়ে, কলকাতা ময়দানের প্রথম ফুটবল খেলার অবিস্মরণীয় দিনটির সাক্ষী হয়ে আছে। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে কিন্তু সেই খেলার বিশেষ কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। খেলাটি যে হয়েছিল শুধু তারই উল্লেখ আছে।

১৮৫৪ সাল। সময়টা বোধহয় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। আদ্যিকালের আজব শহর কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হলো অভিনব এক অনুষ্ঠান। সাগর পারের দেশ থেকে আসা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় সাহেবরা সেদিন খেলেছিলেন এক আজব খেলা। একটা হাওয়া ভর্তি চর্ম-গোলককে লাথালাথি করা—যার নাম নাকি ফুটবল। ......।

খেলা হয়েছিল এসপ্লানেডের ময়দানে। সেদিন খেলাটি কিন্তু আসল ছিলো না, সেই খেলার আসল উদ্দেশ্য ছিল সাহেব মেমদের একসঙ্গে খানিকটা হৈ চৈ, আনন্দ আর ফুর্তি করা। সেদিনের সেই খেলায় অংশ নিয়েছিল—ক্যালকাটা ক্লাব অফ সিভিলিয়ানস ও জেন্টেলমেন অফ বারাকপুর।

সেই প্রথম ফুটবল খেলা। শুধু কলকাতা বা বাঙলাদেশেই নয়—ভারতবর্ষের প্রথম ফুটবল খেলা ছিলো সেদিনের সেই জেণ্টলমেন অফ বারাকপুর ও ক্যালকাটা ক্লাব অফ সিভিলিয়ানস দলের মধ্যের খেলাটি।

সেদিনের সেই খেলাটি আজ তাই গল্পের মতো মনে হয়। কিন্তু ঘটনাটি গল্প হলেও সত্যি......।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তরিকতাই সব

—গৌতম সরকার

"জীবনের ঐটাই তো প্রথম বড় খেলা! নামী দলে লাল-হলুদের জার্সি গায়ে চড়িয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতে শুরু করেছি। সুধীর সেবার দলনায়ক। প্রতিপক্ষ প্রতিবেশী দল মহামেডান স্পোর্টিং। ভীষণ ভয় করছিল। দামী দল আর নামী সব খেলোয়াড়। খেলা বেশ জমেই উঠেছিল। কিন্তু কোন পক্ষই গোল করতে পারছে না। একটা বল নিয়ে ফরোয়ার্ড লাইন ক্রশ করে সুভাষকে বলটা এগিয়ে দিই। সুভাষ আবার আমাকেই সেই বলটা ফিরিয়ে দেয় একেবারে প্রায় গোলমুখে। চকিতে সট নিয়ে প্রতিপক্ষ গোল-রক্ষককে পরাস্ত করে দিই। সেই গোলের কথা আজও চোখ বুজলে ভেসে উঠে স্মৃতি-পটে। সেদিন আমরা ২-০ গোলে জিতেছিলাম। অপর গোলটা করেছিল আকবর। স্বদেশে সেই খেলাই আমার জীবনের স্মরণীয় খেলা হয়ে আছে।"
—ইষ্ট বেংগল ক্লাবের বর্তমান বছরের অধিনায়ক গৌতম সরকার স্মৃতিচারণ করে বললেন ১৯৭২ সালের আবির্ভাব লগ্নের এক স্মরণীয় খেলার কথা।

জোড়াবাগান ক্লাবে ১৯৬৬ সালে ফুটবলের হাতেখড়ি হয়েছিল গৌতমের। ১৯৬৭ থেকে '৬৯ তিন বছর ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, ও খিদিরপুরে দু'বছর '৭০ ও '৭১-এ খেলে '৭২ এ জার্সি বদলে এলো লাল হলদের জার্সির দেশ ইষ্ট বেংগলক্লাবে। প্রাণমন সঁপে দিলো মাঠের সবুজ ঘাসে ঘাসে।

ফুটবলার—ভাল খেলোয়াড় হতেই হবে। সেই বাহাত্তর থেকে শুরু করে ছিয়াত্তরে এসে দলাধিপতির বিরাট দায়িত্বে চিন্তিত গৌতম বললেন "আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো এবারও লীগ জয় করতে—তাহলে পর পর সাতবার হবে। রেকর্ড আরও বেড়ে যাবে। পাঁয়ে চোট রয়েছে—অনুশীলনে বাধা পড়ছে। তবে তা সাময়িক। মনে হয়, (শান্ত দা, সুনীল, সুধীর, স্বপন, সমরেশ, অশোকের মত) আমার বছরেও সক্কলের আন্তরিকতায় আমরা লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হতে পারব।"

জুনিয়ার জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গৌতম ৬৮' ও ৬৯এ। সিনিয়ার মানে সন্তোষ ট্রফিতে যাওয়া শুরু সেই ৭২ থেকে—আজও তা অপরিবর্তিত। রোভার্সে '৭০ থেকে, ডুরাণ্ড ও ডি. সি. এম. 'এ '৭১ থেকে যাচ্ছে গৌতম দলের সংগে। এর মধ্যে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে গৌতম। ইরাণে দু'দুবার—১৯৭৩ ও '৭৪-এ। ইন্দোনেশিয়ায় '৭৫ আর মালয়েশিয়ায় '৭৪-এ গিয়ে সুনামের সংগে খেলেছে গৌতম।

তিন ভাই আর তিন বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান গৌতম, পিতা মাখনরঞ্জন সরকার। সেন্ট্রাল ব্যাংক নিউ মার্কেট শাখার সদাহাস্যময় যুবক গৌতমের ধারনা কিন্তু কোচের প্রয়োজন হয় না বড় দলের খেলোয়াড়দের জন্য। খেলোয়াড়দের আন্তরিকতা থাকলেই দল ভাল খেলবে—কোচিং-এ খেলার মানের বিশেষ উন্নতি হয় না। বিজ্ঞানের স্নাতক গৌতমের আদর্শ খেলোয়াড় প্রশান্ত সিনহা আর প্রেরণার উৎস? সে তো মমতাময়ী মা আর নিষ্ঠাবান পিতা মাখনবাবু তার সংগে পাশাপাশি পি. কে. বাঘা সোম-এর মত অমর নাম। এত এত সব গুণের মধ্যে নামী মানুষের বিশেষত খেলোয়াড়ের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সময়ানুবর্তিতা—সেটার কিন্তু অভাব রয়েছে গৌতমের।

মানিক লাল দাশ

কুয়াশার গভীরে আলোর ঝর্ণা

১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

—রাগ করলে শমি?

—নাতো। রুমনির স্যাঁতসেঁতে সুমসৃণ পিঠে হাত রেখে শমিত ব'লল, তুমি ঠিকই ব'লেছো রুম্। ষ্ট্রাগল্ ফর এগজিস্‌টেন্স কথাটা আমি মাঝেমাঝেই কেন ভুলে যাই বলো তো?

থির থির করে রুমনির পিঠ কাঁপতে লাগল। হাতের সিস্‌মোগ্রাফে সে কাঁপন ভাল ক'রেই টের পেল শমিত। রুমনি নিঃশব্দে কাঁদছে। শমিত নিবিড় ক'রে ওকে কাছে টানল। পৃথিবীর মধুরতম স্বরে ব'লল,

—রুম্, এই রুম্ কেঁদো না।

রুমনি শমিতের উষ্ণ বুকে মুখ গুঁজে দিল। কোনো এক সন্তানসম্ভবা আমগাছের ডালে বসে' রুচিমতী এক ফাজিল কোকিল খেয়ালে ডেকে' উঠল। ছল ছল জলের শব্দ। অফুরন্ত কালের প্রবাহে মুহূর্তের পর মুহূর্ত টুপটাপ খসে পড়তে লাগল দু'টি শরীর স্বাভাবিক প্রশ্বাসে-নিশ্বাসে ফিরে এলে শমিত ব'লল,

—এবার আমি নিজেই কিছু একটা ক'রব রুম্।

—ভয় পাবে না তো? শমিতের কথায় রুমনি ভরসা পেল।

—একটুও না। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হ'য়ে শমিত ব'লল, যুদ্ধ করেই এই কঠিন দুনিয়ায় আমার জায়গা আমি করে নেবো।

তুমি পারবে শমি, আমি বিশ্বাস করি তুমি পারবে। আবেগে রুমনির গলা কাঁপল।

পাতলা মেঘের ঘোমটায় কনে বৌয়ের মতো চাঁদ মুখ ঢাকল। চারদিকে কেমন যেন ফ্যাকাসে অন্ধকার। বিশাল প্রান্তরে অগুন্তি জোনাকির দীপাবলী। কুচি কুচি নীলাভ আলোয় অন্ধকার মুছে গেছে।

চিল্‌কীগড়ের ছো নাচ

১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কাঠি নাচ ছাড়া আর একটি নাচ এখানে দেখা যায়, এই নাচ পাঁতা নাচ নামে পরিচিত। পাঁতা অর্থাৎ দল বেধে নাচ। কাঠি নাচ ও পাঁতা নাচে তালও ভিন্ন রকম। নাচের সঙ্গে বাজে বাদ্যযন্ত্র।

চিল্‌কীগড়ের শালবন ঘেরা পল্লী-প্রান্তর এবং ডুলুং নদী পার হয়ে কিছু দূরে চোখে পড়বে বিরাট কয়েকটি বটগাছ। ওই সব বটগাছের তলায় বসে 'বেলিয়া গ্রামের' হাটতলা। নানা উৎসবে, পূজা-পার্বণে ধুমশা, মাদলের তালে তালে এখানেও চলে নৃত্যোল্লাস। মাদল বাজে, গান গায় ছেলেরা, মেয়েরা। সবুজ পল্লীপ্রান্তর গানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১ জুলাই
১৯৭৬

'শিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং কারিগরী স্বয়ম্ভরতার ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ-যোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি। পঁচিশ বছর আগে পাঁচ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হত। এবছর তা বেড়ে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে। এই একই সময়ের মধ্যে আমরা রেল ইঞ্জিন, জাহাজ, উড়োজাহাজ, ভারী টারবাইন, ভারী মাটি কাটার যন্ত্রপাতি, আণবিক শক্তি কারখানা, অতি আধুনিক কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এবং এমনকি কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরীর ক্ষমতা লাভ করেছি। কিন্তু এতেই কি তুষ্ট হওয়া চলে? আরো অনেক কিছু যে করবার আছে। দেশের বৈষয়িক জীবনে যে বিরাট রূপান্তর ঘটাতে হবে আমরা কেবল তার সূচনা মাত্র করেছি।'

—ইন্দিরা গান্ধী

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন: ২৩২৫৭৬

প্রধান সম্পাদক: এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

পরবর্তী সংখ্যায়

মন্ট্রিলে আসন্ন অলিম্পিক এবং আমাদের সম্ভাবনা—এই পর্যায়ে দুটি বিশেষ রচনা লিখছেন:
অজয় বসু
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ নিবন্ধ লিখছেন

আজকের তামিলনাড়ু
আনন্দ ভট্টাচার্য

কেন এই জন্মশাসন
গোপালকৃষ্ণ রায়

দূষিত পরিবেশের সমস্যা
উৎপল সেনগুপ্ত

স্বদেশী জিনিস কিনুন
ইন্দু ভূষণ বসু

বোনাস
বিশেষ প্রতিনিধি

ফিচার বাস্তুভিটা
কাজী মুরশিদুল আরেফিন

গল্প লিখেছেন:
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এছাড়া খেলাধুলা, মহিলা মহল, সিনেমা এবং অন্যান্য নিয়মিত ফিচার।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা:
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার:
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

টেলিগ্রামের ঠিকানা:
EXINFOR, CALCUTTA

বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন:
অ্যাডভারটাইজমেন্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অগ্রণী পাক্ষিক

বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা
১৫ জুন ও ১ জুলাই, ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের কলমে

গত ১ জুলাই, ১৯৭৫ জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য বিশদফার এক নতুন অর্থনৈতিক কার্যসূচী ঘোষণা করেন। তখন থেকে সারা দেশে নব উদ্যমে তার রূপায়ণের কাজ সুরু হয়। আজ ১ জুলাই সেই ঘোষণার পর এক বছর পূর্ণ হল। কী পেলাম এই এক বছরে? কতটা অগ্রগতি হল? হিসেব মিলাতে বসে দেখা গেল বিগত বছরের ইতিহাস–অভূতপূর্ব সাফল্যের ইতিহাস।

জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, চোরাকারবারী, মজুতদার কর ফাঁকিবাজ ও কালোবাজারীদের দৌরাত্ম্যে দেশের আর্থিক কাঠামো যখন প্রায় ভেঙ্গে পড়ছে, জনজীবন যখন আর্থিক সমস্যার চাপে বিপর্যস্ত, স্বার্থান্বেষী কিছু রাজনৈতিক চক্র দেশে এক অরাজক অবস্থা সৃষ্টির জন্য যখন সক্রিয় এমনি সময়ে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের কাজও আরম্ভ হয় সারা দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগের ফলে দেশে এক আর্থিক নব জাগরণের সূচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর এই বিশদফা কর্মসূচী শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে এক বিপ্লবাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর সঞ্জীবনী স্পর্শে শিল্পে, কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, উৎপাদনবৃদ্ধির যে নতুন জোয়ার এসেছে তার ফলে জাতীয় অর্থনীতি সবল ও সচল হয়ে উঠেছে। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয় উৎপন্ন দ্রব্য সমূহের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে এবং মজুতদারী ও কালোবাজারী বন্ধের ফলে জিনিষপত্রের মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা শুধু সম্ভব হয়েছে তাই নয় নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্রের দাম আগের তুলনায় কমেছেও। ফলে উপকৃত হয়েছে সর্বস্তরের জনসাধারণ।

তাছাড়া, এই নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী বহুবছরের জড়বৎ গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের পর ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের ও বাস্তহীনদের মধ্যে বাস্ত জমি বিতরণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরী স্থির ও ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্র চাষী ও কারিগরদের মহাজনদের কবল থেকে রক্ষার জন্য ঋণ মকুবের ব্যবস্থা অবহেলিত এই দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রমিকদের শিল্প পরিচালনায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করার ফলে শিল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থেই ন্যূনতম বোনাস আইন প্রচলিত হয়েছে সারা দেশে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বই ও খাতাপত্রের সরবরাহের ব্যবস্থা এবং হোষ্টেলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের ফলে দরিদ্রশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে কর্মসংস্থান ও সুযোগ বাড়াতে নতুন শিক্ষানবিসী পরিকল্পনা চালু হয়েছে সারা দেশে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সেচের প্রসার, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবনে নতুন পরিকল্পনা, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সরবরাহ বজায় রাখতে জাতীয় পারমিট প্রথার প্রবর্ত্তনের ফল জাতীয় অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে সুদূরপ্রসারী হবে।

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এই এক বছরে উল্লেখযোগ্য যে সাফল্য লাভ করা গেছে সেটা সম্ভব হয়েছে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে। ভবিষ্যতে আরও এধরনের জনকল্যাণকর কর্মসূচী রূপায়ণে দেশের জনগণ এভাবে এগিয়ে আসবে এটাই সকলের কাম্য। তা হলেই দেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

জয়যাত্রার পথে

নির্মল সেনগুপ্ত

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, মানবিক রীতিনীতি এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিল—'শত্রুরা যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করে, সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতর্ক থাকবেন'। (রাজশেখর বসু কৃত অনুবাদ)।

দেশের এক বছর আগেকার অবস্থার কথা ভাবতে গেলে অনুশাসন পর্বের এই উপদেশটির কথা বিশেষভাবে মনে হবে। ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন লোকের অভাব নেই। এমন অনেক দেশ আছে, যারা ভারতকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেখতে চায় না। তারা চায় বিশাল ভারতের ৬০ কোটি মানুষ দুর্বল হয়েই থাকুক। তারা চায় এই দেশটা কখনই যেন বড় বড় শিল্পোন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হবার স্বপ্ন না দেখে। এখানকার শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রথম থেকেই তাদের পছন্দ হয় নি। এই নেতৃত্বকে দুর্বল করার জন্য, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় জনমতকে তারা নানাভাবে প্রভাবিত করার এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। সরকারকে এবং সরকারী নেতৃবৃন্দকে উপেক্ষা করার প্রবণতা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত প্রায় সমস্ত স্তরে। বিশৃংখলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল চলতি রেওয়াজ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, শিক্ষা ও শিল্প এবং ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল উচ্ছৃংখলতার লীলাক্ষেত্র। এটা ছিল এক বছর আগের পরিচিত চিত্র। কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গত বছরে।

গত বছর জুন মাসের ২৬ তারিখে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ কর্তৃত্বে কাজ করার জন্য কোনো জাতীয় সরকারের ক্ষমতাকে দুর্বল করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পরিস্থিতি বাইরের বিপদকেও ডেকে আনতে পারে। এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য হ'ল দেশের সংহতি ও স্থিতি সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা।

সারা দেশটাকে যদি একটা বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে আমরা পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ অনুসরণ ক'রে অনায়াসে বলতে পারি যে, শত্রুরা ভ্রাতাদের মধ্যে যাতে ভেদ সৃষ্টি না করতে পারে, তা যেমন দেখবেন পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তেমনি দেশের মানুষের মধ্যে যাতে বাইরের কেউ ভেদ সৃষ্টি করতে না পারে, তা দেখবার দায়িত্ব হ'ল দেশের প্রধানতম ব্যক্তির, অর্থাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীর।

বলা বাহুল্য, আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারতে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, অল্পকালের মধ্যেই তার অবসান ঘটেছিল। সারা দেশে উত্তেজনা হ্রাস পেতে এবং শান্তি ফিরে আসতে বিলম্ব হয় নি। কিন্তু সেটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। দেশে আইন শৃংখলা ফিরিয়ে এনেই সরকার থেমে থাকেন নি। সরকারের নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকে বুঝেছিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ও জনজীবনে পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা আনতে হলে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এমনি এক কর্মসূচী হ'ল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক ঘোষিত ২০-দফা অর্থনৈতিক কার্যক্রম। আমাদের স্বাধীনতার প্রায় ৩০ বছর সময়ের মধ্যে এরকম যুগান্তকারী কার্যক্রম এর আগে আর কখনও দেখা যায় নি। এই কার্যক্রমে আমরা দেখতে পাই, একই সঙ্গে আঘাত হানা হয়েছে আশু সমস্যাগুলির উপর এবং যুগযুগান্তর ধরে সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত সামাজিক ব্যাধিগুলির উপর। আশু সমস্যাগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক এবং পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলি প্রধানত সামাজিক, যেমন পণপ্রথা। আবার কোনো কোনো সমস্যা হ'ল সামাজিক-অর্থনৈতিক (Socio-Economic), যেমন পল্লী ঋণ ও বেগার শ্রমিক প্রথা। এগুলি দৃশ্যত অর্থনৈতিক বটে কিন্তু কয়েক শতাব্দীকাল ধরে এগুলি ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে ভারতের পল্লীসমাজে ওতপ্রোত হয়ে ছিল। তার ফলে নিছক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে একদিন যে ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তা সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সব অর্থ-নৈতিক গ্লানি সমাজ জীবন থেকে নির্মূল করা বড় সহজ কাজ নয়। একশ বছর ধরে যা গড়ে উঠেছে, এক বছরে তা বিলুপ্ত হবার কথা নয়। যে ব্যবস্থাকে বিলোপ করা হচ্ছে, তার বিকল্প উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিতান্ত কম সময়
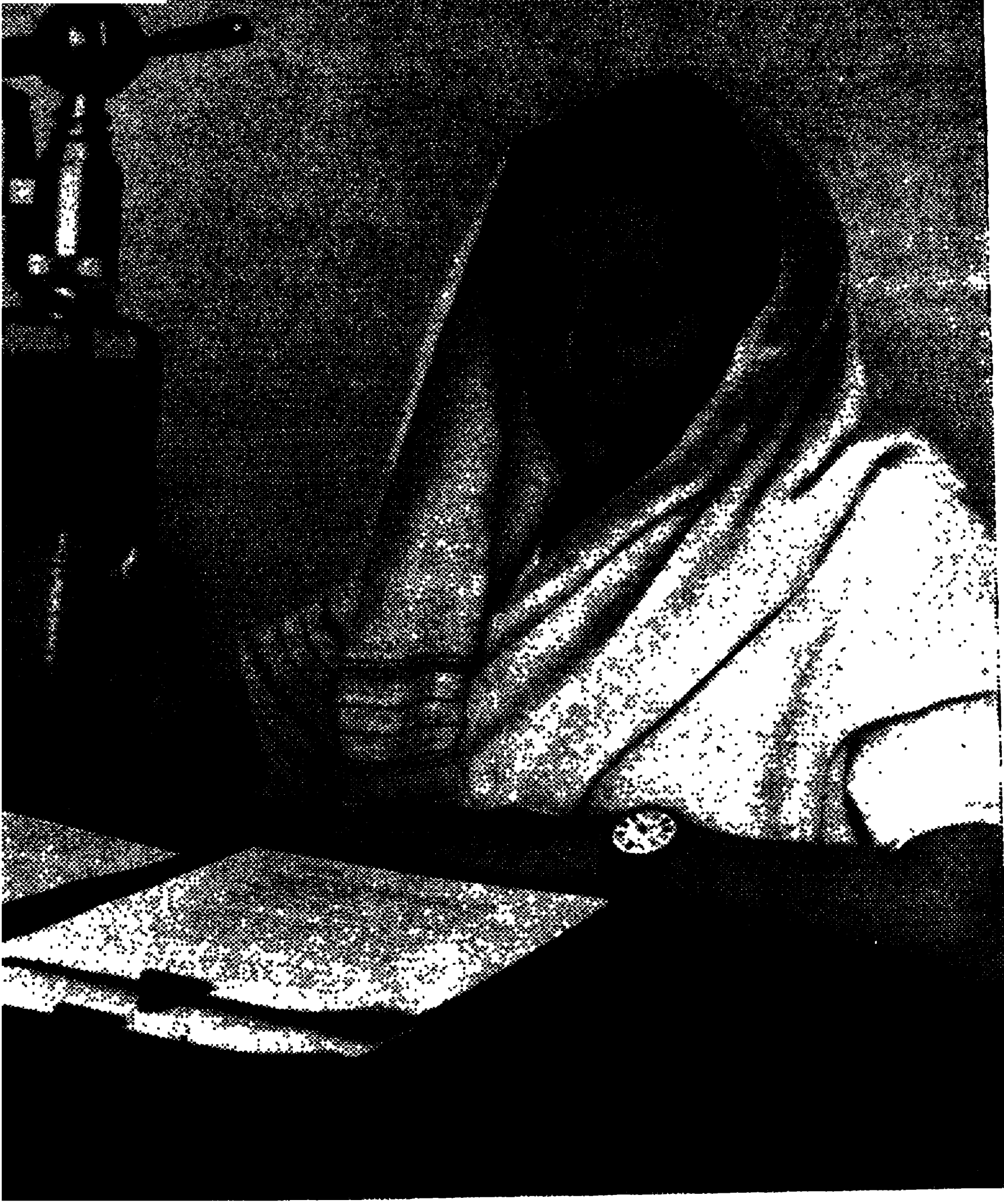
লাগবার কারণ নেই। তবু এই এক বছরের মধ্যে যতটা হয়েছে, তা কোনো-ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে, বর্তমান অনুশাসন পর্বে আমাদের জনজীবনে নতুন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিবেশে এই কাজগুলি যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। পল্লীর প্রতিবেদনে আমরা দেখতে পাই, সেখানকার জীবন ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলেছে। একদিন যে মানুষ-গুলি মহাজনের কাছে সর্বরকমে বাধা পড়ে থাকতো, আজকে তারা বুক ফুলিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যাচ্ছে ঋণ নেবার জন্য। তার হাল গরু লাঙ্গল সব কিছু এখন অনেক বেশী নিরাপদ। তারা ঘর পাচ্ছে জমি পাচ্ছে। আগেকার যুগের সেই মর্মান্তিক অবস্থাটা হয়তো বিবৃত রয়েছে শিশুর ছড়ায়—'হালের গরু বাঘে খেয়েছে, পিঁপড়ে টানে মই।'

সুতরাং এখন দেশ এগিয়ে চলেছে সর্বক্ষেত্রে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রগতিটাই সবার আগে চোখে পড়বে। গত দু বছর ধরে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরুদ্ধ হয়ে সেটা বিপরীতমুখী হওয়াতে এ বছর মার্চ মাসের পাইকারী মূল্যস্তর ফিরে গেছে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের মূল্যস্তরে। এবারে মরশুমী মূল্যবৃদ্ধিও তেমন ঘটে নি। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের রিপোর্টে দেখতে পাই, অন্যান্য দেশে এর উল্টোটাই ঘটেছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল সাড়ে চার শতাংশ, তার আগের বছর ছিল আড়াই শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে কয়লা, লোহা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ প্রভৃতি মৌল সামগ্রীগুলির উৎপাদন যথেষ্টই বেড়েছে। খাদ্য-উৎপাদন হয়েছে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টন, অর্থাৎ আগে যা হয় নি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক হ'ল সেচের এবং আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক হলো বিদ্যুতের। চলতি বছরে সেচ ও বিদ্যুতের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ হ'ল ১০০ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন রাজ্যে এই কাজে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা। এর ফলে এবছর অতিরিক্ত সেচ সুবিধা-প্রাপ্ত জমির পরিমাণ হবে ২০ লক্ষ হেক্টর।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ১৯৭৫-৭৬ সালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মে মাসের শেষ দিকে প্যারিসে অনুষ্ঠিত Aid India Consortium বা ভারত সাহায্য সংস্থার বৈঠকের জন্য এই রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে যে, কৃষি, শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরকারী শিল্পোদ্যোগের উৎপাদন এবং রপ্তানি বাণিজ্যসহ অর্থনীতির যাবতীয় ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধে ভারতের কৃতিত্ব বিশ্ব-রেকর্ড বলে বিশ্বব্যাঙ্ক অভিহিত করেছে।

শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিতেই নয়, ভারত সরকারের নজর পড়েছে আরও অনেক কিছুতে। যেমন একটি হ'ল চোরাচালান রোধ। এ সম্পর্কিত আইনটি এত কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, তাতে চোরাচালান প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। কুখ্যাত পাকা চোরাচালানকারীদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং ৪২ জন চোরাকারবারীকে ফেরার বলে ঘোষণা ক'রে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে করফাঁকি এবং গোপন আয়ের বিরুদ্ধেও অভিযান চলেছে। কর ফাঁকির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার ফলে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে

১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

এক বছরে কি পেলাম

ডঃ দিলীপ মালাকার

দেখতে দেখতে একটা বছর যেন ঝড়ের বেগে কেটে গেল। আমি এমার্জেন্সির এক বছরের কথাই বলছি। এমার্জেন্সি নিয়ে কত কথাই না শুনেছি। কেননা আমরা নতুনকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করি। অবশ্য এখন দ্বিধা কেটে গেছে। আমরা তাকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু কেন?

কয়েক শতাব্দীর বিদেশী শাসনে ও শোষণে আমরা ভারতীয়রা ডিসিপ্লিন বা শৃংখলা বস্তুটি ভুলে যেতে বসেছিলাম। একে দেশটা বিরাট। ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিতে জাতিতে কত পার্থক্য। সব জাত, সব ভাষা-ভাষী, সব সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা বোধ সমান হারে ছিল না। কারুর বেশী কারুর কম। আবার কারুর ডিসিপ্লিনের বালাই ছিলনা। একটা স্বাধীন দেশে, স্বাধীন জাতির মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বোধ থাকবে না তা তো হতে পারে না। এবং না থাকাটা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

জরুরী অবস্থা আর যাই আনুক দেশে সর্বস্তরে না হক, বহু ক্ষেত্রে শৃংখলা এনেছে। একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। এক বছরের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এটাই।

বেশ কিছুকাল যাবৎ সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে, রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে অরাজকতার ছাপ ফুটে উঠেছিল। এমার্জেন্সির পরে সে ভাব অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে। জরুরী অবস্থার সব চেয়ে বড় সার্থকতা এখানেই।

এটা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন হয়ত, এমার্জেন্সির আগে সরকারী অফিসে সময় মতন হাজিরা দিতেন খুবই স্বল্প সংখ্যক কর্মচারী। রেল, পোষ্ট অফিস, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানে যেখানে ডিসিপ্লিন অত্যাবশ্যক সেখানে শৃঙ্খলার বড়ই অভাব ছিল। আজ সেখানে সময় মত কাজ পাওয়া যাচ্ছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ মাঝে মাঝেই বাজার থেকে উধাও হয়ে যেত বিনা নোটিশে। সেই সব বে-আইনী কাজ বন্ধ হয়েছে এমার্জেন্সির পর। কোন জিনিষের সঠিক দামটা কি সেটা যাচাই করা ছিল অসম্ভব। এমার্জেন্সির ফলে দোকানে দোকানে দাম লেখার রেওয়াজ এসেছে। ফলে দোকানদার ও খদ্দের উভয়েই লাভবান হয়েছেন।

ডিসিপ্লিন যাদের জীবনে প্রথম কথা হওয়া উচিত সেই তরুণরা গত কয়েক বছর ধরে অরাজকতা রোগে ভুগছিল। পরীক্ষার হলে টোকাটুকি থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা জগতে নৈরাজ্য এনেছিল তারা। ফলে পরীক্ষার তারিখ পিছোতে পিছোতে দু বছর পর্যন্ত পিছিয়েছে। লাভবান হয়েছে কে? কেউ নয়। বরং উল্টোটাই হয়েছে। কত ছেলের লেখা-পড়া নষ্ট হয়েছে এর জন্যে তার কোনো হিসেবনিকেস নেই। সুখের কথা এমার্জেন্সির পর ইস্কুল-কলেজ—পরীক্ষা হলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। বহু স্থগিত পরীক্ষা সময়মতন হয়েছে। টোকাটুকি বন্ধ হয়েছে। আগে টোকাটুকি হত বলে বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের তরুণ ছাত্রদের ভর্তি করতে চাইত না। এ নিয়ে কি কেলেঙ্কারীই না হয়ে গেছে। শিক্ষা জগতে সে অন্ধকার দিনগুলো কেটে গেছে।

কলকারখানা ও শিল্প জগতে চলছিল অরাজকতা বেশ কয়েক বছর ধরে। এখন বন্ধ, ঘেরাও ও ধর্মঘট ঘন ঘন হয়না। ফলে শিল্প জগতে ও অর্থনৈতিক বাজারে শান্ত ভাব ফিরে এসেছে। এই কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ সম্ভব হয়েছে। এক বছর আগে ভারতীয় মুদ্রার যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে বহুগুণ উন্নত হয়েছে বিদেশের বাজারে। পশ্চিমের উন্নতমানের মুদ্রার তুলনায় এখন ভারতীয় টাকার মূল্য বেড়েছে। বৃটিশ পাউণ্ডের দাম কমছে। কিন্তু ভারতীয় টাকার দাম বাড়ছে।

এক বিদেশী ধনবিজ্ঞানী সম্পতি ভারতে এসেছিলেন। এমার্জেন্সির পরে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা কি রকম হয়েছে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যাপক ডঃ রবার্ট. জি. হকিন্স ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটে বক্তৃতা দিয়েছেন। ডঃ হকিন্স বলেছেন, এমার্জেন্সির দৌলতে শ্রমিক অসন্তোষ কমেছে। আয়কর ফাঁকি দেওয়া কমেছে। আয়কর জমা পড়ছে ঠিক মতন। এইসব কারণে মুদ্রাস্ফীতি রোধ সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে একটা শৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। এটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক।

বাসে উঠতে সুশৃঙ্খল লাইন

আগে ট্রেনে চাপলে যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে রসিকতা করতেন যে ট্রেনটি যে সময়ে পৌঁছুবার কথা থাকত সেটা ঠিক সময় মতনই পৌঁছত তবে একদিন কি দুদিন পরে। প্রতীক হিসাবে ট্রেনের কথা তুলছি এই জন্যে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়মানুবর্তিতার কোনো বালাই ছিল না। ট্রেনগুলো সময়মতন পৌঁছত না কারণ নিয়মানুবর্তিতার অভাব ঘটেছিল বলে। এবং তার ফলে আমরা শুধু ট্রেনযাত্রীরা নই, যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর করে যায় আমাদের খাদ্য সরবরাহ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হচ্ছিল। আধুনিক যুগের শিল্প, কৃষি, খাদ্য, চিকিৎসা-ওষুধ সব কিছু নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর। শুধু রেল নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ডাক বিভাগ ইত্যাদি। এই সব বিভাগে বেশ কিছুকাল যাবৎ অ-নিয়মানুবর্তিতার রাজত্ব চলছিল। ফলে দেশের ও জাতির দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হচ্ছিল। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়ছিলাম। এক বছরের শৃঙ্খলায় আমরা হয়ত এক লাফে সব পথটাই অতিক্রম করতে পারিনি। কিন্তু অনেকখানি পথ আমরা অতিক্রম করেছি সাফল্যের সঙ্গে। শৃংখলার মনোভাব সর্বস্তরের এবং সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পুরোপুরি জেগে উঠলে এই পিছিয়ে পড়া ভারতবর্ষ একদিন বিশ্বের উন্নতশীল দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে সমর্থ হবে। তার সবটাই নির্ভর করছে আমাদের জনগণের ওপর।

গত এক বছরে আমরা যা পেয়েছি, তার আরও অনেক বেশী পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাইনি কেন তার হিসেব কষতে বসলে একটি কথাই বারবার উঠবে। আমরা প্রত্যেকেই কি নিয়মানুবর্তি হয়েছি? শৃঙ্খলা কি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে জেগে উঠেছে?

আমি বড় বড় তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলব না বা নীতিবাদের কথাও তুলব না। কিন্তু আমার ছোট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আমরা যেখানেই বাস করিনা কেন, তা কলকাতার মতন বড় শহরই হোক বা মফঃস্বল শহর কিম্বা গ্রামই হোক। রাস্তাঘাট বাড়ি-ঘর যেমন আমরা নোংরা করি তেমন কিন্তু পরিষ্কার করিনা। নোংরার মধ্যে আমরা বাস করতে কি আনন্দ পাই? একটু ডিসিপ্লিন মেনে চললে কি আমরা আমাদের শহর কিংবা গ্রামটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি না? কলকাতা শহরে জলাভাব। কিন্তু জলের অপচয় আমরা চোখের সামনে রোজই দেখি। এই অপচয় রোধ কি আমরা করতে পারিনা? বাড়ির ময়লা টুপ করে রাস্তার পথচারীর মাথায় ফেলা আমরা কি বন্ধ করতে পারিনা? এর জন্যে আইন প্রণয়ন করার কি প্রয়োজন? সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে যা চাই তাহলো শৃঙ্খলা এবং সে শৃঙ্খলা চাই আমাদের জনগণের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। এমার্জেন্সির পর আমরা যা পাইনি তার জন্যে যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন তাহলে বলব সে আমাদের গাফিলতিতে হয়েছে। হয়েছে আমাদেরই শৃঙ্খলা-বোধের অভাবে।

বিনা টিকিটের যাত্রীরা হুঁশিয়ার

জনগণের দুর্বলতম শ্রেণীর কিছু অংশকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ কুড়ি দফা। কর্মসূচীতে রয়েছে। সুতরাং এই কর্মসূচীর রূপায়ণ অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু এই কর্মসূচীও আসলে বৃহত্তর এক কর্মসূচীর অঙ্গ, এটা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেরই একটি অংশ। জনগণের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে শেষ পর্যন্ত যার মাধ্যমে আমরা সক্ষম হবো তা হল বাড়তি উৎপাদন এবং অধিকতর উন্নয়ন।

—ইন্দিরা গান্ধী

আর্থিক সুস্থিতির অন্তরালে

ডঃ অমরনাথ দত্ত

দেখতে দেখতে একটা পুরো বছরই পার হয়ে গেল। কেমন ছিল এই বছরটি আমাদের জীবনে? এক কথায় জাতির জীবনে বছরটি ছিল নতুন সংকল্প ও রূপায়ণের অভূতপূর্ব বছর। শৃংখলার অনুশাসনে এসময় সমগ্র জাতির যেন এক জন্মান্তর ঘটে গেছে। আজ বিশ্বের ছোটবড় দেশ মুক্ত কণ্ঠে যে ভারতকে তার অপরিসীম কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা জানাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে অনুশাসনের কল্যাণ ছায়ায় প্রধানমন্ত্রীর নতুন কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ণ, যার মধ্যে রয়েছে নতুন ভারত গঠনের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। একবছর আগের সেই দিনগুলিতে নানান সমস্যায় জর্জরিত জাতীয় জীবনে নেমে এসেছিল অবক্ষয়, কালোবাজারী, চক্রবৃদ্ধি হারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, মজুতদারী ও ব্যাপক ফাটকাবাজি, আর এগুলির অনিবার্য্য ফলশ্রুতি হিসেবে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি। দেশ, জাতি ও সমাজজীবন ছিল বিপর্য্যস্ত। ঠিক এই সময়ে ঘোষিত হ'ল জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের এক সুনির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা, বিশ-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী। দুর্দমনীয় মুদ্রাস্ফীতি সবলে প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতীয় অর্থনীতি যে ক্রমশঃ ধসে পড়বে এটা সম্যকভাবে বুঝতে পেরেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওই মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা সমূলে বিনাশ করতে এগিয়ে এলেন। আর এইটিই প্রাধান্য পেল বিশ-দফা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণে। গত এক বছরে জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে দ্রুত বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে সুরু হল এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সুরু করার পথে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির মত কঠিন সমস্যা। তাই এই সমস্যাটির মূলেই কুঠারাঘাত করা হল সবার আগে। কথাটা খুলেই বলা যাক। ১৯৭৩ সালের শেষ দিক থেকে গোটা আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ঘটতে লাগল অর্থনৈতিক অঘটন। দেখা দিল বাণিজ্যচক্রের নানান উত্থান-পতন। কখনও ঘটতে লাগল পাকে পাকে মূল্যবৃদ্ধি, কখনও দারুণ মন্দা আবার কখনও সেইসঙ্গে অন্তহীন বেকার সমস্যা। একই সঙ্গে আরব দেশগুলি দু বছরে তেলের দাম ৪০০ শতাংশ বাড়িয়ে দেবার ফলে আরব দুনিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনে অস্বাভাবিক ঘাটতি হতে লাগল। পরবর্ত্তীকালে অবস্থা কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে এলেও বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপের মধ্যে বিশেষ কিছু তারতম্য হ'লনা। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে যে বছর শেষ হয় তাতে দেখা যায় যে, আইসল্যাণ্ডে মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার হ'ল ৪৪ শতাংশের কাছাকাছি। মোদ্দা কথা হ'ল, বিভিন্ন উন্নত দেশগুলি তাদের বেসামাল অর্থনীতি বাগে আনতে গিয়ে শুধু যে একটা বিশ্বব্যাপী মন্দার রেশ নিজেদের অজান্তে সৃষ্টি করেছে তাই নয়, অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলিকেও একই সঙ্গে তৈল ও তৈলজাত পদার্থ, শিল্পে ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল, সার ও খাদ্যদ্রব্যের বর্দ্ধিত মূল্য মেটানোর জন্য হিমসিম খেতে হচ্ছে।

তাই আন্তর্জাতিক দুনিয়ার পক্ষে যে দুঃসময় চলেছিল তাতে করে হঠাৎ কোনরকম শুভ পরিবর্ত্তন আশা করা অর্থহীন ছিল। আর বাণিজ্য চক্রের আবর্ত্তনে মুদ্রাস্ফীতি একটা স্বাভাবিক তরঙ্গ বিশেষ। সময়মত যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার নজির অর্থশাস্ত্রে অনেক রয়েছে। আর তাবৎ বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদ ও উপদেষ্টাগণ তো রয়েছেনই। কিন্তু সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়ায় যখন বিদগ্ধ ও পণ্ডিত উপদেষ্টাগণ এত চেষ্টা করেও কোন কুলকিনারা করতে পারছেন না, উন্নত আর্থিক ও রাজস্ব নীতি (improved fiscal and monetry techniques) প্রয়োগেও সব ফল যখন ব্যর্থ হল, মনোমত আর্থিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ থাকা সত্ত্বেও আলগা অর্থনীতির (permissive order) বলগা টানা যেখানে যায়নি, সেখানে ভারতের মত একটা বিকাশশীল দেশে এটা, মানে আর্থিক সুস্থিতি তথা শূন্য মুদ্রাস্ফীতি মাত্র ক'মাসের মধ্যে অর্জন করা যে কীভাবে সম্ভব হ'ল তা পশ্চিমী দেশগুলির কাছেও এক বিরাট বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কিভাবে এটা বাস্তবায়িত হ'ল? এই অসাধ্যসাধনের অন্তরালে ছিল দুর্জয় সংকল্প ও কঠিন কর্মসূচীর রূপায়ণ। চাহিদার তুলনায় জিনিসপত্রের সরবরাহ কম হলেই মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়। বাজারে দাম যতই চড়তে থাকে ততই মাইনে ও মজুরী বাড়াবার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু মজুরী বাড়লেও সেই অনুপাতে উৎপাদন বা উৎপাদন-ক্ষমতা, কোনটাই এই অবস্থায় (স্বল্পকালে অন্তত) বৃদ্ধি পায়না। ফলে এই বাড়তি

আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি·

পশ্চিমবঙ্গে সবুজ বিপ্লব

সবুজ বিপ্লব কথাটা এখন আর শুধু কথার কথা নয়, বলা যায় পুরোপুরি খাঁটি। তবু শুধু মুখের কথা নয়, দেখা যাক তথ্যের নিরিখে যষলে এই দাবী কতটা সার্থক।

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৯৬.৬০ লক্ষ একর জমিতে আউশ, আমন ও বোরো মিলিয়ে চাল উৎপাদিত হয়েছিল মোট ৩৫.৬১ লক্ষ টন। সে তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে চাষ হয়েছে ১৩৩.৯৩ লক্ষ একর জমিতে এবং চালের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫.৪৩ লক্ষ টনে। ১৯৭৫-৭৬ সালে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৩.৫০ লক্ষ টন এবং আশা করা হচ্ছে যে প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টনের বেশি হবে।

অধিক ফলনশীল বীজের প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গম চাষের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে মাত্র ১.০২ লক্ষ একর জমিতে গম চাষ হয়েছিল এবং উৎপাদন ছিল ৩৪.০ হাজার টন, সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে গম চাষ হয়েছিল ১০.৪২ লক্ষ একর জমিতে এবং ফলনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮.৩৭ লক্ষ টন।

১৯৭৫-৭৬ সালে প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে গম চাষ হয়েছে এবং অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ হল ১১ লক্ষ টন। উল্লেখজনক যে এই পরিমাণ হবে রেকর্ড।

১৯৭৫-৭৬ সালে দ্রুত খাদ্য-উৎপাদন প্রকল্প অনুযায়ী ৪৮০০ অগভীর নলকূপ, ৭৭ টি গভীর নলকূপ ২০ টি নদী সেচ কেন্দ্র, ১৯ টি অন্যান্য সেচ প্রকল্প এবং ৫০০ পুকুর ও ৬২৫ টি কূপ খননের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ১৭ হাজার হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় আসবে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সার ব্যবহার করছেন। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে নাইট্রোজেনের ব্যবহার ছয় গুণ বেড়েছে। ঐ একই সময়ের মধ্যে ফসফেটের ব্যবহার প্রায় চার গুণ এবং পটাশের ব্যবহার প্রায় ছয় গুণ বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় আর তা ঘটতে থাকে বাজারে পণ্য সরবরাহ অপেক্ষা দ্রুততর হারে। এর ফলে অবস্থা কী দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। প্রথম পর্য্যায়ে অতিরিক্ত মজুরির জন্য দাবীদাওয়া বাড়তে থাকায় জিনিষ-পত্রের উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি (cost push inflation) ঘটে। কিন্তু সমানমাত্রায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় জিনিষ-পত্রের দাম আরও বৃদ্ধি পায়। তার ফলে বাড়তি মজুরীর জন্য, আবার দাবী দাওয়া বাড়ে, ফলে আবার একতরফা মূল্যবৃদ্ধি, (demand induced inflation) আর এই দুষ্টচক্র সমানেই চলতে থাকে।

এর অথ্যগত দিকটি আরও চমকপ্রদ। এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে স্বল্পকালে টাকার যোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জিনিষপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি দুরূহ হয়ে ওঠে। তাই মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকেনা। বস্তুত পক্ষে বিগত পাঁচ বছরের হিসেব নিলে দেখা যাবে কেমন ভাবে অর্থের সরবরাহ ক্রমশঃই বেড়ে গিয়েছিল। আগের বছরের তুলনায় ১৯৬৯-৭০ সালে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১ শতাংশ বেশি। ১৯৭০-৭১ সালে তা ছিল ১১.২ শতাংশ, ১৯৭১-৭২ সালে ১৩.১ শতাংশ, ১৯৭২-৭৩ সালে ১৫.৯ শতাংশ আর ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৫.৩ শতাংশ। ওদিকে সেই তুলনায় জাতীয় আয়বৃদ্ধির চিত্রটি কেমন ছিল ? উল্লিখিত বছরগুলিতে শতকরা হিসেবে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার হ'ল যথাক্রমে ৫.৭, ৪.৯, ১.৪, নেগেটিভ ০.৯ ও ৩.১। এবারে মুদ্রাস্ফীতির হার এই পরিপ্রেক্ষিতে কী ছিল তা দেখা যাক। ১৯৭১-৭২ সালের আর্থিক বছরে পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক তার আগের বছরের তুলনায় ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২-৭৩ সালে তা প্রায় ১০ শতাংশ বাড়ে, ১৯৭৩-৭৪ সালে বৃদ্ধির মাত্রা ছিল প্রায় ২৩ শতাংশ আর ১৯৭৪-৭৫ সালে তা প্রায় ৩০ শতাংশে এসে দাঁড়ায়।

গুপ্তধন উদ্ধার—নয়াদিল্লীর একটি বাড়ী থেকে

টাকার ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থের মূল্যমান ক্রমশঃই পড়ে যেতে থাকে।

১৯৭৪-৭৫, সালে অবস্থা যখন এরকম সঙ্গীন হয়ে উঠল তখন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সুরু হ'ল। সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থের সরবরাহ হ্রাস করলেন। এরই ফলশ্রুতি-রূপে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে দুটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হ'ল। প্রথম অর্ডিন্যান্সে সর্বোচ্চ লভ্যাংশ বণ্টনের পরিমাণ কোম্পানীর নীট লাভের ৩৩০ শতাংশে অথবা প্রেফারেন্স শেয়ারের বাহ্যমূল্যের উপরে অনধিক ১২ শতাংশে সীমিত করে দেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় অর্ডিনান্সে বাড়তি মজুরী ও বেতনের উপর এক বছর মেয়াদে আবশ্যিক জমা প্রকল্প চালু করা হ'ল (সম্প্রতি এর সময়-সীমা আরও বাড়ানো হয়েছে)। সেই সঙ্গে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণও হ্রাস করা হ'ল। ফলে ১৯৭৪-৭৫ সালের প্রথম দশমাসে অর্থের সরবরাহ বাড়ল মাত্র ৩.১ শতাংশ, যেখানে তার আগের বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৫.৩ শতাংশ।

শুধু তাই নয়। দ্রব্যমূল্যের উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরও পাকাপোক্ত হ'ল যখন সরকারী অনুশাসনের ফলে জিনিষ-পত্রের বাজারদামে কালো টাকার ফাটকা-বাজি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হল। দুটি পর্য্যায়ে এই ব্যবস্থা কার্য্যকর হ'ল। প্রথম পর্য্যায়ে ব্যাঙ্কের সুদের হার চড়িয়ে দেওয়ায় মজুতদাররা মজুতের পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য হ'ল। আর দ্বিতীয় পর্য্যায়ে মজুতদার, চোরাকারবারী ও চোরাই চালানদারদের বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ও সেইসঙ্গে ব্যাপক গণ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠায় বাজারে কালো টাকার প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পেল।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে হিসেব বহির্ভূত এই টাকা রাখা অর্থনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে এবং অর্থনৈতিক অপরাধীদের চরম শাস্তি ঘোষণার পর থেকে কালো টাকার দাপট বহুলাংশে খর্ব্ব হয়েছে। একটা স্বস্তির আবহাওয়া ফিরে এসেছে। ।

এসবের সম্মিলিত ফল হল সুদূর-প্রসারী। বিশ-দফা কর্মসূচীতে এজন্য যথা-যথভাবেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এরকম একটা কথা এখন হামেশাই সকলের মুখে শোনা

যাচ্ছে। হিসেবটা তাই একবার নিয়েই দেখা যাক না কেন। যে মুদ্রাস্ফীতি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে বাড়তে ১৯৭৪ সালের জুনমাসে ৩০ শতাংশের সীমানায় এসেছিল তা ১৯৭৫ সালের জুনমাসে ২.৮ শতাংশে সরাসরি নেমে আসে। তারপরের কাহিনী আরও বিচিত্র। তাবৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাইকারী মূল্য-সূচক জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৭ শতাংশ পড়ে যায়। আর একটা হিসেবও তাৎপর্য্যপূর্ণ। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল শূন্য থেকেও নেগেটিভ, ১.৯ শতাংশের কম। ফলে সময়ের ব্যবধানে শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের সূচক ৯.১ শতাংশে নেমে আসে আর কৃষিশ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের সূচক ১৯.৫ শতাংশে নেমে আসে। এমনকি মরশুমী মূল্যবৃদ্ধি ও প্রতিবছরে বাজেটের আগে যে জিনিষপত্রের দাম চড়তে দেখা যায় তা পর্যন্ত এবারে পরিলক্ষিত হয়নি। শুধু যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়িতেই সার্বিক উন্নতি ঘটেছে একথা ঠিক নয়। পণ্য (শিল্প) ও শস্য (কৃষি) উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে আর সেই সঙ্গে সরকারী পণ্যবণ্টন ব্যবস্থা আরও কার্য্যকর হয়েছে। দিল্লীতে একটি আদর্শ বণ্টন ব্যবস্থার মডেল চালু করা হয়েছে আর তা সমস্ত দেশের বিভিন্ন শহরগুলিতে কার্যকর করা হচ্ছে শীগগিরই। খরিফ শস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে অনুমিত খরিফ লক্ষ্যমাত্রা ৪৬ লক্ষ টনের নিরিখে বাস্তবে সংগ্রহের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টন ছাড়িয়ে যাবে।

শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির খতিয়ানও কম চমকপ্রদ নয়। এ পর্যন্ত যা দেখা গিয়েছে তাতে বলা যায় যে ১৯৭৫-৭৬ সালে উন্নতির হার ৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। কতটা প্রকৃত উন্নতি ঘটবে তা বাস্তবে নির্ভর করবে বেসরকারী শিল্প কতটা ক্রেতার বর্দ্ধিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উৎপাদনব্যয় তথা দ্রব্যমূল্য একটা যুক্তিযুক্ত স্তরে নিয়ে আসতে পারবে তার ওপর।

ইতিমধ্যেই যে দুটি লক্ষণীয় ঘটনা ঘটেছে তা হ'ল একদিকে মুদ্রাস্ফীতির পুরোপুরি হ্রাস আর অপরদিকে অসাধু উপায়ে অর্জিত আয় ও সম্পদের উপর তীব্র আক্রমণব্যূহ রচনা। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে একটা সুস্থিতি ফিরে এসেছে অনেকদিন পরে। আর এটা রক্ষা করা সম্ভব যদি শিল্পোৎপাদনকারীরা উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জিনিষ-পত্রের দাম একটা ন্যায্য পর্যায়ে নিয়ে আসেন।

এই সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা-বিপত্তি দূর করবার জন্যে সরকার নতুন কিছু আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল দ্রুতগতিতে লাইসেন্স মঞ্জুর করা ও শিল্পবিনিয়োগের বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি দ্রুত কার্য্যকর করা। ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে পড়ে থাকা ও বিলম্বিত কেসগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করার ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় অগ্রগতি দেখা গিয়েছে। আমদানী নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও লাইসেন্স মঞ্জুরের সময়সীমা সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং বহুলাংশে আমদানীকৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ভিত্তিতে লাইসেন্স মঞ্জুরের পরিকল্পনাটি যে সত্যিই অভিনব তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এগুলির সামাজিক তাৎপর্য্য এই যে, অনেকগুলি আশাপ্রদ ঘটনা পরম্পরায় ১৯৭৫-৭৬ সালে জাতীয় অর্থনীতিতে অর্জিত সুফলগুলি যে স্থায়ীভাবে লাভ করা সম্ভব (consolidated) হয়েছে শুধু তাই নয়, অনুমান করা হচ্ছে যে ১৯৭৬-৭৭ সালে সাফল্যের মাত্রা বিভিন্ন লক্ষ্যসীমাকে অতিক্রম করে যাবে। মূল্যের সুস্থিতি ছাড়া আর একটি যে বিষয় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে তা হ'ল কৃষির আশানুরূপ ফলন। এর ফলে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলিতে কৃষি কাঁচামাল প্রাপ্তির পথ অনেক সুগম হয়েছে আগের চাইতে। আর সেইসঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎপাদক উপাদান (produ-tion inputs) যেমন, কয়লা, সিমেন্ট ও ইস্পাতের উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে এবং সরবরাহ আরও উন্নত হয়েছে, আরও সহজলভ্য হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুকূল হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে আর সেই সঙ্গে সরকারী শিল্পগুলিতে বিনিয়োগের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটায় জাতীয় অর্থনীতিতে চাহিদার পরিমাণ যে স্বল্পকালের মধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের অগ্রগতির আলেখ্য কেমন? উত্তরে প্রথমেই সরকারী শিল্পোদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালে সরকারী শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যা উন্নতি ঘটেছে তা সামগ্রিক শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতির চাইতে অনেক বেশি। পরিমাণ-গতভাবে বলা যায় যে, ১৯৭৫-৭৬ সালের এপ্রিল থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে উৎপাদন তার আগের বছরের ওই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক-কালে এই সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলি জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্প-গুলিকে যথাযোগ্যভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

এবারে অন্যান্য শিল্পের কথা। ভারী শিল্পে ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রথম দশমাসে উৎপাদন ৫৫৭ কোটি টাকার মত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে আর এটা তার আগের বছরের ওই সময়ের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি।

সরকারী শিল্পক্ষেত্রে (public Sector) এই চমকপ্রদ অগ্রগতি ছাড়াও বেসরকারী শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি দেখা দিয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে মেসিন টুলস (যন্ত্রপাতির) উৎপাদন হয়েছে ১০০ কোটি টাকারও বেশি আর এর

আগের বছরের উৎপাদন ছিল মাত্র ৯১ কোটি টাকার মত। ১৯৭৪-৭৫ সালের টায়ার ও রবারের বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন মূল্য ছিল সাড়ে তিনকোটি টাকার মত আর এবছরে তার উৎপাদন দ্বিগুণিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ৫০০ কোটি টাকার মত রাসায়নিক যন্ত্রপাতি এবছরে উৎপাদন হয়েছে এটা গত বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি।

অন্যান্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অভাবনীয়। বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন বড় বড় মিশ্র ইস্পাতের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে (integrated steel plant) ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (এপ্রিল—জানুয়ারী ১৯৭৫-৭৬), কয়লার উৎপাদন (লিগনাইট সহ) বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশ ও বিদ্যুতের উৎপাদন বেড়েছে ১২ শতাংশ।

জয়যাত্রার পথে

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

২৭.৪ শতাংশ। স্বেচ্ছায় গোপন আয় প্রকাশের সুযোগ দেবার ফলে প্রায় আড়াই লক্ষ ব্যক্তি তাদের গোপন আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ প্রকাশ করেছেন। এর পরিমাণ হ'ল ১৫৮৭ কোটি টাকার ওপর। তা' থেকে কর বাবদ রাজস্ব পাওয়া গেছে ২৪৯ কোটি টাকা। আয়কর ছাড়ের সীমা যেমন বার্ষিক ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার করযোগ্য আয়ের সন্ধান চালিয়ে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ব্যক্তিকে আয়করের আওতায় আনা হয়েছে।

শিল্প পরিচালনায় শপ ও প্ল্যাণ্ট পর্য্যায়ে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছিল গত বছর অক্টোবর মাসে। যে সব শিল্পে অন্ততঃ ৫০০ শ্রমিক রয়েছে, তাদের জন্য প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা এ পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে ২০০ টি শিল্প সংস্থায়, যার মধ্যে ৪৭ টি হ'ল কেন্দ্রীয় শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে।

শিল্পে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের বিষয়টি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে সংসদে ঘোষিত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়ামের সর্বশেষ প্রস্তাবে। প্রস্তাবটি হ'ল, শ্রমিকদের অতিরিক্ত উপার্জনের যে অংশটা আবশ্যিক আমানতে সঞ্চিত হয়, তা শিল্পে বিনিয়োগ করা। এখন পর্যন্ত এই সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রীর মতে সবচেয়ে লাভজনক কয়েকটি শিল্পে এই অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে। প্রস্তাবটিতে যথেষ্ট নতুনত্ব আছে সন্দেহ নেই। শুধু নতুনত্ব নয়, যুগান্তকারীও বটে। এর দ্বারা শ্রমিকরা প্রকারান্তরে শিল্পের মালিকও হতে পারেন। শ্রীসুব্রহ্মনিয়ামের ভাষায়—'যদি সরকারী, বেসরকারী, যৌথ এবং সমবায় ক্ষেত্র থাকতে পারে, তবে শ্রমিক ক্ষেত্র থাকতেও বাধা নেই।'

আগে বলেছি, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সারা দেশে শান্তি ফিরে এসেছে। তার ফলে আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পূর্ণ শান্তি বিরাজ করার ফলে দেশের মানুষ অনেক সংকীর্ণ ও আঞ্চলিক বিবাদ ভুলে গেছে এবং বহুদিনের বহু বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছে। যেমন অন্ধ্র, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশা পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা গোদাবরী নদীর জল বন্টন সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে। পাঞ্জাব ও হরিয়াণা ভুলেছে ইরাবতী ও বিপাশার বিবাদ এবং বিহার ও ওড়িশা ভুলেছে সুবর্ণরেখার বিরোধ। শুধু আন্তরাজ্য বিরোধই নয়, সীমান্তবর্তী নাগাল্যাণ্ড এবং মিজোরামের এক শ্রেণীর লোকদের বৈরিতার অবসানও ঘটেছে। সীমান্তের বাইরে তাকালে দেখতে পাই, চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদক্ষেপ।

যে কথাটা উল্লেখ না ক'রে পারা যায় না, সেটা হ'ল জাতীয় জীবনে শৃংখলার পুনরভ্যুদয়। অফিসে আদালতে কলকারখানায়, স্কুল কলেজে এবং পথে ঘাটে আজকের মতো সুশৃংখল পরিবেশ এক বছর আগেও দেখা যায় নি। বলতে দ্বিধা নেই, একটা প্রচণ্ড আঘাতে যেন গোটা জাতির সম্বিৎ ফিরে এসেছে। আমরা ভারতীয়রা বুঝি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—

'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।।'

সেই স্বর্গের পথে জয়যাত্রার পথে আমরা এগিয়ে চলেছি।

আর একটি কথা না বললে অগ্রগতির খতিয়ান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ-দফা কর্মসূচীতে সুবিন্যস্ত বন্টন-ব্যবস্থা যে সঙ্গতভাবেই প্রাধান্য লাভ করেছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুখের কথা, বন্টন ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার অনেকগুলিই ফলপ্রদ হয়েছে। আলোচ্য বছরে (১৯৭৫-৭৬) ন্যায্যমূল্যের দোকানের (খাদ্যশস্য ও চিনি বিক্রয়) সংখ্যা দু'লক্ষ পনের হাজার থেকে বেড়ে দু'লক্ষ তিরিশ হাজারে এসেছে। অনুরূপভাবে, কেরোসিন বিক্রি করার খুচরো কেন্দ্রের সংখ্যা এক লক্ষ থেকে বাড়িয়ে দু' লক্ষ ষোল হাজারে আনা হয়েছে। তাছাড়া দেশের উত্তরাংশে কাঁচাকয়লা বণ্টনের জন্য আরও ছয় হাজার খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। একই সঙ্গে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও কার্য্যপদ্ধতি বাস্তবমুখী করে তোলার প্রয়াস অব্যাহত। বর্তমানে এই সমবায়ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে ১৭,০০০ খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রে, ১৭১ টি সমবায় বিপণন বিভাগে ও গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৫৩,০০০ খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রে কার্য্যকর রয়েছে। ১৯৭৫ সালের জুনমাসে যে বছর শেষ হয়েছে তাতে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ৭৫০ কোটি টাকার খুচরো ভোগ্যপণ্য বিক্রয় বা লেনদেন হয়েছে। চলতি বছরে তা প্রায় ১০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে সঙ্গতভাবেই আশা করা হচ্ছে। তাই একথা এখন স্বীকার না করে পারা যায়না যে আমরা এক শ্বাসরুদ্ধকারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অচলাবস্থার থেকে বিমুক্ত হয়ে এক বিরাট ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি মেলে ধরেছি। আমরা এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের তোরণ দুয়ারে নবজীবনের প্রতীক্ষা করছি।

আপনারা কি বলেন ?

কলকাতার লোক এবার সি. এম. ডি. এ-র ওপর আরও চটে যাবেন। কথাতেই তো বলে 'পেটে ভাত নেই, রাজকন্যেকে বিয়ে করার শখ',—কলকাতার যা অবস্থা তাতে আবার কালচার, তার আবার 'বিউটি', তার আবার সাজানো। কিন্তু না সাজালেও তো চলছে না। কারণ এখানে এত শিল্পী আছেন, এত স্থপতি আছেন, ভাস্কর আছেন, আর শিল্প রসিকের সংখ্যাও তো কম নয়। বরং বেশী। তবু শহরটার একটা বদনাম আছে। এখানে লোক নাকি সৌন্দর্য ভালবাসে। খালি পেটে কবিতা লেখে, ডাষ্টবিনে ফুলের গন্ধ পায় আর শিল্পীর হাত নিশপিস করে শহীদ মিনারকে রাঙিয়ে দিতে হাওড়া ব্রীজের ওপর দৈত্য দাঁড় করাতে। কলকাতাকে সুন্দর করতে হলে এঁদের দরকার।

আসল কথায় আসি। আমরা ঠিক করেছি যে ডিসেম্বর মাস নাগাদ একটা ভাস্কর্য প্রদর্শনী করব। ভাস্কররা সেখানে নিজেদের সৃষ্টির নমুনা রাখবেন, শিল্প-রসিকরা কয়েক দণ্ড তাকাবেন, আর সম্ভব হলে, সি. এম. ডি. এ. বা অন্যরা পরে কিছু ভাস্কর্যের নমুনা সংগ্রহও করতে পারেন। নবীন, প্রবীণ সব শিল্পীকেই আহ্বান জানানো হচ্ছে, সি. এম. ডি. এ-র জনসংযোগ (পাবলিক রিলেশন) দপ্তর থেকে নিয়মাবলী সংগ্রহ করুন।

একটা প্রশ্ন করবো ? এ ব্যাপারে আর কোনও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা আর কারও কি কোনও দায়িত্ব নেই ? তারা একটু শহরটার সৌন্দর্য্যের দিকে নজর দিতে পারেন না ?

আর একটা কাজ সি. এম. ডি. এ. করতে যাচ্ছে—সেটা শহরের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি নয়, শহরটার বাঁচবার তাগিদে। সেই বহু বিতর্কিত "হকার" যারা রাস্তা অবরোধ করে আছেন তাঁদের সমস্যা। থানা থেকে ফর্ম বিলি করার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, অন্ততঃ দশটি জায়গায় বাজার তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। যারা "সত্যিকারের" হকার তাঁদের আস্তে আস্তে সেই সব বাজারে সরে যেতে হবে। অনেক দিক ভেবে, অনেক চিন্তা করে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

এটা ঠিক যে কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজার না বাড়ার জন্য যত্র-তত্র সর্বত্র বেচাকেনা চলছে। কিন্তু এভাবে ক'দিন চলবে ? অনেক জায়গায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না, গাড়ী যাওয়া দুরের কথা। অস্বাস্থ্যকর, বিশ্রী পরিবেশ, দুর্ঘটনা লেগেই আছে। কতদিন থেকেই তো শোনা যাচ্ছে, একটা কিছু করা দরকার। সেই "একটা" কিছু এবার হচ্ছে রাজ্য সরকার, সি. এম. ডি. এ. কলকাতা কর্পোরেশন আর পুলিশের যৌথ চেষ্টায়।

একটা জিনিষ বুঝে দেখুন—এত বড় শহরে, যেখানে লোক এত বেশী গাড়ী এত বেশী, রাস্তা এত কম, সেখানে অরাজক কেনা-বেচা আর কতদিন চলবে ? আজ হোক, কাল হোক এটা বন্ধ করতেই হবে। আর যদি সত্যিকারের হকার আর জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে, গড়ে উঠবে নিয়মিত বাজার। প্রথম অবস্থায় কয়েকটি, পরে আরও বেশী। প্রথম অবস্থায় কাঁচা অস্থায়ী ব্যবস্থা, পরে পাকাপাকি সুন্দর ব্যবস্থা। কাজ আরম্ভ হয়েছে, থেমে থাকবে না।

জানি বেশীর ভাগ লোকই খুশী হবেন, কেউ কেউ আবার খুশী হবেন না। তবে বৃহত্তর কলকাতার স্বার্থে, পরিবহণ ব্যবস্থা অটুট রাখতে হলে, দুর্ঘটনা বন্ধ করতে, আর সর্বোপরি পরিবেশটা একটু স্বাস্থ্যকর ক'রে তুলতে এছাড়া আর কি পথ আছে ? প্রশ্নটা আপনাকে। 'যাঁরা হকার' তাদের যাঁরা ফুটপাত দিয়ে হাঁটেন, রাস্তা দিয়ে চলেন, যাঁরা কেনেন, যাঁরা বেচেন—সবাইকে প্রশ্ন করছি। কলকাতার রাস্তা ফুটপাথ বাধামুক্ত হোক, এটা চান কি না ? নিয়মিত বাজারে হকাররা কেনা-বেচা করুন, এটা চান কি না ?

তাহলে নিজেরাই এগিয়ে আসুন নিয়মিত বাজারে জিনিষ কেনা-বেচার ব্যবস্থা আর অভ্যাস করুন।

সি. এম. ডি. এ-র সবচেয়ে বড় দোষ শুধু চ্যাটাং চ্যাটাং কথাই বলে না, যা সবাই জানে, সেই কথাই বলে।

আপনারা তো সবাই জানেন যে রাস্তায় ফুটপাথে বাজার ব'সে কি অবস্থা হয়েছে শহরটার। তাহলে নতুন কথা আর কি বলবো ?

নতুন কথা হ'ল,—বেলেঘাটা মেন রোড, হেম নস্কর রোড, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, সর্বমঙ্গলা লেন, হুমায়ুন এ্যাভিনিউ আর দমদমে নর্দান অ্যাভিনিউতে অস্থায়ী বাজার বানানো হচ্ছে। আরও হবে।

আর একটা কথা বিশ্বাস করুন। কলকাতার রাস্তা-ফুটপাথ বাধামুক্ত হ'লে কলকাতার ছাইচাপা সৌন্দর্য্য কিছুটা প্রকাশ পাবে। লোকের চলাফেরার সুবিধা হবে, দুর্ঘটনা কমবে, জঞ্জাল কম জমবে। এই একটা পরিকল্পনায় কলকাতার চেহারা পাল্টে যাবে। সেটাকে বাধা দেবেন কি ?

বিজ্ঞাপন

দারিদ্র্য বিদায়: এক বছরের নিরিখে

আনন্দ ভট্টাচার্য

আজ থেকে বছর দুই আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রথম 'গরীবি হটাও'-এর সংকল্প ঘোষণা করেন তখন, বলতে দ্বিধা নেই, আমরা সকলেই একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। কেননা আমাদের বিশাল দেশের দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য দূর করার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, নয় সহজ এবং সরল। যে কঠিন সংকল্প ও নিরলস কর্মপ্রয়াস এজন্যে দরকার দেশের মানুষ কি তা করতে প্রস্তুত? আমাদের সুশৃংখল জাতীয় চরিত্র কি প্রতিক্রিয়ার কবল থেকে মুক্ত হয়ে দেশগঠনের কাজে আত্মনিবেদনের জন্য তৈরী? কিন্তু আমাদের সমস্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে দৃঢ় সংকল্পের মশাল জেলে এক মহাকর্মযজ্ঞে আহ্বান জানালেন এক মহান নেত্রী। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এই মহান নেত্রী নিজের কথায় ও কাজে, এক পাও পিছিয়ে যান নি—মুহূর্তের জন্যও হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন নি—পক্ষান্তরে অদম্য মনোবল ও দৃঢ় চিত্তে তিনি সমস্যাজর্জরিত দেশের সঙ্কট সমাধান করতে কৃতসংকল্প। এক-দিকে সুশৃংখল জাতীয় চরিত্র গঠন এবং অন্যদিকে বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সুরু হল তাই দারিদ্র্য দূরীকরণের কঠিন সংগ্রাম।

এ যেন সাধারণ মানুষের জীবনে এক নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা। আজ সেই বিপ্লবের একবছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই এক বছরে তার নির্দেশিত কর্মসূচী কতখানি সাফল্য অর্জন করেছে একবার খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যমান কমিয়ে আনা এবং স্থিতিশীল রাখা—উৎপাদন বৃদ্ধি, সংগ্রহ ও বণ্টন নীতির সুসমতা রক্ষা হল এই কর্মসূচীর প্রথম ও প্রধান ধাপ। নিঃসন্দেহে বলা যায় গত-বছরের তুলনায় নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কমে গেছে। বাজারে প্রতিটি দোকানে ও সংস্থায় এগুলির জোগান ও মজুত পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা ন্যায্যমূল্যে সবসময় পাওয়া যাচ্ছে। পরিসংখ্যানে বলে গত জুলাই ও ডিসেম্বরের মধ্যে সাত শতাংশ মূল্য (অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর) কমেছে—এটা হল পাইকারী মূল্যের ক্ষেত্রে। তেমনি শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের সূচক সংখ্যা কমেছে, ডিসেম্বরের শেষে শতকরা ৯.১ ভাগ এবং কৃষিমজুরদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৯.৫ ভাগ। এছাড়াও ডিসেম্বরের পর প্রায় প্রতিটি পণ্যের দাম আশাজনক ভাবে কমতির দিকে গেছে। অবশ্য দু একটি ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। সেগুলি সম্বন্ধেও ব্যাপক চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী পর্যায়ে নানান কার্যকরী ব্যবস্থাই এই সুফল এনে দিয়েছে।

এই সঙ্গে জনগণের জন্য বণ্টননীতিরও আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে যার ফলে যে কোন রাজ্যে যে কোন পণ্যসামগ্রী সহজলভ্য হয়েছে। এজন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু হয়েছে দিল্লীতে যার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যান্য রাজ্যেও এ ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রাহকসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পণ্যের মোড়কে দাম ছাপানোর নির্দেশ কার্যকরী করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী হয়েছে।

কৃষি জমির উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া, উদ্বৃত্ত জমি অথবা অঘোষিত জমির সুষ্ঠু বণ্টন এবং জমির সঠিক দলিল প্রণয়ন ছিল আর একটি প্রধান কর্মসূচী। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় নির্দেশিকা-নুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে জমির (শহর এবং গ্রাম) উর্দ্ধসীমা বেঁধে দিয়ে প্রয়োজনীয় আইন করা হয়েছে। এবং চালু আইন সংশোধন করা হয়েছে। এপর্যন্ত সমগ্র দেশে ১১ লক্ষ ৯০ হাজার রিটার্ণ দাখিল হয়েছে যার মধ্যে ৩ লক্ষ সরকারী উদ্যোগে। এর মধ্যে ৬,০০,০০০ টি রিটার্ণের দ্বারা ৯,৩০,০০০ একর উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গেছে। ১,২০,০০০ একর জমি ভূমিহীনদের এর মধ্যেই বণ্টন করা হয়ে গেছে এবং একাজ এখনও চলছে।

বাস্তুহীনদের জন্য এবং দুর্বলশ্রেণীর লোকেদের জন্য বাস্তুভিটা নির্মাণের

কর্মসূচী পুরোদমে চলেছে। বাস্তুহীন ও অনুন্নত দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যেই ৬০ লক্ষ বাস্তুভিটা বন্টন করা হয়েছে। কোন কোন রাজ্যে গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিছু রাজ্য যেমন, কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিম বাংলায় গৃহনির্মাণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে অথবা তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা নিজেরাই গৃহনির্মাণ করে নিতে পারেন। ২০০,০০০টি এরকম গৃহ এর মধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

বেগার শ্রমের অবলুপ্তিকরণে দেশে এর মধ্যেই আইন রচিত হয়েছে। এই আইনানুযায়ী, জেলাস্তরের সকল অফিসার-দের এমন পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা তাঁরা বেগার শ্রম সম্পর্কীয় যে কোন অনুসন্ধান কাজ, ধরপাকড় এবং এরকম যে কোন মামলা সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে অনেক রাজ্যে অনেক কাজ হয়েছে। প্রায় ২০,০০০ বেগার শ্রমিক এপর্যন্ত শ্রমের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন। এদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গ্রামে ঋণগ্রস্ত লোকেদের বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষি মজুর, শ্রমিক ও ছোট ছোট চাষীদের ঋণ মকুব করে অথবা সরকার নিজে ঋণ শোধ করে আমাদের এই দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের সুস্থ নাগরিক জীবন ফিরিয়ে দিতে কৃতসংকল্প। এ সমস্যা বলতে গেলে ভারতের সব রাজ্যেই আছে। তাই ইতিমধ্যে হরিয়ানা, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলায় সরকার এ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন। অন্যান্য রাজ্য যেমন আসাম, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে, এই গ্রামীণ ঋণগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সমস্যা একটু অন্য ধরণের হওয়ায় সরকার ঋণদান প্রথা সম্পূর্ণ রদ করেছেন। সম্প্রতি বিহারও ঋণমুকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মহাজনী ঋণ থেকে এইসব মানুষদের মুক্তি দিয়ে বিকল্প ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম গ্রামান্তরে সরকারী ব্যাঙ্ক খোলা হচ্ছে, যেগুলিকে সাধারণত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বলা হয়। এছাড়াও সরকার এই দুর্বলতম শ্রেণীর মানুষের জন্য ঋণদানের নয়া পদ্ধতি গ্রামের সমবায় সমিতি ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চালু করেছেন।

ন্যূনতম কৃষি মজুরীর ব্যাপারেও বিভিন্ন রাজ্য সরকার অনেকদূর এগিয়ে এসেছেন এবং রাজ্যে রাজ্যে এ ব্যাপারে সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করে এ আইনটির প্রয়োগ ত্বরাণ্বিত করা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে যাতে ন্যূনতম কৃষি মজুরী থেকে কেউ বঞ্চিত না হন।

হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ২০ লক্ষ ৪ হাজার (২.০৪ মিলিয়ন) হেক্টর অতিরিক্ত জমি এবছর সেচের আওতায় আনা যাবে বলে আশা করা যায়।

গত বছরের তুলনায় (৭৫-৭৬) এ বছর (৭৬-৭৭) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় সেদিকে সরকার সবরকম নজর রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এজন্য অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করার আয়োজন চলছে এবং আপাতত এজন্য মোট চারটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলি হল: সিংগ্রেলী, কোরবা, ফরাক্কা ও নেভেলী।

সস্তায় জনতা কাপড় এখন সহজেই মেলে

আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক। নতুন কর্মসূচীতে তাই কৃষির ওপর সবিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে যাতে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি উৎপাদন বাড়ে। তাই এবারে, চলতি বছরে সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প খাতে বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যগুলিকে যেসব সেচ ও বৈদ্যুতীকরণের কাজ অনেকাংশে এগিয়ে আছে, সেগুলিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেবার জন্য ৮৫ কোটি টাকা সাহায্য

পতিত অসেচযোগ্য জলাভূমি ও খরাপীড়িত কিছু জমিকে চাষাবাদযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান কাজ চালানো হচ্ছে। এই গবেষণাকাজ ও পরীক্ষানিরিক্ষা করার জন্য সরকার আপাতত ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

কৃষির পরেই দেশের গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে বড় জীবিকা হল তাঁত। এই তাঁত শিল্প আজ নানা সঙ্কটের সম্মুখীন। দেশে

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরই এই জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পটির দিকে তাই সরকার বিশেষভাবে নজর দিলেন। বহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে গোটা তাঁত শিল্পকে নতুন জীবন দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ১ কোটিদরিদ্র তাঁতশিল্পীকে বাঁচানোর জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য-সরকার ব্যবস্থা করেছেন।

জনতা কাপড় এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। সমাজের দরিদ্রশ্রেণী ও গ্রাম গ্রামাঞ্চলের দুর্বলতম সম্প্রদায়ের জন্য অল্পমূল্যে ভাল ধুতি কাপড় সরবরাহ করা হচ্ছে কণ্ট্রোল দরে। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা কো-পারেটিভ সংস্থাগুলি। সরকার এই সংস্থাগুলিকে চাঙ্গা করার জন্য ও অর্থ-বিনিয়োগে বলিষ্ঠ করার জন্য উদার হস্তে নানান আর্থিক সাহায্য করছেন। সারা দেশে ৪৬ হাজারেরও বেশী জনতা কাপড়ের খুচরা দোকান খোলা হচ্ছে।

শহরাঞ্চলের জমির মালিকানা সীমিত-করণের উদ্দেশ্যে The Urban land ceiling and Regulation Act. 1976 গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারী থেকে চালু হয়েছে। এর ফলে, শহরাঞ্চলে জমির ন্যূনতম যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার বেশী পতিত জমি, খালি জমি সরকার অধিগ্রহণ করে নেবেন। যেখানে এধরণের জমি বিক্রী হয়েছে, সরকার ইচ্ছে করলে তাও বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। এই আইনটি ভারতের যে কোন স্থানে প্রযুক্ত হতে পারে সরকারের ইচ্ছামত এবং সংবিধানের Article 252এর 1(1) ধারা মতে। কিন্তু আপাতত এটি কার্যকরী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা এবং উত্তর প্রদেশে। এই আইনে ভবিষ্যতে বসবাসযোগ্য গৃহ নির্মাণের জন্য ন্যূনতম ভিৎ সীমাও (Plinth area) বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

উপযুক্ত বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো একটি কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যাতে শহরাঞ্চলে কেউ বিলাসবহুল অট্টালিকা বা বাসগৃহ নির্মাণে কোনরকম কারচুপি না করতে পারে। এজন্য একটি Special Squad গঠন করা হয়েছে যাদ্বারা অঘোষিত সম্পদ বিনিয়োগের ব্যাপারে তারা অনুসন্ধান করে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাদি নিতে পারেন। বিলাসবহুল প্রাসাদোপম বাড়ী নির্মাণ করে তার আসল খরচের চেয়ে বহুলাংশে কম খরচ দেখানো (Undervaluation) এবং লগ্নীকৃত অর্থের সঠিক হদিস না দেখানো (Undisclosed investment) প্রভৃতি বিষয়ে এরমধ্যেই ১৭ কোটি (১৭০ মিলিয়ন) টাকার কারচুপি ধরা হয়েছে।

করফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে জোরদার তদন্ত ও অভিযান পুরোদমে চলছে। যার ফলে আপনারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, গত বছরের জুলাই মাসে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর আদায় শতকরা ২৭.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সরকার দয়াপরবশ হয়ে করফাঁকিবাজদের শেষ সুযোগ দেন এবং ঘোষণা করেন, যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের গোপন আয় ও সম্পদ সরকারকে জানাবেন তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে এবং ১,৫৮৭ কোটি (১৫৮৭০ মিলিয়ন) টাকারও বেশী গোপন আয় ও সম্পদ সরকারের কাছে জানানো হয়েছে। এথেকে কর বাবদ সরকার পেয়েছেন ২,৪৯ কোটি (২৪৯০ মিলিয়ন) টাকা। সামনের বছরগুলিতেও এই ট্যাক্স বাবদ সরকারের পৌনপুনিক রাজস্ব আদায় হবে।

চোরাকারবারী ও স্মাগলারদের কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে গত এক বছরে সরকার জোরদার ব্যবস্থা নিয়েছেন। সরকার কঠোর হস্তে এদের দমন করার কাজে এগিয়েছিলেন বলে দেশের বিরাট বিরাট চোরাচালানকারীরা ধরা পড়ে। সম্প্রতি

পুরুলিয়ায় ভূমিহীনদের জমির পাট্টা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

সরকার এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য এক আইন প্রণয়ন করেন।

বেআইনী ভাবে সঞ্চিত বা অর্জিত ধন-সম্পদ এর দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঐসব চোরাকারবারীদের আত্মীয় পরিজন অথবা বন্ধুবান্ধব বা সহযোগীদের অপরাধও সমান বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রাথমিক কাজ করা হয়ে গেছে—ভবিষ্যতে আরো হবে।

শিল্পসংস্থাগুলিকে আরো ভালোভাবে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দানকল্পে সরকার অর্থলগ্নী প্রথাটির আমূল সংস্কার করেছেন, যারদ্বারা দেশের ছোট ছোট শিল্প-পতিরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনার পুরো লাভ ওঠাতে পারেন। আমদানী লাইসেন্সের অপব্যবহার বন্ধ করা যায়

কর্মসূচী পুরোদমে চলেছে। বাস্তুহীন ও অনুন্নত দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যেই ৬০ লক্ষ বাস্তুভিটা বন্টন করা হয়েছে। কোন কোন রাজ্যে গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিছু রাজ্য যেমন, কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিম বাংলায় গৃহনির্মাণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে অথবা তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা নিজেরাই গৃহনির্মাণ করে নিতে পারেন। ২০০,০০০টি এরকম গৃহ এর মধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

বেগার শ্রমের অবলুপ্তিকরণে দেশে এর মধ্যেই আইন রচিত হয়েছে। এই আইনানুযায়ী, জেলান্তরের সকল অফিসার-দের এমন পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা তাঁরা বেগার শ্রম সম্পর্কীয় যে কোন অনুসন্ধান কাজ, ধরপাকড় এবং এরকম যে কোন মামলা সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে অনেক রাজ্যে অনেক কাজ হয়েছে। প্রায় ২০,০০০ বেগার শ্রমিক এপর্যন্ত শ্রমের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন। এদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গ্রামে ঋণগ্রস্ত লোকেদের বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষি মজুর, শ্রমিক ও ছোট ছোট চাষীদের ঋণ মকুব করে অথবা সরকার নিজে ঋণ শোধ করে আমাদের এই দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের সুস্থ নাগরিক জীবন ফিরিয়ে দিতে কৃতসংকল্প। এ সমস্যা বলতে গেলে ভারতের সব রাজ্যেই আছে। তাই ইতিমধ্যে হরিয়ানা, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলায় সরকার এ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন। অন্যান্য রাজ্য যেমন আসাম, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে, এই গ্রামীণ ঋণগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সমস্যা একটু অন্য ধরণের হওয়ায় সরকার ঋণদান প্রথা সম্পূর্ণ রদ করেছেন। সম্প্রতি বিহারও ঋণমুকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মহাজনী ঋণ থেকে এইসব মানুষদের মুক্তি দিয়ে বিকল্প ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম গ্রামান্তরে সরকারী ব্যাঙ্ক খোলা হচ্ছে, যেগুলিকে সাধারণত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বলা হয়। এছাড়াও সরকার এই দুর্বলতম শ্রেণীর মানুষের জন্য ঋণদানের নয়া পদ্ধতি গ্রামের সমবায় সমিতি ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চালু করেছেন।

ন্যূনতম কৃষি মজুরীর ব্যাপারেও বিভিন্ন রাজ্য সরকার অনেকদূর এগিয়ে এসেছেন এবং রাজ্যে রাজ্যে এ ব্যাপারে সক্রিয় কর্ম-সূচী গ্রহণ করে এ আইনটির প্রয়োগ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে যাতে ন্যূনতম কৃষি মজুরী থেকে কেউ বঞ্চিত না হন।

হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ২০ লক্ষ ৪ হাজার (২.০৪ মিলিয়ন) হেক্টর অতিরিক্ত জমি এবছর সেচের আওতায় আনা যাবে বলে আশা করা যায়।

গত বছরের তুলনায় (৭৫-৭৬) এ বছর (৭৬-৭৭) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় সেদিকে সরকার সবরকম নজর রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এজন্য অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করার আয়োজন চলছে এবং আপাতত এজন্য মোট চারটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলি হল: সিংগ্রেলী, কোরবা, ফরাক্কা ও নেভেলী।

সস্তায় জনতা কাপড় এখন সহজেই মেলে

আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক। নতুন কর্মসূচীতে তাই কৃষির ওপর সবিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে যাতে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি উৎপাদন বাড়ে। তাই এবারে, চলতি বছরে সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প খাতে বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যগুলিকে যেসব সেচ ও বৈদ্যুতীকরণের কাজ অনেকাংশে এগিয়ে আছে, সেগুলিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেবার জন্য ৮৫ কোটি টাকা সাহায্য

পতিত অসেচযোগ্য জলাভূমি ও খরাপীড়িত কিছু জমিকে চাষাবাদযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান কাজ চালানো হচ্ছে। এই গবেষণাকাজ ও পরীক্ষানিরিক্ষা করার জন্য সরকার আপাতত ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

কৃষির পরেই দেশের গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে বড় জীবিকা হল তাঁত। এই তাঁত শিল্প আজ নানা সঙ্কটের সম্মুখীন। দেশে

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরই এই জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পটির দিকে তাই সরকার বিশেষভাবে নজর দিলেন। বহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে গোটা তাঁত শিল্পকে নতুন জীবন দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ১ কোটিদরিদ্র তাঁতশিল্পীকে বাঁচানোর জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য-সরকার ব্যবস্থা করেছেন।

জনতা কাপড় এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। সমাজের দরিদ্রশ্রেণী ও গ্রাম গ্রামাঞ্চলের দুর্বলতম সম্প্রদায়ের জন্য অল্পমূল্যে ভাল ধুতি কাপড় সরবরাহ করা হচ্ছে কণ্ট্রোল দরে। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা কো-পারেটিভ সংস্থাগুলি। সরকার এই সংস্থাগুলিকে চাঙ্গা করার জন্য ও অর্থ-বিনিয়োগে বলিষ্ঠ করার জন্য উদার হস্তে নানান আর্থিক সাহায্য করছেন। সারা দেশে ৪৬ হাজারেরও বেশী জনতা কাপড়ের খুচরা দোকান খোলা হচ্ছে।

শহরাঞ্চলের জমির মালিকানা সীমিত-করণের উদ্দেশ্যে The Urban land ceiling and Regulation Act. 1976 গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারী থেকে চালু হয়েছে। এর ফলে, শহরাঞ্চলে জমির ন্যূনতম যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার বেশী পতিত জমি, খালি জমি সরকার অধিগ্রহণ করে নেবেন। যেখানে এধরণের জমি বিক্রী হয়েছে, সরকার ইচ্ছে করলে তাও বায়েজাপ্ত করতে পারেন। এই আইনটি ভারতের যে কোন স্থানে প্রযুক্ত হতে পারে সরকারের ইচ্ছামত এবং সংবিধানের Article 252এর 1(1) ধারা মতে। কিন্তু আপাতত এটি কার্যকরী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা এবং উত্তর প্রদেশে। এই আইনে ভবিষ্যতে বসবাসযোগ্য গৃহ নির্মাণের জন্য ন্যূনতম 'ভিৎ সীমাও (Plinth area) বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

উপযুক্ত বিষয়টির সঙ্গে সংপৃক্ত আরো একটি কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যাতে শহরাঞ্চলে কেউ বিলাসবহুল অট্টালিকা বা বাসগৃহ নির্মাণে কোনরকম কারচুপি না করতে পারে। এজন্য একটি Special Squad গঠন করা হয়েছে যাদ্বারা অঘোষিত সম্পদ বিনিয়োগের ব্যাপারে তারা অনুসন্ধান করে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাদি নিতে পারেন। বিলাসবহুল প্রাসাদোপম বাড়ী নির্মাণ করে তার আসল খরচের চেয়ে বহুলাংশে কম খরচ দেখানো (Undervaluation) এবং লগ্নীকৃত অর্থের সঠিক হদিস না দেখানো (Undisclosed investment) প্রভৃতি বিষয়ে এরমধ্যেই ১৭ কোটি (১৭০ মিলিয়ন) টাকার কারচুপি ধরা হয়েছে।

করফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে জোরদার তদন্ত ও অভিযান পুরোদমে চলছে। যার ফলে আপনারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, গত বছরের জুলাই মাসে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর আদায় শতকরা ২৭.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সরকার দয়াপরবশ হয়ে করফাঁকিবাজদের শেষ সুযোগ দেন এবং ঘোষণা করেন, যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের গোপন আয় ও সম্পদ সরকারকে জানাবেন তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে এবং ১,৫৮৭ কোটি (১৫৮৭০ মিলিয়ন) টাকারও বেশী গোপন আয় ও সম্পদ সরকারের কাছে জানানো হয়েছে। এথেকে কর বাবদ সরকার পেয়েছেন ২,৪৯ কোটি (২৪৯০ মিলিয়ন) টাকা। সামনের বছরগুলিতেও এই ট্যাক্স বাবদ সরকারের পৌনপুনিক রাজস্ব আদায় হবে।

চোরাকারবারী ও স্মাগলারদের কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে গত এক বছরে সরকার জোরদার ব্যবস্থা নিয়েছেন। সরকার কঠোর হস্তে এদের দমন করার কাজে এগিয়েছিলেন বলে দেশের বিরাট বিরাট চোরাচালানকারীরা ধরা পড়ে। সম্প্রতি

পুরুলিয়ায় ভূমিহীনদের জমির পাট্টা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

সরকার এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য এক আইন প্রণয়ন করেন।

বেআইনী ভাবে সঞ্চিত বা অর্জিত ধন-সম্পদ এর দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঐসব চোরাকারবারীদের আত্মীয় পরিজন অথবা বন্ধুবান্ধব বা সহযোগীদের অপরাধও সমান বলে গণ্য হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রাথমিক কাজ করা হয়ে গেছে—ভবিষ্যতে আরো হবে।

শিল্পসংস্থাগুলিকে আরো ভালোভাবে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দানকল্পে সরকার অর্থলগ্নী প্রথাটির আমূল সংস্কার করেছেন, যারদ্বারা দেশের ছোট ছোট শিল্প-পতিরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনার পুরো লাভ ওঠাতে পারেন। আমদানী লাইসেন্সের অপব্যবহার বন্ধ করা যায়

সেজন্যও সরকার কতগুলি ব্যবস্থা চালু করেছেন। বিনিয়োগ ব্যবস্থার সরলীকরণে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাহল :

(ক) ২১ টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের লাইসেন্স সম্পূর্ণ রেহাই।

(খ) ২৯ টি বিশেষ নির্বাচিত শিল্প-সংস্থা তাদের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার অতিরিক্ত উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারবেন, যদি তা লাইসেন্স প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলেও।

(গ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষমতার মধ্যে কিছু কিছু শিল্পে উৎপাদন বহু-মুখীকরণ করা হয়েছে।

(ঘ) Research & Development-এর ভিত্তিতে ছোট ও মাঝারি উদ্যোগীদের জন্য আমদানী লাইসেন্স খুব সহজ ও উদারনীতির ওপর মঞ্জুর করা হবে।

(ঙ) যে সব শিল্পসংস্থা তাদের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করে থাকেন তাদের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করার জন্য অনুমতি দান করা হয়েছে।

এছাড়া আরো বহুবিধ সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়েছে যার প্রমাণ পাওয়া যায়—অ্যালুমিনিয়াম, ছাপার কাগজ, টায়ার, টিউব, বেবীফুড, সিমেণ্ট, ট্র্যাক্টর, দাড়ি কামানোর ব্লেড প্রভৃতি বহু জিনিষের ওপর কড়াকড়ির শিথিলতায়। আমদানী রপ্তানী নীতিরও সরলীকরণ করা হয়েছে।

শিল্পপরিচালনায় সরকারের সঙ্গে অথবা মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীর সরাসরি অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়েছে গত ৩০ শে অক্টোবর থেকে। ২০০টি শিল্প কারখানার এপর্যন্ত এ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে।

বেগার শ্রম থেকে মুক্তি

সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে জাতীয় পারমিট প্রথার প্রচলন এক কথায় বলা যেতে পারে, যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৩৯ সালের Motor Vehicles আইন টিকে আমূল সংস্কার করা হয়েছে। দেশে সবরকম পণ্যমূল্য স্থিতিশীল ও ন্যায্য রাখার জন্যই এই জাতীয় পারমিট প্রথা বেসরকারী সড়ক পরিবহণ সংস্থাগুলিকে কমপক্ষে পাঁচটি পাশাপাশি রাজ্যের মধ্যে অবাধে পণ্য বহন করার অধিকারী করবে। ফলে, সমগ্র দেশে বিনা বাধায় মাল চলাচল অল্প সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং ক্রেতা সাধারণ ন্যায্যমূল্যে ভোগ্য পণ্য পেতে পারবেন। এ পর্যন্ত ১০০০ টি পারমিট মঞ্জুর করা হয়েছে—মোট হবে ৫৩০০ টি।

আয়করের হার আরো সহজ করা হয়েছে এবং এতে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হচ্ছে, বার্ষিক ৮০০০ টাকা আয় বিশিষ্ট কর্মচারীদের। সেইসঙ্গে যারা আদৌ ইনকাম ট্যাক্স দিতেন না বা ফাঁকি দিতেন সেরকম ২,৪০,০০০ নূতন আয়করদাতা সম্প্রতি নথিভুক্ত হয়েছেন।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য—বিশেষ করে যারা হোষ্টেলে থাকেন তাদের জন্য কণ্ট্রোল দরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা সরকার হাতে নিয়েছেন। এর সুফলও অনেকে পেয়েছেন এবং এদ্বারা ৬১৩৮ টি হষ্টেলে ৭,৬২,০০০ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন।

ছাত্রছাত্রীদের (সর্বস্তরের) জন্য কণ্ট্রোল দরে পাঠ্যপুস্তক ও লেখাপড়ায় ব্যবহৃত খাতাপত্র পেন্সিল কালি কলম প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ইতিমধ্যেই সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এতে ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর উপকৃত হয়েছেন। শতকরা ৪ থেকে ৭ ভাগ বইয়ের দাম এর মধ্যে কমে গেছে।

দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। এরদ্বারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিশেষ করে—তপশীলি জাতি ও উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীরা সবিশেষ লাভবান হবেন। স্কুল ও কলেজ পর্য্যায়ে ৭৪,৮৬৮ টি বইব্যাঙ্ক কাজ করছে।

নতুন কর্মসূচীর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল শিক্ষানবিসি পরিকল্পনা। প্রচলিত আইন সংশোধন করে শিক্ষানবিস নিয়োগ, বিশেষকরে দুর্বলশ্রেণীর সম্প্রদায়ের জন্য, বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিশদফা কর্মসূচী প্রণয়নের আগে ১,১০,০০০ (সমগ্র দেশে) শিক্ষানবিস পদের মধ্যে ৪০,০০০ টি খালি পড়ে থাকত। সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়ে বর্তমানে ব্যাপক সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে করেছেন ১,২৮,০০০ টি পদ। ইতিমধ্যে ১,২১,০০০ টি আসন পূর্ণ হয়ে গেছে।

উল্লিখিত প্রতিবেদন গত এক বছরে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ২০ দফা কর্মসূচীর ব্যাপক কর্মযজ্ঞের সামান্য উল্লেখ মাত্র। দেশের কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের নিগড় থেকে মুক্ত করবার এমন ব্যাপক পরিকল্পনা এই প্রথম। একবছরে কাজ অনেকটা এগিয়েছে। আগামী দিনের সম্ভাবনা আরো বিপুল।

আমরা এ-ভাবে হেঁটে গেছি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা এতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিলাম। এবার বোধ হয় বনবাসের পালা। অন্তত বাবার কথাবার্তায় এবং আচরণে এমনই মনে হত। এত বড় বনের ভেতর আমাদের আবাস, যেদিকে চোখ যায় বাবলার জঙ্গল, আর বড় বড় শিশুগাছ, অথবা যেন ক্রোশের পর ক্রোশ চলে গেছে শুধু বাঁশের ঝাঁড় অথবা কোথাও কোথাও মনীন্দ্র কাঁটার জঙ্গল।

ঘরে দরমার বেড়া। আকাশ সামান্য ফর্সা হলেই টের পাওয়া যেত সকাল হচ্ছে। ফাঁকে ফোঁকরে বাইরের ফর্সা ভাবটা কেমন সব রঙ্গীন আতসবাজীর মতো মনে হত তখন। জ্যোৎস্না রাতে বেড়ার ফাঁকগুলো এক একটা এক রকমের। কোনোটা তারাবাতির মতো, কোনোটা যেন মোমবাতির শিখা। ভেতরে আমরা ক'জন। মা আর ছোট ভাইটা ওপাশের মাচানে। বাঁশ কেটে মাচান করে দিয়েছে বাবা। লম্বা মাচান। খলপা ফেলে মাচানকে সমতল করা হয়েছে। মা পিলু আর মায়া, এবং ছোট ভাইটা পাশাপাশি থাকে। একটা ছেঁড়া মশারী। কতকালের পুরানো যেন এবং রঙ একেবারে কালো—ধুলো ময়লা লাগলে আর টের পাবার জো নেই। তালিমারা এত যে আসল মশারীটা কবেই উবে গেছে।

চারপাশের বনভূমিতে কত সব নাম না জানা পাখির কলরব শুনতে পেতাম। ইতিমধ্যে কিছু কাক আমাদের বাড়ির চারপাশে উড়ছে। কিছু শালিখ পাখি উঠানে নেমে আসছে। চড়াই পাখিরাও যেন জেনে ফেলেছে, এই বনভূমিতে একজন মানুষ তার আবাস গড়ে তুলছে।

এবারে বিগিউল বেজে উঠল। মাঠ পার হলে সেই পুলিশের ব্যারাক বাড়িতে এতদূর থেকেও টের পাওয়া যায়, বেশ সরগোল। ওরা বোধ হয় এবারে ঝাঁক বেঁধে পি. টির জন্য বড় সড়কে বের হয়ে পড়েছে। আমরা জানি বাবাও উঠে পড়বে এবার। মা তারপরে। উঠেই মা গোবর গুলে ঘরের দাওয়া লেপে দেবে। বাড়ির চার পাশে গোবরের ছড়া, বাবা গরুটা বের করে আমড়া তলায় নিয়ে যাবে। সূর্য তখনও উঠবে না। বাবা উঠোনে এসে দাঁড়াবে চুপচাপ। বাবা আবার ভাল করে দেখে নেবে, এই আবাস নির্মাণের জন্য তার আর কি কি দরকার।

সূর্য ওঠার আগে বাবা তার বাড়ির সীমানাটা প্রতিদিনের মতো একবার ঘুরে ঘুরে দেখবে। বেশ চিন্তাশীল মানুষের মতো তখন তাকে হাঁটতে দেখা যায়। পাঁচ মাসে পাঁচ বিঘা জমির প্রায় বেশিটা সাফ করা হয়ে গেছে। হেমন্তের সময় বলে হিম পড়ে থাকে ঘাস পাতায়। কোথাও শুকনো কাটা জঙ্গল, কোথাও আগুনে ভাল করে ডালপালা পোড়েনি বলে আধ পোড়া শাক পাতা, সব মাড়িয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাবে বাবা। কোন দিকটায় হাত দেওয়া যাবে, কোনদিক হাত লাগালে তাড়াতাড়ি সাফ হবার কথা, সব ভেবে দেখা, তারপর যেমন পালং-এর জমি পেঁয়াজের জমি, সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান, কোথাও সামান্য জমিতে মূলো চাষ, সব কিছুতে বীজ বপনের পর কার কতটা বাড় বাড়ন্ত প্রতিদিন সকালে না দেখতে পেলে যেন তার ভাল লাগে না। আর মনে হয় বাবা সারারাত বিছানায় শুয়ে থাকে জোর জবরদস্তি করে। এ-সময়টুকু এইসব হাতে বোনা ফসলের সঙ্গে থাকতে পারলে যেন বেঁচে যেত মানুষটা। কতক্ষণে সকাল হবে। যে গাছগুলো বড় হয়ে উঠছে, অথবা যে লতার ফুল আসবে, কখন কার কি পরিচর্যা দরকার, রাতে শুয়ে কেবল ভাবল। এবং কোথাও দাঁড়িয়ে, কোথাও বসে অতি সন্তর্পণে সব কিছু ঠিকঠাক করে দিতে দিতে বাবা বুঝি টের পায় পূব আকাশে লাল। পাখিরা সব মাথার ওপর দিয়ে বনের অন্যপ্রান্তে চলে যাচ্ছে। গাছপালা এত ঘন যে মাত্র কিছুদূরের আকাশ দেখা যায়, পরে এই বনভূমি সব ঢেকে দেয় বলে কখনও বাবা দাঁড়ায় আমড়াতলায়।

বিছানায় শুয়ে বাবার গলা শুনতে পাই,-উঠে পড় সবাই। রোদ উঠে গেছে। আর বিছানায় থাকতে নেই।

পূব আকাশটা সামান্য লালচে দেখলেই বাবা রোদ ওঠার কথা বলত। কিছুতেই আমাদের উঠতে ভাল লাগত না। শীতের সময় না হলেও শীত পড়তে বেশি দেরি নেই। কাঁথা গায়ে শুয়ে থাকার ভেতর ভারি আরাম। কুঁকড়ে শুয়ে আছি। চোখে রাজ্যের ঘুম, যদিও কখনও কখনও মনে হয় খুব সকালে উঠে পড়তে পারলে ভাল হয়। বাবা চায় তার সঙ্গে আমিও এই সব চাষ আবাদ ঘুরে ঘুরে দেখি। এবং মা যেন শস্যের গন্ধ পায়। গরুটি
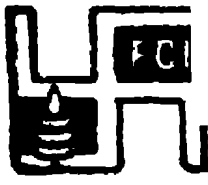
আসার পর কিছু পেঁপে গাছ লাগানোর পর—বাবা কোথা থেকে নিয়ে এসেছে দুটি ছোট কলাগাছ। সে গাছ লাগানোর সময় কি যে যত্ন সহকারে বাবা ছেঁড়া চট দিয়ে বেঁধে দিল, ওই সব দেখেই বোধ হয় মা বাবাকে কিছুটা আবার নির্ভরশীল মানুষ ভাবতে পেরেছে। আজকাল কথায় কথায় আর বাবাকে সেনাপতি বলে ঠাট্টা করে না। এবং সকালে উঠে প্রথম বাবার গলায় শোনা গেল, কিরে, পড়াশোনা করতে হবে না।

এবং দেখা গেল, বাবা কিছু কলাপাতা এনে মায়াকে বলল, অ আ লেখ। আমাকে বলল, তোর বইগুলো বের কর। মানুর কাছে যা। পরীক্ষাটা দিতে হয়।

পরীক্ষাটা দিতে হয়, যেন অনেকদিন পর একটা নতুন কথা, বাবা অথবা আমার খুব একটা মনে ছিল না, সহসা এই সব বাবার আবার মনে পড়ে গেছে। পিলুকে বাবা কিছুতেই পড়াতে বসাতে পারল না। সে একটা কাঁচি নিয়ে সকালে ঘাস কাটতে কোথায় চলে গেল। গরুটির জন্য বাবার দুর্বলতা ভীষণ। গরুটার জন্য ঘাস কাটতে পারলে পিলুর ওপর বাবার রাগ থাকবে না। আর এদেশে এসে বাবাকে আমরা খুবই কম রাগ করতে দেখেছি। বরং মা যখন অভাবের জন্য ভারি অশান্তি করত, বাবা কেমন শিশুর মতো হয়ে যেত। লাফঝাঁফ দিত, আমি কি করব, চেষ্টারতো শেষ নেই। না পারলে কি করব।

পিলু বাবাকে খুব একটা আজকাল ভয়ও পায়না। অভাবী মানুষের সন্তানেরা বোধ হয় একটু বেশি বেয়াড়া হয়। পিলু যে বের হয়ে গেল, বাবা পিলুকে কিছু বলতে পর্যন্ত সাহস পেল না। পিলুর এই বয়েস, ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়তে পারত, তার এ-সবে আর ততটুকু আগ্রহ নেই। বরং সে যতটা পারে, মার জন্য, বাবার জন্য কাজ করে বেড়ায়। ওরা কেউ আর তাকে ঘাটায় না। দেখা গেল পিলু আসছে, হাতে পায়ে কাদা মাখা, কোচড়ে সব পুঁটি ট্যাংরা মাছ। কোন্ গর্ত থেকে সব ধরে এনেছে। হয়তো দেখা গেল পিলু মাথায় করে নিয়ে আসছে এক ঝুড়ি গোবর। কখনও দেখা গেল পিলু আসছে, কোচড়ে গিমা শাক। সে বাড়িতে ইতিমধ্যেই বাবার মতো আংশিক সংসারী মানুষ হয়ে উঠেছে।

বাবা ইতিমধ্যে একদিন আশ্চর্য একটা খবর নিয়ে এল। বনটার শেষ প্রান্তে কেউ ঠিক আমাদের মতো আর একটা আবাস গড়ে তুলছে। বিকেলে একজন বাবার বয়সী লোক এল। ফতুয়া গায়ে। সে খুব আপনজনের মতো কথাবার্তা বলছিল। বাবাকে ঠাকুর কর্তা ডাকছিল। বাবা তাকে তামাক খাওয়াল এবং এমন একটা জায়গা লোকটা আবাস নির্মাণের জন্য নির্বাচন করেছে জেনে খুব খুশী। মাকে কর্তামা কর্তামা করছিল। মা-ও বেজায় খুশী। কারণ যেন বোঝা যাচ্ছিল, এই ব্রাহ্মণ পরিবার দেখেই লোকটির এখানে আসা। সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে গঙ্গা-পাড়ে আসা। পালা পার্বণে যদি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে বেঁচে থাকার আনন্দ থাকে না। ঠিক হল পরের শনিবারে শনিপুজো করবে লোকটা। নাম বলল নিবারণ দাস। বাবার একজন যজমান পাওয়া গেল তবে।

শনিবারের জন্য আমাদের কি যে তখন প্রতীক্ষা। মা-ও শনিপুজো একটা না করলে হয়না এমন বায়না ধরলে বাবা বলল, হবে হবে। সব হবে। আগে একটা পঞ্জিকা কেনা দরকার। পঞ্জিকা না হলে পুরুত মানুষের মান সম্মান থাকে না।

শনিপুজার দিনে বাবা বেশ বিকেলেই আমাদের নিয়ে রওনা দিল। কতকাল পর আমরা আবার সম্মানিত মানুষ। আমাদের জামা প্যান্ট খারে কাচা হয়েছে। কালীর পুকুরে মা সারা দুপুর আমাদের ছেঁড়া তালিমারা যা জামাকাপড় ছিল সব ধুয়ে ঘাসের ওপর শুকুতে দিয়েছে। পাহারায় থেকেছি আমি। গরুটা দূরে ঘাস খাচ্ছে। ব্যারেক বাড়িতে একজন মানুষের গলায় রামাহৈ রামাহৈ চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। ও-পারে সব পুলিশ কোয়ার্টার। ওরা কেউ কেউ ঘাটে স্নান করছিল। বাবা যে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিশ্বাস হয়নি। দেশ ছেড়ে সবাই চলে এসে মুচি মেথর ঘোষ বোস লাগাচ্ছে। বাবা যে তেমন একজন কেউ নয় কে জানে। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছিল না। এবং বাবা যখন দূরের কোনো গাঁয়ে, দশবিশ ক্রোশ দূরের গাঁয়ে কোনো পূজো পার্বণ সেরে মাথায় পুটুলী নিয়ে আসত প্রায়ই দেখেছি সোজা পথে না এসে সেই ট্রেনিং ক্যাম্পের ভেতরের রাস্তায় ঢুকে যেত। বেশ অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয় তবু কোনো সুবেদার হাবিলদার দেখলে বুঝি টের পাবে মানুষটা আসলে জাত ভাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু এত সব সত্বেও এদের কোনো পালা পার্বনে বাবার ডাক পড়েনি। বাবার ধারণা একটা পঞ্জিকার অভাবেই এটা হচ্ছে। পঞ্জিকাটা থাকলে দিনক্ষণের শুভাশুভ জানতে ঠিক ওরা আসত।

রাস্তাটা বেশ মনোরম লাগছিল। কখনও আমি এদিকটায় আসিনি। ছোট ভাইটাকে বাবা কাঁধে নিয়েছে। কিছু শিরিশ গাছ আর বনের ভেতর দিয়ে একটা সোজা পথ নিমতলার কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে। কত সব যে গাছ পালা এবং বেশ নিরিবিলি ছায়া, তার ভেতরে ঢুকে গেলে চারপাশে দেখা যায় শুধু সবুজ এক অন্ধকার। এই বনের ভেতরই পর পর কটা খেঁজুর গাছ। গাছে হাঁড়ি পাতা। দূরে বাদশাহী সড়কের কাছে আছে চার পাঁচ ঘর বাগদি। ওদের বোধহয় গাছগুলো। এবং এইসব গাছের জন্য সকাল বিকেল; কখনও কখনও ও অঞ্চলে মানুষের সাড়া পাওয়া যায়।

বাবা অনেকটা আগে চলে গেছে। গায়ে নামাবলি। কতদিন পর বাবা নামাবলি

গায়ে দিয়েছে। বাবাকে আমাদের খুব এখন ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। পিলু পর্যন্ত বাবার কথা শুনছে। সে বাবার নাগাল কিছুতেই ছাড়ছে না। আমার গায়ে হাফসার্ট। পা খালি আমাদের সবার। বেশ উঁচু নিচু পথ। দুপাশের সব ঝোপ জঙ্গল রাস্তা ঢেকে রেখেছে। কিছুটা প্রায় লাফিয়ে যেতে হচ্ছে কখনও। নীল সব কুর্চি ফুলের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। মনে হল পিলু এ-সব অঞ্চলে ঘুরে গেছে। সে-ই সব খবর দিচ্ছিল আমাকে। বলল, ডান দিকে ঐ যে দেখছিস, দেখতে পাচ্ছিসনা দাদা, বড় বড় দুটো বাঁশঝাড়, ওপাশে গেলে একটা পোড়ো বাড়ি আছে। তারপর আছে তোর কারবালা, পরে মাঠ, রেললাইন। কারবালায় তোকে একদিন নিয়ে যাব। ইঁটের ভাটা আছে একটি। নবমী বলে একটা বুড়ি থাকে। কচু বনআলু সেদ্ধ করে খায়। কোনো দুঃখ নেই। লোক দেখলেই ফোকলা দাঁতে হাসে, ওমা তুমি কেগা। সুমার বনে একা ঘুরে বেড়াচ্ছ।

আমার ভাল লাগত না। পিলুর বেজায় সাহস। কোনো বনের ভেতর বুড়ি থাকলে ডাইনী বুড়ি না হয়ে যায় না। মাকে বলেছিলাম, মা পিলু কোথায় না কোথায় যায়। বুড়িটার কথা বলেছিলাম। বুড়িটা যদি পিলুকে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখে।

পিলু বলেছিল, জানিস দাদা, বুড়িটার দুটো বড় ছাগল আছে। কত বড় শিং। মাকে বলেছিলাম, মা, বুড়িটা দেখবে পিলুকে বাঁদর বানিয়ে রেখে দেবে। মা বলত, মানুষ কখনও বাঁদর হয়।

—কত তুকতাক জানতে পারে।

মা হাসত। বাবা এলে বলত, বিলুটা খুব ভীতু স্বভাবের। কি বলছে শোন। আমরা হেঁটেই যাচ্ছি। রাস্তা আর শেষ হচ্ছে না। বন বাদাড়ের রাস্তা বুঝি কখনও শেষ হতে চায় না। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। এত ঘন গাছপালা যে মাথার ওপরে আকাশ আছে বোঝা যাচ্ছিল না। দিনের বেলাতেই গা ছম ছম করছে। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কেমন ভয় লাগছিল। রাতে আমরা ফিরব কি করে। যদিও বুঝতে পারছিলাম এ-সব বলা যায় না। বাবা খুব গুরু গম্ভীর গলায় বলবে, তুমি বামুনের ছেলে। তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। বাবার কিছু দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যেমন সব ভূত প্রেতের কথায় এলে বাবা অনায়াসে বলবে, বামুনের বাচ্চা, কেউটের বাচ্চা এক। সবাই ভয় পায়।

পিলু বাবার কাছাকাছি হাঁটছে। মায়া মাঝখানে। সবার শেষে আমি। মাঝে মাঝে কতদূরে আছি বাবা ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল। ছোট ভাইটা এমন একটা রাস্তায় আসতে পেরে খুব দাপাচ্ছে বাবার কাঁধে। মাঝে মাঝে ডাকছে, হাত দিয়ে, দাদা আয়। ভাইটা দুটো একটা কথা বলতে শিখে গেছে। পিলু বাবার পেছনে ভাইটার সঙ্গে কত সব রাজ্যের কথা বলে চলেছে। এবং একসময় সুখী পরিবারের মতো সে বাবার কাছ থেকে ভাইটাকে নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। ভাল ফাঁকা রাস্তা দেখলেই হাত ধরে হাঁটিয়ে নিচ্ছে। বাবার ডান হাত ধরে রেখেছে মায়া। সে পুজোর সব খেয়ে নেবে বলছে। পেট ভরে সিন্নি খাবে, মুড়ি খাবে, নারকেল বাতাসা খাবে, যেন এমন অতীব এক ভোজন কতকাল পরে প্রায় উৎসবের মতো এসে গেছে।

আমি জানি, বাবা, আজ ভারি তন্ময় হয়ে যাবে পুজোয় বসে। বেশ নিয়ম নিষ্ঠা, যা দেখলে নিবারণ দাস আখেরে আর সাহসই পাবেনা, পুজো পার্ব্বনে অন্য বামুনের কথা ভাবতে। একেবারে বাবা যেন আত্মীয়ের মতো অথবা পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ, পুজার সুফল কি, কেন এইসব পালাপার্ব্বন, হিন্দু ধর্ম, তার দেবদেবীর কি মাহাত্ম্য এবং পাঁচালী পড়লে গেরস্থ মানুষের যা কিছু ফললাভ বাবা ব্যাখ্যা করে যাবে।

পিলু বলল তখন, দাদা যাবি?

—কোথায়।

-কারবালাতে।

—আমার ভয় করে।

—ভয় কিরে!

—ওখানে মুসলমানদের কবরখানা আছে।

—তাতে কি!

—কত সব মানুষের কংকাল।

—তুই দেখেছিস?

—দেখব কি করে?

—তবে! শেষে সে অভয় দেবার মতো বলল, একটাও থাকে না। শেয়ালেরা সব খেয়ে নেয়। সে একবার একটা শেয়ালকে মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছিল। প্রায়, যা বর্ণনা পিলুর, বাঘ টাঘের সামিল। সে কিছুদূর পর্যন্ত শেয়ালটার পেছনে দৌড়চ্ছিল। এবং বনের ভেতর ঢুকে যেতেই ভারি একা মনে হয়েছিল নিজেকে। আর বোধ হয় ভয় ভয়ও করছিল। দাদা সঙ্গে থাকলে অন্তত সেটুকু থাকত না। এবং এ-জন্যই মাঝে মাঝে তোষামোদ দাদাকে—যাবি দাদা। কত রকমের সব ফলের কথা, এবং বড় বড় বন-আলু তুলে আনা যায়—এক একটা আলু পনেরো বিশ সের ওজনে। একবারতো সারাদিন পিলুর দেখা নেই। মা বার বার বলছিল, কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবার সাদাসিধে কথা। গেছে কোথাও—ঠিক চলে আসবে। সকালে পিলু কিছু না খেয়ে বের হয় সেদিন। মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে। মা রেগে গিয়ে খেতে দেয়নি কিছু। রাগের মাথায় যদি একটা কিছু করে ফেলে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। মা না খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—আমিও কতবার ডাকাডাকি করেছি। বাড়ির মাঠে এবং বাদশাহী সড়কে উঠে দেখে এসেছি। নেই।

মা তখন প্রায় ভেউ ভেউ করে কেঁদেই দিত। মায়া এসে বলল, ছোড়দা আসছে। ছোড়দা মাথায় কি একটা অতিকায় বহন করে আনছে। কাছে এলে দেখতে পেলাম অতিকায় বন-আলু। প্রায় হাতির সাদা দাঁতের মতো। মার যত রাগ, নিমেষে উবে গিয়েছিল।—এতবড় বন-আলু মা জীবনেও দেখেনি। প্রায় দুহাতে মাথা থেকে নামাতে গেলে পিলুর প্যান্ট হর হর করে নেমে গেল পেট থেকে। কিছু খায়নি বলে পেটটা কোথায় চলে গেছে। হাতে পায়ে মুখে—শরীরের সর্বত্র মাটি কাদা এবং সেদিন ওকে পুকুর পাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বাংলা সাবানে শরীর পরিষ্কার করে দিয়েছিল। একটা আলুতে আমাদের কতদিন চলে যাবে। খেতে বসে পিলুর সাম্রাজ্য জয়ের কথা শুনতে শুনতে মা কেবল চোখের জল ফেলেছিল। বাবার মতো পিলুকে সেই থেকে কেন জানি মাঝে মাঝে আমার ভারী সমীহ করতে ইচ্ছে হত।

বাবা বলল, এসে গেছি।

বনটার শেষ। এদিকেও সেই বাদশাহী সড়ক ঘুরে এসেছে, এবং বোঝাই যায় পূর্ব উত্তর, কিছু দক্ষিণও এই বড় বনটাকে একটা হাঁসুলির মত ঘিরে রেখেছে। ঠিক রাস্তার ধারে দুটো দোচালা টিনের ঘর। উত্তর পশ্চিম বলে, সকালের সবটা রোদই বাড়িটা পায়। সাঁঝ লেগে গেছে। আমাদের দেখে নিবারণ দাস হাত জোড় করে ছুটে আসছে। ভাইকে নিয়ে একটা জলচৌকিতে বসিয়ে দিল। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখেছে বারান্দায়। খোলা উঠোনে বেশ বড় একটি গামলায় দুধ, চালের গুড়ো সাদা পাথরে। নিবারণ দাসের দুই বৌ, মা, ছেলেমেয়ে আট দশটি। ওরা বেশ পরিষ্কার জামা গায়ে দিয়ে আছে। বড় মেয়েটি শাড়ি পরেছে। চপ চপ করে প্রথমে বাবাকে, তারপর আমাকে, পিলুকে, লুটের বাতাসার মতো প্রণাম করতে থাকল। ভারি মজা লাগছিল। পিলু দেখলাম মুখ বেশ গম্ভীর করে রেখেছে। ওর জামার নিচে প্যাণ্ট, প্যাণ্টে দড়ি পরানো নেই, পরিয়ে দিলেও থাকে না। মা হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন পিলু এত গম্ভীর যে মনে হয় দম বন্ধ করে আছে। দম আলগা করে দিলেই হড় হড় করে প্যাণ্ট একেবারে নিচে না নেমে যায়। ভাগ্যিস বড় মেয়ে কিরণী আমাদের বারান্দার একপাশে একটি সতরঞ্চ দিল বসতে। তাড়াতাড়ি পিলুকে টেনে নিয়ে সতরঞ্চিতে বসিয়ে দিলাম। যেন আমরা সবাই নিরীহ-মানুষের মতো বসে থাকার সময় দেখলাম, সেই নিবারণ দাসের মা লাঠি ঠুকে এদিকটায় আসছে। হ্যারিকেন তুলে আমাদের মুখ দেখছে। তারপর লাঠি পাশে রেখে মাথা ঠুকছে দাওয়ায়।

বাবা পদ্মাসনে বসে আছে। আমরা তার সন্তান বোঝাই যাচ্ছিল না। আমরা কি করছি, কি-ভাবে আছি, একবারও দেখছে না। কেবল পূজোর ফুল নৈবেদ্য, ঘট, আমের পল্লব, সিঁদুরের থান, এসব নিজের কাজের যা কিছু তখন দরকার সব কাজ ভারি নির্ভুলভাবে করছে। নিবারণ দাস বাবার পা ধুইয়ে দিয়েছে জলে। পা মুছে দিয়েছে। এত বড় মানুষটা এ-ভাবে বাবাকে সমাদর করতেই বোধ হয় পিলু পর্যন্ত ভাল ছেলে হয়ে গেছে। একটা কথা বলছে না।

চারপাশে আর কোনো লোকালয় নেই। দূরে, এই কিছু জমি পার হয়ে গেলে একটা সড়ক সোজা বাদশাহী সড়ক অতিক্রম করে রাজবাড়ির দিকে চলে গেছে। চৌমুখিতে বড় পাটের আড়ত। কিছু পাট বোঝাই গরুর গাড়ি। বারান্দায় হ্যাজাকের আলো। এখানে বসেও দেখা যায় পাটের আড়তে কাজকর্ম হচ্ছে।

নিবারণ দাস বলল, পাটের আড়ত দেব ভেবেছি কর্তা। কেমন হবে।

চারপাশে বাবা ফুল চন্দন ছিটিয়ে দিচ্ছিল। বেশ পূজা পূজা গন্ধ সারা বাড়িটাতে ম ম করছে। বাবা ভারি নিপুণ গলায় বলল, লক্ষ্মী আপনার বাঁধা দাস মশাই। যাতে হাত দেবেন সোনা ফলবে। বাবার কথা অমৃত সমান ভেবেছে নিবারণ দাস। আমার কেবল মনে হয়েছিল, আমাদের জন্য বাবা কেন এমন আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নেয় না। কত সহজে বাবা নিবারণ দাসকে অমৃত সমান কথা বলে দিতে পারল। আমার বাবা বেশ সুশ্রী মানুষ, লম্বা এবং কিছুটা গৌরবর্ণ। আর বাবার এত অভাবের ভেতরও শরীর বেশ কোমল. এবং মাথা ঠিক রাখতে পেরেছে। বাবাকে কে কি দিল। এই যে শনির পূজো, একটা বড় গামছা দিতে পারত নিবারণ দাস। কত না জানি দক্ষিণা দেবে। অথচ সে-সব আদৌ বাবা গ্রাহ্য করে না। এবং বেশ সময় নিয়ে পূজো করে গেল, শান্তির জল দিল সবাইকে, সুর ধরে পাঁচালী পাঠ করল, সবাইকে প্রসাদ মেখে সিন্নি, চাল কলা, আমাদেরও হাতে হাতে দিল। কাউকে বেশি না কম না। মায়া যে রাস্তায় পই পই করে বলেছে, পেটভরে সিন্নি খাব বাবা, সে-সব যেন বাবা একেবারেই ভুলে গেছে। এত কমে এত বেশি পুণ্য হয় না। আমার বাবাটা যে কি!

পিলু পর্যন্ত দুবার চাইতে পারল না।

দাসের মা বলল, কর্তা প্রসাদ এত খাবে কে!

বাবা বলল, আসবে। মানুষজন আসবে। এলে দেবেন। প্রসাদ নামমাত্র।

আর দক্ষিণা মাত্র পনের পয়সা। পনেরটা পয়সাই তামার। তামার পয়সা কটা, এবং ভোজ্য দ্রব্য বলতে সামান্য চাল, দুটো বেগুন, একটা হরিতকী, ছোট ছোট সাদা জরুলের মতো গোটা তিনেক আলু। এই সামান্য পাওনার বিনিময়ে লোকটাকে কত বড় কথা বলে গেল। বাবা যখন উঠবে উঠবে করছে, নিবারণ দাস বলল, এরাতো কিছুই খেল না।

৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন
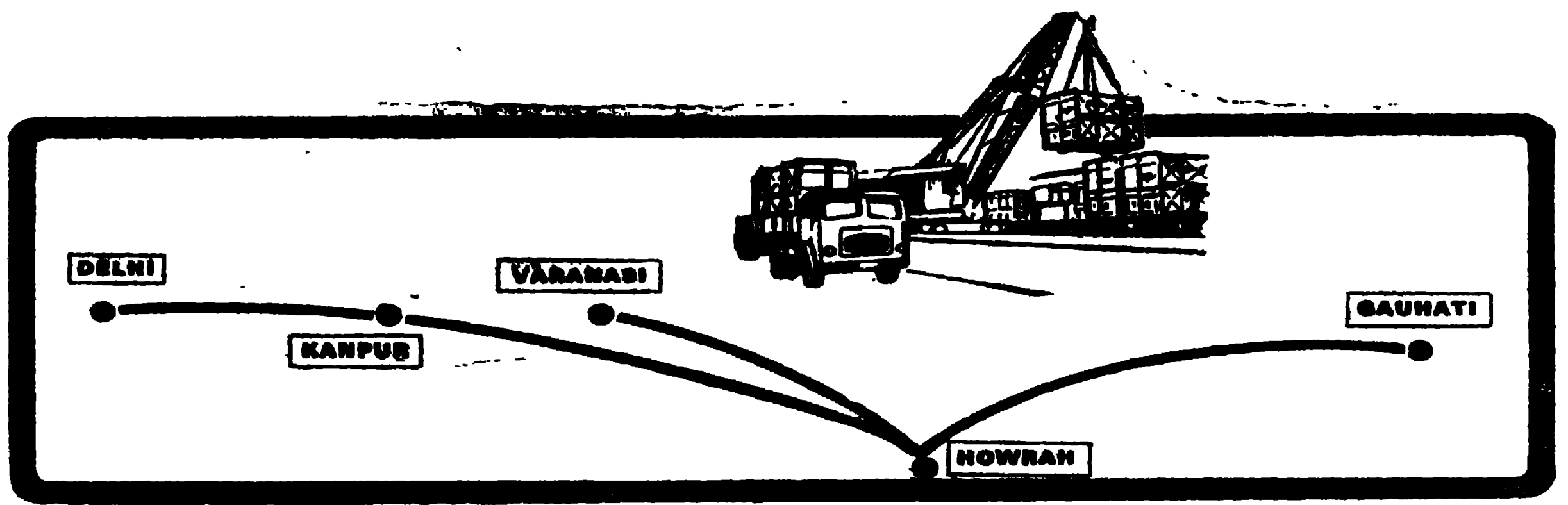
গ্রামগঞ্জ আর পিছিয়ে নেই

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস
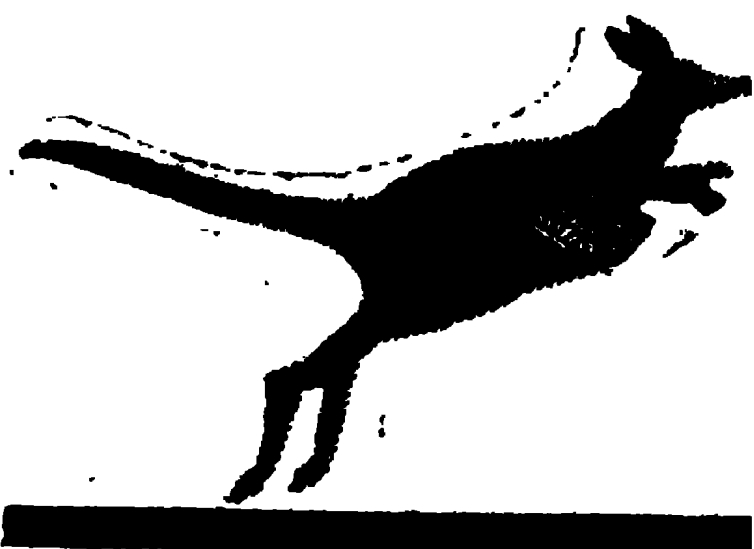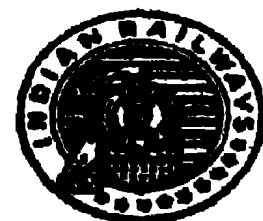
'ফিরে চল মাটির পানে যে মাটি আঁচল পেতে তাকিয়ে আছে মুখের পানে'। সেই মাটির টানে আজ গ্রামে ফিরে যাবার ডাক এসেছে। সেখানে গ্রাম উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন চাষী, মজুর, কারিগর, সবাই।

গত মাসে গিয়েছিলাম পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর এলাকায়। রুক্ষ লাল পাহাড়ে মাটি। চাষীরা দলবদ্ধ হয়ে দরবার করতে এসেছেন ব্লক অফিসে, তাঁদের গ্রামে এগ্রো সারভিস সেন্টার চাই তাহলে ভালবীজ, কীটনাশক, সার পাবেন ন্যায্য দামে, হাতের কাছে। প্রয়োজনে ভাড়া পাবেন ট্রাক্টর পাওয়ার টিলার ও স্প্রেয়ার। ঐ গ্রামের চাষী বলাই মাহাতো, শক্ত সবল যুবক, আদুল গা, কোমরে গামছা প্যাচানো—বললেন, এইযে জমিটা এটায় এবার চীনাবাদাম চাষ দেব। গতবার ভাল ফলন পেয়েছি। জলের বড় অভাব আজ্ঞা। আশার কথা পুকুর কাটা হচ্ছে ইন্দারাও হচ্ছে একটা। তা থেকে সেচের জল পেলে বলাই তাঁর জমিতে সোনা ফলাবেন।

শহর ছেড়ে সম্প্রতি যাঁরা গ্রামে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন কৃষি ক্ষেতে সামগ্রিক কর্ম ব্যস্ততা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার পার হচ্ছে। গরুর গাড়ি চেপে বড় পাম্প মেসিন চলেছে ক্ষেতে জল সেচ দিতে। ফেরার পথে ঐ গাড়ি করেই মাঠ থেকে ধান, পাট, কলাই বা ভুট্টা বোঝাই হয়ে বাড়ি ফিরছে চাষী। গত কবছর আগেও ধান ক্ষেতে মাজরার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসে হা হুতাশ করতেন। সেই চাষীকেই এখন দেখি ব্লক অফিসে ছোটাছুটি করে চাষবাবুর পরামর্শে কীটনাশক ছড়িয়ে মাজরা কেন তাবৎ পোকা মাকড় সাবাড় করছেন। সার কীটনাশক প্রয়োগ দেখে যারা সর্বনাশের নোটিশ দিয়েছিল—তারাই এখন জিব কামড়ে বলছে—না হে মোড়ল চাষবাবুরা যে ভেলকি দেখাল। একদিকে তিনগুণ ফসল ফলিয়ে, অন্যদিকে বছরে একই জমি থেকে তিন চারটা ফসল তুলে।

সার, বীজ, কীটনাশক গ্রামে এসব একটা বড় সমস্যা নয় আজ। কৃষির বড় সমস্যা সেচের জলের। 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' বলে—আকাশের দিকে তাকিয়ে আর কতকাল চাষীরা চাষ করবেন। সময়মত জল সরবরাহ করতে পারলে উৎপাদন বাড়ে শতকরা তিরিশ ভাগ। আবার জলের অভাবে গোটা শস্যটাই মার যেতে পারে। কাজেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, খাল পরিকল্পনা, গভীর নলকূপ পরিকল্পনা, নদীথেকে জল উত্তোলন পরিকল্পনা প্রভৃতির সাহায্যে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গঞ্জে অগভীর নলকূপের তো এখন ছড়াছড়ি। তবুও অনেক জমি জলের অভাবে অনাবাদি পড়ে থাকছে। শুকনো জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের বিরাট এলাকায় এ সমস্যা বড়ই প্রকট। এজন্য গঠিত হয়েছে মাইনর ইরিগেশন করর্পোরেশন, ওয়াটার বোর্ড। ছোট খাটো সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে আরো বেশি চাষের জমিতে ফসল ফলান যায়। এসব দেখে চাষীদের মনে আশা জেগেছে। অনেক শুকনো মুখে হাসি ফুটেছে। রুক্ষভূমি হচ্ছে শস্য শ্যামলা।

বর্ধমানের মশাগ্রামের চাষী গদাধর সামন্ত একটুকরো জমির পাট্টা পেয়ে সেদিন আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। বললেন—একটুকরো সোনা পেলাম। সামান্য ক্ষেতমজুর। চিরকাল অন্যের জমিতে ভূতের বেগার খেটেছে। নিজের জমি বলতে এক ছটাকও নেই। সরকার আমার মত হতভাগাকে জমি দিলেন। হাতে স্বর্গ পেলাম, চাঁদ পেলাম। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সাত মাসের মধ্যেই ৯৭ হাজার একর কৃষি জমি ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদের দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এসময়ে ১০ হাজার একর জমি বাড়ী তৈরী করবার জন্য বিলি বন্টন করা হয়েছে। হাজার হাজার গদাধরের মুখে হাসি ফুটেছে। ব্যাপারটি যে এত সহজে হয়েছে তা মোটেই নয়। বাধা এসেছে বহু ভাবে। বহু জোতদার নানা কারসাজি করে গদাধরদের বঞ্চিত করতে এগিয়ে এসেছে। সরকারের কানে এসেছে সেসব কথা। ব্যবস্থা হচ্ছে তার।

প্রায় ৯ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক এরাজ্যে জমি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তপশিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি। যাতে এসব জমি চাষের জন্য উন্নয়ন করতে পারেন চাষীরা তারজন্য তাঁদের সহায়তা দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের একটি সংশোধনের সাহায্যে এসব জমি হস্তান্তরের অযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুন আইনে বর্গাদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা হয়েছে। বে-আইনী বর্গাদার উচ্ছেদ এখন আদালতগ্রাহ্য অপরাধ। বর্গাদাররা উত্তরাধিকার পরম্পরায় এসব জমি চাষ করতে পারবে। বর্ধমানের অন্য এক গ্রামে এখবর যখন

গুজরাটের গ্রামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ বণ্টন করা হচ্ছে

বর্গাদারদের মধ্যে পৌঁছাল তখন তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে নাচতে শুরু করল।

প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটি অন্যতম দফা ভূমিহীন ও অভাবী দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য সতবজমি ও বাড়ির বন্দোবস্ত করা। কত দুঃখী মানুষ একটুকরা মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে চিরকাল যাযাবরের বসত জীবন কাটাচ্ছিল। গৃহহীন এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য বসতজমি ও বাড়ি করে দেবার এক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর বাস্তহীনদের বাস্তজমি দেবার সময়সীমা ছিল গান্ধীজীর জন্মদিন ২ অক্টোবর ১৯৭৫। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ আগ্রহে এ সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই ৩ লক্ষ ২ হাজারের উপর বাস্তুহীনকে জমি বিলি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই এসব জমিতে ৪০ হাজার গৃহ তৈরী হবার কথা। গৃহহীনরা ঘরের খুঁটি-বেড়া জোগাড় করবেন নিজেরাই। গৃহনির্মাণে কায়িক পরিশ্রমও দিতে হবে তাঁদের। প্রকৃত পক্ষে নিজের ঘর নিজে তৈরী করবেন গৃহহীনরা। সরকার প্রতি গৃহের চাল বা ছাদ তৈরীতে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা সাহায্য দেবেন। এভাবে গৃহহীনরা নিজেরাই তাদের নিজ-হাতে কাঁচা ঘর খাসা করে গড়বেন।

মানুষ মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখে, এ পরিস্থিতির, কথা আজকের আধুনিক মানুষ ভাবেন কি করে? অথচ এই ক্রীতদাস প্রথাই পরবর্তী কালে বেগার শ্রমপ্রথায় পরিবর্তিত হয়। এদেশে বেগার শ্রম দাসত্ব প্রথার মূল কারণ হল অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। চিরকাল বেগার খেটে শোধ দিতে হবে বিত্তের বিনিময়। আমরা গর্বিত যে পশ্চিমবঙ্গে বেগার প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য রাজ্যে এ অমানবিক প্রথা চালু ছিল। প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচী অনুযায়ী এই বেগার প্রথা রদ করা হয়েছে।

গ্রামীণ মহাজনী ঋণ গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং কারিগরদের একেবারে অক্টোপাশের মত ঘিরে ধরেছিল। অনাবৃষ্টি-অতিবর্ষণে ফসল নষ্ট। সুতরাং চাষী মহা-জনের খপ্পরে পড়লো টাকার জন্য। জমি, বাড়ী বাঁধা রেখে দুশো টাকা ঋণ নিয়ে কাগজে কলমে চারশো টাকা লিখে দিয়ে এল। চাষী হাতে পায়ে ধরে বললেন—দুশো টাকায় বছরে দুশো টাকা সুদ! মরে যাবো কর্তা ওটাকে একশো টাকা করুন।

লোভী মহাজনদের হাত থেকে এই অসহায় ঋণগ্রস্তদের পরিত্রাণের জন্য এল পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ঋণ ত্রাণ আইন ১৯৭৫। উদ্দেশ্য মহাজনী ঋণের আওতা থেকে অসহায় অভাবী ঋণগ্রস্তদের অব্যাহতি দেওয়া। একটি সরকারি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এতে ৩৪ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের ৩৫ কোটি টাকা ঋণের পুরোপুরি মুকুব এবং ২১ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের ৩২ কোটি টাকা ঋণের ক্ষেত্রে আংশিক মুকুব ঘটবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। নিশ্চিত-ভাবে এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। একজন চাষী মন্তব্য করেছেন—আমি ব্যাপারটা শুনে একেবারে চমকে যাচ্ছি, তবে আশংকা হচ্ছে, সহজে ঋণ পাবো আমরা কোথা থেকে? উত্তর এসেছে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দেবে, সরকার এগিয়ে আসবেন ঋণ দিতে।

গতমাসে কৃষ্ণনগর থেকে আসছিলাম লোকাল ট্রেনে কলকাতায়। সকাল বেলা হাজার কয়েক ক্ষেতমজুর চলেছেন কাজের সন্ধানে। এক একটা ষ্টেশন এলেই এক একটি দল নেবে যাচ্ছে। বেথুয়াডহরি ও রাণাঘাটে সবচেয়ে বেশি নাবল। আউস ও পাট নিড়ানীর কাজ এখন। অনেকেই তাঁরা মজুরী আইনের কথা শুনেছেন। দু একজন বললেন—নাস্তা খাবার জল খাবার নিয়ে মোটামুটি হয় আবার কমও হয়। সর্বনিম্ন মজুরী আইন অনুসারে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক কৃষি শ্রমিক মোট ৬ টাকা ৬৩ পয়সা পাবেন। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃষি শ্রমিদের জন্য ধার্য হয়েছে মোট ৪ টাকা ৭৪ পয়সা। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ আর এক ধাপ এগিয়ে আছে। প্রাপ্তবয়স্ক কৃষি শ্রমিক পাবেন এখানে ৮ টাকা ও অপ্রাপ্ত বয়স্করা পাবেন ৫ টাকা ৮২ পয়সা। খবরটা সেদিন বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল ট্রেনে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শ্রমদপ্তর ১৯৭৫ সালে ক্ষেত মজুরদের

সর্বনিম্ন মজুরী বেঁধে দিলেন। সেই সঙ্গে নারী ও পুরুষের সমান হারে মজুরীরও ব্যবস্থা করে দিলেন। এই আইন বলবৎ হবার পর রাজ্য শ্রমদপ্তর সমীক্ষা করে দেখেছেন—যে আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও শতকরা প্রায় ৯০ জন ক্ষেতমজুরই সর্বনিম্ন মজুরীর খবর রাখেন না। এর প্রতিকারের জন্য সরকার জেলায় জেলায় ব্লকে তদারকির ব্যবস্থা করেছেন।

এছাড়া সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আদিবাসী, তপশিলী সম্প্রদায় ও পাহাড়ে-উপজাতির উন্নয়নের জন্য সরকার নিয়েছেন নানা-প্রকল্প। উন্নয়নের বার্তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দিতে এবং সমাজের অবহেলিতদের সামিল করতে চাই সময় ও সকলের সহযোগিতা। সরকারী বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই।

কৃষির পরেই আমাদের গ্রামের মানুষের বেশীর ভাগ লোকের জীবিকা তাঁত। ভারতের প্রায় ১ কোটি লোক দেশের সবচেয়ে বড় এই কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িত। শুধু জীবিকার প্রশ্ন নয় চিরন্তন গ্রামীণ ভারতের ঐতিহ্য এই তাঁত। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা এনেছে ১১১ কোটি টাকা। আমেরিকা, কানাডা ও পশ্চিম দুনিয়ায় আমাদের তাঁত বস্ত্রের কদর দিন দিন বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ তাঁতে প্রায় ৫ লক্ষ শিল্পী বর্তমানে নিযুক্ত। এখন মেদিনীপুর, বসিরহাট, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ধনেখালি ও পশ্চিম দিনাজপুরের তাঁত শিল্পীদের মুখে হাসি। কারণ গ্রাম উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে তাঁতশিল্পীদের জন্যও নেয়া হয়েছে কয়েকটি ব্যবস্থা। তাঁতশিল্পের নিবিড় উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী এরাজ্যে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটিতে ৫ হাজার করে তাঁত থাকবে। এছাড়া ৪ হাজার তাঁত নিয়ে নতুন ১৩৭ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে।

নতুন পাওয়া বাস্তুভিটায় নিজের হাতে তৈরী সুখী গৃহকোণ

বাঁকুড়ার সোনামুখীর আদিবাসী ক্ষেত মজুর রেণুকার সাধছিল একখণ্ড চাষের জমি। মাঠের পারে ছোট কুঁড়ে ঘর। ঘরের পাশের খালি জমিতে সে নিজেই করবে সবজি ক্ষেত। সারাদিন ক্ষেত খামারে খেটে এসে সবজি বাগান দেখে তাঁর মন তরতাজা হয়ে উঠবে। রাত বিরেতে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না তাকে। টপাটপ সবজি বাগান থেকে বেগুন, লঙ্কা, বরবটি তুলে কুটুমদের খাবার দেবে। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলা মানুষটা বুধু এসে চমকে যাবে। এতসব কি করে করলিরে রেণুকা। বুধু, রেণুকা ও তাদের দুই ছেলে নিয়ে ছোট্ট সংসার। রেণু-বুধু দুজনেই ক্ষেত মজুর। অন্যের বাড়ির মাঠের এক কোণে থাকত। যা মজুরী পেত তাতে চলেনা। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই রেণু-বুধুর চিরকালের স্বপ্ন, এক টুকরা চাষের জমি, ছোট একখানা কুঁড়েঘর ঘরের পাশে সবজি বাগান। সোনামুখীর বুধু-রেনুকার স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। গত বড় পূজার পর পেয়েছে এক বিঘা চাষের জমি। ৬ কাঠা বাস্তু জমি। তাতে কুঁড়ে ঘর বানাবার জন্য বুধু বেড়া, খুঁটির জন্য বাঁশ-কাঠ জোগাড় করেছে। চাল করার জন্য ব্লকবাবুরা টাকাও দেবেন। সেদিন ব্লকের একবাবু বলেছিলেন—সুসংবাদটা—এখন থেকে বুধু-রেণুদের ক্ষেত মজুরী বেড়ে ৮ টাকা হয়েছে। প্রথমে বুধুর একটু দ্বিধা ছিল। একদম বিশ্বাসই করেনি। 'মরদ-মেয়ের মজুরী সমান নাকিরে। তুই আমারে ভরকি দিচ্ছিস। বোকা ভাবসিস।' 'নারে না। ব্লক বাবুরা নিজে মুখে বলেছে' তবুও রেণুকার বিশ্বাস হয়না। শেষে সবাই যখন কবুল করল, রেণুকা বললো—কিন্তু....। সেদিনই তাঁরা দুজনে মোট ১৬ টাকা মজুরী পেল ব্লক থেকে।

ভূমি সংস্কারে নতুন গতি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রীর নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে ভূমি সংস্কারের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই মুখ্যমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে (মার্চে অনুষ্ঠিত) স্বীকার করেছেন ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব মোটেই নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বারবার বলা হয়েছে ভূমি সংস্কারের কথা। তবু যে প্রধানমন্ত্রীর বিশ-দফা কর্মসূচীতে ঐ প্রশ্নটিকে বিশেষ ঠাঁই দিতে হলো তার কারণ, এ বিষয়ে কথা যতোই বলা হোক না কেন এই ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কানুনকে কাজে রূপায়িত করা হয় নি ঠিকমতো। কেন হয় নি? শ্রীমতী গান্ধী তার দুটি কারণের উল্লেখ করেছেন। প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্যই, ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব ঠিকমতো উপলব্ধি করা হয় নি। আর দ্বিতীয় কারণ, কায়েমী স্বার্থের বাধা।

ভারতের মতো যে-সব উন্নয়নশীল দেশকে বিরাট জনসংখ্যার বোঝা বইতে হয় সে সব দেশে সাধারণত দেখা যায়, জমি বন্টনের ব্যাপারে রয়েছে বিরাট বৈষম্য। কিছু লোকের হাতে রয়েছে অধিকাংশ চাষের জমি, অথচ বিপুল সংখ্যক লোকের কোনো জমিই নেই। অথবা যদি থাকে তবে তার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। আমাদের দেশে চাষের জমির মালিকানার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষাতেই ধরা পড়েছে। এর ফল হয়েছে কি, প্রকৃত চাষীদের মধ্যে অনেকে চাষের জমির মালিক না-হওয়ায় চাষের কাজে তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এগোন নি, আর সেই কারণেই চাষবাসের ক্ষেত্রে প্রার্থিত গতির সঞ্চার হয় নি। দ্বিতীয়ত, এর ফলে গ্রামাঞ্চলে একটা উত্তেজনা ও অসন্তোষের ভাব বজায় থেকেছে এবং মতলববাজ লোকেরা সেই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার তো বটেই, এমন কি বিভিন্ন রাজ্য সরকারও এই নীতি মনে নিয়েছেন যে, 'লাঙল যার মাটি তার'। এই নীতিরই স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং সুরু হয় চাষের জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার উদ্যোগ। এই সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে আইনও তৈরি হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেই সব আইন কার্যকর করার ব্যাপারে উৎসাহ যথেষ্ট দেখা যায় নি। তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার ছিল। এক-একটি রাজ্য নিজেদের সুবিধেমতো আইন তৈরি করেছে। এ-ব্যাপারে কোনো জাতীয় নীতি ছিল না। আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকরও ছিল। সুযোগ-সন্ধানী লোকেরা সেই সব ফাঁককে কাজে লাগিয়ে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত আইন ফাঁকি দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। অন্য দিকে আদালতে মামলা দায়ের হওয়ার ফলেও হাজার হাজার একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার কাজ আটকে গেছে।

ভূমি সংস্কারের কাজ ঠিকমতো এগোচ্ছে না দেখে ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রশ্নটির দিকে নতুন করে নজর দেন। ঐ বছরের জুলাইয়ে একটি জাতীয় নীতিও নির্ধারিত হয়। সেই নীতি কার্যকর করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয় বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাকে। এই নতুন নীতি অনুসারে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা আগের তুলনায় অনেক কমিয়ে আনা হয়। সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয় এই রকম: সেচসেবিত দু'ফসলী জমি হলে দশ থেকে আঠারো একর, সেচসেবিত এক ফসলী জমি হলে ২৭ একর এবং অন্যান্য শ্রেণীর জমি হলে ৫৪ একর।

আইনের নানা ফাঁক বন্ধেরও ব্যবস্থা হয়। জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের নিয়ে গঠিত একটি পরিবারকে 'ইউনিট' ধরা হয় এবং ব্যক্তি বিশেষের বদলে এই পরিবার পিছু সীমা নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়। সীমা নির্ধারণের আওতা থেকে যাদের ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেই তালিকাও বেশ কিছুটা ছাঁটাই করা হয়। আরো স্থির হয়, উদ্বৃত্ত জমি বিলির ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে ভূমিহীন চাষীরা, বিশেষত তপশীলভুক্ত জাতি ও আদিবাসীরা। এই নতুন নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্য সরকার পুরোনো আইন সংশোধন অথবা নতুন আইন তৈরিতে উদ্যোগী হন। বিশেষ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এই সব আইন রূপায়ণে একটা নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ঠিক হয়েছে, এই বছর জুনের মধ্যে ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর করা হবে।

ভূমি সংস্কার সম্পর্কে নতুন জাতীয় নীতি নির্ধারিত হওয়ার পর নতুন আইনে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা কীভাবে

বাসন্তীতে জমির পাট্টা বিতরণ করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

কমে গেছে তা কয়েকটি রাজ্যের উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। যেমন অন্ধ্র প্রদেশে আগে সর্বোচ্চ সীমা ছিল জমির ধরণ অনুযায়ী ২৭ থেকে ৩২৪ একর পর্যন্ত। নতুন আইনে ঐ সীমা হয়েছে (পরিবার পিছু) ১০ থেকে ৫৪ একর। হরিয়ানায় আগে ছিল ২৭ থেকে ১০০ একর, এখন হয়েছে ১৮ থেকে ৫৪ একর। কর্ণাটকে পুরনো আইনে সর্বোচ্চ সীমা ছিল ২৭ থেকে ২১৬ একর। আর নতুন আইনে তা কমে গিয়ে হয়েছে ১০ থেকে ৫৪ একর। রাজস্থানে যেখানে পুরানো সীমা ছিল ২২ থেকে ৩৩৬ একর, এখন সেখানে হয়েছে ১৮ থেকে ৫৪ একর (অবশ্য মরু এলাকায় ১৭৫ একর)। এইভাবে সর্বোচ্চ সীমা কমে যাওয়ায় আরো বেশি জমি উদ্বৃত্ত হচ্ছে এবং সরকারের হাতে আসছে বেশি জমি।

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় কতোটা কী কাজ হয়েছে সে বিষয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। যে-সব রাজ্যে গোড়া থেকেই জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা কম করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে পড়ে পশ্চিম বাংলা। ১৯৫৩ সালে তৈরি হয় জমিদারি বিলোপ আইন। ঐ আইনে চাষের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ২৫ একর (ব্যক্তিবিশেষ পিছু)। ১৯৭২ সালে জাতীয় নীতি তৈরি হওয়ার আগেই এই সীমা আরো কমিয়ে আনা হয়। '৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় (জমি অনুযায়ী) ১২.৪ একর থেকে ১৭.৩ একর। এই আইন কার্যকর করার ফলে চলতি বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত ১০,১০,৪৭৬ একর উদ্বৃত্ত জমি সরকারের ওপর বর্তেছে। অবশ্য এর মধ্যে ৯১,১৪৩ একর জমির ব্যাপারে দখল নেওয়ার আগেই আদালত থেকে ইনজাংশন দেওয়া হয়। সরকার যে উদ্বৃত্ত জমির দখল নিয়েছেন তার পরিমাণ হলো ৮,৪৪,৪৯২ একর। দখল নেওয়ার পর আবার অনেক জমির মালিক আদালতের দ্বারস্থ হন। ৬৮,৮৪৯ একর জমির ব্যাপারে আদালত ইনজাংশন দেন। তা ছাড়া দেখা যায়, দখল নেওয়া জমির মধ্যে ১,৪৭,১১৯ একর জমি বিলি করার অযোগ্য। অর্থাৎ জানুয়ারী পর্যন্ত বিলি করার মতো জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,২৮,৫২৪ একর। এর মধ্যে বিলি করা হয়েছে ৬,০৯,০৬৮ একর। ভূমি-হীন ও ছোট চাষীরা পেয়েছেন ৫,৬৯,৯৫৪ একর আর ভূমিহীন লোকেদের বাস্তুভিটা তৈরির জন্যে দেওয়া হয়েছে ৭,৮৮৪ একর। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্যে দেওয়া হয়েছে ৩১,২৩০ একর।

বিশ-দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর পশ্চিম বাংলায় ভূমি সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিত করার দিকে স্বভাবতই বেশি নজর পড়েছে। গত বছর জুলাই থেকে এই বছর জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য সরকার যে উদ্বৃত্ত জমির দখল নিয়েছেন তার পরিমাণ ৫২,৯৬৪ একর। ভূমিহীন ও ছোট চাষীর মধ্যে বিলি করা হয়েছে ৯৭,০৪৩ একর। তা ছাড়া বাস্তুভিটের জন্যে দেওয়া হয়েছে ১০,৯৪১ একর। এই রাজ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিলির ব্যাপারে একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয়। যে-সব ভূমিহীন ও ছোট চাষী উদ্বৃত্ত জমি পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই তপশীলভুক্ত জাতি, আদিবাসী আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। মোট ৮,১৬,৪৩৭ জন পেয়েছেন উদ্বৃত্ত জমি। তাঁদের মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতির লোক ২,৮৬,৩৯১ জন, আদিবাসী ১,৭৫,৮৪৪ জন আর মুসলমানের সংখ্যা ১,৩০,৬২৬ জন।

অবশ্য ভূমিহীনদের জমি দিলেই যে তাদের নিরাপত্তা বেড়ে যায় তা নয়। কিছু জমির মালিক হলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে না। তাই এমন আশংকা থেকে যায় যে, টাকা ধার করার জন্যে তাঁরা সেই জমি মহাজনদের

৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবেশ সেন

“রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল—প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, অনেকেরই একফোঁটা জমি জায়গা নাই, পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে ‘জন’ খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলেই কিংবা অসুখ-বিসুখে কাজ না করিতে পারিলেই সপরিবারে উপোস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের দায়েই হোক অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতিবৎসরই তাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়।” পাঠক জানেন- উদ্ধৃত অংশটুকু শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজ থেকে, পাঠক এটাও জানেন যে, শরৎচন্দ্র সমস্যা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছিলেন—কিন্তু কোনো সমাধান বাতলান নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ—এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন, বাস্তব ও স্থায়ী পথ। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন—গ্রামের এইসব দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য একমাত্র উপায় হ'ল ‘যুক্তি সঙ্গত কম সুদে প্রয়োজন মত কর্জ দেবার ব্যবস্থা করা।” সে চেষ্টাও তিনি করেছিলেন এর ওর কাছ থেকে ধার নিয়ে পাতিসরে কৃষি ব্যাঙ্ক খুলে। নোবেল পুরস্কার বাবদ যে টাকা তিনি পেয়েছিলেন সে টাকাও রাখা হয়েছিল এই ব্যাঙ্কে। কাজও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—“কালিগ্রাম পরগণার মধ্যে বাইরের মহাজনেরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার।”

মলয়

রবীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন প্রয়াস এবং শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ দর্শনের পর বেশ অনেকদিন কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। নানা ক্ষেত্রে নানারকম অগ্রগতিও হয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের অবস্থার তেমন একটা হের ফের হয় নি। গ্রামীণ ঋণভার সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১-৫২ সালে যে সমীক্ষা চালান তাতে দেখা যায় যে ভারতের ৫ লক্ষের বেশী গ্রামের ৬৩ শতাংশ পরিবারই ঋণে জর্জরিত এবং এদের পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ—২৮৩ টাকা। মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৫০ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ সালের গ্রামীণ ঋণ ও বিনিয়োগ সমীক্ষায় দেখা গেল পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ ফুলে ফেঁপে দাঁড়িয়েছে ৬৫৪ টাকা। ১৯৬২ সালের শেষনাগাদ কৃষকদের কাছে বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। ৭১-৭২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর একটি সমীক্ষায় দেখা গেল গ্রামীণ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ হাজার ৯২১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন—এই পরিমাণ ৭৫ সাল নাগাদ হাজার সাতেক কোটির কাছে দাঁড়ায়। এই হিসেব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ কার্য্যত মহাজনদের কাছে বন্ধক ছিল।

আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং অর্থনীতিবিদরা ঠিকই বুঝতে পেয়েছিলেন, গ্রামের মানুষকে যদি তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে দিতে হয় তবে তাকে ঋণভার থেকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু কিভাবে তা করা সম্ভব—তার উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সমবায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল কিন্তু তা পরিণতিতে পৌঁছুতে পারে নি। কাঞ্চন কৌলিন্যের জোরে মহাজনরা কম শক্তিশালী ছিলেন না। সুতরাং বাধা ছিল নানা দিক থেকে। গত বছর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে সরকারের হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা আসে। তাতেই সুবিধা হয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে। ২০ দফা কর্মসূচীতে গ্রামীণ ঋণভার লাঘব করবার উপর জোর দেওয়া হ'ল। বিভিন্ন রাজ্যে অর্ডিন্যান্স জারী করে এবং পরে তাকে

বিকাশ কেন্দ্র দেখে আসুন

- *উৎপাদন কর্মসূচীতে ব্যাপক গণ অংশগ্রহণের সার্থক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ*
- *স্থানীয় সম্পদ ও প্রতিভার সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনাময় উদ্যোগ*
- *পূর্ব ভারতে অভিনব*

গ্রামীণ বিকাশ কেন্দ্র

বামনখালি, নামখানা, গণেশপুর, মাধবনগর, কুয়েমুড়ি, মথুরাপুর, রায়দীঘি, জামতলা জালাবেড়িয়া, দক্ষিণ বারাসত, ক্যানিং, বাসন্তী, ছোট মোল্লাখালি, কালানগর, দুলদুলি, মুরারি শা, হাড়োয়া ও মিনাখান্ ইত্যাদি মোট সাতাশটি স্থানে স্থাপিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ—

- *জমিকে দুই বা তিন ফসলী করা*
- *মৎস্য চাষ*
- *পশুপালন*
- *স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে কুটির শিল্প গড়ে তোলা*
- *পথঘাট ও বাজার নির্মাণ করা ইত্যাদি মাধ্যমে আদর্শ স্বচ্ছল উৎপাদন ভিত্তিক বসতি সংগঠন যার কল্যাণমূলক প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী*

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ
পশ্চিমবংগ সরকার

আইনের রূপ দিয়ে যে সব পরিবারের বার্ষিক আয় ২ হাজার ৪০০ টাকার বেশী নয় এবং যাদের ১ হেক্টর জমির বেশী জমি নেই তাদের মহাজনী ঋণ পুরোপুরি মকুব করা হয় এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঋণ আদায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৩৪ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের ৩৫ কোটি টাকা ঋণের বোঝা পুরোপুরি মকুব হয় এবং ২১ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের ৩২ কোটি টাকা ঋণ আংশিকভাবে লাঘব হয়।

কৃষকেরা এবং গ্রামের কারিগররা মহাজনদের কাছ থেকে দুরকম ঋণ নিতেন। প্রথম ঋণ হ'ল—উৎপাদক ঋণ যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হ'ত—আর দ্বিতীয় ঋণ হ'ল টানাটানির সময় সংসার সামলাবার ঋণ। মহাজনদের ঋণ আদায় বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রশ্ন উঠলো গ্রামের মানুষ ঋণ পাবে কি করে। রবীন্দ্রনাথ যেমন পাতিসরে কৃষি ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন—কৃষিজীবীদের সহজ সর্তে ঋণ দেবার জন্য ঠিক তেমনি আর্থিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। চেষ্টা চললো গ্রামের মানুষের কাছে সহজ শর্তে আর্থিক ঋণের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেবার।

কিছু কিছু কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। সেগুলি জোরদার করা হ'ল এবং নূতন নূতন কর্মসূচী গ্রহণও করা হ'ল। মোট প্রায় ৩০ দফা কর্মসূচী চালু করা হ'ল গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের উৎপাদন ক্ষমতাকে দৃঢ় ভিত্তি দেবার জন্য। কয়েকটি কর্মসূচী-সম্পর্কে সংক্ষেপে খোঁজ খবর নেওয়া যাক। চতুর্থ যোজনার শেষ দিকে সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর সহযোগিতায় চালু হয়েছে S.F.D.A বা ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থা এবং M.F.A. বা প্রান্তিক কৃষিজীবী ও কৃষিমজুর উন্নয়ন সংস্থা। এই দুটি সংস্থার আওতায় নির্বাচিত ১৬০টি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের মার্চ
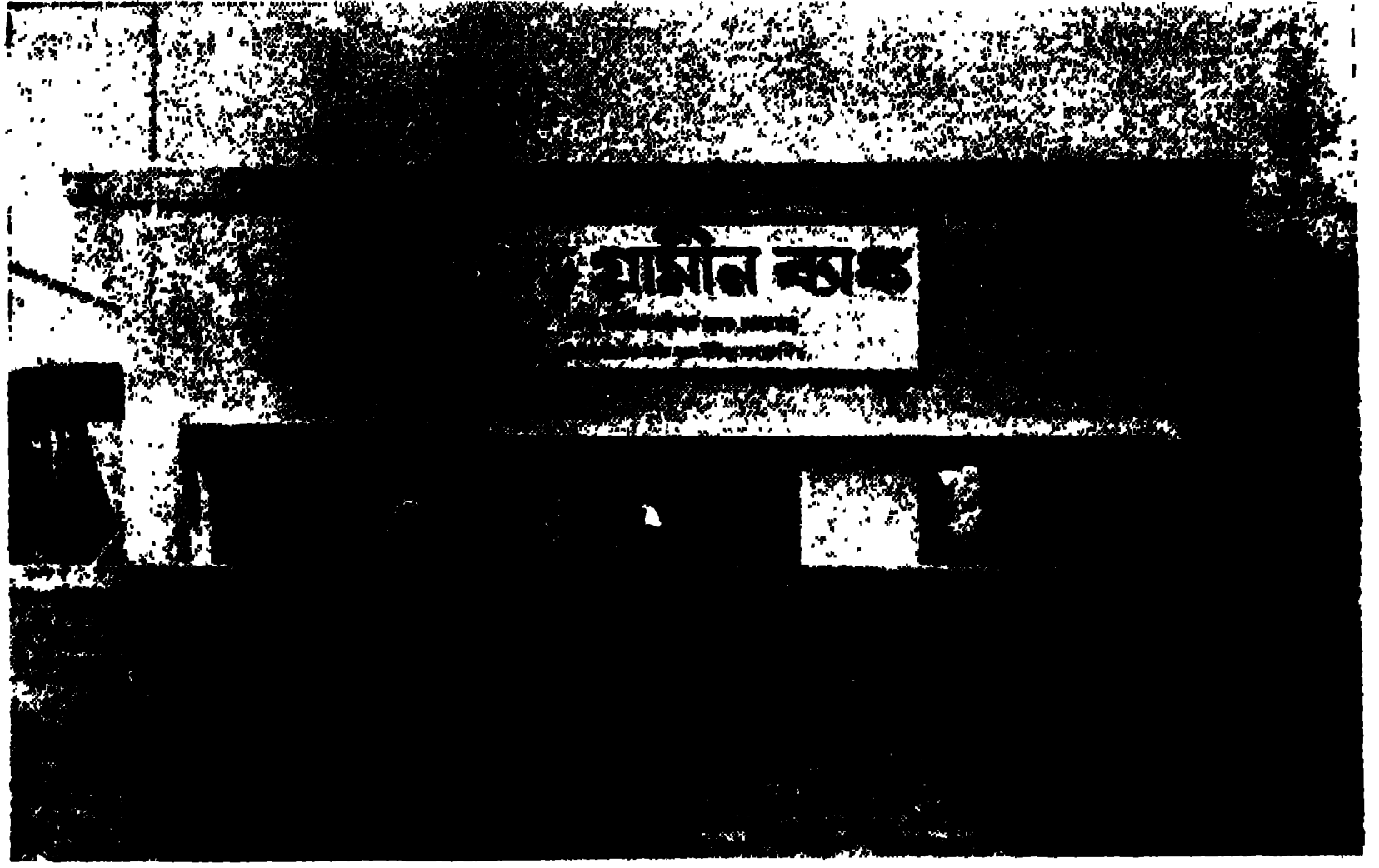
মালদহে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

পর্যন্ত এগুলোতে ৬১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থানই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। দেশের ৭৪টি খরাপ্রবণ জেলার জন্যেও বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হ'ল। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই প্রকল্পের জন্যে ৫০ কোটি ২২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। খরাপ্রবণ এলাকার কৃষিকাজের সহায়ক কর্মসূচীর রূপায়ণই এর উদ্দেশ্য। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা উন্নয়নের জন্য বেশ কটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ২০ লক্ষ উপজাতীয় মানুষ এবং ৩ লক্ষ একর জমি এই উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এর জন্য পঞ্চম যোজনায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পার্বত্য এলাকা উন্নয়নেও ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সব প্রকল্পের প্রতিটির উদ্দেশ্য হ'ল কৃষি কাঠামো জোরদার করা।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ঋণের চাহিদা পূরণের মুখ্য দায়িত্ব পড়েছে সমবায় ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-এর উপর। বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে সমবায় আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে সমবায় সমিতিগুলি ৯৭৯ কোটি টাকা স্বল্প এবং ৭৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মাঝারী মেয়াদী ঋণ দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে সমবায় সমিতিগুলির লক্ষ্য ছিল ৮০৭ কোটি টাকা স্বল্প এবং ৫৮ কোটি টাকা মাঝারী মেয়াদ ঋণ দেওয়া। ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ—অর্থাৎ পঞ্চম যোজনার শেষ বছরে দেশের উৎপাদনমুখী ঋণের চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩ হাজার কোটি টাকা—এর মধ্যে ১ হাজার ৩শো কোটি টাকাই পাওয়া যাবে সমবায় থেকে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কও গ্রামাঞ্চলে ঋণের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সময় গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৩২। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৩৭৬। ১৯৭৫ সালে যে ২ হাজার ৩৩৪ টি শাখা খোলা হয় তার মধ্যে ১ হাজার ৫৩৫ টি খোলা হয় গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে যে সব এলাকায় আগে কখনও ব্যাঙ্ক ছিল না। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে ব্যাঙ্কের মজুতের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে যেখানে ১৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রামাঞ্চলে সেখানে তার পরিমাণ বেড়েছে—৫৫০ শতাংশ হারে। সামগ্রিক আগাম যেখানে বেড়েছে ১২৯ শতাংশ হারে সেখানে গ্রামাঞ্চলের শাখাগুলিতে আগামের পরিমাণ বেড়েছে ৮১৮ শতাংশ

হারে। ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ দেবার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা—১৯৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। আর ১৯৭৫-৭৬ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

কুড়ি দফা কর্মসূচী রূপায়ণেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর একটি হ'ল—অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাঙ্কের প্রদর্শিত পথে গ্রামীণ আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক স্থাপন। সারা দেশে এ পর্যন্ত ১৪ টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী ও কারিগরদের সহজ শর্তে এবং স্বল্পতম শর্তে ঋণ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেবার জন্য ভ্রাম্যমান ও ভাসমান ব্যাঙ্কও চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছিল গত বছরে গৌড়ে। এবছর বিষ্ণুপুরে স্থাপিত হল রাজ্যের দ্বিতীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, মল্লভূমি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথের পাতিসরের ব্যাঙ্ক কালিগ্রাম পরগণার মধ্যে বাইরের মহাজনদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। কোন সন্দেহ নেই গ্রামাঞ্চলের মানুষ যদি ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করা সম্পর্কে দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দেন তবে সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মসূচীর দৌলতে গোটা দেশ থেকে অচিরেই মহাজনদের দৌরাত্ম্য নিশ্চিহ্ন করা যাবে। গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষরা তাদের শ্রমের ফল পুরোটাই ভোগ করতে পারবেন।

আমরা এভাবে হেঁটে গেছি

২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কর্তামার জন্য একটু এবং এই বলে সে বড় একটা পাথরে প্রায় অনেকটা প্রসাদ, চাল কলা, ফল গামছায় বেঁধে দিল নিজে। নিবারণ দাসের সঙ্গে বাবা কথাবার্তা বলছিল, একেবারে অন্য গলায়। কোথায় দেশ ছিল সেটা বাবার জানা হয়ে গেছে। মেয়ের একটা ভাল বর খোঁজা দরকার। বাবা নিজের ওপরেই ভারটা নিয়ে নিল। এবং এমন সব মানুষজন এবং তাদের খবরাখবর দিল যে নিবারণ দাস বাবাকেই এ-বিপদে একমাত্র কাণ্ডারী ভেবে ফেলল।

ফেরার পথে একটা হ্যারিকেন দিয়ে দিল। নিবারণ দাস কথা বলতে বলতে কিছুটা পথ এগিয়ে দিচ্ছিল। সিন্নি প্রসাদ নিবারণ দাসের হাতে। যে ভাবে বাবা আর নিবারণ দাস কথাবার্তায় মসগুল হয়ে গেল না জানি, পুটুলিটা দাসের হাতেই থেকে যায়। যা আমার একখানা বাবা. ফেরার পথে শুধু হ্যারিকেনটাই হয়ত ধরা থাকবে। পিলু বোধ হয় এটা টের পেয়েই খুব কায়দা করে বলল, জ্যাঠা আমাকে দিন আমি নিচ্ছি।

জ্যাঠা বলল, পারবে তো।

পিলু ঘাড় উঁচিয়ে বলল, খুব।

যখন কিছুটা পথ এগিয়ে নিবারণ দাস আমাদের বনের ভেতর ছেড়ে টর্চ জ্বেলে চলে গেল তখন পিলু আর পারল না। হাত ঢুকিয়ে একটা কলা বের করে বলল, দাদা খা।

আবার বের করে দিল দু টুকরো বড় নারকেল। মায়াকে দিল আমাকে দিল। সে নিজেও রাক্ষসের মতো সব মুখে ফেলছিল।

বাবা বলল, বেশতো ভাল ছেলে হয়েছিলে বাবারা। বনের ভেতর ঢুকেতে না ঢুকতেই স্বমূর্তি ধারণ করলে বাবারা। তোমার মার জন্য কিছু রেখ।

আমরা এ-ভাবে হেঁটে যাচ্ছিলাম। বাবার কাঁধে ভাই। আমার হাতে হ্যারিকেন। অন্ধকার ঘোলাটে পৃথিবী ফুঁড়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমাদের ছায়া-গুলো কখনও লম্বা কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছে। পিলু সবার আগে। এবং জানি মা খলপার দরজা বন্ধ করে রাস্তায় কোনো শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। আমার মা ভয় পেতে পারে। আমরা তখন প্রায় দৌড়ে সেই অন্ধকার বনভূমি পার হবার চেষ্টা করছিলাম। পৃথিবীতে এ ক'টা প্রাণী বাদে, এই বনভূমি এবং অন্ধকারে কিছু জোনাকি পোকা, আর আমাদের মা নিশীথে কখন আমরা ফিরছি এই আশায় বসে রয়েছে। বাড়ির কাছে আসতেই পায়ে ভীষণ জোর এসে গেল। দৌড়ে দরজায় উঠে গেলাম। ডাকলাম, মা ওঠো, কত প্রসাদ।

মা লম্ফ হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই বলল, তোর বাবা কোথায়?

—আসছে।

আমরা মার যেন কেউ না। বাবার জন্য লম্ফ হাতে মা উঠোনে নেমে গেল। বাবা যাতে ভাল দেখতে পায় সেজন্য লম্ফটা আরও উঁচু করে ধরল।

মনে হল মা আমার নিমেষে আকাশ-বাতি হয়ে গেছে। সবার ওপরে হাত। হাতে লম্ফ। লম্ফের আলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাবা আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। বাবাকে খুব শক্তিশালী যুবকের মতো মনে হচ্ছিল।
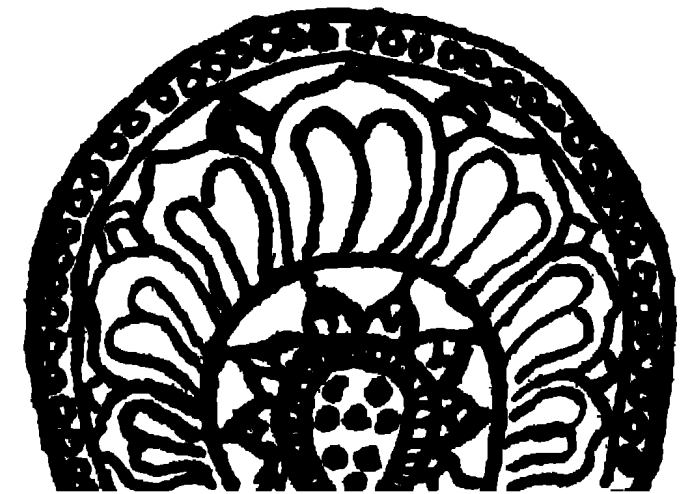
সবুজ ধানে ছেয়ে যায়

অতীন সরকার

মথুরাপুরের সাধারণ চাষী দীননাথ বিশ্বাস বা শেখ রমজানের দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ালে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচে বা খাদ্যের জন্য পরনির্ভরতা কমে এতো-সব বড়বড় কথা জানা নেই। তবে এটা ওরা মনেপ্রাণে বুঝেছেন যে, ঐ বি. ডি. ও. অফিস থেকে বাবু এসে যে সব কথা বলেছিল তা'তে জমির ফসল বাড়ে। "ছেলে-পিলের" মুখে দু'টো ভাত দেওয়া যায়। পাশের নূরপুরে তো ওরা নিজেদের চোখেই দেখে এসেছে—আমন ধান তোলার পরে সে গাঁয়ের জমি আর রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে থাকে না, সবুজ ধানে ছেয়ে যায়।

এবারই বি. ডি. ও. অফিসের সেই বাবুর কথায় উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চাষ করেছিল ওরা। বি. ডি. ও. অফিস থেকে ছোট ছোট প্যাকেটে বীজ, সার ও ওষুধ পেয়েছিল। আর সবাই মিলে চেষ্টা তদ্বির করে ব্যাঙ্কের সহায়তায় একটা "শ্যালো" বসিয়ে জলের ব্যবস্থা করে যা ধান ওরা তুলেছে তা'তে সংবৎরের খাদ্য পুরোটা হবেনা ঠিকই তবে অভাবী বর্ষার দিনগুলোতে খেতে পাবে। এবার খরচ খরচা কুলিয়ে লাভ সামান্যই হয়েছে এতে পোষায়না ঠিকই তবুতো খেতে পাবে। আর আগামী বছর আরও ভাল চাষ করে এটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে বলে আশা করছে। ফসল ফলনে সাফল্যের এই চিত্র আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামান্তরে। গত এক বছরে খাদ্য উৎপাদনের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে বলা যায়। এর আগে কয়েকটি বছর মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি এক বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। গত বছর অবশ্য ফলন বেশ কিছুটা বেড়েছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবার পর এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশদফা কর্মসূচী অনুযায়ী বেশ কিছু ব্যবস্থা নেবার ফলে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টন ফসল ফলিয়ে এবার আমাদের চাষী-ভাইরা একটা রেকর্ড করেছেন। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পথে আমরা যে অনেক দূর এগিয়ে গেছি এবছরের এই অভূতপূর্ব সাফল্য তারই ইঙ্গিত।

১৯৭৫-৭৬-এর প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল ছিল। ফলে বর্ষার আগে, বর্ষার সময় এবং পরে অঞ্চল ভেদে বৃষ্টি খারিফ মরসুমের চাষে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। পূর্ব ঘোষিত লক্ষ্য (৬ কোটি ৯০ লক্ষ টন) ছাড়িয়ে যায়। বর্ষার শেষ পর্যায়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়ায় রবি মরসুমে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা জমিতে থেকে যায়। প্রকৃতি নির্ভরতাকে কাটাবার জন্য জল সেচের আওতায় আরও ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি আনবার সিদ্ধান্ত ২০ দফা কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা কার্যকরীও করা হতে থাকে এর অল্প দিন পরে থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত মানের এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং উন্নত প্রথায় চাষ করার জন্য কৃষকদের শিক্ষিত ও আগ্রহী করার কাজ চলতে থাকে। এই সমগ্র উদ্যোগের সাফল্য হিসাবেই ভারত ১৯৭৫-৭৬-এ খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়। এই উৎপাদনের মধ্যে শুধু চাল নয়, গম, ডাল এবং অন্যান্য দানা শস্যও আছে।

জরুরী অবস্থায় এই উৎপাদন লক্ষ্য পূরনের অবশ্যম্ভাবী সাফল্য হিসাবেই ১৯৭৫-৭৬-এর ঘাটতির মাসগুলিতে খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে পারেনি। আর খাদ্য সংগ্রহ অবস্থারও বিশেষ উন্নতি ঘটে। ১৯৭৬ এর মার্চ পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে ৫৩ লক্ষ টন, আগের বছর ঐ সময় পর্যন্ত সংগ্রহ ছিল মাত্র ৩২ লক্ষ টন। এবছর ১ কোটি ৪১ লক্ষ টনের এক মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে।

বস্তুত জরুরী অবস্থা এবং বিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে ভারত কৃষি উৎপাদনের স্বাবলম্বী হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ৭৫-৭৬-এ খাদ্য উৎপাদনের (১১ কোটি ৬০ লক্ষ টন) লক্ষ্য পূরণ সেই সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ।

উৎপাদনের সঙ্গে খাদ্য আমদানীর সম্পর্কও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ১৯৭৩-৭৪-এ খাদ্য উৎপাদন ছিল ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬০ হাজার টন। ফলে ১৯৭৩-এ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার টন খাদ্য আমদানী করতে হয়েছিল। অপর দিকে তার পরের বছর ১৯৭৪-৭৫-এ খাদ্য উৎপাদন ৩৬ লক্ষ টন কম হয়। ফলে ১৯৭৪-এ আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টনে ওঠে এবং তার পরের বছর ১৯৭৫-এ খাদ্য আমদানী করতে হয় আরও বেশী ৭৪ লক্ষ ৭ হাজার টন। ১৯৭৫-৭৬-এ খাদ্য
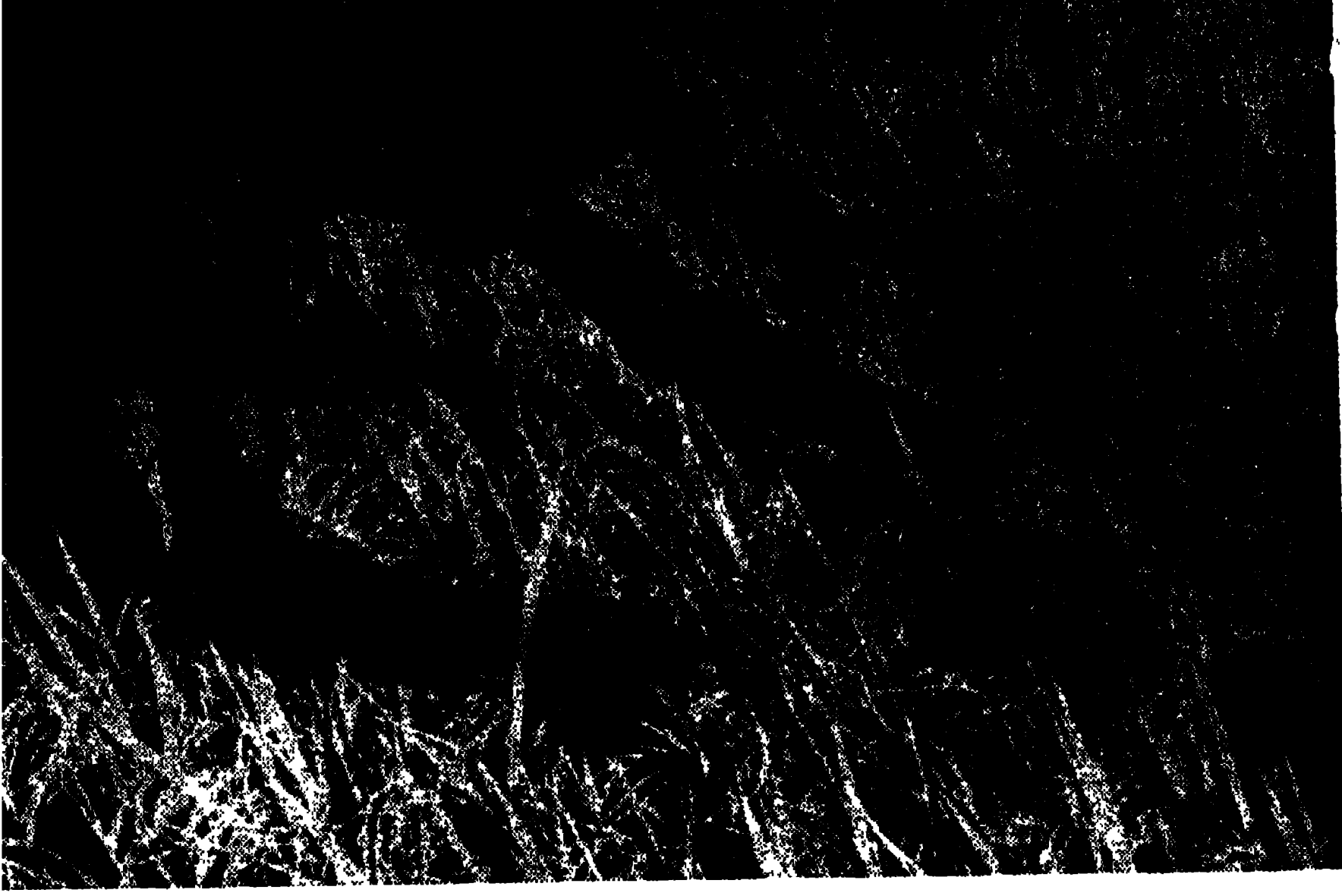
'সুফলা'র সুফল

উৎপাদন ভাল হওয়ায় আশা করা যায় ১৯৭৬-এ খাদ্য আমদানী অনেক কম করতে হবে। এর ফলে আমরা শুধু দুর্মূল্য বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সক্ষম হবো না, খাদ্যের জন্য পরনির্ভরতাও কমাতে পারবো।

পশ্চিমবঙ্গে মোট জমি ৮৮ লক্ষ ৫২ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে ৫৫ লক্ষ ৪২ হাজার হেক্টর চাষের জমি আর ৩ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমি এখন পর্য্যন্ত অব্যবহৃত, ১১ লক্ষ ১ হাজার হেক্টর সংরক্ষিত বনাঞ্চল। চাষের অযোগ্য ৬ লক্ষ ৭ হাজার হেক্টর। সারা ভারতে মাথা পিছু চাষের জমি '২৯ হেক্টর কিন্তু আনুপাতিক ঘন বসতিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে ঐ জমি তার অর্দ্ধেকেরও কম অর্থাৎ মাত্র '১৪ হেক্টর।

এই রাজ্য খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি অঞ্চলের অন্যতম। চাষযোগ্য জমির এক বড় অংশ পাট চাষের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। রাজ্যের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের জন্য (দৈনিক মাথা পিছু ১৬ আউন্স হিসাবে) খাদ্য দরকার বছরে ৮১ লক্ষ ৩৩ হাজার টন। আর এর সঙ্গে বীজ ধরলে প্রয়োজন দাঁড়ায় প্রায় ৯০ লক্ষ টন। অথচ রাজ্যের মোট উৎপাদন তার থেকে কম। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ১৯৭৫-৭৬-এর জন্য উৎপাদন লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করেন ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার টন। ফসল হিসাবে ভাগ করলে তা ছিল ৫২ লক্ষ টন আমন, ১১.৫৮ লক্ষ টন গম, ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টন আউশ, ১১.৫ লক্ষ টন বরো। বাকি অংশ ডাল ও অন্যান্য দানা শস্য।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরে উৎপাদন লক্ষ্য পূরণে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫-এর আগষ্ট মাসে রাজ্য সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক জরুরী কর্মসূচী অনুযায়ী ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। জরুরী অবস্থার উপযোগী ২০ দফা কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান জলসেচ উন্নয়নও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই ব্যবস্থা পঞ্চম পরিকল্পনায় বরাদ্দের অতিরিক্ত। ঐ সাত কোটি টাকার মধ্যে ৬ কোটি ৭৫ হাজার টাকা গভীর অগভীর নলকূপ বসানো ও পাম্প ঘর নির্মাণ, ৫ লক্ষ মিনি কিট বিতরণ (মিনি কিটে ২ কেজি অধিক ফলনশীল বীজ, ৪ কেজি রাসায়নিক সার ও ২০০ গ্রাম কীটনাশক থাকে) করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বছর শেষের (১৯৭৫-৭৬) হিসাবে দেখা যায় মোট ৪,৮০২ টি অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে ও ৩,০৪১ টি পাম্প ঘর স্থাপিত হয়েছে। তিন লক্ষ ৫৬ হাজার মিনি কিট বিতরণ হয়ে গেছে, কৃষিঋণ (১৯৭৬এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত) দেওয়া হয়েছে ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ৬২৬ টি বড় কূপ খনন, ৫০০ পুকুর সংস্কার ও অন্যান্য সেচ প্রকল্প মাধ্যমে ৫৫ হাজার ৯ শ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই উদ্যোগের ফলে অধিক ফলনশীল চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের জমি ৭ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর থেকে বেড়ে ১৯৭৫-৭৬-এ হয়েছে ১৪ লক্ষ হেক্টর। গম চাষের অধিক ফলনশীল বীজ দিয়ে চাষ হয় সাড়ে পাঁচ লক্ষ হেক্টর জমিতে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার ১৯৬৯-৭০-এর সাড়ে ৫৫ হাজার টন থেকে বেড়ে ১৯৭৫-৭৬-এ হয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৭০০ টন। সেচের জমি ১৯৭১-৭২ ছিল সাড়ে ১৬ লক্ষ হেক্টর। এখন তার পরিমাণ ২৩ লক্ষ ১৬ হাজার হেক্টর।

অধিক ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার সার ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচের আওতায় বেশী পরিমাণ জমি আসায় রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলা যায়।

গত এক বছরে বাড়তি কৃষি উৎপাদনের এই চিত্র দেখা গেছে শুধু এরাজ্যেই নয়, সারা দেশে। খেতের ফলন বাড়াবার জন্য এখন শুধু সেচ ও সার যোগানোর ব্যাপারেই সরকারে দৃষ্টি সীমিত নেই। বিশ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ ভূমিহীনকে জমির মালিকানা দিয়ে বাড়তি ফসল ফলানোর অভিযানে সক্রিয় অংশীদার করে তোলা হয়েছে। চাষী ভাইদের ঋণের জন্য এখন আর মহাজনের দরজায় যেতে হবেনা। সেকাজে এখন সমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এগিয়ে এসেছে। সারা বছর ধরে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ যাতে সবুজে সবুজে ছেয়ে থাকে তারই আয়োজন এখন ক্লান্তিহীন।

কালো টাকার সন্ধানে

জ্যোতি সেনগুপ্ত

কালো টাকার উৎস অনেক। সবচেয়ে বড় উৎস কর ফাঁকি এবং চোরাকারবার। বছরের পর বছর কর ফাঁকি দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকার পাহাড় দেশের বিত্তবানদের মধ্যে জমেছে তার হিসেব পাওয়া মুস্কিল। তবে ১৯৭৫-এর শেষ দিকে ১,৫৮৭ কোটি টাকার স্বেচ্ছামূলক গোপন আয় ঘোষণা থেকে বোঝা যায় কালো টাকার মূল দেশের কত গভীরে প্রবেশ করেছে।

অনেকে হয়ত জানেন না বহুদিন আগেকার বাধা নিষেধহীন অবাধ বাণিজ্য-কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরাধীন ভারত জানত যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে বৃটেনের তৈরি মাল এখানে বিক্রী করে। এখানকার কাঁচামাল সস্তায় ওখানে চলে যেত। তেমনই যদি শুল্ক না বসানো হত অন্য-দেশের তৈরি মাল এখানে "ডাম্প" করে আমাদের বাজার থেকে দেশী মালকে সরিয়ে দেওয়া হত। দেশের উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী না হওয়ার দরুন আমাদের শিল্পও নষ্ট হয়ে যেত।

কিন্তু শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বহু কোটি কোটি টাকার বিদেশী মাল এদেশে এনে ফেলা একটা বিরাট অদৃশ্য ব্যবসা চালু হয়ে গিয়েছিল। এখনও আছে। তবে সরকার অনেক কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে চোরাচালানের জোয়ারে ভাঁটা এনে দিয়েছেন।

মনে পড়ে যায় নতুন দিল্লীতে ১৯৫০ সালে ইম্পিরিয়াল হোটেলে একটি সান্ধ্য উৎসবের কথা। আমরা তিনচার জন সাংবাদিক এককোণে দাঁড়িয়ে গেলাস চুমুক দিচ্ছিলাম। পণ্ডিত নেহরু কাছে এগিয়ে এলেন। তখন ভারত সরকার বাণিজ্যের ওপর নতুন নতুন আইন চালু করছিলেন। OGL, KO ইত্যাদি নানান শব্দ বাণিজ্য আইনে স্থান পেত ও ঐসব ব্যবস্থার ওপর আমাদের খবর লিখতে হত। পণ্ডিতজীকে আমরা বল্লাম ভালোভালো জিনিষ আর পাওয়া যাচ্ছেনা। সবই ত ব্যান্ড হয়ে গেল, অথচ দিশী জিনিযও তৈরি হচ্ছেনা। পণ্ডিতজী একটি সিগারেট হাতে নিয়ে অর্দ্ধেক ক'রে মুখে দিয়ে আগুন খুঁজ ছিলেন। আমি লাইটার জ্বেলে দিলাম। "Ronson?" বলে তিনি হাসলেন। আমাদের গ্লাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—Scotch? আমার বুকের কালো জামায় হাত রেখে বললেন—"Vienna?" আমার পায়ের দিকে একটু চেয়ে বললেন—Made in England? বললাম—Yes, Three castle! আমার সঙ্গের সাংবাদিকরা হেসে উঠলেন, একজন বললেন—We are smoking Churchman and Three castle.

আমাদের একজন বলে উঠলেন—পণ্ডিতজী আপনিও Black & White সিগারেট খাচ্ছেন? প্রধান মন্ত্রী খুব খুশী হয়ে আমাদের দুজনের কাঁধে হাত রেখে বললেন—You have explained our industrial policy—we have to tighten our belt, a generation may deny itself of good things, but in a decade or two, all these things and many more will be 100% India made. আজ ২৬ বছর পর যখন এদিকওদিক চেয়ে দেখা যায় বিদেশী দ্রব্য প্রায় নেই, জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সেই এক সন্ধ্যায় মাত্র ১৫-২০ মিনিটের হাসিঠাট্টার মধ্যে তার Vision যা দেখা গিয়েছিল তার কথাটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে ভাবলে গর্বিত হতে হয়।

কিন্তু দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রকল্পে যে আঘাত দেয় তাকে কি চোখে দেখা উচিত?

অনেক আইন তৈরি হয়েছে। নানান ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বহু লোক ধরা পড়েছে—কিন্তু এই সমস্যার সমাধান শুধু আইন ও সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণে হয় না। দরকার প্রতিটি ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর

শুল্কবিভাগের আটক করা চোরাই মাল

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত

1975-76

কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান

* চোরাকারবারীদের উৎখাত করা হয়েছে......দলের চাঁইরা জেলে...... বিয়াল্লিশ জন চোরাকারবারীকে ফেরার বলে ঘোষিত এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

* শহর এলাকায় খালি জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে...... সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে জমি হাত-বদল নিষিদ্ধ।

* আবাস গৃহের ভিতের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে......করফাঁকি ধরার জন্যে জমকালো বড় বড় বাড়ীর দাম নতুন করে হিসেব করা হচ্ছে......করফাঁকি ধরার জন্যে তল্লাসী চালিয়ে 1975 সালের জুলাই মাস থেকে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের পরিমাণ 27.4 শতাংশ বেড়েছে।

* স্বেচ্ছাঘোষণা প্রকল্প অনুসারে আড়াই লক্ষ জনেরও বেশি ব্যক্তি 15,870 মিলিয়ন টাকার ওপর আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন...... কর বাবদ রাজস্বের পরিমাণ 2,490 মিলিয়ন টাকা।

76/90 (Bengali)

পরিবর্তন। কৈ আজ ত দাঁড়ি কামাবার ব্লেডের জন্য বিদেশী ছাপ দেখবার দরকার হয়না? সাবান দাঁত মাজার পাউডার থেকে মোটর গাড়ীর জন্যও লোকে বিদেশী মার্কা খোঁজ করেনা। কেন রেলগাড়ীতে চড়ে কি আর মনে হয়—দিশি বাজে গাড়ী?

যেখানে আমাদের দেশ এখনও পৌঁছুতে পারেনি যেমন technologyর কিছু কিছু শাখায়,—আমাদের সরকার নিজেই সেসবের আমদানীর ব্যবস্থা করেন।

আজ যে ক'মাস ধরে এত ধরপাকড় হল, বহু গুপ্তধন বের করা হল, তা দেখে কি মনে হয়না যে, সাধারণ মানুষ যেখানে হাসিমুখে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে সুখী হয়, সেখানে ঐ ওরা, দেশকে ফাঁকি দিয়ে কালোটাকার বস্তার ওপর বসে সুখ করছে। ওরা একরকম দেশদ্রোহী এবং ওদের মার্জনা করা শক্ত। কিন্তু ওদেরও বোঝা উচিত যে চোরাচালান কাজে যে পরিশ্রম ও ত্রাসের মধ্যে দিয়ে ধরুণ ১,000 টাকা লাভ হয়, তার চেয়ে সাধারণ নাগরিক হয়ে খোলা ব্যবসা ক'রে যদি ৫00 টাকা মাসিক আয় হয়, সেটা কি শ্রেয় নয়? দেশে এমন নানান ব্যবস্থা হয়েছে, সরকার যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে ক্ষুদ্র মানুষও ব্যাঙ্কের সহায়তায় নিজের স্বাধীন ব্যবসা স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু এই কর ফাঁকি ও চোরাচালান ব্যবসা দেশে একটি সাংঘাতিক, ক্ষতিকর সমান্তরাল অর্থনীতি বা Parallel economy গঠন করে বসেছিল। এর ফলে দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বিঘ্নিত ত হচ্ছিলই তাছাড়াও একটি নতুন ধনী সমাজ করে তুলছিল। এরই ভিত্তিতে সমাজে অসৎ-এর আঘাত সৎ-এর ওপর প্রচণ্ডভাবে পড়ছিল। সমাজের নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধস্ফীতি এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এনে ফেলেছিল। করফাঁকি ও চোরাচালান দুটি শক্তিই

বোম্বাই উপকূলে আটক দুবাইয়ের চোরাই মালের জাহাজ আল ইয়াকুবি

একতালে পা ফেলে দেশের অর্থনীতির গলা টিপে এক অদ্ভুত তাণ্ডবের রাজত্ব এনে ফেলেছিল। ফলে, কালোটাকা অর্থাৎ যে টাকা অর্জন করতে শুল্ক দেওয়া হয়না তা সাধারণ বাজারে ক্রয় ক্ষমতা কালোবাজারী ও চোরাচালানীদের হাতে একচেটিয়া তুলে দিয়েছিল। এই অসাধু সমাজ বিক্রেতাদের পকেটেও বেশী টাকা যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ফলে, ভারতের বাজার-বাজার বলতে সবই, বাড়ীঘরও—একদিন ঐ অসাধুর আওতায় চলে গিয়েছিল। এ অবস্থা কতদিন চলতে পারে? যদি এর প্রতিকার সরকার না করতেন তাহলে কী যে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিতো তা কল্পনাও করা যায় না। এই আট বছর আগে, ১৯৬৮-'৬৯ সালেই প্রায় ৭000 কোটি কালো টাকা (ওয়াঞ্চু কমিটির হিসেবে) দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদে কামড়ে বসেছিল। তারপর ক'বছরে এই সংখ্যা নিশ্চয় আরও অনেক বেড়ে গেছে।

চোরাচালান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ১৯৭৪ সাল থেকে নেওয়া হয়েছে। Maintenance of Internal Security Act প্রয়োগ করা হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে। সুকুর নারায়ণ বাখিয়া ও হাজী মাস্তানের মত বেশ কয়েক জন কুখ্যাত চোরা চালানীদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সঙ্গে কিছু কিছু সহায়কদেরও ধরা হয়। পরে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে COFEPOSA Act প্রয়োগ করা হয়। এই আইন ১লা জুলাই ১৯৭৫ সালে সংশোধিত হয়। আবার সংশোধন করা হয় ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক যারা এই চোরাচালানের ব্যবসায় জড়িত, তাদের আটক রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসূচীতে চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জোরদার করার কথা ঘোষণা করা হয়। এরপর নানা জায়গায় হানা দিয়ে বহু কারবারীদের ধরা হয় ও মাল বাজেয়াপ্ত করা হয়। গত ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৯৭২ জন চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। ১৯৭৬এর জানু

৫২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিবেকানন্দ রায়

বিশ-দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর থেকে একবছর হতে চলেছে। কোনো জাতির জীবনে একবছর খুব বেশী সময় নয়, তবুও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রবণতাটুকু অন্তত একবছর ধরা পড়ে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গত একবছরে একটা আলোড়ন এসেছে, এক স্বদেশী যুগছাড়া বোধহয় এরকম একটা ইতিবাচক আলোড়নের ইঙ্গিত এমন করে আমাদের জীবনে আসে নি।

গত একবছর অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত দেশের শিল্পের ক্ষেত্রও উন্নতির ইংগিতের বার্তা বয়ে এনেছে; শুধু পরিসংখ্যান যদি ধরি তাহলেও বারোমাসের এই উন্নতির বাতাবরণ অস্বীকার করা যায় না।

১৯৭৫ সালের মার্চমাসে যে আর্থিক বছর সুরু হয়েছিল, তাতে শিল্প-উৎপাদন চার থেকে পাঁচ শতাংশ বেড়েছিল। কয়েকটি বড় বড় শিল্পে অবশ্য এই উৎপাদন বৃদ্ধির হার এগার থেকে উনত্রিশ শতাংশ। এগুলি হল, ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, সার এবং বিদ্যুৎ। গত আর্থিক বছরের প্রথম দশমাসে তার আগের বছরের প্রথম দশমাসের তুলনায় এইসব শিল্পের উৎপাদন ছিল যথেষ্ট বেশী। আরও কয়েকটি শিল্পে যে উৎপাদনে মন্দা দেখা দিয়েছিল গত আর্থিক বছরের গোড়ার দিকে, সেগুলিতেও বছরের শেষ ভাগে উন্নতির সূচনা হতে সুরু করে। এগুলি হল, প্লাষ্টিক, কৃত্রিম তন্তু, কাগজ, কাগজের বোর্ড, রং ও বার্নিশ এবং দিয়াশলাই।

এ দুই মিলিয়ে বলা যায় শিল্পের একটা বড় অংশ গত আর্থিক বছরে সাত থেকে আট শতাংশ বেশী উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত আর্থিক বছরে সরকারী শিল্প সংস্থাগুলির কৃতিত্ব। ক্ষয়-ক্ষতি- লোকসানের তকমা বহন করা যেসব শ্বেতহস্তীর মত শিল্পসংস্থার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল- তা হঠাৎ মোড় ফেরাতে আরম্ভ করল বিশেষ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে। খুব কাছের দুর্গাপুর শিল্পনগরীর কথাই ধরা যাক। ইস্পাত কারখানা, মিশ্র ইস্পাত কারখানা, খনি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্ লিমিটেড প্রভৃতি সরকারী সংস্থাগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ, পরিচালনগত অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে যেখানে ধীরে ধীরে সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত লোকসান ও ক্ষতির অংকের লালবাতি দেখিয়ে, সেগুলিতে এল শৃঙ্খলা, লোকসান চুকিয়ে লাভ করার সবুজ আলোর সংকেত। রাজ্যের অন্যান্য শিল্পসংস্থাতে অনুরূপ আশার ছবি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গত বছর দেশের সরকারী শিল্পক্ষেত্রে প্রথম দশমাসে তার আগের বছরের ঐ সময়ের চেয়ে উৎপাদন বেড়েছে সতেরো শতাংশ। ফলে সরকারী কল-কারখানা শিল্পে আবার নেতৃত্ব দিতে সুরু করেছে। যেমন ধরুন ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের কথা। ভারি শিল্প দপ্তরের আয়ত্তে যেসব সংস্থা রয়েছে তাতে গত বছরের প্রথম দশমাসে উৎপাদন হয়েছিল ৫৫৭ কোটির টাকার মত। তার আগের দশমাসের তুলনায় প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ বেশী।
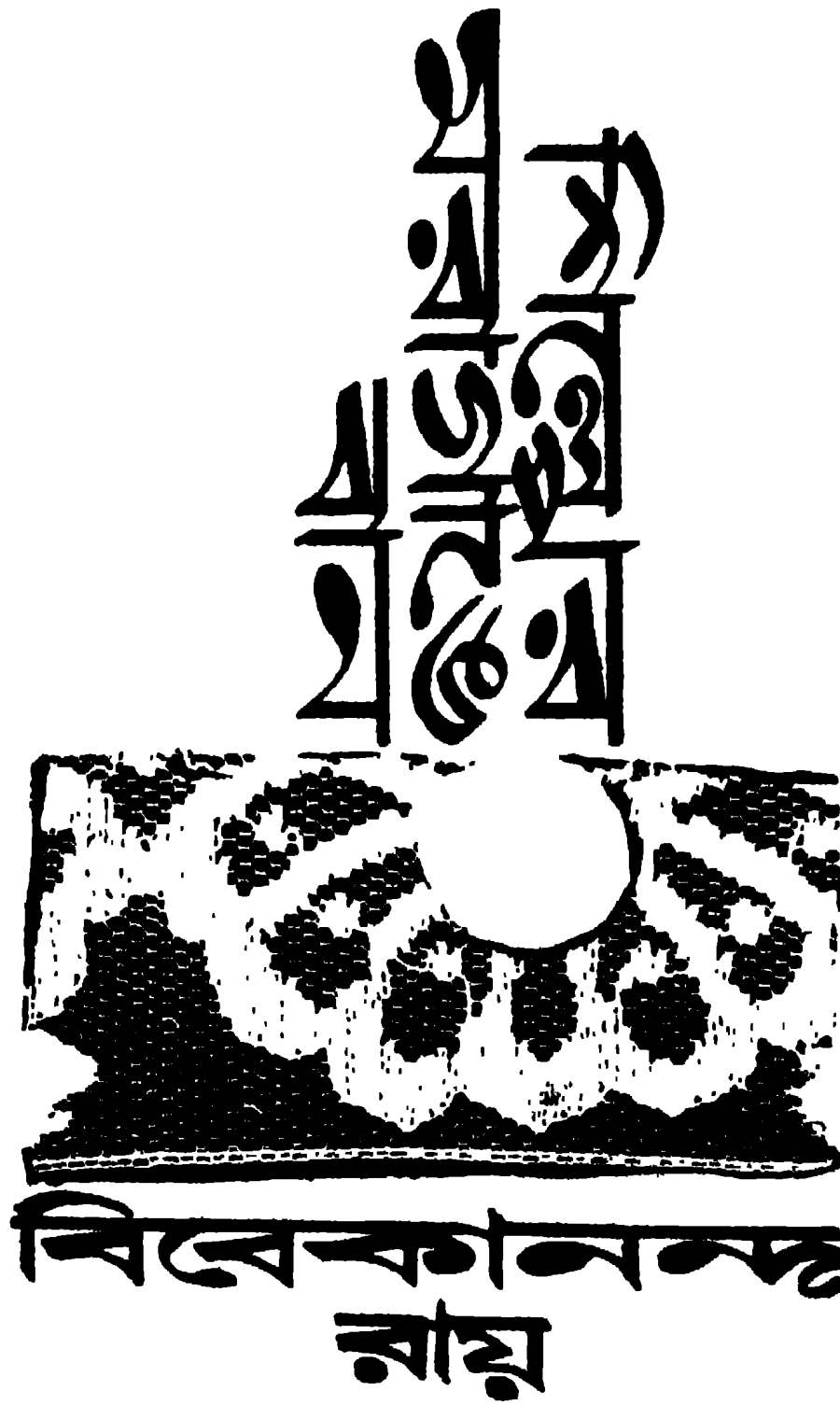
বেসরকারী শিল্প সংস্থাগুলিতেও উৎপাদনের প্রবণতা কিছু কম ছিল না, বিশেষ করে কয়েকটা সঙ্কটবহুল ক্ষেত্রে। রবারের টায়ার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈরীর মেসিন তৈরী উৎপাদন, কার্যত বেসরকারী শিল্পেই সীমাবদ্ধ, এসময় সাত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। তার আগের বছর হয়েছিল সাড়ে তিন কোটি টাকা। কাগজ ও চিনি তৈরীর মেসিন তৈরী হয় যথাক্রমে কুড়ি কোটি ও ত্রিশ কোটি টাকার মত, তার আগের বছরের চেয়ে ৫৬ ও ১৮ শতাংশ বেশী। এইভাবে বেসরকারী শিল্পে বাণিজ্যিক যান, মোটর সাইকেল, স্কুটার ও ট্রাক্টরের উৎপাদন তার আগের বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

এই হল, সরকারী ও বেসরকারী শিল্পে গত একবছরে উৎপাদনে অগ্রগতির পরিসংখ্যাননির্ভর খতিয়ান। প্রশ্ন উঠতে পারে, যাকে আমি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলেছি তার কারণ কী? এটা কি জরুরী অবস্থার সঙ্গে নিতান্তই কাকতালীয় সম্পর্ক? এই উন্নতির সংকেত এতদিন কোথায় ছিল? কী কী কারণে বারমাসের বার-মাস্যাতে রূপান্তরিত হল নির্ভুল প্রগতির ইসারাতে? প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী শিল্পে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, বিভিন্ন সংস্থায় উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার, উৎপাদন ও বিনিয়োগ বহুমুখী করার জন্য পদ্ধতির সরলীকরণ। শিল্প লাইসেন্স ও নীতিতেও কতকগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন করা হয়। যেমন, মেসিন, মেসিন টুলস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যাত্রীবাহী গাড়ী প্রভৃতি কারখানাগুলিকে উৎপাদন বহুমুখী করার অনুমতি দেওয়া হয়। সিমেন্ট প্রস্তুতকারকদের সিমেন্ট তৈরীর যন্ত্রপাতি তৈরী করার অনুমতি দেওয়া হয় তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য। কয়েকটি

বিশেষ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে বছরে পাঁচ শতাংশ করে পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদন বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়, মোট পনেরটি শিল্পে। এছাড়া শিল্প লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে পদ্ধতি সরল করা হয়েছে এবং লাইসেন্সেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে গবেষণা ও উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে যে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ান হয়, তাকেও ঢালাওভাবে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদন বহুমুখী করা, এবং COB লাইসেন্স প্রভৃতির দরখাস্ত যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়, তার জন্য প্রশাসক মন্ত্রকগুলিতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যাতে শিল্পোদ্যোগীদের সংখ্যা বাড়ে ও শিল্পের সাধারণভাবে উন্নতি হয়, তার জন্যে একশটি বিশেষ শিল্পকে লাইসেন্স নেওয়া থেকে পুরো রেহাই দেওয়া হয়েছে।

এ হলো বড় বড় শিল্পের কথা। ছোট ও কুটিরশিল্পের অগ্রগতির জন্যেও কয়েকটি সুদূর-প্রসারী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে বিশেষ করে অনগ্রসর ও গ্রামীণ এলাকাতে এইসব শিল্পের প্রসার হয়। এইসব শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যয়বহুল হওয়ায়, সরকার এইসব শিল্পে বিনিয়োগের উর্দ্ধসীমার সংশোধন করে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা থেকে দশলক্ষ টাকা করেছেন। আনুষঙ্গিক শিল্পগুলিতেও এই বিনিয়োগের উর্দ্ধসীমা দশ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে পনেরো লক্ষ টাকা করা হয় গত বছরের মে মাসে। বিশদফা কর্মসূচীর আওতায় গ্রামীণ সমাজের দরিদ্রশ্রেণীকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ-অর্থ দিয়ে কয়েকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। চল্লিশটি নির্বাচিত শিল্পের আধুনিকীকরণের কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছে। কাঁচামালের আমদানী বাড়ানোর জন্য আমদানী নীতিও শিথিল করা হয়েছে ছোট শিল্পের জন্য। গ্রামীণ শিল্পের জন্য যেসব কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প রয়েছে সেগুলিও এবছর আরো উন্নতি করেছে। এর আওতায় চল্লিশ হাজার নতুন শিল্প সংস্থা হবে। তাতে কাজ জুটবে প্রায় দুলক্ষের মত কর্মীর। যে সব শিল্পোদ্যোগী কয়েকটি বিশেষ অনগ্রসর জেলায় শিল্পস্থাপন করতে চাইবেন তাঁদের এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ভরতুকী দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে অনগ্রসর এলাকাতেও শিল্প স্থাপনে এসেছে নতুন আগ্রহ এবং ইতিমধ্যেই এরকম বেশ কয়েকটা এলাকায় নতুন শিল্প গড়ে উঠবে।

শিল্পে এই প্রগতির চেহারা কী শ্রমিকদের গায়েও লাগতে সুরু করেছে? তারা কী এই প্রগতির ভাগীদার? এর উত্তরে দুটো নতুন ব্যবস্থার কথা বলতে চাই। এক হল, বোনাস আইনের সংশোধন। কেন্দ্রীয় সরকার এই বোনাস আইনের সংশোধন করে যে নতুন বোনাস আইন গতবছর চালু করেছেন তার ফলে বোনাসকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ লাভ যদি নাও হয়ে থাকে, উৎপাদন বাড়লেই সেই অনুযায়ী বোনাস দিতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যা এককালীন সাহায্যরূপে সুরু হয়েছিল, তাকে এখন একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ না করেও বোনাসকে একটা অধিকার কিংবা 'বিলম্বিত মজুরী' হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়, ধর্মঘট, ঘেরাও প্রভৃতি অসুস্থ প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। নতুন বোনাস আইনে সেই অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করার একটা প্রয়াস আছে। সেইসঙ্গে একটি নিম্নতম বোনাসও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নামমাত্র উদ্বৃত্ত বা লাভ হলেই তার চারশতাংশ শ্রমিকদের বোনাস হিসেবে দিতে হবে। সর্বনিম্ন বোনাস প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চল্লিশ ও পঁচিশ টাকা থেকে বাড়িয়ে যথাক্রমে একশত ও ষাট টাকা করা হয়েছে। এর ফলে যেসব শ্রমিক কম মজুরী পান তাঁরা আগের চেয়ে কিছু বেশী পাবেন বোনাস।

বোনাসের সংশোধনের সঙ্গে এসেছে কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ যা কিনা সমাজতান্ত্রিক দেশে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জরুরী অবস্থার অনুকূল বাতাবরণে এই নতুন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে অনেক কলকারখানায়। 'শপ' বা 'ফ্লোর' লেভেলে যে কমিটি আছে তার অর্ধেক প্রতিনিধি আসবে শ্রমিকদের মধ্য থেকে। এমনিভাবে কারখানা বা 'প্ল্যান্ট' লেভেলেও কমিটির প্রতিনিধিত্ব করবেন শ্রমিকেরা, উদ্দেশ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মালিক ও শ্রমিকের পরামর্শ, সহযোগিতা ও যৌথ দায়িত্ব। পশ্চিমবংগের অনেক কারখানাতেই এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য শিল্পকারখানায় নতুন শিক্ষানবিশী প্রকল্পও এরাজ্যে গত বছরের শেষেই পুরোপুরি বলবৎ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পদপ্তর দাবী করেছেন, গত কয়েক বছরে শিল্পে এই রাজ্যে যতলোক কাজ পেয়েছেন, এমন শিল্প অগ্রসর রাজ্য মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ুতেও পাননি। রাজ্যের দুটি শিল্পে এখন কিছুটা সংকটের মুখে। পাটশিল্পে সংকটটা কিছু পুরোনো, বাষট্টিটা চটকলের মধ্যে দশটা বন্ধ হয়ে গেলে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। রাজ্যে পাটচাষের এলাকা না বাড়ালে এবং বিদেশে পাটজাত রপ্তানী না বাড়াতে পারলে এই সংকট থেকে আশু মুক্তি নাই। অধিকাংশ চটকলের যন্ত্রপাতিও সেকেলে ও অকেজো হয়ে গেছে, তারও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন রপ্তানী বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন শুল্কও তুলে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতেও বিশেষ সুরাহা হয়নি। মোটর গাড়ী তৈরীর কারখানা পশ্চিমবঙ্গে একটা, উত্তরপাড়ায় হিন্দ-মোটর বিড়লা কোম্পানীর। দাম বেড়ে যাওয়ায় মোটর গাড়ীর ক্রেতা কমেছে, ক্রেতা কমায় উৎপাদন কমাতে হচ্ছে, তার জন্য পর্য্যায়ক্রমে শ্রমিকদের 'লে-অফ' ও ছাঁটাই করতে হয়েছে।

চতুর্থ কভারে দেখুন

প্রগতির চাবিকাঠি বিদ্যুৎ

এ কথা বললে বেশী বলা হবেনা যে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ বিদ্যুতের যোগানের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রধানতম সংস্থা হিসাবে রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৬৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্য-পূরণে আমরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন আজ দিনের পর দিন তাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি দিকে দিকে।

এ পর্যন্ত আমরা ৯,৯০৯ টি মৌজায় (১০,৪৪৭ টি গ্রামে) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া গত ৪ বছরে ২৩,০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ ও পরিবহণ লাইন পাতা হয়েছে, ফলে সুদূর গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান আরো উল্লেখজনক। ১৯৭৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২,১৪৫ টি গভীর নলকূপ, ৬,৯৫২ টি অগভীর নলকূপ এবং ৬৮৯ টি রিভার লিফট পাম্প বিদ্যুৎ চালিত করার ফলে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

দু বছরের মধ্যে সাঁওতালডিহিতে দুটি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিট চালু করা হয়েছে, ফলে এখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কলকাতার আশে-পাশের শিল্প এলাকার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম খাঞ্চলার বিদ্যুৎ চাহিদাও মেটাচ্ছে। আমাদের সম্প্রসারণ কার্যসূচী এগিয়েই চলবে। সাঁওতালডিহির ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কোলাঘাটের ৩×২০০ মেগাওয়াট ইউনিট ও ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপন করে সেই কেন্দ্রের সম্প্রসারণের কাজও একই রকম দ্রুতগতিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ট্র্যানস্মিশন লাইন পাতার কাজও চলেছে।

উত্তরবঙ্গে আমরা এখন নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যে আছে ২ মেগাওয়াটের রিংচিনটন এবং ৮ মেগাওয়াটের জলঢাকার ২য় পর্যায়ের কাজ। ৫০ মেগাওয়াটের রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ চলেছে। নতুন ডিজেল জেনারেটিং সেটগুলি বসানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী বাবদ ৬৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আরো বেশী টাকা সংগ্রহের জন্যে।

আরো বেশী বিদ্যুৎ যোগান দিতে আমরা প্রতিনিয়তই সচেষ্ট—বলতে গেলে এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মানেইতো দেশের দশের সার্বিক উন্নতি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

সাক্ষাৎকার

এখন সবই ঠিকঠাক মিলছে

জেলার নাম হুগলী। ব্লক পোলবা। পোলবার গোবর্ধন মণ্ডল নেহাত নিতান্তই এক গরীব গুবরো সাধারণ মানুষ। নিজের সামান্য দু-তিন বিঘে জমির চাষবাস আর বৌ ছেলে মেয়েদের নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। পোলবার নামটা সমাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্যে সবসময় পুলিশের খাতায় থাকে। চুরি ডাকাতি এটাসেটা লেগেই আছে নিত্যদিন। তাই গোবর্ধন বাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম-ও অঞ্চলের আইন শৃংখলার পরিস্থিতি কেমন? উনি বলেছিলেন—গত এক বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে আমাদের এই গ্রাম পাশের গ্রামগুলোয় চুরি ডাকাতি বলতে গেলে প্রায় লেগেই থাকত। কত গেরস্তবাড়ীর যে সর্বনাশ হত। গ্যালো সনের মাঝ নাগাদ থেকেই সব চিট। এখন আমাদের মত সাধারণ গেরস্তজনরা একটু নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারে।

সিঙ্গুর ব্লকের দ্বিজপ্রসাদ ভট্টাচায্যি মশাই পেশায় ইস্কুল মাস্টার। আর তাঁর নেশা হল গিয়ে বনের মোষ তাড়ানো মানে সমাজসেবা করা। ব্লকের মানুষগুলোর সুখে দুঃখের ভাগীদার দ্বিজবাবুকে শুধিয়েছিলাম— বাজারের হালখালত কেমন? উনি বললেন—রামরাজত্বের মত সস্তা গণ্ডার বাজার না হলেও দেখা যাচ্ছে জিনিসপত্রের দরদামগুলো কিছু দিন আগেও যেমন 'আজ বেড়েছে, কাল বেড়েছে', সেটা আর হচ্ছে না। এখন দরদাম আগের তুলনায় ভালোই কমেছে আর সব থেকে বড় কথা হল নট নড়ন চড়ন। মানে একটা জায়গাতেই দরদামগুলো থির থিতু হয়ে আছে। ব্যবসাদাররা চাপে হোক ভয়ে হোক এখন অনেকখানিই সংযমী।

বলরামবাটীর অশোক চট্টোপাধ্যায় তিরিশ বছর বয়সী এক তরুণ। ব্যবসাদার। ডেকোরেটিংয়ের ব্যবসা করেন। তিনি বললেন—বছর কয়েক আগের তুলনায় মানুষের মনে আনন্দ ফুর্তিটা এখন অনেক বেড়েছে। সেসঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠানও। কাজেই মোটামুটি ব্যবসা চলছে এখন আমার।

হাওড়া জেলার ভাটোরা- গ্রাম। জেলার একেবারে একটেরেতে অবস্থান। ভাটোরার অমলেন্দু মুখার্জি সাধারণ এক সংসারী মানুষ। নিজের গাঁ-গেরাম সম্পর্কে হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়াকিবহাল। ভদ্রলোক আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন—গত বছর খানেকের মধ্যে মানে জরুরী অবস্থাটা ঘোষণার পর থেকেই তো সারা দেশ জোড়া একটা শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি আমাদের এই ভাটোরার মত অজ তস্য অজ গাঁয়ে বসেও এখানকার মানুষ অল্পবিস্তর সেটা টের পাচ্ছে। কোথা যেন কিছুর একটা ভয়ে এক শ্রেণীর মানুষ যারা অ্যাদ্দিন ধরে এইসব গ্রামাঞ্চলে যা খুশী তাই করে এসেছে, তারা যেন এখন একটু থমকে গেছে। সব ব্যাপারেই অল্প বিস্তর সমঝে চলছে তারা।

বর্ধমানের মেমারীর এক বয়স্ক চাষী হলেন গিয়ে নকুল পাত্র। তা পাত্তর মশাইকে শুধিয়েছিলাম—আপনাদের এ এলাকায় চাষাবাদের হাল হালতের কতটা উন্নতি টুন্নতি হয়েছে বলুন। উনি বললেন—এ এলাকার মাঠে-আবাদে সেই অ্যাত-টুকুন বয়স থেকেই দেখে আসছি, সোনা ফলতে, মানে চাষাবাদের হাল এখানে চিরকালই ভালোর দিকেই। তবে মাঝে কিছুদিন সার বীজ এটা সেটা ঠিক মত মিলছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী দামে কিনতে হচ্ছিল। সেটা গত আট-ন'মাস হল আর নেই। এখন সবই ঠিকঠাক মিলছে। যত চাও তত পাবে গোছের করেই। অনেক ক্ষেত্রে দামও কমেছে।

হুগলী জেলার শুকদেব দাস। শুকদেবের হাল ছিল হাড়ির হাল। বাপ-ঠাকুদ্দা এক মুঠো মাটি দিয়ে থুয়ে যেতে পারেনি। অ্যাতটুকুন বয়স থেকে হাত-পা-ই একমাত্তর ভরসা। নিজের তো জমিজিরেত ছিল না এক বেঘতও। জমি মানে চাষের জমি। তাই পরের জমিতেই কিষেণী করতে হয়েছে। কখনও বাঁদী কিষেণী, কখনও বা নাগরী কিষেণী। চাষের জমিও ছিল না। এমনকি বাস্তু জমিও না। জন কিষেণীর রুজি-রোজগার কত আর—শুধুমাত্তর পেট ভরতেও কুলোয় না। কাজেই বাস্তু-জমিটুক্ কেনাও আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি অ্যাদ্দিন। এত বছর পরে এই কিছুদিন আগে পেল নিজের জমি। ও-তো প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেনি। জমির পাট্টা হাতে পাবার পর বিশ্বাস করেছে। আর (পাগল পারা হয়ে) দু'হাত তুলে নেচেছে। আগে ও কোন স্বপ্নই দেখত না, এখন দেখে—মাথার ওপর একটা কুঁড়ে মতনও তোলার স্বপ্ন। ও বলল—অ্যাদ্দিন ধরে দেখে এয়েছি। যা কিছু সুখ সুবিধা তেলা-মাথারাই পেয়েছে। আমাদের মত গরীব-গুরবোরা গরু-ছাগলের মত ছ্যাবলা, মানুষ বলে গণ্যি হতুম না। এখন কিন্তুক সরকার আমাদের মত গরীব-গুরবো জনদের দিকেও ফিরে তাকাচ্ছেন, এটা সেটা করছেন। ভগবান তাদের ভালো করবেন।

গৌতম ভট্টাচার্য্য

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত

1975-76

যুবগোষ্ঠির কল্যাণে

★ 10,490 হোস্টেলের 956,000-রও বেশি ছাত্রছাত্রী নিয়ন্ত্রিত দরে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস পাচ্ছেন।

★ রেহাইমূল্যে সাদা ছাপাবার কাগজ সরবরাহের ফলে পাঠ্যপুস্তক এবং খাতাপত্রের দাম কমেছে। কলেজ ও স্কুলগুলিতে 88,600 বইব্যাঙ্ক চালু হয়েছে।

★ 103 টি পেশা এবং 216 টি শিল্প এখন শিক্ষানবিসি প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

★ আরও 18,800 আসন যোগ করার ফলে শিক্ষানবিসি প্রকল্পের অধীন আসনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 133,900-র ওপর······এর মধ্যে 128,900 পদে শিক্ষার্থী আছে যার মধ্যে 28,000 (শতকরা কুড়ি জনেরও বেশি) আসন দেওয়া হয়েছে তফসিলী জাতি তফসিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের।

ইজেলে নতুন শৃঙ্খলার ছবি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এক রবিবারের সকালে চৌকির ওপর আমার সামনে একেবারে মুখোমুখি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর "পঞ্চতপা" উপন্যাস থেকে যে জনপ্রিয়তার শুরু আজ ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও তার কমতি নেই। ও'র উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ষাট ছুঁয়েছে আর গল্পগ্রন্থ সতেরো আঠারো।

কলম থামিয়ে পুরু লেনসের চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন আমার দিকে। না ভুল বললাম ঠিক আমার দিকে নয় আমাকে অতিক্রম করে ওর বেদনার্ত দৃষ্টি চলে গেছে অতীতে। ওর স্মৃতিতে ভাসছে কয়েক বছর আগের বিশৃংখল দিনগুলো। অদূর অতীতে নিবদ্ধ ধূসর দৃষ্টিকে ক্যামেরার ফোকাসের মত ক্রমে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন আমার দিকে।

'দেখ সাহিত্যিক হলেও আমি সামাজিক মানুষ। এই সমাজের ন্যায়, অন্যায়, নীতি, দুর্নীতি সবই আমাকে স্পর্শ করে গভীরভাবে। আমি আত্যন্তিকভাবে চিন্তিত আমাদের বিক্ষুব্ধ যুবসমাজকে নিয়ে। তারা ক্ষতবিক্ষত, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত এবং হতাশ। এখানে বলা প্রয়োজন, এই অবস্থার জন্য কেবল আমাদের যুবসমাজই দায়ী, একথা বিশ্বাস করি না আমি। এর আসল কারণ আমাদের যুবমানসের সামনে তাৎপর্যময় কোন সুস্থ আদর্শের নজির নেই, তাদের প্রেরণা বা উদ্দীপনা দেবার মতো নেই কোন ইনস্টিটিউসন, তাদের সামনে শুধু গ্লানিময় হতোদ্যম নিস্পৃহ নিষ্ঠুর জগৎ, অনুজ্জ্বল দীর্ঘ ভবিষ্যতের ছবি। এতদিন তাই ছিল। তবে সেই ছবিটা এখন যেন বদলাতে চলেছে। অন্তত সেই বিশৃংখলার ছবিটা মুছে নিয়ে ইজেলে নতুন শৃংখলার ছবির আভাস। মাঝে মাঝে অনুভব করি, পালাবদলের হাওয়াটা আমাদের মনের অন্দরে বোধহয় ঢুকতে শুরু করেছে। তবে এজন্য আমাদের অনেক বেশি আন্তরিক চেতনাসম্পন্ন এবং নিষ্ঠাবান হতে হবে সকলকে, শুধুমাত্র ফতোয়া ঘোষণা করে আত্মতুষ্টির গজদন্তমিনারে বসে থাকলে হবে না। তবেই এই বিরাট যুবসমাজ তথা জনসমাজ হতাশার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে দেশের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে সার্থকভাবে যোগ দিতে পারবে।'

উনি থামলেন একটু, এবার তাকালেন টুলের ওপরে রাখা অসমাপ্ত উপন্যাসের দিকে।

'আর একটা কথা। বাইরের বিশৃংখলা আমার মনোজগতে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড অস্থিরতা, লেখার কাজ ব্যাহত হয়। এখন ধীরে ধীরে সমাজে যে শৃংখলাবোধ ফিরে আসছে, তাতে সৃষ্টির সত্তাগুলো আরো স্থিতধী হতে পারছে। মৌল সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে এই শৃংখলার যোগ অঙ্গাঙ্গী, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, একথা বলতেই হবে।' এই ক'টি কথা মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে আশুতোষবাবু পানকৌড়ির মতো ডুব দিলেন এক দুর্জ্ঞেয় মনোজগতের গভীরে।

ক্রমশই চারিদিকে আস্থা ফিরে আসছে

বিকাশ ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের কাছাকাছি একটা রংচটা হলুদ রংয়ের বাড়ির দরজায় কলিংবেল টিপতেই ডানদিকের ফ্রেম ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এলেন এক প্রচণ্ড স্বাস্থ্যবান যুবক। টকটকে ফর্সা রং, মুখে ঘন কালো চাপদাড়ি।

প্রশ্ন করলাম, 'বিকাশ বাবুর সঙ্গে—,

'আমিই বিকাশ ভট্টাচার্য।'

বিস্ময়ে আমার চোখের ভুরু প্রশ্নবোধক চিহ্ন হলো। এত কম বয়েস। জানতাম, বিকাশবাবু নামী প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, এরই মধ্যে বারকয়েক ললিতকলা আকাদমীর সর্বভারতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ওর আঁকা ছবির বেশ চাহিদা নয়াদিল্লী ও বোম্বাইয়ের রসিকমহলে।

নিজের পরিচয় দিয়ে প্রয়োজনের কথাটা বলতেই সাদর আহ্বান জানালেন, 'ভেতরে আসুন'।'

পুরনো আমলের সিঁড়ি বেয়ে ওর পেছন পেছন একেবারে বেডরুমে।

ঘরের চারদিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। বেশ ছোট, কিন্তু খুবই নিটোল পরিপাটি করে গোছানো। তথাকথিত শিল্পীদের মতো বিশৃংখল নয় মোটেই।

এই একই শৃংখলার পরিচয় পেলাম ওর কথায়, মনে এবং ছবির ঋজু বলিষ্ঠ বক্তব্যে। ওর ছবির উপজীব্য আপাত ফ্যাণ্টাসিময় বাস্তবজগৎ—তার অপূর্ণতা এবং অসঙ্গতি। ওর ছবিতে অন্ধ শিশু চেয়ে থাকে শ্বেত পায়রা এবং জলন্ত সূর্যের দিকে। আমলার দপ্তরে জমে থাকা অর্থহীন ফাইলের ওপরে পাতলা সুতো থেকে ঝোলে ধড়হীন মুণ্ড। আরেকটি ছবিতে শুধু মৃতদেহ আর কংকালের স্তূপ।

'জরুরী অবস্থাকে কীভাবে দেখছেন?'

উত্তেজনা কমে গিয়ে ছত্রিশ বছর বয়সী শিল্পীর গলার স্বরে এবার আত্মপ্রত্যয়ের ভাব:

'হ্যা, জরুরী অবস্থা নিশ্চয়ই সমর্থন করি আমি। ছবি আঁকবার বিদেশী রংয়ের কথাই ধরুন। জরুরী অবস্থার আগে পয়সা দিয়েও সহজে রং পেতাম না, এখন অনায়াসেই দোকান থেকে রং কিনতে পারা যাচ্ছে। এবং কিছুটা কম দামেই। এছাড়া এখন যেন মনে হচ্ছে, ক্রমশই চারিদিকে আস্থা আর শৃংখলাবোধ ফিরে আসছে। বিশৃংখল অবস্থা মনের ভেতরে টেনসন তৈরি করে, কোন কাজ করতে দেয় না। ছবি আঁকবার প্রয়োজনেই দরকার শৃংখলা, না হলে ছবি আঁকতে পারব না আমি।'

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্য উদ্দীপনা

কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখি না পাওয়ার চেয়ে পাওয়ার দিকেই যে পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই। আমি গত এক বছরের হিসাব মিলাতে বসেছি। এক বছরে হিসাব মিলাতে গিয়ে গ্রামনগর পরিক্রমায় ধরা পড়েছে আমার অনেক মানুষ, যারা জীবনধারণের সংগ্রামে পরস্পর ভিন্ন ধারার শরিক কিন্তু গত একটি বছর স্পষ্টতই এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে তাদের জীবনে দিয়েছে উৎসাহ, সাহস ও নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারের গৌরব।

উত্তর শহরতলীর বি. টি. রোডের ধারে দুফার ইন্টারক্রান কোম্পানির প্রতিনিধি অসিত ঘোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাদের বাড়িতে বসেই। শ্রীঘোষের কর্মক্ষেত্র উত্তরবঙ্গ ও আসাম। ছুটিতে আসেন কলকাতায়। শ্রীঘোষ বলছিলেন, একটা বছর যেন একটা যুগের মতো মনে হলো আমার। শুধু বাংলা দেশেই নয় আসামেও যেখানে যেখানে গিয়েছি লক্ষ্য করেছি মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্য উদ্দীপনা। উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে চাষীদের মধ্যে কি উৎসাহ। সবুজ ফসলে ভরিয়ে তুলছে খেত খামার।

বেশ কয়েক বছর ধরে ফেলে রাখা জমিও আসামে এখন নতুন উৎসাহে চাষ হচ্ছে, এ খবর দিলেন শ্রীঘোষ।

শান্তিপুরের বেড়পাড়ায় পণ্ডিত অরবিন্দ আচার্যের বাড়িতে এখন বহু মানুষের ভিড়। অধিকাংশই সম্পন্ন বা ভাগচাষী এবং ব্যবসায়ী লোক।

আচার্য মশাই যজমানি করেন, হাত দেখাটা তার উপরি পেশা। এমন ভিড়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম পণ্ডিত গৃহিণী ঊর্মিলা আচার্যের কাছে। বাড়ির অস্ট্রেলিয়ান গরুর খাঁটি দুধ, গাছের মর্তমান কলা, কোটা চিড়ের পায়েস আর ক্ষীর দিয়ে অভার্থনা জানালেন আমাদের।

একগাল হেসে ঘনকালো চোখ দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, এক বছর আগে আমাদের নিজেদের বেঁচে থাকাই একটা সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একদিন কি হলো, রেডিওতে কি সব ঘোষণা—মানুষজন রাতারাতি বদলে গেল, এক্কেবারে চোখের সামনে। সুরু হয়ে গেল আচাষ্যি মশায়ের ডাক বাড়ি বাড়ি। সরকারী টাকা আর সার পেয়ে চাষীদের খুশির অন্ত নেই। ফি হপ্তায় লেগে গেল লক্ষ্মীপুজোর ধুম। গত একটা বছরে যেন দশ বছরের রোজগার হয়েছে তার। সত্যি সত্যি তাকিয়ে দেখি সে বাড়িতে লক্ষ্মীর কল্যাণ স্পর্শ বড় উজ্জ্বল করে তুলেছে মানুষগুলোকে।

জীবন যে জরুরী এবং প্রয়োজনীয় —জরুরী অবস্থা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংস্থার বিমানবন্দর ম্যানেজার প্রভাস কুমার বরাটকে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে কর্মের যে শৈথিল্য ঘিরে ধরেছিল বিমান বন্দরকে তা মুহূর্তে কোথায় যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। প্রভাসবাবুর ভাবতে এখনো অবাক লাগে। বিমানবন্দরে চতুর্থ শ্রেণীর যে সব কর্মচারী সময়ের সীমা না মেনে কাজ করতেই ছিল প্রায় অভ্যস্ত, জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এসেছে এক দায়িত্ব বোধ। অফিসারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাজ। দেশকে এগিয়ে নেবার ব্রতে তারাই যে আসল কর্ণধার। প্রভাসবাবু বলছিলেন, বদলে গেছে বিমানবন্দরের সমস্ত কর্মীদেরই কর্মধারা। এখন সবাই বুঝেছেন, সাফল্যের যাদু একটাই—কঠিন পরিশ্রম।

দক্ষিণ কলকাতা মহিলা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা তপতী মজুমদারকে প্রশ্ন করলাম, গত এক বছর কি আপনার জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়? জীবনের বিশেষ কোন স্মরণীয় বছর থেকেও কি এ বছরটিকে আপনি অন্য দৃষ্টিতে দেখতে পারেন? তপতী মজুমদার: অবশ্যই পারি। গত এক বছরের জাতীয় কর্মযজ্ঞ আমার জীবনকেও অবশ্যম্ভাবীরূপে আলোড়িত করেছে সন্দেহ নেই। জাতির সঙ্গে জীবনের কোথায় যেন একটা একাত্মবোধ রচিত হয়েছে এই ঘোষণায়। ২০ দফা কর্মসূচী সার্থক হওয়া মানে জাতির জীবনে নবজাগরণ। ছাত্রীদের কাছে একটি কথাই বলেছি বার বার জরুরী অবস্থা নিজেকে সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার সাহস দিচ্ছে—উৎসাহ যোগাচ্ছে।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

ঘরহারা আজ ঘরের মালিক

গাঁয়ের নাম দৈয়ের বাজার। নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর থেকে পীচে মোড়া যে সড়কটা এঁকেবেঁকে পূব সীমান্তের দিকে চলে গেছে—সেই সড়কের ধারে ধারে যে বসতি আর বেসাতি—তারই নাম দৈয়ের বাজার। কৃষ্ণনগর থেকে মাত্র আট কিলোমিটার।

এ গাঁয়ের কথা লিখছি কেন? সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েক লক্ষ গ্রাম। তবে শুধু দৈয়ের বাজারের কথা লিখছি। কেন? এ গাঁয়ের দই কি ভাল? অথবা অনেক দৈয়ের কারবারী আছে? আদমসুমারী বলতে পারে এ কথা। তবে কি গ্রামটা প্রাচীন! এখানে কি কোন মধ্যযুগীয় মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে? থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমি বলব তা নয়। এখানে জনাকয়েক মানুষ পাওয়া গেছে। যাদের পুরুষানুক্রমে ঘর ছিলনা, মাটিকে 'মা' জেনেও—যাদের নিজেদের মাটি ছিলনা, এমন কয়েক ঘর লোক—কিসের যাদুমন্ত্রে যেন পালটে গেল!

অর্ধশতাব্দী আগে দৈয়ের বাজার কেমন ছিল জানিনা। শুনেছি মাটির এবড়োখেবড়ো সড়কটা ঝনুঝনের মাঠের মধ্যে দিয়ে—আজকের সীমান্ত গ্রাম হৃদয়পুর ছাড়িয়ে ওপাড়ের মেহেরপুরের দিকে চলে গেছে। আজ রাস্তা পাকা। প্রতি মুহূর্তে, বাস, লরী, টেম্পোর চলাচলে সরগরম। ইঁটের দেয়ালে অনেক বাড়ি। পাটের আড়ৎ। রেশনের দোকান। এত পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন, ঐ জমিহীন ঘরহারা কয়েকঘর মানুষ—আজ মাটির মালিক।

দৈয়ের বাজারে আপনি পদ্মা আর গঙ্গার ভাষা শুনতে পাবেন। কেউ বলবে 'আসুন', আর কারো বা মুখে শুনতে পাবেন 'বহেন বহেন'।

বসলাম। বসলাম একটা বাঁশের মাচানের উপর। মাথার উপর গাছের ছায়া—পায়ের নীচে তৃণময়ী গালিচা।

—ওই রহমতকে জিজ্ঞাসা করুন। ও একখণ্ড বাড়ির জন্য জমি পেয়েছে।

—বহেন বহেন, আমি ডাইকা আইনছি।

নিমিষে একটি কিশোর ছুটে গেল পাটের আড়তের পাশ দিয়ে সদ্য বৃষ্টি ভেজা মেঠো রাস্তার মধ্য দিয়ে।

—জানেন স্যার, ও পাড়ার জীবন মণ্ডল, তারক নগরের পলাশ বিশ্বাস আর ঐ ঢাকা পাড়ার সতীশ সরকার, চাষের জমি পেয়েছে। আরও অনেকেই পেয়েছে.... আপনার চায়ে একটু দুধ দেব স্যার?

—রহমত ঘর তোলেনি?

—ঘর তুলতেই তো ব্যস্ত। ঘর তোলার টাকাও পেয়েছে।

—মহাজনের কাছ থেকে ধার ক'রেছে, বুঝি?

—প্রথমে ধার নেবে ভেবেছিল—কিন্তু নিতে হল না, সরকার থেকেই দু'দফায় পাঁচশ' টাকা পেয়েছে।

একটা বাস এসে থামলো। বাসের ছাদে ছাদে মানুষ। সবাই চলেছে শহরে। কৃষ্ণনগরে। বেউবা কোর্টে আর বেউবা অফিসে।

ফিরে এল সেই কিশোরটি। প্রাণবন্ত। চঞ্চল।

—আইতাছে। ঘরের চালে খড় দিছিলো।

—সতীশ সরকার, পলাশ বিশ্বাস ওরা টাকা পায়নি?

কিশোরটি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বলল, আমি শুইনছি, অগোও দিবো। জমি ঠিকঠাক করার জইন্যে অরাও টাকা পাইবো।

—স্যার একটু কইবেন, কতলোকে এমনি জমি পাইছে?— কিশোরটির চোখে মুখে কৌতূহল।

-প্রায় আট লক্ষ।

-আরে বাব্বা! এত জমি গভরমেণ্ট দিছে

—মোট প্রায় ৫ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমি এদের দেওয়া হয়েছে।

রহমত এল। রোদে পোড়া মানুষটির কোমরে জড়ানো গামছা। আদুল গায়ে ছোট ছোট খড়ের টুকরো। কিশোরটিই পরিচয় করিয়ে দিল। যে মানুষটি জন্মানোর পর থেকে গাছের ছায়ায়, দোকানের বারান্দায়, অথবা পরের বাড়ির গোয়ালের ভাঙ্গা টিনের চালের নীচে প্রায় চল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত করেছে—আজ সে একটি শান্তির নীড় পেতে চলেছে।

—কও না রহমত, আর কয়দিন লাইগবো, তোমার ঘর তুলতে।

—হ'য়ে এসেছে। আজকেই চালে খড় দিচ্ছি।

—বিয়ে করেছ।

—আজ্ঞে হ্যা, দু'মেয়ে আর দু'ছেলে।

—কি কর?

—মুনিষ দিই—জোগালের কাজ করি।

—এবার তো ঘর হল, নিজের চাষের জমি করবে না?

—আল্লাহ জানে।

আবার কিশোরটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। কত লোকে বাড়ি করার জমি পাইছে?

আমাকে বলতে হল না। ওরাও কিছু কিছু খবর রাখে। চায়ের দোকানী ব'লে উঠলো, কাগজে দেখিসনি, প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার লোক বাস্তু পেয়েছে।'

—আরে বাব্বা!

আর একটা বাস এল। এবার আমাকে উঠতে হবে।

রহমত সামনে এগিয়ে এসে বলল, জুম্মা বারে ঘরে ঢুকবো। আপনি সেদিন কিন্তু আসবেন স্যার।

গোপাল কৃষ্ণ রায়

ভূমি সংস্কারে নতুন গতি

২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কাছে বন্ধক দিয়ে বসবেন। এমনটা যাতে ঘটতে না পারে সেজন্যে পশ্চিম বাংলায় ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করা হয়েছে। এখন এই সব জমি ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতি থেকে টাকা ধার নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে বন্ধক দেওয়া যাবে না। উদ্বৃত্ত জমির নতুন মালিকেরা যাতে ভালোভাবে চাষবাস করতে পারেন সে জন্যে একটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমির সন্ধান পাওয়া গেছে তা অল্প নয়। কিন্তু এখনও যে-সব জমি লুকোনো রয়েছে তা উদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। লুকোনো জমি উদ্ধার এবং উদ্বৃত্ত জমি বিলি করার চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাওয়াও খুব দরকার। যেমন, কোন চাষের জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, উদ্বৃত্ত জমি বিলি করার ফলে কারা উপকৃত হচ্ছেন, এই সব বিষয়ে প্রচার চালানো খুবই জরুরী। এই ধরণের প্রচার চালাতে পারলে ভূমি সংস্কার আইন রূপায়ণে জনসাধারণের সাহায্য পেতে সুবিধে হবে। উদ্বৃত্ত যে জমি সরকারের হাতে আসছে ভূমিহীন চাষীরা কী করে তা পেতে পারেন সেকথা ব্যাপকভাবে জানানোর গুরুত্বও কম নয়। ভূমি সংস্কারের কাজ যে প্রার্থিত গতিতে এগোতে পারে নি তার একটা কারণ, ভূমিহীন চাষী বর্গাদার প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নথীপত্রের অভাব। ভূমিহীন চাষী ও বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার জন্যে ইদানিং অবশ্য জোর চেষ্টা সুরু হয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় উদ্বৃত্ত জমি দখল ও বিলি করার জন্যে ভূমি সদ্ব্যবহার দপ্তরে একটি পৃথক শাখা তৈরি হয়েছে গত নভেম্বর থেকে। এই শাখার কর্তা হলেন ডিরেক্টর অফ ল্যাণ্ডরেকর্ডস এ্যাণ্ড সার্ভেস। উদ্বৃত্ত জমি সংক্রান্ত যে-কোনো খোঁজখবর এই শাখার কাছে এবং বিভিন্ন জেলায় ভূমি রাজস্ব অফিসারদের কাছে নিতে হবে।

নতুন সমাজ গড়ে তুলতে

কবিতা সিংহ

ভারতবর্ষে এখন 'নতুন-স্বরাজ'। এই 'নতুন-স্বরাজ' শুধু কথার কথা নয়। কথা মত কাজ। নতুন স্বরাজের' দুটি রূপ। একটি ভাবরূপ, একটি বাস্তব রূপ।

ভাবরূপ হ'ল মানুষের মধ্যে বিশ্বাস আস্থা স্বাজাত্যবোধ ফিরিয়ে আনা, দেশের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করা এবং ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রকারীদের ছদ্মা ষড়যন্ত্রের জাল কেটে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন কিসে তা বুঝতে পারার মত বোধ ও বুদ্ধিতে জাগ্রত হয়ে ওঠা।

সুখের বিষয় ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে এই বরণীয় গুণগুলি ক্রমশ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আমরা দিনের পর দিন কেবল ধ্বংসের দেয়াল-লিখনই পড়েছি, ঘর-ভাঙানি শ্লোগানের কান-ভাঙানিতে লালন করেছি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা। আজ আমাদের চোখ খুলে গেছে নতুন দেয়াল-লিখনের প্রতি, কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই', 'কথা কম কাজ বেশী'।

হ্যাঁ তাই। কঠোর শ্রমের নেই বিকল্প কর্ম অধিক—বাক্য অল্প।

সুতরাং বিমুখী মন অবিশ্বাসী মন বিক্ষিপ্ত মন, হতাশাবাদী মন, ক্রমশ সংহত হয়ে উঠছে। সহানুভূতি ও সহকর্মিতার হাত ক্রমশ এগিয়ে আসছে একটি পতাকা-দণ্ডকে সবার উপরে তুলে ধরবার জন্য।

সেই পতাকাটি কি?

সেই পতাকাই 'নতুন—স্বরাজের' আর এক রূপ। ভাবরূপ-এর পরিপূরক 'বাস্তব রূপ।' আমাদের গ্রহণকামী মনের অন্যতম নির্ভর—বিশদফা কর্মসূচী। যার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক। আমরা আজ চোখের সামনে দেখছি কি অঘটন সম্ভব হয়েছে। সমস্ত বিশ্ববাসী ভারতের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলছেন—ভারতে এই এক বছরে এত কাণ্ড সম্ভব হ'ল কি ক'রে?

কি কাণ্ড?

না টাকার মূল্য বৃদ্ধি!

ভাবা যায়! টাকার দাম বাড়ছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম কমছে এবং বাজারে আর কৃত্রিম শূন্যতা সৃষ্টি করে জিনিষপত্রের দাম বাড়াবার অপচেষ্টা নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি উপমা দিয়ে বলা যায়, নব-দম্পতির বিবাহ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল অবশ্যই প্রেম, কিন্তু সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন বাস্তব কয়েকটি উপকরণের। ইঁট কাঠ মাটি দিয়ে বানানো ঘর, কাঠ কয়লা কেরোসিন এবং তৈল তণ্ডুলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। বিশদফা কর্মসূচীর অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তির ওপরই তাই নির্ভর করছে একটি জাতির গণতান্ত্রিক পথে অগ্রগমন ও উন্নয়নের সমস্ত সাফল্য।

আমাদের তরুণতর নেতাদের কথায় দেখুন না, চাকচিক্য নেই ভাষার ফুল-ঝুরিও নেই কোনো চমকপ্রদ নতুন প্রস্তাবও না। না, আমাদের তরুণতর যুবনেতা যেমন সঞ্জয় গান্ধীর কথাই ধরুন না, ইনি কখনই বন্দুকের নলকে শক্তির উৎস হিসেবে তুলে ধরেন নি। নবোদ্ভিন্ন যুব-শক্তির কাছে বরং তিনি অতি সাদা মাঠা ভাষায় অল্প কথায় বলতে চেয়েছেন বহুবার শোনা প্রয়োজনীয় অল্প কয়েকটি রূঢ় বাস্তব কথা। তা'হল—'ভাইসব, কাজ আছে গ্রামে চলো', 'ভাইসব পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করো', 'ভাইসব পরিবার পরিকল্পনা জোরদার করো', 'ভাইসব জাতিভেদ করোনা, পণ নিওনা, হরিজনদের কোল দাও'—'ভাইসব নারীদের সম্মানিত করো। তাঁদের বাঁচিয়ে তোলো, অধিকার দাও বিবাহ আইনকে সংশোধন করে তাঁদের স্বাধীন ভাবে বাঁচার, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার দাও। গড়ে তোল নতুন সমাজ।' সত্যি এই সব সঞ্জয়-উবাচে কোনো চমৎ-কারিনী বার্ত্তা নেই যা এ্যাডভেঞ্চারলোভী ক্ষণিক সুখে উৎসাহী তরুণ মনকে ক্ষণিকের জন্য চনমনে করে তুলবে। কিন্তু এই প্রতিটি কথার দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। যা ক্রমশ তরুণের কর্মোদ্যম জাগ্রত করে তুলবে। আসুন সেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মূল সন্ধান করা যাক্। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে আছে 'যে গৃহে নারী পূজিতা হ'ন সেগৃহ ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করে।' আজ ভারতবর্ষেই শুধু নয়, সারাবিশ্বে নারীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। কারণ নারীর পক্ষে ঘর ও

বাইরের জীবনের চাপ পুরুষ শাসিত সমাজের চাপ অত্যধিক হয়ে পড়ছে। ভারতে পুরুষের সংখ্যা ২৮৪ মিলিয়ন, মেয়েদের সংখ্যা ২৬৪ মিলিয়ন, পশ্চিম বাংলায় ২৩.৪ মিলিয়ন পুরুষের বিপরীতে মাত্র ২০.৯ মিলিয়ন মেয়ে রয়েছেন। আজ নারীর এই সংখ্যা হ্রাসের পিছনে যে সব সামাজিক কারণ আছে তা দূরীকরণ করতে হলে অতি অবশ্যই চাই পণপ্রথা নিবারণ এবং ডিভোর্স আইন সরলীকরণ। নতুন স্বরাজ গত এক বছরে সেই বহুনিন্দিত, বহু রমণীর মৃত্যু ও নির্যাতনের অন্যতম কারণ পণপ্রথার বিরুদ্ধে এনেছে নতুন জেহাদ। এই জেহাদের ফলে ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিরোধক আইনকে সক্রিয় করে তোলা হ'চ্ছে আন্দোলনের মাধ্যমে। কেবল আন্দোলন নয় আইনও প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রে, যেসব ক্ষেত্রে সরকার সহজেই আইনের ও আদেশের প্রযুক্তি বিধান করতে পারেন। যেমন সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই আইনের নির্দেশ লিখিত ভাবে হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়। মূলত 'নতুন-স্বরাজে', তরুণ কর্মীদের কাজই হলো সমাজের মধ্যে এই ঘৃণিত প্রথার বিরুদ্ধে এমন একটা জনমত গড়ে তোলা যাতে করে লোকে আঙুল দেখিয়ে পণ গ্রহণকারীকে জনশত্রু বলে চিহ্নিত করে দিতে পারে। যাতে রক্তপিপাসু খুনিদের মত তারা সমাজতন্ত্রবাদের পরিপন্থী শক্তি রূপে প্রতীয়মান হয়।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আর একটি লক্ষ্য হল, দেশের কোণে কোণে শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া। এটিও একটি বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা। এবং বলা যায় এই চিন্তা পণপ্রথা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতির সঙ্গেও প্রত্যেক্ষ ভাবে সংযুক্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,—'আমাদের সমাজ হল এক ডানা ভাঙ্গা পাখী। তার ভাঙাডানাটি হ'ল আমাদের নারী সমাজ। তাই আমাদের সমাজের পাখী উড়তে পারে না।' কথাটি সত্য। যেদেশে জননী নিরক্ষর, শ্বাশুড়ি মূর্খ, সে দেশে পণপ্রথার বিরুদ্ধে, অধিক সন্তান জন্মদানের বিরুদ্ধে নারীদের মধ্যে সচেতনতার আশা করাই বৃথা। বিশেষত একজন সাক্ষরা জননী মানেই কি কয়েকটি সাক্ষর সন্ততি নয়? দেশের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলে অবশ্যই সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও সরকারী বেসরকারী উৎসাহদান ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন ক্রমশ কমে আসবে।

তাই বিশদফা কর্মসূচীর পাশাপাশি এসেছে বারোদফা মদ্যপান নিরোধক কর্মসূচী। দেশের নারীপুরুষ ও যুবশক্তিকে এই কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ইন্দিরা-সঞ্জয়। নতুন সমাজের অন্যতম কাজ সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারের

পণ নেব না এই করিলাম পণ—প্রধানমন্ত্রীর সামনে শত তরুণের শপথ

অভিযান। এই অভিযানের জন্য প্রযুক্ত হচ্ছে বিশদফা কর্মসূচীর কয়েকটি দফা। যাতে করে শিক্ষা, এ্যাপ্রেনটিস নিয়োগ, ওয়ার্ক-এডুকেশন, হোস্টেল ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা এবং অবৈতনিক পাঠক্রম, সস্তায় ষ্টেশনারী, বই প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

মানুষের চোখের সামনে জ্ঞানের জগত খুলে দিলে সে তখন নিজেই পড়ে শুনে বুঝে সচেষ্ট হয়ে ওঠে পরিবার পরিকল্পনা আর সামাজিক অভিশপ্ত প্রথাগুলির বিরুদ্ধে। কেননা যেখানেই শিক্ষার প্রসার ঘটেছে সেখানেই শিশুর জন্মের হার কমেছে।

আসলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুলতায় তলিয়ে যাচ্ছে বলেই আমরা বুঝতে পারছিনা ভারত আজ সমৃদ্ধির কোন উচ্চ চূড়ায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এক নতুন দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সম্প্রতি এক সুইডিশ পত্রিকা সম্পাদিকার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভারত অনুন্নত দেশ নয়, কিন্তু ভারতের এক এক স্থান খুব উন্নত আবার কোনো কোনো জায়গা উন্নত নয়। এই দুই রকমের অবস্থার সহাবস্থানই আজ ভারতের সমস্যা। কোনো কোনো রাজ্যে হাজারে ৪১ থেকে জন্মহার কমে গিয়ে ৩৫ এমন কি ৩০-এও দাঁড়িয়েছে। যে রাজ্য অর্থনৈতিক ভিত্তিতে উন্নত সেরাজ্যে জন্মসংখ্যা হ্রাসের হার তত বেশি। জন্মসংখ্যা আরো কমাতে হবে। এজন্য ব্যবস্থা নিতেই হবে। সরকার নির্বীজকরণ এবং আইনসঙ্গত গর্ভমোচন দ্বারা পরিবার পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করে তাই জনসংখ্যা কমাবার প্রচেষ্টা করছেন।

নতুন স্বরাজের ভাবরূপ এবং বাস্তব রূপের মিলিত প্রবর্তনাই দেশ ও জাতির উন্নয়নের ভিত্তি। এই ভিত্তি স্থাপনের কাজে গত এক বছর ধরে সাধারণ মানুষও আজ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। তার কারণ তারা প্রতি পদেই আজ অনুভব করছেন দিনকাল পাল্টাচ্ছে এবং দেশ এখন অগ্রগতির পথে।

এছাড়া আমাদের প্রধানমন্ত্রী হরিজন, তপশীলি জাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য যে সব বিশেষ সুবিধা বিশদফা কর্মসূচীর অন্তর্গত করেছেন, তার সুফল লাভ করে হরিজনরা এই একবছরেই গৃহহীনতা ভূমিহীনতা এবং বর্ণগত ভেদাভেদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এ এক নিঃশব্দ বিপ্লব।

কিছুদিন আগে দিল্লীতে একটি মধ্যবিত্ত পাড়ায় সরকার ও সাধারণের এক স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার [illegible] এসেছে। একটি গৃহবধূ ময়লা অপসারণকারীদের সঙ্গে নিজে অপসারণের কাজে সহযোগিতা করেছেন। সংবাদ পত্রে লেখা হয়েছে, দিল্লীর বিভিন্ন বসতি-এলাকাগুলি ক্রমশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রাজধানীর চেহারা পাল্টে দিচ্ছে।

কিন্তু কেবল গৃহবধূ বা অঞ্চলবাসীর চেষ্টা বা কেবল সরকারী বা পৌর প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় কি এতটা হওয়া সম্ভব? —ময়লা ফেলার গাড়িগুলি ঠিক সময়মত ঘড়ির কাঁটা ধরে এসে হাজির হয়। এবং ময়লার বীনগুলো ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হয়। এই যে সচেতনতা এই যে পারিপার্শ্বিকে পরিশুদ্ধ করার ইচ্ছা, এই ইচ্ছা ক্রমশ গ্রামে ও, শহরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই নবচেতনা নতুন স্বরাজেরই দান। শ্রীমতী গান্ধী এই পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এই পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতনতা আনার একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। পারিপার্শ্বিক মলিনতা আজ এক বিশ্বজনীন সমস্যা। বৈজ্ঞানিকরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। ভারতবর্ষেও সময়োচিত সচেতনতা ক্রমশ জাগ্রত হয়ে উঠছে।

ভারতে মহাত্মাগান্ধীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আজ তাই নানা উপায়ে নানাদিক থেকে অনুন্নত দুর্ব্বল মানুষের সহায়তায় বিশদফা কর্মসূচীর ধারায় ধারায় এনেছে মুক্তির স্বাদ, অধিকারের হাতিয়ার। গড়ে উঠছে নতুন সমাজ।

কালো টাকার সন্ধানে
৩৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মাসে আর একটি আইন করে চোরাকার-বারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ৬০ কোটি টাকার চোরাই মাল আটক করা হয়।

আরব দেশে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ কয়েকটি দেশ আছে সেখানে বাণিজ্যিকর নেই বা নেই বললেই চলে। সেখানে ভারতীয় চোরাকারবারীরা অনেক যুগ ধরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কুয়েত, আবু ধাবি ও অন্যান্য দেশ থেকে নৌকায় এনে বহু বিদেশী মাল বম্বে উপকূলে ঢেলে ফেলত। এটা একটা বিরাট ব্যবসা ছিল। শুল্ক বিভাগের তৎপরতায় এই ব্যবসার জাল অনেকটা গুটিয়ে গেছে। কিন্তু ওদের তৎপরতা চলছে—একস্থান থেকে অন্য স্থানে মাল আনা হচ্ছে, অবশ্য ধরাও পড়ছে।

এদিকে নেপাল ও বাঙ্গলাদেশের সীমান্তেও বেশ ঐরূপ চোরাচালান চলছিল। বাঙ্গলাদেশ সীমান্তে এখন দু'তরফের তৎপরতায় চোরাচালান বেশ কমে গেছে, তবে নেপাল থেকে এখনও পাহাড় জঙ্গল, এলাকা দিয়ে মাল আসছে। —গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাকারবার নিরোধ আইন অনুযায়ী ১৯৭৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছে। এর মধ্যে ১৬৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চোরাকারবারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও পাশপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে চোরাকারবারীরা এখন অনেকটা নিষ্ক্রিয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কার্যসূচী অনুযায়ী চোরাকারবার ও শুল্কফাঁকি বন্ধ করার আদেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সব অফিসার, কর্মচারীদের এই রোগ প্রতিরোধের প্রেরণা দিচ্ছেন। এই যে রোগ এর বিনাশ করার জন্য ব্যাঙ্কগুলির সহায়তা ও বড় বড় বাণিজ্য সংস্থা বিশেষ করে বিদেশী সংস্থা সমূহের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘন করে কালো টাকার কারবারে নিযুক্ত বেশ কিছু লোককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যুগযুগ ধরে যে কালোবাজার চলে আসছে তার মূল তুলে ফেলতে প্রতিটি ভারতবাসীর সমর্থন আছে। নাগরিকদের সহায়তা আর সুফল বেশী পাওয়া যায় যদি তারা চোরাই মাল গ্রহণ না করে সরকারকে এর খবর দিয়ে দেন।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারত-থাইল্যাণ্ড মেয়েদের ফুটবল খেলার একটি বিশেষ মুহূর্ত

এবারের লীগ ফুটবলের প্রথম সপ্তাহেই মোহনবাগান মাঠে মেয়েদের খেলার আসর পাতা হয়েছিল। সফরকারী থাইল্যাণ্ড দলের শেষ খেলা ছিল ভারতের সঙ্গে। ভারত-থাইল্যাণ্ডের মেয়েদের ফুটবল খেলাটি খেলার নামে খেলাই ছিল। থাই মেয়েরা যদিও কিছুটা খেলতে পারে—আমাদের মেয়রো ফুটবলে একেবারেই অবলা। সুতরাং ভারত যে হারবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে। তবে এই খেলায় ভারত হেরেছে মাত্র এক গোলে। প্রথমার্ধে থাইল্যাণ্ডের সুওয়ানে মনচন্নন খেলার একমাত্র গোলটি করেন।

কলকাতার আগে থাই দল কালিকটে ৩—০ বাঙ্গালোরে ৩—১, হায়দরাবাদে ৩—০, কোটায় ২—০, আগ্রায় ৫—০ ও মোরাদাবাদে ৪—১ গোলে ভারতীয় মহিলা দলকে হারিয়ে দিয়েছেন।

খেলাধূলা

থাইল্যাণ্ডের মেয়েরা অনেক উন্নত

নিলি ঘোষ
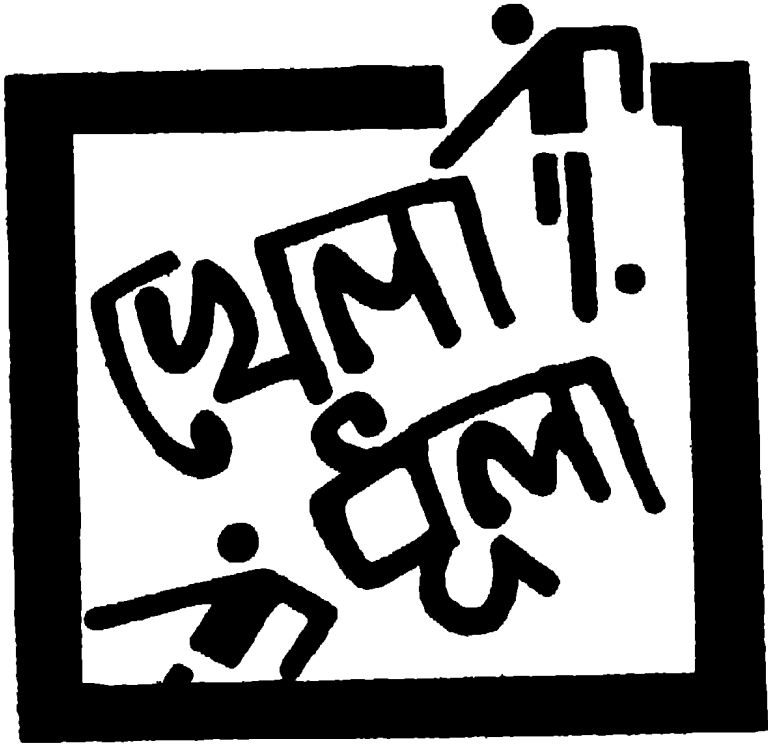
"ছোটবেলা থেকে ফুটবল খেলা ভাল লাগে। ফুটবল এমনই একটা খেলা যাতে আছে থ্রি-ল-চার্ম আর সেই সংগে আছে প্রচুর আনন্দের খোরাক। ফুটবলের জনপ্রিয়তা বোধ হয় সেজন্য। আর এই জনপ্রিয়তাই আমাকে ফুটবল খেলতে ইশারা করেছিল। পাড়ার দীপক সংঘে'র ছেলেদের সংগে ফুটবল খেলতে শুরু করেছিলাম। আর পূর্ণ ফুটবল খেলোয়াড়ে রূপ নিলাম ১৯৭৫ সালের ৯ই জুন। বাংলার মেয়ে ফুটবল দল গড়া হবে। যুগান্তর পত্রিকাতে ছিল—'উৎসাহী মেয়েরা কালিঘাট মাঠে সুশীল ভট্টাচার্য্যের সংগে যোগাযোগ করুন'। আমি গিয়ে হাজির হই ৮ই জুন। আমাকে পরের দিন দেখা করতে বলা হয়। পরের দিন যেতে পরীক্ষায় বসতে হোল। আমাকে দেখা হল বল রিসিভ করতে পারি কি না। তারপর সট ও পুস ইত্যাদি কেমন আমার। উত্তীর্ণ হলাম। প্রথমে ব্যাকে খেলতাম। সুশীলদা আমাকে ফরোয়ার্ডে নিয়ে এলেন। লাভই হয়েছে।" জিজ্ঞাসা করেছিলাম নিলির ফুটবলের শুরু কিভাবে—তারই উত্তর এটা।

১৯৭৫ সালের জুলাইতে লক্ষ্ণৌয়-এ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অধিনায়িকা সতের বছরের নিলি ঘোষ বাংলা দলকে নিয়ে গিয়েছিল। বিদর্ভকে ২—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্মান অর্জন করে। এরপর ১৯৭৬-এর জানুয়ারী মাসে ইন্টার জোনের আসর নাগপুর থেকেও চ্যাম্পিয়ানশিপ ছিনিয়ে আনে সেন্ট্রাল জোনের কাছ থেকে, নিজেরই দেওয়া একমাত্র গোলে। সেরা খেলোয়াড়েরও স্বীকৃতি অর্জন করে সেখানে। থাইল্যাণ্ড মহিলা ফুটবলের সংগে খেলার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহে কেরালাতে কিছু প্রদর্শনী খেলা হয়। সেখানেও তার দল জিতেছে। সে কোনদিনই হারে নি খেলায়। তাই থাইল্যাণ্ড দলের কাছে সাত সাতটা ম্যাচে হেরে গিয়ে খুবই মনমরা হয়ে পড়ে নিলি।
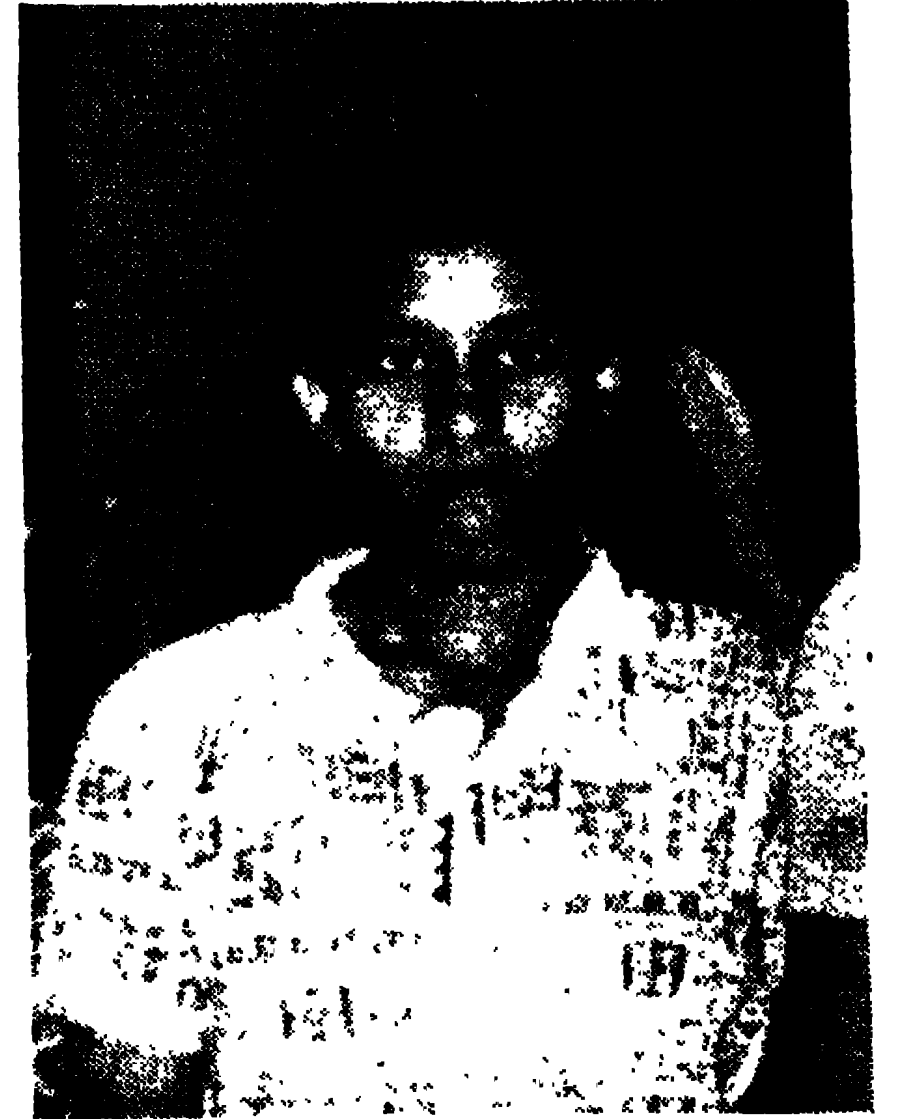
"থাইল্যাণ্ডের মেয়েদের কাছে আমরা অনেক শিশু। শিখতে হবে অনেক। ওদের বল ধরার কৌশল কল্পনাই করতে পারি না। ওদের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই প্রতিটি পজিসনে খেলতে পারে। এটাই ওদের সবচেয়ে বেশী সুবিধা। ওদের পায়ে কিক আছে।"

DHANADHANYE
Price Re. 1.00

YOJANA
(Bengali)

REGD. NO. D(D) 78
June 15 & July 1, 1976

বি. এ. পার্ট ওয়ানের ছাত্রী বাংলা দলের ক্যাপ্টেন কুমারী নিলি ঘোষ হ্যাণ্ডবল ও ক্রিকেট খেলে। তিনবোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। তাই আদরের খুব। কলকাতায় থাই দলের বিপক্ষে ভারতীয় দলের অধিনায়িকা ছিল সে। "কলকাতায় মাত্র এক গোলে হেরেছি। থাই দলের মিষ্টি মেয়ে গোল-রক্ষক কুমারী আনচান চেপরণ বলেছিল কলকাতায় তোমাদের দশ গোলে হারাব। খেলা শেষে আমি তাকে চুমু খেয়ে বলেছিলাম আমরা এক গোলে হেরেছি কিন্তু।"

* * * *

"হ্যায়! হ্যায়! আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা—আমরা প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকি বিশেষ মজাদার উপায়ে যা কিনা তোমরা আদৌ কল্পনা করতে পার না। পুরুষ ফুটবল দলের সংগে মেয়ে দলের খেলা হয় নিয়মিত। অতএব বুঝতে নিশ্চয়ই পারছ আমাদের তরিকাটি কেমন। এই ভাবে অনুশীলনের বিশেষ সুবিধা—পুরুষরা মেয়েদের চাইতে শক্তিমত্তায় বেশী—দমও বেশী। ওদের সংগে খেলতে খেলতে আমরা মেয়েরা পারদর্শিনী হয়ে উঠি। দম শারীরিক শক্তিমত্তা বিভিন্ন কলাকৌশলও শিখতে পারি। এর পর তো রয়েছেন আমাদের প্রশিক্ষক মিঃ এমফোরনের বিশেষ ট্রেনিং। তবে আমরা গভীরভাবে অনুশীলন করি। আর এটাই আমাদের সবচেয়ে গোপনাস্ত্র।" কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেল্লেন থাইল্যাণ্ড মেয়ে ফুটবল দলের অধিনায়িকা ত্রিশ বছর বয়স্কা কুমারী হয়পিন শেরনিউন। প্রশ্ন করেছিলাম ওদের দেশের খেলোয়াড়রা কিভাবে তৈরী হয়।

নিবিড় অনুশীলন জয়ের গোপনাস্ত্র

কুমারী হয়পিন শেরনিউন

উচ্ছল হাসি আর সুঠাম দেহের কানায় এখনও যৌবন উপচে পড়া কুমারী হয়পিন সেন্টার ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়।

১৯৭২ সালে সেকেণ্ডারী স্কুল সার্টি-ফিকেট পাশ করে থাইল্যাণ্ড রয়্যাল এয়ারফোর্সে যোগদান করেই ফুটবলে পা দিয়েছেন। এখন জাতীয় দলের এবং এয়ারফোর্স দলের একজন অন্যতম প্রধান খেলোয়াড় কুমারী হয়পিন হংকং-এ আয়োজিত ১৯৭৫ সালের এশীয় মেয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। দলকে জেতাতে না পারলেও রানার্স আপ হয়—নিউজিল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জন করে। মালয়েশিয়া, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ইংল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সফর করার সৌভাগ্য হয়েছিলো হয়পিনের।

"ভারতবর্ষ খুব ভাল দেশ। কলকাতা সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে। তোমাদের দর্শকরা সত্যিই খেলা পাগল। তোমাদের কথা, মিসেস ব্যানার্জী ও কুমকুম-এর কথা ভুলব না। খুবই ভাল ওঁরা। কলকাতার মাঠ বেশ সুন্দর। নরম-কোমল তোমাদের মেয়েদের মত। আমরা তত কোমল নই—রুক্ষ আমরা। যাই হোক, কলকাতায় আসার আশায় থাকব। তোমাদের আতিথেয়তা ভুলব না। তোমাদের মেয়েরা নিশ্চয়ই একদিন আন্তর্জাতিক জগতে স্থান করে নেবেই নেবে। কারণ ওদের চেষ্টা আছে। এই সফর থেকে শিখে গেলাম মানুষকে কিভাবে ভালবাসতে হয়।"

শিল্পের মরা গাঙে বান

৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

খুব সম্প্রতি মোটর যাত্রীবাহী গাড়ীর উৎপাদন কিছু বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে গাড়ীর দামও কিছু কমানো হয়েছে।

প্রথমে যে প্রগতির অনুভূতির কথা বলেছি তা অবশ্য আপেক্ষিক। যারা পাঁচছয় বছর আগে কলকাতায় ছিলেন, তারা শিল্পের সংকটের অবস্থাটা জানেন। এমনকি জরুরী অবস্থার আগেও এই সংকটটা অসহনীয় ছিল। ধর্মঘট, কাজ বন্ধ, ঘেরাও, লক-আউট, লে-অফ, ছাঁটাই ছিল ব্যাপক, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সুখের বিষয় এই অসুস্থ প্রবণতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে গত এগারো মাসে।

আধুনিকীকরণের জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এর জন্যে অর্থ সাহায্য দিতেও বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা ও অর্থমন্ত্রক রাজী আছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। পশ্চিমবংগে ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, ও পাট শিল্পের সংকটের মোচনের জন্য যা প্রয়োজন তা হল আধুনিকাকরণের। শ্রী টি. এ. পাই আশ্বাস দিয়েছেন, আধুনিকীকরণ হলে বর্তমান কর্মীরা বেকার হবেন না; এই অশ্রুবিহীন মন্ত্র আধুনিকীকরণের প্রথম পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হাওড়ার প্রায় শ' চারেক ছোট ঢালাই ও ওয়েল্ডিং কারখানা সম্পর্কে। "অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু"।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১৫ জুলাই ১৯৭৬
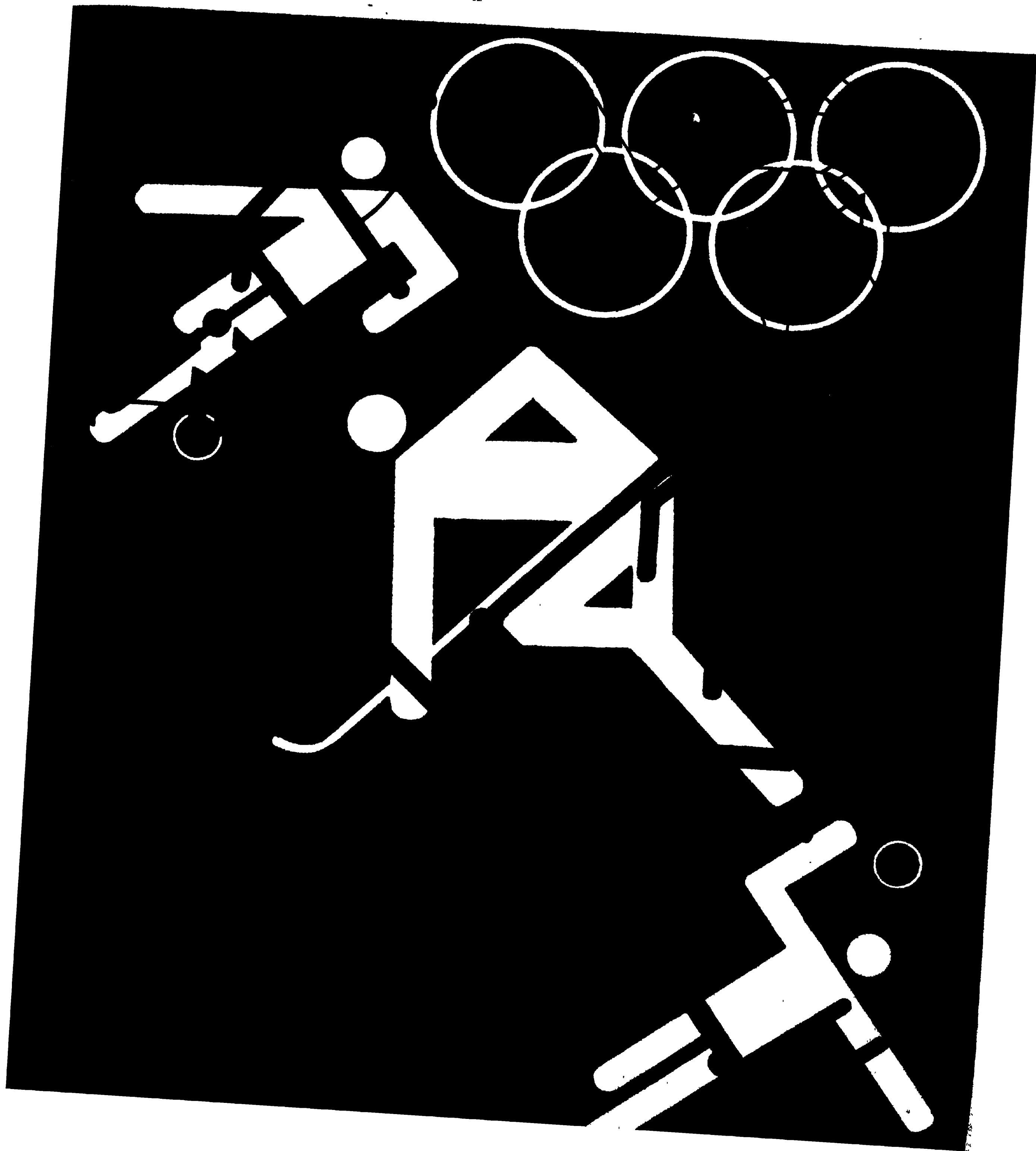
কুড়িদফা অর্থনৈতিক কার্যসূচী অনুযায়ী সারা দেশে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের কাজ চলছে। মহারাষ্ট্রে ভূমিহীন আদিবাসীদের জমির পাট্টা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

পরবর্ত্তী সংখ্যায়

বিশেষ রচনা

স্বদেশী জিনিস কিনুন
ইন্দু ভূষণ বসু

অন্যান্য রচনা

লটারীর সেকাল ও একাল
শোভন গুপ্ত

সি.এম.ডি. এ'র দু-চার কথা
স্বপন কুমার ভট্টাচার্য

আজকের তামিলনাড়ু
আনন্দ ভট্টাচার্য

প্রাকৃত (গল্প)
রানা দাস

বিশেষ সংযোজন (এই সংখ্যা থেকে)

কার্টুন

এছাড়া মহিলামহল, সিনেমা, খেলাধুলা, যুবমানস এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
অগ্রণী পাক্ষিক

১৫ জুলাই, ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ—শ্যাম দুলাল কুণ্ডু
আলোকচিত্র—শেখর তরফদার

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদকের কলমে

সপ্তাহব্যাপী বিদেশ সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরেছেন। এই সফরসূচীর মধ্যে ছিল ইউরোপের পূর্ব জার্মানি ও আমাদের প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান। এই দুই দেশের সংগে আমাদের দ্বিপাক্ষিক কোন সমস্যা নেই। শুভেচ্ছা ও মৈত্রীর পরিধিকে বিস্তৃত করাই শ্রীমতী গান্ধীর এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই প্রথম একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ব জার্মানি সফরে গেলেন। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগে ভারতের দীর্ঘকালের সম্পর্ক। ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করতে জার্মান পণ্ডিতদের অগ্রণী ভূমিকার জন্য ভারত ও পূর্ব জার্মানির মধ্যে এক বিশেষ মৈত্রীর বন্ধন গড়ে উঠেছে। দু'দেশের এই বন্ধুত্ব ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। এই সফরে বার্লিনে প্রধানমন্ত্রী জনগণের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন তাতে ভারত সম্পর্কে সেখানকার মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক বেড়েছে সেটাই প্রমাণিত।

তিনদিনের সফর শেষে ৪ জুলাই সোসালিষ্ট ইউনিটি পারটির প্রধান এরিখ হোনেকার ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষরিত যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে উভয় নেতাই একমত হন যে এশিয়া মহাদেশকে শান্তি ও সহযোগিতার এলাকায় পরিণত করতে হলে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সৎপ্রতিবেশীসুলভ স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই সফরের ফলে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে এবং দু'দেশই এতে উপকৃত হবে। দু'দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিসর সম্প্রসারিত হবে। শ্রীহোনেকার, ভারত যেভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হচ্ছে তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তিনি শান্তিভিত্তিক পররাষ্ট্র নীতি ও জোট-নিরপেক্ষতা আন্দোলনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত এক ঐতিহাসিক স্বল্প সময়ের মধ্যে যে সাফল্য ও অগ্রগতি করেছে তাতে তাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত!

১৯৭৩ সালে আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর এই প্রথম শ্রীমতী গান্ধী প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ দাউদের আমন্ত্রণে চার দিনের সফরে কাবুল পৌঁছুলে সেখানকার জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান। কাবুলে পৌঁছেই তিনি বলেন, সকলের সংগে বন্ধুত্বই ভারতের কাম্য। প্রেসিডেণ্ট দাউদের সংগে আলোচনা কালে দু'দেশের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বর্ত্তমান শ্রীমতী গান্ধী তার উল্লেখ করেন। এই উপমহাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল করার জন্য ভারত ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যোগাযোগ, বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে চুক্তি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তার উল্লেখ করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শ্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সংগে সম্প্রতি আফগান প্রেসিডেণ্টের যে আলোচনা হয় সে সম্পর্কে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে অবহিত করেন। বাংলাদেশের সংগে সম্পর্কের উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, ভারত চায় বাংলাদেশের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বন্ধুত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে ভারতের সদিচ্ছাকে বাংলাদেশ স্বাগত জানাবে বলে শ্রীমতী গান্ধী আশা প্রকাশ করেন।

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই মৈত্রী বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে ও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হবে প্রধানমন্ত্রীর এই শুভেচ্ছা সফরের ফলে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমস্ত সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে ভারত প্রয়াসী। এ প্রচেষ্টা সফল হলেই এই উপমহাদেশে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিটি রাষ্ট্র তখন নিজ নিজ দেশের জনগণের আর্থিক উন্নয়নে সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে।

মৈত্রীর বন্ধনে প্রতিবেশী দেশ

অসিত কুমার বসু

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তার স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই ভারত কোন সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি পোষণ করে না এবং কোন সামরিক রাষ্ট্র জোটে যোগদান করবার ইচ্ছাও রাখে না। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা লাভের লড়াই থেকে দূরে থেকে ভারত সর্বদা বিশ্বে শান্তি রক্ষার কাজেই ব্যাপৃত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সমস্যা সমাধান করা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। পঞ্চশীলের উপর এ নীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেও ভারত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন নয়। শান্তির জন্য সে সকল প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। অপরদিকে তৃতীয় রাষ্ট্র জোট গড়ে তোলাও তার অভিপ্রায় নয়। গত তিন দশক ধরে ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলেছে। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরু যে পথ সৃষ্টি করেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত তা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে চলেছে। বিশেষ করে তার প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতি। এক্ষেত্রে নেহরু প্রতিষ্ঠিত নীতিতে শ্রীমতী গান্ধী একটা গতিশীলতা সঞ্চার করেছেন।

গত পাঁচ বছরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিরোধের কারণগুলির অবসান ঘটিয়ে দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি সম্প্রসারিত করা। বিশেষ করে উপমহাদেশের দেশগুলির সঙ্গে এই মৈত্রী ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। ভারতের ক্ষেত্রেও এটা অনস্বীকার্য। তাই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সমস্যা ভারত সাফল্যের সঙ্গেই অতিক্রম করেছিল। ফলে এশিয়ার এই খণ্ডে ভারত অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। সেই থেকে বিশেষ করে ভারত তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করতে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। আর এই প্রতিবেশীরাও উপলব্ধি করেছে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের গুরুত্ব। এটা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক উন্মোচিত করল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সাম্প্রতিক ভারত-পাক ও চীন-ভারত দূত বিনিময় তারই পরিণতি। নয়াদিল্লী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের মধুর সম্পর্ক বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ শক্তি বা প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পথে অন্তরায় নয়। তাই চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ভারত সরকারের উদ্যোগ ও চীনের সঙ্গে দূত বিনিময়ের সিদ্ধান্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বাগত জানিয়েছে। চীনের সঙ্গে দূত বিনিময় আমাদের এই নিকট শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থায়ী করার পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

গত মে মাসে ইসলামাবাদে সিমলা চুক্তি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যে চুক্তি হয়েছে আশা করা যায় এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। এই নতুন চুক্তি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ একযোগে পরস্পরের আকাশসীমা ব্যবহার এবং বিমান সংযোগের ব্যবস্থা শুরু করবে। এ মাসের মাঝামাঝি আবার দু'দেশের মধ্যে রেল চলাচল করবে। এই রেল যোগাযোগ চালু হলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার পথ আরও উন্মুক্ত হবে। ফলে এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি, সহযোগিতা ও মৈত্রী গড়ে উঠবে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যা একান্ত জরুরী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বতস্ফূর্ত সদিচ্ছার মূলে আছে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক অতি দ্রুত স্বাভাবিক করা যাতে করে এই উপমহাদেশে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা চিরস্থায়ী হয়। সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ অবশ্য অনেকটা নির্ভর করবে পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কতখানি খাঁটি তার উপর। সরাসরি ও শান্তিপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে ভারত সর্বদাই আগ্রহী।

এখানে উল্লেখ্য যে পোখরান বিস্ফোরণ এবং জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তি করে সিকিমের ভারতভুক্তি কোন কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অমূলক সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। কিন্তু ভারত তাদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে প্রভুত্ব নয় সে তাদের কাছ থেকে আশা করে কেবল বন্ধুত্ব। গত কয়েক বছরের কয়েকটা ঘটনা এখানে নজীর হিসাবে উল্লেখ করা যায় যা থেকে বোঝা সহজ হবে যে ভারত সরকার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সহাবস্থানের

নীতি দৃঢ় করার জন্য সুদীর্ঘ কাল ধরে যে সব সমস্যা ছিল তা সমাধান করতে পেরেছে। শ্রীলঙ্কাকে কচ্ছতিভু দিয়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সামুদ্রিক সীমা-রেখা স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে এক সরাসরি উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

নেপালের সঙ্গে আমাদের যে সব বড় সমস্যা ছিল তার সমাধা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা' যে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাধা হবে সে বিষয়ে নেপাল সচেতন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী ডঃ তুলসি গিরির সাম্প্রতিক ভারত সফরে ভারত আর নেপালের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। গত মাসের ভারত-নেপাল বাণিজ্য চুক্তির সমস্যা সমাধানে নয়াদিল্লীর বৈঠক তার নজীর। গণ্ডক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যে দু মাইল দীর্ঘ নেপাল পূর্ব খাল খননের কাজ হাতে নিয়েছেন তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা তৈরী করতে ছয় কোটি টাকা ভারত খরচ করেছে। অপরদিকে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যে দীর্ঘ সীমানা তা' প্রায় সবই নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। মালাদিভস্-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শান্তি ও বন্ধুতার নীতিতে গড়ে উঠেছে। এ দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী সহযোগিতাও ক্রমবর্দ্ধমান। আর ভারত-ভুটান সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে দৃঢ় হয়েই আছে। পশ্চিম ভারতে আফগানিস্তান ভারতের পুরাতন আস্থাভাজন বন্ধু। এ মাসের চার তারিখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তিন দিনের জন্য আফগানিস্থান সফরে গিয়েছিলেন। গত বছর আফগানিস্থানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ দাউদও ভারতে এসেছিলেন। আশা করা যায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়তে সর্বদাই গুরুত্ব দিয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো সিমলা চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন

যদিও শেখ মুজিবর রহমান, তাঁর পরিবার-বর্গ ও বাংলাদেশের অন্যান্য নেতাদের হত্যার ঘটনায় ভারত খুবই মর্মাহত। এই শোচনীয় ঘটনাকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ভারত মনে করে।

কখনই ভারত তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেনা এটাই আমাদের নীতি। সম্প্রতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে দিল্লীতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ফরাক্কার জল বণ্টন ও সম্ভব বলে ভারত বিশ্বাস করে। দুদেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে দুদেশের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, জোট নিরপেক্ষতা এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতীয় প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফর গিয়েছিলেন। এই সফরের ফলে দু-দেশের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে বলে আশা করা যায়।

ভারত তার সব প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী। উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ভারত তার ভূমিকা পালন করে যাবে। ভারত আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী এবং বিশ্বাস করে যে এর ফলে বৃহৎ শক্তির স্বার্থে গঠিত সামরিক ঘাঁটি এই উপমহাদেশে গড়ে উঠতে পারবে না এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দূর হবে। ভারতের উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা বার বার প্রমাণ করেছে যে ভারত প্রতিবেশীর প্রতি বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্র বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

দূষিত পরিবেশের সমস্যা

উৎপল সেনগুপ্ত

দূষিত পরিবেশে সারা বিশ্ব এখন ধুঁকছে। মানুষের সেবায় বিজ্ঞান যত এগুচ্ছে—ঠিক সেই পরিমাণে দূষিত হচ্ছে আবহাওয়া পরিমণ্ডল এবং পরিবেশ। ফলে পৃথিবীর মানুষ নানারকমের রোগে রোগগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যায় এখন বিব্রত বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা। গত ষাট দশকের শেষভাগে এই সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ হয়েই পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা কৃষি ও শিল্পের ফলে বাতাস ও জল যেভাবে দূষিত হচ্ছে, তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। আর শুধু বাইরের কথাই বা বলি কি করে এই সমস্যায় চিন্তান্বিত ভারতও।

দূষিত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে জুন মাসে স্টকহোমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। সেবারই প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দূষিত পরিবেশ সম্পর্কে যুগ্মভাবে দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছান।

সমস্যার মোকাবিলার জন্য ভারত-সরকার ইতিমধ্যেই একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি গঠন করেছেন।

দূষিত পরিবেশ আমাদের দেশে আকস্মিকভাবে শুরু হয়নি। বহুদিন আগের পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থাই এর কারণ। ইতিহাসের পাতার দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, বৃটিশরাজ এখানে উপনিবেশ শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করে কয়েকটি শহরকে নিয়ে। মানুষের সমস্ত রকমের শ্রমকে শোষণ করে তারা শহরে ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে, এই লোকগুলো ক্রমশ তাদের চরিত্র হারিয়ে ফেলে। পরিবহণ ব্যবস্থা বৃহৎ অট্টালিকা ও শিল্প উৎপাদনে কারিগরী উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বুকে তৈরী হয়ে যায় বস্তী ও জবরদখল-কারীদের অঞ্চল এবং পরিবেশ হয় দূষিত।

স্বাধীনতার পর শহরের পরিকল্পনা করা হয় এক নতুন দিক থেকে। অনেক নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল ও শহর তৈরীর মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত হয়। কিন্তু নতুন শহর কিংবা শিল্পাঞ্চলের গোড়া-পত্তন ছাড়া ভারতের পুরানো শহরগুলোতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, দরিদ্র জীবনযাত্রা ও দূষিত পরিবেশের ফলে মানুষ নানা ব্যাধিতে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। শহরের এইসব নোংরা-ঘিঞ্জি এলাকায় জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাটুকু পর্যন্ত অনুপস্থিত। এই সমস্ত শহরের খুব অল্প জায়গা জুড়েই আছে পয়ঃপ্রণালী ও ভূগর্ভস্থ জলনিকাশী ব্যবস্থা। এখানে জল ও বায়ু ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। বৃটিশ আমলের এলোমেলো শিল্পোন্নয়ন ও ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে ভারতের শহরগুলো মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল করেছে—উপরন্তু উদ্বৃত্ত কৃষি মজুররা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে কাজের খোঁজে। ফলে বড় বড় শহরের বুকে তৈরী হয়েছে বস্তী বা জবর-দখল নোংরা আস্তানার বসতি। শহরের উপর এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে কদর্য করেছে।

আমাদের দেশের শতকরা মাত্র ২০ ভাগ লোক শহরাঞ্চলে বাস করেন। তাহলেও শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের স্থান সারা বিশ্বে চতুর্থ। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, পরবর্তী ত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ বছরে এদেশের জনসংখ্যা হবে দ্বিগুণ এবং শহরের জনসংখ্যা হবে তিনগুণ।

জীবনে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য যেমনি এসেছে তেমনি যন্ত্রসভ্যতা ও শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার সমস্যাও তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে নতুন ভাবে।

ক্ষমতার লোভে মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার করছে। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তার কল্যাণে দূষিত পরিবেশ এখন প্রকট আকার ধারণ করেছে।

সাধারণভাবে দূষিত পরিবেশের উৎস হ'ল পয়ঃপ্রণালী, ভূগর্ভস্থ নর্দমার গ্যাস, নর্দমা ও শিল্পাঞ্চলের ধোঁয়াশা। এগুলোই নানাভাবে দূষিত করছে আব-হাওয়া পরিমণ্ডলকে—সৃষ্টি হচ্ছে অজানা অনেক রোগের এবং ব্যাহত হচ্ছে সুস্থ নাগরিক জীবন।

শহরাঞ্চলে শিল্পের উন্নতির ফলে সর্বাপেক্ষা দূষিত করছে মুক্ত বাতাসকে। বড় বড় কলকারখানার বাষ্পীয় গ্যাস চারিদিকে নির্গত হয়ে বাতাসকে বিষাক্ত করছে। এই বাতাসের ঘ্রাণ শহরবাসী নিচ্ছে এবং বের করছে প্রতিনিয়ত—যা কারখানার দূষিত বাষ্প দ্বারা পরিবৃত।

এছাড়া বেশীর ভাগ শহরেই মোটরযানের চাপের জন্যই আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে। এইসব মোটরগাড়ীর দুর্বল যন্ত্রাংশ এবং পুরানো মডেলের গাড়ী এজন্য বেশী দায়ী। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে নতুন গাড়ীর ক্ষেত্রেই যেখানে শতকরা ১.৫ ভাগের বেশী কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস গাড়ী থেকে নির্গত হওয়া নিষিদ্ধ এদেশে সেখানে গাড়ীর এই গ্যাস প্রতিদিন বেরোবার মাত্রা হল ৫.৫ থেকে শতকরা ১০ ভাগ। কলকাতা হল এই ব্যাপারে বিশ্বে সর্বোচ্চ রেকর্ডের অধিকারী। এই শহরে প্রচণ্ড জনচলাচলের সময়ে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস প্রতি দশলক্ষে বেরোয় শতকরা ৩৫ ভাগ। এই অধিক পরিমাণ বায়ু কেবল কলকাতা ও বোম্বাইয়ের গাড়ীর জন্যই দূষিত হচ্ছে।

শহরের পরিবেশ দূষিত হওয়ার একটি কারণ —চিমনির ধোঁয়া

দূষিত বাতাসের আর একটি অন্যতম কারণ হ'ল এখানকার গৃহস্থবাড়ীর উনুনের কয়লার ধোঁয়া। শীতকালের সন্ধ্যায় এই ধোঁয়াশা এরাজ্য ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে দেখা যায়।

সেই সঙ্গে জল দূষিত হওয়ার সমস্যাও আমাদের দেশে প্রকট। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দেশে এমন কোন নদী নেই—যা দূষিত নয়। এমনকি গঙ্গা-যমুনার মতো নদীর নিম্নস্থানে অধিক মাত্রায় দূষিত জল বিদ্যমান। দেশের ছোট ছোট নদীগুলোতেতো সব সময়ই ভূগর্ভস্থ নর্দমার জল আর শিল্পাঞ্চলের রাসায়নিক তরল পদার্থ পড়ছে। সাবরমতী নদীতে আমেদাবাদে টেক্সটাইল কারখানার দূষিত জল মিশছে। হুগলী নদীতে মিশ্রিত হচ্ছে চটকলের অপ্রতিষেধক দূষিত পদার্থ।

মোটামুটিভাবে এটাই হচ্ছে দেশের দূষিত পরিবেশের একটা চিত্র এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ও শিল্পোউন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা আরো জটিল হবে।

রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচীর ডিরেক্টার মিঃ এম. কে. টৌলবা তাঁর সাম্প্রতিক ভারত সফরে বলেছেন যে, এই দেশের মোট পরিবেশ সমস্যার এক-পঞ্চমাংশ হল দূষণের সমস্যা।

দারিদ্র্যই পরিবেশ সমস্যার জন্ম দেয় এবং এতে জমির ওপর চাপ পড়ে অত্যধিক। সুতরাং উন্নয়নই এর একমাত্র সমাধানের পথ।

এই পরিধির মধ্যেই দেশের পরিবেশ পরিকল্পনা সুসংবদ্ধ করতে হবে। বেশীর-ভাগ পরিবেশ সমস্যাই মূলত উন্নয়নের সমস্যা থেকেই উদ্ভূত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

দূষিত পরিবেশ নিবারণের জন্য যে সব ব্যবস্থা এখনই করা উচিত তা হল: শহরকে সুন্দর করে রাখতে হবে। শহরের মধ্যে বেশীক্ষণ জঞ্জাল জমিয়ে রাখা চলবে না। বড় বড় দেয়ালের গায়ে লিখন ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে একটি আইন প্রবর্তন করে এ ধরণের ব্যবস্থা বন্ধ করেছেন। শহরের বুক থেকে গাছ কাটা বন্ধ ও সুষ্ঠুভাবে গাছের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং মুক্ত জায়গা রক্ষার জন্য আইন করতে হবে।

শহরকে সবুজ রাখতে চাই আরো নতুন নতুন গাছের সমারোহ, খেলার মাঠ ও পার্ক। পথচারীদের চলাফেরার জন্য ফুটপাতের সুব্যবস্থা চাই। শহরের এক একটি কোণে প্রস্রাবখানা পরিষ্কার ও সুবন্দোবস্ত করে রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় জায়গা ছেড়ে বসতবাড়ীর পরিকল্পনা করতে হবে। বসবাসকারী এলাকায় কলকারখানা স্থাপন চলবে না। প্রাকৃতিক সম্পদকে (দীঘি-নদীর জল) পরিষ্কার করে রাখতে হবে। শহরে গৃহস্থদের জ্বালানী হিসেবে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করে ধোঁয়াশাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এইক্ষেত্রে রান্নার জন্য গ্যাসের ব্যবহার চালু করতে হবে। যেখানে সুস্থ পরিবেশের ঘাটতি রয়েছে সেখানে পানীয় জল সরবরাহ, ভূগর্ভস্থ নর্দমা ও নালার সুব্যবস্থার জন্য বড় পরিকল্পনার দরকার। পানীয় জলের গুণা-গুণ পুংখানুপুংখভাবে বিচার করতে হবে। পুকুর পরিষ্কার রাখা দরকার। এছাড়া পায়খানা ব্যবস্থা পাকা চাই। শহরের মধ্যে গোলমাল হ্রাস করতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পাঞ্চল, রেল লাইন ও জনবসতিপূর্ণ

২২ পৃষ্ঠায় শেষাংশ

বাস্তুভিটা

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

ধবলাটের বিজয় ওঁরাওকে আশ-পাশের কে না চেনে? তেল কুচকুচে কালো চেহারার দিনমজুর বিজয় যার বাড়ি যখন যে কাজ পায়, তা-ই করে। মাটি কোপানো, ধান রোয়া, ধান কাটা, ডিঙি নৌকোয় চড়ে সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যে জালীর কাজ করা, কী না করে এই সাঁওতালী তরুণ। জানালার গরাদের মতো লিকলিকে অথচ শক্ত হাতে-পায়ে শক্তিটুকু ভগবানের কৃপায় ভালোই পেয়েছে সে। এই শক্তিটুকুই বিজয়ের ভরসা। কিন্তু শক্তি আর থাকেই বা কেমন করে? আজকাল লোকের বাড়িতে কাজ করে কি সুখ আছে? সারাদিন কোদাল কুপিয়ে রক্ত জল করার পর গেরস্ত বাড়ির বৌ-ঝিদের দয়ায় এক মুঠো ভাত পায়। তরকারি কখনো থাকে, কখনো একটা কাঁচা লঙ্কাও জোটে না। কাজ করে খেতে না পেলে তো দুঃখ হবারই কথা। তাই বিজয় মাঝে মাঝে জেলেদের নৌকোয় করে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যায়। নৌকোয় থাকলে, খাওয়া-দাওয়াটা খারাপ হয় না। মাঝে মধ্যে বিড়ি-টিড়িও পায় সে। তাই ক্ষেতমজুরের কাজ আজকাল আর সে করতো না বললেই হয়। কিন্তু মাঝে একবার ঘূর্ণি ঝড়ের দরুন বিজয় আর তার দলের মাঝিরা কোনরকমে সমুদ্রে ডুবে মরার হাত থেকে রেহাই পেয়ে তীরে ফিরে এসেছিল। আর সেই থেকে বিজয় তার বউ লছমির কাছে কথা দিয়েছে, সে আর কখখনো সমুদ্রে যাবে না। ডাঙ্গার মানুষ ডাঙ্গায় থাকবে। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও সমুদ্রে নামবে না।

তাই বিজয় এখন আগের মতোই অপরের বাড়িতে কাজের সন্ধান করে বেড়ায়। বিজয়ের কাজ করার ক্ষমতা আছে। তাই স্থানীয় সবাই জানে যে, তাকে কাজে নেওয়া মানেই একটা মজুরের দামে তিনটে মজুরের কাজ পাওয়া। ফাঁকির কারবার ওর মধ্যে একদম নেই। বিজয় বলে, 'তু আমাকে খাইতে দিবি, পয়সা দিবি, আর আমি ফাঁকি দিব ক্যান? ফাঁকি আমার সয় না।'

এই হল বিজয়। আর্থিক দুর্দশার জন্যে বেচারার একটা মাথা গোঁজার মতো ঘর তৈরী করার সামর্থ্যও নেই। তাছাড়া, ঘর করবেই বা কোথায়? জমি চাই তো? জমি কেনার মতো অত টাকা সে কোথায় পাবে? তাই বাধ্য হয়ে অপরের বাড়ির গোয়াল ঘরের এক পাশে সরু এক চিলতে জায়গায় লছমীর পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে ভোর হলেই দু'জনে মাঠে কাজ করতে চলে যায়। রাতে বিজয়ের চোখে ঘুম আসে না। লছমীর চুলের মধ্যে আঙুল গুঁজে হাত বোলাতে-বোলাতে তার দঃখের কথা ভাবে। আজ পর্যন্ত নিজের হাতে একখানা ভালো শাড়ি তাকে কিনে দিতে পারলে না সে। মাথায় মাখার একটু তেল, পায়ে লাগানোর জন্যে একটু আলতা, নাকে পরার জন্যে একটা রূপোর নথ কি তার কিনে দেওয়ার ইচ্ছে হয় না? কিন্তু সে কী করবে? এত সব সখের জিনিস কিনতে যে অনেক টাকার দরকার! অত টাকা সে কোথায় পাবে?

কিন্তু এই বিজয়ের ভাগ্যেই হঠাৎ একদিন যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। কার্তিক হাজরার জমিতে ধান রোয়ার সময় সুনীল ঘোড়ুইয়ের কাছে বিজয় শুনলো, যাদের ঘর-বাড়ী নেই, সরকার বাহাদুর তাদের জমি দেবে, ঘর বানাবার টাকা দেবে, চাষের জন্যেও জমি পাওয়া যাবে। সব নাকি ফ্রি। 'ফ্রি'-তে জমি পাওয়া যাবে শুনে বিজয় প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি। বিজয় বলেছিল, 'মোকে তুমি ঠাট্টা করো ক্যান সুনীলদা?' সুনীল বলেছিল, 'তুই ব্যোমকেশবাবুর কাছে গিয়া জিগা। তখন জানতি পারবি মুই সত্যি কথা কইছি কি না।'

সুনীলের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্যে বিজয় সেদিন ব্যোমকেশবাবুর কাছে গিয়ে জিগ্যেস করতেই, ব্যোমকেশ-বাবু তাকে বললেন, 'হ্যাঁরে। সরকার তোদের জমি দেবে, টাকা দেবে, চাষ করার জমি পাবি। তোর নাম আমি লিষ্টি করে বি. ডি. ও. অফিসের বাবুদের কাছে পাঠায়ে দিয়েছি। ক'দিন পর তোরা জমির পাট্টা পাবি।

ধবলাট অঞ্চলের প্রধান ব্যোমকেশবাবুর কথাগুলো শুনে বিজয়ের বুকের মধ্যে অজস্র আনন্দের ঢেউ উপচে পড়ছিল। ব্যোমকেশবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেই ছুটত ছুটতে লছমীর কাছে গিয়ে বিজয় তাদের এই সুখবরটা পৌঁছে দিতেই লছমীরও সে কি ভীষণ আনন্দ!

কয়েকদিন পরে শিবপুরের হাটে গিয়ে বিজয় দেখল একটা খাকি জামা পরা লোক ঢোল পিটিয়ে চাঁৎকার করে সবাইকে খবর দিচ্ছে: কাল এস. ডু. সাহেপ এসে বাস্তুহীনদের জমির পাট্টা দেবেন গো—। সবাই সকাল দশটার মধ্যি ছয়ের ঘেরীর মোড়ে পৌঁছে যাবা। এস. ডু. সাহেপ এসে পাট্টা দেবেন গো—।

খবরটা শুনে বিজয় বাড়ি গিয়ে লছমীকে বললো, 'কাল মুরা জমির পাট্টা

১২ পৃষ্ঠায় শেষাংশ

জাঁহাপানা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

গাঁয়ে থাকতে ছেলেরা মিলে থিয়েটার করতুম। চাকর বলে ওকে ছোট করব না, বাড়িতে নানা রকম কাজকর্ম করত যে যোয়ান ছেলেটি, তার নাম ছিল বাঁকা। একটু বাঁকা গড়ন, তাই বাঁকা। নাদুস-নুদুস কালো কুচকুচে চেহারা। হাঁটলে বড়বড় হাতদুটো হাঁটু অব্দি ঝুলত। এর কারণ আর কিছু নয়, একটু সামনে ঝুঁকে গরিলার মতো হাঁটত। দাদু মির্জাসায়েব ওকে বলতেন 'হাবসী' অর্থাৎ আবিসিনিয়ার লোক। সেবার থিয়েটারে ওকে হাবসী খোজার পার্ট দেওয়া ওই থেকেই। তার মোট তিনটি সংলাপ ছিল এবং তিনটিই 'জাঁহাপানা'। সেই ভূমিকাটিতে বাঁকা চমৎকার অভিনয় করেছিল। তারপর থেকে তার নাম হয়ে উঠেছিল জাঁহাপানা। জাঁহাপানার ওজনদার ধাক্কায় বাঁকা নামটা গড়াতে-গড়াতে দূর বিস্মৃতির গভীর গর্তে একদা তলিয়ে গেছে।

জাঁহাপানার বাবাকে আমার বিশেষ মনে পড়ে না। সে নাকি ছিল আরও প্রকাণ্ড মানুষ। মীর্জাসায়েব একবার প্রচণ্ড বন্যার সময় ত্রাণের কাজে বেরিয়ে লোকটাকে কুড়িয়ে পান। তার একটা সখের পানসি নৌকো ছিল। গাঁয়ের পাশের নদীতে বারোমাস জল থাকে না। কিন্তু বর্ষা থেকে হেমন্ত অব্দি পানসি নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। হাতে থাকত বন্দুক। এবং বানবন্যা হলে ডুবো এলাকায় যথাসাধ্য ত্রাণের কাজে লেগে যেতেন। বাঁকার বাবাকে তিনি একটা ভেসে যাওয়া ঘরের চালে উবুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন এবং নিয়ে আসেন। তারপর সে আর নিজের গাঁয়ে ফিরে যায় নি। তার বউ ছেলেমেয়েদের সেই মারাত্মক বন্যা গিলে খেয়েছিল। এমন এক শোকার্ত মানুষকে মীর্জাসায়েব আবার সংসার দিয়েছিলেন—তবে সে-সংসার তাকে কতটা সুখী করেছিল, আমার সংশয় আছে। আমাদের বাড়ির এক বাঁদী অর্থাৎ ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। আস্তাবলের দিকটায় একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাঁকার জন্মের পর তার মা মারা যায়। তার বাবা আমাদের আস্তাবলের সহিস হামিদ খাঁর সঙ্গে কী নিয়ে একদিন বচসা করে এবং আচমকা হামিদ খাঁর মাথায় ইঁট মেরে বসে। এই খুনের দায়ে লোকটার যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল। হামিদ খাঁকে মীর্জা খুবই স্নেহ করতেন, তাই তার এই খুনখারাবি সইতে পারেন নি।

অথচ বাঁকার বাবাকেও তো তিনি কম স্নেহ-যত্ন করতেন না। আসলে মানুষের মনের গতিক বোঝা কঠিন। সে জেলে গেলে বাঁকা আরেক বাঁদীর হাতে মানুষ হতে থাকল। মীর্জা সবসময় বাঁকাকে ডাকাডাকি করতেন। তার হাতে বদনার জল না পেলে মীর্জার নমাজের অজু অর্থাৎ প্রক্ষালন হত না। এখনও সেই জাঁদরেল দাদু সায়েবের হাঁকডাক স্পষ্ট শুনতে পাই।—এ্যাই ব্যাটা হাবসী! কোথায় গেলি তুই? এ্যাই উল্লুক! এবং তখন হয়তো বাঁকা আস্তাবলে নতুন সহিস হরমুজ খাঁয়ের গায়ে চড়ে ডলাইমলাই দিচ্ছে।

তো, বাঁকা সেই থিয়েটারের পর থেকে জাঁহাপানা হয়েছিল। দাদুর মৃত্যুর পর জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটল। পারিবারিক গোলমাল শুরু হল জটিল শরীয়তী সম্পত্তি বণ্টন প্রথা নিয়ে। বাবা তার ছোট্ট পরিবার নিয়ে পৈতৃক বিশাল দালানের একাংশে সরে গেলেন। জাঁহাপানা আমাদের কাছেই থেকে গেল। এসব দশবারোবছর আগের কথা। তারপর তো আমি চাকরি করতে কলকাতা চলে এলুম। বিয়ে করলুম। এখন এখানেই আমার সংসার জীবনযাত্রা এবং সব আশাআকাংখার কেন্দ্র। জাঁহাপানা রয়ে গেল বাবার কাছে গাঁয়ের বাড়িতে।

আলস্য এবং ব্যস্ততা দুইয়ে মিলে গাঁয়ে যাওয়া একেবারে কমে গেছে দিনেদিনে। কিন্তু জাঁহাপানা বাবা ও আমার মধ্যে একটা যোগসূত্রের কাজ করে। সে একমাস-দুমাস অন্তর আমার বাসায় আসে। খবর দেয় নানারকম। খুঁটিয়ে সবকিছু দেখার অভ্যাস আছে বলেই সে

কোন ঘটনার চমৎকার একটা বিবরণ দিতে পারে। কিন্তু বরাবর তার আসল কথা একটিই। সে অনুযোগ করে—আপনিও এলেন আর থেটারও বন্ধ হল। ছিনছিনারিগুলো পোকায় কাটছে। হ্যাঁ গো, এই রকম চলবে?

বুঝতে পারি সে কী বলতে চাইছে। সে থিয়েটারে পার্ট করতে চায় আবার। ওই একবারই ঐতিহাসিক নাটক আমরা করেছিলুম। বাকি সবই সামাজিক নাটক। তাকে চাকর-বাকরের পার্ট দেওয়া কঠিন ছিল এসব নাটকে। কারণ রিহার্সালে কিছুতেই তাকে 'জাঁহাপানা' সম্ভাষণ ছাড়াতে পারিনি। জগার পার্টে তাকে জগা বলে ডাকলেই জাঁহাপানা বলে কুর্নিশ দিয়ে হাজির হত। তারপর জিভ কেটে কাঁচুমাচু হাসত। কিন্তু ওই অভ্যাস ছাড়ানো যায়নি। অগত্যা আমরা ঝুঁকি নিতুম না।

থিয়েটারের কথা উঠলে তাকে বলি—কেন? গাঁয়ের ছেলেরা থিয়েটার করতে চায়না?

জাঁহাপানা জোর মাথা দোলায়। বলে—না গো। সব পার্টি-ফার্টি করে। কেলাব-ঘরটায় শুধু গুলতানির আসর। ঝাঁটা মারো। ঝাঁটা মারো। থেটারের কথা উঠলে বলে—দূর দূর। ঝামেলা। বরং সখ হলে ছিনেমা দেখে আসব। বুঝুন ব্যাপার। ইদিকে ছিন-ছিনারিগুলো মাঝেমাঝে রোদ খাওয়াব বলে যেই মই লাগিয়েছি, ছোট সায়েব মই কেড়ে মারতে আসবেন। নষ্ট হোক গে না, আমার কী?

ছোট সায়েব মানে আমার বাবা। আমি অবশ্য ভালভাবেই জানি, গাঁয়ের ছেলেরা থিয়েটার করতে চাইলেও উনি ষ্টেজ বা সিন কিচ্ছু দেবেন না। ওগুলো বড় মীর্জার এই নাতির সম্পত্তি। নাতিকে তিনি আব্দার মেটাতে শহর থেকে শিল্পী-আনিয়ে এবং মিস্তিরি ডেকে বানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি দিতে বললে বাবা অন্যমত করবেন না। কিন্তু গাঁয়ের ছেলেরা তো আদতে থিয়েটারই করতে চায় না।

আর জাঁহাপানার এই করুণ দৃষ্টি চাপা সাধ এবং মঞ্চের একটি ঝলমলে রাতের স্বপ্নের দিকে মন দেবার মতো সময়ও তো আমার নেই। আসলে গাঁয়ে গিয়ে একমাস থাকা এবং সবাইকে রাজী করানোও একটা সমস্যা। সবচেয়ে বড় কথা কলকাতা এতদিনে আমাকে আমূল বদলে দিয়েছে। এখানকার মঞ্চে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখার পর সেই গেঁয়ো থিয়েটার আমার কাছে হাস্যকর ভাঁড়ামো মনে হয়। কিন্তু জাঁহাপানা তো তা বুঝবে না।

এইসব কথা ভাবতে গিয়ে কিছু পুরনো দৃশ্য চোখে ভেসে আসে। যেবার ওকে পার্ট দিলুম, প্রায়ই ডাকাডাকি করে পাওয়া যেত না। ব্যাপারটা একদিন আবিষ্কার করেছিলুম। ভাঙাচোরা আস্তাবলের এক নির্জন ঘরে সে একা বারবার এগিয়ে যাচ্ছে, কুর্নিশ করছে এবং চাপা গলায় বলে উঠছে—জাঁহাপানা! ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শূন্য ঘরে প্রতিধ্বনি তুলছে। মুখটা উঁচু করে এবং শরীর কুঁজো রেখে কড়িকাঠের দিকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁত বের করে সে তাকাচ্ছে এবং ফের বলছে—জাঁহাপানা।

কতক্ষণ দেখে হাসি চেপে রাখা যায়নি। হো হো করে হেসে উঠেছিলুম। অমনি সে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—এট্টুকুন প্যাক্টিশ করছি গো।

অর্থাৎ প্র্যাকটিস করছে। আমাদের এক যুবতী বাঁদী ছিল। তার নাম জুলেখা। তার সঙ্গেই জাঁহাপানার বিয়ে দেবার প্রস্তাব ছিল মায়ের। কিন্তু জাঁহাপানা যখন-তখন জুলেখার সামনে কুর্নিশ করে জাঁহাপানা বলে তাকে এমন চটিয়ে দিল, বলার নয়। বিয়ের কথা শুনলেই তখন জুলেখা কান্নাকাটি জুড়ে দিত। সে কী কান্না। ....অমন ভাল্লুকের বাচ্চাকে আমি সাদী করব না গো। আমাকে সবসময় কুবাক্যি বলে মস্করা করে গো! আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবো গো!

ওটা যে কুবাক্যি নয়, বোঝাবে সাধ্যি কার? জুলেখা বাঁদী হলে কী হবে? সে ছিল ভারি একরোখা মেয়ে। অগত্যা মা বলেছিলেন, কিছুদিন যাক্। আবার কথাটা তুলব।

জুলেখা শুনেছি পুরুষানুক্রমে বাঁদী ছিল। প্রথামতো আমার মাতামহের বাড়ি থেকে যে-বাঁদী মায়ের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, তার মেয়ে জুলেখা। মায়ের সঙ্গেই এবাড়ি এসেছিল সে। তাই তার ওপর অধিকারটা বেশি ছিল মায়ের।

পরে মা ফের কথাটা তুললে জুলেখা মুখের ওপর কড়াস্বরে না বলায় মা তক্ষুনি আঙুল তুলে গর্জে ওঠেন—বেরো তবে আবাগির বেটি! এক্ষুনি বেরো!

ব্যাস। তারপর জুলেখার আর পাত্তা মেলেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। শেষে জানা যায়, মকবুল দরজীর সঙ্গে কাটোয়ায় ঘর বেঁধেছে। মা বাবার পেছনে লেগেছিলেন। চুলের ঝুঁটি ধরে ছুঁড়িকে নিয়ে এসো। বাবা বলেছিলেন—কালের হাওয়া অন্যরকম। আর তা পারা যায় না।

মীর্জার আমলে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর মতো বাস করতে হত চাকর-বাঁদীদের। পালিয়ে গেলে ধরে আনতে অসুবিধে ছিল না। আইন যাই বলুক, প্রথাকে সরকারী লোকেরা আমল দিতেন। পুলিশের সাহায্য এসব ব্যাপারে পাওয়া যেত।

তো জুলেখা পালিয়ে যেতে বেচারা জাঁহাপানা কিছুকাল দারুণ মনমরা হয়ে থাকত। সবাই তাকে ঠাট্টা করত—ওই থেটার করাই তোর কাল হল রে ছোঁড়া। বুঝলি তো? কিন্তু জাঁহাপানা রেগে গিয়ে বলল—না বেশ করেছি।

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জন বিস্ফোরণের পটভূমিকায় সম্প্রতি ঘোষিত জাতীয় জননীতি বা National Population Policy জন্ম শাসনে নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কয়েকটি কায়েমীস্বার্থের ক্ষীণকণ্ঠ প্রতিবাদ ছাড়া এই নীতি সর্বস্তরে সমাদৃত প্রশংসিত এবং 'ঐতিহাসিক' ব'লে অভিনন্দিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সাতাশ বছরের ইতিহাসে জন-স্বার্থে যে সব ঐতিহাসিক নীতি গৃহীত হ'য়েছে তারমধ্যে সম্প্রতিক জাতীয় জন-নীতিকে "স্বর্ণনীতি" বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। যে ধ্যান এবং ধারণাকে সামনে রেখে এই "স্বর্ণনীতি" গৃহীত হল—তার ঔজ্জ্বল্য অম্লান রাখতে পারবেন একমাত্র জনসাধারণই।

কেন এই জন্ম শাসন

গোপালকৃষ্ণ রায়

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জন বিস্ফোরণের রূপ নেওয়ায় শুধু প্রতিটি পরিবারে দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করেনি, সামাজিক শৃংখলাকে ভঙ্গুর করেনি, পরিবেশ পরিমণ্ডলকে বিষায়িত করেনি,—সুস্থ-সবল-সুখী মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে কণ্টকিত ও বিঘ্নিতও ক'রে তুলেছে। একটি বিকাশশীল দেশের পক্ষে এই জন-বিস্ফোরণ সর্বস্তরে উন্নতির অন্তরায় হ'য়ে দাড়িয়েছে। সম্প্রতি ঘোষিত জাতীয় জননীতির প্রতিটি অক্ষর কার্য্যকর হ'লে হয়ত এই মুহূর্তে সবকিছু সোনা হ'য়ে উঠবে না তবে আগামী দশকে আমরা স্বর্ণ-দেউড়ীর দোরগোড়ায় দাঁড়াব। আর যদি এই নীতি কার্য্যকর করতে জাতি হিসাবে আমরা ব্যর্থ হই—তাহলে আমাদের জনসংখ্যা শুধুমাত্র আশি কোটিতে গিয়ে ঠেকবে না—আমাদের পিঠে পিঠ ঠেকে যাবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব নিয়ে চোখ বুঁজে একটু ভাবুন। ভেবে দেখুন, গত পয়লা জানুয়ারী ভারতের জনসংখ্যা ৬০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ভেবে দেখুন, স্বাধীনতার ঐতিহাসিক রাতে আমাদের যে জনসংখ্যা ছিল – তার সঙ্গে এই সাতাশ বছরে ২৫ কোটি নতুন মুখের যোগ হ'য়েছে। প্রতি বছর মৃত্যুসংখ্যা বাদ দিয়ে ভারতের ঘরে ঘরে এক কোটি নতুন মানুষের জন্ম হচ্ছে।

গল্প নয় বাস্তব সত্য। স্বাধীনতার পর যে জনসংখ্যা আমরা উপহার পেয়েছি তা ভারতের ছ'গুণ বড় সোভিয়েত রাশিয়ার জনসংখ্যার সমান। শুধু তাই-ই নয়, আঁতকে উঠবেন না, ভারতে আমরা প্রতি বছর একটি ক'রে অষ্ট্রেলিয়ার জন্ম দিচ্ছি। এখন ভাবুন, যদি জনসংখ্যা বিস্ফোরণ আয়ত্তে না আনা যায় এই শতাব্দীর শেষে আমাদের জনসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যাকে বাদ দিয়েও ১০০ কোটিতে এসে দাঁড়াবে। তাদের আহার, তাদের বাসস্থান, তাদের শিক্ষা এবং সর্বোপরি, সুস্থ মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকার আপনারা কি দিতে পারবেন? পারবেন কি সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে তাদের মানুষ ক'রে তুলতে? তাদের মান আর হুঁস-এর সমন্বয় করতে?

এখানেই শেষ নয়, আরও শুনুন, এই পৃথিবীতে ভারতের জমির পরিমাণ মাত্র ২.৪ শতাংশ, আর মানুষের সংখ্যা হল ১৫ শতাংশ। অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৯০১ সালে জনসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি আশী লক্ষ, বিভক্ত ভারতে সাতাশ বছরে নূতন জন্ম হয়েছে ২৫ কোটি।

বিশেষজ্ঞদের একটি হিসাব দেখুন: প্রতি বছর ভারতে নূতন জন্ম হচ্ছে, ১ কোটি ২০ লক্ষ, প্রতি মাসে ১০ লক্ষ, প্রতি দিন ৬০,০০০, প্রতি ঘণ্টায় ২৫০০, প্রতি মিনিটে ৪০ আর প্রতি দেড় সেকেণ্ডে একজন! ভাবুন, মানুষ হিসাবে আপনি দিনরাত দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যেভাবে পরিশ্রম ক'রে চলেছেন—প্রতি সেকেণ্ডে একজন ক'রে নূতন মুখের আবির্ভাবে আপনার সুখী হওয়ার স্বপ্ন আপনার শান্তিতে থাকার সাধকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিচ্ছে না কি?

জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি--'পিল'

মনে করুন, আপনার ঠাকুর্দার মুখের সেই কথাটা, ''দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল''। আদিকালের সেই কথাটা আজকেও কিন্তু আমার আপনার কাছে আরও বেশী অর্থবহ। আপনার যখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তখন একগাদা সন্তান আপনার কাছে কি সুখের? চোখের সামনে যখন দেখেন অপুষ্টিতে হাড় জিরজিরে ছেলেগুলো ধোঁকে—তখন আপনার সাধ থাকলেও কি পুষ্টি জোগাবার সাধ্য থাকে? দশটি সমাজবিরোধীর চেয়ে কি একটি সুস্থ-সবল প্রাণবন্ত সন্তানই আপনার কাম্য নয়?

আসুন, এবার জাতীয় জননীতির কথায় আবার ফিরে আসা যাক। দেখা যাক, জন্ম শাসনের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। বিবাহের বয়:সীমা বৃদ্ধি ক'রে দিয়ে এই নীতিতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া হয়েছে। সারদা আইনের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় জন-নীতিতে বিবাহের বয়:সীমা বৃদ্ধি ক'রে নির্ধারণ করা হ'য়েছে—মেয়েদের ক্ষেত্রে চৌদ্দ থেকে আঠারো এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে একুশ। উদ্দেশ্য জন্মরোধ। বিবাহের বয়:সীমা বৃদ্ধির ফলে ধারণা করা হচ্ছে গত দশ বছরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যতগুলি জন্মরোধ করা সম্ভব হ'য়েছে—এই নীতি বাস্তবে পরিণত হ'লে তার প্রায় অর্ধেক সময়ের মধ্যেই ততগুলি জন্মরোধ সম্ভব হ'তে পারে। একটি সম সাময়িক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশে প্রতি বছর মোট বিবাহের ৫০ শতাংশ মেয়েদের ১৪ ও ছেলেদের ১৮ হ'তে না হতেই হয়ে যায়। এই নীতিতে বিয়ের বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে চার ও ছেলেদের ক্ষেত্রে তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
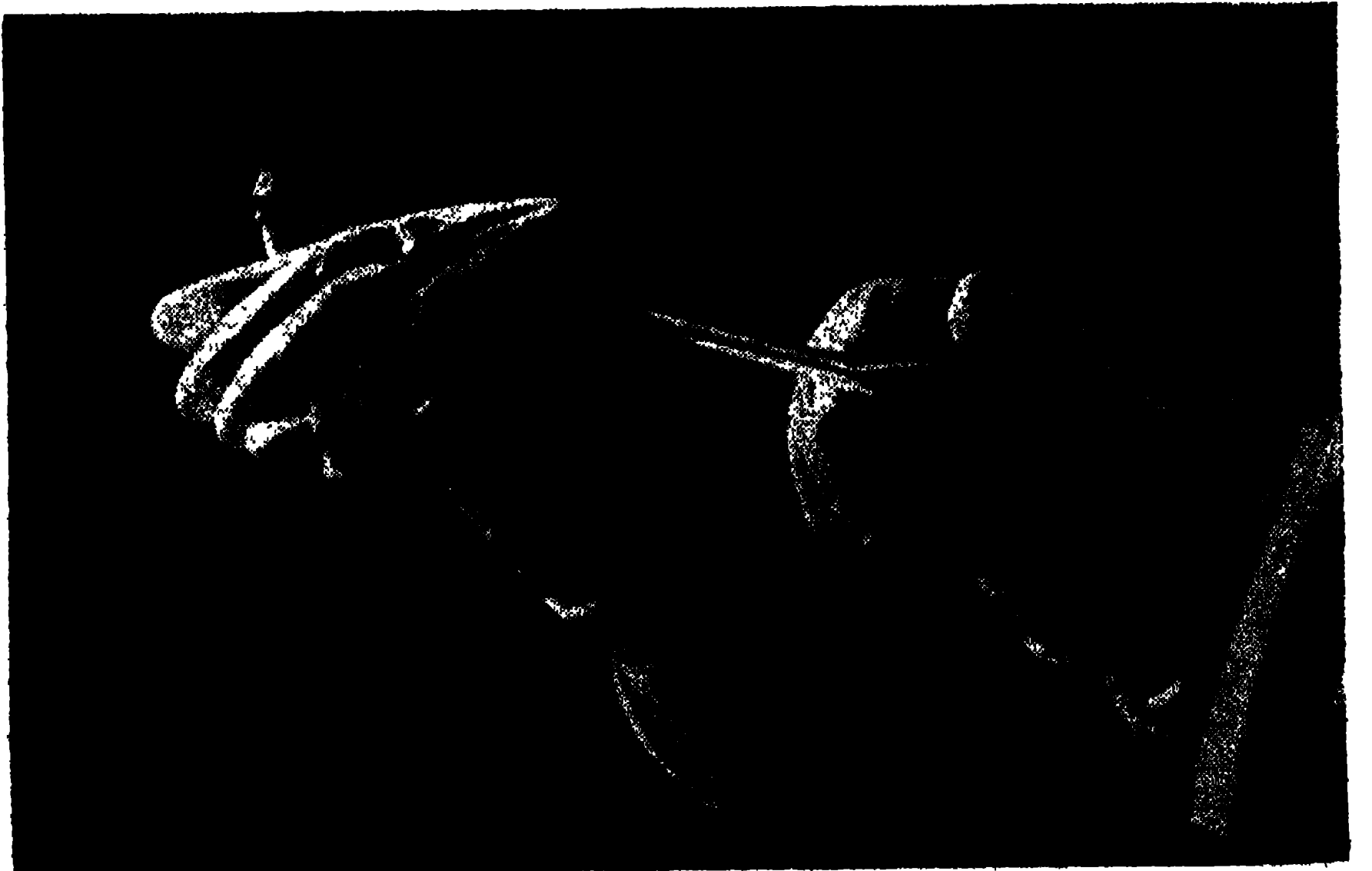
দেশের সর্বস্তরের চিন্তাশীল মানুষ বিবাহের বয়:সীমা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা জোর দিয়েছেন এ নীতিকে প্রকৃত কার্যকরী করার দিকে। নতুন জন-নীতিতে প্রতিটি বিবাহকে আইন-সিদ্ধ করার প্রস্তাব রয়েছে—অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটা কার্য্যকর করা বাঞ্ছনীয়। গ্রাম পর্য্যায়ে বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ সমীচীন ব'লে অনেক মনে করছেন। শুধু পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর না ক'রে গ্রাম পর্য্যায়ে বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করলে শুধু বয়:সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবই কার্য্যকর হবে না বিবাহের হিসাব রাখাও সম্ভব হবে এবং কিছু শিক্ষিত লোকের আংশিক কর্ম সংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে ৫,৬৮,০০০ গ্রাম আছে এবং এই গ্রাম গুলিতে প্রতিবছর ৫টি ছেলে মেয়ের বিয়ে হ'লেও প্রায় ৩০ লক্ষ নবদম্পতি বর্তমানের ১০ কোটি ২০ লক্ষ দম্পতির সহযোগী হচ্ছে।

জাতীয় জন-নীতিতে আবশ্যিক নির্বীজকরণে কেন্দ্রীয় আইনের আবশ্যকতা রাখা হয়নি। পরিবর্তে রাজ্য সরকারগুলির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন রাজ্য সরকার অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তিন বা ততোধিক সন্তানের জনক বা জননীর একজনকে

জন্মনিরোধের আরেকটি উপায়--'লুপ'

জাতি ও ধর্ম, নির্বিশেষে আবশ্যিক নির্বীজকরণের আওতায় আনা যেতে পারে। সরকার আশা করেন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সদিচ্ছায় জন্মশাসন সম্ভব হবে, কোন কঠোর ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে না।

এই নীতিতে বর্তমান জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৫ থেকে কমিয়ে আগামী ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে ২৫-এ নামিয়ে আনতে চাওয়া হয়েছে।

এই নীতির আর একটি দিক হল নির্বীজকরণের দরুণ চলতি আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি। কোন দম্পতি দুই বা তার চেয়ে কম সন্তান থাকা সত্ত্বেও যদি নির্বীজকরণ করেন, তাহলে তাকে ১৫০ টাকা, তিন সন্তানের দম্পতিকে ১০০ টাকা ও চার বা অধিক সন্তানের দম্পতিকে ৭০ টাকা ক'রে দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে।

সম্ভবত এইপ্রথম 'জন' শিক্ষাকে স্কুলের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হল। এই বিষয়টি নিয়ে বছর তিনেক আগে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিতর্ক সুরু হয়েছিল। কেউ পক্ষে কেউবা বিপক্ষে। কিন্তু সমর্থকের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় জননীতিতে এই প্রথম 'জন' শিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। সরকারী কর্মচারী "ছোট পরিবার নিয়ম" মেনে চললে তাদের ক্ষেত্রে চাকুরি আইনের সর্ত শিথিল করার কথাও জন-নীতিতে অনুরণিত হয়েছে।

সুতরাং এভাবে, জাতীয় জননীতি কার্য্যকর হ'লে জন্ম শাসন সহজেই সম্ভবপর হবে। তবে কার্যকর করার দায়িত্ব শুধু সরকার বা তার কর্মচারীদেরই নয়—দেশের প্রতিটি জনসাধারণের। এটা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি দেশ-প্রেমিক নাগরিকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ব'লে মনে করা উচিত।

প্রসঙ্গত গত ২০ বছরের পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি সারাদেশে প্রজনন-ক্ষমতা সম্পন্ন দম্পতির সংখ্যা প্রায় দশ কোটি কুড়ি লক্ষ। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। কোন একজন বিজ্ঞানী হিসাব ক'রে দেখেছিলেন একটি দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনতে গড়ে ৭৬০ টাকা খরচ হ'য়েছে। এত করা সত্ত্বেও আমাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, **'Only the fringe of the problem has been so far touched'.**

পরিবার পরিকল্পনার অন্যতম সহজ পদ্ধতি—পুরুষদের অস্ত্রোপচার

গত ২০ বছরের মধ্যে গত বছর (১৯৭৫-৭৬) সালে পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতি অনেকটা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৪৮.৫৫ লক্ষ দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। গত বছরের প্রথম দশমাসে নির্বীজকরণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬.৬৬ লক্ষ। তার আগের বছর এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১০.৩১ লক্ষ। দেখা যাচ্ছে নির্বীজকরণ প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সামগ্রিক নির্বীজকরণের মধ্যে মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪৮.৩ ভাগ। নির্বীজকরণের হিসাবে দেখা যাচ্ছে—প্রতি হাজারে ২৯.৭ জন এই ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এবং প্রায় ২ কোটি জনকে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। নির্বীজকরণ ক্ষেত্রে ভারতে মহারাষ্ট্রের স্থান প্রথম। পরিবার পরিকল্পনার জন্ম লগ্ন থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী পর্যান্ত এই রাজ্যে ৩,১৮৪,৭৭৪ জন দম্পতি নির্বীজ ও বন্ধ্যাত্বকরণ গ্রহণ করেছে। মহারাষ্ট্রের পর তামিলনাড়ু। এ রাজ্যে নির্বীজ ও বন্ধ্যাত্বকরণের সংখ্যা ২০,৬৯,৫৪৬। তৃতীয় স্থানের অধিকারী হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ—১,৯১৪,৪৫০। মোট আটটি রাজ্য নিযুতের অংকে পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষষ্ঠ। এ রাজ্যে মোট ১,১২৮,০৯৯ জন দম্পতি বন্ধ্যাত্ব ও নির্বীজকরণের আওতায় এসেছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক এবং আরও দুটি রাজ্যে পুরুষের নির্বীজকরণের চেয়ে মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরণের সংখ্যা বেশী ছিল।

গত দু'দশকে লুপ গ্রহণ করেছেন ৫৮.৬৩ লক্ষ মহিলা। গত বছর লুপ গ্রহণকারিণীর সংখ্যা তার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১ লক্ষ বেশী ছিল।

'ডায়াফ্রাম'—বহুল প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ভ্রূণ মোচন বা ইংরেজীতে Medical Termination of Pregnancy কম-বেশী সারা দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, তামিলনাড়ু ও গুজরাটে ভ্রূণ মোচন এখন মোটামুটি জনপ্রিয়। ১৯৭২ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ২,৮৪,০৭৪ টি ভ্রূণমোচন হয়েছে।

ভ্রূণমোচন পদ্ধতিতে অন্তসত্ত্বা মহিলাদের গোপনে ভ্রূণমোচন ক'রে হাতুড়ে কোয়াক ডাক্তারের কাছে—আত্মাহুতির দেওয়ার হাত থেকে যেমন বাঁচানো হয়েছে—তেমনি পরিবার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেও একে গ্রহণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এ পর্যন্ত ৪০ জন ধাত্রীবিদ্যা বিশারদকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ভ্রূণমোচনের কাজে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এনেছেন। তাছাড়া সারা দেশে ১৫৪টি হাসপাতালে ভ্রূণ মোচনের ব্যবস্থা আছে।

সংক্ষেপে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনার রূপরেখা এই। এখন আপনি ভাবুন এত করেও যদি জন বিস্ফোরণ বন্ধ না করা যায় তাহলে কোন সরকার দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে যদি কোন কঠোর ব্যবস্থা নেন —তাহলে কি কোন অন্যায় করা হবে?

সম্প্রতি কোন এক রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, প্রতিজ্ঞা করুন, আগামী দুবছরের মধ্যে কোন সন্তানের জন্ম দেবেন না। জানিনা, মন্ত্রীমহোদয়ের আবেদনে কেউ সাড়া দেবেন কিনা। দিলে, আমার, আপনার আর দেশের ভবিষ্যত চেহারাটাই পাল্টে যাবে সন্দেহ নেই।

বাস্তু ভিটা

৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পাবো গো। এস. ডু. সাহেপ আসপে... তারিণী চৌকিদার খাকি জামা গায় দিয়া হাটে ঢোল পিটায়ে দিছে। সকাল-সকাল ছয়ের ঘেরীর মোড়ে যেতি হবে কাল।'

লছমী বলল, 'তুমার সাঁথে মুইও যাবু।'

'—নেশ্চয়ই যাবি। জমি পাবার এমন দিন যে আর আসপে না লছমী। তুই মোর সাঁথে যাবি। নেশ্চয়ই যাবি।'

এস. ডি. ও. সাহেবের হাত থেকে জমির পাট্টা নেবার সময় বিজয়ের বুকের ভেতরটা আনন্দে নেচে উঠছিল। পাট্টাখানা হাতে নিয়ে তিনবার কপালে ঠেকিয়ে নিল। তারপর লছমীর দিকে এগিয়ে গেল। পাট্টা হাতে নিয়ে লছমীও তিনবার মাথায় ঠেকালো। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো অন্যান্য ভূমিহীন মজুরদের পাট্টা নেবার দৃশ্য।

ছয়ের ঘেরীর মোড়ে কালো কালো চেহারার এক হাট ভূমিহীন চাষীর সেই আনন্দের দৃশ্যটা সত্যিই দেখার মতো ছিল।

পরের সপ্তায় জে. এল. আর. ও. অফিস আর বি. ডি. ও. অফিসের বাবুরা এসে মাপজোক করে প্রত্যেকটা মৌজায় দেখিয়ে দিয়ে গেলেন কার কোথায় ঘর হবে। কোথায় রাস্তা হবে। কোথায় পুকুর, কোথায় টিউবওয়েল, আর কোথায় হবে প্রাইমারী স্কুল। সবাই নিজের নিজের সীমানা ঘিরে খোঁটা পুঁতে চিহ্ন দিয়ে রাখলো। জমির মাপজোকের সময় অফিসের বাবুরা জানালেন সামনের সপ্তায় বাড়ি তৈরীর টাকা দেওয়া হবে। সবাইকে রেভিনিউ স্ট্যাম্প নিয়ে বি· ডি· ও· অফিসে যাওয়ার জন্যে জানিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা আর একবার আনন্দে দুলে উঠলো।

বেশ জরুরী একটা কাজের জন্যে কয়েক মাস বাইরে ছিলাম। শহর থেকে ফিরে যখন আবার ধবলাটের গ্রামে এলাম, তখন দেখলাম পতিত জায়গাগুলোতে অসংখ্য নতুন ঘর-দোর। এক সময়ের বাস্তহীনদের নিয়ে এখানেই গড়ে উঠেছে নবপল্লী। নবপল্লীর নতুন নতুন ঘর-বাড়ীর মধ্যে বিজয় ওঁরাও-এর বাড়িটাও দেখলাম। লছমীকে নিয়ে বিজয় সেখানে সুখে দিন কাটাচ্ছে। বাড়ির সামনের এক ফালি জমিতে পুঁইশাকের ডগা লতিয়ে জায়গাটা সবুজ করে রেখেছে। ঘরের চালের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে লাউয়ের ঘন সবুজ ডগা। বড় বড় সবুজ পাতার মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম বেশ কয়েকটা লাউয়ের গোলগাল চেহারা বিজয়ের ঘরের চালে সবুজ সম্পদের মতো ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

নতুন দিনের আলোয়

স্নেহময় সিংহ রায়

মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া আর কালো মেঘ নিয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে নেমে আসে কালবৈশাখী—তার তাণ্ডবে ভেঙে পড়ে অনেক কিছু, আবার তার শেষে প্রাণমাতানো বৃষ্টি এসে সুন্দর সজীব করে তোলে বসুন্ধরাকে। এমনই ঘটে বারংবার—এমন ভাবেই নতুন প্রাণচেতনায় ভরে ওঠে জীবনধারা। অন্ধকার তটভূমি পার হয়ে নতুন দিনের আলোয় নতুন আশ্বাস ভরা নব নব ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে তরণী এসে ঘাটে পৌঁছয়। তা থেকে আগামী কাল আমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এমনই এক ইতিহাসের ধারা বহন করে আমরা আজ এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ারে উপস্থিত।

গভীর অন্ধকার নেমে এসেছিল আমাদের শিক্ষাজগতে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে গত ২৬ বছর ধরে নানা অপপ্রভাব ও চাপের জন্য যে সমস্ত শিক্ষাসংস্কারকে কার্যে রূপদান করা যায়নি, আমরা আজ তা সফল ও সার্থক করতে চলেছি। ১৯৭৪-এ গুজরাট, বিহার, কেরালা আর উত্তর প্রদেশে বিপুল ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ঘটে। আজ তা শান্ত। ১৯৬৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের আবহাওয়া প্রকট হয়ে উঠেছিল তা ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে এবং ১৯৭৫-এ এসে তাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে। রাজনৈতিক অস্থিরতা যে কেমন দ্রুতভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের শৃংখলা ও সামঞ্জস্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে এর মধ্যে আরণ্যক ভয়াবহ পরিবেশ ঘনিয়ে তুলেছিল সে ইতিহাস আজও হয়ত অনেকের স্মৃতি-পট থেকে মুছে যায়নি। রাজনৈতিক চক্রান্তে বহু শিক্ষাবিদ্‌ অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। মারণাস্ত্রের ধ্বংসলীলায় বলি হয়েছে বহু ছাত্রের প্রাণ। অত্যাচারীর নির্যাতনে অবনমিত হয়েছে বহু ছাত্রছাত্রীর শিক্ষামান, বহু সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান ঐতিহ্য, সম্মান, সম্পত্তি ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র হয়েছে বিনষ্ট। একযুগে যারা শিক্ষার আলোক বর্তিকা জ্বালিয়েছিলেন জাতীয় জীবনে, যারা ছিলেন বিপ্লবী ত্যাগী ও দেশাত্ম-বোধে উদ্দীপ্ত মনীষী তাদের জন্য নির্মিত বেদি, স্তম্ভ ও মূর্তি হয়েছে খণ্ডিত বা ধ্বংস। হিংসা ও ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত রাজনীতি যে যথার্থ শিক্ষার কতবড়ো শত্রু—তার প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয়েছে ঐ কয়েক বৎসরের চির কলঙ্ক চিহ্নিত দিনগুলিতে।

এরপরে দিনবদলের পালা আসে। আসে জাতির জীবনে আত্মস্থ হবার দিন। মহান ঐতিহ্য ও সুস্থ নাগরিকতার পুনরুজ্জীবনের জন্য আকাংখা স্বত-প্রণোদিত হয়ে প্রকাশ পায় বিভিন্ন উক্তি ও কর্মধারার মধ্যে। এর ফলে প্রধান-মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও দ্রুত চিন্তা ও কর্মধারা পরিবর্তনের প্রেরণা আসতে থাকে এবং সর্বত্র এক জাতীয় পুনর্গঠনের প্রকল্প গ্রহণের প্রচেষ্টা অনুভূত ও স্বীকৃত হতে থাকে। এরই ফলে ১৯৭৫-এর ২৬শে জুন ঘোষিত হয় জরুরী অবস্থা এবং তারই অনতিপরে ১লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত হয় বিশ-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী। বস্তুত এই কর্মসূচী ভারতের জনগণের জন্য প্রদত্ত এক মহান সংকল্প বা ব্রত—যার দ্রুত রূপায়ণ জাতির জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে নিয়ে আসবে শক্তি সৌন্দর্য আত্মনির্ভরতা আর্থিক সচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও সামগ্রিক কল্যাণ। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই কর্মসূচীর রূপায়ণ অবশ্যই শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষার মানকে দ্রুত অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। জাতীয় সাংস্কৃতিক মানকে সুউচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরতে শিক্ষাব্যবস্থায় নানা উন্নয়ন-মূলক প্রকল্প অবশ্যই অমোঘ ও অব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে।

ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা ফিরে এসেছে। যথানির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এবং ফলপ্রকাশে অযথা বিলম্ব বা কালক্ষেপ রহিত করা হয়েছে। সেই শ্বাসরোধকারী পরিবেশ আর নেই। পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়েছে এই অছিলায় চেয়ার বেঞ্চ ভাঙা, অসময়ে দলবদ্ধভাবে পরীক্ষার হল ত্যাগ এবং গার্ডকে প্রহার বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে পিছিয়ে দেওয়ার আন্দোলন। গণ-টোকাটুকি প্রায় বিলুপ্ত। এখন শিক্ষা-ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের পরিবর্তে ফিরে এসেছে সুশাসন, আস্থা, নিরাপত্তা ও সুস্থিতির লক্ষণ। এর পিছনে আছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা, ছাত্রদের অভাব অভিযোগ দূর করবার সক্রিয় প্রয়াস। কুড়িদফা কর্ম-সূচীতে ছাত্রকল্যাণের উদ্দেশ্যে এজন্য বেশ কয়েকটি কর্মসূচী রাখা হয়েছে। ১৮ সংখ্যক দফায় ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে অত্যাবশ্যক পণ্য সর-বরাহের কথা বলা হয়েছে। ১৯ সংখ্যক দফায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বই ও খাতাপত্র

সরবরাহের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে ছাত্রকল্যাণের জন্য আরও বহু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হয়েছে এবং সক্রিয়ভাবে সে সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এর লক্ষ্য পাঠরত অবস্থায় ছাত্রদের বেকার অবস্থা দূরীকরণে সহায়তা করা এবং সমাজ সেবায় প্রেরণা সঞ্চার। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে জাতীয় সেবা প্রকল্পে বিশেষভাবে গ্রামে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের প্রকল্প। ছাত্রছাত্রীরা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, টিকা দেওয়া, রাস্তাঘাট তৈরী ও জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করছেন। অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি নানা কুসংস্কার দূরীকরণ, নেশাভাঙ রহিত করা, পণপ্রথা রোধ করা এবং পরিবার পরিকল্পনার সুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করানোর কাজেও তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন। ১৯৭৪-এর ১লা জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ যে নতুন পাঠক্রম প্রবর্তন করেছেন তাতে 'কর্মশিক্ষা' নামে এক নতুন অংশ যুক্ত হয়েছে—যার উদ্দেশ্য ছাত্রদের হাতে কলমে নানা জিনিস তৈরী করতে শেখানো, নানা কর্মে অংশগ্রহণের শিক্ষা ও সমাজসেবায় পাঠগ্রহণ। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরও নানা সমাজসেবামূলক কর্মধারায় প্রবর্তিত করা হচে। এতে গড়ে উঠেছে দৃঢ় জাতীয়তার মনোভাব এবং আস্থাশীল সুনাগরিকতার চিত্তবৃত্তি আত্মোৎ-স্বর্গের প্রেরণা। ছাত্রসম্প্রদায় যে কেবল পুঁথি পড়ুয়া নন, আজ ও আগামী দিনের সমাজজীবন গঠনে যে তারাও অংশীদার ও অন্যতম কারিগর—একথা উপলব্ধি করে নিজের ও সমাজজীবনের সংরক্ষণ সুপরিচালন ও প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ছাত্রকল্যাণের জন্য যে সমস্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে। বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার বাইরের ছাত্রাবাস সমূহের ছাত্র ছাত্রীদের এখন প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম চাল, ১,৫০০ গ্রাম গম ও ২০০ গ্রাম চিনি সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদুৎবিহীন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের ১ লিটার করে কেরোসিনও দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থার ফলে ১০১০ টি হোস্টেলের ৬৭,৩২৪ জন ছাত্রছাত্রীকে এই কার্যসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। মোট যে সংখ্যক দরখাস্ত পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় ১০০ শতাংশ এবং সংশোধিত রেশন এলাকায় প্রায়

বই ব্যাংক থেকে ছাত্ররা এখন সহজেই পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছেন

৯৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এই সুবিধা পাচ্ছেন। কলকাতা, বসিরহাট, যাদবপুর, বারাসত এবং দুর্গাপুরের পাঁচটি পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতি এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় ষ্টোর্স ১৫ টি ছাত্রাবাসে সুবিধা দরে জিনিষপত্র সরবরাহ করছেন। এ পর্যন্ত পাইকারী ক্রেতা সমবায় ষ্টোর্সের সঙ্গে ১৬২ টি ছাত্রাবাসকে যুক্ত করা হয়েছে। ৬১৩৮ টি হোস্টেলের ৭৬২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি দেওয়া হচ্ছে। ১৪ টি ক্রেতা সমবায় সমিতি হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা দরে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ ছাত্রদের মধ্যে ন্যায্য-মূল্যে বই খাতা প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য ৪০ টি নির্বাচিত ব্লকে ৪০ টি বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার খুলছেন। এই কার্যসূচী অনুযায়ী সর্বমোট ৪০০ টি দোকান বা সমবায় সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। গত ৬ মাসে ৯০ টি ছাত্র সমবায় সংগঠিত হয়েছে। শিক্ষা বিভাগ অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীকে সরকার প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকেন। যে সব পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলি চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত ও অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণীত ৩০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর অবশিষ্ট ছাত্রছাত্রীকে স্বল্পমূল্যে পুস্তক সরবরাহ করা হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এবং বেসরকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যাতে ন্যায্যমূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে পারেন সেজন্য সুবিধা দরে বেশি পরিমাণে কাগজ সর-

বরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। অনুরূপভাবে ছাত্রসম্প্রদায় যাতে সস্তাদরে অনুরূপভাবে, লিখবার কাগজ পান সেজন্য বেশী পরিমাণে কাগজ সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকাশকগণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ থেকে মূল্য নির্ধারণ কমিটি অনুমোদিত মুদ্রিত মূল্যের উপর আরও শতকরা পাঁচভাগ দাম কমাতে সম্মত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত দু' বছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজগুলিতে ১৪৪ টি বই ব্যাঙ্ক এবং জুনিয়র হাইস্কুল ও মাদ্রাসায় ৮০টি বই ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছেন। আনুমানিক ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুনিয়র হাইস্কুল ও মাদ্রাসায় ৫০০টি এবং হাইস্কুলে ৫৬৪টি বই ব্যাঙ্ক খোলার একটি ভাণ্ডার গঠন রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিবেচনাধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তরফেও ডিগ্রি কলেজে বই ব্যাঙ্ক স্থাপনের এক পরিকল্প চালু আছে। এক একটি কলেজের জন্য এই অর্থের পরিমাণ ৪,৫০০ টাকা থেকে ১৭,০০০ টাকা। সমগ্র দেশে স্কুল ও কলেজে মোট কার্যরত বই ব্যাঙ্ক-এর সংখ্যা ৭৪,৮৬৮। বিশেষ ভাবে তফসিলভুক্ত বিভিন্ন সম্পদায় এবং উপজাতি সমূহের ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে বহু অঞ্চলে বই ব্যাঙ্ক স্থাপনে করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশের সর্বত্র বই ও খাতা অবাধে ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। সুবিধাজনক দরে সাদা ছাপার কাগজ সরবরাহ করা হচ্ছে বলে পাঠ্য বই ও খাতা কম দামে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, যদিও ছাপার খরচ বেড়েছে, তবু বই-এর দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে এবং ১৯৭৩-এর সময়ের দরে বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য করার জন্য সরকার প্রকাশকদের অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ১৯৭৬-এর ১লা জানুয়ারি থেকে নির্ধারিত মানের এক্সারসাইজ খাতার সংশোধিত মূল্য চালু হয়েছে এবং এজন্য ৪ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যহ্রাস করা হয়েছে।

বিশদফা কার্যসূচী অনুযায়ী সারা দেশের চার হাজার হোস্টেলবাসী ছাত্রকে ১৩৪ টি সমবায় দোকান মারফত ১২ টি রাজ্যে সরবরাহ করা হচ্ছে ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। উপকৃতের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বই ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে ২৫০ থেকে ৫০০ জন ছাত্র-বিশিষ্ট কলেজগুলিকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে কমপক্ষে দশ হাজার টাকা। এছাড়া অনুদান মঞ্জুর করা হচ্ছে ব্যায়ামাগার ও ছাত্রাবাস প্রভৃতি নির্মাণের জন্যও।

ছাত্রস্বার্থ সংরক্ষণ, ছাত্র কল্যাণ ও শিক্ষাজগতের মধ্যে সর্বস্তরে সমন্বয়ে সুস্থ পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ফিরিয়ে আনার গৌরবে গৌরবান্বিত বিগত বৎসর। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে সুবর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে—আশা করা যায়, এই শুভ প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ঝাড়গ্রামে নতুন ছাত্রাবাস

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
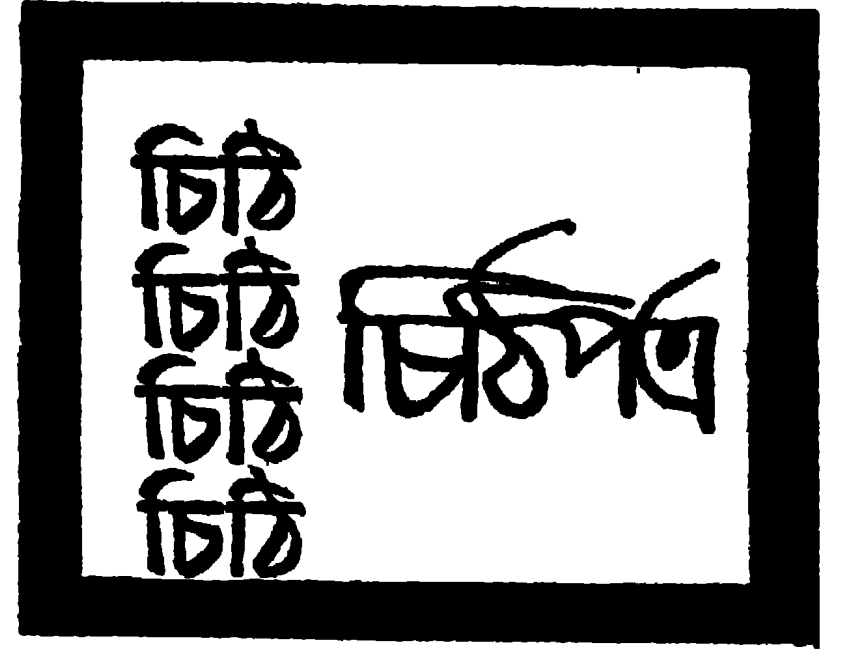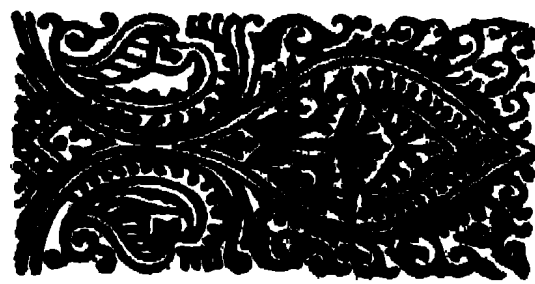
মহাশয়

আমি এই পত্রিকার একজন সাধারণ গ্রাহক ও পাঠক। যে কারণে এই পত্রিকা আমাকে আকৃষ্ট করেছে বা গ্রাহক হতে প্রলুব্ধ করেছে তা জানানো প্রয়োজন মনে করছি।

কারণগুলো হলো :—

১। আমি গ্রামাঞ্চলের একটি অখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই পত্রিকা তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ এবং সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির উপর মূল্যবান রচনা ও সংবাদাদি পরিবেশন করে—যা, আমাকে ও আমার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত সাহায্য করে।

২। প্রকাশিত রচনাগুলি উন্নত মানের।

৩। অঙ্গসৌষ্ঠবে সুরুচিসম্পন্ন। এ বিষয়ে উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করছি।

৪। পত্রিকার পক্ষে প্রধান বক্তব্য—এটি 'উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক'।

৫। এই পত্রিকা বাজারে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা হইতে একটু ভিন্ন ধরণের এবং তা, সহজেই চোখে ও মনে ধরা পড়ে।

নীরদপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৯

পথের ধারে পুষ্প তরু

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
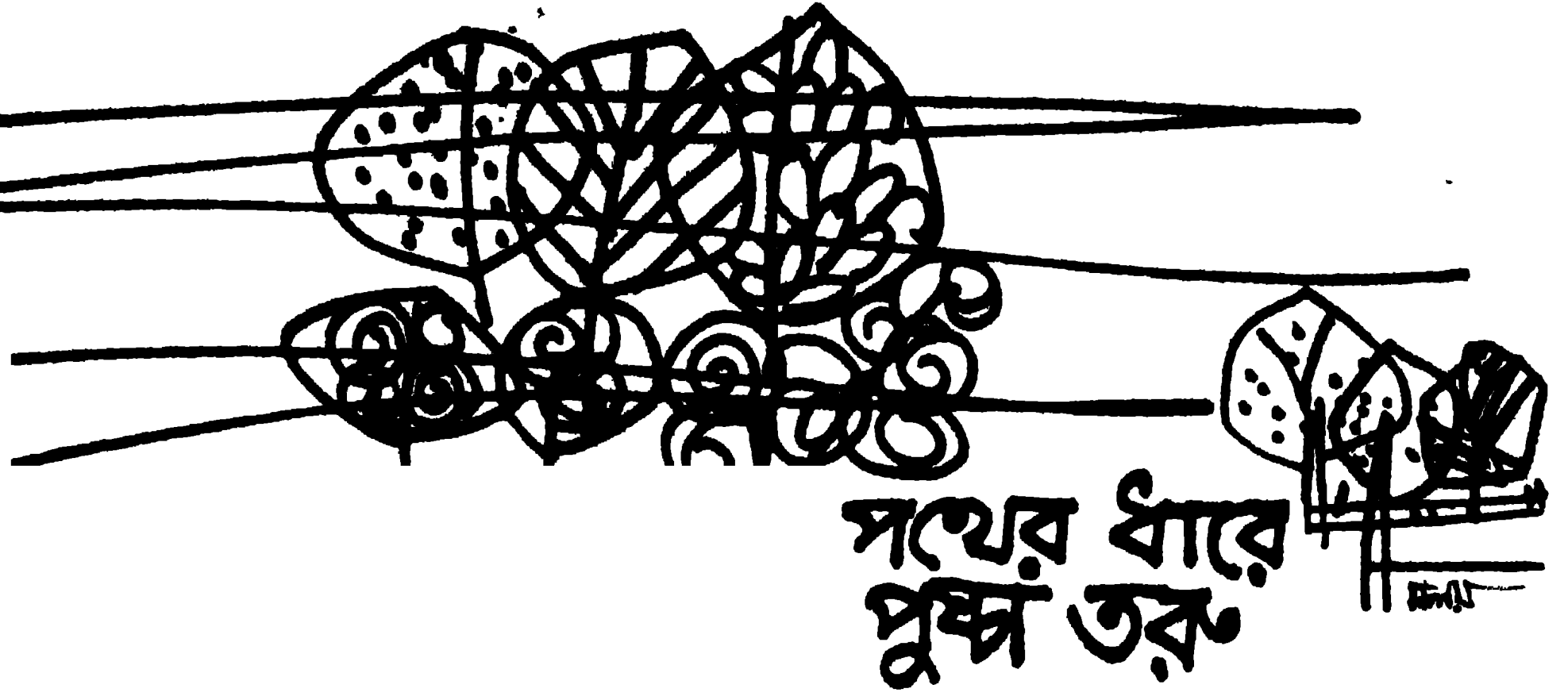
আমাদের 'ঘরের আশে পাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে' তাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত কবি-ভাবুকের মনে বরাবরই জেগেছে নিবিড় মমতা ও কৌতূহল। কিন্তু এখন গতিবেগ চঞ্চল বৈশ্য জগতের প্রয়োজন-সর্ব্বস্ব জীবনধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে আমরা অনেকেই ঐ 'বোবা' অথচ উপকারী বন্ধুদের ভুলতে বসেছি। রসিক জনের কথায় সায় বলা চলে বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে 'আবেগ!' তাই প্রত্যহের তেল-নুন-লক্‌ড়ির হিসাব করতে করতেই দিন কেটে যায়, 'ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিত' পার্ক, ময়দান কি পথের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ আর পাইনা তেমন। তাই কয়েক দশক আগেও কলকাতার প্রধান রাজপথগুলির পাশে অথবা পার্কে-ময়দানে ফুলে ঝলমল দেশী-বিদেশী যে সব পুষ্পপ্রসূতরু চোখে পড়তো তার অধিকাংশই আমদের অনাদরে, উপেক্ষায় ধীরে ধীরে হয় শুকিয়ে গেছে নয়তো অকালে বিদায় নিয়েছে নির্দয় কুঠারাঘাতে। তবু ব্যাপক উপেক্ষা সত্ত্বেও নীরস 'অ্যাসফল্ট অরণ্যে' যে দু' একটি পুষ্পপ্রসূতরু কোন ক্রমে টিঁকে আছে তাদের দিকে চেয়ে শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কৌতূহলী পথিক থমকে দাঁড়ান; সে সমস্ত গাছের ফুল্ল-কুসুমিত রং-বাহার এখন আমাদের চোখ টানে, মন টানে; গাছের নাম বংশ পরিচয়, জন্মস্থান নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনাও শোনা যায় ট্রামে বাসে। 'রক্তকরবী' নাটকের কিশোর যন্ত্র ও যন্ত্রণাময় যক্ষপুরীর জঞ্জাল-অবর্জনার মধ্যে যেমন হঠাৎ একটা রক্তকরবী গাছ (লাতিন : নেরিয়াম ইণ্ডিকাম) দেখতে পেয়ে আনন্দ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল আমরাও তেমনি কলকাতার পথে বা পথের প্রান্তে হঠাৎ কোনো ফুল্ল কুসুমিত তরু আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। এমনকি দ্রুত ধাবমান গাড়ি থেকে নজরুল ইসলাম এভিনিউ-এর সদ্য রোপিত তরু-বীথির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে বিদেশী অতিথিগণও 'মিছিল', 'আবর্জনা'র নগরী কলকাতার প্রেমে পড়ে যেতে পারেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা 'জন্মদিন' কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর আস্তাকুঁড়ের মধ্যে অনাদরে ফুটে ওঠা নাগকেশর (ওছরোকারপাস লঙ্গিফোলিয়াস) ফুলটিকে তাঁর প্রেম-নিবেদন করে গেছেন। আসলে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্র মোহন বাগচী প্রমুখ কবিরা সহর কলকাতার পুষ্প বীথিকে ভালবেসেছিলেন মনেপ্রাণে। তাই দেখি তাঁদের বহু সঙ্গীত ও কবিতার উদ্দীপন বিভাব হচ্ছে ফুল বা ফুলের গাছ।

অতএব, প্রসঙ্গত, এখনও অবশিষ্ট আছে এমন কয়েকটি পুষ্পশোভিত তরুর বিষয়ে দু' এক কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এই সমস্ত গাছের প্রতি সকলের মনে মমতা জাগাতে হলে প্রথমে অজ্ঞতা দূর করা দরকার; আর অজ্ঞতা দূর করতে হলে প্রয়োজন গাছ চেনা, তার বংশ পরিচয়, ফুল ফোটার ঋতু ও ক্ষণ সব কিছুই ভালো করে জানা। অবশ্য পথ আলো করে থাকা নানা কুসুমিত তরুর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সে সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অসম্ভব; কারণ এক এক পরিবেশে, ক্ষণে এক একটি গাছকেই এক এক রকম দেখায়। বসন্তের কদমের (নাউক্লিয়া কদম্ব) কোন গৌরব নেই অথচ 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' আমাদের মনে কী গভীর রসাবেশই না জাগায়। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন: 'সংস্থান সমাবেশের আনন্দ', 'সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ' বা পার্শ্ববর্তীর সঙ্গে বৈচিত্র্য সাধনের আনন্দ। আসলে ফুলেরও এক গোপন ভাষা আছে, যাঁরা সংবেদনশীল তাঁরাই সে ভাষার অর্থ বোঝেন।

তবে যখন যেটা মন চায় সেটা সব সময় পাওয়াও যায়না। যেমন, কোন গাছে ফুল আসার সময় পল্লবগুলি একে একে ঝরে পড়তে থাকে। অথচ পাতার পটভূমিতে ফুলের বাহার যে আরও বাড়ে সেটা সকলেই জানেন। আবার কোন গাছের ঘন পত্রগুচ্ছ ফুলকে ঢেকে ফেলে একেবারে। কোন গাছে সকালে ফোটা ফুল ঝরে পড়ে দিন শেষ না হতেই, যেমন, শেফালিকা বা শিউলি (নাইকট্যানথেস আরবোর ট্রিসটিস) এবং বকুল (মিমু-সোপস্ এলেঙ্গি)।

পথের ধারে পুষ্পতরু

শহরতলীতে বাবলা গোত্রের (আকাসিয়া) কণ্টকাচ্ছাদিত চিরহরিৎ যে বৃক্ষরাজী চোখে পড়ে সেগুলির ফুলের বাহারও দেখবার মত। কাঁটার রক্ষা কবচের জন্যে গরু ছাগল ঐ সব গাছের কাছে সহজে ঘেঁষে না। আমাদের প্রতিবেশী বাবলা (আকাসিয়া আরাবিকা) কিন্তু আসলে এসেছে বিদেশ থেকে; আফ্রিকার সেনেগাল অঞ্চল এর আদি প্রাপ্তি স্থান। এই বাবলা থেকে বাবলা-গঁদ বা গাম-আরাবিক নামে এক ধরণের আঠাও প্রস্তুত হয়ে থাকে। বসন্ত সূচনায় বাবলা গোত্রের (জেনাস) প্রায় ৪০০ প্রজাতির গাছেই গাঢ় হলুদ রঙের গন্ধহীন ফুল ধরে। বাবুল, গুয়ে বাবলা বা বিট খদির গাছ কলকাতার গড়ের মাঠে যথেষ্ট চোখে পড়বে। বাবুল গাছে গাছে বছরে কয়েকবার পর্যাপ্ত ফুল আসে; ফুলের মৃদু গন্ধ আছে, বর্ণ গাঢ় পীত, লম্বা ও গুচ্ছবদ্ধ; পাতাগুলি বক্রাকৃতি; তবে সেগুলিকে ঠিক পাতা বলা যায় কিনা সেটাও বিবেচনার বিষয়। ঐ পল্লব আসলে কাণ্ডেরই অংশ; যাকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বলে ফাইল্লোডিয়া'; খদির (দেব-বাবুল) অপেক্ষাকৃত হাল্কা গাছ। বিট এর হলুদ ফুলেরও বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ আছে। ঋতু নির্ভর অন্যান্য গাছের মধ্যে বসন্ত সমাগমে অশোক (সারাকা ইণ্ডিকা, জোনেসিয়া অশোকা), অর্জুন (টার্মিনেলিয়া অর্জুনা), কৃষ্ণচূড়া (পয়েন্সিয়ানা পুলছের্‌রিমা), কৃষ্ণকলি (মিরাবিলিস জালাপা), রাধাচূড়া (পয়েন্সিয়ানা রেজিয়া), পলাশ (বিউটিয়া ফ্রোনডোসা) প্রভৃতি গাছেও থোকায় থোকায় উজ্জ্বল বর্ণের প্রচুর ফুল ধরে। শীতের শেষে, ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে, এই অনতিউচ্চ বৃক্ষগুলিতে ফুলের সমারোহ পথিক মাত্রেরই চোখ টানে। এদের মধ্যে অশোক ও অর্জুন পৌরাণিক যুগ থেকেই লাল ফুল এবং নানা ভৈষজ্য গুণের জন্যে বিশেষ সমাদৃত। কালিদাসের কাব্যে এই দুটি গাছেরই প্রশস্তি আছে। রবীন্দ্র সরোবরে, গঙ্গার ধারে এখনও দুএকটি অশোক গাছ চোখে পড়বে। কৃষ্ণচূড়াকে কেউ কেউ বলেন গোলমোহর। 'গোল-মোহর বিদেশী গাছ, এসেছে জ্যামাইকা দ্বীপ থেকে। এতে লাল, নীল, কমলা প্রভৃতি নানা রঙের ফুল ধরে। ময়ূর পুচ্ছের সঙ্গে এই ফুলের আকারগত সাদৃশ্য থাকায় এর আর এক নাম 'পীকক্ ফ্লাওয়ার'; ফুলের রঙ কমলা মেশানো লাল; গাছের উচ্চতা ৬।৭ মিটার। রাধাচূড়া বা মোহন চূড়া ফুলের রঙ গাঢ় কমলা; ইংরাজিতে একে বলে 'ফ্ল্যামবয়াণ্ট'; এর ফুলের শোভাও অতি মনোহর। গাছের আকৃতি ও পত্রপল্লব অনেকটা কৃষ্ণচূড়ারই মত। কৃষ্ণকলি গাছের আর এক নাম 'সন্ধ্যামণি' বা 'নন্দদুলাল'; এ গাছটি আসলে বিদেশী; এসেছে সুদূর পেরু (দক্ষিণ আমেরিকা) থেকে। এর ইংরাজী নাম 'ফোর ও ক্লক প্ল্যাণ্ট'; অপরাহ্নে বা সন্ধ্যাগমে এতে লোহিতাভ ফুল ফোটে। পলাশকে ইংরাজিতে কেন 'অরণ্যের অগ্নিশিখা' বলা হয় তা ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে আগুন-রাঙা ফুলে ঢাকা এর ডালপালার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। পলাশ ফুলের মধুর লোভে মৌমাছি, কাকরাও এর ডালে এসে ভিড় করে। পলাশের আর এক নিকট জ্ঞাতির (বিউটিয়া সুপার্বা) গাঢ় হলুদ রঙের ফুলের বাহারও দেখবার মত; একে কেউ বলেন 'ভু পলাশ' কেউ বা হস্তিকর্ণ পলাশ'। রবীন্দ্রনাথ বসন্ত বন্দনায় যথার্থই লিখেছেন—'সাজাক পলাশ আরতি পাত্র রক্তপ্রদীপে ভরা' অথবা 'ওরে পলাশরাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বালাস!' এই পলাশের কথা বলতে গিয়ে শিমুল ফুলের (সং: শাল্মলী, হিন্দী: সমল, বোমবাক্স মালা-বারিকা) কথাও মনে পড়ে যেতে পারে। এই বড়ো বড়ো ফুলগুলির মধ্যেও প্রচুর মধু সঞ্চিত থাকে। তাই এই গাছের ডালে ডালে কাকেদের বাসা বাঁধতে দেখা যায়। কবিও ঐ মধু ভাণ্ডারের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখেন—'নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার। রক্ত দুকূল দিল উপহার।' এই শিমুলেরই নিকট জ্ঞাতি হচ্ছে শ্বেত শিমুল (এরিওডেনড্রোন এনফ্রাকটুওসাম) ও পীত শিমূল (কোচলোসপারমাম গোস্‌সিপিয়াম); এই দুই গাছে যথাক্রমে

সাদা ও হলুদ ফুলধরে। গাছের উচ্চতা ও আকৃতি অনেকটা শিমুলেরই মত। এই সূত্রে পৌরাণিক যুগ থেকে যে গাছটি অনেকের প্রশংসা কুড়িয়ে আসছে সেই 'ভারতের গৌরব' এবং 'কসুম-রাণী' জারুলের (কেউ কেউ জারুলকেই অর্জুন গাছ রূপে সনাক্ত করেছেন) নামও করা দরকার। এই লাল-বেগুনি রঙের জারুল ফুলের শোভা যেমন মনোমুগ্ধকর, জারুল কাঠও তেমনই আমাদের নানা প্রয়োজনে লাগে। পূর্বে কলকাতায় দু'চারটি জারুল গাছ চোখে পড়তো; এখন তা' একান্তই দুর্লভ। এপ্রিল-মে মাসে এই গাছে ফুল ধরে।

রবীন্দ্রকাব্যে যে 'বাওবার' (হিন্দী: গোরখা ইমালি; এ ডানসোনিয়া ডিজিটাটা) গাছের প্রশস্তি পাওয়া যায় সেটিও একটি পুষ্পপ্রসূতরু বৃহৎ বৃক্ষ; এর ইংরাজী নাম 'মাঙ্কি ব্রেড'; ময়দানে এখনও দুচারটি বাওবার গাছ দেখা যাবে।

'শরৎ নিশির স্বপ্ন' রূপে রবীন্দ্রনাথ যে ফুলটির বন্দনা করেছেন সেই শিউলির (হিন্দী: হরসিঙ্গ) বৃন্তটি কমলা রঙের, ফুলের রঙ সাদা; উষা কালে গাছের নীচে এই ঝরে থাকা শিউলির শোভা দেখবার মত। এই শিউলির মত আর এক ক্ষণস্থায়ী ফুল হচ্ছে 'হিজল' (হিন্দী: সমুন্দর কা ফুল, ব্যারিংটোনিয়া একুটাংগুলা); এ এফুল জীবনানন্দের বিশেষ প্রিয়। সন্ধ্যায় কুসুম কলিকাগুলি বিকশিত হয়। এই হিজল হেমন্তের ফুল। এই সূত্রে ক্ষণস্থায়ী, বসন্ত-সহচর বকুলের ছোট ছোট, শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধ ফুলের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

সম্প্রতি সোঁদল (ক্যাসসিয়া) গোত্রের স্বল্প বর্দ্ধনশীল আর একটি গাছ সম্পর্কে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। তার নাম 'অমলতাস' (ক্যাসসিয়া ফিস্টুলা); চার থেকে ছয় বছরের মধ্যে এই গাছ বীজ উৎপাদনে সক্ষম হয়ে উঠে; উচ্চতা ৬।৭ মিটারের মত। ফুলের মিষ্টি গন্ধ আছে, বর্ণ স্বর্ণাভ-পীত; থোকায় থোকায় নতমুখী অজস্র ফুল ধরে। ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ফুল ধরার কাল। এর ইংরাজী নাম 'পুডিং পাইপ ট্রি'। বাঙলায় কেউ কেউ বলেন 'বাঁদর লাঠি'। এই 'অমলতাসে'র জাত ভাই হচ্ছে জাভার রাণী (ক্যাসসিয়া জাভানিকা), সোনামুখী প্রভৃতি গাছ। জাভার রাণীর রঙ মেটে লাল।

চম্পক গোত্রের বেশ কিছু ফুলের কথাও এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। কলকাতার পার্কগুলিতে, লাল দীঘিতে, ইডেন উদ্যানে এক সময় কনক চাঁপা, গোলন চাঁপা, চীনে চাঁপা, দোলন চাঁপা এবং স্বর্ণচাঁপা প্রভৃতি শ্বেত-পীত-স্বর্ণাভ পুষ্প সমৃদ্ধ বহু গাছ চোখে পড়তো। এদের জ্ঞাতি নাগেশ্বর চাঁপা খুব ধীরে ধীরে বাড়ে; এর ফুল-দলও শ্বেত বর্ণ, পরাগ

বনমহোৎসব দিবস উপলক্ষে বিশেষ রচনা

কেশরের রঙ সোনালী। তবে সম্ভবত গন্ধে ও বর্ণে হিম চাঁপা (ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা) সবাইকে হারিয়ে দিতে পারে। অবশ্য এর পত্রগুচ্ছ যতই চটকদার হোক সোনালী রঙের সুবৃহৎ ফুলগুলির পাপড়ি সামান্য স্পর্শেই খসে পড়ে; রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—'ম্যাগনোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খসে খসে পড়ে ঘাসে।' এই ফুলের গন্ধও সুমিষ্ট ও মাদকতাময়। বর্ষাসূচনায় গাছে ফুল আসে। কিছুদিন আগেও থিয়েটার রোডে হিমচাঁপার একটা গাছ দেখেছিলাম।

কাঞ্চন (বাউহিনিয়া) গোত্রের বেশ কিছু গাছও এক সময় কলকাতায় দেখা যেত। বিশেষ করে রক্ত কাঞ্চন (সং: কোবিদার, হিন্দী: কাঞ্চনার, বাউহিনিয়া ভারিয়েগাটা) ফুলটির শোভা দেখবার মত; কবি যতীন্দ্র মোহন যথার্থই লিখেছেন—'ফাল্গুন সাঁঝে ধীরে আসে ও-সে কে?/ সঙ্কোচে নত রাঙা কাঞ্চন যে।' এই রক্ত কাঞ্চনেরই দোসর হচ্ছে শ্বেত কাঞ্চন ও দেব কাঞ্চন।

সংস্কৃত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'কুটজ' ফুলের বড় কদর। এই 'কুটজে'র বাঙলা নাম 'কুরচি' বা 'কুড়চি'। এটি থেকে নানা ঔষধ প্রস্তুত হলেও 'ফুলের তপস্যার মহাশ্বেতা' সুমসৃণ কুরচি শাখার শোভায় একদা রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই ফুলের রঙও সাদা। এই কুরচিও বসন্তের দূতী।

সবশেষে বলি বর্ষার ফুল কদমের কথা। পাউডার পাফের মত গোলাকার ঐ কদম ফুল-এর শুঁয়াগুলি সাদা; কিন্তু ভিতরের রঙ গাঢ় হলুদ। এই ফুলেও প্রচুর মধু সঞ্চিত থাকে। টালা-অঞ্চলে পথের ধারে এখনও কদম-গাছ চোখে পড়ে। এই কদমেরই মত আর এক বর্ষার গাছ 'কেলিকদম' (নাউক্লিয়া কোরডিফোলিয়া)। এছাড়াও শিরীষ (এলবিজুয়া লেবেক), মাধবী (হিপটাগে মাডাব্লাটা), মালতী বা চামেলী (একিটেস কারিও ফাইল্লোটা), মাদার বা মন্দার (কোরাল ট্রি, এরাই-থ্রিনা ইণ্ডিকা), রঙ্গন (ইক্সোরা কোক্সি-নিয়া) প্রভৃতি প্রিয় ও পরিচিত পুষ্প-প্রসূতরুর নাম করা চলে। এরাও সংরক্ষণের অভাবে কলকাতা থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। এদের কি আমরা ধরে রাখতে পারি না?

অলিম্পিক হকিতে ভারত

অজয় বসু
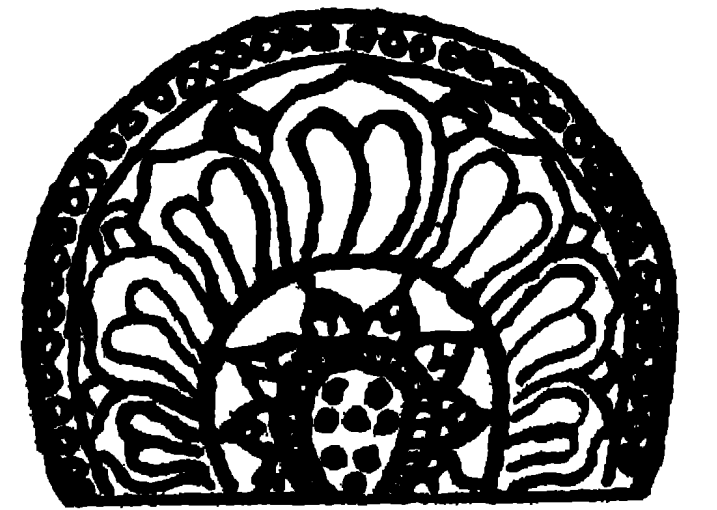
আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হকি খেলায় সাফল্য। হকিতে ভারতীয় অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক লগ্ন ১৯২৮ সালে। বিশ্ব অলিম্পিক আসরে ভারতীয় হকি দল সেবারেই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটায় এবং আবির্ভাবেই বিশ্ব বিজয়ীর স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

সেই থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে ভারতীয় হকির বিজয়-রথ গড়গড়িয়ে ছুটতে থাকে। তারপরই হোঁচট খায় প্রথম ১৯৬০ সালে। চার বছর পর জাপানের রাজশহর টোকিও-তে অষ্টাদশ ওলিমপিয়াড উপলক্ষে ভারত হকিতে বিশ্ব খেতাব পুনরুদ্ধার করলেও পরের কটি বছর ভারতীয় হকিকে ব্যর্থতার বেদনায় ভুগতে হয়েছে। এই পর্বে অনুষ্ঠিত পরপর দুবার অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনোটিতেই ভারত তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর সম্মানের চেয়ে বেশি কিছু আদায় করতে পারে নি।

১৯২৮ থেকে ১৯৫৬—দীর্ঘ আটাশ বছরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত, মাঝের চৌষট্টি সালকে বাদ দিয়ে, ভারতীয় হকিতে ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। প্রশাসনিক দৈন্য আত্মকলহ, সাংগঠনিক বিরোধ ও তিক্ততা, সব মিলিয়ে খেলোয়াড়দের মনোবল ভেঙে দেওয়ায় চরম পরীক্ষার লগ্নে তাঁরা স্বাভাবিক ক্রীড়ানিপুণতার মূলধন যোগাড়ে আনতে পারেন নি। দলগত সংহতি বলে কিছুই ছিল না। ফলে বারবার আন্তর্জাতিক আসরে অবতীর্ণ হয়ে পরাজয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে জাতীয় দলকে স্বদেশে ফিরতে হয়েছে।

সেই অবক্ষয়ের যুগ এখন অস্তমিত প্রায়। প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। আত্মকলহ ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতীয় হকিও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যে পৌছুবার প্রতিশ্রুতি মুখের কথার মতো নেহাৎই এক ঠুনকো বস্তু নয়। যেহেতু গত বছরে কোয়ালালামপুরে আয়োজিত বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার মতো এক বৃহৎ অনুষ্ঠান জয় করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে ভারতীয় দলই। মণ্ট্রিল অলিম্পিকের ঠিক আগে বিশ্বকাপ হকিতে ভারতের এই সাফল্য অর্থবহ এবং স্বভাবতই এই দৃষ্টান্ত ভারতীয় হকির অনুরাগীমহলে নতুন আশায় বুক বাঁধতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

তবে অতি সম্প্রতি বিশ্ব কাপটিকে নিজের ঘরে তুলতে পেরেছে বলেই যে ভারতীয় হকি দল মণ্ট্রিলের বিজয় মঞ্চের মাঝখানে মাথা তুলে আবার দাঁড়াবেই দাঁড়াবে, একথা স্থির বিশ্বাসে নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়া বোধহয় বুদ্ধিমানের

টোকিও-য় হকিতে স্বর্ণপদক জয়ের পর

কাজ হবে না। যেহেতু বড় হওয়ার দায় অনেক। যে দল বিশ্ব বিজয়ীর অভিধায় অভিনন্দিত তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অনেক পক্ষই তৈরী হয়ে ওঠে। শক্তিধর পাকিস্তান এবং আগের বারের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী ও আরও কটি দেশ ভারতের আসন ধরে সবিক্রমে টান কষাবার সংকল্পে পূর্ণশক্তি নিয়ে মন্ট্রিলের মাঠে ময়দানে হাজির থাকবে। তারপর থাকবে নতুন ধরণের খেলার মাঠের অতি বাস্তব চ্যালেঞ্জ। অতএব সব কিছুর বিচারে, মন্ট্রিলের চ্যালেঞ্জ কঠিন। বাধা ডিঙ্গোতে ভারতীয় দলকে সর্বাত্মক চেষ্টার, ক্রীড়াগত সঙ্গতি এবং দলগত সংহতির মূলধন যোগাড়ে রাখতেই হবে। যেমন রাখা হয়েছিল বছর খানেক আগে কোয়ালালামপুরে। কোয়ালালামপুরের অভিজ্ঞতা বাস্তব ও শিক্ষণীয়। বিশ্বাস করা যায় যে সেই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আত্মস্থ করে ভারতীয় দল এবার মন্ট্রিলে পথের কাঁটা একটি একটি বেছে নিয়ে চলার সড়ককে সুগম করে লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে।

মন্ট্রিলে হকি খেলা হবে এক বিশেষ ধরণের মাঠে। ঘাসের বদলে কৃত্রিম উপকরণে গড়া একটি চাদর বিছানো এই মাঠে বৃষ্টি পড়লেও তার চেহারা ও চরিত্রের হেরফের ঘটবে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই কালে মাঠের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার এ এক কৃত্রিম উপায়। সাধারণ হিসেবে এই মাঠে নির্ঝঞ্ঝাটে খেলার সুবিধা অনেক। তবে কৃত্রিম মাঠে বল কতোটা জোরে ছুটবে, লাফাবে কতোটা, বল নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বাভাবিক ভাবে খেলা সহজ হবে কিনা তা পরীক্ষার বিষয়। এমন অভিনব মাঠে খেলার অভ্যাস ভারতীয়দের নেই। সেই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতায় রপ্ত হতেই ভারতীয় দল ওলিম্পিকের আগে ইওরোপ সফর করে ভিন্নতর পরিবেশে খেলেছে। আশাকরা যায়, এর ফলে কৃত্রিম মাঠে খেলার প্রাথমিক অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হবে। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ওলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের আগে অন্যদেশে গিয়ে কৃত্রিম মাঠে খেলার অভ্যাস এক গঠনমূলক সুচিন্তিত পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া গেলে এই পরিকল্পনার সার্থকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে।

মন্ট্রিলে কি ঘটতে পারে, অনাগত ভবিষ্যতের সেই সম্ভাব্য কাহিনী ঘিরে আলোচনান্তে এবার পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক্ যে কিভাবে ভারতীয় হকি বিশ্ব ওলিম্পিকের আসরে গৌরব ও মর্যাদামণ্ডিত আসন দখল করেছিল।

প্রধানমন্ত্রীর সংগে মন্ট্রিলগামী ভারতীয় হকিদল

সাল ১৯২৮। বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়াকেন্দ্র আমষ্টারদাম। একমাত্র কুস্তি ছাড়া খেলাধূলার অন্য কোনো বিভাগেই ভারতীয় দক্ষতা তখন অস্বীকৃত। সেই লগ্নেই ভারতীয় হকি বিশ্ব ক্রীড়াভূমিতে হাজির হয়ে আটাশ বছরের সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে দিয়েছিল। তার আগে ওলিম্পিকে হকি খেলার আসর বসেছিল দুবার ১৯০৮ ও ১৯২০ সালে এবং সে দুবারই গ্রেট বৃটেন হকিতে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের আখ্যা অর্জন করে নিয়েছিল।

কিন্তু ১৯২৮ সালে গ্রেট বৃটেন হকি খেলতে ইউরোপেরই এক শহর আমষ্টারদামে উপস্থিত হয় নি। কারণ, ইংরাজের আশঙ্কা ছিল ভারতের হাতে হেরে যাওয়ার। বৃটিশ সাম্রাজ্যে তখন সূর্য ডোবে না। ভারত তখন ইংরাজ শাসিত পরাধীন। শাসিত ‘নেটিভদের’ কাছে পাছে মাথা নত করতে হয় এই ভয়ে বৃটেন সেদিন হকি মাঠের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের মোকাবিলা করতে চায় নি। আমষ্টারদামে যাওয়ার পথে খাস বৃটেনে ভারতীয় দল যে কটি প্রদর্শনী বা অনুশীলনী ম্যাচ খেলে তার একটিতেও হকিতে বৃটিশ সামর্থ্য গ্রেট বৃটেন বা বৃটিশ একাদশের নাম নিয়ে অংশ নেয় নি। ভারত বনাম গ্রেট বৃটেনের খেলার প্রস্তাব নিয়ে ভারতীয় দলের পক্ষে সবিনয় অনুরোধ রাখা সত্ত্বেও দুপক্ষে কোনো খেলা হয়নি। অনুরোধ, উপরোধের সূত্রে তেল পুড়েছিল কয়েক মন, কিন্তু রাধা কিছুতেই নাচতে রাজী হয় নি।

আসল কথা, স্পোর্টসম্যানশিপের মানদণ্ডে বৃটেন সেদিন সংকুচিত হয়ে উঠেছিল। হেরে যাওয়ার ভয়ে হারের আগেই তারা রণে দিয়েছিল ক্ষান্তি। আমষ্টারদামে হকিতে সোনা পাওয়ার পথে ভারত হারিয়েছিল অষ্ট্রিয়াকে ৬–০, বেলজিয়ামকে ৯–০, ডেনমার্ককে ৫—০, সুইজারল্যাণ্ডকে ৬—০ এবং হল্যাণ্ডকে ৩–০ গোলে।

১৯২৮ সালে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন প্রথম পর্বে জয়পাল সিং। পরে এরিক পিনিজার। নির্বাচিত নেতা জয়পাল সিং উত্তরপর্বে কেন দল পরিচালনার দায়িত্বভার ছেড়ে দেন, তার সঠিক কারণ আজও অজানা। এই দলের মধ্যমণি ছিলেন ধ্যানচাঁদ। আশপাশে অনেক জাত খেলোয়াড়ের জমায়েৎ। তবু তাঁদের ভিড়ে ধ্যানচাঁদ ছিলেন নিজের বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যাদুকরী প্রতিভায় প্রতিভাত হয়ে ধ্যানচাঁদ সর্বকালের সর্বোত্তম হকি খেলোয়াড় তথা সেণ্টার ফরোয়ার্ডের অভিধায় অভিনন্দিত হয়ে আছেন। আমার বিচারে ধ্যানপ্রতিভা আদ্যাশক্তি স্বরূপা। এক বিশাল মহীরূহের মূল শিকড়ের মতো। তাঁকে ভিত্তি করেই ভারতীয় হকিতে ডালপালা গজিয়ে উঠেছে। প্রেরণার প্রাণশক্তি উৎসারিত হয়েছে সেই মূলেই। ভারতের মাটিতে সেই বিশের দশকে ধ্যানচাঁদের সৃষ্টি সম্ভব না হলে ওলিম্পিক হকিতে ভারতের যোগদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হত কিনা সন্দেহ। আমার চোখে ধ্যানচাঁদ শুধু এক দিকপাল খেলোয়াড়ই নন, ইতিহাসের স্রষ্টা। ভারতীয় হকির ভাগ্যবিধাতা।

১৯৩২ সালে সুদূর মার্কিন মুলুকের লস এঞ্জেলসে ওলিম্পিক ক্রীড়ার আসর সাজানো হলে লাল শাহ্ বোখারির নেতৃত্বে ভারত আবার ওলিম্পিক হকিতে শীর্ষস্থান পায়। সেবার প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল সীমিত। ভারত হারায় জাপানকে ১১-১ ও আমেরিকাকে ২৪—১ গোলের ব্যবধানে। মূল আসরে একা ধ্যানচাঁদ গোল করেছিলেন বারোটি। আর তাঁর সহোদর রূপ সিং তার চেয়ে একটি বেশী।

চারবছর পর নাৎসী জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে ওলিম্পিক ক্রীড়ার আয়োজন ঘটলে হকিতে বিশ্ব বিজয়ীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন স্বয়ং ধ্যানচাঁদই। এবং নিজে গোল করেন এগারোটি। বার্লিনে ভারত হারিয়েছিল হাঙ্গেরীকে ৪—০, আমেরিকাকে ৭—০, জাপানকে ৯—০, ফ্রান্সকে ১০—০ এবং জার্মানীকে ৮—১ গোলে। ১৯৩৬ সালে নাৎসী প্রভাব ছিল তুঙ্গে। নাৎসী নেতা হিটলার ছিলেন আর্য শোণিতের অবিমিশ্র অস্তিত্বে আস্থাবান। কৃষ্ণকায় ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে কালা আদমী ভারতীয়দের এই চূড়ান্ত সাফল্যকে তিনি খুসীমনে গ্রহণ করতে পারেন নি, তা বোধকরি বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে লণ্ডনে ওলিম্পিক ক্রীড়ার চতুর্দশ অনুষ্ঠান হয় ১৯৪৮ সালে। সেই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিজয়ীর স্বর্ণ স্বীকৃতি আদায়ে ভারতের অসুবিধে হয় নি। দলপতি ছিলেন কিষেণলাল। ভারত হারিয়েছিল প্রাথমিক লীগে অষ্ট্রিয়াকে ৮—০, আর্জেণ্টিনাকে ৯—১, স্পেনকে ২—০, সেমিফাইনালে নেদারল্যাণ্ডকে ২—১ এবং ফাইনালে সংগঠক রাষ্ট্র গ্রেট বৃটেনকে ৪—০ গোলে।

নিশীথ সূর্যের দেশ ফিনল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কি শহরে পঞ্চদশ ওলিম্পিক আসরে ভারত হকিতে তার শীর্ষাসন অবিচল রেখে দেয় কে ডি সিং,, ওরফে বাবুর নেতৃত্বে। সেবার ভারত হারিয়েছিল অষ্ট্রিয়াকে ৪—০, গ্রেট বৃটেনকে ৩—১ ও নেদারল্যাণ্ডকে ৬-১ গোলে। হেলসিঙ্কির পর মেলবোর্ণ—১৯৫৬ সাল। বলবীর সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় দল এবারও শীর্ষস্থানে অনড় থাকে। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান এতোদিনে হকিতে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তবু চূড়ান্ত খেলায় ভারত পাকিস্তানকে হারায় এক গোলে এবং অন্যান্য প্রতিযোগী যথা আফগানিস্থান, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর ও জার্মানীকে পরাজিত করে যথাক্রমে ১৪—০, ১৬—০, ৬—১ ও ১—০ গোলে।

একটানা ছটি ওলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতা জয়ের সুবাদে স্বর্ণপদকটি ভারতের ঘরে ছিল এক নাগাড়ে বত্রিশ বছর ধরে। ১৯৬০ সালে চিরন্তন নগরী রোমে সেই পদক হাতছাড়া হয়ে যায় অবিভক্ত ভারতের অপর শরিক পাকিস্তানের চড়া চ্যালেঞ্জের চাপে। ফাইনালে পাকিস্তান ভারতকে হারায় এক গোলে। তার আগে ভারত হারিয়েছিল ডেনমার্ককে ১০—০, নেদারল্যাণ্ডকে ৪—১, নিউজিল্যাণ্ডকে ৩—০, কো: ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া ও সেমিফাইনালে বৃটেনকে একটি করে গোলের ব্যবধানে। রোমে ভারতীয় দলাধিপতি ছিলেন লেসলি ক্লডিয়াস। বেচারি লেসলি। আগের দুটি ওলিম্পিকে বিজয়ী দলের সদস্য হিসাবে তাঁর অধিষ্ঠান ছিল বিজয় মঞ্চের মাঝখানে। এবার কিন্তু তাঁকে পাশের ধাপে মাথা নীচু করে দাঁড়াবার তিক্ত অভিজ্ঞতা মেনে নিতে হয়। তবে রোমে যে সাম্রাজ্য বেহাত হয়ে গিয়েছিল সেটি পুনরুদ্ধার করেন দলপতি চরণজিত সিং ও তাঁর সহযোগীরা ১৯৬৪ সালে টোকিওর আসরে। এবারেও ফাইনালে মুখোমুখি লড়াই বাধে ভারত ও পাকিস্তানে। লড়াই শেষে বিজয়ী সাব্যস্ত হয় ভারতই। টোকিওতে ভারতের খেলার ফলাফল : স্পেন ও জার্মানীর সঙ্গে খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিত, জিৎ নেদারল্যাণ্ডের (২—১), মালয়েশিয়া (৩—১), বেলজিয়াম (২—০), কানাডার (৩—০), হংকং (৬—০) ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে।

পরবর্তী ইতিহাস ভারতীয় হকিদলের পদস্খলনের কাহিনীতে ভারাক্রান্ত। ১৯৬৮-তে মেকসিকো এবং ১৯৭২-এ মিউনিখে ভারত তৃতীয়স্থানেই আটকে পড়ে। পরপর দুটি ওলিম্পিকে এই বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত যেন এক কালের বিশ্ববিজয়ীর আত্মবিস্মরণেরই নজির।

আত্মবিস্মরণের কাল পেরিয়ে ভারতীয় হকি কি ম ণ্ট্রি লে পূর্ণ মর্যাদা ও গৌরবে নিজেকে ফিরে পাবে না? ভারতীয় ক্রীড়া সমাজের এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে আপাতত এমাসের তৃতীয় পক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকা যাক্।

জাঁহাপানা

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আমার স্মৃতি কোনকোন ব্যাপারে খুব অস্পষ্ট। জাঁহাপানা জুলেখাকে কি ভালবাসত? আজকাল তাকে জুলেখার কথা বললে সে লজ্জায় লাল হয়ে জোরে মাথা দোলায়। অথচ তারপর তাকে বিয়েতে কিছুতেই রাজী করানো যায় নি। কেন?

একদিন অফিস যাবার জন্যে তৈরী হয়েছি, পিয়ন একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। বুক কেঁপে উঠল। ইদানিং বাবার শরীর ভাল যাচ্ছিলনা।

হাত কাঁপছিল। খুলে চোখ রাখলুম। না—বাবার কিছু হয়নি। "তোমার জাঁহাপানা এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।"

আমাদের গ্রামটা ছিল বর্ধিষ্ণু। ক্রমশ ছোটখাটো শহর হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ এসেছে। রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে। যানবাহন বেড়েছে। নির্ঘাৎ জাঁহাপানা গাড়িচাপা পড়ে মরেছে। আজকাল জাতীয় সড়ক হওয়াতে পাশের রাস্তায় বিশাল সব লরী যায়। দুর্ধর্ষ তাদের গতিবেগ। হিংস্র চেহারার ড্রাইভার বসে থাকে দেখেছি।

জাঁহাপানা ছিল আমার ছেলেবেলার কত ঘটনার সঙ্গী। মন কেমন করে উঠল।

গাঁয়ে পৌছালুম সন্ধ্যায়। গিয়ে সব শুনে অবাক হলুম। না—জাঁহাপানা গাড়িচাপা পড়ে মরে নি। দাদুর বিশাল দালান বাড়ির যে অংশে বাবা থাকেন, তার সামনে উত্তরের দেউড়ি। দেউড়ির একপাশে আগের দিনের খাজাঞ্চি খানা। একটামাত্র ঘর টিঁকে ছিল। বাকিগুলো ধ্বংসস্তুপ মাত্র। সেই ঘরটায় ছিল আমাদের থিয়েটার ক্লাব। তার দুপাশের দেয়ালে গর্ত করে বাঁশের মাচা তৈরি করেছিলুম আমরা। মাথার ওপর সেই মাচায় থিয়েটারের ষ্টেজ এবং সিন থাকত। মাচাটা খুব চওড়া ছিল না। তার ফলে সব ডাঁই হয়ে দড়িবাঁধা অবস্থায় চাপানো থাকত। আলকাতরা দেওয়া হয়েছিল বাঁশে। কিন্তু ঘূণ পোকাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় নি।

বাবা বললেন, আগের রাতে আমি বাইরের ঘরের বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শুনলুম তোমাদের ক্লাবঘরে প্রচণ্ড শব্দ হল। আলো নিয়ে দৌড়ে গেলাম। আরও অনেকে এসে গেল। শব্দটা সবাই শুনেছিল। ঢুকে দেখি ষ্টেজ-সিনগুলো পড়ে রয়েছে মেঝেয়। তখনও বুঝতে পারিনি যে ওর তলায় হারামজাদা চাপা পড়েছে। সবই নসিব। তখন যদি জানতুম, ওর তলায় মানুষ আছে।

বাবা চোখ মুছলেন বান্দার শোকে।

ষ্টেজ-সিন পড়েছে তো কী হয়েছে। সকালে জাঁহাপানাকে বললে আবার সব তুলে কোথাও রাখবে। তাই সবাই ব্যাপারটা দেখে চলে যান।

সকালে জাঁহাপানার খোঁজ হল। তার পাত্তা নেই। হঠাৎ বাবার সন্দেহ হল। তিনি সেই ঘরে ঢুকলেন। তখন যা চোখে পড়েনি, এবার পড়ল। একফালি রক্ত চবচব করছে স্তুপের কোনায়।

বান্দা হারামজাদা সারারাত ধরে ওই স্তুপের তলায় চাপা পড়ে থেকেছে। বের করা হল, তখন নাকেমুখে রক্ত—গা হিম বরফ।

কিন্তু কেন ওখানে রাতদুপুরে ঢুকেছিল সে? কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব নেই। আচমকা দৈবাৎ বাঁশ ভেঙে পড়ে গেছে তা ঠিক। কিন্তু ওখানে কী করছিল সে?

জাঁহাপানার টাটকা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললুম—তোমার আত্মার শান্তি হোক।

তারপর চোখ ঝাপসা হয়ে এল এবং ফিরতেই মনে হল—নাকি স্পষ্ট শুনলুম—চৈত্রের বাতাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে বলে উঠেছে—জাঁহাপানা।

আসলে শিল্প যখন মানুষের সত্তাকে গ্রাস করে, তখন আর তার মুক্তি নেই। শিল্পের গ্রাস অজগরের মতো।

দূষিত পরিবেশের সমস্যা

৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এলাকার মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন। শহরের জনবহুল এলাকায় নতুন কারখানার চলবে না। পরিবেশ অনুযায়ী কারখানার শ্রেণীভেদ করতে হবে।

সুখের কথা, এসব কথা ভেবেই কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশ পরিকল্পনা-সহযোগিতার ওপর একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য হল, পরিবেশকে সুস্থ রাখতে এরা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ দেবেন এবং সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সক্রিয় হবেন। গভীরভাবে বিষয়টিকে তলিয়ে দেখার জন্য এই কমিটি চারটি বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, (১) গ্রাম স্থাপন (২) শহর স্থাপন, (৩) শিল্প ও পরিবেশ (৪), প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ।

গ্রাম ও শহর এলাকার অর্থনৈতিক কর্মসূচীর দিকে নজর রেখে ভারত সরকার জনসংখ্যার সমবণ্টনের চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন রাজ্যে এর মধ্যেই আঞ্চলিক পরিকল্পনার কাজ এজন্য এগিয়ে চলেছে। শহরের জমির সীমানা নির্ধারণ, গ্রামের জমির সংস্কার, কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রভৃতি একটি সুস্থ মানবিক পরিবেশ গঠনে সহায়ক হবে।

ওলিম্পিকের গল্প

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে আর মাত্র কটা দিন। তারপরই মনট্রিলে শুরু হবে এবারের ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। দেশ বিদেশ থেকে প্রতিযোগীরা, ক্রীড়ারসিকরা একে একে গিয়ে হাজির হচ্ছেন মনট্রিলে। ভারতীয় দলও পৌঁছে গেছে।

দিন যতো এগিয়ে আসছে ততোই সকলের জানতে ইচ্ছে করছে ওলিম্পিকের কথা। প্রতি চার বছর অন্তর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা সমস্ত বিশ্বকে মাতিয়ে তোলে। হিংসার কোন স্থান নেই ওলিম্পিকের আদর্শে। দেশে দেশে মৈত্রীর বাণী প্রচার করাই বিশাল এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য।

ওলিম্পিকের ইতিহাস নিয়ে হাজার গল্প-কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। ইতিহাসের পাতায় ছড়ানো সেই সব গল্প কাহিনীর কয়েকটির কথাই বলবো। প্রচলিত উপকথায় পাওয়া যায় যে দেবাদিদেব জিউসের সঙ্গে ক্রোনানের যুদ্ধে বিজয়ী জিউসের বিজয় উৎসব উপলক্ষে এবং জিউসের সঙ্গে টিটিয়ানদের যুদ্ধে দেবাদিদেবের বিজয় উৎসবের জন্যে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই ওলিম্পিক ক্রীড়ার গোড়ার কথা। তবে সব থেকে প্রচলিত উপকথাটি হলো বীর হারকিউলিসকে নিয়ে।

হারকিউলিস ছিলেন দারুণ শক্তিশালী। কাউকে তিনি পরোয়া করতেন না। একবার কোন এক অপরাধের জন্যে অ্যাপোলো দেব শাস্তি দেবার জন্যে আক্রমণ করলেন হারকিউলিসকে। হারকিউলিস কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলেন না। অ্যাপোলোদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। সাংঘাতিক যুদ্ধ। রক্তের বন্যা বইতে লাগলো যুদ্ধক্ষেত্রে। শেষ পর্যন্ত দেবাদিদেব দুই যোদ্ধার মধ্যে বজ্র ফেলে যুদ্ধ থামালেন। এবং তাঁর আদেশে ইয়ুরেস্থিয়াসের নির্দেশ মতো কাজ করতে বাধ্য করলেন হারকিউলিসকে। ইয়ুরেস্থিয়াসের আদেশে বারোটি কঠিন কাজ করতে হলো হারকিউলিসকে। এই বারোটি কাজই গ্রীসে এথলো নামে খ্যাত। এই এথলো থেকে অ্যাথলেটিক বা অ্যাথলেট কথার উৎপত্তি।

ঐ বারোটি কঠিন কাজের মধ্যে একটি ছিল একরকম অসম্ভবই। এলিসের রাজা আগিয়াসের সুবৃহৎ পশুশালা একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করে দিতে বলা হলো হারকিউলিসকে। রাজা আগিয়াসের হাজার হাজার গৃহপালিত পশু ছিল। ইয়ুরেস্থিয়াস বললেন, কারো কোন সাহায্য না নিয়ে ঐ পশুশালায় বছরের পর বছর ধরে যে আবর্জনা জমে উঠেছে তা পরিষ্কার করে দিতে হবে হারকিউলিসকে। এবং একদিনের মধ্যেই। রাজা আগিয়াস এই আদেশ শুনে হাসলেন। ভাবলেন, এতো একেবারেই অসম্ভব কাজ। এই ফাঁকে না হয় নিজের মহত্ব একটু প্রচার করা যাক। তিনি বললেন, হারকিউলিস যদি সত্যিই একদিনের মধ্যে ঐ কাজ করে দিতে পারে তা'হলে তিনি তাঁর পশুশালার এক দশমাংশ পশু হারকিউলিসকে দিয়ে দেবেন।

অসীম শক্তিধর হারকিউলিস আলফিউস ও পিনেশ নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে পশুশালার মধ্যেদিয়ে সেই জল বইয়ে দিলেন। এবং নদীর জলে একদিনের মধ্যেই সাফ হয়ে গেলো বছরের পর বছর জমে ওঠা সমস্ত আবর্জনা। কাজ শেষ হওয়ায় হারকিউলিস ভাবলেন রাজা আগিয়াস তাঁর কথা মতো কয়েক হাজার পশু তাঁকে দেবেন। তাই তিনি রাজাকে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে পশুগুলি দাবী করলেন। রাজার তখন মাথায় হাত। অসম্ভব ভেবেই তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন। আর বলেছেন বলেই যে তাঁকে কথা রাখতে হবে এমন কোন কথাও নেই। তাই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করলেন। বললেন, ইউরেস্থিয়াসের আদেশ মতই হারকিউলিসকে ঐ কাজ করতে হয়েছে।

দারুণ রেগে গেলেন হারকিউলিস। কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি রাজা আগিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। সেই যুদ্ধে মারা গেলেন রাজা আগিয়াস। নিহত হলেন তাঁর ছেলেরাও। এলিস রাজ্য দখল করলেন হারকিউলিস।

হারকিউলিসের এই জয়ে দেবাদিদেব জিউসকে পূজা করার জন্যে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আলফিউস নদীর তীরে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম বিষয় ছিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তারপর থেকে প্রতিবছর আলফিউস নদীর তীরে জিউসদেবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এই উৎসবের আয়োজন করা হতো। এই আনন্দ অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই ওলিম্পিকের সূচনা বলে প্রচলিত।

আর একটি কাহিনী

পিসার রাজা ওয়েনোমাসের মেয়ে হিপ্পোডামিয়ার দারুণ সুন্দরী। তাঁর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল নানা দেশে। বিভিন্ন দেশের রাজা আর রাজকুমারেরা চাইতেন সেই সুন্দরী রাজকুমারীকে বিয়ে করতে। কিন্তু রাজা ওয়েনোমাসের অদ্ভুত খেয়াল। তিনি ঘোষণা করলেন রথের প্রতিযোগিতায় যে তাঁকে হারাতে পারবে তাকেই তিনি জামাই করবেন।

রাজার সেই ঘোষণায় রাজকুমারীকে পাবার আশায় অনেকেই এগিয়ে এলেন রথ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। রাজকুমারী হিপ্পোডামিয়ারকে থাকতে হতো বিবাহেচ্ছু প্রতিযোগীর রথে। ওয়েনোমাস তাঁর রথে চড়তেন হাতে একটি বর্শা নিয়ে। তারপর শুরু হতো প্রতিযোগিতা। নামেই প্রতিযোগিতা। কারণ যে মুহূর্তে তিনি বিবাহেচ্ছু প্রতিযোগীর সামনে আসতেন অমনি হাতের বর্শা ছুঁড়ে তাকে হত্যা করতেন।

এই ভাবে একে একে তেরোটি হতভাগ্য যুবক রাজা ওয়েনোমাসের হাতে প্রাণ হারালেন। তের সংখ্যাটি যে অশুভ এবং দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তা চালু হয়েছে ঐ সময় থেকেই।

পেলোপস এতোদিন ধরে সব কিছু দেখছিলেন। এইবার তিনি রাজাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলেন। প্রতিযোগিতার আগেই তিনি রাজার রথের সারথি মার্টিলাসকে ঘুষ দিয়ে নিজের দলে টেনে নিলেন। ঠিক হলো মার্টিলাস রাজার রথের চাকার চক্রসংযুক্ত কিলক খুলে রেখে দেবে। আর সেই স্থানে লাগিয়ে দেবে মোমের কিলক।

হলোও ঠিক তাই। প্রতিযোগিতা শুরু হবার পরই রথের চাকা খুলে যাওয়ায় রাজা ছিটকে পড়লেন বহু দূরে এবং মারা গেলেন। পেলোপস পিসা রাজ্যের রাজা হলেন এবং বিয়ে করলেন হিপ্পোডামিয়ারকে। এই প্রতিযোগিতার বিজয়কে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে ও পিতামহ জিউসদেবকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে পেলোপস অলিম্পিয়ার প্রান্তরে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করেছিলেন সকলে মনে করেন সেই প্রতিযোগিতা থেকেই এসেছে আজকের এই ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

টোকিও ওলিম্পিকে মার্চ পাস্টে ভারতীয় দল

মিউনিখে সোনা পেয়েছিলেন যাঁরা

পুরুষ বিভাগ :

শত মিটার দৌড়—ভ্যালেরি বোরজভ (রাশিয়া) ১০.১৪ সেঃ ; দুশ মিটার দৌড়—ভ্যালেরি বোরজভ (রাশিয়া) ২০ সেকেণ্ড ; চারশ মিটার দৌড়—ভিন্স ম্যাথুজ (আমেরিকা) ৪৪.৭ সেকেণ্ড ; আটশ মিটার দৌড়—ডেভিড ওটল (আমেরিকা) ১ মিঃ ৪৫.৯ সেঃ ; পনেরোশ মিটার দৌড়—পেককাভাসালা (ফিনল্যাণ্ড) ৩ মিঃ ৩৬.৩ সে ; পাঁচ হাজার মিটার দৌড়—লাসে ভিরেণ (ফিনল্যাণ্ড) ১৩ মিঃ ২৬.৪ সেঃ ; দশ হাজার মিটার দৌড়—লাসে ভিরেন (ফিনল্যাণ্ড) ২৭ মিঃ ৩৮.৪ সেঃ ; তিন হাজার মিটার ষ্টিপল চেজ—কিপচো কিনো (কেনিয়া) ৮ মিঃ ২৩.৬ সেঃ ; ম্যারাথন দৌড়—ফ্র্যাঙ্ক স্টার (আমেরিকা) ২ ঘণ্টা ১২ মিঃ ১৯.৭ সেঃ ; ১১০ মিটার হার্ডল—রডনি মিলবার্ণ (আমেরিকা) ১৩.২৪ সেঃ ; চারশ মিটার হার্ডল—জন আকিবুয়া (উগাণ্ডা) ৪৭.৮২ সেঃ ; ৪ × ১০০ মিটার রিলে— আমেরিকা ৩৮.১৯ সেঃ ; ৪ × ৪০০ মিটার রিলে—কেনিয়া ২ মিঃ ৫৯.৮ সেঃ ; হাই জাম্প—ইউরিটারমাক (রাশিয়া) ২.২৩ মিটার ; লং জাম্প—র‍্যানডি উইলিয়ামস (আমেরিকা) ৮.২৪ মিটার ; হপ স্টেপ জাম্প—ভি স্যানিয়েভ (রাশিয়া) ১৭.৩৫ মিটার ; পোলভল্ট—উলফগ্যাং নরউইক (পূঃ জাঃ) ৫.৫০ মিটার ; বর্শা নিক্ষেপ—ক্লস উলফারম্যান (পঃ জাঃ) ৯০.৪৮ মিটার ; ডিসকাস নিক্ষেপ—লুডউইক দানেক (চেক) ৬৪.৪০ মিটার ; শট পুট—ডব্লিউ কোমার (পোল্যাণ্ড) ২১.১৮ মিটার ; হ্যামার নিক্ষেপ—এ বান্দারস্কুক (রাশিয়া) ৭৫.৫০ মিটার ; ডেকাথলন—নিকোলাই অ্যাভিলা ও (রাশিয়া) ৮৪৫৪ পয়েন্ট ; আধুনিক পেণ্টাথলন—বলিকজো (চেক)—দলে রাশিয়া ; ৫০ হাজার মিটার ভ্রমণ—বি ক্যানারবার্জ (পঃ জাঃ) ৩ ঘঃ৫৬ মিঃ

শেষাংশ চতুর্থ কভারে

সিনেমা

জানিনা কি কারণে গত দু বছর পুনা ফিল্ম ও টি ভি ইন্সিটিটিউটের ছবিগুলো কলকাতায় দেখানো যায়নি। এবার অবশ্য দেখানো হলো। তা'ও সব ছবি নয়, চল্লিশখানি ছবির মধ্যে মাত্র দশটি।

ইন্সিটিউটের ছাত্রদের ছবিতে পেশাদারী চমৎকারিত্ব হয়তো থাকেনা, কিন্তু এক ধরনের নবীন মানসিকতার ছাপ থাকে, বোধ হয় সেই কারণেই এই ছবিগুলির প্রতি বিদগ্ধ রসিক দর্শকের আগ্রহ একটু বেশী।

গত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে অধিকাংশ ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের উন্নাসিক মনোভাব তীব্রভাবে কাজ করে, বিদেশী

ছাত্রদের ছবি

চলচ্চিত্রকারদের প্রভাবে প্রকৃত শিক্ষার চাইতে আত্মম্ভরিতাই জন্মায় বেশী এবং সেই হেতু অধিকাংশ ছবিই হয়ে দাঁড়ায় ফর্মের তালগোল পাকানো প্রায় বক্তব্যহীন কয়েকটি চলৎ চিত্র। চলচ্চিত্র নয়। ফর্মের সঙ্গে কনটেন্টের যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক সেটা প্রায়ই নজরে আসে না ছাত্রদের ছবিতে। তিনচার বছর পড়াশুনোর পর ফিল্মের এই বেসিক জ্ঞানটুকুর প্রতিফলনও যদি তাদের ছবিতে না দেখা যায়, তাহলে দোষটা কোথায়?

বলতে দ্বিধা নেই—এবছরও যে ক'টি ছবি দেখা গেল, তারও অধিকাংশ উপরোক্ত দলভুক্ত। চিত্রনাট্য রচনার সময় সম্ভবত সকলের মনেই গদার, রে'নে, জাকসোর বিভিন্ন ছবির নানা শট্ ও কম্পোজিসন্ মাথায় ঘোরে। নইলে নিজের দেশের মাটির কথা বলতে গিয়ে অমন প্যাঁচ পয়জারের প্রয়োজনটা কি? আধুনিক প্রকরণগুলিকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতাটুকু ছাত্রদের থাকা দরকার।

ছবি হিসাবে বিচার করলে অরবিন্দ দত্তরায়ের 'কাজললতা'ই একমাত্র পরিচ্ছন্ন গিমিকহীন, বাস্তব ছবি। বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পটি ছবিটির আখ্যান ভাগ। তরুণী কাজলের চঞ্চলতা, গ্রামবাংলার চিত্র, মা-বাবার চরিত্রায়ণ সবকিছুই অতিরঞ্জনের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বিশ্বাসের

কাজললতায় রামেশ্বরী ও হৈমন্তী

স্তরে দাঁড়িয়েছে। কাজলের মৃত্যু দৃশ্যটিও নির্দেশকের সূক্ষ্ম শিল্প চিন্তার পরিচায়ক। নির্দেশকের সঙ্গে এই সফলতার অনেকটা কৃতিত্ব অবশ্যই চিত্রগ্রাহক মাইকেল ফু ও শিল্পী রামেশ্বরী তলুরির প্রাপ্য।

বিশেষ করে শ্রীমতী তলুরী অন্যান্য ছবিগুলিতেও তাঁর সু-অভিনয়ের নজির রেখেছেন। দীঘল চোখ তাঁর যেন কথা বলে। সারা মুখে এক্সপ্রেশনের ভিড়।

ছন্দিতা মুখার্জীর 'ঘোড়ে কি শিং' গভীর বক্তব্যপূর্ণ বটে কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর জড়তায় সব নিষ্ফল যেন। শাসিত ও শাসকের মানসিকতার পার্থক্য এই ছবিতে একটি শিশু বালিকা এবং স্কুলের এক বিদেশী মহিলা শিক্ষিকার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। স্কুলের পাশেই রাস্তায় এক গোরা সাহেব পথের বাধা হওয়ায় একটি ঘোড়াকে গুলি করে। ঠিক ঐ সময়ই ইংরেজীর ক্লাস শুরু হয়। বিদেশী শিক্ষিকা এক ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন 'ঘোড়ার ক'টি শিং' ভীত সন্ত্রস্ত ছাত্রীটি সঠিক উত্তর জানলেও বিচলিত হয়ে উত্তর দেয়, দুটি শিং। শিক্ষিকা তাকে তিরস্কার করে ক্লাসঘর থেকে চলে যান। ছবিটির অঙ্গে পরিচালিকার আন্তরিকতার

ছাপ ছড়িয়ে আছে। যদিও বক্তব্য প্রকাশে তেমন গভীর নন।

কে. জি. গিরিশের 'অবশেষ' ছবিখানিতে এক শিশুর একাকীত্বকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রবীণদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ এবং নবীনদের অবসর বিনোদনের ব্যস্ততার মধ্যে শিশুটি এক অচেনা দ্বীপের অধিবাসী যেন। ঐ বাড়ীর তার একমাত্র দেখার রুগ্নাবৃদ্ধা ঠাকুরমা। দুজনে দুজনার একাকীত্বের সঙ্গী। স্বল্প পরিসরে পরিচালক তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

অভিনয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তৈরী শ্যাম বেনেগালের 'হিরো' স্যাটায়ার ধর্মী ছবি, নাসিরুদ্দিন শাহ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করছেন। এস. কে. সুরির 'থ্রী টু পাওয়ার ইনফিনিটি'তে—ফর্মের সঙ্গে কনটেণ্টের মিলনের অভাব বড় প্রকট। জোহানন শঙ্কর মঙ্গলমের 'অশ্বমেধ'ও তাই। উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ নিয়ে ছবিখানি। এক রাজনৈতিক নেতাকে খুন করে দুজন পলাতক হয়। পুলিশ শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের সম্মুখ সমরে পরাস্ত করে। এম. মহাপাত্রের 'আনটাইটেলড্' এবং উপরোক্ত দুটি ছবিতেই হলিউডি ধাঁচে মারপিটের দৃশ্যাধিক্য পীড়া দেয়।

সুভাষ চন্দ্রের 'এ ওয়াক থ্রু দি ডার্ক' অতি আধুনিক চিত্রকলার মত কষ্টবোধ্য। এখানেও বিষয়বস্তু বা বক্তব্য পরিষ্কার নয়। ছবি নয়, অসংখ্য কথার ভিড়ে সব যেন হারিয়ে গেল। জোহানন শঙ্কর মঙ্গলমের দ্বিতীয় ছবি 'অল ভিদা'ও খাঁটি বোম্বাই ধাঁচের ব্যবসায়িক ছবির মশলায় তৈরী। নতুন কোন দিক তিনি যোগ করতে পারেননি।

রেখাপাত করার মত অভিনয় একমাত্র রামেশ্বরী তলুরির কাছেই পাওয়া গেল। আভা ঢুলিয়া বিশেষ ধরণের চরিত্রেই হয়তো সুযোগ পাবেন। অজিত পত্তিতুণ্ডুর প্রতিও নজর পড়তে পারে।

ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীমূর্তির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল নানাদিক বিচার করে নাকি পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করা হচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক পরিচয়ের জন্য নতুন ক্লাস শুরু হচ্ছে। নইলে ছাত্ররা সব শেকড় ছেঁড়া নিরালম্ব শিক্ষিত বেকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে কাজটি শ্রীমূর্তি করতে চলেছেন সেটি হল ছাত্রদের ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের জন্য ষোল মি. মি. তোলা ছবির সারা দেশব্যাপী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। এই কাজে কেন্দ্রীয় সরকারও নাকি সহযোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হলে ভারতীয় ছবির জগতে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।

—নির্মল ধর

সত্যানুসন্ধানে সিদ্ধার্থ

সুখ্যাত ঔপন্যাসিক হেরমান হেস-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'সিদ্ধার্থ'-র চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন বিদেশের পরিচালক কোনরাড রুকস। এটি সার্থক চিত্র হিসেবে কতখানি সাড়া জাগাতে পেরেছে সে-বিচার পরে। তার আগে এটুকু বলা যায় যে একজন বিদেশী পরিচালকের দৃষ্টিতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এ চিত্র দর্শকের মনে বৈরাগ্যের রস সৃষ্টি করতে পেরেছে।

ছবির নামকরণের মধ্যে সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের নাম থাকলেও আসলে এটি তাঁর জীবনী-চিত্র নয়। প্রতীক নাম হিসেবে ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ সত্যের সন্ধানে সংসার ছেড়ে বাইরে দূরে বেড়িয়েছে। সত্যানুসন্ধানের জন্য সে রাজনর্তকীর কাছে প্রেম, ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত এক বন্ধুর কাছে থেকে যে শিক্ষালাভ করেছে তার মূল সত্যটি হল সবই অনিত্য, একমাত্র সত্য ঈশ্বর। ঈশ্বরের সান্নিধ্যই প্রকৃত শান্তি।

আধ্যাত্মবাদের পটভূমিতে কাহিনীর পরিবেশ রচিত হলেও ভারতীয় আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্যটুকু ছবিতে ফুটে ওঠেনি। তাছাড়া ভারতের সনাতনী আধ্যাত্মিকতার যথার্থ মূল্যায়ণ এচিত্রে অনুপস্থিত। রাজনর্তকীর সঙ্গে সিদ্ধার্থর মিলনদৃশ্য শিল্পসম্মত হলেও তাদের সন্তানলাভ এবং সবশেষে রাজনর্তকীর নাটকীয় মৃত্যুদৃশ্য ছবিতে কি জীবনধর্মী হতে পেরেছে? মানুষের জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করে 'ও নদীরে' ও 'কতদূর আর কতদূর' (হেমন্তকুমারের সুরে ও কণ্ঠে) গান দুটির প্রয়োগ পরিবেশানুগ নয়। বরং স্তোত্র-সঙ্গীত ব্যবহৃত হলে ছবির ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি পেত। তবে আবহসুরে করুণ রসের ব্যঞ্জনা হৃদয়গ্রাহী।

ছবিটি বিদেশী পরিচালকের ইংরেজী ভাষায় নির্মিত হলেও এর পটভূমি এবং শিল্পী ভারতীয়। ভারতের নানা অঞ্চলে গৃহীত ছবির আলোকচিত্র এ ছবিকে বিশিষ্ট করেছে। শ্বেন নিকিভিস্ট-কৃত ছবির রঙিন ফটোগ্রাফী অনবদ্য চিত্রকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। অভিনয়ে নামভূমিকায় শশী কাপুর এবং রাজনর্তকীর চরিত্রে সিমি যথার্থ রূপ দিয়েছেন। এছাড়া পিঙ্কু কাপুর, রমেশ শর্মা, জুল ভেনেলি সুঅভিনয় করেছেন।

— চিত্রক

মিউনিখে সোনা পেয়েছিলেন যাঁরা

২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

১১ সেঃ; বিশ হাজার মিটার ভ্রমণ—পিটার ফ্রেনকেল (পূঃ জাঃ) ১ ঘঃ ২৬ মিঃ ৪২ সেঃ।

মহিলা বিভাগঃ

শত মিটার দৌড়—রেনেটে ষ্টেচার (পূঃ জাঃ) ১১.০৭ সেঃ; দুশ মিটার দৌড়—রেনেটে ষ্টেচার (পূঃ জাঃ) ২২.৪০ সেঃ; আশী মিটার দৌড়—অ্যানেলি এরহার্ড (পূঃ জাঃ) ১২.৫৯ সেঃ, পনেরো শ মিটার দৌড়—এইচ ফ্রাক (পূঃ জাঃ) ১ মিঃ ৫৮.৬ সেঃ; চারশ মিটার দৌড়—মনিকা জার্ট (পূঃ জাঃ) ৫১.০৮ সেঃ হাই জাম্প—উলমেকার্থ (পূঃ জাঃ) ১.৯২ মিটার; লং জাম্প—হিদেল রোজেনডল (পঃ জাঃ) ৬.৭৮ মিটার; ডিসকাস নিক্ষেপ—ফেনা মেলনিক (রাশিয়া) ৬৬.৬২ মিটার; বর্শা নিক্ষেপ—রুথ ফুকস (পূঃ জাঃ) ৬৩.৮৮ মিঃ; ৪×১০০ মিঃ রিলে (পঃ জাঃ ৪২.৮১ সেঃ; ৪×৪০০ মিঃ রিলে (পূঃ জাঃ) ৩ মিঃ ২৩.০৪ সেঃ; পেণ্টাথলন—মেরি পিটার্স (বৃটেন)।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১ আগস্ট ১৯৭৬
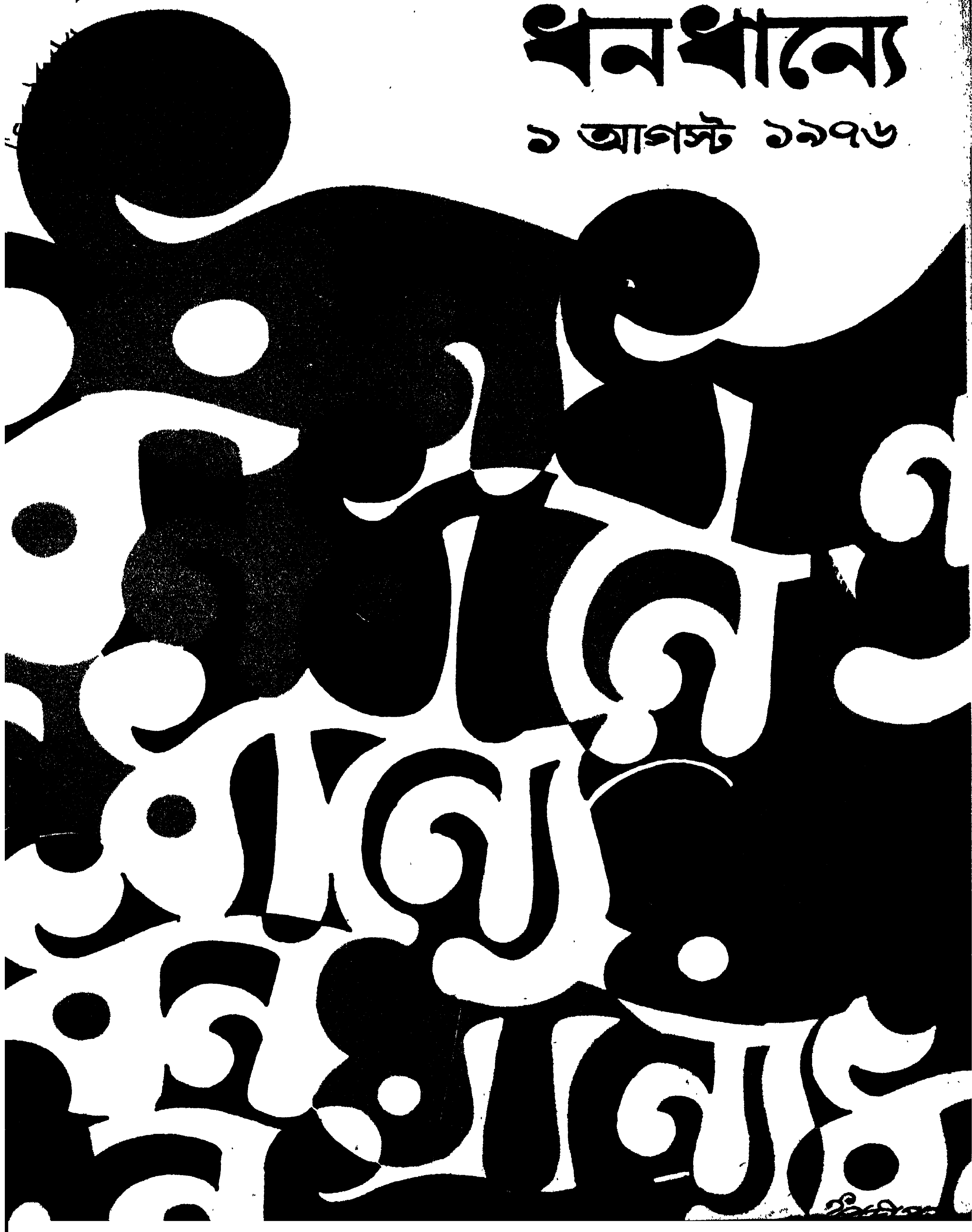
পরবর্তী সংখ্যায়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা দুটি রচনা আগামী সংখ্যার অন্যতম আ ক র্ষ ণ

অন্যান্য রচনা

ব্যাঙ্ক এখন প্রগতির হাতিয়ার
প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়

শতবর্ষের আলোকে বন্দেমাতরম
মৃগাঙ্ককৃষ্ণ রায়

শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে
ডক্টর অমরনাথ দত্ত

এই সংখ্যার গল্প লিখেছেন
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

এছাড়া যুবমানস, খেলাধুলা, সিনেমা, মহিলামহল, গ্রন্থ-আলোচনা এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

"আমাদের আরো বেশী করে জাতীয় গর্ব থাকা দরকার। ব্যক্তির নিজের বিষয়ে গর্ব থাকা ভালো জিনিস নয়, কিন্তু তাঁর জাতীয় গর্ব অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। আমেরিকাই হোক বা কম্যুনিষ্ট দেশই হোক, প্রতিটি দেশই সবসময় তার কাজের মধ্য দিয়ে তার গর্ব গ'ড়ে তুলছে। জাতীয় ঐক্য এভাবেই গ'ড়ে ওঠে। আর এই গর্বই বিভিন্ন স্তরে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের আশা, আস্থা এবং উৎসাহ যোগায়।

অথচ যা কিছু ভারতীয় তাকেই হেয় করা আমাদের অভ্যাস হয়ে উঠেছে। ভারতে অনেক কিছুই আছে যা ভালো নয়। একে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। আপনার বাড়ী যদি অপরিষ্কার থাকে তো তাকে পরিষ্কার করুন। তারজন্য আপনি বলবেন না, "আমি এ বাড়ী ভেঙ্গে ফেলব।" একটা ঝাড়ু বা ঝাঁটা নিন এবং বাড়ীটাকে পুরোপুরি পরিষ্কার করে ফেলুন। এমনি করে আমাদের সমাজে এবং সমস্ত কাজকর্মে যা ত্রুটি রয়েছে তাকে ঝেড়ে ফেলে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। কিন্তু জাতিকে ধ্বংস করা চলবে না"

ইন্দিরা গান্ধী

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশন্‌স ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রণী পাক্ষিক

১ আগষ্ট, ১৯৭৬

অষ্টম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ—প্রদীপ দাস
আলোকচিত্র—কেশব দাস

সম্পাদকের কলমে

যুবশক্তি জাতির এক বিরাট শক্তি। আজকের যুবকেরাই তো আগামী দিনে দেশের কর্ণধার হবে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, নতুন উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত এই যুব শক্তি। এদের বাহুতে অমিত বল, মনে অভূতপূর্ব সাহস, চিন্তাধারা স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ। গঠন-মূলক পথে পরিচালিত করার এই ত সময়। আজ এই অমূল্য সময়কে, এই সতেজ ও সজীব শক্তিকে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করা দেশের ভবিষ্যতের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সমাজের নানা স্তরে মৌলিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে আজকাল তা থেকে এই তরুণ মনকে বাঁচাতে হবে। অর্থোপার্জন করে সকলেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে চায়। তবে অনেকে সে অর্থোপার্জনের পথ সম্পর্কে বিশেষ কোন চিন্তা করেনা। যে কোন উপায়ে হোক অর্থসংগ্রহই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। এই সব শ্রেণীর লোক কালোবাজারীকে অন্যায় মনে করে না; কর ফাঁকি দেওয়া তাদের কাছে কোন অপরাধই নয়; চোরাচালান এদের কাছে একটা ব্যবসা। ঘুষ দেওয়া বা ঘুষ নেওয়া একটা জঘন্য মারাত্মক অপরাধ বলে এরা মনে করে না। এরাই সমাজের পরম শত্রু। এছাড়া জাতিভেদ প্রথা ও পণপ্রথার মত অনেক কুপ্রথা সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছে। তরুণদের মনে এই সমস্ত ঘৃণ্য অপরাধ ও কুসংস্কার যাতে সংক্রামিত হয়ে তাদের স্বচ্ছ চিন্তাধারাকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য এদের সামনে বলিষ্ঠ আদর্শের উদাহরণ তুলে ধরতে হবে যাতে তারা মৌলিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত না হয় এবং সমাজের নানা কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে লড়তে শেখে।

যুবসমাজকে অনেক সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত হতে দেখা যায়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যুবকদের কাছ থেকে জাতির যা প্রত্যাশা ছিল সেটা আমাদের দেশের যুবসমাজ নিজেদের জীবন দিয়ে তা পূরণ করে গেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে যুবসমাজের সামনে আরও কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছে। তাই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে না পড়ে গঠনমূলক কাজে যুবকেরা যদি তাদের শক্তি নিয়োজিত করে তবেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে। সেজন্য যুব সমাজকে আজ সামাজিক আন্দোলনের সামিল হতে হবে। দেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কমই বাড়ছে। সেটা স্বাভাবিক। তাই জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার রোধ করতেই হবে। আর যুব সমাজ নিছক কাজের প্রত্যাশায় বসে না থেকে জনবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবারের' মর্মার্থ যদি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে অগ্রসর হয় তাহলেই দেশের সবচেয়ে বড় কাজ হবে। পণ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যুবশক্তি একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণেও প্রভূত সাহায্য করতে পারে এই তরুণরা। আমরা অধিকার সম্পর্কে যতটা সচেতন কর্তব্য সম্বন্ধে ততটা নই। শহরের অপরিচ্ছন্নতার জন্য আমরা নাগরিকরা অনেকাংশে দায়ী। অন্যের বাড়ীর সামনে জঞ্জাল ফেলে নোংরা করতে দ্বিধা বোধ করিনা। পাড়ার যুবকেরা নিজেদের পাড়া পরিচ্ছন্ন রাখতে অনেক সাহায্য করতে পারে। এর জন্য তারা যখন এগিয়ে আসবে সারা সহরটাই তখন বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। আজকের যুবশক্তির কাছে এটাই জাতির প্রত্যাশা। আর সে প্রত্যাশা তারা পূর্ণ করতে সমর্থ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পূর্বদিগন্তে সুস্থিতি

অসিতকুমার বসু

দেশের পূর্বদিগন্তের দুটি এলাকা নাগাল্যাণ্ড আর মিজোরাম। একটি বর্তমানে পুরোরাজ্য, অন্যটি কেন্দ্রশাসিত এলাকা হলেও রাজ্যের সব সুবিধাই এখন পাচ্ছে। এর সঙ্গে মণিপুরের উপদ্রুত এলাকার কিছু অংশ যোগ দিলে আমাদের সামনে উত্তরপূর্ব সীমান্তের যে চেহারাটা ধরা পড়ে তা কিছুদিন আগেও এক অস্থিরতার কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু যারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়, তথাকথিত স্বাধীনতার ধূয়া তুলে সজোরে চেঁচায় তাদের স্বরূপটা এতদিনে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ফলে পূর্বাঞ্চলের এই তিন এলাকা, দেশবৈরীদের উপদ্রবে যেখানে দীর্ঘকাল ধরে অশান্তি চলছিল সরকারের বলিষ্ঠ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির ফলে আবার সেখানে স্থিতি ফিরে এসেছে। বিশেষ করে গত এক বছরে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার দরুণ নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরামের জনগণ এখন শান্তির পরিবেশে দেশ গঠনের কাজে ও উন্নত সমৃদ্ধিতর জীবনের জন্য জাতীয় কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করেছেন।

নাগাল্যাণ্ডের কথাই প্রথম ধরা যাক। স্বাধীনতার পর থেকে ফিজোর নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী নাগা সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি তুলে বেশ কয়েক বৎসর যথেষ্ট উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল বটে। কিন্তু দেখা গেছে নাগা জনসাধারণের অধিকাংশই শান্তিকামী এবং ভারতীয়বোধে গর্বিত। অনগ্রসর নাগা জনগণের আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করতে তুয়েনসাং এলাকা ও নাগাপাহাড় নিয়ে ১৯৬১ সালে গঠন করা হল ভারতের ষোড়শী রাজ্য নাগাল্যাণ্ড।

১৯২৯ সালে সাইমন কমিশন কোহিমাতে গেলে নাগা ক্লাব এক স্মারকপত্র পেশ করেন। সরকারী ভাবেস্বীকৃত এই ক্লাবের দাবি ছিল বৃটিশ সরকার যেন সোজাসুজি শাসন চালান। ১৯৪৬ সালে উখাতে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠিত হয়। উদ্দেশ্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও কল্যাণ সাধন। এই কাউন্সিল পরে চলে যায় ফিজোর দখলে এবং স্বাধীন সার্বভোম নাগাভূমি গঠন করবার জন্য ফিজো সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

স্বাধীনতার পর আসামের তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রী আকবর হায়দারী কোহিমায় কাউন্সিলের নেতাদের সঙ্গে ন'দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে নাগাদের স্বায়ত্ত শাসনের কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্রোহীরা এ চুক্তি উপেক্ষা করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারা সাধারণ নির্বাচন বয়কট করে তথাকথিত 'স্বাধীন নাগাভূমি' গঠন করে। কিন্তু উল্লেখ্য, শান্তিবাদী অধিকাংশ নাগা এই কাউন্সিলের নেতৃত্ব কোনদিন স্বীকার করেনি।

পঞ্চাশদশকের প্রথমদিকে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্যরা দাবি আদায়ের জন্য হিংসার পথ অবলম্বন করেছিল। তথাকথিত নেতাদের অনেকেই গোপন আস্তানায় স্থান নিয়েছিল। প্রস্তুতিপর্বে এঁদের প্রধান হাতিয়ার ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরিত্যক্ত গোলাবারুদ। পরবর্তীকালে বৈরী নাগারা চীন ও পাকিস্তান থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক সাহায্য ও মদত পেয়ে এসেছে। এর আগে এরাই বিদেশী ধর্মযাজকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার উস্কানি পেয়েছিল। ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে নাগা পরিস্থিতির মোড় ঘুরতে শুরু করে। বৈরী নাগারা দাবি আদায়ে বেশ মারমুখী হয়ে ওঠে এবং ব্যাপকভাবে নরহত্যা শুরু করে। অবস্থা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার নাগাভূমির গোপন সংস্থাগুলি বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন। ফিজোর এই বিভেদ নীতি এবং হিংসাত্মক পদ্ধতিতে কোনদিনও অধিকাংশ নাগাদের সমর্থন নেই। তাই শান্তিপ্রিয় অধিকাংশ নাগাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যবস্থা নিতে হল। ইতিমধ্যে শান্তিকামী নাগা পিপলস কনভেনসনের নেতারা বিভিন্ন জেলায় সম্মেলনের পর একটি ষোল দফা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাতে নাগা সমস্যা চূড়ান্তভাবে সমাধানের মৌলিক ভিত্তি নির্ণয় করা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা হয় এবং ১৯৬১ সালের পয়লা ডিসেম্বর নাগাল্যাণ্ড একটি অঙ্গরাজ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু বৈরী নাগাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ তখনো অব্যাহত রইল। কারণ নিজের দেশকে ভালোবাসবার মত সদিচ্ছা তাদের জন্মেনি। অবশ্য তাদের এই মনোভাবের পেছনে বিদেশী হাত যে ছিল তা অস্বীকার করার নয়। সুতরাং নাগাল্যাণ্ডে চিরস্থায়ী শান্তি আনতে ১৯৬৪ সালে বিদ্রোহী সশস্ত্র নাগাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য একটা শান্তি মিশন গঠন করা হয়। এই মিশনের সদস্য ছিলেন স্বর্গত বি. পি. চালিহা, শ্রী জে. পি. নারায়ণ এবং রেভঃ মাইকেল স্কট। বৈরী নাগা নেতাদের সঙ্গে ভারত সরকারের প্রতিনিধিবর্গ ন'দফা আলোচনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও ছ'দফা আলোচনা হয়। এই সব আলোচনা হয়েছে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত। কিন্তু

আলোচনাতেই এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর কেটে যায় আরো কয়েকটি বছর।

১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে বৈরী নাগারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল ঠিকই। কিন্তু এ সময় চীনগামী বিদ্রোহী নাগাদের দুটি দল সীমান্ত বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং মার্চ মাসে নাগাল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসন ঘোষণা করা হয়। ফলে আত্মগোপনকারীরা আন্দোলনে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ব্যাপক অভিযান ও প্রশাসনিক তৎপরতার ফলে আত্মগোপনকারীদের মধ্যে ভাঙন ধরে। বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগাযোগের অভাব এবং নৈতিক মানে ভাঁটা পড়ে যাওয়ায় নাগাভূমির সাতটি জেলার মধ্যে ছটি জেলা সম্পূর্ণ বিদ্রোহমুক্ত হয়। বাকি জেলাটিতেও বিদ্রোহীদের আয়ত্তে আনার চেষ্টা চলে। বৈরী নাগারা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে গত বছর জানুয়ারী মাসে আত্মগোপনকারী বৈরী নাগারা নতুন করে আলোচনায় বসতে রাজী হন। এর উদ্যোক্তা গীর্জার কর্তাব্যক্তিরা। পরে আলোচনা চলতে থাকে ন্যাগাল্যাণ্ড শান্তি পরিষদ, রাজ্য সরকার ও আত্মগোপনকারী নাগাদের মধ্যে। নানা ধরণের গুপ্ত নাগা সংস্থার দলপতিদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা চলে। ভারত সরকারও তাতে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুসৃত নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই বৈরী নাগাদের সঙ্গে বোঝাপড়া চলে। অবশেষে তার পরিণতি ১৯৭৫ সালের ১১ই নভেম্বর শিলং চুক্তি। চুক্তির প্রধান তিনটি শর্ত এই রকম: প্রথমত, বৈরীরা বিনাশর্তে এবং স্বেচ্ছায় ভারতের সংবিধান মেনে নিচ্ছেন। অর্থাৎ তাঁরা স্বীকার করে নিচ্ছেন নাগাল্যাণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, বৈরী নাগারা হিংসার পথ ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে কিছু আদায়ের অলীক স্বপ্ন তাঁরা ত্যাগ করেছেন এবং বৈরীরা সরকার নির্ধারিত স্থানে তাঁদের সব অস্ত্রসস্ত্র তুলে দেবেন। তৃতীয়ত, মীমাংসা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি এই চুক্তির কাঠামোর ভিত্তিতে বৈরীদের মিটিয়ে নিতে হবে এবং তা একটা যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে। একবার পারস্পারিক সন্দেহের অবসান ঘটলে স্থায়ী শান্তির পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। সুতরাং অন্য কোন প্রশ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও হেতু নেই। কারণ সেগুলি ভারতীয় সংবিধান কিংবা সার্বভৌমত্বের সঙ্গে জড়িত নয়।

ডিহোমায় বৈরী নাগাদের এক জমায়েতে শিলং চুক্তি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং সকলেই এ চুক্তি সমর্থন করেন। শিলং চুক্তি এক স্মরণীয় ঘটনা। এর ফলে দুদশকের হঠকারী এবং আত্মঘাতী এক বিদ্রোহের অবসান সূচিত হ'ল। এক বিষাদময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

শিলং চুক্তির পর এবছর জানুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখে বৈরীদের সঙ্গে আর একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তির মূল রূপ রেখা হল: ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যেই অস্ত্র সংবরণ শেষ করতে হবে। কমিশনার, বৈরীদের প্রতিনিধিগণ ও সংযোগ স্থাপনকারী কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে অস্ত্র সংগ্রহের স্থান নির্ধারিত হবে। মণিপুরেও এ জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এই বোঝাপড়ার ফলে বৈরীরা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছেন। রাজ্যপালও ধৃত বিদ্রোহীদের মামলা তুলে নেওয়ার ও মুক্তি দেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

সশস্ত্র বৈরী নাগারা ভারত-ব্রহ্ম সীমানায় ফিরছে বলে খবরে প্রকাশ। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সীমানা বরাবর পাহারা দিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে শিলং চুক্তি মেনে নিয়ে সাধারণ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে তাদের সম্মত করবার প্রচেষ্টা চলেছে। শিলং চুক্তি মেনে নিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি স্বীকার করতে নাগাভূমির দুই রাজনৈতিক দল—নাগাল্যাণ্ড ন্যাশনালিষ্ট অরগানাইজেশন এবং যুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট—বৈরীদের কাছে আবেদন রেখেছেন। রাজ্যপালও বন্দীদের মুক্তি ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া বৈরী নাগাদের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিজোরামের সমস্যাও প্রায় নাগাভূমির অনুরূপ। মিজোরামে দু'বছর আগে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর গুলিবিদ্ধ হন। গত বছর পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল সহ তিন জন বড়কর্তা নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিলনা। বৈরী নাগাদের প্রশ্রয় দিয়েছে মূলত চীন এবং পাকিস্তান। মিজোদের উস্কানি তারাই দিয়েছে। ব্রহ্মদেশের আরাকানে গিয়েও বৈরী মিজোরা নাকি নিয়মিত হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

১৯৬১ সালে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট গঠিত হয়। উদ্দেশ্য, স্বাধীন সার্বভৌম মিজো পার্বত্য এলাকা গঠন করা। ক'বছর বাদেই এই ফ্রণ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আইজলে ট্রেজারীসহ বিভিন্ন সরকারী অফিস আক্রমণ করে। বৈরী মিজোরা বিদ্রোহী নাগাদের কার্যাকলাপ থেকে উৎসাহ পেয়েছে। তাদের কর্মপন্থা ও বৈরী নাগাদের মত। হত্যা, লুট, ডাকাতি, ইত্যাদিভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। গত দুবছরে বৈরীদের দৌরাত্ম্য খুব বেশী বেড়ে যাওয়ায় এটা ভারত সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মিজোরামের অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্য মিজো জাতীয় ফ্রন্টকে গত বছর শেষের দিকে সরকার বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন। নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক অভিযান শুরু করেন এবং শান্তিকামী গ্রামবাসীদের অসহযোগিতার ফলে বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শিলং চুক্তি এবং বৈরী নাগাদের ক্রমশঃ আত্মসমর্পণের ফলে বিদ্রোহী মিজোরা অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ফ্রণ্টের বহু সদস্য রালকুমারের নেতৃত্বে আইজলে রাজ্যপালের নিকট সম্প্রতি আত্মসমর্পণ করে।

৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় ৭ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর আগের বছর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৯৭৮ কোটি টাকা। সুতরাং বৃদ্ধির হার দাঁড়াচ্ছে ৩১.৪ শতাংশে। এদেশে পরিকল্পনা চালু হবার পর থেকে আর কখনো কোনো এক বছরে এত বিরাট পরিমাণ অর্থ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়নি।

১৯৭৫-৭৬ সালে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং মূল্যস্তরে যে স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছে তার পটভূমিতেই চলতি বছরের পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার ফলে।

গত বছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ। ১৯৭৪ সালে অক্টোবর মাস থেকেই জিনিসপত্রের দাম কমতে থাকে। ১৯৭৫-৭৬ সালেও এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে জিনিসপত্রের গড় দামের সূচক তার আগের বছরের তুলনায় ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতির এই অধোমুখী প্রবণতা বর্তমান আন্তর্জাতিক মূল্যস্তরের দিক থেকে দেখতে গেলে একটা বিরাট সাফল্য।

এ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা

বিশেষ প্রতিনিধি

২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে এবং দেশে যে শৃংখলাবোধ ও আস্থার ভাব সৃষ্টি হয়েছে এই পরিকল্পনা রচনার সময় তাও মনে রাখা হয়েছে। ৩১.৪ শতাংশ হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি যাতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টির কারণ হয়ে না দাঁড়ায় তার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ২০ দফা কর্মসূচীর কার্যকর ও উদ্দেশ্য-মুখীন রূপায়ণের উপর।

১৯৭৫-৭৬ সালের বৈশিষ্ট্য হ'ল মূল্যস্তর অনেকাংশে স্থিতিশীল থেকেছে। কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় শিল্পোন্নয়নের হার বেড়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ স্বচ্ছন্দ থেকেছে। খাদ্যসংগ্রহ ভাল হওয়ায় এবং আমদানী ঠিকমত হওয়ায় খাদ্যশস্যের একটা উল্লেখ-যোগ্য মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে অনুকূল আবহাওয়ায় এবং বিশেষ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলায় কৃষি ও শিল্পোৎপাদন উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় মূল্য পরিস্থিতি অনুকূল হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে কালোবাজারী, মজুতদারী, ও মুনাফা-খোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, হিসাব বহির্ভূত অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মূল্য তালিকা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা, একচেটিয়া বিক্রয়ব্যবস্থার নিষিদ্ধকরণ এবং ব্যাপক মজুত উদ্ধার অভিযান প্রভৃতি। এর ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মনেই একটা বড় রকমের মন-স্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসে এবং তাতে বিক্রেতার বাজার ক্রেতার বাজারে পরিণত হয়।

কৃষি

১৯৭৬-৭৭ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উন্নয়নখাতে যে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে তার প্রতিফলন সবচেয়ে বেশী ঘটেছে কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে, সেচ, বিদ্যুৎ, শিল্প এবং খনিজ সম্পদ খাতে। অর্থনীতির মৌল ক্ষেত্র-গুলির বুনিয়াদ শক্ত করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৯৭৫-৭৬ সালে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৯১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা—এটা এবছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৯৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ। এছাড়া সমবায়, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কৃষি পুনর্বিনিয়োগ কর্পোরেশনের মতো আর্থিক সংস্থাগুলির দিক থেকেও কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতেও বরাদ্দ বেড়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৬৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা—আর এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। বিদ্যুৎ খাতেও বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ৩২ শতাংশ বাড়িয়ে ১ হাজার ১ কোটি ৫৮ লক্ষের জায়গায় ১ হাজার ৪৫৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

১৯৭৬-৭৭ সালের শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন তৈলবীজ, ১৫ কোটি টন আখ, ৭৫ লক্ষ গাঁট তুলো এবং ৬৫ লক্ষ গাঁট পাট মেস্তা।

১৯৭৫-৭৬ সালের মতো আবহাওয়া অনুকূল থাকলে, ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য বিনিয়োগ যে ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে তাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে কটি প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা হ'ল—সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, আরও বেশী পরিমাণ উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার এবং ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা। বড়, মাঝারী ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সাহায্যে আরও ২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হবে। এতে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণও ২৩ লক্ষ হেক্টর বাড়বে। এছাড়া, ডাল ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং আধা শুখা

বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ

(দশ লক্ষ টাকার ইউনিট)

	বিভিন্ন খাতে	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭
(১)	কৃষি	৬৯১৪.১	৮৯৬২.৩
(২)	সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৪৬৮২.২	৬৮৬৭.৯
(৩)	বিদ্যুৎ	১১০১৫.৮	১৪৫৩৪.০
(৪)	গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প	৭৩৮.৯	৯৫০.২
(৫)	শিল্প ও খনি	১৬৪৪০.২	২১৮৫৩.৪
(৬)	পরিবহণ ও যোগাযোগ	১০৪০৪.৪	১৩০৪৩.১
(৭)	সমাজসেবা	৭৮২৮.২	১০১০০.৬
(৮)	অন্যান্য	১৭৫৭.১	২২০৭.৭
	মোট	৫৯৭৮০.০	৭৮৫১৯.২

২০ দফা কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ

		১৯৭৫-৭৬ (আনুমানিক ব্যয়)	১৯৭৬-৭৭ (অনুমোদিত বরাদ্দ) ১০ লক্ষ টকার ইউনিট
(১)	ভূমি সংস্কার	২৩১.০	৩৭২.৬
(২)	ক্ষুদ্র সেচ	১২৯১.৮	১৪৯০.৪
(৩)	বৃহৎ ও মাঝারী সেচ	৪৭৫০.৫	৬১৩৬.৬
(৪)	সমবায়	৪৩২.১	৫৭৫.২
(৫)	বিদ্যুৎ	১১৫৯৫.৬	১২৮৯৬.৯
(৬)	হস্তচালিত তাঁতশিল্প	৮৯.৮	১১৭.০
(৭)	ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের বাস্তুজমি	৯৮.৩	৯৯.৭
(৮)	শিক্ষনবিশী কর্মসূচী	৩.৮	৯.৫
(৯)	বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, খাতা-পত্র সরবরাহ ও বই ব্যাঙ্ক স্থাপন	১৩.৯	৪২.১
	মোট :—	১৮৫০৬.৮	২১৭৩৯.৭

অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, খরা প্রবণ অঞ্চল এবং কম্যাণ্ড এরিয়া উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ১৯৭৬-৭৭-এ তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৯৩ কোটি ১৩ লক্ষ। পরীক্ষামূলকভাবে একটা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হবে—এর জন্য বরাদ্দ ১৫ কোটি টাকা।

শিল্প

শিল্প ও খনি খাতেও বরাদ্দ উল্লেখ-যোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে সরকারী উদ্যোগের খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬৪৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালে এই বরাদ্দ প্রায় ৩৩ শতাংশ বাড়িয়ে ২ হাজার ১৮৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বিনিয়োগ ও শিল্পোন্নয়ন বাড়াবার জন্য একটি শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। এতে জোর দেওয়া হয়েছে—কৃষি, জালানী, রপ্তানী, উৎপাদন ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ সদ্ব্যবহার ও দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণের স্বার্থে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। সূতীবস্ত্র, সিমেণ্ট, কাগজ প্রভৃতির মতো সরকারী উদ্যোগের ভোগ্য-পণ্য শিল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ সালের ৬৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। অনগ্রসর এলাকায় শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ ও পরিবহণ অনুদান ১৯৭৫-৭৬ সালে ছিল ৫ কোটি টাকা। এটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ ও পরিবহণের মতো মৌল উৎপাদনগুলির সরবরাহ এখন বেশ সন্তোষজনক। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জিত হলে পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ লক্ষ কিলোওয়াট দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর আগের বছর যেখানে রেলওয়ে ২১ কোটি ৪০ লক্ষ টন মাল পরিবহণ করেছিল—এবার সেখানে রেলওয়ে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টন মাল পরিবহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

কৃষি, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প ও সরগ্রাম সরকারী উদ্যোগের নতুন গতিশীলতা এবং নতুন শিল্প পরিবেশ যে সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে তাতে এবছর অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশী হবে আশা করা যায়।

আগের বছরের তুলনায় ১৯৭৬-৭৭ সালে সমাজসেবা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ২৯ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। পার্বত্য ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ১৯৭৫-৭৬ সালের ৪০ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৬-৭৭ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৬ কোটি টাকা। ন্যূনতম চাহিদা কর্মসূচীতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৯০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। এটাও লক্ষণীয় যে, ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্যে ২ হাজার ৩ শো ৩৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

করা হয়েছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণের আয় বাড়বে।

কর্মসংস্থান এবং শ্রমিক কল্যাণ

পুরোধা নিবিড় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে শেষ হয়ে গেছে। এটা ছাড়া গ্রামীণ উন্নয়নের সমস্ত কর্মসূচীই এই বছর চালু থাকবে। অধ্যাপক এম. এল. দাঁতাওয়ালার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি সারা দেশের জন্য যাতে একটি বিশদ কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় তার জন্য নিবিড় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা চালাবেন। ক্ষুদ্র কৃষিজীবী উন্নয়ন সংস্থার খাতে ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি টাকা। উপজাতি উন্নয়ন সংস্থাগুলির জন্য রাখা হয়েছে ২৩ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারগুলিও এসব খাতে তাদের বাজেট থেকে বরাদ্দ করবেন।

১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানেরও নুতন সুযোগ সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছে। ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের সুবাদেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষা-নবিশী কর্মসূচী, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিকাশ ও প্রসার কর্মসূচী প্রভৃতি। কয়েকটি রাজ্য সরকার গ্রামাঞ্চলে কূপ, পুকুর, খাল প্রভৃতি স্থায়ী সম্পদ তৈরী করবারও কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।

অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ও এলাকার উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণের উন্নয়নের জন্য ৯৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে উপজাতি উপ-পরিকল্পনার জন্য। অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির জন্য ৩৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে।

২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী

২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিভিন্ন দিককেও এই বার্ষিক পরিকল্পনায় জোরদার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর সঙ্গে বর্তমান পরিকল্পনাকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ সারণীতে দেয়া হল।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাষিত অঞ্চলগুলি বার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছাড়াও এই কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিকের জন্য আরও ১৬৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যই হল ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত বৃদ্ধি থেকে যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ সুবিধা পেতে হয় তবে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার পরিবেশ বজায় রাখাই সবচেয়ে দরকারী। বিশেষ করে তাই ভোগ্যপণ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, আবশ্যকীয় কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামের সরবরাহ ঠিক রাখা, সরকারী বন্টন ব্যবস্থা জোরদার, আর্থিক ক্ষেত্রে শৃংখলা এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় হ্রাসের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পূবদিগন্তে সুস্থিতি

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এই সব প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ মিজোরামে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলেছে।

মিজোরামের বিদ্রোহী নেতা লালডেঙ্গা বিদেশে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি এ বছর দেশে ফিরে মার্চ মাসে একদল আত্মগোপনকারী সঙ্গীদের নিয়ে দিল্লী যান কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে। মনে হয় নাগাল্যাণ্ডের পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তিনি অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্বীকার করেছেন যে, মিজোরাম ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী খুরানার সঙ্গে লালডেঙ্গা এবং তাঁর দলের আরও ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দলের যে কয়েকটি বৈঠক হয়েছে তার ফলেই মীমাংসার সূত্রপাত ঘটেছে। এই বৈঠক এখনো চলছে।

বিদ্রোহী মিজোরা লালডেঙ্গার নেতৃত্বে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে পরিচিত হতে চান, কবুল করেছেন এ দেশ তাঁদেরই স্বদেশ। এদিকে সরকারের মৈত্রীর হাতও প্রসারিত। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও হবে। তাই পূর্বাঞ্চলে স্থিতি আর শান্তি ফিরে আসছে এমন ধারণা খুব অযৌক্তিক হবে না।

নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরামের বিদ্রোহের এই পরিণতি কিন্তু প্রত্যাশিত। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী স্বভাবতই ঐ এলাকায় আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকারের নীতি ছিল একদিকে উদার মন নিয়ে শান্তির সন্ধান, আর অপরদিকে শান্তি-ভঙ্গকারীদের কঠোর হস্তে দমন। বৈরীদের নমনীয় মনোভাব ও আত্মসমর্পণের পেছনে পরিবর্তিত পাক-ভারত ও চীন -ভারত সম্পর্ক উল্লেখ করা যেতে পারে। মনে হয় বৈরীরা যাদের কাছে মদত পেয়েছে তাদের উপর আস্থা হারিয়েছে। তাই পথভ্রষ্ট মিজো-নাগারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সংঘর্ষের পথ বর্জন করতে উদ্যত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুসৃত দৃঢ় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই বৈরীদের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর স্থৈর্য্য ও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বিপথগামীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। নাগা আর মিজো সমস্যার ফয়সালা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রচনার পথে নিঃসন্দেহে এক সুনিশ্চিত দৃঢ় পদক্ষেপ। আশা করা যায় বিদ্রোহীরা যাঁরা এখনও অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে আসেননি তাঁরা অচিরেই যুক্তির পথ নিতে উৎসাহী হবেন, জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং জাতীয় উন্নয়নের কাজে সামিল হবেন।

স্বদেশী জিনিস কিনুন

ইন্দুভূষন বসু

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিন-গুলিতে বিদেশী জিনিস বর্জন করে স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আহ্বান একদা সারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বহুদিক থেকে এই আহ্বান তাৎপর্য্যমণ্ডিত ছিল। একদিকে এ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ। অন্যদিকে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলে জাতীয় জীবনে স্বদেশী মনোভাব সম্প্রসারিত করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার পূর্বেকার এই স্বদেশী আন্দোলন একদা বস্তুতই সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে ২৭ বছর আগে নিশ্চিহ্ন হলেও স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতিকে এই স্বদেশী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস ত পায়ই নি বরং নানা কারণে এর উপর জোর দেয়ার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে।

দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশী মানসিকতার বিস্তার এবং স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্য ব্যবহারের প্রবৃত্তি জাগ্রত করার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কর্মযজ্ঞে এবং শিল্পায়ণের দিক থেকে দেশ ও দেশ-বাসীর এক সহায়ক শক্তি হিসাবে এর বিরাট ভূমিকা আছে। জাতিকে আত্ম-নির্ভর করে তুলতেও এর অবদান যথেষ্ট।

স্বাধীনোত্তর যুগে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ় করার প্রয়াসে সরকার পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে দেশ আজ শিল্পায়ণের দিক থেকে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে এমন অনেক জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে—যেগুলি গুণগত উৎকর্ষে বিশ্বের যে কোন শিল্পোন্নত দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে একই মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের তৈরী এই সব পণ্যদ্রব্যের বাজার বিদেশে সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনে আমাদের সাহায্য করছে। শিল্পায়ণের ক্রমোন্নতির মাধ্যমে দেশকে আরও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই অবস্থায় দেশবাসী যদি স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন তবে এই শিল্পায়ণ পরিকল্পনাকেই যে অনেকখানি সাহায্য করা হয় একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য অধিকাংশ দেশবাসীর মধ্যে এই স্বদেশানু-রাগ আজ সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বদেশী দ্রব্য তারা ব্যবহার করছেনও।

কিন্তু এটা খুব দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আজও দেশবাশীর কিছু অংশের মধ্যে এই স্বদেশ অনুভূতি এবং স্বদেশে প্রস্তুত জিনিসের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধার ভাব গড়ে ওঠে নি। বিদেশী জিনিসের প্রতি তাদের মধ্যে একটা অকারণ মোহ রয়েছে। ফলে তারা বিদেশী দ্রব্যের পেছনে ছুটে বেড়ান। এবং যেকোন দামে বিদেশের ছাপ মারা জিনিস কিনতে প্রস্তুত। এই মনোবৃত্তি যে আমাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দুর্ব্বল করে অপরিসীম ক্ষতিসাধন করে শুধু তাই নয়—দেশবাসীর কিয়দংশের মধ্যে বিদেশের জিনিসের প্রতি এই কাঙালপনার সুযোগ গ্রহণ করছে একদল সমাজ বিরোধী—যারা চোরাকারবারী নামে কুখ্যাত। এরা নানা কায়দায় এবং কৌশলে দেশের বাজারে বিদেশী দ্রব্য চালান দিয়ে দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি করছে। অবশ্য দেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণার পর সরকার এদের কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। সরকারী এই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সাহায্য করা হয় যদি দেশবাসী বিদেশী জিনিসের প্রতি মোহমুক্ত হন। আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত—আমরা ভারতীয়, ভারতীয় জিনিসই আমরা কিনব।

বিদেশের জিনিসের প্রতি এই অহেতুক আকর্ষণ ত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে আমরা বিদেশের বাজারের অর্গল বন্ধ করে দেব। যেসব জিনিস আমাদের প্রয়োজন আছে এবং দেশে এখনো যেসব পণ্য পর্যাপ্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় নি সে সমস্ত জিনিস আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু যে কথা আজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে যে কিছু ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেও যেন আমরা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হই। এই ভাবধারা সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসার লাভ করলে আমাদের দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে তার সুফল হবে সুদূরপ্রসারী। এর ফলে একদিকে দেশের শিল্প সমৃদ্ধতর হবে অন্যদিকে তেমনি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং বেকার সমস্যার সমাধানেও দেশবাসীরা যথেষ্ট সাহায্য করবেন। অত্যাবশ্যক কিছু পণ্য এবং কারিগরী যন্ত্র কিনতে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার দরকার। এই বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় আমাদের যথেষ্ট নয়। তার বেশ কিছু অংশ যদি বিদেশী ভোগ্যপণ্য

আমদানী করতেই চলে যায় তাহলে ঐ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমরা কিনব কি করে? সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্বের দিক থেকেও স্বদেশী জিনিস ব্যবহার আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাছাড়া বিদেশী জিনিসের প্রতি মোহের সুযোগ নিয়ে যে সমাজবিরোধী চোরাকারবারীরা বিদেশী পণ্য চোরাই পথে আনছে তারা কালো টাকার পাহাড় জমিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে যেমন বিপর্যস্ত করছে তেমনি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয় থেকেও বঞ্চিত করছে।

শিল্পক্ষেত্রে আমরা যে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছি তা এখন সর্বস্বীকৃত। প্রমাণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে ভারত আজ ৯০ টিরও বেশী দেশে তার উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করছে। আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে শিল্পক্ষেত্রে অত্যধিক উন্নত দেশগুলিতে আমাদের তৈরী পণ্যের তিন-ভাগের এক ভাগ যায়। সম্প্রতিকালে বিদেশে আমরা যে সমস্ত পণ্য রপ্তানি করেছি তার মধ্যে রয়েছে চটের জিনিস, চা, সুতী কাপড়, চিনি, কফি। এগুলি আমরা বরাবর রপ্তানী করে এসেছি। এছাড়া এখন আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে কম্পিউটার, ফ্যান, টাইপ-রাইটার, ছাপার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। এবং এটা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের দেশে প্রস্তুত এই সমস্ত জিনিস গুণগত উৎকর্ষে বিশ্বের যে কোন শিল্পোন্নত দেশের সমকক্ষ।

এই পটভূমিকায় বিচার করলে একথা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে বিদেশী জিনিসের প্রতি অকারণ মোহ আজও আমাদের কিয়দংশের মধ্যে যে রয়েছে তা এক হীনমন্য মনোভাব-সঞ্জাত।

আপাতত শহরের কিছু সম্পত্তি আপনার নামে লিখে দিতে চাই

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার বেতার ভাষণে এই হীনমন্যতার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, কিছু লোক ইংলণ্ড থেকে কয়েকটি সামগ্রী কিনে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করে-ছিলেন। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে ঐগুলি ভারতেই প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে এক রাষ্ট্রদূতের পরিবারের এক জনের একটি বিছানার চাদর ক্রয় করার ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন। যে চাদরটি তিনি বিদেশে প্রস্তুত বলে বুকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তা ছিল আসলে ভারতের তৈরী জিনিস।

এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে নিছক উৎকর্ষতার বিচারেই এই ধরনের ব্যক্তিরা বিদেশী জিনিস ক্রয় করে না। বিদেশের জিনিষ ক্রয় করার পেছনে এক দেউলিয়া মনোভাবই এক্ষেত্রে কাজ করে থাকে।

অতীতে আমাদের দেশের চিন্তাশীল সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ যারা দেশবাসীকে স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে দেশের প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করতে বলেছেন তার পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি আজীবন দেশ-বাসীকে এই স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাছাড়া এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গোপাল কৃষ্ণ গোখেল, লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায় এবং মতিলাল নেহরুর মত মনীষীরা।

আজ তাই বিচার করতে হবে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার গুরুত্ব কত গভীরে। এর দ্বারা যেমন জাতির স্বাবলম্বনের পথ প্রশস্ত হবে তেমনি চোরাচালানদারদের মত যে সমাজবিরোধী এবং দেশদ্রোহী অশুভ শক্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের নিশ্চিহ্ন করাও সম্ভব হবে।

প্রাকৃত

রানা দাস

যৌবনের পর আরো কিছুকাল এই জগতে উমাকান্ত তার নিজস্ব জীবনটাকে অনেকখানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর কবে থেকে যেন গোটাবার পালা শুরু হয়। এই ঘাটে পৌঁছে এখন উমাকান্তর ধারণা, বয়স আসলে কিছুই নয়, চারপাশের মায়া ও মোহ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত ক'রে আনা। ওপারের ডাক হয়তো এখুনি তোমার কানে পৌঁছুচ্ছে না। কিন্তু তাই ব'লে ওপার তো আর বেশি দূরেও নয়, হাওয়া যখন তোমাকে সে দিকেই টানছে, তখন কার জন্য আর ভাবনা, কিসের জন্য ভাববে বল তো ?

নিজের কাছে এইরকম একটা প্রশ্ন তুলে হাতের ছড়িটায় আলতো ভর রেখে একটুখন দাঁড়িয়ে নেয় উমাকান্ত। এতক্ষণ একটানা বাসে ব'সে থাকায় শরীরের গিট-গুলোতে যেন আট লেগে আছে।

গ্রামের ভেতর দিয়ে পীচের এই সরু রাস্তা শহর থেকে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু স্থানীয় ধুলো-বালির সংখ্যাতীত অনু-কণার তা সহ্য হবে কেন! তাই তারা দু-পাশ থেকে এসে সর্বদা ভিড় ক'রে থাকে এই রাস্তাটার উপর। শহর থেকে কোনো যন্ত্রদানব এলেই তারা হেই-হেই ভঙ্গিমায় একসঙ্গে তার পেছন-পেছন ছুটে যায়।

বাসের ফেলে যাওয়া পথে ধুলো-বালির সেই ছুট কিছুক্ষণ তাকিয়ে দ্যাখে উমাকান্ত। বাঁ-হাত দিয়ে কাপড়ের কোঁচা উপরে তুলে নাকে গুঁজে দ্যায়। তারপর হাঁটতে থাকে একটু একটু। আল বেয়ে নীচে নেমে আসে। তার ধারে কাছে আর কোনো মানুষ দ্যাখা যাচ্ছে না এখন। অন্য আর কেউ বাস থেকে নামেওনি এখানে। আসলে, এটা তো আর বাস স্টপ নয়। জানালা দিয়ে দেখতে-দেখতে ভালো লেগে যাওয়ায় কণ্ডাকটারকে ব'লে উমাকান্ত এখানেই নামে। গুলিমারো বাসস্টপ, গুলিমারো অন্য কোনো মানুষ! উমাকান্ত জানে, মানুষ যেখানে বেশি সেখানে প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে, লজ্জাবতীর মতো আড়াল হ'য়ে যায়। তাকে সম্পূর্ণ সহজ-নগ্ন দেখতে চাও তো একা হও, ভীষণ একা হও, তবেই না সেও একান্ত তোমার।

দ্যাখো কাণ্ড, আবার সেই তোমার আমার। তুমিটা কে হে, কতদিনের যে, তোমার ব'লে আবার কিছু থাকতে হবে। তার চাইতে বলনা বাপু, তুমি এই জগতের, —যেমন এই পথ, পথের ধারে সারি-সারি গাছ, ক্ষেত, লতা পাতা—তুমিও তেমন একটা কিছু।

এই সময় দূরের নারকেল গাছের পাতায় হাওয়া বাজে। বাতাসে শো-শো শব্দ হয়। ধানের শিষে কাঁপন লাগে। নিকটের বিলটাতে জলের আনন্দ ঢেউ কেটে কেটে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়ে। উমাকান্তর বুঝতে বিলম্ব হয় না, তার সাথে এই চারপাশের প্রকৃতি একাত্ম বোধ করছে এতক্ষণে। তার বুকের ভেতরটায় একসাথে অনেকখানি আনন্দের জন্ম হয়। সেই আনন্দটা অসীম শূন্যতায় চায় উড়ে যেতে। উমাকান্ত ছড়িটা ফেলে দিয়ে দু-হাতে বুক চেপে আকাশের দিকে তাকায় একবার। নিজেকে ভারী হাল্‌কা বোধ হ'তে থাকে। ছোট্ট একটা পাখির মতো সত্যি সত্যি কোথাও উড়ে যেতে সাধ হয় তার।

বুক থেকে হাত নামিয়ে উমাকান্ত চারপাশে তাকালো। না, কোথাও কেউ নেই এখন। অতএব হাত দুটো ডানার মতো ক'রে দেহের দু-পাশে ছড়িয়ে দিল সে। তারপর মাথা নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো একটু। উমাকান্ত ঠিক উড়তে পারলো না, কিন্তু এই ভাবেই কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করলো।

এখন তার বুকটাতে ধপ্‌ ধপ্‌ ক'রে শব্দ হচ্ছে। দুপায়ের পেশী এসেছে অবশ হয়ে। মাটিতে পড়ে থাকা ছড়িটাকে তুলতে গিয়ে উমাকান্ত একেবারে বসেই পড়লো। মুখের হা-টা ছড়িয়ে দীর্ঘ ক'রে বুকের বাতাস বার কয়েক পালটালো। শরীরের সামগ্রিক কষ্টটাকে কোনো-তে সামলাতে সামলাতে উমাকান্ত ভাবলো, এই বয়সে কি পাগলামো করছিল সে; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, পাগলামোর আবার বয়স আছে নাকি। মানুষ তো সমস্ত জীবন ধরেই পাগলামো করে। পাগলামো করতে করতেই নিজেকে ক্ষয় করে সে; অবশ্য এই ক্ষয়ের মধ্যেই মানুষের তৃপ্তি, তৃপ্তির মধ্যেই আবার তার পূর্ণতা।

এই মুহূর্তে কাননের কথা মনে পড়ে গেল। কাননবালা। উমাকান্তর স্ত্রী। এই কাননবালাও একসময় তার নরম বুকের উপর তুলে নিয়ে উমাকান্তকে পাগল বলতো। এখন কাননের বয়সও প্রায় পঞ্চাশ পার হয়ে এলো। আজ পঞ্চাশ বছরের কানন দিনের অধিকাংশ সময় তার গুরুদেব পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর পুজো, আর নাতি-নাতনির হৈ চৈ সামলাতেই

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহিলা মহল

মায়ের দায়িত্ব

পরিবারের প্রতিটি কোণ থেকে আরম্ভ ক'রে জাতীয় বা সামাজিক জীবনের প্রতিটি কাজে ছাপ পড়ে মেয়েদের দুটি হাতের, যেন মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে।

মেয়েদের এই গুরুদায়িত্ব আরম্ভ হয় মা হবার সঙ্গে সঙ্গে। চাঁদের টুকরোর মতন সন্তান কোলে আসার পর থেকেই স্নেহ-শাসন-সেবা-যত্নর ভেতর দিয়ে তিলে তিলে প্রতিটি দিনে বড় করে তোলেন মা তাকে। তৈরী করতে থাকেন দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিককে, কাজেই মায়ের শিক্ষার ওপর যেমন নির্ভর করে সন্তানের ভবিষ্যৎ, এই সন্তানের ভবিষ্যতের ওপরই আবার ঠিক তেমনি নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ। কারণ দেশ-শাসনের চাকাতো একদিন এদের হাতেই পড়বে, তাই সেদিন যদি তারা শক্ত হাতে এই চাকা লক্ষ্য পথে ঘুরিয়ে নিয়ে চালাতে না পারে তবে নৌকোরূপী দেশের হালতো ভেঙ্গে পড়বে এক সময়!

কাজেই একটি সুস্থ সবল জাতি তৈরী করতে হলে মেয়েদের তথা মায়েদের দায়িত্ব যে সবচেয়ে বেশী একথা অস্বীকার করা যায়না কোনমতেই। নিজেদের সংসারের আবর্জনা দূর করে সমাজের বা দেশের উন্নতির বাধা স্বরূপ সব আবর্জনা দূর করার কাজে সাহায্য করেন এই মায়েরাই।

ছোটবেলা থেকেই তাই নিয়ম-শৃংখলার ভেতর দিয়ে সন্তানকে বড় ক'রে তুলবেন মা। দেহ-মনে-পরিবেশে অর্থাৎ সবদিক থেকেই যাতে একটি সুস্থ জীবন সন্তান পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে মাকেই।

অল্প বয়েস থেকেই ছেলে-মেয়েরা যেন স্বাবলম্বী হয়—নিজেদের পোষাক বা শরীর যাতে অপরিষ্কার না থাকে তার দিকে যেন তারা দৃষ্টি দেয়-সুঠাম স্বাস্থ্য গড়বার জন্য যেন তারা খেলাধূলোর ভেতর দিয়ে ব্যায়াম চর্চ্চা করে—এবং সবার ওপর সময়ের মূল্য যেন তারা দিতে শেখে। এক কথায়, খেলাধূলোর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম আর শৃংখলা যেন তারা মেনে চলে।

এই নিয়মানুবর্ত্তিতার বাঁধনে যদি একবার সন্তানকে বাঁধা যায় তবে তার দৈহিক আর মানসিক গঠন হবে নিখুঁত।

এই সব কিছুই অবশ্য নির্ভর করে মায়ের ওপর। মা যদি নিজে পরিষ্কার না থাকেন—মা যদি নিজে সংযমী না হন অথবা তাঁর আচরণে কোন অশালীন পরিচয় প্রকাশ পায় তবে সন্তানের চরিত্রের ওপর তার প্রভাব হবে মারাত্মক। কারণ ছেলে-মেয়ের সামনে মা যদি অহেতুক অসভ্য কথা বলেন অথবা পরনিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন কিংবা সকাল বেলা ভাল করে মুখ না ধোওয়া, নখ না কাটা, জামা-কাপড় পরিষ্কার না রাখা ইত্যাদি নোংরা অভ্যাসগুলো যদি তার স্বভাবে বজায় থাকে তবে সেই সব ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে মিথ্যেবাদী, পরনিন্দুক আর নোংরা স্বভাবের হবেই।

অন্যদিকে, পৃথিবীর মনীষীদের জীবন-ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁদের মায়েরা ছিলেন স্বভাব আর আচরণে আদর্শ স্থানীয়।

এর থেকেই বোঝা যায় যে নিজেকে সংশোধন করে প্রতিটি মাকে সংশোধন করতে হবে তাঁর ছেলে কিংবা মেয়েকে। তিনিই দেখবেন যেন তাদের মধ্যে কোন-রকম বদ বা নোংরা অভ্যাস না জন্মায়। তিনিই দেখবেন যেন তারা পাড়া-প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের সমব্যথী হয়। তিনিই দেখবেন যেন তারা সত্যিকারের শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়ে ওঠে।

তাই সংসারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যেমন বড় হয় ওরা, ঠিক তেমনি বাইরের জগতের অবহাওয়া যার সংস্পর্শে ওদের আসতে হয় সব সময়, তাও যেন কোন প্রকারেই কলুষিত না হয়। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রভাবেই কাজে-মনে সদ্‌ভাব বা সদগুণ বজায় রাখা সবথেকে সহজ হয়।

প্রতি ঘরের মায়েরা যদি তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সন্তানের দিকে এই ভাবে সজাগ দৃষ্টি দেন, তবে প্রতি ঘরেই সৃষ্টি হবে এক একজন সতিকারের দেবোপম মানুষ।

সন্তানের মনে যদি কোন সময় অসভ্য চিন্তা বা কুভাব দেখা দেয় তবে মায়ের সু-শিক্ষার গুণে যেমন তা জোর ক'রে নষ্ট করে ফেলবে সে, ঠিক তেমনি ঘরের বাইরে বা পাড়ায় যদি জমে ওঠে জঞ্জালের স্তূপ—তাও সে সরিয়ে ফেলবে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়।

দেহে-মনে ঘরে-বাইরে যদি এইভাবে আবর্জনা জমতে না পারে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তথা সুস্থ-সবল জাতির সৃষ্টি হয়, তবে দেশের বাগিচায় যে ফুল ফোটাবে তারা, তার সুবাস ছড়িয়ে পড়বে বিদেশের প্রতিটি কোণায়।

উমা দাশগুপ্ত

বোনাস

বিশেষ প্রতিনিধি

কোনও প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংশ নেবার অধিকার সেখানকার কর্মীমাত্রেরই প্রশ্নাতীত অধিকার। উৎপাদন এবং উৎপাদনভিত্তিক সাফল্য যেহেতু কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সরাসরি সহায়তার উপর নির্ভরশীল, সেহেতু উৎপাদনবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কারের ব্যাপারগুলিকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। এই স্বীকৃত রীতিপ্রকরণকে সামনে রেখে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কিংবা অপর-পক্ষে উৎপাদন সফলতার মাপকাঠিতে বোনাসের বিষয়কে পর্যালোচনা করতে হবে।

বোনাস কি ?

শ্রমজীবীরা প্রথম বোনাস পেয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে। তখন অবশ্য ব্যাপারটা 'এক্স-গ্রাসিয়া' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ধরণের অনুদান অবশ্যই বিধিবদ্ধ বিষয় ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের সন্তুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যেই দীর্ঘকাল ধরে এই নীতি অনুসৃত হয়েছে, যদিও ব্যাপারটি মূলত সামাজিক ন্যায়, সমতা এবং শিল্পেশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শুভনীতি বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'বোনাস' ব্যাপারটা রীতিমত চালু হতে শুরু করে—তবে সে সময়েও, ক্ষেত্র বিশেষ যেক্ষেত্রে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মুনাফা হতো না, সে ক্ষেত্রে সেখানকার কর্মীরাও বোনাস পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন না।

শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং প্রায়-নিয়মিত বোনাস পাবার অভ্যাস ইত্যাদি শ্রমিকদের মনে ক্রমশ এমন একটা ধারণা করিয়ে দিয়েছে যে বোনাস ব্যাপারটা যেন তাঁদের একটা অধিকার বিশেষ। বোনাস যে শিল্পক্ষেত্রের এক অধিকার, সে কথা শিল্প-ট্রাইবুনালের বহু রুলিং এবং আদালতের অজস্র রায়েও আজ স্বীকৃত।

১৯৬৫ সালে বোনাস আইন গৃহীত হবার পরে এমন দাবীও উঠেছিল যে ন্যূনতম বোনাস তো 'পাওনা মজুরী'—এ তো প্রাপ্য ব্যাপার। এই ধুঁয়ো যাঁরা তুলেছিলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে কিন্তু আসলে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষিত হয়নি। কারণ যে প্রতিষ্ঠান লোকসানে চলছে সেখানে যদি বোনাস দিতে বাধ্য করানো হয় তাহলে তা এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন সেখানকার কর্মীরা।

সমতার প্রয়োজন

বোনাস ভাবনা বহু দিন ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। বোনাস মীমাংসার বিষয় নিয়ে কম পক্ষে চার বার জরুরী প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রথমে ১৯৪৮ সালে 'প্রফিট-শেয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫০ সালে লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (LAT) এক সূত্র অনুমোদন করেন। বলা হয় যে বাৎসরিক সমস্ত খরচখরচা বাদ দিয়ে পরিচালক মণ্ডলীর হাতে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, সেটাই কর্মীদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট বিষয়টিকে স্থগিত রাখেন।

তারপর, ১৯৬১ সালে সরকার এক বোনাস কমিশন গঠন করেন। কমিশন সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন তিন বছর পর। পরিশেষে, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে সরকার বোনাস প্রদান আইন বিধিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন।

বোনাস আইন পুনরায় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ১৯৭১ সালে আবার একবার নানা তরফে দাবী ওঠে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁদের কর্মীদের কেবল ন্যূনতম বোনাস দিচ্ছেন এবং কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাৎসরিক উর্দ্ধতপত্রে উদ্বৃত্ত হিসেবে কিছুই দেখাচ্ছেন না যাতে করে কর্মীরা আরো বেশি বোনাস দাবী করতে পারেন।

সঠিক দৃষ্টিকোণ

মুনাফার ভিত্তিতে বোনাস, কিংবা অপরপক্ষে উৎপাদন বা উৎপাদন ভিত্তিক বোনাস প্রদান,—বর্তমান বোনাস (সংশোধন) আইন সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা দেবে। মুনাফা এবং উৎপাদনভিত্তিক লাভের ব্যাপারে কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বোনাস আইনে বলা হয়েছে যে, বোনাস উৎপাদন অথবা সম্ভাবনাময় উৎপাদনভিত্তিক হবে। যে ক্ষেত্রে তা নিরূপণ সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে মুনাফার ভিত্তিতে ধার্য হবে'।

মূলনীতি

বর্তমান আইনের নেপথ্যে যে নীতি কার্যকর, তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উর্দ্ধগতি মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতকে মনে রেখে রচনা করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের বিনিয়োগ স্বল্পতা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-জনিত কারণে শিল্প ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও লগ্নী আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পায়। শিল্পে লগ্নীর একান্ত অভাবে নতুন ভবিষ্যতের পরিবর্তে নৈরাশ্য দেখা দেয়; বেকারেরা চাকুরির ক্ষেত্রে এতোটুকু আলোর সন্ধান পান না। উৎপাদন খরচা বেশি মাত্রায় বেড়ে যাওয়াতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিদেশী বাজারেও শিল্প ইউনিট-

গুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। শিল্পের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই পরিস্থিতির সুরাহা করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। অন্যথায় শ্রমিকশ্রেণীকেই এই উচ্চ মূল্যমানের বাজারে প্রথম শিকার হতে হতো। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলির উপর গুরুত্ব, সুযোগের সদ্ব্যবহার, সেই সঙ্গে অর্থ সরবরাহ সুনিয়ন্ত্রণ এবং আর্থনীতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে মুদ্রাস্ফীতিকে অবশেষে আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হয়েছে। বর্তমান অচলাবস্থার পরিবর্তন সাধন করে আরো কাজের সুযোগ, মুদ্রাস্ফীতি বোধ এবং সুসমদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য অদম্য কঠোর মনোভাব নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে।

দেশকে বর্তমানে দুটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে আরো কি ভাবে বেশি বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, কি ভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনা যায়, এবং কি ভাবে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও আরো বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, যেহেতু পরিকল্পনাহীন অর্থনীতি কর্মসংস্থান সমস্যার সুরাহার পরিবর্তে বরং সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং বোনাস আইনে যে সকল পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি বর্তমান সমাজ-অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই অনুধাবন করতে হবে।
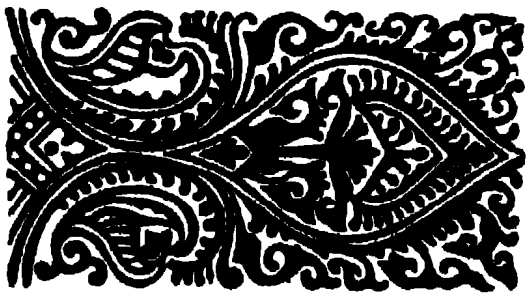
লাভ

বোনাসের মূলনীতি অনুযায়ী বর্তমান আইনে বলা হয়েছে যে, নামমাত্র উদ্বৃত্ত হলেও ন্যূনপক্ষে শতকরা চার ভাগ বোনাস দিতে হবে। এই নীতি গ্রহণের ফলে শ্রমিকরা বর্তমান সর্বনিম্ন বোনাস হার ৪০ ও ২৫ টাকার পরিবর্তে এবার থেকে সর্বনিম্ন যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৬০ টাকা হিসাবে বোনাস পাবেন। নিম্নমজুরীর শ্রমজীবীরা এই ব্যবস্থার ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন।

এই বোনাস আইনের নতুন ব্যবস্থায় দশ বা ততোধিক শ্রমিক যেখানে কাজ করছেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবীরাও বোনাস পাবার অধিকারী বলে বিবেচিত হলেন। এই আইন আরো বেশি সংখ্যক শ্রমজীবীকে বোনাস অর্জনের আরো বেশি সুযোগ করে দিল। এতোদিন পর্যন্ত যে শিল্প ইউনিটে কুড়ি জনের বেশি শ্রমিক কাজ করতেন একমাত্র তারাই বোনাস পাবার অধিকারী ছিলেন।

বোনাস সূত্র

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যদি সামান্যতমও উদ্বৃত্ত হয় এবং তা যদি পয়সার হিসেবেও হয়,—নিয়োগকর্তা প্রত্যেক কর্মীকে তাঁদের বেতন বা মজুরীর হিসেবে ন্যূনপক্ষে ৪ শতাংশ বোনাস দিতে বাধ্য থাকবেন। এজন্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ গণ্য করতে হবে 'Roll-on' হিসেবে চার বছরের জন্য', Set-on অথবা Set-off পদ্ধতিকে, যে ক্ষেত্রে যেমন, রীতিকে সামনে রেখে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে আইনের তৃতীয় তপশীলে। মুনাফার বিষয়কে বিকল্পে উৎপাদন অথবা উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে; মুনাফা অথবা উৎপাদন কিংবা উৎপাদনক্ষমতার মধ্যে সমতারক্ষার জন্য উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত বোনাস নির্ধারিত করা হয়েছে। সমাজ-অর্থনীতির বহু পরিচিত এই দুই পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বোনাসের মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বোনাস আইনকে আরও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে মূল আইনের ৩৪ উপধারাকে সেজন্য সংশোধন করা হয়েছে।

'ব্যাঙ্ককে' এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ব্যাঙ্কের মতো লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন, জেনারেল ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন এবং অপ্রতিযোগী সরকারী সংস্থাসমূহেও সেক্ষেত্রে বোনাসের পরিবর্তে এক্স-গ্রাসয়া দেওয়া হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অনুদান সেখানকার আর্থিক অবস্থা মজুরীর পর্যায়ক্রম ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বিবেচনা অনুযায়ী দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ দশ শতাংশ সর্তসাপেক্ষ এই অনুদান দেওয়া যেতে পারে।

হিসাব

অতীতে, নানা ধরণের ব্যয় ইত্যাদি 'সাবসিডি' খাতে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সম্প্রতি সেজন্য মূল আইনের দ্বিতীয় তপশীলের অনুরূপ প্রথম তপশীলের ৬ (চ) ধারার সংশোধন-ক্রমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি সরকার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বাজেট অন্তর্ভুক্ত অনুদান, তা সরাসরি কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো কারণে যদি কারো মাধ্যমে প্রদত্ত হয় এবং সেই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য যদি তা সংরক্ষিত রাখা হয়, তাহলে উক্ত অনুদানকে নগদ সাবসিডি খাতে খরচ দেখানো যাবে।

অভিযোগে প্রকাশ, কোনো কোনো মালিক পক্ষ নাকি বিশেষ কোনো বছরে সে গ্রাচুয়িটি ঋণ বাবদ অস্বাভাবিক খরচ দেখিয়ে লাভের ঘরে পর্যাপ্ত কারচুপী করছেন। এর ফলে কর্মচারীদের তাঁদের ন্যায্য বোনাস থেকে বঞ্চিত করছেন। এ অবস্থার প্রতিকারে সংশোধিত বোনাস আইনে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং যে টাকা তার থেকে বাড়তি ব্যয় বলে দেখানো হয়েছে মোট মুনাফার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জের হিসেবে তার পুরো হিসেবটা ধরতে হবে। এর ফলে অসদুপায় অবলম্বন করে মুনাফার পরিমাণ কম দেখানো এবং ফলে কর্মীদের অন্যান্য ভাবে কম দেবার ব্যবস্থাটা শক্তহাতে রোখা যাবে।

সি.এম.ডি.এ'র দু'চার কথা

স্বপন কুমার ভট্টাচার্য

কলকাতা নবকলেবর ধারণ করছে, কায়কল্প চিকিৎসা চালাচ্ছেন সি. এম. ডি. এ কিন্তু কেন?

তাহলে বলি অপরিসর রাস্তা, পথ বোঝাই যানবাহন, ঘিঞ্জি বস্তি আর বিপুল জনসংখ্যার সম্মিলিত চাপে পুর-সেবামূলক ব্যবস্থা এ মহানগরীতে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে ষাটের দশক থেকে। কাছে বা দূরে বসে কলকাতার হালচালের খবর যারা রাখেন তাদের এটা অজানা নয়। তাই ক্রমবর্ধমান গণদাবীর প্রয়োজন ও চাহিদার ঘাটতির ঘনঘটাকে হালকা করে পুরব্যবস্থার নবীনায়ন ও সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালাতেই ৭০ সালের শেষে তৈরী হল বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা বা সংক্ষেপে সি. এম. ডি. এ।

শতাধিক অঞ্চল-সহ পৌরসভা ও একাধিক উন্নয়ন-সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ৫৪০ বর্গমাইলের মধ্যে ৮০ লক্ষাধিক লোকের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর কাজে অর্থ-সামর্থ্য-প্রকল্প নিয়ে সি. এম. ডি. এ এগিয়ে এসেছে।

মনে রাখা দরকার বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে কেবল শহর কলকাতার প্রায় ৩৭ বর্গমাইল পরিমিত এলাকার ভেতর যা কিছু শহুরে ব্যবস্থা চালু আছে (যদিও তা যথেষ্ট নয়)। বাকী বিশাল অংশে পুর-বন্দোবস্ত খুবই সীমিত বলা চলে। এই বিভেদ ঘোচাতেই সর্বত্র মূল সমস্যার সমাধানে ও আশু অবক্ষয় রোধে উন্নয়ন-মূলক কাজ চলছে। এখন আর কেউ ক্ষয়িষ্ণু শহর কলকাতা বলার সুযোগ পাবেন না। কেননা-জরুরী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের সাহায্যে শতাধিক প্রকল্পের রূপায়ণ চলছে চারহাজার কাজের জায়গায়। সবাই জানে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার গতিশীল, পরিকল্পনা-ও তাই গতিশীল। ১৯৬১ সালে সি. এম. ডি. এ এলাকার লোকসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ আর ৭১ সালে ৭০ লক্ষের বেশী দাঁড়াল। ১৯৮৬ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ। এজন্য বর্তমান ও ভাবী বাসিন্দাদের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের লক্ষ্যেই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্পের কাজ চলছে।
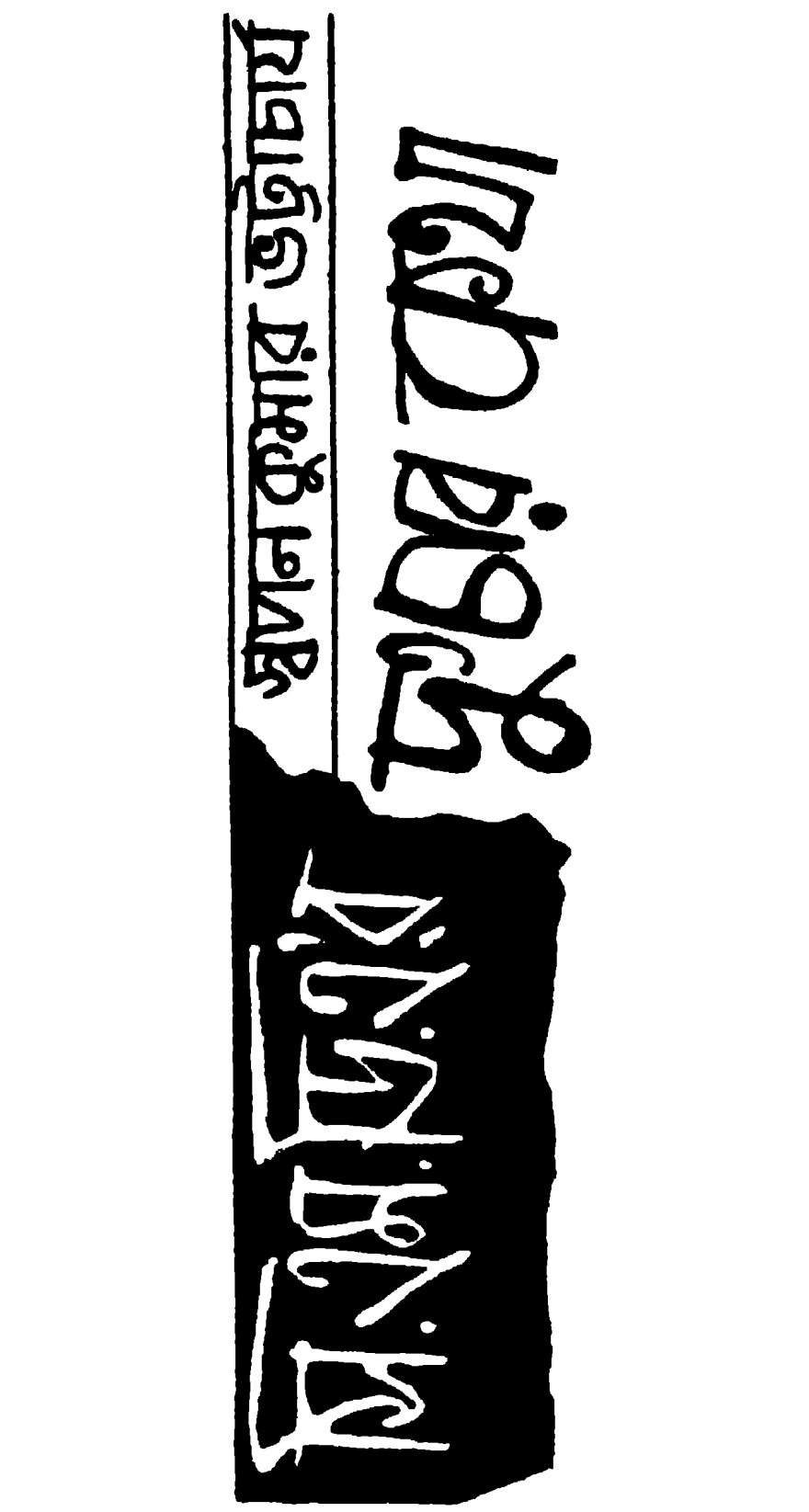
জল সরবরাহ

সি, এম, ডি, এ-র কাজের ফলেই কলকাতাতে দৈনিক গড়ে মাথাপিছু ২০ গ্যালনের মাত্রা বেড়ে এখন প্রায় ৩০ গ্যালনে দাঁড়িয়েছে। পলতা টালা জলপ্রকল্পের বর্তমান ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে এর শক্তি প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকাবাসী যাতে জল পায় তার জন্য ১০০ টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। জীবনে এই প্রথম বস্তিবাসীদের এক বিরাট-সংখ্যক লোক পানীয় জল যোগান পাচ্ছে। প্রতিটি পুরসভাকে সাহায্য করা হচ্ছে। কলকাতাতে অকূল্যাণ্ড স্কোয়ার, ও সুবোধ-মল্লিক স্কোয়ারে জলাধার (৬০ লক্ষ গ্যালন) নির্মাণের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। এই শতাব্দীতে এই প্রথম একাধিক জল-প্রকল্পের কাজ চলছে। গার্ডেনরীচে (৬ কোটি গ্যালন-জল), হাওড়া (৪ কোটি গ্যালন) ও বরাহনগরে (৬ কোটি গ্যালন) গঙ্গার জল তুলে পরিশোধন করে পাঠানোর জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। গার্ডেনরীচে জল প্রকল্পের কাজ চলছে। সি. এম. ডি. এ-র লক্ষ্য প্রতিটি শহরবাসীকে ৫০ গ্যালন জল যোগান। মোট ২৮ টি প্রকল্প এ-ব্যাপারে নেওয়া হয়েছে।

জলনিকাশী প্রকল্প

এই শতাব্দীতে এই প্রথম বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জল ও মল-নিকাশী ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১২ টি পুরসভা এলাকায় পাকা ড্রেনের কাজ শেষের পথে। কলকাতার প্রধান ও জনাকীর্ণ রাস্তা সমূহে যাতে বর্ষার জমা-জল দ্রুত সরে যায় তার জন্য ৭০ টি বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিকাশী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিকাশী খালগুলোর আমূল সংস্কার হচ্ছে, পাম্পিং স্টেশনগুলোর শক্তি বাড়ান হয়েছে। জল ও মল নিকাশী ব্যবস্থা সহ আবর্জনা অপসারণের জন্য আবশ্যকীয় সাহায্য প্রতিটি পুরসভাকে দেওয়া হচ্ছে। হাওড়াতে ও শ্রীরামপুরে নোংরাজল সহ মল শোধন প্রকল্পের কাজ চলছে। মোট ৫২ টি প্রকল্প এ ব্যাপারে রাখা হয়েছে।

পথ পরিবহণ

কলকাতাবাসীরাই নয় আগন্তুকরাও দেখেছেন তৈরি হল হাওড়া সাবওয়ে। সেইসঙ্গে হাওড়া স্টেশন সন্নিহিত এলাকার আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। এখনই কলকাতার প্রায় ৪০ টি রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে। এর মধ্যেই চেতলায় যতীনদাস সেতু, উল্টাডাঙ্গায় অরবিন্দ সেতু তৈরি হল, চওড়া হল কালীঘাট সেতু। কাজ চলছে ব্র্যাবোর্ণ রোড ফ্লাইওভারের, বঙ্কিম সেতুর (হাওড়া)। ডায়মণ্ডহারবার রোড ছিল ৪৫ ফুট চওড়া, এখন ১২০ ফুট প্রশস্ত করার কাজ চলছে। ২০ টি রাস্তা চওড়া হয়েছে। পথ পরিবহণের উন্নতিকল্পে ২৫ টি প্রকল্প রাখা হয়েছে। কাজ কোথাও দ্রুত সমাপ্তির পথে, কোথাও সবে শুরু হয়েছে বা শীঘ্রই শুরু হবে। এই সংস্কার হাতে নেওয়া কাজগুলো
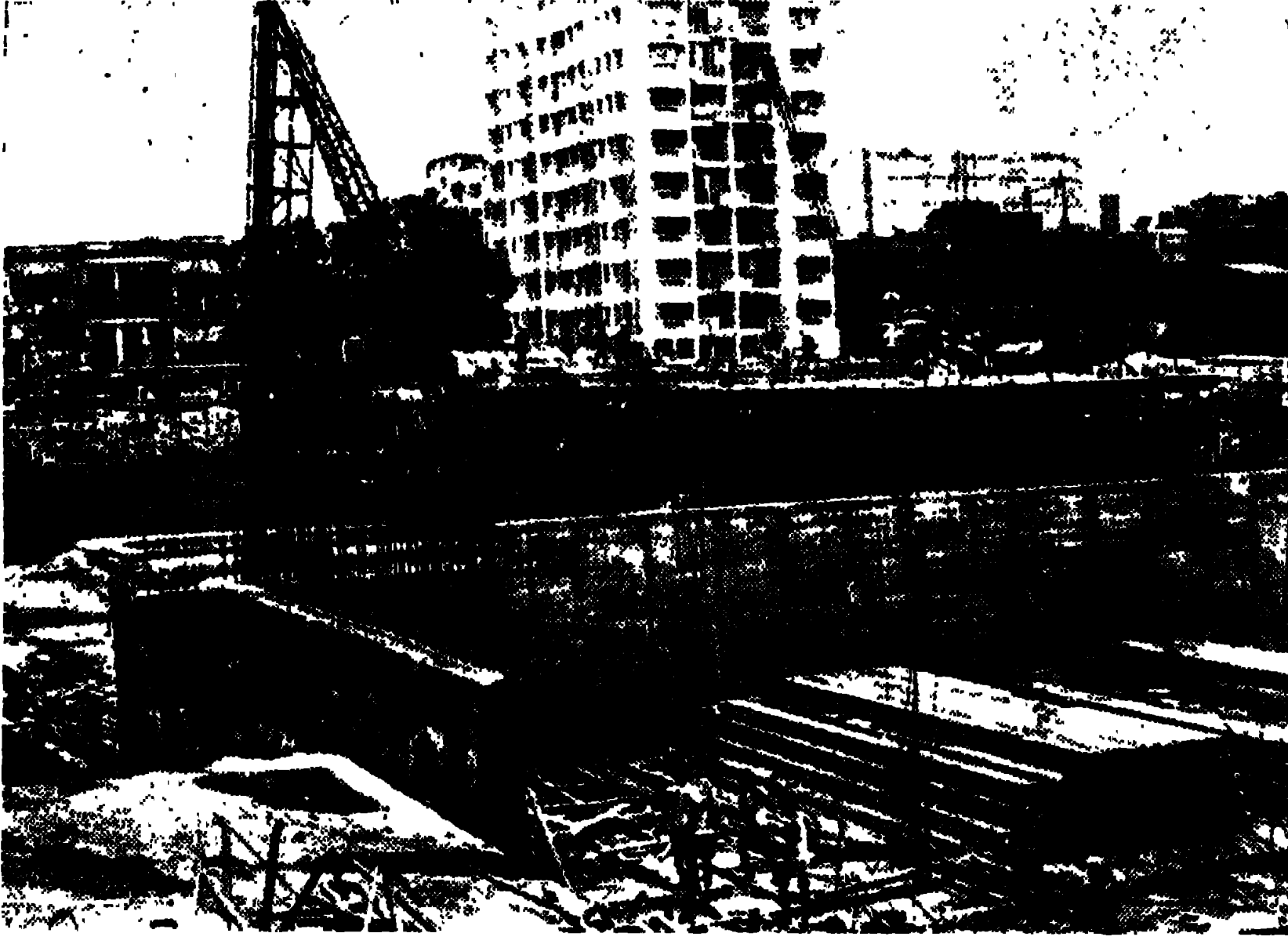
অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে নির্মীয়মান জলাধার

হল—জিটি রোড বাইপাস, ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাস, কোণা এক্সপ্রেসওয়ে, কল্যাণী সেতুপথ, বারাকপুর কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি। শিয়ালদহে 'র‍্যাম্প' বা দোতলা রাস্তা তৈরি হবে, গাড়ী আর পদযাত্রীর ভিড় আলাদা রাখবে এই ব্যবস্থা। কসবা ওভারব্রীজের কাজ শেষের পথে। কলকাতার ধর্মতলায় বাস টার্মিন্যাস হবে। কোণাতে 'ট্রাক টার্মিনাল' তৈরির প্রকল্প রয়েছে। সমগ্র সি. এম. ডি. এ. এলাকায় প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিয়ন-বাতির ব্যবস্থা হচ্ছে। কলিকাতা রাষ্ট্রীয়-পরিবহণকে ৫ কোটি টাকা ও ট্রাম-কোম্পানীকে ৬কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে গণ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য।

বস্তি উন্নয়ন

কেবল কলকাতা শহরেই ১০১৫ টি পঞ্জীকৃত বস্তি আছে, এতে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ লোক বাস করেন। কলকাতার ১০০ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯৭ টি ওয়ার্ডেই বস্তি আছে। সি. এম. ডি. এ. এলাকায় পঞ্জীকৃত তিনহাজার বস্তির বাসিন্দা ২০ লক্ষাধিক। সি. এম. ডি. এ. দেড় হাজার বস্তিতে এখনই পরিস্রুত জল, স্যানিটারী পায়খানা, পাকা রাস্তা, ড্রেন ও বিজলী বাতি সহ সম্ভব হলে খেলার মাঠ বা উদ্যান, কম্যুনিটি সেন্টার বা প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছে। এছাড়া বস্তিবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য নানাভাবে সহযোগিতা করছেন সি. এম. ডি. এ.-র সমাজসেবক সেবিকার দল। বহুসংখ্যক শিশুকে পুষ্টি-প্রকল্পের আওতায় আনতে সমর্থ হয়েছে এই সংস্থা। উন্নত পরিবেশ রচনার কাজ বস্তিতে বস্তিতে এগোচ্ছে।

সুস্থ পরিবেশ

প্রাথমিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য এখনই মহানগরীর হাসপাতালগুলোতে দু'হাজার অতিরিক্ত-শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪ টি স্থানু ও ১২টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের বাড়তি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন এলাকাতে। প্রায় ৬০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভবন নির্মাণ ও মেরামতিকল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথমেই খাটা পায়খানা উচ্ছেদ করে তৈরি স্যানিটারী পায়খানা সিকি দামে গৃহস্থকে যোগানোর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ২৬০০০ এর বেশী তৈরি পাকা পায়খানা বস্তি-উন্নয়ন বিভাগ থেকেই সরবরাহ করা হয়েছে। শহরের প্রায় ১০০ টি পার্ক সাজান হচ্ছে এবং নতুন উদ্যান, খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এখনই ৩১ টি পার্ক-খেলার মাঠের সংস্কার করা হয়েছে। শহরের প্রায় দেড়শটি পার্কে ও জনাকীর্ণ পথের ধারে সাধারণ শৌচাগার নির্মাণ-প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। একাধিক বাজারের উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাতের হকারের ভিড় সরানোর জন্য 'হকার্স-কর্ণার' তৈরির কাজ চলছে। শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলী, তিলজলা-তপসিয়া, মেটিয়াবুরুজ, ডানকুনি ও কোণায় কর্মভিত্তিক কলোনী তথা উপনিবেশ বিকাশ যোজনার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

শহরের বিশেষ স্থান-সমূহে দর্শনীয় ভাস্কর্য রেখে শহরকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার প্রকল্প হচ্ছে। কাজ চলছে-চলবে নাগরিক চাহিদার ন্যূনতম বন্দোবস্ত সরবরাহের জন্যই। কলকাতা রূপান্তরের পথে যাত্রা করেছে, কাণ্ডারী সি. এম. ডি. এ.। মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গে তালমিলিয়ে চলতে হলে বাঁচার মত-পরিবেশ একটানা বজায় রাখতে সচেষ্ট হতেই হবে। সি. এম. ডি. এ.-র কাজকর্ম এ জন্যই।

দীর্ঘকালের ইতস্তত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের ফেলে রাখা পৌরব্যবস্থা গুছিয়ে রাখতে সময় লাগবেই। নগর প্রকল্পবিদ্‌দের তোয়াক্কা না করে যে সব অঞ্চল গড়ে উঠেছে তাতে পূর্ত্ত ব্যবস্থার কাজ পেতে হলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে। কাজ শেষ হতে নানাকারণে দেরী হওয়া স্বাভাবিক। আবার নতুন করে নতুন জায়গায় পুর-সেবামূলক কাজকর্ম চালু করাও সময়সাপেক্ষ। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে আছে—নেই—চাই এই গরমিলের চিত্র সর্বদা বিদ্যমান। কাল-স্থান-সম্পদের উৎস এবং আয় বুঝে ব্যয় এদের সঙ্গে তাল-মিলিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ চালাতে হচ্ছে। উন্নয়নমূলক কাজের সুফল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাদিকে ছড়াচ্ছে। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে সুফলের মাত্রা ততই বাড়ছে এই ঘটনা অনস্বীকার্য্য।

লটারির সেকাল ও একাল

শোভন গুপ্ত

রাতারাতি লাখপতি হবার একটা অতি সহজ উপায় আছে। তবে অবশ্য সেই লাখপতিকে লাকপতি হতেই হবে। কোন আসল খাটাবার ঝামেলা নেই, দুশ্চিন্তার নির্ঘুম রাত্রি নেই, শুধু একটি টিকিট আর নিরানব্বুই পারসেন্ট লাক—ব্যস! পড়ে পাওয়া লাখ টাকা... কম কথা নয়। লাখ টাকা পেলে একটা মানুষ কত কি করে ফেলতে পারে। এই সহজলভ্য লক্ষ টাকার লোভে ভারতের অন্তত চল্লিশ কোটি হস্ত একবারেই প্রসারিত হয়ে আছে।

মানুষের এই প্রবণতা—অর্থাৎ রাতারাতি লাখপতি হবার দুর্নিবার ইচ্ছা কিন্তু আজকের নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে এই পশ্চিমবাংলাতেই একটি টিকিটে একলক্ষ টাকার দাঁও মেরে দেবার নজির আছে। সমাচার দর্পণের একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি:

'কলিকাতা ২৬ নাম্বির —৮০৯ নম্বর টিকিটে ১০০০০০ একলক্ষ টাকা চুচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে। ... ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮২২॥'

বর্তমান কালের লটারী পরিচালকরা নিশ্চয়ই পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করবেন না। বিপুল জনসংখ্যার উপর নির্ভর করেই এক একটি রাজ্য যৎসামান্য টাকার টিকিটের উপর পনেরো লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দিয়েছেন। এতো কেবল প্রথম পুরস্কার বিজেতাদের বেলায়। এছাড়াও বাকী ঝরতি-পড়তি প্রাইজগুলোর মধ্যে কত যে টাকা কত লোকে পাচ্ছে... সে এক বিরাট ব্যাপার! এতো দিয়েও লাভ থাকছে এবং রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি দিকে টাকা লগ্নী করাও হচ্ছে।

তখনকার দিনে লটারীর এত জনপ্রিয়তা ছিলনা। তাছাড়া ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে লটারীর টিকিট কেনার ক্ষমতা বা স্পৃহা আছে এরকম ধনী ও সৌখীন লোকের সংখ্যা গুণে বলা যেতো। পুরানো একটি খবর থেকে জানা যাচ্ছে লটারীর এক একটি টিকিটের মূল্য একশ টাকা করে ধার্য হয়েছে:

'কলিকাতা লটারি॥—গত বৃহস্পতিবার গভর্ণমেণ্ট গেজেট দ্বারা অবগত.... কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ সালের প্রথম লটারি গভর্ণমেণ্ট দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার ব্যাপার লটারি কমিটির আজ্ঞানুসারে সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট করিলেন তাহার ধারা গতবারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খোলা হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গাল বেঙ্কে বিক্রয় হইবেক, প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ (একশত) টাকা। —সমাচার দর্পণ, ১ জানুয়ারী, ১৮২৫॥'

লটারীরূপী ভাগ্যনদীর উৎস খুঁজতে-খুঁজতে ১৭৮৪-র গোড়ার দিকে একটু থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

বাংলার খ্যাতিমান নবাব সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৫ সনে সেণ্ট অ্যান গির্জাটি ধ্বংস করে ফেলায় ইংরেজ সরকার এবং ইংরেজ ও ইংরেজ পুষ্ট ভারতীয় নাগরিক বেশ চমমনে হয়ে উঠেছিল। সে সময় সকলের প্রয়াসে সেণ্ট অ্যান চার্চ-এর স্থলে আর একটি চার্চ তৈরী করার কথা ওঠে। এজন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন সেটাও লটারীর মাধ্যমেই তোলা হবে বলে ঠিক হয়। তিন হাজার টিকিটের বিনিময়ে তিনশ পঁয়ত্রিশটি প্রাইজ এবং এক একটি টিকিটের মূল্য দশ মোহর, অর্থাৎ তখনকার টাকার হিসেবে ১৬০ টাকা।

বলা বাহুল্য একশত ষাট টাকা দিয়ে একটি টিকিট কেনা সৌখীনতা ছাড়া

এক টাকা টিকিটে লক্ষ টাকা একালের লটারী

কিছু নয়। এবং একথাও ঠিক যে ভারত-বাসীকে ভাগ্যপরীক্ষার এই সৌখিন নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেছে ইংরেজ। ইংরেজরা আবার এই নেশার স্বাদ পেয়েছে ইয়োরোপের কাছ থেকে। ইয়োরোপে লটারীর প্রচলন হয় পঞ্চদশ শতকে। তারও আগে অগস্টাস, নীরো ইত্যাদি রোমের কয়েকজন সম্রাট নির্মাণ প্রকল্প এবং রাজস্ব আয়-বৃদ্ধির জন্য লটারী পরিচালনা করতেন। ইংলণ্ডে প্রথম লটারী খেলা হয় ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে। রাণী এলিজাবেথ তার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। কিন্তু সে সময় টিকিট বিক্রীর নাম করে এতো দুর্নীতি বেড়ে ওঠে যে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে লাইসেন্সবিহীন লটারী নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮২৪ পর্যন্ত কোন লটারীকেই লাইসেন্স দেওয়া হয়নি।

লটারীর পরিচালকরা টিকিট বিক্রীর জন্য ক্ষেত্র বিশেষ অনেক রকম পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়া যে পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল সেটি বেশ অভিনব। সে সময় এক একটি যুদ্ধবণ্ড-এর সঙ্গে বিনামূল্যে একটি করে লটারীর টিকিট দেওয়া হয়েছিল এবং তার প্রথম পুরস্কার ছিল এক লক্ষ রুবল।

সবচেয়ে বেশী পুরস্কার দেওয়া হতো যে লটারীতে তার নাম আমেরিকার লুইসিয়ানা স্টেট লটারী। এমনিতে আমেরিকার কোন স্টেটই ১৮৯৩-এর আগে কোন লটারিকে লাইসেন্স মঞ্জুর করেনি। অথচ ১৮৬৮ তে উক্ত লুইসিয়ানা স্টেট লটারী নাকি লাইসেন্স পেয়েছিল। তবু কেন যে তাদের লাইসেন্স হাতছাড়া হ'লো সেইটাই সন্ধান করে দেখা যাক। এই লটারীটি লাইসেন্স পেয়েছিল এই শর্তে যে প্রতি বছর তারা স্টেটকে ৪০,০০০ ডলার দিয়ে যাবে। যে সময়ে লটারী পূর্ণোদ্যমে চলছিল সে সময় এই লটারী প্রতি মাসে ২০,০০,০০০ ডলারের টিকিট বিক্রী করতো। কিন্তু করলে কি হবে, যেখানে অর্থ সেইখানেই অনর্থ। এই লটারীকে কেন্দ্র করে এতো দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়লো যে ১৮৯০ সালে লাইসেন্স নবী-করণের সময় স্টেট ৪০,০০০ ডলার তো দূরের কথা ১১,২৫,০০০ ডলারের দানকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলো। আগের ৪০,০০০ ডলার থেকে এই নতুন দানের অঙ্ক ১০,৮৫,০০০ বেশী। সুতরাং দুর্নীতির পরিমাণটা সহজেই অনুমেয়। তারপরের তিন বছরের মধ্যে আর কোন স্টেট লটারিকেই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়নি।

ভয় হয় এই ভেবে যে, যে ভাবে লটারী ভারতবর্ষে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং যেভাবে পুরস্কারের পরিমাণ বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এক টাকার বিনিময়ে লক্ষপতি হয়ে উঠবার এমন সহজ সুযোগ, স্বপ্ন সফল করার এমন রূপকথার জ্যোতিষ্ক ভারতের নানা ভাবনায় জর্জরিত নাগরিকদের ভাগ্যাকাশ থেকে বিলীন না হয়ে যায়।

প্রাকৃত

৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ব্যস্ত। উমাকান্তর জন্য তার সমস্ত প্রেম অনুরাগ আজ শুধু কর্তব্যে গিয়ে ঠেকেছে। উমাকান্ত তাতেই খুসী, তৃপ্ত। পুরুষ আর নারী হৃদয়ের মস্ত বড় একটা ফারাক আছেই আছে। উমাকান্ত জানে, পুরুষ হিসেবে সে আজ সংসার থেকে নিজেকে যতটা হালকা ক'রে এনেছে, কানন এখনো ততটা পারেনি। সংসারের কোনো নারীই বোধ হয় তা পারে না। কারণ তাদের হৃদয়ের মায়া অনেক গভীর, সংসারের মোহের সঙ্গে তার যোগ খুব অল্পই। জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছে কানন উমাকান্তর মতো মোহমুক্ত হলেও এখন পর্যন্ত মায়াকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি তাই। বরং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার হৃদয়ের মায়া আরো অধিক পরিমাণে নেমে আসছে সংসারের বুকে। উমাকান্ত খেয়াল করে, কানন এখনো অনেক ছোট-খাটো ব্যাপারে মাথা ঘামায়, ছেলে ছেলেবৌ তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে হৈ চৈ করে, —যে সবের কাছ থেকে বাস্তবিক উমাকান্ত আজ অনেক দূরে।

চোখ বরাবর নারকেল গাছের পাতায় আবার হাওয়া লাগে। সেই হাওয়ার শব্দে উমাকান্তর মনস্কতা আবার এই প্রাকৃত দৃশ্যের কাছে ফিরে আসে। ঝড় উঠছে নাকি তা হলে? ...উমাকান্ত নিজের মনে মনে হেসে ওঠে। এই গাছ-গাছালি ঘাস আর জলের এত কাছাকাছি থেকে এখন কাননবালাকেই কেন বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে তার। এই গ্রামীণ এলাকা থেকে বেশ দূরে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পঞ্চাশ বছরের গিন্নী কানন এই সায়াহ্ন সন্ধ্যায় দোক্তা পাতা দেয়া পান চিবুতে চিবুতে এখন এক মুহূর্তের জন্যও কি ভাবছে তার স্বামী উমাকান্তর কথা? কিংবা সে কি শুনতে পাচ্ছে, ষাট বছরের পুরুষ উমাকান্তর হৃদয়ের ডাক: আয় বৌ দেখে যা; আমি এইখানে যা দেখে আনন্দ পাচ্ছি, তার একটু ভাগ তুইও নিয়ে যা বৌ।

ঝড় সত্যিই উঠেছে। দক্ষিণের বাতাসে ভর দিয়ে দিয়ে ক্রমশ মেঘ জমে উঠেছে উত্তরের আকাশটায়। একটু বাদে এখানে অন্ধকার নেমে আসবে। হৈ হৈ করে। এইসব ভাবতে-ভাবতে উমাকান্তর আনন্দ অনেকখানি তরল হয়ে যায়। হৃদয় খুঁড়ে নিঃসঙ্গতা জেগে উঠতে সে কেমন অসহায় বোধ করতে থাকে। ছড়িটাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় উমাকান্ত। এবং ঠিক তক্ষুণি সে যেন শুনতে পায়, সংসারের সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে থেকেও তার কানন গোপনে হাতছানি দিয়ে ডাকছে এই বুড়ো মানুষটাকে। উমাকান্ত যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করে, কাননের এই ডাক আজ প্রেমের চেয়েও অনেক গভীর, অনুরাগের চাইতেও অনেক উষ্ণ। পুরুষ উমাকান্তর জন্য আজ এতটুকু মোহ নেই কাননের, কিন্তু,. মানুষ উমাকান্তর জন্য আজো যে তার অনেক মায়া।

হাতের ছড়িটা সামনে তুলে ধ'রে উমাকান্ত খুব দ্রুত পীচের রাস্তার দিকে উঠে আসে। এদিকে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে হাওয়া, জমে উঠছে মেঘ। সমস্ত আয়োজন গোছ-গাছ করে এগিয়ে আসছে ঝড়। হোক পঞ্চাশের, তবু একান্ত নিজের বৌ কাননবালার কাছে ফিরে যাবার জন্য উমাকান্ত ক্রমশই কাতর হ'য়ে পড়ে।

সেচের জলের সদ্ব্যবহার করুন

রণদাসুন্দর পাল
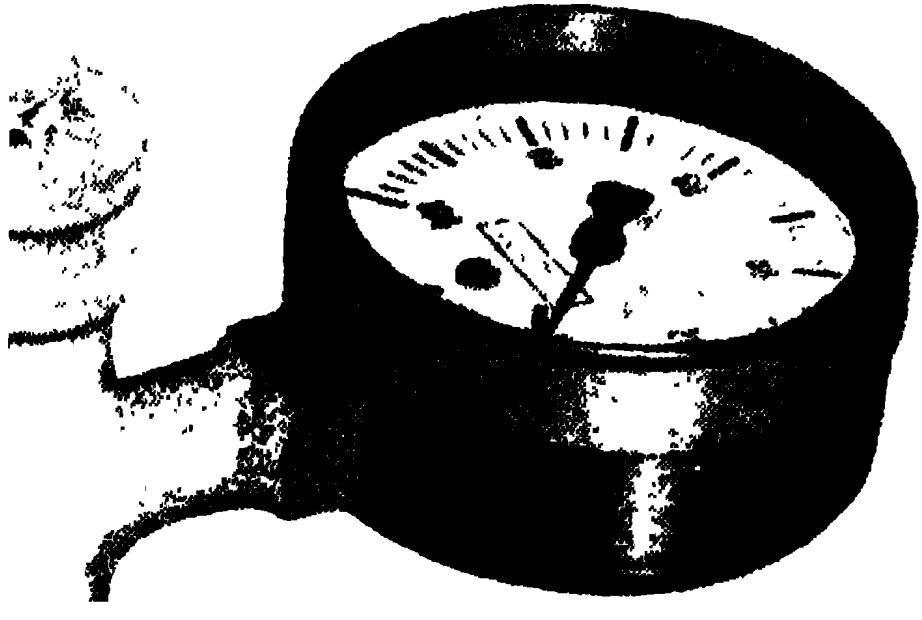
টেনসিওমিটার যন্ত্র

আমাদের দেশের চাষীরা অনেকেই জমিতে সেচের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করেন। বৃষ্টি না হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেচের অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। দেশে খাদ্যের অকুলান হয়। সম্প্রতি সেচের কাজে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। সেচ নলকূপ স্থাপন করে পাম্পের সাহায্যে এখন সেচ দেয়ার কাজ দেশের সর্বত্র চলছে, বিশেষত শুষ্ক এলাকায়। কিন্তু নলকূপ ও পাম্পের মূল্য এত বেশী আমাদের সাধারণ চাষীর পক্ষে তার জন্য অর্থ যোগাড় করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। সরকার ও ব্যাঙ্কের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে নলকূপ বসাতে হয় ও পাম্প কিনতে হয়। পাম্প চালান ও তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচও মন্দ নয়। সুতরাং পাম্পের জলের প্রতিটি বিন্দুর যাতে সদ্ব্যবহার হয় সে বিষয়ে প্রত্যেক চাষীই উদগ্রীব। কিন্তু কোন্ ফসলে কখন ও কি পরিমাণ সেচ দেওয়া প্রয়োজন তা নির্ণয় করা চাষীদের পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হয় না।

কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন—এই যন্ত্রের নাম সেচযন্ত্র বা টেনসিওমিটার। এই যন্ত্রের সাহায্যে কখন কোন শস্যে কি পরিমাণ সেচ দিতে ও কখন সেচ বন্ধ করতে হবে তা বোঝানো যায়।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন কত জলের চাপে কোন শস্যের ফলন ভাল হয়। এই যন্ত্রে তাই দেখান আছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা এই উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এই তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন শস্যে সেচ দিলে ফসল ভাল হবে এবং জলের অপচয় বন্ধ হবে।

যেমন আলুর ক্ষেতে যন্ত্র বসালে যন্ত্রের ভ্যাকুয়াম গ্যাসের কাঁটা ২৫ দাগের উপরে গেলে বুঝতে হবে আলুর ক্ষেতে সেচের প্রয়োজন,—তখন আলুক্ষেতে সেচ দিতে আরম্ভ করতে হবে এবং গ্যাজের কাঁটা ২৫-এর নিচে চলে গেলে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। সেইরকমভাবে গমের ক্ষেতে যন্ত্র বসালে গ্যাজের কাঁটা ৫০ দাগের উপরে গেলে ক্ষেতে সেচ দিতে সুরু করতে হবে। এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে জলের সদ্ব্যবহার হবে এবং ফসলও ভাল হবে। আমেরিকায় অষ্ট্রেলিয়া জাপান প্রভৃতি দেশে কৃষির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এ সকল দেশের কৃষকরা জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদন করেন। এসব দেশে প্রায় সকলেই জমিতে সেচ দিয়ে থাকেন যন্ত্রের সাহায্যে যার নাম টেনসিওমিটার।

আমাদের দেশে এই যন্ত্রের ব্যবস্থা কৃষি বিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয় ও কৃষি গবেষণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই যন্ত্র এতদিন বিদেশ থেকে আমদানী করা হত। মূল্য—প্রতিটি ৮০০।৮৫০ টাকা, এত বেশী দাম দিয়ে আমাদের চাষীদের পক্ষে এই যন্ত্র ক্রয় করা এক প্রকার অসম্ভব। বর্তমানে এই যন্ত্র আমাদের দেশেই তৈরী করা হচ্ছে—মূল্য ১৫০্ টাকা হইতে ২২০্ টাকা।

আমাদের দেশের কৃষি বিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি গবেষণাগারগুলি এখন স্বদেশে প্রস্তুত এই যন্ত্র ব্যবহার করে ভাল ফল পাচ্ছেন।

হরিয়ানা, পাঞ্জাব, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে কিছু চাষী এখন এই যন্ত্র ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা এই যন্ত্র সম্বন্ধে অনেকেই জানেন না একথা বলা ভুল হবে। কেননা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ একটি বিশেষ শাখা খুলেছেন ও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছেন। তাঁরা এই সেচযন্ত্র কি করে ব্যবহার করতে হয় তা চাষীভাইদের বুঝিয়ে দেবেন। বর্তমানে কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠান এই যন্ত্র তৈরী করছেন। এটা দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারে বিদেশী যন্ত্রের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে পরীক্ষিত হয়েছে।

আশা করা যায় এই যন্ত্রের ব্যবহার পদ্ধতি ও উপকারিতা সম্বন্ধে জানতে পারলে কৃষকরা এ যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে ঠিক সময়ে ও ঠিক পরিমাণে সেচ দিয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। উপরন্তু মূল্যবান জলের অপচয়ও বন্ধ হবে।

সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের কৃষি কর্মকর্তা ও গ্রাম সেবকগণ এই যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিত করলে আশা করা যায় সুফল পাওয়া যাবে।

রাজ্যে রাজ্যে

আজকের তামিলনাড়ু

আনন্দ ভট্টাচার্য

তিনশ পয়ষট্টি দিনে এক বছর। এমনি ৩৬৫টি বছর আগে একদল শ্বেতকায় মানুষ সমুদ্রপথে, মস্তুলিপত্তনম থেকে নৌকাযোগে এসে উঠলেন ভারতের দক্ষিণ উপকূলের একটি অতি মনোরম প্রান্তে যেখানে বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর এবং ভারত মহাসাগর একসঙ্গে মিলেছে। সেই সুনীল জলরাশির স্পর্শে এই রমণীয় স্থানটি তাদের খুব ভাল লাগল। ওরা ঠিক করলেন এখানেই পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে হবে। সেইমত কাজ আরম্ভ হল। সেটা ছিল ১৬১১ খৃষ্টাব্দ। ক্রমে ওরা তৈরী করলেন St. George কেল্লা ও একটি কুঠী। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে গড়ে তুললেন একটি পৌরসংস্থা।

এরপর এখানে নানা জাতি নানা ধর্মের মিলন ঘটতে লাগল। প্রাচীন রোম ও মিশরের সঙ্গে এই ভূমির যোগ স্থাপন হল যে সব বন্দরগুলির মারফৎ তার নাম তখন ছিল Madias Presidency। পরবর্তী সময়ে হল শুধু মাদ্রাজ—গোটা রাজ্যের নাম। আধুনিক ও বর্তমান নাম হল মাদ্রাজের তামিলনাড়ু।

তামিলনাড়ুর মানুষ ধর্মপ্রাণ। অসংখ্য মন্দির ভাস্কর্যের ও সৌন্দর্যের মনোমুগ্ধকর ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই তামিলনাড়ুকে সঙ্গত কারণেই বলা হয় মন্দিরময় রাজ্য। এরাজ্যের একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে এগমোরের যাদুঘর যেমন ঐতিহাসিক সংগ্রহের জন্য বিখ্যাত তেমনি বিখ্যাত এ রাজ্যের জনগণের অটুট মনোবল ও সংকল্পের ইতিহাস। এই সংকল্পের ইতিহাসই গত ন বছরের ডি. এম. কে. শাসনামলের অবসানের ইতিহাস। কারণ?

কারণ এই সরকার নিজের রাজ্যকে সমৃদ্ধির পথে অধিকতর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্বেও তার সদ্ব্যবহার করেন নি—বরং জনগণের অর্থ তাঁরা অন্য কাজে নিয়োগ করে জনগণের দুঃখদুর্দশা বাড়িয়ে তোলেন। ফলে, তামিলনাড়ু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। এই ডি. এম. কে. শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর জনসাধারণই অনাস্থা প্রকাশ করেন—তাঁরাই এই সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও উন্নয়ন প্রয়াসে ব্যাপক গাফিলতির অভিযোগ আনেন। এই জনমতের ভিত্তিতেই ওখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল এ বছরের ফেব্রুয়ারীতে। আর এতেই যাদুর মত কাজ হল।

প্রথমেই অবসান হল অরাজকতার—ফিরে এল শান্তি শৃংখলা—প্রতিষ্ঠিত হল আইনের রাজত্ব। জনগণ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ও চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হল—দোকানে দোকানে মূল্যতালিকা ঝোলান হল। ডি. এম. কে. শাসন কালে চালের যে দর ছিল এরপর তা তিরিশ শতাংশ নেমে এল। খাদ্য চলাচলে যে সব বিধিনিষেধ ছিল সেগুলিকে শিথিল করা হল—কোন কোন ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হল।

জনগণের নানান অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশার সুষ্ঠু মীমাংসাকল্পে সরকার নানা প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করলেন।

ডি. এম. কে. রাজত্বে সতেরটি শিল্পসংস্থা অচলাবস্থায় ছিল। হয় ষ্ট্রাইক না হয় লক আউটের জন্য। ফলে ২৪,০০০ শ্রমিক ও কর্মীর রুজি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি শাসনভার হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির ওপর নজর দেওয়া হল এবং এগুলি পুনরায় চালু করা হল।

খরাপ্রপীড়িত এলাকার জনগণের জন্য সরকার সবরকম ত্রাণ ও সাহায্যব্যবস্থা ত্বরান্বিত করলেন। জলাভাব দূরীকরণের জন্য ২৫০০ টি গভীর নলকূপ খননের ব্যবস্থা করা হল। ৫০ টি সমষ্টি কূপ খননের কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ এগুচ্ছে।

গত জুন মাসে সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পর তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে. সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে হয় সরাসরি অগ্রাহ্য করছিলেন নয়ত বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। ফলে জরুরী অবস্থায় অন্যান্য রাজ্যে যে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেল, তামিলনাড়ু তা থেকে আশ্চর্য ব্যতিক্রম রয়ে গেল। রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ দফা কর্মসূচীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজে লাগানো হল।

শহরের সম্পত্তি, কৃষি জমির উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া এবং তামিলনাড়ুর গ্রাম গ্রামান্তে দাস শ্রমিকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা প্রভৃতি নানা উল্লেখযোগ্য কাজ এর মধ্যেই করা হয়েছে। নীলগিরি জেলার ৪৮১ জন পানিয়া, দক্ষিণ আরকটে ১৩৯ জন এবং কোয়েম্বাটুরে ৪৬০ জন বেগার শ্রমিক এরই মধ্যে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে। এর ফলে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর লোকেদের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হয়েছে। এদের জন্যই গঠিত হয়েছে গ্রামীণ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প যার কাজ হবে এই শ্রেণীর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ অথবা যে গ্রামে তারা বাস করেন সেই সব গ্রামের জীবন-যাত্রার সার্বিক উন্নয়ন করা। আইন করে ন্যূনতম মজুরী ঠিক করে দেওয়া হয়েছে

দৈনিক নয় টাকা হারে—আগে যেখানে তা ছিল চার অথবা পাঁচ টাকা।

কন্ট্রোলদরে লেখাপড়ার যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে তামিলনাড়ুর ৪০,০০০ আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তাছাড়া, খাতার ওপর বিক্রয় কর তুলে নেওয়া হয়েছে।

এতগুলি কাজ ক্রমান্বয়ে করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। কারণ, অনেকে বলে থাকেন, তামিলনাড়ু নাকি কেন্দ্র দ্বারা সবসময় অবহেলিত। ধারণাটি, বা অভিযোগটি একেবারে ভুল। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী কে. কে. শাহ সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন : অভিযোগটি ঠিক নয়। তামিলনাড়ু কেন্দ্রের কাছে সবরকম সাহায্য পেয়ে এসেছে। তবে, সাম্প্রতিক কালে ডি. এম. কে. সরকারের গাফিলতিতে এধরণের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হতে পারে নি। অযথা বিলম্বিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের কথা তারা মুখে বললেও, কাজে তা করেন নি। তাই বাধ্য হয়ে, এরাজ্যের জনগণ ডি. এম. কে. সরকারকে সরিয়ে দিয়ে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, এবার দেখা যাক্ ভারতের চতুর্থ বৃহৎ এই রাজ্যটির শিল্পোন্নয়নে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে কি কি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান হল ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত Neyvelli Lignite Corporation। এটিকে তামিলনাড়ুর ভাগ্যলক্ষ্মী বলা হয়। কথাটা খুব যুক্তিসঙ্গত—কারণ, এই একটিমাত্র বহুমুখী কারখানা এই রাজ্যটিকে সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। এই কারখানাটি একদিকে যেমন খনিজ সম্পদ আহরণ করে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, সার তৈরী করে—তেমনই অন্যদিকে ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে সস্তায় জ্বালানী সরবরাহ করে থাকে। এই লিগনাইটকে কাজে লাগিয়ে সরকার সালেমে প্রায় দুলক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পেরাম্বুরে Integral Coach Factory আজ বিশ্ববিখ্যাত—এখানে বিভিন্ন ধরণের রেলওয়ের কোচ এবং রেলবগী দেশ বিদেশের চাহিদানুযায়ী তৈরী হয়ে থাকে। Madras Fertilizer Ltd. সার উৎপাদন করে রাজ্যের সারের চাহিদার যোগান দেয়। Surgical Instruments Plant চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও শল্য চিকিৎসার নানান সরঞ্জাম দেশে ও বিদেশে সরবরাহ করে। Hindusthan Teleprinters Ltd. দেশে ক্রমবর্দ্ধমান টেলিপ্রিন্টার ব্যবস্থার উন্নয়নের চাহিদা নিষ্ঠার সঙ্গে পূরণ করে চলেছে।

Ootcamund-এ প্রায় ১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগে Hindusthan Photo Films Manufacturing Company সবরকম ফিল্ম ও ফোটো ছাপার কাগজ তৈরী করে চলেছে।

Bharat Heavy Electricals Ltd. হাই প্রেসার বয়লার তৈরীর কারখানা। দেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বয়লারের চাহিদা মেটাচ্ছে।

আবাদীর কারখানায় তৈরী বিশ্ববিখ্যাত বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক ও শক্তিমান ট্রাক তৈরী আজ এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আমরা সবাই তার প্রয়োগ সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধে দেখেছি।

Madras Refineries Ltd. একটি বড় তৈল শোধনাগার—এটি ইরাণের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে।

কালপাক্কামে স্থাপিত হতে চলেছে বিরাট এক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

এসব ছাড়া তামিলনাড়ুতে আছে অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরি।

শিল্পোন্নয়নের সহযোগী জাতীয় গবেষণাগারগুলির মধ্যে রয়েছে Electro Chemical Research Institute এবং Leather Research Institute.

মাদ্রাজ বন্দর ছাড়া তুতিকোরিণে আরো একটি বন্দর নির্মিত হয়েছে।

তামিলনাড়ুর বস্ত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৪ টি রুগ্ন কাপড়ের কল অধিগ্রহণ করেছেন এবং দরাজ হাতে বহুবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রচনা করে বহু শ্রমিক কর্মচারীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁত শিল্প তামিলনাড়ুর এক ঐতিহ্যবাহী শিল্প। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ লোক এরাজ্যে তাঁত শিল্প থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন। দেশের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক তাঁত শিল্পী প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক এই রাজ্যে বাস করেন। ভারতের মোট তাঁত বস্ত্রের এক চতুর্থাংশ তৈরী হয় তামিলনাড়ুতে। তাই ২০ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী, এই রাজ্যের তাঁতশিল্পের উন্নয়নেও এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

ডি. এম. কে. সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল এই সরকার তামিলনাড়ুতে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন—অথচ এরাজ্যে কখনও বিচ্ছিন্নতাবাদ ছিলনা। তাই চালু হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী।

তামিলনাড়ুর জনগণ এখন সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমৃদ্ধতর নতুন এক রাজ্য গড়ে তোলার ভূমিকায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করছেন। অচিরেই আমরা দেখতে পাব একদা সমৃদ্ধ এই রাজ্য আবার তার হৃত গৌরব ফিরে পেয়ে স্বমহিমায় অন্যান্য রাজ্যের মতই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

শরৎ-ভাবনার কয়েকটি দিক

সমরেন্দ্রকুমার জানা

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব। শরৎচন্দ্রের ন্যায় অপর কোন সাহিত্যিকই সর্বশ্রেণীর মানুষের রসপিপাসাকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মতোই দিগদিগন্ত আপন সৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণ ধারার উজ্জ্বল ও সুধাসিক্ত করে তুললেন। সকল স্তরের মানুষ যেন তাদের নিজেদের কাহিনী পড়তে আরম্ভ করল এই অমর শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে। আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই প্রথম বেদে, বাউল, ভিখারী, জোলা ও চাষীকে এবং স্খলিত পতিত অবনমিত নিম্নবর্ণের মানুষকে মর্য্যাদার সঙ্গে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। পতিতার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে তিনি স্বীকার করেছেন, মেসের ঝি-কে সম্মানিতার মহিলার আসনে বসিয়েছেন, গ্রামের সাধারণ মহিলার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন মহিমময়ী নারিত্ব। গ্রামের গরীব লাঠি-য়ালকে ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলো বৃহৎ মানুষরূপে প্রতিভাত করতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। তিনি সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি নুড়ির মধ্যে খুঁজেছেন মুক্তাকে। তিনি মানুষের স্খলন পতনকে অতিক্রম করেও যে তার অন্তর্নিহিত মানব-মহিমা অজেয় থাকে তাকে বারবার তাঁর পাঠকের দৃষ্টির সামনে তুলে-ধরেছেন অকম্পিত হস্তে। (সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, বিজলী প্রভৃতি চরিত্র এই মন্তব্যের প্রমাণ।)

শরৎ-সৃষ্টির সাহচর্য্য সহমর্মিতার, সহানুভূতির। শরৎ সাহিত্যে রয়েছে সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তার জীবন সংগ্রামের অতি মর্মান্তিক সমস্যাগুলির সকরুণ উপলব্ধি। শরৎচন্দ্র যেন অতি সাধারণ বাঙালীর সপ্রাণ বন্ধু, একেবারে তার একাসনে বসে তার অন্তর্বেদনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তার অন্তরের রুদ্ধ বাণী প্রকাশ করেছেন। জনগণের মাঝেই গণপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের আসন। উর্দ্ধলোক হতে কল্পনার নেত্রে তিনি দেশকে দেখেছেন, কোন পূর্ব-কল্পিত আদর্শের তৌলদণ্ডে মানুষকে বিচার করেননি। যেখানে মানুষ কাজ করে, যেখানে প্রাচীন বিধিনিষেধ কণ্টকিত সমাজ দুঃখীকে কেবল দুঃখের মধ্যে ঠেলে দেয়, যেখানে গফুর চাষার মাটির প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে গৃহের সম্ভ্রমকে পথিকের করুণার উপর ফেলে রেখেছে, সভ্যতার কৃতঘ্নতায় বিদীর্ণ হৃদয় মানুষ যেখানে বিধাতার দরবারে সকল নালিশ তুলে দিয়ে সাতপুরুষের ভিটে ছাড়া হচ্ছে, সেখানে, সেই সহস্র দুঃখ ও পাপ পঙ্কিলতার মধ্যে নেমে এসে সাশ্রুনেত্রে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। তাদের জীবনের সুখদুঃখ ও অশ্রু বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধ-মধুর ও বেদনা-বিধুর কাহিনী সৃষ্টি করেছেন যা আর কেউ পারেননি এর আগে। তাই আজো তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিল্পী বাংলা কথা সাহিত্যের আসরে।

বিংশ শতকে বাঙালীর মানসলোকে নানা পরিবর্তন দেখা দিল। বাঙালী আর ঐতিহাসিক উপান্যাস অথবা কাল্পনিক কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। বাঙালী জানতে চাইল নিজেকে, বুঝতে চাইল সমাজকে। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। মানুষ ক্রমে ক্রমে সমাজ সচেতন হল। সমাজেও নানা কারণে দেখা দিল অসন্তোষ। পল্লী-সমাজ তখন দুর্নীতি, অসাম্য ও নানা অনাচারে পরিপূর্ণ। একদিকে বিদেশী শাসন ও শোষণ সমাজপতিদের অত্যাচার, অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে লাগল। কিন্তু তাদের প্রকাশের ভাষা ছিল না। শরৎচন্দ্র তাদের নিরুদ্ধবেদনার কাহিনীকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এদের জন্যেই শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই তিনি দৃপ্তকন্ঠে বলেছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসেব নিলেনা, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলনা সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম; এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কু-বিচার কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।" শরৎচন্দ্র ছিলেন অনুভূতিশীল এবং তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। সমাজের বহু অবিচারের তিনি

শেষাংশ ২৩ পৃষ্ঠায়

ব্রেখটীয় নাট্যচিন্তা

কমল মুখোপাধ্যায়

ব্রেখটের নাটকের অন্তর্নিহিত মর্ম খুব সহজে উপলব্ধি করা যায় এ ধারণা ভুল। এই কারণেই বিশেষত যে, ব্রেখট্ প্রচলিত নাটক-রচনার প্রথা প্রকরণ পরিত্যাগ করে এক নতুন পথের সূচনা করেছেন। ব্রেখটের নিজের মতানুসারে পরিবর্তনশীল এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে শিল্পসৃষ্টিতেও পারস্পরিক যে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে তাও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। আরিষ্টটলীয় নাট্য-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্রেখটের সমস্ত নাটক বরং action-প্রধানই বলা যেতে পারে।

আরিষ্টটলীয় নাট্যনীতি অনুযায়ী নাটকের পুরো কর্মকাণ্ড তথা ঘটনাবলীর ঐক্য সীমিত একটা গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ। আরিষ্টটলের নির্দেশ অনুযায়ী ট্র্যাজেডির সমাপ্তি নির্ভর করবে ট্র্যাজেডির ঘটনা-কাঠামোর এবং যেভাবে ঐ ঘটনা-কাঠামোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার ওপর। ঘটনার অভিক্ষেপ ও সংযোজন আর নাটকের আরিষ্টটলীয় ঐক্যবিধান এমনভাবে সংশ্লিষ্ট থাকবে যাতে নাটকের "সঙ্কটমুহূর্ত" পার হয়ে যাবার পর নাটকীয় দ্বন্দ্বের চরম মুহূর্ত দর্শকের যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে। নাটক সমাপ্তির এই যুক্তিগ্রাহ্যতা দুটি বিশেষ অবস্থার ওপর নির্ভরশীল—(১) গ্রীক নাটকে যা ব্যাখ্যা করা হয় "ঘটনা-কাঠামোর ওপর নির্ভরশীলতা" বলে এবং (২) ট্র্যাজেডিতে যাকে বলা হয় "চরিত্রের আপন স্বভাবজাত দোষগুণাবলী"।

তাঁর নিজের সব নাটকে আরিষ্টটলীয় সীমিতকরণের এই নীতি ব্রেখট্ পুরোপুরি বর্জন করেছেন। নাটকের পরিণতি স্মরণে রেখে তাঁর কোন নাটকই রচিত হয় নি; প্রত্যেকটি নাটক যেন পর পর কয়েকটি অবস্থার প্রতিবেদন। যেন ছবির পর ছবি সাজিয়ে ছবির এক মালা! নাটকের প্রতিটি দৃশ্যেরই আপন গুরুত্ব রয়েছে। প্রয়োজনীয়তার জন্যই যে ঘটনার সংযোজন করা হয়েছে তা নয় বরং প্রত্যেকটি ঘটনাই যেন পরবর্তী ঘটনার অভিক্ষেপ। কোন বিশেষ ঘটনার সংযোজনকে আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর মনে করা যেতে পারে কিন্তু ঐ ঘটনাটিও শিল্পীর বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, দর্শক যাতে চরিত্রের ভাগ্যবিপর্যয়ে অভিভূত না হয়ে পড়ে, যাতে ঐ অবস্থার সঙ্গে একাত্ম না হয়ে যাবার অবকাশ পায়, মঞ্চে অনুষ্ঠিত বিপাককে অবশ্যম্ভাবী না ভেবে নেয়। কেননা এই বিশেষ অবস্থায় শিল্পীর উদ্দেশ্য ঠিক তার বিপরীত। তিনি চান দর্শক তার নিজের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে মঞ্চে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে থাকুক আর স্বাধীনভাবেই ঐ অবস্থায় তার নিজের কী বক্তব্য তা প্রয়োগ করে স্বয়ং ঐ বিশেষ চরিত্রের ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করুক। আবার এ পরিস্থিতি তখনোই সম্ভব—যখন মঞ্চে অনুষ্ঠিত ঘটনা অন্যভাবেও ঘটানোর অবকাশ থাকে। নাটকীয় সম্ভাবনার অপরাপর দিক দর্শকের মানসদৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়াই ব্রেখটের আসল উদ্দেশ্য। সমালোচকরা সাধারণত ব্রেখটীয় নাটককে যে বিশেষণে ভূষিত করেন—যেমন "হুক-কাটা নাটক" ইত্যাদি—তাই এখানে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষক অর্থাৎ ব্রেখটের নাটক-কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হ'ল নাটকের স্তরে স্তরে সাজানো প্লট। যা দর্শককে মোহগ্রস্থ করে তোলে যাতে নাটকের ঘটনাপ্রবাহ আর চরিত্রের পারস্পরিক অবস্থা অনায়াসেই খাপ খেয়ে যায় তেমন সবকিছুরই বিরুদ্ধে ব্রেখট প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর নির্ণয়ে ব্রেখটীয় রচনার বৈশিষ্ট্য হ'ল: উপস্থাপকের নিবেদন ও উপস্থাপনা (কাহিনী বা প্লট); দর্শককে সোজাসুজি সম্বোধন; নাট্যকারের আপন অভিমত জ্ঞাপন; এবং সবশেষে নাটকের সঙ্গীত।

বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্তরেরই আপন আপন বৈচিত্র্য আছে। নাটকের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার স্তর হিসাবে যা বর্ণিত হয়েছে তারই পাশাপাশি নৈতিক স্তরও সমানভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটক অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই নৈতিক বক্তব্যও সমানে দর্শকের সামনে উপস্থিত থাকবে। এছাড়া নাটকের সঙ্গীতের স্তরটির কথাও মনে রাখার প্রয়োজন। ব্রেখটের নাটকে সঙ্গীত ও নীতিকথা সাধারণভাবে নাটকীয় সংঘাতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে এক অতি উঁচু স্তরে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলোকে এমন সব উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে সংপৃক্ত করে দেয় যা নাটকে বর্ণিত স্থান কিংবা সময় সময় দৃশ্যেরও-বহির্ভূত। তবে স্থানান্তর ও দৃশ্যান্তরের এই সব পরিস্থিতি কল্পনাপ্রসূত কোন জগতের নয়, বরঞ্চ অভিজ্ঞতালব্ধ আমাদের এ জগতেরই উপাদান থেকে সংগৃহীত। ঘটনাপ্রবাহের রূপান্তর হবার অবকাশ যে সব সময় আছে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ দায়িত্ব ব্রেখটীয় নাটকের বিভিন্ন স্তরবিন্যাসকে পালন করতে হয়। নাটকের নামকরণ ও কাহিনীবস্তু এই প্রয়োজনীয়তাকেই সাহায্য করে অর্থাৎ এগুলিও ঐ সব বহিরাবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা নাটকের দৃশ্যান্তরে অবস্থিত; যেন একই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বহু নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে।

এ সব নাটকের মূল বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ বিশেষ কোন দৃশ্যের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। বরং বলা যেতে পারে দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরের সংযোজনেই বক্তব্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা সম্ভব। সাধারণ পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যই এক একটা উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। আবার প্রতিটি দৃশ্যের প্রতিটি স্তরের নিজস্ব বিশেষত্বও আছে। নাট্যবস্তুর সম্ভাব্য একটা ঐক্য যেন তেন প্রকারেণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নাটকের বিভিন্ন স্তর ও ঘটনাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে দেওয়া ব্রেখটের নাট্য-নীতির সুস্পষ্ট বিরোধী। তাঁর নাটকের গঠনশৈলী তা-ই এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে: নাটকের অন্তঃস্থ উপাদান অর্থাৎ নাটকের প্রতিটি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বর্ণিত মূল কাহিনী বিভিন্ন স্তরে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত। এই মৌলিক উপাদান সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে নাটকের ব্যাখ্যা সঙ্গীতগুলোকে মূল কাহিনী থেকে পৃথক করে নিয়ে অন্যান্য স্তরগুলির সঙ্গে সংযোজন করা দরকার। সঙ্গীতগুলো এমনই যে বিস্ফোরকের মত উপাদান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কাহিনীবহির্ভূত (সময় সময় নাটক বহির্ভূত) অন্য আর এক লোকে দর্শককে স্থানান্তরিত করবেই করবে। ব্রেখটের মঞ্চজগত নাটকের কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাঁর নাটকের কর্তব্যই হল নাটকে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা বারে বারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া। ব্রেখটীয় নাটকের একটি মাত্র গঠনপ্রণালী আর তা হল 'কাঠামোহীন গঠন'।

দর্শকের কাছে ব্রেখটের দাবী, স্তরবিন্যাস, স্থান ও কালের ভেদাভেদ যেন দর্শক আপনাথেকেই সৃষ্টি করে নেয়। দর্শকের যা প্রয়োজনে লাগবে তা হল তার dialectical বিচারবুদ্ধি অর্থাৎ অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার ক্ষমতা। অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার সম্বন্ধে ব্রেখট্ যা বোঝাতে চাইছেন তা হল নাটকের বস্তুসত্তা, নাটকের অসঙ্গতি, বিভিন্নতা, ঐক্যবিহীনতা আর পরস্পরবিরোধিতাকে সমষ্টিগতভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা; Mutter courage নাটকের পঞ্চম দৃশ্য সঠিকভাবে বোঝা তখনই সম্ভব, যখন টিলির যুদ্ধে জয়লাভ আর মাদার কুরাগের চারটি কামিজ চুরি যাওয়া একই সঙ্গে চিন্তা করে নেওয়া যায়। Dialectics তথা অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী অবস্থা পরস্পরবিরোধী থাকলেও মনে রাখতে হবে প্রচলিত নিয়মানুগ ধ্যান-ধারণাকে এই বিচারপদ্ধতি কঠিনভাবে আলোড়িত করে; উদাহরণস্বরূপ যেমন "যুদ্ধ" বলতে প্রচলিত অর্থে যা সবাই বুঝে এসেছে, dialectics বিচারে তা অবশ্যই অন্য রূপে ধরা দেবে। ব্রেখট প্রচলিত চিন্তা-ধারণায় এই আলোড়ন আনতে চান একটি মাত্র কারণেই—দর্শকের অনীহাকে সর্বক্ষেত্রেই ভেঙে দিয়ে তার সুপ্ত চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে।

"পরস্পর বিরোধিতাকে" অর্থাৎ বৈষম্যকে বিচার-বিশ্লেষণের মানদণ্ড করে বাস্তবকে আরো উদ্ভাসিত করার যে নীতি ব্রেখট অবলম্বন করেন, চরিত্র রূপায়ণেও তাঁর ঐ একই নীতি। প্রচলিত অর্থে আধুনিক নাটকের চরিত্র বলতে যা বোঝায় ব্রেখটের কোন চরিত্রকেই সে পর্যায়ে ফেলা চলে না। পরিপূর্ণ একটা চরিত্রে নির্দিষ্ট দোষ-গুণের যে সমাবেশ চরিত্রটিকে বিশেষত্ব দান করে, সাধারণ বিচারে ব্রেখটের প্রতিটি চরিত্রেই সে সবের অভাব থাকবেই। আবার ব্রেখটীয় চরিত্রের ব্যবহারিক বৈষম্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, সে বৈষম্য বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই কেবল চরিত্রগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা আনা সম্ভব।

"পরস্পরবিরোধিতার" প্রয়োগনৈপুণ্যে চরিত্রগুলির পারস্পরিক ব্যবহারে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তারই মাধ্যমে চরিত্রগুলির স্বকীয় বাস্তবতা মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার চরিত্রগুলো সম্বন্ধে তথাকথিত এক পূর্ণাবয়ব ধারণা আনতে হলেও ঐ একই অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার তথা dialectical বিশ্লেষণের আশ্রয় নিতেই হবে। ব্রেখটের কোন একটি চরিত্রেরও সঠিক বিশ্লেষণ কখনোই সম্ভব হবে না যদি সেই চরিত্রকে সাধারণ মানদণ্ডের বিচারে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। যে পরস্পর বিরোধিতাকে নাট্যকার সুচিন্তিতভাবে তাঁর নাটকে সন্নিবিষ্ট করেছেন চরিত্র বিচারের সময় স্মরণ করা দরকার যে ঐ পরস্পরবিরোধিতার সমন্বয় কখনোই কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

সবচেয়ে বড় কথা প্রচলিত অর্থে আদর্শ চরিত্র বলতে যা বোঝায় ব্রেখটীয় কোন নাটকেই তেমন তুলনীয় চরিত্র পাওয়া যাবে না। প্রতিটি চরিত্র তার নিজস্ব বৈষম্যে যে বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলে তার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দর্শক বাধ্য হয় চরিত্র মূল্যায়ণে নিজের আপন সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করবে। আর এই পদ্ধতি সক্রিয় করার উপায় হিসেবে ব্রেখট চরিত্রচিত্রায়ণে কখনো রহস্য, কখনো বা সন্দেহজনক জটিলতার সৃষ্টি করেন; কোন একটি নাটকীয় ঘটনার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কখনোই দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে দেবার চেষ্টা করেন না, বরং নাটকের প্লটকে এমন দ্রুতলয়ে এগিয়ে নিয়ে যান যার ফলে দর্শকের উপলব্ধি গাঢ়তর হতে থাকে এবং দর্শকের নিজস্ব চরিত্র-মূল্যায়ণের ও নাট্যবস্তু সমালোচনার স্পৃহা তীব্রতর হতে থাকে।

এ ধরণের পরিকল্পনায় নাটক ও চরিত্র সৃষ্টির ফলে নাটক-বিশ্লেষণে স্বভাবতই নানান সমস্যা উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। আগেই বলা হয়েছে চিরাচরিত নিয়মের মানদণ্ডে ব্রেখটের নাটক ও চরিত্রের মূল্যায়ণ কখনোই সম্ভব না। তাঁর কোন নাটককেই চিরাচরিত প্রথায় এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা যাবে না।

ব্রেখটের নাট্যবস্তুতে আর চরিত্রগুলির ব্যবহারে উত্তেজনা, সোচ্চার প্রতিবাদ, অনুশোচনার অভিব্যক্তি, বৈপরিত্য তো

আছেই, আরো আছে সমান্তরাল পথে অগ্রসর না হয়ে প্লটের গতিপরিবর্তনের প্রক্রিয়া। অতএব এ সব নাটকের বিশ্লেষণে সর্বপ্রধান কর্তব্য নাটকের আপাত-বিশৃঙ্খল সীমাহীনতাকে সহজবোধ্য করে তোলা, সমস্ত বৈষম্যকে যুক্তিগ্রাহ্যতার মধ্যে সুসংবদ্ধ করা। কোন কোন উপঘটনা এ সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন থেকে গেলে ঐ উপ-ঘটনাটিকে মূল কাহিনীর সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশ্লেষণ চলাকালে অবশ্যই সব সময় মনে রাখতে হবে এবং ব্রেখটেরও তা-ই মত—নাটকের বস্তুসত্তার কোন হানি কোন অবস্থাতেই যাতে না ঘটে। মূল বক্তব্য অবশেষে যা দাঁড়াচ্ছে তা হল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সজাগ রেখে নাটকের প্রত্যেকটি ঘটনা উপঘটনার সুতীক্ষ্ণ অনুধাবন। এই প্রয়োজনীয় কর্তব্যটি অবশ্যই এত বিরাট ও বৈচিত্র্যময় যে অনায়াসেই বলা চলে বিশেষণধর্মী এ সব নাটকের বিশ্লেষণ বোধ হয় কখনোই শেষ হবার নয়।

শরৎ ভাবনার কয়েকটি দিক

২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ছিলেন নীরব সাক্ষী। তাই তিনি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গেই বলতে হবে তাঁর ঘটনা কাহিনী একান্ত-ভাবে বাঙালী জীবন-কেন্দ্রিক হলেও তার মধ্যে বহুস্থলেই ভূগোল—ইতিহাসের সীমা মুছে গিয়ে চিরকালের মানুষের শোভা-যাত্রাই ফুটে উঠেছে। কারণ বাংলার বাইরে ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর গ্রন্থ সবচেয়ে বেশী বিক্রী অতীতে হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। শুধু তাই নয় বাঙালীর সমাজ জীবনও পারিবারিক সুখদুঃখের সঙ্গে পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কেরল, অন্ধ্রের মিল অতি সামান্য। তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত প্রদেশে অনুবাদের মারফতে তাঁর উপন্যাস ও গল্প জনপ্রিয় হয়েছে।

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নারী চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মমতা ও দরদের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলা যায় আমাদের সমাজে নারী যুগ যুগ ধরে নির্যাতিতা। তাঁর চরিত্রগুলোতে বাস্তবতার প্রচণ্ড ছোঁয়া ছিল। কিন্তু এই বাস্তবতাকে তিনি খুব নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলোর বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমার চরিত্রগুলির 90% Basis সত্য! (নাইন্টি পারসেন্ট বেসিস সত্য)। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সত্য মাত্রই সাহিত্য নয়......কিন্তু সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। বনেদ নিরেট হলে আর ভয় নেই।"

সমাজের মধ্যে অসাম্য যে শিকড় গেড়েছিল তা তিনি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে অর্থনৈতিক চিন্তারও প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

অপরাজেয় কথাশিল্পী ভারতমাতাকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত করবার স্বপ্নও দেখে ছিলেন। এই স্বপ্ন তাঁর সাহিত্যে বাস্তব রূপ নিয়েছিল। রাজনৈতিক চিন্তাধারার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি তাঁর সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে বিশেষ করে 'পথের দাবীতে'।

যা দেখেছেন, যা পেয়েছেন, জীবনে সেই সব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দিয়ে সাহিত্য রচনা করে শরৎচন্দ্র সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি যতো পেয়েছিলেন, নিন্দা-দুর্ণাম-নির্যাতন-ও তার চেয়ে কিছু কম সহ্য করেননি। আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে, সাহিত্য রচনার জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল, নিজেরই গ্রামে 'একঘরে' হয়ে-ছিলেন, মিথ্যা মামলার আসামীও হতে হয়েছিল তাঁকে। আমাদের এই বাংলা দেশেই মাত্র পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে শরৎচন্দ্রের যুগে নীতিবাগীশের দল তাঁর লেখাকে 'অশ্লীল' বলে অভিহিত করে পড়তে নিষেধ করেছিলেন। 'চরিত্রহীন' রচনা করে স্রষ্টাকেই সেদিন 'চরিত্রহীন শরৎ চাটুজ্যে' আখ্যা নিতে হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন সম্ভোগবিরোধী নীতিবিদ, ইংরেজীতে যাকে বলে 'Puritan'। শরৎসাহিত্যের মূলে কল্যাণবোধ প্রবাহিত ছিল। মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর শিল্পসৃষ্টি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

স্বদেশী মনোভাবকে উদ্দীপিত করেই আর্থিক পরিস্থিতিকে আমরা উন্নত করতে পারব। স্বদেশীর অর্থ এই নয় যে আমরা একদম আমদানী করবনা। স্বদেশীর অর্থ কেবল এই যে আমরা যতটা সম্ভব সাশ্রয় করব, আমাদের নিজেদের তৈরী পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করব এবং আমাদের সম্পদের পুরো সদ্ব্যবহার করব। কিন্তু নতুন কারিগরী কলা-কৌশল শেখার জন্য যদি কিছু আমদানী করতে হয় তবে তা করতে আমাদের দ্বিধা থাকবেনা। স্বদেশী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুল-বার দায়িত্ব সরকারের একার নয়। গ্রাম ও শহরের প্রতিটি নাগরিক-কেই স্বদেশী জিনিস জনপ্রিয় করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

ইন্দিরা গান্ধী

খেলা ধুলা
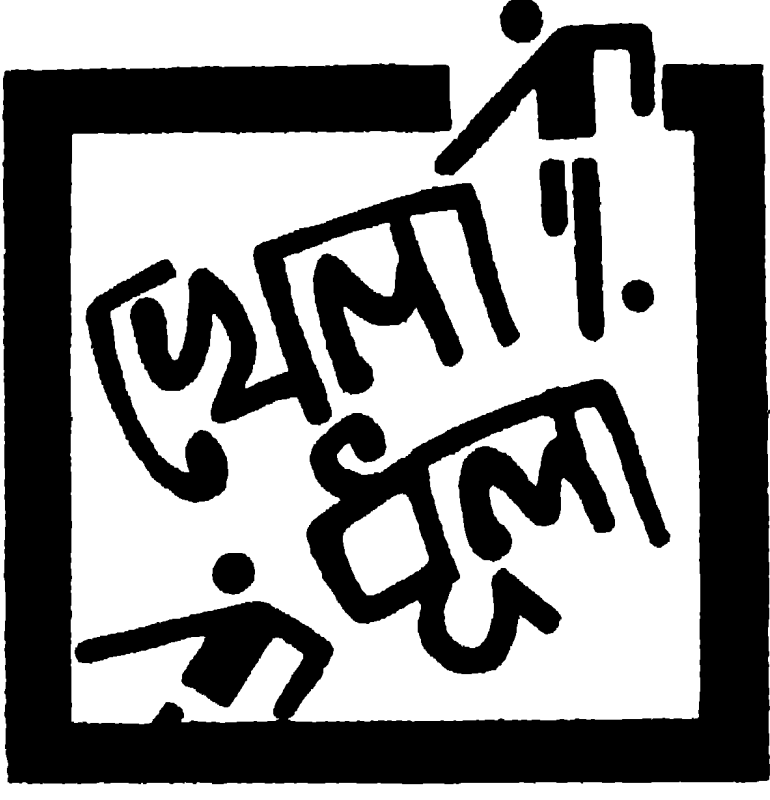
"আমি খুব হ্যাপি—খুব খুশী নাকিও বলতে পারি বৈকি। এবছর এত সব ভাল ভাল খেলোয়াড়দের পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পর পর কয়েক বছর আমাদের খুব খারাপ সময় গেছে। এবার আমি দলনায়ক। প্রদীপদার মত সুন্দর ও কাছের মানুষকে এবছর আমরা কোচ হিসাবে পেয়েছি। সেদিক থেকে নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে হচ্ছে। নিজেদের দলগত সংহতি বাড়াবার জন্য আমি প্রতিটি খেলোয়াড়ের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করছি। দলের নায়ক আমি—কিন্তু সবার আন্তরিকতা আর ঐকান্তিকতায় এবার আমরা লীগ শীল্ড তথা সর্ব-

কনফিডেন্সই বড় মুলধন

প্রশান্ত মিত্র

ভারতীয় সকল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার মত আশা রাখি। তবে যতক্ষণ না সেই শেষের লগ্ন আসে ততক্ষণ তো প্রতীক্ষায় থাকতে হবে!" আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়-পুরো ৫ ফুট সাড়ে ১১ ইঞ্চি লম্বা সুঠাম দেহী প্রশান্ত মিত্র এবছর মোহন-বাগান অর্থাৎ ঐতিহাসিক সবুজ-মেরুন জার্সি পরা ক্লাবের অধিনায়ক। দলের অধিনায়ক হবার পর কি ভেবেছেন জিজ্ঞাসার উত্তরে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মুখে একরাশ উজ্জ্বল হাসি এনে উপরের কথা-গুলো বলেছিলেন। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন হাবিব।

শ্যামনগর যুগের প্রতীক ক্লাবে কেষ্ট পালের কাছে ফুটবলের হাতেখড়ি হয় ১৯৬৬ সালে। পরের বছর বেহালা ইয়ুথ'এ এসে ভ্রাতৃ সংঘের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে রানার্স হয়। জ্যোতিষদা নিয়ে গেলেন ইষ্টবেঙ্গলে ১৯৬৮তে। জুনিয়ার দলে খেললেও ডুরাণ্ডে দলের সংগে প্রশান্তকে নিয়ে যান। এবং কয়েকটা প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিয়েছিল প্রশান্ত। ১৯৬৯ থেকে '৭১ তিন তিনটে বছর খিদিরপুরে কাটিয়ে চলে আসে প্রশান্ত ৭২-এ মোহন-বাগানে। সেই থেকে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে খেলে চলেছে প্রশান্ত। নিজের উপর ভীষণ আস্থা। দলের সংকটজনক মুহূর্তে ভীষণ নির্ভরশীল একজন খেলোয়াড় এই প্রশান্ত। জুনিয়ার জাতীয় প্রতি-যোগিতায় খেলার সুযোগ না এলেও সন্তোষ ট্রফিতে প্রশান্ত বাংলা দলের একজন অপরিহার্য্য খেলোয়াড় সেই '৭৩ সাল থেকে। ১৯৬৯ সাল থেকে ডুরাণ্ড-রোভার্সে নিয়মিত গেছে। বরদলুই ট্রফিতে ঐ '৬৯ থেকে যাচ্ছে প্রশান্ত। এবং মধ্যে ১৯৭৪ সালটা ওর কাছে স্মরণীয় বছর বলা যেতে পারে। এশিয়ান ইয়ুথ গেমস ব্যাংকক, মারডেকা, মালয়েশিয়া এবং এশিয়ান গেমস তেহেরানে প্রশান্ত মিত্র নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তিন তিনটে বড় আসরে একই বছর প্রতিনিধিত্ব করা যথেষ্ট কৃতিত্বের নিঃসন্দেহে।

স্মরণীয় খেলার কথা আজও প্রশান্ত'র মনে আছে। "উঃ কি থ্রিলিং গেম। ১৯৭৪ সালের মে মাস। এশিয় যুব ফুটবলের ফাইন্যালে টপ ফেভারিট ইরানের সঙ্গে খেলা। ইরান ঐ বছর কোন দলের কাছে একটিও গোল খায় নি। বরঞ্চ প্রতিটি দলকে ৪।৫ টা করে গোল দিয়েছে। খেলা সুরুর ২০ মিনিটের মাথায় ইরান সুন্দর একটা গোল করে এগিয়ে যায়। গোল খেয়ে ভাবলাম এবার পর পর গোল খেয়ে গো-হারান হারব। কিন্তু দলের প্রতিটি খেলোয়াড় ভীষণভাবে লড়াই করছে। হায়নার মত হানা দিচ্ছে ইরানের গোল লাইনে। বিশ্রাম পর্যন্ত হারছি এক গোলে। কোচ অরুণদা বললেন, তোরা স্লো গেম খেল। সর্ট পাশ করে খেল, সুবিধা হবে। সেই উপদেশমত খেলা শুরু করলাম বিশ্রামের পর। খুব ভাল ফল হ'ল। দলনায়ক সাবির আলি এক্কেবারে সুরুতেই গোল দিয়ে খেলায় সমতা আনলো। তখন ইরান মরিয়া হয়ে উঠেছে। খেলা শেষ হ'ল অমীমাংসিত ভাবে। ৯০ মিনিট খেলার পর আবার এক্সট্রা ১৫ মিনিট খেলা শুরু হ'ল। পরিশ্রান্ত-ক্লান্তিতে শরীর মন ভরপুর। কিন্তু অদম্য উৎসাহে খেলা শুরু করেই লতিফুদ্দিন গোল দিয়ে দেয়। মাঠের সবাই ভেবে নিয়েছিল ভারত এবার উইনার্স হয়ে গেল। কিন্তু জেকভ পেনাল্টি সীমানায় ফাউল করায় ফ্রিকিক পেয়ে যায় ইরান। গোলের জন্য মরিয়া ইরান দলের সকলে একেবারে উপরে উঠে এল। গোলে বল না মেরে সেণ্টার করলো। পর পর তিনজন হেড মিস করলো। চতুর্থজন হেড করে বলটাকে জালে জড়িয়ে দিলো। আমি হা, করে হতভম্বের মত বলের দিকে তাকিয়ে। সেণ্টার হ'ল। খেলা ভাঙ্গার বাঁশী বাজলো। অমীমাংসীত হয়ে যুগ্ম বিজয়ীর সম্মানেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। গোলশেষ থেকে আরম্ভ করে আজও কেবলি বিবেকের দংশনে আমি জ্বলছি। একটু যদি এলার্ট থাকতাম গোলটা হত না।"

চার ভাই তিন বোনের মধ্যে প্রশান্ত দ্বিতীয়। '৭২এ বি. এ. পাশ করে আইন পড়ছে এখন। শ্যামনগর হিন্দুস্থান লিভারে একাউন্টসে চাকরী করে। ফরিদপুরের ছেলে হলেও জন্ম এখানেই।

মাণিক লাল দাস

বিধান চন্দ্রের নামে ক্লাব ভবন

দিন কয়েক আগে সি. এ. বির 'ক্লাব হাউজের' শিলান্যাস করা হয়। বিধান রায়ের নামে ইডেনের এই নতুন ক্লাব ভবন তৈরী করতে কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হবে। তিন তলা এই বাড়ীর এক তলায় থাকবে সি. এ. বির অফিস, খেলোয়াড়দের খাওয়ার, শুশ্রুষার, চিকিৎ-সার ও থাকার ঘর। ওপর দুটি তলায় মোট সতেরো শ দর্শকের বসার জায়গা থাকবে। অবশ্য এর মধ্যে থাকবে রেডিও, টি. ভি. ও সাংবাদিকদের আসন। খেলোয়াড়দের ও নিমন্ত্রিত ভি. আই. পি-দের জন্যে নির্দ্দিষ্ট জায়গা।

সিনেমা

উপভোগ্য অথচ রুচিসম্পন্ন ও শিল্পসমৃদ্ধ ছবি তৈরিতে তপন সিংহ অদ্বিতীয়। তাঁর সৃষ্টি তালিকায় নতুন উল্লেখযোগ্য সংযোজন হারমোনিয়াম। সাম্প্রতিক সমাজ সমস্যা বা কোনো চরিত্রের সংকট বিশ্লেষণ নয়। অনেকটা হালকা দৃষ্টিতে কিছু ঘটনা, কিছু চরিত্র আর কৌতুককর মজাদার পরিণতিগুলিকে কেন্দ্র করে রসসিক্ত একখানি রমণীয় ছবি উপহার দিয়ে তিনি পুনঃপ্রমাণ করলেন যে নাটকীয় এবং ঘটনা-বহুল গল্পের চিত্রায়ণে এখনও তিনি প্রথম সারিতে।

সুরবদ্ধ হারমোনিয়াম

জমিদারি উঠে যাচ্ছে। নীলাম হয়ে গেল সব জিনিসপত্র। বাবা ভূপেন্দ্র-কিশোরের কেনা বিমলার প্রাণের সঙ্গী হারমোনিয়ামটাও নীলাম হোল মাত্র দু'শ টাকায়। বিমলা আশ্রয় নিলেন দয়ালু গৃহভৃত্য বিরজুর কাছে।

হারমোনিয়ামটি এলো এক কেরানী পরিবারে। সেখানে কিশোরী বাসন্তী আর গানের মাষ্টার অশোকের প্রণয়কে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের চেহারা দেখা গেল। এর পরে পরিচালক কিছু কৌতুক-কর ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন দৃশ্যায়ন ভঙ্গিতে। সংলাপে (কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রুতিকটু লাগে বটে) স্যাটায়ারের লক্ষণ রয়েছে। ফলত যেখানে তিনি সিরিয়াস হবার চেষ্টা করেছেন সেখানে তা সফল-রূপ পায়নি।

এরপর হারমোনিয়ামটি বিক্রীত হয়ে গেল পতিতালয়ে। গান পাগল রতন সেটি উপহার দিল প্রেয়সী শ্যামাকে। শ্যামাকে যে এই পাপ ব্যবসায় নামিয়েছে সেই হারান নামক অসামাজিক যুবকটি রতনকে সহ্য করতে পারে না। একদিন রাত্রে তার ক্রোধের শিকার হয়ে রতন খুন হয়, আর পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় হারান।

এই পর্বে পরিচালক অপেক্ষাকৃত সিরিয়াস। হালকা কৌতুকভঙ্গি প্রায় অনুপস্থিত। চরিত্রগুলির আচার আচরণেও বাস্তবতার ছাপ বেশী। শ্যামাকে অতি সহজেই একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে চিনতে পারা যায়। পাড়ার মাসীর চরিত্রটিও সুন্দরভাবে চিত্রিত। তৃতীয়বার হাত ফেরত হয়ে হারমোনিয়াম যে বাড়ীতে গেল তা বিমলারই প্রতিবেশীর বাড়ী। সে বাড়ীর মেয়ে বিমলার প্রিয়পাত্রী। হারানো হারমোনিয়ামটি ফিরে পেয়ে তিনি খুশী হলেন।

ছবির এই অংশটি শুচিস্নিগ্ধ, বাস্তবসম্মত। এখানে পরিচালক বিমলার ট্র্যাজেডির সঙ্গে প্রতিবেশী ভদ্রলোকটির একাকীত্বকে সমীকরণ করেছেন। সুসংবদ্ধ সংলাপ ও দুজনার নিরুচ্চার চাউনিতে উভয়ের ব্যথা বেদনার পারস্পরিক বোঝাপড়ার কাজটি হয়েছে। পরিচালনার মুন্সিয়ানা এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়।

একটি নিষ্প্রাণ হারমোনিয়ামকে ঘিরে তিনটি বাড়ীর কাহিনীর মধ্যে যদিচ ট্র্যাজেডির সুরটাই স্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্র চিত্রায়নভঙ্গী সুষম নয়। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও কিছু সমস্যার প্রতি তিনি কখনও তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ করলেও তা গভীরতা পায়নি। সম্ভবত যে বিদেশী ছবিটির (ইয়েলো রোলস রয়েস) প্রেরণায় 'হারমোনিয়ামে'র সৃষ্টি এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ছবির সেই গভীরতা দ্বিতীয়টিতে অনুপস্থিত। অবশ্য তপন সিংহের তেমন কোনো সদিচ্ছাও বোধ হয় ছিল না। মজাদার কৌতুককর একটি ছবি করার উদ্দেশ্য ছিল প্রধান। নইলে ভানু ব্যানার্জীকে দারোগা বা সন্তোষ দত্তকে দিয়ে অমন কমোডিয়ান সুলভ আচরণ করাবেন কেন?

ছবিতে যেহেতু হারমোনিয়াম আছে সুতরাং গানের সংখ্যাও কম নেই। এবং প্রতিটি গানই মন মাতানো সুরে শিল্পীরা গেয়েছেন। বিশেষ করে হেমন্তর গাওয়া

হারমোনিয়াম ছবিতে দেবিকা দাস ও সোনালী গুপ্ত
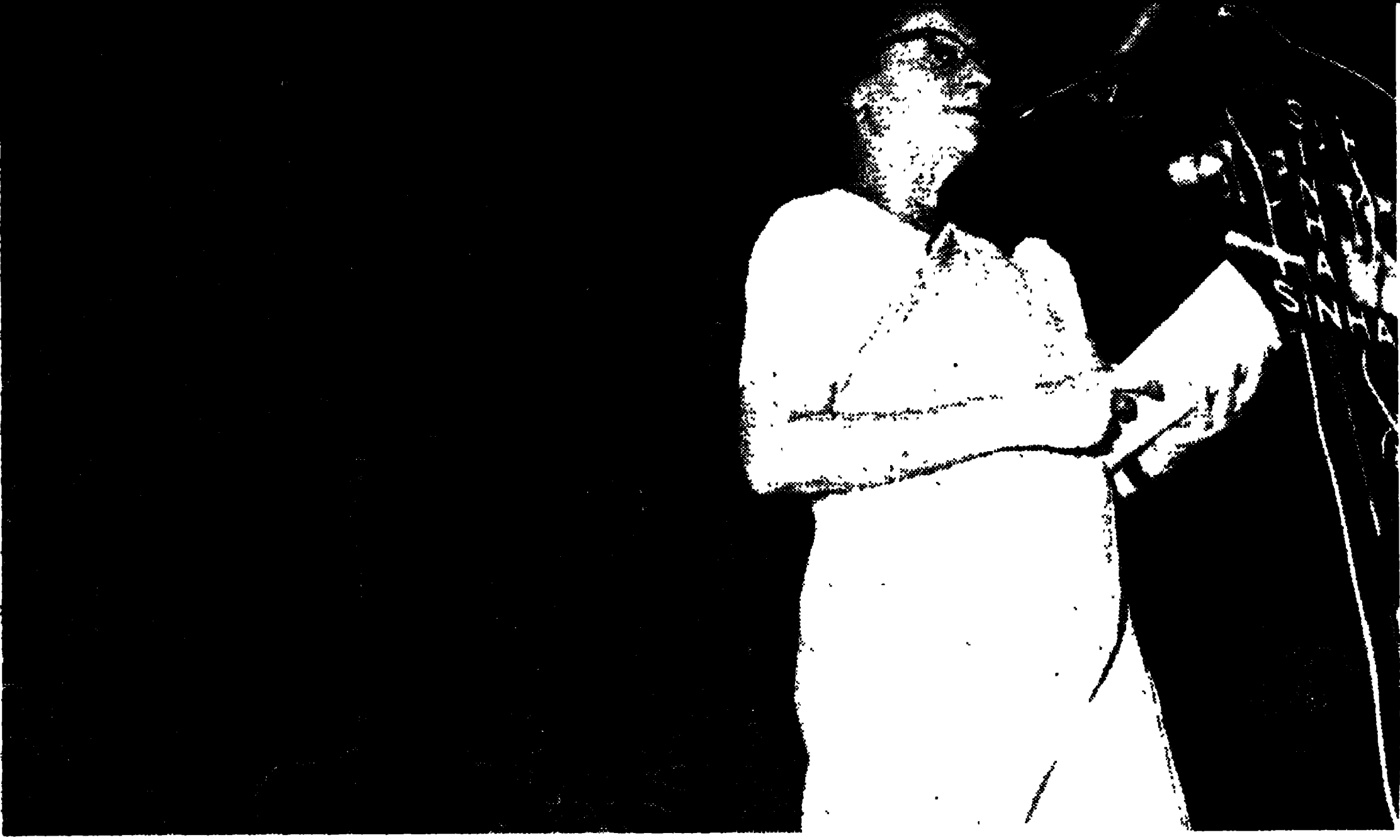
শক্তি ও স্বনির্ভরতা অর্জনের মন্ত্র অনলস পরিশ্রম

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভিশন অব সায়েন্সের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী

গত ২৯ শে জুলাই কলকাতায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটি-ভেশন অব সায়েন্সের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, জাতির নবজাগরণে এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রজ হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। এই প্রতি-ষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নামের তালিকা যেকোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গর্বস্বরূপ। এই তালিকায় আছেন–বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্র সরকার, জগদীশ চন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সি. ভি. রমন, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ ও কে. সি. কৃষণ। তাঁরা শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতকে দেখিয়েছেন আলো। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অবদানের স্থান থাকলেও বর্তমান যুগে নতুন জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্য যৌথ প্রয়াস একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের এখন কাজের মান ও সুফলের দিকে নজর দেবার সময় এসেছে। কয়েকজন নিশ্চয়ই সময় দেবেন নতুন নতুন আবিষ্কারের গবেষণায়। কিন্তু বাকিদের অগণিত শহর ও পল্লীবাসীর মধ্যে তার সুফল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সাথে সাথে। বিজ্ঞানীদের সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব অনেক বেশী। উৎপাদন নয়, প্রয়োগ যেখানে লক্ষ্য সেখানে শুধু কিছু ডিগ্রীধারী সৃষ্টি নয় কিশোর ও যুবক যুবতীদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে পারলেই এই প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, সাম্প্রতিক বিজ্ঞান বিপ্লবে যোগ দিতে গেলে ভারতকে অনেক বেশী দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা জানি মানব জীবনে নিজেকে এবং নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে চাওয়ার যে ইচ্ছা তাই থেকেই বিজ্ঞানের মূল। এই চিন্তা থেকেই প্রাচীন সভ্যতা বর্তমান যুগে এগিয়ে এসেছে। আমাদের অতীত যেমন গৌরবময় ছিল সেই মান বজায় রাখার জন্যই আমাদের দেশে অগণিত জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন একান্ত-ভাবেই প্রয়োজনীয়। এবং এর দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের উপর। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমেই আমরা জনগণের মৌল প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারি। এবং তার দ্বারাই উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকায় আমি আমাদের অভাব অসুবিধার কথাগুলি জানি। কিন্তু তবু বলতেই হবে সব মিলিয়েও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। আমাদের সাফল্যের নিদর্শন রূপে শুধু পোখরান বা আর্যভট্ট নয়–ইস্পাত, সেচ, কৃষি ও শক্তির উল্লেখও আমরা করতে পারি যেখানে আমাদের উন্নতি অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, এখন আবার একটা নতুন ধরণের উপনিবেশবাদ দেখা যাচ্ছে—সমুদ্র সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে। এবং এখানেও যাঁরা প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে শক্তিশালী তারা এর সুযোগ আরো বেশী করে গ্রহণ করছেন। আজ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে এসমস্যা মোকাবিলা করার জন্য, যাতে আমরা এ সম্পদের সমান ভাগ পেতে পারি।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অগ্রণী পাক্ষিক

১৫ আগষ্ট ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ—মনোজ বিশ্বাস
ওলিম্পিকের আলোকচিত্র—
অমিয় তরফদার

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬
প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদকের কলমে

গত জুলাই মাসে বরণীয় তিন স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্ম-জয়ন্তী বিশেষ মর্যাদা সহকারে সারা দেশে পালিত হল। এদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক স্মরণীয় হয়ে আছেন তার ঐতিহাসিক শ্লোগান, 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার' এর জন্য। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ ও বি. কে. দত্ত উভয়েই দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বলি দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এরকম শত শহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। আজ ১৫ই আগষ্ট এই পুণ্যদিনে জাতি স্মরণ করছে সেই সব শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের।

শুধুমাত্র এঁদেরকে স্মরণ করলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদিগকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে ও তাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যতদিন আমরা অর্জন করতে সক্ষম না হচ্ছি ততদিন আমাদের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম সুরু হয়েছে সেদিন থেকে, যেদিন শেষ হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম। নানা কারণে সেই ঈপ্সিত আর্থিক স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি আশানুরূপ ভাবে দানা বাধতে পারেনি স্বাধীনতার লাভের বেশ কয়েক বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গতিশীল নেতৃত্বে দেশে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের যুগ সুরু হয়েছে।

যে সংগ্রামের মুখোমুখি দেশ আজ উপনীত সে সংগ্রামে জয়লাভ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত এবং নানা কার্যকরী অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্যে প্রতিফলিত। যে দেশ একদিন সামান্য আলপিন থেকে সুরু করে প্রায় সব জিনিসের জন্যই বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল আজ সেই দেশ সেই সমস্ত জিনিসতো আমদানী করছেই না বরং অনেক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও অসংখ্য ভোগ্যদ্রব্যও বিদেশে রপ্তানী করছে। স্বয়ম্ভরতার পথে দেশ আজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশ যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমরা যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কুড়িদফা অর্থনৈতিক কার্যসূচী রূপায়ণের ফলে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন লক্ষণীয়। মুদ্রাস্ফীতি রোধ হয়েছে, চোরাকারবারী, কালো বাজারী, ও মুনাফাখোরদের মত সামাজিক শত্রুর সংখ্যা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে এদের অবস্থার আকাঙ্খিত পরিবর্তন হতে সুরু করেছে। সর্বস্তরে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। এই উন্নতির গতিকে অব্যাহত রাখতে সকলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শপথ নিতে হবে, দেশকে আমরা স্বয়ম্ভর করে তুলবই। আজ সেই শপথ গ্রহণের দিন। আমাদের শ্লোগান হোক, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শুধু নয়, 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার'।
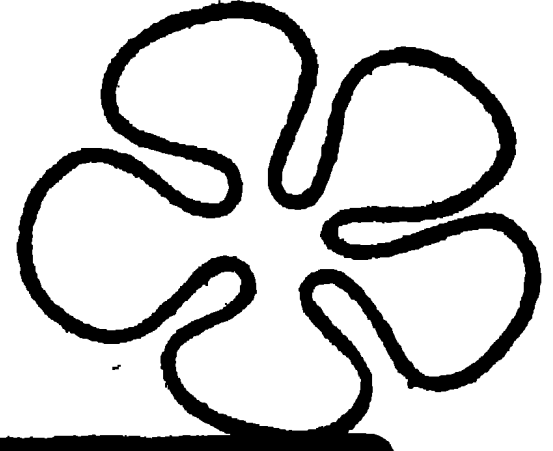
স্বনির্ভরতার পথে

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ভারতের মতো যে-সব দেশকে দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় থাকতে হয়েছে তাদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা খুবই কঠিন। আর পাঁচটা ঔপনিবেশিক শাসনের মতো ইংরেজও আমাদের দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের দিকে সামান্যই নজর দিয়েছিল। আমাদের দেশ প্রধানত ছিল বৃটেনের কল-কারখানার কাঁচা মালের যোগানদার। ফলে এদেশে কল-কারখানার বিস্তার ঘটেনি, চাষের খেতেও আসে নি কোনো নতুন জোয়ার। ইংরেজদের এই ইচ্ছাকৃত নীতির উদ্দেশ্য ছিল একটাই: ভারতকে পরমুখাপেক্ষী, অর্থাৎ ইংরেজদের মুখাপেক্ষী করে রাখা। এই রকম একটা অবস্থা থেকে দেশকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠোর সাধনার ব্যাপার, যদিও সাধনা একাই সাফল্যের পুরো গ্যারান্টি নয়, কারণ এই স্বনির্ভর হয়ে ওঠা-না-ওঠা অনেক সময় এমন সব ব্যাপারের ওপর নির্ভরশীল যা সংশ্লিষ্ট দেশের আয়ত্তের বাইরে। সে-প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

আপাতত আমরা এই স্বনির্ভরতা কথাটার অর্থ একটু বিশদ করে নিতে পারি। স্বনির্ভরতা আর স্বয়ং সম্পূর্ণতা (সেল্ফ রিল্যায়েন্স আর সেল্ফ সাফিসিয়েন্সি) কিন্তু ঠিক এক জিনিষ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, এই দুনিয়ায় কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, এমন কি হতেও পারে না। একটি দেশকে কোনো না কোনো ব্যাপারে অপর অনেক দেশের ওপর নির্ভর করতেই হয়। তার ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ইত্যাদি নানা কারণ থাকাই সম্ভব। তা ছাড়া প্রতিটি দেশ যদি নিজের প্রয়োজনীয় সব কিছুই নিজে উৎপাদনের চেষ্টা করে তবে এক ধরণের অপচয়ও হয়, তার সঙ্গে বন্ধ হয় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ যদি না-হওয়া যায়, স্বনির্ভর হয়ে উঠতে কোনা বাধা নেই। যে-জিনিস আমাদের দেশে মেলে না, তা অপর দেশ থেকে যোগাড় করতে হবে, কিন্তু সেই যোগাড়টা আমরা করব আমাদের সামর্থ্যেরই দ্বারা, অন্য কোনো দেশের কাছে হাত পেতে নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, আমাদের যদি পেট্রোলিয়ামের ঘাটতি থাকে তবে তা আমরা বিদেশ থেকে আনব, কিন্তু সেই আমদানির জন্যে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা আমরা যোগাড় করব আমাদেরই দেশের অন্য কোনো পণ্য বা সার্ভিস বেচে। অন্য আর পাঁচটা দেশের মতো আমাদেরও লক্ষ্য এই ধরণের স্বনির্ভরতা অর্জন।

আমরা স্বাধীনতার পর যে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ ধরি তার লক্ষ্যই হলো দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা। চারটি পাঁচশালা যোজনার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, তিনটি বার্ষিক যোজনাও শেষ হয়েছে, এখন চলছে পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার পালা। এই সব যোজনা রূপায়ণের পথে দেখা দিয়েছে নানা বাধা, সব সময় সব নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হয় নি। তবু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই সব যোজনায় বিপুল পরিমাণ লগ্নী গত ২৯ বছরে আমাদের বৈষয়িক ব্যবস্থার চেহারা বদলে দিয়েছে। চতুর্থ যোজনা পর্যন্ত মোট প্রায় ৫৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃথা যায় নি। পঞ্চম যোজনায় এই বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই পরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে ভারত কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধির পথে অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে। খাদ্যশস্য, কৃষিজাত অন্যান্য পণ্য, কল-কারখানায় তৈরি জিনিস—সব কিছুরই উৎপাদন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বেড়ে গেছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ধারার মধ্যে একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষণীয়। সেটা হলো, মোট উৎপাদনের হিসেবের মধ্যে কৃষির আনুপাতিক অংশ ক্রমশ
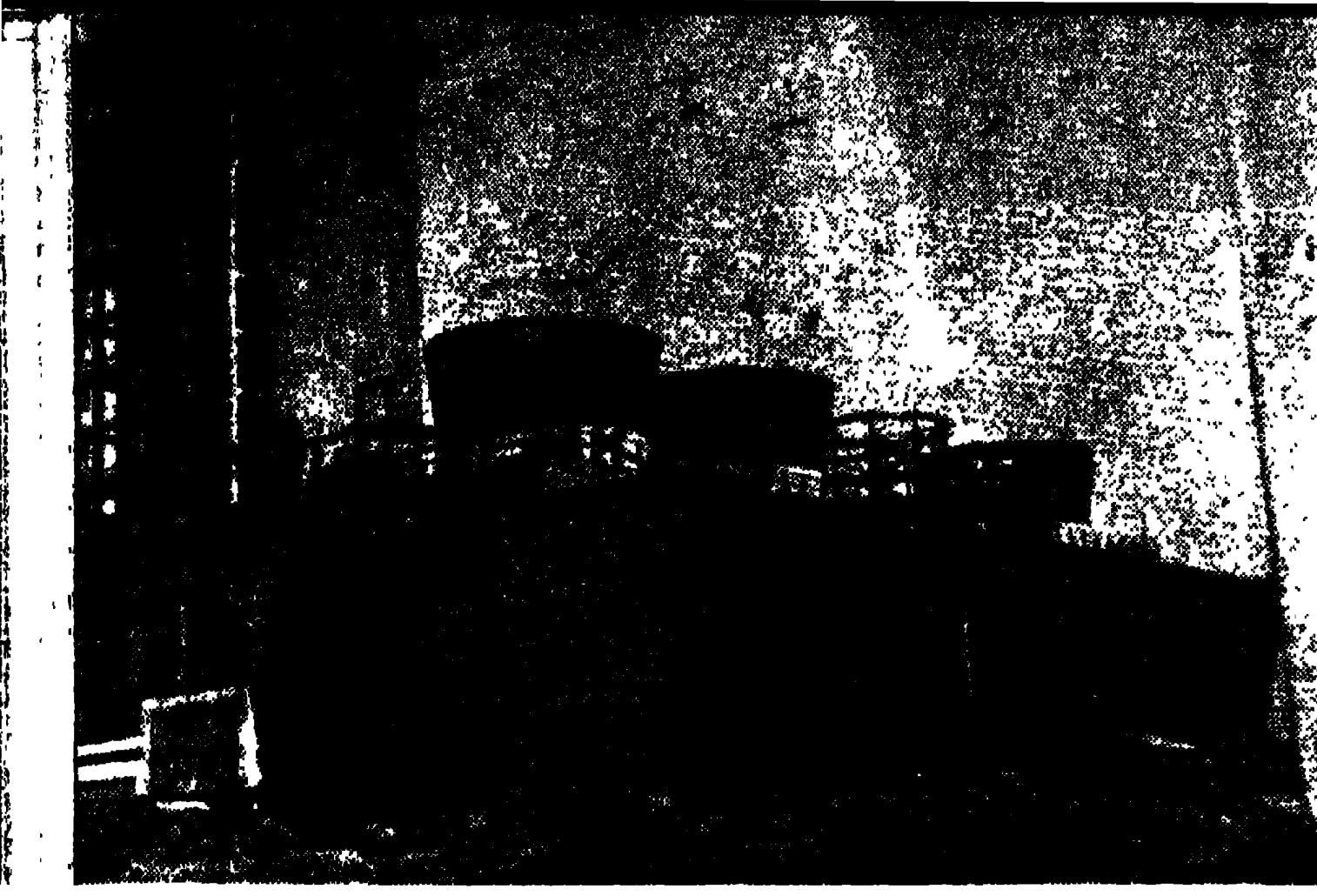
তালচেরে দেশের বৃহত্তম কয়লা ভিত্তিক সার কারখানা

কমে আসছে এবং কল-কারখানা, খনি, বিদ্যুৎ, যানবাহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনের অংশ ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের বৈষয়িক ব্যবস্থার ক্রমিক রূপান্তরেরই লক্ষণ এটা।

আমাদের এই উন্নয়নের পথে বিদেশী অর্থ সাহায্য যে দরকার হয়নি তা মোটেই নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত যোজনার কাজে আমরা মোট যতো টাকা লগ্নী করেছি তার কথা মনে রাখলে দেখা যাবে, বিদেশী অর্থ সাহায্যের ভূমিকা নিতান্তই সামান্য। তা ছাড়া, এই অর্থ সাহায্যকে 'সাহায্য' আখ্যা দিলে মোটেই ঠিক বলা হয় না। বিদেশী সাহায্য হিসেবে এযাবৎ আমরা যা পেয়েছি তার অধিকাংশই হলো ঋণ এবং সেই ঋণ আমাদের সুদে-আসলে শোধ করতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

পঞ্চম যোজনার যে খসড়া তৈরি হয়েছিল তার দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল: দারিদ্র্য দূর করা এবং স্বনির্ভরতা অর্জন। অনেকে হয়ত জানেন না, এই দুটি লক্ষ্যের মধ্যে একটা যোগাযোগও আছে। দারিদ্র্য যদি দূর করা যায়, অর্থাৎ নিচের তলার মানুষের যদি আয় বাড়ে তবে তাতে স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য হয়। কারণ নিচের তলার মানুষের আয় বাড়লে তাঁরা সেই আয় দিয়ে এমন সব জিনিস কিনবেন যার মধ্যে আমদানি-করা পণ্যের অংশ হবে খুবই সামান্য। বিশেষ করে খাদ্যশস্য আমদানির যদি দরকার না থাকে। পঞ্চম যোজনার খসড়া যখন তৈরি হচ্ছিল তার আগে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে নতুন রেকর্ড তৈরি হয় (১৯৭০-৭১ সালে) এবং আমদানির পরিমাণও ক্রমশ কমতে থাকে। স্থির হয়, বিদেশী অর্থ সাহায্যের ওপর নির্ভরতাও ক্রমশ কমিয়ে ফেলা হবে। তখন যা অবস্থা ছিল তাতে ভাবা হচ্ছিল, পঞ্চম যোজনার শেষে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছানো যাবে যাতে পুরোনো ঋণ শোধ করার জন্যে যতোটুকু দরকার তার বেশি বিদেশী সাহায্য আমরা নেব না। এই রকম একটা লক্ষ্য নির্ধারণের কারণও ছিল। আমরা যে বিদেশী সাহায্য পাচ্ছিলাম তার পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছিল। যেমন, ১৯৬৭-৬৮ সালে আমরা বিদেশী সাহায্য পেয়েছিলাম ১১৯৬ কোটি টাকা। এই অঙ্ক কমতে-কমতে ১৯৭২-৭৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৬৬৬ কোটি টাকায়।

কিন্তু এর পরেই দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। প্রথমত, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খরার জন্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন মার খায়, ফলে আমদানির পরিমাণ আবার বাড়তে সুরু করে। তবে তার চেয়েও বড় কথা, আরব-ইস্রায়েলি যুদ্ধের (১৯৭৩) পরিণতিতে অশোধিত তেলের দাম লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়তে সুরু করে। যদিও ইরাণ বা আরব দেশগুলো এইভাবে দাম বাড়িয়ে ধনী দেশগুলিকেই শায়েস্তা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এর ফলে সত্যি করে সংকটে পড়লো ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশ। অশোধিত তেল এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম-জাত পণ্য আমদানি বাবদ আমাদের খরচ দেখতে দেখতে পাঁচ গুণ বেড়ে গেল। ১৯৭২-৭৩ সালে এই বাবদ খরচ হয়েছিল ২০৪ কোটি টাকা, আর ১৯৭৪-৭৫ সালে খরচের পরিমাণ দাঁড়ালো ১১৫৬ কোটি টাকা। এই জন্যেই গোড়ায় বলেছিলাম যে, স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে অনেক সময় এমন অনেক বাধা আসে যা সব সময় কোনো একটি বিশেষ দেশের আয়ত্তে থাকে না। আর শুধু যে অশোধিত তেলের দামই বেড়ে যায় তা নয়, বেড়ে যায় সার এবং খাদ্যশস্য আমদানির খরচও।

এই বিরাট ধাক্কা যে ভারতের মতো দেশ সামলে উঠতে পেরেছে সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিদেশী অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় কিছুটা উর্ধ্বমুখী, কিন্তু এই ধাক্কা সামলে ওঠা প্রধানত সম্ভব হয়েছে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ রীতিমতো বেড়ে যাওয়ার ফলে। রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে রপ্তানির মোট অঙ্ক দাঁড়ায় ৩৩০০ কোটি টাকার ওপর। কিন্তু শুধু রপ্তানির মোট অঙ্ক বেড়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। বদলে গেছে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের ধারাও।

রেল ওয়াগন বিদেশে পাঠানো হচ্ছে
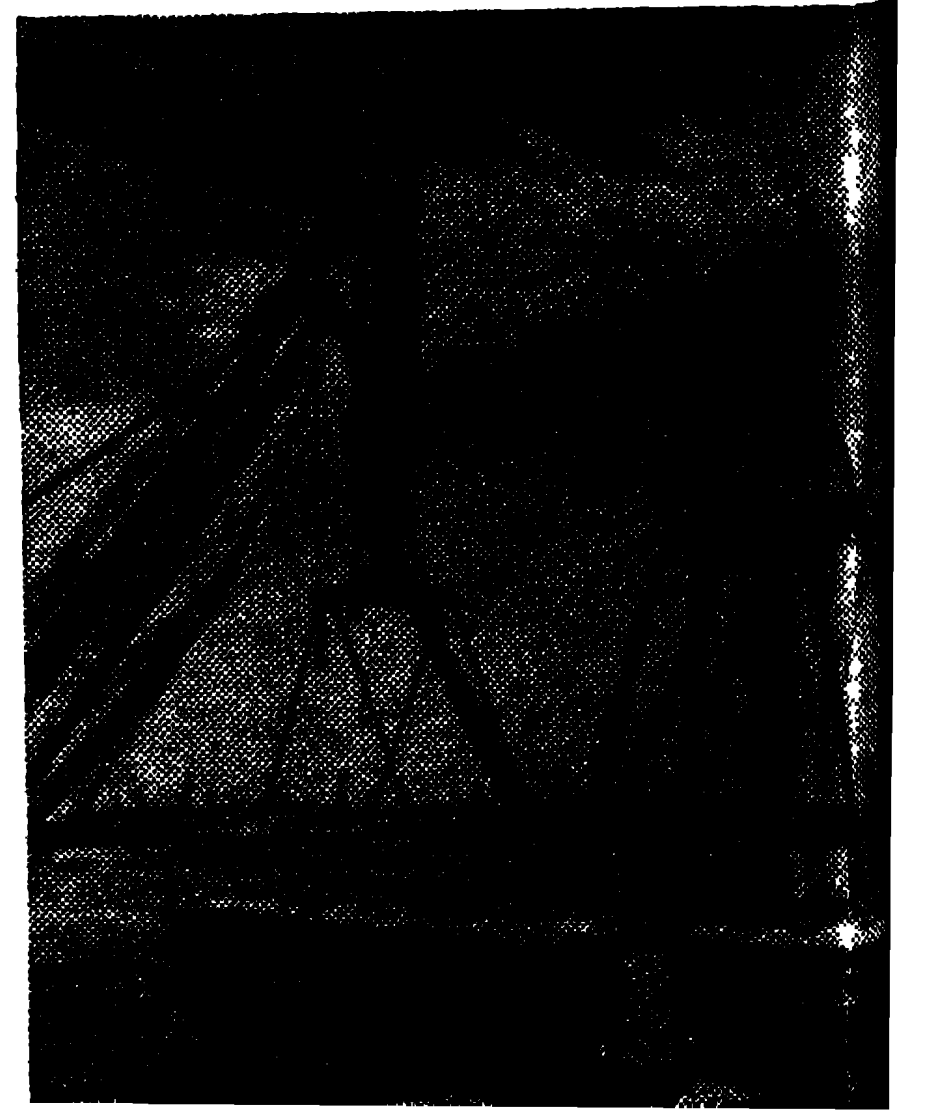
আগে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য বলতে ছিল পাট, চা বা কফির মতো কৃষিজাত পণ্য অথবা আকরিক লোহার মতো কাঁচা মাল। কিন্তু ক্রমশ রপ্তানি পণ্যের মধ্যে কল-কারখানায় তৈরি জিনিসের অনুপাত বাড়ছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানি করে আমরা পেয়েছিলাম মাত্র ২৬ কোটি টাকা, সেখানে দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ঐ অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৩৫০ কোটি টাকার ওপর (১৯৭৪-৭৫ সালে)। ইস্পাতের মতো যে পণ্য এক দিন আমাদের আমদানি করতে হতো তা এখন আমরা রীতিমতো রপ্তানি করতে সুরু করেছি। রপ্তানি করছি নানা সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি।

বিশাখাপত্তনমে দেশের বৃহত্তম জাহাজ কারখানা

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমদানি করার সমস্যা আমাদের এখনও মেটে নি। গত আর্থিক বছরের শেষে দেখা গেছে যে, আমদানি আর রপ্তানির মধ্যে হাজার কোটি টাকার মতো ফারাক। কিন্তু তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। রপ্তানি বাণিজ্যে বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম কয়েক মাসে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ ছিল বেশি। খাদ্যশস্য ও সার আমদানি বাবদ খরচ কমের দিকে। গত মরশুমে খাদ্যশস্যের রেকর্ড ফলন অবস্থা অনেকটাই বদলে দিয়েছে। অন্য দিকে ভারতের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণও গিয়ে পৌঁছেছে রেকর্ড অঙ্কে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানত চোরাচালান বন্ধের জোরদার প্রচেষ্টার ফলে। বিদেশী মুদ্রার এই মজুত এখন আমাদের উন্নয়নের কাজে একটা মস্ত বড় হাতিয়ার।

স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যে এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন রপ্তানি বাড়ানো এবং আমদানির ওপর, বিশেষত অশোধিত তেল আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো। রপ্তানি বৃদ্ধির হার যে আশাব্যঞ্জক তা আমরা আগেই দেখেছি। তবু দীর্ঘ দিন ধরে শতকরা আট থেকে দশ ভাগ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি অবশ্যই জরুরি। রপ্তানি বাড়াতে গেলে প্রধান প্রয়োজন রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো। তা না হলে দেশের মধ্যে ঐ ধরণের পণ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সুখের বিষয় সম্প্রতি কল-কারখানার উৎপাদনের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরের অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠা গেছে। ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, কয়লা ইত্যাদি নানা পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে। সাম্প্রতিক লক্ষণ থেকে মনে হয়, চলতি বছরে এই সব সামগ্রীর উৎপাদন আরো বাড়বে, ফলে দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

এই সঙ্গে খাদ্যশস্য এবং অশোধিত তেল উত্তোলনের পরিমাণ বাড়ানোও অত্যন্ত জরুরি। গত মরশুমে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ফলন খুবই আশা জাগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচিতে সেচের সম্প্রসারণের ওপর যে-জোর দেওয়া হয়েছে তার ফলে খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ানোর ব্যাপারে একটা বড় অনিশ্চয়তা দূর হবে। অশোধিত তেলের উত্তোলনের পরিমাণ ৮০ লাখ টনে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে আরো জোরদার প্রয়াস দরকার, কারণ এখনও এক কোটি ৪০ লাখ টন তেল আমদানি করতে হচ্ছে। দেশের মধ্যে ও উপকূলবর্তী এলাকায় তাই তেলের সন্ধান নতুন উদ্যোগে সুরু হয়েছে। বিশেষত বোম্বাই দরিয়ায় তেলের উত্তোলন সুরু হওয়ায় নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে গেছে।

সাঁওতালদিহির বিদ্যুৎ কেন্দ্র

শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে

ড: অমরনাথ দত্ত

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বিশ-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন "নতুন বিনিয়োগ গড়ে তোলার পক্ষে লাইসেন্স ব্যবস্থার গড়িমসি অযথা প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়ে থাকে। এখন থেকে এটি সহজ করে তুলতে হবে। আমদানী অথবা সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন নেই এমন সব শিল্পে বিনিয়োগ সীমা বাড়িয়ে তোলা হবে।" তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—"অর্থনৈতিক ক্ষমতার লোভ সংযত রাখতে নিয়ন্ত্রণের দরকার, তবে অযথা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভীষ্ট সিদ্ধ হবেনা। কিন্তু তাই বলে কোন কারণেই যথেচ্ছাচার বরদাস্ত করা হবেনা"।

এই দিগদর্শনকে কেন্দ্র করে দেশে আজ গড়ে উঠেছে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের এক বিরাট ক্রমপর্যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিল্পবিনিয়োগ ব্যবস্থাকে সামাজিক প্রয়োজন-মুখী করা হয়েছে। সেইসঙ্গে লাইসেন্স ব্যবস্থার বহুবিধ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে যাতে একটি সুষম শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

১৯৫১ সালের শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বিধি বলে লাইসেন্স ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৫৬ সালে ঘোষিত শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্পক্ষেত্রে সংবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায় ও স্ব-নির্ভরতা গড়ে তোলা আর সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির দায়দায়িত্ব বর্তাল সরকারী ক্ষেত্রের উপর যার ফলশ্রুতি হ'ল গত দুই দশকে জাতীয় শিল্পক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের ক্রমবর্দ্ধমান নেতৃত্ব ও বলিষ্ঠ ক্রমবিকাশ। কিন্তু তা' বলে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান, এর কোনটিই উপেক্ষিত হয়নি। আর এখানেই ঘটেছে সুষম শিল্পনীতির সার্থকতা।

১৯৫১ সালের লাইসেন্স নীতি অনুযায়ী ন্যূনাধিক ১৪৭ টি দ্রব্যের উৎপাদন শুধুমাত্র ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরও ৩০ টি দ্রব্যের তালিকা তাতে সংযোজিত হ'ল। বিদ্যুৎ যন্ত্রশিল্প উৎপাদনের সরঞ্জাম, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপতি, মোটরগাড়ি, ও সহায়ক শিল্পের যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক দ্রব্য, কাঁচ, চীনামাটি, প্লাষ্টিক চামড়া ও কাঠের বিভিন্ন শিল্পে এই সংরক্ষিত বস্তুগুলির উৎপাদন একক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হ'ল। বৃহৎ ও বিদেশী লগ্নীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকম্‌প্লেক্স সৃষ্টি শিল্প-নীতির আরেকটি অভীষ্ঠ লক্ষ্য হিসেবে স্থির হল।

বৃহৎ শিল্পগুলির তাহলে কী ভূমিকা রইল? যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় মূলধন অথবা অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত মূলধনের পরিমাণ বিশ কোটি টাকার কম নয়, বৃহদাকার সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত বিশেষ সামগ্রী উৎপাদন করতে পারবে তা হল: মেটালার্জি (ধাতু সংক্রান্ত বয়লার ও স্টীম উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ, প্রাইম মুভার, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, পরিবহণ ও কৃষিকার্য্যে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সামগ্রী (ফার্টিলাইজার কাজে), ভেষজ ও ঔষধপত্র, কাগজ ও কাগজের মণ্ড, মোটরগাড়ির টায়ার ও টিউব, প্লেট গ্লাস, চীনামাটির দ্রব্য, সিমেন্ট প্রভৃতি। শুধুমাত্র একটি সর্ত্তসাপেক্ষে, যে উৎপাদনযোগ্য এসব সামগ্রী ক্ষুদ্র শিল্প অথবা সরকারী ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত থাকছে না।

১৯৬৬ সালের অক্টোবরে লাইসেন্স নীতিকে আরও নমনীয় করে তুলবার জন্য স্থির করা হ'ল যে লাইসেন্স পাওয়া অথবা রেজিষ্ট্রীকৃত শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও অতিরিক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে ২৫ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটনা যেতে পারে তবে বাড়তি উৎপাদনের জন্য নতুন মেসিনারী সংযোজন চলবেনা, বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হবেনা অথবা দুষ্প্রাপ্য কাঁচা-মালের জন্য বাড়তি চাহিদা দেখা দেবেনা।

১৯৬৯ সালে যখন চতুর্থ যোজনা রূপায়িত হয় তখন শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষ করে এঞ্জিনীয়ারিং ও মূলধনী পণ্যশিল্পে অব্যবহৃত ক্ষমতার প্রাচুর্য্য দেখা দেয়,। এই অসম অবস্থার প্রতিবিধানে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প ও খনিজ বিনিয়োগে ৩,০৫০ কোটি টাকা আর বেসরকারী ও সমবায় ক্ষেত্রে ২,২৫০ কোটি টাকা লগ্নীর সিদ্ধান্ত করা হয় যাতে শিল্পোৎপাদনের হার বছরে ৮ থেকে ১০ শতাংশে পৌঁছুতে পারে।

শুধু উৎপাদনবৃদ্ধিই নয়। শিল্প ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে গিয়ে নয়া লাইসেন্স ব্যবস্থা ঘোষিত হ'ল ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এক-চেটিয়া পুঁজির প্রভাব খর্ব্ব করে ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদনে সরকারী ক্ষেত্রের প্রবেশাধিকার ঘটল; সমগ্র শিল্পব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হ'ল: (১) কোর সেক্টরে পড়ল সরকারী ক্ষেত্র পরিচালিত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এছাড়াও স্থির হ'ল যে পাঁচ কোটি টাকার উপরে নতুন বিনিয়োগ ঘটলেই তা ভারী বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) মাঝারি সেক্টরে বিনিয়োগসীমা এক কোটি টাকা থেকে পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হ'ল। বিশেষ করে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা নেই এমন সব শিল্পে বিনিয়োগ ব্যবস্থা আরও উদার করা হ'ল। আর শিল্পের স্বাভাবিক প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শিথিল করা হ'ল।

শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা উৎপাদন-মুখী করে তুলবার জন্য প্রচলিত নীতির সংশোধন ঘটল ১৯৭৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটা কার্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা হ'ল। শিল্পে কাঠামোগত অসাম্য দূর করার জন্য বৃহৎ শিল্পগুলির উপরে আরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হ'ল। আর ক্ষুদ্র, সহায়ক ও সমবায় ক্ষেত্রগুলির উপরে আরও গুরুত্ব দেওয়া হ'ল। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের মে মাসে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের সীমা ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সাড়ে সাত লাখ টাকা থেকে দশ লাখ টাকা আর সহায়ক শিল্পগুলির ক্ষেত্রে দশ লাখ টাকা থেকে পনের লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হ'ল।

পঞ্চম যোজনার উৎপাদন লক্ষ্যগুলি কার্যকর করে তোলার নিবিখে যে প্যাটার্ণ রচিত হয়েছে তা হ'ল: কোর সেক্টর শিল্প, রপ্তানি-মুখী শিল্প ও ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির উৎপাদন ত্বরান্বিত করবার জন্য লাইসেন্স পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও অনুমোদনের সময়সীমা সংক্ষেপ। ১৯৭৩ সালের ৩১ শে অক্টোবরের নীতি অনুযায়ী এই সময়সীমা হ'ল বৃহৎ শিল্পগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ৯০ দিন আর বৃহৎ শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ১২০ দিন। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ও অক্টোবর মাসে মেসিনারী শিল্প ও মেসিন টুল শিল্পগুলির বহুমুখী সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ সুযোগসুবিধা দেওয়া হ'ল, শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ সালের এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও স্টিল উৎপাদকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হ'ল। সিমেন্ট ও এসবেস্টস সিমেন্ট উৎপাদকদের সিমেন্ট প্রস্তুতের যন্ত্র উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হ'ল।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশ-দফা কর্মসূচীতে মৌল শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে ও নিয়োজিত উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ঘটাতে শিল্প লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা আরও সরল ও উদার করে তোলা হ'ল। এরই ফলশ্রুতিরূপে ১৯৭৫ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে ২১-টি মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নতুন ইউনিট গড়ে তুলতে, উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটাতে ও নতুন দ্রব্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে লাইসেন্স অনুমোদনের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হ'ল। সেইসঙ্গে নিয়োজিত শক্তির সদ্ব্যবহার ঘটাতে মাঝারি ক্ষেত্রের ২৯-টি শিল্পকে অনুমতি প্রদান করা হয়। মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির উৎপাদন বিকাশের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা ও বাড়তি উৎপাদনকে রপ্তানিযোগ্য করে তোলা অথবা সরকারী বিধিসম্মত কোন ব্যবস্থার উপযোগী করে তোলাই হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি হ'ল ১৫-টি নির্বাচিত এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা। ফলে মুখ্যত রপ্তানিমুখী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রাক-অনুমোদনব্যবস্থা ব্যতিরেকে বছরে ৫ শতাংশ হারে ৫ বছরে ২৫ শতাংশ উৎপাদন-বৃদ্ধি সহজেই সম্ভব হবে। অন্যান্য কোর সেক্টর শিল্প সম্পর্কিত ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। এ যাবৎ কোন শিল্পই অনুমোদন ব্যতিরেকে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা কার্য্যকর করতে পারত না। কিন্তু যেখানে পুরোনো যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় অথবা গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে শক্তিবৃদ্ধি করা যায় তার জন্য কোনও পূর্ব স্বীকৃতি প্রয়োজন হবেনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৫-৭৬ সালের আমদানি নীতিতে
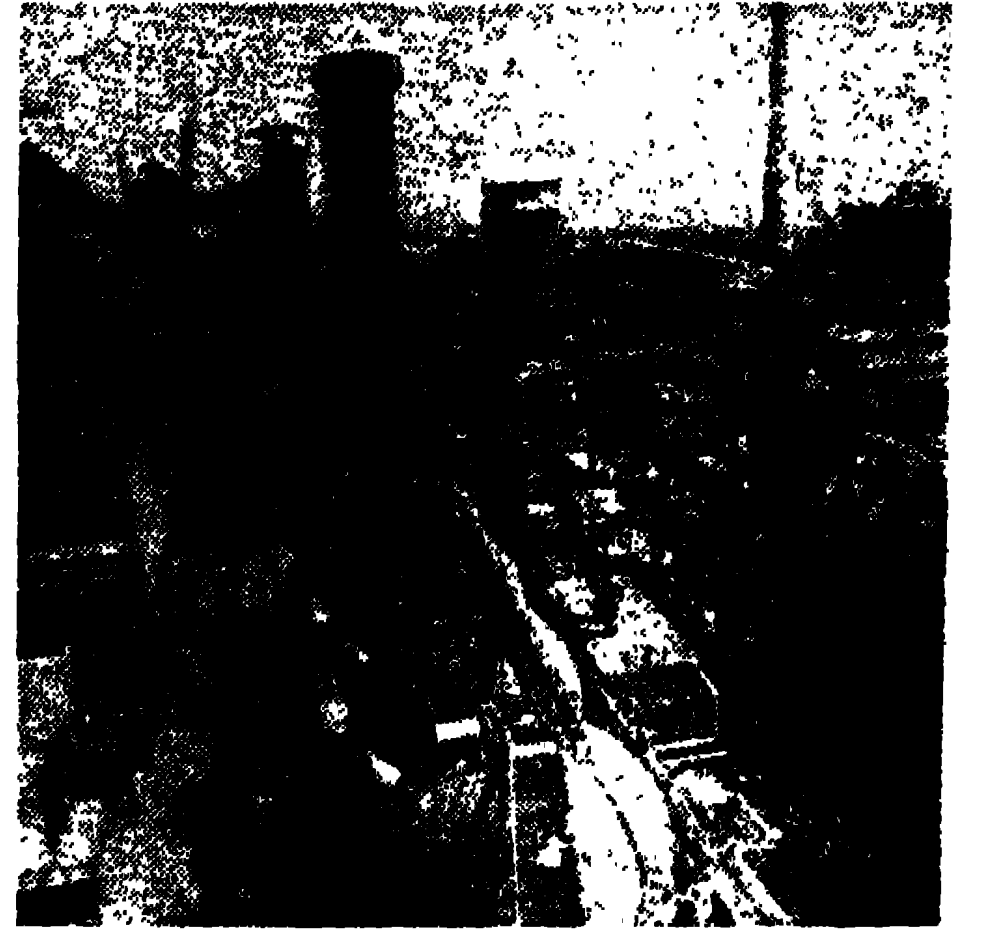
বোকারো ইস্পাত কারখানা

একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করা গিয়েছে যাতে স্বয়ংক্রিয় ভিত্তিতে লাইসেন্স মিলতে পারে। এর ফলে অযথা বিলম্ব এড়িয়ে শতকরা ৮০ ভাগ লাইসেন্স প্রদান করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে। এর ফলশ্রুতিরূপে মূল সেক্টরগুলিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের আমদানী নীতি শুধু যে এই সুবিধা বজায় রেখেছে তাই নয়, প্রকৃত উৎপাদকদের জন্য (actual users) আরও উদার ও নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। রেজিষ্টার্ড রপ্তানিকারক ও রপ্তানি প্রতিষ্ঠান-গুলির ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত সামগ্রীর (canalised items) সরবরাহে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বহুবিধ ক্ষেত্রে রিলিজ অর্ডার ছাড়াই সোজাসুজি আমদানি-কৃত কাঁচামাল সরবরাহে যাবতীয় বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই সব ব্যবস্থা তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ ও কার্যকর করায় বর্তমান বছরে শিল্পবিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি আশা করা যাচ্ছে। নমনীয় ঋণদান নীতি বিনিয়োগব্যবস্থা ও শিল্পতৎপরতাকে আরও সক্রিয় করে তোলার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দিয়েছে।

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত

1975-76

তন্তুবায় এবং শ্রমিকদের সাহায্যার্থে

★ জমে যাওয়া তাঁতের কাপড় খালাস করার জন্যে 47.2 মিলিয়ন টাকা দেওয়া হয়েছে।

★ হস্তচালিত তাঁতশিল্প সম্প্রসারিত করে তার বিকাশকল্পে তেরটি নিবিড় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কুড়িটি রপ্তানি উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে উঠছে।

★ 'জনতা' বস্ত্রের গুণমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা সহজে পাওয়া যাচ্ছে। জুলাই 1975 থেকে খুচরো বিক্রির কেন্দ্র বৃদ্ধি পেয়ে 47,694-এতে দাঁড়িয়েছে যার শতকরা আশীটি হ'ল পল্লী অঞ্চলে।

★ সড়কপথে দেশের সর্বত্র অত্যাবশ্যক সামগ্রী অনায়াসে নিয়ে যাবার জন্যে 1,181 জাতীয় পারমিট ছাড়া হয়েছে।

★ সাতচল্লিশটি কেন্দ্রীয় সরকারী শিল্প সংস্থা সমেত 617-এরও বেশি শিল্প সংস্থায়, পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদার করার জন্যে, 'শপ্ কাউন্সিল' এবং 'জয়েণ্ট কাউন্সিল' স্থাপন করা হয়েছে।

DAVP 76/92

স্বাধীনতাঃ দুই প্রজন্মের দর্পণে

সুতপা দাশগুপ্ত

সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই রোজ দেশবন্ধু পার্কে মর্ণিং ওয়াকে আসেন শ্রী নলিনীকান্ত চক্রবর্তী। স্বদেশীযুগের প্রবীণ বিপ্লবী, সত্তর উর্দ্ধ মানুষটিকে জরা এখনও কাবু করতে পারেনি। ঋজু, ধীরপায়ে সবুজ ঘাস মাড়িয়ে সূর্যের প্রথম আলোকে অবগাহন করেন। সেদিন এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে, সহাস্যে আহ্বান জানালেন। বললেন, 'আমরা সংগ্রাম করেছি দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্য। আইন অমান্য, ভারত ছাড় আন্দোলন সবেতেই এগিয়ে গিয়েছি। ছয় মাস রাজশাহী জেলে, এক বছর মাদারিপুর জেলে, তারপর রুদ্রকরে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত গৃহ অন্তরীণ ছিলাম। বিপ্লবের পথে সাথীদের মধ্যে ময়মনসিং-এর মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ঢাকার নলিনীকান্ত গুহ, বরিশালের যতীন রায়ের কথা হয়ত তোমরাও শুনেছ। আমরা সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলাম।'

প্রশ্ন করলাম--'আপনাদের সময় এমন কিছু সমস্যা ছিল কি যা এখন নেই বলে মনে করেন?' গভীর প্রত্যয়ে বললেন 'নিশ্চয়, আমাদের সময় সমাজ ছিল কুসংস্কারের ঘোমটা পরা। এখনতো মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক বেড়েছে। পণপ্রথা উঠে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। আস্তে আস্তে জনমানসেও পরিবর্তন আসছে। পরাধীন ভারতে যা ছিল সমস্যা এখন তার সমাধান হতে চলেছে।' উপলব্ধির কথা শুধালে বললেন, 'দেখ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি, ব্যক্তিগতস্বার্থকে দূরে সরিয়ে রেখে। তবে স্বাধীন ভারত আমাদের স্মরণ করেছে, তাম্রপত্রে সম্মানিত করেছে, মাসিক পেনসনও বরাদ্দ হয়েছে। তবে এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব দেশের যুবশক্তির হাতে। আমি মনে করি দেশের তরুণ সমাজ আজ সচেতন। এত বড় দেশে এত সমস্যা, তবু তারা শক্ত হাতে মোকাবিলা শুরু করেছে। বাজারদাম অনেক স্থিতিশীল, অরাজকতা কমেছে অনেক, মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ফিরে এসেছে, শহরে গ্রামে দরিদ্র মানুষেরা আজ আর অবহেলিত নয়। আমরা নিজের জীবনকে বাজি ধরে যে সংগ্রাম করে স্বাধীনতাকে পেয়েছি, আমাদেরই উত্তরসূরী দেশের যুবসমাজ সংগ্রাম করে চলেছে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার, মর্য্যাদা দান করবার জন্য।'

সি. আই. টি. ফ্ল্যাটে বসে কথা বলছিলাম শ্রীমতী লীলা দাশগুপ্তার সঙ্গে। সত্তর পেরিয়েছেন অনেক দিন, স্মিত-ভাষিণী, অবিবাহিতা, শিক্ষাই জীবনের মূল ব্রত। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন, 'দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি, সিলেটে গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুলে আমি শিক্ষয়িত্রী, দেশে পুরোদমে স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার। বিপ্লবী, স্বদেশপ্রেমী সকলকেই দেখেছি দেশমাতৃকাকে শৃংখল মুক্ত করতে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, জেল খেটেছেন, শত অত্যাচার সহ্য করেছেন। গভর্ণমেন্ট স্কুল, তাই আমাদের প্রতি ভীষণ কড়াকড়ি ছিল। মনে মনে তাই শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংগ্রামীদের সমর্থন করেছি। তাছাড়া আমাদের সময় মেয়েদের সামাজিক এবং পরিবেশগত অনেক বাধা ছিল। শিক্ষাব্যবস্থায় কোর্স অনেক কম ছিল কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত মাধ্যম ছিল ইংরাজি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের অভাব ছিল। শিক্ষা কিছুটা পুঁথিগত ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'তোতাকাহিনী'তে যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন সেটা তখনকার পরিবেশের এক ছবি বলা যায়। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা অনেক পরিবর্তন এনেছে।

সেই পরিবর্তনের কথা শুধোতে আবার বললেন 'স্বাধীনতার পর শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে নতুন জোয়ার। নতুন সমাজের অন্যতম কাজ সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারের অভিযান। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুবিধা অনেক বেশি। নানা হাতের কাজ কারিগরি কৌশল আজ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী স্বনির্ভর হতে পারে। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। তাই আরো অনেক বেশি সংখ্যায় শিক্ষকের প্রয়োজন যারা প্রচেষ্টা আর উদ্দীপনা দিয়ে স্বাধীন ভারতের সুনাগরিকদের গড়ে তুলবেন।'

প্রশ্ন রাখলাম, 'নারীশিক্ষার এবং প্রগতিতে জাতীয় স্বাধীনতা কি ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করেন?' একটু হেসে বললেন, 'মেয়েদের জীবনের অন্ধকার মুছে গিয়েছে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের সঙ্গে। নারীশিক্ষার প্রসারে দেশে এখন অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েদের আজ অগ্রণী ভূমিকা। ডাক্তার

ইঞ্জিনীয়ার বৈজ্ঞানিক সব ক্ষেত্রেই মেয়েরা এগিয়ে চলেছে। নারীজগতে শুধু দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন নয় চিন্তাধারারও আমূল পরিবর্ত্তন সুচিত হয়েছে।'

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কথা উঠতেই বললেন, 'আমাদের সঙ্গে ছাত্রীদের সম্পর্ক বড় মধুর ছিল। ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বড় কাছাকাছি ছিলাম আমরা ; পরাধীনতার গ্লানিতে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক দুপক্ষই সমান মুহ্যমান ছিলাম। দেশমাতার স্বাধীনরূপটি দেখবার আশায় আমরা দিন গুনতাম অধীর আগ্রহে। আজ স্বাধীনতা পরবর্ত্তী যুগে এতবড় ভারতবর্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আজ অগণিত, কিন্তু শিক্ষকরা আজ শিক্ষার্থীদের থেকে অনেক দূরের মানুষ।

ফিরতি পথে দেখা করতে গিয়েছিলাম শ্রী অনিল মজুমদারের সঙ্গে। ভারি অমায়িক, বয়স বছর ৫৮, বর্তমানে এক বিরাট কারখানার মালিক। বললেন, 'শুরু করেছিলাম মাত্র ৭ জন লোক নিয়ে আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার পূর্ববর্ত্তীকালে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপযোগী ছিল না। নিজস্ব মূলধন বিনিয়োগ করার ক্ষমতা আমাদের মত ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুবই সীমিত ছিল। তৈরী জিনিস বাজারে বিক্রী হতে অনেক সময় নিত। দেশের বাজারে বিদেশের জিনিস বিক্রী হতে দেখে ভেবেছিলাম আর ব্রিটিশের গোলামী নয়, স্বাধীনভাবে উৎপাদন করে দেশের বাজারে দেশী মালই বিক্রী করব, দেশের পয়সা বিদেশে যেতে দেবনা।' 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই কি আপনার ব্যবসা এতবড় আকার লাভ করেছে?' 'ব্যবসার ক্ষেত্রে আগে অনেক অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়েছে। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে লোকজন বেড়ে ৭ জন থেকে ১০০-তে এসেছে। ব্যাংক জাতীয়করণ হওয়াতে আমাদের অনেক সুযোগ এসেছে। তবে সত্তরের দশকের গোড়াতে আমাদের মত ব্যবসায়ীদের বহু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। শ্রমিক বিক্ষোভ ও অরাজকতা, শিল্পকে অসুস্থ করে তুলেছিল। কিন্তু আজ সব থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিকন্‌ষ্ট্রাক্‌শন কর্পোরেশন-এর কাছ থেকে। শিল্পকে তারা নতুন জীবন দান করেন। তাদেরই সাহায্যে আমার শিল্পে আজ ২০০ জন কাজ করেন। শ্রমিক ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন বলে বিক্ষোভ নেই, উৎপাদন বেড়েছে, বিক্রীর বাজারও ভাল'।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। এরপর আলাপ হল শ্রী উমাপদ আচার্য্যের সঙ্গে। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। কথাবার্ত্তায় ভারি চমৎকার মানুষ। কথা হতে বললেন, 'দেখুন দুটো যুগকেই তো দেখেছি। স্বাধীনতার আগে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু কেরাণী-গিরি করা, মানে অন্নযোগাতে বৃটিশের গোলামী। স্বাধীন চিন্তাধারা ছিলনা, সমাজ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আরে আমার বিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর্দা মাত্র ২০ বছর বয়েসে, তাও পণের পাল্লাটা বেশ ভারি হাতেই আদায় করেছেন। কিন্তু আজকে আমাদের ছেলে পুলেরা পণের কথা শুনলে রেগে আগুন, নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বিয়েই করতে চায়না। আজকের ছেলেরা স্বাধীন ব্যবসার কথা বেশি করে ভাবছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ পাচ্ছেন অতি সহজে। আমাদের সময় এতশত রকমারি জিনিসপত্র চোখেই পড়েনি। পোষাকের ক্ষেত্রেই ধরুন না, বস্ত্রশিল্পের উন্নতিতে কাপড়ের কি অভিনব সমাবেশ, টেরিকট, টেরিলিন তো ঘরে ঘরে। গ্রামগঞ্জে পৌঁছে গেছে বিদ্যুত, ট্রানজিস্টর। আমাদের ছেলেবেলায় এসব কল্পনার বাইরে ছিল।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনেই চোখে পড়ল দলে দলে ছাত্র, কত রকমের আলোচনা, তারুণ্যের উচ্ছলতা। ভেতরে ঢুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে আলাপ জমালাম প্রণব সাহার সঙ্গে। আমার কথার জবাবে বললেন 'দেখুন, স্বাধীনতার পরে আমার জন্ম। আমাদের কাছে এই স্বাধীনতার মূল্য অনেকখানি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা আজকের যুবসমাজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহিঃশত্রুকে রুখব আর ধ্বংস করব সমাজের শত্রু কালোবাজারী ভেজাল-কারী মজুতদারদের।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক ছাত্রী কল্পনা সেন। স্বাধীনতার পরে জন্ম। প্রশ্ন করলাম, 'আপনার জীবনে স্বাধীনতার মূল্য কতখানি?' বড় বড় চোখে দৃঢ়তার প্রতিজ্ঞায় বললেন, 'আমরা মেয়েরা এখন আর বিয়ের বাজারে বেচাকেনার বস্তু নই, পণপ্রথা, বহুবিবাহ আজ নিষিদ্ধ। মেয়েদের সামনে স্বাধীনতা এক নতুন আশার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। স্বাধীন ভারতে জন্মেছি বলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই'।

পথেই দেখা পেলাম হারু দাসের, বড় বড় ইমারত গড়ে তোলে, দিন মজুরীর কাজে। বলল, 'দিদিমণি আমার হাতের কাজ সবাই বলে ভাল, আমার বাবাও এই কাজই করতেন। তবে ছেলেবেলায় রোজ আমাদের খাওয়া জুটত না, বাবা রোজ পেত দেখেছি মাত্র ১ টাকা। ভাইবোন ছিলাম ৭ জন। তবে আজতো দিন বদলেছে। এখন কত বড় বড় ইমারত তৈরী হচ্ছে, রাস্তাঘাট নতুন হচ্ছে, মজুরীও বেড়েছে অনেক। বাবার দেনা ছিল মহাজনের কাছে, বাবা মরতে তাই দেশের ভিটেটাও কেড়ে নিল।' প্রশ্ন করলাম, 'তোমার সংসারে আছে কে?' বলল, 'বিয়ে করেছি, বৌ আর দুটি ছেলে মেয়ে'। 'কলকাতাতেই থাকে সবাই'? 'না দিদিমণি গ্রামে একটুকরো জমি দিয়েছেন সরকার, মাথা গোঁজবার ঠাঁই-এর মত একটা ঘর তুলেছি, সেখানে চাষের জন্য দুবিঘে খানেক জমিও করেছি। ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছি, তা দিয়ে দুটো হালের গরু কিনেছি। চাষের মরশুমে গ্রামে চাষবাস করি আর যে সময় চাষ থাকেনা তখন এই দিনমজুরী করি। আপনাদের আশীর্বাদে আমাদের মত গরিবদের দুঃখ অনেকটা কমেছে।' মনে মনে বললাম, তোমাদের মত আর সব গরিবের দুঃখ যেদিন ঘুচবে সেইদিনই স্বাধীনতার স্বপ্ন সার্থক হবে।

ব্যাঙ্ক এখন প্রগতির বড় হাতিয়ার

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

দুটি বিপরীত আবর্ত—জোয়ার আর ভাঁটা ; এই নিয়ে চলে যেমন নদীর খেলা ঠিক তেমনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক জীবনে পড়ে তার প্রতিচ্ছবি—আশা আর নিরাশার দ্বন্দ্ব। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে এই আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ হয়েছিল ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের মধ্যভাগ এবং এখনও পর্যন্ত তার প্রভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করছি। ১৯৬৯ সালের ১৯ শে জুলাই ভারতের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক জীবনে এসেছিল এক নতুন প্রাণের জোয়ার—ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। কয়েকটি বিদেশী পত্রিকাও সেদিন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল, বলতে তারা ছাড়েনি, "প্রধানমন্ত্রীর এটি একটি গুরুতর ভুল।" প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে বনস্পতির দল যেমন শঙ্কান্বিত হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ঠিক তেমনি আমরাও বিপদের দিনগুলি, অনগ্রসরতার দিনগুলি, ঝুঁকির এবং হতাশার দিনগুলি সাহস দিয়ে, ধৈর্য্য দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, তিতিক্ষা দিয়ে প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছি। আবার ১৯৭৫-এর ২৬ শে জুন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে সূচনা করেছে নবদিগন্তের। সব পেয়েও শৃংখলাবোধটুকু না থাকলে কোন দেশের প্রগতি ত্বরান্বিত হয় না। সেই শৃংখলার নতুন পটভূমিতে জাতির নব উত্থানের বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে বিশ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি :

(১) মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তথা প্রতিপত্তি কেড়ে নেওয়া ;

(২) কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানের ব্যাপক সহায়তা করা ;

(৩) ধনী দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য দূর করা এবং জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার করা।

এই মহৎ উদ্দেশ্যের আলোকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে কিন্তু আমরা মোটেই আশাহত হব না। কারণ ১৯৬৯ সালের জুনমাসে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মোট শাখার সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৮,৩২১টি, সেখানে অস্বাভাবিক রকমের শাখা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০,৪৫১ টি। অর্থাৎ দেশের প্রতি সাতাশ হাজার মানুষের জন্য ব্যাঙ্কের একটি করে শাখা খোলা হয়েছে। ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ১৯৬৯ সালের জুনের শেষে ছিল ৪,৬৬৯ কোটি টাকা। আর গত ডিসেম্বরে এসে তা দাঁড়িয়েছে তিনগুণ বেড়ে ১৩,৪৮২ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কগুলির আজ সবথেকে বড় দায়িত্ব কৃষি ঋণ সরবরাহ এবং গ্রাম উন্নয়ন। আজ যদি ভূমিহীন, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের কাঁধ থেকে ঋণের বোঝা অপসারণ করা যায় তাহলে লক্ষ লক্ষ কৃষক তা থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং নতুন উদ্যমে চাষাবাদ করে সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন। সুতরাং এই কাজে অংশ গ্রহণ মানেই গ্রামাঞ্চলের সেই ভয়ঙ্কর সুদখোরদের উচ্ছেদ করা। অতএব, ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতিগুলিকে আজ এগিয়ে আসতে হবে কৃষকদের পাশে। এই দায়িত্বটুকু ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতিগুলির আজ পালন করতেই হবে। ১৯৬৯ সালে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের মোট সংখ্যা যেখানে ছিল ১.৬ লক্ষ এবং ঋণের পরিমাণ ১৬২ কোটি টাকা সেখানে ১৯৭৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪ লক্ষ এবং মোট অর্থ বিনিয়োগ করা আছে ৭৬৮ কোটি টাকা। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সাহায্যের জন্য 'প্রভেদক সুদের হার প্রকল্পও' চালু করা হয়েছে গত কয়েক মাস যাবৎ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি দুর্বলতর শ্রেণীর চাষীদের নির্বাচন করবে তাদের আয়, জমির আয়তন প্রভৃতি পরীক্ষা করে এবং ব্যাঙ্কের সাধারণ সুদের হারের চেয়ে শতকরা ৪' কম সুদের হারে তাদের ঋণ দানের ব্যবস্থা কববে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাড়ে তিন লক্ষ কৃষকভাই উপকৃত হবেন।
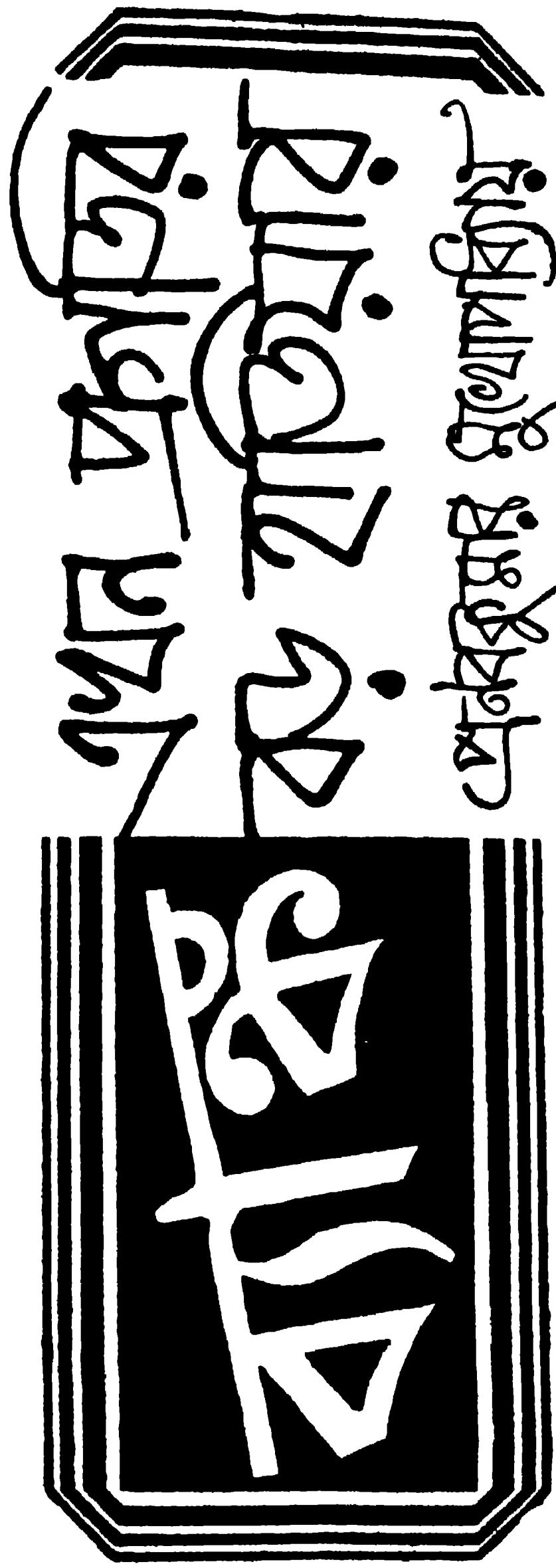
বাণিজিক ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি ছাড়াও আরো এক ধরণের ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয়েছে বর্তমানে। তার নাম—গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। বয়সে একেবারেই নবীন। কিন্তু 'ছোট যে হায় অনেক সময় বড়োর দাবী দাবিয়ে চলে'। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের উদ্ভবের মূল উদ্দেশ্যই হল, সুদূর গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা খোলার যে অসুবিধা রয়েছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের মাধ্যমে তা অনায়াসেই দূর করা। আমি আশা রাখি যে যে কারণে গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি সৃষ্টি হয়েছে তার নিজের অঞ্চলের উন্নয়নের আদর্শ নিয়ে তারা তা নিশ্চয়ই পালন করবেন। তাদের কাজের প্রকৃতি অনেকটা 'অপাবেশন ক্রেডিট ফ্লাড'-এর মতো।

কৃষিক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভূমিকা—প্রসঙ্গেই বলি, ১৯৬৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত
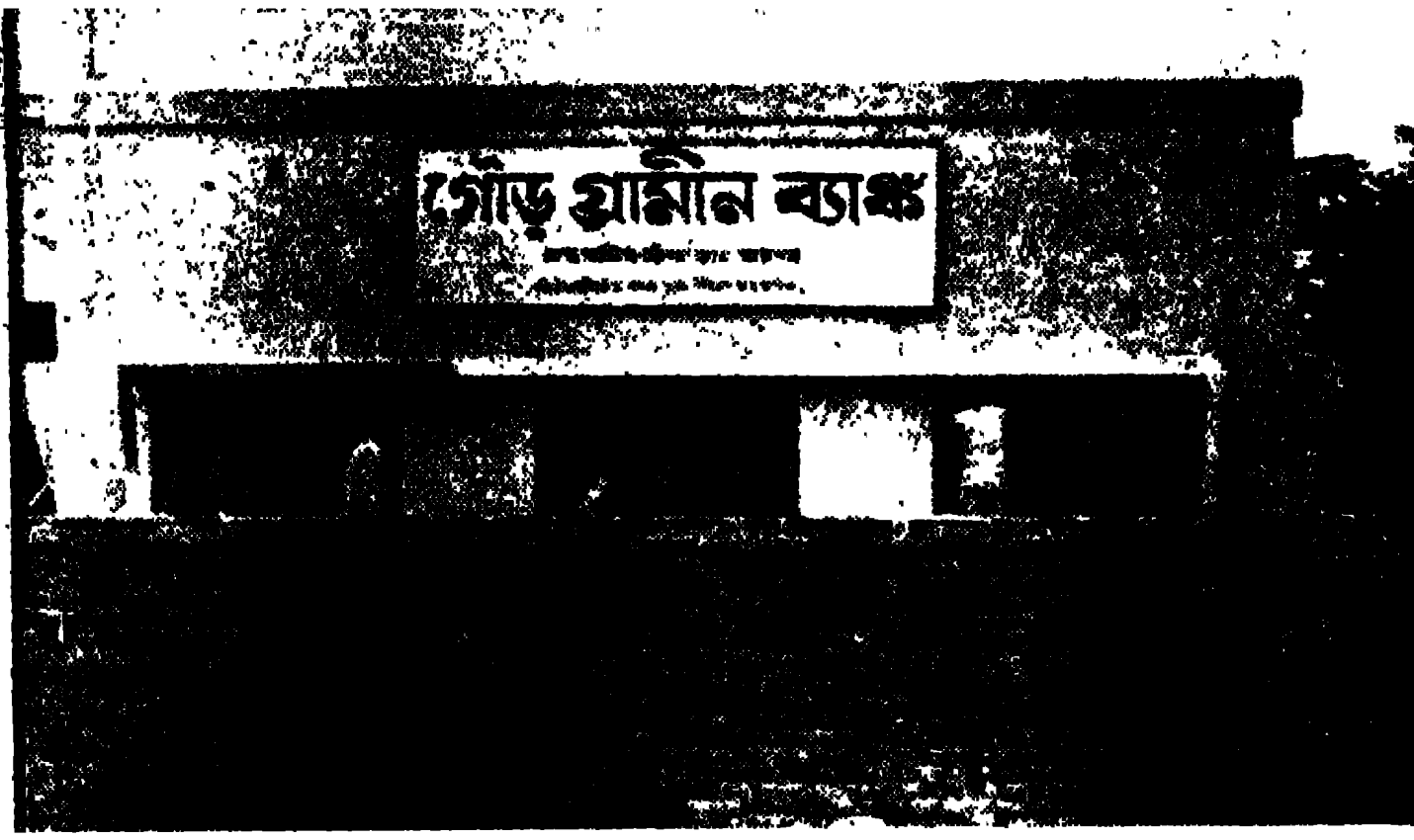
মালদহে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের মোট সংখ্যা ছিল যেখানে ১৮৬০টি, ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সেখানে ঘটেছে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। ১৯৬০ থেকে বর্তমানে মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১৮৫ টি।

কৃষি, শিল্প এবং স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের এই যে বিরাট ভূমিকা তা লক্ষণীয় এবং তার ফলে ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারও উপর্যু-পরি বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্কের ভাণ্ডার অর্থ সমাগমে পরিপূর্ণ হওয়ায় সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে আশানুরূপ। ১৯৬৯ সালে বিনিয়োগের যে পরিমাণ ছিল ১৩৫৯ কোটি টাকা ১৯৭৫ সাল অর্থাৎ এই সাত বছরের মধ্যেই তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৫৫ কোটি টাকা। সুতরাং বাৎসরিক গড় হার দাঁড়ালো শতকরা ৩৮ শতাংশ। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবার ফলে অর্থনীতিতে এলো এক বিশেষ লক্ষণীয় পরিবর্তন। অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রে একাজ উপেক্ষিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দৃষ্টি পড়ল তাদের ওপর। যেমন—কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, সড়ক পরিবহণ ইত্যাদি।

স্বল্প আয়ভোগী ব্যক্তিরা আগে যখন ঋণ পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার বলে মনে করত এখন আর তা নয়। স্বল্প সুদে এই শ্রেণীর লোকেরা যাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আজ উদার হাতে ঋণের ঝুলি নিয়ে বসে আছে।

সরকারী উদ্যোগের যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তাদের চাহিদা পুরণের জন্যও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আজ ঋণদানে তৎপর। ১৯৭৪ সালের জুনের শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রদত্ত ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ১২০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত শিল্পগুলি আজ ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদের হারে ঋণ পেতে পারে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈদেশিক শিল্পে নিয়োজিত ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৭৭১ কোটি টাকা।

হস্ত চালিত তাঁত শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। শুধু ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্যই যে এই শিল্পের প্রয়োজন এ ভাবনাই যথেষ্ট নয়। এই শিল্প বিদেশের বাজার থেকে অর্জন করছে আশানুরূপ মুদ্রণও। বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী এই শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে যাতে তারা ঋণ পেতে পারে তারজন্য সমবায় সমিতিগুলি আজ তৎপর। কিন্তু শুধু ঋণ দানে সহৃদয় হলেই যে উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এমন চিন্তা না করাই ভাল। আজ চাই সমীক্ষা। আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁতশিল্পীদের জন্য ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতিগুলির অনুদানের সমীক্ষা করা যাতে অতীতের দোষত্রুটি সংশোধন করে তাদের কাছে তুলে ধরতে পারি এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

পরিশেষে বলি, 'লীড ব্যাঙ্ক প্রকল্প' বেশ কয়েক বছর হল চালু রয়েছে আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'লীড ব্যাঙ্কের' কৃতকার্যতার সমীক্ষা চালান একদল সমীক্ষকদের মাধ্যমে। তাঁরা জানান যে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত 'সীডমানি' প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকাররা যাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন তারজন্য ব্যাঙ্কের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সমীক্ষকরা আরো জানান যে ঋণগ্রহীতাদের ঋণের জন্য আবেদনপত্রকে যদি দ্রুত নিষ্পত্তি না করা হয় তাহলে তাদের ঋণের প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করা হয়। কথায় আছে ন্যায় বিচারকে শ্লথ মানেই বিচারকে উপেক্ষা করা। এক্ষেত্রেও এটি একটি যথার্থ উপমা। সুতরাং আমার ব্যক্তিগত মতামত হল যে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকার সীমায় যে সমস্ত ঋণ গ্রহীতারা আছেন তাদের ঋণ দানের সর্বোচ্চ সময় ষাট দিনের বেশী হওয়া কখনই উচিত নয়। সুতরাং বিশ দফা কর্মসূচীকে যদি আজ স্বার্থক রূপ দিতেই হয় তাহলে দরকার ঋণের আবেদনের ক্ষেত্রে সহজীকরণ, সমান সুদের হারের প্রবর্তন এবং সমান মার্জিন।

অনুলিখন: **প্রশান্ত রায়**

ব্যাঙ্কের ঋণ পেয়ে গোপালপুরের তাঁতীরা এখন স্বনির্ভর

ছারপোকা

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মতালুতে সূর্যকে বেঁধে ভর দুপুরে কলকাতার পথে-বিপথে কত লোকই তো ঘোরে : ছকুও তাদের একজন। ওর কোন ধরা বাঁধা চাকরী নেই, তাই শত কাজ। কাক-জাগা ভোরে বস্তির এজমালি ঘর ছেড়ে ও পথে নামে ; তারপর সারাদিন ধরে চলে চৌ-চৌ কোম্পানির ম্যানেজারি !

ও জানে, কলকাতার পথে-ঘাটে, সদরে-অন্দরে হাজার ধান্দা ; যারা হুলুক সন্ধান জানে তারা খলিফা বনে যায়। তখন একের পয়সা ছু-মন্তরে চলে আসে অন্যের পকেটে ; হাতে মিলে যায় ব্লেক করা সিনেমার টিকিট, রেসের টিপস্‌, কিম্বা ভালো বিলাইতি মালের বোতল! ছকু তাই ঘোরে, আর ধান্দায় থাকে।

তিন কুলে কেউ নেই ওর। শুধু আছে এক এজমালি মাসি ; আর আতর নামে হাড় জিরজিরে পাঁচ বছরের এক মা-বাপ হারানো বোন। এক ফালি ভাঙা দরমার অন্তরালে ছকুর ছোট্ট সংসার।

জষ্ঠির রোদ কি শ্রাবণের আকাশ-ভাঙা জল দুই-ই ওর শিরোধার্য। ফুটো ছাদে কিছুই মানায় না। ছকু তাই ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে। এছাড়া আতরের সর-সাদা উপোসী মুখটা ঘরে থাকলেই যেন চাবুক মারে ; ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

তবে ছকু মিত্রার দোস্ত অনেক। সবাইকেই প্রায় পথে কুড়িয়ে পাওয়া। কলাবাগানের বটা, মেছোবাজারের আবন, সোনাগাছির সনাতন। সেই সব দোস্তদের জীবিকাও বিচিত্র। কেউ হাফ্‌-গেরস্তর দালাল, কেউ রেসের টাউট, কেউ পকেটমার, কেউ বা পেশাদার রক্তদাতা। যেমন আবন। ও অভাবে পড়লেই শিরা ওঠা হাত খানা বাড়িয়ে ধরে সুঁচের সামনে। রক্তের বিনিময়ে মেলে খাবার, টাকা। ছকুও ওর সাকরেদ। তাই মাস না ঘুরতে সে-ও নাম ভাঁড়িয়ে গিয়ে হাজির হয় বড় বড় থাম্বাওয়ালা, ওষুধের গন্ধ মাখা বড় বাড়িটার সামনে। কখনও কখনও দালালীও করে। গ্রাম থেকে ফুসলে নিয়ে আসে অভাবী মানুষ। রক্তদানের বিনিময়ে ওদের পাইয়ে দেয় কড়কড়ে খান কয়েক নোট। ওর ভাগে থাকে কমিশন। তাতেই কোন মতে চলে যায় দুটো পেট।

সত্যি, দেশে রক্তের বড় অভাব। তাই ছকুকে এ-লাইনে এনেছে 'ওস্তাদ। ও বলে—'বুঝলি শালা, ভদ্দর নোকের জন্যে রক্ত দিচ্ছিস্‌, তাই সড়সড়িয়ে সগ্যে চলে যাবি একেবারে।'

সত্যি, ঐ রক্তের জন্যে হা পিত্যেশ করে মরছে কত রোগী ; হন্যে হয়ে ঘুরছে কত লোক। চাহিদার তুলনায় খুব কমই রক্ত আছে দেশে। তাই রক্তদাতাদের বড় খাতির। তবে নিয়মও আছে। ঘন ঘন, খুশিমত হাত বাড়িয়ে দিলেই চলে না। দু মাস করে ফাঁক দিতে হয়। কিন্তু কে মানে সে নিয়ম। পেটে জ্বলছে খাণ্ডব বন। তাই বারবার হাজির হয় নাম ভাঁড়িয়ে। রক্ত টানার সময় শরীরটা যেন হঠাৎ পলকা হয়ে আসে। তবে ডাক্তার বাবু বলেন, ওটা মনের ভ্রম। গরম দুধে চুমুক দিতে দিতে কড় কড়ে নোটগুলো তাই ছকু ট্যাঁকে গোঁজে।

তবে মাঝে মধ্যে ধরাও পড়ে যায় ওরা। হাতে সুঁই-এর দাগ দেখে ধরে ফেলেন নার্স-দিদি। ওদের আর কি অপরাধ ; প্রায় প্রতি মাসেই যে দেখাতে হয় এই মুখগুলো। দেখতে দেখতে চেনা জানা হয়ে গেছে। মায়া পড়ে গেছে কেমন।

তাই খাতা বাবু, নার্স, কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলে প্রতিবারেই। ঐ মানুষগুলোকে ধোঁকা দেওয়ার কায়দাও ছকুকে শিখিয়েছে আবন ওস্তাদ। সেবার হল্লা এলো মেছো-বাজারে ; ঐ হল্লার কাছে মস্তানি ফলাতে গিয়ে ওস্তাদ হারিয়েছে ডান কব্জিটা। ও বেচারা তাই নিজে ঘন ঘন আর রক্ত বেচতে পারে না। কারণ ওর নুলো হাতটা দেখলেই ঠিক চিনে ফেলে খাতা বাবু। নাকের ওপর চশমা ঝুলিয়ে বলে— 'ক্যা ? রজত মণ্ডল ? না, না, তুমি বাপু নাম ভাঁড়াচ্ছো। এই তো গত মাসেই তুমি রক্ত দিয়ে গেলে, কি নাম যেন ......

পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে আবন তখন লাইন থেকে কেটে পড়ে আর তখনই 'খ্যা...খ্যা' করে হাসতে থাকে পথে কুড়িয়ে পাওয়া স্যাঙাৎ-রা। কারণ ওরাও যে রয়েছে আসেপাশে।

কিন্তু ছকুর দেহটা দড়ি পাকানো। মুখটা পোড় খাওয়া। দশ জনের মধ্যে

পাসিয়ে দিলে ওকে আলাদা করে চেনা শক্ত। ও তাই দিব্যি ম্যানেজ করে ফেলে। বিড়িটা কানে গুঁজে, মুখটা যথাসাধ্য ভালো মানুষের মত ক'রে বিড় বিড় ক'রে বলে— 'এজ্ঞে, কি বল্লেন? নাম? ছিনাথ মণ্ডল। সাকিন? সোনারপুরের পাশে ঐ যে কালিকাপুর।...'

এরপর আর কেউ ধরতে পারে না। কোন হাঙ্গামা হয় না। তবে টেবিলে শুয়ে চোখ বুঁজলেই বুকটা ধক্ ধক্ করে। হ্যাঙ্গলা বোনটার টিকটিকে মুখখানা চোখের ওপর এক লহমার জন্যে ভেসে ওঠে। অবশ্য ততক্ষণে টকটকে, তাজা ফেনা ভরা রক্তে ভরে উঠছে কাঁচের পাত্রটা। সেদিকে ছকু তাকায় না। ওস্তাদের বারণ। কারণ নিজের রক্ত দেখলে সব শালারই নাকি মাথায় ঘুর লাগে।

এরপর টাকাগুলো গুনতে গুনতে যখন রোদে নামে তখন আবার সব ঠিক হয়ে যায়। সোনাগাছির দালালীর থেকে অনেক সরল কাজ। হাঙ্গামা নেই। হল্লা নেই। ঘুষ নেই। মূলধনও লাগে না এই ব্যবসায়।

সেদিনও জষ্টির ঠা ঠা রোদে হাসপাতালের গেটের কাছে ওস্তাদের অপেক্ষা করছিল ছকু। আবন এখন আড়কাঠির কাজ করে। গ্রাম থেকে রক্ত দেওয়ার জন্যে ধরে আনে অভাবী মানুষ। তারপর ভাগ বসায় তাদের রোজগারে। যাকে ভদ্দর লোকেরা বলেন দস্তুরি বা কমিশন। আজকাল বেশ ভালোই চলছে ওস্তাদের। গ্রাম গঞ্জ উজাড় করে ধরে আনছে খেয়ে মন্দ।

কিন্তু আজ যেন বড্ড দেরী। ছকু তাই একটা বিড়ি ধরায়। ফুটপাতের ওধারে দোকানের শো-কেসে সারবন্দী সাজানো নকল হাত-পাগুলো দেখতে দেখতে ওস্তাদের হারানো কব্জিটার কথা মনে পড়ে। শালা, যে হারে কামাচ্ছে তাতে অমন একটা কলের হাত জুটিয়ে নেবে শিগ্গির।

ঠিক তখনই জ্বলে ওঠে কোমরের কাছটা।

'শা....লা!'—তেল চিটচিটে ববি-মার্কা গেঞ্জিটা খামচে ধরে ছকু। উলটে ফেলে তক্ষুনি। রক্ত শুষে টসটসে হয়ে উঠেছে একটা ছারপোকা। ব্যাটার নড়বারও শক্তি নেই। আমীরের মত এলিয়ে আছে একেবারে।

সে সন্তর্পণে নখের ওপর তাই তুলে নেয় ওটাকে। ওর দুচোখে তখন বিষ ঝরছে—'হারামজাদা। রক্ত খাবার আর লোক পেলিনে।'

—'থাক্।'

পেছন থেকে হাতটা চেপে ধরে ওস্তাদ। খ্যা-খ্যা করে হেসে বলে-- 'ও শালার আর দোষ কি! রক্ত না পেলে ওরই বা চলবে কি করে।'

শতবর্ষের আলোকে বন্দে মাতরম্

মৃগাঙ্ককৃষ্ণ রায়

ঋষি বঙ্কিমের যে গান একদা ভারতের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষের সংকল্পের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল সেই 'বন্দেমাতরমে'র শত বৎসর পূর্ণ হলো। পরাধীন ভারত একশত বৎসর পূর্বে স্বাধীনতার অমরবাণী 'বন্দেমাতরমে-র মধ্যেই শুনতে পেয়েছিল। এই গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি সমগ্রজাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার অটল সংকল্পে শুধু বৃটিশকায়েম শাসনকেই ধিক্কার জানায়নি—জাতীয় হৃদয়—মনকেও স্বদেশ ভূমির প্রতি মাথানত করতে শিক্ষা দিয়েছিল। দিয়েছিল সেদিন দিচ্ছে আজও। সেদিনের 'বন্দেমাতরম' গানটি ছিল স্বাধীনতার গান—দেশকে স্বাধীন করার হাতিয়ার আর আজ এই মন্ত্রধ্বনি দেশকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার হৃদয় সংগীত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'বন্দেমাতরম' গানটি রচনা করেন এবং পরে এই গানটি তিনি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং লোকমান্য তিলক 'বন্দেমাতরম্-এর গানের সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় জনগণের পরিচয় করিয়ে দেন এবং সেখানকার গণেশ পূজার উৎসবের মধ্যে 'বন্দেমাতরম্'-ও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে এটি গাওয়া হয়।

এরপর 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন সভাসমিতি ও স্বাধীনতাকামী মিছিলে মিছিলে এগিয়ে চললো। 'বন্দেমাতরম্' এই একটি মাত্র ধ্বনি-ই বৃটিশ শাসকদের প্রকম্পিত করে তুললো। ফলে বৃটিশ সরকার আইন করে 'বন্দেমাতরম্' স্লোগান বন্ধ করে দিল। পুলিশকে আদেশ দেওয়া হলো যারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলবে তাদের উপর চাবুক ও লাঠি চালাতে। ১৯০৫ সালে এলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বাংলার লক্ষ লক্ষ প্রাণকে সেদিন এই গান স্বাদেশিকতার জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আইন করে ১৯০৬ সালে 'বন্দেমাতরম্' বন্ধ করা হলো কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ কি সেই আইনকে মেনে নিলো ? না, নেয়নি—নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এর মর্মার্থ হলো—'মা তোমাকে বন্দনা করি।' দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দ মঠ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্'' সংলিপিত করেন। এই উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই 'আনন্দমঠ' বৃটিশদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। 'আনন্দমঠ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর George Campbell একজন বৃটিশ সামরিক অফিসারকে দিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করান। বহরমপুর কোর্ট থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পালকিতে করে বাসায় ফেরার সময় সেই সামরিক অফিসারটি পালকি থামিয়ে অপমান করে। বঙ্কিমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানি মামলা রুজু করেন। পরে সেই অফিসারটি লিখিতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেয়। এইখানেই কিন্তু এর শেষ নয়।

১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করে যান। কিন্তু বঙ্কিম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজের মধ্যে নিজেকে সীমায়িত রাখতে পারেননি। পরাধীনতার গ্লানি তার হৃদয় মনকে নিপিড়ীত করছিল। তাই দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে তিনি লেখনী ধারণ করেন। বঙ্কিম অনেক উপন্যাসই লিখে গেছেন। কিন্তু তার সুপ্রসিদ্ধ দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দমঠে'-র মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র রোপিত হল। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ঐক্যবদ্ধ সন্ন্যাসীদের জাতীয়তাবোধ। অভিজাত পরিবারের মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে 'আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। 'আনন্দমঠ' যে স্বাধীনতার প্রতীক তা একটি কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। মহেন্দ্র দেখলেন একজন দস্যু (ভবানন্দ) গান করতে করতে কাঁদছে :

> ''বন্দেমাতরম্।
> সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
> শস্যশ্যামলাং মাতরম্।''

'মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কারা ?

ভবানন্দ বলিল, ''আমরা সন্তান''।

মহে। সন্তান কি ? কার সন্তান ?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহে। ভাল সন্তানই কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে ? সে কেমন মাতৃভক্তি ?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি ? কার টাকা লুঠিলাম ?

মহে। কেন ? রাজার ?

২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

কৃষিতে প্লাস্টিক

নিশীথ চৌধুরী
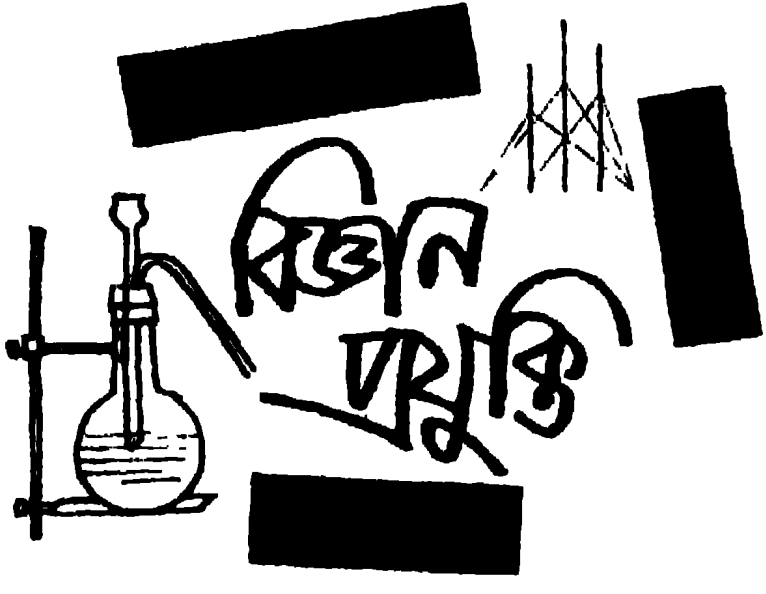
কৃষিতে উৎপাদনের সঙ্গে জলের প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক বলার অপেক্ষা রাখেনা। জলের যোগান বাড়াতে পারলেই বাড়বে কৃষি ফলন। কারণ জলের সরবরাহে যদি পরিমাণ মত থাকে, তবেই অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যেতে পারে, উন্নত ধরনের অধিক ফলনশীল বীজ কাজে লাগানো যেতে পারে।

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ, খনিজ পদার্থ ও খনিজ তেলের অপ্রতুলতা এখন পর্যন্ত আছে। কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে যে জলের প্রাচুর্য্য আছে, তা লক্ষ্য করবার মত। ভারতবর্ষে বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০০ মিলিমিটার বা ১০০ সেন্টিমিটার প্রায়। কিন্তু এই বৃষ্টিপাতের প্রায় সবটাই মাস চারেকের মধ্যেই হয়ে থাকে, আর জল সঞ্চয় করে রাখবার উপযুক্ত আধার না থাকায় খুব অল্পই কৃষির কাজে লাগানো যায়। এছাড়া রয়েছে শুষ্ক অঞ্চল ও মরু অঞ্চল। বৃষ্টির জলের পরিমাপটাকে একটু অন্যভাবে বললে দাঁড়ায়: মোটামুটি ৩,৭০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার বা ৩,০০০ মিলিয়ন একর ফুট বৃষ্টির জল মেঘ থেকে পাই আমরা। এর সাহায্যে ৩০০০ কোটি একর জমি ১ ফুট করে জলে ডুবিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই জলের খরচের হিসেবটা একটু দেখা যাক।

জলের বাষ্পীভবন ও উদ্ভিদের বাষ্পমোচনের ফলে আমরা প্রায় ১০০০ মিলিয়ন একর ফুট জল ব্যবহারের জন্য পাই না। ৬৫০ মিলিয়ন একর ফুট জল মাটি শুষে নেয়। একটু যোগ বিয়োগ করলেই দেখা যাবে যে অবশিষ্ট জলের পরিমাণ দাঁড়ালো প্রায় ১,৩৫০ মিলিয়ন একর ফুট বা ১৩৫ কোটি একর ফুট। এই অবশিষ্ট জলটুকুই নদীতে স্রোতের আকারে বয়ে চলে। আমাদের সোনার তরী সোনার ফসলে ভরে তুলতে কিন্তু কাজে লাগানো যেতে পারে মাত্র ৫৪০ মিলিয়ন একর ফুট পরিমাণ জল। যা মাটির উপরের জলের ৪০ শতাংশ প্রায়। মাটির নিচের ২৮০ মিলিয়ন একর ফুট বা ২৮ কোটি একর ফুট জল কৃষির কাজে লাগানো যেতে পারে। এই ভূগর্ভস্থ জল তুলে সেচ ব্যবস্থায় ব্যবহার করতে হলে যে নলকূপের সাহায্য নিতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

মহাকাশের যুগেও আমাদের সাধারণ জলসেচ ব্যবস্থায় জলের কতটা অপচয় হয়, জানলে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। খাল, নালা প্রভৃতির সাহায্যে জল যখন ক্ষেতে এসে পৌঁছায়, তখন তার কলেবরের শতকরা ৬৬ ভাগ অংশই অকাজে ক্ষয় হয়ে যায়,—মাটিতে শুষে নেওয়ার জন্য ও বাষ্পীভবনের কারণে। ভূ-নিম্নস্থ জলের বেলায় বাষ্পীভবন জনিত অপচয়ের আশঙ্কা থাকে না। তা হ'লেও জল সেচের সময় কিন্তু জলের অনেকাংশই জমি শুষে নেয়। বিশেষজ্ঞদের হিসেব থেকে জানা যায় যে, ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে এখন প্রায় ১৬ মিলিয়ন হেক্টর (৩.৯ কোটি একর প্রায়) জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা করা হয়। একটু সচেষ্ট হলেই, বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে ঠিক মত প্রয়োগ করে এই সেচ এলাকাকে বাড়ানো যাবে। প্রায় ৮.৮৯ কোটি একর জমিতে ভূ-নিম্নস্থ জল সেচের জন্য পৌঁছে দেওয়া যেতে পারা যায়।

মাটিতে শোষণ এবং বাষ্পীভবন জনিত সেচের জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য প্লাষ্টিকের ব্যবহার খুবই সম্ভাবনাময়। উন্মুক্ত কাঁচা নালায় জল পরিবেশন না করে মাটির নীচে চওড়া নল বসিয়ে এ কাজ করা যেতে পারে। এর ফলে সুবিধে হবে দুরকমের: জমিতে যেমন জল শুষে নেবে না আর বাষ্পীভবনের জন্যও জলের অপচয় বন্ধ হবে, তেমনই আবার এই ব্যবস্থার ফলে চাষের জমিতে নালা খুঁড়ে জমি নষ্ট করতেও হবে না।

সমস্ত ক্ষেত 'জলে ভাসিয়ে' দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থাই সচরাচর দেখা যায়, তা যে ধরনের ফসলের জন্যই হোক না কেন। ধান ও পাট ছাড়া অন্যান্য ফসলের বেলায় বিশেষ করে, সরু নলের গায়ে প্রয়োজন মত ছিদ্র করে তার সাহায্যে জল ছিটিয়ে দেওয়া চলতে পারে। এই পদ্ধতিকে (Sprinkler-System) জল ছিটানোর পদ্ধতি বলা হয়। ফসলের চারার গোড়া প্রয়োজন মত ভিজিয়ে রাখবার জন্য (drip-system) 'চুইয়ে চুইয়ে' জল দেবার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির জন্য দরকার হলো মাটির নিচে সছিদ্র নলের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থার প্রায় স্বাভাবিক চাপে একটু একটু করে জল চুইয়ে এসে প্রয়োজন মত মাটি ভেজা রাখতে পারে এই ব্যবস্থা। এই কাজে যে সব নলের ব্যবহার করতে হবে,—সেগুলো ধাতুর তৈরী হতে পারে। কিন্তু ধাতুর চাইতে অনেক কম খরচে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী প্লাষ্টিকের নলের ব্যবহার অনেক উপযোগী। বিশেষ ধরণের প্লাষ্টিকের নল যেমন 'মরীচা-জয়ী' তেমনই আবার টেকসইও হতে পারে। জল সেচের এইসব পদ্ধতি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয়সাপেক্ষ হলেও, যেখানে জলের প্রাদুর্ভাব রয়েছে সেই সব জায়গাতে বিশেষ করে খুবই উপযোগী হবে। সম্ভাবনাময় এই পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে এখনও অবশ্য বেশী পরিচিত হতে পারেনি আমাদের দেশে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার থেকে শুরু করে রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময় পর্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভিতর দিয়ে প্লাষ্টিকের সাথে আমাদের

সম্পর্ক। ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রে প্লাষ্টিকের ব্যবহার দিন দিন এমন বাড়ছে যে আজকের মহাকাশ যুগকে প্লাষ্টিক যুগ বললেও বেশী হবে না।

যে প্লাষ্টিকের ব্যবহার এক যুগান্তর এনেছে—তার সবটাই কৃত্রিম উপায়ে তৈরী। অবশ্য প্লাষ্টিক বললেই এক রকমের নরম পদার্থকে বোঝায়, যাকে নানা রকমের আকারে গড়ে তোলা যায়। তখন প্লাষ্টিকের অর্থের পরিধিতে এসে

কারখানায় প্লাষ্টিকের পাইপ তৈরী হচ্ছে

জুটবে কাদা মাটি, কাঁচ, নানা রকমের ধাতু, রবার, মোম, সিমেন্ট প্রভৃতি। কারণ উপযুক্ত অবস্থায় এই সবেরই আকার বদলে যায়। সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ বাসস্থান তৈরীর জন্য, মনোহর-দ্রব্যাদি তৈরী, উৎসব-পূজোতে নানা উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক প্লাষ্টিক ব্যবহার করে এসেছে। মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ধরনটাই চলেছে বদলে। তাই তো বিভিন্ন সময়ে এসেছে প্রস্তর যুগ, ধাতব-যুগ ইত্যাদি। সভ্যতার বিকাশের আজকের পর্যায়ে এসে মানুষ শুরু করেছে মহাকাশ যুগের। যুগের সাথে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে কৃত্রিম প্লাষ্টিকের অভিযান। লৌহ-ইস্পাত ছাড়া অন্যান্য ধাতুর সমবেত ব্যবহারকে ছাড়িয়ে গেছে আজ প্লাষ্টিক। প্রযুক্তিবিদদের আশা যে ১৯৮৫ সাল নাগাদ প্লাষ্টিকের উৎপাদন লৌহ ও ইস্পাতকেও ছাড়িয়ে যাবে।

কৃত্রিম প্লাষ্টিকের আজকের সার্বজনীন নাম হ'লো 'প্লাষ্টিক'। এর ব্যবহার সার্বজনীন হ'তে হ'লে এর বাজার দর হওয়া দরকার কম। তাইতো পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, বাতাস, জল এবং কৃষির উপজাত দ্রব্য প্রভৃতিকে কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগানো হয় প্লাষ্টিক তৈরী করতে। আজকাল অবশ্য পেট্রোলিয়াম খনিজ তেলের যা দাম বেড়েছে, তাতে খনিজ তেল ভিত্তিক প্লাষ্টিক শিল্প গড়ে তোলা খুবই ব্যয়-সাপেক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষে কয়লার মজুত ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে প্লাষ্টিক এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করবার পরিকল্পনা তাই জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

প্লাষ্টিকের জিনিসপত্র তৈরী করতে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে 'প্লাষ্টিক রেজিন' বলা হয়। প্লাষ্টিক রেজিনের সাথে কাঠগুঁড়ো, সেলুলোজ, অ্যাসবেস্টস, কয়লা গুঁড়ো, অভ্র এবং রং করবার জিনিসপত্র মিশিয়ে ছাঁচের সাহায্যে-নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করা হয়।

প্লাষ্টিক-রেজিন তৈরী করার জন্য সাধারণত দুটো তরল পদার্থ অথবা একটা শক্ত আর একটা তরল উপাদান মিশিয়ে বড় 'কেটলীর মধ্যে' গরম করা হয়। এই বিক্রিয়াতে যে জল বেরিয়ে আসে তা প্রয়োজন মত সরিয়ে ফেলতে হয়। কতক্ষণ গরম করা হবে কতক্ষণ রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতে দেওয়া হবে তা ঠিক করা হয় উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ী গলনাঙ্ক এবং আঠালো ভাবের থেকে। বিক্রিয়ালব্ধ রেজিনের রং নির্ভর করে উপাদানের উপরে। সাধারণত ঘন রংয়ের উপাদান থেকে ঘন রংয়ের রেজিন পাওয়া যায়।

প্লাষ্টিকের জিনিসপত্র তৈরী করার জন্য রেজিন প্রধানত দু ধরণের হয়ে থাকে। এক ধরণের রেজিনকে গরম করে চাপ দিয়ে গরম অবস্থায় ঢালাই করা হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঈপ্সিত শক্ত আকার ধারণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়। তারপর ঠাণ্ডা করা হয়। এই রকম রেজিনের নাম থার্মোসেটিং রেজিন। এই রেজিন থেকে যে প্লাষ্টিক তৈরী হয় তাকে বলা হয় থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক। থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক গরম করেও আর নরম করা যায় না। ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম এবং তাপ প্রতিরোধক দ্রব্যাদির প্রয়োজনে এই ধরনের প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হয়।

অপর ধরনের রেজিনকেও নির্দিষ্ট আকার দিতে হলে তাপ ও চাপ দিতে হয়। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যকে শক্ত করতে হলে ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন। হঠাৎ করে ঠাণ্ডা ক'রে ঢালাই করা জিনিসের গঠন, দরকার মত করে নেওয়া চলে। এই রকম রেজিনকে বলা হয় 'থার্মোপ্লাষ্টিক-রেজিন' আর উৎপন্ন প্লাষ্টিকের নাম থার্মোপ্লাষ্টিক। উত্তাপে আবার নরম হয়ে পড়াই হলো এই প্লাষ্টিকের ধর্ম।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের ছাপাখানার ব্যবসায়ী ওয়েস্‌লি হায়াট্‌ ও তার ভাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম কৃত্রিম প্লাষ্টিক সেলুলয়েড
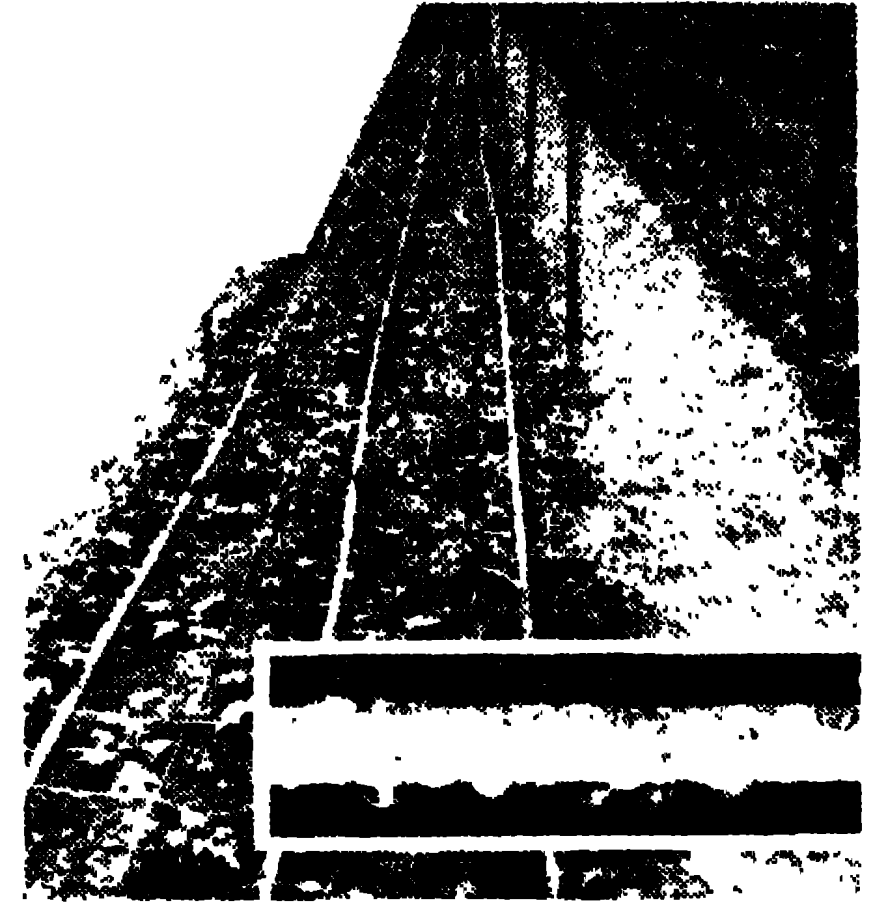
প্লাষ্টিকের সছিদ্র পাইপ বসিয়ে চারাগাছে পরিমিত জলসেচ

তৈরী করেন। সেলুলোজ ও নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়াজাত পদার্থ হলো নাইট্রোসেলুলোজ। এই নাইট্রোসেলুলোজ তিসির তেল ও কর্পূর গুঁড়োর সাথে অল্প তাপে এক নরম আঠালো জিনিস তৈরী করে,—যাকে উপযুক্ত চাপ ও তাপ দিয়ে সেলুলয়েডের পাত অথবা চৌকো আকারের পদার্থ পাওয়া যায়। সেলুলয়েড

হ'লো থার্মোপ্লাষ্টিক। বোতাম, খেলনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরী করার কাজে লাগে।

সেলুলয়েড আবিষ্কারের প্রায় চার দশক পরে বেলজিয়াম থেকে আগত বিজ্ঞানী ডঃ বেকল্যাণ্ড আমেরিকাতে এসে বসবাস করতে থাকেন। অন্য ধরণের থার্মোসেটিং প্লাষ্টিকের 'আদম'কে সৃষ্টি করেন ডঃ বেকল্যাণ্ড, 'বেকেলাইট' আবিষ্কার করে। কয়লা থেকে বিশেষ পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ফিনল (কার্বোলিক এসিড) পাওয়া যায়। এই ফিনল ডিহাইডের পাতলা জলীয় দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে একটা বড় 'কেটলীতে' নেওয়া হয়। প্রয়োজনমত প্রভাবকের স্বল্প পরিমাণ উপস্থিতিতে এই সংমিশ্রণকে উত্তপ্ত করা হয়। পরে ঠাণ্ডা করে উপরের জলীয় অংশ ফেলে দেওয়া হয়, এবং পরে অল্প তাপে ও বায়ুশূন্য অবস্থায় 'কেটলীর' নীচে যে তরল দ্রব্য সঞ্চিত হতে থাকে—তা হ'লো বেকেলাইট রেজিন। উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে বলে প্লাষ্টিকের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ফারনেস প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়।

সব চাইতে বেশী উপযোগী প্লাষ্টিক বোধ হয় 'পলিথিন'। পলিথিন হলো থার্মোপ্লাষ্টিক, অল্পতাপে নরম হয় ঠাণ্ডা করলে আবার শক্ত আকার লাভ করে। পলিথিনের পাতলা চাদর তৈরী করে তার থেকে নল, ব্যাগ, বালতি, খেলনা নানা রকমের জিনিষপত্র জড়িয়ে রাখবার জন্য আবরণী প্রভৃতি তৈরী করা চলে। পলিথিন আবিষ্কার করেন বৃটেনবাসী বিজ্ঞানী ফাউসেট, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। ইথিলিন গ্যাস পাওয়া যায় খনিজ তেলের শোধনাগার থেকে। ইথিলিন হ'লো অসম্পৃক্ত কার্বন যৌগ। এদের একাধিক অনু পর পর একটার সাথে আর একটা যুক্ত হয়ে লম্বা লম্বা শৃংখল তৈরী করতে পারে। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই ইথিলিন গ্যাস থেকে পলিথিন তৈরী করা হয়ে থাকে। 'পলি' মানে অনেক 'থিন' শব্দটা ইঙ্গিত দেয় ইথিলিনের—দুই মিলিয়ে হ'ল 'পলিথিন'। বায়ুমণ্ডলের চাপের ১০০০ গুণ চাপে ইথিলিন গ্যাসকে একটা বিক্রিয়া কুণ্ডলীর মধ্যে পাঠানো হয়। বিক্রিয়া কুণ্ডলীর (Reaction coil) উপরের দিকে ২০০ সেন্টিগ্রেড এবং নীচের অংশে ১২০-সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়। খুব অল্প পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস (০.০১ শতাংশ) ব্যবহার করা যেতে পারে অনুঘটক রূপে। বিক্রিয়া কক্ষে (কুণ্ডলীতে) তরল পলিথিনকে গ্যাসীয় পদার্থ থেকে আলাদা করে সংগ্রহ করা হয়। পলিথিন হালকা, নমনীয় অথচ শক্ত ও ঘন, সহজে ভাঙেনা এবং জল ও রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায় না। পলিথিনের এই সব বৈশিষ্ট্যই তার জনপ্রিয়তার কারণ। পলিথিনের মতই পি ভি সি (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড) প্লাষ্টিক থেকে নল ও চোঙ তৈরী করা হয়ে থাকে।

নাইলন, টেরিলিনও এক ধরণের প্লাষ্টিক। আবার বিশেষ ধরণের প্লাষ্টিকের সাহায্যে উড়োজাহাজের দেহ নির্মাণ হচ্ছে, আর মহাকাশ যানেও প্লাষ্টিক চলে যাচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, মানব সভ্যতার নিদর্শন বয়ে নিয়ে।

মরু অঞ্চলে এবং শুষ্ক অঞ্চলে চাষবাস করতে হলে সবচেয়ে দরকারী হলো জল। শুকনো মাটি জল শুষে নিতে পারে তাড়াতাড়ি। 'খটখটে' আবহাওয়াতে জল শীগগির বাষ্পায়িত হয়ে চলে যায়। তাই তো এই রকম জায়গায় জল সংরক্ষণ করতে প্লাষ্টিকের পাতলা আবরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন কি 'টেডলুর' ধরনের বিশেষ প্লাষ্টিকের চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত জায়গাতে শাক-সবজি এবং ফলমূল পর্যন্ত ফলানো যেতে পারে—এই সব শুষ্ক অঞ্চলে। আবু-ধাবীর মরু অঞ্চলে শাক-সবজির চাষ করতে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। থর মরুভূমি অঞ্চলে এবং রাজস্থানের শুকনো জায়গাগুলোতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করবার সুযোগ রয়েছে।

সব রকমের ফসলের জন্যই মাঠ-ভাসিয়ে 'জল-সেচ' না করে নলের সাহায্যে জল ছিটিয়ে দিয়েও ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে; অবশ্য ধান ও পাটের বেলায় এই 'জল ছিটিয়ে' দেওয়ার পদ্ধতি খুব উপযোগী নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াতে চাষ আবাদের প্রায় ১০ শতাংশ এই পদ্ধতির সাহায্যে হয়ে থাকে। ইস্রায়েলে জলের পরিমিত ব্যয়ের মাধ্যমে কৃষি সামগ্রী ফলনের উদ্দেশ্যে একটু একটু করে 'জল চুইয়ে চুইয়ে' দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যাকে বলা হয় drip-irrigation। এর জন্য দরকার হলো জমিতে সচ্ছিদ্র নলের পরিকল্পিত বিন্যাস। নলের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জল আস্তে আস্তে চুইয়ে পড়ে ও উদ্ভিদের চারার গোড়ায় মাটিকে ভেজা রাখতে সাহায্য করে।

আমাদের এই ভারতবর্ষের জল-বায়ু ও ভূ-প্রকৃতি নানা অঞ্চলে নানা রকমের। চাষ করতেই মাঠ ভাসিয়ে জল সেচ না করে, মাটির নীচে নলের সাহায্যে বিশেষ সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে জলের অপচয় অনেক কমে যাবে। আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জলের সাহায্যে এখন আরও বেশী জমি চাষ করা চলবে আর নয়তো একই জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফসল ফলানো যাবে। আবার মাটির নীচে জলের যে সঞ্চিত ভাণ্ডার আছে—তাকেও সর্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগিয়ে খাদ্যের ফলন অনেক বাড়ানো যাবে। এই নতুন ধরনের জল সেচ ব্যবস্থায় মহাকাশ যুগের অতি উপযোগী বস্তু-প্লাষ্টিক, আমাদের প্রভূত উপকারে লাগবে। ধাতব বস্তুর পরিবর্তে অনেক কম খরচে কৃত্রিম প্লাষ্টিকের তৈরী কৃষির জিনিসপত্র ও জল সেচ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে সত্যি সত্যিই এক বিরাট জোয়ার এনে দেওয়া যাবে ভারতীয় কৃষি উৎপাদনে।

প্রত্যাশা থেকে পূর্ণতায়

সুধাময় মুখোপাধ্যায়

দুঃখের সাগর থেকে সুখের সরসী কতদূর? কতদূর আত্মিক প্রয়োজন থেকে আধ্যাত্মিক অভিবাসন? প্রত্যাশা থেকে পূর্ণতা—তাই বা কতদূর? যত দূরই হোক, নিষ্ঠা আর কর্মোদ্যোগ থাকলে যোজনব্যাপী দূরত্বও যে অতিক্রম করা যায়, তার প্রমাণ আমাদের স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তী ইতিহাস। ১৯৪৭-এর প্রত্যাশা ১৯৭৫-এ পূর্ণতা পেয়েছে। অবশ্য তার জন্যে দিতে হয়েছে অনেক এবং এটাও সত্য যে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। এও সত্য যে পাওনাটা যদি হয় বেশ বড় ধরণের দেওয়াটাও তখন ক্ষুদ্র থাকে না। আমরা পেতে চেয়েছিলাম সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি—চেয়েছিলাম ঐক্যবোধে সংহত এক অখণ্ড ভারত, প্রার্থনা করেছিলাম, একটি জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞার সার্থকতা। আজ ১৯৭৬-এর ১৫ই আগষ্টের দিকে তাকিয়ে পরম আত্মপ্রসাদে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি—আমাদের সংকল্প ছুঁয়েছে। সিদ্ধির দেহ, আমাদের প্রত্যাশা পেয়েছে পূর্ণতার আশ্রয়। স্বাধীনতার পরবর্তী কালের ইতিহাসে যদি বা কিছু সংশয় সন্দেহ দুর্বলতা ছিল, আজ আর তা নেই এবং না থাকার কারণ সেই তৎপরতা যা না থাকলে সিদ্ধি আয়ত্ত হয়না, না থাকার কারণ সেই দিব্য দীপ্ত অনুভব, যার আর এক নাম দেশপ্রেম। আমরা আজ ফিরে পেয়েছি বিশ্বাস, দূর করতে পেরেছি ভিন্নতা বোধ, উত্তীর্ণ হয়েছি সেই উদার উপলব্ধিতে যে উপলব্ধিতে জাতির চেয়ে বড় আধার নেই, দুঃখের চেয়ে বড় বন্ধু নেই, সহযোগিতার চেয়ে বড় প্রেরণা নেই।

১৯৪৭-এ সংকল্প, ১৯৭৫-৭৬'-এ তার সিদ্ধি। ১৯৪৭-এ সাধনা, ১৯৭৫-৭৬-এ তার পূর্ণতা। স্বাধীনতার জন্যে আত্মদানের পেছনে ছিল মানুষকে একান্ত ক'রে ভালবাসার প্রেরণা। ভারতবর্ষের মানুষ, দরিদ্র মুচি মেথর, গ্রামের চাষী মুজুর, এরাই যে রক্ত, এরাই যে ভাই, এই সত্যে উত্তীর্ণ হবার আর এক নাম স্বাধীনতায় উত্তরণ। কারণ, দেশ তো লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে—যে মানুষ কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

এই মানুষই বঞ্চিত হয়েছে মর্মান্তিক ভাবে, এই মানুষই উপেক্ষিত হয়েছে অসহায় ভাবে। যখন, স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু জাগ্রত হয়নি সেই চৈতন্য, যে চৈতন্যে মানুষের মুক্তি, তখন মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা রয়ে গেছে অব্যাহত। দেশে উৎপাদন বেড়েছে, সৃষ্টির উৎসাহ বেড়েছে, গড়ার সংকল্প জেগেছে, কিন্তু বাড়েনি সেই বোধ যে বোধে ধনীর প্রাসাদ, আর গরিবের কুঁড়েঘর সমান হয়ে যায়। তা নাহ'লে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুটি দশক কেটে গেলেও শিশুর খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল দেবার মত ঘৃণ্য মানসিকতা মরে না কেন? কেন মনুষ্যত্বের সর্বনাশ চোখে দেখেও জাগেনা নৈতিক বোধ, কেনই বা জনগণকে বিভ্রান্ত ক'রে লোক দেখানো বিপ্লবের নামে চলে সরকারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তিহীন জেহাদ?

এলো ১৯৭৫-প্রশাসনিক স্তরে নবক্রান্তির সূচনা ক'রে ঘোষিত হলো জরুরী অবস্থা। অনুশাসন পর্ব এলো শোষিত মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে। বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সুরু হলো স্বাধীনতাকে মানুষের জীবনে অর্থবহ করে তোলার বিপুল উদ্যোগ। সামাজিক স্তরেও পণপ্রথা বিরোধী মনোভাব গতানুগতিকতার কন্ঠরোধ করল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি—সমস্ত ব্যাপারেই একটি সংহত যোজনার আশ্রয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নকেই মূল লক্ষ্য করা হল। সমস্ত চেষ্টাকে সংহত করা হল দেশের গঠন কার্যে—সমস্ত চিন্তাকে সংযোজিত করা হল ভারতবর্ষের মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্যে। কেটে গেছে একটি বছর। আজ দেশ সত্যিই স্বাধীন দেশ। শুধু নামে নয় কাজেও আজ আমরা সমাজতন্ত্রী। এবারের স্বাধীনতা দিবস তাই লক্ষ্য পূরণের আনন্দে সার্থক। এবারের ১৫ই আগষ্ট সংকল্প থেকে সিদ্ধিতে পৌঁছে দেবার জন্যে আমাদের কাছে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রত্যাশা এখনও আছে, তবে পূর্ণতার পথে আমরা পা রেখেছি। এটাই আশ্বাসের কথা।

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত

1975-76

উৎপাদন ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি

- ★ অর্থনৈতিক বিকাশের হার 1974-75-এর 0.2%-এর তুলনায় 5.5% হয়েছে।
- ★ 1974-75-এর 2.5%-এর তুলনায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার 4.5%।
- ★ খাদ্যশস্যের উৎপাদন 114 মিলিয়ন টনের মাত্রায় পৌঁছুবার আশা রয়েছে।
- ★ সরকারী শিল্প সংস্থাগুলির মোট উৎপাদন প্রায় 36% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ★ রেলচলাচল, ডাক ও তার ব্যবস্থায় সময়নিষ্ঠা, কাজে তৎপরতা, সৌজন্য ও জনসেবার আগ্রহ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

DAVP 76/93

খেলাধুলা

সবই প্রায় খরচের খাতায়

অজয় বসু
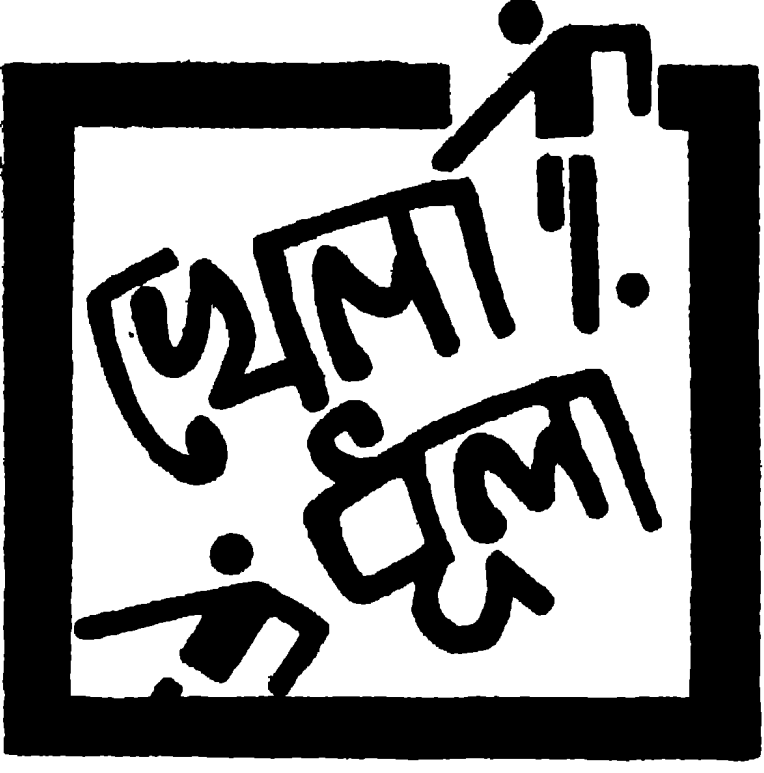
সোনা নয়, রূপো নয়, ম্যাড়মেড়ে ব্রোঞ্জ নয়, বিশ্ব কাপ বিজয়ী ভারতীয় হকি দল ক্রীড়াতীর্থভূমি মন্ট্রিলে এক চিলতে ধাতুও সংগ্রহ করতে পারে নি। বিকল্পে পেয়েছে সপ্তম প্রতিযোগীর স্বীকৃতি। একবিংশতিতম ওলিম্পিক আসরে উপস্থিত ছিল মোট এগারটি হকিদল। তাদের মধ্যে ছ'টি দল স্বীকৃতির সিঁড়ি পেয়ে ভারতকে টপকে গেছে। ভারতীয় হকির এ এক অভাবনীয় পদস্খলন। নজিরটির দিকে যতোই তাকানো যায় ততোই যেন হতাশার জ্বালায় যন্ত্রণাবিদ্ধ অন্তরে হায় হায় করে উঠতে হয়।

গত আটচল্লিশ বছরে বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার দশটি অনুষ্ঠান হয়েছে। দশবারেই ভারতীয় হকিদল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে হয় সোনা আর না হয় রূপা বা ব্রোঞ্জ পদক সংগ্রহ করে ঘরে ফিরেছে। শূন্য হাতে প্রত্যাবর্তন ছিল অকল্পনীয় প্রায়। কিন্তু অতীতে যা ছিল ধারণার অতীত, বাস্তবে তাই আজ সত্য হয়ে দাঁড়ালো। তাই সাতবারের চ্যাম্পিয়নকে এবার শূন্যহাতে নতমস্তকে স্বদেশে ফিরতে হয়েছে। সপ্তম শ্রেষ্ঠের সংজ্ঞাও ভারতীয় হকি দলকে কণামাত্র সান্ত্বনার খোরাক যোগাতে পারছে না। সামনে নৈরাশ্যের অন্ধকার। এ আঁধার পেরিয়ে কবে যে প্রত্যাশা পূরণের তটভূমিতে ভারতীয় হকির উত্তরণ ঘটবে, তা কেইই বা বলতে পারে।

আধুনিক ওলিম্পিকের প্রবর্তক ফরাসী চিন্তানায়ক ব্যরণ পিয়ের দ্য কুবারটন বলেছিলেন 'জয় নয়, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করাই বড় কথা।' গভীর মূল্যায়ণে তাঁর উপলব্ধি হয়তো সাচ্চা। কিন্তু যেকালে সংগৃহীত সোনাদানার খতিয়ানে এক একটি দেশ ও জাতির যথার্থ মূল্যায়ণ করা হয়, বাস্তবধর্মী সেই কালে শুধু যোগদানেই আওয়ান বা উন্নতকামী কোনো দেশের আশা, আকাংখা চরিতার্থ হতে পারে না। তাই আশা-ভঙ্গের খোঁচায় ভারতীয় জনমানস আজ প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

এই বিহ্বলতার হেতুও অনুধাবন-যোগ্য। কোনো পদক না পেলেও হয়তো আমাদের সইতো। মিউনিখ ও মেক্সিকোতে জুটেছিল ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জের সঙ্গে পদক না পাওয়ার ব্যবধানই বা কতোটুকু? কিন্তু তাই বলে একটি ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৬ গোলে হারতে হবে? কোনো সন্দেহ নেই যে আন্তর্জাতিক হকিতে অধুনা অনেক শক্তিধর দলের আবির্ভাব ঘটেছে। উপ-মহাদেশের দুই শরিক ভারত ও পাকিস্তানকে চড়া চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে অষ্ট্রেলিয়া ও ইয়োরোপের একাধিক প্রতিনিধি গোকুলে বেড়েছে। তবুও বলি, ৬-১ গোলে হেরে যাওয়ার নজিরকে মেনে নিতে যুক্তি, বুদ্ধি, সবেতেই যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পদক সংগ্রহ ভারতের ব্যর্থতা নয়, আসলে অষ্ট্রেলিয়ার হাতে আধ ডজন গোল খাওয়াই আন্তর্জাতিক হকিতে শতাব্দীর বৃহত্তম অঘটন। পণ্ডিতেরা এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা অতঃপর এই অঘটন সম্পর্কে যে কৈফিয়ৎ দাখিল করেন, তা জানার জন্যে আজ প্রতীক্ষা করছি।

দেশ বিদেশ সফরের পরিণত অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে এমন পণ্ডিতবর্গ মন্ট্রিল ক্রীড়ার আগে ভারতীয় হকির সম্ভাব্য সাফল্য ঘিরে অনেক গালগল্প শুনিয়েছিলেন। আত্মতুষ্টিই ছিল তাঁদের অভিমতের উৎস। কিন্তু প্রথমে হল্যাণ্ড, পরে অষ্ট্রেলিয়ার প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে সেই আত্মতুষ্ট মনোভাব যখন ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হলো তখন তাঁরা সখেদে শুধু শোনালেন 'এরপর আর বলার কি আছে।' পাণ্ডিত্য অভিমানের কৌপীন গা থেকে খুলে নিয়ে তাঁরা সব তখনই সেই সাধারণ মানুষের দলে গা ভিড়িয়ে দিলেন যাঁরা স্বচক্ষে মন্ট্রিলে ভারতীয় হকি দলের খেলা দেখেননি এবং তা না দেখেও যাঁরা বলতে পারতেন যে এরপর আর বলার কি আছে। আশ্চর্য এই যে কোচ, ম্যানেজার, শেফ্ দ্য মিসন সকলেরই চোখের সামনে এতোবড় অঘটন ঘটে গেল। কিন্তু কেউই জানাতে পারলেন যে কী কারণে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার দিনে ভারতীয় প্রতিরোধ এমন শিথিল ও অকেজো হয়ে পড়লো।

বলতে পারলেন না, না বলতে চাইলেন না? এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নি। তাই সন্দেহ জাগে যে সেদিন মাঠে নেমে এগারোজন ভারতীয় কী পুতুলের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন? দলের মধ্যে দল ছিল? পারস্পরিক বনিবনার অভাবে কেউ কারুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্পে স্রেফ্ দাঁড়িয়ে থেকেই খেলার ভান্ করে জাতীয় দলকে পথে বসাবার চক্রান্ত এঁটেছিলেন? এসব সন্দেহ যে অযৌক্তিক নয়, জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান পৃথিপাল সিং সোচ্চারে তা জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগের সূত্রে ঝুলির ভেতর থেকে বিড়ালটি সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে। আরও কথা চালাচালি করা হলে বা পৃথিপালের দাবি অনুযায়ী নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হলে

মন্ট্রিলে হকি ফাইনালে জয়ের পর নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়েরা

ঝুলির বিড়ালটি একেবারে বাইরে এসে পড়বে। তাতেও হয়তো ভারতীয় হকির রঙ চটা ভাবমূর্তির ওপর মনোহারি রঙের প্রলেপ লাগানো যাবে না। কিন্তু তবুও বলি, এই তদন্ত হোক্। ভারতীয় ক্রীড়া-শুভাকাঙ্খী মহল সেই সূত্রে জানতে পারুন ভারতীয় হকির ভাগ্য বিপর্যয়ের যথার্থ কারণটি কী। তদন্তে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হবে তো? হওয়াই উচিত। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা যদি নিরিখ হয় তাহলে বলা যায় যে এবারেও কেউ শাস্তি পাবেন না। যেহেতু ক্রীড়াক্ষেত্রে অনাচারের অভিযোগে ভারতবর্ষে কেউ কোনোদিন তিরস্কৃত হয় নি। একদিকে জমা করা অনাচারের পাহাড় অন্যদিকে মনে মনে স্বর্ণ স্বপ্নের জাল বোনা, এ কী এক নিরর্থক মানসিক বিলাস নয়? একেই তো বলে স্ববিরোধিতার ভোগান্তি। শুধু হকিই না, অন্যান্য খেলাধূলার ক্ষেত্রেও ভারতকে এই দুর্ভাগ্যের বোঝা ঘাড় পেতে বইতে হচ্ছে। এই ভোগান্তির শেষ কোথায়? শেষ নেই, যদি না ক্রীড়াচর্চাকে জাতীয় কর্তব্য বলে আমরা মনে করতে পারি। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায়, কিংবা অর্থনৈতিক গবেষণায় অধুনা যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই গুরুত্ব যদি খেলাধূলায় আরোপিত না হয় তাহলে মুস্কিল আসানের সন্ধান পাওয়া কঠিন। খেলাধূলা জীবনে অসম্পৃক্ত নয়, এই উপলব্ধির তাগিদেই জাতিগত কর্মোদ্যমের জোয়ার বইয়ে দিতে হবে জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে। নইলে পদক সংগ্রহ তালিকায় ভারতের নাম খোদাই করার কাজ এমনি করে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। ছোট ছোট দেশ, অপ্রধান সব রাষ্ট্র পদক তালিকায় নিজেদের নাম স্বহস্তে উৎকীর্ণ করেছে। আমরা তা পারি নি। পারি নি বুদ্ধির দোষে, কর্মোদ্যমের অভাবে, পরিকল্পনার দৈন্যে। কর্ম ধর্মের সমন্বয়ে জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে সর্বশক্তি সংহত করতে পারলে সে কাজ অসাধ্য থেকে যাবে বলে মনে করি না। তবে এর জন্যে প্রয়োজন সুস্থ চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গতি। নিছক শৌখিন মনোভাবের তাগিদে জাতীয় ক্রীড়ার উন্নয়নের স্বপ্ন দেখার দিন আর নেই। এখন দরকার কঠিন মন ও নিষ্ঠার। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভের মতলব ছেড়ে সাধনায় আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজনই আজ ঐতিহাসিক।

মন্ট্রিল অলিম্পিকে শুধু যে জাতীয় হকি দল ভরাডুবির স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হয়েছে তাই নয়। সেই সঙ্গে ভারতীয় ভারোত্তলক, মুষ্টিযোদ্ধা ও লক্ষ্যবিদেরা আত্মবিলুপ্তির অখ্যাতির বোঝা ঘাড় পেতে নিয়েছেন। মুষ্টিযোদ্ধা এস কে রাই ছাড়া কেউই প্রাথমিক পর্বের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে এক কদম এগোতে পারেন নি। আফ্রিকান প্রতিদ্বন্দ্বী নাম প্রত্যাহার করায় এস কে রাই ওয়াক ওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে এগিয়ে যান বটে। কিন্তু সেখানেই ইতি। আর তিন লক্ষ্যবিদের একজন রনধীর সিং ট্র্যাপে যুগ্মভাবে একুশতম ও গুরবীর সিং স্কিটে তিনজনের সঙ্গে একত্রে ছাপ্পান্নতম আসনটি ভাগা-ভাগি করে নিলেও অবসিষ্ট প্রতিযোগী ভীম সিং স্কিটের আটষট্টি জন প্রতিযোগীর মধ্যে সর্বশেষ আসনটি ছেড়ে আর ওপরে উঠতে পারেন নি।

ওলিম্পিক হকি, ভারোত্তোলন, মুষ্টি-যুদ্ধ এবং স্যুটিং, সবেতেই ভারতীয় ভূমিকা খরচের খাতায়। চারপাশে একরাশ অন্ধকার, হতাশার পাহাড়। সার্বিক মূল্যায়নে ব্যর্থ। শুধু ব্যতিক্রম যুগল অ্যাথলিট শ্রীরাম সিং ও শিবনাথ সিং।

আটশ মিটার দৌড়ে শ্রীরাম সপ্তম স্থান পেয়েছেন এবং ওলিম্পিক রেকর্ড ডিঙ্গিয়ে নিজের সামর্থ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ধরে রেখেছেন মন্ট্রিলের ট্র্যাকে। অনগ্রসর ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে অ্যাথলেটিক্সে ওলিম্পিক রেকর্ড ভাঙ্গা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। ভারত ১৯২০ সাল থেকে ওলিম্পিক অ্যাথলেটিক্সে যোগ দিয়ে আসছে। দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বছরের অবকাশে মাত্র তিনজন ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাথলেটিক্স ফাইনালে অংশ গ্রহণের অধিকার অর্জন করতে পেরেছেন। তাঁদের প্রথমজন হলেন ভারতের বেসরকারী প্রতিনিধি নর্ম্যান প্রিচার্ড, যিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে দৌড়ে ও হাডল রেসে দুটি রৌপ্য পদক পান। দ্বিতীয়জন

মিলখা সিং রোম অলিম্পিকে চারশ মিটার দৌড়ে চতুর্থ হন এবং তৃতীয় প্রতিযোগী হলেন হার্ডলার গুরবচন সিং, যিনি টোকিও ওলিম্পিকে পঞ্চম স্থান পান। এই ত্রয়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীরাম এবার ফাইনাল পর্যন্ত এগিয়ে যান।

শিবনাথ সিং শ্রমসাধ্য ম্যারাথন দৌড়ে (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) একাত্তর জন প্রতিযোগীর মধ্যে একাদশ স্থান লাভ করেন। ম্যারাথন দৌড়ে শিবনাথ যে সময় (২ ঘণ্টা ১৬ মিঃ ২২ সেকেণ্ড) নিয়েছেন এবং আটশ মিটার দৌড়ুতে শ্রীরাম যে সময় (১ মিঃ ৪৫.৭৭ সেঃ) নেন, তা আন্তর্জাতিক মানে মানান সই। অনেকের অনুমান, ভেতরের কোনো লেনে দৌড়ুবার সুযোগ পেলে শ্রীরাম হয়তো আরও কম সময় নিতেন। কথাটি মিলখা সিংয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মিলখা ও শ্রীরাম, দুজনেরই বরাত খারাপ। লটারির মাধ্যমে লেন নির্ধারণের কালে তাঁরা উভয়েই বাইরের লেনে পড়ে যান। ভেতরে থাকতে পারলে ছুটন্ত প্রতিযোগীকে সামনে দেখে তাঁকে অতিক্রমে তারা হয়তো আরও চেষ্টা করতে পারতেন।

তবু ভাগ্যকে মেনে নিয়ে শ্রীরাম এবার যা করতে পেরেছেন এবং শিবনাথ যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার জন্যে তাঁরা কুণ্ঠাহীন অভিনন্দনযোগ্য। টি. সি. জোহানন লংজাম্প এবং হরিচাঁদ দশহাজার মিটার দৌড়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে ছাঁটাই হয়ে গেলেও ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে জাতে তুলে ধরার কৃতিত্ব যাঁরা দেখিয়েছেন সেই শিবনাথ ও শ্রীরাম সিংয়ের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

হকিতে সোনা পাওয়ার স্বপ্নে মশগুল থাকতে গিয়ে আমরা এতদিন শ্রীরাম ও শিবনাথের দিকে নজর দিতে চাই নি। হকিতে নাকের বদলে নরুণ জোটার পর যেন জাতিগত শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে আজও বুঝি ওঁদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি না। কিন্তু নিজেদের কর্মকাণ্ডের পুণ্যে ওই যুগল ভারতীয় তরুণ জাতীয় অ্যাথলটিক্সের ইতিহাসের দৃষ্টি তাঁদের দিকেই আকর্ষণ করে নিয়েছেন। অতএব ওঁদের সাধুবাদ জানিয়ে বলি, হতাশার সাগর পারে একটু-করে আশার আলো জ্বালিয়েছেন ওঁরাই। এই যুগলের দ্বৈত কীর্তি হয়তো হকিতে হারের শোক ভোলাতে পারবে না। কিন্তু তবুও ওঁদের ভূমিকা অস্বীকৃত থাকার নয়। একপেশে মন যদি তা মানতে নাও চায়, তাহলেও কিন্তু ইতিহাস কৃতজ্ঞচিত্তেই ওঁদের জয়ধ্বনিতে সোচ্চার থেকে যাবে।

আবার তাই বলি। অ্যাথলেটিক্সে পিছিয়ে থাকা ভারতবর্ষের দুই প্রতিনিধির পক্ষে আন্তর্জাতিক মানে লাফিয়ে উঠে পড়া যেমনতো এক কৃতিত্বের নজির তাতে কোনো সন্দেহই নেই। মনে রাখা উচিত যে শ্রীরাম সিং ছাড়া কোনো এশীয় অ্যাথলিট এখনও পর্যন্ত ওলিম্পিকে আটশ মিটারে দৌড়ের ফাইনালে দৌড়ুবার অধিকার অর্জন করতে পারেন নি।

মন্ট্রিলে ৮০০ মি. ফাইনালে শ্রীরাম সিংহ (৫১২)

বন্দেমাতরম্ শতবর্ষের আলোকে

১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এটাকায় তার কি অধিকার?
মহে। রাজার রাজভোগ।
ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করেনা, সে আবার রাজা কি?"
অনেক কথাবার্তার পর ভবানন্দ বলল—'এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুয়ানী থাকে?
মহে। তাড়াবে কেমন করে?
ভবা। মেরে।
মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দস্যু গায়িল——

"সপ্তকোটি কন্ঠ কল-কল নিনাদকরালে!
দ্বিসপ্ত কোটি ভুজৈ ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

পরবর্তী কালে 'বন্দেমাতরম্' প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর বীজমন্ত্রে পরিণত হল। 'বন্দেমাতরম্'-এর মধ্যেই একদিন বাংলার বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন মৃত্যুকে জয় করার মহান মন্ত্র।

মাতৃ বন্দনার যে সংগীত শতবর্ষ আগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, সেই সংগীতের সুর তেমনি আজও সমান ভাবে বেজে চলেছে শহর থেকে গ্রামে—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। রবীন্দ্রনাথের 'জনগন মন'-এর মতই 'বন্দেমাতরম্' স্বাধীন ভারতে জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় ভূষিত।

গ্রন্থ আলোচনা
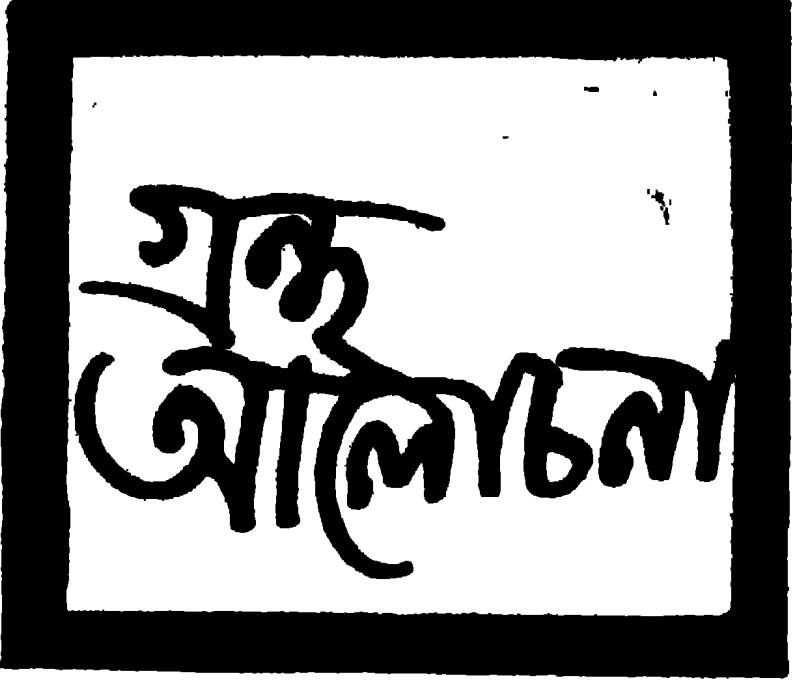
দুই মধুসূদন॥ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক: আনন্দম্॥ রামকৃষ্ণ পল্লী, বিরাটি। কলিকাতা-৫১। দাম-সাত টাকা

মাইকেল মধুসূদনের সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দুই মধুসূদন' গ্রন্থখানি। গ্রন্থখানি ব্যক্তি মাইকেলের দ্বৈত সত্তা এবং কবি শ্রীমধুসূদনের যুগ্ম সত্তা উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। ঠিক এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থে ব্যক্তি ও কবির পরস্পর বিরোধী এবং পরস্পর পরিপূরক সত্তার বিচার বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে হয়নি। লেখক শ্রী মুখোপাধ্যায়ের উপস্থাপন প্রাঞ্জল, ভাষা হৃদয়গ্রাহী এবং বিশ্লেষণের লক্ষ্যবস্তু পূর্বালোচিত হয়েও নবতাৎপর্যে দীপ্যমান। তথ্য সংগ্রহের বিপুল নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরস তীর্যক বাগ্‌ভঙ্গির সাহায্যে বক্তব্য পরিবেশনের নিপুণতা।

মাইকেল মধুসূদন, সেই নীলনয়না মেয়েটি, ক্যাপটেন রিচার্ডসন, গোল্ড-স্মিথের ব্যাধি, বালিকা বিবাহ, নীলদর্পণের অনুবাদক, বিস্মৃত কবিতা ও মাইকেল বনাম মধুসূদন—এই আটটি প্রবন্ধে লেখক তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি 'এক দেহে দুই মধুসূদন' (পৃ: ৭৫) তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মাইকেলের ব্যক্তিগত অভিরুচি এবং সাহিত্যিক প্রবণতার মধ্যে আবহমান দ্বৈধ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন"। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রভাবের স্বীকৃতি এবং জাতীয়তাবোধের জাগরণ—মধুসূদনের জীবনে এই দুই বিরোধী ভাবধারা একত্রে স্থান লাভ করেছিল এবং পরিশেষে জাতীয়তারই জয় হয়েছিল। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, 'মাইকেল মধুসূদন এই নাম তাই কোন মানুষের নয়, এ নাম একটি যুগের। অনেক দ্বন্দ্ব ও জটিলতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা জাতীয়তাবাদকেই যে জয়ী করতে পেরেছিলাম, এটাই হল এ যুগের সার কথা'। (পৃ: ৯৭)।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় যিনি প্রেমের প্রসঙ্গে নীরব থাকতেন, তিনি যে কেমন গভীরভাবে প্রেমিক ছিলেন, যিনি এদেশীয় বালিকা বিবাহে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন তিনিই যে পরপর দুবার শ্বেতাঙ্গিনী বালিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, ক্যাপটেন রিচার্ডসনের প্রতি যিনি এককালে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন পরবর্তী কালে তিনি তার সম্পর্কে আশ্চর্য-ভাবে নিরুত্তাপ ও নীরব হয়ে যান, ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথের মতো যিনি ঋণ গ্রহণে অকুণ্ঠ ছিলেন অথচ ঋণ পরিশোধে বিচিত্র মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, যিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তিনিই বিদ্যাসাগরের তাঁর উদ্দেশে 'বাবু' সম্বোধন করে লেখা পত্র এবং তার জন্য নির্বাচিত বাসগৃহ প্রত্যাখান করেছিলেন—ইত্যাদি নানা পরস্পর বিরোধী আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মধুসূদনের দ্বৈত সত্তার পরিচয় মেলে।

যিনি নবযুগের বাংলা কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিই যে চিরকাল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে চাইতেন, 'England doe not want a Black Mecaulay or Black Shakespeare' একথা জেনেও যিনি অন্তরের নিভৃতে ইংরেজি ভাষার স্বীকৃত কবি হতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি, খ্রীষ্টান যুবক হিসেবে যিনি হিন্দুধর্মে বিন্দুমাত্র অস্থাশীল ছিলেন না—তিনিই যে তাঁর পূর্বপুরুষদের মহৎ পুরাণ কাহিনীগুলিকে কেমন প্রীতির চক্ষে দেখতেন, যিনি M. S. D নামে ইংরেজি কবিতা লিখতেন তিনিই যে শেষ পর্যন্ত তাঁর সমাধিলিপিতে 'কবি শ্রীমধুসূদন' লিখেছিলেন—ইত্যাদি বিচিত্র প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিত্বপ্রবণতায় দ্বিধা-বিভক্ত চিত্ততা আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া লেখক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। 'নীলদর্পণের' ইংরেজি অনুবাদ কে করেছিলেন—মাইকেল, না মহেন্দ্রনাথ দত্ত কথিত রামচন্দ্র? ব্যক্তিগত জীবনে মাইকেল বনাম মধুসূদনের দ্বন্দ্ব এবং কবিজীবনেও মাইকেল বনাম শ্রীমধুসূদনের স্ববিরোধিতা অথচ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সমন্বয় পরিণামমুখী ঐক্য বিশ্লেষণ পরম্পরায় ধরা পড়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে কোনদিন দ্বন্দ্বের নিরসন হয়নি বলে ব্যক্তি জীবনের শেষ পরিণামে এসেছে ট্র্যাজেডি, কিন্তু কবিজীবনে সকল দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ কাব্য সার্থকতায় তিনি যুগপ্রবর্তক কবি হিসেবে চিরন্তন মহিমায় সমাসীন—এই সত্যের পুনর্মূল্যায়ণ হয়েছে এ গ্রন্থে।

প্রবন্ধগুলির নামকরণের মধ্যে আপাত বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু গ্রন্থপাঠশেষে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থাকে না। গ্রন্থটিতে ছাপার ভুলের সংখ্যা আরও কম হতে পারত।

স্নেহময় সিংহরায়
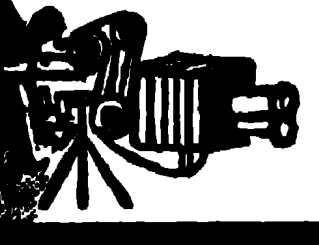
সিনেমা

দর্শক সাধারণ যে কোন্ ধরনের ছবি পছন্দ করেন বা করবেন—তা কোনো চলচ্চিত্র নির্মাতাই ছবি মুক্তির পূর্বে বলতে পারেন না। তবে চলচ্চিত্র নির্মাতারা ভালো ছবি নির্মাণ করার চেষ্টা করতে পারেন অনায়াসে। ভালো বাণিজ্য হবে ভেবে যেসব সিনেমার গল্প তৈরী করে ছবি নির্মাণ করা হয়, তাতে মশলা হয়তো বহু থাকে—কিন্তু স্বাদ হয় না। তখন না হয় বাণিজ্য, না দেওয়া যায় রসের যোগান। বস্তুত এ বছর মুক্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি বাংলা ছবির হাল তাই। সেগুলি না সরকা না ঘাটকা—যথার্থ বাণিজ্যিক বা শৈল্পিক কোনো ধরনের ছবিই হচ্ছে না।

দুর্বল চিত্রনাট্যের ছবি 'অর্জুন'

এবং সেক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ইন্দর সেনের পরিচালনায় সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত অর্জুন ছবি সম্পর্কে চলচ্চিত্র ও সাধারণ দর্শকমহলে বেশ কিছু আশা ছিলো। কিন্তু সেই আশা যথাযথ পূরণ হয়নি। প্রধান কারণ দুর্বল চিত্রনাট্য (ইন্দর সেন)। উদ্বাস্তু সমস্যার যে দিকটি ছবিতে দেখানো হয়েছে—সেটা আজকের নয়, অন্তত একযুগ অতীতের। আজকের উদ্বাস্তু সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, ছবিতে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। অবশ্য পরিচালক চিত্রনাট্যকার যদি মহাভারতের অর্জুনের কাহিনীর রূপকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে থাকেন, তাহলেও সেটা একপেশে, চিরায়ত হয়ে ওঠেনি। কাহিনীতে উপাদান ছিল ঠিকই কিন্তু ঘটনার বাঁধুনি বিক্ষিপ্ত। ছবির গতি ঋজু এবং একমুখীন না হওয়ায় সবটাই মাঠে মারা গোছের হয়ে গেছে।

ছবিতে মূলত একটি উদ্বাস্তু কলোনিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—কতকটা মঞ্চের ঢঙে। প্রয়োগকর্মে চলচ্চিত্রের রীতি কিন্তু নাট্য ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ থিয়েটার। ঘটনা সংঘাত অপেক্ষা কথাবার্তার আদান-প্রদানই বেশী। বিভিন্ন চরিত্রগুলি সুখ-দুঃখ আশা-আকাংখা আনন্দ-বেদনার কথা বলেছে। অথচ যুগ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনার অবজেক্টিভ রূপ ছবিতে নেই। এমন নয় যে উদ্বাস্তু কলোনি থেকে পরিচালক বাইরে বেরিয়ে আসেননি। নায়কের ধনী প্রেমিকা-উপাখ্যানে গাড়িতে চেপে গান গাওয়া, সুইমিং পুলে হ্রস্ব পোষাকে মেয়েদের স্নানের দৃশ্য কিংবা নির্জন নদী বা লেকের ধারে নায়ক ও তার ধনী প্রেমিকার প্রেমপ্রেম খেলা ইত্যাদি কলোনির বাইরেই ঘটেছে। এইসব দৃশ্যের সংযোজন সম্ভবত বাণিজ্যিক কারণে। এগুলি ছবি থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারতো। বস্তুত ক্লান্তিকর এই দৃশ্যগুলি বাণিজ্যের কিছুমাত্র সুরাহা করেনি, বরং ক্ষতি করেছে বলা যায়। ছবিতে অবজেক্টিভ ঘটনা ও কার্যকারণ থাকলে নায়ক অর্জুন কিংবা তারই আপনজন দীপু (পুরোপুরি হিন্দি ছবির ভিলেন) বিশ্বাসযোগ্য হতে পারতো, লাবণ্যের বড়ো হওয়ার স্বপ্নদেখাকে সমর্থন করা যেতো, পূর্ণিমার দুঃখের অংশীদার হতেও বাধা থাকতো না। বস্তুত অর্জুন চিত্রের সমস্ত ঘটনা এবং চরিত্রগুলি কেমন ভাসাভাসা—সাজানো। পূর্ববঙ্গের ফ্ল্যাশ-ব্যাকে অহল্যাদির মুখে রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'.... গানটি বেমানান। অহল্যাদিকে অন্য যেকোনোভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেতো। পূর্ণিমার মদ খেয়ে গভীর রাত্রে ফিরে এসে নিজের দুঃখের কাঁদুনি গাওয়ায় সহানুভূতির বদলে বিরক্তিরই উদ্রেক করে। ছবির চরিত্র এবং ঘটনাক্রম থেকে এরকম আরো অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সে-কারণেই অর্জুন ছবি সবকিছু থেকেও মনের গভীরে রেখাপাত করেনি। তবু একথা অবশ্যই বলা যায় যে, ইন্দর সেন ভালো ছবি নির্মাণ করার অন্তত চেষ্টা করেছেন। প্রয়োগে কিছু কিছু ডিটেলের কাজ প্রশংসনীয়—যেমন, কচুর শাকের প্রসঙ্গ, লন্ড্রিতে বিজন ভট্টাচার্যের বিড়ি খাওয়ার দৃশ্যটি, শেষের সেই ভয়ংকর দিনে দাদুর হাত থেকে নাতির লাঠি ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি এককথায় অনবদ্য।

একমাত্র নায়ক অর্জুনের চরিত্রে স্বরূপ দত্ত ব্যতিরেকে ছবির অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের অভিনয় মোটামুটি ভালো লেগেছে। স্বরূপ দত্তের মুখে আবৃত্তি অসহ্য। লাবণ্যবেশী সন্ধ্যা রায় অপূর্ব। কয়েকটি অসাধারণ চরিত্র উপহার দিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য, প্রেমাংশু বসু ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী। শমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, রাজশ্রী বসুর অভিনয় মামুলী। এছাড়া ভালো অভিনয় করেছেন গীতা দে, শোভা সেন, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পীরা।

সঙ্গীত আনন্দ শংকরের। রবীন্দ্র ও নজরুল সঙ্গীত ছাড়া একখানি গানে তিনি সুর দিয়েছেন। অত্যন্ত জোলো। আবহ-সঙ্গীত ছবিকে কোনো সাহায্য করেনি। চিত্রগ্রহণ শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয়। কিছু কিছু শট ও কম্পোজিশন সুন্দর। অরবিন্দ ভট্টাচার্যের সম্পাদনা উল্লেখযোগ্য।

উৎপল মিত্র

DHANADHANYE YOJANA (Bengali)
REGD. NO. D(D) 78
Price 50 Paise August 15, 1976

'অসময়' ছবিতে একটি বিশেষ মুহূর্তে অপর্ণা সেন

অসময় ঃ
ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের ছবি

দুর্বল কাহিনীর ভারগ্রস্থ শরীর নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র যখন আজকের সময়ের পথ দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে—ইন্দর সেনের 'অসময়' ঠিক সেই সময়েরই ছবি। কাহিনীর বলিষ্ঠতার কথা স্মরণ রেখেই পরিচালক বেছে নিয়েছেন এবছরের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত বিমল করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অসময়'-কে। আধুনিক ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ জীবনের সমস্যাকে পরিচালক তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর এই ছবিতে। কাহিনীর নায়িকা মোহিনী (অপর্ণা সেন) বাবামা'র অমতের ফলে বিয়ে করতে পারেনি ভালোবাসার পাত্র শচিপতিকে, (দীপংকর দে), কারণ শচিপতির সংসারের কোন পুরুষই চল্লিশ বছরের বেশী বাঁচেনা; শচিপতিও পারেনি মোহিনীকে গ্রহণ করতে, ছবির শেষে অবশ্য শচিপতিও মারা গেছে দুরারোগ্য ক্যান্সারে। মোহিনীর সংগে বিয়ে হয়েছে বাবার মনোনীত পাত্র রাজেশ্বরের (নিমু ভৌমিক), কিন্তু শিক্ষিতা মোহিনীর পক্ষে লম্পট স্বামীকে সহ্য করে বিবাহিত জীবন যাপন করা অসম্ভব হওয়ায় তাকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে বাবার ঘরে; নিঃসঙ্গভাবে নিজেকে নিয়েই কেটে গেছে এক একটা দিন—এক একটা বসন্ত। এমনই অসময়ে শহর থেকে ছোটভাই সুহাসের (কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়) সংগে এসেছে তার বন্ধু অবিন (স্বরূপ দত্ত), গভীরভাবে ভাল বেসেছে সে মোহিনীকে, মোহিনী নিজেকে আড়ালে রেখে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে, ভালোবাসা নিয়ে পত্র যুদ্ধ করেছে উভয়েই। কিন্তু ছবির শেষে মোহিনীর একলা-মুহূর্তে কলকাতা থেকে আবার ফিরে এসেছে অবিন, ভালোবাসার ঘায়ে ভেঙে ফেলেছে প্রেমের বন্ধ দরজা। মোহিনীর সংগে অবিনের অবশেষে মিলন হয়েছে অসময়ে। পরিচালক এই ছবিতে মোহিনীর মানসিক দ্বন্দ্বকে খুব সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মোহিনীর অতীত জীবনের ঘটনাগুলো ছোট ছোট ফ্ল্যাশব্যাকে বিবৃত হয়েছে। অপর্ণা সেনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় মনে রাখার মতো। তিনি মোহিনীর জীবনের বিচ্ছিন্নতা বোধ এবং দ্বান্দ্বিক চরিত্রকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দীপংকর দে'র প্রথম অংশের অভিনয়ের ভিতর আমরা বাঞ্ছিত পেসিমিষ্টিক ভাব দেখলাম না, তিনি সাবলীলভাবে ঘোড়াগাড়ীতে চেপে গান গেয়েছেন। অবিনের তাজা, উচ্ছলভাবকে খুব সহজেই তুলে ধরেছেন স্বরূপ দত্ত। এ'ছবির আরও একটা উপকাহিনী আয়না এবং তপুর প্রেম। ছবির শেষে অবশ্য তা হারিয়ে গেছে। এই দুই চরিত্রে নন্দয়া রায় চৌধুরী এবং পার্থ মুখোপাধ্যায় দর্শকদের সব সময় মাতিয়ে রেখেছেন। এ'ছাড়া ছোট ছোট চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় (জ্যাঠামশাই), নিমু ভৌমিক, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, কণিকা মজুমদারের অভিনয় উল্লেখের দাবী রাখে।

এ'ছবির অন্যতম সম্পদ কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ক্যামেরা, তাঁর প্রতিটি ছবিতেই গভীর শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। আনন্দ শংকরের আবহসংগীত প্রথম থেকেই বেশ চড়া পর্দায় বাঁধা, অনেক সময় ছবির সংগে সংগীত মিলে যেতে পারেনি—ছবি থেকে আবহ সংগীত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

মোহিনীর মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের সময় পরিচালককে নেপথ্যভাষা (চরিত্রের কণ্ঠস্বরের সাহায্যে) প্রয়োগ করতে হয়েছে। (প্রসঙ্গতঃ অজয় করের সাতপাকে বাঁধা ছবির কথা স্মরণীয়) ফলে চলচ্চিত্র তার নিজস্ব ভার হারিয়েছে। মোহিনীর সংগে অবিনের পত্রযুদ্ধের দৃশ্য বড়ই ক্লান্তিকর। শচিপতি এবং মোহিনীর বাগানের ভিতর 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে'—গান গাওয়ার দৃশ্য বেশ অস্বস্তিকর। ইন্দর সেন তাঁর এই 'অসময়' ছবিতে কোনরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি না নিয়ে, বাংলা ছবির চিরাচরিত-ধারা অনুসরণ করে একটা পরিচ্ছন্ন ছবি গড়ে তুলেছেন।

বিভাবসু দত্ত

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১লা সেপ্টেম্বর
১৯৭৬

যার বিকল্প নেই

গোপালকৃষ্ণ রায়

সুখ সমৃদ্ধির চাবিকাঠি

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

দু তিনটির পর আরো একটি সন্তান এলে আজ আর একগাল হেসে কেউ বলেন না সবই মা ষষ্ঠীর কৃপা। বরং একটু খিন্ন ভাবে বলেন, কৃপা না ঘণ্টা। মা ষষ্ঠীর অভিশাপ। কারণ তাবৎ গ্রাম-গঞ্জের লোকজনও জেনে গেছেন—'চাম দো হামারে দো' স্লোগানটি। তারচেয়েও বড় সত্য তাঁদের কাছে—অধিক সন্তান অনিবার্য দারিদ্র্য আনে। জনবিস্ফোরণের জন্যই যে এই দারিদ্র্য সারা ভারতে জাঁকিয়ে বসেছে সে খবরও আজ প্রায় সবাই জানেন।

সমস্যার দিকে একটু তাকানো যাক। বিশ্বে প্রতি সেকেণ্ডে ৪ টি, মিনিটে ২৪০ জন এবং প্রতিদিনে প্রায় ৫০ হাজার জন শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। পৃথিবীর এই জন্ম হারের প্রতি সাত জনের মধ্যে একজন ভারতীয়। ভারতের স্থলভাগের পরিমাণ সমগ্র পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ২.৪ ভাগ মাত্র। অথচ এখানে বসবাস করছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৪ ভাগ। প্রতিবছর এদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ করে। কি ভয়াবহ অবস্থা। পশ্চিম বাংলার অবস্থা আরো জটিল। এ রাজ্যের স্থলভাগের পরিমাণ সমগ্র ভারতের মোট স্থল ভাগের শতকরা ২.৭৪ ভাগ। কিন্তু বসবাস করছে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮.১১ ভাগ। গড় হিসাবে ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যেখানে ১৭৮ জন সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এ সংখ্যা ৫০৪ জন। জনসংখ্যার হার বর্তমান গতিতে যদি বেড়েই চলে তবে সেদিন আর বেশী দূরে থাকবেনা যখন ভারত বা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি মানুষের বসবাসের জায়গাটুকুও থাকবে না।

আমাদের প্রতিবেশী ভজহরি মণ্ডলের বর্তমান সন্তান সংখ্যা ১১। ভজহরি দিনমজুর। কুঁড়েঘরে থাকে। শুনেছি তমলুকের দিকে তার একসময় জায়গা জমি ছিল। অভাবের দায়ে সব খুইয়েছে। প্রতিবেশি এক ভদ্রলোকের বাড়ীর কানাচে থাকে। ১১ টি সন্তানের মধ্যে বর্তমানে ৭ জন জীবিত। জীবিতদের মধ্যেও কয়েকজন মরতে মরতে বেঁচে আছে। ভজহরির স্ত্রী রেণুকা শীর্ণকায়া। প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকে। প্রায়ই যায় যায় অবস্থা। হাসপাতালের ডাক্তার বাবু বলেছেন—বছর বছর সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে রেণুকা আজ মৃত্যুপথযাত্রী। জীবিতরা শীর্ণ লিকলিকে। অভাব খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও পরিচর্যার। আধাশিক্ষিত অভাবী ভজহরি বা অধিক সন্তানের জননী রেণুকার কারোর সাধ্য বা সামর্থ্য কিছুই নেই যে এতগুলো সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করে তোলে।

অথচ শহরের শিক্ষিত পরিবারে একটি দুটির বেশি সন্তান হয়না। কারণ কম সন্তানের সুখের স্বাদ তারা পেয়েছেন। তারা জানেন দুটি সন্তানের বেশি হলে ভাল স্কুলে পড়াতে পারবেন না, রোগ হলে ভাল ডাক্তার ডাকতে পারবেননা। আরো দশজনের মত তার ছেলেকে বড় করে তুলতে হলে তাঁদের এ আয়ে কুলোবে না। লেখাপড়া না শেখাতে পারলে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারবেনা। হবে বংশের কুলাঙ্গার, দেশে চোর৷ ডাকাত হয়ে সমাজের সকলের বিষ নজরে পড়বে। গুণ্ডা ও ডাকাত হয়ে সুস্থ নাগরিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটাবে। সমাজের একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে এই অবাঞ্ছিত সন্তান। কারোর পকেট কাটবে, ব্যাঙ্ক লুটপাট করবে, অফিসে আদালতে হুল্লোড় করবে। সুস্থ নাগরিক জীবনে এক ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে।

পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা থেকে সরিয়ে নেবার জন্য অনেকে অনেক ধর্মীয় কুসংস্কারের কথা বলে থাকেন। অনেকে ভগবানের ইচ্ছার বিরোধিতার কুফলের কথাও বলেন। প্রধানত, ধর্মীয়, সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে এই বিরোধিতা আসে। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কিছুলোক মনে করেন কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ একটি নৈতিক অপরাধ। সমাজবাদীদের মনোভাব কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই হাস্যকর। ওঁদের অনেকেই ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্বটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। আর জাতীয়তাবাদীরা উটপাখির মত চোখ উল্টে বলেন বিরাট জনসংখ্যা জাতির পক্ষে আশীর্বাদ। অবশ্য বুদ্ধিমান দল-ছুটরা এর মধ্যেই বলতে শুরু করেছেন, হ্যাঁ সুস্থ জীবন, সুখী জনসম্পদ গড়তে ও অর্থনৈতিক সংকট এড়াতে এখনই পরিবার পরিকল্পনা চাই। বর্তমানে যদি কেউ বলেন—সন্তান দিয়েছেন যিনি খাদ্য দেবেন তিনি, তবে তিনি সবার পরিহাসের বস্তু হবে। তিক্ত বিরক্ত মায়েরা তাই এদের চোখ রাঙানীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে-নিজেরাই পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আজ পাড়াগাঁয়ের অতি লাজুক বধূটিও তাই আজ অতি সচেতন এ ব্যাপারে। সে জানে বেশি সন্তান মানেই অশালীনতা। শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত সন্তান একদিন যখন বহু সন্তানের বাবা-মার সামনে রুখে দাঁড়িয়ে জবাব চাইবে—কোন আক্কেলে আমাদেরকে পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছিলে? রুগ্ন, স্বাস্থ্যহীন সন্তানকে পৃথিবীতে এনে দুবেলা দুমুঠো খাবার পর্যন্ত জোটাতে পারলেনা কেন?

এইভাবে অবাঞ্ছিত অবহেলিত সন্তান যত্রতত্র আগাছার মত বেড়ে উঠে পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে সমগ্র দেশকে অনায়াসেই আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন আগামী দিনে 'এ পাপ আমার এ পাপ তোমার' বলে কপাল চাপড়ালেও সমাধানের কোন সূত্র মিলবেনা। কাজেই সজাগ ও সচেতন মা-বাবা 'নাউ অর নেভার' নীতি মেনে এখনই সমাধান খুঁজতে

চলেছেন। তাঁরা জেনে গেছেন অধিক সন্তান দারিদ্র্যের কারণ, দুঃখের কারণ। বাঘের বাচ্চা তো একটাই ভাল। কম সন্তান যেমন তেজী ও শক্তিমান হয়, তেমনি অধিক সন্তান আনে দারিদ্র্য, রোগ ও দুশ্চিন্তা। এর প্রতিবাদ করে যদি কেউ বলেন এ্যাত দিনতো আমরা এসব ভাবনা চিন্তা বা পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ না নিয়েই দিব্বি চালিয়ে এসেছি। তার উত্তরে বলবো, বাপুহে—দিনকাল বদলায়। তাছাড়া সম্পদেরতো একটা সীমা পরিসীমা আছে। লোক যে হারে বাড়ে উৎপাদনতো আর সেহারে বাড়ছে না, জমিতো বাড়ছে না। আর অসংখ্য অপদার্থ জনভার নিয়ে দেশের শক্তি বৃদ্ধি হয়না। প্রজাবৃদ্ধি মানেই শক্তি বৃদ্ধি নয়। রামায়ণের কাহিনীর কথায়ই আসি। রাম রাবণের যুদ্ধে অত বিরাট জনবল থাকা সত্ত্বেও রাবণের গো হার হল। "এক লক্ষ পুত্র যার সোয়ালক্ষ নাতি। না কেহ রহিল তার বংশে দিতে বাতি।।" সংখ্যা দিয়ে শক্তির বিচার হয়না। সুস্থ, স্বাভাবিক জনবলই শক্তির আকর। আজ যারা পরিকল্পিত পরিবারের বিরোধিতা করেন— তাঁদেরকে সবিনয় একটি প্রশ্ন—আজকের পৃথিবীতে যে হিংসা, প্রতিহিংসা, হানাহানি, মারামারি, জিঘাংসা দেখা যাচ্ছে তার মূলে কি অর্থনৈতিক সমস্যা নয়? আর এই অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে আছে এই অনাকাংখিত বাড়তি জনগোষ্ঠীর ভার। একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? দিন দিন মানুষ মানুষের কাছে যে ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছে তার মূলেও আছে এই বাড়তি জনসমস্যা। অথচ এই বাড়তি জনগোষ্ঠীকে অন্যদেশের মানুষ সম্মানের চোখে দেখে না। তাদের চোখে ভারত একটা ভিড়ে গিসগিস করা দেশ, সেখানকার মানুষ গরীব, অশিক্ষিত, খেতে পায়না, বাসস্থানের অভাবে ফুটপাতে পড়ে থাকে। এজন্যই আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে লোকবল বলা যায়না, বরং এটাই দেশের বোঝা।

খৃষ্টান মিশনারিরা বলেন, মানুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা পাপ। কিন্তু আসলে সেটা একটা ফাঁপা অবাস্তব কথা। একটা ছেলের জন্ম দিয়ে তারপর তাকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করে, তারপর তাকে অকারণ যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরে ফেলাই বা কি ধরণের মানবিকতা? গত এক শতাব্দী ধরে খৃষ্টানরাই কি বিশ্বের বড় বড় যুদ্ধগুলো বাধায়নি? একজন যুদ্ধবাজ সামরিক সেনাপতিকে কি কেউ প্রকাশ্যে হত্যাকারী বলে নিন্দা করে? অথচ একটা যুদ্ধে কত শত অসহায় প্রাণী হত্যার জন্য সে দায়ী। জীবিত মানুষকে এইভাবে হত্যা বা অনাদরে অবহেলায় অনাহারে মাঠেঘাটে মৃত্যুর চেয়ে অনাগতকে হত্যা অনেক সুস্থ চিন্তা নয়কি?

ডেসমণ্ড মরিস নামে একজন বিদেশী লেখক জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধীদের সমাজের শত্রু ও প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এভাবে জনসংখ্যা বাড়লে ভবিষ্যতের পৃথিবীটা ভিড়ে গিসগিস করবে, পৃথিবীর সব জমি ভরে যাবে। মানুষের দাঁড়াবার জায়গাও থাকবে না। তখন নির্বিচারে মারামারি কাটাকাটি ছাড়া উপায় কি?

কলকাতায় শিয়ালদার মোড়ের ফুটপাথে থাকে এমন একটি পরিবারকে আমি জানি। ফটিকরা আট ভাই-বোন। সুন্দরবন এলাকা থেকে গত চার বছর আগে ওরা কলকাতায় এসেছিল। ফটিকের দাদা যাদুর স্টেশন এলাকায় ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে একখানা হাত ভাঙা পড়েছে। একবছর ধরে সে জেলে হাজতে। দিদি ও একবোন বহুদিন ধরে নিরুদ্দেশ। ছোট ভাই দু'জন রাস্তায় ভিক্ষে করে। ফটিক মোট টানে রেলযাত্রীদের। মাসে মাসে সেও ধরা পড়ে বেআইনী কাজের জন্য পুলিশের হাতে। ফটিকের মা-বাবা একদিন পাশের হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারা পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ চায়। দেরীতে হলেও তারা ভাল চায়, সুযোগ চায়। একটি শিশুর সোনার থালা দুটি হলেও আদর।। অধিক মানে অবহেলা কেবলই চড়চাপড়। এ বার্তা যে তাঁদের কাছে পৌঁছে গেছে। সব ভাল যার শেষ ভাল।

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে জনৈকা গ্রামের বধূ—উদ্দেশ্য : সন্তান জন্মরোধ

বারুদের গন্ধ

অশোককুমার সেনগুপ্ত

চিঠিটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল অতসী। বন্দনার তাহলে তাকে মনে আছে! ভুলে যায়নি! ভুলে যাওয়া যায় নাকি? সে তো চিঠি দেয়নি তাবলে ভুলে গিয়েছে নাকি বন্দনাকে। কক্ষণো না। মাথা নাড়ল অতসী। পটপট পড়ে ফেলল চিঠিখানা। অনেক কথা লিখেছে বন্দনা। একরাশ অভিযোগ। ঠিক আগেকার মত আছে। বড্ড বেশী বেশী বলে। আশ্চর্য তার ঠিকানা তো ঠিক মনে রেখেছিল। ক্ষণে ক্ষণে অতসীর ফর্সা রোগা মুখে খুসীর নানা আলোর ছটা পড়তে থাকল। যেন বন্দনা নিজেই এসেছে, তারপর গলা জড়িয়ে পিছন থেকে ফিসফিস করে কথা বলছে।

দোতালার পশ্চিমের জানালা গলে আধময়লা গোলাপী ছাপা শাড়ী হলুদ ব্লাউসঘেরা অতসীর কোমর পর্যন্ত নরম রোদ পড়ে আছে। সামনের নারকেল গাছের পাতায়ও চিকচিকে রোদ। শ্যাওলায় ভরা পুকুরটায় হাঁস সাঁতরাচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ে এখন পাখিদের শব্দ। অদূরে জং ধরা টিনের শেডের কারখানার বিশাল চত্বর জুড়ে ধূসরতার ছায়া যেন এখনই ঘনাচ্ছে। তবু অতসীর দৃষ্টিতে দীঘল নারকেল গাছের শীর্ষের সবুজ, ভাসমান ডানা পাখিদের এবং দূরের ওই আকাশ মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে রাখে।

শেষবয়সে জমানো সব টাকা নিঃশেষ করে শ্বশুরমশাই শহরতলীর জলাভূমির টুকরো একটা খণ্ডে এই দোতালা বাড়ী-খানা করে গিয়েছেন। অসম্ভব ছোট্ট জায়গা। মনে হয় খেলনার যেন একটা বাক্স। আড়াআড়ি নয় লম্বা করে খাড়া যেন দেশলাইয়ের বাক্স। উপরে নিচে দু'খানা করে ঘর, টুকরো বারান্দা, টুকরো উঠোন। তবু তো নিজের বাড়ী। সুজিতের পাশে এই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে পরম নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়া যেত। হ্যাঁ, নিতও। প্রায়ই রাতে এই জানালার সামনে তারা দাঁড়াত। কখনও অন্ধকারে কখনও জোৎস্নায় ডুবে থাকত চোখের সামনেকার, ঝোপঝাড় নারকেল বীথি, কারখানার বিশাল শেড, চিমনি, মিটমিটে আলো ছড়ান জীর্ণ পথ, ছোট বড় নানান হরফের বাড়ী। তবু কি চমৎকার না ধরা পড়ত চোখে। চেনা তবু যেন রাত্রির আবরণে অচেনা। সুজিতের তপ্ত শ্বাসে শরীর হয়ে যেত নদী। কুল কুল করে স্রোত বওয়ার শিরশিরানিতে সে চোখ বুজে ফেলত।

এক সময়। এক সময় এ সব হত। তখনও—তখনও বুঝি বন্দনার চিঠির এই অতসা। না, বন্দনার চিঠির অতসী বুঝি তারও আগের। কিশোরী মনে তখন প্রকৃতি আর মানুষের অপার মুগ্ধতা। রহস্যময় এই পৃথিবীর দিকে দিকে নতুন আবিষ্কারের উন্মাদনা শরীরে, মনে, দৃষ্টিতে। তখন সকলই হাসির উচ্ছলতার। কোন গ্লানি কোন ক্লেদ নেই। দু'চোখ রঙীন স্বপ্নময়। বন্দনার সঙ্গে ঘোরা, সিনেমা যাওয়া, লুডো খেলা, বন্দনাদের ছাদে বিকেল কাটান, আশেপাশের ছাদে আরও মুখ দেখে কল্পনা করে হাসাহাসি করা। বাবা কত ভালবাসতেন। অভাবের সংসার ছিল, কিন্তু তার মনের কোন ইচ্ছাই তো অপূর্ণ রাখলেন না বাবা। পড়াশুনায় অমনোযোগ তার ফলেই যেন বেড়েছিল। আর বন্দনার সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্বের কারণও ছিল ওই অমনোযোগ। বন্দনা তার মতই ক্লাস এইটে দু'বার ফেল করেছিল। কিন্তু দুঃখ ছিল নাকি তার জন্যে? তখন দুঃখের জন্যে ব্যয় করার মত সময় কোথায়। দিনগুলোর যেন পাখা ছিল। হু হু করে বয়ে যেত। পরে ভাবতে অতসীর মনে হয়েছে কি করে বন্দনার সঙ্গে অমন করে সে সময় কাটাতো? কি গল্প হত তাদের? মনে করতে পারে না। শুধু মনে হয় দাদুর কথাটা। বন্দনার দাদু বলতেন, প্রত্যেক মানুষের মনে বারুদ থাকে রে।

আস্তে আস্তে সে বারুদ খরচা করতে হয়। তোরা বড় তাড়াতাড়ি খরচা করছিস। বন্দনা বলেছিল, 'আমাদের বারুদ ফুরুবে না দাদু।'

চিঠিখানা হাতে নিয়ে অতসীর মনে হচ্ছে সে বারুদ ফুরিয়েছে।

বন্দনা লিখেছে, 'আয় না বাবা, আমি সে বন্দনাই আছি। বল, আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল বিয়ে হলেও পাশাপাশি থাকব। শ্বশুরের সম্পত্তি বিক্রী করে দু'জনে ভাড়াটে হব একই বাড়ীর। কিংবা পাশাপাশি বাড়ী করব। সে না হয় হল না। আয় না একবার। হয়ত হবে একদিন। কি কষ্ট যে হচ্ছেরে তোকে দেখতে না পেয়ে। কাল স্বপ্নে দেখেই, আজ চিঠি লিখছি ......।'

চিঠিটা হাতে রেখে ঘাড় ফেরাল অতসী। ছোট্ট ঘরখানা খাট বিছানা আলমারিতে ভরাট। মেঝেয় রাজ্যের পুতুল নামিয়ে খেলছে যুঁই। ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা নিচু করে যেন বড় ব্যস্ত। তাকেই গোটাতে হবে। তবু বিরক্ত হল না অতসী। খেলতে গিয়েছে দিপু আর নীপু। এবার ফিরবে। সুজিতেরও ফেরার সময় হয়ে এল। চিঠিখানা ভাঁজ করে ড্রেসিং টেবিলে রেখে যুঁইকে আদর করল অতসী। কি ভাল যে লাগছে। না ফুরোয় নি বারুদ। একটু আগুনের গন্ধ পেলেই সে জ্বলে উঠতে পারে।

সুজিত ফিরতেই অতসী বলে উঠল, 'জান বন্দনা চিঠি দিয়েছে।'

'কে বন্দনা।' সুজিত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

'ও মা তোমার মনে নেই, সেই যে গো আমার খুব বন্ধু ছিল। ফর্সা, ছিপছিপে।' দু'চোখ উজ্বল করে তাকাল অতসী।

'তা হবে। মা কেমন আছেন?'

'ভাল।'

পকেট থেকে লালচে রঙীন শিশি বের করে সুজিত বলল, 'ভাল টনিক। মাকে খাবার পর এক চামচ করে দেবে। ভুলে যেও না যেন।'

'না।' অতসী শিশিখানা হাতে ধরে বলল, 'এই আজ ট্যুইশিনি যাবে। থাক না?'

'সর্বনাশ। এখন কামাই করে। সামনে পরীক্ষা। দাও, খাবার দাও।' ব্যস্ত গলায় বলল সুজিত।

আহত হল অতসী। কত অফিস কামাই করেছে তারজন্যে সুজিত একদিন। একটু আগুনের ছোঁয়া দাও না গো, দেখ ভেতরের বারুদ কেমন জ্বলে উঠবে। কত উজ্বলতা কত তেজ।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে অতসী আবার সেই প্রসঙ্গ তুলল। সুজিতের বুকে চুড়িপরা হাত রেখে বলল, 'এই, ছুটি করে চল না একদিন।'

'কোথায়?' সুজিত কাৎ হয়ে ঘন শ্বাস ফেলে বলল।

অভিমানে গলা ভারী করে অতসী বলল, 'তুমি বড্ড ভুলে যাও।'

'মনে করিয়ে দাও আমাকে।'

হেসে ফেলল অতসী। সুজিতের গলায় তার কাছে প্রার্থনার সুর বাজল, না? বলল, 'বন্দনার কাছে। আহা, কতদিন দেখিনি।'

'গেলেই হয়।' সুজিত সহজ হাল্কা গলাতে বলে উঠল।

'কবে যাবে গো?'

'যেদিন হোক, একদিন গেলে হবে।' সুজিত বলে চলল, 'জান অফিসে বড্ড চাপ পড়েছে। তারপর একদিন সুলতার কাছেও যাওয়া দরকার। একটি বোন আমার। আনব ভাবছিলাম। সুলতা এলে মায়ের শরীরটাও ভাল থাকে।'

'তা তো থাকবেই। আমি তো পর...।' অতসী ঘন শ্বাস ফেলল।

মুখে চুক চুক করল সুজিত। বলল, 'পর কোথা, পুত্রবধূ।'

'থাক।' পাশ ফিরে শুল অতসী।

মান ভাঙানোর পর ঠিক হল যাওয়া হবে একদিন বন্দনার বাড়ীতে। আবার যেন অতসী ফিরে পেল তার দিন। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তার দেখতে ইচ্ছে করল, সেই আগেকার ছবি আছে কিনা। এখন অন্ধকার না জ্যোৎস্না। আলো বেড়েছে না কমেছে। গাছেরা সেই এক আছে কি না। ক'টা নতুন বাড়ী উঠল। কিন্তু সুজিতের গাঢ় বন্ধন থেকে ওঠা হল না। শরীরে কুলকুল স্রোতে নদী বওয়ার বিহ্বলতা তাকে অবশ করে রাখল।

তারপর ক'টা দিন কেমন কেটে গেল। মায়ের অসুখটা বাড়ল। আবার সর্দি-জ্বরে পড়ল দীপু। ওদিকে ওভারটাইম হচ্ছে সুজিতের। বড় ক্লান্ত হয়ে ফেরে মানুষটা। মায়ের সেবা। তারপর ঘরের কাজ—অবসর কোথা। এর মধ্যে এসে পড়ল সুলতা। বাপের বাড়ী এসেছে। ওকে তো আর বেশী খাটতে দেওয়া ঠিক নয়। দম ফেলার অবসর জোটে না। রাত্রিতে সুজিতের পাশে সেও নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। শ্বাস নেবার সময় যেন ওটুকুই। বারুদ যেন ভিজে যায় কাজের বৃষ্টিতে। আগুনের ফিনকি দুএকটা ছুটে আসে। কিন্তু জ্বলে না।

একদিন সুজিতই বলল, 'তোমার বন্ধুর বাড়ী যাওয়া হল না।'

'হুঁ'।'

'ঠিক আছে, যাওয়া হবে একদিন। মা একটু ভাল হন।'

'হুঁ।'

'কি রাগ হয়েছে?' সুজিত হাত বাড়াল।

'না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতসী। বলল, 'রাগ কেন হবে?'

'হয়েছে, আমি বুঝেছি।'

'না গো!' ক্লান্তস্বরে অতসী বলে সুজিতের চুলে হাত রাখল। এইটুকু পাওয়াই তার যথেষ্ট। বলল, 'জান ওকে একটা চিঠি দেব।'

'তাই দিও। লিখো খুব শীঘ্রি আমরা যাচ্ছি।'

অতসী অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলল,

অনেক রাতে অতসী টের পেল, এটাই ঠিক। চিঠি দেওয়াই ভাল। যাওয়া হবে না। এতকাল পরে বন্দনার স্বপ্ন দেখা বারুদ জ্বালাতে চেয়েছিল, আর চিঠিতে সেই বারুদ জ্বালানোর জন্যে তাকে লিখেছিল। কিন্তু ফুরিয়ে গিয়েছে বারুদ। আছে সুধু গন্ধটুকু। এতকাল পরে স্বপ্নে যা পেয়েছে বন্দনা। হ্যাঁ, চিঠিতে সেই গন্ধই সে পাঠাবে বন্দনার কাছে। কাল—কালই চিঠি লিখবে বন্দনাকে।
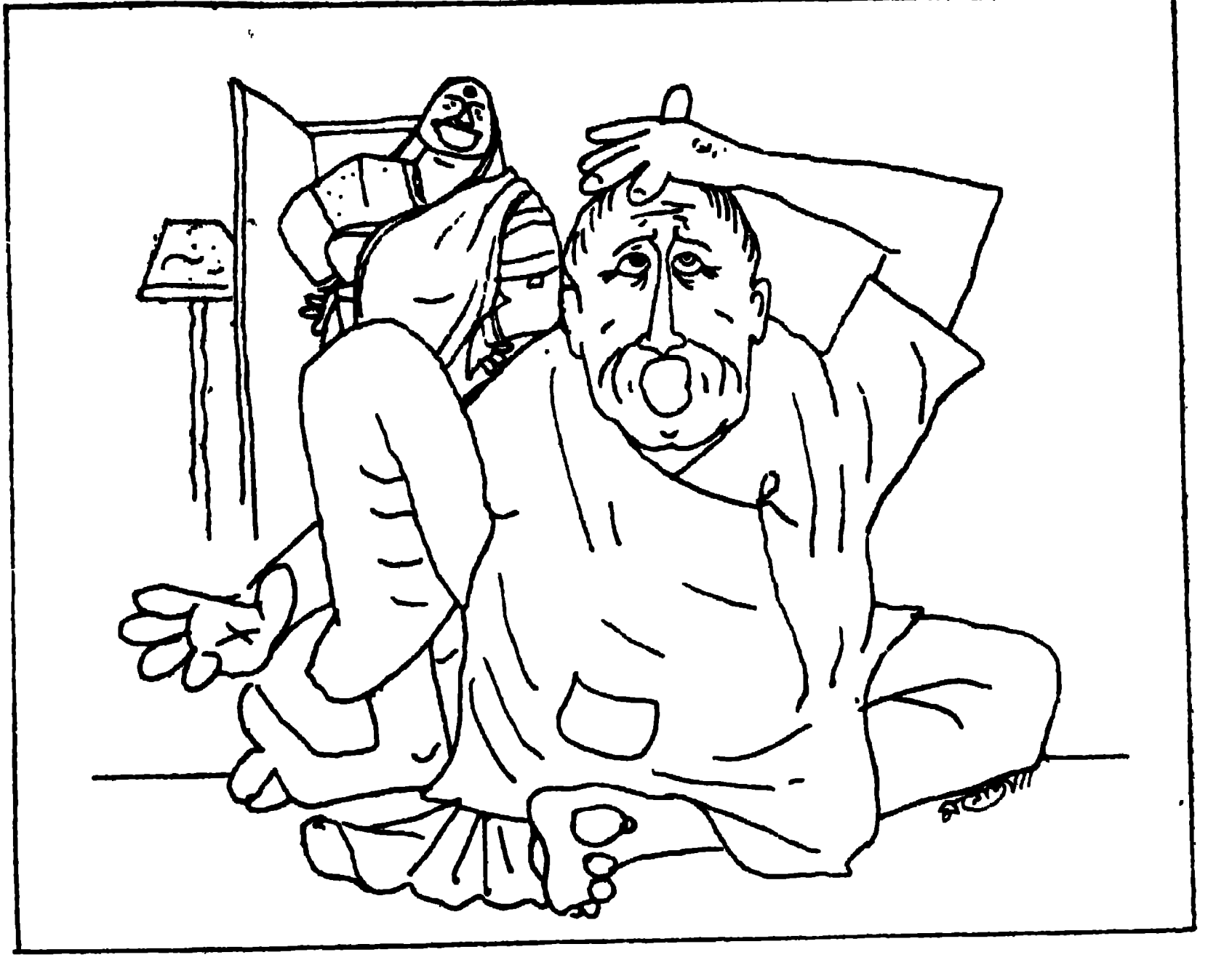
এবার পুজোতে সাত মেয়ে তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে আসছে
সঙ্গে জামাইরাও আসবে লিখেছে

সংখ্যা নয়, গুণগত বৈশিষ্ট্য একটি উন্নত জাতির মাপকাঠি। একটি উন্নত জাতির প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি। অনিয়ন্ত্রিত জনস্রোত যে কোনও দেশে জাতি গঠনের পরিপন্থী।

পৃথিবীর ৭৬টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ৬৩ টি দেশ পরিবার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে। ঐ ৭৬টি দেশের মোট জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশ বাস করে এই ৬৩ টি দেশে। এর মধ্যে ৩৪ টি দেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে এবং পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্য্যসূচীকে সরকারী প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে। এশিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৮ শতাংশ বাস করে এশিয়ার উন্নয়নশীল সেই সব দেশগুলিতে যারা পরিবার পরিকল্পনার কার্য্যসূচীকে সমর্থন করে।

এই ৩৪ টি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণকারী দেশের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র আছে। যেমন মিশর (১৯৬৫), ইরাণ (১৯৬৭) তুরস্ক (১৯৬৫), পাকিস্থান (১৯৬০), মালয়েশিয়া (১৯৬৬), তিউনেশিয়া (১৯৬৪), ঘানা (১৯৬৯), মরক্কো (১৯৬৮), ইন্দোনেশিয়া (১৯৬৮), মরিশাস (১৯৬৫), বাৎসুয়ানা (১৯৭০), ফিজি (১৯৬২) এবং বাংলা দেশ (১৯৭১)।

বাকি ২৯ টি দেশ পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পকে সমর্থন করেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নয়, সমর্থন করেছে পরিবারের স্বাস্থ্য, মানব কল্যাণ এবং মানবিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে।

এদের মধ্যেও অনেক মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র আছে। যেমন ইরাক (১৯৭২), আলজেরিয়া (১৯৭১), উগাণ্ডা (১৯৭২), তানজেনিয়া (১৯৭০), সুদান (১৯৭০), নাইজেরিয়া (১৯৭০), দামানি (১৯৬৯), মালি (১৯৭২), জাম্বিয়া (১৯৬৯) এবং আফগানিস্থান (১৯৭০)।
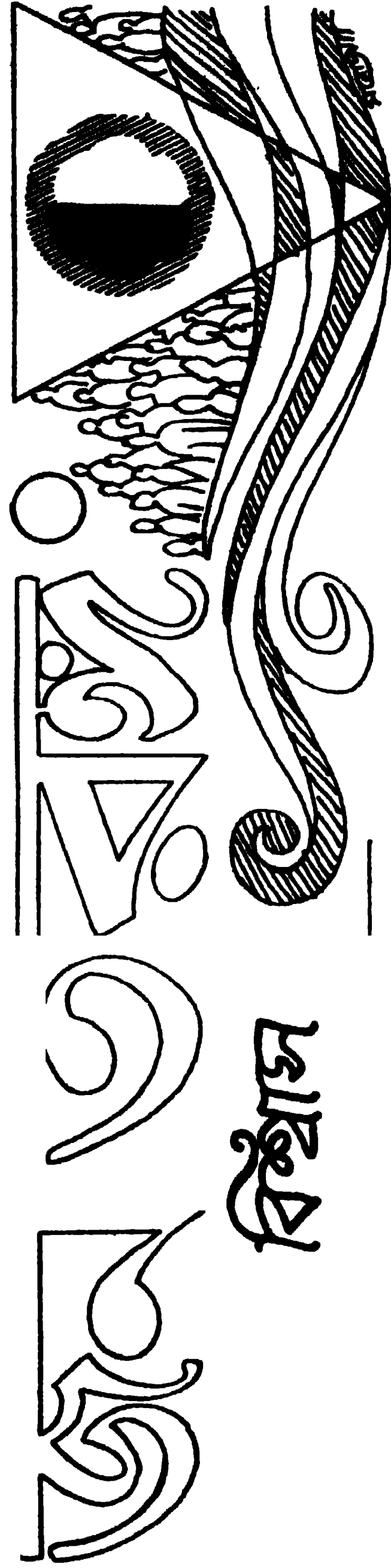
(বন্ধনীতে উল্লিখিত সালগুলি প্রতিটি দেশের পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প গ্রহণের সাল।)

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ করে মিশর, ইরাণ, তুরস্ক এবং পাকিস্থানে ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চলছে।

মিশরের জনসংখ্যা ১৮ই মার্চ ১৯৭৫ সালে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ অতিক্রম করে গেছে। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ। তাই মিশরে প্রতি বছরে ০.১ শতাংশ হারে জন্মের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলির মধ্যে খাওয়ার বড়ি এবং লুপ বিশেষ জনপ্রিয়।

বর্ত্তমানে ইরাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.১ শতাংশ হারে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। গত ১৬ই জুন ১৯৭৩ সালে সেখানকার পার্লামেন্টে নিউ পেনাল কোড আইন পাশ করে ভ্রুনমোচন, ভেসেকটমি, এবং টিউবেকটমি অপারেশনকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে।

এখানে অস্থায়ী পদ্ধতির মধ্যে 'ওরাল পিল' বিশেষ জনপ্রিয়। গত বছর অতিরিক্ত প্রায় ৬ লক্ষ প্রজননক্ষম দম্পতি এই পরিকল্পনার আওতায় এসেছেন এবং এদের মধ্যে ৭৪ শতাংশই খাওয়ার বড়ি ব্যবহার করছেন।

তুরস্কের জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ছিল এবং এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ। এখানকার প্রায় ২.৫ শতাংশ বা ৪৪ হাজার বিবাহিত মহিলা 'লুপ' ব্যবহার করছেন। এ ছাড়াও বেশ কিছু দম্পতি কনডম এবং খাওয়ার বড়ি ব্যবহার করে থাকেন।

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের জনসংখ্যা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ সালের শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৮০ লক্ষেরও বেশী। এখানে পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচীকে বলা হয় "পপুলেশন প্ল্যানিং প্রোগ্রাম।" পাকিস্তানের গ্রোথ সার্ভের সমীক্ষা অনুসারে সেখানকার জন্মহার হাজার প্রতি ৩৭ জন এবং মৃত্যুর হার হাজার প্রতি ১১ জন। বর্ত্তমানে পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশ। পাকিস্তানে ভেসেকটমি, টিউবেকটমি, খাওয়ার বড়ি এবং লুপ বিশেষ জনপ্রিয়। ১৯৭৪ সালে সেখানে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৪৬৬ জন মহিলা লুপ গ্রহণ করেন। স্থায়ী অস্ত্রোপচারের

মাধ্যমে ৫ হাজার ৩৬৬ টি পরিবার তাদের পরিবারকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল রাষ্ট্র বাংলাদেশ। ১৪২ হাজার বর্গ কিলোমিটার-ব্যাপী এই নতুন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গ্রামীণ ঘনবসতির দেশ। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীতে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে, আগামী ২৫ বছরের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটিতে স্থিতিশীল রাখা। এই লক্ষমাত্রাকে পূরণ করার জন্যে চলতি পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৭৮ সালে জনসংখ্যার বৃদ্ধির বর্তমান হারকে ৩ শতাংশ থেকে ২.৮ শতাংশে কমিয়ে আনতে হবে এবং এর মধ্যে প্রয়োজন ৬ লক্ষ ২০ হাজার জন্মরোধ। এখানে ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি-গুলির মধ্যে রয়েছে 'লুপ', খাওয়ার বড়ি (খায়াবড়ি) কনডোম (রাজা) এবং অস্ত্রোপচার।

বর্তমান চীনের জনসংখ্যা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার তিনটি রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলা দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে সামান্য কম হলেও আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার মোট জনসংখ্যার চেয়ে এখনও বেশী।

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে চীন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ছাড়াও ১৯৭১ সাল থেকে কয়েকটি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এই কার্যক্রমের প্রথম অঙ্গ হল শহরাঞ্চলে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিয়ের বয়স স্থির করা হয়েছে ২৫ বছর এবং ছেলেদের ২৮ বছর। এই বিবাহের বয়স গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের ক্ষেত্রে ২৩ বছর এবং ছেলেদের ২৫ বছর। দ্বিতীয় সুপারিশে বলা হয়েছে, প্রথম সন্তানের জন্ম থেকে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের মধ্যে কমপক্ষে ৫ বছরের ব্যবধান রাখা বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় সুপারিশে বলা হয়েছে, ছোট পরিবারই যে আদর্শ পরিবার দেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে তা স্মরণ রাখতে। একটি আদর্শ পরিবারের জন্যে শহরাঞ্চলে দুটি এবং গ্রামাঞ্চলের জন্যে তিনটি সন্তানই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে পুত্র এবং কন্যার পার্থক্য রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। চীনে ব্যবহৃত জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কনডোম, ফোম টেবলেট এবং খাওয়ার বড়ি।

পৃথিবীর প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশে পরিবার পরিকল্পনা বিপুলভাবে জনগণের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। ভারতের পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কার্য্যসূচী বিশ্বের কাছে আদর্শ এবং পথ প্রদর্শক। দেশবাসীর জীবনযাপনের মান উন্নয়ন, দেশের প্রতিটি শিশুকে তার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান এবং দেশের দারিদ্র্য মোচনে বিশ্বের মধ্যে ভারতই প্রথম একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা করে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে ষষ্ট পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে জন্মহারকে প্রতি হাজারে ৩৭ থেকে ২৫-এ নামিয়ে আনতে হবে। চলতি পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেশের ৩৩ শতাংশ প্রজননশীল দম্পতিকে এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের মধ্যে দেশে ৪৫ শতাংশ প্রজননশীল দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে।

অগ্রগতির খতিয়ান বিশেষ উৎসাহজনক এবং এ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনার যা কাজ হয়েছে তার দ্বারা হাজার প্রতি জনসংখ্যার প্রায় ২৮ জনকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এবং প্রায় ১৪ জনকে অস্থায়ী পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে এবং এর ফলেই প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ শিশুর জন্ম এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ভারতের সুদূর গ্রামান্তরে জনসাধারণের কাছে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার নিরলস প্রচেষ্টা চলছে। এটা আশার কথা, প্রতিটি মা আজ নিজের পরিবারকে সীমিত রাখার জন্যে সচেষ্ট। অনেক কুসংস্কার, ভুল ধারণা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধের মধ্যেও মায়েরা পরিবারকে সীমিত রাখার জন্যে বদ্ধপরিকর।

নিজের পরিবারকে সীমিত রাখতে দেশের কাছে এক উজ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন সুদূর সুন্দরবনের একটি দ্বীপের বাসিন্দা শ্রীমতী তুলাভাই। ক্যানিং থেকে ছোট-মল্লাখালির দূরত্ব খুব বেশী না হলেও লঞ্চে সময় লাগে প্রায় ৬ ঘণ্টা। তুলাভাই-এর স্বামী নিধু ভাই—সামান্য একটি মনিহারীর দোকানী। পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল। পরিবার নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে স্বামীকে ভেসেকটমি অস্ত্রোপচার করিয়ে নিতে অনেক চেষ্টা করেও রাজী করাতে না পারায় শেষে সে দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলেন সবার অগোচরে নিজের প্রিয় সোনার হার বিক্রি করে। স্থানীয় চিকিৎসকের সাহায্যে রাত আড়াইটের একমাত্র লঞ্চে কলকাতায় এসে টিউবেকটমি অপারেশন করিয়ে নিয়ে প্রায় দশদিন পরে বাড়ি ফেরেন।

পরে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম এইভাবে অপারেশন করিয়ে আপনার কি লাভ হয়েছে। চোখে জল নিয়ে অনেক দুঃখে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁর বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে পারে। বছর বছর সন্তান হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত।

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানা অঞ্চলের বাসিন্দা শ্রীমতী রানী নস্করের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কলকাতা মেডিকেল কলেজে। পাঁচটি জীবিত সন্তানের মা। তিনি প্রসব করেছিলেন ৮ টি সন্তান। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, এতো দেরীতে অস্ত্রোপচার করালেন কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, একান্নবর্তী পরিবারে থেকে তাঁর স্বামীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শাশুড়ীর বাধা নিষেধের জন্যে অস্ত্রোপচার করাতে পারেন নি। শাশুড়ীর বক্তব্য, জন্মশাসন বা অস্ত্রোপচার করালে পরিবারের অমঙ্গল হবে। ঈশ্বর রুষ্ট হবেন। গত তিনমাস হল শাশুড়ী মারা গিয়েছেন। তাই দেরী হলেও এখন তিনি অপারেশন করাতে পেরেছেন। এদিকে শাশুড়ীর কথা মানতে গিয়ে সংসারে অনেক দুঃখ দুর্দশা যে বেড়ে গিয়েছে সে কথা তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করলেন।

সুপরিবারের একটি পথ গর্ভপাত

অতীন সরকার

ভারত এক বিরাট জনবিস্ফোরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা না গেলে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড়হার শতকরা ২.৯-এর বেশী। একে কমাতেই হবে। এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে জন্মশাসনের নানা পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি।

মেডিকেল টারমিনেশন অফ প্রেগ্‌নান্‌সি (এম. টি. পি.) বা গর্ভপাত বিধিগত-ভাবে পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কার্যক্ষেত্রে (যদিও পরোক্ষ ভাবে,) তা পরিবার পরিকল্পনাকে সাহায্য করছে।

ভারতই একমাত্র উন্নয়নশীল দেশ যেখানে নারীদের সমাজতান্ত্রিক দেশের নারীদের মত সন্তান ধারণ করা না করার অধিকার তাঁদের নিজেদের। অর্থাৎ এম. টি. পি-র আশ্রয় নেবার জন্য ভাবী সন্তানের বাবার বা মহিলার অভিভাবকের (কুমারীদের ক্ষেত্রে) সম্মতির তাদের প্রয়োজন হয় না।

এখানে গর্ভপাত আইন পাশ হয় ১৯৭২-এ। চালু হয় ঐ বছরেরই এপ্রিল মাস থেকে।

এই আইন পাশ হবার আগেও বৈধ গর্ভপাত সরকারী হাসপাতালে হতো। তবে তা ছিল শুধু মাত্র ডাক্তারী কারণে। ভাবী মা হৃদরোগে, এ্যাপিলেপ্‌সি, বহুমূত্র, নেফ্রাইটিস, মানসিক বা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে গর্ভপাত করানো যেতো।

নতুন আইন অনুসারে চারটি কারণে গর্ভপাত করানো যাবে। সেগুলি হল—(১) গর্ভনিরোধক ব্যবস্থার ব্যর্থতা (ভ্যাসেক্টমী, টিউবেক্টমী ও লাইগেশন সহ)। (২) গর্ভস্থ ভ্রূণ ভাবী মা-এর দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হলে (৩) ভাবী শিশুর অস্বাভাবিক গড়ন হলে। (৪) বলাৎকারে সৃষ্ট গর্ভের জন্য। কোন ভাবী মা এই আইনের সুযোগ নিতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স ১২ সপ্তাহ হলে এক জন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তার; আর তার থেকে বেশী সপ্তাহ হলে ২ জন ডাক্তারের যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২০ সপ্তাহ পার হয়ে গেলে এম. টি. পি. করানো যাবে না।

এই আইন কার্যকরী করার জন্য সরকারী হাসপাতালগুলিতে ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিভাগের শতকরা ২০ ভাগ শয্যা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। ডাক্তারদের বিশেষভাবে লাইসেন্স নিতে হয়েছে। এখন সাধারণ ডাক্তারদেরও ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্য স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষিত ডাক্তারগণ লাইসেন্স নিয়ে নার্সিং হোমের মাধ্যমে এম. টি. পি. করাতে পারেন।

দেশ বিদেশে গর্ভপাত

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাত আইন-সঙ্গত হয় ১৯৭০-এ। ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলির মধ্যে জাপান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ঐ দেশে কয়েক লক্ষ মার্কিন সৈন্যের অবস্থিতির ফলে সে দেশে বর্ণশঙ্কর জন-সংখ্যার হার ভীষণভাবে বেড়ে যায়। সারা দেশে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি হলে জাপান সরকার ১৯৫০-এ গর্ভপাত আইন-সম্মত করে। এর ফলে ঐ দেশে দু'বছরের মধ্যে জন্মহার হাজারকরা ৪০ থেকে কমে ১০-এ দাঁড়ায়।

বত্রিশটি মুসলিমপ্রধান দেশের মধ্যে একমাত্র মালয়েশিয়ায় গর্ভপাত আইন-সঙ্গত। মিশরে গর্ভপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও সেখানে সরকারী হিসেব অনুসারেই গর্ভপাতের জন্য জন্ম-হার হাজারকরা ৪০ থেকে কমে ৩৫-এ দাঁড়িয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গর্ভপাত আইনসঙ্গত। সেখানে কোন নারী, বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যাই হোন না কোন সন্তান ধারন করা না করার অধিকার তাঁর নিজের। গণতান্ত্রিক জার্মানিতে গর্ভপাত আইন সঙ্গত। পশ্চিম জার্মানীতে গর্ভপাত বৈধ নয়। কিন্তু গর্ভপাতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

গর্ভপাতের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, এই আইন কার্যকরী হবার প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩-এ ২,২০০ জন মহিলা গর্ভপাতের সুবিধা গ্রহণ করেন। ১৯৭৩-৭৪-এ ৩,৩৭৫ জন এবং ১৯৭৪-৭৫-এ ১১,০০০ মহিলা গর্ভপাতের সাহায্য নিয়েছেন। ১৯৭৫-৭৬-এর লক্ষ্য হল ২০ হাজার। এটা অবশ্যই সরকারী হাসপাতালের হিসেব। এই সঙ্গে রাজ্যের কয়েকশ' নার্সিং হোমের সংখ্যা ধরা হয়নি।

কলকাতার চারটি সরকারী হাসপাতালের ৪৮৪ জন মহিলাকে বেছে নিয়ে বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে ৪৫ জন অবিবাহিতা, ১২ জন বিধবা এবং ১ জন বিবাহ বিচ্ছিন্না এবং বাকি ৪২৬ জন স্বামী-সংযুক্তা। এই ৫৮ জন-এর এম. টি. পি. গ্রহণের কারণ সামাজিক তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর বাকী ৪২৬ জনের মধ্যে শতকরা ৪২.৫ ভাগ এম. টি. পি. করেছেন গর্ভনিরোধকের ব্যর্থতা দেখিয়ে। বাকি ৫৭.৫ ভাগ ভাবি মা'-এর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই কারণে। বলাবাহুল্য যে কারণই এঁরা দেখান না কেন অনেকেরই প্রধান কারণ হল পরিবার সীমিত করণ।

উল্লিখিত ৪২৬ জনের শতকরা ৬৭.২ ভাগের বয়স ২৫ থেকে ৩৪ এবং তাঁরা ঈপ্সিত পরিকল্পিত পরিবারের অনুরূপ সন্তান আগেই পেয়েছিলেন। এদের বেশীরভাগ এই এম.টি.পি.'র সঙ্গে সঙ্গে "টিউবেকটমী" করিয়ে স্থায়ী জন্মনিরোধক ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছেন।

অবিবাহিতা ৪৫ জনের মধ্যে ৩৭ জনের বয়স ২০ বছরের নীচে এবং বিধবা ১২ জনের মধ্যে ১০ জনের বয়স ৩০-এর উপরে।

চণ্ডীগড়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ-এর ১৯৭৩-এর জানুয়ারী থেকে ১৯৭৫-এর মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এম. টি. পি. করিয়েছেন ২২৬০ জন মহিলা। এঁদের মধ্যে শতকরা ১.৮ জন এর বয়স ১৯ বছরের নীচে এবং সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ শতকরা ৪৩ ভাগ এর বয়স ২৫ থেকে ২৯-এর মধ্যে। ৪০ বছরের বেশী বয়সের মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম।

দিল্লীর মৌলানা আজাদ কলেজ এবং আরউইন হসপিটালের ১৯৭২-এপ্রিল থেকে ১৯৭৫-এর মার্চ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায়, মোট ৩১০৫ জন মহিলা এম. টি. পি. করিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২৪৬০ জন সম্পর্কে বিশেষ সমীক্ষা করা হয়েছে।

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে এদের মধ্যে ২৩৩৮ জন বিবাহিতা (স্বামী সংযুক্তা), ১৩৭ জন অবিবাহিতা এবং ১৫ জন বিধবা বা স্বামী বিচ্ছিন্না।

এঁদের শিক্ষাগত বিভাগ হল—সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্না ৪৯২ জন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—১০৯৫ জন এবং হাইস্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মানের ৮৭২ জন।

এঁদের বয়সগত বিভাগ হল—১৫ থেকে ২০ বছর—৬০, জন, ২১ থেকে ২৫ বছর—৩৭৫ জন, ২৬ থেকে ৩০ বছর—৯৩২ জন, ৩১-৩৫ বছর—৭৭৮ জন এবং চল্লিশ উর্দ্ধে-৩১৫ জন।

এঁরা এম. টি. পি. করিয়েছেন বিভিন্ন কারণে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী হল—সামাজিক-আর্থিক কারণে ১৫৫৮ জন, জন্ম নিরোধকের ব্যর্থতায়—৬৯০ জন, ভাবি মা'-এর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায়--১৫২ জন এবং অন্যান্য কারণে ৬৪ জন।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের (ইডেন হসপিটাল) এক সমীক্ষায় দেখা যায়—১৯৭২-এর মে থেকে ২ বছরে ২৪০০ এম. টি. পি. করা হয়েছে। ১৯৭৩-এর জুন থেকে ১৯৭৪-এর মে পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত এম. টি. পি. কেসগুলির মধ্য থেকে ৪৪৮ টি কেস নিয়ে সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০ বছরের নীচের মহিলা ছিলেন—১৪ জন। সবচেয়ে বেশী সংখ্যা হল ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে।

এঁদের মধ্যে ২৭ জন অবিবাহিতা, আর ২২৭ জন উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা উত্তীর্ণা এবং ৪০ জন স্নাতক। পারিবারিক আয়ের ক্ষেত্রে এক শ'টাকার কম আয় ২৭ জন, ২০০ টাকার কম আয় ১১২ জন, তিনশ টাকার কম ১০২ জন এবং চার শ'টাকার কম ১৮১ জন।

এথেকে দেখা যায় নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষই হাসপাতালে গিয়েছেন, তবে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিতা।

উপরোক্ত হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—সারাদেশে সমীক্ষা নেবার কোন সমান নিয়ম চালু নেই। তবে সামাজিক আর্থিক কারণে নিম্নআয়ের মহিলাগণ এম. টি. পি.-এর আশ্রয় নিয়েছেন বেশী হারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সারা ভারতে এম, টি. পি. ক্লিনিকের সংখ্যা ১২৪৯-টি।

গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হওয়ার পর এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে এর সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

সুপরিবার গঠনে যাঁরা কৃতসংকল্প তাঁদের অনেকেই এখন এই ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছেন।

যার বিকল্প নেই

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কলকাতা শহরের একটি বিশিষ্ট হাসপাতালের সমীক্ষা দেখুন। এখানে সমীক্ষকগণ দেখেছেন অধিক সন্তানের মায়েদের মধ্যে সারভিক্স ক্যান্সার বেশী। যাঁরা চার বা ততোধিক সন্তানের জননী তাদের মধ্যে সারভিক্স ক্যান্সার বেশী। সুতরাং এই রোগীর সংখ্যা প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। দেখুন, অধিক সন্তান শুধু সন্তানেরই ক্ষতি করে না—তার মাকেও রোগগ্রস্থ করে রাখে।

মাতৃ ও শিশু কল্যাণের উদ্যোগে ১৯৭৪-৭৫ সালে যে কতগুলি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল-তা এ বছরও চালু রাখা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় আট লক্ষ সন্তানসম্ভবাকে টিটেনাসের সংক্রমণ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ১৪ লক্ষ শিশুকে ডিপ্থেরিয়া, হুপিংকাশ ও টিটেনাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতার বিরুদ্ধে প্রায় ২৪ লক্ষ মা ও ২৩ লক্ষ শিশুকে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। সমস্যার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করলে এ ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। তাহলেও উল্লেখযোগ্য।

বস্তী উন্নয়নে ফিরে আসা যাক। সারা দেশের নয়, কলকাতা ও আশে-পাশের বস্তী উন্নয়নের একটি রূপরেখা তুলে ধরা যাক। Calcutta Metropolitan Development Authority (সি. এম. ডি. এ) গত ১৯৭৫-৭৬ সালে ১৬.৮১ কোটি টাকার বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করে প্রায় ১৩.৬২ লক্ষ বস্তিবাসীর উন্নতি করা হয়েছে। পরিবেশকে স্বাস্থ্যোপযোগী ক'রে তুলতে রাস্তা, আলো, নর্দমা ও জল-সরবরাহের উন্নতি করা হয়েছে।

এত করা সত্ত্বেও তবু কেন আমরা সমস্যা সমাধানের দোর গোড়ায় পৌঁছুতে পারছিনা ? আজকে এই প্রশ্নই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সমাধানের পথ খোলা আছে। সেটাই একমাত্র পথ যার কোন বিকল্প নেই। সে হচ্ছে জন্মশাসন পথ। একটি বা দুটি সন্তান। তার বেশী নয়।

গ্রাম বাংলার পাঁচালী

আবদুল জব্বার

বাঁশ বেচে গরু কেনা

'আষাঢ় মাসে কেউ বাঁশ বিক্রি করে? বাঁশের কোঁড় বেরিয়ে বড় হয়ে গেছে। কাঁচা কোঁড়গুলো যে ভেঙে যাবে।'

রিয়াজ মোল্লার মেজাজ সপ্তমে চড়েই থাকে সব সময়। বলে, 'তোমাকে আর জ্ঞান-উপদেশ দিতে হবে না। কাটো বাঁশ। একশো বাঁশ বার করে দিতে হবে ঝাড় থেকে।' অগত্যা রিয়াজের সাবালক ছেলে ভারী কাটারী নিয়ে একটার পর একটা বাঁশের গোড়া কেটে দিতে থাকে। অবশ্য রিয়াজ সেগুলোতে খড়ি মাটির দাগ মেরে দেয়।

কলকাতার চালানী বাঁশের ব্যাপারী ফরহাদ গাড়োয়ান বসে থাকে। বিড়ি টানে। তার লোক আছে। ভারী কাটারী আছে। কিন্তু তাদের রিয়াজ বাঁশ কাটতে দেয় না। বলে, 'তোমার লোক দিয়ে বাঁশ কাটতে হবে না। তোমরা মোটা কাঁচা বাঁশের গোড়ায় কোপ দেবে। ঝাড়ের বারোটা বাজিয়ে দেবে। এতো আর আমার পেটের জ্বালায় বাঁশ বেচা নয়। হালের গরু কিনতে হবে। কালী ধাড়ার বাড়ির গরুটা মস্ত গুঁতোনে ছিল ঠিকই কিন্তু কাজের গরু ছিল। ডাইনে হাল-লাঙল বাইত। আয় বাবা বলে ন্যাজে হাত ঠেকাতে না ঠেকাতেই চর্কির মতো আঁতড়ের মাথা ঘুরে আসত। সেই গরুকে শালা মুচিতে বিষ খাওয়াল। কলা পাতায় করে সেঁকো বিষ বেঁধে দূর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। গরু সেই কলাপাতা মচমচ করে খেয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যায় গোয়ালে গরু তুলে দিয়ে খড়-ভুঁষি দিই, দেখি শালা গরু জাবনায় মুখ দেয় না। গা চোমরায় না। পেট ফুলে দুরমুস। ভাবলুম, গরুর তো 'পেট-কাঁকড়ি' হয়নি? কি এমন খেয়েছে যে পেট-কাঁকড়ি হবে? দড়ি দড়া ছিঁড়ে উলুমাঠ জঙ্গল ফসল খেয়ে এলে সেটা হতে পারে। যাই হোক সেই রাতকালেই মুই হারকেন বাতি নিয়ে আগান-বাগান ঘুরে হাতীশুঁড়ের শেকড় তুলে আনলুম। আড়াই গোলমরিচ, তিন গাঁট হলদি, গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা দিয়ে বেটে খাইয়ে তবে গোবদ্যি সত্য মানিককে ডাকতে গেলুম। সত্যদা এসে গরুর অবস্থা দেখে বললে, 'মুখ থেকে লালা ঝরছে। গরু কি দড়ি ছিঁড়ে বনজঙ্গলে চরাট খেতে গেছিল? আমি বললম, না। তখন সত্যদা বলল, গরুকে মুচি বিষ খাইয়ে গেছে। আর একে বাঁচানো যাবে না। সেই আমার লক্ষ্মী গরুটা মাঝ রাতেই মরে গেল।

গামছার খুঁটে চোখের জল মুছতে লাগল রিয়াজ মোল্লা। বলল, 'মায়ের কি কান্না! হায় রে অভাগা কপাল। এমন কাজের গরু তুই মরে গেলি। এখন বাছা আমার কি দিয়ে হাল নাঙল করে জমি চষবে?'

বউ কাঁদতে লাগল, বলতে লাগল, 'মোর গায়ের গয়না খুলে বেচে এসে ঐ মারানে গুঁতোনে গরু কিনে আনলে তিন শো টাকা দিয়ে। জাবনা দিতে যেতে মোকে একদিন এমন গুঁতো মারলে শিং দিয়ে যে তিনদিন কোমরের যন্তনায় মরে যাই। আর একবার সবে গড়া থেকে খুলে বার করছি, হাতে একটা বাড়ি আছে। হঠাৎ তেড়ে আসবে নে! মুই দৌড়ে যেয়ে মেয়ে মানুষ হয়েও বাগানীদের শোয়া খেজুর গাছটাতে উঠে পড়লুম। তবু গরুটা শিং দিয়ে মোর দুটো পা চ্যালা করে দিলে। মুই চেল্লাচ্চি, পাড়ার ছেলেমেয়েরা লাঠি নিয়ে ভয় দেখিয়ে তেড়ে আসছে। ও বাবা, তাদেরই ও তেড়ে নিয়ে গেল, তখন মুই নেমে পালাই! সেই গরু মারা গেল। মোর গয়নাগুলো পানিতে পড়ল।'

গাড়োয়ান বলল, 'সন্ধান করে আবার একটা তোমার বাঁয়ের গরুর জোড়া করো। গরু খুঁজে খুঁজে পাওয়া অবশ্য খুব শক্ত কাজ। মাথা রোদে ফেটে যায়। মাঠে ঘাটে চলে চলে পায়ের চটা উঠে যায়। গরু কেনার কথা আর বলো না মোল্লার পো।'

'তোমার তা পেট ঝোলা মাঝের ভরা গরু হলেই গাড়িতে চলে ভাল। ভারী মাল টেনে হামুস হামুস করে যাবে। আর আমার যে হাল-মই বাইবে। শাওন মাসে পেট ডোবা পানিতে বকের মতো পা ফেলে ফেলে এগোবে। ঐ কালী ধাড়ার গরুটাকে দিয়ে মই দৌড় করিয়ে মুই ঘড়া জিতে এনেছিলুম। সাত গাঁয়ের কেউ মোর গরুর সাথে

দৌড়তে পারলে না। সেই গরু মরে গেল বলেই তো মাথা খারাপ। নাহলে কি গড়ানের পো তোমাকে এমন অসময়ে মোর বাঁশে দা দিতে আনি।'

'যাই বলো মোল্লার পো, তোমার বাঁশে আমার লোসকান হবে। আমরা গোড়া মোটা কাঁচা বাঁশ কাটি। কলকাতা শহরের আড়তদাররা ফিতে দিয়ে গোড়া মেপে বাঁশ নেয়। কাঁচা বাঁশের গোড়া মোটা। কথায় আছে বাঁশ পাকলে সরু, পোদ পাকলে গরু, কায়েত পাকলে ছীরের ধার আর মোচোলমান পাকলে গপ্প সার। তা শহরের বাবু আড়তদার মোর কথা শুনে খালি হা হা করে হাসে। বলে, 'ওহে গাড়োয়ান, তুমি ব্যবসার কি বোঝ। কাঁচা বাঁশ আমরা চাই কেন জানো? ধরো পাকা ইমারত বাঁধার জন্য আমাদের গোলা থেকে কেউ পাঁচশো বাঁশ নিলে ভাড়ায়। বাড়ি শেষ হবার পর যখন ফেরত দেবে তখন আমি চারশো বাঁশ পাবো। বাকি একশো ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। এই একশো বাঁশের দাম পাঁচশো টাকা আমি আদায় করে নোব। কেননা কথাই ছিল নষ্ট ভাঙা বাঁশের দাম ধরে দিতে হবে। কাজেই পাকা বাঁশে আমার কি আয় দেবে। পাঁচ শো টাকা ভাড়ায় পাব আর পাঁচশো উদ্বৃত্ত। এই বাঁশ অবশ্য কেনা ছিল চারশো টাকাতে। কিন্তু তিন চার বছর ওগুলো ভাড়া খাটিয়ে কবেই টাকা উঠে গেছে। কাজেই মোল্লার পো এক সনের বা দু'সনের কাঁচা বড় বাঁশ আমার দরকার।'

'হ্যাঁ, ঝাড়ের গুষ্টির তুষ্টি করবে। কাঁচা বাঁশে কোঁড় বেরুবে। এই দ্যাখো না, তুমি হলে এই বাঁশটায় কোপ দিতেই, কিন্তু এতে দ্যাখো, দুদিক থেকে দুটো বাঁশ বের হয়েছে। শালা, গাড়োয়ান খদ্দেরকে কেউ বাঁশ বেচতে দেয় যদি না আমার মতন দুর্দশায় পড়ে। এই খোকা, এখনো কি তুই 'নাবাল্যক' আছিস? গোড়া তুলে বাঁশ কাটতিছিস কেন? ঝাড় উঁচু হয়ে যাবে নে? মাটির কোল ঠেসে বাঁশ কাট। সাড়ে তিন শো টাকা শ দিতে হবে গাড়ানের পো, আমরা বাঁশ কেটে দিচ্ছি। তোমার জন খরচা বেচে গেল।'

ফরহাদ গাড়োয়ান সিগারেট খায়। বলে, 'কে তোমাকে বাঁশ কেটে দিতে বলছে। ওতে তো মোর আরো লোসকান শহরের বাবুরা চায়....'

'তুত্তোর শহরের বাবুদের নিকুচি করেছে। তাদের তোরা কাঁচা বাঁশ দিতে যাস কেন? তারা মোটা বড় বাঁশ দেখলেই পছন্দ করবে। শহরের বাবুদের যেমন চকচকে নধর চেহারা। ভেতরে শক্তি নেই। সেই রকম নিজের জাত চিনে তারা ব্যবসার মাল নেয়। যেন না বেশি দিন কেউ টেকে। ছাঁটাই করো, নতুন লোক আনো—নইলে দল পাকাবে। ঘুষ যে নেয় সে বেশি পাপী না যে দেয় সে? তোরাই তো শহরের আড়তদারদের খারাপ কাজ করতে শিখিয়িছিস।'

গরিব বেওয়া কোনো বিধবার কাঁচা কচি বাঁশ কম টাকা দিয়ে ঝেড়ে শহরে নিয়ে গেছিস আর চকচকে বাবুদের চকচকে বাঁশ চোখে ধরে গেছে–তাই চাহিদা বুঝে তোরাও দেশের সর্বনাশ করছিস। যা তোদের আমি বাঁশ দোব না। মেলা খ্যাচ খ্যাচ ভাল লাগে না। ঐ ছোড়া, আর কাটিস নি। চলে আয়। যা কাটা হয়েছে পান বরোজে দিয়ে দোব। যা তুই ফরহাদ গাড়ান। তোর ছায়া পড়লে, গায়ের গন্ধ লাগলে আমার বাঁশের ঝাড় নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আহা রাগ করো কেন মোল্লার পো, কাটো তুমি। আমরা সরে যাচ্ছি। অন্য ঝাড় দেখি।'

'হ্যাঁ, যাও কারো মাথায় হাত বুলোও খেয়ে

পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য শুধু জনসংখ্যা হ্রাস করা নয়। এর লক্ষ্য এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে আরো সুখী পরিবার গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে এমন পরিবার যেখানে বাবা মা তাদের সন্তানের প্রতি উপযুক্ত যত্ন নিতে পারেন।

পরিবার পরিকল্পনা আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। বর্তমান হারে যদি জনসংখ্যা বেড়ে চলে তবে আমাদের খাদ্যেই শুধু টান পড়বেনা, এমনকি দাঁড়াবার জায়গাতেও টান পড়বে। এখনি আমাদের এই কর্মসূচী রূপায়িত করতে হবে। এর সুফল রাতারাতি আসবেনা। সুফল পেতে এক বা দুদশক সময় লাগবে।

ইন্দিরা গান্ধী

দ্রুত খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পের কাজ এগুচ্ছে

নীলমণি মিত্র

কৃষিতে নবযুগ আনতে সেচের ভূমিকা মুখ্য। পুরোপুরি ভাবে রাসায়নিক সার এবং অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার করতে হলে নিশ্চিত সেচ সুযোগ প্রয়োজন। একথা মনে রেখেই ক্ষুদ্র সেচকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে আনুমানিক ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্রুত খাদ্য উৎপাদন প্রকল্প নেওয়া হয়। মঞ্জুরীকৃত ৭ কোটি টাকার মধ্যে শুধু ক্ষুদ্র সেচের জন্যই ধরা হয়েছিল ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই কার্যসূচীর সহযোগী হিসেবে অধিক ফলনশীল ধান ও গমের নতুন নতুন জাত কৃষকদের কাছে প্রচলিত করে তুলতে আনুমানিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিনিকিট প্রদর্শনীর এক নতুন কার্যসূচীও নেওয়া হয়েছিল।

নতুন সেচ সুযোগ সৃষ্টি

সেচের সুযোগকে বেশি করে বাড়িয়ে তুলতে এবং কৃষকশ্রেণীর অনুন্নত সম্প্রদায়কে সেচ সুযোগ দিয়ে সাহায্য করতে সরকার কৃষক গোষ্ঠীকে দ্রুত খাদ্য-উৎপাদন কর্মসূচীতে অগভীর নলকূপ বসাতে, এবং পুকুর কাটা বা পুকুর সংস্কার করতে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। কৃষকদের এই সব গোষ্ঠীর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক অথবা প্রান্তিক কৃষক আছেন। বস্তুত পক্ষে গোষ্ঠীতে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের হার সাধারণত শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি। অগভীর নলকূপের গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় সকল কৃষকই এই গোষ্ঠীতে থেকে সেচের সুযোগ পেয়েছেন।
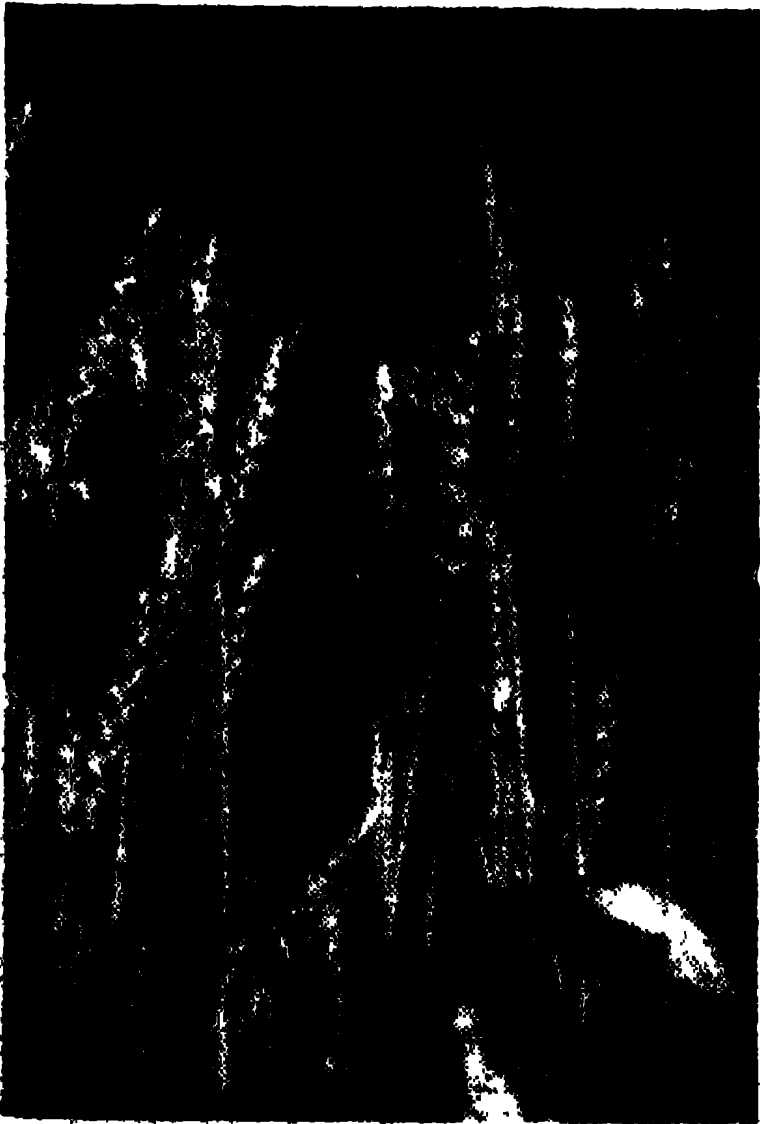
অধিক উৎপাদনশীল গম

পাম্প সেট সহ অগভীর নলকূপ

পাম্পসেট, পাম্পঘর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমেত কৃষকরা যৌথভাবে সরকারী ঋণের মাধ্যমে গুচ্ছ প্রকল্পে অগভীর নলকূপ বসিয়েছেন। প্রতি নলকূপের জন্য এ বাবদ খরচ হয়েছে গড়ে ৯০০০ টাকা। মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩.৭৫ কোটি টাকা এবং এর দ্বারা ৪,৮০২টি বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপ বসানো সম্ভব হয়েছে। ফলে ৩৬ হাজার একর জমিতে নতুনভাবে সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কূপ খনন

মাটির নীচে পাথুরে স্তর থাকায় কিংবা অন্যান্য কারণে অনেক এলাকায় অগভীর নলকূপ বসানো সম্ভব নয়। এসব এলাকায় সেচের জন্য কুয়ো কৃষকদের কাছে সমাদৃত। ৮ থেকে ২০ ফুট ব্যাসের ৭৮৩টি কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। এর প্রতিটির জন্য গড়ে ৮,০০০ টাকার বেশী খরচ করা হয়নি। সেচের জন্য কৃষকরা নিজেরাই কুয়ো খুঁড়ে নিয়েছেন, ঋণ এবং অনুদান হিসেবে আর্থিক সাহায্য পেয়ে। ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষকদের কুয়ো খোঁড়ার যথার্থ ব্যয়ের যথাক্রমে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ৬৬⅔ ভাগ টাকা সরকার ঋণ বাবদ অগ্রিম দিয়েছেন। আর অনুদান বাবদ যথার্থ ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ ও ৩৩⅓ ভাগ পেয়েছেন যথাক্রমে ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক। এই বাবদ মোট খরচ পড়েছে ৫০ লক্ষ টাকা এবং এর ফলে সর্বমোট প্রায় ১০০০ একর জমি সেচ পাবে।
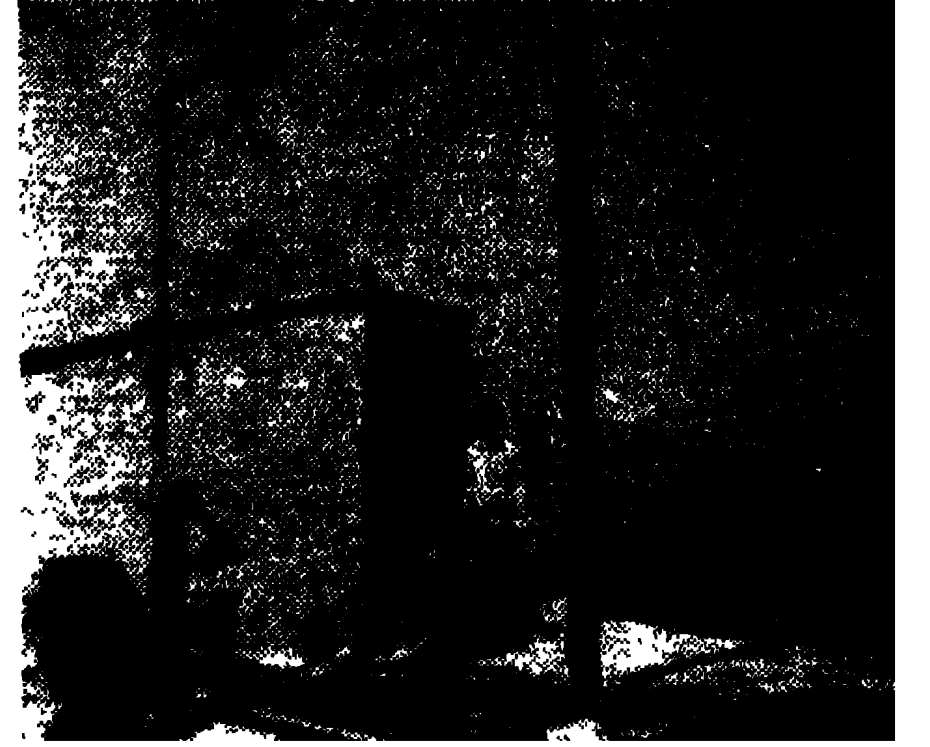
সেচের কাজে অগভীর নলকূপ

পুকুর কাটা বা পুরানো পুকুরের সংস্কার

এই কর্মসূচীতে ৬৩৫টি পুকুর কাটা বা সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিটি পুকুরের জন্য গড়ে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এ বাবদ মোট অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা এবং পাঁচ হাজার একর বাড়তি জমি সেচের আওতায় এসেছে।

সেচের-সুযোগ সৃষ্টির এই তিনটি মুখ্য কর্মসূচী ছাড়াও ৭৭টি নতুন গভীর নলকূপ, ২০টি নদী সেচ কেন্দ্র এবং ১৮টি অন্যান্য সেচ প্রকল্প রূপায়িত করা হয়েছে। এ বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা। এর ফলে বাড়তি ২০ হাজার একর জমিতে সেচের সুযোগ হয়েছে।

মিনিকিট

এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আউশ, আমন ও বোরো ধানের মরসুমে এবং গমের মরসুমে কৃষকরা নিজেদের

১৮ পৃষ্ঠায় শেষাংশ

প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়

পাটের গোড়ছাল – পাট চাষীর ভাবনা

পাটের বাজারে আঁশের মান নির্ণয় করা হয় কয়েকটি বিষয়ের ভিত্তিতে। এর মধ্যে হ'ল আঁশে গোড়ছালের পরিমাণ। এই ছাল আঁশে যত বেশী ততই তার মান নীচে নেমে যায়। ফলে শুধুমাত্র গোড়ছালের উপস্থিতির জন্যেই চাষীরা আঁশের মান অনুযায়ী যথাযোগ্য দাম পান না।

গোটাপাটের নীচের দিকের শক্ত ছালী অংশই গোড়ছাল। এর যে অংশ কেটে বাদ দিয়ে চটকলে প্রচলিত পদ্ধতিতে সুতা কাটান হয় তাকে বলে গোড়াকাটা। অনেক সময় গাছের নীচের দিকের কাণ্ড শক্ত হওয়ায় অথবা পচানোর ত্রুটিতে বেশীর ভাগ পাটেই গোড়াছাল হয়ে থাকে। তিতাপাটে গোড়ছালের পরিমাণ মিঠা-পাটের তুলনায় বেশী। সাধারণত গোড়ছালের পরিমাণ উৎপাদিত আঁশের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ।

আঁশে গোড়ছাল থাকলে চটকলে তাকে ব্যবহার করতে খুবই অসুবিধা হয়। জানা গেছে, ভারতে উৎপাদিত পাটের শতকরা ১০–১৫ ভাগ আঁশে এত বেশী শক্তছালী অংশ থাকে যে তা চটকলে ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী অথবা তা থেকে কেবলমাত্র নীচুমানের সুতা তৈরিই সম্ভব।

পাট ও মেস্তার গোড়ছালের পরিমাণ কমাতে কৃষিবিদ্‌রা অবশ্য উন্নত প্রথায় জাঁক দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাট-গাছের ওপরের অংশ গোড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি পচে যায়। সম্পূর্ণ গাছ সমভাবে পচাতে হলে প্রথমে গাছের আঁটিগুলির গোড়ার অংশ ৫০–৬০ সেন্টি-মিটার গভীর জলে দাঁড় করিয়ে রাখা প্রয়োজন। এইভাবে ৩–৪ দিন রাখলে গোড়ার দিকটা অল্প পচে যায়। তারপর আঁটিগুলি জলের মধ্যে পাশাপাশি বা দুটি স্তরে সাজিয়ে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে জাঁক দিলে আঁশে গোড়ছাল কমে যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

গবেষকগণ আঁশে গোড়ছাল কমাতে জাঁক দেওয়ার আগে পাটগাছের গোড়ার অংশ ঘা দিয়ে থেঁতলে নেওয়ার কথাও চিন্তা করেছিলেন। এতে আঁশের উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ার পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য হয় নি। বরং কাণ্ডের গোড়ার অংশ মৃদু 'ইউরিয়া' দ্রবণে ডুবিয়ে নিয়ে জাঁক দিলে গোড়ছালের পরিমাণ কমে যায়। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে—যান্ত্রিক উপায়ে পাটগাছের ছাল আলাদা করে পচালে গোড়ছালের সম্ভাবনা থাকে না। এ বিষয়ে এখন ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

পাট ও মেস্তার উন্নত প্রথায় ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা ক'রছেন দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্কে অবস্থিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের পাট শিল্প গবেষণাগার (জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরিজ)। সেখানে এক বিশেষ ছত্রাক-জীবাণু নির্ণয় করা হয়েছে যার মাধ্যমে গোড়ছাল বা শক্তছালী আঁশকে অল্প খরচে ও কম সময়ে নরম করা সম্ভব (সূত্রঃ ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ্ মাইক্রোবায়লজি, সংখ্যা ১৪, ১৯৭৪ পত্রিকায় প্রকাশিত পাটশিল্প গবেষণাগারের ডঃ নিশি ভূষণ পাল এবং ডঃ সুজিত কুমার ভট্টাচার্য রচিত নিবন্ধ)। উল্লেখ করা দরকার, পাটশিল্প গবেষণা সমিতিতেও আর এক জাতীয় ছত্রাক জীবাণু নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে।

চটকলে প্রচলিত পদ্ধতিতে গোড়ছাল নরম করতে সময় লাগে বেশী। এই পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে তেল-জল-সাবানের মিশ্রণের (ব্যাচিং ইমালসন্) ব্যবহার ও ব্যাপক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার (কার্ডিং) প্রয়োজন। তবুও সেই আঁশ সমভাবে নরম হয় না এবং কিছু কিছু শক্তছালী অংশ থেকে যায়। তাছাড়া আঁশ হয় কমজোরী। সাধারণত চটকলে এই পদ্ধতিতে নরম করা আঁশ থেকে তৈরী হয় বস্তা জাতীয় জিনিস।

জে. টি. আর. এল-এ নির্ণিত ছত্রাক-জীবাণু পাট ও মেস্তার গোড়ছাল অথবা শক্তছালী আঁশকে নরম করার পক্ষে খুবই উপযোগী। ছত্রাক-জীবাণু দ্রবণ গোড়ছাল ছিটিয়ে দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায় (৩০–৩২–সেণ্টিগ্রেড) ২–৪ দিন রাখলে নরম হয়ে যায়। অবশ্য ঐ সময়ে জীবাণুকে বাঁচিয়ে রাখতে কিছু খাদ্যের (অ্যামোনিয়াম-ডাই-হাইড্রোজেন ফসফেট বা ইউরিয়া এবং

চতুর্থ কভারে দেখুন

ছত্রাক জীবাণুর সাহায্যে গোড়-ছালের মান উন্নয়ন
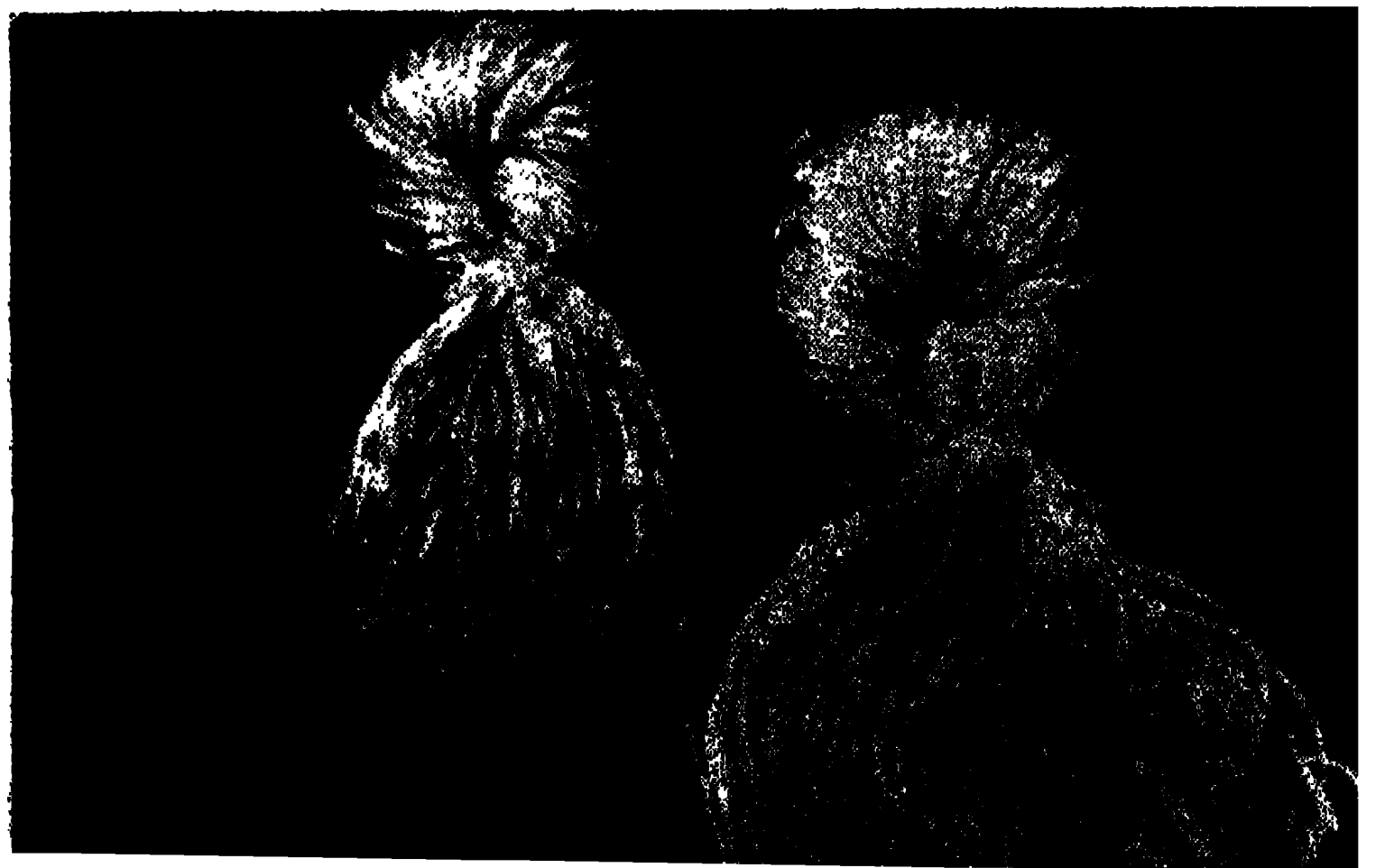
মনোজ বসুর এখন বয়স ৭৪ বছর। বইয়ের সংখ্যা সত্তরেরও বেশী। গল্প সংখ্যা আড়াইশোর উপর। ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠী ও মালায়ালম ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে। দু'খানা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। ছায়াছবি হয়েছে— আগষ্ট ১৯৪২, জলজঙ্গল, ভুলিনাই প্রভৃতি দেশাত্মবোধক বই। ''নিশি কুটুম্ব'' বইটি আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ঘুরেছেন চীন, সোভিয়েত দেশ, পূর্বজার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ। শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর লিখেছেন 'মানুষ গড়ার কারিগর'। 'এখনও তিনি লিখে যাচ্ছেন। বল্লেন—'আরও যে ক'টা দিন শক্তি আছে অন্যদিকে চোখ ফেরানোর উপায় নেই। কাজ বৃহৎ, হাতে সামান্য সময়। যখন স্মৃতি শিথিল ও কলম অপটু হবে, তার পরে ভবভার হয়ে এক মুহূর্তও বাঁচতে চাইনা'। কল্লোল গোষ্ঠির সম-সাময়িক হয়েও তিনি

ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার ঝোঁক। মিল দেওয়া ছোট ছোট কবিতা লিখে হাত পাকান। তাঁর বাবাও লিখতেন। ফলে শৈশবের প্রবণতা আরও দৃঢ় হয়ে তরুণ মনে লেখক হওয়ার বাসনা সুতীব্র হয়ে ওঠে। যশোর থেকে কলকাতা এসে বি. এ. পাশ করে মাষ্টারী শুরু করে দেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে টিউশানী নিতে হয়েছে। ক্রমশ মন শক্ত হয়ে ওঠে, হাত পাকা হয়ে ওঠে। ঠিক করেন যা লিখবেন তা ছোটখাট কাগজে দেবেন না, বড় কাগজে দিয়ে বক্তব্য সবাইকে পড়াবেন। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রায় লেখা পাঠাতেন। ছাপা হত, মাঝে মাঝে ফেরতও আসত। এসময় কবি হেম বাগচীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রোজ বিকেলে তাঁর আড্ডায় যেতেন। বিচিত্রায় 'নতুন' ও প্রবাসীতে 'বাঘ' গল্প বের হলে সুনাম কুড়ান। প্রবাসীতেই 'বনমর্ম্মর' ছাপা হয়।

—আজকের বাংলা ও বাঙ্গালী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

বার্দ্ধক্যের সৌন্দর্য্য মনোজ বসুর চোখে মুখে। ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে স্নেহের সুরে বলেন—বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে আমার লেখায় অনেক বলেছি। মনের মধ্যে দেশখণ্ডন ও স্বাধীনতার অপ-

মুখোমুখি

আরও যে ক'টা দিন শক্তি আছে অন্যদিকে চোখ ফেরানোর উপায় নেই। কাজ বৃহৎ, হাতে সামান্য সময়। যখন স্মৃতি শিথিল ও কলম অপটু হবে, তার পরে ভবভার হয়ে এক মুহূর্তও বাঁচতে চাইনা।

মনোজ বসু
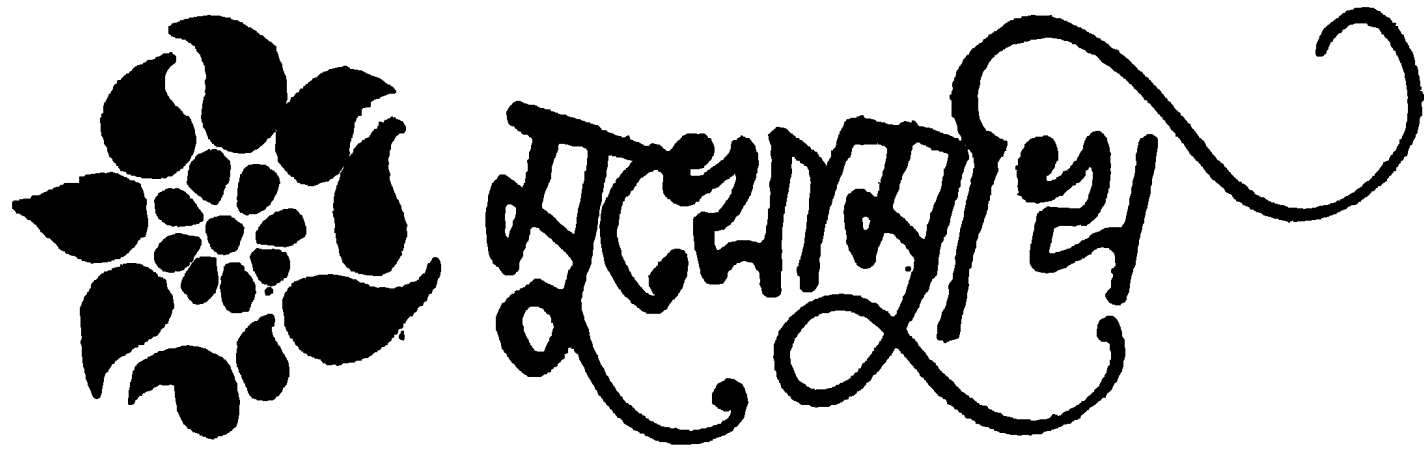
তাঁদের সমধর্মী নন, সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের লেখক। নগর ও নাগরিক জীবনের প্রতি অন্যদের মত লক্ষ্য না দিয়ে জলজঙ্গলের আবাদভূমি, সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য অরণ্য, গাঙ্গেয় অববাহিকার পলিমাটির লোকজনদের নিয়েই লিখেছেন বেশী। তাদের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, আধিভৌতিক জীবন রঙে-রেখায় জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মনোজ বসু ভিন্নজাতের সাহিত্যিক। প্রত্যেক সাহিত্যিকই লেখায়, স্বভাবে ও চরিত্রে অন্য সাহিত্যিক অপেক্ষা ভিন্ন। মনোজ বসু তাঁর দেখা ও জানা রাজনৈতিক জীবন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দাঙ্গা, ভাষা-বিদ্রোহ, সমাজ ও রাষ্ট্রের আদিব্যাধি ইত্যাদি অত্যন্ত নিপুণভাবে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। মনোজ বসু সৎ শিল্পী।

প্রশ্ন করলাম—লেখার উপাদান কোথায় পেয়েছেন?

—লেখার উপাদান পেয়েছি দেশের মানুষজন হতে, গ্রাম হতে। ঘুরে ঘুরে অনেক দেখেছি। অনেক শুনেছি। জন্মভূমির কথা, দেশের কথা লেখার জন্য মনের মধ্যে ঝড় বইত। মনে অনেক ক্ষোভ, জ্বালা ছিল। অনেক বয়স হল, সবকিছু লেখা হয়ে ওঠেনি।

—লেখা দিতে খুঁতখুঁত ভাব আছে?

—নিশ্চয়। সময় নিয়ে, যত্ননিয়ে লিখি। ভালো কাগজে ছাড়া লিখি না।

—অবসর সময় কি করেন?

—অবসর কোথায়? শরীর ভাল যাচ্ছে না। সময় পেলেই কিছু কিছু লিখি। বিকেলে বেড়াতে যাই।

ব্যবহারের জন্য দুঃখবোধ আছে। 'সৈনিক' বইতে বেকার সমস্যা নিয়ে লিখেছি। আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, তাই পিছিয়ে যাচ্ছি। 'পথ কে রুখিবে' বইতে সব কথা বলেছি।

—নতুন লেখকদের সম্পর্কে আপনার ধারণা? কাহিনীশূন্য গল্প বা উপন্যাস সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

—নতুনদের লেখা পড়ি, তবে অনেকেই হতাশ করে। গল্পে বা উপন্যাসে কাহিনী না থাকলে কে পড়বে? ওসব শেষ পর্যন্ত টেঁকে না।

মনোজবাবু ভাগ্যে বিশ্বাসী নন। পুরুষকারে বিশ্বাসী। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'শরৎ পুরস্কার', 'চীন দেখে এলাম' বইটিতে 'নরসিংহ' পুরস্কার, 'নিশিকুটুম্ব'

বইটির জন্য 'সাহিত্য একাদেমী' পুরস্কার এবং আরও ছোটখাট কিছু পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি। কিন্তু তিনি মনে করেন পুরস্কার নবীনদের দিলে তাদের আত্মবিশ্বাস আসবে এবং আর্থিক সাহায্যও হবে। আজকাল অনুরাগীদের চিঠিপত্রে বিশেষ সাড়া দেন না। জীবনের শেষ ঘণ্টা বুঝি বেজে গেল। তাই আত্মজীবনীমূলক কিছু লিখে যাচ্ছেন।

আরো কিছু প্রশ্ন ছিল। বললাম,

—সমালোচক ও পত্র পত্রিকার ভূমিকাকে কি চোখে দেখেন? বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা কি?

—নিজের চিন্তা ভাবনা ও সাহিত্যকর্মের উপর আত্মবিশ্বাস আছে। কিন্তু ওতে আমার কোন আগ্রহ নেই। এ বয়সে চেষ্টা করলেও কিছু পাল্টানো যায় না। যা লিখছি তাই আমার কাছে মূল্যবান। তা প্রকাশের জন্য ভাল মিডিয়াম চাই। পত্র-পত্রিকার ভূমিকার নিশ্চয় মূল্য আছে। ... সাহিত্য কখনও আটকে থাকে না। বাংলা ভাষার অভ্যুদয় হবেই। একদিন পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র বাংলা ভাষা শিখবেই।

—সংসারী জীবন সাহিত্যজীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে?

—এক সময় বাধা ছিল। স্কুল মাষ্টার ছিলাম। দারিদ্র্যের জন্য বহু সময় নিস্ফলা গেছে। মাঝে মাঝে আপশোষ হয়। এখন কোন জ্বালা নেই। সাহিত্য করতে গিয়ে বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছি। বহু মানুষের সুখদুঃখের সাথী হয়েছি।

—কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন? কি অভিজ্ঞতা হল? চলচ্চিত্রে আপনার সাহিত্যের রসের কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

—করেছি,—'সাহিত্যের খবর' এবং 'বাংলার শক্তি'। কত লোক আর বই পড়ে, সিনেমার দর্শকই তো বেশী। তাদের সঙ্গে লেখকের ঘটনার একটা যোগাযোগ হয়ে যায়, পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। তবে উল্টোটাও হয়।

আমার সামনে চায়ের কাপ। কাপটার আকৃতি বাটির মত। রসিকতা করে বল্লেন—চীন থেকে আনা পাত্র। রবীন্দ্রনাথ তো কত বড় পাত্রে চা খেতেন। তোমরা আজকালকার তরুণরা প্রায়ই স্বাস্থ্যহীন।

—বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আপনার মতামত?

—ওদের কবিতা প্রবন্ধ ভালই। গল্প উপন্যাস ধীরে ধীরে উন্নত হবে। ওদের নিষ্ঠা প্রবল। ওরাই আঞ্চলিক ভাষার অভিধান করেছে।

—ধর্ম মানেন? ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনার কি ধারনা?

—ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাইনি। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান বলে কোন পার্থক্য নেই। মানবতাবাদে বিশ্বাস করি। বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই আগ্রহী।

মনোজ বসু হংকং, লঙ্কা, চীন, আফগানিস্থান, রাশিয়া, ইংলণ্ড, জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স পোলাণ্ড, ইতালী, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে সরকারী নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ঘুরে এসেছেন। তবু খুবই সহজ-সরল ও হাসিখুশির মানুষ। গীতার গুরুবাদ ও ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে কিছু সময় আলোচনা চলে। বললেন, গীতা না বুঝলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে চেনা যায় না। আরও কিছু প্রশ্ন করা যেত। কিন্তু তাঁর বয়স ও শরীরের কথা ভেবে আর কষ্ট দিতে পারলাম না।

সাক্ষাৎকার : সত্যানন্দ গুহ

দ্রুত খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পের কাজ এগুচ্ছে

১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করে কোন জাত তাঁদের জমির উপযুক্ত তা যেন বেছে নিতে পারেন। নির্বাচিত প্রত্যেক কৃষক ২ কেজি বীজ, ৪ কেজি ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম কীট বা রোগ-নাশক ওষুধ পেয়েছেন। এরকম প্রতিটি মিনিকিটের দাম ১৫ টাকা এবং তা কৃষকদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। প্রগতিশীল ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষকদের এই মিনিকিট বিতরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীতে যোগদানকারী কৃষকদের প্রত্যেকের ১০ শতক ধানের জমি ও ৫ শতক গমের জমিতে এক একটি প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছিল।

যদিও মিনিকিট প্রদর্শনের লক্ষ্যসীমা করা হয়েছিল পাঁচ লক্ষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার মিনিকিট বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। শস্য অনুযায়ী এই হিসাব হল আমন ধানের ১ লক্ষ ৭৯ হাজার, বোরো ধানের ৫৯ হাজার, গমের ১ লক্ষ ৬ হাজার এবং উত্তরবঙ্গের প্রাক-খরিফ মরসুমে ধানের জন্য ১০ হাজার। মিনিকিট কর্মসূচী বাবদ মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা।

চলতি আর্থিক বছরেও এই মিনিকিট প্রদর্শন কর্মসূচী রূপায়িত করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। অধিক ফলনশীল জাত যাতে কৃষক সমাজে ভালভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে, সেজন্য আবার নতুনভাবে নির্বাচিত কৃষক গোষ্ঠীকে মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছে। সেজন্য এবছরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। খরিফ মরসুমে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছে।

এসব সুযোগ কৃষক সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়কেই যতদূর সম্ভব দেওয়া হয়েছে। দ্রুত খাদ্য-উৎপাদন প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার ফলে যে নতুন সেচ-সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তাছাড়া, আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষকরা প্রস্তাবিত অর্থ বিনিয়োগ করে যাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে আর্থিক লাভ করতে পারেন, তারজন্যও সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

দুটি সন্তানই যথেষ্ট

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব

স্বপন কুমার ঘোষ

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে বৃক্ষরোপণ উৎসব একটি বর্ণাঢ্য ও বিশিষ্ট উৎসব। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে গানের সঙ্গে সঙ্গে চলমান নৃত্য শোভাযাত্রা। বিশ্বভারতীর শিশু বিভাগ থেকে শুরু করে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গাছের চারা নিয়ে রঞ্জিত বেশে নৃত্য সহকারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় যেন ক্ষয়হীন জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়। ১৯২৮ সালের ১৪ জুলাই শান্তিনিকেতন গৌর প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের পৌরহিত্যে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর বাইশ বছর পর ভারত সরকার বনমহোৎসবের সূচনা করেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই বন-মহোৎসবের পথিকৃৎ। ১৯৪২ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর থেকেই 'বাইশে শ্রাবণ' শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করা হয়। গুরুদেবের তিরোধাণ দিবসে এই অনুষ্ঠান বেশ তাৎপর্যমণ্ডিত।

১৩৪৫ সালে বৃক্ষরোপণ উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি। তাই নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে; তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরের ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময় তার এমন দৃশ্য ছিল না। এখানে ছিল অরণ্য—যে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে। তার ফল মূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে—আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।'

রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে যে বন স্থাপন করবার কথা ভেবেছিলেন তার সেই দূরদর্শিতা—'বিশ্বনীড়' শান্তিনিকেতনে ছায়া সুনিবিড় পরিবেশের মধ্যেই প্রতিফলিত।

প্রতিবারের মতন এবারেও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ দিবসে এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে' সমবেত কণ্ঠে গানের সঙ্গে অশোক গাছের চারা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা হয়।

পূর্বপল্লীতে হিউম্যানিটিজ বিল্ডিং প্রাঙ্গণে বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী শ্রী রাম-কিংকর বেইজ বৃক্ষরোপণ করেন।

পৌরহিত্য করেন বিশ্বভারতীর উপচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ। কৃষক সমাজের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা রবীন্দ্র-নাথের মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। কৃষক সমাজকে প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ও কৃষি কর্মকে ভবিষ্যতে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে

শেষাংশ চতুর্থ কভারে দেখুন

শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ বৃক্ষরোপণ করছেন, পাশে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ
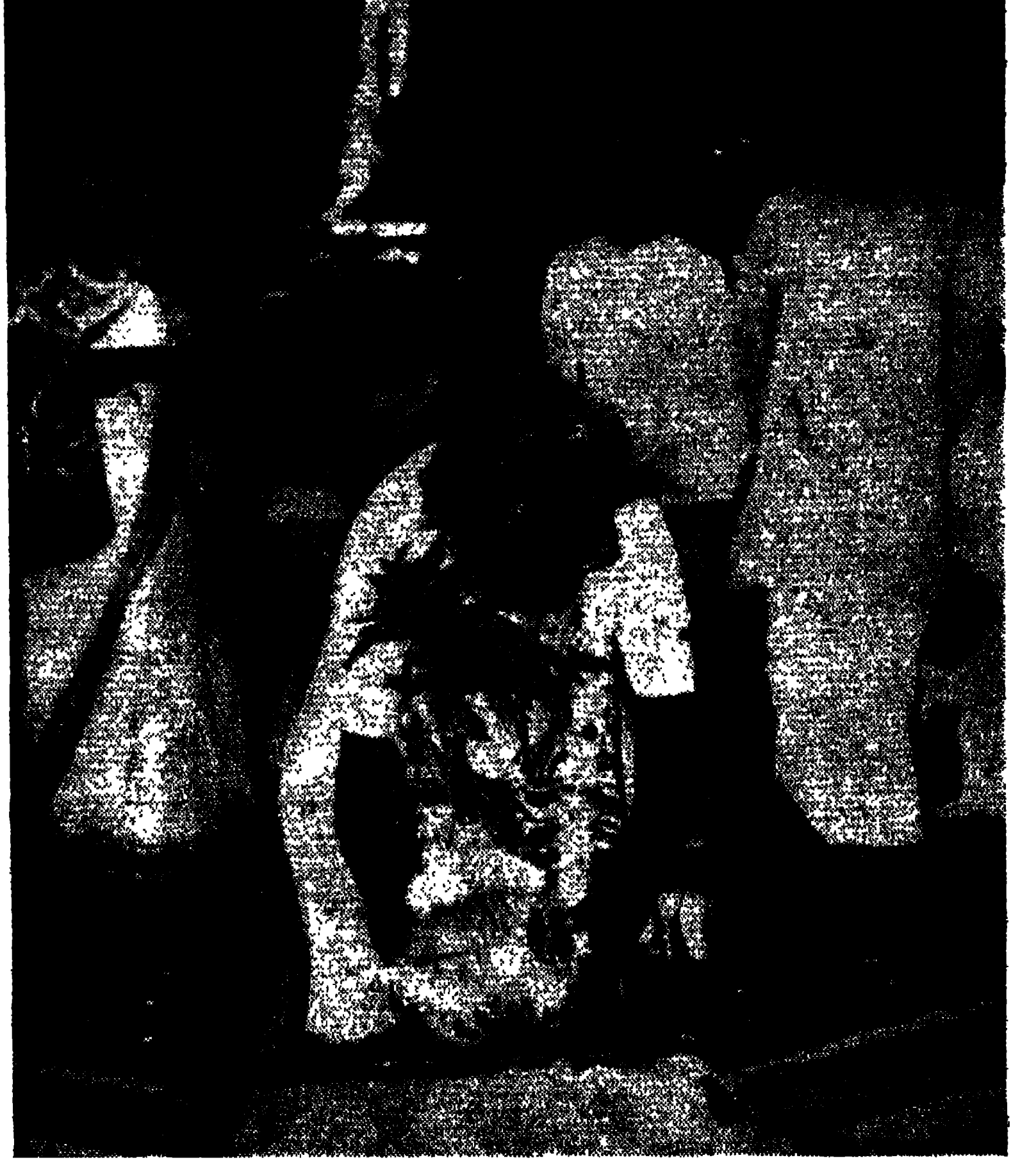
পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব
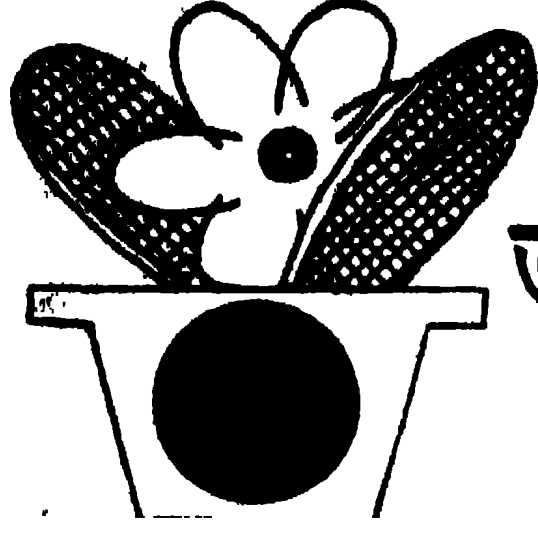
অমলেন্দু রায়চৌধুরী

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তি, সমষ্টি ও জাতীয় জীবনে এক মহৎ গুণ। নোংরামি ও জঞ্জালমুক্ত করতে হবে দেশকে। আর আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যও নির্ভর করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরে।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিক থেকে বলতে গেলে, স্বাস্থ্য বিধানের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার যোগাযোগ খুব নিবিড়। স্বাস্থ্যলাভ করতে হলে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পারিপার্শ্বিকের পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ময়লা, নোংরা, অপরিষ্কার পরিবেশের মধ্যে কখনও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারা যায় না।

দেহ সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে হলে আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধেই সচেতন থাকতে ও বিশেষ যত্ন গ্রহণ করতে হবে। নিজের দেহটিকে কী উপায়ে সুস্থ ও সমর্থ রাখা যায় তা জেনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে আমাদের।

দাঁত, চোখ, চামড়া, চুল প্রভৃতি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে যদি আমরা নজর দিই তাহলে দেখব পরিচ্ছন্নতার উপরেই এগুলির স্বাস্থ্য নির্ভর করছে। অপরিচ্ছন্নতার জন্য দাঁত খারাপ হয়। আমরা যখন কোন খাদ্য চিবিয়ে খাই তখন দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যের কণা ঢুকে যায়। প্রতিদিন ভালোভাবে দাঁত পরিষ্কার না করলে ঐ খাদ্যকণাগুলি দাঁতের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জমতে থাকে এবং ক্রমে এইভাবে দন্তক্ষয় (Caries) রোগ হয়। অবহেলার ফলে দন্তক্ষয় রোগ ক্রমে পরিণত হতে পারে পায়োরিয়ায় (Pyorrhoea) এবং এর ফলে আবার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও খারাপ হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দিনে অন্তত দুবার করে দাঁত মাজা প্রয়োজন।

চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ এবং আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এই চোখ দিয়ে আমরা বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করি। আমাদের অবহেলার ফলে যাতে চোখ নষ্ট না হয় সেজন্য চোখের পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে। ভারতবর্ষ বাস করে গ্রামে। গ্রামের পরিবেশ এমনিতেই শহর থেকে অধিকতর স্বাস্থ্যকর। বিশুদ্ধ আবহাওয়া, মুক্ত বাতাস, টাটকা সবুজী, ফলমূল প্রভৃতি গ্রামবাসীরা শহরবাসীর তুলনায় অতি সহজেই লাভ করতে পারেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের অত্যন্ত অভাবের জন্যই গ্রামের স্বাস্থ্যও নষ্ট হতে পারে। যে পুকুরের জলে স্নান করা ও কাপড় কাচা প্রভৃতি হয় সেই পুকুরের জলই অনেক গ্রামবাসীরা পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করেন। কাপড় কাচা অপরিষ্কার জল পান করার ফলে নানা রকম রোগে আক্রান্ত হন গ্রামবাসী। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্থার সমীক্ষামতে এই ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়েই প্রতিদিন ২৫ হাজার ভারতবাসীর মৃত্যু হচ্ছে। পৃথিবীর ৭০ ভাগ মানুষই নির্মল জল পান করতে পান না, আর আমাদের তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের এমনই কপাল যে এখানকার শতকরা ৯০ জন মানুষই দূষিত জল ব্যবহারে বাধ্য হয়। জল আমাদের জীবন, তাই জীবন-পণ করেই নির্মল, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার জল ভারতের গ্রামে গ্রামে দিতে হবে—নইলে আত্ম-হননের দায়ে আমরা দায়ী হব।

যারা গরীব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পথে তাদের দারিদ্র্য কোন বাধা হতে পারে না। গ্রামের দারিদ্র অধিবাসীর মাটির ঘরটিকেও খুব ঝকঝকে তকতকে করে রাখা যায় যাতে কোন বীজাণু না থাকতে পারে। নোংরা ও জঞ্জাল যেখানে রোগ বীজাণুও সেখানে। গ্রাম ও শহরে যেখানেই আমরা থাকিনা কেন আমাদের নিজেদের শরীর, নিজেদের বাসস্থান এবং যেখানে আমরা কাজ করি সেসব জায়গাই পরিষ্কার রাখতে হবে।

অনেক অফিসে পুরানো ফাইল পত্র ধ্বংস করে না ফেলে আলমারীর মাথায় রাখা হয়। খোলা জায়গায় থাকার ফলে ধুলোর পাহাড় জমে ওঠে এই সমস্ত ফাইলপত্রের উপরে। পাখা চালালে এই ধুলো, ময়লা অফিস কর্মীদের নাকে মুখে চলে যায়। অনেকের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস বাসা বেঁধে রয়েছে, তারা নখ কাটে না। মুখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে নখ খোটে। ফলে নখের সমস্ত ময়লা তাদের পেটে চলে যায়। পিন দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে এরকম ঘটনাও একেবারে বিরল নয়।

এছাড়াও কতকগুলি অপরিচ্ছন্ন অভ্যাস আছে। কেউ কলা খেয়ে তার খোসা ফেলে দিল রাস্তায়—কেউ বা আমের আটি বা খোসা ফেলে। ফলে ঘটে নানা রকম অঘটন বা পথ দুর্ঘটনা। বলি হয় অনেক

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহিলা মহল

সাক্ষরতা ও আমরা মেয়েরা

মীরা ভট্টশালী

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। এই শিক্ষার যাতে ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং দেশের প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছয় তার জন্য চলেছে নিয়ত সংগ্রাম। গ্রামে-গ্রামান্তরে শহরে-শহরান্তরে দেশে-দেশান্তরে গড়ে উঠেছে ব্যাপক গণ-উদ্যোগ। অথচ কয়েক বছর পেছনে তাকালেই দেখা যাবে হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখর চূড়ার মতো নিরক্ষরতার সমস্যা কিভাবে পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল।

জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছিল নিরক্ষরের সংখ্যাও। আজকের শিশু আগামীকালের বয়স্ক নিরক্ষর। ফল দাঁড়িয়েছিল ভয়াবহ। যা নাকি ১৯৫১ সালের মোট জনসংখ্যাকেও ছাপিয়ে গেছে। তাতে শতকরা ৭০ ভাগ লোকই ছিল নিরক্ষরের দলে।

কিন্তু আজকের চিত্র অন্যরকম। জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে সাক্ষরতাও। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোথাও কোথাও প্রতি হাজারে ৪১ থেকে নেমে হয়েছে ৩০।৩৫। সেই সঙ্গে সাক্ষরের সংখ্যাও বেড়েছে।

নিরক্ষরের মোটসংখ্যার একটা বড় অংশই জুড়ে আছে মেয়েরা। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও গভীর। ১৯৭১ সালের আদমসুমারীর হিসেবে ভারতে মোট নারীর সংখ্যা ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ। এঁদের মধ্যে ২১ কোটি ৪৭ লক্ষ নারীই নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। এই সংখ্যার মধ্যেই আছেন উৎপাদনক্ষম বয়ঃগোষ্ঠী অর্থাৎ যাঁদের বয়স ১৫-৪৫ বছরের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল (১৯৭১ সালের হিসেবে) ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার। আর মোট সাক্ষর জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ২২ জন হলেন মহিলা। আশার কথা বিগত দু'দশকে পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের সাক্ষরতার হার অনেক বেশী।

১৯৭১ সালের সাক্ষরতা চিত্র দেখে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। কারণ ঐ সালকে পেছনে ফেলে আমরা আরও কয়েক বছর এগিয়ে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটেছে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। বিশ্বের কোন উন্নয়নশীল দেশই কোন সমস্যাকে বেশীদিন জিইয়ে রাখেনি। ভারতের মতো দেশও তা রাখতে চায় না। আর তা চায় না বলেই প্রধানমন্ত্রীর বিশ-দফা কর্মসূচী গ্রহণ। শুধু গ্রহণ নয় তার সফল রূপায়ণ। আর সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত যুব কংগ্রেসের চার-দফা কর্মসূচীর অন্যতম-নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল ইউনেস্কো। অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যাকে বড় করে তুলে ধরে ভারতবর্ষও উদ্‌যাপন করেছে ঐ বছরটি। স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে নারীর যে সমমর্যাদার কথা স্বীকৃত হয়েছিল আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষের নিরিখে আজ তার নবমূল্যায়ণ হচ্ছে। আর তাই তো নারীবর্ষের ব্যাপ্তি নারীদশকে।

পক্ষান্তরে সত্তরের দশক সাক্ষরতার দশক হিসেবেও চিহ্নিত। সাক্ষরতার কাজে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আজ গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন।

নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য বা গরীবীর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং দেশের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে সাক্ষরতার মূল্য অপরিসীম। অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ়তর করবার জন্য বিশেষ করে দরকার উৎপাদনক্ষম বয়ঃগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলা। এই বয়ঃগোষ্ঠীতে যে সমস্ত মহিলারা পড়েন তাদের সংখ্যাও উপেক্ষণীয় নয়। সমাজের এই বৃহত্তর অংশকে বাদ দিয়ে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়—একথা উপলব্ধি করছেন সর্বস্তরের মানুষ। এই বিরাট মহিলা সমাজকে সাক্ষর করে তুলতে পারলেই নিরক্ষরতা সমস্যা ক্রমশ কমে আসবে এ বিশ্বাস আজ অনেকের মনেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি শিশু যখন বড় হয়, তার শৈশবের অনেকটা সময়ই কাটে মায়ের কাছে। ফলে ভবিষ্যৎ আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা সেখান থেকেই হয় প্রভাবিত। আর অক্ষর পরিচয়ও তিনিই করান, যদি সে না সাক্ষর হন।

প্রধানমন্ত্রী কোন একটি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেছেন, আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষের অন্যতম প্রধান কাজ মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার। আর এই দশকে মহিলাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সাক্ষরতাই হবে শক্তিশালী হাতিয়ার।

ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে সভানেত্রী করে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিম-বঙ্গ মহিলা সমিতি, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

প্রভৃতি গণসংগঠন যৌথভাবে নিয়েছেন এক বিশেষ কর্মসূচী, যার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মহিলা অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে পৌঁছুবেন শিক্ষার আলোর জগতে।

যুবনেতা সঞ্জয় গান্ধীও ডাক দিয়েছেন দেশের প্রতিটি যুবককে। বলেছেন নারীদের সম্মানিত করো, পণপ্রথার বিলোপ করে তাঁদের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার দাও, গড়ে তোল নতুন সমাজ।

গড়ে উঠছে নতুন সমাজ। সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারের জন্য যুক্ত হয়েছে বিশ-দফা কর্মসূচীতে কয়েকটি দফা। যাতে আছে শিক্ষা, এ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ, হোস্টেল ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্যমূল্যে জিনিস দেওয়া, সস্তায় ষ্টেশনারী, বই প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনে উৎসাহ বৃদ্ধির চেষ্টা। বেতার ও টেলিভিসনের মাধ্যমে চলছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক প্রচেষ্টা। জেলায় জেলায় সমাজশিক্ষা অধিকারিক কাজ করছেন। কাজ করছেন নেহরু যুবকেন্দ্র।

সাক্ষরতার কাজে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও গৃহীত হচ্ছে নতুন নতুন কর্মসূচী। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দিষ্ট পাঠ্য-সূচীতে স্থান পেয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একাজ চলছে জাতীয় সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে। অংশ নিচ্ছেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। এঁদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমেও এক বিরাট সংখ্যক মহিলা নিরক্ষরতার দুঃখ ভুলছে বৈকি।

এগিয়ে এসেছেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলোও। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাডাল্ট এড়-কেশন এ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ, নিখিল ভারত জনশিক্ষা প্রচার সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, জাতীয় সাক্ষরতা-সমন্বয় সমিতি, কেরালা গ্রন্থশালা সংঘম প্রভৃতি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। গড়ে উঠছে নতুন নতুন সাক্ষরতা কেন্দ্র।

আজকে যাঁরা লেখাপড়া শিখে সাক্ষর হচ্ছেন, অনভ্যাসবশত বা অনুসারী পাঠ্যপুস্তকের অভাবে আগামী দিনে তাঁরাই যাতে আবার নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি না করেন সেদিকেও সরকারের সদা-সচেতন দৃষ্টি। তাইতো প্রতি বছরেই অনুসারী পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কি রাজ্য, কি কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় বিশেষ পুরস্কার। একাজে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও পেছিয়ে নেই।

'একে অপরকে শেখাও'—এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকেই কাজ শুরু করেছেন ইতিমধ্যেই। চালু হয়েছে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। যুদ্ধকালীন গুরুত্বের দাবীতে লোকসভায় উত্থাপিত হয়েছে সাক্ষরতা বিল। আর তাইতো লাল ত্রিকোণের পাহারা এড়িয়ে সাক্ষরতার পরিবার আজ ক্রমবর্ধমান।

পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব

২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

নির্দোষ প্রাণ। সেই সঙ্গে রাস্তাঘাটও নোংরা হচ্ছে।

অনেক সময়ই দেখা যাবে ডাবের খোলা স্তূপীকৃত হয়ে জমা রয়েছে কলকাতার রাস্তার উপরে। ডাবগুলি আসে গ্রাম থেকে। শহর কলকাতায় নাগরিকদের তৃষ্ণা নিবারণ করে। কিন্তু তারপরেই জঞ্জাল হিসেবে জড়ো হয় রাস্তায়। ডাব যারা শহরে এনে বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করে তাদের উচিত নয় বিনিময়ে শহরের জঞ্জাল বাড়িয়ে অস্বাস্থ্যকে টেনে আনা। আর যারা এই ডাব খান তারাও একটু কষ্ট করে এগুলিকে কাছাকাছি কোন ডাষ্টবিনে ফেলতে পারেন।

শহরের রাস্তায় অনেকে উনুন জ্বালান। রাস্তাটা যে উনুন ধরাবার জায়গা নয় তা বুঝতে চান না। এই উনুনের ধোঁয়া কলকাতার বাতাসকে করে দূষিত। ফলে শহরের বাতাস মানুষ ও গাছপালার স্বাস্থ্যের পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে থুথু ফেলেন রাস্তায়। ফুটপাথেও দোকান সাজিয়ে বসেন অনেকে। ফুট-পাথটা ব্যবসা করার জায়গা নয়—পুলিশ মাঝে মাঝে হামলাও করে এই নিয়ে। ফুটপাথে ব্যবসা যদি করতেই হয় তাহলে সেটা এমনভাবে করা উচিত যাতে লোকের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অভাবে দোকানদাররা লোকের ক্ষতি করেন বিনা দ্বিধায়।

ছেলেমেয়েদের স্বভাবের মধ্যেই যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বোধ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে গড়ে ওঠে সেটা তৈরী করার ব্যাপারে মায়েদের একটা কর্তব্য রয়েছে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন—The hand that rocks the cradle, rules the world। অর্থাৎ মায়ের যে হাত দোলনা দোলায়, সেই হাতই জগৎ শাসন করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখানোর ব্যাপারে মায়েরা তাঁদের কর্তব্য করতে পারেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকাল থেকেই তাঁরা এমন ভাবে তৈরী করবেন যাতে, কোন জঞ্জাল তাদের ত্রিসীমানার মধ্যে কোথায়ও জমতেই পারবে না।

পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস আমাদের গঠন করতেই হবে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি সব কিছু পরিষ্কার রাখতে হবে। এব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে। নিজেদের ঘরবাড়ী, নিজেদের গ্রাম ও নিজেদের শহর পরিষ্কার রাখার কাজ আমাদের সবাইকেই করতে হবে। না হলে এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও পরিচ্ছন্ন জাতি গঠনের কাজ পিছিয়ে পড়বে।

যুব মানস

তরুণরা কোন নির্দিষ্ট কালের নয়—সকল কালের সকল যুগের তরুণদেরই স্বভাব ও মানসিক ধর্ম অভিন্ন—অপরিবর্তিত। তাহলো নতুন কিছু করা, দেশ আর জাতির জন্য নিজের সর্বস্বটুকু পণ করা। তবু কালে কালে তারুণ্যের প্রকাশধর্ম হয় ভিন্ন। যেমন ইয়ং বেঙ্গল, পরবর্তী কালের বিপ্লবী আর স্বাধীনতা সংগ্রামী তরুণ এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের তরুণদের সজীবতার প্রকাশ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। কিন্তু এ দশকের শুরুতেই এবং দেশে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী জরুরী অবস্থা ঘোষণায় দেশের তরুণসমাজ দেশ ও জাতির প্রগতির সংকল্পে যে ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন নজির।

যুবকদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত—দেশের জন্য জাতির জন্য তাদের কর্তব্য

আজকের তরুণ

শিশির ভট্টাচার্য

আত্মত্যাগ প্রয়োজন সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বারবার তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন। বিশদফা কর্মসূচী দেশের প্রগতির মূল-চাবিকাঠি বলে প্রধানমন্ত্রী যুবকদের এই কর্মসূচী রূপায়ণে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এজন্য প্রথমে প্রতিটি যুবককে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাগ্রহণের এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রামের লোকদের মধ্যে স্বদেশ চিন্তা এবং দেশের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার জন্য তিনি ছাত্রদের গ্রামে যাবার উপদেশ দিয়েছেন। এরফলে যেমন শহরের যুবকদের সঙ্গে গ্রামের যুবকদের ভাবনাগত ঐক্য ঘটবে তেমনি গ্রামের সাধারণ মানুষ শিক্ষিত যুবকদের সংস্পর্শে এসে অর্জন করতে পারবেন জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলায় যুবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। গ্রামের লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, নারীদের সমাজে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া এবং পণপ্রথার মতো সমাজের কু-প্রথাগুলি ধ্বংস করার ব্যাপারেও যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। দেশের সাধারণ মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্বও যুব সমাজকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোকসংস্কৃতি-কৃষ্টি রক্ষার ব্যাপারেও এঁদের ভূমিকা সর্বাধিক।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের একভাগ হলো তরুণ। আর শিক্ষিত যুবসমাজের এক বিরাট অংশ হলো জাতীয় সেবাপ্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবী। দেশে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে এই সেবাপ্রকল্পের ইউনিট। এই ইউনিটগুলির মোট স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা প্রায় দু লক্ষ। সমাজে সেবামূলক কর্মের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের যুবকযুবতীদের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। ১৯৬৯ সালে এই প্রকল্প সুরু হওয়ার পর সারা দেশের ছাত্রসমাজ 'মন্বন্তরের বিরুদ্ধে যুবসমাজ' ও 'অপরিচ্ছন্নতা ও রোগের বিরুদ্ধে যুবসমাজ' ধ্বনিতে গ্রামে গ্রামে, শহরের বস্তি অঞ্চলে এবং অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে সেবামূলক কাজ করেছে। এই সংস্থার মাধ্যমে যুবসমাজ বস্তীবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া, টীকা ও কলেরার ইনজেক্সন দেওয়া, পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় সেবাপ্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবীরা ত্রাণকার্যে অংশ নিয়েছেন। এসময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে দেশের যুবসমাজ প্রশংসনীয় ভূমিকা নেয়। দেশের ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এসময় দেশের প্রতিরক্ষা জোরদার করার জন্য বে-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। রণাঙ্গনে জওয়ানদের সহযোগিতা করার জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব যুবসমাজই কাঁধে তুলে নেয়। ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী জওয়ানদের জন্য রক্তদান করেন। এই সমাজসেবার কাজে জাতীয় সেবাপ্রকল্পের পাশাপাশি রয়েছে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী, স্কাউটস্ ও গাইডস্, নেহরু যুবকেন্দ্র এবং নানা সেবামূলক ও সমাজসংস্কারক প্রতিষ্ঠান।

দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর যুবসমাজ প্রগতির সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তুলে নিয়েছে বিশদফা কর্মসূচী রূপায়ণের গুরুদায়িত্ব। বর্তমানে যুবসমাজ রাজনৈতিক শ্লোগান আওড়ানোর চেয়ে সমাজ সংস্কারেরই অধিক আগ্রহী। দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষিত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এমন যুবসমাজ মিলিতভাবে সমাজ উন্নয়নের কাজে হাত লাগিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার হাতিডোবা গ্রামের তরুণদের কথা। পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার বাণী সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন ঐ অঞ্চলের যুবকরা। এজন্য তাঁরা ঐ অঞ্চলে সাধারণের জন্য পাঠাগার তৈরী করেছেন, গড়ে তুলেছেন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। এইসব যুবকদের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে এ-পর্যন্ত ঐ গ্রামের বেশ কিছু সংখ্যক লোক নির্বীর্য্যকরণ অস্ত্রোপচারে সম্মত হয়েছেন। শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলেই নয়—পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই যুবসমাজ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলছেন। বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প কেন্দ্রের প্রায় ১৩ হাজার যুব সৈনিক সীমিত পরিবারের চিন্তা ছড়িয়ে দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

নিরক্ষরতা এদেশের এক নিদারুণ অভিশাপ। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে শিক্ষিত যুবসমাজ গ্রামে গ্রামে ও বস্তি অঞ্চলে ন্যূনতম শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গতবছরে এজন্য পশ্চিমবঙ্গে ৩০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছেন। এরই সঙ্গে রয়েছে আরো নানা সেবাপ্রকল্পের বয়স্ক ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র যেখানে যুবকরা শিক্ষা বিস্তারের অতন্দ্র সাধনায় নিয়োজিত।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে আর চাষে প্রয়োজনীয় বর্ষণের জন্য দরকার বৃক্ষ। শহরবাসীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবুজ গাছের গুরুত্ব অনেক। এজন্য দেশের যুবসমাজ গ্রামে গ্রামে এবং শহরের ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষরোপণ করছেন। গতবছরে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সেবাপ্রকল্পের ছেলেরাই ২ হাজারেরও বেশী বৃক্ষ রোপণ করেছে। এরই সঙ্গে চেষ্টা চলছে অনাবাদী জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার। দক্ষিণ ভারতের নল্লারপালায়ামে যুবকরা প্রায় এক প্রকার অনাবাদী জমিকে কৃষিযোগ্য করে তুলেছেন। এজন্য কিছু সংখ্যক যুবক অর্থ ও স্বেচ্ছায় শ্রমদান করেছেন। ঐসব যুবক এখন পোরানবক্কুতে আরো দু-একর অনাবাদী জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারেও গ্রামবাসী এবং বস্তিবাসীকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজে যুবকরা একত্রে এগিয়ে এসেছেন। এক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গুলবার্গের প্রায় ৫০ জন যুবতী জাওয়ার্গী গ্রামে নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালী কেটে আবর্জনা পরিষ্কার করে ঐ অঞ্চলের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করে তুলেছেন। গড়ে নিয়েছেন স্থানীয় মহিলাদের জন্য শৌচাগার। এরই সঙ্গে তাঁরা তৈরী করে দিয়েছেন যাতায়াতের পথ—হরিজন বস্তিতে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিতরণ করেছেন প্রয়োজনীয় ওষুধ। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার যুবক-যুবতীরা গ্রামে গ্রামে টীকা, ইনজেকশন ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ছাড়াও গড়ে তুলেছেন স্বাস্থ্যের ভিত্তিতে আদর্শ গ্রাম। হাওড়ায় আর ২৪ পরগণা জেলায় এরকম তিনটি গ্রাম তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। এবছরে এমন ৮টি আদর্শ গ্রাম তৈরির পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী ঘোষিত আদর্শগ্রামে প্রত্যেকের টীকা এবং কলেরার ইনজেকশন নেওয়া থাকবে। গ্রামবাসীরা ছোঁয়াচে সব রকম রোগ থেকে মুক্ত হবেন। আর ঐ গ্রামের পরিবেশ হবে পরিচ্ছন্ন। এই সব গ্রাম হবে ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং বসন্তরোগমুক্ত।

দেশের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কাজেও সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিয়েছেন দেশের যুবসমাজ। দরিদ্র কৃষকদের ব্যাঙ্কের ঋণ পাইয়ে দেওয়া—ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনে সহায়তা করা বেগার ও দাসপ্রথার উচ্ছেদ করা এবং সমবায় কৃষিসংস্থা ও উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রচার করার কাজে যুবসমাজের ভূমিকা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেদিনীপুরে একটি কলেজে গড়ে তোলা হয়েছে কৃষি কেন্দ্র। এইসব কলেজের ফাঁকা জমিতে চাষ করা হচ্ছে সূর্যমুখী। ছাত্র-ছাত্রীরা এইসব কেন্দ্রে উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা পেয়ে শিক্ষিত করে তুলছেন গ্রামের কৃষকদের। এছাড়া গ্রামের মানুষদের সঞ্চয়ে উৎসাহী করার জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের জন্য প্রচার কাজেও যুবকরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনটি ব্লকে এধরণের সঞ্চয় প্রকল্প গড়ে তুলেছেন জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবীরা।

যে জাতির ইতিহাস নেই সেজাতি কোনদিনই উন্নতি করতে পারেনা। এজন্য দেশের ঐতিহাসিক কীর্তিগুলি রক্ষার জন্যও যুবসমাজ এগিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের পুরাকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণে পুরাকীর্তি দপ্তরের সঙ্গে সহায়তা করছেন যুবসমাজ। পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে যুবসমাজ ইতিমধ্যেই পুরাকীর্তি রক্ষার কাজ সুরু করেছেন।

শুধুমাত্র সেবাপ্রকল্পের যুবকরাই নয় যুবকদের রাজনৈতিক সংস্থাও দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছে। এপ্রসঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের যুব শাখার সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী উল্লেখযোগ্য। ঐ শর্তানুযায়ী ঐ রাজনৈতিকদলের যুব-সদস্যরা বিবাহে পণ নিতে পারবেন না, পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা অবশ্যই মেনে চলবেন। কোন রকম জাতিভেদ স্বীকার করবেননা—নিরক্ষরতা দূরীকরণে সব-রকম সহায়তা করবেন।

এই যুবসংস্থাটি দেশে বিবাহে পণপ্রথা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচার চালাতে শুরু করেছেন। পণ প্রথা যে শুধুমাত্র নিরক্ষর ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই রাজনৈতিক সংস্থাটির একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলে। তিনি জানালেন ইতিমধ্যেই একজন এ্যাডভোকেটের পুত্রবধূর চিঠি তাঁরা পেয়েছেন। বিবাহে ঠিক মতো পণ না দেওয়ায় শ্বশুর নানাভাবে অত্যাচার করছেন বলে পুত্রবধূটি অভিযোগ করেছেন।

এই রাজনৈতিক সংস্থার যুবশাখাটি সম্প্রতি কলকাতা সাফাইয়ের অভিযান শুরু করেছেন। ধ্বনি রেখেছেন 'নিজের মহল্লা নিজে পরিষ্কার রাখ'। এজন্য রাস্তায় ডাষ্টবিন ও লিটারিন রাখার কথাও তাঁরা বিবেচনা করছেন।

সমগ্র দেশে শিক্ষা বিস্তার থেকে সুরু করে অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করা সবরকম কাজেই যুবসমাজ এখন অগ্রণী। আর প্রকৃত অর্থে দেশ গড়ার বৃহৎ কর্মকাণ্ডে যুবসমাজ বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তরুণ অধ্যাপক, তরুণ বিজ্ঞানী, তরুণ কারিগর—সমস্ত পেশায় নিয়োজিত তরুণ-রাইতো আনছেন নতুন ভাবনা।

সিনেমা

হানাদারদের মেজরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো হিংস্র শ্বাপদের মত। শেষবারের মত লোকটা জিগ্যেস করলো : বন্ধ ঘর থেকে দুটো ছেলে কোথায় পালিয়ে গেছে?

উত্তর নেই।

—জবাব দাও তোমরা। সিষ্টার আমার কথার জবাব দেবেন কিনা—কোথায় গেছে ওরা? তবু জবাব নেই। না সিস্টার—না অরফ্যানেজের ছেলেমেয়েদের।

—ইণ্ডিয়ান আর্মির ছাউনিটা কোথায়?

একই স্তব্ধতা। উত্তর দিলনা কেউ ওই রক্ত চক্ষু লোকটার প্রশ্নের।

ষ্টুডিও থেকে ষ্টুডিওয়

আচ্ছা—হুংকার দিয়ে মেজর ইংগিত করলেন অরফানেজের ছোট মেয়ে গুলমানকে একটা খুঁটির সঙ্গে বাধার জন্য। মেয়েটা আঁতকে উঠে সিস্টারকে আঁকড়ে ধরলো। ওরা ওকে জোর করে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল। বাঁধলো। বন্দিশালায় পর পর কদিন জল পায়নি মেয়েটা। নিষ্ঠুর হানাদাররা কাউকে এক ফোঁটা জল বা খাবার খেতে দেয়নি। কিছু পরেই মেয়েটা মারা গেল। সিস্টার চোখ বুজলেন 'আমেন'। কিছু পরে ওরা সিস্টারকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানের জায়গাটা বলার জন্য চাপা দেবার উদ্দেশ্যে একে একে ছেলে মেয়েদের হত্যা করতে লাগলো। মেজর গুণে যেতে লাগলো—টার্গেট নাম্বার ওয়ান। টার্গেট নাম্বার টু........ দাঁতে দাঁত চেপে সিস্টার ওদের মৃত্যুকে সহ্য করতে লাগলো শুধু এই কথা ভেবে যে তাঁদের জীবনের বিনিময়ে যদি গোটা দেশটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে বেঁচে যায় তাহলে তাই হোক।

এতেও কাজ হলনা দেখে মেজর অর্ডার দিল ফায়ার অল। স্টেনগানের আগুন আগুনের মালা গেঁথে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো অরফানেজের বাকি শিশুরা। কিছু পরে এলো ইণ্ডিয়ান আর্মি। এলেন কর্ণেল সেনগুপ্ত। কিন্তু হায় তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

নয় একটা ভাললাগার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সিস্টারের সঙ্গে। হানাদারদের মেজরের রোল করছেন উৎপল দত্ত। কালিম্পং এবং দেউলিতে ইতিমধ্যেই যে ব্যাপক আউটডোর স্যুটিং করা হয়েছে তাতে হানাদারদের সঙ্গে গাড়োয়ালী এবং নেপালীদের সংঘর্ষে বহুলোক আহত হয়। সংঘর্ষের দৃশ্য এবং কলকাতার ইনডোর স্যুটিং-এ-ও সত্যিকার বন্দুক এবং স্টেনগান ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছবির জন্য মোট খরচ পড়বে পনের লক্ষ টাকা।

পীযূষ বসুর নির্মীয়মান 'সিষ্টার' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী

ভারত সীমান্তে অবস্থিত এক পার্ব্বত্য এলাকার আট হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এক অরফানেজের সিস্টারকে কেন্দ্র করেই পীযূষ বসুর এই সম্পূর্ণ রঙীন ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। এ ছবির নাম ভূমিকার রূপারোপ করছেন সুপ্রিয়া দেবী। এটা হবে তাঁর লাইফ টাইম রোল। উত্তমকুমার এ ছবিতে ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক কর্ণেলের রোল করেছেন। কর্ণেল সেনগুপ্ত যার সঙ্গে ঠিক ভালবাসা

রবি ঘোষের নিধিরাম সর্দার ছবিতে উত্তম কুমার তিনটি ভিন্ন মানুষের চরিত্র করছেন যাদের মুখের চেহারা আলাদা, হাবভাব বাচনভঙ্গীও আলাদা। শহর থেকে মেয়ে পাচারকে কেন্দ্র করেই এ ছবির বিস্তার। অর্পণা করছেন সেই মেয়েটির রোল যাকে পাচার করার ব্যাপার নিয়ে কলকাতা শহর তোলপাড় হয়ে যায়। এক রবিনহুড স্টাইলের চরিত্র করছেন উত্তমকুমার, যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে

নানা ধরনের মেকআপ নিয়ে ডাকাতি করে ধনীদের ঘরে। তাদের সর্ব্বস্বান্ত করেই তাদের আনন্দ। উত্তম রূপারোপিত ভোলা ময়রার কাজও শেষ। পীযূষ গাঙ্গুলী পরিচালিত এ ছবিতে সুপ্রিয়া দেবীর চরিত্রটিও চ্যালেন্‌জিং। ভোলার বাল্যসঙ্গিনী কালি এবং পরবর্তী জীবনে রূপারোপিত নাচনেওয়ালী বগীর। এ ছবিতে যেমন অভিনয় তেমনি নাচ। জুন মাসে উত্তম কুমার বম্বে গিয়েছিলেন। তিনি ওখানে এফ. সি. মেহেরার হিন্দী বাংলা ডাবল ভার্সান ছবিতে কাজ করবেন যা পরিচালনা করছেন আলো সরকার যিনি অতীতে চোটিসী মুলাকাত পরিচালনা করেছিলেন। রাখী এ ছবির নায়িকা। অন্যান্য গুরুত্ব-পূর্ণ চরিত্রে রূপারোপ করবেন শোলে খ্যাত আমজাদ খান, বিন্দু এবং উৎপল দত্ত। ইতিমধ্যেই এ ছবির জন্য শ্যামল মিত্রর সুরে চারটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তম বাবুর কাছ থেকে জেনেছি উনি শক্তি সামন্তকে ডাক্তার (হিন্দী বাংলা) ছবির জন্য ডেট দিয়েছেন নভেম্বরে। বম্বের একাধিক ছবিতে কাজ করার কথা হলেও তিনি একসঙ্গে বেশী ছবিতে কাজ করতে চাননা বলে আর কাউকেই ডেট দেননি।

পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্ত্তী রথযাত্রার দিন তাঁর নতুন ছবি প্রণয়-পাশার শুভ মহরৎ করলেন। এ ছবির নায়িকা হিসাবে আছেন সুচিত্রা সেন। এটা কোন রোমাণ্টিক গল্পের ছবি নয়—এর কেন্দ্রবিন্দু হবে সামাজিক-অপরাধ। এক যে ছিল দেশ-এর নায়ক—কেমিষ্ট অবনী ব্যানার্জীর তৈরী বিশেষ কেমিকেলে লাগিয়ে নেওয়া সিগারেট খাইয়ে যেসব দৃশ্যে শিল্পপতি এবং ব্যবসা-দারদের কনফেসান আদায় করছে সেই সব দৃশ্যে তাদের সেই স্বীকারোক্তিগুলোকে স্বরচিত মজার মজার কবিতায় বলিয়ে নিয়েছেন তপন সিন্‌হা। এর সঙ্গে অর্কেষ্ট্রাইজেশন করা হয়েছে।

সমীর ঘোষ

পাটের গোড়ছাল

১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মাটির নিষ্কাশন) প্রয়োজন। গুণগতমান বিচার করে দেখা গেছে, এই পদ্ধতিতে নরম করা আঁশের রঙ ও ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের হয়। এগুলি সমভাবে নরম হয় এবং আঁশ কমজোরী হয় না। নরম করা গোড়ছাল থেকে সহজে চটকলে সুতা কাটান সম্ভব। এই সুতার মান প্রচলিত পদ্ধতিতে নরম করা গোড়ছালের চেয়ে অধিক উন্নত।

এই গবেষণাগার কয়েকটি চটকলে ও পল্লী অঞ্চলে ছত্রাক-জীবাণুর বৃহদায়তন পরীক্ষা করেছেন। সেখানে গোটাপাটে ছত্রাক জীবাণু দ্রবণ ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে শক্তছালী অংশ নরমতো হয়ই উপরন্তু গোটাপাটের অন্য অংশের মান অপরিবর্তিত থাকে। সম্পূর্ণ সফল এই সব পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, শতকরা ১০-১২ ভাগ গোড়ছাল সহ আঁশে ছত্রাক-জীবাণু প্রয়োগ করলে যে মানের আঁশ পাওয়া যায় তা থেকে মিহিচটের উপযোগী সুতা তৈরি করা যায়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে গোড়ছাল নরম করতে খরচও পড়ে খুবই সামান্য।

সুতরাং পাট ও মেস্তা আঁশের মান উন্নয়নে ছত্রাক-জীবাণুর সাহায্যে শক্তছালী অংশকে নরম করা দরকার। চাষীদের মধ্যে এই পদ্ধতি প্রচলিত হ'লে পাটচাষ অপেক্ষাকৃত লাভজনক হবে এবং সংগে সংগে পাটচাষে উৎসাহ বাড়বে বেশী। এজন্য কৃষি ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ, সমবায় সমিতি এবং উন্নয়ন সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ প্রচেষ্টা সফল হলে অদূর ভবিষ্যতে এই ছত্রাক-জীবাণু পাট ও মেস্তার গোড়ছাল অথবা শক্তছালী আঁশকে নরম করতে নিশ্চিত "আদর্শ জীবাণু ঘটিত" পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সালের ২৫শে শ্রাবণ সীতাযজ্ঞ নামে একটি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন।

এই হলকর্ষণ উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য হবে: গ্রামবাংলার মানুষদের সঙ্গে নিবিড় সখ্য গড়ে তোলা। বৃক্ষরোপণ উৎসবের পরদিন ১৯২৮ সালের ১৫ই জুলাই শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদেব স্বয়ং হলচালনা করেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী কৃষি প্রশংসা পাঠ করেন। ১৯৩০ সালে ২৪শে জানুয়ারী শ্রীনিকেতন উৎসব প্রাঙ্গণের দেওয়ালে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে হলকর্ষণ উৎসবের চিত্র অঙ্কন শেষ হয়।

হলকর্ষণ উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন: 'আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলার পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা, মানব সভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষি বিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দ স্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।'

গত আটই আগষ্ট সকালে শ্রীনিকেতন আম্রকাননে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকাল বেলার বাদল আঁধার কেটে গিয়ে শ্রাবণের আকাশে রোদ ফুটে উঠেছিল। রৌদ্র-করোজ্জ্বল পরিবেশে 'ফিরে চল মাটির টানে' গানের সঙ্গে কৃষি কর্মীদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান মণ্ডপে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে হলকর্ষণ উৎসবের সূচনা। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য ক'রে বিশ্বভারতীয় উপাচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ বলেন: 'গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে পল্লীর কাছে প্রকৃতির কাছে কতটা যেতে পেরেছি তা ভেবে দেখতে হবে। গুরু-দেবের এই চিন্তা সারা দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছে।' ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গোয়ালপাড়ার কৃতি কৃষক শ্রী মিস্ত্রী মুরমু নানা রংয়ের আলপনায় সুসজ্জিত একটি নির্দিষ্ট ভূমিরেখার ওপর আনষ্ঠানিকভাবে হলচালনা করেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

'হাম দো হামারে দো' আলোচনাচক্রে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিচ্ছেন

আমরা দুজন, আমাদের দুজন

গত ১৮ই আগষ্ট কলকাতায় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তিন দিনের এক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ বলেন, কোন যুক্তির ধার যাঁরা ধারেন না অথচ ছেলেমেয়ে বাড়িয়ে যান, তাঁদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতায় সমাজ কদাপি প্রশ্রয় দিতে পারেনা। কেননা সেইসব ছেলেমেয়ের প্রতি তাঁরা নিষ্ঠুর আচরণ করেন এবং বহু সামাজিক সমস্যা তাঁরা সৃষ্টি করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনে সারা দেশে মুসলমানরা যোগ দিয়েছে। কোরাণশরিফ, হাদিস বা উলেমায় কোথাও পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে কিছু আছে বলে রাষ্ট্রপতি জানেন না। কেননা, তখনকার দিনে এসব সমস্যা ছিলনা।

তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতার আগে এই দেশে মৃত্যুহার হাজারে ৪৭ ছিল। জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার দৌলতে তা কমে ১৫ হয়েছে। কিন্তু জন্মহার সে তুলনায় কমেনি। সেইজন্য পঞ্চম পরিকল্পনা-কালে হাজারে বর্তমান ৩৫ জন্মহারকে ৩০-এ এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তা ২৫-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। তিনি বলেন, জনসাধারণকে বোঝাতে হবে, পরিবার পরিকল্পনা ব্যক্তি এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে।

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনাধন্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষঃ ষষ্ঠ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—মলয়শংকর দাশগুপ্ত

সম্পাদকের কলমে

মরমী কথা শিল্পীর দরদী লেখনীতে যাদের কথা অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে তারা সমাজের নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অবহেলিত। মানব প্রেমিক কথার কারিগর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এদের কথাই অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। এছাড়াও শরৎচন্দ্রের আরেকটি দিক ছিল—সেদিকটার কথা আমরা অনেকেই বিস্মৃত। সারা দেশ যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্দোলিত, সাহিত্যিক বলে তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। বিদেশী সরকার যখন সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছিল তখন শরৎচন্দ্র লিখলেন তাঁর বিখ্যাত 'পথের দাবী'। ফলে যা হবার তাই হল। রাজরোষে সেই বই বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করল। তা সত্ত্বেও তিনি নীরব রইলেন না।

সুদীর্ঘ দিন ধরে শরৎচন্দ্র রাজনীতির সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। হাওড়ায় থাকাকালে সাহিত্য চর্চার ফাঁকে ফাঁকে তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সংগে তিনি নীরবে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অনলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকীতে তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকৃতির সংগে সংগে আমরা স্মরণ করছি স্বদেশ প্রেমিক সেই শরৎচন্দ্রকে।

এই উপলক্ষে বুদ্ধিজীবীদের সংগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণে আসছে। স্বাধীনতা লাভের পর সমাজে মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, সাহিত্যের মধ্যে সেটা কতটা প্রতিফলিত? দেশগঠনের কাজে সাহিত্যিক ও লেখক সমাজেরও যে একটা দায়িত্ব রয়েছে সেকথাই প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দেশের অগ্রগতির পথে রয়েছে নানা বাধা। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সমাজের পুরাতন রীতি-নীতি যেটা আজকের সমাজে অচল—এই সমস্ত সামাজিক অন্তরায়গুলি দূর করতে না পারলে সমাজ পঙ্গু হয়েই থাকবে। এই বাধাগুলি দূর করে মৌলিক মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রেখে পরিবর্তিত সমাজে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাতে পারে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও লেখক সমাজ।

দেশ আজ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতিকে, ত্বরান্বিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরের নাগরিকের চাই পূর্ণ সহযোগিতা। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছি অনেকদিন। এখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার আন্দোলন সুরু হয়েছে। সেই আন্দোলনের শরিক হতে হবে সবাইকে—তবেই সফল হবে সেই আন্দোলন—এগিয়ে যাবে দেশ সমৃদ্ধির পথে।

দেশের দুঃখে শরৎচন্দ্র

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

১৮৭৬ থেকে ১৯৩৮—এই বাষট্টি বছরের আয়ু নিয়ে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত সাহিত্য-সম্রাট, তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তখন আসন্ন। কমলাকান্ত, লোকরহস্য প্রভৃতি রচনায় দেশের দুরবস্থার কথা নানাভাবে বলেছেন। ১৮৭৫-৮০'র মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের লেখাগুলি বেরুতে আরম্ভ করে। শরৎচন্দ্রের জন্মের বছর-ষোলো আগেই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বেরিয়ে গেছে। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক, আইন-কানুন ইত্যাদি আরো আগেকার ঘটনা। দেশে ব্যাপক শিক্ষার অভাব, শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে উদ্যমহীনতা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার দৈন্য ইত্যাদি পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই চলছিলই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম এবং আরো অনেকে দেশের দুঃখের চেহারা দেখেছেন এবং সে দুঃখ দূর করার উপায় ভেবেছেন, লিখেছেনও। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, জাতিভেদ মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা এবং সর্বাধিক দুঃখ পরাধীনতার গ্লানি—এই সবের মধ্য দিয়েই এগুতে হয়েছে তখনকার প্রতিভাধর লেখক, কবি, শিল্পীকেও।

তার অনেকদিন পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকান্তের' ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় যখন, সে-বইয়ের ভূমিকায় টম্‌সন সাহেব শরৎচন্দ্রের এক আত্ম-পরিচয়মূলক বিবৃতি ছাপেন—যার বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছিল ১৩৪৪ সালের 'বাতায়ন' পত্রিকায় শরৎ-স্মৃতি সংখ্যায়। সেই লেখাটির প্রথম তিনটি বাক্যেই শরৎচন্দ্রের শৈশব ও যৌবনের দুর্দশার উল্লেখ ছিল—"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। "তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তো বটেই, দেশের দুঃখের কথা এবং দেশগঠনের নানা চিন্তা তাঁর 'নারীর মূল্য' (১৩৩০), 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯২৯), 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৩৩৯), প্রভৃতি সন্দর্ভগুলিতে ছড়িয়ে আছে। 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসে বিশেষভাবে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী সন্ত্রাসবাদীদের কথাও সুপরিচিত। 'পল্লী-সমাজ' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) ইত্যাদি কাহিনীতে তিনি দেশ, সমাজ, ব্যক্তিজীবন—তিন ক্ষেত্রেই দুঃখের খুবই বাস্তব গ্রন্থিগুলি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'রামের সুমতি' কে না জানেন? 'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধে কথাসূত্রে তিনি লেখেন—"রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোনো সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করেনা। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশি আর কিছু করবার আমার নেই।"

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে কমললতা আর গহরের কথাপ্রসঙ্গে এই সংলাপটুকু মনে পড়ে:

"কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠোনে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাও না।

বৈষ্ণবী কহিল, না।"

এবং তারপর কমললতার উদ্দেশে শ্রীকান্তর এই উক্তিটি:

"কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাসা করচ না।"

একই সূত্রে মনে দেখা দেয় তাঁর 'দেনা-পাওনা'র (১৯২৩) এককড়ি, মগের-সর্দার, শিরোমণি, তারাদাস ঠাকুর, জীবানন্দ, ষোড়শী, জনার্দন রায়, নির্মল হৈম—

এবং পুরো চণ্ডীগড় গ্রামখানি। এবং সেই শেষ প্রহরের সংলাপ:

"জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমা করা ঋণ?

ষোড়শী তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, পুরুষানুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে।"

তাঁর 'বাল্যস্মৃতির' গদাধর ঠাকুরকে দেখতে পাই। সেজদাদা পঞ্চাশ-ষাট টাকা দামের একটা ল্যাম্প কিনে এনেছিলেন। কৌতূহলবশে সেটি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেই সেজদাদার ছোটভাই সেটার কাঁচের চিমনি ভেঙ্গে ফেলে, কিন্তু সমস্ত অপরাধের দায়ী হতে হয় গদাধর ঠাকুরকে। মেজদাদা, সেজদাদা সকলেই বিমুখ হয়ে নিরীহ গদাধরকে বরখাস্ত করে দেন। শরৎচন্দ্রের সেই 'স্মৃতি'র শেষ কথাগুলি এই ছিল: "কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই গরিব গদাধর ঠাকুর আমার বুকের আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের বুকের শুধু আধখানাই নয়, তাঁর সমস্ত বুক জুড়ে বিদ্যমান ছিল তাঁর স্বদেশ ও সাহিত্য। ১৩২৯ সালে 'নারায়ণ' পত্রিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অশেষ গুণগ্রাহী এই শরৎচন্দ্রই মহাত্মা গান্ধীর চৌরিচৌরার পরবর্তী আন্দোলন-প্রত্যাহার প্রসঙ্গে লেখেন—"সিন্ধু হইতে, আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকালবিলম্বে দিল্লীর নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিলনা। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, I have lost all fear of man—জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করিনা—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন।" দেশের নেতাকে দেশের দুঃখ দূর করার তপস্যায় মগ্ন থাকতে হয়—এবং দেশগঠনের যথার্থ উদ্যম পরিণামে কাজে, ব্যবহারে, নিয়োগে উত্তীর্ণ হ'য়ে সার্থক হয়। তাঁর এই বিশ্বাসই তিনি তাঁর 'মহাত্মাজী' নামে সেই নিবন্ধে লেখেন। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না—বিবেকানন্দের এই উক্তিরই উদাহরণ দেখেছিলেন তিনি গান্ধীজীর মধ্যে। তাঁর এই মন্তব্যটি তাই স্মরণীয়:

"কোন দেশ যখন স্বাধীন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেশাত্মবোধের সমস্যাও খুব জটিল হয়না, স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয়না। দেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয়তো চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে তখন ঢিলা-ঢালা কর্তব্যের আর অবকাশ থাকেনা। তখন এই দুর্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতায় অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয়, —কাজে, চালাকির মারপ্যাচে নয় —সরল সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়,—সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিতে হয়।"

রাজনীতি, সমাজসেবা, পল্লী-উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় তাঁর আগ্রহ প্রবাহিত হয়েছিল। সংস্কার ও প্রগতির দায়িত্ব তিনি মননগুণে মেনেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতায় সেসব বিচিত্র রচনায় পরিণতও হয়েছে। তবে গঠনের জন্যেই ধৈর্য দরকার, যুগান্তরে পৌঁছোবার জন্যেই সহিষ্ণুতা চাই—এ বিশ্বাসও তাঁর বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে মানুষকে তিনরকম শাসন পাস মেনে চলতে হয় একথা তাঁরই কথা, "প্রথম রাজ-শাসন দ্বিতীয় নৈতিক শাসন এবং তৃতীয় যাহাকে দেশাচার কহে তাহারই শাসন।" তিনি এই তিন পাসকেই মেনেছেন, মানতে বলেছেন। তবে 'রাজার আইন রাজা দেখিবেন সে আমার বক্তব্য নয়।" কিন্তু সামাজিক আইনে ভুলচুক সংশোধন করার, গঠনমূলক কর্তব্য তিনি সর্বদাই মেনেছেন। এবং বারবার যথোচিত ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করতে ভোলেন নি। মানুষের প্রতি অসীম মমতাই তাঁর পাথেয় ছিল এবং মানব সম্পর্কের সমুচিত বোঝাপড়ার দিকে কোনো ক্লান্তি তিনি বরদাস্ত করতে নারাজ ছিলেন। দেশের দুঃখ এবং ভবিষ্যতের প্রগতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ এই চিন্তাটুকু এখানে এই সূত্রে তুলে দেখা যায়—

"সেই সময়ের বাঙলা দেশের সহস্র প্রকার অসঙ্গত অমূলক ও অবোধ্য দেশাচারে বিভক্ত হইয়া কয়েকজন মহৎপ্রাণ মহাত্মা এই অন্যায়রাশির (অর্থাৎ উনিশ শতকের গোঁড়া হিন্দুসমাজের কোনো কোনো আচারের) আমূল সংস্কারের তীব্র আকাংখায়, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত করিয়া নিজেদের এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা নিজেদের যদি বা কাজে লাগিয়া থাকে, দেশের কোনো কাজেই লাগিল না। দেশ তাঁহাদের বিদ্রোহী ম্লেচ্ছ বলিয়া ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান মনে করিতে লাগিল।"

না, শরৎচন্দ্রকে যতোটা ব্রাহ্মবিদ্বেষী মনে করা হয়, তিনি তা ছিলেন না। তাঁকে যতো বিপ্লবী-ঘেঁষা মনে করা হয়, তাও তিনি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন সংস্কার, চেয়েছিলেন গঠন, চেয়েছিলেন প্রগতি। এবং রসসাহিত্যের বাহনে সেই স্বাক্ষরই তিনি রেখে গেছেন।

শরৎ সাহিত্যে 'অ্যালিয়েনেশন'

কার্তিক রায়

প্রত্যেক যুগেই বিচ্ছিন্নতা ছিল, এবং আছে, তবে এই বিচ্ছিন্নতার রূপ আলাদা ; শরৎচন্দ্র এই বিচ্ছিন্নতা কাটাতে চেয়েছিলেন সমাজ ও মানুষের সঙ্গে আত্মিক বোধে, কিন্তু পারেন নি ; শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতা বহু রকম, সমাজ ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, এবং ব্যক্তির নিজের বোধের ভেতরে নির্জনতা-জনিত হতাশ ও ব্যর্থতা।

মার্কসীয় পদ্ধতিতে যে অ্যালিয়েনেশন এর কথা জানি, তার সুন্দর রূপ দেখি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে। চাষী মজুর গফুর তার চাষের মধ্যেই আনন্দ পায়, এই চাষকে যে গভীর ভাবে নিবিড় করে তোলে, সে হলো তার গরু 'মহেশ'। এই মহেশ ও মাটিই জীবন, তার অস্তিত্ব। গফুরের অস্তিত্বময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই মাটি ও ষাঁড় একাত্ম ; তার আমিনাকে সে যেমন ভালোবাসে কন্যা হিসাবে, মহেশকেও সে ভালোবাসে পুত্রের মতো ; এই পুত্রের সঙ্গে মাটি এসেছে জননী হিসাবে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাকে সে পাচ্ছে না দুটো দিক থেকে ; প্রথমত সে দরিদ্র, পরের জমিতে চাষ করে সে, তার নিজের কোনো অধিকার নেই জমির ওপর, ফলে তার ভালোবাসাকে গভীর-ভাবে অনুভব করতে পারছে না। তার, কাজের সঙ্গে তার ভালোবাসা মিলছে না, তার শ্রমকে কিনে নিচ্ছে জমিদার। শ্রমের মূল্যে সে নিজেকে যেমন পরিতৃপ্ত করতে পারছে না, তেমনি নিজের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বলে জমির ওপর ভালোবাসাও সে ন্যস্ত করতে পারছে না। সে উদ্বৃত্ত মূল্যের যন্ত্রমাত্র, এই উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ করে সামন্ততান্ত্রিক প্রভু—যে প্রভু বিনাশ্রমে এই মূল্য লাভ করে বিলাশ ব্যসনে জীবন যাপন করে। তার ভোগের মধ্যে কল্পনা ও মিথ্যা রয়েছে, আর গফুর বাস্তব থেকে শোষণে মিথ্যায় উঠছে। দ্বিতীয়ত, সে মুসলমান, অথচ তার ষাঁড়ের নাম রেখেছে "মহেশ", হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় দেবতা, এই দেবতা মধ্যযুগে চাষ করেছিলেন ; সুতরাং এখানে আরেক বিরোধ, এবং এই বিরোধ আরো তীব্র। সে মুসলমান, কিন্তু জমিদার হিন্দু ব্রাহ্মণ, জমিদারের চেয়েও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অধিকার বেশি, এই পুরোহিত সম্প্রদায় চালকলা দিয়ে বুভুক্ষু মহেশকে তৃপ্ত করতে পারে না, কিন্তু না খেয়ে আছে বলে গফুরকে তিরস্কার করে, কেননা হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে, প্রাণীহত্যা ঈশ্বর হত্যার নামান্তর। কিন্তু মানুষ যে চেতনায় আরো বড়ো প্রাণী, তাকে মারলে যে হত্যা করা হয়, এই বোধ কারুর নেই। এই দারিদ্র্য, ধর্মবিরোধ এবং শোষণ অত্যাচার শেষ পর্যন্ত গফুরকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। গফুর মহেশকে বিক্রি করতে গেছে এবং রাগের বশে মহেশকে হত্যা করেছে সে, মহেশকে হত্যা মানে নিজেকেই হত্যা করেছে, তার ভালোবাসা ও অভিজ্ঞতাকেই হত্যা করেছে সে।
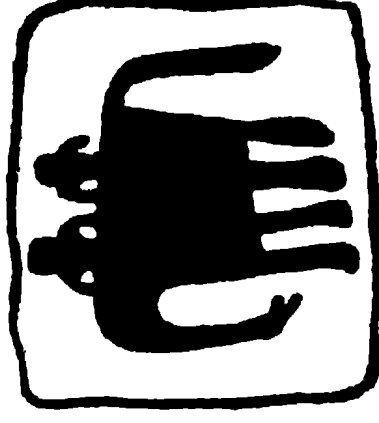
এই ভালোবাসা ও অভিজ্ঞতাকে হত্যা করে সে বস্তু হয়ে উঠেছে, তার সত্তা হারিয়ে গেছে, এই সত্তাহীন বস্তু হয়ে, জমি ছেড়ে শহরের মজুর হতে চলেছে রাত্রির অন্ধকারে আমিনার হাত ধরে। শোষণে কৃষিজীবী ও মজুর কিভাবে শিল্পের শিকার হয়, তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন শরৎচন্দ্র এই গল্পের শেষে। চাষী যখন শহরে মজুর হয়, তখন সে নির্বাসিত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। নিজেকে সে কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না। এমনিভাবে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন মানুষ কিভাবে পণ্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত পণ্য বস্তুকে আর তখন মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যে এই গল্পটি যুগান্তকারী। তিনি মার্কস পড়েছিলেন বলে জানিনা, হয়তো নজরুলের সান্নিধ্যে এসে এই জাতীয় মনোভাব পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাংলা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ছবির এতো স্পষ্টরূপ কারো লেখায় এর আগে ধরা পড়েনি। গফুরের কাছে সমাজ ও অর্থনীতি এক নিয়তি, ভগবান-তুল্য, একে সে পূজোও করতে পারে না, গ্রহণও করতে পারে না। তাই এই গল্পের ধারা পরবর্তী কালের সমাজ সচেতন সব লেখকের ওপর পড়েছে। শঙ্করের 'চৈতালি ঘূর্ণি' এই সমস্যার ওপরই রচিত। 'গঞ্জগ্রাম' ও 'গণদেবতা' উপন্যাসে অনিরুদ্ধ কামারের কাহিনীতে এই ছায়াই বিস্তারিত হয়েছে। গোপাল হালদারের গল্পে এই ধারাই রক্ষিত।

সমরেশ বসুর প্রথম পর্বের গল্পে চাষীর জীবনের এই রূপই পাই। বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার বদল হলেও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণী শক্তির পরিবর্তন তেমন হয় নি, সুতরাং মূল সমস্যা রয়ে গেছে, রূপ পাল্টেছে একটু।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে বিচ্ছিন্নতার অন্য রকম সমস্যা। অভাগী নিম্নবর্ণের হিন্দু, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে তার বিরোধ বিবাহে ও মৃত্যুতে, নিম্নবর্ণের হিন্দু হয়েও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আদর্শকে সে পূজা করে, তাকে পেতে চায়, কিন্তু পায় না, ফলে তার আদর্শ ও আকাংখার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ বাধছে, অথচ মানুষ হিসাবে এই অধিকার বোধও তার আছে, কিন্তু সমাজের রীতি, সংস্কার ও অর্থনৈতিক কাঠামো এমন যে অভাগী কখনই তার আদর্শকে বাস্তবে লাভ করতে পারেনি।

রাজলক্ষ্মী চরিত্রে বিচ্ছিন্নতাবোধ এসেছে সমাজ থেকে। রাজলক্ষ্মী সমাজের সঙ্গে এক হতে চায়, পারে না, সমাজ থেকে মুক্ত হয়ে প্রেমকে গ্রহণ করতে চায়, সেখানেও সে অসমর্থ। বাইজী জীবন সে গ্রহণ করেছে, কিন্তু বাইজীর কাজের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের যোগ নেই, সে মাতা হতে চায়, কিন্তু সমাজ তাকে মা হতে দেয় নি, আর সে মা হতেও পারে না, প্রেম এসে মায়ের মুখে ছায়া ফেলে। অথবা মা এসে প্রেমের হৃদয়ে মেঘ এনে দেয়। বাইজীকে সে ছাড়তে চায়, অথচ জীবিকার জন্যে ত্যাগ করতে পারে না, তাই বাইজী জীবনের ছায়া মা ও প্রেমিকার বুকের স্তনের মাঝখানে বসে চোখ ওল্টায়। সে ভালোবাসে শ্রীকান্তকে, কিন্তু বিধবা বলে সমাজ সংস্কার তাকে বাধা দেয়, অথচ বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও সে বাস করতে পারে নি। সমাজ সংস্কার তার কাছে নিয়তি এবং ভগবান, একে সে দেখে না, তবু এর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সে অস্বীকার করতে পারে না কখনো তার জীবনে। এই অদৃশ্য শক্তি রাজলক্ষ্মীর রক্তে ঢুকে পড়েছে, সমাজের ভয়ে ও অত্যাচারেই সমাজ থেকে বাইরে, অথচ সমাজে প্রবেশ করবার জন্যে তার গভীর আকুলতা। দীঘি কাটিয়ে, গরিবের ছেলের পড়াশোনার জন্য সে পয়সা জোগায়, এবং আরও জনহিতকর কার্য করে, তবু মন পায় না, সমাজধ্বজীরা তাকে অত্যাচার করে। এই অদৃশ্য সমাজশক্তির সঙ্গে সঙ্গে লড়াই হলো রাজলক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব। এই সমাজ শক্তি তাকে খেতে দিতে পারেনা, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম, বিয়ের রাত্রে কুলীন স্বামী যখন তাদের দু'বোনকে ফেলে চলে যায়, সমাজ তখন নির্বিকার। তাদের গ্রাসাচ্ছাদন কিভাবে হবে, তাও ভাবে না, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে যখন সে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তখন সমাজ তাকে পীড়ন করেছে, এবং এই পীড়ন শুধু সমাজ ও জীবিকার ব্যবধান থেকে আসেনি, রাজলক্ষ্মীর প্রেম ভালোবাসা ও মাতৃত্বের মধ্যেও বিরোধ বাধিয়েছে, এর থেকে জীবনে মুক্তি পায় নি। শ্রীকান্ত খুব বড়ো করে বলেছে বটে বড়ো প্রেমের জন্যেই সে সরে দাঁড়িয়েছে, তাতে দুজনই মহান হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভালোবাসাও তো বাস্তবে মাটির ওপর দাঁড়াতে চায়, দেহতনুর পুষ্পিত পুষ্পের শোভায়। এ সত্য, শরৎচন্দ্র দেখাতে পারেন না। পারেননি, তার কারণ শ্রীকান্ত সংবেদনশীল হলেও ভীরু, তার একদিকে সমাজবোধ অন্যদিকে ব্যথাদীর্ণ মানুষের প্রতি মুক্তির আকুলতা এবং সর্বোপরি শ্রীকান্তের উদাসীনতা ও নিরাশক্তি। সে পথের নিত্যযাত্রীর মতো হেঁটে বেড়িয়েছে, পথের দু'পাশের হাসিকান্না মাখা জীবনের রঙ্গিন ছবি দেখে পুলকিত হয়েছে, কিন্তু ধরা দিতে পারে নি, এবং কমললতা যে কেন শ্রীকান্তের মন হরণ করেছে রাজলক্ষ্মীর বড়ো প্রেম বুকে নিয়েও, তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি শরৎচন্দ্র। কেননা, অন্নদা দিদির সতীত্বের আদর্শতো কমললতার জীবনেও যাচাই করতে পারা যায় নি। তাই বলছি, রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে যে বিচ্ছিন্নতার দ্বন্দ্ব আমরা লক্ষ্য করি, তা আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি। এই বিচ্ছিন্নতা পেরিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতায় ও ভালোবাসার নিজের পায়ের শক্ত মাটি পেয়েছিল শুধু একমাত্র অভয়া। শরৎচন্দ্রের অন্য অনেক চরিত্রে এই দ্বন্দ্বই আছে বিচ্ছিন্নতাজাত, কিন্তু অস্তিত্বের নিবিড়তা কোথাও পাওয়া যায় নি। হয়তো ব্যথার মধ্যেই এই বেদনার নিবিড়তা গভীর।

সমাজের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিচ্ছিন্নতা রাজলক্ষ্মীর চরিত্রকে সহনীয় করে তুলেছে, শরৎচন্দ্রের সমাজ সচেতনতা এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু অচলা চরিত্রের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব, তাও একরকম বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা সমাজ থেকে আসে নি, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে আসে নি, এসেছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ থেকে, এবং এই বিচ্ছিন্নতা সুদূরপ্রসারী। মানুষ যতোদিন বাঁচবে ততোদিন এর হাত থেকে তার রেহাই নেই। মানুষের রক্তের মধ্যেই কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নতা আছে, তার যৌন জীবনের মধ্যে আছে। অচলা একাকী বা বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজের কোনো মানুষের থেকে, তার শ্রম ও শ্রমমূল্যেরও কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু সে যাকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসিত মানুষকে হারিয়ে বা না পেয়েই সে নিঃসঙ্গ, এই নিঃসঙ্গতা থেকেই নির্জনতার আবির্ভাব। এই নির্জনতার নিঃসঙ্গতার ব্যথা অচলা চরিত্রে চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। স্বামী মহিমকে ভালো বাসলেও অচলার জীবনের যৌন মমতার মধ্যে সুরেশের দুর্দমনীয় চঞ্চলতার প্রতি কান্না লুকিয়ে ছিল। তাই মহিমের বুদ্ধি, সচেতনতা, বিচক্ষণতা, সামঞ্জস্যবোধ, হয়তো কিছুটা দারিদ্র্য অচলাকে আঘাত দিয়েছে, কিন্তু সুরেশকেও স্বামী হিসাবে গণ্য করতে পারে নি, জানিনা, বিবাহ বিচ্ছেদ নীতি চালু থাকলে অচলার সমাধান কি হতো। কিন্তু তার নিজের সঙ্গে নিজেরই যে বিরোধ, তা তার রক্তের বিরোধ। সুরেশের কাছে

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

চন্দ্রের আলোচনায় ব্যক্তি শরৎচন্দ্র

অচিন্ত্যেশ বসু

শরৎচন্দ্রের ৫৩-তম জন্মদিনে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে দেশবাসীর তরফ থেকে ১৯২৮ সালে (বাংলা ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র) যে মানপত্রটি দেওয়া হয়, তা প্রকাশিত হয় 'বাংলার কথা'য় ১৩৩৫ সালের ১লা আশ্বিন।

মানপত্রটিতে কতকগুলো কথা আছে, যা উল্লেখ না করলে বোঝা যাবেনা শরৎচন্দ্রকে দেশের মানুষ কতটা ভালোবাসতেন, অবশ্য তারা তাঁকে কতটা বুঝতে পেরেছিলেন তা স্বতন্ত্র কথা! মানপত্রটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

"তোমার ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মদিবস" উপলক্ষে তোমার জন্মভূমি দেবানন্দপুরের অধিবাসীবৃন্দ আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর সহিত মিলিত হইয়া, গর্ব ও গৌরবের সহিত, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

মহাকালের মহৎ প্রয়োজন তোমাকে দেবানন্দপুরের নিভৃত পল্লীবক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া, বিপুল পৃথিবীর বুকে বিচিত্র আনন্দ বেদনার তীব্র সংঘাতের মধ্য দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। যে জীবন সত্যের অনুসন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে, মত হইতে মতান্তরে, স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে—অবশেষে একদিন শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ করুণাধারার বঙ্গসাহিত্য-গগন প্লাবিত করিয়া অকস্মাৎ উদিত হইয়াছে—আজ মধ্যগগনে তার কী অপরূপ শোভা!

হে প্রিয়, জগতের হাটে তোমাকে হারাইয়া আবার বঙ্গবাণীর পূজাতীর্থের ঘাটে আমরা তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। বাঙ্গালীর হাসি কান্না সুখদুঃখের সংসারে অপমানিত নারীত্ব এবং অধঃপতিত পৌরুষের দুঃখ ও লজ্জাকে, হে মানব মহত্বের পুরোহিত, তুমি যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া, সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, বর্ত্তমানের গ্লানিভার তুচ্ছ করিয়া, প্রতিভার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছ, তাহার কল্যাণ সম্পদ কালের ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া রহিল। তুমি শুধু বর্ত্তমান বাঙ্গালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক নহ,—তোমার মনুষ্যত্ব রুদ্রতেজে দৃপ্ত, অথচ স্নেহে মমতার করুণ কোমল, সহানুভূতিতে নিত্যবিগলিত!

পরবর্ত্তীদিগকে তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদের চিত্তে গৌরব বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিবে, এই আশায় তোমার জন্মভূমির দীন অধিবাসীবৃন্দ "শরৎচন্দ্র পাঠাগার" স্থাপন করিয়াছে। সেই অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও সূচনা হইতেই তোমার প্রসন্ন দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইয়াছে, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

১৩৪৪ সালে শরৎচন্দ্র পরলোক গমন করেন। অর্থাৎ এই সম্বর্ধনার প্রায় নয় বছর পরে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্র জীবিতকালেই সম্বর্ধনা পেয়ে গেছেন তার স্বগ্রামে, সেইসব গ্রাম্য পরিবেশে 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ' লেখার জন্যে যেখানে একদা তাকে একঘরে হতে হয়েছিল, এবং পরে দীর্ঘদিন বিরামপুরে নিজের গ্রাম পরিত্যাগ করে তাকে থাকতে হয়েছিল, সেখানে মৃত্যুর ন বছর পূর্বে এই সম্বর্দ্ধনা প্রমাণ করে, স্থানীয় গ্রাম্য-জীবনে তার প্রতিষ্ঠা ততদিনে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। কেন এই স্থায়িত্ব? তা কি শুধুই তাৎক্ষণিক?

না। শরৎচন্দ্রের এই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছিল যা তার সম্বন্ধে জনগণের অভিমতের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, পরবর্ত্তীকালে তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে কথাসাহিত্যে মুখ্য ব্যক্তিত্বের।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে যারা এতটুকু কিছু শেখার পাননি, তারা পেয়েছেন তা তারই সাহিত্যে। একথা অস্বীকার করে কিছু লোক আনন্দ পান, তাতে তাদের তবলচিদের কাছে তারা বাহবাও পেয়ে থাকেন, কিন্তু যারা শরৎ 'সাহিত্যকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তারা ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের কাছে শেখার মত, শ্রদ্ধা করার মত যে অনেক কিছুই পান ও পেয়ে থাকেন, একথা স্বীকার করার মত তাদের সাহস কোথায়? সেটাই দুঃখজনক!

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের কাহিনীর অনেকাংশে লেখক যে কী ভীষণ তার গ্রাম্যজীবনদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার উল্লেখ করেছেন দীনবন্ধু ঘোষ তার শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুর সম্পর্কিত বক্তব্যে, "দীর্ঘ পথের ধারে আমকাঁঠালের গাছ, দরিদ্রমানুষ, পশুপাখী, গাড়ী-ঘোড়া, গঙ্গার বুকে ভাসমান নৌকা, এ সবই তার গহন মনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী।"

এমনকি কাহিনীর অনেকগুলো অংশে শরৎ জীবনের কিছু কিছু উপন্যাস গল্পের

উৎসও লেখক উল্লেখ করেছেন। কোন্ কোন্ উপন্যাসের কোন্ কোন্ অংশে কোন্ কোন্ কাহিনীতে গ্রাম্য ঘটনার ছাপ পড়েছে, তারও উল্লেখ করেছেন দীনবন্ধু বাবু।

কোথাও কোথাও তিনি ব্যক্তি শরৎ-চন্দ্রের শৈশবের উল্লেখ দেখিয়েছেন শরৎ উপন্যাসের উৎসমূলে। যেমন নীচের এই বর্ণনায় দেখি:

"আর্ত্ত মানুষের সেবা, দুঃস্থদের সাহায্য, নদীর ধারে সঙ্গিনীদের নিয়ে বৈচি ফল খাওয়া, বেহালা-বাজানো প্রভৃতি কাজে অকাজে তার অনেক সময় কাটে।"

বেশ অল্প বয়সেই বিদেশী শিক্ষার অনুভূতি, বিদেশী উপন্যাস পড়ার বা শোনার সুযোগ শরৎচন্দ্রের এসেছিল। তিনি যে ইংরেজী ভাষায়ও মোটামুটি দখল রাখতেন, তারও উল্লেখ তার বাল্যস্মৃতিতে আছে, 'সন্তোষ ঘোষের কলমে' (আনন্দ বাজার পত্রিকায়) লেখক উল্লেখ করেছিলেন কিছুদিন আগে একটি রাজনৈতিক সভায় বর্ত্তমান স্মৃতিচারক জানতে সক্ষম হয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র কী সুন্দর ইংরেজী কথাবার্তা বলতে পারতেন, এবং তার এই কথার ধরণে লেখক স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন কত বেশী বিদেশী ভাষার ও সংস্কৃতিতে শরৎচন্দ্রের কতটা দখল ছিল।

বিভিন্ন কথার উল্লেখ করে জনৈক শরৎ প্রেমিক একথাও বলেছেন, "ছাত্র-বৃত্তিতে তখন ইংরেজী পড়ানো হোতনা। তবে বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে একটু বেশি করেই পড়ানো হোত। শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাশ করার ফলে জেলাস্কুলের বাংলা অঙ্ক ইত্যাদি তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল। তাঁকে কেবল ইংরেজীই যা পড়তে হোত। ফলে সেবছরের শেষ ইংরেজী পরীক্ষায় শরৎচন্দ্র এত বেশী নম্বর পেয়েছিলেন যে, শিক্ষক মহাশয়রা তাঁকে ডবল প্রমোশন দিয়েছিলেন।"

এই উদ্ধৃতি দেয়া হল শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের কিছুটা দিক দেখাবার জন্যে। পরবর্ত্তীকালে অর্থাভাবে তার পড়াশুনো করা হয়নি এমনকি পরীক্ষার ফি মাত্র কুড়িটি টাকা জোগাড় করতে না পারায় তার এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়াও হয় নি। এই দারিদ্র্য তাকে বিক্ষুব্ধ করেছিল।

অতঃপর শরৎচন্দ্র বেরিয়ে গেলেন। পিতার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হওয়াতে একবার তিনি বেরিয়ে গেলেন, সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ালেন, শেষে পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে গ্রামে এসে ছোট বোনকে আত্মীয়ের কাছে জমা রেখে বেরোলেন ভাগ্য অন্বেষণে।

এরপর কলকাতা-রেঙ্গুন-কলকাতা করে তিনি সাহিত্য জীবনে পুরোপুরি আত্ম-নিয়োগ করলেন।

ব্যক্তিজীবনের এই কাহিনী শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আলোচনার একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে।

শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ তাঁর লেখনীতে কয়েকটি উপন্যাসের স্থানকাল পাত্র নির্বাচনে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি মানসের প্রভাবের কথাও গ্রাম্য জীবনের কাহিনীর উল্লেখ করেছেন:—

"শরৎচন্দ্রের সহচরবৃন্দ বলেছেন 'শ্রীকান্তের রাজলক্ষী'! সে তো প্রতিবেশী দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশ্রিতা বিধবা ভগ্নীর অনূঢ়া কন্যা।"

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নায়ক নীলাম্বরের পিতৃভূমি ঐ পাশের গ্রাম সপ্তগ্রামে।

'বিন্দুর ছেলে,' গল্পে যাদবের পিসতুতো বোন এলোকেশীর শ্বশুরবাড়ী ছিল উত্তরপাড়ায়।

"পণ্ডিতমশাই"-এ কৃষ্ণ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুম শমের পাঁচ বছরের সুশ্রী মেয়েটির সঙ্গে বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তার পুত্র বৃন্দাবনের সঙ্গে বিয়ে দেয়।

'শুভদা' উপন্যাসের হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ছিল যে গ্রামে তার নাম হলুদপুর।

"দেবদাস"-এর নায়িকা পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল বর্দ্ধমান জেলার হাতি পোতা গ্রামের জমিদার ভুবনমোহন চৌধুরীর সঙ্গে।

এই উদাহরণগুলি উল্লেখ করা হল ব্যক্তিজীবনের শরৎচন্দ্র ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সাযুজ্য বোঝানোর উদ্দেশ্যে। এই রকম অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করে শরৎ মানসিকতাকে দেখানো যেতে পারে।

বস্তুত পক্ষে শরৎচন্দ্র মানুষ হিসেবে যত বড় ছিলেন, সাহিত্যিক হিসেবেও ছিলেন তত বড়ই। কেননা ব্যক্তি শরৎচন্দ্র তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যকে মিশিয়ে দিয়েছেন।

এখন বিচার্য এই লেখাগুলি কি চিরন্তন নয়, তা কি সাময়িক? তার লেখায় কী সাময়িকতা সর্ব্বস্ব মানসিকতা। না। এই খানেই সমালোচকেরা ভুল করেন। কেননা তাঁরা তাকে কেবল সমাজ সংস্কারক এবং নারী মুক্তির বিদ্যাসাগরীয় উত্তর সাধক বলেই ধারণা করে যান। এই খানেই আমার প্রতিবাদ। অধ্যাপকেরা অনেকে মনে করে থাকেন শরৎচন্দ্র তথাকথিত নারীমনোরঞ্জনী সাহিত্যের জন্মই দিয়েছেন। তাদের মতে নারীবর্ধর জন্যেই শরৎচন্দ্রকে কেবলমাত্র উল্লেখ করা যায়। সত্যিই কি তাই?

ব্যক্তি শরৎ সাহিত্যিক শরতে প্রবেশ করেছে। সৃষ্টি হয়েছে শরৎ সাহিত্য।

মানবজীবনের সমস্ত বেদনাই তার মনোবীণার তন্ত্রীতে বাজনা বাজিয়ে দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে কাঙালীচরণের মা অভাগীর স্বর্গলাভের চেতনাকে যেমন অস্বীকার করা অসম্ভব, তেমনি মহেশের জন্য গফুরের প্রার্থনাকে ভুয়ো বলে নাকচ করে দেওয়া শক্ত। হরিলক্ষ্মী বা কমলা এদের দুজাতের চরিত্রেই শরৎ সাহিত্যে সমান মর্যাদা পেয়েছে।

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র : স্মৃতিচারণ

মণি বাগচি

সকাল থেকেই যেন আমাদের মফস্বল শহরটায় সাড়া পড়ে গেল।

আজ বিকেলে নবদ্বীপে আসছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন; তাঁর সঙ্গে আসছেন শরৎচন্দ্র—অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। দুজনের সম্পর্কেই আমার কৌতূহলের সীমা পরিসীমা ছিলনা। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে। আমি তখন নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র (এখনকার ক্লাস টেন)। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলায় প্রথম হওয়ার দরুণ আমি শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' উপন্যাস প্রাইজ পেয়েছিলাম। সেই আমার তাঁর লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। শুনেছিলাম অসহযোগ আন্দোলনেব যুগে দেশবন্ধুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র ঐ আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন এবং কিছুকালের জন্য তিনি কলম ফেলে চরকা ধরেছিলেন। এত বড়ো লেখক, দেশ-জোড়া নাম—তিনি আজ দেশের কাজে সর্বস্বত্যাগী দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাঙালি পাঠকের তিনি প্রিয় লেখক, এখন যেন তিনি তাদের প্রিয়তম হয়ে উঠলেন তাঁর দেশপ্রেমের জন্য। সুভাষচন্দ্র মিথ্যা বলেননি—'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের চেয়ে দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র অনেক বড়ো।'

কংগ্রেসের স্বরাজ্যদলের নির্বাচনী অভিযানে দেশবন্ধুর সঙ্গী হিসাবে শরৎচন্দ্র নবদ্বীপে এলেন। শরৎচন্দ্রের লেখা পড়েই তো চিত্তরঞ্জন এই মানবদরদী লেখকটির প্রতি অমন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র আসবেন শুনে, আমি প্রাইজ-পাওয়া বইটি সঙ্গে করে নিয়ে সভায় এসেছিলাম। উদ্দেশ্য-বইটির প্রথম পাতায় তাঁর 'অটোগ্রাফ' নেওয়া। শরৎচন্দ্রের কাছাকাছি বসবার স্থান করে নিয়েছিলাম। দেখলাম বাঙলার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিককে—বাঙালি-জীবনের ব্যথা ও বঞ্চনার কাব্যকার শরৎচন্দ্রকে। কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুলগুলি শাদা; অন্তর্ভেদী দুই চোখ, খাঁড়ার মতো নাক, যেমনটি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। সমস্ত মুখখানা যেন প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। গায়ে তসরের একটা জামা, পরনে খদ্দরের ধুতি।

কাছে এসে প্রণাম করে খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই বললাম, আপনার এই বইটা, আমি স্কুলে প্রাইজ পেয়েছি। তিনি যেন কথাটা শুনে একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, আমার বই তাহলে স্কুলে প্রাইজ দেওয়া হয়। কি চাও? বললাম, আমার এই বইটার প্রথম পাতায় দু'লাইন লিখে আপনার একটা স্বাক্ষর যদি দেন—।

আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে, হলুদ রঙের একটা পার্কার ফাউন্টেন পেন দিয়ে আমার সেই প্রাইজ-পাওয়া 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসটির প্রথম পাতায় মুক্তাক্ষরে লিখলেন: 'সত্যকে পাওয়াই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড়ো পাওয়া। কারো কৃপায় নয়, মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে তার নিজের সত্য সাধনায়। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৪।৯।২৩'। সভাতেই তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্র কলম ছেড়ে রাজনীতিকের দলে ভীড়ে পড়েছিলেন। শুনেছি, এজন্য তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার তাঁকে বলেছিলেন, এটা সাহিত্যিকের কর্তব্য নয়, শরৎ। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এটা সাহিত্যিকেরই কর্তব্য। আমি তাই কিছুদিনের জন্য কলম ছেড়ে চরকাই ধরেছি। কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র দেশজননীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন চিরকাল—রাজবন্দীদের সম্পর্কে তাঁর ছিল অপরিসীম সহানুভূতি। অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয়, অন্তরের

প্রেরণায়। কংগ্রেসের সেবায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে গ্রামে থাকতেন। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন; প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য হয়েছিলেন। নিয়মিতভাবে তিনি চরকা কাটতেন, সেই চরকার কাটা সূতা দিয়ে খদ্দর তৈরি করবার জন্য নিজের বাড়িতে ছোট একটি তাঁতশালাও বসিয়েছিলেন। একবার তাঁর হাওড়ার বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি, তিনি নিবিষ্টচিত্তে চরকা কাটছেন, তাঁতীদের কাজের তদারকি করছেন। প্রশ্ন করেছিলাম: আপনি চরকা বিশ্বাস করেন? উত্তর পেয়েছিলাম: করি—মনেপ্রাণেই করি।

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী হিসাবে শরৎচন্দ্র সর্বস্ববিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করলেন। দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। ইংরেজ-বিদ্বেষের আগুনে পরিশুদ্ধ ছিল সেই দেশপ্রেম। তিনিই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি সোজাসুজি ভারতের পরাধীনতার কারণ ইংরেজ রাজশক্তিকে ঘৃণা করেছেন; এমন কি ইংরেজের পদলেহনকারী ভারতীয়দের তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। অমৃতসরের অমানুষিক হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের দেওয়া মানের মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলে শরৎচন্দ্র সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করেছিলেন ও বলেছিলেন; 'কবি, আমাদের মুখ রেখেছেন'।

স্বাধীনতার সংগ্রামে যারাই নির্ভীক চিত্তে অংশ গ্রহণ করতেন, দেখেছি, তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে না পারলেও, শরৎচন্দ্র তাদের আরব্ধ মহৎপ্রয়াসে সর্বদা সহানুভূতি দেখাতেন।. এই ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের মনের জ্বালা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে এই একটিমাত্র উপন্যাস যার মধ্য দিয়ে নিশব্দে প্রবাহিত হয়েছে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-কামী ভারতবাসীর প্রচণ্ড ক্ষোভের গৈরিক প্রবাহ। শরৎচন্দ্রই বোধকরি বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক যিনি রাজনীতির সঙ্গে অমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং পরাধীনতার বেদনাকে এমন অগ্নিক্ষরা ভাষা দিতে পেরেছিলেন।

যেদিন শরৎচন্দ্রের কাছে সংবাদ এলো যে দেশবন্ধু ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, শুনেছি, সেদিন জলস্পর্শ করেন নি—এমনি ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। তারপর যেদিন তিনি কারামুক্ত হলেন সেদিন তিনিই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন। 'দেশবন্ধুর কারাভোগের সেই ছয়মাসই যেন আমার বুকে গুরুভার পাষাণের মতো বোধ হয়েছিল'—এই কথা তিনি একবার বলেছিলেন এই নিবন্ধ লেখককে তাঁর কলকাতার বাড়িতে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের প্রতি গভীরভাবেই আকৃষ্ট হন ও কংগ্রেসের কাজে যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে সুভাষচন্দ্রের কথামত তিনি নির্দ্বিধায় তা করেছেন। এর একটা গল্প বলি।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি ভালবেসে-ছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। বলতেন, সবাইকে ছাড়তে পারি সুভাষকে পারি না। শিবপুরে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কর্মী সন্মেলন হল। শরৎচন্দ্রের প্রিয়তম শিষ্য ও সহকর্মীরা এই সন্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। যেদিন শরৎচন্দ্রকে সন্মেলনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে কর্মীরা গেলেন সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কী একটা কাজে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি থাকতেই কর্মীরা এসে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের দলের যিনি নেতৃস্থানীয় তিনি বললেন, শরৎদা, আপনি নিশ্চয়ই যাবেন।

—আমি যাব না।

—কেন যাবেন না? হাওড়া জেলার কর্মীসন্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম?

—শুনছি ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারি না।

—আপনার সুভাষ শিব নয়, ভূত।

—ভূত নয় রে ভূত নয়, ভূতনাথ।

সেদিন শরৎচন্দ্রের যে মূর্তি দেখেছিলাম তা আমার হৃদয়ের পটে আজও আঁকা আছে।

ভারতের স্বাধীনতার কামনা তাঁর বুকে অনির্বাণ আগুনের মতই জলত—তাঁর কথাবার্তায়, লেখায় এর প্রকাশ দেখে সবাই বিস্মিত হতেন। বাংলার বিপ্লবীদেরও তিনি শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন তাদের সর্বত্যাগী দেশপ্রেমকে। তাঁর অন্যতম মাতুল প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর মুখে শুনেছি যে, অনেক বিপ্লবীকে শরৎচন্দ্র গোপনে অর্থসাহায্য করতেন। তেমনি বিদ্রোহী কবি নজরুলকে তার আগুন-ঝরানো লেখার জন্যই এত ভাল-বাসতেন। হুগলী জেলে কাজী যখন অনশন করেন, সেই সংবাদে শরৎচন্দ্রকে উদ্বেগ বোধ করতে দেখেছিলাম এবং সেই অনশন ভাঙবার জন্য অনুরোধ করতে নিজে হুগলী জেলে গিয়ে নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনুরোধেই নজরুল অনশন ভেঙেছিলেন। সেই সময়ে আমাকে একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন: 'নজরুল একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেউ আর অত বড় কবি নেই।'

মোটকথা, মানবদরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মধ্যে দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রকে তাঁর স্বদেশবাসী যেন কোন দিন বিস্মৃত না হয়।

পাড়ার ছেলেরা

বিজন কুমার ঘোষ

আমার যেন হঠাৎ বয়েস কমে গেছে। পুজোর আগে পাড়ার ছেলেরা এসে ধরতেই এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু প্রবল আপত্তি জানাল আমার স্ত্রী। স্ত্রীকে পাড়ার ছেলেরা মাসিমা ডাকে। বলে উঠল, কিছু ভাববেন না মাসিমা, চ্যাংড়াদের হঠিয়ে এবার পুজোর ভার আমরা নিয়েছি। আমাদের দলে এক জন টাক মাথা অথবা পাকা চুলের লোক দরকার। তা মেসোমশায়ের দুটোই আছে।

—টাক মাথা পাকা চুল দেখলে লোকে থলে ভরে চাঁদা দেবে নাকি?—স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল: ওনার আবার হাই প্রেসার—

—কোন অসুবিধা হবে না মাসিমা। রবিবার সকালে দু'ঘন্টার জন্য বেরোবো। মেসোমশাই শুধু সঙ্গে থাকবেন। ওকে দেখলে আমাদের সম্পর্কে লোকের আইডিয়া পালটে যাবে। থলে ঝেড়ে দিতে যাবে কেন?

কালু এবার স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু জাতীয় স্কলারশিপ পেয়েছে। বলল, ফি বছর পাড়ার চারটে করে পুজো হত। এবার একটা পুজো হবে। অলিতে গলিতে পুজো চলবে না। সবাইকে একথা বলে দিয়েছি।

চন্দন গেলবার স্কুল ফাইনালে ত্রয়োদশ স্থান দখল করেছিল। বলল, খুব সংক্ষেপে এবার পুজো সারব মেসো-মশাই। যা বাঁচবে তার অর্ধেক দেওয়া হবে বন্যা ত্রাণ তহবিলে, বাকীটা দিয়ে পাড়ার একটা লাইব্রেরী গড়ে তোলা হবে।

ডাক্তার বলেছে, প্রেসারের রোগীদের সব সময় মন প্রফুল্ল রাখা উচিত। আমার প্রফুল্লতা সারা মুখ ছাপিয়ে গেল। সত্যি, পাড়ায় এত ভাল ভাল ছেলে আছে জানতাম না তো।

ছেলেবেলাটা পাড়াগাঁয়ে কেটেছে। চাঁদা তোলার অভিজ্ঞতা সেখানে ছিল না। তবে এখানে আমার করণীয় তো কিছুই নেই, শুধু সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা ছাড়া। মা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।

বিশাল বাড়ি। গেটে লেখা আছে, কুকুর হইতে সাবধান। ছেলেরা কড়া নাড়তেই সিল্কের লুঙ্গী, চটি জুতো পায় এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

—কি চাই?

—পুজোর চাঁদা। —এই বলে গোবিন্দ একখানা বিল হাতে ধরিয়ে দিল।

বিলে একবার চোখ বুলিয়েই উনি হঠাৎ ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠলেন।—
—ইয়াকি পেয়েছ, বদমায়েসের দল? পাঁচশো টাক চাঁদা! পুলিশে খবর দেব তা জানো।

এই রে, আমার না প্রেসার বেড়ে যায়। পাঁচ শো টাকা চাঁদা তো কখনো শুনিনি। সত্যি, এটা অন্যায়। খুব শান্ত গলায় গোবিন্দ জবাব দিল, আপনি কষ্ট করবেন কেন, আমরাই পুলিশে খবর দেব। ইনকাম ট্যাক্সের ইন্‌স্‌পেক্টার আপনি, কেটে কুটে পান সাড়ে আটশো টাকা। তা এত বড় বাড়িটা করলেন কি করে? আপনার তো করা উচিত গোল পার্কে। সেখানে বাড়ি না করে নগেন ঘোষ লেনে এলেন নজরে পড়ার ভয়ে? সব জানি।

ভেবেছিলাম, এ কথা শুনে উনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। আশ্চর্য, সে সব কিছুই হল না। শুধু বললেন, আহা, একটুতেই মাথা গরম করলে চলে? আমরা এক পাড়ায় বাস করি। নিশ্চয়ই দেব, পাড়ার পুজো বলে কথা! তার আগে একটু চা হয়ে যাক—।

দ্বিতীয় বাড়িটা বড়, কিন্তু সেকেলে ধরনের। বাড়ির মালিক পঞ্চাশের কাছা-কাছি। যেমন কালো, তেমনি মোটা। বিল পেয়ে অত বড় শরীরটা মিনিট খানেক ধরে কাঁপল। তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন, গত বারও পাঁচ টাকা দিয়েছি, এবার পাঁচশো টাকা। মামদো বাজি? এক পয়সাও দেব না। গেট আউট—

—আহা, অত চটে যাচ্ছেন কেন?

—আই সে, গেট আউট। আভি নিকালো—

—তা যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন আপনার একটা রেশন শপ আছে—

—তাতে কি হয়েছে। আমি খেটে খাই। তোমাদের মত গুণ্ডামী করে চাঁদা তুলে আমার চলে না। বাঃ, দলে একটা ওল্ড ফুলও আছে দেখছি!

আমি ততক্ষণে ঘেমে উঠেছি। একি ফ্যাসাদে পড়লাম রে বাবা!

—আহা, কথাটা শেষ করতেই দিন—পরিমল খুব মোলায়েম গলায় বলল: সেই রেশন দোকানে সাড়ে তিনশো ফল্‌স কার্ড আছে। ফি সপ্তাহে সাড়ে তিনশো কার্ডের চাল, গম, চিনি, সুজি, ময়দা ব্ল্যাকে বিক্রী করেন। গভর্ণমেণ্ট এসব খুব ধরছে, তাও জানেন আশা করি।

ফোলা বেলুনে যেন পিন ফোটানো হল। উনি বিগলিত হাসি হেসে বললেন, আরে ওসব ভুল প্রচার। জানো তো এপাড়ায় আমার অনেক শত্রু। আর তোমরাও হলে সরল প্রকৃতির, তাই বিশ্বাস করেছ। তা কত হলে পুজোটা হয় বল না?

—আমাদের পাঁচশো টাকাই লাগবে।

বেলা বেশ চড়ে উঠেছে। এবার যে বাড়িতে গেলাম সেখানে একেবারে উলটো দৃশ্য। বিছানার ওপর বছর দশেকের একটি ছেলে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মা বাবার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। পাড়ায় এঁরা নতুন এসেছে। খুব বেশি চেনা জানা হয়নি। গোবিন্দ এগিয়ে গেল, ডাক্তার ডেকেছেন? কি হয়েছে?

ভদ্রলোক কেটলি করে মাথায় জল ঢালছিলেন। ফিরে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু আসতে চাইলেন না, অনেক বার ডেকেছি।

গোবিন্দ বলল, চন্দন, যা তো ডাক্তারকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়। আমার কথা বলবি।

কথায় কথায় অনেক কিছু জানা গেল। ভদ্রলোক যে কারখানায় কাজ করেন, সেখানে চার মাস লক আউট চলছে। সুতরাং ভিজিট না পেলে ডাক্তার আসবেন কেন? কিন্তু এবার এলেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললেন, টাইফয়েড। প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশও দিলেন। গোবিন্দ ভদ্রলোককে চাঁদার এ্যাকাউণ্ট থেকে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলল, ফলটল আর যা দরকার কিনে আনুন। প্রেস-ক্রিপ্‌সনটা নিয়ে যাচ্ছি। ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেব। কোন চিন্তা করবেন না।..

হঠাৎ কড়া নাড়ার তীব্র ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঘুমটা আচমকা ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলতেই এক পাল ছেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।—বড়দা চাঁদাটা? আমরা পঞ্চাননতলা থেকে এসেছি।

—কিসের পুজো? এখন তো কোন পুজো নেই।

—সে কি, কার্তিক পুজো কি পঞ্জিকা থেকে হাওয়া হয়ে গেল!

—না ভাই, কার্ত্তিক পুজোর চাঁদা দিতে পারব না।

সরু প্যাণ্ট, ব্লাউজ গায়ে দেওয়া চোয়াড়ে একটা ছেলে এগিয়ে এল, মাইরি হিন্দুর সন্তান হয়ে কি করে বললেন চাঁদা দেব না। লে হালুয়া—

আর এক জন বলল, বাজে বকিস নি, বিলটা ফেলে দিয়ে বল্‌, কাল বিকেলে আসব, টাকা যেন রেডি থাকে। না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে—

ওরা চলে যেতেই স্ত্রী বলল, কেন শুধু শুধু তর্ক করতে যাও। তোমার হাই প্রেসার জানো না?

—কিন্তু মাসের শেষ, দশ টাকা চাঁদার জন্যে কি আমি পকেট মারব লোকের?

স্ত্রী কোন উত্তর দিল না। আমার এখনও যেন ঘোর কাটেনি। ভাবছিলাম, দেবদূতের মত ছেলেরা কোথায় গেল? আহা, স্বপ্ন বাস্তব হয় না!

শরৎ সাহিত্যে অ্যালিয়েনেশন

৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেহ দিয়ে মহিমের কাছে ফিরে আসাই তার জীবনের এই নির্জন নিঃসঙ্গতাই তীব্র হচ্ছে। এই আধুনিকতার সমস্যা শরৎচন্দ্র অন্য কোনো গল্পে দেখাতে পারেনি।

মানুষের হৃদয়কে তিনি অনন্তভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন, এই অনন্তের অনুভব যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেইখানেই শরৎচন্দ্রের নরনারীরা দ্বন্দ্বে মথিত হয়েছে বারবার। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন নারী বেশ্যা হয় রক্তের উন্মাদনায় নয়, সমাজের অত্যাচারে ও অর্থনৈতিক চাপে। এবং আমাদের বিচ্ছিন্নতা তৈরি যে অবচেতন ও চেতন মনের দ্বন্দ্বে, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত ও অচলার মধ্যে তারই রূপ লক্ষ্য করি। শরৎচন্দ্র মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারে অনুভবের আলোর জ্যোতি এনেছেন, সেই জ্যোতিতে দেখিয়েছেন বেদনার মণিভা। শ্মশানের অন্ধকার যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি মানুষের জীবনের শ্মশানের অন্ধকারের মধ্যেও বেদনার অসীমতার আলো লক্ষ্য করে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়েছেন। এখানেই শরৎচন্দ্র মানবিক, মনুষ্যত্ববোধের উদ্‌গাতা।

পরবর্তীকালে এই বোধগুলি কম বেশি শরৎচন্দ্রের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। অচলা আজকে সচল হলেও তার মনের মধ্যে দেহ ও আত্মার যে বিরোধ, সেই বিরোধ অতিক্রম করে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি, কেননা মোহিনী আমাদের নিজের দেশের মেয়ে নয়।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

অজিত পাঁজা*

এই বছরটি আমাদের দেশে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার কর্ম্মসূচীর ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনাকে জাতীয় উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে এই কর্ম্মসূচীর গুরুত্ব আরও অনেক বেশী বাড়ানো হয়েছে এবং ক্রমশই আমরা উপলব্ধি করেছি যে বিপুল অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও পরিকল্পনার সাফল্য যদি প্রতিটি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হয় তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একান্তই প্রয়োজন। কারণ যা কিছু উৎপাদন বাড়ছে তা বাড়তি জনসংখ্যা যার সংখ্যা হ'ল বছরে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ, যা আবার কিনা গোটা অষ্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান, তাদের চাহিদা মেটাতে মেটাতেই ফুরিয়ে যাচ্ছে—জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও সুনিশ্চিত ও দৃঢ় পদক্ষেপ দরকার।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই বছরের এপ্রিল মাসে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষিত হ'ল। ঘোষণা করলেন আমাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ করণ সিং। এই জাতীয় জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেককে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হ'ল অন্যদিকে এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যাতে সমষ্টিগতভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্যগুলি পরিবার পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী গ্রহণ করতে আরও বেশী উদ্যোগ নিতে পারে। আর এসবের ওপর পরিবার পরিকল্পনা হ'ল প্রত্যেকটি নাগরিকের এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জাতীয় কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার ও ডঃ করণ সিংয়ের যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা বৃহত্তর অর্থে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার প্রসারে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির সিদ্ধান্তগুলি সুদূর প্রসারী সাফল্য নিয়ে আসবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষভাবে তৎপর হয়েছি, এই রাজ্যে এই নীতির সফল রূপায়ণে। গতবছর থেকেই সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষ এবং নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতার সাহায্যে এই পরিকল্পনা এই রাজ্যে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা আমরা গত বছরে অতিক্রম করতে সক্ষম হই। এবছরে জাতীয় নামক অস্ত্রটিকে হাতে নিয়ে জন-সংখ্যাবৃদ্ধির হারের বিরুদ্ধে এক সর্ব্বাঙ্গীণ যুদ্ধ আমরা ঘোষণা করেছি। আমাদের সঙ্গে এবারে আছেন রাজ্যের সমস্ত দপ্তর, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, এবং অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের ও শহরাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী। বস্তুত পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার কাজে এমন বিপুল সাড়া এর আগে আর কখনই পাওয়া যায়নি। আর এইজন্যই মাত্র পাঁচমাসের ভেতরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই রাজ্যের জন্য স্থিরীকৃত সারা বছরের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছি। শুধু তাই নয় শুধুমাত্র এই পাঁচমাসেই পরিবার কল্যাণ পরি-কল্পনার কর্ম্মসূচী আগেকার সমস্ত বৎসরের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। যে সমস্ত কর্মীদের নিরলস প্রয়াসের ফলে এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে সমস্ত রাজ্য আজ তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আমি তাদের জন্য গর্ব্বিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্থির করা লক্ষ্য-মাত্রা অতিক্রম করাটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য জন্ম-হারকে হাজার প্রতি ৩৬ থেকে যতশীঘ্র সম্ভব ২৫-এ নামিয়ে আনতে চাই—যার জন্য আরও বিপুল কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন—আমরা এই মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমাদের রাজ্যের নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছি এবছরে ১১ লক্ষ ষ্টেরিলাইজেশন অপারেশন এবং আমরা সুনিশ্চিত যে এই লক্ষ্যমাত্রা আমরা অতিক্রম করবই। পর্য্যায়ক্রমে আগামী বছরগুলিতে আমরা ধীরে ধীরে এই লক্ষ্যমাত্রা এমনভাবে স্থির করব যাতে অচিরেই আমরা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি। ৭৭ লক্ষ যোগ্য দম্পতির মধ্যে আজ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ দম্পতি পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার আওতায় এসেছেন। আমাদের এপর্য্যন্ত কাজের ফলে প্রায় ৪০ লক্ষ জন্মরোধ করাও সম্ভব হচ্ছে। তথাপি এই বিপুল সমস্যার সামনে এই সমস্ত উৎসাহব্যঞ্জক পরিসংখ্যান নিয়ে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাই আমরা একদিকে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার কর্ম্মোদ্যোগকে বিভিন্ন দিক থেকে বাড়িয়ে চলেছি—অন্যদিকে আবার জাতীয় জনসংখ্যা নীতি অনুযায়ী একটি রাজ্য নীতিও গ্রহণ করেছি যার বিভিন্ন ধারার মূল কথা হ'ল ছোট পরিবারের আদর্শ গ্রহণ করতে জনসাধারণকে আরও বেশী উৎসাহিত করা এবং পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী বাড়ানো।

আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে জনসংখ্যার বৃদ্ধির উচ্চহার এক বিশেষ চ্যালেঞ্জ স্বরূপ—আমাদের দেশের সকল

---

* পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী

নাগরিককে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই হবে। আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচী যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়ে থাকে তবে সেই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে গেলে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করতেই হবে। আজ আর শুধু বিশদফা নয়—বিশেষ কারণে ও যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই এই কর্মসূচী আজ 'চব্বিশদফা' আর তাতেই স্থান পেয়েছে 'পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা' এক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে।

আসুন আমরা সবাই এই জাতীয় আন্দোলনে সামিল হই। বন্দে মাতরম

আগামী সংখ্যায়

শারদোৎসব উপলক্ষে এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

শক্তিসাধনা ও স্বাদেশিকতা
ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

পুজো নিয়ে একটু আধটু
হিমানীশ গোস্বামী

ঊনিশ শতকের বাংলা কবিতায় দুর্গা
স্নেহময় সিংহরায়

কুমোর পাড়ায় ব্যস্ত সবাই

গল্প লিখছেন
কবিতা সিংহ

বিদ্রোহী কবি নজরুল স্মরণে বিশেষ রচনাঃ

কবি নজরুল ইসলাম
ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল
মিত্র

এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
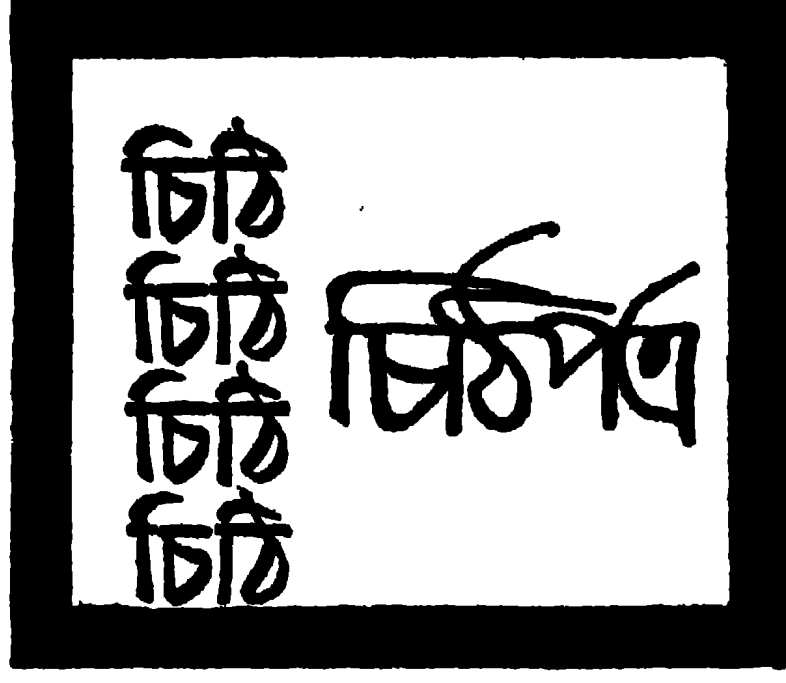
মহাশয়,

একটু আগে-ভাগে বাড়ী ফেরার-ইচ্ছায় ষ্টেশন প্লাটফরমের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা মানুষের ভীড় বাঁচিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের এক বুকষ্টলে সাজিয়ে রাখা একটা পত্রিকার প্রচ্ছদপট নজরে আসতে থমকে দাঁড়ালাম। বুকষ্টলের কাছে দাঁড়াতেই পরিচিত মালিক হাসিমুখে আমার নিবদ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে "ধনধান্যে" ১৫ই মে হাতে ধরিয়ে দিলেন।

হলুদ রঙের প্রচ্ছদে কালো রঙের গোলাকারে 'প্রতি সংখ্যা মাত্র ৫০ পয়সা' চমৎকার আকর্ষণীয় রূপ পেয়েছে। সমগ্র প্রচ্ছদপদটিতে সম্পাদকের ব্যবসায়িক প্রচারের অপূর্ব কৌশলে মুগ্ধ হয়ে পত্রিকাটি কিনে গাড়ীতে উঠলাম।

ট্রেনের কামরায় বেঞ্চিতে বসেছি। আমার দু-পা জোড়া করা কোলের উপর রাখা 'ধনধান্যে' সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তা বুঝতে পারলাম—পাশে বসা ভদ্রলোকটির কথা শুনে। "পত্রিকাটি একটু দেখতে পারি?" আধ ঘণ্টা বাদে গাড়ী থেকে নামবার সময় অপর একজন ভদ্রলোককে বলতে হ'ল "এবার আমি নেমে যাব", তিনি পত্রিকাটি যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে ফিরিয়ে দিলেন।

রাতে শোবার আগে 'ধনধান্যে'-র পাতা মেললাম। সুন্দর কাগজে ঝকঝকে ছাপা ও বিষয়বস্তুর নির্বাচন আমাকে মুগ্ধ করল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ' অনুবাদ হ'লেও সার্থক ও বলিষ্ঠ অনুবাদ। পড়তে গিয়ে মনে হ'ল যেন প্রধানমন্ত্রীর মুখেই তাঁর বক্তব্য শুনছি।

শ্রী বিদ্যুৎ মল্লিক 'সময়, দুঃসহ সময়' গল্পে বর্তমান সমাজের একটি করুণতম আলখ্যের উন্মোচন করলেও তা অবাস্তব বলে মনে হয়। আমরা ধর্মতলার মোড়ে বা অন্য কোথায়ও এই 'মাকে' দেখেছি কতকগুলি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে পাশে জল ছিটিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা তারও অধিক সময় শুয়ে থেকে লোকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে। ট্রেনে বা ষ্টেশনে এমনতরও দেখা যায় যে গলায় 'দড়া' বেঁধে বাবা বা মা মারা গেছেন তার সাহায্য ভিক্ষা করতে। কিন্তু মরা ছেলে সামনে রেখে সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভিক্ষা করবার মতন এমন নির্মম হৃদয়হীনতা শত দারিদ্র্যেও কোন মা-বাবার থাকতে পারে তা দেখিনি, শুনিনি।

"খেলাধূলা" বিভাগে 'ফুটবলে দল বদল' অনেক পুরানো খবর। পাঠকের কাছে এর আকর্ষণ অতি অকিঞ্চিৎকর। এই বিভাগে মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যদি পাঠককে নূতনতর কিছু দিতে চেষ্টা করেন তাহ'লে পত্রিকাটির আভিজাত্য-তো বৃদ্ধি পাবেই উপরন্ত তরুণ সমাজের কাছে পত্রিকাটি আরও সমাদৃত হবে।

গোবিন্দ দাস
কলকাতা-৬৯

বর্তমান প্রজন্মের মধ্যেই যদি ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হয়, যদি একটি বা দুটি খরার মুখোমুখি হবার মত শক্তি অর্জন করতে হয় তবে একমাত্র জনসংখ্যাকে সীমিত রেখেই তা সম্ভব হবে।

—ইন্দিরা গান্ধী

গ্রাম বাংলার পাঁচালী

আবদুল জববার

আর নয়

'মিথ্যে কথা বলব না, কারখানা থেকে আমি পাঁচশো টাকা মাইনে পাই কিন্তু তবুও সংসার চালাতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'কেন, পাঁচশোতে কুলোচ্ছে না, কেন?'

'যেখানে হাজার টাকা দরকার, সেখানে পাঁচশোতে কি হবে?'

'রমজান মিয়া, কতজন ছেলেমেয়ে আপনার?'

'তা ন'জন হবে।'

'কেন, এত হবে? কোনো ভদ্রলোক তো আজকাল এত ছেলেমেয়ের বাবা হতে চান না। আগে নাকি লোকে আশীর্বাদের ছলে অভিশাপ দিত, তুই বেটা সাতছেলের বাপ হ।'

রমজান মিয়া বলল, 'ঠিকই, ফলের ভারে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে যেমন আমারও হয়ে গেল তেমনি। তবে সবই তো সেই 'তেনার' হাত।'

বললাম, 'আপনার কোনো হাত নেই, কি বলেন?'

রমজান মিয়া মাথা নামালেন, লজ্জা পেলেন বোধ হয়।

সন্ধ্যার সময়। শহরতলীর চা-দোকান। নানান ধরনের লোকের ভিড়। আসগার খাঁয়ের দোকান। কাজেই গুলগুল্লা আর শিককাবাবের ভক্ত যারা তারাই মৌতাত করছিল। অনেকেই চটকল, সুতোর কল, তেলকলের শ্রমিক। এবং বেশির ভাগ লোকই মুসলমান। এখনো এদেশে অনেক দোকানই চেনা যায়—সেটা হিন্দুর না-মুসলমানের। হয় দেবদেবীর ছবি থাকবে, নয় তো কাবা শরীফের, মদিনার হজরতের সমাধির, অথবা বোররাকের আরবী লেখার অলংকরণ এবং তার সঙ্গে উভয়তই যৌবন প্রকট যুবতীদের ছবি। যেগুলো রেষ্টুরেণ্ট, আধুনিক ডিজাইনের দোকান সেখানে হয়তো প্রকৃতির ছবি, নয়তো রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ছবি এসে জুটেছে। সেটা সেকুলার দোকান। সব সম্প্রদায়ের লোক আছে। তারা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে সব শহরেই বেশি আছে।

সে যাক, মালিকের মনের ওপরেই দোকানের চেহারা। আসগার খাঁয়ের দোকানে মুসলমানদেরই প্রাধান্য। একজন কাবুলিওলা তার খাতকের সঙ্গে কথা বলছিল। জন চারেক রেসের কোন্ ঘোড়া বাজি মারবে তার গবেষণায় মশগুল। দর্জিদের মূর্খ ছেলে দামী স্যুট পরে বেমানান হয়ে বসে আছে। আমিও যেন এখানে বেমানান। কেন না আমার পরনে পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি। আর চার-পাশে ময়লা জামা-কাপড়ওলা লোকের ভীড়।

একজন মৌলবী গোছের লোক আমাদের আগের কথার জের টেনে বললেন, 'সন্তান-সন্ততি হওয়া না হওয়ার ভার সবই আল্লার হাতে।'

বললাম, 'আল্লার আবার হাত কল্পনা করছেন কেন, তিনি তো নিরাকার।'

লোকটি হঠাৎ আটকা পড়ে যেতে তাঁর চোখে যেন রাগের কিম্বা বিরক্তির আগুন ঝকমক করল। বিরক্ত মেজাজে বললেন, 'দেখুন, হাত মানে এখানে শক্তির কথাই বলছি। আপনারা খোদার কলম রদ করছেন। আমি মিলাদ মহফিলে নানান জায়গায় মুসলমানদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে নিষেধ করছি। এটা গোনাহের কাজ। সন্তান আপদ নয়, সম্পদ। তাদের হত্যা করা পাপ।'

আসগার মিয়া আমাকে চা দিলেন। তাঁর একটি ভাই হাইস্কুলের হেড মাষ্টার। আমার বন্ধু। তার খোঁজেই এসেছিলাম।

রমজান মিয়া বললেন, 'কারখানার কিছু কিছু মুসলমান-শ্রমিকও অপারেশন করিয়েছে।'

মৌলবী আলী আনসার আবুল হায়াত দস্তগীর আল্ তালপুরী বললেন, 'যারা অপারেশন করাচ্ছে তাদের মৃত্যুর পর জানাজা পড়ানো উচিৎ নয়।'

আমি মৌলবী ভাইকে একটা সিগারেট দিলাম। বললাম, 'দেখুন ভাই, এটা কি কোনো শরিয়তের বিধান। কোথাও লেখা আছে যে যেসব বান্দা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করবে কলিকালে বা আখেরী জমানায় তাদের মৃত্যুর পর জানাজা পড়াবে না? এসব ফতোয়া আপনাদের মন গড়া ব্যাপার। আর কোনো আধা শিক্ষিত মৌলবীর মন গড়া বিধানই ইসলাম ধর্মশাস্ত্র নয়।

ইসলাম একটি বিজ্ঞান-সম্মত সর্ব-আধুনিক ধর্ম। তার ত্রুটিবিচ্যুতির কথা আজ যদি আমাকে কেউ বোঝাতে পারে কালই আমি ইসলাম ত্যাগ করব। ইসলামে চারটে পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েজ আছে কিন্তু সেটা এমনি জটিল অবস্থায় আছে যার পরিষ্কার নির্দেশ হল একটা বিয়ে করো। প্রবল কাণ্ডজ্ঞানের ওপরে ইসলামের ভিত্তি। বলা হয়েছে, প্রথম স্ত্রী যদি বন্ধ্যা অথবা চিরস্থায়ী দুর্বল অসুস্থ হয় তবে তার অনুমতি নিয়ে তবেই দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে। তা করা হয় কি? বলা হয়েছে, চার বিবি যদি হয় যেন তাদের মধ্যে কলহ না হয়, যেন তাদের ভাত কাপড়ের টানাটানি না পড়ে। তাদের সন্তান-সন্ততিদের যেন মানুষ করা হয়। কিন্তু সেসব করা হচ্ছে কি? আর জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আপনারা এক অসৎ উদ্দেশ্য মনে রেখে বাইরে প্রচার করছেন ওসব করা না-জায়েজ। না-জায়েজ কি শুধু ভারতের জন্য? এখানের দশকোটি মুসলমানকে আরো বিশকোটি বাড়িয়ে এখানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হবার অলৌকিক বাসনা আপনাদের। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্ত মুসলিম দেশগুলিতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। একদিন প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় এমনিই নিয়ম ছিল বাঘ সিংহ জীবজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার জন্যে অধিক সংখ্যায় মানুষ জন্মানোর দরকার। হিন্দু শাস্ত্রে আছে, সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছায় কোনো রমণী যে কোনো পুরুষকে আকাংক্ষা করলে তার আমন্ত্রণে সাড়া না দেওয়া ছিল অমানবিক, অসামাজিক। আজকে এটা করা অ-সামাজিক তো বটেই, বেআইনী। তার কারণ আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ যে যার স্ত্রীর দ্বারা সন্তান উৎপাদন করব। এবং সন্তান যখন বেশি হয়ে গেছে তখন সংযম দরকার। সেই সংযম আমরা রাখতে পারি না বলে অনেক ভেবেচিন্তে বিজ্ঞানীদের দিয়ে যাতে আমাদের পুরুষদের শুক্রকীট নারীদের শরীরে নিষিক্ত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন। আল্লা মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন, তোমরা করে খাও, জগতের কল্যাণ করো। কাণ্ডজ্ঞান ঠিক রাখো। পবিত্র কোরআন বলেছেন: 'আর তোমাদের পুত্রদের হত্যা করো না, কেননা তাদের লালন-পালনের ভার আমার ওপরে।' জন্ম-নিয়ন্ত্রণ যে পুত্রহত্যার ব্যাপার নয় আদৌ সেটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ছিল বলে প্রবাদ আছে। বিজ্ঞান বলছে, এটা কিন্তু অসম্ভব নয়। পুরুষদের এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে কয়েক শত শুক্র কীট থাকে। এগুলো জীবন্ত মানুষের বীজ। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন এই শুক্রকীটগুলো নড়াচড়া করছে। এগুলো ঠিক ঠিক সময়ে নারীদেহে নিষিক্ত হয়ে তাদের ডিম্বানুর সঙ্গে মিলন ঘটালেই সন্তান উৎপাদন হবে। এবার প্রশ্ন করি, কত লক্ষ কোটি শুক্রকীট আমরা প্রতিনিয়তই নিহত করছি? এগুলোকেও কি আমাদের বাঁচানো উচিৎ ছিল না? এখন বিবেচনা করতে হবে শুক্রকীটকে, আপনি মৌলবী-ভাই, পুত্র বলে মনে করেন কিনা?'

মৌলবী আলী আনসার সাহেবের হল উভয়-সংকট অবস্থা। হ্যাঁ বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ।

বললাম, 'পুত্র বলেই বিবেচনা করছেন তো? নইলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পুত্রহত্যা বলে প্রচার করবেন কেন? এখন আপনিই বলুন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ না করেও আপনি সেই প্রথম যৌবন থেকে এই মধ্য যৌবন পর্যন্ত কত হাজার পুত্র ধ্বংস করেছেন? কত লক্ষ শুক্রকীট নষ্ট করছেন?' যারা জীবন্ত ছিল। যাদের আল্লা পাঠিয়েছিলেন আপনার শরীরে। প্রত্যেকটি খাঁটি মুসলমান যদি কয়েক হাজার করে সন্তান উৎপাদন করতে পারতেন তাহলে জগৎ তো তাঁদেরই হাতের মুঠোয় থাকত। কিন্তু এসব ভাবনা এখন বাতুলতা। যাদের সংসারে আনব তাদের ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে খাইয়ে-ধুইয়ে মানুষ করতে হবে। নইলে ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে একটা শতাব্দী পরেই। ভবিষ্যতের এই বিপদ থেকে আমাদের সন্তানদের রাক্ষস বংশ তৈরি যাতে না করি তার জন্যে বিজ্ঞানীরা শুক্রকীট আসার পথ রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এটা সরকার যখন গ্রহণ করেছেন, প্রচার করছেন, তখন অনেক ভেবে, অনেক দেখেই করেছেন। এতে শরীরের কিম্বা যৌন সুখভোগের কোনো রকম ক্ষতি হয় না। বরং এটা করাতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীদের বাহাদুরী দেওয়াই উচিৎ।'

রমজান মিয়া হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আর দ্বিধা নয়, কালই আমি ভ্যাসেকটমী করাব। আর সন্তান চাই না। অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল। তাহলে ছেলে-মেয়েগুলোকে ভাল করে মানুষ করতে পারতাম।'

রবীন্দ্র সঙ্গীত আজ যে জনপ্রিয়তার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গিয়েছে তার মূলে এ যুগের অন্যতমা প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতের পূজারিনী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেলা কণ্ঠকে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। খ্যাতির চূড়ায় উঠেছেন কিন্তু অহঙ্কার নেই। কণিকার সুললিত কণ্ঠের দ্যুতিময় ব্যঞ্জনা মনের ছন্দীতে সুরের বোল ফোটায়। টপ্পা অঙ্গের গানে খ্যাতির শীর্ষে তিনি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে কীর্তন বাউলের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি।

শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের এক কালের ছাত্রী পরবর্তীকালে অধ্যাপিকা কণিকা এখন সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষা। সঙ্গীত ভবনের উন্নতি নিয়ে আপনি কি ভাবছেন?

'কণিকা'—নামটি গুরুদেবেরই দেওয়া। স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, 'বুঝলি মোহর আজ থেকে গানের জন্য প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে জলপানি পাবি'। ডাকনাম মোহর। শান্তিনিকেতনের অন্তরঙ্গ মোহরদি। গুরুদেবের কাছে গানের আসরে যাত্রা হল শুরু। রবীন্দ্রনাথ সবসময় কাছে ডাকতেন। নানা রকম মজার গল্প করতেন। কণিকা গুরুদেবকে দেখতেন সঙ্গীর মতন। বড়দের আসরে গান গাইতে বলতেন। 'শারদোৎসবে' গুরুদেবের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বোলপুরে যখন প্রথম টেলিফোনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো সেই অনুষ্ঠানে বড়দের সঙ্গে গান গেয়েছেন। ওঁর গান 'ওগো পঞ্চদশী' রেডিওতে ব্রডকাষ্টিং হয়েছিল।

মুখোমুখি

"চাওয়া পাওয়ার কথা কেউ বলতে পারে না। আমার চাওয়া বা পাওয়ার গুরুত্ব কিছু নেই আমার কাছে। "আমি শুধু গেয়ে বেড়াই চাইনা হতে আরো বড়।" এই ভালো লাগাটুকুই পরম প্রাপ্তি। আর তার ছোঁয়া যদি শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় তাহলে তার থেকে বড় চাওয়া বা পাওয়ার আর কী আছে।" —কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কথা জানতে চেয়ে কণিকার কাছে যা জবাব পেলাম তা হলো এই: 'আমার পক্ষে কিছু বলার সময় আসেনি। তবে সম্প্রতি বিশ্বভারতীর সার্বিক উন্নয়ন চিন্তায় মাসুদ কমিটির যে মন্তব্য প্রচারিত হয়েছে তাতে সঙ্গীত ভবনে একাধারে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ও বাংলার অন্যান্য ধ্রুপদ ও লোক সঙ্গীতের এবং কথাকলি, মণিপুরী, ভরতনাট্যম, কথক প্রভৃতি নৃত্যপদ্ধতির শিক্ষা প্রকল্প ব্যাপকতর হবে। হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা। আমার মনে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রধানতম কেন্দ্রে রেখে এই সূত্রে ব্যাপক শিক্ষাক্রম ও গবেষণার প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত।' শান্তিনিকেতনের নিচু বাংলার বাড়ীতে মুখোমুখি বসে কথা বলছিলাম কণিকার সঙ্গে। শান্ত সংযত। ধীর। স্থির। স্নিগ্ধ মুখশ্রী।

ছায়া সুনিবিড় সব পেয়েছির দেশ শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে গুরুদেবের স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন দিনের পর দিন। রবীন্দ্রনাথের খুব কাছ থেকে গান শিখেছেন। তাই তো তিনি এমন-ভাবে প্রাণ ঢেলে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন গান শিখতে। গানের রূপকে বুঝতে এবং গানের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে। তাতে তিনি সফল হয়েছেন।

কবিগুরুর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করা বিশ্ববিদ্যার এক তীর্থপ্রাঙ্গণ—শান্তিনিকেতনের মহামিলনের যজ্ঞে কণিকা দীর্ঘদিন গান শিখেছেন গান গেয়েছেন এখনও গান শেখাচ্ছেন। আশ্রমের গেরুয়া খোয়াইয়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে কবিগুরু যেমন নিজের ভেতর থেকে খুঁজে পেয়েছিলেন সুর তেমনি মোহরদি খুঁজে পেয়েছেন তার নতুন জীবন বোধ। শান্তিনিকেতনের পাখি ডাকা ভোরে নির্জন শালবনে আর উধাও অথৈ দিগন্তে কত না হাজার সুর ছড়িয়ে আছে। যে সুর ছড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সে সুর ছড়িয়েছেন কণিকা ও অন্যান্যরা। কবিগুরুর গান নিখিল মানবের জন্য আর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুরটি ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশ দেশান্তরে।

—আপনার জীবনে গুরুদেবের প্রভাব কতখানি?—

'প্রভাব' কথাটা আমার মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। শান্তিনিকেতনের পরিবেশেই জীবন কেটেছে। গুরুদেবের ছায়াতেই জীবনের শুরু। তাঁরই সুরে জীবনের পোষণ। তাঁর বাণীটুকু গানের মধ্য দিয়ে ধরে দিতে পারলেই সার্থকতা।

—রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কি?—

জানো কোন কিছুরই ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে নেই। বর্তমান নিয়ে কারবার। বর্তমানে এ গানের প্রসার ও সমঝদারদের

বিস্তৃতি দেখে আশান্বিত হই। শ্রোতাদের অন্তরে যদি আমার গান পৌঁছে দিতে পারি তবেই আসবে সার্থকতা।

স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকা প্রেস ক্লাবে কণিকার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। ওপার বাংলার অগণিত মানুষ তাঁর গান শুনে ধন্য হয়েছেন। মনে খুশীর বন্যা বইয়েছেন। আর বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে যেন কণিকার একান্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওপার বাংলা থেকে ফিরে এসে এপার বাংলার শান্তিনিকেতনে এক সাক্ষাৎকারে আমায় বলেছিলেন: বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসে মনে হয়েছে আমার শিল্পী জীবন সার্থক।

মূলত নিউইয়র্ক টেগোর সোসাইটির আমন্ত্রণে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় '৭৪ সালে আমেরিকা ও কানাডা সফরে গিয়েছিলেন। টেগোর সোসাইটি থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য এদেশ থেকে তিনিই প্রথম আমন্ত্রিত অতিথি। মার্কিন ভূখণ্ডে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিসাবেও তিনিই প্রথম অতিথি।

প্রায় দুমাস আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি ওদেশের সব রাষ্ট্র থেকেই গীত পরিবেশনের জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হন। প্রধান প্রধান দশটি শহরের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন। এই সব জায়গায় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে কেন্দ্র করে।

টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে "যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি" এই গান দিয়ে শুরু করেছিলেন আর শেষ গানটি গেয়েছিলেন "আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে"। মাঝখানে ছিল শুধু এক অন্তহীন বিস্ময়। সেদিন সাগর পারের শ্রোতারা কণিকার গানের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন।

—বিদেশের মাটিতে গান পরিবেশন করে আপনার কেমন লাগল?

—বিদেশের অভিজ্ঞতা তো ভালই হয়। ঘুরে বেড়ালাম দেখলাম খুশি হলাম। আপ্যায়নে অভিভূত হলাম। আর গান শুনিয়ে আনন্দ পেলাম।

শেষ প্রশ্ন রেখেছিলাম, আপনার শিল্পী জীবনের সব চাওয়া পাওয়া কি মিটে গেছে?

—চাওয়া পাওয়ার কথা কেউ বলতে পারে না। আমার চাওয়া বা পাওয়ার গুরুত্ব কিছু নেই আমার কাছে। "আমি শুধু গেয়ে বেড়াই চাইনে হতে আরও বড়"। এই ভালো লাগাটুকুই পরম প্রাপ্তি। আর তার ছোঁয়া যদি শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় তাহলে তার থেকে বড় চাওয়া বা পাওয়ার আর কী আছে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ডারটিংটনের আমন্ত্রণে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে ডারটিংটন হলের ৫০ বছর পুর্তি উৎসব উপলক্ষে গত মে মাসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব ও আন্তর্জাতিক মেলায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

তিনি লণ্ডন, সুইডেন, ষ্টকহোম, ডেনমার্ক, কোপেনহেগান, ফ্রান্স, জার্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি শহরে পুরো দুমাসে অনেকগুলি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বি. বি. সি-র পক্ষ থেকে শ্রোতাদের সামনে কণিকার গানের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

সাক্ষাৎকার: **স্বপন কুমার ঘোষ**

শরৎচন্দ্রের আলোচনায় ব্যক্তি শরৎচন্দ্র

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

লক্ষ্য করা গেছে ইবসেনের নোরা বা নষ্টনীড়ের চারুলতার পাশে শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী, অচলারা মর্যাদা হারায় নি। এই আন্তর্জাতিক মানোন্নয়ন একমাত্র শরৎ সাহিত্যের পক্ষেই সম্ভব। সেখানে শ্লোগান নেই তত্ত্ব প্রচার নেই, আছে রেখা চিত্রায়ণ। তাই প্রথম জীবনে তাকে জন্মভূমি, মাতৃভূমি চিনতে ভুল করলেও দুলে, ডোম, (অভাগীর স্বর্গ) হাড়ি, বাগদি, জোলারা (মহেশ) ভুল করেনি। বিরামপুরে তাদের পাশে থেকে তিনি তাদের কথা তুলে ধরেছেন।

তাই পরবর্তী দেবানন্দপুর তাকে টেনে নিয়েছে কোলে, মৃত্যুর নয় বৎসর পুর্বেই তাঁকে তারা সম্বর্ধনা দিয়ে নিজেদেরই সম্মানিত করেছেন।

তাই একথা অস্বীকার করা যায় না তাৎক্ষণিক ও তদানীন্তন জীবনকে অবলম্বন করলেও তিনি সমসাময়িক হয়ে থাকেন নি। একটি মাত্র জীবনে একাধারে খ্যাতি ও অখ্যাতি, নিন্দা ও প্রশংসা তাই তাঁর পাশাপাশি জুটেছে। তাঁকে করেছে সারা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষের (সর্বাধিক অনূদিত ও সর্বাধিক প্রচারিত) একটি অবিস্মরণীয় নাম। একটি যুগান্তর ও যুগোত্তীর্ণ পরিচয়: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি
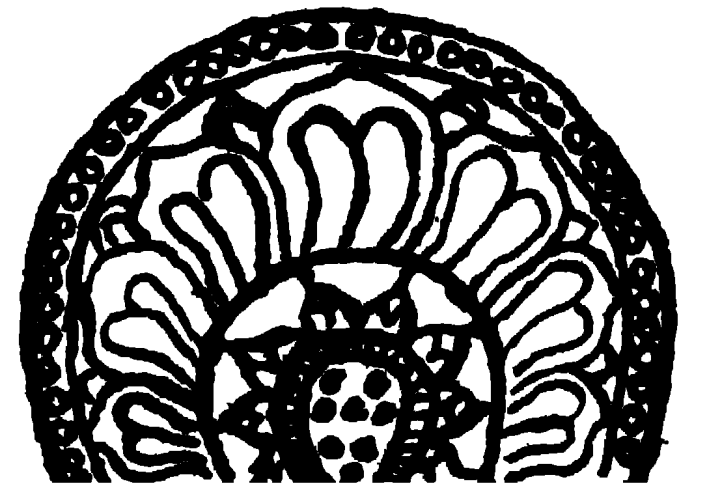
ক্যান্সার অতি প্রাচীন রোগ। তার ইতিহাসের মূল সৃষ্টির সেই অস্পষ্ট, অস্মৃত ঊষাকালে। এই গ্রহে প্রথম যখন প্রাণের উদ্ভব হয় তখন থেকেই এই রোগ অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে। উদ্ভিদ, এককোষী জীব, ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, ভাইরাস, পাখি, সরীসৃপ, মেরুদণ্ডী প্রাণী—সকলেই এই রোগের শিকার। আনুমানিক পাঁচ কোটি বছর আগে এই পৃথিবী যখন বিশালকায় ডাইনোসোরদের বিচরণক্ষেত্র ছিল তখনও ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ছিল। অধুনালুপ্ত ঐ প্রাণীর জীবাশ্মে ক্যান্সারের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

ক্যান্সারঃ মারে, কিন্তু সারেও

রমেন মজুমদার

ক্যান্সার রোগ হিসাবে প্রথম ধরা পড়ে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে লেখা মিশরীয় প্যাপিরাসে Skin Ulcer বা চামড়ার দূষিত রোগের বর্ণনা আছে।

ক্যান্সারকে এক কথায় বলা যেতে পারে, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতিকারক বৃদ্ধি। ইংরেজীতে—Uncontrolled malignant growth। Malignant মানে চিকিৎসার অসাধ্য, এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণনাশক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতি বছর গোটা পৃথিবীতে ক্যান্সারে অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রতি বছর গোটা পৃথিবীতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় আটত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ লোক। এটা মোটামুটি হিসাব, এবং সম্ভবত খুব-কম-করে ধরা।

ভারতের শহরাঞ্চলে মারী রোগ হিসাবে ক্যান্সারের স্থান চতুর্থ। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায়, ভারতের প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে একজন এই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়। মুখের ক্যান্সার আর নারীর স্তন ও জননেন্দ্রিয়ের ক্যান্সারই শতকরা ৬০ ভাগের উপর। মুখের ক্যান্সার একেবারে শীর্ষস্থানে।

পাশ্চাত্য দেশের গবেষণায় ধূমপান আর ফুসফুসের ক্যান্সারের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যারা অত্যধিক বিড়ি খায়, পান খায়—তাদের মধ্যে ক্যান্সার খুব বেশি। যেসব অঞ্চলে খৈনির প্রচলন আছে সেইসব অঞ্চলে একাধিক বার সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, খৈনি আর মুখের ক্যান্সারে মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুখের ক্যান্সার হয় উত্তর প্রদেশের মণিপুরী জেলায়। সেখানে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ২২ জন মুখের ক্যান্সারে ভোগে। তারা সকলেই তামাক-পাতা, চুন, সুপুরি আর কর্পূর কিংবা লবঙ্গ দিয়ে তৈরি এক রকম জিনিস খৈনির মতো করে খায়। তার নাম "মণিপুরী"।

কেরলের লোকেরাও "জাফনা" অথবা "ভদকন" নামে এক ধরনের জিনিসে আসক্ত। সে-ও তামাক দিয়ে তৈরি এবং খৈনির মতো করে খেতে হয়। তাই কেরলেও গালের ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বেশি।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের লোকেরা উলটো করে বিড়ি খায়, বিড়ির জ্বলন্ত দিকটা তারা মুখের মধ্যে রেখে টানে। সেখানে মুখের ক্যান্সার বেশি। অন্ধ্র প্রদেশের গুণ্টুর জেলা একটি ক্যান্সার-অধ্যুষিত অঞ্চল, এবং সে ক্যান্সার মুখের ক্যান্সার—প্রধানত গাল আর জিভেই এই ক্যান্সার হয়। গুজরাটেও জিভের পশ্চাদ্‌বর্তী অংশে ক্যান্সার বেশি দেখা যায়।

আগ্রায় প্রায় ৪০,০০০ স্ত্রীলোকের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, প্রতি ৫৭ জনের মধ্যে একজন জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত। জরায়ুতে ক্যান্সার হয় তার সরু বহির্মুখে—ইংরেজীতে যে জায়গাটাকে সারভিক্স বলে। ডাক্তারদের ধারণা, বাল্যবিবাহ সারভিক্সের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। অধিক সন্তানের জননী-দেরও জরায়ুর বহির্মুখে ক্যান্সার হবার আশঙ্কা থাকে।

পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীলোকের স্তনেই ক্যান্সার হয় বেশি, আর আমাদের দেশে জরায়ুর বহির্মুখে। তার কারণ হিসাবে ডাক্তাররা বলেন, পাশ্চাত্য দেশে সন্তানকে স্তন্যদান-প্রথা প্রায় বিলুপ্ত।

পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণে এ দেশেও যাঁরা অত্যাধুনিক হবার মোহে তাঁদের শিশুসন্তানদের মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত করছেন তাঁরাও অলক্ষ্যে ঐ মারী রোগ ডেকে আনছেন। আবার যাঁরা অত্যধিক বিলম্বে বিবাহ করছেন এবং খুব কম সন্তানের জননী হচ্ছেন তাঁরাও স্তনের ক্যান্সারের পথ প্রশস্ত করছেন।

উলটো করে বিড়ি খাওয়ার দরুণ ক্যান্সার হয় কিনা তা দেখার জন্য বিশাখাপত্তনমের অন্ধ্র মেডিক্যাল কলেজে একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ইঁদুরের গায়ে তামাকের নির্যাস মাখিয়ে সেই জায়গায় ৫৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োগ করা হয়েছিল, যাতে উলটো করে বিড়ির খাওয়ার ফলটা সৃষ্টি হয়। আট মাস পরে দেখা গিয়েছিল, শতকরা ৮০ ভাগ ইঁদুরের ক্যান্সার হয়েছে।

সিগারেটের সঙ্গে ক্যান্সারের একটা সম্পর্ক নির্ণয়ের পরেও কোথাও সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয়নি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। একটা সিগারেট কোম্পানি হিসাব দিয়েছে, মাত্র দশ বছরে সিগারেট

খাওয়া প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ১৯৬১ সালে যেখানে ৩,৫০০ কোটি সিগারেট বিক্রি হয়েছিল, ১৯৭১ সালে সেখানে হয়েছে ৬,৫০০ কোটি।

হিসাব করে দেখা গেছে, ভারতের প্রায় তিন কোটি লোক, অর্থাৎ প্রাপ্ত-বয়স্কদের শতকরা প্রায় দশভাগ সিগারেট খায়। আর যারা বিড়ি খায় তাদের সংখ্যা এর কয়েকগুণ বেশী।

ক্যান্সার কেন হয় তা এখনও ভালো করে জানা যায় নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, দেহকোষের (cell) পরিবর্তনই ক্যান্সারের কারণ—এবং সে পরিবর্তন ভাইরাসও আনতে পারে। স্বাভাবিক দেহকোষ যখন অনুক্রমিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে তখনই ক্যান্সার হয়। এবং এই পরিবর্তন ঘটতে দশ বছর পর্যন্তসময় লাগতে পারে। পরিবর্তনের শেষ ধাপ—ক্যান্সার।

সজীব প্রাণীর দুটি প্রধান মৌলিক ধর্ম—বৃদ্ধি আর জনন। অর্থাৎ, সজীব প্রাণী ছোটো থেকে ক্রমশ আয়তনে বড়ো হতে পারে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এই দুটি মৌলিক ধর্মই তাকে অচেতন পদার্থ থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। কিন্তু সমাজের কোনো সংস্থা যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে অথবা দেশের জনসংখ্যা—তাহলে যেমন বিপদ অবশ্যম্ভাবী তেমনি অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিও ক্ষতিকর—এবং মারাত্মক। ক্যান্সার শরীরের কোনো অংশের অ-নিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে শরীরের বৃদ্ধি তখনই ঘটে যখন দরকার হয় এবং ততটুকু ঘটে যতটুকু দরকারে লাগে। কিন্তু ক্যান্সার এই দরকার-অদরকার মানে না, বৃদ্ধি চালিয়ে যায়।

যে কোনো জীবেরই দেহ—তা সে উদ্ভিদের দেহই হোক কি অন্য কোনো প্রাণীর—কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশে গঠিত, এবং সেইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি-টিরই আলাদা-আলাদা কর্ম আছে, সমাজে যেমন শ্রমভাগ আছে। উদ্ভিদের শিকড় মাটি থেকে জল আর খনিজ পদার্থ শোষণ করে উপরে তোলে, তার পাতা সূর্যের আলোর সাহায্যে গোটা উদ্ভিদের জন্য খাদ্য তৈরি করে। ঠিক তেমনি মানুষের দেহের পাকস্থলী আংশিকভাবে খাদ্য পরিপাক করে, অগ্ন্যাশয় তার জন্য পাচক রস সরবরাহ করে, বৃক্ক রক্তের অপ্রয়ো-জনীয় বর্জ্য পদার্থ প্রস্রাবের মধ্য দিয়ে বের করে দেয়, মস্তিষ্ক পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের সমস্ত খবরাখবর গ্রহণ করে।

সাধারণভাবে জীবন মানে, গোটা দেহের সংগঠিত, সমগ্র জীবন—অর্থাৎ, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু কর্মসম্পাদন। কিন্তু এই গোটা দেহ অথবা এই গোটা দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একই পদার্থের একটা অবিচ্ছিন্ন পিণ্ড নয়, ইংরেজীতে যাকে বলা যায় a continuous mass of uniform material তা নয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য একক বস্তুর সমষ্টি, এবং সেই এককের নাম কোষ (cell)। সাদামাটাভাবে একটা অট্টালিকার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। একটা বিরাট অট্টালিকা যেমন একটা বিশাল ইঁট দিয়ে তৈরি হয় না, ছোটো ছোটো অসংখ্য ইঁট গায়ে গা লাগিয়ে গেঁথে গেঁথে তৈরি করতে হয়—এ-ও তেমনি। দেহের ঐ কোষগুলি তাই ইঁট আর প্রতিটি ইঁটের মতো প্রতিটি দেহকোষই স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি কোষেরই একটা পৃথক ও স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রজীবন আছে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার, নিজের বৃদ্ধি ঘটাবার ও বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা আছে।

সুতরাং দেহের কোনো অংশের বৃদ্ধি মানে ঐ আলাদা আলাদা কোষের বৃদ্ধি ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। যখন কোনো নতুন কোষ আয়তনে বাড়ে তখন তার ঐ বাড়ার একটা সীমা আছে—একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বেড়ে তারপর তা বিভাজিত হয়ে অনুরূপ দুটি কোষে পরিণত হয়। তারপর ঐ দুটি কোষ আবার তাদের নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়তনে বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে ঐ সীমায় পৌঁছনো মাত্র বিভাজিত হয়—দুটি কোষ থেকে চারটি হয়। এইভাবে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

শিশুর জন্মের একেবারে গোড়ায় জীবন আরম্ভ হয় একটিমাত্র নিষিক্ত কোষ থেকে—সেই নিষিক্ত কোষ তৈরি হয় মাতার ডিম্বাণু আর পিতার শুক্রাণুর সম্মিলনে। একটি মাত্র ডিম্বাণু-কোষ ও একটিমাত্র শুক্রাণু-কোষ সম্মিলিত হয়ে যে নিষিক্ত পূর্ণ-কোষ সৃষ্টি হয় সেই একক কোষ ক্রমশ বিভাজিত হয়ে এবং শেষে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষে পৃথক্ হয়ে শিশুর দেহ গঠন করে। জন্মের পরেও কোষবৃদ্ধির দরুণ তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে—শিশু বড়ো হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধি একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় হয়, এবং শিশু যখন পূর্ণবয়সে পৌঁছয় তখন এই বৃদ্ধি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়। তারপর কদাচিৎ চামড়া আর যকৃতের কোষ বৃদ্ধি পায়। যদি কখনও চামড়া বা যকৃতের কোনো অংশ কেটে যায় কি ছড়ে অথবা জখম হয় তখন এ ক্ষতি পূরণ করার জন্য পার্শ্ববর্তী কোষগুলি বিভাজিত হতে আরম্ভ করে। ক্ষতস্থানের চারপাশে যেসব কোষ থাকে সেইসব কোষ বিভাজিত হয়ে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে ঐ ক্ষতটা ভরিয়ে দেয়।

তবে মস্তিষ্কের কোষসংখ্যা এইভাবে বাড়ে না। শিশুর বয়েস দু-তিন বছর হলেই মস্তিষ্ক-কোষের বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। এবং তারপর যদি তার মস্তিষ্কের কোনো অংশ রোগাক্রান্ত হয় কিংবা জখম হয় তাহলে সেই ক্ষতি আর পূরণ হয় না।

কিন্তু ক্যান্সারের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। ক্যান্সার এই নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে কোষ-বিভাজন চালিয়ে যায়। শরীরের যেখানে ক্যান্সার হয় সেখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, ফলে সেখানকার কোষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে—আর কোষের এই অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিই ক্যান্সার।

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহিলা মহল

কর্মী মেয়েদের সাজসজ্জা

হেনা চৌধুরী

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে শিক্ষিতা ও আধুনিক সমাজের মেয়েরা যে সাজ-সজ্জা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন তা বিভিন্ন সভাসমিতি ও পার্টিতে গেলে বেশ লক্ষ্য করা যায়। আর একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে যত নারী প্রগতিই আসুক না কেন নারীর সাজ-সজ্জার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রূপ ও রুচি অনুযায়ী উৎসব ও প্রয়োজন ভেদে সাজ-সজ্জার মধ্য দিয়ে নারীর রূপের যে মহিমা ফুটে ওঠে—মাধুর্য্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তার মূল্য কোনক্রমেই অবহেলার নয়।

পাশ্চাত্যে আজ মেয়েদের জীবনে জীবিকা অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে এবং সেখানকার কর্মী মেয়েদের পোষাকে বেশ একটি বাহুল্যবর্জিত ছিমছাম ভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় পোষাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বও প্রতিভাত হয়। বিপরীত-পক্ষে আমাদের মেয়েরা আজ দায়ে পড়ে জীবিকার সন্ধানে বের হলেও তাঁদের কাজকর্ম, সাজ-পোষাক ও চলাফেরা সবকিছুর মধ্যেই বেশ একটা ঢিলেঢালা ভাব এবং সপ্রতিভতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু আগাগোড়া অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই পোষাকের পিছনে ব্যয় তার কম হয়নি। বিশেষ করে আজও বিবাহিতা কর্মী মেয়েরা যে পরিমাণ সোনার গয়না গায়ে চাপান তার মূলে মধ্যবিত্ত আভিজাত্যে মোড়া একটি সংস্কারসুলভ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে কর্ম-ক্ষেত্রে সোনারদরে মানুষের ওজন হয়না। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয় কর্মীরই প্রধানগুণ সপ্রতিভতা, কর্মকুশলতা, ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহার।

আর আমাদের ক্ষেত্রে এসবের বিকাশের পক্ষে সাজ-পোষাকের যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে কর্মক্ষেত্রের পোষাকে রুচির সংগে শালীনতা না থাকলে তা অবশ্যই দৃষ্টিকটু ঠেকে। হেয়ারষ্টাইলের ক্ষেত্রে সব সময়ই লেটেষ্ট ফ্যাসান চলতে পারে কিন্তু সাজ-পোষাকের ক্ষেত্রে ফ্যাসনের সংগে শালীনতার একটা সামঞ্জস্য না করে নিলে সে নারী কখনও সহকর্মী পুরুষের চোখে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেনা। আর আমার নিজস্ব অভিমত যে শালীনতা বজায় রাখলে আধুনিকতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়না।

দ্বিতীয়ত কর্মী মেয়েদের জামাকাপড় সব সময়ই ভাল ইস্ত্রি থাকা প্রয়োজন। যত দামী শাড়ীই হোক না কেন তা ঠিকমত ইস্ত্রি না থাকলে সুন্দর দেখায় না এবং তার চেয়েও বড় কথা সপ্রতিভতার হানি হয়।

কর্মী মেয়েদের প্রতিদিন ট্রাম বাসে যাতায়াত করতে হয়। তাতে একদিনের পাটভাঙ্গা শাড়ী পরের দিন ব্যবহার করা যায়না। আর স্বাস্থ্যের দিক থেকেও তা উচিত নয়। অবশ্য সিল্ক বা দামী শাড়ী সাধারণত বাড়ীতে কাঁচা যায়না, তা একদিন ব্যবহারের পর পুনরায় ইস্ত্রি করে ব্যবহার করা চলে। তবে শীতকালে তা চলে—কিন্তু গরম কালের প্রখর মধ্যাহ্নে সিল্কের শাড়ী জামায় গরম বেশী হয়। ফলে অস্বস্তি বোধ হওয়ার জন্য কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু শীতকালে শাল বা কার্ডিগানের সংগে মিলিয়ে কর্মক্ষেত্রে সিল্কের শাড়ী চলতে পারে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ, পিওরসিল্ক বা নাইলন শাড়ী পরবেন। কাঞ্জিভরম, সম্বলপুরী বা বেনারসী নয়। গরমকালে ভয়েল বা ছাপাশাড়ী অফিসের পোষাকের পক্ষে ভাল। তাঁতের শাড়ী যারা পছন্দ করেন তাঁরা অবশ্য তাঁতের শাড়ী পরতে পারেন। তবে তাঁতের শাড়ী ব্যয়সাপেক্ষ। বর্ষাকালে কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল নাইলন শাড়ী। কারণ বৃষ্টিতে ভিজলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এবার আসি রং-এর কথায়—চেহারা ও গায়ের রং-এ মিলিয়ে শীতকালে উজ্জ্বল বর্ণের পোষাকই ভাল দেখায়। কিন্তু গরমকালে হাল্কা রং-এর। বর্ষাকালে মেঘলা আকাশের পটভূমিকায় নীল গোলাপী এবং হাল্কা হলুদ রং-এর শাড়ী ভাল মানায়।

ব্লাউজের রংটি সবসময়ই হবে শাড়ীর রং-এর সংগে মেলানো। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সম্ভব না হলে সাদা বা কালো ব্লাউজ চলতে পারে। কারণ এ দুটি রং প্রায় সব রং-এর সংগেই খাপ খেয়ে যায়।

শাড়ী ধোয়ার ব্যাপারে অনেক মেয়েই আজকাল স্বয়ং-নির্ভর। তেমনি ব্লাউজও যদি নিজের বাড়ীতে তৈরী করে নেওয়া যায় তবে মধ্যবিত্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকটাই বাড়তি খরচ বেঁচে যায়।

এরপর প্রসাধনের ব্যাপারটি ভাবা যাক্। কর্মী মেয়েদের প্রসাধনের দিকে

সব সময়ই একটু বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে প্রসাধনের উগ্রতা যেন কোন সময়ই মুখের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে না যায়। আর আশা করি আধুনিককালে প্রতিটি আধুনিকাই জানেন যে বর্তমান সৌন্দর্যচর্চায় প্রসাধনের চেয়ে ত্বকের সৌন্দর্য্য চর্চার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। আর সেই জন্যই আমার মতে মুখের প্রকৃত লাবণ্য ও শ্রী বাড়াবার জন্য প্রতিটি কর্মীমেয়েরই সময় করে সপ্তাহে অন্তত দুদিন ত্বক পরিচর্য্যা করা উচিত। আধুনিক প্রসাধনের অভিধানে কোন পাউডার প্রায় অচল হয়ে গেছে। তার স্থান নিয়েছে নানারকম ক্রীম ও লোসন। মোটকথা ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে তোলাই আধুনিক প্রসাধনের গোড়ার কথা। ওষ্ঠ প্রসাধনী লাগাবার সময় তা যতটা সম্ভব পোষাকের সংগে সামঞ্জস্য রেখে লাগালে ভাল দেখায়। তবে এই বাজারে সকলের পক্ষে সব সময় তা সম্ভব নয়। হাল্কা সোনালী ওষ্ঠ প্রসাধনী চলতে পারে। তবে লাল বা অন্যকোন ঘোর রং-এর ওষ্ঠ প্রসাধনী কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই ভাল। কাজল বা আইলাইনার যে যেমন ব্যবহার করেন তা অবশ্যই করবেন। তবে সবটাই যেন চোখের সংগে মিশে থাকে। নেলপালিস পোষাকী রং-টাই ভাল। রং খুব ফর্সা হলে লাল রং চলতে পারে।

সবশেষের হলেও আধুনিক ফ্যাসানের মূলকথা হেয়ার ষ্টাইল। ওটা অবশ্যই যার যার নিজস্ব স্বাধীনতা অনুযায়ী করবেন। স্যাম্পু করে খোলা চুলের সৌন্দর্য্য অনেককেই সপ্রতিভ করে তোলে। আবার ছিমছাম খোঁপা কারুর ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব বিনুনী করা পরিহার করে চলবেন। মোটকথা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সংগে ফ্যাসানের সামঞ্জস্য রেখেই করতে হবে হেয়ার ষ্টাইল।

শেষকথা পায়ের চটি ও ব্যাগ। আজকাল হাইহিল জুতোর প্রচলন মেয়েদের মধ্যে খুব বেশী। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে হাইহিল পরার ফলে চলার স্বাচ্ছন্দ্য গতি যেন ব্যাহত না হয়। আর জুতোই হোক আর চটিই হোক তা যেন সব সময়ই পরিষ্কার আর ঝকঝকে থাকে। জুতোর ফ্যাসানে আধুনিকতার দিকেও বিশেষভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। ঠিক একই কথা ব্যাগ সম্পর্কে। তবে যে ব্যাগ বাজারে বহুল প্রচলন তেমন না কিনে একটু খুঁজলে সস্তায় সুন্দর সুন্দর ব্যাগ মার্কেটেই পাওয়া যায়। কারণ আমার নিজের মনে হয় চলতি ফ্যাসানের ব্যাগ বড় বাহুল হয়ে যায় এবং তা ফ্যাসানকে অনেকখানিই ব্যাহত করে।

মোটকথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে কর্মী মেয়ের সাজে ফুটিয়ে তুলতে হবে ব্যক্তি নয় ব্যক্তিত্বকে। পুরুষের যেমন অফিসের পোষাক আলাদা মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন কোন পোষাক না মানালেও একটু বুদ্ধি খরচা করলেই প্রতিটি কর্মী মেয়েই রূপ অনুযায়ী সুন্দর, মার্জিতরুচিসম্পন্ন এবং বাহুল্যবর্জিত পোষাকের জন্য সহকর্মীদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করতে পারেন।

ক্যান্সার : মারে, কিন্তু সারেও

২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ক্যান্সার নিয়ে সারা পৃথিবীতে যত গবেষণা হচ্ছে, আর কোনো রোগ নিয়ে তত হচ্ছে কিনা জানা নেই। ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশেও ক্যান্সার-গবেষণা সমধিক গুরুত্বলাভ করেছে। দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণা চলছে। ক্যান্সার কেন হয়, কী করে তা দমন করা যায়—শুধু তাই নিয়েই গবেষণা নয়, অনেক আহার্য্য আর ব্যবহার্য বস্তুর ভিতরে ক্যান্সার সৃষ্টির গুণ বা অপগুণ আছে কিনা তা নিয়েও। কিছু ভোজ্য তেল, সুরাজাতীয় জিনিষ, তামাক, জন্ম-নিরোধক, কীটনাশক ইত্যাদিতে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী গুণ আছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে। তামাকের নির্যাস, সুপুরির নির্যাস, নাম-করা এক কোম্পানির বাদাম তেল, এমন কি অতি জনপ্রিয় এক সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক নিয়েও গবেষণা হচ্ছে।

গবেষকরা বলছেন, ক্যান্সার যদি গোড়াতেই ধরা যায়, আর ধরার সঙ্গে সঙ্গেই বিকিরণ প্রয়োগ করে অথবা অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসা করা হয় তাহলে ভয় নেই। তাঁরা যেসব গবেষণা করছেন তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে এখনই যে জ্ঞান হাতের মধ্যে আছে তা ব্যবহার করে ক্যান্সার-রোগীদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায়।

সারভিক্সের ক্যান্সার শতকরা ১০০ ভাগই সারে, যদি গোড়ার দিকে ধরা পড়ে। ধরার পদ্ধতিও আছে—সারভিক্স থেকে সামান্য একটু স্রাব নিয়ে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের তলায় ধরে ক্যান্সার-কোষ নির্ণয় করা যায়।

'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন এগেন্স্ট ক্যান্সার' নামে যে সংস্থা আছে তার সভাপতি পিয়ের দেনো কিছুদিন আগে বলেছেন, ক্যান্সার কথাটা এখনও ত্রাসের সঞ্চার করে, তার পরিণতি বড়োই ট্র্যাজিক। কিন্তু—"Cancer is not inexorable। It is not incurable."

কিছুদিন আগে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের মহা-অধিকর্তা অধ্যাপক এস. এন. ওয়াহিও বলেছেন, লোককে জানতে হবে, ক্যান্সারও সারে—যদি তার তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা হয়।

কিন্তু লোকে যে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাবে, বুঝবে কী করে যে, ক্যান্সার হয়েছে? অধ্যাপক ওয়াহি সাতটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন: (১) গলায় যদি প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং তা সারতে না চায়, (২) স্ত্রীলোকের যদি রক্তস্রাব হতে থাকে, (৩) শরীরের কোথাও যদি আব দেখা দেয়, (৪) কাশিতে যদি স্বরভঙ্গ লক্ষিত হয়, (৫) মলত্যাগের অভ্যাসে যদি পরিবর্তন ঘটে, (৬) দেহের কোথাও আঁচিল থাকলে তার রং যদি বদলায়, অথবা (৭) সেই আঁচিলের আয়তন যদি বাড়তে থাকে।

খেলা ধূলা

কলেজ স্কোয়ারে ওয়াটারপোলো

জলক্রীড়াতে চিরদিনই বাংলা ভারতের শীর্ষভাগে ছিল। চিরসবুজ শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের বেশীর ভাগই জল। আর সেই কারণেই সম্ভবত বাঙ্গালী জলের খেলাতে এত পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছিল। একটু পিছনের দিকে যদি চোখ ফেরানো যায় তবে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। প্রফুল্ল ঘোষ, ইলা ঘোষ, ডাঃ বিমল চন্দ, ব্রজেন দে, আরতি গুপ্তা (সাহা) মিহির সেন প্রভৃতিদের কীর্তি-গাথাই প্রমাণিত করে জলের খেলাতে বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রাধান্য। আরও বহু কীর্তিখ্যাত রয়েছেন যাঁদের জন্য এক-সময় বাংলা সত্যই অনন্যার স্বীকৃতি সংগ্রহ করতে পেরেছিল। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতাই হ'ল এই জলের খেলার পীঠস্থান। কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে আর ওদিকে গঙ্গার পাড়ে আহিরীটোলা, শোভাবাজার, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে গড়ে উঠে ছিল বহু কৃতী সাঁতারু। গঙ্গায় সাঁতার কেটে কেটে বহু সাঁতারু হয়ে উঠেছিল এক সময়ে কৃতী। যাই হোক, কলেজ স্কোয়ারের ঐ চৌহদ্দীতেই তৈরী হয়েছিল বহু যশস্বী সাঁতারু। আজ অবশ্য নয়, একদিন ছিল সর্বভারতীয় জলক্রীড়া দল গঠনে বাংলার খেলোয়াড়দেরই আধিপত্য। দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের কথা বাংলার আজ সেই সুদিন নেই, নেই সেই সুনামও।

কলেজে স্কোয়ারে সম্প্রতি শেষ হয়েছে বর্ত্তমান মরশুমের ওয়াটারপোলো প্রতি-যোগিতার আসরগুলো। এই আসরগুলো থেকেই প্রতি বছর জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের নির্বাচিত করা হয় এবং অতীতে সর্ব্বভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় বেশীরভাগই এইসব খেলোয়াড়রা সুযোগ পেতেন। সকলেরই জানা আছে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে ১৯৭০ সালে ভারত এশীয় ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ ব্যাংককে জাপানের কাছে ৪-২ গোলে হেরে গিয়ে অপ্রত্যাশিত রূপা নিয়ে দেশে ফিরেছিল। সেই দলের সাতজনের মধ্যে বাংলা থেকে ছিলেন তিন তিনজন—আর তাঁরা সবাই বাঙ্গালী। দলের অধিনায়ক ছিলেন বাংলার ছেলে পীযূষ মিত্র। আবদুল মতলিফ ও তরুণ গোস্বামীও ছিলেন সেই দলে। অতর্কিত অপ্রত্যাশিত রূপো পেয়ে ভারত ভীষণ আশাবাদী হ'ল বটে কিন্তু অনুশীলন অধ্যবসায় বা আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনকে রপ্ত করানো হ'ল না খেলোয়াড়দের। আর অনভিজ্ঞতার ফসল গুনতে হল ১৯৭৪ সালে তেহরানে চরমতমভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে। যোগদান-কারী আটটি দেশের মধ্যে সাতটি দেশের বিরুদ্ধেই ভারত হেরেছিল শোচনীয়ভাবে। অবশ্য সেই দলেও সাতজনের মধ্যে তিনজন খেলোয়াড় ছিলেন বাংলার—তাঁরা সবাই বাঙ্গালী—অশোক বিশ্বাস, বেণী-মাধব তালুকদার ও অমর রায়।

ফিরে যাওয়া যাক কলেজ স্কোয়ারের টলটলে জলের বুকে। ওয়াটারপোলোর আসরের মধ্যে অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা হ'ল স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপ লীগ যাকে অবশ্য বলা হয় বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েসন লীগ। সংক্ষেপে বি. এ. এস. এ. লীগ। এছাড়া প্রমথনাথ ননীগোপাল মেমোরিয়াল ওয়াটারপোলো টুর্ণামেন্ট, আর শ্যামচাদ দত্ত মেমোরিয়াল (জুনিয়ার) ট্রফি—কামিনী দত্ত মেমোরিয়াল ট্রফি। এক এক করে সব ট্রফির খেলা হয়ে গেছে। বি. এ. এস. এ. লীগের খেলার সূচনা হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। এবছর (১৯৭৬) বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দলকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দিয়ে সপ্তমবার বিজয়ী হল। ১৯৬৪ সালে প্রথম রেল দল এই ট্রফিতে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় আসে। ১৯৬৪ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পর পর ছয়বার এই ট্রফি জয় করে একাদিক্রমে ইষ্টার্ণ রেলওয়েকে হারিয়ে দিয়ে। মজার ব্যাপার হল ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পর পর বিজয়ী হয় আবার ঐ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল প্রতিপক্ষ প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দলকে হারিয়ে দিয়ে।

প্রমথনাথ ননীগোপাল মেমোরিয়াল ট্রফি এবার জিতেছে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল—প্রতিপক্ষ সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়েকে ৬-৫ গোলে হারিয়ে দিয়ে। বর্ত্তমান মরশুমে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে বিজয়ী হওয়ার ফলে ১৯৭২ থেকে একটানা পাঁচ পাঁচবার এই ট্রফি জিতে এক নজির সৃষ্টি করেছে।

পূর্ব রেল ও দক্ষিণপূর্ব রেলের খেলায় পূর্ব রেলের গোল করার দৃশ্য

সিনেমা

বাংলা ছবিতে শরৎচন্দ্র

চলচ্চিত্র একটি আলাদা শিল্পমাধ্যম বলে আমরা যতই চিৎকার করিনা কেন, আমাদের দেশে এখনও তা তেমন মর্য্যাদা পেয়েছে এমনটি বলা যায় না। এখনও ছবির সাধারণ দর্শক একটি নিটোল ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ গল্প দেখার জন্যই প্রেক্ষাগৃহে যান, হাসি কান্নায় দুলতে তাঁরা পছন্দ করেন বেশী।

হাতে গোনা গুটিকয় ব্যাতিক্রম অবশ্য বাদ দিলে বাংলা ছবি মূলত তাই গল্পনির্ভর, যার অভাবে বর্তমান বাংলা ছবির অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়।

এমন অবস্থায় এই রাজ্যের ছবি ও ছবির জগৎ যদি মাঝে মধ্যে পেছন ফিরে তাকায় তাহলে বোধ হয় তাকে তেমন দোষ দেওয়া যাবে না।

অতীতের কয়েকটি পাতা ওল্টালে সর্বপ্রথমেই যে নামটি সার্থক গল্পকার হিসাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিনি শরৎচন্দ্র। তিনি শুধু সার্থক কথাসাহিত্যিক নন, সর্বাধিক সংখ্যক সফল বাংলা ছবির কাহিনীকারও বটে।

সেই ১৯২২ সালে 'আঁধারে আলো' গল্প দিয়ে শরৎচন্দ্রের পর্দায় আবির্ভাব। আজ প্রায় পঞ্চান্ন বছর হতে চললো— তাঁর কাহিনীর আবেদন বিন্দুমাত্র কমেনি।

এর আগে প্রমথনাথ ননীগোপাল ট্রফি জিতেছে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব যথাক্রমে ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৭১, আর রানার্স হয়েছে ১৯৫৭, ১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে। ১৯৭০ থেকে মাত্র দুবার কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব কিছুটা উজ্জীবিত হয়েছিল। ১৯৭০-এ ন্যাশানাল সুইমিং ক্লাবকে হারিয়ে কলেজ স্কোয়ার বিজয়ী হলেও পরের বছরে '৭১-এ সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কাছে হেরে গিয়ে রানার্স হয়। ন্যাশন্যাল সুইমিং ক্লাব এই ট্রফিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছে কয়েকবার। ১৯৫৭-তে বিজয়ী হওয়া ছাড়া '৫৬ ও পরবর্তী কালে '৭০ সালে রানার্স হয়েছে। আর এখন ত' ওয়াটারপোলো মানেই এখন রেলদল।

শ্যামচাদ দত্ত মেমোরিয়াল (জুনিয়ার) ট্রফির সূচনা হয় ১৯৫৬-এ। প্রথম বছর ওয়াই. এম. সি. এ. সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবকে হারিয়ে প্রথম ট্রফি জয়ের নজির রেখেছে। বর্ত্তমান ('৭৬) মরশুমে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দলকে ৭-৩ গোলে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হয়েছে। ১৯৫৭ সালে কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব সেন্ট্রালকে হারিয়ে এই ট্রফি পেয়েছিল। এই ট্রফিতে কোন দলই একাধিপত্য দেখাতে পারে নি। ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে ট্রফি। হাটখোলা ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব, সেন্ট্রাল, ন্যাশন্যাল, ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোসিয়েশন ওয়াই. এম. সি. এ. ক্যালকাটা ইউনি-ভারসিটি স্পোর্টস বোর্ড প্রভৃতি দল মাঝেমধ্যে এক আধবার পেয়েছেন এই ট্রফি।

কামিনী দত্ত মেমোরিয়াল ট্রফি এবার জিতেছে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ইষ্টার্ণ এয়ার কমাণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে।

কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে প্রধানত ষ্টেট ট্রান্সপোরট, ষ্টেট ব্যাংক, সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব, ওয়াই. এম. সি. এ., ফুড করর্পোরেশন, ক্যালকাটা স্পোর্টস ক্লাব, হাটখোলা, ইষ্টার্ণ রেল, সাউথ ইষ্টার্ণ রেল প্রভৃতি দল ওয়াটারপোলো খেলায় মেতে ওঠে। এর মধ্যে বর্ত্তমানে রেল দলের আধিপত্য ক'লকাতার ওয়াটারপোলো ইতিহাসে নজীর সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের কাছে অন্যান্য দলের কোন স্থানই হয় না অনেকটা ফুটবলে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানেরই মত প্রায়। তবুও আজ সর্বভারতীয় ওয়াটারপোলোতে বাংলা দল উপেক্ষিত এত ভাল দল এত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা থাকতেও।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও বাংলা আজ ওয়াটার পোলো এবং সাঁতারে উপেক্ষিত। কিন্তু বললে একটুও বেশী বলা হবে না যে ভারতীয় দলে বাংলার খেলোয়াড়রা পুরোপুরি অপরিহার্য্য। বাংলার খেলোয়াড়রা উপেক্ষিত বলেই ভারতীয় দলের আজ চরম দুর্দশা। একথা সকলেই বুঝতে পেরেছেন। নুতন নতুন কলাকৌশল, আন্তর্জাতিক মানের বল (এখনও আমরা রবারের বলে খেলে থাকি) উন্নত ধরণের পুলের ব্যবস্থা না হলে আমরা উন্নতি করতে পারব না। বাংলা দলেরও প্রয়োজন কঠোর অনুশীলন। ভারতীয় ওয়াটারপোলোর পীঠস্থান প্রমাণে বাংলাকে আরও কঠিন কঠোর ভাবে অধ্যবসায়ী, হতে হবে। বিচক্ষণ প্রশিক্ষক চাই। উন্নতমানের জল চাই। কলেজ স্কোয়ারের জলে আজ সাঁতার কাটাই যায় না। এই জলে বাইরের লোকেরা আজ স্নান করে। এই স্নান অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের প্রশান্ত ধর আর দিলীপ ব্যানার্জি সেদিন রেকর্ড বই থেকে স্মৃতিচারণ করছিলেন। আক্ষেপ করে অনেক কথাই বলেছেন। তবে সাঁতার আর ওয়াটারপোলো তাঁদের প্রাণ ঘর-বাড়ি তাঁদের কথাতেই বুঝেছি।

মাণিক লাল দাশ

শুভদা (১৯৪৮)/ পাহাড়ী সান্যাল ও সুনন্দা দেবী

নির্বাক থেকে সবাক যুগের মধ্যদিনে এসেও বাংলা ছবি এখনও শরৎচন্দ্রকে এড়াতে পারেনি, বোধ হয় পারবেও না। নইলে 'দত্তা' তিন-তিনবার (১৯৩৬ সালে দীনেশরঞ্জন দাসের পরিচালনায়, ১৯৫১-য় সৌম্যেন মুখার্জীর নির্দেশে এবং ১৯৭৬-এ অজয় করের পরিচালনায়) চিত্রায়িত হতো না। কিংবা দেনা পাওনা (১৯৩১ ও ১৯৫৪), পল্লীসমাজ (১৯৩২ ও ১৯৫২), পণ্ডিত মশাই (১৯৩৬ ও ১৯৫১), চন্দ্রনাথ (১৯২৪ ও ১৯৫৭), বড়দিদি (১৯৩৯ ও ১৯৫৭), অরক্ষণীয়া (১৯৫৮ ও ১৯৭২) ইত্যাদি কাহিনীর দ্বিতীয়বার চিত্ররূপ হতো কি? সাহিত্য পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা যেমন অমলিন দর্শকের কাছেও তাঁর আবেদন সমান। ফলে পরিচালক প্রযোজকদের কাছেও শরৎচন্দ্র এখনও তাই অতি আদরণীয়।

কিন্তু কেন তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রিয়তা? একশত বছর পরেও শরৎ কাহিনী কেন বিন্দুমাত্র আবেদন হারায়নি? কারণ—(ক) তাঁর গল্পের আশ্চর্য মানবিক আবেদন, 'মানব জীবনের সুখ-দুঃখ ও অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধ মধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি।' (খ) চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সঙ্গে সমান তালে শরৎ কাহিনীগুলিতে নাটকীয়তার সন্নিবেশ, সেই সঙ্গে ঘটনার টানে ঘটনার ঘনঘটা এক ধরনের গতির সৃষ্টি করত। (গ) তাঁর রচনার চিত্রময়তা এবং (ঘ) সহজ সরল সরস সংলাপ।

এই চারটি গুণের সঙ্গে মিশেছিল তৎকালীন কিছু সমস্যার প্রতি তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ। যদিও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে অনেক ক্ষেত্রেই সেই গ্রাম্য চিত্রটি আজ অনুপস্থিত, কিন্তু সেই বাস্তবতার সঙ্গে শরৎচন্দ্র যে রোমাণ্টিকতার মিলন ঘটিয়েছিলেন তার আবেদন আজকের যন্ত্রসভ্যতায়ও বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং সেই রোমাণ্টিকতার মধ্যে এক ধরনের রিলিফ পাওয়ার চেষ্টা চলে (এখন দেবদাসের মত কোনো যুবককে আজকের সমাজ-ব্যবস্থায় কল্পনা করা যায় না ঠিকই, কিন্তু দেবদাস-পার্বতীর রোমাণ্টিক মুহূর্তগুলো এখনও মনের গভীরে দাগ কাটে)। শরৎচন্দ্রের লেখনীতে যে হৃদয়হরণকারী যাদু ছিল তা আর কারুর কাছ থেকে ঐ সময় পাওয়া যায়নি।

এই কথায় জানি হাঁ-হাঁ করে উঠবেন অনেকে এবং রবীন্দ্রনাথের নামটি সামনে রেখে তর্ক জুড়তেও পারেন। কিন্তু একটি কথা—রবীন্দ্রনাথের রচনায় আবেগের চাইতে মনন ও বুদ্ধির আবেদনটাই বেশী নয় কি? ছবির সাধারণ দর্শক সাধারণ বুদ্ধিরই মানুষ এবং বহুলাংশে আবেগ-তাড়িত। এবং সেই কারণেই অন্তত চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের চাইতে শরৎচন্দ্রের চাহিদা বেশী, জনপ্রিয়তাও।

সামান্য একটি মজার ঘটনাও শরৎচন্দ্রের লেখনীতে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনায় যতদূর জানি কাউকেই তেমন তাই বেগ পেতে হয়নি। তাঁর লেখনীতেই যেন চিত্রনাট্য তৈরী থাকত। অধ্যায়ের পর অধ্যায় চিত্রায়িত করলেই সফল ছবি তৈরী। ফলে কোনো কোনো নবীন পরিচালক শরৎচন্দ্রের কাহিনীকেই তাঁর প্রথম ছবি হিসাবে নির্বাচিত করেছেন এবং একের পর এক সফল ছবি করে খ্যাতিও কম পাননি। তাঁদের প্রয়োগ নৈপুণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় শরৎচন্দ্রের কাহিনী নির্বাচন তাঁদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

একটা সময় ছিল যখন কানন দেবীর শ্রীমতী পিকচার্স শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে বছরের পর বছর ছবি করে গেছেন। যার জন্য দর্পচূর্ণ ('৫২), নববিধান ('৫৪), দেবত্র ('৫৫), চন্দ্রনাথ ('৫৭), ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি ('৫৯) ও অভয়া ও শ্রীকান্ত ('৬৫)—মত পরিচ্ছন্ন ছবি আমরা পেয়েছিলাম। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের অধিকাংশ ছবিই করেছেন শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে। যেমন—পরিণীতা ('৪২), অরক্ষণীয়া (৪৮), স্বামী ('৪৯), নিষ্কৃতি ('৫৩), ষোড়শী ('৫৪), নিষিদ্ধফল ('৫৫) ও মামলার ফল ('৫৬) প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ('৩৫) ও গৃহদাহ ('৩৬), বাংলা ছবির জগতে এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

শরৎচন্দ্রের প্রতিটি চিত্রায়িত গল্প উপন্যাস অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে, মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। একমাত্র ব্যতিক্রম বুঝি 'অভাগীর স্বর্গ' ('৫৬)। অভাগীর দুঃখ ও দুঃসহ যন্ত্রণাকে চিত্ররূপ দেবার মত চিত্রনাট্যকার অন্তত তখন ছিল না। এই ঘটনাই প্রমাণ করে শরৎচন্দ্র শুধু কাহিনীকারই নন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রনাট্যকারও বটে। যার প্রয়োজন আজ বাংলা ছবিতে সবার আগে।

নির্মল ধর

DHANADHANYE
Price 50 Paise

YOJANA
(Bengali)

REGD. NO. D(D) 78
September 15, 1976

দত্তা উল্লেখযোগ্য ছবি

দত্তা (১৯৫৯) সুনন্দা দেবী, পরেশ ব্যানার্জী

চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা নিশ্চয় সাহিত্যের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, যদিও সাহিত্যের 'চাটুবৃত্তি' করে চলচ্চিত্র আজো চলেছে নির্বিঘ্নে। এবং সেক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দত্তার হুবহু চিত্ররূপ যাঁরা অজয় করের দত্তায় খুঁজবেন—তাঁরা কিছু পরিমাণে পরিতাপ করার অবকাশ পেতে পারেন, একান্ত হলো না বলে আক্ষেপ করতে পারেন, বিচার বিশ্লেষণ করে বিস্তর ত্রুটি বিচ্যুতি আবিষ্কারও করতে পারেন। তবু একথা ঠিক যে, অজয় কর পরিচালিত দত্তা ছবিটি এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ভালো ছবি। অন্যপক্ষে বাণিজ্যিক দিক থেকে সফলও হয়েছে নিঃসন্দেহে।

বস্তুত, শরৎচন্দ্রের দত্তা উপন্যাস বাঙালি পাঠকের কাছে নতুন নয়, পক্ষান্তরে সর্বজন পরিচিত ছিল অন্তত দু দশক আগে পর্যন্ত। এর আগে দুবার এটি চিত্রায়িত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের বিজয়া এবং কালাপানি ফেরৎ ডাক্তার আধুনিক নরেনের প্রেমপ্রীতিকে কেন্দ্র করে গোষ্টি গত ধর্মীয় সংস্কারের ওপর কিছু কশাঘাত এবং পরিশেষে জীবন ধর্মের প্রতিষ্ঠাই এই কাহিনীর মূল উপজীব্য। শরৎ-কাহিনীর ঘটনাক্রম চিত্রনাট্যে (সলিল সেন) কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিবর্জন করা হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কাহিনীর মূল সুর বা স্পিরিট ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবে ঘটনা সংযোজন কিছু মামুলি এবং অতি-নাটকীয়। সেগুলি অনায়াসে পরিহার করা যেতো। মনে হয়, চলচ্চিত্র-নির্মাতারা একালের দর্শকের কথা স্মরণ রেখে, কিছু বাণিজ্যিক কারণে চলচ্চিত্রের ঘটনা বিন্যাসে আদ্যন্ত নাটকের মেজাজ-টিকেই রেখেছেন। তার ফলে রাসবিহারী, বিলাসবিহারী চরিত্র বেশ কিছু পরিমাণে স্থূল। এ প্রসঙ্গে বিজয়ার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং নরেনের ছেলেমানুষি কতকটা নাটকীয় ফরমূলা—কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য। সেকারণেই নলিনী এখানে অবান্তর। চলচ্চিত্রের বিজয়া নলিনীর সঙ্গে নরেনের মেলামেশা নিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি করবে কিনা প্রশ্ন জাগতে পারে। ঠিক তেমনি শেষের মধুর পরিণতির জন্যে সস্তা সাসপেন্স রক্ষা কিংবা রাস-বিহারীর হাস্যকর আচরণ রসসৃষ্টিতে অবশ্যই ব্যাঘাত ঘটায়। তবু আশার কথা এই যে, মূল লক্ষ্য এবং পরিণতির ক্ষেত্রে কাহিনী এবং চলচ্চিত্রে খুব বেশী বিবাদ চোখে পড়ে না।

চলচ্চিত্র-প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ছবিতে নতুন কিছু দেখা গেলো না। ছবিটির গতি মন্থর। সেক্ষেত্রে ছবির অবান্তর অংশ, যেমন বৈষ্ণবের গাওয়া একটি গান এবং বিজয়ার মুখে বেমানান 'মোর বীণা... এই দুটি গানই অনায়াসে বর্জন করা যেত। বিলাসবিহারী-নরেনের হাতাহাতির দৃশ্যটি পীড়াদায়ক। তেমনি মাইক্রোস্কোপ কেন্দ্রিক দৃশ্যটি এককথায় অপূর্ব। পরি-চালক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সতর্ক হলে ছবিটি দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং কিছু পরিণত চিন্তা-ভাবনার পরিচয় দিতে পারতেন।

অভিনয়ে বিজয়ার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তাঁর চলা-বলা-অভিব্যক্তিতে চলচ্চিত্রের বিজয়া একটি অভূতপূর্ব চরিত্রসৃষ্টি। দত্তার মূল আকর্ষণ বস্তুত সুচিত্রা সেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নরেন প্রাণবন্ত। উৎপল দত্তের রাসবিহারী অবিশ্বাস্য হলেও, তাৎক্ষণিক মন্দ লাগে না। শমিত ভঞ্জও বিলাসবিহারীর বেশে শুধু চেঁচামেচিই করেছেন। এছাড়া স্বল্প অবকাশে ভালো অভিনয় করেছেন সুমিত্রা মুখার্জি, শৈলেন মুখার্জি, গীতা দে, মাঃ জমিদার প্রভৃতি।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় ছিলেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী ও দুলাল দত্ত। তাঁদের কাজ সাধারণ মানের—তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। ওঁর মুখের গানটি ভালো লাগেনি। আবহ-সঙ্গীত অবশ্যই ভালো। তবে শেষ দৃশ্যে ব্যাণ্ড কেন বাজালেন?

উৎস মিত্র

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

চিঠিপত্র
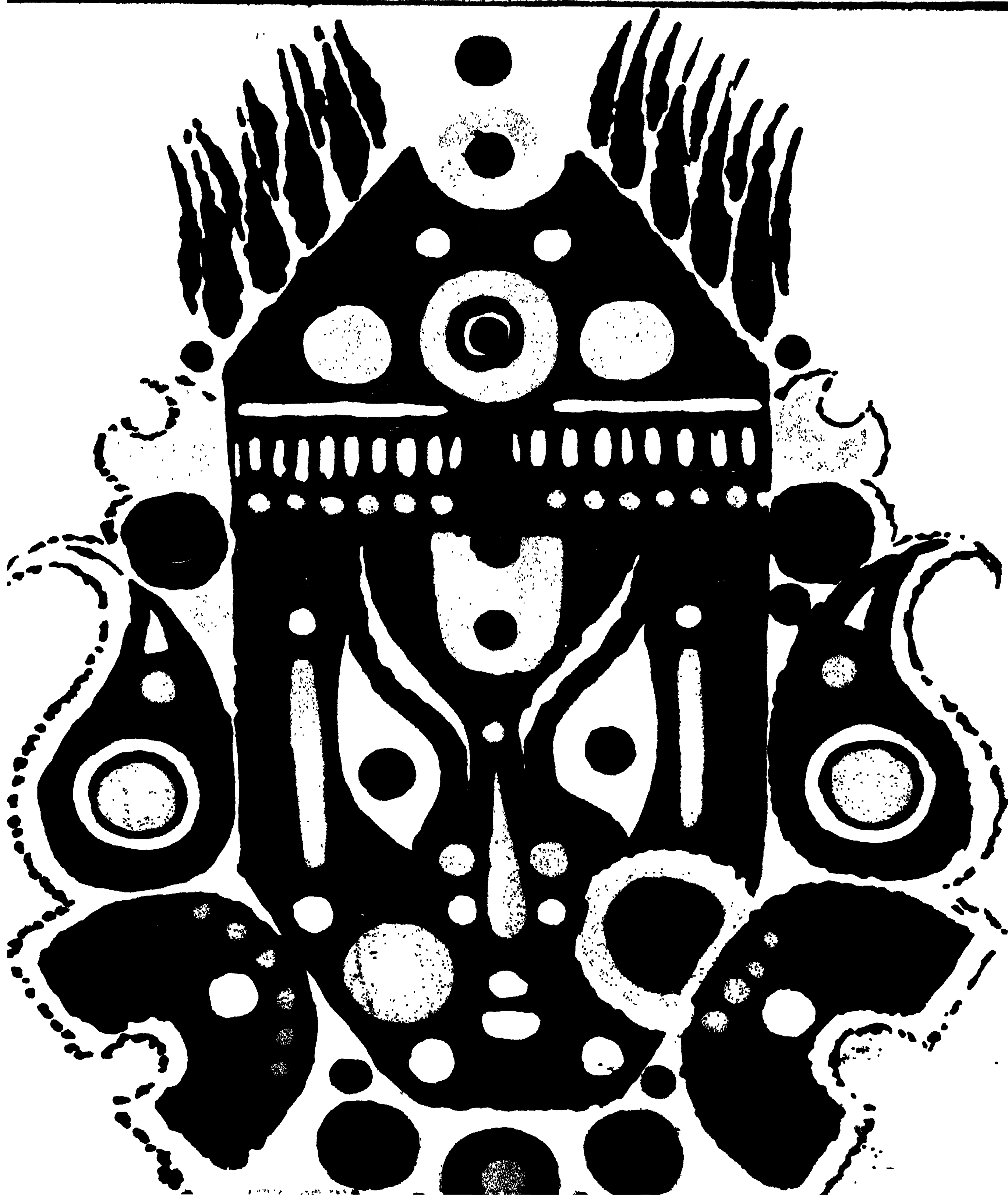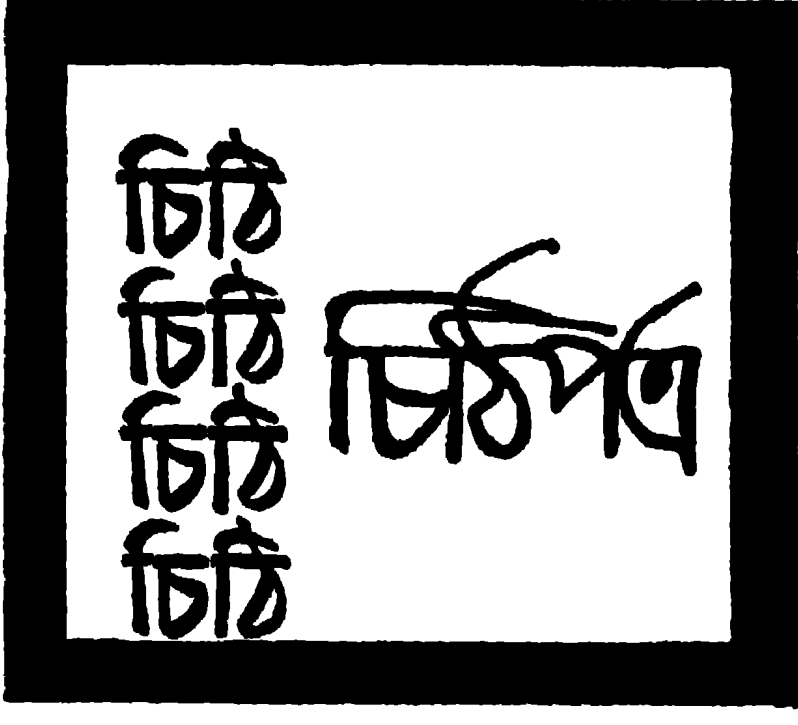
মহাশয়,

ধনধান্যের ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় শ্রীনির্মল ধরের 'জন অরণ্যের' চিত্র সমালোচনার সর্বাঙ্গে অমনোযোগের ছাপ ও চিন্তার দৈন্য সুস্পষ্ট। শঙ্করের কাহিনী অনুযায়ী অমানবিক জনঅরণ্যে নায়কের একাকীত্ব, তার সুকুমার প্রকৃতিগুলির সঙ্গে নিষ্ঠুর বাস্তবের দ্বন্দ্ব এবং অর্ন্তদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নায়কের মূল্যবোধ নিহত হয়েছে বাস্তবের যূপকাষ্ঠে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের হাতে নায়ক প্রথম থেকেই কিছুটা উন্নাসিক। প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানকে সে, চাপে অযথা মিথ্যা আস্ফালন দিয়ে। বেকারত্বের নির্মম যন্ত্রণা তার কাছে দারিদ্র্যের জ্বালা নয়, কাজ না পাওয়ার দুঃখ। ব্যবসায়ে নামার পেছনেও কিছু একটা করতে হবে এই মনোভাব কাজ করেছে। ফলত আকাঙ্খিত অর্ডারটিকে যে ধরণের ঘুষ দিয়ে সংগ্রহ করতে হল সেজন্য পাপবোধ পীড়িত করলেও আত্মগ্লানি তাকে গ্রাস করেনি, তাড়িয়ে ফিরেছে মাত্র। আত্মবিক্রয়ের ঘাটে ধাপে ধাপে নেমেছে নায়ক।

সত্যজিৎ রায়ের এই কাহিনীতে দেখা যায় মূল্যবোধের ক্রমাগত বির্সজনের চিত্র। খণ্ড খণ্ড দু একজন ছাড়া কেউ প্রশ্ন তোলেনা। প্রতিরোধের কথা তো অনেক দূরে। ছাত্ররা টুকাটুকি এবং ব্যবসায়ীরা ছল-চাতুরীকে অবশ্যকর্তব্য রূপে পালন করে, দেহপসারের ব্যবসা চলে অভিনয়ের আড়ালে।

চিত্র সমালোচক লিখছেন--'যে সত্যটির প্রতি শ্রীরায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তীক্ষ্ণভাবে সেটি হল এই সমাজের প্রতিটি অবস্থাকে আমরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি। তৃতীয় অনুচ্ছেদে-- ''বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া এ ধরণের মানসিকতার যে বিস্তার ঘটেছে আমাদের সমাজে তার একটা অতি বাস্তব চিত্রের সঙ্গে এই অবস্থার বিরুদ্ধে কঠিন পায়ে দাঁড়াবার ইঙ্গিতও তিনি রেখেছেন।' এই প্রসঙ্গেই আবার চতুর্দশ অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন—'নির্দেশক এই প্রশ্নটি সরাসরি ছবিতে কোথাও রাখেননি, প্রচ্ছন্নভাবেও এমন কোনো জিজ্ঞাসা কখনও নেই।' স্বতঃবিরোধ সম্বলিত এই চিত্র সমালোচনার অর্থ কী?

সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন এই আত্মবিক্রয় চাপে পড়ে এবং সব কিছু মেনে নেওয়া বিনা প্রশ্নে নয়, অপ্রতিবাদে নয়। তবে কোন প্রতিরোধ নেই। সে প্রশ্ন কখনও নায়কের মুখে, কখনও তার পিতার সোচ্চার কণ্ঠে, কখনও অসহায় নিরুপায় শিক্ষকের চোখে।

দ্বিতীয়ত কয়েকটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। যেমন 'সেকেণ্ড ক্লাস গ্র্যাজুয়েট।' স্নাতকশ্রেণীতে সাম্মানিক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্ন ওঠে। সাম্মানিক ইতিহাসের ছাত্র যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় শুধু গ্র্যাজুয়েট হিসেবে পাশ করে। সুতরাং সে 'ইতিহাসের স্নাতক' হতে পারে না। ফলত 'মাত্র সাত নম্বরের জন্য ফার্ষ্ট ক্লাস হাত ছাড়া' হবার প্রশ্নই ওঠে না। স্নাতক ও সাম্মানিক শব্দ দুটির অর্থ সমালোচকের খেয়াল ছিল না বলেই মনে হয়।

হাজার হাজার জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান কি কেবল মূল্যবোধের বিসর্জনে, আত্মবিক্রয়ে? 'জন অরণ্যে' এই সব প্রশ্নাও পথ হারিয়েছে।

সোমনাথ দে
কলকাতা-১২

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন: ২৩২৫৭৬

প্রধান সম্পাদক: এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা:
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার:
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

টেলিগ্রামের ঠিকানা:
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন:
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে
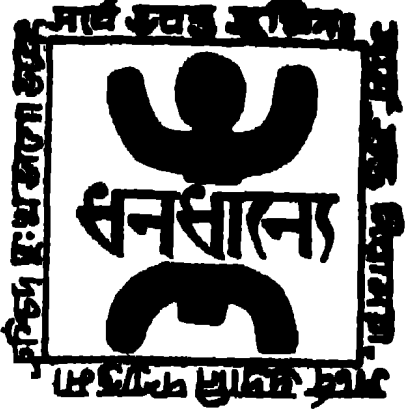
উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১-১৫ অক্টোবর, ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—সীতেশ রায়

সম্পাদকের কলমে

বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব। এ উৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সংগে গভীরভাবে জড়িত। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে ভারতের যেসমস্ত স্থানে মোটামুটি সংখ্যায় বাঙ্গালী আছে সেখানেই এই দুর্গোৎসব মহাসাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি ভারতের বাইরে বিদেশে বহুস্থানে ধুমধাম সহকারে এই মহাশক্তির আরাধনা হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বাঙ্গালী জীবনের উপর কি গভীর প্রভাব এই উৎসবের।

অতীতের দুর্গাপূজার সংগে বর্ত্তমান পূজার অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আগে ব্যক্তিগত পূজাই বেশী হত। ধনী গৃহস্থ ও জমিদারেরাই এই পূজা করতে সক্ষম হত। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই সেই উৎসবে যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করত। সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে আর্থিক ও সামাজিক অনেক পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটেছে। ফলে এই অনুষ্ঠানের প্রকৃতি অনেক বদলেছে। এখন ব্যক্তিগত পূজা খুবই সীমিত। সর্বজনীন পূজাই অধিক সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সর্বজনীন উৎসবে দশ জনের প্রদত্ত চাঁদা দিয়ে উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করার চেষ্টা করা হয়। আর্থিক সামর্থানুযায়ী চাঁদা আদায় করাই বাঞ্ছনীয়। জোর করে চাঁদা আদায় করে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে চাঁদা দাতা কিছুতেই সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে পারেনা। ফলে উৎসবের উদ্দেশ্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এই উৎসবে আনন্দ উপভোগটাই আনুষ্ঠানিক পূজার থেকে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই দিনগুলির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। নতুন জামাকাপড়তো আছেই তা ছাড়া পূজার ক'টা দিন নিকট আত্মীয়স্বজনদের সংগে মিলিত হয়ে একত্রে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে থাকে। তবে সম্প্রতি সর্বজনীন পূজার বাহ্যিক আড়ম্বরের আধিক্য দেখা যায়। যদিও এই আড়ম্বরের প্রয়োজন আছে তথাপি এমন কিছু মাত্রাতিরিক্ত করা ঠিক নয় যেটা সুরুচির পরিচয় বহন করেনা। তাই আধিক্য বর্জন করে সকলেই যাতে উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিলে উৎসবের মর্যাদাও বাড়ে আর উৎসবও সার্থক হয়।

এই যে বিরাট উৎসব এতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়ে থাকে। আনন্দোৎসবে একটু বেশী অর্থব্যয়ই হয়। সকলেই সামর্থ্যের অধিক ব্যয় করে থাকে। দেশের ধনী দরিদ্র সকলেই যদি এই আনন্দ যজ্ঞের শরিক হতে পারে তবেই এ উৎসবের সার্থকতা। এই উৎসবের দিনে তাই মনে পড়ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গৃহহারা মানুষদের কথা। সাম্প্রতিক বন্যায় পশ্চিবঙ্গের মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের বহু মানুষ বিপন্ন। কিছুদিন আগে ঘূর্ণিঝড়ে ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার অসংখ্য লোক দুর্দশাগ্রস্ত। এই উৎসবের আড়ম্বরতা সামান্য কমিয়ে এই দুর্গত মানুষদের সাহায্যকল্পে কিছু অর্থ যদি প্রেরণ করা যায় তবে নিঃসন্দেহে সার্থকতর হবে এই আনন্দোৎসব।

শক্তিসাধনা ও স্বাদেশিকতা

ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

স্মরণাতীত কাল থেকেই শক্তিসাধনার পুণ্যপীঠ ভারতভূমি। এই জগৎ ও জীবন এক অচিন্ত্য এবং অনন্ত মহাশক্তিরই লীলাবিলাস। সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চের যা কিছু প্রকাশ তারই অন্তরালে রয়েছে এক মহাশক্তিময়ী চৈতন্যশক্তির অপূর্ব অস্তিত্ব। তাঁকেই আবার চৈতন্যময়ী মহাদেবী বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নামে আখ্যাত করা হয়। ভারতের এক নারী ঋষি দেবী বাক্ ধ্যানযোগে বিশ্বপ্রকৃতি তথা মহাশক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব ক'রে ঘোষণা করেছিলেন--"রুদ্র, বসু, আদিত্যাদি দেবরূপে আমিই বিশ্বের সর্বত্র বিচরণ করি এবং সকল ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করি। বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর সকল ক্ষেত্রে আমারই শক্তির লীলা। আমি বিশ্বাতীত, আবার বিশ্বরূপা। আমিই রাষ্ট্রশক্তি। সর্বত্র আমারই মহিমা প্রকটিত।"

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা—
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর—
র্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥"

(ঋগ্বেদ—দেবীসুক্ত)

কেনোপনিষদে বহুশোভমানা হৈমবতী উমা রূপে শক্তিময়ী, দীপ্তিময়ী, দ্যোবনশীলা এই মহাদেবীর আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। তিনিই আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবী দুর্গারূপে বন্দিতা—"অগ্নিবর্ণা, তপোভাস্বরা, কর্মফলদায়িনী, দুর্গতিনাশিনী এই মহাদেবী দুর্গাকে। অসুরবিনাসের জন্য বন্দনা করি" —

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
অসুরান্ নাশয়িত্র্যৈতে নমঃ ॥"

বৈদিক ঋষি ধ্যানদৃষ্টিতে ধরিত্রীকে জড় প্রকৃতি বা ভূমিমাত্রাবশিষ্টা রূপে দেখেননি। তাঁদের মতে মাতা ধরণী—"প্রাণদায়িনী, স্তন্যদায়িনী কল্যাণী মাতা।" ঋগ্বেদে তিনি বন্দিতা, অথর্ব বেদে ধরিত্রীসুক্তে নন্দিতা। পুরাণে মহাশক্তিই ভূশক্তি এবং বিষ্ণুশক্তি রূপে কীর্ত্তিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তসতী চণ্ডীতে মহীরূপে স্থিতা মহাশক্তি তথা জগন্মাতাকে বন্দনা করা হয়েছে—

"আধারভূতা জগদস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।"

চণ্ডীতে "শাকম্ভরী রূপে তিনিই আবার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেবী অন্নপূর্ণা। তন্ত্রে সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে পরমাশক্তিই জন্মদাত্রীমাতা, পয়স্বিনী গোমাতা এবং দেশমাতা রূপে আমাদের কাছে আবির্ভূতা"—

'সর্বপ্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গো পয়স্বিনী।
মহাশক্তের্জগন্মাতুঃ প্রতিরূপ সুশোভনা ॥

শক্তিসাধনার এই বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী ধারা দুইটি ভারতে চিরকালই স্বাদেশিকতার গংগা-যমুনা সংগম যুগে-যুগে রচনা করেছে। তাইতো রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠে প্রচলিত প্রবাদে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী দেবী "ভবানীকে" ইষ্টদেবীরূপে গ্রহণ ক'রে স্বাদেশিকতায় সমগ্র জাতিকে সেদিন প্রবুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গভারতের নব-জাগরণে শক্তি-সাধনার এই স্বদেশীয় ধারাটিই নানা ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের স্থিতধী পুরুষ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৭৬ এ "পুষ্পাঞ্জলি" গ্রন্থে জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী "অধিভারতীকে" অন্নদানরতা মাতৃমূর্তি এবং দুর্গতিনাশিনী মহাদেবী রূপে দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে স্তুতি রচনা করলেন—

"মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতল-পুণ্যতীর্থাং।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃত সমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌকিরীট ভূষাম্।
হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলাঙ্কিতা
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরংগিণী সুরধনী পীযুষ-নিঃস্যন্দিনী

সূর্যেন্দু প্রাতবিম্বিতারমূলসৎ প্রালেয়-মৌলি জ্বলা সৌম্যা স্যাদধিভারতী ভয়হরা
নিত্যানুদা সান্তয়ে ॥"

এর পরেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি—"বন্দে মাতরম্" ধ্বনি এবং সঙ্গীত। যা মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায়, তাই হ'চ্ছে মন্ত্র আর সেই মন্ত্র যিনি দর্শন করেন তিনিই হলেন ঋষি—"ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টার:"। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মৃন্ময় মাতৃভূমিকে চিন্ময় মহাশক্তিরূপে বন্দনা করলেন এই মন্ত্রে এবং সঙ্গীতে। ঐ ১৮৭৬এ এই সঙ্গীত রচনা হয়। ফলে এই বৎসরটি হ'চ্ছে সেই "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পুণ্য বর্ষ। এই সঙ্গীতই দিল ভারতের মুক্তি যজ্ঞের বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারী মঙ্গল মন্ত্র। ১৮৮২তে "আনন্দমঠ" উপন্যাসে এই সঙ্গীতটি সন্নিবেশিত হ'লেও রচিত হয়েছিল ১৮৭৬এ। দেবভাষায় মধুর এবং গম্ভীর শব্দ সংস্কারের সঙ্গে বাংলা ভাষার লালিত্যের মিশ্রণে রচিত এই অনবদ্য সঙ্গীত। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে-লালিত্যে, মাধুর্যে-গাম্ভীর্যে হৃদয়কে আপ্লুত করে ভারতের চিরন্তন কালের এই জাতীয় সঙ্গীত।—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্রজ্যোৎস্না—পুলকিত—যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত—দ্রুমদল—শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকন্ঠ—কল-কল—নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভূজৈর্ধৃত—খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিনীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিনীং মাতরম্॥

তুমি বিদ্যা ,তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বংহি প্রাণা: শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলাকমল-দলবিহারিণী,
বাণীবিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

১৮৯৬তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই বন্দে-মাতরম্ সংগীতটি ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে চিহ্নিত ক'রে তাঁর দিব্য কন্ঠে পরিবেশন করেন। সেইদিন এই সঙ্গীত যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, সেই উন্মাদনাই বিবিধ পথে বিচিত্র প্রেরণায় দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল। এই "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতই ভারতের সেদিনের সশস্ত্র বিপ্লবের ছিল জাগরণ মন্ত্র। যোগী ঋষি শ্রী অরবিন্দ এই পরম্পরাগত সাধনা এবং বন্দে-মাতরম্ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে লিখলেন—

"অন্যলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলি মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে। আমি দেশকে মা বলিয়া জানি। ভক্তি করি, পূজা করি"। বরোদা প্রবাসকালে যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের কাছে যোগদীক্ষা নিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনের জন্য বিন্ধ্যপর্বতে "ভবানী" মন্দির প্রতিষ্ঠা, তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতিতে সংগ্রামীদের দীক্ষাদান করে মাতৃচরণে নিবেদনাদি ঐ ধারারই অনুশীলন। তারপর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সমগ্র দেশে দেশমাতৃকার অখণ্ডত্ব রক্ষার যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, তার মূল মন্ত্র ছিল—"বন্দে মাতরম্"। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ক'রে দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দান করেছিলে ভারতের প্রতিটি বিপ্লবী সেদিন এই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে। সমগ্র দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার কন্ঠে কন্ঠে সেই দিন এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে বিদেশী সরকারকে বিব্রত ক'রে তুলেছিল। এই 'বন্দে মাতরম্'' ধ্বনি উচ্চারণ না করার জন্য বিদেশী শাসক অত্যাচার যতই তীব্র করতো, ততই নিপীড়িত দেশসেবীর কন্ঠে উচ্চকিত হ'ত এই মন্ত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহিংস অহিংস সকল সংগ্রামীরই জপমন্ত্র ছিল এই "বন্দে-মাতরম্"। তিলক, অরবিন্দ, খুদিরাম, কানাইলাল, সূর্যসেন, মাতঙ্গিনী হাজরা, গান্ধী, সুভাষ সকলেই এই মন্ত্রে উজ্জীবিত। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম হ'য়েছে রুটি এবং রুজির জন্য। তার পশ্চাতে কোন অধ্যাত্ম চেতনা ছিলনা। একমাত্র ধর্মভূমি ভারতেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে ছিল এই পরম্পরাগত মাতৃ তথা অধ্যাত্ম-সাধনা নির্ভর শক্তি সাধনার সুমহৎ ঐতিহ্য। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহাশক্তির "ভারতমাতৃকা" রূপে পূজা, যার ধ্যানমন্ত্র রচিত হয়েছিল—

"বন্দে ভারতমাতরং হিতরতাং ধর্মার্থদাং
মোক্ষদাম্
আরাধ্যামৃষি সেবিতামনুপমাং শস্যান্বিতাং
শোভনাম্।
ফুল্লাব্ধাং শৈলরম্যাং সুবিমল-সলিলাং
শ্যামলাং রত্নভূষাং
ত্রৈলোক্য-প্রীতিগীতাং হিমগিরিমুকুটাং
সাগরৈর্ধৌতপাদাম্॥

এই শক্তি সাধনাই ভারতে স্বাদেশিকতার উৎস। স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশমাতৃকার যে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি গঠনের পরিকল্পনা চলেছে, তখন যুগান্তরেও বিংশ শতাব্দীর মনীষী সাধক বরেণ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণের কন্ঠে মহাদেবীকে ভারত-মাতৃকা রূপে বন্দনা করি—

"উদ্যৎ-স্বর্ণ করোজ্জ্বলাদ্রি-মুকুটাং
নীলাব্ধিনীরাঞ্চলাং
শ্যামাং কানন-কুন্তলাং চ ললিতাং
পুণ্যপ্রভাবশীতলাম্।
কাশী-বঙ্গ-কলিঙ্গ-দ্রাবিড়যুতাং
সৌরাষ্ট্র-রম্যস্থলাং
বন্দে ভারত-মাতৃকাং চ বরদাং
গঙ্গাসরিন্মালিনীম্॥"

নজরুল আর জীবনানন্দ, বাঙালীর প্রিয় এই দুই কবিই রবীন্দ্রযুগের জাতক ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'মানসী' বেরিয়ে গেছে যখন, তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক অবিস্মরণীয় কবিপ্রতিভা বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সেই স্বীকৃতিও হঠাৎ ঘটেনি। স্বীকৃতি ও সন্দেহ দুইই-চলছিল। নজরুল্ বা জীবনানন্দ কেউই তখনো জন্মগ্রহণ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পান, সেই দশকেই কবিতার অনুভবে নজরুলের এবং জীবনানন্দের, উভয়েরই প্রবেশ ঘটে। কিন্তু শতকের তৃতীয় দশকেই তাঁদের কাব্যচর্চার ব্যাপ্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' (১৯২৩) বেরিয়ে গেছে তখন এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লোকান্তরিত হয়েছেন (১৯২২)। চন্দ্র নাগ এবং আরো অনেক কবি-সাহিত্যিকের সেই আদিপর্বের বন্ধু ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের 'বসন্ত' বইখানি উৎসর্গ করেন। জীবনানন্দের প্রথম দিকের কবিতায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও 'প্রথমা'তে নজরুলের প্রবল ও কোমল ব্যক্তিত্বের প্রভাব চোখে পড়ে। মোহিত-লাল মজুমদার তাঁর খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন সে পর্বে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ, শব্দ এবং তাঁর কবিতায় বিষয়ের দিক থেকে বিশেষতঃ জনজীবনের দিকগুলি নজরুলকে খুবই আকর্ষণ করেছিল—যেমন, সেই রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তির মধ্যেই আমাদের আরো কোনো কোনো প্রিয় কবিকেও সেসব আকর্ষণ করে। নজরুলের কবিতা ছিল সংক্রামক।

তিনি তাঁর প্রবল, সহাস্য, সম্প্রদায়-শুচিবায়ু ছিলনা। তাঁর হাতের বীণা সবসময়ে অগ্নিবীণা ছিল,—এ ধারণাও ঠিক নয়। অনেক স্নিগ্ধ, কোমল স্বাদ ধ্বনিত হয়েছে সে বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে। তিনি যে শুধু কবি ছিলেন, তাও নয়; অনেক না-হোক, বেশ কিছু গদ্য রচনাও রেখে গেছেন তিনি। শক্তির বরপুত্র ছিলেন তিনি। শক্তির সাধনাই তিনি ক'রে গেছেন। পরিচিত পরিভাষা ব্যবহার কর'লে বলতে হয় যে তিনি একজন রোমাণ্টিক কবিই ছিলেন। কিন্তু সে তো তাঁর পূর্ণপরিচিতির বাচক নয়। তাঁর কবিব্যক্তিত্ব কি কোনো ইস্কুলগ্রাহ্য 'লেবেল' দিয়ে বোঝানো যায়? ছোটোদের জন্যে লেখা তাঁর একটি কবিতায় তিনি বলেন—"নাম-হারা তুই পথিক শিশু!" নজরুল হয়তো তাই-ই।

কবি নজরুল ইসলাম

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪–১৮) নজরুল হন 'হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর 'অগ্নিবীণা'র 'বিদ্রোহী' কবিতা সেকালের ব্রিটিশ-শাসনাধীন স্বাধীনতাকামী বাঙালী কাব্যানুরাগীর কন্ঠে-কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সর্বহারা', 'ফনিমনসা', 'সিন্ধুহিন্দোল', 'চিত্তনামা', 'ঝিঙেফুল', 'জিঞ্জির' ইত্যাদি অসংখ্য কবিতার বই বেরিয়েছে নজরুলের। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কথা লিখে গেছেন। নলিনীকান্ত সরকার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এঁরাই তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছেন সে-পর্বে। শৈলজানন্দ মুখো-পাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রবোধ কুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুল সংকোচহীন, স্বাধীন তেজস্বিতায় ও প্রেমের গুণেই তাঁরা শৈশব ও বাল্যপর্বের চরম দুঃখদুর্দশার অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে-পুড়ে যখন প্রতিষ্ঠার দিবালোকে বেরিয়ে এসে একটি আসন খুঁজছিলেন তখন দেশ তাঁকে একেবারে সিংহাসন দিয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশেই দ্বিতীয় সিংহাসন। ব্রিটিশ সরকার কেঁপে উঠেছিল তাঁর প্রবল প্রাণাবেগের ধ্বনিতে। যাঁরা গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দলাদলি নিয়ে কারবার করে থাকেন, তাঁদের বিপক্ষে ছিলেন নজরুল। সমাজের দলিত, শোষিত, নিপীড়িত যাঁরা, তাঁদের ভাব-সংকটত্রাতা ছিলেন নজরুল। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, বাংলা—কোনো শব্দেই তাঁর

খুবই আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। দিলখোলা সেনাপতি যেন,—যেন বীর প্রেমিক,—যেন চিরশিশু,—যেন চিরবিপ্লবী বীর!

'কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে যা'—সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ-ফৌজের এ গানের অনেকদিন আগে তিনি লিখেছিলেন—"জোর কদম্ চল্ রে চল্।" সেই 'জিঞ্জির'-এর 'অগ্র পথিক' মনে পড়ে। মনে পড়ে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পরে তিনি লিখেছিলেন 'ইন্দ্র-পতন'। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ অনুরাগ ছিল তাঁর। তাঁর 'সর্বহারা'-র 'ফরিয়াদ' কি ভোলা যায় আজও? ভগবানকে 'পিতা' বলেছিলেন সেদিন—

"এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার; উত্তর দাও আদি পিতা
ভগবান।"

সেদিন জনগণের বেদনার সামিল হয়েই তিনি তাঁর কবিতায় লেখেন—

"জয় নিপীড়িত প্রাণ।
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান।"

নিজের কর্ম ও ধর্মের কৈফিয়ৎ দিয়ে লেখেন—

"বর্তমানের কবি আমি ভাই,
ভবিষ্যতের নই 'নবী'
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে
মুখ বুজে তাই সই সবি।

রবীন্দ্রনাথ যে 'বিশ্বকবিসম্রাট'—এ উপাধি তাঁরই দেওয়া। নজরুল রবীন্দ্র-যুগের প্রাণবন্ত সর্বপ্রিয় একজন বাঙালী কবি ছিলেন। শক্তির পূজারী এই কবির 'সাম্যবাদী' নামে 'লাঙ্গল' পত্রিকা থেকে তোলা চটি কবিতাগুচ্ছটি মনে পড়ে যাতে তাঁর মন্তব্য ছিল--

বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে
যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-
বাইবেল-ত্রিপিটক,
জেন্দা বেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও
যত সখ,—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম,
মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কশাকশি?
—পথে ফুটে তাজা ফুল।
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব
সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা
খুলে দেখ নিজ প্রাণ।

সাম্যবাদী নজরুলের এই ছিল সাম্যবাদ। এর নামান্তর বোধ হয় মানববাদ হতে পারে। এবং তাঁকে যাঁরা কেবল ভাঙনের গানের গায়ক মনে করেন,—যাঁরা 'প্রগতি'র বিপক্ষে রাখেন 'ঐতিহ্য'কে, তাঁরা কি বলবেন তাঁর সম্বন্ধে? বিদ্রোহী কবি নজরুলই চিরকালের ভারত-ভাব-ধর্মের ঐতিহ্যবাহী ছিলেন। এসব ছত্র পড়লে সত্যিই আজও কি তাঁকে চুরুলিয়া-আসানসোলের,—বীরভূমের বাউলদের উত্তর-অধিকারী মনে হয় না? 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কেম্‌নে আইসে যায়!' সেই বেদনাই মানুষের গভীরতম আত্মজিজ্ঞাসা।

তিনি সাম্যের গান গাইতে গাইতে ঐক্যের দেবীকে নিজেরই অন্তরলোকে পেয়েছিলেন। যিনি একদিন লেটোর দলের বালক-নজরুল ছিলেন, তিনিই রাগপ্রধান, ইসলামী, লোকগীতি, শ্যামা-সংগীত লিখে গেলেন ভূরি পরিমাণে। তাঁর ভগবান কখনো পিতা ছিলেন, পরিণামে জননী হলেন। আঠারোর শতকের রামপ্রসাদের সঙ্গে আমাদের শতকের কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) এই দিকটিতে কোনো ভেদ নেই। তাঁর 'তাপসিনী গৌরী জাগে', 'ব্রজগোপী খেলে হোরি', 'জয় দুর্গা দুর্গতিনাশিনী', 'তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা'—এইসব গানের সঙ্গে 'আমি আল্লার নামে বীজ বুনেছি', 'তুমি অনেক দিলে খোদা', 'লহ সালাম লহ, দীনের বাদশাহ' —এসব গানের মর্মব্যঞ্জনার প্রভেদ কোথায়? একটি ইসলামী গানে তিনি লেখেন—

সোজা পথে চলরে ভাই ইমান থেকো ধ'রে।
খোদার রহম মেঘের মত ছায়া দেবে তোরে॥

বিদ্রোহী মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত চিনেছিলুম আমরা। ১৯৪২ থেকে সেই যে তিনি মূক হয়ে দিন যাপন ক'রে গেছেন, ১৯৭৬-এ যখন চলে গেলেন, তখন বুঝি বলে গেলেন--

সকাল হোলো, শোনরে আজান,
ওঠরে শয্যা ছাড়ি,
মসজিদে চল দীনের কাজে,
ভোল্ দুনিয়াদারী॥

স্বগ্রাম চুরুলিয়ায় তাঁর মরদেহ তাঁর চিরপ্রিয়া পত্নী প্রমীলাসুন্দরীর পাশে শায়িত হবার দৃশ্যটি তিনি নিজেও অনেকবার স্বপ্নদর্শনে অনুভব করে গেছেন। কিন্তু তা হোলো না। খোদার অভিপ্রায়?—শ্যামা মায়ের ইচ্ছা?—অমোঘ নিয়তি? ভাবতে ভাবতে চোখে জল আসে। তাঁরই গানের ভাষায় মন বলে—

ওই ঘর ভুলানো সুরে—
কে গান গেয়ে যায় দূরে!

[শ্রীমতী এণাক্ষী গোস্বামীর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় দুর্গা

স্নেহময় সিংহরায়

বাঙালি শক্তিসাধক। এই শক্তি-সাধনার দুটি ধারা। এক মাতৃরূপে (জগজ্জননী) মহাশক্তির সাধনা, আর সেই মহাশক্তিকে নিজগৃহের কন্যারূপে দেখা। প্রথমটিতে ঐশ্বর্য, দ্বিতীয়টিতে মাধুর্য। বাঙালি লৌকিক ধর্মচর্চায় চিরকাল ভগবানের সঙ্গে এই মাধুর্যের সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পদাবলীর সূচনা করেন। এই শাক্ত পদাবলী কাব্যের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এক, বিশুদ্ধ সাধন-সংগীত, দুই, লীলা-সংগীত। এদের আবার যথাক্রমে শ্যামা-সংগীত ও উমা-সংগীত নামেও চিহ্নিত করা চলে। উমা-সংগীতে ভক্তি কল্পনার ঐকান্তিকতায় বিশ্বজননী মহাশক্তি দুর্গা বাঙালি ঘরের দুহিতা উমায় রূপান্তরিত হয়েছেন। এই উমাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জনমানসের তথা বাঙালি মাতৃহৃদয়ের কন্যাসন্তানের জন্য সুগভীর স্নেহমমতা-বাৎসল্য উৎকণ্ঠা মিলন বিচ্ছেদের সুখ ও আর্তি সুচিহ্নিত হয়ে আছে।

উনিশ শতক বাঙালির নবজাগরণের যুগ। এই নবজাগরণের একটি বৈশিষ্ট্য, বাংলার চিরপ্রবহমান সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন। এযুগে বাংলার আগমনী বিজয়া গানেও তার আবহমান কালের রূপটি নতুন সার্থকতায় রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও এই কাব্যধারায় একমাত্র কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ব্যতীত নতুন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয়নি, তবু বহু কবির কবিতায় তার বৈচিত্র্যময় রূপ ও ব্যঞ্জনা সংযোজিত হয়েছে। কবিওয়ালাদের 'ভবানী বিষয়'-ক গানে দুর্গা তথা উমার পিতৃগৃহে আগমন ও বিদায়ের মর্মব্যথা প্রকাশিত হয়েছে। হরু ঠাকুর, রাম বসু ও দাশরথি রায় প্রমুখ বিখ্যাত কবিওয়ালা ও পাঁচালিকারের আগমনী-বিজয়া গান এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমে কমলাকান্তের আগমনী-সংগীতের উল্লেখ করা যাক—

আমি কি হেরিলাম নিশি—স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরি আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে!

রাম বসুর সংগীতে—

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন—
এল হে, সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে—'মাকৈ, মাকৈ, মাকৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।'
অমনি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।
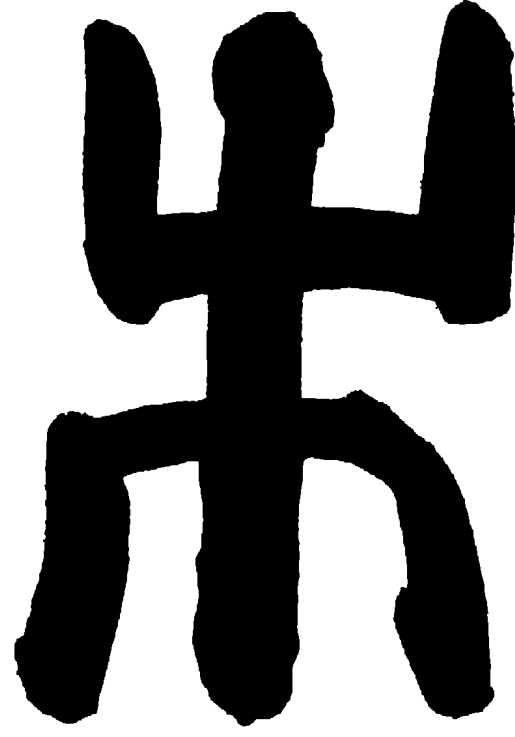
হরু ঠাকুরের পদাবলীতে লক্ষ্য করা যায়—

গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে,
পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচুলো বেদনা সকল যন্ত্রণা।
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে ঝিয়ে দেখা হোতো না।

দাশরথি রায়ের গানে মা মেনকার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতায় অপূর্ব কারুণ্য সঞ্চার—

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল!
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো॥

দেবীর ঐশ্বর্যময় মূর্তি অপেক্ষা মাধুর্যময় মূর্তি কবিচিত্তকে বেশি আকর্ষণ করেছে। তাঁর সংগীতে মা মেনকা 'রণরঙ্গিণী' 'ত্রিলোক-জননী'কে বরণ করতে চাননি, তিনি চেয়েছেন উমা 'নন্দিনী', 'ইন্দু-বদনী'কে। বিজয়ার গানেও কবির দক্ষতা অনবদ্য ভাষায় রূপ পেয়েছে—

গিরি, যায় হে ল'য়ে হর প্রাণ-কন্যা গিরিজায়।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী,
বাঁচে পাষাণী, গিরি! যায়!!

এই 'প্রাণ-কন্যা' উমার আগমনী-বিজয়া সম্পর্কে কবিওয়ালাদের গানে লৌকিক ধর্মচেতনার অনুপ্রবেশ এবং অধ্যাত্ম-আবরণের অন্তরালে বাস্তব জীবনের আকুতির স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রস্তুতি সূচিত হয় ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য রচনায়। এই আধুনিকতার ভিত্তি মানব-জীবন সম্পর্কে কৌতূহলের ব্যাপ্তিতে ও বৈচিত্র্যে এবং মানবজীবনরসসৃষ্টিতে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে কবিওয়ালাদের কাব্য-সংগীতে আংশিকভাবে এই মানব-জীবনরসস্ফুরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মাইকেলের কাব্য কবিতায় পূর্ণাঙ্গ মানবিকতার প্রবর্তন ঘটে। এজন্য কবিওয়ালাদের বাংলাকাব্যে পূর্ব-সূরিত্বের দাবি অনস্বীকার্য। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়—

কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে।
কি কর হে গিরিবর, যাও যাও, এস জেনে।
সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার,
সার করি যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে।

আগমনী ও বিজয়া-বিষয়ক কবিতায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মাইকেলের 'আশ্বিন মাস' ও 'বিজয়া-দশমী' কবিতা দুটি। 'আশ্বিন মাস' কবিতায় কবি দেবীর আগমনের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন—

এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;

কিন্তু 'বিজয়া-দশমী' কবিতায় কবিচিত্ত বেদনাভারাক্রান্ত, মা মেনকার কন্যাবিচ্ছেদ-জনিত অশ্রুজল এই কবিতায় প্রবাহিত হয়েছে। এখানে দুর্গা 'মহিষমর্দ্দিনী' নন, তিনি একান্তভাবে বাঙালি গৃহের অশ্রুমুখী পতিগৃহগামিনী কন্যা 'উমা'। কবি বলেছেন—(মা মেনকার আর্তি এখানে সুস্পষ্ট)—

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারা দলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বারমাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্তনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এমন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূরকরি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!" –কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

পৌরাণিক ঐতিহ্য-অনুসরণে দুর্গার অসুরনাশিনী রূপ এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য ও প্রাচীন মঙ্গলকাব্য অনুসরণে পার্বতী গৌরী বা উমার রূপ—দুইয়েই বাঙালি জাতির উত্তরাধিকার। কিন্তু সমগ্রভাবে বাঙালি জাতি, বাঙালি সাধক ও কবিগণ মধুর রসের উপাসক হওয়ায় তাঁরা পার্বতী উমার পুণ্যকাহিনীর মধ্য থেকে মধুররূপিনী উমার প্রতিই সমধিক আকর্ষণ বোধ করেছেন। জনমানসের এই সত্য আকাংখাই রূপায়িত হয়েছে উনিশ শতকের দুর্গাবিষয়ক শাক্ত-কবিতায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালি শাক্ত কবিগণের আগমনী-বিজয়া-বিষয়ক কবিতায় তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—বাস্তবতা, সমাজসচেতনতা ও অকুন্ঠ সহানুভূতি। রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্য সাহিত্যে' প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা ঐ যুগের কবিতারও মর্মকথা—'হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলাদেশের একটা বড়ো মর্মের কথা আছে।....কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃপরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে।........শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি-ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।'

এই যুগের অনেক কবির কবিতায় জননী মেনকার আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। অনেক কবিতায় উমার পিতৃগৃহে আসার আকাংক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো কবিতা কৌতূহলোদ্দীপক। এই সব কবিতায় উমা তাঁর মাকে বলেছেন, কে বলে তাঁর জামাতা শিব দরিদ্র, এখন তিনি অতুল ঐশ্বর্য লাভ করেছেন। কবি বলছেন, "উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।" মা মেনকা উমাকে বলেন, "এসেছিস মা-থাক্‌না উমা দিন-কত। হয়েছিস ডাগর ডোগর, কিসের এখন ভয় এত? আবার বলেন, "এখন বুঝি ঘর চিনেছিস-তাই হয়েছি পর, কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে-দিতিস্, নিতে এলে হর। সঁপে দিচ্ছি-পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত।" বিবাহের সময়ে দরিদ্র ও পরে আর্থিক সচ্ছলতায় সমৃদ্ধ স্বামীর কথা পিতৃগৃহে জ্ঞাপন, কন্যার যৌবনকালে পরিণত বুদ্ধিলাভ ও দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে অবস্থানের অনিচ্ছা—এ সমস্ত পারিবারিক তথা সামাজিক তথ্য আভাসিত হয়েছে এ যুগের কবিতায়। এই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতায় চিরন্তন বাঙালি সংসারে কন্যার পিতৃগৃহে আগমন, মাতা-কন্যার সুখে-দুঃখে আনন্দসম্মিলনের চিরন্তন ছবি গাঁথা হয়ে রয়েছে। কন্যা পিতৃগৃহ হতে বিদায় নিয়ে গেলেও তার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় মাতৃহৃদয়ের পুনর্মিলনের আকাংখা মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে। উমার আগমনে পাড়াপ্রতিবেশী-দের যেমন আনন্দের সীমা থাকে না, তেমনি বিদায়ের দিনে তাদের অশ্রুজল বাধা মানে না। সমাজমানসের এই সম্মিলিত আনন্দ ও বেদনাবোধে বহু কবির কবিতা সার্থক ও সমুজ্জ্বল। এ যুগের আগমনী ও বিজয়া কবিতায় যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন—নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অক্ষয় চন্দ্র সরকার। নবীনচন্দ্রের আগমনী-কবিতা—

দেখে আয় তোরা হিমাচলে

ওকি আলো ভাসে রে,
উমা আমার আসে বুঝি
উমা আমার আসে রে।

গিরিশচন্দ্রের বিজয়া-বিষয়ক কবিতায় মা মেনকার উক্তি—

কালকে ভোলা এলে বল্‌বো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে!
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই ব'লে;
যায় যাবে সে, গেলে চ'লে যা হয় তখন দেখবো পরে।

আসন্ন কন্যাবিদায়ের দুঃখে মাতার চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতার এমন অনিন্দ্যসুন্দর করুণ প্রতিচ্ছবি খুব অল্প কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়। মহিলা কবিগণের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতায় ও তরু দত্ত কর্তৃক লিখিত (সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক বাংলায় অনূদিত) 'যোগাদ্যা' কবিতায় দুর্গা বা উমার মানবী রূপের পরিচয় বিধৃত করবার প্রয়াস লক্ষণীয়।

জেতার খেলা

কবিতা সিংহ

বীরেশ্বর হালদার তিনদিন ধরে বকুলকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। শীলারাণী তিনদিন ধরে বকুলের রোলটাকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—ফলে থিয়েটার পাড়ায় বিশ্রী বদনাম হয়ে যাচ্ছে, তবু হিরোইন বকুলের রাগ পড়ল না।

ও হাঁ! বকুল আবার ওকে আজকাল ওই বকুল টকুল বলা পছন্দ করছেনা। ওকে নাকি সমানে চার অক্ষরের ওই পোশাকী 'দীপাবলী' না কি একটা নামে ডাকতে হবে। তা, সে যাহোক এখন তাহলে কি করা? বীরেশ্বর হালদারের 'টাউট' বৃজবিলাস বলছিল বকুলের আজকাল এই থিয়েটার সংক্রান্ত সবতাতেই রাগ। আর রাগ হওয়ার তার কারণও আছে।

তার থিয়েটারে বছর খানেক কাজ করার পর বকুল নাকি আজকাল সিনেমা টিনেমাতেও বড় বড় কনট্রাক্ট পেতে আরম্ভ করেছে।

আসলে বীরেশ্বর প্রথম দিকে বকুলকে যে ভুলভাল সুতো ছেড়ে দিয়েছিল তা ওই হতচ্ছাড়া টাউট বৃজবিলাসের ওপর নির্ভর করে। এবং দুর্ভাগ্যবশত সেই সুতো ছাড়াটা কিছু বুদ্ধির কাজ হয়নি। বৃজবিলাস বলেছিল,—আপনি দেখবেন হালদার বাবু, বকুলকে ফিলমে ভালো দেখাবেনা। ওর ওই রকম চোকো চোয়াল আর বড় কপাল। ওই ছুটকো ছাটকা রোল। কিন্তু সিনেমায় নামতে দিলে সুবিধেটা কি হবে জানেন, সবাই জানবে চলচ্চিত্র জগতের ওমুক আপনার থিয়েটারে কাজ করে। বোকার মত বীরেশ্বর হালদার বৃজবিলাসের কথাটা মেনে নিয়েছিল। তখন তার একবারও মনেও হয়নি যে বৃজবিলাস ফোটোজেনিক ফেস-এর কি বোঝে শোনে?

যত্ত সব।

তখন কত সহজেই না খুশি হত বকুল। প্রথম যেদিন তাকে রাধাবাজারের ঘুঁজি গলির মধ্যে দু ঘরের একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে বলা হ'ল—'বকুল, এ ফ্ল্যাটটা তোমার', তখন বকুল কি ডগমগ। কি খুশি। একবার বিছানার চাদরে হাত বুলোয়। একবার বাইরের ঘরের সোফা কৌচে। রান্না ঘরে গিয়ে খালি রেগে গিয়েছিল বকুল। —

—ওমা, এঘরে থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল ঠাসা কেন শুধু?

—'আহা! হোটেল থেকে খাবার আসবে গো। আমরা আরাম করে বিছানায় বসে বসে খাবো।' বীরেশ্বর বকুলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল, —'তোমার সোনার অঙ্গ কালি করে আমিতো আর নিজের ক্ষতি করতে পারিনা।'

—'না তা চলবেনা। তুমি আমায় এত বড় বাড়ী দিলে, এত আরাম, এত সুখ। আমি তোমায় রান্না করে খাওয়াবো না? সেও কি কখনো হয়? আহা সে সব কি সুখের দিন ছিল। থিয়েটারের সময়টুকু ছাড়া সারাদিনরাত বকুলকে একা একা ভোগ।

সেই বকুল!

থিয়েটারের রবরবা বাড়লো। বুদ্ধি দেবার লোকজন বাড়ল। এর ওর তার গোপন যাওয়া আসা শুরু হ'ল। চোখ কান খুলতে লাগলো বকুলের। জিভ শানাতে লাগলো, নবদ্বীপ থেকে এক জবরদস্ত মাসী এসে গেল—চেহারায়ও, ফুলে ফেঁপে একেবারে পূর্ণ যৌবনে ফেটে পড়তে লাগলো বকুল। আর ততই বীরেশ্বরের বুকের ভেতরের গুরগুরোনি বাড়ীতে লাগলো।

বীরেশ্বর যেক'টা ভুল চাল চেলেছে, সব কটাই ওই বৃজবিলাসের জন্যে। সেই-ইতো তাকে তোল্লা দিয়ে বলেছিল, —'হালদার মশাই, আপনার পরোয়া কিসের। আপনার বাড়ি, আপনার গাড়ি, আপনার টাকা, আপনার রাজত্বিতে আছে। তাতে বকুলের এত তেজ। একবার ডাকবেন নাকি নাক কাটা কানাইকে। শিক্ষে দিয়ে দেবে।'

নাক কাটা কানাই রাধাবাজারের ওই গলির জালগুলোর একচ্ছত্র গুণ্ডা। গুণ্ডা হলেও আবার নানা রকম ফাংসন করে।

গ্যাস খেয়ে কেন যে পরশুর আগের দিন ডাকিয়ে আনালো নাক কাটা

কানাই-কে। আর যায় কোথায়। ব্রজবিলাস বলল—'আমি কি বলব হালদার মশাই, বললে পেত্যয় যাবেন না। বকুলের বাড়ি থেকে কে বেরুল জানেন, স্বয়ং হীরো! আমার তো লাল গাড়িটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।'

কোন্ হীরো আর বলতে হলো না। বীরেশ্বরের গাল ভয়ে ডোল হয়ে উঠলো। ব্রজবিলাস বলল,—'চিল্লাচিল্লী করে ভয় দেখাবার জন্যে, গোটা দুই পেটো ঝাড়তেই দরজা খুলে একেবারে বেরিয়ে এলো ফিলিম লাইনের খুব রগ্‌রগে সেই লোকটা। লোকটাকে যে কখন ঝুলিতে পুরে ফেলেছিল বকুল, কে জানতো। বলল,—কিরে কানাই, আমি এখানে রয়েছি না। তোর একটা ভয়ডর নেই। সরস্বতী পুজো হবেনা। কাকে ওপনিং করতে ডাকবি, আমাকে? না বীরেশ্বর হালদারকে?

ব্যাস সাপের মুখে ধুলো পড়া। নাককাটা কানাই আর ছুটে পালাতে পথ পায়না। সেই থেকে বকুল নিপাত্তা। একবার ঝগড়া করতেও আসেনি।

এদিকে ক্যাবারের সিনে, মাইক্রোফোন হাতে গান গাওয়ার দৃশ্যে বকুলের শিওর ক্ল্যাপ্‌গুলো শীলারাণী ধ্বড়াধ্বড় হারাচ্ছে। থিয়েটার হলে প্রাণই নেই আর। লোকে হাসছেনা, কাঁদছেনা, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেনা। কেবল দেখার জন্যে দেখে যাচ্ছে। এই আর কি!! তাহলে কী?....বীরেশ্বর হালদার তার সামনের সেই গিরিশ ঘোষের আমলের মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ওপর দুপা তুলে দিয়ে সামনের দেয়ালে টাঙ্গানো তারাসুন্দরীর ঝাপ্‌সা ফটোগ্রাফ্‌টার দিকে চেয়ে নিজেকেই বলল, আশা ছেড়ে দেবো?

এলাইনের ঘাঘু পুরোনো পাপী বীরেশ্বর। অমন কত বকুলরাণী এসেছে কত বকুলরাণী গেছে। সেই আরকি। 'ওয়্যান মে কাম, ওয়্যান মে গো, বাট বীরেশ্বর গোজ অন ফর এভার!'

কে যেন বলত? ও: মনে পড়েছে! সেই যে সুশিক্ষিত হীরো। ঘনশ্যাম চৌধুরী। বেশ বলত কইত লোকটা। বেশ রসিকতা করতে পারতো। এখন যাত্রাপার্টিতে সাইড্ রোল করে।

তাহলে এখন কি চাই? নতুন হিরোইন চাই। কোথায় পাওয়া যাবে? হিরোয়িন তো আর তেলাকুচা ফল নয়, যে গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে গাছে গাছে ঝুলে থাকবে। টাউট ব্রজবিলাসের খবর হল অন্য অন্য থিয়েটারে মেয়েগুলো সব নিজেদের নিজেদের থিয়েটার নটবরকে ছুতো করে মিছরির দানার মত আটকে থাকে। থিয়েটার—নটবর মানে থিয়েটারে দলের সমর্থ পুরুষটি। সে হিরোও হতে পারে। ডিরেক্টরও হতে পারে, আবার বীরেশ্বরের মত ডিরেক্টর প্রডিউসারও হতে পারে। মেয়েগুলোর নিয়ম হ'ল কামড়াকামড়ি খেয়োখেয়ি করবে কিন্তু দল ছাড়বে না।

আচ্ছা প্রথম যখন থিয়েটার আরম্ভ করে বীরেশ্বর, তখন প্রথম যে হিরোয়িন হয়েছিল তাকে কোথা থেকে জোগাড় করেছিল বীরেশ্বর। সোনাগাছি থেকে। আহা যেন কানে ঘুঙুর বেজে উঠলো বীরেশ্বরের।

বাগিচায় বুলবুলি তুই—
ফুলবাগিচায় দিসনে আজি দোল
—বাগিচায়।

ঘুরে ঘুরে নাচছিল পরীবিবি। বড় বড় হুম্‌ড়ি খাওয়া আয়নায় তার ছায়া পড়ছিল। তাকে দেখেই বীরেশ্বরের অংশীদার বলেছিল, —'থিয়েটারে এবার চোক কান বুজে আলিবাবা নামিয়ে ফেল, একেবারে জমে কুল্‌পি হয়ে যাবে। কি ফিগার। কি দারুন দেখতে। কি ফ্রি!'

সেই পরীবিবির পর হাস্নুহানা, চাঁদবালা ব্র্যাকেটে টুনু,—তার পর সর্বজন স্নেহ ধন্যা রূপমালা,—এমনি আরো কত এলো গেলো। আহা তাইতো। পরপর মেয়েছেলেগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমশ বুকে বল বাড়তে লাগলো বীরেশ্বরের। তাহলে বকুল গেলেও ভয় কি। আরো কত ফুল ফল এসে যাবে।

ড্রয়ার খুলে, ভিতর থেকে বোতল গেলাস বের করে একপাত্র ঢালবার পর বীরেশ্বরের ক্রমশ সাহস ফিরে আসতে লাগলো। জলদ-গম্ভীর গলায় সে ডাকলো, —'ব্রজ, —ব্রজবিলাস। ব্রজবিলাস বাইরে টুলে বসেছিল বীরেশ্বর ডাকতেই উঠে এলো।

—বলুন হালদার মশাই।

—থিয়েটারের বিক্রি আজ কত?

—মাঝারি রকম।

—তাহলে কী থিয়েটার তুলেই দেবো বলতে চাও?

—তা কেন? তা কেন?

—তা কেনই বা নয়? শুনি? তোমরা একটা নতুন হিরোয়িন জোগাড় করে এখনো তো বকুলের নাকের ওপর নেড়ে দিতে পারলে না।

—মানে শীলারাণী!

—থামো, ওই আধবুড়ির কথা আর বলো না একদম। অন্য কথা থাকে তো বলো। আর নাহলে যাও—যাও—যেখানে থেকে হোক একটা হিরোয়িন......।

একটা ছোট পোষ্ট কার্ড ঠিক তখনই তাঁর ঘরের বেয়ারা এসে টেবিলের ওপর রেখে গেল। বকুলের নামে চিঠি। প্রতিদিন এমন শয়ে শয়ে চিঠি আসে বকুলের নামে। এ চিঠিও তেমনি একটা। তবু বকুলের সঙ্গে গোলমাল বেধেছে বলেই—বীরেশ্বরের বলা আছে বকুলের নামে লেখা সব চিঠিপত্তর কাগজ যেন তার টেবিলে রেখে যাওয়া হয়। সে বকুলের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। আসলে

মোটেই পাঠায় না। সবাই চলে গেলে, খালি ঘরে, একা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। হঠাৎ এই পোষ্টকার্ডটা বীরেশ্বর হাতে তুলে নিল।

একেবারে আঁকা বাঁকা দুর্বল হাতের লেখা চিঠি। কতদিন বাদে নীল কালির বড়ি ভিজিয়ে কালি করে তাতে পেন হোল্ডার দিয়ে লেখা :

পূজনিয় বকুল দিদি,

অতিশয় কস্টো করিয়া তোমার ঠিকানা জোগার করিয়াছি। তুমি যে সেই যাবার সময় বলিলে বিলাসী আমি যাত্রায় পাঠ পাইয়াছি, তোরে লইয়া যাইব। কই আসিলেনা। তুমি বলিতে বিলাসী— তুই যা সুন্দরী তুই সিনেমায় রানিবালা হইবি। এখন দুইবেলা খাওয়া জুটেনা। দিদি পাঠ্ চাহিনা। আমাকে তোমার বাড়ির বাসন মাজার কাজ দাও তো বাঁচি। এখানে বড় কষ্ট। ভোলাকাকা বলিতেছে কলকাতায় লইয়া যাইবে। শিয়ালদায় ওর বাসায় থাকিয়া আয়ার কাজ খুঁজিব। তুমিই আয়া করিয়া নাও না।

দিদি বিলাসীকে কি কলকাতায় গিয়া বড় থিয়েটারের নায়িকা হইয়া ভুলিয়া গেলে? ভোলাকাকা 'কাটে' ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। আমি কলকাতা চিনিনা। তুমি আমায় বাসায় আসিয়া লইয়া যাইবে। বিলাসী।

চিঠি পড়া শেষ করে পাগলের মত বেল্ বাজাতে লাগল বীরেশ্বর। তিনচার জন ছুটে এলো। ব্রজবিলাসও।

—এই ঠিকানাটা কাগজে লিখে নাও। এখনি যাও। বকুলের নাম করে আমার এখানে এনে তুলবে। বকুলের বোন বা পাড়ার মেয়েটেয়ে কেউ হবে। নিশ্চয়ই সুন্দরী হবে। একে আমার চাই।

একটা শাদা কাগজে কাঁপা কাঁপা হাতে বিলাসীর ঠিকানা টুকে নিয়ে ব্রজবিলাস প্রায় ছুটেই পালালো। ড্রয়ার খুলে বোতল থেকে বেশ বড় মাপের ডোজ গেলাশে ঢাললো বীরেশ্বর। এক চুমুকে গলায় ঢালতেই ঘাড় মাথা জলে উঠলো তার। চোখের সামনে স্পার্ক খেলতে লাগলো। খানিকক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথাটা এলিয়ে দিল সে। তার সারা মুখে বিন্‌বিনে ঘাম ফুটে উঠতে লাগল। মনে পড়ল একদিন এই ঘরে.... ওপর থেকে আলোর হাজার ডালের ঝাড় থেকে ছুঁচোলো কাচের কলম গুলো যেন এক ঝাঁক তীরের মত ক্রমশ নেমে আসতে লাগলো তার দিকে।

বীরেশ্বর নিজেকে দেখতে পেল গাঁয়ের উঁচু রাস্তায়। ঝুঁঝকো বেলায় আবছা কুয়াশায় সে যেন প্রেতের মত এসে দাঁড়িয়েছে। উঁচু আলপথ থেকে দূর থেকে গ্রামের অনেকখানি ছবি দেখা যাচ্ছিল। সারি সারি কুটির, বাগান, ছোট ছোট পুকুর। চিক্‌রি কাটা চাষা ক্ষেত।

বীরেশ্বর একদিন এই গাঁয়েরই ছেলে ছিল। এই গাঁয়ের মানুষ। এই ছোট্ট গাঁটুকু বাদ দিয়ে বাকি পৃথিবীটা তার পর ছিল। মিথ্যে ছিল।

সে যাত্রা থিয়েটার ভালবাসতো। তাই সে গাঁয়ে জমিদার বাবুর বড় ছেলের তামাক বরদার মোসাহেবের পোষ্টে ঢুকে গিয়েছিল সেই ছোট বেলা থেকেই। জমিদার বাবুর বড় ছেলে গোপীকৃষ্ণ বাবু যখন বাপের সম্পত্তি পেয়ে কলকাতায় থিয়েটার খুলল,—তখন বীরেশ্বরও চলল মনিবের সংগে। গাঁথেকেই সে হয়ে গিয়েছিল মনিবের মেয়ে ধরার টাউট।

গোপীকেষ্ট যখন বিকেল বেলা টম্‌টম্ হাঁকিয়ে বেরোতো তখন বীরেশ্বর সঙ্গে থাকতো হামেহাল। টম্‌টমে বসে বসেই গড়গড়া টানতো গোপীকেষ্ট। পাছে ঝাঁকানিতে গড়গড়া পড়ে যায় একটা চাকর সামনে দুহাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে থাকতো তলাটা। আর কাপড় মুড়ে ধরে থাকতো গরম কলকেটা। পথে যে মেয়েকেই গোপীকেষ্ট দেখতো তাকেই তার চাই।

একে একে সবাইকেই এনে দিয়েছিল বীরেশ্বর। একরাত দু-রাত থেকে, নীচু ঘরের মেয়েগুলো আবার যে যার ঘরে ফিরে যেত। দুখানা শাড়ি, দু চারটে রূপোর গয়না পেত ব্যাস। বড় ঘরের মেয়েরা বেশির ভাগই গোপীকেষ্টর হাত ঘুরে কলকাতায় চারিয়ে যেত। কেবল একটা কাদের বৌ যেন বোকার মত আত্মহত্যা করে মরেছিল। তাতে কার কি এলো গেল? মাঝ থেকে তোর নিজের জীবনটা-ই গেল। ঝিমুনেশার মধ্যে বীরেশ্বর একবার ভাবল কথাটা সে আদৌ কাকে বলছে? মানুষের প্রাণটা ছাড়া আর কি থাকে? প্রাণটাকে লক্ষ্য করেই তো সিরিয়াস কথাবার্তা হয়, তাই না?

না তা বোধ হয় নয়। তাহলে বীরেশ্বরতো ব্যাপারটাকে 'ফিনিশ' হয়ে যাওয়া একটা কাণ্ড মনে করতে পারত। বোকা বৌটার জলেডোবা চেহারাটা তাহলে কেন বার বার তার সামনে এভাবে ভেসে ভেসে ওঠে।

বীরেশ্বর বুঝতে পারে বৌটার আত্মাটা কিন্তু আছেই। কোথাও সেই আত্মাটা ঘুরে বেড়াচ্ছেই। কারণ সব বড় বড় কথাই তো আর ফাঁকা বুলি নয়। সেই কোন আদ্যি কাল থেকে গোপীকৃষ্ণর থিয়েটারে প্রায় প্রত্যেকটা নাটকেই একবার করে নানা ভাবে বসানো হয়েছে আত্মা অবিনশ্বর।

বীরেশ্বরেরও বোধহয় তখন একটা আত্মা ছিল। তাই কাঁদনকে সে বলে-রেখেছিল,—'ছোড়দি, সন্ধ্যেবেলা তুই বড় পুকুরে চান করতে যাবিনি।' কাঁদন সরল পুঁটির গড়নের চোখ দুটি তুলে বলেছিল,—কেনে গো?

—ত্যাখন জমিদারবাবুর বড় বেটাটা যায়না। তামাক টানতে টানতে, টমটমে

'তোকে উঠায়ে নিয়ে যাবে।'

—নাঃ, যাবুনি।

বলেছিল কাঁদন।

কাঁদন বীরেশ্বরের ছোড়দি নয়। ঝুমুরওয়ালী যতনের মেয়েও। জন্মের ঠিক নেই। যতনের মায়ের কাছে থাকে। যতন ক্বচিত গাঁয়ে আসে। ক্বচিত মেয়ের কাছে আসে। মেয়ে মাকে মা বলে জানলেও বলে, 'নালো যে যাই বলুক। আমি তোর মা নই। মাসি। তুমি বড় ঘরের মেয়ে। তোরে মেলায় কুড়ায়ে পেয়েছি'।

খুব ভদ্রসদ্র সেজে আসতো যতন। তখন আর তার ব্লাউজকে পাখীর বাসা মনে হত না। যে বাসা থেকে যুগল ডিম আধো দেখা যায়। তার সুকুমার উদরের মাঝখানটি—চন্দ্রবিন্দুর মত নাভি দেখা যেত না।

যতন গ্রামের বাইরে দিয়ে দলের সঙ্গে বিড়ি টানতে টানতে বলত,—আমি কাঁদনের বিয়া দিব। দশ কুড়ি টাকা পণ দিব। চারবিঘা জমি দিব। দেখি কাঁদন আমার ঘরের বৌ হয় কিনা।

ছোটবেলায় দেখা যতনের স্মৃতি। কিন্তু যতন কিছুই দিয়ে যেতে পারেনি কাঁদনকে। কোথায় তার পুঁটলি ভরা কাঁচা দশ কুড়ি টাকা, কোথায় বা সেই চারবিঘা জমি!

কাঁদন ঘুঁটে বেচে গরুর দুধ বেচে চালাত। বুড়ো দিদিমার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলত—'ওই বুড়ি যতনের লুকোনো টাকার খবর সব মাথার মধ্যে বন্দী করে কুলুপ দেবার পর পাগল হয়ে গেছে। ঠাট্টা করে সেই সুন্দরী রাইকিশোরী কাঁদনকে বীরেশ্বর ছোড়দি বলত। সেই ছোড়দি। কলকাতায় এসে বাবু গোপীকৃষ্ণর মেয়েছেলে জোটানো থিয়েটার চালানো, ফন্দী ফিকির করে যোগসাজস্ করে বাবুকে পথে বসানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে বীরেশ্বর আর তার খবর নিতে পারেনি। কিন্তু মনের মধ্যে সে ছিলই।

খুব ভোর বেলা, হঠাৎ বাইজি বাড়ির ভাঙা মেহফিলের আসরে ঘুম ভেঙে গেল, —কিংবা দুররাতে যখন থিয়েটারের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে সে একলা হত তখন কাঁদনের কথা মনে পড়ে যেত তার। সে মনে মনে বলত,—'যাবো, ছোড়দি, যাবো। তোমায় রাণী করে দেব। যতন মাসীকে আমি দেখেছি। তার দুঃখ কষ্ট সব দেখেছি। তার স্বাদ আহ্লাদ স্বপ্নের কথাও আমি জানি। আমি সেই স্বপ্ন সার্থক করব। বিশ্বাস করো ছোড়দি, আমি কিছু চাইনা। তোমার দেহ চাইনা। তোমার সেবা যত্ন কিছু চাইনা। তুমি লক্ষ্মী বৌটি হয়ে ঘর করবে। সংসার করবে। আর আমি মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা তোমার দাওয়ায় এসে বসব। তোমার ছেলেমেয়ে স্বামী তোমার তরকারীর ক্ষেত ফুলের বাগানের খোঁজ নেব। কি শান্তি! না ছোড়দি!

হঠাৎ বীরেশ্বরের একটা বড় মাপের চুরি, যাকে বলে দিনে ডাকাতিই ধরা পড়ে গেল। তখন থিয়েটারে বীরেশ্বরের একটা শত্রু জুটেছিল। হারান নস্কর। সেও গোপীকৃষ্ণকে দোহন করতে চাইত। নিত্য নতুন মেয়ে এনে দেওয়ার ঠেলায় বীরেশ্বরের চাকরি যায় যায়।

আর তার চুরিটা ধরা পড়ায় বীরেশ্বরকে ডেকে গোপীকৃষ্ণ মেজাজি গলায় বলেছিলেন, গাঁয়ের মানুষ বলে ছেড়ে দিলাম। নাহলে তহবিল তছরূপের দায়ে তোমায় জেলে পাঠাতুম। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। ঠিক এই ভাবে। যেভাবে আজ ব্রজবিলাসকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল বীরেশ্বর। কিন্তু বীরেশ্বরও যায়নি। বাইরে গিয়ে হাতজোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। শুনতে পাচ্ছিল গোপীকৃষ্ণের বিস্বাদ গলার স্বগতোক্তি—'যাঃ শালা, একে মেজাজ খারাপ। পরপর সাতটা মেয়েছেলে এনে দিল হারান, গাঁয়ের মেয়ে, আনকোরা, এই সব ভাঁওতা দিয়ে, সব বাজারের। একেবারে সোনাগাছির ট্রেনিং দেওয়া।'

বীরেশ্বর বেরিয়ে আসতে আসতে ঠিক করে ফেলেছিল সেও গাঁয়ে যাবে। গাঁয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর বাঁচবার পথ নেই। কিন্তু গাঁয়ের উঁচু রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার বিবাদ লেগেছিল। ওই ছোট্ট গাঁ। ওই কটা খড়ে ছাওয়া বাড়ি। ইলেকট্রিকের আলো নেই, পাখা নেই। পীচ্বাঁধা রাস্তা নেই। চর্ব্বচোষ্য খাওয়া নেই। রিহের্সালে থিয়েটারের মেয়েদের সংগে ফষ্টিনষ্টি নেই আর সবচেয়ে বড় কথা নিজের পাওয়ার দেখানো নেই।

নাঃ, তা আর হয়না। আর তখন আত্মাটাকে বিক্রি করে দেবার কথা ভেবেছিল বীরেশ্বর।

তাদের গ্রামে মাঝে মাঝে বেদেরা আসতো। বেদেরা বলত কটা চোখের মেয়েরা ডাইন হয়। কটা চোখ দিয়ে তারা ভিতর পর্যন্ত দেখতে পায়। একদলে এমনি এক দলনেত্রীকে দেখেছিল বীরেশ্বর। সে বীরেশ্বরকে বলেছিল তোর কি চাই বল—

বীরেশ্বর তখন কিশোর বয়সের। সে বলেছিল, আমার অনেক ক্ষমতা চাই। আমি শুনেছি তোমরা গাছের ডালে চেপে দেশে বিদেশে উড়ে যেতে পারো। বাণ মেরে রক্ত বমি করিয়ে দিতে পারো শত্রুর। নিঙড়ে নিতে পারো মানুষকে, কেবল গামছা নিঙড়ে।

—সব পারি। আরো অনেক ক্ষমতা পারি। তার বদলে একটা জিনিষ দিয়ে দিতে হবে, দিবি?

—কি?

—তোর আত্মা।

বেদেনী বলেছিল, আত্মা।

ওটা আমাদের গুরু নিয়ে নেবে।

—কে তোমাদের গুরু।

—যে মানুষকে ঠুঁটো করে রাখতে চায়না। মানুষকে অনেক বেশি শক্তি দিতে চায়।

—'আত্মা' দেব। কী আছে? আত্মা দিলেতো কোনো ক্ষতি নেই।

—কি ক্ষতি আছে?

বেড়ালচোখী বেদেনী হেসেছিল,

—তোর যে 'আত্মা' আছে তুই টের পাস? যেটা টের পাসনা, সেটাই শুধু দিয়ে দিবি। সেটা আছে কি নেই তারই যখন সাড় নেই তখন কিসের দুঃখ?

বীরেশ্বর উত্তেজিত কন্ঠে প্রশ্ন করেছিল না দুঃখ কিছু না শুধু—

শুধু, মরার পর তোর আত্মা ভগবানের কাছে যাবেনা। থাকবে আমার গুরুর কাছে। শেষদিন তক 'শতরঞ্জ' খেলবে।

ভয়ে আতঙ্কে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল বীরেশ্বরের। সে উঠে এসেছিল। পিছন থেকে বেড়ালচোখী বেদেনী বলেছিল—'আমায় দিস না দিস, পরোয়া নেই। তুই একবার নিজে নিজে বললেই আপনি আমার গুরু এসে তোর 'আত্মা' নিয়ে নেবে। তার বদলে তোর যা চাই, যত চাই সব দেবে।'

একদিন পরে সেদিন, সেই বহুদিন ছেড়ে যাওয়া, তার সেই গাঁয়ের রাস্তার ওপর এক ভূতের মত দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ার মত করে বীরেশ্বর বলেছিল,—'হে শয়তান, হে ইবলিশ তুমি আমার আত্মা নাও। না, ছোড়দি কোনো ব্যাপার নয়। ছোড়দির আশা আকাংখা পবিত্রতা আছাড়িপিছাড়ি—কিছুই কোনো ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার বীরেশ্বরের আত্মার বিক্রয়। ওই ক্ষতিটার কাছে একটা মেয়ের সতীত্ব যাওয়া আর না যাওয়া। ফুঃ—

অজস্র ছুটন্ত আলপিনের মত ঝাড়ের কলমগুলো যেন সারা গায়ে বিঁধে যাচ্ছিল বীরেশ্বরের। সেগুলো তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল বেদনাদায়ক। কিন্তু তা অতিক্রম করেও তো একটা কালহীন, সময়হীন অন্ধকার। একটা ঝুঁকে পড়া কঙ্কালসার অস্তিত্বের সংগে অনন্তকাল ধরে হারহীন, জিতহীন, মুক্তিহীন, 'শতরঞ্জ' খেলা।

বীরেশ্বর থর থর করে কেঁপে উঠল। না সে বিশ্বাস করেনা। আত্মা কখনো চিরকালের মত কিনে নেওয়া যায় না। আত্মা যায় আর আসে। একটা বলের মত একবার ভগবানের হাতে, একবার শয়তানের হাতে। তার আত্মাকে সে ফিরিয়ে নেবেই। মানুষ পারে। মানুষই পারে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার উপায় বার করতে।

হালদার মশাই!

মৃদু বিনীত গলায় ডাক শুনলো বীরেশ্বর। বৃজবিলাস ডাকছে।

—বিলাসীকে এনেছি।

—এনেছো? এত শিগগির, আনো, আনো।

চটকা ভেঙে যেন জেগে উঠলো বীরেশ্বর। ভবিযুক্ত হয়ে টেবিলের সামনে বসল।

বৃজবিলাসের পেছন পেছন পায়ে পায়ে ঢুকলো বিলাসী। জড়োসড়ো একেবারেই একটি গেঁয়ো তরুণী।

ঠাহর করে দেখতে লাগলো বীরেশ্বর। তার শয়তানী চোখ আনকাট হীরে আর কাঁচের তফাৎ দিব্যি বুঝতে পারে। সরল গেঁয়ো কষ্ট দুঃখ সওয়া একটা সাদাসাঠা মেয়ে। কিন্তু ভিতরে একটা চরিত্র আছে। তলতলে নয়। শেখালে শিখবে। বোঝালে বুঝবে। আর চোখে মুখে বুকে শরীরে কটিতে একেবারেই বকুল মাখানো। মনশ্চক্ষে বীরেশ্বর বিলাসীকে স্টেজের ওপর দেখতে পেল। বকুল যেমন প্রথম ক্যাবারে দৃশ্যে আসে। মাথায় লাল বিচ-হ্যাট্ আর ফ্রিল দেয়া গাউন পরে। বুকের ভাঁজে থাকে একথোকা গোলাপ। তারপর আস্তে আস্তে একটি একটি করে......।

হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে গেল গেল যেন বীরেশ্বরের। আজকাল ব্যাথাটা মাঝেমাঝেই হয়। কাঁদনকে যেদিন গোপীকৃষ্ণর হাতে তুলে দিয়েছিল সেদিন থেকেই এই 'ছোড়দি' এই চাপা অস্ফুট আর্তনাদটা বাইরে কোথাও না বেরোতে পেরে তার ভিতরে ছুরির মত বিঁধে আছে। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া দেয়।

নিজেকে সে আবার সেই কালহীন সময়হীন পৃথিবীহীন ত্রিশঙ্কু লোকে দেখতে পেল। এক হাস্যহীন শুষ্ক অনন্ত 'শতরঞ্জ' খেলায়।

আর্তস্বরে সে বলে উঠলো—তুমি বকুলের বোন? কলকাতায় কাজ খুঁজতে এসেছো।

মাথা নাড়ালো বিলাসী,—যে কোনো কাজ বাবু, ঝি-এর হোক, রাঁধুনীর হোক।

—কাজ পাবে।

উচ্ছ্বসিত স্বরে বৃজবিলাস বলল,—তাহলে আপনার ওই আহিরীটোলার ফ্ল্যাটটায় ওকে এখন তুলি।

—না।

—তবে

—বিলাসী, আমাদের বসতবাড়ি, বড় বাড়ি। অনেক ছেলেপুলে। আমার বড় বৌমাটি গতবছর মারা, গেছেন। তাঁর একটি ছোট্ট ছেলে আছে তুমি তাকে দেখবে? পঞ্চাশ টাকা, খাওয়া-পরা, সব পাবে। আমাদের বাড়ি কোনো ঝনঝাট নেই। খুব ভালো।

—পঞ্চাশ টাকা। বিলাসীর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো।

—হ্যাঁ।

হাল্কা সহজ শান্ত বীরেশ্বর বৃজবিলাসের দিকে তাকালো। তার চোখ দুটো কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

—হ্যাঁ আমাদের বাড়িতে,—ছোড়দি—না মানে,—একেবারে ঘরের মেয়ের মত আমার নিজের ছোট বোনের মতো থাকবে।

মুখটা আলোর দিক থেকে ঈষৎ ঘুরিয়ে অন্ধকার ছায়ায় নিল বীরেশ্বর। যাতে তার সামনে দাঁড়ানো দুজন চোখের জমিন উপচে উঠে আসা অশ্রু যেন দেখতে না পায়।

একশত সাত নীলপদ্ম

তথাগত চক্রবর্তী

দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলার সংস্কৃতিধারার রূপ পাল্টেছে, স্থান কাল, আর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সূত্র ধরে। দীর্ঘ 'একশত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজস্থানের নাগোর অঞ্চলে প্রাপ্ত মহিষমর্দিনী মূর্তি কল্পনার সঙ্গে একালের নারকেল ছোবড়া বা পেরেকের প্রতিমার মূর্তি কল্পনার পার্থক্য ঘটেছে অনেক। তবু বলি, আমাদের এই দীর্ঘ সামাজিক ইতিহাসে প্রাণের এক ফল্গুধারা বয়ে গেছে, যার স্পন্দন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে আজও আমাদের মধ্যে সমান ছন্দে বাজে।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় বাবু গৌরবের রঙমশাল জ্বালানো সন্ধ্যায় বাইনাচ আর ফরাসী মদ্যপানের আসর যেমন দুর্গোৎসবের পবিত্র সন্ধ্যাগুলোকে অপবিত্র ক'রে তুলেছিল, তেমনি আবার এই শহরের বুকেই কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণু বাড়ীতে কাঙালী-ভোজনে আর একশ আট ব্রাহ্মণকে পিতলের থালা, কাপড় আর একপোয়া চিনিদান করে পূজাকে সার্থক করে তোলার প্রয়াসও দেখা গেছে। এইভাবেই পাশাপাশি বয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রের থেকে আমরা একটা ধারণাই লাভ করেছি—তা হ'ল এই যে, সাংস্কৃতিক প্রাণপ্রবাহকে বদ্ধ রাখা যায় না।

সে আমলে পুজোর সময় প্রবাসীরা বাড়ী ফিরে আসত। বাড়ীর পুজো বা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় পুজো—সবাই তাতে অংশগ্রহণ করত-প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ত মায়ের সবার অংশগ্রহণে। গ্রামের ঘরামীরা বেঁধে দিত বাঁশ—ঢাকীরা বাজাত ঢাক, ডাক পড়ত সবারই। একালে সবাই পুজোর ছুটি পেলে ছোটে বাইরে—বছরান্তে কয়েকদিনের জন্যে। বৈপরিত্য মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ঘটে গেছে।

দুর্গাপূজার ধুম দেখা যায় কলকাতার বুকে ১৭৫৭ সালের আশ্বিন মাসে। ঐ বছরেই নবকৃষ্ণ দেব সিরাজদৌল্লার ধনরত্ন লুন্ঠন করা অর্থে পলাশী যুদ্ধের স্মৃতি-উৎসব করেন দুর্গাপূজা ক'রে। লর্ড ক্লাইভ এসেছিলেন সে পূজায়। তারপর আস্তে আস্তে ধনী জমিদারদের অর্থগৌরবের ফসল ফলল পরবর্তী এক শতাব্দী ধরে। ১৭৯২ সালের ১৮ ই সেপ্টেম্বর 'ক্যালকাটা ক্রনিকেল' পত্রিকায় আসন্ন দুর্গোৎসবের বিবরণ প্রসঙ্গে যে কয়টি বাড়ির কথা বলা হয়েছিল তাতে পাওয়া যাচ্ছে নবকৃষ্ণ দেব, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ী। এইসব বাড়ীর দুর্গোৎসব-কেন্দ্রিক প্রমোদসভায় যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন সায়েবসুবোরা। এই ছিল হলওয়েলের ভাষায় তৎকালীন জেন্টু বা বাবুদের জমকালো উৎসব ('The grand feast of the gentoos'—Holwell : Interesting Historical Events : 1766) । তাছাড়া শোনা যায় যে জয়মিত্রের বাড়ীতে নবমীর দিন অসংখ্য মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি দেওয়া হত। বলিদানের পর রক্ত মেখে মহাউল্লাসে গীতবাদ্যের সঙ্গে নাচতে নাচতে রাস্তায় মিছিল ক'রে বেরোতেন বাবুরা।

আগেই বলেছি, স্থান, কাল আর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভেদে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক কিছুর। যেমন বাঁকুড়া অঞ্চলে আমরা একটি দেবীমূর্তির সন্ধান পাচ্ছি যার মুখ বন্যকুক্কুর বা শৃগালের মতো। আবার বালিগ্রাম অঞ্চলে একটি পূজায় দেখেছি সিংহের মুখ ঘোড়ার মতো। এমন কি শ্যামবাজারের রাজবল্লভপাড়া অঞ্চলে একালের একটি প্রতিমা, সিংহবাহিনী নন-ব্যাঘ্র বাহিনী। দাক্ষিণাত্যে তো মৃগবাহিনী দেবীর পূজার প্রচলন আছেই। আরও একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে নবমীর দিনে বাঁকুড়ায় রাত বারোটার পরে 'খচ্চরবাহিনী'—নামক দেবীর পূজা হয়। ঐ অঞ্চলেই এক ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে অষ্টধাতুর দেবী দুর্গার উপর একটি মাটির নারীমুণ্ড চাপান হয়।

চৈতল পাড়ার দেড়শ বছরের পূজা
বৈশিষ্ট্য : সিংহের মুখ ঘোড়ার মুখের মত।

দুর্গাপূজার উপাচার বিবিধ। বালিগ্রাম চৈতলপাড়ায় অধুনারূপান্তরিত সার্বজনীন পূজা যা আগে চট্টোপাধ্যায় বংশীয় পূজা ছিল, সেখানে ঐ বংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠকে ধুতি-চাদর দিয়ে 'চৈতলচূড়ামণি' বরণ করা হয়। তাছাড়া দেবীর হাতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা গেছে—কোথাও বা দুই, কোথাও চার, এমন কি বত্রিশ হাতের দুর্গার সন্ধানও আমরা পেয়েছি।

প্রসঙ্গত, এ আমলে যাঁরা মাটির মূর্তি ছেড়ে ভিন্ন উপাদানে মূর্তি গড়ছেন তাঁদের দিকে তাকিয়ে প্রাচীনপন্থীরা যেন নাসিকা কুঞ্চিত না করেন—কারণ আমাদের এই

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কুমোরপাড়ায় ব্যস্ত সবাই

অঞ্জলি ভৌমিক

বাহ্যিক রূপ নয়, অন্তরের ঐশ্বর্যের প্রতিফলন হওয়া চাই শিল্পীর স্থষ্টির মধ্যে। আবার ভাবের আবেগে লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মত চললেই যে স্থষ্টি সার্থক হবে এমন কথাও নয়। পুরাকালে তৈরি হত পাষাণ প্রতিমা, তৈরি হত লৌহ, ব্রোঞ্জ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও অষ্টধাতুমূর্ত্তি। তারপর এক সময় যখন পাষাণ ও ধাতুমূর্ত্তি তৈরী করা ব্যয়সাধ্য বলে বিবেচিত হল তখন মৃন্ময়ীমূর্ত্তির চাহিদা ক্রমশ বাড়তে লাগল। শিল্পচাতুরীতে মৃৎশিল্পের কৌশল ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলল। পোড়ামাটির মূর্ত্তিনির্মাণ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পে সমাদৃত হল। তারপর এল কাঁচামাটি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করার এক আগ্রহ। বর্তমানের মৃৎশিল্পীরা এই মূর্ত্তিনির্মাণের ধারক ও বাহক, —বললেন ভাস্কররত্ন শ্রী কালীপদ পাল।

পুজো তো এসে গেল। চারদিকে এখন শুধু সাজ সাজ রব। শিল্পীরা কে কি গড়ছেন তাই দেখবার জন্য গিয়েছিলাম কুমোরটুলিতে। শিল্পী শ্রী কালীপদ পাল তখন উঁচু টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দুর্গাপ্রতিমার ঠোঁট আর চিবুকে শেষ স্পর্শ দিচ্ছিলেন। মূর্তিটি দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে তৈরি হচ্ছিল।

কাজ করছেন দর্শকদের নির্দেশে না নিজের অভিরুচিতে—প্রশ্ন করলাম শিল্পীকে।

—শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ ও পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে আমি যে মূর্ত্তি গড়ি তাতে দর্শকরা বড় একটা আপত্তি জানান না। শিল্পে 'রূপভেদাঃ, প্রমাণানি, ভাব-লাবণ্যযোজণম, সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ' যদি থাকে তবে তা কার অপছন্দ হবে?

—আদর্শধর্মী না বাস্তবধর্মী, মূর্তি কি ধরণের হচ্ছে?

—দর্শকের চাহিদা বাস্তবধর্মী কিন্তু কোন কোনক্ষেত্রে পুরনো আদর্শকে কেউ কেউ ধরে রেখেছেন। এবার মূর্তি গড়ছি শিমলা ব্যায়াম সমিতির। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে পুজো হয়ে আসছে। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম বোস মহাশয় ও নেতাজীর ভাবাদর্শে মহিষাসুরবধের যে রণরঙ্গিনী মূর্তি নির্মিত হত আজও সেই আদর্শে প্রতিমা নির্মিত হচ্ছে। একই বেদির ওপর থাকবে সব দেবদেবীরা, এর উচ্চতা হবে প্রায় বাইশ ফুট। চাহিদার হেরফের এখন আর তেমন নেই। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মুখের অনুকরণে মূর্তিগড়ার হিড়িক বছর কয়েক ধরে বন্ধ হয়েছে।

অজন্তা, ভুবনেশ্বর, দক্ষিণভারতীয় মহীশূর প্রভৃতি বিভিন্ন স্টাইলে প্রতিমা গড়েন শিল্পী কালীপদ পাল। তিনি

শোলার কাজে ব্যস্ত শিল্পী

এবছরের পূজার জন্য চার-পাঁচখানা প্রতিমা তৈরি করছেন।

এই পূজার অর্থাগমে তাঁর সারাবছর চলে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন—এবার পাঁচখানা মূর্তি গড়ছি। বায়না পেয়েছি বহু আগে থেকেই। পূজার আয় থেকে মোটামুটি আমার সারাবৎসর চলে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজের ফাঁকে আমি এই কাজ করি। আর এতে আমার সারাবৎসরের সংকুলান না হলেও ভাবনাতে আর কি হবে? আজকাল শিল্পের সমাদর নিশ্চয়ই বেড়েছে, কিন্তু শিল্পীকে তার যথাযোগ্য মূল্য দিতে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই কৃপণ।

মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ডিগরি হাসপাতালের হরেন মুখার্জীর প্রতিকৃতিটি তাঁরই হাতে তৈরি। তিনি অল্পকিছুদিন আগে শিবনাথশাস্ত্রীর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি করে দিয়েছেন সিটি কলেজে। এছাড়া নেলী সেনগুপ্ত, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি আরও অনেকের প্রতিকৃতি গড়েছেন।

কালীপদ বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম শিল্পী যোগেন্দ্র পালের টিনের চালার নীচে। তিনি বসেছিলেন একটি মাচার উপরে। তার সামনে ছিল ছাঁচ থেকে সদ্য তোলা অনেকগুলি প্রতিমার মুখ। তাঁর কারিগররা ছিলেন নানাকাজে ব্যস্ত। কেউবা খড়ের কাঠামোর ওপর মাটি চাপাচ্ছিলেন, কেউবা চাপানো মাটিকে ঠিকঠিক আকারে আনার চেষ্টা করছিলেন। যোগেন্দ্রবাবুকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম তাঁর আয়ের কথা—এই পুজো থেকেই কি সারাবৎসরের খরচ তুলতে পারবেন?

তিনি একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—বর্তমানে প্রায় বছর তিনেক ধরে বাজার বেশ মন্দা। প্রতিবার যে সারাবছরের খরচ তুলতে পারি এমন কোন কথা নেই, আগে, অবশ্য কুলিয়ে যেত। এই দেখুন না প্রতিমা গড়েছি কুড়ি-একুশ খানা, হয়তো সব বিক্রী হবেনা। পড়ে থাকবে দু'চারখানা। আজকাল পুজোর ঠিক দু'একদিন আগে নগদ দামে প্রতিমা কিনে নিয়ে যান উদ্যোক্তারা। তখন এমনও হয় যে, যে প্রতিমা তৈরি করতে খরচ পড়েছে পাঁচ'শ তা বেঁচে দিতে বাধ্য হই চার'শতে কারণ ঘরে ফেলে রাখলে তো আর অর্থাগম হয় না। বায়না দিয়ে ঠাকুর কেনার রেওয়াজ এখন তো দেখছি অনেক কমে গিয়েছে। শিল্পীদের ভাগ্যে সুনাম থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু অর্থলাভ দুর্লভ ব্যাপার। একথা বলেই একটু ভারীগলায় আবার বললেন—বাস্তবজগতে অর্থ ছাড়াইবা চলে কেমন করে।

মূর্তি গড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে

শিল্পী যোগেন্দ্র পাল নিজে প্রতিমা গড়েন, সঙ্গে আছে তাঁর তেইশ বছরের ছেলে মন্টু। তার হাতটিও বেশ কুশলী। কলেজে পড়ুয়াদের মতই তার পোষাক-আষাক হলেও একাজে তার কোন অনীহা নেই। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ক্ষমতাটি নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প।

—ডাকের সাজের চাহিদা কেমন?

—খুব সামান্যই। এই ঢঙের বায়না পেলে মণ্ডপে গিয়েই প্রতিমার কাজ করি। এবার যেমন রথের পর থেকেই একটি বাড়ীতে কাজ সুরু করেছি।

—কারিগর ক'জন আর কেমন করেই বা তাঁদের নিয়োগ করেন?

—কারিগর তো জনা পাঁচেক। এর বেশী প্রয়োজন হলেই বা সাধ্যি কোথায়? জানেন, আমাদের বাড়ীর যোলজন ছেলের মধ্যে আজকাল তিনজনই জাতব্যবসা ছেড়ে অফিস-আদালতে কাজ করতে শুরু করেছে। এত পরিশ্রমের কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে তারা অনিচ্ছুক। লেখাপড়া, বংশপরম্পরা প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি তারা এই শিল্পকর্মকে বহন করে তবে তারা নিশ্চয়ই শিল্পে এক যুগান্তর আনতে পারবে।

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

পাটের নতুন শ্রেণীবিভাগ

প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের সংগে পাটের পরিচয় বহুযুগের। কিন্তু ৪৭-এর স্বাধীনতায় দেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় পাটচাষের ক্ষেত্রটি অনেক সংকুচিত হয়। তখন নবগঠিত ভারত প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো পাটচাষ বাড়াবার। দুই দশক ধরে বাড়তে বাড়তে পাটচাষ আজ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে।

কিন্তু সংকট দেখা দেয় আবার। বাজারে কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তুর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। রপ্তানীর কাজে পাটের বস্তার বদলে "বাল্ক হ্যাণ্ডলিং" প্রথা চালু হয়। এতে বিশ্বের বাজারে পাটজাত জিনিষের অবিরাম যোগান বজায় রাখতে ভারতকে হতে হয় প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। এজন্য প্রচলিত পাটজাত দ্রব্যের সামগ্রিক মান উন্নয়নের প্রয়োজন। আর তারজন্য অবশ্যই দরকার উন্নতমানের পাটের।

চাষীরা পরোক্ষভাবে চটকলগুলির কাছে তাঁদের উৎপন্ন কাঁচাপাট বিক্রি করে থাকেন। অথচ পাটের বিপণন ব্যবস্থা খুবই জটিল। বাজারে 'হাতে ধরে চোখে দেখে' পরিভাষায় যাকে বলে Hand and eye method অনেকটা আন্দাজে আঁশের মান বিচার করা হয়। তাও আবার চাষীকে আঁশের গড়দাম দেবার পর। এর সংগে আছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত আঁশের বাজার দরের তারতম্য। ফলে দিনের পর দিন চাষীরা আঁশের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ভারতে পাটচাষ লাভজনক করতে এবং মান অনুযায়ী আঁশের দাম ঠিক করতে ভারতীয় মানক সংস্থা (আই এস [illegible] পাট সংক্রান্ত সব কটি সংগঠনের মাধ্যমে কাঁচাপাটের এক বিজ্ঞানসম্মত নতুন শ্রেণীবিভাগের প্রচলন করেছেন। এবছর জুলাই মাস থেকেই এ নিয়ম কার্যকরী হয়েছে। এই নতুন শ্রেণীবিভাগের প্রধান সিদ্ধান্ত হ'ল—আঁশের মান বিচার করা হবে কেবলমাত্র তার গুণাবলীর ভিত্তিতে। যে অঞ্চলেরই পাট হোক না কেন আঁশের মানের ওপরেই নির্ভর করবে তার দাম।

এতদিন বিপণনের সময় তিতা আর মিঠাপাটের সাতটি ভাগ ছিল। বিভাগগুলি হচ্ছে—স্পেশাল টপ, টপ, স্পেশাল মিডল, বটম, বি বটম আর ক্রস। নতুন নিয়মে তার জায়গায় আঁশকে আটভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের দামও নির্দিষ্ট। মান বিচারের সময় আঁশের ছটি গুণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে—গোড়ছালের পরিমাণ, শক্তির পরিমাণ অর্থাৎ কতখানি শক্ত, দোষ, রঙ, সুক্ষ্মতা আর ঘনত্ব। প্রতি গুণের জন্য বিশেষ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। এসব গুণের মোট নম্বর ১০০। এছাড়া আঁশ হবে কমপক্ষে দেড় মিটার লম্বা আর মজুত করার উপযোগী শুকনো। আঁশে কাদা ধুলো, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত শক্তছালী অংশ (মরাপাট) ইত্যাদি থাকবে না।

কাঁচাপাটের নতুন শ্রেণীবিভাগ বাস্তবে রূপায়িত করতে দক্ষিণ কলকাতার ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের পাটশিল্প গবেষণাগারের ভূমিকা উল্লেখের দাবী রাখে। সেখানে আঁশ কতখানি শক্ত এবং আঁশ সরু না মোটা অর্থাৎ সুক্ষ্মতা মাপার জন্য দুটি যন্ত্র তৈরি হয়েছে। প্রথমটির নাম Bundle Strength Tester এবং দ্বিতীয়টি Fibre Fineness Tester। যন্ত্রগুলোর ব্যবহারিক পদ্ধতি খুবই সহজ এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আবার এগুলো চালাতে বিদ্যুতের প্রয়োজন নেই।

আঁশের মান নির্ণয়ের সময় যন্ত্রের অভাব থাকলে অথবা তাড়াতাড়ি মান বিচারের সুবিধার জন্য এ গবেষণাগার তিতা ও মিঠা পাটের বিশেষ 'নমুনা বই' (এলবাম) তৈরি করেছেন যা দেখে সহজেই আঁশের শ্রেণীবিভাগ বোঝা যাবে। নমুনা বই-এ রাখা সব রকম গুণের বিভিন্ন মানের আঁশের সংগে উল্লেখ আছে নির্দিষ্ট নম্বর। এ বই কাছে থাকলে কার্যক্ষেত্রে 'হাতে ধরে চোখে দেখে'-ই আঁশের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হবে।

আঁশগুলি ভালভাবে ছড়িয়ে দিয়ে প্রথমেই দেখতে হবে এর গোড়ছালের পরিমাণ। গোড়ছাল বলতে গোড়ার দিকে শক্তছালী অংশকে বোঝায়। আঁশে যত বেশী গোড়ছাল থাকবে ততই তার নম্বর যাবে কমে। নমুনা বই-এর তালিকার সাহায্যে ঠিক করতে হবে আঁশ গোড়ছালের জন্য কত নম্বর পেতে পারে। এর সবচেয়ে বেশী নম্বর হ'ল ৩৩।

মান বিচারের দ্বিতীয় বিষয় হ'ল—আঁশের দোষ। দোষকে ভাগ করা হয়েছে দুই শ্রেণীতে—মুখ্য আর গৌণ। মুখ্য দোষগুলি হ'ল—মাঝছাল (গোড়ার থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত মোটামুটি অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত শক্তছালী অংশ), গাঁট (এক এক জায়গায় গির বা শক্তছাল), জড়ানো পাটকাঠি যেগুলো সহজে আলাদা হয় না, বেশী পচে গেলে কমজোরী আঁশ, ভিজে অবস্থায় পাট মজুত করলে আঁশ হয় ম্যাড়মেড়ে, কখনও কখনও জমিতে জল ঢুকলে শ্যাওলা ধরা আঁশ। গৌণ দোষ বলতে বোঝায় আগছালী আঁশ, আঠাযুক্ত আঁশ, আলগা পাতা, আলগা পাটকাঠি আর গির বা চৌক। নমুনা বই-এ রাখা

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

হিমানীশ গোস্বামী
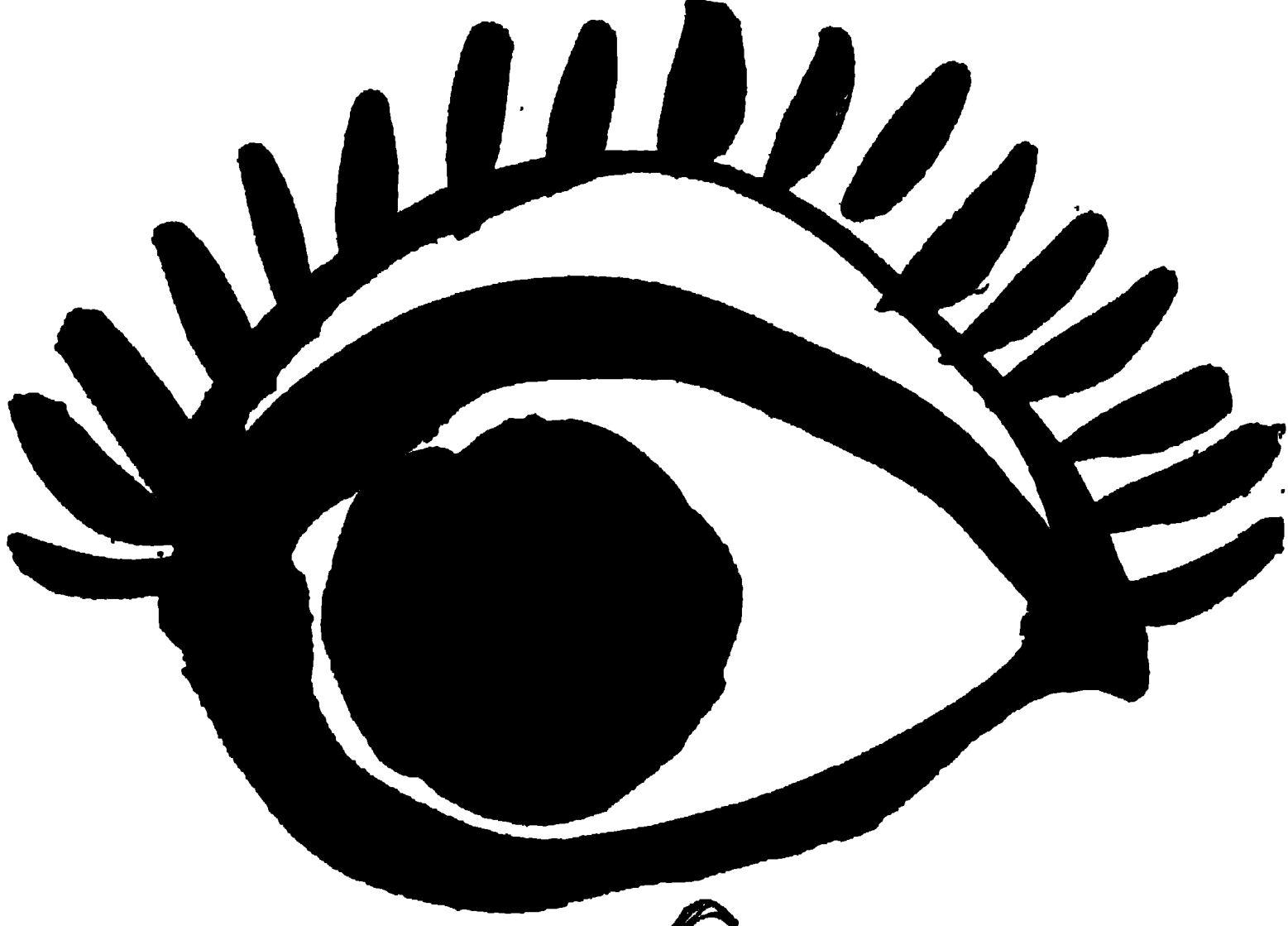
পুজো নিয়ে একটু আধটু

আকাশে মেঘগুলো কালো, ধূসর এবং আরও কয়েকটি রঙে রঙীন ছিল, যা ভেদ করে বর্ষার ঝম ঝম বৃষ্টি কখনো আমাদের খুসি কখনো দুঃখে জর্জরিত করত—এখন হঠাৎ সেগুলো কোথা থেকে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোলাই হয়ে সূর্যের আলোয় ঝকঝক করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর হাওড়া থেকে খড়গপুরের দিকে ট্রেনে যেতে যেতে দুপাশের অনেক খালে কি অজস্র সব শালুক ফুটে রয়েছে, এবং আরও অজস্র শালুক ফুটবে বলে কত কুঁড়ি বানিয়ে রেখেছে। এই সব দেখেই মনে হচ্ছে এবারও তাহলে এসে গেল পুজো।

সারা বছর আমাদের পুজো অনেক। দেবতা বানানো আমাদের খেলা। কোথায় পড়েছিলাম ধানবাদে দুর্ঘটনা দেবীর মূর্তি বানিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে পুজো হয়েছে। বেশ কিছু বছর আগে, গান্ধীজী জীবিত থাকার সময় কোনো এক মতলববাজ ভক্ত গান্ধীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাকি করতে চেয়েছিলেন—সেই কথা শুনেই গান্ধীজী সেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী যে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এ থেকেই তা বোঝা যায়।

কিন্তু ভারতে অসংখ্য দেবদেবী, মন্দির পুরোহিত, মন্ত্র—এগুলির সংখ্যা এত বেশি যে এগুলিকে এক সঙ্গে মনে আনাই এক শক্ত ব্যাপার। কিন্তু দুর্গাপুজোর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। এটির জন্য বিশেষ করে মনে আনতে হয়না। দুর্গা আমাদের কাছে অতি প্রিয় এবং পরিচিত। এবং দুর্গাপুজো কেবল যে দুর্গাপুজো তা নয়। দুর্গার সঙ্গে হাসি মুখে যাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক—এঁরা আমাদের অতি আপনার জন। আমরা ঐ তিনজনকে দুর্গার সঙ্গে অতিরিক্ত যে কেবল পাচ্ছি তা নয়, তারই সঙ্গে পাচ্ছি রাজহাঁস, প্যাঁচা এবং ময়ূরকেও। আর যদি সরস্বতী আমাদের বিদ্যা, লক্ষ্মী ধন, এবং কার্ত্তিক বীরত্ব দেন তাহলে তো ব্যাপারটি আরও সুখের হয়ে ওঠে।

রাজহাঁস, প্যাঁচা, ময়ূর এই তিন পাখি আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ছাড়াও আমরা পাচ্ছি সিংহ-কে। দুর্গা এরই উপর চড়ে থাকেন। কিন্তু কি সুন্দর ভারসাম্য! আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় একটা বিরাট সিংহের উপর অতগুলি হাত নিয়ে অতগুলি অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বহন করে কি ভাবে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। এ ছাড়া জন্তুদের মধ্যে থাকে একটা মোষ। এটিকে দেখলে অবশ্যই করুণা জাগে। আর গণেশের বাহন ইঁদুরকে দেখেও কষ্ট হয়। ভীত তার চেহারা, মনে হয় এতগুলি জন্তু এবং এত সম্মানীয় মানুষের মধ্যে সে সঙ্কুচিত।

আর রয়েছেন মহাদেব। সশরীরে তিনি মূর্তিমান নন—তবে সঙ্গেই থাকেন চালচিত্রে। দুর্গার প্রতি তাঁর অভিভাবক সুলভ দৃষ্টি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে তাঁর ফূর্তি করার মনোভাব। এবং সঙ্গী রয়েছেন একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীন দুজন—নন্দী এবং ভৃঙ্গী। এঁরা, এবং আর একজনের কথা এখনো বলিনি। ইনি হলেন সিদ্ধিদাতা গণেশ, এবং তাঁর স্ত্রী। এ স্ত্রী কিন্তু মানুষের মত নয়—এটি কেবলি একটা কলা গাছ। শাস্ত্রে কি লেখা আছে এ ব্যাপারে আমি জানিনা, তবে গণেশ নিজেও তো ঠিক মানুষ নন। তাঁর মুখটাই তো হাতির। মনে হয় গণেশের বিয়ে টিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই বলেই তাকে কলাগাছ দিয়ে ভোলানো হয়েছে। কেননা, একথা সকলেই জানেন কাঁচা কলাগাছ হাতির পক্ষে পরম সুস্বাদু।

এই সমস্ত অসাধারণ এবং কিম্ভূত-এর সংমিশ্রণ হচ্ছে দুর্গা পুজো। এটা এক পাঁচ মিশেলি ব্যাপার—অবশ্য সঙ্গে রয়েছে এক নীতি—দুর্গার জয় এবং অসুরের পরাজয়। সমস্তটা মিলে কোনো কোনো হিন্দী

ফিলমের সঙ্গে মিলে যায়। চট করে দেখলে চমক লাগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনা। হিন্দী ফিলমের সঙ্গে দুর্গাপুজোর অন্য মিলও কম নয় যেমন এর অসামান্য জনপ্রিয়তা। কোথায় লাগে শোলে। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও শোলে যেমন চালু, দুর্গা পরিবারও তেমনি চালু। ঐ যে বললাম, চট করে দেখলে চমক লাগে। এর মধ্যে কি নেই খুঁজে পাওয়া শক্ত।

তবে, বলা যায় আজকের ভারতের সঙ্গে এই দুর্গা প্রতিমার মিলও অনেকখানি। ভারতে শোলের মত ফিল্ম তৈরি হয়, দুর্গার মত প্রতিমা পুজো হয় তার একটা স্বাভাবিক কারণ রয়েছে। এক হিসেবে দেখতে গেলে সমস্ত ভারতই একটা অবিশ্বাস্য কিম্ভূত ব্যাপার, আশ্চর্য এর কাণ্ড কারখানা। এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতমালা, আবার দেখুন ভারতের দুই তৃতীয়াংশ লোক এই পর্বতকে একবার চোখেও দেখেনি। ভারতের প্রায় তিন দিকে সমুদ্র, অথচ ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ লোকই সমুদ্র দেখেনি। এদিকে আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড এই সব রাজ্যের নাম শুনেছে কেরালার, মহারাষ্ট্রের, গুজরাটে, জম্মু ও কাশ্মীরের লোক, কিন্তু ঐ দিকের শতকরা এক ভাগ লোকও হয়ত পূব দিকের রাজ্যে যায়নি। তেমনি সত্যি উলটো দিক থেকেও, যেমন বলা যায় নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, আসামের কটা লোকই বা কাশ্মীর, গুজরাট, বোম্বাই বা কেরালায় গেছেন।

এই বৈচিত্র্যময় ভারত রয়েছে এবং দার্শনিকেরা অবাক হয়ে দেখেছেন এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই রয়েছে অসাধারণ এক ঐক্যের ব্যাপার। কোথায় বাংলা, বাঙালী এবং কোথায় পাঞ্জাবী—একদল কঠিন পরিশ্রমী, অন্য দল শারীরিক ভাবে দুর্বল, কিন্তু এই ভারতে প্রয়োজন দু জনেরই। কেননা দুর্গার সঙ্গেও রয়েছেন কার্তিক এবং সরস্বতী। বাংলা যদি সরস্বতী হয় তাহলে পাঞ্জাব হল কার্তিক. আর সেই লজিককে বিস্তৃত করলে বলা যাবে গুজরাট হল লক্ষ্মী, আর দুর্গা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভারতের অভিভাবিকা।

পুজোর আগে একটি ব্যাপারে আমার খুবই আশ্চর্য লাগে। ধুতি শাড়ি ব্লাউজ ট্রাউজারস এই সময়ে যথেষ্ট বিক্রী হয়—বিক্রী হয় চাদর উল, খাদ্য—সবই আমার মনে হয় স্বাভাবিক! কিন্তু এই সময়ে ওষুধের দোকানও গমগম করে কেন? আমাকে একজন ওষুধ বিক্রেতা জানালেন বছরের এই সময় ওষুধ বিক্রী শতকরা প্রায় ত্রিশভাগ বেড়ে যায়।

এত আনন্দ হাসির মধ্যে লোকেরা কি বেশি অসুস্থও হয়ে পড়ে? নাকি বছরের অন্যান্য সময় হাতে তেমন পয়সা থাকেনা বলে বহু লোক ওষুধ খাওয়াও মুলতুবী রাখে?

ব্যাপারটা ঠিক আমার জানা নেই, তবে আমার এটা জানা আছে পুজোর আগে নয়, পুজোর সময় প্রচণ্ড অসভ্যতা সহকারে যেসব মাইক বাজানো হয় তাতে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রতি বছর আমিও অসুস্থ হই. কিন্তু সে তো পুজোর সময়।

আগামী সংখ্যায়

আলোর উৎসব দীপান্বিতা
অমিতাভ চক্রবর্তী

পুরাকীর্তি সংরক্ষণে নতুন উদ্যোগ
গোপালকৃষ্ণ রায়

অন্যান্য রচনা

ব্যবচ্ছেদ (গল্প)
মীনাক্ষী ঘোষ

হাঙ্গেরিতে ভারত চর্চা
পবিত্রকুমার সরকার

এবারের মুখোমুখি: চলচ্চিত্র জগতের স্বনামখ্যাত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে

এছাড়া থাকছে খেলাধুলা, মহিলামহল, সিনেমা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

কুমোর পাড়ায় ব্যস্ত সবাই

১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কুমারটুলী ছাড়ার আগে আরও জনাকয়েক শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হল। সেখানে সব মিলিয়ে আছেন শ'দেড়েক শিল্পী আর তাঁদের কাছে কাজ করছেন প্রায় ছ'শ শিল্পী কারিগর। তাঁরা অধিকাংশ দিনমজুরীতে খাটেন। সেখানে যেমন পনেরো টাকার দিনমজুরীর কারিগর আছেন, আছেন তেমনি এমন কারিগর যাঁদের পারিশ্রমিক দিনে পঞ্চাশ-ষাট টাকা। পুজো যত আসন্ন হয় এই মজুরীর হার অনেকের একশো টাকা পর্যন্ত ওঠে। অবশ্য সর্তসাপেক্ষে কারিগররা নিজেদের পছন্দমত কর্মস্থান পরিবর্তন করতে পারেন।

কুমোরপাড়াতে অবস্থাপন্ন শিল্পীদের পাশাপাশি রয়েছেন অভাবী শিল্পীরা। এই সময়ে তাঁরা সারা বছরের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। তাঁদের এই বাঁচার লড়াই-এ প্রায়ই প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে পরিত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এসেছেন সরকার। ব্যাঙ্ক থেকে তাঁরা পাচ্ছেন ঋণ। শতকরা দশটাকা হার সুদে এই ধারের টাকা পাথেয় করে জীবনসংগ্রামে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। বৎসরে তাঁরা পাঁচহাজার টাকা পর্যন্ত ধার করতে পারেন। কুমারটুলী সমবায় সংস্থা ও কুমারটুলী মৃৎশিল্পী বারোয়ারী এই দুই সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা সাহায্য গ্রহণ করছেন।

সরকারী এই সাহায্য গ্রহণ করছেন প্রায় অধিকাংশ শিল্পী। তাঁদের ধারনা-বিপদের সময় এ সাহায্য না পেলে তাঁরা হয়তো জীবিকার তাগিদে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও গৌরবের ধারক ও বাহক এই শিল্পকলাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতেন। আর এই সাহায্যপুষ্ট হয়ে অনেক শিল্পী বিদেশে আমাদের এই শিল্প সৌন্দর্যের প্রসারে সাহসী হতে চেষ্টা করছেন।

কুমোরপাড়ায় এখন সবাই ব্যস্ত—কি মৃৎশিল্পী, কি শোলাশিল্পী। আষাঢ়ের শুরুতে যে ব্যস্ততার ঝড় উঠেছে তা থামবে জগদ্ধাত্রী পুজোতে।

মহিলা মহল

কম খরচে কয়েকটি পুষ্টিকর খাবার

বাণী চট্টোপাধ্যায়

পুষ্টিকর খাদ্য বলতে কি আমরা খুব দামী-দামী খাদ্যকেই বোঝাই? না তা নয়, যে খাদ্য আমরা তাড়াতাড়ি হজম করতে পারি তাই পুষ্টিকর খাদ্য, এবং তা থেকে আমাদের শরীরের বৃদ্ধি হবে এবং আমাদের শরীরে অধিক তাপ উৎপাদন করে আমাদের কাজ কর্মের সহায়তা করবে। তা যে সামান্য ডাল ভাত খেয়েও হতে পারে যদি তা ভাল ভাবে হজম করা যায়। সেইজন্য আমাদের এমন খাদ্য বাছতে হবে যাতে সব রকম ভিটামিন থাকবে আবার তা আমরা অতি সহজেই হজম করতে পারব। আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী করার প্রণালী বলছি।

নিউটি ন্যাগেট রোল

উপকরণ :

আলু	৫৫০ গ্রাম
পিঁয়াজ	৫০০ ,,
আদা	২০ ,,
জিরা	২০ ,,
লাললঙ্কা	২০ ,,
হলুদ	২০ ,,
কাঁচালঙ্কা	১৫ ,,
সরষের তেল	২০০ ,,
রসুন	২৫ ,,
নাগেট	১৫০ ,.
ময়দা	১ কে. জি.

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে ন্যাগেগুট্‌লো একটা পাত্রে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। তারপর ময়দা একটু লবণ দিয়ে জল জল করে মেখে রাখুন। এরপর একটা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে তেল দিয়ে উনানে বসান। ইতিমধ্যে আপনি আলুগুলোকে ছোট ছোট করে কুচিয়ে নেবেন এবং পরে ঐ প্যানে সব মসলা গুলে বেটে নিন। কেবল লঙ্কার গুঁড়ো ও জিরা মরিচ গুঁড়ো করে দেবেন; এর পর ঐ প্যানের মশলাটার ভেতর আলুগুলো দিয়ে নাড়তে থাকুন। একটু পরে সামান্য জলদিন এবং জলটা একটু ফুটতে থাকলে ঐ ন্যাগেটগুলো গরম জল থেকে তুলে আলুর মধ্যে দিন। যখন দেখবেন ঐ প্যানের আলু ও ন্যাগেট বেশ কষা মাংসের মতো হয়ে গেছে তখন কিছুক্ষণ ভাজাভাজা করে নামিয়ে আনুন। দেখবেন এইটা একদম কষা মাংসের মতো হয়ে গেছে। এরপর ঐ ময়দাগুলোকে গোল্লা গোল্লা পাকিয়ে পরটার মতো করে ওর মধ্যে ঐ ন্যাগেটের পুরটা পুরে রোল করে নিন এবং এর পর আপনি তেল অথবা ঘি দিয়ে ভাজতে আরম্ভ করবেন। এই রোলগুলো খেতে দারুণ ভাল লাগে। আর স্বাস্থ্যের পক্ষেও খুব উপকারী। কারণ ঐ ন্যাগেটগুলো সয়াবীন থেকে তৈরী হয়ে থাকে। আর এই খাদ্য তৈরী করতেও বেশী খরচ লাগেনা।

ব্যালেন্সড চাপাটি

উপকরণ :

ময়দা	১ কেজি
কাঁচা শাক	২৫০থেকে৫০০গ্রাম
তেল বা ঘি	পরিমাণ মত

প্রস্তুত প্রণালী : শাক বলতে পালং শাক হলেই ভাল হয়, কারণ এই চাপাটি শীতকালেই যখন পালং শাক টাটকা থাকে তখন করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। প্রথমে আপনি ময়দাটা একটু লবন দিয়ে মেখে রেখে দিন। এরপর ঐ শাকগুলো কুচিয়ে পরিমান মতো জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন, এইবার যখন দেখবেন শাকগুলো প্রায় সেদ্ধ হয়ে জলের সঙ্গে গুলে গেছে তখন শাক ও তার জল দিয়ে ময়দাটা মাখুন তারপর লুচি বা পরোটার মত করে তেলে ভেজে নিন। ইচ্ছা করলে একটু মরিচগুড়ো ঐ ময়দার সংগে দিতে পারেন। এতে স্বাদ বাড়বে।

আলুর আচার

উপকরণ :

আলু	১ কেজি,
সরষের তেল	১০০ গ্রাম
জিরা, কালোতিল, সরষের গুঁড়ো	পরিমাণ মতো
লাল লঙ্কা	পরিমাণ মত
তেজ পাতা	পরিমাণ মত
লবণ, চিনি ও তেঁতুল জল	পরিমাণ মত

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে আলুগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে সেদ্ধ করে নিন, তারপর খোসাগুলো ছাড়িয়ে নিন। এরপর একটি স্টীলএর পাত্রে ঐ আলুগুলো রাখুন। এরপর জিরা, কালোতিল, লাললঙ্কা, চিনি, লবণ, সব গুঁড়িয়ে নিন। তারপর ঐ আলুর প্যানের মধ্যে ঐ গুঁড়োগুলো নিন। সরষের গুঁড়োটা দিতেও ভুলবেন না। তারপর ঐ সরষের কাঁচা তেলটা দিন। দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। মাখার পর ঐ তেঁতুল জলটা দিন। যদি দুচার দিন রাখতে চান তাহলে তেঁতুল জল না দিয়ে লেবুর রস দেবেন। দুচার দিন স্বচ্ছন্দে রাখা যাবে,নষ্ট হবে না। এই আচার আপনি রুটি, পরটা, লুচি, পাঁউরুটি দিয়েখেতে পারেন।

ছাতুর ডালপুরী

উপকরণ :

ময়দা— ১ কেজি
ছাতু— ৩০০ গ্রাম
সরষের তেল— ১০০ গ্রাম
জোয়ান— আপনার রুচি অনুযায়ী
আদা— ,,
রসুন, বীটনুন, চিনি, লেবুর রস,
ডালডা অথবা বাদাম তেল—৩০০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে ময়দাটা একটু ময়ান ও লবণ দিয়ে মেখে রাখুন। এরপর জোয়ান, বীটলবণ, চিনি সব গুঁড়িয়ে নিন। আদা ও রসুন বেটে নিন। এইবার ঐ ছাতুটা ঐ মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। লেবুর রসটা দিতে ভুলবেন না। ছাতুটা ভালো করে মাখা হয়ে গেলে ময়দার গোল্লা পাকিয়ে তার মধ্যে ছাতুর পুর ভরে ডালডা অথবা বাদাম তেলে ভাজুন। বেশ মচমচে করে ভাজবেন। এই ছাতুর ডালপুরীও খেতে খুব ভালো লাগে আর স্বাস্থ্যের দিক থেকেও খুব উপকারী।

গাজরের হালুয়া

উপকরণ :

গাজর ১ কেজি।
দুধ ৫০০ গ্রাম।
চিনি ৩০০ গ্রাম
কয়েকটি ছোট এলাচের গুঁড়ো।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে গাজরগুলোকে জিরে জিরে করে কেটে নিন। তারপর ভালকরে সেদ্ধ করে নেবেন। তারপর ভালকরে সেদ্ধ হয়ে গেলে জলটা ফেলে দেবেন। এরপর একটা প্যানে বেশ কিছুটা ঘি নিয়ে গাজরগুলো ভেজে নিয়ে দুধটা দিয়ে দেবেন। তারপর দুধটা ফুটতে থাকলে চিনিটা দিয়ে দেবেন এবং হাতা দিয়ে ঘনঘন নাড়তে থাকবেন। যখন দেখবেন হালুয়াটা বেশ থকথকে হয়ে গেছে তখন উনান থেকে প্যানটা নামিয়ে আনবেন। এরপর ঐ ছোট এলাচের গুঁড়ো হালুয়ায় ছড়িয়ে দিন, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পরিবেশন করুন।

পাটের নতুন শ্রেণীবিভাগ

১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

বিভিন্ন দোষযুক্ত আঁশ দেখে ঠিক করতে হবে বিচার্য আঁশে কি কি দোষ আছে আর তারজন্য সেই আঁশ কত নম্বর পেতে পারে। দোষযুক্ত আঁশের মোট নম্বর—২২।

এবার দেখতে হবে আঁশের রঙ। পাটের রঙকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে।

নমুনা বই-এর বিভিন্ন রঙের আঁশের মধ্যে যে রঙের সংগে মিল থাকবে তারজন্য নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া হবে। এরজন্য মোট নম্বর—১২।

মান নির্ণয়ের পরের গুরুত্বপর্ণ কাজ হ'ল—আঁশ কত শক্ত অর্থাৎ এর শক্তির পরিমাণ। এ মানকে ছ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এটা মাপতে ১৫ থেকে ২০টি পরিষ্কার আঁশ দু হাতের আঙুল দিয়ে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার (২ ইঞ্চি) দূরত্বে চেপে ধরা হয়। আঁশের সংখ্যা নির্ভর করে আঁশ কত সরু বা মোটা তার ওপর। তারপর আঁশগুলোর ক্রমশঃ টান বাড়িয়ে ছিড়তে কতখানি শক্তির প্রয়োজন তা অনুসন্ধান করতে হবে। টান দেবার সময় কখনই ঝাঁকুনি দেওয়া চলবে না। নমুনা বই-এর বিভিন্ন মানের আঁশের সংগে একইভাবে তুলনা করে এর মান ও তার নম্বর নির্ণয় করা হয়। আঁশ কত শক্ত তার পরিমাণের সর্ব্বোচ্চ নম্বর—২৬।

তারপর দেখা হয় আঁশ কত সুক্ষ্ম অর্থাৎ সরু না মোটা। সুক্ষ্মতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নমুনা বই-এর নির্দিষ্ট সুক্ষ্মতা মানের আঁশের সংগে মিলিয়ে এর নম্বর ঠিক করা হয়। আঁশ খুব সরু হলে ৫ নম্বর পর্যন্ত পেতে পারে।

সবশেষে দেখতে হবে আঁশ কত ভারী অর্থাৎ এর ঘনত্বমান। হাতের ওপর রেখে আঁশের ঘনত্ব বুঝে নিয়ে নমুনা বই-এর আঁশের সংগে তুলনা করে নম্বর দেওয়া হয়। এরজন্য ২ নম্বর নির্দিষ্ট।

এইভাবে মোট যত নম্বর উঠল তার ভিত্তিতেই আঁশের শ্রেণী ও মূল্য নির্দ্ধারিত হবে। আই. এস. আই. নির্দেশিত ১ থেকে ৮ ভাগ পর্যন্ত তিতা ও মিঠা পাটের প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট নম্বর যথাক্রমে—১০০, ৮৫, ৬৯, ৫৪, ৩৯, ২৬, ১২ (মিঠার জন্য ১৩), ০। (এ বিষয়ে আরও তথ্য ১৯৭৫ সালে আগষ্টমাসে প্রকাশিত আই. এস. আই.-এর 'ভারতীয় পাটের শ্রেণীবিভাগ—আই, এস ২৭১-১৯৭৫' বই থেকে পাওয়া যাবে)।

পাটের নতুন শ্রেণীবিভাগ সত্যিই সার্থক হবে যদি এ পদ্ধতি বাজারে আঁশ বিক্রির আগে করার ব্যবস্থা করা যায়। এবং এ ব্যবস্থা অবশ্যই পাটের প্রাথমিক বাজারে অর্থাৎ গ্রামের হাটে চাষীর কাছে করতে হবে। তবেই উন্নত মানের পাট বেশীদামে বিক্রি হবে। সংগে সংগে চাষীরা এ আঁশ উৎপাদনে উৎসাহ পাবেন।

আগামীকালের লক্ষ্য উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ

ইউনেস্কোর সমীক্ষা থেকে জানা গেছে পুস্তক প্রকাশে ভারত পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের কাছে গর্ব ও গৌরবের সংবাদ। ভারতে শিক্ষিতের হার যথেষ্ট নয়। তাই পৃথিবীর মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশে সাতের পর আট—এর স্থান দখল করা কম বড় কথা নয়। কিন্তু অষ্টম স্থান অধিকারের খবর জেনে বিজয় উল্লাসে আত্মহারা হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা লোকসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। তাই অষ্টম স্থান থেকে আরো যাতে উপরে ওঠা যায় সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বই কম প্রকাশের কারণ কি? সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে, বই ছাপা হয় কাদের জন্য?

বাংলা বইয়ের প্রকাশন

প্রবীর ঘোষ

শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থ যে অপরিহার্য এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয় তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর হলেও একথা মনে করা অবশ্যই ভুল হবে যে গ্রন্থের মধ্য দিয়ে দেশের বা জাতির কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞানার্জন এবং ঐ জ্ঞানার্জন বা বিচারবুদ্ধি লাভের ভিতর দিয়ে জাতির বা সমাজের মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের প্রয়াস ঘটে তা মনে রাখা প্রয়োজন বই কি।

শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পুস্তকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। সহজেই অনুমেয় যে দেশ যত উন্নত বা অগ্রসর, সে দেশে তত বেশী বই প্রকাশিত হয়ে থাকে। ১৯৫০-এ ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং জাপান ছাড়া এশিয়া বিশ্বের শতকরা ২৪ ভাগ পুস্তক প্রকাশ করেছিল; কিন্তু ১৯৭০-এ এই হার কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯ ভাগ। ইউনেস্কোর 'পুস্তক ক্ষুধা' নামক সমীক্ষা থেকে আমরা আরো জানতে পেরেছি, পৃথিবীতে যত গ্রন্থ বের হয়, তার পাঁচ ভাগের মধ্যে চার ভাগই প্রকাশিত হয়, ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে। আর সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে।

আমাদের দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ নিরক্ষর হলেও বর্ত্তমানে পুস্তকের চাহিদা অনেক অ-নে-ক বেড়েছে। সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে অসাধারণ বুদ্ধি-জীবীরাও বই-এর জন্য এখন জোর তলব করেন। সাত-আট কোটি টাকার গ্রন্থ বছরে বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে—তবুও পুস্তকের চাহিদা মেটেনি। ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ দিয়ে তো নয়ই, এমনকি বিদেশী গ্রন্থ দিয়েও পুস্তকের আকাল মিটছে না। ১৮৬৯-৭০ সালে ভারত ১০,৬০,০০০ টাকার পুস্তক আমদানী করেছে। ১৯৬১-৬২-তে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ছ' কোটি টাকার মতো, আর বর্ত্তমানে ৭।৮ কোটি টাকার মত।

ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে বহুদিন আগে চলে গেলেও প্রকাশনের ক্ষেত্রে ইংরেজী বই কিন্তু এখনো সর্বোচ্চ। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিবছর যত বই বের হয়, তার এক তৃতীয়াংশ হলো ইংরেজী বই। ১৯৬৮-৬৯ সালে মোট প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা ছিল ২০,৯৭৮। তার মধ্যে ইংরেজী বই অধিকার করেছিল। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা গেছে, উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু বছরে বরাদ্দ গড়ে ২০০০ মুদ্রিত পাতা; আমাদের জন্য সেখানে বরাদ্দ মাত্র ৩২ পাতার মতো।

১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রন্থের তালিকায় ১২০০ পুস্তক প্রকাশ করে বাংলা বই চতুর্থ স্থান দখল করেছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল ইংরেজী, হিন্দী ও তামিল গ্রন্থ; সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩০০, ৩১০০, ২২০০—মোটামুটি হিসাবে অবশ্য এটি পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত সংখ্যা। ১৯৭১-৭২ সালে বাংলা বই প্রকাশের সংখ্যা ছিল ১২৮৪। ১৯৬৯ সালের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা হল ৬৩৩২। ১৯৬৯-৭০-এ মোট প্রকাশিত ১৯,৩০২ খানি বই-এর মধ্যে ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যা ৭১৭০। ১৯৭০-৭১ ৭১-এ ১৮,৩০৫-টি পুস্তকের মধ্যে ৬২১০-টি গ্রন্থ ইংরেজী।

১৯৭১-৭২ সালে মোট প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৭,৫৫৭। এর মধ্যে ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যাই ৭,১৮২। এক তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল, ১৯২০-২১ সালে আমাদের দেশে মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ১১৭,৯৫; এর মধ্যে ইংরেজী বই ছিল ১৬৯০ টি। বোম্বাই ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সম্মত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা গেছে, ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত সর্বভারতীয় পুস্তকের তালিকায় ৪৩০০ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে ইংরেজী বই যথারীতি প্রথম স্থান

এ পর্যন্ত সর্বাধিক অর্থাৎ ১৩১০ খানি। ১৯৭০-এ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা ৯১৪। প্রকাশিত এই সমস্ত বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় বৈচিত্র্যের পুস্তক আছে। এর মধ্যে সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান থেকে জেনেছি, প্রতিবছর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে উপন্যাস ও গল্প সর্বদা প্রথম স্থানে, প্রবন্ধ ইত্যাদি গ্রন্থ সাধারণত সর্বশেষ স্থানে এবং কবিতা ও নাটকের গ্রন্থ উভয়ে কয়েক বছরে গড় হিশাবে প্রায় পাশাপাশি চলেছে। আবার একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, পশ্চিমবাংলায় গড়ে ২৩০০ বই প্রতিবছর প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ১৩০০ হোলো বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই-এর গড়।

এদেশের বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম অংশ কৃষক এবং মজুর। এদের অধিকাংশই আবার নিরক্ষর। সুতরাং আশা করি মানুষের শিক্ষার নিম্নমান এবং নিরক্ষরতার দরুণ প্রতিবছর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। দেশে বাংলা জানা বা বাংলাভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা সাড়ে-চার কোটির মতো। খবরটি জেনে অবাক হতে হলেও একথা সত্য, ২৩০০০ বাংলা ভাষাভাষীর জন্য প্রতিবছর গড়ে একটিমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। আর ২১০০০ ভারতীয়ের জন্য বছরে একটি মাত্র গ্রন্থ বের হয়। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, নেদারল্যাণ্ডসে ১২০০ নাগরিকের জন্য একটি এবং জাপানে ৩২২৫ জন নাগরিকের জন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করতে পারি, উল্লিখিত দেশগুলি সমাজ-জীবনে জ্ঞানবিস্তারে ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচারে-প্রসারে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছে। আর আমরা?

বাংলা বই প্রকাশিত হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম, একথা বলা হয়তো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কেন কম ছাপা হচ্ছে, একথা কি আমরা চিন্তা করে দেখেছি?

কিন্তু ও অবস্থা কেন? বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশন শিল্পের অনগ্রসরতা। আর প্রকাশন শিল্পের এই দুরবস্থার কারণও একাধিক। পুস্তক প্রকাশনের এখন প্রধান অন্তরায় হয়তো কাগজের অভাব ও অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। এই একটি মাত্র ব্যবসাই যা এখনও পুরোপুরি বাঙালীদের হাতে আছে। কিন্তু অবস্থা এখন যা, তাতে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। একথাও বলা হয়, এই ব্যবসায়ে নাকি মুনাফা-লাভ খুব তাড়াতাড়ি আসে না, তাই ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসায় টাকা পয়সাও তেমন খাটাতে চান না। প্রকাশন ব্যবসায় সরকার অনুমোদিত বা স্বীকৃত নয়। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এই ব্যবসায়, অর্থসাহায্য করতেও ততোধিক উৎসাহ-আগ্রহ দেখান না। উপরন্ত গ্রন্থ প্রকাশন তপশিলভুক্ত শিল্প হিসাবে স্বীকৃত না হওয়ায়, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে প্রকাশন ব্যবসায়ের জন্য অর্থ দেওয়া হয় না। এছাড়াও আছে দেশীয় বই-এর বাজারে বিদেশী অর্থের প্রবেশ, কাগজের ঘাটতি ও কালোবাজারী। এ ছাড়া উন্নত শ্রেণীর গ্রন্থগুলির ক্রমশ মূল্যবৃদ্ধির ফলে, আমাদের দরিদ্র দেশের গরীব জনসাধারণের পক্ষে ইচ্ছামতো বই ক্রয় করে জ্ঞানবৃদ্ধি করা নিতান্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

প্রকাশন-শিল্পের দিকে সরকারকে সবিশেষ দৃষ্টি দিয়ে যথোপযুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করতে হবে। প্রকাশদেকর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির দিকে নজর না দিয়ে- অন্ততঃপক্ষে 'ভালো গ্রন্থগুলির'' বা দশ-বিশ হাজারের কাছাকাছি বা বেশী বিক্রয় হচ্ছে- এমন বই সহজ কারণেই অনেক কম মূল্যে বাধ্যতামূলক ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য সরকার ইতিমধ্যেই এব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছেন।

তবু বিদ্যুতের অভাব কাগজের অগ্নিমূল্য ও অভাবনীয় দুষ্প্রাপ্যতা নিশ্চিতভাবে দূর করে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে নিয়মিতভাবে কাগজ সরবরাহ করে সহৃদয়তার পরিচয় দিতে হবে কাগজ ব্যবসায়ী ও সরকারকে; দেশের বা সমাজের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে তা একান্ত জরুরী।

একশত সাত নীলপদ্ম

১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সব উপাদানের অনেকগুলিই শাস্ত্রসম্মত। এইভাবেই বিচিত্র উপাদান সমন্বয়ে, বিচিত্র লোকমানসিকতাকে উপজীব্য ক'রে গড়ে উঠেছে বিচিত্র সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের পূজা।

এইপূজাকে কেন্দ্র করেই এক সময় হয়েছে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ—আবার গ্রামের জমিদার বাড়ীতে মুসলমান প্রজারা অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ নিয়ে ফিরে গেছে নিজেদের বাড়ীতে। এই বাংলার বুকেই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মহান মিলন ঘটেছে। সেকালের জমিদারবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ-কেন্দ্রিক দুর্গাপূজা এক অর্থে সার্বজনীন—গণতান্ত্রিক। একে কেন্দ্র করেই বাংলার পণ্ডিতসমাজে প্রবল তর্কের ঝড় উঠেছে চায়ের পেয়ালায়—নয়—তুলসী পাতার শরবতের গেলাসে। সার্বজনীন পূজা ক'রেছিলেন বলে বাগবাজারের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যকে একঘরে করা হয়েছিল।

আজকের এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পৌঁছে একবার যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় অতীতের সেই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, একালের নিয়ন-মাইকের ব্যস্ত তোড়জোড়ের মধ্যেও সেই ইতিহাসই ভিন্নরূপে বয়ে চলেছে।

পূজার থেকে রামচন্দ্র তীরধনুক নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—একটি মাত্র নীলপদ্ম কম। তাই নীলোৎপল সদৃশ একটি নয়ন বিসর্জন দিতে গেলেন দেবীর পাদপদ্মে। দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে ফিরিয়ে দিলেন নীলপদ্ম—পরীক্ষীত হোল রামচন্দ্রের ভক্তি।

একালের পূজায় কী একটি নীলপদ্ম কম পড়েছে?

খেলা ধূলা

মরশুমী ফুটবল

অজয় বসু
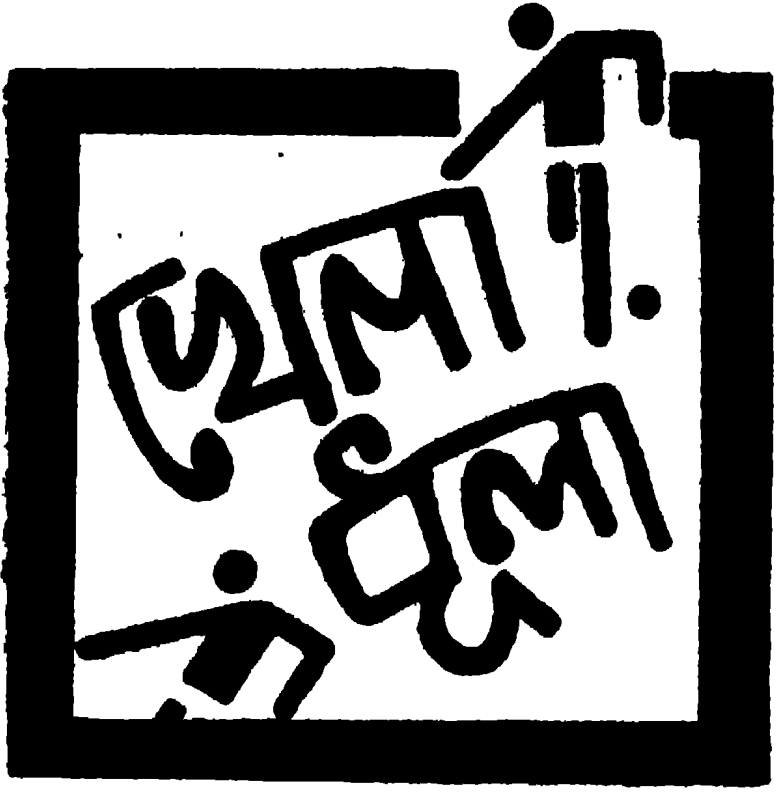
কলকাতায় মরশুমী ফুটবলের পালা এখন গুটিয়ে নেবার মুখে। দীর্ঘমেয়াদী লীগ শেষ হয়েছে অনেক দিন আগেই। শীল্ডও শেষ। পেছনের দিকে তাকিয়ে গড়ের মাঠের রমরমা প্রহরগুলিকে খতিয়ে দেখতে দিয়ে আজ কেবলই মনে হচ্ছে যে, যে ফুটবল এবারে দেখতে পেলাম তাতে মন ভরেনি। দৃষ্টিসুখ যে কী অভিজ্ঞতা তা উপলব্ধি করা যায় নি। হিসাব নিকাশের আঁক কষতে বসে এই উপলব্ধিই বুঝি সাচ্চা হয়ে উঠেছে যে যথার্থ ফুটবল অনুরাগীদের প্রত্যাশামুখী মন যেন এবার ফাঁকিতেই পড়ে গেছে।

লাভ হয়েছে অবশ্য মোহনবাগানের। ছ ছবছরের আত্ম বিস্মরণের কাল পেরিয়ে লীগ জয়ের সাফল্যের সূত্রে মোহনবাগান নিজেকে আবার ফিরে পেয়েছে। অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের চড়া চ্যালেঞ্জকে বাগে এনে স্বমূর্তিতে প্রতিভাত হওয়া মোহনবাগানের পক্ষে যেমন, তেমনি কলকাতার ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজনীয় ছিল। এই দরকারি কাজটি মোহনবাগান এবার করে তুলতে না পারলে ইস্টবেঙ্গলের একতরফা প্রাধান্যের চাপে কলকাতার ফুটবলের গতি প্রকৃতি চেহারা চরিত্র, সব কিছুই আরও একপেশে হয়ে পড়তো। গত ছ বছরের কলকাতাকে প্রতিদিনই এই একপেশে প্রাধান্যের স্বাদ পেতে হয়েছে। তাতে না ছিল বৈচিত্র্য, না তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঁচ। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন জোলো হয়ে পড়ছিল। পালের হাওয়া উলটো মুখে বইয়ে দিয়ে মোহনবাগান অন্তত এবারের জন্যে লীগ খেলার আসরটিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছে। হারজিৎ, সাফল্য-ব্যর্থতা, ভাঙ্গা গড়াকে কেন্দ্র করেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান জমে ওঠে। গত ৬ বছরে উত্থান ও পুনরুত্থানের সূত্রে ইস্টবেঙ্গল দল তার বিজয় রথটিকে যতোই গড়গড়িয়ে ছুটিয়েছে, ততোই যেন প্রতিযোগিতাভূমিতে নিরুত্তাপ অন্ধকার নেমে এসেছে। অন্ধকারের কোন ছেড়ে আলোর রাজ্যে পুনঃপ্রবেশ করে মোহনবাগান যে বাস্তব পারস্থিতিতে উপভোগ্য উপাদান মিশিয়ে দিতে পেরেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এতো করেও কী মোহনবাগান ঘরোয়া ফুটবলের মানকে উঁচু জাতে তুলে ধরতে পেরেছে? বোধহয় পারেনি। মরশুম আরম্ভের আগে জনকয়েক নামী ফরোয়ার্ডকে নিজের শিবিরে টেনে এনে মোহনবাগান তার সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে তুলেছিল, সার্বিক মূল্যায়ণে সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় নি। আশা ছিল, মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইন আরও ভাল খেলবে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত লগ্নে দপ করে জ্বলে ওঠার বেশি তাঁরা আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি। দপ করে জ্বলে উঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটানোর সূত্রেই মোহনবাগান লীগের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে সত্যি। কিন্তু সমমানে ঠায়পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধারাবাহিক নিপুণতার পরিচয় রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাগে আনতে মোহনবাগানকে মাঝে মাঝে অমন বেগ পেতে হোত না। আসলে মোহনবাগানের নামী ফরোয়ার্ডরা নন, অখ্যাত হাফব্যাক প্রসূন ব্যানার্জির আচরণেই এবার ক্রমোন্নতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গলের সুবিখ্যাত হাফব্যাক, মেহনতী ও মজবুত গৌতম সরকারের পাশে মানানসই হয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা দেখিয়েছেন প্রসূন, নিজের কর্মকাণ্ডের জোরে।

লীগ মরশুমের অভিজ্ঞতা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সুখকর নয়। ছবারের চ্যাম্পিয়নের অবস্থা রাজ্যহারা সম্রাটের মতো। তবে এই পরিস্থিতি তাদের কাছে বোধহয় তেমন অপ্রত্যাশিত ছিল না। যেহেতু মরশুম শুরুর মুখে দল ভাঙাভাঙির জের মিটোতে গিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে বেশ বড় রকমের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। গৌতম, সুরজিৎ এবং সুধীর কর্মকারের শত চেষ্টাকরেও ঘাটতি পূরনে সফল হতে পারেন নি। অত্যুৎসাহী দল সমর্থকেরা ইচ্ছাপূরণের তাগিদে ইস্টবেঙ্গলের যথার্থ শক্তি সামর্থ্য সমন্ধে যতোই উঁচু ধারণা পোষণ করে থাকুন না কেন, বাস্তব মূল্যায়ণে এবার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গতিতে টান পড়েছিল, যে সঙ্গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল মোহনবাগানের ক্ষেত্রে। কাজেই মূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লীগ ফুটবলে মোহনবাগানের সাফল্য সুসমগুণেই।

তবে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল, ডাকসাইটে এই দুটি দল যে এবার উঁচু ধরণের ফুটবল খেলেছে অথবা কলকাতার ফুটবলের মানকে নতুন আশায় রাঙিয়ে তোলায় নিশ্চিত ভাবে কিছু করতে পেরেছে, তা মনে করা যায় না। তাদের অনুসৃত পদ্ধতি ছিল, মোটামুটি সাবেকী ছাঁদেই গড়া। এই ছাঁদ বৃহত্তর আসরে তো নয়ই, এশীয় ক্রীড়ার সীমায়িত পরিধিতেও ফয়দা তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বড় বড় দলের তাবড় খেলোয়াড়দের কেউ কেউ ফুটবলের প্রাথমিক দক্ষতায় রপ্ত হয়ে উঠতেই হাঁফিয়ে পড়েছেন। সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ যেন নিত্যকার। কাজেই ওঁরা যে কী ফুটবল খেলছেন, তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু তা সত্বেও মহানগরী কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবাংলাই মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা মহানন্দে উপভোগ করেছেন। কলকাতার ফুটবল মানেই

মহামেডান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় সুরজিত এগিয়ে যাওযার চেষ্টা করছে

তো এই দুটি দল। ওদের উত্থানপতন ঘিরেই কান্না হাসির দোলদোলানি। উৎসাহ, উদ্দীপনা, আবেগের ছড়াছড়ি। গ্যালারি জুড়ে নিত্যই কতো অভিনব দৃশ্যকাব্যের অবতারণা। মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল, কলকাতার ফুটবল অনুরাগীদের নয়নের নিধি, মাথার মণি, প্রাণের প্রাণ। কয়েক যুগ আগে মহামেডান স্পোর্টিংও ছিল এমন জন-সমর্থিত। কিন্তু কীর্তি কৃতিত্বের পরিচয় রাখায় ক্রমশঃই পিছু হটার ফলে মহামেডান আজ তার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি হারিয়ে ফেলেছে। এখন মূল আসর ইষ্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের নামগানেই অষ্টপ্রহর সোচ্চার। ওদের পায়েই জনতা আত্ম-সমর্পিত প্রাণ। কেউ যদি বলে, কলিকাতার ক্রীড়ানুরাগীরা ফুটবল বলতে পাগল, তাহলে ভুল করা হবে। সত্য এই যে তারা পাগল মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গলের মোহ জড়ানো নামেই। তাই মারদেকা ফুটবলে জাতীয় দল যদি দুটি খেলায় উনত্রিশটি গোল খায় আর ঘরোয়া আসরে যদি মোহনবাগান লীগ জয় করতে পারে তাহলে এই জনতা জ.তীয় দলের বিপর্যয়ের শে ক ভুলে মোহনবাগানের সাফল্য ঘিরে উচ্চকন্ঠ জয়ধ্বনি তোলেন। ওঁদের মূল্যবোধ ভিন্নতর। তার তাগিদেই কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবাংলার ক্রীড়ানুরাগীরা আজ স্ববিরোধিতায় ভুগছে। ভারতীয় ফুটবলে এও এক ট্র্যাজেডি। যেহেতু ভারতীয় ফুটবলের ধাত্রীগেহ হলো কলকাতা। অথচ ফুটবলে ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর চিন্তার বাদবিচার করায় কলকাতার কোনো আগ্রহই নেই।

কলকাতার লীগ ফুটবলকে মূলতঃ কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়। এক অধ্যায়ে নামমাত্র দুটি দল শীর্ষস্থান পাওয়ার চেষ্টা করে। অন্য পর্বে বেশির ভাগ প্রতিযোগীই প্রথম ডিভিশনে তাদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখায় নানা ফন্দী ফিকির আঁটে। আর তারই পরিণাম লীগের আসরে খেলা খেলা ভাব জাগানো নকল প্রতিযোগিতার মহড়া দেওয়া হয় এবং নেপথ্যে চলে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির ফলাও কারবার। নেপথ্যের এই কাজ কারবারে গড়ের মাঠ অধুনা এক সামাজিক ব্যাধির ডিপোতে পরিণত হয়ে গেছে। ওখানে বাড়ন্ত ছেলেদের চরিত্র হননের পাকা আয়োজন করে তাদের দুর্নীতিতে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এমন অলুক্ষনে কাণ্ড হাজারো মানুষের খোলা দৃষ্টির সামনে ঘটলেও সংক্রামক ব্যাধি নিরাময়ে কোনো চেষ্টাই যে করা হচ্ছে না তা শুধু ফুটবলেরই নয়, জাতির পক্ষেও দুর্ভাগ্যজনক।

শুধু উপরতলায় থেকে যাওয়ার একমাত্র সংকল্পে যে সব দল লীগে খেলেছে তাদের বাদ দিলে থাকে আরও কটি পক্ষ যাদের অধিষ্ঠান লীগ কোঠার মাঝপর্বে। তারা চ্যাম্পিয়ানশিপ পাওয়ায় চেষ্টিত নয়। আবার নেমে যাওয়ার আশঙ্কায়ও আতঙ্কিত নয়। এককথায়, তারা মোটামুটি মানে দাঁড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং, এরিয়ান্স, জর্জ টেলিগ্রাফ, পোর্ট কমিশনার্স এবং রেজিমেন্ট আর্টিলারি মন্দ খেলেনি।

অনেকদিন পর আবার একটি ফৌজিদলকে আমরা লীগের আসরে দেখতে পেলাম। দেখে খুসীই হয়েছি। যেহেতু নির্ভেজাল শারীরিক সক্ষমতাকে মূলধন রূপে ব্যবহার করেই এঁরা উত্তরণের পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন। এঁদের কাজে ভেজাল ছিল না। শুধু শরীরকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করে ফুটবল মাঠে কতোটা কি করা যায় তা তাঁরা দেখিয়েছেন।

তবে সবটুকু করে ওঠা সুস্থ, সক্ষম ফৌজি খেলোয়াড়দের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। কারণ ফুটবল তো শুধু শরীরেরই খেলা নয়। শুধু শরীর নিয়ে হয়তো যন্ত্রবৎ নিখুঁতত্বে পৌঁছানো যায়। কিন্তু যন্ত্রকে বিকল করার বুদ্ধি ধরে যে মস্তিষ্ক তার ছলাকলা সামলে দিতে যা বুদ্ধির প্রয়োজন ঘটে সেই উজ্জীবিত চিন্তার সামিল ছিলেন না ফৌজি খেলোয়াড়েরা। তাই তাঁরা লীগে আগুয়ান অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে একেবারে সামনের সারির সিঁড়ি দখল করে নিতে পারেন নি। তবে তাদের আবির্ভাবে এবার গড়ের মাঠে যে তাজা হাওয়া বয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেখানকার আবহাওয়ায় তাঁরা সুস্থতা ও শারীরিক সফলতার স্পর্শ জাগাতে পেরেছেন। ফুটবলকে তাঁরা মরদের খেলায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।

ফৌজি দলের নওজোয়ানদের শারীরিক সঙ্গতির সঙ্গে বুদ্ধিধর খেলোয়াড়দের মস্তিষ্কের যদি সংমিশ্রণ ঘটানো যেতো তাহলে কী হতে পারতো আজ তাই কেবল ভাবছি। তখন কি আমাদের ফুটবল খোলনলচে পাল্টে ভলির দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইতো না? সত্যিই, এটা ভাববার কথা।

সিনেমা
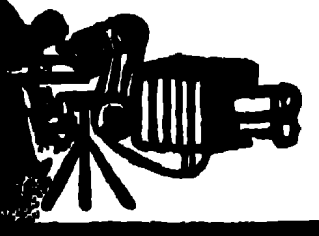
চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বিষয়টি অদ্যাবধি প্রায় অনুল্লেখ থেকে গেছে। তাঁর কবিতা, গান, উপন্যাস কিংবা পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা ও গীতরচনা বিষয়েও অনেকের রচনাপাঠে জানা যায়। মনোমোহন থিয়েটারে শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল', মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সওদাগর', 'মহুয়া' ইত্যাদি নাটকে নজরুল সঙ্গীত পরিচালনা ও গীতরচনা করেছিলেন।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সঙ্গীত পরিচালক ও গীতিকার হিসাবে।

১৯৩১, মতান্তরে ৩২-এ সঙ্গীত পরিচালক-রূপে নজরুলের প্রথম চলচ্চিত্রে প্রবেশ। ছবির নাম, 'পাতালপুরী'। নির্মাণ করেছিল তদানীন্তন প্রযোজক সংস্থা কালী ফিল্ম ষ্টুডিও। ছবির পরিচালক ছিলেন পি. এন. গাঙ্গুলী।

এর দীর্ঘদিন পরে ১৯৩৭-এ তিনি অপর চলচ্চিত্রের সঙ্গীতপরিচালকরূপে দেখা দিলেন। ছবি, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক নরেশ মিত্র ছিলেন গোরার পরিচালক। এই ছবিতে নজরুলের সহকারী ছিলেন বর্তমানের খ্যাতিমান সুরকার কালীপদ সেন। রসিকমহলে 'গোরার' সঙ্গীত পরিচালকরূপে নজরুল সে সময় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

নজরুলের সঙ্গীত পরিচালনায় পরবর্তী ছবির নাম 'চৌরঙ্গী' (১৯৪১)। চৌরঙ্গী বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষায় নির্মিত হয়েছিল। নির্মাণ করেছিল তৎকালীন কজলী ব্রাদার্স। বাংলা চৌরঙ্গীর পরিচালক ছিলেন, নরেন্দ্র সুন্দর। হিন্দি ভাষ্যে পরিচালনা করেছিলেন এস. কজলী। নজরুল যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। চৌরঙ্গীর বাংলা ভাষ্যের কয়েকটি গান তখন সাধারণের মুখে মুখে ফিরত। আরবি সুরের সেই বহু বিখ্যাত নজরুল-গীত. 'কম ঝুম ঝুম ঝুম খেজুর পাতায় নূপুর বাজায়ে কে যায়....' চৌরঙ্গী চিত্রে এটি সংযোজিত হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ছবির জন্য এই গানটি গেয়েছিলেন গায়িকা শৈলদেবী।

চৌরঙ্গীর সঙ্গীত বিষয়ে নজরুলের নাম দশদিকে নন্দিত হয়েছিলো ঠিক কথা, কিন্তু এছবির পারিশ্রমিক বাবদ নজরুল একটি কপর্দকও পাননি। এ বিষয়ে যা জানা যায়—তাহলো, অসুস্থ হবার পর অর্থাৎ ১৯৪২-এর শেষের দিকে নজরুলকে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। মধুপুর থেকে তিনি তাঁর সুযোগ্য সহকারী কালীপদ সেনকে একটি চিঠিতে জানান যে, নিদারুণ অর্থকষ্টে তিনি কাল কাটাচ্ছেন। কালীবাবু যেন কজলী ব্রাদার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্তত কিছু টাকা সংগ্রহ করে মধুপুরে পাঠিয়ে দেন। এ বিষয়ে তৎপর হয়ে কালীবাবু কজলী ব্রাদার্সের কলকাতা অফিসে গিয়ে জানতে পারেন, গণেশ উল্টে কজলী ব্রাদার্স বোম্বাই চলে গেছে। কালীবাবু টাকা আদায়ের জন্যে চেষ্টা চরিত্র যথেষ্ট করেছিলেন। কিন্তু টাকা পাওয়া যায়নি। ফলত, চৌরঙ্গীর সঙ্গীত পরিচালনা বাবদ নজরুলের প্রাপ্তিযোগ কিছুই ঘটেনি।

চৌরঙ্গীর পর নজরুল আর কোন ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেননি। তবে অভিন্নহৃদয় বন্ধু শৈলজানন্দ পরিচালিত 'নন্দিনী' (১৯৪২) ছবিতে নজরুলের কিছু উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল। শচীনদেব বর্মণ গীত 'চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল পাখি...' বহু বিখ্যাত গানটি এই ছবির। যদিও নন্দিনীর সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন তৎকালের বিখ্যাত সুরকার হিমাংশু দত্ত, কিন্তু নজরুল এই গানটি রচনা ও সুর সংযোজন করে শচীনদেব বর্মণের কণ্ঠে রেকর্ড করিয়েছিলেন। এবং এর জন্যে পারিশ্রমিক হিসাবে নজরুল ও শচীনদেব উভয়েই ১০০ টাকা করে পেয়েছিলেন।

এরপরেই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়—বস্তুত জীবন ও জগতের সঙ্গে। সৃষ্টির সঙ্গেও।

এবারের পুজোর ছবি

এবারের পূজায় বাংলা ছবির আকর্ষণ অন্যান্যবারের তুলনায় কিছু নিষ্প্রভ। কতগুলি ছবি থাকে, যেগুলি দেখতেই হবে বলে দর্শককুলে রীতিমত সাড়া পড়ে যায় এবং পূজার সময় টিকিট সংগ্রহের একটা প্রাণান্তকর চেষ্টা চলে। বস্তুত সেধরনের সাড়া জাগানো বাংলা ছবি এবারে নেই।

শরৎচন্দ্রের দত্তা ছবিটি ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সুচিত্রা সেনের অভিনয় এছবির মূল আকর্ষণ। দত্তা পূজায় চলবে। এছাড়া আসছে আরো তিনটি নতুন ছবি: (১) বহ্নিশিখা (২) নিধিরাম সর্দার (৩) দুইবোন।

চিঠিপত্র

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি
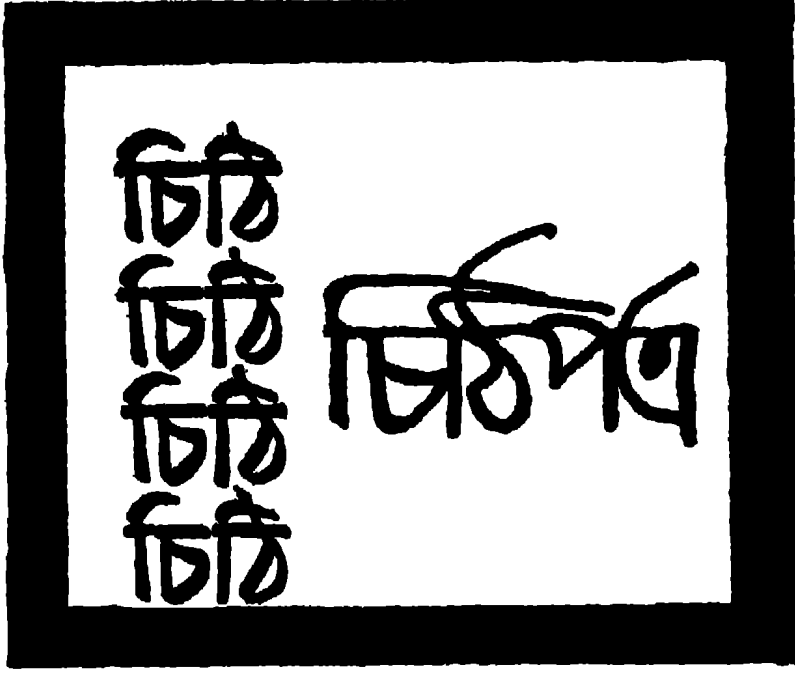
সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার ১৫ আগষ্ট সংখ্যায় 'বন্দেমাতরম' শীর্ষক প্রবন্ধটির মধ্যে একটি তথ্যগত মারাত্মক ভুল রয়েছে। মৃগাঙ্ক বাবু তাঁর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অপমানিত হবার যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন সেটি ১৮৮১ সালের অনেক আগেই ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ সালে যখন বহরমপুরে বদলি হয়ে আসেন তখন সেখানকার গোরা-ব্যারাকের ভেতর দিয়ে তিনি কাছারী যেতেন পাল্কী চড়ে। গোরাদের তাতে খুব আপত্তি ছিল এবং একদিন বিকেলে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাছারী থেকে ফিরছিলেন তখন ব্যারাকের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ডাফিন তাঁর পাল্কীর বন্ধ দরজায় করাঘাত করেন। তিনি তার প্রতিবাদ করলে উদ্ধত কর্ণেল তাঁর হাত ধরে ঝাঁকানি দেন। বঙ্কিমচন্দ্র এর বিরুদ্ধে ফৌজদারিতে নালিশ করেন। শেষ পর্যন্ত জেলা জজ বেনব্রিজ সাহেবের মধ্যস্থতায় এই অপ্রীতিকর ঘটনার অবসান হয়। ডাফিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চেয়ে অব্যাহতি লাভ করেন।

আরো দুটি ভুল আছে। বন্দেমাতরম গান রচিত হয় ১৮৭৫ সালে আর 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।

কলিকাতা-২৮

মণি বাগচি

মহাশয়,

আপনাদের 'ধনধান্যে' পত্রিকাটি মাঝে মাঝে পড়বার সৌভাগ্য হয়। যে কটি সংখ্যা হাতে পাই, সবগুলিই অত্যন্ত উঁচু মানের। লেখা-রেখা, রচনার বিষয়বস্তু সব দিকেই আপনাদের পত্রিকায় শোভন রুচির ছাপ যে-কোন রসিক পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পত্রিকাটির মধ্যে সমাজ-দেশ-জনসাধারণ যেমন উপস্থিত, তেমনি সাহিত্যকেও আপনারা নানান্ রচনা ও ফিচারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। বস্তুত, এমন সুসম্পাদিত রুচিশীল পত্রিকা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাদবাহী সরকারী পত্রিকা বড় একটা দেখা যায় না। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কলকাতা-২৬

পলাশ মিত্র

সবিনয় নিবেদন,

পূর্বে আমি 'ধনধান্যে'র অনিয়মিত পাঠক ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে এই পাক্ষিকটির প্রতিটি সংখ্যা আর না পড়ে থাকতে পারি না। পত্রিকাটির প্রতি আকর্ষণের কারণ সুসজ্জিত প্রচ্ছদ ও তথ্যবহুল অজস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনা। গত (১৫ সেপ্টেম্বর) সংখ্যাটি আমাকে বিশেষভাবে চমৎকৃত করেছে। 'গ্রাম বাংলার পাঁচালী' এবং 'বিজ্ঞান প্রযুক্তি' কলমে যথাক্রমে আব্দুল জব্বারের 'আর নয়' ও রমেন মজুমদারের 'ক্যান্সার মারে কিন্তু সারেও' রচনা দুটি যেমন সময়োপযোগী তেমনি যুক্তিনির্ভরও বটে। বিশেষ ক'রে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখকদের উচ্ছভাবনা-জাত রচনাগুলি পত্রিকাটির আভিজাত্য শতগুণে বর্দ্ধিত করেছে। আশা করি 'ধনধান্যে'র এই সাধুপ্রচেষ্টা চির অক্ষুন্ন থাকবে।

সুব্রতকুমার করণ

২৪ পরগণা

আগামী সংখ্যায়

ইউনেস্কোর ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ রচনা

শান্তির হাতিয়ার ইউনেস্কো
প্রণবেশ সেন

সংবিধান সংশোধন কেন
অসিত কুমার বসু

আজকের শিক্ষাভাবনা
ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নেশা (গল্প)
অমিয় চৌধুরী

এবারের মুখোমুখি : প্রখ্যাত শিল্পী রামকিংকর বেইজ-এর সঙ্গে

এছাড়া খেলাধুলা, মহিলামহল, কৃষি, সিনেমা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার :
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩২৫৭৬

প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩১ অক্টোবর, ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষ : অষ্টম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের কলমে

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর চোরাই চালান বন্ধ অভিযানের দু'বছর পূর্ণ হল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যে সাফল্য লাভ করা গেছে সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পূর্বে চোরাই মাল বড় বড় শহরের যত্রতত্র প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত। এটাকে বন্ধ করার জন্য ত্রিমুখী অভিযান চালানো হয়। প্রথমতঃ চোরাই চালানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আটকের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন জায়গায় অনবরত তল্লাসি চালিয়ে মালামাল আটক করা হয় এবং তৃতীয়তঃ চোরাচালানকারীদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আইন প্রণীত হয়। এই ত্রিমুখী অভিযান খুবই কার্যকরী হয়।

গত দু'বছরে ২৭৮৫ জন চোরাচালানকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। এর মধ্যে ২৩৮২ জনকে আটক করা সম্ভব হয়। বাকী ৪০৩ জন এখনও আত্মগোপন করে আছে। গত জুন মাস পর্যন্ত ৯১৯৪ ক্ষেত্রে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালানো হয়। ঐ সময় দুবছরে ৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আটক করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালের এ পর্যন্ত তল্লাসির সংখ্যা বাড়লেও টাকার মূল্যে দ্রব্যাদি উদ্ধারের পরিমাণ কমেছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় চোরা চালানের সংখ্যা কমেছে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় একথা জানান।

কালোটাকা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেও নানা প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আয়কর ফাঁকি বন্ধের উদ্দেশ্যে প্রতিবছরই তল্লাসির ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে মাত্র ৩৫ টি জায়গায় তল্লাসি চালিয়ে ৪.৪৮ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয় সেক্ষেত্রে ১৯৭৫-৭৬ সালে ২৬৩৫ জায়গায় এবং ১৯৭৬ সালের চার মাসে ১৪০৬ জায়গায় তল্লাসি চালিয়ে যথাক্রমে ২১.৩৫ কোটি ও ৮.৩৫ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় ঘোষণা পরিকল্পনানুযায়ী গত বারে ১৫০০ কোটি টাকার মত জমা পড়েছিল। বর্ত্তমানে আয়কর ফাঁকি বন্ধের অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।

চোরাইচালান একেবারে বন্ধ না হলেও এখন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে বিদেশী মাল বিক্রী কম হতে দেখা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে চোরাই পথে টাকা আনাও বন্ধ হয়েছে। চোরাইচালান ও কালো টাকা বন্ধ করার অভিযান কার্যকর হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। দেশের সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতির যে উন্নতি বর্ত্তমানে দেখা দিয়েছে তার জন্য কালোটাকা উদ্ধার ও চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানের সাফল্য বিশেষভাবে দায়ী।

কিন্তু একমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাই এটাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে সমর্থ নয়। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা এই ব্যাধিকে নির্মূল করতে পারে। বিদেশী জিনিসের প্রতি মোহ বিসর্জন দিতে হবে। স্বদেশী জিনিসের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। চোরাচালানকারীদের গোপন আস্তানা সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরকে জানাতে হবে। কালোটাকা বন্ধের জন্যও সরকারের সঙ্গে সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তা হলেই সফল হবে এই অভিযান।

দীপাবলী

অমিতাভ চক্রবর্তী

মা কালীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এঁকেছিলেন যে মূর্তি সেখানে এক নিঃশব্দ আঁধার—নিভে গেছে নক্ষত্র....সহস্র উন্মাদ আগলখুলে করেছে আত্মপ্রকাশ....উৎপাটিত হচ্ছে বৃক্ষমূল.... সর্বব্যাপী এক ঝড়। সেইরূপেরই প্রতিফলন যে অমাবস্যায় দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরেই—সেইদিনই হয় কালীপুজো। বাঙালীর, বিশেষ করে কোলকাতায় এ পুজোর এক বিশেষ আবেদন।

আবহমানকালধরে পালনকরে আসা এই রাতটিকে উপলক্ষ করে এ যুগে যুবশক্তি যখন নিয়োজিত হন চাঁদা সংগ্রহে তখন মনে পড়ে এক ঐতিহ্যের কথা। রায় বঙ্গের তান্ত্রিকদের হাতে যখন হত নরবলি। মায়ের হাতের খড়্গ সেদিন উঠত ঝলসে আর তন্ত্রপ্রেমিক সেদিন নরকরোটিতে পান করতেন কারণসুধা। সেই সঙ্গে সারা আকাশ ছেয়ে যেত আতস পাখীর অগ্নি উজ্জ্বল ডানায়। আতসবাজীর মালায় অমাবস্যার রাত হয়ে উঠত উজ্জ্বল আর সেই আলোর মালার ছটায় ছুটত খুসীর বন্যা। সে আবার আরেক ঐতিহ্যের কথা।

এই ঐতিহ্য বাবু গৌরবের ঐতিহ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যে বাবুয়ানীর শুরু সেই নকলনবিশী.... 'কালচারের' সমৃদ্ধি একেকটি উপলক্ষে। বারোইয়ারী বা বারোয়ারী পুজো ছিল সেইসব উপলক্ষ। তবে বারোয়ারী পুজো বলতে আদত পুজো ছিল দুর্গাপুজো। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' একসময় বলেছিলেন সারাবছরের যত পাপকার্য হয়ে থাকে তার অধিকাংশই ঘটে এই সময়। কালী-পুজো দুর্গোৎসবের অব্যবহিত পরেই হবার দরুণ যে উৎসবের উদ্বোধন মহা-দুর্গার পুজো উপলক্ষে—তাকে পুনর্বার যে এসময় জারিয়ে তোলা হত তা অনুমান করা যেতে পারে।

কিন্তু বারোয়ারী দুর্গোৎসবের সাথে কালীপুজোর বিশেষ করে কোলকাতায় রয়েছে এক বিশেষ তফাৎ। যেখানে দেবীদুর্গার সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্ক বছরে চারদিনের—সেখানে মা কালীর সঙ্গে তার চেনাপরিচয় একেবারে আটপৌরে।

বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে রামকৃষ্ণের যে গাথা অঙ্গাঙ্গী জড়িত তাতে দেখা যায় তিনি সাধারণ ঘরের মেয়ের মত সাধারণ ভাষায় তাঁকে করছেন সম্বোধন.... খাওয়াচ্ছেন....কথা বলছেন। তাই দেখা যায় কালীঘাটের, ঠনঠনের, বৌবাজারের কালী জুড়ে রয়েছে বাঙালীর রোজনামচায়। পরীক্ষায় পাশ-ফেল, চাকরী, বড়বাবুর মনরাখা বা বাবু-বিবির মান-অভিমানের নানান পর্য্যায়ে এই দেবীকে ডাক পড়ে।

কেবল বাঙালী কেন? হিন্দুসমাজের জাতিপ্রথা যেমন ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যেও অনুসৃত—তেমনি প্রচলিত কালীপুজো এমনকি ফিরিঙ্গি সমাজেও। রাজনারায়ণ বসুর লেখায় পাওয়া যায় যে কালীঘাটের মন্দিরে প্রথমে পুজো হ'ত সাহেবদের। তাদের মানত করা পাঁঠার ওপর পড়ত প্রথম কোপ। তারপর অধিকার থাকত বাবুদের। এমনকি নবাবের সাথে যুদ্ধ জিতলেও হত পাঁঠাবলি। আর সেই সাহেব-সৌদামিনির মধ্যে যে দেখেছিল বাংলার লাবণ্য, এ দেশের জল হাওয়ার সোঁদাগন্ধে যে লবণের ব্যবসা ছেড়ে অশ্রুজলে খুঁজতে চেয়েছিল লবণ—সেই ফিরিঙ্গি কবিয়াল এন্টনিও পাগল হয়েছিল মা কালীর পুজো করে। প্রতিষ্ঠা করেছিল ফিরিঙ্গি কালী বৌবাজারে। হোক্ না ম্লেচ্ছ তবুও তো কালীভক্ত। তাইতো সে স্পর্শ করেছে বাঙালীর মন, অমর হয়ে আছে তার সামাজিক ইতিহাস।

তবে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত পীঠস্থান বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কালীঘাটের কালীমন্দির। দক্ষিণভারতে যে স্থান তিরুপতি বালাজীর উত্তরপূর্ব ভারতে সেই স্থান হচ্ছে কালীঘাটের মন্দিরের। ধনাঢ্য রাজারাজড়া বা জমিদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এসেছে এই জাগ্রত

দেবীকে অলংকারে সজ্জিত করার। শোভাবাজারের রাজবাড়ী থেকে এসেছিল সোনার হাত। অন্যান্য অলংকার। সোনার মুণ্ড ঝুলেছিল মায়ের হাতে। সাবর্ণ চৌধুরীরা, পাইকপাড়ার রাজারা নিয়েছিলেন অন্যান্য দায়িত্ব। ঠাকুর সেবার। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিত্তবানদের ওপর মাকালীর এই প্রভাব আজও লক্ষ্যণীয়। সংবিধান প্রথমবার সংশোধিত হবার পর জমির মালিকানা ক্রমশ আসছে সমাজের অধিকারে আর জমিদারদের দোর্দণ্ডপ্রতাপও হচ্ছে বিলীয়মান। Feudalism পথ করে দিচ্ছে Capitalism এর। তবু ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতাপশালীর দল উপেক্ষা করতে পারছেনা মা কালীকে। যে দায়িত্ব একদিন পালন করতেন রাজা গোপীমোহন বা নবকৃষ্ণ সে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বিড়লাবাড়ী। মন্দিরের ফলকেই তার প্রমাণ।

বাঙালী ভালবাসে কিংবদন্তী। ভালোবাসে প্রবাহমানতা। শিকড়হীন বৃক্ষ তেমন টানেনা বাঙালীকে যেমন টানে বট-অশ্বত্থ বা পিপুল। তাই সবচেয়ে প্রিয় দেবীর মন্দির ঘিরে রচিত হয়েছে গাথা। কিংবদন্তী। গঙ্গার ওপারে চিত্রেশ্বরীর মন্দির সম্পর্কে প্রচলিত গল্পে পাওয়া যাচ্ছে যে মধ্য-উত্তর কোলকাতা-ব্যাপী বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ঘিরে ছিল 'চিতেডাকাত'দের আধিপত্য। চিত্রেশ্বরীর কালীর সামনে নরবলি দিয়ে ধনিক বা পথচারী লুন্ঠনে বেরোত এই ডাকাত দল। কালীঘাট সম্পর্কে কথিত আছে দেবী সধবার বেশে এক ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়ে বলেন তারই ঘরের একটি কৌটোর কথা। সেই কৌটো খুলে সে দেখে পাষাণময় আঙুল। তারপর সন্ধান পায় পাথরের কালীর মুখাবয়ব। সেই থেকেই কালীঘাটের দেবীর প্রতিষ্ঠা।

আদ্যাপীঠের কালী সম্পর্কেও প্রচলিত আছে স্বপ্নাদেশে কালীমূর্তি প্রাপ্তির কাহিনী। লক্ষ্যণীয় প্রতিটি কাহিনীর আটপৌরে ছোঁয়ায় বাঙালী মন গড়ে তুলেছে মা কালীকে পরিবার দেবতায়। যে দেবতা দূরত্বে সম্ভ্রমে নির্বাসিত নন, রক্তমাংসের এবং জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যেই যাঁকে পাওয়া যায় সেই দেবতার আর্চনা করছে বাঙালী।

কালীপুজোর ঐতিহ্যের আর একটি দিক আছে। যাকে উল্লেখ না করলে সম্পূর্ণ হবে না ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস। সে হল উনবিংশ-বিংশ শতকে মুক্তিসংগ্রামীদের প্রেরণার উৎসের ইতিবৃত্ত। 'বন্দেমাতরম্' যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে জাতীয় চেতনার—দেবীমন্দিরের পুজোও তেমনি তদানীন্তন বিপ্লবীদের শোনিতে এনেছে বিক্রম। আতসবাজী তৈরীর সূত্র আবিষ্কারের নেশায় বাঙালী আহরণ করছে বোমাবারুদের চাবিকাঠি। অনুশীলন, যুগান্তর দলভুক্ত বিপ্লবীদের প্রতি বিবেকানন্দ বা ভগিনী নিবেদিতার সমর্থনের কথা কে না জানেন। শক্তিপূজার এছিল এক পরোক্ষ রাজনৈতিক তাৎপর্য্য।

অন্যান্য সব পুজোর মতই বারোয়ারী সমারোহ কেন্দ্রিক এই পুজোর আতসশিল্প এবং খাওয়াদাওয়া চর্চার দিকটাই স্মরণ করায় দীপাবলী। ক্যালেণ্ডারে ওঠে লালকালীর দাগ। এযুগের বাবুরা কাল্পনিক কাহিনী তৈরী করে ছুটির দরখাস্ত লেখেন। অনেক ক্ষেত্রেই মৃতা জননীর পুনর্বার দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার প্রস্তাব থাকে যাতে দুর্গাপুজোর সঙ্গে কালীপুজোর ছুটিটা একটানা ভোগ করা যায়। তারপর বোনাস বা পুজো অ্যাডভান্স পেলে ঘাটশীলা, পুরী, দীঘা কিম্বা নিদেনপক্ষে তারকেশ্বর। আর কোনও কারণবশতঃ সেসব না হলে মায়ের প্রসাদ অর্থাৎ পাঁঠার মাংসের অঢেল সেবন তো আছেই। কবি ঈশ্বরগুপ্ত এ নিয়ে রসিকতা করেছেন।

"প্রতিকোপে যত পাঁঠা বলিদান করে।
দেবী বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে।।
একজন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায়।।"

আর দন্তহীনদের কালীপুজোর আকর্ষণ সম্পর্কে কথা আছে জনৈক বৃদ্ধের খেদোক্তির মধ্যে—"আর কালীপুজো, দাঁতই নেই"।

উদরবিভাগীয় রসের প্রাবল্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক দেওয়ালীতে এসে মিলেছে উত্তর ভারতের আলোর উৎসব 'দেওয়ালীর ধারা'। সেই বাবুগৌরবের যুগে যেমন মল্লিক, মিত্র, বোস, ঘোষ ইত্যাদি উত্তর কোলকাতার বনেদী কায়স্থ বা গন্ধবণিকের ঐশ্বর্য্যের আলোর মালা ঝলমল করত আতসবাজীর আলোর বিন্যাসে—এ যুগে বারুদের ঝলকানির জায়গায় এসে পৌঁছেছে বিজলীর বৈচিত্র্য বিন্যাস। পৌরাণিক সূত্র ধরে সাধারণ মানুষের ধারণা ভূত-প্রেতের আধিক্য থেকে ত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে এই উৎসব। এই উৎসবের অন্যনাম "ভূতচতুর্দশী" অর্থাৎ কালীপুজোর আগের দিন। এদিন ঘরের দেওয়ালে, কার্ণিশে ওঠে আলোর মালা। মোমবাতি জ্বলে অন্ততঃ চৌদ্দটি। আর কালীপুজোর মত আমিষের আধিক্য না থাকলেও চলে ক্ষীরের মিষ্টি বিতরণ, সেবন। মধ্য-পশ্চিম কোলকাতার সাবেকী অট্টালিকার মধ্যে যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয়দের ঠাস্‌বুনানি সেখানে উঠবে দেওয়ালী উৎসবের জোয়ার। বাঙালীর প্রিয় দেবতা কালীর আরাধনার সাথে মিলবে "দীপাবলীর" বিচিত্র ধারা। অমাবস্যার কালিমা ঘুচবে মনের আলোর ঝলকে। কেননা পক্ষকাল আগেই দেবী গমন করেছেন নৌকায়। অর্থাৎ আগামীদিনে ফুলে-শস্যে পরিপূর্ণা বসুন্ধরার প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এবছর পালিত হবে দীপাবলী। যার আলোর শিখায় জ্বলবে আত্মবিশ্বাস।

পুরাকীর্তি সংরক্ষণ

গোপালকৃষ্ণ রায়

বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে বিক্ষিপ্ত পাহাড় শুশুনিয়া ও বিহারীনাথের কোলে কোলে প্রস্তর যুগের মানুষ কোন এক সভ্যতা বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করেছিল। সম্প্রতি শুষ্ক প্রায়—নদীর বক্ষ খুঁড়ে ভূ-তাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিকগণ সেই বিস্মৃত যুগের সভ্যতার কিছু নিদর্শন উদ্ধার ক'রেছেন।

ভূ-তাত্ত্বিকেরা সেখান থেকে পেয়েছেন প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের কিছু জানা ও অজানা প্রাণীর কঙ্কাল। সেই কঙ্কাল পরীক্ষা ক'রে তাঁরা দেখেছেন—আজ প্রায় ২০ হাজার বছর আগে বহু বিচিত্র প্রাণী শুশুনিয়া পাহাড়ী উপত্যকায় বিচরণ করতো। আর সেই হারিয়ে যাওয়া বনভূমি আর তৃণভূমি খুঁড়ে পরাতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন কিছু প্রস্তর-যুগের অস্ত্র। সেই পাথুরে অস্ত্রগুলি—সেই কালের মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন বহন ক'রে চলেছে। সেই অস্ত্রগুলি প্রমাণ করছে—সভ্যতা বিকাশের জন্য সেই আদিম যুগের মানষ—কি সংগ্রামই না ক'রে গেছে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সেই সংগ্রাম আজও সমান ভাবে চলেছে। একটি দেশের ও জাতির প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই দেশের ও জাতির বর্তমানের গর্ব আর ভবিষ্যতের প্রেরণা।

ভারতের বুকে এমন বিভিন্ন সময়ে উজ্জ্বল সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। খৃষ্ট জন্মের তিনহাজার বছর আগে মহান সিন্ধু সভ্যতা থেকে সুরু ক'রে আজও সেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ সমান ভাবে চলেছে। পাঁচ হাজার বছর আগে যে শিল্পী নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যে শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে আজ বিংশ শতাব্দীর আণবিক আলোতেও তার ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। সেই যুগের শিল্পীর শিল্পকর্মে ধর্ম, জীবন ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে রূপ প্রাণময় হ'য়ে উঠেছিল—তা আজকের মানুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে চলেছে।

জাতির সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার নিদর্শন এইসব শিল্পকর্ম এবং পুরাকীর্তি তাই বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের পুরাকীর্তি বিদেশে পাচারের প্রবণতা বেড়ে গেছে। সংরক্ষিত পুরাকীর্তির গা থেকে অনুপম শিল্প-সৌন্দর্য্যকে সরিয়ে নিয়ে একশ্রেণীর মানুষ ব্যবসা সুরু ক'রে দিয়েছে। বিদেশে ভারতের প্রাচীন পুরাকীর্তির প্রচণ্ড চাহিদা থাকায় পুরাকীর্তি অপসারণের প্রবণতা সম্প্রতিকালে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে নবম ও একাদশ শতাব্দীর ব্রোঞ্জ নির্মিত দুটি' বিষ্ণু-মূর্তির অপসারণ, আলমোড়া জেলার কাটারমলের সূর্য্য মন্দির থেকে একটি অনুপম অষ্টধাতুর মূর্তি ও শিবপুরমের নটরাজ মূর্তি চুরি এখনও মানুষের স্মৃতিতে সজীব। এছাড়া বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্বে সমৃদ্ধ স্থান থেকে টেরা-কোটা মূর্তি অপসারণ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই সব বেদনাদায়ক ঘটনার পটভূমিকায়, ভারত সরকার পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও চোরাকারবারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে Antiques and Art Treasures Act 1972 পাশ করেছেন এবং গত এপ্রিল মাস থেকে এই আইন বলবৎ হ'য়েছে। আইনের বিশদ ব্যাখ্যা করার আগে উল্লেখ করি, সম্প্রতি হরপ্পার সমকালীন ফারাক্কা সভ্যতার নিদর্শন অনুসন্ধানের কাজ সুরু হয়েছিল, কয়েকটি চিত্তাকর্ষক টেরাকোটা মূর্তির মধ্য দিয়ে। ফিডার ক্যানেল খননের সময় মূর্তি ক'টি পাওয়া গিয়েছিল।

ঐ মূর্তির সূত্র ধরে রাজ্য সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ, স্তরভিত্তিক অনুসন্ধান কার্য্য চালান। ইতিমধ্যে আরও কতকগুলি মূর্তি সেখান থেকে পাওয়া যায়। মূর্তিগুলি পরীক্ষা ক'রে পুরাতাত্ত্বিকগণ একটি অজানা জনস্থানের আভাস পান। খনন কার্য্যের সংগে সংগে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যা হরপ্পার সমকালীন।

পুরাতাত্ত্বিকদের মতে, ফরাক্কাকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে। ফরাক্কার আবিষ্কৃত সভ্যতাকে তাঁরা চারটি যুগে ভাগ ক'রেছেন।

মাটির স্তরে কয়েকটি কূপ ও তার আশেপাশে কতগুলি মৃত-পাত্র পাওয়া যায়। পুরাতাত্ত্বিকদের ভাষায় মৃৎ-পাত্রগুলি "Ochre-coloured ware" বলা হয়। এসভ্যতাকে হরপ্পার একটি শাখা ব'লে মনে করা হচ্ছে।

ফরাক্কার কবর থেকে যে জগটি উদ্ধার করা হয়েছে, বিশেষজ্ঞগণ তাকে মধ্য ব্রোঞ্জ যুগের প্যালেস্টাইন থেকে পাওয়া বিখ্যাত "এক হাতল-জগ"-এর সংগে তুলনা ক'রেছেন। ঐ জগটি খৃষ্ট-জন্মের দু'হাজার বছর আগে কোন এক শিল্পীর অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি। ফারাক্কার মাটির নীচে থেকে অনুসন্ধানকারী দল একটি নৌকার কিছু অংশ উদ্ধার করেছেন। কে জানে, অতীতের কিছু মানুষের হয়ত সলিল সমাধি হয়েছিল সেখানে।

বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, একটি সভ্যতা মাটি চাপা পড়ার পর—তার উপর গড়ে উঠেছে—আর একটি সভ্যতা। এমনি ক'রে চারটি সভ্যতার সন্ধান মিলেছে ফরাক্কা থেকে। Archaeological Survey of India ফরাক্কা খননের সবুজ সংকেত দিয়েছেন। রাজ্যসরকার এজন্য অর্থও বরাদ্দ করেছেন।

শুধু ফরাক্কা নয়, পশ্চিমবঙ্গই এমনি অনেক পুরাকীর্তিতে সমৃদ্ধ। বর্ধমান জেলার পাণ্ডু রাজার ঢিবি ও ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড় ছাড়াও—রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ বিভিন্ন সময়ে বহু পুরাকীর্তির সন্ধান পেয়েছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গলকোটে সন্ধানকার্য্য হাতে নিয়েছেন। খৃষ্টজন্মের ১২০০ বছর আগে—এই মঙ্গলকোটে গ'ড়ে উঠেছিল একটি সভ্যতা।

তাম্রলিপ্তের কাহিনী নূতন ক'রে বলার অপেক্ষা রাখেনা। বরং মেদিনীপুর শহরের কাছে জিন শহরের মন্দিরের কথা বলি। রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ জিন শহরে প্রায় হাজার বছরের একটি পুরানো মন্দির আবিষ্কার করেছেন। দশম শতকের গোড়ার দিকে কোন এক সময়ে মন্দিরটি তৈরী করা হয়েছিল। তেমনি কর্ণগড়ের কথাও উল্লেখ্য।

পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের বিক্ষিপ্ত অঞ্চল থেকে কপার হোর্ড (Copper hoard) সংস্কৃতির কিছু নমুনা ছাড়াও বর্ধমান জেলার অজয় নদের ধারে সর্বপ্রথম চালকোলিথিক (Chalcolithic) সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। অজয় উপত্যকার ধারে জায়গাটির নাম—'পাণ্ডুরাজার ঢিবি'। পরে অবশ্য ঐ সভ্যতার ধারাবাহিকতা রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর ধারে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

উক্ত এলাকা থেকে সংগৃহীত পুরাকীর্তি থেকে পুরাতাত্ত্বিকরা অনুমান করছেন এই সভ্যতা খৃষ্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে গ'ড়ে উঠেছিল এবং বিহার, মধ্যভারত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য দূর-দূরান্ত দেশের সংগে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

২৪ পরগণা জেলার 'চন্দ্রকেতুগড়' থেকে সংগৃহীত ষাড় অংকিত একটি মাটির সীলমোহর পুরাতাত্ত্বিকদের প্রায় তিনহাজার বছর আগে কোন এক সভ্যতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। পুরাতাত্ত্বিকদের ধারণা, 'চন্দ্রকেতুগড়' প্রাচীন ভারতের একটি মহান সভ্যতার নিদর্শন। এইসব সভ্যতার নিদর্শনগুলি এবং দীর্ঘদিন থেকে সংগৃহীত পুরাকার্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হল স্বাধীনতার পর। ১৯৪৭ সালে এই উদ্দেশ্যে একটি আইন পাশ হয়। ১৯৭২ সালে সেই আইনের বদলে Antiques and Art Treasures Act পাশ হয়। এই আইন গত ৫ই এপ্রিল ১৯৭৬ থেকে বলবৎ করা হয়।

এই আইন অনুসারে সমস্ত পুরাকীর্তি ব্যবসায়ীগণকে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। এর ফলে ব্যবসায়ীগণ সরকারী আদেশ ছাড়া কোন পুরাকীর্তিসামগ্রী বে-আইনীভাবে দেশের বাইরে পাঠাতে পারবেনা। এই আইন অনুসারে ব্যক্তিগত সংগ্রহকারীগণকেও তাঁদের সংগ্রহের পরাকীর্তি নথিভুক্ত করতে হবে। এই নথিভুক্ত বা রেজিষ্ট্রেশন করার ফলে সরকার বুঝতে পারবেন দেশের মহান পুরাকীর্তি কোথায় কতগুলি আছে।

গত ৫ই এপ্রিল এই আইন সারাদেশে বলবৎ হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশনের শেষ তারিখ শেষ হবে ৪ঠা অক্টোবর। অবশ্য গত ৪ঠা জুন, ১৯৭৬ রাষ্ট্রপতি এক অডিন্যান্স জারি ক'রে—এই আইনের কিছু সংশোধন ক'রেছেন। এই সংশোধনে পুরাকীর্তি রেজিষ্ট্রেশনের কিছু হেরফের করা হয়েছে। সংশোধিত আদেশে বলা হয়েছে, একশত বছরের বা তার উর্দ্ধে পুরাকীর্তি সামগ্রী রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। যে সব পুরাকীর্তি রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে তার মধ্যে আছে পাথরের ভাস্কর্য্য, টেরাকোটা, ধাতুমুদ্রা, হাতির দাঁতের কারুশিল্প, চিত্রকলা, টঙ্কা, চিত্রকলা, অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা যায়, গতমাস পর্য্যন্ত সারা ভারতে প্রায় ৫০০০ পুরাকীর্তি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ আবেদন পেয়েছেন। এরমধ্যে প্রায় ১৫০০ আবেদন এসেছে একমাত্র কলকাতা থেকেই। পূর্বাঞ্চলে ২০ জন ব্যবসায়ী পুরাকীর্তি ব্যবসার জন্য অনুমোদন চেয়েছেন।

রাজ্য সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের জনৈক মুখপাত্র মনে করেন, কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও অনেক বেশী আবেদনপত্র আসা উচিত ছিল। তাঁরা লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন অনেক অভিজাত পরিবার রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন।

ইতিমধ্যে পুরাকীর্তি নথিভুক্ত করবার শেষ তারিখ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭৬ থেকে আরো চার মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণের ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও অভূতপূর্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আশানুরূপ বাড়েনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপরে দেশের সার্বিক উন্নতি নির্ভরশীল।

এতদিন ভারতের কোন "জাতীয় জননীতি" ছিল না। নতুন দিল্লীতে করে, জনসংখ্যা হ্রাস করতে অনেক বৎসর সময়ের প্রয়োজন এবং ততদিন জনসংখ্যা বর্ত্তমানের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে যাবে। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা Vicious cycle বা দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি করেছে। এই চক্রকে কোন এক স্থানে কঠোর আঘাতে ছেদ করতে হবে।

জননীতিতে মেয়েদের বিবাহের বয়স বর্ত্তমানের ১৫ বৎসর থেকে তিন বৎসর বাড়িয়ে ন্যূনতম ১৮ বৎসর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর করার কথা বলা হয়েছে ক্ষেত্রে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশী। সুতরাং জন্মহার কমানোর এবং মায়ের ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য বিবাহের বয়স বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সাধারণত বিবাহ রেজেষ্ট্রী হয়না বলে, কতসংখ্যক ছেলে ও মেয়ের কোন বয়সে বিয়ে হচ্ছে তা জানা যায়না। ১৯৩০ সালের Sarada Act–এ মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বৎসর ও ১৯৫৫ সালের Hindu Marriage Act–এ ১৫ বৎসর করা হলেও এর চেয়ে কম বয়সের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে।
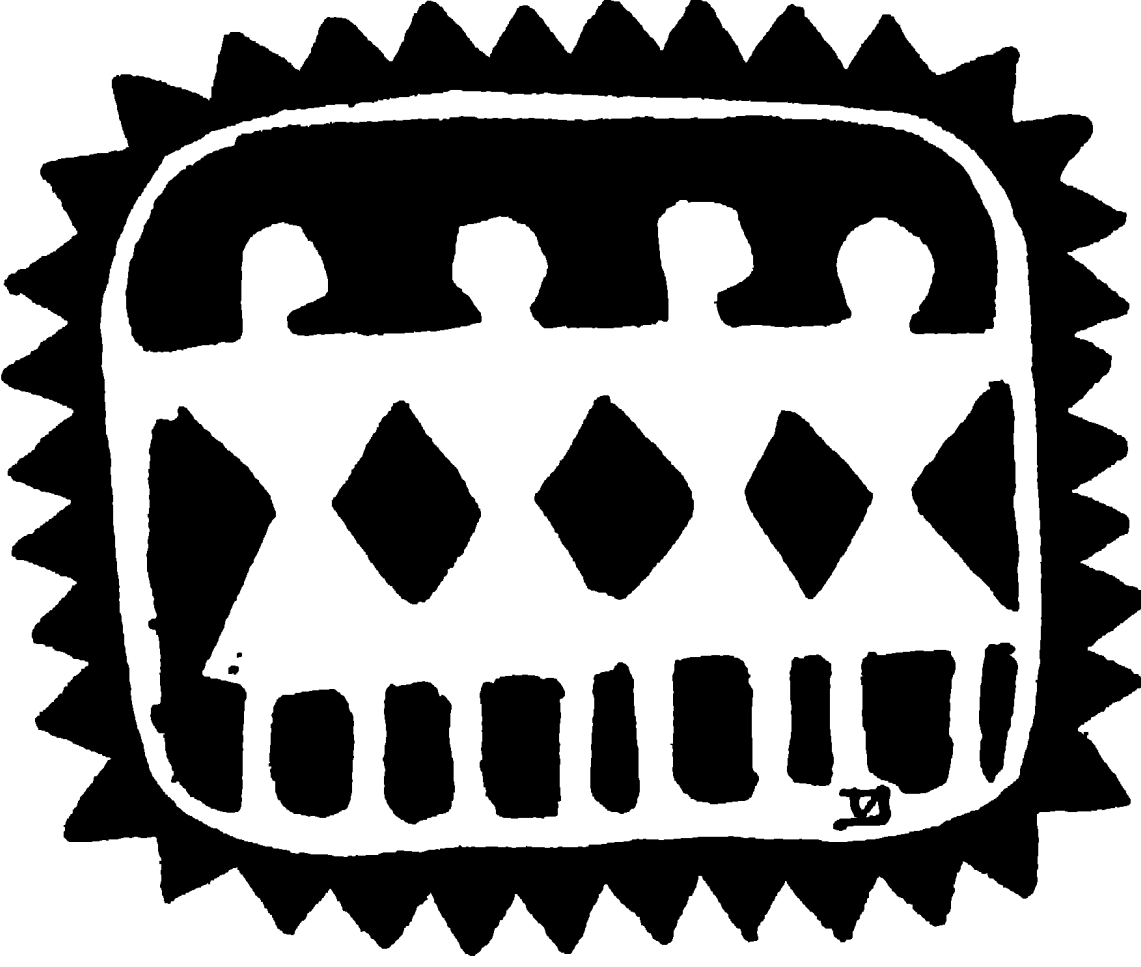
পরিবার পরিকল্পনা ও জাতীয় জননীতি

ডাঃ রণজিৎ দত্ত

Central Health and Family Planning Council–এর যুক্ত অধিবেশনে গত ১৬ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ করণ সিং ভারতের জাতীয় জননীতি (National Population Policy) ঘোষণা করেন এবং এই নীতি বিষয়ক কতকগুলি সুপারিশ সম্বলিত একটি বিবৃতি দেন। এই সুপারিশগুলি যথাযথ বিবেচনার পর লোকসভায় আইনরূপে গৃহীত হবে।

জননীতি বিষয়ক সুপারিশের মুখ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা বিস্তার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার হ্রাস পায়। কিন্তু ভারতের মত বিশাল উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার প্রসার ও দারিদ্র্য দূর করে জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রজননের সময় সাধারণত ১৫ থেকে ৪৫ বৎসর। এই ৩০ বৎসর ব্যাপী প্রজননের সময় থেকে ৩ বৎসর বাদ দিলে অনেক জন্ম রোধ করা যেতে পারে। ১৯৭১ সালের Census অনুযায়ী ভারতে ৩৭ লক্ষেরও বেশী মেয়ে ১৪ বৎসরেরও কম বয়সে বিয়ে হয়েছে। এইরূপ বিপুল সংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিয়ে যদি ৩ বৎসর পিছিয়ে দেওয়া যায়, তবে কয়েকলক্ষ জন্মরোধ করা যেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ের বিয়ে হলে তারা সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হয় এবং পরিকল্পিত ও সীমিত পরিবার গঠনে উদ্যোগী হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা মা হলে, মায়ের ও সন্তানের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে এবং এজন্য এসকল জাতীয় জননীতিতে বাধ্যতামূলক বিবাহ রেজিষ্ট্রীর জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে বলা হয়েছে।

ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে বিধানসভা ও লোকসভার আসনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়। সেজন্য গত কয়েক দশকে কয়েকটি রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এইরূপ আসনসংখ্যাও বেড়ে গেছে। অন্যদিকে কিছু রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনা সফলতর রূপায়ণের ফলে জনসংখ্যা অনুরূপ না বাড়ায় বিধানসভা ও লোকসভার আসন তত বাড়েনি। রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সাহায্য ও অনুদানও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। একদিকে রাজ্যগুলিকে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে বলা হচ্ছে,

চতুর্থ কভারে দেখুন

ব্যবচ্ছেদ

মীনাক্ষী ঘোষ

জয়ীতা বৎসরান্তে একবার সকন্যা বাপের বাড়ি বিজয়ার প্রণাম সারতে আসে। অবশ্যই ইদানিং। বাবা বেঁচে থাকতে ও কলকাতা থেকে কলকাতায় ঘনঘন যেত এবং দুচারদিন ইচ্ছামত থাকতো। এবার গ্রীষ্মের ছুটীর প্রারম্ভে ওর প্রিয় বৌদির পঞ্চমবার সন্তান সম্ভাবনার কথা শুনেই ছুটে আসছে।

মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে স্বাধীনভাবে রাস্তায় বেরোতে ওর খুব ভালো লাগে বিশেষ করে মেঘলা দিনে। অবশ্যই বৃষ্টিহীন। আরো ভালোলাগে প্রায় ফাঁকা ট্রামে করে যেতে। ট্রামটা যখন ঢিকোতে ঢিকোতে ঘটাং ঘটাং করে পরিচিত পথ দিয়ে যায় জয়ী উৎসাহভরে মেয়েদের দেখায় ও-ওই দ্যাখ আমার স্কুল কিংবা ও-ওইত আমার বাবার অফিস। ওর পাশের রাস্তায় আমার এক বন্ধুর বাড়ি ছিল। একবার গেলে হয়। নাঃ যাবোনা, কতকাল যোগাযোগ নেই,....না-যা-বো-না।

ট্রামে মায়ের উচ্ছল ছেলেমানুষী দেখে দশ বছরের মিঠু আর তের বছরের পুপ্পি হাসে। বাপের বাড়ি আসার সময় মায়ের পাগলামি বাড়ে। আর দাদুর কথা বলতে বলতে মা স্বর্গে চলে যায়।

ট্রামে থেকে নেমে ভাইপো ভাইঝিদের জন্য জয়ী প্রিয় দোকান থেকে একবাক্স সন্দেশ কিনে নেয়। বাপের বাড়ি পা দিয়েই ও মেয়েদের দোতলায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে রান্নাঘরে বৌদির কাছে পিঁড়ি পেতে বসে। বেচারী সুন্দর বিকেলবেলায় এককিলো আটার রুটী একহাতে করছে বুড়োপেট নিয়ে, ভালকরে বসতেই পারছে না। সাহায্য করার কেউ নেই। কবে যে হাতেগড়া রুটী তৈরীর মেশিন বেরোবে! দাদার জন্য আবার লুচি!

বৌদি হাঁ হাঁ করে ওঠে 'এই গরমে ঠাকুরঝি রান্নাঘরে কেন ওপরে যাও, আমি কাজ সেরে যাচ্ছি।'

জয়ী হাত নেড়ে বলে, 'তবেই হয়েছে। তোমার যেতে সেই ন'টা। ততক্ষণে আমার ফের'র সময় হবে।'

বৌদি জয়ীদের জন্যে আরো খানিকটা আটায় জল ঢালতে ঢালতে বলে কেন, ভাই, এসেছো দুদিন থাকো না।'

জয়ী বলে-'না বৌদি, আমার শাশুড়ি মোটে ছাড়তেই চায়না। তোমার খবরটা শুনে ছুটে এলুম। আবার কেন এ কাঁদে পা দিলে?'

বৌদির চোখ ছলছল করে, 'সাধে কি ভাই। তোমার মা উঠতে বসতে বলেন, একটা ট্যাকা ট্যাকা নয় একটা ছেলে ছেলে নয়। কবে হুট করে মরে যায়। তোমার দাদার'ত কোন ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। যে যা বলে তাতেই হ্যাঁ। নইলে তিন মেয়ে এক ছেলে'—

জয়ী গম্ভীর হয়ে বলে 'এবারে যে ছেলে হবে তার গ্যারাণ্টি কোথায়?' বৌদি বলে, 'তুমি বাপু ওপরে মায়ের কাছে যাও, নইলে রাগ করবেন। বাবা মারা যাবার পর ছোট ঠাকুরঝির শশুর নাকি সম্পত্তির ভাগ চেয়েছেন। তোমার দাদা আর মায়ের সেজন্য মেয়েদের ওপর খুব রাগ।'

জয়ী বলে, 'আমার শাশুড়ি বলেছেন, তোমার বাবা অনেক খরচপত্র করে বিয়ে দিয়েছেন। দুভাই-এর সামান্য সম্পত্তি থেকে ভাগ নেয়া ঠিক হবেনা। ছোট ভাই বেকার। তোমার দাদার অতগুলি ছেলেমেয়ে মা বেঁচে। আমাদের পরের ধনে লোভ নেই। কথায় বলে লোকের দেওয়ায় কুলোয় না ভগবানের দেওয়ায় ফুরোয় না। সত্যি এত মানুষ দেখলুম আমার শাশুড়ীর মত মানুষ হয়না। তা হ্যাঁগো বৌদি দাদা রাত্রে লুচি খান ওই চেহারায়। প্রেসারে ধরবে যে'। বৌদি সভয়ে বলে—'তাই নাকি? তুমি ভাই ডাক্তার গিন্নী, অনেক জানো।' এদিক ওদিক তাকিয়ে বৌদি আবার বলে 'আমার কোন কথা এরা নেয়না। অথচ ছেলেমেয়েরা লুচি খাবার জন্য পাগল। ওদের চোখের সামনে কী জানি ভাই তোমাদের বাড়ির ব্যাপার আলাদা, আমার কথা চলেনা কারণ আমার গরীব বাবা—মাত্র দশ ভরি সোনায় আমায় পার করেছেন। তোমার দাদা আর মা, আমি চার ছেলেমেয়ের মা, এখনো খোঁটা দেয় আমাকে।' বৌদির চোখে জল।

জয়ীর মনে পড়ে রূপ দেখে বাবা বৌ এনেছেন। আজ বৌদির হাঁড়ির হাল। অথচ একদিন জয়ীর বর রহস্য করে

বলতো, বৌদির মত সুন্দরীকে 'শোকেসে' সাজিয়ে রাখা উচিত।

ওপরে যেতে মা বিরস মুখে বললেন, 'হঠাৎ কি মনে করে?' সম্পত্তির ভাগ চাইতে এসেছিস বোধ হয় কিন্তু আমি ত বেঁচে'—জয়ী ম্লান মুখে বলে' 'কী হতচ্ছাড়া আইন যে হল। বাপের বাড়ির সঙ্গে বিচ্ছেদ। তোমাদের দেখতে এলুম। তা হ্যাঁগো মা বৌদির আবার—'

এবার মা স্থানকালপাত্র ভুলে চেঁচিয়ে ওঠেন—'তার আমি কী জানি বাছা? বৌ শুদ্ধ এমন করে যেন আমিই দোষী। আমি যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি। ছেলেবৌয়ের ঘরে এবার পাহারা দিতে হবে দেখছি—জ্ঞান নিতে হবে পেটের মেয়ের কাছে।'

মায়ের মুখ চিরকাল আলগা। একবার ছ্যাড়ছ্যাড় করে বলতে বসলে জ্ঞান থাকেনা লঘুগুরু। কাজেই জয়ী বৌদির কাছে গিয়ে লুচি বেলতে বসলো। 'জানো বৌদি আমার শাশুড়ীকে দেখলে সত্যি ভক্তি হয়। শুনেছি আমার শ্বশুর খুব কিপ্টে ছিলেন। তোমার ননদাইকে কিছুতেই ডাক্তারী পড়াতে রাজী নন। বলতেন এক ছেলেকে পড়াতে গিয়ে ফকির হয়ে ঘটি বাটি বেচবো নাকি? ডাক্তারী পড়ানো হাতির খরচ। এর পর চুরি ডাকাতি করতে হবে। আমার শাশুড়ীও নাছোড়বান্দা ছেলে যখন পড়াশুনায়, ভালো ওকে পড়াতেই হবে। আমি ভাল শাড়ি চাইনা গয়না চাইনা কাজের লোক চাইনা শুধু আমার ছেলে মানুষ হোক। নিজে কেরানী, ছেলেও কি তাই হবে নাকি? আমি শুনেছি ছেলেরা যতদিন লেখাপড়া করেছে উনি সিনেমা থিয়েটার পর্যন্ত যাননি। ওঁর মেয়ে নেই। আমাকে চোখের আড়াল করতে চাননা। ছোট দেওর নকশালে মারা যাবার পর উনি কী বললেন জানো, কত বাছা মায়ের কোল খালি করে চলে গেল। ওরা ভুল করুক যাই করুক দেশকে ভালবাসতো এটাত ভুল নয়। ক'জন এমন বলতে পারে। আর ছেলেরাও মা বলতে অজ্ঞান।'

বৌদি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন—'সব মা যদি এমনি হত। ছোট ঠাকুরপো বেচারী অনার্স নেই কিছু নেই সাধারণ বি. এ. পাশ করে বসে আছে। তোমার মা আর দাদা মিলে তাকে যাচ্ছেতাই করছে। মা হয়ে ছেলেকে একদিন বললেন, চাকরি না পেলে এবার ভাতের বদলে ছাই দেবো। অতবড় ছেলের চোখ দিয়ে ভাতের থালায় টপ্‌টপ্ করে জল পড়তে লাগলো। চাকরী কী মুখের কথা।'

জয়ী বললো, 'এই করেই ছেলে মেয়েরা খারাপ আড্ডাবাজ হয়। এর পর আমার ভাই বাধ্য হয়ে চুরি ডাকাতি ছিনতাই করবে নয়তো রকবাজি করে মেয়েদের পেছনে লাগবে, লোক ঠকাবে। হরেক পুজো আর ফাংশানের নামে লোকের গলা-টিপে চাঁদা আদায় করবে। শান্ত ছেলে একবার অশান্ত হলে সে দুর্দান্ত হয়। ঘরে যদি একটু শান্তি একটু সহানুভূতি না পায়। খোকন আমার আছে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। আজও দেখা হলনা।' বৌদি কড়ায় লুচি ছাড়তে ছাড়তে বলেন 'আমার ছেলে মেয়েগুলো খুব বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। আমি মা হয়ে ওদের শাসন করতে পারি না। তোমার মা অমনি বলবেন—গলাটিপে একেবারে মেরে ফ্যালো।'

জয়ী এবার বলে 'তুমি শক্ত হও বৌদি, এবার ছেলেই হোক মেয়েই হোক অপারেশন করাও। ভালোকরে মানুষ করলে ছেলেই বা কী মেয়েই বা কী। বরং মেয়েরা মাবাপের দুঃখ বেশী বোঝে। আর দৈবের কথা ছাড়ো। যদি চল্লিশ বছর বয়সে কারো ছেলে মরে যায় সে কি আবার কেঁচেগণ্ডুস করে ছেলে বিইয়ে মানুষ করবে? দাদাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এজন্মের মত ক্ষ্যান্ত দাও।'

ওপর থেকে মা এবার রণরঙ্গিনী মূর্তিতে নেমে এসে সুর ধরলেন 'হ্যাঁলা বৌএর বাচ্চা হবে ত তোর এত মাথা ব্যথা কিসের? তুই খাওয়াবি না পরাবি? বড় জোর মুখেভাতের সময় একটা টিংটিঙে আংটি দিয়ে দায় সারবি। এসে অবধি গুজুরগুজুর ফুসুরফুসুর। বেরো আমার বাড়ী থেকে। বৌএর কানে মন্ত্র দেওয়া হচ্ছে? নাচানো হচ্ছে? পেট কেটে রোগে পড়লে হাঁড়ি ধরবে কে—তুই? মেয়ে বিয়ে দিয়েছি পর হয়েছে, অত কিসের?'

অপমানিত জয়ী ব্যাগ থেকে সন্দেশের বাক্সটা মায়ের হাতে দিয়েই মেয়েদুটোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বৌদি কাতর কন্ঠে বলেন 'ও ঠাকুরঝি, কখন এসেছ চাটুকুও খাওনি। তোমাদের খাবার করলুম যে। মেয়েদুটোর মুখ শুকিয়ে গেছে।'

মেয়েদুটো রাস্তায় মাকে বলে 'তুমি একটা ভালো মামারবাড়িও দিতে পারলেনা। সবার মামারবাড়ি কেমন ভালো!'
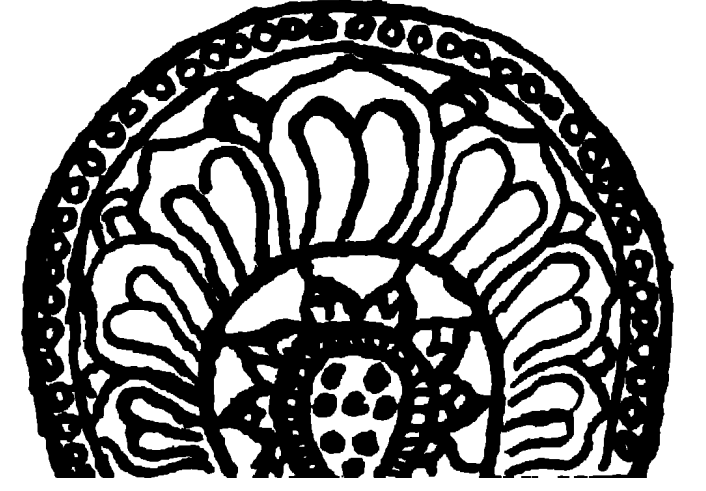
অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের অধিকার অন্যের কর্তব্যের উপর নির্ভর-শীল, তাই অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্যের কথাও মনে রাখতে হবে।

হাঙ্গারিতে ভারত-চর্চা । পবিত্র কুমার সরকার

Hungary

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুরোনো বাড়ির দো-তলার বারান্দার মুখে একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি দেখতে পাবেন। এটি আলেকজাণ্ডার করশি চমার। তিনি একজন হাঙ্গেরীয় পরিব্রাজক। দঃসাহসিক প্রচেষ্টায় পায়ে হেঁটে তিব্বতের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন। ১৮৩৪ থেকে ১৮৪২ পর্যন্ত অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণা করেছেন। তিনি ছিলেন সোসাইটির ফেলো সদস্য। করশি চমা এদেশে তিব্বতী গবেষণার পথপ্রদর্শক। মৃত্যুর পর তাঁকে দার্জিলিংয়ে কবর দেওয়া হয়।

করশি চমা থেকেই হাঙ্গেরীয়দের ভারতচর্চা শুরু। তারপর ভারতের সঙ্গে হাঙ্গেরির সেতুবন্ধ রচনা করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৬ সালে তিনি হাঙ্গেরি এসেছিলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারে। বলাতন লেকের ধারে ফুরেড নগরীর স্বাস্থ্য নিবাসে তিনি ছিলেন। সে সময় এখানে তিনি লাইম গাছের একটা চারা পুঁতেছিলেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯২৬-এর ৮ নভেম্বর তিনি যে চারা গাছ লাগিয়েছিলেন সেটি আজ ছায়াতরুর রূপ নিয়েছে। গাছটির পাশে কবির মর্মরমূর্তি ও দুটি প্রস্তর ফলক আছে। তার একটিতে কবির একটি কবিতার প্রথম কটি ছত্র ইংরেজী ও হাঙ্গেরীয় ভাষায় খোদিত আছে। কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফুরেড শহরের বলাতন লেকের ধারে একটি জনবহুল রাস্তার নামকরণ হয়েছে তাঁর নামে।

একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের মত হাঙ্গারিতেও রবীন্দ্রনাথ বরণীয় কবির মর্যাদা পেয়েছেন বহুকাল আগে। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থ ও-দেশের ভাষায় অনূদিত হয় এবং বিদগ্ধ পাঠকমহলে তাঁর রচনা বেশ সমাদর লাভ করে। ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সংকলন বেরিয়েছে হাঙ্গারীয় ভাষায়।

হাঙ্গারির জনমানসে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন ভারতবর্ষকে। সেই থেকে এদেশ সম্পর্কে ওদেশের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

বাংলার সমাজজীবনের ওপর হাঙ্গারীয় ভাষায় প্রথম বই বেরোয় তিরিশের দশকে --ইগানাৎস রুসার ভ্রমণ কাহিনী 'বেঙ্গলি তুইজ' অর্থাৎ বাঙলার আগুন। ওদেশের ছেলে-বুড়ো অনেকেই বইটা পড়েছেন। হাসপাতালে এক রোগীর হাতে আমি প্রথম বইটা দেখি। পরে অনেকের মুখে আমি বইটার কথা শুনি। অত দিন আগে লেখা হলেও পাঠক মহলে আজও এর যথেষ্ট সমাদর আছে।

যুদ্ধের আগে হাঙ্গারিতে যতটুকু ভারতচর্চা হয়েছে তা মূলত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রয়াস। ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল নতুন হাঙ্গেরি—সমাজজীবনের খোলসটা গেল বদলে। প্রাণচর্চার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা গেল খুলে।

পঞ্চাশের দশকে হাঙ্গারির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা শুরু হয়। তখন ভারততত্ত্ব প্রাচ্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলাদা কোন ভাগ ছিল না। হাঙ্গেরিতে ভারততত্ত্ব বা Indology-তে পথপ্রদর্শক হচ্ছেন অ্যাকাডেমিশিয়ান টোকাই ফেরেন্স এবং এরভিন বাকতাই। ফেরেন্স প্রথমে চীনা ভাষা অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি ভারতচর্চায় ঝোঁকেন। ফেরেন্সের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Asiatic Mode of Production (এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি)। বাকতাইও প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে গবেষণাকালে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি 'ভারতের শিল্পকলা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য, বাকতাই এর কন্যা এক ভারতীয়র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং বিবাহের পর তিনি অমৃত সেগিল নামে পরিচিত হন। শ্রীমতী সেগিল হাঙ্গারির খ্যাতকীর্তি চিত্রশিল্পীদের অন্যতম (নয়াদিল্লীতেও অমৃত সেগিলের নামে একটা রাস্তা আছে)।

সত্তরের দশকের গোড়ায় ভারততত্ত্বের একটা পৃথক বিভাগ খোলা হয় বিশ্ব অর্থনীতি গবেষণা সংস্থা (Institute for World Economy)-র অধীনে। মোটামুটি ১০ জন গবেষক এ বিভাগে যুক্ত আছেন। ভারততত্ত্ব বিভাগ খোলার

হাঙ্গারির বলাতন লেকের ধারে রবীন্দ্রনাথের নামে সড়ক—টেগোর সেতানে

ব্যাপারে যাঁরা বিশেষ উদ্যোগ নেন তাঁদের অন্যতম সাংবাদিক কাল মার (ইঁনি 'নেপ সাবারচাগ' পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে পাঁচ বছর ভারতে কাটান)।

দশ জনের ঐ দলে আছেন তরুণী গবেষক ভেরা গাথি। ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে আজ হাঙ্গারিতে তাঁর নামই সবচেয়ে বেশি। শ্রীমতী গাথি পররাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ইনস্টিটিউট অব কালচারাল রিলেসান সংস্থার অন্যতম সচিব।

শ্রীমতী গাথি দর্শনে ডক্টরেট। বছর ৩৫ তাঁর বয়স। ১৮ বছর থেকে শুরু করেন ভারত সম্পর্কে পড়াশুনা। মাতৃভাষা ছাড়া জানেন ইংরেজী, হিন্দী আর কিছুটা সংস্কৃত। ভারত সম্পর্কে ডঃ গাথির তিনটি বই বেরিয়েছে হাঙ্গারীয় ভাষায়—(১) মহাত্মা গান্ধী (১৯৭০), (২) ভারতীয় উপমহাদেশ (১৯৭৪) এবং (৩) ভারতীয় গল্প সংকলন (১৯৭৫)। প্রধানত গত ১৫ বছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় গল্পের সংকলন এটি। বর্তমানে তিনি স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর Discovery of India গ্রন্থের অনুবাদ-কর্মে রত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ডঃ গাথি পররাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্বশীল পদে বৃত আছেন। তাই অফিসের কাজের পর অবসর সময়ে তিনি ভারতচর্চা করেন। এটা তাঁর নেশার মত। ঘর সংসারও তাঁকে দেখতে হয়।

ডঃ গাথির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তাঁর অফিসে। তাঁর ভারতচর্চা নিয়ে আমি কটা প্রশ্ন করেছিলাম। প্রথম প্রশ্ন ছিল: 'ভারত সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ কি?''

খুব সংক্ষেপে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, ''পৃথিবীতে দুটি সভ্যতা—একটি চীনের, অপরটি ভারতের—অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই দুই সভ্যতার ধারাবাহিকতা আছে।'' আর দুয়ের মধ্যে ভারতের প্রতি শ্রীমতী গাথির আকর্ষণ বেশি।

ডঃ গাথি ভারতীয় ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা এবং ভারতীয় ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন করে থাকেন। ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিক কালপর্ব তাঁর পাঠ্যবিষয়। মূলত তিনি ঔপনিবেশিক শাসনকাল, স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীন ভারতবর্ষ—এই তিনটি বিষয় যত্ন সহকারে পাঠ করেছেন।

কথা হচ্ছিল তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' বইটি নিয়ে। ডঃ গাথি বিশ্বাস করেন মহাত্মা গান্ধীর মত এত বড় নেতা একালে ভারতবর্ষে আর হয়নি। ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণ তাঁর ডাকে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তিনিই পেরেছিলেন বিরোধী শ্রেণীগুলোকে স্বাধীনতার অভিন্ন দাবিতে এক মঞ্চে জড়ো করতে। ডঃ গাথি মনে করেন, মহাত্মা গান্ধীর কিছু কিছু বক্তব্য আজকের ভারতবর্ষেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডঃ গাথি ভারতবর্ষে এসেছেন পাঁচ বার। এ দেশের সব কটা বড় শহর, গাঁ-গঞ্জ, অনেক দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে-ফিরে দেখেছেন। এছাড়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে মস্কোয় ভারততত্ত্ববিদদের সম্মেলনে তিনি যোগ দেন এবং আজকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি একটি পেপার পাঠ করেন।

সম্প্রতি ভারতীয় সাহিত্যিকদের অনেকগুলো বই হাঙ্গারীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এ বইগুলোর বেশ কাটতি আছে। বইগুলোর কয়েকটি:—ট্রেন টু পাকিস্তান—খুশবন্ত সিং, লিঙ্গারিং শ্যাডো—মোহন রাকেশ, তুঘলক—গিরিশ কার্ণাড, সংস্কৃত গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত রচনা)।

হাঙ্গারিতে 'মুজিকা' নামের একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত পত্রিকা আছে। সম্প্রতি ঐ পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিক-ভাবে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ওপর মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কথা-প্রসঙ্গে এক মধ্যবয়েসী মহিলার কাছ থেকে আমি এ তথ্য সংগ্রহ করি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত এদেশেও বিদগ্ধ মহলে রবিশঙ্করের যথেষ্ট নাম আছে। তাঁর ভক্তসংখ্যা হাঙ্গারিতে কম নেই।

হাঙ্গারি একটা ছোট্ট দেশ। আয়তন ভারতের তুলনায় নগণ্য। লোকসংখ্যা এক কোটির সামান্য কিছু বেশি। কিন্তু এতটুকু দেশে ভারত সম্পর্কে এত বেশি আগ্রহ দেখে আমি বিস্ময় বোধ করেছি। শুধু এ আগ্রহ ভারততত্ত্ব বিদদের গবেষণায় সীমাবদ্ধ নেই, সাধারণ মানুষের মনের দরজাও স্পর্শ করেছে।

ডি. জি. নামের আড়ালে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একজন ভারতবিখ্যাত চলচ্চিত্রকার। বলা যায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ৪৯ টি চিত্র পরিচালনা করেছেন। চলচ্চিত্রের শৈশব অবস্থাকে তিনি যৌবনের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। ১৯১৮ সালে 'বিলাত ফেরত' প্রথম চিত্র পরিচালনা করেন। প্রথম চিত্রেই নাম-যশ হয়। তারপর ২৩ টি নির্বাক, এবং ২৫টি সবাক চিত্র পরিচালনা করেন। আজ ৮৪ বৎসর বয়সে ৫০-তম ছবি 'ঠিকানা সঠিক' পরিচালনা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এদৃষ্টান্ত বিরল। তিনিই প্রথম গৃহস্থদের ও ভদ্র-সমাজের মেয়েদের চলচ্চিত্রে নিয়ে আসেন। তাঁর স্ত্রী রমলাদেবী, তার মেয়ে, এবং তার পুত্র বধূকে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করেন।

এই প্রাণচঞ্চল মানুষটির জন্ম কলকাতার কর্ণওয়ালীস স্ট্রীটে (১৮৯৩)। আজ এবছর (১৯৭৬) তিনি 'দাদাভাই ফালকে' পুরস্কার লাভ করেন। শুধু তাই নয়—কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের তিনি চলচ্চিত্রে নিয়ে আসেন। কাননদেবী, প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু তাঁর চেষ্টাতেই চলচ্চিত্রে আসেন এবং পথ পেয়ে যান। ক'দিন আগে এই মানুষটির মুখোমুখি হয়ে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—চলচ্চিত্রে আত্মনিয়োগ করলেন কেন? এর পেছনে কি কোন প্রেরণা ছিল?

—১৯০৭ সালে শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা শেষ করি। ১৯১৬-১৮ হায়দরাবাদের নিজামে অধ্যক্ষ ছিলাম। ছোট বেলা থেকেই আঁকতে শিখি, আর্টের প্রতি প্রবল নেশা ছিল। নিজের চেষ্টাতেই এপথে আসি। কারো দ্বারা ইন্‌ফ্লুয়েন্স্‌ড নই। ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের দুর্দশা দেখে এগিয়ে আসি। যেমন গ্রিফিথ এসেছিলেন।

—আপনার পরিচালিত কোন কোন ছবি আপনার মতে বিশিষ্ট?

মুখোমুখি
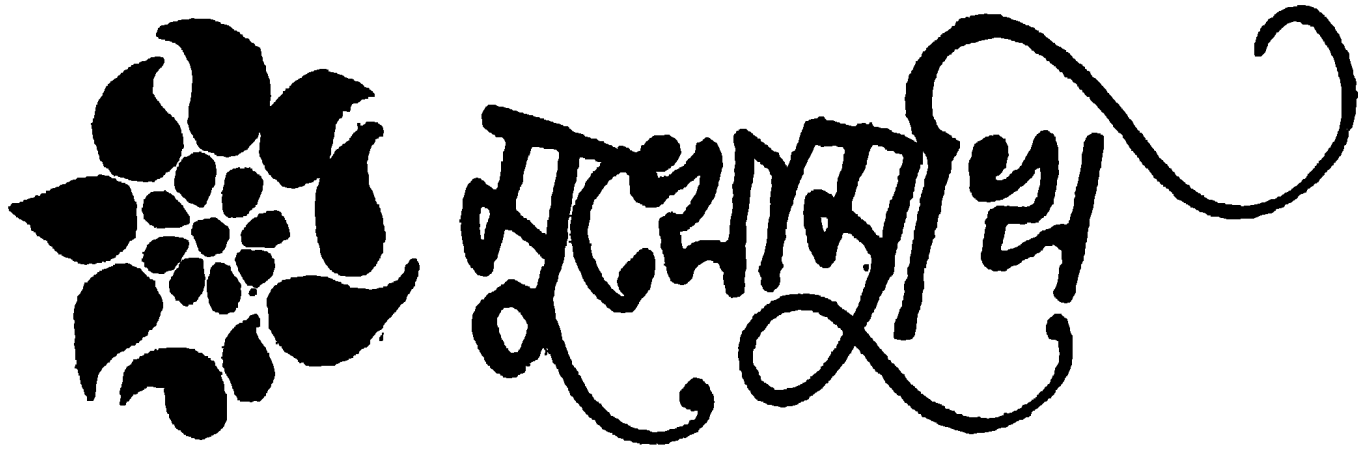
আর কোন নালিশ নেই। পঞ্চাশতম ছবিটি এবং বায়োগ্রাফি লেখা শেষ হলে আর কোন আশা নেই।

ডি. জি.

বেহালায় নিজে বাড়ী করেছেন। সাদা চুল দাঁড়িতে তাঁকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মত মনে হয়। বড় ভাই রবীন্দ্রনাথের মেয়ে মীরা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। বড় ভাইয়ের মেয়ে অরুণা আসফ আলী। একটি সামাজিক পরিচয় থাকার ফলে চলচ্চিত্রের জগতে এসে তাঁকে নানা প্রশ্নের ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মনের জোর ও পরিশ্রমের জন্য আজ তিনি নানা সম্মানে ভূষিত। ভারত সরকার ১৯৭৪ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৭৫ সালে তাঁকে 'চলচ্চিত্রাচার্য' সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

—এক্সকিউজ মি স্যার, দাবী, পথভুলে, হালবাংলা। রবীন্দ্রনাথ 'হালবাংলা' নামা-করণ করেন। ১৯৩২ সালের আগে নির্বাক চিত্র তৈরী হত। ১৯৩২ সালে Talkie-এর জন্ম। ভারতের সমস্ত বিশিষ্ট ভাষায় আমি ছবি করেছি, এমনকি উর্দুতেও।

—আজকের বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে মতামত?

—বাঙালীরা ঈর্ষাপরায়ণ—কেউ কাউকে সাহায্য করেনা, এগিয়ে যেতে সহানুভূতি দেখায় না। রাজনীতির নোংরা ঢেউয়ে সবাই মত্ত। প্রথম জীবনে আমি ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অপবাদ কি না পেয়েছি। সিনেমায় ভদ্রপুরুষ ও ভদ্রমহিলা পাওয়া দুষ্কর ছিল। একঘরে হয়ে ছিলাম দীর্ঘকাল। কোন বাড়ীতে গেলে যে চেয়ারে বসতাম তা ধুয়ে ফেলত। অবজ্ঞাত অপাংক্তেয় ছিলাম। দিনকাল পাল্টে গেছে। এখন সিনেমায় কে না নামতে চায়? আজ রাষ্ট্র ও সমাজ চলচ্চিত্র ও শিল্পীকে কুলীন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

চা এল। Album দেখালেন। কতশত স্মৃতিগাঁথা। Diary ও চিঠিপত্র দেখালেন। লেন্স দিয়ে স্থানে, স্থানে পড়ে শোনালেন। বারবণিতাদের চলচ্চিত্রে আসার কথা বললেন। বললেন কানন দেবী ও প্রমথেশ বড়ুয়া সম্পর্কেও। ঘরের চারদেয়ালে নানা মানপত্র ও পুরস্কার আলো করে আছে। বড় একটি বাঁধানো মোটা Albumএ পত্র-পত্রিকার কাটিং গাঁথা। বিস্মিত ও বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। এসব দেখেশুনে পুনরায় প্রশ্ন করি—ভাগ্য বিশ্বাস করেন? জ্যোতিষ-জ্যোতিষ শাস্ত্রে? উত্তরে বলেন—ভাগ্যকে কেউ জয় করতে পারেনা, ভাগ্যই মানুষকে টেনে নেয়। মাদুলী বা স্টোন দিয়ে ভাগ্য গড়া যায় না। পুরুষকারের প্রয়োজন। নিজের জীবনে গতি থাকা চাই।

—সমালোচকদের কোন দৃষ্টিতে দেখেন? আধুনিক নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মতামত যদি দেন—

—আমার কিছু আসে যায় না। সমালোচনায় যে যা খুশি বলুক লিখুক। দর্শকের কাছেই পুরস্কার। এখন চারধারে পতনের স্রোত। আধুনিক নাটক শুধু sex আর politics। বাংলার ঐতিহ্য নেই। এদেশের কিছু নেই। সব বিদেশী ধারকরা মালমশলা।

—চলচ্চিত্র কি আপনার সাংসারিক জীবনে বিঘ্ন ঘটায়নি? সিনেমার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কতটুকু?

—বৌ, মেয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। সিনেমায় অভিনয় করেছে। সাহিত্যগুণ না থাকলেও সিনেমা শুধু শিল্পকর্ম নিয়ে (Craft) দাঁড়ায় না।

—শিল্পীদের কি, চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রয়োজন?

—সংযম প্রয়োজন। মদ খাও কিন্তু খাঁটি শিল্পী হও।

—কারজন্য ছবি করেন?

—নিজের ভাবনায় করি। নিজের Satisfaction হলেই বুঝি দর্শকের জন্য হয়েছে।

—প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া তো বাংলা চলচ্চিত্রের অবিস্মরণীয় পুরুষ, বড় শিল্পী, পরিচালক ও পথিকৃৎ তিনি? তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

—আসামের জমিদারের ছেলে। অনেক গুণ ছিল। একেবারে (জাত) আর্টিষ্ট। এ লাইনে অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। আমিই তাকে এ পথে নিয়ে আসি। শিল্পী হিসেবে, পরিচালক হিসাবে, মানুষ হিসাবে কর্মদক্ষ মানুষটি আমাদের বিস্মিত করে দেয়। বিদেশে জন্মালে অন্য মূল্য পেত। তার দেবদাস, মুক্তি, রজতজয়ন্তী, মায়েরপ্রাণ শাপমুক্তি সে যুগে সবাইকে বিস্মিত করে ছিল। প্রমথেশচন্দ্র চলচ্চিত্রের শক্তভিত। তাকে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করা মানেই শিল্পপতিকে ভুলে যাওয়া।

কথা প্রসঙ্গে বললেন: শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিধানচন্দ্র রায় ও অন্যান্য বহু বিখ্যাত লোককে Studio-তে এনেছেন, সুটিং দেখিয়েছেন। এবার প্রসঙ্গ ঘুরে গেল। ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম – ধর্ম সম্পর্কে আপনার ধারনা কি? আপনি কি দীক্ষা বা গুরুবাদে বিশ্বাসী?

উত্তরে বললেন—অনেককেই দেখেছি। Religious দিকটা নিয়ে কিছু করিনি। তবে কর্ম করে গেছি। গুরুদেবরূপে রবীন্দ্রনাথকে মানতাম। শিল্পই আমাদের কাছে ধর্ম ছিল। আমরা ব্রাহ্ম ছিলাম। শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণদেবরা সাধক, প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। শ্রী চৈতন্যের কথায় আমরা সবাইকে আপনকরে নিয়েছি। পশ্চিম বঙ্গে সমস্ত জাতি মিলেমিশে আছে। আমরা বলিনা West Bengal for Bengalees। ধর্মের নিশ্চয় প্রয়োজন। প্রেম-ভালোবাসাই ধর্মের মূলকথা। গঙ্গার ওপর দিয়ে যখন মানুষ খালি পায়ে হেঁটে যেতে পারে তখনই মনে হয় বিজ্ঞান ধর্মের উপর টেক্কা মারতে পারেনি।

—আপনার সর্বশেষ কথা কি?

—কেউ বেঁচে থাকতে আমরা তাকে চিনিনা, খোঁজ নিইনা। মৃত্যুর পর চিনি। বেঁচে থাকতে যাকে একটা ফুলদিতে চাইনা। মৃত্যুর পর তাঁকে অজস্র ফুলের মালা দিই। কেন তাঁরা বেঁচে থাকতে ভালোবাসা বা স্নেহের কিছু দেখে যেতে পারেন না? এসব বলে আর কি হবে। আর কোন নালিশ নেই। পঞ্চাশতম ছবিটি এবং বায়োগ্রাফীটি লেখা শেষ হলে আর কোন আশা নেই।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের অনেক দিয়েছেন। চলচ্চিত্র জগৎ তাঁর কাছে অশেষ ঋণী। তাঁর কাছে আমাদের চাইবার আর কিছু নেই। এই বয়সে কতজন শিল্পী সক্ষম থাকেন বা শিল্প রচনায় মন দিতে পারেন? তবু আমাদের অসীম আগ্রহ এই অশীতিপর বৃদ্ধের দীর্ঘ জীবন পরিক্রমার, তাঁর আত্মজীবনীটি পড়ার এবং পঞ্চাশতম চলচ্চিত্র 'ঠিকানা সঠিক' দেখার। সম্প্রতি চোখে অপারেশন হলো, শরীরও ঠিক যাচ্ছে না। তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা যেন কাজ দুটি তিনি সুস্থ থেকে সময়মত শেষ করে যেতে পারেন।

সাক্ষাৎকার: **সত্যানন্দ গুহ**

পুরাকীর্তি সংরক্ষণে নতুন উদ্যোগ

৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পুরাকীর্তি নথিভুক্ত করবার জন্য সারা দেশে ৯৮ জন রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, বর্ধমান, বহরমপুর ও শিলিগুড়িতে এই রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা রয়েছেন। পুরাকীর্তি ব্যবসায়ীদের অনু-মোদন দেবার জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের রাজধানীতে সুপারিন্টেন্ডিং আর্কিওলজিষ্ট নিযুক্ত করেছেন।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

বিজ্ঞানকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে

নিশীথ চৌধুরী
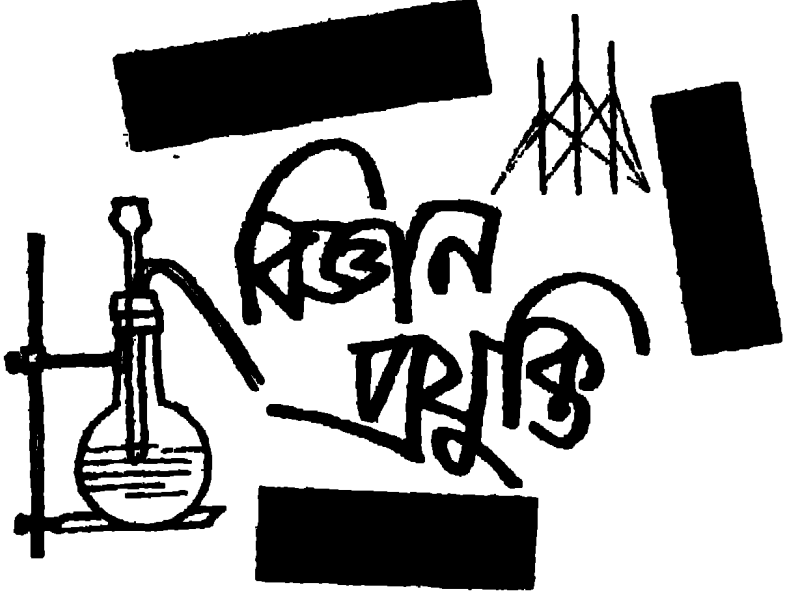
এবছর জানুয়ারী মাসে ওয়ালটেয়ারে বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গ্রাম-ভারতের জনজীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরীকে প্রয়োগ করবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বস্তুতই বিজ্ঞানের অর্জিত সুফলগুলি দিয়ে জন জীবনের উপর গাঢ় দাগ কাটতে হলে চাই গ্রাম-ভিত্তিক বিজ্ঞান চিন্তা ও প্রয়োগ ধারা। কারিগরীর উৎপাদনকে করা দরকার গ্রামাঞ্চলের সহজলভ্য কাঁচামাল-গ্রামাঞ্চলের নানা রকম গাছ গাছড়ার ভেষজগুণের উপযুক্ত ব্যবহার করে ওষুধের প্রয়োজন মেটানোর কথাও শ্রীমতী গান্ধী উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতি দিয়ে গাছপালার ভেষজ-গুণের যথার্থ মূল্যায়ণ ও তার সুচারু প্রয়োগ করতে পারলে—কম খরচে ওষুধ ছাড়াও গ্রামের লোকেরা এইসব উদ্ভিদের চাষ করে লাভবান হতে পারবেন। এই রকম কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে—যার মধ্যে পল্লীজনের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ থাকবে অনেক।

অতি পরিচিত ও বহুল প্রচলিত এক গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থা হল গরুর গাড়ীর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞদের মতে সারা ভারতে যান ও পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা লগ্নী হয়ে আছে। দেশের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ পশুটানা গাড়ীর মধ্যে গরু-মহিষের গাড়ীই মহাভাগ জুড়ে রয়েছে। ১০০০ কোটি মেট্রিক টন মালপত্র বহন করা হয়ে থাকে বছরে এই ব্যবস্থার সাহায্যে। আর দু কোটি'র মতো লোক কোনও না কোনও ভাবে জড়িয়ে আছে এই ব্যবস্থার সঙ্গে। গরুর গাড়ীর কর্মকুশলতা কি করে বাড়িয়ে তোলা যায়, কম খরচে সমাজের উপযোগী গরুর গাড়ী তৈরী করা যায় কি ভাবে, একটা গাড়ীর আয়ু বাড়িয়ে তুলে তাকে আরও সুলভ করা চলে কি উপায়ে—এই সব দিকে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা চালিয়ে তার সুফলকে গ্রামীণ জীবনে ছড়িয়ে দিতে হবে।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া অথবা তেল, কয়লার মতো জ্বালানী পৌছানোর দুরূহতা অজানা নয়। আবার এই সব অঞ্চলে খরস্রোতা নদী বা জল-ধারার প্রতুলতাও সুবিদিত। বেগবতী জলধারার উন্মত্ততাকে কাজে লাগিয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে শক্তি সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা খুবই কার্যকর হতে পারে। পুরোনো মোটর গাড়ীর অথবা ট্রাকের ডায়নামো সংগ্রহ করে তার সাথে ফলকযুক্ত উপযোগী চাকা লাগাতে হবে। এখন পাহাড়ী খরস্রোতধারাকে অনেক উঁচু জায়গা থেকে এই যন্ত্র ব্যবস্থার ফলকের উপর ফেলে ডায়নামো ঘোরানো সম্ভব এবং তার ফলে বিদ্যুৎ শক্তিও উৎপন্ন হবে। একে জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের একটা ছোট্ট আকার বলা যেতে পারে। অঞ্চল ভিত্তিক ছোটখাটো প্রয়োজন মেটাতে এই ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া খুবই উপযোগী হতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তৈল সঙ্কট, বিদ্যুতের ঘাটতি, কয়লা বয়ে নিয়ে যাবার ব্যয় বহুলতা প্রভৃতির টানা পোড়েনে কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের জন্য নতুন নতুন শক্তির উৎস সন্ধান একান্ত নির্ভর। গ্রাম ভারতের উন্নতিতেই সমগ্র দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হতে পারে—এই ধারণা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর দর্শনেও স্থান পেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হবে দেশের গ্রামাঞ্চলে পরিবেশ উপযোগী ও স্বল্পব্যয়ী প্রযুক্তি বিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগ।

ডাক্তার ও চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যেও জাতির নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল ও সুযোগ দেশের আনাচে-কানাচে পৌছে দিয়ে সাধারণ লোককেও উপকৃত করতে হবে। এর জন্য শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি সমন্বিত হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রই যথেষ্ট হতে পারেনা। অতি সহজ ও সাধারণ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি চিকিৎসক—বিজ্ঞানীদের কাছে, যার সাহায্যে সুদূর পল্লী অঞ্চলেও অল্প আয়াসেই সুচিকিৎসার সুযোগ হবে। এছাড়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অপ্রচলিত শক্তির উৎস হিসাবে সৌরশক্তি, বাতচক্র (Wind mill) গোবর গ্যাস প্রভৃতি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে শক্তির মিশ্র উৎসের ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়েছে ১৯৭৬ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে। জ্বালানী তেল, বিদ্যুৎ, কয়লা প্রভৃতি শক্তির চলতি উৎসের সঙ্গে সৌরশক্তি, বাতচক্র, গোবর গ্যাস জনিত্র ইত্যাদিও গুরুত্ব পেয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে আমাদের দেশে এই সৌরশক্তি খুবই উপযোগী হয়ে উঠবে। আর বহু প্রাচীন কাল থেকেই তো সমুদ্রের জল শুকিয়ে লবণ তৈরী করতে, ফলমূল শুকিয়ে রাখবার কাজে, আচার প্রস্তুত করবার জন্য এবং রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনে সূর্যকিরণের ব্যবহার হয়ে আসছে। সৌরশক্তিকে মানব কল্যাণে

নিয়োগের নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছে মহাকাশ-গবেষণায় তাপ সৃষ্টি করবার বিশেষ প্রচেষ্টা থেকে। তাহলেও কিন্তু আমাদের দেশের কল্যাণে সৌরশক্তি ব্যবহারের কথা উঠলেই কৃষির কাজে জলসেচের বিষয় না এসে পারে না। সুদূর মফঃস্বলের গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট জনপদে সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে, শহরাঞ্চলের অর্থনীতি ও শিল্পের উপর চাপ কমাতে পারবে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া সূর্যকিরণ ব্যবহারকারী ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগ। শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ দূষিত-করণের পথও বহুলাংশে রোধ করা যাবে, গ্রামমুখী এই রকম বিকল্প শক্তির উৎস থেকে।
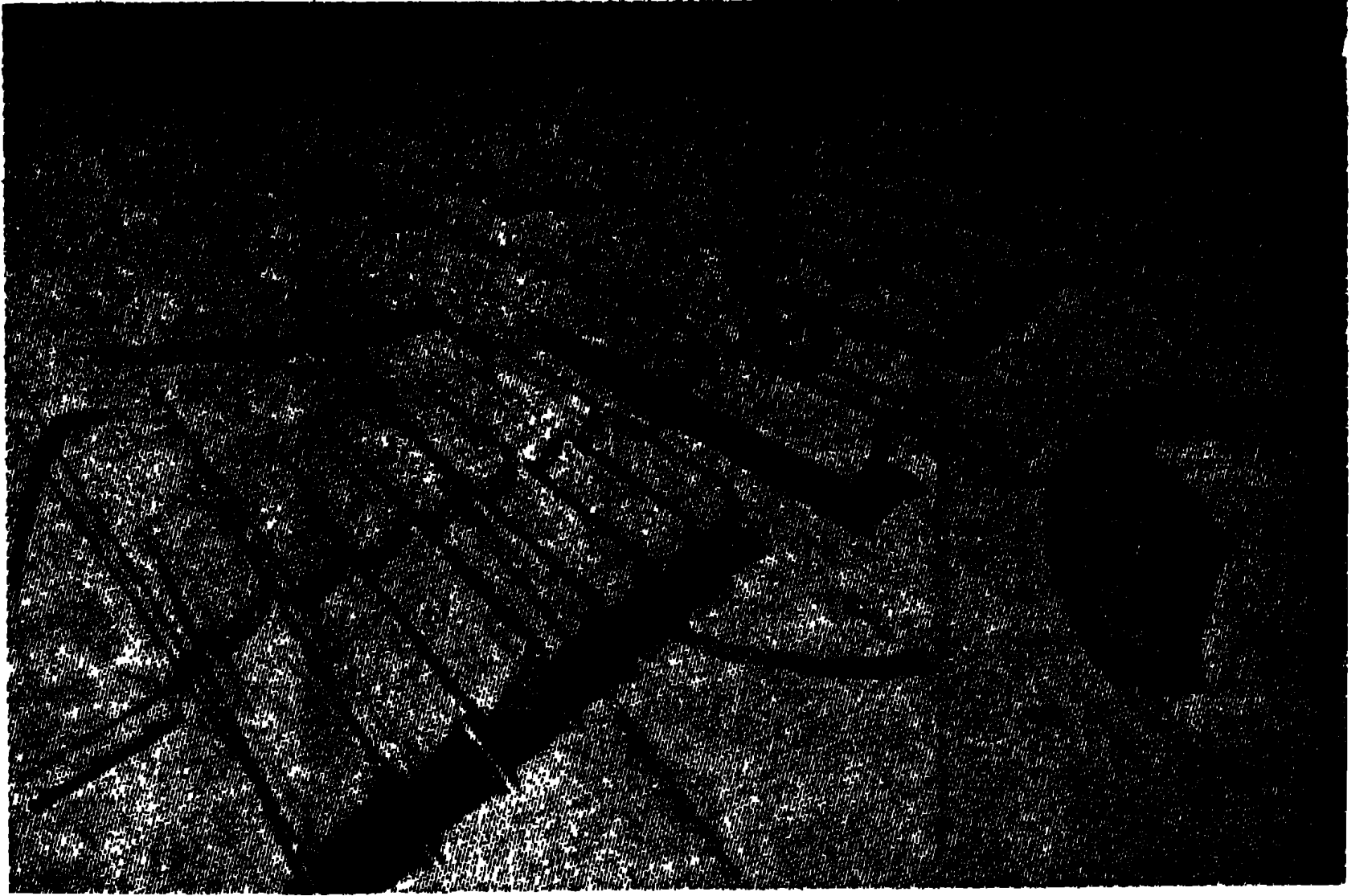
সৌরসক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালিয়ে জলসেচের কাজ করা যেতে পারে। তারজন্য দরকার—ছড়িয়ে পড়া সৌরশক্তিকে একত্রিত করা এবং সঞ্চিত তাপের সদ্ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এক ব্যবস্থায় দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে শায়িত ধাতব পাত্রের উপর সূর্যকিরণ পড়ে তাপ সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত এই তাপকে বায়ু অথবা জলের সাহায্যে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র কাজে লাগানো যেতে পারে। সাধারণত তাপশোষক ধাতব পাত্রের উপর একটা কালো রংয়ের প্রলেপ দেওয়া থাকে। ছাতার কালো কাপড় অন্য যে কোন রংয়ের কাপড়ের চাইতে তাড়াতাড়ি বেশী গরম হয়ে ওঠে—তা অজানা নয়। তাপ বিকিরণ বন্ধ করতে এবং কালো রংয়ের তাপ শোষণের ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য শোষক পাতের পাশে ও নীচে তাপ কুচারিবাহী পদার্থের একটা আস্তরণ দেওয়া হয়ে থাকে। ঘরের ছাদে এই ধরণের তাপ শোষক ব্যবস্থা গেঁথে রেখে ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো অনেকাংশে সম্ভব হবে।

সৌরতাপ সংগ্রহের জন্য বর্ণিত পদ্ধতিতে সঞ্চিত তাপকে জলের সাহায্যে আহরণ করা হয়। উত্তপ্ত জল দিয়ে টিউটেনের মতো হাইড্রোকার্বনকে বাষ্পায়িত করা হয়। বাষ্পীভবনের সময় যে চাপ সৃষ্টি হয় তা দিয়ে পিষ্টনের সাহায্যে 'পাম্পসেট' চালানো যেতে পারে।

সৌরশক্তি সংগ্রহ করার জন্য স্থপতির পরিকল্পিত ব্যবস্থা

পরীক্ষামূলকভাবে ভারতবর্ষেও এই ধরণের পাম্পসেট নির্মিত হয়েছে এবং এই পাম্পসেট বসানোর জন্য ব্যয় সঙ্কোচের কাজও এগিয়ে চলেছে। যদিও এই পদ্ধতিতে খরচ একটু বেশী তবুও কিন্তু যে সব গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ, কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানী পৌঁছে দেওয়া খুবই দুরূহ—সেই সব জায়গায় কৃষিকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের এই পদ্ধতি বেশ উপযোগী হবে।

দিল্লীর National Physical Laboratory-তে সৌরশক্তি চালিত উষ্ণ গ্যাস ব্যবহারী যন্ত্রের সাহায্যে নানা রকমের কাজ করবার উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া জল গরম করবার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করবার ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হয়েছে এখানে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশের ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫ শ'র মতো গ্রামে বিদ্যুৎ শক্তি পৌঁছে দেওয়ার আশা খবই ক্ষীণ। অপর পক্ষে বলা যেতে পারে যে, এই সব গ্রামে ব্যবহার্য্য গবাদি পশুর গোবর সদ্ব্যবহার করে আঞ্চলিক শক্তির চাহিদা মেটানো যাবেই, উপ-রন্তু ভবিষ্যতের বর্দ্ধিত চাহিদা মেটাতেও এর অবদান থাকবে অনেক। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই কাঁচামাল পাওয়া যাবে, প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণও স্থানীয় লোকদের দিয়ে হতে পারবে বলে গ্রামীণ জনজীবনে গোবর গ্যাস প্রকল্পের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। ইতিমধ্যেই এধরণের প্রকল্প এখন দেশের সর্বত্র চালু হয়েছে।

গোবর গ্যাসের সাহায্যে ইঞ্জিন চালিয়ে জলসেচ করা চলবে, রান্না করবার জন্য জ্বালানী গ্যাস পাওয়া যাবে, আবার রাত্রে আলো জ্বালানোও চলবে গোবর গ্যাস ব্যবহার করে। গোবরের অবশিষ্টাংশ জমির সার হিসাবে খুবই কাজে লাগে। বাতাসের অবর্তমানে জল মেশানো গোবরের মিশ্রণ একটা আবদ্ধ পাত্রে গাঁজতে থাকে, যে প্রক্রিয়ার নাম সন্ধান। এর ফলে মিথেন গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই মিথেন গ্যাসের দহন ক্ষমতা প্রচুর এবং এই গ্যাস হ'লো একটি সহজ দাহ্য পদার্থ। উৎপন্ন গোবরগ্যাস 'গালভ্যানাইজ' করা গম্বুজাকৃতির একটা বড় ড্রামে সঞ্চিত

থাকে, আর প্রয়োজন মতো ব্যবহৃত হয়।

খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন গোবর গ্যাস ব্যবহার করে রান্না করবার উপযোগী এক বিশেষ ধরণের উনুন তৈরী করেছেন। আলোর জন্য পেট্রোম্যাক্স বাতির মতো এক ব্যবস্থাও উদ্ভাবন করেছেন। কিভাবে কম খরচে গোবর গ্যাস তৈরী করে তাকে ব্যবহার করা চলে সে বিষয়ে আরও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ এবং ব্যাঙ্গালোরের Indian Institute of Science প্রভৃতি সংস্থা।

প্রচলিত মনোভাব একটু বদলে নিতে পারলেই আমাদের পরিত্যক্ত অব্যবহৃত পুরীষকে কাজে লাগিয়েও গ্রামীণ জীবনে শক্তির চাহিদা কিছুটা মেটানো যায়। বিশেষ করে লোকজনের পুরীষ থেকে উদ্ভূত গ্যাসকে যদি গোবর গ্যাসের সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়। গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্টের সঙ্গে কংক্রীটের তৈরী পায়খানা জুড়ে দেবার ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছে কোনও কোনও স্থানে। সাংলী জেলার মাইশাল গ্রামে হরিজন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে সমষ্টির ব্যবহারের জন্য গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্টের সাথে প্রায় ১০০ ঘরের উপযুক্ত মলত্যাগের স্থান জুড়ে দিয়ে প্রাণীজ গ্যাসের যৌথ উৎস গড়ে উঠেছে। এই প্রকল্পের কঠিন অবশিষ্টাংশ সমবায় ভিত্তিতে কৃষির কাজে সার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বায়ুশক্তির উৎস হিসাবে কাজে লাগতে পারে। বায়ুচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জলসেচের পাম্প চালানো যায়। আবার এই বাত চক্রের সাহায্যে ডায়নামো ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনও হতে পারে।

বায়ুচালিত কল, যাকে বাতচক্র বলা হয়, তার ব্যবহার আছে বহুদিন থেকেই। কিন্তু চলতি অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী ব্যয়সাধ্য হওয়াতে এতদিন পর্যন্ত বাত চক্রের ব্যবহারের উপর আকর্ষণ জন্মায় নি। জ্বালানীর বর্দ্ধিতমূল্য ও তৈল সঙ্কটের দিনে বায়ুশক্তিকে কাজে লাগাবার কথা আজ আবার নতুনভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। বিশেষত যে সব পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ, তেল বা কয়লার মতো জ্বালানী পৌঁছানো খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার—সেই সব জায়গায় বায়ুশক্তির ব্যবহার হতে পাবে।

ফলকযুক্ত কাগজের ফুল বাতাসের উল্টোদিকে ধরে থাকলে তা ঘুরতে থাকে। বাত চক্রের মূলনীতিও মোটামুটি এই রকমের। কয়েকটি ফলা বাতাস লেগে ঘোরে। এই ঘূর্ণনকে নানা উপায়ে প্রয়োগ করে পাম্প চালানোর কাজে আর নয়তো ডায়নামো ঘোরাতে ব্যবহার করা যায়।

রবিচাষের সময় আমাদের দেশে জলসেচের প্রয়োজন বেশী হয়। এই সময়ের বর্দ্ধিত প্রয়োজন মেটাতে চাষীরা বাতচক্রের ব্যবহার করে 'পাম্পসেট' চালাতে পারেন। যাতে করে প্রয়োজনের সময় বাতাস চালিত কলে ফলক লাগিয়ে নিতে পারেন এবং প্রয়োজন মিটে গেলেই আবার নিজেরাই বাতচক্রের ফলক খুলে নিতে পারেন—সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বায়ু চালিত যন্ত্র বা বাত চক্রের দ্বারা চালিত কলের কথা উঠলেই প্রারম্ভিক ব্যয়ের আলোচনা না এসে পারে না। এই খরচের বহুলাংশ যন্ত্রের ফলক নির্মাণে, বাত চক্রের প্রধান কাঠামো গঠনে এবং আনুষঙ্গিক খরচের খাতে চলে যায়। কম খরচে ফলক নির্মাণ করে ফলকের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে এবং স্থায়িত্বের কালের পরিধি সম্প্রসারিত করে সামগ্রিক খরচ কমানোর চেষ্টা চলেছে আমাদের দেশের নানান সংস্থায়। এই সব সংস্থায় অনেক উৎসাহজনক ফলও এসে পৌঁছেছে বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদদের হাতে।

ব্যাঙ্গালোরের Central Power Research Institute-এর নির্মিত 'বাত চক্র' পল্লীঅঞ্চলে জলসেচের কাজে কতটা লাগতে পারে—সে সম্পর্কে বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। উল্লম্ব অক্ষযুক্ত বাতচক্রের (সোভেনিয়াস প্রবর্ত্তিত যন্ত্রের মতো) পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জিত এক মডেল তৈরী করেছেন Indian Institute of Science এর এ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। এই মডেল ছোটখাটো কাজের উপযোগী হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারনা। এই রকম বায়ুচালিত যন্ত্রের ফলকগুলো নির্মিত হয়েছে টান করে রাখা তারের উপরে কাপড়ের পাল এঁটে দিয়ে। উল্লিখিত বাতচক্রের দাম পড়বে আনুমানিক ১৫০০ টাকার কাছাকাছি এবং অভিজ্ঞমহলের ধারণা যে প্রয়োগকালে সত্যি সত্যি ব্যয়ভার আরও নিম্নমুখী হবে। এই ভাবে দেখা যাবে যে, বিজ্ঞানের বর্তমান অনেক নীতিই গ্রাম ভারতের পরিবেশ উপযোগী করে ব্যবহার করতে পারলে তা সমগ্র দেশেরই শ্রীবৃদ্ধির কাজে লাগবে।

প্রয়োজনবোধে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাধারণ গ্রামবাসীর মাথা থেকেও অনেক উপযোগী ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হতে পারে। এর নিদর্শন পাওয়া যায় বিহারের সহর্ষ জেলায় লালপুর গ্রামের একজন সাধারণ চাষীর কাজকর্ম থেকে। রবি মরশুমে চাষের জন্য জলের জোগান দিতে গিয়ে নলকূপের জন্য দুর্মূল্য লোহার পাইপের নাগাল না পেয়ে বিকল্প এক অভিনব পথ খুঁজে পেলেন। বাঁশের তৈরী ফাঁপা নল দিয়ে নলকূপ গড়ে তুললেন। এর জন্য দরকার হয় মাত্র কয়েকটা গ্রাম্য জিনিষ। পাঁচ-ছটা বাঁশ, গজ পাঁচেক লোহার তার, নারকেল বা শনের দড়ি ২০ থেকে ২৫ কেজির মত, ১০ সেণ্টিমিটার ব্যাসযুক্ত লোহার কয়েকটি আংটা, কিছু লোহার পেরেক, গোটা কয়েক চটের থলে, কিছুটা আলকাতরা। এই ব্যবস্থায় বাঁশের ২৫ মিটার নলকূপ বসাতে প্রায় ৩০০ টাকার ভিতরে খরচ পড়বে।

স্বল্পব্যয়ী এই বাঁশের তৈরী নলকূপ ব্যবস্থার বহুল প্রচলন দেখা যায় বিহারে। দেশের অন্যত্রও এর ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।

জনজীবনের সাথে বিজ্ঞানের যোগসূত্র গাঁথতে হলে বিজ্ঞানকে গ্রামমুখী হতে হবে, গ্রামবাসীদেরও বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হবার মতো মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তা হলেই ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীর সংখ্যায় বিশ্বে স্থান অধিকারী ভারতের সামগ্রিক উন্নতি হবে।
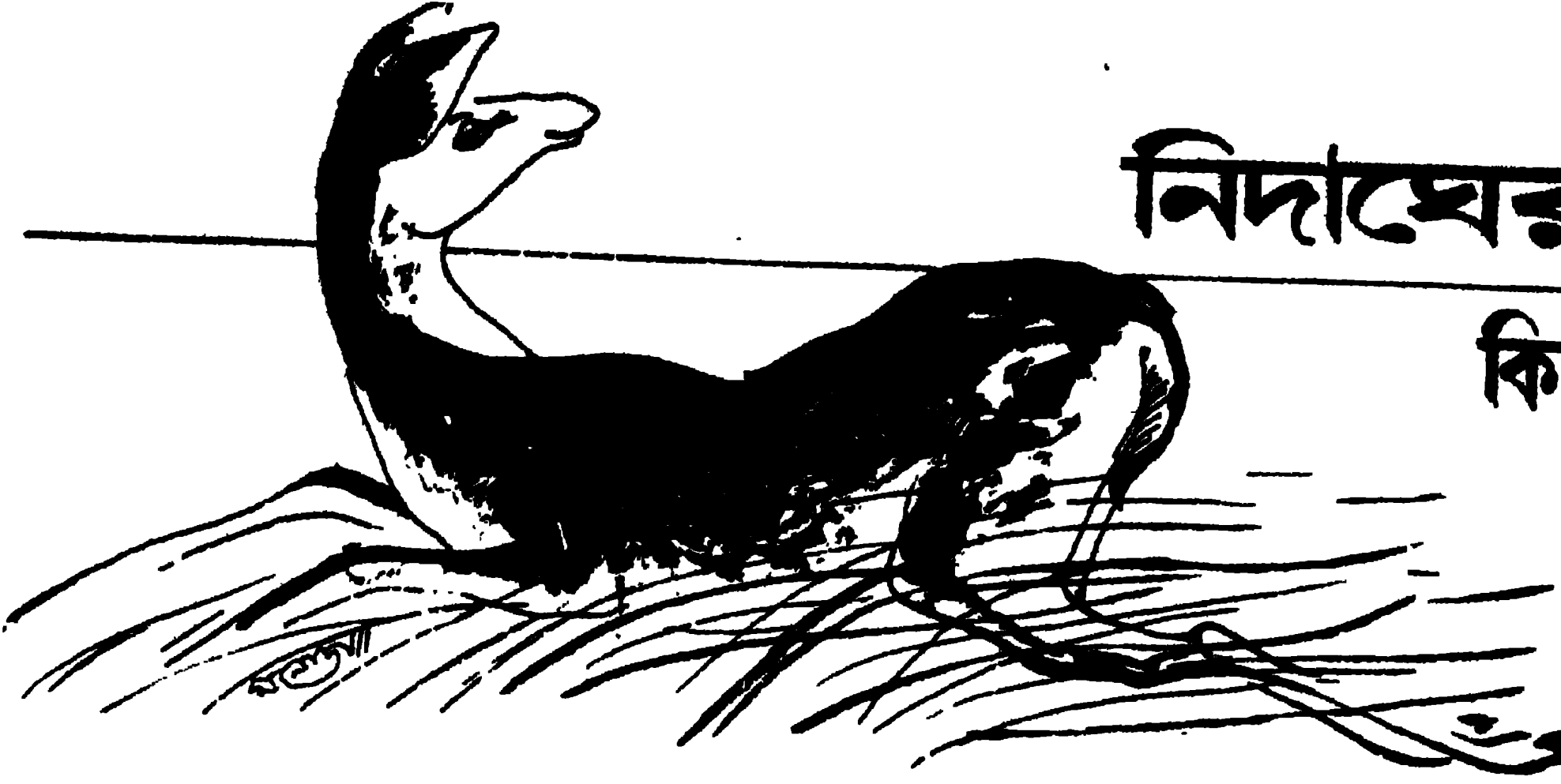
নিদাঘের হরিণী

কিরণশঙ্কর মৈত্র

দেশের রাজা একদা মৃগয়ায় গিয়ে একটি গর্ভিনী হরিণীকে ধরে বুনোলতায় বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে এসে পশুশালায় রেখে দিলেন। পশুশালার এই নবলব্ধ জীবটিকে দেখতে এসে তরুণ রাজকুমারের হৃদয় বিদ্ধ হয়ে গেল হরিণীর আয়ত চোখের মায়ায়। বন্ধন মুক্ত করে দিল সে। ত্রস্ত চকিত ভীত হরিণী অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। পশুশালার অধ্যক্ষের মাধ্যমে অচিরে এই সংবাদ রাজ্যাধিপতির কানে পৌঁছুল। ক্রুদ্ধ রাজা পরের দিন বিচার সভায় আপন আত্মজকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন।

রাজকুমার রাজ্যসীমা পার হয়ে সামনের এক অরণ্যে প্রবেশ করছিল। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যরশ্মির অতি অল্পই গহন বনের মধ্যে আলো ফেলছিল। ছায়াময় অরণ্যপথে আনমনা চলতে চলতে হঠাৎ চমকে গিয়ে দেখে—তার সামনে সেই বন্দিনী মৃগী-যাকে সে মুক্ত ক'রে দিয়েছিল। রাজকুমারের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে সেই হরিণী রূপান্তরিত হলো রূপসী কিশোরী কন্যায়। যুক্ত করে সে রাজার ছেলেকে প্রণতি জানাচ্ছে।

রাজপুত্র বললে—ওগো হরিণী মেয়ে, রাজরোষে এখন আমি এক নির্বাসিত মানুষ। তুমি আমার কাছে এসো না। কে জানে—হয়ত আমার সঙ্গে থাকলে তোমার জীবনেও বিপদ ঘনিয়ে আসবে।

কিন্তু রাজপুত্রের কথায় কান না-দিয়ে সেই মেয়েটি তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রাজপুত্রের তৃষ্ণা পেয়ে গেল। এদিক ওদিক খানিকটা খুঁজে একটা ডোবা দেখতে পেল, নীচের দিকে একটুখানি জল। চারধারে ভালো ক'রে দেখে যখনই জল খেতে নামবে তখনই চোখে পড়ল—ডোবার মধ্যে সাপের মুখে একটা ব্যাঙ। ব্যাঙটা তখনও চীৎকার করছে—ক্রাও-ক্রাও-ক্রাও। রাজপুত্র সাপটাকে মারতে গিয়েও মারল না। ভাবল—সাপতো তার আহার জোগাড় করে নিয়েছে। ক্ষুধার্তের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নেওয়া অন্যায়। তাই সে নিজের ডান হাতের মাংস খানিকটা কেটে সেই সাপের দিকে ছুঁড়ে দিল, সাপ ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিয়ে সেই মাংসের টুকরোটা খেতে লাগল। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালাল ব্যাঙ। ইতিমধ্যে সঙ্গিনী মেয়েটি জল নিয়ে এসেছে। সেই জল খেয়ে আবার তারা চলতে লাগল। ক্রমে এক রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে তারা প্রবেশ করল আর এক রাজ্যের মধ্যে।

নতুন রাজ্যের রাজধানী-শহর থেকে যখন তারা দু'জনে যাচ্ছিল—রাস্তার পাশে চুল ছাঁটার দোকান থেকে দেখতে পেল নাপিত। মেয়েটির রূপ দেখে ক্ষৌরকার এমনই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে নিজের কাজও ভুলে গিয়েছিল। আচমকা তার হাতের ক্ষুরের খোঁচা লেগে গেল খদ্দেরের গালে। সে যন্ত্রণায় 'উঃ' বলে চেঁচিয়ে নাপিতকে গাল দিল। কিন্তু ক্ষৌরকার সে দিকে কান না দিয়ে হাতের যন্ত্রপাতি ফেলে ছুটল রাজপ্রাসাদে। পুরু মখমলের পালঙ্কে বসে রাজা তখন ঢুলছিলেন, বিরাট রঙিন পাখা নিয়ে হাওয়া করছিল পরিচারিকারা। ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হয়ে নরসুন্দর বললে—মহারাজ, আপনার জীবনই ব্যর্থ, আপনার রাজপ্রসাদ শ্রীহীন।

বাস্তারের মুরিয়া উপজাতির একটি উপকথা

রাজার ঘুমের আমেজ কেটে গেল। তার দু'পাশের গোঁফ খাড়া হয়ে উঠল, উৎকন্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন রে?

—মহারাজ, আপনার রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি যাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখুন। এমন রূপসী তো শুধু আপনার প্রাসাদেই স্থান পাবার যোগ্য। এমন সুন্দরীর সঙ্গ ছাড়া আপনার জীবন যে লবণহীন ব্যঞ্জন।

রাজা তাড়াতাড়ি পালঙ্ক থেকে উঠে গলা বাড়িয়ে দেখলেন—সত্যিই এক অপরূপ লাবণ্যবতী মেয়ে স্বামীসহ রাজপথ দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। সেই সতেজ রূপশ্রীকে দেখে

রাজার মাথা ঘুরে গেল। একটু পরে স্থির হয়ে বললেন—কিন্তু সঙ্গে যে ওর স্বামী। স্বামীর হাত থেকে কি ক'রে আমি ছিনিয়ে আনব এই রমণীয় কন্যাকে?

নাপিত বললে—ওর স্বামীকে ডেকে এক কঠিন কাজের ভার দিন। বলুন—এক পাত্র বাঘের দুধ এনে দিতে। না-পারলে তার জীবনদণ্ড।

রাজা পরদিন প্রতিহারী পাঠিয়ে নগর প্রান্তের কুটির থেকে ডেকে অনলেন নির্বাসিত রাজকুমারকে। তারপর নাপিতের পরামর্শ মতো তাকে বললেন—আজ সূর্যাস্তের আগে একপাত্র বাঘের দুধ এনে দাও। না-পারলে ঘাতকের হাতে প্রাণ যাবে তোমার।

বিষণ্নমনে রাজপুত্র কুটিরে ফিরে আসে। হরিণী-মেয়ে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে? সব শুনে বললে—চিন্তা করো না। তুমি দু' বাটি বাঘের দুধ নিয়ে যাবে রাজার কাছে। আমি সব ব্যবস্থা করছি। এই বাটি দুটো নিয়ে পুব দিকের জঙ্গলে যাও। সেখানে বাঘিনীর দেখা পেলে সে যখন তোমাকে খেতে আসবে—তোমার ডান হাত উপরে তুলো। বাঘিনী তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।

রাজপুত্রের ডানহাতটি মন্ত্রপুত ক'রে হরিণী-মেয়ে তাকে অরণ্যে পাঠিয়ে দিল।

গভীর বনের মধ্যে গিয়ে রাজপুত্র দেখে—সেখানে দুটি বাচ্চাসহ এক বাঘিনী নিদ্রিত। হাওয়ায় ভেসে ভেসে যখন মানুষের গন্ধ নাকের মধ্যে ঢুকল—ঘুম ভেঙ্গে গেল বাঘিনীর। সে লাফ দিয়ে রাজপুত্রের সামনে এসে তাকে খেতে গেল, রাজপুত্র ততক্ষণে তার ডানহাত উপরে তুলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী থেমে গেল। বুঝল—এ যে আমার ছোটবোনের কাছ থেকে এসেছে আমার দুধ নেবার জন্যে। —নিজের থাবা দিয়ে বুকের দুধ দুইয়ে সে রাজপুত্রের দুটো বাটিই ভরে দিল। তারপর তার বাচ্চা দুটিকেও রাজপুত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল রাজধানীতে রাজার কাছে।

দু'হাতের দু'বাটিতে বাঘের দুধ, দু' পাশে দুই বাঘের বাচ্চা—রাজপুত্রকে আসতে দেখেই রাজার ভিরমি খাবার অবস্থা। কোনরকমে সামলে সে রাজকুমারকে চলে যেতে বলল। খবর পেয়ে একটু পরে নাপিত এসে হাজির। বললে—ভয় পাবেন না মহারাজ, হতাশ হবেন না। এই সুন্দরী মেয়েটিকে আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রাসাদে আনতে পারবেন। ওর স্বামীকে কাল আপনি রাক্ষসদের দেশে পাঠিয়ে দিন। সেখানে রাক্ষসদের ক্ষেত থেকে আনতে বলুন ঝুড়ি ভর্তি সোনালী শস্য।

পরের দিন রাজা তাই করলেন। আজও রাজপুত্র চিন্তিত হয়ে ঘরে ফিরলে হরিণী মেয়ে সব শুনে বললে—চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঝুড়ির উপরে সাঙ্কেতিক ভাষায় আমি সংবাদ পাঠিয়ে দেব। সেই লেখা পড়ে রাক্ষসেরা তোমায় খুসী মনেই শস্য দিয়ে দেবে।

রাজপুত্র রাক্ষসের দেশে রওনা দিল। সেখানে গিয়ে দেখে বিরাট তালগাছের মতো এক রাক্ষস ঘুমিয়ে আছে কাৎ হয়ে এক কান ভূমির উপর রেখে, অন্য কান আকাশের দিকে। রাজকুমার সে দিকে যেতে না-যেতেই মাটিতে তার পায়ের শব্দ কানে গেল রাক্ষসের। সঙ্গে সঙ্গে সে দুরন্ত ঝড়ের দমকা হাওয়া-মুক্ত বাঁশ গাছের মতো সোজা দাঁড়িয়েই রাজকুমারকে মারতে গেল। কিন্তু রাজপুত্রের হাতের ঝুড়ির লিখন ততক্ষণে তার নজরে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজকুমারকে মহা সমাদরে দু'ঝুড়ি শস্য দিয়ে তার সঙ্গে রাজপ্রসাদে এলো। সেই দৃশ্য দেখে রাজা ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন, প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন আর কি। রাজ-বৈদ্য কোনরকমে তাকে সুস্থ করেন। রাজার মাথা ঠাণ্ডা হ'লে তখনই নাপিতকে নিয়ে আসবার জন্যে প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলেন।

নাপিত এসে সব দেখে-শুনে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। তার কপালের রেখা-গুলিতে এঁকেবেঁকে যেতে লাগল সাপের কুটিলতা। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে—হ্যাঁ, মহারাজ, এবার আর বাছাধন পার পাবে না। এক কাজ করুন। আপনি মহারাণীর হীরের হার রাজপ্রাসাদের বাইরের ঐ গভীর কুয়োর মধ্যে ফেলে দিন। তারপর—

পরের দিন রাজপুত্রকে ডেকে রাজা বল্লেন—ঐ কুয়োর মধ্যে মহারাণীর হীরক-হার পড়ে গেছে। যাও, এক্ষুনি তুলে নিয়ে এসো। সূর্য পশ্চিমে চলে পড়বার আগে হার না-নিয়ে এলে তোমার গর্দান যাবে।

কুমার ঘরে ফিরে হরিণী-কন্যাকে সব কিছু বলল। এবার সেও হীরের হার তুলে আনবার কোনো উপায় না-পেয়ে বাক্‌হারা। কুয়োটা ছিল খুবই গভীর আর পিছল। দু'জনেই মৌন হয়ে ব'সে রইল মাথা নীচু ক'রে। রাজপুত্র ভাবল—এবার তার জীবন শেষ। —এমন সময় সেই ব্যাঙ আর সাপ এসে হাজির। তারা রাজপুত্রকে চিন্তা করতে বারণ ক'রে তখনই কুয়োর মধ্য থেকে রাণীর হার তুলে নিয়ে এলো। রাজকুমার হাসিমুখে সেই হার দিয়ে এলো রাজাকে।

পরের দিন নাপিত এলে রাজা বল্লেন, আর কিছু করবার নেই। এই যুবকের উপর অলৌকিক শক্তির আশীর্বাদ আছে।

নাপিত বল্লে—মহারাজ, ঘাবড়াবেন না। শেষ চেষ্টা করা যাক। এক্ষুনি এমন একটা শক্ত কাজ ভেবে বার করছি—যা করা মানুষ তো দূরের কথা যক্ষ-রক্ষদের পক্ষেও সম্ভব নয়।.....হ্যাঁ—হ্যাঁ, পেয়েছি আপনি ঐ ছেলেটাকে ডেকে বলুন—এক রাতের মধ্যে এক ফলন্ত আমের বাগান

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

যুব মানস

চব্বিশদফা কর্মসূচী এবং যুবসমাজ

অমর দাশ

ভারতের জনদরদী প্রধানমন্ত্রী সমাজের দরিদ্র অবহেলিত বঞ্চিত অংশকে অর্থনৈতিক, ও সামাজিক দিক থেকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বছরখানেক আগে বিশদফা কর্ম্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ঘোষণামত সারা দেশ জুড়ে চলেছে আজও এক বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ। চারদিকে বিরাজ করছে শৃংখলা, জাতি ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। ভূমিহীন পেয়েছে তার চাষের জমি, গৃহহীন পেয়েছে মাথা গুজবার ঠাঁই। বেগার শ্রমিক মুক্তি পেয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছে মাননীয়া ইন্দিরাজীকে। গ্রামীণ ঋণবিলোপের কর্ম্মসূচীর জন্য মহাজনদের কবল থেকে রেহাই পেয়েছে দরিদ্র চাষী কৃষিশ্রমিক তার ন্যূনতম মজুরীর কথা জানতে পেরে আজ নিজের শ্রমের মর্য্যাদার ওপর ফিরে পেয়েছে অগাধ আস্থা। চোরাচালানকারী মজুতদার কালোবাজারীকে শায়েস্তা করার জন্য সরকারী প্রশাসন অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ নজর রাখছে দ্রব্যমূল্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহের ওপর। ছাত্রছাত্রীরাও আজ বিশেষভাবে উপকৃত। হোস্টেলে তাদের কন্ট্রোলদরে জিনিষপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। কন্ট্রোল দরে কাগজ, কালি, বই সরবরাহের ব্যবস্থাও হয়েছে। পড়াশুনোর সুবিধার জন্য স্থাপিত হয়েছে বুকব্যাঙ্ক। কর্মসংস্থান ও শিক্ষানবিসীরও সুযোগ বেড়েছে। যেটুকু হয়েছে সেটুকুই সব নয়—কাজ থেমে নেই—এগিয়ে চলার মন্ত্রে আমরা দীক্ষা নিয়েছি। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ব্যাধি, ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের চলার বিরাম নেই। দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যুবসমাজকে চালিত করার জন্য ইন্দিরাজীর সুযোগ্যপুত্র সঞ্জয় গান্ধী যুবনেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন সারাদেশের অবিসংবাদিত যুবনেতা। তিনি বলেছেন—যুবকদের বসে থাকলে চলবে না। তাদের কাজ করে যেতে হবে—বিশদফা কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্যদিয়ে দেশের প্রগতি সম্ভব করে তুলতে হবে।

যুবনেতা হিসাবে সঞ্জয় গান্ধী আরো চার দফা কাজ বিশেষভাবে প্রতিটি যুবককে সম্পাদন করতে বলেছেন। এই চারদফা কর্মসূচী হল, (এক) পরিবার নিয়ন্ত্রণ (দুই) বৃক্ষরোপণ (তিন) নিরক্ষরতা দূরীকরণ (চার) পণপ্রথা বিলোপ। সম্প্রতি তিনি আর এক দফা কর্মসূচীর কথা বলেছেন। তা হল পরিচ্ছন্নতা।

বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাব শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে গেলে এই চারদফা কর্ম্মসূচীর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আর এই কর্ম্মসূচীগুলো বিশেষভাবে যুবসমাজই সফল করে তুলতে সক্ষম।

আমাদের মতো দেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। জন্মনিয়ন্ত্রিত না হলে দেশের প্রগতির ফসল নবজাতকেরাই নিঃশেষ করে দেবে, যারা উত্তর পুরুষ তারা সুফল কিছুই ভোগ করতে পারবে না। জন্মশাসিত না হলে অগণিত জনতার ভরণ পোষণ সুশিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান আহার বিহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। দারিদ্র্য হবেনা দূরীভূত। যুবসমাজকে এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। সরকার গ্রামে গঞ্জে শহরে হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং উপকেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেছেন। নারীপুরুষ উভয়েই পরিবার পরিকল্পনার আওতায় এসে সুখী জীবন যাপন করতে পারেন। আজকের তরুণ-তরুণীরা ভাবীকালের জনকজননী। সুতরাং এই কর্মসূচী উপেক্ষা করা চলে না। যারা স্বল্পশিক্ষিত নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দিশেহারা তাদেরকে বুঝিয়ে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসা যুবক-যুবতীদের দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবার পরিকল্পনার অধীনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বেকার ভাইবোনের জীবিকা অর্জনের কিছু ব্যবস্থাও রেখেছেন।

ছোটবেলা বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছিলাম আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি আর গাছ তা গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে। তখন থেকেই বুঝতে পেরেছি গাছের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। তাছাড়া দেশে বৃষ্টিপাত, বন্যা প্রতিরোধ প্রভৃতির জন্যও বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা আছে। রাস্তার দুধারে বৃক্ষরোপিত হলে পথিকের চলার পথ যেমনি হবে ছায়াসুশীতল তেমনি সবুজ পত্রপুঞ্জশোভিত বৃক্ষরাজি মানবমনে প্রশান্তি বিস্তার করবে। আধুনিক শহর কলকারখানার চুল্লী-ধোঁয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক গ্যাসে পরিপূর্ণ। দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করার জন্যও দরকার বৃক্ষরোপণ। জনসংখ্যার অনুপাতে বৃক্ষরোপিত হলে জনজীবন ব্যাধি মুক্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। দেশ রক্ষা পাবে বন্যার কবল থেকে। খরা অঞ্চলে শ্রাবণের ধারা পড়বে—দেশের মাঠ ভরে উঠবে সবুজ ফসলে। জ্বালানি কাঠেরও সমস্যা মিটবে।

তৃতীয় দফায় রয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী। নিরক্ষরতা বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ। অন্ধ যেমন তার চক্ষুরত্ন ছাড়া পৃথিবীর সবরকম সৌন্দর্য্যকে চাক্ষুষ করতে পারে না তেমনি নিরক্ষর লোক চক্ষুষ্মান হয়েও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। নিজের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হতে পারে না। তাই সমাজ চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। গ্রামবহুল আমাদের দেশ—আর গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষই নিরক্ষর। কৃষিকাজে—গ্রামের জীবনে

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহিলা মহল

কৃষি প্রশিক্ষণে মেয়েরা

দেবেশকৃষ্ণ কর

বর্ধমান জেলার কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনায় কালনা ১ নং ব্লকের কৃষ্ণদেবপুর গ্রামের হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত তিন দিনের মহিলা কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বাছাই করা ২৬ জন মহিলা শিক্ষার্থী। শিবির চলেছিল ২২ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত।

এই মহিলা প্রশিক্ষণ শিবিরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তিন দিনে কি শিখলেন? মায়া দত্ত বললেন, শিখেছি অনেক। তাঁর বাবার নাম শ্রীনগেন দত্ত। কাপড়ের ব্যবসায় আছে।

স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে মায়া। মায়াদের চাষের জমি মাত্র দুই বিঘা। এই দুই বিঘা জমিতে তিন বার ফসল তুলতে পারলে ছয় বিঘার আয় হতে পারে। গ্রামের একজন মহিলার কাছ থেকে শোনা এই কথাগুলি কিসের ইংগিত বহন করে?

কথা হচ্ছিল মহিলা শিক্ষণ শিবিরে বসে। গোয়াড়া গ্রামের শ্রীমতী মায়া দত্ত বললেন, অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদনে মহিলাদের ভূমিকা কিছু কম নয়। সেই জন্য চাষবাসের আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকা মহিলাদের একান্ত আবশ্যক। শস্য গোলাজাত করণ ও অপচয় রোধে মহিলাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি কি না বলুন?

মায়া দত্ত একা নন। বি. এস সি. পাশ শ্রীমতী মঞ্জু সরকারের বাড়ি কৃষ্ণদেবপুরে। বয়স ২০। জমির পরিমাণ প্রায় ৮ বিঘা। মঞ্জু আবার গ্রামের মহিলা সমিতির সম্পাদিকা। চটপট প্রশ্নের উত্তর দিতে মঞ্জুর এতটুকুও দেরি হয় নি। বাড়ির আবর্জনা পচিয়ে কিভাবে কম্পোষ্ট তৈরি করতে হবে সেই কম্পোষ্ট বাড়ির লাগোয়া সবজি বাগানে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার সবই তিনি রপ্ত করে নিয়েছেন। মঞ্জু বললেন, এই ধরণের প্রশিক্ষণ শিবির যত বেশি হয় ততই মঙ্গল। তিন দিনের না হয়ে এই শিবির আরও কয়েক দিন বাড়ান যায় কিনা ভেবে দেখতে তিনি অনুরোধ জানালেন।

নাদাই গ্রামের বি. এ. পাশ মহিলা মাধুরী নন্দীর কথাও তাই। মধুর হেসে মাধুরী বললেন, পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করা যায় কি না ভেবে দেখবেন।

বর্ধমান জেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যসূচী চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যতগুলি মহিলা শিক্ষণ শিবির হয়েছে তার প্রায় সব কটি থেকেই এই ধরণের অনুরোধ পাওয়া গেছে। আরো অনেকে অনেক কথা বললেন। প্রশ্নের জবাব দিলেন।

মোটামুটি ২৫ জন বাছাই করা মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এক একটি শিবিরে। বাছাই করা হয় এই কারণে যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা বাড়ির পুরুষদের পরামর্শ দিতে পারেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে যে বিষয়গুলির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় তার মধ্যে আছে খাদ্যশস্য উৎপাদনে মহিলাদের ভূমিকা, সবজি চাষ ও দোরগগোড়ায় সবজি বাগান। ফলের চাষ, সয়াবীন ও সূর্যমুখী চাষ, রান্নায় সূর্যমুখী তেলের ব্যবহার, স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস ও সুষম খাদ্য, পুষ্টির জন্য সয়াবীন উপজাত খাবার তৈরীর পদ্ধতি,

কৃষ্ণদেবপুরে মহিলা প্রশিক্ষণ শিবির

মহিলা শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিখছেন

ফল ও সবজি সংরক্ষণ, কম্পোষ্ট ও সুপার কম্পোষ্ট সার তৈরী, বিভিন্ন রকমের বীজ, সার, রোগ ও কীটনাশক পরিচিতি এবং সেগুলি সংরক্ষণ। শস্য সংরক্ষণ, হাঁস—মুরগি ও গো-পালন ইত্যাদি।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা সহজ সরল ভাষায় মহিলাদের সঙ্গে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রায়ই ফিল্ম ও স্লাইডের সাহায্যে বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়।

১৯৬৯-৭০ সালে বর্ধমান জেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হওয়ার পর ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত ৮২১ জন মহিলা এর সুযোগ নিয়েছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে নতুন চালু হওয়ায় ৬০ জন মহিলা শিক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য বাদে ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত ২০ থেকে ৩০ বছরের মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০৫ জন। ৩১-৪০ বছরের ছিলেন ১৯৩ জন। চল্লিশোর্ধ বয়সের মহিলা ছিলেন মোট ৬৩ জন।

বয়স বাদে অন্য যে তথ্য আছে তা আরো চমৎকার। ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সন পর্যন্ত মহিলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪০ জন স্বল্প শিক্ষিতা। প্রাইমারি পাশ মহিলার সংখ্যা ২১১ জন। সেকেণ্ডারি বা স্কুল ফাইন্যাল পাশের সংখ্যা ৪৮৫ জন। গ্র্যাজুয়েট মহিলা শিক্ষার্থী ছিলেন ২৫ জন। এর মধ্যে লক্ষণীয় হল ১৯৭১-৭২ সালে কম লেখা পড়া জানা মহিলা এসেছিলেন ১০ জন। ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র এক জনে। সে বছর প্রাইমারী শিক্ষার্থী মাত্র ছিলেন ৪৬ জন। তাও কমে ১৯৭৫-৭৬ সলে দাঁড়িয়েছে ৩০ জনে। অন্যদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা মহিলা ১৯৭১-৭২ সনে ৫ থেকে বেড়ে ১৯৭৫-৭৬ ১৬৩ জনে উঠেছেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে মাত্র ৪ জন স্নাতক মহিলা প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে ১৯৭৫-৭৬ সালে এগিয়ে এসেছেন ১২ জন।

বর্ধমান জেলায় চাষবাসে উন্নতির এটাও অন্যতম কারণ বলা যায়। যেখানে কাজে মহিলারাও পিছিয়ে নেই সেখানে অগ্রগতি হতে বাধ্য।

চব্বিশদফা কর্মসূচী

১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে পোঁছে দিতে হলে দরকার সাক্ষর গ্রামবাসী।) তাই যুবসমাজকে প্রতিটি গ্রামে পরিচালনা করতে হবে নৈশ বিদ্যালয়—বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। সেখানে অক্ষর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তারা আধুনিক কৃষিকথা, পরিবার পরিকল্পনা সব কিছু সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল হতে পারবে। সরকার এজন্য প্রতিটি জেলার সমাজশিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খুলে খাতা শ্লেট বই পেন্সিল বিতরণ করে এই কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যুবসমাজ এই কর্মযজ্ঞের সামিল হলে অচিরেই আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে দেশের নিরক্ষর জনগণকে আলোকে নিয়ে আসতে পারব।

(চতুর্থ দফায় পণপ্রথার বিলোপ। আমাদের সমাজে ছেলেমেয়েদের বিয়েতে পণ দেওয়া নেওয়া চলে আসছে বহুদিন থেকে। সরকার পণপ্রথা নিষিদ্ধ করে আইনও রচনা করেছিলেন কিন্তু সেটা তেমন কার্যকরী হয়নি। পণ দেওয়া নেওয়া তেমনি চলে আসছে। সঞ্জয় গান্ধীই একমাত্র যুবনেতা যিনি নাকি মনে প্রাণে এই সামাজিক পাপকে উৎখাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্নপ্রান্তের যুবক-যুবতীরা শপথ গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের বিয়েতে পণ নেবেনা বা পণ দেবেনা। বিভিন্ন রাজ্যের সরকার পণ নেওয়া দেওয়ার বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। পণপ্রথা তো যুবকযুবতীদের ব্যাপার। তারা যদি এই কর্মযজ্ঞের পুরোহিত হয় তবে আর চিন্তা কি! তারা বেঁকে বসলে মা বাবা আর তাদের গোঁড়ামিতে বহাল থাকতে পারবেন না। ফলে যুবসমাজের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে—মা বাবা ও এই ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নেবেন। সুতরাং এই চারদফা কর্ম্মসূচী যুবসমাজের বন্ধনমুক্তির হাতিয়ার—নতুন ভারত গঠনের চাবিকাঠি। মনপ্রাণ দিয়ে ভারতের প্রতিটি তরুণতরুণীকে এই মহাযজ্ঞের সামিল হতে হবে।

পঞ্চম দফায় যে পরিচ্ছন্নতার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সেক্ষেত্রেও যুবসমাজের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। গ্রাম ও শহর পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযানে ইতিমধ্যেই তাঁরা সামিল হয়েছেন সারা দেশে।

কুসুম সম্বন্ধে জানুন

প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়

কুসুমবীজের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলায় এর কিছু কিছু চাষ হয়ে থাকে।

কুসুমবীজের তেল রান্নায় ব্যবহারের জন্য খুব ভাল। এর বীজে ৩০–৩২ শতাংশ তেল আছে। এতে আড়াই শতাংশ খনিজ পদার্থ আঠার শতাংশ শর্করা (Carbo Hydrate) আছে। বীজে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কচি পাতায় লোহা এবং যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন আছে। অধিক দিন সংরক্ষণের ফলে এর তেল হলদে হয়ে যায় না। ঘিয়ের সঙ্গে এর তেল ভেজাল দেওয়া হয়। কখন কখন তেলে একটা খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়। হলুদ, লবঙ্গ বড় এলাচ পান শুকনো আদা প্রভৃতির রস মিশিয়ে ফোটালে এর গন্ধ দূর হয়। কুসুম তেলে এমন এক এ্যাসিড আছে, যেটা রক্তের cholestrol-এর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তাই হৃদ-রোগীদের পক্ষে এটা খুবই উপকারী। তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং রং হলদে হয়ে যায় না বলে পেইন্ট ও বার্ণিশ তৈরীতে এটা ব্যবহার করা যায়। আবহাওয়া প্রতিরোধে এটা তিসির তেলের মতই ভাল। এর তেল বাতি জ্বালাতে এবং সাবান উৎপাদনে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। কুসুম তেলকে ৫৫০° ফারেনহাইট উষ্ণতায় ২ ঘণ্টা যাবৎ গরম করার পর ঠাণ্ডা জলে ঢাললে এক প্রকার আঠালো পদার্থ পাওয়া যায়—এটাকে গ্লাস সিমেণ্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। টালি, সৌখিন পাথর প্রভৃতি আটকাতে এটা প্লাষ্টার অব পেরিসের বদলে ব্যবহার করা চলে। কুসুম তেল ওয়াটারপ্রুফ কাপড় তৈরীতে ব্যবহার হয়। তেলটা ৫০৭—৩১০° ফারেনহাইট উষ্ণতায় ২১৩ ঘণ্টা ফুটিয়ে টারপেইণ্ট তেলে ডোবালে Water proof compound পাওয়া যায়। কুসুমের ভূষি সেলুলোজ ইনসুলিন তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। খোসা সুদ্ধ বীজ থেকে পাওয়া খইল জৈব সার হিসাবে এবং খোসা ছাড়ানো বীজ গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খইল শুকনা অবস্থায় রাখলে ছাতকুড়া (mould) পড়ে না। খইলের বিভিন্ন উপাদান নীচে দেওয়া হল :—

	খোসা সমেত বীজ (শতাংশ)	খোসা ছাড়ান বীজ (শতাংশ)
গো-খাদ্য হিসাবে		
জলীয় অংশ	৭.৩	৮.৭
চর্বি	৮.৩	১০.৯
প্রোটিন	২৮.৩	৪৫.৪
শর্করা	২৭.৩	২০.১
আঁশ	২৩.১	৮.৩
ছাই	৫.৭	৭.৫
ার হিসাবে		
নাইট্রোজেন্	৪.৯২	৭.৮৮
পটাশ	১.২৩	১.৯২
ফস্‌ফোরিক্ এসিড্	১.৪৪	২.২০

কসুমের ফল বেদনানাশ (Sedative) Laxative ও Stimulant। কসুমবীজ টনিক হিসাবে ব্যবহার হয়। পোড়ানো কসুমবীজের তেল ক্ষত এবং বাত রোগে ব্যবহার করা চলে। শুকানো কসুম পাতার গুঁড়া দিয়ে দই পাতা যায়।

কুসুম পাপড়িতে কারথামিন এবং কুসুম হলুদ এই দুইটী রঙীন বস্তু আছে। প্রথমটি জলে গুলে যায় না এবং অপরটি জলে দ্রবনীয়। পাপড়িতে 0.08 শতাংশ কারথামিন এবং ৩১ শতাংশ কসুম হলুদ থাকে। কসুম-হলুদ যদিও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তবুও এটা কোনও কাজে লাগে না। ভাল রং পেতে হলে এটাকে কারথামিন থেকে আলাদা করতে হবে। রঙ করার জন্য পাপড়িগুলোকে তুলে নিয়ে ছায়ায় শুকোতে হবে। তারপর সেটাকে এসিড্ মেশানো জলে তিনচার বার ধুয়ে নিলে হলুদ রঙটা চলে যাবে। সেটাকে শুকিয়ে নিয়ে বিক্রীর জন্য রাখতে হবে। কসুমের পাপড়িগুলোকে সাজী মাটি (Sodium Carbonate) গোলা জলে ধুয়ে নিয়ে dilute এসিড্ দিয়ে থিতানো হয় এবং বাজারে পেষ্ট হিসাবে বিক্রী করা হয়। রাসায়নিক রঙ্ থাকা সত্ত্বেও কুসুম রঙ্ ভারতে উৎসবের কাপড়ে, খেলনা, মদ, মিঠাই, প্রসাধনী তৈরী এবং বিভিন্ন সাজসজ্জাতে ব্যবহৃত হয়। বাগানের চারপাশে লাগালে এটা বেড়া হিসাবে কাজ করে।

ভারতে আনুমানিক ১৫ লক্ষ একরে কসুম চাষ হয় এবং বছরে মোট উৎপাদন প্রায় ১৩ লক্ষ টন। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ,

কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র প্রদেশেই প্রধানত কুসুম চাষ সীমাবদ্ধ। এমনকি এই সব প্রদেশেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গমের চার-পাশে অথবা অন্য ফসলের সঙ্গে এর মিশ্র চাষ করা হয়। বিভিন্ন তৈল বীজের মধ্যে কুসুম অনেক বেশী খরা সহ্য করতে পারে। এর মজবুত ও বহু বিস্তৃত শিকড় মাটীর রসের সদ্ব্যবহার করতে পারে। বার্ষিক ১৫ থেকে ২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত কুসুম চাষে যথেষ্ট, তবে ভাল ফলনের জন্য আরও বেশী বৃষ্টি দরকার। উত্তম জল নিকাশী ব্যবস্থা সহ মাঝারী উর্ব্বরতার দোঁয়াস মাটি কুসুম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। মাটী খুব বেশী উর্ব্বর হলে গাছের বৃদ্ধি অতিরিক্ত হয়, ফলে বীজের ফলন কমে যায়।

জাতের মধ্যে Nag-7, No. 62-8, A-300 No. 7-13-3-এর নাম উল্লেখ যোগ্য। কুসুম বোনার উপযুক্ত সময় কার্তিক মাস। তারপর বুনলে ফলন কম হবে। ড্রীল দিয়ে অথবা লাঙ্গলের পেছনে দেড় ফুট দূরে দূরে লাইন করে দুই ইঞ্চি গভীরে বীজ বুনতে হবে। একরে ৮।১০ কেজি বীজ লাগবে। বোনার ২৫ দিন পরে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮ ইঞ্চি করে দিতে হবে। একরে ১৬ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১০ কেজি P-205 প্রয়োগ করতে হবে। সারটা বীজের ২ ইঞ্চি নীচে এবং ৪ ইঞ্চি পাশে দিতে পারলে ভাল হয়। কুসুমের চারা তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বেশী বাড়ে না এই সময় আগাছা জন্মাবার সুযোগ পায় ও ফসলকে বড় হতে দেয় না। তাই গাছগুলো চার ইঞ্চি লম্বা হলে আগাছা নিড়ান খুবই প্রয়োজন। এর পনের দিন পরে আরেকবার নিড়ানি দিতে হবে। শাখা প্রশাখা বিস্তারের জন্য বোনার ৭।৮ সপ্তাহ পরে গাছের মাথাটা ভেঙে দিতে হবে। এভাবে বেশী ফুল আসে এবং ফলে বীজের ফলনও বাড়ে। শুকনো পরিবেশে চাষ করলে কুসুম গাছের দুই মাটির মধ্যেকার মাটি খড়, পাতা প্রভৃতি দিয়ে ঢেকে দিলে মাটির রস বেশীদিন জমিতে থাকবে।

ভোরবেলায় গাছগুলো যখন শিশিরে ভেজা থাকে, তখন গাছগুলোকে টেনে তুলতে হয়। ভেজা থাকলে গাছগুলো ভাঙ্গে না এবং কাঁটাগুলো কম যন্ত্রণা দেয়। একরে ফলন ১০—১২ কুইন্টাল পর্যন্ত পাওয়া যায়।

নিদাঘের হরিণী

১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

বানিয়ে দিতে।.....এবার বাছাধনের সব জারিজুরি শেষ। এ-কাজ আর করতে হচ্ছে না। আপনি নতুন রাণীর জন্যে নতুন মহলের ব্যবস্থা করুন। রাজ্যের মধ্যে বইয়ে দিন আনন্দের বন্যা। আদেশ দিন রাজপ্রাসাদ আলোকমালায়-সাজিয়ে দিতে—

নতুন কাজের ভার পেয়ে এবারে রাজপুত্রের মন একেবারেই ভেঙ্গে গেল। তিন তিন বার সে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। কিন্তু এক রাতের মধ্যে ফলন্ত আমের বাগান—একেবারেই অসম্ভব।

হরিণী-মেয়ে বল্লে—চিন্তা করো না। রাতের খাবার খেয়ে নাও। আজ রাতের মধ্যেই আমি অপূর্ব ফলের বাগান বানিয়ে দেব।

তারপর সে রাজপুত্রকে একটা তরবারি আর খানিকটা নুন আনতে বল্ল। সেই নুন দিয়ে ঘষে ঘষে তরবারিকে করতে হবে খুব শানিত ঝকঝকে।

রাজপুত্র সেই ভাবে কাজ করলে সে বল্লে—দ্যাখো, আবার আমি হরিণী হয়ে যাচ্ছি। হরিণী হ'য়ে এই এলাকার চারদিকে আমি দৌড়ে ঘুরে আসব। যেদিক দিয়ে আমি দৌড়ে আসব সেখানে সেখানে ফলন্ত আমের বাগান হ'য়ে যাবে। তারপর পুরো বাগান বানানো হয়ে গেলে যখন আমি এসে তোমার কাছে দাঁড়াব তখনই এই তরবারি দিয়ে আমার গলা কেটে ফেল।

শুক্লপক্ষের রাত্রির আকাশে চাঁদ ভেসে উঠতেই সে ঘরের বাইরে গিয়ে দৌড়ুতে শুরু করল, আর যেখান থেকে গেল সেখানেই ফলভারানত আমের গাছ গজিয়ে উঠতে লাগল। তারপর পুরোপুরি এক বাগান হয়ে গেলে যখন সে কাছে এসে দাঁড়াল—রাজপুত্র তরবারির এক আঘাতে তার গলা কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেই হরিণী আবার ফিরে পেল তার নারীরূপ।

পরদিন প্রভাতে রাজা সেই ফলন্ত আম্র-কানন দেখলেন, তার বাক্যস্ফূর্তি হ'লো না। নিস্ফল হ'লো তার সকল প্রচেষ্টা। তার লম্বা গোঁফ ঝুলে পড়ল গালের দু'দিকে। নাপিতের মুখের সামনে বন্ধ হ'য়ে গেল রাজপ্রাসাদের দরজা।

কিছুদিন পরে রাজপুত্র নিজরাজ্যে ফিরে যেতে মনস্থ করল। কয়েকদিন পরে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা সেই জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে হরিণী অনুপমা কন্যার রূপ পেয়ে রাজপুত্রের অনুগামিনী হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে হরিণী-মেয়ে বল্লে—আমাদের সময় পূর্ণ হয়েছে। এবার আমি আমার আপন জনদের মধ্যে ফিরে যাব, তুমি তোমার পিতার কাছে।—এই ব'লে রাজ-পুত্রের ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটুখানি রাখল, তারপর ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ আবার হরিণীতে রূপান্তরিত হয়ে দ্রুত গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেল।

রাজপুত্রের কাছে এতোদিনের ঘটনা মনে হ'লো ছায়াচ্ছন্ন মধ্যাহ্নের স্বপ্নের মতো। সেই নির্জন নিঃসঙ্গ অরণ্যে তার মনের মধ্যে জেগে থাকল শুধু এক জোড়া আয়ত গভীর চোখের কাজল-কালো নিদাঘ মায়া।

খেলাধুলা

মুর্শিদাবাদে দূরপাল্লার সাঁতার
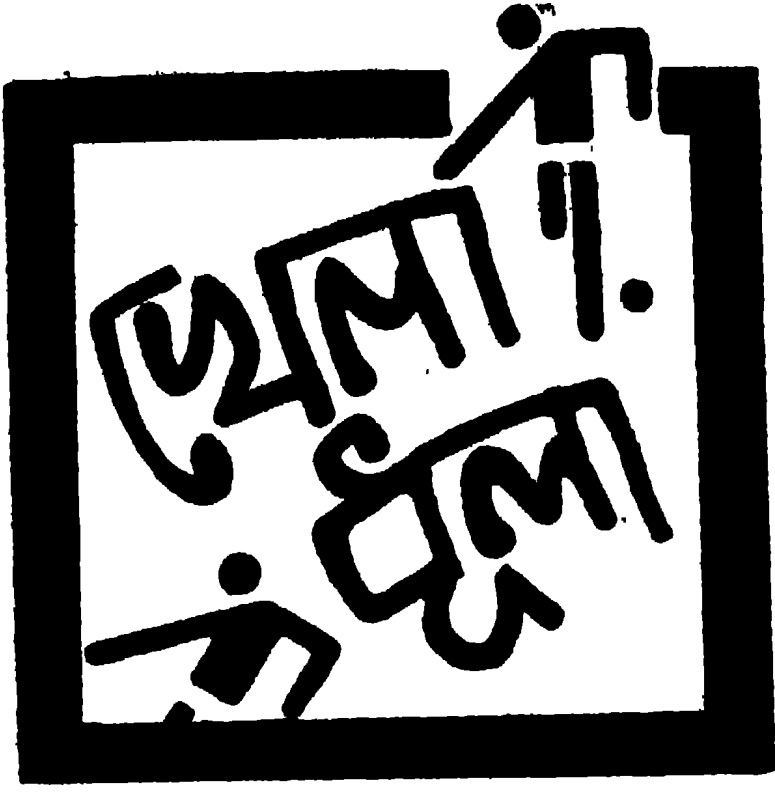
সালটা যতদুর জানা যায় ১৯১২। বোটানিক্যাল গার্ডেন্স ফেরৎ একটি জাহাজ ভাগীরথীতে ডুবে যায়। সেই জাহাজ ডুবি বা নৌ-দুর্ঘটনা ছিল মর্মান্তিক। বহু ছাত্রের অকাল বিয়োগে কলকাতা শোকাহত হয়েছিল। অনেকে বলেন সেই দুর্ঘটনাই নাকি তদানীন্তন যুব সমাজকে বিশেষ করে বঙ্গ সন্তানদের সাঁতার শেখার উৎসাহ জুগিয়েছিল। ঐ দুর্ঘটনা উত্তর কলকাতায় সৃষ্টি ক'রল এক বিস্ময়কর আলোড়ন। সাঁতার শেখা ও প্রসারের জন্য দেখা দিল বিশেষ উদ্দীপনা সর্বস্তরেই-কি ছেলে কি মেয়ে। আর তারই ফলে গড়ে উঠলো ক্যালকাটা সুইমিং এণ্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশন রায় বাহাদুর ডাঃ হারাধন দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে।

নদীমাতৃক দেশ বাংলা একসময়ে সাঁতারের ক্ষেত্রে বিশেষ কুশলতা অর্জন করেছিল। বাংলা দেশে হাজার অসুবিধার মধ্যেও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের বঙ্গালী ছেলেমেয়েরা চিরকালই সাঁতারে শীর্ষস্থানে ছিল। প্রখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ, জ্ঞান চ্যাটার্জী, নলিন মালিক, শচীন নাগ, রাজারাম সাউ, ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস, মিহির সেন, আরতি সাহা (গুপ্তা), পক প্রণালী বিজয়ী বৈদ্যনাথ নাথ, বাণী ঘোষ, লীলা চ্যাটার্জী, সুখলতা পাল—এঁরা সবাই বাঙ্গলামায়ের সন্তান। দূরপাল্লার সাঁতারে মেয়ে সাঁতারু আরতি সাহা (গুপ্তা) তো ইংলিশ চ্যানেল জয় করে অনন্যা হয়েছেনই। কিন্তু যাঁর ইচ্ছা ছিল এমন আর এক বঙ্গললনার কথা জানেন কি? চল্লিশ বছর বয়সে ঘর সংসার করা তিন সন্তানের জননী সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের গৃহিণীও যে ইংলিশ চ্যানেলের মত দূরপাল্লার সাঁতারে সফলতা আনতে পারে তা প্রমাণ করার সুযোগ চেয়েছিলেন লীলা চ্যাটার্জী। সরকার তাঁকে অনুমতি দেন নি। তবে লীলা ঝড়বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে ৩০ মাইল গঙ্গা সাঁতারে যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে তা থেকে প্রমাণিত তদানীন্তন দূরপাল্লার সাঁতার ও
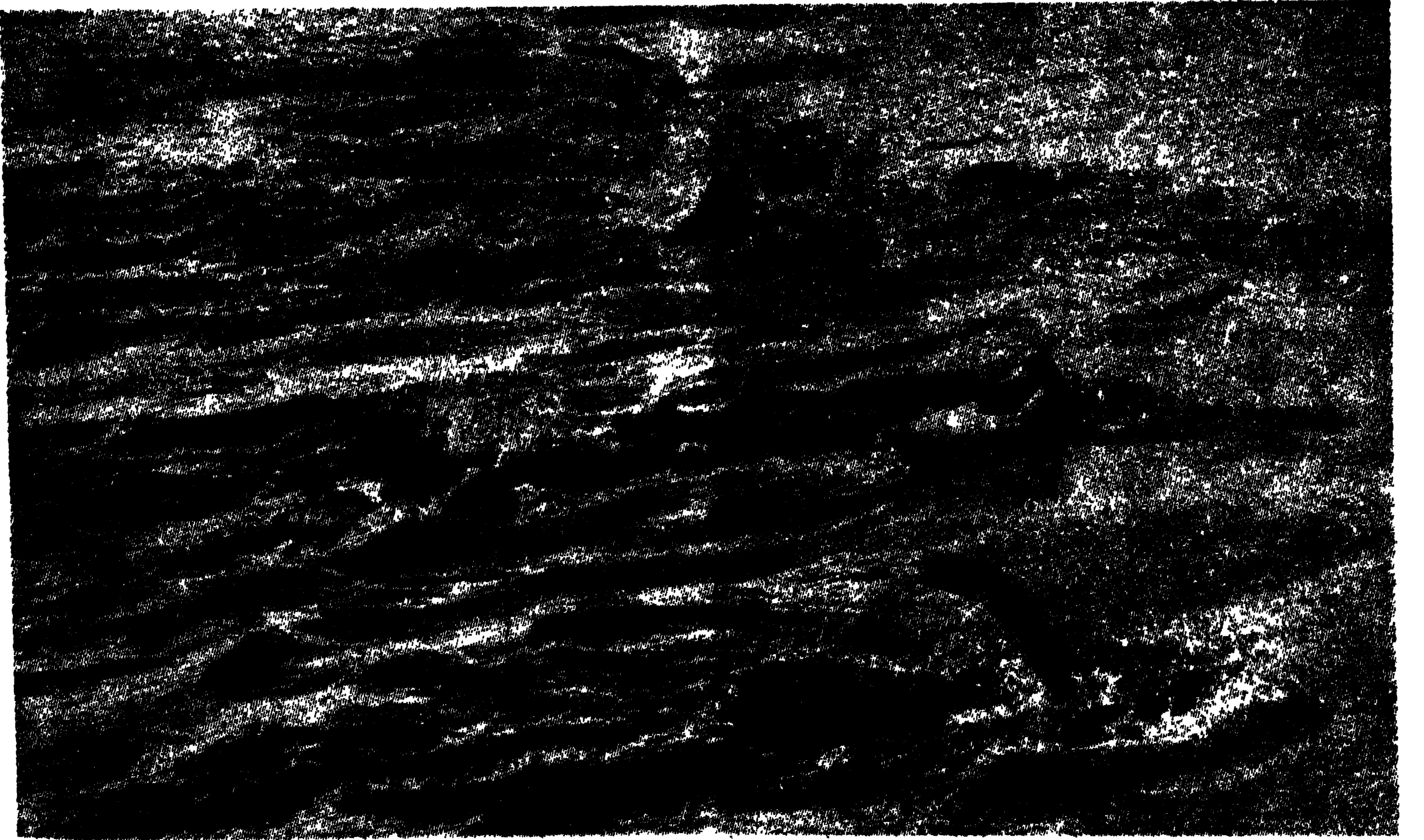
মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর বুকে বিশ্বের দীর্ঘতম ৭৪কিঃ মিঃ সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতার মাঝামাঝি সময়ে সাঁতারুদের এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে

বাঙালীসমাজের কথা। দূরপাল্লার সাঁতারে দেখা দিয়েছিল তখন অসামান্য উদ্যম। প্রতিযোগিতার দিনগুলোতে গঙ্গা এক অপূর্ব রূপ ধারণ করতো। হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবণিতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে ষ্টীমার লঞ্চ ও নৌকার গঙ্গাবক্ষে এক বর্ণাঢ্য মেলা বসত।

কলকাতার ঢেউ একসময় গিয়ে ধাক্কা দিলো মুর্শিদাবাদে। সেই মুর্শিদাবাদের সাঁতারই হলো আজকের বিশ্বের অন্যতম দূরপাল্লার সাঁতার।

১৯২৮-এর কথা। মহারাণী স্বর্ণময়ী এসোসিয়েসন—বহরমপুরে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কয়েকজন যুবক ভাগীরথীর বুকে এক সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সৈদাবাদ জলকলঘাট বা ফরাসডাঙ্গা ঘাট থেকে গোরা বাজার ঘাট পর্য্যন্ত মাত্র ৩ কিলো মিটার ছিল সেই প্রথম প্রতিযোগিতা। কিন্তু সুরুতেই ঘটে গেলো সমাপ্তি। ১৯৩২ সালে এসে নানারূপ অসুবিধার জন্য বন্ধ হল প্রতিযোগিতা। ছয় ছয়টা বর্ষা কেটে গেছে। ১৯৩৮ সালে আবার কিছু যুবক উদ্বুদ্ধ হ'ল। এদের সঙ্গে এগিয়ে এলেন শৈলেন বিশ্বাস, শৈলেন অধিকারী, স্বর্গীয় হরিনারায়ণ পাল, স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। আবার শুরু হল সাঁতার। অবশ্য মাঝপথে আর বন্ধ হয় নি। সেই ১৯৩৮ সাল থেকে আজ ১৯৭৬ এ এসে পেঁাছেছে। ১৯৪১-এ এই প্রতিযোগিতাকে আরও দীর্ঘ করা হয়। লালবাগের হাজারদুয়ারী ঘাট থেকে গোরাবাজার ঘাট অর্থাৎ ১১ কিলোমিটার করা হয়। ১৯৪২ সালে মুর্শিদাবাদ জিলা সন্তরণ সংস্থার জন্ম হয়। এবং ১৯৪৩ সালে এই সংস্থা মুর্শিদাবাদ জিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদন লাভ করে। আর বর্তমান দূর পাল্লার সাঁতারের পরিচালনভার তাই মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার অধীনে। জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে-গোরাবাজার পর্য্যন্ত আরও একটি প্রতিযোগিতার সূচনা হল ১৯৪৪ সাল থেকে, এটার দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটার। এই প্রতিযোগিতায় বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতির অবদান উল্লেখ্য। ১৯৪৪ সাল থেকেই মহিলাদের আরও একটি প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। তখন এর দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র এক চতুর্থাংশ মাইল।

আজকের সাড়া জাগানো দূরপাল্লার প্রতিযোগিতা যাকে ঘিরে অনেককিছু আশা উদ্দীপনা-অনেক দাবী, বিশ্বের দীর্ঘতম প্রতিযোগিতা—সেই ৭৪ কিলোমিটারের প্রতিযোগিতার সুরু ১৯৬১-তে। জঙ্গীপুরের সদরঘাট থেকে গোরাবাজার এই দীর্ঘতম সাঁতার পরীক্ষামূলকভাবে সুরু হলেও আজও তা বিশ্বের অন্যতম দূরপাল্লার সাঁতার। সর্বভারতীয় স্বীকৃতি আসে ১৯৬৯-এ। আজ এই প্রতিযোগিতা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়; ভারতকে টপকে বিদেশের আঙিনায় চলে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ১৯৪৪ থেকে ১৯৬০ পর্য্যন্ত। ১৯৬১ থেকে প্রতিযোগিতার সীমানা বাড়ানো হয় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিযোগিরা আসতে থাকেন। গত বছর ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে মেয়েদের সাঁতারটি ১১ কিলোমিটার করা হয়। লালবাগের হাজারদুয়ারী ঘাট থেকে সুরু করে বহরমপুরের গোরাবাজারে গিয়ে শেষ এই প্রতিযোগিতার। দূরপাল্লার এই সাঁতার ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। দূরপাল্লার সাঁতার কেন্দ্র মুর্শিদাবাদে প্রতি বছরই তিন তিনটি ৭৪, ১৯ ও ১১ কিলোমিটার মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতা অসীম উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে—হবেও ভবিষ্যতে।

বর্তমান বছরে আকর্ষণীয় এই দূরপাল্লার আসর প্রবল বৃষ্টিতেও কিন্তু বিঘ্নিত হতে পারে নি। নির্ধারিত সময়-সূচী অনুযায়ী জঙ্গীপুরের সদরঘাট থেকে সাঁতার শুরু হয়। ৭৪ কিলোমিটারের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমাতে গতবারের ('৭৫) বিজয়ী সহদেব দাস এ'বছরের বিজয়ী পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের (ব্যারাকপুর) খগেন দত্তের সঙ্গে ২০ মাইল পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেছেন। কিন্তু তারপর আর কোন সময় সহদেব দাস খগেন দত্তকে নাগালের মধ্যে আনতে পারেন নি। চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবের সভ্য খগেন বাবু এই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় নিয়েছেন মাত্র ১০ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। সহদেবের সময় হোল ১০ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির অঞ্জন মজুমদার ১০ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৩২ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে। এই বিভাগে ২০ জনের মধ্যে একমাত্র মেয়ে প্রতিযোগিনী পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফের ১৯ বছরের রেখা ঠাকুর প্রশংসনীয়ভাবে ৭৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছেন ১১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে।

১৯ কিলোমিটার সাঁতারে প্রথম হয়েছে আগরতলার রাম ঠাকুর কলেজের হিউম্যানিটিজের প্রথম বর্ষের ছাত্র রতন বণিক। জিয়াগঞ্জ থেকে গোরাবাজার পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্শে খুবই আকর্ষণীয় হয়। রতন সময় নিয়েছেন ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৫৭ সেকেণ্ড। ২ ঘণ্টা ১২ মিনিট ২৭ সেকেণ্ডে দ্বিতীয় হয়েছেন মুর্শিদাবাদের অনুপ সরকার। আর তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন বহরমপুর বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্র পঞ্চানন ঘোষ ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ডের সময়ে। এই বিভাগেও একমাত্র মহিলা প্রতিযোগী ছিলেন বহরমপুরের সন্ধ্যা সাহা। তিনি সাঁতার সম্পূর্ণ করেছেন।

মেয়েদের ১১ কিলোমিটার দূরত্বের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন ত্রিপুরার ১৫ বছরের স্কুলের ছাত্রী সুচিত্রা সরকার। সোনামুড়ি সুইমিং ক্লাবের এই মেয়ে। সময় নেয় ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড। ১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির সভ্যা রীণা ব্যানার্জী দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। আর তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন রীণা ব্যানার্জীর সংগে চুলচেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির যূথিকা পাল। সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ১০.৬ সেকেণ্ড।

মাণিক লাল দাশ

মৃগয়া ঃ পরিণত ছবি, কিন্তু...
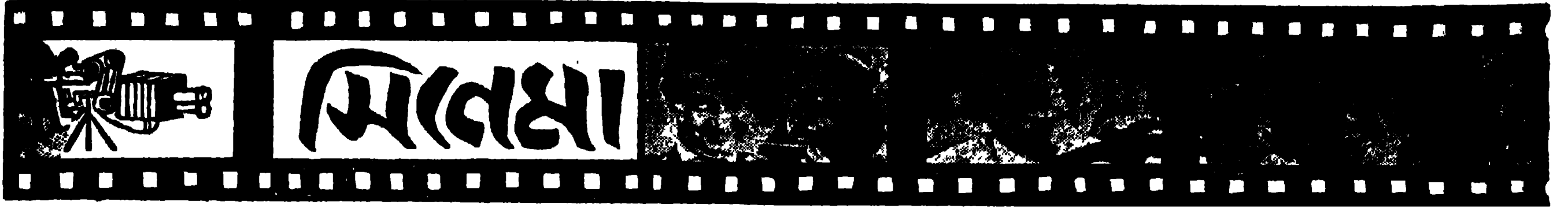
এমন কতগুলি ছবি থাকে যেগুলি দেখার আগে পর্যন্ত দর্শকের মনে বেশ বড়োরকমের আশা ও কৌতূহল উজিয়ে রাখে কিন্তু দেখার পরে বোঝা যায়, সবটাই ফাঁকি এবং ফাঁকা। মৃণাল সেনের সাম্প্রতিকতম ছবি মৃগয়া (হিন্দি) দেখে বহুজনের মতন বর্তমান সমালোচকেরও অনুভব তাই। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু সাফাই আছে, মৃণালবাবু মহৎ সৃষ্টির কারবারী নন, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টিছাড়া—বক্তব্যের ওপরে তিনি জোর দেন। তাঁর ছবি উদ্দেশ্যমূলক এবং সোচ্চার বলে অন্তত তিনি নিজে প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু মুশকিল হলো, মৃগয়া না হয়েছে সোচ্চাবধর্মী—না অনুচ্চার শৈল্পিক রীতির—মাঝখান থেকে মাঝামাঝি কিছু হয়ে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। বস্তুত মৃণালবাবু এ ছবিতে অন্তত যেখানে বড়ো বেশী সোচ্চার সেখানে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। সেই অর্থে ছবির অনুচ্চার অংশ অনেক বেশী কথা বলেছে, ভালো লেগেছে।

মৃগয়ার কাহিনীর পটভূমি তিরিশের দশকের বৃটিশ রাজত্বকালের একটি সাঁওতালি গ্রাম, নাম তালডাঙা। মোটা-মুটি প্রতিপাদ্য বিষয়, সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাকার ঘটনাক্রম এবং পরিশেষে নব জাগরণ। এবং বস্তুত এই জাগরণ পর্যায়েই ভয়ঙ্কর খটকা লাগে। শেষের এই 'Stand up ...' সাব-টাইটেলটি কেন? কাহিনীর নায়ক সাঁওতাল ছেলে হীরুয়া কি শহীদ হতে পারলেন? কাহিনীর যা ঘটনাক্রম তাতে হীরুয়াকে ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলতেও অনেকের দ্বিধা থাকার কথা নয়—কিন্তু প্রণাম জানানো কেন? শহীদের সংজ্ঞা কী। বড়ো কথা, হীরুয়ার ফাঁসি হবে কেন? তাঁর অপরাধ? জেলার শাসন-বিভাগের সর্বময়কর্তা কালেক্টর সাহেবের সাক্ষ্যে কী তাই বলে! মৃণালবাবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুতুল নাকি ভালোমানুষির মুখোশ পরা প্রতিনিধি হিসাবে কালেক্টরকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন—ছবিতে কিছুই স্পষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যকারী দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বহারাদের সব চেয়ে বড়ো শত্রু, মৃণালবাবু যদি তাই বলে থাকেন তাও ছবিতে উহ্য। ছবিতে শম্ভুর কাহিনী এত নিষ্প্রভ কেন? এই ছেলেটির বিপ্লবী-উপাখ্যান বাস্তবিক ছবিতে উপেক্ষিত। ওঁকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ অনেক বেশী তীব্র করা যেতো, তদানীন্তন যুগ ও জীবন প্রতিবিম্বিত হতে পারতো। হীরুয়া না হয়ে শম্ভু শহীদ হলে সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত হতো নিঃসন্দেহে। সেকারণেই এ কাহিনী হীরুয়া এবং ওর স্ত্রী ডুংরিরই কাহিনী—জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নির্বিশেষ বক্তব্যে সোচ্চার হওয়া কেন?

নির্বিশেষ বাণী না থাকলেও মৃগয়া পরিচ্ছন্ন ছবি অনায়াসে বলা যায়। অর্থাৎ মৃণালবাবু টাইটেলের সেই জানোয়ার তাড়ানো থেকে শুরু করে পরিশেষে একটি বড়ো জানোয়ার হত্যার ছবি নির্মাণ করে ফেলেছেন—অজান্তে। সেজন্যে বড়ো কিছু, গভীর কিছু আশা না করাই শ্রেয়। ছবির প্রয়োগকর্মেও মঞ্চ-রীতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। অবজেক্টিভ ঘটনাক্রমের অভাব—কথা আছে, শব্দ আছে—কিন্তু ছবি নেই। সেক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ফাঁকি থেকেই গেছে। এবং তারফলে স্থানে স্থানে ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির প্রয়াস ভয়ঙ্কর ক্লান্তিকর। টাইটেলে জানোয়ার তাড়ানোর চীৎকার বেশী ব্যবহারের ফলে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। মুখিয়ার সংলাপ এবং একটি মড়ার খুলির সাহায্যে কি সাঁওতাল-বিদ্রোহের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের চিত্রায়ণ সম্ভব হয়েছে? হরিণ শিকারের দৃশ্যে হরিণ না থাকায়, দৃশ্যটি কোনো উত্তেজনাই সৃষ্টি করে না বা বলা ভালো, ছেলেটিকে দক্ষ শিকারী ভাবতে অসুবিধা লাগে। এই অর্থে লক্ষ্যভেদের দৃশ্যটিও নিরর্থক।

মৃগয়া : মিঠুন চক্রবর্ত্তী ও মমতা শংকর

তেমনি ডুংরিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে হীরুয়ার কতগুলি পাসিং শট অকারণ সংযোজন মনে হয়েছে। সূর্য ওঠার অনুষঙ্গ ছবিতে কিছু নতুন নয়, এছবিতেও আছে। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে কোরাসে প্রার্থনা বহু মামুলী হিন্দি ছবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃশ্যান্তর পরিবর্জন কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশ উপভোগ্য। পরবর্তী দৃশ্যের শব্দের ওভারল্যাপিং-এর ব্যবহার স্থানে স্থানে রীতিমত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তেমনি অপূর্ব রোমান্টিক ডাইমেনশন এসে এনে দিয়েছে হীরুয়া এবং ডুংরির কয়েকটি দৃশ্য। বস্তুত মৃণালবাবুর এই ছবিতে আরোপিত সোচ্চারধর্মিতা অপেক্ষা স্বতোৎসারিত অনুচ্চার রোমান্টিকতা বেশী ভালো লেগেছে। মেমসাহেবের ঘোড়ায় চড়ার ফ্যান্টাসীধর্মী দৃশ্যটি বিদেশী ছবিকে স্মরণ করিয়ে দিলেও সারল্যের প্রকাশক হিসাবে চমৎকার। একথা বলতে দ্বিধা নেই, বহু দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মৃণাল সেন এ ছবিতে অনেক পরিণত, যদিও স্বচ্ছ চেতনার স্তরে বসে এ ছবি উনি নির্মাণ করেন নি। অবশ্য এ ছবির ক্ষেত্রে তাঁকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন চিত্রগ্রাহক কে কে মহাজন। ফোটোগ্রাফী অপূর্ব। ছবির ক্লান্তিকর অংশ অনেক ক্ষেত্রে 'দুরছাই' হয়ে ওঠেনি। ঠিক তেমনি দুর্বল সলিল চৌধুরী কৃত ছবির সঙ্গীতাংশ। পটভূমি এবং মানুষের সঙ্গে সঙ্গীত একাত্ম হয়নি। গ্রাম্য পরিবেশে মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশে ভাইব্রোফোন বাজলো কেন? সম্পাদনার কাজ উল্লেখযোগ্য—তবে আরো কিছু ছেঁটে ফেললে ছবিটি আরো গতি পেতো।

অভিনয়াংশ ছবির সম্পদ বাড়িয়েছে। বিশেষ করে নায়ক মিঠুন চক্রবর্তী এককথায় অসাধারণ। এমন ভালো অভিনয় সচরাচর চোখে পড়ে না। মমতা শংকর চালিয়ে গেছেন। জ্ঞানেশবাবুর মুখিয়া মন্দ নয়। অপূর্ব অভিনয় করেছেন জোতদার সজল রায়চৌধুরী। ইংরেজ দম্পতির অভিনয় বেশ উপভোগ্য। এছাড়া ভালো অভিনয় মোটামুটি সকলেই করেছেন। সাধু মেহের এতটা মনে দাগ কাটেনি। মেক-আপের ব্যবহারে আরো কিছু সতর্কতার প্রয়োজন ছিলো।

উৎপল মিত্র

পরিবার পরিকল্পনা ও জাতীয় জননীতি

৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অন্যদিকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিধান সভা ও লোকসভায় আসন বন্টন এবং কেন্দ্রীয় অর্থবন্টন প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থা। সুতরাং জাতীয় জননীতিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে ১৯৭১ সালের Census অনুযায়ী বিধানসভা ও লোকসভায় নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা ২০০১ সাল পর্যন্ত আর বাড়ানো হবেনা। এবং রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থও ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার হিসাব অনুযায়ী দেওয়া হবে। রাজ্যগুলিকে দেওয়া কেন্দ্রীয় সাহায্যের শতকরা ৮ ভাগ পরিবার পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকবে।

ভারতে ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বৎসরে ১৩ লক্ষ নারী ও পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অস্ত্রোপচার করিয়েছে এবং ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বৎসরে এর সংখ্যা হয় ২৬ লক্ষ অর্থাৎ দ্বিগুণ। অধিকাংশ অস্ত্রোপচারকারীর বয়স এবং সন্তান সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস জন্মসংখ্যা ও জনসংখ্যার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সুতরাং অল্পবয়সের এবং অল্পসন্তান বিশিষ্ট দম্পতিদের এই অস্ত্রোপচারে আগ্রহী করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জাতীয় জননীতি বিষয়ক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, ২ টি পর্যন্ত সন্তান আছে এইরূপ নারী বা পুরুষ অস্ত্রোপচার করালে ১৫০্ টাকা, ৩ টি সন্তানের ক্ষেত্রে ১০০্ টাকা এবং ৩ টির অধিক সন্তানের ক্ষেত্রে ৭০্ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। এই অর্থের মধ্যে অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া অর্থ, ঔষধপত্রের দাম এবং এই বাবদ অন্যান্য খরচও ধরা হয়েছে। ব্যক্তিগত অর্থ ছাড়াও সমষ্টিগতভাবে কিছু অর্থ দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়েছে। চিকিৎসকগোষ্ঠী বা পঞ্চায়েত সমিতি প্রভৃতি যাঁরা পরিবার পরিকল্পনায় কাজ করবেন গোষ্ঠীগতভাবে তাঁদেরও কিছু অর্থ দেওয়া হবে।

জন্মসংখ্যা তথা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এতদিন শুধু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু যেহেতু এটা একটা জাতীয় সমস্যা সেজন্য শিক্ষা, শ্রম, কৃষি প্রভৃতি সকল সরকারী বিভাগকে এই কর্মসূচীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। বিশেষত জেলাস্তরের সকল দায়িত্বশীল অফিসারদের পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব দেওয়া হবে।

দেখা গিয়েছে যে শিক্ষার বিস্তার বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হলে জনসংখ্যার হার হ্রাস পায়। জাতীয় জননীতিতে শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্তরে বিশেষত পরিবার পরিকল্পনায় অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার চান যে, সকল সরকারী কর্মচারী পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ছোট পরিবার গঠন করুক। এইজন্য সরকারী কর্মচারীদের সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলেরও পরিবর্তন করা হয়েছে বা হচ্ছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য আইন করে জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্ত্রোপচারকে বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবছে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে, ভারতের জনসাধারণ জন্মনিয়ন্ত্রণের আরও কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকলেও ভারতের মত বিশাল দেশে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যতসংখ্যক অস্ত্রোপচার কেন্দ্র, হাসপাতালের শয্যা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রয়োজন তা নেই। আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার সরকারী ব্যবস্থা দেশের মোট ১০ কোটি প্রজননক্ষম দম্পতির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ভারত সরকার কেন্দ্রে এখন এইরূপ কোন বাধ্যতামূলক অস্ত্রোপচারের আইন প্রবর্তন করবেন না। তবে কোন রাজ্য যদি মনে করে যে, সেই রাজ্যে এইরূপ বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত ও অনুকূল ব্যবস্থা আছে, তবে সেই রাজ্যে এইরূপ আইন প্রবর্তিত হলে কেন্দ্র তার অন্তরায় হবে না। ভারত সরকার চান যে, কোন রাজ্যে এইরূপ আইন হলে তাতে যেন তিন বা তার বেশী সন্তান আছে এইরূপ দম্পতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাজ্যের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে এই আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হয়।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১৬-৩০ নভেম্বর, ১৯৭৬

চিঠিপত্র
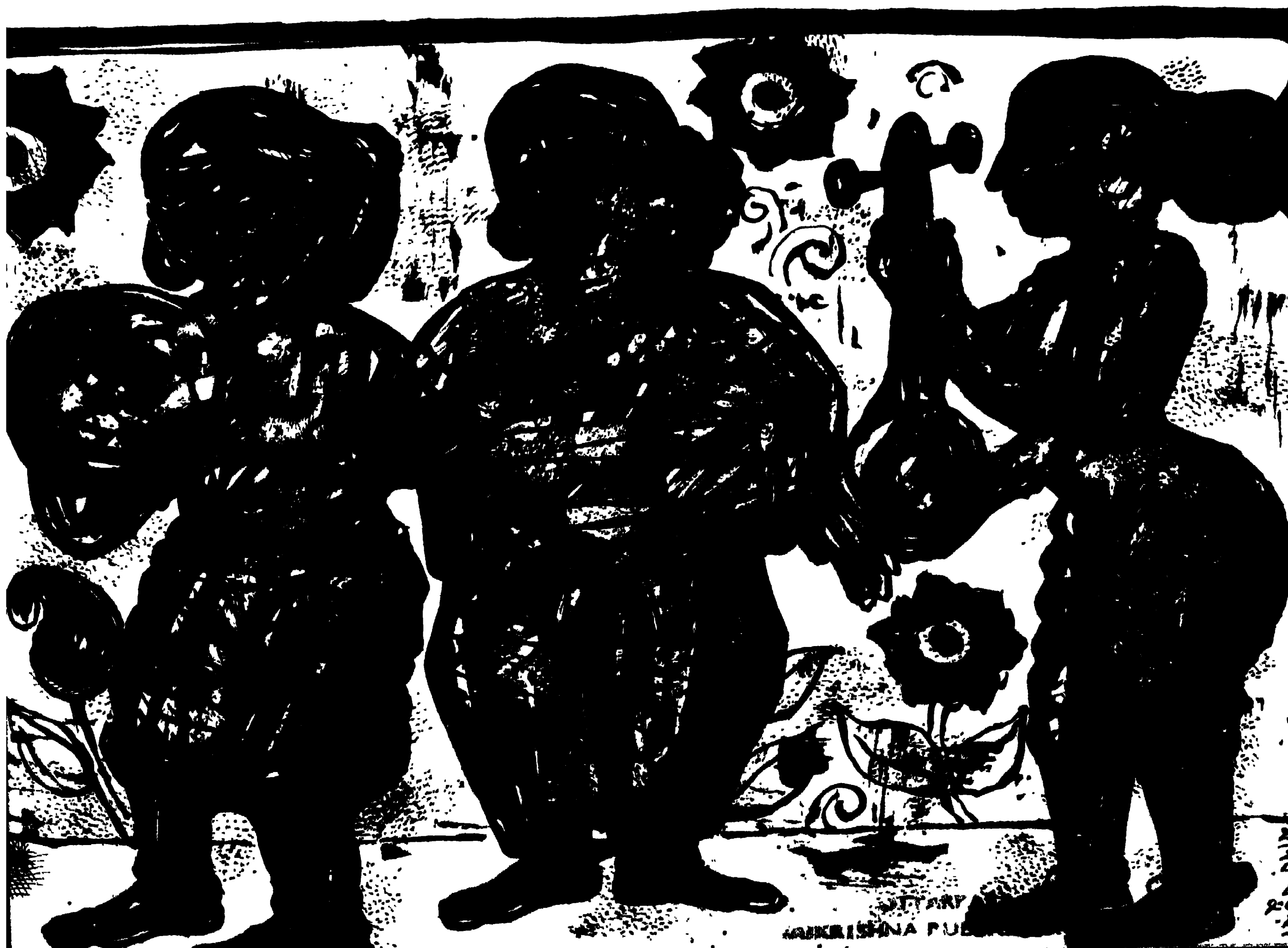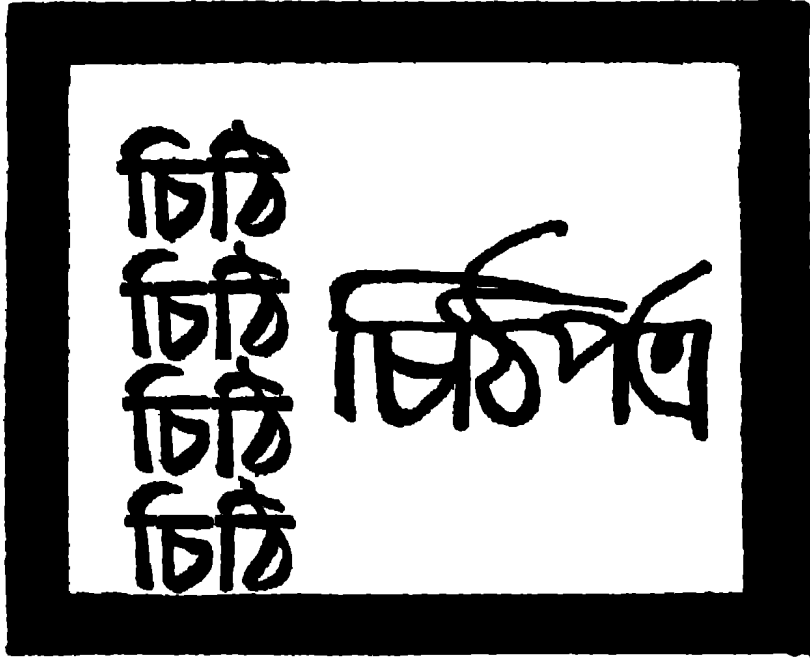
মহাশয়,

'ধনধান্যে'র (অষ্টমবর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা) ১৫ জুলাই সংখ্যাটি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। পত্রিকাটি যে সুসম্পাদিত তাতে কোন রকম সন্দেহ নেই।

আজকাল বিভিন্ন আজেবাজে লেখায় সমৃদ্ধ পাঁচ মেশালী কমার্শিয়াল বা লিটল্‌-ম্যাগাজিনের হিড়িকে 'ধনধান্যে' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, অন্য ধাঁচের।

'কেন এই জন্মশাসন' (গোপালকৃষ্ণ রায়) থেকে শুরু করে, ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পথের ধারে পুষ্পতরু' পর্যন্ত প্রতিটি রচনার মান-ই উন্নত।

এছাড়া মৌলিক গল্প ও ফিচার, খেলার খবর মনকে আকর্ষণ করে।

'এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য'—উক্ত ঘোষণাবলী সত্যই মানসিকতাকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যায়।

পরিশেষে আমার নিজস্ব মতামত হল:

১। গ্রামাঞ্চলের নিরীহ চাষী-কৃষকদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ও তাদের পারিবারিক মান উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ সমীক্ষা ছাপানো হোক।

২। গ্রামে ক্রমশ বিলুপ্ত পশু-পাখিদের সম্বন্ধে নিবন্ধ প্রকাশ করা হোক।

পরিতোষ নন্দী
বেড়ী গোপালপুর
২৪-পরগনা

মহাশয়,

অনেকদিন থেকেই আমার 'ধনধান্যে' পড়ার ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলাম রাউরকেলায় হয়ত এই পত্রিকা পাওয়া যাবে না। কিন্তু সম্প্রতি স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনের এ. এইচ. হুইলারের দোকানে শুকতারার খোঁজ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের ছবি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বুকষ্টলের একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ১৫ই সেপ্টেম্বরের ধনধান্যে হাতে ধরিয়ে দিলেন।

মাত্র ৫০ পয়সা দামের পাক্ষিক পত্রিকা হাতে আসতেই মনটা আনন্দে ভরে উঠল। খুশী মনে বইটা নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

বাড়ীতে এসে সবে খেলার বিভাগটি খুলেছি, এমন সময় একজন বন্ধু বাড়ীতে এসে হাজির। তিনি কি বই বলে দেখতে চাইলে বইটা তাঁর হাতে দিলাম। তিনিও আমার সাথে একবাক্যে 'ধনধান্যে'র প্রশংসা করলেন। খেলাধূলা বিভাগটা পড়ে খুবই খুশী হলাম। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যদি এই বিভাগে আরও একটা পাতা জুড়ে প্রকাশ করেন তাহলে 'ধনধান্যে'র আভিজাত্য তো বৃদ্ধি পাবেই উপরন্তু আগ্রহী পাঠকরা যে এবিষয়ে সহজেই নজর দেবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তরুণ ঘোষ
রাউরকেলা-২

আগামী সংখ্যায়

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে বিশেষ রচনা লিখেছেন:
গোপালকৃষ্ণ রায়

অন্যান্য নিবন্ধ

দায়িত্ব ও অধিকার
যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

বালিকাবধূ সংবাদ
সুভাষ সমাজদার

গল্প

ভালবাসার জন্য
রণজিৎ ভট্টাচার্য

ফিচার

আপন ভাগ্য জয়ে
চান্দ্রেয়ী রায়

এছাড়া খেলাধূলা, মহিলামহল, কৃষি, সিনেমা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী
সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন: ২৩২৫৭৬

প্রধান সম্পাদক: এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা:
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
গ্রাহক মূল্যের হার:
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

টেলিগ্রামের ঠিকানা:
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন:
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার,
'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস,
নতুনদিল্লী-১১০০০১
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
পাক্ষিক

১৬-৩০ নভেম্বর, ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষ : দশম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী— মানব বড়ুয়া

সম্পাদকের কলমে

১৪ই নভেম্বর পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিন। এবছরও এই দিনটি সারাদেশে পালিত হল। উদযাপিত হল অন্যান্য বারের মত শিশুদিবস রূপে। নেহরু ছিলেন শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি তাদের। তাই তাঁর জন্মদিনটিকে শিশুদিবস রূপে চিহ্নিত করা হয়। এর আরেকটা তাৎপর্য আরও গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের প্রতি তাদের প্রাপ্য নজর দিতে হবে। তাদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠার দিকে তীক্ষ্ন লক্ষ্য রাখতে হবে। ভবিষ্যৎ সুনাগরিকের অঙ্কুর যাদের মধ্যে নিহিত তাদের অবহেলা যে কোন জাতির পক্ষেই মারাত্মক। প্রত্যেক শিশুর অন্তরে এক-একটি শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে যারা ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেবে, দেশের গুরু দায়িত্ব বহন করবে ও দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

চিলির বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল মিস্ট্রেল বলেছেন, 'শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য যা করার দরকার সেটা কালকের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়। আজই সেকাজে হাত দিতে হবে।' সত্যিই তাই। শিশু যখন আস্তে আস্তে বড় হয় তখন প্রত্যেক স্তরে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সজাগ দৃষ্টি শুধু নয় সেই ভাবে কাজ করতে হবে। যে শিশু রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বড় হয় তার বুদ্ধিবৃত্তিও সম্যকরূপে বিকশিত হতে পারে না। তাছাড়া ভিত্তি যদি সুদৃঢ় না হয় তবে কোন অট্টালিকাই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তেমনি শিশুর স্বাস্থ্য যদি মজবুত করে গড়ে তোলা না হয় প্রথম থেকে তবে সেই শিশু ভবিষ্যতে পরিবারেরই কেবল নয় জাতির ভারস্বরূপ ও সমস্যারূপে দেখা দেয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে পনর বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা ২৪ কোটির মত। প্রতিদিনে আবার প্রায় ৬০ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করছে। এই বিপুল সংখ্যক শিশুদের মধ্যে নগরের থেকে গ্রামীণ শিশুদের সংখ্যাই অধিক। এদের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে ১৯৭৪ সালে আমাদের দেশে শিশুদের সার্বিক উন্নতির জন্য জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হয়। পরের বছরেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শিশু পর্ষৎ গঠন করা হয়। তা ছাড়া জাতীয় পরিবার পরিকল্পনার সংগে সম্প্রতি শিশুকল্যাণ কর্মসূচীও যুক্ত করা হয়েছে। ফলে যে দিকটা এতদিন অবহেলিত ছিল এবার নিশ্চয়ই সেদিকে নজর দেওয়া সম্ভব হবে। পরিকল্পনার পুষ্টি কার্যক্রমকে প্রথমেই যে কর্মসূচীগুলিকে রূপায়িত করা হবে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে।

শিশুর বেড়ে ওঠার প্রথম পর্বে অপরিহার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শহরের ও গ্রামের কিছু আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার ছাড়া অধিকাংশের পক্ষে এই অপরিহার্য বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়ার মত কোন সামর্থ্য নেই। তারপর যদি আবার চার পাঁচটি শিশু থাকে তাহলে ত কোন দিকেই তারা লক্ষ্য দিতে পারেনা। একমাত্র ছোট পরিবারের পক্ষে সব দিকে সাধ্যমত নজর দেওয়া সম্ভব। তাই প্রত্যেক পরিবারে শিশুর সংখ্যা তো সীমিত রাখতেই হবে, তাছাড়াও এদের প্রতি যত্নবান হতে হবে যাতে এরা ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে এবং সুস্থ, কর্মঠ ও দায়িত্বশীল সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে।

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

সংবিধান ও সংসদ

ভারতীয় সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী বিলটি গত পয়লা সেপ্টেম্বর লোকসভায় পেশ করা হয়। ৫৯টি ধারা-উপধারা সম্বলিত এত বড় সংশোধনী ইতিপূর্বে কখনও প্রস্তাবিত হয়নি এবং এই সংশোধনীটি গৃহীত হলে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্যের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে যাবে।

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতির অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করার জন্য শাসকদল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবিধানের যুগোপযোগী সংস্কারের দাবি ওঠে এবং ৪৪তম সংশোধনীটি সেই দাবিরই পরিণতি। সংবিধানের যে কোন ধারা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংসদে কিংবা রাজ্য বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের আছে। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতই সব বা শেষ কথা নয়। সে কারণে লোকসভায় বিলটি পেশ করার পরও তা নিয়ে দেশজোড়া বিতর্কের সুযোগ দিতে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের ঘন ঘন পরিবর্তন বা সংশোধনীর সংযোজন অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সংবিধান পবিত্র দলিল ও অপরিবর্তনীয় এমন ধারণাও ঠিক নয়। সংবিধান হল একটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক গঠনসূচক ও নীতি নির্দেশক দলিল। সুতরাং লক্ষ্য ও নীতির যদি পরিবর্তন হয় এবং যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে যদি রাষ্ট্রীয় কাঠামোরও মৌল পরিবর্তন অপরিহার্য হয় তাহলে সংবিধান সেক্ষেত্রে অলঙ্ঘ্যবাধা হয়ে থাকতে পারে না। সংবিধান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতরতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। জাতির মহান নেতারা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যে সংবিধান বলবৎ করেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছে তা অতি পবিত্র দলিল। কিন্তু সে সংবিধানও মাত্র দুবছরের মধ্যে অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হয় এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দেই তার সঙ্গে দশটি সংশোধনী সংযুক্ত হয়। তারপর আজ পর্যন্ত আরও পনেরটি সংশোধনী মার্কিন সংবিধানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কিন্তু তাতেও পরবর্তীকালে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রেসিডেন্টের কার্যকাল, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যুগোপযোগী সংশোধনের জন্য আরও কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব বর্তমানে মার্কিন সংবিধান বিশেষজ্ঞদের বিবেচনাধীন আছে। ফ্রান্সে বিগত দুই শতাব্দীতে সংবিধান নিয়ে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওলট-পালট করা হয়েছে তা বলে শেষ করা যায়না। পরপর পাঁচটি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফ্রান্সে, কিন্তু শেষ রিপাবলিকেও সংবিধান সম্পর্কে শেষ কথা বলার দাবি জানানো হয়নি। আর বৃটেনে ত কোন লিখিত সংবিধানই নেই, দীর্ঘাচরিত প্রথা ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেদেশের শাসনদায়িত্ব নির্বাহ হচ্ছে। অবশ্য ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট অ্যাক্টের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বৃটিশ সংবিধানের অংশ, কিন্তু সংবিধানকে সম্পূর্ণ লিখিত করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত সেদেশের কোন জাতীয় দলের পক্ষ থেকে করা হয়নি। কিন্তু তাই বলে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বৃটেনের সংবিধান এক জায়গায় থেমে নেই। নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে সেদেশের রাজা, পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেটের ক্ষমতার রূপান্তর সমানেই ঘটে চলেছে। সুতরাং ভারতের সংবিধান ঘন ঘন পরিবর্তিত হচ্ছে বলে যারা গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হচ্ছেন তারা গণতন্ত্রী দেশগুলির সংবিধান সম্পর্কে মনোভাব ও আচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল বলে মনে হয় না।

যে দেশ সদ্যস্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি বা ঐতিহ্য গড়ে ওঠার যথেষ্ট অবকাশ যে দেশের মেলেনি তার সংবিধান অবশ্যই সম্পূর্ণ লিখিত, যথেষ্ট বিশ্লেষিত ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে শাসিত দেশে কেন্দ্র ও অঙ্গ-রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার এক্তিয়ার বা দায়িত্ব নিয়ে যাতে কোন বিরোধ না দেখা দেয় বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় তার জন্য কেন্দ্র-তালিকা, রাজ্য-তালিকা ও উভয়ের এক্তিয়ারভুক্ত যুগ্মতালিকা যতদূর সম্ভব বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিভাবে সংবিধানে লিখিত থাকার প্রয়োজন।

এসবের জন্যই একুশটি রাজ্য ও নয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত বিশাল ভারতের সংবিধান প্রায় মহাভারতের মতো বৃহদাকৃতি। তারপরও কাজ চলতে চলতে যখন কোন অসুবিধা দেখা দিয়েছে বা সংবিধানের কোন ধারা কিছুটা

৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

বন্দে মাতরম্

রমেন মজুমদার

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক কবে "বন্দে মাতরম্" রচনা করেছিলেন, আজ তা বলা কঠিন। গবেষকদের অনুমান, বাংলা ১২৮১ সনের কার্তিক থেকে ১২৮২ সনের চৈত্রের মধ্যে কোনো এক সময়ে। ইংরেজী ১৮৭৪-৭৫ সালে। দেশে তখন হিন্দু-মেলার হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

কিন্তু কোন্ অমোঘ শক্তির প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই গান রচনা করেছিলেন? তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

মহাষ্টমীর রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আর তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বসে আছেন পূজামণ্ডপে। একজন কীর্তনিয়া বলরাম দাসের একটি পদ গাইছেন—

"এসো এসো বঁধু এসো.
আধ আঁচরে বসো—
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে,
মনের মানসে,
তোমাধনে মিলাইল বিধি।"

গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ভাবান্তর এল। তাঁর উপলব্ধির এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হ'ল। কীর্তনিয়ার অন্য গান ভেসে গেল, ঐ একটি গানেরই পদ বঙ্কিমচন্দ্রের মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে লাগল। এমনি করে অতিক্রান্ত হ'ল মহাষ্টমীর রাত্রি।

তার আগের দিন সপ্তমী পূজার রাত্রেও তাঁর এক নতুন উপলব্ধি হয়েছিল, কল্পনেত্রে তিনি তাঁর মাকে দেখেছিলেন। দেখেই চিনেছিলেন: চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না——কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভূজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয় কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল-স্রোতের মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন: প্রতীতি হয়, ইহার পরেই 'বন্দে মাতরম্'-এর সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র উভয়েই সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন যে, 'আনন্দমঠ' প্রকাশের বহু পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন কালে ১৮৭৫ সন নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতটি রচনা করেন। কাগজ ছাপিবার কালে অনেক সময় matter কম পড়িলে পাতা পূরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে উপস্থিত মত কিছু লিখিয়া দিতে হইত। তিনি একদা একখানি কাগজে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্র বলেন, ছাপাখানার পণ্ডিতমহাশয় পাতা পূরণের জন্য, এটি দেখিয়া মন্দ নয় বলিয়া কহিলে,

'সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবেনা, কিছুকাল পরে বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।'

১৯০৭ সালের ২১ এপ্রিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বঙ্কিমস্মৃতি উৎসবে কাঁঠালপাড়ায় যান। সেখানে একজন পণ্ডিতমশাই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে একটি গল্প বলেন। বঙ্কিমবাবু "বন্দে মাতরম্" গানটি রচনা করে পণ্ডিতমশায়ের হাতে দিলে পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, "এতে কি বঙ্গদর্শনের পেট ভরবে?" উত্তরে বঙ্কিম বলেছিলেন, "যদি বেঁচে থাক তো দেখবে এই গানেই অনেকের পেট ভরবে। ততদিন হয়ত আমি বেঁচে থাকব না।"

সেদিন "বঙ্গদর্শন"-এর পৃষ্ঠাপূরণের জন্য "বন্দে মাতরম্" প্রকাশিত হয়েছিল কিনা পণ্ডিতমশাই তা বলেন নি। বঙ্কিম-অনুরাগী কয়েকজনের লেখা থেকে জানা যায়, "বঙ্গদর্শন"-এ সেদিন "বন্দে মাতরম্" ছাপা হয় নি।

কিন্তু অমলেশ ভট্টাচার্য এক চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একদিন সন্ধ্যার সময় বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" অফিসে বসে আছেন। প্রেসে পত্রিকা ছাপার কাজ চলছে। হঠাৎ প্রেস থেকে একজন লোক এসে খবর দিল, খানিকটা
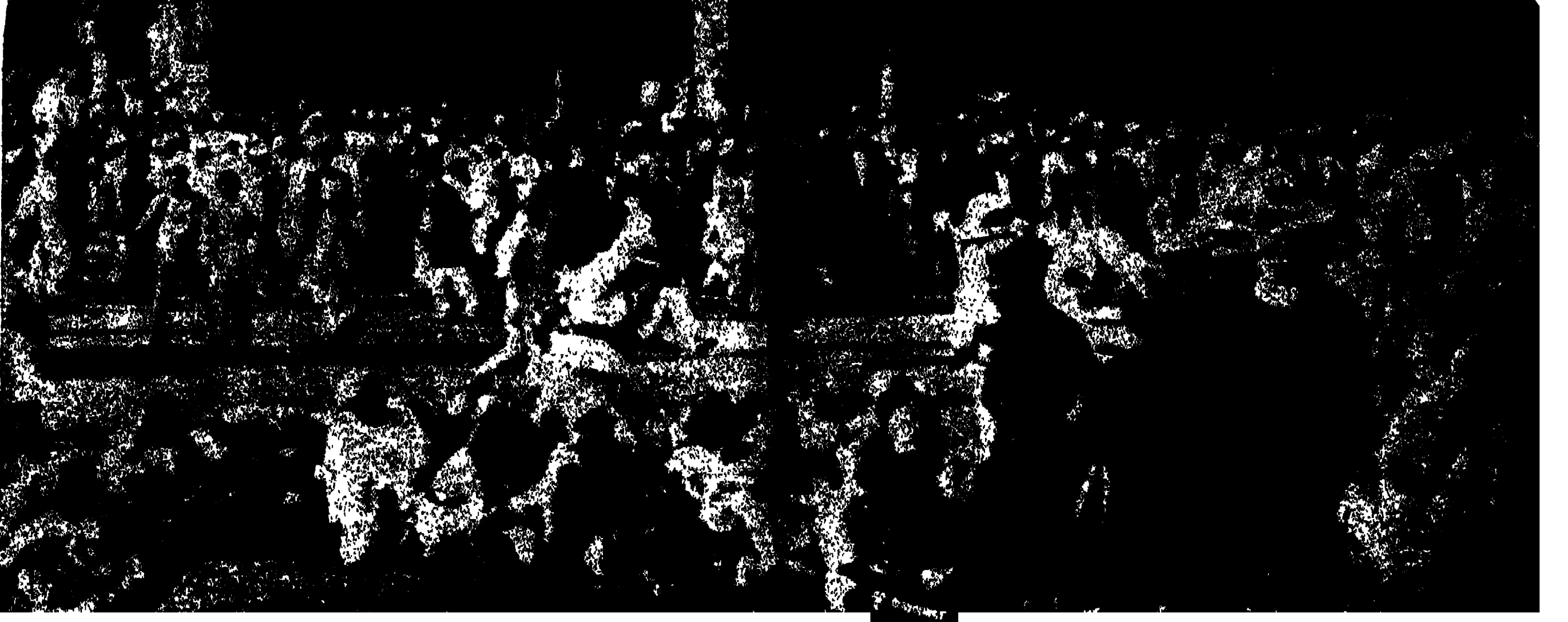
স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস আইন অমান্যকারী দেশবাসী

জায়গা ভরাট করা যাচ্ছে না, 'ম্যাটার' কম পড়ে গেছে। আরও কিছু "ম্যাটার" চাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বিব্রত হলেন। দেবার মতো কোন লেখা প্রস্তুত নেই। তবু এখানে-ওখানে হাতড়াতে লাগলেন। হঠাৎ একখানা কাগজ উঠে এল হাতে। তাঁরই লেখা একখানি গান। বঙ্কিমচন্দ্র তাকিয়ে রইলেন গানখানির দিকে। যেন ধ্যানমগ্ন হলেন। চোখে জল এল।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার পড়লেন গানখানি। না, এ গান এখন ছাপা যাবে না। তার সময় এখনও হয় নি।

প্রেসের লোকটি তখনও দাঁড়িয়ে। তাকে কিছু দিতেই হবে। কিন্তু কী দেবেন? শেষে বাধ্য হয়ে ঐ গানখানিই তার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, কম্পোজ করে নিয়ে এস"।

পরদিন সম্পূর্ণ ভরাট হয়েই "বঙ্গদর্শন" বার হল।' তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানমন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"।

অমলেশ ভট্টাচার্যের এই কাহিনী সত্য বলেই মনে হয়। তার কারণও তাঁর রচনা থেকে আবিষ্কার করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় প্রায়ই সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত। তাতে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ তখনকার দিনের খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা আসতেন। একদিন এই রকম এক আড্ডায় "বন্দে মাতরম্" প্রসঙ্গ উঠেছিল। নবীনচন্দ্র গানটির প্রতিকূলে কথা বলেছিলেন। সেই আলোচনার সময় "আনন্দমঠ"-এর কথা হয়েছিল, এমন উল্লেখ নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, গানটি "আনন্দমঠ"-এ সন্নিবিষ্ট করবার আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধ্যানমন্ত্র বাঙালী জাতিকে উজ্জীবিত করতে পারে নি। এই ধ্যানমন্ত্র সেদিন বাঙালীর দৃষ্টিপথে পড়লেও তা রয়ে গিয়েছিল অলক্ষিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তার অমোঘ শক্তির কথা জানতেন। তাই মৃত্যুশয্যায় তাঁর কন্যাকে বলেছিলেন, "একদিন তোরা দেখে নিস, আজ থেকে বিশ-ত্রিশ বছর পরে, এই 'বন্দে মাতরম্' গান সারা দেশের মানুষের বুকের রক্তে নাচন আনবে।"

"শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে" লিখেছেন, বঙ্কিমের মৃত্যুর দু-চার বছর আগে একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে "বন্দে মাতরম্" নিয়ে কথা হচ্ছিল, বঙ্কিম তখন বলেছিলেন, "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।"

বঙ্কিমের মৃত্যুর কিছুদিন পরে শচীশচন্দ্র তাঁর ভগ্নীর কাছে এই গল্প শুনেছিলেন।

"বন্দে মাতরম্" গানের মধ্যে যদুভট্ট যেন মহাসমুদ্রের মহাধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। যদুভট্ট এই গানের প্রথম সুরকার ও গায়ক।

আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুমেলার হাওয়ায় "বন্দে মাতরম্" লিখেছিলেন। হিন্দুমেলার হাওয়া বইতে শুরু করেছিল ১৮৬৭ সালে, চলেছিল ১৮৮০ সাল পর্যন্ত। এই হিন্দুমেলার সময়েই জাতীয় সঙ্গীতের গোড়াপত্তন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনমোহন বসু ভারতে জাতীয় সঙ্গীতের আদি রচয়িতা। এরপর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ বহু জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। এই জাতীয় সঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যেই ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"। বঙ্কিম "আনন্দমঠ"-এর সন্তানদের কণ্ঠে "বন্দে-মাতরম্"-এর শক্তিমন্ত্র দেন। সেই শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে সন্তানদল নির্ভীক চিত্তে

মুসলমান ও ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে লড়াই করে। পরে বাংলার মানুষ এই শক্তিমন্ত্রকে তার প্রাণমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে।

কিন্তু "আনন্দমঠ" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই "বন্দে মাতরম্" বাঙালীর প্রাণমন্ত্র হয় নি। "আনন্দমঠ" প্রকাশের কুড়ি-বাইশ বছর পরেও বঙ্কিম "বন্দে মাতরম্"-এর স্রষ্টা হিসাবে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সুপরিচিত হন নি। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের কাছে যে "আনন্দমঠ" তখন আদরণীয় হয়েছিল সে শক্তিমন্ত্রের প্রচারক "আনন্দমঠ" নয়—একখানি অনবদ্য উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত "আনন্দমঠ"।

১৮৮২-৮৪ সালে ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় "বন্দে মাতরম্" ছিল অনুচ্চারিত। ১৮৮৩ সালের ৫ মে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হলে তাঁর বিচারের সময় ছাত্রনেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার ছাত্রসমাজ যখন আদালতে ভেঙে পড়েছিল ও আন্দোলন চালিয়েছিল এবং ৪ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ মুক্তি লাভ করলে বেঙ্গলী অফিসে ও কলিকাতার রাজপথে যখন তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল তখন "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হয় নি। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়েও "বন্দে মাতরম্" গীত হয় নি। তবে ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যে "বন্দে মাতরম্" গাওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাখীবন্ধন" কবিতায়—

"গাহিল সকলে মধুর কাকলি
গাহিল বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

এর দশ বছর পরে ১৮৯৬ সালে আবার যখন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয় তখন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর নিজস্ব সুরে "বন্দে মাতরম্" গানখানি গেয়েছিলেন। কিন্তু সে গাওয়া ছিল আরও কয়েকখানি সময়োপযোগী গান গাওয়ার মতো—"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে", "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" প্রভৃতি গানের মতো। "বন্দে মাতরম্" তখনও শক্তিরূপিণী মাতার বন্দনাসঙ্গীত হয়নি। হয়েছে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়।

সমসাময়িক প্রফুল্লচন্দ্র সরকার তাঁর "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখেছেন: "স্বদেশী আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কবে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে টাউন হলে যে বিরাট বয়কট সভা হইয়াছিল, তাহাতেই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রথম উচ্চারিত হয়।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলার যুবক সম্প্রদায় এক নতুন উন্মাদনায় অস্থির, চঞ্চল হয়ে জেগে উঠেছিল। বিনয়কুমার সরকার তাঁর "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" গ্রন্থে লিখেছেন: যুবক ভারত জাগিয়া উঠিয়া দেখিল একটা জিনিষের তার অভাব। একটা মন্ত্র তার দরকার। এই মন্ত্র হইতেছে 'বন্দে মাতরম্'।

"বন্দে মাতরম্" তখন জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হ'ল।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখের বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় লিখেছেন:

No nation can grow without finding a fit and satisfying medium of expression for the new self into which it is developing—without a language which shall give permanent shape to its thoughts and feelings and carry every new impulse swiftly and triumphantly into the consciousness of all. It was Bankim's first great service to India that he gave the race which stood in its vanguard such a perfect and satisfying medium. ....It was thirty-two years ago that Bankim wrote his great song and few listened ; but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang Bande Mataram. The mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The Mother had revealed herself. Once that vision has come to a people, there can be no rest, no peace, no further slumber till the temple has been made ready, the image installed and the sacrifice offered.

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন বাংলাদেশে রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সেদিন সারা বাংলায় ছিল অরন্ধন। স্বদেশীরা "বন্দে মাতরম্" গান গেয়ে শোভাযাত্রা করেন। ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রতীক হিসাবে কল্পিত ফেডারেশন হলের মাঠে এক বিশাল সভা হয়। সেই সভায় "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেই সভায় "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র প্রচার করেন।

"বন্দে মাতরম্" মন্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর কলিকাতার শিক্ষিত যুবকবৃন্দ একটি সম্প্রদায় গঠন করেন, তার নাম "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়।" এই সম্প্রদায়ের প্রথম সভাপতি ছিলেন মন্মথ মিত্র, পরবর্তী সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতি রবিবার "বন্দে মাতরম্" গান গেয়ে শহর ও শহরের উপকণ্ঠ পরিভ্রমণ করতেন। সেই পরিভ্রমণ-সঙ্গীতের সুরসংযোজনা করেছিলেন দক্ষিণা সেন। চাঁদা সংগ্রহের কোনো প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য না থাকলেও পরিভ্রমণের সময় অযাচিতভাবে বহু টাকা চলে আসত, আর পরিভ্রমণদল যতই অগ্রসর হতো ততই তার কলেবর বৃদ্ধি পেত।

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজপথে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে নগর পরিভ্রমণ করতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মাঝে মাঝে এই পরিভ্রমণে যোগ দিতেন। রবীন্দ্রনাথও একদিন যোগ দিয়েছিলেন।

"বন্দে মাতরম্" সম্প্রদায় ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ও ধ্বনির প্রভাব দেখা যায়। ১৯০৬ সালের ১ আগষ্ট "বন্দে মাতরম্" নামে একটি ইংরেজী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। তার সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। পরে ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে অরবিন্দ এই পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন।

বাংলার ছাত্র ও যুবসমাজের কাছে "বন্দে মাতরম্" যেন হঠাৎই হয়ে উঠল তাদের ধ্যানমন্ত্র। ইংরেজ শাসক এই মন্ত্রের মধ্যে হঠাৎ রাজদ্রোহের আভাস দেখতে পেল। জারি করল কারলাইল সার্কুলার। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দেবার "অপরাধে" এই সার্কুলারের বিধি অনুসারে সরকারী স্কুলকলেজের বহু ছাত্র বহিষ্কৃত হ'ল। কারারুদ্ধ হ'ল অগণিত মানুষ, চলল পুলিসী নির্যাতন। তবু "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি থামল না।

১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। কনফারেন্সও নিষিদ্ধ ঘোষিত হ'ল। কিন্তু তবু আকাশ বিদীর্ণ করে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠল। পুলিশের লাঠি যখন কনফারেন্স ভেঙে দিল তখনও সেই ধ্বনি থামে নি। এই কনফারেন্সে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার কিশোর পুত্র চিত্তরঞ্জনও বজ্রমুষ্টি এঁটে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিয়েছে। পুলিশের অবিরাম লাঠির আঘাতেও তার কন্ঠ রুদ্ধ হয় নি। পুলিস তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে পুকুরে ফেলে দিয়েছে। যতক্ষণ তার সংজ্ঞা ছিল ততক্ষণ সে নির্ভয়ে বলেছে "বন্দে মাতরম্"।

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকা মামলায় আদালতে যে ভিড় হয়েছিল তা অকল্পনীয়। জনতা মুহুর্মুহু: "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিয়েছিল। পুলিস তখন তাদের উপর লাঠি চালায়। সুশীল সেনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সার্জেন্ট হুয়েকে ঘুঁষি মেরেছেন। তাঁকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের সামনে হাজির করা হয়। কিংসফোর্ড তাঁকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুশীল সেনকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়। অকুতোভয় সুশীল বেত্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিতে থাকেন। পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই নিয়ে গান রচনা করেন—

"বেত মেরে তুই মা ভোলাবি
আমি কি মা'র সেই ছেলে—"

বাংলাদেশে উদ্গীত এই "বন্দে মাতরম্" ক্রমে বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হ'ল। সারা ভারতের মানুষকে দিল স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। তারা দুর্ধর্ষ ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্য এক কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ল। হাসিমুখে কারাবরণ করল, পুলিসী নির্যাতন সহ্য করল, ফাঁসির মঞ্চে গেল "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গেয়ে।

তাই আজ স্বাধীন ভারতে "বন্দে মাতরম্" অন্যতর জাতীয় সঙ্গীত। "জনগণমন"-র সঙ্গে তার সমান মর্যাদা।

সংবিধান ও সংসদ

২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সংশোধিত না হলে এগিয়ে চলা অসম্ভব মনে হয়েছে তখনই সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা হয়েছে। এইভাবে তেতাল্লিশটি সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর এখন ৪৪তম সংশোধনী প্রস্তাব জাতির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধনীতে যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসার প্রস্তাব আছে তা হ'ল সংসদের সার্বভৌমত্বের সীমা। আমরা যে কোন প্রশাসনিক বা আইন সম্পর্কিত বিতর্কের মীমাংসায় সদাসর্বদা বৃটেনের নজির টানি। কিন্তু বৃটেনে পার্লামেন্ট যে প্রশ্নাতীত সার্বভৌমত্বের ধারক একথা মনে রাখিনা। বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকার সেদেশের সর্বোচ্চ আদালত বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে এইটাই সঠিক নীতি। কারণ পার্লামেন্ট বা সংসদ হল, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারক, জনগণের ইচ্ছানুসারে গঠিত জনগণের অনুমোদিত কার্যসূচী রূপায়ণের জন্যই তার সৃষ্টি। ভারতের সার্বভৌম ষাট কোটি লোকশক্তির প্রতিনিধিরূপে কাজ করছেন ভারতীয় সংসদের সদস্যরা। সুতরাং সংসদের কাজে বাধা দেওয়ার অর্থ সার্বভৌম জনগণের অনুমোদিত কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি করা। সুতরাং সে বাধা যত দায়িত্বশীল মহল থেকেই আসুক না কেন তার তত্ত্বগত বৈধতার নিষ্পত্তি অবিলম্বে হওয়া দরকার। সংসদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত হলে যাঁরা স্বৈরতন্ত্রের আশঙ্কা করেন তাঁদের জানা দরকার যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়—এবং তখনই জনগণ তাঁদের কাজের হিসাব নিকাশের সুযোগ পায়। সুতরাং সংসদের উপর যে নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার তা জনগণের হাতের মুঠোতেই আছে। অন্য নিয়ন্ত্রণ শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অবাঞ্ছিতও।

বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণে জাতির সম্মুখে যে প্রয়োজন বড় হয় তা সব সময় দেশের প্রচলিত আইন মাফিক নাও হতে পারে। যেমন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বা রাজন্য ভাতা বিলোপের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। এসব বিষয়ে সংসদের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে জাতিরই সিদ্ধান্ত। সুতরাং আইনের মারপ্যাচে তার প্রয়োগ ব্যাহত করার বিশেষ ক্ষমতা কারও হাতে থাকা সমীচীন নয়। সুতরাং ৪৪ তম সংশোধনী বিলে যে সংসদের প্রশ্নাতীত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রয়েছে তা গণতন্ত্রের প্রকৃত সমর্থকদের অকুন্ঠ সমর্থন লাভ করবে।

জন বিস্ফোরণ

হরিপদ মজুমদার

ট্রামে-বাসে, হাটে-বাজারে কান পাতলেই শুনতে পাবেন নেই নেই। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই। অথচ আমাদের জাতীয় আয় বাড়ছে। স্বয়ম্ভরতার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। কৃষি-শিল্প অন্ন বিস্তর সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন বেড়েছে। এসব দেখে সাধারণ মানুষ মাথায় হাত দিয়ে হয়ত ভাবে, তাইতো উৎপাদন যদি বেড়েই থাকে তবে জিনিষপত্র পাচ্ছিনা কেন? অফিসযাত্রীরা রোজই গজগজ করছেন বাস-ট্রামের ভাড়া বেশী দিচ্ছি, তবুও বাদুড়ঝোলা বন্ধ হল কৈ? এত এত যে মিনিবাস বাড়লো নতুন নতুন বাস বেরুল তবুও ঠেলাঠেলি কমছে না কেন?

এই কেনর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের আশে পাশে এবং বাড়ীর ভিতর দিকেই প্রথমে দৃষ্টি ফেলতে হয়। ২০।২৫ বছর আগে আমার বাড়ীরই লোকসংখ্যা ছিল ৬ জন। এখন দাঁড়িয়েছে ১৪ জনে। প্রায় আড়াইগুণ। অবশ্য এটাত কমই বলতে হবে। পাড়ায় এমন পরিবারের সংখ্যাই বেশী যেখানে সংখ্যাটা ৩।৪ গুণ বেড়েছে। ফলে এই বাড়তি লোকের জন্য খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় জোটাতে গিয়ে যে হিমসিম খেতে হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

বাড়তি লোকদের খাওয়া-পরা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে যেমন পরিবারে সংকট দেখা দিয়েছে তেমনি করে সংকট দেখা দিয়েছে প্রতিটি অনুন্নত দেশে এবং গোটা পৃথিবীতেই। অর্থাৎ মা-ষষ্ঠীর কৃপা শুধু আমার-আপনার উপরই বর্ষিত হচ্ছে না, নিরপেক্ষভাবে তিনি সবারই ঘর ভর্তি করে চলেছেন। এদিকে অন্নপূর্ণা মহা ফ্যাসাদে। অন্নদাত্রী এত অন্ন যোগাবেন কোত্থেকে?

সমস্যাটা খতিয়ে দেখতে হলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার বর্ত্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৫০ কোটি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন এখন সারা পৃথিবীতে যা খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে তাতে মাত্র ২৫০ কোটি মানুষের সুষম খাদ্য বন্টন করা যেতে পারে। বাকী ১০০ কোটি মানুষের জন্য ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে তারা হাওয়া খেয়ে বেঁচে আছেন। অখাদ্য, কুখাদ্য এবং আধ পেটা খেয়েই তারা যে বেঁচে আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আসল কথা জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে; উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। বরং বলা চলে বর্ত্তমানে পৃথিবীতে মনুষ্য উৎপাদনই সকল উৎপাদনকে হার মানিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর গতিকে যদি কঠোর হাতে লাগাম পরিয়ে কষে না ধরা যায় তবে সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই।

১৬৫০ সালে এদেশের লোকসংখ্যা ছিল দশ কোটি। ১৮৭২ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২০ কোটিতে অর্থাৎ দশ কোটি থেকে জনসংখ্যা ২০ কোটি হতে সময় লেগেছিল (১৮৭২-১৬৫০)-২২২ বছর। তারপর ২০ কোটি দ্বিগুণ হয় ১৯৬১ সালে অর্থাৎ (১৯৬১-১৮৭২)-৮৯ বছরে। কিন্তু এ হিসেবটাও ঠিক হল না। কারণ ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। পূর্বেকার আয়তন আর নেই। ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২.৫, এই গতি যদি বজায় থাকে তবে ১৯৬১ সালের প্রায় ৪৪ কোটি জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে মাত্র ২৮ বছর। অর্থাৎ ১৯৮৯ সালের আগেই ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৮৮ কোটিতে।

এবার পশ্চিম বাংলার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারলুম না। ১৯৭১ সালে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ। ১৯৬১ সালে ছিল ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ। অর্থাৎ দশ বছরে প্রায় ১ কোটি লোক বেড়েছে। ঐ দশকে এ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৭.২৪। এই হারে যদি জন-উৎপাদন চলতে থাকে তবে ১৯৮৯ সালে পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। এখন যারা যাতায়াতের সময় গজ-গজ করছেন—তখন তারা কি করবেন? পাতাল রেল, হুগলী ব্রীজ, সাবওয়ে, মিনিবাস, ট্রলিবাস দিয়ে কূল-কিনারা পাওয়া যাবে কী? চিকিৎসকেরা যদি বাদ না সাধেন তবে মানুষের মাথার উপর দিয়ে মানুষ হাঁটার দৃশ্যটা আমার দেখার সুযোগ হবে না—এই যা রক্ষা।

বিশিষ্ট জনতত্ত্ববিদ ডঃ চন্দ্রশেখর একবার বলেছিলেন ভারতে প্রতি বছর যে দেড় কোটি করে লোক বাড়ছে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হলে প্রতি বছর ১ লক্ষ ২৬ হাজার স্কুল, ৩ লক্ষ ৭২ হাজার শিক্ষক, ২৬ লক্ষ বাড়ী, ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ মিটার কাপড়, ১ কোটি ২৫ লক্ষ কুইন্টাল খাদ্য এবং ৪১ লক্ষ ৩০ হাজার নতুন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

জনসংখ্যা কি হারে বাড়ছে

অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলির অনুমান খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে, অর্থাৎ কৃষি আবিষ্কৃত হবার আগে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটির কম। পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুমান খৃষ্ট জন্মকালে অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার বছর আগে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৩০ কোটি। অর্থাৎ ২ কোটি থেকে ৩০ কোটিতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল ৪ হাজার বছর। তারপর ১৭০০ শতাব্দীতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ কোটি।

মোগল সম্রাট আকবর তখন ভারতের অধীশ্বর। আর আকবরের রাজত্বকালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১০ কোটি।

এখানে মনে রাখা দরকার আঠার শতকের মধ্যভাগে পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। তারপর থেকেই বন্যার জলের মত হু হু করে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে দুর্বার গতিতে। ১৯২০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ২০০ কোটি। অর্থাৎ ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দু'বার দ্বিগুণ হয়। প্রথমবার দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছিল ১০০ বছর; কিন্তু পরেরবার দ্বিগুণ হতে সময় লাগে ১০০ বছরের কম। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি অপরিবর্তিত থেকে যায় তবে ১৯২০ সালের ২০০ কোটি লোক ৪০০ কোটিতে দাঁড়াবে ১৯৮০ সালে। আর মাত্র ৪ বছর পর। কি ভয়াবহ অবস্থা একবার কল্পনা করুন! জনতত্ত্ববিদেরা অনুমান করছেন ২০০০ খৃষ্টাব্দে আমাদের এই গ্রহের লোক সংখ্যা হবে প্রায় ৬৫০-৭০০ কোটি। আর মাত্র ২৫ বছর পর এই পৃথিবী ৭০০ কোটি মানুষের পদভারে গুড়িয়ে যাবে নাকি?

সারা পৃথিবীর কথা ভেবে লাভ নেই। আমাদের ভারতবর্ষের সমস্যাটাই একবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কোনো খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই বলে আমরা দিনরাত আকাশ ফাটা চিৎকার করছি; কখনও দায়ী করছি অদৃষ্টকে; কখন গাল দিচ্ছি সরকারকে; কিন্তু এই সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নটা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সে খেয়াল কয়জনের আছে?

সুতরাং আমরা যে দ্রুতগতিতে একটা বিস্ফোরক অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছি, তা বুঝে এখনই তার মোকাবিলায় সকলকে তৎপর হতে হবে। ধীরগতিতে চলার আর সময় নেই। একদিকে যেমন জন-উৎপাদন বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে হবে অপরদিকে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে। সাথে সাথে সকলকেই মিতব্যয়ী হতে হবে। আড়ম্বর, অপচয় বন্ধ করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগ নিয়ে মত্ত থাকলে চলবে না। দেশের ও দশের কথা ভাবতে হবে।

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। আগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। এখন এটা কোন সমস্যাই নয়। একমাত্র দরকার মানসিক প্রস্তুতি। সরকার প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পুরুষদের জন্য ভ্যাসেকটমি ও মহিলাদের জন্য টিউবেকটমি অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেছেন। এতে কোন খরচ নেই— বরং পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। তবুও যদি আমরা এই সুযোগ গ্রহণ না করি তবে সংকট সৃষ্টির জন্য ভবিষ্যত বংশধরেরা আমাদের দায়ী করবে নাকি? সন্তানদের যদি উপযুক্ত খাদ্য-শিক্ষা-আশ্রয় ও রোজগারের ব্যবস্থা না করতে পারেন তবে পিতামাতা সন্তানদের অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে পারেনা। অনেকেই প্রচার চালান এই অস্ত্রোপচারের ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, কর্মক্ষমতা কমে যায়। আমার পরিচিত অনেকেই এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কারুরই স্বাস্থ্যহানি বা কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবার লক্ষণ দেখিনি। বরং ছোট পরিবার নিয়ে তাঁরা আনন্দেই আছেন। অনেক বেশী সময় দিতে পারছেন ২।৩ টি ছেলে মেয়ের দিকে নজর রাখতে। আমি বরং বলতে চাই, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তবে একজনের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া বরং শ্রেয়, ৪।৫ টা ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যত নষ্ট করার চাইতে। এই সহজ সরল কথাটা আমাদের বুঝতে হবে। শুধু নিজে এ কাজে অগ্রসর হলেই হবে না, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে ভাবী সংকটের ভয়াবহতা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষিতা মেয়েদের এ কাজে এগিয়ে আসা চাই। কারণ সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মায়েদেরই বেশী। ৪।৫ টা ছেলেমেয়ে মানুষ করা যে কি ঝক্কি, কি অমানুষিক পরিশ্রম, শারীরিক ক্লেশ তা প্রতিটি মা-ই হাড়ে হাড়ে টের পান। সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করে, সুখী পরিবার গড়তে চাইলে জন্মনিয়ন্ত্রণের অপরিহার্যতা স্বীকার করতেই হবে। নতুবা শেষের সে দিন যে ভয়ঙ্কর সে চিত্র আগেই তুলে ধরা হয়েছে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলে আর পার পাওয়া যাবে না। কর্মফল ভোগ করতেই হবে।
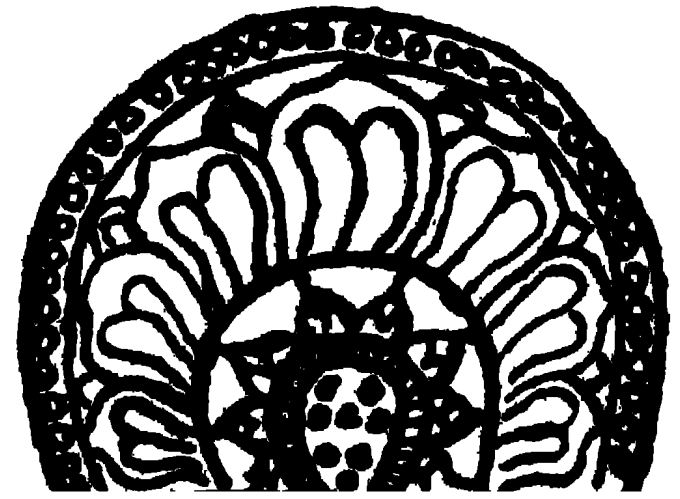
সুশোভন দত্ত

ফুল-ব্রাইট

সুগন্ধী চন্দনের মতো মোলায়েম বৃষ্টি গায়ে মেখে অর্ণব হস্টেলে ফিরল। কম্পাসের টিউলিপগুলো জলের ছিটেয় ফ্যাকাসে লাল। অর্ণবের বুকের ভিতর হাজার উড়ুক্কু মাছ খুশিতে অস্থির। সবকটা কোয়ার্টারের পরীক্ষাতেই ও 'এ' পেয়েছে। ছ'মাসের চলতি ট্রেনিং শেষ হ'লেই ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেট পলিটেকনিক কলেজ থেকে ও খালাস পাবে। এখানকার পাট চুকলে আবার সেই বত্রিশ নাড়ির বন্ধনে জড়ান নিজের দেশের মাটি—মাটির আজন্মলালিত মিঠে সুঘ্রাণ, শালিকের ডানায় সকালের তরতাজা রোদ, ঘরের বারদুয়ারের মাথায় পুষ্পিত মাধবীলতা, বাবা মা, ভাই-বোনের মিলিত সাহচর্যে একটা অন্তরঙ্গ সংসার—যার জন্যে বিগত চার বছরে প্রতি মুহূর্তেই অর্ণবের মনটা উন্মুখ ও অতৃপ্ত থেকেছে। তাছাড়া কৃষ্ণার ভূমিকাও ওর জীবনে অবিচ্ছেদ্য—যার ডাগর ডাগর কালো চোখের দীঘল তারায় ভালবাসার উষ্ণ-প্রস্রবণ, সান্নিধ্যে বরাভয় আশ্রয়।

ডিনারের সময় হ'য়ে গেছে। চটপট পোষাক পাল্টে অর্ণব ডাইনিং-স্পেসে চলে এলো। অধিকাংশ টেবিল ফাঁকা। আজ শনিবার। উইক-এণ্ডে আবাসিকরা যে যার বান্ধবীকে নিয়ে ডেটিং-এ বেরিয়ে গেছে। দূরে গ্রামের বাড়িতে গেছে কেউ কেউ। অর্ণবকে দেখে কাউণ্টারে বসা রেড্-ইণ্ডিয়ান ছেলেটির মাংসল ঠোঁটে এক চিলতে সৌজন্যের হাসি ঝিকিয়ে উঠল।

কয়েকটা টেবিলে দু'চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আহারে ব'সেছে। তিনটে হিপি চুলের চীনা ছেলে ঘরের এক কোণায় ব'সে টেলিভিশানে উত্তেজক বিজ্ঞাপন-প্রোগ্রাম দেখছে। মেমসাবদের নগ্ন দেহের বেআবরু প্রতিচ্ছবি চাখতে চাখতে ওরা যে এখন বেশ গরম হ'য়ে উঠেছে তা দেখেই মালুম হচ্ছে। প্লেটের ওপর খাবার তুলবার পর একটি চলনসই ঘনিষ্ঠ মুখ খুঁজে পেয়ে অর্ণব সেদিকে এগিয়ে গেল।

চোখ তুলে অর্ণবকে দেখল ড্যানি কার্টার। ইঙ্গিতে ওকে এই টেবিলেই ব'সতে ব'লল। সম্মতি পেয়ে অর্ণব টেবিলের ওপর হাতের প্লেট নামাল। খাওয়া থামিয়ে ড্যানি ব'লল,

—আমার খাবার কিন্তু শেষ হ'য়ে এসেছে।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। অর্ণব কাঁটা দিয়ে ষ্টেক্ ছিঁড়ল।

কাঠ কয়লার আগুনে পোড়ানো গরুর মাংসের একটা টুকরো মুখে ফেলতেই গোটা জিবটা তেঁতো হ'য়ে গেল। অর্ণব বিরক্ত হ'য়ে ভাবল, এই ছাইভস্ম এরা কোন সুখে খায়? ও স্যালাড্ খেতে শুরু ক'রল। ড্যানি জিজ্ঞেস করল, —তুমি কি আজ এ ঘরেই থাকছো?

—হ্যাঁ! অর্ণব দাঁতের ফাঁকে আটকে যাওয়া গাজরের টুকরোটা বের ক'রল।

—তোমার গার্লফ্রেণ্ড সুশান ডরিংটন..

—সুশান আমার গার্ল ফ্রেণ্ড নয়, শি ইজ জাস্ট অ্যা ফ্রেণ্ড। কথার মাঝখানেই অর্ণব ড্যানিকে বাধা দিল।

—আমার ভুল হ'য়ে থাকবে। ড্যানি বাক্যটি সংশোধন ক'রে ব'লল, যাই হোক তোমার ফ্রেণ্ডকে তো আর তোমার কাছে আসতে দেখি না।

—সে এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় নেই।

—তোমার ফ্রেণ্ড ষ্টেডি হয়নি তো? ড্যানি মুচকি হাসল।

—তোমার কোনো ক্ষতি আছে তাতে? অর্ণব বিরক্ত হ'য়ে উঠে পড়ল। হাত মুছে কাগজের ন্যাপকিনটা বাস্কেটে ফেলে দিল।

নিজের ঘরে ঢুকে অর্ণব একটা কষ্টকর নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হ'ল। সবকিছুই কেমন যেন নিরর্থক বিস্বাদ। নৈঃশব্দের রমণে কেবলি শূন্যতা। মানুষের মনটা শরতের আকাশের মতো ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়—কখনো ঝলমলে রোদ্দুরে ঘন নীল আবার কখনো কালো মেঘের ঘোরাটোপে মলিন। লেখার টেবিলে এলিয়টের ''ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' আর শেগেলের 'লাভ ষ্টোরী'। সুশানের প্রীতির স্মারক। অর্ণব 'লাভ ষ্টোরী' পড়েনি। বইটার লাখ লাখ কপি নাকি এই মার্কিন মুলুকে বিক্রি হ'য়েছে। অর্ণব অগত্যা 'লাভ ষ্টোরী'-তেই মন দিল।

গল্পটা বেশ জমে উঠেছে। নায়ক নায়িকাকে জিজ্ঞেস ক'রছে, তুমি কি গর্ভবতী? দরজায় অসহিষ্ণু করাঘাত। এই অসময়ে আবার কে এলো? সুশান? বিল ষ্টুয়ার্ট? রণবীর সিং? পদ্মিনী কাপুর? মানস সোম? পর পর অনেক-

গুলো নাম ভেবে নিয়ে অর্ণব একে একে প্রত্যেককেই খারিজ ক'রে দিল। দরজা খুলে অবাক হ'ল। লস এঞ্জেলসের পপুলার এঞ্জিনিয়ার সুন্দর মালহোত্রা এই মুহূর্তে অর্ণবের আশার বাইরে ছিল। মালহোত্রা জিজ্ঞেস ক'রল,

—কি ব্যাপার, সন্ধে রাতেই ঘুমুচ্ছিলে কেন ?

—ঘুমাইনি তো, গল্পের বই পড়ছিলাম।

—বিরক্ত ক'রলাম কি ?

—নট্ এ্যাট অল্।

অর্ণব এতক্ষণে মালহোত্রার সঙ্গিনীটিকে দেখল। আটত্রিশ চব্বিশ আটত্রিশ মাপের বেশ ধবধবে ভাগলপুরী। ভারতীয় কি ? মিড্‌নাইট-ব্ল্যাক শাড়ির সঙ্গে নিতান্ত নিয়মরক্ষার জন্যেই একটি সানফ্লাওয়ার চেলি যাতে তার নির্লোম বৈদ্যুতিক উর্ধ্বাঙ্গের অনেকটাই প্রকৃতির মতো উন্মুক্ত। মালহোত্রা চওড়া বুকটাকে আরও একটু চওড়া ক'রে অর্ণবের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিল,

—ডাট মীট মাই গার্ল ফ্রেণ্ড মালা নিগম, মালা ইণ্ডিয়ান এম্‌ব্যাসির ফার্ষ্ট সেক্রেটারি অনিল নিগমের ডটার।

যৌবনের টাটানিতে সুন্দর মালহোত্রা ক্যাসানোভাকেও অতিক্রম ক'রেছে। দু'চারদিনের বেশি ও কোনো মেয়ের সঙ্গ নেয় না। নিত্যি দাড়ি কামাবার মতো মালহোত্রা অবলীলায় হামেশা বান্ধবী বদল করে আর ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে লাখ লাখ পেনিসিলিন নেয়। মালা হেসে হাত বাড়াল। বিদেশি কেত্তায় না ভুলে অর্ণব হাতজোড় ক'রে নমস্কার ক'রল। মালা আঁখির কোণা দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছিটিয়ে দিল যা দেখে চির-কালই সব পুরুষের বুকের রক্ত চমকে ওঠে। অর্ণবের মনে হ'ল, মালা নিগম একটা পাকা চিতল মাছের সুস্বাদু তেলুক পেটি।

অর্ণবের কটে আরাম ক'রে ব'সে সুন্দর মালহোত্রা ব্যাগ খুলে বিয়ারের বোতল বের ক'রল। তিনজনে ভাগাভাগি ক'রে দু'টো বড় বোতল সাবড়ে দিল। মালা গুনগুন ক'রে সুর ভাঁজছিল। অর্ণবের অনুরোধে গলা চড়াল—রুয়েজে হম্ হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো। মালা নিগম সুকন্ঠি। তাল লয় সম্বন্ধে ওর বোধও যথেষ্ট। বহুদিন পর প্রবাসে গালিবের গজল অর্ণবের মনটাকে গ্রীষ্মকালের ফুরফুরে হাওয়ার মতো একটা মিষ্টি আমেজে ভরিয়ে তুলল।

রাত বারটা নাগাদ মালহোত্রার এমারল্ড গ্রীণ ইম্পালা পার্কিং জোন থেকে বেরিয়ে গেল। ও নিশ্চয় মালাকে নিজের এ্যাপার্টমেন্টে তুলবে। তারপর সার্কাসের ক্লাউনের মতো পুরুষ-নারীর চিরকালীন ডনকুস্তি—সবশেষে নিপাট শূন্যতা। সুন্দরের জন্যে অর্ণবের কষ্ট হ'ল। ওর মতো একটা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, চৌকস এঞ্জিনিয়ার অতিরিক্ত আত্মধর্ষণে দিনের পর দিন অসহায়ভাবে নিজেকে বাতিল ক'রে দিচ্ছে।

ব্রিড ক'রে অর্ণব এক ধরণের মাষ্টার্ড সীড তৈরী ক'রেছে। এতে অল্প জমিতেই অপর্যাপ্ত সরষে ফলবে। ক্যালপলীর এগ্রিকালচার ল্যাবে অর্ণব নতুন সীডের প্ল্যান্ট টেষ্ট ক'রছিল। হাতের কাছে টেলিফোন বাজল। প্রফেসর ওয়েগনার কাজের শেষে ওকে দেখা ক'রতে ব'ললেন।

ডক্টর ওয়েগনার নিজের রুমে ব'সে ফাইল দেখছিলেন। আঙুল তুলে অর্ণবকে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিলেন। হাতের কাজ শেষ ক'রে শুধালেন,

—এখানে তোমার ভাল লাগছে না ?

—এ'কথা ব'লছেন কেন স্যার ? অর্ণব চিন্তিত হ'ল। উনি কি ওর কাজে কোনো গাফিলতি খুঁজে পেয়েছেন ?

—টার্ম এক্সটেনশানের জন্যে তুমি তো দরখাস্ত ক'রলে না ?

—ট্রেনিং শেষ হ'লে দেশে ফিরব ঠিক ক'রেছি। অর্ণব আশ্বস্ত হ'ল।

—ইজ্ ইট্ সেটেলড্ ? যদি এখানকার কোনো য়ুনিভার্সিটিতে তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করা হয় ?

—সরি, সে চাকরি য়্যাকসেপ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—কেন ? জোসেফ ওয়েগনার অবাক হ'লেন। বলে কি ছেলেটা। উনি হেসে ব'ললেন ডাট্ এখানে পার এ্যানাম তুমি যত ডলার পাবে তোমার দেশের কেনো সম্ভ্রান্ত চাকরিতেই এর ওয়ান-ফের্থাও তুমি পাবে না।

—জানি স্যার, তবু আমি দেশে ফিরব। অর্ণব সংকল্পে দৃঢ় হ'ল, নিজের দেশের ওপর নৈতিক কর্ত্তব্যকে আমি অবহেলা ক'রতে পারি না।

—ইয়ং ম্যান আই উইশ য়োর গুড লাক্। প্রফেসর ওয়েগনার আঠাশ বছরের এই নির্লোভ বাঙালী তনয়টিকে মনে মনে শ্রদ্ধার আসনে না বসিয়ে পারলেন না।

বেশ কিছুদিন পর একটা কফিবারের সামনে মানস সোমের সঙ্গে অর্ণবের দেখা হ'য়ে গেল। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের টাকায় মেট্যালর্জি পড়তে মানস সোম ষ্টেটসে এসেছিল। পড়াশুনা শেষ ক'রে আর দেশে ফেরেনি। চাকরি নিয়ে এখানেই থেকে গেছে। এখনও বিয়ে করেনি। একটি পোলিশ মেয়ের সঙ্গে একই এ্যাপার্ট-মেন্টে থাকে। সোম দুচারটে প্রাথমিক কথাবার্তার পর অর্ণবকে জিজ্ঞেস ক'রল,

—তুমি নাকি দেশে ফিরবে ?

—তাছাড়া আর কি ক'রব ? অর্ণব পাল্টা প্রশ্ন ক'রল।

—থেকে যাও হে, থেকে যাও। খুব গোপন কথা বলার মতো ফিসফিস ক'রে মানস সোম ব'লল, এরকম আরাম সুখের জায়গা জীবনে আর পাবে না।

অর্ণবের গা গুলিয়ে উঠল। মানস সোমের মুখে মারুয়ানার বদগন্ধ। একটু তফাতে সরে গিয়ে অর্ণব ছেলেমানুষের গলায় ব'লল,

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মুখোমুখি

সবকিছু ছাপিয়ে আমার অন্তরের গভীরে এ কথাটাই সব চেয়ে সত্য যে 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।'

—নীলিমা সেন

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গান অনেকের মতে একমাত্র তাঁর গলাতেই বেদের চেয়ে গভীর হয়ে ওঠে। শিল্পীর নাম নীলিমা সেন। রেডিওতে রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে যখন তিনি বলেন: 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ'—তখন মানসপটে জনারণ্য থেকে দূরে ভাঙ্গা মন্দিরে এক একাকিনী চির কাঙালিনীর ছবি ভেসে ওঠে। তার সেই গহন সমর্পিত শব্দরাজির মায়ায় সেই মুহূর্তে সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যে যেন অনন্তকাল জন্মগ্রহণ করে।

১৯২৮ সালের ২৮ শে এপ্রিল কলকাতায় নীলিমার জন্ম। ছ বছর বয়সে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে সপরিবারে। তখন আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবিত। সেই থেকে ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন দিনের পর দিন। পাঠভবনে পড়াকালীন চলে যান সঙ্গীত ভবনে। সেখান থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্নাতক হন। পাঠভবন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে শিক্ষাভবন থেকে মানবাত্মিক বিভাগে স্নাতক উপাধি পান। ১৯৫১ সালে স্বামী ডঃ অমিয় কুমার সেনের সঙ্গে আমেরিকা যান। এক বছর থাকা কালীন নর্থ ওয়েস্টার্ণ ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সায়েন্সে ও রেডক্রস আয়োজিত ফার্স্ট এইডে একটি সার্টিফিকেট পান।

ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ওঁর প্রবণতা ছিল। শান্তিনিকেতনে এসে সঙ্গীত জীবনকে সার্থক করবার জন্য প্রতিদিনের পূজায় তিনি অঞ্জলি দিতেন। আশ্রমে যখন ঋতুর পর ঋতুর আবাহন হতো তখন ঋতু উৎসবের মহড়ায় গুরুদেবের গানের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠতেন। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ। তের বছরের মেয়ে নীলিমা উদয়নের বারান্দায় আয়োজিত ১৯৪১ সালে গুরুদেবের শেষ জন্মদিনে প্রণাম করে কবিকে গান শুনিয়েছিলেন 'গানের ঝরণা তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে'। দূরভাষ মারফৎ যোগাযোগ করে পূর্বপল্লীর 'সোনাঝুরি' বাড়ীতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পূজারিণী নীলিমা সেনের মুখোমুখি বসে শুধিয়েছিলাম, আপনার জীবনে গুরুদেবের গানের প্রভাব কতখানি?

—'আমার নিজের কাছে গুরুদেবের গানের প্রভাবের গুরুত্বের সীমা নেই। এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে গুরুদেবের গানকেও একদিন জীবন ধারণের উপাদানের মতো করেই পেয়েছিলাম। জানো সে পাওয়া আমার সারা জীবনকে মধুর করে দিয়েছে। আমার জীবনের সার্থকতা আমি গুরুদেবের গানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। যখন মন দিয়ে গুরুদেবের গান গাইতে পেরেছি তখন আমার মনে হয়েছে গুরুদেব যে কথা বলতে চেয়েছেন সে যেন আমি আভাসে বুঝতে পেরেছি। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যার কাছে পৌঁছুতে পারি না যদি গানের সুরে কোন দিন পথ কেটে থাকতে পারি তবে সেখানে গুরুদেবের চরণের স্পর্শ পড়েছে।' শান্ত ভাবে পরিচ্ছন্ন জবাব দিয়ে থামলেন নীলিমা।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের যথার্থ উপস্থাপনের জন্য এর প্রত্যেকটি শব্দের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এর শিরা উপশিরায় যে গভীরতা আছে তার আস্বাদন করতে হবে কন্ঠে। এমনতর রবীন্দ্র সঙ্গীত যিনি গাইতে পারেন তিনি সার্থক রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। নীলিমা সেন নিঃসন্দেহে সার্থকতার এই আসনে অধিষ্ঠিতা। গানে সর্বপ্রথম প্রেরণা পেয়েছেন বড় দিদি অনিমার কাছ থেকে। শৈলজা রঞ্জন মজুমদারের একান্ত উৎসাহে ও প্রচেষ্টা নীলিমার সঙ্গীত শিক্ষার জীবনের সব চেয়ে বড় উৎস। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুলেখা ঘোষ, অমিতা ঠাকুর এঁদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা ওকে অনুপ্রাণিত করেছে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি ওঁদের পরিবারের শ্রদ্ধা যার অনুপ্রেরণা ওর জ্ঞানে কিছুটা

অজান্তে নীলিমাকে গুরুদেবের গানের প্রতি আকর্ষণ করেছে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম : রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে আপনি এমন কি পান যার ফলে রবীন্দ্র সঙ্গীত আপনার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে?

—অল্প বয়েসে রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাকে খুব বেশী টানতো। তবে আমার বাবা আমার শিশু বয়স থেকে একথা বারে বারেই বলতেন আগে গানগুলিকে ভালো করে বার বার পড়তে। কথাকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা বা জ্ঞান তখনও আমার হয়নি। জানিনা তবু কিসের আকর্ষণে রোজ যখন তখন গীতবিতান নিয়ে গান-গুলিকে বার বার পড়তাম. গানগুলি মুখস্ত হয়ে যেত। যদিও সুর বেশীই ছিল অজানা। বয়সের সাথে কথাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি। তার সঙ্গে সুরের মিলন মনকে অভিভূত করেছে। আজ যেখানে পৌঁছেছি সেখানে সঙ্গীত, দৈনন্দিন জীবনের উৎস বা সহায় আমার এই গান। গানই আমার ধর্ম বা ভগবান যা আমার জীবনের পথকে সহজ করে তাকে সুন্দর করে তুলছে। রবীন্দ্রনাথের গানে আমার জীবনের সার্থকতা খুঁজতে চেষ্টা করেছি। সঙ্গীতহীন জীবন আমার কাছে মৃতবৎ।

নীলিমার সমস্ত চেহারা জুড়ে আছে মূর্তিময়ী নারীত্ব। স্নেহরসে ভরা। প্রথম আলাপেই মনে হয় অনেকদিনের চেনা। প্রথম পরিচয় কোন দিনও ছিন্ন হবার নয়। নীলিমার যশ প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন করেনি তার ব্যক্তিগত সারল্যকে। প্রকৃত শিল্পীর যে কোন গ্ল্যামার থাকতে পারে না এই মহিলা যিনি শান্তিনিকেতনের আনন্দপাঠশালা থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে 'বাচ্চুদি নামে সমধিক পরিচিতা—তিনিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

—বাচ্চুদি আপনি যখন গান পরিবেশন করেন তখন কি শ্রোতাদের কথা ভাবেন—

—গান গাইতে বসে প্রথম অল্পক্ষণ শ্রোতাদের সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে। তবে এই সচেতনতা ক্রমশই দূর হয়ে গিয়ে গান আমার নিজের হয়ে যায়। একথা প্রায় সব শিল্পীর সম্বন্ধেই সত্য। তবে কখনো কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয় না এ কথা বললে ঠিক কথা বলা হবে না। এবং শিল্প সৃষ্টির সম্পূর্ণ সার্থকতা বলেই আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কি? আমার প্রশ্নের জবাবে সঙ্গীত ভবনের এক কালের ছাত্রী একালের অধ্যাপিকা নীলিমা সেন মুক্তকন্ঠে বললেন: রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিস্তার যে কতখানি বেড়েছে আজকাল সে কথা আমরা সকলেই উপলব্ধি করি। গান শুধু গায়ক গায়িকার নয় শ্রোতাদেরও, একথা আজকে সার্থক হয়ে উঠেছে। এই সীমাহীন আনন্দের মধ্যে একটি আশঙ্কা মাঝে মাঝে মনে জাগে যে আজকের শিল্পী ও শ্রোতারা মিলে রবীন্দ্রনাথের গানকে যেখানে স্থান দিয়েছেন সেই উৎসাহ আজ যেমন দেখছি ভবিষ্যতে থাকবে কিনা। জানো অনেক সময় দেখা যয় খুব উৎসাহের পর খানিকটা ভাঁটাও পড়ে যায়। সেই আশঙ্কাকে দূর করবার ভারও আগামীকালের শিল্পী ও শ্রোতাদের ওপর। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টাই এই অমূলক আশঙ্কাকে দূর করতে পারবে।

নীলিমার কণ্ঠ মধুর। গুরুদেবের অনেক গান খুব মর্মস্পর্শী। গানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধ্রুপদী বা টপ্পা ঢং। আমেরিকায় থাকাকালীন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সুরপ্রধান গান গেয়েছেন। 'এসো শরতের অমল মহিমা' নীলিমার কণ্ঠে এই গান সাগরপারের বিদেশী শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। নীলিমার কন্যা নীলাঞ্জনা রবীন্দ্র সঙ্গীতে আগামী কালের সম্ভাবনায় বর্তমানে প্রতিশ্রুতির এক নাম।

বাচ্চুদির কাছে শেষ প্রশ্ন রেখেছিলাম : আপনার সঙ্গীত জীবনের চাওয়া পাওয়া কি শেষ হয়ে গেছে?

—জানো চাওয়ার শেষ নেই। কাজেই কোথাও জোর করে ছেদ টানার প্রয়োজন আছে। আরও কেন হলো না একথা আগে কখনও মনে আসেনি তা নয়। তবে আজ যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে আমি যেটুকু পেয়ে থাকি তাই আমার প্রাপ্য বলে মন মেনে নেয়। সব কিছু ছাপিয়ে আমার অন্তরের গভীরে একথাটাই সব চেয়ে সত্য যে 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'। শুধু একটি আকাঙ্খা আজীবন বেঁচে থাকবে যেন গলার সুরটিকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি। জন-সাধারণের জন্য গান নাই বা গাইলাম। কিছু ছাত্রছাত্রীকে তৈরী ক'রে দিতে পারলে গুরুদেবের গান তাঁদের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকবে। যেমন করে আজ পর্যন্ত এই গান বেঁচে রয়েছে সেই ভাবেই যেন এ গান যুগে যুগে বেঁচে থাকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও শ্রোতাদের সার্থক প্রচেষ্টায়। সরল মুখখানায় খুশীর আমেজ ছড়িয়ে নীলিমা কথা শেষ করলেন।

এসব বলা নীলিমা সেনের কথা। আমরা বলব নীলিমা সেন যেন জেগে থাকেন তাঁর সমর্পণের শেষ রাগিণীতে: 'প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে।'

সাক্ষাৎকার :—**স্বপনকুমার ঘোষ**

গ্রামের নাম ডিহি মেদান মেলা

ডঃ দীপ্তি চৌধুরী
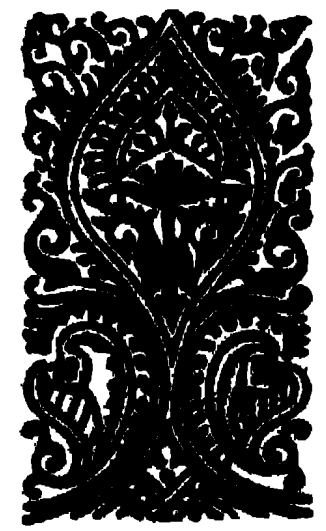
সেদিন ছিল শনিবার। সকাল ন'টায় চলেছি কোলকাতার দক্ষিণে। গাড়ীতে আমরা চারজন—আমি ছাড়া বাকী তিনজনই কোন না কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ওরা চলেছে গ্রামের বাড়ীর পরিকল্পনার সমীক্ষা করতে। আমরা শহুরে মানুষ প্রায়ই ভুলে যাই ভারতবর্ষে প্রতি পাঁচজনের চারজনই থাকে গ্রামে, মাত্র এক জনের ঠাঁই শহরে। তবুও আমাদের শিক্ষায়, আমাদের পাঠ্যক্রমে গ্রামের উল্লেখ কোথায়?

গাড়ী এসে দাঁড়ালো রেল লাইনের এধারে। দূরে মল্লিকপুর ষ্টেশনে লাল গুমটি ঘর দেখা যাচ্ছে। সরজমিনে গ্রামে সমীক্ষা চালাচ্ছে যে তরুণ-ছাত্রটি সে ঐ গ্রামেই থাকে। সে রাস্তার মোড়ে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। মুখে তাঁর প্রচ্ছন্ন উৎসাহের দীপ্তি। পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চল্‌লো সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে। হাঁটছি আর হাঁটছি। দুধার ঘন সবুজ। কত নাম না জানা ফল আর ফুলের গাছ, লতা। মাঝে মাঝে এক চিলতে ধানের ক্ষেত। সব মিলিয়ে মনে হয় কে পুরু সবুজ গালিচা পেতে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ চলার পর এসে দাঁড়ালাম এক বাড়ীর আঙ্গিনায়। বাড়ীর সীমানা আর ক্ষেতের সীমানা প্রায়ই বুঝতে পারছিলাম না। ক্ষেতের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছি বলতেই পারবোনা। সে জায়গায় শহুরে কড়া শাসন। রাস্তা, ফুটপাত, বাড়ীর সীমানা, করপোরেশনের সীমানা সূচক পাথর—খালি সীমানা, সীমানা আর সীমানা। কতো হাতপা ছাড়া এরা। মাটির বাড়ী, খুব নিকোনো, খুব পরিচ্ছন্ন। গৃহস্বামী উঠোনে বসে তামাক খাচ্ছেন। উঠোনের একপাশে কুটনো কুটছে গৃহস্বামীর পুত্রবধু। গৃহস্বামীর স্ত্রী বৃদ্ধা দাওয়াতে শীতের রোদ্দুর পোহাচ্ছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা উঠোনে খেলছে। তরুণ ছাত্রটি এই গৃহস্থের গৃহস্থালীর সব কিছু তথ্য সমীক্ষা করে রেখেছে। কখানা ঘর, কিভাবে তৈরী, দেওয়াল, চাল, ভিৎ সব খবর। কজন লোক, কি উপার্জন, কতটা জমি কিছুই বাদ দেয় নি। পরিবারের প্রত্যেকে সারা দিনে কে কখন কোথায় কাটায় সে খবরও নিয়েছে। এই খবরটা কিন্তু বেশ মজার। এতে ঘরের আয়তন, দাওয়ার আয়তন এ সব বার করা যায়। যদি ধরা যায় এরা কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম, কি শীত সব সময়ে দিনে বা রাতে ভাত দাওয়াতে বসে খায়। কতজন এক সাথে বসে, পরিবেশনের ধরন কি এ সব খবর জানা থাকলে দাওয়ার আয়তন ঠিক করে দেওয়া যায়। এই ভাবে তরুণ ছাত্রটি অনেকগুলো গৃহস্থ বাড়ীর পরিবারের সব কয়টি লোকের সারা দিনরাতের কাজ এবং বাড়ীর কোথায় কে বসে কাজ করে তার একটি তালিকাও তৈরী হয়েছে।

বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। আবার মেঠোরাস্তা। মাটির দেওয়াল ভারী মজার। শীতে ভেতরটা সত্যিই একটু গরম, গ্রীষ্মে তো অসম্ভব ঠাণ্ডা। দেশে এতো ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা, মাটির দেওয়াল নিয়ে তো কোথাও কাজ হতে দেখিনি। মাটির দেওয়াল অসম্ভব মজবুত দেখেছি। হুগলী বাঁকুড়া জেলার সীমানায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমার জন্মভূমির কাছাকাছি সব গ্রামে চমৎকার চমৎকার মাটির দেওয়ালে তৈরী বাড়ী দেখেছি। মাটির দেওয়ালের রোদ, ঝড়, ঝাপটা, বৃষ্টি এসব সইবার জন্য দেওয়ালের বাইরের দিকটায় একটা মাটি আর ধানের তুষে মিশিয়ে আস্তরণ দেয়। জানালার নীচের অংশে দেওয়ালে বৃষ্টির ঝাপটা আসে। সেখানে দেওয়ালকে ত্রিভুজের ঢঙে এগিয়ে দিয়ে ঘরের ভিৎকে জলের ঝাপটার হাত থেকে রক্ষা করে।

মাটির দেওয়াল অত মজবুত হয় সেদিন ডিহি মেদান মেলায় না গেলে

হয়তো কোন দিনও জানতে পারতাম না। এর পরে যে বাড়ীতে গেলাম সে বাড়ীর একটি ঘর একশ বছরের পুরোনো। ভিৎ আড়াই হাত উঁচু। মাঝখানে ঘর, চার পাশে আড়াই হাত চওড়া দাওয়া। ঘরের দেওয়াল মাটির, দেড় হাত চওড়া। একশ বছরের পুরনো গাঁথনী। লোহার গজ হাতুড়ী দিয়ে মেরে ঢোকাতে কেউই পারলাম না। ঐ গাঁথুনী গাঁথবার ঢঙই ছিল আলাদা। দেড় হাত চওড়া দেওয়ালে তাল তাল মাটি সজোরে ছুড়ে মেরে মেরে দেওয়াল তুলেছে। এই ভাবে গাঁথুনী এখন ওরা গাঁথতেই পারে না। অনভ্যাসে এইভাবে গাঁথবার কলা-কৌশল হারিয়ে গেছে। দুচারজন যা জানে তারা যেদিন চোখ বুঝবে এই কলা-কৌশল চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। আধুনিকতা গ্রামকে কিছুতো দিলই না, উল্টে যা তার ছিল তাকেও লোপ পাইয়ে দিয়েছে। ইঁটের দেওয়াল যদি মাটির গাঁথনিকে তাড়িয়ে দেয় তখন গ্রাম ইঁট, চুন, সুরকী, সিমেন্ট, বালি সব কিছুর জন্য তাকিয়ে থাকবে শহরের দিকে।

চাল ছাইবার ব্যাপারেও মনে হলো। গ্রামবাসী একই ধরণের মানসিক দরিদ্রতায় এসে দাঁড়িয়েছে। পয়সা হলেই টিনের চাল-এর কথা ভাবে। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে টিন অত্যন্ত উদাসীন। সে জায়গায় খড়ের চাল, শীততাপ নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির এক অপূর্ব উপাদান। এর একমাত্র দোষ দু-তিন বছর বাদে বাদে পঁচে যায় তাই পালটাতে হয়। আমাদের দেশে বৃষ্টি বেশী, বাতাস আর্দ্র : খড়ের চালে তাই নানারকম জীবানু সহজে জন্মায় এবং খড়কে পঁচিয়ে দেয়। বাঁকুড়া অঞ্চলে তো অনেক সময় দুএক পশলা বৃষ্টির পর সারা খড়ের চাল জুড়ে জন্মায় ছত্রাক। হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল সমস্ত চাল ছেয়ে গেছে। এদের আক্রমণে বিশেষ করে পচনক্রিয়ায় চাল ক্ষইতে থাকে। আমাদের বিজ্ঞানীরা কি পারেননা কোন সহজলভ্য রাসায়নিক দ্রব্য বার করতে, যাতে খড় ভিজিয়ে চাল ছাইলে চালের আয়ু বাড়বে। ভাল জাতের ছত্রাক কিন্তু প্রোটিনপুষ্ট খাদ্য—এই সম্ভাবনার দিকেও তাকাতে দোষ কি!

চাল ছাইবার জন্য টিন, এসবেস্টস্ সীট, টালি, খড়, নানা রকম স্থানীয় পাতা আছে। শেষ দুটোই গ্রামীণ পরিবেশে ভারী সুন্দর মানিয়ে যায়। টালির রঙ লাল হলে, সবুজের, ফাঁকে ফাঁকে লাল ছোপ— মিষ্টিই দেখায়। কিন্তু টিন, এসবেসটস সীট, পাকা দালানের মতই বেমানান।

একশ বছরের পুরোনো ঘর থেকে বের হতে যাচ্ছি—এমন সময় তরুণ ছাত্রটি বললো ওপরের দিকে তাকান। তাকিয়ে দেখি ঘরের চারচালাকে ভেতর থেকে ঢেকে দিয়েছে। শহুরে ভাষায় ফল্‌স্ শিলিঙ দিয়ে আর গ্রাম্য ভাষায় কার্ দিয়ে। এই কার্ তৈরী হয়েছে বাঁশে। বেড়ার দুপাশে মাটির প্রলেপ দিয়ে। এই কারের ওজন বইবার ক্ষমতাও আছে। বহু জিনিষ কারে তোলা আছে এবং জিনিষ তোলা নামার জন্য একজনকে ওর ওপরে সবসময়ে উঠতে হয়। লোহার রড্ আর সিমেন্ট জমানো পাটাতন ছাড়া আর কোন উপাদানের কথা আমাদের শহুরে ইঞ্জিনীয়াররা ভাবছেন না। ঐ ধরনের বাঁশ মাটির পাটাতন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে ক্ষতি কি। ঘরের বাইরে এসে আঙ্গিনায় নামলাম। বাড়ীর মেয়েরা নানান কাজে ব্যস্ত, কেউ ঢেঁকিতে পার দিচ্ছে, কেউ ধান কুলোয় ঝাড়ছে, কেউ ধান শুকোচ্ছে। ফসল ঘরে এলে মেয়েদের কাজ বাড়ে; কাজ করবার উৎকৃষ্ট জায়গাই হচ্ছে উঠোনটি। তাই সব গৃহস্থালীতে আঙ্গিনা বা উঠোনটি বেশ বড়। এই আঙ্গিনাই গৃহস্থালীর কর্মকেন্দ্র। শীতে আঙ্গিনাটি সত্যি আকর্ষণীয়। শুকনো, পরিষ্কার তার ওপর মিষ্টিমধুর রোদ। কিন্তু বর্ষায়! তরুণ ছাত্রটিকে প্রশ্ন করে চিন্তিত করে দিলাম। বললাম, "তোমাদের পরিকল্পনায় এই ভাবনাটি ভেবো।"

যারই জমি আছে, ভিটে আছে, তারই ধান মজুত করার কথা ভাবতে হবে। ক্ষেত থেকে ফসল কেটে যখন বাড়ীতে আসে তখন খড় সমেত ধান আসে। এই খড় সমেত ধানকে থাকে থাকে সাজালে একটি ড্রামের মত দেখায়। বৃষ্টি বা কুয়াশা যাতে না ভিজিয়ে দেয় তার জন্য গোলার ওপরে খড় দিয়ে এমন ভাবে ছেয়ে দেয় দেখলে মনে হয় টুপী পরিয়ে দিয়েছে। তলাটা মাটি থেকে কিছুটা ফাঁক রাখে যাতে মাটির ছোঁয়ায় ক্ষতি না হয়। এই খড়ের গোলাটি ত্রিভুজ আর বৃত্তের সমন্বয় তৈরী। খড় সমেত ধানকে যেমন কিছুকাল রাখতে হয় তেমনি ধানকে অনেকদিন রাখতে হয়। সারা বছরের খাবার ধান, বীজের ধান সবই অতি যত্নে রাখতে হয়। ধানের গোলা দেখতে ঘরের মতোই। আকারে ছোট। দরজা জানালা নেই—একটি জানালা ওপরের দিকে চালের ঠিক নীচে। তাতে বেয়ে উঠতে হয়। এতো কষ্ট করে ওঠানামার ব্যাপারটা কিছুটা চোরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। তলাটা মাটি থেকে হাত দুই ওপরে যাতে ইঁদুর না ঢোকে। দেওয়াল ও তলা বাঁশের বেড়ায় তৈরী। ভেতরের দিকটায় মাটির আস্তরন। ভেতরে কয়েকটা ভাগ, বিভিন্ন ধরণের ধান রাখার জন্য। তাল গাছের চেলা দিয়ে দেওয়াল ও তল মজবুত করা আছে। তালের চেলা যেমন শক্ত তেমনি স্থায়ী—ঘূণ একে ছুতে পারেনা।

ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য যে সব স্থানীয় উপকরণ এবং সেই সংগে ঘরবাড়ী তৈরীর যে স্থানীয় পদ্ধতি এ নিয়ে তো কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা আজও দেখতে পেলাম না। গ্রামীণ গৃহনির্মাণে বিজ্ঞানও কারিগরী কৌশলের কোন অবদান আজও দেখতে পেলাম না। এই ডিহি মেদান মেলায় এসে প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে আমাদের বিজ্ঞানী ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশলের পণ্ডিতদের কেউ কেউ এদিকে মন-প্রাণ

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

যুব মানস

ছাত্র অসন্তোষ ও যুব বিশৃঙ্খলার সেই অন্ধকারের দিনগুলি আমরা পেরিয়ে এসেছি। তার বদলে গত এক বছরে যুবসমাজের মধ্যে গঠনমূলক মনোভাবের চেহারাটা এখন দেশের সর্বত্রই যেন চোখে পড়ছে। কেননা তাদের সামনে এক নতুন আদর্শ এবং দেশগঠনে তাদের বিরাট ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিশোর যুবকরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত একথা এখন দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে যুবসমাজ নিজেরাও ভাবতে সক্ষম হয়েছে। তাই এখন তাদের হাতে কিছু কর্মসূচী যেমন জাতি তুলে দিয়েছে তেমনি তারাও সেই কর্মসূচীকে সেবাব্রতরূপে গ্রহণ করেছে। এমনি একটি কর্মসূচী জাতীয় সেবা প্রকল্প। দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এখন স্বেচ্ছা-সেবক হিসাবে সেবা প্রকল্প রূপায়ণে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন। সেই সঙ্গে চলছে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য সুশৃঙ্খল পরিবেশে স্কুল-কলেজে বিদ্যাভ্যাস। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলাতে এই সেবা প্রকল্প রূপায়ণে যে যুবকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এদের কাজ হল গ্রামীণ অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করা ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো। বিশেষ করে গ্রামের যুবকদের নানা দিক থেকে শিক্ষিত করে তোলা। অবসর সময়ে ছাত্ররাই এর দায়িত্ব নিয়েছে। সারাদেশের যুব-কেন্দ্রগুলোতে এরমধ্যেই এই কাজের সমারোহ পড়ে গেছে। যুবকরা নিজেরাই গ্রামের যুবক ও লোকদের হাতে-কলমে কাজ শেখাচ্ছে। যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে। যুবকরা যেখানে ১৯৬৯-১৯৭০ সালে এগিয়ে এসেছিল ৪০ হাজার। বর্তমান বছর তাকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ বিশ হাজার। ছাত্রীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে এ ব্যাপারে উৎসাহের সাড়া। ১৯৬৯-৭০ সাল এসেছিল ২৮ হাজার ছাত্রী। বর্তমান বছরের এসেছে ৪২ হাজার ছাত্রী।

এই প্রকল্প কার্যে রূপায়িত হচ্ছে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলো আর্থিক ব্যাপারে সাহায্য করছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও নীতি নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এরমধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিবির খোলা হয়েছে। এই রকম শিবিরের সংখ্যা গতবছর ছিল ১৪০০ এবার তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজারেরও বেশী।

দেশগঠনে যুবগোষ্ঠী

—উৎপল সেনগুপ্ত

ছাত্ররা তাদের কর্মসূচীর অন্যতম হিসাবে বেছে নিয়েছে দেশের প্রত্নতত্ত্বকে ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার করার দায়িত্ব। এছাড়া প্রতিদিনের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: অঞ্চল পরিষ্কার ও গাছ পোঁতা। জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছা-সেবকরা যাতে বিশদফা কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করে তারজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা ও পণপ্রথা ধরণের সামাজিক শত্রুকে দূর করার জন্য প্রত্যেক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকরা আলোচনা ও শ্লোগানের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় সেবা প্রকল্পের ছাত্ররা নিজেদের হাতে আশ্রয়হীনদের ঘর-বাড়ী তৈরী করে দিচ্ছে।

এমনকি বিহার, উত্তর প্রদেশ ও ওড়িশার বন্যাপীড়িতদের মধ্যে দ্রুত ত্রাণের জন্য এইসব ছাত্ররাই এগিয়ে এসেছে খাদ্য ও বস্ত্রাদি নিয়ে। জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকরা ত্রাণ শিবির খুলে বন্যাপীড়িতদের আশ্রয় দিয়েছে। গ্রামের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও বয়স্ক-ব্যক্তিদের শিক্ষাদানে প্রতিদিন ক্লাস নিচ্ছে এই ছাত্ররাই।

এ বছরের গোড়ার দিকে 'নোংরা ও রোগের বিরুদ্ধে যুবকরা' এই শ্লোগানের ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২ হাজার শিবির খোলা হয়েছে। এতে জড়িত হয়েছে একলক্ষ ছাত্র, এদের প্রধান কাজ হল: বসন্ত প্রতিরোধে টীকা দেওয়া, ট্রিপল এন্টিজেন ও কলেরা টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়ার মত মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক ওষুধ বা ইঞ্জেকসন দেওয়া। এই কর্মসূচীতেই নেওয়া হয়েছে শিশুসহ জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি।

একটি গ্রামের পরিবার পরিকল্পনা

গ্রামের নাম হাতিডোবা। পশ্চিম-বঙ্গের এক নির্জন পাড়া গাঁ। এখানকার বেশীরভাগ লোক অনুন্নত ও তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানকার মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত তরুণ এগিয়ে এল এই গ্রামের বিবর্তন ঘটাতে। এখানকার একটি লাইব্রেরীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হল। ভেসেকটমি অপারেশনের সুফল পাওয়া গেল।

বিশদফা রূপান্তর

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশদফা কর্মসূচীতে বিশেষ করে ছাত্ররা স্বস্তি পেয়েছে। কেননা, তাদের আবাসিক কেন্দ্রে থাকার সুব্যবস্থাসহ বই ও অন্যান্য মনোহারী দ্রব্যের মূল্য কমে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রকল্প চালু হয়ে গেছে চারদিকে। উপকৃত হচ্ছে দেশের বহু শিক্ষানবিসী-হাতে-কলমে কাজ শেখার। এছাড়া, শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের উন্নতি রীতিমত আশাপ্রদ।

কর্ণাটকে কোলার গোল্ড ফিল্ডসের একটি কলেজের ছত্রিশজন ছাত্র সমাজ সেবায় এগিয়ে এসেছে। এইসব ছেলেরা রাস্তা-ঘাট মেরামত, গাছ পোতা, বাড়ী-ঘর তৈরীতে সাহায্যদান ও তপশীলীদের আবাস নির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। এরা কামসমুদ্রম থেকে বোড়াগুড়কি পর্যন্ত লম্বা রাস্তা তৈরী ও মেরামত করে দিয়েছে। এতদিন এই রাস্তা ছিল যানবাহনের চলাচলের বাধাস্বরূপ। এমনকি সামান্য গরুরগাড়ী পর্যন্ত চলতে পারতনা। এই ফার্মি রাস্তা এখন ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে এই ছেলেরাই বাঁধিয়েছে।

এই ছেলেরাই জগমানঘাটা পাহাড়ী এলাকাকে বনাঞ্চল করার দায়িত্ব নিয়েছে। তারা ৩০০ টি সুড়ঙ্গ খনন করেছে। এই এলাকায় গাছ পোতার ব্যাপারে সাহায্য করছে রাজ্য বন বিভাগ।

কোঙ্গারহীলিতে এরাই স্থানীয় লোকদের জনতা বাড়ী তৈরী করে দিয়েছে। গ্রামবাসীরা এদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।

কুড়ি দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবকরা সমান-অর্থনীতির এক সমীক্ষা চালিয়েছে তিনটি গ্রামে। ভূমি সংস্কার, বেগার শ্রম, তাদের নানা সমস্যা ও সরকারী সাহায্যের ব্যাপারে গ্রামবাসীরা কতটা সজাগ এর উপরই মূলতঃ সমীক্ষা চালানো হয়।

উদয়পুর এখানকার সেণ্ট পল্‌স বিদ্যালয়ের নমারি গ্রামের সাতজন গরীব চাষীর ভাগ্য ফিরিয়েছে। এই ছাত্ররা অনেকগুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। সমাজ উন্নয়ন অফিসারের সঙ্গে ৩০০ জন ছাত্র এই গ্রামে এক সপ্তাহের শিবির খোলে। এরা সাতটি দলে ভাগ হয়ে সাতজন কৃষকের জমিতে গভীর নলকূপ তৈরী করে দেয়। কৃষকরা এখন জমিতে জল দিতে পর্যাপ্ত জল পাচ্ছে।

কুড়ি দফা কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এ বছরই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দেশের ১০ হাজার ৪৯০টি হোস্টেলকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, একই সময়ে ৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ছাত্র এর সুবিধা পাচ্ছে। ছাত্রদের ব্যবহারযোগ্য সাদা কাগজ পাঠ্যপুস্তক ও খাতা-পত্রের দাম অত্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে।

হরিয়ানা সরকার তপশীলী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনে ১৩.৯ মিলিয়ান খরচ করবে। এরমধ্যে ছাত্রদের স্মারক স্কলারশিপ, শূকর কেনা, ও বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থলগ্নীর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে হরিজন ছাত্রদের জন্য ১৮০ টি আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ে হাইস্কুল পর্যন্ত বিনাব্যয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এবার একটি চাকরীর যোগাড় করো।
—আমার আঠারোয় পড়তে দেরী আছে।

কৃষি

মাছের অভাব মিটাতে জিওল মাছ

গোপাল দাস

পশ্চিম বাংলায় যত মাছ বিক্রী হয় তার আনুমানিক ১৫ ভাগ অধিকার করে আছে আমাছা। আমাছাগুলি আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন পুঁটি, মৌরালা, বেলে, রয়না, ট্যাংরা, চেলা ইত্যাদি চুনো মাছ। আর কই, শিঙ্গি, মাগুর, শাল, শোল, ল্যাটা, চিতল, ফলুই ইত্যাদি জিওল মাছ। জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকার জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন নেবার ক্ষমতা আছে বলেই ওরা সহজে মরে না। পক্ষান্তরে চুনো মাছগুলি খুবই ক্ষীণজীবী, অথচ প্রায় অধিকাংশ আমাছাই খাল, বিল, ডোবা, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের অপরিষ্কার জলে আপনা-আপনি জন্মায় ও বড় হয়। ওরাও কিন্তু আজকাল জাতে উঠেছে।

এরাজ্যে অনেক জলাশয় বহুকাল ধরে পতিত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। অথচ পতিত জলাশয়গুলি কোনও লাভজনক কাজে লাগানো হচ্ছে না। অগভীর বা কাদামাটি যুক্ত জলাশয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল ভাল জন্মায় না। কাজেই পতিত জলাশয়গুলি সংস্কার করে মাছ চাষের উপযোগী করতে হলে প্রচুর অর্থের দরকার। পতিত জলাশয়ের নীচে জৈবিক উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে। আর যেমন জলের নীচে দ্রবীভূত অক্সিজেন বেশী থাকে না তেমনি দ্রবীভূত কার্বন-ডাই অক্সাইড অতিমাত্রায় বেশী থাকায় রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি কার্প জাতীয় মাছ চাষের অনুকূল নয়। কিন্তু কই, সিঙ্গি, মাগুর মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে; ফলে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে বাঁচার ক্ষমতা আছে। সেজন্য ওরা কচুরি পানা ও শেওলা ভর্তি পতিত জলাশয়েও অনায়াসেই জন্মে ও বাড়ে।

কার্প মাছের চাষ ব্যয়বহুল। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানভিত্তিক এদের মিশ্র চাষও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ মাছের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে অল্প ব্যয়ে জিওল মাছের চাষ করা যেতে পারে। ওদের খাদ্য খাওয়ার জন্যও বাড়তি খরচ নেই বললেই চলে। সাধারণতঃ কই, সিঙ্গি, ল্যাটা কীট পতঙ্গ জলে যা জন্মায় তাই খেয়ে থাকে। জলের নীচের পঁচা পাতা, মরা পোকা, আশে পাশের কেঁচো ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশে যে সংমিশ্রণ তৈরী হয় তার থেকেও ওরা খাদ্য সংগ্রহ করে। সিঙ্গি, মাগুরের কার্ব হাইড্রেট গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। কই মাছ ছোট অবস্থায় জলের প্লাঙ্কটন খায়, বড় হলে জলীয় কীট পতঙ্গ খেতে পছন্দ করে। আবার খোল, ধানের কুড়া ইত্যাদি দেওয়া হলে তাতেও অরুচি নেই। প্রকৃতিগত ভাবেই খাবার কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়। আর স্বাভাবিক ভাবেই শীত ও গ্রীষ্মের অসময়ে খাদ্যাভাবে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়। কিন্তু এদের অসময়ে পরিবেশন করা খাদ্য দিয়ে যত্ন পরিচর্য্যা করা হলে আরও বেশী বড় করা যায়।

বর্ষা সমাগমে জিওল মাছ প্রথম বছরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাচ্চা দেবার উপযুক্ত হলে আকৃতি ও প্রকৃতির লক্ষণ দেখে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ সহজে চিনে বের করা যায়। সাধারণভাবে স্ত্রী মাছের পেট মোটা হয়, আর পুরুষ মাছের পেট স্বাভাবিক থাকে। আকারেও সামান্য লম্বা ধরণের হয়। আজকাল রুই, মৃগেল, কাতলা মাছের কৃত্রিম প্রজননের মত জিওল মাছেরও পিটুইটারী হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আর ডিম থেকে ডিম পোনা করবার জন্য এমনকি নাইলন হাপা ব্যবহার করা হয়েছে কল্যাণীর সরকারী মৎস্য চাষ খামারে। গবেষণায় কতগুলি সুফলও পাওয়া গেছে। বিদেশের থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, মালয় ও ভিয়েৎনামে গবেষণালব্ধ মাগুর মাছের জনপ্রিয়তা দেখা যায়। আমাদের দেশেও মাগুর ও অন্যান্য জিওল মাছের উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে। বিহারে কই সিঙ্গি মাছ পতিত পুকুরে চাষ করে সুফল পাওয়া গেছে। আসামে এবং কর্ণাটক প্রদেশে এসব মাছ চাষের উৎপাদন আশাপ্রদ। সমীক্ষা থেকে জানা যায় যেকোন পরিমিত জলাশয়ে জিওল মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ অনুশীলন করা হলে অন্য যে কোনও মাছের ফলনের থেকে বেশী হবে।

পশ্চিম বঙ্গে বর্ষাকালে প্রাকৃতিক জলাভূমি থেকে কই, মাগুর, সিঙ্গি, শোল, শাল, ল্যাটা মাছের বাচ্চা বিভিন্ন অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়। এই সংগ্রহ করা বাচ্চা দিয়েও ওদের উন্নত ধরনের চাষ শুরু করা যেতে পারে।

বিনাচাষে পশ্চিম বাংলায় কই, মাগুর
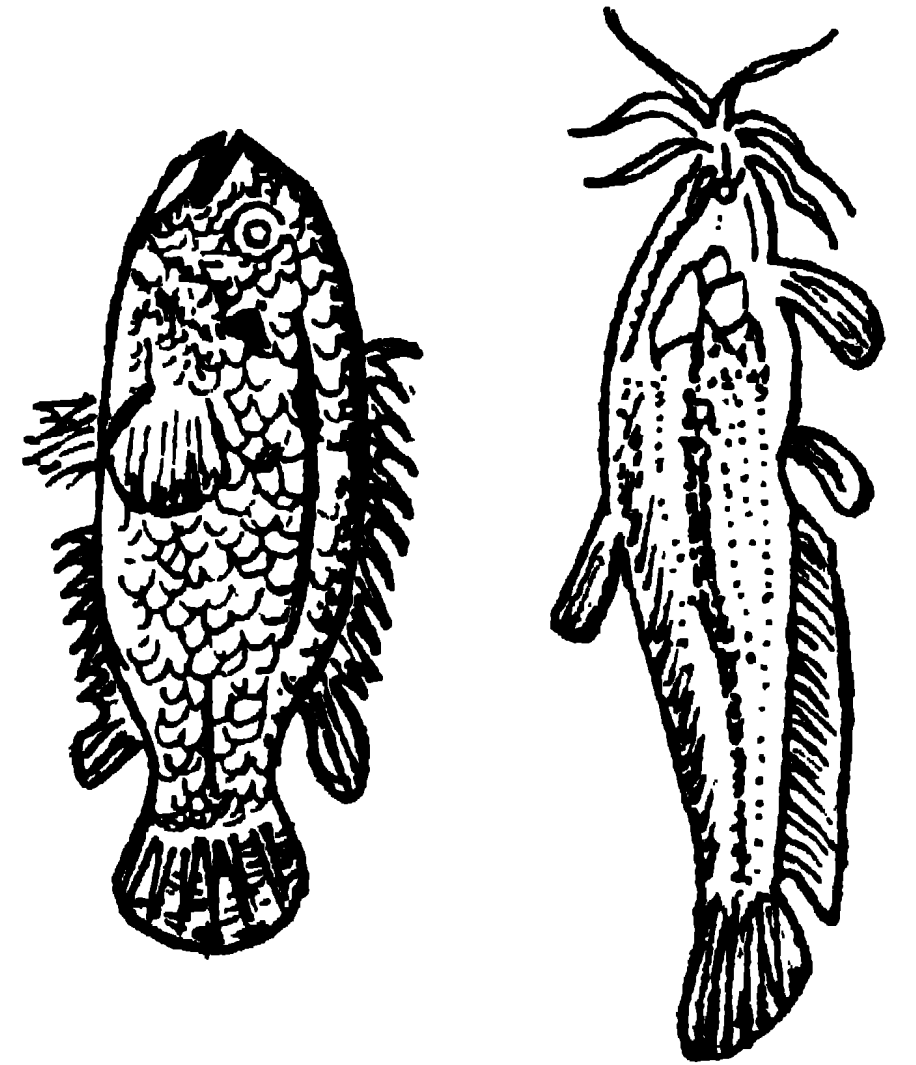
সাধারণভাবে বাঁশের বেড়া দিয়ে উত্তর ২৪ পরগণায় মাকরদহ ও মথুরা বিলের মত বড় বড় পতিত জলাশয় ছোট ছোট অংশে ভাগ করে তাতে জিওল মাছের চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। উক্ত বিল দুটির আমাছারও যথেষ্ট নাম আছে। নিদানপক্ষে আমাছার দৌলতে স্থানীয় মৎস্য সমবায় সমিতিটি ও তার ৩১৪ হাজার অনুগামী টিকে থাকার সুযোগ পাবে। কেননা, আজকাল আমাছারও চাহিদা ও বাজার দর শীর্ষে।

খাদ্যগুণেও জিওল মাছের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে। কই ও মাগুর মাছের নামডাক আগেও ছিল, এখনও আছে। এসব মাছে প্রোটিন বেশী থাকে, চর্বি কম থাকে, শরীর গঠন উপযোগী লোহার পরিমাণও যথেষ্ট থাকে। সেজন্য রোগীর পথ্য হিসেবেও এদের কদর বেশী।

যেসব পতিত জলাশয়ে মাখনা, পানিফল চাষ করা হয়, এর সঙ্গে জিওল মাছের চাষ করলে আরও বেশী অর্থলাভ হতে পারে। ২৪ পরগণার খড়দহতে পয়ঃ প্রণালীর জল পুকুরে নিয়ে তাতে মাগুর ও তিলাপিয়া সমান অনুপাতে চাষ করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে। মাগুর ও তিলাপিয়ার মিশ্র চাষের ফল ভাল। উন্নত উপায়ে জিওল মাছের চাষ আগ্রহীরা নদীয়া জেলার কল্যাণীর খামার-পুকুরে বা গবেষণাগারে এসে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করতে পারেন।

গ্রামের নাম ডিহি মেদান মেলা

১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ঢেলে নজর দিলে তো পারতো। আমার দলে একজন ছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং এর শিক্ষক আর ঐ তরুণ ছাত্রটি ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র। শিক্ষক বললেন "মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে নিশ্চয়ই ইচ্ছে হয়। বাসনা আছে বলেই তো আজকে গ্রামে একটি ছাত্র পাঠিয়েছি। একটি ছাত্রের সাধ্যে যা কুলোয় সেই মত অর্থ সংগ্রহ করছি। হয়তো বছর দশেক কাজ চালালে গ্রামীণ গৃহনির্মাণে অনেক উন্নতি আনা যাবে। তাতে গ্রামের জিনিসই ব্যবহার হবে, শহরের জিনিষ নয়। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখেছেন। আমাকে তো কোন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান উপদেষ্টা হিসেবে ডাকবে না—কারণ সব প্রতিষ্ঠানের কাজের ঢঙই হচ্ছে শহর কেন্দ্রিক। ঐ গ্রামের গৃহনির্মাণ বিদ্যেতো আমার কোন কাজেই আসবে না। শিক্ষকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তরুণ ছাত্রটি বললো "এই গ্রামীণ সমীক্ষায় যেখানে আমাদের পাঁচজনের কাজ করার কথা ছিল, চারজনই দু'দিন এসে পালিয়েছে। বলে গেল গ্রামের ইঞ্জিনীয়ার হবো না। আমি চালিয়ে গেলাম কারণ এই গ্রামেই আমার বাড়ী।" বুঝলাম সরকারী উদ্যোগ ও উৎসাহ চাই। কিছু কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রুরাল হাউসিং বা গ্রামীণ গৃহসংস্থা বিভাগ খোলা উচিত—পোষাকী ঢঙে নয় বাস্তব ঢঙে। যে সব ছেলে কাজ করবে, শিখবে, তারা ছড়িয়ে যাবে গ্রামে।

চলতে চলতে কখন বেলা একটা বেজে গেছে বুঝতেই পারি নি। পেটের খিদে ঘড়ির দিকে তাকাতে বাধ্য করেছে। আমরা সঙ্গে খাবার নিয়েছিলাম। তরুণ ছাত্রটির ব্যবস্থানুযায়ী গ্রামীণ এক মাষ্টার-মহাশয়ের বাড়ীতে খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। সেই বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর পরিবেশ অপূর্ব। বিস্তীর্ণ মাঠ একদিকে, আরেক দিকে তার নিজস্ব ফলের বাগান। তারই ধার ঘেষে রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে ধানের ক্ষেত যতদূর চোখ যায়। রেললাইন ধানক্ষেতকে কেটে বেরিয়ে গেছে। বাড়ীর সামনে গোলাপ-বাগান, একচিলতে জমিতে নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। শীতের পাখী এ ডালে ও ডালে উড়ছে, ডাকছে। সব মিলে এক কথায় চমৎকার। এর মাঝে বেমানান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাষ্টার মহাশয়ের একটি ইটের বাড়ী।

গল্পে গল্পে বেলা পড়ে এলো। মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী চায়ের তৃষ্ণা মেটালেন। এখন বাড়ী ফেরার পালা। ডিহি মেদান-মেলা চব্বিশ পরগণার এক পরগনা ছিল। সেই আমলের এক দীঘি আস্তে আস্তে মজে গিয়ে আজ হোগলা বন তার চারপাশ ঘিরে আস্তে আস্তে ডাঙ্গায় অনেক উঁচু গাছ, অধিকাংশই নারকেল গাছ। হোগলা বন এত ঘন, এত উঁচু এতে মনে হলো জিরাফও লুকিয়ে থাকতে পারে। এই হোগলা বন আজ কত নাম না জানা পাখীর রাতের আস্তানা।

গোধূলী আস্তে আস্তে ঘন হচ্ছে। পাখীর ঘরে ফেরা দেখে মন আরও সতেজ হলো। ওদের কতো কথা—মনে হয় ওদের কথা কোনও দিনও ফুরবে না। যারা পাখী দেখতে চায়, জানতে চায় ডেহি মেদান মেলার ঐ মজে যাওয়া দীঘি অনেক সন্ধান দেবে। এবার গাড়ী চড়া আর বাড়ী ফেরা। ফিরছি আর ভাবছি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭৬-কে জনবসতি বছর নাম দিয়েছে। কানাডার ভ্যাঙ্কবার শহরে একশ চব্বিশটি দেশের সরকারী প্রতিনিধি আলোচনায় বসেছে। আজকের জনবসতির অগণিত সমস্যার সমাধান অনুসন্ধানে তাঁরা মেতেছেন। কিন্তু সেখানে গ্রামের উল্লেখ কই। সমস্ত এশিয়া জুড়ে আজও গ্রামেই অধিকাংশ মানুষের ঠাঁই। তার গৃহসমস্যা ভাববে কে?

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও খাদ্যশস্যের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিই আজ সকলের লক্ষ্য। কিভাবে শুষ্ক, পতিত জমিকে চাষের কাজে ব্যবহার করা যায় অথবা এক-ফসলী জমিকে দুই বা তিন-ফসলী জমিতে পরিণত করা যায়—এ চিন্তা আজ দেশের চাষী, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ ও শাসনযন্ত্রের পরিচালক-সকলের। প্রচুর পরিমাণে জলের যোগান ছাড়া কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়, আর এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি মাটির নীচে ভূস্তরে অনেক জায়গাতেই প্রচুর জলের যোগান রয়েছে। রাজ্যের অনেক জায়গায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সেচের কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব ছিল না; সে সব জায়গায় দুই তিন দশক আগেও চাষীকে জলের জন্য আকাশের মেঘের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হত। ঠিক সময়ে জল না পেলে চাষের কাজে সুবিধা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণ মত জল পাওয়াটা আজ আর স্বপ্নের ব্যাপার নয়। মাটির নীচে বেশ কিছুটা গভীরে যেখানে ভূস্তরে প্রতিনিয়ত ভালভাবে জলের প্রবাহ চলেছে সে পর্যন্ত নলকূপ বা টিউবওয়েল বসিয়ে চাষের জন্য এই ভূ-জল পাওয়া সম্ভব। তবে প্রাকৃতিক কারণেই জলের স্তরের গভীরতা বা জলের যোগান সর্বত্র একরকম নয়। নলকূপ বসাবার আগে সেই তথ্যগুলি একটু জানা প্রয়োজন।

চাষের জল—পশ্চিমবঙ্গের ভূস্তরে

সুনীল ভট্টাচার্য্য

প্রকৃতিদেবীর কোন কার্পণ্য নেই। জলের উৎস এখানে বিভিন্ন প্রকারের; আকাশের বৃষ্টির জল ছাড়া আছে—নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর। এর সঙ্গে আরও আছে পশ্চিমবঙ্গের মাটির নীচে ভূস্তরের জল—যা সাধারণতঃ কূপ খনন করে বা টিউব ওয়েলের সাহায্যে পাওয়া যায়।

নদী, নালা ইত্যাদির জলে সেচের সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র নেই। ডি-ভি-সি, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ইত্যাদি প্রকল্পের সেচের জল কোন কোন স্থানের জমিতে আসে বটে কিন্তু মোট চাষের জমির প্রায় তিন চতুর্থাংশই সে ধরণের সুযোগ পায় না। এর প্রধান কারণ ভৌগোলিক, নদী-নালা তো রাজ্যের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে নেই, আর সেচের খালের জন্য জমির দামও একটা বড় সমস্যা। কিন্তু

পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগটাই গাঙ্গেয় পলিভূমির অংশ। এই গাঙ্গেয় পলিভূমিতে বালি ও বালিমাটির স্তরগুলিই হল ভূজলের ভাণ্ডার। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির কিছু অংশ আর পশ্চিমে বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার কতকাংশ ছাড়া প্রায় গোটা পশ্চিমবঙ্গেই এই গাঙ্গেয় পলিভূমি বিস্তৃত। জলের স্তরগুলি পলিভূমির মধ্যে কোথায়, কত নীচে ও সেখানে জলের যোগান কিরকম এসব তথ্য বিশদ ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেই জানা সম্ভব। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে নলকূপ বসাবার কাজ হয়েছে তাতেও ভূস্তরের জলের অনেক তথ্যই পাওয়া গেছে।

দেখা গেছে যে পলিভূমির গভীরতা যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশী চাষের জন্য নলকূপের সম্ভাবনাও সেখানেই। বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলায় ও উত্তরবঙ্গের পাথুরে অঞ্চলের পাশাপাশি যে পলিভূমি আছে সেখানে পলিভূমির গভীরতা বেশী নয়, সেখানে চাষের জন্য অল্প পরিমাণ জলই পাওয়া সম্ভব; তথাকথিত গভীর নলকূপ খননের সাফল্যের সম্ভাবনা কম। তবে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় অধিকাংশ অঞ্চল, উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ এবং হুগলী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার অধিকাংশ স্থানেই চাষের জন্য নলকূপ বসানো সম্ভব। এই স্থানগুলিতে প্রচুর জলবাহী স্তরগুলি সাধারণতঃ মাটির নীচে ২০০ থেকে ৫৫০ ফুটের মধ্যেই আছে। হুগলী, নদীয়া ও বর্ধমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নলকূপ ৩৫০ ফুটের নীচে নেওয়ার প্রয়োজনই হয় না। আবার চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে ও মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রের উপকূল অংশে অগভীর স্তরগুলির জল নোনা। কিন্তু নোনা জল চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৩৫০ ফুটের নীচে ও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে ৬৫০ ফুটের নীচের স্তরের ভূজল চাষের উপযোগী। উত্তর বঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার যে অংশে নলকূপ বসাবার মত পলিভূমি আছে সেখানে জলবাহী স্তর নির্দিষ্টভাবে অনেক জায়গায় না পাওয়া গেলেও পলিভূমির মধ্যে কোথাও কোথাও প্রচুর কাঁকর, বালি ও নুড়ি একত্রিত রয়েছে, এবং তারই মধ্যে রয়েছে চাষের উপযোগী জলের সঞ্চয়।

বিভিন্ন জেলায় ভূজলের যোগান কিরকম এ বিবেচনা ছাড়াও অন্যান্য জলের উৎস সেচের সুবিধা ও চাষীদের জলের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সরকারের সাহায্যে অনেক গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা যায় গভীর নলকূপগুলির সংখ্যা

বিভিন্ন জেলায় এইরূপ :—

জেলা	সংখ্যা
দার্জিলিং	১
কুচবিহার	১৫
জলপাইগুড়ি	৩৩
বীরভূম	৩৯
বাঁকুড়া	৫৯
হাওড়া	৭৮
প: দিনাজপুর	১১৬
মালদহ	১২৮
মেদিনীপুর	১৮৭
চব্বিশ পরগণা	২১৫
হুগলী	২২৩
বর্ধমান	৩০২
মুর্শিদাবাদ	৩৭১
নদীয়া	৫০৯

হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের যে অংশে গভীর নলকূপগুলি বসানো হয়েছে সেই সব অঞ্চলে ভূস্তরে জলের যোগান খুব বেশী। উপরে ১২ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত গভীর নলকূপ এই সব জায়গায় স্বাভাবিক পাম্পের ফলে ঘন্টায় সধারণত: ৪০ থেকে ৫৫ হাজার গ্যালন পর্য্যন্ত জল দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশী। অন্যান্য জেলায়, যেখানে অপেক্ষাকৃত কম জল পাওয়া যাচ্ছে সেখানেও ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪৫ হাজার গ্যালন পর্য্যন্ত জল পাওয়া যায়। যেখানে জল বেশী পরিমাণে (ঘন্টায় ৪০ হাজার গ্যালনের বেশী) পাওয়া যাচ্ছে সেখানে চাষীদের মধ্যে জলের বন্টন ঠিকভাবে করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ২০০ একরের মত খারিফ শস্য চাষের জমি অথবা ৩০০ একরের মত রবিশস্য চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

চাষের জমিতে সেচের জল বন্টন আমাদের দেশে একটা বড় সমস্যা। সুষম চালযুক্ত বিস্তীর্ণ এলাকা না হলে জমিতে জলের বন্টনে অসুবিধা হয়, এবং গভীর নলকূপ বসিয়ে সুবিধা হয় না। এজন্য আজকাল চাষীদের মধ্যে অগভীর নলকূপের প্রচলন হয়েছে ভালোভাবেই। অগভীর নলকূপের একটি বড় সুবিধা হ'ল—মাটির নীচে জলের যোগান অপেক্ষাকৃত কম হলেও এ ধরণের নলকূপ বসানো চলে। এতে খরচও কম, তাই চাষীর পক্ষে সহজেই নিজের জমিতে এ ধরণের নলকূপ বসানো সম্ভব। জেলায় জেলায় গভীর নলকূপ ছাড়াও এখন অগভীর নলকূপের ছড়াছড়ি। ৩।৪ ইঞ্চি ব্যাসের এই ধরণের ছোট নলকূপ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত: ১৫০।১৬০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর হয়। এতে ২।৩ একর জমি ভালো ভাবেই চাষ করা সম্ভব। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্ধমানের যে অঞ্চলে পলিভূমির গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম সেখানে অগভীর নলকূপের সাহায্যে কিছুটা চাষের কাজ চলতে পারে। যে সব স্থানে পলিভূমি ৫০।৬০ ফুটেরও কম এবং জমি পাথুরে—অনুকূল অবস্থায় সেখানেও চাষের জন্য ভূজল কিছুটা পাওয়া সম্ভব, তবে তা বড় ব্যাসের কূয়ো বা ইঁদারা খনন করে। পশ্চিমবঙ্গে কতকগুলি স্থানকে চিরন্তন খরা এলাকা বলা চলে, তারই বেশ কিছু অঞ্চলে এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া সম্ভব।

ভূস্তরের জল প্রকৃতির এক আশীর্বাদ। পশ্চিমবঙ্গও প্রকৃতির এই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের মাটিও অধিকাংশ জায়গাতেই চাষের উপযোগী। অধিকফলনের জন্য জমির কৃষি সম্পর্কিত গুণাগুণ, শস্যের ধরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন; সেই সঙ্গে প্রয়োজন স্থান, কাল বিচার করে ভূজলের ব্যবহার। অন্যান্য জলের সঙ্গে ভূজলের সদ্ব্যবহার করতে পারলে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে "সবুজ বিপ্লবের" আবির্ভাব ঘটবে।

দেশ গঠনে এগিয়ে আসুন

কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই

একটি সামাজিক অভিশাপ পণপ্রথা

বাণী চট্টোপাধ্যায়

বিবাহ হল স্বর্গীয় প্রথা। কিন্তু এর যে বিরাট একটা গলদ পণপ্রথা তা আমাদের নরকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এর থেকে আমরা মানে আমাদের সমাজ কি কোনদিন বেরিয়ে আসতে পারবে? আমার ব্যক্তিগত মত হল, এই প্রথা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল মেয়েদের বা মহিলাদের এই প্রথার বিরুদ্ধে নিজেদের জেহাদ্ ঘোষণা করা।

এই প্রথা আমাদের দেশে বোধহয় চিরকালই আছে। যুগের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রকমফের হয়েছে মাত্র। আগেকার কালে ছিল সোনা, ও গৃহস্থালী তৈজসপত্র বা তারও আগে গৃহপালিত পশুও যৌতুক বা পণ হিসাবে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্রিজ, টি ভি, রেডিওগ্রাম, ভালো ভালো আধুনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র এবং মোটা ক্যাশ টাকা। সোনার চাহিদা হয়তো বা কিছুটা কমেছে। ক্যাশ টাকাটা নেওয়া পাত্রের পিতার ওপরেই বেশীর ভাগ নির্ভর করে।

এই পণপ্রথা ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় সারা পৃথিবীতে চালু ছিল। দ্বিতীয় চার্লস যখন পর্তুগালের রাজার ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন তখন বৃটিশরা যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই শহরটি পেয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের পরে যখন ফিউডাল প্রথা ভেঙ্গে গেল তখন পশ্চিমের দেশগুলো থেকে মোটামুটিভাবে পণপ্রথা অনেকটা কমে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে, দুঃখের বিষয় এতবড় স্বাধীনতার পরও সমাজে এই প্রথা চলতে লাগল। কেননা কিছুটা শিল্প বিপ্লব হবার ফলে এবং সমস্ত টাকা কিছু লোকের হাতে যাবার ফলে এই প্রথার বিশেষ কোনই পরিবর্তন হতে পারলনা। ভারতবর্ষে এখনও নেগোসিয়েটেড বিবাহ চলছে এবং দেনা পাওনার বোঝাও সমানে পাত্রীর বাবা বা আত্মীয়ের ওপরে এসে পড়েছে। এইটাই কি সমাজের একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা নয়?

অনেকেই পণপ্রথাকে সমাজের একটা অভিশাপ বলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কারা বলেন? নিশ্চয় খুব একটা সম্পন্নলোকেরা নয়। কারণ অবস্থাপন্ন লোকেদের কাছে পণ সমস্যা নয়। তাহলে কি যারা খুব গরীব তাদের কাছে? না তাদের কাছেও পণপ্রথা একটা সমস্যা নয়। কারণ তার পণ দিতে বাধ্য নয়। আর তাছাড়া তাদের এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করতে হয়না। তারাই কিন্তু আমাদের দেশে বেশীর ভাগ অংশ। তাহলে এ সমস্যায় সবচেয়ে কারা বেশী জর্জরিত? এরা হচ্ছে মধ্যবিত্ত সমাজ। আজকের সমাজে এদের কথাই হচ্ছে সমাজের কথা তথা দেশের কথা। এই মধ্যবিত্ত সমাজ একদিকে বলছে পন নিওনা বা দিওনা আবার অন্যদিকে তারাই গোপনে পণ দিচ্ছে এবং নিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা সমাজে সবচেয়ে বেশী Suffer করছে কেন? তার উত্তরে বলব, পাত্রীর পিতাদের ভালো পাত্রের দিকে ঝোঁক। এরজন্য পিতাকে যে দাম দিতে হচ্ছে তা সাধ্যের বাইরে। পাত্রীর পিতাদের দামী পাত্রের চাহিদার প্রতিযোগিতায় পাত্রের পিতারা তাঁদের পুত্রদের দাম আরো উঁচুতে তোলার চেষ্টা করছেন। ফলে এই পণ নেওয়ার চেষ্টা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে।

পণপ্রথা দূরীকরণের পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে জাতি প্রথা। নিজের জাতের মধ্যে গোত্র মিলিয়ে ভালো পাত্র পাত্রীদের পিতারা খুঁজছেন। অন্যজাতে বা অন্য গোত্রে বিয়ে দিতে নারাজ। তাছাড়া তাঁদের ধারণা তাঁরা যদি অন্য জাতে কন্যার বিবাহ দেন তাহলে নাকি তাদের নিন্দা হবে স্নুতরাং Castless সমাজ আমরা চিন্তাই করতে পারিনা। যদি সমাজ থেকে এই পণপ্রথা দূর করতে হয় তাহলে Caste System এর কথা ভুলতে হবে।

ধনী পাত্রীর পিতাদের লক্ষ্যই হচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও উচ্চ সরকারী চাকুরীয়া পাত্রদের ওপর। তাঁরা তাঁদের কন্যাদের জন্য মোটা টাকা ক্যাশ দিয়ে বড় বড় সরকারী চাকুরীয়া পাত্র কেনেন। কিন্তু বেশীর ভাগ বড় বড় সরকারী চাকুরে পাত্ররাই আসে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। স্নুতরাং তাদের বড়লোক পাত্রীর পিতারা মোটা টাকা ক্যাশ বা আনুষঙ্গিক আরো দামী দামী যৌতুক দিয়ে পাত্র কিনে নেওয়ার পর কিন্তু ঐ সকল পাত্ররা বড়লোক পিতার কন্যার চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেকেই চাকুরী ক্ষেত্রে নানা রকম অন্যায়ের শিকার হন।

সমাজ যতদিন স্ত্রীলোকদের বোঝা মনে করবে ততদিন আমাদের সমাজ থেকে পণপ্রথার অভিশাপ যাবে না। তবে বর্তমানে যে সমাজে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে সমতার লড়াই শুরু হয়েছে তা

যদি সর্বক্ষেত্রে সফল হয় তাহলে হয়তো পণপ্রথার দোষগুলো সমাজ থেকে নির্মূল করা যেতে পারে

অনেক আদিবাসী ও পাহাড়ী জাতির মধ্যে নিয়ম আছে বিবাহের সময় পাত্রীর পিতাকে পাত্রের পিতার পণ দিতে হবে। তার কারণ আর কিছুই নয় তারা কন্যাকে অর্থনৈতিক সম্পত্তি বলে মনে করে। কেননা তাদের ঘরের মেয়েরা পুরুষদের মতোই কাজ করতে পারে এবং পয়সা রোজকার করতে পারে। সুতরাং পাত্রীর পিতার নিশ্চয় পণ নেওয়ার অধিকার আছে।

আমরা যদি পশ্চিমের দেশগুলির মতো গৃহস্থালী কাজের জন্য বেতন দাবী করি তাহলে হয়তো পণের বিরুদ্ধে কিছু করা যায়। কিন্তু পশ্চিমের মহিলারা বেশীর ভাগই বাইরে কাজ করেন যাঁরা তাঁরাই গৃহস্থালী কাজের জন্য বেতন দাবী করছেন। আমাদের দেশে যেহেতু বেশীর ভাগ মহিলারাই বাইরে মানে অফিস আদালত ইত্যাদিতে কাজ করেননা মুষ্টিমেয় কিছু মহিলারাই কাজ করেন সুতরাং তাঁরা গৃহস্থালী কাজের জন্য বেতন দাবী করতে পারেন না। সেইজন্য তাঁদের গৃহস্থালী কাজের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন মূল্য দেওয়া হয়না।

আসল কথা, ভারতবর্ষের মেয়েরা পশ্চিমের দেশের মেয়েদের মতো এখনও প্রচুর পরিমাণে স্বাবলম্বী হয় নি। এখনও ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব বহুল পরিমাণে কাজ করে যাচ্ছে।

এখন কথা হচ্ছে শুধু আইন করে কি এই কুপ্রথা দেশ থেকে বিতাড়ন করা যাবে? আমার মনে হয় তা সম্ভব হবেনা। সরকার সরকারী কর্মচারীদের আইন করে পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে চেষ্টা করছেন বটে। তাতেই কি আমরা সফল হব? আসল লড়াই আমরা এর বিরুদ্ধে করতে পারি যদি মেয়েরা একতাবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াই। এর জন্য দরকার আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা। তবে উচ্চশিক্ষা পেয়ে যদি সেই সকল মেয়েদের জন্যই মোটা টাকা পণ দিয়ে পাত্র খুঁজতে হয় তাদের সমতা বজায় রাখার জন্য তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষা বা উচ্চ-শিক্ষা পরোক্ষে পণপ্রথাকেই সমর্থন করবে। একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলারাই পারেন এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। এবং তাঁদের বলা উচিৎ যে তাঁদের যাঁরা বিবাহ করবেন তাঁরা পণ নিতে পারবেননা। তাছাড়া মায়েরা যাঁরা আজকে মেয়ের বিবাহের জন্য পণ গুনছেন তাঁরাই আবার ভবিষ্যতে পুত্রের বিবাহের সময় মোটা টাকা পণ ঘরে তুলছেন। মায়েরাও পারেন এই প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। কেননা আমাদের দেশে পুত্র কন্যার বিবাহে মায়েদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তাঁরা যদি এগিয়ে না আসেন বা এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করেন তাহলে আমার মনে হয় বোধহয় পণপ্রথা সমাজ থেকে যেতে আরও অনেক সময় লেগে যাবে। সেইজন্য আমি আবার বলছি আসুন আমরা সকলেই এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই এবং এর মূল সমাজ থেকে একেবারে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করি। আমরা এখনও হয়তো ভাবতে পারছিনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেনা-পাওনার মতো কত দেনা-পাওনার করুণ ঘটনা আমাদের সমাজে কত ঘরে ঘটে চলেছে।

ফুল-ব্রাইট

১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

—দেশ ছেড়ে এতদূরে থাকতে পারব না মানসদা। আমি যে কিছুতেই বাপ-মা, ভাই-বোনের কথা ভুলতে পারি না।

—কোনো রকম নস্টালজিয়াকে প্রশ্রয় দিও না অর্ণব। মানস মুখ গম্ভীর ক'রে উপদেশ শুরু ক'রল, এখন ইণ্ডিয়ায় কত বেকার জানো? ন'কোটি। ফিরে গিয়েই যে তুমি চাকরি পাবে এমন গ্যারাণ্টি নেই। ওখানে কয়েক কোটি ভারতসন্তান এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে অহল্যার মতো তপস্যা ক'রছে।

—মানসদা এইসব ভেবেই কি আপনি এখানে থেকে গেছেন? অর্ণব ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল।

—ঠিক তাই। তাছাড়া এখানে একটানা কিছুদিন থাকবার পর ওই লো ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং—হরিবল্! অর্ণবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মানস সোম ব'লল, কোনো ডিসিশান নেবার আগে ভাল ক'রে সবকিছু ভেবে দেখো।

ট্রেনিং শেষ। অর্ণবের এবার ঘরে ফেরার পালা। সুশানের সঙ্গে অর্ণব শেষ বারের মতো সান ফ্রান্সিসকোতে বেড়াতে এসেছে। ওরা সমুদ্রের ধারে এসে ব'সেছে। রঙিন সুতোয় বোনা বিকেল। এপ্রিলের শান্ত পেসিফিক। অর্ণব সুশানের দিকে তাকাল। ওর ক্রিমসন রেড ফ্যান্সি স্কার্ট হাওয়ার চোঁয়ায় প্রজাপতির মতো অল্প অল্প দুলছে।

—তুমি খুব বাজে লোক। সুশান ফিক ক'রে হাসল।

—কেন? অণব অপ্রতিভ হ'ল।

—তোমার সঙ্গে মিশে আমি সেন্টি-মেণ্টাল হ'য়ে গেছি।

—আমেরিকানরা কখনও সেন্টিমেণ্টাল হয় না।

—আমি আমেরিকান নই, আমি মানুষ—একটা আস্ত মেয়েমানুষ। সুশান অর্ণবের চোখে চোখ রাখল।

—তোমার শরীরই তো তার আইডেনটিটি।

—অর্ণব, তুমি এখানে থাকতে পারো না? প্রশান্ত মহাসাগরের অতলান্ত নীল জলের সঙ্গে সুশান ডারিংটনের নীল চোখ মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেল।

—হয় না সুশান, কিছুতেই তা হয় না। অর্ণবের বুকের মধ্যে একটা কষ্ট পাকিয়ে উঠছে।

—কেন? তুমি কি ফিঁয়াসের জন্যেই ফিরে যাচ্ছ?

অর্ণবের মধ্যে স্মৃতির স্বয়ংক্রিয় প্রোজেকটারটা চালু হ'য়ে গেল। ছবি, ছবির পর ছবি—অনেক ছবি। কৃষ্ণার জন্যে অর্ণব বুকের দাঁড়ে একটা দোয়েল পুষে রেখেছে। ও বিষন্ন গলায় বলল।

—অনেক বড় কিছুর জন্যে আমি ফিরে যাচ্ছি সুশান।

খেলা ধূলা
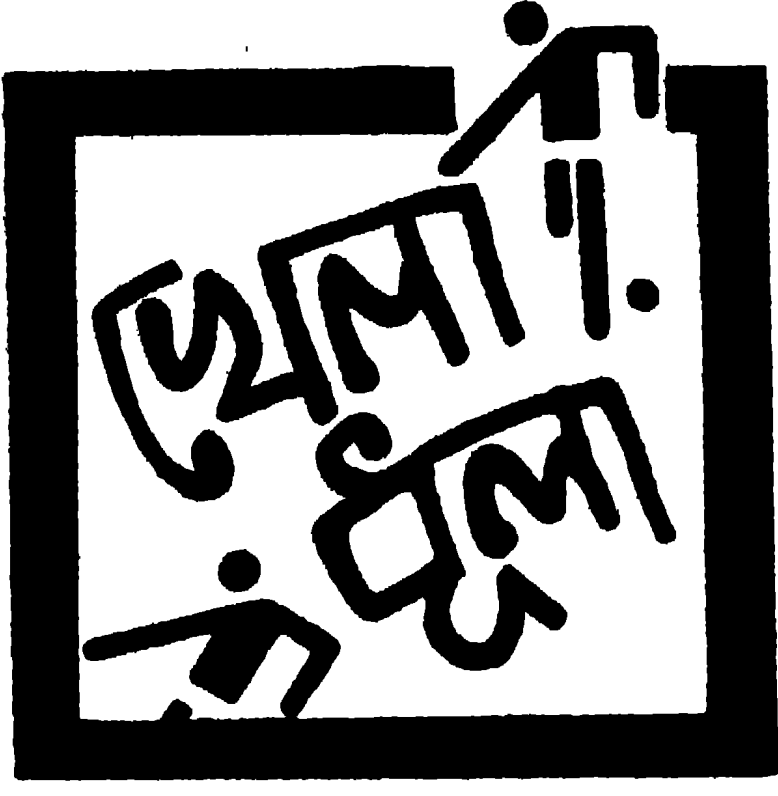
"কলকাতার গড়ের মাঠ আমি ১৯৭৩ সালেই প্রথম দেখি। খুব ছোটবেলা থেকে আমি কলকাতার কথা শুনেছি। ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান এই বাংলা—কলকাতা, তাই অন্যান্য সব খেলোয়াড়দের মত আমিও স্বপ্ন দেখতাম কলকাতার সোনালী সতেজ সবুজ মাঠের গালিচাতে ফুটবল খেলবো। অবশেষে সার্থক হ'ল আমার বহুদিনের স্বপ্ন—১৯৭৩ সালে। মহামেডান স্পোর্টিং থেকে আমার ডাক এলো। ঐ মরশুমে খেলার জন্য ছুটে এলাম স্বপ্নের নগরী কলকাতায় ফুটবল খেলতে। প্রথম যেদিন ম্যাচ খেলতে নামলাম তার আগের

জার্সি বদলাবার ইচ্ছে নেই

— আনোয়ার হোসেন

দিন রাত্রে উত্তেজনায় ঘুম প্রায় হয়ই নি বলা যেতে পারে। ও! সে এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা। আজও মনে আছে খেলার প্রথম দিনের কথা। কলকাতার মাঠের দর্শকরা এত খেলা পাগল যে চিন্তা করতে পারে না অন্য প্রভিন্সের খেলোয়াড়রা"।

স্মৃতিচারণ করছিলেন সেদিন বৃষ্টিভেজা সকালে হাওড়া ইউনিয়ন-মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে বসে বর্তমান বছরের (১৯৭৬) মহামেডান স্পোর্টিং দলের অধিনায়ক আনোয়ার হোসেন। মিষ্টভাষী জামসেদপুরের এই আনোয়ার হোসেন কলকাতার মাঠে প্রথম আবির্ভাব লগ্ন থেকেই খেলে চলেছেন অতীতের ঐতিহ্যশালী মহামেডান স্পোর্টিং দলে—আজও খেলছেন—ইচ্ছা, জার্সি তিনি পালটাবেন না। মহামেডান দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আনোয়ার খেলার মাঠে যেমন ভীষণ সংগ্রামী মাঠের বাইরে ঠিক তেমন অমায়িক অনিন্দ্যসুন্দর মানুষ। তেইশ বছরের এই এই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আনোয়ার হোসেন খেলেন ষ্টপারে। এই বছর দলাধিনায়ক। জন্ম জামসেদপুরের কদমায়। ১৯৬৫ সাল থেকে প্রকৃত পক্ষে ফুটবলের হাতেখড়ি। স্থানীয় ইয়ংগার স্পোর্টিং দলে খেলা শুরু ১৯৬৫ তে—১৯৬৬ পর্যন্ত ওখানে খেলার পর জামসেদপুর মহামেডান স্পোর্টিং-এ খেলেন দু'বছর—১৯৬৭ ও ১৯৬৮। এরপর টিসকোতে '৬৯ থেকে '৭২ পর্যন্ত খেলে মোটামুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর ১৯৭৩ সালে ডাক এলো কলকাতার নামী দল মহামেডান স্পোর্টিং থেকে।

১৯৬৭ সালে জামসেদপুর সেন্ট্রাল বারমিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বারমিয়া সিটি কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। স্কুলে ফুটবল দলের ছিলেন সুযোগ্য অধিনায়ক। কলেজে পড়ার সময় রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন দুবার—১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে।

জীবনের স্মরণীয় খেলার কথাতে মুখটা লাল হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"খুব চেষ্টা করেছিলাম ইষ্টবেঙ্গলকে হারাতে। ১৯৭৪ সাল—ইষ্টবেঙ্গলের স্মরণীয় বছর। ওরা চেষ্টা করছে পর পর পাঁচ বারের লীগ জয়ের অনন্য সাধারণ রেকর্ডকে স্পর্শ করতে। আর আমাদের চেষ্টা যেমন করেই হোক আমাদের রেকর্ডকে অটুট রাখা। তাই লীগের খেলাতে আমাদের সবার শপথ ছিল ঐ খেলায় জিততে হবেই হবে। খেলা ছিল খুব উত্তেজনাপূর্ণ। খেলাতে জেতার জন্য প্রাণমন সঁপে নিয়েছিলাম সেদিন। না—পারিনি জিততে। ওদের বাধা দিতে পারলাম না। ওরা লীগ জয় করলো পর পর পাঁচবার আমাদের হারিয়ে।"

মাণিকলাল দাশ

কেউ জানে কেউ জানেনা

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় সবে ফুটবল খেলা স্থুরু হয়েছে। খেলাটা অবশ্য তখন পুরোপুরি ইংরেজ রাজকর্মচারী আর গোরা সৈন্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সেই সময় রোজ ভোর বেলায় মার সঙ্গে ছোট্ট একটি ছেলে বাবুঘাটে যেতো। মা গঙ্গায় চান করতেন। সে ঘাটে বসে থাকতো। যাওয়া-আসার সময় ঘোড়ার গাড়ীর দরজা ফাঁক করে ছেলেটি চোখ গোল গোল করে সব দেখতো।

সেদিন বাবুঘাটে যেতে যেতে কেল্লার সামনে সে এক অদ্ভুৎ দৃশ্য দেখলো। একদল সাহেব গোল মতো একটা বস্তু নিয়ে দিব্যি লাথালাথি করছে। ছেলেটি তো দারুণ অবাক। এ আবার কি? খেলা নাকি? মাকে বলে গাড়ী থামিয়ে ছেলেটি টুক করে নেমে পড়লো, তারপর গিয়ে দাঁড়ালো সাহেবদের খুব কাছাকাছি।

হঠাৎ বলটা গড়াতে গড়াতে তার কাছে এলো। ভেবেছিল ঐ গোলাকার বস্তুটি বুঝি খুব ভারী হবে। কিন্তু হাতে তুলে দেখলো বেশ হাল্কা। বলটা হাতে নিয়ে তাকে অবাক হয়ে দেখতে দেখে একজন সাহেব হাসতে হাসতে বললো. "কিক ইট টু মি...."।

ছেলেটি দেখেছিল সাহেবরা কি করে পা দিয়ে বলটি মারে। ও ঠিক সেই ভাবেই দুম করে মেরে বসলো। তারপর অবাক হয়ে দেখলো বলটা গড়াতে গড়াতে সাহেবদের কাছে চলে যাচ্ছে।

সাহেবদের কাছেই সে শুনলো ঐ গোলাকার বস্তুটির নাম—ফুটবল। ভারতীয়দের মধ্যে সেই ছেলেটিই প্রথম ফুটবলে কিক করেছিল। তার নাম নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

কিছুদিন পরে এই নগেন্দ্রপ্রসাদই কয়েকটি ক্লাব করে ভারতীয়দের মধ্যে ফুটবল খেলা চালু করেছিলেন। তাঁর হাতে গড়া কয়েকটি ক্লাব আজো কলকাতা ময়দানে খেলছে। তাই নগেন্দ্রপ্রসাদকে ভারতীয় ফুটবলের জনক বলা যায়।

কলকাতা ময়দানে লীগ ফুটবল এখন জাঁকিয়ে বসেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই কলকাতার ময়দানে গায়ে-গা-লাগা ভিড়। মাঠগুলো উপচে পড়েছে। প্রচণ্ড রোদ, ঝড় কিম্বা বৃষ্টি রুখতে পারে না ফুটবল উৎসাহী দর্শকদের।

—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

যাত্রার জয়যাত্রা

সত্যানন্দ গুহ

নরদানব (নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী)

কি করে একটা মানুষ নরদানব হয়ে ওঠে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে তারই দুর্বল কাহিনী নিয়ে জিতেন্দ্রনাথ বসাক পালা রচনা করেছেন। অমিয় বসুর পরিচালনাও দুর্বল। অবাস্তব কাহিনীর টিমওয়ার্কও ভাল নয়। কারো অভিনয়ই মনে রেখাপাত করেনা। নরদানবরূপী চারু ঘোষের মেকআপ চমক দেয়। মন্দের ভাল অভিনয় করেন-অশোক কুমার (কৌশিক), প্রশান্তকুমার (কুরদ), কানন দাশ (শিখা), ছবি রায় (শতাব্দী) প্রভৃতি।

বিরাজবৌ (অনামিকা যাত্রা ইউনিট)

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ'কে পালাকার আগন্তুক অক্ষত রেখেছেন। দিলীপ কুমারের নির্দেশনাও সুন্দর। গোপাল মল্লিকের সুর ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দর্শকদের খুশি করে। টিম ওয়ার্ক ভাল। পালাটির গতি আছে। দিলীপ কুমার বলিষ্ঠ অভিনেতা—বারবার দর্শকদের হাততালি পেয়েছেন। দুলাল ঘোষ (যদু) দর্শকদের প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। তাছাড়া অজিত মুখার্জী (ছিদু মুখুজ্যে), মধুশ্রী দেবী (বিরাজ বৌ), বুলবুল দে (মোহিনী), বেলা ঘোষ ও (সুন্দরী) সুনাম কুড়িয়েছেন। অন্যান্য শিল্পীরা মোটামুটি দাবী মিটিয়েছেন।

পুরানো সুর (মাধবী নাট্য কোম্পানী)

টপ্পা সম্রাট নিধু বাবুর জীবন আলেখ্য নিয়েই পালা রচনা করেছেন চিত্ত ঘোষ। নাট্য নির্দেশনায় কৃষ্ণকুণ্ড। যাত্রার কোন গন্ধ পাওয়া গেল না। দুর্বল পালা। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বটে—মনে কোন আঁচড় দেয় না। অভিনয়ের জন্য আংশিক প্রশংসা করা যায়—শ্যামসুন্দর গোস্বামী, কৃষ্ণকুণ্ড, সন্তোষ হালদার, দীপ্তি দাশ, সন্ধ্যা ব্যানার্জী ও শান্তা চৌধুরীকে।

লায়লা মজনু (নবরঞ্জন অপেরা)

বিখ্যাত প্রেম কাহিনীর পালারূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন শৈলেশ গুহ নিয়োগী। এত সুন্দর ডায়ালগ ও নাট্যগুণ কম বইতে দেখা যায়। টিম ওয়ার্ক খুব সুন্দর, যাত্রাগুণ সম্বলিত। রঘুনাথ দাসের গানের সুর বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। নাচে গানে, হাস্যোল্লাসে ও প্রেমের অপূর্ব অভিব্যক্তিতে ছন্দা চ্যাটার্জী (লায়লা) হাজার হাজার দর্শককে মাতিয়ে রাখেন। এমন ষ্টেজ ফ্রি ও শক্তিশালী অভিনেত্রী যাত্রাজগতে দেখা যায় না। জহর রায় আব্বাসের ভূমিকায় ব্যক্তি পূর্ণ অভিনয় করেছেন। স্বপ্নদৃশ্যগুলি অপূর্ব। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর প্রশংসা করতে হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ রচনা প্রশংসনীয়। মোট কথা নাচ-গান প্রেমের ডায়ালগ ও মিউজিকের রেশ পালাটি শেষ হলেও কানে বাজতে থাকে।

লায়লা মজনু/ইন্দ্র লাহিড়ী ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

কাঁচকাটা হীরে (জনতা অপেরা)

সত্যপ্রকাশ দত্তের রোমাঞ্চকর পালা। অভিনেতা স্বপন কুমারই পরিচালনা করেছেন। একটা ফ্যাক্টরী ও মালিকের মেয়েকে কেন্দ্র করে ঘটনা দানা বাঁধতে থাকে। ম্যানেজার মালিকের মেয়ের প্রতি আসক্ত। মেয়ের প্রাথমিক প্রশ্রয় পেয়ে ম্যানেজার কারখানার কর্মীদের উপর খেয়ালখুশি মত ব্যবহার করে, অত্যাচার করে ও নারী সম্ভোগ করে। নবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার তার যথেচ্ছাচার পছন্দ করেনা, বাধা দেয়। ইঞ্জিনিয়ারের কাজকর্মে মালিক খুশি, মেয়েও ক্রমশ আসক্ত হয়। কাঁচকাটা হীরের মত ইঞ্জিনিয়ার ক্রমশ দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত কি করে ম্যানেজারকে ক্ষমতাচ্যুত ও পর্য্যুদস্ত করে ইঞ্জিনিয়ার কারখানার কর্মীদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ দূর করে মালিকের মন জয় করেন ও মেয়েকে গ্রহণ করেন তাই কৌতূহলী হয়ে দেখতে হয়। ইঞ্জিনিয়ার সৈকত মুখার্জীর ভূমিকায় স্বপন কুমার অপূর্ব অভিনয় করেন, তাঁর বাচন ভঙ্গী ও ধারালো ডায়ালগ পালাটিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। তবে তার

মুভমেন্ট ও থ্রোয়িং নাটকোচিত—যাত্রানুগ নয়। মালিকের মেয়ের ভূমিকায় স্বপ্না কুমারী ও (রমলা) সমান পাল্লা দিয়েছেন। স্থূলদেহ নিয়েও যাত্রানুগ মুভমেন্ট করেছেন। বিভিন্ন বেশভূষায় ও সব মিলিয়ে সুন্দর অভিনয় করেছেন। কিশোরী পাল (অমৃতলাল) অসুস্থ, চোখে-মুখে কালি, কিন্তু গলার স্বর এত জোরালো কেন? কয়েকজন শিল্পীর কোন মুভমেন্ট নেই। শান্তি ঘোষাল (জয়নারায়ণ) মণ্টু ঘোষ (সদাশিব), প্রবীর কুমার (ইন্দ্রনারায়ণ), কাশীদত্ত (কিরিটি সেন), কালি পাঠক (অমল গুপ্ত), সোমা রায় (শান্তি), তনুশ্রী ঘোষ (আরতি) ভাল অভিনয় করেছেন।

রাইকমল (অগ্রগামী)

তারাশঙ্করের বিখ্যাত কাহিনীর পালারূপ দিয়েছেন কানাই নাথ। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কেন্দ্র করে কাহিনীটি রচিত। কমললতার ভজন গান ও কৃষ্ণভক্তি তারা-রাণী পাল অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রের সঙ্গে তার শরীরের গঠনও বেশ মানিয়েছে। রসিক দাসের ভূমিকায় তারা ভট্টাচার্য্যও ভাল অভিনয় করেছেন। তাঁর মুখের বাউল গানগুলি বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। ভোলাপাল (মহেশ), আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখহরি), সুনীল দত্ত (পেঁচে), নন্দিতা দাশগুপ্ত (দুর্গামণি), বীণানন্দী (কাঁদু), অনিল ভট্টাচার্য্য (ভোলা) ভাল অভিনয় করেছেন। রিক্তা সরকার (কামিনী) মনে দাগ কাটেনা। অনিল বাকচীর সুর হৃদয়গ্রাহী।

হো-চি-মিন (নিউ প্রভাস অপেরা)

ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা-বাহিনীর নায়ক হো-চি-মিনের বিপ্লবী ও সংগ্রামী জীবনকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন রমেশ লাহিড়ী। পালাটি দ্রুতগতিসম্পন্ন ও সুপরিচালিত। হো-চি-মিনের আদর্শ জীবন, জাগ্রত বাণী, হত্যা-অত্যাচার ও অন্যান্য সময়োচিত অ্যাকশান দর্শকদের বিচলিত করে তোলে। সংগ্রামের শেষে বিজয়ী বেশেও দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। হো-চি-মিনের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেন সমীর লাহিড়ী। বাবলু ভট্টাচার্য্য (গিয়াপ), কুমার অঞ্জলি (গিয়াং), চন্দ্রশেখরকে (রুজ), স্বপন কুমারের কুমার দাশ (ওয়েডার), অমূল্য (তোবা), রীতা দত্ত (লিসি), লিলি মণ্ডল (খান) আগাগোড়া সুঅভিনয় করেন। টিম ওয়ার্ক খুব ভাল। প্রশান্ত ভট্টাচার্য্যের স্বরও নাট্যোচিত। তবে হো-চি-মিনকে বার বার 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করা বেখাপ্পা লাগছিল।

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী (তরুণ অপেরা)

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ, ভারতবর্ষ পরিক্রমা, আমেরিকা গমন নিয়ে, নিবেদিতাকে ভারতে আনা, নানা প্রতিকূল পরিবেশকে কাটিয়ে শিষ্য সংখ্যা বাড়ানো ও বেলুড়মঠ গঠন করে দরিদ্র নারায়ণ সেবাকে ভিত্তি করে পালাটি রচনা করেছেন চারু রায় ও বিশ্বজিত পুরকায়েত। সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছেন স্বয়ং শান্তিগোপাল। অন্যান্য পালাতে শান্তি-গোপাল যত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এ পালাতে তা পারেননি। আগাগোড়া ব্যক্তিত্ব নিয়ে অভিনয় করলেও তাঁর স্থূল শরীর বেমানান লেগেছে। এবং বাচনভঙ্গীও আগাগোড়া ঠিক ছিলনা। বরং পালাকারের কৃতিত্ব বেশী। বিবেকানন্দের জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ, মূল্যবান বাণী ও সময়োচিত কর্মময় বাণী দিয়ে দর্শকদের প্রেরণাপুষ্ট করে তুলতে পালাকারদ্বয় সাহায্য করেছেন। শর্মিলা পালের (ঝুমরি) গানের গলা মিষ্টি। কিন্তু গান করার সময় খাস বাংলা আর কথা বলার সময় হিন্দী ডায়ালগ কেন? বাবলু চৌধুরী (শরৎ গুপ্ত) ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। অশোক চৌধুরীর (ডেভিড) গলার স্বর সাহেবদের মত নয়, বাঙালীদের মত, টোনের কোন পরিবর্তন নেই। অমর ভট্টাচার্য্য (মেজর ব্রায়াণ্ট) বেশ প্রাণবন্ত। সোমনাথ ব্যানার্জী (রামকৃষ্ণ), সমীর ব্যানার্জী (ভাণ্ডি), ছবি তালুকদার (মার্গারেট) চলনসই।

রাইকমল/তারা ভট্টাচার্য্য ও তারারাণী

চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে (মুক্তমঞ্চ)

একটা মেস ও তার বাসিন্দা, সুন্দরী পরিচালিকা ও মালিককে কেন্দ্র করে হাসির পালাটি রচিত। কাহিনীকার রসরাজ অমৃতলাল। নাট্যরূপ গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর এবং পরিচালনায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁড়ুজ্যে বেশ প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য। দর্শকদের তিনি সর্বক্ষণ হাসিয়ে ছেড়েছেন। সুধীন মুখার্জী (চাটুজ্যে), প্রণয় সাহা (সরকার মশাই,) রবীন মুখার্জী (ন্যাংটেশ্বর ঘটক), অন্নপূর্ণা মুখার্জীও (ভব) সুন্দর অভিনয় করেছেন।

বিদ্যাসাগর (নট্ট কোম্পানী)

বিখ্যাত পালাকার মহেন্দ্রকুমার দে জীবনীমূলক গল্পটি রচনা করেন। নির্দেশক অরুণ দাশগুপ্ত বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন এবং বিদ্যাসাগরের দৃঢ় প্রচেষ্টা ও ন্যায়নিষ্ঠাকে সুন্দরভাবে দর্শক সমাজের কাছে তুলে ধরেন। অরুণ বাবুকে ধন্যবাদ এইজন্য যে তিনি প্রতিটি পালা বৃহত্তর দর্শক সমাজের মঙ্গলের কথা ভেবেই করে থাকেন। পালাটি শিক্ষা-

DHANADHANYE YOJANA REGD. NO. D(D) 78
Price 50 Paise November 16—30, 1976

মূলক। অন্যান্য যাঁরা ভাল অভিনয় করেছেন—দীপেন চ্যাটার্জী (রামকৃষ্ণ), দেবগোপাল ব্যানার্জী (মাইকেল), দুর্গাদাশ (রাধাকান্ত), বীণা দাশগুপ্ত (সুরমা), কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (হেনরিয়েটা) উল্লেখযোগ্য।

মেঘনাদ বধ (মোহন অপেরা)

ব্রজেন্দ্র কুমার দের শেষ রচনা। মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনা। সত্যি-কারের প্রথম শ্রেণীর যাত্রা! মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (রাবণ), মোহন চ্যাটার্জী (মেঘনাদ) রাজেন সাহা (বিভীষণ), প্রবীর কুমারের (লক্ষণ) ফিগার যেমন হওয়া উচিত তেমনটি হয়েছে। বাচনভঙ্গী ও মুভমেণ্ট সুন্দর। স্তোত্রপাঠও সুন্দর। প্রমীলারূপী মিতা চ্যাটার্জীও সমান পাল্লা দিয়েছেন। স্পষ্ট গলা, মিষ্টি সুর। মধ্যপর্ব হতে দোলাবসু (সীতা) সুঅভিনয় করেছেন। নীতিশ সান্যালকে (রামচন্দ্র) অতিরিক্ত পেইন্ট করায় ভাল দেখায় নি, ষ্টেজ ফ্রিও নন। গৌরচন্দ্র ভড় (মারুতি), সব্যসাচী মুখার্জী (কালনেমী), যাত্রানুগ অভিনয় করেছেন। পালাটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত, ডায়ালগও সুন্দর। পঞ্চানন মিত্রের সুরও প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা (রূপ ও কথা)

লাল মোহন চক্রবর্ত্তীর ভক্তিমূলক পালা। সুধীর দে পরিচালনা করেছেন। বামাক্ষ্যাপার বাল্যজীবন, দীক্ষা গ্রহণ ও মধ্যজীবন নিয়ে কাহিনীটি রচিত। মধু ভট্টাচার্য্যের (ছোট বামাচরণ) ভক্তিমূলক বাচন, ক্ষুধার্তরূপ, আকুলতা, পাগলভাব প্রশংসনীয়। সুধীর দে (বড় বামাচরণ) বামাক্ষ্যাপা রূপে প্রথম দিকে মনে দাগ কাটতে পারেনি। শেষপর্বে সুন্দর অভিনয় করেছেন। বিশ্বনাথ বসু (নদাই) বেশ মানিয়েছে। দেব কুমার সরকার (সাগর) মুকুল সরকার (আসাদুল্লা) রীণা বন্দ্যোপাধ্যায় (জয়মণি), গৌর সরখেল (মোক্ষদানন্দ), গঙ্গাধর (ব্রজবাসী) ভাল অভিনয় করেছেন। তপন রায় চৌধুরীকে (কিশোরীলাল) রাজপুরুষ বেশে মানায়নি, সপ্রতিভ নন, অমিতা দেবীর (রাজকুমারী) কন্ঠস্বর নিচু। বেলাদত্তকে (ভৈরবী) রুগ্ন ও বয়স্কা লাগছিল। আলোকসম্পাত, আবহ সঙ্গীত ভাল।

যত মত তত পথ (এম. জি. এণ্টার-প্রাইজ)

রামকৃষ্ণ দেবের জীবনকে কেন্দ্র করে নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী। পালাটিতে রামকৃষ্ণ দেবের সাধনা, বিবাহ, অবতারত্ব, তন্ত্রসাধনা, বেদান্ত সাধনা, ইসলাম ধর্মের সাধনা, সারদামণি প্রসঙ্গ, তীর্থভ্রমণ ও ভক্তদের সঙ্গে ধর্মালোচনা দেখানো হয়েছে। দর্শকদের মধ্যে ভক্তিভাব জাগিয়ে দিতে গুরুদাস ও মলিনাদেবী পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। টিম ওয়ার্ক ভাল। অন্যান্য শিল্পীরাও ভাল অভিনয় করেছেন। তবে পালাটিকে যাত্রা না বলে নাটক বলব।

এবারের যাত্রা সম্মেলন সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন। যাত্রার জয়যাত্রা হলেও বহু পালারই যাত্রা হয়নি, নাটক হয়েছে। যাত্রা আর নাটকের মধ্যে নিশ্চয় পার্থক্য আছে। বহু নট-নটীর মুভমেণ্ট নেই গলা ভাল নয়, ফিগারও চরিত্রানুগ হয়নি। বহু কাহিনী দুর্বল ও সময় অনুপযোগী। বহু পালাকার অক্ষমতা নিয়েই পালা রচনা করেছেন। নির্দেশকদের অনেকেই ভুলে যান যে চরিত্রের সঙ্গে ফিগার, গলা, ডায়ালগ ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যাত্রার এত আলোর রোশনাই, ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক বা গান কেন? মাইকের মুভমেণ্ট ছিল না বলে বেঁটে নট-নটীদের গলা মাঝে মাঝে শোনা যায়নি। কর্ম-কর্ত্তাদের অনুরোধ আগামী বছর যেন প্রাথমিক নির্বাচনের পর ভাল পালাগুলিকে একমাত্র প্রতিযোগিতায় স্থান দেওয়া হয়। প্রথম থেকে সাবধান না হলে অতি সন্ন্যাসীতে (যাত্রার সংসার ক্রমশ বাড়ছে) যাত্রার জয়যাত্রা ব্যাহত ও বিঘ্নিত হবে।

(ফটো: মধুসূদন ঘোষ)

বিশেষ সংবাদ
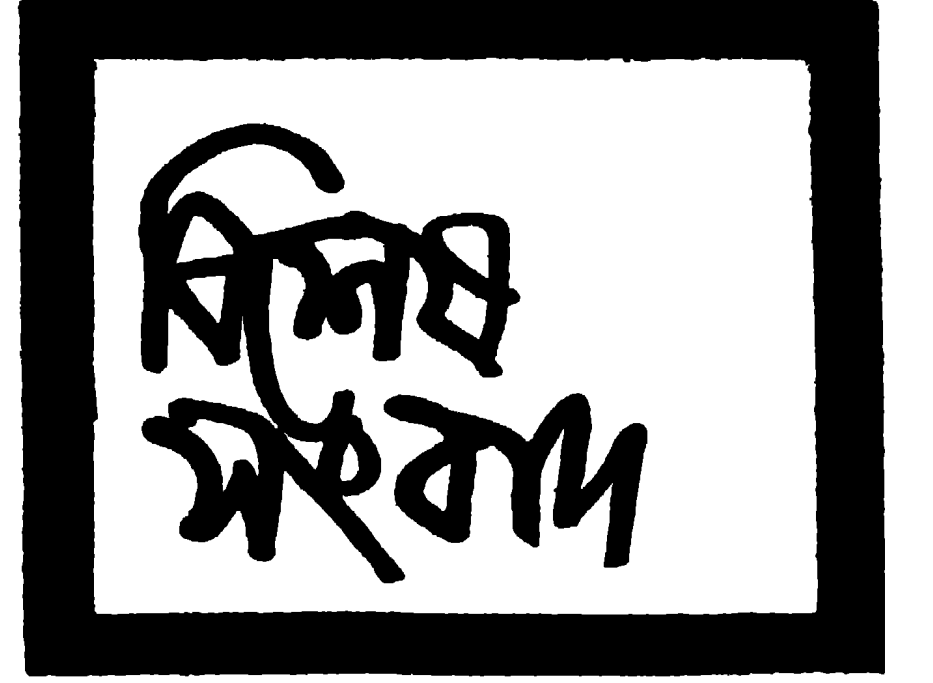
ন্যাশান্যাল পারমিট

বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ মাল-পরিবহণের জন্য জাতীয় অনুমতিপত্র প্রকল্পে পাঁচ হাজার তিনশ অনুমতিপত্র বণ্টন করা হয়েছে। সারাদেশে অবাধে মাল-পরিবহণ-যান চলাচলের জন্যে চৌকি-গুলির বিলোপ সাধনের ও পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে। মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন করা হল। তার ফলে বণ্টন ব্যবস্থার জটিলতা কমবে এবং জিনিষ পত্রের অহেতুক সরবরাহে ঘাটতি বন্ধ করা যাবে। জিনিষপত্রের দামেরও সমতা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

দুগ্ধসমবায়ে লাভ

গত বছর ২০ জন সদস্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার 'মনিগ্রাম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি' ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৪৭ এবং দৈনিক দুধ সংগ্রহ ১০ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ১৫০ কিলো-গ্রাম দাঁড়িয়েছে। এক বছরেরও কম সময়ে ১২৯১.৮৮ টাকা লাভ হয়েছে।

বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচারে নতুন রেকর্ড

এ বছরে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত চার মাসে দেশে রেকর্ড সংখ্যক বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তার সংখ্যা হল ১০লক্ষ ১২ হাজার। এই সংখ্যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় তিন গুণ।

সাধারণত গ্রীষ্ম ঋতুতে অস্ত্রোপচার কম হয়ে থাকে কিন্তু এ বছর পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী অনুযায়ী দেশে অস্ত্রোপচারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১-১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
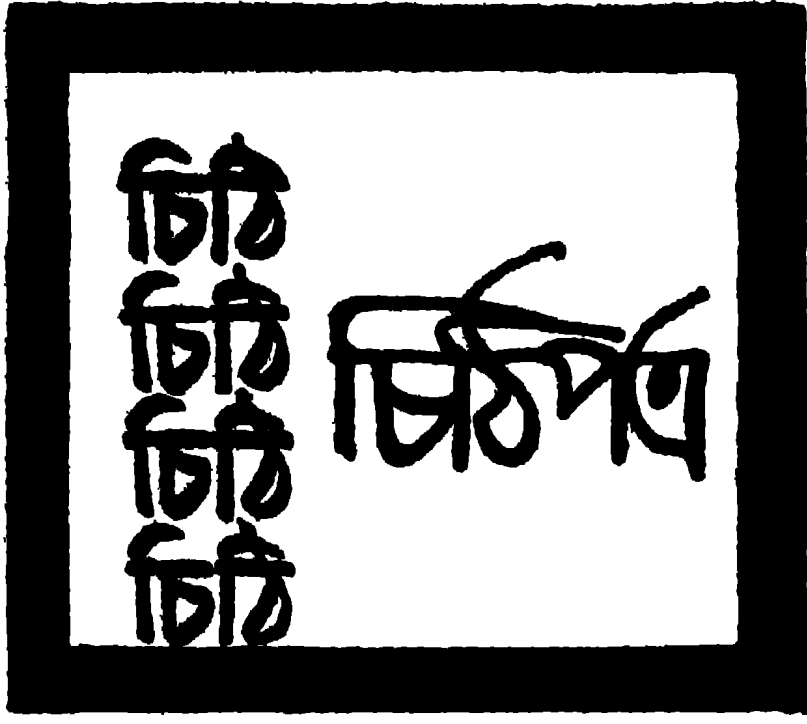
মহাশয়,

সরকারি প্রয়াসে এহেন পরিচ্ছন্ন পত্রিকা পড়ে বিস্ময় জাগে।

আরো সুন্দর ও বিচিত্র হোক আপনাদের যাবতীয় প্রয়াস-প্রচেষ্টা। অভিনন্দন ও ধন্যবাদযোগ্য হ'য়ে উঠুক ঘরে ঘরে সমাদরে।

নিত্যনবত্বে পত্রিকাটি আরো অনবদ্য ও বহুজন-আস্বাদ্য করুন—তবেই আপনাদের শ্রম ও সাধনার সার্থকতা।

আমার মনে হয় আমাদের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিককালের প্রধান প্রধান প্রথম শ্রেণীর লেখকদের উপযুক্ত, সহজ ও যথোচিত কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক রচনাদি সামান্য দুচারকথার সংযোজনী টীকাভাষ্যসহ প্রাঞ্জল ক'রে উপস্থাপিত হলে দেশকালের সম্প্রসারিত চেতনা যথাশ্রয় মহদাশ্রয় লাভ করবে। নির্বাচন করতে হবে কালানুক্রমিক ও পরিকল্পিত সুচেতনায়। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে 'ধনধান্যে' পুষ্পিত, পল্লবিত ও সুফলপ্রদ হোক—এই আশায় ও আনন্দে উপযাজক হয়েই এত কথা বলা।

এন. কে. নন্দী
কলিকাতা-২৬

মহাশয়,

আমরা প্রায় নিয়মিতই 'ধনধান্যে' পড়ে আসছি। এরকম একটি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশ করবার জন্য পাবলিকেশনস্ ডিভিশনকে ধন্যবাদ জানাই। পত্রিকাটির রুচিশীল প্রচ্ছদ এবং বিভিন্ন বিভাগ আমাদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এতে সাহিত্য, খেলাধূলা, পত্রিকা সমালোচনা প্রভৃতির আলাদা বিভাগ থাকলেও ছোটদের জন্য কোন বিভাগ নেই। আমরা আশা করছি 'ধনধান্যে' একটি ছোটদের বিভাগ খোলা হবে। তবে পত্রিকাটির আবেদন সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারবে। বড়দের মতন পত্রিকাটি ছোটদের কাছেও সমান প্রিয় হয়ে উঠবে। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যদি আমাদের এই আবদার পূরণ করেন—খুসী হবো।

রথীন্দ্রনাথ রায়
তপন কুমার চৌধুরী
মিলনপাড়া রায়গঞ্জ

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৮, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন: ২৩২৫৭৬

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা:
সম্পাদক 'ধনধান্যে'
পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯

গ্রাহক মূল্যের হার:
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

আগামী সংখ্যায়

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক: এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

টেলিগ্রামের ঠিকানা:
EXINFOR, CALCUTTA

বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন:
অ্যাডভারটাইজমেন্ট ম্যানেজার, 'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস, নতুনদিল্লী-১১০০০১

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। এজেন্সী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

ধনধান্যে
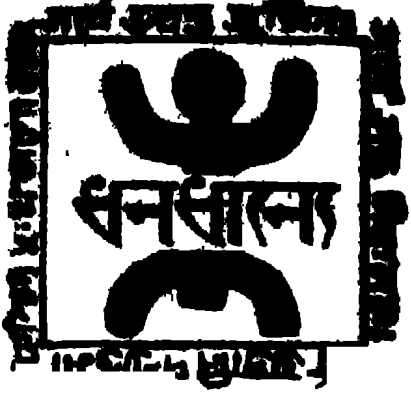
উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
পাক্ষিক

১-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৬
অষ্টম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—মনোজ বিশ্বাস

সম্পাদকের কলমে

'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে ফেলিবে যে নীচে'। কবিকণ্ঠে এ সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছিল বহুকাল আগে। সুদীর্ঘকাল ধরে তার থেকে আমরা মনে হয় কোনই শিক্ষাই লাভ করতে পারিনি। জঘন্য জাতিভেদ প্রথা এখনও সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। অস্পৃশ্যতা যা সমাজে এক গ্লানিময় কলঙ্ক আজও তা দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজদেহে বিদ্যমান। কবির প্রতিবাদ আমাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে সমর্থ হয়নি। তাই আজও ভারতের নানা রাজ্যে অস্পৃশ্যতার নামে মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী খবরের কাগজের পাতায় পাতায় দেখা যায়। সমাজের একটি বৃহৎ অংশ তাদের ন্যায্য মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে সমাজের এক অংশকে অবহেলিত রেখে আরেক অংশ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এই পেছনে পড়া অনুন্নত শ্রেণী শোষিত মানবগোষ্ঠী অগ্রগতির চাকা অনেকখানি কবির ভবিষ্যৎবাণীর মত পেছনে টেনে রেখেছে। এদেরকে বাদ দিয়ে সমাজের এক অংশ এগিয়ে গেলেও পুরো সমাজ বা দেশের অগ্রগতি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীর মত অনেক মনীষী ও সমাজ সংস্কারক অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করে গেলেও এই ঘৃণ্য প্রথা কিন্তু সমাজদেহ থেকে দূর হয়নি। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন দেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু সেই আইন এই ঘৃণ্য অপরাধ দূরীকরণে ব্যর্থ হওয়ায় আরও কঠোর আইন প্রণয়নের চিন্তা শুরু হয়। তারই ফলস্বরূপ বর্তমান নাগরিক অধিকার আইন প্রণীত হয় এবং সংসদের অনুমোদনলাভ করে। এই নতুন আইনে আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে আইনটি কার্যকর হচ্ছে। এই আইনে অস্পৃশ্যতার জন্য জেল ও জরিমানা দুইই হবে। প্রথমবার অপরাধের জন্য এক মাসের জেল ও একশো টাকা জরিমানা হবে। দ্বিতীয় বার অপরাধে ছ মাস জেল ও দুশো থেকে পাঁচশো টাকা জরিমানা এবং তৃতীয় বার অপরাধ করলে একবছর থেকে দু বছর জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা। তাছাড়া অস্পৃশ্যতার অপরাধে শাস্তি পেলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হবেনা। সরকার অস্পৃশ্যতার জন্য গ্রাম ও সারা এলাকার উপর জরিমানা ধার্য্য করতে পারবেন। কোন সরকারী কর্মচারী এ অপরাধের ব্যাপারে অবহেলা করলে কড়া জরিমানা ভোগ করবেন। ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম বা ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে অস্পৃশ্যতার পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেউ মতামত প্রচার করলেও তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

এই আইন নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যুগযুগ ধরে যে ব্যাধি সমাজের গভীরে বিদ্যমান তাকে শুধুমাত্র আইনের সাহায্যে নির্মূল করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানসিকতার আমূল পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন আনতে নিশ্চয়ই বর্তমান আইনটি প্রভূত সাহায্য করবে। আর সে জন্যই চাই সকলের আন্তরিক সহযোগিতা।

এই সব ম্লান মুখ

গোপালকৃষ্ণ রায়

বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী শব্দটির সঙ্গে বহু শতাব্দীর একটি অভিশাপ সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোয়ও সেই অভিশাপ থেকে মানবজাতি মুক্ত হতে পারেনি। তবে অঙ্গহীনতাই যে বেঁচে থাকার অন্তরায় নয়, প্রতিবন্ধীরা আজ তা প্রমাণ করে দিচ্ছেন।

প্রাচীন সমাজ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকাকে অবাঞ্ছিত মনে করত। হিন্দু আইন এদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। রোমান আইন এদের মানসিক-পঙ্গু ব'লে শ্রেণীভুক্ত করেছে আর জাষ্টিনিয়ান কোড এদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালন থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী ধরে কিছু মানুষের অনলস প্রচেষ্টায় দৈহিক প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকার পরিবেশ গড়ে উঠছে। এই সব ম্লান মুখ আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এবছর প্রতি-বন্ধীদের বেঁচে থাকার অধিকার বৎসর উদ্‌যাপনের মধ্যে এই আলো অনির্বাণ হ'য়ে থাকবে।

যারা মূক যারা বধির অথবা যারা দৃষ্টিহীন তারা যে অকর্মণ্য বা সংসার বা সমাজের বোঝা এই অধিকার বছর পালনের মধ্যে ব্যর্থ হোক। নাই-বা থাকল ওদের মুখে ভাষা, নাই-বা শুনলো কেউ পৃথিবীর অহরহ শব্দ নাই বা দেখল কেউ আলোয় ভরা সৌন্দর্য্য, ওরা কাজ করুক, বেঁচে থাকুক ওদের জন্মসূত্রে পাওয়া অনুভূতি নিয়ে। আর এগিয়ে চলা পৃথিবীর মানুষ গবেষণা করতে থাকুক কেমন করে প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধান করা যায়।

ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা হয়েছে। দৃষ্টিহীন অকর্মণ্য নয়, বোবা পারিবারিক সমস্যা নয়, অথবা অঙ্গহীনতা অন্তরায় নয় একথা আজ প্রমাণিত।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সারাদেশে অন্ধ, মূক-বধির ও অঙ্গহীনদের মোটামুটি সংখ্যা প্রায় ১ কোটি কুড়ি লক্ষ। সারা বিশ্বজুড়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। তাছাড়া আরও কয়েক কোটি মানুষের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই মুহূর্তে কার্যকর ব্যবস্থা না করলে এই শতাব্দীর শেষে এই প্রতিবন্ধী মানুষদের সংখ্যা সম্ভবত দ্বিগুণ হ'য়ে যাবে।

বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন বিকাশশীল রাষ্ট্রগুলির মোট দৃষ্টিহীনদের দুই-তৃতীয়াংশ আরোগ্যযোগ্য। এমনকি উন্নত দেশগুলিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা রোধ করা সম্ভব। বিকাশশীল রাষ্ট্রগুলিতে ট্র্যাকোমা বা ঐ জাতীয় রোগ একটা ভয়াবহ সমস্যা। সারা পৃথিবীতে ট্র্যাকোমা রোগীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ কোটি তারমধ্যে ভারতেই এদের সংখ্যা প্রায় বার কোটি।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, ভারতে শতকরা ১.৫ ভাগ লোক দৃষ্টিহীন। এদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন কর্মক্ষম বয়সের। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জনের দৃষ্টিহীনতাই রোধযোগ্য। এ-ছাড়া সারা দেশে ছড়িয়ে আছে প্রায় ৬০ লক্ষ অর্ধদৃষ্টিহীন অথবা আরোগ্য-যোগ্য দৃষ্টিহীন। সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা ৭০ জন দৃষ্টিহীন বাস করেন গ্রামাঞ্চলে। শতকরা পাঁচ ভাগ থাকেন দেশের বৃহত্তম সাতটি শহরে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, হায়দরাবাদ ও আমেদাবাদে। আর বাকি ২৫ ভাগ দেশের ছোট শহর ও শহরতলীতে রয়েছেন।

মূক ও বধিরদের সংখ্যাই বা কত দেশে? এদেরও কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কেউ কেউ হিসাব ক'রে দেখেছেন সারাদেশে প্রায় দু'লক্ষ মূক-মানুষ আছে। এদের মধ্যে মাত্র শতকরা দু'জন অর্থাৎ ৪০০০ মূকদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমানে সারাদেশে মূক ও বধিরদের শিক্ষার জন্য ৭০টি বিদ্যালয় আছে। গড়ে ৬০ জন মূক-ছাত্র এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা এদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন বেশি। এঁরা মনে করেন প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হলেই সামাজিক পুনর্বাসনের সমস্যা সহজ হয়ে যাবে।

আর এই অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রতিটি প্রতিবন্ধীদের বিশেষ কাজের প্রতি আগ্রহকে মূল্য দিতে হবে। জানতে হবে এদের পারিবারিক পশ্চাৎভূমি। প্রতিটি রাজ্যে বয়স্ক-মূকদের প্রশিক্ষণের জন্য হায়দরাবাদের মত শিক্ষণ কেন্দ্র থাকলে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সহায়তা হতে পারে। আমাদের দেশে পুরুষের চেয়ে মূক-বধির মেয়েরাই অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে বেশী কষ্ট পেয়ে থাকেন। এদের জন্য কি আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব নয়?

হিসাবে দেখা যাচ্ছে, দেশের বেশীর ভাগ প্রতিবন্ধী গ্রামে বাস করেন। এসেছেন এরা ছোট চাষী দরিদ্র কৃষিমজুর বা কারিগরদের ঘর থেকে। কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে এদের অর্থ-নৈতিক পুনর্বাসনের সুযোগ আমাদের দেশে রয়েছে। বিশ্বের এই অন্যতম মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—সমাজ সচেতন। সামাজিক দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন না হলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সামাজিক পুনর্বাসন যত তাড়াতাড়ি সমস্যা মোকা-বিলা করার সহায়তা করবে—অন্য কোন

পদ্ধতিতে তা সম্ভব হবে না। প্রতিবন্ধীরা যে শুধু পারিবারিক বা সামাজিক বোঝা স্বরূপ—এই কুসংস্কারে পূর্ণ অচল যুক্তিকে সম্পূর্ণ বরবাদ ক'রে—এদের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সামিল করতে পারলে এই জাতীয় সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হবে। প্রতিটি দায়িত্ব-শীল নাগরিকের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি করতে হবে যে, প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে তাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। সরকার বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন, প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু প্রতি-বন্ধীদের সম্পূর্ণ সামাজিকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই মানবিক সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রতিবন্ধীদের অবজ্ঞা না ক'রে জনজীবনে এদের দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত করলে সামাজিকরণ সহজ হ'য়ে উঠবে। অবশ্য এর আগে এদের বিশেষ কর্ম প্রবনতা বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে—কে কোন কাজের উপযোগী এবং কে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। জনসাধারণের মনে যখন প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা আসবে তখনি এই মানবিক সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যাবে। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যে যাতে প্রতিবন্ধীগণ ভাবেন যে তারা সমাজে অবাঞ্ছিত নয়।

অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য সরকারী ক্ষেত্রে যতটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বে-সরকারী ক্ষেত্রে ততটা না নেওয়ায় এই সমস্যার ব্যাপকতা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। বে-সরকারী ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা বৃত্তিমূলক কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, বধিরদের মানসিক ক্ষমতা ও যন্ত্র পরিচালন দক্ষতা সাধারণ মানুষের চেয়ে কম নয়। তাঁরা মনে করেন, এই সব বধিরদের উপযুক্ত সুযোগ দিলে তারা দেশের 'সম্পদ' হ'তে পারে। কি ভাবে এই সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, এখন সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বধিরদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য তিন রকম কর্ম সংস্থানের প্রস্তাব অনেকে করেছেন। 'খোলা চাকুরি' (Open employment) ক্ষেত্রে বধিররা সাধারণ মানুষের সমদক্ষতা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিস কমিশন-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ১২৬০ রকমের কাজ কানে না শুনলেও ঠিকমত সম্পন্ন করা যায়। আমাদের দেশে ঐ ধরণের একটা সমীক্ষা করলে প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সহায়ক হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোন সময়ই কার্যকর হবে না যদিনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করা না যায়। এর জন্যে স্বগৃহ কর্ম বা (Home employment) জোরদার করা উচিত।

প্রতিবন্ধীদের সমস্যা উপলব্ধি ও তা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় কম, তবু কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাই, হায়দরাবাদ, দিল্লী ও জব্বলপুরে মোট চারটি 'বৃত্তিগত পুনর্বাসন কেন্দ্র' (Vocational Rehabilitation Centre) স্থাপন করেছেন। ১৯৬৮ সালে বোম্বাই ও হায়দরা-বাদে প্রথম দুটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই দু'টি কেন্দ্রের উপকারিতা উপলব্ধি ক'রে দিল্লী ও জব্বলপুরে আরও দু'টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেরাদুনের দৃষ্টিহীন কেন্দ্রে দৃষ্টিহীনদের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। হায়দরাবাদ কেন্দ্রে বয়স্ক বধিরদের ইনজিনীয়ারীং ও নন্-ইনজিনীয়ারিং ট্রেনিং-এর সুযোগ সম্প্রতি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় সংস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও তাঁদের জাতীয়স্তরে চাকুরির সুবিধার জন্য প্রশিক্ষণ দেবে। ইতিমধ্যে সমাজ কল্যাণ দপ্তর একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নিযুক্ত করেছেন। এই ওয়ার্কিং গ্রুপ বিচার ক'রে দেখবেন প্রতিবন্ধী বালক-বালিকাদের কিভাবে সাধারণ স্কুলে সকলের সংগে সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং সমান ভাবে কাজে নিয়োগ করা যায়।

প্রতিবন্ধীদের কাজে নিয়োগ ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষিক্ষেত্র থেকে সুরু করে বড় বড় কারখানায় কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

সরকার এপর্যন্ত প্রায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ১২টি বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছেন। গত ১৯৬৮ সাল থেকে এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ২০০০ প্রতিবন্ধী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়েছেন। প্রতিটি রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্র খোলা যায় কিনা এ বিষয়ে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছেন।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকার বৃত্তি চালু ক'রেছেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানও প্রতিবন্ধীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজেরাও বৃত্তি দিচ্ছেন। এই ব্যবস্থা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করলে প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনই শুধু হবেনা—এদের সামাজিকীকরণ সহজতর হয়ে উঠবে।

পঞ্চম পরিকল্পনা: কর্মসংস্থান

জ্যোতি সেনগুপ্ত

যে হারে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে মনে হয় বেকার সমস্যাই প্রকল্প কর্মকর্তাদের সব হিসেব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। এমনিতেই যদি পাঁচজনের একটি করে পরিবার ধরা যায়, তাহলেও তো দেখা যায় সারাদেশে চাকরির সংখ্যা ১২ কোটিতে তুলতে হবে। এত বেশী সংখ্যার চাকরির ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

কিন্তু বেকারত্ব ও চাকরি এদুটি যদি আলাদাভাবে দেখা যায় তাহলে সমস্যার আয়তন আর ততটা ভয়াবহ দেখাবে না। যদি বেকার শিক্ষিত কোন তরুণ একটি ছোট কারখানা খোলেন বা ছোট ব্যবসা করেন, তাহলে তার নিজের বেকারত্ব থাকবে না। তাছাড়া তার সেই ক্ষুদ্র সংস্থায় আরও দু-তিনটি লোকের কাজের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

অবশ্য এইভাবে বেকারত্ব ঘোচাবার উদ্দেশ্যে সরকার গত ক'বছরে অনেক ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবুও দেখা যায় সরাসরি চাকরিতে নিযুক্ত করারও একটা অঙ্ক যোজনার মধ্যে ছকে রাখতে হয়। কলকব্জার কারখানায় কত লোকই বা ঠাঁই পেতে পারে? ৩২০০০-ই না হয় হল একটি ইস্পাত কারখানায় চাকরির সংখ্যা। কিন্তু ১০০টি ইস্পাত কারখানা থাকলেও মাত্র ৩২,০০,০০০ লোকই চাকরিতে রইল। এই চাকুরেদের সংখ্যা হ্রাস খুব কম মাত্রায়ই হয়। তারমানে নতুন যে সব তরুণ যারা বড় হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে কাজ খুঁজছে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঐ শূন্যপদগুলিতে স্থান পেতে পারে। কারণ শূন্যপদের সংখ্যাতো সীমিত। আর নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ।

কিন্তু বিজ্ঞান, বিশেষ করে, শিল্প বিজ্ঞান, যে হারে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাতে উৎপাদনের বৃদ্ধি যন্ত্রের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে খরচও কম। দশটা লোককে দিয়ে যে যে কাজ আগে হত এখন সেখানে একটা লোক সুইচ্‌ টিপেই চালিয়ে দিতে পারে।

সবাই চায় ক্রেতা। যে শিল্পপতি সেও ক্রেতা চায় আবার যে লোক খুব নিম্নস্তরে মেশিনে কাজ করে সেও ক্রেতা। যে লোক মহানগরে প্রচুর অর্থের মালিক সেও ক্রেতা আবার অন্য আর একজন যে পাড়াগাঁয়ে থাকে সেও ক্রেতা। পরিদার বড় থেকে ছোট সবাই কতকগুলি জিনিষ কিনতে বাধ্য, যেমন জামাকাপড়, খাদ্য-সামগ্রী ইত্যাদি। অতএব দেশে সব চেয়ে বড় 'চাকরি'র ক্ষেত্র হল অত্যাবশ্যকীয়, অপরিহার্য্য ভোগ্যপণ্য সামগ্রী উৎপাদনের কাজ। অবশ্য এইরূপ অঙ্ক কষা সোজা। আসলে কিন্তু আমাদের দেশের মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে দেখা যায়, সরকার চাকরির সংস্থান যা করেন তার সিংহভাগ কাজে নিযুক্ত হয় সরকারি সংস্থাগুলিতে।

পঞ্চম যোজনায় এখন সংশোধিত হয়েছে। এই চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুসারে দেখা যায় ১৯৭৪—১৯৭৯ সালের মধ্যে কৃষি-ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৬২ লক্ষ। তারপরের, ষষ্ঠ যোজনায় এই সংখ্যা আরও ২৭ লক্ষ বেড়ে যাবে। অবশ্য National Sample Survey-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে পঞ্চম যোজনায় কর্মীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮২ বা ১ লক্ষ ৯৯ হাজার বাড়বে। এঁরাও মেনে নিয়েছেন যে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতর কর্মী যোগানোর সঠিক হিসেব করা যায় না। কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে। অবশ্য উৎপাদন বা চাহিদা ইত্যাদি সব রকম লক্ষ্য ঠিকঠিক পূর্ণ হলে এই যে কর্মপ্রার্থীর ভীড় জমে উঠবে সেটা যে সব কাজ বাড়বে তাতেই নিযুক্ত হয়ে যাবে। এমন কি ষষ্ঠ যোজনায় এই সংখ্যার কিছু-ভাগের নিয়োগ হয়ে যাবে। মনে হয় ষষ্ঠ যোজনায় আগেকার বেকার বা কর্মপ্রার্থীর সমস্যার সমাধান হয়েই যাবে।

কৃষি বা গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মবৃদ্ধি অবশ্য নির্ভর করবে প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা অনুযায়ী ভূমি সংস্কার কর্মসূচী পরিপূর্ণ রূপায়ণের ওপর। তাছাড়া যেসব ব্যবস্থা ২০ দফা কর্মসূচীতে নেয়া হয়েছে তা ছোট ছোট জমির মালিক বা দুর্ব্বল শ্রেণীর কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য করবে।

কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগে শুধু সরাসরি কর্মিনিয়োগের সম্ভাবনা তাহলে দেখা যায়, সীমিত নয়। তাই বাংলা, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা বা অন্য কোন রাজ্য বা এলাকার অনগ্রসর এলাকায় যেখানে বহুকাল কলকারখানার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ঘটেনি তেমন এলাকায় সরকারী উদ্যোগে কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টির যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ফলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বিস্তৃত হয়েছে।

এর মধ্যে দেখা যায় সরকারী শিল্পোদ্যোগ দেশের সব যায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আয়তন ও প্রসারের দিক ছাড়াও উন্নত পরিচালন ও কারিগরি স্তরে সরকারী শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তি দক্ষতা, কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন, অতি জটিল শিল্প সরঞ্জাম যন্ত্রাদি ও কলকব্জার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেগুলি সক্রিয় রাখার মত আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা

৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

দায়িত্ব ও অধিকার

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দশটি নাগরিক দায়িত্বের সংযোজন। এতদিন সংবিধানে শুধু নাগরিক অধিকারের কথাই বলা ছিল, এবং ঐ অধিকার তালিকা এত বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিল যে, ভারতীয় নাগরিকরা তাঁদের দায়িত্বের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন। যদিও একথা অজানা নয় যে, কর্তব্য ও দায়িত্বের সঙ্গে অধিকারের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধিকারের চিন্তাই সেদিন ভারতীয় নাগরিকদের মনে বড় হয়ে দেখা দেয় এবং সংবিধানকারীরাও সেই চিন্তাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে সংবিধানের মুখবন্ধে শুধু অধিকার তালিকাই লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু সংবিধানকারীদের মনে সেদিনই এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, শুধু অধিকার চিন্তা ভবিষ্যতে দায়িত্বচেতনা গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই গণপরিষদের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি. এন. রাও সেদিনই বলেন 'Fundamental rights are not absolute and unconditional', অর্থাৎ, মৌল অধিকারগুলি চূড়ান্ত বা নিঃশর্ত নয়। স্বাধিকারের নামে যদি অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য হয় তবে দেশে আইন শৃংখলা বিলুপ্ত হয়ে জঙ্গলের আইন চালু হবে। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও সেদিন গণপরিষদে বলেছিলেন—'No individual can override ultimately the rights of community at large, অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিস্বার্থ কখনও সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের চেয়ে বড় হতে পারবে না।

ভারতীয় সংবিধানের জনকরূপে খ্যাত ডঃ বি. আর. আম্বেদকার ১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পেশ করার সময় বলেন, সংবিধানে প্রস্তাবিত প্রতিটি নাগরিক অধিকার সরাসরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বদাই থাকবে।

উল্লেখিত উক্তিগুলি থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সংবিধানকারিগণ ও জাতীয় নেতারা কোন সময়েই একথা বলেননি যে, সংবিধানের মুখবন্ধে উল্লেখিত মৌল অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণের অতীত, অপরিবর্তনীয় বা অলঙ্ঘ্য। বরঞ্চ জাতির সামগ্রিক স্বার্থ কোন সময়েই ব্যক্তির মৌল অধিকারের অজুহাত দেখিয়ে ক্ষুণ্ণ করা চলবে না, এই কথাটাই তাঁরা বারবার বলেছেন। যেমন ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত মৌল অধিকার, এই যুক্তি দেখিয়ে জমিদারি প্রথার অবসান ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

৪৪তম সংশোধনীতে মৌল অধিকার তালিকার পাশেই দশটি মৌল কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। আমাদের মতো গরীব দেশকে গড়ে তোলার প্রয়োজনে প্রথম থেকেই এই কর্তব্যতালিকা সংবিধানে সংযুক্ত থাকা উচিত ছিল বলে মনে করি। আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ দেশের প্রেসিডেন্ট, জন কেনেডি দায়িত্ব গ্রহণের পরেই বলেছিলেন—দেশ তোমার জন্য কি করতে পারে সে জিজ্ঞাসার সময় এটা নয়, তুমি দেশের জন্য কি করতে পারো তাই বলো।

জাতির জনক গান্ধীজী বারবার দেশবাসীর কর্তব্যের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, জাতির অগ্রগতির উদ্যোগে সামিল হওয়াই প্রতিটি দেশবাসীর প্রধান কর্তব্য। সামগ্রিক কল্যাণে স্বেচ্ছা-সংযম একই সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ করে। কতকাল আগে গান্ধীজী হরিজন ও ইয়ং-ইণ্ডিয়া পত্রিকায় এসব কথা বলেছিলেন, কিন্তু আজও তা আমাদের চলার পথে অভ্রান্ত নির্দেশক হয়ে আছে। ১৯১৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লেখেন, মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়ে যেমন আমাদের প্রার্থনার সময় মনে করিয়ে দিতে হয়, আমাদের কর্তব্যবোধের চিন্তাও তেমনি কেউ জোর গলায় আমাদের না মনে করিয়ে দিলে খেয়াল থাকেনা। আমরা ভুলে যাই যে, ঠিকমতো কর্তব্য করার অর্থই হ'ল তার সম পরিমাণ অধিকার অর্জন করা। যারা অধিকারের কথা আগে ভেবে কাজে হাত দেয় তাদের কাজে নিষ্ঠার অভাব থাকবেই এবং সে কাজ কিছুতেই ঠিকমতো সম্পন্ন হবে না। ঠিকমতো কাজ করার অধিকারই ব্যক্তির ও সমাজের সবচেয়ে বড় অধিকার। মানুষ প্রয়োজনে তার অধিকার ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু নিজের বিবেক বর্জন না করে কর্তব্য ত্যাগ করতে পারেনা।

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যই নয়, একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গসুন্দর দেশ গড়ে তোলার শপথ নিয়েই এদেশের মানুষ এই শতাব্দীর সূচনা থেকে স্বার্থত্যাগে ও আত্মনিবেদনে ব্রতী হয়। সুতরাং শুধু বৈদেশিক শাসনের অবসান হতেই কর্তব্যের শেষ ও নিছক অধিকার ভোগের সূচনা হতে পারে না। অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু কর্তব্য বাদে তা অর্থহীন। গান্ধীজীর ভাষায় যিনি যতটুকু কর্তব্য করলেন ঠিক ততটুকু অধিকারের ভাগী হলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি সংবিধানের মৌল অধিকার তালিকা বিশ্লেষণ করে বলেন, তার গোড়ায় আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের কথা, তার পরে উল্লেখিত হয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের কথা। যার অর্থ হল, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হলে তবেই ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে কোন অজুহাত অন্তরায় হতে পারে না।

যে দশটি নাগরিক কর্তব্য সংবিধানে লিপিবদ্ধ হ'ল, সেগুলি হচ্ছে:—

(১) সংবিধান মেনে চলা এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া;

(২) যে মহৎ আদর্শগুলি জাতির মুক্তি সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলি অন্তরে উপলব্ধি করা ও অনুসরণ করা;

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিরক্ষায় সদা তৎপর হওয়া;

(৪) আহ্বান এলেই জাতীয় কর্তব্য পালনে ও দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করা;

(৫) ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক ব্যবধান লোপ ক'রে ভারতের জনগণের মনে ঐক্য ও সৌভ্রাত্রভাব জাগ্রত করা ও নারীর অমর্যাদাকর সকল প্রথা লোপ করা;

(৬) ভারতের সমন্বয়-সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মূল্য উপলব্ধি করা ও তা সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া;

(৭) অরণ্য, হ্রদ, নদী ও আরণ্যক জীবন নিয়ে গড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সমুন্নত করা এবং সকল জীবের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া;

(৮) মনকে বিজ্ঞানানুগ করা ও মানবতা বোধ জাগিয়ে তোলা এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সংস্কারের উপযোগী মানসিকতা গড়ে তোলা;

(৯) সাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা;

(১০) সব ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগ সফল করার জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং জাতিকে নিত্য-নূতন সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলা।

উল্লিখিত কর্তব্য তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একটি সুসংহত, সমৃদ্ধ ও আদর্শ উদ্বুদ্ধ জাতি গঠন করার দিকে দৃষ্টি রেখে ঐ তালিকা রচিত হয়েছে। সংবিধান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য এবং একমাত্র তারই ভিত্তীতে গড়ে উঠতে পারে জাতীয় শ্লাঘা, ঐক্য-চেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। একমাত্র মৌল কর্তব্য যথাযথ পালিত হলে তবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, অধিকার ভোগের উপযুক্ত পরিবেশ আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি। জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হলে তবেই ব্যক্তির কল্যাণ। স্বাধিকারের ছদ্মাবরণে যদি ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখা হয় তবে শেষ পর্যন্ত তাতে ব্যক্তি বা জাতি কারও কল্যাণ হবে না। ব্যক্তি স্বার্থ মাত্রই জাতীয় স্বার্থ নয়। কিন্তু জাতির কল্যাণ মানেই সকল ব্যক্তির কল্যাণ।

পঞ্চম পরিকল্পনা ঃ কর্মসংস্থান

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অর্জনের বনিয়াদ তৈরী করে দিয়েছে। কারিগরী দক্ষতার বিকাশ না হলে দেশকে বৈদেশিক সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের যে সূত্রপাত করা হয়েছে তার সাহায্যে, দেশে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ও অধিকতর উন্নতির জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আজ ভারতের তৈরী শিল্পজাত পণ্য পৃথিবীর বহুদেশে, এমন কি অনেক এগিয়ে পড়া দেশেও যাচ্ছে। বাইরের অভিজ্ঞ লোকেরা যাঁরা এদেশে সব দেখে যান তাঁরাও বলেন যে তাঁরা জানতেন ভারত এখনও অনেক পেছিয়ে আছে, কিন্তু সে ভুল তাঁদের ভেঙ্গে গেছে।

যেমন আমাদের সরকারী সংস্থাগুলি দ্রুত এগিয়ে চলেছে তেমনই বেকারত্বের ব্যূহ ভেদ হচ্ছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ৪.০৫ লক্ষ লোক সরকারী সংস্থায় নিযুক্ত ছিল। ১৯৭৩-৭৪-এ ২২৫ শতাংশ বেড়ে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩.১৪ লক্ষে।

পঞ্চম যোজনায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রসারের জন্য মোটা টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগই সুকল্পিত ক্ষুদ্র-শিল্প এলাকার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। কুটির ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পে, প্রধানত গুরুত্ব দেখা হয়েছে তাঁতের কাজ, নারকেল ছোবড়া, গালিচা বোনা ও কারিগরি শিক্ষা। সরকার বিশেষ করে কয়েকটি খাতে নজর রাখবেন, যাতে হাতের কাজ বেশী হয়, এইরূপ সংস্থার গঠনের দিকে। পঞ্চম যোজনায় ধরা হয়েছে শিল্পে সাড়ে আট লক্ষ চাকরীর সংস্থান হবে। এই সংখ্যা ষষ্ঠ যোজনায় ৯ লাখের ওপর উঠে যাবে।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্পপ্রসারে নানান সুযোগসুবিধার যে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে নিশ্চয় দেখা যাবে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বেড়ে যাবে তেমনি বেকার সমস্যার সমাধানেও তা সহায়তা করবে।

দেনা-ছাড়

সুশোভন দত্ত

দেনা-ছাড় চলতি বিশদফা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। যে সমস্ত কৃষক সর্বাধিক ২.৫ একর সেচবিহীন জমির মালিক তাদের যাবতীয় দেনা ছাড় দেওয়ার জন্যে এবং ২.৫ একর থেকে ৫ একর পর্যন্ত জমির মালিক কৃষককে আংশিক মকুবের জন্য কেন্দ্র ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাজ্যগুলি সাধারণ ভাবে কেন্দ্রের এই নির্দেশ রূপায়িত করেছেন। এবং গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর জন্য ঋণ মকুবের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নও প্রায় শেষ। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে দেনা আদায় রাজ্যগুলি আইন ক'রে স্থগিত রেখেছেন।

গ্রামের দরিদ্র সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে এই এককালীন ঋণ-মকুবের দরকার ছিল। কারণ যে দেনার বোঝা এরা টানতো তা অনেক সময়েই ছিল ভুয়ো। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসলের সঙ্গে উত্তরোত্তর চড়া সুদের ভার যুক্ত হ'য়ে এই দেনার বোঝা তাদের পক্ষে দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল।

অবশ্য শুধু দেনা-ছাড়েই এই কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটবে না। বিশ দফা কর্মসূচীতে ঋণ-মকুবের অর্থ আরও ব্যাপক। এর উদ্দেশ্য দরিদ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। গ্রামের দরিদ্রতর সম্প্রদায়ের প্রকৃত ঋণমুক্তি তখনই ঘটবে যখন তাদের কাজ পেতে কোনো অসুবিধা হবে না, পরিপূরক কর্মসংস্থানের উপায় থাকবে এবং উৎপাদনের জন্যে ধার পাওয়ার সুবিধাজনক ব্যবস্থা থাকবে।

সবুজ-বিপ্লব কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন নিঃসন্দেহে অনেকটা বাড়ালেও এই কৃষি থেকে নিম্নবিত্ত চাষীদের এখনও দিন আনা দিন-খাওয়া ছাড়া বেশি কিছু হয় না। দেশের একটা বড় অংশ জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকরাও ক্ষেত খামারে কাজ ক'রে রুজি জোগাড় করে।

গ্রামের এই দরিদ্র কৃষিনির্ভরশীল পরিবারগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। এদের দিনের আয় দিনেই ফুরিয়ে যায়। দুর্দিনের জন্যে দু'চার পয়সার সঞ্চয় এদের কাছে আকাশকুসুম। তাই ফসল না হ'লে বা কাজ বন্ধ থাকলে একবেলা একমুঠো আহারের জোগাড় করাও এদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। বাধ্য হ'য়েই তারা পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিশেষ ভোগ্য ঋণ নেয়।
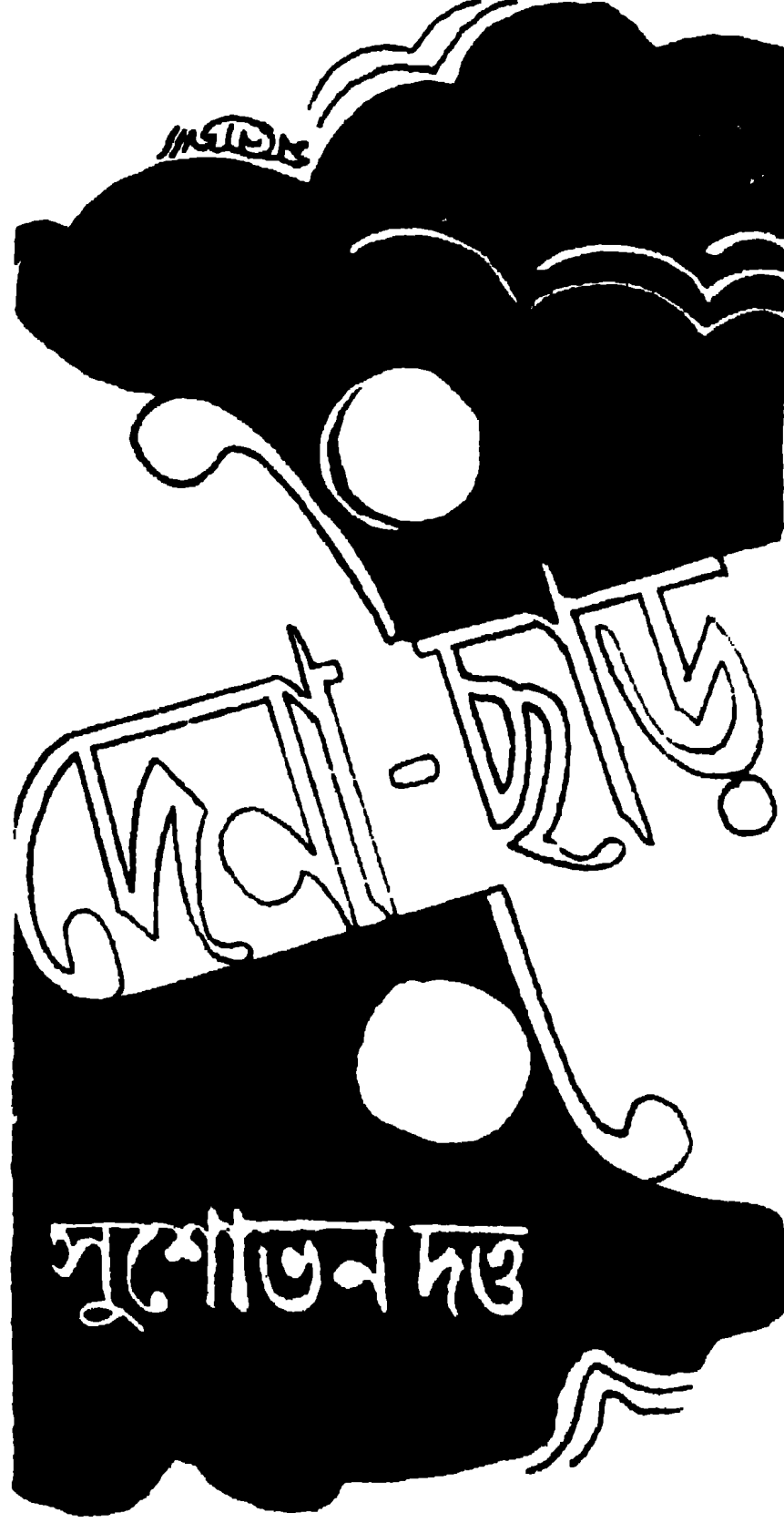
গ্রামাঞ্চলে ঋণদানের কারবারটা মহাজনদের একচেটিয়া ছিল। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয় সেগুলিও বড় বড় মহাজন ও জোতদারদের তাঁবে। মহাজনরা চিরকালই অধমর্ণদের অক্টোপাসের বাঁধনে বেঁধে রাখে—চড়া সুদের ভার দেনাদারদের ঘাড়ে চাপায়, অল্প মজুরীতে তাদের খাটিয়ে নেয় আর উৎপন্ন ফসলও নামমাত্র দামে তাদেরই কাছে বিক্রি ক'রতে বাধ্য করে।

গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের ঋণদানের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কমিটি বিষয়টিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা ক'রে রিপোর্ট পেশ ক'রেছেন। প্রদত্ত এই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারগুলিকে যে ধার দেওয়া হয় তার একটা বড় অংশই বিশেষ ভোগ্য ঋণ। এই কমিটির সুপারিশ হ'ল, গ্রামে দরিদ্র পরিবারগুলিকে ঋণদানের প্রধান দায়িত্ব সমবায় সমিতি, কৃষক সেবা সমিতি, বহুমুখী সংস্থা ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকেই দেওয়া উচিত। এর ফলে মহাজনদের ঋণদানের একচেটিয়া করবার রদ হবে। দেনাদারদের চড়া হারে সুদ গুণতে হবে না, ঋণের বোঝা দিনে দিনে বেড়ে তাদের সর্বস্বান্ত ক'রতে পারবে না।

ঋণদান পদ্ধতির মধ্যে কিছু জটিলতা থেকে গেছে। যার ফলে দরিদ্রতর শ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ধার পাওয়া অনেক সময়েই সহজ হয় না। এই দরিদ্রতর সম্প্রদায়ের মানুষেরা দরকারের সময় যাতে সমবায় সমিতি, কৃষক সেবা সমিতি, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি দেনা-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ সহজেই ধার পেতে পারেন তার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। গ্রামের দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষদের জন্যে কার্যকরী ঋণদানের ব্যবস্থা কিছুটা এগিয়েছে। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে পঞ্চম যোজনায় কতকগুলি কর্মসূচী নেওয়া হ'য়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদন, মেষপালন, শূকর-পালন, পোলট্রি ইত্যাদি পরিপূরক কাজের সাহায্যে প্রান্তিক চাষী ও মজুরদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট উদ্যোগগুলি থেকেও দরিদ্র পরিবারগুলোর অন্নসংস্থান হ'তে পারে। ৫৩ লক্ষেরও কিছু বেশি এই ধরণের উদ্যোগ আমাদের দেশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে আছে। অবশ্য এর নব্বই শতাংশকেই পারিবারিক উদ্যোগ বলা যায়। এইসব গ্রামীণ উদ্যোগ থেকে যে পণ্য উৎপাদিত হয় তা স্থানীয় অঞ্চলেরই চাহিদা পূরণ করে।

১০ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভালবাসার জন্য

রণজিৎ ভট্টাচার্য

স্টেশন থেকে জয়ন্ত ফিরছিল। একটু আগে ট্রেনটা চলে গেছে। মন্দিরা, ছেলে টুম্পা আর মন্দিরার ভাইকে ট্রেনে তুলে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। ক' পলক তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, মুহূর্তে মুহূর্তে সরে সরে যাচ্ছিল মুখটা, মুখের পাশে পাশে ছোট্ট রুমালখানা উড়ছিল। বিদায় সঙ্কেত করছিল মন্দিরা। এখন, এই মুহূর্তে, যখন সকালের পৃথিবীটা নরম আলোয় মাখামাখি, সাইকেলটার গতি মন্থর, দুপাশের দৃশ্যাবলী সর সর করে পিছিয়ে যাচ্ছিল, তখনও জয়ন্তর হৃদয়মন মন্দিরার ছবিতেই ভরপুর। তুমি আশ্চর্য সুন্দর মন্দিরা। তুমি আমাকে ভালবেসেছ, আমার কাজকে ভালবেসেছ, ভালবেসেছ আমার জীবনকে।

পিছনের সেদিনকার ছবিখানা ভেসে উঠছিল। টুকটাক কাজের মধ্যে সারা দিনের খণ্ড খণ্ড অবসরে মাঝেমাঝেই কাছাকাছি হতে হয়েছে। জয়ন্ত বলেছে, 'কেমন লাগছে।' মন্দিরার উত্তর, 'ভালই তো।' জয়ন্ত আশ্বস্ত কিছুটা, তবুও সামান্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'জান তো আমি চাকরি করি না।' মন্দিরা ঘাড় নিচু করে উত্তর দিল, 'জানি'। 'জান!' সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে জয়ন্ত সামান্য আবেগাপ্লুত। তার মনে ইতস্তত হালকা মেঘ, দ্বিধার ভেলায় সঞ্চরমান, সমগ্র চিন্তা জুড়ে তাদের স্বচ্ছ ছায়া থরো থরো কাঁপছিল।

'কিন্তু একথা তো জান না যে আমি চাষা।'

'জানি।' লাজুক দৃষ্টিটা জয়ন্তর চোখে ফেলেই মন্দিরা চোখ নামিয়ে নিল। 'গ্রাজুয়েট চাষা'। অস্ফুট রিণরিণে হাসিতে তার চাপা কণ্ঠস্বর টলটল করছিল। জয়ন্ত আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাল। মন্দিরার সমগ্র মুখমণ্ডলে তার দুচোখ নিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সমস্ত দ্বিধা সংকোচ ও অবিশ্বাসের মধ্যে সে যেন একটা শান্ত প্রত্যয়কে খুঁজছিল, উন্মুখ হচ্ছিল অনুসন্ধানে, তার রূপ আবেগ এখন পদ্মপাতার জল। সে কাঁপা কাঁপা হাতে স্পর্শ করছিল মন্দিরাকে, মন্দিরাও থরোথরো কাঁপছিল, তার হৃদয়ের আঙিনায় সহসা এক ময়ূরী পেখম মেলছিল। জয়ন্ত তাকে দুই বাহু দিয়ে ঘন আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছিল।

জয়ন্ত-মন্দিরার প্রথম রাত্রিটা চোখের সামনে এই মুহূর্তে ভাসছিল।

বাড়িতে ফিরতেই দিদি বললেন, 'বউ গাড়িতে বসতে পেয়েছে তো।' জয়ন্ত উত্তর দিয়ে বাবার কাছে চলে গেল। বাড়িতে ছোট সংসার। মাতৃহীন সংসারে জয়ন্ত আর মন্দিরা। তাদের ছেলে টুম্পা ও বাবা, দূর সম্পর্কের এই বিধবা দিদিটি। দু একজন ঝি-চাকর। ছোট ভাইটি খড়গপুরে। টেকনোলজি পড়ে। বাবা প্রথমে মন্দিরার ট্রেনে বসার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, টুম্পার অভাবে আপনার শূন্যতার কথা বললেন। জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত শুনছিল, বা শুনছিল না, সে কথায়-বার্তায় উত্তর-প্রত্যুত্তরে আজ কিছুটা বা সংক্ষিপ্ত, বাবা সামান্যক্ষণ লক্ষ্য করলেন, তাঁর দুই ঠোঁটে পাতলা হাসি ভেসে উঠছিল। বললেন, 'তুই শ্বশুরবাড়ি কবে যাবি। শ্রীরামপুরে?'

'বৌভাতের দিন। বলে দিয়েছি ওদের। ওরা অবশ্য আগেই যেতে বলছিল।'

মন্দিরাও বলেছিল। 'তুমি বিয়ের দিন যাবে না?'

'না মনু। এত আগে থেকে তুমি যেতে বল না। আমি বৌভাতের দিন যাব। তুমি তো আমার প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছই।' টুকরো টুকরো সুখের হাসিতে জয়ন্তর স্বর উচ্ছল হয়ে উঠছিল, 'তোমার দাদার বিয়ে, না গিয়ে পারি। নতুন বৌদির প্রেজেনটেশনটা ঠিক করে নিয়েছ তো।'

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হতে হতে জয়ন্ত হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল। সে নিজেকে সচেতন করতে

চাইল। মনের উজ্জ্বল আঙিনা থেকে মন্দিরার মূর্তিটাকে দুহাতে আলতো করে সরাতে সরাতে ব্যস্ততার পটভূমে মনটাকে মুড়ে ফেলবার চেষ্টা করল। তাকে বেরোতে হবে এবার। কাজ আছে। অনেক কাজ। দরজার মাথার উপরেই মন্দিরার ছবি। ওপাশে মায়ের ফটোটার অদূরে মন্দিরা-জয়ন্তর জোড়া ছবি। টেবিলে টুমপাকে কোলে নিয়ে মন্দিরা। সর্বত্র তার স্পর্শ, সমস্ত ঘর জুড়ে পুষ্পগন্ধের মত তার স্নিগ্ধহাসি। ভাসমান, দোদুল্যমান। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার কাজকে তোমার জীবনকে ভালবেসে তোমার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি। তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব।

বেরোতে গিয়েও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়ন্ত। সে আবার সেই বিচিত্র মগ্নতায় লীন হয়ে যাচ্ছিল। এমন কথা বোধ হয় বিচিত্রই। কোন তরুণী একটি তরুণকে ভালবাসবে, এ অতি স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেমিককে ভালবেসে তার জীবন ও কাজকেও মহৎ ভালবাসায় সিঞ্চিত করতে পেরেছে কজন, জয়ন্তর অজানা। অনেক যন্ত্রণার মত আজ অকস্মাৎ আর একটি যন্ত্রণা তাকে মৃদুমৃদু দংশন করছিল। যে যন্ত্রণার নাম চন্দ্রিমা। কল্যাণী কৃষি মহাবিদ্যালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মীর কন্যা। জয়ন্ত যখন ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র, তখন তার সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়, পরিচয় থেকে প্রেম। প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে চন্দ্রিমার বিয়ের দাবী। কিন্তু ভেঙে গেল সব। প্রতিবন্ধক হলেন বাবা। এক বিচিত্র প্রতিবাদে তিনি কঠোর হয়ে উঠেছিলেন।

সেই দিনটি জয়ন্তর চোখে পুরানো এক ছায়াছবি। বাবার মর্মাহত দৃষ্টির সামনে জয়ন্ত স্তব্ধ, বিস্মিত। তার হাতে এক নামকরা কৃষি কলেজের অধ্যাপক পদের নিয়োগপত্র। বাবা মৃদু গম্ভীর-কণ্ঠে বলছিলেন, কিছুটা ক্ষুব্ধ ব্যথিত, 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুই ছিঁড়ে ফেল জয়। ওতে আমার মত নেই।

জয়ন্ত বিস্ময়াহত, বলল, 'সে কি বাবা। কলেজের লেকচারারের পোষ্ট, ভাল পে-স্কেল। এমন একটা সম্মানের চাকরী—'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। ছেলের সঙ্গে তর্কাতর্কি তাঁর ভাল লাগছিল না। অনেকক্ষণ পরে শান্তস্বরে বললেন, তাঁর অনুত্তেজ স্বরে—এই মুহূর্তে আদেশ ছিল না, 'চাকরী করার জন্য আমি তোকে এগ্রিকালচার পড়তে পাঠাইনি। আমাদের এত জমি, বাগান পুকুর। তুই তো জানিস আমাদের যা কিছু সবই চাষ থেকে। লোকের ধারণা মূর্খ লোকেরই চাষ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। চাষের জন্যও যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দরকার। সেই শিক্ষার জন্য তোকে পাঠালুম। কিন্তু কলেজের শিক্ষা তোকে বাবু করে দিয়ে ফেরত পাঠাল!'

জয়ন্তর মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। সে অধীর হয়ে বলল, কিছুটা বিরক্ত বিব্রত, 'এত পড়শোনা করে চাষ করব বাবা।'

'তাই তো তোকে পাঠিয়েছিলুম জয়।' বাবা উত্তর দিলেন, তাঁর স্বর শান্ত বিষণ্ণতায় মোড়া, 'আমি মামুলি নিয়মে চাষ করি। তেমন লেখাপাড়া জানি না, বিজ্ঞান জানি না। আশা ছিল, ছেলে চাষে পণ্ডিত হয়ে আসবে, তার বিদ্যে দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে নতুন ধরণে চাষ করব, মাটিতে সোনা ফলাব। কিন্তু মাটিকে ভালবাসার শিক্ষা তো তুই পাসনি বাবা। শুধু কেতাবী বিদ্যেটাতেই পণ্ডিত হয়ে এলি।'

সেইদিন জয়ন্তর সমস্ত দিনরাত কুয়াশায় জড়িয়ে গিয়েছিল। তার স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। থেকে থেকে মনের আকাশে চন্দ্রিমার মুখটা তারকার মত ভেসে উঠছিল। অবশেষে সে মনস্থির করে ফেলল। তার কানে তখন বাবার বিষণ্ণ স্বর নিরন্তর বাজছিল: 'তোর নিজের জমি নিজের পুকুর পড়ে থাকবে, আর তুই যাবি পরের চাকরী করতে।' মনস্থির করে ফেলল জয়ন্ত। তার এ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিল। সে তখন ভাবতেও পারেনি তার স্বপ্নটাও এমনিভাবে নিঃশেষে উড়ে যাবে। চন্দ্রিমা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যাখ্যান করল তাকে। জয়ন্ত বেদনায় নিষ্প্রভ হতে হতে বলল, 'কিন্তু বিয়েটা তুমিই চেয়েছিলে চন্দ্রিমা।'

'এখনও চাই জয়ন্ত। তুমি চাষের পাগলামী ছাড়। চাকরীটা নাও।'

জয়ন্তর ঠোঁটদুটি সামান্য কাঁপছিল, নিরক্ত নিষ্প্রভ। সেই পাণ্ডুর ঠোঁটে ফিকে জ্যোৎস্নার হাসি জাগছিল। সে অনুভব করতে পারল সমস্ত ঘর জুড়ে বাবার উদগ্র চোখদুটি অধীর আগ্রহে বিস্ফোরিত হয়ে রয়েছে।

চোখের জলে ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

ধীরগতিতে সাইকেল চলছিল জয়ন্তর। তার চোখের সামনে আনন্দ-বেদনার হাত ধরাধরি, কখনো মন্দিরা কখনো চন্দ্রিমা পথের শূন্যতায় ভাসছিল, দুপাশে পত্র-বহুল ছায়াময় গাছগুলি সর সর করে পিছলে যাচ্ছিল। জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত তার কলমের আমবাগানের দিকে চলেছিল। সেখানে তার চারিদিকের বারান্দামোড়া বাংলোর মত ছোট ঘরটিতে আজ অনেক অভ্যাগতের আসার কথা। আসবেন বি. ডি. ও.। তাঁর সঙ্গে জেলার কৃষি অফিসার, রাজ্যের কৃষি ডিরেক্টার ও ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা। আধুনিক কৃষিতে তার সাফল্যের কথা আলোচনা করবেন, আলোচনার টেপরেকর্ড করবেন। ওরা অবাক হয়ে যাবেন জয়ন্তর বিরাট কৃষিক্ষেত্র দেখে। আম পেঁপে কলা। কত রকমের রবিশস্য। অন্য আর এক দিকে আলবলী ধানের জমি। এখানে ওখানে গভীর জলাশয়।

মন্দিরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'এই সব ফল তোমার বাগানের। এতো ধান, এতো ফসল এমন বড় বড়

মাছ—সব তোমার জমির, তোমার পুকুরের!' তরুণ জয়ন্তর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল, তার চোখের তারায় আশ্চর্য মুগ্ধতা, মন্দিরার কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই বলেছিল, হ্যাঁ। এতদিন আমারই ছিল। এখন একজন অংশীদার পেয়ে গেলাম। এখন থেকে এ সব তোমারও—।.... জান তো আমি চাকরী করি না।'

'জানি।'

'আমি বাবু টাবু নই। চাষা।'

'হাঁ। গ্রাজুয়েট চাষা।' মন্দিরার চোখমুখে রোমাঞ্চ গড়িয়ে পড়ছিল।

আস্তে আস্তে দিনরাত্রির আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে মন্দিরা নিজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে লাগল। সে শহরের মেয়ে। যথেষ্ট শিক্ষিতাও। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও সে এই নতুন জীবনে কেমন করে মগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। এদের ছিমছাম পরিচ্ছন্ন বাড়ি, টিউবওয়েল বাথরুম পুকুর বাগান, ইলেকট্রিসিটি, রেডিও—তার আশৈশব শহরের গন্ধটা এই নতুন পরিবেশের সমগ্রতায় বিন্দু বিন্দু শিশিরের মত ঘনীভূত হয়ে গিয়েছিল। সে আশ্চর্য হচ্ছিল। জমিতে বারোমাস ফসল, পুকুরে বারোমাস মাছ, ওপ্রান্তের গোয়ালে দুধ, আশ্চর্য মিষ্টি তার স্বাদ, বাড়ির পার্শ্বস্থিত ঘেরা ফালি জায়গায় ছোট একটি পোলট্রি, আস্তে আস্তে তার মন গুঁড়ো গুঁড়ো মমতায় মণ্ডিত হয়ে যাচ্ছিল।

জয়ন্ত থেকে থেকেই বলত, 'মন্দিরা, আমি চাকরী করি না। তাই আমার ছুটি নেই।'

ততদিনে মন্দিরা জয়ন্তর সহধর্মিণী। জয়ন্তর বুকে মুখ ঘষে উত্তর দিতে তার দেরী হত না, 'না থাক। তবে আমাদের সব কাজের জন্য যে লোকগুলিকে রেখেছ, মাঝেমাঝে তাদের ছুটি দিও কিন্তু।'

'তাই হবে মহারাণী।'

কিন্তু, জয়ন্ত মাঝেমাঝে লক্ষ্য করে মহারাণীর হুকুম মালিককেও কখনো কখনো মুশকিলে ফেলে দেয়। অন্ততঃ মন্দিরার দাদার বিয়ে উপলক্ষে জয়ন্তকে এমনি এক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল। মন্দিরা সরাসরি জয়ন্তকে বলল, 'শুনেছ, মহারাণীর হুকুম আছে।' জয়ন্ত সকৌতুকে তার দিকে তাকাল, মন্দিরার কণ্ঠেও সকৌতুক উচ্ছলতা, 'আমার দাদার বিয়েতে মালিকের চারদিন ছুটি চাই। আমার সঙ্গে যাবে।' জয়ন্ত নিঃশব্দে তার ভ্রূভঙ্গী উপভোগ করছিল, চোখে বিন্দু বিন্দু মুগ্ধতা, ঘাড় নেড়ে বলল, 'মালিককে ছুটির লোভ দেখিও না মহারাণী, তাহলে প্রশ্রয় পেয়ে যাবে, কাজ ভুলে ছুটির কাঙাল হয়ে উঠবে।'

ছোট বাংলোটায় বসতে না বসতেই অনিল সাইকেল থেকে নামল। অনিলই জয়ন্তর প্রধান সহকারী হিসাবে সব কাজ-কর্মের তদারক করে। সে বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল, 'ওঁরা বি. ডি. ও. অফিসে এসে গেছেন দাদা। বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।'

জয়ন্তর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তার মনে একটা সুখের আস্বাদ মাখা তুলছিল। মন্দিরা এতক্ষণে বোধ হয় পৌঁছে গেছে, কলকণ্ঠে গল্প করছে, টুমপাকে সামলাতে সামলাতে বলছে: 'তোমার জামাই আজ আসতে পারল না মা, আজকে তার কাছে কত সরকারী লোক আসবে, তার কথা 'টেপ' করবে....

জয়ন্তর শান্ত দৃষ্টিটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার বাগানে ফলের জমিতে সবজীর ক্ষেতে এখন মৃদু ব্যস্ততা। 'জনেরা' কাজ করছে, শ্যালো টিউবওয়েল ঝলকে ঝলকে শীতল জল উপরে দিচ্ছে, সোনাপ্রসবিনী শ্যামল মাটি আপন শরীরটাকে ধারায় ধারায় ভিজিয়ে নিচ্ছে। জয়ন্তর মুগ্ধ চোখ দুটি স্বপাতুর হয়ে উঠছিল।

অনিল বলল, 'জিপের শব্দ শোনা যাচ্ছে দাদা।'

জয়ন্তর চোখে ব্যস্ততা জাগল। মগ্নতার আবরণ-টা মুহূর্তে মুহূর্তে সরিয়ে দিতে দিতে অনিলকে কাছে ডেকে কিছু বলল। অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল।

দেনা-ছাড়

৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সম্প্রদায়ের অর্থ-নৈতিক উন্নতি বাস্তবায়িত ক'রতে হ'লে এই ছোট ছোট কুটির শিল্প গড়ে তোলা দরকার। যদি এই সমস্ত উদ্যোগগুলি উৎপাদন বাড়াতে পারে ও স্থানীয় বাজারের বাইরেও একটা বাজারের ব্যবস্থা ক'রতে পারে তা'হলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবার-গুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে। কারণ এই ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার কেবল স্থানীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যাপক হবে। ফলে একটা অনুন্নত অঞ্চল উন্নত অঞ্চলের বাজারে অংশ নিতে পারবে এবং অনুন্নত জায়গাটির অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলগুলিতে বেকার ও আংশিক বেকার মজুর বহু আছে। কাজ পেলেও তারা অনেক সময় বাইরে যেতে চায় না। অথচ এই গ্রামগুলিতেইও প্রয়োজন মাফিক কুশলী শ্রমিক অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। শ্রমিকদের জন্যে যদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তা'হলে তারা অল্পায়াসে দক্ষ হ'য়ে উঠবে ও নানান রকমের কাজ ক'রতে শিখবে। শ্রমিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গাবাদে পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হ'য়েছে।

প্রান্তিক চাষী, মজুর তথা গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষদের কিছুটা অর্থ-নৈতিক প্রগতি যদি না ঘটানো যায় তা'হলে দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে না। তাই ঋণ মকুব কর্মসূচীর লক্ষ্য মহাজনদের কবল থেকে এদের শুধু মুক্ত করাই নয় তার চেয়েও বড় লক্ষ্য উপার্জন বৃদ্ধির নানা সুযোগ এদের সামনে হাজির করা।

মুখোমুখি

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি নির্ভর করবে তার গদ্যের শক্তির ওপর। বাংলাভাষাকে এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যার ফলে তার ভেতর দিয়ে সব কিছু জানা আর প্রকাশ করা যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে তিনি এলেন। দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিনকে ছাড়িয়ে চলেন তাই আগে আগে। আর জেনে নিয়েছেন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আনতে চেয়েছেন তিনি দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি। মুখ তাই ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো। ডেকে বলেছিলেন :

জয়মণি স্থির হও
হে কালবৈশাখী শান্ত হও—
এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,
দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশ গঙ্গা।

আরো অনেক দিনের মতোই দামালো দিনের সেই কবি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হলাম আবার।
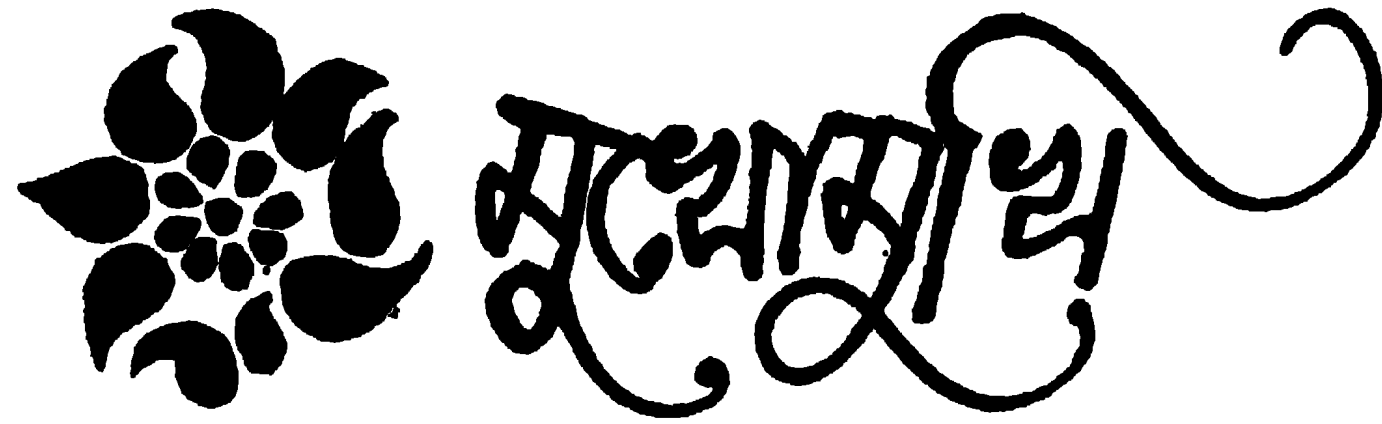
বসবার ছোট্ট ঘরখানায় তাঁর বিপুল বিশ্বের আদল। ডা: শরৎ ব্যানার্জী রোডের এই পরিচিত ঘরখানায় পা দিলেই মনে হয় গোছা গোছা ধানের শীষের মধ্যে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। যে-হিরণ্যগর্ভ দিন আসছে মাথায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে তার সেই বলিষ্ঠ হাত দুখানা দেখতে পান তিনি আজো। আর ছড়িয়ে দেন, ভরিয়ে দেন ভালোবাসার সুর। ভালোবাসার সুরে এক হয়ে যায় দেশ আর মা। মা আর দেশ।

ঘরের ভিতর মুখোমুখি আমরা। পরনে পরিচিত সেই চেক লুঙ্গি, মুখে পাইপ। মাঝে মাঝে হাত বোলাচ্ছেন বাবুই পাখির বাসায়। তাঁর চুল, কবির ভাষায়, বাবুই পাখির বাসা।

কিছু টুকিটাকি কথা হল। হল নানা খবরের লেনদেন। এর পর পাড়লাম আসল কথা। বললাম, ছেলেবেলার কথা কিছু বলুন। হ্যাঁ, আপনার জীবনে, সাহিত্য চর্চায় কোনো পারিবারিক প্রভাব ঘটেছে কি?

মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইলেন পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ফিরে গেলেন ফেলে আসা দিনগুলোয়। স্বভাবসিদ্ধ শান্তগতিতে থেমে থেমে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। বললেন, কবে জন্মেছি জানো? ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী। মাঘ সংক্রান্তির দিনে, কৃষ্ণনগরে, মামা বাড়িতেই আমি জন্মেছিলাম। বাবা মারা যান অনেক কাল আগেই, মা-ও আমার গত হয়েছেন। বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাবার যা রোজগার ছিল, তাতে কোনদিনই সংসারে সাচ্ছলতা ছিল না। সবসময়েই টানাটানি লেগে থাকত। এমনকি তিনি যখন মারা যান তখনও কিছু টাকা রেখে যেতে পারেন নি। তবে একটা জিনিস রেখে গিয়েছিলেন, তা হল সততা।

মা যামিনী দেবী। আমার মা খুব ভালো কথা বলতে পারতেন। তাঁর হৃদয় ছিল খুব বড়। আর এই মা, আমার মায়ের হৃদয়, বাবার বুদ্ধি হল আমার সাহিত্যের ভিত। বাবা ছিলেন বেশ কড়া। মা দিতেন কিন্তু আস্কারা। বলতেন, রোদে জলে না বেরুলে শক্ত হবি কি করে। আমার মা ছিলেন সত্যিসত্যিই বেশ সাহসী, বেপরোয়াও। আমার ঠাকুরদার প্রভাবও আমার ওপর আছে। রোজ ভোরবেলায় তিনি গীতা পড়তেন, মন্ত্র আওড়াতেন। তুলসীদাসের দোঁহা পড়েও বুঝিয়ে দিতেন। মা ছিলেন খুব মানুষপ্রিয়। তাঁর কাছেই প্রথম শিখি মানুষকে ভালোবাসতে। আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে লেখাপড়া ছাড়াও গান-বাজনা আবৃত্তি খেলাধুলোর ভিতর দিয়ে। সাঁতার কাটা, লাঠিখেলা, ছোরা খেলাও ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। জীবনকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, প্রকৃতিকে ভালোবাসা, দেশকে ভালোবাসা এবং তা থেকে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল। এসবের মূলেও আমার মা। আমার ভালোবাসার মা। প্রথম লেখাপড়া আমার নওগাঁর মাইনর স্কুলে। তারপর আসি কলকাতায়, সেটা ১৯৩০ সাল। মেট্রোপলিটান, সত্যভামা, মিত্র ইনস্টিটিউশনেও পড়ি। মিত্র থেকেই পাশ করি ম্যাট্রিক ১৯৩৭

সালে। তারপর আই.এ. পাশ করি আশুতোষ কলেজ থেকে, আর বি. এ. পাশ স্কটিশচার্চ থেকে। গ্রাজুয়েট হবার পর ভর্তি হলাম য়ুনিভার্সিটিতে, দর্শন শাস্ত্র পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হল না। রাজনীতিই বাদ সাধল।

আবার থামলেন কিছুক্ষণ। ইতোমধ্যে এলো চা, দুধছাড়া চা। ডুব দিলাম তাতে। মাঝে মাঝে ছাড়া-ছাড়া আরো কিছু কথা। দেখতে দেখতে সময় এগোতে লাগল। প্রায় সাড়ে দশটা। কবির মেয়ে চলে গেলেন স্কুলে।

আমি বললাম, আপনার জীবিকার কথা কিছু বলবেন?

—আগে একটি প্রকাশন সংস্থায় কয়েক মাসের জন্য করেছিলাম আংশিক সময়ের চাকরি। কিন্তু সেটিও রইল না। তারপর লেখাটাই ছিল একমাত্র জীবিকা। সামান্যই পেতাম, তাও অনিয়মিত। তখন থাকি আমি বজবজে। পরে কলকাতায় এসে কিছুকালের জন্যে এক ঘণ্টা করে সম্পাদনার কাজ করতাম সিগনেট প্রেস-এ। এক্ষেত্রেও জুটত সামান্য। কিন্তু তা-ও রইল না। রইল শুধু বই লেখা আর অনুবাদকর্ম। কিছুদিন একটি বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থায় অনুবাদের কাজ করেছি বাড়িতে বসে। বেশ কিছুকাল করবার পর আর ভালো লাগল না একাজ। ছেড়ে দিলাম। আবার এলাম পুরোপুরি লেখাতে। এরপর বছর খানেক করলাম 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনা। এটাও ছাড়তে হল একসময়। কাগজের আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে তখন। সময়টা ১৯৬২-৬৩। সত্যিকথা বলতে কি, বরাবরই আমাকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে। আর বরাবরই চেষ্টা করেছি কোনো বাঁধা চাকরি না করে স্বাধীনভাবে থাকার। এখন লেখাটাই আমার একমাত্র জীবিকা। পুরনো বইয়ের রয়্যালটি কিছু কিছু পাই। তাছাড়া রোজগারের মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে পাওয়া অর্থ। অর্থাৎ নানান, দেশে আমার যেসব লেখা অনূদিত হচ্ছে তার থেকে আসে যেমন কিছু, তেমনি বিদেশে কখনো বেতারে কথা বলেও কিছু কিছু এসে যায় আমার হাতে। প্রসঙ্গত বলি, ডাক বাংলার ডায়েরিটা আবার দ্বিতীয় পর্বে শুরু করছি আনন্দ-বাজারে।

তবে একটা কথা মনে রেখো, জীবিকার জন্য আজ পর্যন্ত আমি এমন কিছু করিনি যাতে লজ্জা পেতে পারি বা আদর্শকে বাঁধা দিতে হয়। না, এব্যাপারে কোনদিনই আদর্শকে ক্ষুন্ন করিনি। ফলে আর্থিক সচ্ছলতা আমার যেমন কোনদিন ছিল না, তেমনি আজো নেই। খুব টেনেটুনেই চলে আমার সংসার।

এরপর প্রশ্ন করলাম, আপনার কাব্যজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। প্রথম কোন্ লেখার জন্য আপনি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হন?

কবি বললেন, আমার কাব্যজীবন বলতে ঠিক কিছু নেই। সত্যি বলতে গেলে, কবিতা দিয়ে কিন্তু আমার লেখা শুরু নয়। আমি শুরু করি গদ্য দিয়ে। তখন ক্লাশ সেভেন-এর ছাত্র আমি। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য লিখেছিলাম 'ঝরা ফুল'। তারও আগে লিখেছি 'চিত্রকর'। হ্যাঁ, দুটো লেখাই গল্পের মতো।

কবিতা লিখতে শুরু করি একরকম বন্ধুদের তাগিদেই। তারপর চলল কবিতাই। শেষে কবিতা লিখতে লিখতে গদ্য লেখা ভুলেই গেলাম। তারপর অনেক পরে আবার গদ্য লিখতে শুরু করি ১৯৪২ সালে জনযুদ্ধের সময়। পদ্যের ব্যাপারে যেমন মাষ্টারমশাই কবিশেখর কালিদাসের সাহায্য পেয়েছি তেমনি গদ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাহায্য করেন শ্রমিক নেতা, গল্পলেখক সোমনাথ লাহিড়ী।

প্রথম থেকেই আমি সাধারণ পাঠকের স্বীকৃতি পেয়েছি, পেয়েছি ভালোবাসা। তবে 'যে দিনের গান'-ই প্রথম কিছুটা চাঞ্চল্য এনেছিল। এটি বেরোয় প্রথম 'যুগান্তর' রবিবাসরীয়তে। তখন সম্পাদনা করতেন এটি প্রবোধকুমার সান্যাল। তারপর 'চীন—১৯৩৮' বেরোয় আনন্দ-বাজারে। এবং এটাই সে সময় সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিল।

—উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন কেন, এতে কি আপনার জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে বেড়েছে?

—আগেই বলেছি, গদ্য দিয়েই আমার সাহিত্য শুরু। আর উপন্যাস লেখার ইচ্ছে সেই ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকেই আমার ছিল। তার কারণ হচ্ছে কবিতায় সব বলা যায় না, বলতে পারিনা। আমিতো নানান রকম লোকেরই সংস্পর্শে এসেছি, দেখেছি নানান ধরণের মানুষ। তাদের কথাই বলতে চেয়েছি উপন্যাসে। আমাকে কেউ ঠিক ঔপন্যাসিক বলে স্বীকার করতে চায় না। সে অর্থে উপন্যাস কোন বাড়তি জনপ্রিয়তা দেয়নি। হ্যাঁ, 'হাংরাস' উপন্যাসটি রুশভাষায় অনূদিত হচ্ছে, সামনের বছরই বেরুবে।

জিজ্ঞাসা করলাম আবার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরের কবিতার মধ্যে আপনি কোন তফাৎ দেখেন কি?

—আগেকার কবিরা প্রধানত মনের বাইরের জগতটাই বড়ো করে দেখতেন। যুদ্ধ-পরবর্তী কবিরা অন্তর্জগতকেই প্রাধান্য দিলেন। দ্বিতীয়ত, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি ব্যাপারে যুদ্ধ-পরবর্তী কবিদের হাত অনেক বেশি পাকা। সে তুলনায় আগেকার কবিদের ভিতরে ভাষা, ছন্দে অত বেশি মাজাঘষা ছিল না। কিন্তু, বোধহয়, আগেকার লেখায় অনেক বেশি প্রাণ ছিল আর এটার অভাব খানিকটা দেখি এখনকার কবিদের কবিতায়।

—আপনি তো আফ্রো-এশীয় লেখক সংস্থার ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল। সে সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তরে বললেন, আমাদের হেড কোয়ার্টার কায়রোয়। বিভিন্ন দেশের

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষি

গম চাষের আগাম ভাবনা

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

মাত্র কয়েকমাস আগে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী জগজীবন রাম কলকাতায় বলেছেন—ভারতবর্ষের কোথায়ও যদি গম বিপ্লব হয়ে থাকে তা হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। গত কয়েক বছর ধরেই রেকর্ড ফলনের জয়টীকা কপালে নিয়ে পশ্চিম বাংলা গম চাষে এগিয়ে চলেছে। এই জয়যাত্রার ভাগিদার অবিসংবাদিত ভাবে বাংলার গমচাষীরা।

গত বছর পশ্চিম বাংলায় প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে গম উৎপাদন হয়েছে ১২ লক্ষ টন। পশ্চিম বাংলার গম চাষীরা হরিয়াণা-পাঞ্জাবের গমচাষীদের কাছে পরম ঈর্ষার পাত্র। কারণ তাদের হাতের গমচাষের জয়পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছে এবাংলার গম চাষীরা। ক্রমশই পশ্চিম বাংলায় গম চাষের এলাকা বাড়ছে। এবছরের লক্ষ্য সীমা ধরা হয়েছে ১৮ লক্ষ একর জমি। গম চাষের ফলনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৪.৫ লক্ষ টন।

এর মধ্যেই পশ্চিম বাংলার গম উৎপাদক প্রধান কয়েকটি জেলায় গম চাষের তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মালদা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়। গমচাষের নানা সুবিধা। বিশেষ ক'রে সুবিধা হল এতে সেচের জলের চাহিদা কম। এক একর বোরো ধান চাষ করতে যে পরিমাণ সেচের জলের দরকার সেই পরিমাণ জল দিয়ে প্রায় চার একর গম চাষ করা যায়। তাছাড়া গম চাষে জমি কম দিন আটকে থাকে। কাজেই পরবর্তী পাট, আউশ ও অন্যান্য ফসলের জন্য চৈত্র মাসের আগেই জমি খালি পাওয়া যায়। গম চাষের এ এক মস্ত সুবিধা। আগে আমন ধানের পর এই ৩।৪ মাস জমি খালি পড়ে থাকতো। গম চাষে চাষীরা সব চেয়ে বেশি আগ্রহী—কারণ, গমে রোগ-পোকা অন্যান্য ফসলের তুলনায় অনেক কম।

তবে গত বছর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার গম চাষীরা ভুসো রোগের আক্রমণে চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ভুসো মূলত বীজবাহিত রোগ। কাজেই ভালভাবে পরিশোধিত বীজ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করলে এ ব্যাপারে আপনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

পশ্চিম বাংলায় সোনার রঙে রঙ সোনালিকার কদর সর্বত্র। শুধু রঙই নয়, চেহারা, গতর, বেশিফলনের যোগ্যতা, উত্তম মান, বিভিন্ন মাটিতে ফলনের সুবিধা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সোনালিকা সব চাষীর আদরিণী। এবিষয়ে আপনাকে সতর্ক হতে হবে যে আপনার বীজ ভুসো রোগ প্রতিরোধী করে শোধন করা হয়েছে কিনা। আর একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার যে রোগহীন ফসল থেকে ঐ বীজ সংগৃহীত হয়েছিল কিনা। ভেজাল বীজে বাজার ভরে গেছে। ইদানীং অনেকেই খাবার গম বীজ হিসাবে বিক্রি করছে। এজন্য খুব বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান থেকে পুষ্ট দানার, শুকনো, তাজা, শোধন করা বীজ দেখে নেবেন। আর বীজ নির্বাচনের সময় কোন মাটিতে কোন জাতের বীজ উপযোগী তা জেনে নিতে হবে। কৃষি বিজ্ঞানীরা বার বার বলেছেন সঠিক জমিতে সঠিক বীজ নির্বাচনের উপর গমের ফলন নির্ভরশীল।

এবার অনেক জায়গায়ই এখনও ভাল বৃষ্টি হয়নি। গম চাষ এবার একটু নাবি হবে বলে ধারণা। কাজেই সোনালিকা সারা অগ্রহায়ণ মাস ধরে বোনা চলবে। শীতও এবার দেরীতে আসছে—কাজেই গম চাষও পেছিয়ে যাবে কিছু দিন। সোনালিকা গম বাদামি, কালো মরচে রোগ প্রতিরোধী। সমতলভূমিতে বোনার পক্ষে সোনালিকাই সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

আগাম বোনার পক্ষে কল্যাণসোনা ও অর্জুন যথেষ্ট উপযোগী। তবে ইদানিং কয়েক বছর এ দুটি জাত নাবিতে বোনা হচ্ছে। তবে তাতে ফসলের পরিমাণ কমে যেতে পারে। অর্জুন মরচে রোগ প্রতিরোধী। সুতরাং যেখানে এই রোগের আক্রমণ বেশি সেখানে কল্যাণ সোনার বদলে অর্জুনই বোনা উচিত। জনক জাতের গমও পশ্চিম বাংলার পক্ষে উপযোগী। অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত বোনা চলে এবং এজাত বাদামী মরচে রোগ প্রতিরোধী। মালদা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় জনকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তবে এটি জলদি জাতের গম বলে আগাম বোনাই ভাল। নতুন জাতের একটি ভাল গম প্রতাপ। যেখানে সেচ, সারের সুযোগ কম সেখানে প্রতাপ খুব ভাল ফলন দিচ্ছে। শুকনো এলাকায় নাবিতে এবং আধা অনুর্বর জমিতেও প্রতাপ চাষ করে অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন উঠেছে গত বছর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে জমিতে হেক্টরে কল্যাণসোনা ৪৭ কুইন্টাল ফলন দিয়েছে সেখানে প্রতাপ ফলন দিয়েছে প্রায় ৫৫ কুইন্টাল। এছাড়া প্রতাপ মরচে রোগ প্রতিরোধী। দানাগুলি পুষ্ট, সোনালী, শক্ত এবং আটার রুটি ভাল হয়। খাদ্য গুণও এতে বেশি।

এবার শীত দেরীতে আসছে। সুতরাং গম চাষ এবার সারা অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত চলবে বলে আশা করা যায়। কাজেই পশ্চিম বাংলার পাহাড়ী এলাকার জমিতে সোনালিকা, কল্যাণসোনা ও গিরিজা কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বালিকাবধূ সংবাদ

— সুভাষ সমাজদার

আজ সে আসবে। তার বুকের রক্তে উল্লাসের কলধ্বনি বাজছে। তার একঘেয়ে একটানা ধূসর অন্ধকার জীবনে রামধনুর রঙীন ঝিলিমিলি ফুটে উঠেছে।

চারিদিকে ঝাঁপিয়ে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। আকাশে জ্বলে উঠল তারার দীপালি। আবছায়া অন্ধকারের পট-ভূমিতে আরও এক ছোপ নিকষ কালোর ইঙ্গিত দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সে নামল।

আলতা-রাঙা ছোট ছোট দুটো পা। পায়ের আঙুলে আঙুলে রূপোর আঙুঠী চকচক করছে। বাসুদেবের বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। কিন্তু—

মন খারাপ হয়ে গেল বাসুদেবের। এক গলা ঘোমটা। বঁধুর বদনখানা দেখা গেল না। তা না যাক—সংসারের সব কাজ শেষ হলেই তার মা তো তাকে তার ঘরে ঠিক পাঠিয়ে দেবে। তখন সেই নিরালা ঘরে—ভাবতে গিয়ে তার বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে।

বাসুদেবের বয়স পঞ্চাশ।

মুন্নিয়ার দশ।

রাত্রি নামল ঘন হয়ে।

মুন্নিয়া এল। এল বাসুদেবের ঘরে। ঠিক যেমন ভীত একটা ছাগশিশু আসে হিংস্র আর ক্ষুধার্ত বাঘের গুহায়। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসেও বাসুদেবের বুকের ভেতরে তীব্র কামনার অগ্নিগোলক উগ্র ক্ষুধায় জ্বলে উঠল। তারপর—

তারপরের সেই রোমাঞ্চকর আর শোকবহ খবর দেখুন ১৮৯১ সালের ২১শে মার্চের Times of India-র পাতায়—

A child wife Munnia (10) was murdered from the effects of an outrage, committed by her husband Basudev (50).

অর্থাৎ দশ বছরের এক বালিকাবধূ তার পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক স্বামীর যৌনক্ষুধা নিবৃত্তি করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। আরো আছে।

চল্লিশ বছরের একটি কৃষকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল একটি পাঁচ বছরের মেয়ের। তিন বছর পর স্বামীর ঘর করতে এল। ঠিক তার দিন পনের পর একদিন ভোরের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে শোনা গেল সেই কিষানের আর্তনাদ—আমার বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে গো—ঘুমজড়ানো চোখে ছুটে এল আশেপাশের লোক। দেখল—শোয়ার ঘরের বরগার সঙ্গে বাঁধা দড়িতে ঝুলছে হতভাগিনী। পুলিশ এল। বহুদর্শী প্রবীণ দারোগার চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল। লাশ পাঠিয়ে দিল সরকারী ডাক্তারের কাছে। পোষ্টমর্টেম পরীক্ষায় জানা গেল সম্পূর্ণ অন্য এক তথ্য—অসহায় শিশুটি আত্মহত্যা করেনি। তাকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। যখন তাকে দড়িতে টাঙ্গানো হয়েছিল তখনো সে জীবিত ছিল। মোটা সেই রশিটির ওপরে এবং নীচে তার কামড়ানো ও আঁচড়ানোর দাগ জানিয়ে দিল পৈশাচিক সেই হত্যাকে সে তার দুর্বল শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। বোম্বে হাইকোর্ট রিপোর্টসে এই চাঞ্চল্যকর মামলার পুরো বিবরণ ছাপা হয়েছে। কিষান তার স্বীকারোক্তিতে বলেছিল—তার যৌন-লালসা চরিতার্থ হওয়ার পরই মেয়েটি গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েছিল। সে ভেবেছিল বুঝি, মরেই গিয়েছে। তাই আত্মহত্যা প্রমাণ করার জন্যেই সে একাজ করেছিল.... ।

জুরীরা মন্তব্য করেছিল—One of the most brutal and cowardly murders that can be conceived, আর বিখ্যাত দৈনিক Bombay chronicle তার সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, This case of a child wife, so shockingly done to death, was a brutal one.

বেশীদূরে যেতে হবে না। বিগত শতাব্দীর পত্র-পত্রিকায় আর বিভিন্ন আদালতের নথিপত্রে ছড়ানো রয়েছে এমনি কত হাজারো বালিকা বধূদের নিষ্ঠুর ও বীভৎস অপঘাত মৃত্যুর করুণ ইতিবৃত্ত।

সতীদাহের মতই শিশুবিবাহ একটি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ—'Brutal Social crime' বলেছেন চাইল্ড ম্যারেজের গবেষক এবং Little wives of India গ্রন্থের লেখিকা ডক্টর এমিলি ব্রেনার্ড রাইডার (Dr. Emily Brainered Ryder)।

স্মরণাতীত কালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আড়ালে প্রচুর অবদান রয়েছে ডক্টর রাইডারের এই অমূল্য গ্রন্থ 'লিটল ওয়াইভস্ অফ ইণ্ডিয়া'র। আর একথা অনস্বীকার্য যে দূর ভবিষ্যতে Child Marriage

বরের বয়স পঞ্চাশ, কনের পাঁচ

Restraint Act-এরও বনিয়াদ রচনা করেছিল রাইডারের বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই বইটি—যার সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমালোচকরা বলেছেন, True and faithful picture of the cruel system of child Marriage।

রাইডার ইংরেজ মহিলা।

ভারতের পশ্চিমে বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামে গঞ্জে জনপদে ডাক্তারী করেছেন বহুকাল। কোন্ ঘটনা শিশুকন্যার বিবাহের এই মানবতা বিরোধী প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর মনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল সেটা তাঁর জবানীতেই শুনুন—

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল।

আমার বাংলোর বারান্দায় ডেক-চেয়ারে আমি একাই বসেছিলাম। দূর থেকে আরব সমুদ্রের বাতাস শীতল জলের ঝাপটার মত আমার নাকেমুখে আছড়ে পড়ছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, বাংলোর উঠোনে নারকেল গাছের আড়ালে একটা ছায়ামূর্তি যেন একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—কে ওখানে?—সামনে এসো—

—মেমসাহেব, আমাকে মরার ওষুধ দিন—আপনার পায়ে পড়ি—অন্ধকারের ভেতর থেকে তার কান্নাভরা কথাগুলো শোনা গেল।

—কি হয়েছে তোমার?

ফুলমণি থেমে থেমে বলেছিল-তার কাহিনী। সেই ইতিবৃত্ত যেমন করুণ তেমনি নিষ্ঠুর।

ফুলমণির একমাত্র সন্তান—তার আট বছরের মেয়ে লছমীর সাদী দিয়েছিল খুব সমারোহ করে। বরের বয়স বত্রিশ। গাট্টাগোট্টা চেহারা। তার আরও চার বৌ আছে। প্রথমদিনে স্বামীর সঙ্গে রাত্রিবাস করার পরই লছমী অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার ওপর শুরু হলো নির্মম অত্যাচার। খবর পেয়ে ফুলমণি যেয়ে দেখল তার আদরের লছমীর মৃতদেহ সাদা কাপড়ে জড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এই পর্যন্ত বলেই সে অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কান্না-জড়ানো গলায় বলল, আর বেঁচে থেকে কি হবে মেমসাহেব—আমাকে মরার ওষুধ একটু দিতে পারেন না মেমসাহেব—

আমি তাকে সান্ত্বনার একটি কথাও বলতে পারলাম না। আমার বাংলোর বারান্দার এককোণে সে বসে রইল—বসে রইল একটা পাথুরে মূর্ত্তির মত। চারদিকে নিশিরাত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। এক সময় সে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখে কেমন স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, সালাম মেমসাহেব—

ধীরপায়ে, সে উঠোন পেরিয়ে দূরে ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই চারিদিকের গভীর স্তব্ধতার ভেতরে মৃদু শব্দ শোনা গেল ঝপ্—আমার বাড়ির সামনে গভীর জলে ভরা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল ফুলমণি। এই ঘটনার পরই I resolved to "go on a mission for these child wives"—

এসব ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। এই বছরেরই এই মাসেরই শেষের দিকে ফুলমণির প্রসঙ্গে এলাহাবাদের বহুল প্রচারিত দৈনিক 'পাইওনিয়ারে'

লিখলেন রাইডার একটি জ্বালাময়ী নিবন্ধ; সঙ্গে সঙ্গে দেশের দিকে দিকে জেগে উঠল অভূতপূর্ব একটা চাঞ্চল্য। ডক্টর ম্যানসেল আর মহিলা চিকিৎসক রাইডারের নেতৃত্বে ভারতের সমস্ত লেডী ডাক্তারদের একটা কনফারেন্স ডাকা হলো। সেই সভার প্রস্তাবগুলো জানিয়ে তদানীন্তন কালের গভর্ণর জেনারেল অর্থাৎ বড়লাট ল্যান্সডাউনকে আবেদন জানানো হলো। সেই দরখাস্তে স্বাক্ষর করল সারা ভারতের প্রায় পঞ্চায় জন বিদেশিনী ও দেশীয় মহিলা ডাক্তার—তার আরম্ভে ছিল—

May it please your Excellency.

"The undersigned women, practising medicine in India, respectfully crave your Excellency's attention—মহানুভব নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন, মাতৃত্বের উপযোগী হওয়ার পূর্বে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞান হওয়ার আগেই শিশুকন্যাকে বিবাহে ভারতীয় আইনে কোন বাধা নেই বলেই সমাজে বহুবিধ অন্যায় এবং পাপের পাহাড় জমে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, This Marriage Act has permitted homicide অর্থাৎ বিবাহ আইন অবাধ নরহত্যার অনুমোদন করেছে। আরও ছয় সাত দফার সে এক দীর্ঘ ও বিশদ আবেদনের শেষে মহিলা ডাক্তারদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কয়েকটি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কেসও অর্থাৎ কয়েকটি দুর্ভাগিনী শিশু বধূর ইতিবৃত্ত ছিল। এই দরখাস্তটা বড়লাট ল্যান্সডাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল ১৮৯০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর।

তারপরেই মাদ্রাজ টাইমসে, পাইওনিয়ারে এবং ভারতের বহুল প্রচারিত বিভিন্ন দৈনিকে ঘৃণ্যতম এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তারই ফলশ্রুতিতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Indian Legislative Assembly) স্যার অ্যাণ্ড্রুস্কোবল তুললেন Age of Consent Bill। এই বিলে বলা হলো, বিয়ের আইন সম্মত বয়স অথবা যৌন মিলনের বয়স হলো বারো। কিন্তু আইন লংঘন করলে শাস্তি হবে এমন কোন সর্ত ছিল না বলেই এই বিল মোটেই কার্য্যকরী হলো না। তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পর যখন মণ্টেগু চেমস ফোর্ড প্রবর্তিত শাসন সংস্কারে এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে দেশব্যাপী গণজাগরণের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন ভারতীয় সমাজ সংস্কারকরা আবার অ্যাসেম্বলীতে চাইল্ড ম্যারেজের প্রশ্নটি নতুন করে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যখন দেশজুড়ে বিয়ের নিম্নতম বয়স নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা তখন সুদূর আজমীরের ভারতীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিদগ্ধ ও মহাপ্রাণ যে প্রৌঢ়ের মন তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল এবং যিনি চৌদ্দ বছর নিম্নতম বয়সের দাবী জানিয়ে বিল তুলেছিলেন তিনি 'চাইল্ড ম্যারেজের' ইতিহাসে স্বনামধন্য ব্যক্তি—রায় সাহেব হরবিলাস সারদা (১৮৩৬-১৯৩৫)।

এই বিলটি আনার পর ভারত সরকার মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সভ্য মোরপন্থ যোশীর নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন আইনজীবী ও বিচারকদের এক কমিটির ওপরে এই বিষয়টির তদন্তের ভার দিয়েছিলেন। যোশী কমিটি রিপোর্ট দিনের আলোয় মেলে ধরল অনেক পৈশাচিক ও বীভৎস তথ্য—প্রতি ১০০০ গার্ল ওয়াইফের ভেতরে ১০০ জন মারা যায় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে নিদারুণ আতঙ্কে। আর প্রতি বছর ২০০,০০০, শিশু-স্ত্রী ভবলীলা সাঙ্গ করে। যোশী কমিটির সভ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কলকাতার এক প্রসূতি সদনের ডক্টর মিসেস এডিথ ঘোষ বলেছেন—আমি বহু কেস দেখেছি, সপ্তম কি অষ্টম সন্তান গর্ভে নিয়ে এসেছে এমন মেয়ে যার বয়স মাত্র বাইশ। আরও বহু প্রত্যক্ষদর্শী চিকিৎসকের জবানবন্দী সম্বলিত যোশী কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাশ হয়ে গেল Child Marriage Restraint Act (1st October, 1929)।

অন্ধ কুসংস্কারের সেই দৈত্যের সঙ্গে সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে শুভবুদ্ধির ও মানবতার জয় হলো। তারপর—সারদা অ্যাক্টের সংশোধন হয়েছে; হয়েছে ১৯৫৪ সালে Special Marriage Act। Hindu Marriage Act হয়েছে ১৯৫৫ সালে। এমন কি পরিবার পরিকল্পনার এবং স্বাধীনোত্তর কালের উপরোক্ত আইনগুলোর ভেতরে এদেশের নারীকল্যাণেরই আন্তরিক প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তবুও—তবুও গৌরীদান করে পুণ্যসঞ্চয়ের সেই সর্বনাশা ও বীভৎস কুসংস্কারের সেই দানবটা দূর গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাঁধে যে চেপে রয়েছে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে নতুন দিল্লীতে ন্যাশনাল ফোরামের ডেলিগেশনের উদ্দেশ্যে ২০শে আগষ্ট ১৯৭৫ সালে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতায়।

পরিশেষে দেশব্যাপী কোটি কোটি নির্যাতীত দুর্ভাগিনীর ভেতরে এক বিদ্রোহিনীর কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে চাইল্ড ম্যারেজের ইতিবৃত্ত।

রুখমাবাই। আট বছরের ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয়েছিল চল্লিশ বছরের বরের সঙ্গে। মেয়ে গোঁ ধরে বসল বুড়ো বরের সঙ্গে যাবে না। ভদ্রলোকটি হাইকোর্টে মামলা রুজু করে দিল। ডিগ্রী হলো দু হাজার টাকা। রুখমাবাইয়ের বাবা টাকাটা দিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে বিলেতে ডাক্তারী পড়তে পাঠালো। ফিরে এসে প্র্যাক্‌টিস করতে সুরু করল। মাদ্রাজের হিন্দু দৈনিকে লিখেছিল—একদা কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি রুখমাবাইয়ের সফল জীবনের ভেতরে সমগ্র নারী সমাজের অনাগত আলোকোজ্জল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিহিত আছে—।

আপন ভাগ্য জয়ে

চান্দ্রেয়ী রায়

আজকের সমাজে শারীরিক পটুতা আছে এমন ব্যক্তিদের কাছেই শুধু দেশ ও সমাজের প্রত্যাশা অনেক—এমত যাঁরা মনে মনে পোষণ করেন, তাদেরও একবার থমকে দাঁড়াতে হবে—আর এক শ্রেণীর লোকের কাছে। যাঁরা দীর্ঘদিন বিকলাঙ্গ বলেই পরিচিত ও উপেক্ষিত হয়ে আসছেন সমাজে। এই উপেক্ষিতরা ঠিকমত প্রশিক্ষণ পেলে যে কোন ধরনের কাজ যে করতে পারেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—যদি কেউ নরেন্দ্রপুরের অন্ধ শিক্ষায়তন, বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্প নিকেতন, রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডিয়া কিংবা মাণিকতলার অলকেন্দু বোধ নিকেতন একবার পরিদর্শন করে আসেন। নিজেদের জীবনের দুর্বিষহ অবস্থাকে দূরে হটিয়ে কিভাবে তাঁরা আপন ভাগ্য জয়ে নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন তার কিছু পরিচয় পাবেন। সুখের কথা সরকার এবার শারীরিক অপটুদের কথা বিশেষভাবে ভাবছেন। রাজ্যের কয়েকলক্ষ বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যাতে আজকের বেকারত্বের যুগে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তারজন্য সরকার নিজ হাতে প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই দৃষ্টিহীন আছে ৮০ হাজার। এছাড়া বিকলাঙ্গ আছেন আরো প্রায় লাখ খানেক। এরা কি খেলা-ধুলায়, কি কাজকর্মে সমানভাবে স্বাভাবিক মানুষের মতই পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন।

এদের দৈহিক কাজকর্মকে পরখ করার জন্যই একদিন হাজির হয়েছিলাম বেহালার দৃষ্টিহীন শিল্প নিকেতনে। এই সংস্থাটির বয়স মাত্র ৩ বছর। এখানকার একটুকরো জমি নিয়েই তৈরী হয়েছে বিকলাঙ্গদের এই আবাসটি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ৬০।৭০ জন অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়ে কাজে লেগে যেতে পেরেছে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, এদের কাজের মেয়াদ। হাতে তৈরী জিনিষগুলির মধ্যে আছে ধূপকাঠি, বাজারের থলে, মোমবাতি, বিভিন্ন ধরণের বেতের কাজ, দড়ির পাপোষ ও ইলেকট্রিক মিটারের যন্ত্রাংশ। এর আগে অবশ্য প্রত্যেকেই কারিগরী বিদ্যার বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। যখন সংস্থাটির কাজ শুরু হয়, তখন ২০০ টাকা ছিল মূলধন। এখন এর পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি কর্মী এরজন্য মাসে ৫০ টাকা করে পাচ্ছেন। তাছাড়া প্রোডাকসনস বোনাস তো আছেই। দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা আছে। যাতায়াতের খরচাও আছে। মাল তৈরীর-প্যাকেট তৈরী ও লেবেল লাগানো বাজারে অর্ডার ইত্যাদি এইসব কাজ অন্ধ ও বিকলাঙ্গরাই করছে।

হোক না শারীরিক অপটুতা—বিকলাঙ্গ মহিলারা সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত

অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও—একজন অন্ধ নিজেই মোমবাতি তৈরী করে আমাদের আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছে

এই সংস্থাটি পরমুখাপেক্ষী নয়। নিজের পায়ে দাঁড়ানো এর অদম্য স্পৃহা। সবাইকে নিয়েই যেন এর বাঁচার তাগিদ। মাত্র কয়েকবছরের মধ্যেই সংস্থাটি সমস্ত খরচা পুষিয়ে ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা জমা রাখতে পেরেছেন। মাসে কয়েক হাজার টাকার অর্ডার বরাবরই থাকছে।

এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ চ্যাটার্জির কাছ থেকে জানা গেল যে, তিনি কোন সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকেই এই সংস্থাটিকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি নিজে দেখেছেন কারিগরী শিক্ষালাভের পরেও বিভিন্ন অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা পরিবারের কাছে অতিরিক্ত সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। তাই তিনি এদেরকে নতুন পথে চালনা করার সঙ্কল্প নিয়ে এখানে এসেছেন। বেহালা ব্লাইণ্ড স্কুলের অবদানএ বিষয়ে অনস্বীকার্য। শ্রীচ্যাটার্জি আশা করেন, বর্তমান বছরেই আরো শ'খানেক ছেলে-মেয়ের এখানে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। সরকারী অর্থ সাহায্য পেলে আবাস-সহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কথা

চুপচাপ কাজ করাই ভাল—রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডিয়ার মহিলা—মূক-বধির—যন্ত্রাংশ জোড়া লাগাতে ব্যস্ত।

মাথায় রয়েছে। বহু দূর থেকে এদের যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণে সুষ্ঠু ব্যবস্থা চাই বলে তিনি জানান।

এদের সমস্যা দূরীকরণে কিংবা স্বাবলম্বী হতে রিহ্যাবিলিটেশন অব ইণ্ডিয়ার প্রচেষ্টাও কম নয়। যদিও ভারতের অন্যান্য যায়গায় বিকলাঙ্গদের সাহায্যার্থে পুনর্বাসনের কাজ চলেছে—সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে থাকা দুঃখজনক। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গেই বিকলাঙ্গরা সংখ্যায় অধিক।

এই সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে মহৎ প্রচেষ্টাকে সকলেই সাধুবাদ জানাবেন। এখানকার মূক-বধির ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা টেলারিং, খাম, ছাপাখানা, প্লাষ্টিক মোলডিং ও নানা ধরণের এসেম্বলি ওয়ার্কসের কাজ করছেন। প্রায় চল্লিশজন স্ত্রী-পুরুষ সাপ্তাহিক বেতনের ভিত্তিতে কাজ চালাচ্ছেন।

এই পুনর্বাসনের কাজকে ত্বরান্বিত করার প্রতিবন্ধকতা হলো স্থানাভাব। তাছাড়া আছে আর্থিক সঙ্কট। এই সংস্থাটির আরেকটা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল বিকলাঙ্গদের জন্য আচ্ছাদিত কর্মশালা নির্মাণ।

সুখের কথা, এদের জন্য এতদিন বে-সরকারি সংস্থা চিন্তা করছিল—এখন সরকারও শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিদের দিকে নজর দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে অন্ধ্র প্রদেশের বিকলাঙ্গদের সরকারী উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। সেখানে সরকারী প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে বিকলাঙ্গদের মহান কর্মযজ্ঞ। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে শিখেছে তারা।

বিশেষ সংবাদ
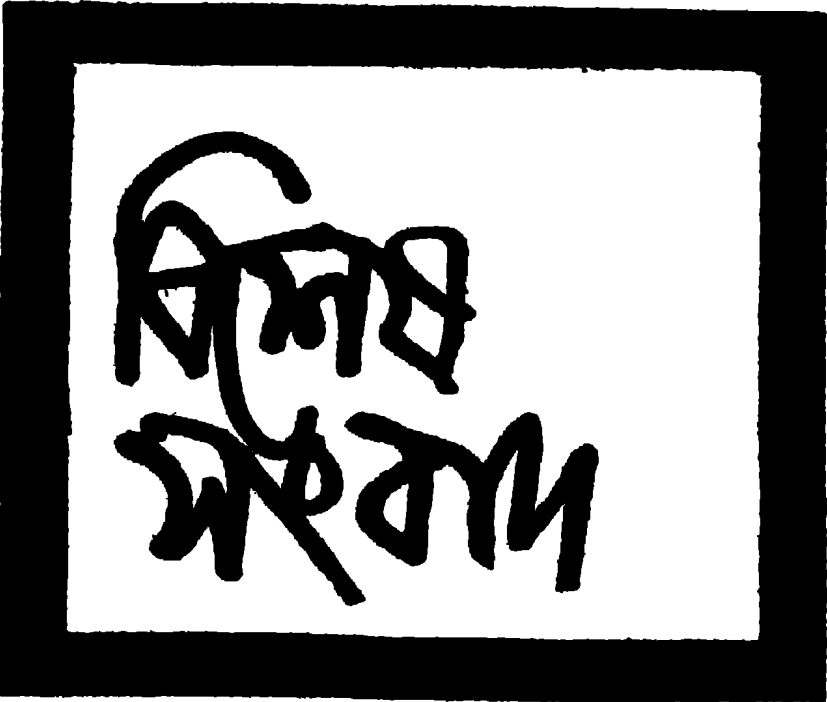
বিনা পণে বিয়ে

গুজরাটে বরোদা জেলার মুসলমান 'ক্ষত্রী' সম্প্রদায় বিনা পণে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একসঙ্গে ৭৮ টি বিয়ে দেন। এই সম্প্রদায় নিজেরাই সমস্ত খরচ বহন করেন। পণপ্রথা বিলোপ ও অপচয় বন্ধই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। উপস্থিত বিপুল জনতা তাঁদের পুত্র-কন্যার জন্য পণ দেয়া ও না নেয়ার শপথ নেন।

গোবর-গ্যাস কারখানা

পশ্চিমবঙ্গে এই বছর ১০০০ টি গোবর-গ্যাস কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। গত আর্থিক বছরে এই রাজ্যে ৪৬২ টি গোবর গ্যাস কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

গোবর থেকে গ্রামাঞ্চলে গ্যাস, জ্বালানী ও জৈব সার উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম যোজনায় সারাদেশে এক লক্ষ গোবর-গ্যাস কারখানা স্থাপনের কর্মসূচী নিয়েছেন। এরাজ্যে প্রস্তাবিত গোবর-গ্যাস্ কারখানাগুলো এই কর্মসূচীরই অঙ্গ।

এই কর্মসূচী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর প্রতিটি কারখানা স্থাপনের মূলধনী খরচ বাবদ ২৫ শতাংশ ভরতুকি দিয়েছিলেন। চলতি আর্থিক বছরে এই ভরতুকির পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ শতাংশ।

বাঁধ নির্মাণে স্বেচ্ছাশ্রম

ওড়িশার ঢেনকানাল জেলার সিংহারী-খোল পাহাড়ে ২৩০ ফুট লম্বা ৯০ ফুট চওড়া ও ২০ ফুট উঁচু মাটির বাঁধ তৈরীর জন্য ঢেনকানাল কলেজের ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র ও ১০০ জন গ্রামবাসী বিনা পারিশ্রমিকে 'জাতীয় সেবা প্রকল্পে'র অঙ্গ হিসাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। এই বাঁধের জলে ২০০ একর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে। ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে এই জমি বন্টন করা হয়েছিল। এঞ্জিনীয়ার ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিনা মূল্যে শিক্ষালাভ করে এঁরা নির্মাণকার্য্য এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সামান্য সাহায্য ছাড়া জাতীয় সেবাপ্রকল্পের পক্ষ থেকেই প্রকল্পটিতে আর্থিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে।

শিশুদের নানা রং-এর উলের পোষাক

ভারতী বিশ্বাস

পুজার রেশ কাটতে না কাটতেই শীতের শুকনো হাওয়া বইতে সুরু করেছিল। এখন শীত পুরোপুরি এসে গেছে । মায়েদের হাতের উল কাঁটা সচল হয়ে উঠেছে। দোকানগুলিও নানারকম উজ্জ্বল রঙিন উল ও শীতের পোষাকে নিজেদের সাজিয়ে তুলেছে। ঝলমলে দোকানগুলি চোখ ধাঁধিয়েই শুধু দেয় না দামে মনকে ভয়ও পাইয়ে দেয়। কিন্তু বাচ্চাদের শীতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দু' একটা শীতের পোষাকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। তাই অল্প খরচে বাড়ীতে পড়ে থাকা নানা রংএর টুকরো উলের সাহায্যে কি করে সুন্দর ডিজাইনের সাহায্যে ছোটদের জন্য নয়নমুগ্ধকর সোয়েটার, টুপি ও মোজার সেট তৈরী করা যায় তার একটা নমুনা নীচে দিলাম।

আমি এক থেকে দু'বছর বয়সের বাচ্চাদের সাইজের নমুনাটা দিচ্ছি। কিছুঘর বাড়িয়ে কমিয়ে আপনারা ইচ্ছেমত সাইজ বড় বা ছোট করে নিতে পারেন।

সোয়েটার

এই সোয়েটার বুনতে চারটি রংএর প্রয়োজন হবে। সোয়েটার যে রংএ বুনবেন সেই রংটির উল বেশী পরিমাণে লাগবে। নিজেরা ইচ্ছেমত "কনট্রাষ্ট কালার" অর্থাৎ বিপরীত রংএর যে কোন রং ব্যবহার করতে পারেন। আমি নিজে একটা রং মিলিয়ে দিলাম।

১ নং রং সোয়েটারের জন্য লাল রংএর ৩ টি বল লাগবে।

২ নং রংএর ২ টি বল লাগবে (কাল বা নেভি ব্লু)

৩ নং রংএর ১ টি বল লাগবে (সাদা)

৪ নং রংএর ১ টি বল লাগবে (হলুদ)

দুই জোড়া সেলাই বোনার কাঁটার দরকার হবে। ১০ নম্বরের এক জোড়া এবং ৮ নম্বরের এক জোড়া কাঁটা লাগবে। লাল উল দিয়ে এক থেকে দুই বছরের বাচ্চার জন্য প্রথমে ১০ নং কাঁটায় ৬৭ টি তুলুন। এবার একঘর সোজা একঘর উল্টো এই ভাবে প্রথম কাঁটা শেষ হবে। দ্বিতীয় কাঁটাতে সোজা ঘরে সোজা উল্টো ঘরে উল্টো বুনে যেতে হবে। এই ভাবে ২ ইঞ্চি চওড়া 'রিপ' বা বর্ডার বোনা হয়ে গেলে এবার ৮ নং কাঁটা নিয়ে সব ঘরগুলি সোজা বুনে যেতে হবে। কোন ঘর বাড়ানোর দরকার নেই। উল্টো কাঁটায় উল্টো বুনুন। এবার হলুদ রংটি নিয়ে এক কাঁটা সোজা বুনুন ও এক কাঁটা উল্টো বুনে নিন।

এবার সাদা রংটি নিয়ে আগের মতই এক কাঁটা সোজা ও এক কাঁটা উল্টো বুনে নিন।

সাদার পর কালো রংএর উল নিয়ে এক কাঁটা সোজা ও উল্টো কাঁটা উল্টো বুনে নিন। পুনরায় হলুদ রংএর উলের সাহায্যে এক কাঁটা সোজা ও এক কাঁটা উল্টো বুনুন।

সাংকেতিক চিহ্নগুলির অর্থ বলে দিচ্ছি। ১নং রং অর্থে সোয়েটারের লাল রং বুঝতে হবে।

২নং রং অর্থে কাল বা নেভি ব্লু রংএর উল হবে।

৩নং রং অর্থে সাদা রংএর উল হবে।

৪নং রং অর্থে হলুদ রংএর উল হবে।

১ সোঃ অর্থে ১ ঘর সোজা বুনতে হবে। ১ উঃ অর্থে ১ ঘর উল্টো বুনতে হবে। ১নং ৩ সোঃ, অর্থে ১ নম্বর রং দিয়ে ৩ ঘর সোজা বুনে হবে। তেমনি ২নং রং ১ উঃ, অর্থে ২ নম্বর রং দিয়ে ১ ঘর উল্টো বুনতে হবে।

'* — *' তারকা চিহ্ন থেকে তারকা চিহ্ন পর্যন্ত বুনে আবার তারকা চিহ্ন থেকে বোনা আরম্ভ করতে হবে। উপরোক্ত নিয়মে রং ও ঘরের বোনার হিসাব এবং নিয়ম বুঝতে হবে। এবার প্যাটার্ণটি সুরু হবে।

প্রথম লাইন:—* ১ নং রং ২ সোঃ, ২ নং রং ১ সোঃ, ১ নং রং ১ সোঃ, * — * চিহ্ন থেকে চিহ্ন পর্যন্ত পরপর বুনে যান। শেষ ঘরটি ১ নং রং ১ সোঃ হবে।

দ্বিতীয় লাইন:—* ১নং রং ১ উঃ, ২ নং ৩ উঃ, *— এই ভাবে চিহ্ন থেকে পর পর বুনে যান। শেষ ঘরটি ১ নং ১ উল্টো হবে।

তৃতীয় লাইন:—*২নং রং ২ সোঃ, ৩নং রং ১ সোঃ, ২ নং রং ১ সোঃ*, শেষ ঘরটি ২ নং রং ১ সোজা হবে।

চতুর্থ লাইন:—* ২ নং রং ২ উঃ, ৩ নং রং ৩ উল্টো,* এইভাবে পুনরায় * চিহ্ন থেকে বুনে যেতে হবে। শেষ ঘরটি ২ নং রং ১ উল্টা।

পঞ্চম লাইন:—* ২ নং রং ২ সোঃ, ৩ নং রং ১ সোঃ, ২ নং রং ১ সোঃ, * শেষ ঘরটি ২ নং রং ১ সোঃ।

ষষ্ঠ লাইন:—* ৪ নং রং ১ উঃ, ২ নং রং ৩ উঃ*, চিহ্ন থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ঘরটি ৪ নং রং ১ উঃ।

সপ্তম লাইন:—* ৪ নং ২ সোঃ, ২ নং রং ১ সোঃ, ৪ নং রং ১ সোঃ,* * চিহ্ন থেকে পুনরাবৃত্তি হবে। শেষ ঘরটি ৪নং রং ১ সোঃ।

অষ্টম লাইন :—ষষ্ঠ লাইনের মত।

নবম লাইন :—* ৪ নং রং ১ সোঃ, ২ নং রং ৩ সোঃ * —এইভাবে বুনে শেষ ঘরটি ৪ নং রং ১ সোঃ, হবে।

১০ম লাইন :—ষষ্ঠ লাইনের মত।

১১শ লাইন :—নবম লাইনের মত।

১২শ লাইন :—* ৪ নং রং ২ উঃ, ২ নং রং ১ উঃ, ৪ নং রং ১ উঃ, * * চিহ্ন থেকে পুনরাবৃত্তি, শেষ ঘরটি ৪ নং রং ১ উঃ, হবে।

১৩শ লাইন :—নবম লাইনের মত।

১৪শ লাইন :—ষষ্ঠ লাইনের মত।

১৫শ লাইন :—নবম লাইনের মত।

১৬শ লাইন :—ষষ্ঠ লাইনের মত।

১৭শ লাইন :—সপ্তম লাইনের মত।

১৮শ লাইন :—ষষ্ঠ লাইনের মত।

১৯তম লাইন :—পঞ্চম লাইনের মত।

২০তম লাইন :—চতুর্থ লাইনের মত।

২১তম লাইন :—তৃতীয় লাইনের মত।

২২তম লাইন :—দ্বিতীয় লাইনের মত।

২৩তম লাইন :—প্রথম লাইনের মত।

২৪তম লাইন :—১ নং রং দিয়ে উল্টো বুনে নিতে হবে সব ঘরগুলি।

এবার পুরো রং-এর ডিজাইনটা উঠে গেল। এখন ১ নং রং দিয়ে সোজা কাঁটা সোজা উল্টো কাঁটা উল্টো বুনতে থাকুন। এইভাবে বুনতে বুনতে যখন বর্ডার থেকে বোনাটা লম্বায় ১০ ইঞ্চি হবে তখন বগলের ঘর ফেলতে হবে।

বগলের সেপ প্রথম কাঁটা :—সোজা কাঁটায় প্রথমে ৪ ঘর বন্ধ করে সব ঘর বুনে নিন।

দ্বিতীয় কাঁটা :—উল্টো কাঁটার প্রথমে ৪ ঘর বন্ধ করে বোনো শেষ করতে হবে।

তৃতীয় কাঁটা :—২ ঘর উল্টো বুনে দু'টো ঘর একসঙ্গে নিয়ে ১ জোড়া সোজা বুনুন। এতে একটি ঘর কমে যাবে। বাঁ হাতের কাঁটায় ৪ টা ঘর রেখে আর সব ঘর সোজা বুনুন। এবার বাকী চারটি ঘরের ২ টি ঘর এক সঙ্গে জোড়া বুনে বাকী দুই ঘর উল্টো বুনুন। এদিকে একটি ঘর কমবে। অর্থাৎ মোট দু'ঘর কমবে।

চতুর্থ কাঁটা :—২ ঘর সোজা, বাকী ঘরগুলি উল্টো বুনে নিয়ে শেষ ঘরদুটি সোজা বুনুন।

পঞ্চম কাঁটা :—তৃতীয় কাঁটার মত।

ষষ্ঠ কাঁটা :—চতুর্থ কাঁটার মত।

এইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ কাটার মত পর পর বুনতে থাকুন। এতে আস্তে আস্তে ঘর কমে আসবে। বর্ডার থেকে ১৫ ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেলে এবং হাতের কাঁটায় ২২ ঘর থাকতে বোনা শেষ করুন। ঘরগুলি সেফ্‌টিপিনে আটকে রাখুন।

সামনের পার্ট বা অংশ ও পিছনের পার্টের নিয়মে বুনে নিন। পিছনের ও সামনের পার্ট দু'টি হয়ে গেলে হাতা আরম্ভ করুন।

হাতা ৩৮ টি ঘর ১০ নং কাটায় তুলে ১০ ইঞ্চি চওড়া বর্ডার বুনুন। বর্ডার শেষ হলে সোজা কাঁটায় ৫ ঘর বাড়ান। মাট ৪৩ ঘর হল। ১ কাটা উল্টো বুনুন।

এবার ৪ নং রং দিয়ে দুই লাইন সোজা ও উল্টো বুনুন।

৩ নং রং দিয়ে দুই লাইন সোজা ও উল্টো বুনে নিন।

২ নং রং দিয়ে দুই লাইন বুনুন।

৪ নং রং দিয়ে দুই লাইন বুনুন। এবার প্যাটার্ণ হবে।

প্রথম লাইন :—পিছনের অংশের প্যাটার্ণের ১ম লাইনের মত।

দ্বিতীয় লাইন :—দ্বিতীয় লাইনের মত।

তৃতীয় লাইন :—পিছনের পার্টের তৃতীয় লাইনের মত।

চতুর্থ লাইন :—চতুর্থ লাইনের মত।

পঞ্চম লাইন -:-পঞ্চম লাইনের মত।

ষষ্ঠ লাইন :—পিছনের পার্টের দ্বিতীয় লাইনের মত।

সপ্তম লাইন :—প্রথম লাইনের মত।

অষ্টম লাইন সব উল্টো বুনতে হবে, ১ নং রং দিয়ে।
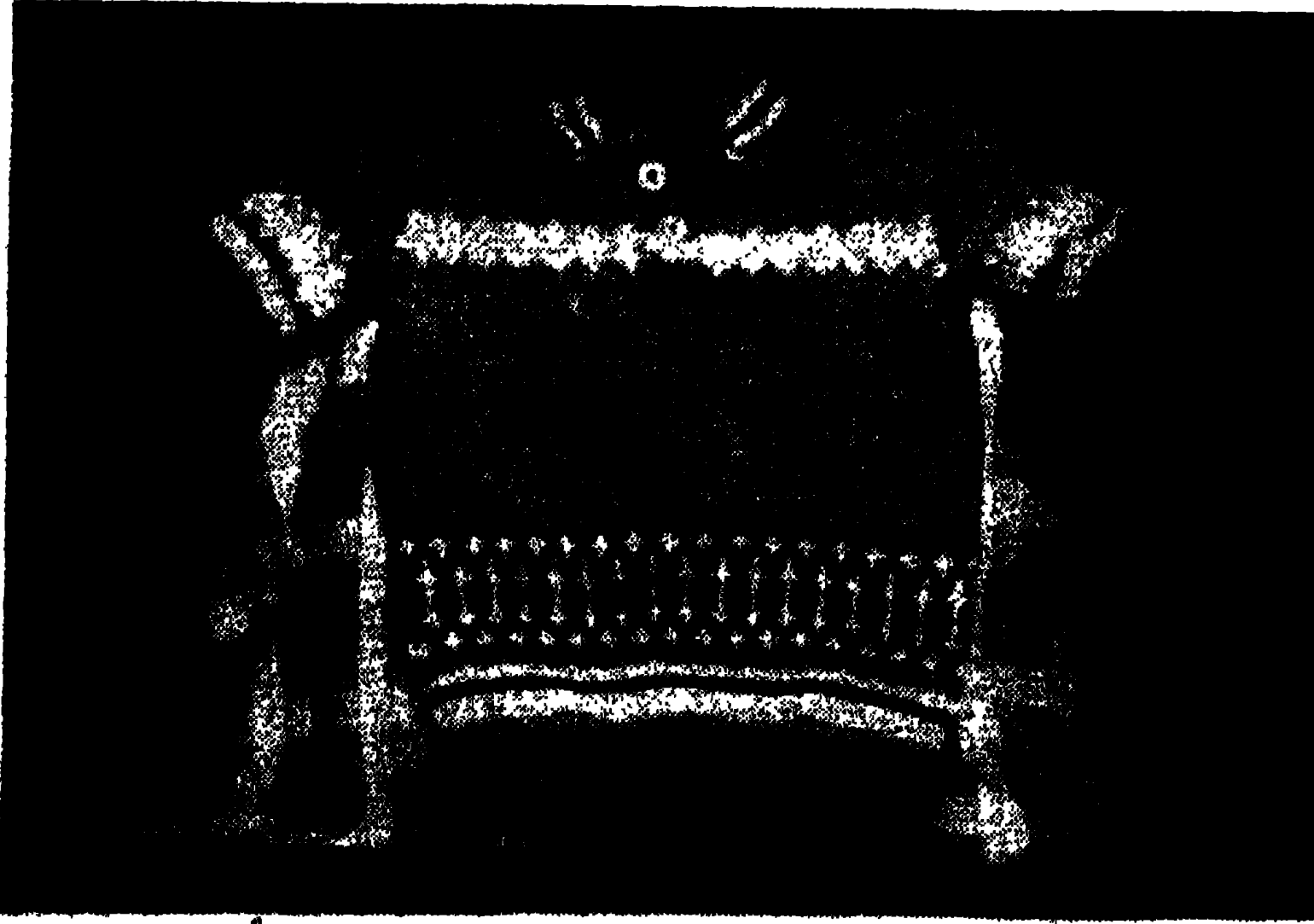
সোয়েটারের ডিজাইন

প্যাটার্ণ শেষ। এবার প্রত্যেক ছয় কাঁটা অন্তর সোজা কাঁটায় প্রথম ও শেষ দুটি করে ঘর বাড়াবেন। এমনি করে বুনে যেতে থাকুন। যখন হাতা লম্বায় ৮½ ইঞ্চি হবে এবং হাতের কাঁটায় ঘর ৫০ ঘর বেড়ে ঘর হয়ে গেলে বোনা বন্ধ করে বগলের ঘর ফেলতে হবে। আগের পার্টগুলিতে যেভাবে বগলের জন্য ঘর কমানো হয়েছে সেই নিয়মেই প্রথমে ৪ ঘর করে দুইপাশ থেকে কমিয়ে পরে প্রত্যেক সোজা লাইনে দু'পাশ থেকে জোড়া বুনে ঘর কমাতে থাকুন। ঘর কমতে কমতে যখন অন্য অংশের বগলের সেপের সমান হয়ে যাবে তখন হাতের কাঁটায় ৪ টি ঘর রেখে হাতা বোনা বন্ধ করুন। ঘরগুলি সেফ্‌টিপিনে আটকে রাখুন। দ্বিতীয় হাতাটাও প্রথম নিয়মে বুনে নিন।

এবার ১০ নং কাঁটায় সোয়েটারের একটা পার্টের ঘরগুলি তুলে নিন। এরপর ঐ কাঁটায়ই একটি হাতার ঘর চারটি ঢুকিয়ে নিন। এবার অন্য পার্টের ঘরগুলি ঢুকিয়ে অবশিষ্ট হাতার ঘরগুলি কাঁটায় তুলে নিয়ে ১ ঘর সোঃ ১ উঃ এইভাবে বুনে যান। গলার বর্ডার ১ ইঞ্চি বা পছন্দ মত চওড়া হলে ঘরগুলি এক এক করে বন্ধ করে দিন।

এবার বগলের অংশগুলি সেলাই করে নিন। একটা দিকের কিছুটা অংশ সেলাই করে গলার দিকের কিছুটা খোলা রেখে বোতাম লাগিয়ে দিন। এবার দেখুন কি রকম সুন্দর একটি সোয়েটার তৈরী হয়ে গেল।

টুপি

টুপির জন্য সোয়েটারের লাল রং-এর একটি বল উল লাগবে। প্যাটার্নের জন্য আগের রং-এর কিছু রঙিন উল।

প্রথমে ৬৭ টি ঘর ১০ নং কাটার তুলে ১ ইঞ্চি বর্ডার বুনুন। বর্ডার হয়ে গেলে ৮ নং কাঁটায় ৭ ঘর বাড়িয়ে নিন। এবার হাতায় যে নিয়মে ডিজাইনটি তৈরী করেছেন ঐ নিয়মে টুপিতেও ডিজাইনটি তুলে নিন। এবার ১ নং রং-এ সোজা কাঁটায় সোজা উল্টো কাঁটায় উল্টো বুনে যান। ৫০ ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেলে এবার সোজা কাঁটায় ২ সোঃ বুনে ১ জোড়া সোজা বুনুন। ২ সোঃ ১ জোড়া (দুই ঘর একসঙ্গে নিয়ে জোড়া) সোজা এই ভাবে বুনে কাঁটা শেষ করতে হবে। এর ফলে অনেকগুলি ঘর কম হয়ে যাবে। এবার উল্টো কাঁটা উল্টো বুনুন। আরও দুই লাইন সোজা উল্টো বোনার পর সোজা কাঁটায় পর পর জোড়া বুনে নিন। উল্টো কাঁটা উল্টো বুনে সোজা কাঁটায় আবার পর পর জোড়া বুনে ঘর কমিয়ে ফেলুন। এবার যে সামান্য ঘর থাকবে সেগুলি একসঙ্গে বুনে ফেলে দিন। এবার দু'পাশে সেলাই করে নিন। দেখুন বাচ্চাদের টুপি তৈরী হয়ে গেল। এই টুপি মাথার উপর দিয়ে কান ঢেকে পরিয়ে দিন। টুপির উপরে উল দিয়ে কদম ফুল তৈরী করে লাগিয়ে দিন। খুব সুন্দর লাগবে দেখতে।

কদম ফুল তৈরীর জন্য ২ ইঞ্চি পরিমাণ এক গোছা উল কেটে নিন। এবার ঐ গোছার মাঝ বরাবর আর একটি উলের সুতা দিয়ে কষে শক্ত করে বাঁধুন। সঙ্গে সঙ্গে গোল একটি কদম ফুল তৈরী হয়ে যাবে।

মোজা

সোয়েটারের রং-এর ১ টা বল উল ও কিছু রং-এর উল লাগবে।

প্রথমে ১০ নং কাঁটায় ৪০ ঘর তুলে ১০ ইঞ্চি বর্ডার বুনে নিন। বর্ডার হয়ে গেলে ৮ নং কাঁটায় হাতার প্যাটার্নের মত প্যাটার্ন তৈরী করুন। ডিজাইনটি তোলা হয়ে গেলে ৪০ ইঞ্চি লম্বা বুনে নিন। এবার সোজা কাঁটায় সামনে সুতা রেখে অর্থাৎ উল্টো বোনার নিয়মে সুতা রেখে ১ জোড়া সোজা বুনুন। সামনে সুতা রেখে পর পর জোড়া বুনে কাঁটা শেষ করুন। উল্টো কাঁটা সব উল্টো বুনুন। এবার ঘরগুলিকে সমান তিনভাগে ভাগ করে নিন। দু'পাশের ১৩ টি করে ঘর সেফটিপিনে আটকে রাখুন। মধ্যের ১৪ টি ঘর প্লেন বুনুন যতক্ষণ না ৩০ ইঞ্চি হচ্ছে। এবার বোনা অংশের দু'পাশ থেকে ১২ টি করে ঘর কাঁটায় তুলে নিন। ঘরগুলি তোলা হয়ে গেলে সেফ্‌টিপিনের রেখে দেওয়া ঘরগুলিও বুনে কাঁটায় তুলে নিন। মোট ৬৪ টি ঘর হবে। এবার সোজা বুনে যান। ১০ ইঞ্চি খানেক চওড়া হয়ে গেলে সব ঘরগুলি সমান দু'ভাগে দু'টি কাঁটায় রেখে তৃতীয় একটি কাঁটার সাহায্যে জোড়া বুনে ঘরগুলি বন্ধ করে দিন। এবার খোলা অংশের দু'মুখ সুঁচ দিয়ে সেলাই করে দিন। মোজা তৈরী হয়ে গেল। এবার একটি রিবন নিয়ে মোজাটির গোড়ালীর উপরে যে ছিদ্র তৈরী হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে রিবনটি পরিয়ে দিন। রিবনের দু'মুখে ছোট ছোট দু'টি কদমফুল তৈরী করে সেলাই করে দিন।

এইভাবে দ্বিতীয় মোজাটিও তৈরী করুন। এবার দেখুন টুপি ও মোজা সহ চমৎকার একটি পুরো সেট সোয়েটার তৈরী হয়ে গেছে।
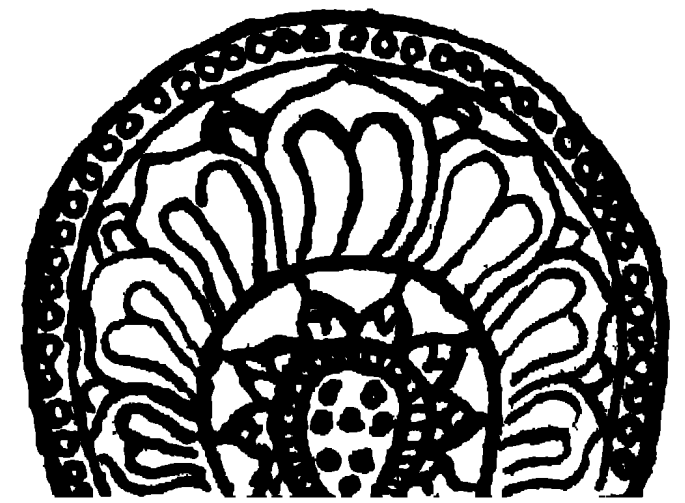
গম চাষের আগাম ভাবনা

১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শুরু করে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত বোনা চলবে। তবে অগ্রহায়ণ মাসের পর গম বোনা মোটেই লাভের হয় না। কারণ গাছ ততটা তেজী হয়না, নানারোগে ধরে, ফলন এজন্য কম হয়। শীত চলে গেলে গমের দানা পুষ্টি হয়না, ভালভাবে পাকেও না। কাজেই চাষীর আখেরে লাভ কমই হয়।

লাঙ্গল পিছনে, 'পোরা' দিয়ে বা সীড ড্রীল দিয়ে বীজ বোনাই ভাল। বীজ বেশি গভীরে গেলে তা অঙ্কুরিত হতে অসুবিধা হবে, আবার মাটির উপরের দিকে থাকলে জমিতে পাখি বসে তা খেয়ে নিতে পারে। এজন্য বীজ যাতে অন্তত দেড় থেকে দুইঞ্চি মাটির গভীরে থাকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

নাইট্রোজেন সারের এবার কোন অভাব নেই। সব সারই অঢেল পাওয়া যাচ্ছে। বাদাম ও সরষের খইলেরও অভাব নেই। অনেককেই দেখেছি রাসায়নিক সারের সঙ্গে যথেষ্ট গোবর সার, অন্যান্য ধরণের কম্পোষ্ট সার ও খইল প্রয়োগ করে ভাল ফলন পেয়েছেন। এতে চাষের মোট খরচও কম পড়ে। তবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হল সঠিক ভাবে মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করা।

গমচাষে সেচ দিলে অবশ্যই ভাল ফলন পাবেন। অন্তত চারবার গম ক্ষেতে সেচ দিলেতো সোনায় সোহাগা। তবে দুবার সেচ অবশ্যই দরকার। শীর্ষ শিকড় গজানোর সময়, গাঁট দেখা দেওয়ার সময়, ফুল আসার আগে এবং ফুলন্ত অবস্থায় সেচ দেওয়া দরকার। মনে রাখবেন সেচের জলের খুব টানাটানি থাকলে বুঝে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনের সময় সেই মোক্ষম সেচটিকে কাজে লাগাবেন। একটি সেচের সুযোগ থাকলে গমে শীর্ষ শিকড় গজাবার সময় সেটি দেবেন। দুটি সেচের সুযোগ থাকলে প্রথমটি শীর্ষ শিকড় গজাবার সময় ও দ্বিতীয়টি দানা বাধার সময় দিলে ভাল কাজ হবে। এটেল মাটির চেয়ে বেলে মাটিতে সেচের দরকার বেশি।

শীত আমাদের দোড়গোড়ায়। মাঝে ছিটে ফোঁটা বৃষ্টিও যে না হচ্ছে তা নয়। সার্টিফায়েড ভাল গম বীজেরও অভাব নেই। রাসায়নিক সারতো গুদাম উপচে পড়ছে। তাও হাতের কাছে না পাওয়া গেলে বাদাম-সরষের খইল ও গোবর কম্পোস্ট তো আছেই। কাজেই একটু সেচের জল ও রোগেভোগে সামান্য ওষুধ যোগাতে পারলেই গমচাষে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব অক্ষুন্ন থাকবে। এবিশ্বাস নিয়েই চাষীরা এবার মাঠে নেমেছেন। সুতরাং জয় তাঁদের হবেই।

মুখোমুখি

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

লেখক সংস্থা এর সদস্য। তাছাড়া যাঁরা সদস্য নন তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় আমাদের সম্মেলনে। সংগঠনটি ইউনেস্কো স্বীকৃত। ফলে তাঁদের সভায় আমরা আমন্ত্রিত হই, উপস্থিত হই, নানান কাজে অংশ নিই। এ সংগঠনের রয়েছে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র। নাম লোটাস। এটি একসঙ্গে তিনটি ভাষায় বেরোয়—ইংরেজি, ফরাসী আর আরবিতে। বলা ভালো, এরকম কাগজ আর একটিও নেই। আমাদের অনেক পরিকল্পনাই আছে। আন্তর্জাতিক এই সংগঠনটিকে আরো মজবুত করতে হবে, তাতে শুধু আমাদের নয়, গোটা পৃথিবীরই লাভ।

অবশেষে আর একটি প্রশ্ন, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি-বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

তিনি বললেন, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি নির্ভর করবে তার গদ্যের শক্তির ওপর। গদ্যের শক্তি বলতে মনে করি বাংলাভাষাকে এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যার ফলে তার ভেতর দিয়ে সব কিছু জানা আর প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ এ ভাষাকে হতে হবে পুরোপুরি আত্মনির্ভর। ইংরেজি না জেনেও একজন বাঙালি যাতে বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান পেতে পারে, সবরকম কাজই চালাতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা আজ আমাদের চারদিকেই। কোন প্রতিষ্ঠানই এদিকে সেভাবে নজর দিচ্ছেনা।

এরপর থামলেন উনি। দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকক্ষণ। এবার উঠতে হবে তাঁকে।

বেরিয়ে পড়লাম আমি। তাকালাম আকাশের দিকে। মনে হল সে-আকাশ পাগল বাবরালির চোখের মত। চারদিকে তখন মিছিল। সেই মিছিলে পিছিয়ে পড়েছে বাবরালির মেয়ে সালেমন। হ্যাঁ—

মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে
পিচুটি পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে
তোমাকে ডাকছে শোনো
সালেমানের মা—।

গ্রন্থপঞ্জী

কবিতা

পদাতিক, চিরকুট, অগ্নিকোণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, যত দুরেই যাই, কাল মধুমাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, এই ভাই, ছেলে গেছে বনে।

অনুবাদ কবিতা

নাজিম হিকমতের কবিতা, নিকোলা ভ্যাপৎসারেন-এর দিন আসবে, পাবলো নেরুদার কবিতা, ওলঝাস সুলেমানভ-এর রোগা ঈগল।

গদ্য

আমার বাংলা, যখন যেখানে, ডাক বাংলার ডায়েরী, নারদের ডায়েরী, কথার কথা, জগদীশচন্দ্র, ভুতের বেগার, বাঙালীর ইতিহাস, দেশ-বিদেশের রূপকথা, ক্ষমা নেই, অক্ষরে অক্ষরে।

উপন্যাস

হাংরাস, কে কোথায় যায় (যন্ত্রস্থ)।

অনু-গদ্য

ভবানী ভট্টাচার্যের কত ক্ষুধা, রোজেন-বার্গ পত্রগুচ্ছ, রুশ গল্প-সঞ্চয়ন, শের জং-এর ডোরাকাটার অভিসারে, যেতে যেতে দেখা, আলেকজান্দার সোল-ঝেৎসিনের ইভান দেনিশোভিচের জীবনের একদিন।

গণেশ বসু

গ্রন্থ আলোচনা
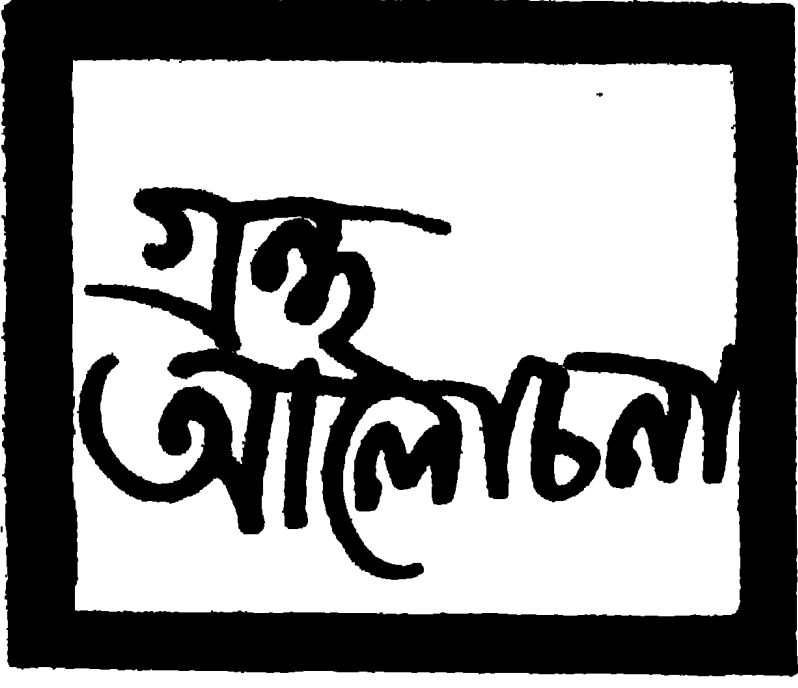
শারদ সংকলন

'জয়পুর দুর্গাবাড়ী এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে বার্ষিক দুর্গাপূজা সংখ্যা। পত্রিকাটিতে বাংলা হিন্দী ও, ইংরেজি—তিনটি বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে কবিতা, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ। কয়েকটি প্রবন্ধ সুলিখিত। বাংলা বিভাগে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উর্দু কবিতা ও বাস্তবতা', জ্যোতির্ময় দাশের 'প্রাচীন রাজস্থানী দোঁহায় বিরহীর স্বপ্নসম্ভাবনা' উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। মোহন মুখার্জীর 'The Antiquities and art tyeasurs of India.' অসীম কুমার রায়ের 'The Gaudiya Vaishnava Temples of Jaipur' তথ্য সন্নিবেশে সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। শ্যামলী দাসের 'A museum for Indian Costumes এবং Onlooker এর জয়পুর বঙ্গসংস্কৃতির পরিচয়মূলক 'Bengali Cultural activities in Jaipur' রচনাটি চিত্তাকর্ষক।

সম্পাদক জ্যোতির্ময় দাশ।

অভিযাত্রী। প্রধান সম্পাদক—**চিত্তরঞ্জন মল্লিক।**

হাওড়ার সালকিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটি। কবিতা, গল্প ও নানা বিষয়ে লেখা নিবন্ধে এই সংখ্যাটি সুরুচি-পূর্ণ সাহিত্যপ্রয়াসের নিদর্শন। এতে লিখেছেন—কবিতা সিংহ, শান্তনু দাস, নবনীতা দেবসেন ও স্বপনবুড়ো প্রমুখ প্রখ্যাত এবং প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী, প্রমুখ লেখক লেখিকাবৃন্দ।

পল্লীপ্রচার। সম্পাদনা—**অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ কুশারী**। ক্ষীরপাই, মেদিনীপুর।

পল্লীপ্রচারে প্রধানত গ্রামাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নমূলক সংবাদ ও নানা কৃষি-কার্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এতে লিখেছেন—নীলমণি মিত্র, রণজিৎ সামন্ত ও সেখ মহম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ। রোগ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে লিখেছেন—ডাঃ তারাপদ ফৌজদার। এছাড়া অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রে আমার রূপদান'ও চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ছবির কথা'ও আকর্ষণীয়।

বর্ণালী। বসিরহাট সুন্দরবনাঞ্চলের কাগজ। সম্পাদনা—**প্রবীর ঘোষ**

কবিতা, গল্প ও লঘুনিবন্ধ পত্রিকাটির আকর্ষণ। কবিতা লিখেছেন—বনফুল, দক্ষিণারঞ্জন বসু, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অজিত বাইরী প্রমুখ। গল্প লিখেছেন—নির্মলেন্দু গৌতম। দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনা এবং সুন্দর প্রচ্ছদ পত্রিকাটির অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য।

স্নেহময় সিংহরায়

• • •

উদাস, আত্মনেপদী, ছারপোকা

সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯॥ পনেরো টাকা।

অভিনেতা, নাট্য-প্রযোজক ও নাট্যকার-রূপে সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর নাম আধুনিক নাট্য-প্রেমীর কাছে অপরিচিত নয়। বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে লেখা তার তিনটি নাতিদীর্ঘ, মৌলিক নাটক উদাস, আত্মনেপদী ও ছারপোকা। নাট্যকারের মতে প্রথম নাটকটি 'ছাত্রবয়স্কদের' জন্যে লেখা। দ্বিতীয়টি লেখা হয়েছে 'তরুণ বয়স্কদের কেন্দ্র করে'; আর শেষেরটি 'বেকার বয়স্কদের' নাটক। প্রত্যেক নাটকের আগে এক একটি প্রস্তাবনায় নাটকের বক্তব্য বা ইঙ্গিত সূত্রাকারে উপস্থাপিত। এছাড়া নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় নাট্যকার মঞ্চ, মঞ্চ সজ্জা, অভিনয় রীতি, আলোক সম্পাত, নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে যেসব চিন্তা-উদ্দীপক মন্তব্য করেছেন সেগুলিও প্রণিধান যোগ্য।

তিন অঙ্কের উদাস নাটকে 'কেন তরুণ জীবন ফুল হয়ে না ফুটে উঠে অকালে ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে' এবং 'জীবনে অনুভূতি বা মননশীলতা'র অপমৃত্যু ঘটছে প্রতিকূল পারিপার্শ্বের অভিঘাতে—নাট্যকার তা' আলোচনা করেছেন। উদাস চরিত্রটি একই সঙ্গে বাস্তবনিষ্ঠ ও প্রতীকী। সমসাময়িক যুগযন্ত্রণা এই মিতায়তন নাটকের প্রেক্ষাপট। তবে কিছু তত্ত্ব প্রণোদিত সংলাপ সাধারণের রসাস্বাদের অন্তরায় হ'তে পারে। উদাস সত্যসন্ধ; বৈশ্য জগতে, অর্থ-সন্ধানী মানুষেরা তার মূল্য বুঝলে না। উদাসের, তার মামা মামীর, তিন বন্ধুর ও কাবেরীর জীবনে যা ঘটলো তা' অনেকের জীবনে বারবার ঘটে; অর্থাৎ সমস্যাটি একান্তভাবে সমকালীন। তবু সব কিছুর নেপথ্যে চিরন্তনত্বের ইঙ্গিত রয়েছে।

আত্মনেপদীও মিতায়তন (তিন অঙ্ক); নাটকটি মনস্তত্ত্ব প্রধান। এখানে মানুষের মন কিভাবে ভেঙে চুরে বদলে যায়, নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতা-চক্রে পিষ্ট হয়ে মানুষের মূল্যবোধ বা মানসিকতা কি ভাবে আমূল পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে আলোক-পাত করেছেন নাট্যকার। তবে নাট্য-কারের ভাষাতেই বলা যায়, সাধারণ দর্শকের কাছে এটি 'শক্ত নাটক'। তাই প্রমোদ সন্ধানী দর্শক কিছুটা নিরাশ হবেন; কিন্তু তন্নিষ্ঠ রসিকের এ নাটক ভালো লাগবে। সংলাপ বেশ তীক্ষ্ণ, তরতাজা, ইঙ্গিতময়।

ছারপোকা মঞ্চ-সফল নাটক। নাট্য-কারের মতে এটি anti-illusionist নাটক। এর নায়ক ছারপোকা; তার কামড় ভীষণ হলেও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তার অবস্থান একান্ত স্বাভাবিক। এক তরুণ কেরানীর আশা—আকাঙ্খা কেমন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক নাট্যকার তা'ও দেখিয়েছেন। নাটকটি 'দৃশ্য' ও 'ছেদ' হীন। পরীক্ষামূলক এই নাটকে নাট্যকার শ্রীনন্দীর নাট্য-প্রতিভার সম্ভবত অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে। আর সে পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সেদিন সেই বাঞ্ছিত মানুষটির মুখোমুখি হলাম। সৌমেন্দু রায়। বললেন কি খবর।

বল্লাম।—একটু পরে প্রশ্নের আঙ্গিনায় পা ফেল্লাম। উত্তরে মুখর হলেন প্রিয়-দর্শন মানুষটি: উনিশশো চুয়ান্নতে ফিল্মে প্রথম আসি। যোগাযোগটা হয়েছিল হিরণ্ময় সেন বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন ফিল্ম ডিরেক্টর তার মাধ্যমে। তিনি আমাকে ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্তের কাছে নিয়ে যান। তার কাছে ইচ্ছেটা প্রকাশ করি। তিনি বলেন—আপনাকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিতে পারি তবে এ লাইনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই—তবে আসতে পারেন। এলাম। সেই থেকে টেকনিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে ক্যামেরার কাজ শিখতে লাগলাম অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে। তারপর পথের পাঁচালীর কাজ আরম্ভ হয়। তখন এখনকার মত আউটডোরে কাজ করার জন্য এরিফ্লেক্স ক্যামেরা ছিলনা। ফলে ভারী মিশেল ক্যামেরাই নিয়ে যেতে হতো আউটডোরে। পথের পাঁচালীর সময় মিচেল ক্যামেরার কেয়ার টেকার হিসাবে যেতাম আউটডোরে। ঐ সময় সত্যজিৎ রায় এবং ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্রর সঙ্গে আলাপ হয়। সুব্রত বাবুর অ্যাসিস্টান্ট হিসাবে তাঁর সঙ্গে কাজ করি পথের পাঁচালি, অপরাজিত, অপুর সংসার, দেবী, পরশপাথর এবং কাঞ্চনজংঘা ছবিতে।

—ইনডিপেনডেন্ট ভাবে কাজ শুরু করেন কবে থেকে?

—উনিশশো ষাট-এ। সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের উপর যে ডকুমেন্টারী ছবি করেন স্বাধীনভাবে তার ক্যামেরার কাজ করি। এরপর আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম তিনকন্যা। এরপর সত্যজিৎ রায়-এর যেসব ছবিতে আমি কাজ করেছি তা হল অভিযান, চিড়িয়াখানা, গুপীগাইন বাঘা বাইন, অরণ্যের দিন রাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ, অশনী সংকেত, সোনার কেল্লা, জন অরণ্য। দুটি ডকুমেন্টারী ছবির ক্যামেরার কাজ করেছি—ইনার আই এবং সিকিম। কয়েকটা দিন আগে শেষ করি আর একটা ডকুমেন্টারীর কাজ বালা সরস্বতী, মাণিকদার ছবি।

সত্যজিৎ রায়-এর সঙ্গে এতদিন কাজ করছেন, কেমন ফিল করছেন, জিগ্যেস করলাম সৌমেন্দুবাবুকে।—ওকে তো একটা ইনষ্টিটিউশন বলা যায়। ওঁর প্রত্যেকটা ছবির কাজই ট্রেনিং-এর মত হয়।

—কালার ফটোগ্রাফিতেও ত আপনি প্রচুর নাম কিনেছেন। শিখেছেন কার কাছ থেকে?

—কারও কাছ থেকে নয়—শেখার ত কিছু নেই। এক্সপিরিয়ান্স এবং বই পড়ে যতটা জানা যায় শেখার চেষ্টা করেছি। তবে ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফির সঙ্গে কালার ফটোগ্রাফির খুব যে একটা তফাৎ আছে বলে আমি মনে করিনা। যেটুকু ডিফারেন্স রয়েছে তা কাজ করতে করতে হয়ে যায়।

—ফটোগ্রাফির এক্সপেরিমেন্টাল সাইডটা নিয়ে কতদূর এগিয়েছেন?

—দেখুন এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করার মত স্কোপ কোথায় এখানে, তবে মাণিকদা কিছু কিছু সুযোগ দিয়েছেন আমাকে। অশনী সংকেতে—এমন কিছু টেক্‌নিক্যাল কাজ করেছি যা প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী করা বারণ। তেমনি অনেক কিছু করে সাক্সেসফুলও হয়েছি।

—এরমধ্যে ফরেনে গিয়েছিলেন কি ফটোগ্রাফির কাজ শেখার জন্য? —জিজ্ঞেস করি ওকে।

—না, ১৯৬৭-তে রাশিয়ায় গিয়েছিলাম ওখানকার একটা চলচ্চিত্র উৎসবে সিনে টেকনিসিয়ান্স ডেলিগেশন-এ। ১৯৭৪-এ আমেরিকা যাই। ওখানে লস এ্যাঞ্জেলসে 'ফিল্ম এক্স' বলে একটা ফিল্ম ফেষ্টিভালে আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার্স সোসাইটি যে ইন্টারন্যাশানাল সিনেমাটোগ্রাফার্স কনফারেন্স ডাকে তাতেও যোগ দিয়েছিলাম ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমি এবং সুব্রত মিত্র।

সৌমেন্দু রায়

—লেটেষ্ট ট্রেণ্ড নিয়ে কিছু ভাবছেন না?

—ব্যাপার কি জানেন বিদেশে গিয়ে যে সব ছবি দেখেছি তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু হওয়ার পিছনে অনেক ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক ওরা লেটেষ্ট ট্রেণ্ডে কাজ করার জন্য নানান ধরনের লেন্স, উন্নত মানের র'ফিল্ম এবং ল্যাবরেটরীর সুযোগ পায় যা এখানে আমরা পাইনা। তাই এখানে ওদের মত কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তবু যা আছে তাই দিয়ে ভালো ছবি করার চেষ্টা করি আমরা। এখানকার প্রডিউসারদের দোষ দেব না। এক্সপেরিমেন্ট করার মত টাকা কোথায় আমাদের—তার ওপর সে এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল না হয় তাহলে ত সর্বনাশ।

সিনেমা

সৌমেন্দু বাবু বললেন, বম্বেকে আমরা যতই সমালোচনা করিনা কেন ওদের টেকনিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক উঁচু আমাদের থেকে তা স্বীকার করতেই হবে। ওরা ত কিছু কিছু ভাল ছবি, অফবিট ছবি করে দেখাচ্ছে। এখানে আমরা মান্ধাতার আমলের চিন্তাধারা আঁকড়ে বসে আছি। এছাড়া এখনকার ষ্টুডিওগুলো ভাল নয়। আমি মানিকদার লেটেষ্ট ডকুমেন্টারী

চতুর্থ কভারে দেখুন

খেলা ধুলা
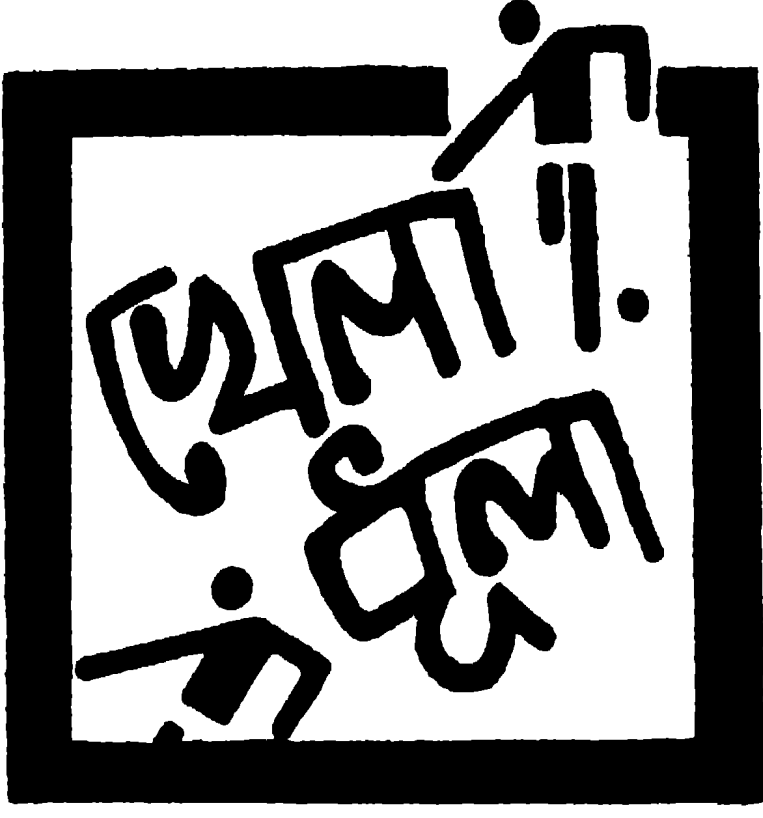
কাবাডি—যার নাম মহারাষ্ট্রে আর গুজরাটে হু-টু-টু, চেডু-গুডু দক্ষিণ ভারতে ডু ডু (হাডুডু) সেই কপাটি বা কাবাডির জন্মস্থান বাংলাদেশ। সঠিক কোন সময় থেকে এই খেলা শুরু হয়েছিল তা জানা যায়না। তবে গ্রাম-বাংলার অতি প্রাচীন খেলা হাডুডু—আজ সর্ব্বভারতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। নিখিল বঙ্গ হাডুডু সংঘের নেতৃত্বেই ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ কপাটি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত

কাবাডি বাংলারই খেলা

মাণিক লাল দাশ

হয় বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার ও সরোজেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতে। অবশ্য এর আগে হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডলের অধীনে একটি কপাটি দল এই খেলাটি দেখানোর জন্য ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে যোগদান করে। কাবাডি কথাটি উত্তর প্রদেশের দেওয়া অর্থাৎ উত্তর প্রদেশের মানুষ এ খেলাটিকে কাবাডি বলে জানে। কাবাডি এখন ভারতীয় ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত।

শারীরিক দক্ষতা আর প্রচুর দমের প্রয়োজন হয় এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে হলে, তাছাড়া যাকে বলে ফিজিক্যাল ফিটনেস—তার প্রয়োজনও বেশী।

কাবাডির পূর্বের নাম হাডুডু যখন প্রথম গ্রামবাংলায় গড়ে ওঠে তখনকার থেকে এখনকার কাবাডি অনেক অনেক উন্নত হয়েছে। চন্দননগরের উৎসাহী যুবকরা তখনকার দিনে ঘরে ঘরে কাবাডি (হাডুডু) খেলার প্রচার বাড়িয়ে যেতে থাকে। পরে সৃষ্টি হল কলেজ স্কোয়ারের পূব পাড়ে ক্যালকাটা হাডুডু ক্লাব—। চন্দননগরের একই পরিবারের তিন ভাই রাধু সুর, তারিণী সুর ও বারিধি সুর তদানীন্তন হাডুডুর দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। স্বীকৃত হয়েছে বৈদ্যনাথ শীল, বলাই শীল, যতীন নিয়োগী, তারাপদ ঘোষ, জয়দেব নাথ, শশী ব্যানার্জী, নির্মল রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর অনুশীলন। অধ্যবসায় রয়েছে বাংলার হাডুডুতে। এঁদের ভালবাসা, এঁদের প্রচেষ্টা, এঁদের আন্তরিকতা পথ দেখিয়েছে রঞ্জিত ধর, গোপাল সমাদ্দার, রাধাশ্যাম সরকার, হীরেন বসু (মনুদা) প্রভৃতিদের হাডুডুকে বাংলাদেশে বাঁচিয়ে রাখতে। নির্মল রায়ের মত মিডল ম্যান আর দ্বিতীয়টি বাংলাদেশে যেমন গড়ে ওঠেনি তেমনি গড়ে ওঠেনি লাইনম্যান রঞ্জিত ধর আর একজন। যাঁরা হাডুডু-কাবাডি খেলায় যথেষ্ট উৎসাহী তাঁরা সবাই জানেন মনী চক্রবর্ত্তীর নাম। বর্ত্তমানের উল্লেখ্য খেলোয়াড়রা হলেন গোপাল দত্ত, এ. রাউথ, রবিন সাহু, এল. সাঁতরা, ইনসান আলি প্রভৃতি।

কাবাডি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভারতীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছায় ১৯৫৩ সালে। নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় পুরুষদের কাবাডি। আর সেই বছর পশ্চিম বাংলাই বিজয়ী হয়ে সুষ্টার ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করে। ১৯৫৪ সালে নয়াদিল্লীতেও বিজয়ীর সম্মান পায় পশ্চিম বাংলা। '৫৬ এবং ৫৮ সালেও বিজয়ীর সম্মান অটুট রইলো। কিন্তু ১৯৫৮ সালের পর পশ্চিম বাংলা হারিয়ে গেছে জাতীয় কাবাডি থেকে। ১৯৫৫ সালে প্রথম বছরেই পশ্চিম বাংলার মহিলা কাবাডি দল কিছুটা নৈপুণ্য দেখায়। এর পরের বছর থেকে এক দুর্ঘটনার জন্য মহিলা কাবাডি দল আর জাতীয় আসরে অংশ নেয়নি।

সুদীর্ঘ ১৭ বছর পর ১৯৭২ সালে জাতীয় আসরে কাবাডির প্রচলন আবার হয়।

১৯৬১ সালে রাজ্য কাবাডি এসো-সিয়েশন ময়দানে পাকাপাকি স্থান পায় এবং রাজ্য কাবাডির প্রসারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে। ১৯৭৩-এ আন্তঃ কলেজ কাবাডি প্রতিযোগিতার প্রচলন হয়। ঐ বছরই ভোলানাথ গুঁইকে কাবাডিতে অসামান্য পারদর্শিতার জন্য জাতীয় স্বীকৃতি 'অর্জুন' পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭৫-৭৬ জামসেদপুরের জাতীয় আসরে তিনটি বিভাগে সেমি-ফাইনালে উঠে পশ্চিম বাংলা সেরাদল মনোনীত হয়।

কাবাডি পশ্চিমবঙ্গে আজ জনপ্রিয় খেলা। সংস্থা চান রাজ্যের ৩৭২ টি ব্লকে কাবাডির প্রচলন হোক কাবাডির রজত জয়ন্তীর প্রাক্‌কালে।

যে সময় এশীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধূলোয় স্থান পাবার প্রচেষ্টা চলেছে সেই সময় এই খেলার প্রতি আমাদের ঔদা-সীন্য তথা খেলোড়ায়দের উৎসাহে ভাঁটা যখন চোখে পড়ে তখন বড়ই কষ্ট দেয় প্রাণে। খেলোয়াড়দের অনুশীলনে মনপ্রাণ সঁপে দিতে হবে। সরকার ও খেলোয়াড়দের সক্রিয়তায় কাবাডির উন্নতি আর প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে আশা রাখবো সারা ভারতের কাবাডি প্রেমিকদের মত বাংলার কাবাডি উৎসাহীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতীয় কাবাডি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সফল হবেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাবাডি এসোসিয়েশন রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করছে আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। এই প্রতিযোগিতার আসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাবাডির প্রসার বাড়ানো। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাবাডি এসোসিয়েশনের এই প্রচেষ্টা রজতজয়ন্তী বর্ষে মহৎ নিঃসন্দেহেই।

DHANADHANYE YOJANA (Bengali) REGD. No. D(D) 78
Price 50 Paise December 1—15, 1976

কাবাডি খেলায়
ব্যস্ত মেয়েরা

কাবাডির আসরে মেয়েরা

কেশব লাল দাস

"মেয়েরা কাবাডি খেলবে? পুরুষদের মত ধ্বস্তাধ্বস্তি লাফালাফি করবে?—এ প্রশ্ন আমাদের সংস্কারগ্রস্ত মনের। ভাবতে হয়ত খারাপ লাগে, দৃষ্টিতেও হয়ত কটু ঠেকে সত্যি কাবাডি কঠিন-কর্কশ (রাফ্ টাফ খেলা)। কিন্তু ভাবুন তো যে যুগে মেয়েরা সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাষ্টে অংশ নিচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ায় বিজয় নিশান ওড়াচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহিণী হয়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে; সেখানে আমাদের দেশের মেয়েরা নির্ভেজাল স্বদেশী খেলা থেকে দূরে থাকবে, তা হতে পারে না"—কথাগুলো পাতিয়ালার প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত একমাত্র মহিলা কাবাডি শিক্ষিকা অনিমা পণ্ডিতের। তাঁর মতে কাবাডি একটু দৈহিক শ্রমসাধ্য খেলা বটে কিন্তু এতে শরীরের গঠন মজবুত হয় শক্তি সাহস বাড়ে। গার্লস গাইড, এন-সি-সি, গোয়েন্দা পুলিশে মেয়েরা যেখানে সানন্দে নাম লেখায় সেখানে কাবাডি খেলতে অসুবিধা কি? বরঞ্চ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে শক্তিশালী নারী বাহিনী গড়ে তুলতে কাবাডির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পঞ্চাশের দশকে মেয়েদের কাবাডি খেলা শুরু হয় আমাদের পশ্চিম বাংলায়। তবে সে সময়ে কোনো জাতীয় রেকর্ডের অধিকারিণী হ'তে পারেনি বাংলার মেয়েরা। তাই প্রথম সাতাশ বছরের ইতিহাসে কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। আবার নতুনভাবে মেয়েদের কাবাডি খেলা শুরু হয় ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত প্রশিক্ষক শৈলেন সেনের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। ক্যালকাটা খো-খো ও হাডুডু ক্লাবের উদ্যোগে প্রধানত মেয়েরা কাবাডি খেলা শুরু করে। বিভিন্ন জেলাদল সমেত মোট তেইশটি কাবাডি দল আছে পশ্চিম বাংলায়। এদের মধ্যে নতুন বাজার, অশোক সংঘ, এরিয়ান্স, জর্জ টেলিগ্রাফ, মহামেডান-এ. সি. ও নদীয়া জেলা কাবাডি এ্যাসোসিয়েশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যালকাটা খো-খো ক্লাবেই আছে ১০০টি মেয়ে। গড় বয়স ১০ থেকে ২৫ বছর।

সাধারণত পুরুষদের কোর্টের তুলনায় মেয়েদের কোর্টের মাপ একটু ছোট। ১১ মিটার দৈর্ঘ্যে; প্রস্থে ৮ মিটার। প্রতিযোগীদের সংখ্যা ৬ থেকে ৭। দেহকে খেলার উপযোগী রাখতে ওদের নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয়। অনুশীলনের তালিকায় আছে—নেট রোটেশন, আর্ম রোটেশন, ওয়ার্ম আপ ব্যাক্ কিক্, ফ্রন্ট কিক্, রোল কিক্ ইত্যাদি। প্র্যাকটিশ হয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল কাবাডি এ্যাসোসিয়েশনের মাঠে বিকাল ৪ টা—৬ টায়। মেয়েদের আন্তঃ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কাবাডি প্রতিযোগিতা যেমন হচ্ছে, তেমনি জেলা ও জাতীয় প্রতিযোগিতারও আসর বসছে প্রতি বছর।

প্রতিযোগিতার তারতম্য অনুযায়ী স্কুল কলেজের ছাত্রীদের জন্য ৩০০, ৬০০ ও হাজার টাকার বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। মেধাবী ছাত্রী রঞ্জনা ব্যানার্জী খো-খো খেলায় ষ্টেট উইম্যান অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এ বছর। আগে থেকেই রঞ্জনা লেখাপড়ায় বৃত্তি পেয়ে আসছেন। তাই আর ওর খেলোয়াড় বৃত্তির দরকার হয়নি।

জাতীয় মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতায় বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটছে। মহারাষ্ট্র উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে; আর বাংলা দল ১৯৭৩-৭৬ চার বছরের রানার্স আপ। গুজরাট, মহীশূর, বিদর্ভ, হায়দ্রাবাদও মহিলা কাবাডিতে উন্নতি করছে।

প্রথম দিকে একটু দ্বিধার ভাব থাকলেও এখন আর কোনো সংশয় নেই। অসুবিধা যা কিছু আছে তা হ'লো আর্থিক। বেশীর ভাগ নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে; অনেক সময় গাড়ি ভাড়ার অভাবে হেঁটেই আসতে হয় খেলতে। ভাল খাওয়া দাওয়া তো পরের কথা। ফলে শরীরের ওপর চাপ পড়ে। তাই শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হলেই চলবে না। বেসরকারী সাহায্যেরও দরকার। স্বল্প মাপের জমিতে প্রায় নিখরচায় সুন্দর এই সম্পূর্ণ স্বদেশী খেলাটি অনাদৃত হোক এটা কারো কাম্য নয়।

ক্লোজ-আপ

২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ছবি বালা সরস্বতীর প্রসেসিং-এর ব্যাপারে মাদ্রাজে গিয়েছিলাম। ওখানে জেমিনী কালার ল্যাবরেটরীর কাজ দেখে অবাক হয়ে গেছি। ওখানেই শুনেছি মালয়ালম কানাড়ী ছবিতে এখন দারুণ এক্সপেরিমেন্ট চলছে।

ওঠার আগে সৌমেন্দু বাবুকে জিগ্যেস করলাম—এ পর্যন্ত কোন কোন ফিল্মে এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন?—উনি দেখিয়ে ছিলেন অদূরে সারি দিয়ে সাজানো পুরস্কারগুলো। বললেন—পাঁচবার বি. এফ. জে. এ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বেষ্ট ক্যামেরাম্যান হিসাবে। অশনী সংকেত এবং সোনার কেল্লার কালার ফটোগ্রাফীর জন্য স্টেট এবং ন্যাশানাল দুরকম এ্যাওয়ার্ডই পেয়েছি।

সমীর ঘোষ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
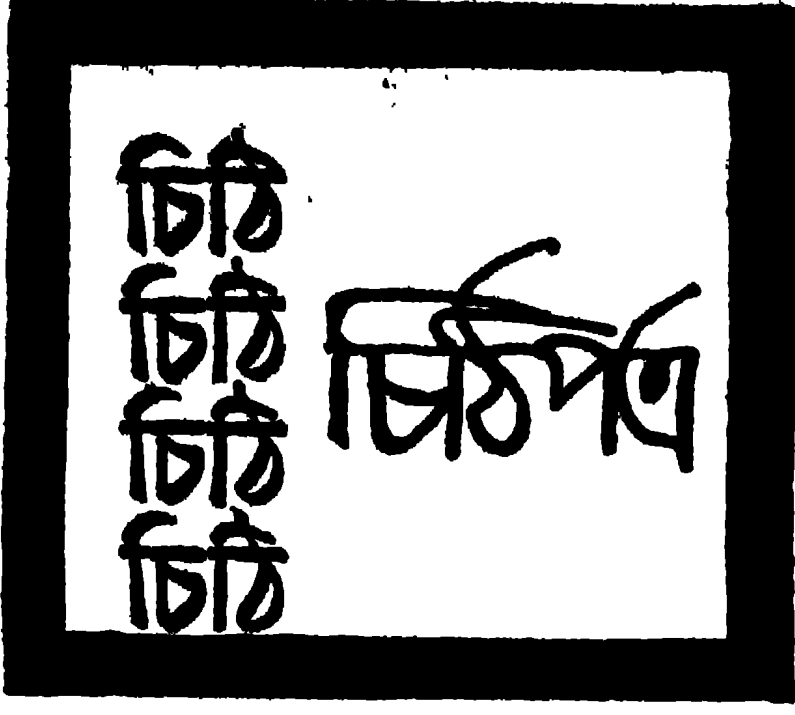
মহাশয়,

আমি কয়েক বছর ধরে পাক্ষিক সচিত্র ধনধান্যের নিয়মিত পাঠক। সুসম্পাদিত এবং বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় কলমের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পত্রিকাটির বিষয়বস্তু যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি আকর্ষক। একজন ছাত্র হিসেবে এর লেখাগুলো আমার খুবই কাজে লাগে। সত্যি বলতে কি বিদেশের অনেক পত্র-পত্রিকা দেখেছি সেসব পত্রিকার ছাপা, কাগজ এবং পারিপাট্য দেখে ঈর্ষা বোধ করি। কারণ আমাদের এখানে অমন গুণসম্পন্ন কাগজ কমই হাতে আসে। এই অবস্থায় ধনধান্য পেয়ে সত্যিই অহংকার বোধ করি। কারণ এর সেসব গুণ অবশ্যই আছে।

এইতো সেদিন খবরের কাগজ বেচতে গিয়ে কাগজওয়ালা অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলো এই পত্রিকাগুলোও বেচে দেওয়ার জন্য। আমি পারিনি পত্রিকাগুলো ওর হাতে তুলে দিতে। কারণ ধনধান্যের দু-তিন রঙের প্রচ্ছদপট আর শোভন অলংকারের জন্য পত্রিকাটি জমিয়ে রাখার মতই। বৈচিত্র্যময় ঝকঝকে প্রচ্ছদ সহজেই মন আর চোখ টেনে নেয়। আসলে কাগজওয়ালার ঝুলোঝুলি করার কারণটা বুঝলাম, এই পত্রিকার ভালো কাগজের জন্যই ওর এত লোভ পত্রিকাগুলো পাওয়ার। ঠিক তেমনি আমারও লোভ হয় রঙিন প্রচ্ছদ, শোভন অলংকরণ এবং প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় লেখাগুলো সংগ্রহ করে রাখতে।

এছাড়া আর একটা কারণে এই পত্রিকার জন্য আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি, তা হ'ল এই পত্রিকায় তরুণ লেখক-লেখিকা ও শিল্পীরা তাঁদের লেখা এবং আঁকা প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমাদের মত তরুণদের কাছে এটা সত্যিই আনন্দের।

পরিশেষে এ পত্রিকায় কিছু কবিতা এবং পাঠকদের চিঠিপত্র আরো কিছু বেশী রাখার অনুরোধ করছি। কারণ পাঠকের সমালোচনা এবং মতামতের গুরুত্ব যে অপরিসীম একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

শচীন কুণ্ডু

দমদম রোড, কলিকাতা-৭৪

মহাশয়

আপনার পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের চলচ্চিত্র উৎসবের রিপোর্টটি পড়লাম। একটি পাক্ষিক পত্রিকায় এমন হালকা রিপোর্টের মূল্য কি? একি দৈনিক পত্রিকা? না সংবাদ পাক্ষিক? সত্যজিৎ, তপন সিংহ, মৃণাল সেন না হয়ে অজয় কর কেন? তিনি একজন তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালক। এমন একটি দায়িত্বশীল পত্রিকায় বিশিষ্ট লোকদের সাক্ষাৎকার বের হওয়া উচিৎ। বাণিক রায় মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন। সন্ধ্যার গোলাপ কি ছোট গল্প হয়েছে? কাঁচা লেখা।

বিপ্লব চ্যাটার্জী

শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাশয়,

আমি 'ধনধান্যে' নিয়মিতভাবে পড়ে থাকি। এ রকম একটি সুদৃশ্য পাক্ষিক এত অল্প মূল্যে পাওয়া সত্যই দুর্লভ। কি প্রচ্ছদে, কি বিষয়বস্তুতে—'ধনধান্যে' অন্যান্য পত্রিকাগুলির তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। এর প্রতিটি রচনাই বেশ উচ্চমানের। তাই পত্রিকাটি আজ শুধু শহরেই নয় গ্রামাঞ্চলেও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিশেষে পত্রিকাটি সু-সম্পাদনার জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

সুব্রতকুমার করণ

বাওয়ালী, ২৪ পরগণা

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়

সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা

উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক : এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার

বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাহক মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা ও সম্পাদকীয় কার্য্যালয় :
'ধনধান্যে', পাব্লিকেশনস ডিভিশন, ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন : ২৩-২৫৭৬
টেলিগ্রামের ঠিকানা :
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন :
অ্যাডভারটাইজমেণ্ট ম্যানেজার, 'যোজনা' পাতিয়ালা হাউস, নতুনদিল্লী-১১০০০১

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৭
অষ্টম বর্ষ : উনবিংশতিতম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদকের কলমে

এই পক্ষেই আরেকটি বাংলা বছরের সমাপ্তি। নতুন বছরের শুরু। ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ। নববর্ষের এই শুভদিনে সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা। নতুন বছর আনুক জাতির জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি।

আরেকটি ঘটনাবহুল বছর শেষ হল। ফেলে আসা দিনগুলিতে যে সমস্যা আমাদিগকে বিব্রত করেছে আগামী দিনগুলিতে আমাদের প্রয়াস হবে সেই সব সমস্যার সমাধান। দেশের অগ্রগতির পথে যে বাধা—যে সব সমস্যা অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে সেগুলি দূরীকরণের শপথ নিতে হবে সকলকে। সমবেতভাবে এগিয়ে আসতে হবে ব্যষ্টির স্বার্থের কথা ভুলে সমষ্টির স্বার্থের জন্যে। তবেই সামগ্রিক ভাবে দেশ এগিয়ে যাবে।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সংগে তাল রেখে বিশ্বের উন্নতশীল দেশগুলি আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা যদি সেই তালে এগুতে না পারি তাহলে আমরা পেছনেই পড়ে থাকবো। তাই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিল্পে, কল কারখানায়ই শুধু নয়, কৃষিকাজেও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য চিরাচরিত চিন্তাধারারও পরিবর্তন চাই। খুবই আশার কথা সে পরিবর্তন প্রায় সর্বত্র সুপরিস্ফুট। আজ গ্রামের মানুষও বিজ্ঞানকে কৃষিকাজে লাগাতে আগ্রহী। ফলে দেশে কৃষির উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা গ্রামীণ অর্থনীতিকে আমূল পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করছে। এটাকে আরও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে দেশের কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বাড়াতে হবে। তার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে।

তাই আমাদের সমাজের বুকে যে সমস্ত কুসংস্কার আজও জগদ্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে সে সবের থেকে মুক্ত করতে হবে দেশকে। তার জন্য যে গণ আন্দোলন দরকার সেই গণ-আন্দোলনে সকলকে সামিল হতে হবে। মুষ্টিমেয় সমাজসংস্কারকের হাতে অথবা কেবলমাত্র আইন করে সে কুসংস্কার সমাজ থেকে দূর করা যাবেনা। জনগণের ব্যাপক সমর্থনই পারে সমাজ-দেহের এসব ব্যাধিকে নির্মূল করতে। তাহলেই দেশের অগ্রগতি সম্ভব হবে। দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে।

দুজনের
যাতে
পেট ভরে

চারটির
তাতে
ক্ষিদে মরে ?

তাই তো বলি —
সুখে থাকুন
পরিবারটি
ছোট রাখুন

ভারতের লৌহ সম্পদ

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষের প্রয়োজনে লোহা ব্যবহৃত হলেও আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি মূলত লোহা ও ইস্পাতের ওপর নির্ভরশীল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা লোহা উৎপাদনের ওপর এতই নির্ভরশীল যে লোহা উৎপাদনের পরিমাণ থেকেই সাম্প্রতিকালে কোন দেশের অগ্রগতির পরিমাপ করা হয়। সামান্য ছুরি-কাঁচি থেকে শুরু করে ভারী যন্ত্রপাতি-সব কিছুতেই লাগে এই পরম প্রয়োজনীয় ধাতুটি।

প্রকৃতির বুকে এই ধাতুর সন্ধান মেলে কয়েকটি আকরিকের আকারে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গাঢ় বাদামি কিংবা চেরীর মতো লাল হেমাটাইট, চুম্বক শক্তি যুক্ত কালো রংয়ের ম্যাগনেটাইট, হালকা বাদামি রংয়ের লিমোনাইট এবং হলুদ অথবা ধূসর রংয়ের সিডেরাইট। একমাত্র সিডেরাইট ছাড়া বাকি তিনটি আকরিকের রাসায়নিক উপাদান লোহা এবং অকসিজেন আর সিডেরাইট হলো লোহার কারবনেট। তবে লোহা নিষ্কাশনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় আকরিক দু'টি—হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট। এদের মধ্যে লোহার পরিমাণ শতকরা-- ৬৫-৭০ ভাগের মতো।

সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, প্রকৃতির বুকে লোহার আকরিকের জন্ম হলো কী করে। এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক কারণেই একমত নন। এদের মতে, ভিন্ন ভিন্ন ধরণের আকরিকের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হয়েছে। যেমন, কালো ম্যাগনেটাইটের জন্ম তরল উত্তপ্ত ম্যাগমা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে নানা জটিল প্রক্রিয়ার ফলে। তবে হেমাটাইট আকরিকের উৎপত্তির ব্যাপারে অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানীর ধারণা, উপসাগরীয় বা হ্রদীয় অঞ্চলে রাসায়নিক অবক্ষেপণের ফলে পাললিক উপায়ে জলের নিচে লোহা-সমৃদ্ধ পলি জমে জমে সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের বিশ্বাস, বিহার, উড়িষ্যার হেমাটাইটের জন্ম এভাবেই। তবে কয়েকজন বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী এই তত্ত্বের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তবে লোহার আকরিকের উৎপত্তির ব্যাপারে যতই মতভেদ থাকুক, কিন্তু এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই যে ভারতে প্রচুর ভালো জাতের লোহার আকরিক পাওয়া যায়। যে সব প্রদেশে প্রচুর ভালো জাতের লোহার আকরিক পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই উল্লেখযোগ্য বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক। তবে কিছুটা নিচুমানের লোহার আকরিকের সন্ধান মিলেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানে।

ভারতের লোহার আকরিকের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার রয়েছে বিহারের সিংভূম এবং পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার কেওঞ্জর, বোনাই, সুন্দরগড়, কটক এবং ময়ূরভঞ্জ জেলায়। অন্তত ৫০-১০০ কোটি বছরের প্রাচীন প্রাক-কেম্ব্রিয়ান যুগের পাথরে এই আকরিকের সন্ধান মিলেছে। এই অঞ্চলের লোহার আকরিক মূলত হেমাটাইট যার মধ্যে শতকরা ৬০ থেকে ৬৯ ভাগ লোহা, ৪ থেকে ৫ ভাগ অ্যালুমিনা এবং ২ থেকে ৪ ভাগ সিলিকা।

বিহার ও উড়িষ্যার যে সব জায়গায় লোহার আকরিকের উত্তোলন চলছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইসকোর গুয়া এবং মনোহরপুর অঞ্চলের খনি, টিসকোর নোয়ামুণ্ডি, গরুমহিষানি, সুলাইপত, বাদামপাহাড় এবং জোদা খনি, বার্ড কোম্পানি ও ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের বড়া জামদা খনি, হিন্দুস্থান ষ্টিলের বারসুয়া খনি, জাতীয় খনিজ উন্নয়ন করপোরেশনের কিরিবুরু খনি এবং বোলানি আকরিক প্রাইভেট কোম্পানির বোলানি খনি। এছাড়া রাউরকেলা ষ্টিল ওয়ার্কসের আকরিক আসে বড়াজামদা এবং বারসুয়া খনি থেকে এবং দুর্গাপুর ষ্টিল ওয়ার্কসের জন্য কাঁচা লোহার আকরিক পাওয়া যায় বোলানি, বড়াবিল এবং বড়াজামদা খনি থেকে।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার এবং দুর্গ জেলার বাইলাদিলা এবং রাওঘাট ও দল্লি-রাজহরা পাহাড় অঞ্চল থেকে এই প্রদেশের অধিকাংশ লোহার আকরিক উত্তোলিত হয়। বাইলাদিলার হেমাটাইট আকরিকে লোহার পরিমাণ ৬৮ ভাগের বেশি এবং দুর্গ জেলার আকরিক লোহার পরিমাণ শতকরা ৬৪ থেকে ৬৯ ভাগ। মধ্যপ্রদেশ থেকে যে লোহার আকরিক উত্তোলিত হয়, তার অনেকটাই চালান যায় ভিলাই ষ্টিল প্ল্যাণ্টে। তা'ছাড়া মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রচুর লোহার আকরিক চালান যাচ্ছে বিদেশে। আর একটা কথা—মধ্যপ্রদেশের লোহার আকরিকের উৎপত্তির ইতিহাস কিন্তু বিহার-উড়িষ্যার লোহার আকরিকের অনুরূপ।

মহারাষ্ট্রের চন্দা জেলার বিভিন্ন জায়গায় হেমাটাইট-কোয়ার্টজাইট পাথরের জঠরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকারে হেমাটাইট আকরিক পাওয়া যায়। এতে লোহার পরিমাণ শতকরা ৬১ থেকে ৭১ ভাগের মধ্যে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলা ও

মধ্যপ্রদেশের একটি লোহার খনিতে কাজ চলছে

গোয়ায় এক বিরাট লোহার আকরিকের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি এই এলাকা দু'টি থেকে প্রচুর পরিমাণে লোহার আকরিক রপ্তানী হচ্ছে বিদেশে।

কর্ণাটকের সবচেয়ে লোহার আকরিকের (হেমাটাইট) ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে চিকমাগালুর জেলার বাবাবুদান পাহাড় এবং বেল্লারি জেলার সানদুর, হোসপেট এবং বেল্লারির দীর্ঘ পর্বতমালায়। বাবাবুদান পাহাড়ের প্রধান খনি অঞ্চল রয়েছে কেমমানগুণ্ডিতে। খনন কাজের দায়িত্ব মহীশূর লোহা এবং ইস্পাত ওয়ার্কসের ওপর। সানদুর অঞ্চলে পাহাড়ের মাথায় ভাসমান টুপির মতো ৩০ থেকে ৬০ মিটার পুরু লোহার আকরিক পাওয়া যায়। চিকমাগালুর জেলার কুদরেমুখ অঞ্চলে সম্প্রতি একটি বড় আকারের ম্যাগনেটাইটের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। মোট মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণ ১ কোটি টনেরও বেশি।

নিচু মানের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধরনের হেমাটাইট পাওয়া যায় অন্ধ্রপ্রদেশের কাড়ডাপা, চিঙুর, নেলোর, অনন্তপুর, কৃষ্ণা, কুর্নুল, খাম্মাম, ওয়ারাঙ্গল, করিমনগর এবং আদিলাবাদ, হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় (লোহার ভাগ শতকরা ৬০), রাজস্থানের আলওয়ার এবং ঝুনঝুনু জেলায়।

এছাড়া বিহারের সিংভূম জেলায় ম্যাগনেটাইট-অ্যাপেটাইট (ফসফেট পাথর) পাথরের ভেতরে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় ভ্যানাডিয়াম এবং টিটানিয়ামযুক্ত লোহার আকরিক অন্ধ্রপ্রদেশের গুনটুর এবং নেলোর, তামিলনাড়ুর সালেম ও তিরুচিরাপল্লী, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে ২০-২২ কোটি বছরের প্রাচীন গণ্ডোয়ানা যুগের পাথরের ভেতরে পাওয়া গেছে সিডেরাইট জাতীয় লোহার আকরিক। অবশ্য এই জাতীয় লোহার আকরিকের ভেতরে লোহার ভাগ বেশ কম (প্রায় ৪০%) এবং ফসফরাসের ভাগ বেশি। বেশ কয়েক বছর আগে কুলটির লোহার কারখানায় এই লোহার আকরিক ব্যবহৃত হোত, কিন্তু পরে বিহার ও উড়িষ্যায় ভালো জাতের লোহার আকরিক আবিষ্কৃত হওয়ায় গণ্ডোয়ানা যুগের লোহার আকরিক ব্যবহার করা বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতে বিভিন্ন জাতের লোহার আকরিকের মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হোল

(১) হেমাটাইট আকরিক—
৫৩২ কোটি টন
(প্রমাণিত এবং হিসাবজাত)
১৭৫৩ কোটি টন (সম্ভাব্য)

(২) ম্যাগনেটাইট আকরিক—
৬০ কোটি টন
(প্রমাণিত এবং হিসাবজাত)
১৬১ কোটি টন (সম্ভাব্য)

(৩) সিডেরাইট এবং লিমোনাইট আকরিক
৫০ কোটি টন
(প্রমাণিত এবং হিসাবজাত)
২০০ কোটি টন (সম্ভাব্য)

সারাভারতে সবজাতের লোহার আকরিকের মজুত পরিমাণ মোট ৪০০ কোটি টন (প্রমাণিত এবং হিসাবজাত) এবং ২১০০ কোটি টন (সম্ভাব্য)।

সারাভারতে বিগত কয়েক বছরে লোহার আকরিকের উৎপাদন নিচে দেওয়া হ'ল।

১৯৭৩ — ৩৫,৪০০,৯৮৮ টন

১৯৭৪ — ৩৫,৩০৪,৫৮২ টন

১৯৭৫ — ৪১,৪০৫,৩০৫ টন

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

স্নেহময় সিংহরায়

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পশ্চাতে আছে ১৯৬৪-৬৬ তে কার্যরত কোঠারি কমিশনের সুপারিশ। ১৯৬৪ তে যে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন হয়েছিল সেখানে সর্বভারতে কলেজে ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষাগ্রহণের পূর্বে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে বারো বছরের শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। কোঠারি কমিশন এমত সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন। কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং সর্বাত্মক জাতীয় উন্নয়নের উপর। কমিশনের প্রতিবেদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিক্ষানীতি আলোচিত হয় এবং জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে—(১) ভারতের সকল অঞ্চলে সাধারণভাবে ৭ বছরের প্রাথমিক, ৩ বছরের নিম্নমাধ্যমিক, ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক (এই ২ বছর স্কুল বা কলেজের সঙ্গে যুক্ত হবে) এবং ৩ বছরের কলেজে শিক্ষা—মোট ১৫ বছরের একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা হবে। (২) মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার করা হবে। (৩) কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন, সমাজসেবা, স্বাবলম্বন, চরিত্র গঠন, জাতীয় পুনর্গঠন কর্মসূচীতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। (৪) জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের জন্য বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার অগ্রাধিকার থাকবে। (৫) শারীর শিক্ষা, খেলাধূলা ও স্পোর্টসের উন্নতি প্রয়োজন। এই সমস্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৯৭৪ এর জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে দশ শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে নবপ্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। ১৯৭৬ এর জুলাই থেকে শুরু হয়েছে ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের পঠন-পাঠন। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের উপর ন্যস্ত হয়েছে এই স্তরের শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব। প্রথম বছরে এই রাজ্যে প্রায় ৯০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ শিক্ষা এবং প্রায় ১০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৃত্তি শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম, সাধারণ শিক্ষা প্রবাহ (General stream)। এই প্রবাহ প্রধানত: পাঠ্য বিষয়কেন্দ্রিক। অপর দিকে, বৃত্তি শিক্ষাপ্রবাহ (Vocational Stream) বৃত্তি শিক্ষাকেন্দ্রিক। এইভাবে এই পাঠ্যক্রমের দ্বিমুখী আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচী এইভাবে নির্ধারিত হয়েছে:—

(১) ভাষা—৪০০ নম্বর। 'এ' গ্রুপে আছে বাংলা, নেপালী, সাঁওতালি, হিন্দী, উর্দু, অসমীয়া ইত্যাদি ১৩ টি ও ইংরেজি মোট ১৪ টি ভাষা। এর মধ্যে যে কোন একটি নিতে হবে—মোট নম্বর ২০০। মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা বাংলাকে প্রথম ভাষা হিসেবে নিয়েছে তারা এখানে এই গ্রুপে বাংলা নিতে পারবে। 'বি' গ্রুপে ইংরেজি নিতে হবে। যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী 'এ' গ্রুপে ইংরেজি নিয়ে থাকে, তার ক্ষেত্রে বাংলা বা হিন্দী। এতে মোট নম্বর—২০০।

(২) তিনটি নির্বাচিত বিষয়। প্রতিটির জন্য ২০০ নম্বর। মোট ৬০০ নম্বর। এই বিষয়গুলি হচ্ছে—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, গণিত, অর্থনীতি, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, দর্শন, অর্থনৈতিক ভূগোল, হোম ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড নার্সিং, সংগীত ও শিক্ষা—ইত্যাদি ২৫ টি বিষয়। এছাড়া (ক) ক্লাসিক্যাল, (খ) আধুনিক ভারতীয় ভাষা, (গ) আধুনিক বিদেশী ভাষা সমূহের মধ্যে যে কোন একটি। এই ভাষাগুলি হচ্ছে—(ক) সংস্কৃত, পালি, ফারসী ও আরবী। (খ) বাংলা, হিন্দী, উর্দু, নেপালী, সাঁওতালি, ওড়িয়া ও অসমীয়া। (গ) ফরাসী, জার্মান, রাশিয়া ও চীন। এই ক্ষেত্রে মোট ৪০ টি বিষয় (নানা বিষয় ও কয়েকটি ভাষা মিলিয়ে) নির্ধারিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মোট ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু এখানেই পাঠ্যক্রম শেষ হয়নি। এছাড়া রয়েছে—

(৩) সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যক্রম হিসেবে অবশ্য কর্তব্য একটি কাজ। এই কাজগুলি হচ্ছে। (ক) কর্মশিক্ষা। (খ) শারীর শিক্ষা (গ) এন. সি. সি। (ঘ) সামাজিক এবং জনসেবামূলক কাজ। এই কাজে যোগদান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের প্রধান সার্টিফিকেট দেবেন।

(৪) ঐচ্ছিক নির্বাচিত বিষয়—সাধারণ বা উন্নত (অ্যাডভান্স) মানের:—(ক) সাধারণ মানের ১ টি বিষয়ে ২০০ নম্বর। অথবা (খ) উন্নত মানের ১ টি বা ২ টি বিষয়ে—প্রতিটিতে ১০০ হিসেবে ২০০ নম্বর।

বৃত্তি শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচী এইভাবে নির্ধারিত হয়েছে:—

(১) ভাষা সমূহ। মোট—২০০ নম্বর।

(ক) 'এ' গ্রুপের ভাষাসমূহের মধ্যে আছে—বাংলা, নেপালী, হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজি। এর মধ্যে একটিতে ১০০ নম্বর।

(খ) 'বি' গ্রুপের ভাষাসমূহের মধ্যে আছে—ইংরেজি অথবা ইংরেজিকে যদি 'এ' গ্রুপের মধ্যে নেওয়া হয় তাহলে বাংলা অথবা হিন্দী। এর মধ্যে একটিতে ১০০ নম্বর।

(২) তিনটি নির্বাচিত বিষয়—এ তিনটিতে ১০০ নম্বর করে মোট ৩০০ নম্বর। এই সমস্ত বিষয় সমূহের মধ্যে আছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, গণিত, জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহ, বাণিজ্যিক অর্থনীতি—বাণিজ্যিক গণিত সহ ব্যবসায় সংগঠন, হিসাবশাস্ত্র ও অর্থনৈতিক ভূগোল।

(৩) একটি বা দুটি পঠন ক্ষেত্র তথা বিষয়—মোট নম্বর ৫০০। একটি বিষয়ে থিওরি পেপার্স ২০০ নম্বর। প্র্যাকটিক্যাল ৩০০ নম্বর। দুটি বিষয়ে—থিওরি পেপার্স—৩০০। এই সমস্ত বিষয়গুলি হচ্ছে—কৃষি, শিল্প (টেক্সটাইল গ্রুপ), টেকনিক্যাল এডুকেশন, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, প্যারা মেডিক্যাল এডুকেশন।

মোট হাজার নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে।

(৪) আবশ্যিক সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে একটি—এই কার্যাবলী হচ্ছে—(ক) কর্মশিক্ষা। (খ) শারীর শিক্ষা। (গ) এন. সি. সি। (ঘ) সামাজিক ও জনসেবামূলক কার্যাবলী। এই কার্যে যোগদান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে সার্টিফিকেট নিতে হবে।

এছাড়া Bridge Course এও পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কোন ছাত্র Vocational Stream এ পাশ করার পর General Stream এ আসতে চায়, সে Bridge Course নিতে পারে। এক্ষেত্রে Bridge Course এ ৫ টি বিষয় নিতে হচ্ছে (যাতে ছাত্র Vocational Stream—এ পূর্বেই পাশ করেছে।) এতে V-Course এ ৫০০ এবং B-Course এ ৫০০ মোট ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কোঠারি কমিশন বলেছিলেন, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র যেন বৃত্তি-শিক্ষা গ্রহণ করে।

এবারে পরীক্ষার কথা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ ফেল থাকবে না। এখানে গ্রেড ক্রেডিট পদ্ধতি চালু হবে। পরীক্ষার খাতায় নম্বর না দিয়ে গ্রেড পয়েন্ট দেওয়া হবে। এর প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য—(ক) নম্বর দিয়ে পরীক্ষার ফল নির্ণয় হবেনা, তার বদলে গ্রেড পদ্ধতি চালু হবে। (খ) আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ করা হবে। (গ) যে সব বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়না সেগুলির জন্য ইনটারন্যাল ও এক্সটারন্যাল পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। (ঘ) এখনকার মত 'গ্লোব্যাল পাশ' সারটি-ফিকেট প্রথার বদলে সাবজেক্ট পাশ বা ক্রেডিটপ্রথা চালু। (ঙ) যে কোন পরীক্ষার্থীকে তার প্রথমবারের উচ্চ মাধ্য-মিক পরীক্ষার বসবার তিন বছরের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা শেষ করতে হবে। তবে মোট পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বছর চারটি বিষয়ে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। (চ) প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষার প্রাপ্ত ক্রেডিট পয়েন্ট দিয়ে প্রতি বছর পরীক্ষার্থীকে একটি করে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে। সব পরীক্ষার শেষে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট। ক্রেডিট পয়েন্ট প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য, গুণানুসারে যথাক্রমে সাতটি পয়েন্ট থাকবে। সেগুলি হচ্ছে—(১) ও—আউটস্ট্যানডিং। (২) এ—ভেরিগুড। (৩) বি—গুড। (৪) সি—স্যাটিসফ্যাক্টরি। (৫) ডি—ফেয়ার। (৬) ই—পুওর। (৭) এফ—ভেরি পুওর। (ক্রেডিট পয়েন্ট হবে—'ও' থেকে 'এফ' পর্যন্ত— ৬ থেকে ০। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই সব বিষয়ে 'ডি' অথবা তার ওপরের কোন গ্রেড-এর ক্রেডিট পয়েন্ট পেতে হবে। পাঁচটি বিষয়ে 'ডি' পেলে ক্রেডিট পয়েন্ট হবে ১০। কেউ একটাতে 'ই' পেলে অন্য সব বিষয় মিলিয়ে ক্রেডিট পয়েন্ট পেতে হবে ১৩। সব বিষয়ে পরীক্ষা একই বছরে না দিলেও চলবে। ফলাফলে সন্তুষ্ট না হলে পরীক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা দিতে পারবে। পুনশ্চ, সব বিষয়েই নতুন করে আবার পরীক্ষায়ও বসতে পারবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনে বহু বাধা রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু সমস্যাও রয়েছে। চাকরি ইত্যাদির সুবিধার জন্যে অনুপযুক্ত ছাত্র বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পাঠ্যক্রম নিচ্ছে। সর্ববিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক সর্বত্র নেই। শিক্ষা পরিবেশ উন্নততর করার প্রয়োজন। সর্বত্র নির্দেশ সত্ত্বেও উপযুক্ত কমনরুম ও লাইব্রেরী নেই। ১৯৭৬ এর মে মাসে উপযুক্ত শিক্ষক তালিকা প্রণয়নের জন্য দরখাস্ত জমা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও শিক্ষকদের বেতনহার ঘোষণা করা হয়নি ও শিক্ষক নেওয়া হয়নি। কিছু কিছু প্রকাশক বহু বিষয়ে উপযুক্ত মানের পুস্তক প্রকাশ করলেও সমস্ত বিষয়ে বহু পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় জীবন-গঠনের প্রতি অসীম আগ্রহ, জ্ঞান অর্জন ও দৈহিক মানসিক এবং নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়, মানবিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা এবং বাণিজ্যিক বিষয় সমূহের পঠন ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমকে মূল্যবান মনে হলেও—এর সার্থক রূপায়ণে সুদীর্ঘ ধৈর্যপূর্ণ কর্মপ্রয়াস ও অধ্যবসায় অবশ্যই প্রতীক্ষা করে লক্ষ্য করতে হবে।

সীমা

কবিতা সিংহ

সকাল থেকেই বাড়ির প্ল্যান্ নিয়ে পড়েছেন অনিল বাবু। আর ক্রমাগত নাক চুলকোচ্ছেন। প্রথমটা তাঁর নেশা। দ্বিতীয়টা মুদ্রাদোষ। সামনের সোফায় বসে আছে তাঁর বড় মেয়ে সীমা। এই মাত্র বেয়ারা পেয়ালা টিপট্ সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে। সীমা চা ঢালবার আগে টোটে পুরো করে মার্মালেড্ লাগাচ্ছিল। তখনই পর্দা সরিয়ে ঢুকলো বেয়ারা। মৃদু গলায় বলল—সাব, একজন সায়েব দেখা করতে চাইছেন?

মার্মালেড্ মাখতে মাখতে সীমা একটু যেন চম্‌কে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, বোধহয় সুনীল এসেছে। সুনীল কাল লেকের পাড়ে বসে সীমাকে খুব শাসিয়েছিল। বলেছিল, অত ভয় কিসের? তোমার বাবার ভয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবোনা? এটা কোনো কথা হলো? বয়সতো বাড়ছেই না, বরং কমছে তোমার। কালই যাচ্ছি তোমার বাবার কাছে। বলব—মশাই, আপনার এই অপদার্থ মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই।

সীমা চোখ বড় বড় করে বলেছিল, —বলতে পারবে তুমি? বাবার মুখের ওপর? তো—তোমার ভয় করবে না? আমার বাবা কিন্তু, খুউব রাগী!

—ভয়? ওঃ, কাল তোমার বাবার যে কি দুর্দ্দিন সীমা! আহা, ভদ্রলোকের কথা ভেবে আমার খু-উ-ব কষ্ট হচ্ছে!

সীমা বলেছিলো,—কে-কেন? কেন? কি করবে তুমি?

—মুখের রেখাগুলোকে কঠোর করে তুলে সুনীল বলেছিল,—সঙ্গে একটা রিভলভার নিয়ে যাবো—বলব, স্যার, হয় আপনার এই মেয়েটিকে দিন, না হ'লে.

সীমা বলেছিল,—সে কী? আমার জন্যে তুমি স্যুইসাইড্ করবে?

—ধ্যাৎ, সুইসাইড্ করব কেন? আমি তোমার বাবাকে মার্ডার করব।

সীমা ভাবল সত্যিই যদি সুনীল তার বাবাকে পিস্তল-টিস্তল দেখিয়ে একাকার করে বসে........তাই সে বেশ উত্তেজিত হয়ে নড়েচড়ে বসল। বেয়ারা আর একবার অনিল বাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে বলল,—সাব্!

অনিল বাবু চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, আঃ বললাম না আমায় বিরক্ত করোনা এখন? খালি, সাব্-সাব্-সাব্।

সীমা কাঁপে চা ঢালতে ঢালতে বলল,—একটা লোক বাড়ি বয়ে এসেছে তার সঙ্গে কথা বলবেনা, দেখা করবেনা—এটা আবার কেমন?

অনিল বাবু বললেন,—না, না, এখন আমার সময় নেই। তোমাদের দুই বোনের এই বাড়ির প্ল্যান্ আমাকে আজই ফাইনাল করে ফেলতে হবে।

সীমা মরিয়ার মত বলল,—আহাঃ, সকাল বেলা শুভ কাজে বসেছো বলেই তো বলছি,—একটা লোক দেখা করতে এসেছে, তাকে কি ফেরাতে আছে?

বিরক্ত হয়ে অনিল বাবু বেয়ারাকে বললেন—বেশ, বেশ, যাও ডেকে নিয়ে এসো লোকটাকে।

সীমা চা ঢালতে ঢালতে চোখের কোণা দিয়ে সদর দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। সুনীল ঢুকতেই টপ্‌করে চোখ নামিয়ে নিল সীমা। ঢুকেই নমস্কার করে সহাস্য মুখে সুনীল অনিলবাবুর সামনে বসল। সীমার দিকে ফিরেও তাকালো না। এমন একটা ভাবসাব, যেন সীমাকে দেখতেই পাচ্ছেনা। অনিলবাবু কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই টেবিলের ওপরের প্ল্যানের কাগজটা তুলে নিয়ে বলল,—বাঃ দারুণ তো, রুজু রুজু জানালা-দরজা, বেশ এয়ারি, ভারি মর্ডার্ণ আউটলুক্ তো!

অনিল বাবু পুলকিত স্বরে বললেন,—বলছো, ভালো হয়েছে? সবই আমার নিজের মাথা থেকে বেরিয়েছে। অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারদের হেল্পও নিয়েছি........

সীমা অনিল বাবুর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতেই সুনীল তাচ্ছিল্যরভরে তার দিকে একটু তাকিয়ে বলল—আমাকেও এক কাপ দিনতো—তারপর অনিল বাবুর দিকে ফিরে উল্লসিত কণ্ঠে বলল—আপনি স্যার রিয়েলি জিনিয়াস! তবে একটা কথা বলবো—এই প্ল্যানদুটো যদি আস্ত একটা বাড়ির প্ল্যান হয় তাহলে কিন্তু স্যার একটু গোলযোগ রয়ে গেছে বলতেই হবে।

অনিলবাবু উল্লসিত হয়ে বললেন, আরে তুমিতো ঠিক ধরেছো দেখছি। সত্যিই এগুলো পুরো বাড়ির প্ল্যান নয়। আসলে ব্যাপারটা কি জানো, শোনো তাহলে বলি। চায়ের পেয়ালায় লম্বা চুমুক মেরে বললেন,—আমার দুটি মেয়ে। ছেলে নেই। আমি আর আমার স্ত্রী ঠিক করেছি, মেয়েদের জন্যে এই বাড়িরই দুপাশে দুটো উইঙ্ করে নেব। মেয়েরা আমাদের সঙ্গেই থাকবে আর কি? সুনীল সীমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে নিতে গম্ভীর মুখে বলল,

—ও, --আপনার মেয়েরা বুঝি চির কুমারী ব্রত নিয়ে ফেলেছেন?

সীমা ভয়ঙ্কর ভ্রূ-ভঙ্গিকরে তাকালো সুনীলের দিকে। সে হয়তো কিছু বলতো, কিন্তু তার আগেই অনিলবাবু হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন,—না, না, তা নয়, মেয়েদের বিয়ে আমি দেবো। বিয়ের পর জামাইরাও আরকি বুঝলেনা........

সুনীল বল্ল,—তা আপনার এই এতবড় বাড়িতে মেয়ে-জামাই সব শুদ্ধ ধরে যাবেনা?

—কোথায়? এই এতটুকু একটা বাড়ি—ওই বাইরে থেকেই দেখতে বড়ো-সড়ো। মোটে পাঁচতলা। তা ধরোগে নীচে তো মোটে ছ খানা ঘর। গেষ্ট রুম, লিভিং রুম, মর্নিং রুম আর এই ড্রইং রুম আর মেয়েদের আলাদা ড্রইং রুম নিয়ে। দোতলায় হল লাইব্রেরী কাম-স্টাডি। তিনতলায় কিচেন, ডাইনিং রুম আর বড় ডাইনিং হল। চার তলায় বড় আর ছোট মেয়ে থাকে। তাদের প্লে রুম আর বেড্ রুম। বড্ড ঘেঁষা ঘেঁষি হয় দুজনের। ওপরে আমার আর গিন্নির শোয়ার ঘর—। তাও আমারটা একটু কোনাচে।

সুনীলের চোখ ক্রমশ বড় হয়ে উঠছিল। সে বল্ল সত্যিই তো, আপনার—তো তাহলে খুবই স্পেসের প্রবলেম! চার চার জন লোক,—এই টুকু ছোট্ট মাত্র একটা পাঁচতলা বাড়িতে কি করে ধরবে? আচ্ছা, আপনার মেয়েদের ঘেঁষাঘেঁষি হয় কেন?

অনিলবাবু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বললেন—আর বলোনা,—একটি ভালোবাসে ইণ্ডিয়ান মিউজিক, আর একটি ওয়েষ্টার্ণ। তাই নিয়েই ঝগড়া।

সীমা একটু উসখুস করে বলল,—বাবা উনি কি কাজে এসেছেন জিজ্ঞেস করলে না? নাম ধাম এসব কিছু......

সুনীল সীমার দিকে ফিরে চট্করে বলল,—নমস্কার! আমার নাম সুনীল বারিক। আমি আপনার বাবার সংগে একটা পার্সোনাল কাজে এসেছি। বড়দের ব্যাপার। আপনি ছেলে মানুষ মাথা গলাবেন না। যান্—এখানকার কাজ কর্ম হয়ে থাকলে, প্লে-রুমে খেলতে যান গিয়ে।

সীমা উগ্র দৃষ্টিতে সুনীলকে পুড়িয়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল। অনিলবাবু বললেন—আহাঃ, শোন্, শোন্, সীমা রাগ করলি নাকি?

সীমা রাগত কণ্ঠে বলল,—না বাবা, উনি খালি ধানাই পানাই করছেন। আসল কথাটা কিছুতেই বলছেন না।

সুনীল হাসতে হাসেত বলল,—আচ্ছা, আপনিতো একজন মাল্টি মিলিওনেয়ার। আপনিই বলুন স্যার, ধানাই পানাই না করে আসল কথায় কখনো আসা যায়? —কই দেখি, আপনার উইং দুটোর এলিভেসন প্ল্যান কেমন করলেন?

অনিলবাবু সাগ্রহে এলিভেসন প্ল্যান দুটো সুনীলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—কেমন?

সুনীল বলল, অপূর্ব!

অনিলবাবু সগর্ব্বে বললেন—আগাগোড়া ইটালিয়ান টাইলস্ দিচ্ছি।

সুনীল বলল—বাঃ বাঃ ইটালিয়ান টাইলস্—বেশি হলে আমি একপিস নেবো স্যার। ঘরে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব। আজ-কালতো আর ইটালিয়ান টাইলস্ তেমন পাওয়া যায়না।

সীমা ফুলদানীতে ফুল সাজাতে সাজাতে বলল,—টাকা যোগালে এই কলকাতা শহরে কি না পাওয়া যায়? বাঘের দুধও পাওয়া যায় বুঝলেন? সুনীল হঠাৎ অনিলবাবুর দিকে ফিরে বলল,—আচ্ছা। আচ্ছা! কালই তো শুনছিলাম ভেনিসিয়ান টাইলস্ আর ফ্লিনট্ গ্লাস্ ভর্ত্তি দুটো ট্রাক্ পুলিশে ধরেছে। ড্রাইভার ক্লীনার পলাতক।

—এঁ্যা? সর্ব্বনাশ!

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোনের দিকে যেতে গেলেন অনিলবাবু।

সুনীল বলল,—আহাঃ বসুন বসুন, ব্যস্ত হবেন না স্যার। এবয়সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কোন কাজ করাই ভালো নয়। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি এই ফাঁকে, আমি ইনকামট্যাক্স্........

অনিলবাবু সুনীলের কথা শেষ হবার আগেই আঁৎকে উঠে বললেন, এঁ্যা, কি বললে? ইনকামট্যাক্স? তুমি ইনকামট্যাক্স অফিসে কাজ করো?

সুনীল বলল, না না আমি নয় আমি নয়, আমার দাদা ইনকামট্যাক্স অফিসে কাজ করে। আমি আর্কিটেক্ট্, তবে আমি যদি কোনো শাঁসালো খদ্দেরের খবর টবর জোগাড় করে দিতে পারি,

তাহলে কিন্তু ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে আমার দাদার একটা ভালো প্রমোশন হতে পারে। ইনকামট্যাক্সের লোকেরা আজকাল যা হয়েছে স্যার। আপনার মত এই সব লাক্সারি বাড়ি দেখলেই হন্যে হয়ে ধাওয়া করে। যেমন সোজা এসে আপনার এই যে শ্বেতপাথরের দেয়ালটা, এটাই হয়তো খুঁড়ে ফেলল,--

—এঁ্যা, আঁতকে উঠলেন অনিলবাবু।

সব গোল্ডবার কালোটাকা ওই সবের তলায়ইতো লুকোনো থাকে স্যার।

সীমা এবার এগিয়ে এসে বলল,— সুনীল, আমি অনেক সহ্য করেছি। তখন থেকে তুমি খালি আমার বাবাকে ভয় দেখাচ্ছো।

অনিলবাবু চমকে উঠে বললেন— সুনীল? তারমানে একে তুই আগে থাকতেই চিনিস নাকি? দ্যাখো বাপু সত্য বলছি আমার ওসব গোল্ড বার টার লুকোনো নেই কোথাও,--

সুনীল বলল,—আপনার লুকোনোর দরকার কী। আপনারতো সব চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। দুহাজার স্কোয়ার মিটারের চেয়ে অনেক বেশি জমি, বাড়ি—এতো প্লেন চোখেই দেখা যাচ্ছে। এক্স-রে আই তো লাগেনা।

সীমা ক্রুদ্ধস্বরে বলল,—ওসব জমিতো বাবা আমাদের দুই বোনকে ভাগ করে দিয়েছেন।

সুনীল বলল,—স্যার আপনার এই মেয়েটি দেখছি ভারী ডেঁপো প্রকৃতির, গুরুজনদের সুনীল, সুনীল করে ডাকছে...

অনিলবাবু হাঁ করে সীমার দিকে তাকালেন শুধু। সুনীল বলল,—গুরুজন মানে দুদিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে ওর—

—বিয়ে? মানে?

অনিলবাবু রাগে ফেটে পড়লেন এবার, উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজনায়। সুনীল আরাম করে সোফায় এলিয়ে বসে বলল,— কাজকম্মতো কিছুই শেখেনি। বিয়ে না করলে ওর চলবে কি করে? বাপের সম্পত্তি? সে গুড়ে বালি। আমিতো এখুনি সরকারকে জানিয়ে দেবো আপনি শহরে জমি বাড়ির সীমা মানছেন না। তারপর আপনি ধরা পড়বেন। আপনার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, তখন এই মেয়েকে দেখবে কে?

অনিলবাবু ধপাস্ করে বসে পড়ে বললেন—সত্যি, তুমি বলে দেবে?

—দেবনা? বলো সীমা, তুমিই বলো? বলো?

সীমা নেভা গলায় বলল,—বাবা, মানে ও-না—আর্কিটেক্ট। বিদেশ থেকে পাশ করে এসেছে। ও যা বলছে তা হয়তো ঠিকই বলছে। মানে......... তাছাড়া বাবা ও আমায় বিয়ে করতে চায়।

সুনীল বলল,—চাই, কিন্তু পাত্রী হিসেবে তুমি মোটেই ভালো নও। এতবড়লোক তোমরা? আগে বলোনি কেন? এখন যে আমি কী করি? তোমাকে ভালোবেসে ফেলে ঝামেলা হয়ে গেল দেখছি।

সীমা রাগে ফাটতে ফাটতে বলল,— কী-ই, আমি খারাপ পাত্রী? এতবড় কথা। আমি তোমাকে বিয়েই করবনা যাও!

সুনীল তাচ্ছিল্যভরে বলল,—আমিও তোমায় বিয়ে করবোনা। কারণ ঘরজামাই টামাই হওয়া আমার পোষাবেনা। আর তুমি যা মোটা হয়ে যাচ্ছ দিন দিন......

অনিলবাবু দুজনের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছিলেন শুধু। শেষ পর্যন্ত অসহায় কণ্ঠে বললেন,—ও, তার-মানে সবই ঠিকঠাক্, তোমরা ষড়যন্ত্র করেই........

সুনীল হেসে উঠল, বলল, না—না স্যার ষড়যন্ত্র কিছু না। আমি ওর সংগে পরামর্শ করে আপনার পারমিশান নিতে এসেছিলাম শুধু! তবে এখন ও যখন আর আমায় বিয়ে করবেইনা বলেছে তখন আর........

সীমা আহ্লাদী গলায় বলল,— দিনরাত মোটা মোটা করলে আমি তোমায় বিয়ে করতে যাবোই বা কেন?

সুনীল বলল—তোমার তো প্লেরুম্ আছে সেখানে কী খেলো?

সীমা বলল—কেন? পুতুল, তাস লুডো।

সুনীল অনিলবাবুর দিকে চেয়ে বলল—দেখলেন তো, কি একখানি মেয়ে তৈরী করেছেন, পারমিশন নিতে এসে দেখছি শুধু আপনার মেয়ের নয় আপনারও একজন এ্যাডভাইসার দরকার! নাহলে আপনার তো দেখছি সম্পদের সীমাও থাকবেনা, লোভেরও না, এবং....... শান্তিরও না। জানেনইতো লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু........

সীমা পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে বলল,—বাবা তুমি ওর এ্যাড-ভাইস শোনোগে, আমি শুনছি না........

সুনীল বলল,—সীমা শোনো, যেওনা, কেন বলছি একথা বুঝছ না। সব কিছুরই সীমা থাকা দরকার। তোমার নামেই তো রয়েছে তার পরিচয়। সী-মা। সব কিছুরই একটা সংযম, একটা সীমা থাকার প্রয়োজন—ধন, অর্থ, সম্পদ, জমি এবং মেদ বৃদ্ধিরও........

সীমা বলল,—বাবা দেখেছো!

অনিলবাবু স্বস্তির হাসি হেসে বললেন, --না না, সুনীল ঠিকই বলেছে। ও ভালো এ্যাড্ভাইস দেয় দেখছি। আমি ওর কথাই শুনবো ঠিক করেছি। আর তুমিও শুনে চলো। মনে নেই এমাসে ক'পাউণ্ড বেড়েছো তুমি?

এখন তিনি রিখিয়ায়।

কলকাতার প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের সেই ঘরখানা আগের মতো আর তেমন বেজে উঠছে না। অথচ শিল্পী যামিনী রায়ের আঁকা ছবিগুলো, ভাস্কর্যের ছোটখাটো নানান স্বাক্ষর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আর স্তূপীকৃত বইতে মনটিই আছে। সেই পোড়ামাটি পর্দা, চৌকি, কবির বসবার 'সিংহাসন' দিয়ে বাইরের ঘরখানা অবিকল আগের মতোই পরিপাটি।

শুধু ব্যতিক্রম একটিই।

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ নিয়ে সরল হাসির উজ্জ্বলতম যে-মানুষটি নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে যেতেন বারবার শুধু তিনিই নেই এখানে কিছুকাল। হ্যাঁ সময়োচিত বাগ্বিধির ব্যবহারে সমাজ-সচেতনায় স্পষ্ট বর্তমানের সবচেয়ে সেরা জীবিত কবি বিষ্ণু দে বেশ কিছুকাল কলকাতার বাইরে। বিহারের সাঁওতাল পরগণায় সাজানো-গোছানো সুরেলা এলাকা রিখিয়ায় কাটছে তাঁর এখনকার দিনগুলো রাতগুলো।

"উত্তরাধিকার ভেঙ্গে ভেঙ্গে
চিরস্থায়ী জাহ্নবীকে জটাজালে বাঁধিনা,
বরং আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি,
গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি,
খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে,
হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই
খরস্রোতে নব আনন্দের।"

মনের পরিধি তাঁর বিশাল। তাই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্ভার তাঁর চিত্রকল্পের উৎস। অনায়াসে ভিড় করে স্বদেশ ও বিদেশের চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যের স্মৃতি—

তাই প্রতীক্ষার স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে
বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে অভঙ্গ আতত
বালা সরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো।

কিংবা,
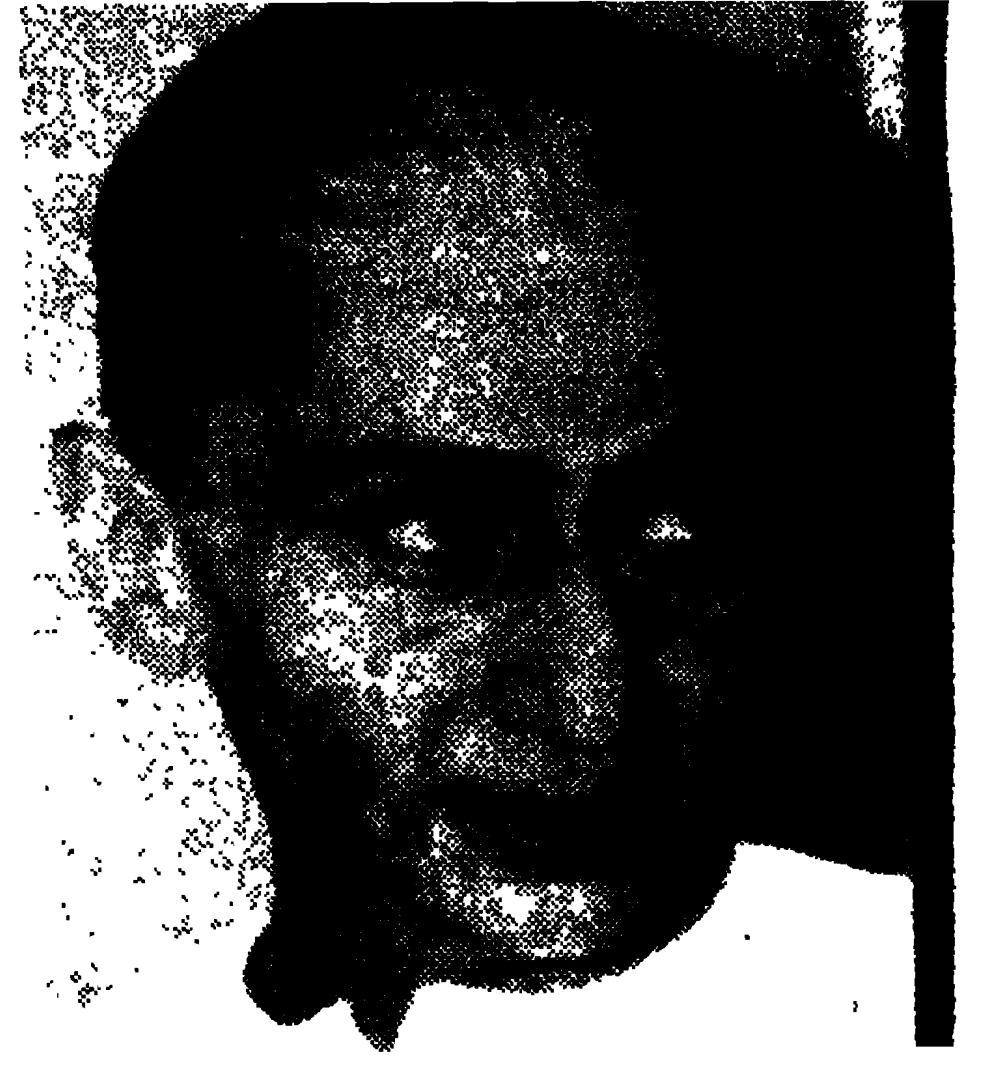
অনুরক্ত, সমাজ ও জীবনের অগ্রগামিতায় বিশ্বাসী কবি স্পষ্ট করে গদ্যেও বলেন: পশ্চিম ইওরোপের স্বপ্নে আমাদের মুক্তি নেই, না ভাড়া-করা পাপের সন্ধানে, না অস্মিতার জীবন্মৃত ক্লান্তিতে, না সাম্রাজ্য-বাদের বা স্বাধীন সংস্কৃতির ছদ্মবেশী হাহাকারে।

মুখোমুখি

তরুণ কবিদের কবিতা প্রায়ই পড়ি এবং সংখ্যায় তাঁরা অনেক—কিন্তু মানতে হয় যে মাঝে মাঝে তাঁদের ভাবনা-চিন্তার বা লেখারই ধরন ধারণ অস্বস্তিকর লাগে। সব সময়ে নয়, এবং সেটাই আমার আত্মচিন্তাকে আশ্বস্ত করে।

বিষ্ণু দে
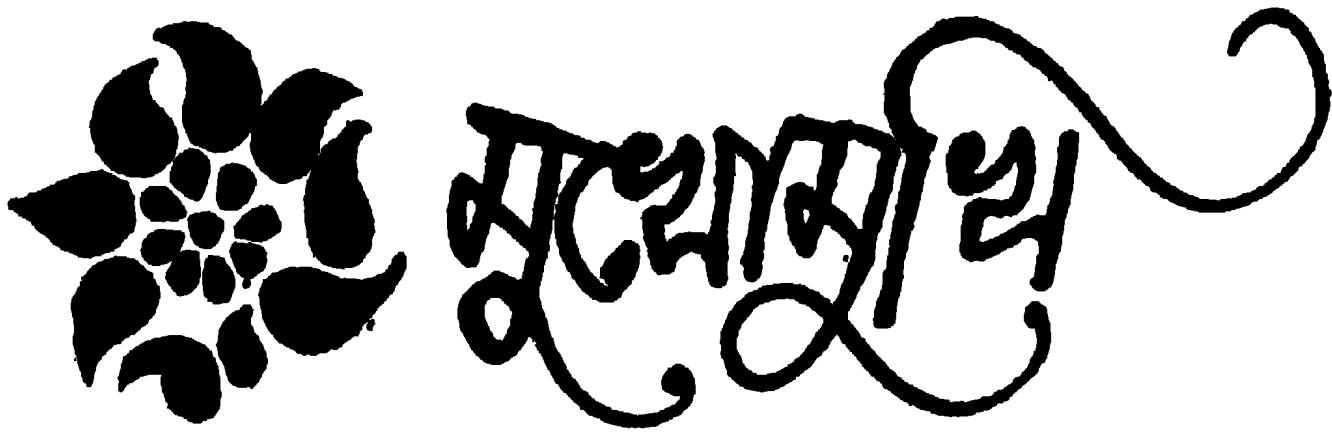
একথা ঠিক, 'ভাবের' লেখার পেছনে সময় না কাটিয়ে কবিতা রচনাকে মনন-সাপেক্ষ করণের দৃঢ়তার জন্য বিষ্ণু দে স্মরণীয়। তিনি হলেন তিরিশের যুগের সেই বিরলতম কবি যিনি এখন থেকেই নৈরাজ্যবাদী মানসিক অসুস্থতা আর নেতিবাচক অধ্যায়ের পরিপোষকতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন অনেক, অনেক দূরে। ঘটিয়েছিলেন মণীষা ও হৃদয়ের সম্মিলন। সংযুক্তিকরণ হল যুগের প্রগতিশীল সমাজচেতনার সঙ্গে মণীষা।

তারপরে নীলে একে একে জ্বলে আলো
বোলশয় বালে, হাজার নাচের তালে

হ্যাঁ, বিষ্ণু দের অনিষ্ট একক সাধনার পথে মেলে না, মেলে সচেতন সমাজ সমবায়ের পথে। কবিমন তাঁর বিকশিত হয় সেই যেখানে—

আমার যাত্রার পিছে দীর্ঘ পটভূমি
আমার সম্মুখে
তুমি।

নিজের কবিকর্ম সম্পর্কে বড়ো বেশি আত্মসচেতন, মহৎ ঐতিহ্যের প্রতি গভীর

আর এই একই কারণে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করেন: কল্পনার উদ্ভট সন্ধানে তথাকথিত আধুনিক খেয়ালের স্বকীয়তায় একটা নতুন-কিছু করার তাগিদে তিনি রূপের বিকার চর্চা করেন নি।

এই মহৎ কবি বর্তমানে রিখিয়ায়। আগেও মাঝে মাঝে যেতেন। কাটাতেন ছুটি-ছাটা। তখন তিনি অধ্যাপক। এমনকি, যখন তিনি মৌলানা আজাদ কলেজের উপাধ্যক্ষ তখনও গিয়েছেন সুরেলা রিখিয়ায়। কিন্তু কেন?

শৌখিনতা ? তা বটে,
শহরের পলাতক হৃদয়-বিলাস—
যাতে কটা দিন সভ্যতার ভুল-ভ্রান্তি-
ক্রমেই যা তীব্র হয়, প্রায় অগোচরে
সাপ কিংবা ইঁদুরের মতো,
জীবনসঙ্কটে
যেমনটা হয় অন্নবস্ত্র সবেতেই
মূল্যবৃদ্ধি দিনে দিনে—
যাতে কটা দিন সভ্যতার ধৃষ্টতার পাপ
সস্তার টিকিট কিনে
আমাদেরও অংশীদারী অনুতাপ
আরামে জানাই
নিসর্গের রূপসঙ্গে, প্রকৃতির মানসিক
গুণে।

হ্যাঁ, এখন তিনি রিখিয়ায়। আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম অগ্রনায়ক রিখিয়ায় কাটাচ্ছেন তাঁর অবসর জীবন।

কিন্তু কেমন আছেন তিনি ?

: আমার ডান হাতটা এখনও সারেনি, ভেঙে গিয়েছিল। ফলে লেখা কষ্টকর। সবসময়ে কব্জির ব্যথা ও ফুলো। তাছাড়া একটা হার্নিয়া ক' বছর আগে কাটা হয়, আরেকটা হয়েছে, সেটা কাটাবার জায়গা নেই। আমার স্ত্রী আমায় সর্বদা সাহায্য করেন। তাঁরও চোখের গুরুতর অপারেশন করতে হয়, দুবার নার্সিং-হোমে থাকতে হয়।

—তরুণ কবিদের লেখা সম্পর্কে ধারণা কি ?

: তরুণ কবিদের কবিতা প্রায়ই পড়ি এবং সংখ্যায় তাঁরা অনেক—কিন্তু মানতে হয় যে মাঝে মাঝে তাঁদের ভাবনা-চিন্তার বা লেখারই ধরন-ধারণ অস্বস্তিকর লাগে। সব সময়ে নয়, এবং সেটাই আমার আত্ম-চিন্তাকে আশ্বস্ত করে।

—আপনার ছেলেবেলা ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

: আমার ছেলেবেলা ও ছাত্রজীবনের স্মৃতি সুখকর নিশ্চয়ই।

—আপনার জীবিকার কথা ?

: জীবিকার কথা ? কলেজের চাকরি ? ৫৮ বছর অবধি করেছি, তারপরেও সরকার দুবছর কাজ করতে বলেন, করেছি। আরো চাকরির কথা সরকার বলেন, রাজি হইনি।

—সাহিত্য আকাদমি, সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ ইত্যাদি পুরস্কার পাবার পর আপনার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল ?

: পুরস্কার পাওয়া তো ভালোই। টাকাটা খরচ করা যায়।

—শোনা যায় 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার প্রথম অংশ জ্বরের ঘোরে লিখেছিলেন, শেষ অংশ সুস্থ হয়ে লেখেন অর্থাৎ সম্পূর্ণতা দেন। এই বিখ্যাত জনপ্রিয় কবিতা রচনার প্রেক্ষাপটটি বলবেন ?

: 'ঘোড়সওয়ার' খানিকটা জ্বরের ঘোরে মাথায় আসে। তারপর শেষ করি।

—শিল্পী যামিনী রায় ও সত্যেন বসুর সঙ্গে আপনার ছিল ঘনিষ্ঠ ও উষ্ণ সম্পর্ক। সে বিষয়ে কিছু বলবেন কি ?

: যামিনী রায় ও সত্যেন বসু আমায় বহু বছর ধরে সম্প্রীতিতে স্নেহ ব্যবহারে ধন্য করেন। অনেকদিন অনেক ঘন্টা তাঁদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি, তার হার্দ্য উষ্ণতা মনকে ভরে তোলে।

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের ও পরের কবিতার মধ্যে আপনি কোন তফাৎ দেখেন কি ?

: নিশ্চয়ই।

—বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে কিছু বলুন।

: বাংলা সাহিত্য তো বেশ উন্নতি করেছে ও করছে। তাই না ?

—কলকাতা ছেড়ে রিখিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইলেন কেন ? এ জীবন কেমন লাগছে ?

—রিখিয়ায় শরীর ভালো থাকে। কলকাতার ধোঁয়া, খারাপ হাওয়ার জন্যে। চোখের আরামও একটা ব্যাপার।

সাক্ষাৎকার: **গণেশ বসু**

বিশেষ সংবাদ
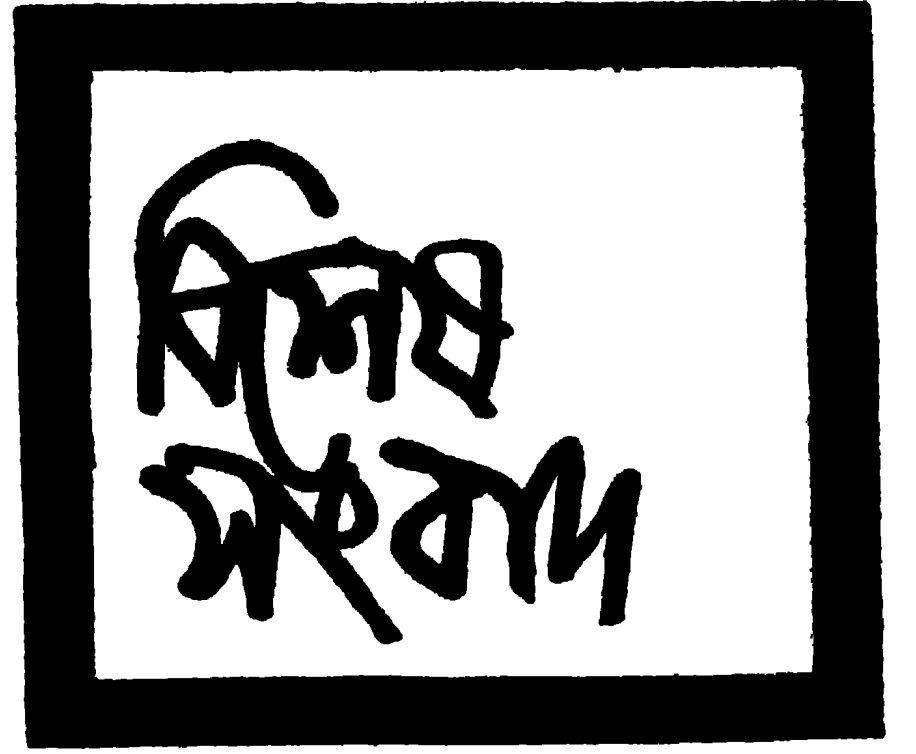
ছাত্রদের জন্য ন্যায্যমূল্যে জিনিষপত্র

ন্যায্য মূল্যে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বিতরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে অবস্থিত ৮৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পারমিট দিয়েছেন। ফলে ৪৪,৯৬৭ জন (প্রাপ্ত বয়স্ক) ছাত্র উপকৃত হয়েছেন। ন্যায্যমূল্যে জিনিষ-পত্র ও খাতা-পত্র ইত্যাদি সরবরাহের জন্য সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে ২৫৭ টি এবং ডিগ্রি কলেজে ৮ টি সমবায় বিপণিও খোলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বই-ব্যাঙ্ক

পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়ার হাইস্কুলে এবং মাদ্রাসার জন্য মঞ্জুরীকৃত ১৬০টির মধ্যে মোট ১৪০ টি বই-ব্যাঙ্ক গত দুই বছরে খোলা হয়েছে।

চাষবাসে ইসলামপুর

পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমায় এবার চাষবাসে নতুন জোয়ার এসেছে। গতবারের চেয়ে অনেক বেশী জমিতে গম, সরষে ও লঙ্কা চাষ হয়েছে। গতবারে ৫২ হাজার একর জমিতে গম চাষ হয়েছিল ; এবছর সেই এলাকা আরও সাত হাজার একর বেড়েছে। সরষের চাষ হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ জমিতে। এককালে হাতিয়াগাছ, দোলুয়া, মাঝিয়ালী ইত্যাদি গ্রামে প্রায় চাষ হ'তনা বললেই চলে। সেখানে এবছর প্রায় ৮ হাজার একর জমিতে জায়েন্টকিউ জাতের আনারস চাষ হ'য়েছে।

কলকাতা বইমেলা

বিবেকানন্দ রায়

পঁচিশে ফেব্রুয়ারী থেকে ছয়ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় বইমেলা হয়ে গেল। বিড়লা তারামণ্ডলীর পশ্চিমদিকে ময়দানে কিছু জায়গা জুড়ে উঠল ১৩০টি সংস্থার বইয়ের আলো ঝলমল ষ্টল, সার সার ৬৫ হাজার বই দশদিন ধরে দেখলেন প্রায় দু'লক্ষ বইপাগল মানুষ, বই বিক্রীও হোল ৩৫ লক্ষ টাকার। কলকাতায় এই দ্বিতীয় বই মেলা বসল, গত বছরের বইমেলা যখন কলকাতায় বসে তখন অবিশ্বাস্য সাড়া পড়েছিল। পত্র-পত্রিকায় এই নতুন ধরণের মেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়েছিল। হাজার হাজার নারীপুরুষ ও শিশু এই স্নিগ্ধ মেলায় কাটিয়েছিলেন প্রথম বসন্তের আতপ্ত মধ্যাহ্ন ও মধুর সন্ধ্যা। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বইমেলা আমাদের দেশে নতুন হলেও বিদেশে নতুন নয়। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে প্রতিবছর বিশ্ব বইমেলা বসে। পৃথিবীর তাবৎ প্রকাশক ও বইবিক্রেতা তাদের সওদা সাজিয়ে বসেন উৎসুক বই-পাগল মানুষদের জন্যে। পশ্চিমী দেশে বই পড়ার রেওয়াজ বেশী, বইপ্রেমী মানুষের সংখ্যাও নগণ্য নয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের বইমেলার আদলেই কলকাতা বই মেলা, হয়ত আকারে ও সাজসজ্জায় বিশ্বমেলার সঙ্গে কলকাতার মেলার তুলনা হয় না। তবুও কলকাতা বইমেলাকে এব্যাপারে সমগ্রদেশের অগ্রণী, পথিকৃৎ বলা চলে।

যাঁরা এবছরের বইমেলায় গিয়েছেন. তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, কী সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশ। কিছুক্ষণের জন্য যেন এই সমস্যা সঙ্কুল শহরটা মন থেকে দূরে সরে যায়। মাইকে বাজতে থাকে মৃদু সানাইয়ের সুর বা মধুর রবীন্দ্রসংগীত, আবহসঙ্গীতের মত কাজ করে চলে বই প্রেমীদের মনের আনাচে কানাচে। কলকাতার এই বইমেলার আয়োজন করেন Publishers and Book-Sellers Guild নামে একটি সংস্থা। এদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন Publishers and Book-Sellers Association of Bengal, All India Hindi Publishers Association এবং Delhi State Book-Sellers and Publishers Association. শুধু বইয়ের প্রদর্শনী বা কেনাবেচাই নয়, এঁরা তিনটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন। প্রথমটির উদ্যোক্তা National Book Trust of India, দ্বিতীয়টির Federation of Publishers and Book-Sellers Association of India ও তৃতীয়টির উদ্যোক্তা West Bengal Master Printers Association Ltd. বিষয় ছিল যথাক্রমে আগামী দশকে বাংলা বইয়ের প্রকাশনা, বইয়ের রপ্তানী এবং মুদ্রক ও প্রকাশকদের মধ্যে সম্পর্ক। ২৫শে ফেব্রুয়ারীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন দিনে বইমেলার বিশিষ্ট ক্রেতাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস, শিক্ষামন্ত্রী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অনেক বিশিষ্ট আধুনিক কবি ও সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। শেষের তিনদিন, চার, পাঁচ ও ছয়ই মার্চ মেলার বসেছিল বইয়ের বাজার; জলের দামে বিকিয়েছে অনেক বই।

বই শুধু জ্ঞানের উৎসই নয়, প্রমোদের উপকরণও বটে; বই মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গী। ভারতের গীতা বা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কত শোকসন্তপ্ত মানুষকে দিয়েছে সান্ত্বনা, জীবনে প্রেরণা ও সাহস। বইমেলায় তাই ছিল লঘুগুরু বইয়ের সমাবেশ। জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন দিকের উপর ও প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতির উপর যেমন ছিল অসংখ্য বই, তেমনি ছিল আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মপুস্তক।

CALCUTTA BOOK FAIR
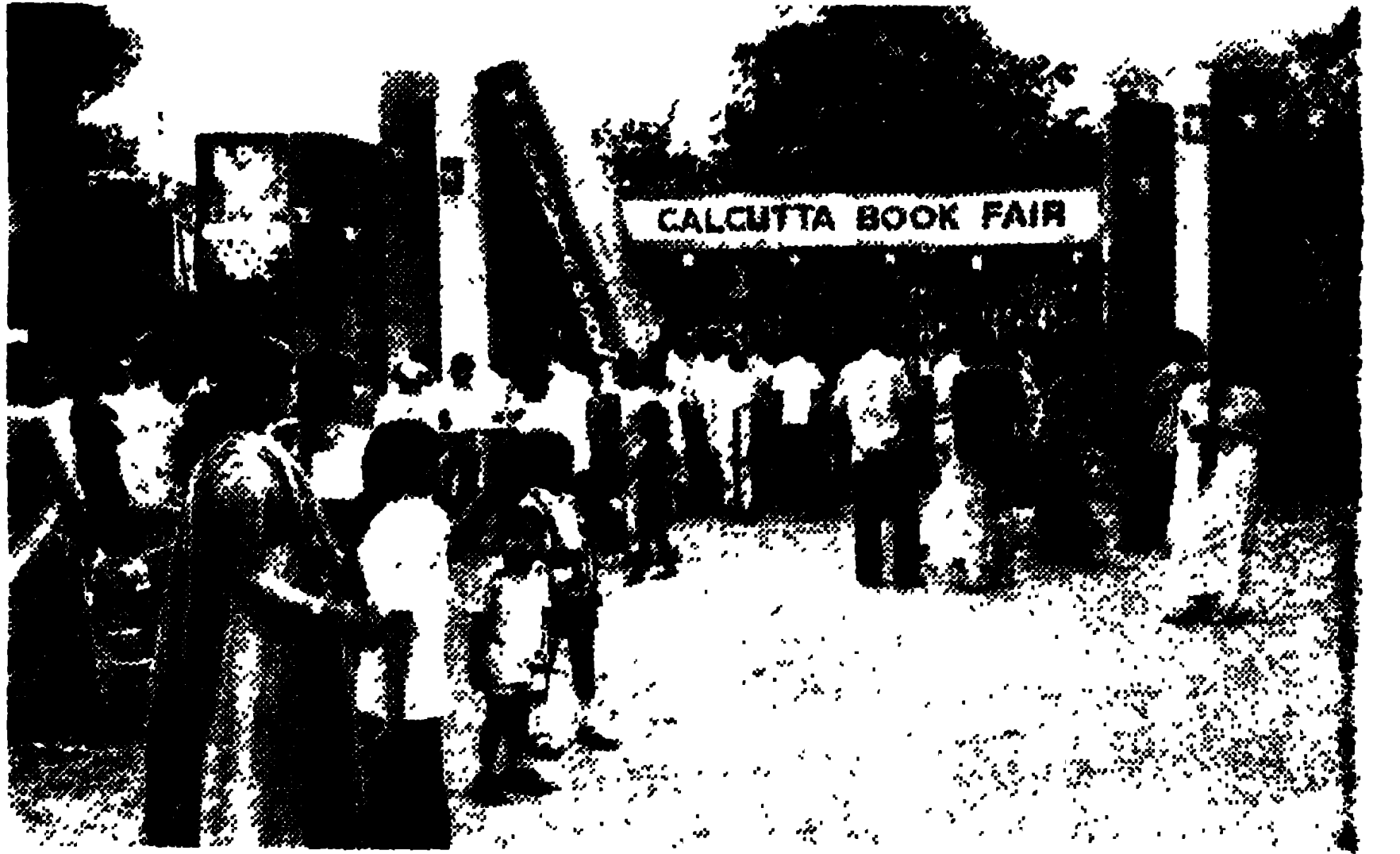
অধীর আগ্রহে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছেন বইপ্রেমী দর্শক

ধূপসৌরভিত আর্যসমাজ, শ্রীগুরু কানন দেবীর ষ্টল কিংবা যোগদা সৎসঙ্গ বা স্বামী অভেদানন্দের বইয়ের প্রদর্শনী কতলোককে টেনেছে। আরও ছিল ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ প্রকাশিত নানা ধরনের পুস্তক, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধনী প্রকাশনের বই, খৃষ্টানদের বই, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ বা শ্রীমার বই, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের বই, পি. এম. বাক্‌চী কোম্পানির পুরোহিত-দর্পণ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বই, কৃষ্ণচৈতন্য সমাজের ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট, যাঁরা নাকি ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে ষাট লক্ষ বই প্রকাশ করে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রকাশন-সংস্থা হয়েছেন। নিতান্ত গ্রামের মানুষদের উপযোগী হিন্দী বইয়ের ষ্টল খুলেছিলেন দিল্লীর চৌরী বাজারের দেহাতী পুস্তক ভাণ্ডার। দামী ও নামী কোম্পানীদের সঙ্গে পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন হিন্দ পকেট বুক্‌স, ও জায়কো পেপারব্যাক। হিন্দ পকেট বুক্স ভারতপ্রেমী ম্যাক্স-মুলারের আত্মজীবনী দিয়েছেন মাত্র ছয়টাকায়, অনেক মূল্যবান বই এইসব পকেট বইয়ের প্রকাশন বিক্রী করেছেন নামমাত্র দামে। কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য-পুষ্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ষ্টল, এরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনে নেমেছেন অনেক দুঃসাহস নিয়ে।

বিদেশে প্রকাশিত বইয়ের পসরা নিয়ে এসেছিলেন কলেজ ষ্ট্রীটের রূপা এণ্ড কোম্পানি। বৌবাজারের ম্যাকমিলান, নিউমার্কেটের ইণ্ডিয়া বুক হাউস, লালবানি ব্রাদার্স, ফ্যারাডে হাউসের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পার্ক ষ্ট্রীটের অক্সফোর্ড এণ্ড আই বি এচ্ পাবলিশিং কোম্পানি, দিল্লীর প্রেন্‌টিস হল অব ইণ্ডিয়া, ইউসিস বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যকেন্দ্র। থিয়েটার রোডের ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীও তাদের প্রকাশিত বইয়ের একটি মনোরম প্রদর্শনী খুলেছিলেন এবছরের বইমেলায়। বাংলা বইয়ের আভিজাত্য নিয়ে এসেছিলেন

বই বাজারের দৃশ্য

বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসূরীদের বই নিয়ে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, শ্রীভূমি প্রকাশন, পুঁথিপত্র, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, মণীষা গ্রন্থালয়, জিজ্ঞাসা, লেখক সমবায় সমিতি, জোনাকী, গ্রন্থালয়, দাশগুপ্ত প্রকাশন, বিশ্ববাণী, আশা প্রকাশনী ও বাকি কোম্পানির কর্মচারীদের সমবায় শিল্প সংস্থা, যাঁরা নতুন প্রকাশনে নেমেছেন।

অসম্পূর্ণ এই তালিকা থেকে শুধু এটাই প্রমাণ হয় শুধু দর্শক বা ক্রেতাদের কাছেই নয়, প্রকাশক ও মুদ্রকদের কাছে বইমেলা ক্রমশঃই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বইমেলা থেকে প্রকাশকরা অনেক মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন, পাঠকের রুচি, বইপড়ার ফ্যাশন ও ঝোঁক, মুদ্রন ও অলংকরণ সম্পর্কে পাঠকদের মন্তব্য, বইয়ের কাটতি, বইয়ের দাম নির্ধারণ ইত্যাদি। সম্প্রতি বইয়ের দাম বাড়াতে অনেক বইপ্রেমী হতাশ হতে সুরু করেছেন : দাম কমিয়েও তাদের চাহিদা কীকরে মেটানো যায় তার ইঙ্গিতও মিলতে পারে এই সার্বজনীন বইমেলায়। তা যে মিলছে তার প্রমাণ প্রকাশক ও প্রকাশন সংস্থাদের উৎসাহে কিছুদিন আগে ময়দানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনেও এমনি বইমেলার ছোট সংস্করণ বসেছিল। বই যে ক্রমে ক্রমে বাঙালী ও কলকাতার লোকের দৈনন্দিন সংস্কৃতি ও জীবনধারার অঙ্গ হয়ে উঠছে তার নির্ভুল ইঙ্গিত মিলছে এইসব ছোটবড় বইমেলায়।

'কলকাতার বইমেলা' এইসব দিক-দিয়েই পথিকৃতের কাজ করবে তাতে সন্দেহ নাই। এবারে বইয়ের দামে যাঁরা হতাশ হয়েছেন তাদের কথা আগামীবারে উদ্যোগীরা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন।

প্রকৃত অর্থেই বই অনেক মানুষের সুখদুঃখের, দিনে রাতের সঙ্গী। শুধু গীতা কিংবা গীতাঞ্জলিই নয়, রুচিবিভেদে নানান ধরনের বই মানুষ প্রতিনিয়ত পড়তে ভালবাসে, পড়েও। বইয়ের দাম কম ও নিয়ন্ত্রণে রাখা তাই সব প্রকাশকের কর্তব্য। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সাফল্য বা লাভক্ষতির কথা মনে না রেখে এই সুরুচিপূর্ণ সমাজসেবার কথা তাঁরা মনে রাখলে বইমেলাও ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নাই।

বাংলায় অ্যাবসার্ড নাটক

বিজয় দেব

বিশ শতকের ষাটের দশকে এসে নাটকের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে দর্শক হিসেবে আমরা সবাই উত্তেজনার শিকারে পরিণত হয়েছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই অবস্থা? তখন এসবের পটভূমিকায় দেখা যায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের এবং যুদ্ধোত্তর কালের অনিশ্চয়তা এবং একঘেয়েমীর ক্লান্তি। কোথাও বিশ্বাস নেই। আমরা তখন অসহায়ের যন্ত্রণা বহন করে চলেছি। অস্থিরতা আমাদের মূল্যবোধে আঘাত সৃষ্টি করেছে। যার অনিবার্য পরিণতিতে আমাদের ব্যক্তি-চেতনায় এক স্থিতিহীন নিরালম্ব অবস্থা দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে। আমরা দেখতে পাই, প্রাত্যহিক নিয়মের শৃংখলে সবাই বন্দী হয়ে রয়েছি। স্বাভাবিক ভাবে সেখানে উদ্ভূত এক সীমাহীন অর্থহীনতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বা সময়কালকে অতিক্রম করে রাখে। এই বিশ্ব সংসারে সেই শূণ্যতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে,—আমি কে? কেনই বা এ জীবন? এসবের তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আত্মহননের প্রবৃত্তি মনকে অধিকার করে রাখে। মনে হয়, বেঁচে থাকার কি সার্থকতা? এবং সত্যিই কি আত্মহত্যার প্রয়োজন রয়েছে? এসব প্রশ্নের সম্মুখে অবস্থান করে মানুষ, নিজেকে বারবার নিরীক্ষণ করে। আলবেয়ার কাম্যু, জ্যাঁপল সাঁর্ত্রে এবং নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটও একই সমস্যার শিকারে পরিণত হয়েছেন। তাই স্যামুয়েল বেকেটের ভবঘুরেরা Godot-এর প্রতীক্ষায় সময় ক্ষেপণ করে ও জানতে পারে, সে আসবেনা। অথচ হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে অভ্যাসবশে আবার তারাই Godot এর প্রতীক্ষা করে। এখানেই জীবনের অ্যাবসার্ডিটি (অধিবাস্তবতা) নিহিত। বস্তুতঃ প্রতিকূল বিশ্বে মানুষের অসহায় অবস্থাই অ্যাবসার্ড তত্ত্বের মূল কথা।

প্রসঙ্গতঃ পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড (অধি-বাস্তব) নাটকের বিশেষত্ব আলোচনা করলে দেখা যায়, বাদল সরকারের নাটকের মধ্যে সেই রীতি বা আঙ্গিক বা যন্ত্রণার প্রভাব বিশেষ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে। বাংলা নাটকের এক-ঘেয়েমীতে আমরা যখন সবাই প্রায় ক্লান্ত তখন বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রিজিৎ' নাটক দর্শক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মোটকথা, 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-কে প্রথম পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড ধারণার অন্তর্গত নাটক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাদল সরকার প্রথমেই প্রথাগত নাট্যরীতি বা মঞ্চসজ্জার বিন্যাসে প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি করলেন। মঞ্চে সঞ্চারিত বিদ্রোহের সুরকে দর্শক সাদর আহ্বান জানাল। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের চারটি চরিত্রের উপস্থিতিও তাই বিস্ময়কর। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ তারা সবাই বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারেরই তরুণ সন্তান। তারা সবাই একই শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে জীবিকার অনুসন্ধানে তৎপর। অথচ কোন এক নিয়মের প্রবাহে তারা এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে ভাসমান। যেমন ছাত্র থেকে শিক্ষকে; কেরাণী থেকে বাক্স-ওয়ালায়। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ? সেই হয়তো ব্যতিক্রম। তাই বোধহয় সে কখনো কখনো বিসদৃশ মন্তব্য করে বসে। মূলতঃ সে সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই জীবন স্বীকৃতি পেতে চায়। কিন্তু তার সমাজ বা পৃথিবী সেখানে এক নিষ্ঠুর কুমোর মাত্র। সে তার আপন খেয়ালে তাকে গড়ছে। সেই অবস্থায় বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা ঘটে, তাহলে কেনইবা একজনের বাঁচা উচিত? নাট্যকার অবশ্য 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ যে সমাধান বের করেন তাহলো আধুনিক মানুষ মাত্রেই সে সিসিফাসের প্রেতচ্ছায়া মাত্র। আধুনিক মানুষ তাই অভিশপ্ত। সেক্ষেত্রে নাস্তি-বাচক উত্তর হলো, তাহলে কি আত্মহননেই সার্থকতা! যা বর্তমান যুগের অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের আবিষ্ট করে রাখে।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে ইন্দ্রজিতের জীবনে এক সীমাহীন অর্থহীনতার উপলব্ধি এবং যন্ত্রণা হেতু সে পার্থিব আনন্দ বা রোমাঞ্চের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করেনা। সেখানে বাদল সরকার এবং স্যামুয়েল বেকেট একই ভাবনায় আচ্ছন্ন। যেমন ইন্দ্রজিৎ সিসিফাসের মতো প্রাত্যহিক নিয়মে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে মরছে। অস্তগামী দিবসের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অবশ্য সিসিফাস এক চিরায়ত ক্রীতদাসের জীবনের করুণ ব্যর্থতা অনুভব করছে। তেমনি ইন্দ্রজিতের মধ্যেও ক্রমে জীবন সম্বন্ধে এক গভীর অর্থহীনতা নেমে এসেছে।

ইন্দ্রজিৎ: আমরা তবে কি নিয়ে থাকব?

লেখক: পথ, আমাদের শুধু পথ আছে। আমরা হাঁটবো। আমার লেখবার কিছু নেই, তবু লিখব। তোমার বলবার কিছু নেই, তবু বলবে। মানসীর বাঁচবার কিছু নেই তবু বাঁচবে। আমাদের পথ আছে, আমরা হাঁটব।

লেখক: আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা, আমরাও জানি, ও পাথর পড়ে যাবে। যখন ঠেলে ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোনো মানে নেই, পাহাড়ের ঐ চূড়োর কোনো মানে নেই।

ইন্দ্রজিৎ: তবু ঠেলতে হবে?

লেখক: তবু ঠেলতে হবে। আমাদের আশা নেই, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের জানা। আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। আমরা জেনে গেছি পেছনে যা ছিলো, সামনেও তাই।

এখানে ইন্দ্রজিৎও যেন অভিশপ্ত সিসিফাসের ছায়ামূর্তিতে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করছে। তেমনি স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো'র ভ্লাদিমিরও কি একই পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলিত?

বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া'য় জীবনের জটিলতার সঙ্গে অতীত, বর্তমান, ভালবাসা, স্বপ্নভঙ্গ, দায়িত্ববোধ জড়িত রয়েছে। শ্মশানে চারজনের আগমন ঘটে, তারা সবাই এক তরুণীর মৃতদেহ নিয়ে এসেছে। এখন শবদাহ সমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাস খেলে সময় কাটাতে সবাই তৎপর। তরুণীর মৃত্যুর কারণ কি? এই কৌতূহল সবাইকে পৃথকভাবে সচেতন করে তোলে। সবাই ক্রমে বহির্বাস্তব থেকে অন্তর্বাস্তবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। সত্যিই কি তাহলে প্রতিটি চরিত্র সম্পর্কিত তরুণীর মৃত্যুর জন্য দায়ী? ধীরে ধীরে মালতী-শশী, হিমাদ্রি-নিশি, সাতু-লছমী এবং কার্ত্তিক-লাজুক মেয়ে প্রসঙ্গ নাটকে বিস্তার লাভ করে। চারিটি চরিত্রই দায়িত্ব এবং অপরাধ বোধে আচ্ছন্ন। এখানে অবশ্য পাগলা ঘোড়া বন্য প্রকৃতিসহ দ্রুত ধাবমান। সে ক্ষিপ্ত অবস্থায় দৃষ্টি যাদের ওপর নিক্ষেপ করছে তাঁদের সে ঈশ্বরের মতোই ধ্বংস করে চলেছে।

কার্ত্তিকের ভালবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে আত্মহননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও নাটকে তার দায়িত্ববোধ দর্শকদের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আত্মহত্যাই কি একমাত্র সমাধানের উপায়? মায়াময় অবস্থায় মেয়েটির মূর্ত্ত প্রতিমা কার্ত্তিকের সান্নিধ্যে এল। তাকে যন্ত্রণার জন্য অভিযুক্ত করলো।

কার্ত্তিক: লোকের যন্ত্রণার ভার লাঘব করার দায়িত্ব আমার উপর নেই।

মেয়েটা: আর যন্ত্রণা দেওয়া? মালতীর মতো যন্ত্রণা? তার দায়িত্ব নিতে চাওনি কোনদিন?

এই যন্ত্রণা তো অ্যাবসার্ড তত্ত্বেরই অন্তর্গত। মেয়েটার মধ্যে অনুক্ষণ প্রবাহিত যন্ত্রণা কি লাঘব করার কোন উপায় নেই? সেখানে কি মানুষের কোন দায়িত্ব নেই? নানা প্রশ্ন জেগে ওঠে। তাহলে কেন এ জীবন? কি তার উদ্দেশ্য? স্যামুয়েল বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোদো'-র ভ্লাদিমির এস্ত্রাগণের মধ্যে মানুষের যন্ত্রণা লাঘবের উপলব্ধি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া পোজোর যন্ত্রণার সঙ্গে মালতীর যন্ত্রণার কোন পার্থক্য নেই। দুটো চরিত্রই অস্তিত্ববাদী ধারণার সঙ্গে যুক্ত।

ভ্লাদিমিরকে উচ্চারণ করতে হয়েছে নিষ্ঠুর নিয়তির কথা। সেখানে মানুষ শুধুমাত্র চেষ্টা করে যেতে পারে। দৈহিক, মানসিক যন্ত্রণার উপশম কি মানুষ নিশ্চিতভাবে করতে পারে?

বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'পাগলা ঘোড়া' পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অ্যাবসার্ড দর্শনের অন্যতম পুরোহিত আলবেয়ার কাম্যুই তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও বাদল সরকার নাটকের পরিণতিতে এসে ভারতীয় ঐতিহ্যে নিজেকে সমর্পণ করে সমাধান খুঁজেছেন। সমগ্র নাটক-

বহুরূপীর 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের একটি দৃশ্যে শান্তি দাস ও রমলা রায়

ব্যাপী বাদল সরকার সংশয়, বিশ্বাসহীনতা এবং জীবনের অর্থহীনতায় ক্লান্তি অনুভব করেও জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে কখনো বিরত হননা।

পরিশেষে লক্ষ্য করা যায়, বাদল সরকার বারবার বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। কেন তিনি তাঁর নাটকে বেঁচে থাকার পথ নির্দেশে ব্যর্থ হয়েছেন? যদিও গড্ডালিকা সদৃশ মানুষ জীবনকেই ভালবাসে। সেখানে জীবন কি? জীবনের তাৎপর্য কি? এসব প্রশ্ন উদ্ভূত সমস্যার উত্তর দিতে গিয়ে অ্যাবসার্ড নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের মতোই বাদল সরকার বলেছেন: যদি আমার সেই পথ জানা থাকতো তাহলে নাটকেই তার নির্দেশ থাকতো। দেখা যাক অন্য কেউ পারে কিনা? যদি সমাধান আমার জানা না থাকে তাহলে কি লেখা ছেড়ে দেবো?

যুব মানস

ফিরে চলো আপন ঘরে
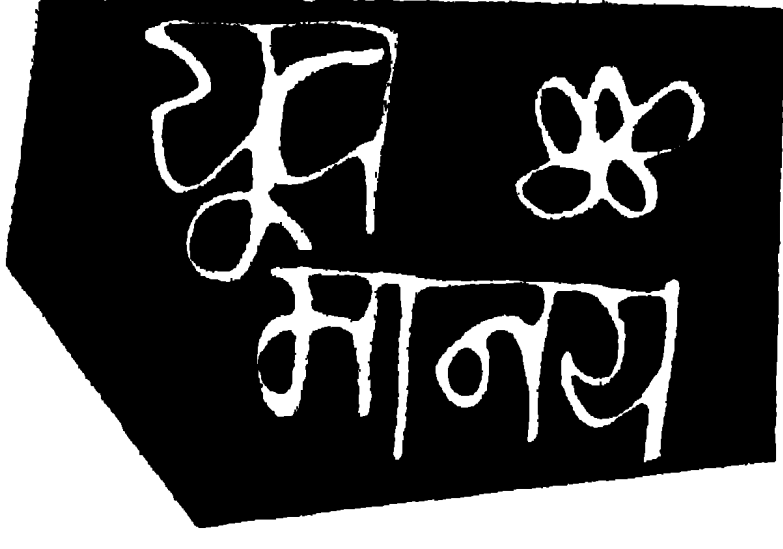
সুধাময় মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম বাংলার জাগ্রত যৌবন আজ শৃংখলিত মানবতার মুক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শরিক। দেশগঠনের সাম্প্রতিক বিভিন্ন কর্মসূচী যৌবনকে দিয়েছে বহির্মুখী বিভ্রান্তি থেকে অন্তর্মুখী ধ্যানলীনতায় উত্তীর্ণ হবার প্রেরণা। এতদিন ঘরের থাকতে পরের নেবার পারবশ্যতায় অন্ধ ছিল যে মন, আজ তার ঘরে ফেরার ডাক এসেছে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে একদিন বাংলার যুব-মানস দিব্যি আরামে কাটিয়েছে। কিন্তু আর নয়। পশ্চিম বাংলার যুব-মানসের কাছে আজ দাবি—'ফিরে চলো আপন ঘরে।'

উনিশশতকী রেনেসাঁর যাঁরা পরম পুরোহিত সেই সমাজ সংস্কারক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সেই কর্মগুরু বিবেকানন্দ। সেই ভাবসাধক রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, কিংবা সেই সাহিত্য সাধক বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ—এঁরাই সাজিয়েছেন বঙ্গমাতার মালঞ্চ। দুঃখের ও যন্ত্রণার কথা—পশ্চিম-বাংলার এতদিনের সুপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত যৌবন কিন্তু এতাবৎকাল নানা কারণে এঁদের দিকে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করেনি। করেনি, তার কারণ, তারা শিক্ষা-সংস্কৃতির গোটা পটভূমিকাকে স্বকীয়তার গৌরবে গরীয়ান দেখতে অভ্যস্ত ছিলনা। বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় সর্বত্রই শুধু অকারণ অবারণ উন্মার্গগামিতায় পেয়ে বসেছিল যৌবনকে। চাকরীর মোহ ছিল, মোহ ছিল শুধু আত্মিক আশুস্ততার। পরকে নিয়ে ভাবনা ছিল কম, দেশ বা জাতিকে নিয়ে গড়ে ওঠেনি কোনও উজ্জ্বল 'ইমেজ', যার বৃন্তে মানসিক সংস্থিতি সহজলভ্য হতে পারে। গত কয়েক দশকে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত,—সর্বত্রই শুধু বিকারের বিড়ম্বনা, ব্যাভিচারী মনের উন্মাদ উল্লাসই অভিব্যক্ত হয়েছে। দেশের যৌবনকে স্থিতধী কোনও স্নিগ্ধ আশ্রয়ে অভিবাসিত করার চেষ্টা ছিল না সাহিত্যে শিল্পে বা সঙ্গীতে। ফলে একটি অপ-সংস্কৃতির দৌরাত্ম্য অব্যাহত হয়েছে এতদিন, ব্যাহত হয়েছে জাতীয় চৈতন্যের মোহমুক্তির আন্দোলন। ঘরে যে মণি-মাণিক্য রয়েছে পরম প্রযত্নে লালন করার মত শুচিসুন্দর ঐতিহ্য হয়ে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে শুধু বাইরের উচ্ছাসে অন্দরের দৈন্য ঢাকবার নিস্ফল প্রয়াসই চলেছে।

আজ পশ্চিমবাংলার জনজীবনে আবার এসেছে স্বাভাবিক স্থিরতা, আর বিচ্ছিন্নতা-কামী মানসিকতার হাতে উদ্‌ভ্রান্ত বিবেকের ভ্রূণহত্যা নয়। এখন একটি অখণ্ড জীবনবোধ ও জাতীয় চৈতন্যের নব-জাগরণের আলোকে যুব-মানসকে আপন ঘরের সুস্থতায় পুনর্বাসিত করার দিন। বঙ্কিমের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাধনা, বিবেকানন্দের মানব-ধর্ম, বিদ্যাসাগরের সমাজ-চেতনা—এগুলিকে বাদ দিয়ে বাঙালী বাঁচতে পারেনা। তাই আমাদের যুব-মানসে এই সব দিকপালের কর্ম ও ভাবের আলোক বিচ্ছুরিত করতে হবে। সাংগঠনিক চেতনার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাবনার সমন্বয় ঘটিয়ে সাহিত্যে শিল্পে আনতে হবে পুনরুজ্জীবনের বিপ্লব।

আজ এগিয়ে আসতে হবে নবনব উদ্যোগের উৎসব-পত্র হাতে। পুরাতন মূল্যবোধের হাতে রাখী পরিয়ে নতুন যৌবনকে দীক্ষিত করতে হবে জাতীয় ধর্মে। তাইতো প্রয়োজন যাত্রা, কথকতা, পর্যটন, কুটিরশিল্পের উজ্জীবন, শিক্ষার কর্ম-শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদি নানা-মুখী প্রকল্প। সুখের কথা পশ্চিম-বাংলার পথে পথে আজ উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের বিকার আর প্রকট নয়—স্কুলে কলেজে গণ-টোকাটুকির উন্মাদ তাণ্ডব আজ স্তিমিত, নিয়ন্ত্রিত। আজ যে ঘরে ফেরার দিন। আজ তাই মনে পড়ছে কবিগুরুর সেই উক্তি—"তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাংখাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বত-বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে।"

সাহিত্য সংখ্যা

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান পাঠক পাঠিকারা

স্বাধীনতা-উত্তর তিন দশকের বাংলা সাহিত্য

বাংলা কথাসাহিত্যে অব-ক্ষয়ের পালা কবে শেষ হবে

শিশুসাহিত্যে আমরা কতটা এগিয়েছি

রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়

এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রপক্ষে 'ধনধান্যে'র বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা ১৬ মে প্রকাশিত হবে। এতে আলোচনা করবেন বিশিষ্ট লেখক, কবি ও সাহিত্যিক।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

কলকাতায় কেমন আছি

রমেন মজুমদার

কলকাতায় কেমন আছি? ভালো নেই। কেননা কলকাতা শহরে এখন দারুণ অরাজকতা। রাজনৈতিক অরাজকতা নয়,—জৈবিক অরাজকতা। কলকাতা শহরে এখন রাজত্ব করছে লাখে লাখে ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা। এই শহরের মানুষদের মুখে এখন একটিমাত্র কথা: এত মশা কোথায় ছিল? কোথা থেকে এল?

জ্ঞানীরা বলেন, মশা আছে সারা পৃথিবীতে। এমন কি, সুমেরু অঞ্চলেও। সুমেরু অঞ্চলে মশার দাপট অতি প্রচণ্ড। সুমেরুর নিম্নাঞ্চলেও তাই। কিন্তু কুমেরু অঞ্চলে মশা আছে বলে জানা যায় নি।

এ যাবৎ প্রায় আড়াই হাজার প্রজাতির মশা আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কার চালিয়ে গেলে আরও আড়াই হাজার না হোক, আড়াই শ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এই আড়াই হাজার প্রজাতির মশাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স আর ইডিস। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার কারণ, কিউলেক্স ফাইলেরিয়াসিসের, আর ইডিস ডেঙ্গুজ্বর, পীতজ্বর ইত্যাদির।

১৮৯৯ সালের আগে পর্যন্ত মশারা পতঙ্গবিজ্ঞানীদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। মশাদের এত বিভিন্ন প্রজাতির কথাও জানা যায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রোনাল্ড রস প্রথম মশা নিয়ে গবেষণা করেন। ১৮৮০ সালে এই কলকাতা শহরে বসে স্ত্রী-অ্যানোফিলিস মশার উদরে তিনি ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অবস্থিতি আর বংশ-বৃদ্ধি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

'মশকদংশন' বা 'মশার কামড়' বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে সেটা কিন্তু ঠিক নয়। মশারা আসলে কামড়ায় না। দংশন মানে তো দন্তাঘাত, দাঁত নেই, তার, কামড়াবে কীকরে? মশার মাথায় হুল থাকে, সেই হুল ফুটিয়ে শরীর থেকে সে রক্ত চুষে নেয়। তবু, কবে থেকে কে জানে, 'মশা কামড়ানো' যখন চলে আসছে তখন তাই চলুক।

মশা কামড়ালে যে চুলকোয় কিংবা জ্বালা করে তার একটা বিশেষ কারণ আছে। মশা যখন কামড়ায় তখন মানুষের দেহের প্রোটিন আর মশার দেহের প্রোটিনের মধ্যে একটা সংমিশ্রণ ঘটে। তাতে একটা রিঅ্যাকশন অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া হয়। মানুষ আর মশার প্রোটিন তো এক জাতের নয়, তাই ঐ প্রতিক্রিয়া। আর ঐ প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রদাহ।

মশারা কিন্তু নির্বিচারে সকলকে কামড়ায় না। তাদের বাছবিচার আছে। শিশুদের প্রতিই তাদের বেশি লোভ। শিশুদের পরে তাদের পছন্দ যুবতী রমণী। পুরুষদের তারা কিছু হেলাফেলা করে। শিশু কিংবা নারী না পেলে তখন পুরুষদের কামড়ায়। তা-ও সকলকে সমানভাবে নয়—বেছে বেছে, সুন্দর দেখে। তাই একজায়গায় পাঁচজন পুরুষ বসে থাকলে কাউকে হয়তো অবজ্ঞাভরে ছেড়ে দেয়, আবার কাউকে কামড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দেয়।

মশারা তাদের শিকার ঠিক করে গন্ধ শুঁকে। এক-একজনের গায়ে এক-একরকম গন্ধ। সচরাচর সেই গন্ধ আমরা টের পাইনা। কিন্তু মশাদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর, তারা সহজেই গন্ধ শুঁকে পছন্দের মানুষ চিনতে পারে। অবশ্য গন্ধ ছাড়াও তাদের আকৃষ্ট হবার জন্য কিছু কারণ আছে। তবে সেই কারণগুলি গৌণ। প্রধান কারণ গন্ধ।

আবার, সব মশাই কিন্তু কামড়ায় না। কামড়ায় স্ত্রী-জাতের মশা। স্ত্রী-জাতের মশাদের প্রধান খাদ্য রক্ত—তা সে মানুষের রক্তই হোক, কি অন্য কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর। তবে মানুষের রক্ত হলেই ভালো। রক্ত না পেলে অবশ্য বাধ্য হয়ে তখন গাছপাছালির রক্ত ইত্যাদি পায়। সুমেরু অঞ্চলে যে মশা আছে, বংশপরম্পরায় তারা রক্ত না খেয়েই বেঁচে থাকে। তাই বলে তারা নিরামিষাশী হয়ে যায় না। রক্তবাহী জীব পেলেই অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্ত্রী-মশার প্রধান খাদ্য যেমন রক্ত, তেমনি পুরুষ-মশার প্রধান খাদ্য গাছ-গাছড়ার রস। তাই পুরুষ-মশা জঙ্গল-ঝাড়েই বেশি থাকে। জল বা জলাভূমির ধারের জঙ্গল হলে তো সোনায় সোহাগা।

স্ত্রী-মশা বরাবরই সাহসী। পুরুষ-মশা আগে কিঞ্চিৎ ভীরু প্রকৃতির ছিল, এখন জন-বিস্ফারণে মানুষ দেখে দেখে সাহসী হয়েছে। তবে খাদ্যাভ্যাস পালটায় নি। দংশন করার প্রবৃত্তিও জাগে নি। জাগলেও

উপায় নেই, কারণ পুরুষ-মশার হুল ভোঁতা, শরীরে ঢোকানো শক্ত।

এই যে এখন কলকাতা শহরে লাখে-লাখে, ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা আর তার জন্য নানাবিধ অসুখ—এতে কিন্তু মশাদের দোষ নেই। এটা আধুনিক সভ্যতার ফল। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্রকৃতির রাজ্য এতকাল একটা সুষম অবস্থায় চলছিল, তার সবকিছুর মধ্যে একটা সমতা ছিল। তৃণভোজীরা তৃণ খেয়ে পৃথিবীকে তৃণময় হয়ে উঠতে দেয় নি, মাংসভোজীরা মাংস খেয়ে পৃথিবীতে উদ্ভিদ আর প্রাণীকুলের মধ্যে একটা সমতা বিধান করেছিল। আবার এক জাতের প্রাণী আর-এক জাতের প্রাণী খেয়ে কোনো জাতিকেই প্রাধান্য লাভ করতে দেয় নি।

এই যে সমতা, এটা মানুষের নিজেরই বেঁচে থাকার জন্য দরকার ছিল। কিন্তু মানুষ নিজেকে বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব ভেবে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' নীতি অবলম্বন করে প্রকৃতির এই সমতা নষ্ট করে দিয়েছে। মানুষ তার বলদর্পে, বুদ্ধিগর্বে, নিকট প্রয়োজনের খাতিরে প্রকৃতির উপর হাত দিয়েছে। যেসব প্রাণী মশার লার্ভা বা শূক খেয়ে বেঁচে থাকত তাদের বিনষ্ট করেছে। ফলে মশার সংখ্যা বেড়ে গেছে।

টিকটিকি জাতীয় কিছু সরীসৃপ আছে, তারা মশা খায়। তেচোখো, খলসে প্রভৃতি কিছু মাছ আর ব্যাঙাচি খায় মশার লার্ভা। ব্যাঙাচির প্রধান খাদ্যই হ'ল মশার লার্ভা। ইউট্রিকিউল্যারিয়া নামে এক জাতের জলজ উদ্ভিদ্ আছে, উদ্ভিদেরও খাদ্য মশার লার্ভা। সেই উদ্ভিদের প্রচলিত নাম ব্লাডারওয়ার্ট। বাংলায় ঝাঁজি।

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাণী আর জলজ উদ্ভিদ্ দিন দিন কমে যাচ্ছে। কলকারখানায় দূষিত পদার্থে নদীখালের জল দূষিত করে মানুষ মাছের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় বা জলাভূমি বুজিয়ে ঘরবাড়ি তুলে ঝাঁজির বিনাশ ঘটাচ্ছে, আর মাছ ও ব্যাঙের বসবাস অসম্ভব করে দিচ্ছে। তার উপর ব্যাঙের চাষ না করেই ব্যাঙ ধরে ধরে বিদেশে চালান দিয়ে ব্যাঙবংশ নির্বংশ করছে।

মশা মারার জন্য এখনও পর্যন্ত যেসব রাসায়নিক বেশি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে ডি-ডি-টিই' প্রধান। ডি-ডি-টি'র ব্যবহার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। চল্লিশের দশকের শেষভাগেই সবচেয়ে বেশি ডি-ডি-টি ব্যবহৃত হয়। সেই সময় থেকে যে কনসেনট্রেশনে অর্থাৎ শক্তি-মাত্রায় ডি-ডি-টি ব্যবহার করা হচ্ছে, মশারা তা সহ্য করার মতো ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। তাই তারা এখন অনায়াসেই ডি-ডি-টি'র আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারছে। আগের কনসেনট্রেশনের ডি-ডি-টি'তে এখন আর মশা মরছে না। তাদের মারতে হলে কনসেনট্রেশন বাড়াতে হবে। কিন্তু বাড়ালে মানুষের পক্ষে বিপদ হবে। একটা সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে হাজারটা সমস্যার সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যেই হয়েছে কিছু। তা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে আলোড়নও জেগেছে বেশ।

ডি-ডি-টি'তে অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই ক্ষতি হতে পারে। গত কয়েক বছরে নির্বিচারে, ব্যাপক হারে কীটনাশক হিসাবে ডি-ডি-টি ব্যবহার করার ফলে মানুষের যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনি হয়েছে পশুপাখির।

ডি-ডি-টি'কে বিজ্ঞানীরা 'ব্রড স্পেকট্রাম পয়জন্' বলে থাকেন। এই বিষ শরীরের মধ্যে গিয়ে জমে। জমতে জমতে শরীরের চর্বিজাতীয় পদার্থে পাকা আসন করে নেয়। তারপর সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, হার্ট, কিডনি ইত্যাদির ক্ষতি করে। ক্ষতির বহর আরও আছে। বহুবিধই আছে। কিন্তু প্রধান ক্ষতি ঐ তিনটির।

ডি-ডি-টি'র স্থায়িত্ব অনেক বেশি একবার স্প্রে করলে দশ বছর পরেও তার সন্ধান পাওয়া যায়। ডি-ডি-টি ধূলিকণা আর জলবিন্দুর সঙ্গে মিশে দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়েছে। এস্কিমোদের মধ্যেও তার সন্ধান পাওয়া গেছে।

সুতরাং ডি-ডি-টি'র কনসেনট্রেশন বাড়িয়ে মশা মারার চিন্তা করাও ভয়ঙ্কর। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডি-ডি-টি দিয়ে মশা মারার ঘোর বিরোধী। মশা মারার প্রধান উপায় তাঁরা বলছেন—বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল।

অর্থাৎ, প্রকৃতির সেই প্রাচীন পদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ। তাঁরা বলছেন, ব্যাঙের চাষ না করে ব্যাঙ ধরা বন্ধ করতে হবে।

ব্যাঙ চাষের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজির চাষও করতে হবে—সেই সঙ্গে তেচোখো, খলসে ইত্যাদি মাছের চাষও।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে মশক অধ্যুষিত কতকগুলি জায়গায় 'মসকিটো ফিস' চাষ করে মশকবংশ নির্বংশ না হলেও নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে।

শুনে হাসবেন না, মশক কুলে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছড়িয়েও মশকদমন সম্ভব। ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র হারে সম্ভব হয়েছে। হরমোন জাতীয় রাসায়নিক দিয়ে পুরুষ-মশাদের নির্বীজ করে দিতে পারলে মশার বংশ কমবেই কমবে।

ভাবছেন, পুরুষ মশা চিনব কি করে? কেন, আগেই বলেছি, পুরুষ-মশার প্রধান খাদ্য গাছগাছালির রস আর সেজন্য তারা জঙ্গলঝাড়েই থাকে বেশি। সুতরাং পর-পর কিছুদিন মশক-অধ্যুষিত জঙ্গলঝাড়ে ঐ হরমোন জাতীয় রাসায়নিক স্প্রে করলেই হবে।

প্রাণী দেহে কোষ নির্মাণ এবং শরীর যন্ত্রে ইন্ধন যোগাবার কাজে প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য একজন বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন। তার জন্য চাই অন্ততঃ পক্ষে ৯০ গ্রাম প্রোটীন, ৪৫০ গ্রাম শ্বেতসার ও শর্করা এবং ৯০ গ্রাম চর্ব্বি। বিভিন্ন দেশের খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি এবং প্রোটীন নিহিত থাকে তার হিসাব এইরূপ:

দেশ	শক্তি (ক্যালরী) (গ্রাম)	মোট প্রোটীন (গ্রাম)	প্রাণীজ প্রোটিন (গ্রাম)
ব্রিটেন	৩২৫০	৮৮	৫৪
আমেরিকা	৩১০০	৭২	.৬৬
সুইডেন	২৯৪০	৮৩	৫৪
ভারত	২০৪০	৫৩	৬

এই সারণী থেকে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রোটীন পোষণের সমস্যাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পর্য্যাপ্ত প্রোটীন-এর জন্য যে পরিমাণ এবং যে ধরণের খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন তার একটা তালিকা দেওয়া যাক।

খাদ্য	প্রয়োজনীয় মাত্রা (গ্রাম)	উপলব্ধি মাত্রা (গ্রাম)
শস্য	৪০০	৪৭০
ডাল	৮৫	৭০
দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য	২৮৪	৭০
মাছমাংস	৮৫	
ডিম	৪০	১৫

উল্লিখিত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে দুই এর অভাব শুধুমাত্র ভারত কেন এশিয়ার প্রায় সব দেশেই বর্ত্তমান। এদেশে মাছ মাংস বা ডিম-এর কেবল উৎপাদনই কম নয়, কতকটা অর্থনৈতিক কারণে আবার কতকটা ধর্ম্মগত কারণে এর ব্যবহার ও কম।

এখন দেখা যাক যে সকল খাদ্যদ্রব্য আমরা গ্রহণ করি তার থেকে আমরা কি পরিমাণ প্রোটীন পেতে পারি।

খাদ্য	প্রতি একশত গ্রামে প্রোটীনের মাত্রা (গ্রাম)
চাল	৬.৮
গম	১১.৮
ভুট্টা	১১.১
ডাল	২০.০—২৪.০
দুধ	৪.৩
মাছমাংস	২০.০
শাক	৪.০
সব্জী	২.০
ফল	০.৮
মূল	২.০

কোন কোন উচ্চ ফলনশীল ধানের মধ্যে প্রোটীন-এর মাত্রা প্রায় ১১-১২% এবং এই জাতীয় উন্নত গম ও ভুট্টার মধ্যে প্রায় ১৬% বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য কতকগুলি ডাল জাতীয় কাঁচা সব্জীর মধ্যেও প্রোটীন ৬-৭% পাওয়া যায়। যেমন মটরশুঁটি লিমাবীন এবং গোয়ার ইত্যাদি। এই সকল বনস্পতি জাতীয় প্রোটীন-এর মধ্যে কতকগুলি অনিবার্য্য অ্যামিনো এসিডের (লাইসিন, মিথিয়োনিন, ট্রিপটোফেন ইত্যাদি) মাত্রা কম রয়েছে। কখনও আবার প্রোটীনযুক্ত খাদ্যবস্তুর মধ্যে বিষাক্ত পদার্থেরও সমাবেশ দেখা যায়। যেমন চীনেবাদামে থাকে অ্যাফ্লেটক্সিন।

ভারতীয় জনতার একটা বড় অংশ নিরামিষাশী। তাই উপযুক্ত প্রোটীন পোষণ থেকে বঞ্চিত। এই সবকারণে প্রোটীন এর নূতন উৎস সন্ধানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। খাদ্য বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য পড়েছে সয়াবীন এর উপর। বনস্পতির মধ্যে এর ভেতর প্রোটীনের মাত্রা সর্ব্বোচ্চ (৪২%)। আজকাল সয়াবীন থেকে দুধ এবং অন্যান্য প্রোটীন সমৃদ্ধ খাদ্য বস্তুর উৎপাদন করা হয়েছে। সম্প্রতি Winged bean বা পালকযুক্ত বীন এর-বীজের মধ্যে শতকরা ৩৪ ভাগ এবং কন্দএর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ প্রোটীনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই প্রোটীন আবার সয়াবীন প্রোটীন-এর ন্যায় লাইসিন, মিথিয়োনিন এবং সিস্টীন সমৃদ্ধ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঢ্যাঁড়স এর বীজের মধ্যেও রয়েছে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ প্রোটীন। এই বীজ থেকে আটা তৈরী করে গমের আটায় মিশ্রণের দ্বারা প্রোটীন সমৃদ্ধ আটা তৈরীর চেষ্টা চলছে।

প্রোটীনের সন্ধানে

অসিতবরণ পাল

সামুদ্রিক মাছ থেকেও শতকরা ৮০ ভাগ প্রোটীন যুক্ত এক প্রকার খাদ্য তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ভারত মহাসাগর থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২০।২৫ লক্ষ টন এবং আরব সাগর থেকে প্রায় ৬০।৭০ লক্ষ সামুদ্রিক মাছ তোলা হয়। এর থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন খাদ্য তৈরী করা যাবে। পেট্রোলিয়ম থেকেও প্রোটীন উৎপাদনে সফলতা পাওয়া গেছে। সূক্ষ্ম জীবাণু দ্বারা কার্বনযুক্ত জৈবিক পদার্থ থেকে প্রোটীন উৎপাদন করা হচ্ছে।

উপসংহারে এই বলা যেতে পারে আমাদের প্রোটীন সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে জৈবিক প্রোটীন বা আমিষ খাদ্যের অতি অল্পমাত্রায় গ্রহণ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও আমাদের খাদ্যের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। প্রোটীন সমৃদ্ধ খাদ্য অধিক মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে। প্রোটীনের নূতন উৎস সমূহ এ বিষয়ে বেশ কিছু সাহায্য করতে পারবে আশা করা যায়।

গ্রন্থ আলোচনা
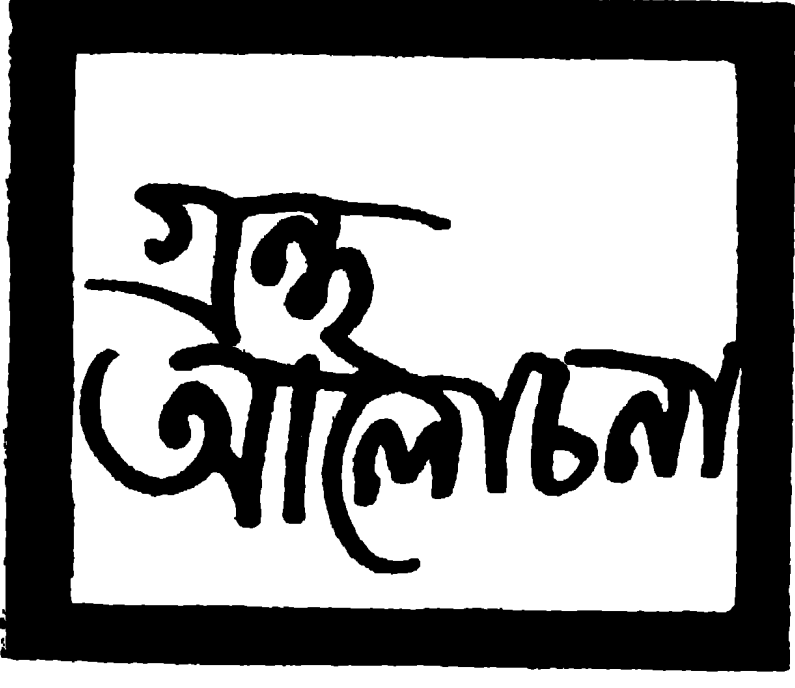
এই ভারত। শীলা ধর। প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক। ভারত সরকার। পাতিয়ালা হাউস। নূতন দিল্লী। দশ টাকা।

কবি যখন বলেন, 'এদেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা' তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এ কোন দেশ, কোন দেশের মাটি কবির কাছে সোনা ; আমি জানি সহস্রকণ্ঠ এর উত্তর দেবে যে দেশে আমরা জন্মেছি, যে দেশে আমরা বাস করি সেই ভারতই কবির গর্ব, কবির অহংকার।

ঐতিহ্যময়ী মহান ভারতবর্ষের সুবিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের পরিচিত করে তোলার মানসেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের এই প্রকাশন: এই ভারত। একশো চুরানব্বই পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে আছে পঁচিশটি পর্ববিভাগ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: একই দেশের সহবাসী, কী এই ভারতীয়ত্ব, এযুগে জন্মানোর মজা, স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের জয়, আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা, যেখানে সবাই রাজা, চাওয়া পাওয়া, চাষের কাজের হাজারো ধান্দা, প্রত্যেক চোখ থেকে প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুছে দেওয়া, যে গ্রাম প্রথম হলো, নূতন দেশের নূতন মানুষ, আমাদের গলদ, সমস্যার রূপ, আশ্চর্য দেশের ছবি ও বিশ্বজোড়া চিত্রপট।

ঐতিহাসিক ভারতের অরণ্য, নদী, পর্বত আর মানুষের প্রতি ভালবাসার শপথ নিয়ে লেখিকা বলেছেন, "স্বাধীন ভারত বয়সে নবীন, তার অঙ্গে অঙ্গে তারুণ্যের অদম্য শক্তি। কিন্তু আমরা অতি প্রাচীন ও জ্ঞানবৃদ্ধ জাতি। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রেরণা যোগায় সত্য, কিন্তু নবীন ভারত পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা থেকেও উদ্দীপনা লাভ করে।"

এক কথায় এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ 'এই ভারত'। প্রাচীন গুহাচরিত্রের প্রতিলিপি থেকে সুরু করে অমৃতা শেরগিল পর্যন্ত শিল্পীর চিত্রকর্মে ভূষিত গ্রন্থটি ছোট-বড় সকলের মনে নানান রঙে গাঁথা ফুলের মালার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ক্ষিতীশ রায়ের অনুবাদ সহজ, প্রানবন্ত এবং সুন্দর।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

★ ★ ★

চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু (প্রথম খণ্ড)

ঋত্বিককুমার ঘটক। সন্ধান সমবায় প্রকাশনী। দাম—ছ'টাকা।

চলচ্চিত্রের ইতিহাস যাকে 'বাংলা চলচ্চিত্রের রেনেসাঁস'—আখ্যা দেয়, তার প্রধান পুরোধা ঋত্বিককুমার ঘটকের যে পর্বত প্রমাণ চিন্তা ছিল, সেই চিন্তা তাঁর ছবিতে নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পেতে পারেনি, এক্ষেত্রে তাঁর নির্মিত ছবির পাশাপাশি তাঁর লেখা চলচ্চিত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী সম্পূর্ণ ঋত্বিককে পরিমাপ ও চিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সময়ে লেখা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে ষোলটি প্রবন্ধ নিয়ে ঋত্বিককুমার ঘটকের 'চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু'-র প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিকে আমরা তিনভাগে ভাগকরে নিয়ে তাঁর সম্পর্কে যথার্থ আলোচনা করতে পারি; এরই প্রথম পর্যায়: চলচ্চিত্র চিন্তা। স্বদেশ ও শিল্পীর ধর্ম, নিরীক্ষামূলক ছবি, আজকের ছবির গতি-পরিণতি, ছবিতে ডায়লেকটিক্স, ছবিতে শব্দ, সারিসারি পাঁচিল, শিল্প ছবি ও ভবিষ্যৎ, শিল্প ও সততা—এই আটটি প্রবন্ধে লেখক বিদেশী ছবি সম্পর্কে সম্যক পরিচয়ের পাশাপাশি তুলে ধরেছেন স্বদেশের ছবি সম্পর্কে দীর্ঘ ও সুচিন্তিত ভাবনাচিন্তা, সেই সংগে পরিচালকদের ছবি তৈরিতে অসুবিধা (সারি-সারি পাঁচিল); নিরীক্ষামূলক ছবি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত দিক নিয়ে গভীর এবং জটিল প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব: পরিচালক প্রসঙ্গে। এই গ্রন্থে সংযোজিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ঘুরেফিরে আইজেনস্টাইন, ডিসিকা, রেঁনয়া, ফেলেনি, আঁদ্রে ভাইদা প্রভৃতি অনেক পরিচালকদের কথা এসেছে, কিন্তু এদের মধ্যে স্বদেশের সত্যজিৎ রায় ও বিদেশের লুই বুনুয়েল তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল, এদের নিয়ে স্বতন্ত্র দু'টি প্রবন্ধে ঋত্বিক ঘটক নিজের ভালো-লাগা-মন্দলাগা দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন।

এই গ্রন্থে তৃতীয় পর্যায় একান্তই ব্যক্তিগত—নিজের ছবিসম্পর্কে বক্তব্য। এই প্রবন্ধগুলো লেখার উৎস-স্থল দর্শকদের ছবি না বোঝা এবং ভুলবোঝার থেকে। (যেমন অনেকের মতে তিনি নৈরাশ্যবাদী পরিচালক) এইসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে তাঁর এই পর্যায়ে। তাঁর ছবি যে খামখেয়ালী, এলোমেলো নয় প্রতিটি ছবিই যে তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা এবং চিন্তার ফসল—সুদীর্ঘ দু'টি প্রবন্ধে তাই ফুটে উঠেছে, এখানে তিনি নিজেই নিজের ছবির ব্যাখ্যাতা। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধাবলীর সংগে সংযোজিত হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের ফটোগ্রাফ সহ-জীবনপঞ্জী ও চলচ্চিত্র তালিকা, তবে চলচ্চিত্র তালিকায় তার শেষতম ছবি রামকিংকরের উপর ডকুমেন্টারীর কোন উল্লেখ নেই।

ঋত্বিক তাঁর সমস্ত প্রবন্ধেই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ঋজুভাবে; কোথাও কোনরকম কুয়াশার জাল স্পষ্টি করেননি, ফলে সমস্ত পাঠকই চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিককে পূর্ণাঙ্গভাবে চিনে নিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র চিন্তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাবেন।

বিভাবসু দত্ত

মহিলা মহল

কর্মী মেয়েদের সংসার

হেনা চৌধুরী

পাশ্চাত্যে সংসার জীবনে শৃংখলা ও পরিমিতিবোধের সাথে সেখানকার মেয়েরা জীবন ও জীবিকার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে নিতে পেরেছেন। শুধু তাই নয় সংসার ও চাকরী করার পরও তাঁরা আমোদ প্রমোদের সময় ও সুযোগ পান।

কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকতর ভূমিকা নেয়া বলতে গেলে অনেকটা সাম্প্রতিক ঘটনা।

আধুনিক যুগে শিক্ষিতা মেয়েদের এই কর্মজীবন বরণকে কতটা মানসিক তাগিদ আর কতখানি প্রয়োজনরূপে নিরূপিত করা যায় তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়।

তবে সাধারণভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপেই আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারের কন্যা ও বধূরা কর্মজীবনকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই চাকুরী জীবীদের মধ্যে যারা বিবাহিতা তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন ও জীবিকার মধ্যে সামঞ্জস্য করতে না পেরে এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছেন এবং এদের বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হতে দেখা যায়।

সংসার বলতে সাধারণ বাঙালী পরিবারের দুই ধরণের রূপ চোখে পড়ে। প্রথমত স্বামী পুত্র, শ্বশুর শাশুড়ী ও দেওর ননদসহ যৌথ সংসার। দ্বিতীয়ত স্বামী-স্ত্রীর একক সংসার।

অফিসপাড়ায় যে সব বিবাহিতা মেয়েরা আসেন তারা সকলেই এর কোন একটির বধূ বা গৃহিণী। এই সব পরিবার সাধারণত উপার্জিত নারী ও পুরুষের সম্মিলিত আয়ে চলে। বাড়ীভাড়া, ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা, ইলেকট্রিক বিল, গোয়ালা, মুদি, ধোপা, ট্রামবাসের ভাড়া, দৈনিক খাবার খরচ এছাড়া লোক-লৌকিকতা সম্পন্ন করে কাজের লোক রাখার মতন এদের অধিকাংশেরই সামর্থ্য থাকেনা।
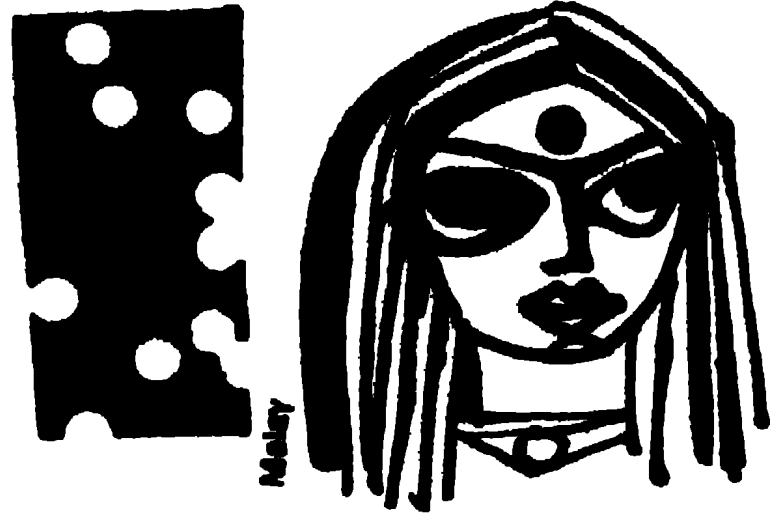
অতিকষ্টে হয়ত বাসনমাজার একজন ঠিকা ঝি রাখেন আর যাদের আরও একটু সাধ্যে কুলোয় তাদের সংসারে ১২।১৪ বছরের একটি কাজ করবার ছেলে থাকে যাকে প্রায় জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের ভূমিকায় দেখা যায়।

ঠিক তেমনি ভূমিকায় দেখা যায় সংসারের সেই বধূটিকে যিনি ৯ টা বাজতেই দুটি নাকে মুখে গুজে বাদুরঝোলা হয়ে অফিস পাড়ায় ছোটেন। টাইপ করে করে যার সুন্দর আঙ্গুলগুলিতে কড়া পড়ে যায়। যিনি ফাইলের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে থাকেন—তারপর ক্লান্ত দিনের শেষে অকরুণ পুরুষযাত্রীদের সংগে ঠেলাঠেলী করে ট্রামে বাসে একটু বসবার জায়গা পেয়েই অপরিসীম ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েন।

কিন্তু এভাবে একটি মেয়ের জীবনের ছন্দ হারাতোনা যদি আমাদের অভ্যস্ত সংসার জীবনকে আমরা একটু পরিমিত করে নিতে পারতাম।

অথচ তাতো হয়নি উপরন্তু সংসারে টাকা দিলেও শুধুমাত্র মেয়ে বলে সংসার তার পাওনা গণ্ডা সুদে আসলে উসুল করে নেয়। মেয়েদের প্রতি সহানুভূতি ও দরদ যখন সংসার দিতে নারাজ তখন সুন্দর, সুস্থ ও ভারসাম্য জীবনের জন্য সংসারের অভ্যস্ত ছন্দকে কিভাবে সীমিত করা যায় তার উপায় আমাদের নিজেদেরই নির্দ্ধারণ করে নিতে হবে।

এক্ষেত্রে বর্ত্তমান রন্ধন প্রণালীর সুবিধার জন্য রন্ধনশালা, আসবাবপত্র, জ্বালানী এবং সর্বোপরি রন্ধনের প্রণালীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বলে আমি তো মনে করি। যেমন গ্যাস, ফ্রিজ, কাঁচের-বাসন, কুকিংরেঞ্জ, প্রেসার কুকার এসবের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। এখানে অনেকে হয়তো বলবেন এগুলি সংগ্রহ করবার মতন সাধ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের নেই। তার উত্তরে আমার বক্তব্য গয়না গড়ানোর জন্য সামান্য কিছু বাজেট প্রায় অধিকাংশ বিবাহিতা মেয়েদেরই থাকে যা এক্ষেত্রে ব্যয় করা যেতে পারে। আর তা না হলে আস্তে আস্তে টাকা জমিয়েও সংসারের এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলো নিজেদের কাজের সুবিধের জন্যই সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। হয়ত আমাদের ব্যাপক ও রসনার পরিতৃপ্তি-কারী খাদ্য তালিকার আবশ্যিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের আর কোন জাতি বোধ হয় শুধুমাত্র খাদ্য প্রস্তুতের জন্য এত সময় ব্যয় করেন না। মেয়েদের জীবন যেদিন শুধুমাত্র গৃহে আবদ্ধ ছিল এবং জিনিষপত্র সংগ্রহ করা সাধারণ মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে ছিল তখন না হয় ভোজন বিলাসিতা শোভা পেত কিন্তু আজ দিন পালটেছে। অতএব থোর, মোচা, শাক এগুলি প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকাভুক্ত হলে তার পেছনে অযথা সময় ব্যয় হয়। ভাজাভুজি, চচ্চড়ির চেয়ে অথবা ঝোলঝালের চেয়ে ষ্টু, সুপ, অথবা সেদ্ধ খাওয়া শরীরের দিক থেকে অনেক বেশী উপকারী। আর ষ্টু বা সুপ

রান্না করতে সময় বেশী নেয় বলে কাজের দিনে এগুলো তালিকাভুক্ত করা সম্ভব নয়। তারপর আমাদের বাঙালীদের সাধারণত পাঁচপদের কম খাওয়া হয়না এবং খাওয়ার ব্যাপারে অনেকের অনেক-রকম বাছবিচার থাকে যার ফলে রান্নার ভার যার কাঁধে থাকে সে খুব অসুবিধে বোধ করে।

ফলে তাকে ৯ টার ট্রাম ধরে সময়মত অফিস পৌঁছতে না পারলে বসের মুখঝাড়া খেতে হয়—সংসারের লোককে সুখী করার জন্য হয়ত শেষরাতে উঠেই তাকে সংসারের হাল ধরতে হয়।

শুধুমাত্র রান্নাবান্নাই নয় এছাড়া থাকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে টিফিন দেওয়া, স্কুল থেকে ফিরবার পর তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা, ঘরদোর গুছিয়ে রাখা, জামাকাপড় কাঁচা ইত্যাদি।

তার ওপর শিক্ষিতা স্ত্রী বা বধূ শুধুমাত্র টাকা এনে দিয়েই খালাস পান না। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়ানো, ব্যাঙ্ক, ডাক্তারখানা, বাজার কি-ই-বা না করতে হয়। তার ওপর মেয়েদের স্বাস্থ্যতো বাঙালী সমাজে একটি চরম উপেক্ষিত বস্তু—সুতরাং এ-ভাবে সংসার একটি আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ের কাছ থেকে নিঃশেষে তার কর্মশক্তির সবটুকু নিংড়ে নেওয়ার ফলে অকালে নানারোগ এসে তার শরীরে বাসা বাঁধে।

এ নিয়ে প্রত্যেক পাড়ার কর্মী মেয়েরা মিলে যদি একটা সংস্থা গড়ে তোলেন যেখানে নিজেদের সংসার জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা যাবে; বিভিন্ন দেশের মেয়েরা কিভাবে জীবন ও জীবিকার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সংসার ও চাকরী করার পরও আমোদ প্রমোদের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাচ্ছেন তার নজীর এই আলোচনায় তুলে ধরা হ'বে। যদি কর্মী মেয়েরা তাদের নিজস্ব পরিচালনায় এ বিষয়ে পত্রিকা বা তথ্যচিত্র করেন এবং সর্বোপরি নিজেদের স্বভাব ও সংস্কারের পরিবর্তন করেন তবে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের কর্মীমেয়েরা জীবন ও কর্মের মধ্যে জীবনের ছন্দ খুঁজে পাবেন।

খেলা ধূলা

ফুটবলের জার্সি বদল

ফুটবল মরশুমের শুরুর আগেই প্রতি বছরের মত এবছরও বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে একমাস ধরে চললো দলবদল তথা জার্সি বদলের পালা। যত দিন যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে দলবদলে নূতন নূতন জিনিষ। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে দলবদলের মরশুম শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই নানা খবরে নানা গুজবে কলকাতার মেঠো বাজার রীতিমত তেতে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বিভিন্ন ক্লাবের 'খেলোয়াড় ধরারা' অনেক আগে থেকেই আসরে নেমে পড়েছিলেন, অন্য দলের 'রুই কাৎলা'গুলোকে নিজেদের জালে টানার জন্য। এরই সংক্রমণে ভারতীয় বণিক সভা আয়োজিত কলকাতার প্রথম নৈশ ফুটবল খেলায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্থানীয় নামীদামী ক্লাবের 'রুই-কাৎলা', খেলোয়াড়দের খেলতে দেখা যায় নি। তাঁরা তখন 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' ছিলেন নাকি! দলবদলের সই সাবুদ শুরু হয় মঙ্গলবার ১৫ই ফেব্রুয়ারী আর শেষ হয় ১৫ই মার্চ মঙ্গলবার।

ঘরোয়া লীগ-শীল্ডে ইতিহাস সৃষ্টি করা ইষ্টবেঙ্গল দলের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ শ্যাম থাপা এবার মোহনবাগানের মেরুন সবুজ জার্সি গায়ে পরার উদ্দেশ্যে ইষ্টবেঙ্গল ছেড়েছেন। আর মেরুন সবুজ জার্সি পরিত্যাগ করে মোহনবাগানের নির্ভরশীল খেলোয়াড় উলুগানাথন ইষ্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সি গায়ে জড়িয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। ভারতীয় ফুটবলের কৃতী খেলোয়াড়ের অনেকের স্বপ্ন থাকে মোহনবাগান (মেরুন সবুজ) ও ইষ্টবেঙ্গল (লাল হলুদ) ক্লাবের ঐতিহাসিক জার্সি গায়ে দেবার। তাই অনেকে নিজ-নিজ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে কলকাতার এই দুই দলের জার্সি গায়ে দিতে চলে আসে ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতায়। যাই হোক শ্যাম-উলুগার জার্সি বদল এবার অপ্রত্যাশিত ছিল না।

দুই প্রধান চির প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ঐ দুই 'কাৎলার' উপর। দুই শিবিরই খুশী। হারানোর বেদনা কাউকেই আঘাত করেনি। তবে প্রতি শিবিরই চেয়েছিল উভয়কে পেতে। অর্থাৎ ইষ্টবেঙ্গল শ্যামের সঙ্গে উলুগাকে যেমন চেয়েছিলে তেমনি মোহন-বাগানও চেয়েছিল উলুগার সঙ্গে শ্যামকে। তা আর হোল কৈ। দল বদলের সুরু'র সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারী আই. এফ. এ. অফিসের দরজা খোলার সাথে সাথেই দল বদলের পালা শুরু হয়ে যায়। ঠিক বেলা দুটো। কলকাতা পুলিশের ওয়ারলেস ভ্যানে চেপে মোহনবাগান সমর্থক ও কর্মকর্তাদের কড়া পাহারার মধ্যে শ্যাম থাপা আই. এফ. এ. অফিসে আসেন। সাদাপ্যাণ্ট, বাটিকের কাজ করা ফুলহাতা জামা, পায়ে হাল ফ্যাশানের হাই হিল জুতো, চোখে গগলস্ দিয়ে শ্যাম এলেন—চোখে মুখে ভীষণ এক উত্তেজনা। মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যে সব কাজ সেরে যুদ্ধ বিজয়ী বীরের মত মোহনবাগানের অনুকূলে সই করে পুনরায় পুলিশ ভ্যানে চেপে চলে গেলেন বোধ হয় যেখান থেকে এসেছিলেন সেই 'অজ্ঞাত' স্থানে। আই. এফ. এ. অফিসের সামনে লোকে-লোকারণ্য। মোহনবাগান সমর্থকের জয়ধ্বনির প্রতি-উত্তরে শ্যাম পুলিশ ভ্যানের মধ্যে থেকেই হাত নেড়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন চরম উত্তেজনার মধ্যে সমর্থকদের। উত্তেজনার শুরু হয়েছিল ঠিক সোয়া এগারোটায়। মোহনপ্রিয় উলুগানাথন যখন ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক কর্মকর্তাদের কড়া বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে এসেছিলেন আই. এফ. এ. অফিসে, সেও এক ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা। এলেন সই করলেন লাল-হলুদ জার্সির অনুকূলে, চলে গেলেন হাত নাড়তে-নাড়তে। ফটোগ্রাফার দিলীপ মুখার্জীর ক্যামেরাতে ধরা পড়েছিল সেই ঐতিহাসিক সই। চারিদিকের রাস্তাঘাট উত্তেজনায় থমথম করছে। এই হ'ল বিচিত্র কলকাতার ইতিবৃত্ত। জার্সি বদলের জন্য বিশ্বের অন্যান্য স্থানে এই দৃশ্য দেখা যায় বলে আমার মনে হয় না। এ যেন এক মহা যুদ্ধের ব্যাপার। ঐতি-হাসিক ঘটনার সামিল।

দল বদলের চতুর্থ দিনে কিছু সময়ের জন্য আই. এফ. এ. অফিসের পাশের রাস্তাঘাট ছোটখাট একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সুদিন-দুর্দিনের দুই সহচর সুধীর কর্মকার ও গৌতম সরকার বহুদিন পরে দল ছাড়লেন। মোহনবাগানের জার্সি গায়ে দিয়ে খেলবেন এই মরসুমে। এঁদের দলবদলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় শিবিরের সমর্থকদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনার জোয়ার বয়ে যায়। সুধীর এরিয়ান্স থেকে ১৯৬৯ সালে এবং খিদিরপুর থেকে গৌতম ১৯৭২ সালে এসে যোগ দিয়েছিলেন ইষ্টবেঙ্গলে। সুধীরের দান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে অনেক। দীর্ঘ আট বছরের মত দলের সেবা করে গেছেন। এমতাবস্থায় দল ছাড়তে গিয়ে সই করার সন্ধিক্ষণে ক্লাব সমর্থকরা তো

বিচলিত হবেনই। প্রিয় খেলোয়াড়কে ছাড়বেন কিভাবে। তাই উত্তেজনা-গণ্ডগোল। শেষ পর্যন্ত চরম উত্তেজনার মধ্যে থেকে মোহনবাগানের অনুকূলে সই করে চলে গেলেন গৌতম-সুধীব। এবারের দল বদলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই-ই। এছাড়া নামী অনেকেই দলবদল করেছেন। কিন্তু তাঁদের ঘিরে এত উত্তেজনা দেখা যায় নি। বিউগিল-শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে নূতনকে স্বাগত জানাতে কলকাতার খেলাপাগল সমর্থকরা আই. এফ. এ. অফিসে যেভাবে হাজিরা দিয়েছেন ঐ একমাস যাবৎ তা দেখার মত। জনৈক জাপানী বন্ধু কলকাতার এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

দলবদলের পালা শেষ হয়েছে। কোন দলের পাল্লা ভারী হয়েছে বলা খুবই কঠিন। তার প্রমাণ ঘরোয়া লীগ শুরু হলেই মিলবে। দলে নামীদামী খেলোয়াড় থাকলেই তো আর দল ভাল হয় না। ইদানিংকালে স্থানীয় ঘরোয়া ফুটবলে কোন কৌতূহলই যেন নেই। অথচ নামীদামী খেলোয়াড়ের তো অভাব নেই নামীদামী দলে। বরং ছোট ছোট দল অনামী খেলোয়াড়দের নিয়ে ভালই খেলা দেখাচ্ছে। যাই হোক এবছর দলবদল করলেন ১৯৬০ জন খেলোয়াড়। দেখা যাক দলবদলের ফলে 'রুই-কাৎলা'রা কেমন খেলা দেখান। দর্শক মন জয় করতে পারলেই এই দল-বদলের সার্থকতা পুরোপুরিভাবে প্রমাণিত হবে।

প্রসঙ্গত কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড়দের জার্সি অর্থাৎ দল বদলের পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম।

প্রখ্যাত ফুটবলার পরিতোষ চক্রবর্তী বললেন—"খেলতে গিয়ে জীবনের প্রথম দলকেই মানুষ বেশী ভালবাসে। আর দলকে ভালবাসতে না পারলে সে খেলা খেলাই হয় না। তাই এবছর এ'দল পরের বছর অন্য দল বদলের অর্থই হ'ল খেলাকে ভালবাসা নয়। খেলা নিছক খেলার জন্য।"

মোহনবাগানের উলগানাথন দল বদলে ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে সই করছেন

সবার প্রিয় চুনী গোস্বামীর মতে—"দল আর জীবন একই। যে দলে খেলবো সে দলের জন্য প্রাণপণ উৎসর্গ করবো—দলই আমার সব। যতক্ষণ অবশ্য খেলবো। সে ভাবেই আমি খেলেছি। সকলের উচিতও বোধ সেইভাবে খেলা।"

চির সবুজ শান্ত মিত্র (মাঠের ভিতরে-বাইরে) সুন্দর মানুষ জনপ্রিয় শান্ত মিত্র (সবার প্রিয় মানুদা) বললেন—"বছর বছর জার্সি বদলের সঙ্গে জার্সির রঙের সাথে সাথে মনেও রঙ ধরে। খেলতে অসুবিধা হয়। আগের বছর যে দলের জার্সি গায়ে খেলেছি পরের বছর দল বদলের ফলে সেই পুরানো দলের বিরুদ্ধে খেলার দিন স্বভাবতই: মনের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অবশ্য যদি দলকে ভালবাসা যায়। আর দলকে ভাল না বাসলে খেলার সার্থকতা আছে কি?"

বিক্রমজিৎ দেবনাথ দলবদলের পক্ষে। কারণ দলের কর্মকর্তারাই নাকি খেলোয়াড়-দের দলবদলে প্রলুব্ধ করেন।

প্রত্যেকেই খেলোয়াড় জীবনের সবচেয়ে শীর্ষক্ষণে জার্সি বদল করেন নি। যেদলে খেলা শুরু করেছিলেন সেই দলে শেষ করেছেন খেলোয়াড় জীবন।

মাণিকলাল দাশ

সিনেমা

একালের বাবুমশাই সেকালের কলকাতায়

আমরা বিশ্বাস করেই ফেলেছি টালিগঞ্জে আঙুলে গোনা তিন-চারজন ছাড়া ফিল্ম করিয়ে আর কেউ নেই। সকলেই চলচ্চিত্র পরিচালক নামধারী ভাগ্যান্বেষী ব্যবসায়ী, এবং এঁরাও বিশ্বাস করে ফেলেছেন দর্শকের 'আই-কিউ' সাধারণ মানেরও নীচে। মেলোড্রামার ভোঁতা ছুরিতে অতি সহজেই দর্শকের ঘিলুকে নাড়িয়ে দেওয়া যায়, আর ঘিলু নড়লেই তাঁদের পকেটের পয়সা বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ। তাতে 'ফিল্ম' নামক ধারালো ফিল্ম-মাধ্যমটির যদি গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে তাতেই বা কার কি যায় আসে?

কিন্তু ব্যাপারটা তখনই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় যখন দর্শকদের বোকা বানাতে গিয়ে নিজের বোকামিটাই ধরা পড়ে। সলিল দত্তর সেকালের 'বাবুমশাই' একালের দর্শকের কাছে তাই যদি দুষ্পাচ্য হয় তাহলে দর্শকের 'আই-কিউ'কে একটু বাড়তি নম্বর দিতেই হবে। প্রথমতঃ ১৯১৩ থেকে ১৯৪০ সাল অবিদ ঘটে যাওয়া গল্পে কলকাতার চিত্রটি অনুপস্থিত। নিওন লাইটে সাজানো আউটরাম ঘাট কিংবা আজকের বেনারসের চেহারা সলিল বাবুর ক্যামেরা ফ্রেমিং ও সট্ কম্পোজিসান্ থেকে বাদ পড়েনি, দ্বিতীয়তঃ পরিবেশ সৃষ্টিতে ঝাড়-লণ্ঠন হুঁকো-টেলিফোন আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যাপারে যত্নবান হয়েও অলকা গাঙ্গুলীর চুলের কন্টিনিউটি বা মহুয়া'র আই লাইনার কিংবা চড়া মেক-আপ চোখ এড়িয়ে গেল কি করে? আর রাত্রি-দিনের আলোক-বর্ষণে সেই সময় সূর্যদেব যে এত অকৃপণ ছিলেন সে সত্যটিও দর্শককে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাঈজীর ঘর থেকে বাবুমশাই এর বেড্‌রুম অবিদ আলোর বিন্দুমাত্র হেরফের নেই।

বহিরঙ্গের এইসব চুলচেরা বিচার হয়তো বা মনে আসত না যদি 'গল্প বলিয়ে' সলিল দত্ত বিশ্বাস্য ভঙ্গিতে গল্পটাও বলতেন। ইচ্ছাপূরক এই গল্পে কাহিনী বিন্যাসকারী সংলাপ লেখক চিত্রনাট্যকার অসহায় মেরুদণ্ডহীন বাবু-মশাইকে (কিন্তু বাবুমশাই সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে ষোলআনা খাঁটি সতী) ঘিরে বাড়ীর চাকর নাকর ম্যানেজার এমনকি কর্তামা পর্যন্ত সকলকে সমগোত্রীয় করে তুললেন কেন? তারা কিন্তু আবার দর্শকের হাততালি কুড়োবার জন্য একবারে অতি আধুনিক সুরে মান্না দে, শিপ্রা বসুর গলায় দম দেওয়া কলের গানের মত গেয়ে উঠতে ভুলে যান না।

বাবুমশাইএর বংশপরিচয়গত আত্ম-অবমাননা এবং নফর-এর বংশপরিচয় একে অপরের কাছে সুরক্ষিত থাকলেও দর্শকরা যখন পূর্বাহ্নেই সেই সত্যটি জেনে ফেলেছেন তখন জগত্তারণের উৎপলীয় নাটুকেপনায় ভিলেন মামা যত প্যাঁচ পয়জারই করুন চিত্রনাট্যের ঝাঁপি জালে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হবে—এতো স্বতঃসিদ্ধ। যেমন স্বতঃসিদ্ধ এ ছবিতে বাবু কালচারের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভোঁতা চেহারাটা।

না সিরিয়াস, না হালকা—কোন চোখে সলিল বাবু গল্পটা সাজাবেন তাই নিয়ে তিনি বিব্রত ছিলেন বোধ হয় একটু বেশীই। তাই ভিস্যুয়ালস্ এর দাবী নস্যাৎ করেও গল্পের অধিকারকে তিনি জোরদার করতে পারেননি।

মান্না দে'র সুরে গানগুলিতে ১৯৪০ সালের আবহাওয়া অনুপস্থিত, একমাত্র ব্যতিক্রম 'কি-এমন বেশী রাত'। আবহ-সৃষ্টিতে বেহালার ছড়টানা কর্ণবিদারী।

আর অভিনয়? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবতঃ পেশাদারী শিল্পী বলেই ফিল্মের মড়ক লাগা টালিগঞ্জের 'ভালো' চরিত্রের খোঁজে সময় নষ্ট করতে তিনি চান না। কারণ ঠগ বাছতে যদি গাঁ উজোড় হয়ে যায়। নইলে অভিযানের নরসিং বা চারুলতার অমলকে 'বাবুমশাই' সাজতে হবে কেন? আরোসব নামী দামী শিল্পীর ভিড়ে একমাত্র বিশ্বাসের কাছাকাছি আছেন মহুয়া রায় চৌধুরী। তাঁকেই একমাত্র বাবুমশাই-এর রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভিড়ে রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায়।

নির্মল ধর

বাবুমশাই/গায়ত্রী ও সৌমিত্র

DHANADHANYE YOJANA (Bengali)
Regd. No. WB/CC-315
April' 1—15, 1977
Price 50 Paise

বহুপঠিত উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন কুণাল মুখোপাধ্যায়। গল্পাংশ করলে দাঁড়ায়—হরিদ্রা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়। তিনি এবং তাঁর ছোট ভাই স্বর্গীয় রামকান্ত রায় দু'জনের চেষ্টায় বিরাট জমিদারী গড়ে ওঠে। ৺রামকান্ত বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোন মাথা ঘামাননি। কিন্তু জ[illegible]কান্তই এ নিয়ে দিন কাটাতেন। তবে তাঁর মধ্যে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিল। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে আট আনা সম্পত্তি লিখে দেন। এই উদারতা কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হরলাল মেনে নিতে পারেননি। তীব্র প্রতিবাদ জানান, ভাইকে শাসায়, বাবাকে বিধবা বিয়ে করবে বলে ভয় দেখায়। অর্থাৎ রায় বংশের কুলে কালি দেবে। কৃষ্ণকান্ত এককথার লোক। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। হরলাল উইল চুরি করতে বয়ান লেখক ব্রহ্মানন্দকে টাকার লোভ দেখায়। অরাজী হলে

কৃষ্ণকান্তের উইল

ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুন্দরী বিধবা রোহিণীকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে উইল চুরি করতে বাধ্য করায়। রোহিণী হরলালের বদমতলব বুঝতে পেরে উইল লুকিয়ে রাখে। সহজসরল গোবিন্দলাল বারুণীর ঘাটে রোহিণীকে প্রায়ই কাঁদতে দেখে গায়ে পড়ে খবর নিতে চায়। রোহিণীর সব কথা শুনে গোবিন্দলাল উপকার করতে এগিয়ে আসে। বিবেক দংশিত রোহিণী আসল উইল রেখে নকল উইল চুরি করতে গিয়ে কৃষ্ণকান্তের হাতে ধরা পড়ে। গোবিন্দলাল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রোহিণীকে রক্ষা করে।

গোবিন্দলালের সহজ সুন্দরী বৌ ভ্রমর ভ্রমরের মত সে উড়ে উড়ে বেড়ায়, কোন বিষয়ে গভীর মন নেই। স্বামীই তার ইহকাল পরকাল—চাওয়া পাওয়া সবই। গোবিন্দলালের মন জুড়ে রোহিণী। রোহিণীর প্রতি স্বামীর ভাবনাচিন্তা ভ্রমর সহ্য করতে পারেনা—বারবার স্বামীকে

কৃষ্ণকান্তের উইল/ সতীন্দ্র ভট্টাচায্য ও মহেন্দ্র গুপ্ত

প্রশ্ন করে, তার সাদা মন স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসী হতে চায়না। দাসী ক্ষীরি গোবিন্দলালের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ভ্রমর, বলে—'পোড়ার মুখী রোহিণী যেন বারুণীর জলে ডুবে মরে।' রোহিণী সত্যি সত্যি মনের জ্বালায় বারুণীর জলে ডুবে মরতে যায়। গোবিন্দলাল ঘটনাচক্রে জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে ও বাঁচায়। রোহিণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে একসঙ্গে রাত কাটায়। সুখের নীড়ে বিষবৃক্ষ রোপণ করে। ঠিক এসময় পবিত্র ভ্রমর মাথা ঘুরে পড়ে যায়, অসুস্থ হয়, তার মন ভয়ে দুলে ওঠে (এ বাস্তব দৃশ্যের জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ)। গোবিন্দলাল ফিরে এলে মান, অভিমান, জেদের পালা চলে। দোটানা মনকে শক্ত করে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করে রোহিণীকে নিয়ে ঘর বাঁধে। তার অন্তরে ভ্রমর বাইরে রোহিণী। কোমলপ্রাণা ভ্রমর অসুস্থ হয়, বাপের বাড়ী ফিরে যায়। কৃষ্ণকান্ত সবই বুঝতে পারেন কিছু বলেন না। মিলনের প্রতিক্ষায় দিন গুনতে থাকে ভ্রমর। সে বড় মুখ করে বলেছিল-'যেতে চাও যাও। কিন্তু আমি যদি সতী হই, নারায়ণ যদি সত্যি তাহলে তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে, আবার ভ্রমর বলে ডাকতে হবে।'

নিয়তির এমনই পরিহাস যে নানা ঘটনা-চক্রে শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলাল গুলি করে রোহিণীকে মেরে ফেলে। এদিকে ভ্রমর মরতে বসেছে, দিন গুনতে গুনতে শুকিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভ্রমরের প্রতীক্ষার দিন শেষ হয়। গোবিন্দলাল এসে ধরা দেয়। নাটক শেষ হয়।

নাটকটিকে আধুনিকীকরণ করার জন্য নাট্যকার কুণাল মুখোপাধ্যায় ও নির্দেশক রঞ্জিতমল কাংকারিয়াকে ধন্যবাদ। কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্ত অনবদ্য অভিনয় করেছেন। ভ্রমরের চরিত্রে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এর আগে কোন স্টেজে এত ভাল অভিনয় করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। রোহিণী চরিত্রে মঞ্জু ভট্টাচার্য্য মনে দাগ কাটেনা। গোবিন্দলাল হিসাবে সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রাণবন্ত, অলোক বাগচি (হরলাল) যথাযথ, অনামিকা সাহা (ঝি) অকারণে দাপাদাপি করেছেন। বাগানের ওড়িয়া মালীর চরিত্রে তপন বসু দর্শকদের হাসিয়ে ছেড়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপক মজুমদার (নিশাকর) নির্মল ঘোষ (ব্রহ্মানন্দ), কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় (উকিলবাবু), হরিধন মুখোপাধ্যায় (পোষ্ট মাষ্টার), দীপক গাঙ্গুলী (পিওন), মধুমিতা বসু (কমলা) নাট্যানুগ। চণ্ডীদাস বসুর সুর শ্রুতিমধুর। সন্তোষ সরকারের সাজসজ্জা, তিমির বরণের আবহ সঙ্গীত ও নির্মল ঘোষের মঞ্চপরিকল্পনা প্রশংসনীয়। মোটকথা কয়েক যুগ পরেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পরিবেশনের গুণে সমান উপভোগ্য হয়েছে।

সত্যানন্দ গুহ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭[illegible]৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
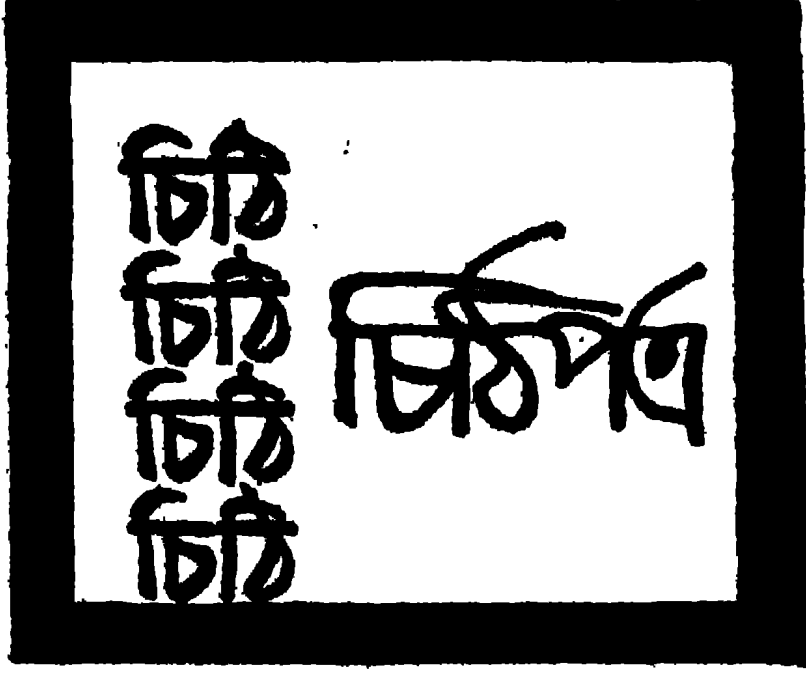
মহাশয়,

প্রতিদিন খবরের কাগজের ষ্টলে আরো বহু কাগজের সঙ্গে দেখতাম 'ধনধান্যে'। কিন্তু পড়তাম না। উল্টে-পাল্টে দেখার কথাও কোন দিন উদয় হয়নি মনে। আমার মধ্যে একটা সবজান্তা মানুষ ছিল যে পূর্বাহ্নেই আমাকে জানিয়ে রেখেছিল—'সরকারী কাগজে আবার চিন্তার স্বাধীনতা। ওখানে বৈচিত্র্য খোঁজা আত্মসুখী—শ্রম ও সময়ের অপব্যবহার।' কিন্তু 'বই মেলা' আমার ভেতরের সবজান্তাটার জ্ঞানের গুমোর ফাঁস করে দিল। সর্বসমক্ষে করলো হতমান।

নিজের অজ্ঞাতসারেই গতকাল ২.৩.৭৭ বই মেলাতে পত্রিকার অষ্টম বর্ষের অষ্টম-সংখ্যার সূচী পড়তে পড়তে কখন ভেতরের পাতায় চলে গেছি, কখন সংখ্যাটা কিনেছি আর কখন যে পড়ে ফেলেছি এখন ভাবতে অবাক লাগে। যেন আমি সন্মোহিত ছিলাম মেলা প্রাঙ্গণে। এখন আমি শুধু 'ধনধান্যের' পাঠক নই—প্রচারকও বটে।

এককথায় তত্ত্বে, তথ্যে ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা নিঃসন্দেহে। প্রায় সমস্ত শ্রেণীর পাঠকের মনের খোরাক সাজানো রয়েছে থরে থরে পাতায় পাতায়। কোন রচনাই তথ্য কণ্টকিত কিম্বা তত্ত্বের কচকচিতে তলিয়ে যায় নি অথবা অর্থহীন আবেগসর্বস্ব হুজুগে সাহিত্যের নমুনা নয়।

কলকাতার যুদ্ধ ক্ষণেকের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেদিনের আলিনগরে। রসসমৃদ্ধ 'শঙ্খ ফেলে কাঁচের চুড়ী', নিটোল প্রচারধর্মী গল্প 'একা একা করি খেলা', এছাড়া ফাউ পেয়েছি গ্রন্থ আলোচনা, মহিলামহল, খেলাধুলা আর সিনেমা, পঞ্চম যোজনায় পশ্চিম বঙ্গের সেচ, রাজ্যে রাজ্যে, কৃষি, তার থেকে বড় ফাউ জয়নগরের মোয়া। পড়তে পড়তে মনে হল একটি প্রথম শ্রেণীর তথ্যচিত্র।

অতঃপর জনান্তিকে সসঙ্কোচ এক ক্ষুদ্র আবেদন সম্পাদক মহাশয়ের নিকট—আরো একটি নিয়মিত বিভাগ থাকলে আরো ভালো হয়। যার লক্ষ্য হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। ভারতের সনাতন আদর্শ—অধ্যাত্মবাদ। এই বিভাগের লেখাগুলোর মধ্যে থাকবে ভারতের বিভিন্ন ধর্মামলম্বী মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও তার দর্শন। তাদের আচার আচরণের নিরপেক্ষ লিপিচিত্র। (সপ্তদশ সংখ্যার, দোলের লেখাটা এখনো পড়া হয়নি—তবুও ধন্যবাদ আপনাকে। আমার মনের খবর আপনার মনের মুকুরে ধরা পড়েছে পূর্বাহ্নেই।)

মোহাম্মদ কারো
বসন্তপুর, সরিষা, ২৪ পরগণা।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এতে শুধুমাত্র সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার,
বার্ষিক-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রাহক মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

আগামী সংখ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দু'টি বিশেষ নিবন্ধ:—

আমি চিত্রাঙ্গদা—রাজেন্দ্র নন্দিনী
ভবানীগোপাল সান্যাল

রবীন্দ্রনাথ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

গল্প

পরমেশ, মমতা ও একটি মুরগী
অমিয় চৌধুরী

অন্যান্য রচনা

শ্রমিকদের কল্যাণে
অশোক ঘোষ

মানব কল্যাণে রেডক্রস
গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

বিদেশে ভারতীয় সহযোগিতায় শিল্পায়ন
কালীপদ বসু

এছাড়া কৃষি, যুবমানস, মহিলামহল, গ্রন্থ আলোচনা, সিনেমা, নাটক এবং অন্যান্য নিয়মিত রচনা।

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক: এস. শ্রীনিবাসাচার
পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত

গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা ও সম্পাদকীয় কার্যালয়:
'ধনধান্যে', পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯
ফোন: ২৩-২৫৭৬
টেলিগ্রামের ঠিকানা:
EXINFOR, CALCUTTA
বিজ্ঞাপনের জন্য লিখুন:
অ্যাডভারটাইজমেন্ট ম্যানেজার, 'যোজনা'
পাতিয়ালা হাউস, নতুনদিল্লী-১১০০০১

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৭৭
অষ্টম বর্ষ : বিংশতিতম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—মনোজ বিশ্বাস

সম্পাদকের কলমে

জাতির ইতিহাসে আরেকটি স্মরণীয় দিন ২৪শে মার্চ, ১৯৭৭। এদিন শ্রী মোরারজী রণছোড়জী দেশাই প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ত্রিশবছরের কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটল। জনতা পার্টি ও তার সহযোগী দলের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত হল। নতুন জনতা সরকারকে আশীর্বাদ জানালেন শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ। এক হিসাবে ত তাঁরই সৃষ্টি এ সরকারের। তিনি বললেন, গত ত্রিশ বছরে ইতিহাসের ভিত্তি ছিল রাজনীতি। এবারের ভিত্তি হবে জনতার শক্তি।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির প্রতি এক বার্তায় শ্রী মোরারজী দেশাই সমগ্র জাতির আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেছেন, দশ বছরের মধ্যে তিনি ভারতকে সবচেয়ে সুখী দেশরূপে গড়ে তুলতে চান। তিনি বলেন, স্বেচ্ছাচার ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সারা দেশ অভাবনীয় ভাবে সাড়া দিয়েছে। তার ফলে বিশ্বের দরবারে আমাদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মান যাতে আরও বৃদ্ধি পায় তার জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা চাই। তাই তিনি দেশবাসীর কাছে পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেন। কোন ভুল হলে দেশবাসী নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে দেখিয়ে দেবেন বলে প্রধানমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

নির্বাচনের মাধ্যমে সারা দেশে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল। রক্তক্ষয়ী কোন সংগ্রাম নয়। অহিংস রক্তপাত হীন নিঃশব্দ বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যালট বাক্সে জনগণের রায়ে সরকারের পরিবর্তন ঘটল। ইতিহাসে অভূতপূর্ব এ ঘটনা। ভারতবাসী প্রমাণ করল গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আস্থা কত গভীর। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই জয় সূচিত হল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। সংসদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দান কালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনতা সরকারের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়েছে।

শ্রী মোরারজী দেশাই এক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে দেশের হাল ধরেছেন। শ্রী দেশাই দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর সুদীর্ঘ দেশসেবা ও প্রশাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। জনগণের আশা আকাংখার রূপ দিতে এগিয়ে এসেছেন মহাত্মা গান্ধীর একান্ত অনুগামী ঋজু চরিত্রের এই মানুষটি। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জনগণের সহযোগিতায় দেশ সকলপ্রকার সমস্যার সমাধান করে নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

পয়লা বৈশাখ

অমরনাথ বসু

মাসে মাসে গড়িয়ে যায় বছরের পরিধি, সহসা চৈত্র সংক্রান্তিতে মনটা হু হু করে কেঁদে ওঠে রাশিকৃত ঝরা পাতার হাহাকারে। বর্ষশেষের মাতামাতির পরেই বর্ষশুরুর স্বতস্ফূর্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস। বাঙালীর নববর্ষ মানেই নতুন মাস নতুন বছর নতুন পাঁজি নতুন ক্যালেণ্ডারের পাতা এককথায় সবই নতুন। নববর্ষে বাংলা পঞ্জিকা প্রকাশ একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে। একটু খোঁজ খবর নিলেই দেখা যাবে বাংলা পঞ্জিকার প্রচার সংখ্যা কি দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছে। খবরে প্রকাশ ব্যক্তিগত ব্যবহারের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বাংলা পঞ্জিকা বিদেশের একাধিক গবেষণা কেন্দ্রে, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরখানা ছাড়াও মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রটি গ্রহ নক্ষত্রের ঠিক ঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য বাংলা পঞ্জিকা-টিকে যথাযথ মর্যাদায় সসম্মানে গ্রহণ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে বাংলার গর্ব। একথা অনস্বীকার্য যে পঞ্জিকার বিচার বিশ্লেষণ বিশেষ করে গ্রহ নক্ষত্রদের ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড ঘিরে যথাযথ অবস্থান চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তাছাড়া ব্রত পার্ব্বন উৎসবের সময়সূচীর নির্ঘণ্ট তৈরী যে কত শ্রমসাধ্য ব্যাপার সেকথা গণনাকারী এবং পঞ্জিকারচনাকারী উভয়েই বোঝেন অথবা জানেন। তাছাড়া পঞ্জিকা ঘিরে খনার বচনের বাড়তি আকর্ষণ তো সকলেরই স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ।

সে যাই হোক নববর্ষ মানেই নতুন খাতার মহরৎ। সাল তামামি আর নতুন হিসেব শুরু। লাভ লোকসানের পাঠ চুকিয়ে নতুন করে হাল ধরা। একজন মানুষের মত বিদায় নেয় একটি বছর—যার সঙ্গে এত অধিক নিবিড় হয়েছিলাম সে আর ফিরে আসবে না। প্রবীণ প্রবীণারা ক্যালেণ্ডারের পাতায় সন তারিখের দিকে ম্লানমুখে তাকিয়ে থাকেন। এ তাঁদের দুঃখও নয়—আনন্দও নয়। কি এক ঔদাসীন্যের মধ্যে ডুব দিয়ে যেমবা অনেক শোক ও আনন্দ জয়ের নিবিড় ভালবাসা। পুরানোর বিসর্জন আর নতুনের আগমন। পয়লা বৈশাখ বাংলার জনজীবনে এক বহুকাঙ্খিত উৎসব। নতুন দিনের শুভযাত্রায় আজ যুবক যুবতীর দেহে উজ্জ্বল আবরণ মুখে উজ্জ্বল হাসি। বৈশাখী দিনের উৎসব প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখবো! পূজো, প্রতিমা না মানুষ—নাকি আলোক সজ্জা! সবকিছুই প্রত্যক্ষ করা যাবে একসঙ্গে। আজ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে উৎসব দেখার আনন্দ অনুভব করছে। নতুন বছরে প্রবেশ করার মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে যেন বা দুর্যোগের অবসান ঘটিয়ে নতুন বছরে সবটুকুই শুভ হয়ে উঠবে। সব ক্ষতই সেরে উঠবে নতুন দিনের শুভ কামনায়।

বছরের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কিনা নববর্ষের শুভলগ্নে সর্বত্র গণেশ আর ধনদেবী লক্ষ্মীর পূজা। গণেশ হচ্ছেন সিদ্ধিদাতা বিঘ্নেশ্বর। সে কারণে নববর্ষের প্রথম দিনটিতে মনো-বাসনা ও বিঘ্ননাশ করবার জন্য চারিদিকে গণেশপূজার এত সমারোহ। তিনি আবার সৌভাগ্যের দেবতা। ভারতীয় দেবদেবীর মধ্যে তিনি আদি এবং অনন্য। সম্ভবত সে কারণেই তাঁর পূজার এত অধিক প্রচলন। গণেশ হচ্ছেন আবার ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতীক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজো মহা ধূমধাম সহকারে হয়ে থাকে। আর বাঙালী গণেশকে বিশেষভাবে আরাধনা করেন ১লা বৈশাখের শুভক্ষণে শুভলগ্নে। পুরুতমশাই কালিকলম দিয়ে লিখবেন "সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ, শ্রীশ্রী কালীমাতার প্রসাদ ও আশীর্বাদ লইয়া এবং শ্রীশ্রী গণেশ পূজা করতঃ সভক্তি মনে এই কারবার করিতেছি। ইতি অদ্য ১লা বৈশাখ ১৩৮৪ সন বৃহস্পতিবার।" এবং সবশেষে মালিকের নাম। অবশ্য একটি কথা, লেখার আগে দোকানের সামনে শোলার ফুলমালা মঙ্গলঘট, পূর্ণকুম্ভ আর দুপাশে কলাগাছ দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা তো রয়েছে। চারিদিকে একটা পূজোর আমেজ নিয়ে ব্রতের মাস বৈশাখ শুরু হচ্ছে। এদিনের উৎসবে সকলের আনন্দটাই বড়ো কথা। ধর্ম আর ভক্তিটা নিতান্তই আনুষঙ্গিক। নববর্ষের উৎসব এক সার্বজনীন উৎসব। ছোটো বড় ডান বাম সকলের ভেদ ঘুচিয়ে দেবে এদিনের উৎসব। এই আলোকো-জ্জ্বল প্রমত্ত কলকাতাকে কেই বা ভাল না বেসে থাকতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পয়লা বৈশাখ জাতীয় সংস্কৃতির মহোৎসব রূপে চিহ্নিত।

একথা বললে ভুল হয় না পৌষালী শীতের ইংরেজী নববর্ষ ঘিরেই দৈনন্দিন

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

নতুন প্রধানমন্ত্রী

শ্রী মোরারজী রণছোড়জী দেশাই

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

এক সময় প্রশ্ন উঠেছিল, আফটার নেহেরু হু? নেহরুর পর কে? জবাবটা পাওয়া গিয়েছিল বিদেশী সাংবাদিকদের কাছ থেকে। তাঁরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে-দিয়েছিলেন গুর্জরের এক দীর্ঘকায় সৌম্য দর্শন মানুষকে। আগাগোড়া খাদিতে মোড়া সেই মানুষটি ব্যক্তিত্বে, কর্মক্ষমতায় সততা ও আন্তরিক নিষ্ঠায় নেহরুর উত্তরাধিকার পাবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি।

কিন্তু না, সিজার তিন তিনবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন রাজমুকুট। গুর্জরের মহানায়ক গান্ধী শিষ্য মোরারজী রণছোড়জী দেশাই তিন তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিন-বারই ভাগ্যচক্রে প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ ৮২ বছর ধরে সুদীর্ঘ জীবন সংগ্রামের পর ভারততরণীর কর্ণধার হবার আমন্ত্রণ এল যখন জীবনে তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। জনতা দলের মহা বিজয়ের পর আবার যখন ভারতের আকাশ বাতাস উত্তাল, আফটার ইন্দিরা হু? জগজীবন না মোরারজী? মোরারজী না জগজীবন? তখন সেই চরম নাটকীয় মুহূর্তে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে আপনি কি ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী? গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ সেই মানুষটি উত্তর দিয়েছিলেন ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হবে। তিনি যদি চান আমি প্রধানমন্ত্রী হই তবে আমি তাই হব।

অবশেষে তাই হল। ঈশ্বরের ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছার মধ্যদিয়ে রূপায়িত হল। ২৪ মার্চ সংসদের সেন্ট্রাল হলে আর একটি রক্তপাতহীন বিপ্লবের সূচনা। ভারতের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ বিজয়ী জনতা দলের মধ্য থেকে। ত্রিশ বছরের ইতিহাসে ভারতে এই প্রথম অকংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। কিছুদিন আগেও যা ছিল অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়। ষাটের দশকে রাজ্যগুলিতে একদা যে মেঘ দেখা দিয়েছিল এবং যে মেঘ ইন্দিরা ঝড়ের দাপটে দ্রুত মিলিয়ে গিয়েছিল-- ১৯৭৭ সালে সেই মেঘের আবার আবির্ভাব ঘটবে রাজনীতির আবহাওয়া তত্ত্ববিদরা ভাবতে পারেননি কিছুদিন আগেও। কিন্তু সেই মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। তারপর দীর্ঘ একটানা গুমোটের অবসান। তপের তাপের বাঁধন কেটে ধারা বর্ষণের সূচনা।

ভারতের নতুন যুগের ভোরে যে জননায়ক নেতৃত্বের গুরুভার তুলে নিলেন সেই মোরারজী রণছোড়জী দেশাইর জন্ম ১৮৯৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী। বছরটি লিপ ইয়ার। তাই লোকে বলে ৮২ বছরের মোরারজী ভাইয়ের আসল বয়স এখন মাত্র ১৯। কারণ চার বছর অন্তর একবার করে তাঁর জন্মদিনটি আসে। একারণে তিনি ১৯টির বেশী জন্মদিন পালন করতে পারেননি। কিন্তু ব্যঞ্জনার্থে কথাটি ঠিকই। আট দশক অতিক্রান্ত বিশ্বের বহু সফল রাষ্ট্র-নায়কদের মত মোরারজী এই বয়সেও চিরতরুণ 'এভার গ্রীন'। শোনা যায় ৮০ তম জন্মদিনে চার্চিলের ফোটো তুলতে এসে একজন তরুণ ফোটোগ্রাফার চার্চিলকে বলেছিলেন, মিঃ চার্চিল, আশা করি আপনার শততম জন্মদিনেও আমি আপনার ছবি তুলতে পারব। চার্চিল নাকি গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিলেন: 'ওয়াই নট, ইউপ, ইউ টেক কেয়ার অব ইউর হেল্থ।

মোরারজীও চার্চিলের মত এখনও যে কোন তরুণকে দীর্ঘজীবন ও সুঠাম স্বাস্থ্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন। বলতে পারেন, 'এ ম্যান ইজ অ্যাজ ওলড অ্যাজ হি ফিলস' সেদিক থেকে মোরারজীর প্রাণে উনিশ বছরের সজীবতা। মেঘমুক্ত আকাশে তিনি থির বিজুরি।

মহৎ ব্যক্তিরা দু শ্রেণীর। এক যাঁদের ওপর মহত্ত্ব আরোপিত হয়। দুই যাঁরা মহৎ হয়ে জন্মায়। মোরারজী এই শেষোক্ত শ্রেণীর। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর গুরু মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী। রূপোর চামচ মুখে দিয়ে তাঁর জন্ম নয়। শিক্ষা নয় হ্যারো কেমব্রীজ কিংবা কোন শৈলাবাসের পাবলিক স্কুলে। জন্মেছেন বোম্বাই প্রদেশের বুলসারের কাছে এক অখ্যাত গ্রামে অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। বাবা রণ-ছোড়জী দেশাই ছিলেন স্কুল মাষ্টার। আট আটটি ছেলেমেয়ে। সংসার চলত কষ্টে সৃষ্টে। কিন্তু বাবার অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। মোরারজীর তখন ১৫ বছর মাত্র বয়স। বিনা মেঘে বজ্রপাতন ঘটল। পরিবারের বড় ছেলে। সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তা বাদে এমন সময় সেই ঘটনাটি ঘটল যা তাঁর জীবনের পক্ষে

আরও মর্মন্তুদ। কারণ ওই ঘটনার ঠিক তিনদিন পরেই তাঁর বিয়ে।

দুঃখ সইবার ক্ষমতা সেই প্রথম অর্জন করলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। স্কলারশীপও পেলেন। বোম্বায়ে এসে ভরতি হলেন উইলসন কলেজে। ১৯১৯ সালে গ্র্যাজুয়েট হলেন অর্থনীতি নিয়ে। আর পড়া হলনা। এবার দরকার একটা চাকরি। বসলেন বোম্বাই সিভিল সারভিস পরীক্ষায়। পাশ করে গেলেন। ভরতি হয়ে গেলেন বিদেশী সরকারের গোলামখানায়। ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে সুরু। তারপর বারো বছর ধরে সরকারী চাকুরির নানা শাখা প্রশাখায় বিচরণ। দেশ তখন স্বাধীনতার স্বপ্নে উত্তাল। দেশ জুড়ে আন্দোলন আর আন্দোলন। আর সেই আন্দোলনের পুরোভাগে পোরবন্দরের এক অর্দ্ধনগ্ন মহামানব। সরকারী গোলামখানা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল তাঁর কাছে। অবশেষে এল ১৯৩০ সাল। দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন গান্ধীজী। এবার সেডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না মোরারজী। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রিশের আন্দোলনে। তারপরের চার-বছরের মধ্যে তিন তিনবার কাটল জেলে। একদা আইনের রক্ষক আইন ভাঙ্গার দায়ে কারারুদ্ধ হলেন।

কিন্তু ততদিনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সক্রিয় রাজনীতিতে। বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হলেন প্রথমে। তারপর সম্পাদক। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ একটানা ছয়বছর কাটালেন সেই গুরুত্বপূর্ণ পদে। এরই মধ্যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। উল্লেখযোগ্য 'কর বন্ধ' আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তিনি। কারাদণ্ডও ভোগ করতে হল তার জন্য। ১৯৩১ সালেই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। করাচী কংগ্রেসের পর তিনি এ আই সি সি-র সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ভারতের ১১ টি প্রদেশে গঠিত হয় আইনসভা। ১৯৩৭ সালে মোরারজী দেশাই বোম্বাই আইনসভায় নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা। ১৯৩৭ সালে বোম্বায়ে কংগ্রেস প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে। ৪১ বছরের মোরারজী সেদিন মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে-ছিলেন রাজস্ব ও বনমন্ত্রী হিসাবে। তিন বছর ছিলেন ওই পদে। বি জি খের সেদিন বোম্বায়ে প্রধানমন্ত্রী।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ঘৃণা ছিল তীব্র। কিন্তু তা বলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল দৃঢ় করার জন্য এই যুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটিশকে মদত যোগাতে চায়নি। গান্ধীজী বড়লাটকে লিখেছিলেন, নাৎসী বা ফ্যাসীবাদ এবং ভারতে ইংরেজের স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কংগ্রেসের দাবি যুদ্ধের লক্ষ্য যদি ফ্যাসীবাদের ধ্বংস ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে ভারতের স্বাধীনতার দাবি আশু স্বীকৃত হওয়া উচিত। ইংরাজ সরকার স্বাধীনতার দাবি মেনে নিলেন না। কংগ্রেসের সেদিন জবাব: এক পাইও না, এক ভাইও না। এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এর সঙ্গে আমাদের কোন সহযোগিতা নয়।

অতএব রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে গেল। মোরারজী আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। গান্ধীজী এবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছেন। যে যুদ্ধের প্রথম সৈনিক বিনোবা ভাবে। মোরারজী যোগ দিলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে। তারপর রক্তঝরা বিয়াল্লিশ। গান্ধীজী বলেছিলেন, আমি যখন যাত্রা সুরু করব তখন উথাল পাতাল হয়ে উঠবে হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী। সত্যিই তাই হল। আরব সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ল পশ্চিম উপকূলে। সারা দেশ জুড়ে কলকল নিনাদ করালে একই ধ্বনি, বন্দেমাতরম্, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, ইংরেজ ভারত ছাড়।

মোরারজী সেই যুদ্ধের এক সেনাপতি, তিন বছরের কারাদণ্ড হল বিচারে।

১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব করলেন যুক্তরাষ্ট্র গঠন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আহ্বান জানালেন ক্যাবিনেট মিশন। ১৯৪৬ সালে বোম্বাই বিধানসভার নির্বাচনে জয়ী হলেন মোরারজী, দ্বিতীয় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় তিনি পেলেন আরও গুরুদায়িত্ব—স্বরাষ্ট্র এবং রাজস্ব।

স্বাধীনতার পরও সে মন্ত্রিসভা চলল একটানা ৫২ সাল পর্যন্ত। ৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এবারও বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী কংগ্রেস। নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব পেলেন মোরারজী দেশাই। বোম্বাই প্রদেশের তিনি মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবি সোচ্চার। আজীবন ঐক্যের পূজারী মোরারজী বোম্বায়ের অঙ্গচ্ছেদের কথা চিন্তাই করতে পারলেন না। তিনি চেয়েছিলেন গুজরাতি আর মারাঠির সম্মিলিত বোম্বাই। কিন্তু জনমত সেদিন খণ্ডিতকরণের পক্ষে। সুরু হয়ে গেল দাঙ্গাহাঙ্গামা। গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রী সেদিন অনশনের পথ বেছে নিয়েছিলেন অশান্তি অবসানের জন্য।

তিন বছর পরে বোম্বাই যখন ভাষার ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল তখন মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিলেন দেশাই। নেহরু তাঁকে সাদরে স্থান দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। তাঁকে ভার দেওয়া হল বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের। ১৬ মাস বাদে তিনি হলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী। ১৯৫৮–১৯৬৩ ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি ছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী। গুরুত্ব-পূর্ণ কেননা, ১৯৬২ সালে ভারতের অর্থনীতির ওপর প্রবল আঘাত এসে পড়ল চীনা আক্রমণের ফলে। হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে চীনা সৈন্যরা তাদের সেমি অটোমেটিক রাইফেল থেকে

যে বুলেট গুলি ছুড়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য ভারতের অর্থনীতির পাঁজরটাকে ফুটো করে দেওয়া। পররাজ্য গ্রাস বা সম্প্রসারণবাদের চেয়ে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্রম উন্নতিশীল অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়াই ছিল সেই সীমান্ত হামলার উদ্দেশ্য। মোরারজী সেদিন কঠোর মনে কতগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যেগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠতে দেরী হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত আর্থিক ব্যবস্থাগুলি যে কতখানি খাঁটি ছিল তার প্রমাণ পরবর্তী কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রীরাও মোরারজী প্রবর্তিত কর নীতি ও অর্থনীতির কোন মৌল পরিবর্তণ ঘটাননি।

১৯৫৮ সালে দিল্লিতে ও ১৯৫৯, ১৯৬০–৬১ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কএর সম্মেলনে মোরারজী ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৮ সালের কমনওয়েলথ ট্রেড ও ইকনমিক কনফারেন্স ও ১৯৫৯, '৬০ ও ১৯৬১ সালে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে মোরারজী নেতৃত্ব দেন।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে সুরাট থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে এলেন মোরারজী নেহরু মন্ত্রিসভায়। এবার তিনি আপন শক্তিতে দেদীপ্যমান। কিন্তু ১৯৬৩ সালে মোররজীকে বিদায় নিতে হল নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে। বিনা বাক্যব্যয়ে পাদপ্রদীপের আলো থেকে নেপথ্যে সরে গেলেন মোরারজী।

১৯৬৪ সালের ২৫ শে মে নেহরুর মৃত্যুর পর সত্যি সত্যি উত্তরাধিকারী হিসাবে মোরারজীর নাম উঠল। কিন্তু হাইকম্যাণ্ড সেদিন তাঁর বিপক্ষে। মোরারজী বলেছিলেন, জনসাধারণ যদি চান তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। ওয়াকিং কমিটিতে চক্রধারীরা তোবা তোবা করে উঠলেন। দলনেতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এবারও শিখণ্ডী কামরাজ। তিনি বললেন, 'কনসেনশাস'। কংগ্রেসের রথী মহারথীরা নাকি লালবাহাদুরকে চান। লাল বাহাদুর সর্বসম্মত নেতা। কাশী বিদ্যাপীঠের ওই নির্বিরোধী ছোটখাটো মানুষটির ওপর মোরারজীরও কোন রাগ ছিলনা। তিনি সরে দাঁড়ালেন মঞ্চ থেকে।

ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। লালবাহাদুরজী মোরারজীকে মন্ত্রিসভায় নিতে চেয়েছিলেন তবে তাঁর স্থান হবে বলেছিলেন তিন নম্বরে। কারণ পয়লা নম্বর তিনি নিজে। দু নম্বরে থাকবেন নন্দজী—প্রাক্তন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী। মোরারজী উত্তর দিয়েছিলেন, ধন্যবাদ। এ প্রস্তাবে রাজি হওয়া আমার পক্ষে সম্মান হানিকর।

দুবছরের মধ্যে আবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন। তাসখন্দ থেকে কফিনে ঢাকা লালবাহাদুরের মৃতদেহ ফেরৎ এল। ততদিনে মোরারজীর বিরোধীচক্র আরও শক্তিশালী। শাস্ত্রী মন্ত্রিসভার বেতার ও তথ্যমন্ত্রী নেহরু তনয়া ইন্দিরা গান্ধীকে ঘিরে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি

শক্তিশালী উপদল দানা বেঁধে উঠেছে সেদিন।

দশজন মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন আমাদের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী। দুবছরের রাজনীতিজ্ঞ ইন্দিরাজীকে ঘিরে সেদিন ওয়ার্কিং কমিটির বহু সদস্য। কামরাজ এবারও তাঁর কামান দাগলেন: 'কনসেনশাস'। কিন্তু এবার বিনাযুদ্ধে প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি ছেড়ে দিতে চাইলেন না মোরারজী। তিনি বললেন, না, নির্বাচন।

এরপর ১৯৬৬ সালের ১৯ জানুয়ারীর সেই ঐতিহাসিক ভোটাভুটি। বিজয়িনী ইন্দিরা। তিনি পেলেন ৩৫৫ জনের সমর্থন। মোরারজীর দিকে মাত্র ১৬৯ জন। মোরারজী বললেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমি হেরে গেছি। আমার কোন দুঃখ নেই। আমার পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন ইন্দিরাজী।

পরের বছর সাধারণ নির্বাচন। কংগ্রেসের জয় হল। জয়ের পর আবার নেতা নির্বাচন। কামরাজ আবার কনসেনশাস চাইলেন। কিন্তু মোরারজী চান আর একবার জনপ্রিয়তা যাচাই করতে। সুরু হল আলাপ আলোচনা। ওয়ার্কিং কমিটির অনেকে ইন্দিরাজীকেই প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান। তাঁরা চান যে করে হোক মোরারজীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে। অবশেষে আপোষের সূত্র পাওয়া গেল। মোরারজী পছন্দমত দফতর পাবেন সেই সঙ্গে উপপ্রধানমন্ত্রিত্ব। ইন্দিরাজী বললেন, আমি ওঁকে দ্বিতীয় স্থান দিতে রাজি কিন্তু উপপ্রধানমন্ত্রিত্ব নয়। ১৯৪৭-১৯৫০ সালে বোম্বাই প্রদেশের আর একজন নেতাকে উপপ্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল। তিনি বল্লভ ভাই প্যাটেল। কিন্তু প্যাটেলের মৃত্যুর পর নেহরু আর কাউকে উপপ্রধানমন্ত্রী করেননি। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন ইন্দিরাজী। কিন্তু ইন্দিরাজীকে অর্দ্ধেক ত্যাগ করতে হয়েছিল সেদিন। মোরারজীর পিছনেও কম জনসমর্থন নেই। ১১ মার্চ মোরারজী প্রধানমন্ত্রীর পদে ইন্দিরার নাম প্রস্তাব করলেন। ইন্দিরা মোরারজীকে নিলেন অর্থমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী হিসাবে। কিন্তু দু বছরের বেশী এই পদে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কংগ্রেসের মধ্যে নেমে আসে আদর্শগত সংঘাত। কংগ্রেস দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। মোরারজী সেদিন থেকে ইন্দিরা বিরোধী শিবিরের মহা পরিচালক। জনতা পার্টির জন্ম যদি কংস কারাগারে হয় তাহলে সেদিন সংগঠন কংগ্রেসের জন্ম সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী এখনও চরকায় সুতো কাটেন। জীবনে মাদক দ্রব্য দূরে থাক ধূমপানও করেননি। চা বা কফি কিছুই খাননা। সারাদিনে সন্ধেবেলা মাত্র আহার করেন। তাও সাধারণ নিরামিষ আহার। ভালবাসেন বই পড়তে। গান শুনতে। ভজন ও কীর্ত্তন সবচেয়ে প্রিয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি অগাধভক্তি তাঁর। তাঁর ঘরে রামকৃষ্ণের ছবি। বিশ্বাস করেন প্রাকৃতিক চিকিৎসায়। টিকা নেননা। কৃত্রিম জন্মনিরোধে নিজে বিশ্বাসী নন। চাটুকারিতা পছন্দ করেন না—ওই পথ ধরে চলেননি বলে তিনি বরাবর অপ্রিয়। শুদ্ধাচার তাঁর জীবনে কোন কৌশল নয় জীবন চর্যারই অঙ্গ। চালাকির দ্বারা তিনি কোন মহৎ কাজ করতে চাননা। যখন লবণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তখন নিজে কাঁচা তরকারি খেয়ে থেকেছেন।

মোরারজী অপ্রিয় সত্য কথা বলেন। নিষ্ঠুর সত্য জীবনে পালন করেন এজন্য তাঁর শত্রুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তারা বলে মোরারজী দক্ষিণপন্থী, তিনি রাইট। মোরারজী বলেন, হ্যাঁ তিনি রাইট তবে এই রাইটের অর্থ ন্যায়। শত্রুরা বলেন, মোরারজী গরীবের শত্রু, ধনীর বন্ধু। মোরারজী বলেন, আমার মন্ত্রী জীবনে আমি গরীব মানুষদের জন্য যা করেছি তা বোধহয় আর কেউ করেনি। দেনার দায়ে মাথা বিকিয়ে থাকা চাষীদের জন্য ঋণ রেহাইয়ের ব্যবস্থা আমিই এদেশে করি। আমিই রায়তদের খাজনা কমিয়ে দিলাম। বোম্বাইয়ে সড়ক পরিবহণ রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলাম।

একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ধারণা প্রথম দিকে ওতে তাড়াতাড়ি কাজ হয় কিন্তু স্থায়ী কোনো কাজ হয় না। গণতন্ত্রে যা হয় তা হয়ত ধীরে কিন্তু তা স্থায়ী।

রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে তিনি ব্যক্তি সত্ত্বাকে বাঁচাতে চান। এটা মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার প্রশ্ন। এজন্য উৎপাদন রাষ্ট্রীয়করণের পথেও ভেবেচিন্তে এগুতে হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রী মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। যেমন পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি প্রকৃত জোট নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন—জোট নিরপেক্ষতার শ্লোগানে নয়।

আর মাদক বর্জন? এটাতো সংবিধানে ঘোষিত নীতি। এরজন্য মোরারজী গণভোট নিতে রাজি আছেন। তাঁর মতে দেশের অধিকাংশ মানুষ এই সর্বনাশা মাদক দ্রব্য থেকে নিজেদের মুক্তি চাইবে।

মোরারজী কোন কোন ব্যাপারে অনমনীয় বিশেষ করে আদর্শের ব্যাপারে। আবার বহুক্ষেত্রে তিনি মডারেট—রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে।

তাঁর সম্পর্কে অনেকে বলেন এম ফর মরালিটি। কথাটা মিথ্যা নয় কারণ মোরারজী বিশ্বাস করেন, নীতিহীন মানুষ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতই।

এবছরের অন্তর্বর্তী বাজেট

বিশেষ প্রতিনিধি

অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ এম প্যাটেল সম্প্রতি লোকসভায় ১৯৭৭-৭৮ সালের যে অন্তর্বর্তী কালীন বাজেট পেশ করেন তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো: আগামী বছর আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪৯১০ কোটি টাকা। ব্যয়ের হিসেব হলো ১৫৫৪২ কোটি টাকা। ঘাটতি থাকছে ৬৩২ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব খাতে আয় হবে ৮৭২০ কোটি টাকা। এরমধ্যে রাজ্যগুলির অংশ হবে ১৭৮৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব আদায় হবে ৬৯৩২কোটি টাকা। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক ৩৪৫৩ কোটি টাকা, বাণিজ্য শুল্ক ১৫৭৮ কোটি টাকা, কর্পোরেশন শুল্ক ১২৪৩ কোটি টাকা, আয়কর ৩২৭ কোটি টাকা।

সুদ ও লভ্যাংশ আদায় সহ কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হবে ২৩৪৭ কোটি টাকা। বাজারে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৮৯০ কোটি টাকা, ৮৯৪ কোটি টাকা, ১৭০৩ কোটি টাকা। অন্যান্য মূলধনী আদায়ের হিসেবে হলো ১৫১৭ কোটি টাকা।

মোট আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ হলো ১৫৫৪২ কোটি টাকা। এরমধ্যে ৫৭ শতাংশ উন্নয়ন খাতে (৮৯২০ কোটি টাকা), প্রতিরক্ষায় ২৮০৮ কোটি টাকা, ১৬০০ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দেয়া হবে ৭৮৪১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় হবে ১৪০৩ কোটি টাকা।

উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ হলো ৮৯২০ কোটি টাকা। এরমধ্যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাবদ ৫৫০৮ কোটি টাকা। সমাজ কল্যাণ ও সমষ্টি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ৮৬৭ কোটি টাকা এবং কেন্দ্র-শাসিত সরকারগুলিকে উন্নয়ন বাবদ দেয় ২৫৩৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া সাধারণ কাজকর্ম বাবদ পরিকল্পনায় ৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে। যোজনা বাবদ ১৯৭৭-৭৮ সালে মোট বরাদ্দ ৯৯৫৩ কোটি টাকা। চলতি বছরে ছিল ৭৮৫২ কোটি টাকা। যোজনা বাবদ ১৯৭৭-৭৮ সালে কেন্দ্রীয় খাতে ব্যয় হবে ৫০৫৩ কোটি টাকা। এছাড়া পরিকল্পনায় সহায়তা বাবদ ৪০৯৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। রাজ্য পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ ১৫২৫ কোটি টাকা এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা বাবদ ১৬৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতে উল্লেখ-যোগ্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে কৃষি ৪৯৫ কোটি টাকা, শিল্প ও খনিজ ২০৫৮ কোটি টাকা, জল ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন ২৪৬ কোটি টাকা, যানবাহন ও যোগাযোগ ৭০২ কোটি টাকা, সমাজ কল্যাণ ও সমষ্টি উন্নয়ন বাবদ ৫৯৫ কোটি টাকা।

লোকসভায় ১৯৭৭-৭৮ সালের অন্তবর্তীকালীন বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল জানিয়েছেন সরকারের নীতি ও আদর্শ কাজে পরিণত করার জন্য পঞ্চম যোজনা এবং ব্যয় বরাদ্দগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা এবং পরিবর্তন করা হবে। তিনি জানান, আগামী মে মাসে যখন নিয়মিত বাজেট পেশ করা হবে তার মধ্যেই এই পরীক্ষা করার কাজটি সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

১৯৭৬-এর মার্চ থেকে দেশের পাইকারী মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৫ শতাংশ। কাজেই ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে খুবই সতর্কভাবে। অর্থমন্ত্রী তাই জানিয়েছেন, মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য এবং দেশের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার সরকারীস্তরে খরচ এমনভাবে করতে ইচ্ছুক যাতে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণগুলি দূরীভূত হয়।

তিনি আরও জানান, জনগণ চান আমাদের অর্থনীতি এমনভাবে পরিচালিত হোক যাতে দেশের দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা দ্রুত দূর হয়, আয় ও সম্পদ বণ্টনের সমস্যা দূরীভূত হয়। সরকার জনগণের এই ইচ্ছাকে পূর্ণ মর্যাদা দেবেন।

যতক্ষণ না পঞ্চম যোজনার পূর্ণ পর্যালোচনা করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে নতুন পরিকল্পনা কিংবা উদ্যোগ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সমস্ত মন্ত্রক এবং সরকারী উদ্যোগকে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খরচ করার ক্ষেত্রে সব ধরণের কৃচ্ছ্রতা পালন করতে এবং অকারণ বাহুল্য বর্জন করতে।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, চলতি আর্থিক বছর ৪২৫ কোটি টাকার ঘাটতি নিয়েশেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত বাজেটে বলা হয়েছিল এ ঘাটতি দাঁড়াবে ৩২৮ কোটি টাকা।

শ্রী প্যাটেল বলেন, এ বছরে বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবের ফলে ১৯৭৭-৭৮ সালের মোট ঘাটতি দাঁড়াবে ১৪৩২ কোটি টাকা। তারমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল থেকে ৮০০ কোটি টাকা বার করায় ঘাটতি কমে দাঁড়াবে ৬৩২ কোটি টাকায়।

রেল বাজেট উদ্বৃত্ত, ভাড়াও বাড়ছে না

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারের অন্তর্বর্তী রেলবাজেটে ২৬.৪৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে। যাত্রীভাড়া অথবা মাশুলের হারেও কোন পরিবর্তন হবে না। ১৯৭৭-৭৮ সালের প্রথম চার মাসের জন্য এই ভোট অন অ্যাকাউণ্ট বাজেট সম্প্রতি লোকসভায় পাশ হয়ে গেছে।

রেলমন্ত্রী শ্রী দণ্ডবতে জানিয়েছেন, ১৯৭৪ সালের মে মাসের ধর্মঘটে অংশ নেবার জন্য যেসব রেলকর্মীকে সাসপেণ্ড বা বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের বিনাসর্তে আবার কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

রেলমন্ত্রী আরো জানান, কয়েকটি অনগ্রসর এলাকা, যেমন, কোঙ্কন, ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে অবিলম্বে রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হবেন।

আগামী বছর রেলে যাত্রী সংখ্যা ৬ শতাংশ বাড়বে, এবং মাল পরিবহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে ২১.৭ কোটি টন। যাত্রী ভাড়া ও মাশুল থেকে রেলের মোট আয় স্থির হয়েছে ২০৯১.৪৪ কোটি টাকা। যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় হবে ৬০৭ কোটি টাকা, অন্যান্য কোচ ব্যবস্থা মারফত ৯২.৩১ কোটি টাকা, মাল পরিবহণ থেকে ১৩৬২.৭৬ কোটি টাকা, এবং অন্যান্য সূত্র থেকে ৫৪.৩৭ কোটি টাকা।

রেল ব্যবস্থা চালু রাখতে ১৬৩৫.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কর্মীদের বার্ষিক ইনক্রিমেণ্ট, ১৯৭৭-৭৮ সালে মিয়াভয় কমিটির সুপারিশ রূপায়ণ, তৃতীয় বেতন কমিশন সুপারিশ জনিত বৈষম্যগুলির অবসান এবং কয়েকটি নন-গেজেটেড পদের উন্নতি সংক্রান্ত হিসেবগুলিও ধরা হয়েছে। রেলপথ, রোলিং ষ্টক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও বাড়তি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্দ্ধিত হারে রেল চলাচলের চাহিদা মেটানোর জন্যও বাড়তি জ্বালানীর টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

এছাড়া, রেল কনভেনশন কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ডেপ্রিসিয়েশন রিজার্ভ তহবিলে বরাদ্দের অঙ্ক বাড়িয়ে ১৪০ কোটি টাকা করা হয়েছে। পেনসন তহবিলের জন্যও আরো বেশী টাকা (৪০ কোটি টাকা) বরাদ্দ থাকছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে সাধারণ রাজস্বের লভ্যাংশের দায় বাবদ ১৯৭৬-৭৭ সালের সংসদীয় অনুমোদন অনুযায়ী ২২৫.৫৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এসব ব্যয় বরাদ্দ সত্ত্বেও ১৯৭৭-৭৮ সালে আনুমানিক ২৬.৪৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে।

১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত বাজেটে উদ্বৃত্তের কারণ কাজের উন্নতি এবং রেল চলাচলে নিয়মানুবর্তিতা। চলতি আর্থিক বছরে রেলের মাল বোঝাইয়ে এক সর্বকালীন রেকর্ড হবে বলে আশা করা যায়।

রেলমন্ত্রী জানান, চলতি আর্থিক বছরে ভারতীয় রেলযাত্রী সংখ্যা বেড়েছে অভূতপূর্বভাবে। ১৯৭৬-৭৭ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরে তার আগের বছরের তুলনায় শহরতলীর যাত্রীসংখ্যা বেড়েছে ১০ শতাংশ, আর দূরগামী যাত্রীসংখ্যা বেড়েছে ২৪ শতাংশ। এই বৃদ্ধির মূল কারণগুলি হলো বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করার নিরলস প্রয়াস, ঠিক সময়ে গাড়ীগুলির যাতায়াত, নতুন নতুন ট্রেন চালু করা এবং বর্তমানে চালু ট্রেনগুলির যাত্রাপথ বাড়ানো।

এই সব মিলিয়েই রেলমন্ত্রী জানান, ১৯৭৬-৭৭ সালে রেলের মোট আয় দাঁড়াবে ১৯৮৭.৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ বাজেটে অনুমিত আয়ের থেকে ৩২ কোটি টাকা বেশী।

চলতি আর্থিক বছরের সংশোধিত বাজেটে ৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছে কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে এবং খরচ কমিয়ে। রেল মন্ত্রী শ্রী মধু দণ্ডবতে আশা করছেন, বর্তমান আর্থিক বছরে রেলের নীট উদ্বৃত্ত দাঁড়াবে ৩৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। অথচ বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছিল ৮৯.৮ মিলিয়ন টাকা।

রেলমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৬-৭৭ সালে রেলের সব জায়গাতেই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে বিনাটিকিটে ভ্রমণ। এখন ট্রেন এবং ষ্টেটশনগুলি আরো পরিচ্ছন্ন, উন্নত হয়েছে চলতি ট্রেনে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং শতকরা ৯০ টি ট্রেনই সময়-সারণি অনুযায়ী যাতায়াত করছে।

রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি বছরে দেশের বিভিন্ন রাজধানী এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির মধ্যে দ্রুতগামী মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে চালু করে একদিকে যেমন যাতায়াতের সময় কমানো হয়েছে তার সঙ্গে সুযোগ বেড়েছে আরো সহজ ভ্রমণের। এই ট্রেনগুলির মধ্যে আছে তামিলনাড় এক্সপ্রেস, কর্ণাটক ও কেরল এক্সপ্রেস, জম্মু ও গোমো এক্সপ্রেস। এছাড়া ১৯৭৬-৭৭ সালে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পুনরায় রেল চালু করা। কর্মীদের উচ্চ কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে রেলমন্ত্রী জানান, পরিচালন কাজে কর্মীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে পরিচালন কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য একটি নতুন আদর্শ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

এটা খুবই আনন্দের কথা, ১৯৭৭-১৯৭৮ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব হয়েছে যাত্রী এবং মালের ভাড়া বৃদ্ধি না করেই।

দেখা হয় নাই

রণজিৎ ভট্টাচার্য

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সাইকেল রিকশার ষ্ট্যাণ্ডে আসতেই থামতে হল। পাশ থেকে ডেকে উঠল, 'ইন্দ্র না।' চমকে ফিরে তাকালাম। চোখে চোখে ক পলক মিলে গেল, অস্ফুটে বললাম, 'সন্তোষ!'

সন্তোষের মুখ হাসিতে বিস্তৃত হচ্ছিল, সাবলীল ভঙ্গীতে বলল, 'তাহলে চিনতে পেরেছ। অবশ্য না চিনলেও বলার কিছু নেই, প্রায় এক যুগ পরে দেখা তো। তার ওপর আমার এই রাজপোষাক। তোমার আর দোষ কি।' আমি সামান্য অপ্রস্তুত। কিন্তু সন্তোষ নির্মল হাসির তোড়ে সব সঙ্কোচ ভাসিয়েয়ে দিচ্ছিল, আমাকেও হাসতে হচ্ছিল, যেন কষ্টের হাসি, একটা দ্বিধা পদে পদে হাসিটাকে জড়িয়ে ধরছিল।

সন্তোষ বলল, 'কতদিন পরে এলে। মাসীমা তোমাকে দেখে দারুণ আনন্দ করবেন। তুমি তাহলে চল।'

'তুমি যাবে না?'

সন্তোষ এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'একটু দেরী আছে। আমাকে একবার রায়পাড়ায় যেতে হবে। মানে, মন দুই মাছের অর্ডার আছে, ডেলিভারীটা দিয়ে আসি।'

'মাছ।' আমি সহসাই বলে ফেললাম। সন্তোষ আবার হাসল, 'হাঁ। আমি মাছের ব্যবসা করি।'

সামান্যক্ষণ, আমরা উভয়েই স্তব্ধ হয়ে উঠছিলাম, হঠাৎ বললাম, 'তোমার সেই চাকরী?'

'সেই সিনেমা হাউসেরটা তো। ও আমি ছেড়ে দিয়েছি।' সন্তোষের স্বর সামান্য গম্ভীর, তার গলায় আবেগের বাষ্প জমছিল, বলছিল, 'সে এক দারুণ অবস্থায় পড়ে.... .তুমি জানবে কি করে সেই যে চলে গেলে, আর তো......। আচ্ছা তুমি চল, পরে দেখা হবে।'

রিকশাটা আস্তে আস্তে চলে গেল। আমার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল। রিকশার সামনের পাদানিতে বড় বাজরাটায় মাছের স্তুপ। উপরের সিটে সন্তোষ, সর্বাঙ্গে স্থূল মালিন্য ও লাবণ্যহীন রুক্ষতা। স্যাণ্ডেল আর আধময়লা ধুতি-শার্ট পরা গ্রাম্যতার ছবি।

মনটা বিরূপ হয়ে উঠছিল। শহরে বড় চাকরী করি। মুখে চোখে সেই আভিজাত্যের ছবি ফুটে উঠল কিনা জানিনা, কিন্তু চলনে-বলনে পোষাকে-পরিচ্ছদে সেই অভিজাত মনোবৃত্তির যে এতটুকু খুঁত নেই তা আমি খুবই জানি। সন্তোষের সঙ্গে সেদিক থেকে আমার জীবনযাত্রার তফাত নিঃসন্দেহে অনেকটাই। তবুও দীর্ঘদিন পরে তার সঙ্গে এই আকস্মিক সাক্ষাতের কালেই হয়ত সেই স্বাতন্ত্র্য হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এবং সে কথা ভেবেই এই মুহূর্তে মনটা বিচিত্র অস্বস্তিতে ভরে উঠল।

স্টেশন থেকে মাইল চারেক পথ। রিক্সাটা যখন মাসীমার দরজায় এসে পৌছাল একেবারে হৈ হৈ পড়ে গেল। অনেকদিন পরে আমাকে পেয়ে মাসীমা আর ছেলেমেয়েরা হাসিতে কলরবে বাড়িখানা ভরিয়ে তুলল।

বিরাট গ্রাম। বর্ধিষ্ণুও। গ্রামের পূর্ব প্রান্তে ব্রাহ্মণপাড়া। তারপরই দুলে, বাউরী, ডোম, জেলে এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের বাস। একটা বিরাট দীঘি দুই পাড়ার মাঝে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে। দীঘির এ পারেই মাসীমার বাড়ি। আর ওপারে সন্তোষের। সন্তোষের কথা তুলতে মাসীমার ছেলে সজল বলল, 'সন্তোষের সঙ্গে দেখা হল বুঝি। তোমাকে চিনতে পারলে? তার সব কথা জান তো?'

সজল আমার প্রায় সমবয়সী। চকিতে তার দিকে তাকালাম। প্রায় সাত বছর আগের কথা, তবু মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সব। সন্দিগ্ধস্বরে বললাম, কি কথা।'

'সে কথা শুধু তার নয়। তোমারও।'

মুহূর্তের স্তব্ধতায় আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলাম। বলে উঠলাম, 'তুই কি উমার কথা......'

সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল সজল। তারপর সরে এসে বলল, 'তুমি জানবেই বা কি করে। সন্তোষ বিয়ে করেছে উমাকে।'

আস্তে আস্তে চোখটা মুদে যাচ্ছে যেন।

উমাকে মনে পড়ছিল।

শুধু উমাকে নয়। তার লাঞ্ছনার কথাটাও মুহূর্তে মনে পড়ছিল।

সেদিন সন্ধ্যার আঁধারে আমি একা। আমার সামনে মুখোমুখি উমা দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু, বিপর্যস্ত চেহারা, চোখের কোলে শুকনো কান্নার দাগ। আগের রাত্রেই ঘটে গেছে দুর্ঘটনাটা। পশুতে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে ওর কুমারী শরীরটা। আমি কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিছু বলতে পারছিলাম না।

আমার চোখে চোখে চেয়ে ধরাগলায় উমা বলল, 'আর আমার কাছে এসোনা ইন্দ্রদা। তুমি যাও, আমার ভার আমাকেই বইতে দাও।'

বলেছিলাম, 'তোমার দুঃখের ভাগ যদি কিছু নিতে পারতাম। উমা, আমি তোমাকে······'

'জানি। মুখ ফুটে বলনি বলে কি আমি বুঝতে পারিনা। আমিও যে তোমাকে......। তবু তুমি আর এসোনা। এখান থেকে আমাদের যেতে দাও।'

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠেছিল সে। পরমুহূর্তে ছুটে চলে গিয়েছিল ওদের পল্লীর মধ্যে। গ্রামের শেষে যেখানে চৌধুরী বাবুদের সিনেমা বাড়িটা তারও কিছু পরে বাসরাস্তার ধারেই ওদের বসতি। প্রায় শ দুয়েক উদ্বাস্তু পরিবারের বাস ওখানে। ওরই মধ্যে মিশে গেল উমা। সে ফিরবে না আর। ফেরাতে পারবে না কেউ। আমি পারব না, সুকুমার পারবে না, সন্তোষও না।

মাসীমার বাড়িতে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। সন্তোষের গলা শোনা গেল। সজল ডাকল, 'আয় সন্তোষ। বস।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সন্তোষ বলল, 'না, এখন আর বসব না। আমি ইন্দ্রকে ডাকতে এলাম।' সন্তোষ সামান্য হাসল, আমাকে ইশারায় ডেকে আবার বলল, 'চল ইন্দ্র, একটু বেড়িয়ে আসি।'

নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এলাম। নীরবে চলতে লাগলাম সন্তোষের পাশে। দীঘি আর সন্তোষের পাড়া বাঁ দিকে ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম বাজারের দিকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সন্তোষ বলল, 'তোমাকে দেখে পুরানো কথা মনে পড়ে গেল।'

অন্যমনস্কের মত বললাম, 'আমারও'।

সন্তোষ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার চোখে চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, সামান্য দ্বিধা করে মুখ নিচু করে বলল, 'ইন্দ্র, আমি উমাকে বিয়ে করেছি।'

আমি স্থিরচোখে সন্তোষের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার দুচোখ ভরে একটা জ্বালা অনুভব করছিলাম। সুকুমার যা এড়িয়ে গেল, আমি যা করতে ভয় পেয়েছি, সন্তোষ তাই করেছে। সে আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে যেন। তাকে মহান বলে ভাবতে ইচ্ছা করছে।

বাজারে এসে গিয়েছিলাম। চারিদিক আলোকোজ্জ্বল। দোকানপাট। বাস ষ্ট্যাণ্ড। রিকশার আড্ডা। কোলাহলে কলরবে জমজমাট। বাজার ছড়িয়ে পথটা অন্ধকারে ডুবে গেছে। আমি জানি এবার আমরা পুলটার উপরে উঠব। সর্বাঙ্গে অন্ধকার জড়িয়ে একধারে বসব। সন্তোষ কথা বলবে। আমি শুনব।

'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে ইন্দ্র।' সন্তোষের গভীর স্বরে আমি শিউরে উঠলাম। সে জানতেও পারল না, বলে চলল, 'তুমি তো জান, স্বাভাবিক অবস্থায় উমা আমাকে বিয়ে করতে চাইত না। একটা কায়স্থর মেয়ে কি জেলের ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। বিশেষ করে যেখানে ভালবাসা নেই।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু—।'

বিচিত্র হেসে সন্তোষ বলল, 'অবশ্য দেখলে অন্যরকম মনে হবে। কিন্তু ইন্দ্র, নিপুণ কর্তব্যপালন আর ভালবাসার ঠিকানা যে আলাদা আলাদা। তুমি যদি বিয়ে করতে সুখী হত। সুকুমারকে ও চায়নি, ঘৃণা করত। আর আমি। আমাকে ও করুণা করত ইন্দ্র। তবু আমিই তাকে বিয়ে করলাম। সেই দুর্ঘটনাই ওকে আমার কাছে এনে দিল। কিন্তু ততদিনে তুমি চলে গিয়েছিলে।'

আমার চোখের সামনে অন্ধকারের পর্দাটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল সব। আমি সুকুমার আর সন্তোষ তিনজনেই উমার রূপবহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝলসে গিয়েছিলাম। সুকুমার বলত, 'ও বাবা ক্যাম্প-কলোনীর মেয়ে, খুব চালু। বলে কিনা কায়স্থ। আচ্ছা, আমিও কায়েতের ছেলে, কতদিন তুমি আমাদের খেলাও, দেখব।'

আমি হাসতাম। সন্তোষ চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে মনে হত যাব না উমার কাছে। কিন্তু আবার যেতাম, দেখা করতাম, পথের ধারে কিংবা দীঘির পাড়ে অথবা খালের বাঁধে। কখনও তিনজনে দল বেঁধে। কখনও একা। একদিন বলল, 'চলে যাচ্ছি এবার। সরকার থেকে হরিপালে আমরা বাস্তুজমি পেয়েছি। আর তোমাকে জ্বালাব না।'

'আমাকে?' আমার প্রশ্নে তার চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল,

'হাঁ। শুধু তোমাকে। শোন, ওদের সঙ্গে আস কেন। একা আসতে পার না।'

আমার বুক দুরু দুরু করছিল, বললাম, 'কেন।'

'কেন আবার'। মুহূর্তের বিরতির পর সে হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'বোকারাম, ভীরু। তুমি কি। না আছে বুদ্ধি না আছে সাহস।'

আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছিল।

মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই যন্ত্রণার কাহিনীটাও।

সেদিন সন্ধ্যার আঁধারে আমি একা। আমার সামনে মুখোমুখি উমা দাঁড়িয়েছিল। ভগ্ন বিধ্বস্ত চেহারা। শ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে অনুজ্জ্বলতা। আগের রাত্রেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে। রাতের অন্ধকারে একটা নির্মম পাশবতৃষ্ণার আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। তাকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে গেছে কলোনীর বাইরে। তার কুমারী শরীরটা পশুতে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে। সব বলেছে উমা, আমাকে বলেছে সব। আমি বিচলিত স্বরে একপা এগিয়ে আত্মবিস্মৃতের মত তাকে কিছু বলতে গিয়েছিলাম, সে সন্ত্রস্তের মত পিছিয়ে গিয়েছিল, ভগ্নস্বরে বলল, 'তুমি ফিরে যাও ইন্দ্রদা। তোমাকে আমি—। কিন্তু আর যে আমার কিছু নেই, আমি নষ্ট হয়ে গেছি। না, তুমি যাও, আর এগোনা। আমাদের এখান থেকে চলে যেতে দাও।'

দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়েছিল উমা। আমি স্তব্ধ নিশ্চল, নামটা কানে বাজছিল থেকে থেকে। সুকুমার। সুকুমার এমন কাজ করল।

কিন্তু চলে যেতে পারেনি উমা। সন্তোষ বলে চলল। আলোকোজ্জ্বল বাজারের দিকে চেয়ে বলে গেল তার কথা। যাওয়া হলনা উমার। প্রার্থনা নিয়ে, একটা বিপুল বাধার মত দাঁড়িয়েছিল সন্তোষ। তার মুখের দিকে বিচিত্র বিস্ময়ে তাকাল উমা, শান্তস্বরে বলল, 'আমি মরে গিয়েছি, আবর্জনা হয়ে গিয়েছি। বইতে পারবে তুমি? ফেলে দেবে না তো।'

'না।' বেশী কথা বলতে জানেনা সন্তোষ। সে বলল, তার গলা সামান্য কাঁপছিল 'আবর্জনা আমিও। তুমি যদি পার আমিও পারব।'

অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল উমা। কাঙাল মানুষটার এ এক নতুন চেহারা। এরা ফেলতে জানেনা বইতেই জানে। উমার শরীরে সহসা যেন মমতার জোয়ার বয়ে গেল মৃদু আবেগে সে থরোথরো কেঁপে উঠছিল, তার ভিজে চোখদুটি আস্তে আস্তে বুজে যেতে লাগল। সে অনুভব করছিল দুটি সবল বাহুর কঠিন বন্ধনে তার নরম দেহটা একটা উত্তপ্ত বুকে মিশে যাচ্ছে।

'তারপর' অন্ধকারে সন্তোষ আবার বলল, 'জান ইন্দ্র, আমাকে সিনেমার বুকিং ক্লার্কের চাকরী ছাড়তে হল। উমা বলল,—বামুন কায়েতের মত অপরের গোলাম মানায় না তোমাকে আর চাকরী করতে দেব না।'

'তবে।' সন্তোষ প্রশ্ন করল।

'জাত-ব্যবসা কর তুমি। মাছের ব্যবসা। চাকরী আর নয়।'

বিপুল বিস্ময়ে সন্তোষ বলল, 'সে কি। তবে ম্যাট্রিক পাস করলাম কেন।'

শান্ত স্বর উমার, অটল, উত্তর দিল, 'হোক'।

সন্তোষ অনেকক্ষণ চেয়ে রইল উমার দিকে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে তো কিছু পুকুর জমা নিতে হয়। কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার।'

'হোক। তুমি বি-ডি-ওতে যাও, ব্যাঙ্কে যাও। এ সব ব্যাপারে ঋণ দিচ্ছে। তুমিও নিশ্চয়ই পাবে।'

সন্তোষ নিঃশব্দে ক'পলক চেয়ে রইল। উমার মুখ অতি ধীরে শান্ত হাসিতে বিস্তৃত হচ্ছিল, জলে টলমল করছিল দুটি চোখ। আস্তে আস্তে সন্তোষের বুকে মাথা রেখে ধরাগলায় বলল, 'আমার এই সাধটুকুতে বাধা দিও না গো। আমরা বামুন হতে চাইনা কায়েত হতেও চাইনা। তুমি যা, তুমি তাই হও। আমাকে এ বাড়িতে সত্যিকারের বৌ হতে দাও।'

সামনের রাস্তা দিয়ে ঝড়ের মত একটা বাস চলে গেল। মুহূর্তের জন্য অন্ধকার ব্রিজটা আলোকিত হয়ে উঠল। সন্তোষ বলল, 'হরিপালের লাষ্ট বাস এসে গেল।' চোখটা মুছে আস্তে আস্তে বললাম, 'চল।' ফিরতে ফিরতে সন্তোষের কথাগুলি মনের ভিতরে নড়াচড়া করছিল। সন্তোষ এখন ভাল ব্যবসা করছে। অনেকগুলি পুকুর জমা নিয়েছে, মাইনে দিয়ে কয়েকজন লোকও রেখেছে। গ্রামের অন্য দিকে ছোট একটি বাড়িও করেছে। উমার জন্যই হয়েছে এই সব। উমা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আমার চোখে চোখে সন্তোষ বলল, 'উমার সঙ্গে দেখা করবে না?'

হৃদপিণ্ডটা ধক করে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না না, আজ থাক। কাল—কাল দেখা করব।'

কিন্তু আমি জানি কাল দেখা হবে না। কোনদিনই না। কাল ভোরের বাসেই চলে যেতে হবে আমাকে। তারপর ট্রেন। শহর, আমার চাকরী আমার সমাজ আমার নিজস্ব জীবনযাত্রা। আজকের এই বিচিত্র রাত্রির পর আর থাকা যাবে না এখানে। ভোরের বাসটা যখন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে যাবে তখনও ভুলতে পারব না। বুকের আকাশে শুকতারার মত জ্বলতে থাকবে উমার কথা সন্তোষের কথা। রক্তরাঙা পূর্বদিগন্তে চেয়ে চেয়ে মন ভরে প্রার্থনা করব,—যারা ব্রাহ্মণ হতে চাইল না কায়স্থ হতে চাইল না, যারা ভুয়া সম্মানের মোহ ত্যাগ করে পরিশ্রমের মুকুট মাথায় তুলে নিল, দুঃখের পথ মাড়িয়ে যারা জীবনটাকে ফুলেফলে ভরে তুলতে চাইল, তাদের গর্ব তাদের অহঙ্কার যেন কোনদিন চূর্ণ না হয়।

মহিলা মহল

যাঁরা মা হ'তে চলেছেন

বাণী চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ আজ নিদারুণ ভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। শিশু হচ্ছে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। যদি অপুষ্ট শিশু জন্মায় তাহলে আমরা উত্তর কালে সেই শিশুর কাছ থেকে বড় একটা কিছু আশা করতে পারিনা। গর্ভবতী মায়েদের এই শিশুদের জন্যই ক্যালসিয়াম ও লৌহ খনিজের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন তার বৃদ্ধি মায়ের শরীরের রক্তের ওপরেই নির্ভর করে। মা যদি রুগ্ন ও অসুস্থ হয় তাহলে তার শিশু কখনই সুস্থ ও সবল হয়না। আমাদের দেশে গর্ভবতী মায়েদের দিকে বোধহয় বড় একটা নজর দেওয়া হয়না। সেজন্যই আমাদের দেশে অপুষ্ট শিশুর হার এত বেশী। মায়ের শরীরের রক্তের ওপর যখন শিশুর বৃদ্ধি নির্ভর করছে তখন ঐ রক্তের জন্য মায়ের শরীরে যথেষ্ট ক্যালসিয়ামের দরকার হয়। গর্ভাবস্থায় মা যদি ঠিকমতো ক্যালসিয়াম না পায় তাহলে বাচ্চার গড়ন ভালো হয়না। ফলে সে জন্মাবার পরেই কোননা কোন রোগের শিকার হয়। তাছাড়া বাচ্চা জন্মাবার পরও মায়ের দুধের জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। মা যদি ঠিকমতো ক্যালসিয়াম না পায়, তাহলে তার পেশী থেকে বাকি ক্যালসিয়াম চলে যায় এবং বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, মায়েদের বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত পেশীগুলো বেঁকে যায়। অনেকের অস্ট্রোম্যালেসিয়া রোগ হয়। গর্ভাবস্থায় ক্যালসিয়ামের অভাব হলে বাচ্চার দাঁত উঠতে দেরী হয় এবং পরে দাঁতে নানা রকম রোগ দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দিনে কতটা ক্যালসিয়ামের দরকার? দিনে ১.৫ গ্রাম গর্ভবতী মায়েদের, আর যাঁরা বাচ্চাকে দুধ দেয় তাদের দরকার ২ গ্রাম। সবচেয়ে বেশী ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় দুধ থেকে। তারপর ছোট মাছ, সবুজ শাকসব্জি, ডাঁটাযুক্ত শাকে বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। তাছাড়া ছোলা, ডাল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। গর্ভবতী মায়েরা যদি পান খেতে পাবেন তাহলেও ঐ পান ও চুনের মধ্যে বেশ ভালো ক্যালসিয়াম পেতে পারেন। ৮টা পান ও চুন সাধারণত দশ আউন্স দুধের কাজ করে।

এইবার লৌহ খনিজের প্রসঙ্গে আসছি। গর্ভবতী মায়েদের লৌহখনিজেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যদি যথেষ্ট পরিমাণ লৌহ খনিজ গর্ভাবস্থায় না পাওয়া যায় তাহলে অ্যানিমিয়া হতে পারে। ঠিকমতো রক্তের হোমোগ্লোবিন বজায় রাখতে হলে লৌহখনিজ জাত খাদ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে হবে। লৌহের ঠিকমতো সরবরাহ না হলে বাচ্চারা বড় ও স্বাস্থ্যবান হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ গর্ভবতী মায়েরাই গর্ভাবস্থায় অ্যানিমিয়ায় ভোগেন এবং পরে বাচ্চা জন্মাবার পরও নানারকম রোগের তারা শিকার হন। কেননা রক্তে হোমোগ্লোবিনের অভাব হলে শরীরের সমস্ত অংশে ঠিকমতো অক্সিজেন পৌঁছায় না। সাধারণত ঐ অক্সিজেন গ্রহণ করেই গর্ভস্থ শিশু বড় হয়। সুতরাং রক্তে ঠিকমতো হেমোগ্লোবিন না থাকলে ঐ শিশু অক্সিজেনের অভাবে কমজোরী বা রুগ্ন হয়। সুতরাং সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে গর্ভাবস্থায় লৌহ খনিজের ঘাটতি না হয়।

লৌহ খনিজ কোন কোন খাদ্য থেকে মায়েরা পেতে পারেন? ডিমের কুসুম, মাংসের লিভার, ও কিডনীতে বোধহয় সবচেয়ে লৌহ খনিজ পাওয়া যায়। তাছাড়া শুকনো ফল, টাটকা শাকসব্জিতে যথেষ্ট লৌহ খনিজ আছে। আলুতেও লৌহ খনিজ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। তাছাড়া পাবেন আপেল, কলা, ডাল, বাজরা, জোয়ার, ভাত, রুটি, কাঁচকলা, থোড়, টমাটো, মোচা, ইত্যাদিতে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহ খনিজ পাওয়া যায়। দিনে ১০ থেকে ১২ গ্রামের মতো দরকার হয় গর্ভবতী মায়েদের।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গর্ভাবস্থায় ও শিশু জন্মাবার পরও মায়েদের যথেষ্ট পরিমাণে লৌহখনিজের দরকার হয়।

বাচ্চাকে সুস্থ-সবল ও রিকেটের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে এবং মায়েদের অ্যানিমিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহ খনিজের যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

আগুন নিয়ে খেলা নয়

কমল ভট্টাচার্য

খবরের কাগজের পাতা খুললে রোজই প্রায় চোখে পড়বে শহর বা শহরতলীর কোথাও না কোথাও আগুন লেগেছে। জীবন ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এক কথায় হয়ত কেউ কেউ বলবেন, এটা নিছক দুর্ঘটনা। করার কিছু নেই। কিন্তু সত্যিই কী তাই? ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলে দেখবো আমরা আগুন সম্পর্কে সচেতন হলে এ ধরণের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনীর হিসেব মত সারা রাজ্যে বছরে ৩,৫০০ টির মত আগুন লাগার দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে মুহূর্তের অসাবধানতা, অসতর্কতা আর অজ্ঞতাই এই সর্বনাশকে ডেকে নিয়ে আসে। তাই আগুনের ধ্বংসকারী শক্তি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দরকার এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা।

আগুন লাগার ঘটনা প্রধানত আমরা দুরকমভাবে দেখতে পাই। বাসগৃহ অথবা ঘর-বাড়িতে আগুন লাগা, এবং কল-কারখানা গুদাম ও অফিস বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা। এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যেকোন আগুনই কিন্তু শুরুতে বড় আকার ধারণ করে না। তাই আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে যদি আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে সহজে তা আয়ত্তে আনা যায়। প্রকৃত পক্ষে অভাব হল একাজটা করার মত উপস্থিত বুদ্ধি এবং মানসিকতা। পক্ষান্তরে আগুন দেখলেই আমরা ভয়ে দোড়াদোড়ি শুরু করি অথবা কি করব বুঝতে না পেরে চেঁচামেচি শুরু করে দিই।

ঘর-বাড়িতে আগুনের সূত্রপাত ঘটে হয় রান্নাঘর থেকে, না হয় বৈদ্যুতিক সংযোগ মারফৎ। রান্না ঘরে রান্না করতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লাগাতো হামেশাই ঘটে। কয়লার উনান অথবা কেরোসিন ষ্টোভ জ্বেলে কাজের সময় আমাদের মা-বোনেরা সতর্ক হলে—এ বিপদ এড়ানো যায়। উনুনের সামনে কখনোই কোন দাহ্য পদার্থ রাখা ঠিক নয়। আর কেরোসিন ষ্টোভেরও জ্বলন্ত বা গরম থাকা অবস্থায় কখনও কেরোসিন ঢালা উচিত নয়। গ্যাসের উনান, ষ্টোভও অনেক বিপত্তি ঘটায়। এ ধরনের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হারও নেহাৎ কম নয়। যেমন গ্যাসের উনানের কক খুলে যদি দেশলাই-এর খোঁজে যেতে হয় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই কক খোলার সঙ্গে সঙ্গে উনান জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত। এছাড়া গ্যাসের উনানের রবার পাইপ ফেটে গেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন কিছুদিন আগে বালিগঞ্জের কর্ণফিল্ড রোডের এক বাড়িতে গ্যাসের উনান জ্বালাতে গিয়ে এক পরিবারের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল সেকথা নিশ্চয়ই আমাদের স্মরণ আছে। ইলেকট্রিক উনানও সবসময়ে নিরাপদ নয়। উনানের ক্ষমতা অনুযায়ী বৈদ্যুতিক লাইন করা আছে কিনা দেখা দরকার। নচেৎ তারে তারে আগুন ধরে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এগুলি ছাড়া তুচ্ছ বিড়ি-সিগারেটের আগুন অনেক সময় বিপত্তি ঘটায়।

গ্রামাঞ্চলে আর এক অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ গ্রামের বাড়ি প্রধানতঃ কাঠ, বাঁশ, হোগলা, খড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। এর ওপর কেরোসিনের কুপি বা প্রদীপই সম্বল। তাই আগুনের সংখ্যাও বেশি। গ্রামে দমকল বাহিনীর কেন্দ্র নেই। সুতরাং গ্রামের মানুষদের এবিষয়ে সাধারণ জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি এবং সতর্কতা দরকার।

আগুনের এই কুটিল রূপটির কথা মনে রেখে সবারই কিন্তু সজাগ হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনীও এ ব্যাপারে জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রসারিত করেছেন সাহায্যের হাত। শুধু এখন কেন? ১৯৫৬ সাল থেকে ১৪ই এপ্রিল দিনটি তাঁরা পালন করছেন অগ্নি নিরোধ দিবস হিসাবে। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে ১৪ই এপ্রিল এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে চলেছে। এর মূল কথাই হল একটা স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করে। তাই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত

কলকাতা ও শহরতলীতে সম্প্রতি বড় বড় অফিস বাড়ি, গুদাম ইত্যাদিতে আগুন লাগার ঘটনা বেড়ে চলেছে। গত দুবছরের মধ্যে কলকাতায় নেতাজী সুভাষ রোডের অগ্নিকাণ্ড অথবা বড় বাজারের মারাত্মক আগুনে জীবন হানির কথা এখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি। এই সমস্ত আগুনের ময়না তদন্ত করতে গিয়ে দমকল বাহিনীর অফিসাররা দেখেছেন আগুন প্রতিরোধ করা সম্পর্কে দমকল বাহিনীর নির্দেশ অমান্য করা, বে-আইনীভাবে দাহ্য পদার্থ মজুতই এর প্রধান কারণ।

দমকল বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে ইকুইপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কথায় কথায় তিনি জানালেন, শিল্পে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সহজ দাহ্য পদার্থের ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। তাই এগুলোর আইন মাফিক ব্যবহার ও মজুত করার দিকে বিশেষ যত্নবান না হলেই মারাত্মক আগুনের সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া আকাশ ছোঁয়া বাড়ির কর্তারা বা কলকারখানার মালিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগুন নেভানোর কোন উপযুক্ত বন্দোবস্তের দিকে তেমন লক্ষ্য রাখেন না।

এইসব বড় বড় বাড়ি, গুদাম ও কলকারখানায় আগুন প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকার এক নতুন আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইন বলে পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনীর অধীনে একটি বিশেষ শাখা খোলা হচ্ছে। এর নাম অগ্নি নিরোধ শাখা। এই শাখার অধীনে আবার একটি করে পরিদর্শক দল থাকবে। তাঁরা প্রেক্ষাগৃহে অথবা আমোদ-প্রমোদের স্থানগুলি পরিদর্শন করবেন। দেখবেন আগুন নেভানোর প্রাথমিক ব্যবস্থা আছে কিনা। এছাড়া হঠাৎ আগুন লাগলে তা নেভাতে জলের জন্য যাতে ভাবনায় পড়তে না হয় তার জন্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও এই পরিদর্শকদলের ওপর দেওয়া হয়েছে।

এই নতুন আইনে রাজ্য দমকল বাহিনীর প্রধান অধিকর্তার হাত আরও মজবুত হয়েছে। এখন থেকে যদি কোন জায়গায় বে-আইনীভাবে দাহ্য পদার্থ মজুত করা হয় এবং দমকল অধিকর্তা যদি মনে করেন যে এটা জন-জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক, তাহলে তিনি এ দাহ্য পদার্থ অবিলম্বে সরিয়ে নেবার হুকুম দেবার অধিকারী থাকছেন। হুকুম পাওয়ার পরও যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদেশ অমান্য করেন, তাহলে অধিকর্তা পুলিশের সাহায্যে তা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হবেন।

টাকা আনা পাই

অর্থমন্ত্রী ১৯৭৭-৭৮ সালের যে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে আয় হিসেবে যে টাকা পাওয়া যাবে তার প্রতিটিতে ২২ পয়সা আসবে আবগারি কর থেকে, ১০ পয়সা শুল্ক, ৮ পয়সা পৌর কর, ২ পয়সা আয়কর এবং অন্যান্য কর থেকে ২ পয়সা। করবিহীন রাজস্ব থেকে ১৫ পয়সা, ধার শোধ বাবদ ১১ পয়সা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ১০ পয়সা, বৈদেশিক ঋণ ৬ পয়সা, এবং অন্যান্য খাতে আয় ১০ পয়সা। বাকী ৪ পয়সা আয়ের কোন ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা হয় নি।

এ ভাবে যে টাকা আদায় হবে সরকার তার মধ্যে থেকে প্রতি টাকার ৩৭ পয়সা খরচ করবেন যোজনা বাবদ, ২০ পয়সা উন্নয়ন খাতে, প্রতিরক্ষার জন্য ১৮ পয়সা, সুদবাবদ ১১ পয়সা, রাজ্যগুলিকে সহায়তা বাবদ ৫ পয়সা, এবং অন্যান্য খরচ ৯ পয়সা।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনা করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র ভারতের মানুষের কাছে নয় সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি গ্রন্থাগার জগতেরও একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব মানুষ। আজ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার যে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে তার পেছনে প্রভাতকুমারের সেবা নিষ্ঠা আর সীমাহীন ঐকান্তিকতা ছিল অনেকখানি। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে কাজের ভার নেবার পর তিনি এখানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর ধরে তিনি বিশ্বভারতীর পাঠভবনে শিক্ষাভবনে অধ্যাপনা ও গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন। ইতিহাস দর্শন সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান আমাদের বিস্মিত করে। দিনের পর দিন অক্লান্ত অধ্যয়ন আর অনন্য সাধনা প্রভাতকুমারের জীবনের মূলমন্ত্র।

: বাল্যজীবনে পাঠদ্দশায় ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা ছিল কি?

: কোন আশা আকাঙ্খা ছিল না। আমাদের সবটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

কুমারের জন্ম। বাবা নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। মায়ের নাম গিরিবালা দেবী। রাণাঘাট পাল চৌধুরী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর চলে আসেন গিরিডিতে। কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় ১৯০৭ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাতে তিনি গিরিডি সরকারী বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। পরের বছর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৯ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক হিমাংশু প্রকাশ রায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসেন।

: ১৯০৯ সালের শেষ ভাগে প্রথম রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসি। তারপর বত্রিশ বছর তাঁকে দেখবার, জানবার তাঁর কথা শুনবার, অপার স্নেহ পাবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক এমন কি সভা সমিতিতে তার বিরোধিতা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। 'রবীন্দ্র পরিচয়' সভার আবেদন পত্রে লিখেছিলাম, ১৯১০ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনী সংকলনের ভার গ্রহণ করেছিলাম। তার গ্রন্থাগারে আমার ঘরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে
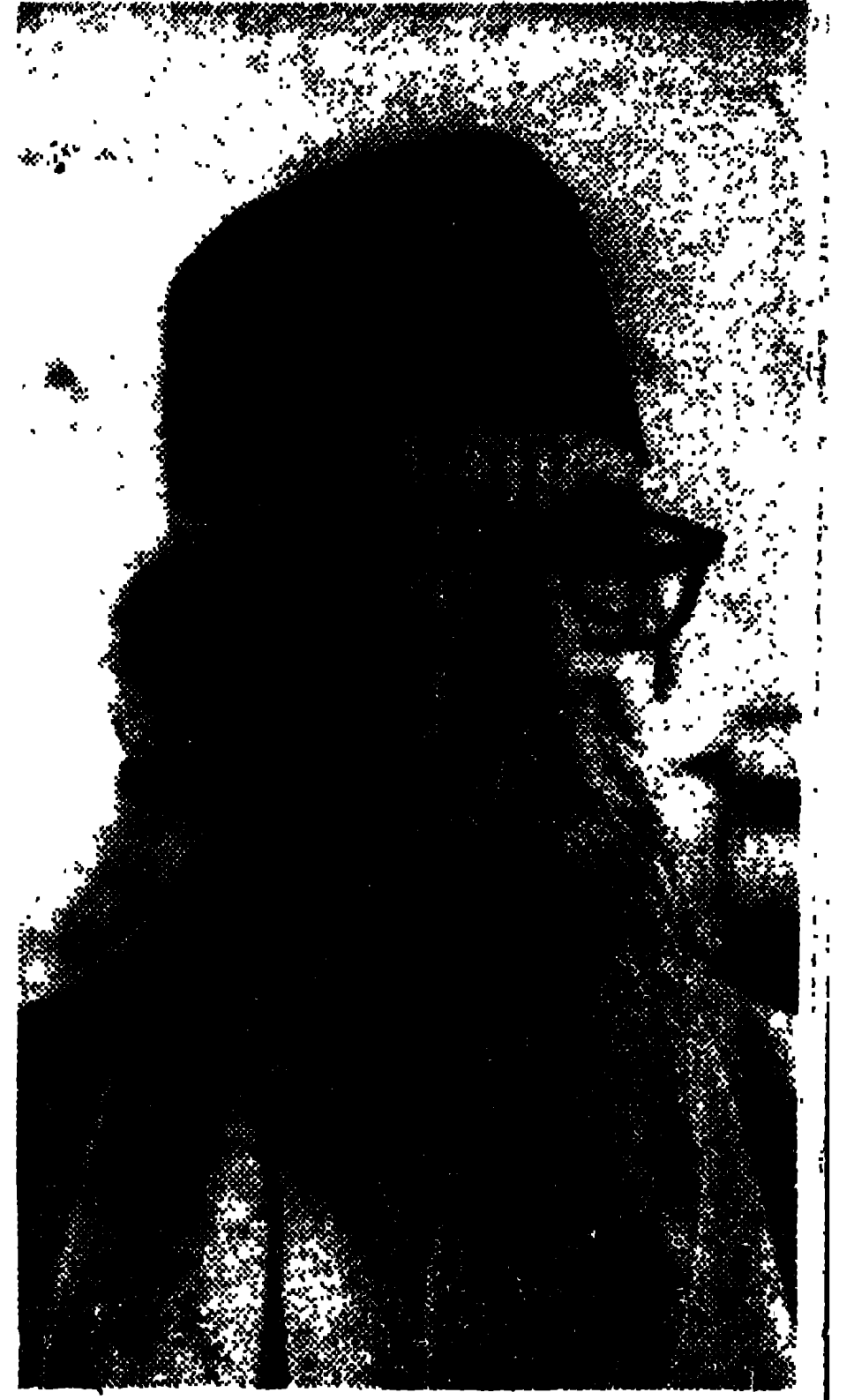
পাঠকরা ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি দেখিয়েছেন। ও সেরকম পত্র পাই। পত্রিকাদি ক সাহায্য পাই। জ্ঞানের রথ কি হলের টিনাতে চলে? বহুজনের

মুখোমুখি

রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল মাত্র কবি হতেন তাহলে হয়তো তাঁর জীবনচরিত রচনার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন সত্তায় কবি ও কর্মীর যে যুগ্মরূপ ফুটেছে তা এর আগে কোন কবি বা কর্মীর জীবনে এমন সুষমভাবে পরিস্ফুটনের অবকাশ পায়নি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
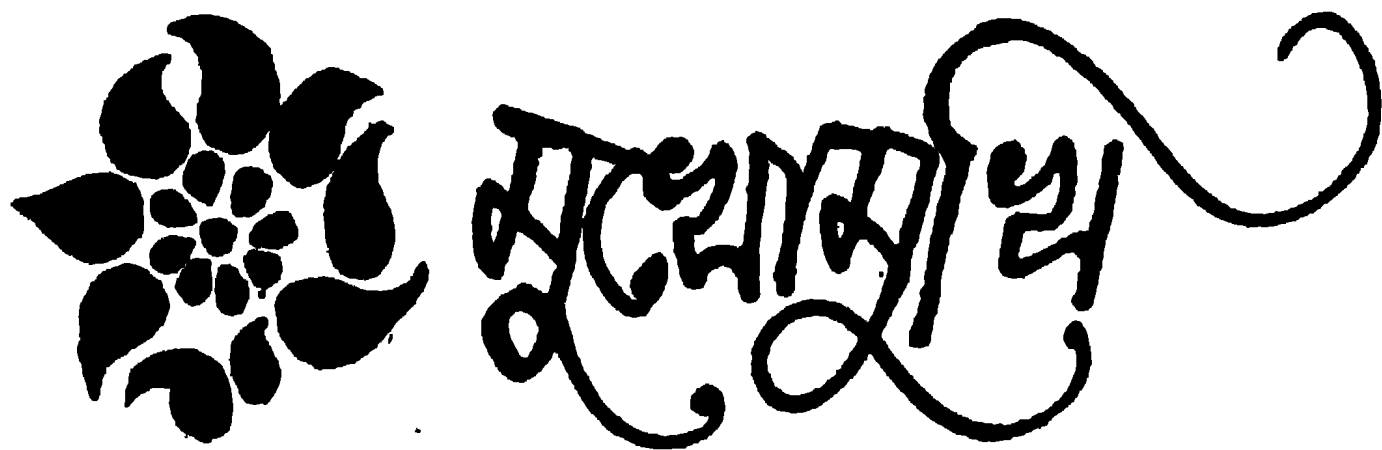
পড়াশুনায় অত্যন্ত মাঝারি ধরণের ছিলাম। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। গিরিডিতে যাবার পর ধীরে ধীরে পড়াশুনোর দিকে বিশেষ ঝোঁক যায়।

বোলপুরের ভুবননগরের বাড়ীতে 'গবেষণার কারখানায়' বিদগ্ধ প্রৌঢ় জ্ঞানতপস্বী প্রভাতকুমারের মুখোমুখি বসে কথা বলছিলাম। ১৮৯২ সালের ২৭শে জুলাই নদীয়া জেলার রাণাঘাটে প্রভাত

যে সব লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো তা থাকত। এগুলির দিকে তাকাতাম আর ভাবতাম এগুলির ব্যবহার করব না? সেই হলো প্রেরণা।

: এক বিশাল ব্যক্তিত্বের জীবনচরিত লেখার পর এ দেশীয় পাঠকসাধারণের মনে তার প্রতিক্রিয়া কতখানি নাড়া দিয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

হাতের স্পর্শে তা চলে। জীবনী লেখাও তাই। তা না হলে রবীন্দ্র জীবনীর চতুর্থ সংস্করণেও সংযোজন, সংশোধন চলতো কি।

আধুনিক ভারতবর্ষে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভালো করে চীনা ভাষার সাহিত্যের ও সংস্কৃতির আলোচনা শুরু করেছিলেন। বিশ্বভারতীর সূচনা পর্বে যাঁরা চীনা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গভীর ভাবে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সুবিখ্যাত

পণ্ডিত প্রভাত কুমার। তিনি কাঁশী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদে বৃহত্তর ভারত সর্ম্পকে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। 'ইণ্ডিয়ান লিটারেচার ইন চায়না এণ্ড দি ফার ইষ্ট' গ্রন্থ রচনা করে সেকালের প্রাচ্য-বিদ্যার চর্চাকল্পে ভারতে তিনি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন। প্রাচ্য-বিদ্যার তৎকালীন বিশিষ্ট ইংরেজ অধ্যাপক ডঃ জি. এইচ. ল্যাস এই বইটির ভুয়সী প্রশংসা করেছিলেন। প্রখিতযশা হিন্দী সাহিত্যিক ও প্রাচ্যবিদ শ্রী রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রভাত কুমারের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর 'বোদ্ধ সংস্কৃতি' নামক হিন্দী বইটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। তিনি বাংলা ভাষার কোষগ্রন্থ 'জ্ঞান ভারতী' রচনা করেন। ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের স্বাক্ষর হচ্ছে 'ভারত পরিচয়', ভারতের জাতীয় 'আন্দোলন', 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রভৃতি বই। ''বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ'', ''বাংলা দশমিক বর্গীকরণ''—গ্রন্থাগার জগতের অমূল্য বই। 'রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক', 'রবীন্দ্র জীবন কথা', 'শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতী', 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', 'গীত-বিতান' (কালানুক্রমিক সূচী) প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র জীবন কথার ইংরেজী অনুবাদ 'লাইফ অব টেগর' বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বইটি অনুবাদ করেছেন বিশ্বভারতী ইংরেজী বিভাগের প্রধান শিশির কুমার ঘোষ।

যদিও ব্যক্তি মাত্রই অনেকখানি পারিপার্শ্বিক ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষেরা বা প্রতিভাবানেরা অনেক সময় ইতিহাসের ঊর্দ্ধে ?

: কোন ব্যক্তিই সম সাময়িক ইতিহাসের ঊর্দ্ধে থাকতে পারেন না। সাময়িক আন্দোলন-আলোড়নে ঊর্দ্ধে যেখানে কবি সেখানেই তিনি সার্থক। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ এমন কি কবিতাও আছে যা সাময়িকী। সেগুলি সাহিত্যের স্থানে। অধিষ্ঠিত হবে না তো।

১৯৫৭ সালে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 'রবীন্দ্র জীবনী'র জন্য প্রভাত কুমার রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। বাষট্টি সালে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমী কর্তৃক আমন্ত্রিত হযে ভারত সরকারের ব্যবস্থা-পনায় তিনি এক পক্ষ কাল রাশিয়া সফর করেন। ১৯৬৫ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক তিনি 'দেশিকোত্তম', উপাধিতে ভূষিত হন। টেগর রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট থেকে 'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য্য' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি থেকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার ও মানপত্র পান। তিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

এই পঁচাশি বছর বয়সেও প্রভাত কুমারের যুবকোচিত কর্মক্ষমতা আমাদের অবাক করে। যদিও এই কর্মক্ষমতা তাঁর জন্মগত। এই বয়সেও তিনি মনের আনন্দে কাজ করে চলেছেন। প্রায় কুড়ি হাজার 'ডে বাই ডে কার্ড' আছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য তা চিঠি বা প্রবন্ধ বা কোন ঘটনার উল্লেখ হোক তা কার্ডে লিখে যথাযথ স্থানে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কালানু-ক্রমিক ভাবে সাজিয়ে রাখার কাজ চলছে। রবীন্দ্র জীবনী সংস্করণ, ফিরে ফিরে চাই, নব জ্ঞান ভারতী বা বিশ্ব ভূগোল কোষের নতুন সংস্করণের কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথ দশ বছর বয়েস থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত যে সমস্ত ইংরেজী কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তার মূল অনুসন্ধানের কাজ হচ্ছে। এই সব কাজে সহায়তা করছেন প্রবীর দেবনাথ, দিলীপ দত্ত ও দ্বিজপদ হাজরা।

কালের হিসাবে যদিও তাঁকে বৃদ্ধ বলতে হয় কিন্তু দেহ মনের সজীব স্বাস্থ্যে তিনি যুবক ছাড়া আর কিছু নন। প্রভাত কুমারের কর্মতৎপরতা এবং শ্রম স্বীকার ক্ষমতা যে কোন তরুণেরই ঈর্ষা বা আদর্শের বিষয় হতে পারে।

সাক্ষাৎকার : **স্বপনকুমার ঘোষ**

পয়লা বৈশাখ

২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের যা কিছু হিসাব নিকাশ শোক দুঃখ হতাশা কিংবা সুখ আনন্দ উন্মাদনা। তাই ইংরাজী সন তারিখের দাপট এতই বেশী যে বাংলা নববর্ষের রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে এর স্বীকৃতি সত্যি সত্যিই এক অসাধ্য সাধনা। তবু রৌদ্রদগ্ধ চৈত্র শেষে যেমন চড়কের উৎসব, চৈত্র সমাপ্তিতে বৈশাখের প্রথম সকালে বাঙালী জনজীবনে হাল-খাতার প্রাক্‌লগ্নে চড়কের মেলা, নীলের উপবাস এবং 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা দেওয়ার অভিযান সব মিলিয়ে আমাদের সামাজিক কর্মীয় এবং ধর্মীয় জীবনের শেষের দিনটি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। আসলে নববর্ষকে স্বাগত জানাবার শাশ্বত অনুষ্ঠান।

এদিনের নববর্ষ উৎসবে যুবমন এক সুদৃঢ় আশার স্বপ্নে বিভোর। সে স্বপ্ন বাস্তব অবাস্তব উভয়ই হতে পারে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার মত অবস্থা আদৌ নয়। অসীম অনন্ত উদ্দীপনার ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে চরিত্র পরিস্ফুটনে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। সেই সরল বিশ্বাস নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা। স্বাগতম ১লা বৈশাখ। আজ থেকে ১২১ বছর আগে অর্থাৎ ১২৬৩ সনের ১লা বৈশাখ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় নববর্ষকে স্বাগতম জানিয়ে লেখা হয়েছিল--"হে নববর্ষ! আপনি আগমন মাত্রেই আমার দিগ্যে হর্ষপ্রদান করুন, আমরা গত মহাশয়ের অধিকারে অশেষ প্রকারেই ক্লেশ পাইয়াছি, কোন বিষয়েই সুখের সংযোগ ও শান্তির সম্ভোগ হয় নাই, কেবল দুঃখেই কালযাপন হইয়াছে, বর্ত্তমান একবৎসর কাল আমরা সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বোতো-ভাবেই আপনার অধীন হইলাম, আপনার মনে কি আছে বলিতে পারিনা, আপনি ভালোমন্দ যাহা করিবেন তাহাই হইবে মনুষ্যমাত্রেই অদ্য অতি সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করিতেছে, পুরাতন সকল পরিত্যাগ করিয়া নূতনের অনুরাগ করিতেছে।"

উল্কি আঁকা শরীর

হাবিব আহসান

'উল্কি' এদেশের একটি প্রাচীন লোকচিত্র। শুধু এদেশেই নয় ভারতের বাইরেও কিছু কিছু উল্কি আঁকা মানুষ দেখা যায়। 'উল্কি' উপজাতীয় মানুষের একটি শিল্প। সমাজতত্ত্বের কোন কোন গবেষকের মতে উল্কি বহু ঐতিহ্যশালী আধুনিক শিল্পের জনকও। আজকের দিনের 'আলপনা' আঁকার রেওয়াজ কিছু পরিমাণে উল্কি চর্চ্চার দ্বারা প্রভাবিত বলে অনেকের দাবী।

'উল্কি' এক ধরনের স্থায়ী মনোগ্রাম। নীলচে রঙ—ত্বকের ভেতর থেকে উদ্ভাসিত। এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সূঁচ ফুটিয়ে উল্কি আঁকা হয়। সুতরাং উল্কি গ্রহণ পর্ব কিঞ্চিৎ কষ্টকরও বটে। এর জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকও দিতে হয়। তুলনায় মেয়েরাই বেশি উল্কি ব্যবহার করে। কিছু সংখ্যক পুরুষকেও সাগ্রহে উল্কি নিতে দেখা যায়। বিভিন্ন আদিবাসী ছাড়াও পাল্কী-বেহারা, ভোজপুরী গোয়ালা এবং ধাঙড়দের বাহুতে এই ছাপ দেখা যায়। রাম-সীতা, ভক্ত হনুমান, হর-পার্বতী, সূর্যমুখী, হরতন, গণেশ প্রভৃতি অসংখ্য উল্কি এদের বাহুতে শোভা পায়। এই উল্কি গ্রহণের মূলে রয়েছে প্রাচীন সংস্কার এবং অন্ধ ধর্মীয় প্রত্যয়। উল্কি গ্রহণ করলে অপদেবতার কোপ এবং মহামারী ও মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় বলে এদের বিশ্বাস। অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে ফাইলেরিয়া রোগের প্রতিরোধক হিসাবে গলায় উল্কি জাতীয় এক ধরণের ক্রস চিহ্ন আঁকতে দেখা যায়। তবে নিছক সখের বশেও অনেকে উল্কি ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশের অনেক বিদেশী সৈন্যও হাতে উল্কি নিতেন।

এদেশের সম্ভ্রান্ত সমাজে উল্কির আদৌ প্রচলন নেই। হিন্দু পরিবারে উল্কি নেওয়া নিষিদ্ধ। এই নিয়ে স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মজার গল্প আছে। এক জমিদার বধূ এক শিল্পীর প্রেমে পড়লে শিল্পী তার দয়িতার বাহুতে আদর করে একটি উল্কি এঁকে দেয়। একদিন ঘটনাচক্রে জমিদারের চোখে ধরা পড়ে গেল সেই অশুভ চিহ্ন। তারপর শুরু হ'ল খুনসুটি। গোটা সংসার অশান্তির আগুনে জ্বলে উঠলো।

এদেশের বহু কবির কবিতাতেও 'উল্কি' শব্দটি চোখে পড়ে। সাঁওতালী কবি উরিয়া দাউচি এবং নিমাই রাজওয়ালা উল্কি নিয়ে বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। একটু অনুসন্ধিৎসু হলে উপজাতীয় সাহিত্য থেকে উল্কি-চর্চ্চার আরো বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ভারত ছাড়াও সিংহল-মালয়-ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া-বর্মা-থাইল্যাণ্ড এবং আফ্রিকার কোন কোন আদিবাসীকে উল্কি ব্যবহার করতে দেখা যায়। আফ্রিকার 'পিগমী' উপজাতির লোকেরা বিয়ের সময় বর ও কনের কপালে এক ধরনের উল্কি এঁকে দেয়। এটিকে একাধারে বিবাহ ও প্রতিবন্ধকতা রোধের প্রতীক চিহ্ন মনে করা হয়। মালয়ের 'সেমাং' জাতি 'দুরিয়ান' উৎসবের সময়ে পাঁচ বছরের শিশুদের বাহুতে উল্কি এঁকে দেয়।

আজকাল এদেশের উপজাতিরা ধীরে ধীরে সভ্যতার আলোক-তীর্থের দিকে এগিয়ে আসছে। স্বভাবতই বিত্ত-সংস্কৃতির আকর্ষণে এরা উল্কির মত প্রাচীন শিল্পকে পরিহার করতে চাইছে। ইউরোপের নানা জায়গা জুড়ে কিন্তু এখানকার পরিত্যক্ত শিল্পটির চর্চা শুরু হয়েছে। উল্কি আঁকা ওদের এখন একটা আল্ট্রা মডার্ণ ফ্যাশন।

বৃটেনের বিখ্যাত উল্কিওয়ালা বিল স্কুজ-এর মতে চামড়াই তার ক্যানভাস। জ্যানেট লেসলি ফিল্ড তাঁর শ্রেষ্ঠ ক্যানভাস। সাতাশ বছরের এই মেয়েটি জীবনের রোদে পবিত্র এক ইসাবেলা। আগে গণিক বিভাগে কাজ করতেন। কিন্তু ভালো না লাগায় চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তিনি স্কুজের জীবন্ত ক্যানভাস। বৃটেনে তাঁর নাম 'উল্কিরাণী'। দীর্ঘ ন'বছর ধরে স্কুজ তার ক্যানভাসকে চিত্রিত করেছেন। মড়ার খুলি, শয়তান, সাপ, ইঁদুর, ভ্যাম্পায়ার, ড্রাগন, নেমপ্লেট, ফুল ইত্যাকার অদ্ভুত অদ্ভুত ছবিতে ছয়লাপ

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংযোজিত যমজ

মিতালী চ্যাটার্জী

চ্যাং ও এং—শ্যামদেশীয় যমজ (Siamese Twins) দুটি বিজ্ঞানী মহলে এক অতিপরিচিত নাম। যদিও তারাই প্রথম সংযোজিত যমজ নয়, তবু তাদের নামানুসারেই সাধারণভাবে সব সংযোজিত যমজ সন্তানদের শ্যামদেশীয় যমজ বলা হয়। ১৯৪৭ সালে এদের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে।

১৮১১ সালের মে মাসে এক চীনা ধীবরের ঔরসে এক আধা চীনা ও আধা মালয়েশিয়ান মহিলার গর্ভে দুটি সংযোজিত যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এরাই পরবর্তীকালে চ্যাং ও এং নামে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল।

এদের মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তাই তিনি তাঁর আর চারটি স্বাভাবিক সন্তানের মতই একইভাবে এদের লালন-পালন করেছিলেন। একদিকে দৃঢ়শাসন এবং অন্যদিকে সুকোমল মাতৃস্নেহদ্বারা এমনভাবে তাঁর এই সংযোজিত সন্তানদুটিকে তিনি মানুষ করেছিলেন যাতে তারা বাল্যাবস্থা থেকেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে যতদূর সম্ভব সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পেরেছিল। কিংবদন্তী আছে যে শ্যামদেশের তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় রাম, মনে করেছিলেন যে এরা প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার ফল হিসেবে জন্মেছে এবং বেঁচে থাকলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। তাই তিনি এদের মৃত্যু-দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা পালিত হয়নি।

চ্যাং ও এং তাদের মায়ের সযত্ন পরিচর্যার গুণে সুস্থ ও সবল বালক হিসেবে বড় হয়ে উঠছিল। এমনকি তাদের সমবয়সী আর পাঁচজনের সঙ্গে সাঁতারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত।

তাদের মা সবসময় সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখতেন যাতে যে পেশীবন্ধনীটির দ্বারা ওরা সংযুক্ত হয়ে আছে সেটা যতদূর সম্ভব প্রসারিত হয়ে যেতে পারে। চ্যাং ও এং-এর শৈশবাবস্থায় এই বন্ধনরজ্জুটি এতই ছোট ছিল যে তারা কেবল সামনা-সামনি মুখ করে শুতে পারত। যখন তারা ক্রমশ বড় হয়ে উঠল তখন এই বন্ধনরজ্জুটি বেড়ে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়েছিল এবং এর ফলে তারা দুজনের থেকে অর্ধেক পেছন ফিরে দাঁড়াতে পারত। আর একটি বিষয়ে তাদের মা সবসময় জোর দিতেন যেটা হল সবাই যাতে তাদের স্বাভাবিক শিশু বলেই মনে করে উপযুক্ত ব্যবহার করে এবং তারা নিজেরা যেন কখনই নিজেদের অস্বাভাবিক জীব বলে না ভাবে। শিশুকাল থেকেই—তাঁর এই সদুপদেশের ফলেই চ্যাং ও এং সারাজীবন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আনন্দেই কাটাতে পেরেছিল।

একটু বেঁটে ধরনের বলিষ্ঠ পুরুষ, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট, পাঁজরার তলাথেকে নাভি পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এক পেশী-বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত—এই ছিল চ্যাং ও এং-এর পরিণত বয়সের চেহারা। এং ছিল ডানদিকের যমজ এবং তার স্বভাব অন্যটির তুলনায় বেশী মধুর ও আকর্ষণীয় ছিল। চ্যাং একটু বদরাগী ছিল এবং প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল।

তাদের জগৎজোড়া খ্যাতির মূলে ছিল রবার্ট হান্টার নামে এক বৃটিশ বণিকের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ। রবার্ট হান্টারই প্রথম ইংরেজ যিনি শ্যামদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আবছা অন্ধকারে ব্যাংকক শহরে এক নদী পার হবার সময় তিনি চ্যাং ও এং-কে প্রথম দেখেন। প্রথম দর্শনে তিনি তাদের নদীতে সাঁতার-কাটা এক অদ্ভুত জন্তু মনে করেছিলেন। কিন্তু যখন তার বিস্ময় বিস্তারিত চোখের সামনে দিয়ে ওরা নৌকায় উঠল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ওরা দুটি পরস্পর সংযুক্ত মানুষ।

এরপর ধীরে ধীরে চ্যাং ও এং কে কেন্দ্র করে ওদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই হান্টারের এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্ব ও প্রীতি কতখানি আন্তরিক সেটা বিচারসাপেক্ষ, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিচক্ষণ ও চতুর হান্টার ওদের পশ্চিমদেশে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখেছিলেন।

চ্যাং ও এং-এর ইংল্যাণ্ড যাওয়া সম্বন্ধে ওদের বাবা মাকে রাজী করাতে পারলেও হান্টার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি জোগাড় করতে পারেন নি। পাঁচবছর পরে হান্টারের ব্যবসায়ের সঙ্গী আমেরিকার নৌ সেনাপতি ক্যাপ্টেন এ্যাবেল কফিনের সহায়তায় হান্টার ঐ অনুমতি জোগাড় করতে সক্ষম হন। ১৮ বছর বয়সে চ্যাং ও এং বিদেশ যাত্রা করে এবং তারা আর কোনদিন নিজের দেশের মাটিতে ফিরে আসেনি।

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

উন্নতমানের পাটচাষ

প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের কৃষি, শিল্প ও রপ্তানী বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান সামগ্রী পাট। পাটশিল্পের প্রথম যুগে পাটের জিনিস প্যাকিং-এর কাজে বেশী ব্যবহার করা হ'ত। তখন রপ্তানীযোগ্য পাটজাত সামগ্রীর বেশীর ভাগই ছিল বস্তাজাতীয় জিনিস। শষ্য মজুতের বস্তা, উল রাখার বস্তা, সিমেন্টের ব্যাগ, তুলো রাখার বস্তা, ময়দার প্রভৃতি তৈরী হ'ত পাট দিয়ে।

সাম্প্রিতককালে বিশ্বের বাজারে নানান কঠিন প্রতিযোগিতার চাপে পাটজাত জিনিসের রপ্তানী অনেক কমে যায়। ১৯৭৬ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২৪৭ কোটি টাকার মত। এবছরে সেই টাকাই আয় করা যাবে কিনা সন্দেহ। পাটের এই পড়ন্ত বাজারকে সজীব ক'রে তুলতে পাট থেকে নতুন নতুন জিনিস তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়। আর তারই জন্য দরকার উন্নত মানের আঁশের।

উন্নতমানের আঁশ বলতে বোঝায় সেটা কত শক্ত, মিহি না মোটা এবং তা থেকে সুতা কাটার সুবিধা অসুবিধা কতটা। তাছাড়া দেখতে হবে আঁশের রঙ। গোড়ার দিকে শক্তছালী অংশ বা আঁশে যাতে দোষ না থাকে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা দরকার। অবশ্য এসব গুণের একত্র সমন্বয় প্রায় বিরল।

আবার দেশের বহু পাটচাষীর আজ প্রশ্ন—পাটচাষে যদি লাভ না হয় তবে কেন তাঁরা এ ব্যাপারে উৎসাহী হবেন। তাঁরা ক্রমশ মনোযোগী হয়ে পড়ছেন খাদ্যশষ্যের চাষ-আবাদ করতে। পাটের বদলে ধান বা গম চাষ করলে লাভ বেশী। সংগে সংগে দেশে খাদ্যশষ্যের অভাবও মিটবে।

এপ্রশ্ন সঙ্গত। কিন্তু চাষীদের এই অনীহার কারণ এই যে তাঁরা পাটচাষের উজ্জ্বল দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল নন। পাটচাষ আরও লাভজনক করা যায়। একই জমিতে পাট ও অন্যান্য ফসলের চাষ করাও সম্ভব।

উন্নতমানের আঁশ তৈরি করতে প্রয়োজন উন্নত প্রথায় পাটচাষ। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিন্তু আমাদের দেশে পেছিয়ে নেই। পাট সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু তেমনভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে নি চাষীদের মধ্যে। এ ফাঁকটুকু ভরাট করতে পারলেই পাটচাষে উৎসাহ বাড়বে বেশী। সংগে সংগে দেশে বিদেশে পাটের যোগান থাকবে অব্যাহত।

অধিক পরিমাণে উন্নতমানের আঁশ পেতে হলে পাটের বীজ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটির প্রকৃতি, জমির অবস্থান অর্থাৎ উঁচু, মাঝারি বা নীচু এবং জলদি বা নাবী বোনা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিচার করে পাটের বীজ ঠিক করা উচিত। উন্নতজাতের প্রচলিত পাট বীজগুলি হল:

তিতাপাট: জে. আর. সি ২১২ (সবুজসোনা); জে. আর. সি ৩২১ (সোনালী); জে. আর. সি ৭৪৪৭ (শ্যামলী) ডি-১৫৪।

মিঠাপাট: জে. আর. ও ৬৩২ (বৈশাখী তোষা); জে. আর. ও ৭৮৩৫ (বাসুদেব); জে. আর. ও ৮৭৮ (চৈতালী তোষা): জে. আর. ও ৫২৪ (নবীন)।

উল্লেখ করা দরকার, এদের মধ্যে জে. আর. ও ৫২৪ সবচেয়ে নতুন বীজ। এ বীজ মার্চ মাসে বোনা যেতে পারে। ফলে জমিতে অন্য ফসলের চাষ করা সহজ। চালু সব জাতের পাট আগে বুনলে অসময়ে ফুল ধরে যায়। এটা পাটচাষের এবং পাটচাষীদের এক সমস্যা। কিন্তু এই নতুন পাট যদি এপ্রিলের মাঝামাঝিও বোনা হয় তবু সময়ের আগে ফুল হবে না। আবার এর ফলন বেশী এবং আঁশের মানও অনেক উন্নত।

পাটবীজ বোনা হয় সাধারণত ছিটিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে। কিন্তু বীজ বোনা যন্ত্রের (সীডড্রীল) সাহায্যে পাট বুনলে পাটচাষে অনেক সুবিধা। এতে বীজের পরিমাণ এবং নিড়ানির খরচ অনেক কম লাগে। দু'টি সারিতে সমান দূরত্ব থাকায় প্রত্যেকটি গাছ সমানভাবে বেড়ে ওঠে। ফলে জমিতে চাপান সার দেওয়া ও রোগ পোকা মাকড় নিবারণের জন্য ঔষধ ছিটানোও সহজ। এছাড়া পাটগাছ কাটতে সময়ও লাগে কম। উৎপাদিত আঁশের মান হয় অনেক উন্নত সুষম। অর্থাৎ সমস্ত পাটের মানই প্রায় এক ধরণের।

জমিতে দু'টি চারাগাছের দূরত্বের সংগে আঁশের মানের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। জানা গেছে, উন্নত মানের আঁশ পেতে গেলে পাট বোনার সময় গাছের দূরত্ব কম রাখা উচিত। ফলে গাছ খুব মোটা হয় না। কিন্তু তাতে উন্নতমানের আঁশ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে জমিতে গাছের সংখ্যাও বাড়ে।

পাটচাষে সবচেয়ে বেশী খরচ হয় জমি নিড়ানি দিতে অর্থাৎ আগাছা পরিষ্কার করতে। প্রচলিত পদ্ধতির চাইতে রাসায়নিক ঔষধ দিয়ে আগাছা দমন করলে সময় লাগে কম, খরচাও কম। কিন্তু অধিক পরিমাণে এসব ঔষধ ব্যবহার করলে আঁশের মান নেমে যায়। একথা সকলেরই জানা, পাটের ফলন বাড়াতে জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস
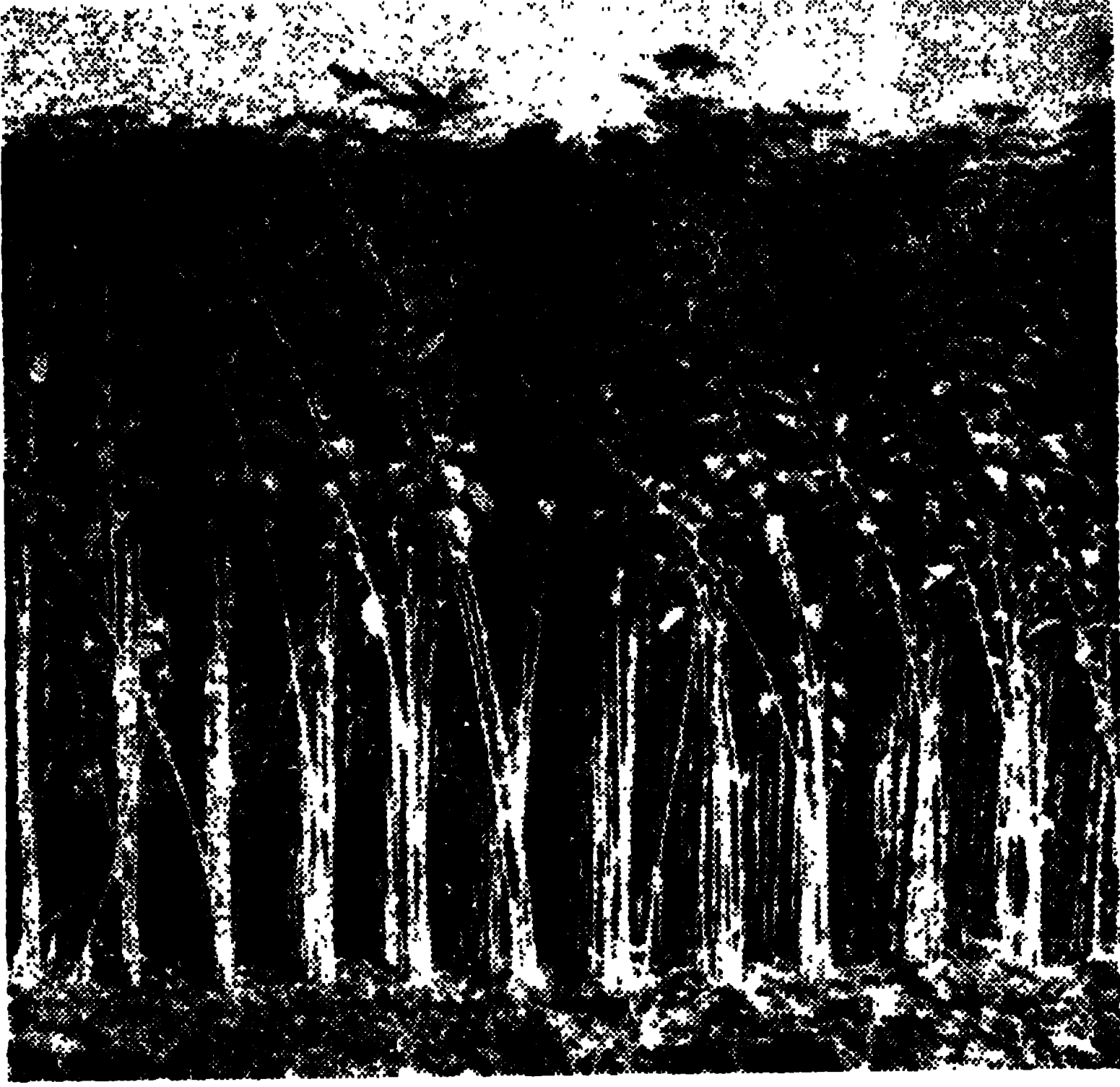
ও পটাশ সার ব্যবহার করতে হয়। সব সময়েই অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা উচিত। বিশেষত নাইট্রোজেন-ঘটিত সার অনুমোদিত মাত্রার বেশি ব্যবহার করলে আঁশের ফলন কিছুটা বাড়ে ঠিকই কিন্তু তার মান অনেক সময়ে খারাপ হয়।

পাটচাষে অনিষ্টকারী জিনিস হ'ল রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ। গাছের বিভিন্ন রকম রোগের উৎস হল ছত্রাক। এর প্রতিকারের উপায় বোনার আগে বীজগুলি এগ্রাসান জি-এর অথবা ক্যাপটান দিয়ে শোধন করে নেওয়া। আবার গাছে আংকা পোকার আক্রমণে আঁশ কমজোরী হয়। দেখা গেছে, নির্দিষ্ট মাত্রায় এনড্রিন দ্রবণ দশ দিন অন্তর ছিটিয়ে দিলে এ পোকার হাত থেকে গাছকে রক্ষা করা সম্ভব।

প্রবাদ আছে—পাট কাটবে কখন, গুটি ধরবে যখন। বোনার সময় থেকে সাধারণত ১০০ থেকে ১৫০ দিন পরে গাছ কাটা হয়। গুটি বা ছোট ছোট ফল ধরার আগে পাট কাটলে ফলন কিছুটা কম পাওয়া যায়। কিন্তু আঁশের মান ভালই থাকে। ফলে কম ফলনের ক্ষতিটুকু পুষিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত—জমিতে অন্য ফসল বুনতে হলে কিছু আগে অর্থাৎ ১০০ থেকে ১২০ দিনের মাথায় যদি পাট কাটতে হয় তাতে আঁশের মান কমে না।

ভাবতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি, উন্নতমানের আঁশ উৎপাদন একান্ত-ভাবে নির্ভর করে উন্নত প্রথায় পাট-পচানোর উপর। অনেক সময় সুস্থ সবল গাছ চাষ করেও শুধুমাত্র পচানোর ত্রুটিতেই আঁশের মান অনুন্নত থেকে যায়। পাট পচানোর সময়সীমা আর উৎপাদিত আঁশের গুণাবলী প্রধানত পচাবার জলের অবস্থা ও তার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। ধীরস্রোতা পরিষ্কার জলে পাটগাছ ও জলের অনুপাত ১ : ২০ থাকলে পাট তাড়াতাড়ি পচে। কিন্তু বদ্ধ ডোবায় বা কম জলে অথবা যে জলে লোহার পরিমাণ বেশী সেখানে বার বার পাট পচালে শেষের দিকে আঁশের রঙ কালো বা শ্যামলা হয়ে যায়।

পাটপচানো পাটচাষীর কাছে আজও সমস্যা। সব সময়ে ঠিকমত তাঁরা একাজটা পেরে ওঠেনা। পাটপচাবার জলের অভাব দূর করা এবং আঁশের মান উন্নয়ন —এসব বিষয়ে গবেষকদের প্রচেষ্টার ফল—বিশেষ ধরণের দু একটি যন্ত্র। নাম জুট রিবনার এবং ডিকর্টিকেটর। এদুটি যন্ত্রের সাহায্যে গাছের ছাল, কাঠি থেকে আলাদা করে পচানো হয়। তখন ছালগুলো পচতে অল্প জল আর কম সময়ের দরকার। অথচ আঁশে গোড়ার দিকে শক্তছালী অংশ থাকে না।

পাটচাষের শুরু থেকেই যদি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায় তবে আঁশের মান অবশ্যই উন্নত হবে। এরজন্য কিছু অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু তাতে লোকসান নেই। কারণ, বাজারে উন্নত-মানের আঁশের যেমন আছে চাহিদা তেমনি তার দামও বেশী।

উল্কি আঁকা শরীর

১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

হয়ে গেছে জ্যানেটের শরীর। খিল ক্যাজের ক্যানভাস হিসাবে ব্যবহৃত হতে হতে জ্যানেট ওরফে রাষ্টি নিজেই একজন উল্কিওয়ালী হয়ে গেছেন। বিলেতের মানুষকে ধরে ধরে তিনি উল্কি দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

লোক সাহিত্য, লোক নৃত্য প্রভৃতির মত লোকচিত্রও আমাদের লোক সংস্কৃতির একটি মূল্যবান প্রবাহ। উল্কি এরই একটি শাখা। বুকের মাটিতে ফোটা ফুলের অনুপ্রেরণায় একদল মানুষ আমাদের অগোচরে এর চর্চা করে যাচ্ছে। যেমন করে বনফুল। সকলের অগোচরে তার গন্ধ বিলিয়ে যায়। উল্কি আঁকার কাজ এত নিপুণ যে এই অজ্ঞাত পরিচয় শিল্পীদের কুশলী হাতের তারিফ করতেই হয়। তাল-পলাশের বনে ঢাকা যাদের ডেরায় সভ্যতার এক চিলতে আলোও ছড়িয়ে পড়েনি কি করে তাদের এই স্বকীয় শিল্পটি মানচিত্রের সীমানা ছিঁড়ে আশে-পাশে, দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ল ভেবে অবাক হই। অবাক হই যখন দেখি সভ্যতার স্বর্গভূমিকেও এই শিল্প নাচিয়ে তোলে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

আর্কিটেক্‌চারেল বায়োনিক্স

নিশীথ চৌধুরী
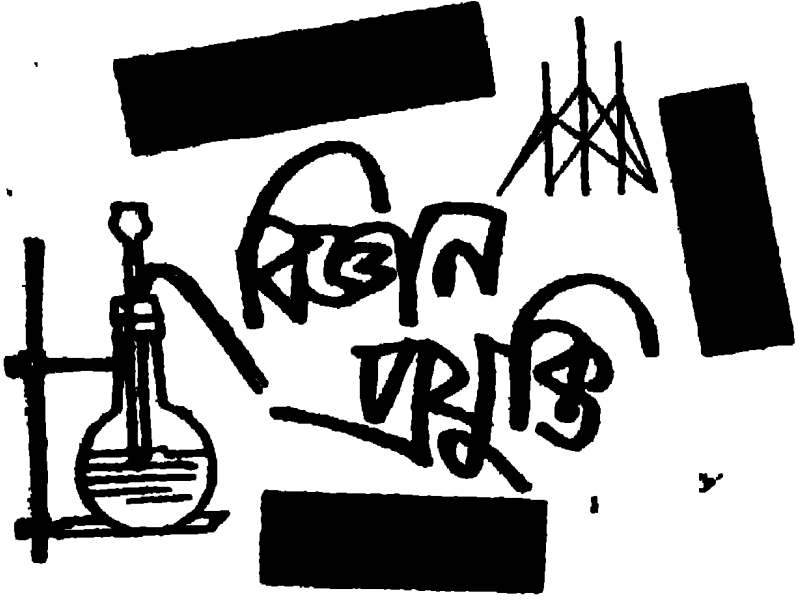
সমুদ্রে দিকনির্ণয় যন্ত্র যে কত অপরিহার্য্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবীর চুম্বক শক্তির সাহায্য নিয়ে কয়েক ধরণের শুক্তি-শামুক জাতীয় জীব জলের নীচে দিক ঠিক করে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (যেমন নাসারিয়াস স্নেলস্)। ভাবলেও অবাক হতে হয় যে সামুদ্রিক মাছও আবার এক্স-রে নির্গত করতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছে সমুদ্রের গভীর থেকে তুলে নিয়ে আসা মাছের এক্সরে বিকিরণের ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন আমেরিকার সমুদ্র বিজ্ঞানীরা। এই মাছের চোখের পেছনে খুব উজ্জ্বল অংশ থেকে সাধারণ আলো বিকিরণের সাথে সাথে মারাত্মক ধরণের এক্সরে নির্গত হয়। চামচিকে বা ছোট বাদুড় (যারা ফল খেয়ে বেড়ায়) রাতের অন্ধকারেও নির্ভুলভাবে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পথের কোন সূক্ষ্ম বাধা এড়িয়ে চলে। অতি উচ্চ কম্পনযুক্ত শব্দতরঙ্গ গলা থেকে বের করে তার সাহায্যে দিক ঠিক রাখে। আবার রাত্রে তাদের শিকার অন্বেষণেও এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। বাদুড়ের এই 'আলট্রা সাউণ্ড' আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু এক রকমের পতঙ্গ (ক্লথ মথ) আছে যারা এই আলট্রা সাউণ্ড শুনতে পায় বিশেষ ভাবে সুবেদী ও সূক্ষ্ম জৈবিক ব্যবস্থার দ্বারা। এই পতঙ্গগুলো বাদুড়ের খবর পেয়েই লুকিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করে।

উড়তে উড়তে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে নিমেষে দেখতে পায় যেমন—তেমনি আবার উপর থেকে নীচে নামার সাথে সাথেই চোখের লেন্স স্বনিয়ন্ত্রিত ভাবেই বদলে যায় বলে মাটির উপর কোন জিনিষ চিনতেও দেরী হয়না পাখীদের। পাখীর চোখ এক আশ্চর্য সৃষ্টি। যাযাবর পাখীর পথ চিনে বাসায় ফেরার রহস্য আজও সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নি। হয়তো বা তাদের চোখের ভিতর এমন কোন দিগ্‌নির্ণয় ব্যবস্থা থাকতে পারে—যার আদর্শে তৈরী কোন যন্ত্র ভবিষ্যতে দিক নির্ণয় ও সঠিক পরিচালনার জন্য আকাশ যানকে অভূতপূর্ব সাহায্য করতে পারে।

প্রকৃতির রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জৈবিক ব্যবস্থার এইসব বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমাদের প্রযুক্তি বিদ্যাকে সমৃদ্ধ করার ও আমাদের কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে বলতে গেলে অল্পদিনই হলো। জীব বিদ্যা ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সেতু বন্ধন হয়েছে প্রায় বছর পনের আগে, আমেরিকার ডেটন শহরে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের এই সেতুর নাম 'বায়োনিকস্'। বায়োনিকস ইঞ্জিনীয়ারগণ প্রকৃতির রাজ্যের জীবন্ত নমুনার উপর ভিত্তি করে নানা রকমের অভিনব যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরী করে চলেছেন।

জঙ্গলের মধ্যে চলবার উপযুক্ত সাঁজোয়া গাড়ীর নকসা তৈরী করার জন্য আমেরিকার প্রযুক্তিবিদরা অনুসরণ করছেন মাকড়সার পায়ের গঠন ও চলার ভঙ্গী। ডলফিনের চামড়ার ভিতরের গঠন বৈশিষ্ট্য তাদের দ্রুতগতি সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। যুদ্ধ জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষীপ্রগতি টর্পেডো নির্মাণ করবার জন্য ডলফিনের দেহত্বকের অন্তর্গঠনের আদর্শ খুবই কার্য্যকরভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ডলফিনের পাখনার অনুকরণে দুটো ঘূর্ণিয়মান পাল্লা একটা ধাতব দণ্ডে লাগিয়ে জলযানের সাথে জুড়ে ঐ জলযানের পরিচালন ক্ষমতা চারগুণ পর্যন্ত বাড়াতে পেরেছেন বার্লিনের প্রযুক্তিবিদরা। জেলী মাছের (Jelly Fish)—শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবস্থা অনুকরণ করে চমৎকার কর্মক্ষম এক আবহাওয়া নির্দেশক যন্ত্র তৈরী করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। ১২—১৩ ঘন্টা আগেই ঝড়ের পূর্বাভাস দিতে পারে এই যন্ত্র।

বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যে জৈবিক বৈশিষ্ট্য আছে স্থাপত্যবিদ্যায় তার উপযুক্ত প্রয়োগ করার চেষ্টায় গড়ে উঠেছে 'আর্কিটেক্‌চারেল বায়োনিকস'। ঘর বাড়ী তৈরী করতে গেলে আবার জীব জগতের কোন বৈশিষ্ট্য কাজে লাগতে পারে কিনা ভাবলে প্রথমেই একটু থমকে যেতে হতেও পারে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের যে শিল্প নৈপুণ্য আছে তা বোঝা যায় বাবুই পাখীর বাসা আর নয় তো টুনটুনি পাখীর দুটো পাতা সেলাই করে বাসা তৈরীর মধ্যে। উই পোকা অথবা পিঁপড়েদের তাপ নিয়ন্ত্রতি সুবিন্যস্ত আবাসস্থল মানুষের বাসস্থান নির্মাণে কিছু ইংগিত বহন করতেও পারে। মৌমাছি ও বোলতার বাসাগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ওগুলো হাজার হাজার ছয়তল বিশিষ্ট প্রিজম-এর সমান্তরাল শ্রেণী সমবায়ে গঠিত। প্রতিটি এই রকম প্রিজমের ভূমিতে বিষমকোণী সমচতুর্ভুজ আছে তিনটি। বিভিন্ন গণনা থেকে দেখা যায় যে এই বিষমকোণী সমচতুর্ভুজের প্রতিটি সূক্ষ্ম কোণের পরিমাপ হচ্ছে ৭৪ ডিগ্রী ৩২ মিনিট। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে মৌচাকের ষড়ভূজক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রী কম খরচ করেও মৌচাক কোষের সর্বাধিক আয়তন সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই নির্মাণ কৌশলের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে ঐ ৭৪ ডিগ্রী ৩২ মিনিট-এর সূক্ষ্মকোণের পরিমাপে।

যুগ যুগ ধরে মৌমাছিরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে কম খরচে বেশী আয়তন-যুক্ত বাসস্থানের নির্মাণ কৌশল আয়ত্ব করে নিয়েছে। এই মৌচাক তৈরীর নীতির আদর্শে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা শস্য রাখবার জন্য এলিভেটর (Grain elevator) তৈরী করেছেন খুব সহজেই। আবার বহুতল-বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ীও তৈরী করা হয়েছে এই মৌচাক নীতির উপর নির্ভর করেই। স্থপতিরা দেখেছেন যে ফেরোকংক্রীটের (লোহা ও সিমেন্ট, বালী, পাথরকুচি প্রভৃতির মিশ্রণ) ব্যবহার এর ফলে তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত ব্যয় কমানো গেছে, আর কমেছে শ্রমিকের খরচও। তারা আশা করছেন যে অদূর ভবিষ্যতে বহুতলবিশিষ্ট অফিস অথবা বাসা বাড়ীও কম খরচে তৈরী করা যাবে—এই ষড়ভূজ-আকৃতির মৌচাকের গঠন অনুসরণে।

জলের উপর বড় বড় ভাসমান পাতার (পদ্মপাতার মত) নীচের দিকে দেখা যায় অসংখ্য শিরা। এই শিরাগুলো কাঁপা নলের মত একটার সাথে অপরটার মধ্যে সংযোগ সাধন করে কাটা কুমড়োর ফালির আকারের ফিতের মত অংশ। এই শিরাগুলো মাঝ থেকে বাইরের দিকে আলোর ছটার মত ছড়ানো আছে। ভাসমান এই সব পাতার গঠন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে পরিবহণের জন্য ছড়ানো তল-যুক্ত নৌকাও যেমন তৈরী হয়েছে সেই রকমই আবার বহুতলবিশিষ্ট ভাসমান বাড়ীও তৈরী হয়েছে কাস্পিয়ান সাগরে।

প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করে স্থাপত্য বিদ্যায় যুগান্তকারী বিপ্লব আনবার অঙ্গীকার করতে পারে আজকের কিশোর 'আর্কিটেকচারেল বায়োনিক্স্।'

গ্রন্থ আলোচনা
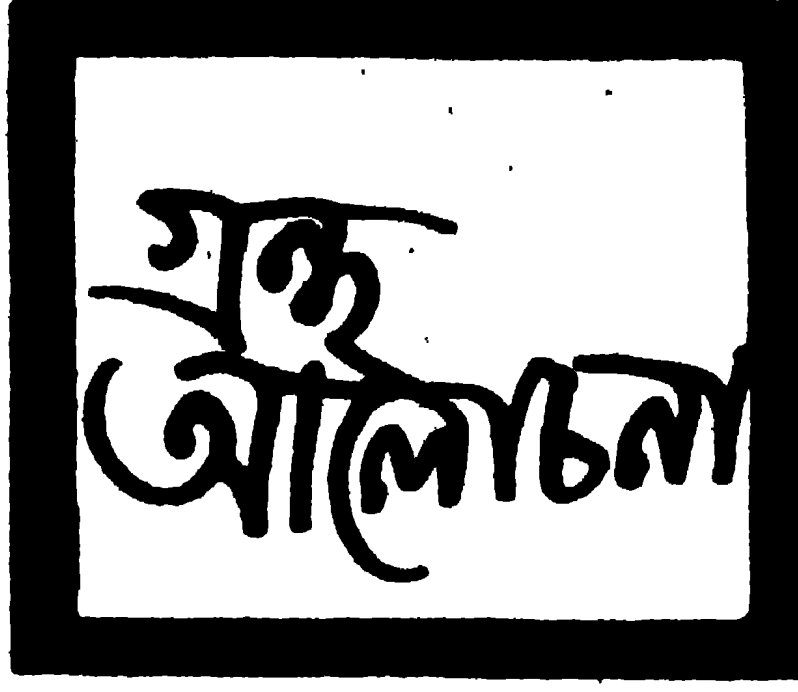
অমিলে মিল। হিমালয় নির্ঝর সিংহ। অনন্যা প্রকাশনী। দাম চার টাকা।

হিমালয় নির্ঝর সিংহ, দীর্ঘদিন থেকে ছোটদের কবি হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি তাঁর 'অমিলে মিল' কাব্যগ্রন্থটি বয়স্ক কাব্য রচনাতেও তার দক্ষতাকে প্রমাণ করে। নানা বর্ণের বিয়াল্লিশটি কবিতা নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে এই বই। ছন্দ ও ছন্দহীনতায় তিনি যে সমান দক্ষ তা' বেশ বোঝা যায় এই কবিতাগুলি থেকে। তবে বেশির ভাগ কবিতাতেই গদ্য ছন্দের ব্যবহার করেছেন কবি। তাঁর কবিতাগুলি একালের কবিতার অস্পষ্টতা বা তির্যকতা বিষয়ে সাধারণ পাঠকের ভীতি ও অস্বস্তি ঘোচাবে। এই কবিতা-গুলিতে কবি কখনই অনাবশ্যক জটিল নন। তাঁর একান্ত আবেগ ও অনুভূতি স্পষ্ট ছবি ও উচ্চারণে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াতেই তাঁর আগ্রহ। তাঁর অনেকগুলি কবিতা থেকেই তাঁকে সমাজ সচেতন এক কবি ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিক। জীবনের রুক্ষতা ও রূঢ়তার দিকে তাকিয়ে তিনি 'রাত পোহালো' 'আমি বেঁচে আছি' 'তিষ্ট' এই কবিতাগুলি লিখেছেন। তবু তাঁর রোমান্টিক প্রেমিক মনটিই বেশির ভাগ কবিতায় ফুটে উঠেছে। যদিও প্রেমের কবিতা লিখতে গিয়েও চারপাশের জীবনের দিকে তাকাতে তিনি ভোলেননি'। যেমন—'কুঁদফুলের মালা'। তবে তিনি বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ছোট ছোট ছবিকল্প রচনায়। যেমন—'ছন্দের হারমোনি / এঁকে বেঁকে / কিছুটা ধীরে কিছুটা দ্রুততার..../ স্রোতে পড়া ফুলের মতন' কিংবা 'পূরব আকাশে মিঠি মিঠি রোদ্দুর / সোনালী চোখের দুষ্টুমি হাসি হেসে / বলে গেল পথ এখনও অনেক দূর।" আবার 'তুমি আর আমি, কেউ কুঁড়ি, কেউ ফুল / কাছে গেলে এক, দূর থেকে শুধু ভুল' এ-রকম গভীর কিছু পংক্তি ও স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় উপহার দিয়েছেন তিনি। গদ্যছন্দে তিনি বেশি কবিতা লিখলেও, আসলে ছন্দ-ব্যবহারেই তিনি বেশি দক্ষ। সুতরাং তাঁর চর্চা এই দিকেই হওয়া উচিত। তবে এই কাব্যগ্রন্থের পর-পর নির্বাচিত কবিতাগুলি থেকে তাঁর মানসিক ক্রমশঃ পরিণতির কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এ জন্য বোধহয় তাঁর আগামী রচনার দিকেই পাঠককে তাকিয়ে থাকতে হবে।

বইটির ছাপা মোটামুটি, তবে প্রচ্ছদ কোন অতিরিক্ত তাৎপর্য আনেনা।

— সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

খেলা ধূলা
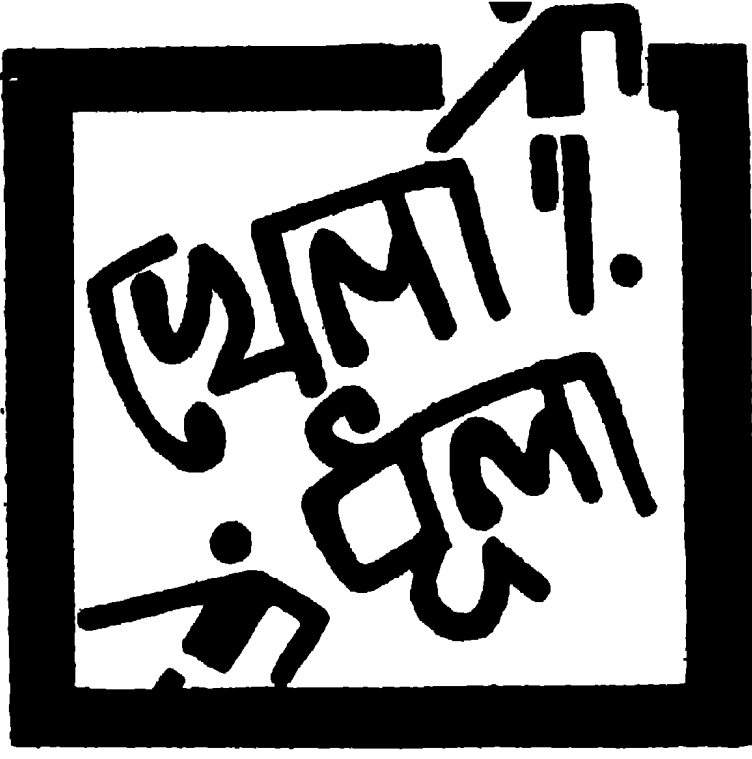
হুজুগপ্রিয় কলকাতাবাসী সম্প্রতি এক নতুন ধরণের জিনিষ দেখে চোখকে সার্থক করলেন—মিলিটারী টাটু। সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে চলেন তারই এক ছোটখাট বর্ণোজ্জ্বল মহড়া দেখালেন সৈনিকরা ক্রিকেট তীর্থ ইডেন উদ্যানে। সব কিছুই টিপটপ। ছবির মত দু'ঘণ্টা ব্যাপী অনুষ্ঠান। কামান, মটারের গুরুগম্ভীর আওয়াজে ইডেনের আশেপাশের সন্ধ্যার সুমিষ্ট আমেজকে সন্ত্রাসে পরিণত করে চলেছিল। আবার চোখজুড়ানো আতসবাজীর ফোয়ারায় উপস্থিত দর্শকরা দিশেহারা হয়েছেন।

মাল খাম্বা তৈলাক্ত বাঁশের উপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছেন জওয়ানেরা
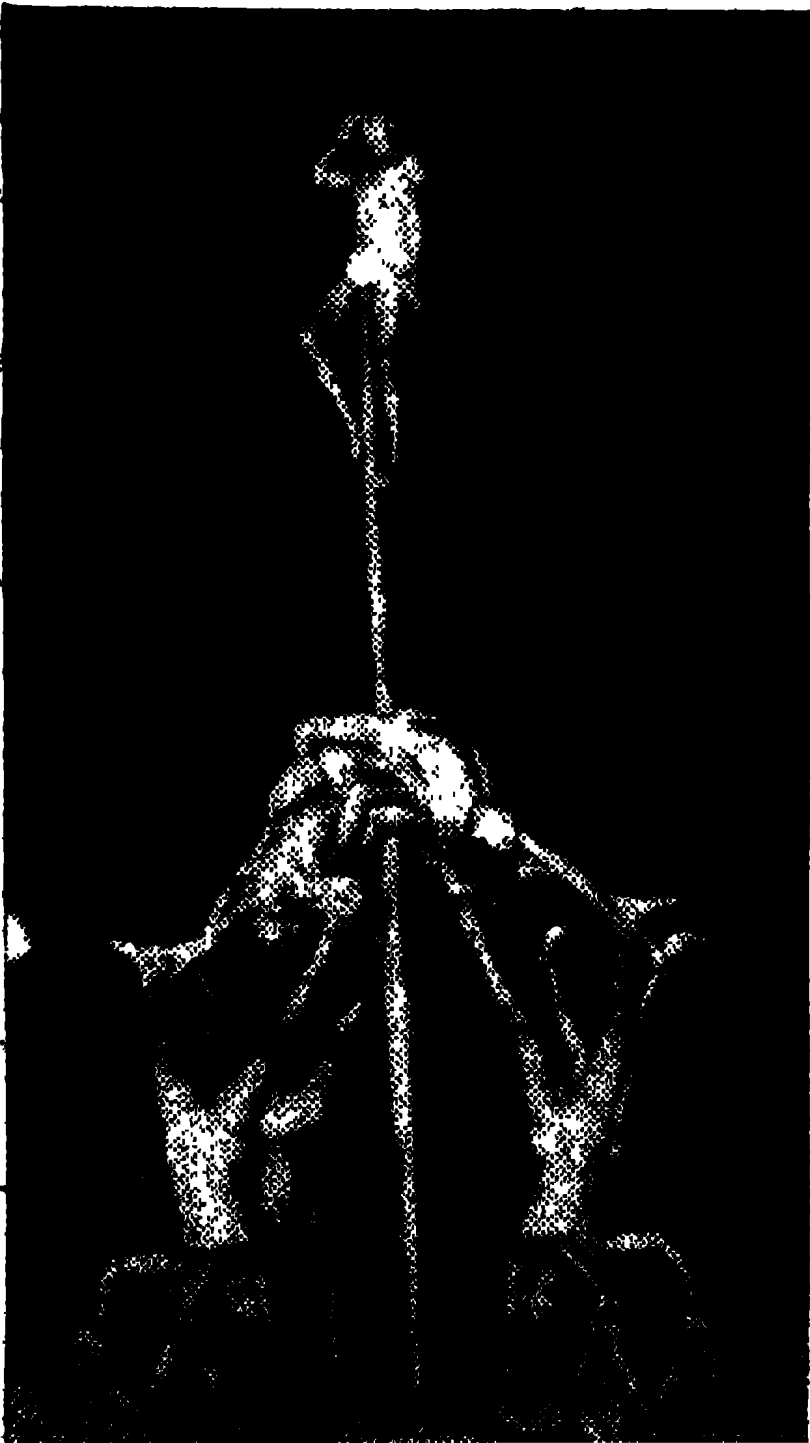
মুহুর্মুহু মেশিনগানের গুলি ছোঁড়ার শব্দ দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তুলছিল। বেশ পুরোপুরি যুদ্ধক্ষেত্র—প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণকে উপেক্ষা করে পাল্টা আক্রমণ হেনে শত্রুকে ঘায়েল করার দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়।

অনেকটা উন্নত ধরণের সার্কাসের মত হয়তো লাগে। কিন্তু সার্কাসের জোকারের বদলে এখানে ছিল ক্লাউন, কিন্তু তাঁর কুশলী সৈনিক। দর্শকদের হাসিয়ে আনন্দ দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই সেই সৈনিকরা প্রমাণ রেখেছেন তাঁরা কত নিপুণ—কত দক্ষ, এক মুহূর্তের ভুলের মাশুলে প্রাণ পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

প্রতিটি দর্শক দু'চোখ ভরে দেখেছেন সামরিক বাহিনীর মনোরম ব্যাণ্ড-কুচকাওয়াজ, ঘোড়সওয়ার সৈনিকদের পরিক্রমা,

খাল পেরিয়ে যুদ্ধে জরুরী সংবাদ পাঠাচ্ছেন ডেসপ্যাচ রাইডার

ইডেনে মিলিটারী টাটু

মোটর সাইকেলে খবর আদান প্রদানের জন্য দ্রুতগতিতে ছুটোছুটি, মোটর সাইকেল দিয়ে শত্রু পক্ষের গড়ে তোলা ইটের প্রাচীর ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া। জলন্ত আগুন। শত্রুপক্ষ বাধার বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। যাতায়াতের পথে খাল খুঁড়ে বাধার সৃষ্টি করেছে। সব কিছুকে উপেক্ষা করে আগুনের মধ্যে দিয়ে ২৫।৩০ ফুটের মত জায়গা লাফিয়ে মোটর সাইকেলে করে পাড়ি দিতেও জওয়ানেরা যে প্রয়োজনে পিছুপা হয় না—তাও দেখলেন কলকাতার মানুষরা সবিস্ময়ে।

শরীরকে সুস্থ সবল অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফিট'—রাখতে জিমন্যাষ্টিকের যে প্রয়োজন আছে তাও দেখালেন সৈনিকরা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে। 'মাল খাম্বা'র কসরৎও দেখালেন জওয়ানরা। একটা তৈলাক্ত লম্বা বাঁশের শীর্ষে উঠে যাওয়া গাছে চড়ার মত এক নিমেষে—এ' সম্ভব কেবলমাত্র তাঁদেরই যাঁদের আছে অসাধারণ ফিজিক্যাল ফিটনেস, শুধু কি তাই?—ঐ বাঁশের শীর্ষে বাঁশকে জড়িয়ে ধরে একাধিক ব্যালান্সের খেলা। একজন খেলোয়াড়ের যতটা প্রয়োজন শরীর সুস্থ রাখার জন্য এই 'মাল খাম্বা'র প্রয়োজনীয়তা ঠিক তারও বেশী সৈনিকদের কাছে। এর ফলে পিঠ, পেট, বুক, কোমর, পা ও হাতের মাসেল তথা শরীরের প্রতিটি অংশের চালনা হয় এই 'মাল খাম্বা'র ফলে। প্রসঙ্গত, 'মাল খাম্বা'র উদ্ভাবক কিন্তু মারাঠারাজ ছত্রপতি শিবাজী।

কুকুর শুধু ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় নি যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের যাত্রী হিসাবে রণাংগনেও কুকুর বহু কাজে লাগে। নাগাল্যাণ্ড—মিজোরামের যুদ্ধ তথা সাম্প্রতিক যুদ্ধে কুকুর বিশেষ আকর্ষণীয় কাজ করেছে। সেগুলোও

দেখানো হ'ল সুন্দরভাবে। ভারতে যুদ্ধে কুকুরদের ভূমিকার কথা ভেবে একটি শিক্ষা স্কুল খোলা হয় ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই স্কুল সাময়িক ভাবে বন্ধ যায় হয়ে যুদ্ধ শেষে। পুনরায় ১৯৬০ থেকে আবার একটি চালু হয়েছে। দর্শকরা দেখলেন টেন্ট পেগিং। মাটিতে পোঁতা ছোট ছোট 'পেগ' অর্থাৎ খুঁটা—সেগুলোকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটন্ত ঘোড়ার পিচ থেকে ঘোড়সওয়ার বর্শার সাহায্যে তুলে নিচ্ছেন। কত প্রখর দৃষ্টিশক্তি থাকলে আর নিজের উপর কত আস্থা থাকলে এটা সম্ভব হয় তা সত্যিই দেখবার মত।

রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং বাহিনীরও নয়। তাই ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশেষ করে স্থানীয় পি, আর, ও অফিসের অনলস পরিশ্রমে সফল হয়েছে যুদ্ধের এক সুন্দর মহড়া। কলকাতাবাসীদের সামনে উপস্থাপিত করার এই সামরিক মহড়া সামরিক পরিভাষার নাম 'মিলিটারী টাট্টু'। টাট্টু কথাটি অনেকের কাছে গ্রীক কথা মনে হলেও সামরিক বাহিনীতে এটি একটি অতি পরিচিত কথা। প্রকৃতপক্ষে একটি এসেছে 'টাপ টো' (Tap to) ডাচ কথা থেকে। এর ইংরেজী পরি ভাষা হলো ক্লোজ দি ট্যাভারনস (Close the Taverns) অর্থাৎ 'শুঁড়িখানা বন্ধ কর'। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে ঘোড়ার প্রচলন। ঘোড়ায় চড়ে জওয়ানরা যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও ঘোড়সওয়ার সেনানীর ভূমিকা আজও আছে।

যে মাঠে হাজার হাজার দর্শক টিকিট কেটে টেষ্ট ক্রিকেট খেলা উপভোগ করেন সেই বিখ্যাত পিচের উপর অনুষ্ঠিত নানা উপভোগ্য বস্তু যুদ্ধের দৃশ্য থেকে পাঞ্জাবী ভাঙড়া আর মারাঠা লোকনৃত্য 'লেজিম' নাচ যা হোল মিলিটারি টাট্টু।

মানিকলাল দাশ

সংযোজিত যমজ

১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রথম থেকেই তাদের সাফল্যের ইতিহাস-প্রধানত মার্কিণ মুলুকে। শুধু দুবার তারা ইউরোপ ভ্রমণ করেছিল। প্রথম প্রথম ওদের বিকৃত রূপটাই লোকে দেখতে আসত। ক্রমশ ওরা নিজেরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে লাগল। খুব শীঘ্রই ওরা ইংরেজী-ভাষা রপ্ত করে ফেলে এবং এমনভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে শুরু করে যাতে ওদের পারদর্শিতা খুব সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অচিরেই তারা ব্যাডমিন্টন খেলায় দক্ষতা অর্জন করে এবং গাড়ীর চাকা ঘোরান ইত্যাদি নানরকম দৈহিক কসরৎ দেখিয়ে সুনাম অর্জনকরে।

একবার মার্কিন দেশে খেলা দেখিয়ে বেড়াবার সময় চ্যাং ও এং উত্তর ক্যারোলিনার সৌন্দর্য্যে ঘেরা পাহাড়ী অঞ্চল দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং অবসর-গ্রহণ করে ওখানেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ওখানেই তারা তাদের ভাবী বধূদের—সারা ও এডিলেডের দেখা পায়। ওরা ছিল ওখানকারই এক কৃষকের মেয়ে। ১৮৪৩ সালের ১৩ই এপ্রিল চ্যাং এডিলেডকে এবং এং সারাকে বিয়ে করে। কনেরা ছিল বরদের চাইতে দশ বছরের ছোট।

এই দুই দম্পতির অভিনব বিবাহিত জীবন মানব ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এদের সবশুদ্ধ ২২টি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তারমধ্যে এং ও সারার তিনটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে হয়। চ্যাংএর একটি কালা ও একটি বোবা মেয়ে ছাড়া আর সব সন্তানই ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক।

কয়েক বছর তারা সবাই মিলে তাদের পুরোনো বাড়ীতেই ছিল। তারপর যখন দুজনের পরিবার বৃদ্ধি পেল তারা দুজনে একমাইলের ব্যবধানে দুইটি বাড়ী করে। তারপর থেকে তারা একাদিক্রমে তিনদিন একজনের বাড়ীতে থাকত এবং পরের তিনিদিন অন্যজনের বাড়ীতে থাকত। এক বাড়ী থেকে অপর বাড়ীতে পরিবারের পুরুষরাই যাতায়াত করত। তাদের স্ত্রীরা স্থায়ী ভাবেই যে যার বাড়ী থাকত। চ্যাং ও এং—এর মৃত্যুকাল অবধি এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। এইভাবে ৬০ বছর বয়স পর্য্যন্ত সগৌরবে তারা জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাদের জীবনে একটু হতাশা ও অশান্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। কারণ অতিরিক্ত মদ্যপান করার জন্য চ্যাং-এর শরীর ক্রমশঃই খারাপ হয়ে পড়েছিল। এং এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে যে তাদের পক্ষে আলাদা হওয়া সম্ভব কিনা। কিন্তু কোনও চিকিৎসকই তাদের উপর অস্ত্রোপচার করার ঝুঁকি নিতে চাননি।

চ্যাং ও এং-য়ের অভিনব জীবনের পরিসমাপ্তি অত্যন্ত নাটকীয় ভাবেই ঘটেছিল। ১৮৭৪ সালের ১২ই জানুয়ারী, সোমবার, তার নিজের বাড়ীতে, চ্যাং ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগ্রহণ করে। বৃহস্পতিবার এডিলেড্ ও এং-এর ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও চ্যাং তাদের নিয়মানুযায়ী এং-য়ের বাড়ীতে যাবার জন্য জেদ ধরে।

জানুয়ারী মাসের প্রচণ্ড শীতে এই যাত্রা চ্যাং সহ্য করতে পারে নি এবং ক্রমশঃই তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। ১৭ই জানুয়ারী শনিবার, সকালবেলা এং ঘুম থেকে উঠে চ্যাং-এর দিক থেকে কোনও সাড়া পায় না। এং সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলে তার এক ছেলে দৌড়ে আসে এবং চ্যাংকে নাড়া দেয়। তারপর বলে, "বাবা, চ্যাং কাকা মারা গেছেন।" তার বাবাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় 'আমারও শেষ ঘনিয়ে এল' এবং দুঘণ্টা পরে এ্যাং-য়ের জীবন-দীপ নিভে যায়।

এইভাবে চ্যাং ও এং-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে।
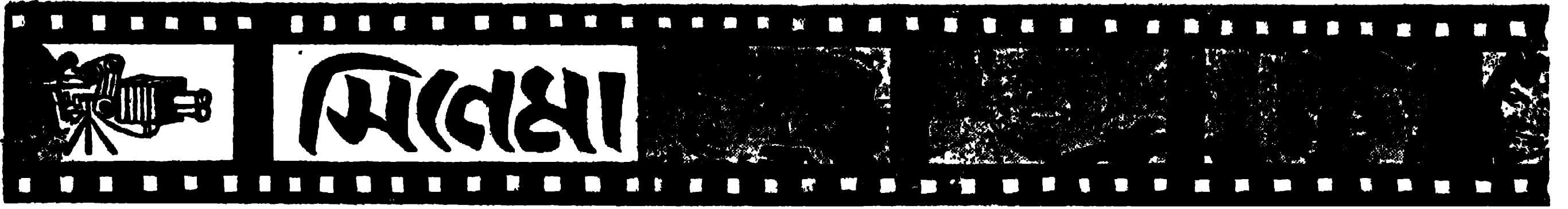
অজস্র ধন্যবাদ

কোমল-কান্ত পদাবলীর স্রষ্টা জয়দেব সন্দিগ্ধচিত্তে যেমন তাঁর একটিমাত্র চরণের ভূমিকায় পাঠককে উল্টো-ধমক দিয়ে রেখেছিলেন: যদি হরিস্মরণে চিত্ত রসায়িত না-হয়ে থাকে, তবে তাঁর পদাবলীর যথার্থ রসাস্বাদন সম্ভব নয়—তেমনই এ ছবির পরিচালক শুরুতেই দর্শকদের ধমকে রেখেছেন বিশেষ বয়সের রসে জারিত এবং বর্ণালী মানসিকতা ছাড়া তাঁর ছবির আস্বাদ সম্ভব নয়। সত্যভাষণের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। আর ভবিষ্যতের এই ধন্যবাদ আগে থেকে আন্দাজ করেই বোধ করি এ ছবির নামকরণ।

গানের জগতের সঙ্গে কাহিনীকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পরিচয় দীর্ঘ দিনের। সেখানকার কোন পাত্র-পাত্রীর ব্যবসাবুদ্ধি-ঘেঁসা প্রেমকথাই সম্ভবত: কাহিনীর ভিত্তিভূমি কিন্তু বাস্তব বলতে ওইটুকুই। কাহিনী-অংশের বাকী শাখা-প্রশাখাগুলি এতই দুর্বল যে তার ওপর ভর করে কোন সবলদেহ চিত্রনাট্য দাঁড়াতে পারে না। যে-জন্যে প্রখ্যাত শিল্পপতির একমাত্র কন্যা গোপা, একটা মিলের পুরো দায়িত্ব যার ঘাড়ে, বয়ো-চাপল্যে ভুগছে। এমন কি দায়িত্বশীল বোঝাতে একটা মোটা ফ্রেমের চশমাও রূপসজ্জাকর তাকে দেননি। তার জীবনে প্রথম প্রেম এসেছে লঘু পাখা জড়িয়ে—উড়েও গেছে যুক্তির মাটিতে পা-রাখার আগেই। এক সংগীতশিল্পীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় ব্যর্থ প্রথম প্রেমের ক্ষত শুকিয়ে ওঠার আগেই দ্বিতীয় আধার আশ্রয় করেছে সে। দ্বিতীয় আধারটি ধ্রুপদী সঙ্গীতের শিল্পী ধ্রুব। ততক্ষণে, সিনেমা-গল্পের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী, বাবার বিধিনিষেধও জরুরী অবস্থার মতো হঠাৎ উঠে গেছে।

চিত্রনাট্যের কথা আগেই বলেছি; পরিচালনা সম্পর্কেও বলার মতো কিছু নেই। 'কিছুক্ষণ' থেকে নকল-সোনা'-র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এ ছবিতে দু-একবার উঁকি দিয়ে গেছেন মাত্র। বাচ্চা মেয়ে ফুল হাতে বিস্তৃত সিঁড়ি ভেঙে উঠছে চিত্রকল্পটিতে মধুকরী কল্পনার বিন্যাস বা মহারাজা চিত্র-মূর্তির প্রতীকী ব্যবহার ইত্যাদি কয়েকটি খণ্ড মুহূর্ত ছাড়া তাঁর সাক্ষাৎ বিশেষ কোথাও পাওয়া গেল না। লঘু সঙ্গীতের শিল্পীর লঘুচরিত্র এবং ধীরোদাত্ত ধ্রুপদী শিল্পীর চরিত্রের পাশাপাশি উপস্থাপনায় মুন্সীয়ানার ছাপ প্রত্যক্ষ। গোপার জীবনের প্রথম নায়ক অবাঙালী সুনীল মায়ার মুখের ভাঙা বাংলা সংলাপ সাহস-দৃঢ় সিদ্ধান্তের ফসল।

সংলাপ কোন কোন সময় বুদ্ধিদীপ্ত ও ছবির প্রয়োজনে সরস হয়ে উঠলেও তীক্ষ্ণতাহীন। গান পারিবারিক ফর্মুলা মেনে চলেছে। অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর দর্শককে খুশি রাখতে মহম্মদ রফি থেকে শৈলেন্দ্র সিং, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অমিত গাঙ্গুলী সবাইকেই ঢং-অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। শ্যামল মিত্রকে ধন্যবাদ, গানগুলি কানপসন্দ। ফোটোগ্রাফি ও সম্পাদনা মিল ধর্মঘটের দৃশ্যের এক্সট্রাদের দৃষ্টিকটু হাসির চেয়ে সহনীয়।

অভিনয়ে অনিল চট্টোপাধ্যায় চতুর-বুদ্ধি ব্যবসায়ীর চেয়ে স্নেহময় বাবা হয়ে ওঠার দিকে নজর রেখে সফল হয়েছেন। অপর্ণা সেন গোপা চরিত্রের গভীরে নেমেছেন অনেক পরে। তখন বোধকরি কিছুটা দেরীই হয়ে গিয়ে থাকবে। নায়কের চরিত্রে শৈলেন্দ্র সিংকে দেখে মনে হলো, বাংলা ছবি এখনও সুন্দর চেহারার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ততার বাদাম চিবোচ্ছে। ওরই মধ্যে যাঁরা ন্যস্ত দায়িত্ব মোটামুটি পালন করার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা হলেন: রঞ্জিত মল্লিক, মহুয়া রায়চৌধুরী, অনুপ কুমার, তরুণ কুমার ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

বিদগ্ধ পাঠক

অজস্র ধন্যবাদ/অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সেন ও অপর্ণা সেন

DHANADHANYE YOJANA REGD. No. WB/CC-315
Price 50 Paise (Bengali) April 16—30, 1977

আজকের নাটক
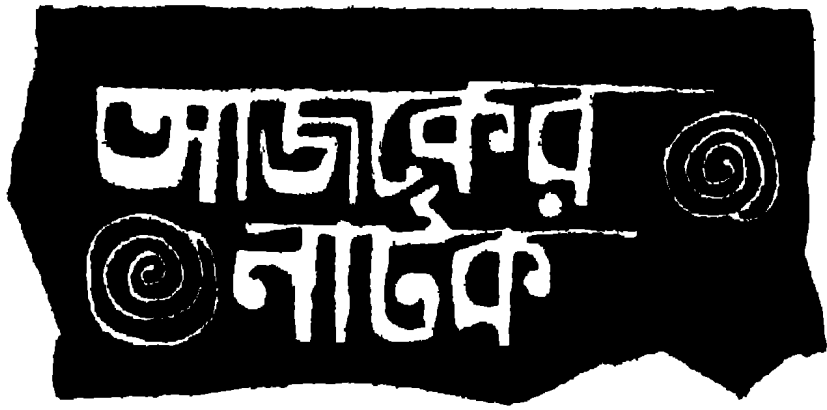
সংগ্রামী নাট্যকার-নির্দেশক ও অভিনেতা অসীম চক্রবর্তী পরপর কয়েকটি নাটকে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'বারবধূ' নাটকে লক্ষ্মীলাভ করেছেন। অর্থাৎ নাম, যশ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ইঁর মানুষের জীবনে নিশ্চয় বড় ফ্যাক্টর। নয়ত জনৈকের মৃত্যু, পতনের পর, ধর্মঘট, থানা থেকে আসছি, অথ মালতী বৃষভ কথা, বিসর্জন, নীলরঙের ঘোড়া বা পথের দাবীর মত আদর্শমূলক নাটক করেও দাঁড়াতে পারেননি কেন? সুবোধ-ঘোষের একটি সাদামাটা গল্পের নাট্য-রূপই 'বারবধূ'। গল্পের বিষয়বস্তু আমাদের কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়না তবু পরিবেশনের গুণে উপভোগ্য ও বাস্তব-

চতুর্মুখের 'বারবধূ'

ধর্মী হয়ে উঠেছে। নাটকটির সার সংক্ষেপ এই—প্রসাদ রায় লতারাণী নামে একটি দেহ ব্যবসায়ী মেয়েকে হাজারিবাগে বেড়াতে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোক ও অন্যান্য ভ্রমণকারীদের কাছে লতাকে বৌ বলে পরিচয় দেয়। লতা ক্রমশঃ চেঞ্জারদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে, সংসারের স্বাদ পায় এবং প্রসাদকে সত্যিকারের জীবনসঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। চেঞ্জারের সমবয়সী সকল মেয়েরা তাকে বৌদি বৌদি বলে আবেগমথিত করে তোলে। প্রসাদের দেওয়া সিঁদুর তার মনে রং ধরায়। সে চায় অন্য মেয়েদের মত সেও মা হবে, বোন হবে, স্ত্রী হবে। অর্থাৎ নারী সত্তা জেগে ওঠে। ভুলে যায় সে বারবনিতা বা বারবধূ। বিধিবাম। বাস্তবজীবনে কল্পনা বুঝি মেলেনা। প্রসাদ রায় শুধু একে নিয়ে তৃপ্ত নয়। তাঁর কামুক প্রবৃত্তি, নারী সম্ভোগ মন আভা নামক এক সুন্দরী স্কুল শিক্ষিকার দিকে ধাবিত হয়। সুযোগ পেয়ে আভাও প্রসাদের জীবনসঙ্গিনী হতে চায়, প্রসাদ দেহ ভোগের জন্য সচেষ্ট হয়। লতার চোখে কিছুই এড়ায় না। নিজের অধিকার রাখতে তর্ক বাধায়, দ্বন্দ্ব হয়। প্রসাদও বুঝিয়ে দেয় বার-বধূদের নিয়ে স্ফূর্তি করা যায়, বিয়ে করা যায় না। লতা দুঃখে ক্ষোভে প্রসাদকে ছেড়ে চলে যায়। লতা বুঝল এ সমাজে তার কোন সম্মান নেই, স্থান নেই, বারবধূ রূপেই তাকে থাকতে হবে।

নাটকটিতে প্রসাদ রায়কে ভোগী মানুষ ছাড়া অন্য কিছু দেখানো হয়নি। তার জীবনে অন্য কোন সদ্‌গুণ বা উদ্দেশ্য আছে কিনা তাও জানা যায়নি। এ নাটকে প্রধান গুণ টিমওয়ার্ক ও গতি। প্রসাদ-রায়ের ভূমিকায় অসীম চক্রবর্তী অনবদ্য। তাঁর কথা বলা, মদ খাওয়া, লতাকে মান অভিমানে মুখবিকৃত করা, চেঞ্জারদের দেখে বিরক্ত হওয়া, আভাকে পটাতে চোখে মুখের খুশি খুশি ভাব ও বিশেষ বিশেষ স্থানে হাসাতে তিনি যথার্থ সুশিল্পীর মতই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। লতার ভূমিকায় কেতকী দেবী যথেষ্ট প্রাণসঞ্চার করেছেন। বিভিন্ন পরিবেশে তাঁর চলা বলা ও ভাবভঙ্গী অনবদ্য। তবে স্থানে স্থানে তাঁর গলার স্বর আরও উঠলে ভাল হত। 'একি মায়াজালে জড়ালে আমায়' গানটি তাঁর কণ্ঠে বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের গানগুলি, প্রাচীন লোকগীতি ও বিনোদিনী দাসীর গানগুলিও সুন্দর গেয়েছেন। গানগুলি সুপ্রযুক্ত। লতার হাতে গলায় এত গহনা অথচ আঙুলে কোন আংটি নেই কেন? দালালের ভূমিকায় শঙ্কর পাল প্রাণবন্ত।

বারবধূ/অসীম চক্রবর্তী

তিনি প্রথম পর্বে হাস্যরস, দ্বিতীয় পর্বে করুণ রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী (কেষ্টবাবু) অনিলদাস (রাখালবাবু), মঞ্জু চক্রবর্তী (নূপুর) দর্শকদের বেশ হাসিয়েছেন। মঞ্জু গঙ্গোপাধ্যায় (লক্ষ্মীদি) বেশ গাম্ভীর্য্য ও ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। তারক, প্রদ্যোৎ, নিমাই, পিকলু, হারাধন, মধু, পিণ্টু, তেওয়ারী, ডাক্তার ও পচার ভূমিকায় যথাক্রমে জয়গোবিন্দ চক্রবর্তী, সুবীর দত্তরায়, বিশ্বনাথ মুখার্জী, জ্যোতিষ রায়, প্রশান্ত চক্রবর্তী, অশোক চক্রবর্তী, মাঃ অজয় ঘোষ, চরণ দাশ, সুভাষ বসু, ও গোপাল মজুমদার নাটকের দাবী মিটিয়েছেন। মঞ্চপরিকল্পনা (রঙ্গলাল শর্মা), ধ্বনি (কমল চৌধুরী), আলো (গোপাল দাশ) ও দৃশ্যপট পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। চেঞ্জারদের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নাটকের মহড়ার দৃশ্যটি বেশ প্রাণবন্ত। সবমিলিয়ে কয়েকঘণ্টা সময় কাটাতে নাটকটি বেশ উপভোগ্য।

সত্যানন্দ গুহ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

১-১৫ জুন
১৯৭৭

ধনধান্যে

একান্তই গৃহিণীদের জন্য

বিশেষ প্রতিনিধি

শহরে কিংবা গ্রামে যেখানেই হোক আজকের গৃহিণীদের হাজারো সমস্যা। তার মধ্যে অনেকগুলিই আবার রান্না ঘরের। অর্থাৎ সমস্যাটা জ্বালানীগত।

শহরের কথাই ধরা যাক। অফিসের রান্না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারতে হবে। নইলে অফিসযাত্রী কর্তার দেরী হবে। কিংবা যে বাড়িতে কর্তা-গিন্নী দুজনেই কাজে যান তাঁদের তো রান্না-বান্নার পাট আরো সংক্ষিপ্ত করতে হয়। অফিস কাছারী না থাকলেও কোন আধুনিক গৃহিণী আজ আর রান্নাঘরে অনর্থক বেশীক্ষণ থাকতে চান না। শহরে অনেক বাড়ীতে আজকাল রান্নার গ্যাসের চলন হয়েছে। কিন্তু যাদের গ্যাস নেই, তাদের সংখ্যাই অনেক অনেক গুণে বেশী। তাদের ভরসা সেই সাবেকী কয়লার উনুন, কিংবা মিতায়তন পরিবার হলে কেরোসিনের ষ্টোভ। আর কয়লা ও কেরোসিন দুটোর দামই গত কয়েক-বছরে অসম্ভব বেড়ে গেছে।

কিন্তু কয়লার উনানের ধোঁয়াটা কারুরই সুখপ্রদ নয়। গৃহিণীদের তো বটেই, সারা পরিবারের পক্ষেই কয়লার ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। আজকাল তো আবার দূষিত পরিবেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা সতর্কবাণী শোনাচ্ছেন। আর এক ঝঞ্ঝাট হলো উনুন ধরানো।

ধোঁয়াহীন নতুন চুল্লী

কয়লার উনুনের ধোঁয়ার সমস্যাটা গ্রামাঞ্চলেরও। অনেকদিন থেকেই ভাবা হচ্ছিল এমন এক উনুন তৈরীর কথা যে উনুনে ধোঁয়া হবেনা, যে উনুনের নক্সা আধুনিক হবে অথচ সবাই ব্যবহার করতে পারবে, যে উনুন জ্বালাতে সময় কম লাগবে অথচ অল্প কয়লায় জ্বলবেও বেশীক্ষণ এবং যাতে আঁচ বেশী হবে। তাছাড়া এধরণের উনুনের খরচাও এমন হবে যাতে সাধারণ লোকে ব্যবহার করতে পারে।

এমনি একটি উনুন উদ্ভাবনের জন্য সরকারী কয়লা দপ্তর কোল ইণ্ডিয়া একটি জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৭৯ টি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা এবং বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে দুর্গাপুরের খনি যন্ত্রবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের নকসাই সবচেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হয়েছে। এই উনুনটির গড়ন অত্যন্ত সরল, দামও মাত্র ১৫ থেকে ২২ টাকা। এই উনুন সহজেই ধরানো যায়। ধোঁয়া হয়না, ধোঁয়াটাও ভেতরে গিয়ে আগুনকে আরো উসকে দেয়। আঁচ খুব তেজী হয়। রান্নাও তাই তাড়াতাড়ি হয়। এই উনুনের নক্সাটি সবে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্যাপকহারে উৎপাদন সুরু হয়নি। বাজারে আসতে তাই কিছু সময় লাগবে।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর-২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্লিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেণ্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্লিকেশনস ডিভিশনের এজেণ্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :

'ধনধান্যে, পাব্লিকেশনস ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯, ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত।

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১-১৫ জুন, ১৯৭৭
অষ্টম বর্ষ : ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—মনোজ বিশ্বাস

প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যাবে এবং তারা তাদের উৎপাদনের উৎকর্ষ ও মূল্য উভয়ই উন্নত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

নতুন বাণিজ্যনীতি

মোহন ধারিয়া

যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সে-দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটে তার ওপর। দেশীয় উৎপাদিত ও বিদেশ থেকে আমদানিকৃত উভয়প্রকার অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সময়মত পাওয়ার ওপর শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতি প্রধানত নির্ভর করে। কয়েকদিন আগে ঘোষিত ১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য নতুন আমদানি নীতিতে দেশের শিল্প উন্নয়ন এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুসংহত অর্থনৈতিক উন্নতির কার্যক্রম থেকেই আমদানি নীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আরো বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ, দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি, অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির সরবরাহ—বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর নিকট এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণের নিমিত্ত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারও এই নতুন নীতির একটি উদ্দেশ্য।

বেশ কিছু পরিমাণ কার্যপদ্ধতিগত সরলীকরণ ছাড়াও কিছু সংখ্যক সামগ্রীকে খোলা সাধারণ লাইসেন্সে ও অবাধ লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত করে নতুন নীতিতে আমদানিকে উদার করা হয়েছে। এই নীতির পিছনে মূল দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল যতদূর সম্ভব সহজে ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরে শিল্পের অত্যাবশ্যক সামগ্রী পাওয়া যাতে সুলভ করা যায় তা সম্ভব করা। এমন কি যেখানে সরকারী ক্ষেত্রের কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমদানী সামগ্রীগুলির বিন্যাস করা হয়েছে সে-ক্ষেত্রেও সরাসরি আমদানি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমদানির উদার নিয়মকানুন দেশে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে যাওয়া শিল্প ক্ষমতার অধিকতর ব্যবহারের উদ্দেশ্যটি সফল করবে বলে আশা করা যায়।

রপ্তানির ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন প্রথা এই নতুন আমদানি নীতিতে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রথমতঃ পঞ্জীভুক্ত রপ্তানি-কারকদের ক্ষেত্রে 'ক্রয় তালিকা' যাতে বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্রী আমদানির সীমা নির্ধারিত রাখা হয়েছিল, তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন আমদানি-কারকরা তাদের উৎপাদনের প্রয়োজনানুসারে তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমদানি সামগ্রী পেতে পারবে। এর ফলে আমদানি সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং আমদানি সামগ্রীর সুলভে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও আর্থনীতিক পরিমণ্ডল উৎসাহিত হবে এবং তার ফলে উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করতেও সহায়তা করবে। অবশ্য আমদানির ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করার বেলায় যত্ন নেওয়া হয়েছে, যাতে দেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থ ব্যাহত না হয়। এইসব বিধিনিষেধ আরোপ করার ফলে, দেশীয় শিল্পের

যদিও আগাম লাইসেন্সের ক্ষেত্রে কিছুকাল ধরেই শুল্কমুক্ত আমদানির একটি পরিকল্পনা চালু ছিল কিন্তু এর কাজকর্ম ভালভাবে চলছিল না। তাই এই পরিকল্পনাটির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং ৯৪ টির মত দ্রব্য এখন এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমদানি শুল্ক আদায় না দিয়েই এগুলি আমদানি করতে দেওয়া হবে। আমদানিকারকের পক্ষে সুবিধা দাঁড়াবে এই যে তিনি যদি আগাম আমদানি লাইসেন্সের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ পরিপূরণে অক্ষম না হন তাহলে তাকে আমদানি শুল্ক দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আগেকার পরিস্থিতি থেকে এটি উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি। আগেকার পরিস্থিতিতে আমদানিকারকের প্রদত্ত আমদানি শুল্কের ফেরত পাওয়ার দাবি জানাতে হত, এমনকি আমদানি শুল্ক ১০০ ভাগ ফেরতের ক্ষেত্রে পর্যন্ত। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে তহবিল ক্ষীণতার দরুণ খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে পড়ত।

মেশিনপত্র ও মূলধনী সামগ্রী ইত্যাদি দেশীয় সরবরাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এখন কিছু শর্তসাপেক্ষ মেশিনপত্র ও স্পেয়ার-পার্টস আমদানির জন্য আমদানি পরিপূরক লাইসেন্স পাওয়া যাবে। স্পেয়ার-পার্টসের ক্ষেত্রে তাদের মূল্যের ১০% পর্যন্ত আমদানি করার ব্যাপারে লাইসেন্স ব্যবহার করা যাবে। মেশিনপত্রের ক্ষেত্রে শিল্পের সম্প্রসারণ, পরিবর্তন, সামঞ্জস্যবিধান, আধুনিকীকরণ কিংবা গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র আমদানির জন্য পুরা অধিকার ব্যবহার করা যাবে।

কান্দলা ও সান্তাক্রুজস্থিত মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে আমদানির পরিমাণ

আরো বাড়ান হয়েছে এবং সাধারণ খোলা লাইসেন্সে (ক) মেশিনপত্র, (খ) কাঁচা মালমশলা, (গ) যন্ত্রাংশ, (ঘ) মেশিন পত্রের স্পেয়ার-পার্টস, (ঙ) ক্ষয়শীল দ্রব্যাদি, (চ) টুলস, জিগস, গ্যাজেস ও ফিক্সচারস, (ছ) প্রযুক্তি ও বাণিজ্য নমুনাদির আমদানি সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলে এই সব দ্রব্য আমদানির জন্য কোন প্রকার আমদানি লাইসেন্সের প্রয়োজন পড়ে না।

কিছু জিনিষের আমদানি সরকারী ক্ষেত্রের সংস্থা সমূহ যেমন এস. টি. সি, এম. এম. টি. সি, এস. এ. এল. এল, ইত্যাদির মাধ্যমে আনতে হবে বলে বিধান করা হয়েছে। ঐ সমস্ত জিনিষ এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে আমদানি করার বিধান সত্ত্বেও অবশ্য এই সমস্ত দ্রব্যের কয়েকটি রপ্তানিকারকগণ সরাসরি আমদানি করতে পারবেন। রপ্তানিকারকগণ যাতে খুব মিতব্যয়িতার সঙ্গে ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করতে পারেন এবং আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কর্মসূচী ও বস্তুগত রপ্তানির অর্ডার ডেলিভারী দেওয়ার কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য তাঁদের প্রয়োজনানুযায়ী সময়মত আমদানি করতে পারেন, তার জন্য এটি করা হয়েছে।

রপ্তানিকারক সংস্থাগুলি সম্পর্কিত পরিকল্পনাটিও সংশোধন ও সরলীকরণ করা হয়েছে। এই নতুন পরিকল্পনায় রপ্তানিকারক সংস্থাগুলিকে আরো বেশি সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা তাঁদের সহায়ক প্রস্তুতকারকগণকে, বিশেষত যারা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প ক্ষেত্রে আছেন তাঁদের পণ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সার্ভিসের ব্যবস্থা করতে পারেন। নতুন পরিকল্পনার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রস্তুতকারকগণ বিশেষত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রের প্রস্তুতকারকগণ যাতে বিদেশে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণনে কোন অসুবিধা ভোগ না করেন এবং যাতে রপ্তানিকারক সংস্থাগুলি তাঁদের সহায়ক প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ও ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। অবশ্য নিম্নতম রপ্তানি যাতে বৃদ্ধি পায় এই বিষয়টির ওপর লক্ষ্য রেখে রপ্তানিকারক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতিপ্রদানের ক্ষেত্রে মনোনীত রপ্তানি সামগ্রীর ক্ষেত্রে সীমা বৃদ্ধি করে ১ কোটি টাকা ও অমনোনীত সামগ্রীর ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটগুলি এবং কুটির ও গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত ইউনিটগুলি যাতে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি করতে পারে তার জন্য এই নতুন নীতিতে বিশেষ রেহাই-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন প্রস্তুতকারকদের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সংস্থা হিসেবে পঞ্জীভূত হওয়ার উদ্দেশ্যে রপ্তানির ন্যূনতম সীমার পরিমাণ হ্রাস করে মনোনীত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা এবং অমনোনীত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে ২ কোটি টাকা করা হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কোন ইউনিট এই গ্রস পরিমাণ রপ্তানি কার্যে অক্ষম হয়ে পড়লেও আরো সুযোগ পাবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কয়েকটি ইউনিট মিলে একটি সমিতি গড়ে তুলতে পারবে তবে এই সমিতির প্রধান ইউনিটগুলিকে অবশ্যই ২৫ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি টাকার (যেক্ষেত্রে যেরূপ) রপ্তানির কাজ সম্পাদন করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্মিলিত ইউনিটগুলি যদি ২৫ লক্ষ টাকার রপ্তানি সম্পাদনে অপারগ হয় তথাপি তারা যদি ১০ লক্ষ টাকার রপ্তানি করতে পারে তাহলে তাদের 'রপ্তানি গ্রুপ' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হবে আর শর্ত থাকবে যে ২৫ লক্ষ টাকার সীমায় পৌঁছানো না পর্যন্ত তারা প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকার রপ্তানি বাড়িয়ে যাবে। এই রপ্তানি গ্রুপগুলিকে রপ্তানি সংস্থার কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হবে। এই ধরনের কোন রপ্তানি গ্রুপ যদি কুটির ও গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্রের দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানিতে নিয়ত থাকে তাহলে তাকে প্রথম পর্যায় থেকেই পুরাপুরি রপ্তানি সংস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে।

এই নতুন নীতি প্রণয়নের সময় জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ বিবেচনা করা হয়েছে। ক্যানসার-প্রতিরোধক ও জীবনদায়ী ঔষধসমূহ, অন্ধ মানুষদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, হাসপাতাল ও চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রপ্তানির উপর কোনরূপ বাধানিষেধ নেই। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিশেষজ্ঞের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থাদি ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায় না, সেগুলি অবাধে আমদানি করা যাবে। শিল্পীদের প্রয়োজনীয় কিছু মালমসলা ও যন্ত্রপাতিও সহজেই আমদানি করা চলবে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানির সুযোগসুবিধাও বাড়ান হয়েছে। সমস্ত স্বীকৃত গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান বিনা লাইসেন্সে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের কাঁচা মালমশলা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি আমদানি করতে পারবে।

এই নতুন আমদানি নীতিতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি ও দেশীয় প্রস্তুতকারকদের স্বার্থ—এই দুটির সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে এবং রপ্তানিকারকদের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে রপ্তানি বৃদ্ধির সমস্ত প্রকার চেষ্টা করার সময় দেশীয় প্রস্তুতকারকদের স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আত্ম-নির্ভরতা অর্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে রপ্তানি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপের সময় সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা বিকল্প আমদানির এলাকাও প্রসারিত করেছি। এই নতুন নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত গতিতে ও অধিকতর আস্থার সঙ্গে আত্ম-নির্ভরতা অর্জন করা। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস' এই দর্শনের ভিত্তিতেই এই নতুন নীতি গঠিত হয়েছে।

কলুষিত পরিবেশ প্রসঙ্গে

সুভাষ সমাজদার

সাদা চুল, সাদা দাড়ি। আর বয়সের রেখা আঁকা মুখখানা যেন বহু—বহু দূরের কোন পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া একটা শিলাখণ্ড। সেখানে অনেক বছরের ঝড়-জল-রোদের সুস্পষ্ট ছাপ।

যেখানে এসে সে দাঁড়ালো তার চারিদিকে খাড়া পাহাড়। তার গায়ে গায়ে বনতুলসী আর বেঁটে বেঁটে পাহাড়ী বাঁশের ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে সারি সারি পাইন গাছ। হঠাৎ দেখলে দূর থেকে মনে হয় কে যেন গাঢ় সবুজ রং দিয়ে এক একটা সমান্তরাল রেখা টেনে দিয়েছে। চারিদিকের সেই অফুরন্ত সবুজের সমারোহের ভেতরে দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে ইস্পাতের ফলার মত পাহাড়ী একটা ঝরণার নীলিমোজ্জ্বল রেখা। পাথরে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে তীব্র বেগে সেই ঝরণার জল গড়িয়ে পড়েছে নীচে। শব্দ উঠছে ঝর-ঝর-ঝর। চারিদিকে অবারিত সেই আরণ্যক প্রকৃতির শান্ত সমাহিত স্তব্ধতা সেই শব্দে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ক্রীক্-ক্রীক্—ঝরণার সেই শব্দটাকে টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করল সেই বৃদ্ধ। এরপর সে এল শহরে।

গর্জন করে ছুটছে বাস, ছুটছে ট্রাম। ট্রাক-ষ্টেশনওয়াগন-টেম্পো-ট্যাক্সির আর অজস্র মানুষের সমবেত কোলাহলের শব্দ সব মিলিয়ে যেন একটা সমুদ্র।

শব্দের সমুদ্র। তার এক একটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে বায়ুমণ্ডলে। কাঁপতে কাঁপতে, মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে ঈথারে। জনাকীর্ণ একটা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের সেই আক্ষেপোক্তি—

—'দরজায় টোকা কিম্বা হাতুড়ির শব্দ আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে' —তার কানে বাজে আর এক দুঃখবাদী ফিলসফারের কথা—বুদ্ধিজীবীদের সবচাইতে বড় শত্রু হলো—গোলমাল যাকে বলে 'নয়েজ'—তাঁরা দার্শনিক—বৈজ্ঞানিক নন। তাই তাঁরা জানেন না শব্দ শুধু শত্রু নয়, অবিরাম শব্দ তরঙ্গ মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

একটু অবাক হচ্ছেন—না? আচ্ছা—হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি কি কানে কম শোনেন? অডোমিটার টেষ্টিং মেশিনের সামনে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ এক ক্রেনড্রাইভারকে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ-স্যার ফুল ভলিউম না করলে শুনতেই পাইনা রেডিও—

পরীক্ষা করে দেখাগেল তার হার্টের অবস্থাও ভালো নয়।

এইবার অডোমিটারের সামনে নিয়ে এলাম এক কৃষককে। তার বয়স অষ্টাশী। অটুট স্বাস্থ্য। গ্রামের শান্ত নিভৃত পরিবেশে বাস করে সে। এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেল—তার শ্রবণশক্তি যেমন তেমনি হার্টের কণ্ডিশন ক্রেনড্রাইভারের চেয়ে অনেক ভালো। কেন হয় জানেন?

খুব জোরে শব্দ হলেই হার্টবিট দ্রুত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডভেসলগুলো যায় কুঁচকে আর ষ্ট্যাকে এবং ইনটেষ্টাইনের ভেতরে চলতে থাকে স্প্যাজম অর্থাৎ খিচুনী—তার ফলেই মানুষ শিকার হয় সেই রোগটির যা আমাদের মনে ছড়িয়ে দেয় একটা আতঙ্কের বিভীষিকা। মারাত্মক সেই রোগটির নাম—হার্টডিজিজ।

উপরোক্ত কথাগুলো যিনি বলেছেন; যিনি পাহাড়ে, বনে, জনবহুল শহরের পথে পথে ঘুরে শব্দের বৈচিত্র্যকে রেকর্ড করছেন তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং ডক্টর রসেন—স্যামুয়েল রসেন। পৃথিবীর সবচাইতে বড় 'নয়েজ-পলিউশান এক্সপার্ট'। বর্তমান বয়স—উনআশী। একসময়ে ছিলেন ইয়ার সার্জেন—কানের চিকিৎসা করতে করতে হাজারো বধির মানুষের হার্টের অবস্থা দেখে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তিনি বলেছেন--Noise is, obviously, contributor to heart disease and human coronary. . . .

ক্যালিফোর্ণিয়ার আর এক নয়েজ এক্সপার্ট ডক্টর ভাণো নুডসন সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—

দিনের পর দিন যে হারে পৃথিবীতে শব্দতরঙ্গ বেড়ে চলেছে, তাতে ত্রিশ বছর পর সারাটা জগৎ হয়ে উঠবে এক শ্বাসরোধী বিষাক্ত গ্যাস চেম্বার।

আর একজন—আরও এক সর্বনাশা খবর দিয়েছেন। ডক্টর রাসমুসেন বলেছেন ক্যানসার জাতীয় টিউমারের জীবাণুও ছড়ায় 'নয়েজ'!

শুধু নয়েজ নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশকে অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টকে দূষিত করছে প্রতি মুহূর্তে রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়া, ডিসেল বাসের এবং বিভিন্ন রকমের অটোমোবাইলসের গ্যাস, কয়লা ও কাঠের ধোঁয়া। এই ধোঁয়া বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে বিপন্ন করে তুলছে জীব জগতের অস্তিত্ব। দিনে দিনে পৃথিবীর দিকে দিকে যত

শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হচ্ছে, বাড়ছে কলকারখানা ততই; উদ্ভিদ আর প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক নানারকমের বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে করছে দূষিত। একেই বলে এয়ার পলিউশান।

পলিউশান কথাটির অভিধানগত অর্থ হলো—কলুষিত করা—

১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের ষ্টকহলম শহরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ অ্যাজেণ্ডাই ছিল—'হিউম্যান এনভায়রনমেণ্ট'। এই কনফারেন্সের কার্য বিবরণীতে বলা হয়েছে পলিউশান হয় ছয়রকমে—জলে, বাতাসে, আবর্জনায়, রোগের জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধে অত্যুজ্জ্বল কিরণ এবং গোলমাল।
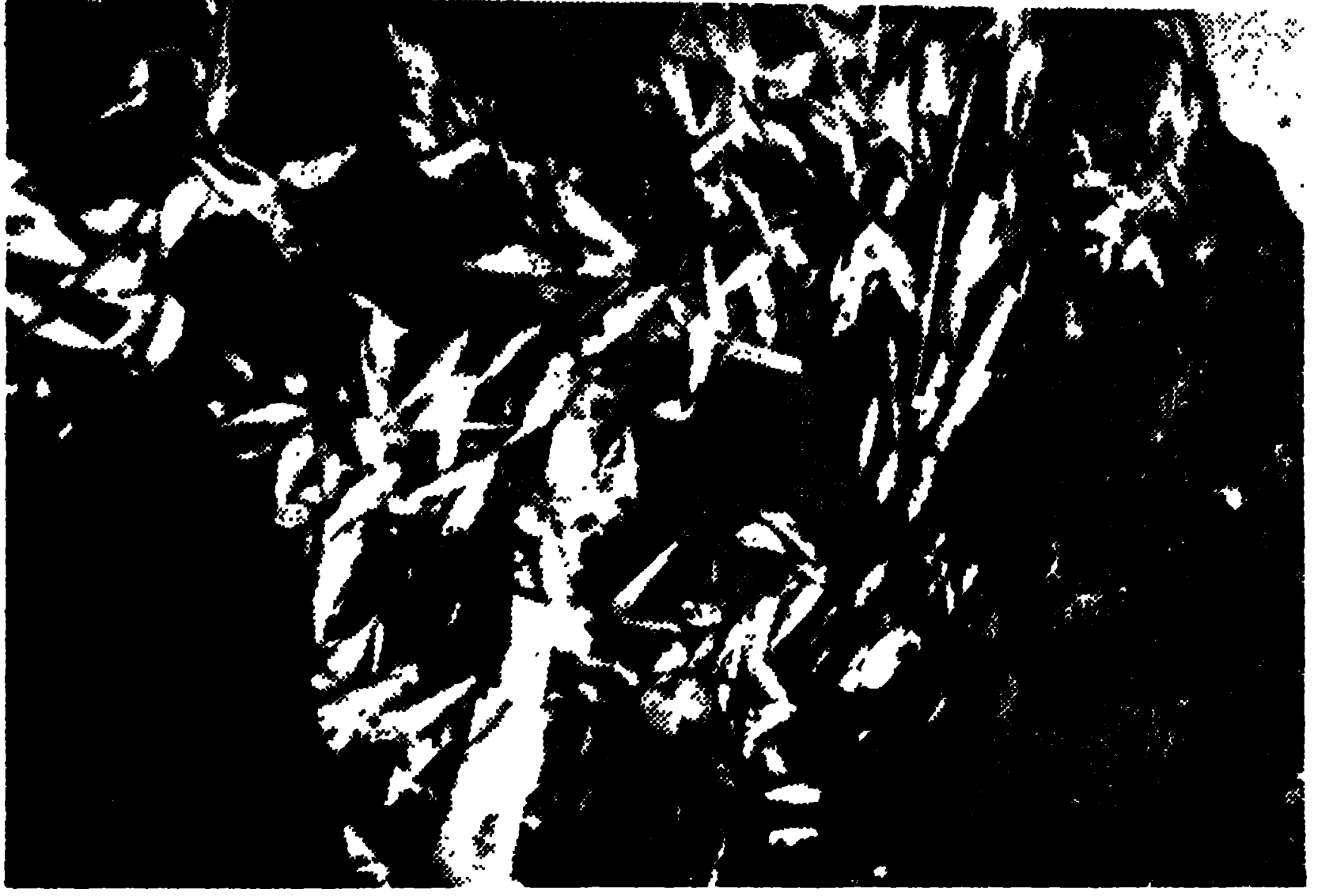
এয়ার পলিউশনের কথা বলেছি, এবারে বলি—ওয়াটার পলিউশানের ইতিবৃত্ত

সমুদ্র। দিগন্তবিসারী বিশাল জলরাশি। যতদূর চোখ যায়—জল আর জল—এই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে আলোড়ন আনছে একটা জাহাজ। হঠাৎ সাঁ-সাঁ করে কিছু অপ্রয়োজনীয় তেল এবং তার সঙ্গে কিছু কেমিক্যালস্‌ ডিসচার্জ করল সাগরের জলে। কখনো কখনো জাহাজ থেকে 'ড্যাম্পিং রিফিউজ' অর্থাৎ আবর্জনাও ফেলা হয়—এই কেমিক্যালস্‌, তেল, আবর্জনা সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এই ওয়াটার পলিউশানের এক বিপজ্জনক পরিণাম দেখা গিয়েছে পৃথিবীর সুদূর উত্তরে এক সাগরে।

বাল্টিক সাগর। এই সাগরের চারিদিকে ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মাণী, পোল্যাণ্ড আর সোভিয়েত রাশিয়ার সীমানা। এই দেশগুলোর অসংখ্য জাহাজ এই বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়েই যায় উত্তর সাগরে, যায় আটলান্টিকে। এই জাহাজগুলো থেকে এত বেশী পরিমাণে তেল, বিষাক্ত তরল রসায়নিক পদার্থ ছাড়াও পারদ এবং কেডিয়াম ডিসচার্জ হয়েছে যে সুইডেনের কাছাকাছি বাল্টিক সাগরের মাছের দেহে প্রচুর পরিমাণে পারদ জমা হয়ে গিয়েছে। তাই এই অঞ্চলে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে মাছ ধরা। শুধু পারদ নয়, এই সাগরে ডি. ডি. টি. এবং ক্লোরিণযুক্ত কীটনাশক পদার্থ ফেলা হয়েছিল। তার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। বাল্টিকের মাছ এবং সীল প্রভৃতির দেহ ওই বিষাক্ত পদার্থগুলো পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রের মাছ ও প্রাণীর তুলনায় প্রায় দশগুণ পরিমাণ বেশি জমা হয়েছে। তাই ষ্টকহলম থেকে সুইডিশ ইন্টারন্যাল প্রেসবুরো খবর দিচ্ছে—১৯৭৫ সালের ২২শে মার্চ বাল্টিকসাগর তীরবর্তী দেশগুলোর মিনিষ্টারস-ইনচার্জ অফ এনভায়রনমেন্টাল অ্যাফেয়ারসদের এক অধিবেশন বসেছিল। তারা (প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি) সমবেতভাবে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ হয়েছে এই বলে যে—তাদের দেশের কোন জাহাজ থেকে আর হ্যাজার্ডাস সাবস্ট্যান্স নিক্ষেপ করবে না বাল্টিকের জলে।

আমেরিকাও বসে নেই। তাদের দেশে কলকারখানা বেশী। তাই তার দুদিকের দুই মহাসাগর আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। তাই তারা ১৯৭০ সালে একটা স্বায়ত্ত-শাসিত যুক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইণ্ডেপেণ্ডেট ফেডারেল এজেন্সী স্থাপিত করেছে তার নাম এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সী।

দূষিত জলের বলি হতভাগ্য মাছ

ভয়াবহ এই সমস্যা শুধু বাল্টিকের চারিদিকের দেশগুলোর নয়, শুধু আমেরিকার নয়—সর্বনাশা এই বিপদ আজ পৃথিবীর সব দেশের। বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হচ্ছে যত সমৃদ্ধ হচ্ছে সভ্যতা ততই বিষাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবীর আকাশ বাতাস-জল-মাটি। দুঃসাধ্যসাধনগর্বী মানুষ একদিকে গ্রহান্তরে উপনিবেশের স্বপ্ন দেখছে, চাঁদের থেকে মাটি এনে চাষ করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে আর একদিকে নিজেরই তৈরি মরণ ফাঁদে মৃত্যু বরণ করতে চলেছে। মনে পড়ে দূরদর্শী ঋষি রবীন্দ্রনাথের সেই সতর্কবাণী—মানুষের ঔদ্ধত্য যখন তার চারিদিকে গর্বের পাঁচিল তৈরি করে সেই প্রাচীরে ভগবান তার কামান দাগে। তাই তো আজ নিখিল বিশ্ব-মস্তিষ্কে ধূমায়িত হয়ে উঠেছে সর্বব্যাপী বিধ্বংসী কলুষিতা থেকে প্রকৃতিকে

মুক্ত করার হাজারো পরিকল্পনা। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে শুধু ১৯৭২ সালে ষ্টকহলমে নয়, তার আগের বছর জেনেভায় তার আগে নিউইয়র্কে হিউম্যান এনভায়রনমেন্টের অধিবেশন বসেছিল। এইবার দিকে দিকে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষের কল্যাণকামী রাষ্ট্রসংঘের শ্লোগান—প্রিভেন্ট পলিউশান অফ এনভায়রনমেন্ট—এই বছর জুন মাসে এই 'ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেণ্ট ডে' হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

দিনে দিনে ভারতেও কল-কারখানা বাড়ছে। তাই অনিবার্যভাবেই এদেশের শহরে, জনপদেও সভ্যতার সেই ভয়াবহ অভিশাপ—এনভায়রনমেণ্টাল পলিউশান দেখা দিয়েছে। সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ দেশব্যাপী সমীক্ষা করে দেখেছেন—ভারতবর্ষে এমন একটা নদী নেই যার জল পলিউটেড অর্থাৎ দূষিত নয়। তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ হিমালয় থেকে যাদের জন্ম সেই গঙ্গা-যমুনাও তার নিম্নগতিতে দূষিত হয়েছে। ছোট ছোট নদীর জল কলকারখানার নোংরায় আরও বেশি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আমেদাবাদের কাপড়ের কারখানার ময়লা বহন করছে সবরমতী। ভদ্রাবতীর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার 'ওয়েষ্টেজ' থরে থরে সঞ্চিত হয়েছে ভদ্রার জলে। আর একথা কে না জানে হাওড়া ও হুগলীর পাটকলের নোংরা রয়েছে ভাগীরথীর জলে। যে জলকে আমরা পবিত্র স্নানে পূজা করি সেই জলকেই বেশি নোংরা করি আমরা। তাই ভারতবর্ষে **Water is a major factor in the Polluted environment in India.** 'পলিউটেড ওয়াটার' আমাদের দেশে কী ভয়াবহ ক্ষতি করছে তা পরিস্ফুট হয়েছে এই সমীক্ষার ভেতরে—গ্রামাঞ্চলে প্রতি ১০,০০০ হাজারে ৩৬০ জন মারা যায় শুধু দূষিত জল খেয়ে। ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগেও এদেশে ১,৮৫,০০০ গ্রামের ১৬ কোটি মানুষ তাদের পানীয় জল খায় হয় খোলা কূয়ো না হয় পুকুর থেকে। বলা বাহুল্য এইসব পুকুর ও কূয়োর জলে জলজ কীটপতঙ্গ, এবং সরীসৃপদের আবাসস্থল। জলের মতই বাতাসও এদেশে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কলকারখানার ঘন কালো ধোঁয়া প্রতি মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলকে করছে দূষিত। বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর কলকাতা—ভারতের প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে কলকারখানা অধ্যুষিত শহরের বাতাস ভারী হয়ে থাকে ফ্যাক্টরীর কালো ধোঁয়ায় যার ভেতরে থাকে কারবন মনোক্সাইড, হাইড্রোকারবনস আরও নানাবিধ বিষাক্ত গ্যাস। ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্টাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট পরীক্ষা করে দেখেছেন ভারতের অন্যান্য শহরের চেয়ে কলকাতা শহরের বাতাস সবচাইতে পলিউটেড। এয়ার পলিপলিউশনের জন্য দায়ী হলো ফ্যাক্টরীর চিমনীর ধোঁয়া অটোমোবাইলের এবং জেট এয়ার ক্র্যাফ্‌টের গ্যাস—বলাবাহুল্য আধুনিকালের সভ্যতার বিলাসে এই উপকরণগুলো কলকাতাতেও পর্যাপ্ত।

চিমনির কালো ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত হচ্ছে

নয়েজ পলিউশন যে মানুষের কত বড় শত্রু সে কথা আগে বলা হয়েছে। নয়েজ পলিউশান বিশেষজ্ঞ সুইস বৈজ্ঞানিক বলেছেন বিগত ত্রিশবছর ধরে যেমন পরিমাণে নয়েজ পলিউশান চলছে ঠিক সেই হারে যদি এই পলিউশান চলতে থাকে আগামী ত্রিশবছরে ভারতের অবস্থা হবে ভয়াবহ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রতিটি পর্যায়েই এদেশকেও তিলে তিলে ধ্বংসের সেই অনিবার্য পরিণামের দিকে নিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের পরিবেশ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরাও বসে নেই। তারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত ন্যাশনাল কমিটি অন এনভায়রনমেণ্টাল প্ল্যানিং অ্যাণ্ড কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ রাখার জন্য সমবেতভাবে সংগ্রামে নেমেছেন। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা যাতে উন্নত হয়, বাতাসকে যেন দূষিত করতে না পারে কলের ধোঁয়া সেই প্রচেষ্টায় ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন ভারতকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পঞ্চম যোজনা অনুযায়ী আশা করা যায় প্রায় ১৮০০০ গ্রামে নলকূপ হ্যাণ্ড-পাম্পের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ হবে। পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য আরও বহুবিধ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলেছে। নিশ্চয়ই আশা করা যায় পলিউশনের অনুদার চক্রান্তকে এড়িয়ে ভারতের জনপদ-জীবনেও অবারিত আলো বাতাস বহন করে আনবে সুখ আর সমৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন সম্ভব

চির দত্ত

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সংবাদপত্রের চাহিদা যে হারে বেড়ে যাচ্ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের দেশে নিউজপ্রিন্টের চাহিদাও অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৬ সালে যে বছর শেষ হলো সে বছরের নিউজপ্রিন্টের চাহিদা ছিল ৩,২৫,০০০ টন। ১৯৮০-৮১ সালে সেই নিউজপ্রিন্টের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৫০,০০,০০০ টন। অথচ গত বছরে আমাদের দেশে তৈরী নিউজ-প্রিন্টের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৫,০০০ টন অর্থাৎ প্রয়োজনীয় প্রিন্টের তুলনায় ঘাটতি প্রায় ২,৫০,০০০ টন। ১৯৮০-৮১ সালের হিসেব অনুসারে ২,৫৫,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট এ দেশে তৈরী করা সম্ভব হ'লে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে সে বছরে ৩,৪৫,০০০ টন।

এতবড় ঘাটতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পরিকল্পনাবিদদের আজ গভীরভাবে চিন্তা করতে হ'চ্ছে কি করে দেশে তৈরী নিউজপ্রিন্টের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা যায়। কারণ এই ঘাটতি নিউজপ্রিন্ট বিদেশ থেকে আনতে গিয়ে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। হিসেবে দেখা গেছে ১৯৮০-৮১ সালে এর জন্য দরকার হ'বে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা। আমাদের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার উপর এতবড় চাপ অবস্থাকে খুবই জটিলতর করে তুলবে।

নিউজপ্রিন্টের এই সমস্যাকে সঠিক ভাবে মেটাতে গেলে আগে থেকেই পরিকল্পনা দরকার কি ভাবে বিদেশের নিউজপ্রিন্টের ওপর সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের উৎপাদনকে সাধ্যমত বাড়িয়ে তোলা যায়। সেদিক থেকে ভারতের কতকগুলো চিত্র খুবই আশা-ব্যঞ্জক যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ খোঁজ খবর নিয়ে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন, যদি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অবিরাম যোগাড় করা সম্ভব হয়, তা হ'লে এ রাজ্যে ২৫০ থেকে ৩৩০ টন পর্যন্ত নিউজ-প্রিন্ট তৈরীর ইউনিট সহজেই বসানো সম্ভব। তবে তার জন্য আগে থেকেই কাঁচামাল যোগানোর জন্য পরিকল্পনা করতে হবে এবং হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সহজপথে কাঁচামাল আনার বন্দোবস্তকেও পাকাপাকি করে ফেলতে হবে।

সে পরিকল্পনা অনুসারে চলতে গেলে আগে আমাদের দেখা দরকার পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের মধ্যে কোন শ্রেণীর মালের উপর আমরা বেশী নির্ভর করতে পারি এবং কার দাম তুলনা-মূলক ভাবে কম পড়ে। সেদিক দিয়ে পাইন জাতীয় গাছকে (কণিফেরাস) সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য কাঁচামাল হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ২,৫০০ মিটার উঁচুতে এ গাছের উৎপাদন খুব বেশী হয়না বলে এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নাও পাওয়া যেতে পারে। এর পাশাপাশি বাঁশগাছকেও ব্যবহার করার জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামত রয়েছে। তবে বাঁশগাছ ব্যবহারের জন্য এত উচ্চ স্তরের প্রক্রিয়া প্রয়োজন যা আমাদের দেশে এখনো গড়ে উঠতে পারেনি।

কাঁচামালের জন্য পরবর্তী বিচারে আমাদের মনে আসে শক্ত কাঠের কথা। যার সাথে আরো কিছু ভিন্ন জাতীয় উপাদান মিশিয়ে আমরা নিউজপ্রিন্ট তৈরীর কাজে সংমিশ্রিত বস্তুকে কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে শক্ত কাঠের আঁশসমূহ এত কমজোরী যে পুরোপুরী এর ওপর নির্ভর করা যায় না। তবে এ বিষয়েও গবেষণা চলছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সম্ভাব্য এই তিন জাতীয় কাঁচামালের উৎপাদন বর্তমানে কি পরিমাণ হচ্ছে তার হিসেব তৈরী করা। সে হিসেবে দেখতে পাই, এ রাজ্যে ৮০,০০০ টন বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে ২১,০০০ টন বাঁশ প্রতি বছর পাওয়া যেতে পারে।

পাইন জাতীয় গাছের ব্যাপারে হিসেবে দেখা গেছে দার্জিলিংকে ঘিরে ৪০০০ হেক্টর পার্বত্য জমিতে ৭০ লক্ষ

ঘন মিটার বুপীসারি এখন দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৮০-৮১ সালে এর পরিমাণ ১২০ লক্ষ ঘন মিটারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সিংগলিলা পার্বত্য অঞ্চলের ৩০০০ মিটার উচ্চতায় আরো কিছু কাঁচামাল পাওয়া যেতে পারে। হেমলক এবং সিলভার ফির জাতীয় গাছ এখানে ছড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমাণে ১১২ লক্ষ ঘন মিটার ধরে। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ গাছকে কাজে লাগানো যায় কাঁচামাল হিসেবে।

নিউজপ্রিণ্ট তৈরীর জন্য অপর উপাদান শক্তকাঠ। তার দু'শ্রেণী "পিপিলি" এবং "ইউটিস" জাতীয় গাছ উত্তরবঙ্গে যত্রতত্র রয়েছে এবং দক্ষিণে অফুরন্ত "ইউক্যালিপটাস" গাছকেও একাজে লাগানো যায়।

কিন্তু সব কিছু বিচার করে এটা দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো এক জাতীয় কাঁচামালকে ব্যবহার করলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচামাল পাওয়া যাবে না। সুতরাং তার জন্যে দরকার বিভিন্ন কাঁচামালের মিশ্রণের সাথে রাসায়নিক উপাদান, যাতে দৈনিক ২৫০ টন উৎপাদন-ক্ষম নিউজপ্রিণ্ট তৈরী কারখানার জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অনবরত যোগান দেওয়া যায়।

এবিষয়ে পরীক্ষাগারে গবেষণার ফলশ্রুতি যদি ২৫ শতাংশ রাসায়নিক মণ্ড, ২০ শতাংশ আধা রাসায়নিক মণ্ড এবং ৫৫ শতাংশ যন্ত্রচালিত মণ্ড মিশ্রিত করা যায়, তা হলে সকলের গ্রহণযোগ্য ভালো নিউজপ্রিণ্ট তৈরী করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন ১৯৪০০ টন বাঁশ জাতীয় কাঁচামাল রাসায়নিক মণ্ডের জন্যে, ৬৬,৮০০ টন পাইন জাতীয় গাছ রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক মণ্ডের জন্যে এবং ৪৩,৬০০ টন শক্ত কাঠ ও ইউক্যালিপটাস জাতীয় গাছ রাসায়নিক এবং আধা রাসায়নিক মণ্ডের জন্যে।

উপরোক্ত চার জাতীয় কাঁচামালের মধ্যে শুধু মাত্র পাইন জাতীয় গাছের যোগান সম্বন্ধেই কিছু অনিশ্চয়তা আছে। কারণ ১৯৮০-৮১ সালে যে পরিমাণ পাইন জাতীয় গাছ পাওয়া যাবে, তাতে করে চাহিদা মেটানো যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন এখন থেকেই পাইন জাতীয় গাছ রোপণের পরিকল্পনা। বর্তমানে দার্জিলিং, কার্সিয়াং এবং কালিম্পং ডিভিসনের ৭৫০ মিটার থেকে ২৭০০ মিটার উচ্চতায় অনেক জায়গা আছে যেখানে এর ফলন সম্ভব। পরিকল্পিত এই রোপণ, ১৯৯৩ সালের পর থেকে পুরোপুরি ভাবে কাঁচামাল যোগান দিতে সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে আশংকা আসা স্বাভাবিক, দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল থেকে কি উপায়ে কাঁচামাল নিয়ে আসা হবে। বর্তমানে যে সব রাস্তায় ট্রাক চলে, তাদের বহন ক্ষমতা ১০ টনের বেশী নয়। সুতরাং সমস্যার সমাধানের জন্য "রোপওয়ে" ছাড়া পথ নেই। এ ব্যাপারে একটি "রোপওয়ে" রাংগাপাণি থেকে সুরু করে সুকিয়া পোকরি পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে এবং পরে সেটা সিংগলিলা পর্যন্ত টানা যায়। অপর রোপওয়ে কালিম্পং ডিভিসনের নিউমাল বন থেকে সুরু করে পাংকাসারি পর্যন্ত টানা যেতে পারে। এই 'রোপওয়ে' দুটো তৈরী করতে প্রায় ১৫ কোটি টাকার প্রয়োজন বলে এক সঙ্গে সুরু না করে সময়ের ব্যবধানে পর পর করা যেতে পারে। কারণ কাঁচামাল বহন করার জন্য প্রথমেই দুটো পথ খোলার প্রয়োজন নেই।

কাঁচামালের ফলন এবং পরিবহণের প্রশ্নের পরে আসে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি যোগানোর সম্ভাব্যতা। এ ধরনের মিলের জন্যে দরকার প্রায় ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়ারদের বক্তব্য এসব মিলে ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী নিজস্ব প্ল্যাণ্ট বসানো যেতে পারে, বাকীটা বিদ্যুৎ পর্ষদের ভাণ্ডার থেকে নিতে হ'বে। সেটা সম্ভব না হ'লে নিজস্ব প্ল্যাণ্টেই সব বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে—এতে অবশ্য মিলের অতিরিক্ত খরচ বাড়বে—প্ল্যাণ্ট তৈরীর জন্যে যার আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৯.২৭ কোটি টাকা।

এখন মূল বিচার—কারখানার উপযুক্ত স্থান কোথায়? রাজ্যের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চল এই দু'জায়গাতে কারখানা বসাতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। নিউজ-প্রিণ্ট বিশেষজ্ঞদের অবশ্য এ বিষয়ে অন্যমতও আছে। ডি. ভি. সি.র উপত্যকা জুড়ে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ফলন এবং পরিবহণের জন্য ডি. ভি. সি.র নদী প্রবাহ ব্যবহারের অফুরন্ত সুযোগ থাকার জন্য তাঁরা মনে করেন ডি. ভি. সি.র উপত্যকার কোল ঘেষে নিউজপ্রিণ্ট কারখানার স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে। তাছাড়া তাদের যুক্তির আরো একটি সারগর্ভতা হ'লো, এ কাজে ডি. ভি. সি.র নিজস্ব সংগঠনকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে এ বিতর্কমূলক প্রশ্নে না ঢুকে আমরা উত্তর ও দক্ষিণের সার্বিক উন্নতির জন্য দু জায়গাতেই কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হতে পারি। সে দিক দিয়ে সবচেয়ে বিবেচনার কাজ হবে যদি দক্ষিণে সারা বছর জল থাকে এ ধরনের নদী অর্থাৎ দামোদর, ভাগীরথী রূপ-নারায়ণ বা সুবর্ণরেখার পাড়ে স্থান ঠিক করা হয়। আর উত্তরে মহানন্দা, তিস্তা, জলঢাকা বা তোরষা নদীর পাড়ে এ ধরনের কারখানা বসানো হয়। এর পরে হয়তো আরো প্রশ্ন আসতে পারে পরি-বহণের সুবিধার জন্যে কারখানার স্থান উত্তরবঙ্গের কাঁচামালের কাছাকাছি পার্বত্য অঞ্চলে কেন স্থির করা হচ্ছে না। কিন্তু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, উত্তর-বঙ্গের ১,৪৫,০০০ টন কাঁচা মাল ছাড়াও নিউজপ্রিণ্টের জন্য অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজন হ'বে প্রায় ২,৫০,০০০ টন এবং

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

রাক্ষস

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

বায়না নিয়েই ঘুম থেকে উঠেছে কাম্বো। স্কুলেও গেল না, নাকি সুরে কেঁদেই চলেছে—আমি মাংস খাব। মা শান্তা বাঈ অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে—কাঁদিস নি, কাল ঠিক মাংস আনব দেখিস।

কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর দেয়—সব মিথ্যে কথা, রোজ বল কাল দেব... আজ এখুনি চাই....কবে একবার মামা মাংস এনেছিল, আর কোনদিন তুমি মাংস আনো না, কেবল রুটি আর পেঁয়াজ...

শান্তা বাঈ ছেলেকে ব'কবে কি তার নিজের চোখই সজল হয়ে ওঠে। এর থেকে বেশী করার ক্ষমতাও তো নেই তার, সাধতো তারও হয় ছেলেমেয়েদের মুখে ভাল ভাল জিনিষ তুলে দিতে। কিন্তু তার সামান্য কটা টাকা দিয়ে বোম্বাই শহরে এর থেকে ভাল আর কিইবা যোগাড় করতে পারা যায়।

তবুতো এক ফোঁটা বিশ্রাম করে না। চারটে ছেলেমেয়েকে রেখে কিম্বা স্কুলে পাঠিয়ে সে যায় লোকের বাড়ী কাজ করতে। তার আগে রাত চারটায় উঠে অন্ধকারে কুপি জ্বালিয়ে ঘরের কাজ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দুধের বোতলের জন্যে লাইন দিতে। ঘরে ঘরে দুধ পোঁছে বাড়ী আসতে প্রায় সাতটা হয়। তাড়াহুড়ো ক'রে ছেলে মেয়েদের ঘুম থেকে তুলে খাবার দেয়।

মাধব তখনও বুনোশুয়োরের মত নাক ডেকে পড়ে থাকে। আর থাকবে নাই বা কেন, রোজ রাত্রেই তো নেশা ক'রে ফেরে। এক একদিন নেশা এত বেশী হয় যে খেতেও পারে না। বেশী ডাকাডাকি ক'রলে রেগে মারতে ওঠে। তবু দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা এই যে বিমলা, সুমন, সুহাগীর স্বামীদের মত তেমন মারধোর করে না।

শান্তা বাঈএর আবার মনে হয় ওদের স্বামীরা যখন নেশা করে তখন হয়তো মারধোর করে ঠিকই কিন্তু অন্য সময় তো বৌদের সঙ্গে কত গল্প করে হাসি তামাশা করে, কখনো কখনো সিনেমায় নিয়ে যায়। কথাটা মনে হতেই নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

অথচ তার বাবা খোঁজ খবর করে দেখেশুনেই তার বিয়ে দিয়েছিল লেখা-পড়া জানা ম্যাট্রিক পাশ মাধবের সঙ্গে। কারখানায় ভাল মাইনের চাকরি করে। কিন্তু সব কথার কথা মনে হয়, একদিন সোহাগ করে একটা ফুলের মালাও কিনে দেয়নি। আজ নাহয় শান্তা হতশ্রী হয়েছে কিন্তু চিরদিন তো আর তা ছিল না। মাসে দু'বার রেশন তোলার টাকা আর বাড়ী ভাড়া দিয়েই মাধব নিজের কর্তব্য সারে। আর সব দায়ই যেন তার।

রোজগারের টাকা বদ অভ্যাসে ওড়ালে কি হবে, জিভের স্বাদ বেশ আছে। রান্না কোনদিন মনমত হয় না। বাবুদের বাড়ী থেকে যখন যা পায় শান্তা নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখে মাধবকে দেবে বলে। যার জন্যে এত করে, সে কি কোনদিন তার কথা ভাবে।

কাম্বো এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। শান্তা উঠে এক চড় কশিয়ে দেয়। আচম্বকা চড় খেয়ে কাম্বো খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে যায়। শান্তার মাথাটা যেন হাল্কা লাগে। কিন্তু মনটা ভার হয়েই থাকে—দুধের শিশু, কিই বা খেতে দিতে পারে, বন্ধুদের কাছে ভাল ভাল খাবারের গল্প শুনে যদি ওর ইচ্ছে করেই থাকে তাতে আর বেচারার কি দোষ।

মুখে রাজ্যের বিরক্তি মাখিয়ে, ঘুম থেকে উঠে এসে দাওয়ায় বসে মাধব। যন্ত্র চালিতের মত চায়ের জল চড়াতে যায় শান্তা। জল ফুটলে গুঁড়ো চায়ের পাতা ফেলে দেয়। চিনির কৌটা নামাতেই শান্তার শরীরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে, চিনি নেই। এখন উপায়।

বিস্বাদ চা মুখে দিলেই মাধব কাপ ছুঁড়বে। শান্তা তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরের দরজায় টোকা দেয়। এটায় নতুন বিয়ে হওয়া মেয়ে গাঙ্গুরা থাকে। বড় বেশী ঢং করে মেয়েটো, শান্তার অসহ্য লাগে, কিন্তু এখন আর অত ভাবার সময় নেই।

গাঙ্গু দরজা খুলল। তার বিস্রস্ত বেশবাস দেখেই বোঝা গেল সে বিছানা থেকে উঠে এসেছে। শান্তা একটু লজ্জা পেল, তবু বলল—আমার চিনি ফুরিয়ে গেছে তোমার কাছে থাকলে দাও, আমি পরে দিয়ে দেব।

—আমার চিনিও ফুরিয়ে এসেছে। একটু দাঁড়াও দেখি।

একটু পরেই গাজু ফিরে এসে একটা ছোট কাগজের মোড়ক দিল।

কাপে চিনি ঢালতে গিয়ে শান্তা দেখল, এক চামচের মত চিনি আছে। মাধব-আবার একটু বেশী মিষ্টি পছন্দ করে। ....কিন্তু কি ক'রবে সে।

—চা হবে, না বাইরে যাব?

বিরক্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

শান্তা তাড়াতাড়ি চা ছাঁকে, ইস্ চা-টা ভীষণ কড়া হয়ে গেছে; কিন্তু এখন আর করবার কিছু নেই, বেশী করে দুধ দিয়ে তিক্ত স্বাদটা কাটাতে চায়।

কাপটা মাধবের দিকে এগিয়ে দেয়। এক চুমুক খেয়েই বিস্বাদে মুখ কুঁচকে মাধব খিঁচিয়ে ওঠে—কি বিশ্রী চা. তেতো নিমপাতা, চিনি দেখি এক চামচ।

ঠিক সেই মুহূর্তে. এতক্ষণ চুপক'রে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল তাই দিয়ে কান্টো আবার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মাধব চায়ের কথা ভুলে ছেলেকে এক ধমক দেয়—এই চুপ্। সক্কাল থেকে সুরু করেছো, ফের যদি কান্না শুনি এক থাপ্পড়ে দাঁত ফেলে দেব। বদ্ কোথাকার।

কিন্তু কান্টো তখন পূর্ণ উদ্যমে সুরু করেছে, খামার জন্য নয়, সে আর এক পর্দা গলা তুলে দিল।

মাধবের মাথায় আগুন ধরে ওঠে। এক চুমুকে চা শেষ ক'রে উঠে কান্টোর দিকে যায়। সে একটু যেন ভয় পায়, কান্নায় মুহূর্তের যতি পড়ে। কিন্তু আবার সুরু করে। মাধব সজোরে এক চড় কশায় কিন্তু কান্টো কেঁদেই চলে। এই অবাধ্যতায় মাথায় যেন রক্ত উঠে যায় মাধবের, নির্দয় ভাবে মারতে সুরু করে।

ঘটনার আকস্মিকতায় শান্তা কেমন একটু অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্যে, তারপরেই ছুটে বাপ ছেলের মধ্যে পড়ে ছেলেকে সরিয়ে দেয়।

কান্টো চুপ করে গেলেও শান্তা আজ আর চুপ ক'রে থাকেনি, বলে—লজ্জা করে না ছেলেকে মারতে। কি পার ছেলের জন্যে করতে? ছেলে মাংস খেতে চেয়েছে ব'লে মারছ?

—না মারব না আদর করব, নবাব মাংস খাবেন।

—না ও মাংস খাবে কেন তুমি খাবে। তোমার রোজগার কিছু কম? সব পয়সা তো নিজের ভোগে.....

—বেশ করি আমার পয়সা আমি খাই. না পোষায় চ'লে যাও।......

কথার পৃষ্ঠে কথা বাড়ে। সময় কাটে।

হঠাৎ একটা সোরগোল শুনে শান্তা থেমে যায়।

—মাধব.....এই মাধব।

শান্তাই সাড়া দেয়—কে?

—তাড়াতাড়ি এসো, দ্যাখো.....

একদল লোক এক সঙ্গে চিৎকার ক'রছে। রাস্তার ওপর ঝোপড়ার ধারে আর একটা বিরাট জটলা। কি—কি হয়েছে....অধৈর্য শান্তা। সোরগোল বলে সবুজ গাড়ী,.......নতুন ড্রাইভার......

রাস্তায় নেমে দেখে বড় রাস্তার ওপর একটা বড় ভিড়। পুলিশের গাড়ী। সবুজ রংএর গাড়ীর একটু মাথা। শান্তার বুক অজানা আশঙ্কায় দুর্ দুর্ ক'রে দুলে ওঠে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়...... কে শুয়ে! কান্টো! ও কখন এখানে এলো?

শান্তা মাথা ঘুরে সেখানেই ব'সে পড়ে। পা দুটি জড়ো করা, একটি হাত মাথার দিকে তোলা আর একটি হাত পাশে, মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। কান্টো চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে।

ঘণ্টা বাজিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ী এসে যায়।

শান্তার চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত কি সব হ'য়ে চলে। কান্টোকে স্ট্রেচারে করে গাড়ীতে তুলল, শান্তাও গাড়ীতে উঠল।

হাসপাতালে বেশীক্ষণ সময় নষ্ট হয়নি। কান্টো বেশ তাড়াতাড়িই ছুটি দিয়ে দিয়েছিল সকলকে। পাড়ার লোকেরা কান্টোর শেষকৃত্য কি করল শান্তা খোঁজ রাখেনি।

কদিন বাদে সবই যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। শুধু বাড়ীর একজন লোক কমে গেল।

দিন পনেরো পরে মাধব একদিন সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়ি ফিরল, সব থেকে অবাক লাগে শান্তার মাধব মদ না খেয়েই এসেছে।

জামা কাপড় ছেড়ে, স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে মাধব গলায় একটু মধু ঢেলে বলে—এক কাপ চা হবে নাকি?

শান্তা মাধবের সঙ্গে এ কদিন একটা কথাও বলেনি, আজও কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না, উঠে চা ক'রতে গেল।

মাধব যেন কি বলার জন্যে উসখুস্ করে।

শান্তা নিচু হ'য়ে চায়ের কাপটা রাখতেই, পুরনো কথার জের টানার মত ক'রে কথা সুরু করে—আমাকে খুব ধরাধরি ক'রছে, কিন্তু আমিতো আর কাঁচা ছেলে নই, দরদস্তুর ক'রে ঠিক মোটা রকম আদায় ক'রে নেবো, ভগবান যখন সুযোগ দিয়েই দিয়েছেন।

শান্তা বুঝতে পারে না কিছুই, শূণ্য দৃষ্টি মেলে মাধবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাধব এবার ঘটনাটি যেন বিস্তারিত করতে বসে—ঐ কান্টোর অ্যাক্সিডেন্ট করা পার্টি, এখন খুব ধরাধরি করছে কেস তুলে নেবার জন্যে।

উদাস ভাবে শান্তা বলে—তা কেসটা তুলে নিলেই তো হয়।

বিজ্ঞের মত হেসে মাধব ব'লল—এখন বাছাধনরা কারে প'ড়ে ধরাধরি ক'রছে। ওদের একটু শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব। পয়সা আছে ব'লে ভাবে কি আমাদের প্রাণের কোন দাম নেই? আমি

২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

পথ দুর্ঘটনা কেন ঘটে

মাঝে মাঝে সকালে খবর পড়ে চমকে উঠতে হয়। কোন একটি বে-সামাল লরি হয়তো ফুটপাতে শায়িত সাতটি মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে পরিবহণের বলি হয়েছে কোন কিশোর। কোন রেস্তোরাঁয় আড্ডারত যুবকরা হঠাৎ কোন বিশেষ একটি দোতালা বাসের ধাক্কায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কিংবা উৎসবের শোভাযাত্রা থেকে হারিয়ে গিয়েছে কয়েকটি মানুষ; কারণ শোভাযাত্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল কোন প্রাইভেট বাস। এমনি অসংখ্য পথ দুর্ঘটনার খবর আমরা প্রায় প্রত্যেকদিনই পাই। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলে আমরা শঙ্কিত হই, ব্যথিত হই। ছোটখাটো খবরগুলি চেয়েই দেখিনা। এ-সব মৃত্যুকে আমরা শহরবাসীরা প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যুর মতোই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু সবক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী নয়। আমাদের ত্রুটিই অনেকাংশে দায়ী। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক পথ দুর্ঘটনাই রোধ করা সম্ভব।

ভারতের বিভিন্ন শহরে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং ট্র্যাফিক সমস্যার একটি তুলনামূলক আলোচনা থেকে এর ভয়াভয়তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করা যাবে সমস্যার জটিলতা ও সমাধানের উপায়ও।

পথ দুর্ঘটনা কেন ঘটে এ প্রশ্ন নিয়ে ভাবলে দেখা যাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চারটি জিনিস—পথ, পথচারী, গাড়ী আর গাড়ীর চালক। প্রথমে পথের কথাতেই আসা যাক।

কলকাতা শহরে পথ দুর্ঘটনার জন্য এর দায়িত্ব কম নয়। এ শহরে প্রতিদিন যত গাড়ী এবং পথচারী চলাচল করে তার তুলনায় রাজপথের দৈর্ঘ্য খুবই কম। ৪০ লক্ষ লোকের এই ১০৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের শহরটিতে মাত্র ৬.২ শতাংশ পথ যানবাহন চলাচলের উপযোগী। আর এইটুকু পথে প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ বিভিন্ন দ্রুতগামী যান, অগুনতি ঠেলা ও রিক্সা এবং প্রায় ২৪ লক্ষ লোক চলাচল করে। কলকাতার তুলনায় দিল্লী এবং বোম্বাই, এদু'টি শহরে রাজপথের পরিমাণ কিছু বেশী—২২.৫ শতাংশ এবং ১১.৫ শতাংশ। আর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে শহরের মোট আয়তনের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ রাজপথ থাকা উচিত।

শুধু পথের দৈর্ঘ্যই কম নয়—কলকাতা শহরের রাজপথের অনেকাংশই যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী। এর একটি কারণ হলো পথের মাঝে মাঝে গর্ত এবং উঁচু নীচু ঢাল। বর্ষাকালে গর্তগুলিতে জল জমে দ্রুতগামী যানের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে উঠে। এ-ছাড়া যেখানে সেখানে সিগ্‌নাল পোষ্ট, ইলেকট্রিক ফীডার বক্স, টেলিফোন বক্স, নিয়ন আলোর অত্যাচার, হঠাৎ বাঁক আর দৃষ্টি অবরোধকারী গাছ এ-সবত আছেই। এর ফলে পাশ থেকে অথবা সামনের দিক থেকে আসা কোন গাড়ী কিংবা মানুষ চালকের চোখে পড়েনা। দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এথেকে বোঝা যায় এই শহরের রাজপথের নক্সাটি অবৈজ্ঞানিক কিংবা বর্তমানে অকেজো। এর কারণ, এইসব পথের নক্শা যখন তৈরী হয়েছিল তখন কলকাতায় যান বলতে বোঝাত জীব জন্তু আর মানুষে টানা গাড়ী; যাদের গতিসীমা ছিল ঘণ্টায় ১০ থেকে বারো মাইল। আর কলকাতায় বসবাসকারী এবং পথচারীর সংখ্যাও ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম।

পথের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফুটপাতের সমস্যা। আমাদের দেশে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ

বিভিন্ন শহরের কতকগুলি যান চলাচলের চিত্র

শহরের নাম	মিনিবাস	ট্যাক্সি	মোটর সাইকেল, স্কুটার, সাইকেল, অটোসাইকেল ইত্যাদি	মোটর, জীপ ও মিনিবাস	লরি, ডেলিভারি ভ্যান, টেম্পু ইত্যাদি	পথ দুর্ঘটনা
কলকাতা	১,৮৫৫	৬,১৭৯	৩২,৪৪৩	৭৬,৪৯৭	৫,৫৯৯	১১,৫৩২
বোম্বাই	৬৭৮	২২,২৩১	৫৬,১৬৫	১,২৭,৬০৮	৩২,৮৫৫	২৪,১৭৭
মাদ্রাজ	×	২,৩৭৫	১৯,৮১৭	২২,৩২২	৪,৮২১	৫,৫৯৯

এর সঙ্গে রয়েছে আরো বিভিন্ন মন্থরযান। আর কলকাতা শহরের অতিরিক্ত যান হ'ল ট্রামগাড়ী।

রাস্তা পার হওয়ার সময় পথচারীদের জন্য জেব্রা চিহ্ন

মোটর গাড়ীর সঙ্গে বাস দুর্ঘটনার একটি দৃশ্য

সম্পর্কে ধারণাতে ত্রুটি থাকায় এ-সমস্যার সমাধানে জোর দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এখানে শুধুমাত্র চলাচলকারী গাড়ীগুলোর কথাই ভাবা হয়—পথচারীরা ভাবনার বাইরে থেকে যান। ফুটপাতগুলিতে যেখানে সেখানে বিপজ্জনক ভাঙাচোরা আর বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা, টেলিফোন সংস্থা কিংবা সি. এম. ডি. এ'র খোঁড়া বিরাট আয়তনের গর্ত। এর ওপরে রয়েছে ফুটপাতের ওপরে বেদখলের ঘটনা। দোকান, গুদাম, বাসস্থান সব কিছুই এই ফুটপাতের ওপরে। এরফলে পথচারীরা ফুটপাত ছেড়ে পথে নেমে আসেন। দ্রুতগামী যান মন্থরগামী যানে পরিণত হয়—আর পথ দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে যায়।

শহরে পথ দুর্ঘটনার জন্য গাড়ীর চালকদের দায়িত্বও কম নয়। অনেক সময়ই বেসামাল চালকের অসতর্কতার জন্য কয়েকটি অমূল্য প্রাণ হারিয়ে যায়। এর কারণ হলো চালকের প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং সতর্কতার প্রতি অবজ্ঞা। এজন্য অনেকেই যানবাহনকে দায়ী করতে চান। তাঁদের অভিযোগ উপযুক্ত পরীক্ষা ছাড়াই অধিকাংশ চালককে গাড়ী চালানোর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এর ফলে এইসব চালকরা কোন ট্র্যাফিক সংকেত অনুসরণ করেননা, রাস্তার কুল কিনারা ঘেঁসে গাড়ী চালান, অন্যায়ভাবে ওভার-টেক করেন, কোনরকম গতিসীমা মেনে চলেননা।

খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে অসতর্ক এবং বে-আইনীভাবে গাড়ী চালানোর জন্যই অধিকাংশ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে বে-সরকারী বাস এবং মিনিবাসের চালনা সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেকেরই অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া যাত্রীবোঝাই গাড়ী থেকে ঝুলন্ত মানুষ পড়ে গিয়ে মারা যাওয়ার ঘটনাও কম নয়। অসতর্ক বা বেসামাল গাড়ী চালনার শাস্তির ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলে পুলিশ বিভাগের অভিযোগ। কাউকে চাপা দেবার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হলো দু-বছরের জেল এবং জরিমানা। বে-সামাল গাড়ী চালানোর জন্য চালকের ছাড়পত্র খারিজ করা কিংবা মালিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন সে পরিমাণের জরিমানা করারও কোন উপায় নেই। এর ফলে শহরের রাস্তায় বে-সামাল গাড়ী চালানো বেড়েই চলেছে।

অনেক সময় গাড়ীর যান্ত্রিক গোল-যোগের জন্যও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ব্রেক কিংবা ষ্টিয়ারিং ফেল হয়ে যাওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এটাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য দরকার শহরের পথে চলাচলকারী গাড়ীগুলি আচমকা পরীক্ষা করে দেখা এবং যান্ত্রিক গোলযোগ রয়েছে এমন গাড়ী চলতে না দেওয়ার ব্যবস্থা।

পথচারীর পথচলার রীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অতিব্যস্ততাও দুর্ঘটনা টেনে আনে। অনেকেই ট্র্যাফিক সিগ্‌নাল অবজ্ঞা করে পথের যেখান-সেখান দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিকভাবে High way code মেনে পথ পার হতে পথাচরীদের উৎসাহ দেওয়া এবং কোথাও কোথাও বাধ্য করলে দুর্ঘটনার সংখ্যা কিছুটা কমানো সম্ভব হবে।

সামগ্রিকভাবে পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অবিলম্বে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রতিটি রাজপথ দ্রুতগামী যান চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে পরিবর্তিত করতে হবে পথের নক্‌শা। এজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ট্র্যাফিক এঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটি পৃথক দপ্তর গঠন করা যেতে পারে। এঁদের সহযোগিতা করবেন ট্র্যাফিক পুলিশ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ট্রাম, বাস, পৌরসংস্থা, সি. এম. ডি. এর মতো বিভিন্ন দপ্তর। ফুটপাত রেলিং দিয়ে ঘিরে দিলে যেখান-সেখান দিয়ে পথ পার হওয়া বন্ধ করা যাবে। প্রতিটি মোড় ও একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে বেশী সংখ্যায় ট্র্যাফিক পুলিশ ও প্রয়োজনীয় ট্র্যাফিক সিগ্‌নাল দিয়ে পথচারীকে সতর্ক করে দেওয়া যেতে পারে। তিনটি বা চারটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এমন স্থানকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করে দিলে পথচারী ও চালক উভয়েই সতর্ক থাকতে পারবেন। যেখানে পথচারী এবং গাড়ীর ভিড় বেশী সেখানে ভূগর্ভপথ বা উড়াল সেতু তৈরী করা যেতে পারে। কোন কোন রাজ-পথকে শুধুমাত্র পথচারী এবং মন্থরযান চলা-চলের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ার কথাট ভাবা যায়। বে-সামাল গাড়ী চালানোর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দরকার। আর এর সঙ্গে সঙ্গে দরকার ট্র্যাফিক পুলিশ ও ট্র্যাফিক আইন ঢেলে সাজানো, পথ ও ফুটপাতের প্রতি যত্ন নেবার ব্যবস্থা এবং জনসাধারণকে পথ চলার রীতি সম্পর্কে অবহিত করা।

মুখোমুখি

> **খুব খেটে বাংলায় প্রথম প্রবন্ধ লিখলাম—'বুদ্ধি বিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি'। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মুখে প্রবন্ধটি শুনে রবীন্দ্রনাথ খুব প্রশংসা করেছিলেন। তারপর পরিচয় / কবিতা / চতুরঙ্গ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে লাগলাম।**

আবু সয়ীদ আইয়ুব

শুধুমাত্র প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি পাওয়া যায়, অর্থ পাওয়া যায় এবং সাহিত্য-পুরস্কার পাওয়া যায় তার নজির দেখালেন আবু সয়ীদ আইয়ুব মহাশয়। এই নিরলস সাধক, জ্ঞানতপস্বী রবীন্দ্র সাহিত্যকে সুগভীর রসবোধ ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মরমী বিশ্লেষণ করেছেন। এক এক করে লিখলেন—পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতার (১৯৫৩) সম্পাদনা, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮), Poetry and Truth (১৯৭০), পান্থজনের সখা (১৯৭৩) প্রভৃতি গ্রন্থ। নাম-যশ খ্যাতির সঙ্গে পেলেন 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (১৯৬৯), 'সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার' (১৯৭১), 'কালিদাস নাগ স্মৃতি পদক' (১৯৭৪), আনন্দবাজার পত্রিকার 'সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৭৬) ও অন্যান্য পুরস্কার।

কলকাতাতেই আইয়ুবের জন্ম ১৯০৬ সালে। পিতামহ শামসুল উলেমা ইলাহেবাদ সাহেব কিশোর বয়সে দ্বারভাঙ্গা হতে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। মাদ্রাসা সংলগ্ন এক ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জীবন সংগ্রামে তিনি পিছুপা হননি। নিজে মাদ্রাসার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ করে হেড মৌলভী পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। ছেলেদের সব সুশিক্ষা দেন। তাঁর সাত ছেলের মধ্যে তৃতীয় পুত্র আবুল মকারেম আব্বাদ সাহেবের ছেলেই আজকের প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক আইয়ুব মহাশয়। আইয়ুবের মাতামহ ও পিতামহরা আরবী, ফারসী ভাষা ও ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বহু জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর বাবা লর্ড কার্জনের চিঠিপত্র নকল করতেন। সুদর্শন ও স্বল্পভাষী মানুষটি ক্ষীণদৃষ্টি ও নানা অসুখের জন্য অসময়ে অবসর নেন। কলকাতায় থাকলেও এঁরা বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। লাহোরের নামী পত্রিকা 'কাহকুশানের' গ্রাহক ছিলেন আইয়ুব। তেরো বছর বয়সে এই পত্রিকায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ ও অন্যান্য কবিতার অনুবাদ পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাংলা শিখতে অনুপ্রাণিত হন। কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম—বাড়ীতে শিখেছেন না স্কুলে কলেজে শিখেছেন? অসুস্থ মৃদুভাষী সুদর্শন মিঃ আইয়ুব বললেন—বন্ধুদের চাপে আই. এস. সি. পরীক্ষাতে বাংলা নিয়েছিলাম। বি. এস. সি. পাশ করার পর পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এস. সি. পড়ার সময় সি. ভি. রমণের সঙ্গে 'রমণ এফেক্ট' নিয়ে কিছুকাল গবেষণা করি। শরীর অসুস্থ বলে এম. এস. সি. আর পাশ করতে পারিনি। পরে দর্শন নিয়ে এম. এ. পাস করি।

—সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল? কখন? কি ভাবে?

মৃদুকণ্ঠে বললেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন 'পরিচয় গোষ্টীর' সঙ্গে পরিচয় হয়। খুব খেটে বাংলা প্রথম প্রবন্ধ লিখলাম—'বুদ্ধি বিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি'। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মুখে প্রবন্ধটি শুনে রবীন্দ্রনাথ খুব প্রশংসা করেছিলেন। তারপর পরিচয়, কবিতা, চতুরঙ্গ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে লাগলাম।

আইয়ুব বেশ লাজুক প্রকৃতির লোক। তিনি পরিশ্রমী লেখক. ধীরে ধীরে লেখেন। চট করে কিছু লিখে ছাপাতে দেননা। তাঁর 'কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। পুনরায় প্রশ্ন করি—কোন গ্রন্থ প্রথম লেখা? কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে অস্পষ্ট সুরে বলেন—১৯৪০ সালে হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আধুনিক বাংলা কাব্যের' প্রথম সংকলন করি। রবীন্দ্রনাথ বইটির ভূমিকা পড়ে খুব খুশি হয়ে আমাকে ডাকেন এবং বলেন, 'মনে হয় যেন তুমি আধুনিক কবিদের মনের কথাটি ধরতে পেরেছ, আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি কথাটি কি?' আমার সব কথা রবীন্দ্রনাথ চুপ করে শোনেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তি পাওয়ায় তিনি প্রথম জীবনে চাকরীর কোন তাগিদ অনুভব করেননি। প্রেসিডেন্সী কলেজে দু'বার অস্থায়ীভাবে অধ্যাপনা করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াতে গিয়ে অসুস্থ হন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের অবর্ত্তমানে আইয়ুব কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর দর্শনের ক্লাশ নিয়েছিলেন। ডঃ রাধা-কৃষ্ণণের সম্পাদনায় Philosophy East and West (১৯৪৯) এর Philosophy

of Whitehead, Marxist Philosophy প্রবন্ধ দুটি লেখেন। ১৯৫০ সালে 'বিশ্ব-ভারতী'তে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে ছেড়ে দেন।

—আপনার জীবনে এত সুযোগ ও সম্মান—শেষ পর্যন্ত কোথাও টিকে থাকতে পারলেন না। সাহিত্য কর্মই আপনার স্থায়ী কর্ম। কি বলেন?

উত্তরে বললেন—হয়তো তাই। শরীর অসুস্থ, সাহিত্য কর্মেও প্রচুর বাঁধা পাচ্ছি। প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকি। ১৯৫৪-৫৬ সাল পর্যন্ত Rockefeller Foundation এ Fellow ছিলাম। গবেষণার বিষয় ছিল Marxist Theory of Value. ১৯৫৭-৬৭ পর্যন্ত Quest পত্রিকা সম্পাদনা করি। ১৯৬১ সালে মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষ বিভাগের দায়িত্ব নেই। অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসি। ১৯৬৯-৭১ সালে সিমলার Institute of Advanced Studies এর Fellow ছিলাম। তারপরই কর্মে বিরতি। সাহিত্য কর্মে মেতে থাকি।

অসুস্থ ক্লান্ত আইয়ুবকে আর প্রশ্ন করলাম না। এর মধ্যে প্রায় এক বছর কেটে গেল। এবার আবার দেখা করলাম। ঐ রকমই অসুস্থ। স্ত্রী অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব ও ছেলে আমাকে তাঁর অস্পষ্ট কথা বুঝতে ও সাল-তারিখ তথ্যাদি পেতে কাগজপত্র দিয়ে সাহায্য করেন। আমার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর উদ্ধার করলাম। প্রশ্ন—রাজনীতিতে আকর্ষণ আছে কি? আজকের বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে কি ধারণা? উত্তর—ছিল, এখন নেই। এর উত্তরে অনেক কথা বলতে হয়। এই অসুস্থ অবস্থায় আর তা বলে যাওয়ার মতো সামর্থ্যও নেই।

—কোন আঘাত বা দুঃখ আপনাকে পীড়া দেয়? বাংলা সাহিত্যের হালচাল অবস্থা দেখে কি ভাবছেন?

—'ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুঃ ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ'—এই রিপুই আমাকে কষ্ট দেয়।

—সংসারী জীবন সাহিত্য সাধনায় সাহায্য করেছে? মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব আছে? বিদেশে কোথাও গেছেন?

—বিবাহিত জীবনে করেছে। এমন কাউকে বিয়ে করতাম না যে সাহিত্য সাধনায় কিছুটা সাহায্য না করত। মার্কসীয় দর্শনের যৎকিঞ্চিৎ প্রভাব আছে। মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্ডিয়ান ষ্টাডিজ ডিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তার প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে গিয়ে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু অসুস্থ হয়ে ফিরে আসি।

—বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে মতামত কি?

—সেখানে খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক এখনও দু'একজনের বেশি আছেন বলে মনে হয় না। তবে ওঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে মনে হয় দু'তিন দশকের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

—আত্মজীবনীমূলক কিছু লিখেছেন?

—লিখবার ইচ্ছে আছে। তবে সে জাতীয় রচনার ভাষা আমি এখনও আয়ত্ত করিনি। একমাত্র চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধের ভাষাই এতদিনকার সাধনার ফলে আত্তয় করতে পেরেছি বলে আমার ধারণা।

আরও কিছু কথা ছিল। অসুস্থ ও অসামর্থ্য বলে বিরক্ত করলাম না। আর কোনদিন সুস্থ হবেন বলে মনে হয়না। মমতাময়ী স্ত্রী সর্বদা শিশুর মত আগলে রাখেন। এই অবস্থাতেও ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যের কাজ করেন। জাত লেখকদের বসে থাকা চলে না—এ এক রাজরোগ। মৃত্যু ছাড়া বিশ্রাম নেই। আমরা তা চাইনা। শতায়ু হয়ে লিখে যান। পরবর্তী সাড়া জাগানো লেখার জন্য সাগ্রহে দিন গুনছি।

পশ্চিমবঙ্গে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন সম্ভব

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এই সামগ্রী নিয়ে যেতে হবে দক্ষিণবঙ্গ থেকে। তাই পরিবহণের প্রশ্নে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে মাঝামাঝি জায়গায় কারখানা থাকাই সবচেয়ে ভাল। সেদিক দিয়ে দুটো আদর্শ স্থান হ'লো উত্তরবঙ্গে মালদার কাছাকাছি যেখানে মহানন্দা নদী কালিন্দীর সাথে মিশেছে তার কিছুটা নীচু অঞ্চলে এবং দক্ষিণবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় মণিগ্রাম অঞ্চলে ভাগীরথীর তীরে।

এই বিরাট সম্ভাবনাময় নিউজপ্রিণ্ট কারখানা তৈরী করতে প্রচুর অর্থেরও সংস্থান দরকার। হিসেবে দেখা গেছে, উপরোক্ত মিল বসাতে গেলে এক একটির জন্য দরকার হবে প্রায় ৮৫ কোটি টাকা। তবে এ টাকা খরচ করে দু'বছরে কোন লাভের অঙ্ক দেখানো গেলেও অর্থনীতি-বিদদের ধারণা অনুসারে তৃতীয় বছর থেকে লাভ হওয়া সম্ভব। কারণ প্রথম দু'বছর পুরো পরিমাণ নিউজপ্রিণ্ট তৈরী হবে মিল থেকে। আশা করা যায় পরবর্তী বছর গুলোতে নিউজপ্রিণ্টের দাম বর্তমানে প্রতিটন ২৭০০ টাকা দামের চেয়ে অনেক কমেই উৎপাদন করতে পারবে এবং ১৬ বছর পর থেকে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে ১৬ কোটি টাকা লাভ করা যেতে পারে। এ হিসেবের ওপর আস্থা রাখলে আমরা নিশ্চয় বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গে নিউজপ্রিণ্ট ফ্যাক্টরী অর্থ-নৈতিক দিক থেকেও লাভবান সংস্থায় পরিণত হবে।

তাছাড়া উন্নত মানের নিউজপ্রিণ্ট তৈরীর জন্য যে সংশ্লিষ্টদের গবেষণা এখন ল্যাবরেটরীতে হ'চ্ছে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত মণীষা এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ মানুষও রয়েছে আমাদের রাজ্যে।

তাই সকলের প্রত্যাশা নিউজপ্রিণ্ট কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি আরো সংহত হয়ে উঠুক।
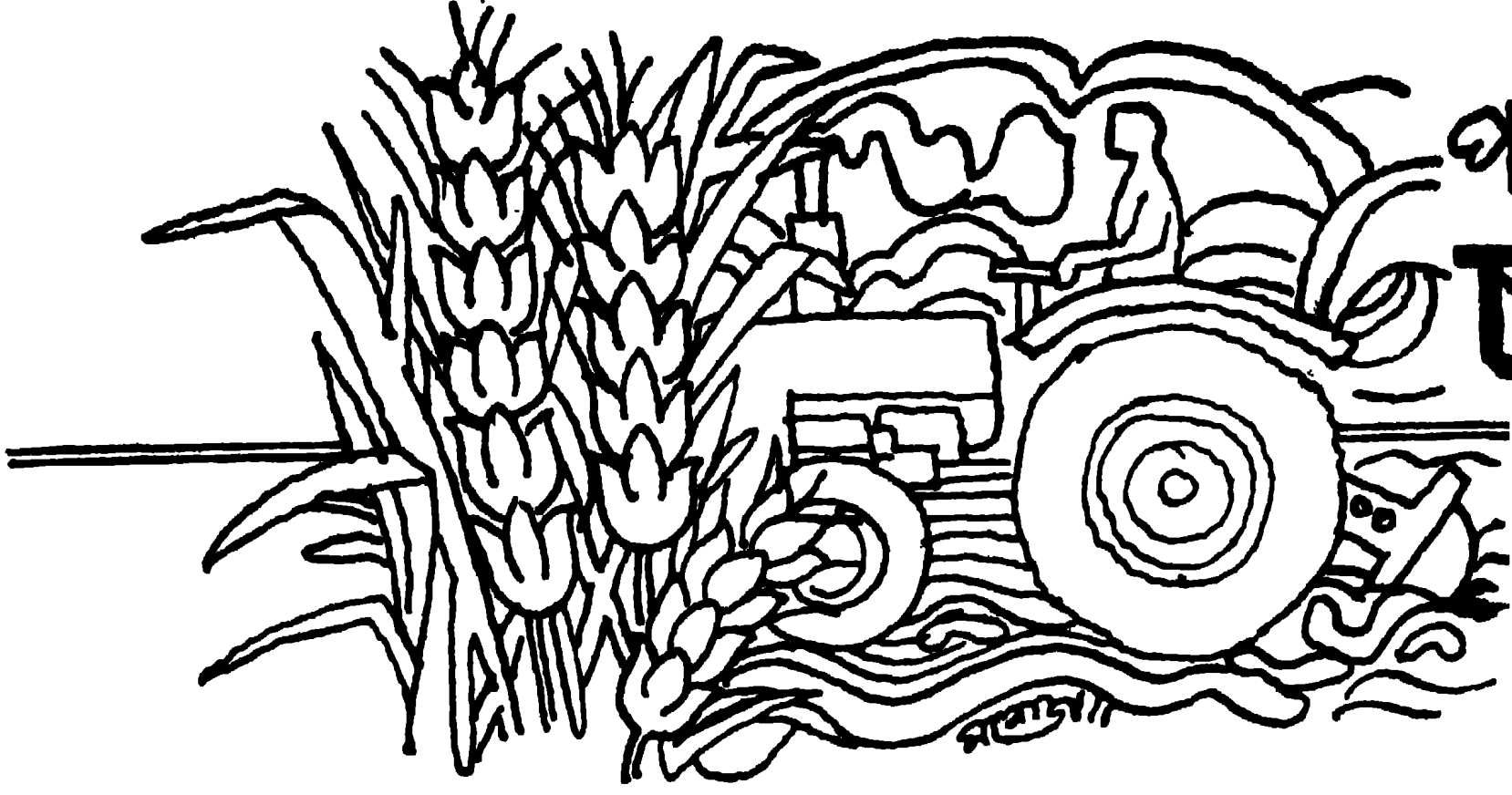
পরিবর্তনের মানসিকতা: চাষবাসে

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

একটা সময় ছিল, যখন চাষবাসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কথা কল্পনাও করা যেত না। তখন চাষীরা কোনরকমে জমি চষে খেয়াল-খুশিমত বীজ ছড়িয়ে রেখে আসতেন মাঠে। পরিচর্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা তো দূরের কথা, ফসলের প্রতি সাধারণভাবে যেটুকু নজর রাখা দরকার, তা-ও ঠিকমতো পালন করা হ'ত না। তাছাড়া, অবহেলা এবং উদাসীনতার ফলে লক্ষ-লক্ষ একর জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকতো। এদিকে, জনসংখ্যা বেড়ে চলেছিল তীব্রগতিতে। অতএব, খাদ্য ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক উৎপাদনশীল চাষবাসের সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়েছে।

চাষবাস এবং জনজীবনের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটছে, তার কয়েকটি নজির স্বচক্ষে দেখার জন্যে সম্প্রতি চব্বিশ পরগণায় গিয়েছিলাম। হাবড়া, বনগাঁ, মসলন্দপুর, জঙ্গলপুর, দেগঙ্গা, হুমাইপুর, বসিরহাট, বেগমপুর, হাড়োয়া, সাগরদ্বীপ এমনি কয়েকটি এলাকায়।

উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম চাষের ক্ষেত্রে হাবড়া ও বনগাঁর চারিদিকে যেখানে তাকানো যাবে, চোখে পড়বে শুধু সবুজ আর সবুজ। দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। গ্রীষ্মের দাবদাহে সেখানে মাঠ-ঘাট এখন ফাটার সুযোগ পায়না। ডিপ টিউব ওয়েল এবং শ্যালো টিউব-ওয়েলের পর্যাপ্ত সেচের জলে বোরো-ধানের ক্ষেত যেন ছবির মতো মনে হয়। কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। ধান এবং গম ছাড়াও, কেউ-কেউ চাষ করছেন উচ্ছে, শশা, কুমড়ো, পটল ইত্যাদি অর্থকরী সবজির ফসল। গমের সোনালী ক্ষেত খালি হতে না হতেই চাষীভাইরা কেউ পাটচাষের কথা ভাবছেন, কেউবা ভাবছেন আরও অন্যকোন মরশুমী শস্যপর্যায়ের কথা। এইসব এলাকার চাষীভাইরা আর শুধুমাত্র লাঙল-গরুর সাহায্যে চাষ করার ভরসায় না থেকে স্বাচ্ছন্দে ট্রাক্টর ব্যবহার করতে পারছেন। অ্যাগ্রো সার্ভিস সেন্টার ছাড়াও, অনেক সাধারণ চাষী ব্যাঙ্কের কল্যাণে ট্রাক্টরের মালিক হয়েছেন। কেউবা কিনছেন পাওয়ার টিলার বা মোটর-চালিত লাঙল। নিজের জমি চাষ করার সঙ্গে-সঙ্গে এইসব যন্ত্রপাতিকে তাঁরা অপরের জমিতে ভাড়ায় খাটাচ্ছেন। ফলে, অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ জমি চাষ করার সুযোগ এখন চাষীদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

এইসব এলাকায় সবুজ বিপ্লব যে সঠিক অর্থেই সার্থকতার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বছরের বারো মাস ধরে হাবড়া-বনগাঁ-বসিরহাট ইত্যাদি এলাকায় কোন-না-কোনরকম ফসল ঘরে উঠছে। ফসল ওঠার পর শস্যরক্ষার ব্যাপারেও চাষীভাইরা এখন অনেক বেশি সচেতন। কিছুদিন আগেও ক্ষেতের ফসলের ওপর পাখির হামলা, চাষীদের গোলা বা ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর, রোগ-পোকামাকড়ের উপদ্রবে প্রচুর পরিমাণে ফসল নষ্ট হ'ত। এমনকি, ফসল কাটা, পরিবহণ করা এবং ঝাড়াই মাড়াইয়ের সময়েও মোট ফসলের এক বিরাট অংশ শুধুমাত্র অসাবধানতা'র জন্যে নষ্ট হয়ে যেত। এখনকার চাষীভাইরা এইসব ব্যাপারে কিন্তু অতিমাত্রায় সচেতন। উৎপাদিত ফসলের যথাযথ সংরক্ষণের ফলে শস্যহানির পরিমাণ কমেছে। চাষবাস সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে জঙ্গলপুর কিংবা হয়দারপুরের আবদুল বদি, রইস মিঞার মতো গরীব চাষীরা অন্যান্য এলাকার মতো নিজেরাও ব্লক অফিসে গিয়ে এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসারের সঙ্গে দেখা করছেন এবং গ্রামসেবকবাবুদের কাছথেকেও অনেক আধুনিক চাষবাস পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি জেনে নিচ্ছেন।

যদুহাটির রাজবেড়িয়া গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রগতিশীল চাষী জনাব কাজী আবদুল গফফর সাহেবের জমিতে গেলেই দেখা যাবে, তাঁর জমিতে এখন ইলেকট্রিক জেনারেটরের সাহায্যে শ্যালো-টিউব ওয়েল থেকে সেচের জল উঠছে। জন-মজুররা কেউ সার ছড়াচ্ছেন, কেউবা কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করে বোরো ধানের ফসলে পরিচর্যা করছেন আবার কেউবা কোন্ জমিতে কতটা জল সেচ দিতে হবে, তা দেখে নিচ্ছেন সঠিকভাবে। গফফর সাহেব এই এলাকার চাষীদের কাছে

আগাছা নিড়ানোর আধুনিক যন্ত্র প্যাডি উইডার

একটি আশ্চর্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। ধান-গম-আলু-পাট সব চাষেই তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা আজ সবাই অনুসরণ করছেন। মাটি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী কোন জমির কোন্ ফসলে কতটা ইউরিয়া, কতটা সুপার ফসফেট এবং কতটা পটাশ সার দিতে হবে—এইসব হিসেব করে গফফর সাহেব কৃষি মজুরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন: এই দিকে আসুন। আপনাকে এবার ফসল ঝাড়াই-মাড়াই করার ঘরটা দেখাই। গফফর সাহেবের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে মাঠের মধ্যে যে লম্বা ঘরটার কাছে এসে দাঁড়ালাম, তার ভিতরে তখন গম ঝাড়াই করার কাজ চলছিল। ফসল ঝাড়াই করার এই ঘরটা তৈরী করার পর তিনি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। বৃষ্টির দিনে ফসল কাটলে কিংবা ফসল কাটার পর হঠাৎ বৃষ্টি এলে ক্ষতি হওয়ার কোন ভয় নেই। তাড়াতাড়ি সব ফসল তুলে মাঠের এই ঘরের মধ্যে রাখলে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, গফফর সাহেবের সমৃদ্ধ ধান ও গমের ক্ষেত না দেখলে, চাষবাসের ক্ষেত্রে গ্রামগঞ্জের মানুষের ব্যাপক পরিবর্তনের মানসিকতা সম্পর্কে আমার অনেকটাই অজানা থাকতো।

খোলাপোতার আবদুস সোবাহান সাহেব আসলে একজন ডাক্তার। চারিদিকে চাষ-বাসের ব্যাপক প্রসারের ফলে তিনিও অনুপ্রাণিত হয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ চাষের দিকে নজর দিয়েছেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁর জমিতে সেচ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন। শ্যালো টিউব-ওয়েল বসেছে জমির পাশে। পাম্প মেশিনের সাহায্যে সেই 'শ্যালো' থেকে জল উঠছে সারা বছর। তাঁর দুই ছেলে রফিকুল ইসলাম ও সফিকুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হল। এবছর দুজনেই বসিরহাট কলেজ থেকে বি-এ পারট-টু পরীক্ষা দিয়েছেন। পরীক্ষার পর থেকে দুজনেই চাষবাসে লেগে আছেন পুরোদমে। সফিকুলকে দেখলাম, কাঁধে প্লাস্টিকের হাল্কা স্প্রেয়ার ঝুলিয়ে বোরো ধানের পোকামাকড় দূর করার জন্যে কীটনাশক ওষুধ ছড়াচ্ছেন। এই ধরনের স্প্রেয়ার গরীব এবং সাধারণ স্তরের চাষীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। কোন্ জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে, কোথায় পোকা লেগেছে, কোন্ জমিতে আগাছা পরিষ্কার করার জন্যে প্যাডি উইডার মেশিন কীভাবে চালাতে হবে, কোন্ ধানের জমিতে কতদিনের মাথায় কতটা সেচ দিতে হবে—এইসব খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্পর্কে সফিকুলের এখন টনটনে জ্ঞান। রাত্রে অবসর সময়ে চাষবাস সম্পর্কে সরকারী প্রচারপত্র অথবা পুস্তিকা প'ড়ে অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও ভালো ফল লাভের সবকিছু শিখে নিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে বি-ডি-ও অফিসে গিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিচ্ছেন, গ্রাম-সেবকবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছেন রেডিওতে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান শুনছেন, আবার খবরের কাগজ পড়েও জেনে নিচ্ছেন উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস বিষয়ক অনেক তথ্য। চাষবাসের কাজ করছেন বলে তাঁর মনে কোনরকম ক্ষোভ, দ্বিধা, সংশয় কিংবা লজ্জার লেশমাত্র নেই। কথা প্রসঙ্গে সফিকুল বললেন: উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস করতে হলে পড়াশুনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ভালোভাবে সবকিছু জানতে হলে, সব ভালো চাষীরই কিছু-কিছু পড়াশুনা করার সুযোগ থাকা দরকার। প্রগতিশীল চাষবাসের নীতি অনুসরণ করায়, খোলাপোতার আশপাশের জমি এখন সবুজ হয়ে আছে। সারা দেশেই এভাবে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটছে। এভাবে সবাই মিলে দেশে খাদ্য উৎপাদন যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটনের কোন সমস্যাই আমাদের অসুবিধায় ফেলতে পারবে না।

ভারত-জারমান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অধীনে উত্তর চব্বিশ পরগণার ময়নালী গ্রামকে কেন্দ্র হিসেবে ধরে নিয়ে আকতপুর, ঘোড়ারস, উত্তর মথুরাপুর, দক্ষিণ মথুরাপুর, কোড়াপাড়া, চাঁপাপুকুর, অর্জুনপুর, জাফর-পুর এবং কাটিয়ারবাগের মোট ৭৩৩ জন চাষীকে নিয়ে ওই প্রকল্পের কৃষি প্রদর্শক শ্রী প্রভাতকুমার মণ্ডল তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন পূর্ণোদ্যমে। সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্প এলাকার জমির উর্বরতাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সাহায্য করা এবং রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের অভিজ্ঞ করে তোলার জন্যে ভারত-জারমান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, প্রত্যক্ষ তার ফল হিসেবে ময়নালী মুখ্য গ্রাম এবং অন্যান্য নয়টি গ্রামের চাষীরা ধান, গম ও পাটের ফাউণ্ডেশন বীজ, বিনামূল্যে স্প্রেয়ার মেশিন, সীড ড্রিল, প্যাডি উইডার, ইত্যাদি কৃষি উপকরণ সাহায্য হিসেবে পেয়েছেন। এছাড়া বিলি করা হয়েছে তিল, মুগ ও সূর্যমুখীর বীজ। চাষীদের জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে বলে দেওয়া হচ্ছে কোন্ জমিতে কোন্ সার কতটা পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি। এমনকি, জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য কোন্ জমিতে

হাল্কা প্লাস্টিকের স্প্রেয়ারের সাহায্যে ওষুধ ছড়ানো হচ্ছে

পশু চিকিৎসালয়ে গরুর রোগ পরীক্ষা করা হচ্ছে

কোন্ ফসলের পর কেমন ধরনের শস্য-পর্যায় বেছে নেওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও কৃষি প্রদর্শক হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। গরীব চাষীদের আর্থিক সুরাহার জন্যে প্রভাতবাবু বসিরহাট শাখার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে এবছরের রবি মরশুমে পনেরো জন চাষীকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আগামী খরিফ মরশুমে আরও কিছু ঋণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেল। চাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিচ্ছেন আবার, ফসল ওঠার পর শোধ করে দিচ্ছেন। এইভাবে ময়নালী সহ দশটি গ্রামের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

গ্রামগঞ্জের চাষীদের মধ্যে মানসিকতার ক্ষেত্রে কীভাবে পরিবর্তনের জোয়ার আসছে, তার একটি সুন্দর উদাহরণ হল বারাসত ২ নং বুকের হুমাইপুর। কিছুদিন আগেও যেখানে চাষীরা তাঁদের আনাড়ী জ্ঞানের ভিত্তিতে খেয়াল-খুশিমত চাষ করতেন, সেখানে এখন ধান-গম-পাট-সূর্যমুখী-আলু-কড়াই-ডাল-বরবটি ইত্যাদি কী না হয়। হুমাইপুরের আবদুল আজিজ, জোহর আলি, লতিফ মণ্ডল, এক্রামুল হোসেন, মজিদ মিঞা, সবার মুখেই এখন হাসি ফুটেছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এসসি. পাশ ক'রে শ্রীদেবজ্যোতি গুহ ভারত-জারমান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অধীনে চাকরী নিয়ে এখন বালিগঞ্জের মতো ঝকঝকে এলাকার বাড়ি ছেড়ে এখানকার চাষীদের সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে আছেন। আকতার আলি, সোলেমান মিঞা, নূর আলি, মোমিন আলি এবং হুমাইপুর এলকার অন্যান্য সমস্ত চাষী-ভাইদের কাছে দেবজ্যোতিবাবু 'দেবুদা' নামেই পরিচিত। তিনি এখানে এসে চাষীদের সঙ্গে মাঠে নেমে হাতে-কলমে শিখিয়ে দিচ্ছেন পরিমিত সার প্রয়োগের উপকারিতা, সেচ দেওয়ার নিয়ম-কানুন, ফসলের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচর্যার পদ্ধতি, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার গুরুত্ব ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলি। 'দেবুদা' চাষীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে সবুজ বিপ্লবকে হুমাইপুরের আশপাশের গ্রামগুলির মানুষজনের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছেন। ডিপ টিউবওয়েলের জলের ধারায় হুমাইপুর ক্রমশঃ উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠছে। এখানকার চাষীদের আনন্দ এখন ফসল উৎপাদনের শতধারায় প্রবাহিত।

দু'বছর আগে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ মিঃ ড্যানিয়েল বেনো পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সম্প্রসারণের জন্য একটি কার্যকরী পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। এই প্রকল্প অবলম্বনের ফলে কৃষি গবেষণার আধুনিক তথ্যগুলি কৃষকদের কাছে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রেনিং অ্যাণ্ড ভিজিট'। সংক্ষেপে টি-ভি। বাংলায় বলা হয় প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কৃষকদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের নতুন-নতুন তথ্য জানানো এবং নতুন ধরনের চাষবাস পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানোর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করে সব কিছু হাতে-কলমে শেখানো।

কিছুদিন আগেও গ্রামগঞ্জের মানুষ নিজেদের চিকিৎসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অসুখ-বিসুখ হলে হাতুড়ে চিকিৎসার অনাদরে মারা যেত অনেকেই। কিন্তু এখন চাদিরিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্র হয়েছে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমেও গ্রামের গরীব লোকজন সুযোগ পাচ্ছেন। এমনকি, এখন আর শুধুমাত্র মানুষের চিকিৎসা-ই নয়; পশু-চিকিৎসার জন্যেও বুক পর্যায়ে ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী পশু-চিকিৎসকরা গ্রামে-গ্রামে গিয়ে গরু-ছাগল-মহিষ-ভেড়া-শূকর-হাঁস-মুরগী ইত্যাদি অর্থকরী গৃহ-পালিত জীবজন্তুর চিকিৎসার প্রসার ঘটাচ্ছেন। এব্যাপারে বসিরহাট ২ নং বুকের একটি পশু-চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি জানালেন: আজকাল প্রতিদিন সকালে-বিকালে আমাদের চিকিৎসা-কেন্দ্রে তিরিশ-চল্লিশটির মতো গরু-বাছুর-ছাগল ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য চাষীভাইরা সংস্কারমুক্ত মনে এগিয়ে আসছেন। এর ফলে যাবতীয় সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে পশু-পাখি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারছে। ঘা কিংবা এঁশে হওয়া, গলা-গাল ফোলা, আমাশা হওয়া, এমনকি সর্দি-কাশি হলেও গরু-বাছুর ইত্যাদির সবরকম চিকিৎসার জন্য সাধারণ অজ্ঞ-অশিক্ষিত লোকজন সময়মত এগিয়ে আসছেন। কৃত্রিম উপায়ে গো-প্রজননের জন্যেও খোলা-পোতায় রাজ্য সরকারের একটি কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে জার্সি জাতের গো-প্রজননের জন্য সবাই বিনামূল্যে সুযোগ নিতে পারছেন। গো-প্রজনন এবং উন্নততর পদ্ধতিতে গো-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারী এইসব ব্যবস্থাপনা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে—এটি অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দের কথা।

এইসব বিজ্ঞানসম্মত চেতনার প্রসার সরকারী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে গ্রামগঞ্জের মানুষ এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। ফলে, আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথও গ্রামের মানুষরে কাছে ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে উঠছে।

গ্রন্থ আলোচনা
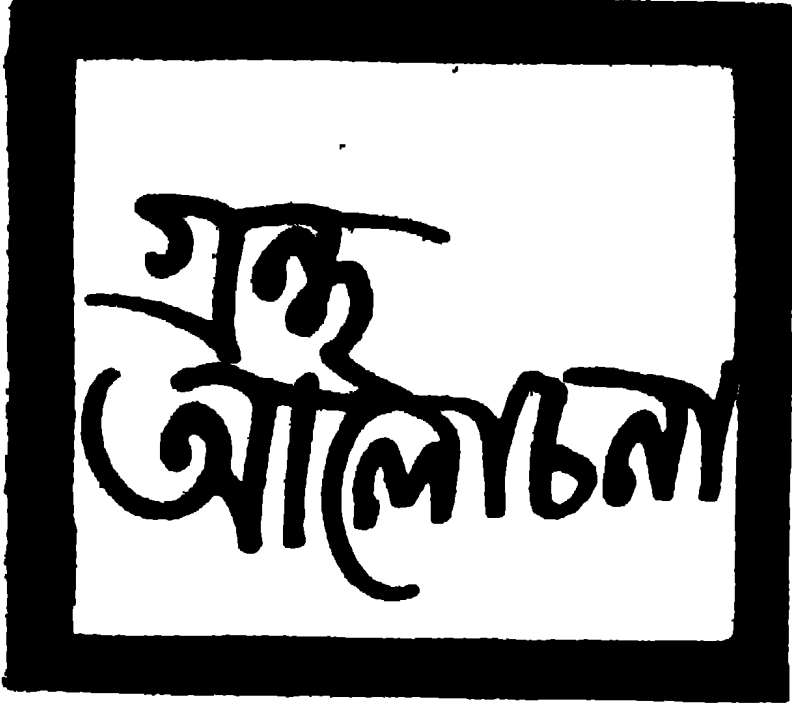
গোমুখীর পথে (ভ্রমণ কথা)।
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২।
মূল্য—১৬.০০ টাকা।

বর্তমানে বাঙলা ভ্রমণ-সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ; বিশেষত ভ্রমণ-বিলাসী বাঙালী লেখকেরা বারবার ছুটে গেছেন দূর-দুর্গম হিমালয়ের ডাকে।

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর মত দণ্ডায়মান নাগাধিরাজ হিমালয়ের নানা তীর্থে সরোবরে হিমবাহে নদীর উৎস মুখে তুষার মৌলি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের রাজকীয় বৈভবে অপার্থিব রহস্য ও অতুল সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন। দেবস্থা হিমালয়, তার ক্রোড়ে লালিত বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতি, তার 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর' গিরি-পথে ভারতের নানা প্রান্তের থেকে আসা শত-সহস্র ভ্রমণার্থী ও তীর্থঙ্কর ঐ সমস্ত রচনাকেই প্রায় করে তুলেছে আকর্ষণীয় ও স্বাদু। পর্যটন বিলাসী বুদ্ধদেব বাবুও জীবন-জিজ্ঞাসার অদম্য আবেগে বারবার পাড়ি দিয়েছেন হিমালয়ের নানা তীর্থে, নানা দুর্গম নদীর উৎস মুখে। 'গোমুখী' হিন্দুমাত্রেরই কাছে পরম তীর্থ। কিন্তু সেখানে পৌঁছানো সহজ নয়। বহু চটি পার হয়ে চিরবাসা, ভগীরথ পর্বত, ভুর্জবাসা পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে হয় সেই পথে। সেই পথে হাঁটতে হাঁটতে ভূয়োদর্শী, সত্যদর্শী লেখকের মনে হয়েছে—'পা কি শুধু পথ? না তার চেয়েও কিছু বেশি? গোমুখীর পথ?.....না কি একটা ইচ্ছা? মানুষের উত্তরণের?.....হৃদয় দেবতা ভেতর থেকে নির্দেশ দেন, –এগিয়ে চলো; আঁধার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে।' সেই উত্তরণের অমৃতকথা–'গোমুখীর পথে'; এই গ্রন্থে পথকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে 'পথের মানুষকেই' বেশি দরদ দিয়ে যেন এঁকেছেন লেখক। 'যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে' সেই পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ,তিনি নিরীক্ষণ করেছেন 'যুগ যুগান্তের' 'বিরাট স্বরূপ'। কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র তাদের জীবন-কাহিনী। পাপ আর পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে একই শরীরে। রামরতন সিন্‌হা, ললিত মোহন বিশ্বাস, ভগীরথ সিং, আদিত্য প্রসাদ বণিক—সকলেই উত্তরণের নেশায় বেরিয়ে পড়েছে গোমুখের পথে। বড় দরদ দিয়ে লেখক এঁকেছেন তাদের চরিত্র-চিত্র; তাই নামে ভ্রমণ কথা বা পথচলার কাহিনী হলেও বইটি উপন্যাসের মত এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। আর পড়তে পড়তে মনে হয় আমরাও বুঝি লেখকের ভ্রমণ সঙ্গী হয়ে উঠেছি। পাঠকের এইটাই বড় প্রাপ্তি।

বইটির মধ্যে যে আলোক চিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট সেগুলিও নয়নরঞ্জন।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বেঁটে বাচ্চুর গপপো
শ্রীবরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী
পরিবেশক: বিশ্বাস পাবলিসিং হাউস
৫/১-এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
দাম তিন টাকা

'বেঁটের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি' ঠাকুরমার এই বিশেষণটি আপাতদৃষ্টিতে গল্পকারের প্রেরণা বলে ধরে নেওয়া যায়। গাঁটে গাঁটে দুষ্টবুদ্ধির অনেক ঘটনা বইটিতে ছড়ানো ছিটানো আছে। বেঁটে বাচ্চুর মজাদার কাহিনী স্কুল-পড়ুয়া দুটি ছাত্রকে কেন্দ্র করে। কিশোর জীবনের সম্ভাব্য অনেকগুলি ছোট ছোট ঘটনাকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। যা প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সরস্বতী পূজার আগে কুল খাওয়া নিষেধ, নগেনবাবুর অঙ্কের ক্লাস না হওয়ার নেতিমূলক আনন্দ গরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়ার মত চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ, নিভৃতে পেন্সিলে ব্লেড লাগিয়ে দাঁড়ি কামাতে যাওয়ার বিড়ম্বনা ও অযথা রক্তপাত, হালখাতার দিনে উপহারের মিষ্টির বাক্স থেকে মিষ্টি তুলে নিয়ে তার বদলে ছেকো করে কেটে শক্ত ভেলিগুড়ের ডেলা পুরে রাখা এবং ধরা পড়ে নিজের দুষ্ট বুদ্ধির স্বরূপ প্রকাশ করার মজা—এমন সব অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনায় ঠাসা বইটিতে ছোটরা তো মজা পাবেই, বড়রাও বইটি পড়তে পড়তে অনায়াসে শৈশবস্মৃতি রোমন্থন করতে পারবেন। মোহনবাগান–ইষ্টবেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচ দেখার শিহরণও বাদ দেননি গল্পকার বেঁটের অভিজ্ঞতা থেকে। কমেন্‌টেটারস বক্সের কাছে গিয়ে 'বাচ্চু' বলে ডাক দেওয়ার প্রসঙ্গটিতে কিশোর মনের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। —ঐ ঘরের কাছে গিয়ে বাচ্চু বলে ডাকলে আরো মজা হ'ত। বাচ্চু তো নিশ্চয়ই রেডিও খুলে বসে আছে রীলে শোনার জন্যে। ও তাহলে শুনতে পেত।' কাহিনীর মধ্যে একটি করুণ মানবিক আবেদনও রয়েছে। হঠাৎ মামারবাড়ী থেকে ফিরে এসে প্রিয় পাখীর ছানাটির মৃত্যুর ঘটনা এবং বেঁটের শোকের গভীরতা সহজেই পাঠকের মনে দাগ কাটে।

কয়েক জায়গায় দু একটি ঘটনা একটু বেসুরো ঠেকেছে। বেঁটের দাদার সিগ্রেট ফোঁকা এবং পরিত্যক্ত সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে বেঁটের সিগ্রেট টানার ব্যাপারটা এ জাতীয় বইএ কিছুটা অস্বস্তিকর। ঠিক তেমনি দাদুর মাথায় টাক আর-এর ব্যাখ্যান যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ বলে মনে হবে না। অঙ্কের খাতায় শুধু অঙ্ক টুকে দিয়ে অঙ্কের মাষ্টার মশাইকে ঠকাতে যাওয়ার প্রসঙ্গটি খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। আগন্তুক দাদুর নাকডাকা প্রসঙ্গে বেঁটের সারারাত্রি ব্যাপি জাগরণ এবং অসহায় অবস্থা বর্ণন বাস্তবানুগ। ভবতারণ বাবুর সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত ছিল বেঁটের সেখানে চাঁদা চাইতে যাওয়ার ঘটনায় অনেক প্রত্যাশা ছিল। ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সে প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় কিছুটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও লেখক অন্যভাবে তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। ছাপা ঝকঝকে, কিছু কিছু শিশুশিল্পীর ছবির অলংকরণ বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। কয়েক জায়গায় একই শব্দ সমষ্টির পুনারাবৃত্তি সম্বন্ধে লেখক একটু সাবধান হলে ভালো হত।

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহিলা মহল

যদি একটু

উমা দাশগুপ্ত

সমস্যা আর সমস্যা। এখনকার দিনে বেঁচে থাকাটাই যেন একটা বিরাট সমস্যা।

ট্রামে-বাসে ওঠা একটা সমস্যা, ছোট্ট একটা বাসা পাওয়া সমস্যা, সুন্দর করে সংসার চালানো সমস্যা, এমনকি ভগবানের দান বলে এতদিন যাদের মনে করা হোত সেই সন্তান-সংখ্যা বেড়ে গেলেও একটা সমস্যা।

আর এই সমস্যা জর্জরিত জীবনে সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে পড়েছে এখন মানুষের মনটা। কারণ বহু সমস্যার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে অতি অল্পতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে সকলের মন, ফলে সর্ব্বত্র অশান্তির আগুন জ্বলে উঠছে অনেকটা সামান্য কারণেই।

অথচ আমরা যদি একটু সহযোগিতার মন নিয়ে সব কিছু ভেবে দেখি অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে যদি একটু বিবেচনার চোখ বুলিয়ে নেই তবে বোধহয় এত সমস্যার ভেতরে থেকেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি আমরা।

বিশেষ করে এই অশান্তির আগুনের আঁচ অনেকটা কমিয়ে দিতে পারেন মেয়েরা; এমনকি তাদের কথা বা কাজের ভেতর দিয়ে স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে এই আঁচ একেবারে চাপাও দিতে পারেন তাঁরা।

কেননা বর্ত্তমানে নানা কারণে যখন সকল কাজেই পুরুষের সঙ্গে সমান তালে অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে মেয়েদের, তখন নিত্যকার জীবনে কোন কাজ করবার কিংবা কোন কথা বলবার আগে যদি একটু দরদী দৃষ্টি বা মন দিয়ে সব কিছু দেখে নেন তাঁরা, তবে বোধহয় অনেকখানি হাল্কা করে ফেলা যায় এই সমস্যা জর্জরিত জীবনের অসহনীয় গুমোট আবহাওয়া।

যেমন ধরুন না, ট্রামে বা বাসে উঠতে গেলে ভীড়ের মধ্যে একটু ঠেলাঠেলি হবেই, তাতে যদি আমরা চটে গিয়ে পাশে দাড়ানো ভদ্রলোক বা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কটু কথা বলতে থাকি তবে তার দিক থেকেও নিশ্চয়ই উঠবে প্রতিবাদ, আর এই বাদ-প্রতিবাদের অশান্ত ঝড়ে বিরক্ত হয়ে উঠবেন আশে পাশের অন্যান্যরা। তাই ট্রামে বাসে চড়ার এই স্বল্পকালীন সময়টুকুতে খানিকটা অসুবিধা হলেও যদি একটু সহ্য করে নিতে পারি আমরা তবে বোধহয় ভীড়ের এত ধাক্কা-ধাক্কি আর কণ্ডাক্টারের চেঁচামেচির মধ্যেও উত্যক্ত হয়ে উঠবেন না অন্যান্য যাত্রীরা।

আবার দেখুন, অনেক সময় দেখা যায় ট্রাম বা বাসের লেডীজ সীট্ জুড়ে বসে আছেন অল্পবয়সী অথবা সমর্থ কোন মেয়ে। আর ঠিক তার সামনেই বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে আছেন আর একজন যিনি লেডীজ সীট্ ভর্ত্তি বলে বসতে পারছেন না। এখন ঐ বসে থাকা অল্পবয়সী মেয়েটি যদি উঠে দাঁড়িয়ে বসতে দেন বাচ্চা কোলে মহিলাকে তবে দৃশ্যটা খুব সুন্দর হয়ে ওঠে নাকি?

তাই বলছি, ট্রামে বাসে চলতে গিয়ে যদি একটু আরাম ছেড়ে সহযাত্রীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই আমরা তবে নিশ্চয়ই একটা স্নিগ্ধ হাওয়া অনেকখানি হাল্কা করে দেবে ভীড়ের এই অসহ্য গুমোট ভাবটা।

এই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চললে বাসা-বাড়ীর অসুবিধাটাও অনেকখানি দূর করতে পারি আমরা।

যেমন ধরুন, পাঁচ-ভাড়াটের বাড়ীতে আপনাকে থাকতে হচ্ছে। জল-কল ব্যবহার করতে হচ্ছে সকলের সঙ্গে, অথচ সময় মত জল পাওয়া একটা সমস্যা। আর এই সমস্যা থেকেই শুরু হয় অশান্তি—যার ফল ঝগড়া, কোন-কোন সময় মারামারি। সমস্যার সমাধান কিন্তু এইভাবে কিছুই হয়না।

তাই এই পথে না গিয়ে যদি একটু মিলেমিশে এক সঙ্গে বসে জল নেবার সময় ভাগ করে নেওয়া যায় অথবা একঘর আর এক ঘরের প্রয়োজন যদি একটু সহানুভূতি সহকারে বিচার করে দেখেন তবে বোধহয় অন্যান্য অনেক অসুবিধার মধ্যে জল-কলের সমস্যাটা এত মারাত্মক হয়ে দেখা দেবেনা।

এছাড়াও এই সহযোগিতার মনোভাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে সংসারের আঙিনায়।

মা অনেক আশা করে ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনেছেন ঘরে। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল পৃথক সংসার হয়েছে ছেলে-বৌএর। এই পৃথক হবার পেছনে যে বৌএর বুদ্ধিই বেশী কাজ করে একথা আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারিনা। আর তার এই দুর্বুদ্ধির জন্যই মায়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসে অনেক দীর্ঘশ্বাস।

অনেকে হয়তো বলবেন, সব সময় যে বৌএর দোষ থাকে তা নয়। শাশুড়ী ঠাকরুনের ব্যবহারও অনেক সময় অসহনীয়

২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

কৃষি

আউশ চাষে বেশী ফলন পেতে

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় এখন আউশ ধান চাষের ধুম পড়েছে। কম বৃষ্টি ও খরার জন্য একদিকে যেমন বোরো মার খেয়েছে; তেমনি হুগলী, হাওড়া, বর্ধমানের বোরো চাষীরা মার খেয়েছেন সময় মত ডি-ভি-সি-র জল না পেয়ে।

এবার বর্ষা আগাম পাওয়ায় তাই চাষীরা আউশ ধান দিয়ে বোরোর লোকসানটা পুসিয়ে নিতে চাইছেন। আগাম বর্ষা আউশের আশাকে ক্রমশই জোরদার করছে। উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতে চাষীরা এবার দেখেছি পাটের জমিতেও আউশ দিচ্ছেন। কারণ খোঁজ করতে অনেকেই জানালেন গতবার পাট দিয়ে ভাল দাম পাননি।

আউশ ও পাট চাষ প্রায় একই সময় হবার দরুণ অনেককেই পাশাপাশি আউশ পাট দিয়ে ভুগতে হয়। কারণ আউশ ধান প্রথম অবস্থায় বেশি জল সহ্য করতে পারেনা। তাই বেশি বৃষ্টি পেয়ে যেসব আউশের জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাবে সেখানে আউশের সর্বনাশ। আবার পাশের পাটের জমিতে জল দরকার। আউশ বোনার জন্য জমি নির্বাচনের সময় এসব দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার।

এরাজ্যে আলাদাভাবে দেখলে দেখা যাবে যে প্রায় ৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়। এবং এরাজ্যে হেক্টর প্রতি গড় ফলন প্রায় ১০ কুইন্টাল। এইরকম কম ফলনের প্রধান কারণ মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালী। এবার বৈশাখ মাস থেকেই ভাল বৃষ্টি হওয়ায় আশাকরা যাচ্ছে আউশের ফলন এবার ভালো হবে। সারা জ্যৈষ্ঠ মাস ধরেই চলবে আউশ ধান বোনা ও রোয়া। একটা কথা চাষীরা নিশ্চয়ই জানেন উন্নত প্রথায় অধিক ফলনশীল জাতের আউশের ফলন কিন্তু আমন ধানের চেয়ে অনেক বেশি।

এরাজ্যের চাষীদের মধ্যে সাবেকি প্রথায় দেশী জাতের ধান বোনার দিকে প্রচণ্ড লোভ। উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপক ভাবে চাষ হচ্ছে চীনা আউশ, দুলার, চুর্ণকাঠি, ভুতমুড়ি, ইত্যাদি ধান। উত্তরবঙ্গে জোলি, বউমাল ধাওড়া, ঝড়া ইত্যাদি ধান ছিটিয়ে বোনার রেওয়াজ। দেশী জাত ছিটিয়ে বোনার সপক্ষে চাষীরা যেসব যুক্তি দিয়ে থাকেন—তাহল চাষ সহজ, কম সার টানে, রোগ-পোকার উপদ্রব কম, চাষে খরচ কম ইত্যাদি। এসব ধারণা যে বেঠিক তা অস্বীকার করে লাভ নেই। তবে সব চেয়ে বড় কথা এতে ফলন কম এবং লাভও কম।

এখন চাষের বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কম সময়ে বেশি লাভ কি করে করা যায় এবং একই জমি থেকে বেশি বারে কিভাবে আরো বেশি ফলন তোলা যায়। সেজন্য অধিক ফলনশীল জাতের ধান উন্নত প্রথায় চাষ করলে ফলন তো দ্বিগুণ পাওয়া যাবেই। জমিও তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে পরবর্তী ফসলের জন্য। কারণ দেশী প্রথায় চাষ করলে একটি জমি থেকে বছরে দুটির বেশি ফসল তোলা অসুবিধা। সেখানে সঠিক শস্য পর্যায় ঠিক করে উন্নত প্রথায় অধিক ফলনশীল জাতের ফসল বছরে চারটি তোলা যাবে।

গত বছর এবং এ বছরের বোরো চাষে দেখা গেছে আবহাওয়ার খামখেয়ালীর জন্য ঘূর্ণি ঝড়ে পাকা ধানে মই পড়েছে। এটাও এড়ানো সম্ভব যদি অধিক ফলনশীল জাতের বেঁটে ধরনের আউশের জাত বোনা বা রোয়া যায়। গাছ লম্বা হলেই সহজে কাত হয়ে পড়বে, আর বেঁটে হলে সে সম্ভাবনা খুব কম।

বোনা আউশে চারবার আড়াআড়ি লাঙল ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে ও রোয়া আউশের বেলায়ও দুবার শুকনোতে ও দুবার কাদাতে লাঙল মই দিয়ে কাদান করতে হবে। ভাল ফলনের জন্য আউশের জমিতে যতটা সম্ভব জৈবসার প্রয়োগ করাই ভাল। এজন্য জমি তৈরির সময় ৯।১০ গাড়ি গোবর সার এবং শেষ চাষের সময় মূল সার হিসাবে একর প্রতি ৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি সুপার ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ জমিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

এজন্য প্রথম বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিতে লাঙল দিতে হবে। এরপর বৃষ্টি পেয়ে আগাছা বের হবে প্রচুর। এর পর ১০।১৫ দিন বাদে লাঙল ও মই দিয়ে জমিতে মিশিয়ে দিলে আউশের জমিতে আগাছা কম হবে। এতে নিড়ানি খরচা কম পড়বে ও জমি কিছু সবুজ সার পাবে।

এবার মাটির তারতম্য হিসাবে আউশ ধানের জাত নির্বাচন করুন। খরা অঞ্চলে ছিটিয়ে বোনা আউশের জাত হিসেবে কাবেরী, আই-ই, টি-৮২৬, পলমন্-৫৭৯, সি, আর১২৬-৪২১ ভাল। এবং খরা অঞ্চলে জল পাওয়া গেলে রোয়ার জন্য ওইসব জাততো রোয়া যাবেই উপরন্ত

রত্না, পুসা-৩৩-৩০ এবং আই-আর-৩০ ও রোয়া যাবে।

পলিমাটি অঞ্চলের উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাতের মধ্যে পলমন-৫৭৯ সি, এন, এম-২৫, সি-আর-১২৬-৪২-১ ও আই-ই-টি-২২৩৩ ছিটিয়ে বোনা চলবে। এসব জাত ছাড়াও রত্না, পুসা-৩৩-৩০; আই-আর-২৮ ও আই-আর-৩০ জাতের আউশ রোয়া চলে। এছাড়া আর-পি-৭৯-১৪ আউশ খন্দে বোনা ও রোয়া দুইই চলে। পুসা-২-২১ উঁচু ও মাঝারি জমির উপযোগী এবং বোনা রোয়া দুইই চলে। বালা হাত কিছুটা খরা সহাশীল। এবং ছিটিয়ে বোনা হিসাবেই ভাল।

এবার জলের ব্যবহারের কথায় আসা যাক। রোয়া ধানের বেলায় চারা রোয়ার সময় জমি কাদাকাদা থাকলেই ভাল। একটু জল থাকলেও ক্ষতি নেই। রোয়ার পর প্রথম ৪০ দিন ওই জমিতে অন্তত ১ ইঞ্চি জল ধরে রাখা প্রয়োজন। চাপান সার দিতে হলে মনে রাখবেন জমির জল শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। চাপান সার দিয়ে আবার তার পরের দিনই এক ইঞ্চি পরিমাণ জল ধরিয়ে দিতে হবে। এবং ওই পরিমাণ জল ধান কাটার ১৫ দিন আগে পর্যন্ত জমিতে ধরে রাখতে হবে। রোয়া ধানে জল থাকলে আগাছার উৎপাত কম হয়। তবে গাছের গোড়ায় নতুন বাতাস চলাচলের জন্য মাঝে মাঝে ২।১ দিনের জন্য জমি থেকে জল বের করে দিতে পারলে ভাল হয়।

আউশ ছিটিয়ে বোনা ও রোয়ার ১৫।২০ দিন বাদেই নিড়ানি দরকার। বোনা আউশে প্রচুর শ্যামা জাতীয় ঘাসের উপদ্রব হয়। নিড়ানি দিয়ে ঘাসতো তুলতেই হবে সঙ্গে সঙ্গে ধান গাছের গোড়ার মাটি উস্কে দিলে গাছ বেশি খাবার নিতে পাবে ও গাছ বাড়তে পারবে তাড়াতাড়ি। রোয়া আউশ ধানের আগাছা দমনের জন্য রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি সুযোগ থাকে ও নিড়ানির জন্য জন মজুর সময়মত না পাওয়া যায় তবে রাসায়নিক প্রথায় আগাছা দমন করাই লাভের।

আউশের জমিতে সার প্রয়োগ ব্যাপারে বারে বারে ভাগে ভাগে সার প্রয়োগ করলে খরচ কম বেশি ফল পাওয়া যায়। সারের অপচয়ও রোধ হবে। উঁচু জমির ধানে একর প্রতি ১২ কেজি নাইট্রোজেন দেওয়া লাভজনক। এভাবে যারা সার ব্যবহার করবেন, তারা মূল সার হিসাবে শুধু ১০।১২ গাড়ি কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করবেন। নাইট্রোজেন সার মূল সার হিসাবে দেবেন না। প্রথম দফায় আগাছা দমনের পর চারা গজানোর ২১ দিনের মাথায় ৬ কেজি নাইট্রোজেন চক্রবিদা বা খুরপি দিয়ে সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। দ্বিতীয় বারে ৩ কেজি ৪০ দিনের মাথায় ও বাকি ৩ কেজি গাছে থোড় আসার ঠিক আগে প্রয়োগ করবেন। রোয়া জমিতে মোট ১৬ কেজি নাইট্রোজেন সার দেবেন ৮+৪+৪ হিসেবে। এতে সার প্রয়োগের খরচ কমবে, ফলন বাড়বে।

যদি একটু

১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

হয়, একথা মেনে নিয়েও বলছি, ক'দিনই বা বাঁচবেন বৃদ্ধা মা। তাই তার কথা শুনতে খারাপ লাগলেও যদি একটু সহ্য শক্তির পরিচয় দেন বৌমা তবে বোধহয় স্বামী শাশুড়ীর সংসারে সুখী পরিবেশ গড়ে ওঠে একটা।

অবশ্য শাশুড়ী ঠাকরুণকেও বৌমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে বৈকি! মেয়ে অন্যায় করলে মা কি তাঁকে ভালবাসেন না? তেমনি বৌ অন্যায় করলেও সে কথা পাঁচখানা করে ছেলের কানে না তুলে মা যদি একটু ক্ষমার মনোভাব নিয়ে স্নেহের বাঁধনে কাছে টেনে নেন তাকে, তবে হয়তো বৌমা সহজেই সংসার ভেঙ্গে দূরে যেতে পারেনা।

আবার সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে স্বামী ফিরে এলে তৎক্ষণাৎ যদি স্ত্রী তার কাছে বলতে থাকেন সারাদিনের অসুবিধার কথা তবে স্বামীর ক্লান্ত মনটা যে বিরক্তিতে ভরে উঠবে এতো সহজ কথা।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি একটু ধৈর্য্য আর অনুভূতির পরিচয় দেন তবে নিশ্চয়ই প্রশান্তিতে ভরে উঠবে স্বামীর মন।

এসব ছাড়াও ভাবুন তো, বহু সন্তানের মা হওয়া এখন কত বড় একটা সমস্যা!

অর্থ বা সামর্থ্যের অভাবে বহুজনের সংসারে কোন সন্তানই ঠিকমত মানুষ হতে পারেনা। মায়ের শরীর ভেঙ্গে পড়ে ক্রমশ, তাই রুক্ষ হয়ে উঠে তার মেজাজ। ফলে সার কাছ থেকে আদর বা সহানুভূতি না পেয়ে ছেলেমেয়েগুলো বেড়ে ওঠে পরগাছার মতন।

এখানে মা যদি একটু মেজাজ ঠিক রাখেন—যদি একটু সহানুভূতি আর আদর মিশিয়ে সন্তানের সঙ্গে ব্যবহার করেন তবে বোধ হয় সেই সন্তানের মধ্যে পরবর্তীকালে দেখা দেয় দৃঢ় চারিত্রিক গুণ বা সুস্থ মানসিকতা।

অবশ্য এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা। ভাবি সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে যদি একটু সংযত থাকেন মা বাবা, আর নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারেন যদি একটা সুন্দর বোঝাপড়া; তবে মনে হয় বহু সন্তানের মা হওয়ার অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারেন ভদ্রমহিলা।

তাই বলছি, সারা-দিন-রাত্রের কথায় আর কাজে যদি একটু সহানুভূতি সহযোগিতা, সমদর্শিতা, সমবেদনা অথবা ক্ষমা বা ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে পারেন মেয়েরা তবে বোধহয় শত সমস্যার মধ্যেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুস্থ এবং শান্তিতে থাকবে গোটা পরিবার।

খেলাধুলা

ফুটবলের নায়কেরা
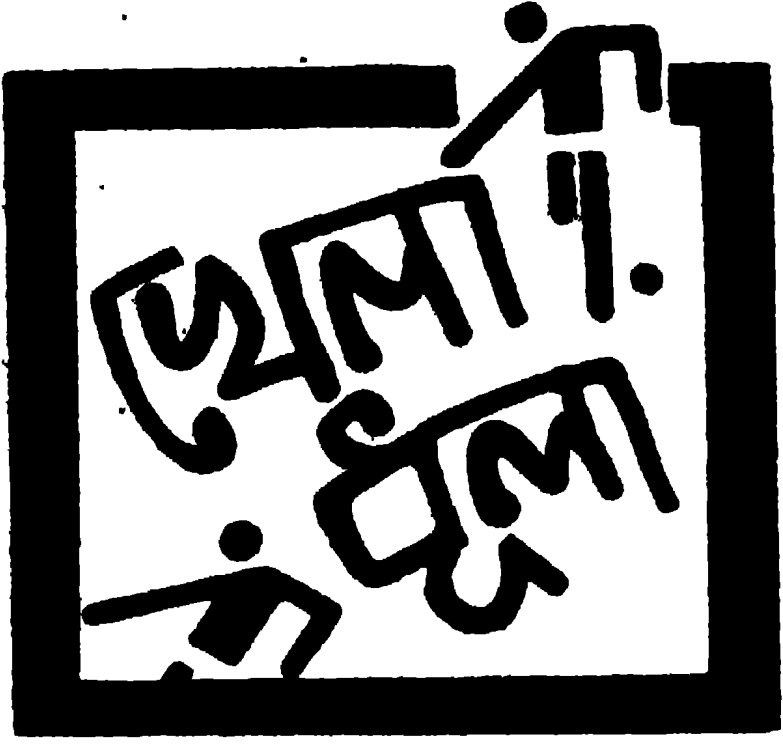
সত্তরের দশকের প্রথম ছ'টা বছর মোহনবাগানের কাছে যেন দুঃস্বপ্নের মতো। দীর্ঘদিন ধরে ইস্টবেঙ্গলের কাছে নাস্তা নাবুদ হতে হয়েছে। মোহনবাগানের নামী-দামী খেলোয়াড়রা বার বার ইস্ট-বেঙ্গলের গোল পোস্টের সামনে নিষ্ফল মাথা কুটে মরেছে। জয় মেলেনি কল-কাতার ময়দানে। জয়লক্ষ্মীকে বরণ করে আনতে যেতে হয়েছে দিল্লীর দরবারে ডুরাণ্ডের খেলায়। মিলেছে তাও ঐ এক-বারই অতিকষ্টে চুয়াত্তর সালে। কিন্তু কলকাতার মাঠে ঈপ্সিত জয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ছিয়াত্তর সাল অবধি। ঐ সময়টা মোহন-বাগানের পক্ষে শুভই বলা যায়। একদিকে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দীর্ঘ দিনের পরাজয়ের গ্লানি খানিকটা ঝেড়ে ফেলে আই-এফ-এ লীগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে শীল্ড ও গোল্ডকাপ ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে হলেও ডুরাণ্ডে একক সম্মান মিলেছে।

প্রাপ্তিযোগ ভাল হলেও কিন্তু তার মধ্যে বুকভরা তুষ্টি মেলেনি। ইস্টবেঙ্গল হেরেছে মাত্র একবার। তাও পনের সেকেণ্ডের মাথায় গোল দিয়ে বাকী সময়টা সীমাহীন উৎকণ্ঠায় প্রতিপক্ষের মুহুর্মুহু আক্রমণ ঠেকাতেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

এবার তাই মোহনবাগানের খেলোয়াড়, সদস্য, সমর্থক, সবাই চান গৌরব দীপ্ত জয়ের সম্মান। কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগানের অবিসংবাদী নেতৃত্ব, যার সূচনা হয়েছিল শ্যাম-নগরের দীর্ঘদেহী শান্ত যুবক প্রশান্তের দলনায়কত্বে। প্রশান্ত মিত্রের আনা বিজয় গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব এবার শ্যামনগরেরই অপর একটি কোঁকড়া চুল সাহসী ছেলে সুব্রত ভট্টাচার্যের ওপর পড়েছে।

চব্বিশ বছরের সুব্রত মোহন বাগানে খেলছে '৭৪ সাল থেকে। তার আগের ইতিহাস হল ১৯৬৫-৬৬-তে ২৪ পরগণা জেলা লীগে অংশ গ্রহণ। '৬৮-তে ইস্টবেঙ্গলে জুনিয়ার দলে ছিলেন। প্রথম ডিভিসনে খেলা শুরু করেন বালি প্রতিভা ক্লাবে '৬৯ সালে। দু-বছর ওখানে খেলার পর তিন বছর অর্থাৎ '৭৩ পর্যন্ত বি-এন-আর দলের হয়ে খেলে নাম লেখালেন মোহনবাগানে। '৭৩-এ জাতীয় ফুটবলের সেমি ফাইনালে সুরজিৎ সুভাষ-হাবিব-আকবর সমন্বিত বাংলা দলকে রেল দু'বারই হারায়। যার পেছনে সুব্রতর সংগ্রামী ক্রীড়াধারার কৃতিত্ব অনেকখানি। তার পরের বছর তাই মোহনবাগান তাকে টেনে নেয়। ঐ বছরই সর্বভারতীয় দলে তার স্থান হয় মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায়।

ডিপ্ ডিফেন্সের খেলোয়াড় সুব্রতর ক্রীড়াশৈলীর মধ্যে আছে ট্যাকলিং ও হেডিং-এর দীপ্ত ভঙ্গিমা। স্থান জ্ঞানও খুব ভাল। সব সময় নজর রাখেন বলের গতি। ফুটবলের নতুন দায়িত্ব 'প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন' এবং প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের গোল সীমানায় হানা দেওয়া এই দুটি কাজে সুব্রত নিজেকে দক্ষ করে তুলতে তালিম নিয়েছে সুযোগ্য কোচ প্রদীপ ব্যানার্জীর কাছে।

কোচিনে ফেডারেশন কাপে জলাতঙ্ক রোগের ইন্জেকসন্ নেওয়া জ্বর গায়ে খেলা সত্ত্বেও সুব্রত তার সাহসী মনের পরিচয় রেখেছে। 'হ্যাঁ ফাইনালে
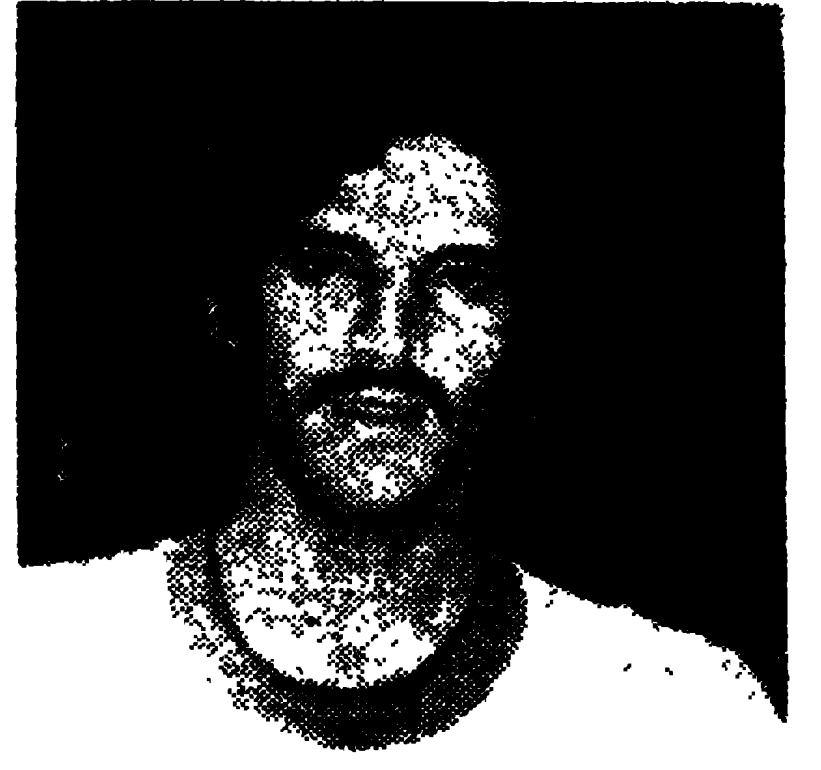
মোহনবাগানের অধিনায়ক সুব্রত ভট্টাচার্য

জিততে পারিনি; তাতে কি হয়েছে? ভাল খেলেছিলাম খেলার ৭০ ভাগই ছিল আমাদের আক্রমণ। শ্যাম-আকবরের শটও পোষ্টে লাগল। অসংখ্য আক্রমণ রচনা করেছি। গোলটাই শুধু পেলাম না। সেটা দুর্ভাগ্য। হেরে গেছি স্বপক্ষে আর কিছু বললে লোকে বিশ্বাস করবে না ঠিকই। তবে এটাত আসল খেলা নয়। এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়। নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে আণ্ডারষ্টানডিং করতে একটু-ত সময় লাগবে। তবে দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে পরবর্তী খেলায়। রক্ষণভাগের বোঝাপড়ার অভাবে যে ফাঁকগুলো তৈরী হয়েছে আগামী দিনের খেলায় তা ধরা পড়বে না। লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। দল তৈরী হয়েছে ভাল ভাবে। মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে খেলে যাব।' মাতৃভক্ত সুব্রতর দৃঢ় বিশ্বাস বাংলার ফুটবল সরোবরে পাল তোলা নৌকো দুর্বার গতিতে লক্ষ্যসীমায় পৌঁছোবেই।

ইস্টবেঙ্গলের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের বড় দায়িত্বও এবার অপর একটি ডিপ ডিফেণ্ডার শ্যামল ঘোষের ওপর পড়েছে। গত চার বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলে শ্যামলের অভিজ্ঞতা বেড়েছে ঠিকই কিন্তু ওর থেকেও যারা বেশী অভিজ্ঞ সেই সুধীর, অশোক, গৌতম, শ্যাম থাপা দল ছেড়ে গিয়ে তার দায়িত্বের বোঝা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত কৃতী তিনজন প্রতি-রক্ষায় তার সঙ্গে দীর্ঘ দিন অংশ নিয়ে
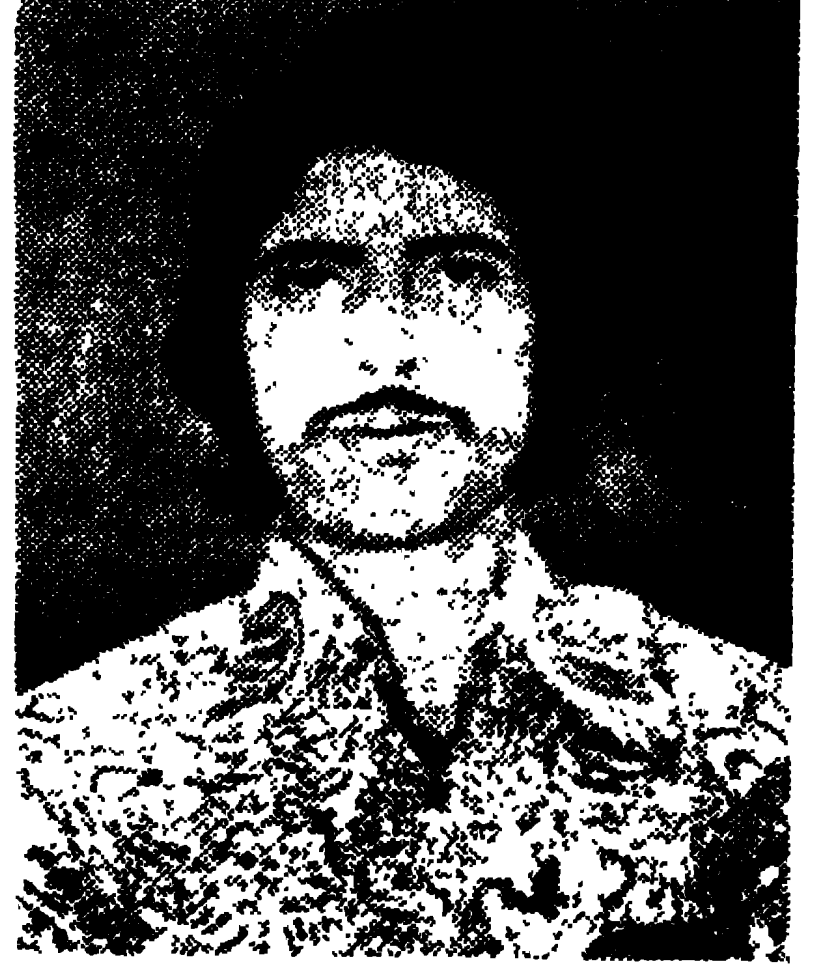
যে সহজ বোঝাপড়া গড়ে তুলেছিল নতুন খেলোয়াড় নিয়ে তাকে সেই ফাঁক পূরণ করতে হবে। অতএব চিন্তাটা কম নয়।

কিন্তু শ্যামলের সহজাত বৈশিষ্ট্য হ'ল ওর 'স্পিরিট' মনোবল যেটা মূলধন করে '৭২ সালে মোহনবাগানে গিয়েছিল। খেলার সুযোগ হয়নি: কিন্তু তাতে মনোবল কমেনি। ইস্টবেঙ্গলে এসে কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। চার বছর কাটাবার পর এবার অধিনায়কের দায়িত্ব।

শ্যামল ফুটবল খেলছে ১৯৬৬ সাল থেকে। '৬৮তে ভেটারেন্স ক্লাব তাঁকে উপহার দেন সেরা স্কুল ফুটবলের সম্মান। '৬৯—৭১ তিন বছর খিদিরপুরে খেলেছেন। '৬৯-এ তাঁরই অধিনায়কত্বে আসামে অনুষ্ঠিত যুব ফুটবলে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়। '৭০ এবং '৭১-এ সর্বভারতীয় যুব ফুটবলে শ্যামল নির্বাচিত হয় এবং অধিনায়কত্বও করে। সুকেশ, সুদেহী, গৌরবর্ণ শ্যামলের খেলার ভঙ্গীটি সহজ ও সুন্দর।

"ওর অ্যান্টিশিপেশন, স্পীড, হেডিং সুন্দর"—এবারের শ্যামলের ফর্ম কেমন জানতে চাওয়ায় কথাগুলো বললেন প্রশিক্ষক অমল দত্ত। "গ্রাউণ্ড ট্যাকলিংটা একটু উইক। তবে তালিম নিয়েছে যথেষ্ট, এই দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠে নিশ্চয়ই ভাল খেলবে।" শ্যামলের খেলার বৈশিষ্ট্য হল দল যখন আক্রমণ করে, ও তখন প্রতিপক্ষের সীমানায় দ্রুত পৌঁছে যায় আবার প্রতিরক্ষার সময় পিছিয়ে আসতে একটুকুও দেরী করে না। এই ধরনের খেলোয়াড় খুব বেশী দেখা যায় না। শ্যামলের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে একসময় ও আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় ছিল।

খেলোয়াড় জীবনে উন্নতির মূলে ওর জীবনে খিদিরপুরের ভূতনাথ বিশ্বাসের অবদান অনেকখানি। প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অরুণ ঘোষ, সত্য সোম, পি. কে. ব্যানার্জী প্রমুখ নামী কোচ এর কাছে। মাঠের মধ্যে

ইষ্টবেঙ্গলের অধিনায়ক শ্যামল ঘোষ

সিরিয়াস, নিষ্ঠাবান, ব্যক্তিগত জীবনে রসিক নির্মল নিরহংকার শ্যামল এবারের খেলায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অহেতুক মন্তব্য করতে নারাজ। শুধু বলল "লিখে দিন, নামী দামী খেলোয়াড় দল ছেড়ে চলে গেছে ঠিকই। কিন্তু তরতাজা তরুণ যে খেলোয়াড়দের আমরা পেয়েছি নিজেদের পজিসনে তারা এক একজন বড় খেলোয়াড়। ওরা যদি ওদের নিজস্ব খেলা খেলতে পারে আমাদের দল অসম্ভবকে সম্ভব করবে।"

লেখা ও ছবি: ***কেশবলাল দাশ***

রাক্ষস

১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

না বাবা! আমার ছেলে গেল—এমনি ছাড়ব!

—ওরা তো ইচ্ছে করে করেনি।

—ইচ্ছে ক'রে নয়তো কি, বিনা লাইসেন্সে একটা ষোল বছরের ছেলে গাড়ী চালাচ্ছে, সঙ্গে তার বড় বোন যার মাত্র কদিন আগে লাইসেন্স হ'য়েছে। এসব কি ওদের অভিভাবকরা জানে না? ছেলে তো ছেলে ওর বাবার পর্যন্ত জেল হ'য়ে যাবে।

—আইন কানুন বুঝিনা, তুমি ওদের মাপ ক'রে দাও, আমার কাত্তোর আত্মার শান্তি হবে। সে বড় কষ্ট নিয়ে চলে.....

কথা শেষ ক'রতে পারল না, এই প্রথম শান্তা কাত্তোর জন্যে এমন প্রাণ খুলে কাঁদল। দুঃখের বরফটা স্বামীর কণামাত্র সাহচর্যের উত্তাপে গলে গেল।

এ নিয়ে আর কোন কথা হয়নি। সপ্তাহ খানেক বাদে একদিন মাধব আরও তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরল। খুব খুশী খুশী মনে, হাতে বিরাট একটা নতুন রেশন ব্যাগ। বাড়ী ঢুকে দাওয়ায় ব'সে ডাকতে লাগল—এই রাধো, গীতা....গণেশ....

কাত্তো যাবার পর থেকে তিন ভাই বোন যেন কলের পুতুল হ'য়ে গিয়েছিল। হৈ চৈ করে না, কাঁদে না। মারামারিও যেন ভুলে গেছে। গীতা আড়ালে আড়ালে চোখের জল মোছে মাঝে মাঝে।

হঠাৎ তাদের বাবার উল্লাসভরা ডাক শুনে ওরা বেশ অবাক হ'লো। ভয়ে ভয়ে পা টেনে টেনে ঘর থেকে বেরুল। রাধো আগে সব শেষে গীতা।

—এই রাধো এইনে তোর জন্যে পোষাক এনেছি, দম দেওয়া গাড়ী....

ম্যাজিসিয়ানের মত থ'লের মধ্যে একবার হাত দেয় আর একটা ক'রে জিনিষ বার করে। আশ্চর্য! ছেলেরা কিন্তু প্রলোভিত হ'লো না, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েই রইল। মাধব নিজের আনন্দে নিজেই মশগুল।

শান্তা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

মাধব বার করেই চ'লেছে, শান্তার জন্যে সিল্কের শাড়ী, নিজের সার্ট, প্যান্ট.....

সব শেষে প্লাষ্টিকের একটা ঠোঙ্গা বার ক'রে গীতার দিকে তাকিয়ে বলে—নে ধর, এতে দু কিলো মাংস আছে তোর মাকে বল ভাল ক'রে তেল মশলা দিয়ে রান্না ক'রতে। .....আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তেল মশলা যা লাগে নিয়ে আয়।

—খবরদার গীতা, ঐ মাংসে হাত দিবি না। ছেলেকে বলি দিয়ে সেই মাংস খেতে চাইছে। ও মানুষ নয়, নরখাদক, রাক্ষস।

শান্তা দুম্ ক'রে মাধবের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

সিনেমা

সিস্টার

স্বভাব অনভূতিপ্রবণ বঙ্গসন্তানের বুকের ঠিক কোন্ স্পর্শকাতর পাঁজরাটায় ন্যায়-নীতি আদর্শের পালক বুলিয়ে কাজ হাসিল করে নিতে হয়—কানাকানিতে এতদিনে তা সব চিত্রনির্মাতাদেরই জানা। তাই একটি আদর্শ বক্তব্য বা চরিত্রকে বৃদ্ধ মূল গায়েনের মতো আসরের মাঝে দাঁড় করিয়ে রেখে অনেকেই নিজের মতো গাওনা সেরে নেন। সেক্ষেত্রে যুক্তি-টুক্তির ব্যাপারগুলো হলের বাইরে রেখে আসতে পারলে ছবির শেষে ভালো লাগার বুক-পকেটে হাত বোলাতে বোলাতে খুশিমনে বাড়ী ফেরা যায়।

নাহলে, স্নেহ, ভালবাসা, সেবা দিয়ে শুধু সাঁইত্রিশটি অনাথ ছেলেমেয়েরই নয়, সীমান্তবর্তী এক পাহাড়ী অঞ্চলের সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার আসনে সিষ্টার নামে খ্যাত যে অনাথ আশ্রমের পরিচালিকাটি দেবীমূর্তির মতো প্রতিষ্ঠিতা—তাঁর চরিত্রের উন্মোচনে আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে এলোমেলো নাচের আয়োজন করতে হলো কেন? বা খৃষ্টের পায়ে নিবেদিত-প্রাণ সিষ্টারকে, বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতে নিজের হাতে রাইফেল তুলে নিতে হলো কেন?

সীমান্তঘেঁষা পাহাড়ী গ্রামে হানাদারদের আক্রমণ এক ধ্বংসলীলা—কাহিনীর এই উপজীব্য তথ্যটুকু কোন প্রামাণ্য ঘটনাকে ইঙ্গিত করেনা। দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্মুক্ত করতে এতগুলি কিশোরপ্রাণের সমবেত আত্মোৎসর্গের ঘটনাও নিকট-অতীতে ঘটেছে বলে মনে পড়ছে না। ফলে কাহিনী-অংশে বাস্তবের খড়-মাটিতে কল্পনার ভেজাল চালাতে হয়েছে। যার পরিণতি হিসেবে পুরো ছবিটি, বিশেষ করে প্রথম অর্ধ, পা টেনে টেনে মন্থর-গতিতে এগিয়েছে।

অথচ অবাক, কয়েকটি ডিটেলকে কাজে লাগিয়ে যে অসাধারণ কটি মুহূর্ত পরিচালক পীযুষ বসু উপহার দিয়েছেন তার একাংশও সার্বিক ব্যঞ্জনায় ছায়া ফেলতে পারেনি। যেখানে অনাথ আশ্রমের সেই কিশোর ডেভিড হানাদারদের নজর এড়িয়ে ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিতে খবর পৌঁছে দিতে গিয়ে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে দড়ি ছিঁড়ে পাহাড়ের খাদে তলিয়ে গেল—সেখানে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তের ছেলেমেয়েদের হঠাৎ-ঝাঁকিতে দুর্ঘটনা বুঝতে পেরে কঁকিয়ে ওঠার মুহূর্তে 'অনুষ্টুপ ছন্দে'র পরিচালকের কথা মনে পড়েছে। কিংবা মরিয়মের নারীত্বটুকু বাঁচাতে নারীমাংসলোভী হানাদারদের কাছে বিশৃংখল চুল সরিয়ে সরিয়ে সিষ্টারের নিজের মুখটা পছন্দ করানোর প্রচেষ্টা!

নাম ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয় দক্ষতা যতোটা আছে, তুলনায় ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ততোটা নেই। তবে বৃদ্ধার ভূমিকায় তাঁর অভিব্যক্তি মনে দাগ কাটে। উত্তমকুমারের কর্ণেল সেনগুপ্ত চিত্রনাট্যের প্রতি বিচ্যুতিহীন ভাবে বিশ্বস্ত। আশ্চর্য চরিত্র চিত্রায়ন সন্তোষ দত্তের। এমন আতিশয্যহীন 'টাইপ চরিত্র' বাংলা ছবিতে বড়ো একটা দেখা যায়নি। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে উৎপল দত্ত, অরুণ রায়, শম্ভু ভট্টাচার্য ও অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

সলিল চৌধুরীর স্বর, বোধহয় এই প্রথম দেখলাম, ছবিতে বাড়তি ব্যঞ্জনার আরোপ করতে পারলো না। সম্পাদকের কাঁচি, যে একমাত্র ছবিকে কিছু গতি-সম্পন্ন করে তুলতে পারতো অকারণে মমত্ব পোষণ করেছে। তবু ছবি দেখতে দেখতে যেটুকু আগ্রহ শেষ পর্যন্ত সেঁচে ফেলা বিলের জলের মতো পড়ে থাকে—সেটুকু সম্পূর্ণ রঙিন ছবির রঙের জন্যে নয়, ক্যামেরার সহৃদয়তায়।

বি-দগ্ধ পাঠক

সিস্টার/সুপ্রিয়া দেবী

শিরোনামের পুরোভাগে ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা

সম্প্রতি ইউ-এস-আই-এসএর সৌজন্যে ক্যাপরার তিনখানি ছবি দেখার সৌভাগ্য হোল। বুকের ইচ্ছেটা এখন শান্ত। আর মনের বরণীয় মানুষটি আরও গভীরে ঠাঁই করে নিলেন, আরও আপন হলেন তিনি।

বেঁচে থাকার সংগ্রামে ক্যাপরা যেভাবে যোদ্ধার পোশাক পরেছিলেন সেটা আজকের 'রাগী' তরুণদের ক'জন পারবে? ক্ষত-বিক্ষত মন নিয়ে তিনি এগিয়েই গেছেন, পেছন ফিরে তাকাননি। 'ইট হ্যাপনড্ ওয়ান নাইট' ছবিতে পাঁচ পাঁচটি অস্কার জিতে নেবার পর ক্যাপরা বুঝেছিলেন ফিল্মটাই তাঁর হৃদস্পন্দন। গ্যাগার রাইটার বা ল্যাংডনের ছায়া হয়ে থাকার তাঁর প্রয়োজন নেই।

ছায়াছবি কথা বলতে শেখার সেই সময় থেকেই আরও করেছে গল্প বলার অভ্যেস। টেকনিক্যাল কচকচানি কিংবা গিমিক তখন পরিচালকের মাথায় আসেনি। ক্যাপরা সাহেবও পরিচ্ছন্ন সরল ভঙ্গিতে গল্প বলেছেন। কোনো প্যাঁচ-পয়জারি নেই।

তাঁর এই গল্প বলার ভঙ্গিটুকুই চোখ ঝলসে দেয়, মনের নরম জায়গায় কখন স্থান করে নেয়। মিঃ স্মিথ বা মিঃ ডিড্সের সারল্য মানবিক বোধ অসহায়ের অস্থিরতাগুলো আমরা অনুভব করতে পারি। 'লষ্ট হরহাইজন' ছবিতে স্যাংগ্রিলার শান্ত সমাহিত পরিবেশ এই পৃথিবীর মানুষের কাছে অন্য গ্রহের মাটির মত।

ক্যাপরা বলতেন—'আমি ব্যক্তির মর্যাদায় বিশ্বাস করি, এও বিশ্বাস করি মানুষ তাঁর ক্ষমতায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।' তাঁর ছবির প্রতিটি চরিত্রই তাই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সামাজিক সমস্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং নিজের ক্ষুদ্র-সামান্য ক্ষমতায় পরিবর্তন করেই চলে তাঁরা। মিঃ স্মিথ (মিঃ স্মিথ গোজ্ টু ওয়াশিংটন) সেনেটে বহু বাধার হাউল পেরিয়েও তাঁর গাঁয়ের লোকগুলোকে প্রাপ্যটুকু দিয়েছিল। শুনেছি ওয়াশিংটনে এই ছবির প্রিমিয়ারে নাকি সংবাদিকরা হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সারা পৃথিবী 'স্মিথ'কে দিয়েছে সম্মান, খ্যাতি।

'মিঃ ডিডস্ গোজ্ টু টাউন' ছবিতেও মিঃ স্মিথের ছায়া। অবশ্য উল্টো বলাটাই উচিত। কারণ মিঃ ডিড্স আগে তৈরী। ক্যাপরা এই ছবি করার সময় বলেছিলেন 'কোনো নীতিকথা বলতে আমি চাইনা। আসলে আমি চাই দর্শককে আনন্দ দিতে। আনন্দ পাওয়ার পরও তাঁরা যদি চিন্তার খোরাক পেয়ে যান ছবি থেকে সেটাই আমার লাভ'।

তিনি বিশ্বাস করতেন—'শুধুমাত্র প্রোপ্যাগাণ্ডার জন্য ছবি করলে তার মানবিক আবেদন থাকেনা, দর্শকও নিতে পারেনা ছবি। তাই ক্যাপরার ছবিতে হাসি আছে, স্ল্যাপষ্টিক হাসি নয়, ব্ল্যাক কমেডি ধাঁচের। আনন্দ আছে, সংলাপের

মিঃ স্মিথ গোজ্ টু ওয়াশিংটন/জেমস্ স্টুয়ার্ট ও জিন আরথারকে ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা নির্দেশ দিচ্ছেন

DHANADHANYE YOJANA Regd. No. WB/CC-315
50 Paise (Bengali) June 1—15, 1977

চাতুরীতে যাদু আছে। আর সবার ওপর রয়েছে সোশ্যাল মেসেজ।

'লষ্ট হরাইজন' যে ঐ স্বপ্নের দেশ স্যাংগ্রিলা যেখানে সংগ্রহ করা আছে পৃথিবীর যাবতীয় 'সু'গুলি, যুদ্ধে সব ধ্বংস হলেও এই স্যাংগ্রিলা থাকবে চিরদিন অমর। আমাদের স্বপ্নতো ঐ স্যাংগ্রিলাই। ক্যাপরা সাহেবও এরকম দেশের স্বপ্ন দেখতেন।

কিন্তু হোল না। এই পৃথিবী তেমন সোনার স্বপ্নের দেশ হোল না। তাই, ক্যাপরা আজ লস অ্যাঞ্জেলসএর ভিড় থেকে সরে গেছেন, প্রায় আত্মসমাহিতের মত ক্যালিফোর্নিয়ার 'লা কুইন্তাতে তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে। বাহাত্ত সালে শেষ ছবি করেছেন 'আওয়ার মিঃ সান।' ফিল্মি দুনিয়ার ষ্টার সিষ্টেম তাঁকে আঘাত দিয়েছে, ব্যথা পেয়েছেন ছবি তৈরীর কাণ্ড কারখানায়।

সিসিলির এক চাষীর ছেলে ক্যাপরা আত্মবিশ্বাস আর অধ্যবসায়ের জোরে যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আজকের তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছেন 'আমি যদি পেরে থাকি, তাহলে তোমরা যে কেউ পারবে।' দুঃখের বিষয় তা হচ্ছে না, ছবি দিয়ে গল্প বলার কাজটুকুও পারছেন না সবাই, পারলে একটা 'ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা' হবে কেন?

—*নির্মল ধর*

আজকের নাটক

থিয়েটার ক্যালকাটা প্রযোজিত স্বর্ণভিলা/ রুমা দাশগুপ্ত ও বিপ্লব চ্যাটার্জী
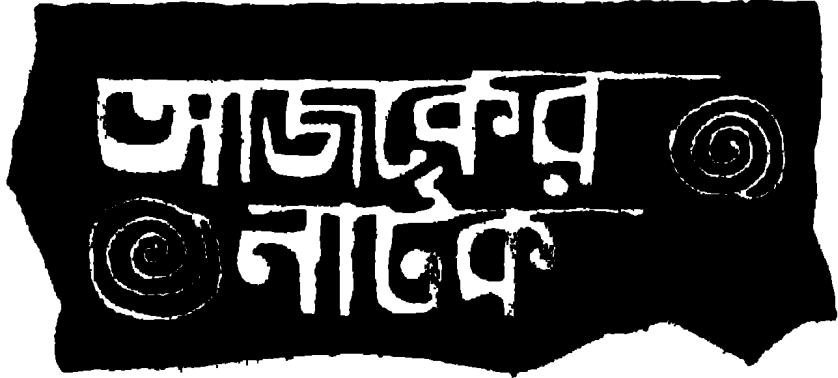
নানান রসের বাংলা নাটকের ভিড়ে সরস ও বক্তব্য প্রধান ব্যঙ্গ নাটকের যে যথেষ্ট চাহিদা অব্যাহত আছে থিয়েটার ক্যালকাটার স্বর্ণভিলা নাটক তারই প্রমাণ। ধারালো অথচ হাস্যরসাত্মক সংলাপ এ নাটকের প্রধান আকর্ষণ যদিও ঘটনার মধ্যে কোন অভিনবত্ব নেই কিন্তু দৃশ্য সংস্থাপনায় নাটকীয় চমক আছে। গল্পের ঠাশ বুনুনি এবং তীক্ষ্ণ সরস সংলাপ নাটকটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। (রচনা-পার্থ চট্টোপাধ্যায়) এবং নাটকের শেষে দর্শকদের পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে দেখা যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে মেলোড্রামার প্রবণতা আছে কিন্তু গল্পের মূল উপজীব্য যে মানবিকতা বা হিউম্যান এলিমেন্ট তা সব ত্রুটিকে ঢেকে দেয়।

স্বর্ণভিলা

স্বর্ণভিলার গল্প গড়ে উঠেছে প্রদীপ্ত নামে ভাগ্যান্বেষী এক বেকার যুবককে কেন্দ্র করে। বোম্বায়ের এক মাঝারি শিল্পপতি তার উত্তমর্ণ সুনন্দ সেনের নিরুদ্দিষ্ট ছেলে আনন্দ বলে ভুল করে প্রদীপ্তকে নিয়ে এসে তুলেছে স্বর্ণভিলায়। উদ্দেশ্য প্রদীপ্তর সঙ্গে একমাত্র মেয়ে ববির বিয়ে দিয়ে সুনন্দর ছেলেকে হাত করা। কিন্তু এই মতলবের বিন্দুবিসর্গ প্রদীপ্ত জানেনা। সে সমস্ত কিছুকে কল্যাণ রায়ের মহানুভবতা বলে ভেবে মুগ্ধ হয়। কল্যাণ প্রদীপ্তকে তাঁর বিপর্যস্ত কারখানার পরিচালনার ভার দেয়। দুমাসের মধ্যে সে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ববির সঙ্গে প্রদীপ্তর বিয়েও পাকা হয়ে যায়। ঠিক এই নাটকীয় মুহূর্তে ধরা পড়ে প্রদীপ্ত শিল্পপতির সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলে নয়, সে প্রকৃতই এক সাধারণ বেকার যুবক। তখন প্রদীপ্তকে অপমানিত হয়ে স্বর্ণভিলা থেকে বিদায় নিতে হয়। এই বিদায় বেলায় ববির কাছ থেকেও সে প্রত্যাখ্যাত হয় কিন্তু তার সঙ্গে স্বর্ণভিলা ছেড়ে বেরিয়ে আসে স্বাতী বলে কল্যাণের এক দূর সম্পর্কের আশ্রিতা আত্মীয়া। ধরা পড়ে এতদিন দুজনে দুজনকেই নীরবে ভালোবেসে এসেছে।

এ নাটকে উচ্চবিত্ত সমাজের অন্তসার-শূণ্যতা শিল্পপতিদের অর্থের লালসা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট মূল্যবোধের অভাব নাট্যকার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অথচ এর সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে হাসির মধ্যে দিয়ে। নাটকের শেষ অংশ সে তুলনায় গুরু-গম্ভীর এবং এবং হয়ত সেজন্য কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট।

দৃশ্য পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় পরিচালক বরুণ দাসগুপ্তের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। আবহ সঙ্গীতে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

অভিনয়ে সবার আগে প্রশংসার দাবি রাখেন মনোরমার ভূমিকায় মঞ্জু দে। রুমা দাশগুপ্তের ববি চরিত্রানুগ। কিন্তু ইংরাজি উচ্চারণে উভয়েরই আরও প্রযত্ন নেওয়া প্রয়োজন। প্রদীপ্তর ভূমিকায় অসিত বসুকে ভাল মানিয়েছে। তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট কিন্তু অভিনয়ে ম্যানারিজম কেন? বরুণবাবুর কল্যাণ রায় যথাযথ। অন্যান্য ভূমিকায় বিমল দের (কমল) কিছুক্ষণের জন্য হলেও দর্শকদের মনে সাড়া জাগিয়ে যান। সুশান্তর ভূমিকায় বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় ভাল অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁর স্মারট চেহারায় অসহায় বোকা ব্যর্থ প্রেমিকের অভিব্যক্তি খাপছাড়া মনে হয়। স্বাতীর ভূমিকায় সোমা চট্টোপাধ্যায় মনে দাগ কাটেন। কল্যাণ প্রসাদ (আশিস) ও শম্ভু চৌধুরী (গিরিজা) যথাযথ। শোনা গেল, নাটকটির নিয়মিত অভিনয় হবে জুন থেকে।

নাট্যসমালোচক

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক শ্রী এন. এন. পিল্লাই;
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা অফিস: ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯) এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

১৬-৩০ জুন ১৯৭৭

পঞ্চাশ পয়সা

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
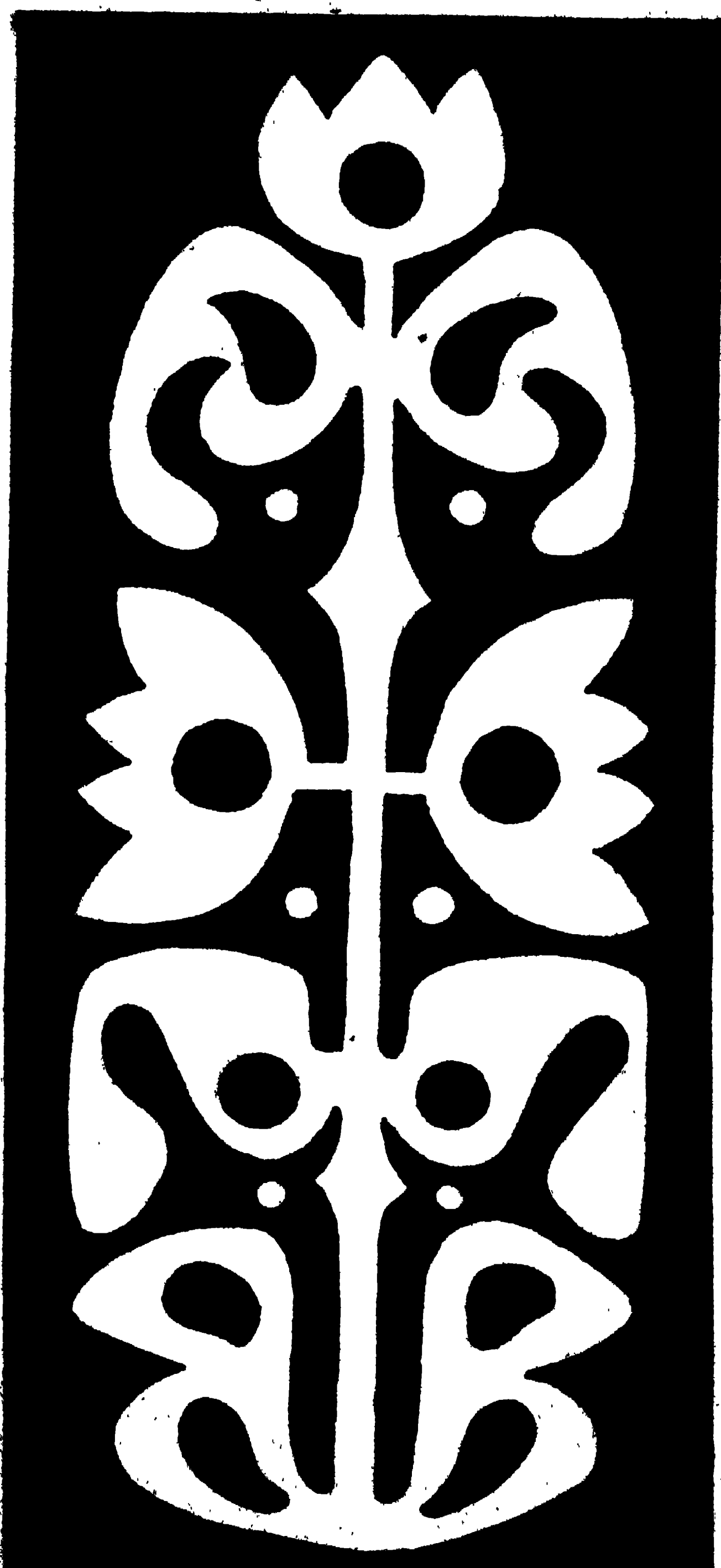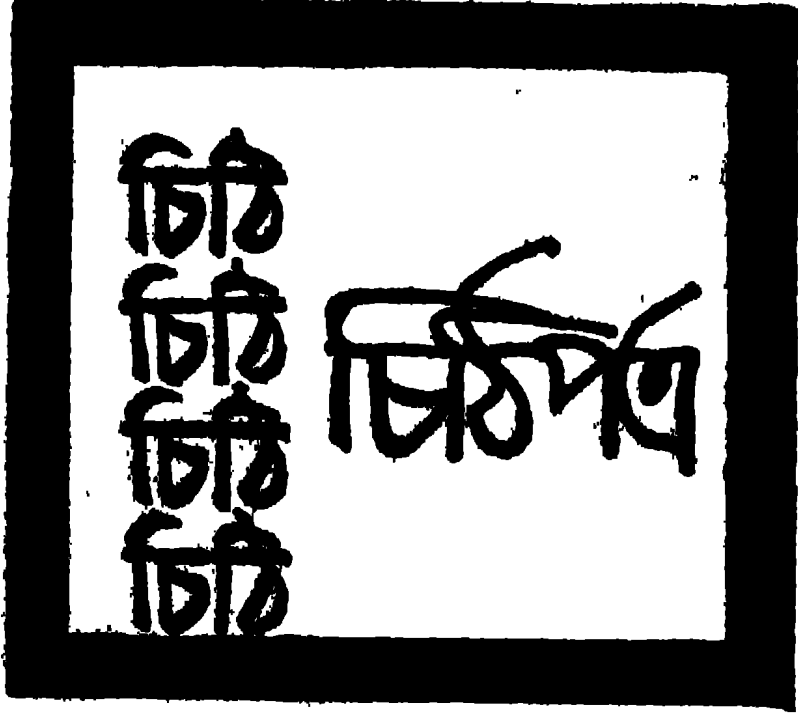
মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত 'ধনধান্যে'র সপ্তদশ সংখ্যায় (১—১৫ মার্চ ১৯৭৭) তরুণ কুমার রায়ের লেখা 'মধুও নিন, ফসলও বাড়ান' পড়লাম। পড়ে মনে হল যে প্রবন্ধটিতে মৌমাছি পালনের অনেক কিছু ঠিকভাবে বলা হয়নি। যে যে অংশ ঠিক বলা হয়নি ওগুলো পরপর ঠিক করে দিলাম।

(১) খাস শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামেও মৌ-কলোনী গড়া সম্ভব।

(২) বিভিন্ন সময় ফুল হয় এমন সব গাছই মৌ-কলোনীর কাছাকাছি চাই—তবেই সারাবছর মধু পাওয়া সম্ভব।

(৩) ঘরের চালার ছায়ায় বাক্স রাখলেও চলবে।

(৪) কলোনীতে একাধিক রাণী মৌমাছি একমাত্র মধুর ঋতুতেই পাওয়া সম্ভব—অন্য সময়ে নয়। কাজেই একমাত্র ঐ সময়েই পৃথক মৌ-কলোনী গড়া সম্ভব। তাছাড়া ঐ সময় পুরাতন রাণী বদলের প্রশ্নও আছে।

(৫) মৌচাকে চিনির জল ঢালার পদ্ধতি বোধহয় কোথাও প্রচলন আর নেই। Super Chamber এর চাকের উপর কাঁচের শিশিতে, চিনির রস (ফোটান) ভরে, শিশির মুখ তুলা বা কাপড় এঁটে কাৎ করে রাখাটাই মনে হয় সবচেয়ে ভাল। রসে ভেজা তুলা বা কাপড়ে শুঁড় দিয়ে মৌমাছি রস খেতে পারবে। আর যতদিন বর্ষা থাকবে ততদিন চিনির রস ফুরিয়ে গেলেই আবার শিশি ভরে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে মৌমাছিদের মধ্যে ডাকাতি ঠেকানও সম্ভব।

(৬) কয়েক জাতের পোকা চাক-খেয়ে ও ডিম পেড়ে চাক নষ্ট করে দেয়—তাদের হাত থেকে কলোনীকে রক্ষা করার জন্য সারাবছর নজর রাখতে হবে।

(৭) মৌমাছি পালনের খুঁটিনাটির যেসব বই মৌমাছি পালন সমবায় সমিতিতে পাওয়া যায় সেগুলো দাম দিয়ে কিনতে হয় বলেই জানি।

প্রবন্ধে মধু খাওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু লেখা না থাকলেও, মৌমাছির কামড়ের (হুল ফোটানো) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল, কেননা মধুর স্বাদের কথা চিন্তা করে যে সব গৃহস্থ কিছুটা এগিয়ে আসবেন, কামড়ের জ্বালার কথা মনে পড়লে হয়ত তারচেয়ে বেশী পিছিয়ে যাবেন।

সুনীলকুমার সেন
ফরাক্কা

আগামী সংখ্যায়

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশেষ নিবন্ধ লিখছেন :

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে থাকছে মণি বাগচির

কর্মযোগী বিধানচন্দ্র রায়

এবারের গল্প **'আলো'** লিখছেন :

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বনমহোৎসব উপলক্ষে দু'টি বিশেষ রচনা লিখছেন :

অনিলচন্দ্র বসু

ও

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

এছাড়া থাকছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, রেল বাজেট, কৃষি, মহিলামহল, গ্রন্থ আলোচনা, খেলাধুলা, সিনেমা প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগ।

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর-১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর-২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্লিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্লিকেশনস ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
'ধনধান্যে, পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩০ জুন, ১৯৭৭
অষ্টম বর্ষ : চতুর্বিংশতিতম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদশিল্পী—মনোজ বিশ্বাস

সম্পাদকের কলমে

গ্রাম প্রধান ভারতের অন্যান্য অনেক সমস্যার মধ্যে দরিদ্র গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যা একটা বড় সমস্যা। চিকিৎসার সুযোগসুবিধা শুধু শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করতে হবে। সে চেষ্টা যে হয় নাই একেবারে তা নয়। গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ৫,৩০০ এর বেশী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩,৭০০এর উপর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তথাপি অবস্থার তেমন কিছু উন্নতি হয়নি।

নতুন সরকার এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দানের জন্য নতুন ভাবে চিন্তা সুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক ব্যাপক স্বাস্থ্যকর্মসূচী গ্রহণের জন্য সচেষ্ট। এই নতুন স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য হল জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা। জনগণ যাতে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। জনগণকে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত করাও এর আরেকটি উদ্দেশ্য। অবশ্য শহরাঞ্চলে বর্তমান কর্মসূচীগুলির রূপায়ণ অব্যাহত রাখা হবে।

আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। নানা কারণ অবশ্য এর জন্য দায়ী। তবে অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে মা ও বাবার শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। এজন্য তাদেরকে বিশেষ ভাবে অবহিত করার প্রয়োজন। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে শিশু-মৃত্যুর হারও নিশ্চয়ই কমবে। আর শিশু-মৃত্যুর হার কমলে অধিক সন্তান লাভের আকাংখাও কমবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পাবে। এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য নতুন স্বাস্থ্যনীতিতে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচীকে আরও জোরদার করা হবে।

যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাকে প্রতিরোধ অবশ্যই করতে হবে। তবে পরিবার সীমিত রাখার জন্য কোন রকম বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। এটা পুরোপুরি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কর্মসূচী রূপে রূপায়িত করা হবে। নতুন স্বাস্থ্য-নীতিতে পরিবারকল্যাণ কর্মসূচী স্বাস্থ্যকর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হবে। ফলে আশা করা যায়, জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন সুযোগ বৃদ্ধির সংগে সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীকে একটা গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখেই নতুন স্বাস্থ্যনীতি তৈরী করা হচ্ছে।

লোকপাল প্রসঙ্গে

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্রমাত্রেরই একটি আদর্শ থাকা দরকার এবং পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেরই তা আছে। কিন্তু আদর্শ যাই হোক একটি রাষ্ট্র নিজেকে পুঁজিবাদী, গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজবাদী বা একনায়কতন্ত্রী যে নামেই অভিহিত করুক, তার উন্নতি বা সমৃদ্ধি শুধু ঐ ঘোষিত রাষ্ট্রীয় আদর্শটুকুর উপর নির্ভরশীল নয়। রাষ্ট্রের পরিচালন দায়িত্ব যে প্রশাসনের উপর ন্যস্ত, তা যদি যথেষ্ট কর্তব্যনিষ্ঠ, পারদর্শী ও দুর্নীতিমুক্ত না হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের জনজীবন কিছুতেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারবে না।

রাষ্ট্রের পরিচালিকা শক্তি প্রশাসন। সুতরাং প্রশাসন যাতে নিখুঁত যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে তার জন্য যাবতীয় বিধিব্যবস্থা থাকা দরকার। কখনও যদি প্রশাসনের চেয়ে কোন ব্যক্তির মর্যাদা বড় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই ব্যক্তির কর্মক্ষমতা যতই থাকুক, শেষ পর্যন্ত সেই প্রশাসন লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেই। কারণ মানুষের সব সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতে পারেনা। সুতরাং অত্যধিক ক্ষমতাধারী ব্যক্তি যখন ভুল করেন তখন সে ভুলের খেসারত একটি জাতিকে দিতে হয়। প্রশাসন পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েক ব্যক্তি সকল রাষ্ট্রেই থাকবেন। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বজনীন কল্যাণে তাঁদের উপরেও একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই উপলব্ধি থেকেই লোকপাল পদের উদ্ভব।

বিশ্বের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে উচ্চ পদাধিকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়। সুইডেনে ১৮৯৯ সালে ওম্‌বুদ্‌সম্যান (OMBUDSMAN) পদের সৃষ্টি হয় এবং তা পরপর ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে অনুসরণ করে। আধুনিককালে ওমবুদ্‌সম্যান পদ সৃষ্টি হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডে ১৯৬২ সালে ও বৃটেনে ১৯৬৬ সালে। ওম্‌বুদ্‌সম্যান-এর দায়িত্ব হ'ল প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা ও দুর্নীতি দমন করা। রাষ্ট্রের সাধারণ আইন কোনক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনের পক্ষে যথেষ্ট নয় প্রমাণ হলে ওমবুদ্‌সম্যান-এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা হবে তার পরিপূরক।

ভারতে আমরা বারবার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা শুনেছি, কিন্তু রাষ্ট্রের সাধারণ আইনে তার কোন প্রতিকার সম্ভব নয় বলে শেষপর্যন্ত হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবকিছু মেনে নিয়েছি। সারা ভারতের সাধারণ মানুষের মনে আজ এ ধারণা বদ্ধমূল যে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, এবং এর কোন প্রতিবিধান নেই। সংসদে মাঝে মাঝে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্নীতি নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে, খবরের কাগজে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির কথা ফলাও করে প্রচারিত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছুই যেন ধামাচাপা পড়ে যায়। আদালতে গিয়েও প্রতিকারের আশা ক্ষীণ, কারণ মামলা ব্যয়সাধ্য, অনিশ্চিত ও কালক্ষয়ী। আইনের মারপ্যাচ এত সূক্ষ্ম যে, নানা পাপে পাপীর পক্ষেও সন্দেহের অবকাশে বেকসুর খালাস পাওয়া অতি সাধারণ ঘটনা।

এই অনিশ্চয়তা ও হতাশার সুনিশ্চিত প্রতিকার ঘটাতেই ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে প্রশাসন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে ওম্‌বুদ্‌সম্যান-এর অনুকরণে ভারতে লোকপাল ও লোকআয়ুক্ত পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়, যে পদাধিকারীর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির বা ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার ও সে সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিলের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

লোকপাল ও লোকআয়ুক্ত নিয়োগের প্রস্তাব ভারতের জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করে এবং কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে সংসদকে কয়েকবার তৎপর হতে দেখা যায়। ১৯৬৮ সালের ৯ই মে লোকসভায় এ সম্পর্কে প্রথম বিল পেশ করা হয় এবং লোকসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর তা রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। কিন্তু তারপরেই লোকসভা বাতিল হয়ে যাওয়ায় বিলটির অপমৃত্যু ঘটে। তারপর ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে আবার নতুন উদ্যোগে আর একটি বিল উত্থাপিত হয়। কিন্তু পঞ্চম লোকসভার আয়ু শেষ হওয়ার আগে ঐ বিলটিকেও আইনে পরিণত করার কাজ শেষ হয়নি।

কেন্দ্রীয় লোকপাল বিলে বলা হয়, ভারতের প্রধান বিচারপতি ও লোকসভায় বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি একজন লোকপাল নিয়োগ করবেন। রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব স্বভাবতই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশ। তাই লোকপাল যাতে শুধুমাত্র সরকারী দলের মনোমত কেউ না হন তার জন্যই ঐ নিয়োগকে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতার অনুমোদন সাপেক্ষ করা হয়েছে। সুতরাং লোকপাল শাসন বিভাগের প্রস্তাবিত ব্যক্তি হলেও

তিনি বিচারবিভাগ ও আইন বিভাগেরও অনুমোদিত প্রার্থী হবেন। প্রশাসনের তিন বিভাগের এই অনুমোদন স্বভাবতই লোকপালপদের মর্যাদা উন্নীত করবে এবং সাধারণ মানুষেরও ঐ পদাধিকারীর প্রতি গভীর আস্থা থাকবে। তাকে একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হতে হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু আইন ও প্রশাসন বিষয়ে তার অবশ্যই গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

লোকপালের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। কিন্তু তার আগেও রাষ্ট্রপতি তাকে পদচ্যুত করতে পারবেন শুধুমাত্র অসদাচরণ (misbehaviour) ও অক্ষমতার (incapacity) অভিযোগে। সুপ্রীমকোর্ট অথবা হাইকোর্টের বিচারপতিকে অপসৃত করার যে পদ্ধতি সংবিধানে লিখিত আছে, লোকপাল অপসারণের ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতি প্রয়োজ্য।

লোকপাল যে কোন মন্ত্রী, দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব অথবা উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করতে পারবেন। তারজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাগজপত্র দেখার অবাধ ক্ষমতা তাঁর থাকবে। তবে তদন্তই (investigation) তাঁর প্রধান কাজ এবং তদন্তে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে সত্যতা আছে বলে তাঁর মনে হয় তবে তার প্রতিকারের জন্য তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। আর যদি তাঁর সুপারিশমতো উপযুক্ত ব্যবস্থা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি বলে তাঁর মনে হয় তবে লোকপাল রাষ্ট্রপতিকে সেকথা লিখিতভাবে জানাবেন। নির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত ছাড়াও লোকপালের নিয়মিত কাজ হবে সমগ্র প্রশাসন সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রতিবছর রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করা। সে রিপোর্ট নিয়ে সংসদের উভয় সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপকে লোকপালের এক্তিয়ার বহির্ভূত রাখাটাকে অনেক বিশেষজ্ঞ বিলটির একটি বড় ত্রুটি বা দুর্বলতা বলে মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের মুখ্য পরিচালক। তিনি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকলে তাঁর প্রশ্রয়পুষ্ট ব্যক্তিরা তার দোহাই দিয়ে অনেক অপকর্মের দায়িত্ব এড়াতে পারবেন, এ আশঙ্কা অমূলক নয়। এছাড়া লোকপালের সরাসরি ব্যবস্থাবলম্বনেরও বিশেষ ক্ষমতা কিছু দরকার। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির সমান মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষমতা শুধু সুপারিশেই সীমিত থাকা উচিত নয়।

লোকপাল পদ সম্পর্কে এমন একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, লোকপালের হস্তক্ষেপে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে অযথা বাধা আসতে পারে। মন্ত্রী তার সকল কাজের জন্য একক ও যৌথভাবে সংসদের কাছেই দায়ী। সুতরাং আবার লোকপালের কি প্রয়োজন? কিন্তু এ আপত্তি যুক্তিসহ বা বাস্তবানুগ নয়। সংসদের অল্প সময়ে প্রতিটি দপ্তরের খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়না। তারপর সংসদীয় শাসন হ'ল প্রকৃতপক্ষে সংসদের গরিষ্ঠদলের শাসন যার প্রতিটি সদস্য দলের হুইপ মেনে চলতে বাধ্য। তাঁরা অনেক কথা জানলেও দলীয় শৃংখলার প্রয়োজনে তা প্রকাশ্যে আলোচনা করবেননা। আর বিরোধীপক্ষের সদস্যদের সরকারি কাজের সব খুঁটিনাটি জানার সুযোগ খুবই সীমিত। অভিযোগ আনলেও অনেক সময় প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের অভাবে তা ঠিকমতো দাঁড় করাতে পারেননা। এই অবস্থায় লোকপালের মতো এমন একজন থাকা দরকার যিনি প্রয়োজনবোধে যে কোন দপ্তরের নথিপত্র তলব করতে পারবেন এবং সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন। লোকপালের সঙ্গে মন্ত্রিসভার নীতি নির্ধারণের কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং কোন মন্ত্রীর রাজনৈতিক অধিকারে তাঁর হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই উঠেনা।

তাছাড়া কোন রাজ্যের বা কেন্দ্রের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন দুর্নীতির জোরালো অভিযোগ উঠেছে তখন সে অভিযোগের সত্যতা যাঁচাই করতে অনেকবারেই অনেক কমিশন গঠিত হয়েছে। যেমন পাঞ্জাবে প্রতাপ সিং কায়রোঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করতে গঠিত হয় দাস কমিশন। সে কমিশন গঠনে মন্ত্রীর দায়িত্ব ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এমন কথা কেউ বলেননি। সুতরাং এ ব্যাপারে একটি বিধিবদ্ধ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান কোন সঙ্গত কারণে আপত্তির বিষয় হতে পারে না।

লোকপালের ক্ষমতা বিচার বিভাগের দায়িত্বে হস্তক্ষেপের সামিল, এমন কথাও ঠিক নয়। কারণ বিচারের দায়িত্ব বা দণ্ড বিধানের অধিকার তাঁর নেই। তাঁর কাজ শুধু অভিযোগের তদন্ত করা এবং সে সম্পর্কে নির্ভয়ে নিরপেক্ষ মনে অভিমত প্রকাশ করা যার ভিত্তিতে ব্যবস্থাবলম্বনের শেষ দায়িত্ব শাসন বিভাগের কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বিচারবিভাগের। বিচার বিভাগের ক্ষমতা সীমিত। নিজে থেকে কোন বিষয়ে তদন্তের ক্ষমতা তার নেই। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত যেসব কাগজপত্র, সাক্ষীসাবুদ পেশ করবে তার ভিত্তিতেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এইদিক থেকে দেখলে লোকপালের অবাধ তদন্তকারী ক্ষমতাকে বিচার বিভাগের ক্ষমতার পরিপুরক বলা যায়।

শুধু প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্যেই নয়, প্রশাসনের উপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যও লোকপালের প্রয়োজন। এমন একজন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যিনি প্রয়োজনমত যে কোন দপ্তরের কাগজপত্র দেখতে পারেন এবং তাতে কোন দুর্নীতির বা অন্যায়ের সন্ধান পেলে সে সম্পর্কে প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন—এই সচেতনতাই প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির প্রবণতা অনেকখানি সংযত রাখবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা

অরুণ বসু

বঙ্কিমচন্দ্রের ১৩৯তম জন্মতিথি পালন উপলক্ষে বিশেষ রচনা

ইতিহাসচেতনা, অতীতমনস্কতা ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং স্বজাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করার সংকল্প উনিশ শতকীয় নব জাগরণের কতিপয় বিশিষ্ট মুদ্রাচিহ্ন। সেকালের মত এ স্বভাবগুলি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল, একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল এবং সে বিষয়েও যথেষ্ট উক্তি এতাবৎ সংকলিত হয়েছে। আমাদের আলোচনার উদ্যম তার পুনরুক্তিতে নয়। উনিশ শতক থেকেই বাঙলা ও বাঙালির একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্র দেখে আসছিলেন, আজ পর্যন্ত তা সার্থক হয়নি। অথচ আজ আমরা বন্দে মাতরম্-এর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। এই উদ্‌যোগ সার্থক হল না যোগ্য ইতিহাস-কারের অভাবে, তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে শ্রমসাধ্য দায়িত্বগ্রহণের অপটুতায়, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এবং আমাদের ইতিহাস বিষয়ক সহজাত নির্বিকারত্বে।

বঙ্কিমচন্দ্র একাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, শুরুও করেছিলেন, অসম্ভব বিধায় অপরকে উৎসাহিত করেছিলেন, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও সামর্থ্য নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্যই তার ইতিহাসচেতনা বিশুদ্ধ নিরাসক্ত ছিল না —সেকালে তা সম্ভবও ছিল না। স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ-প্রেমের তীব্রতা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। তার উপর আবার তাঁকে খানিকটা হিন্দু জাতীয় আর্য চেতনা ইত্যাদি মনোভাবও আক্রমণ করেছিল। টয়েনবির মত ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখার দৃষ্টি বঙ্কিম কোথায় পাবেন? তথ্যান্তরালস্থিত সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের বোধ রবীন্দ্রনাথের আগে আমাদের দেশে কাব্যের মধ্যে দেখা যায়নি। তবে ইতিহাস যে কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ইতিহাসও, এই সত্য এদেশে তিনিই আশ্চর্য দূরদর্শিতায় অনুভব করেছিলেন। একদিকে ইতিহাসের তথ্য অবলম্বনে তিনি লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস, অন্যদিকে ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণে তিনি ভারত ইতিহাসের মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। তার এই দুই পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণও আজ পর্যন্ত হয়নি। অতীত গৌরব ও জাতীয় শ্লাঘা যতটা উপন্যাসের ভাগে পড়েছে, মননধর্মী, প্রবন্ধের ভাগে সেই তুলনায় যেন নিরাসক্ত বিজ্ঞানী মনের উঁকিঝুঁকিও পাওয়া যাচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আংশিক ছিল বলেই তিনি স্টুয়ার্ট মার্শম্যানের সমালোচনায় রূঢ়বাক্ হতে পেরেছিলেন। পূর্বতন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে শাসক শ্রেণীর অহমিকা ও বিজিত জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে, বঙ্কিম ঐতিহাসিকের এই প্রতারণা সইতে পারেননি। ইতিহাসের তথ্যচয়নে ও উপাদানসংগ্রহে তাঁর প্রয়াস আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অনুমোদনই লাভ করবে। তিনি প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্র, শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য, মহাকাব্য প্রত্যেকটিকেই মূল্যবান মনে করেছিলেন; মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতি-হাসিকদের নথিপত্র কিছুই বাদ দেননি। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে মহাভারত, মনুসংহিতা থেকে মেগাস্থিনিস, রামায়ণ ও মীনহাজ-উদ্দিন সবই তাঁর কাছে মূল্য পেয়েছে। বিদেশী ইতিহাসকার, ভারততত্ত্ববিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের আলোচনার সঙ্গেও তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং যে ইতিহাসগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সম্ভবপর হলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অসাধারণ কিছু হত তাতে সন্দেহ নেই।

বাঙলা দেশের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দুটি উদাহরণ স্মরণ করা যেতে পারে। 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,

"কোনো দেশের ইতিহাস লিখতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কী ছিল? আর এখন এদেশে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, কী প্রকারে—কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বলা অনর্থক কালহরণ মাত্র।"

দ্বিতীয় উদাহরণ, ইতিহাস বলতে তিনি যে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়, সামাজিক ইতিহাসকেই বোঝাতেন, তার প্রমাণ আছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের সমালোচনা-উপলক্ষে তাঁর রচনায়। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে লিখেছেন,

"ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"

তবে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসবিষয়ক যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন, তাতে রাষ্ট্রনৈতিক

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

নতুন স্বাস্থ্যনীতি

রাজনারায়ণ

মাও-সে-তুং বলেছিলেন বন্দুকই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। কিন্তু ভারতের জনগণ সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছেন যে ক্ষমতা আসে ব্যালট বাক্স থেকেও। তাঁরা একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বের আস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, অন্যদিকে আমাদের দেশের ভিতরে গণতন্ত্রকে জোরদার করেছেন, এর শেকড়কে গভীরে প্রোথিত করেছেন।

গণতন্ত্রের অর্থ হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার। আমরা বারে বারে বলেছি ভারতের জীবন রয়েছে গ্রামে। আর সেই গ্রামের উন্নয়ন না ঘটলে কোন অর্থবহ প্রগতি সম্ভব হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, ১৯৪৭ সালে গ্রামগুলির যে শোচনীয় অবস্থায় ছিল তা থেকে এগুলোকে আমরা কতটা উদ্ধার করতে পেরেছি? গত ৩০ বছরে গ্রামের যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে তা দেখাবার জন্য পরিসংখ্যানের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য তার বিরোধিতা করা নয়। কিন্তু কঠোর বাস্তবতা থেকেও তো চোখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। সামাজিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে শহর ও গ্রামগুলির দূরত্ব যেমন ছিল, তেমনি আছে। গণতন্ত্রকে যদি প্রকৃতই তাৎপর্য্যপূর্ণ করে তুলতে হয় তবে আমরা যারা সরকারে বা বিরোধী পক্ষে রয়েছি তাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারায় গ্রামকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেশের সমস্ত অংশ জুড়ে সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়তে দিতে হবে। এটা একটা সহ-সহযোগিতামূলক প্রয়াস। আমরা যারা গ্রামে রয়েছি, যারা শহরে রয়েছি তারা সবাই মিলে যদি, শুধু সদিচ্ছা নিয়ে নয় দৃঢ় সংকল্প নিয়েও এই প্রয়াসের সামিল হই তবেই তা সার্থক হতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার উপর গুরুদায়িত্ব বর্তেছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আজ যেসব দুর্ভাগ্যজনক বিকৃতি রয়েছে তার একটি হলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তার যোগ্য গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ইস্পাত কারখানা, ভারী যন্ত্রপাতি কারখানা, পারমাণবিক রিঅ্যাকটর এই ধরণের প্রকল্প গড়ে তুলতে আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছি। কিন্তু আমি মনে করি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে তুলনামূলকভাবে বিনিয়োগ অত্যন্ত কম। আমি মনে করি জাতির প্রগতির ক্ষেত্রে যাই বিনিয়োগ করা হোক না কেন চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তা মানবিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। সেই সঙ্গে আমি এই বিশ্বাসও ঘোষণা করতে চাই যে, জনগণ যদি শক্তিশালী না হন তবে দেশ শক্তিশালী হবে না। আর জনগণকে গড়ে তোলবার জন্য যদি আরো ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা না হয় তবে জনগণও শক্তিশালী হবেন না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে একদিকে আমি যেমন স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে বরাদ্দ বাড়াবার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যে আমার সহকর্মীদের রাজী করাবার চেষ্টা করবো অপর দিকে তেমনি আমাদের জনগণের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণের স্বার্থে এই কর্মসূচীগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয় তার জন্যও সচেষ্ট থাকবো।

গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মসূচীকে জোরদার করবার জন্য আমি আমার মন্ত্রকের কর্মীদের সাহায্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছি। এই কর্মসূচীর পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হলো একদিকে গ্রামের মানুষের কাছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে রোগ নিবারণ এবং স্বাস্থ্য বিকাশের ব্যাপারে গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। দেশে এখন ৫,৩০০-এর বেশী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৩,৭০০-এর এরও বেশী উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। আর এগুলির সবই রয়েছে গ্রামাঞ্চলে।

এই বিরাট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সত্ত্বেও গ্রামের অবস্থা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে এই অবস্থার একটা বড় কারণ হলো স্বাস্থ্য-চর্চা কর্মসূচীতে যথেষ্ট পরিমাণে জনগণের অংশগ্রহণ না করা। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন আকাংখা জাগিয়ে তোলা যায় নি।

নতুন স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে যে সমস্ত গ্রামের জনসংখ্যা ১,০০০ সেই সমস্ত গ্রামে স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে তাদের আস্থাভাজন এবং যোগ্য এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হবে যিনি গ্রামীণ স্বাস্থ্য

উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করবেন। এই প্রতিনিধিকে মৌল স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সেগুলো মোকাবিলা করার সহজ উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই নির্বাচিত ব্যক্তিটির বয়স হবে ৩০-এর কম। আর লেখা পড়ার মান হবে অন্তত ষষ্ঠশ্রেণী। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ২০ জন করে দল গঠন করে এদের তিনমাস ধরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখার উপায়, সাধারণ সংক্রামক রোগের চিকিৎসা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেবার পর এদের পরীক্ষা করা হবে এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এদের ঔষধপত্র সম্বলিত কিছু সরঞ্জামও দেওয়া হবে। এরা গ্রামে যাবেন এবং সেখানে কাজ করবেন। এদের পরিচয় হবে সমষ্টি স্বাস্থ্যকর্মী। এরা নিজেদের পেশায়, যেমন—কৃষিকাজ, শিক্ষকতা, নানা ধরনের জিনিস-পত্র তৈরীর কাজ প্রভৃতি করতে পারবেন। শুধু তাদের উদ্বৃত্ত সময়ের দু থেকে তিন ঘণ্টা প্রতিদিন জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে লাগাতে হবে।

আমরা আশাকরি এই কর্মসূচী রূপায়ণ শুরু হবার বছর দুয়েক-এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এই সমষ্টি স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ আশি হাজারের মত দাঁড়াবে। এরা প্রশিক্ষণের তিনমাসে মাসিক ২০০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড পাবেন। তারপর গ্রামে কাজ শুরু করবার পর বছরে ৬০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। এদের যে সরঞ্জাম দেওয়া হবে তার দাম হবে ২০০ টাকা। তাছাড়া প্রতি বছর প্রত্যেক কর্মীকে ৬০০ টাকার মূল্যের ঔষধপত্র দেওয়া হবে।

সমষ্টি স্বাস্থ্যকর্মী সাধারণ অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা করবেন। সদ্যজাত শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করবেন। অন্ধতা নিবারণের জন্য শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ট্যাবলেট বণ্টন করবেন এবং ম্যালেরিয়ারও চিকিৎসা করবেন। এই কাজ কেমন চলছে তা পর্যালোচনা করবার পর সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীর ভাতা বছরে ১২০০ টাকা করবার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

ভারতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা খুববেশী। ১৯৭১ সালে শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১২২। গ্রামাঞ্চলে শিশু প্রসবের পুরো দায়িত্ব থাকে অদক্ষ ধাত্রীদের উপর। এটা উচিত নয়। তাই নতুন কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক গ্রামে একজন করে ধাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এতে দু বছরের মধ্যে এই ধাইদের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ লক্ষ আশি হাজার। প্রশিক্ষণের সময় হবে একমাস। এই সময় এরা ভাতা পাবেন ৩০০ টাকা করে। এদেরও প্রসবের সরঞ্জাম দেওয়া হবে বিনা মূল্যে। সমষ্টি স্বাস্থ্য কর্মীদের মত গ্রামবাসীরাই এই ধাইকে নির্বাচিত করবেন। ফলে গ্রামাঞ্চলে একটা দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে। এছাড়া পাঁচ হাজার জন-সংখ্যা পিছু একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সর্বার্থসাধক কর্মী থাকবেন। সমষ্টি স্বাস্থ্যকর্মী এবং ধাই এদের পরামর্শ নিতে পারবেন। বহু সংখ্যক সর্বার্থ-সাধক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এঁরাই হবেন সুসংহত স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর প্রাণবিন্দু। এরাই গ্রামাঞ্চলে পরিবার কল্যাণসহ মৌল স্বাস্থ্য কর্মসূচী রূপায়ণের উপর নজর রাখবেন।

এই কর্মসূচী ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের জন-গণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য আমি আরো কতগুলি কর্মসূচী ভেবে রেখেছি। এগুলো চূড়ান্ত করবার পর জনগণের কাছে পেশ করা হবে। শহরগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান কর্মসূচীগুলির রূপায়ণ অব্যাহত থাকবে।

পরিবার কল্যাণ প্রসঙ্গে রাষ্টপতির ১৯৭৭ সালে ২৮শে মার্চ তারিখে সংসদে প্রদত্ত ভাষণে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন যে একটা স্বেচ্ছাভিত্তিক কর্মসূচী হিসাবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃমঙ্গল, শিশু কল্যাণ, পরিবার কল্যাণ, মহিলাদের অধিকার এবং পুষ্টি নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী রূপায়ণের উপর জোর দেওয়া হবে। আশা করবো পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী সম্পর্কে এই মন্তব্য সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করবে। পরিবারের সংখ্যা সীমিত করতে আমরা কাউকে বাধ্য করতে চাইনা। জাতীয় উন্নয়নে জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনিয়ন্ত্রিতভাবে এই সংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে তবে পরিবারের এবং সামগ্রিকভাবে জাতিরও কল্যাণপ্রয়াসে জটিলতার সৃষ্টি হবে। আমি নিঃসন্দেহ আমাদের জনগণ এটা উপলব্ধি করতে পারবেন। দায়িত্ব-শীল পিতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি তাঁরা সচেতন হন, যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সুবিধাদি দেওয়া যায় তবে তারা নিজেরাই ছোট পরিবারের আদর্শের দিকে ঝুঁকবেন। যেটা দরকার, তাহলো এদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করা। কেন্দ্রীয় সরকারের পর্য্যায়ে আমরা এ কর্মসূচী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা তথ্য ও বেতার দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি এই উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও যাতে সামিল হয়। আমরা আশা করি রাজ্য সরকারগুলিও তাদের প্রচার মাধ্যমগুলিকে সুসংহত করে এই কর্মসূচী আপনাআপনি রূপায়ণের যাতে একটা পরিবেশ গড়ে উঠে তাতে সাহায্য করবেন।

পরিবার কল্যাণ, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পালনের মধ্যে বেশ কিছুটা সংহতি এখনও আছে। আমরা এটাকে জোরদার করবার চেষ্টা করবো। সেই সঙ্গে আমরা চেষ্টা করবো স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে একটা অর্থবহ সমন্বয় গড়ে তুলতে। আর এটা হবে কল্যাণ সম্পর্কিত যে ধারণায় জাতি অঙ্গীকারাবদ্ধ তারই আওতায়।

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

রাজবন্দীর মুক্তি / অরুণ বাগচী

জেল গেটে আমাকে দেখে একটুও অবাক হলনা পদ্মরাজ। খুব সহজভাবেই বললে, 'এসেছেন? ভাল আছেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমি ভালই আছি। তুমি?'

পদ্ম বললে, 'ভালই বলা উচিত। দুনিয়াতে অনেকের চেয়েই তো ভাল। চলুন, তাড়াতাড়ি চলে যাই কোথাও। নইলে সব মালাটালা নিয়ে এসে ঝামেলা করবে।'

'চল, রাস্তার ওপাশে গাড়িটা রেখে এসেছি।' আমি হাসলাম। 'তা মালা ফুলে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। এ্যাদ্দিন বাদে রাজবন্দীরা সব ছাড়া পাচ্ছেন। লোকেদের আনন্দ তো হবেই। হবে না?'

'আনন্দ না কচু। যত্ত হুজুগ। এই ক'বছর জেলে দাদা অনেক দেখলাম। ভাববার সুযোগও পেয়েছি ঢের। তাছাড়া, সত্যি বলতে কি, আমিতো রাজনীতি করে জেলে যাইনি। গিয়েছি খুন করে।'

কথা বলতে বলতে আমরা গাড়ির কাছে এসে পড়েছিলাম। ষ্টার্ট দিয়ে চৌরাস্তার মোড় পেরিয়ে আলোচনার খেই ধরলাম। 'ওকথাটা এর আগেও তুমি বলেছ। সেই কোরটের বারান্দায় একবার। কথাটার মানে কী? তোমাদের পারটির নির্দেশে খুনের রাজনীতি যেটা করতে সেটা কি ভুল ছিল বলছ? ছেড়ে দিচ্ছ রাস্তাটা?'

উত্তর দেবার আগে যেন দম নিল পদ্মরাজ। 'দাদা, আমার কোন পারটি ছিল না। এখনও নেই। আমি রাজনীতি করিনি। পরিষ্কার খুন করেছিলাম পুলিশের কেরাণী অমল দত্তকে। তখন তার নামটাও জানতাম না। পরে জেনেছি। আসলে আমি ভেবেছিলাম আমি খতম করছি নবাব কোতোয়ালীর নিমাইচাঁদকে। মানে নিমাইকেই আমি মেরেছি আমি জানি। তবু——'

ইতস্তত করে থেমে গেল পদ্ম। 'আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা।'

মাথা নাড়ালাম। 'না, বুঝতে সত্যিই পারিনি। মুখে বললাম, আগে আমার বাড়ি চল পদ্ম। স্নান করে খেয়ে টেয়ে বিশ্রাম কর। তারপর সব কথা হবে।'

পদ্ম বললে, 'তাই হবে দাদা। আপনাকে আমি আর কী বলব। আমার নিজের আত্মীয়রা সব দূরে রইল। পর করে দিল আমাকে। আর আপনি, আত্মীয় না হয়েও আপনজনের মত এগিয়ে এসেছেন। আমাকে যাতে মারধর না করে সেজন্য রাইটার্স বিলডিং লালবাজার করেছেন। সব খবর আমি পেয়েছি। বিশ্বাস করুন দাদা, আমি সত্যিই বলেছি— আমার কোন রাজনীতি ছিল না। রাজনীতি চাপানো হয়েছিল আমার ওপর। লর্ড সিন্‌হা রোডে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন: তুমি কোন্ গোষ্ঠীর লোক? চারু মজুমদার, কাকা, কানু স্যান্যাল— হু ইজ ইয়োর লিডার? সুশীতল টুয়েলব ডিসেম্বর খোঁড়া পলটুকে দিয়ে কী ইন্‌স্‌-ট্রাকসন পাঠিয়েছিল? বল, বল.....উই নো ইট অল....ফল্‌স্ স্টেটমেন্ট করলে ধরে ফেলব।'

'এখন এসব ভাবলে হাসিই পায়। সেদিন কিন্তু দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে-ছিলাম। এক নিমাইচাঁদকে মারার ব্যাপারটাই কেমন গণ্ডগোলে। তা আমিতো স্বীকার করেইছি। ফাঁসী দিবি তো দে, দ্বীপান্তর পাঠাবি তো পাঠা। তা না, হাজার প্রশ্ন। বল, তোমাকে কে হুকুম দিয়েছিল মারডার করতে। তুমি কোন গোষ্ঠীর নকশাল। সত্যি বলছি, এক চারু মজুমদার ছাড়া কারো নাম জানতামই না আমি। শ্রীকাকুলাম শুনে প্রথমটা হাসিই পেয়েছিল—যেন কেউ

কাতুকুতু দিচ্ছে। ভেবেছিলাম ওটা বুঝি কোন লোকের নাম। একটানা জেরা আর পীড়ন সহ্য করতে না পেরে যখন বললাম, নিমাইচাঁদকে খুন করার সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই। খুন করেছি। কারণ ও একটা শয়তানের বাচ্চা। আমার বাবা মা ভাই বোন সবাইকে—বাড়ির পোষা বেজী আর ময়নাটাকে পর্যন্ত—পুড়িয়ে মেরেছে। আমাকে খুঁটিতে বেধে আমার সামনে ইজ্জৎ নিয়েছে আমার বাগদত্তা সরস্বতীর। তারপর আমাকে ভল্লা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। তারপর——'

ঘোরের মধ্যে যেন কথা বলে যাচ্ছিল পদ্মরাজ। আচমকা থেমে বলল, 'আপনি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারছেন না। পুলিশ আমাকে মিথ্যাবাদী মতলববাজ ঠাউরেছিল। আপনি বোধ হয় আমাকে পাগল ভাবছেন।'

আমি বললাম, 'পদ্ম, আমি কিছুই ভাবছিনা। তবে লক্ষ্য করে দেখো, গাড়ি থেমে গেছে। কারণ আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি। এখন চল, বিশ্রাম নাও, পরে কথাটথা সব হবে।'

তারাভরা আকাশের নিচে ছাতে বসে আছি। অনেকদূর থেকে যেন শহর কলকাতার নানান শব্দ ভাঙচুর হয়ে আমাদের কানে পৌঁছচ্ছে। ঝলমল করছে সাহেবপাড়ার দিকটা। চৌরঙ্গীর ওই অঞ্চল চিরকালই বাঙ্গালীদের নাগালের বাইরে রয়ে গেল। আগে ছিল ইংরেজ। স্বাধীনতার পর মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাতীদের দখলে।

পদ্মরাজের বলা গল্পটার কথাই ভাবছিলাম বসে। মাদুরের উপর মাথার নিচে দুহাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল পদ্ম। সম্ভবত কালপুরুষ নক্ষত্রের জলুষ দেখছিল।

গল্পই বটে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না। কিন্তু পদ্মর মুখে চোখে এমন একটা স্বাভাবিক সারল্য, কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা। জন্মমৃত্যুর পারে যে কিছু একটা থাকতে পারে সেই সম্ভাবনাটা কেমন ভাবে যেন এসে বিশ্বাসের মধ্যে জমি নিয়ে বসে।

পদ্ম বলছিল, 'একশ চৌত্রিশ হাইওয়ে দিয়ে প্রায়ই তখন যেতাম। বাসে চড়ে উত্তরবঙ্গ। পরে মনে হয়েছে থানা অফিসারের হলুদলাল কোয়ার্টারটাও যেন বাস থেকেই নজরে পড়েছে। কখনও বাস থেকে নামিনি নোনাডিহি। নামবার দরকারই হয়নি। বাসও তো দাঁড়াতনা ওই ছোট্ট অজ জায়গায়।

'সেবার হঠাৎ বাস বিগড়ে গেল ওই থানা অফিসারের বাড়ির সামনেই। বাসেই বসেছিলাম কিছুক্ষণ। ড্রাইভার কনডাক্টরা মিলে ইনজিন দেখছিল। খটর খটর করছিল। ভাবছিলাম এখনিতো মেরামত হয়ে যাবে। আবার বাস চলবে বায়ুবেগে

'আধঘণ্টাটাক বাদে ঠাহর করে দেখি ড্রাইভার কনডাক্টার কাউকেই আর দেখা যাচ্ছেনা। অন্য বাসযাত্রীদের অসন্তুষ্ট গুঞ্জন থেকে জানা গেল কয়েক-ঘণ্টার মধ্যে অচল বাসের চলবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বহরমপুর থেকে রিলিফ বাস আসার কথা বলে ফোন করতে গেছে, ড্রাইভার কনডাক্টার।

'অগত্যা আমিও রাস্তায় নামলাম। খানিকটা এদিক ওদিক করে ওই থানা অফিসারের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। কোন্ অন্ধ আকর্ষণে তখনও জানিনা।.... বাড়ির সামনে পেয়ারাতলায় চেয়ার পেতে বসে ছিলেন খাকি পোষাকপরা দারোগা-বাবু। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে সবুজ লুঙ্গি আর গেঞ্জী পরা একটি লোক খলবল করে কথা বলছিল। তখন জানিনে ওই লোকটাই নিমাইচাঁদ। অথবা অমল দত্ত, যা বলেন। দারোগাবাবুর পায়ের কাছে বসে ডাব কাটছিল একটা পিয়ন।

'আমি সামনে যেতেই লোকটা কথা থামিয়ে আমার দিকে চাইল। মুখ তুলে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, দারোগাবাবু। পিয়নটা খেয়াল করেনি। ও যেমন ডাব কাটছিল কেটে যেতে লাগল।

'বললে বিশ্বাস করবেন না, নিমাই-চাঁদও আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। নইলে অমন চমকে উঠবে কেন? কেন বিবর্ণ হয়ে যাবে তার মুখ?

'আমি নিমাইয়ের দিকে এক লহমা তাকিয়েই অনেক কিছু দেখে নিলাম। দুপুরের রোদে ঝলসে যাচ্ছে একটা মাঠ। আমি ভরা খেতের দিকে তাকিয়ে তন্ময়। এবার ফসল ভাল হয়েছে অনেক সাল বাদে। এবার সরস্বতী বউ হয়ে আমার ঘরে আসবে।

'হঠাৎ একদল লোক অতর্কিত আক্রমণ করে আমাকে কাবু করে ফেলল। বেঁধে ফেলল গাছের সঙ্গে। তারপর ধূর্ত শেয়ালের মত হাসতে হাসতে নিমাইচাঁদ সামনে এসে দাঁড়াল। কোতোয়ালীর নিমাইচাঁদ। পিশাচ নিমাইচাঁদ, যাকে সবাই ডরায়।

'বিকট হেসে নিমাই বললে, এবার কী করবি? বারবার বলেছি জমিটা দে আমাকে। পরিবর্তে সারাজীবন কাজ করার সুযোগ পাবি কোতোয়ালীতে। তা বিটলে বুড়োটা শুনল? তুই শুনলি? বললাম, সরস্বতীকে দুরাতের জন্য দে আমার কাছে। দিলি তুই? বাড়িঘর শুদ্ধ পুড়িয়ে মেরে এসেছি তোর বুড়ো বাপটাকে। এবার তোর পালা। কাউকে বাকি রাখব না।

'বলতে বলতে নিমাইচাঁদ অসতর্ক হয়ে সামনে চলে এসেছিল। আমি মারলাম কষে তলপেটে লাথি। কোঁক করে করে দুহাতে পেট চেপে ধরে ও বসে পড়ল। পরে একটু ধাতস্থ হয়ে রাগে চেড়া গলায় হুকুম দিলে, নিয়ে আয় মেয়েটাকে।

'প্রায় বিবস্ত্র সরস্বতীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল চেলারা। আমাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল সরস্বতী। ওগো বাঁচাও, ওরা সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে।

'কে কাকে বাঁচায়। প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কষালে শয়তানটা সরস্বতীকে। মাটিতে পড়ে গেল সরস্বতী। তারপর...... তারপর চোখের সামনে একটা নরম ফুলকে পিষ্ট হয়ে যেতে দেখলাম আমি।

'সেই থানা অফিসারের বাড়ির সামনে পেয়ারাতলায় নিমাইচাঁদের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মাথায় আগুন জ্বলে গেল আমার। পিয়নটার হাত থেকে দা কেড়ে নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম নিমাই-চাঁদের উপর।

'বাকিটা আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন। অমল দত্তের খুনের দায়ে সোপর্দ হলাম। জঙ্গীপুরে মামলা চলল কিছুদিন। তারপর হঠাৎ কোথায় কী ঘটল। গোয়েন্দা পুলিশ এসে বলল, তাহলে তুমি নকশাল। তাই বল। কোন গ্রুপের সঙ্গে আছ? কার হুকুমে নোনাডিহি গিয়েছিলে অমল দত্তকে খুন করতে? গড়িয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম অমলকে। তবু তোমরা ছাড়নি। এখন বল সব কেচ্ছা... স্পিক আপ ম্যান....খুলে বল——

'আলিপুরে মামলা চলার সময় একদিন আপনার সঙ্গে পরিচয়। আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলাম। আপনি খবর করবেন বলে কোন্ বড় কর্তাকে বলেটলে যোগাযোগ করেছিলেন, সে আপনিই জানেন।

'সে কথা যাক দাদা। আপাতত দুটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। জেলে বসে অনেক ভেবেছি। রাজনীতিটা ভাল করে বুঝতে হবে। অনেক জানার আছে। জেলে কিছু কিছু বই পড়েছি। আরও পড়তে চাই। আপনি সাহায্য করলে সেটা হবে। তাছাড়া দেখুন, ওই নিমাই-চাঁদের ব্যাপারটা। অমল দত্ত লোকটা ভাল ছিল না, সে খবর পেয়েছি। মাতাল ছিল, দুশ্চরিত্র ছিল। বউকে পেটাত। ঘুষখোর ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু ওই নিমাইচাঁদের ব্যাপারটা। প্রমাণতো কিছু নেই। আমার মাথার মধ্যে আরেকটা জগৎ নিয়ে ঘুরছি। পূর্বজন্মের স্মৃতি হয়তো বা। হয়তো আমার পাগলামি বিলকুল। হয়তো অমল দত্তকে শুধু শুধুই মেরেছি? কে হিসেব করবে?

'কিন্তু সে যাই হোক, নিমাইচাঁদের—— অর্থাৎ অমল দত্তের বাড়ির লোকতো আর দোষ করেনি। খোঁজ নিয়েছি, ওর বউ একটা বাচ্চাকে নিয়ে থাকে নাকতলায়। মাসোহারা পেয়েছে কিছু সরকার থেকে। মিল্ক বুথে কাজ করে। কিন্তু তাতে কি চলে? চলতে পারে? ওদের কিছু সাহায্য আমায় করতেই হবে। একলা আমি যেতে চাইনা। আপনি কাল একটু নিয়ে যাবেন?'

খুব ভোরে মিল্ক বুথেই গিয়ে হাজির হলাম খুঁজে খুঁজে। ভারী লাবণ্য-ময়ী এক মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মিসেস দত্ত। এক মিনিটের জন্য একটু বাইরে আসবেন? কাজ আছে।'

বুথ থেকে বেরিয়ে এসে মিসেস দত্ত মিষ্টি করে হাসলেন 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারছিনা। কী কাজ বলুন তো।'

উত্তর দিলাম, 'কাজটা আমার নয়, আমার বন্ধুর। ওই যে কালো ফিয়াট গাড়িটা পাশে দাঁড়িয়ে.....ওই যে....'

ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস দত্ত দেখলেন পদ্মরাজকে। দেখে মুখ নামালেন। আবার দেখলেন। শক্ত হয়ে উঠল তার সুন্দর মুখ। তারপর হন হন করে বুথের দিকে এগুলেন।

আমি বললাম, 'শুনুন.....'

বুথের দরজায় একটু থামলেন মিসেস দত্ত। চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল গালে। 'আমার স্বামীর হত্যাকারীকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে? কী চান আপনারা?'

দৌড়ে কাছে চলে এসেছিল পদ্মরাজ। বললে, 'সরস্বতী, শোনো, শোনো আমি তোমাকে সাহায্য করতে......'

ক্রুদ্ধ গলায় মিসেস দত্ত বললেন, 'কী বলছেন? আমি সরস্বতী নই। আপনার সাহায্য কে চায়? আপনার মুরোদ আমার জানা আছে। ওরা যখন আমার গায়ে হাত দিল.....'

থেমে গেলেন মিসেস দত্ত। কথাটা বলে ফেলে যেন অবাকও হয়ে গেলেন খানিকটা। তারপর টুক করে বুথে ঢুকে পড়লেন।

তাকিয়ে দেখি পদ্মরাজের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। 'ও যে সরস্বতী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লাষ্ট কথাটা শুনলেন না? আমাকেও চিনতে পেরেছে। যতই রাগ দেখাক, ও শেষ পর্যন্ত আমার কাছে আসবেই।'

সমীক্ষা
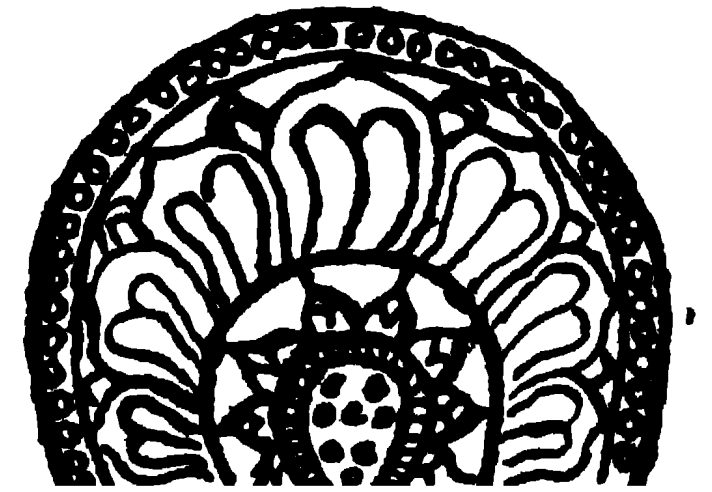
খনিজ সম্পদের আলোয় পুরুলিয়া

শান্তি সিংহ

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ঢেউখেলানো রুক্ষ লাল মাটি আর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত সবুজের ছোঁয়া বুকে অনেকের ভালোবাসার বাইরে উপেক্ষিতা রয়েছে নীল পাহাড়ের দেশ পুরুলিয়া। এই জেলার নামে অনেক সময় বিদগ্ধজন অনুকম্পার স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করেন। কারণ, তাঁরা জানেন—পুরুলিয়া-মানেই খরা পীড়িত, শিল্পে অনগ্রসর একটি জেলা।

এ জেলার ওপর দিয়ে চলে গেছে কর্কট ক্রান্তিরেখা। তাই শীতের সময় ৭.৮° সেন্টিগ্রেড থেকে গ্রীষ্মকালে ৪৬.৬° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত জেলার তাপমাত্রা ওঠানামা করে। জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০২৩.৭ মিলিমিটার। এই বৃষ্টিপাতের প্রভাব ঢেউখেলানো উঁচুনীচু জমিতে বেশীদিন থাকেনা। তদুপরি নেই সেচের ভালো ব্যবস্থা। তাই বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায় আজো বৃষ্টির অভাবে হা-পিত্যেশ করে দেবতার কৃপায় বাঁচতে চান। এবং খরাকে ফি-বছর সঙ্গী হিসেবে মেনে নেন।

এহেন পুরুলিয়ার বুকে বিরাট সম্ভাবনার আলো জ্বেলে দিয়েছে খনিজ সম্পদ। পুরুলিয়ার সম্ভাব্য কয়লার পরিমাণ ৫৪০ লক্ষ টন। বেশীর ভাগ কয়লাখনি রাণীপুর, পারবেলিয়া, নিতুরিয়া, শতড়োড়ার আসেপাশে রয়েছে। এ জেলায় নিম্ন মানের চুনা পাথরের সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০ লক্ষ টন। মানবাজার থানার তামাখান জায়গায় ১৮ ফুট গভীরে তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ওখানে সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুমিত হয়েছে ৮০০০ টন।

ঝালদা ব্লকের মাহাতোমারায়, পুরুলিয়া ব্লকের কলাবনীতে এবং বাঘমুণ্ডি বক্ষের বিভিন্ন স্থানে চীনামাটি পাওয়া যায়। আমতোড়ে চীনামাটি উত্তোলন কাজ চলছে। ঝালদা থানার বালামু পাহাড়ী এলাকায় ফ্লুওরাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। ঝালদা ব্লকে চুনাপাথরের পরিমাণ ২০ মিলিয়ান টন। ঝালদা, পাড়া, রঘুনাথপুর কাশীপুর অঞ্চলে ফেল্‌স্‌পার পাওয়া যায়। সিরজাম রেল ষ্টেশনের কাছে প্রায় ৫০ মিটার প্রশস্ত স্থান জুড়ে এবং পাড়া ব্লকের সিঁদুরপুর সিলিকান রক রয়েছে।

সাম্প্রতিক এটমিক এনার্জি কমিশনের সন্ধানকার্যে বহুমূল্য ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের সন্ধান পুরুলিয়ায় পাওয়া গেছে। লোহা, কয়লা, কোয়ার্জ প্রভৃতির পরিমাণ জানার জন্য সন্ধান চালাচ্ছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। সন্ধান পাওয়া গেছে বহুমূল্য নীলা পাথরের। রাজ্য সরকার সংস্থা ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলাপ-ম্যাণ্ট আণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ফেল্‌স্‌পার, কোয়ার্জের কাজ চলছে পালমাতে। ব্যাক মাইকা খনির কাজও চলছে। অযোধ্যা পাহাড়ের তলায় সিরমি অঞ্চলে ইচ্ছে কোয়ার্জ খনির কাজ। বলরামপুর থেকে কিছুদূরে বেলদিতে রক-ফসফেট খনিতে কাজ করছেন প্রায় আড়াইশো শ্রমিক। রক-ফসফেটগুঁড়োর জন্য কারখানাও তৈরী হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতে এর দারুণ চাহিদা।

সরকার খনিজ সম্পদ উদ্ধারকার্যে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই পুরুলিয়া আপন ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (বিচার সম্পর্কিত) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ২৫ জন তফসিলী ও আদিবাসী প্রার্থীকে ১০ মাস শিক্ষাদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এর জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৮২,০২০ টাকা। কোন প্রার্থীকে একাধিক বার এ সুযোগ দেয়া হবে না।

★ ★ ★

আগামী দশবছরে কয়লার উৎপাদন দ্বিগুন করা হবে। 'কালো হীরে প্রকল্প' নামে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আগামী দশ বছরের পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

বিশেষ সংবাদ
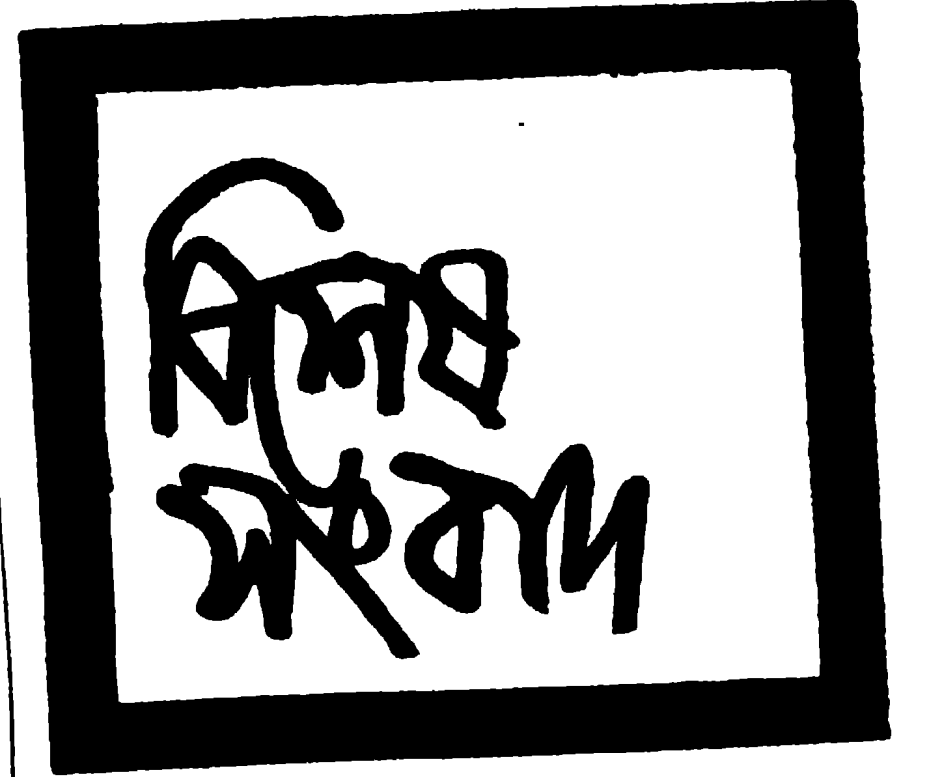
ভারতীয় সিমেণ্ট কর্পোরেশনের তিনটি কারখানা বর্তমানে বছরে ৬ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদন করে।

★ ★ ★

পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের অখ্যাত গ্রাম বিজয়শ্রী আজ সবুজের সমারোহে শ্রীমণ্ডিত। গত বছর পর্যন্ত বিজয়শ্রী, মাধবপাড়া ও হাতিরাপাড়া গ্রামগুলির দৈন্যদশা ছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন পাশাপাশি গ্রাম তিনটির কৃষক ভায়েরা। সম্প্রতি দ্রুত খাদ্যোৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪টি বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপ বসিয়ে ১৬৫ ঘর কৃষক তাঁদের ১৪৪ একর জমিতে বারমাস ফসল ফলাবার সুযোগ পেয়েছেন। আগে যেখানে রবি মরসুমে প্রায় কিছু হতনা এখন সেই একই জমিতে বহু ফসলের চাষের সম্ভাবনা কৃষকদের কাছে আর স্বপ্ন নয়—বাস্তব ঘটনা।

দৃষ্টিহীনদের শিল্পনিকেতন

লেখা দাশ

বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্প নিকেতনটি অবশ্যই প্রধানত দৃষ্টিহীন মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতে বেকার সমস্যার যে প্রকট রূপ দেখা দিয়েছে তার কবল থেকে দৃষ্টিহীনরা রেহাই পায়নি। বিশেষ করে দৃষ্টিহীন শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য আজও তেমন কোন সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিকলাঙ্গদের প্রকৃত পুর্নবাসন আজও হলনা পশ্চিমবঙ্গে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বিকলাঙ্গ বিশেষ করে দৃষ্টিহীনদের পুনর্বাসন না হলেও অন্তত তারা যেন পেটে খেতে পারে তারই এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্প নিকেতন—১৯৭২ সালের পয়লা ডিসেম্বর কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত লাল বিহারী শাহ্-এর শুভ জন্মদিনে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হল অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা যাতে করে তারা নিজেদের সুস্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এখানে এরা এত নিপুণভাবে দড়ির কাজ, বেতের কাজ, প্লাষ্টিক, ধূপ, মোমবাতি তৈরী করে যে তা দেখলে দৃষ্টবান মানুষকেও অবাক হয়ে যেতে হয়। মাত্র পাঁচজন অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এই শিশু প্রতিষ্ঠান ভুমিষ্ট হয়। আজ এখানে কর্মী সংখ্যা সেই ৫ থেকে ২০তে এসে পোঁছেছে। অর্থাৎ ২০ জন বিকলাঙ্গ ভাইবোন তাদের পরিবারের প্রায় ১০০ জনের জন্য অন্নসংস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে।

সারা ভারতে মোট ১১০টি অন্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেখানে শুধু দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা দেওয়া হয়। আর পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৬টি প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অন্ধ প্রতিষ্ঠান হল ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল। এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৪ সালে স্বর্গীয় আচার্য লালবিহারী শাহ্-এর দ্বারা। স্বর্গীয় শাহ মাত্র ১টি ছাত্র নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেছিলেন। আর এখন সেখানে ছাত্র ছাত্রী মিলিয়ে ১৫০ জনের মত। সেই অন্ধ বিদ্যালয়ের এক ফালি জমি নিয়ে কাজ শুরু হয় দৃষ্টিহীন শিল্প নিকেতনের। ২০ জন দৃষ্টিহীন ও বিকলাঙ্গ মেয়ে পুরুষকে এই শিল্প নিকেতনে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। তামাম দুনিয়া এদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকলেও কাজকর্মে এরা কিন্তু আলোর সন্ধান পেয়ে গেছে। সকাল দশটায় হাজিরা দিতে হয়—ছুটি বিকেল চারটেয়। চটকলের মত হয় ভেঁপু বাজানো না হলেও এরা কিন্তু ভীষণভাবে নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে—সময়ানুবর্তিতার সাথে সাথে ঠিক কাটায় কাটায় দশটায় এরা সব্বাই কাজে হাত দিয়ে দেয়। হাতের বিরাম কৈ। এরা সবাই কারিগরী শিক্ষার বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

দৃষ্টিহীন ভাইরা বেতের মোড়া তৈরী করছে

এক সাক্ষাৎকারে ম্যানেজার বীরেন সান্যাল জানালেন (চক্ষুষ্মান) সহৃদয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও আমাদের ক্রেতাগণের সহযোগিতায় কর্মীসংখ্যা ৫ থেকে ২০তে পোঁছেছে। এই সব অন্ধ ও বিকলাঙ্গ কর্মীকে নিয়োজিত করেছি মোমবাতি, ধূপকাঠি, বেতের মোড়া, বেতের ওয়েষ্ট পেপার বাক্স, নারকেল দড়ির পাপোষ, খাম, কাপড়ের ব্যাগ প্রভৃতি তৈরীর কাজে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহজ সাধারণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের Assembling ও filling-এর কাজে। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠান ১০ জন বেকার দুঃস্থ যুবককে মোমবাতি ও ধূপ বিক্রয়ে নিয়োজিত করেছে। তাদের প্রত্যেকের অধীনে ৪।৫ জন করে দুঃস্থ যুবক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠানে মন্দাভাব দেখা দেয়। কিন্তু এখানকার প্রত্যেকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মন্দাভাব কাটিয়ে চলতি বছরে আমরা প্রায় ২২,০০০ টাকার সামগ্রী তৈরী ও বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছি এবং ৬,০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য লাভ করেছি। আমরা আরও ভালভাবে কর্মীদের কাজে নিয়োজিত করতে পারতাম যদি আমরা আমাদের চাহিদানুযায়ী কাঁচা মোম সরবরাহ পেতাম, অন্ততঃ পক্ষে আর ১০,০০০ টাকার মোমবাতি বাজারে বিক্রয় করতে সক্ষম হতাম।

আগে প্রতিমাসে প্রতি কর্মী ৫০ টাকা করে মাস মাহিনা পেত। যাতায়াতের গাড়ীভাড়া, দুপুরের টিফিন ছাড়াও প্রোডাকসন বোনাসও পেত কর্মীরা। কিন্তু

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

আইসক্রীমের দিগ্বিজয়

—সুরজিৎ ধর

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের আগুনে যখন সবকিছু দাউ দাউ করে জ্বলতে আরম্ভ করে, যখন গরম হল্কায় চোখমুখ জ্বালা করে ওঠে সেই সময় নির্জন রাস্তা দিয়ে 'আইসকিরিম' 'আইসকিরিম' ডাকটা আপনাদের কাছে কেমন লাগে জানিনা, তবে আমার মনে হয় স্বর্গ থেকে কোন দেবদূত অমৃত পাত্র-খানি ছিনিয়ে নিয়ে আসছে। বরফ কল যখন এদেশে আসে নি, তখন রাজা বাদশা অথবা অভিজাতরা চুপ করে বসে থাকতেন না। সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে লোক পাঠিয়ে, পাহাড় থেকে বরফের চাই—কাঠের গুড়ো অথবা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে আসতেন। প্রাচীন কালে রোমান অভিজাতরা বরফ সংগ্রহ করত পাঁচশ' মাইল দূরের আল্পস পর্বত থেকে। সেখান থেকে দ্রুত রথে চড়ে অথবা দেশের দৌড়বীরদের সাহায্যে নিয়ে আসা হত বরফের চাই। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে আইসক্রীম জাতীয় ঠাণ্ডা খাবারের বহুকথা জানতে পারা যায়। সম্রাট নীরো প্রায়ই তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ভোজ বসাতেন ফলের রসের সঙ্গে বরফের গুঁড়ো মিশিয়ে। সেকালের রোমান পাচকগণ বরফ দিয়ে খাবার তৈরীর প্রণালীটি অত্যন্ত গোপনের সঙ্গে রক্ষা করতো। কিন্তু কি করে যেন তা চলে গিয়েছিল ফরাসীদের রন্ধন শালায়। সেখান থেকে তার যাত্রা হয় ইংলণ্ডে। এ ব্যাপারে রাজা প্রথম চার্লসের অবদান অনেকখানি। তিনি নাকি ফরাসী রাজার পাচককে ঘুষ দিয়ে জেনে নিয়েছিলেন, বরফ দিয়ে খাবার তৈরীর প্রণালীটি। এখান থেকে লোকেরা যখন আমেরিকায় আস্তানা গাড়ছিল, সেই সময় তা চলে যায় সেদেশে। ফ্রান্সে বরফ দেওয়া খাবারকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন ক্যাথারিন দ্য মেডিকা নামে জনৈকা মহিলা। মার্কোপোলো যখন প্রাচ্যদেশ সমূহে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি এসব দেশ থেকে শিখে নিয়েছিলেন জল থেকে বরফ তৈরীর কৌশল। তবে তা নিশ্চয়ই এখনকার মত উন্নত ছিল না।

এসব তো হলো বহুদিন আগেকার কথা। এই কলকাতাতে বরফের প্রথম আমদানী হয়, এই সেদিন অর্থাৎ ১৮৩৩ সালে। যেদিন মার্কিন জাহাজ বোঝাই হয়ে কলকাতাতে বরফ এলো সেদিন কিন্তু এই শহরে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল গোরারা। কলকাতার সাহেবদের মুখপাত্র হয়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সভাকরে সেদিন মার্কিন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তবে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই যবনদের হাতের সে বরফ মুখে দিতে প্রথমদিকে অস্বীকার করলেও পরে অবশ্যি তাদের সেই আপত্তি ধোপে টেঁকেনি।

আইসক্রীমের আবিষ্কারের কাহিনীটি কিন্তু আইসক্রীমের মতো ঠাণ্ডা নয়, দস্তরমতো গরম ব্যাপারই বলতে হবে। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। যিনি এই সুস্বাদু বস্তুটি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি কোন বিরাট ব্যক্তিও নন, সাদাসিধে একজন রাঁধুনী মাত্র। নাম স্যাডি জনসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্থ প্রেসিডেণ্ট-এর খাদ্য তৈরী করতো এই নিগ্রো পাচক। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী ডলি ম্যাসিডন হোয়াইট হাউসে এক পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই পার্টির খাবারের রান্নার দায়িত্ব ছিল, যথারীতি সেই পাচকের উপর। বিস্তর খানাপিনার ব্যবস্থা হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কি এক অনির্দিষ্ট কারণে শেষ পর্যন্ত বাতিল হ'য়ে গেল ডলি ম্যাসিডনের এত সাধের আসরটি। ঠিক হ'লো ঠিক—দু'দিন পরে আবার সবাই হাজির হবেন। স্যাডি জনসন দেখলো মহাফ্যাসাদ। এতকষ্টের রান্না নষ্ট করতে তার প্রাণে চায়না। তাই সে ডিম আর দুধের তৈরী হালুয়া রেখে দিল আইসবক্সে। তারপর নানান কাজের ঝামেলায় ভুলে গেল সেকথা। দু'দিন পরে যখন আবার পার্টির আয়োজন হ'ল, তখন নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করা হ'ল জমাট বাঁধা শক্ত হালুয়া। বেশ জমাটি পরিবেশের মধ্যেই চলছিল ভোজন পর্ব। কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন করলেন তালভঙ্গ। তিনি বোধহয় দাঁতের অসুখে ভুগছিলেন। ঠাণ্ডা জমাট হালুয়া খেয়ে দাঁত শিরশির করে উঠতেই চেচিয়ে উঠলেন বিষ! বিষ! বলে, ব্যাস লেগে গেল তুমুল হৈ-চৈ। এতক্ষণ যারা খুশীমনেই আহার করছিলেন তারাও গলা মেলালেন ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে। রাঁধুনী স্যাডি জনসনের ডাক পড়লো তৎক্ষণাৎ। গ্রেপ্তার করা হ'ল সেই নির্বোধ পাচককে। পণ্ড হয়ে গেল সেদিনকার ভোজন পর্ব।

ডলি ম্যাসিডন দেখলেন মহা কেলেঙ্কারী ব্যাপার। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এত আতঙ্কিত হওয়ার কারণটি। এতদিনকার জনসন এমন কাজ করবে একথা মানতে তিনি

২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মুখোমুখি

জীবনের সবচেয়ে আজ পর্যন্ত বড় পাওয়া পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদজী বড়ে গোলাম আলি সাহেবের স্নেহসুধা। যা পেতে গেলে বহু জন্মের সুকৃতির প্রয়োজন। আর চাওয়া? সে প্রশ্নের সময় এখনও হয়নি।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

"এখনও অনেক দূরে যেতে হ'বে"—সোনালী ভোরের সোনা ঝলমলে দিনের শুরুতে যখন শোনা যায় শিল্পীর সুললিত কণ্ঠ থেকে তখন কি কেউ ভাবতে পারেন সেই শিল্পী শিল্প জীবনের সব কিছুকেই পুরো হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন? শিল্পী জীবনের সকল চাওয়া পাওয়ার সীমা অতিক্রম করার পরও যে শিল্পী এমন মিষ্টি মধুর গান গাইতে পারেন এমন কথার ফুলঝুরিতে সুরের মায়াজাল বুনতে পারেন সেই শিল্পী কত বড়, কত মহৎ তা তার জীবনোপাখ্যান পড়ে জানার প্রয়োজন হয় না। আজকের এই পরিণত শিল্পী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় শিশুকালে অবাক বিস্ময়ে শুনতেন—বাবা গাইতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের গান। চোঙ্গাওয়ালা গ্রামোফোনে যখন শুনতেন কানন্‌বালার গান 'আমি বন ফুল গো' বা 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন' অথবা আঙ্গুরবালার কালজয়ী গান 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা' অবাক বিস্ময়ে আত্মহারা শিশু সন্ধ্যা দিশাহারা হয়ে পড়তেন। গুনগুন করে গেয়ে উঠতেন। কিন্তু রক্ষণশীল বাড়ী—তাই শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ ঘটার সুযোগ কুঁড়ি থেকে ঘটে নি। বারো বছর বয়সে কৈশোরের কুঁড়ি প্রকাশ বেদনায় যখন ব্যাকুল তখন দাদা সুশীলবাবুর দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ভোরের সন্ধ্যাতারা। আকাশবাণীর 'গল্পদাদুর আসর'-এ গান গাইলেন। শুরু হল পথ চলা। ঐ বারো বছর বয়সেই প্রকাশিত হল তার প্রথম রেকর্ড—'তোমার আকাশে ঝিলমিল' এবং 'তুমি ফিরায়ে দিয়েছ যারে।' কথা ও সুর গিরীন চক্রবর্তীর। রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানীর।

চাকুরিয়া ব্যানার্জী পাড়া লেনের ছোট্ট স্কুলের মেয়ে সন্ধ্যাদেবীর সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় সন্তোষ বসু মল্লিকের কাছে। তারপর যামিনী গাঙ্গুলীর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, পরে সংগীত জগতের দীপ্ত সূর্য ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর স্নেহধন্যা হয়ে পথ-পরিক্রমার হয় শেষ।

"উহু! এক মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সালটা ১৯৫০। (ক্ষণিকের জন্য একটু আনমনা হলেন সন্ধ্যা। কাঁপা গলায় শুরু করলেন) গুরুজী—পিতাজী বললে খুব বেশী বলা হবে না—ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের এক্কেবারে মুখোমুখি বসেছি। গানের পরীক্ষা দিচ্ছি। না না গান শোনাচ্ছি না—গানের পরীক্ষা দিচ্ছি। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই তার কাছে গান শেখার সুযোগ মিলবে। তাই প্রাণমন ঢেলে গানের ডালি সাজাতে চেষ্টা করেছিলাম। ভয়ে জিব আড়ষ্ট হয়ে আসছিল, বুক হিমশীতল প্রায়। এক সময়ে গান শেষ করলাম। ভয়ে ভয়ে লাজো লাজো চোখে তাকাতে দেখি চোখ বন্ধ। একটু পরেই সেই ধ্যানস্থ মানুষটার কণ্ঠ থেকে গুরু গম্ভীর সুর ধ্বনিত হোল—'বাঃ বাঃ বেটী। তোকে আল্লা এমনই কণ্ঠ দিয়েছেন, যে আমি যেভাবেই শেখাই না কেন রোশনারা বেগমের চেয়ে তোর রোশনাই কমতি হবে না।' সেদিনকার কথা আজও মনে হলে দিশেহারা হয়ে পড়ি।"

আধুনিক গানের সফল শিল্পী সন্ধ্যা মুখার্জী উচ্চাংগ সঙ্গীতকে ভীষণভাবে ভালবাসলেও রবীন্দ্র সঙ্গীতেরও এক বিশিষ্ট শিল্পী। সন্ধ্যাদীপের শিখা, চিরকুমার সভা, মনের ময়ূর প্রভৃতি ছবিতে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন সেখানেও অনন্যা। 'সন্ধ্যাদীপের শিখায়' বিশ্ববন্দিতা অভিনেত্রীর ঠোঁটে 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আহ্বান' সংগীতের জন্য সে বছর বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েসন তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। রবীন্দ্র সংগীত না উচ্চাংগ না আধুনিক কোন্‌টাতে পরিতৃপ্তি পেয়েছেন তার উত্তরে বিদগ্ধা শিল্পী সন্ধ্যার খুব ছোট্ট উত্তর ছিলো—"পরিতৃপ্তি পেলাম কোথায় রে ভাই। অনেক বাকি এখনও।"

রাইচাঁদ বড়ালের স্নেহধন্যা হয়ে নবীন প্রতিভা সন্ধ্যা মুখার্জী প্লে-ব্যাক করার সুযোগ পেলেন। বিমল রায়ের পরিচালিত রাইচাঁদ সুরারোপিত 'অঞ্জন-গড়' ছায়াছবিতে। সেটা ছিল ডবল ভার্সান অর্থাৎ বাংলা ও হিন্দীতে। বাংলায় গেয়েছিলেন—'গুন্ গুন্ গুন্ মোর গান' এবং 'হাঃ হাঃ হাসকে জিয়ে' হিন্দীতে। এর পরের ছবি 'সমাপিকা'-য় গাইলেন 'মানুষের মনে ভোর হল আজ অরুণ

গগনতল'। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হিট করলো। আজও তাঁর গানে মানুষ পাগল। রবীন্দ্র সংগীতে প্রায় ৮ খানা, উচ্চাঙ্গ সংগীতে ১টা এবং আধুনিক? আধুনিক এক হাজারের বেশী রেকর্ড করেছেন শিল্পী। আজও তাঁর গান আবালবৃদ্ধবনিতা সম্মানের সঙ্গে শুনতে অভ্যস্ত। নিজের স্বরেই স্বামী গীতিকার শ্যামল গুপ্তের কথায় তিনি ১৯৭৫-৭৬ সাল মিলিয়ে প্রায় ৮ খানা রেকর্ড করেছেন। উল্লেখ্য সব কটা গানই মানুষের মনের গহনে সাড়া জাগিয়েছে। ঝরা পাতা ঝড়কে ডাকে, চন্দন পালঙ্কে শুয়ে একা একা কি হবে, এখনও অনেক দূরে যেতে হবে, বড় দেরীতে তুমি বুঝলে, খোলা আকাশে কি মনে ইত্যাদি। "না ভাই গীতিকার হবার সখ আমার নেই। আর ওকথা ভাবতেই পারি না। গীতিকার হই আর তোমার শ্যামলদার সঙ্গে অশান্তি বাধুক আর কি, (হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে) না না ভাই এই তো বেশ আছি।" গীতিকার হবার কথা ভেবেছেন নাকি তার উত্তরে ঐ কথা গুলো বলতে গিয়ে হেসে কুটোকুটি হয়ে গিয়েছিলেন।

: শিল্পী জীবনে কি চেয়েছিলেন আর কিই বা পেয়েছেন?

খুব ছোট্ট সহজ সরল নিরহংকার উত্তর—"সবে তো শুরু করলাম। এর মধ্যে পাবই বা কি। চাইবই বা কি? আর জীবনে চাওয়া-পাওয়ার কি শেষ আছে রে ভাই! জীবনের সবচেয়ে আজ পর্যন্ত বড় পাওয়া পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদজী বড়ে গোলাম আলী সাহেবের স্নেহসুধা। যা পেতে গেলে বহু জন্মের সুকৃতির প্রয়োজন। আর চাওয়া? সে প্রশ্নের সময় এখনও হয় নি। তোমাদের যদি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গানে ভুলিয়ে যেতে পারি সেটাই হবে সারা জীবনের সফল চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নিকেশ।"

জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আসর —১৯৫৫ সালে রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে আবেগে পুলকে দিশেহারা ষাট হাজার জনগণের সেই অভিনন্দন—'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু আজ স্বপ্ন জড়াতে চায়, হৃদয় ভরাতে চায়'। আবেগভরা গানের সফল পরিক্রমা।

প্রশ্ন রেখেছিলাম, প্রতিভাবান শিল্পীই কি জনপ্রিয় হয়? জনপ্রিয় হতে গেলে কি প্রতিভাবান হতেই হয়?

"এক মিনিট। প্রশ্নটা বড় জটিল। (চট করে আনমনা হয়ে গেলেন সন্ধ্যাদি) বলতে সুরু করলেন—হ্যা, ভাই শোন। এই প্রশ্নের একটাই উত্তর—যা হল কণ্ঠ দিয়ে পাঠান ভগবান আর অধ্যবসায়-সাধনা নিজের। প্রতিভা ক্যান নট বি পারচেজড্ বাট জনপ্রিয়তা ক্যান বি।"

যে শিল্পীর কণ্ঠে ভেসে ওঠে 'ধূপ চিরদিন নীরবে ঘলে যায়—প্রতিদান সে কি পায়?' তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে জানাই হে দেবী তুমি যেন জনগণকে শেষ দিনেও শোনাতে পার: গানে তোমায় আজ ভোলাব, প্রাণে তোমার সুর দোলাব।

মাণিক লাল দাশ

নতুন স্বাস্থ্যনীতি

৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পুষ্টি, খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নারীকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবার কল্যাণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক যাতে সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রয়াসের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়, আমি চেষ্টা করবো তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে। অন্যসব মন্ত্রণালয় যাতে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীকে তাদের স্বাভাবিক কর্মতৎপরতার অঙ্গীভূত করেন তার জন্য আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো। জন্ম নিয়ন্ত্রণের নানা রকম পদ্ধতি আছে আমরা সবগুলির উপরই জোর দেবো। যারা স্বেচ্ছায় অস্ত্রোপচারের সুযোগ পেতে চান তারা বিনামূল্যেই তা পাবেন। তবে লুপ ও অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদির প্রতিও সমদৃষ্টি দিতে হবে। প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের আদর্শেরও পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

ভারতে প্রতিমাসে দশ লক্ষ করে জনসংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান জন্মহার হলো হাজার প্রতি ৩৪.৫ শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য হলো ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই হারকে হাজার প্রতি ৩০-এ এবং ১৯৮৪ সালে মার্চ মাসের মধ্যে হাজার প্রতি ২৫-এ কমিয়ে আনা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা সব রকমের চেষ্টা চালাবো। তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ যাতে এ আন্দোলনের সামিল হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, সমবায় সমিতি, নারী সংগঠন, শিক্ষক সংস্থা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মত যেসব সংগঠনের জনমতের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ রয়েছে তাদের প্রত্যেককেই এই কর্মসূচীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে হবে। আমরা আশা করি এরা নিজেরাই জাতীয় স্বার্থে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন।

সবশেষে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে আমি তার উপর জোর দিতে চাই। এই দুটি একে অপরের পরিপূরক। সংযুক্তভাবে এই কর্মসূচী অস্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মত সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। এইটিই প্রথম পদক্ষেপ। যদি সম্পদের সংস্থান হয়, তবে আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচীই আমরা গ্রহণ করিনা কেন, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাহায্যেই তা সর্বস্তরে রূপায়িত করতে হবে। এই কর্মসূচীতে জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন আনবে।

রামরাজা উৎসব

অমরনাথ বসু

সত্যিই রামরাজা উৎসব। ফি-বছরের মত এবারও চৈত্রের রামনবমী তিথিতে মেলা ও উৎসবের শুভ সূচনা হয়েছে। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—

‘শ্রী রামনবমী প্রোক্তা কোটি সূর্য্য গ্রহাধিকা
তস্মিন দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ।।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম তত্তব ক্ষয়কারকম্
চৈত্রে মাসি নব ম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ংহরি।।’

শাস্ত্রকার রামনাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে ‘রা’ শব্দে বিশ্ব, ‘ম’ শব্দে ঈশ্বর বিশ্বের—এবং লক্ষ্মীপতি রামই মানবলোকের কল্যাণশ্রেষ্ঠ পুরুষ। হ্যাঁ, এমন জমজমাটে মেলা ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী বারোয়ারী পূজা সারা ভারতের আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় কিনা সন্দেহ। হাওড়া ষ্টেশন থেকে বাহান্ন নম্বর বাসে চড়ে যে কেউ পৌঁছে যাবেন উৎসবতলা, রামরাজাতলা। রামরাজা পূজোর সূচনার আগে এ স্থানটি অবশ্য সাঁত্রাগাছি গ্রাম নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

আনুমানিক দু'শো বছর পূর্বে স্বনামধন্য জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী স্বীয় ইষ্ট-দেবের মৃন্ময়ী মূর্তি অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে মহাসমারোহে এই পূজা ও উৎসবের সূচনা করলেন। রামরাজা পুজার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকন্ঠে ধ্বনিত হ'ল:

গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারানসী সমতুল তাহে
সাঁত্রাগাছী গ্রাম গো,
তব আগমনে অযোধ্যা সমানে
পবিত্র হইল আজি গো ।।
সবে মিলি আজি রামনাম গাহি
পুরাব মনেরি বাসনা।
পাপ তাপ যত দুঃখ অবিরত
নাশিবে রামেরি মহিমা ।।

সুদীর্ঘ চব্বিশফুট মূর্ত্তি নির্মাণে অযোধ্যারাম চৌধুরী স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন।

আসলে এই রামরাজা মৃন্ময়ী প্রতিমা রাবণবধের পর অযোধ্যার সভা। রামসীতা ছাড়াও এ মূর্ত্তিতে রয়েছেন ভরতাদি ভাতৃবর্গ, হনুমান, জাম্বুবান, বশিষ্ট, নারদ প্রমুখ দেবদেবীরা ছাড়াও শ্রীরামসীতার পাদদেশে চারজন নৃত্যরত সখী এবং প্রতিমাটির একেবারে উর্দ্ধে ভারতমাতা তারপর জগদ্ধাত্রী এবং একপাশে সরস্বতী প্রতিমা। এই সরস্বতী প্রতিমা থাকার পিছনে একটি ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। তা'হচ্ছে সে সময়ে এই গ্রামটিতে বারোয়ারী সরস্বতী পূজা মহাধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হ'ত। শ্রী রামচন্দ্রের পূজারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দু-দলের সঙ্গে প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হ'ল। বিষয় সরস্বতী পূজা এবং রামপূজা—কিন্তু সব বাতবিতণ্ডার মুহূর্ত্ত-মধ্যে অবসান ঘটালেন স্বয়ং অযোধ্যারাম চৌধুরী। স্থির হ'ল গ্রামের বারোয়ারীর বাগদেবী সরস্বতী মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রের মৃন্ময়ী প্রতিমার শীর্ষস্থানে অবস্থান করবেন। আর মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি

নির্মাণের (বাঁশপূজা) আয়োজন করা হয়। আর পুজোর সূচনা বাসন্তী পুজোর নবমী তিথিতে অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিবস রামনবমী থেকে শ্রাবণের শেষ রবিবারে সকাল পর্য্যন্ত। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত যা কিছুই ঘটুক না কেন শেষ রবিবার প্রতিমার বিসর্জন হবেই হবে। দীর্ঘ চারমাস ধরে এখানে প্রতিদিন চলে পুজো, হোম, ভোগ, সন্ধ্যারতি, কীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, কথকতা, যাত্রা, (প্রতি শনিবার) ভোগবিতরণ, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ইত্যাদি আরো একাধিক অনুষ্ঠান।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে দুশো বছর আগে প্রথম রামপূজার প্রাক্‌কালে তিনদিন পূজা অনুষ্ঠিত হ'ত। তারপর একপক্ষ, মাসাধিক, ক্রমে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্রের চারমাসব্যাপী পূজা উৎসবের সাড়ম্বর আয়োজন ঘটলো। এবং অযোধ্যারাম চৌধুরীর মৃত্যুর পর স্থানীয় কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য, পি. কে. লাহিড়ী, সীতারাম খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিদের একান্ত সহযোগিতায় বর্তমান পুজোর স্থানটুকু পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছে।

দীর্ঘ চারমাসব্যাপী রামরাজা মহামেলা প্রতি বছরের মত এবারও চৈত্রের রামনবমী তিথিতে শুরু হয়েছিল। এখনো চলছে। হাওড়ার জনজীবনে এক বহুকাঙ্খিত উৎসব রামরাজা মহামেলা উৎসব। পয়লা বৈশাখের শুভযাত্রায় যুবক যুবতীর মুখে বসন্তের যৌবন উচ্ছল হাসি দেহে উচ্ছল আবরণ ঘিরে এদিনের মেলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখবো—পুজো, প্রতিমা না মানুষ—না'কি উজ্বল আলোকসজ্জা।

সকলের করুণপ্রাণে উচ্চারিত হবে "সীতারাম" "সীতারাম" এবং দীর্ঘকায় মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে পর্যবেক্ষণ করবেন রাবণবধের পর অযোধ্যার সজ্জা। এ উৎসব ছোট বড় ডান বাম সকলের ভেদ ঘুচিয়ে দেবে। আর মেলা সেতো মহামিলনের পরম পবিত্র স্থান। মেলারই একপাশে রয়েছে মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি দশ-অবতারের আবির্ভাব। মানুষের কল্যাণে পুরাণোক্ত কল্কি অবতার কলিযুগের শেষ ভাগে আবির্ভূত হবে। বর্তমানে প্রবলকলির মধ্যযুগ। শান্তির ললিত বাণী প্রতিষ্ঠা কল্পে এই রামরাজার মেলা উৎসব। ভারতবর্ষকে নব অযোধ্যায় পরিণত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। চলুন যাই রামরাজা মহামেলায়।

দৃষ্টিহীনদের শিল্পনিকেতন

১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এখন আর ফিক্‌সড মাস মাহিনা কেউই পায়না। যার যার কাজের ওপর মাহিনা দেওয়া হয়। বাইরের বাজারের বিপুল চাহিদার সঙ্গে এরা কোমর বেঁধে লড়ছে। কেউ মাল তৈরী করছে, কেউ প্যাকেট করছে, কেউবা আবার লেবেল লাগাচ্ছে। বাজারে অর্ডার হিসেবপত্র সবই এই অন্ধ ভাই বোনেরা করছে।

ডলি সরকার—দৃষ্টিহীন কর্মী। ৪ বছর হল এখানে কাজ করছে। আসে বেলেঘাটা থেকে। ধূপকাটি প্যাকেটে ভর্তি করে। দিনে প্রায় হাজারের মত কাঠি ভর্তি করতে পারে ডলি। শান্ত সুন্দর স্বভাবের মেয়ে ডলি বললো, "প্রতিদিন আসি এখানে ১০ টায়, বিকেল ৪ টায় ছুটি হয়। বাড়ী গিয়ে বৃদ্ধ বাবাকে দেখাশোনা করতে হয়। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি প্রতিষ্ঠানকে বড় করার জন্য। কিন্তু সরকার আর আপনাদের সহযোগিতা না পেলে আমরা বড় হব কি করে?" কথা হল বি. এ. পার্ট ওয়ানের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অনার্সের

দৃষ্টিহীন বোনেরা ধূপকাঠি ভরছে

ছাত্র দৃষ্টিহীন কৃষ্ণকুমার মান্নার সঙ্গে। কৃষ্ণ ধূপকাঠির গোল প্যাকেটগুলোতে লেবেল লাগিয়ে কাঠি ভর্তি করে।

আর্থিক অসচ্ছলতায় দৃষ্টিহীন শিল্প-নিকেতন কয়েকটি নতুন প্রকল্পে হাত দিতে পারছে না। এরা চাইছে সেমি অটোমেটিক মোমবাতির মেসিন এবং খাম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় মেসিনপত্র বসাতে, নারকেল দড়ি তৈরীর প্রকল্প, বোতলের ছিপি তৈরীর প্রকল্প, চক পেন্সিল তৈরীর প্রকল্প গড়ে তুলতে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পেলে এই প্রকল্প থেকে আরও দৃষ্টিহীন ও বিকলাঙ্গ ভাই বোনদের কর্ম্মসংস্থান সম্ভব হয়ে উঠবে।

এছাড়া কৃষ্ণ ডলি, মনীষা, শম্ভু প্রভৃতি দৃষ্টিহীন তথা বিকলাঙ্গ ভাই-বোনদের একটা সমস্যা হল যাতায়াত করার ভীষণ অসুবিধা। আলোক-চিত্র শিল্পী দিলীপ মুখোপাধ্যায় যখন ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছিলেন তখন আমাদের কাছে ওরা জানালো, "যাতায়াত করা আমাদের কাছে এক ভীষণ অসুবিধা। তাই আমাদের জন্য আবাসিক গৃহ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। জনসাধারণ ও সরকার আমাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে আমাদের আবাসিক গৃহ নির্মাণে সহায়তা করুন, বাসস্থান পেলে আমরা আরও বেশী কাজ করতে পারবো। সমাজের কিছু সমস্যা তো কমবে।"

মহিলা মহল

গৃহিণীরাই পারেন পরিবারের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে

বাণী চট্টোপাধ্যায়

আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা আধুনিক গৃহপরিবেশে সুগৃহিণীর অভাব। গৃহিণী সকলেই কিন্তু কথা হচ্ছে সুগৃহিণী কতজন হতে পারেন? কেননা গৃহিণীর ওপরেই সমগ্র পরিবারের স্বাস্থ্য ও স্থায়িত্ব টিঁকে থাকে মোটামুটিভাবে। বর্ত্তমান যুগ হল কর্মব্যস্ততার যুগ। হয়তো গৃহিণীরা বলবেন, আমাদের সময় কোথায় পরিবারের সমস্ত লোকের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়ে চলার। কিন্তু কথা হচ্ছে এতে কিন্তু আপনার সময় খুব একটা খরচ হবেনা। দরকার আপনার দৃষ্টিভঙ্গির। কেননা একজন গৃহিণী, মানে সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য হল গৃহের প্রত্যেকটি লোকের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা। সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য হল শিশু বয়স থেকেই তিনি গৃহের সকল সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলো অভ্যাস করাবেন। ছেলে-মেয়েদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দাঁতের গঠন যাতে ভাল হয় গৃহিণী তার চেষ্টা করবেন। যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজবার সময় দাঁতের মাড়ি রগড়ান, চোখে যাতে পিচুটি না থাকে সেজন্য প্রচুর জল দিয়ে চোখ ধোয়া, খাবার পর মুখ কুলকুচ করা, নখ কাটা, মেরুদণ্ড সোজা করে বসা ইত্যাদি। জ্বর, সর্দিকাশি, আমাশয় ইত্যাদি সাধারণ রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো সবসময় সম্ভব হয়না। এই সকল রোগের পরিচর্যা গৃহিণীর বাড়ীতেই করা উচিৎ। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গৃহিণী বাড়ীতেই প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা রাখবেন। সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ এড়াবার জন্য প্রতি বছর বাড়ীর লোকদের টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা করাও সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য।

এর পরের প্রসঙ্গ খাদ্যের কথায় আসা যেতে পারে। পরিবারের খাদ্য পরিকল্পনার সময় গৃহিণীর প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে পরিবারের সকলে সুষম খাদ্য পাচ্ছে কিনা। তাছাড়া সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে রান্নার সময় যতদূর সম্ভব খাদ্যবস্তুর ভিটামিন যেন খাদ্যদ্রব্যে বজায় থাকে। যেমন, তরকারীর খোসা যতদূর সম্ভব না ফেলাই ভাল। কারণ এতে তরিতরকারীর ভিটামিনটাই ফেলে দেওয়া হয়। কেননা খোসাতেই ভিটামিন চলে যায়। তারপর, ভাতের মাড় না ফেলা—সম্ভব হলে। সুষম খাদ্য প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি অগ্নিমূল্য প্রোটিনবহুল খাদ্য আমাদের গরীব দেশে সংগ্রহ করা খুবই শক্ত। ডাল প্রাণিজ প্রোটিনবহুল খাদ্য অপেক্ষা অনেক সস্তা ; এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ডিম, দুধ থেকেও ডালে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী। কিন্তু দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে প্রাণিজ প্রোটিনের প্রয়োজন অনেক বেশী, এজন্য মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি খাদ্য থেকে একেবারে বাদ দেওয়া চলবে না। সয়াবীনে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। যদিও এই প্রোটিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং প্রাত্যহিক খাদ্যে কিছু সয়াবীন যোগ করলে প্রোটিনের অভাব কিছুটা পূরণ হয়। প্রোটিনের পরিমাণ কমালেই ডালের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ভাত, রুটি ইত্যাদির পরিমাণ কমিয়ে ঐ তাপমূল্যের সমান ঘি, ডালডা ইত্যাদি দিয়ে পূরণ করা উচিৎ। কিন্তু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য স্নেহ-প্রধান খাদ্যের তুলনায় সস্তা। সুতরাং আর্থিক দিক থেকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমিয়ে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বাড়াবার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে সুগৃহিণীকে যদি পরিবারের স্বাস্থ্য ঠিকমতো বজায় রাখতে হয় তাহলে প্রাণিজ প্রোটিনকে একেবারে খুব কমালে চলবে না।

খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আর একটা প্রয়োজনীয় কথা হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। যে পাত্রে খাদ্য তৈরী করবেন তা যেন সবসময়ই পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে থাকা চাই। ভাল পরিষ্কার জলে আহার্য বস্তু ও বাসন কোসন ধোয়া হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। খাবারের পরিচ্ছন্নতা রক্ষাই বোধহয় সুগৃহিণীর সর্বপ্রথম কর্তব্য। কারণ খাদ্যবস্তুর সঙ্গে বহু রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

সমগ্র পরিবারের মধ্যে বোধহয় বৃদ্ধ ও শিশুর স্বাস্থ্য বজায় রাখাই কঠিন। কারণ বৃদ্ধ ও শিশুরা বোধহয় একই পর্যায়ে পড়ে। কারণ বৃদ্ধ ও শিশুরাই সমগ্র পরিবারের মধ্যে দুর্বল ও অসহায়। কারণ বৃদ্ধ বয়সে দেহযন্ত্রের প্রতিটি অংশেরই কার্যক্ষমতা কমে যায়। সুতরাং তখন তাদের খাবারের ওপর গৃহিণীর সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তেমনি বৃদ্ধের খাদ্য ব্যবস্থায় দৈহিক ক্ষয় পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ করবার শক্তি যাতে বাড়ে সে দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সময় প্রোটিন কম দেবেন এবং স্নেহ পদার্থ হজমের শক্তি এই বৃদ্ধ বয়সে অনেক কমে যায়।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্রন্থ আলোচনা
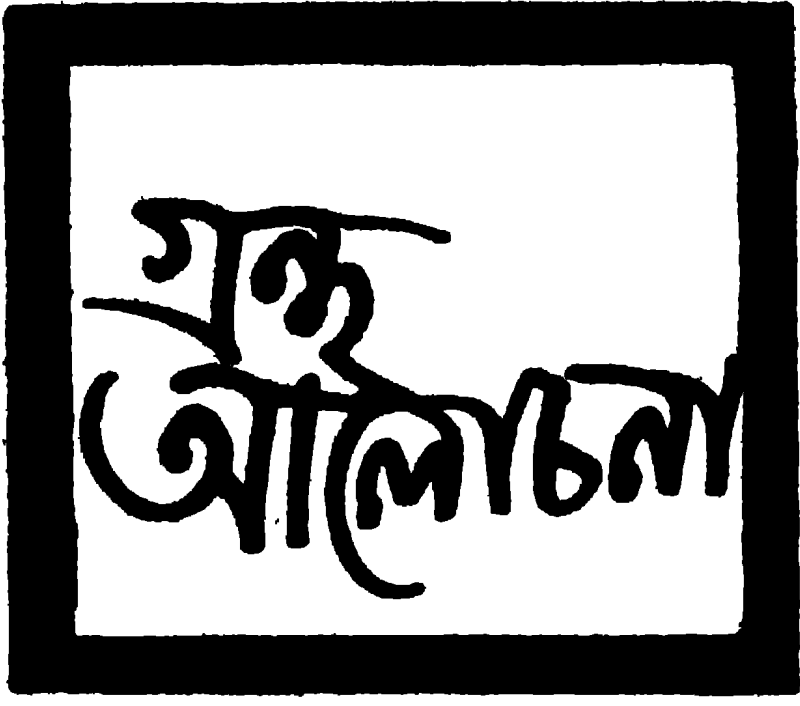
তালবাতাসী। উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পত্রমিতা। ৫৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে হরিপদ ঘোষ প্রকাশ করেছেন। দাম : এক টাকা।

সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগেই উষাপ্রসন্নের দরাজ হাত। গল্প ফিচার নক্সা কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে তিনি অনেক লিখেছেন। সেসব কবিতাকে একসূত্রে গেঁথেই হয়তো তালবাতাসী। তবে তার দুতিনটি কবিতা যা আমি অন্যত্র পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম তা বইয়ে দেখছি না।

পকেট কবিতা সিরিজের এটি কত নম্বর বই তা জানিনা। তবে পত্রমিতা জানাচ্ছেন কবিতাকে জনপ্রিয় করতে এক টাকায় একটি প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে দামই এখানে কবিতাকে জনপ্রিয় করার মাপকাঠি কি? যাই হউক উদ্যোগ ভাল। পত্রমিতা চালিয়ে গেলে সাধুবাদ পাবেন।

উষাপ্রসন্নর কবিতার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক সরল চিন্তা ও বিষয়। যা হৃদয় ও মনকে নাড়া দেয় সহজেই। বিষয়-বস্তু, মনন ও মানসিকতায় তিনি গতানুগতিক। কবিতার আঙ্গিক নিয়েও তিনি খুব একটা মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হ'লনা। তবুও কয়েকটি নিটোল কবিতা মনকে নাড়া দেয়। অবিন্যস্ত ছন্দ-বিন্যাসের মধ্য দিয়েও তিনি একটা ছন্দের আমেজ এনে দিতে পেরেছেন। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য হলেও মনে তা দীর্ঘস্থায়ী করে রাখেনা। এটাই বোধহয় তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় দোষ।

কবি উষাপ্রসন্নকে দেখি তার কবিতায় হাজার শব্দের চেতনায় বাদশাহী আফিসের মৌতাতে আজীবন বুঁদ, প্রায়ই গতিহীন শ্লথ স্থবির হয়ে আছেন, আবার কখনও অনাবশ্যক নষ্টালজিয়ায় ক্ষেপে উঠে বলেছেন জেনো নকল; নতজানু......। প্রায় প্রতিটি কবিতা পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে ফেলি, দীর্ঘসূত্রতায় জড়িয়ে পড়ি। অথচ কবিতাগুলি দীর্ঘ নয়। আকষিত লতার মতো উষাবাবু আন্তরিক বন্ধুর মতো এগিয়ে আসেন এলিয়টিয় কায়দায়। কবি বুদ্ধদেব বসুর ছোঁয়া পাই তাতে—কিছুটা বা মুগ্ধ হই, ধরা পড়ি। এলোমেলো প্রান্তরে কিছুটা উদ্দেশ্যহীন ঘোরার মত। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই প্রাচীন। আধুনিক, শরীরহীন, মধ্যরাতে শীতের বাতাস কাটতে কাটতে দ্রুতগামী ট্রেন এগিয়ে, বহুদিন লেভেল ক্রসিংয়ে মশাল নিয়ে বসে থাকে আধো ঘুমের ওই লোকটা। এসব যেন স্বপ্ন। তাই বাস্তব চিন্তা কবিতায় স্থান পায়নি এখানে। তবুও আশা জাগে রাইন রমণী খাঁটি জার্মান ভাষায় যখন বিদায় জানায়—'আউফ ভিদাজেন'।

তবুও আমরা স্বপ্নের রমণীর মত ট্রাইলে স্বপ্ন দেখি ভাল লাগে কিছু কবিতা —রূপসা পেরিয়ে, তিনটি শালিক দেখে, বুকুনের জন্যে কবিতা ও তালবাতাসী। এরপর আরো অনেক ভাল কবিতা উষাবাবুর পরবর্তী বইয়ে পাব। কারণ তাঁর কবিতার হাত দরাজ সরল।

আর একটা কথা বলি ২৪ পৃষ্ঠার ২৬টি কবিতার বইয়ে সূচীপত্রে গণ্ডগোল ও ভূমিকায় কোন কবির সার্টিফিকেট জোড়াটা প্রাচীন পন্থা। ছাপা খুবই পরিপাটি।

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

অন্তর্লোক। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্তিস্থান : মল্লিক ব্রাদার্স ৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা।

নতুন কবি ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটি দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট তেইশটি কবিতা আছে। শ্রেণীবিভাগ করলে কবিতাগুলির দুটি ধারা চোখে পড়ে—একটি প্রাচীন ভাবধারা অনুসারী, আর একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রকৃতি সৌন্দর্য, প্রেম ও আদর্শবাদ, যেমন তাঁকে আকর্ষণ করে, তেমনি তিনি আহতও ক্ষতবিক্ষত হন দৈনন্দিন জীবনধারণের দৈন্য কুশ্রীতা যন্ত্রণা ও কলুষকালিমায়। মননশীলতা ও আন্তরিকতা তার কবিতায় অলক্ষ্য নয়।

মানসনিরীক্ষা ও তত্ত্বমূলক কবিতায় তার বিশেষ প্রবণতা আছে। এই শ্রেণীর কবিতা—অন্তর্লোক, তমসো মা জ্যোতির্গময়, উন্মোচন, দিনান্তের ক্ষোভ ও অন্বেষণ প্রভৃতি। তাঁর আলোক সন্ধান অতন্দ্র। কবি ও সাহিত্যিকদের স্মরণে তাঁর কবিতায় তেমন নতুনত্ব নেই। এই শ্রেণীর কবিতা—পঁচিশে বৈশাখ, শরৎচন্দ্র ও সুকান্ত। এখানে যারা 'নিপীড়িত মানবাত্মার অব্যক্ত ক্রন্দনে' সাড়া দিয়েছেন তাদের প্রতি তিনি আস্থা প্রকাশ করেছেন, আন্তরিক সংযোগ রক্ষার প্রয়াস করেছেন।

মিলন বিরহ প্রতীক্ষা আর্তি প্রণয়াকাঙ্খা ও স্বপ্নভঙ্গে তার প্রেমের কবিতাগুলি কোন অনিবার্য নতুন পথ-পরিক্রমা করেনি, পুরনো পথেই ঘুরে ফিরে এসেছে। অভিমা, অন্তর্লীনা ও দেহাতীতা কবিতায় তিনি প্রেমের বাস্তবরূপের সঙ্গে দেশকালোত্তীর্ণ চিরন্তন রূপেরও সন্ধান করেছেন। 'রোগশয্যায়' সুন্দর নিসর্গ-কবিতা। গ্রন্থটিতে কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্টিকটু হয়েছে।

স্নেহময় সিংহ রায়

কেমন করে পাবো

অসিতবরণ পাল

কথায় বলে "ফেল কড়ি, মাখ তেল।" যদি পেতে চাও তবে পয়সা ছাড়। তরিতরকারীর কথাই বলছি। বাজারে গিয়ে দেখুন, শাকসব্জী অগ্নিমূল্য। আহার শাস্ত্রীরা বলছেন দৈনিক মাথা পিছু কমপক্ষে ৩০০ গ্রাম তাজা এবং কাঁচা সব্জী খান। তবেই স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। শুনেই মাথায় হাত। কিন্তু উপায় আছে। উৎপাদন করুন। জমি থাকে তবে লাগান নানান জাতির সব্জী। তা না হলে মাটির গামলাতে কাঠের বাক্সে অথবা সিমেন্টের টবে মাটি ভরে গাছ লাগান। সারা বছর তাজা সব্জী পাবেন।

এর জন্য আগে একটা মোটামুটি পরিকল্পনা তৈরী করে নিন। এমনভাবে তরকারী লাগাবেন যেন সব সময় একটা না একটা কিছু ফলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। জমি তৈরী করে তাকে ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে দিন। এক একটা প্লটে এক একটা সব্জী লাগান হবে তা আবার পর্য্যায়ক্রমে। কোন সব্জী সবটা এক সঙ্গে না লাগিয়ে ২০।২৫ দিন বাদে আবার লাগান। একটা শেষ হতে না হতে আর একটা তৈরী। কোন কোন সব্জীর আবার ২।৩ প্রকার শ্রেণী আছে যারা জলদি, মাঝারী অথবা দেরীতে তৈরী হয় যেমন—মটর, কপি, মূলো, আলু ইত্যাদি। এক সঙ্গে একাধিক শ্রেণীর বীজ লাগিয়ে দিলেও পর পর তৈরী হতে থাকবে। কোন ঋতুতে কোন সব্জী লাগান যাবে তার একটা তালিকা দেওয়া হোল।

গ্রীষ্ম এবং বর্ষা

চ্যাড়স, লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে বা করলা, শশা, বেগুন, টম্যাটো, কচু, পুঁইশাক, লাল শাক, ফরাসবীন, বরবটী ইত্যাদি।

শীত

বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওল-কপি, শালগম, মূলো, গাজর, বীট, মটর, পালংশাক, লেটুশ, পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদি।

উৎপাদন পরিকল্পনার একটা নমুনা দেওয়া হলো। এক একটা প্লটে—একের পর এক তিনবার সব্জী লাগান যেতে পারে। লক্ষ্য করুন এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক মাসে কোন না কোন সব্জী তৈরী হতে থাকবে।

প্লট নং	সব্জী	লাগাবার সময়	তুলবার সময়
১	ফরাসবীন	মাঘ	চৈত্র, বৈশাখ
	ফুলকপি (আগাম)	আষাঢ়	আশ্বিন
	পালং শাক	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ, পৌষ
২	টম্যাটো	কার্ত্তিক	মাঘ, ফাল্গুন
	বরবটী	চৈত্র	জ্যৈষ্ঠ
	বেগুন	আষাঢ়	কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ
৩	মূলো	কার্ত্তিক থেকে পৌষ	অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ
	কুমড়ো	ফাল্গুন	আষাঢ়
	লালশাক, পাটশাক	আষাঢ়	শ্রাবণ, ভাদ্র
৪	বাঁধা কপি	কার্ত্তিক	মাঘ, ফাল্গুন
	শশা	চৈত্র	আষাঢ়
	পালং	শ্রাবণ	ভাদ্র, আশ্বিন
৫	আলু	কার্ত্তিক	মাঘ, ফাল্গুন
	ঢ্যাঁড়শ	চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র

কোন কোন সব্জী যেমন মূলো, গাজর, শাক ইত্যাদি দুই প্লটের মাঝখানে আলের উপরেও লাগাতে পারা যায়। জমির চার ধারে লতাজাতীয় সব্জী যেমন লাউ, ঝিঙে, কুমড়ো, পটল, করলা, পুঁইশাক ইত্যাদি বেড়া অথবা পাঁচিলের উপর লতিয়ে দিতে পারা যায়। বাগানের কোণাতে ২।১ টা কলা গাছ, ২।৪ টা লঙ্কা গাছ একটা সজনে গাছ লাগিয়ে দিলে কিছু বাড়তি সব্জীও পাওয়া যাবে। জমি না থাকে গামলাতেও এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তরকারী লাগাতে পারেন।

আজকাল তরিতরকারীর কতকগুলি উন্নত জাত বেরিয়েছে। সেগুলি লাগালে বেশী পরিমাণে এবং উন্নত মানের সব্জী পাবেন। কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। এসব বীজ রাষ্ট্রীয় বীজ নিগম এর বিক্রয়কেন্দ্রগুলি থেকে সরবরাহ করা হয়।

সব্জী লাগাবার ১৫ দিন আগেই মাটি খুঁড়ে সম্ভবমত পচা গোবর সার অথবা রেড়ী, সরষে, নিম অথবা করঞ্জ এর খোল গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিন। লাগাবার ঠিক আগে একভাগ সালফেট অথবা আধভাগ ইউরিয়া, দেড়ভাগ সুপার ফসফেট এবং আধভাগ পটাশ সার একসঙ্গে মিশিয়ে মাটীতে দিন। চারা বেরুবার

উন্নত জাতের বীজের তালিকা

বেগুন	আর্কা নীল	মুলো	পুশা চেতকী
টমাটো	পুসা রুবী	শালগম	পুসা চন্দ্রিমা
মটর	বোন ভিলে	লাউ	পুসা মেঘদূত
ফরাসবীন	কণ্টেণ্ডার	কুমড়ো	আর্কা চন্দন
বরবটী	পুসা দোফশলী	ফুলকপি	পুশা কাতকী
পালং	পুসা জ্যোতি		স্নোবল
ঢ্যাঁড়শ	পুসা শাওনী	বাঁধাকপি	ড্রামহেড

এক দেড় মাস পরে ঐ মাত্রায় সালফেট অথবা ইউরিয়া গাছের চার পাশে ছড়িয়ে মাটি খুঁড়ে মিশিয়ে দিন। পরে জল দিন।

শুধু বীজ লাগিয়ে সার দিলেই কাজ শেষ নয়। রীতিমত এবং নিয়মিত পরিচর্য্যাও দরকার। মাঝে মধ্যে ঘাস বা অন্য আগাছা তুলে ফেলুন। মাটি খুঁড়ে হাল্কা রাখুন। পোকা মাকড় এবং রোগের উপদ্রব হতে পারে। কিছু কীটনাশক ঔষধ যেমন রোগোর, সেভিন, একাটক্স এবং রোগনাশক ঔষধ যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, ব্লাইটক্স, কুমান, ক্যারাথেন কিনে রাখুন। ঔষধের সঙ্গে নিয়মাবলী পাবেন। দরকার মত ব্যবহার করুন।

গৃহিণীরাই পারেন পরিবারের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে

১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সুতরাং সুগৃহিণীর উচিত বৃদ্ধদের খাদ্যে স্নেহের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া। সহজ পাচ্য স্নেহ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করালে পেটের গোলমাল লেগেই থাকবে। দুধের স্নেহ সহজ পাচ্য। সুতরাং স্নেহের অভাব তেল, ডালডা ইত্যাদি খাদ্যের বদলে দুধ, মাখন প্রভৃতি থেকে পূরণ করাই ভাল। কার্বহাইড্রেটের পরিমাণও এই বয়সে কমাতে হবে। যথা, চিনি, মিশ্রি ইত্যাদি কম খেয়ে রুটি, ভাত ইত্যাদি খাওয়া ভাল। দুধে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। সুতরাং শরীর সুস্থ এবং জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য সুগৃহিণীর উচিত পরিবারের বৃদ্ধদের বেশী করে দুধ দেওয়া। বৃদ্ধদের মধ্যে প্রায়ই রক্তাল্পতা দেখা যায়; সেজন্য মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করা উচিত। কেননা যকৃত লৌহঘটিত খাদ্য। ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায়ই বৃদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়, সেজন্য খাদ্যে প্রচুর ফলের ব্যবস্থা করা উচিত। শাক-সব্জি কম দেওয়া ভাল কারণ অজীর্ণ ও বদ হজমের সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ জল দেবেন বৃদ্ধদের খাদ্যের সঙ্গে। যতদূর সম্ভব বৃদ্ধদের স্নেহ জাতীয় খাদ্য, ভাজা, কেক, পুডিং এবং বেশী মিষ্টিজাতীয় খাদ্য না দেওয়াই গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

গৃহিণীরা কিভাবে পরিবারের শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন তার প্রসঙ্গে বলা যায় শিশুদের যাতে পুষ্টিকর খাদ্য ঠিকমতো দেওয়া হয় তার জন্যে সুগৃহিণীর সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। সন্তোষজনকভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা শিশুদের জন্যে করতে হলে সবসময় এই খাদ্যগুলোর কথা গৃহিণীদের মনে রাখা উচিত। যেমন তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য গম, যব, রাগী, জোয়ার ইত্যাদি। আধ সের দুধ। সম্ভব হলে ১ সের দুধ। আমিষ জাতীয় খাদ্য যথা মাছ, মাংস, ডিম, চীনাবাদাম, ছোলা ডাল ইত্যাদি। চা চামচের দুই বা তিন চামচ ঘি বা মাখন, পাতা জাতীয় সবুজ হলদে অথবা হলদে সব্জী। ফল অথবা সব্জী; যাতে সি ভিটামিন বেশী থাকতে পারে যেমন, আমলকী, টম্যাটো, পেঁড়স, পাতিলেবু, কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি।

এরসঙ্গে থাকবে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য—আলু, সাবু, অথবা চাল।

খুব যারা ছোট তাদের খাদ্য থেকে এগুলো বাদ দেওয়া উচিত।

(১) অত্যধিক ঝাল ও মশলা দেওয়া খাদ্য।

(২) ভাজা জাতীয় খাদ্য।

(৩) শক্ত এবং আঁশযুক্ত খাদ্য।

(৪) চা বা কফি

(৫) অতিরিক্ত মিষ্টিযুক্ত খাদ্য।

সুগৃহিণীর উচিত বাচ্চাদের অল্প অল্প করে খাওয়ানো। জোর করে কখনই তাদের খাওয়ানো উচিত নয়।

সবসময় শিশুদের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। শিশুদের খাদ্যে সবসময় বৈচিত্র্য থাকা উচিত। স্বাদ, গন্ধ যেন সব ঠিক থাকে, তা দেখা দরকার। শিশুরা ভাজাভুজি, মুচমুচে সব জিনিষ যেমন আলুভাজা, কাঁচা গাজর, শশা ইত্যাদি খুব পছন্দ করে। তাছাড়া ডিম সেদ্ধ, মটরশুটি, গাজর এগুলো ওরা খুব ভালবাসে। এগুলো দিতে পারেন। আর সবসময় সুগৃহিণীর দেখা দরকার যাতে শিশুদের খাবার-সময়ে গোলমাল না হয়। এতে বাচ্চাদের হজমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সমগ্র পরিবারের স্বাস্থ্য ঠিকমত বজায় রাখতে গেলে সু-গৃহিণীর কতদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা তাদের সর্বপ্রধান কর্ত্তব্যই হল সকলের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখা। পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ভাল যদি রাখতে পারেন সেখানেই হবে সুগৃহিণীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

রাসায়নিক সার তৈরীর কাজে পাথর

সুনীলসাগর ভট্টাচার্য্য

এদেশে চাষের জমিতে সারের প্রয়োগ নতুন কোন ব্যাপার নয়। নানারকম জৈব সারের প্রচলন ছিল বহুযুগ ধরে। তবে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রচলন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। এর একটা প্রধান কারণ ছিল এদেশে ঐ ধরণের সারের উৎপাদন না হওয়া। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর দেশে রাসায়নিক সারের অনেকগুলি উৎপাদন ক্ষেত্র তৈরী হওয়ার ফলে এবং কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষা-বিস্তারের প্রভাবে রাসায়নিক সারের প্রচলন অনেক বেড়ে গেছে। এই সঙ্গে রাসায়নিক সার প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। কাঁচামালগুলির মধ্যে রয়েছে কয়েক ধরণের পাথর, যা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে। আজকের আলোচনা সেই পাথরগুলি নিয়ে। কি রকম সেই পাথরগুলি? সেই সব পাথর আমাদের দেশে কোথাও পাওয়া যায় কি? পেলেও প্রকৃতিতে কেমন ভাবে থাকে? সার তৈরীর কাজেই বা তা কেমন করে ব্যবহার হচ্ছে? এসব প্রশ্ন তুললে একে একে অনেক কথাই এসে পড়ে। সংক্ষেপে বিষয়গুলি জানবার চেষ্টা করা যাক্।

যে রাসায়নিক সারগুলি আজকাল ব্যবহার হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—ফসফেট ঘটিত সার ও নাইট্রোজেন ঘটিত সার। পটাশ সারের (যেমন Saltpetre) যদিও ব্যবহার আছে তার চলন খুব কম। এই সারগুলিতে কাঁচামাল হিসেবে যে প্রাকৃতিক পাথরগুলি ব্যবহার হয় একে একে তাদের কথা বলি।

ফসফেট-জাতীয় সারের প্রধান উপাদান হল 'অ্যাপাটাইট' (Apatite) অথবা অন্য একটি খনিজ—'রক্ ফসফেট্' (Rock phosphate)। অ্যাপাটাইট হল এমন একটি খনিজ যা সাধারণত আগ্নেয়শিলার সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে। রং কখনও বা হালকা নীলাভ, কখনও ধূসর, আবার কখনও বা ফিকে হলুদ। মানুষের শরীরে যেমন শিরা-উপশিরা বিস্তৃত হয়ে থাকে, আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলার মধ্যে কোথাও কোথাও এই বস্তুটি সেইভাবে ছড়িয়ে থাকে। 'রক্ ফসফেট'-এর প্রাকৃতিক অবস্থিতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট করে বলা মুস্কিল, তবে পাললিক শিলার মধ্যে কোথাও কোথাও স্তরের অনেকটা অংশ জুড়ে 'ক্যালসিয়াম ফসফেট' উপাদানটি প্রচুর পরিমাণে থাকার ফলে সেই অংশের পাথরকেই 'রক ফসফেট' বলা হয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 'ক্যালসিয়াম ফসফেট' উপাদানটি শিলাস্তরে একধরণের নুড়ি বা ঢেলার সঙ্গে মিশে থাকে; আর এগুলোকে বলা যেতে পারে 'ফসফেটনুড়ি' বা 'ফসফেট গুলি' (Phosphatic nodule)।

ভারতে সাধারণত 'রক্ ফসফেট'-ই সার তৈরীর কাজে ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে। তবে ফসফেট পাথর সার তৈরীর উপযোগী কিনা তা যাচাই করার জন্য এই পাথরের যে গুণগুলি ধরা হয় তা হল 'রক্ ফসফেটে' অন্তত শতকরা ২৭ ভাগ 'ফসফোরাস পেন্টক্সাইড' (Phosphorus Pentoxide) অথবা শতকরা ৭০ ভাগ 'বোন্ ফসফেট অব লাইম্ (Bone Phosphate of lime) থাকা চাই। এছাড়া লোহা ও এ্যালু-মিনিয়ামের অক্সাইড শতকরা ৩ ভাগের মধ্যে সীমিত থাকা দরকার।

প্রাকৃতিক ফস্ফেট পাথরকে প্রথমে ব্যবহার করা হয় ফস্ফোরিক এ্যাসিড তৈরীর কাজে। তারপর গুঁড়ো করা ফস্ফেট পাথরের সঙ্গে এই এ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে নানারকম ফস্ফেটঘটিত সার তৈরী হয়ে থাকে। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়েও একধরণের সার করা হয়ে থাকে।

বছর পনেরো আগেও এই 'রক্ ফস্ফেট'-এর জন্য ভারতকে আমদানীর ওপরই নির্ভর করতে হত। বিহারের সিংভূম জেলায় অ্যাপাটাইট যেটুকু পাওয়া যায় বহুদিন থেকেই তা অন্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অত্যন্ত সুখের কথা এই যে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে এদেশে অনেক জায়গাতেই 'রক্ ফস্ফেট' পাওয়া গেছে। ভারতে মোট সঞ্চয়ের একটা খসড়া পরিমাপের হিসাবে দেখা গেছে এই জিনিসটির প্রাকৃতিক সঞ্চয় আছে প্রায় ৬ কোটি মেট্রিক টনের মত। অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনমে, তামিলনাড়ুতে তিরুচিরাপল্লী, দক্ষিণ আর্কট, আর পণ্ডি-চেরীতে, উত্তরপ্রদেশের মুসৌরী এবং রাজস্থানের বার্মার জেলাতেও এই জিনিসটির সন্ধান পাওয়া গেছে। বলাই বাহুল্য যে ফস্ফেট পাথরে আসল ফস্ফেট উপাদানটির পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয়, তবে সাধারণত শতকরা ১০ ভাগ থেকে শতকরা ৩০ ভাগের মধ্যে দেখা যায়। প্রয়োজনে অবশ্য পাথরগুলিকে শোধন করে সার তৈরীর কাজে কিছুটা উন্নত ধরণের কাঁচামাল পাওয়া সম্ভব।

নাইট্রোজেন ঘটিত সারের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেটের ব্যবহারই খুব বেশী। এই জিনিষটি তৈরীর জন্য যে কয়টি কাঁচামাল প্রয়োজন জিপসাম নামক খনিজটি তার মধ্যে অন্যতম। খুব নরম খনিজ বলে এ জিনিষটির খ্যাতি আছে। রং অনেক সময়েই খুব ফিকে হলুদ বা সাদা, তবে রেশমের মত একটা চকচকে জৌলুস সব সময়েই গায়ে মাখা থাকে। প্রাকৃতিক অবস্থায় সাধারণত স্তরীভূত পাললিক শিলার আকারেই জিপসামকে

পাওয়া যায়। পাললিক স্তরের চিহ্নগুলি লোপ পেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ জমাট আকারেও জিনিষটি পাওয়া যায়। আবার কোথাও কোথাও অন্য পাথরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে অনেকটা শরীরের মধ্যে শিরা-উপশিরার মত। সার প্রস্তুতের জন্য যে জিপসাম প্রয়োজন তার বেশ কিছুটা বিশুদ্ধতা থাকা দরকার। ভারতে এখন জিপসাম যতটা উৎপন্ন হয় তার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই সিন্ধ্রি সার তৈরীর কারখানা গ্রহণ করে। এখানে যে ধরণের জিপসামের চাহিদা তা হল: জিপসাম শতকরা ৮৫ ভাগ বিশুদ্ধ হবে, তাতে ক্লোরাইড লবণ শতকরা ০.০১ ভাগ এবং সিলিকা (Sio 2) বা বালি-অংশ শতকরা ৬ ভাগ এর মধ্যে সীমিত হবে।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে জিপসামের প্রাকৃতিক সঞ্চয় ভারতে ভালোই। এপর্যন্ত অনুসন্ধান করে যতটা জানা গেছে —মোট সঞ্চয় হবে প্রায় ১২ কোটি মেট্রিক টন। সম্ভবত এশিয়ায় আর কোন দেশেই এই জিনিষটির প্রাকৃতিক সঞ্চয় এত বেশী নেই। ভারতে প্রাকৃতিক সঞ্চয়ের বেশীর ভাগটাই পশ্চিমাঞ্চলে—রাজস্থানে ও গুজরাটে। বর্তমানে অবশ্য রাজস্থান থেকেই সিন্ধ্রির সার কারখানার জন্য জিপসাম আসছে। রাজস্থানের জিপসাম খনিগুলির মধ্যে বিকানীর, নানাউর, যোধপুর, জয়সলমীর ও বার্মার জেলার খনিগুলিতে প্রচুর জিপসাম উৎপন্ন হয়। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের দোদা ও বরমূলা জেলাতে প্রচুর জিপসাম পাওয়া গেছে যা সার তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া উত্তর প্রদেশে দেরাদুন, গাড়োয়াল, নৈনিতাল জেলায়; হিমাচল প্রদেশে কাংড়া ও সিরমুর জেলায় জিপসামের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রেও কিছুটা জিপসামের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর ও গুজরাটের কয়েকটি স্থানের জিপসাম গুণগত উৎকর্ষে সবার উপরে।

পটাশ সারের প্রধান প্রাকৃতিক উৎস 'সল্ট পিটার' জিনিসটি সাদা এবং গুঁড়ো গুঁড়ো অবস্থায় গাঙ্গেয় সমভূমির কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায়, বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে কাঠ আর গোবরকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উত্তর প্রদেশে কানপুর, গাজীপুর, এলাহাবাদ ও বারানসী জেলা, উত্তর বিহারে সারণ, চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর জেলা, আর পূর্ব পাঞ্জাবের কয়েকটি জায়গায় সল্টপিটার শুকনো আবহাওয়ার সময়ে মাটির ওপর ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিসটি অবশ্য সংগ্রহ করে রাসায়নিক পদ্ধতিতে কিছুটা শোধন করে নিতে হয়।

দেশে ক্রমবর্দ্ধমান সারের চাহিদা মেটাবার জন্য কাঁচামাল হিসেবে প্রয়োজনীয় পাথরগুলির চাহিদাও বেড়ে চলেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে, ১৯৮০-৮১ সনের মধ্যে দেশে রক্ ফসফেটের চাহিদা বাৎসরিক ৭৫ লক্ষ টনের মত হবে বলে ধরা হয়েছে; আর ঐ সময় নাগাদ জিপসামের প্রয়োজন হবে ২০ লক্ষ টনেরও বেশী। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় অবশ্য এপর্যন্ত খনিজগুলির প্রচুর প্রাকৃতিক সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে; তবু এই সন্ধানের প্রয়োজন কমে যাবে না। বরং ক্রমশ বেড়েই যাবে, কারণ মনে রাখতে হবে আমাদের ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান। আর কৃষির উন্নতির জন্য সারের প্রয়োজন।

আইসক্রিমের দিগ্বিজয়

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কিছুতেই রাজী নন। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি নিজের মুখেই তুলে নিলেন সেই জমাট হালুয়া। আঃ কি দারুণ! কি দারুণ এর স্বাদ! ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তিনি ডেকে পাঠালেন জনসনকে। তখন সে বেচারা জেল-খানায় ফাঁসীর দিন গুনছে। অতঃপর ছাড়িয়ে আনা হ'ল হতভাগ্য জনসনকে। এ কাহিনী ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জেনে গেল বরফের সাহায্যে আইসক্রীম তৈরীর কৌশল। দেখতে দেখতে তা সবজায়গায় প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠল। দিগ্বিজয় আরম্ভ হ'ল আইসক্রীমের। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, যে আবিষ্কার করেছিল সুস্বাদু এই বস্তুটি, তাকে সেদিন কতইনা অপমানিত হ'তে হয়েছিল। যদিও সে এই পরম রতনের সন্ধান পায় নিজের অজান্তেই।

সিনেমা

'জয়'-পরিচ্ছন্ন কিশোর চিত্র

বাংলা ছবির রাজ্যে ভালো ছবির অভাব এমনিতেই, তার ওপর যদি ভালো শিশুচিত্রের তালিকা তৈরী করতে হয় তাহলে পচাত্তর বছরের বুড়ো এই টালিগঞ্জের ঝুলিতে দশখানা ছবিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সেই কবে 'পরিবর্তন' হয়েছিল—তারপর দীর্ঘ পঁচিশ তিরিশ বছরে আর কি ছবি পেলাম? সত্যজিৎ রায়ের 'গুগাবাবা'। ব্যাস।

আর কোন ছবি নেই কলকাতার পরিবেশকদের কাছে যাকে চেহারায় চরিত্রে এবং মেজাজে খাঁটি শিশুচিত্র বলতে পারি। শিশুচিত্র নামধারী বেশীর ভাগ ছবিগুলিতেই 'বড়োপনা'র আধিক্যই বেশী, যেটুকু আছে তা আদর্শ আর শাসনের আড়ালে ছোটদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী।

সম্প্রতি গুরু বাগচীর নতুন ছবি 'জয়' বাংলা ছবির শিশুচিত্র তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত হবার যোগ্যতা নিয়ে হাজির। যদিও এই ছবি চলতি ধ্যানধারণা বা ফর্মুলার বাইরে নয়, কিন্তু বড়োদের 'বড়োআনায়' এছবি আক্রান্ত নয়। উন্মুক্ত প্রান্তর আর দুঃখ রাগ হাসিতে ভরা কয়েকটি কিশোর মুখ ছড়িয়ে রয়েছে এগার রীল স্থায়ী পর্দায়। শাসনের নামে অপশাসন আছে, আদর্শের ফুলঝুরিও ঝরেছে অনেক কিন্তু ছবির গতিকে ব্যাহত করে কিংবা অপ্রাসঙ্গিকভাবে নয়, কাহিনী, চরিত্র, সিনেমার গতির সঙ্গে তাল রেখে।

পিতৃ আদর্শে অনুপ্রাণিত শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক জয় মা-বাবাকে হারিয়ে স্থান পেল আধুনিকা পিসিমা আণ্টির কাছে। যার আধুনিকতার শৃঙ্খলে জয়ের স্বাভাবিক স্ফুরণ বাধা পায়, প্রতি পদক্ষেপে তাকে আণ্টির বাধা নিষেধ মেনে চলতে হয়। সে বুঝতে পারে গরীবকে দয়া করা, নীচু জাতকে সমান চোখে দেখা—সবই অপরাধ। জয়-পীড়নে আণ্টির সঙ্গে যুক্ত হয় তার বখাটে ছেলে পিকলুও। স্কুলে, স্কুলের বাইরে সর্বত্রই দুজনের মধ্যে চলে রেষারেষি। জয়ের শান্ত-নির্লিপ্ততা পিকলুকে নিষ্ঠুর করে তোলে।

জয়কে উচিত শিক্ষা দেবার চরম মুহূর্তে পিকলু বুঝতে পারে নিজের ভুল। টাকা চুরির বদনাম দিয়ে জয়কে বাড়ি থেকে তাড়ানোর মতলব আঁটে সে। কিন্তু সবকথা ভুলে যাওয়ার অভ্যাসে পোক্ত ভৃত্য ভুলোরাম সবাইকে জানিয়ে দেয় জয়ের এই বিপদের কথা। গ্রাম (শহর) শুদ্ধ সবাই হাজির হয় ওদের বাড়িতে জয়কে আটকাতে। পিকলু নিজের ভুল বুঝে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে, 'ভালো হয়ে চলব....' ইত্যাদি। পিকলুকে জয় করে নেয় জয়, সেই সঙ্গে দর্শকেরও মন জয় করে সে।

জয়/পার্থ ও বুলবুল চৌধুরী

প্রধান চরিত্রগুলির পাশে জয়ের শুভার্থী হিসাবে রয়েছে পিকলুর কিশোরী দিদি, ক্লিপ্টে বুড়ো আর বাড়ির বৃদ্ধা চাকরাণী। এরা তিনজন সাদরে তাকে আপন করে নিয়েছিল প্রথম দর্শনেই। ক্লিপ্টে বুড়োর চরিত্রে ইংরেজী গল্প 'সেল্‌ফিস্ জায়েন্ট'র ছাপ বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তাকে একবারে কাছের মানুষ করে তৈরী করেছেন চিত্রনাট্যকার।

ঘটনার বাহুল্য এবং নাটকীয় ওঠাপড়া ছবিটিকে উপভোগ্য করেছে নিঃসন্দেহে। বিশেষ ভাবে এছবি যাদের জন্য তৈরী সেই শিশু কিশোররা উপভোগ করবে জয়-পিকলুর বিরোধ, ক্লিপ্টে বুড়োর সঙ্গে জয়ের সখ্যতা এবং চাকর ভুলো-রামের কীর্তিকাহিনী। পরিচালক গুরু বাগচী আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সমব্যথী সেজে ছবিটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আর এ ছবির আরেকটি আকর্ষণ হোল ঘাটশিলার নয়ন মনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশে গৃহীত দৃশ্যাবলী। তরুণ চিত্রগ্রাহক মনীষ দাশগুপ্ত বিভিন্ন সময়ে পরিবেশটিকে সুন্দর করে ধরেছেন ক্যামেরায়।

আর অভিনয়? শিশুশিল্পীরা অভিনয়ে কখনই আড়ষ্ট হয় না। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। প্রধান ভূমিকায় মাঃ পার্থ ও পিকলু চরিত্রের শিল্পী অরুনাভ অধিকারীর অভিনয় ছোটদের ভালো লাগবেই, বড়দেরও মন কেড়ে নেবে ওরা। বিকাশ রায় (ক্লিপ্টে বুড়ো) একটা নতুন টাইপ তৈরী করেছেন তাঁর অভিনয়ে। দিলীপ রায়, বুলবুল চৌধুরী অত্যন্ত সংযত চরিত্রো-পযোগী অভিনয় করেছেন। আণ্টির ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী দাপটের সঙ্গে চরিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে পদ্মা দেবী, গীতা কর্মকার প্রমুখ পরিচালকের নির্দেশটুকু মান্য করেছেন।

কিশোর চিত্র হিসাবে বাংলা ছবির ছোট্ট পরিধিতে 'জয়' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ফিল্মের 'ফিল্মত্ব' বাদ দিয়ে উপভোগ্য ছবি ভালো লাগার ছবি হিসাবে 'জয়'-এর জয় অবশ্যম্ভাবী।

নির্মল ধর

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচেতনা

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ও সামাজিক ইতিহাস উভয়েরই উপকরণ আছে। তাঁর লেখা 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'ও 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' নৃতত্ত্বর্ঘেষা ইতিহাস-প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে তিনি ডালটনের এথনোলজি অফ বেঙ্গল ও তৎকালীন আদমসুমারির বিবরণ অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর কতটা উৎসাহ ছিল প্রবন্ধ দুটি তারই সাক্ষ্য। বিবিধ প্রবন্ধে 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধ তিনটি রাজনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে লেখা। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ও 'বঙ্গ দেশের কৃষক' প্রবন্ধ দুটি সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গির নিদর্শন। 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি মুস্লিম ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য অবলম্বনেই দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে ভারতবাসীর রণনৈপুণ্য ও রণবীর্যের অভাব ছিল না। কিন্তু 'হিন্দুর ইতিবৃত্ত নাই'—তাই সেকালের সেই ভারত-গৌরব স্মৃতি রক্ষিত হয়নি। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধেও সেই একই আক্ষেপ। আমাদের এই ইতিহাস বিমুখতার কারণ, বঙ্কিমের মতে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনধর্মের উর্দ্ধচারিতা, ইহবিমুখতা ও দৈবনির্ভরতা।

কিন্তু আমাদের ইতিহাস-উদ্ধার কি অসম্ভব? 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাল ও সেনবংশ বিষয়ক গবেষণার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয় কাহিনী একটি অবাস্তব জনশ্রুতি মাত্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধেও একই আক্ষেপ—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" বাঙ্গালী যে চিরকালই এরূপ হীনবীর্য হতগৌরব ছিল না, বঙ্কিম তার কয়েকটি তথ্যও সংকলন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম থেকেই এসেছিল এই ইতিহাসচেতনা। তাই তিনি লিখেছিলেন,

"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।"

এই প্রবন্ধেই বাঙলার ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণাটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তিনি মনে করেন, বাঙলার ইতিহাস শুরু করতে হবে বাঙালি জাতির উৎপত্তির ইতিহাস দিয়ে। বাঙালি জাতির গঠনে আর্য-অনার্যের পরিমাণ, আদিশূরের পূর্বে বাঙলার রাজ্যগত অবস্থা, মুসলমান সমাগমের পূর্বে বাঙলা দেশের অবস্থা কেমন ছিল, এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তৎকালীন বঙ্গের উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রজাবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন, ধর্ম-দর্শন, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার-বিশ্বাস-প্রথা জ্যোতিষ-বাণিজ্য-শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংকলন করা দরকার। মুসলমান আগমনের পর থেকে পাঠান ও মোগলযুগ সম্পর্কেও তথ্যসংগ্রহরীতি হবে একই প্রকার। এই সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও সমীক্ষার দ্বারা মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত অজস্র অপপ্রচার ও ভ্রান্তধারণাগুলিকে তিনি নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। তথ্যানুসন্ধানে নিশ্চিত হয়েই তিনি বলেছেন, "পাঠানেরা কস্মিনকালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করে নাই।" এই সূত্রে বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে সুঅধীত হওয়ার উপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে ইতিহাস আজও অলিখিত রয়ে গেছে। 'ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই'—বঙ্কিমের এই আদর্শকে শত বৎসরেও আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। এই আত্মতুষ্ট গৌরব-বিলাসী দেশবাসীর পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে পুলকিত হওয়া কি সাজে?

খেলা ধুলা

কলকাতার ফুটবল জমে উঠেছে

কলকাতার ফুটবলের বয়স একশ বছরের মতো হয়ে গেল। কোন কোন ক্রীড়া-সাংবাদিক বা রচনাকারের বক্তব্য অনুযায়ী এ'বছর কলকাতার ফুটবল শতবর্ষে পদার্পণ করল। যদিও এর কোন সঠিক ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

যাই হোক প্রথম ডিভিশন লীগ শুরু হয়ে গেছে। আজব শহর ও শহরতলীর অগণিত ফুটবল প্রেমীদের আগমনে ময়দানী আসর হয়ে উঠেছে আবার কোলাহল মুখরিত। অসংখ্য মানুষের পদবিক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনী ধুলো ওড়াচ্ছে। দেখা নেই। সেইজন্য তীব্র দাবদাহের সঙ্গে ধুলোও একটু বেশী। অসহ্য গরমের মধ্যেও কিন্তু ফুটবলকে ঘিরে ময়দান সরগরম। প্রায় প্রত্যেক দলেরই ৫।৬ টা করে খেলা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। তিন প্রধানের মধ্যে মোহনবাগান, এবং ইষ্টবেঙ্গল এখনও পর্যন্ত পুরো পয়েণ্টের অধিকারী হয়েই বিরাজ করছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলাদণ্ডে কার পাল্লা ভারী সেটা এখনও পর্যন্ত নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

এর কারণ কি? উত্তর দিতে গেলে সেটা অনেকটা নেতিবাচক ভাবেই দিতে হয়। কারণ তিন বড় দলের খেলা দেখে তাদের সমর্থকরা কেউই খুব একটা খুশী হতে পারছেন না। ভরসা করে বলতে পারছেন না "আমাদের দলই শ্রেষ্ঠ।" গত তিন বছরের ময়দানের হিরো এবং এবার জাতীয় ফুটবলে যে খেলোয়াড়ের বিরাট কৃতিত্বে বাংলা সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলল সেই শ্যাম থাপার ক্রীড়া-শৈলী পালতোলা নৌকোয় তুফান আনতে পারছে না। শ্যামের 'খেলার বাঁশীর' মাতাল সুরে আকুল হতে চাইছে মোহনবাগান। কিন্তু মরিচীকা সম আশা, অন্যদিকে কালোর সঙ্গে সাদা মিলিয়ে আর এক 'বালক-শ্যাম' (সুধীরের সহোদর) মহমেডানের ঘর আলো করে তুলছে।

লাল-হলুদ শিবিরের কথা বলি। তাদের রক্ষণদুর্গ এবার প্রায়ই অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। সাধারণ খেলায় ইতিমধ্যেই তাদের জালে তিনবার বল জড়িয়েছে। তাই বলছিলাম ত্রুটিবিহীন কেউ নয়। সবারই ফাঁক-ফোঁকর আছে। তার মধ্যেই অনেকে আশার আলো জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। নামী-দামী খেলোয়াড় পুষ্ট মোহনবাগানের খেলা আশানুরূপ হচ্ছেনা ঠিকই কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে। হাবিব চেষ্টা করছেন লেফ্‌ট-উইংয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে। গোল খোঁজা ছাড়াও আকবরের খেলা এবার খানিকটা গঠনমুখী। চ্যাম্পিয়নের রক্ষণভাগ মোটামুটি সবল। মহমেডানের আজিজ, লতিফুদ্দীন, সাজ্জাদ, বালসুব্রাহ্মনিয়াম, কাজল এবং বলা বাহুল্য শ্যাম হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট তৎপর।

আফগানিস্থানে খেলার জন্য কোন্ কোন্ খেলোয়াড়কে ছাড়তে হয় এই ভয়ে সব দলের সভ্য-সমর্থকরা শঙ্কিত। মোহন-বাগানের সমর্থকরা বলছেন—ইষ্টবেঙ্গলের সুরজিৎ-উলগা-চিন্ময় চলে গেলে কি হবে? ইষ্টবেঙ্গলের সাপোর্টারদের বক্তব্য: মোহনবাগানের দুটো হাফ (গৌতম ও প্রসূন) যাক্, তারপর দেখি কি হয়?

যাই হোক কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছেনা। তিন প্রধানের সঙ্গে লড়ছে এরিয়ান ক্লাব। এদের পরে রয়েছে পোর্ট, জর্জ ইত্যাদি দল। নিচেরদিকে জিমখানা, কাস্টমস—এদের মধ্যে টিকে থাকার লড়াই চলছে।

প্রতিভাধরদের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গলের মিহির-বিমল, মোহনবাগানের মানস-বিদেশ, এরিয়ান্সের উদয়-কেষ্ট, পোর্টের অশোক চ্যাটার্জী-কাশী নন্দী এবং ইষ্টার্ণরেলের অশোক চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সবার কিন্তু লক্ষ্য ইষ্টবেঙ্গল-মোহন-বাগানের ২রা জুলাইয়ে খেলার প্রতি। আগামী সংখ্যায় সেই মহারণের প্রস্তুতি বিষয়ে অনেক মজার খবর থাকবে।

ফুটবলের নায়কেরা

এরিয়ান ঐতিহ্যশালী ক্লাব। দেবগুপ্ত পদ্ম মিত্র, বিদ্যুৎ মজুমদার এদের মত বাঘা বাঘা খেলোয়াড় এদলে খেলে নিজেদের এবং দলের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দু'দশকের আগের কোলকাতার ময়দানে একটি বিরল ঘটনা ঘটেছিল। এরিয়ানের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় বাইকোকাল লেন্সের চশমা পরিহিত দেবগুপ্ত প্রতি-পক্ষের গোলের দিকে এগোচ্ছেন, একক সময় নায়কের ভঙ্গিমায়। ছোটবড় পায়ের কাজে একে একে একাধিক খেলোয়াড়কে অতিক্রম করে তাল গাছের মত গোলকিপার চ্যাটার্জীকেও ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে গেছেন। শূন্য গোলে আলতো ছোঁয়ায় শেষ কাজটি বাকী। কিন্তু চোখ থেকে চশমাটা পড়ে গেছে। অন্ধের মত মাটিতে হাতড়াচ্ছেন, দেবগুপ্ত চশমাটা খুঁজে পাবার জন্য। ইতিমধ্যে চ্যাটার্জী বলটা কুড়িয়ে নিয়ে চশমাটা দেবগুপ্তের হাতে দিলেন। মোহনবাগানের সমর্থকদের বন্ধ হৃৎস্পন্দন সাময়িকভাবে আবার চালু হলো। এরিয়ানের তখনকার খেলার নমুনা ছিল এরকম। এরিয়ান ক্লাবই ইস্টবেঙ্গলকে একবার চার চারটি গোল দেয়। গতবার ওদের ছিনিয়ে নেওয়া একটি পয়েন্টের ব্যবধানেই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের পেছনে থেকে লীগের খেলা শেষ করে। এই এরিয়ানের সঙ্গে লীগের শেষ খেলায় মোহনবাগান কষ্টে জিতে শেষ পর্যন্ত লীগ বিজয়ীর আখ্যা পায়।

এইবার এরিয়ান ক্লাবের অধিনায়কত্ব করার ভার পড়েছে প্রাক্তন রেল দলের খেলোয়াড় মীরকাশেম আলির অনুজ বিশ বছরের নাসিম আলির ওপর।

কলকাতার অলি গলির খেলায় পথচলতি অনেক ক্রীড়ামোদীই হয়ত নাসিমের ব্যাকভলি, গ্রাস্ কাটিং সটে অগুনতি গোল দেখে থাকবেন। তবে বর্তমানে গলির দায়িত্ব নাসিম আলির নয়। কারণ সেই ঘাটের শেষের নাসিমের আজ অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। ছিপছিপে বেতের মত দেহটা দৈর্ঘ্যে আকার নিয়েছে প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি।

এরিয়ান্সের দলনায়ক নাসিম

মহমেডান এ. সি. তে অ্যালেম লীগের মাধ্যমে ফুটবল শুরু করেন। পরের বছর তৃতীয় ডিভিশন্ চন্দ্র মেমেরিয়ালে। ৭১-এ দ্বিতীয় ডিভিশনে কালীঘাট মিলনীতে। সেবার জাতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় গুজরাটে। ১৯৭২ সালে খিদিরপুর ক্লাবে অচ্যুত ব্যানার্জীর আনুকূল্যে ময়দানের বড় আসরে প্রথম খেলা শুরু। তার পরের বছর অর্থাৎ '৭৩ থেকে এরিয়ান্স ক্লাবে। পঞ্চমবর্ষে দলনায়কের যে গুরু দায়িত্ব নাসিমের ওপর এসে পড়েছে তা পালন করতে নাসিম চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

খেলোয়াড় হিসাবে নাসিমের সব চেয়ে বড় গুণ ও খেটে খেলে। সব সময় বলের পেছনে চেক করে। স্পীডের সঙ্গে দু'পায়ে সট আছে ভালই। গোলের সামনে নার্ভ ঠিকমত ধরে রাখতে পারলে নাসিম অঘটন ঘটাতে পারে। ষ্টেট ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ডে চাকরির জন্য অরুণাভ সেনের প্রতি তার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

"এবারে আপনার দল কেমন খেলবে" জিজ্ঞেস করায় নাসিম জানায় "মানস, বাবু, শিবাজী দল ছেড়ে গেলেও কেষ্ট মিত্র, উদয় দাশ, তপন দাশ নিশ্চয়ই আমাদের শূণ্যস্থান পূরণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস। গতবারের মত এবারও ফাইট দিতে কসুর করব না।"

* * *

গতবার লীগে তৃতীয় স্থানাধিকারী মহমেডান দলপতি আজিজের জন্ম কেরালার মালব পুরমে। জাতীয় খেলায় সার্ভিসেস ও কর্ণাটক দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ব্যাঙ্গালোর এ. সি. তে খেলার সময় ফুটবল সম্পাদক মহম্মদ মামুদের ওর খেলা ভাল লাগে। তিনিই ওকে মহমেডানে নিয়ে আসেন ১৯৭৫ সালে।

খেলোয়াড় জীবনে কৃতিত্ব আজিজের উল্লেখযোগ্য। এই ত এবছর কোচিনে ফেডারেশন কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মরশুমের সেরা গোলটি করে আজিজ দলের পরাজয় রক্ষা করে। পরের দিনে জয়সূচক গোলটিও তারই দেওয়া। ফুটবলের আধুনিক ছলাকলা বিষয়ে ওর ধারনাও ভাল। ক্ষিপ্রতায় সঙ্গে আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয়, আবার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে দলের প্রয়োজনে নেমে এসে ডিফেন্সকে সাহায্য করে। গত বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় লতিফুদ্দিন গোলদাতার পেছনে আজিজের অসামান্য দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের নামী খেলোয়াড় লতিফ বর্তমানে দলের শিক্ষক।

কলকাতার ময়দানের প্রতাপশালী ইনসাইড ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু একেবারে লজ্জাবতী লতা। পাঁচবার কৌশলে এড়িয়ে গেছেন সাক্ষাৎকারের সময়। শোনা যায় এই "সরমের" জন্যই ভারতীয় দলে প্রাথমিক পর্যায়ে আজিজ নির্বাচিত হয়েও খেলতে যায়নি। যাই হোক অবশেষে সহ-সম্পাদক লাব্বির আমেদের জোরাজুরিতে তার সঙ্গে কোচের পাশে বসল সম্পাদক ও কোচ মশাই বলে চলেন, আর আজিজ মাথা নাড়ে।
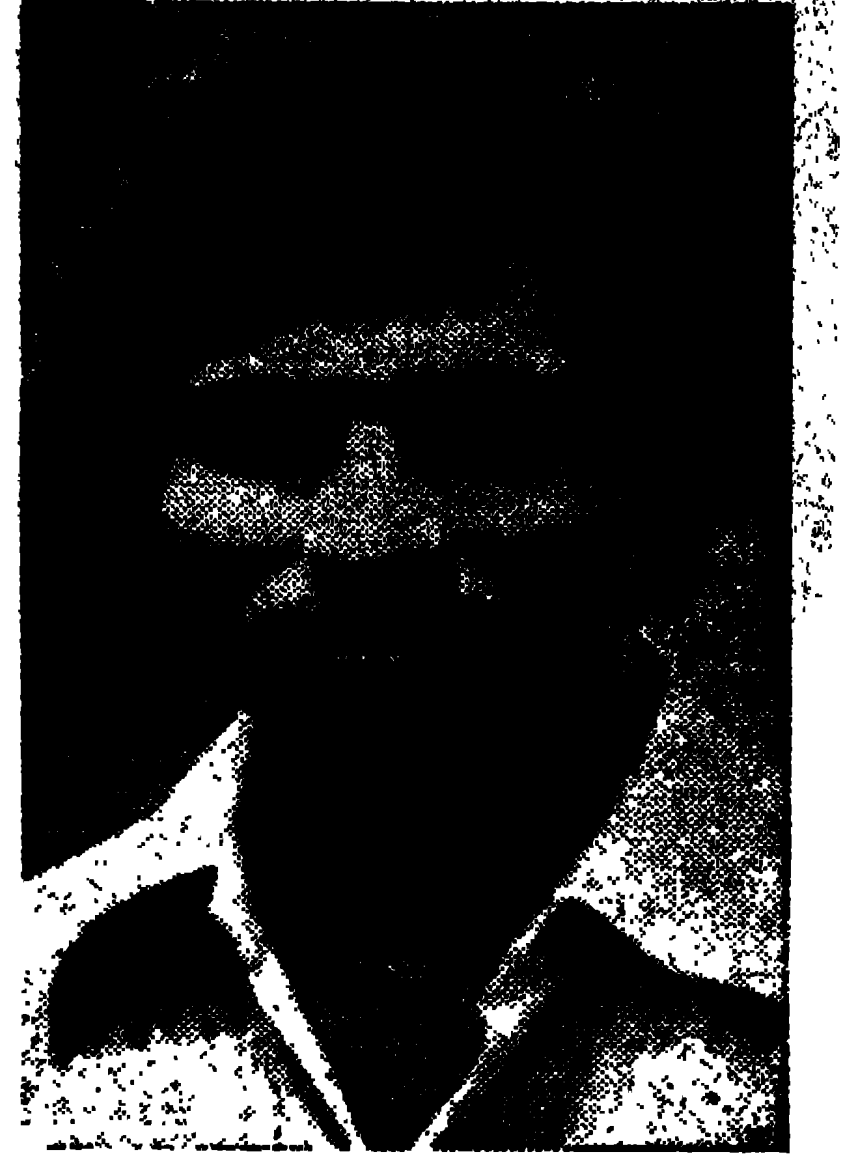
এবারে দলের প্রসঙ্গে ওঁদের বক্তব্য ভারসাম্যের প্রতি নজর রেখেই দল গঠন করা হয়েছে। তরুণ বোস আসায় দীর্ঘদিনের গোল রক্ষার সমস্যা এবার আর নাই। ডিফেন্সে অভিজ্ঞ অশোকলাল ও আনোয়ারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়া হয়েছে সুন্দর। অন্যদিকে সুধীরের ভাই শ্যাম কর্মকার এবার মাঠে চমক সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে।

মহমেডানের অধিনায়ক আজিজ

লতিফুদ্দিন, সুরিন্দর কুমার, মোহন সামাদ হাবিবের সহোদর নবাগত জাফর ও দাদাপীরের সমন্বয়ে আক্রমণ ভাগ রীতিমত শক্তিশালী। কাজল ঢালী ও লতিফুদ্দিন অবশ্য বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ নন। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। লিঙ্কম্যানদের মধ্যে আস্থা পাওয়া যাচ্ছেনা। তবে দু'তিনটে গেমের পর নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে। কোচ জানান তিনি ৭ দিনের বেশী সময় না পেলেও ক্লাব যে এবছর প্রতিটি প্রতিযোগিতায় "ফাইট" দেবে এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী।

লেখা ও ছবি: কেশবপ্রসাদ দাশ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

চিঠিপত্র

আমি আপনার সম্পাদিত পত্রিকা 'ধনধান্যে'র নিয়মিত ছোট্ট পাঠক। আপনার পত্রিকায় প্রয়োজনীয় সমস্ত রচনা সম্ভারই বর্ত্তমান, তবে আমার সামান্য অনুরোধ যে আপনি অন্তত গল্পের সংখ্যা আর একখানি বাড়াবেন।

সোমনাথ নায়েক
বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বীরভূম

আপনার পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই আমার হৃদয়ে গভীর আনন্দ এনে দিয়েছে। ১৬-৩১ মে, ১৯৭৭ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রী উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সাংবাদিকতা ও আধুনিক বাংলা গদ্য শিল্প অনন্য সাধারণ রচনা হয়েছে। ভালো লেগেছে শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর 'কৃষক কবি' প্রবন্ধটি। শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের 'লোকসাহিত্যের সন্ধানে' একটি প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ডাইনোসর খুব ভাল গল্প। শ্রী নিতাই বসুর 'নরেন্দ্র নাথ মিত্রের' ওপর লেখাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। কবিতাগুলিও যথেষ্ট শক্তিশালী।

অশোক পোদ্দার
এম. আই. জি. কোয়ার্টার্স, কলকাতা-২

টাকা কিভাবে আসে যায়

চলতি বছরে ভারত সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করবেন তার প্রতি টাকার ২৩ পয়সা আসবে উৎপাদন শুল্ক থেকে, ১৫ পয়সা আসবে করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে। ১২ পয়সা আসবে পূর্ব প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাণিজ্য শুল্ক থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাজারের ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে, ১০ পয়সা আসবে অন্যান্য সূত্র থেকে, ৮ পয়সা আসবে কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে, ৬ পয়সা আসবে বহিরাগত ঋণ থেকে এবং ২ পয়সা আসবে আয়কর থেকে এবং বাকি ২ পয়সা আসবে অন্যান্য কর আদায় থেকে।

এইভাবে সংগৃহীত অর্থের প্রতি টাকা সরকার নিম্নলিখিত হারে ও খাতে ব্যয় করবেন—৩৭ পয়সা পরিকল্পনায়, ২০ পয়সা অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় সংকুলনের জন্য, ১৮ পয়সা প্রতিরক্ষায়, ১০ পয়সা ধার দেওয়া টাকার সুদ পরিশোধে, ৯ পয়সা অন্যান্য খাতে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারকে বিধিবদ্ধ ও অন্যান্যভাবে দেওয়া হবে টাকায় ৬ পয়সা।

আগামী সংখ্যায়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ধনধান্যে'র আগামী সংখ্যাটি বিশেষ যুগ্মসংখ্যা হিসাবে পনেরই আগষ্ট প্রকাশিত হচ্ছে।

এর বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নিবন্ধ।

সম্ভাব্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সংসদের কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ।

এছাড়া থাকছে, 'স্বাধীনতার ত্রিশ বছর'—এই পর্যায়ে একটি আলোচনা।

সেই সঙ্গে গল্প, কৃষি, খেলাধুলা, নাটক, সিনেমা, মহিলামহল ইত্যাদি নিয়মিত রচনা।

এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য—এক টাকা

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহকমূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্‌লিকেশন্‌স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্‌লিকেশন্‌স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :

'ধনধান্যে, পাব্‌লিকেশন্‌স্‌ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩১ জুলাই, ১৯৭৭
নবম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদকের কলমে

গত সতেরই জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন সরকারের প্রথম বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। জনতা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে তৈরী প্রথম বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে সরকারের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা পরিচয় মেলে। কারণ নতুন সরকার বাজেট তৈরী করার জন্য হাতে পেয়েছেন খুব কম সময় ও পূর্বতন সরকারের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয় এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব সত্ত্বেও এবছরের বাজেট আগামী দিনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিশারী রূপে চিহ্নিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধে বাজেট একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ যখন একান্তই কাম্য তখন বাজেটের ফলে দ্রব্যমূল্য যাতে না বাড়ে বরং কমপক্ষে স্থিতিশীল থাকে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি প্রথমেই সেই দিকে। তাই তিনি আয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য যাতে ন্যূনতম থাকে সেজন্য ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৭২ কোটি টাকায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এজন্য অসামরিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ১৩০ কোটী টাকা কমানোর জন্য অর্থমন্ত্রী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা পালনের জন্যও নতুন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাজেটের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষিকে উন্নত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কৃষিখাতে বাজেটে ত্রিশ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে জন্য যে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামাঞ্চলের সংগে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক নির্মাণ, বাজার, পানীয়জল প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করাই নয় একে পুনর্গঠিত করতে নতুন সরকার বদ্ধপরিকর। তারই ইংগিত বহন করছে এবছরের বাজেট। তাই অনুন্নত ও গ্রামীণ এলাকায় বিনিয়োগে উৎসাহ-দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এজন্য পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগের জন্য নতুনভাবে শিল্পের অধিকারের ক্রমবিন্যাশ করার কথাও বলা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে আছে পেনশনভোগীদের আরও সুযোগ সুবিধা দান, পানীয় জলের জন্য চল্লিশ কোটা টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব, আয়করের রেহাই সীমা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, দেশীয় কারিগরী বিদ্যার সহায়তায় যন্ত্রাংশ নির্মাণের ছোট কারখানার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রভৃতি। তবে দশহাজার টাকার উপর যাদের আয় তাদের আয়করের রেহাই সীমা আগের আট হাজার টাকায় বহাল রাখা এবং আয়করের সারচার্জ বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বিড়ির উপর কর ধার্যের ফলে ও দরিদ্র শ্রেণীর উপর চাপ পড়বে। এসব দু একটা বিষয় গণ্য না করলে বাজেটে কর প্রস্তাব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের উপর কোন রূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেনা আশাকরা যায়। আর এবছরের বাজেট যদি দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সক্ষম হয় তবে সেটাই হবে জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে বেশী স্বস্তির।

কেন্দ্রীয় বাজেট

পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান:

এবারের বাজেটের দুই লক্ষ্য

— বিশেষ প্রতিনিধি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সম্প্রতি নতুন সরকারের যে প্রথম বাজেটটি পেশ করলেন তার উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করা, এবং উন্নয়নের সুফলগুলি সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা।

চলতি বছরের বাজেটে রাজস্বখাতে রয়েছে মোট ১৫,৩৬৬ কোটি টাকা। চলতি কর হার অনুযায়ী কর বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হবে ৮,৮৭৯ কোটি টাকা, যা ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত হিসেবের চেয়ে ৭৯৮ কোটি টাকা বেশী। এই বেশী কর আদায়ের দরুণ রাজ্যগুলির ভাগে থাকবে ১০১ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক থেকে সংগ্রহ হবে ৪,৫৫০ কোটি টাকায়, যা গত বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৩৭৩ কোটি টাকা বেশী। আয়কর এবং করপোরেশন কর থেকে আদায় হবে ২২৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ—১৮০ কোটি টাকা বেশী। আমদানী শুল্ক থেকে আদায় হবে ১৭৩৪ কোটি টাকা।

বাজারের ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ১০০০ কোটি টাকা। গত বছরে ঐ হিসেব ছিল ৮৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া বিদেশী মুদ্রার জমা তহবিল থেকে সরকার ৮০০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন।

ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার পর নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হবে ১০৫২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় যোজনা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যোজনাখাতে সাহায্য বাবদ ১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫৭৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছর বরাদ্দ হয়েছিল ৪৭৫৯ কোটি টাকা।

এবারের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কমছে। শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতি হল সবরকম ব্যয় বাহুল্য বর্জন করা। সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ঐ মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং বাজেটে ঐ ধরনের ব্যয় ১৩০ কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব রয়েছে।

যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত হিসেব এবং বর্তমান কর হার অনুযায়ী রাজস্বের হিসেব নিয়ে চলতি বছরের বাজেটে ২০২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকছে।

যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ২৭৫২ কোটি টাকা, যা অন্তবর্তী বাজেটের তুলনায় ৫৬ কোটি টাকা কম। খাদ্যের জন্য ভরতুকি এবং মজুত খাদ্যের পরিবহণ বাবদ হিসেব ধরা হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা। ঐ হিসেব অবশ্য আলোচ্য বছরের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঘাটতি রাজ্যগুলিকে বর্তমান বাজেটে অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিন বছরের ঘাটতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

জীবনধারণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেক কেন্দ্রীয় সরকারী পেন্সনভোগী অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছুটা সুবিধাবৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিলেন। সে অনুরোধ রেখে এবারের বাজেটে তাদের কিছু সুবিধা দেবার প্রস্তাব করেছেন। এ বাবদ খরচ হবে বছরে ১০ কোটি টাকা।

১৯৭৭-৭৮ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাতে অর্থনৈতিক ত্রুটিগুলি দূর করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নীতি ঢেলে সাজানো দরকার। পুনর্গঠিত যোজনা কমিশন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি জানান, সরকার বিভিন্ন মন্ত্রকের সংগে এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এবং জনতা পারটির নির্বাচনী ইস্তাহারের সংগে সঙ্গতি রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর একটি নতুন পথ নির্দেশ করবেন বলে সরকার স্থির করেছেন।

তিনি জানান, নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যোজনার পরিবর্তন করে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, খাদি, এবং গ্রামীণ শিল্প, রেশম, হস্তচালিত তাঁত শিল্প, গ্রামাঞ্চলে ডাক, টেলিফোন, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা করা হবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের মূল প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।

গ্রামাঞ্চলে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, হাঁসমুরগীর খামার, মাছচাষ ও বনাঞ্চল তৈরীর উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সমবায় ভিত্তিতে দুগ্ধপালন কেন্দ্র পরিচালনার উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে। কৃষিকে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করার ওপর জোর দেওয়া হবে। কৃষির উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বর্তমান যোজনা বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে উঠবে, গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির চাহিদার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে, এবং তুলা, তৈলবীজ ও ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

হরিয়ানা, গুজরাট ও রাজস্থানের জন্য একটি মরু উন্নয়ন সংক্রান্ত পুরোধা প্রকল্প নেওয়া হবে। বর্তমান যোজনায় এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার দরুণ রাজ্য সরকারকে আগাম পরিকল্পনা সাহায্য খাতে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় অ্যাগ্রিকালচারাল রিফিন্যানস অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এবং অন্যান্য লগ্নী সংস্থার মাধ্যমে ২৬০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেচের পাম্পসেট বৈদ্যুতিকৃত কর'ব জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কৃষি, বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, সার, গ্রামাঞ্চলে সমবায় এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট ৩০২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা বরাদ্দের শতকরা ৩০.৪ ভাগ এ বাবদ ব্যয় করা হবে।

গ্রামের উন্নয়নে অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে সংযোগকারী সড়ক তৈরীর ব্যাপারে আরও জোর দেবেন। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। শুরুতে এ বাবদ বিশ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার ও স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা থেকে আরও টাকা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে "কাজের বদলে শস্য" নামে নতুন প্রকল্পটির সাহায্য নেওয়া যাবে।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য দেবেন এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে শ্রী প্যাটেল জানান। এ ব্যাপারে এ বছরই বর্তমান ব্যয় বরাদ্দের উপর অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে আরও বেশী টাকা যোগানোর কথাও অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, হরিজন, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী ও ব্যয়বরাদ্দে তিনি সন্তুষ্ট নন। যদিও এ সব রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তবুও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরীর কাজে হাত দেবেন।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নয়নে ২৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সিঙ্গরৌলি অতিকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় একটি অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সুরু করার জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এ বাবদ খরচ করেন ১৬৭৬ কোটি টাকা। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সাহায্যার্থে গ্রামীণ বিদ্যুৎ করপোরেশনকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকার হিসেবে)

	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
রাজস্ব	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
আদায়	৮২১৯	৮৫০৭	৯৪২৪
			(+) ১১১ শতাংশ
ব্যয়	৭৬৯০	৮৫৫৪	৯৪৮৭
	(+) ৫২৯	(−) ৪৭	(−) ৬৩
			(+) ১৩০ শতাংশ
মূলধন			
আদায়	৪৪২৩	৫২৫২	৫৯৪২
ব্যয়	৫২৮০	৫৬৩১	৬০৮১
	(−) ৮৫৭	(−) ৩৭৮	(−) ১৩৯
মোট			
আদায়	১২৬৪২	১৩৭৫৯	১৫৩৬৬
			(+) ১১১ শতাংশ
ব্যয়	১২৯৭০	১৪১৮৪	১৫৫৬৮
মোট ঘাটতি	৩২৮	৪২৫	২০২
			(−) ১৩০ শতাংশ

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করার পর বাজেট প্রসঙ্গে নানা আলোচনা এখনও চলছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব সরকারী ব্যয় কমানো-বাড়ানোর কোনো বিশেষ প্রবণতা এই বাজেটে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে কর বসিয়ে কিংবা ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যয়যোগ্য সম্পদ সংগ্রহ করতেই হবে, কিন্তু বাজেটের এই সম্পদ সংগ্রহের দিকটি আমাদের আলোচনার বস্তু নয়। আমরা আপাততঃ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি শুধু সরকারের ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণের নীতির দিকে।

চলতি বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুল্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৫,৫৬৮ কোটি টাকা। এই সমগ্র পরিমাণকে আমরা নানাভাবে বিভক্ত করে হিসাব-নিকাশ করতে পারি। প্রথমতঃ দেখা যাক এই ব্যয়ের মধ্যে মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কতটা। মূলধনী খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তার দ্বারাই প্রধানত দেশের অর্থনৈতিক ভাবী বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, যদিও শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মূলধনী-খাতের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে ফলাফলের দিক থেকে পার্থক্য নির্দেশ করা খুব সঙ্গত হবে না। বাজেটের হিসাবে মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশের কিছু কম (৬,০৮১ কোটি টাকা) মূলধন-খাতে খরচ হবে। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে এই ধরণের ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশের সামান্য উপরে। সেই বৎসর অবশ্য শেষ পর্যন্ত মূলধন-খাতে ব্যয় ঐ পর্য্যায়ে পৌঁছাতে পারে নি। সুতরাং পূর্ববর্তী বাজেটে এবং বর্তমান বাজেটে এই দিক দিয়ে বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। গত বৎসরের তুলনায় চলতি বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ শতাংশের সামান্য কিছু কম। কিন্তু মূলধন-খাতে ব্যয় বাড়ানো যাচ্ছে ৮ শতাংশের সামান্য কিছু বেশী।

দেশে সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে শিক্ষা, সমাজসেবা বা আর্থিক কাঠামোর উন্নয়নকল্পে কতটা কাজে লাগানো হবে তার নীতি সব দেশে, সব যুগে এক থাকেনি। আমাদের সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরণের গঠনমূলক কিংবা বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ কতটুকু? চলতি বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের বরাদ্দ ধার্য্য হয়েছে ৪,২৫০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ২৭.৫ শতাংশ এই ধরণের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ ছিল ২৭ ভাগ কিংবা সামান্য কিছু কম। এখানেও দুটি বাজেটে প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছু চোখে পড়ছে না।

বিকাশমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সমবায় ভিত্তিক সংস্থা কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে ঋণ দিয়ে থাকেন। যদি এই ধরণের ঋণকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশ সহায়ক ব্যয়ের রকমফের বলে ধরা হয়, তবে মোট ব্যয়ের শতকরা আরও প্রায় ২২ ভাগকে এই হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। পূর্ব্ববর্তী বৎসর এবং বর্তমান বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে এই দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়বে না।

সরকারের যে-সব ব্যয়কে কোন অর্থেই বিকাশমূলক বলা যায় না তার মধ্যে প্রধানতম প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যয়ের অনুপাত চলতি বাজেটে শতকরা ১৭.৭। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে এই খাতে ব্যয় হয়েছে সম্ভবত শতকরা ১৮ ভাগ। আনুপাতিক হারে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য কিছু কমেছে। অনুরূপ ব্যয়-সংক্ষেপের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে শাসনতন্ত্র পরিচালনার নানাবিধ ব্যয়ের ক্ষেত্রে। পরিষদীয় কাঠামো, মন্ত্রিসভা, রাজস্বসংগ্রহ বিভাগ ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ ব্যয়কে সংযত রাখার প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান বাজেটে। কিন্তু অন্য দিকে পুরাতন ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ এবং পেন্‌সনভোগীদের ক্লেশ লাঘবের জন্য প্রদেয় ভাতার পরিমাণ আনুপাতিক হার অপেক্ষা একটু বেশী করেই বেড়েছে। সুতরাং এই ধরণের বাঁধা খরচের পরিমাণ কমিয়ে বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে রাজ্যসরকারগুলি আর্থিক বিকাশের জন্য আর্থিক অনুদান ও ঋণ পেয়ে থাকেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই ভাবে ৩,৬৩৮ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকার হাতে পাবেন। এর মধ্যে ২,১৭৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে রাজ্যের পরিকল্পনাভুক্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। আরও ৫০৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে পরিকল্পনার বাইরে নানা ধরণের গঠনাত্মক কাজের সহায়তায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ হবে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য শতকরা ১০.৪ ভাগ.

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ আয়করে কিছু রেহাই ঃ পরোক্ষ কর ১৩০ কোটি টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারের (১৯৭৭-৭৮) কেন্দ্রীয় বাজেটে করপ্রস্তাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত করযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারগুলিকে আয়কর দিতে হবেনা। আয়করের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা আট হাজার টাকাই রাখা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার বেশী সেখানে এখনকার মতই আট হাজার টাকার বাড়তি টাকার উপর কর দিতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী হলে সেখানে কিছু রেহাই দেওয়া হবে। কোম্পানী বাদে সর্বশ্রেণীর আয়কর-দাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হারও বর্তমানের ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ করা হয়েছে। কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান বাজেটে আয়করের হারে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে গতিশীল করার জন্য অর্থমন্ত্রী গতবছর প্রচলিত বিনিয়োগ সাহায্য কর্মসূচীকে আরো সুবিস্তৃত করেছেন। এক্ষেত্রে সিগারেট, প্রসাধন সামগ্রী, মদ ইত্যাদির মত নিম্ন অগ্রাধিকারযোগ্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর সর্বশ্রেণীর শিল্পকে ঐ বিনিয়োগ সাহায্যের সুযোগ দেওয়া হবে।

বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন তাঁর প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবে আসল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানী-গুলির সঞ্চয় বাড়ানো, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য আরো বেশী অর্থবরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নকে গতিশীল করা। পরোক্ষ কর সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, এক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা বিলাস সামগ্রীর মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

অর্থমন্ত্রী সম্পদ কর বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছেন। বর্তমানে মোট সম্পদের প্রথম আড়াই লক্ষ টাকার উপর সম্পদ করের হার আধশতাংশ বজায় থাকলেও তার ওপরের স্ল্যাবে আরো আধশতাংশ সম্পদকর বাড়বে। বর্তমান পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নীট সম্পদের করধার্যযোগ্য স্ল্যাব দুইভাগে করা হয়েছে। প্রথম স্ল্যাব ২,৫০,০০০ টাকা এবং পরবর্তী স্ল্যাব ২,৫০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০ টাকা। এর-ফলে ৭৭-৭৮ সালে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হবে।

আয়কর দাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পটি আরো দু বছরের জন্য চালু রাখার প্রস্তাব রয়েছে। অবশ্য সত্তর বছরের বেশী কোন ব্যক্তিকে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হবে না।

দেশের শিল্প সংস্থাগুলিকে স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণালব্ধ কারিগরি জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হলে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

অর্থমন্ত্রী চালু মূলধনী আদায় করের ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, সরকার রুগ্ন কলকারখানা অধিগ্রহণে ইচ্ছুক নন। তবে রুগ্ন কারখানা যদি কোন চালু প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হতে চায় তবে সরকার সেক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন।

কোন কোম্পানী যদি অনুমোদিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করেন তাহলে সরকার তাকে করযোগ্য লাভ থেকে কিছু রেহাই দেবেন। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ইউনিট স্থাপিত হলে এবং সেগুলি এবছরের ৩০ জুনের পর উৎপাদন সুরু করলে এইসব শিল্পোদ্যোগ তাদের লাভের ২০ শতাংশ করযোগ্য আয় থেকে ছাড় পাবেন।

কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে আয়করের ওপর ৫ শতাংশ সারচার্জের বদলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে পাঁচ বছর ঐ হারে টাকা জমা রাখার সুবিধা এ বাজেটে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ফলে সরকারের ৫৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সীমা দু লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয়করের হারের কোন হেরফের হবেনা। তবে কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য সব করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের হার শতকরা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হলো। প্রত্যক্ষকর থেকে বর্তমান বছরে ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে।

শ্রী প্যাটেল জানান প্রত্যক্ষ কর আইন দিন দিন জটিল হয়েছে। তাই এর সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হচ্ছে এ বছরের শেষ নাগাদ।

এবারের বাজেটে মোটর যানবাহনের ওপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। মোটর গাড়ীর ওপর শুল্ক ২.৫ শতাংশ বেড়ে ১৭.৫ শতাংশ এবং দুই ও তিন চাকার গাড়ী ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৫ শতাংশ হয়েছে। দুই ও

তিন চাকার গাড়ীর টায়ার, টিউব ও ব্যাটারীর ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়ায় এসব গাড়ীর ওপর প্রকৃতপক্ষে নীট ২.২৫ শতাংশ শুল্ক বাড়ছে। এই শুল্ক বাড়ানোর ফলে বছরে এবাবদ মোট ৫.১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমানে রং তৈরীর দ্রব্যাদি, রং, এনামেল, বার্নিশ প্রভৃতির উপর উৎপাদন শুল্ক নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে মূল্যানুপাতে ধার্য্য করার প্রস্তাব রয়েছে। বেশী দামের দ্রব্যাদির ওপর সাধারণত ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কমদামের দ্রব্যাদির ওপর শুল্ক প্রায় একই রকম থাকবে।

সিনেমার ফিল্মের ওপরও মূল্যমান বিচার করে সংশোধিত শুল্কের হার মূল্যানুপাতে ১০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব আছে।

সিগারেটের দামের ওপর মূল্যানুপাতিক হারে কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিড়ির ওপর কর প্রতি হাজারে ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ টাকা করা হয়েছে। এই সব কর থেকে বছরে বাড়তি আয় হ'বে ৪৫ কোটি টাকা।

(১) ইতিপূর্বে শুল্ক ধার্য হয়নি এমনসব হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, (২) ওজন করার যন্ত্র, (৩) হাত ঘড়ি ও টেবিল ঘড়ি, (৪) বৈদ্যুতিক বাতির সরঞ্জাম, (৫) জুতোর কালি, গাড়ির রং ধাতুর পালিশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ উপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎপাদন হয় এরূপ ক্ষুদ্রায়তন হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও কালি শিল্পগুলিকে শুল্কের রেহাই দেওয়া হ'বে। আশা করা হচ্ছে এবাবদ মোট ১১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমান বাজেটে নির্দ্দিষ্টভাবে নতুন উৎপাদন শুল্কের আওতায় পড়েনি এমন সব পণ্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক বর্তমানে ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২ শতাংশ করা হবে। শুল্ক ধার্য্য হয়েছে এরূপ অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলে এইসব পণ্যের ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়া হবে। এই শ্রেণীর আওতায় ছোট ছোট অনেক শিল্প সংস্থা রয়েছে বলে স্থির হয়েছে, কর্মী সংখ্যা অনুপাতের বদলে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট শিল্পগুলিকে উৎপাদন শুল্কে ছাড় দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ-বিহীন সকল শিল্পকেও এই ছাড় দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রীর পরোক্ষ করের প্রস্তাবে হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্পগুলি লাভবান হবে। ২০ কাউন্ট সুতো পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাড়তি কাউন্টের জন্য প্রতি কেজিতে ৩০ পয়সা পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পগুলি প্রচুর পরিমাণে স্পান সুতো ব্যবহার করায় এক্ষেত্রেও একই রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত তাঁতশিল্পকে বর্তমানের চক্রবৃদ্ধি হারের উৎপাদনশুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবে ৮০ হাজার তাঁত শিল্প শুল্ক নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পাবে। স্ক্রিম্পিং সুতোর ওপর শুল্কের হার প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে ৫ পয়সায় কমানো হয়েছে।

ট্রানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, রেডিও, ষ্টিরিও প্রভৃতি ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ওপর মূল্যানুপাতে শুল্কের হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে। ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে মূল্যানুপাতিক শুল্কের হারে ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে ০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে। ৩৬ সেন্টিমিটারের বড় স্ক্রীনসহ যে সকল টি. ভি. সেটের উৎপাদন মূল্য ১৮০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা বা তার কম হবে সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে। ৫০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত টেপরেকর্ডার এবং ১৭৫ টাকা পর্যন্ত হিসাব রক্ষন যন্ত্র এ সুযোগ পাবে।

সমবায় সমিতি বা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সদস্য ক্ষুদ্র এবং কুটীর দেশলাই শিল্পগুলি উৎপাদনের ওপর বর্তমানে প্রতি গ্রোসে ৫৫ পয়সার বদলে দ্বিগুণ ছাড় পাবে। বৈদ্যুতিক ইনসুলেটিং টেপ, গ্লেটেড এক্সেলস, মিষ্টি, টফি, চিনের খাদ্যও শুল্কের রেহাই পাবে।

মিনি-ইস্পাত কারখানাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ইস্পাত কারখানা থেকে কাঁচামাল হিসাবে স্ক্র্যাপ যোগান দেওয়া দরকার। সেজন্য এই সব কারখানায় ব্যবহারোপযোগী কাঁচামাল হিসেবে বড় ইস্পাত কারখানাগুলি থেকে যেসব স্ক্র্যাপ আনা হবে সেগুলোর ওপর শুল্ক ছাড় দেয়া হবে।

শুল্ক ফাঁকি রোধ ও দুর্নীতি দুরী-করণের উদ্দেশ্যে পশম সুতোর উপর উৎপাদন শুল্কের পরিবর্তে কাঁচা ও নিকৃষ্ট পশম এবং কম্বলের ওপর আমদানী শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হ'য়েছে। মিহি পশমের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫ পয়সা শুল্ক করা হবে। এর ফলে রাজস্বের যা ক্ষতি হবে তা আমাদানী করা কাঁচা পশমের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে পূরণ করা হবে। এর ফলে দেশজ পশমের দাম কমবে। ঘড়ির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিঃ এর মারফত ঘড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হবে। আমদানী-কৃত ঘড়ি জনসাধারণের কাছে কমদামে বিক্রির জন্য অর্থমন্ত্রী ঘড়ির যন্ত্রপাতি ও ঘড়ির ওপর মূল্যানুপাতে আমদানী শুল্ক ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন।

নিউজপ্রিণ্টের ওপরও মূল্যানুপাতিক আমদানী শুল্কের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

শিল্পপ্রসার ও দেশজ শিল্পের প্রতি-যোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মূলধনী পণ্য দেশজ উৎপাদনের অবস্থা আগে খতিয়ে না দেখেই আমদানী করার প্রস্তাবও অর্থমন্ত্রী করেছেন। অপরদিকে ভারতীয় মূলধনী পণ্য যাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় আরো ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে তার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের তামার তারের আমদানী শুল্ক বর্তমানে ৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে মূল্যানুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া ষ্টেনলেস ষ্টিলের ও হাই-কার্বন ষ্টিলের চাদর অন্যকোন মূলধনী পণ্য উৎ-পাদনে ব্যবহৃত হ'লে সেইসব ইস্পাতের চাদ-রের ওপর কর ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে গেইজ অনুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ২২ গেইজের ষ্টেনলেস ষ্টিলের বাসনপত্রের করও ৩২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২০ শতাংশ করা হ'য়েছে। তামা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির ওপর কর কমানোর ফলে আমদানী শুল্কে ৩৬.২৫ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে।

এই সমস্ত প্রস্তাবের ফলে ঘাটতির পরিমাণ বর্তমানে ২০২ কোটি টাকার বদলে ৭২ কোটি টাকা হবে এবং চলতি বছরে পরোক্ষ কর থেকে মোট ১৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় আয় হবে।

মঞ্জুলা বসু

নতুন বাজেটে কর প্রস্তাব

এ বছর বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল যে উদ্দেশ্যগুলির উপর বারবার জোর দিয়েছেন সেগুলি হল উৎপাদনশীল কর্মসূচীকে উৎসাহিত করা, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ধনবণ্টনে অসাম্য দূর করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করতে বাজেটের প্রস্তাবগুলি কতদূর সহায়ক হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থাকে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে তার পরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে এটা সাধারণ প্রত্যাশার মধ্যে ছিল। নূতন সরকারের নানা সময়ে ঘোষিত নীতির থেকেও অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে দেখতে বর্তমান বছরের বাজেটে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি, একমাত্র ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা ছাড়া। করসংক্রান্ত প্রস্তাবেও তাঁরা নূতন কর কিছু বসাননি বা পুরোনো কোনও কর তুলে নেননি, প্রচলিত ব্যবস্থাতেই কিছু হের ফের ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য বাজেটে প্রত্যক্ষ করের থেকেই বাড়তি রাজস্বের অধিকাংশ আদায় হবে বলে আশা করা হয়েছে। করবাবদ নূতন রাজস্বের প্রত্যাশিত পরিমাণ হল ২৪২ কোটি টাকা, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বাবদ ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার বৃদ্ধি। ব্যক্তিগত আয়ের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের (Surcharge) হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ফলে সর্বোচ্চ স্তরে আয়ের উপর করের হার দাঁড়াচ্ছে ৬৯ শতাংশ। এই অতিরিক্ত শুল্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত বা যৌথ পরিবারের আয়ের উপর প্রযোজ্য, কোম্পানীগুলির আয়ের উপর নয়। উপরন্তু কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য বিনিয়োগ ছাড় (Investment Allowance) দেবার যে ব্যবস্থা বিগত বাজেটে সীমিতভাবে ছিল আলোচ্য বাজেটে তা আরও বিস্তৃত করে দেশের সব শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম মাত্র সিগারেট, মদ্যজাতীয় পানীয়, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি যেগুলি প্রয়োজনের ভিত্তিতে যথেষ্ট অগ্রাধিকার পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।

ঊর্ধ আয়ের উপর অতিরিক্ত শুল্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন আয়ের লোকেদের কিছু ছাড় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নতম আয়ের উপর করের হার কমানো হয়নি বটে, কিন্তু সর্বনিম্ন যে আয়ের উপর কর কমানো হবে তার পরিমাণ বছরে ৮০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যাদের বাৎসরিক আয় তাদের কোনও আয়কর দিতেই হবে না। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক আয় ১০,০০০ টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৮০০০ টাকার ওপরই ছাড় দেওয়া হবে।

কর প্রস্তাবের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে বহু-বিতর্কিত বাধ্যতামূলক জমা-ব্যবস্থা (Compulsory Deposit Scheme) যা পূর্বতন সরকার চালু করেছিলেন তা আপাতত তুলে নেওয়া হচ্ছে না, যদিও জনতা সরকার ক্ষমতায় যখন আসীন হন তখন এইরকমই আভাস দেওয়া হয়েছিল যে বাধ্যতামূলক জমা রাখা বন্ধ করে দেওয়া হবে ও সঞ্চিত অর্থ প্রত্যর্পণ করা হবে।

এই প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল এই যে একবারে নিম্নবিত্ত আয়ের লোকেদের বাদ দিলে সাধারণ লোকের করের ভার বর্তমান বাজেটের প্রস্তাবগুলির ফলে অনেকখানিই বেড়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যার বার্ষিক আয় তার দেয় করের পরিমাণ হবে শূন্য আর ১০,৫৫০ টাকা যার বার্ষিক করযোগ্য উপার্জন তার দেয় করের পরিমাণ হবে ৩৮৫ টাকা। পরবর্তী আয়ের ধাপগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ হিসাব করে দেখানো যেতে পারে যে মধ্যবিত্ত লোকেদের ওপর চাপ আলোচ্য বাজেটে বেড়ে যাচ্ছে।

মধ্যআয় সম্পন্ন লোকেরা বাজেটের ফলে যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছে তার জন্য আবশ্যিক জমার ব্যবস্থাও দায়ী। ধনবৈষম্য কমানো ও মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা—এই দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখেই অতিরিক্ত শুল্ক ও আবশ্যিক জমা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়াও এই প্রস্তাবগুলির অন্য অসুবিধা আছে। এই দুটি ব্যবস্থাকেই বিশেষ প্রয়োজনে সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োগ করা উচিত, সেই সাময়িকতার জন্যই এদের প্রভাব। স্বাভাবিক সময়ে দীর্ঘকালীন কর্মসূচীর মধ্যে এগুলিকে গ্রহণ করলে ক্রমশ এদের ধার

কমে আসে এবং স্বল্পসময়ের জন্য ফলপ্রসূ হলেও অন্তত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘকালে প্রভাব কমে যায়।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক কর সঞ্চয়ের প্রবণতাও কমিয়ে দেয়। সর্বোচ্চ স্তরে প্রান্তিক আয়করের হার ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। মধ্য আয়ভোগী ও উচ্চবিত্ত লোকেদের সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগ ছাড়, অতিরিক্ত শুল্ক থেকে রেহাই ইত্যাদি যে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাও কতদূর কার্যকর হবে তা সন্দেহের বিষয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য করের হার যদি খুব বেশী হয় তাহলে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে আয় বাড়াবার উৎসাহও নষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত আয়কর বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর করের হারও বাড়ানো হয়েছে। ২.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার আরও ই শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে দেয় করের হার বাড়ছে ১শতাংশ। সম্পত্তির উপর করের হার বৃদ্ধির স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, প্রথমত বিগত বাজেটে এই হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত সঞ্চয় ও উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার পক্ষে ব্যক্তিগত আয়কর অত্যধিক না বাড়িয়ে অনুৎপাদনশীল সম্পত্তির উপর কর বসানোই বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবের মধ্যে Capital Gains বা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের ওপর যে কর প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থন পাবে সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাসযোগ্য বাড়ী বিক্রী করলে তার মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের উপর যে কর দেয় তা মকুব করা হয় যদি ছয় মাসের মধ্যে অন্য কোনও বাড়ী তৈরী বা বিক্রী করা হয়। অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ছাড় প্রযোজ্য নয়। নতুন প্রস্তাবে অলঙ্কার বা শেয়ার বিক্রয়লব্ধ লাভের ক্ষেত্রেই অনুরূপ রেহাই দেওয়া হবে যদি ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ শেয়ার, ব্যাঙ্ক আমানত, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট ও অন্যান্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে খাটানো হয়। এই ব্যবস্থায় যাতে কেউ অন্যায় সুবিধা না নিতে পারে সেজন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ লব্ধ অর্থ অন্তত তিন বছরের জন্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে নিয়োজিত রাখতে হবে। এর ফলে সম্পত্তিতে ফাটকাবাজী করে লাভের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বাজেট প্রস্তাবের ফল শেয়ার বাজারে অনুকূল হবে বলেই আশা করা যায়। বাজেট পেশ করার অব্যবহিত পরে শেয়ার বাজারে কিছুটা মন্দা ভাব এলেও পরে আবার উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে দেখা গেছে।

উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোম্পানীগুলিকে যে বিনিয়োগ ছাড় দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি অধুনালুপ্ত সম্প্রসারণের জন্য রিবেট (Development Rebate) এরই বিকল্প সংস্করণ। উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে এই ব্যবস্থা উৎসাহ যোগাবে সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে যাদের গুরুত্ব নেহাৎই কম সেই সব শিল্প ছাড়া অন্য সব শিল্পের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে সব শিল্প দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গড়ে উঠবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে স্বয়ং-নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছাড়ের অনুপাত ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য আলোচ্য বাজেটে আরও কিছু প্রস্তাব আছে যা সকলের সমর্থন পাবে। যেমন গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্পস্থাপন করলে তারজন্য বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে কর বসানোর প্রস্তাব আছে। বর্তমান বছরের জুন মাসের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প সংস্থাপন করলে দশ বছর তাদের লাভের ২০ শতাংশ আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। তেমনই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাদের শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ ২৫০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তারা যাতে অযথা বিব্রত না হয় সেজন্য উৎস থেকে আয়কর তুলে নেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও প্রচলিত করব্যবস্থায় কোনও মৌলিক পরিবর্তন না করে প্রচলিত করের হারেই কিছু অদলবদল করা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করার বিষয় হল যে কতকগুলি জিনিষের উপর ১ শতাংশ হারে নতুন আবগারী কর বসছে, যার মধ্যে আছে, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, ওজনের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হাত ঘড়ি ও টাইমপীস, জুতোর কালি, গাড়ির পালিশ। ১২ শতাংশ হারে আবগারী কর বসছে ক্ষুদ্রশিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের উপর (যদিও ১ লক্ষ টাকা উৎপাদন পর্যন্ত একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে)।

রেডিও, ট্র্যানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, স্টিরিও ইত্যাদির উপর মূল্য অনুসারে ১৫ শতাংশ থেকে ৩৫শতাংশ পর্যন্ত আবগারী কর ধার্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র অল্পমূল্যের টি. ভি. সেটের উপর আবগারী কর হবে ৫ শতাংশ। যথারীতি সিগারেট, বিড়ির উপর ধার্য করের বৃদ্ধির হার পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যথারীতি বলছি এইজন্য যে সব বাজেটেই বিড়ি সিগারেটের দাম বাড়াটা যেন একটা অবধারিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটরগাড়ির উপর করও বাড়ছে। আমদানী শুল্ক বাড়ছে বিদেশী পশম, কম্বল ইত্যাদি পশমজাত দ্রব্যের উপর। আবগারী শুল্ক কমছে তাঁতবস্ত্র, ছোট কারখানায় তৈরী কাগজ, ক্ষুদ্র ইস্পাতশিল্প, সমবায় সমিতির প্রস্তুত দেশলাই, জলতোলার বৈদ্যুতিক পাম্প,

২৪ পৃষ্ঠার দেখুন

রুমমেট / দেবযানী

আমার মত আড্ডাবাজ মেয়ের সঙ্গে যে শকুন্তলা আপ্তের কি করে ভাব হ'ল সেটা শুধু আমার বন্ধুমহলেই একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি, সত্যি বলতে কি আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগতো। আকৃতি প্রকৃতি কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র মিল ছিল না আমাদের। শকুন্তলা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু মনে হ'ত তার রূপ যেন শুধু দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বড় বেশী শান্ত ও গম্ভীর মেয়েটির সমস্ত হাবভাবের মধ্যে একটা সুসংযত দৃঢ়তা ফুটে উঠতো সব সময়। সবার থেকে সে যে স্বতন্ত্র একথা যে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দেখতো সেও বুঝতে পারতো। আমরা কো-এডুকেশন কলেজে পড়তাম। শকুন্তলাকে কেউ কখনও কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেনি। এমনকি কোন মেয়ের সঙ্গেও বিনা প্রয়োজনে কথা বলতো না সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী শকুন্তলা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হ'তে না পারার দুঃখ ভুলেছিল আই. এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড বিট্ করে। কিন্তু সবসময় নিজের চারিদিকে কি যেন এক গণ্ডী টেনে রাখতো শকুন্তলা। নিজের স্বপ্নের রাজ্যেই বিভোর হয়ে থাকতো সে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তাকে রীতিমতো সমীহ করতো। বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও করেছিল অনেকেই কিন্তু তার সে গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি কেউ।

সব দিক দিয়েই শকুন্তলার বিপরীত ছিলাম আমি। নিজমুখে রূপের প্রশংসা করাটা রীতিবিরুদ্ধ। তবু অতিরিক্ত বিনয় না করেও বলতে পারি যে ঠিক প্রশংসা করার মত রূপ আমার ছিলনা কোনকালেই। আর গুণ? ফাঁকিবাজ, ক্লাস-পালানো ইত্যাদি নানারকম দুর্নাম অর্জন করেছি কলেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা যে রেটে বেড়ে চলেছিল তাতে হিতাকাংখীরা রীতিমত আতঙ্কিত হতেন আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। Academic career ও তথৈবচ। ভাল রেজাল্টের প্রতি একেবারে লোভ নেই একথা বলতে পারিনা, কিন্তু তার জন্যে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হ'বে অন্যান্য বিষয়ে তা করতে আমি নারাজ।

এ হেন গোল্লায় যাওয়া মেয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা রত্নটির এমন গলায় গলায় ভাব হওয়া যে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্যের অন্যতম একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। অথচ এর সূত্রপাত হয়েছিল অতি সাধারণভাবে। বি. এ. তে আমাদের দু'জনেরই সংস্কৃত ছিল। সংস্কৃতের "স্যার" একটু বেশীরকম কড়া মেজাজের লোক। টিউটোরিয়াল ক্লাসে 'টাস্ক' করে না আনলে এমন বাছা বাছা বাক্যবাণ ঝাড়তেন যা আমার মত নাককান কাটা মেয়েরও অসহ্য লাগতো। মেয়ে বলে ছেড়ে দিতেন না তিনি। প্রথমে কিছুদিন অসহযোগ চালালাম—তাঁর টিউটোরিয়ালের ধারে কাছে, ঘেঁসতাম না। শেষে বুঝলাম এভাবে চলবে না। টিউটোরিয়ালের পার্সেন্টেজ কমে গেলে নিজেরই বিপদ, পরীক্ষা দিতে পারবো না। বেগতিক দেখে অবশেষে শকুন্তলার শরণ নিলাম—তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনা। দেখতে দেখতে আমাদের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে কলেজে সবার মুখে মুখে ওই এক কথা ফিরতে লাগলো। সবাই হিংসে করতো বুঝতাম এবং সেজন্য রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম।

ফোর্থ ইয়ারের শুরুতেই বাবা বদলী হয়ে গেলেন পাটনা থেকে সেই সুদূর পাঞ্জাব। আমায় হস্টেলে থাকতে হ'বে এবার—জীবনে প্রথমবার। শকুন্তলা হস্টেলেই থাকতো বরাবর। সুপারিন-টেণ্ডেণ্টকে ধরে আমরা দুজনেই একটি ডবল সিটেড রুম নিলাম। হস্টেলে আসার পর আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলাম

শকুন্তলাকে। বন্ধুহীন, চাপা মেয়েটির এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম যেন। হস্টেলে আসার পর থেকে আমার এমন আদর যত্ন শুরু করলো যে বাড়ি ছেড়ে থাকার দুঃখ দু'দিনেই ভুলে গেলাম।

মাঝে মাঝে অবশ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ওর গিন্নীপনায়। কোনদিন রাত্রে হয়তো চুপি চুপি সিনেমা দেখে ফিরেছি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নজর এড়িয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি শ্রীমতীর মুখ অন্ধকার। তারপরই শুরু হ'ত লম্বা বক্তৃতা। লেখা-পড়া না করলে কি ভবিষ্যৎ হ'বে, আজে বাজে সিনেমা দেখার পরিণাম কি, হোটেলে আমার মত ভাল মেয়েদের দেখলে লোকে কি ভাববে—ইত্যাদি নানারকম ফিরিস্তি। চুপ করে শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুনেই যেতাম। যখন অসহ্য মনে হ'ত হঠাৎ উঠে নিজের বাক্স প্যাঁটরা ধরে টানাটানি শুরু করতাম। জিজ্ঞেস করতো—"ওকি হ'চ্ছে?" গম্ভীর মুখে বলতাম—"রুম বদলাবো। থাকবো না এঘরে।" ব্যস, এক ওষুধেই সব ঠাণ্ডা। শকুন্তলার মুখে আর রা'টি শোনা যেত না খানিকক্ষণ। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মিনিট দশেক পরেই এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির হ'ত—"খেয়ে নে। পাঞ্জাবী হোটেলের অখাদ্য কুখাদ্যে পেট ভর্তি। সে কথা বললে আবার ঘণ্টাখানেক ধরে যে উপদেশামৃত বর্ষিত হ'বে তার কথা ভেবে শঙ্কিত হই। অতিকষ্টে দুধটুকু শেষ করে বিরক্ত হয়ে বলি, "সব সময় এমন জ্বালাস কেন বলতো? তুই যে আর জন্মে আমার কে ছিলি ভগবানই জানেন—।" ও হাসে—"শুধু ভগবান কেন আমিও জানি।"—"কি?" "সতীন"—ও কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলে।

"উহুঁ, সতীন নয়, শাশুড়ি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি অন্য বন্ধুদের খোঁজে।

একদিন এক বাদলঝরা সাঁঝে একটি দুর্বল মুহূর্তে অবশেষে বলে ফেলি বহু-দিনের গোপন রাখা কথাটি। উৎসাহে আরও কাছে সরে আসে শকুন্তলা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বিভ্রান্ত করে তোলে তার প্রশ্নজালে—"তার নাম কি? কোথায় থাকে? কবে আলাপ হ'ল? বল শীগগীর—।" বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হ'চ্ছে। জানালার ধারে বসে সেই বর্ষণ ধারার দিকে চেয়ে বলে যাই আমার সেই কাউকে না বলা কাহিনী.....

বাবার যখন এলাহাবাদে বদলী হল তখন আমি ম্যাট্রিকে পড়ি। আমি অঙ্কে বরাবরই ভীষণ কাঁচা, তবু জেদ করে অ্যাডিশনাল ম্যাথেমেটিক্স নিয়েছিলাম। প্রথমে অতটা বুঝি নি, এখন যতই পরীক্ষা এগিয়ে আসছিল ততই নিজের দুর্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। শেষে একদিন কাতরভাবে বাবার দরবারে হাজির হ'লাম। কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লাম "অঙ্কের একজন মাষ্টার চাই বাবা, নইলে কিছুতেই পাশ করবো না।" বাবা তাঁর বন্ধু অবনী দত্তকে ধরলেন একজন ভাল মাষ্টার ঠিক করে দেবার জন্যে। অবনীবাবুর ছেলে শোভন সবে বি. এস্. সি. পাস করে দিল্লীতে ডাক্তারী পড়ছে। কি একটা লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। অবনীবাবু তাকেই আমার অঙ্ক শেখানোর ভার দিলেন।

শোভনের কাছে অঙ্ক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান নিশ্চয়ই হয়েছিল তা নাহ'লে ম্যাট্রিকটা অমন নির্ঝঞ্ঝাটে উৎরোতে পারতাম না। কিন্তু শোভনকে কাছে পেয়ে সমস্ত জীবন যেন তোলপাড় হয়ে গেল—দু'জনেরই। কি যেন এক প্রচণ্ড আকর্ষণ দু'টি হৃদয়কে এক করে দিল। শোভনকে ভাল লাগা এমন কিছু বিস্ময়কর হয়তো নয়। রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য সব দিক দিয়ে যে কোনও মেয়ের কাম্য সে। তবু মনে হ'ত ওর প্রতি আমার যে আকর্ষণ তা রূপ, গুণ বা সম্পদের নয়। সে যে কি তা বুঝতে পারতাম না।

আমি কলেজে ভর্ত্তি হ'লাম। শুধু শোভনকে কাছে পাওয়ার লোভেই আবার অঙ্ক নিলাম। শোভন ছুটিতে বাড়ি এলেই আমায় অঙ্ক শেখাতো আসতো। অধ্যাপনায় তার মনোযোগ দেখে বাবা-মাদেরও তাক লেগে যেত মাঝে মাঝে।

দুরূহ ষ্ট্যাটিস্টিক্স-এর আড়ালে আমরা দু'জন তখন কল্পনায় স্বর্গ রচনা করে চলেছি। দু'জনেই বুঝতাম সে স্বর্গকে এই মাটির পৃথিবীতে টেনে আনতে বাধা কোথায়। একদিকে জাত ও আরেক দিকে অর্থ ও রূপের পাঁচিল। অব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদানের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না আমার রক্ষণশীল বাবা মা। শোভনের অভিভাবকরাও কক্ষনো রাজী হ'বেন না এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলা মেয়েকে বধূরূপে ঘরে এনে নিজেদের আভিজাত্য খর্ব্ব করতে। অবশ্য আইনের সাহায্যে ঘর বাঁধা চলে, কিন্তু মন মানতে চায়না সে কথা। সবাইকে দুঃখ দিয়ে যে মিলন সুখের হ'বে কিনা কে জানে।

আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট ও বাবার পাটনায় বদলী হ'বার খবর প্রায় এক সঙ্গে এলো। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা ম্লান করে দিল সাফল্যের সব আনন্দকে। বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় বান্ধবীর বাড়ি যাবার ছলে শোভনের সঙ্গে দেখা করলাম কালীমন্দিরে। বিগ্রহের সামনে প্রতিশ্রুতি দিলাম দু'জনে দু'জনকে—যদি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় জীবন শেষ হয়ে যায় যাক্, তব এই ক'টি বছরই অক্ষয় হয়ে রইবে আমাদের জীবনে। অন্য কেউ আসবে না সেখানে।......

শকুন্তলা একমনে শুনে যাচ্ছিল আমার ইতিবৃত্ত। খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বললো—"তার ফটো নেই তোর কাছে?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—আছে। "কই দেখি?" খানিক ইতস্ততঃ করে ট্রাঙ্ক খুলে বার করলাম শোভনের সেই ফটোখানা যা অনেক যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন। ও অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, তারপর হেসে বললো—"বাব্বাঃ, তোর বয়ফ্রেণ্ডের সংখ্যা দেখে মাঝে মাঝে এমন ভয় হ'ত ভাবতাম—,

তুই বন্ধি কোনদিন কারো প্রতি সিনসিয়ার হ'তে পারবি না।" শোভনের ফটো আর ট্রাঙ্কে উঠলো না। বইয়ের আলমারীর মধ্যেই রেখেদিলাম সেটা। আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ খুলতো না সে আলমারী। আর ওতো জেনেই গেছে এখন।

শকুন্তলা এর পর থেকে প্রায়ই শোভনের বিষয় নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতো। একটু দেরী করে ফিরলেই সে কি রাগ—"বেচারী শোভনবাবু, কপালে দুঃখ আছে ভদ্রলোকের।" লেখাপড়া করিনা, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিই তা নিয়ে সব সময় ভয় দেখাতো—"লিখছি শোভনবাবুকে, নিয়ে যান তাঁর মালুকে। আর আমি পারবো না' ইত্যাদি। আর যেদিন শোভনের চিঠি আসতো সেদিন তো কথাই নেই। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওর চিঠি আসতো আর প্রত্যেকটি চিঠি পড়ে শোনাতে হ'ত শকুন্তলাকে। কারণ বাংলা বলতে পারলেও পড়তে জানতো না ও। মাঝে মাঝে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হ'ত ওর সঙ্গে। শেষে কোন কূল কিনারা না পেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো। আলো জেলে দেখতাম শকুন্তলা তখনো চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করতাম "কি ভাবছিস্ অতো?" ও ম্লান হেসে বলতো—"কিছুনা ঘুমো। আমি তোর কপালে হাত বুলিয়ে দি।" ঠাট্টা করতাম—"উঃ কুন্তীর কত ভাবনা, যেন কন্যাদায় পড়েছে।" ও হঠাৎ রেগে উঠতো—"কন্যাদায় থেকে রুমমেট্ দায়টা কিছু কম নয় মশায়, অবস্থায় পড়লে বুঝতে।"

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। শকুন্তলার আবার পুজো করার বাতিক ছিল। রোজ ভোরবেলা স্নান করে ঘন্টা খানেক পুজো না করলে ওর হ'ত না। তার উপর বিশেষ বিশেষ তিথিতে তো কথাই নেই—নির্জ্জলা উপোস সেদিন। ওর ভক্তির বহর দেখে আমরা সবাই হাসতাম।

এরপর হঠাৎ এক নতুন উপদ্রব আরম্ভ করলো শকুন্তলা। কি একটা কারণে ক'দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল। হষ্টেলে ফিরে আমাকে দেখেই দূর থেকে চ্যাঁচাতে লাগলো—"মালুরে সব ঠিক হয়ে গেছে—"। কিন্তু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমি। শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিশ্বাসে যা বলে গেল তার সারমর্ম্ম হ'ল—আমি নাকি শোভনকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি—। তার অতি সহজ উপায় আছে না কি আমার হাতের মুঠোয়। "উপায়টা কি শুনি?"—"সন্তোষী মা'র পুজো কর।" আমি ঠাট্টা ভেবে হাসতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ও ঠাট্টা করেনি। সত্যিই নাকি ওর পিসতুতো বোনের এক ননদ না কে যেন সন্তোষী মা'র পুজো করে নিজের বাঞ্ছিত দয়িত লাভ করেছে—এইবার বাড়ি গিয়ে সদ্য সদ্য শুনে এসেছে সে। শুধু শোনা নয় সমস্ত ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে এনেছে সেই সঙ্গে। সন্তোষী মা'র ফটো কিনে এনেছে একখানা, পুজোর মন্ত্রটন্ত্রগুলোও নোট করে এনেছে কোত্থেকে। "তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে'না মালু, শুধু রোজ ভোরে উঠে চান করে মাত্তর এক ঘন্টা......।" শুনতে শুনতে কম্প দিয়ে জ্বর আসার উপক্রম হ'ল। আমি মালবিকা মুখার্জ্জী—কোনদিন সাড়ে সাতটার আগে বিছানা ছেড়েছি এমন অপবাদ যাকে অতি বড় শত্তুরেও দিতে পারবে না, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এক প্লেট জলখাবার না ধরলে যার হাঁক ডাকে বাড়ি এবং পাড়া (উপস্থিত হষ্টেল) শুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি করে—খোদ সেই আমি ভোরে উঠে, স্নান করে, খালি পেটে করবো এক ঘন্টা !!! তাছাড়া ভগবানে একটু আধটু বিশ্বাস যদিও ছিল তবু সন্তোষী মায়ের একটু স্তব স্তুতি করলেই যে আমাদের অমন গোঁড়া বাবা মা সব সংস্কার আভিজাত্যে জলাঞ্জলি দেবেন এ কথা গাঁজাখুরি ছাড়া আর কিছু মনে হ'ল না আমার। "ও সব আমার দ্বারা হ'বে না ভাই" নিতান্ত ভয়ে ভয়ে নিজের মতামত জানালাম তাকে। কিন্তু আমার মতামত নিয়ে মাথা ঘামাতে কুন্তীকে কোনদিনই দেখিনি, সেদিনও বিশেষ গা করলো না। নির্ব্বিকার মুখে পুজোর সাজ সরঞ্জাম রেডী করতে লাগলো সে। শেষে সেই অসম্ভবই সম্ভব করালো আমাকে দিয়ে। শীতকালের সকালে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে স্নান করে, চা জলখাবারের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, ঝাড়া একঘন্টা দরজা জানালা এঁটে সে কি প্রাণান্তকর সাধনা! সংস্কৃত উচ্চারণটা কিছুতেই রপ্ত হ'ত না, পাশে বসে কারেক্ট করতো শকুন্তলা। অবশ্য বেশীদিন ভুগতে হয়নি আমাকে। সকালে স্নান টান কোনকালেই সহ্য হ'ত না। দিন দশেকের মধ্যেই জ্বর বাধিয়ে ফেললাম। শকুন্তলার বোধহয় করুণা হ'ল এবার, কারণ অসুখ সারার পর আর কোনদিন পুজো টুজো করতে বলেনি আমায়।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। শকুন্তলা ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে পাশ করলো। আমি পাশ করলাম অতি সাধারণভাবে। অনার্স আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম বেগতিক বুঝে। তারপর এম. এ.। এইবার একটু মুস্কিল বাধলো। শকুন্তলা ইকনমিক্স নিলো, আমি বাংলা। সারাদিন আলাদা আলাদা কাটাতো, কিন্তু হস্টেলে এবারও আমরা দুজন রুমমেট। কাজেই আর সবই আগের মত চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে শোভন ডাক্তারী পাশ করে গেছে। হৃদরোগ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যাচ্ছে সে। যাবার আগে দিন পনেরোর জন্যে পাটনায় এলো বিদায় নিতে।

শকুন্তলার সঙ্গে শোভনের আলাপ করিয়ে দিলাম। আমার নামে শোভনের কাছে নালিশ করবে বলে সবসময় শাসাতো, কিন্তু দেখলাম যত বক্তৃতা ওর আমার কাছেই। শোভনের সামনে একেবারে চুপ। মাথা হেঁট করে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। একটা কথা বলতে হ'লে ঘেমে নেয়ে উঠতো যেন, গাল দ'টো লাল হয়ে উঠতো অকারণে। কুন্তী কতটা

লাগতো আমার, কেমন জব্দ। রোজ শোভন এলেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতাম ওকে। শোভন কিন্তু বিরক্ত হ'ত। আড়ালে বকতো আমাকে—"রোজ ওকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আস বলো তো? আর মাত্র ক'টা দিন, তারপর কতদূরে চলে যাবো, জানিনা আবার কবে দেখা হ'বে। অন্ততঃ এই ক'টা দিন তোমায় একা পেতে চাই—।"

রোজ শোভন আসার ঘন্টাখানেক আগে থেকে আমায় নিয়ে পড়তো শকুন্তলা। আমি নাকি চুল বাঁধতে জানিনা, শাড়িটা পর্যন্ত ঠিক করে পরতে শিখিনি এতদিনে। নিজে হাতে পরিপাটি করে চুল বেঁধে, নিজের সব চেয়ে সুন্দর শাড়িটি পরিয়ে দিত আর সমানে গজ্ গজ্ করতো। তারপর সব সাজগোজ শেষ হ'লে খোঁপায় ফাইনাল টাচ্ দিতে দিতে দুষ্টুমীভরা হাসি হাসতো। ফিরে এলে শোভন কি কি কথা বলেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতো বারে বারে।

অবশেষে পনেরোটি দিনের হাসি গান শেষ করে দিয়ে শোভন বিদায় নিল। আমি আবার ফিরে গেলাম আমার পুরোনো জীবনে। আগে শকুন্তলার জন্যে ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন তো দু'জনের ক্লাশ আলাদা, কাজেই অবাধ গতি। রোজ ক্লাশ পালিয়ে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো ম্যাটিনি সিনেমা দেখতাম, কখনো কফি হাউসে আড্ডা বসতো। শকুন্তলা কিছুই টের পেত না। শোভনের কথা যে কখনো মনে পড়তো না তা নয়; কিন্তু তার কথা ভাবলেই প্রচণ্ড অভিমানে ভরে উঠতো মন। শোভন বলেছিল তার বাবা মা'র মতের বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না কোনদিন। রাগ করে বললাম, "তোমার কাছে বাবা মা'ই সব? আমি কিছু নই?" —"কে বলে তুমি কিছু নও? তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো। কিন্তু মা বাবার মনে দুঃখ দিতে পারবো না আমি।" মনে পড়তো তাকে দেওয়া আমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা। কি তার পরিণাম? জীবনে আর কখনো গড়তে পারবো না একখানি সুখের নীড়। জানি শোভনও নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে। কিন্তু সে পুরুষ। সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিলিয়ে দেবে সে নিজেকে। কোনও রিক্ততাই থাকবে না তার। কিন্তু আমি! কি নিয়ে কাটবে এই নিঃসঙ্গ জীবন?

শোভনের চিঠির সংখ্যাও কমতে থাকে ক্রমশ। অসংখ্য হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি পরীক্ষায় ব্যস্ত সে। হাজার হাজার মাইল দূরে তার কথা ভেবে কার হৃদয় বিকল হ'চ্ছে সে কথা মনে করার সময় কোথায়!..

একটু একটু করে রাত গভীর হয়। চোখের জলে ভিজে ওঠে বালিশটা। "মালু!" হঠাৎ দেখি কোন ফাঁকে শকুন্তলা মাথার কাছে এসে বসেছে। আমি উত্তর দিইনা। ও আস্তে আস্তে আমার চোখের জল মুছে দেয়।

এক একটা করে মাস কেটে যায়। একদিন খবর পেলাম ১৮ই মে থেকে আমাদের পরীক্ষা শুরু হ'বে, অর্থাৎ ঠিক তিন মাস বাকী। হঠাৎ যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। অথচ এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। এম. এ. পরীক্ষা সাধারণত ঐ সময়েই হয়ে থাকে এবং এবছরও যে হ'বে সেটা আগেই আমার জানা উচিৎ ছিল। তবু কেন জানি পরীক্ষার কথাটা কোনদিন মনে পড়েনি এর আগে, তাই হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলাম "মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে"। একটি বইও নেই আমার কাছে। থাকবেই বা কোথা থেকে। বই কেনার টাকাতেই তো সিনেমা দেখা ও হোটেলে খাওয়া চলতো। লাইব্রেরীর বই থেকেও কিছু নোট করিনি আর এই অল্প সময়ের মধ্যে তা আর সম্ভবও নয়। সব মিলিয়ে চোখে অন্ধকার দেখার মতই অবস্থা।

অবশেষে সেই অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর মত দেখা দিলেন আমাদের অধ্যাপক ডাঃ সুকান্ত চ্যাটার্জী। মাত্র কয়েক বছর হ'ল পাশ করে রিসার্চ করছিলেন। মাস ছয়েক হ'ল আমাদের ক্লাশ নিচ্ছেন। অনেকবার আমাকে বলেছেন পড়াশোনা বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে তাঁকে জানাতে। এতদিন সময় হয়নি আমার। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়লো। অকপটে জানালাম নিজের অবস্থা। আমার ফাঁকি দেবার বহর দেখে তিনি প্রায় হতভম্ব। হয়তো বকাবকি করতেন কিন্তু আমার কাতর মুখ দেখে বোধহয় দয়া হ'ল। আমাকে নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন তিনি। রোজ ক্লাশ শুরু হ'বার আগে সকাল বেলা ও সন্ধ্যায় ক্লাশ শেষ হ'বার পর পড়াতেন। বাড়ি থেকে নোট তৈরী করে আনতেন আমার জন্য। কিছুদিন পরেই Preparatory leave আরম্ভ হ'ল। তখন প্রায় সারাদিন ধরেই আমাকে পড়াতেন সুকান্ত চ্যাটার্জী। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠতো আমার। ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত; মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসতো আমার। কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি তাঁর মুখে। দেখতে দেখতে দুরূহ কোর্স সহজ হয়ে আসে। পরীক্ষার ভয়ও কেটে যায় ক্রমশ। সেইসঙ্গে যে নিরাশার অন্ধকার ঘিরে রেখেছিল আমার জীবন তার মাঝেও বুঝি আলো ফোটে।

পরীক্ষার মাত্র দু সপ্তাহ বাকী। না, পরীক্ষাকে আর মৃত্যুদূত বলে মনে হ'চ্ছে না। অটল বিশ্বাসে, বেশ খুসী মনেই প্রতীক্ষা করছি তার জন্য। সেদিন পড়াতে পড়াতে বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন সুকান্ত চ্যাটার্জী। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন,—"তুমি পরীক্ষার পর ক'দিন থাকবে এখানে?"—"তার পরদিনই যেতে হ'বে।"—"চণ্ডীগড়?"—"হ্যাঁ"। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর ইতস্তত করে বল্লেন—"মালবিকা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম....।"

সেদিন হস্টেলে ফেরার পথে বার বার শুধু মনে হ'চ্ছিল—এই ভাল, শোভনকে আমি পাবো না কোনদিন। আর তার কাছে আমার মূল্যই বা কতটুকু? থাকুক সে তার কর্তব্যবোধ, তার যশ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মরীচিকার পিছনে ছুটে হতাশা।

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভবতোষ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট: সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সরকারি বাজেটের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আগামী বছরে বিভিন্ন খাতে এবং সমগ্রভাবে কী পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে, সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কতটাকা লাভ হবে, সরকারি ব্যয় কোন দিকে কতটা হবে ইত্যাদি বিষয়ে একটি হিসাব তৈরি করা। মোট ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কীভাবে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে সেটাও বাজেটেই দেখানো হয়। ঘাটতি মেটাতে হলে যদি নূতন কর-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার জন্য ব্যবস্থাও বাজেটে থাকবে। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত থাকে সরকারি করনীতি ও ব্যয় থেকে দেশের উৎপাদন ও বণ্টনে কী পরিবর্তন হতে পারে, বা কী পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার পরিচয়। সরকারি ব্যয় আজকাল কোন দেশেই শুধু প্রশাসন পরিচালনায় সীমাবদ্ধ থাকেনা। দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরকারি ভূমিকা সব দেশেই বেড়ে চলেছে। সরকারি আয়-ব্যয় দেশের মোট আয়-ব্যয়ের একটা বড় অংশ এবং সরকারি আর্থিক পরিকল্পনা কম-বেশি আজকাল সব দেশেই গৃহীত। এদিক থেকে দেখলে বাজেট শুধু একটা আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়। বাজেট দেশের উন্নতিতে সরকারি নীতি ও প্রভাব কী হবে তার প্রতিফলন।

দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে আছে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সেই সঞ্চয়ের সুপরিকল্পিত এবং বাঞ্ছনীয় ফলপ্রসূ বিনিয়োগ। আমাদের মত দেশে, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাতে সরকারের অংশ ক্রমেই বাড়ছে, সেখানে প্রত্যক্ষ সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। বস্তুত, বর্তমানে ভারতে যা মোট নূতন বিনিয়োগ হয় তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি সরকারি পরিচালনায়, আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি কৃষি, কুটির শিল্প, বেসরকারি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের বেশির ভাগই অবশ্য এখনো আসে বেসরকারি উদ্যোগ থেকে, কিন্তু তার জন্য যে বিনিয়োগের কাঠামো দরকার—যানবাহন, রাস্তাঘাট, রেল-পথ, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, রাসায়নিক সার—সেটা সরকারি কর্মনীতির অঙ্গ হিসাবেই তৈরি হয়। আর্থিক পরিকল্পনার নীতি গ্রহণের আরম্ভ থেকে সরকারি বিনিয়োগ কোন কোন দিকে যাবে এবং কোথায় কোথায় বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নীতি নেওয়া হয়েছে। যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশি, যেখানে প্রত্যক্ষ লাভ বেশি না হলেও সমাজের উপকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুবিধা অনেকখানি। যেখানে বিনিয়োগের ফল পেতে দেরি হতে পারে, সেখানে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোই সঙ্গত, কারণ ঠিক এই সব ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সহজে আসবে না।

দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর সরাসরি আয়-ব্যয় নীতির প্রভাবের প্রশ্নটি দুই ভাগ করে দেখা প্রয়োজন। সরকারি খাতে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা হল প্রথম বিবেচ্য এবং দ্বিতীয় বিবেচ্য হল সরকারি করনীতি ও ব্যয় ব্যবস্থায় বেসরকারি ক্ষেত্রে—অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দানের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সরকারি আয়-ব্যয়কে যদি চলতি খাতে ও মূলধনী খাতে এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয় তাহলে চলতি খাতে উদ্বৃত্ত হলে সেটাকে সরকারি সঞ্চয় বলে অভিহিত করা যায়। যদি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে সরকারের আয় হয় দশ হাজার কোটি টাকা এবং চলতি খাতে ব্যয় হয় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা, তাহলে উদ্বৃত্ত পাঁচশ কোটি টাকা সরকারের সঞ্চয়—অর্থাৎ সরকারের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয়। এই সঞ্চয়টাকে মূলধনী খাতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মূলধনী আয় যোগ দিলে যে টাকাটা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মূলধনী ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এই মূলধনী ব্যয়ের প্রধান অংশ হল আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পিতভাবে স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা। মূলধনী আয় আসে সরকারের কাছে জমা দেওয়া নানা রকমের টাকা থেকে—যেমন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা পোষ্ট অফিসের আমানত—এবং নূতন তোলা ঋণ থেকে। এর অনেকটাই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের হস্তান্তর। রাজস্ব খাতে বা চলতি খাতে উদ্বৃত্ত আজকাল খুব একটা হয় না। কিন্তু এবারে ৬৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে। আর সরকারের এবারকার মোট মূলধনী আয় ৬০১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩২৪৮ কোটি টাকা আসবে নানারকমের জমা থেকে, আর বাকি ২৭৬৬ কোটি টাকা তোলা হবে ঋণ করে—দেশের বাজার থেকে ১০০০ কোটি টাকা, বিদেশ থেকে ৮৯৪ কোটি টাকা, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে মোট ৮৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে। দেশের মধ্যে যে ঋণ তোলা হবে তার কতটা আসবে প্রকৃত সঞ্চয় থেকে আর কতটা

আসবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে (অর্থাৎ মুদ্রা-সম্প্রসারণ থেকে) সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

সরকারি খাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আর্থিক পরিমাণ কতটা তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় পরিকল্পনার জন্য ব্যয় থেকে। পরিকল্পনার ব্যয়ের বাইরেও সরকারি বিনিয়োগ হতে পারে—যেমন প্রতিরক্ষা বিভাগে। আবার পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যেও কিছুটা সাধারণ চলতি খরচ থাকতে পারে। তবু, এই পরিকল্পনা ব্যয় থেকেই সরকারি বিনিয়োগের সবচেয়ে সহজবোধ্য চিত্র পাওয়া যায়। এবারে, অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮-এ, কেন্দ্রীয় খাতে মোট পরিকল্পনা ব্যয় হবে ৫৭৯০ কোটি টাকা—রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র পরিকল্পনার জন্য যে সাহায্য দেবে সেটা ধরে নিয়ে। এ'ছাড়া রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের আয় থেকে আর্থিক পরিকল্পনার জন্য যা খরচ করবে সেটা ধরে নিলে মোট পরিকল্পনা ব্যয় গিয়ে দাঁড়াবে ৯৯৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। এর মধ্যে কৃষি, জলসেচ, সারপ্রকল্প ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য মোট ব্যয় হবে ৩০২৪ কোটি টাকা। রাস্তাঘাট, পানীয়-জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কুটির শিল্প ইত্যাদি সব দিকেই এবারে আগের বছরের চেয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটির দিকে তাকানো যেতে পারে। সরকারি আয়-ব্যয় নীতি, এবং বিশেষ করে করনীতি দিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান-গত সঞ্চয় বাড়াবার কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। জীবন-বীমা বা প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডে টাকা জমা দিলে আয়কর অনেকটা মকুব হয়। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট কিনলে বা দেশীয় কোম্পানির শেয়ার কিনলে তার থেকে যে আয় হয় তাতেও আয়কর অনেকটা ছাড় পাওয়া যায়। এবারে এদিক থেকে কোন নূতন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, কিন্তু যাদের আয় বছরে আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা তাদের আয়কর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই স্তরে আয়কর দাতাদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। এই ৮ লক্ষ লোক আগে আয়কর হিসাবে যে টাকাটা দিতেন তার সবটাই যদি সঞ্চয় করেন, তাহলে মোট সঞ্চয় বাড়বে প্রায় ১৬ কোটি টাকা, কিন্তু যে টাকাটা বাঁচবে তার সবটাই সঞ্চিত হবে এটা আশা করা অন্যায় হবে। অন্যদিকে, যাদের আয় দশ হাজারের বেশি তাদের উপরে আয়কর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তাদের সঞ্চয় কমবে, তবে আবশ্যিক জমা প্রকল্পে যে টাকাটা তারা দেবে সেটাও সঞ্চয়। এই জমার একটা অংশ এবারে ফেরৎ আসছে, সেটা আবার সঞ্চিত হবে না ব্যয়িত হবে বলা কঠিন। মোটের উপরে বলা যায় যে এবারকার বাজেটে বেসরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য নূতন ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে, বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াবার জন্য কিছু নূতন ব্যবস্থা বাজেটে নেওয়া হয়েছে। আগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন বিনিয়োগ করলে আয়করের সুবিধা দেওয়া হত। এবারে এই সুবিধা প্রসারিত করে সব রকমের শিল্পেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কেবল তালিকাভুক্ত ৩৪ টি শিল্প বাদে। যেসব শিল্প এসব সুবিধা পাবে না, তাদের মধ্যে আছে কিছু বিলাস দ্রব্য (যেমন মদ, সিগারেট, প্রসাধনের জিনিস ইত্যাদি) এবং এমন আরো কয়েকটি শিল্প যেখানে এজাতীয় সুবিধার কোন প্রয়োজন নেই। কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প যাতে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত নূতন ক্ষুদ্রশিল্পকে আয়করের কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। ভারতে উদ্ভাবিত কারিগরির পদ্ধতি ব্যবহার করলেও আয় কর কমানো হবে। যদি কোন সুপরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো 'রুগ্ন' শিল্পকে নিজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেয়, তাহলেও আয়করের সুবিধা পাওয়া যাবে। 'মূলধনী লাভ'-এর ক্ষেত্রে করনকুবের সুবিধা আগে পাওয়া যেত শুধু বসত বাড়ি বিক্রির লাভের বেলাতে—এবারে সে সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে অন্য সম্পদের ক্ষেত্রেও। আশা করা যায় যে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তার কিছুটা যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিযুক্ত হবে। সম্ভবত এই টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা হবে। তাতেও বিনিয়োগেরই উপকার।

অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে—যেমন কোন কোন ধরণের সুতা বা দেশলাই। যেক্ষেত্রে নূতন ট্যাক্স বসানো হয়েছে সেখানেও ক্ষুদ্র শিল্পকে অনেকটা অব্যাহতি দেওয়ার হয়েছে। সবশুদ্ধ বলা যায় যে এবারকার বাজেটের মূলনীতি হল ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দান, বিশেষ করে সেই ক্ষুদ্রশিল্প যদি গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়। এই নীতি আজকাল প্রায় সকলে বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতের দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অভাবের সমস্যা দূর করতে হলে বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারণের জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এবারকার বাজেটে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা শক্ত। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা, বা বেসরকারি বিনিয়োগের মূল সমস্যা সমাধান করতে হলে করনীতি ছাড়াও অন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সে সব ব্যবস্থা কী হবে সেটা নূতন পরিকল্পনা নীতিতে স্থির হবে। এ বছরের বাজেট নূতন সরকার মাত্র তিনমাস সময়ের মধ্যে তৈরি করেছেন, অতএব এর মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন থাকবে এটা আশা করা অসঙ্গত। আগামী কয়েক মাসে নূতন পরিকল্পনা কমিশন আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক উন্নতির কর্মপন্থা কী রকম হবে তার একটা খসড়া তৈরি করতে পারবেন নিশ্চয়ই। এবং তখন সময় আসবে নূতন করনীতি এমন ভাবে তৈরি করবার, যাতে সম্ভাব্য সব উপায়ে সঞ্চয় বাড়ানো যায় এবং দেশব্যাপী কৃষি ও শিল্পোন্নতি, কর্মসংস্থান ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণের পথে বিনিয়োগকে চালিত করা যায়।

অমর নাথ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট কতটা জনতা-বাজেট

প্রশ্নটার মধ্যে কতখানি কৌতুহল আর আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব রয়েছে তা আমার জানা নেই তবে কেন্দ্রে সমাসীন জনতা সরকারের বাজেট নিঃসন্দেহে কিছুটা চমকের সৃষ্টি করেছে। জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ ছিল সেগুলি বহুলাংশে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে এবারের এই কৃষি উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় বাজেটে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উপরে যে পরিমাণ ঝোঁক দেওয়া হয়েছে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবারের বাজেটে মধ্য ও উচ্চ আয়, সম্পন্ন ব্যক্তিদের যতটা হতাশ হতে হয়েছে ততটা সুবিধা মিলে গেছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের যাঁদের মাসমাইনের উর্দ্ধসীমা মোটামুটিভাবে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। আর একটা সুবিধে, পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের নানাবিধ প্রকল্পে বিশেষত কৃষি আর সেচ, রাস্তাঘাট আর পানীয় জল, প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস মিলেছে। এবারে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রচলিত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বহাল উৎপাদন শুল্কের উপরে অতিরিক্ত ১ শতাংশ বৃদ্ধি, এর পেছনে সতর্কতার আভাস পাওয়া যায়।

বস্তুত মুদ্রাস্ফীতি কবলিত ও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর ভারে প্রপীড়িত আর্থিক কাঠামোয় নতুন করের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ একান্তই সীমাবদ্ধ। তবুও এবারের বাজেটে দুটো আপাত বৈশিষ্ট্য হ'ল, প্রথমত সামগ্রিক করের পরিসরে সম্ভাব্য সংকোচন। আর দ্বিতীয়ত ঘাটতি ব্যয়ের মাত্রা ন্যূনতম পর্য্যায়ে সীমিত করা। আগামী আর্থিক বছরে সংগ্রহযোগ্য কর আদায়ের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ হ'ল ১৩০ কোটি টাকা। আর ঘাটতি ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হ'ল ৯২ কোটি টাকা আর পরোক্ষ কর হ'ল ৫৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেই শুধু বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা বাৎসরিক ৮০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে, আর সেইসঙ্গে কোম্পানিগুলির আয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল কোম্পানিগুলির সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নে গতিবেগ সৃষ্টি করা। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সামান্যই হেরফের ঘটানো হয়েছে। তাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যস্তরে করজনিত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটে।

কৃষি উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসার ঘটে আর সেইসঙ্গে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী হ'ল শিল্পগত মন্দা ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। এই অবস্থার প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করে বেশ কয়েকবারই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্টে ও বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রসার ঘটে। আর এজন্যই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের গুরুত্ব খুবই বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে আর্থিক বিনিয়োগে নানারকম সুবিধা প্রদান করে একটা অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন।

উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়ে গিয়েছে। চিরাচরিত ধারায় আর্থিক ও রাজস্বগত অনুদান বা মঞ্জুরি মারফত সুযোগ সুবিধে শিল্পে কেন দেওয়া হয়নি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে গতানুগতিক বা মামুলি প্রথায় শিল্পে কোনও প্রকার সাহায্য ফলপ্রসূ হবেনা। বিগত কয়েকবছরের ইতিহাস তাঁর এই যুক্তি প্রমাণ করছে। কিন্তু তার জন্য শিল্পকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্পের (Investment Allowance Scheme) সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি দাবী পূরণ করেছেন। শুধুমাত্র ৩৪-টি স্বল্প-গুরুত্বসম্পন্ন শিল্প ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শিল্পে প্রচলিত ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্প কার্যকর হওয়ায় একটা প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী দেশের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলিতে এক বছরে

মোট ২১৩ কোটি টাকার যত নতুন বিনিয়োগ ও মূলধন সম্প্রসারণ ঘটবে।

শিল্পক্ষেত্রে আরও কতকগুলি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তবে সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই সুবিধে মিলবে। রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুবিধে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ইউনিট যদি চালু ইউনিটগুলির সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তি ঘটায় তবে সেক্ষেত্রে রুগ্ন শিল্পের সঞ্চিত ক্ষতির তহবিল চালু সংস্থার মুনাফার সঙ্গে সমীকরণ করা যাবে। আর একটি সুবিধে হ'ল যে, কোন কোম্পানি যদি স্বীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে লগ্নীব্যয় করে তবে সরকার তাকে করযোগ্য মুনাফায় কিছুটা রেহাই অনুমোদন করবেন।

বর্তমান বাজেটে আশু সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও সুষ্ঠু উন্নয়নের একটা পথনির্দেশ করা হয়েছে। ফলে বর্তমান-কালের বার্ষিক ১২.৫ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের তাগিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের জন্য সম্ভাব্য পরিমাণে ভোগাপণ্য ও সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সাধনে অর্থমন্ত্রীর প্রধান সহায়ক দুটি শক্তি হ'ল বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ও খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার। বিদেশী মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল থেকে ৮০০ কোটি টাকায় ঋণ নেওয়ার ফলে ঘাটতি ব্যয়ের সীমা সংকুচিত করা সম্ভব হয়েছে। আর সেইসঙ্গে খাদ্যসংগ্রহ অভিযানে সরকারী অর্থব্যয়ে বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, রাজস্ব ব্যয় ও দেশরক্ষা খাতে অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করে ও উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির যথাযথ বিন্যাস ও চালু প্রকল্পগুলির রূপায়ণে একটা গতিসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন।

তবে প্রত্যেক বাজেটের মত এবারের বাজেটও কিছু দুর্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-সংস্থাগুলি উৎপাদনক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পোঁছে গেছে। তাই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে অনেকগুলি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা সৃষ্টি করা দরকার। আগামী বছরে পরিকল্পনা ব্যয় ২৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৯,৯৪৭ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির দরুণ এর প্রকৃত পরিমাণ বেশ কিছুটা কমে যাবে। তাছাড়া শিল্প হ'ল অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত ক্ষেত্র যেখানে অর্থনৈতিক গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারে। অনেকের মতে শিল্পে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দিয়ে কৃষির উপর সহসা গুরুত্ব প্রদান করায় জাতীয় উৎপাদন ক্রম-ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্যের অভাব দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

ঘাটতি ব্যয় প্রসঙ্গে আর একটি দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় থেকে ৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা করা হবে তার সুস্পষ্ট কোনও হদিস নেই। যদি তা মামুলি সরকারী ঋণ পত্রের (Ad-hoc Securities) মাধ্যমে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে নোট ছাপানোরই নামান্তর। তবে এটুকু মাত্র আভাস মিলেছে যে এক বিশেষ সিকিউরিটির মাধ্যমে এই টাকা তোলা হবে। কিন্তু তাহলেও মুদ্রাস্ফীতির সমূহ সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায়না। তবে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখবার একটাই পথ এক্ষেত্রে খোলা রয়েছে। ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রার সমমূল্যে যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তাহলে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ না বেড়ে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

মোটের উপর বাজেটের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে যে চিত্রটি সুস্পষ্ট হয় তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে একটি সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে করের হেরফের ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী একটি সুসংবদ্ধ অথচ উন্নয়নমূলক বাজেট সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অল্পবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের রেহাই দান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুতপক্ষে অর্থমন্ত্রী একটি পুনর্বন্টনমূলক করবিন্যাস প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সর্বাধিক রাজস্ব (৯২ কোটি) প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করছেন। সেসঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়স্তরের বৈষম্য হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষির উপরে বাজেটের গুরুত্ব জনতা সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর নবরূপায়ণ নির্দেশ করে। বিশেষত এই পথে কৃষিই হবে ভাবী অর্থনীতির উন্নতির পরিমাপক ও উন্নতি বিধায়ক। আর শিল্প তার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

রুমমেট

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ও অবহেলার গ্লানি কুড়োতে পারিনা আর।

কিন্তু রুমের দরজার কাছে এসেই চিন্তাধারা থেমে গেল। দরজা ভেজানো, অর্থাৎ শকুন্তলা রুমেই আছে। ওর কথা মনে হ'তেই রক্ত হিম হয়ে এলো যেন। ক করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো সেইটাই সিব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ও যদি জানতে পারে? তখনি আবার মনে হ'ল, জানলোই বা, লুকোচুরির কিই বা আছে এতে? আজকেই বলবো ওকে সব কথা। জানিয়ে দেবো শোভন চলে গেছে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মত।

একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। দেখি শকুন্তলা বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "কুন্তী কি হয়েছে রে?" চমকে মুখ তুলে তাকালো শকুন্তলা। হঠাৎ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। হুড়মুড় করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর আমি প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাতে চেপে ধরলাম টেবিলটাকে। মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ—দেয়ালগুলো চোখের সামনে দুলছে।

শকুন্তলার বিছানার উপর শোভনের ফটো। ফটোর কাঁচে তখনো টল টল করছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে ২৪ জুন, শুক্রবার ১৯৭৭ সাল। এপ্রিল মাসে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সপ্তম বিধানসভা ভেঙ্গে দেন। মে মাসে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন বিধান সভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ ও ১৪ জুন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সমাধা হয়। এই নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা ও কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে সি-পি-আই(এম)-এর নেতৃত্বে ছয়দলের বামফ্রণ্ট নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ২১ জুন সি-পি-আই(এম)-এর নেতা জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ২২ জুন আরও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলে পশ্চিমবঙ্গে ২২ জনের মন্ত্রিসভার বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে রাজ্যের সপ্তম বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে ২১৬ টিতে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছিলেন। সেবার সব দল মিলিয়ে ও নির্দলদের নিয়ে মোট প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ছিল ৮৩৩ জন, ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭,৯৪৬ টি। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে অষ্টম বিধানসভার এই যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে মোট ২৯৪ টি আসনের জন্য (লক্ষণীয়, ১৪ টি আসন বেড়েছে), নির্দল প্রার্থীদের ধরে মোট প্রার্থী ছিলেন ১,৫৭১ জন। ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৯,০৬২। এবার একটি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হয়নি। পুরুলিয়া জেলার আরসা কেন্দ্রে জনতা দলের প্রার্থীর নির্বাচনের ঠিক আগেই মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ওই কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রেখেছেন। সুতরাং ১৯৭২ সালের ২৮০ জন সদস্যের তুলনায় এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট ২৯৪ জন সদস্যের মধ্যে ২৯৩ জনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যখন এপ্রিল মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখন মোট ২৮০ জনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১৬, সি পি আই-এর ৩৫, আর এস পি-র ৩, সংগঠন কংগ্রেস ২ গোর্খা লীগ ২, এবং নির্দল ৫। যদিও সি পি আই (এম) ১৪ টি আসনে, এবং এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স পার্টি ১ টি করে আসনে জয়লাভ করেছিলেন, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে এই সদস্যরা বিধানসভা বর্জন করেছিলেন। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস ও জনতা দল উভয়েই ২৯৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সি পি আই (এম) দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট), আর সিপি আই ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে একটি বামফ্রণ্ট গঠন করেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে সি পি আই (এম) প্রার্থী দেন ২২৪ টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩৬ টিতে, আর এস পি ২৩, ফরওয়ার্ড ব্লক (মাঃ) ৪, আর সি পি আই ৩ ও বি বা কং ৩টি আসনে। যদিও ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে তারপর চারটি নির্বাচনে হয় সি পি আই দল অপর কোন বামফ্রণ্ট কিংবা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে আসন ভাগাভাগি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন, এবার এঁরা

শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন

একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন ; সি পি আই প্রার্থী দিয়েছিলেন ৬২ টি আসনে। তেমনি এস ইউসিও এবার কোন বামফ্রণ্টে যোগ না দিয়ে নিজেরা ২৩টি আসনে লড়াই করেছেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে অপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় নকসালপন্থী বলে পরিচিত সি পি আই (এম-এল)-এর একটি গোষ্ঠীর নির্বাচনের লড়াই-এ শামিল হওয়া। নকশাল নেতা শ্রী সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থা ঘোষণা করেন এবং এঁদের তিনজন নেতা নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এঁরা তিন জনই মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রী সন্তোষ রানা গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। অপর দুজন অবশ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সর্বভারতীয় সি এফ ডি দল জনতা দলের সঙ্গে মিশে গেলেও অপর কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও সি এফ ডি-র কিছু বিক্ষুব্ধ সদস্য আলাদা ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রায় ১৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে মাত্র একজন—শ্রী আবদুল করিম চৌধুরী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এবার মোট চার জন নির্দল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে একজন সি পি-আই (এম) সমর্থিত।

ছয় পার্টির বামফ্রণ্ট এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এসেছেন। ১৯৭২-এর বিধানসভায় যদিও ২৮০ জনের মধ্যে ২১৬জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেসও বিপুল সংখ্যাধিক্যের সমর্থন লাভ করেছিলেন, এবারকার বামফ্রণ্টের গণসমর্থন তার চেয়েও বিরাট—সর্বকালের রেকর্ড! বামফ্রণ্টের মোট সদস্যের সংখ্যা ২৩০, এঁদের মধ্যে সি পি আই (এম)-এর ১৭৮ (একজন সমর্থিত নির্দলকে নিয়ে), ফ: বু:এর-২৫, আর এস পি-র ২০, ফ: বু: মা: ও আর সি পি আই ৩ জন করে এবং বি বা ক: ১ জন সদস্য। জনতা দল পেয়েছেন ২৯ জন সদস্য। কংগ্রেস ২০ জন। সি পি আই মাত্র ২ জন। অন্যান্য দলের হিসাব: এস ইউ সির ৪, গোর্খা লীগ ২, সি পি আই (এম-এল), মুসলীম লীগ ও সি এফ ডি ১ জন করে এবং নির্দল ৩ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বামফ্রণ্ট ২৩০টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করার পর বিধানসভায় বিরোধী পক্ষে মোট মাত্র ৬৩ জন সদস্য থাকলেন। গরিষ্ঠ বিরোধী দল হিসাবে জনতা দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কাশীকান্ত মৈত্র। কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা হয়েছেন ডা: জয়নাল আবেদিন।

এবার মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ভোট বিধিসম্মত ভাবে দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন গণ্য করেছেন। এই মোট বিধিসম্মত ভোটের মধ্যে একক বৃহত্তম দল সি পি আই (এম) পেয়েছেন ৫১ লক্ষ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৩৬ ভাগ, যদিও ১৭৮ জন প্রার্থী (বিধানসভার মোট নির্বাচিত ২৯৩ জনের শতকরা ৬১ ভাগ) নিবাচনে জয়লাভ করেছেন। বামফ্রন্টের অপর পাঁচটি দল একত্রে ৫২টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন, এই দল কটির মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ১১ ভাগ।

জনতা দলের প্রার্থীগণ মোট ২৮ লক্ষের কিছু বেশী ভোট অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২০ ভাগের কিছু বেশী পেয়েছেন, এই দলের বিজয়ী সদস্যের সংখ্যা ২৯ হওয়ায় দল বিধানসভার মোট আসনের শতকরা দশটিও লাভ করতে পারেন নি। কংগ্রেস দল পেয়েছেন ৩২ লক্ষ ভোট এবং মাত্র ২০টি আসন। অর্থাৎ বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২২½ ভাগ ভোট পেলেও আসনের হিসাবে সে-সমর্থন প্রতিফলিত হয় নি। জেলার হিসাব বিচার করলে দেখা যাবে জনতা প্রার্থীগণ কুচবিহার, ২৪ পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ বর্ধমান, বীরভূম ও পুরুলিয়া এই কটি জেলায় একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেন নি। তেমনি কংগ্রেস কোন আসন পাননি কলকাতা, হাওড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বাঁকুড়া ও হুগলী প্রভৃতি সাতটি জেলায়। জনতা দল সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছেন—৩৭টির মধ্যে ১৭—মেদিনীপুর জেলায়, আর কংগ্রেস পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী—১৯টির মধ্যে ছটি—মুর্শিদাবাদে।

সকলেই জানেন জনতা দল নবাগত-হলেও এই দলের সর্বভারতীয় প্রাধান্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে এই দলের পরিক্রমন অনুসন্ধিৎসার বিষয়। তেমনি, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি আই (এম) ও কংগ্রেসের উত্থান-পতন কৌতুহলী পাঠক মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন, সন্দেহ নেই। যদিও অতীতের হিসাব থেকে জনতা দলের কোন চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় তথাপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিবরণ থেকে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। এই সংকলন ১৯৬৭ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করা হয়েছে কারণ ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত সি পি আই ভাগ হবার আগে পৃথক দল হিসাবে সি পি আই (এম)-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মোটামুটি হিসাবে সি পি আই এবং আরও কয়েকটি দলের উল্লেখও করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ২২ জন সদস্যের মন্ত্রিসভায় —সি পি আই (এম)-এর ১৪ জন, ফরওয়ার্ড ব্লকের চার, আর এস পি-র ৩ ও আর সি পি আই-এর ১ জন। সি পি আই (এম)-এর শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী। ৯৬৭ ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল—দুবারই সি পি আই (এম)-এর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে অন্য বেশ কয়েকটি দল যুক্ত হয়েছিল। দুবারই শ্রী বসু উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর এই বর্তমান

মন্ত্রিসভাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দশবার সরকারের বদল হল। বর্তমান বিধানসভা তথা নতুন সরকারের কথা বলতে হলে বোধ হয় ঐতিহাসিক বর্ণনার খাতিরে আগের সরকারগুলির উল্লেখও প্রয়োজন:

১। মার্চ ১৯৬৭—নভেম্বর ১৯৬৭ প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার।
২। নভেম্বর ১৯৬৭—জানুয়ারী ১৯৬৮ পি. ডি. এফ. সরকার।
৩। জানুয়ারী ১৯৬৮—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রাষ্ট্রপতি শাসন।
৪। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭০ দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার
৫। এপ্রিল ১৯৭০—মার্চ ১৯৭১ রাষ্ট্রপতির শাসন।
৬। মার্চ ১৯৭১—এপ্রিল ১৯৭১ অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সরকার
৭। এপ্রিল ১৯৭১—মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির শাসন।
৮। মার্চ ১৯৭২—এপ্রিল ১৯৭৭ কংগ্রেস সরকার।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জনৈক ভোটদাতা ভোট প্রয়োগ করছেন

৯। এপ্রিল ১৯৭৭—জুন ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতির শাসন।
১০ জুন ১৯৭৭— বামফ্রণ্ট সরকার।

গত দশ বছরে দশবার সরকার পরিবর্তন কী সূচীত করে? বাঙ্গালীর চপলচিত্ততা? নাকি, সমস্যাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা? রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙ্গালী অস্থির কারণ সে অধীর আগ্রহে এমন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা চাইছে যা তাকে শুধু সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি দেবে তাই নয়, আরও বেশী করে দেবে স্বাধীনতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষায় নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার নিরঙ্কুশ সুযোগ।

দল	১৯৬৭		১৯৬৯		১৯৭১		১৯৭২		১৯৭৭	
	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)
কংগ্রেস	৪১	১২৭ (২৮০)	৪০	৫৫ (২৮০)	৩০	১০৫ (২৮০)	৪৯	২১৬ (২৮০)	২২.৫	২০ (২৯৩)
সি পি আই (এম)	১৮	৪৩ (১৩৫)	২০	৮০ (৯৭)	৩৪	১১৩ (২৩৮)	২৮	১৪ (২০৮)	৩৬	১৭৮ (২২৪)
সি পি আই		১৬		৩০				৩৫		
ফ: ব:		১৩		২১				০		২৫
আর এস পি	২	৬	৩	১২	২	৩	২	৩	--	২০
এস ইউ. সি	০.৭	৪	১.৫	৭	২	৭	১	০	—	৪
কংগ্রেস (সং)	—	—	—	—	৬	২	১	২	--	--

পল্লীউন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

জ্বালানীর ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, যোজনায় পেট্রোলিয়ামের জন্য বরাদ্দের হিসেব গত বছরের ৪৮৫ কোটি টাকাকে আরো বাড়িয়ে এ বছর ৬৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপকূলভাগ ও স্থলভাগে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে ৪৫১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সম্প্রতি বোম্বাই হাই ও বেসিন ক্ষেত্রে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন ১ কোটি ১১ লক্ষ ১০ হাজার টনে পৌঁছাবে আশা করা যায়। গত বছর উৎপাদিত হয়েছিল ৮৮৯ লক্ষ টন।

২০০ মেগাওয়াটের একটি নতুন লিগনাইট-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য নাভেলি লিগনাইট করপোরেশনকে দেওয়া হবে ৫ কোটি টাকা। তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎঘাটতির কথা বিবেচনা করে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৬৫১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩৩২ কোটি টাকা রেল পাবে। রেলের বাজেট বরাদ্দ হল ৪৮০ কোটি টাকা।

গ্রামাঞ্চলে আরো বেশী সংখ্যক ডাকঘর চালু করা, এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সুযোগসুবিধা প্রচলনের জন্য অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সুপরিচালনার ফলে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলি যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য যোজনায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে ৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পরে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ হতে পারে। ঐসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। তাঁত শিল্পের জন্য ২০ কোটি এবং রেশম চাষের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

সময় সংক্ষেপ এবং চালু প্রকল্পগুলিতে প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ অব্যাহত রাখার দরুণ 'আমাদের ঘোষিত নীতি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো সম্ভব হয়নি বলে শ্রী প্যাটেল সংসদে মন্তব্য করেন। এছাড়া সম্প্রতি পুনর্গঠিত যোজনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে উঠতে পারেননি বলেও তিনি জানান। শ্রী প্যাটেল বলেছেন, দলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে পল্লী উন্নয়ন, হরিজন, আদিবাসী ও অন্যান্য অবহেলিত শ্রেণীগুলির অবস্থার উন্নতি, বেকারী দূরীকরণ, এবং ঝিঞ্জি-বস্তী অপসারণ সহ অন্যান্য সমাজ সেবার প্রসারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তিনি এমন একটি বাজেট রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যাতে দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের দর্শন, কর্মসূচী ও নীতিগুলির যথার্থ প্রতিফলন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নতির জন্য শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ, সেচ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের উন্নতির জন্য শতকরা ৫.৪ ভাগ, পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদির জন্য শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ব্যয় নির্ধারিত করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত ব্যয়-তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে আনুপাতিক হারে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে, আর এই ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সংকুচিত করা হচ্ছে শিল্প (বিশেষ করে রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য, লৌহেতর খনিজ এবং পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল শিল্প) এবং সমাজকল্যাণ (বিশেষত পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা) বিষয়ক ব্যয়বরাদ্দকে। বর্তমান বাজেটে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ (৩,৪৩১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা)। কিন্তু এর চেয়েও বেশী হারে ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন, গ্রামীণ পানীয় জলের সংস্থান, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, নগর উন্নয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা, ভূমিসংরক্ষণ, পশুপালনশিল্প, মৎস্যচাষ, বনসংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, পেট্রোলিয়াম উত্তোলন, ঔষধ প্রস্তুতকারক শিল্পের বিকাশ, ইলেকট্রনিক্স, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিমান পরিবহণ ইত্যাদি।

প্রদত্ত তালিকা থেকে অনুমান করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের এই বৎসরের পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের দিক থেকে নজর খানিকটা সরিয়ে এনে চালকা শিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষি, সেচ, বনভূমি ও জলাধারের উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের মানুষের জীবিকার পথকেও সুগম করার চেষ্টা রয়েছে এই নূতন ব্যবস্থায়। দেশের স্বয়ংম্ভরতা বাড়াবার জন্য পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশাগত পেট্রোলিয়ামের উপর একান্ত নির্ভরশীল রাসায়নিক শিল্পগুলির বিস্তারে সরকারী আগ্রহ বেশ খানিকটা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ানো এবং সেই ব্যয়কে নূতনতর খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টাই বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলে সাধারণ মানুষের বেকারি ও আর্থিক দুর্গতি হ্রাস পাবে এবং দেশে বিদ্যুৎ ও তেলের ঘাটতি কিছু পরিমাণে মিটবে বলে আশা করা যায়। তবে একটি মাত্র বাজেটের সাহায্যে দেশের আর্থিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হবে এমন আশা সরকারী মহলও নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। পরিবর্তনের দিকে সামান্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপকেই আপাতত যথেষ্ট বলে ভাবা উচিত।

অমলেন্দু রায়চৌধুরী

আপনার আয়কর কত দাঁড়াল

জনতা সরকারের প্রথম বাজেটে আয়কর রেহাইয়ের সীমা আট হাজার থেকে বেড়ে দশ হাজার টাকায় দাঁড়াল। কিন্তু যে সমস্ত করদাতার করযোগ্য আয় দশহাজার টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে আট হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের সবটাতেই ১৯৭৬-৭৭ সালের করহার অনুযায়ী কর ধার্য্য করা হবে। যাদের বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকার সামান্য বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিছু প্রান্তিক (Marginal) সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কোম্পানীগুলি বাদে অন্যান্য সকল শ্রেণীর আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জ দশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পনের শতাংশ করা হয়েছে। পনের হাজার টাকার অধিক আয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিক জমা আরো দু বছর চালু থাকবে।

বার্ষিক দশ হাজার টাকার বেশি আয় না হলে আয়কর দিতে হচ্ছে না। কিন্তু আয় দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলেও নানা রকম ছাড় আছে যেমন দশ হাজার টাকা আয়ের বেতনভুক কর্মচারীরা যাতায়াত, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ কুড়ি শতাংশ হারে ছাড় পাবেন। আয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলে পরবর্ত্তী ধাপের আয়ের জন্য এটা হবে শতকরা দশভাগ। এই বাবদ যে রেহাই পাওয়া যাবে তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ অবশ্য ৩৫০০ টাকা। এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়া ভাতাকে বেতনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে না। বাড়ীভাড়া ভাতাও আয়কর থেকে ছাড় পাওয়া যায়। মালিক পক্ষ যদি কোথাও তার কর্মচারী বা অফিসারকে মোটর গাড়ী বা স্কুটার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেন তাহলে সেই কর্মচারী বা অফিসার এই বাবদ এক হাজার টাকার বেশি রেহাই পাবেন না।

যারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, জীবন-বীমা, ডাকঘরের দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা বা ইউনিট ট্রাষ্টের জীবন বীমায় টাকা জমান তাদের জমার প্রথম চারহাজার টাকায় কোন আয়কর দিতে হবে না। তার সমগ্র আয় থেকে এই টাকাটা বাদ দিয়ে বাকী টাকার উপর আয়কর ধার্য্য করা হবে। এ বিষয়ে নিয়ম হল পরবর্ত্তী জমা ছ হাজার টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বাকী জমানো টাকার শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া যাবে। কিন্তু তাই আয়করের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বেতনের সব টাকা জমানো চলবে না। মোট বেতনের (বেতন থেকে যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ যে ছাড় পাওয়া যায় তা বাদ দিয়ে যেটা থাকে) শতকরা ৩০ ভাগের বেশি জমানো টাকা কর রেহাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ আয়করদাতা আছেন। জনতা সরকারের বাজেটে কর রেহাইয়ের সীমা দুহাজার টাকা বর্দ্ধিত হওয়ায় ৮ লক্ষ ২৩ হাজার আয়করদাতা এখন আয়করের আওতার বাইরে চলে গেলেন।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী করহার ওয়াংচু কমিটির সুপারিশ অনযায়ী কমিয়ে ৬৬ শতাংশ করে দিলেন। জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সারচার্জ পাঁচ শতাংশ বাড়ানোতে করহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে দাঁড়াল ৬৯ শতাংশ।

প্রথম জনতা বাজেটে ১০,৫৫০ টাকার বেশি আয়কারী ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে করের বর্ত্তমান ও নূতন হার অনুয়াযী হিসাব তালিকা নিচে দেওয়া হল:—

(টাকার হিসাবে)

আয়	আয়কর (দশ শতাংশ সারচার্জ সহ বর্ত্তমান হারে)	আয়কর (প্রস্তাবিত পনের শতাংশ সারচার্জ সহ)	করবৃদ্ধি	হ্রাস
১০,০০০	৩৩০	নাই		— ৩৩০
১০,৫০০	৩৮৩	৩৮৫	+ ২	
১১,০০০	৪৯৫	৫১৮	+ ২৩	
১২,০০০	৬৬০	৬৯০	+ ৩০	
১২,৫০০	৭৪৩	৭৭৬	+ ৩৩	
১৫,০০০	১,১৫৫	১,২০৮	+ ৫৩	
২০,০০০	২,১৪৫	২,২৪৩	+ ৯৮	
২৫,০০০	৩,৫২০	৩,৬৮০	+ ১৬০	
৪০,০০০	৯,৫৭০	১০,০০৫	+ ৪৩৫	
৫০,০০০	১৩,৯৭০	১৪,৬০৫	+ ৬৩৫	

এই তালিকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের ব্যক্তিদের কর বৃদ্ধি কতটা তা বোঝা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোররজী দেশাইকে একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, দশহাজার টাকা পর্যন্ত আয় আয়করমুক্ত রাখা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেছেন যে তিনি ইচ্ছে করলে এটা চার হাজার টাকায় নামিয়ে আনতে পারতেন। ব্যাপারটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাৎসরিক ১৬,৯৪৪ টাকা আয়েও এক পয়সা আয়কর না দিয়ে পারা যাবে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করুন মাসিক ৯০০ টাকার মূল বেতনের একজন কর্মচারীর বার্ষিক আয় নিম্নরূপ:—

বেতন	১০,৮০০ টাকা
বাড়ীভাড়া ভাতা	১,৬২০ টাকা
শহর ক্ষতিপূরণ ভাতা	৬৪৮ টাকা
মাগ্‌গী ভাতা	৩,৮৭৬ টাকা
মোট	১৬,৯৪৪ টাকা

এবারের বাজেট অনুযায়ী আয় দশ হাজার টাকা ছাড়ালেই আয়কর দিতে হবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের আয় ১৬,৯৪৪ টাকা হলেও তিনি এক পয়সাও আয়কর না দিয়ে পারেন। তাঁকে অবশ্য সঞ্চয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক:

মোট আয়	১৬,৯৪৪ টাকা
(ক) বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ বাদ	১,৬২০ টাকা
	১৫,৩২৪ টাকা

অফিস যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ বাদ—
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২০০০ টাকা।

(খ) বাকী ৫,৩২৪ টাকার জন্য ৫২১ টাকা।

মোট ২,৫২১ টাকা।

এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়াকে মোট আয় থেকে বাদ দিতে হয়। (গ) জীবনবীমা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ডাকঘরে দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় ইত্যাদি বাবদ বাদ ৩,০০০ টাকা

ছোট ছাড় ৭,১৪৩ টাকা

ভদ্রলোকের আয়ের ১৬,৯৪৪ টাকা থেকে ৭,১৪৩ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ৯,৮০১ টাকা। যেহেতু এই টাকা ১০,০০০ টাকার কম অতএব তাকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হবে না। এছাড়াও পূর্ব্ববর্তী বাজেটগুলিতে মধ্যবিত্তদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল—যেমন মাসিক এক হাজার টাকা আয়ের কর্মচারীদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তান কিংবা নির্ভরশীল ভাই বোনদের জন্য যে ব্যয় তাতে রেহাই দেওয়া—জনতা সরকারের বাজেটে এ সব সুযোগ সুবিধা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

স্বেচ্ছা ঘোষণা অনুযায়ী অনেকেই গোপন আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন, যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেন নি তাদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তাই কর ফাঁকি বন্ধের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কর ফাঁকি ধরা পড়লে জরিমানা হবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, ব্যাংকে রাখা টাকা আয়কর বিভাগ আটকে দিতে পারবেন এবং কারাবাসও করতে হবে। আইন ব্যাপারে আয়কর বিভাগকে অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়েছে। অপরদিকে আয়কর বিভাগকে এও দেখতে হবে সৎ আয়কর দাতারা কোন ভুল করে ফেললে তাদের যেন কোন হয়রানি না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বিভাগও চান করদাতারা যেন নিজেদের আয়ের রিটার্ণ ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পূরণ করে কর বিভাগে জমা দেন। অগ্রিম কর প্রদান করে, স্বনির্দ্ধারিত কর (Self assessment tax) ঠিক সময়ে জমা দিয়ে, হিসাব ঠিকমত রেখে (দুরকম খাতা নয়), করবিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর উল্লেখ করে করদাতারা আয়কর বিভাগকে সাহায্য করতে পারেন। এখন সব করদাতাকেই পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই নম্বর তাঁদের চিঠিপত্রে; রিটার্ণফর্মে এবং চালানে উল্লেখ করতে হবে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগে যেমন কনজিউমার নাম্বার দিতে হয়; আয়কর বিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে তেমনি পার্মানেণ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে।

নিজেদের হিসাব পত্রের খাতা যথাযথ ভাবে রাখাও করদাতাদের অবশ্য কর্তব্য। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, হিসাব-রক্ষক, শিল্প বিষয়ক পরামর্শদাতা, প্রভৃতির আয় যতই কম হোকনা কেন, হিসাব তাঁদের রাখতেই হবে। ব্যবসায় বা পেশায় নিযুক্ত প্রত্যেক করদাতা যাঁদের আয় বার্ষিক ২৫,০০০ টাকার উপরে বা ব্যবসায়ে বার্ষিক বিক্রয় আড়াই লাখ টাকার বেশি তাঁদেরও অবশ্যই হিসাব রাখতে হবে।

১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আয়কর আইনে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। তাতে হিসাব বহির্ভুত ব্যয়কে আয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যদি কোন আয়কর দাতা এমন কিছু ব্যয় করে থাকেন যে ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে এল সে সম্পর্কে আয়কর অফিসারের কাছে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে তিনি না পারেন তাহলে সেই ব্যয় তাঁর আয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে। আয়কর রিটার্ণ ফর্মের চতুর্থ অংশে এখন কর দাতাকে বাড়ীভাড়া, যাতায়াত, বিদ্যুৎ খরচ, ক্লাব এবং ভ্রমণ ও ছুটি কাটান সম্পর্কিত যাবতীয় খরচের হিসাব দিতে হবে।

আয়কর আইনকে ভালভাবে জেনে নিজের সঠিক আয়কর দিয়ে দিলে করদাতারা নির্ভীক ভাবে থাকতে পারেন—আয়কর বিভাগের কোন চিঠি পেলেই আর ভয়ে বক্ষ-কম্পন সুরু হয় না। অবশ্য এই আইন খুবই জটিল এবং তাই বর্তমান অর্থমন্ত্রী এইচ. এম. প্যাটেল এই আইনকে সরল করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আজকের প্রকল্প—যৌথ বীজতলা

কান্তিপদ ঘোষ

আবার এসেছে আষাঢ়। কাজল মেঘের কালো কোমল ছায়া, ঘনিয়ে আসছে থেকে থেকে। ঝর ঝর মুখর বাদল দিন। মাঠের পর মাঠ থৈ থৈ করছে বৃষ্টির জলে। কিন্তু আর একটা পরিচিত দৃশ্য এই দৃশ্যপটে নেই। সেটা হল টোকা মাথায় দিয়ে দলে দলে সকল কৃষকদের ধান রোয়ার ব্যস্ততা। কারণ সকলের চারা তৈরী হয়ে ওঠেনি। জলদি রোয়ার সুবিধাটুকু হাতছাড়া হয়ে গেল। এমন আর একটি ছবি। শরৎ শেষে হিমের পরশে শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অনেক অনেক ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে সে আসছে। কিন্তু মাঠে মাঠে তার আয়োজন কি সারা হয়েছে? কোথাও কিছু মাঠে চাষ পড়েছে, কোন মাঠে এখনও ধান তোলা হয়নি, কোন মাঠে ধানে কাস্তেই চলে নি। আবার কোন মাঠে এখনও ধানে জল দাঁড়িয়ে আছে। খরিফ মরশুমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধান রোয়ার ফলে শীতের ফসলও নাবি হতে লাগল। ফলে এই বাংলার স্বপ্ন স্থায়ী মূল্যবান শীতের অনেকটাই অপচয় হল। এই ক্ষতিগুলো কি এড়ান যায় না? হ্যাঁ যায়। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে আজকের প্রকল্প —যৌথ বীজতলা।

ধানের বীজতলার সাধারণ ছবি কি? আকাশের মুখ চেয়ে বা ক্যানেলের জলের ভরসা করে বর্ষা নামার সময় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ধারণা করে চাষীরা মাঠে বীজ ফেলেন। সাধারণত চাষীরা তাদের নিজের নিজের জমিতে নিজের প্রয়োজনীয় বীজটুকু ফেলেন। অধিকাংশ বীজতলাতেই সেচের বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে চারার উপযুক্ত বাড় অনেক সময়েই সময়মত হয় না। নাবি বৃষ্টিপাত, ক্যানেল বা সেচের জল পেতে বিলম্ব বা অন্যান্য নানাবিধ কারণ অনেক সময় ধান রোয়া বিলম্বিত করে। এই জন্য বর্ষা নামার ৮–১০ সপ্তাহ পরেও অনেক সময় ধান রুইতে দেখা যায়। এর ফলে যে ক্ষতিগুলির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হচ্ছে:—

(১) ফসল লাগানোর প্রকৃষ্ট সময়ের অপচয়।

(২) চারার বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের সম্যক বৃদ্ধি হয় না। বেশী পাশকাঠি বের হয় না এবং রোয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফুল এসে যায়।

(৩) রোগ ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে।

(৪) ফুল অবস্থায় বা পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

(৫) সেচের জলের অপচয় হয়।

(৬) পরবর্তী রবি ফসলও নাবি হয়ে যায়।

এই সব কারণগুলি মিলে খরিফ মরশুমে ধানের ফলন অনেক সময় যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই ক্ষতির হাত এড়িয়ে ফলন বৃদ্ধি এবং সেচের জলের সদ্‌ব্যবহারের জন্য কৃষক সমাজের সকলের যৌথ প্রয়াসে কম্যুনিটি নার্সারি বা যৌথ বীজতলার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। রোয়া শুরু হওয়ার যথেষ্ট আগে সেচের সুবিধা-যুক্ত একটি জায়গায় সকলে একসাথে নিবিড়ভাবে বীজতলা করুন। প্রতি গ্রামে পুকুর, কূপ বা নলকূপের কাছে রোয়ার প্রকৃষ্ট সময়ের বা ক্যানেলের জল পাওয়ার ৪–৬ সপ্তাহ আগে বীজ ফেলতে হবে। একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট অধিক ফলনশীল দু একটি জাতের বীজ ফেলুন। বহনের খরচা বা সময় কমানোর জন্যে যে মাঠে ধান রোয়া হবে তার কাছাকাছি বীজতলা তৈরী করুন। ধানের চারা বয়ে দূরে নিয়ে যেতে হলে রাস্তার ধারে বীজতলা করাই সুবিধাজনক। অনেক সময় ধানের চারা বয়ে বেশ কয়েক মাইলও নিয়ে যেতে দেখা যায়। যেহেতু বীজতলা বেশীদিন জমি আটকে রাখে না, যে কৃষকের জমিতে এই বীজতলা হবে তার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যৌথ বীজতলায় কৃষকেরা যেভাবে উপকৃত হবেন সেগুলি হচ্ছে—

(১) পূর্বে উল্লেখ করা ক্ষতিকারক সম্ভাবনা থেকে ফসল রক্ষা পাবে।

(২) ধানের জাত বাছাই করার ব্যাপারে কৃষকদের প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আসবে।

(৩) এক সাথে বীজ তৈরী হয়ে যাওয়ার ফলে সারা মাঠে একই সাথে আগেই রোয়া সারা হবে। ফলে ঠিক সময়ে পরবর্তী রবি ফসলের জমি তৈরী ও ফসল লাগানোর জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এবং বহু ফসলী চাষেরও প্রসার হবে।

(৪) ধান আগে ওঠার জন্য জল কম লাগে। ফলে একই জাত বা একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট কয়েকটি জাত ক্যানেল-সেচ

সেচিত এলাকায় এক মাঠে লাগালে শুধু যে রোয়া, সেচ ও সার দেওয়া, রোগ-পোকা দমনের, নিড়েন কাটা ও তোলার সুবিধে হবে তাই নয়, সেচের জলের সাশ্রয় হওয়ার ফলে আরও অনেক বেশী জমি রবি ফসলের আওতায় আনা যাবে। অসেচ এলাকাতেও আগে জমি খালি হওয়ার জন্য অনেক জায়গায় তৈল বীজ, ডাল শস্য ইত্যাদি করার জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকবে।

(৫) শস্যরক্ষার খরচা অনেক কম হয়। কারণ এক একর বীজতলায় ওষুধ দিলে প্রায় দশ একর মূল জমিতে রোয়া ধানে প্রাথমিক ওষুধ দেওয়ার কাজ হয়। বীজতলা একত্রে হওয়ার ফলেও মজুর ইত্যাদি খরচ কম লাগে। ফলনও বৃদ্ধি পায়।

(৬) অনেক সময় নাবি রোয়া ধান জলচাপ হওয়ার ফলে ভাল পাশ-কাঠি ছাড়ে না, গুছির সংখ্যাও কমে যায় এবং সারের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, যৌথ বীজতলা করে জলদি রুইতে পারলে এই ক্ষতিগুলি এড়ানো সম্ভব।

(৭) রোয়া দেরী হলে অনেক সময় তাড়াহুড়োর মাথায় জমিকে সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এই সব আগাছা, যা সহজেই বাড়বার ক্ষমতা রাখে, স্থান, আলো ও সারের ব্যাপারে ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু জলদি রোয়ার ফলে ধান তাড়াতাড়ি বেড়ে আগাছার ক্ষতি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সারেরও সদ্ব্যবহার করতে পারে।

(৮) জলদি রোয়ার যে স্বাভাবিক সুবিধা আছে তার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া যায়। আমাদের চাষীরা বলেন আষাঢ়ের রোয়া ধান 'চার পোয়া' হয় অর্থাৎ মরশুমের পুরো সময়টা ফসল পাওয়ার জমির স্বাভাবিক উর্বরতার গাছ পুরো পেতে পারে।

(৯) অধিক ফলন দেওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত এবং অন্যান্য নতুন জাতগুলির দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়। কারণ এই যৌথ প্রকল্পে এক সাথে অনেক চাষী অংশগ্রহণ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জনই এগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন।

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তাতে গমেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। উপযুক্ত জাতের অভাব ও অন্যান্য কারণে ধানের ফলনে ব্যাপক সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইদানীংকালের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিশীল ধানের জাতের আবিষ্কার, ধানে বিজ্ঞান-সম্মত সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং কিছুদিন আগে পর্যান্ত ধান চাষে অখ্যাত রাজ্যগুলির ধানোৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লাভ ইত্যাদি থেকে আশা করা যাচ্ছে 'ধান্য-বিপ্লব' শুরু হওয়ার প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করা গেছে। এই নতুন বিপ্লবে যৌথ বীজতলা বা কম্যুনিটি নার্শারী বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নতুন বাজেটে কর প্রস্তাব

৮ পৃষ্ঠার শেষার্দ্ধ

মাঝারি সংবাদপত্র, দেশী পশম ইত্যাদির উপর।

এছাড়া ঢালাওভাবে ২ শতাংশ কর ধার্য হয়েছে সব জিনিষের উপর যেগুলি অন্যভাবে আবগারী শুল্কের আওতায় পড়েনা। এই শুল্কের হার আগের বাজেটে ছিল ১ শতাংশ এবং ঐ বাজেটেই এই শুল্ক প্রথম বসানো হয়। দেখা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী তাঁর পূর্ববর্ত্তীর পথই এক্ষেত্রে শুধু অনুসরণ করেছেন তাই নয় বরং তাঁর উপর আরও একটু এগিয়ে গেছেন। মনে হয় রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটা এত মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার ফলাফল বিশেষ খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। এমন ঢালাওভাবে আবগারী কর ধার্য করলে তা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সব জিনিষের দামকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং সে হার যত কম থাকে ততই বাঞ্ছনীয়।

সব মিলিয়ে প্রস্তাবিত করব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধি রোধে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত ব্যয়সংকোচ, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির কথা বললেও মোট ধার্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ গত বাজেটের চেয়ে বেশ অনেকটাই বেশী। ফলে নানাভাবে কর সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির একটা বড় কারণ আবগারী শুল্ক, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর। সেদিক থেকে নতুন বাজেট কোনও সুবিধার প্রতিশ্রুতি বহন করে না। হাতে কাজ করার ছোট যন্ত্রপাতি বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কি করে বিলাস বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আওতায় পড়ে বোঝা যায় না। এদের মূল্যবৃদ্ধি মানেই অন্য অনেক জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি।

সবশেষে করব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল তার জটিলতা। একথা অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন কর ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে পূর্বে নিযুক্ত নানা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের উপর কি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা তিনি কিছুই জানান নি। যেভাবে ১০,০০০ টাকার উপর আয়করের প্রান্তিক ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে বা পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেভাবে যন্ত্র চালিত বস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে,—সেসবই এই জটিলতার উদাহরণ। এই ধরণের জটিলতার নানা নিদর্শন কর প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে। এতে করদাতারা বিভ্রান্ত হন। সরকারের রাজস্ব আদায়ের খরচ বাড়ে, আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণও আশানুরূপ হয় না। এই জটিলতা পরিহার না করতে পারলে কর-ব্যবস্থা নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আজকের নাটকে

আমরা সবাই 'জগন্নাথ'

'জগন্নাথ' ফাঁসির দড়ি গলায় নেবার আগে বলেছিল 'আমার পাশে বিপ্লবীরা থাকলে দাসবাবুকে আমিও মারতে পারতাম। পারবে, পারবে নন্দ ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে। ধ্যুস্!'

নাটকের চরম মুহূর্ত এটিই, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও গভীরতার নির্যাসটুকু বেরিয়ে এসেছে এই একটি সংলাপে। নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায় এমনি ছোট ছোট কিছু চিত্রকল্পে ও সংলাপে প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের মোড়কে আজকের, একবারে এই আজকের কয়েকটি শ্রেণীর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন 'জগন্নাথ' নাটকে একাডেমির মঞ্চে। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় চমকে উঠতে হয় মাঝে মাঝে, তার নিপুণ বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে বিস্ময় জাগে।

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'একটি শিশির বিন্দু' বা 'অমূল্য রতন' বিশেষণ দুটি নাটকের প্রধান চরিত্র 'জগন্নাথ'কে দেওয়া যায় অনায়াসেই, অবশ্যই বিনা কারণে নয়। নাট্যকার পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় (অনুপ্রেরণা : লু শুনের একটি ছোট গল্প) শ্রেণী পর্যায়ের একবারে শেষ ধাপটিতে নেমে এসে যাঁকে তাঁর এই নাটকের মধ্যমণি করলেন সে মেরুদণ্ডহীন হাবা-গোবা প্রতিবাদ করার ক্ষমতাহীন এক জনমজুর। সরল সাধাসিধেও বটে জগন্নাথ। ভালোবাসা এবং কর্মক্ষেত্র দু জায়গাতেই সে পাথরের মত নীরব, কিন্তু ভেতরে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আগুনে জ্বলন্ত। আমরা সবাই তো তাই।

এই জগন্নাথকে ঘিরে রয়েছে গাঁয়ের পুরুত ঠাকুর, যিনি জমিদারের মাস-মাইনের চাকর, যাঁর দেওয়া 'কিসব' খেয়ে মেয়ে নলিনীর 'ভর' হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর প্রতি এমন চরম আঘাত আর কেউ দিয়েছেন কি? আছে জমিদার দাসবাবু যাঁর কাছে 'মেয়েছেলে' মানেই উপভোগের বস্তু, আছেন বিপিনবাবু যিনি এইসব ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথদের চোখে 'আত্মার' ঠুলি পড়িয়ে ঘোরাতে চান, আছে গাঙ্গুলী মশাইয়ের মত দালাল, আর আছে বরুণের মত সহৃদয় বিপ্লবী, সশস্ত্র স্বাধীনতা বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী বটে কিন্তু বিপ্লবের আসল শক্তি এই সব 'জগন্নাথ'দের তাঁরা দলে নিতে চাননা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী তাঁরা। 'জগন্নাথ' বরুণদের কাছে ঘুমন্ত।

পাশাপাশি নন্দকে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। নন্দ জগন্নাথের মতই জন-মজুর। একই শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা, কিন্তু নন্দ হাবাগোবা নয়, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে তৎপর। তাই যে জগন্নাথকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়, বিপ্লবীদের দলে ভেড়ে। অবশ্য বিপ্লবীরা বলেন 'ওকে দলে নিতেই হোল'। আসলে জগন্নাথও নন্দ হতে পারত, সঠিক নেতৃত্ব পেলে গাঙ্গুলীমশাই-এর কাছ থেকে পূর্ণ মজুরী আদায় সে করত, বাল্য প্রেমিকা মনোরমাকে দাসবাবুর 'খাদ্য'হতে দিতনা জগন্নাথ। করতে পারত আরও কিছু।

কিন্তু তা আর হল কই! দেশের শতকরা নব্বুই জন নাগরিক রইল নেতৃত্বহীন, হালভাঙ্গা পালছেঁড়া নৌকোর মত। অথচ এরাই আসল শক্তি, হাতিয়ার। সমাজ বদলের যজ্ঞে এরাই প্রকৃত পুরোহিত।

'জগন্নাথ'-এর মৃত্যুর পরও যখন বিপ্লবীদের মধ্যে তার চরিত্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিভেদ জাগে তখনই প্রমাণ হয়ে যায় তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবটা ছিল কেমন তাদের নিগড়। অরুণবাবু প্রায় অনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে জগন্নাথ, আশ-পাশের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর এই বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই জীবন ও মাটির গন্ধ নিয়ে হাজির হবে, কেউ কেউ ক্ষুন্ন হতে পারেন হয়ত কিংবা বিরক্তও, কিন্তু ইতিহাসের গতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবেই।

নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় উপ-স্থাপনার অভিনবত্বে নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেছেন। নাটকের এমন ফিল্মিক ট্রিটমেন্ট সম্ভবত বাংলা মঞ্চে এই প্রথম। দু-ঘন্টার নাটকে তিনি চিত্রনাট্যের ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন সর্বত্র। এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়নি নাটক বাঁধা ফ্রেমের বাইরে।

নাটকের শুরু মঞ্চের দুই প্রান্তে বিপ্লবীদের জমায়েত আর জগন্নাথের মৃত আত্মাকে নিয়ে। বরুণের কথায় বিদ্রূপ করে জগন্নাথ যখন বলে—'চুপ্ চুপ্', আমরা এখন মৃত জগন্নাথের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি' তখনই আসনে সোজা হয়ে বসতে হয়, চোখ ঘুরতে থাকে মঞ্চের আনাচে কানাচে। টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা মঞ্চ কখনও হয় দাসবাবুর বাড়ি—হেঁসেল, বিচারালয়, কালী মন্দির (হাঁড়ি কাঠ এবং বিচারকের চেয়ার একই রেখায় সংস্থাপন বিশেষ অর্থবহ বটে)। কখনও বা জগন্নাথের কুঁড়ে কিংবা রাস্তা।

জগন্নাথ/ স্বপ্না মিত্র ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

DHANADHANYE · REGD. No.
YOJANA (Bengali) · WB/CC-315
Price 50 Paise July 16—31, 1977

ছায়াছবির টাইটেল পর্বের মত টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্যে শুরুতেই অরুণবাবু পরিচয় করিয়ে দেন নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে।

এরপর শুরু হয় নাটক।

ছেঁড়া ছেঁড়া সেই দৃশ্যগুলো বলে দেয় এই নাটক ব্যবসায়ে আপোষচরিত্রের নয়, কিংবা আপাত বামপন্থী বিপ্লবী আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নেই। সৎ পরিচ্ছন্ন রাজনীতির নাটক জগন্নাথ। জগন্নাথ মাটির নাটক, মানুষ নিয়ে নাটক, জগন্নাথ মাটির মানুষের নাটক।

অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকার নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়কেও টপ্‌কে গেছেন। চরিত্রটিকে তিনি দর্শকের একবারে বুকের কাছে পেঁৗছে দিয়েছেন। কখনও নীরব থেকে, কখনও মাইম্‌ করে তিনি সত্যিই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন যেন সবার অজান্তে। দলগত অভিনয়েও কেউ কাউকে টেক্‌কা দিতে পারেননি, সবাই-ই সমান। মনোরমার ভূমিকায় স্বপ্না মিত্রকে একটু বেশী ভালো লাগার কারণ তার আবেগমণ্ডিত মুখশ্রী, কিংবা গাঙ্গুলীবাবুর চরিত্রের শিল্পীকে কিঞ্চিৎ 'নাটুকে' দোষদুষ্ট মনে হবে, কিন্তু সব ছাপিয়ে নাটকের সার্বিক উপস্থাপনায়, মঞ্চ, আলো, অভিনয় ইত্যাদির মোড়কে গভীর তত্ত্ব ও জীবনের যে সত্যটি নিয়ে জগন্নাথ' কলকাতায় হাজির তা শুধু নাট্যকার-নির্দেশকের নয়, দলের (চেতনা) মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং চেতনা বাংলা নাট্যজগতে চলে আসবে প্রথম সারিতে। এ সম্মান অবশ্যই তাঁরা দাবী করতে পারেন।

নির্মল গুহ

খেলাধূলা

জাতীয় নৌ-বাইচে বাংলার সাফল্য

নৌ-বাইচ ফাইনালে জুনিয়ার চার দাঁড়িতে বাংলা তামিলনাড়ুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছে

কিছুদিন আগে পর্যন্ত চিন্তা করা যায় নি, কলকাতার বুকে প্রথম জাতীয় নৌ বাইচের একটা জম-জমাট আসর বসতে পারে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই প্রতিযোগীতাকে ঘিরে এত উন্মাদনা থাকতে পারে। নৌ-বাইচের জাতীয় আসরে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা দল। প্রতিযোগিদের সংখ্যা তেমন বড়সড় ছিল না; তবুও উত্তর প্রদেশ বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে কয়েকটি বিভাগে। মোট ছয়টি বিভাগের এই প্রতিযোগিতায় মুখ্যত প্রাধান্য ছিল বাংলার জুনিয়ারদের; ফাইনালে পাঁচটিতেই বিজয়ী হয়েছে বাংলার খেলোয়াড়েরা। বাকিটাতে জিতেছে তামিলনাড়ু।

বাংলার সাফল্য এসেছে মুক্ত বিভাগের একদাঁড়ী (স্কাল), মুক্ত ও জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ী (পেয়ারস্থ) এবং চার দাঁড়ীর এক হালির (ফোরাস) ফাইনালে।

তামিলনাড়ু বিজয়ী হয়েছে জুনিয়ার বিভাগের একদাঁড়ীর ফাইনালে।

২৬ জুন রবিবার রবীন্দ্র সরোবর লেক ক্লাবের সীমানায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠানটি ছিল জুনিয়ার বিভাগের চার দাঁড়ী এক হালির ফাইনালে। শুরু থেকেই বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। সমাপ্তি রেখার বরাবর এসে বাংলা আধ নৌকার ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে তফাৎ-এ ফেলে দেয়। তারা তিন মিনিট ২৫ সেকেণ্ডে ঐ নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। এটিই ফাইনালের সবচেয়ে আর্কষণীয় মুহূর্ত। সেই মুহূর্ত্তে দর্শকেরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুগছিলেন। সেই সঙ্গে চিৎকার হাত তালিতে মুখরিত হয়ে উঠছিল প্রতি-যোগিতার প্রাঙ্গণ। দর্শকের ভীড়ও ছিল যথেষ্ট। বাংলা দলে ছিলেন এ রায়, এস বিশ্বাস, আর মুখার্জী, পি সাহা এবং হালি সি ব্যানার্জী।

প্রতিযোগিতার একমাত্র ট্রফি প্রেসিডেন্ট কাপকে ঘিরে মুক্ত বিভাগের চারদাঁড়ীর ফাইনালে বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। চার দাঁড়ীতে বাংলার পক্ষে ছিলেন সতীনাথ মুখার্জী, অশোক মেহতা কমল দত্ত, গিরিশ ফানিস এবং হালি নির্মল মজুমদার। জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ীর ফাইনালে বাংলার এস আর কালিদাস, তামিলনাড়ুর ম্যানি-কমের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

জুনিয়ারদের দু দাঁড়ীতে বাংলা (কালিদাস ও এম আর উদয়শংকর) সহজে উত্তর প্রদেশকে এবং মুক্ত বিভাগে ঐ একই আসরে বাংলা (কমল দাস, অশোক মেহতা) দেড় নৌকার ব্যবধানে কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিংকে হারানোর সময় যে দৃশ্য সেদিন সৃষ্টি করেছিল, দর্শকেরা তার মধুর স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। মুক্ত বিভাগের এক দাঁড়ির সেমিফাইনালে তামিনাড়ুর এম এম সান্ন্যালের কাছে মহারাষ্ট্রের সর্বজনপ্রিয় আর দেশপাণ্ডের পরাজয় এবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম অঘটন। কারণ, দেশপাণ্ডে গতবছর কলকাতায় আয়োজিত প্রাচ্য নৌ-বাইচের ঐ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। যাই হোক এবারের প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কলকাতার মানুষের কাছে এবং কয়েকটি বিভাগের স্মৃতি মনে গেঁথে থাকবে আগামী বছর পর্যন্ত।

সরোজ চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং প্রাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র

আমি আপনার সম্পাদিত পত্রিকা 'ধনধান্যে'র নিয়মিত ছোট্ট পাঠক। আপনার পত্রিকায় প্রয়োজনীয় সমস্ত রচনা সম্ভারই বর্ত্তমান, তবে আমার সামান্য অনুরোধ যে আপনি অন্তত গল্পের সংখ্যা আর একখানি বাড়াবেন।

সোমনাথ নায়েক
বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বীরভূম

আপনার পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই আমার হৃদয়ে গভীর আনন্দ এনে দিয়েছে। ১৬-৩১ মে, ১৯৭৭ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রী উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সাংবাদিকতা ও আধুনিক বাংলা গদ্য শিল্প অনন্য সাধারণ রচনা হয়েছে। ভালো লেগেছে শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর 'কৃষক কবি' প্রবন্ধটি। শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের 'লোকসাহিত্যের সন্ধানে' একটি প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ডাইনোসর খুব ভাল গল্প। শ্রী নিতাই বসুর 'নরেন্দ্র নাথ মিত্রের' ওপর লেখাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। কবিতাগুলিও যথেষ্ট শক্তিশালী।

অশোক পোদ্দার
এম. আই. জি. কোয়ার্টার্স, কলকাতা-২

টাকা কিভাবে আসে যায়

চলতি বছরে ভারত সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করবেন তার প্রতি টাকার ২৩ পয়সা আসবে উৎপাদন শুল্ক থেকে, ১৫ পয়সা আসবে করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে। ১২ পয়সা আসবে পূর্ব প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাণিজ্য শুল্ক থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাজারের ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে, ১০ পয়সা আসবে অন্যান্য সূত্র থেকে, ৮ পয়সা আসবে কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে, ৬ পয়সা আসবে বহিরাগত ঋণ থেকে এবং ২ পয়সা আসবে আয়কর থেকে এবং বাকি ২ পয়সা আসবে অন্যান্য কর আদায় থেকে।

এইভাবে সংগৃহীত অর্থের প্রতি টাকা সরকার নিম্নলিখিত হারে ও খাতে ব্যয় করবেন—৩৭ পয়সা পরিকল্পনায়, ২০ পয়সা অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় সংকুলনের জন্য, ১৮ পয়সা প্রতিরক্ষায়, ১০ পয়সা ধার দেওয়া টাকার সুদ পরিশোধে, ৯ পয়সা অন্যান্য খাতে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারকে বিধিবদ্ধ ও অন্যান্যভাবে দেওয়া হবে টাকায় ৬ পয়সা।

আগামী সংখ্যায়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ধনধান্যে'র আগামী সংখ্যাটি বিশেষ যুগ্মসংখ্যা হিসাবে পনেরই আগষ্ট প্রকাশিত হচ্ছে।

এর বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নিবন্ধ।

সম্ভাব্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সংসদের কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ।

এছাড়া থাকছে, 'স্বাধীনতার ত্রিশ বছর'—এই পর্যায়ে একটি আলোচনা।

সেই সঙ্গে গল্প, কৃষি, খেলাধুলা, নাটক, সিনেমা, মহিলামহল ইত্যাদি নিয়মিত রচনা।

এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য—এক টাকা

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্লিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেণ্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্লিকেশন্স ডিভিশনের এজেণ্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
'ধনধান্যে, পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩১ জুলাই, ১৯৭৭
নবম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদকের কলমে

গত সতেরই জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন সরকারের প্রথম বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। জনতা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে তৈরী প্রথম বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে সরকারের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা পরিচয় মেলে। কারণ নতুন সরকার বাজেট তৈরী করার জন্য হাতে পেয়েছেন খুব কম সময় ও পূর্বতন সরকারের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয় এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব সত্ত্বেও এবছরের বাজেট আগামী দিনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিশারী রূপে চিহ্নিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধে বাজেট একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ যখন একান্তই কাম্য তখন বাজেটের ফলে দ্রব্যমূল্য যাতে না বাড়ে বরং কমপক্ষে স্থিতিশীল থাকে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি প্রথমেই সেই দিকে। তাই তিনি আয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য যাতে ন্যূনতম থাকে সেজন্য ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৭২ কোটি টাকায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এজন্য অসামরিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ১৩০ কোটী টাকা কমানোর জন্য অর্থমন্ত্রী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা পালনের জন্যও নতুন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাজেটের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষিকে উন্নত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কৃষিখাতে বাজেটে ত্রিশ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে জন্য যে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামাঞ্চলের সংগে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক নির্মাণ, বাজার, পানীয়জল প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করাই নয় একে পুনর্গঠিত করতে নতুন সরকার বদ্ধপরিকর। তারই ইংগিত বহন করছে এবছরের বাজেট। তাই অনুন্নত ও গ্রামীণ এলাকায় বিনিয়োগে উৎসাহ-দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এজন্য পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগের জন্য নতুনভাবে শিল্পের অধিকারের ক্রমবিন্যাশ করার কথাও বলা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে আছে পেনশনভোগীদের আরও সুযোগ সুবিধা দান, পানীয় জলের জন্য চল্লিশ কোটী টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব, আয়করের রেহাই সীমা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, দেশীয় কারিগরী বিদ্যার সহায়তায় যন্ত্রাংশ নির্মাণের ছোট কারখানার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রভৃতি। তবে দশহাজার টাকার উপর যাদের আয় তাদের আয়করের রেহাই সীমা আগের আট হাজার টাকায় বহাল রাখা এবং আয়করের সারচার্জ বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বিড়ির উপর কর ধার্যের ফলে ও দরিদ্র শ্রেণীর উপর চাপ পড়বে। এসব দু একটা বিষয় গণ্য না করলে বাজেটে কর প্রস্তাব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের উপর কোন রূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেনা আশাকরা যায়। আর এবছরের বাজেট যদি দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সক্ষম হয় তবে সেটাই হবে জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে বেশী স্বস্তির।

কেন্দ্রীয় বাজেট

পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

এবারের বাজেটের দুই লক্ষ্য

বিশেষ প্রতিনিধি—

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সম্প্রতি নতুন সরকারের যে প্রথম বাজেটটি পেশ করলেন তার উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করা, এবং উন্নয়নের সুফলগুলি সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা।

চলতি বছরের বাজেটে রাজস্বখাতে রয়েছে মোট ১৫,৩৬৬ কোটি টাকা। চলতি কর হার অনুযায়ী কর বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হবে ৮,৮৭৯ কোটি টাকা, যা ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত হিসেবের চেয়ে ৭৯৮ কোটি টাকা বেশী। এই বেশী কর আদায়ের দরুণ রাজ্যগুলির ভাগে থাকবে ১০১ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক থেকে সংগ্রহ হবে ৪,৫৫০ কোটি টাকায়, যা গত বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৩৭৩ কোটি টাকা বেশী। আয়কর এবং করপোরেশন কর থেকে আদায় হবে ২২৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ—১৮০ কোটি টাকা বেশী। আমদানী শুল্ক থেকে আদায় হবে ১৭৩৪ কোটি টাকা।

বাজারের ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ১০০০ কোটি টাকা। গত বছরে ঐ হিসেব ছিল ৮৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া বিদেশী মুদ্রার জমা তহবিল থেকে সরকার ৮০০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন।

ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার পর নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হবে ১০৫২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় যোজনা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যোজনাখাতে সাহায্য বাবদ ১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫৭৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছর বরাদ্দ হয়েছিল ৪৭৫৯ কোটি টাকা।

এবারের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কমছে। শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতি হল সবরকম ব্যয় বাহুল্য বর্জন করা। সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ঐ মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং বাজেটে ঐ ধরনের ব্যয় ১৩০ কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব রয়েছে।

যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত হিসেব এবং বর্তমান কর হার অনুযায়ী রাজস্বের হিসেব নিয়ে চলতি বছরের বাজেটে ২০২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকছে।

যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ২৭৫২ কোটি টাকা, যা অন্তবর্তী বাজেটের তুলনায় ৫৬ কোটি টাকা কম। খাদ্যের জন্য ভরতুকি এবং মজুত খাদ্যের পরিবহণ বাবদ হিসেব ধরা হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা। ঐ হিসেব অবশ্য আলোচ্য বছরের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঘাটতি রাজ্যগুলিকে বর্তমান বাজেটে অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিন বছরের ঘাটতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

জীবনধারণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেক কেন্দ্রীয় সরকারী পেন্সনভোগী অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছুটা সুবিধাবৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিলেন। সে অনুরোধ রেখে এবারের বাজেটে তাদের কিছু সুবিধা দেবার প্রস্তাব করেছেন। এ বাবদ খরচ হবে বছরে ১০ কোটি টাকা।

১৯৭৭-৭৮ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাতে অর্থনৈতিক ত্রুটিগুলি দূর করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নীতি ঢেলে সাজানো দরকার। পুনর্গঠিত যোজনা কমিশন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি জানান, সরকার বিভিন্ন মন্ত্রকের সংগে এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এবং জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারের সংগে সঙ্গতি রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর একটি নতুন পথ নির্দেশ করবেন বলে সরকার স্থির করেছেন।

তিনি জানান, নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যোজনার পরিবর্তন করে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, খাদি, এবং গ্রামীণ শিল্প, রেশম, হস্তচালিত তাঁত শিল্প, গ্রামাঞ্চলে ডাক, টেলিফোন, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা করা হবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের মূল প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।

গ্রামাঞ্চলে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, হাঁসমুরগীর খামার, মাছচাষ ও বনাঞ্চল তৈরীর উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সমবায় ভিত্তিতে দুগ্ধপালন কেন্দ্র পরিচালনার উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে। কৃষিকে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করার ওপর জোর দেওয়া হবে। কৃষির উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বর্তমান যোজনা বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে উঠবে, গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির চাহিদার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে, এবং তুলা, তৈলবীজ ও ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

হরিয়ানা, গুজরাট ও রাজস্থানের জন্য একটি মরু উন্নয়ন সংক্রান্ত পুরোধা প্রকল্প নেওয়া হবে। বর্তমান যোজনায় এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার দরুণ রাজ্য সরকারকে আগাম পরিকল্পনা সাহায্য খাতে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় অ্যাগ্রিকালচারাল রিফিন্যানস অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এবং অন্যান্য লগ্নী সংস্থার মাধ্যমে ২৬০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেচের পাম্পসেট বৈদ্যুতিকৃত করার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কৃষি, বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, সার, গ্রামাঞ্চলে সমবায় এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট ৩০২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা বরাদ্দের শতকরা ৩০.৪ ভাগ এ বাবদ ব্যয় করা হবে।

গ্রামের উন্নয়নে অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে সংযোগকারী সড়ক তৈরীর ব্যাপারে আরও জোর দেবেন। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। শুরুতে এ বাবদ বিশ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার ও স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা থেকে আরও টাকা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে "কাজের বদলে শস্য" নামে নতুন প্রকল্পটির সাহায্য নেওয়া যাবে।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য দেবেন এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে শ্রী প্যাটেল জানান। এ ব্যাপারে এ বছরই বর্তমান ব্যয় বরাদ্দের উপর অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে আরও বেশী টাকা যোগানোর কথাও অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, হরিজন, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী ও ব্যয়বরাদ্দে তিনি সন্তুষ্ট নন। যদিও এ সব রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তবুও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরীর কাজে হাত দেবেন।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নয়নে ২৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সিঙ্গরৌলি অতিকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় একটি অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থরু করার জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এ বাবদ খরচ করেন ১৬৭৬ কোটি টাকা। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সাহায্যার্থে গ্রামীণ বিদ্যুৎ করপোরেশনকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকার হিসেবে)

	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
রাজস্ব	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
আদায়	৮২১৯	৮৫০৭	৯৪২৪
			(+) ১৩৩ শতাংশ
ব্যয়	৭৬৯৩	৮৫৫৪	৯৪৮৭
	(+) ৫২৯	(−) ৪৭	(−) ৬৩ (+) ১৩৩ শতাংশ
মূলধন			
আদায়	৪৪২৩	৫২৫২	৫৯৪২
ব্যয়	৫২৮০	৫৬৩৩	৬০৮১
	(−) ৮৫৭	(−) ৩৭৮	(−) ১৩৯
মোট			
আদায়	১২৬৪২	১৩৭৫৯	১৫৩৬৬
			(+) ১৩৩ শতাংশ
ব্যয়	১২৯৭০	১৪১৮৪	১৫৫৬৮
মোট ঘাটতি	৩২৮	৪২৫	২০২
			(−) ১৩০ শতাংশ

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করার পর বাজেট প্রসঙ্গে নানা আলোচনা এখনও চলছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব সরকারী ব্যয় কমানো-বাড়ানোর কোনো বিশেষ প্রবণতা এই বাজেটে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে কর বসিয়ে কিংবা ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যয়যোগ্য সম্পদ সংগ্রহ করতেই হবে। কিন্তু বাজেটের এই সম্পদ সংগ্রহের দিকটি আমাদের আলোচনার বস্তু নয়। আমরা আপাততঃ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি শুধু সরকারের ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণের নীতির দিকে।

চলতি বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুল্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৫,৫৬৮ কোটি টাকা। এই সমগ্র পরিমাণকে আমরা নানাভাবে বিভক্ত করে হিসাব-নিকাশ করতে পারি। প্রথমত দেখা যাক এই ব্যয়ের মধ্যে মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কতটা। মূলধনী খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তার দ্বারাই প্রধানত দেশের অর্থনৈতিক ভাবী বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, যদিও শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মূলধনী-খাতের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে ফলাফলের দিক থেকে পার্থক্য নির্দেশ করা খুব সঙ্গত হবে না। বাজেটের হিসাবে মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশের কিছু কম (৬,০৮১ কোটি টাকা) মূলধন-খাতে খরচ হবে। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে এই ধরণের ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশের সামান্য উপরে। সেই বৎসর অবশ্য শেষ পর্যন্ত মূলধন-খাতে ব্যয় ঐ পর্য্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। সুতরাং পূর্ববর্তী বাজেটে এবং বর্তমান বাজেটে এই দিক দিয়ে বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। গত বৎসরের তুলনায় চলতি বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ শতাংশের সামান্য কিছু কম। কিন্তু মূলধন-খাতে ব্যয় বাড়ানো যাচ্ছে ৮ শতাংশের সামান্য কিছু বেশী।

দেশে সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে শিক্ষা, সমাজসেবা বা আর্থিক কাঠামোর উন্নয়নকল্পে কতটা কাজে লাগানো হবে তার নীতি সব দেশে, সব যুগে এক থাকেনি। আমাদের সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরণের গঠনমূলক কিংবা বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ কতটুকু? চলতি বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের বরাদ্দ ধার্য্য হয়েছে ৪,২৫০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ২৭.৫ শতাংশ এই ধরণের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ ছিল ২৭ ভাগ কিংবা সামান্য কিছু কম। এখানেও দুটি বাজেটে প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছু চোখে পড়ছে না।

বিকাশমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সমবায় ভিত্তিক সংস্থা কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে ঋণ দিয়ে থাকেন। যদি এই ধরণের ঋণকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশ সহায়ক ব্যয়ের রকমফের বলে ধরা হয়, তবে মোট ব্যয়ের শতকরা আরও প্রায় ২২ ভাগকে এই হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। পূর্ববর্তী বৎসর এবং বর্তমান বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে এই দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়বে না।

সরকারের যে-সব ব্যয়কে কোন অর্থেই বিকাশমূলক বলা যায় না তার মধ্যে প্রধানতম প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যয়ের অনুপাত চলতি বাজেটে শতকরা ১৭.৭। পূর্ববর্তী বৎসরে এই খাতে ব্যয় হয়েছে সম্ভবত শতকরা ১৮ ভাগ। আনুপাতিক হারে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য কিছু কমেছে। অনুরূপ ব্যয়-সংক্ষেপের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে শাসনতন্ত্র পরিচালনার নানাবিধ ব্যয়ের ক্ষেত্রে। পরিষদীয় কাঠামো, মন্ত্রিসভা, রাজস্বসংগ্রহ বিভাগ ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ ব্যয়কে সংযত রাখার প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান বাজেটে। কিন্তু অন্য দিকে পুরাতন ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ এবং পেনসনভোগীদের ক্লেশ লাঘবের জন্য প্রদেয় ভাতার পরিমাণ আনুপাতিক হার অপেক্ষা একটু বেশী করেই বেড়েছে। সুতরাং এই ধরণের বাঁধা খরচের পরিমাণ কমিয়ে বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে রাজ্যসরকারগুলি আর্থিক বিকাশের জন্য আর্থিক অনুদান ও ঋণ পেয়ে থাকেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই ভাবে ৩,৬৩৮ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকার হাতে পাবেন। এর মধ্যে ২,১৭৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে রাজ্যের পরিকল্পনাভুক্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। আরও ৫০৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে পরিকল্পনার বাইরে নানা ধরণের গঠনাত্মক কাজের সহায়তায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ হবে ৪,৯৩৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য শতকরা ১০.৪ ভাগ.

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট
আয়করে কিছু রেহাই
পরোক্ষ কর ১৩০ কোটি টাকা
বিশেষ প্রতিনিধি

এবারের (১৯৭৭-৭৮) কেন্দ্রীয় বাজেটে করপ্রস্তাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত করযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারগুলিকে আয়কর দিতে হবেনা। আয়করের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা আট আজার টাকাই রাখা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার বেশী সেখানে এখনকার মতই আট হাজার টাকার বাড়তি টাকার উপর কর দিতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী হলে সেখানে কিছু রেহাই দেওয়া হবে। কোম্পানী বাদে সর্বশ্রেণীর আয়করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হারও বর্তমানের ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ করা হয়েছে। কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান বাজেটে আয়করের হারে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে গতিশীল করার জন্য অর্থমন্ত্রী গতবছর প্রচলিত বিনিয়োগ সাহায্য কর্মসূচীটিকে আরো সুবিস্তৃত করেছেন। এক্ষেত্রে সিগারেট, প্রসাধন সামগ্রী, মদ ইত্যাদির মত নিম্ন অগ্রাধিকারযোগ্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর সর্বশ্রেণীর শিল্পকে ঐ বিনিয়োগ সাহায্যের সুযোগ দেওয়া হবে।

বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন তাঁর প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবে আসল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানীগুলির সঞ্চয় বাড়ানো, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য আরো বেশী অর্থবরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নকে গতিশীল করা। পরোক্ষ কর সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, এক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা বিলাস সামগ্রীর মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

অর্থমন্ত্রী সম্পদ কর বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছেন। বর্তমানে মোট সম্পদের প্রথম আড়াই লক্ষ টাকার উপর সম্পদ করের হার আধশতাংশ বজায় থাকলেও তার ওপরের স্ল্যাবে আরো আধশতাংশ সম্পদকর বাড়বে। বর্তমান পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নীট সম্পদের করধার্যযোগ্য স্ল্যাব দুইভাগে করা হয়েছে। প্রথম স্ল্যাব ২,৫০,০০০ টাকা এবং পরবর্তী স্ল্যাব ২,৫০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০ টাকা। এরফলে ৭৭-৭৮ সালে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হবে।

আয়কর দাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পটি আরো দু বছরের জন্য চালু রাখার প্রস্তাব রয়েছে। অবশ্য সত্তর বছরের বেশী কোন ব্যক্তিকে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হবে না।

দেশের শিল্প সংস্থাগুলিকে স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণালব্ধ কারিগরি জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হলে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

অর্থমন্ত্রী চালু মূলধনী আদায় করের ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, সরকার রুগ্ন কলকারখানা অধিগ্রহণে ইচ্ছুক নন। তবে রুগ্ন কারখানা যদি কোন চালু প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হতে চায় তবে সরকার সেক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন।

কোন কোম্পানী যদি অনুমোদিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করেন তাহলে সরকার তাকে করযোগ্য লাভ থেকে কিছু রেহাই দেবেন। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ইউনিট স্থাপিত হলে এবং সেগুলি এবছরের ৩০ জুনের পর উৎপাদন সুরু করলে এইসব শিল্পোদ্যোগ তাদের লাভের ২০ শতাংশ করযোগ্য আয় থেকে ছাড় পাবেন।

কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে আয়করের ওপর ৫ শতাংশ সারচার্জের বলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে পাঁচ বছর ঐ হারে টাকা জমা রাখার সুবিধা এ বাজেটে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ফলে সরকারের ৫৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সীমা দু লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয়করের হারের কোন হেরফের হবেনা। তবে কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য সব করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের হার শতকরা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হলো। প্রত্যক্ষকর থেকে বর্তমান বছরে ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে।

শ্রী প্যাটেল জানান প্রত্যক্ষ কর আইন দিন দিন জটিল হয়েছে। তাই এর সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হচ্ছে এ বছরের শেষ নাগাদ।

এবারের বাজেটে মোটর যানবাহনের ওপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। মোটর গাড়ীর ওপর শুল্ক ২.৫ শতাংশ বেড়ে ১৭.৫ শতাংশ এবং দুই ও তিন চাকার গাড়ী ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৫ শতাংশ হয়েছে। দুই ও

তিন চাকার গাড়ীর টায়ার, টিউব ও ব্যাটারীর ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়ায় এসব গাড়ীর ওপর প্রকৃতপক্ষে নীট ২.২৫ শতাংশ শুল্ক বাড়ছে। এই শুল্ক বাড়ানোর ফলে বছরে এবাবদ মোট ৫.১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমানে রং তৈরীর দ্রব্যাদি, রং, এনামেল, বার্নিশ প্রভৃতির উপর উৎপাদন শুল্ক নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে মূল্যানুপাতে ধার্য্য করার প্রস্তাব রয়েছে। বেশী দামের দ্রব্যাদির ওপর সাধারণত ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কমদামের দ্রব্যাদির ওপর শুল্ক প্রায় একই রকম থাকবে।

সিনেমার ফিল্মের ওপরও মূল্যমান বিচার করে সংশোধিত শুল্কের হার মূল্যানুপাতে ১০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব আছে।

সিগারেটের দামের ওপর মূল্যানুপাতিক হারে কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিড়ির ওপর কর প্রতি হাজারে ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ টাকা করা হয়েছে। এই সব কর থেকে বছরে বাড়তি আয় হ'বে ৪৫ কোটি টাকা।

(১) ইতিপূর্বে শুল্ক ধার্য হয়নি এমনসব হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, (২) ওজন করার যন্ত্র, (৩) হাত ঘড়ি ও টেবিল ঘড়ি, (৪) বৈদ্যুতিক বাতির সরঞ্জাম, (৫) জুতোর কালি, গাড়ির রং ধাতুর পালিশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ উপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎপাদন হয় এরূপ ক্ষুদ্রায়তন হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও কালি শিল্পগুলিকে শুল্কের রেহাই দেওয়া হ'বে। আশা করা হচ্ছে এবাবদ মোট ১১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমান বাজেটে নির্দ্দিষ্টভাবে নতুন উৎপাদন শুল্কের আওতায় পড়েনি এমন সব পণ্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক বর্তমানে ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২ শতাংশ করা হবে। শুল্ক ধার্য্য হয়েছে এরূপ অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলে এইসব পণ্যের ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়া হবে। এই শ্রেণীর আওতায় ছোট ছোট অনেক শিল্প সংস্থা রয়েছে বলে স্থির হয়েছে, কর্মী সংখ্যা অনুপাতের বদলে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট শিল্পগুলিকে উৎপাদন শুল্কে ছাড় দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ-বিহীন সকল শিল্পকেও এই ছাড় দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রীর পরোক্ষ করের প্রস্তাবে হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্পগুলি লাভবান হবে। ২০ কাউন্ট সুতো পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাড়তি কাউন্টের জন্য প্রতি কেজিতে ৩০ পয়সা পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পগুলি প্রচুর পরিমাণে স্পান সুতো ব্যবহার করায় এক্ষেত্রেও একই রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত তাঁতশিল্পকে বর্তমানের চক্রবৃদ্ধি হারের উৎপাদনশুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবে ৮০ হাজার তাঁত শিল্প শুল্ক নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পাবে। ক্রিম্পিং সুতোর ওপর শুল্কের হার প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে ৫ পয়সায় কমানো হয়েছে।

ট্রানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, রেডিও, ষ্টিরিও প্রভৃতি ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ওপর মূল্যানুপাতে শুল্কের হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে। ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে মূল্যানুপাতিক শুল্কের হারে ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে ০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে। ৩৬ সেন্টিমিটারের বড় স্ক্রীনসহ যে সকল টি. ভি. সেটের উৎপাদন মূল্য ১৮০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা বা তার কম হবে সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে। ৫০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত টেপরেকর্ডার এবং ১৭৫ টাকা পর্যন্ত হিসাব রক্ষন যন্ত্র এ সুযোগ পাবে।

সমবায় সমিতি বা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সদস্য ক্ষুদ্র এবং কুটীর দেশলাই শিল্পগুলি উৎপাদনের ওপর বর্তমানে প্রতি গ্রসে ৫৫ পয়সার বদলে দ্বিগুণ ছাড় পাবে। বৈদ্যুতিক ইনসুলেটিং টেপ, প্লেটেড এক্সেলস, মিষ্টি, টফি, টিনের খাদ্যও শুল্কের রেহাই পাবে।

মিনি-ইস্পাত কারখানাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ইস্পাত কারখানা থেকে কাঁচামাল হিসাবে স্ক্র্যাপ যোগান দেওয়া দরকার। সেজন্য এই সব কারখানায় ব্যবহারোপযোগী কাঁচামাল হিসেবে বড় ইস্পাত কারখানাগুলি থেকে যেসব স্ক্র্যাপ আনা হবে সেগুলোর ওপর শুল্ক ছাড় দেয়া হবে।

শুল্ক ফাঁকি রোধ ও দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পশম সুতোর উপর উৎপাদন শুল্কের পরিবর্তে কাঁচা ও নিকৃষ্ট পশম এবং কম্বলের ওপর আমদানী শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হ'য়েছে। মিহি পশমের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫ পয়সা শুল্ক করা হবে। এর ফলে রাজস্বের যা ক্ষতি হবে তা আমাদানী করা কাঁচা পশমের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে পূরণ করা হবে। এর ফলে দেশজ পশমের দাম কমবে। ঘড়ির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিঃ এর মারফত ঘড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হবে। আমদানীকৃত ঘড়ি জনসাধারণের কাছে কমদামে বিক্রির জন্য অর্থমন্ত্রী ঘড়ির যন্ত্রপাতি ও ঘড়ির ওপর মূল্যানুপাতে আমদানী শুল্ক ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন।

নিউজপ্রিন্টের ওপরও মূল্যানুপাতিক আমদানী শুল্কের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

শিল্পপ্রসার ও দেশজ শিল্পের প্রতিযোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মূলধনী পণ্য দেশজ উৎপাদনের অবস্থা আগে খতিয়ে না দেখেই আমদানী করার প্রস্তাবও অর্থমন্ত্রী করেছেন। অপরদিকে ভারতীয় মূলধনী পণ্য যাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় আরো ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে তার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের তামার তারের আমদানী শুল্ক বর্তমানে ৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে মূল্যানুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া ষ্টেনলেস ষ্টিলের ও হাই-কার্বন ষ্টিলের চাদর অন্যকোন মূলধনী পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হ'লে সেইসব ইস্পাতের চাদরের ওপর কর ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে গেইজ অনুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ২২ গেইজের ষ্টেনলেস ষ্টিলের বাসনপত্রের করও ৩২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২০ শতাংশ করা হ'য়েছে। তামা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির ওপর কর কমানোর ফলে আমদানী শুল্কে ৩৬.২৫ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে।

এই সমস্ত প্রস্তাবের ফলে ঘাটতির পরিমাণ বর্তমানে ২০২ কোটি টাকার বদলে ৭২ কোটি টাকা হবে এবং চলতি বছরে পরোক্ষ কর থেকে মোট ১৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় আয় হবে।

মঞ্জুলা বসু

নতুন বাজেটে করপ্রস্তাব

এ বছর বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল যে উদ্দেশ্যগুলির উপর বারবার জোর দিয়েছেন সেগুলি হল উৎপাদনশীল কর্মসূচীকে উৎসাহিত করা, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ধনবণ্টনে অসাম্য দূর করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করতে বাজেটের প্রস্তাবগুলি কতদূর সহায়ক হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থাকে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে তার পরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে এটা সাধারণ প্রত্যাশার মধ্যে ছিল। নূতন সরকারের নানা সময়ে ঘোষিত নীতির থেকেও অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে দেখতে বর্তমান বছরের বাজেটে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি, একমাত্র ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা ছাড়া। করসংক্রান্ত প্রস্তাবেও তাঁরা নূতন কর কিছু বসাননি বা পুরোনো কোনও কর তুলে নেননি, প্রচলিত ব্যবস্থাতেই কিছু হের ফের ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য বাজেটে প্রত্যক্ষ করের থেকেই বাড়তি রাজস্বের অধিকাংশ আদায় হবে বলে আশা করা হয়েছে। করবাবদ নূতন রাজস্বের প্রত্যাশিত পরিমাণ হল ২৪২ কোটি টাকা, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বাবদ ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার বৃদ্ধি। ব্যক্তিগত আয়ের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের (Surcharge) হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ফলে সর্বোচ্চ স্তরে আয়ের উপর করের হার দাঁড়াচ্ছে ৬৯ শতাংশ। এই অতিরিক্ত শুল্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত বা যৌথ পরিবারের আয়ের উপর প্রযোজ্য, কোম্পানীগুলির আয়ের উপর নয়। উপরন্তু কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য বিনিয়োগ ছাড় (Investment Allowance) দেবার যে ব্যবস্থা বিগত বাজেটে সীমিতভাবে ছিল আলোচ্য বাজেটে তা আরও বিস্তৃত করে দেশের সব শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম মাত্র সিগারেট, মদ্যজাতীয় পানীয়, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি যেগুলি প্রয়োজনের ভিত্তিতে যথেষ্ট অগ্রাধিকার পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।

উর্ধ আয়ের উপর অতিরিক্ত শুল্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন আয়ের লোকেদের কিছু ছাড় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নতম আয়ের উপর করের হার কমানো হয়নি বটে, কিন্তু সর্বনিম্ন যে আয়ের উপর কর কমানো হবে তার পরিমাণ বছরে ৮০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যাদের বাৎসরিক আয় তাদের কোনও আয়কর দিতেই হবে না। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক আয় ১০,০০০ টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৮০০০ টাকার ওপরই ছাড় দেওয়া হবে।

কর প্রস্তাবের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে বহু-বিতর্কিত বাধ্যতামূলক জমা-ব্যবস্থা (Compulsory Deposit Scheme) যা পূর্বতন সরকার চালু করেছিলেন তা আপাতত তুলে নেওয়া হচ্ছে না, যদিও জনতা সরকার ক্ষমতায় যখন আসীন হল তখন এইরকমই আভাস দেওয়া হয়েছিল যে বাধ্যতামূলক জমা রাখা বন্ধ করে দেওয়া হবে ও সঞ্চিত অর্থ প্রত্যর্পণ করা হবে।

এই প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল এই যে একবারে নিম্নবিত্ত আয়ের লোকেদের বাদ দিলে সাধারণ লোকের করের ভার বর্তমান বাজেটের প্রস্তাবগুলির ফলে অনেকখানিই বেড়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যার বার্ষিক আয় তার দেয় করের পরিমাণ হবে শূন্য আর ১০,৫৫০ টাকা যার বার্ষিক করযোগ্য উপার্জন তার দেয় করের পরিমাণ হবে ৩৮৫ টাকা। পরবর্তী আয়ের ধাপগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ হিসাব করে দেখানো যেতে পারে যে মধ্যবিত্ত লোকেদের ওপর চাপ আলোচ্য বাজেটে বেড়ে যাচ্ছে।

মধ্যআয় সম্পন্ন লোকেরা বাজেটের ফলে যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছে তার জন্য আবশ্যিক জমার ব্যবস্থাও দায়ী। ধনবৈষম্য কমানো ও মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা—এই দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখেই অতিরিক্ত শুল্ক ও আবশ্যিক জমা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়াও এই প্রস্তাবগুলির অন্য অসুবিধা আছে। এই দুটি ব্যবস্থাকেই বিশেষ প্রয়োজনে সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োগ করা উচিত, সেই সাময়িকতার জন্যই এদের প্রভাব। স্বাভাবিক সময়ে দীর্ঘকালীন কর্মসূচীর মধ্যে এগুলিকে গ্রহণ করলে ক্রমশ এদের ধার

কমে আসে এবং স্বল্পসময়ের জন্য ফলপ্রসূ হলেও অন্তত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘকালে প্রভাব কমে যায়।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক কর সঞ্চয়ের প্রবণতাও কমিয়ে দেয়। সর্বোচ্চ স্তরে প্রান্তিক আয়করের হার ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। মধ্য আয়ভোগী ও উচ্চবিত্ত লোকেদের সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগ ছাড়, অতিরিক্ত শুল্ক থেকে রেহাই ইত্যাদি যে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাও কতদূর কার্যকর হবে তা সন্দেহের বিষয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য করের হার যদি খুব বেশী হয় তাহলে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে আয় বাড়াবার উৎসাহও নষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত আয়কর বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর করের হারও বাড়ানো হয়েছে। ২.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার আরও ১ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে দেয় করের হার বাড়ছে ১শতাংশ। সম্পত্তির উপর করের হার বৃদ্ধির স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, প্রথমত বিগত বাজেটে এই হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত সঞ্চয় ও উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার পক্ষে ব্যক্তিগত আয়কর অত্যধিক না বাড়িয়ে অনুৎপাদনশীল সম্পত্তির উপর কর বসানোই বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবের মধ্যে Capital Gains বা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি-জনিত লাভের ওপর যে কর প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থন পাবে সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাসযোগ্য বাড়ী বিক্রী করলে তার মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের উপর যে কর দেয় তা মকুব করা হয় যদি ছয় মাসের মধ্যে অন্য কোনও বাড়ী তৈরী বা বিক্রী করা হয়। অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ছাড় প্রযোজ্য নয়। নতুন প্রস্তাবে অলঙ্কার বা শেয়ার বিক্রয়লব্ধ লাভের ক্ষেত্রেই অনুরূপ রেহাই দেওয়া হবে যদি ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয়-লব্ধ অর্থ শেয়ার, ব্যাঙ্ক আমানত, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট ও অন্যান্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে খাটানো হয়। এই ব্যবস্থায় যাতে কেউ অন্যায় সুবিধা না নিতে পারে সেজন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ লব্ধ অর্থ অন্তত তিন বছরের জন্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে নিয়োজিত রাখতে হবে। এর ফলে সম্পত্তিতে ফাটকাবাজী করে লাভের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বাজেট প্রস্তাবের ফল শেয়ার বাজারে অনুকূল হবে বলেই আশা করা যায়। বাজেট পেশ করার অব্যবহিত পরে শেয়ার বাজারে কিছুটা মন্দা ভাব এলেও পরে আবার উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে দেখা গেছে।

উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোম্পানীগুলিকে যে বিনিয়োগ ছাড় দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি অধুনালুপ্ত সম্প্রসারণের জন্য রিবেট (Development Rebate) এরই বিকল্প সংস্করণ। উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে এই ব্যবস্থা উৎসাহ যোগাবে সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে যাদের গুরুত্ব নেহাৎই কম সেই সব শিল্প ছাড়া অন্য সব শিল্পের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে সব শিল্প দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গড়ে উঠবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে স্বয়ং-নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছাড়ের অনুপাত ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য আলোচ্য বাজেটে আরও কিছু প্রস্তাব আছে যা সকলের সমর্থন পাবে। যেমন গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্পস্থাপন করলে তারজন্য বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে কর বসানোর প্রস্তাব আছে। বর্তমান বছরের জুন মাসের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প সংস্থাপন করলে দশ বছর তাদের লাভের ২০ শতাংশ আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। তেমনই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাদের শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ ২৫০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তারা যাতে অযথা বিব্রত না হয় সেজন্য উৎস থেকে আয়কর তুলে নেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও প্রচলিত করব্যবস্থায় কোনও মৌলিক পরিবর্তন না করে প্রচলিত করের হারেই কিছু অদলবদল করা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করার বিষয় হল যে কতকগুলি জিনিষের উপর ১ শতাংশ হারে নতুন আবগারী কর বসছে, যার মধ্যে আছে, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, ওজনের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হাত ঘড়ি ও টাইমপীস, জুতোর কালি, গাড়ির পালিশ। ১২ শতাংশ হারে আবগারী কর বসছে ক্ষুদ্রশিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের উপর (যদিও ১ লক্ষ টাকা উৎপাদন পর্যন্ত একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে)।

রেডিও, ট্র্যানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, স্টিরিও ইত্যাদির উপর মূল্য অনুসারে ১৫ শতাংশ থেকে ৩৫শতাংশ পর্যন্ত আবগারী কর ধার্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র অল্পমূল্যের টি. ভি. সেটের উপর আবগারী কর হবে ৫ শতাংশ। যথারীতি সিগারেট, বিড়ির উপর ধার্য করের বৃদ্ধির হার পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যথারীতি বলছি এইজন্য যে সব বাজেটেই বিড়ি সিগারেটের দাম বাড়াটা যেন একটা অবধারিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটরগাড়ির উপর করও বাড়ছে। আমদানী শুল্ক বাড়ছে বিদেশী পশম, কম্বল ইত্যাদি পশমজাত দ্রব্যের উপর। আবগারী শুল্ক কমছে তাঁতবস্ত্র, ছোট কারখানায় তৈরী কাগজ, ক্ষুদ্র ইস্পাতশিল্প, সমবায় সমিতির প্রস্তুত দেশলাই, জলতোলার বৈদ্যুতিক পাম্প,

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

রুমমেট

দেবযানী

আমার মত আড্ডাবাজ মেয়ের সঙ্গে যে শকুন্তলা আপ্তের কি করে ভাব হ'ল সেটা শুধু আমার বন্ধুমহলেই একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি, সত্যি বলতে কি আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগতো। আকৃতি প্রকৃতি কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র মিল ছিল না আমাদের। শকুন্তলা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু মনে হ'ত তার রূপ যেন শুধু দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বড় বেশী শান্ত ও গম্ভীর মেয়েটির সমস্ত হাবভাবের মধ্যে একটা সুসংযত দৃঢ়তা ফুটে উঠতো সব সময়। সবার থেকে সে যে স্বতন্ত্র একথা যে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দেখতো সেও বুঝতে পারতো। আমরা কো-এডুকেশন কলেজে পড়তাম। শকুন্তলাকে কেউ কখনও কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেনি। এমনকি কোন মেয়ের সঙ্গেও বিনা প্রয়োজনে কথা বলতো না সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী শকুন্তলা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হ'তে না পারার দুঃখ ভুলেছিল আই. এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড বিট্ করে। কিন্তু সবসময় নিজের চারিদিকে কি যেন এক গণ্ডী টেনে রাখতো শকুন্তলা। নিজের স্বপ্নের রাজ্যেই বিভোর হয়ে থাকতো সে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তাকে রীতিমতো সমীহ করতো। বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও করেছিল অনেকেই কিন্তু তার সে গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি কেউ।

সব দিক দিয়েই শকুন্তলার বিপরীত ছিলাম আমি। নিজমুখে রূপের প্রশংসা করাটা রীতিবিরুদ্ধ। তবু অতিরিক্ত বিনয় না করেও বলতে পারি যে ঠিক প্রশংসা করার মত রূপ আমার ছিলনা কোনকালেই। আর গুণ? ফাঁকিবাজ, ক্লাস-পালানো ইত্যাদি নানারকম দুর্নাম অর্জন করেছি কলেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা যে রেটে বেড়ে চলেছিল তাতে হিতাকাংখীরা রীতিমত আতঙ্কিত হতেন আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। Academic career ও তথৈবচ। ভাল রেজাল্টের প্রতি একেবারে লোভ নেই একথা বলতে পারিনা, কিন্তু তার জন্যে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হ'বে অন্যান্য বিষয়ে তা করতে আমি নারাজ।

এ হেন গোল্লায় যাওয়া মেয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা রত্নটির এমন গলায় গলায় ভাব হওয়া যে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্যের অন্যতম একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। অথচ এর সূত্রপাত হয়েছিল অতি সাধারণভাবে। বি. এ. তে আমাদের দু'জনেরই সংস্কৃত ছিল। সংস্কৃতের "স্যার" একটু বেশীরকম কড়া মেজাজের লোক। টিউটোরিয়াল ক্লাসে 'টাস্ক' করে না আনলে এমন বাছা বাছা বাক্‌বাণ ঝাড়তেন যা আমার মত নাককান কাটা মেয়েরও অসহ্য লাগতো। মেয়ে বলে ছেড়ে দিতেন না তিনি। প্রথমে কিছুদিন অসহযোগ চালালাম—তাঁর টিউটোরিয়ালের ধারে কাছে, ঘেঁসতাম না। শেষে বুঝলাম এভাবে চলবে না। টিউটোরিয়ালের পার্সেন্টেজ কমে গেলে নিজেরই বিপদ, পরীক্ষা দিতে পারবো না। বেগতিক দেখে অবশেষে শকুন্তলার শরণ নিলাম—তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনা। দেখতে দেখতে আমাদের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে কলেজে সবার মুখে মুখে ওই এক কথা ফিরতে লাগলো। সবাই হিংসে করতো বুঝতাম এবং সেজন্য রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম।

ফোর্থ ইয়ারের শুরুতেই বাবা বদলী হয়ে গেলেন পাটনা থেকে সেই সুদূর পাঞ্জাব। আমায় হস্টেলে থাকতে হ'বে এবার—জীবনে প্রথমবার। শকুন্তলা হস্টেলেই থাকতো বরাবর। সুপারিন-টেণ্ডেণ্টকে ধরে আমরা দুজনেই একটি ডবল সিটেড রুম নিলাম। হস্টেলে আসার পর আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলাম

শকুন্তলাকে। বন্ধুহীন, চাপা মেয়েটির এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম যেন। হষ্টেলে আসার পর থেকে আমার এমন আদর যত্ন শুরু করলো যে বাড়ি ছেড়ে থাকার দুঃখ দু'দিনেই ভুলে গেলাম।

মাঝে মাঝে অবশ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ওর গিন্নীপনায়। কোনদিন রাত্রে হয়তো চুপি চুপি সিনেমা দেখে ফিরেছি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নজর এড়িয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি শ্রীমতীর মুখ অন্ধকার। তারপরই শুরু হ'ত লম্বা বক্তৃতা। লেখা-পড়া না করলে কি ভবিষ্যৎ হ'বে, আজে বাজে সিনেমা দেখার পরিণাম কি, হোটেলে আমার মত ভাল মেয়েদের দেখলে লোকে কি ভাববে—ইত্যাদি নানারকম ফিরিস্তি। চুপ করে শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুনেই যেতাম। যখন অসহ্য মনে হ'ত হঠাৎ উঠে নিজের বাক্স প্যাঁটরা ধরে টানাটানি শুরু করতাম। জিজ্ঞেস করতো—"ওকি হ'চ্ছে?" গম্ভীর মুখে বলতাম—"রুম বদলাবো। থাকবো না এঘরে।" ব্যস, এক ওষুধেই সব ঠাণ্ডা। শকুন্তলার মুখে আর রা'টি শোনা যেত না খানিকক্ষণ। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মিনিট দশেক পরেই এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির হ'ত—"খেয়ে নে। পাঞ্জাবী হোটেলের অখাদ্য কুখাদ্যে পেট ভর্তি। সে কথা বললে আবার ঘণ্টাখানেক ধরে যে উপদেশামৃত বর্ষিত হ'বে তার কথা ভেবে শঙ্কিত হই। অতিকষ্টে দুধটুকু শেষ করে বিরক্ত হয়ে বলি, "সব সময় এমন জ্বালাস কেন বলতো? তুই যে আর জন্মে আমার কে ছিলি ভগবানই জানেন—।" ও হাসে—"শুধু ভগবান কেন আমিও জানি।"—"কি?" "সতীন"—ও কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলে।

"উহুঁ, সতীন নয়, শাশুড়ি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি অন্য বন্ধুদের খোঁজে।

একদিন এক বাদলঝরা সাঁঝে একটি দুর্বল মুহূর্তে অবশেষে বলে ফেলি বহু-দিনের গোপন রাখা কথাটি। উৎসাহে আরও কাছে সরে আসে শকুন্তলা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বিভ্রান্ত করে তোলে তার প্রশ্নজালে—"তার নাম কি? কোথায় থাকে? কবে আলাপ হ'ল? বল শীগগীর—।" বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হ'চ্ছে। জানালার ধারে বসে সেই বর্ষণ ধারার দিকে চেয়ে বলে যাই আমার সেই কাউকে না বলা কাহিনী.....

বাবার যখন এলাহাবাদে বদ্লী হল তখন আমি ম্যাট্রিকে পড়ি। আমি অঙ্কে বরাবরই ভীষণ কাঁচা, তবু জেদ করে অ্যাডিশনাল ম্যাথেমেটিক্স নিয়েছিলাম। প্রথমে অতটা বুঝি নি, এখন যতই পরীক্ষা এগিয়ে আসছিল ততই নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। শেষে একদিন কাতরভাবে বাবার দরবারে হাজির হ'লাম। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম "অঙ্কের একজন মাষ্টার চাই বাবা, নইলে কিছুতেই পাশ করবো না।" বাবা তাঁর বন্ধু অবনী দত্তকে ধরলেন একজন ভাল মাষ্টার ঠিক করে দেবার জন্যে। অবনীবাবুর ছেলে শোভন সবে বি. এস্. সি. পাস করে দিল্লীতে ডাক্তারী পড়ছে। কি একটা লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। অবনীবাবু তাকেই আমার অঙ্ক শেখানোর ভার দিলেন।

শোভনের কাছে অঙ্ক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান নিশ্চয়ই হয়েছিল তা নাহ'লে ম্যাট্রিকটা অমন নির্ঝঞ্ঝাটে উৎরোতে পারতাম না। কিন্তু শোভনকে কাছে পেয়ে সমস্ত জীবন যেন তোলপাড় হয়ে গেল—দু'জনেরই। কি যেন এক প্রচণ্ড আকর্ষণ দু'টি হৃদয়কে এক করে দিল। শোভনকে ভাল লাগা এমন কিছু বিস্ময়কর হয়তো নয়। রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য সব দিক দিয়ে যে কোনও মেয়ের কাম্য সে। তবু মনে হ'ত ওর প্রতি আমার যে আকর্ষণ তা রূপ, গুণ বা সম্পদের নয়। সে যে কি তা বুঝতে পারতাম না।

আমি কলেজে ভর্তি হ'লাম। শুধু শোভনকে কাছে পাওয়ার লোভেই আবার অঙ্ক নিলাম। শোভন ছুটিতে বাড়ি এলেই আমায় অঙ্ক শেখাতো আসতো। অধ্যাপনায় তার মনোযোগ দেখে বাঘা-বাঘাদেরও তাক লেগে যেত মাঝে মাঝে।

দুরূহ ষ্ট্যাটিস্টিক্স-এর আড়ালে আমরা দু'জন তখন কল্পনায় স্বর্গ রচনা করে চলেছি। দু'জনেই বুঝতাম সে স্বর্গকে এই মাটির পৃথিবীতে টেনে আনতে বাধা কোথায়। একদিকে জাত ও আরেক দিকে অর্থ ও রূপের পাঁচিল। অব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদানের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না আমার রক্ষণশীল বাবা মা। শোভনের অভিভাবকরাও কক্ষনো রাজী হ'বেন না এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলা মেয়েকে বধূরূপে ঘরে এনে নিজেদের আভিজাত্য খর্ব্ব করতে। অবশ্য আইনের সাহায্যে ঘর বাঁধা চলে, কিন্তু মন মানতে চায়না সে কথা। সবাইকে দুঃখ দিয়ে সে মিলন সুখের হ'বে কিনা কে জানে।

আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট ও বাবার পাটনায় বদলী হ'বার খবর প্রায় এক সঙ্গে এলো। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা ম্লান করে দিল সাফল্যের সব আনন্দকে। বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় বান্ধবীর বাড়ি যাবার ছলে শোভনের সঙ্গে দেখা করলাম কালীমন্দিরে। বিগ্রহের সামনে প্রতিশ্রুতি দিলাম দু'জনে দু'জনকে—যদি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় জীবন শেষ হয়ে যায় যাক্, তব এই ক'টি বছরই অক্ষয় হয়ে রইবে আমাদের জীবনে। অন্য কেউ আসবে না সেখানে।......

শকুন্তলা একমনে শুনে যাচ্ছিল আমার ইতিবৃত্ত। খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বললো—"তার ফটো নেই তোর কাছে?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—আছে। "কই দেখি?" খানিক ইতস্ততঃ করে ট্রাঙ্ক খুলে বার করলাম শোভনের সেই ফটোখানা যা অনেক যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন। ও অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, তারপর হেসে বললো—"বাব্বাঃ, তোর বয়ফ্রেণ্ডের সংখ্যা দেখে মাঝে মাঝ এমন ভয় হ'ত ভাবতাম—

তুই বন্ধি কোনদিন কারো প্রতি সিনসিয়ার হ'তে পারবি না।" শোভনের ফটো আর ট্রাঙ্কে উঠলো না। বইয়ের আলমারীর মধ্যেই রেখেদিলাম সেটা। আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ খুলতো না সে আলমারী। আর ওতো জেনেই গেছে এখন।

শকুন্তলা এর পর থেকে প্রায়ই শোভনের বিষয় নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতো। একটু দেরী করে ফিরলেই সে কি রাগ—"বেচারী শোভনবাবু, কপালে দুঃখ আছে ভদ্রলোকের।" লেখাপড়া করিনা, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিই তা নিয়ে সব সময় ভয় দেখাতো—"লিখছি শোভনবাবুকে, নিয়ে যান তাঁর মালুকে। আর আমি পারবো না' ইত্যাদি। আর যেদিন শোভনের চিঠি আসতো সেদিন তো কথাই নেই। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওর চিঠি আসতো আর প্রত্যেকটি চিঠি পড়ে শোনাতে হ'ত শকুন্তলাকে। কারণ বাংলা বলতে পারলেও পড়তে জানতো না ও। মাঝে মাঝে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হ'ত ওর সঙ্গে। শেষে কোন কূল কিনারা না পেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো। আলো জ্বেলে দেখতাম শকুন্তলা তখনো চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করতাম "কি ভাবছিস্ অতো?" ও ম্লান হেসে বলতো—"কিছুনা ঘুমো। আমি তোর কপালে হাত বুলিয়ে দি।" ঠাট্টা করতাম—"উঃ কুন্তীর কত ভাবনা, যেন কন্যাদায় পড়েছে।" ও হঠাৎ রেগে উঠতো—"কন্যাদায় থেকে রুমমেট্ দায়টা কিছু কম নয় মশায়, অবস্থায় পড়লে বুঝতে।"

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। শকুন্তলার আবার পুজো করার বাতিক ছিল। রোজ ভোরবেলা স্নান করে ঘন্টা খানেক পুজো না করলে ওর হ'ত না। তার উপর বিশেষ বিশেষ তিথিতে তো কথাই নেই—নির্জ্জলা উপোস সেদিন। ওর ভক্তির বহর দেখে আমরা সবাই হাসতাম।

এরপর হঠাৎ এক নতুন উপদ্রব আরম্ভ করলো শকুন্তলা। কি একটা কারণে ক'দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল। হস্টেলে ফিরে আমাকে দেখেই দূর থেকে চ্যাঁচাতে লাগলো—"মালুরে সব ঠিক হয়ে গেছে—"। কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমি। শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিশ্বাসে যা বলে গেল তার সারমর্ম হ'ল—আমি নাকি শোভনকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি—। তার অতি সহজ উপায় আছে না কি আমার হাতের মুঠোয়। "উপায়টা কি শুনি?"—"সন্তোষী মা'র পুজো কর।" আমি ঠাট্টা ভেবে হাসতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ও ঠাট্টা করেনি। সত্যিই নাকি ওর পিসতুতো বোনের এক ননদ না কে যেন সন্তোষী মা'র পুজো করে নিজের বাঞ্ছিত দয়িত লাভ করেছে—এইবার বাড়ি গিয়ে সদ্য সদ্য শুনে এসেছে সে। শুধু শোনা নয় সমস্ত ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে এনেছে সেই সঙ্গে। সন্তোষী মা'র ফটো কিনে এনেছে একখানা, পুজোর মন্ত্রতন্ত্রগুলোও নোট করে এনেছে কোত্থেকে। "তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে'না মালু, শুধু রোজ ভোরে উঠে চান করে মাত্তর এক ঘণ্টা......।" শুনতে শুনতে কম্প দিয়ে জ্বর আসার উপক্রম হ'ল। আমি মালবিকা মুখার্জ্জী—কোনদিন সাড়ে সাতটার আগে বিছানা ছেড়েছি এমন অপবাদ যাকে অতি বড় শত্তুরেও দিতে পারবে না, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এক প্লেট জলখাবার না ধরলে যার হাঁক ডাকে বাড়ি এবং পাড়া (উপস্থিত হস্টেল) শুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি করে—খোদ সেই আমি ভোরে উঠে, স্নান করে, খালি পেটে করবো এক ঘন্টা পুজো!!! তাছাড়া ভগবানে একটু আধটু বিশ্বাস যদিও ছিল তবু সন্তোষী মায়ের একটু স্তব স্তুতি করলেই যে আমাদের অমন গোঁড়া বাবা মা সব সংস্কার আভিজাত্যে জলাঞ্জলি দেবেন এ কথা গাঁজাখুরি ছাড়া আর কিছু মনে হ'ল না আমার। "ও সব আমার দ্বারা হ'বে না ভাই" নিতান্ত ভয়ে

ভয়ে নিজের মতামত জানালাম তাকে। কিন্তু আমার মতামত নিয়ে মাথা ঘামাতে কুন্তীকে কোনদিনই দেখিনি, সেদিনও বিশেষ গা করলো না। নির্বিকার মুখে পুজোর সাজ সরঞ্জাম রেডী করতে লাগলো সে। শেষে সেই অসম্ভবই সম্ভব করালো আমাকে দিয়ে শীতকালের সকালে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে স্নান করে, চা জলখাবারের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, ঝাড়া একঘণ্টা দরজা জানালা এঁটে সে কি প্রাণান্তকর সাধনা। সংস্কৃত উচ্চারণটা কিছুতেই রপ্ত হ'ত না, পাশে বসে কারেক্ট করতো শকুন্তলা। অবশ্য বেশীদিন ভুগতে হয়নি আমাকে। সকালে স্নান টান কোনকালেই সহ্য হ'ত না। দিন দশেকের মধ্যেই জ্বর বাধিয়ে ফেললাম। শকুন্তলার বোধহয় করুণা হ'ল এবার, কারণ অসুখ সারার পর আর কোনদিন পুজো টুজো করতে বলেনি আমায়।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। শকুন্তলা ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে পাশ করলো। আমি পাশ করলাম অতি সাধারণভাবে। অনার্স আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম বেগতিক বুঝে। তারপর এম. এ.। এইবার একটু মুস্কিল বাধলো। শকুন্তলা ইকনমিক্স নিলো, আমি বাংলা। সারাদিন আলাদা আলাদা কাটতো, কিন্তু হস্টেলে এবারও আমরা দুজন রুমমেট। কাজেই আর সবই আগের মত চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে শোভন ডাক্তারী পাশ করে গেছে। হৃদরোগ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যাচ্ছে সে। যাবার আগে দিন পনেরোর জন্যে পাটনায় এলো বিদায় নিতে।

শকুন্তলার সঙ্গে শোভনের আলাপ করিয়ে দিলাম। আমার নামে শোভনের কাছে নালিশ করবে বলে সবসময় শাসাতো, কিন্তু দেখলাম যত বক্তৃতা ওর আমার কাছেই। শোভনের সামনে একেবারে চুপ। মাথা হেঁট করে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। একটা কথা বলতে হ'লে যেমে নেয়ে উঠতো যেন, গাল দু'টো লাল হয়ে উঠতো অকারণে। খুব মজা

লাগতো আমার, কেমন জব্দ। রোজ শোভন এলেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতাম ওকে। শোভন কিন্তু বিরক্ত হ'ত। আড়ালে বকতো আমাকে—"রোজ ওকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আস বলো তো? আর মাত্র ক'টা দিন, তারপর কতদূরে চলে যাবো, জানিনা আবার কবে দেখা হ'বে। অন্ততঃ এই ক'টা দিন তোমায় একা পেতে চাই—।"

রোজ শোভন আসার ঘন্টাখানেক আগে থেকে আমায় নিয়ে পড়তো শকুন্তলা। আমি নাকি চুল বাঁধতে জানিনা, শাড়িটা পর্যন্ত ঠিক করে পরতে শিখিনি এতদিনে। নিজে হাতে পরিপাটি করে চুল বেঁধে, নিজের সব চেয়ে সুন্দর শাড়িটি পরিয়ে দিত আর সমানে গজ্ গজ্ করতো। তারপর সব সাজগোজ শেষ হ'লে খোঁপায় ফাইনাল টাচ্ দিতে দিতে দুষ্টুমীভরা হাসি হাসতো। ফিরে এলে শোভন কি কি কথা বলেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতো বারে বারে।

অবশেষে পনেরোটি দিনের হাসি গান শেষ করে দিয়ে শোভন বিদায় নিল। আমি আবার ফিরে গেলাম আমার পুরোনো জীবনে। আগে শকুন্তলার জন্যে ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন তো দু'জনের ক্লাশ আলাদা, কাজেই অবাধ গতি। রোজ ক্লাশ পালিয়ে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো ম্যাটিনি সিনেমা দেখতাম, কখনো কফি হাউসে আড্ডা বসতো। শকুন্তলা কিছুই টের পেত না। শোভনের কথা যে কখনো মনে পড়তো না তা নয়; কিন্তু তার কথা ভাবলেই প্রচণ্ড অভিমানে ভরে উঠতো মন। শোভন বলেছিল তার বাবা মা'র মতের বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না কোনদিন। রাগ করে বললাম, "তোমার কাছে বাবা মা'ই সব? আমি কিছু নই?" —"কে বলে তুমি কিছু নও? তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো। কিন্তু মা বাবার মনে দুঃখ দিতে পারবো না আমি।" মনে পড়তো তাকে দেওয়া আমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা। কি তার পরিণাম? জীবনে আর কখনো গড়তে পারবো না একখানি সুখের নীড়। জানি শোভনও নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে। কিন্তু সে পুরুষ। সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিলিয়ে দেবে সে নিজেকে। কোনও রিক্ততাই থাকবে না তার। কিন্তু আমি! কি নিয়ে কাটবে এই নিঃসঙ্গ জীবন?

শোভনের চিঠির সংখ্যাও কমতে থাকে ক্রমশ। অসংখ্য হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি পরীক্ষায় ব্যস্ত সে। হাজার হাজার মাইল দূরে তার কথা ভেবে কার হৃদয় বিকল হ'চ্ছে সে কথা মনে করার সময় কোথায়!..

একটু একটু করে রাত গভীর হয়। চোখের জলে ভিজে ওঠে বালিশটা। "মালু!" হঠাৎ দেখি কোন ফাঁকে শকুন্তলা মাথার কাছে এসে বসেছে। আমি উত্তর দিইনা। ও আস্তে আস্তে আমার চোখের জল মুছে দেয়।

এক একটা করে মাস কেটে যায়। একদিন খবর পেলাম ১৮ই মে থেকে আমাদের পরীক্ষা শুরু হ'বে, অর্থাৎ ঠিক তিন মাস বাকী। হঠাৎ যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। অথচ এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। এম. এ. পরীক্ষা সাধারণত ঐ সময়েই হয়ে থাকে এবং এবছরও যে হ'বে সেটা আগেই আমার জানা উচিৎ ছিল। তবু কেন জানি পরীক্ষার কথাটা কোনদিন মনে পড়েনি এর আগে, তাই হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলাম "মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে"। একটি বইও নেই আমার কাছে। থাকবেই বা কোথা থেকে। বই কেনার টাকাতেই তো সিনেমা দেখা ও হোটেলে খাওয়া চলতো। লাইব্রেরীর বই থেকেও কিছু নোট করিনি আর এই অল্প সময়ের মধ্যে তা আর সম্ভবও নয়। সব মিলিয়ে চোখে অন্ধকার দেখার মতই অবস্থা।

অবশেষে সেই অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর মত দেখা দিলেন আমাদের অধ্যাপক ডাঃ সুকান্ত চ্যাটার্জী। মাত্র কয়েক বছর হ'ল পাশ করে রিসার্চ করছিলেন। মাস ছয়েক হ'ল আমাদের ক্লাশ নিচ্ছেন। অনেকবার আমাকে বলেছেন পড়াশোনা বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে তাঁকে জানাতে। এতদিন সময় হয়নি আমার। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়লো। অকপটে জানালাম নিজের অবস্থা। আমার ফাঁকি দেবার বহর দেখে তিনি প্রায় হতভম্ব। হয়তো বকাবকি করতেন কিন্তু আমার কাঁদুনে মুখ দেখে বোধহয় দয়া হ'ল। আমাকে নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন তিনি। রোজ ক্লাশ শুরু হ'বার আগে সকাল বেলা ও সন্ধ্যায় ক্লাশ শেষ হ'বার পর পড়াতেন। বাড়ি থেকে নোট তৈরী করে আনতেন আমার জন্য। কিছুদিন পরেই Preparatory leave আরম্ভ হ'ল। তখন প্রায় সারাদিন ধরেই আমাকে পড়াতেন সুকান্ত চ্যাটার্জী। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠতো আমার। ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত; মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসতো আমার। কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি তাঁর মুখে। দেখতে দেখতে দুরূহ কোর্স সহজ হয়ে আসে। পরীক্ষার ভয়ও কেটে যায় ক্রমশ। সেইসঙ্গে যে নিরাশার অন্ধকার ঘিরে রেখেছিল আমার জীবন তার মাঝেও বুঝি আলো ফোটে।

পরীক্ষার মাত্র দু সপ্তাহ বাকী। না, পরীক্ষাকে আর মৃত্যুদূত বলে মনে হ'চ্ছে না। অটল বিশ্বাসে, বেশ খুসী মনেই প্রতীক্ষা করছি তার জন্য। সেদিন পড়াতে পড়াতে বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন সুকান্ত চ্যাটার্জী। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন,—"তুমি পরীক্ষার পর ক'দিন থাকবে এখানে?"—"তার পরদিনই যেতে হ'বে।"—"চণ্ডীগড়?"—"হ্যাঁ"। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর ইতস্তত করে বল্লেন—"মালবিকা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম....।"

সেদিন হষ্টেলে ফেরার পথে বার বার শুধু মনে হ'চ্ছিল—এই ভাল, শোভনকে আমি পাবো না কোনদিন। আর তার কাছে আমার মূল্যই বা কতটুকু? থাকুক সে তার কর্তব্যবোধ, তার যশ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মরীচিকার পিছনে ছুটে হতাশা

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভবতোষ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সরকারি বাজেটের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আগামী বছরে বিভিন্ন খাতে এবং সমগ্রভাবে কী পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে, সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কতটাকা লাভ হবে, সরকারি ব্যয় কোন দিকে কতটা হবে ইত্যাদি বিষয়ে একটি হিসাব তৈরি করা। মোট ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কীভাবে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে সেটাও বাজেটেই দেখানো হয়। ঘাটতি মেটাতে হলে যদি নূতন কর-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার জন্য ব্যবস্থাও বাজেটে থাকবে। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত থাকে সরকারি করনীতি ও ব্যয় থেকে দেশের উৎপাদন ও বণ্টনে কী পরিবর্তন হতে পারে, বা কী পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার পরিচয়। সরকারি ব্যয় আজকাল কোন দেশেই শুধু প্রশাসন পরিচালনায় সীমাবদ্ধ থাকেনা। দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরকারি ভূমিকা সব দেশেই বেড়ে চলেছে। সরকারি আয়-ব্যয় দেশের মোট আয়-ব্যয়ের একটা বড় অংশ এবং সরকারি আর্থিক পরিকল্পনা কম-বেশি আজকাল সব দেশেই গৃহীত। এদিক থেকে দেখলে বাজেট শুধু একটা আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়। বাজেট দেশের উন্নতিতে সরকারি নীতি ও প্রভাব কী হবে তার প্রতিফলন।

দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে আছে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সেই সঞ্চয়ের সুপরিকল্পিত এবং বাঞ্ছনীয় ফলপ্রসূ বিনিয়োগ। আমাদের মত দেশে, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাতে সরকারের অংশ ক্রমেই বাড়ছে, সেখানে প্রত্যক্ষ সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। বস্তুত, বর্তমানে ভারতে যা মোট নূতন বিনিয়োগ হয় তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি সরকারি পরিচালনায়, আর বাকি এক-তৃতীয়াশ হয় সোজাসুজি কৃষি, কুটির শিল্প, বেসরকারি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের বেশির ভাগই অবশ্য এখনো আসে বেসরকারি উদ্যোগ থেকে. কিন্তু তার জন্য যে বিনিয়োগের কাঠামো দরকার—যানবাহন, রাস্তাঘাট, রেল-পথ, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, রাসায়নিক সার—সেটা সরকারি কর্মনীতির অঙ্গ হিসাবেই তৈরি হয়। আর্থিক পরিকল্পনার নীতি গ্রহণের আরম্ভ থেকে সরকারি বিনিয়োগ কোন কোন দিকে যাবে এবং কোথায় কোথায় বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নীতি নেওয়া হয়েছে। যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশি, যেখানে প্রত্যক্ষ লাভ বেশি না হলেও সমাজের উপকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুবিধা অনেক-খানি। যেখানে বিনিয়োগের ফল পেতে দেরি হতে পারে, সেখানে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোই সঙ্গত, কারণ ঠিক এই সব ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সহজে আসবে না।

দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর সরাসরি আয়-ব্যয় নীতির প্রভাবের প্রশ্নটি দুই ভাগ করে দেখা প্রয়োজন। সরকারি খাতে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা হল প্রথম বিবেচ্য এবং দ্বিতীয় বিবেচ্য হল সরকারি করনীতি ও ব্যয় ব্যবস্থায় বেসরকারি ক্ষেত্রে—অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দানের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সরকারি আয়-ব্যয়কে যদি চলতি খাতে ও মূলধনী খাতে এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয় তাহলে চলতি খাতে উদ্বৃত্ত হলে সেটাকে সরকারি সঞ্চয় বলে অভিহিত করা যায়। যদি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে সরকারের আয় হয় দশ হাজার কোটি টাকা এবং চলতি খাতে ব্যয় হয় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা, তাহলে উদ্বৃত্ত পাঁচশ কোটি টাকা সরকারের সঞ্চয়—অর্থাৎ সরকারের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয়। এই সঞ্চয়টাকে মূলধনী খাতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মূলধনী আয় যোগ দিলে যে টাকাটা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মূলধনী ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এই মূলধনী ব্যয়ের প্রধান অংশ হল আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পিতভাবে স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা। মূলধনী আয় আসে সরকারের কাছে জমা দেওয়া নানা রকমের টাকা থেকে—যেমন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা পোষ্ট অফিসের আমানত—এবং নূতন তোলা ঋণ থেকে। এর অনেকটাই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের হস্তান্তর। রাজস্ব খাতে বা চলতি খাতে উদ্বৃত্ত আজকাল খুব একটা হয় না। কিন্তু এবারে ৬৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে। আর সরকারের এবারকার মোট মূলধনী আয় ৬০১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩২৪৮ কোটি টাকা আসবে নানারকমের জমা থেকে, আর বাকি ২৭৬৬ কোটি টাকা তোলা হবে ঋণ করে—দেশের বাজার থেকে ১০০০ কোটি টাকা, বিদেশ থেকে ৮৯৪ কোটি টাকা, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে মোট ৮৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে। দেশের মধ্যে যে ঋণ তোলা হবে তার কতটা আসবে প্রকৃত সঞ্চয় থেকে আর কতটা

আসবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে (অর্থাৎ মুদ্রা-সম্প্রসারণ থেকে) সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

সরকারি খাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আর্থিক পরিমাণ কতটা তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় পরিকল্পনার জন্য ব্যয় থেকে। পরিকল্পনার ব্যয়ের বাইরেও সরকারি বিনিয়োগ হতে পারে—যেমন প্রতিরক্ষা বিভাগে। আবার পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যেও কিছুটা সাধারণ চলতি খরচ থাকতে পারে। তবু, এই পরিকল্পনা ব্যয় থেকেই সরকারি বিনিয়োগের সবচেয়ে সহজবোধ্য চিত্র পাওয়া যায়। এবারে, অর্থাৎ ১৯৭৭–৭৮-এ, কেন্দ্রীয় খাতে মোট পরিকল্পনা ব্যয় হবে ৫৭৯০ কোটি টাকা—রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র পরিকল্পনার জন্য যে সাহায্য দেবে সেটা ধরে নিয়ে। এ'ছাড়া রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের আয় থেকে আর্থিক পরিকল্পনার জন্য যা খরচ করবে সেটা ধরে নিলে মোট পরিকল্পনা ব্যয় গিয়ে দাঁড়াবে ৯৯৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। এর মধ্যে কৃষি, জলসেচ, সারপ্রকল্প ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য মোট ব্যয় হবে ৩০২৪ কোটি টাকা। রাস্তাঘাট, পানীয়-জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কুটির শিল্প ইত্যাদি সব দিকেই এবারে আগের বছরের চেয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটির দিকে তাকানো যেতে পারে। সরকারি আয়-ব্যয় নীতি, এবং বিশেষ করে করনীতি দিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান-গত সঞ্চয় বাড়াবার কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। জীবন-বীমা বা প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডে টাকা জমা দিলে আয়কর অনেকটা মকুব হয়। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট কিনলে বা দেশীয় কোম্পানির শেয়ার কিনলে তার থেকে যে আয় হয় তাতেও আয়কর অনেকটা ছাড় পাওয়া যায়। এবারে এদিক থেকে কোন নূতন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, কিন্তু যাদের আয় বছরে আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা তাদের আয়কর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই স্তরে আয়কর দাতাদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। এই ৮ লক্ষ লোক আগে আয়কর হিসাবে যে টাকাটা দিতেন তার সবটাই যদি সঞ্চয় করেন, তাহলে মোট সঞ্চয় বাড়বে প্রায় ১৬ কোটি টাকা, কিন্তু যে টাকাটা বাঁচবে তার সবটাই সঞ্চিত হবে এটা আশা করা অন্যায় হবে। অন্যদিকে, যাদের আয় দশ হাজারের বেশি তাদের উপরে আয়কর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তাদের সঞ্চয় কমবে, তবে আবশ্যিক জমা প্রকল্পে যে টাকাটা তারা দেবে সেটাও সঞ্চয়। এই জমার একটা অংশ এবারে ফেরৎ আসছে, সেটা আবার সঞ্চিত হবে না ব্যয়িত হবে বলা কঠিন। মোটের উপরে বলা যায় যে এবারকার বাজেটে বেসরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য নূতন ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে, বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াবার জন্য কিছু নূতন ব্যবস্থা বাজেটে নেওয়া হয়েছে। আগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন বিনিয়োগ করলে আয়করের সুবিধা দেওয়া হত। এবারে এই সুবিধা প্রসারিত করে সব রকমের শিল্পেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কেবল তালিকাভুক্ত ৩৪ টি শিল্প বাদে। যেসব শিল্প এসব সুবিধা পাবে না, তাদের মধ্যে আছে কিছু বিলাস দ্রব্য (যেমন মদ, সিগারেট, প্রসাধনের জিনিস ইত্যাদি) এবং এমন আরো কয়েকটি শিল্প যেখানে এজাতীয় সুবিধার কোন প্রয়োজন নেই। কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প যাতে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত নূতন ক্ষুদ্রশিল্পকে আয়করের কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। ভারতে উদ্ভাবিত কারিগরির পদ্ধতি ব্যবহার করলেও আয় কর কমানো হবে। যদি কোন সুপরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো 'রুগ্ন' শিল্পকে নিজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেয়, তাহলেও আয়করের সুবিধা পাওয়া যাবে। 'মূলধনী লাভ'-এর ক্ষেত্রে করমকুবের সুবিধা আগে পাওয়া যেত শুধু বসত বাড়ি বিক্রির লাভের বেলাতে—এবারে সে সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে অন্য সম্পদের ক্ষেত্রেও। আশা করা যায় যে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তার কিছুটা যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিযুক্ত হবে। সম্ভবত এই টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা হবে। তাতেও বিনিয়োগেরই উপকার।

অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে—যেমন কোন কোন ধরণের সূতো বা দেশলাই। যেক্ষেত্রে নূতন ট্যাক্স বসানো হয়েছে সেখানেও ক্ষুদ্র শিল্পকে অনেকটা অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সবশুদ্ধ বলা যায় যে এবারকার বাজেটের মূলনীতি হল ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দান, বিশেষ করে সেই ক্ষুদ্রশিল্প যদি গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়। এই নীতি আজকাল প্রায় সকলে বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতের দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অভাবের সমস্যা দূর করতে হলে বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারণের জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এবারকার বাজেটে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা শক্ত। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা, বা বেসরকারি বিনিয়োগের মূল সমস্যা সমাধান করতে হলে করনীতি ছাড়াও অন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সে সব ব্যবস্থা কী হবে সেটা নূতন পরিকল্পনা নীতিতে স্থির হবে। এ বছরের বাজেট নূতন সরকার মাত্র তিনমাস সময়ের মধ্যে তৈরি করেছেন, অতএব এর মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন থাকবে এটা আশা করা অসঙ্গত। আগামী কয়েক মাসে নূতন পরিকল্পনা কমিশন আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক উন্নতির কর্মপন্থা কী রকম হবে তার একটা খসড়া তৈরি করতে পারবেন নিশ্চয়ই। এবং তখন সময় আসবে নূতন করনীতি এমন ভাবে তৈরি করবার, যাতে সম্ভাব্য সব উপায়ে সঞ্চয় বাড়ানো যায় এবং দেশব্যাপী কৃষি ও শিল্পোন্নতি, কর্মসংস্থান ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণের পথে বিনিয়োগকে চালিত করা যায়।

অমর নাথ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট কতটা জনতা-বাজেট

প্রশ্নটার মধ্যে কতখানি কৌতূহল আর আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব রয়েছে তা আমার জানা নেই তবে কেন্দ্রে সমাসীন জনতা সরকারের বাজেট নিঃসন্দেহে কিছুটা চমকের সৃষ্টি করেছে। জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ ছিল সেগুলি বহুলাংশে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে এবারের এই কৃষি উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় বাজেটে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উপরে যে পরিমাণ ঝোঁক দেওয়া হয়েছে বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবারের বাজেটে মধ্য ও উচ্চ আয়, সম্পন্ন ব্যক্তিদের যতটা হতাশ হতে হয়েছে ততটা সুবিধা মিলে গেছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের যাঁদের মাসমাইনের ঊর্দ্ধসীমা মোটামুটিভাবে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। আর একটা সুবিধে, পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের নানাবিধ প্রকল্পে বিশেষত কৃষি আর সেচ, রাস্তাঘাট আর পানীয় জল, প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস মিলেছে। এবারে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রচলিত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বহাল উৎপাদন শুল্কের উপরে অতিরিক্ত ১ শতাংশ বৃদ্ধি, এর পেছনে সতর্কতার আভাস পাওয়া যায়।

বস্তুত মুদ্রাস্ফীতি কবলিত ও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর ভারে প্রপীড়িত আর্থিক কাঠামোয় নতুন করের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ একান্তই সীমাবদ্ধ। তবুও এবারের বাজেটে দুটো আপাত বৈশিষ্ট্য হ'ল, প্রথমত সামগ্রিক করের পরিসরে সম্ভাব্য সংকোচন। আর দ্বিতীয়ত ঘাটতি ব্যয়ের মাত্রা ন্যূনতম পর্য্যায়ে সীমিত করা। আগামী আর্থিক বছরে সংগ্রহযোগ্য কর আদায়ের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ হ'ল ১৩০ কোটি টাকা। আর ঘাটতি ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হ'ল ৯২ কোটি টাকা আর পরোক্ষ কর হ'ল ৫৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেই শুধু বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটানো হয়েছে। নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা বাৎসরিক ৮০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে, আর সেইসঙ্গে কোম্পানিগুলির আয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল কোম্পানিগুলির সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনমুখী বিনি-য়োগের জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নে গতিবেগ সৃষ্টি করা। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সামান্যই হেরফের ঘটানো হয়েছে। তাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যস্তরে করজনিত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটে।

কৃষি উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসার ঘটে আর সেইসঙ্গে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে গ্রামাঞ্চলে কর্ম-সংস্থান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী হ'ল শিল্পগত মন্দা ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। এই অবস্থার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করে বেশ কয়েকবারই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্টে ও বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রসার ঘটে। আর এজন্যই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের গুরুত্ব খুবই বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে আর্থিক বিনিয়োগে নানারকম সুবিধা প্রদান করে একটা অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন।

উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়ে গিয়েছে। চিরাচরিত ধারায় আর্থিক ও রাজস্বগত অনুদান বা মঞ্জুরি মারফত সুযোগ সুবিধে শিল্পে কেন দেওয়া হয়নি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে গতানুগতিক বা মামুলি প্রথায় শিল্পে কোনও প্রকার সাহায্য ফলপ্রসূ হবেনা। বিগত কয়েকবছরের ইতিহাস তাঁর এই যুক্তি প্রমাণ করছে। কিন্তু তার জন্য শিল্পকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্পের (Investment Allowance Scheme) সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি দাবী পূরণ করেছেন। শুধুমাত্র ৩৪-টি স্বল্প-গুরুত্বসম্পন্ন শিল্প ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শিল্পে প্রচলিত ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্প কার্যকর হওয়ায় একটা প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী দেশের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলিতে এক বছরে

মোট ২১৩ কোটি টাকার মত নতুন বিনিয়োগ ও মূলধন সম্প্রসারণ ঘটবে।

শিল্পক্ষেত্রে আরও কতকগুলি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তবে সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই সুবিধে মিলবে। রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুবিধে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ইউনিট যদি চালু ইউনিটগুলির সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তি ঘটায় তবে সেক্ষেত্রে রুগ্ন শিল্পের সঞ্চিত ক্ষতির তহবিল চালু সংস্থার মুনাফার সঙ্গে সমীকরণ করা যাবে। আর একটি সুবিধে হ'ল যে, কোন কোম্পানি যদি স্বীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে লগ্নীব্যয় করে তবে সরকার তাকে করযোগ্য মুনাফায় কিছুটা রেহাই অনুমোদন করবেন।

বর্তমান বাজেটে আশু সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও সুষ্ঠু উন্নয়নের একটা পথনির্দেশ করা হয়েছে। ফলে বর্তমান-কালের বার্ষিক ১২.৫ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের তাগিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের জন্য সম্ভাব্য পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ও সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সাধনে অর্থমন্ত্রীর প্রধান সহায়ক দুটি শক্তি হ'ল বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ও খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার। বিদেশী মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল থেকে ৮০০ কোটি টাকায় ঋণ নেওয়ার ফলে ঘাটতি ব্যয়ের সীমা সংকুচিত করা সম্ভব হয়েছে। আর সেইসঙ্গে খাদ্যসংগ্রহ অভিযানে সরকারী অর্থব্যয়ে বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, রাজস্ব ব্যয় ও দেশরক্ষা খাতে অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করে ও উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির যথাযথ বিন্যাস ও চালু প্রকল্পগুলির রূপায়ণে একটা গতিসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন।

তবে প্রত্যেক বাজেটের মত এবারের বাজেটও কিছু দুর্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-সংস্থাগুলি উৎপাদনক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে অনেকগুলি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা সৃষ্টি করা দরকার। আগামী বছরে পরিকল্পনা ব্যয় ২৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৯,৯৪৭ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির দরুণ এর প্রকৃত পরিমাণ বেশ কিছুটা কমে যাবে। তাছাড়া শিল্প হ'ল অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত ক্ষেত্র যেখানে অর্থনৈতিক গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারে। অনেকের মতে শিল্পে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দিয়ে কৃষির উপর সহসা গুরুত্ব প্রদান করায় জাতীয় উৎপাদন ক্রম-ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্যের অভাব দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

ঘাটতি ব্যয় প্রসঙ্গে আর একটি দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় থেকে ৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা করা হবে তার সুস্পষ্ট কোনও হদিস নেই। যদি তা মামুলি সরকারী ঋণ পত্রের (Ad-hoc Securities) মাধ্যমে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে নোট ছাপানোরই নামান্তর। তবে এটুকু মাত্র আভাস মিলেছে যে এক বিশেষ সিকিউরিটির মাধ্যমে এই টাকা তোলা হবে। কিন্তু তাহলেও মুদ্রাস্ফীতির সমূহ সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায়না। তবে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখবার একটাই পথ এক্ষেত্রে খোলা রয়েছে। ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রার সমমূল্যে যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তাহলে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ না বেড়ে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

মোটের উপর বাজেটের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে যে চিত্রটি সুস্পষ্ট হয় তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে একটি সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে করের হেরফের ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী একটি সুসংবদ্ধ অথচ উন্নয়নমূলক বাজেট সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অল্পবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের রেহাই দান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুতপক্ষে অর্থমন্ত্রী একটি পুনর্বণ্টনমূলক করবিন্যাস প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সর্বাধিক রাজস্ব (৯২ কোটি) প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করছেন। যেসঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়স্তরের বৈষম্য হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষির উপরে বাজেটের গুরুত্ব জনতা সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর নবরূপায়ণ নির্দেশ করে। বিশেষত এই পথে কৃষিই হবে ভাবী অর্থনীতির উন্নতির পরিমাপক ও উন্নতি বিধায়ক। আর শিল্প তার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

রুমমেট

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ও অবহেলার গ্লানি কুড়োতে পারিনা আর।

কিন্তু রুমের দরজার কাছে এসেই চিন্তাধারা থেমে গেল। দরজা ভেজানো, অর্থাৎ শকুন্তলা রুমেই আছে। ওর কথা মনে হ'তেই রক্ত হিম হয়ে এলো যেন। ক করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো সেইটাই সিব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ও যদি জানতে পারে? তখনি আবার মনে হ'ল, জানলোই বা, লুকোচুরির কিই বা আছে এতে? আজকেই বলবো ওকে সব কথা। জানিয়ে দেবো শোভন চলে গেছে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মত।

একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। দেখি শকুন্তলা বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "কুন্তী কি হয়েছে রে?" চমকে মুখ তুলে তাকালো শকুন্তলা। হঠাৎ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। হুড়মুড় করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর আমি প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাতে চেপে ধরলাম টেবিলটাকে। মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ—দেয়ালগুলো চোখের সামনে দুলছে।

শকুন্তলার বিছানার উপর শোভনের ফটো। ফটোর কাঁচে তখনো টল টল করছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে ২৪ জুন, শুক্রবার ১৯৭৭ সাল। এপ্রিল মাসে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সপ্তম বিধানসভা ভেঙ্গে দেন। মে মাসে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন বিধান সভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ ও ১৪ জুন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সমাধা হয়। এই নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা ও কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে সি-পি-আই(এম)-এর নেতৃত্বে ছয়দলের বামফ্রণ্ট নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ২১ জুন সি-পি-আই(এম)-এর নেতা জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ২২ জুন আরও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলে পশ্চিমবঙ্গে ২২ জনের মন্ত্রিসভায় বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে রাজ্যের সপ্তম বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে ২১৬ টিতে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছিলেন। সেবার সব দল মিলিয়ে ও নির্দলদের নিয়ে মোট প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ছিল ৮৩৩ জন, ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭,৯৪৬ টি। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে অষ্টম বিধানসভার এই যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে মোট ২৯৪ টি আসনের জন্য (লক্ষ্যণীয়, ১৪ টি আসন বেড়েছে), নির্দল প্রার্থীদের ধরে মোট প্রার্থী ছিলেন ১,৫৭১ জন। ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৯,০৬২। এবার একটি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হয়নি। পুরুলিয়া জেলার আরসা কেন্দ্রে জনতা দলের প্রার্থীর নির্বাচনের ঠিক আগেই মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ওই কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রেখেছেন। সুতরাং ১৯৭২ সালের ২৮০ জন সদস্যের তুলনায় এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট ২৯৪ জন সদস্যের মধ্যে ২৯৩ জনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যখন এপ্রিল মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখন মোট ২৮০ জনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১৬, সি পি আই-এর ৩৫, আর এস পি-র ৩, সংগঠন কংগ্রেস ২ গোর্খা লীগ ২, এবং নির্দল ৫। যদিও সি পি আই (এম) ১৪ টি আসনে, এবং এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স পার্টি ১ টি করে আসনে জয়লাভ করেছিলেন, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে এই সদস্যরা বিধানসভা বর্জন করেছিলেন। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস ও জনতা দল উভয়েই ২৯৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সি পি আই (এম) দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট), আর সি পি আই ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে একটি বামফ্রণ্ট গঠন করেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে সি পি আই (এম) প্রার্থী দেন ২২৪ টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩৬ টিতে, আর এস পি ২৩, ফরওয়ার্ড ব্লক (মাঃ) ৪, আর সি পি আই ৩ ও বি বা কং ৩টি আসনে। যদিও ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে তারপর চারটি নির্বাচনে হয় সি পি আই দল অপর কোন বামফ্রণ্ট কিংবা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে আসন ভাগাভাগি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন, এবার এঁরা

শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন

একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন ; সি পি আই প্রার্থী দিয়েছিলেন ৬২ টি আসনে। তেমনি এস ইউসিও এবার কোন বামফ্রণ্টে যোগ না দিয়ে নিজেরা ২৩টি আসনে লড়াই করেছেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে অপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় নকশাল-পন্থী বলে পরিচিত সি পি আই (এম-এল)-এর একটি গোষ্ঠীর নির্বাচনের লড়াই-এ সামিল হওয়া। নকশাল নেতা শ্রী সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থা ঘোষণা করেন এবং এঁদের তিনজন নেতা নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এঁরা তিন জনই মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রী সন্তোষ রানা গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। অপর দুজন অবশ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সর্বভারতীয় সি এফ ডি দল জনতা দলের সঙ্গে মিশে গেলেও অপর কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও সি এফ ডি-র কিছু বিক্ষুব্ধ সদস্য আলাদা ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রায় ১৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে মাত্র একজন—শ্রী আবদুল করিম চৌধুরী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এবার মোট চার জন নির্দল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে একজন সি পি-আই (এম) সমর্থিত।

ছয় পার্টির বামফ্রণ্ট এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এসেছেন। ১৯৭২-এর বিধানসভায় যদিও ২৮০ জনের মধ্যে ২১৬জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেসও বিপুল সংখ্যাধিক্যের সমর্থন লাভ করেছিলেন, এবারকার বামফ্রণ্টের গণসমর্থন তার চেয়েও বিরাট—সর্বকালের রেকর্ড। বামফ্রণ্টের মোট সদস্যর সংখ্যা ২৩০, এঁদের মধ্যে সি পি আই (এম)-এর ১৭৮ (একজন সমর্থিত নির্দলকে নিয়ে), ফ: ব্লু:এর-২৫, আর এস পি-র ২০, ফ: ব্লু: মা: ও আর সি পি আই ৩ জন করে এবং বি বা কং ১ জন সদস্য। জনতা দল পেয়েছেন ২৯ জন সদস্য। কংগ্রেস ২০ জন। সি পি আই মাত্র ২ জন। অন্যান্য দলের হিসাব: এস ইউ সির ৪, গোর্খা লীগ ২, সি পি আই (এম-এল), মুসলীম লীগ ও সি এফ ডি ১ জন করে এবং নির্দল ৩ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বামফ্রণ্ট ২৩০টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করার পর বিধানসভায় বিরোধী পক্ষে মোট মাত্র ৬৩ জন সদস্য থাকলেন। গরিষ্ঠ বিরোধী দল হিসাবে জনতা দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কাশীকান্ত মৈত্র। কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা হয়েছেন ডা: জয়নাল আবেদিন।

এবার মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ভোট বিধিসম্মত ভাবে দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন গণ্য করেছেন। এই মোট বিধিসম্মত ভোটের মধ্যে একক বৃহত্তম দল সি পি আই (এম) পেয়েছেন ৫১ লক্ষ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৩৬ ভাগ, যদিও ১৭৮ জন প্রার্থী (বিধানসভার মোট নির্বাচিত ২৯৩ জনের শতকরা ৬১ ভাগ) নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। বামফ্রন্টের অপর পাঁচটি দল একত্রে ৫২টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন, এই দল কটির মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ১১ ভাগ।

জনতা দলের প্রার্থীগণ মোট ২৮ লক্ষের কিছু বেশী ভোট অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২০ ভাগের কিছু বেশী পেয়েছেন, এই দলের বিজয়ী সদস্যের সংখ্যা ২৯ হওয়ায় দল বিধানসভার মোট আসনের শতকরা দশটিও লাভ করতে পারেন নি। কংগ্রেস দল পেয়েছেন ৩২ লক্ষ ভোট এবং মাত্র ২০টি আসন। অর্থাৎ বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২২½ ভাগ ভোট পেলেও আসনের হিসাবে সে-সমর্থন প্রতিফলিত হয় নি। জেলার হিসাব বিচার করলে দেখা যাবে জনতা প্রার্থীগণ কুচবিহার, ২৪ পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ বর্ধমান, বীরভূম ও পুরুলিয়া এই কটি জেলায় একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেন নি। তেমনি কংগ্রেস কোন আসন পাননি কলকাতা, হাওড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বাঁকুড়া ও হুগলী প্রভৃতি সাতটি জেলায়। জনতা দল সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছেন—১৭ টির মধ্যে ১৭—মেদিনীপুর জেলায়, আর কংগ্রেস পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী—১৯ টির মধ্যে ছ টি—মুর্শিদাবাদে।

সকলেই জানেন জনতা দল নবাগত-হলেও এই দলের সর্বভারতীয় প্রাধান্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে এই দলের পরিক্রমন অনুসন্ধিৎসার বিষয়। তেমনি, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি আই (এম) ও কংগ্রেসের উত্থান-পতন কৌতূহলী পাঠক মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন, সন্দেহ নেই। যদিও অতীতের হিসাব থেকে জনতা দলের কোন চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় তথাপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিবরণ থেকে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। এই সংকলন ১৯৬৭ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করা হয়েছে কারণ ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত সি পি আই ভাগ হবার আগে পৃথক দল হিসাবে সি পি আই (এম)-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মোটামুটি হিসাবে সি পি আই এবং আরও কয়েকটি দলের উল্লেখও করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ২২ জন সদস্যের মন্ত্রিসভায় —সি পি আই (এম)-এর ১৪ জন, ফরওয়ার্ড ব্লকের চার, আর এস পি-র ৩ ও আর সি পি আই-এর ১ জন। সি পি আই (এম)-এর শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী। ৯৬৭ ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল—দুবারই সি পি আই (এম)-এর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে অন্য বেশ কয়েকটি দল যুক্ত হয়েছিল। দুবারই শ্রী বসু উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর এই বর্তমান

মন্ত্রিসভাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দশবার সরকারের বদল হল। বর্তমান বিধানসভা তথা নতুন সরকারের কথা বলতে হলে বোধ হয় ঐতিহাসিক বর্ণনার খাতিরে আগের সরকারগুলির উল্লেখও প্রয়োজন:

১। মার্চ ১৯৬৭—নভেম্বর ১৯৬৭ প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার।
২। নভেম্বর ১৯৬৭—জানুয়ারী ১৯৬৮ পি. ডি. এফ. সরকার।
৩। জানুয়ারী ১৯৬৮—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রাষ্ট্রপতি শাসন।
৪। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭০ দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার
৫। এপ্রিল ১৯৭০—মার্চ ১৯৭১ রাষ্ট্রপতির শাসন।
৬। মার্চ ১৯৭১—এপ্রিল ১৯৭১ অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সরকার
৭। এপ্রিল ১৯৭১—মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির শাসন।
৮। মার্চ ১৯৭২—এপ্রিল ১৯৭৭ কংগ্রেস সরকার।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জনৈক ভোটদাতা ভোট প্রয়োগ করছেন

৯। এপ্রিল ১৯৭৭—জুন ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতির শাসন।
১০। জুন ১৯৭৭— বামফ্রণ্ট সরকার

গত দশ বছরে দশবার সরকার পরিবর্তন কী সূচীত করে? বাঙ্গালীর চপলচিত্ততা? নাকি, সমস্যাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা? রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙ্গালী অস্থির কারণ সে অধীর আগ্রহে এমন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা চাইছে যা তাকে শুধু সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি দেবে তাই নয়, আরও বেশী করে দেবে স্বাধীনতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষায় নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার নিরঙ্কুশ সুযোগ।

দল	১৯৬৭		১৯৬৯		১৯৭১		১৯৭২		১৯৭৭	
	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)
কংগ্রেস	৪১	১২৭ (২৮০)	৪০	৫৫ (২৮০)	৩০	১০৫ (২৮০)	৪৯	২১৬ (২৮০)	২২.৫	২০ (২৯৩)
সি পি আই (এম)	১৮	৪৩ (১৩৫)	২০	৮০ (৯৭)	৩৪	১১৩ (২৩৮)	২৮	১৪ (২০৮)	৩৬	১৭৮ (২২৪)
সি পি আই	৭	১৬	৭	৩০	৯	১৩	৮	৩৫	--	২
ফঃ বঃ	৪	১৩	৫	২১	৪	৩	১	০	--	২৫
আর এস পি	২	৬	৩	১২	২	৩	২	৩	--	২০
এস ইউ সি	০.৭	৪	১.৫	৭	২	৭	১	০	--	৪
কংগ্রেস (সং)	—	—	—	—	৬	২	১	২	--	—

পল্লীউন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

জ্বালানীর ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, যোজনায় পেট্রোলিয়ামের জন্য বরাদ্দের হিসেব গত বছরের ৪৮৫ কোটি টাকাকে আরো বাড়িয়ে এ বছর ৬৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপকূল-ভাগ ও স্থলভাগ অনুসন্ধান চালানোর জন্য তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে ৪৫১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সম্প্রতি বোম্বাই হাই ও বেসিন ক্ষেত্রে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টনে পৌঁছাবে আশা করা যায়। গত বছর উৎপাদিত হয়েছিল ৮৮৯ লক্ষ টন।

২০০ মেগাওয়াটের একটি নতুন লিগনাইট-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য নাভেলি লিগনাইট করপোরেশনকে দেওয়া হবে ৫ কোটি টাকা। তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎঘাটতির কথা বিবেচনা করে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৬৫১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩৩২ কোটি টাকা রেল পাবে। রেলের বাজেট বরাদ্দ হল ৪৮০ কোটি টাকা।

গ্রামাঞ্চলে আরো বেশী সংখ্যক ডাকঘর চালু করা, এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সুযোগসুবিধা প্রচলনের জন্য অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সুপরিচালনার ফলে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলি যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য যোজনায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে ৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পরে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ হতে পারে। ঐসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। তাঁত শিল্পের জন্য ২০ কোটি এবং রেশম চাষের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

সময় সংক্ষেপ এবং চালু প্রকল্পগুলিতে প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ অব্যাহত রাখার দরুণ 'আমাদের ঘোষিত নীতি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো সম্ভব হয়নি বলে শ্রী প্যাটেল সংসদে মন্তব্য করেন। এছাড়া সম্প্রতি পুনর্গঠিত যোজনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে উঠতে পারেননি বলেও তিনি জানান। শ্রী প্যাটেল বলেছেন, দলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে পল্লী উন্নয়ন, হরিজন, আদিবাসী ও অন্যান্য অবহেলিত শ্রেণীগুলির অবস্থার উন্নতি, বেকারী দূরীকরণ, এবং ঝিক্সি-বস্তী অপসারণ সহ অন্যান্য সমাজ সেবার প্রসারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তিনি এমন একটি বাজেট রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যাতে দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের দর্শন, কর্মসূচী ও নীতিগুলির যথার্থ প্রতিফলন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নতির জন্য শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ, সেচ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের উন্নতির জন্য শতকরা ৫.৪ ভাগ, পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদির জন্য শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ব্যয় নির্ধারিত করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত ব্যয়-তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে আনুপাতিক হারে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে, আর এই ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সংকুচিত করা হচ্ছে শিল্প (বিশেষ করে রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য, লৌহেতর খনিজ এবং পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল শিল্প) এবং সমাজকল্যাণ (বিশেষত পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা) বিষয়ক ব্যয়বরাদ্দকে। বর্তমান বাজেটে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ (৩,৪৩১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা)। কিন্তু এর চেয়েও বেশী হারে ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন, গ্রামীণ পানীয় জলের সংস্থান, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, নগর উন্নয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা, ভূমিসংরক্ষণ, পশুপালনশিল্প, মৎস্যচাষ, বনসংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, পেট্রোলিয়াম উত্তোলন, ঔষধ প্রস্তুতকারক শিল্পের বিকাশ, ইলেকট্রনিক্স্, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিমান পরিবহন ইত্যাদি।

প্রদত্ত তালিকা থেকে অনুমান করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের এই বৎসরের পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের দিক থেকে নজর খানিকটা সরিয়ে এনে চালকা শিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষি, সেচ, বনভূমি ও জলাধারের উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের মানুষের জীবিকার পথকেও সুগম করার চেষ্টা রয়েছে এই নূতন ব্যবস্থায়। দেশের স্বয়ংম্ভরতা বাড়াবার জন্য পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশাগত পেট্রোলিয়ামের উপর একান্ত নির্ভরশীল রাসায়নিক শিল্পগুলির বিস্তারে সরকারী আগ্রহ বেশ খানিকটা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ানো এবং সেই ব্যয়কে নূতনতর খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টাই বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলে সাধারণ মানুষের বেকারি ও আর্থিক দুর্গতি হ্রাস পাবে এবং দেশে বিদ্যুৎ ও তেলের ঘাটতি কিছু পরিমাণে মিটবে বলে আশা করা যায়। তবে একটি মাত্র বাজেটের সাহায্যে দেশের আর্থিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হবে এমন আশা সরকারী মহলও নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। পরিবর্তনের দিকে সামান্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপকেই আপাতত যথেষ্ট বলে ভাবা উচিত।

অমলেন্দু রায়চৌধুরী

আপনার আয়কর কত দাঁড়াল

জনতা সরকারের প্রথম বাজেটে আয়কর রেহাইয়ের সীমা আট হাজার থেকে বেড়ে দশ হাজার টাকায় দাঁড়াল। কিন্তু যে সমস্ত করদাতার করযোগ্য আয় দশহাজার টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে আট হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের সবটাতেই ১৯৭৬-৭৭ সালের করহার অনুযায়ী কর ধার্য্য করা হবে। যাদের বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকার সামান্য বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিছু প্রান্তিক (Marginal) সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কোম্পানীগুলি বাদে অন্যান্য সকল শ্রেণীর আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জ দশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পনের শতাংশ করা হয়েছে। পনের হাজার টাকার অধিক আয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিক জমা আরো দু বছর চালু থাকবে।

বার্ষিক দশ হাজার টাকার বেশি আয় না হলে আয়কর দিতে হচ্ছে না। কিন্তু আয় দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলেও নানা রকম ছাড় আছে যেমন দশ হাজার টাকা আয়ের বেতনভুক কর্মচারীরা যাতায়াত, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ কুড়ি শতাংশ হারে ছাড় পাবেন। আয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলে পরবর্তী ধাপের আয়ের জন্য এটা হবে শতকরা দশভাগ। এই বাবদ যে রেহাই পাওয়া যাবে তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ অবশ্য ৩৫০০ টাকা। এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়া ভাতাকে বেতনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে না। বাড়ীভাড়া ভাতাও আয়কর থেকে ছাড় পাওয়া যায়। মালিক পক্ষ যদি কোথাও তার কর্মচারী বা অফিসারকে মোটর গাড়ী বা স্কুটার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেন তাহলে সেই কর্মচারী বা অফিসার এই বাবদ এক হাজার টাকার বেশি রেহাই পাবেন না।

যারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, জীবন-বীমা, ডাকঘরের দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা বা ইউনিট ট্রাষ্টের জীবন বীমায় টাকা জমান তাদের জমার প্রথম চারহাজার টাকায় কোন আয়কর দিতে হবে না। তার সমগ্র আয় থেকে এই টাকাটা বাদ দিয়ে বাকী টাকার উপর আয়কর ধার্য্য করা হবে। এ বিষয়ে নিয়ম হল পরবর্তী জমা ছ হাজার টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বাকী জমানো টাকার শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া যাবে। কিন্তু তাই আয়করের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বেতনের সব টাকা জমানো চলবে না। মোট বেতনের (বেতন থেকে যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ যে ছাড় পাওয়া যায় তা বাদ দিয়ে যেটা থাকে) শতকরা ৩০ ভাগের বেশি জমানো টাকা কর রেহাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ আয়করদাতা আছেন। জনতা সরকারের বাজেটে কর রেহাইয়ের সীমা দুহাজার টাকা বর্দ্ধিত হওয়ায় ৮ লক্ষ ২৩ হাজার আয়করদাতা এখন আয়করের আওতার বাইরে চলে গেলেন।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী করহার ওয়াংচু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিয়ে ৬৬ শতাংশ করে দিলেন। জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সারচার্জ পাঁচ শতাংশ বাড়ানোতে করহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে দাঁড়াল ৬৯ শতাংশ।

প্রথম জনতা বাজেটে ১০,৫৫০ টাকার বেশি আয়কারী ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে করের বর্তমান ও নূতন হার অনুযায়ী নিচে দেওয়া হল:—

(টাকার হিসাবে) আয়	আয়কর (দশ শতাংশ সারচার্জ সহ বর্তমান হারে)	আয়কর (প্রস্তাবিত পনের শতাংশ সারচার্জ সহ)	করবৃদ্ধি +
১০,০০০	৩৩০	নাই	—
১০,৫০০	৩৮৩	৩৮৫	+ ২
১১,০০০	৪৯৫	৫১৮	+ ২৩
১২,০০০	৬৬০	৬৯০	+ ৩০
১২,৫০০	৭৪৩	৭৭৬	+ ৩৩
১৫,০০০	১,১৫৫	১,২০৮	+ ৫৩
২০,০০০	২,১৪৫	২,২৪৩	+ ৯৮
২৫,০০০	৩,৫২০	৩,৬৮০	+ ১৬০
৪০,০০০	৯,৫৭০	১০,০০৫	+ ৪৩৫
৫০,০০০	১৩,৯৭০	১৪,৬০৫	+ ৬৩৫

এই তালিকা থেকে পঞ্চাশ হা টাকা পর্যন্ত আয়ের ব্যক্তিদের কর বৃদ্ধি কতটা তা বোঝা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোররজী দেশাইকে একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, দশহাজার টাকা পর্যন্ত আয় আয়করমুক্ত রাখা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেছেন যে তিনি ইচ্ছে করলে এটা চার হাজার টাকায় নামিয়ে আনতে পারতেন। ব্যাপারটা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাৎসরিক ১৬,৯৪৪ টাকা আয়েও এক পয়সা আয়কর না দিয়ে পারা যাবে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করুন মাসিক ৯০০ টাকার মূল বেতনের একজন কর্মচারীর বার্ষিক আয় নিম্নরূপ:—

বেতন	১০,৮০০ টাকা
বাড়ীভাড়া ভাতা	১,৬২০ টাকা
শহর ক্ষতিপূরণ ভাতা	৬৪৮ টাকা
মাগ্‌গী ভাতা	৩,৮৭৬ টাকা
মোট	১৬,৯৪৪ টাকা

এবারের বাজেট অনুযায়ী আয় দশ হাজার টাকা ছাড়ালেই আয়কর দিতে হবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের আয় ১৬,৯৪৪ টাকা হলেও তিনি এক পয়সাও আয়কর না দিয়ে পারেন। তাঁকে অবশ্য সঞ্চয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক:

	মোট আয়	১৬,৯৪৪ টাকা
(ক)	বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ বাদ	১,৬২০ টাকা
		১৫,৩২৪ টাকা
	অফিস যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ বাদ— ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২০০০ টাকা	
(খ)	বাকী ৫,৩২৪ টাকার জন্য	৫২৩ টাকা
	মোট	২,৫২৩ টাকা

এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়াকে মোট আয় থেকে বাদ দিতে হয়।

(গ)	জীবনবীমা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ডাকঘরে দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় ইত্যাদি বাবদ বাদ	৩,০০০ টাকা
	ছোট ছাড়	৭,১৪৩ টাকা

ভদ্রলোকের আয়ের ১৬,৯৪৪ টাকা থেকে ৭,১৪৩ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ৯,৮০১ টাকা। যেহেতু এই টাকা ১০,০০০ টাকার কম অতএব তাকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হবে না।

এছাড়াও পূর্ব্ববর্তী বাজেটগুলিতে মধ্যবিত্তদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল—যেমন মাসিক এক হাজার টাকা আয়ের কর্মচারীদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তান কিংবা নির্ভরশীল ভাই বোনদের জন্য যে ব্যয় তাতে রেহাই দেওয়া—জনতা সরকারের বাজেটে এ সব সুযোগ সুবিধা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

স্বেচ্ছা ঘোষণা অনুযায়ী অনেকেই গোপন আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন, যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেন নি তাদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তাই কর ফাঁকি বন্ধের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কর ফাঁকি ধরা পড়লে জরিমানা হবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, ব্যাংকে রাখা টাকা আয়কর বিভাগ আটকে দিতে পারবেন এবং কারাবাসও করতে হবে। আইন ব্যাপারে আয়কর বিভাগকে অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়েছে। অপরদিকে আয়কর বিভাগকে এও দেখতে হবে সৎ আয়কর দাতারা কোন ভুল করে ফেললে তাদের যেন কোন হয়রানি না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বিভাগও চান করদাতারা যেন নিজেদের আয়ের রিটার্ণ ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পূরণ করে কর বিভাগে জমা দেন। অগ্রিম কর প্রদান করে, স্বনির্দ্ধারিত কর (Self assessment tax) ঠিক সময়ে জমা দিয়ে, হিসাব ঠিকমত রেখে (দুরকম খাতা নয়), করবিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর উল্লেখ করে করদাতারা আয়কর বিভাগকে সাহায্য করতে পারেন। এখন সব করদাতাকেই পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই নম্বর তাঁদের চিঠিপত্রে; রিটার্ণফর্মে এবং চালানে উল্লেখ করতে হবে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগে যেমন কনজিউমার নাম্বার দিতে হয়; আয়কর বিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে তেমনি পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর দিতে হবে।

নিজেদের হিসাব পত্রের খাতা যথাযথ ভাবে রাখাও করদাতাদের অবশ্য কর্তব্য। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, হিসাব-রক্ষক, শিল্প বিষয়ক পরামর্শদাতা, প্রভৃতির আয় যতই কম হোকনা কেন, হিসাব তাঁদের রাখতেই হবে। ব্যবসায় বা পেশায় নিযুক্ত প্রত্যেক করদাতা যাঁদের আয় বার্ষিক ২৫,০০০ টাকার উপরে বা ব্যবসায়ে বার্ষিক বিক্রয় আড়াই লাখ টাকার বেশি তাঁদেরও অবশ্যই হিসাব রাখতে হবে।

১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আয়কর আইনে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। তাতে হিসাব বহির্ভূত ব্যয়কে আয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যদি কোন আয়কর দাতা এমন কিছু ব্যয় করে থাকেন যে ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে এল সে সম্পর্কে আয়কর অফিসারের কাছে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে তিনি না পারেন তাহলে সেই ব্যয় তাঁর আয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে। আয়কর রিটার্ণ ফর্মের চতুর্থ অংশে এখন কর দাতাকে বাড়ীভাড়া, যাতায়াত, বিদ্যুৎ খরচ, ক্লাব এবং ভ্রমণ ও ছুটি কাটান সম্পর্কিত যাবতীয় খরচের হিসাব দিতে হবে।

আয়কর আইনকে ভালভাবে জেনে নিজের সঠিক আয়কর দিয়ে দিলে করদাতারা নির্ভীক ভাবে থাকতে পারেন—আয়কর বিভাগের কোন চিঠি পেলেই আর ভয়ে বক্ষ-কম্পন সুরু হয় না। অবশ্য এই আইন খুবই জটিল এবং তাই বর্তমান অর্থমন্ত্রী এইচ. এম. প্যাটেল এই আইনকে সরল করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আজকের প্রকল্প—যৌথ বীজতলা

কান্তিপদ ঘোষ

আবার এসেছে আষাঢ়। কাজল মেঘের কালো কোমল ছায়া, ঘনিয়ে আসছে থেকে থেকে। ঝর ঝর মুখর বাদল দিন। মাঠের পর মাঠ থৈ থৈ করছে বৃষ্টির জলে। কিন্তু আর একটা পরিচিত দৃশ্য এই দৃশ্যপটে নেই। সেটা হল টোকা মাথায় দিয়ে দলে দলে সকল কৃষকদের ধান রোয়ার ব্যস্ততা। কারণ সকলের চারা তৈরী হয়ে ওঠেনি। জলদি রোয়ার সুবিধাটুকু হাতছাড়া হয়ে গেল। এমন আর একটি ছবি। শরৎ শেষে হিমের পরশে শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অনেক অনেক ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে সে আসছে। কিন্তু মাঠে মাঠে তার আয়োজন কি সারা হয়েছে? কোথাও কিছু মাঠে চাষ পড়েছে, কোন মাঠে এখনও ধান তোলা হয়নি, কোন মাঠে ধানে কাস্তেই চলে নি। আবার কোন মাঠে এখনও ধানে জল দাঁড়িয়ে আছে। খরিফ মরশুমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধান রোয়ার ফলে শীতের ফসলও নাবি হতে লাগল। ফলে এই বাংলার স্বপ্ন স্বায়ী মূল্যবান শীতের অনেকটাই অপচয় হল। এই ক্ষতিগুলো কি এড়ান যায় না? হ্যাঁ যায়। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে আজকের প্রকল্প —যৌথ বীজতলা।

ধানের বীজতলার সাধারণ ছবি কি? আকাশের মুখ চেয়ে বা ক্যানেলের জলের ভরসা করে বর্ষা নামার সময় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ধারণা করে চাষীরা মাঠে বীজ ফেলেন। সাধারণত চাষীরা তাদের নিজের নিজের জমিতে নিজের প্রয়োজনীয় বীজটুকু ফেলেন। অধিকাংশ বীজতলাতেই সেচের বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে চারার উপযুক্ত বাড় অনেক সময়েই সময়মত হয় না। নাবি বৃষ্টিপাত, ক্যানেল বা সেচের জল পেতে বিলম্ব বা অন্যান্য নানাবিধ কারণ অনেক সময় ধান রোয়া বিলম্বিত করে। এই জন্য বর্ষা নামার ৮–১০ সপ্তাহ পরেও অনেক সময় ধান রুইতে দেখা যায়। এর ফলে যে ক্ষতিগুলির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হচ্ছে:—

(১) ফসল লাগানোর প্রকৃষ্ট সময়ের অপচয়।

(২) চারার বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের সম্যক বৃদ্ধি হয় না। বেশী পাশকাঠি বের হয় না এবং রোয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফুল এসে যায়।

(৩) রোগ ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে।

(৪) ফুল অবস্থায় বা পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

(৫ সেচের জলের অপচয় হয়।

(৬) পরবর্তী রবি ফসলও নাবি হয়ে যায়।

এই সব কারণগুলি মিলে খরিফ মরশুমে ধানের ফলন অনেক সময় যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই ক্ষতির হাত এড়িয়ে ফলন বৃদ্ধি এবং সেচের জলের সদ্‌ব্যবহারের জন্য কৃষক সমাজের সকলের যৌথ প্রয়াসে কম্যুনিটি নার্শারি বা যৌথ বীজতলার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। রোয়া শুরু হওয়ার যথেষ্ট আগে সেচের সুবিধা-যুক্ত একটি জায়গায় সকলে একসাথে নিবিড়ভাবে বীজতলা করুন। প্রতি গ্রামে পুকুর, কূপ বা নলকূপের কাছে রোয়ার প্রকৃষ্ট সময়ের বা ক্যানেলের জল পাওয়ার ৪–৬ সপ্তাহ আগে বীজ ফেলতে হবে। একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট অধিক ফলনশীল দু একটি জাতের বীজ ফেলুন। বহনের খরচা বা সময় কমানোর জন্যে যে মাঠে ধান রোয়া হবে তার কাছাকাছি বীজতলা তৈরী করুন। ধানের চারা বয়ে দূরে নিয়ে যেতে হলে রাস্তার ধারে বীজতলা করাই সুবিধাজনক। অনেক সময় ধানের চারা বয়ে বেশ কয়েক মাইলও নিয়ে যেতে দেখা যায়। যেহেতু বীজতলা বেশীদিন জমি আটকে রাখে না, যে কৃষকের জমিতে এই বীজতলা হবে তার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যৌথ বীজতলায় কৃষকেরা যেভাবে উপকৃত হবেন সেগুলি হচ্ছে—

(১) পূর্বে উল্লেখ করা ক্ষতিকারক সম্ভাবনা থেকে ফসল রক্ষা পাবে।

(২) ধানের জাত বাছাই করার ব্যাপারে কৃষকদের প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আসবে।

(৩) এক সাথে বীজ তৈরী হয়ে যাওয়ার ফলে সারা মাঠে একই সাথে আগেই রোয়া সারা হবে। ফলে ঠিক সময়ে পরবর্তী রবি ফসলের জমি তৈরী ও ফসল লাগানোর জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এবং বহু ফসলী চাষেরও প্রসার হবে।

(৪) ধান আগে ওঠার জন্য জল কম লাগে। ফলে একই জাত বা একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট কয়েকটি জাত ক্যানেল-সেচ

সেবিত এলাকায় এক মাঠে লাগালে শুধু যে রোয়া, সেচ ও সার দেওয়া. রোগ-পোকা দমনের, নিড়েন কাটা ও তোলার সুবিধে হবে তাই নয়, সেচের জলের সাশ্রয় হওয়ার ফলে আরও অনেক বেশী জমি রবি ফসলের আওতায় আনা যাবে। অসেচ এলাকাতেও আগে জমি খালি হওয়ার জন্য অনেক জায়গায় তৈল বীজ; ডাল শস্য ইত্যাদি করার জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকবে।

(৫) শস্যরক্ষার খরচা অনেক কম হয়। কারণ এক একর বীজতলায় ওষুধ দিলে প্রায় দশ একর মূল জমিতে রোয়া ধানে প্রাথমিক ওষুধ দেওয়ার কাজ হয়। বীজতলা একত্রে হওয়ার ফলেও মজুর ইত্যাদি খরচ কম লাগে। ফলনও বৃদ্ধি পায়।

(৬) অনেক সময় নাবি রোয়া ধান জলচাপা হওয়ার ফলে ভাল পাশ-কাঠি ছাড়ে না, গুছির সংখ্যাও কমে যায় এবং সারের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, যৌথ বীজতলা করে জলদি রুইতে পারলে এই ক্ষতিগুলি এড়ানো সম্ভব।

(৭) রোয়া দেরী হলে অনেক সময় তাড়াহুড়োর মাথায় জমিকে সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এই সব আগাছা, যা সহজেই বাড়বার ক্ষমতা রাখে, স্থান, আলো ও সারের ব্যাপারে ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু জলদি রোয়ার ফলে ধান তাড়াতাড়ি বেড়ে আগাছার ক্ষতি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সারেরও সদ্ব্যবহার করতে পারে।

(৮) জলদি রোয়ার যে স্বাভাবিক সুবিধা আছে তার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া যায়। আমাদের চাষীরা বলেন আষাঢ়ের রোয়া ধান 'চার পোয়া' হয় অর্থাৎ মরশুমের পুরো সময়টা ফসল পাওয়ার জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার গাছ পুরো পেতে পারে।

(৯) অধিক ফলন দেওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত এবং অন্যান্য নতুন জাতগুলির দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়। কারণ এই যৌথ প্রকল্পে এক সাথে অনেক চাষী অংশগ্রহণ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জনই এগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন।

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তাতে গমেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। উপযুক্ত জাতের অভাব ও অন্যান্য কারণে ধানের ফলনে ব্যাপক সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইদানীংকালের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিশীল ধানের জাতের আবিষ্কার, ধানে বিজ্ঞান-সম্মত সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধান চাষে অখ্যাত রাজ্যগুলির ধান্যোৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লাভ ইত্যাদি থেকে আশা করা যাচ্ছে 'ধান্য-বিপ্লব' শুরু হওয়ার প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করা গেছে। এই নতুন বিপ্লবে যৌথ বীজতলা বা কম্যানিটি নার্শারী বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নতুন বাজেটে কর প্রস্তাব

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মাঝারি সংবাদপত্র, দেশী পশম ইত্যাদির উপর।

এছাড়া ঢালাওভাবে ২ শতাংশ কর ধার্য হয়েছে সব জিনিষের উপর যেগুলি অন্যভাবে আবগারী শুল্কের আওতায় পড়েনা। এই শুল্কের হার আগের বাজেটে ছিল ১ শতাংশ এবং ঐ বাজেটেই এই শুল্ক প্রথম বসানো হয়। দেখা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী তাঁর পূর্ববর্ত্তীর পথই এক্ষেত্রে শুধু অনুসরণ করেছেন তাই নয় বরং তাঁর উপর আরও একটু এগিয়ে গেছেন। মনে হয় রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটা এত মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার ফলাফল বিশেষ খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। এমন ঢালাওভাবে আবগারী কর ধার্য করলে তা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সব জিনিষের দামকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং সে হার যত কম থাকে ততই বাঞ্ছনীয়।

সব মিলিয়ে প্রস্তাবিত করব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধি রোধে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত ব্যয়সংকোচ, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির কথা বললেও মোট ধার্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ গত বাজেটের চেয়ে বেশ অনেকটাই বেশী। ফলে নানাভাবে কর সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির একটা বড় কারণ আবগারী কর, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর। সেদিক থেকে নতুন বাজেট কোনও সুবিধার প্রতিশ্রুতি বহন করে না। এতে কাজ করার ছোট যন্ত্রপাতি বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কি করে বিলাস বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আওতায় পড়ে বোঝা যায় না। এদের মূল্যবৃদ্ধি মানেই অন্য অনেক জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি।

সবশেষে করব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল তার জটিলতা। একথা অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন কর ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে পূর্বে নিযুক্ত নানা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের উপর কি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা তিনি কিছুই জানান নি। যেভাবে ১০,০০০ টাকার উপর আয়করের প্রান্তিক ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে বা পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেভাবে যন্ত্র চালিত বস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে,—সেসবই এই জটিলতার উদাহরণ। এই ধরণের জটিলতার নানা নিদর্শন কর প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে। এতে করদাতারা বিভ্রান্ত হন। সরকারের রাজস্ব আদায়ের খরচ বাড়ে, আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণও আশানুরূপ হয় না। এই জটিলতা পরিহার না করতে পারলে কর-ব্যবস্থা নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আজকের নাটকে

আমরা সবাই 'জগন্নাথ'

'জগন্নাথ' ফাঁসির দড়ি গলায় নেবার আগে বলেছিল 'আমার পাশে বিপ্লবীরা থাকলে দাসবাবুকে আমিও মারতে পারতাম। পারবে, পারবে নন্দ ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে। থুস্‌!'

নাটকের চরম মুহূর্ত এটিই, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও গভীরতার নির্যাসটুকু বেরিয়ে এসেছে এই একটি সংলাপে। নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায় এমনি ছোট ছোট কিছু চিত্রকল্পে ও সংলাপে প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের মোড়কে আজকের, একবারে এই আজকের কয়েকটি শ্রেণীর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন 'জগন্নাথ' নাটকে একাডেমির মঞ্চে। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় চমকে উঠতে হয় মাঝে মাঝে, তার নিপুণ বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে বিস্ময় জাগে।

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'একটি শিশির বিন্দু' বা 'অমূল্য রতন' বিশেষণ দুটি নাটকের প্রধান চরিত্র 'জগন্নাথ'কে দেওয়া যায় অনায়াসেই, অবশ্যই বিনা কারণে নয়। নাট্যকার পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় (অনুপ্রেরণা : লু শুনের একটি ছোট গল্প) শ্রেণী পর্যায়ের একবারে শেষ ধাপটিতে নেমে এসে যাঁকে তাঁর এই নাটকের মধ্যমণি করলেন সে মেরুদণ্ডহীন হাবা-গোবা প্রতিবাদ করার ক্ষমতাহীন এক জনমজুর। সরল সাধাসিধেও বটে জগন্নাথ। ভালোবাসা এবং কর্মক্ষেত্র দু জায়গাতেই সে পাথরের মত নীরব, কিন্তু ভেতরে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আগুনে জ্বলন্ত। আমরা সবাই তো তাই।

এই জগন্নাথকে ঘিরে রয়েছে গাঁয়ের পুরুত ঠাকুর, যিনি জমিদারের মাস-মাইনের চাকর, যাঁর দেওয়া 'কিসব' খেয়ে মেয়ে নলিনীর 'ভর' হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর প্রতি এমন চরম আঘাত আর কেউ দিয়েছেন কি? আছে জমিদার দাসবাবু যাঁর কাছে 'মেয়েছেলে' মানেই উপভোগের বস্তু, আছেন বিপিনবাবু যিনি এইসব ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথদের চোখে 'আত্মার' ঠুলি পড়িয়ে ঘোরাতে চান, আছে গাঙ্গুলী মশাইয়ের মত দালাল, আর আছে বরুণের মত সহৃদয় বিপ্লবী, সশস্ত্র স্বাধীনতা বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী বটে কিন্তু বিপ্লবের আসল শক্তি এই সব 'জগন্নাথ'দের তাঁরা দলে নিতে চাননা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী তাঁরা। 'জগন্নাথ' বরুণদের কাছে ঘুমন্ত।

পাশাপাশি নন্দকে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। নন্দ জগন্নাথের মতই জন-মজুর। একই শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা, কিন্তু নন্দ হাবাগোবা নয়, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে তৎপর। তাই যে জগন্নাথকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়, বিপ্লবীদের দলে ভেড়ে। অবশ্য বিপ্লবীরা বলেন 'ওকে দলে নিতেই হোল'। আসলে জগন্নাথও নন্দ হতে পারত, সঠিক নেতৃত্ব পেলে গাঙ্গুলীমশাই-এর কাছ থেকে পূর্ণ মজুরী আদায় সে করত, বাল্য প্রেমিকা মনোরমাকে দাসবাবুর 'খাদ্য'হতে দিতনা জগন্নাথ। করতে পারত আরও কিছু।

কিন্তু তা আর হল কই! দেশের শতকরা নব্বুই জন নাগরিক রইল নেতৃত্বহীন, হালভাঙ্গা পালছেঁড়া নৌকোর মত। অথচ এরাই আসল শক্তি, হাতিয়ার। সমাজ বদলের যজ্ঞে এরাই প্রকৃত পুরোহিত।

'জগন্নাথ'-এর মৃত্যুর পরও যখন বিপ্লবীদের মধ্যে তার চরিত্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিভেদ জাগে তখনই প্রমাণ হয়ে যায় তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবটা ছিল কেমন তাসের নিগড়। অরুণবাবু প্রায় অনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে জগন্নাথ, আশ-পাশের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর এই বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই জীবন ও মাটির গন্ধ নিয়ে হাজির হবে, কেউ কেউ ক্ষুন্ন হতে পারেন হয়ত কিংবা বিরক্তও, কিন্তু ইতিহাসের গতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবেই।

নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় উপ-স্থাপনার অভিনবত্বে নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেছেন। নাটকের এমন ফিল্মিক ট্রিটমেন্ট সম্ভবত বাংলা মঞ্চে এই প্রথম। দু-ঘন্টার নাটকে তিনি চিত্রনাট্যের ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন সর্বত্র। এক মূহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়নি নাটক বাঁধা ফ্রেমের বাইরে।

নাটকের শুরু মঞ্চের দুই প্রান্তে বিপ্লবীদের জমায়েত আর জগন্নাথের মৃত আত্মাকে নিয়ে। বরুণের কথায় বিদ্রূপ করে জগন্নাথ যখন বলে—'চুপ্ চুপ্', আমরা এখন মৃত জগন্নাথের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি' তখনই আসনে সোজা হয়ে বসতে হয়, চোখ ঘুরতে থাকে মঞ্চের আনাচে কানাচে। টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা মঞ্চ কখনও হয় দাসবাবুর বাড়ি—হেঁসেল, বিচারালয়, কালী মন্দির (হাঁড়ি কাঠ এবং বিচারকের চেয়ার একই রেখায় সংস্থাপন বিশেষ অর্থবহ বটে)। কখনও বা জগন্নাথের কুঁড়ে কিংবা রাস্তা।

জগন্নাথ/ স্বপ্না মিত্র ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

DHANADHANYE YOJANA (Bengali) RSGD. No. WB/CC-315
Price 50 Paise July 16—31, 1977

ছায়াছবির টাইটেল পর্বের মত টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্যে শুরুতেই অরুণবাবু পরিচয় করিয়ে দেন নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে।

এরপর শুরু হয় নাটক।

ছেঁড়া ছেঁড়া সেই দৃশ্যগুলো বলে দেয় এই নাটক ব্যবসায়ে আপোষচরিত্রের নয়, কিংবা আপাত বামপন্থী বিপ্লবী বুলির আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নেই। • সৎ পরিচ্ছন্ন রাজনীতির নাটক জগন্নাথ। জগন্নাথ মাটির নাটক, মানুষ নিয়ে নাটক, জগন্নাথ মাটির মানুষের নাটক।

অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকার নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়কেও টপ্‌কে গেছেন। চরিত্রটিকে তিনি দর্শকের একবারে বুকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কখনও নীরব থেকে, কখনও মাইম্‌ করে তিনি সত্যিই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন যেন সবার অজান্তে। দলগত অভিনয়েও কেউ কাউকে টেক্‌কা দিতে পারেননি, সবাই-ই সমান। মনোরমার ভূমিকায় স্বপ্না মিত্রকে একটু বেশী ভালো লাগার কারণ তার আবেগমণ্ডিত মুখশ্রী, কিংবা গাঙ্গুলীবাবুর চরিত্রের শিল্পীকে কিঞ্চিৎ 'নাটুকে' দোষদুষ্ট মনে হবে, কিন্তু সব ছাপিয়ে নাটকের সার্বিক উপস্থাপনায়, মঞ্চ, আলো, অভিনয় ইত্যাদির মোড়কে গভীর তত্ত্ব ও জীবনের যে সত্যটি নিয়ে জগন্নাথ' কলকাতায় হাজির তা শুধু নাট্যকার-নির্দেশকের নয়, দলের (চেতনা) মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং চেতনা বাংলা নাট্যজগতে চলে আসবে প্রথম সারিতে। এ সম্মান অবশ্যই তাঁরা দাবী করতে পারেন।

নির্মল ধর

খেলাধূলা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত চিন্তা করা যায় নি, কলকাতার বুকে প্রথম জাতীয় নৌ বাইচের একটা জম-জমাট আসর বসতে পারে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই প্রতিযোগীতাকে ঘিরে এত উন্মাদনা থাকতে পারে। নৌ-বাইচের জাতীয় আসরে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা দল। প্রতিযোগিদের সংখ্যা তেমন বড়সড় ছিল না; তবুও উত্তর প্রদেশ বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে

নৌ-বাইচ ফাইনালে জুনিয়ার চার দাঁড়িতে বাংলা তামিলনাড়ুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছে

কয়েকটি বিভাগে। মোট ছয়টি বিভাগের এই প্রতিযোগিতায় মুখ্যত প্রাধান্য ছিল বাংলার জুনিয়ারদের; ফাইনালে পাঁচটিতেই বিজয়ী হয়েছে বাংলার খেলোয়াড়েরা। বাকিটাতে জিতেছে তামিলনাড়ু।

বাংলার সাফল্য এসেছে মুক্ত বিভাগের একদাঁড়ী (স্কাল), মুক্ত ও জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ী (পেয়ারস্থ) এবং চার দাঁড়ীর এক হালির (ফোরাস) ফাইনালে।

তামিলনাড়ু বিজয়ী হয়েছে জুনিয়ার বিভাগের একদাঁড়ীর ফাইনালে।

ফাইনালে বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। চার দাঁড়ীতে বাংলার পক্ষে ছিলেন সতীনাথ মুখার্জী, অশোক মেহতা কমল দত্ত, গিরিশ ফার্নিস এবং হালি নির্মল মজুমদার। জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ীর ফাইনালে বাংলার এস আর কালিদাস, তামিলনাড়ুর ম্যানি-কমের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

জুনিয়ারদের দু দাঁড়ীতে বাংলা (কালিদাস ও এম আর উদয়শংকর) সহজে উত্তর প্রদেশকে এবং মুক্ত বিভাগে

জাতীয় নৌ-বাইচে বাংলার সাফল্য

২৬ জুন রবিবার রবীন্দ্র সরোবর লেক ক্লাবের সীমানায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠানটি ছিল জুনিয়ার বিভাগের চার দাঁড়ী এক হালির ফাইনালে। শুরু থেকেই বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। সমাপ্তি রেখার বরাবর এসে বাংলা আধ নৌকার ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে তফাৎ-এ ফেলে দেয়। তারা তিন মিনিট ২৫ সেকেণ্ডে ঐ নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। এটিই ফাইনালের সবচেয়ে আর্কষণীয় মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে দর্শকেরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুগছিলেন। সেই সঙ্গে চিৎকার হাত তালিতে মুখরিত হয়ে উঠছিল প্রতি-যোগিতার প্রাঙ্গণ। দর্শকের ভীড়ও ছিল যথেষ্ট। বাংলা দলে ছিলেন এ রায়, এস বিশ্বাস, আর মুখার্জী, পি সাহা এবং হালি সি ব্যানার্জী।

প্রতিযোগিতার একমাত্র ট্রফি প্রেসিডেণ্ট কাপকে ঘিরে মুক্ত বিভাগের চারদাঁড়ীর

ঐ একই আসরে বাংলা (কমল দাস, অশোক মেহতা) দেড় নৌকার ব্যবধানে কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিংকে হারানোর সময় যে দৃশ্য সেদিন সৃষ্টি করেছিল, দর্শকেরা তার মধুর স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। মুক্ত বিভাগের এক দাঁড়ির সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুর এম এম সান্যালের কাছে মহারাষ্ট্রের সর্বজনপ্রিয় আর দেশপাণ্ডের পরাজয় এবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম অঘটন। কারণ, দেশপাণ্ডে গতবছর কলকাতায় আয়োজিত প্রাচ্য নৌ-বাইচের ঐ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। যাই হোক এবারের প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে বিশেষ আর্কষণ ছিল কলকাতার মানুষের কাছে এবং কয়েকটি বিভাগের স্মৃতি মনে গেঁথে থাকবে আগামী বছর পর্যন্ত।

সরোজ চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্রাফগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র

আমি আপনার সম্পাদিত পত্রিকা 'ধনধান্যে'র নিয়মিত ছোট্ট পাঠক। আপনার পত্রিকায় প্রয়োজনীয় সমস্ত রচনা সম্ভারই বর্ত্তমান, তবে আমার সামান্য অনুরোধ যে আপনি অন্তত গল্পের সংখ্যা আর একখানি বাড়াবেন।

সোমনাথ নায়েক
বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বীরভূম

আপনার পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই আমার হৃদয়ে গভীর আনন্দ এনে দিয়েছে। ১৬-৩১ মে, ১৯৭৭ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রী উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সাংবাদিকতা ও আধুনিক বাংলা গদ্য শিল্প অনন্য সাধারণ রচনা হয়েছে। ভালো লেগেছে শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর 'কৃষক কবি' প্রবন্ধটি। শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের 'লোকসাহিত্যের সন্ধানে' একটি প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ডাইনোসর খুব ভাল গল্প। শ্রী নিতাই বসুর 'নরেন্দ্র নাথ মিত্রের' ওপর লেখাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। কবিতাগুলিও যথেষ্ট শক্তিশালী।

অশোক পোদ্দার
এম. আই. জি. কোয়ার্টার্স, কলকাতা-২

টাকা কিভাবে আসে যায়

চলতি বছরে ভারত সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করবেন তার প্রতি টাকার ২৩ পয়সা আসবে উৎপাদন শুল্ক থেকে, ১৫ পয়সা আসবে করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে। ১২ পয়সা আসবে পূর্ব প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাণিজ্য শুল্ক থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাজারের ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে, ১০ পয়সা আসবে অন্যান্য সূত্র থেকে, ৮ পয়সা আসবে কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে, ৬ পয়সা আসবে বহিরাগত ঋণ থেকে এবং ২ পয়সা আসবে আয়কর থেকে এবং বাকি ২ পয়সা আসবে অন্যান্য কর আদায় থেকে।

এইভাবে সংগৃহীত অর্থের প্রতি টাকা সরকার নিম্নলিখিত হারে ও খাতে ব্যয় করবেন—৩৭ পয়সা পরিকল্পনায়, ২০ পয়সা অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় সংকুলনের জন্য, ১৮ পয়সা প্রতিরক্ষায়, ১০ পয়সা ধার দেওয়া টাকার সুদ পরিশোধে, ৯ পয়সা অন্যান্য খাতে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারকে বিধিবদ্ধ ও অন্যান্যভাবে দেওয়া হবে টাকায় ৬ পয়সা।

আগামী সংখ্যায়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ধনধান্যে'র আগামী সংখ্যাটি বিশেষ যুগ্মসংখ্যা হিসাবে পনেরই আগষ্ট প্রকাশিত হচ্ছে।

এর বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নিবন্ধ।

সম্ভাব্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সংসদের কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ।

এছাড়া থাকছে, 'স্বাধীনতার ত্রিশ বছর'—এই পর্য্যায়ে একটি আলোচনা।

সেই সঙ্গে গল্প, কৃষি, খেলাধুলা, নাটক, সিনেমা, মহিলামহল ইত্যাদি নিয়মিত রচনা।

এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য—এক টাকা

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহকমূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেণ্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাবলিকেশন্স ডিভিশনের এজেণ্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
'ধনধান্যে,' পাবলিকেশনস্ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতায়
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩১ জুলাই, ১৯৭৭
নবম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদকের কলমে

গত সতেরই জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন সরকারের প্রথম বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। জনতা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে তৈরী প্রথম বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে সরকারের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা পরিচয় মেলে। কারণ নতুন সরকার বাজেট তৈরী করার জন্য হাতে পেয়েছেন খুব কম সময় ও পূর্বতন সরকারের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয় এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব সত্ত্বেও এবছরের বাজেট আগামী দিনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিশারী রূপে চিহ্নিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধে বাজেট একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ যখন একান্তই কাম্য তখন বাজেটের ফলে দ্রব্যমূল্য যাতে না বাড়ে বরং কমপক্ষে স্থিতিশীল থাকে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি প্রথমেই সেই দিকে। তাই তিনি আয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য যাতে ন্যূনতম থাকে সেজন্য ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৭২ কোটি টাকায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এজন্য অসামরিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ১৩০ কোটি টাকা কমানোর জন্য অর্থমন্ত্রী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা পালনের জন্যও নতুন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাজেটের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষিকে উন্নত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কৃষিখাতে বাজেটে ত্রিশ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে জন্য যে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামাঞ্চলের সংগে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক নির্মাণ, বাজার, পানীয়জল প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করাই নয় একে পুনর্গঠিত করতে নতুন সরকার বদ্ধপরিকর। তারই ইংগিত বহন করছে এবছরের বাজেট। তাই অনুন্নত ও গ্রামীণ এলাকায় বিনিয়োগে উৎসাহ-দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এজন্য পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগের জন্য নতুনভাবে শিল্পের অধিকারের ক্রমবিন্যাশ করার কথাও বলা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে আছে পেনশনভোগীদের আরও সুযোগ সুবিধা দান, পানীয় জলের জন্য চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব, আয়করের রেহাই সীমা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, দেশীয় কারিগরী বিদ্যার সহায়তায় যন্ত্রাংশ নির্মাণের ছোট কারখানার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রভৃতি। তবে দশহাজার টাকার উপর যাদের আয় তাদের আয়করের রেহাই সীমা আগের আট হাজার টাকায় বহাল রাখা এবং আয়করের সারচার্জ বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বিড়ির উপর কর ধার্যের ফলে ও দরিদ্র শ্রেণীর উপর চাপ পড়বে। এসব দু একটা বিষয় গণ্য না করলে বাজেটে কর প্রস্তাব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের উপর কোন রূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেনা আশাকরা যায়। আর এবছরের বাজেট যদি দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সক্ষম হয় তবে সেটাই হবে জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে বেশী স্বস্তির।

কেন্দ্রীয় বাজেট :
পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান :
এবারের বাজেটের দুই লক্ষ্য

— বিশেষ প্রতিনিধি —

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সম্প্রতি নতুন সরকারের যে প্রথম বাজেটটি পেশ করলেন তার উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করা, এবং উন্নয়নের সুফলগুলি সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা।

চলতি বছরের বাজেটে রাজস্বখাতে রয়েছে মোট ১৫,৩৬৬ কোটি টাকা। চলতি কর হার অনুযায়ী কর বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হবে ৮,৮৭৯ কোটি টাকা, যা ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত হিসেবের চেয়ে ৭৯৮ কোটি টাকা বেশী। এই বেশী কর আদায়ের দরুণ রাজ্যগুলির ভাগে থাকবে ১০১ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক থেকে সংগ্রহ হবে ৪,৫৫০ কোটি টাকায়, যা গত বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৩৭৩ কোটি টাকা বেশী। আয়কর এবং করপোরেশন কর থেকে আদায় হবে ২২৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ—১৮০ কোটি টাকা বেশী। আমদানী শুল্ক থেকে আদায় হবে ১৭৩৪ কোটি টাকা।

বাজারের ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ১০০০ কোটি টাকা। গত বছরে ঐ হিসেব ছিল ৮৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া বিদেশী মুদ্রার জমা তহবিল থেকে সরকার ৮০০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন।

ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার পর নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হবে ১০৫২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় যোজনা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যোজনাখাতে সাহায্য বাবদ ১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫৭৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছর বরাদ্দ হয়েছিল ৪৭৫৯ কোটি টাকা।

এবারের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কমছে। শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতি হল সবরকম ব্যয় বাহুল্য বর্জন করা। সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ঐ মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং বাজেটে ঐ ধরনের ব্যয় ১৩০ কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব রয়েছে।

যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত হিসেব এবং বর্তমান কর হার অনুযায়ী রাজস্বের হিসেব নিয়ে চলতি বছরের বাজেটে ২০২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকছে।

যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ২৭৫২ কোটি টাকা, যা অন্তবর্তী বাজেটের তুলনায় ৫৬ কোটি টাকা কম। খাদ্যের জন্য ভরতুকি এবং মজুত খাদ্যের পরিবহণ বাবদ হিসেব ধরা হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা। ঐ হিসেব অবশ্য আলোচ্য বছরের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঘাটতি রাজ্যগুলিকে বর্তমান বাজেটে অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিন বছরের ঘাটতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

জীবনধারণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেক কেন্দ্রীয় সরকারী পেন্সনভোগী অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছুটা সুবিধাবৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিলেন। সে অনুরোধ রেখে এবারের বাজেটে তাদের কিছু সুবিধা দেবার প্রস্তাব করেছেন। এ বাবদ খরচ হবে বছরে ১০ কোটি টাকা।

১৯৭৭-৭৮ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাতে অর্থনৈতিক ত্রুটিগুলি দূর করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নীতি ঢেলে সাজানো দরকার। পুনর্গঠিত যোজনা কমিশন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি জানান, সরকার বিভিন্ন মন্ত্রকের সংগে এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এবং জনতা পারটির নির্বাচনী ইস্তাহারের সংগে সঙ্গতি রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর একটি নতুন পথ নির্দেশ করবেন বলে সরকার স্থির করেছেন।

তিনি জানান, নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যোজনার পরিবর্তন করে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, খাদি, এবং গ্রামীণ শিল্প, রেশম, হস্তচালিত তাঁত শিল্প, গ্রামাঞ্চলে ডাক, টেলিফোন, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা করা হবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের মূল প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।

গ্রামাঞ্চলে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, হাঁসমুরগীর খামার, মাছচাষ ও বনাঞ্চল তৈরীর উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সমবায় ভিত্তিতে দুগ্ধপালন কেন্দ্র পরিচালনার উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে। কৃষিকে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করার ওপর জোর দেওয়া হবে। কৃষির উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বর্তমান যোজনা বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে উঠবে, গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির চাহিদার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে, এবং তুলা, তৈলবীজ ও ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

হরিয়ানা, গুজরাট ও রাজস্থানের জন্য একটি মরু উন্নয়ন সংক্রান্ত পুরোধা প্রকল্প নেওয়া হবে। বর্তমান যোজনায় এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার দরুণ রাজ্য সরকারকে আগাম পরিকল্পনা সাহায্য খাতে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় অ্যাগ্রিকালচারাল রিফিন্যানস অ্যাণ্ড ডেভলেপমেন্ট করপোরেশন এবং অন্যান্য লগ্নী সংস্থার মাধ্যমে ২৬০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেচের পাম্পসেট বৈদ্যুতিকৃত করার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কৃষি, বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, সার, গ্রামাঞ্চলে সমবায় এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট ৩০২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা বরাদ্দের শতকরা ৩০.৪ ভাগ এ বাবদ ব্যয় করা হবে।

গ্রামের উন্নয়নে অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে সংযোগকারী সড়ক তৈরীর ব্যাপারে আরও জোর দেবেন। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। শুরুতে এ বাবদ বিশ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে আরও টাকা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে "কাজের বদলে শস্য" নামে নতুন প্রকল্পটির সাহায্য নেওয়া যাবে।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য দেবেন এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে শ্রী প্যাটেল জানান। এ ব্যাপারে এ বছরই বর্তমান ব্যয় বরাদ্দের উপর অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে আরও বেশী টাকা যোগানোর কথাও অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, হরিজন, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী ও ব্যয়বরাদ্দে তিনি সন্তুষ্ট নন। যদিও এ সব রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তবুও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরীর কাজে হাত দেবেন।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নয়নে ২৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সিঙ্গরৌলি অতিকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় একটি অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র শুরু করার জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এ বাবদ খরচ করেন ১৬৭৬ কোটি টাকা। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সাহায্যার্থে গ্রামীণ বিদ্যুৎ করপোরেশনকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকার হিসেবে)

	১৯৭৬-৭৭ বাজেট	১৯৭৬-৭৭ সংশোধিত	১৯৭৭-৭৮ বাজেট
আদায়	৮২১৯	৮৫০৭	৯৪২৪
			+) ১৩৩ শতাংশ
ব্যয়	৭৬৯৩	৮৫৫৪	৯৪৮৭
	(+) ৫২৯	–) ৪৭	(–) ৬৩
			(+) ১৩০ শতাংশ
মূলধন			
আদায়	৪৪২৩	৫২৫ঃ	৫৯৪২
ব্যয়	৫২৮০	৫৬৩৩	৬০৮১
	(–) ৮৫৭	(–) ৩৭৮	(–) ১৩৯
মোট			
আদায়	১২৬৪২	১৩৭৫৯	১৫৩৬৬
			(+) ১৩৩ শতাংশ
ব্যয়	১২৯৭০	১৪১৮৪	১৫৫৬৮
মোট ঘাটতি	৩২৮	৪২৫	২০২
			(–) ১৩০ শতাংশ

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করার পর বাজেট প্রসঙ্গে নানা আলোচনা এখনও চলছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব সরকারী ব্যয় কমানো-বাড়ানোর কোনো বিশেষ প্রবণতা এই বাজেটে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে কর বসিয়ে কিংবা ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যয়যোগ্য সম্পদ সংগ্রহ করতেই হবে, কিন্তু বাজেটের এই সম্পদ সংগ্রহের দিকটি আমাদের আলোচনার বস্তু নয়। আমরা আপাততঃ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি শুধু সরকারের ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণের নীতির দিকে।

চলতি বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুল্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৫,৫৬৮ কোটি টাকা। এই সমগ্র পরিমাণকে আমরা নানাভাবে বিভক্ত করে হিসাব-নিকাশ করতে পারি। প্রথমত দেখা যাক এই ব্যয়ের মধ্যে মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কতটা। মূলধনী খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তার দ্বারাই প্রধানত দেশের অর্থনৈতিক ভাবী বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, যদিও শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মূলধনী-খাতের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে ফলাফলের দিক থেকে পার্থক্য নির্দেশ করা খুব সঙ্গত হবে না। বাজেটের হিসাবে মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশের কিছু কম (৬.০৮১ কোটি টাকা) মূলধন-খাতে খরচ হবে। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে এই ধরণের ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশের সামান্য উপরে। সেই বৎসর অবশ্য শেষ পর্যন্ত মূলধন-খাতে ব্যয় ঐ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে নি। সুতরাং পূর্ববর্তী বাজেটে এবং বর্তমান বাজেটে এই দিক দিয়ে বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। গত বৎসরের তুলনায় চলতি বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ শতাংশের সামান্য কিছু কম। কিন্তু মূলধন-খাতে ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে ৮ শতাংশের সামান্য কিছু বেশী।

দেশে সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে শিক্ষা, সমাজসেবা বা আর্থিক কাঠামোর উন্নয়নকল্পে কতটা কাজে লাগানো হবে তার নীতি সব দেশে, সব যুগে এক থাকেনি। আমাদের সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরণের গঠনমূলক কিংবা বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ কতটুকু? চলতি বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের বরাদ্দ ধার্য্য হয়েছে ৪,২৫০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ২৭.৫ শতাংশ এই ধরণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ ছিল ২৭ ভাগ কিংবা সামান্য কিছু কম। এখানেও দুটি বাজেটে প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছু চোখে পড়ছে না।

বিকাশমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সমবায় ভিত্তিক সংস্থা কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে ঋণ দিয়ে থাকেন। যদি এই ধরণের ঋণকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশ সহায়ক ব্যয়ের রকমফের বলে ধরা হয়, তবে মোট ব্যয়ের শতকরা আরও প্রায় ২২ ভাগকে এই হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। পূর্ববর্তী বৎসর এবং বর্তমান বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে এই দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়বে না।

সরকারের যে-সব ব্যয়কে কোন অর্থেই বিকাশমূলক বলা যায় না তার মধ্যে প্রধানতম প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যয়ের অনুপাত চলতি বাজেটে শতকরা ১৭.৭। পূর্ববর্তী বৎসরে এই খাতে ব্যয় হয়েছে সম্ভবত শতকরা ১৮ ভাগ। আনুপাতিক হারে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য কিছু কমেছে। অনুরূপ ব্যয়-সংক্ষেপের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে শাসনতন্ত্র পরিচালনার নানাবিধ ব্যয়ের ক্ষেত্রে। পরিষদীয় কাঠামো, মন্ত্রিসভা, রাজস্বসংগ্রহ বিভাগ ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ ব্যয়কে সংযত রাখার প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান বাজেটে। কিন্তু অন্য দিকে পুরাতন ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ এবং পেনসনভোগীদের ক্লেশ লাঘবের জন্য প্রদেয় ভাতার পরিমাণ আনুপাতিক হার অপেক্ষা একটু বেশী করেই বেড়েছে। সুতরাং এই ধরণের বাঁধা খরচের পরিমাণ কমিয়ে বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে রাজ্যসরকারগুলি আর্থিক বিকাশের জন্য আর্থিক অনুদান ও ঋণ পেয়ে থাকেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই ভাবে ৩,৬৩৮ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকার হাতে পাবেন। এর মধ্যে ২,১৭৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে রাজ্যের পরিকল্পনাভুক্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। আরও ৫০৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে পরিকল্পনার বাইরে নানা ধরণের গঠনাত্মক কাজের সহায়তায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ হবে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য শতকরা ১০.৪ ভাগ,

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট · আয়করে কিছু রেহাই : পরোক্ষ কর ১৩০ কোটি টাকা

— বিশেষ প্রতিনিধি

এবারের (১৯৭৭-৭৮) কেন্দ্রীয় বাজেটে করপ্রস্তাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত করযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারগুলিকে আয়কর দিতে হবেনা। আয়করের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা আট আজার টাকাই রাখা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার বেশী সেখানে এখনকার মতই আট হাজার টাকার বাড়তি টাকার উপর কর দিতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী হলে সেখানে কিছু রেহাই দেওয়া হবে। কোম্পানী বাদে সর্বশ্রেণীর আয়কর-দাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হারও বর্তমানের ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ করা হয়েছে। কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান বাজেটে আয়করের হারে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে গতিশীল করার জন্য অর্থমন্ত্রী গতবছর প্রচলিত বিনিয়োগ সাহায্য কর্মসূচীটিকে আরো সুবিস্তৃত করেছেন। এক্ষেত্রে সিগারেট, প্রসাধন সামগ্রী, মদ ইত্যাদির মত নিম্ন অগ্রাধিকারযোগ্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর সর্বশ্রেণীর শিল্পকে ঐ বিনিয়োগ সাহায্যের সুযোগ দেওয়া হবে।

বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন তাঁর প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবে আসল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানী-গুলির সঞ্চয় বাড়ানো, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য আরো বেশী অর্থবরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নকে গতিশীল করা। পরোক্ষ কর সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, এক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা বিলাস সামগ্রীর মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

অর্থমন্ত্রী সম্পদ কর বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছেন। বর্তমানে মোট সম্পদের প্রথম আড়াই লক্ষ টাকার উপর সম্পদ করের হার আধশতাংশ বজায় থাকলেও তার ওপরের স্ল্যাবে আরো আধশতাংশ সম্পদকর বাড়বে। বর্তমান পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নীট সম্পদের করধার্যযোগ্য স্ল্যাব দুইভাগে করা হয়েছে। প্রথম স্ল্যাব ২,৫০,০০০ টাকা এবং পরবর্তী স্ল্যাব ২,৫০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০ টাকা। এর-ফলে ৭৭-৭৮ সালে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হবে।

আয়কর দাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পটি আরো দু বছরের জন্য চালু রাখার প্রস্তাব রয়েছে। অবশ্য সত্তর বছরের বেশী কোন ব্যক্তিকে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হবে না।

দেশের শিল্প সংস্থাগুলিকে স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণালব্ধ কারিগরি জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হলে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

অর্থমন্ত্রী চালু মূলধনী আদায় করের ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, সরকার রুগ্ন কলকারখানা অধিগ্রহণে ইচ্ছুক নন। তবে রুগ্ন কারখানা যদি কোন চালু প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হতে চায় তবে সরকার সেক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন।

কোন কোম্পানী যদি অনুমোদিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করেন তাহলে সরকার তাকে করযোগ্য লাভ থেকে কিছু রেহাই দেবেন। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ইউনিট স্থাপিত হলে এবং সেগুলি এবছরের ৩০ জুনের পর উৎপাদন সুরু করলে এইসব শিল্পোদ্যোগ তাদের লাভের ২০ শতাংশ করযোগ্য আয় থেকে ছাড় পাবেন।

কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে আয়করের ওপর ৫ শতাংশ সারচার্জের বলে শিল্পো-ন্নয়ন ব্যাঙ্কে পাঁচ বছর ঐ হারে টাকা জমা রাখার সুবিধা এ বাজেটে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ফলে সরকারের ৫৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সীমা দু লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয়করের হারের কোন হেরফের হবেনা। তবে কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য সব করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের হার শতকরা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হলো। প্রত্যক্ষকর থেকে বর্তমান বছরে ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে।

শ্রী প্যাটেল জানান প্রত্যক্ষ কর আইন দিন দিন জটিল হয়েছে। তাই এর সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হচ্ছে এ বছরের শেষ নাগাদ।

এবারের বাজেটে মোটর যানবাহনের ওপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। মোটর গাড়ীর ওপর শুল্ক ২.৫ শতাংশ বেড়ে ১৭.৫ শতাংশ এবং দুই ও তিন চাকার গাড়ী ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৫ শতাংশ হয়েছে। দুই ও

তিন চাকার গাড়ীর টায়ার, টিউব ও ব্যাটারীর ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়ায় এসব গাড়ীর ওপর প্রকৃতপক্ষে নীট ২.২৫ শতাংশ শুল্ক বাড়ছে। এই শুল্ক বাড়ানোর ফলে বছরে এবাবদ মোট ৫.১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমানে রং তৈরীর দ্রব্যাদি, রং, এনামেল, বার্নিশ প্রভৃতির উপর উৎপাদন শুল্ক নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে মূল্যানুপাতে ধার্য্য করার প্রস্তাব রয়েছে। বেশী দামের দ্রব্যাদির ওপর সাধারণত ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কমদামের দ্রব্যাদির ওপর শুল্ক প্রায় একই রকম থাকবে।

সিনেমার ফিল্মের ওপরও মূল্যমান বিচার করে সংশোধিত শুল্কের হার মূল্যানুপাতে ১০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব আছে।

সিগারেটের দামের ওপর মূল্যানুপাতিক হারে কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিড়ির ওপর কর প্রতি হাজারে ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ টাকা করা হয়েছে। এই সব কর থেকে বছরে বাড়তি আয় হ'বে ৪৫ কোটি টাকা।

(১) ইতিপূর্বে শুল্ক ধার্য হয়নি এমনসব হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, (২) ওজন করার যন্ত্র, (৩) হাত ঘড়ি ও টেবিল ঘড়ি, (৪) বৈদ্যুতিক বাতির সরঞ্জাম, (৫) জুতোর কালি, গাড়ির রং ধাতুর পালিশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ উপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎপাদন হয় এরূপ ক্ষুদ্রায়তন হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও কালি শিল্পগুলিকে শুল্কের রেহাই দেওয়া হ'বে। আশা করা হচ্ছে এবাবদ মোট ১১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমান বাজেটে নির্দিষ্টভাবে নতুন উৎপাদন শুল্কের আওতায় পড়েনি এমন সব পণ্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক বর্তমানে ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২ শতাংশ করা হবে। শুল্ক ধার্য্য হয়েছে এরূপ অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলে এইসব পণ্যের ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়া হবে। এই শ্রেণীর আওতায় ছোট ছোট অনেক শিল্প সংস্থা রয়েছে বলে স্থির হয়েছে, কর্মী সংখ্যা অনুপাতের বদলে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট শিল্পগুলিকে উৎপাদন শুল্কে ছাড় দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ-বিহীন সকল শিল্পকেও এই ছাড় দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রীর পরোক্ষ করের প্রস্তাবে হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্পগুলি লাভবান হবে। ২০ কাউণ্ট সুতো পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাড়তি কাউণ্টের জন্য প্রতি কেজিতে ৩০ পয়সা পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পগুলি প্রচুর পরিমাণে স্পান সুতো ব্যবহার করায় এক্ষেত্রেও একই রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত তাঁতশিল্পকে বর্তমানের চক্রবৃদ্ধি হারের উৎপাদনশুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবে ৮০ হাজার তাঁত শিল্প শুল্ক নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পাবে। সিক্রিম্পিং সুতোর ওপর শুল্কের হার প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে ৫ পয়সায় কমানো হয়েছে।

ট্রানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, রেডিও, ষ্টিরিও প্রভৃতি ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ওপর মূল্যানুপাতে শুল্কের হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে। ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে মূল্যানুপাতিক শুল্কের হারে ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে ০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে। ৩৬ সেন্টিমিটারের বড় স্ক্রীনসহ যে সকল টি. ভি. সেটের উৎপাদন মূল্য ১৮০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা বা তার কম হবে সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে। ৫০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত টেপরেকর্ডার এবং ১৭৫ টাকা পর্যন্ত হিসাব রক্ষন যন্ত্র এ সুযোগ পাবে।

সমবায় সমিতি বা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সদস্য ক্ষুদ্র এবং কুটীর দেশলাই শিল্পগুলি উৎপাদনের ওপর বর্তমানে প্রতি গ্রসে ৫৫ পয়সার বদলে দ্বিগুণ ছাড় পাবে। বৈদ্যুতিক ইনসুলেটিং টেপ, গ্লুটেড এক্সেলস, মিষ্টি, টফি, চিনের খাদ্যও শুল্কের রেহাই পাবে।

মিনি-ইস্পাত কারখানাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ইস্পাত কারখানা থেকে কাঁচামাল হিসাবে স্ক্র্যাপ যোগান দেওয়া দরকার। সেজন্য এই সব কারখানায় ব্যবহারোপযোগী কাঁচামাল হিসেবে বড় ইস্পাত কারখানাগুলি থেকে যেসব স্ক্র্যাপ আনা হবে সেগুলোর ওপর শুল্ক ছাড় দেয়া হবে।

শুল্ক ফাঁকি রোধ ও দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পশম সুতোর উপর উৎপাদন শুল্কের পরিবর্তে কাঁচা ও নিকৃষ্ট পশম এবং কম্বলের ওপর আমদানী শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হ'য়েছে। মিহি পশমের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫ পয়সা শুল্ক করা হবে। এর ফলে রাজস্বের যা ক্ষতি হবে তা আমাদানী করা কাঁচা পশমের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে পূরণ করা হবে। এর ফলে দেশজ পশমের দাম কমবে। ঘড়ির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিঃ এর মারফত ঘড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হবে। আমদানীকৃত ঘড়ি জনসাধারণের কাছে কমদামে বিক্রির জন্য অর্থমন্ত্রী ঘড়ির যন্ত্রপাতি ও ঘড়ির ওপর মূল্যানুপাতে আমদানী শুল্ক ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন।

নিউজপ্রিণ্টের ওপরও মূল্যানুপাতিক আমদানী শুল্কের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

শিল্পপ্রসার ও দেশজ শিল্পের প্রতিযোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মূলধনী পণ্য দেশজ উৎপাদনের অবস্থা আগে খতিয়ে না দেখেই আমদানী করার প্রস্তাবও অর্থমন্ত্রী করেছেন। অপরদিকে ভারতীয় মূলধনী পণ্য যাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় আরো ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে তার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের তামার তারের আমদানী শুল্ক বর্তমানে ৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে মূল্যানুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া ষ্টেনলেস ষ্টিলের ও হাই-কার্বন ষ্টিলের চাদর অন্যকোন মূলধনী পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হ'লে সেইসব ইস্পাতের চাদরের ওপর কর ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে গেইজ অনুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ২২ গেইজের ষ্টেনলেস ষ্টিলের বাসনপত্রের করও ৩২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২০ শতাংশ করা হ'য়েছে। তামা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির ওপর কর কমানোর ফলে আমদানী শুল্কে ৩৬.২৫ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে।

এই সমস্ত প্রস্তাবের ফলে ঘাটতির পরিমাণ বর্তমানে ২০২ কোটি টাকার বদলে ৭২ কোটি টাকা হবে এবং চলতি বছরে পরোক্ষ কর থেকে মোট ১৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় আয় হবে।

মঞ্জুলা বসু

নতুন বাজেটে করপ্রস্তাব

এ বছর বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল যে উদ্দেশ্যগুলির উপর বারবার জোর দিয়েছেন সেগুলি হল উৎপাদনশীল কর্মসূচীকে উৎসাহিত করা, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ধনবণ্টনে অসাম্য দূর করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করতে বাজেটের প্রস্তাবগুলি কতদূর সহায়ক হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থাকে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে তার পরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে এটা সাধারণ প্রত্যাশার মধ্যে ছিল। নূতন সরকারের নানা সময়ে ঘোষিত নীতির থেকেও অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে দেখতে বর্তমান বছরের বাজেটে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি, একমাত্র ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা ছাড়া। করসংক্রান্ত প্রস্তাবেও তাঁরা নূতন কর কিছু বসাননি বা পুরোনো কোনও কর তুলে নেননি, প্রচলিত ব্যবস্থাতেই কিছু হের ফের ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য বাজেটে প্রত্যক্ষ করের থেকেই বাড়তি রাজস্বের অধিকাংশ আদায় হবে বলে আশা করা হয়েছে। করবাবদ নূতন রাজস্বের প্রত্যাশিত পরিমাণ হল ২৪২ কোটি টাকা, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বাবদ ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার বৃদ্ধি। ব্যক্তিগত আয়ের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের (Surcharge) হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ফলে সর্বোচ্চ স্তরে আয়ের উপর করের হার দাঁড়াচ্ছে ৬৯ শতাংশ। এই অতিরিক্ত শুল্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত বা যৌথ পরিবারের আয়ের উপর প্রযোজ্য, কোম্পানীগুলির আয়ের উপর নয়। উপরন্তু কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য বিনিয়োগ ছাড় (Investment Allowance) দেবার যে ব্যবস্থা বিগত বাজেটে সীমিতভাবে ছিল আলোচ্য বাজেটে তা আরও বিস্তৃত করে দেশের সব শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম মাত্র সিগারেট, মদ্যজাতীয় পানীয়, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি যেগুলি প্রয়োজনের ভিত্তিতে যথেষ্ট অগ্রাধিকার পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।

উর্ধ আয়ের উপর অতিরিক্ত শুল্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন আয়ের লোকেদের কিছু ছাড় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নতম আয়ের উপর করের হার কমানো হয়নি বটে, কিন্তু সর্বনিম্ন যে আয়ের উপর কর কমানো হবে তার পরিমাণ বছরে ৮০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যাদের বাৎসরিক আয় তাদের কোনও আয়কর দিতেই হবে না। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক আয় ১০,০০০ টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৮০০০ টাকার ওপরই ছাড় দেওয়া হবে।

কর প্রস্তাবের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে বহু-বিতর্কিত বাধ্যতামূলক জমা-ব্যবস্থা (Compulsory Deposit Scheme) যা পূর্বতন সরকার চালু করেছিলেন তা আপাতত তুলে নেওয়া হচ্ছে না, যদিও জনতা সরকার ক্ষমতায় যখন আসীন হল তখন এইরকমই আভাস দেওয়া হয়েছিল যে বাধ্যতামূলক জমা রাখা বন্ধ করে দেওয়া হবে ও সঞ্চিত অর্থ প্রত্যর্পণ করা হবে।

এই প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল এই যে একবারে নিম্নবিত্ত আয়ের লোকেদের বাদ দিলে সাধারণ লোকের করের ভার বর্তমান বাজেটের প্রস্তাবগুলির ফলে অনেকখানিই বেড়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যার বার্ষিক আয় তার দেয় করের পরিমাণ হবে শূন্য আর ১০,৫৫০ টাকা যার বার্ষিক করযোগ্য উপার্জন তার দেয় করের পরিমাণ হবে ৩৮৫ টাকা। পরবর্তী আয়ের ধাপগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ হিসাব করে দেখানো যেতে পারে যে মধ্যবিত্ত লোকেদের ওপর চাপ আলোচ্য বাজেটে বেড়ে যাচ্ছে।

মধ্যআয় সম্পন্ন লোকেরা বাজেটের ফলে যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছে তার জন্য আবশ্যিক জমার ব্যবস্থাও দায়ী। ধনবৈষম্য কমানো ও মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা—এই দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখেই অতিরিক্ত শুল্ক ও আবশ্যিক জমা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়াও এই প্রস্তাবগুলির অন্য অসুবিধা আছে। এই দুটি ব্যবস্থাকেই বিশেষ প্রয়োজনে সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োগ করা উচিত, সেই সাময়িকতার জন্যই এদের প্রভাব। স্বাভাবিক সময়ে দীর্ঘকালীন কর্মসূচীর মধ্যে এগুলিকে গ্রহণ করলে ক্রমশ এদের ধার

কমে আসে এবং স্বল্পসময়ের জন্য ফলপ্রসূ হলেও অন্তত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘকালে প্রভাব কমে যায়।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক কর সঞ্চয়ের প্রবণতাও কমিয়ে দেয়। সর্বোচ্চ স্তরে প্রান্তিক আয়করের হার ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। মধ্য আয়ভোগী ও উচ্চবিত্ত লোকেদের সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগ ছাড়, অতিরিক্ত শুল্ক থেকে রেহাই ইত্যাদি যে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাও কতদূর কার্যকর হবে তা সন্দেহের বিষয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য করের হার যদি খুব বেশী হয় তাহলে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে আয় বাড়াবার উৎসাহও নষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত আয়কর বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর করের হারও বাড়ানো হয়েছে। ২.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার আরও ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে দেয় করের হার বাড়ছে ১শতাংশ। সম্পত্তির উপর করের হার বৃদ্ধির স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, প্রথমত বিগত বাজেটে এই হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত সঞ্চয় ও উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার পক্ষে ব্যক্তিগত আয়কর অত্যধিক না বাড়িয়ে অনুৎপাদনশীল সম্পত্তির উপর কর বসানোই বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবের মধ্যে Capital Gains বা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি-জনিত লাভের ওপর যে কর প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থন পাবে সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাসযোগ্য বাড়ী বিক্রী করলে তার মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের উপর যে কর দেয় তা মকুব করা হয় যদি ছয় মাসের মধ্যে অন্য কোনও বাড়ী তৈরী বা বিক্রী করা হয়। অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ছাড় প্রযোজ্য নয়। নতুন প্রস্তাবে অলঙ্কার বা শেয়ার বিক্রয়লব্ধ লাভের ক্ষেত্রেই অনুরূপ রেহাই দেওয়া হবে যদি ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয়-লব্ধ অর্থ শেয়ার, ব্যাঙ্ক আমানত, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট ও অন্যান্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে খাটানো হয়। এই ব্যবস্থায় যাতে কেউ অন্যায় সুবিধা না নিতে পারে সেজন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ লব্ধ অর্থ অন্তত তিন বছরের জন্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে নিয়োজিত রাখতে হবে। এর ফলে সম্পত্তিতে ফাটকাবাজী করে লাভের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বাজেট প্রস্তাবের ফল শেয়ার বাজারে অনুকূল হবে বলেই আশা করা যায়। বাজেট পেশ করার অব্যবহিত পরে শেয়ার বাজারে কিছুটা মন্দা ভাব এলেও পরে আবার উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে দেখা গেছে।

উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোম্পানীগুলিকে যে বিনিয়োগ ছাড় দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি অধুনালুপ্ত সম্প্রসারণের জন্য রিবেট (Development Rebate) এরই বিকল্প সংস্করণ। উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে এই ব্যবস্থা উৎসাহ যোগাবে সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে যাদের গুরুত্ব নেহাৎই কম সেই সব শিল্প ছাড়া অন্য সব শিল্পের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে সব শিল্প দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গড়ে উঠবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে স্বয়ং-নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছাড়ের অনুপাত ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য আলোচ্য বাজেটে আরও কিছু প্রস্তাব আছে যা সকলের সমর্থন পাবে। যেমন গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্পস্থাপন করলে তারজন্য বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে কর বসানোর আছে। বর্তমান বছরের জুন মাসের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প সংস্থাপন করলে দশ বছর তাদের লাভের ২০ শতাংশ আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। তেমনই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাদের শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ ২৫০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তারা যাতে অযথা বিব্রত না হয় সেজন্য উৎস থেকে আয়কর তুলে নেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও প্রচলিত করব্যবস্থায় কোনও মৌলিক পরিবর্তন না করে প্রচলিত করের হারেই কিছু অদলবদল করা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করার বিষয় হল যে কতকগুলি জিনিষের উপর ১ শতাংশ হারে নতুন আবগারী কর বসছে, যার মধ্যে আছে, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, ওজনের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হাত ঘড়ি ও টাইমপীস, জুতোর কালি, গাড়ির পালিশ। ১২ শতাংশ হারে আবগারী কর বসছে ক্ষুদ্রশিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের উপর (যদিও ১ লক্ষ টাকা উৎপাদন পর্যন্ত একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে)।

রেডিও, ট্র্যানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, স্টিরিও ইত্যাদির উপর মূল্য অনুসারে ১৫ শতাংশ থেকে ৩৫শতাংশ পর্যন্ত আবগারী কর ধার্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র অল্পমূল্যের টি. ভি. সেটের উপর আবগারী কর হবে ৫ শতাংশ। যথারীতি সিগারেট, বিড়ির উপর ধার্য করের বৃদ্ধির হার পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যথারীতি বলছি এইজন্য যে সব বাজেটেই বিড়ি সিগারেটের দাম বাড়াটা যেন একটা অবধারিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটরগাড়ির উপর করও বাড়ছে। আমদানী শুল্ক বাড়ছে বিদেশী পশম, কম্বল ইত্যাদি পশমজাত দ্রব্যের উপর। আবগারী শুল্ক কমছে তাঁতবস্ত্র, ছোট কারখানায় তৈরী কাগজ, ক্ষুদ্র ইস্পাতশিল্প, সমবায় সমিতির প্রস্তুত দেশলাই, জলতোলার বৈদ্যুতিক পাম্প,

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

রুমমেট / দেবযানী

আমার মত আড্ডাবাজ মেয়ের সঙ্গে যে শকুন্তলা আপ্তের কি করে ভাব হ'ল সেটা শুধু আমার বন্ধুমহলেই একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি, সত্যি বলতে কি আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগতো। আকৃতি প্রকৃতি কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র মিল ছিল না আমাদের। শকুন্তলা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু মনে হ'ত তার রূপ যেন শুধু দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বড় বেশী শান্ত ও গম্ভীর মেয়েটির সমস্ত হাবভাবের মধ্যে একটা সুসংযত দৃঢ়তা ফুটে উঠতো সব সময়। সবার থেকে সে যে স্বতন্ত্র একথা যে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দেখতো সেও বুঝতে পারতো। আমরা কো-এডুকেশন কলেজে পড়তাম। শকুন্তলাকে কেউ কখনও কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেনি। এমনকি কোন মেয়ের সঙ্গেও বিনা প্রয়োজনে কথা বলতো না সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী শকুন্তলা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হ'তে না পারার দুঃখ ভুলেছিল আই. এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড বিট্ করে। কিন্তু সবসময় নিজের চারিদিকে কি যেন এক গণ্ডী টেনে রাখতো শকুন্তলা। নিজের স্বপ্নের রাজ্যেই বিভোর হয়ে থাকতো সে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তাকে রীতিমতো সমীহ করতো। বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও করেছিল অনেকেই কিন্তু তার সে গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি কেউ।

সব দিক দিয়েই শকুন্তলার বিপরীত ছিলাম আমি। নিজমুখে রূপের প্রশংসা করাটা রীতিবিরুদ্ধ। তবু অতিরিক্ত বিনয় না করেও বলতে পারি যে ঠিক প্রশংসা করার মত রূপ আমার ছিলনা কোনকালেই। আর গুণ? ফাঁকিবাজ, ক্লাস-পালানো ইত্যাদি নানারকম দুর্নাম অর্জন করেছি কলেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা যে রেটে বেড়ে চলেছিল তাতে হিতাকাংখীরা রীতিমত আতঙ্কিত হতেন আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। Academic career ও তথৈবচ। ভাল রেজাল্টের প্রতি একেবারে লোভ নেই একথা বলতে পারিনা, কিন্তু তার জন্যে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হ'বে অন্যান্য বিষয়ে তা করতে আমি নারাজ।

এ হেন গোল্লায় যাওয়া মেয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা রত্নটির এমন গলায় গলায় ভাব হওয়া যে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্যের অন্যতম একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। অথচ এর সূত্রপাত হয়েছিল অতি সাধারণভাবে। বি. এ. তে আমাদের দু'জনেরই সংস্কৃত ছিল। সংস্কৃতের "স্যার" একটু বেশীরকম কড়া মেজাজের লোক। টিউটোরিয়াল ক্লাসে 'টাস্ক' করে না আনলে এমন বাছা বাছা বাক্যবাণ ঝাড়তেন যা আমার মত নাককান কাটা মেয়েরও অসহ্য লাগতো। মেয়ে বলে ছেড়ে দিতেন না তিনি। প্রথমে কিছুদিন অসহযোগ চালালাম—তাঁর টিউটোরিয়ালের ধারে কাছে, ঘেঁসতাম না। শেষে বুঝলাম এভাবে চলবে না। টিউটোরিয়ালের পার্সেন্টেজ কমে গেলে নিজেরই বিপদ, পরীক্ষা দিতে পারবো না। বেগতিক দেখে অবশেষে শকুন্তলার শরণ নিলাম—তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনা। দেখতে দেখতে আমাদের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে কলেজে সবার মুখে মুখে ওই এক কথা ফিরতে লাগলো। সবাই হিংসে করতো বুঝতাম এবং সেজন্য রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম।

ফোর্থ ইয়ারের শুরুতেই বাবা বদলী হয়ে গেলেন পাটনা থেকে সেই সুদূর পাঞ্জাব। আমায় হষ্টেলে থাকতে হ'বে এবার—জীবনে প্রথমবার। শকুন্তলা হষ্টেলেই থাকতো বরাবর। সুপারিন-টেণ্ডেণ্টকে ধরে আমরা দুজনেই একটি ডবল সিটেড রুম নিলাম। হষ্টেলে আসার পর আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলাম

শকুন্তলাকে। বন্ধুহীন, চাপা মেয়েটির এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম যেন। হস্টেলে আসার পর থেকে আমার এমন আদর যত্ন শুরু করলো যে বাড়ি ছেড়ে থাকার দুঃখ দু'দিনেই ভুলে গেলাম।

মাঝে মাঝে অবশ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ওর গিন্নীপনায়। কোনদিন রাত্রে হয়তো চুপি চুপি সিনেমা দেখে ফিরেছি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নজর এড়িয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি শ্রীমতীর মুখ অন্ধকার। তারপরই শুরু হ'ত লম্বা বক্তৃতা। লেখা-পড়া না করলে কি ভবিষ্যৎ হ'বে, আজে বাজে সিনেমা দেখার পরিণাম কি, হোটেলে আমার মত ভাল মেয়েদের দেখলে লোকে কি ভাববে—ইত্যাদি নানারকম ফিরিস্তি। চুপ করে শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুনেই যেতাম। যখন অসহ্য মনে হ'ত হঠাৎ উঠে নিজের বাক্স প্যাঁটরা ধরে টানাটানি শুরু করতাম। জিজ্ঞেস করতো—"ওকি হ'চ্ছে?" গম্ভীর মুখে বলতাম—"রুম বদলাবো। থাকবো না এঘরে।" ব্যস, এক ওষুধেই সব ঠাণ্ডা। শকুন্তলার মুখে আর রা'টি শোনা যেত না খানিকক্ষণ। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মিনিট দশেক পরেই এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির হ'ত—"খেয়ে নে। পাঞ্জাবী হোটেলের অখাদ্য কুখাদ্যে পেট ভর্তি। সে কথা বললে আবার ঘণ্টাখানেক ধরে যে উপদেশামৃত বর্ষিত হ'বে তার কথা ভেবে শঙ্কিত হই। অতিকষ্টে দুধটুকু শেষ করে বিরক্ত হয়ে বলি, "সব সময় এমন জ্বালাস কেন বলতো? তুই যে আর জন্মে আমার কে ছিলি ভগবানই জানেন—।" ও হাসে—"শুধু ভগবান কেন আমিও জানি।"—"কি?" "সতীন"—ও কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলে।

"উহুঁ, সতীন নয়, শাশুড়ি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি অন্য বন্ধুদের খোঁজে।

একদিন এক বাদলঝরা সাঁঝে একটি দুর্বল মুহূর্তে অবশেষে বলে ফেলি বহুদিনের গোপন রাখা কথাটি। উৎসাহে আরও কাছে সরে আসে শকুন্তলা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বিভ্রান্ত করে তোলে তার প্রশ্নজালে—"তার নাম কি? কোথায় থাকে? কবে আলাপ হ'ল? বল শীগগীর—।" বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হ'চ্ছে। জানালার ধারে বসে সেই বর্ষণ ধারার দিকে চেয়ে বলে যাই আমার সেই কাউকে না বলা কাহিনী.....

বাবার যখন এলাহাবাদে বদলী হল তখন আমি ম্যাট্রিকে পড়ি। আমি অঙ্কে বরাবরই ভীষণ কাঁচা, তবু জেদ করে অ্যাডিশনাল ম্যাথেমেটিক্স নিয়েছিলাম। প্রথমে অতটা বুঝিনি, এখন যতই পরীক্ষা এগিয়ে আসছিল ততই নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। শেষে একদিন কাতরভাবে বাবার দরবারে হাজির হ'লাম। কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লাম "অঙ্কের একজন মাষ্টার চাই বাবা, নইলে কিছুতেই পাশ করবো না।" বাবা তাঁর বন্ধু অবনী দত্তকে ধরলেন একজন ভাল মাষ্টার ঠিক করে দেবার জন্যে। অবনীবাবুর ছেলে শোভন সবে বি. এস্. সি. পাস করে দিল্লীতে ডাক্তারী পড়ছে। কি একটা লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। অবনীবাবু তাকেই আমার অঙ্ক শেখানোর ভার দিলেন।

শোভনের কাছে অঙ্ক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান নিশ্চয়ই হয়েছিল তা নাহ'লে ম্যাট্রিকটা অমন নির্ঝঞ্ঝাটে উৎরোতে পারতাম না। কিন্তু শোভনকে কাছে পেয়ে সমস্ত জীবন যেন তোলপাড় হয়ে গেল—দু'জনেরই। কি যেন এক প্রচণ্ড আকর্ষণ দু'টি হৃদয়কে এক করে দিল। শোভনকে ভাল লাগা এমন কিছু বিস্ময়কর হয়তো নয়। রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য সব দিক দিয়ে যে কোনও মেয়ের কাম্য সে। তবু মনে হ'ত ওর প্রতি আমার যে আকর্ষণ তা রূপ, গুণ বা সম্পদের নয়। সে যে কি তা বুঝতে পারতাম না।

আমি কলেজে ভর্তি হ'লাম। শুধু শোভনকে কাছে পাওয়ার লোভেই আবার অঙ্ক নিলাম। শোভন ছুটিতে বাড়ি এলেই আমায় অঙ্ক শেখাতো আসতো। অধ্যাপনায় তার মনোযোগ দেখে বাবা-মাদেরও তাক লেগে যেত মাঝে মাঝে।

দুরূহ ষ্ট্যাটিস্টিক্স-এর আড়ালে আমরা দু'জন তখন কল্পনায় স্বর্গ রচনা করে চলেছি। দু'জনেই বুঝতাম সে স্বর্গকে এই মাটির পৃথিবীতে টেনে আনতে বাধা কোথায়। একদিকে জাত ও আরেক দিকে অর্থ ও রূপের পাঁচিল। অব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদানের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না আমার রক্ষণশীল বাবা মা। শোভনের অভিভাবকরাও কক্ষনো রাজী হ'বেন না এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলা মেয়েকে বধূরূপে ঘরে এনে নিজেদের আভিজাত্য খর্ব্ব করতে। অবশ্য আইনের সাহায্যে ঘর বাঁধা চলে, কিন্তু মন মানতে চায়না সে কথা। সবাইকে দুঃখ দিয়ে সে মিলন সুখের হ'বে কিনা কে জানে।

আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট ও বাবার পাটনায় বদলী হ'বার খবর প্রায় এক সঙ্গে এলো। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা ম্লান করে দিল সাফল্যের সব আনন্দকে। বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় বান্ধবীর বাড়ি যাবার ছলে শোভনের সঙ্গে দেখা করলাম কালীমন্দিরে। বিগ্রহের সামনে প্রতিশ্রুতি দিলাম দু'জনে দু'জনকে—যদি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় জীবন শেষ হয়ে যায় যাক্, তব এই ক'টি বছরই অক্ষয় হয়ে রইবে আমাদের জীবনে। অন্য কেউ আসবে না সেখানে।......

শকুন্তলা একমনে শুনে যাচ্ছিল আমার ইতিবৃত্ত। খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বললো—"তার ফটো নেই তোর কাছে?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—আছে। "কই দেখি?" খানিক ইতস্ততঃ করে ট্রাঙ্ক খুলে বার করলাম শোভনের ছোট্ট ফটোখানা যা অনেক যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন। ও অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, তারপর হেসে বললো—"বাব্বাঃ, তোর বয়ফ্রেণ্ডের সংখ্যা দেখে মাঝে মাঝে এমন ভয় হ'ত ভাবতাম—,

তুই বঝি কোনদিন কারো প্রতি সিনসিয়ার হ'তে পারবি না।" শোভনের ফটো আর ট্রাঙ্কে উঠলো না। বইয়ের আলমারীর মধ্যেই রেখেদিলাম সেটা। আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ খুলতো না সে আলমারী। আর ওতো জেনেই গেছে এখন।

শকুন্তলা এর পর থেকে প্রায়ই শোভনের বিষয় নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতো। একটু দেরী করে ফিরলেই সে কি রাগ—"বেচারী শোভনবাবু, কপালে দুঃখ আছে ভদ্রলোকের।" লেখাপড়া করিনা, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিই তা নিয়ে সব সময় ভয় দেখতো—"লিখছি শোভনবাবুকে, নিয়ে যান তাঁর মালুকে। আর আমি পারবো না' ইত্যাদি। আর যেদিন শোভনের চিঠি আসতো সেদিন তো কথাই নেই। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওর চিঠি আসতো আর প্রত্যেকটি চিঠি পড়ে শোনাতে হ'ত শকুন্তলাকে। কারণ বাংলা বলতে পারলেও পড়তে জানতো না ও। মাঝে মাঝে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হ'ত ওর সঙ্গে। শেষে কোন কুল কিনারা না পেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো। আলো জেলে দেখতাম শকুন্তলা তখনো চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করতাম "কি ভাবছিস্ অতো?" ও ম্লান হেসে বলতো—"কিছুনা ঘুমো। আমি তোর কপালে হাত বুলিয়ে দি।" ঠাট্টা করতাম—"উঃ কুন্তীর কত ভাবনা, যেন কন্যাদায় পড়েছে।" ও হঠাৎ রেগে উঠতো—"কন্যাদায় থেকে রুমমেট্ দায়টা কিছু কম নয় মশায়, অবস্থায় পড়লে বুঝতে।"

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। শকুন্তলার আবার পুজো করার বাতিক ছিল। রোজ ভোরবেলা স্নান করে ঘন্টা খানেক পুজো না করলে ওর হ'ত না। তার উপর বিশেষ বিশেষ তিথিতে তো কথাই নেই—নির্জ্জলা উপোস সেদিন। ওর ভক্তির বহর দেখে আমরা সবাই হাসতাম।

এরপর হঠাৎ এক নতুন উপদ্রব আরম্ভ করলো শকুন্তলা। কি একটা কারণে ক'দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল। হষ্টেলে ফিরে আমাকে দেখেই দূর থেকে চ্যাঁচাতে লাগলো—"মালুরে সব ঠিক হয়ে গেছে—"। কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমি। শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিশ্বাসে যা বলে গেল তার সারমর্ম্ম হ'ল—আমি নাকি শোভনকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি—। তার অতি সহজ উপায় আছে না কি আমার হাতের মুঠোয়। "উপায়টা কি শুনি?"—"সন্তোষী মা'র পুজো কর।" আমি ঠাট্টা ভেবে হাসতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ও ঠাট্টা করেনি। সত্যিই নাকি ওর পিসতুতো বোনের এক ননদ না কে যেন সন্তোষী মা'র পুজো করে নিজের বাঞ্ছিত দয়িত লাভ করেছে—এইবার বাড়ি গিয়ে সদ্য সদ্য শুনে এসেছে সে। শুধু শোনা নয় সমস্ত ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে এনেছে সেই সঙ্গে। সন্তোষী মা'র ফটো কিনে এনেছে একখানা, পুজোর মন্ত্রটন্ত্রগুলোও নোট করে এনেছে কোত্থেকে। "তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে'না মালু, শুধু রোজ ভোরে উঠে চান করে মাত্তর এক ঘণ্টা......।" শুনতে শুনতে কম্প দিয়ে জ্বর আসার উপক্রম হ'ল। আমি মালবিকা মুখার্জ্জী—কোনদিন সাড়ে সাতটার আগে বিছানা ছেড়েছি এমন অপবাদ যাকে অতি বড় শত্রুরেও দিতে পারবে না, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এক প্লেট জলখাবার না ধরলে যার হাঁক ডাকে বাড়ি এবং পাড়া (উপস্থিত হষ্টেল) শুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি করে—খোদ সেই আমি ভোরে উঠে, স্নান করে, খালি পেটে করবো এক ঘণ্টা পুজো!!! তাছাড়া ভগবানে একটু আধটু বিশ্বাস যদিও ছিল তবু সন্তোষী মায়ের একটু স্তব স্তুতি করলেই যে আমাদের অমন গোঁড়া বাবা মা সব সংস্কার আভিজাত্যে জলাঞ্জলি দেবেন এ কথা গাঁজাখুরি ছাড়া আর কিছু মনে হ'ল না আমার। "ও সব আমার দ্বারা হ'বে না ভাই" নিতান্ত ভয়ে ভয়ে নিজের মতামত জানালাম তাকে।

কিন্তু আমার মতামত নিয়ে মাথা ঘামাতে কুন্তীকে কোনদিনই দেখিনি, সেদিনও বিশেষ গা করলো না। নির্ব্বিকার মুখে পুজোর সাজ সরঞ্জাম রেডী করতে লাগলো সে। শেষে সেই অসম্ভবই সম্ভব করালো আমাকে দিয়ে। শীতকালের সকালে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে স্নান করে, চা জলখাবারের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, ঝাড়া একঘণ্টা দরজা জানালা এঁটে সে কি প্রাণান্তকর সাধনা। সংস্কৃত উচ্চারণটা কিছুতেই রপ্ত হ'ত না, পাশে বসে কারেক্ট করতো শকুন্তলা। অবশ্য বেশীদিন ভুগতে হয়নি আমাকে। সকালে স্নান টান কোনকালেই সহ্য হ'ত না। দিন দশেকের মধ্যেই জ্বর বাধিয়ে ফেললাম। শকুন্তলার বোধহয় করুণা হ'ল এবার, কারণ অসুখ সারার পর আর কোনদিন পুজো টুজো করতে বলেনি আমায়।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। শকুন্তলা ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে পাশ করলো। আমি পাশ করলাম অতি সাধারণভাবে। অনার্স আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম বেগতিক বুঝে। তারপর এম. এ.। এইবার একটু মুস্কিল বাধলো। শকুন্তলা ইকনমিক্স নিলো, আমি বাংলা। সারাদিন আলাদা আলাদা কাটতো, কিন্তু হস্টেলে এবারও আমরা দুজন রুমমেট। কাজেই আর সবই আগের মত চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে শোভন ডাক্তারী পাশ করে গেছে। হৃদরোগ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যাচ্ছে সে। যাবার আগে দিন পনেরোর জন্যে পাটনায় এলো বিদায় নিতে।

শকুন্তলার সঙ্গে শোভনের আলাপ করিয়ে দিলাম। আমার নামে শোভনের কাছে নালিশ করবে বলে সবসময় শাসাতো, কিন্তু দেখলাম যত বক্তৃতা ওর আমার কাছেই। শোভনের সামনে একেবারে চুপ। মাথা হেঁট করে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। একটা কথা বলতে হ'লে ঘেমে নেয়ে উঠতো যেন, গাল দু'টো লাল হয়ে উঠতো অকারণে। খুব মজা

লাগতো আমার, কেমন জব্দ। রোজ শোভন এলেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতাম ওকে। শোভন কিন্তু বিরক্ত হ'ত। আড়ালে বকতো আমাকে—"রোজ ওকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আস বলো তো? আর মাত্র ক'টা দিন, তারপর কতদূরে চলে যাবো, জানিনা আবার কবে দেখা হ'বে। অন্তত: এই ক'টা দিন তোমায় একা পেতে চাই—।"

রোজ শোভন আসার ঘন্টাখানেক আগে থেকে আমায় নিয়ে পড়তো শকুন্তলা। আমি নাকি চুল বাঁধতে জানিনা, শাড়িটা পর্যন্ত ঠিক করে পরতে শিখিনি এতদিনে। নিজে হাতে পরিপাটি করে চুল বেঁধে, নিজের সব চেয়ে সুন্দর শাড়িটি পরিয়ে দিত আর সমানে গজ্ গজ্ করতো। তারপর সব সাজগোজ শেষ হ'লে খোঁপায় ফাইনাল টাচ্ দিতে দিতে দুষ্টুমীভরা হাসি হাসতো। ফিরে এলে শোভন কি কি কথা বলেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতো বারে বারে।

অবশেষে পনেরোটি দিনের হাসি গান শেষ করে দিয়ে শোভন বিদায় নিল। আমি আবার ফিরে গেলাম আমার পুরোনো জীবনে। আগে শকুন্তলার জন্যে ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন তো দু'জনের ক্লাশ আলাদা, কাজেই অবাধ গতি। রোজ ক্লাশ পালিয়ে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো ম্যাটিনি সিনেমা দেখতাম, কখনো কফি হাউসে আড্ডা বসতো। শকুন্তলা কিছুই টের পেত না। শোভনের কথা যে কখনো মনে পড়তো না তা নয়; কিন্তু তার কথা ভাবলেই প্রচণ্ড অভিমানে ভরে উঠতো মন। শোভন বলেছিল তার বাবা মা'র মতের বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না কোনদিন। রাগ করে বললাম, "তোমার কাছে বাবা মা'ই সব? আমি কিছু নই?" —"কে বলে তুমি কিছু নও? তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো। কিন্তু মা বাবার মনে দুঃখ দিতে পারবো না আমি।" মনে পড়তো তাকে দেওয়া আমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা। কি তার পরিণাম? জীবনে আর কখনো গড়তে পারবো না একখানি সুখের নীড়। জানি শোভনও নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে। কিন্তু সে পুরুষ। সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিলিয়ে দেবে সে নিজেকে। কোনও রিক্ততাই থাকবে না তার। কিন্তু আমি! কি নিয়ে কাটবে এই নিঃসঙ্গ জীবন?

শোভনের চিঠির সংখ্যাও কমতে থাকে ক্রমশ। অসংখ্য হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি পরীক্ষায় ব্যস্ত সে। হাজার হাজার মাইল দূরে তার কথা ভেবে কার হৃদয় বিকল হ'চ্ছে সে কথা মনে করার সময় কোথায়!..

একটু একটু করে রাত গভীর হয়। চোখের জলে ভিজে ওঠে বালিশটা। "মালু!" হঠাৎ দেখি কোন ফাঁকে শকুন্তলা মাথার কাছে এসে বসেছে। আমি উত্তর দিইনা। ও আস্তে আস্তে আমার চোখের জল মুছে দেয়।

এক একটা করে মাস কেটে যায়। একদিন খবর পেলাম ১৮ই মে থেকে আমাদের পরীক্ষা শুরু হ'বে, অর্থাৎ ঠিক তিন মাস বাকী। হঠাৎ যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। অথচ এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। এম. এ. পরীক্ষা সাধারণত ঐ সময়েই হয়ে থাকে এবং এবছরও যে হ'বে সেটা আগেই আমার জানা উচিৎ ছিল। তবু কেন জানি পরীক্ষার কথাটা কোনদিন মনে পড়েনি এর আগে, তাই হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলাম "মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে"। একটি বইও নেই আমার কাছে। থাকবেই বা কোথা থেকে। বই কেনার টাকাতেই তো সিনেমা দেখা ও হোটেলে খাওয়া চলতো। লাইব্রেরীর বই থেকেও কিছু নোট করিনি আর এই অল্প সময়ের মধ্যে তা আর সম্ভবও নয়। সব মিলিয়ে চোখে অন্ধকার দেখার মতই অবস্থা।

অবশেষে সেই অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর মত দেখা দিলেন আমাদের অধ্যাপক ডা: সুকান্ত চ্যাটার্জ্জী। মাত্র কয়েক বছর হ'ল পাশ করে রিসার্চ করছিলেন। মাস ছয়েক হ'ল আমাদের ক্লাশ নিচ্ছেন। অনেকবার আমাকে বলেছেন পড়াশোনা বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে তাঁকে জানাতে। এতদিন সময় হয়নি আমার। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়লো। অকপটে জানালাম নিজের অবস্থা। আমার ফাঁকি দেবার বহর দেখে তিনি প্রায় হতভম্ব। হয়তো বকাবকি করতেন কিন্তু আমার কাতর মুখ দেখে বোধহয় দয়া হ'ল। আমাকে নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন তিনি। রোজ ক্লাশ শুরু হ'বার আগে সকাল বেলা ও সন্ধ্যায় ক্লাশ শেষ হ'বার পর পড়াতেন। বাড়ি থেকে নোট তৈরী করে আনতেন আমার জন্য। কিছুদিন পরেই Preparatory leave আরম্ভ হ'ল। তখন প্রায় সারাদিন ধরেই আমাকে পড়াতেন সুকান্ত চ্যাটার্জ্জী। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠতো আমার। ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত; মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসতো আমার। কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি তাঁর মুখে। দেখতে দেখতে দুরূহ কোর্স সহজ হয়ে আসে। পরীক্ষার ভয়ও কেটে যায় ক্রমশ। সেইসঙ্গে যে নিরাশার অন্ধকার ঘিরে রেখেছিল আমার জীবন তার মাঝেও বুঝি আলো ফোটে।

পরীক্ষার মাত্র দু সপ্তাহ বাকী। না, পরীক্ষাকে আর মৃত্যুদূত বলে মনে হ'চ্ছে না। অটল বিশ্বাসে, বেশ খুসী মনেই প্রতীক্ষা করছি তার জন্য। সেদিন পড়াতে পড়াতে বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন সুকান্ত চ্যাটার্জ্জী। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন,—"তুমি পরীক্ষার পর ক'দিন থাকবে এখানে?"—"তার পরদিনই যেতে হ'বে।"—"চণ্ডীগড়?"—"হ্যাঁ"। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর ইতস্তত করে বল্লেন—"মালবিকা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম....।"

সেদিন হষ্টেলে ফেরার পথে বার বার শুধু মনে হ'চ্ছিল—এই ভাল, শোভনকে আমি পাবো না কোনদিন। আর তার কাছে আমার মূল্যই বা কতটুকু? থাকুক সে তার কর্ত্তব্যবোধ, তার যশ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মরীচিকার পিছনে ছুটে হতাশা

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভবতোষ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট: সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সরকারি বাজেটের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আগামী বছরে বিভিন্ন খাতে এবং সমগ্রভাবে কী পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে, সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কতটাকা লাভ হবে, সরকারি ব্যয় কোন দিকে কতটা হবে ইত্যাদি বিষয়ে একটি হিসাব তৈরি করা। মোট ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কীভাবে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে সেটাও বাজেটেই দেখানো হয়। ঘাটতি মেটাতে হলে যদি নূতন কর-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার জন্য ব্যবস্থাও বাজেটে থাকবে। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত থাকে সরকারি করনীতি ও ব্যয় থেকে দেশের উৎপাদন ও বণ্টনে কী পরিবর্তন হতে পারে, বা কী পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার পরিচয়। সরকারি ব্যয় আজকাল কোন দেশেই শুধু প্রশাসন পরিচালনায় সীমাবদ্ধ থাকেনা। দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরকারি ভূমিকা সব দেশেই বেড়ে চলেছে। সরকারি আয়-ব্যয় দেশের মোট আয়-ব্যয়ের একটা বড় অংশ এবং সরকারি আর্থিক পরিকল্পনা কম-বেশি আজকাল সব দেশেই গৃহীত। এদিক থেকে দেখলে বাজেট শুধু একটা আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়। বাজেট দেশের উন্নতিতে সরকারি নীতি ও প্রভাব কী হবে তার প্রতিফলন।

দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে আছে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সেই সঞ্চয়ের সুপরিকল্পিত এবং বাঞ্ছনীয় ফলপ্রসূ বিনিয়োগ। আমাদের মত দেশে, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাতে সরকারের অংশ ক্রমেই বাড়ছে, সেখানে প্রত্যক্ষ সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। বস্তুত, বর্তমানে ভারতে যা মোট নূতন বিনিয়োগ হয় তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি সরকারি পরিচালনায়, আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি কৃষি, কুটির শিল্প, বেসরকারি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের বেশির ভাগই অবশ্য এখনো আসে বেসরকারি উদ্যোগ থেকে, কিন্তু তার জন্য যে বিনিয়োগের কাঠামো দরকার—যানবাহন, রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, রাসায়নিক সার—সেটা সরকারি কর্মনীতির অঙ্গ হিসাবেই তৈরি হয়। আর্থিক পরিকল্পনার নীতি গ্রহণের আরম্ভ থেকে সরকারি বিনিয়োগ কোন কোন দিকে যাবে এবং কোথায় কোথায় বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নীতি নেওয়া হয়েছে। যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশি, যেখানে প্রত্যক্ষ লাভ বেশি না হলেও সমাজের উপকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুবিধা অনেকখানি। যেখানে বিনিয়োগের ফল পেতে দেরি হতে পারে, সেখানে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোই সঙ্গত, কারণ ঠিক এই সব ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সহজে আসবে না।

দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর সরাসরি আয়-ব্যয় নীতির প্রভাবের প্রশ্নটি দুই ভাগ করে দেখা প্রয়োজন। সরকারি খাতে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা হল প্রথম বিবেচ্য এবং দ্বিতীয় বিবেচ্য হল সরকারি করনীতি ও ব্যয় ব্যবস্থায় বেসরকারি ক্ষেত্রে—অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দানের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সরকারি আয়-ব্যয়কে যদি চলতি খাতে ও মূলধনী খাতে এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয় তাহলে চলতি খাতে উদ্বৃত্ত হলে সেটাকে সরকারি সঞ্চয় বলে অভিহিত করা যায়। যদি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে সরকারের আয় হয় দশ হাজার কোটি টাকা এবং চলতি খাতে ব্যয় হয় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা, তাহলে উদ্বৃত্ত পাঁচশ কোটি টাকা সরকারের সঞ্চয়—অর্থাৎ সরকারের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয়। এই সঞ্চয়টাকে মূলধনী খাতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মূলধনী আয় যোগ দিলে যে টাকাটা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মূলধনী ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এই মূলধনী ব্যয়ের প্রধান অংশ হল আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পিতভাবে স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা। মূলধনী আয় আসে সরকারের কাছে জমা দেওয়া নানা রকমের টাকা থেকে—যেমন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা পোষ্ট অফিসের আমানত—এবং নূতন তোলা ঋণ থেকে। এর অনেকটাই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের হস্তান্তর। রাজস্ব খাতে বা চলতি খাতে উদ্বৃত্ত আজকাল খুব একটা হয় না। কিন্তু এবারে ৬৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে। আর সরকারের এবারকার মোট মূলধনী আয় ৬০১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩২৪৮ কোটি টাকা আসবে নানারকমের জমা থেকে, আর বাকি ২৭৬৬ কোটি টাকা তোলা হবে ঋণ করে—দেশের বাজার থেকে ১০০০ কোটি টাকা, বিদেশ থেকে ৮৯৪ কোটি টাকা, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে মোট ৮৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে। দেশের মধ্যে যে ঋণ তোলা হবে তার কতটা আসবে প্রকৃত সঞ্চয় থেকে আর কতটা

আসবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে (অর্থাৎ মুদ্রা-সম্প্রসারণ থেকে) সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

সরকারি খাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আর্থিক পরিমাণ কতটা তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় পরিকল্পনার জন্য ব্যয় থেকে। পরিকল্পনার ব্যয়ের বাইরেও সরকারি বিনিয়োগ হতে পারে—যেমন প্রতিরক্ষা বিভাগে। আবার পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যেও কিছুটা সাধারণ চলতি খরচ থাকতে পারে। তবু, এই পরিকল্পনা ব্যয় থেকেই সরকারি বিনিয়োগের সবচেয়ে সহজবোধ্য চিত্র পাওয়া যায়। এবারে, অর্থাৎ ১৯৭৭-৭৮-এ, কেন্দ্রীয় খাতে মোট পরিকল্পনা ব্যয় হবে ৫৭৯০ কোটি টাকা—রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র পরিকল্পনার জন্য যে সাহায্য দেবে সেটা ধরে নিয়ে। এ'ছাড়া রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের আয় থেকে আর্থিক পরিকল্পনার জন্য যা খরচ করবে সেটা ধরে নিলে মোট পরিকল্পনা ব্যয় গিয়ে দাঁড়াবে ৯৯৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। এর মধ্যে কৃষি, জলসেচ, সারপ্রকল্প ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য মোট ব্যয় হবে ৩০২৪ কোটি টাকা। রাস্তাঘাট, পানীয়-জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কুটির শিল্প ইত্যাদি সব দিকেই এবারে আগের বছরের চেয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটির দিকে তাকানো যেতে পারে। সরকারি আয়-ব্যয় নীতি, এবং বিশেষ করে করনীতি দিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান-গত সঞ্চয় বাড়াবার কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। জীবন-বীমা বা প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডে টাকা জমা দিলে আয়কর অনেকটা মকুব হয়। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট কিনলে বা দেশীয় কোম্পানির শেয়ার কিনলে তার থেকে যে আয় হয় তাতেও আয়কর অনেকটা ছাড় পাওয়া যায়। এবারে এদিক থেকে কোন নূতন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, কিন্তু যাদের আয় বছরে আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা তাদের আয়কর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই স্তরে আয়কর দাতাদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। এই ৮ লক্ষ লোক আগে আয়কর হিসাবে যে টাকাটা দিতেন তার সবটাই যদি সঞ্চয় করেন, তাহলে মোট সঞ্চয় বাড়বে প্রায় ১৬ কোটি টাকা, কিন্তু যে টাকাটা বাঁচবে তার সবটাই সঞ্চিত হবে এটা আশা করা অন্যায় হবে। অন্যদিকে, যাদের আয় দশ হাজারের বেশি তাদের উপরে আয়কর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তাদের সঞ্চয় কমবে, তবে আবশ্যিক জমা প্রকল্পে যে টাকাটা তারা দেবে সেটাও সঞ্চয়। এই জমার একটা অংশ এবারে ফেরৎ আসছে, সেটা আবার সঞ্চিত হবে না ব্যয়িত হবে বলা কঠিন। মোটের উপরে বলা যায় যে এবারকার বাজেটে বেসরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য নূতন ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে, বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াবার জন্য কিছু নূতন ব্যবস্থা বাজেটে নেওয়া হয়েছে। আগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন বিনিয়োগ করলে আয়করের সুবিধা দেওয়া হত। এবারে এই সুবিধা প্রসারিত করে সব রকমের শিল্পেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কেবল তালিকাভুক্ত ৩৪ টি শিল্প বাদে। যেসব শিল্প এসব সুবিধা পাবে না, তাদের মধ্যে আছে কিছু বিলাস দ্রব্য (যেমন মদ, সিগারেট, প্রসাধনের জিনিস ইত্যাদি) এবং এমন আরো কয়েকটি শিল্প যেখানে এজাতীয় সুবিধার কোন প্রয়োজন নেই। কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প যাতে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত নূতন ক্ষুদ্রশিল্পকে আয়করের কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। ভারতে উদ্‌ভাবিত কারিগরির পদ্ধতি ব্যবহার করলেও আয় কর কমানো হবে। যদি কোন সুপরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো 'রুগ্ন' শিল্পকে নিজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেয়, তাহলেও আয়করের সুবিধা পাওয়া যাবে। 'মূলধনী লাভ'-এর ক্ষেত্রে করমকুবের সুবিধা আগে পাওয়া যেত শুধু বসত বাড়ি বিক্রির লাভের বেলাতে—এবারে সে সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে অন্য সম্পদের ক্ষেত্রেও। আশা করা যায় যে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তার কিছুটা যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিযুক্ত হবে। সম্ভবত এই টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা হবে। তাতেও বিনিয়োগেরই উপকার।

অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে—যেমন কোন কোন ধরণের সুতো বা দেশলাই। যেক্ষেত্রে নূতন ট্যাক্স বসানো হয়েছে সেখানেও ক্ষুদ্র শিল্পকে অনেকটা অব্যাহতি দেওয়ার হয়েছে। সবশুদ্ধ বলা যায় যে এবারকার বাজেটের মূলনীতি হল ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দান, বিশেষ করে সেই ক্ষুদ্রশিল্প যদি গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়। এই নীতি আজকাল প্রায় সকলে বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতের দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অভাবের সমস্যা দূর করতে হলে বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারণের জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এবারকার বাজেটে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা শক্ত। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা, বা বেসরকারি বিনিয়োগের মূল সমস্যা সমাধান করতে হলে করনীতি ছাড়াও অন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সে সব ব্যবস্থা কী হবে সেটা নূতন পরিকল্পনা নীতিতে স্থির হবে। এ বছরের বাজেট নূতন সরকার মাত্র তিনমাস সময়ের মধ্যে তৈরি করেছেন, অতএব এর মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন থাকবে এটা আশা করা অসঙ্গত। আগামী কয়েক মাসে নূতন পরিকল্পনা কমিশন আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক উন্নতির কর্মপন্থা কী রকম হবে তার একটা খসড়া তৈরি করতে পারবেন নিশ্চয়ই। এবং তখন সময় আসবে নূতন করনীতি এমন ভাবে তৈরি করবার, যাতে সম্ভাব্য সব উপায়ে সঞ্চয় বাড়ানো যায় এবং দেশব্যাপী কৃষি ও শিল্পোন্নতি, কর্মসংস্থান ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণের পথে বিনিয়োগকে চালিত করা যায়।

অমর নাথ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট কতটা জনতা-বাজেট

প্রশ্নটার মধ্যে কতখানি কৌতূহল আর আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব রয়েছে তা আমার জানা নেই তবে কেন্দ্রে সমাসীন জনতা সরকারের বাজেট নিঃসন্দেহে কিছুটা চমকের সৃষ্টি করেছে। জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ ছিল সেগুলি বহুলাংশে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে এবারের এই কৃষি উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় বাজেটে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উপরে যে পরিমাণ ঝোঁক দেওয়া হয়েছে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবারের বাজেটে মধ্য ও উচ্চ আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের যতটা হতাশ হতে হয়েছে ততটা সুবিধা মিলে গেছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের যাঁদের মাসমাইনের উর্দ্ধসীমা মোটামুটিভাবে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। আর একটা সুবিধে, পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের নানাবিধ প্রকল্পে বিশেষত কৃষি আর সেচ, রাস্তাঘাট আর পানীয় জল, প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস মিলেছে। এবারে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রচলিত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বহাল উৎপাদন শুল্কের উপরে অতিরিক্ত ১ শতাংশ বৃদ্ধি, এর পেছনে সতর্কতার আভাস পাওয়া যায়।

বস্তুত মুদ্রাস্ফীতি কবলিত ও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর ভারে প্রপীড়িত আর্থিক কাঠামোয় নতুন করের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ একান্তই সীমাবদ্ধ। তবুও এবারের বাজেটে দুটো আপাত বৈশিষ্ট্য হ'ল, প্রথমত সামগ্রিক করের পরিসরে সম্ভাব্য সংকোচন। আর দ্বিতীয়ত ঘাটতি ব্যয়ের মাত্রা ন্যূনতম পর্য্যায়ে সীমিত করা। আগামী আর্থিক বছরে সংগ্রহযোগ্য কর আদায়ের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ হ'ল ১৩০ কোটি টাকা। আর ঘাটতি ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হ'ল ৯২ কোটি টাকা আর পরোক্ষ কর হ'ল ৫৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেই শুধু বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা বাৎসরিক ৮০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে, আর সেইসঙ্গে কোম্পানিগুলির আয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল কোম্পানিগুলির সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নে পরিবেশ সৃষ্টি করা। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সামান্যই হেরফের ঘটানো হয়েছে। তাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যস্তরে করজনিত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটে।

কৃষি উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসার ঘটে আর সেইসঙ্গে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী হ'ল শিল্পগত মন্দা ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। এই অবস্থার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করে বেশ কয়েকবারই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্টে ও বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রসার ঘটে। আর এজন্যই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের গুরুত্ব খুবই বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে আর্থিক বিনিয়োগে নানারকম সুবিধা প্রদান করে একটা অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন।

উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়ে গিয়েছে। চিরাচরিত ধারায় আর্থিক ও রাজস্বগত অনুদান বা মঞ্জুরি মারফত সুযোগ সুবিধে শিল্পে কেন দেওয়া হয়নি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে গতানুগতিক বা মামুলি প্রথায় শিল্পে কোনও প্রকার সাহায্য ফলপ্রসূ হবেনা। বিগত কয়েকবছরের ইতিহাস তাঁর এই যুক্তি প্রমাণ করছে। কিন্তু তার জন্য শিল্পকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্পের (Investment Allowance Scheme) সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি দাবী পূরণ করেছেন। শুধুমাত্র ৩৮-টি স্বল্প-গুরুত্বসম্পন্ন শিল্প ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শিল্পে প্রচলিত ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্প কার্যকর হওয়ার একটা প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী দেশের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলিতে এক বছরে

মোট ২১৩ কোটি টাকার মত নতুন বিনিয়োগ ও মূলধন সম্প্রসারণ ঘটবে।

শিল্পক্ষেত্রে আরও কতকগুলি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তবে সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই সুবিধে মিলবে। রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুবিধে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ইউনিট যদি চালু ইউনিটগুলির সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তি ঘটায় তবে সেক্ষেত্রে রুগ্ন শিল্পের সঞ্চিত ক্ষতির তহবিল চালু সংস্থার মুনাফার সঙ্গে সমীকরণ করা যাবে। আর একটি সুবিধে হ'ল যে, কোন কোম্পানি যদি স্বীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে লগ্নীব্যয় করে তবে সরকার তাকে করযোগ্য মুনাফায় কিছুটা রেহাই অনুমোদন করবেন।

বর্তমান বাজেটে আশু সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও সুষ্ঠু উন্নয়নের একটা পথনির্দেশ করা হয়েছে। ফলে বর্তমান-কালের বার্ষিক ১২.৫ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের তাগিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের জন্য সম্ভাব্য পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ও সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সাধনে অর্থমন্ত্রীর প্রধান সহায়ক দুটি শক্তি হ'ল বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ও খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার। বিদেশী মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল থেকে ৮০০ কোটি টাকায় ঋণ নেওয়ার ফলে ঘাটতি ব্যয়ের সীমা সংকুচিত করা সম্ভব হয়েছে। আর সেইসঙ্গে খাদ্যসংগ্রহ অভিযানে সরকারী অর্থব্যয়ে বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, রাজস্ব ব্যয় ও দেশরক্ষা খাতে অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করে ও উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির যথাযথ বিন্যাস ও চালু প্রকল্পগুলির রূপায়ণে একটা গতিসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন।

তবে প্রত্যেক বাজেটের মত এবারের বাজেটও কিছু দুর্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-সংস্থাগুলি উৎপাদনক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে অনেকগুলি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা সৃষ্টি করা দরকার। আগামী বছরে পরিকল্পনা ব্যয় ২৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৯,৯৪৭ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির দরুণ এর প্রকৃত পরিমাণ বেশ কিছুটা কমে যাবে। তাছাড়া শিল্প হ'ল অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত ক্ষেত্র যেখানে অর্থনৈতিক গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারে। অনেকের মতে শিল্পে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দিয়ে কৃষির উপর সহসা গুরুত্ব প্রদান করায় জাতীয় উৎপাদন ক্রম-ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্যের অভাব দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

ঘাটতি ব্যয় প্রসঙ্গে আর একটি দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় থেকে ৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা করা হবে তার সুস্পষ্ট কোনও হদিস নেই। যদি তা মামুলি সরকারী ঋণ পত্রের (Ad-hoc Securities) মাধ্যমে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে নোট ছাপানোরই নামান্তর। তবে এটুকু মাত্র আভাস মিলেছে যে এক বিশেষ সিকিউরিটির মাধ্যমে এই টাকা তোলা হবে। কিন্তু তাহলেও মুদ্রাস্ফীতির সমূহ সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায়না। তবে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখবার একটাই পথ এক্ষেত্রে খোলা রয়েছে। ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রার সমমূল্যে যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তাহলে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ না বেড়ে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

মোটের উপর বাজেটের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে যে চিত্রটি সুস্পষ্ট হয় তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে একটি সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে করের হেরফের ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী একটি সুসংবদ্ধ অথচ উন্নয়নমূলক বাজেট সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অল্পবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের রেহাই দান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুতপক্ষে অর্থমন্ত্রী একটি পুনর্বন্টনমূলক করবিন্যাস প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সর্বাধিক রাজস্ব (৯২ কোটি) প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করছেন। সেসঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়স্তরের বৈষম্য হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষির উপরে বাজেটের গুরুত্ব জনতা সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর নবরূপায়ণ নির্দেশ করে। বিশেষত এই পথে কৃষিই হবে ভাবী অর্থনীতির উন্নতির পরিমাপক ও উন্নতি বিধায়ক। আর শিল্প তার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

রুমমেট

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ও অবহেলার গ্লানি কুড়োতে পারিনা আর।

কিন্তু রুমের দরজার কাছে এসেই চিন্তাধারা থেমে গেল। দরজা ভেজানো, অর্থাৎ শকুন্তলা রুমেই আছে। ওর কথা মনে হ'তেই রক্ত হিম হয়ে এলো যেন। ক করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো সেইটাই সিব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ও যদি জানতে পারে? তখনি আবার মনে হ'ল, জানলোই বা, লুকোচুরির কিই বা আছে এতে? আজকেই বলবো ওকে সব কথা। জানিয়ে দেবো শোভন চলে গেছে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মত।

একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। দেখি শকুন্তলা বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "কুন্তী কি হয়েছে রে?" চমকে মুখ তুলে তাকালো শকুন্তলা। হঠাৎ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। হুড়মুড় করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর আমি প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাতে চেপে ধরলাম টেবিলটাকে। মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ—দেয়ালগুলো চোখের সামনে দুলছে।

শকুন্তলার বিছানার উপর শোভনের ফটো। ফটোর কাঁচে তখনো টল টল করছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে ২৪ জুন, শুক্রবার ১৯৭৭ সাল। এপ্রিল মাসে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সপ্তম বিধানসভা ভেঙ্গে দেন। মে মাসে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন বিধান সভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ ও ১৪ জুন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সমাধা হয়। এই নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা ও কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে সি-পি-আই(এম)-এর নেতৃত্বে ছয়দলের বামফ্রণ্ট নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ২১ জুন সি-পি-আই(এম)-এর নেতা জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ২২ জুন আরও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলে পশ্চিমবঙ্গে ২২ জনের মন্ত্রিসভায় বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে রাজ্যের সপ্তম বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে ২১৬ টিতে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছিলেন। সেবার সব দল মিলিয়ে ও নির্দলদের নিয়ে মোট প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ছিল ৮৩৩ জন, ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭,৯৪৬ টি। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে অষ্টম বিধানসভার এই যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে মোট ২৯৪ টি আসনের জন্য (লক্ষ্যণীয়, ১৪ টি আসন বেড়েছে), নির্দল প্রার্থীদের ধরে মোট প্রার্থী ছিলেন ১,৫৭১ জন। ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৯,০৬২। এবার একটি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হয়নি। পুরুলিয়া জেলার আরসা কেন্দ্রে জনতা দলের প্রার্থীর নির্বাচনের ঠিক আগেই মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ওই কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রেখেছেন। সুতরাং ১৯৭২ সালের ২৮০ জন সদস্যের তুলনায় এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট ২৯৪ জন সদস্যের মধ্যে ২৯৩ জনের জন্য ন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যখন এপ্রিল মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখন মোট ২৮০ জনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১৬, সি পি আই-এর ৩৫, আর এস পি-র ৩, সংগঠন কংগ্রেস ২ গোর্খা লীগ ২, এবং নির্দল ৫। যদিও সি পি আই (এম) ১৪ টি আসনে, এবং এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স পার্টি ১ টি করে আসনে জয়লাভ করেছিলেন, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে এই সদস্যরা বিধানসভা বর্জন করেছিলেন। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস ও জনতা দল উভয়েই ২৯৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সি পি আই (এম) দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট), আর সিপি আই ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে একটি বামফ্রণ্ট গঠন করেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে সি পি আই (এম) প্রার্থী দেন ২২৪ টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩৬ টিতে, আর এস পি ২৩, ফরওয়ার্ড ব্লক (মাঃ) ৪, আর সি পি আই ৩ ও বি বা কং ৩টি আসনে। যদিও ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে তারপর চারটি নির্বাচনে হয় সি পি আই দল অপর কোন বামফ্রণ্ট কিংবা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে আসন ভাগাভাগি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন, এবার এঁরা

শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন

একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন ; সি পি আই প্রার্থী দিয়েছিলেন ৬২ টি আসনে। তেমনি এস ইউসিও এবার কোন বামফ্রণ্টে যোগ না দিয়ে নিজেরা ২৩টি আসনে লড়াই করেছেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে অপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় নকসাল-পন্থী বলে পরিচিত সি পি আই (এম-এল)-এর একটি গোষ্ঠীর নির্বাচনের লড়াই-এ সামিল হওয়া। নকশাল নেতা শ্রী সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থা ঘোষণা করেন এবং এঁদের তিনজন নেতা নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এঁরা তিন জনই মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রী সন্তোষ রানা গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। অপর দুজন অবশ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সর্বভারতীয় সি এফ ডি দল জনতা দলের সঙ্গে মিশে গেলেও অপর কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও সি এফ ডি-র কিছু বিক্ষুব্ধ সদস্য আলাদা ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রায় ১৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে মাত্র একজন—শ্রী আবদুল করিম চৌধুরী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এবার মোট চার জন নির্দল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে একজন সি পি-আই (এম) সমর্থিত।

ছয় পার্টির বামফ্রণ্ট এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় এসেছেন। ১৯৭২-এর বিধানসভায় যদিও ২৮০ জনের মধ্যে ২১৬জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেসও বিপুল সংখ্যা-ধিক্যের সমর্থন লাভ করেছিলেন, এবারকার বামফ্রণ্টের গণসমর্থন তার চেয়েও বিরাট—সর্বকালের রেকর্ড। বামফ্রণ্টের মোট সদস্যর সংখ্যা ২৩০, এঁদের মধ্যে সি পি আই (এম)-এর ১৭৮ (একজন সমর্থিত নির্দলকে নিয়ে), ফ: বু:এর-২৫, আর এস পি-র ২০, ফ: বু: মা: ও আর সি পি আই ৩ জন করে এবং বি বা কং ১ জন সদস্য। জনতা দল পেয়েছেন ২৯ জন সদস্য। কংগ্রেস ২০ জন। সি পি আই মাত্র ২ জন। অন্যান্য দলের হিসাব: এস ইউ সির ৪, গোর্খা লীগ ২, সি পি আই (এম-এল), মুসলীম লীগ ও সি এফ ডি ১ জন করে এবং নির্দল ৩ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বামফ্রণ্ট ২৩০ টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করার পর বিধানসভায় বিরোধী পক্ষে মোট মাত্র ৬৩ জন সদস্য থাকলেন। গরিষ্ঠ বিরোধী দল হিসাবে জনতা দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কাশীকান্ত মৈত্র। কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা হয়েছেন ডা: জয়নাল আবেদিন।

এবার মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ভোট বিধিসম্মত ভাবে দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন গণ্য করেছেন। এই মোট বিধিসম্মত ভোটের মধ্যে একক বৃহত্তম দল সি পি আই (এম) পেয়েছেন ৫১ লক্ষ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৩৬ ভাগ, যদিও ১৭৮ জন প্রার্থী (বিধানসভার মোট নির্বাচিত ২৯৩ জনের শতকরা ৬১ ভাগ) নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। বামফ্রন্টের অপর পাঁচটি দল একত্রে ৫২ টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন, এই দল কটির মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ১১ ভাগ।

জনতা দলের প্রার্থীগণ মোট ২৮ লক্ষের কিছু বেশী ভোট অথাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২০ ভাগের কিছু বেশী পেয়েছেন, এই দলের বিজয়ী সদস্যের সংখ্যা ২৯ হওয়ায় দল বিধান-সভার মোট আসনের শতকরা দশটিও লাভ করতে পারেন নি। কংগ্রেস দল পেয়েছেন ৩২ লক্ষ ভোট এবং মাত্র ২০ টি আসন। অর্থাৎ বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২২½ ভাগ ভোট পেলেও আসনের হিসাবে সে-সমর্থন প্রতিফলিত হয় নি। জেলার হিসাব বিচার করলে দেখা যাবে জনতা প্রার্থীগণ কুচবিহার, ২৪ পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ বর্ধমান, বীরভূম ও পুরুলিয়া এই কটি জেলায় একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেন নি। তেমনি কংগ্রেস কোন আসন পাননি কলকাতা, হাওড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বাঁকুড়া ও হুগলী প্রভৃতি সাতটি জেলায়। জনতা দল সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছেন—৩৭ টির মধ্যে ১৭—মেদিনীপুর জেলায়, আর কংগ্রেস পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী—১৯ টির মধ্যে ছটি—মুর্শিদাবাদে।

সকলেই জানেন জনতা দল নবাগত-হলেও এই দলের সর্বভারতীয় প্রাধান্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে এই দলের পরিক্রমন অনুসন্ধিৎসার বিষয়। তেমনি, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি আই (এম) ও কংগ্রেসের উত্থান-পতন কৌতূহলী পাঠক মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন, সন্দেহ নেই। যদিও অতীতের হিসাব থেকে জনতা দলের কোন চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় তথাপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিবরণ থেকে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। এই সংকলন ১৯৬১ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করা হয়েছে কারণ ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত সি পি আই ভাগ হবার আগে পৃথক দল হিসাবে সি পি আই (এম)-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মোটামুটি হিসাবে সি পি আই এবং আরও কয়েকটি দলের উল্লেখও করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ২২ জন সদস্যের মন্ত্রিসভায় —সি পি আই (এম)-এর ১৪ জন, ফরওয়ার্ড ব্লকের চার, আর এস পি-র ৩ ও আর সি পি আই-এর ১ জন। সি পি আই (এম)-এর শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী। ৯৬৭ ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল—দুবারই সি পি আই (এম)-এর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে অন্য বেশ কয়েকটি দল যুক্ত হয়েছিল। দুবারই শ্রী বসু উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর এই বর্তমান

মন্ত্রিসভাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দশবার সরকারের বদল হল। বর্তমান বিধানসভা তথা নতুন সরকারের কথা বলতে হলে বোধ হয় ঐতিহাসিক বর্ণনার খাতিরে আগের সরকারগুলির উল্লেখও প্রয়োজন :

১। মার্চ ১৯৬৭—নভেম্বর ১৯৬৭ প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার।

২। নভেম্বর ১৯৬৭—জানুয়ারী ১৯৬৮ পি. ডি. এফ. সরকার।

৩। জানুয়ারী ১৯৬৮—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রাষ্ট্রপতি শাসন।

৪। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭০ দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার

৫। এপ্রিল ১৯৭০—মার্চ ১৯৭১ রাষ্ট্রপতির শাসন।

৬। মার্চ ১৯৭১—এপ্রিল ১৯৭১ অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সরকার

৭। এপ্রিল ১৯৭১—মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির শাসন।

৮। মার্চ ১৯৭২—এপ্রিল ১৯৭৭ কংগ্রেস সরকার।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জনৈক ভোটদাতা ভোট প্রয়োগ করছেন

৯। এপ্রিল ১৯৭৭—জুন ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতির শাসন।

১০। জুন ১৯৭৭— বামফ্রণ্ট সরকার

গত দশ বছরে দশবার সরকার পরিবর্তন কী সূচীত করে? বাঙ্গালীর চপলচিত্ততা? নাকি, সমস্যাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা? রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙ্গালী অস্থির কারণ সে অধীর আগ্রহে এমন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা চাইছে যা তাকে শুধু সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি দেবে তাই নয়, আরও বেশী করে দেবে স্বাধীনতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষায় নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার নিরঙ্কুশ সুযোগ।

দল	১৯৬৭ মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	১৯৬৭ মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	১৯৬৯ মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	১৯৬৯ মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	১৯৭১ মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	১৯৭১ মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	১৯৭২ মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	১৯৭২ মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	১৯৭৭ মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	১৯৭৭ মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)
কংগ্রেস	৪১	১২৭ (২৮০)	৪০	৫৫ (২৮০)	৩০	১০৫ (২৮০)	৪৯	২১৬ (২৮০)	২২.৫	২০ (২৯৩)
সি পি আই (এম)	১৮	৪৩ (১৩৫)	২০	৮০ (৯৭)	৩৪	১১৩ (২৩৮)	২৮	১৪ (২০৮)	৩৬	১৭৮ (২২৪)
সি পি আই	৭	১৬	৭	৩০	৯	১৩	৮	৩৫	—	২
ফঃ বঃ	৪	১৩	৫	২১	৪	৩	১	০	—	২৫
আর এস পি	২	৬	৩	১২	২	৩	২	৩	—	২০
এস ইউ সি	০.৭	৪	১.৫	৭	২	৭	১	০	—	৪
কংগ্রেস (সং)	—	—	—	—	৬	২	১	২	—	—

পল্লীউন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

জ্বালানীর ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, যোজনায় পেট্রোলিয়াসের জন্য বরাদ্দের হিসেব গত বছরের ৪৮৫ কোটি টাকাকে আরো বাড়িয়ে এ বছর ৬৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপকূল-ভাগ ও স্থলভাগে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে ৪৫১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সম্প্রতি বোম্বাই হাই ও বেসিন ক্ষেত্রে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

১৯৭৭–৭৮ সালে দেশে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টনে পৌঁছাবে আশা করা যায়। গত বছর উৎপাদিত হয়েছিল ৮৮৯ লক্ষ টন।

২০০ মেগাওয়াটের একটি নতুন লিগনাইট-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য নাভেলি লিগনাইট করপোরেশনকে দেওয়া হবে ৫ কোটি টাকা। তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎঘাটতির কথা বিবেচনা করে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৬৫১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩০২ কোটি টাকা রেল পাবে। রেলের বাজেট বরাদ্দ হল ৪৮০ কোটি টাকা।

গ্রামাঞ্চলে আরো বেশী সংখ্যক ডাকঘর চালু করা, এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সুযোগসুবিধা প্রচলনের জন্য অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সুপরিচালনার ফলে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলি যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য যোজনায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে ৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পরে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ হতে পারে। ঐসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। তাঁত শিল্পের জন্য ২০ কোটি এবং রেশম চাষের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

সময় সংক্ষেপ এবং চালু প্রকল্পগুলিতে প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ অব্যাহত রাখার দরুণ 'আমাদের ঘোষিত নীতি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো সম্ভব হয়নি বলে শ্রী প্যাটেল সংসদে মন্তব্য করেন। এছাড়া সম্প্রতি পুনর্গঠিত যোজনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে উঠতে পারেননি বলেও তিনি জানান। শ্রী প্যাটেল বলেছেন, দলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে পল্লী উন্নয়ন, হরিজন, আদিবাসী ও অন্যান্য অবহেলিত শ্রেণীগুলির অবস্থার উন্নতি, বেকারী দূরীকরণ, এবং ঘিঞ্জি-বস্তী অপসারণ সহ অন্যান্য সমাজসেবার প্রসারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তিনি এমন একটি বাজেট রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যাতে দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের দর্শন, কর্মসূচী ও নীতিগুলির যথার্থ প্রতিফলন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নতির জন্য শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ, সেচ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের উন্নতির জন্য শতকরা ৫.৪ ভাগ, পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদির জন্য শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ব্যয় নির্ধারিত করা হয়েছে। ১৯৭৬–৭৭ সালের সংশোধিত ব্যয়-তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে আনুপাতিক হারে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে, আর এই ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সংকুচিত করা হচ্ছে শিল্প (বিশেষ করে রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য, লৌহতর খনিজ এবং পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল শিল্প) এবং সমাজকল্যাণ (বিশেষত পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা) বিষয়ক ব্যয়বরাদ্দকে। বর্তমান বাজেটে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ (৩,৪৩১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা)। কিন্তু এর চেয়েও বেশী হারে ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন, গ্রামীণ পানীয় জলের সংস্থান, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, নগর উন্নয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা, ভূমিসংরক্ষণ, পশুপালনশিল্প, মৎস্যচাষ, বনসংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, পেট্রোলিয়াম উত্তোলন, ঔষধ প্রস্তুতকারক শিল্পের বিকাশ, ইলেকট্রনিক্স্‌, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিমান পরিবহণ ইত্যাদি।

প্রদত্ত তালিকা থেকে অনুমান করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের এই বৎসরের পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের দিক থেকে নজর খানিকটা সরিয়ে এনে চালক শিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষি, সেচ, বনভূমি ও জলাধারের উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের মানুষের জীবিকার পথকেও সুগম করার চেষ্টা রয়েছে এই নূতন ব্যবস্থায়। দেশের স্বয়ংম্ভরতা বাড়াবার জন্য পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশাগত পেট্রো-লিয়ামের উপর একান্ত নির্ভরশীল রাসায়নিক শিল্পগুলির বিস্তারে সরকারী আগ্রহ বেশ খানিকটা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ানো এবং সেই ব্যয়কে নূতনতর খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টাই বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলে সাধারণ মানুষের বেকারি ও আর্থিক দুর্গতি হ্রাস পাবে এবং দেশে বিদ্যুৎ ও তেলের ঘাটতি কিছু পরিমাণে মিটবে বলে আশা করা যায়। তবে একটি মাত্র বাজেটের সাহায্যে দেশের আর্থিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হবে এমন আশা সরকারী মহলও নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। পরিবর্তনের দিকে সামান্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপকেই আপাতত যথেষ্ট বলে ভাবা উচিত।

অমলেন্দু রায়চৌধুরী

আপনার আয়কর কত দাঁড়াল

জনতা সরকারের প্রথম বাজেটে আয়কর রেহাইয়ের সীমা আট হাজার থেকে বেড়ে দশ হাজার টাকায় দাঁড়াল। কিন্তু যে সমস্ত করদাতার করযোগ্য আয় দশহাজার টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে আট হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের সবটাতেই ১৯৭৬-৭৭ সালের করহার অনুযায়ী কর ধার্য্য করা হবে। যাদের বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকার সামান্য বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিছু প্রান্তিক (Marginal) সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কোম্পানীগুলি বাদে অন্যান্য সকল শ্রেণীর আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জ দশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পনের শতাংশ করা হয়েছে। পনের হাজার টাকার অধিক আয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিক জমা আরো দু বছর চালু থাকবে।

বার্ষিক দশ হাজার টাকার বেশি আয় না হলে আয়কর দিতে হচ্ছে না। কিন্তু আয় দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলেও নানা রকম ছাড় আছে যেমন দশ হাজার টাকা আয়ের বেতনভুক কর্মচারীরা যাতায়াত, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ কুড়ি শতাংশ হারে ছাড় পাবেন। আয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলে পরবর্তী ধাপের আয়ের জন্য এটা হবে শতকরা দশভাগ। এই বাবদ যে রেহাই পাওয়া যাবে তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ অবশ্য ৩৫০০ টাকা। এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়া ভাতাকে বেতনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে না। বাড়ীভাড়া ভাতাও আয়কর থেকে ছাড় পাওয়া যায়। মালিক পক্ষ যদি কোথাও তার কর্মচারী বা অফিসারকে মোটর গাড়ী বা স্কুটার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেন তাহলে সেই কর্মচারী বা অফিসার এই বাবদ এক হাজার টাকার বেশি রেহাই পাবেন না।

যারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, জীবন-বীমা, ডাকঘরের দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা বা ইউনিট ট্রাষ্টের জীবন বীমায় টাকা জমান তাদের জমার প্রথম চারহাজার টাকায় কোন আয়কর দিতে হবে না। তার সমগ্র আয় থেকে এই টাকাটা বাদ দিয়ে বাকী টাকার উপর আয়কর ধার্য্য করা হবে। এ বিষয়ে নিয়ম হল পরবর্তী জমা ছ হাজার টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বাকী জমানো টাকার শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া যাবে। কিন্তু তাই আয়করের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বেতনের সব টাকা জমানো চলবে না। মোট বেতনের (বেতন থেকে যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ যে ছাড় পাওয়া যায় তা বাদ দিয়ে যেটা থাকে) শতকরা ৩০ ভাগের বেশি জমানো টাকা কর রেহাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ আয়করদাতা আছেন। জনতা সরকারের বাজেটে কর রেহাইয়ের সীমা দুহাজার টাকা বর্দ্ধিত হওয়ায় ৮ লক্ষ ২৩ হাজার আয়করদাতা এখন আয়করের আওতার বাইরে চলে গেলেন।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী করহার ওয়াংচু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিয়ে ৬৬ শতাংশ করে দিলেন। জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সারচার্জ পাঁচ শতাংশ বাড়ানোতে করহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে দাঁড়াল ৬৯ শতাংশ।

প্রথম জনতা বাজেটে ১০,৫৫০ টাকার বেশি আয়কারী ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে করের বর্ত্তমান ও নূতন হার অনুযায়ী হিসাব তালিকা নিচে দেওয়া হল:—

(টাকার হিসাবে) আয়	আয়কর (দশ শতাংশ সারচার্জ সহ বর্ত্তমান হারে)	আয়কর (প্রস্তাবিত পনের শতাংশ সারচার্জ সহ)	করবৃদ্ধি	হ্রাস
১০,০০০	৩৩০	নাই		— ৩৩০
১০,৫০০	৩৮৩	৩৮৫	+ ২	
১১,০০০	৪৯৫	৫১৮	+ ২৩	
১২,০০০	৬৬০	৬৯০	+ ৩০	
১২,৫০০	৭৪৩	৭৭৬	+ ৩৩	
১৫,০০০	১,১৫৫	১,২০৮	+ ৫৩	
২০,০০০	২,১৪৫	২,২৪৩	+ ৯৮	
২৫,০০০	৩,৫২০	৩,৬৮০	+ ১৬০	
৪০,০০০	৯,৫৭০	১০,০০৫	+ ৪৩৫	
৫০,০০০	১৩,৯৭০	১৪,৬০৫	+ ৬৩৫	

এই তালিকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের ব্যক্তিদের কর বৃদ্ধি কতটা তা বোঝা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোররজী দেশাইকে একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, দশহাজার টাকা পর্যন্ত আয় আয়করমুক্ত রাখা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেছেন যে তিনি ইচ্ছে করলে এটা চার হাজার টাকায় নামিয়ে আনতে পারতেন। ব্যাপারটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাৎসরিক ১৬,৯৪৪ টাকা আয়েও এক পয়সা আয়কর না দিয়ে পারা যাবে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করুন মাসিক ৯০০ টাকার মূল বেতনের একজন কর্মচারীর বার্ষিক আয় নিম্নরূপ:—

বেতন	১০,৮০০ টাকা
বাড়ীভাড়া ভাতা	১,৬২০ টাকা
শহর ক্ষতিপূরণ ভাতা	৬৪৮ টাকা
মাগ্গী ভাতা	৩,৮৭৬ টাকা
মোট	১৬,৯৪৪ টাকা

এবারের বাজেট অনুযায়ী আয় দশ হাজার টাকা ছাড়ালেই আয়কর দিতে হবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের আয় ১৬,৯৪৪ টাকা হলেও তিনি এক পয়সাও আয়কর না দিয়ে পারেন। তাঁকে অবশ্য সঞ্চয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক:

মোট আয়	১৬,৯৪৪ টাকা
(ক) বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ বাদ	১,৬২০ টাকা
	১৫,৩২৪ টাকা

অফিস যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ বাদ—
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২০০০ টাকা

(খ) বাকী ৫,৩২৪ টাকার জন্য	৫২৩ টাকা
মোট	২,৫২৩ টাকা

এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়াকে মোট আয় থেকে বাদ দিতে হয়।

(গ) জীবনবীমা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ডাকঘরে দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় ইত্যাদি বাবদ বাদ	৩,০০০ টাকা
মোট ছাড়	৭,১৪৩ টাকা

ভদ্রলোকের আয়ের ১৬,৯৪৪ টাকা থেকে ৭,১৪৩ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ৯.৮০১ টাকা। যেহেতু এই টাকা ১০,০০০ টাকার কম অতএব তাকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হবে না। এছাড়াও পূর্ববর্তী বাজেটগুলিতে মধ্য-বিত্তদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল—যেমন মাসিক এক হাজার টাকা আয়ের কর্মচারীদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তান কিংবা নির্ভরশীল ভাই বোনদের জন্য যে ব্যয় তাতে রেহাই দেওয়া—জনতা সরকারের বাজেটে এ সব সুযোগ সুবিধা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

স্বেচ্ছা ঘোষণা অনুযায়ী অনেকেই গোপন আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন, যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেন নি তাদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তাই কর ফাঁকি বন্ধের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কর ফাঁকি ধরা পড়লে জরিমানা হবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, ব্যাংকে রাখা টাকা আয়-কর বিভাগ আটকে দিতে পারবেন এবং কারাবাসও করতে হবে। আইন ব্যাপারে আয়কর বিভাগকে অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়েছে। অপরদিকে আয়কর বিভাগকে এও দেখতে হবে সৎ আয়কর দাতারা কোন ভুল করে ফেললে তাদের যেন কোন হয়রানি না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বিভাগও চান করদাতারা যেন নিজেদের আয়ের রিটার্ণ ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পূরণ করে কর বিভাগে জমা দেন। অগ্রিম কর প্রদান করে, স্বনির্দ্ধারিত কর (Self assessment tax) ঠিক সময়ে জমা দিয়ে, হিসাব ঠিকমত রেখে (দুরকম খাতা নয়), করবিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর উল্লেখ করে করদাতারা আয়কর বিভাগকে সাহায্য করতে পারেন। এখন সব করদাতাকেই পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই নম্বর তাঁদের চিঠিপত্রে; রিটার্ণফর্মে এবং চালানে উল্লেখ করতে হবে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগে যেমন কনজিউমার নাম্বার দিতে হয়; আয়কর বিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে তেমনি পার্মানেণ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে।

নিজেদের হিসাব পত্রের খাতা যথাযথ ভাবে রাখাও করদাতাদের অবশ্য কর্তব্য। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, হিসাব-রক্ষক, শিল্প বিষয়ক পরামর্শ-দাতা, প্রভৃতির আয় যতই কম হোক না কেন, হিসাব তাঁদের রাখতেই হবে। ব্যবসায় বা পেশায় নিযুক্ত প্রত্যেক করদাতা যাঁদের আয় বার্ষিক ২৫,০০০ টাকার উপরে বা ব্যবসায়ে বার্ষিক বিক্রয় আড়াই লাখ টাকার বেশি তাঁদেরও অবশ্যই হিসাব রাখতে হবে।

১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আয়কর আইনে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। তাতে হিসাব বহির্ভূত ব্যয়কে আয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যদি কোন আয়কর দাতা এমন কিছু ব্যয় করে থাকেন যে ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে এল সে সম্পর্কে আয়কর অফিসারের কাছে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে তিনি না পারেন তাহলে সেই ব্যয় তাঁর আয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে। আয়কর রিটার্ণ ফর্মের চতুর্থ অংশে এখন কর দাতাকে বাড়ীভাড়া, যাতায়াত, বিদ্যুৎ খরচ, ক্লাব এবং ভ্রমণ ও ছুটি কাটান সম্পর্কিত যাবতীয় খরচের হিসাব দিতে হবে।

আয়কর আইনকে ভালভাবে জেনে নিজের সঠিক আয়কর দিয়ে দিলে করদাতারা নির্ভীক ভাবে থাকতে পারেন—আয়কর বিভাগের কোন চিঠি পেলেই আর ভয়ে বক্ষ-কম্পন সুরু হয় না। অবশ্য এই আইন খুবই জটিল এবং তাই বর্তমান অর্থমন্ত্রী এইচ. এম. প্যাটেল এই আইনকে সরল করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আজকের প্রকল্প—যৌথ বীজতলা

কান্তিপদ ঘোষ

আবার এসেছে আষাঢ়। কাজল মেঘের কালো কোমল ছায়া, ঘনিয়ে আসছে থেকে থেকে। ঝর ঝর মুখর বাদল দিন। মাঠের পর মাঠ থৈ থৈ করছে বৃষ্টির জলে। কিন্তু আর একটা পরিচিত দৃশ্য এই দৃশ্যপটে নেই। সেটা হল টোকা মাথায় দিয়ে দলে দলে সকল কৃষকদের ধান রোয়ার ব্যস্ততা। কারণ সকলের চারা তৈরী হয়ে ওঠেনি। জলদি রোয়ার সুবিধাটুকু হাতছাড়া হয়ে গেল। এমন আর একটি ছবি। শরৎ শেষে হিমের পরশে শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অনেক অনেক ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে সে আসছে। কিন্তু মাঠে মাঠে তার আয়োজন কি সারা হয়েছে? কোথাও কিছু মাঠে চাষ পড়েছে, কোন মাঠে এখনও ধান তোলা হয়নি, কোন মাঠে ধানে কাস্তেই চলে নি। আবার কোন মাঠে এখনও ধানে জল দাঁড়িয়ে আছে। খরিফ মরশুমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধান রোয়ার ফলে শীতের ফসলও নাবি হতে লাগল। ফলে এই বাংলার স্বল্প স্থায়ী মূল্যবান শীতের অনেকটাই অপচয় হল। এই ক্ষতিগুলো কি এড়ান যায় না? হ্যাঁ যায়। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে আজকের প্রকল্প—যৌথ বীজতলা।

ধানের বীজতলার সাধারণ ছবি কি? আকাশের মুখ চেয়ে বা ক্যানেলের জলের ভরসা করে বর্ষা নামার সময় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ধারণা করে চাষীরা মাঠে বীজ ফেলেন। সাধারণত চাষীরা তাদের নিজের নিজের জমিতে নিজের প্রয়োজনীয় বীজটুকু ফেলেন। অধিকাংশ বীজতলাতেই সেচের বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে চারার উপযুক্ত বাড় অনেক সময়েই সময়মত হয় না। নাবি বৃষ্টিপাত, ক্যানেল বা সেচের জল পেতে বিলম্ব বা অন্যান্য নানাবিধ কারণ অনেক সময় ধান রোয়া বিলম্বিত করে। এই জন্য বর্ষা নামার ৮–১০ সপ্তাহ পরেও অনেক সময় ধান রুইতে দেখা যায়। এর ফলে যে ক্ষতিগুলির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হচ্ছে:—

(১) ফসল লাগানোর প্রকৃষ্ট সময়ের অপচয়।

(২) চারার বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের সম্যক বৃদ্ধি হয় না। বেশী পাশকাঠি বের হয় না এবং রোয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফুল এসে যায়।

(৩) রোগ ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে।

(৪) ফুল অবস্থায় বা পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়াব সম্ভাবনা বাড়ে।

(৫ সেচের জলের অপচয় হয়।

(৬) পরবর্তী রবি ফসলও নাবি হয়ে যায়।

এই সব কারণগুলি মিলে খরিফ মরশুমে ধানের ফলন অনেক সময় যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই ক্ষতির হাত এড়িয়ে ফলন বৃদ্ধি এবং সেচের জলের সদ্ ব্যবহারের জন্য কৃষক সমাজের সকলের যৌথ প্রয়াসে কম্যুনিটি নার্শারি বা যৌথ বীজতলার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। রোয়া শুরু হওয়ার যথেষ্ট আগে সেচের সুবিধা-যুক্ত একটি জায়গায় সকলে একসাথে নিবিড়ভাবে বীজতলা করুন। প্রতি গ্রামে পুকুর, কূপ বা নলকূপের কাছে রোয়ার প্রকৃষ্ট সময়ের বা ক্যানেলের জল পাওয়ার ৪–৬ সপ্তাহ আগে বীজ ফেলতে হবে। একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট অধিক ফলনশীল দু একটি জাতের বীজ ফেলুন। বহনের খরচা বা সময় কমানোর জন্যে যে মাঠে ধান রোয়া হবে তার কাছাকাছি বীজতলা তৈরী করুন। ধানের চারা বয়ে দূরে নিয়ে যেতে হলে রাস্তার ধারে বীজতলা করাই সুবিধাজনক। অনেক সময় ধানের চারা বয়ে বেশ কয়েক মাইলও নিয়ে যেতে দেখা যায়। যেহেতু বীজতলা বেশীদিন জমি আটকে রাখে না, যে কৃষকের জমিতে এই বীজতলা হবে তার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যৌথ বীজতলায় কৃষকেরা যেভাবে উপকৃত হবেন সেগুলি হচ্ছে—

(১) পূর্বে উল্লেখ করা ক্ষতিকারক সম্ভাবনা থেকে ফসল রক্ষা পাবে।

(২) ধানের জাত বাছাই করার ব্যাপারে কৃষকদের প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আসবে।

(৩) এক সাথে বীজ তৈরী হয়ে যাওয়ার ফলে সারা মাঠে একই সাথে আগেই রোয়া সারা হবে। ফলে ঠিক সময়ে পরবর্তী রবি ফসলের জমি তৈরী ও ফসল লাগানোর জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এবং বহু ফসলী চাষেরও প্রসার হবে।

(৪) ধান আগে ওঠার জন্য জল কম লাগে। ফলে একই জাত বা একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট কয়েকটি জাত ক্যানেল-সেচ

সেবিত এলাকায় এক মাঠে লাগালে শুধু যে রোয়া, সেচ ও সার দেওয়া, রোগ-পোকা দমনের, নিড়েন কাটা ও তোলার সুবিধে হবে তাই নয়, সেচের জলের সাশ্রয় হওয়ার ফলে আরও অনেক বেশী জমি রবি ফসলের আওতায় আনা যাবে। অসেচ এলাকাতেও আগে জমি খালি হওয়ার জন্য অনেক জায়গায় তৈল বীজ, ডাল শস্য ইত্যাদি করার জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকবে।

(৫) শস্যরক্ষার খরচা অনেক কম হয়। কারণ এক একর বীজতলায় ওষুধ দিলে প্রায় দশ একর মূল জমিতে রোয়া ধানে প্রাথমিক ওষুধ দেওয়ার কাজ হয়। বীজতলা একত্রে হওয়ার ফলেও মজুর ইত্যাদি খরচ কম লাগে। ফলনও বৃদ্ধি পায়।

(৬) অনেক সময় নাবি রোয়া ধান জলচাপ হওয়ার ফলে ভাল পাশ-কাঠি ছাড়ে না, গুছির সংখ্যাও কমে যায় এবং সারের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, যৌথ বীজতলা করে জলদি রুইতে পারলে এই ক্ষতিগুলি এড়ানো সম্ভব।

(৭) রোয়া দেরী হলে অনেক সময় তাড়াহুড়োর মাথায় জমিকে সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এই সব আগাছা, যা সহজেই বাড়বার ক্ষমতা রাখে, স্থান, আলো ও সারের ব্যাপারে ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু জলদি রোয়ার ফলে ধান তাড়াতাড়ি বেড়ে আগাছার ক্ষতি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সারেরও সদ্ব্যবহার করতে পারে।

(৮) জলদি রোয়ার যে স্বাভাবিক সুবিধা আছে তার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া যায়। আমাদের চাষীরা বলেন আষাঢ়ের রোয়া ধান 'চার পোয়া' হয় অর্থাৎ মরশুমের পুরো সময়টা ফসল পাওয়ার জমির স্বাভাবিক উর্বরতার গাছ পুরো পেতে পারে।

(৯) অধিক ফলন দেওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত এবং অন্যান্য নতুন জাতগুলির দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়। কারণ এই যৌথ প্রকল্পে এক সাথে অনেক চাষী অংশগ্রহণ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জনই এগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন।

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তাতে গমেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। উপযুক্ত জাতের অভাব ও অন্যান্য কারণে ধানের ফলনে ব্যাপক সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইদানীংকালের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিশীল ধানের জাতের আবিষ্কার, ধানে বিজ্ঞান-সম্মত সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধান চষে অখ্যাত রাজ্যগুলির ধান্যোৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লাভ ইত্যাদি থেকে আশা করা যাচ্ছে 'ধান্য-বিপ্লব' শুরু হওয়ার প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করা গেছে। এই নতুন বিপ্লবে যৌথ বীজতলা বা কম্যুনিটি নার্শারী বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নতুন বাজেটে কর প্রস্তাব

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মাঝারি সংবাদপত্র, দেশী পশম ইত্যাদির উপর।

এছাড়া ঢালাওভাবে ২ শতাংশ কর ধার্য হয়েছে সব জিনিষের উপর যেগুলি অন্যভাবে আবগারী শুল্কের আওতায় পড়েনা। এই শুল্কের হার আগের বাজেটে ছিল ১ শতাংশ এবং ঐ বাজেটেই এই শুল্ক প্রথম বসানো হয়। দেখা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী তাঁর পূর্ববর্তীর পথই এক্ষেত্রে শুধু অনুসরণ করেছেন তাই নয় বরং তাঁর উপর আরও একটু এগিয়ে গেছেন। মনে হয় রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটা এত মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার ফলাফল বিশেষ খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। এমন ঢালাওভাবে আবগারী কর ধার্য করলে তা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সব জিনিষের দামকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং সে হার যত কম থাকে ততই বাঞ্ছনীয়।

সব মিলিয়ে প্রস্তাবিত করব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধি রোধে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত ব্যয়সংকোচ, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির কথা বললেও মোট ধার্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ গত বাজেটের চেয়ে বেশ অনেকটাই বেশী। ফলে নানাভাবে কর সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির একটা বড় কারণ আবগারী কর, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর। সেদিক থেকে নতুন বাজেট কোনও সুবিধার প্রতিশ্রুতি বহন করে না। হাতে কাজ করার ছোট যন্ত্রপাতি বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কি করে বিলাস বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আওতায় পড়ে বোঝা যায় না। এদের মূল্যবৃদ্ধি মানেই অন্য অনেক জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি।

সবশেষে করব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল তার জটিলতা। একথা অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন কর ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে পূর্বে নিযুক্ত নানা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের উপর কি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা তিনি কিছুই জানান নি। যেভাবে ১০,০০০ টাকার উপর আয়করের প্রান্তিক ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে বা পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেভাবে যন্ত্র চালিত বস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে,—সেসবই এই জটিলতার উদাহরণ। এই ধরণের জটিলতার নানা নিদর্শন কর প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে। এতে করদাতারা বিভ্রান্ত হন। সরকারের রাজস্ব আদায়ের খরচ বাড়ে, আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণও আশানুরূপ হয় না। এই জটিলতা পরিহার না করতে পারলে কর-ব্যবস্থা নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আজকের নাটকে

আমরা সবাই 'জগন্নাথ'

'জগন্নাথ' ফাঁসির দড়ি গলায় নেবার আগে বলেছিল 'আমার পাশে বিপ্লবীরা থাকলে দাসবাবুকে আমিও মারতে পারতাম। পারবে, পারবে নন্দ ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে। ধ্যুস্ !'

নাটকের চরম মুহূর্ত এটিই, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও গভীরতার নির্যাসটুকু বেরিয়ে এসেছে এই একটি সংলাপে। নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায় এমনি ছোট ছোট কিছু চিত্রকল্পে ও সংলাপে প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের মোড়কে আজকের, একবারে এই আজকের কয়েকটি শ্রেণীর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন 'জগন্নাথ' নাটকে একাডেমির মঞ্চে। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় চমকে উঠতে হয় মাঝে মাঝে, তার নিপুণ বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে বিস্ময় জাগে।

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'একটি শিশির বিন্দু' বা 'অমূল্য রতন' বিশেষণ দুটি নাটকের প্রধান চরিত্র 'জগন্নাথ'কে দেওয়া যায় অনায়াসেই, অবশ্যই বিনা কারণে নয়। নাট্যকার পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় (অনুপ্রেরণা : লু শুনের একটি ছোট গল্প) শ্রেণী পর্যায়ের একবারে শেষ ধাপটিতে নেমে এসে যাঁকে তাঁর এই নাটকের মধ্যমণি করলেন সে মেরুদণ্ডহীন হাবা-গোবা প্রতিবাদ করার ক্ষমতাহীন এক জনমজুর। সরল সাধাসিধেও বটে জগন্নাথ। ভালোবাসা এবং কর্মক্ষেত্র দু জায়গাতেই সে পাথরের মত নীরব, কিন্তু ভেতরে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আগুনে জ্বলন্ত। আমরা সবাই তো তাই।

এই জগন্নাথকে ঘিরে রয়েছে গাঁয়ের পুরুত ঠাকুর, যিনি জমিদারের মাস-মাইনের চাকর, যাঁর দেওয়া 'কিসব' খেয়ে মেয়ে নলিনীর 'ভর' হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর প্রতি এমন চরম আঘাত আর কেউ দিয়েছেন কি ? আছে জমিদার দাসবাবু যাঁর কাছে 'মেয়েছেলে' মানেই উপভোগের বস্তু, আছেন বিপিনবাবু যিনি এইসব ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথদের চোখে 'আত্মার' ঠুলি পড়িয়ে ঘোরাতে চান, আছে গাঙ্গুলী মশাইয়ের মত দালাল, আর আছে বরুণের মত সহৃদয় বিপ্লবী, সশস্ত্র স্বাধীনতা বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী বটে কিন্তু বিপ্লবের আসল শক্তি এই সব 'জগন্নাথ'দের তাঁরা দলে নিতে চাননা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে 'যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী তাঁরা। 'জগন্নাথ' বরুণদের কাছে ঘুমন্ত।

পাশাপাশি নন্দকে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। নন্দ জগন্নাথের মতই জন-মজুর। একই শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা, কিন্তু নন্দ হাবাগোবা নয়, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে তৎপর। তাই যে জগন্নাথকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়, বিপ্লবীদের দলে ভেড়ে। অবশ্য বিপ্লবীরা বলেন 'ওকে দলে নিতেই হোল'। আসলে জগন্নাথও নন্দ হতে পারত, সঠিক নেতৃত্ব পেলে গাঙ্গুলীমশাই-এর কাছ থেকে পূর্ণ মজুরী আদায় সে করত, বাল্য প্রেমিকা মনোরমাকে দাসবাবুর 'খাদ্য'হতে দিতনা জগন্নাথ। করতে পারত আরও কিছু।

কিন্তু তা আর হল কই ! দেশের শতকরা নব্বুই জন নাগরিক রইল নেতৃত্বহীন, হালভাঙ্গা পালছেঁড়া নৌকোর মত। অথচ এরাই আসল শক্তি, হাতিয়ার। সমাজ বদলের যজ্ঞে এরাই প্রকৃত পুরোহিত।

'জগন্নাথ'-এর মৃত্যুর পরও যখন বিপ্লবীদের মধ্যে তার চরিত্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিভেদ জাগে তখনই প্রমাণ হয়ে যায় তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবটা ছিল কেমন তাসের নিগড়। অরুণবাবু প্রায় অনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে জগন্নাথ, আশ-পাশের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর এই বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই জীবন ও মাটির গন্ধ নিয়ে হাজির হবে, কেউ কেউ ক্ষুন্ন হতে পারেন হয়ত কিংবা বিরক্তও, কিন্তু ইতিহাসের গতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবেই।

নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় উপ-স্থাপনার অভিনবত্বে নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেছেন। নাটকের এমন ফিল্মিক ট্রিটমেন্ট সম্ভবত বাংলা মঞ্চে এই প্রথম। দু-ঘন্টার নাটকে তিনি চিত্রনাট্যের ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন সর্বত্র। এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়নি নাটক বাঁধা ফ্রেমের বাইরে।

নাটকের শুরু মঞ্চের দুই প্রান্তে বিপ্লবীদের জমায়েত আর জগন্নাথের মৃত আত্মাকে নিয়ে। বরুণের কথায় বিদ্রূপ করে জগন্নাথ যখন বলে—'চুপ্ চুপ্', আমরা এখন মৃত জগন্নাথের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি' তখনই আসনে সোজা হয়ে বসতে হয়, চোখ ঘুরতে থাকে মঞ্চের আনাচে কানাচে। টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা মঞ্চ কখনও হয় দাসবাবুর বাড়ি—হেঁসেল, বিচারালয়, কালী মন্দির (হাঁড়ি কাঠ এবং বিচারকের চেয়ার একই রেখায় সংস্থাপন বিশেষ অর্থবহ বটে)। কখনও বা জগন্নাথের কুঁড়ে কিংবা রাস্তা।

জগন্নাথ/ স্বপ্না মিত্র ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

DHANADHANYE YOJANA (Bengali) Regd. No. WB/CC-315
Price 50 Paise July 16—31, 1977

ছায়াছবির টাইটেল পর্বের মত টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্যে শুরুতেই অরুণবাবু পরিচয় করিয়ে দেন নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে।

এরপর শুরু হয় নাটক।

ছেঁড়া ছেঁড়া সেই দৃশ্যগুলো বলে দেয় এই নাটক ব্যবসায়ে আপোষচরিত্রের নয়, কিংবা আপাত বামপন্থী বিপ্লবী বুলির আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা কিছু নেই। সৎ পরিচ্ছন্ন রাজনীতির নাটক জগন্নাথ। জগন্নাথ মাটির নাটক, মানুষ নিয়ে নাটক, জগন্নাথ মাটির মানুষের নাটক।

অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকার নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়কেও টপ্‌কে গেছেন। চরিত্রটিকে তিনি দর্শকের একবারে বুকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কখনও নীরব থেকে, কখনও মাইম্ করে তিনি সত্যিই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন যেন সবার অজান্তে। দলগত অভিনয়েও কেউ কাউকে টেক্কা দিতে পারেননি, সবাই-ই সমান। মনোরমার ভূমিকায় স্বপ্না মিত্রকে একটু বেশী ভালো লাগার কারণ তার আবেগমণ্ডিত মুখশ্রী, কিংবা গাঙ্গুলীবাবুর চরিত্রের শিল্পীকে কিঞ্চিৎ 'নাটুকে' দোষদুষ্ট মনে হবে, কিন্তু সব ছাপিয়ে নাটকের সার্বিক উপস্থাপনায়, মঞ্চ, আলো, অভিনয় ইত্যাদির মোড়কে গভীর তত্ত্ব ও জীবনের যে সত্যটি নিয়ে 'জগন্নাথ' কলকাতায় হাজির তা শুধু নাট্যকার-নির্দেশকের নয়, দলের (চেতনা) মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং চেতনা বাংলা নাট্যজগতে চলে আসবে প্রথম সারিতে। এ সম্মান অবশ্যই তাঁরা দাবী করতে পারেন।

নির্মল ধর

খেলাধূলা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত চিন্তা করা যায় নি, কলকাতার বুকে প্রথম জাতীয় নৌ বাইচের একটা জম-জমাট আসর বসতে পারে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই প্রতিযোগীতাকে ঘিরে এত উন্মাদনা থাকতে পারে। নৌ-বাইচের জাতীয় আসরে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা . দল। প্রতিযোগিদের সংখ্যা তেমন বড়সড় ছিল না; তবুও উত্তর প্রদেশ বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে কয়েকটি বিভাগে। মোট ছয়টি বিভাগের এই প্রতিযোগিতায় মুখ্যত প্রাধান্য ছিল বাংলার জুনিয়ারদের; ফাইনালে পাঁচটিতেই বিজয়ী হয়েছে বাংলার খেলোয়াড়েরা। বাকিটাতে জিতেছে তামিলনাড়ু।

বাংলার সাফল্য এসেছে মুক্ত বিভাগের একদাঁড়ী (স্কাল), মুক্ত ও জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ী (পেয়ারস্) এবং চার দাঁড়ীর এক্ হালির (ফোরাস) ফাইনালে।

তামিলনাড়ু বিজয়ী হয়েছে জুনিয়ার বিভাগের একদাঁড়ীর ফাইনালে।

নৌ-বাইচ ফাইনালে জুনিয়ার চার দাঁড়িতে বাংলা তামিলনাড়ুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছে

ফাইনালে বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। চার দাঁড়ীতে বাংলার পক্ষে ছিলেন সতীনাথ মুখার্জী, অশোক মেহতা কমল দত্ত, গিরিশ ফানিস এবং হালি নির্মল মজুমদার। জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ীর ফাইনালে বাংলার এস আর কালিদাস, তামিলনাড়ুর ম্যানি-কমের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

জুনিয়ারদের দু দাঁড়ীতে বাংলা (কালিদাস ও এম আর উদয়শংকর) সহজে উত্তর প্রদেশকে এবং মুক্ত বিভাগে

জাতীয় নৌ-বাইচে বাংলার সাফল্য

২৬ জুন রবিবার রবীন্দ্র সরোবর লেক ক্লাবের সীমানায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠানটি ছিল জুনিয়ার বিভাগের চার দাঁড়ী এক হালির ফাইনালে। শুরু থেকেই বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। সমাপ্তি রেখার বরাবর এসে বাংলা আধ নৌকার ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে তফাৎ-এ ফেলে দেয়। তারা তিন মিনিট ২৫ সেকেণ্ডে ঐ নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। এটিই ফাইনালের সবচেয়ে আর্কষণীয় মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে দর্শকেরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুগছিলেন। সেই সঙ্গে চিৎকার হাত তালিতে মুখরিত হয়ে উঠছিল প্রতি-যোগিতার প্রাঙ্গণ। দর্শকের ভীড়ও ছিল যথেষ্ট। বাংলা দলে ছিলেন এ রায়, এস বিশ্বাস, আর মুখার্জী, পি সাহা এবং হালি সি ব্যানার্জী।

প্রতিযোগিতার একমাত্র ট্রফি প্রেসিডেন্ট কাপকে ঘিরে মুক্ত বিভাগের চারদাঁড়ীর ঐ একই আসরে বাংলা (কমল দাস, অশোক মেহতা) দেড় নৌকার ব্যবধানে কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিংকে হারানোর সময় যে দৃশ্য সেদিন সৃষ্টি করেছিল, দর্শকেরা তার মধুর স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। মুক্ত বিভাগের এক দাঁড়ির সেমিফাইনালে তামিনাড়ুর এম এম সান্যালের কাছে মহারাষ্ট্রের সর্বজনপ্রিয় আর দেশপাণ্ডের পরাজয় এবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম অঘটন। কারণ, দেশপাণ্ডে গতবছর কলকাতায় আয়োজিত প্রাচ্য নৌ-বাইচের ঐ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। যাই হোক এবারের প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে বিশেষ আর্কর্ষণ ছিল কলকাতার মানুষের কাছে এবং কয়েকটি বিভাগের স্মৃতি মনে গেঁথে থাকবে আগামী বছর পর্যন্ত।

সরোজ চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

বাজেট সংখ্যা

১৬-৩১ জুলাই ১৯৭৭

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র

আমি আপনার সম্পাদিত পত্রিকা 'ধনধান্যে'র নিয়মিত ছোট্ট পাঠক। আপনার পত্রিকায় প্রয়োজনীয় সমস্ত রচনা সম্ভারই বর্ত্তমান, তবে আমার সামান্য অনুরোধ যে আপনি অন্তত গল্পের সংখ্যা আর একখানি বাড়াবেন।

সোমনাথ নায়েক
বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বীরভূম

আপনার পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই আমার হৃদয়ে গভীর আনন্দ এনে দিয়েছে। ১৬-৩১ মে, ১৯৭৭ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রী উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সাংবাদিকতা ও আধুনিক বাংলা গদ্য শিল্প অনন্য সাধারণ রচনা হয়েছে। ভালো লেগেছে শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর 'কৃষক কবি' প্রবন্ধটি। শ্রী অন্নদাশংকর রায়ের 'লোকসাহিত্যের সন্ধানে' একটি প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ডাইনোসর খুব ভাল গল্প। শ্রী নিতাই বসুর 'নরেন্দ্র নাথ মিত্রের' ওপর লেখাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। কবিতাগুলিও যথেষ্ট শক্তিশালী।

অশোক পোদ্দার
এম. আই. জি. কোয়ার্টার্স, কলকাতা-২

টাকা কিভাবে আসে যায়

চলতি বছরে ভারত সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করবেন তার প্রতি টাকার ২৩ পয়সা আসবে উৎপাদন শুল্ক থেকে, ১৫ পয়সা আসবে করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে। ১২ পয়সা আসবে পূর্ব প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাণিজ্য শুল্ক থেকে, ১১ পয়সা আসবে বাজারের ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে, ১০ পয়সা আসবে অন্যান্য সূত্র থেকে, ৮ পয়সা আসবে কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে, ৬ পয়সা আসবে বহিরাগত ঋণ থেকে এবং ২ পয়সা আসবে আয়কর থেকে এবং বাকি ২ পয়সা আসবে অন্যান্য কর আদায় থেকে।

এইভাবে সংগৃহীত অর্থের প্রতি টাকা সরকার নিম্নলিখিত হারে ও খাতে ব্যয় করবেন—৩৭ পয়সা পরিকল্পনায়, ২০ পয়সা অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় সংকুলনের জন্য, ১৮ পয়সা প্রতিরক্ষায়, ১০ পয়সা ধার দেওয়া টাকার সুদ পরিশোধে, ৯ পয়সা অন্যান্য খাতে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারকে বিধিবদ্ধ ও অন্যান্যভাবে দেওয়া হবে টাকায় ৬ পয়সা।

আগামী সংখ্যায়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ধনধান্যে'র আগামী সংখ্যাটি বিশেষ যুগ্মসংখ্যা হিসাবে পনেরই আগষ্ট প্রকাশিত হচ্ছে।

এর বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নিবন্ধ।

সম্ভাব্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সংসদের কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ।

এছাড়া থাকছে, 'স্বাধীনতার ত্রিশ বছর'—এই পর্যায়ে একটি আলোচনা।

সেই সঙ্গে গল্প, কৃষি, খেলাধুলা, নাটক, সিনেমা, মহিলামহল ইত্যাদি নিয়মিত রচনা।

এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য—এক টাকা

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার :

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা। গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহকমূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্লিকেশন্‌স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেণ্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্লিকেশন্‌স ডিভিশনের এজেণ্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা :
'ধনধান্যে, পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন : ২৩-২৫৭৬

পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার
অগ্রণী পাক্ষিক

১৬-৩১ জুলাই, ১৯৭৭
নবম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী—অমলেন্দু ঘোষ

সম্পাদকের কলমে

গত সতেরই জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন সরকারের প্রথম বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। জনতা দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে তৈরী প্রথম বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে সরকারের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা পরিচয় মেলে। কারণ নতুন সরকার বাজেট তৈরী করার জন্য হাতে পেয়েছেন খুব কম সময় ও পূর্বতন সরকারের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয় এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব সত্ত্বেও এবছরের বাজেট আগামী দিনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিশারী রূপে চিহ্নিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধে বাজেট একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ যখন একান্তই কাম্য তখন বাজেটের ফলে দ্রব্যমূল্য যাতে না বাড়ে বরং কমপক্ষে স্থিতিশীল থাকে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি প্রথমেই সেই দিকে। তাই তিনি আয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য যাতে ন্যূনতম থাকে সেজন্য ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৭২ কোটি টাকায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এজন্য অসামরিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ১৩০ কোটী টাকা কমানোর জন্য অর্থমন্ত্রী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা পালনের জন্যও নতুন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাজেটের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষিকে উন্নত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কৃষিখাতে বাজেটে ত্রিশ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে জন্য যে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামাঞ্চলের সংগে সংযোগরক্ষাকারী সড়ক নির্মাণ, বাজার, পানীয়জল প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করাই নয় একে পুনর্গঠিত করতে নতুন সরকার বদ্ধপরিকর। তারই ইংগিত বহন করছে এবছরের বাজেট। তাই অনুন্নত ও গ্রামীণ এলাকায় বিনিয়োগে উৎসাহ-দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এজন্য পরিকল্পনা খাতে বিনিয়োগের জন্য নতুনভাবে শিল্পের অধিকারের ক্রমবিন্যাশ করার কথাও বলা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে আছে পেনশনভোগীদের আরও সুযোগ সুবিধা দান, পানীয় জলের জন্য চল্লিশ কোটী টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব, আয়করের রেহাই সীমা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, দেশীয় কারিগরী বিদ্যার সহায়তায় যন্ত্রাংশ নির্মাণের ছোট কারখানার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রভৃতি। তবে দশহাজার টাকার উপর যাদের আয় তাদের আয়করের রেহাই সীমা আগের আট হাজার টাকায় বহাল রাখা এবং আয়করের সারচার্জ বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বিড়ির উপর কর ধার্যের ফলে ও দরিদ্র শ্রেণীর উপর চাপ পড়বে। এসব দু একটা বিষয় গণ্য না করলে বাজেটে কর প্রস্তাব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের উপর কোন রূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেনা আশা করা যায়। আর এবছরের বাজেট যদি দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সক্ষম হয় তবে সেটাই হবে জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে বেশী স্বস্তির।

কেন্দ্রীয় বাজেট

পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

এবারের বাজেটের দুই লক্ষ্য

বিশেষ প্রতিনিধি —

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সম্প্রতি নতুন সরকারের যে প্রথম বাজেটটি পেশ করলেন তার উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করা, এবং উন্নয়নের সুফলগুলি সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা।

চলতি বছরের বাজেটে রাজস্বখাতে রয়েছে মোট ১৫,৩৬৬ কোটি টাকা। চলতি কর হার অনুযায়ী কর বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হবে ৮,৮৭৯ কোটি টাকা, যা ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত হিসেবের চেয়ে ৭৯৮ কোটি টাকা বেশী। এই বেশী কর আদায়ের দরুণ রাজ্যগুলির ভাগে থাকবে ১০১ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক থেকে সংগ্রহ হবে ৪,৫৫০ কোটি টাকায়, যা গত বছরের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় ৩৭৩ কোটি টাকা বেশী। আয়কর এবং করপোরেশন কর থেকে আদায় হবে ২২৫৮ কোটি টাকা অর্থাৎ—১৮০ কোটি টাকা বেশী। আমদানী শুল্ক থেকে আদায় হবে ১৭৩৪ কোটি টাকা।

বাজারের ঋণ থেকে পাওয়া যাবে ১০০০ কোটি টাকা। গত বছরে ঐ হিসেব ছিল ৮৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া বিদেশী মুদ্রার জমা তহবিল থেকে সরকার ৮০০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন।

ঋণ ও সুদ পরিশোধ করার পর নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হবে ১০৫২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় যোজনা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যোজনাখাতে সাহায্য বাবদ ১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫৭৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছর বরাদ্দ হয়েছিল ৪৭৫৯ কোটি টাকা।

এবারের পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কমছে। শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতি হল সবরকম ব্যয় বাহুল্য বর্জন করা। সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ঐ মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং বাজেটে ঐ ধরনের ব্যয় ১৩০ কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব রয়েছে।

যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত হিসেব এবং বর্তমান কর হার অনুযায়ী রাজস্বের হিসেব নিয়ে চলতি বছরের বাজেটে ২০২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকছে।

যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ২৭৫২ কোটি টাকা, যা অন্তবর্তী বাজেটের তুলনায় ৫৬ কোটি টাকা কম। খাদ্যের জন্য ভরতুকি এবং মজুত খাদ্যের পরিবহণ বাবদ হিসেব ধরা হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকা। ঐ হিসেব অবশ্য আলোচ্য বছরের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঘাটতি রাজ্যগুলিকে বর্তমান বাজেটে অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলির ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিন বছরের ঘাটতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

জীবনধারণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেক কেন্দ্রীয় সরকারী পেন্সনভোগী অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছুটা সুবিধাবৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিলেন। সে অনুরোধ রেখে এবারের বাজেটে তাদের কিছু সুবিধা দেবার প্রস্তাব করেছেন। এ বাবদ খরচ হবে বছরে ১০ কোটি টাকা।

১৯৭৭-৭৮ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাতে অর্থনৈতিক ত্রুটিগুলি দূর করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নীতি ঢেলে সাজানো দরকার। পুনর্গঠিত যোজনা কমিশন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি জানান, সরকার বিভিন্ন মন্ত্রকের সংগে এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এবং জনতা পারটির নির্বাচনী ইস্তাহারের সংগে সঙ্গতি রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর একটি নতুন পথ নির্দেশ করবেন বলে সরকার স্থির করেছেন।

তিনি জানান, নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যোজনার পরিবর্তন করে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, খাদি, এবং গ্রামীণ শিল্প, রেশম, হস্তচালিত তাঁত শিল্প, গ্রামাঞ্চলে ডাক, টেলিফোন, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা করা হবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের মূল প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।

গ্রামাঞ্চলে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, হাঁসমুরগীর খামার, মাছচাষ ও বনাঞ্চল তৈরীর উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সমবায় ভিত্তিতে দুগ্ধপালন কেন্দ্র পরিচালনার উপর বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে। কৃষিকে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করার ওপর জোর দেওয়া হবে। কৃষির উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বর্তমান যোজনা বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে উঠবে, গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির চাহিদার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে, এবং তুলা, তৈলবীজ ও ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

হরিয়ানা, গুজরাট ও রাজস্থানের জন্য একটি মরু উন্নয়ন সংক্রান্ত পুরোধা প্রকল্প নেওয়া হবে। বর্তমান যোজনায় এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার দরুণ রাজ্য সরকারকে আগাম পরিকল্পনা সাহায্য খাতে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় অ্যাগ্রিকালচারাল রিফিন্যান্স অ্যাণ্ড ডেভলেপমেন্ট করপোরেশন এবং অন্যান্য লগ্নী সংস্থার মাধ্যমে ২৬০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেচের পাম্পসেট বৈদ্যুতিকৃত করার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কৃষি, বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, সার, গ্রামাঞ্চলে সমবায় এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট ৩০২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা বরাদ্দের শতকরা ৩০.৪ ভাগ এ বাবদ ব্যয় করা হবে।

গ্রামের উন্নয়নে অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে সংযোগকারী সড়ক তৈরীর ব্যাপারে আরও জোর দেবেন। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। শুরুতে এ বাবদ বিশ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার ও স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা থেকে আরও টাকা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে "কাজের বদলে শস্য" নামে নতুন প্রকল্পটির সাহায্য নেওয়া যাবে।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য দেবেন এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে শ্রী প্যাটেল জানান। এ ব্যাপারে এ বছরই বর্তমান ব্যয় বরাদ্দের উপর অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে আরও বেশী টাকা যোগানোর কথাও অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, হরিজন, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী ও ব্যয়বরাদ্দে তিনি সন্তুষ্ট নন। যদিও এ সব রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তবুও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরীর কাজে হাত দেবেন।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নয়নে ২৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সিঙ্গরৌলি অতিকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় একটি অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সুরু করার জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এ বাবদ খরচ করেন ১৬৭৬ কোটি টাকা। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সাহায্যার্থে গ্রামীণ বিদ্যুৎ করপোরেশনকে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকার হিসেবে)

	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
রাজস্ব	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
আদায়	৮২১৯	৮৫০৭	৯৪২৪
			(+) ১৩০ শতাংশ
ব্যয়	৭৬৯০	৮৫৫৪	৯৪৮৭
	(+) ৫২৯	(–) ৪৭	(–) ৬৩
			(+) ১৩০ শতাংশ
মূলধন			
আদায়	৪৪২৩	৫২৫২	৫৯৪২
ব্যয়	৫২৮০	৫৬৩৩	৬০৮১
	(–) ৮৫৭	(–) ৩৭৮	(–) ১৩৯
মোট			
আদায়	১২৬৪২	১৩৭৫৯	১৫৩৬৬
			(+) ১৩০ শতাংশ
ব্যয়	১২৯৭০	১৪১৮৪	১৫৫৬৮
মোট ঘাটতি	৩২৮	৪২৫	২০২
			(–) ১৩০ শতাংশ

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করার পর বাজেট প্রসঙ্গে নানা আলোচনা এখনও চলছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব সরকারী ব্যয় কমানো-বাড়ানোর কোনো বিশেষ প্রবণতা এই বাজেটে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে কর বসিয়ে কিংবা ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যয়যোগ্য সম্পদ সংগ্রহ করতেই হবে, কিন্তু বাজেটের এই সম্পদ সংগ্রহের দিকটি আমাদের আলোচনার বস্তু নয়। আমরা আপাততঃ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি শুধু সরকারের ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণের নীতির দিকে।

চলতি বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুল্য ব্যয়ের পরিমাণ ১৫,৫৬৮ কোটি টাকা। এই সমগ্র পরিমাণকে আমরা নানাভাবে বিভক্ত করে হিসাব-নিকাশ করতে পারি। প্রথমত দেখা যাক এই ব্যয়ের মধ্যে মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কতটা। মূলধনী খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তার দ্বারাই প্রধানত দেশের অর্থনৈতিক ভাবী বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, যদিও শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মূলধনী-খাতের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে ফলাফলের দিক থেকে পার্থক্য নির্দেশ করা খুব সঙ্গত হবে না। বাজেটের হিসাবে মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশের কিছু কম (৬,০৮১ কোটি টাকা) মূলধন-খাতে খরচ হবে। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে এই ধরণের ব্যয়ের অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশের সামান্য উপরে। সেই বৎসর অবশ্য শেষ পর্যন্ত মূলধন-খাতে ব্যয় ঐ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। সুতরাং পূর্ববর্তী বাজেটে এবং বর্তমান বাজেটে এই দিক দিয়ে বিশেষ কিছু প্রভেদ নেই। গত বৎসরের তুলনায় চলতি বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ শতাংশের সামান্য কিছু কম। কিন্তু মূলধন-খাতে ব্যয় বাড়ানো যাচ্ছে ৮ শতাংশের সামান্য কিছু বেশী।

দেশে সরকারী শাসন ব্যবস্থাকে শিক্ষা, সমাজসেবা বা আর্থিক কাঠামোর উন্নয়নকল্পে কতটা কাজে লাগানো হবে তার নীতি সব দেশে, সব যুগে এক থাকেনি। আমাদের সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরণের গঠনমূলক কিংবা বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ কতটুকু? চলতি বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের বরাদ্দ ধার্য্য হয়েছে ৪,২৫০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ২৭.৫ শতাংশ এই ধরণের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে। পূর্ববর্তী বৎসরে এই ধরণের ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ ছিল ২৭ ভাগ কিংবা সামান্য কিছু কম। এখানেও দুটি বাজেটে প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছু চোখে পড়ছে না।

বিকাশমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সমবায় ভিত্তিক সংস্থা কিংবা ব্যক্তিবিশেষকে ঋণ দিয়ে থাকেন। যদি এই ধরণের ঋণকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশ সহায়ক ব্যয়ের রকমফের বলে ধরা হয়, তবে মোট ব্যয়ের শতকরা আরও প্রায় ২২ ভাগকে এই হিসাবের মধ্যে আনতে হয়। পূর্ব্ববর্তী বৎসর এবং বর্তমান বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে এই দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়বে না।

সরকারের যে-সব ব্যয়কে কোন অর্থেই বিকাশমূলক বলা যায় না তার মধ্যে প্রধানতম প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যয়ের অনুপাত চলতি বাজেটে শতকরা ১৭.৭। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে এই খাতে ব্যয় হয়েছে সম্ভবত শতকরা ১৮ ভাগ। আনুপাতিক হারে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য কিছু কমেছে। অনুরূপ ব্যয়-সংক্ষেপের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে শাসনতন্ত্র পরিচালনার নানাবিধ ব্যয়ের ক্ষেত্রে। পরিষদীয় কাঠামো, মন্ত্রিসভা, রাজস্বসংগ্রহ বিভাগ ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ ব্যয়কে সংযত রাখার প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান বাজেটে। কিন্তু অন্য দিকে পুরাতন ঋণের জন্য প্রদেয় সুদ এবং পেনসনভোগীদের ক্লেশ লাঘবের জন্য প্রদেয় ভাতার পরিমাণ আনুপাতিক হার অপেক্ষা একটু বেশী করেই বেড়েছে। সুতরাং এই ধরণের বাঁধা খরচের পরিমাণ কমিয়ে বিকাশ-সহায়ক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে রাজ্যসরকারগুলি আর্থিক বিকাশের জন্য আর্থিক অনুদান ও ঋণ পেয়ে থাকেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই ভাবে ৩,৬৩৮ কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকার হাতে পাবেন। এর মধ্যে ২,১৭৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে রাজ্যের পরিকল্পনাভুক্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। আরও ৫০৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে পরিকল্পনার বাইরে নানা ধরণের গঠনাত্মক কাজের সহায়তায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ হবে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য শতকরা ১০.৪ ভাগ,

২০ পৃষ্ঠায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট

আয়করে কিছু রেহাই

পরোক্ষ কর ১৩০ কোটি টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারের (১৯৭৭-৭৮) কেন্দ্রীয় বাজেটে করপ্রস্তাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত করযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারগুলিকে আয়কর দিতে হবেনা। আয়করের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা আট আজার টাকাই রাখা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার বেশী সেখানে এখনকার মতই আট হাজার টাকার বাড়তি টাকার উপর কর দিতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে করযোগ্য আয় দশ হাজার টাকার সামান্য কিছু বেশী হলে সেখানে কিছু রেহাই দেওয়া হবে। কোম্পানী বাদে সর্বশ্রেণীর আয়করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হারও বর্তমানের ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ করা হয়েছে। কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান বাজেটে আয়করের হারে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে গতিশীল করার জন্য অর্থমন্ত্রী গতবছর প্রচলিত বিনিয়োগ সাহায্য কর্মসূচীটিকে আরো সুবিস্তৃত করেছেন। এক্ষেত্রে সিগারেট, প্রসাধন সামগ্রী, মদ ইত্যাদির মত নিম্ন অগ্রাধিকারযোগ্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর সর্বশ্রেণীর শিল্পকে ঐ বিনিয়োগ সাহায্যের সুযোগ দেওয়া হবে।

বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন তাঁর প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবে আসল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানীগুলির সঞ্চয় বাড়ানো, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য আরো বেশী অর্থবরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নকে গতিশীল করা। পরোক্ষ কর সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, এক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা বিলাস সামগ্রীর মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

অর্থমন্ত্রী সম্পদ কর বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছেন। বর্ত্তমানে মোট সম্পদের প্রথম আড়াই লক্ষ টাকার উপর সম্পদ করের হার আধশতাংশ বজায় থাকলেও তার ওপরের স্ল্যাবে আরো আধশতাংশ সম্পদকর বাড়বে। বর্ত্তমান পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নীট সম্পদের করধার্যযোগ্য স্ল্যাব দুইভাগে করা হয়েছে। প্রথম স্ল্যাব ২,৫০,০০০ টাকা এবং পরবর্তী স্ল্যাব ২,৫০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০ টাকা। এর-ফলে ৭৭-৭৮ সালে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হবে।

আয়কর দাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পটি আরো দু বছরের জন্য চালু রাখার প্রস্তাব রয়েছে। অবশ্য সত্তর বছরের বেশী কোন ব্যক্তিকে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হবে না।

দেশের শিল্প সংস্থাগুলিকে স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণালব্ধ কারিগরি জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হলে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

অর্থমন্ত্রী চালু মূলধনী আদায় করের ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন।

শ্রী প্যাটেল জানিয়েছেন, সরকার রুগ্ন কলকারখানা অধিগ্রহণে ইচ্ছুক নন। তবে রুগ্ন কারখানা যদি কোন চালু প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হতে চায় তবে সরকার সেক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন।

কোন কোম্পানী যদি অনুমোদিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করেন তাহলে সরকার তাকে করযোগ্য লাভ থেকে কিছু রেহাই দেবেন। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ইউনিট স্থাপিত হলে এবং সেগুলি এবছরের ৩০ জুনের পর উৎপাদন সুরু করলে এইসব শিল্পোদ্যোগ তাদের লাভের ২০ শতাংশ করযোগ্য আয় থেকে ছাড় পাবেন।

কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে আয়করের ওপর ৫ শতাংশ সারচার্জের বলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে পাঁচ বছর ঐ হারে টাকা জমা রাখার সুবিধা এ বাজেটে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ফলে সরকারের ৫৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সীমা দু লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আয়করের হারের কোন হেরফের হবেনা। তবে কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য সব করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জের হার শতকরা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হলো। প্রত্যক্ষকর থেকে বর্তমান বছরে ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে।

শ্রী প্যাটেল জানান প্রত্যক্ষ কর আইন দিন দিন জটিল হয়েছে। তাই এর সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হচ্ছে এ বছরের শেষ নাগাদ।

এবারের বাজেটে মোটর যানবাহনের ওপর উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। মোটর গাড়ীর ওপর শুল্ক ২.৫ শতাংশ বেড়ে ১৭.৫ শতাংশ এবং দুই ও তিন চাকার গাড়ী ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৫ শতাংশ হয়েছে। দুই ও

তিন চাকার গাড়ীর টায়ার, টিউব ও ব্যাটারীর ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়ায় এসব গাড়ীর ওপর প্রকৃতপক্ষে নীট ২.২৫ শতাংশ শুল্ক বাড়ছে। এই শুল্ক বাড়ানোর ফলে বছরে এবাবদ মোট ৫.১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমানে রং তৈরীর দ্রব্যাদি, রং, এনামেল, বার্নিশ প্রভৃতির উপর উৎপাদন শুল্ক নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে মূল্যানুপাতে ধার্য্য করার প্রস্তাব রয়েছে। বেশী দামের দ্রব্যাদির ওপর সাধারণত ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কমদামের দ্রব্যাদির ওপর শুল্ক প্রায় একই রকম থাকবে।

সিনেমার ফিলেমর ওপরও মূল্যমান বিচার করে সংশোধিত শুল্কের হার মূল্যানুপাতে ১০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব আছে।

সিগারেটের দামের ওপর মূল্যানুপাতিক হারে কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিড়ির ওপর কর প্রতি হাজারে ১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ টাকা করা হয়েছে। এই সব কর থেকে বছরে বাড়তি আয় হ'বে ৪৫ কোটি টাকা।

(১) ইতিপূর্বে শুল্ক ধার্য হয়নি এমনসব হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, (২) ওজন করার যন্ত্র, (৩) হাত ঘড়ি ও টেবিল ঘড়ি, (৪) বৈদ্যুতিক বাতির সরঞ্জাম, (৫) জুতোর কালি, গাড়ির রং ধাতুর পালিশ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ উপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎপাদন হয় এরূপ ক্ষুদ্রায়তন হস্তচালিত ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও কালি শিল্পগুলিকে শুল্কের রেহাই দেওয়া হ'বে। আশা করা হচ্ছে এবাবদ মোট ১১ কোটি টাকা আয় হবে।

বর্তমান বাজেটে নির্দ্দিষ্টভাবে নতুন উৎপাদন শুল্কের আওতায় পড়েনি এমন সব পণ্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক বর্তমানে ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২ শতাংশ করা হবে। শুল্ক ধার্য্য হয়েছে এরূপ অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলে এইসব পণ্যের ওপর শুল্কের ছাড় দেওয়া হবে। এই শ্রেণীর আওতায় ছোট ছোট অনেক শিল্প সংস্থা রয়েছে বলে স্থির হয়েছে, কর্মী সংখ্যা অনুপাতের বদলে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট শিল্পগুলিকে উৎপাদন শুল্কে ছাড় দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ-বিহীন সকল শিল্পকেও এই ছাড় দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রীর পরোক্ষ করের প্রস্তাবে হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্পগুলি লাভবান হবে। ২০ কাউন্ট সুতো পর্যন্ত উৎপাদন শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাড়তি কাউন্টের জন্য প্রতি কেজিতে ৩০ পয়সা পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পগুলি প্রচুর পরিমাণে স্পান সুতো ব্যবহার করায় এক্ষেত্রেও একই রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত তাঁতশিল্পকে বর্তমানের চক্রবৃদ্ধি হারের উৎপাদনশুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবে ৮০ হাজার তাঁত শিল্প শুল্ক নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পাবে। সিক্রিম্পিং সুতোর ওপর শুল্কের হার প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে ৫ পয়সায় কমানো হয়েছে।

ট্রানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, রেডিও, ষ্টিরিও প্রভৃতি ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ওপর মূল্যানুপাতে শুল্কের হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে। ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে মূল্যানুপাতিক শুল্কের হারে ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে ০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে। ৩৬ সেন্টিমিটারের বড় স্ক্রীনসহ যে সকল টি. ভি. সেটের উৎপাদন মূল্য ১৮০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা বা তার কম হবে সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে। ৫০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত টেপরেকর্ডার এবং ১৭৫ টাকা পর্যন্ত হিসাব রক্ষন যন্ত্র এ সুযোগ পাবে।

সমবায় সমিতি বা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সদস্য ক্ষুদ্র এবং কুটীর দেশলাই শিল্পগুলি উৎপাদনের ওপর বর্তমানে প্রতি গ্রসে ৫৫ পয়সার বদলে দ্বিগুণ ছাড় পাবে। বৈদ্যুতিক ইনসুলেটিং টেপ, গ্লেটেড এঞ্জেলস, মিষ্টি, টফি, টিনের খাদ্যও শুল্কের রেহাই পাবে।

মিনি-ইস্পাত কারখানাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য ইস্পাত কারখানা থেকে কাঁচামাল হিসাবে স্ক্র্যাপ যোগান দেওয়া দরকার। সেজন্য এই সব কারখানায় ব্যবহারোপযোগী কাঁচামাল হিসেবে বড় ইস্পাত কারখানাগুলি থেকে যেসব স্ক্র্যাপ আনা হবে সেগুলোর ওপর শুল্ক ছাড় দেয়া হবে।

শুল্ক ফাঁকি রোধ ও দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পশম সুতোর উপর উৎপাদন শুল্কের পরিবর্তে কাঁচা ও নিকৃষ্ট পশম এবং কম্বলের ওপর আমদানী শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হ'য়েছে। মিহি পশমের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ১০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫ পয়সা শুল্ক করা হবে। এর ফলে রাজস্বের যা ক্ষতি হবে তা আমাদানী করা কাঁচা পশমের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে পুরণ করা হবে। এর ফলে দেশজ পশমের দাম কমবে। ঘড়ির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস লিঃ এর মারফত ঘড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হবে। আমদানী-কৃত ঘড়ি জনসাধারণের কাছে কমদামে বিক্রির জন্য অর্থমন্ত্রী ঘড়ির যন্ত্রপাতি ও ঘড়ির ওপর মূল্যানুপাতে আমদানী শুল্ক ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন।

নিউজপ্রিন্টের ওপরও মূল্যানুপাতিক আমদানী শুল্কের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

শিল্পপ্রসার ও দেশজ শিল্পের প্রতি-যোগিতা-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মূলধনী পণ্য দেশজ উৎপাদনের অবস্থা আগে খতিয়ে না দেখেই আমদানী করার প্রস্তাবও অর্থমন্ত্রী করেছেন। অপরদিকে ভারতীয় মূলধনী পণ্য যাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় আরো ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে তার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটরের তামার তারের আমদানী শুল্ক বর্তমানে ৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে মূল্যানুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া ষ্টেনলেস ষ্টিলের ও হাই-কার্বন ষ্টিলের চাদর অন্যকোন মূলধনী পণ্য উৎ-পাদনে ব্যবহৃত হ'লে সেইসব ইস্পাতের চাদরের ওপর কর ১২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে গেইজ অনুপাতে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ২২ গেইজের ষ্টেনলেস ষ্টিলের বাসনপত্রের করও ৩২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২০ শতাংশ করা হ'য়েছে। তামা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির ওপর কর কমানোর ফলে আমদানী শুল্কে ৩৬.২৫ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে।

এই সমস্ত প্রস্তাবের ফলে ঘাটতির পরিমাণ বর্তমানে ২০২ কোটি টাকার বদলে ৭২ কোটি টাকা হবে এবং চলতি বছরে পরোক্ষ কর থেকে মোট ১৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় আয় হবে।

মঞ্জুলা বসু

নতুন বাজেটে করপ্রস্তাব

এ বছর বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্যাটেল যে উদ্দেশ্যগুলির উপর বারবার জোর দিয়েছেন সেগুলি হল উৎপাদনশীল কর্মসূচীকে উৎসাহিত করা, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ধনবণ্টনে অসাম্য দূর করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করতে বাজেটের প্রস্তাবগুলি কতদূর সহায়ক হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থাকে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে তার পরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে এটা সাধারণ প্রত্যাশার মধ্যে ছিল। নূতন সরকারের নানা সময়ে ঘোষিত নীতির থেকেও অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে দেখতে বর্তমান বছরের বাজেটে চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি, একমাত্র ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা ছাড়া। করসংক্রান্ত প্রস্তাবেও তাঁরা নূতন কর কিছু বসাননি বা পুরোনো কোনও কর তুলে নেননি, প্রচলিত ব্যবস্থাতেই কিছু হের ফের ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য বাজেটে প্রত্যক্ষ করের থেকেই বাড়তি রাজস্বের অধিকাংশ আদায় হবে বলে আশা করা হয়েছে। করবাবদ নূতন রাজস্বের প্রত্যাশিত পরিমাণ হল ২৪২ কোটি টাকা, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর বাবদ ৯২ কোটি টাকা আদায় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার বৃদ্ধি। ব্যক্তিগত আয়ের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের (Surcharge) হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ফলে সর্বোচ্চ স্তরে আয়ের উপর করের হার দাঁড়াচ্ছে ৬৯ শতাংশ। এই অতিরিক্ত শুল্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত বা যৌথ পরিবারের আয়ের উপর প্রযোজ্য, কোম্পানীগুলির আয়ের উপর নয়। উপরন্তু কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য বিনিয়োগ ছাড় (Investment Allowance) দেবার যে ব্যবস্থা বিগত বাজেটে সীমিতভাবে ছিল আলোচ্য বাজেটে তা আরও বিস্তৃত করে দেশের সব শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম মাত্র সিগারেট, মদ্যজাতীয় পানীয়, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি যেগুলি প্রয়োজনের ভিত্তিতে যথেষ্ট অগ্রাধিকার পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।

উর্ধ আয়ের উপর অতিরিক্ত শুল্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন আয়ের লোকেদের কিছু ছাড় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নতম আয়ের উপর করের হার কমানো হয়নি বটে, কিন্তু সর্বনিম্ন যে আয়ের উপর কর কমানো হবে তার পরিমাণ বছরে ৮০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যাদের বাৎসরিক আয় তাদের কোনও আয়কর দিতেই হবে না। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক আয় ১০.০০০ টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৮০০০ টাকার ওপরই ছাড় দেওয়া হবে।

কর প্রস্তাবের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে বহু-বিতর্কিত বাধ্যতামূলক জমা-ব্যবস্থা (Compulsory Deposit Scheme) যা পূর্বতন সরকার চালু করেছিলেন তা আপাতত তুলে নেওয়া হচ্ছে না, যদিও জনতা সরকার ক্ষমতায় যখন আসীন হল তখন এইরকমই আভাস দেওয়া হয়েছিল যে বাধ্যতামূলক জমা রাখা বন্ধ করে দেওয়া হবে ও সঞ্চিত অর্থ প্রত্যর্পণ করা হবে।

এই প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল এই যে একেবারে নিম্নবিত্ত আয়ের লোকেদের বাদ দিলে সাধারণ লোকের করের ভার বর্তমান বাজেটের প্রস্তাবগুলির ফলে অনেকখানিই বেড়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যার বার্ষিক আয় তার দেয় করের পরিমাণ হবে শূন্য আর ১০,৫৫০ টাকা যার বার্ষিক করযোগ্য উপার্জন তার দেয় করের পরিমাণ হবে ৩৮৫ টাকা। পরবর্তী আয়ের ধাপগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ হিসাব করে দেখানো যেতে পারে যে মধ্যবিত্ত লোকেদের ওপর চাপ আলোচ্য বাজেটে বেড়ে যাচ্ছে।

মধ্যআয় সম্পন্ন লোকেরা বাজেটের ফলে যে চাপের সম্মুখীন হচ্ছে তার জন্য আবশ্যিক জমার ব্যবস্থাও দায়ী। ধনবৈষম্য কমানো ও মূল্যস্তর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনা—এই দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখেই অতিরিক্ত শুল্ক ও আবশ্যিক জমা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়াও এই প্রস্তাবগুলির অন্য অসুবিধা আছে। এই দুটি ব্যবস্থাকেই বিশেষ প্রয়োজনে সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা হিসেবেই প্রয়োগ করা উচিত, সেই সাময়িকতার জন্যই এদের প্রভাব। স্বাভাবিক সময়ে দীর্ঘকালীন কর্মসূচীর মধ্যে এগুলিকে গ্রহণ করলে ক্রমশ এদের ধার

কমে আসে এবং স্বল্পসময়ের জন্য ফলপ্রসূ হলেও অন্তত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘকালে প্রভাব কমে যায়।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক কর সঞ্চয়ের প্রবণতাও কমিয়ে দেয়। সর্বোচ্চ স্তরে প্রান্তিক আয়করের হার ৬৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৯ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। মধ্য আয়ভোগী ও উচ্চবিত্ত লোকেদের সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানীগুলিকে বিনিয়োগ ছাড়, অতিরিক্ত শুল্ক থেকে রেহাই ইত্যাদি যে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাও কতদূর কার্যকর হবে তা সন্দেহের বিষয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য করের হার যদি খুব বেশী হয় তাহলে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে আয় বাড়াবার উৎসাহও নষ্ট হয়।

ব্যক্তিগত আয়কর বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর করের হারও বাড়ানো হয়েছে। ২.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তির উপর ধার্য করের হার আরও ½ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে দেয় করের হার বাড়ছে ১শতাংশ। সম্পত্তির উপর করের হার বৃদ্ধির স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, প্রথমত বিগত বাজেটে এই হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত সঞ্চয় ও উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার পক্ষে ব্যক্তিগত আয়কর অত্যধিক না বাড়িয়ে অনুৎপাদনশীল সম্পত্তির উপর কর বসানোই বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবের মধ্যে Capital Gains বা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি-জনিত লাভের ওপর যে কর প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থন পাবে সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাসযোগ্য বাড়ী বিক্রী করলে তার মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের উপর যে কর দেয় তা মকুব করা হয় যদি ছয় মাসের মধ্যে অন্য কোনও বাড়ী তৈরী বা বিক্রী করা হয়। অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ছাড় প্রযোজ্য নয়। নতুন প্রস্তাবে অলঙ্কার বা শেয়ার বিক্রয়লব্ধ লাভের ক্ষেত্রেই অনুরূপ রেহাই দেওয়া হবে যদি ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয়-লব্ধ অর্থ শেয়ার, ব্যাঙ্ক আমানত, ইউনিট ট্রাষ্টের ইউনিট ও অন্যান্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে খাটানো হয়। এই ব্যবস্থায় যাতে কেউ অন্যায় সুবিধা না নিতে পারে সেজন্য প্রস্তাব করা হয়েছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ লব্ধ অর্থ অন্তত তিন বছরের জন্য অনুমোদিত সম্পত্তিতে নিয়োজিত রাখতে হবে। এর ফলে সম্পত্তিতে ফাটকাবাজী করে লাভের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বাজেট প্রস্তাবের ফল শেয়ার বাজারে অনুকূল হবে বলেই আশা করা যায়। বাজেট পেশ করার অব্যবহিত পরে শেয়ার বাজারে কিছুটা মন্দা ভাব এলেও পরে আবার উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে দেখা গেছে।

উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোম্পানীগুলিকে যে বিনিয়োগ ছাড় দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি অধুনালুপ্ত সম্প্রসারণের জন্য রিবেট (Development Rebate) এরই বিকল্প সংস্করণ। উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে এই ব্যবস্থা উৎসাহ যোগাবে সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে যাদের গুরুত্ব নেহাৎই কম সেই সব শিল্প ছাড়া অন্য সব শিল্পের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে সব শিল্প দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গড়ে উঠবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে স্বয়ং-নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছাড়ের অনুপাত ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য আলোচ্য বাজেটে আরও কিছু প্রস্তাব আছে যা সকলের সমর্থন পাবে। যেমন গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্পস্থাপন করলে তারজন্য বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে কর বসানোর প্রস্তাব আছে। বর্তমান বছরের জুন মাসের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প সংস্থাপন করলে দশ বছর তাদের লাভের ২০ শতাংশ আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। তেমনই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাদের শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ ২৫০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তারা যাতে অযথা বিব্রত না হয় সেজন্য উৎস থেকে আয়কর তুলে নেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও প্রচলিত করব্যবস্থায় কোনও মৌলিক পরিবর্তন না করে প্রচলিত করের হারেই কিছু অদলবদল করা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করার বিষয় হল যে কতকগুলি জিনিষের উপর ১ শতাংশ হারে নতুন আবগারী কর বসছে, যার মধ্যে আছে, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, ওজনের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হাত ঘড়ি ও টাইমপীস, জুতোর কালি, গাড়ির পালিশ। ১২ শতাংশ হারে আবগারী কর বসছে ক্ষুদ্রশিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের উপর (যদিও ১ লক্ষ টাকা উৎপাদন পর্যন্ত একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে)।

রেডিও, ট্র্যানজিষ্টার, টেপরেকর্ডার, স্টিরিও ইত্যাদির উপর মূল্য অনুসারে ১৫ শতাংশ থেকে ৩৫শতাংশ পর্যন্ত আবগারী কর ধার্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র অল্পমূল্যের টি. ভি. সেটের উপর আবগারী কর হবে ৫ শতাংশ। যথারীতি সিগারেট, বিড়ির উপর ধার্য করের বৃদ্ধির হার পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যথারীতি বলছি এইজন্য যে সব বাজেটেই বিড়ি সিগারেটের দাম বাড়াটা যেন একটা অবধারিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটরগাড়ির উপর করও বাড়ছে। আমদানী শুল্ক বাড়ছে বিদেশী পশম, কম্বল ইত্যাদি পশমজাত দ্রব্যের উপর। আবগারী শুল্ক কমছে তাঁতবস্ত্র, ছোট কারখানায় তৈরী কাগজ, ক্ষুদ্র ইস্পাতশিল্প, সমবায় সমিতির প্রস্তুত দেশলাই, জলতোলার বৈদ্যুতিক পাম্প,

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

রুমমেট

দেবযানী

আমার মত আড্ডাবাজ মেয়ের সঙ্গে যে শকুন্তলা আপ্তের কি করে ভাব হ'ল সেটা শুধু আমার বন্ধুমহলেই একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি, সত্যি বলতে কি আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগতো। আকৃতি প্রকৃতি কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র মিল ছিল না আমাদের। শকুন্তলা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু মনে হ'ত তার রূপ যেন শুধু দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বড় বেশী শান্ত ও গম্ভীর মেয়েটির সমস্ত হাবভাবের মধ্যে একটা সুসংযত দৃঢ়তা ফুটে উঠতো সব সময়। সবার থেকে সে যে স্বতন্ত্র একথা যে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দেখতো সেও বুঝতে পারতো। আমরা কো-এডুকেশন কলেজে পড়তাম। শকুন্তলাকে কেউ কখনও কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেনি। এমনকি কোন মেয়ের সঙ্গেও বিনা প্রয়োজনে কথা বলতো না সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী শকুন্তলা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হ'তে না পারার দুঃখ ভুলেছিল আই. এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড বিট্ করে। কিন্তু সবসময় নিজের চারিদিকে কি যেন এক গণ্ডী টেনে রাখতো শকুন্তলা। নিজের স্বপ্নের রাজ্যেই বিভোর হয়ে থাকতো সে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তাকে রীতিমতো সমীহ করতো। বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও করেছিল অনেকেই কিন্তু তার সে গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি কেউ।

সব দিক দিয়েই শকুন্তলার বিপরীত ছিলাম আমি। নিজমুখে রূপের প্রশংসা করাটা রীতিবিরুদ্ধ। তবু অতিরিক্ত বিনয় না করেও বলতে পারি যে ঠিক প্রশংসা করার মত রূপ আমার ছিলনা কোনকালেই। আর গুণ? ফাঁকিবাজ, ক্লাস-পালানো ইত্যাদি নানারকম দুর্নাম অর্জন করেছি কলেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা যে রেটে বেড়ে চলেছিল তাতে হিতাকাংখীরা রীতিমত আতঙ্কিত হতেন আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। Academic career ও তথৈবচ। ভাল রেজাল্টের প্রতি একেবারে লোভ নেই একথা বলতে পারিনা, কিন্তু তার জন্যে যে পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করতে হ'বে অন্যান্য বিষয়ে তা করতে আমি নারাজ।

এ হেন গোল্লায় যাওয়া মেয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা রত্নটির এমন গলায় গলায় ভাব হওয়া যে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্যের অন্যতম একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। অথচ এর সূত্রপাত হয়েছিল অতি সাধারণভাবে। বি. এ. তে আমাদের দু'জনেরই সংস্কৃত ছিল। সংস্কৃতের "স্যার" একটু বেশীরকম কড়া মেজাজের লোক। টিউটোরিয়াল ক্লাসে 'টাস্ক' করে না আনলে এমন বাছা বাছা বাক্যবাণ ঝাড়তেন যা আমার মত নাককান কাটা মেয়েরও অসহ্য লাগতো। মেয়ে বলে ছেড়ে দিতেন না তিনি। প্রথমে কিছুদিন অসহযোগ চালালাম—তাঁর টিউটোরিয়ালের ধারে কাছে, ঘেঁসতাম না। শেষে বুঝলাম এভাবে চলবে না। টিউটোরিয়ালের পার্সেন্টেজ কমে গেলে নিজেরই বিপদ, পরীক্ষা দিতে পারবো না। বেগতিক দেখে অবশেষে শকুন্তলার শরণ নিলাম—তারপরই সেই আশ্চর্য ঘটনা। দেখতে দেখতে আমাদের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে কলেজে সবার মুখে মুখে ওই এক কথা ফিরতে লাগলো। সবাই হিংসে করতো বুঝতাম এবং সেজন্য রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম।

ফোর্থ ইয়ারের শুরুতেই বাবা বদলী হয়ে গেলেন পাটনা থেকে সেই সুদূর পাঞ্জাব। আমায় হষ্টেলে থাকতে হ'বে এবার—জীবনে প্রথমবার। শকুন্তলা হষ্টেলেই থাকতো বরাবর। সুপারিন-টেণ্ডেণ্টকে ধরে আমরা দুজনেই একটি ডবল সিটেড রুম নিলাম। হষ্টেলে আসার পর আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলাম

শকুন্তলাকে। বন্ধুহীন, চাপা মেয়েটির এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম যেন। হস্টেলে আসার পর থেকে আমার এমন আদর যত্ন শুরু করলো যে বাড়ি ছেড়ে থাকার দুঃখ দু'দিনেই ভুলে গেলাম।

মাঝে মাঝে অবশ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ওর গিন্নীপনায়। কোনদিন রাত্রে হয়তো চুপি চুপি সিনেমা দেখে ফিরেছি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নজর এড়িয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি শ্রীমতীর মুখ অন্ধকার। তারপরই শুরু হ'ত লম্বা বক্তৃতা। লেখা-পড়া না করলে কি ভবিষ্যৎ হ'বে, আজে বাজে সিনেমা দেখার পরিণাম কি, হোটেলে আমার মত ভাল মেয়েদের দেখলে লোকে কি ভাববে—ইত্যাদি নানারকম ফিরিস্তি। চুপ করে শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুনেই যেতাম। যখন অসহ্য মনে হ'ত হঠাৎ উঠে নিজের বাক্স প্যাঁটরা ধরে টানাটানি শুরু করতাম। জিজ্ঞেস করতো—"ওকি হ'চ্ছে?" গম্ভীর মুখে বলতাম—"রুম বদলাবো। থাকবো না এঘরে।" ব্যস, এক ওষুধেই সব ঠাণ্ডা। শকুন্তলার মুখে আর রা'টি শোনা যেত না খানিকক্ষণ। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মিনিট দশেক পরেই এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির হ'ত—"খেয়ে নে। পাঞ্জাবী হোটেলের অখাদ্য কুখাদ্যে পেট ভর্তি। সে কথা বললে আবার ঘণ্টাখানেক ধরে যে উপদেশামৃত বর্ষিত হ'বে তার কথা ভেবে শঙ্কিত হই। অতিকষ্টে দুধটুকু শেষ করে বিরক্ত হয়ে বলি, "সব সময় এমন জ্বালাস কেন বল্‌তো? তুই যে আর জন্মে আমার কে ছিলি ভগবানই জানেন—।" ও হাসে—"শুধু ভগবান কেন আমিও জানি।"—"কি?" "সতীন"—ও কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলে।

"উহুঁ, সতীন নয়, শাশুড়ি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি অন্য বন্ধুদের খোঁজে।

একদিন এক বাদলঝরা সাঁঝে একটি দুর্বল মুহূর্তে অবশেষে বলে ফেলি বহুদিনের গোপন রাখা কথাটি। উৎসাহে আরও কাছে সরে আসে শকুন্তলা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বিভ্রান্ত করে তোলে তার প্রশ্নজালে—"তার নাম কি? কোথায় থাকে? কবে আলাপ হ'ল? বল শীগগীর—।" বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হ'চ্ছে। জানালার ধারে বসে সেই বর্ষণ ধারার দিকে চেয়ে বলে যাই আমার সেই কাউকে না বলা কাহিনী.....

বাবার যখন এলাহাবাদে বদ্‌লী হল তখন আমি ম্যাট্রিকে পড়ি। আমি অঙ্কে বরাবরই ভীষণ কাঁচা, তবু জেদ করে অ্যাডিশনাল ম্যাথেমেটিক্স নিয়েছিলাম। প্রথমে অতটা বুঝি নি, এখন যতই পরীক্ষা এগিয়ে আসছিল ততই নিজের দুর্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। শেষে একদিন কাতরভাবে বাবার দরবারে হাজির হ'লাম। কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লাম "অঙ্কের একজন মাষ্টার চাই বাবা, নইলে কিছুতেই পাশ করবো না।" বাবা তাঁর বন্ধু অবনী দত্তকে ধরলেন একজন ভাল মাষ্টার ঠিক করে দেবার জন্যে। অবনীবাবুর ছেলে শোভন সবে বি. এস্. সি. পাস করে দিল্লীতে ডাক্তারী পড়ছে। কি একটা লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। অবনীবাবু তাকেই আমার অঙ্ক শেখানোর ভার দিলেন।

শোভনের কাছে অঙ্ক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান নিশ্চয়ই হয়েছিল তা নাহ'লে ম্যাট্রিকটা অমন নির্ঝঞ্ঝাটে উৎরোতে পারতাম না। কিন্তু শোভনকে কাছে পেয়ে সমস্ত জীবন যেন তোলপাড় হয়ে গেল—দু'জনেরই। কি যেন এক প্রচণ্ড আকর্ষণ দু'টি হৃদয়কে এক করে দিল। শোভনকে ভাল লাগা এমন কিছু বিস্ময়কর হয়তো নয়। রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য সব দিক দিয়ে যে কোনও মেয়ের কাম্য সে। তবু মনে হ'ত ওর প্রতি আমার যে আকর্ষণ তা রূপ, গুণ বা সম্পদের নয়। সে যে কি তা বুঝতে পারতাম না।

আমি কলেজে ভর্ত্তি হ'লাম। শুধু শোভনকে কাছে পাওয়ার লোভেই আবার অঙ্ক নিলাম। শোভন ছুটিতে বাড়ি এলেই আমায় অঙ্ক শেখাতো আসতো। অধ্যাপনায় তার মনোযোগ দেখে বাবা-মাদেরও তাক লেগে যেত মাঝে মাঝে।

দুরূহ ষ্ট্যাটিস্টিক্স-এর আড়ালে আমরা দু'জন তখন কল্পনায় স্বর্গ রচনা করে চলেছি। দু'জনেই বুঝতাম সে স্বর্গকে এই মাটির পৃথিবীতে টেনে আনতে বাধা কোথায়। একদিকে জাত ও আরেক দিকে অর্থ ও রূপের পাঁচিল। অব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদানের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না আমার রক্ষণশীল বাবা মা। শোভনের অভিভাবকরাও কক্ষনো রাজী হ'বেন না এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলা মেয়েকে বধূরূপে ঘরে এনে নিজেদের আভিজাত্য খর্ব্ব করতে। অবশ্য আইনের সাহায্যে ঘর বাঁধা চলে, কিন্তু মন মানতে চায়না সে কথা। সবাইকে দুঃখ দিয়ে সে মিলন সুখের হ'বে কিনা কে জানে।

আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট ও বাবার পাটনায় বদলী হ'বার খবর প্রায় এক সঙ্গে এলো। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা ম্লান করে দিল সাফল্যের সব আনন্দকে। বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় বান্ধবীর বাড়ি যাবার ছলে শোভনের সঙ্গে দেখা করলাম কালীমন্দিরে। বিগ্রহের সামনে প্রতিশ্রুতি দিলাম দু'জনে দু'জনকে—যদি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় জীবন শেষ হয়ে যায় যাক্, তব এই ক'টি বছরই অক্ষয় হয়ে রইবে আমাদের জীবনে। অন্য কেউ আসবে না সেখানে।......

শকুন্তলা একমনে শুনে যাচ্ছিল আমার ইতিবৃত্ত। খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর বললো—"তার ফটো নেই তোর কাছে?" আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—আছে। "কই দেখি?" খানিক ইতস্ততঃ করে ট্রাঙ্ক খুলে বার করলাম শোভনের সেই ফটোখানা যা অনেক যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন। ও অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, তারপর হেসে বললো—"বাব্বাঃ, তোর বয়ফ্রেণ্ডের সংখ্যা দেখে মাঝে মাঝে এমন ভয় হ'ত ভাবতাম—,

তুই বঝি কোনদিন কারো প্রতি সিনসিয়ার হ'তে পারবি না।" শোভনের ফটো আর ট্রাঙ্কে উঠলো না। বইয়ের আলমারীর মধ্যেই রেখেদিলাম সেটা। আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ খুলতো না সে আলমারী। আর ওতো জেনেই গেছে এখন।

শকুন্তলা এর পর থেকে প্রায়ই শোভনের বিষয় নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতো। একটু দেরী করে ফিরলেই সে কি রাগ—"বেচারী শোভনবাবু, কপালে দুঃখ আছে ভদ্রলোকের।" লেখাপড়া করিনা, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিই তা নিয়ে সব সময় ভয় দেখ তো—"লিখছি শোভনবাবুকে, নিয়ে যান তাঁর মালুকে। আর আমি পারবো না' ইত্যাদি। আর যেদিন শোভনের চিঠি আসতো সেদিন তো কথাই নেই। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওর চিঠি আসতো আর প্রত্যেকটি চিঠি পড়ে শোনাতে হ'ত শকুন্তলাকে। কারণ বাংলা বলতে পারলেও পড়তে জানতো না ও। মাঝে মাঝে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হ'ত ওর সঙ্গে। শেষে কোন কূল কিনারা না পেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো। আলো জ্বেলে দেখতাম শকুন্তলা তখনো চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করতাম "কি ভাবছিস্ অতো?" ও ম্লান হেসে বলতো—"কিছুনা ঘুমো। আমি তোর কপালে হাত বুলিয়ে দি।" ঠাট্টা করতাম—"উঃ কুন্তীর কত ভাবনা, যেন কন্যাদায় পড়েছে।" ও হঠাৎ রেগে উঠতো—"কন্যাদায় থেকে রুমমেট্ দায়টা কিছু কম নয় মশায়, অবস্থায় পড়লে বুঝতে।"

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। শকুন্তলার আবার পুজো করার বাতিক ছিল। রোজ ভোরবেলা স্নান করে ঘন্টা খানেক পুজো না করলে ওর হ'ত না। তার উপর বিশেষ বিশেষ তিথিতে তো কথাই নেই—নির্জ্জলা উপোস সেদিন। ওর ভক্তির বহর দেখে আমরা সবাই হাসতাম।

এরপর হঠাৎ এক নতুন উপদ্রব আরম্ভ করলো শকুন্তলা। কি একটা কারণে ক'দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল। হষ্টেলে ফিরে আমাকে দেখেই দূর থেকে চ্যাঁচাতে লাগলো—"মালুরে সব ঠিক হয়ে গেছে—"। কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমি। শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিশ্বাসে যা বলে গেল তার সারমর্ম্ম হ'ল—আমি নাকি শোভনকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি—। তার অতি সহজ উপায় আছে না কি আমার হাতের মুঠোয়। "উপায়টা কি শুনি?"—"সন্তোষী মা'র পুজো কর।" আমি ঠাট্টা ভেবে হাসতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ও ঠাট্টা করেনি। সত্যিই নাকি ওর পিসতুতো বোনের এক ননদ না কে যেন সন্তোষী মা'র পুজো করে নিজের বাঞ্ছিত দয়িত লাভ করেছে—এইবার বাড়ি গিয়ে সদ্য সদ্য শুনে এসেছে সে। শুধু শোনা নয় সমস্ত ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে এনেছে সেই সঙ্গে। সন্তোষী মা'র ফটো কিনে এনেছে একখানা, পুজোর মন্ত্রতন্ত্রগুলোও নোট করে এনেছে কোত্থেকে। "তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে'না মালু, শুধু রোজ ভোরে উঠে চান করে মাত্তর এক ঘণ্টা......।" শুনতে শুনতে কম্প দিয়ে জ্বর আসার উপক্রম হ'ল। আমি মালবিকা মুখাৰ্জ্জী—কোনদিন সাড়ে সাতটার আগে বিছানা ছেড়েছি এমন অপবাদ যাকে অতি বড় শত্তুরেও দিতে পারবে না, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এক প্লেট জলখাবার না ধরলে যার হাঁক ডাকে বাড়ি এবং পাড়া (উপস্থিত হষ্টেল) শুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি করে—খোদ সেই আমি ভোরে উঠে, স্নান করে, খালি পেটে করবো এক ঘণ্টা পুজো!!! তাছাড়া ভগবানে একটু আধটু বিশ্বাস যদিও ছিল তবু সন্তোষী মায়ের একটু স্তব স্তুতি করলেই যে আমাদের অমন গোঁড়া বাবা মা সব সংস্কার আভিজাত্যে জলাঞ্জলি দেবেন এ কথা গাঁজাখুরি ছাড়া আর কিছু মনে হ'ল না আমার। "ও সব আমার দ্বারা হ'বে না ভাই" নিতান্ত ভয়ে ভয়ে নিজের মতামত জানালাম তাকে। কিন্তু আমার মতামত নিয়ে মাথা ঘামাতে কুন্তীকে কোনদিনই দেখিনি, সেদিনও বিশেষ গা করলো না। নির্ব্বিকার মুখে পুজোর সাজ সরঞ্জাম রেডী করতে লাগলো সে। শেষে সেই অসম্ভবই সম্ভব করালো আমাকে দিয়ে। শীতকালের সকালে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে স্নান করে, চা জলখাবারের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, ঝাড়া একঘণ্টা দরজা জানালা এঁটে সে কি প্রাণান্তকর সাধনা। সংস্কৃত উচ্চারণটা কিছুতেই রপ্ত হ'ত না, পাশে বসে কারেক্ট করতো শকুন্তলা। অবশ্য বেশীদিন ভুগতে হয়নি আমাকে। সকালে স্নান টান কোনকালেই সহ্য হ'ত না। দিন দশেকের মধ্যেই জ্বর বাধিয়ে ফেললাম। শকুন্তলার বোধহয় করুণা হ'ল এবার, কারণ অসুখ সারার পর আর কোনদিন পুজো টুজো করতে বলেনি আমায়।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। শকুন্তলা ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে পাশ করলো। আমি পাশ করলাম অতি সাধারণভাবে। অনার্স আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম বেগতিক বুঝে। তারপর এম. এ.। এইবার একটু মুস্কিল বাধলো। শকুন্তলা ইকনমিক্স নিলো, আমি বাংলা। সারাদিন আলাদা আলাদা কাটতো, কিন্তু হস্টেলে এবারও আমরা দুজন রুমমেট। কাজেই আর সবই আগের মত চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে শোভন ডাক্তারী পাশ করে গেছে। হৃদরোগ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যাচ্ছে সে। যাবার আগে দিন পনেরোর জন্যে পাটনায় এলো বিদায় নিতে।

শকুন্তলার সঙ্গে শোভনের আলাপ করিয়ে দিলাম। আমার নামে শোভনের কাছে নালিশ করবে বলে সবসময় শাসাতো, কিন্তু দেখলাম যত বক্তৃতা ওর আমার কাছেই। শোভনের সামনে একেবারে চুপ। মাথা হেঁট করে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। একটা কথা বলতে হ'লে ঘেমে নেয়ে উঠতো যেন, গাল দু'টো লাল হয়ে উঠতো অকারণে। খুব মজা

লাগতো আমার, কেমন জব্দ। রোজ শোভন এলেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতাম ওকে। শোভন কিন্তু বিরক্ত হ'ত। আড়ালে বকতো আমাকে—"রোজ ওকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আস বলো তো? আর মাত্র ক'টা দিন, তারপর কতদূরে চলে যাবো, জানিনা আবার কবে দেখা হ'বে। অন্ততঃ এই ক'টা দিন তোমায় একা পেতে চাই—।"

রোজ শোভন আসার ঘন্টাখানেক আগে থেকে আমায় নিয়ে পড়তো শকুন্তলা। আমি নাকি চুল বাঁধতে জানিনা, শাড়িটা পর্যন্ত ঠিক করে পরতে শিখিনি এতদিনে। নিজে হাতে পরিপাটি করে চুল বেঁধে, নিজের সব চেয়ে সুন্দর শাড়িটি পরিয়ে দিত আর সমানে গজ্ গজ্ করতো। তারপর সব সাজগোজ শেষ হ'লে খোঁপায় ফাইনাল টাচ্ দিতে দিতে দুষ্টুমীভরা হাসি হাসতো। ফিরে এলে শোভন কি কি কথা বলেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতো বারে বারে।

অবশেষে পনেরোটি দিনের হাসি গান শেষ করে দিয়ে শোভন বিদায় নিল। আমি আবার ফিরে গেলাম আমার পুরোনো জীবনে। আগে শকুন্তলার জন্যে ক্লাসে কাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন তো দু'জনের ক্লাশ আলাদা, কাজেই অবাধ গতি। রোজ ক্লাশ পালিয়ে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো ম্যাটিনি সিনেমা দেখতাম, কখনো কফি হাউসে আড্ডা বসতো। শকুন্তলা কিছুই টের পেত না। শোভনের কথা যে কখনো মনে পড়তো না তা নয়; কিন্তু তার কথা ভাবলেই প্রচণ্ড অভিমানে ভরে উঠতো মন। শোভন বলেছিল তার বাবা মা'র মতের বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না কোনদিন। রাগ করে বললাম, "তোমার কাছে বাবা মা'ই সব? আমি কিছু নই?" -"কে বলে তুমি কিছু নও? তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো। কিন্তু মা বাবার মনে দুঃখ দিতে পারবো না আমি।" মনে পড়তো তাকে দেওয়া আমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা। কি তার পরিণাম? জীবনে আর কখনো গড়তে পারবো না একখানি সুখের নীড়। জানি শোভনও নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে। কিন্তু সে পুরুষ। সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিলিয়ে দেবে সে নিজেকে। কোনও রিক্ততাই থাকবে না তার। কিন্তু আমি! কি নিয়ে কাটবে এই নিঃসঙ্গ জীবন?

শোভনের চিঠির সংখ্যাও কমতে থাকে ক্রমশ। অসংখ্য হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি পরীক্ষায় ব্যস্ত সে। হাজার হাজার মাইল দূরে তার কথা ভেবে কার হৃদয় বিকল হ'চ্ছে সে কথা মনে করার সময় কোথায়!..

একটু একটু করে রাত গভীর হয়। চোখের জলে ভিজে ওঠে বালিশটা। "মালু!" হঠাৎ দেখি কোন ফাঁকে শকুন্তলা মাথার কাছে এসে বসেছে। আমি উত্তর দিইনা। ও আস্তে আস্তে আমার চোখের জল মুছে দেয়।

এক একটা করে মাস কেটে যায়। একদিন খবর পেলাম ১৮ই মে থেকে আমাদের পরীক্ষা শুরু হ'বে, অর্থাৎ ঠিক তিন মাস বাকী। হঠাৎ যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। অথচ এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। এম. এ. পরীক্ষা সাধারণত ঐ সময়েই হয়ে থকে এবং এবছরও যে হ'বে সেটা আগেই আমার জানা উচিৎ ছিল। তবু কেন জানি পরীক্ষার কথাটা কোনদিন মনে পড়েনি এর আগে, তাই হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলাম "মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে"। একটি বইও নেই আমার কাছে। থাকবেই বা কোথা থেকে। বই কেনার টাকাতেই তো সিনেমা দেখা ও হোটেলে খাওয়া চলতো। লাইব্রেরীর বই থেকেও কিছু নোট করিনি আর এই অল্প সময়ের মধ্যে তা আর সম্ভবও নয়। সব মিলিয়ে চোখে অন্ধকার দেখার মতই অবস্থা।

অবশেষে সেই অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর মত দেখা দিলেন আমাদের অধ্যাপক ডাঃ সুকান্ত চ্যাটার্জ্জী। মাত্র কয়েক বছর হ'ল পাশ করে রিসার্চ করছিলেন। মাস ছয়েক হ'ল আমাদের ক্লাশ নিচ্ছেন। অনেকবার আমাকে বলেছেন পড়াশোনা বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে তাঁকে জানাতে। এতদিন সময় হয়নি আমার। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়লো। অকপটে জানালাম নিজের অবস্থা। আমার ফাঁকি দেবার বহর দেখে তিনি প্রায় হতভম্ব। হয়তো বকাবকি করতেন কিন্তু আমার কাতর মুখ দেখে বোধহয় দয়া হ'ল। আমাকে নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন তিনি। রোজ ক্লাশ শুরু হ'বার আগে সকাল বেলা ও সন্ধ্যায় ক্লাশ শেষ হ'বার পর পড়াতেন। বাড়ি থেকে নোট তৈরী করে আনতেন আমার জন্য। কিছুদিন পরেই Preparatory leave আরম্ভ হ'ল। তখন প্রায় সারাদিন ধরেই আমাকে পড়াতেন সুকান্ত চ্যাটার্জ্জী। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠতো আমার। ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত; মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসতো আমার। কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি তাঁর মুখে। দেখতে দেখতে দুরূহ কোর্স সহজ হয়ে আসে। পরীক্ষার ভয়ও কেটে যায় ক্রমশ। সেইসঙ্গে যে নিরাশার অন্ধকার ঘিরে রেখেছিল আমার জীবন তার মাঝেও বুঝি আলো ফোটে।

পরীক্ষার মাত্র দু সপ্তাহ বাকী। না, পরীক্ষাকে আর মৃত্যুদূত বলে মনে হ'চ্ছে না। অটল বিশ্বাসে, বেশ খুসী মনেই প্রতীক্ষা করছি তার জন্য। সেদিন পড়াচ্ছে পড়াতে বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন সুকান্ত চ্যাটার্জ্জী। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন,—"তুমি পরীক্ষার পর ক'দিন থাকবে এখানে?"—"তার পরদিনই বেরুচ্ছি হ'বে।"—"চণ্ডীগড়?"—"হ্যাঁ"। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর ইতস্তত করে বল্লেন—"মালবিকা, অনেক দিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম....।"

সেদিন হষ্টেলে ফেরার পথে বার বার শুধু মনে হ'চ্ছিল—এই ভাল, শোভনকে আমি পাবো না কোনদিন। আর তার কাছে আমার মূল্যই বা কতটুকু? থাকুক সে তার কর্ত্তব্যবোধ, তার যশ ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মরীচিকার পিছনে ছুটে হতাশা

১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভবতোষ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট: সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সরকারি বাজেটের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আগামী বছরে বিভিন্ন খাতে এবং সমগ্রভাবে কী পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে, সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কতটাকা লাভ হবে, সরকারি ব্যয় কোন দিকে কতটা হবে ইত্যাদি বিষয়ে একটি হিসাব তৈরি করা। মোট ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কীভাবে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে সেটাও বাজেটেই দেখানো হয়। ঘাটতি মেটাতে হলে যদি নূতন কর-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার জন্য ব্যবস্থাও বাজেটে থাকবে। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে জড়িত থাকে সরকারি করনীতি ও ব্যয় থেকে দেশের উৎপাদন ও বণ্টনে কী পরিবর্তন হতে পারে, বা কী পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার পরিচয়। সরকারি ব্যয় আজকাল কোন দেশেই শুধু প্রশাসন পরিচালনায় সীমাবদ্ধ থাকেনা। দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরকারি ভূমিকা সব দেশেই বেড়ে চলেছে। সরকারি আয়-ব্যয় দেশের মোট আয়-ব্যয়ের একটা বড় অংশ এবং সরকারি আর্থিক পরিকল্পনা কম-বেশি আজকাল সব দেশেই গৃহীত। এদিক থেকে দেখলে বাজেট শুধু একটা আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়। বাজেট দেশের উন্নতিতে সরকারি নীতি ও প্রভাব কী হবে তার প্রতিফলন।

দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে আছে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সেই সঞ্চয়ের সুপরিকল্পিত এবং বাঞ্ছনীয় ফলপ্রসূ বিনিয়োগ। আমাদের মত দেশে, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাতে সরকারের অংশ ক্রমেই বাড়ছে, সেখানে প্রত্যক্ষ সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। বস্তুত, বর্তমানে ভারতে যা মোট নূতন বিনিয়োগ হয় তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয় সোজাসুজি সরকারি পরিচালনায়, আর বাকি এক-তৃতীয়াশ হয় সোজাসুজি কৃষি, কুটির শিল্প, বেসরকারি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের বেশির ভাগই অবশ্য এখনো আসে বেসরকারি উদ্যোগ থেকে, কিন্তু তার জন্য যে বিনিয়োগের কাঠামো দরকার—যানবাহন, রাস্তাঘাট, রেল-পথ, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, রাসায়নিক সার—সেটা সরকারি কর্মনীতির অঙ্গ হিসাবেই তৈরি হয়। আর্থিক পরিকল্পনার নীতি গ্রহণের আরম্ভ থেকে সরকারি বিনিয়োগ কোন কোন দিকে যাবে এবং কোথায় কোথায় বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নীতি নেওয়া হয়েছে। যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশি, যেখানে প্রত্যক্ষ লাভ বেশি না হলেও সমাজের উপকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুবিধা অনেক-খানি। যেখানে বিনিয়োগের ফল পেতে দেরি হতে পারে, সেখানে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোই সঙ্গত, কারণ ঠিক এই সব ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সহজে আসবে না।

দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর সরাসরি আয়-ব্যয় নীতির প্রভাবের প্রশ্নটি দুই ভাগ করে দেখা প্রয়োজন। সরকারি খাতে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা হল প্রথম বিবেচ্য এবং দ্বিতীয় বিবেচ্য হল সরকারি করনীতি ও ব্যয় ব্যবস্থায় বেসরকারি ক্ষেত্রে—অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ দানের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সরকারি আয়-ব্যয়কে যদি চলতি খাতে ও মূলধনী খাতে এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয় তাহলে চলতি খাতে উদ্বৃত্ত হলে সেটাকে সরকারি সঞ্চয় বলে অভিহিত করা যায়। যদি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে সরকারের আয় হয় দশ হাজার কোটি টাকা এবং চলতি খাতে ব্যয় হয় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা, তাহলে উদ্বৃত্ত পাঁচশ কোটি টাকা সরকারের সঞ্চয়—অর্থাৎ সরকারের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয়। এই সঞ্চয়টাকে মূলধনী খাতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মূলধনী আয় যোগ দিলে যে টাকাটা পাওয়া যায় তাই দিয়ে মূলধনী ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এই মূলধনী ব্যয়ের প্রধান অংশ হল আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পিতভাবে স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা। মূলধনী আয় আসে সরকারের কাছে জমা দেওয়া নানা রকমের টাকা থেকে—যেমন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা পোষ্ট অফিসের আমানত—এবং নূতন তোলা ঋণ থেকে। এর অনেকটাই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের হস্তান্তর। রাজস্ব খাতে বা চলতি খাতে উদ্বৃত্ত আজকাল খুব একটা হয় না। কিন্তু এবারে ৬৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে। আর সরকারের এবারকার মোট মূলধনী আয় ৬০১৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩২৪৮ কোটি টাকা আসবে নানারকমের জমা থেকে, আর বাকি ২৭৬৬ কোটি টাকা তোলা হবে ঋণ করে—দেশের বাজার থেকে ১০০০ কোটি টাকা, বিদেশ থেকে ৮৯৪ কোটি টাকা, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে মোট ৮৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে। দেশের মধ্যে যে ঋণ তোলা হবে তার কতটা আসবে প্রকৃত সঞ্চয় থেকে আর কতটা

আসবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে (অর্থাৎ মুদ্রা-সম্প্রসারণ থেকে) সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

সরকারি খাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আর্থিক পরিমাণ কতটা তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় পরিকল্পনার জন্য ব্যয় থেকে। পরিকল্পনার ব্যয়ের বাইরেও সরকারি বিনিয়োগ হতে পারে—যেমন প্রতিরক্ষা বিভাগে। আবার পরিকল্পনা ব্যয়ের মধ্যেও কিছুটা সাধারণ চলতি খরচ থাকতে পারে। তবু, এই পরিকল্পনা ব্যয় থেকেই সরকারি বিনিয়োগের সবচেয়ে সহজবোধ্য চিত্র পাওয়া যায়। এবারে, অর্থাৎ ১৯৭৭–৭৮-এ, কেন্দ্রীয় খাতে মোট পরিকল্পনা ব্যয় হবে ৫৭৯০ কোটি টাকা—রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র পরিকল্পনার জন্য যে সাহায্য দেবে সেটা ধরে নিয়ে। এ'ছাড়া রাজ্যগুলি তাদের নিজেদের আয় থেকে আর্থিক পরিকল্পনার জন্য যা খরচ করবে সেটা ধরে নিলে মোট পরিকল্পনা ব্যয় গিয়ে দাঁড়াবে ৯৯৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। এর মধ্যে কৃষি, জলসেচ, সারপ্রকল্প ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার জন্য মোট ব্যয় হবে ৩০২৪ কোটি টাকা। রাস্তাঘাট, পানীয়-জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কুটির শিল্প ইত্যাদি সব দিকেই এবারে আগের বছরের চেয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটির দিকে তাকানো যেতে পারে। সরকারি আয়-ব্যয় নীতি, এবং বিশেষ করে করনীতি দিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান-গত সঞ্চয় বাড়াবার কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। জীবন-বীমা বা প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ডে টাকা জমা দিলে আয়কর অনেকটা মকুব হয়। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে, ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট কিনলে বা দেশীয় কোম্পানির শেয়ার কিনলে তার থেকে যে আয় হয় তাতেও আয়কর অনেকটা ছাড় পাওয়া যায়। এবারে এদিক থেকে কোন নূতন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, কিন্তু যাদের আয় বছরে আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা তাদের আয়কর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই স্তরে আয়কর দাতাদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। এই ৮ লক্ষ লোক আগে আয়কর হিসাবে যে টাকাটা দিতেন তার সবটাই যদি সঞ্চয় করেন, তাহলে মোট সঞ্চয় বাড়বে প্রায় ১৬ কোটি টাকা; কিন্তু যে টাকাটা বাঁচবে তার সবটাই সঞ্চিত হবে এটা আশা করা অন্যায় হবে। অন্যদিকে, যাদের আয় দশ হাজারের বেশি তাদের উপরে আয়কর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তাদের সঞ্চয় কমবে, তবে আবশ্যিক জমা প্রকল্পে যে টাকাটা তারা দেবে সেটাও সঞ্চয়। এই জমার একটা অংশ এবারে ফেরৎ আসছে, সেটা আবার সঞ্চিত হবে না ব্যয়িত হবে বলা কঠিন। মোটের উপরে বলা যায় যে এবারকার বাজেটে বেসরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য নূতন ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে, বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াবার জন্য কিছু নূতন ব্যবস্থা বাজেটে নেওয়া হয়েছে। আগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন বিনিয়োগ করলে আয়করের সুবিধা দেওয়া হত। এবারে এই সুবিধা প্রসারিত করে সব রকমের শিল্পেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কেবল তালিকাভুক্ত ৩৪ টি শিল্প বাদে। যেসব শিল্প এসব সুবিধা পাবে না, তাদের মধ্যে আছে কিছু বিলাস দ্রব্য (যেমন মদ, সিগারেট, প্রসাধনের জিনিস ইত্যাদি) এবং এমন আরো কয়েকটি শিল্প যেখানে এজাতীয় সুবিধার কোন প্রয়োজন নেই। কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প যাতে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত নূতন ক্ষুদ্রশিল্পকে আয়করের কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে। ভারতে উদ্ভাবিত কারিগরির পদ্ধতি ব্যবহার করলেও আয় কর কমানো হবে। যদি কোন সুপরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো 'রুগ্ন' শিল্পকে নিজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেয়, তাহলেও আয়করের সুবিধা পাওয়া যাবে। 'মূলধনী লাভ'-এর ক্ষেত্রে করমকুবের সুবিধা আগে পাওয়া যেত শুধু বসত বাড়ি বিক্রির লাভের বেলাতে—এবারে সে সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে অন্য সম্পদের ক্ষেত্রেও। আশা করা যায় যে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তার কিছুটা যৌথ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিযুক্ত হবে। সম্ভবত এই টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা হবে। তাতেও বিনিয়োগেরই উপকার।

অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক কমানো হয়েছে—যেমন কোন কোন ধরণের সুতা বা দেশলাই। যেক্ষেত্রে নূতন ট্যাক্স বসানো হয়েছে সেখানেও ক্ষুদ্র শিল্পকে অনেকটা অব্যাহতি দেওয়ার হয়েছে। সবশুদ্ধ বলা যায় যে এবারকার বাজেটের মূলনীতি হল ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দান, বিশেষ করে সেই ক্ষুদ্রশিল্প যদি গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হয়। এই নীতি আজকাল প্রায় সকলে বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতের দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অভাবের সমস্যা দূর করতে হলে বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারণের জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এবারকার বাজেটে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা শক্ত। কারণ ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা, বা বেসরকারি বিনিয়োগের মূল সমস্যা সমাধান করতে হলে করনীতি ছাড়াও অন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সে সব ব্যবস্থা কী হবে সেটা নূতন পরিকল্পনা নীতিতে স্থির হবে। এ বছরের বাজেট নূতন সরকার মাত্র তিনমাস সময়ের মধ্যে তৈরি করেছেন, অতএব এর মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন থাকবে এটা আশা করা অসঙ্গত। আগামী কয়েক মাসে নূতন পরিকল্পনা কমিশন আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক উন্নতির কর্মপন্থা কী রকম হবে তার একটা খসড়া তৈরি করতে পারবেন নিশ্চয়ই। এবং তখন সময় আসবে নূতন করনীতি এমন ভাবে তৈরি করবার, যাতে সম্ভাব্য সব উপায়ে সঞ্চয় বাড়ানো যায় এবং দেশব্যাপী কৃষি ও শিল্পোন্নতি, কর্মসংস্থান ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণের পথে বিনিয়োগকে চালিত করা যায়।

অমর নাথ দত্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট কতটা জনতা-বাজেট

প্রশ্নটার মধ্যে কতখানি কৌতূহল আর আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব রয়েছে তা আমার জানা নেই তবে কেন্দ্রে সমাসীন জনতা সরকারের বাজেট নিঃসন্দেহে কিছুটা চমকের সৃষ্টি করেছে। জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ ছিল সেগুলি বহুলাংশে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে এবারের এই কৃষি উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় বাজেটে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের উপরে যে পরিমাণ ঝোঁক দেওয়া হয়েছে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবারের বাজেটে মধ্য ও উচ্চ আয়, সম্পন্ন ব্যক্তিদের যতটা হতাশ হতে হয়েছে ততটা সুবিধা মিলে গেছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের যাঁদের মাসমাইনের ঊর্দ্ধসীমা মোটামুটিভাবে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। আর একটা সুবিধে, পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের নানাবিধ প্রকল্পে বিশেষত কৃষি আর সেচ, রাস্তাঘাট আর পানীয় জল, প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস মিলেছে। এবারে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রচলিত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বহাল উৎপাদন শুল্কের উপরে অতিরিক্ত ১ শতাংশ বৃদ্ধি, এর পেছনে সতর্কতার আভাস পাওয়া যায়।

বস্তুত মুদ্রাস্ফীতি কবলিত ও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর ভারে প্রপীড়িত আর্থিক কাঠামোয় নতুন করের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ একান্তই সীমাবদ্ধ। তবুও এবারের বাজেটে দুটো আপাত বৈশিষ্ট্য হ'ল, প্রথমত সামগ্রিক করের পরিসরে সম্ভাব্য সংকোচন। আর দ্বিতীয়ত ঘাটতি ব্যয়ের মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত করা। আগামী আর্থিক বছরে সংগ্রহযোগ্য কর আদায়ের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ হ'ল ১১০ কোটি টাকা। আর ঘাটতি ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হ'ল ৯২ কোটি টাকা আর পরোক্ষ কর হ'ল ৫৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রেই শুধু বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা বাৎসরিক ৮০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে, আর সেইসঙ্গে কোম্পানিগুলির আয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল কোম্পানিগুলির সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা এবং শিল্পোন্নয়নে গতিবেগ সৃষ্টি করা। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সামান্যই হেরফের ঘটানো হয়েছে। তাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যস্তরে করজনিত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটে।

কৃষি উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের প্রসার ঘটে আর সেইসঙ্গে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী হ'ল শিল্পগত মন্দা ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। এই অবস্থার প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করে বেশ কয়েকবারই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্টে ও বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষার কতকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে যাতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রসার ঘটে। আর এজন্যই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের গুরুত্ব খুবই বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে আর্থিক বিনিয়োগে নানারকম সুবিধা প্রদান করে একটা অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন।

উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়ে গিয়েছে। চিরাচরিত ধারায় আর্থিক ও রাজস্বগত অনুদান বা মঞ্জুরি মারফত সুযোগ সুবিধে শিল্পে কেন দেওয়া হয়নি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে গতানুগতিক বা মামুলি প্রথায় শিল্পে কোনও প্রকার সাহায্য ফলপ্রসূ হবেনা। বিগত কয়েকবছরের ইতিহাস তাঁর এই যুক্তি প্রমাণ করছে। কিন্তু তার জন্য শিল্পকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্পের (Investment Allowance Scheme) সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি দাবী পূরণ করেছেন। শুধুমাত্র ৩৮-টি স্বল্প-গুরুত্বসম্পন্ন শিল্প ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শিল্পে প্রচলিত ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ সাহায্য প্রকল্প কার্যকর হওয়ায় একটা প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী দেশের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলিতে এক বছরে

মোট ২১৩ কোটি টাকার যত নতুন বিনিয়োগ ও মূলধন সম্প্রসারণ ঘটবে।

শিল্পক্ষেত্রে আরও কতকগুলি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্বদেশী কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বিনিয়োগ সাহায্যের হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তবে সরকারী গবেষণাগার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই সুবিধে মিলবে। রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুবিধে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ইউনিট যদি চালু ইউনিটগুলির সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তি ঘটায় তবে সেক্ষেত্রে রুগ্ন শিল্পের সঞ্চিত ক্ষতির তহবিল চালু সংস্থার মুনাফার সঙ্গে সমীকরণ করা যাবে। আর একটি সুবিধে হ'ল যে, কোন কোম্পানি যদি স্বীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে লগ্নীব্যয় করে তবে সরকার তাকে করযোগ্য মুনাফায় কিছুটা রেহাই অনুমোদন করবেন।

বর্ত্তমান বাজেটে আশু সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও সুষ্ঠু উন্নয়নের একটা পথনির্দেশ করা হয়েছে। ফলে বর্ত্তমান-কালের বার্ষিক ১২.৫ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের তাগিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের জন্য সম্ভাব্য পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ও সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সাধনে অর্থমন্ত্রীর প্রধান সহায়ক দুটি শক্তি হ'ল বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ও খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার। বিদেশী মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল থেকে ৮০০ কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার ফলে ঘাটতি ব্যয়ের সীমা সংকুচিত করা সম্ভব হয়েছে। আর সেইসঙ্গে খাদ্যসংগ্রহ অভিযানে সরকারী অর্থব্যয়ে বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, রাজস্ব ব্যয় ও দেশরক্ষা খাতে অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করে ও উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির যথাযথ বিন্যাস ও চালু প্রকল্পগুলির রূপায়ণে একটা গতিসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন।

তবে প্রত্যেক বাজেটের মত এবারের বাজেটও কিছু দুর্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-সংস্থাগুলি উৎপাদনক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পোঁছে গেছে। তাই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে অনেকগুলি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা সৃষ্টি করা দরকার। আগামী বছরে পরিকল্পনা ব্যয় ২৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৯,৯৪৭ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির দরুণ এর প্রকৃত পরিমাণ বেশ কিছুটা কমে যাবে। তাছাড়া শিল্প হ'ল অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত ক্ষেত্র যেখানে অর্থনৈতিক গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারে। অনেকের মতে শিল্পে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দিয়ে কৃষির উপর সহসা গুরুত্ব প্রদান করায় জাতীয় উৎপাদন ক্রম-ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্যের অভাব দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

ঘাটতি ব্যয় প্রসঙ্গে আর একটি দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় থেকে ৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা করা হবে তার সুস্পষ্ট কোনও হদিস নেই। যদি তা মামুলি সরকারী ঋণ পত্রের (Ad-hoc Securities) মাধ্যমে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে নোট ছাপানোরই নামান্তর। তবে এটুকু মাত্র আভাস মিলেছে যে এক বিশেষ সিকিউরিটির মাধ্যমে এই টাকা তোলা হবে। কিন্তু তাহলেও মুদ্রাস্ফীতির সমূহ সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায়না। তবে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখবার একটাই পথ এক্ষেত্রে খোলা রয়েছে। ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রার সমমূল্যে যদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তাহলে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ না বেড়ে সামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

মোটের উপর বাজেটের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে যে চিত্রটি সুস্পষ্ট হয় তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে একটি সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে করের হেরফের ঘটিয়ে অর্থমন্ত্রী একটি সুসংবদ্ধ অথচ উন্নয়নমূলক বাজেট সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অল্পবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের রেহাই দান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুতপক্ষে অর্থমন্ত্রী একটি পুনর্বন্টনমূলক করবিন্যাস প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সর্বাধিক রাজস্ব (৯২ কোটি) প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করছেন। সেসঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়স্তরের বৈষম্য হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষির উপরে বাজেটের গুরুত্ব জনতা সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর নবরূপায়ণ নির্দ্দেশ করে। বিশেষত এই পথে কৃষিই হবে ভাবী অর্থনীতির উন্নতির পরিমাপক ও উন্নতি বিধায়ক। আর শিল্প তার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

রুমমেট

১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ও অবহেলার গ্লানি কুড়োতে পারিনা আর।

কিন্তু রুমের দরজার কাছে এসেই চিন্তাধারা থেমে গেল। দরজা ভেজানো. অর্থাৎ শকুন্তলা রুমেই আছে। ওর কথা মনে হ'তেই রক্ত হিম হয়ে এলো যেন। ক করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো সেইটাই সিব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ও যদি জানতে পারে? তখনি আবার মনে হ'ল, জানলোই বা, লুকোচুরির কিই বা আছে এতে? আজকেই বলবো ওকে সব কথা। জানিয়ে দেবো শোভন চলে গেছে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মত।

একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। দেখি শকুন্তলা বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "কুন্তী কি হয়েছে রে?" চমকে মুখ তুলে তাকালো শকুন্তলা। হঠাৎ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। হুড়মুড় করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর আমি প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাতে চেপে ধরলাম টেবিলটাকে। মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ—দেয়ালগুলো চোখের সামনে দুলছে।

শকুন্তলার বিছানার উপর শোভনের ফটো। ফটোর কাঁচে তখনো টল টল করছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

পত্রনবীশ

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভা

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে ২৪ জুন, শুক্রবার ১৯৭৭ সাল। এপ্রিল মাসে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সপ্তম বিধানসভা ভেঙ্গে দেন। মে মাসে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী নতুন বিধান সভার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ ও ১৪ জুন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সমাধা হয়। এই নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা ও কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে সি-পি-আই(এম)-এর নেতৃত্বে ছয়দলের বামফ্রণ্ট নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ২১ জুন সি-পি-আই(এম)-এর নেতা জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে বামফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ২২ জুন আরও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলে পশ্চিমবঙ্গে ২২ জনের মন্ত্রিসভায় বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে রাজ্যের সপ্তম বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ২৮০ টি আসনের মধ্যে ২১৬ টিতে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছিলেন। সেবার সব দল মিলিয়ে ও নির্দলদের নিয়ে মোট প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ছিল ৮৩৩ জন, ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭,৯৪৬ টি। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে অষ্টম বিধানসভার এই যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে মোট ২৯৪ টি আসনের জন্য (লক্ষ্যণীয়, ১৪ টি আসন বেড়েছে), নির্দল প্রার্থীদের ধরে মোট প্রার্থী ছিলেন ১,৫৭১ জন। ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৯,০৬২। এবার একটি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হয়নি। পুরুলিয়া জেলার আরসা কেন্দ্রে জনতা দলের প্রার্থীর নির্বাচনের ঠিক আগেই মৃত্যু হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ওই কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত রেখেছেন। সুতরাং ১৯৭২ সালের ২৮০ জন সদস্যের তুলনায় এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট ২৯৪ জন সদস্যের মধ্যে ২৯৩ জনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যখন এপ্রিল মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখন মোট ২৮০ জনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১৬, সি পি আই-এর ৩৫, আর এস পি-র ৩, সংগঠন কংগ্রেস ২ গোর্খা লীগ ২, এবং নির্দল ৫। যদিও সি সি আই (এম) ১৪ টি আসনে, এবং এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স পার্টি ১ টি করে আসনে জয়লাভ করেছিলেন, নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে এই সদস্যরা বিধানসভা বর্জন করেছিলেন। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস ও জনতা দল উভয়েই ২৯৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সি পি আই (এম) দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট), আর সিপি আই ও বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে একটি বামফ্রণ্ট গঠন করেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে সি পি আই (এম) প্রার্থী দেন ২২৪ টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩৬ টিতে, আর এস পি ২৩, ফরওয়ার্ড ব্লক (মাঃ) ৪, আর সি পি আই ৩ ও বি বা কং ৩টি আসনে। যদিও ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে তারপর চারটি নির্বাচনে হয় সি পি আই দল অপর কোন বামফ্রণ্ট কিংবা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে আসন ভাগাভাগি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন, এবার এঁরা

শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন

একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন; সি পি আই প্রার্থী দিয়েছিলেন ৬২ টি আসনে। তেমনি এস ইউসিও এবার কোন বামফ্রণ্টে যোগ না দিয়ে নিজেরা ২৩টি আসনে লড়াই করেছেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে অপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় নকসালপন্থী বলে পরিচিত সি পি আই (এম-এল)-এর একটি গোষ্ঠীর নির্বাচনের লড়াই-এ সামিল হওয়া। নকশাল নেতা শ্রী সত্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থা ঘোষণা করেন এবং এঁদের তিনজন নেতা নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, এঁরা তিন জনই মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রী সন্তোষ রানা গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। অপর দুজন অবশ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সর্বভারতীয় সি এফ ডি দল জনতা দলের সঙ্গে মিশে গেলেও অপর কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও সি এফ ডি-র কিছু বিক্ষুব্ধ সদস্য আলাদা ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রায় ১৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে মাত্র একজন—শ্রী আবদুল করিম চৌধুরী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এবার মোট চার জন নির্দল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে একজন সি পি-আই (এম) সমর্থিত।

ছয় পার্টির বামফ্রণ্ট এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় এসেছেন। ১৯৭২-এর বিধানসভায় যদিও ২৮০ জনের মধ্যে ২১৬জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেসও বিপুল সংখ্যাধিক্যের সমর্থন লাভ করেছিলেন, এবারকার বামফ্রণ্টের গণসমর্থন তার চেয়েও বিরাট—সর্বকালের রেকর্ড। বামফ্রণ্টের মোট সদস্যের সংখ্যা ২৩০, এঁদের মধ্যে সি পি আই (এম)-এর ১৭৮ (একজন সমর্থিত নির্দলকে নিয়ে), ফ: ব্লু:এর-২৫, আর এস পি-র ২০, ফ: বু: মা: ও আর সি পি আই ৩ জন করে এবং বি বা কং ১ জন সদস্য। জনতা দল পেয়েছেন ২৯ জন সদস্য। কংগ্রেস ২০ জন। সি পি আই মাত্র ২ জন। অন্যান্য দলের হিসাব: এস ইউ সির ৪, গোর্খা লীগ ২, সি পি আই (এম-এল), মুসলীম লীগ ও সি এফ ডি ১ জন করে এবং নির্দল ৩ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বামফ্রণ্ট ২৩০ টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করার পর বিধানসভায় বিরোধী পক্ষে মোট মাত্র ৬৩ জন সদস্য থাকলেন। গরিষ্ঠ বিরোধী দল হিসাবে জনতা দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কাশীকান্ত মৈত্র। কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা হয়েছেন ডা: জয়নাল আবেদিন।

এবার মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ভোট বিধিসম্মত ভাবে দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন গণ্য করেছেন। এই মোট বিধিসম্মত ভোটের মধ্যে একক বৃহত্তম দল সি পি আই (এম) পেয়েছেন ৫১ লক্ষ ভোট অর্থাৎ শতকরা ৩৬ ভাগ, যদিও ১৭৮ জন প্রার্থী (বিধানসভার মোট নির্বাচিত ২৯৩ জনের শতকরা ৬১ ভাগ) নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। বামফ্রণ্টের অপর পাঁচটি দল একত্রে ৫২ টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন, এই দল কটির মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ১১ ভাগ।

জনতা দলের প্রার্থীগণ মোট ২৮ লক্ষের কিছু বেশী ভোট অর্থাৎ মোট বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২০ ভাগের কিছু বেশী পেয়েছেন, এই দলের বিজয়ী সদস্যের সংখ্যা ২৯ হওয়ায় দল বিধান-সভার মোট আসনের শতকরা দশটিও লাভ করতে পারেন নি। কংগ্রেস দল পেয়েছেন ৩২ লক্ষ ভোট এবং মাত্র ২০ টি আসন। অর্থাৎ বিধিসম্মত ভোটের শতকরা ২২½ ভাগ ভোট পেলেও আসনের হিসাবে সে-সমর্থন প্রতিফলিত হয় নি। জেলার হিসাব বিচার করলে দেখা যাবে জনতা প্রার্থীগণ কুচবিহার, ২৪ পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ বর্ধমান, বীরভূম ও পুরুলিয়া এই কটি জেলায় একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেন নি। তেমনি কংগ্রেস কোন আসন পাননি কলকাতা, হাওড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বাঁকুড়া ও হুগলী প্রভৃতি সাতটি জেলায়। জনতা দল সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছেন—৩৭ টির মধ্যে ১৭—মেদিনীপুর জেলায়, আর কংগ্রেস পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী—১৯ টির মধ্যে ছটি—মুর্শিদাবাদে।

সকলেই জানেন জনতা দল নবাগত-হলেও এই দলের সর্বভারতীয় প্রাধান্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে এই দলের পরিক্রমন অনুসন্ধিৎসার বিষয়। তেমনি, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সি পি আই (এম) ও কংগ্রেসের উত্থান-পতন কৌতুহলী পাঠক মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন, সন্দেহ নেই। যদিও অতীতের হিসাব থেকে জনতা দলের কোন চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় তথাপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিবরণ থেকে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। এই সংকলন ১৯৬৭ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করা হয়েছে কারণ ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত সি পি আই ভাগ হবার আগে পৃথক দল হিসাবে সি পি আই (এম)-এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মোটামুটি হিসাবে সি পি আই এবং আরও কয়েকটি দলের উল্লেখও করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ২২ জন সদস্যের মন্ত্রিসভায় —সি পি আই (এম)-এর ১৪ জন, ফরওয়ার্ড ব্লকের চার, আর এস পি-র ৩ ও আর সি পি আই-এর ১ জন। সি পি আই (এম)-এর শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী। ৯৬৭ ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল—দুবারই সি পি আই (এম)-এর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে অন্য বেশ কয়েকটি দল যুক্ত হয়েছিল। দুবারই শ্রী বসু উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর এই বর্তমান

মন্ত্রিসভাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দশবার সরকারের বদল হল। বর্তমান বিধানসভা তথা নতুন সরকারের কথা বলতে হলে বোধ হয় ঐতিহাসিক বর্ণনার খাতিরে আগের সরকারগুলির উল্লেখও প্রয়োজন:

১। মার্চ ১৯৬৭—নভেম্বর ১৯৬৭ প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার।

২। নভেম্বর ১৯৬৭—জানুয়ারী ১৯৬৮ পি. ডি. এফ. সরকার।

৩। জানুয়ারী ১৯৬৮—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ রাষ্ট্রপতি শাসন।

৪। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭০ দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার

৫। এপ্রিল ১৯৭০—মার্চ ১৯৭১ রাষ্ট্রপতির শাসন।

৬। মার্চ ১৯৭১—এপ্রিল ১৯৭১ অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে সরকার

৭। এপ্রিল ১৯৭১—মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির শাসন।

৮। মার্চ ১৯৭২—এপ্রিল ১৯৭৭ কংগ্রেস সরকার।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জনৈক ভোটদাতা ভোট প্রয়োগ করছেন

৯। এপ্রিল ১৯৭৭—জুন ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতির শাসন।

১০। জুন ১৯৭৭— বামফ্রণ্ট সরকার।

গত দশ বছরে দশবার সরকার পরিবর্তন কী সূচীত করে? বাঙ্গালীর চপলচিত্ততা? নাকি, সমস্যাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা? রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙ্গালী অস্থির কারণ সে অধীর আগ্রহে এমন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা চাইছে যা তাকে শুধু সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি দেবে তাই নয়, আরও বেশী করে দেবে স্বাধীনতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষায় নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার নিরঙ্কুশ সুযোগ।

দল	১৯৬৭		১৯৬৯		১৯৭১		১৯৭২		১৯৭৭	
	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)	মোট ভোটের শতকরা প্রাপ্ত	মোট আসন লাভ (মোট আসনে লড়াই)
কংগ্রেস	৪১	১২৭ (২৮০)	৪০	৫৫ (২৮০)	৩০	১০৫ (২৮০)	৪৯	২১৬ (২৮০)	২২.৫	২০ (২৯৩)
সি পি আই (এম)	১৮	৪৩ (১৩৫)	২০	৮০ (৯৭)	৩৪	১১৩ (২৩৮)	২৮	১৪ (২০৮)	৩৬	১৭৮ (২২৪)
সি পি আই	৭	১৬	৭	৩০	৯	১৩	৮	৩৫	—	২
ফঃ বঃ	৪	১৩	৫	২১	৪	৩	১	০	--	২৫
আর এস পি	২	৬	৩	১২	২	৩	২	৩	--	২০
এস ইউ সি	০.৭	৪	১.৫	৭	২	৭	১	০	--	৪
কংগ্রেস (সং)	—	—	—	—	৬	২	১	২	--	--

পল্লীউন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

জ্বালানীর ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, যোজনায় পেট্রোলিয়ামের জন্য বরাদ্দের হিসেব গত বছরের ৪৮৫ কোটি টাকাকে আরো বাড়িয়ে এ বছর ৬৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপকূল-ভাগ ও স্থলভাগে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে ৪৫১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সম্প্রতি বোম্বাই হাই ও বেসিন ক্ষেত্রে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন ১ কোটি ১১ লক্ষ ১০ হাজার টনে পৌঁছাবে আশা করা যায়। গত বছর উৎপাদিত হয়েছিল ৮৮৯ লক্ষ টন।

২০০ মেগাওয়াটের একটি নতুন লিগনাইট-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য নাভেলি লিগনাইট করপোরেশনকে দেওয়া হবে ৫ কোটি টাকা। তামিলনাড়ুর বিদ্যুৎঘাটতির কথা বিবেচনা করে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৬৫১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩০২ কোটি টাকা রেল পাবে। রেলের বাজেট বরাদ্দ হল ৪৮০ কোটি টাকা।

গ্রামাঞ্চলে আরো বেশী সংখ্যক ডাকঘর চালু করা, এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সুযোগসুবিধা প্রচলনের জন্য অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সুপরিচালনার ফলে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলি যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য যোজনায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে ৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পরে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ হতে পারে। ঐসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। তাঁত শিল্পের জন্য ২০ কোটি এবং রেশম চাষের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

সময় সংক্ষেপ এবং চালু প্রকল্পগুলিতে প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ অব্যাহত রাখার দরুণ 'আমাদের ঘোষিত নীতি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো সম্ভব হয়নি বলে শ্রী প্যাটেল সংসদে মন্তব্য করেন। এছাড়া সম্প্রতি পুনর্গঠিত যোজনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে উঠতে পারেননি বলেও তিনি জানান। শ্রী প্যাটেল বলেছেন, দলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে পল্লী উন্নয়ন, হরিজন, আদিবাসী ও অন্যান্য অবহেলিত শ্রেণীগুলির অবস্থার উন্নতি, বেকারী দূরীকরণ, এবং ঝিগ্গি-বস্তী অপসারণ সহ অন্যান্য সমাজসেবার প্রসারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তিনি এমন একটি বাজেট রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যাতে দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের দর্শন, কর্মসূচী ও নীতিগুলির যথার্থ প্রতিফলন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ

৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নতির জন্য শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ, সেচ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের উন্নতির জন্য শতকরা ৫.৪ ভাগ, পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদির জন্য শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ব্যয় নির্ধারিত করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত ব্যয়-তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে আনুপাতিক হারে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে, আর এই ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সংকুচিত করা হচ্ছে শিল্প (বিশেষ করে রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্য, লৌহতর খনিজ এবং পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল শিল্প) এবং সমাজকল্যাণ (বিশেষত পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা) বিষয়ক ব্যয়বরাদ্দকে। বর্তমান বাজেটে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ (৩,৪৩১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,৯৩৯ কোটি টাকা)। কিন্তু এর চেয়েও বেশী হারে ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন, গ্রামীণ পানীয় জলের সংস্থান, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, নগর উন্নয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা, ভূমিসংরক্ষণ, পশুপালনশিল্প, মৎস্যচাষ, বনসংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, পেট্রোলিয়াম উত্তোলন, ঔষধ প্রস্তুতকারক শিল্পের বিকাশ, ইলেকট্রনিক্স, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিমান পরিবহণ ইত্যাদি।

প্রদত্ত তালিকা থেকে অনুমান করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের এই বৎসরের পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের দিক থেকে নজর খানিকটা সরিয়ে এনে হালকা শিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষি, সেচ, বনভূমি ও জলাধারের উন্নতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের মানুষের জীবিকার পথকেও সুগম করার চেষ্টা রয়েছে এই নূতন ব্যবস্থায়। দেশের স্বয়ংম্ভরতা বাড়াবার জন্য পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং বিদেশাগত পেট্রোলিয়ামের উপর একান্ত নির্ভরশীল রাসায়নিক শিল্পগুলির বিস্তারে সরকারী আগ্রহ বেশ খানিকটা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ানো এবং সেই ব্যয়কে নূতনতর খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টাই বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলে সাধারণ মানুষের বেকারি ও আর্থিক দুর্গতি হ্রাস পাবে এবং দেশে বিদ্যুৎ ও তেলের ঘাটতি কিছু পরিমাণে মিটিবে বলে আশা করা যায়। তবে একটি মাত্র বাজেটের সাহায্যে দেশের আর্থিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হবে এমন আশা সরকারী মহলও নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। পরিবর্তনের দিকে সামান্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপকেই আপাতত যথেষ্ট বলে ভাবা উচিত।

অমলেন্দু রায়চৌধুরী

আপনার আয়কর কত দাঁড়াল

জনতা সরকারের প্রথম বাজেটে আয়কর রেহাইয়ের সীমা আট হাজার থেকে বেড়ে দশ হাজার টাকায় দাঁড়াল। কিন্তু যে সমস্ত করদাতার করযোগ্য আয় দশহাজার টাকার বেশী তাদের ক্ষেত্রে আট হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের সবটাতেই ১৯৭৬-৭৭ সালের করহার অনুযায়ী কর ধার্য্য করা হবে। যাদের বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকার সামান্য বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিছু প্রান্তিক (Marginal) সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কোম্পানীগুলি বাদে অন্যান্য সকল শ্রেণীর আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জ আয়কর থেকে ছাড় পাওয়া যায়। মালিক পক্ষ যদি কোথাও তার কর্মচারী বা অফিসারকে মোটর গাড়ী বা স্কুটার প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেন তাহলে সেই কর্মচারী বা অফিসার এই বাবদ এক হাজার টাকার বেশি রেহাই পাবেন না।

যারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, জীবন-বীমা, ডাকঘরের দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা বা ইউনিট ট্রাষ্টের জীবন বীমায় টাকা জমান তাদের জমার প্রথম চারহাজার টাকায় কোন আয়কর দিতে হবে না। তার সমগ্র আয় থেকে এই টাকাটা বাদ দিয়ে বাকী টাকার উপর টাকার শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া যাবে। কিন্তু তাই আয়করের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বেতনের সব টাকা জমানো চলবে না। মোট বেতনের (বেতন থেকে যাতায়াত, বই কেনা প্রভৃতি বাবদ যে ছাড় পাওয়া যায় তা বাদ দিয়ে যেটা থাকে) শতকরা ৩০ ভাগের বেশি জমানো টাকা কর রেহাইয়ের হবে না।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ আয়করদাতা আছেন। জনতা সরকারের বাজেটে কর রেহাইয়ের সীমা দুহাজার টাকা বর্দ্ধিত হওয়ায় ৮ লক্ষ ২৩ হাজার আয়করদাতা এখন আয়করের আওতার বাইরে চলে গেলেন।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী করহার ওয়াংচু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিয়ে ৬৬ শতাংশ করে দিলেন। জনতা সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ. এম. প্যাটেল সারচার্জ পাঁচ শতাংশ বাড়ানোতে করহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে গিয়ে দাঁড়াল ৬৯ শতাংশ।

দশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পনের শতাংশ করা হয়েছে। পনের হাজার টাকার অধিক আয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিক জমা আরো দু বছর চালু থাকবে।

বার্ষিক দশ হাজার টাকার বেশি আয় না হলে আয়কর দিতে হচ্ছে না। কিন্তু আয় দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলেও নানা রকম ছাড় আছে যেমন দশ হাজার টাকা আয়ের বেতনভুক কর্মচারীরা যাতায়াত, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ কুড়ি শতাংশ হারে ছাড় পাবেন। আয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেলে পরবর্তী ধাপের আয়ের জন্য এটা হবে শতকরা দশভাগ। এই বাবদ যে রেহাই পাওয়া যাবে তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ অবশ্য ৩৫০০ টাকা। এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়া ভাতাকে বেতনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে না। বাড়ীভাড়া ভাতাও আয়কর ধার্য্য করা হবে। এ বিষয়ে নিয়ম হল পরবর্ত্তী জমা ছ হাজার টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বাকী জমানো

প্রথম জনতা বাজেটে ১০,৫৫০ টাকার বেশি আয়কারী ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে করের বর্ত্তমান ও নূতন হার অনুযায়ী হিসাব তালিকা নিচে দেওয়া হল:—

[illegible] আয়	আয়কর (দশ শতাংশ সারচার্জ সহ বর্ত্তমান হারে)	আয়কর (প্রস্তাবিত পনের শতাংশ সারচার্জ সহ)	করবৃদ্ধি +	হ্রাস
১০,০০১	৩৩০	নাই	–	– ৩৩০
১০,৫০০	৩৮৩	৩৮৫	+ ২	
১১,০০০	৪৯৫	৫১৮	+ ২৩	
১২,০০০	৬৬০	৬৯০	+ ৩১	
১২,৫০০	৭৪৩	৭৭৬	+ ৩৩	
১৫,০০০	১,১৫৫	১,২০৮	+ ৫৩	
২০,০০০	২,১৪৫	২,২৪৩	+ ৯৮	
২৫,০০০	৩,৫২০	৩,৬৮১	+ ১৬১	
৪০,০০০	৯,৫৭০	১০,০১৩	+ ৪৩৩	
৫০,০০০	১৩,৯৭০	১৪,৬১১	+ ৬১১	

এই তালিকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের ব্যক্তিদের কর বৃদ্ধি কতটা তা বোঝা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোররজী দেশাইকে একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, দশহাজার টাকা পর্যন্ত আয় আয়করমুক্ত রাখা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেছেন যে তিনি ইচ্ছে করলে এটা চার হাজার টাকায় নামিয়ে আনতে পারতেন। ব্যাপারটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাৎসরিক ১৬,৯৪৪ টাকা আয়েও এক পয়সা আয়কর না দিয়ে পারা যাবে।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করুন মাসিক ৯০০ টাকার মূল বেতনের একজন কর্মচারীর বার্ষিক আয় নিম্নরূপ:—

বেতন	১০,৮০০ টাকা
বাড়ীভাড়া ভাতা	১,৬২০ টাকা
শহর ক্ষতিপূরণ ভাতা	৬৪৮ টাকা
মার্গ্গী ভাতা	৩,৮৭৬ টাকা
মোট	১৬,৯৪৪ টাকা

এবারের বাজেট অনুযায়ী আয় দশ হাজার টাকা ছাড়ালেই আয়কর দিতে হবে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের আয় ১৬,৯৪৪ টাকা হলেও তিনি এক পয়সাও আয়কর না দিয়ে পারেন। তাঁকে অবশ্য সঞ্চয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক:

	মোট আয়	১৬,৯৪৪ টাকা
(ক)	বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ বাদ	১,৬২০ টাকা
		১৫,৩২৪ টাকা

অফিস যাতায়াত, বই কেনা
প্রভৃতি বাবদ বাদ—
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২০০০ টাকা

(খ) বাকী ৫,৩২৪ টাকার জন্য
৫২৩ টাকা

মোট ২,৫২৩ টাকা

এই ছাড় দেওয়ার জন্য বাড়ীভাড়াকে মোট আয় থেকে বাদ দিতে হয়।
(গ) জীবনবীমা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ডাকঘরে দশ বা পনের বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় ইত্যাদি বাবদ বাদ ৫,০০০ টাকা

মোট ছাড় ৭,১৪৩ টাকা

ভদ্রলোকের আয়ের ১৬,৯৪৪ টাকা থেকে ৭,১৪৩ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ৯,৮০১ টাকা। যেহেতু এই টাকা ১০,০০০ টাকার কম অতএব তাঁকে এক পয়সাও আয়কর দিতে হবে না। এছাড়াও পূর্ববর্তী বাজেটগুলিতে মধ্যবিত্তদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল—যেমন মাসিক এক হাজার টাকা আয়ের কর্মচারীদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তান কিংবা নির্ভরশীল ভাই বোনদের জন্য যে ব্যয় তাতে রেহাই দেওয়া—জনতা সরকারের বাজেটে এ সব সুযোগ সুবিধা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

স্বেচ্ছা ঘোষণা অনুযায়ী অনেকেই গোপন আয় ও সম্পদ ঘোষণা করেছেন, যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেন নি তাদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তাই কর ফাঁকি বন্ধের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কর ফাঁকি ধরা পড়লে জরিমানা হবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, ব্যাংকে রাখা টাকা আয়কর বিভাগ আটকে দিতে পারবেন এবং কারাবাসও করতে হবে। আইন ব্যাপারে আয়কর বিভাগকে অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়েছে। অপরদিকে আয়কর বিভাগকে এও দেখতে হবে সৎ আয়কর দাতারা কোন ভুল করে ফেললে তাদের যেন কোন হয়রানি না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বিভাগও চান করদাতারা যেন নিজেদের আয়ের রিটার্ণ ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পুরণ করে কর বিভাগে জমা দেন। অগ্রিম কর প্রদান করে, স্বনির্দ্ধারিত কর (Self assessment tax) ঠিক সময়ে জমা দিয়ে, হিসাব ঠিকমত রেখে (দুরকম খাতা নয়), করবিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর উল্লেখ করে করদাতারা আয়কর বিভাগকে সাহায্য করতে পারেন। এখন সব করদাতাকেই পার্মানেন্ট অ্যাকউন্ট নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই নম্বর তাঁদের চিঠিপত্রে; রিটার্ণফর্মে এবং চালানে উল্লেখ করতে হবে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগে যেমন কনজিউমার নাম্বার দিতে হয়; আয়কর বিভাগের সঙ্গে চিঠিপত্রে তেমনি পার্মানেণ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে।

নিজেদের হিসাব পত্রের খাতা যথাযথ ভাবে রাখাও করদাতাদের অবশ্য কর্তব্য। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, হিসাব-রক্ষক, শিল্প বিষয়ক পরামর্শদাতা, প্রভৃতির আয় যতই কম হোকনা কেন, হিসাব তাঁদের রাখতেই হবে। ব্যবসায় বা পেশায় নিযুক্ত প্রত্যেক করদাতা যাঁদের আয় বার্ষিক ২৫,০০০ টাকার উপরে বা ব্যবসায়ে বার্ষিক বিক্রয় আড়াই লাখ টাকার বেশি তাঁদেরও অবশ্যই হিসাব রাখতে হবে।

১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আয়কর আইনে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। তাতে হিসাব বহির্ভুত ব্যয়কে আয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যদি কোন আয়কর দাতা এমন কিছু ব্যয় করে থাকেন যে ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে এল সে সম্পর্কে আয়কর অফিসারের কাছে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে তিনি না পারেন তাহলে সেই ব্যয় তাঁর আয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে। আয়কর রিটার্ণ ফর্মের চতুর্থ অংশে এখন কর দাতাকে বাড়ীভাড়া, যাতায়াত, বিদ্যুৎ খরচ, ক্লাব এবং ভ্রমণ ও ছুটি কাটান সম্পর্কিত যাবতীয় খরচের হিসাব দিতে হবে।

আয়কর আইনকে ভালভাবে জেনে নিজের সঠিক আয়কর দিয়ে দিলে করদাতারা নির্ভীক ভাবে থাকতে পারেন—আয়কর বিভাগের কোন চিঠি পেলেই আর ভয়ে বক্ষ-কম্পন সুরু হয় না। অবশ্য এই আইন খুবই জটিল এবং তাই বর্তমান অর্থমন্ত্রী এইচ. এম. প্যাটেল এই আইনকে সরল করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আজকের প্রকল্প—যৌথ বীজতলা

কান্তিপদ ঘোষ

আবার এসেছে আষাঢ়। কাজল মেঘের কালো কোমল ছায়া, ঘনিয়ে আসছে থেকে থেকে। ঝর ঝর মুখর বাদল দিন। মাঠের পর মাঠ থৈ থৈ করছে বৃষ্টির জলে। কিন্তু আর একটা পরিচিত দৃশ্য এই দৃশ্যপটে নেই। সেটা হল টোকা মাথায় দিয়ে দলে দলে সকল কৃষকদের ধান রোয়ার ব্যস্ততা। কারণ সকলের চারা তৈরী হয়ে ওঠেনি। জলদি রোয়ার সুবিধাটুকু হাতছাড়া হয়ে গেল। এমন আর একটি ছবি। শরৎ শেষে হিমের পরশে শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অনেক অনেক ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে সে আসছে। কিন্তু মাঠে মাঠে তার আয়োজন কি সারা হয়েছে? কোথাও কিছু মাঠে চাষ পড়েছে, কোন মাঠে এখনও ধান তোলা হয়নি, কোন মাঠে ধানে কাস্তেই চলে নি। আবার কোন মাঠে এখনও ধানে জল দাঁড়িয়ে আছে। খরিফ মরশুমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধান রোয়ার ফলে শীতের ফসলও নাবি হতে লাগল। ফলে এই বাংলার স্বপ্ন স্থায়ী মূল্যবান শীতের অনেকটাই অপচয় হল। এই ক্ষতিগুলো কি এড়ান যায় না? হ্যাঁ যায়। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে আজকের প্রকল্প —যৌথ বীজতলা।

ধানের বীজতলার সাধারণ ছবি কি? আকাশের মুখ চেয়ে বা ক্যানেলের জলের ভরসা করে বর্ষা নামার সময় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ধারণা করে চাষীরা মাঠে বীজ ফেলেন। সাধারণত চাষীরা তাদের নিজের নিজের জমিতে নিজের প্রয়োজনীয় বীজটুকু ফেলেন। অধিকাংশ বীজতলাতেই সেচের বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে চারার উপযুক্ত বাড় অনেক সময়েই সময়মত হয় না। নাবি বৃষ্টিপাত, ক্যানেল বা সেচের জল পেতে বিলম্ব বা অন্যান্য নানাবিধ কারণ অনেক সময় ধান রোয়া বিলম্বিত করে। এই জন্য বর্ষা নামার ৮–১০ সপ্তাহ পরেও অনেক সময় ধান রুইতে দেখা যায়। এর ফলে যে ক্ষতিগুলির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হচ্ছে:—

(১) ফসল লাগানোর প্রকৃষ্ট সময়ের অপচয়।

(২) চারার বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের সম্যক বৃদ্ধি হয় না। বেশী পাশকাঠি বের হয় না এবং রোয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফুল এসে যায়।

(৩) রোগ ও পোকার আক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে।

(৪) ফুল অবস্থায় বা পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

(৫ সেচের জলের অপচয় হয়।

(৬) পরবর্তী রবি ফসলও নাবি হয়ে যায়।

এই সব কারণগুলি মিলে খরিফ মরশুমে ধানের ফলন অনেক সময় যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই ক্ষতির হাত এড়িয়ে ফলন বৃদ্ধি এবং সেচের জলের সদ্ ব্যবহারের জন্য কৃষক সমাজের সকলের যৌথ প্রয়াসে কম্যুনিটি নার্শারি বা যৌথ বীজতলার ভূমিকা সুদূর প্রসারী। রোয়া শুরু হওয়ার যথেষ্ট আগে সেচের সুবিধা-যুক্ত একটি জায়গায় সকলে একসাথে নিবিড়ভাবে বীজতলা করুন। প্রতি গ্রামে পুকুর, কূপ বা নলকূপের কাছে রোয়ার প্রকৃষ্ট সময়ের বা ক্যানেলের জল পাওয়ার ৪–৬ সপ্তাহ আগে বীজ ফেলতে হবে। একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট অধিক ফলনশীল দু একটি জাতের বীজ ফেলুন। বহনের খরচা বা সময় কমানোর জন্যে যে মাঠে ধান রোয়া হবে তার কাছাকাছি বীজতলা তৈরী করুন। ধানের চারা বয়ে দূরে নিয়ে যেতে হলে রাস্তার ধারে বীজতলা করাই সুবিধাজনক। অনেক সময় ধানের চারা বয়ে বেশ কয়েক মাইলও নিয়ে যেতে দেখা যায়। যেহেতু বীজতলা বেশীদিন জমি আটকে রাখে না, যে কৃষকের জমিতে এই বীজতলা হবে তার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যৌথ বীজতলায় কৃষকেরা যেভাবে উপকৃত হবেন সেগুলি হচ্ছে—

(১) পূর্বে উল্লেখ করা ক্ষতিকারক সম্ভাবনা থেকে ফসল রক্ষা পাবে।

(২) ধানের জাত বাছাই করার ব্যাপারে কৃষকদের প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আসবে।

(৩) এক সাথে বীজ তৈরী হয়ে যাওয়ার ফলে সারা মাঠে একই সাথে আগেই রোয়া সারা হবে। ফলে ঠিক সময়ে পরবর্তী রবি ফসলের জমি তৈরী ও ফসল লাগানোর জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এবং বহু ফসলী চাষেরও প্রসার হবে।

(৪) ধান আগে ওঠার জন্য জল কম লাগে। ফলে একই জাত বা একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট কয়েকটি জাত ক্যানেল-সেচ

সেবিত এলাকায় এক মাঠে লাগালে শুধু যে রোয়া, সেচ ও সার দেওয়া, রোগ-পোকা দমনের, নিড়েন কাটা ও তোলার সুবিধে হবে তাই নয়, সেচের জলের সাশ্রয় হওয়ার ফলে আরও অনেক বেশী জমি রবি ফসলের আওতায় আনা যাবে। অসেচ এলাকাতেও আগে জমি খালি হওয়ার জন্য অনেক জায়গায় তৈল বীজ; ডাল শস্য ইত্যাদি করার জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকবে।

(৫) শস্যরক্ষার খরচা অনেক কম হয়। কারণ এক একর বীজতলায় ওষুধ দিলে প্রায় দশ একর মূল জমিতে রোয়া ধানে প্রাথমিক ওষুধ দেওয়ার কাজ হয়। বীজতলা একত্রে হওয়ার ফলেও মজুর ইত্যাদি খরচ কম লাগে। ফলনও বৃদ্ধি পায়।

(৬) অনেক সময় নাবি রোয়া ধান জলচাপ হওয়ার ফলে ভাল পাশ-কাঠি ছাড়ে না, গুছির সংখ্যাও কমে যায় এবং সারের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, যৌথ বীজতলা করে জলদি রুইতে পারলে এই ক্ষতিগুলি এড়ানো সম্ভব।

(৭) রোয়া দেরী হলে অনেক সময় তাড়াহুড়োর মাথায় জমিকে সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এই সব আগাছা, যা সহজেই বাড়বার ক্ষমতা রাখে, স্থান, আলো ও সারের ব্যাপারে ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু জলদি রোয়ার ফলে ধান তাড়াতাড়ি বেড়ে আগাছার ক্ষতি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সারেরও সদ্ব্যবহার করতে পারে।

(৮) জলদি রোয়ার যে স্বাভাবিক সুবিধা আছে তার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া যায়। আমাদের চাষীরা বলেন আষাঢ়ের রোয়া ধান 'চার পোয়া' হয় অর্থাৎ মরশুমের পুরো সময়টা ফসল পাওয়ার জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার পাচ পুরো পেতে পারে।

(৯) অধিক ফলন দেওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত এবং অন্যান্য নতুন জাতগুলির দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়। কারণ এই যৌথ প্রকল্পে এক সাথে অনেক চাষী অংশগ্রহণ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জনই এগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন।

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তাতে গমেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। উপযুক্ত জাতের অভাব ও অন্যান্য কারণে ধানের ফলনে ব্যাপক সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইদানীংকালের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিশীল ধানের জাতের আবিষ্কার, ধানে বিজ্ঞান-সম্মত সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ধান চাষে অখ্যাত রাজ্যগুলির ধান্যোৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লাভ ইত্যাদি থেকে আশা করা যাচ্ছে 'ধান্য-বিপ্লব' শুরু হওয়ার প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করা গেছে। এই নতুন বিপ্লবে যৌথ বীজতলা বা কম্যুনিটি নার্শারী বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নতুন বাজেটে কর প্রস্তাব

৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সাময়িক সংবাদপত্র, দেশী পশম ইত্যাদির উপর।

এছাড়া ঢালাওভাবে ২ শতাংশ কর ধার্য হয়েছে সব জিনিষের উপর যেগুলি অন্যভাবে আবগারী শুল্কের আওতায় পড়েনা। এই শুল্কের হার আগের বাজেটে ছিল ১ শতাংশ এবং ঐ বাজেটেই এই শুল্ক প্রথম বসানো হয়। দেখা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী তাঁর পূর্ববর্তীর পথই এক্ষেত্রে শুধু অনুসরণ করেছেন তাই নয় বরং তাঁর উপরে আরও একটু এগিয়ে গেছেন। মনে হয় রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটা এত মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার ফলাফল বিশেষ খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। এমন ঢালাওভাবে আবগারী কর ধার্য করলে তা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সব জিনিষের দামকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং সে হার যত কম থাকে ততই বাঞ্ছনীয়।

সব মিলিয়ে প্রস্তাবিত করব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধি রোধে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত ব্যয়সংকোচ, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির কথা বললেও মোট ধার্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ গত বাজেটের চেয়ে বেশ অনেকটাই বেশী। ফলে নানাভাবে কর সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির একটা বড় কারণ আবগারী কর, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর। সেদিক থেকে নতুন বাজেট কোনও সুবিধার প্রতিশ্রুতি বহন করে না। ... তে কাজ করার ছোট যন্ত্রপাতি বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কি করে বিলাস বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আওতায় পড়ে বোঝা যায় না। এদের মূল্যবৃদ্ধি মানেই অন্য অনেক জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি।

সবশেষে করব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল তার জটিলতা। একথা অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন কর ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে পূর্বে নিযুক্ত নানা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের উপর কি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা তিনি কিছুই জানান নি। যেভাবে ১০,০০০ টাকার উপর আয়করের প্রান্তিক ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে বা পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেভাবে যন্ত্র চালিত বস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে,—সেসবই এই জটিলতার উদাহরণ। এই ধরণের জটিলতার নানা নিদর্শন কর প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে। এতে করদাতারা বিভ্রান্ত হন। সরকারের রাজস্ব আদায়ের খরচ বাড়ে, আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণও আশানুরূপ হয় না। এই জটিলতা পরিহার না করতে পারলে কর-ব্যবস্থা নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আজকের নাটকে

আমরা সবাই 'জগন্নাথ'

'জগন্নাথ' ফাঁসির দড়ি গলায় নেবার আগে বলেছিল 'আমার পাশে বিপ্লবীরা থাকলে দাসবাবুকে আমিও মারতে পারতাম। পারবে, পারবে নন্দ ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে। ধ্যুস্!'

নাটকের চরম মুহূর্ত এটিই, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও গভীরতার নির্যাসটুকু বেরিয়ে এসেছে এই একটি সংলাপে। নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায় এমনি ছোট ছোট কিছু চিত্রকল্পে ও সংলাপে প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের মোড়কে আজকের, একবারে এই আজকের কয়েকটি শ্রেণীর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন 'জগন্নাথ' নাটকে একাডেমির মঞ্চে। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় চমকে উঠতে হয় মাঝে মাঝে, তার নিপুণ বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে বিস্ময় জাগে।

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'একটি শিশির বিন্দু' বা 'অমূল্য রতন' বিশেষণ দুটি নাটকের প্রধান চরিত্র 'জগন্নাথ'কে দেওয়া যায় অনায়াসেই, অবশ্যই বিনা কারণে নয়। নাট্যকার পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় (অনুপ্রেরণা: লু শুনের একটি ছোট গল্প) শ্রেণী পর্যায়ের একবারে শেষ ধাপটিতে নেমে এসে যাঁকে তাঁর এই নাটকের মধ্যমণি করলেন সে মেরুদণ্ডহীন হাবা-গোবা প্রতিবাদ করার ক্ষমতাহীন এক জনমজুর। সরল সাধাসিধেও বটে জগন্নাথ। ভালোবাসা এবং কর্মক্ষেত্র দু জায়গাতেই সে পাথরের মত নীরব, কিন্তু ভেতরে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আগুনে জ্বলন্ত। আমরা সবাই তো তাই।

এই জগন্নাথকে ঘিরে রয়েছে গাঁয়ের পুরুত ঠাকুর, যিনি জমিদারের মাস-মাইনের চাকর, যাঁর দেওয়া 'কিসব' খেয়ে মেয়ে নলিনীর 'ভর' হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর প্রতি এমন চরম আঘাত আর কেউ দিয়েছেন কি? আছে জমিদার দাসবাবু যাঁর কাছে 'মেয়েছেলে' মানেই উপভোগের বস্তু, আছেন বিপিনবাবু যিনি এইসব ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথদের চোখে 'আত্মার' ঠুলি পড়িয়ে ঘোরাতে চান, আছে গাঙ্গুলী মশাইয়ের মত দালাল, আর আছে বরুণের মত সহৃদয় বিপ্লবী, সশস্ত্র স্বাধীনতা বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী বটে কিন্তু বিপ্লবের আসল শক্তি এই সব 'জগন্নাথ'দের তাঁরা দলে নিতে চাননা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীন বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী তাঁরা। 'জগন্নাথ' বরুণদের কাছে ঘুমন্ত।

পাশাপাশি নন্দকে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। নন্দ জগন্নাথের মতই জন-মজুর। একই শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা, কিন্তু নন্দ হাবাগোবা নয়, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে তৎপর। তাই যে জগন্নাথকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়, বিপ্লবীদের দলে ভেড়ে। অবশ্য বিপ্লবীরা বলেন 'ওকে দলে নিতেই হোল'। আসলে জগন্নাথও নন্দ হতে পারত, সঠিক নেতৃত্ব পেলে গাঙ্গুলীমশাই-এর কাছ থেকে পূর্ণ মজুরী আদায় সে করত, বাল্য প্রেমিকা মনোরমাকে দাসবাবুর 'খাদ্য'হতে দিতনা জগন্নাথ। করতে পারত আরও কিছু।

কিন্তু তা আর হল কই! দেশের শতকরা নব্বুই জন নাগরিক রইল নেতৃত্বহীন, হালভাঙ্গা পালছেঁড়া নৌকোর মত। অথচ এরাই আসল শক্তি, হাতিয়ার। সমাজ বদলের যজ্ঞে এরাই প্রকৃত পুরোহিত।

'জগন্নাথ'-এর মৃত্যুর পরও যখন বিপ্লবীদের মধ্যে তার চরিত্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিভেদ জাগে তখনই প্রমাণ হয়ে যায় তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবটা ছিল কেমন তাসের নিগড়। অরুণবাবু প্রায় অনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে জগন্নাথ, আশ-পাশের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর এই বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই জীবন ও মাটির গন্ধ নিয়ে হাজির হবে, কেউ কেউ ক্ষুন্ন হতে পারেন হয়ত কিংবা বিরক্তও, কিন্তু ইতিহাসের গতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেবেই।

নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় উপ-স্থাপনার অভিনবত্বে নাট্যকার অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ছাড়িয়ে গেছেন। নাটকের এমন ফিল্মিক ট্রিটমেন্ট সম্ভবত বাংলা মঞ্চে এই প্রথম। দু-ঘন্টার নাটকে তিনি চিত্রনাট্যের ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন সর্বত্র। এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয়নি নাটক বাঁধা ফ্রেমের বাইরে।

নাটকের শুরু মঞ্চের দুই প্রান্তে বিপ্লবীদের জমায়েত আর জগন্নাথের মৃত আত্মাকে নিয়ে। বরুণের কথায় বিদ্রূপ করে জগন্নাথ যখন বলে—'চুপ্ চুপ্', আমরা এখন মৃত জগন্নাথের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি' তখনই আসনে সোজা হয়ে বসতে হয়, চোখ ঘুরতে থাকে মঞ্চের আনাচে কানাচে। টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা মঞ্চ কখনও হয় দাসবাবুর বাড়ি—হেঁসেল, বিচারালয়, কালী মন্দির (হাঁড়ি কাঠ এবং বিচারকের চেয়ার একই রেখায় সংস্থাপন বিশেষ অর্থবহ বটে)। কখনও বা জগন্নাথের কুঁড়ে কিংবা রাস্তা।

জগন্নাথ/ স্বপ্না মিত্র ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

DHANADHANYE YOJANA (Bengali) Regd. No. WB/CO-315
Price 50 Paise July 16—31, 1977

ছায়াছবির টাইটেল পর্বের মত টুকরো টুকরো কয়েকটি দৃশ্যে শুরুতেই অরুণবাবু পরিচয় করিয়ে দেন নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে।

এরপর শুরু হয় নাটক।

ছেঁড়া ছেঁড়া সেই দৃশ্যগুলো বলে দেয় এই নাটক ব্যবসায়ে আপোষচরিত্রের নয়, কিংবা আপাত বামপন্থী বিপ্লবী বুলির আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা কিছু নেই। সৎ পরিচ্ছন্ন রাজনীতির নাটক জগন্নাথ। জগন্নাথ মাটির নাটক, মানুষ নিয়ে নাটক, জগন্নাথ মাটির মানুষের নাটক।

অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকার নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়কেও টপ্‌কে গেছেন। চরিত্রটিকে তিনি দর্শকের একবারে বুকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কখনও নীরব থেকে, কখনও মাইম্‌ করে তিনি সত্যিই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন যেন সবার অজান্তে। দলগত অভিনয়েও কেউ কাউকে টেক্‌কা দিতে পারেননি, সবাই-ই সমান। মনোরমার ভূমিকায় স্বপ্না মিত্রকে একটু বেশী ভালো লাগার কারণ তার আবেগমণ্ডিত মুখশ্রী, কিংবা গাঙ্গুলীবাবুর চরিত্রের শিল্পীকে কিঞ্চিৎ 'নাটুকে' দোষদুষ্ট মনে হবে, কিন্তু সব ছাপিয়ে নাটকের সার্বিক উপস্থাপনায়, মঞ্চ, আলো, অভিনয় ইত্যাদির মোড়কে গভীর তত্ত্ব ও জীবনের যে সত্যটি নিয়ে 'জগন্নাথ' কলকাতায় হাজির তা শুধু নাট্যকার-নির্দেশকের নয়, দলের (চেতনা) মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং চেতনা বাংলা নাট্যজগতে চলে আসবে প্রথম সারিতে। এ সম্মান অবশ্যই তাঁরা দাবী করতে পারেন।

নির্মল ধর

খেলাধূলা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত চিন্তা করা যায় নি, কলকাতার বুকে প্রথম জাতীয় নৌ বাইচের একটা জম-জমাট আসর বসতে পারে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই প্রতিযোগীতাকে ঘিরে এত উন্মাদনা থাকতে পারে। নৌ-বাইচের জাতীয় আসরে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা দল। প্রতিযোগিদের সংখ্যা তেমন বড়সড় ছিল না; তবুও [illegible] প্রদেশ বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে

নৌ-বাইচ ফাইনালে জুনিয়ার চার দাঁড়িতে বাংলা তামিলনাড়ুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আছে

কয়েকটি বিভাগে। মোট ছয়টি বিভাগের এই প্রতিযোগিতায় মুখ্যত প্রাধান্য ছিল বাংলার জুনিয়ারদের; ফাইনালে পাঁচটিতেই বিজয়ী হয়েছে বাংলার খেলোয়াড়েরা। বাকিটাতে জিতেছে তামিলনাড়ু।

বাংলার সাফল্য এসেছে মুক্ত বিভাগের একদাঁড়ী (স্কাল), মুক্ত ও জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ী (পেয়ারস্থ) এবং চার দাঁড়ীর এক হালির (ফোরাস) ফাইনালে।

তামিলনাড়ু বিজয়ী হয়েছে জুনিয়ার বিভাগের একদাঁড়ীর ফাইনালে।

ফাইনালে বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। চার দাঁড়ীতে বাংলার পক্ষে ছিলেন সতীনাথ মুখার্জী, অশোক মেহতা কমল দত্ত, গিরিশ ফার্নিস এবং হালি নির্মল মজুমদার। জুনিয়ার বিভাগের এক দাঁড়ীর ফাইনালে বাংলার এস আর কালিদাস, তামিলনাড়ুর ম্যানিকমের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

জুনিয়ারদের দু দাঁড়ীতে বাংলা (কালিদাস ও এম আর উদয়শংকর) সহজে উত্তর প্রদেশকে এবং মুক্ত বিভাগে

জাতীয় নৌ-বাইচে বাংলার সাফল্য

২৬ জুন রবিবার রবীন্দ্র সরোবর লেক ক্লাবের সীমানায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠানটি ছিল জুনিয়ার বিভাগের চার দাঁড়ী এক হালির ফাইনালে। শুরু থেকেই বাংলা ও তামিলনাড়ুর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। সমাপ্তি রেখার বরাবর এসে বাংলা আধ নৌকার ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে তফাৎ-এ ফেলে দেয়। তারা তিন মিনিট ২৫ সেকেণ্ডে ঐ নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। এটিই ফাইনালের সবচেয়ে আর্কষণীয় মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে দর্শকেরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুগছিলেন। সেই সঙ্গে চিৎকার হাত তালিতে মুখরিত হয়ে উঠছিল প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণ। দর্শকের ভীড়ও ছিল যথেষ্ট। বাংলা দলে ছিলেন এ রায়, এল বিশ্বাস, আর মুখার্জী, পি সাহা এবং হালি সি ব্যানার্জী।

প্রতিযোগিতার একমাত্র ট্রফি প্রেসিডেণ্ট কাপকে ঘিরে মুক্ত বিভাগের চারদাঁড়ীর ঐ একই আসরে বাংলা (কমল দাস, অশোক মেহতা) দেড় নৌকার ব্যবধানে কোর অফ ইঞ্জিনয়ারিংকে হারানোর সময় যে দৃশ্য সেদিন সৃষ্টি করেছিল. দর্শকেরা তার মধুর স্মৃতি কোনদি ভুলতে পারবে না। মুক্ত বিভাগে এক দাঁড়ির সেমিফাইনালে তামিগাড়ুর এম এম সান্যালের কাছে মহারাষ্ট্রের সর্বজনপ্রিয় আর দেশপাণ্ডের পরাজয় এবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম অঘটন। কারণ, দেশপাণ্ডে গতবছর কলকাতায় আয়োজিত প্রাচ্য নৌ-বাইচের ঐ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। যাই হোক এবারের প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কলকাতার মানুষের কাছে এবং কয়েকটি বিভাগের স্মৃতি মনে গেঁথে থাকবে আগামী বছর পর্যন্ত।

সরোজ চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় তথ্য ও [illegible] প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
[illegible] প্রিন্টিং কোং প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।

ধনধান্যে

স্বাধীনতাদিবস সংখ্যা

এক টাকা

চিঠি চিঠি চিঠি চিঠি চিঠিপত্র
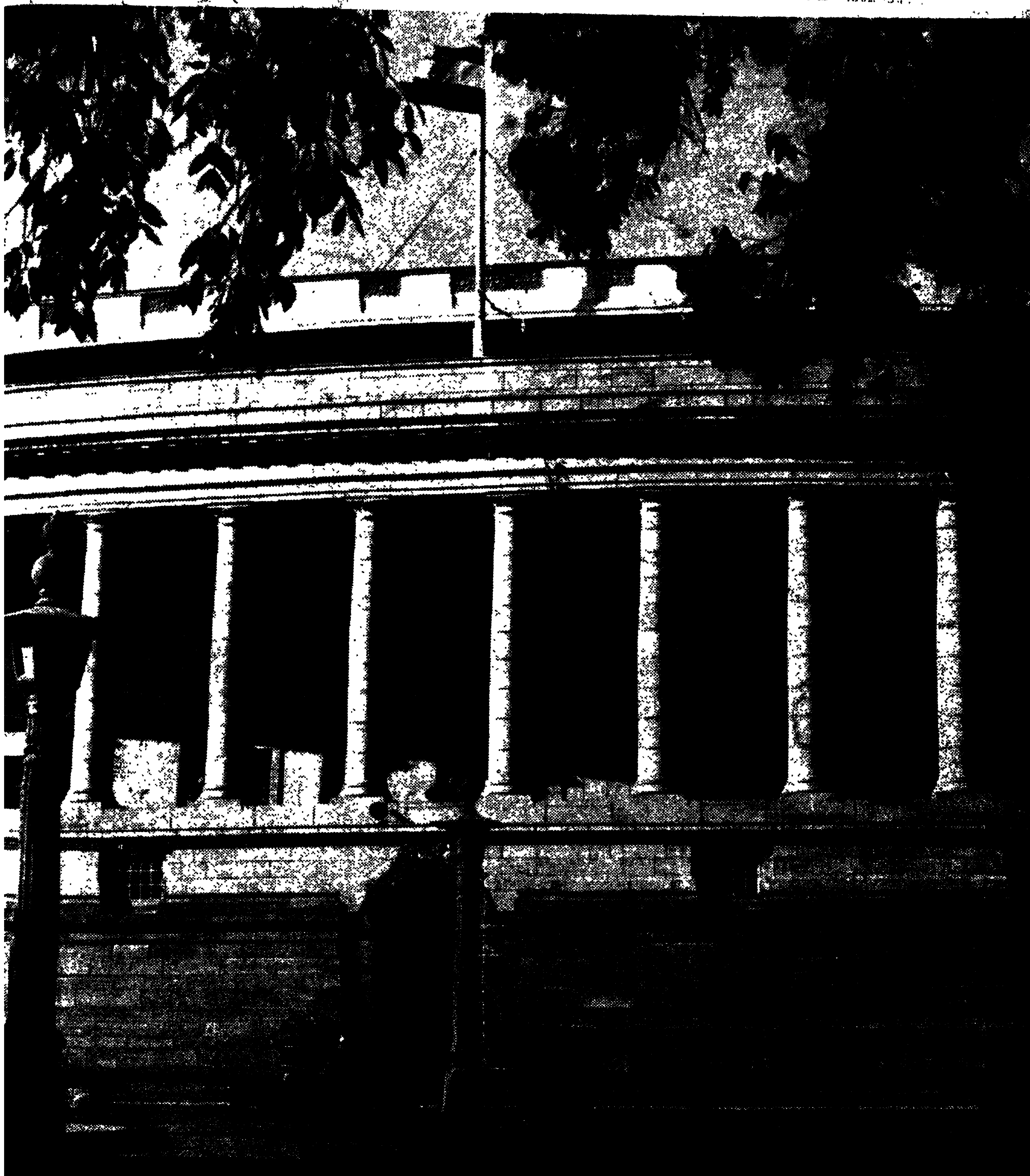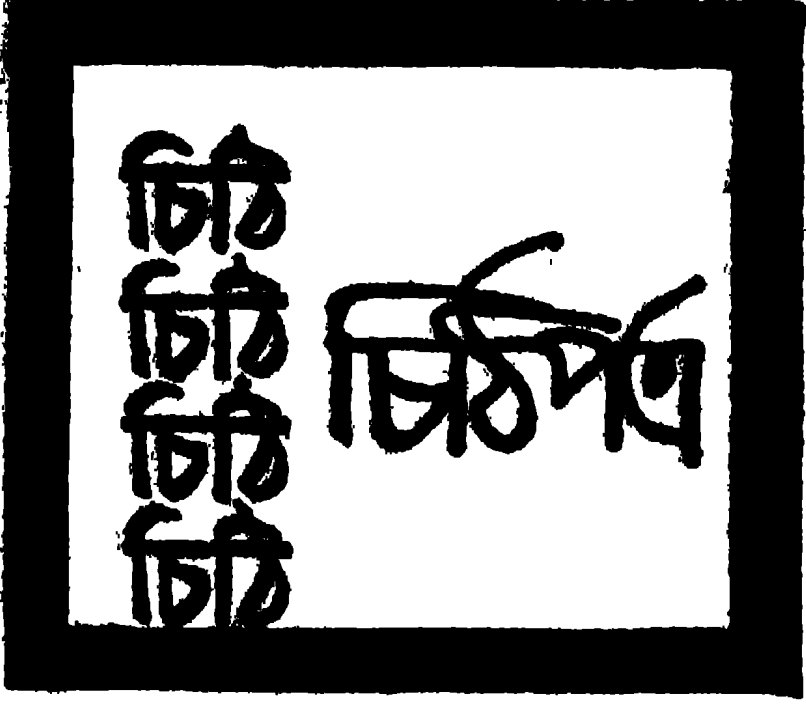
চলার পথে বহু জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। কোনটা নজর কাড়ে আবার কোনটা কাড়ে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা চোখ ঝলসানো জিনিসগুলোর দিকেই তারিফ করে চেয়ে দেখি। মন ভরুক কিংবা নাই ভরুক নামী জিনিসতো দামী হবেই—এই ভাবটা আমাদের মাঝে বড্ড বেশী কাজ করে। আমি এই দল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাদ দিই কি করে? তাই বাংলা সাহিত্যের বাজারে চটকদারী (বাজারে যাদের জোর নামডাক) পত্র পত্রিকাগুলোর প্রতি বরাবরই আমার একটু আকর্ষণ। যেগুলো হালফিল এদের এড়িয়ে চলার একটা মানসিক অবস্থাও দিনে দিনে তৈরী হয়ে যাচ্ছিল। অবসর সময়ে কাছে পড়ে থাকা ও (?) গুলোর পাতা উল্টোনোটাকে অকারণে সময় ব্যয় বলেই ভাবতাম। ঐ শেষোক্ত দলে 'ধনধান্যে'ও বাদ পড়েনি। কোন কোন জায়গায় যদিও নজরে এসেছে, কিন্তু ভেতরে কি মসলা আছে চোখে দেখিনি।

হঠাৎ ১৬-৩০ এপ্রিল ১৯৭৭-এ উল্টেথাকা পাতাটা চোখে পড়লো। মোহাম্মদ কারো মহাশয়ের চিঠিটাতে অকারণে চোখটা এগিয়ে গেল। চিঠিটা শেষ করে জানতে ইচ্ছা করলো ভদ্রলোক কথাগুলো সত্যি বললেন না কোন কারণে স্তুতি করলেন। তারপর সম্পাদকের কলমের কাছ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত একের পর এক লেখাগুলো পড়ে গেলাম। আশ্চর্য লাগল, অনেক নামীদামী পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে কোন টপিক্স বিরক্তি এনে দেয়; কিন্তু 'ধনধান্যে' বিদগ্ধ মনের রস শুধু মেটায়নি, বিষয় বৈচিত্র্যেও সুন্দর। বাংলা সাহিত্যের তারুণ্যের জোয়ার নিশ্চয়ই একে স্বয়ং সম্পূর্ণ করবে। তবে এই পত্রিকাটিতে বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক সম্পর্কে নির্ভীক চিন্তাশীল আলোচনা থাকলে সাহিত্যে চেতনাবোধ আরও সুদূর প্রয়াসী হবে আমার ধারণা।

ভাগাধর বারিক
সাগর, ২৪ পরগণা

হঠাৎ আপনাদের বিশেষ সংখ্যা 'সাহিত্য সংখ্যা ১৯৭৭' পড়লাম। সংখ্যা যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা বিরল। রচনার বিন্যাস সেই সঙ্গে প্রতিটি প্রবন্ধ, গল্পের সঙ্গে যে শক্তিশালী চিত্রকর্ম স্থান লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। সজ্জা-অলঙ্করণ, বলা বাহুল্য, যে কোনো বিখ্যাত পত্রিকা থেকে উৎকৃষ্ট। পত্রিকাটি আমার মনে এমন স্থায়ী ছাপ রেখেছে যে সেজন্য আপনাদের চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। অত্যন্ত রুচিশোভন অর্থব্যঞ্জক। এজন্য শিল্পী মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ধন্যবাদার্হ। আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সোমনাথ সামন্ত
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।

আগামী সংখ্যায়

সুজনের আকাশ (গল্প)
তেজেশ অধিকারী

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখোমুখি
স্বপনকুমার ঘোষ

নিবন্ধ

পশ্চিম বাংলায় সীসা-দস্তা-রূপা
সঙ্কর্ষণ রায়

অ্যাবসার্ড নাটকের দুই শিল্পী
বিজয় দেব

আদিবাসীদের গানে চাষ
সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশেষ রচনা

এই লভিনু সঙ্গতব
কিষণচাঁদ বর্মণ

'ধনধান্যে' প্রতি ইংরেজী মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পরিকল্পনা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। তবে এতে শুধু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয় না। 'ধনধান্যে'র লেখকদের মতামত তাঁদের নিজস্ব।

গ্রাহক মূল্যের হার:

একবছর ১০ টাকা, দুবছর ১৭ টাকা এবং তিনবছর ২৪ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

গ্রাহকমূল্য নগদে বা মনিঅর্ডারে গ্রহণ করা হয়।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহক-মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেওয়া হয়। ভারত সরকারের পাব্লিকেশন্স ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ক্রয় করলে গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পাব্লিকেশন্স ডিভিশনের এজেন্টরাও যথারীতি কমিশন পাবেন। এজেন্সীর জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ও গ্রাহকমূল্য পাঠাবার ঠিকানা:
'ধনধান্যে, পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন,
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট,
কলিকাতা-৭০০০৬৯,
ফোন: ২৩-২৫৭৬

সম্পাদক
পুলিনবিহারী রায়
সহকারী সম্পাদক
বীরেন সাহা
উপ-সম্পাদক
ত্রিপদ চক্রবর্তী

ধনধান্যে

উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার অগ্রণী পাক্ষিক

১-৩১ আগষ্ট, ১৯৭৭
নবম বর্ষ : তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ চিত্র—পি. কে. কাপুর

সম্পাদকের কলমে

ত্রিশ বছর আগে এমনি এক পনেরই আগষ্ট আমরা পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। নিজের দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব দেশবাসীর কাঁধে সেদিন ন্যস্ত হয়েছিল। নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতবাসী সেই দায়িত্ব পালনে যে উত্তীর্ণ হয়েছে সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। গণতান্ত্রিক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি সেদিনকার দেশনেতারা দিয়েছিলেন, ভারতের নাগরিক সে প্রতিশ্রুতির অমর্যাদা করেনি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে যখন একে একে গণতন্ত্রের অকাল মৃত্যু ঘটেছে একনায়কতন্ত্রের হাতে, তখন ভারতবর্ষে সে হাওয়া কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি। ১৯৫০ সালে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল সেই সংবিধানের নির্দেশিত পথে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, ১৯৫২ সালে অর্থাৎ পঁচিশ বছর আগে স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের আরম্ভ প্রথম সার্বিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বহু পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ভারতের মত বিরাট দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার খুবই নগণ্য, সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ছ-ছ'বার সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কিন্তু ভারতবাসী প্রমাণ করেছে সেই সন্দেহ অমূলক। নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধান, নানা কৃষ্টি, নানা সামাজিক আচার ও কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসী প্রতিটি নির্বাচন-পরীক্ষায় সাফল্যের সংগে উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত অবলুপ্তির পর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে। ভারত কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সেই পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছে।

গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতবাসী অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সেই অহিংস পথেই আবার পরিবর্তন সম্ভব সেই নীতিতে ভারতবাসী বিশ্বাসী। তাই গত সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে সুদীর্ঘ ত্রিশবছরের কংগ্রেস সরকার জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শাসন ক্ষমতা থেকে কংগ্রেস দল অপসারিত। নতুন দল—জনতা জনসমর্থনে দেশ গঠনের দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

এই যে পরিবর্তন—এটা কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আসেনি, এসেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে। গণতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর এই যে আস্থা সেটাই প্রমাণ করেছে ভারতে স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের কোন স্থান নেই। ভারতবাসীর কাছে গণতন্ত্রই জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের পথ। তাই শতশহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতাকেই শুধু নয় সেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার শপথ নেওয়ার দিন আজ। এই পুণ্যতিথি সেই শপথ গ্রহণের দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হোক। তাহলেই সার্থক হবে আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালন।
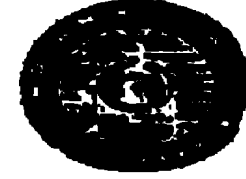
স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা—এই তিন নিয়ে ভারতের সংসদ। যে কোন আইনের প্রস্তাব (বিল) লোকসভায় ও রাজ্যসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করলে তবেই তা আইনে পরিণত হয়। এই ব্যাপারে উক্ত তিন প্রতিষ্ঠানকে সমক্ষমতাসম্পন্নই বলা যায়। কারণ কোন বিল শুধু লোকসভায় বা রাজ্যসভায় অনুমোদিত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, আবার উভয় সভার অনুমোদনও একটি বিলকে আইনে পরিণত করতে পারেনা যদি না রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর না দেন।

রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যরা নির্বাচিত, যদিও সকলের নির্বাচন পদ্ধতি সমরূপ নয় (উভয় সভাতেই অল্প কয়েকজন মনোনীত সদস্য আছেন, যাদের কথা পরে বলা হবে)। সুতরাং বিলকে আইনে পরিণত করার পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক আদর্শ কোনভাবেই ক্ষুণ্ন করা হয়নি আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায়। বৃটেনে রাজা অথবা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রপ্রধানপদে আমৃত্যু অধিষ্ঠিত হন। বৃটেনের পার্লামেন্টের উচ্চসভা 'হাউস অফ লর্ডস্'-এর সকল সদস্যও হয় মনোনীত নয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ পদ প্রাপ্ত। সুতরাং বৃটেনের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় হলেও তাকে সম্পূর্ণরূপে সংসদীয় গণতন্ত্র বলা যায় না। ভারতের সংবিধানে বৃটেনের প্রভাব থাকলেও এইখানেই দুই সংবিধানের মৌল পার্থক্য।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান বলবৎ হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী এবং সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। সাধারণ নির্বাচনে প্রথম গঠিত হয় কেন্দ্রের লোকসভা ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধান সভা। তারপর বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধান সভার সদস্যদের ভোটে গঠিত হয় রাজ্যসভা। রাজ্যসভার প্রথম বৈঠক বসে ১৯৫২ সালের ১৩ মে। সুতরাং, তারিখের হিসাবে, লোকসভার কয়েক মাস পরে গঠিত হয় রাজ্যসভা। এই কারণে সম্প্রতি যখন রাজ্যসভার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশে রজতজয়ন্তী পালন করা হয় তখন অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগে যে, শুধু রাজ্যসভার রজত জয়ন্তী হ'ল কেন? লোকসভার বয়স ত আরও বেশি, এবং তা অধিক প্রতিনিধি-মূলক ও অধিক ক্ষমতাশালী। এর প্রধান কারণ দুটি।

প্রথমত, লোকসভা প্রাক-স্বাধীন যুগের বিধিব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। বৃটেনের ক্যাবিনেট মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ মে তারিখে ঘোষিত পরিকল্পনা অনুসারে ঐ বছর ৯ ডিসেম্বর যে পরিবর্ধিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়, তাই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) ও কেন্দ্রীয় সংসদরূপে কাজ করতে থাকে। সংবিধান রচনার কাজ শেষ হ'লে কেন্দ্রীয় সংসদ আর গণ-পরিষদ থাকেনা, কিন্তু ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন লোকসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কেন্দ্রীয় আইনসভার সকল দায়িত্ব বহন করতে হয়। সুতরাং প্রথম লোকসভাকে প্রাক-স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিসভার অবিচ্ছিন্ন ধারা বলা যায়। সেই হিসাবে লোকসভার সঠিক বয়স নিরূপণ সহজ নয়।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভা যেমন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান লোকসভা তা নয়। সাধারণ অবস্থায় লোকসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি তার আগেও লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। যেমন, ১৯৬৭ সালে গঠিত লোকসভা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আবার দেশে যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তাহলে লোকসভার মেয়াদ পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তার আয়ু প্রতিক্ষেপে একবছর করে বাড়িয়ে যাওয়া চলে, যেমন বাড়ানো হয়েছিল ১৯৭৬ সালে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার কালে।

লোকসভা ভেঙে দিলেই তার সকল সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এবং সে নির্বাচনে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া লোকসভার সদস্যরা বড় জোর নিজেদের প্রাক্তন সংসদ-সদস্য বলতে পারেন। অপরদিকে রাজ্যসভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং তার একজন সদস্য অবিচ্ছিন্নভাবে বারবার নির্বাচিত হতে পারেন। যেমন শ্রী ভূপেশ গুপ্ত রাজ্যসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার সদস্য আছেন, একদিনের জন্যও তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়নি। তাঁর ছয় বছর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

লোকসভাতেও শ্রীজগজীবন রাম, শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন সদস্য আছেন যাঁরা লোকসভার সকল নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তার সদস্য আছেন। কিন্তু লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সদস্য পদেও ছেদ পড়েছে। বর্তমানে তাঁরা ষষ্ঠ লোকসভার সদস্য।

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, বর্তমান সংবিধানে এমন কোন বিধি নেই যা প্রয়োগ করে রাজ্যসভা ভেঙে দেওয়া যায়। কিন্তু রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকাল ছয় বছর, এবং ঠিক দুই বছর অন্তর তাঁদের এক-তৃতীয়াংশের কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। তখন যে রাজ্যের যে ক'জন সদস্যের কার্যকাল শেষ হয় সেই রাজ্যের বিধান সভার সদস্যরা ভোট দিয়ে সেই ক'টি শূন্যপদ পূরণ করেন। ভোট হয় একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের রীতি অনুসারে। এই ব্যবস্থা থাকার জন্য বিধানসভার সংখ্যালঘু দলগুলিও প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থার জন্যই, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কম্যুনিষ্ট পার্টি কোনদিন গরিষ্ঠ দল না হওয়া সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে শ্রী ভূপেশ গুপ্ত বারবার নির্বাচিত হয়ে রাজ্যসভার প্রবীণতম সদস্য হতে পেরেছেন।

রাজ্যসভার সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত। সুতরাং তাঁদের নির্বাচন পরোক্ষ, লোকসভার সদস্যদের মতো তাঁরা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হন না। ফলে স্বভাবতই রাজ্যসভার সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের জোর অনেক কম। সংবিধানেও লোকসভার তুলনায় রাজ্যসভার ক্ষমতা সীমিত, লোকসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাংবিধানিক জোর রাজ্যসভার নেই। রাজ্যসভা হয়ত লোকসভায় অনুমোদিত কোন বিল না-মঞ্জুর ক'রে সাময়িকভাবে একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু দুই সভার যুক্ত অধিবেশন বসলে রাজ্যসভার নতি স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কারণ লোকসভার সদস্য-সংখ্যা রাজ্যসভার দ্বিগুণেরও বেশি।

তাই লোকসভায় অনুমোদিত বিল রাজ্যসভায় আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর গৃহীতই হয়ে থাকে। তাছাড়া দলীয় রাজনীতির জন্য লোকসভায় যে দলের প্রাধান্য রাজ্যসভাতেও সাধারণ অবস্থায় সেই দলেই প্রাধান্য থাকে। আর দলের হুইপ সকল সদস্যের অবশ্য গ্রাহ্য বলে লোকসভায় অনুমোদিত বিল রাজ্যসভায় অননুমোদিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকেনা। কিন্তু কোন অসাধারণ পরিস্থিতিতে যদি লোকসভায় একদলের ও রাজ্যসভায় অন্যদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটে এবং সেই সুযোগ নিয়ে রাজ্যসভা যদি লোকসভার বিল নামঞ্জুর করতে শুরু করে তাহলে সাংবিধানিক সঙ্কট অপরিহার্য হয়। বর্তমানে লোকসভায় জনতা দলের ও রাজ্যসভায় কংগেসের গরিষ্ঠতা। এখন এই দুই দল যদি একমত হয়ে চলতে না পারে তবে দুই সভার পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তে সংসদের কাজ চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই জন্য বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলেন, সাধারণ অবস্থায় যে সভার সমর্থন বাহুল্য মাত্র এবং অসাধারণ অবস্থায় যার বিরোধিতা বিপজ্জনক, তাকে রাজকোষ থেকে বিপুল অর্থব্যয় ক'রে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন কি?

কিন্তু রাজ্যসভার সদস্যরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব, আচরণ, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজ্যসভার অপরিহার্য প্রয়োজন আছে। রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন পর্যন্ত হতে পারে, বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৪৩। তাঁদের মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতির মনোনীত। সংবিধানে ব্যবস্থা আছে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি অথবা সমাজসেবার ক্ষেত্রে সুপরিচিত সুধীজন যাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াতে চাননা, অথচ দেশ গড়ার কাজে যাঁদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, রাষ্ট্রপতি তাঁদের মধ্যে থেকে সর্বাধিক বারোজনকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করতে পারেন। তাঁদের কার্যকালও ছয় বছর, এবং একজনের কার্যকাল শেষ হলে ঐ শূণ্যপদে রাষ্ট্রপতি আর এক জনকে মনোনীত করেন। এই ভাবে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন অধ্যাপক সত্যেন বসু, এম. সি. শীতলাবাদ, সি. কে. দফতরি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সর্দার কে. এম. পানিকার, ডঃ তারাচাঁদ, পৃথ্বিরাজ কাপুর প্রমুখ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক বিশিষ্ট জনেরা। তাছাড়া আচার্য নরেন্দ্র দেও, ভূপেশ গুপ্ত, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, জয়াভাই প্যাটেল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারাও বিভিন্ন সময়ে রাজ্যসভার সদস্যরূপে তাঁদের ভাষণ ও আচরণ দিয়ে শুধু রাজ্য সভার মর্যাদাই বৃদ্ধি করেননি, তার অস্তিত্বের অপরিহার্যতা সম্পর্কেও সন্দেহবাদীদের সন্দেহ নিরসন করেছেন।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি। সেই কারণে রাজ্যসভা তার প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দশ বছর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতো সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও মহৎপ্রাণ মণীষীর হাতে লালিত ও পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তারপর ঐ আসন অলংকৃত করেছেন ডঃ জাকির হোসেনের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পণ্ডিত এবং ভি. ভি. গিরি, জি. এস. পাঠক, বি. ডি. জাত্তি প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। এঁদের জন্যই রাজ্যসভার বিতর্কের মান কোনদিন নত হয়নি, সদস্যদের চিৎকারে ও হুল্লোড়ে মেছো হাটায় পরিণত হয়নি। রাজ্যসভা যখন

কোন বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছে তখন লোকসভার পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যসভার যে অগণিত আলোচনা সংসদে তথা সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা এই নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু কয়েকটির উল্লেখ না করলে রাজ্যসভার সম্যক পরিচয় মিলবে না। শ্রী চন্দ্রশেখর প্রমুখ কয়েকজন সদস্য রাজ্যসভাতেই প্রথম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লাইসেন্স সম্পর্কিত কেলেঙ্কারি ফাঁস করেন এবং তাঁদের দাবির চাপে ঐ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কমিশন গঠিত হয়। শ্রী দয়াভাই প্যাটেল রাজ্যসভাতেই জয়ন্তী শিপিং কোম্পানির অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ প্রথম প্রকাশ করেন। আমদানি লাইসেন্স কেলেঙ্কারি, যা তুলমোহন রাম মামলা নামে বেশি পরিচিত, তাও প্রথম ফাঁস হয় রাজ্যসভায়, শ্রী কৃষ্ণকান্তের জবানিতে। রাজন্যভাতা বিলোপের দাবিও প্রথমে রাজ্যসভাতেই ওঠে, সে দাবি তোলেন শ্রী বি. বি. দাস। আবার রাজনৈতিক ঘটনার অদ্ভুত গতি পরিবর্ত্তনের ফলে, রাজন্যভাতা বিলোপ বিলটি লোকসভায় অনুমোদন লাভের পর রাজ্যসভায় মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সারা দেশে একটা রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটে যায়। হিন্দু কোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিলের দফাওয়ারি আলোচনা রাজ্যসভায় প্রথম শুরু হয় এবং রাজ্যসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর তা লোকসভায় যায়। যৌতুক বিলের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে রাজ্যসভা ভিন্নমত পোষণ করায় ১৯৬১ সালের ২০ মে সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন বসিয়ে তার মীমাংসা করা হয়।

লোকসভার গুরুত্ব তর্কাতিত। ঐ সভার সদস্যরা দেশের সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত এবং বিগত পঁচিশ বছরে জওহরলাল নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, আসফ আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আচার্য কৃপালনী, ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া, ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, কে. কামরাজের মতো দেশনেতারা লোকসভার সদস্য হয়ে দেশের শাসন দায়িত্ব নির্বাহে অংশ নিয়েছেন। ফিরোজ গান্ধী, আনসার আরবানি, নাথ পাইর মতো নবীন সদস্যরা সংসদে প্রথম আবির্ভাবেই দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানের স্বীকৃতি আদায় করেছেন। নেহরু-শ্যামাপ্রসাদ তর্কযুদ্ধও ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

গত লোকসভা নির্বাচনে ভোটদাতারা ভোটপ্রদানের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষমান

এটা বারবার প্রমাণ হয়েছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধিতায় নয়, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় সংসদের উভয় সভার স্বকীয়তা ও সার্থকতা। যে অগণিত বিলের বিচার বিশ্লেষণ ও অনুমোদন সংসদকে করতে হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সময় তার নেই। সুতরাং সব বিল প্রথমে লোকসভায় তুলে ও তাড়াহুড়ো করে পাশ করিয়ে রাজ্যসভায় শুধু অনুমোদনের জন্য না পাঠিয়ে যদি অর্থ বিল বাদে অন্য বিলগুলি আগে রাজ্যসভায় বিশদভাবে অলোচনা করে পরে লোকসভায় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় তা হলে প্রতিটি বিলের কথাই দেশের লোক ভালমতো জানার সুযোগ পায়। এতে কোন বিলের প্রতি অবিচার হওয়ারও আশঙ্কা নেই। কারণ উভয় সভাতেই সবকটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা আছেন। রাজ্যসভার কম্যুনিষ্ট সদস্য একটি বিল সম্পর্কে এমন কোন কথা বলবেন না, যা লোকসভার কম্যুনিষ্ট সদস্যদের গ্রহণযোগ্য নয় বা কোন কংগ্রেসী বা জনতা সদস্য প্রস্তাবিত বিলটির উপর এমন কোন সংশোধনী আনবেন না লোকসভায় সেই দলের সদস্যরা যার বিরোধিতা করবেন। আসল কথা হল, রাজ্যসভার উপর আরও বেশি কাজ চাপিয়ে তাকে অধিক দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র দুই অশ্ব-চালিত রথের মতো, যার সুষ্ঠু ও সাবলীল অগ্রগতির জন্য চাই লোকসভা ও রাজ্যসভার সম মর্যাদা ও সমান গতিশীলতা।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচন

নির্মল বসু

গণপরিষদ ভারতের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করে তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। গণপরিষদের সদস্যগণ বিশ্বে প্রচলিত সকল প্রকার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতের জন্য সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল। ভারতে দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসন ও এই শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা আন্দোলন ব্রিটেনে জন্মলাভ করা এই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে নি, এটা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদারতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, স্বাধীন সংবাদপত্র, সুষ্ঠু ও স্বাধীন জনমত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইনসভার নির্বাচন। আইনসভার অস্তিত্ব এবং এই আইনসভার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, নির্বাচন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এককালে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ছিল—স্পার্টা এথেন্সে সকল নাগরিক একত্র মিলিত হয়ে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। কিন্তু রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে এসেছে প্রতিনিধি-গণতন্ত্র। জনসাধারণের পক্ষে এখন তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কাজ করেন—আইন প্রণয়ন করেন, শাসন পরিচালনা করেন, এমনকি বিচারের কাজ কিভাবে চলবে তারও নীতি তারাই স্থির করে দেন। এই অবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হয় না এবং গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়। শাসনের ওপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়। সরকারী কাজে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

ভিন্নমত পোষণের অধিকার গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। যারা শাসনে কর্তৃত্ব করছেন অর্থাৎ সরকারী দল, কিংবা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা কর্তাব্যক্তি হয়ে বসে আছেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে যে মত পোষণ করেন যদি সবাইকে তা নির্বিচারে মেনে নিতে হয় তবে তার নাম হয় একনায়কতন্ত্র। গণতন্ত্রে ভিন্নমত পোষণ ও তার পক্ষে প্রচারের পূর্ণ সুযোগ থাকে। রাজনীতিক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও কর্মপন্থার সমালোচনা করা, তার বিরোধিতা করা, প্রতিরোধ করা এবং পাল্টা বক্তব্য রাখার অধিকার নাগরিকমাত্রেরই থাকে। ভিন্ন, বিকল্প, বিপরীত কর্মসূচী নিয়ে জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং এই কর্মসূচীর সমর্থকদের পক্ষে সরকার গঠন করে তার সার্থক রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করা গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ। আর এই কাজ করতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমে।

সংবিধান অনুযায়ী ভারতে কেন্দ্রীয় সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিধানসভা ও কয়েকটি রাজ্যের বিধান পরিষদের নির্বাচন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। তারপর বারে বারে নির্বাচন হয়েছে। সংবিধাননির্দিষ্ট সময় ছাড়াও অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ১৯৫২ সালে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা হল নানাদিক থেকে তা পূর্বেকার নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। পূর্বে নিয়ন্ত্রিত ভোটব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক ভোটদানের অধিকারী ছিল—যারা কিছুটা শিক্ষিত ও যাদের কিছু আর্থিক যোগ্যতা ছিল কেবল তারাই ভোট দিতে পারত, আর এখন ২১ বৎসর বয়স হলেই স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই ভোট দিতে পারে। ভোটাধিকার সর্বজনীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে ভারতের মুসলমান, শিখ, অ-মুসলমান, এইভাবে ভোটদাতারা বিভক্ত হয়ে ভোট দিত। এখন ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক। ধর্মের ভিত্তিতে ভোট দাতাদের মধ্যে কিংবা আইনসভায় আসন-বণ্টনের ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য করা হয় না। ধর্মনির্বিশেষে সকলে সমানভাবে ভোটদানের অধিকারী, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। তপশীলী জাতি ও উপজাতির লোকেদের জন্য বর্তমানে লোকসভা ও বিধানসভায় সাময়িকভাবে যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে করা হয়নি, এর ভিত্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

সংবিধান প্রণয়নের সময় যখন ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয় তখন অনেকে এর বিরোধিতা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, ভারতের মত দেশে যেখানে দুই-তৃতীয়াংশের ওপর মানুষ নিরক্ষর সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাইকে ভোটের অধিকার দিলে নির্বাচন যথার্থ হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিতের ভোটে অনুপযুক্ত লোকেরা নির্বাচিত হবে এবং এদের

দ্বারা গঠিত অযোগ্য সরকারের শাসনে দেশের সর্বনাশ হবে। এই তর্ক অবশ্য নতুন নয়। অনেক আগে থেকেই দেশে ও বিদেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে বিপক্ষে জোর আলোচনা চলছে। এই সব সমালোচনা অগ্রাহ্য করে দেশের নেতৃবৃন্দ 'অশিক্ষিতের দেশ' ভারতে সকলের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তীকালে, অনেকগুলি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরেও, দেশী বিদেশী অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমাজের জাতিভেদ প্রথা, সাধারণ মানুষের রক্ষণশীলতা, মেয়েদের অনগ্রসরতা প্রভৃতি কারণে এদেশে নির্বাচন ব্যর্থ হচ্ছে। নির্বাচনকালে ভোটদাতাদের প্রদত্ত রায় বলে যা ঘোষিত হয় প্রকৃতপক্ষে তা জনসাধারণের সচেতন, স্বাধীন, নিজস্ব মত নয়।

এই সমালোচনার মধ্যে অবশ্যই কিছুটা সত্যতা আছে। তথাপি ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং নির্বাচন সফল হয়েছে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়।

প্রজাতান্ত্রিক ভারতে নির্বাচনের পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের সাধারণ ভোটদাতাগণ মত দানকালে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় দিয়েছে। নির্বাচনের একটা বড় কথা পরিবর্তন। যাকে পছন্দ নয়, যার রাজনীতি পছন্দ নয় তাকে ভোটদাতারা চাইলে পরিবর্তন করতে পারবে। এই জিনিষ সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, বিধানসভা বা লোকসভার যে সদস্য আগের থেকে রয়েছেন তিনি হয়তো নানাবিচারে শক্তিশালী তিনি হয়তো মন্ত্রী কিংবা বিশেষ অর্থশালী কোন ব্যক্তি কিংবা বিশেষ ধর্মগুরু, কিন্তু নির্বাচনের ফলে দেখা গেল তিনি পরাজিত হয়েছেন। ভোটদাতারা তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, অন্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছে। রাজনৈতিক দল ও সরকারের

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদাতা ভোট প্রয়োগ করছেন

সম্পর্কেও একই ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত একটানা সরকার পরিচালনা করেছে। ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল, কংগ্রেস হেরে গেছে। কংগ্রেস দল ভাবতে পারে নি যে তারা হারবে। বিরোধী দলগুলিও আশা করতে পারে নি যে কংগ্রেস এই নির্বাচনে পরাজিত হবে এবং তাদের সরকার গঠন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ভোটদাতারা নীরবে তাদের রায় দিয়েছে—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, বিরোধী দলগুলির পক্ষে। তারা শাসনের পরিবর্তন চেয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট এমনকি বিহার উত্তর প্রদেশে, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যেও বারে বারে এই জিনিষ ঘটেছে। ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলও এই একই কথা প্রমাণ করে। কেন্দ্রে দীর্ঘ ৩০ বৎসরের কংগ্রেস শাসনের পর এবার সেখানে অকংগ্রেসী শাসন—জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধি-গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা আইনসভা সদস্যের সঙ্গে তাঁর ভোটদাতাদের বা ব্যাপক অর্থে নির্বাচনক্ষেত্রের অধিবাসীদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। কারণ, গণতন্ত্রে জনসাধারণই দেশ শাসন করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এই প্রতিনিধিরা যদি জনসাধারণের সঙ্গে যোগ না রাখেন বা তাদের আশা আকাংখা দাবী মতন কাজ না করেন তাহলে তা আর যাই হোক জনসাধারণের শাসন বা গণতন্ত্র হয় না। ভারতে এই ব্যবস্থা মোটামুটি গড়ে উঠেছে। কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে, আইনসভা সদস্যরা তাদের নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। যাদের সঙ্গে নির্বাচনক্ষেত্রের যোগাযোগ ক্ষীণ তাদের পক্ষে পুনর্নির্বাচিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারী কাজের ব্যবস্থাও এমন যে স্থানীয় বিধানসভা ও লোকসভা সদস্যকে এখানকার নানা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে অবশ্য যুক্ত থাকতে হয়। তৃতীয়ত, বারে বারে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই জিনিষ দেখা গেছে, যাদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগ নেই, যারা দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য কোন কাজ

করেন নি, যাদের ব্যক্তিগত সততা সন্দেহের উর্দ্ধে নয় তাদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া শক্ত। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যোগ্য ও জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই সাধারণত নির্বাচিত হয়েছেন। চতুর্থত, দেশে এখনও জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভেদ প্রভৃতি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, সাধারণ ভোটদাতারা এই সব বিভেদের উর্দ্ধে উঠে রাজনৈতিক বিচারের দ্বারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এই পশ্চিমবঙ্গেই দেখা গেছে, নেপালী অধ্যুষিত এলাকা থেকে শক্তিশালী নেপালী প্রার্থীকে পরাজিত করে বাঙালী নির্বাচিত হয়েছেন। আবার এও দেখা গেছে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় দলে দলে মেয়েরা নামকরা মহিলা হিন্দু প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অবাঙ্গালী মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন। জাতি ও ধর্মের হিসাবের উর্দ্ধে রাজনীতির বিচারে, অশিক্ষিত সাধারণ ভোটদাতারাও এই সত্য উপলব্ধি করেছে। সর্বক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ দেখা গেছে।

ভারতের বিগত লোকসভা নির্বাচন এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। জরুরী অবস্থার অন্ধকারময় দিনগুলিতে অনেকের পক্ষেই ভাবা কঠিন হয়ে পড়েছিল যে এই দুর্দিনের অবসান ঘটবে, অন্তত এর আশু পরিবর্তন হবে। ইন্দিরা-শাসন চলবে এবং অন্তত বেশ কিছুকালের জন্য ভারতে স্বৈরশাসন অব্যাহত থাকবে, এটাই প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিল। এমনকি বিদেশে যারা ভারতে গণতন্ত্রনিধন-প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেছেন তারাও প্রায় সবাই এমনটাই ভাবা সুরু করেছিলেন। কিন্তু মার্চ, ১৯৭৭-এর লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতে দেখা গেল, সাধারণ ভোট-দাতারা গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দিয়েছে, একনায়কতন্ত্রের অবসানকে তারা সম্ভব করেছে। যে ইন্দিরা গান্ধী জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন তিনি রায়বেরিলিতে পরাজিত হয়েছেন, তিরিশ বছর একটানা শাসনের পর কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে এবং উত্তর ভারত থেকে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এতটা কেউ-ই ভাবতে পারে নি—বিরোধী পক্ষও নয়। মূক, দরিদ্র ভারতবাসী নীরবে তাদের রায় দান করেছে। এই ব্যাপারে ভারতের ভোটদাতা তথা জনসাধারণ যে অসাধারণ গণতন্ত্রবোধ ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল। যথার্থভাবেই তাই অনেকে একে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি যে কত দৃঢ় হয়েছে এবারের লোকসভা নির্বাচন থেকে তা বোঝা গেল। কোন দল যত ঐতিহ্যপূর্ণ শক্তিশালীই হোক না কেন, কোন ব্যক্তি যত জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নই হোন না কেন, তাঁরা যদি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যান স্বৈরতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন তবে জনসাধারণ তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না—। সুযোগ পেলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা জবাব দেবে। এই নির্বাচনে সেই জবাবই তারা দিয়েছে। জুন মাসের বিধানসভা নির্বাচনেও এই কথাই প্রমাণ হল। সব রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হল। কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অধিকাংশ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি জয়লাভ করল, অথচ পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির চরম বিপর্যয় হল, এখানে বামপন্থীরা বিপুল-ভাবে জয়ী হল। সাধারণ ভোটদাতারা নিজেদের বিচারমত এখানে কাজ করেছে।

সাতাত্তরের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন দেশবাসীর মনে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি নতুন করে আস্থা ফিরিয়ে এনেছে। গণতান্ত্রিক পথে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়, নিজেদের পছন্দমত সরকার গঠন করা যায়, এই বিশ্বাস তাদের হয়েছে। বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো যতদিন থাকবে ততদিন এই গণতন্ত্রও থাকবে। সেদিক থেকে সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল গণতন্ত্রকে নিরাপদ করেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, স্বাধীন সংবাদপত্র, সুষ্ঠু ও স্বাধীন জনমত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইনসভার নির্বাচন।

তবে দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য যদি না কমে তবে নির্বাচনে ধনীদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ শেষ হবে না। তাই গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সমতা। দ্বিতীয়ত, যে দলই সরকার গঠন করুন না কেন, যত জনপ্রিয় ব্যক্তিই সরকারের প্রধান হোন না কেন, জনসাধারণকে তাঁদের কাজের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। ভাল কাজ করলে যেমন সমর্থন করতে হবে, তেমনি খারাপ কিছু করলে তার সমালোচনাও করতে হবে। মনে রাখতে হবে, "সদাসতর্ক মনোভাবই স্বাধীনতার মূল্য"।

সামাজিক ক্রান্তিসাধনে ভারতীয় সংসদ

অমিয় চৌধুরী

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনে তৎকলীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। ভারতীয় নেতৃবর্গের মনে তখন একটি প্রশ্নই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কী করে বিদেশী শাসন এবং শোষণের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করা যায়। বরং বলা যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ভারতের রাজনৈতিক মতাদর্শকে একমুখি করেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে নি। এই শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সেইমত ভারতীয় জীবনের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা তাই কোন পরস্পর বিরোধী মতের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হয় নি। ১৯৪৬ এর ডিসেম্বরে গণপরিষদ গড়ে উঠলো সীমিত নির্বাচনের মাধ্যমে। মূল উদ্দেশ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনা। এখানে কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যত রাজনৈতিক গঠন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের অবকাশ রইলো না। যদিও গণপরিষদের সদস্যগণ মার্কসবাদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করলো তা হলো সংসদীয় গণতন্ত্র। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক কাঠামোর বনিয়াদ স্থাপন এবং সামাজিক জীবনের আধুনিকীকরণ।

১৯৫০ সালে সংবিধান গৃহীত হলো। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বপর্যন্ত গণপরিষদই অন্তর্বর্তীকালীন সংসদ হিসাবে কাজ করতে থাকলো। এই সময়ে বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উল্লেখ্য পরিবর্তনের পদক্ষেপ হয় নি বললেই চলে। সংবিধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের রাজনৈতিক হাতিয়ার। কিন্তু এই রাজনৈতিক হাতিয়ার তখন অবধি সামাজিক সর্বজনীন স্বীকৃতি পায় নি। অন্তর্বর্তী সংসদও স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালীন ভাবনা চিন্তার দ্বারা শৃঙ্খলিত। সংসদ সদস্যগণ তৎকালের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিত প্রতিনিধি। দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আবর্তে ঘটনার উত্থিত পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নতুন করে মূল্যায়ন এবং গণতান্ত্রিক মুক্ত রাজনৈতিক অবস্থায় উভয়ের সাযুজ্য স্থাপন আশু প্রয়োজন। অথচ এ কাজ সর্বজনীন অনুমোদন ছাড়া গণপরিষদের দ্বারা সম্ভব নয়। ভারতের গ্রামীণ আর্থনীতিক ভাবনায় সমাজ ব্যবস্থার যে প্রাচীন চেহারা, দীর্ঘদিনের বৃটিশ আধিপত্যেও তা' আধুনিকীকৃত হয়ে ওঠে নি। গণপরিষদের দস্যগণ—যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এটা বুঝেছিলেন যে আমাদের বদ্ধ সমাজব্যবস্থা রুগ্ন অর্থনৈতিক অবস্থায় এক দুষ্ট চক্রে আবর্তিত। সমাজব্যবস্থায় জটিল শ্রেণীবিন্যাস। এবং স্তর বিন্যাসের এই প্রকৃতি অন্তর্মুখি। অতএব সমাজ পরিবর্তনের উপাদানগুলিও ওপরের স্তরগুলিতে আবদ্ধ। উপাদানগুলি সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়ে সমাজ জীবনের আধুনিক ভাবনা চিন্তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া দুরূহ। অথচ সমাজ পরিবর্তনে যে রাজনৈতিক উপাদানগুলোর প্রয়োজন, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে তার অভাব ছিলো না। একটা দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন, সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে তা ছিলো। দ্বিতীয়ত বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করলো কিন্তু পিছনে রেখে গেলো তার বিরাট এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস দেখলে, সমাজ-ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার দক্ষতার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। এগুলি স্বাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার শুভ সংকেতই বলা চলে।

১৯৫২ সালে প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে তখনো 'সাক্ষর'-এর শতকরা হিসাব কিঞ্চিদধিক ১৬ জন। অথচ ১৭.৩ কোটি লোক ভোট প্রদানের দ্বারা ভারতের প্রথম নির্বাচনে সংসদ গঠন করে। পূর্বেই সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক রূপান্তর সাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিন্যাসে সংবিধান ভবিষ্যত সমাজ জীবনে এক সুষম বিকাশ কল্পনা করলো। অপেক্ষাকৃত দুর্বল সম্প্রদায়কে বিশেষ করে তপশিল ভুক্ত জাতি ও উপজাতির বিশেষ সুযোগ সুবিধাদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ও অর্থনৈতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করে সামাজিক প্রগতির দিক নির্দেশ করেছে। হরিজন সম্প্রদায় এখন আর আইনত অচ্ছুত নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার গণ্ডী প্রশস্ততম করবার জন্য সব রকম সামাজিক অবিচার এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংবিধানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটা ধর্মনিরপেক্ষ উন্নতিশীল দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে যে সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে জনগণকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন করানো

সম্ভব ভারতবর্ষের সংবিধানে তা' প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এতো সব কাগজে কলমে। প্রায় রক্ষণশীল প্রাচীন এই দেশের অচলায়তন সমাজ জীবনে সংবিধানের বিধিগুলোকে বাস্তবায়ন তো এক দুরূহ ব্যাপার। শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে যাঁরা সেই নেতৃবর্গ তাঁদের আদর্শের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের আর্থনীতিক কার্যকারণ আবিষ্কার করতে পারেন, নীতি নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ না সমগ্র জন সমাজ সমাজ গঠনের কাজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে পারে ততক্ষণ সামাজিক প্রগতির লক্ষণ শুধু মহৎ লক্ষ্যমাত্র তত্ত্বের দ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ। সামাজিক ক্রান্তি সাধনে দায়িত্ব তাই সংসদেরই। জনগণই এই সংসদ গড়ে তোলে তাদের ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রতিনিধিরা জনগণেরই সামাজিক অবস্থিতির প্রতিফলন। জনগণের আশাআকাঙ্খার ধ্বনি তাদের প্রতিনিধিদের কণ্ঠে সোচ্চার। ভারতীয় সংসদের বয়স পঁচিশ বছর। বিগত এই বছরগুলি সাধারণ নির্বাচনের সংখ্যা ৬ টি। ১৯৫২ সালে যেখানে ভোটার সংখ্যা ছিলো ১৭ কোটির কিছু বেশী, সেখানে ১৯৭৭ সালে ভোটারের সংখ্যা ৩৩ কোটির কিছু বেশী। স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছরে সমগ্র দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ২০ কোটি কিন্তু ভোটারের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। অতএব রাজনৈতিক অংশগ্রহণ জন সংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশী। অতএব এটা সামাজিক পরিবর্তনের পথের শুভ সূচনা। সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাঁরা স্বভাবতই সমাজ, জীবনের বহুমুখি সমস্যা, আশাআকাঙ্খা এবং সংসদের বাইরের নিত্য নূতন উদ্ভূত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। তাঁদের দায়িত্ব সরকারের শাসন সংক্রান্ত নীতি নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করা এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় নীতি কার্যকরী করছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা করলে দেখা যাবে—তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা যথাসম্ভব পালন করতে চেষ্টা করেছেন। সংসদ দুটি কক্ষে বিভক্ত, লোকসভা এবং রাজ্যসভা। জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু লোক সভার গুরুত্বই বেশী, অতএব সমাজ বিন্যাসের প্রকৃতি প্রতিফলন লোকসভাতেই হয়ে থাকে। এই সময়ে লোকসভার সদস্যগণের বয়সের গড় ৪৯.২ বছর। শিক্ষা: স্কুলের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ-নন ২৩.১%। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—১৬%। স্নাতক: ৩৪.৬%। স্নাতকোত্তীর্ণ, কারিগরী সহ: ২৪.৭% এবং ডক্টোরেট: ১.৫%। জীবনের যে সব বৃত্তি থেকে যাঁরা এসেছেন তা হলো: (১) কৃষি এবং ভূমিদার—২০.৯%। (২) রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মী—২৫.২%। (৩) আইনজীবী—২২.৬%। (৪) ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি—৯.২%। (৫) শিক্ষক এবং শিক্ষাব্রতী—৫.৯%। (৬) সাংবাদিক ও লেখক—.৬%। (৭) সিভিল সার্ভিস—৩.১%। (৮) সামরিক—০.৫%। (৯) ডাক্তার—৩%। (১০) ইন্জিনীয়ার এবং অন্যান্য—৬.%। (১১) প্রাক্তন রাজন্যবর্গ—২.১%। (১২) ধর্মীয় সংখ্যালঘু—.৩%। (১৩) শিল্প শ্রমিক—.১% এবং (১৪) শিল্পী—.১%। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এই হিসাবের কিছু তারতম্য ঘটে। কৃষক এবং ভূমিদারগণের প্রতিনিধিত্ব বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.২%। রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মীর হিসাব কমে আসে ২৫.২% থেকে ১৯%; আইনজীবী ২০.৫%; ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি ৬.৮%; অন্যদিকে শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ে ৫.৯% থেকে ৭.১%। এবং সিভিল সার্ভিসের প্রতিনিধিত্ব নেমে আসে ৩.১% থেকে ২.৬%। সামরিক বৃত্তি—.৫% থেকে .৪%। ডাক্তার ৩% থেকে ১.৭%। ইন্জিনীয়ার .৬% থেকে বেড়ে ১.২%। অপরদিকে প্রাক্তন রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্ব কমে দাঁড়ায় ২.১% থেকে .৪%। ধর্মীয় সংখ্যালঘু .৩% থেকে .৪% এবং বিশেষ করে শিল্প শ্রমিক এবং শিল্পীর প্রতিনিধিত্ব কমে দাঁড়ায় শূণ্যে।

উল্লিখিত পরিসংখ্যান সমাজব্যবস্থা এবং তার শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তনের মন্থর সূচক। ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামকেন্দ্রিক। অথচ গ্রামীণ প্রতিনিধিত্ব শতকরা মাত্র ৩৩.২%। যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি কার্য কর করতে পারলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হোত যেমন কৃষির উন্নতি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ধর্মীয় গোঁড়ামির অপসারণ এবং তারজন্য সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তার, গত ত্রিশবছরে আমাদের দেশে তার সূচনাই হয়েছে, বিকাশ হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—সংসদীয় ব্যবস্থায় যে সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হয়, তাদের গতি, গণতান্ত্রিক প্রকৃতির কারণেই মন্থর। সংসদ কি করতে পারে? শাসন-বিভাগের নীতি নির্ধারণের সমালোচনা বা বিভিন্ন সরকারী কমিটি পর্যায়ে পরামর্শদানের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে কতটুকু। দীর্ঘ ২৫ বছরের ইতিহাসে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার গঠনগত দুর্বলতাও এর জন্য কতকটা দায়ী। একটা রাজনৈতিক দলই বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শাসন ক্ষমতায় অবিচ্ছিন্নভাবে আসীন। অপর দিকে বিরোধী দলগুলো কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করেও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। এক্ষেত্রে যা হবার তাই হয়েছে। সরকার জনকল্যাণের নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করেছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে নি। রাজনীতি-পরিচালিত হয়েছে ক্ষমতার কেন্দ্রকে-পরিক্রমন করে, রাজনীতির সামাজিকীকরণ হয়ে ওঠে নি। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতাও এর জন্য দায়ী। রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক ও আর্থনীতিক চিন্তা ভাবনা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের চাপে ভারগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের দৈন্যদশা বেড়েছে বই কমেনি। জমিদারী

১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

স্বাধীন ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে রাষ্ট্রকাঠামো গঠিত হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের স্থান কোথায় সে সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ এবং এদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সংসদীয় গণতন্ত্র লোকশাসন নয়। জনগণ ভোট দেয়, শাসন করে না। যারা জনসাধারণের ভোট পেয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হন তাঁদেরও অধিকাংশ শুধু বক্তা বা শ্রোতা, শাসনযন্ত্র তাদের হাতে নয়।

কেন এমন হয় তা বুঝতে গেলে আমাদের ইতিহাসের ফেলে-আসা অধ্যায়ের দিকে তাকাতে হবে। সামন্তযুগের রাজকীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে প্রজাসাধারণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'গণতন্ত্র'-র ধারণা জন্মলাভ করে। বস্তুত, 'রাজতন্ত্র' শব্দটির প্রতিবাক্য হিসাবেই রাজনৈতিক শব্দভাণ্ডারে 'গণতন্ত্র' শব্দটির উদ্ভব। প্রকৃত শাসনক্ষমতা রাজার (বা সামন্তযুগীয় ভূস্বামীর) হাতে ন্যস্ত থাকলে, সে ব্যবস্থাকে 'রাজতন্ত্র' বলা হত। তার বিপরীতে 'গণতন্ত্র' হল সেই ধরণের শাসন ক্ষমতা যাতে জনগণের হাতে—অর্থাৎ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিমণ্ডলীর হাতে—শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। 'গণতন্ত্র'কে বাহন করেই ধনতন্ত্র মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে তার বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত অর্থনীতির সংকট থেকে মানুষের মুক্তি অর্জনের জন্য উদীয়মান শিল্পপতিদের নেতৃত্বে যে সমাজ বিপ্লব ঘটে, তার রাজনৈতিক মূলমন্ত্র হিসাবেই 'গণতন্ত্র'-এর আবির্ভাব। সামন্তযুগীয় রাজশক্তির হাত থেকে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর হাতে সেই ক্ষমতা ন্যস্ত করা—এই ছিল সেকালে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ। তখনকার দিনের সমাজ বিপ্লবের প্রাগ্রসর চিন্তাসম্পন্ন নেতারা মনে করেছিলেন যে, এই রাজনৈতিক পথ ধরেই শোষিত জনসাধারণের আর্থনীতিক এবং সামাজিক মুক্তি অর্জিত হবে। সেযুগে 'গণতন্ত্র' ছিল প্রধানত একটি রাজনৈতিক ধারণা। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র-সম্পর্কিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হলেই তাকে বর্তমান যুগে 'গণতন্ত্র' বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় না। কারণ এই 'গণতন্ত্র-'এ গণ-এর উপস্থিতি একান্তভাবেই প্রান্তিক। অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবলুপ্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের গ্যারাণ্টিকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত বলে স্বীকৃত হয় না।
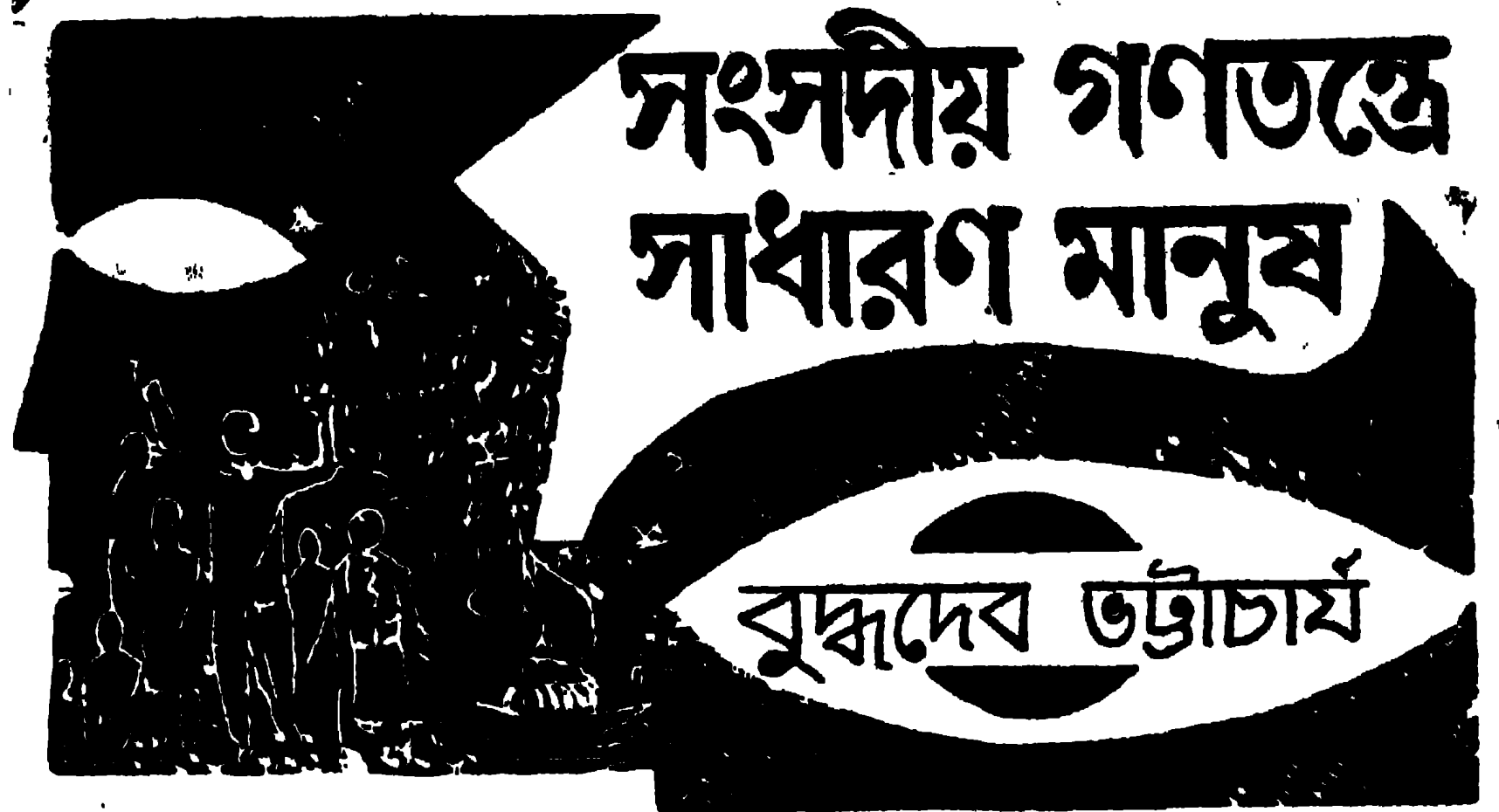
দুর্ভাগ্য হলে'ও একথা সত্যি যে আমাদের দেশে আজও প্রচুর সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি গণতন্ত্রের প্রাচীন ধারণাকেই আঁকড়ে বসে আছেন। তাঁরা মনে করেন, সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। গণ পরিষদে যে-সব জাতীয় নেতা এদেশে সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশের কাছেই বিলাতী কায়দায় পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় গণতন্ত্রই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একমাত্র রূপ বলে মনে হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুর্জোয়া উদারনৈতিক জীবনদর্শনকে নিজেদের জীবনদর্শনের সঙ্গে এক করে নিয়েছিলেন। ফলে কোন দিনই তাঁরা পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া অন্যতর রাষ্ট্রকাঠামোর কথা ভাবতে পারেননি। একথা সবিস্তারে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের দেশ বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় আপস-আলোচনার পরিণতি হিসাবে এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। এই ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত। এই নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণতি-স্বরূপই আমাদের দেশে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তিকে পর্যুদস্ত করার পক্ষে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার ও ভোটের অধিকার কার্যকর হয়েছিল। তারপরে সারা পৃথিবী জুড়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটেছে। একদিকে পুঁজির একচেটিয়া মালিকানা ও অন্যদিকে বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। বেড়েছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জটিলতা। ইতিহাসের এই পর্বে কেবল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করলেই শ্রেণীদ্বন্দ্বজীর্ণ ধনিক সমাজের জটিলতাসমূহ সমাধান করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই গভীর সংশয় পোষণের অবকাশ আছে।

দুই

সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ শ্রমকারী মানুষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের

ধারণা কি তা স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন সংস্থা নয়। ইতিহাসের কোন পর্বেই, কোন দেশেই রাষ্ট্র বিশেষ স্বার্থের গণ্ডিকে অতিক্রম করে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হয়নি। বিপুল সংখ্যাধিক শোষিত জনগণকে দমন করে রাখাই ধনিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামোর অভিন্ন সম্পর্ক। রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি যদি ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই রাষ্ট্র ধনিক ব্যবস্থার পরিপোষকতা করবেই—এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য ও প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রে সশস্ত্রবাহিনী একমাত্র সরকারের অধীনে থাকে। সবচেয়ে নিখুঁত ও উন্নত ধরনের ধনিক রাষ্ট্র হল পার্লামেণ্ট বা সংসদের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। এতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে পার্লামেণ্টের ওপর; রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শাসনের যন্ত্র ও সংগঠন তৈরি হয় প্রচলিত প্রথা অনুসারে; যেমন নিয়মানুযায়ী গঠিত হয় বিরাট সৈন্যবাহিনী, পুলিস বাহিনী এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামো—এগুলো স্থায়ী সংগঠন। এরা বহু রকমের সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং সব সময় জনগণের নাগালের বাইরে থাকে।

আমাদের দেশের সংবিধানে বুর্জোয়া সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গ্যারাণ্টি দেওয়া এবং কাজ পাবার অধিকারকে বিচার বিভাগের সম্মুখে হাজির করার যোগ্য নয় বলে নির্দিষ্ট নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভূত করার পেছনে কোন্ শক্তি বিশেষভাবে কাজ করেছে তা ভেবে দেখার মত।

আমাদের দেশের সংবিধানের মুখবন্ধে যে সাম্যের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের স্বরূপ বোঝার পক্ষে তা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। ভারত রাষ্ট্রকে কেবল বুর্জোয়া বা ধনিক রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করলে এর খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে। এই রাষ্ট্র বুর্জোয়া জনকল্যাণ বা হিতব্রত রাষ্ট্র বা সমাজসেবামূলক রাষ্ট্র। ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু যুগে গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কোন কোন দেশে শাসকশ্রেণী ধনস্বামী স্বত্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রকাঠামোকে বাঁচানোর জন্যে গণতন্ত্রের বহিরাবরণ ত্যাগ করে সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙে দেয়, আবার কোথাও কোথাও বা জনকল্যাণ-ব্রতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ধনিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ক্ষয়কারী শক্তির ফলে উদ্ভূত বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার জন্য সচেষ্ট হয়। বহু প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ-কথা বহু এবং সুবিন্যস্ত যুক্তিসহযোগে প্রমাণ করেছেন যে, পুলিস রাষ্ট্র জনকল্যাণ-মূলক রাষ্ট্রে পরিণত হলেই তার ধনিক শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হয় না। ধনতন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যাবলীরও পরিবর্তন ঘটে থাকে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমত মনে রাখা দরকার যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র শ্রেণী-নিরপেক্ষ বা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত নয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের কারণে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হয় না। তৃতীয়ত, ধনিক গণতন্ত্রকে আদর্শ রাষ্ট্ররূপ ও শাসন ব্যবস্থা সংগঠনের একমাত্র প্রকৃষ্ট রূপ বলে চিহ্নিত করা ইতিহাসসিদ্ধ নয় এবং তা বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রকে কায়েম রাখার যুক্তিগ্রাহ্য চেষ্টা মাত্র। চতুর্থত, বলা হয়ে থাকে যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে (যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা বর্তমান) ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার কুফল প্রতিহত করার উপায় খোলা থাকে। এ-দাবিও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের অভিজ্ঞতা এ-কথাই সাক্ষ্য দেয় যে সামাজিক-আর্থনীতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ধনিকশ্রেণীকে প্রকারান্তরে সহায়তাই করে থাকে। শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষের জন্যে কল্যাণমূলক যে-সব ব্যবস্থা করা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন তার বোঝা আর্থিকভাবে দুর্বল ধনিক শ্রেণীকে আর বহন করতে হয় না; রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি কাজে আর্থিক সহায়তা যোগায় এবং কর নীতি প্রভৃতিও এমনভাবে রচিত হয় যাতে ধনিকশ্রেণীর সুবিধাই হয় বেশী। জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্র-মালিকানাধীন অংশ (যা রাষ্ট্রীয় পুঁজি-বাদেরই নামান্তর) মূলগতভাবে ব্যক্তি-মালিকানাধীন অংশকে পুষ্ট করে থাকে। রাষ্ট্র এমন সব আইন কানুন রচনা করে থাকে যাতে শ্রমিক-কর্মচারীরা ধনিক শোষণের প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে ধর্মঘট প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর শ্রেণী-শোষণ ও শাসনের কাজে লাগে।

বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বৈত ভূমিকা। একদিকে সে ব্যক্তিমালিকানার অধিকারকে রক্ষা করে এবং অন্যদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের নামে ব্যক্তিমালিকানাধীন অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে।

তিন

আগেই বলা হয়েছে, সংসদীয় গণতন্ত্র লোকশাসন নয়। আমাদের দেশের গণতন্ত্রেরও একই অবস্থা। এদেশে সার্ব-জনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বিধান বলে পরিচিত। আমাদের দেশে সংবিধানে নির্দিষ্ট বছর (মূল শাসনতন্ত্রে ছিল পাঁচ বছর অন্তর, সংশোধনের ফলে দাঁড়িয়েছে ছ' বছর, এই সংশোধন পুনঃ সংশোধিত করে পাঁচ বছর হবে বলে আশা করা যায়) অন্তর রাজ্যেরাজ্যে বিধান সভার ও কেন্দ্রে লোকসভার নির্বাচন হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলীয় প্রার্থীদের ভেতর থেকে ভোটাররা ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ তারা রাজ্যে ও কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। দেশের শাসন ক্ষমতা

রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিভক্ত, মূল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে; উভয়ত দেশ শাসনের নীতি স্থির করে মন্ত্রিসভা, নীতি কার্যকরী করে আমলাতন্ত্র। দৈনন্দিন ও আঞ্চলিক শাসন আমলাদের হাতে। এই ব্যবস্থাটিকে আমরা বলি ভারতীয় গণতন্ত্র—কারণ প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর ভোটে এর আইনসভা গঠিত হয় এবং সরকারকে এই সভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

এই শাসন ব্যবস্থায় যে সাধারণ লোকের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর কোন ভূমিকাই নেই তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গণতন্ত্র এখানে অসম্পূর্ণ। তাই ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়ণের কথা উঠেছে। কেন্দ্রে আসীন শাসক দল বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়ণে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগের একটি কমিটি (বলবন্ত রায়-মেহতা টীম) তাদের রিপোর্টেও বিকেন্দ্রায়ণের পক্ষে সুস্পষ্ট-ভাবে সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবটি সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্ন হ'ল চলতি আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামো বজায় রেখে গ্রামস্তর থেকে পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা সাফল্য অর্জন করতে পারবে কি? এই প্রস্তাব বাস্ত-বায়িত হবার সম্ভাবনা কোথায়?

চার

অনেকে আবার পার্লামেণ্টারী নির্বাচনের মাধ্যমে অর্থাৎ বহুমতের ভিত্তিতে গঠিত শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার কথা বলে থাকেন। কিন্তু ধনিক কবলিত সমাজে পার্লামেণ্টারী নির্বাচনের মারফত যে সত্যিকারের গণতন্ত্র (যে-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দেয় ও মৌলিক অধিকার ভোগের বাস্তব অবস্থা বর্তমান থাকে) প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বিভিন্ন ধনিক দেশের দিকে তাকালেও তা বোঝা যাবে। নির্বাচনের পথে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কাঠামোর পরিবর্তনের কথা ভাবা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে ধনিক রাষ্ট্রের সমাজবাদী রূপান্তরের কথা বাদ দিলেও ধনিক গণতন্ত্রে (বিশেষত ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু যুগেও আমাদের মত অনুন্নত ধনিক অর্থনীতির দেশে) গণতান্ত্রিক কার্যক্রম সুসম্পন্ন করে তোলাও সম্ভবপর হয় না।

পাঁচ

এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বহিরাবরণ অটুট রেখে (অর্থাৎ পার্লামেণ্ট না ভেঙে দিয়ে) কিভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করা হয়েছিল, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সংবিধানকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর আঘাত হানা হয়েছিল এবং স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা হয়েছিল তা সকলেরই জানা কথা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পথে সে অশুভ, বিপজ্জনক ও সর্বনাশা ধারাকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু তা থেকে এ-সিদ্ধান্ত করলে ভুল করা হবে যে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ, ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থনীতির ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, যা কাঠামোগত।

ছয়

পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ধনিক শ্রেণী-শাসন ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও চলতি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকামী সমাজবিপ্লবীরা ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অন্য ধরণের শ্রেণী-শাসন অপেক্ষা পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার পক্ষপাতী। এবং পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য স্বৈরতন্ত্রী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তারা সচেষ্ট হন। তার কারণ, পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় বা সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মেহনতী মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত করা, সচেতন করা এবং সংগঠিত করার বেশী অবকাশ থাকে।

সমাজ বিপ্লবীদের কাছে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। তাঁরা মনে করেন যে জনগণের সার্ব-ভৌমত্বের অধিকারের বিকাশের পথে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র একটি অধ্যায়, যায় প্রগতিশীল উত্তরাধিকার বহন করার দায়িত্ব শোষিত-বঞ্চিত মেহনতী মানুষের; এবং সে দায়িত্ব পালন একমাত্র সম্ভবপর শ্রমজীবী জনতার স্ব-উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে। ধনিক ব্যবস্থার মধ্যে যে-সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান তাকে অতি প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এটাই পর্যাপ্ত নয় এবং যদি কেউ ভেবে থাকেন যে চলতি কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার চেষ্টাই যথেষ্ট তবে তা ভুল হবে। অভিজ্ঞতা একথা বলে যে ধনিক শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রবিরোধী দক্ষিণপন্থী অতিপ্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরতন্ত্রী, ফ্যাসীবাদী, আধা ফ্যাসীবাদী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে থাকে। সেই কারণে যে সামাজিক কাঠামোর ভিতরে গণতন্ত্রকে বিনাশের চেষ্টা হয় সেই কাঠামোকে অক্ষত রেখে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করা যায় না। যে বাস্তব ভিত্তিভূমি থেকে প্রতিক্রিয়াবাদ উদ্ভূত হচ্ছে তাকে রূপান্তরিত করার কাজে অগ্রসর হতে হয়। কারণ, ধনিক শাসন এবং প্রকৃত গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী। আজকের যুগে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ করতে গেলে, রাষ্ট্রপরিচালনায় অধিকাংশ মানুষের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। শ্রমজীবী জনতার গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই লোকশাসনের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হতে পারে। এইটেই ইতিহাস নির্দেশিত পথ। এদেশেও সেই ঐতিহাসিক নিয়মের একক ব্যতিক্রম নয়।

[এই পত্রিকায় বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য তাঁদের নিজস্ব। এজন্য সম্পাদক-মণ্ডলী দায়ী নয়।]

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

গণতন্ত্র: গ্রামীণ স্তরে

"গণতন্ত্র" কথাটি এত বেশি ব্যবহৃত হয় যে এর এমন কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন যা সকলেই একবাক্যে মেনে নেবেন। একটা রূপক ব্যবহার করে বলা হয় যে 'গণতন্ত্র' হলো সেই টুপির মতো যা এত লোক মাথায় পরেছে যে তার মূল রূপ বা মাপ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সব রকম তর্কবিতর্ক মেনে নিয়ে অন্তত এইটুকু বলা যায় যে, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র সকল মানুষের মানবিক মর্যদায় বিশ্বাস করে। স্বাধীনতা ও সাম্য হলো গণতন্ত্রের মূল সুর। গণতন্ত্রের সাধনা অনেক দিনের। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের নগর রাষ্ট্রে এবং ভারতবর্ষের কয়েকটি নগরে এক ধরণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় ছিল। যেখানে জন-প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল এবং কোথাও কোথাও সেনানায়ক বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও নির্বাচন করা হতো। এরকম প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব সেইসব সমাজেই যেখানে লোকসংখ্যা বর্তমানের মাপকাঠিতে অত্যন্ত কম। আজকের সমাজে এরকম প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থা একেবারেই অসম্ভব। লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি মানুষের মতামত জানার জন্য বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েক বছর অন্তর নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার সুযোগ আসে নির্বাচনের মাধ্যমে। প্রতিনিধি নির্বাচনের এই অধিকারটি হলো একটি মূল্যবান গণতান্ত্রিক অধিকার। দেশের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি-গুলি যাঁরা নির্ধারণ করবেন তাঁদের পছন্দ করার অধিকারটি হলো ভোটাধিকার। এই ভোটাধিকার একবার প্রয়োগ করার পর কিছু সময় সাধারণ নাগরিককে তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিচারবুদ্ধি ও মতিগতির ওপর নির্ভর করতেই হয়। তবে যদি নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিরোধী কোন কাজ করতে উদ্যত হন, যদি তাঁরা ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হন, যদি দেশের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নষ্ট করতে বসেন বা যদি শাসনের নামে জনসাধারণের জন্য শুধু শোষণ ও বঞ্চনারই ব্যবস্থা করেন, তাহলে জনসাধারণের নিশ্চয়ই এমন কোন সুযোগ থাকা উচিত যার ফলে জনসাধারণ আর নির্বাচনের ভণিতার জন্য অপেক্ষা নাও করতে পারেন। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্নীতি, অনাচার ও ভ্রষ্টাচারের প্রাধান্য থাকলে শুধুমাত্র নিয়ম মাফিক নির্বাচন গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেন না বটে কিন্তু দেশের শাসন-ব্যবস্থায় একটা সুস্থতা থাকুক এটুকু দাবী করা বা সেই প্রত্যাশা যাতে ফলবতী হতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হওয়ার অধিকার তাঁদের সবসময়েই থাকে। ন্যূনতমভাবে যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজে আশা করা হয় যে, দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে যথাযথ সৎভাবে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা হবে এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব সেখানে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

মূলত এই ধারণা থেকেই মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে এমন এক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করতে যেখানে দেশের বৃহত্তম অংশ হওয়া সত্ত্বেও যারা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত থেকেছে সেই গ্রামের মানুষ যেন বুঝতে পারে—যে সে স্বাধীন। বৃটিশ প্রভুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর সংগ্রামের শেষ বৃটিশ শক্তির ভারত ত্যাগেই নয়—একথা গান্ধীজী বা নেতাজীর মত দেশ-নায়কগণ বার বার বলেছেন। আসল কথা গ্রামে গাঁথা বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষে কোনরকম শাসনব্যবস্থাই জনপ্রিয় বা সন্তোষজনক হবে না যতক্ষণ না সেটা গণতন্ত্রের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং কোনরকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কার্যকরী হবে না যতক্ষণ না গণতন্ত্রকে গ্রামীণ স্তরে সফল করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নানা দিক থেকেই প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলের মানুষ দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য বা মতামত প্রকাশ করবে শুধু এজন্যই গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের প্রয়োজন তা নয়। এছাড়াও সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গ্রামের মানুষের কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা দেশ ও সমাজের শ্রী-সমৃদ্ধি বাড়ানোর কাজে। কিন্তু ভারতবর্ষে কোনদিনই তাঁদের এই কাজে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না যতক্ষণ না কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁদের বুঝতে দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের দেশ ও সমাজের বৃহত্তম ও প্রধানতম শক্তি। ভারতবর্ষের সমাজনীতি ও অর্থনীতি এমনই যে যদি গ্রামগুলি ধ্বংস হয় তাহলে গোটা দেশটাই ক্রমশ ধ্বংসের পথে যাবে। কয়েক শতাব্দীর আলস্য ও কুসংস্কার কাটিয়ে শহরের আলোকপ্রাপ্ত (এবং সময় সময় ধূর্ত) মানুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজেকে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশীদার মনে করা গ্রামের মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অথচ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা বা অর্থনীতি-সমাজনীতি নিয়ে যে কেউ চিন্তা করেছেন প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গ্রামের মানুষকে

যে কোন ভাবেই হোক্ দেশের শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করতে হবে।

স্বাধীন ভারতে সরকারী স্তরে প্রথম এই উপলব্ধি ঘটে প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা শেষ হওয়ার পরে। প্রথম যোজনার সময় দুটি পরিকল্পনা চালু হয়: 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' ১৯৫২ সালে এবং 'জাতীয় এক্সটেন্‌সন্ সার্ভিস্' ১৯৫৩ সালে। এদুটি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করা। সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে কতকগুলি 'উন্নয়ন ব্লকে' ভাগ করা হয় এবং প্রতি ব্লকে একজন ব্লক বিকাশ আধিকারিক (বি. ডি. ও.) নিযুক্ত হন। সরকারের প্রত্যাশা ছিল ব্লক বিকাশ আধিকারিকগণ গ্রামের মানুষকে তার জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের পথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সাহায্য এবং সর্বোপরি নেতৃত্ব দিতে পারবেন। সারা ভারত জুড়ে সরকারের পক্ষে অর্থব্যয় ও প্রচার প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না। কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হলো না। প্রধান মন্ত্রী নেহরু আগ্রহ দেখালেন এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বার করতে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে আহ্বান জানালেন এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই পরিষদ নিয়োগ করলেন একটি অনুসন্ধান কমিটি যার সভাপতি হলেন বলবন্ত রায় মেহতা। উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ উন্নয়নের পথে বাধা কি এবং সেই বাধা দূর করার পথ খুঁজে বার করা। মেহতা কমিটি ঘুরলেন সমস্ত ভারতবর্ষ, আলোচনা করলেন বিভিন্ন প্রশাসক, নেতা ও সমাজ কর্মীদের সঙ্গে। পরিশেষে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানালেন ১৯৫৭ সালের প্রতিবেদনে। মূল বক্তব্য একটি: গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে না দিলে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামের মানুষের সহযোগিতা পাওয়া অসম্ভব।

মেহতা কমিটি সমাধান বার করলেন: বিকেন্দ্রীকরণ। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতাকে স্তরে স্তরে প্রয়োজনমত বিকেন্দ্রিত করতে হবে যাতে গ্রামের মানুষ বুঝতে পারে গ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব তাঁদেরই। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র ও আমলাবৃন্দ থাকবেন প্রয়োজনীয় কারীগরী সাহায্য ও প্রশাসনিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আর এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের নীতি মেনে চলতে হবে। তবেই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে টেনে আনা যাবে দেশগঠনের কাজে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার নতুন বিকেন্দ্রিত রূপ গড়ে তুলতে হবে যার ভিত্তি হবে বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত পঞ্চায়েত। গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই প্রস্তাবের নাম পঞ্চায়েতের শাসন বা 'পঞ্চায়েত-ই-রাজ''। নিজস্ব গুণেই মেহতা কমিটির প্রস্তাব সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হলো। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, যোজনা পর্ষদ, ও ভারত সরকার প্রত্যেকেই গ্রহণ করলেন এই বৈপ্লবিক সুপারিশ। রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানানো হলো অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ভারতবর্ষে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এইভাবেই শুরু।

প্রথম এগিয়ে এলেন রাজস্থান সরকার। পরে পরে এলেন অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, বিহার, পশ্চিমবংগ এবং অন্যান্য সকল রাজ্য সরকার। প্রতিটি রাজ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রকে সফল করার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশ যে পঞ্চায়েতী কাঠামো চালু করলেন সেটা মেহতা কমিটির সুপারিশকে ভিত্তি করেই গঠিত। এর তিনটি স্তর: গ্রাম, ব্লক ও জেলা। প্রতিটি স্তরেই আছে পঞ্চায়েত সভা; কিন্তু কেবল গ্রাম স্তরেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, অন্য দুস্তরে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর হলো ব্লক ভিত্তিক "পঞ্চায়েত সমিতি" এবং ব্লক বিকাশ আধিকারিক হলেন এই পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের প্রধান স্তম্ভ। তিনিই হলেন উর্দ্ধতম সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের যোগসূত্র। মহারাষ্ট্রে দেখা যায় আর এক ব্যবস্থা। সেখানেও নামে মাত্র তিন স্তরের কাঠামো, কিন্তু জেলা স্তরে "জেলা পরিষদ" হলো গ্রামীণ গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। গ্রামাঞ্চলের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা রাজ্যসরকার জেলা পরিষদের হাতেই ন্যস্ত করেছেন। এই পরিষদ জেলার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। একে সাহায্য করেন এমন একজন অভিজ্ঞ আই. এ. এস্ অফিসার যিনি চাকুরীতে পদমর্যাদায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ে উচ্চতর অফিসার। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া জেলা প্রশাসনের বাকী সমস্ত দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলা পরিষদের হাতে। এর পরে আছে ব্লক স্তরে "পঞ্চায়েত সমিতি" যা প্রধানত জেলা পরিষদের আঞ্চলিক কমিটি হিসাবে কাজ করে—এই সমিতি একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং ব্লকের এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্যরাই এই সমিতির সদস্য। সবশেষে আছে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত "গ্রাম পঞ্চায়েত" যা গ্রামের সীমিত ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের নির্দেশমত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ ও ১৯৬৪ সালের আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতী রাজের কাঠামো চার স্তরের: গ্রাম, ইউনিয়ন, ব্লক ও জেলা। পরে ১৯৭৩ সালের আইনে তিনস্তরের কাঠামোর প্রবর্তন করা হয়েছে: গ্রাম, ব্লক ও জেলা, এবং প্রতি স্তরেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে ভারতবর্ষে আরো অন্যান্য রাজ্যের গ্রামীণ গণতন্ত্রের কাঠামো পর্যালোচনা করলে এমন বহু সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে। এই কাঠামোগত বৈচিত্র্যে আপত্তি করার কিছু নেই যদি অবশ্য আশানুরূপ ফললাভ ব্যাহত না হয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছে মহারাষ্ট্র। এখন অনেক রাজ্যই আবার নতুন করে ভাবছেন কিভাবে গ্রামীণ গণতন্ত্রের কাঠামোকে আরো জোরদার ও ফলপ্রসূ করা যায়। কিন্তু শুধু কাঠামোর অদল বদল করলেই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে উন্নয়নের কাজে অনুপ্রাণিত করা যায় না। আসলে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই পোশাকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের মানুষের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করার কর্মসূচী শুধু কথার কথাতেই থেকে গেছে। একমাত্র মহারাষ্ট্রেই উন্নয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রামীণ প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়েছে এবং ফললাভ ভালই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু একবার বলেছিলেন: আমি চাই এই জনপ্রিয় পঞ্চায়েতগুলি দশলক্ষ ভুল করুক, কেননা ভুল করে কাজ করতে করতেই গ্রামীণ গণতন্ত্রের নেতারা বৃহত্তর কাজের যোগ্য হয়ে উঠবেন। আদর্শ মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু কটি রাজ্যেই বা এই মহৎ আদর্শকে কাজে রূপ দেওয়ার ক্ষীণতম সৎ প্রচেষ্টা হয়েছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত আছে, নির্বাচন আছে (পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে সে নির্বাচনও প্রায় চোদ্দ-পনের বছর বন্ধ আছে), জন প্রতিনিধিও আছেন। কিন্তু অর্থের অকুলান ও রাজ্য বা জেলা প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিক খবরদারীর দাপটে গ্রামীণ গণতন্ত্রের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। গ্রামীণ স্তরের গণতন্ত্র পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কাজে কোন অর্থপূর্ণ বা ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহায্য করে নি।

'গণতন্ত্র: গ্রামীণ স্তরে' কথাটা শুনতে খুবই ভালো। কিন্তু এর যথাযথ রূপায়ণে সবচেয়ে বড় বাধা বোধ হয় শহরে সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রামের মানুষের সদিচ্ছা ও শক্তিতে অবিশ্বাস। গ্রামের মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশকে ও গ্রামীণ জীবনের সমস্যার স্বরূপকে সবচেয়ে ভালো জানে, অন্তত অল্পবয়স্ক এবং স্থানীয়ভাবে অপরিচিত কোন সরকারী আমলার চেয়ে বেশি জানে। কিন্তু আমলারাই সাধারণত ক্ষমতা ব্যবহার করেন ও ইচ্ছামতো তার ব্যাখ্যাও করেন। আর পঞ্চায়েতের হাতে থাকে সামান্য ক্ষমতা। আর আছে ছোট-বড়-মাঝারি সবরকম সরকারী আমলার হাতে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের ওপর খবরদারীর অধিকার। পশ্চিমবঙ্গে এমন ব্যবস্থা ছিল যার ফলে কিছু সরকারী আমলা পদাধিকার বলে ব্লক ও জেলা স্তরের পঞ্চায়েতের সদস্য হতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা ব্যবহার না করলেও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারে কুন্ঠিত ছিলেন না। নিরক্ষর অথচ বুদ্ধিমান গ্রামের মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারে যে, পঞ্চায়েত প্রধানের চেয়ে বিকাশ আধিকারিকের ক্ষমতা অনেক বেশি। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামীণ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা দুর্বল হতে থাকে। এমন অবস্থায় পঞ্চায়েতী রাজের নামে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের বদলে যা পাওয়া যায় তা হলো বিকেন্দ্রিত আমলাতন্ত্র।

অবশ্য এককথা স্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে গ্রামের মানুষ যার থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত থেকেছে তা হলো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এ দুটো জিনিষ কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেদিন গ্রামে গ্রামে সুনিশ্চিত করা যাবে সেদিন আপনা থেকেই সম্পদ ও শ্রী ফিরে আসবে গ্রামাঞ্চলে। শিক্ষায়, বিশেষ করে প্রাথমিক ও কারীগরী শিক্ষার, ব্যাপকতম প্রসার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক প্রথাগুলিও এর ফলে ধীরে ধীরে লোপ পাবে এবং গ্রামের জনসাধারণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সজাগ হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টার শুরুও হওয়া দরকার গ্রামীণ স্তর থেকেই। পরিকল্পনার ছক প্রথমে গ্রামীণ স্তরেই স্থির করা প্রয়োজন; পরে যেসব কাজ গ্রামীণ স্তরে সম্ভব নয় সেগুলিকে রাজ্যস্তরে এবং যেসব কাজ রাজ্যস্তরে সম্ভব নয় সেগুলিকে জাতীয়স্তরে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এইভাবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে পিরামিডের মত সাজাতে হবে যার পাদদেশে ব্যাপকতম জনসমর্থন থাকবে। গ্রামের নিরন্ন-অশিক্ষিত মানুষের দলকে শহরের দিকে ঠেলে পাঠায় যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিভিন্ন কুটির শিল্পের প্রসার, ছোট আয়তনের গ্রামীণ শিল্পায়ন, সেচের কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার, ব্যাপকহারে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার, প্রতি মহকুমা শহরে পাইকারী ব্যবসার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের শহরমুখী গতি রোধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে গ্রামের মানুষের প্রয়োজন ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হবে এবং গ্রামের প্রতিনিধিদের মতামত এ বিষয়ে নিশ্চয়ই মূল্যবান হবে। গ্রামীণ গণতন্ত্র এবিষয়ে খুবই ফলপ্রসূ ভূমিকা নিতে পারে। নয়তো শুধু পঞ্চায়েত ও নির্বাচন দিয়ে কোন ঐন্দ্রজালিক আশ্চর্য ঘটনা সৃষ্টি করা যাবে না। নির্বাচন গণতন্ত্রের গুরুপূর্ণ অংশ হলেও সব কথা নয়। এই ভাবেই গান্ধীজীর 'গ্রামরাজ' বা 'স্বরাজ'-এর স্বপ্ন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের 'সমবায়ী গণতন্ত্রে'র ধারণাকে রূপায়িত করার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ জাতীয় স্তরে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আর সেই একই যুক্তিতে গ্রামীণ স্তরে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিত করতে না পারলে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের সমস্ত প্রচেষ্টা রাজ্য বা জেলাস্তরের আমলাতন্ত্রের দৌরাত্মে শেষ হয়ে যেতে বাধ্য। ভারতবর্ষের মত জনবহুল ও কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্র শুধু একটা আদর্শ হয়েই যেন না থাকে। একে বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা জাতীয় পুনর্গঠনের প্রধানতম অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া আর অন্য পথ নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

নিরঞ্জন হালদার

১৯৭৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতার তিরিশ বছর পূর্ণ হল। দু বছর বাদে আমরা আবার গণতান্ত্রিক পরিবেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অধিকার অর্জন করেছি। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন ভারতে দ্বিতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ভারতীয় নাগরিকেরা বেঁচে থাকারও আইনগত অধিকার হারান। ভারত সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীনীরেন দে'র যুক্তি মেনে নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী এ. এন. রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত বেঞ্চ ৪-১ ভোটে এই রায় দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এদেশে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি, ঐদিন কলকাতার গান্ধীমূর্তিতে মালা দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অনেকে। ১৯৭৬ সালের পনেরো আগষ্ট সরকারী উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালিত হলেও, সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিলনা। গত মার্চ মাসের লোকসভা নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস দলের পরাজয়ের পর ভারতে আবার নতুন করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এসেছে। কোনো দেশে একবার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, সে দেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। কিন্তু ভারতে উনিশ মাসের একনায়ক শাসনের পর জনগণের ভোটে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত দেশগুলির মধ্যে ছোট্ট সিংহল বাদে একমাত্র ভারতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে টিঁকে আছে। অথচ স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশ ও বিদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবী ভারতের মতো গরিব ও নিরক্ষরদের দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অনুপযোগী বলে প্রচার করেছেন। কম্যুনিষ্ট ও অনেক অ-কম্যুনিষ্ট ব্যক্তি দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রকে বিদায় দেওয়ার কথা বলেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিদায় দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রামের চেষ্টাও হয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ভারত সরকারকে তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে হায়দরাবাদ রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে ভারতের সেনাবাহিনী নিয়োগ এবং অপর দিকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের যুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটেছে। তারপর ১৯৬১ সালে গোয়ার ভারতভুক্তির ব্যাপারে পর্তুগালের সঙ্গে যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে কচ্ছের রান নিয়ে একবার এবং কাশ্মীর নিয়ে আর একবার পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দুই ফ্রণ্টে যুদ্ধ—এতগুলি যুদ্ধ রুশ-বিপ্লবের ৩০ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে এবং গত সাতাশ বছরের কম্যুনিষ্ট রাজত্বে চীনকে করতে হয়নি। চীন ও রাশিয়া থেকে উদ্বাস্তু অন্যদেশে গিয়েছে, কিন্তু ভারতে পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু এসেছে বসবাসের জন্য। এই সব সমস্যার গুরুভার সত্ত্বেও ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিঁকে ছিল ভারতের গণতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় ছিল বলে। ভারতে দীর্ঘকাল যাবৎ গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং যে গণ আন্দোলন প্রতিটি মানুষকে সব কিছু বিচারের মাপকাঠি ভাবতে শিখিয়েছে, সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের লোভ পরিত্যাগ করার কথা বলেছে। গান্ধীজী জনগণের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করতেন বলে কখনোও সামরিক বাহিনীর লোকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেওয়ার কথা ভাবেননি। কারণ তিনি জানতেন, যে-সব পরাধীন দেশ সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেইসব দেশে সামরিক বাহিনীর নেতারাই শাসন-ক্ষমতা দখল করেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনশক্তির উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে ১৯৪৬ সালে নৌ বিদ্রোহীদের সাহায্য নিয়ে তিনি ইংরেজকে আঘাত হানতে চাননি। গান্ধীজী একই সঙ্গে দেশে নতুন রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশান গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। কোন দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও রাজনৈতিক কাজকর্মের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা বজায় থাকা সেই দেশে রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থায় যদি গণতন্ত্রের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে সেই দল ক্ষমতাসীন হলে দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রায় প্রতিটি পরাধীন দেশে একটা বড় রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। দেখা গিয়েছে, স্বাধীনতার পর ওইসব দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর গান্ধীজী কংগ্রেসের বিভিন্ন মতামতের লোকদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের রীতি চালু করেন। এই রীতির জন্য কংগ্রেস সভাপতি বা সম্পাদকের বিশেষ ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা হতেন ওয়ার্কিং কমিটির মুখপত্র। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বলতে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাত না, এই হাইকমাণ্ড গান্ধীজী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মতামতকে একাধিকবার অগ্রাহ্য করেছে। স্বাধীন ভারত একদল-শাসিত দেশ হলেও কংগ্রেস দলের মধ্যে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল বলেই এদেশে একনায়কত্ব চেপে বসতে পারেনি, সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রাধীন থাকায় প্রতিবেশী দেশগুলির মতো ঘটনাও

এদেশে ঘটতে পারেনি। ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ব্যক্তির স্বাধীন মতামতকে স্বীকৃতি দেওয়া হত বলে বিভিন্ন ধরনের কম্যুনিষ্টদের একাধিকবার সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা সফল হয়নি। মনে রাখা দরকার, যে-সব দেশে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করেছে, তার মধ্যে এক চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া আর কোনো দেশের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার কী, তা জানত না। ভারতে ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের বিভাজন এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতা করার কেউ অবশিষ্ট ছিল না। দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটলে সেই দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সেই দলের নেতা বা নেত্রীর মর্জির উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতার তিরিশ বছর বাদে আমরা যে গণতান্ত্রিক পরিবেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে চলেছি, সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ আগামী দিনেও বজায় থাকবে কিনা, তা নির্ভর করবে প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা বজায় থাকা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর।

মনে রাখা দরকার, ১৯৭৫ সালের ২৬ জুনের আগে ভারতের নাগরিকদের সমান অধিকার ছিল, আইনের চোখে ছিলেন সকলেই সমান। জরুরী অবস্থায় একটার পর একটা আইন পাস বা সংবিধানের ধারা সংশোধন করিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার আমাদের সেই অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। জনতা দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পর ৪৩-তম সংশোধন বিলের মাধ্যমে সেই সমানাধিকার ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস দলের বিরোধিতায় ফলে রাজ্যসভায় সেই বিল পাস হয়নি। এ ৪৩-তম সংশোধনে ৩৯-তম সংশোধন প্রত্যাহারের ব্যবস্থা ছিল। ওই ৩৯-তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিচারের অধিকার বিচার বিভাগের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই সংশোধন ছাড়া ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের ৩১-ডি ধারাও নাগরিকদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এই ৩১-ডি ধারা অনুসারে সরকার যে-কোনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়তা বিরোধী সংস্থা বলে বেআইনী ঘোষণা করতে পারবেন এবং তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ করা চলবে না। জরুরী অবস্থার সময়ে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ যেভাবে সক্রিয় কিংবা সচেতন হয়েছিলেন, ভারতীয় সংবিধান থেকে গণতন্ত্র-বিরোধী ধারাগুলি অপসারণের ব্যাপারেও তেমনিভাবে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন এবং তাহলে আমরা এদেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারব।

সামাজিক ক্রান্তিসাধনে ভারতীয় সংসদ

১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রথা বিলোপ হয়েছে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে। এই প্রথা বিলোপের জন্য নির্বাচিত সংসদ সংবিধানের প্রথম সংশোধনের দ্বারা ভূমি সংস্কারের আইনগুলিকে সুরক্ষিত করে। জমিদারী প্রথার বিলোপ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থা গ্রহণে ভারতের অগণ্য জনগণের মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে না যে এই প্রথা বিলোপের ২৫ বছর পরেও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কমে নি। ভূমি সংস্কারের আদর্শ অধিকাংশ রাজ্যে অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পের মতই সরকারী দপ্তরের মহাফেজখানায় জমা হয়ে আছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে যে ভূমিদাস প্রথার প্রচলন ছিলো ভারতের বহু রাজ্যে এখনো তা চলে আসছে। এবং তার জন্যেই ১৯৭৫-এ নতুন করে সংসদকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে বেগার শ্রমপ্রথাকে রদ করতে। হিন্দুকোড বিল, পণপ্রথা বিলোপ ইত্যাদি আইন পাশ করে হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রয়াস গ্রহণ করা হলো। ভারতবর্ষকে প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার বাসনা আন্তরিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সংসদীয় বিতর্কে। কিন্তু সংসদ, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বা ধর্মীয় অস্বাস্থ্যকর প্রথাগুলো সম্বন্ধে কখনই সরব হয়ে উঠতে পারে নি স্বাভাবিক কারণেই। ফলে সমগ্রভাবে সমাজব্যবস্থা তার ধর্মীয়, বর্ণীয় সব রকম স্তরবিন্যাসসহ—যা চলে আসছিল তাই রয়ে গিয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে অল্পই। কেননা শুধু আইন করলেই হয়না। আইন কার্যকরী করলে যাদের স্থায়ী স্বার্থে আঘাত পড়ে, আইন কার্যকরী করবার দায়িত্ব সেই সম্প্রদায় থেকেই আগত নতুন গড়ে ওঠা আর এক শ্রেণীর হাতে। আর এইখানেই ভারতীয় সংসদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। সংসদ যে এ দায়িত্ব পালনে একেবারেই ব্যর্থ একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না।

গৃহীত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সংসদের পক্ষে তার দায়িত্ব পালনের ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয়। এই প্রবন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে, আসলে দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা সামাজিক স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করে। এই অনগ্রসরতা থেকে মুক্তির জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তার অনেক কিছুই ভারতবর্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, খনি, ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো এদিক থেকে সঠিক পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের সীমিত শহরাঞ্চলে এই ব্যবস্থাগুলির ফল নিশ্চয়ই উপলব্ধি করা যায়। তবে ভারতের অধিকাংশ জনগণই গ্রামীণ। পরিবর্তনের প্রয়োজন তাদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী। এখানে বাহ্যত পরিবর্তনের এই গতি কেন ব্যাহত তার দুটি কারণ নির্দেশ করা যায়। যেমন জন্মহারের অতি দ্রুত বৃদ্ধি, এবং জন্মহার রোধের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের অভাব।

পরিশেষে, সংসদ জাতীয় জীবনের প্রয়োজন প্রয়োজনানুগ আইন প্রণয়ন করে সে আইন কার্যকর করবার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু সরকার অনেক সময়ই ভুলে যায় সরকার সংসদেরই প্রতিনিধি। প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনা ক্ষমতার কেন্দ্রকে আত্মসাৎ করবার জন্য নয়, ক্ষমতা প্রয়োগ জনগণের জন্যই। তাই আইন প্রণয়ন করলেই হয়না। সেগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের মনে আশা আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে হয়। আইনের প্রয়োগের মধ্য মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনতে হয়। আর তখনই নতুন ভাবনা চিন্তার বিকাশ হয়। সমাজ সংস্কার বা পরিবর্তনের পথ তৈরী হয়। সার্বজনীন শিক্ষার ভূমিকা মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ভারতবর্ষের সংসদ অনেক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেও সেগুলির ফল জনগণের দুয়ারে আজও পৌঁছে দিতে পারেনি, তার কারণ বোধ করি এই খানেই নিহীত আছে। বিগত ত্রিশ বছরে ভারতে শিক্ষিতের হার বেড়ে হয়েছে শতকরা ২৯.৬ ভাগ। অর্থাৎ অশিক্ষিতের হার এখনো শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। অতএব আশ্চর্য হবার কারণ নেই—যে ভারতের জনগণের শতকরা ৭০ ভাগ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতে বাধ্য। আর এই দারিদ্র্যই ভারতের সমাজ ব্যবস্থার স্থিতাবস্থার জন্য দায়ী এবং ভবিষ্যতে সংসদের প্রধান ভূমিকা এই খানেই।

রাজ্যসভার ডাকটিকিট

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্বের জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে ভারত সরকার যে নিয়মিত ডাকটিকিটগুলির প্রচার করছেন, রাজ্যসভার ২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিট তাদের মধ্যে অন্যতম। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাধীনতা লাভের সময় (১৯৪৭) ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ও অশোকস্তম্ভ যুক্ত ডাকটিকিট প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সময় (১৯৫০) চারটি ডাকটিকিট (বিজয় উৎসব, শিক্ষা, কৃষি ও কুটির শিল্প) এবং স্বাধীন ভারতের রজত-জয়ন্তী (১৯৭৩) উপলক্ষে দুটি ডাকটিকিট।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি; ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রস্তুতি ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে ভারতের আত্মপ্রকাশ; এবং ১৯৫২ সালে ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ভারতের রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনে এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

ইতিহাসের প্রায় শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, শাসক ও রাজন্যবর্গ মনো-নয়নে ভারতবর্ষ নির্বাচনের নীতি পালন করে আসছে। মহাকাব্যগুলিতে তার সাক্ষ্য আছে। ব্রাহ্মণ্যে দেখা যায় জনপ্রিয় শাসককে মনোনয়ন করতো রাজকর্ত্রী নামীয় সংগঠন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায় যে, লিচ্ছবিরা

সাধারণ নির্বাচন ১৯৬৭

রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত করতেন। এই নির্বাচনকে বলা হতো ছন্দ, যার অর্থ ইচ্ছা। ভোটপত্র শলাকা নামে অভিহিত ছিল। এবং শলাকা-গ্রাহক এগুলি সংগ্রহ করতেন। এইসব প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরবর্তীকালে শত্রুর আক্রমণে ব্যাহত হয় এবং ভারত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তারপর অনেক উত্থান পতনের ইতিহাস। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান সংবিধানের প্রবর্তনের পর আরম্ভ হয় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রয়োগ। পর পর ছটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র আজ

সংসদ ভবন

ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত। গত ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে লালচে বাদামী রঙের ডাকটিকিটটি মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে রয়েছে নির্বাচনের একটি চিত্র; আভ্যন্তরীণ চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি গ্রাম্য মহিলা ভোট দিচ্ছেন।

গত ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রী ভারতের পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো। প্রতিটি নাগরিকের জন্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অপক্ষপাতিত্ব, স্বাধীনতা, অবস্থা ও সুযোগের সাম্যতা—সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। ভারতের সংসদীয় সরকার প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম ২৫ বছর নানা কঠিন পরীক্ষা ও দুঃখ দুর্দশার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।
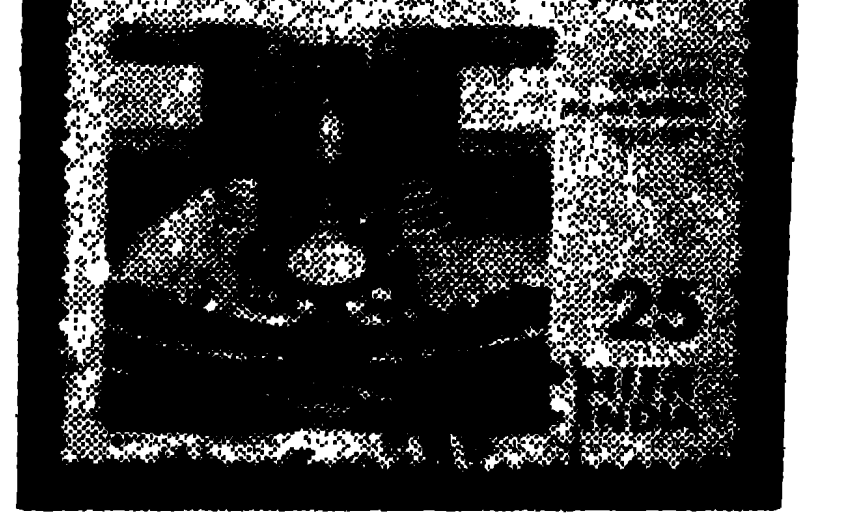
রাজ্যসভা ১৯৫২-৭৭

বিদেশী আক্রমণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। অনুন্নত দেশকে জীবনক্ষম, শক্তিশালী এবং আধুনিকতায় নিয়ে যেতে বিচিত্রধর্মী সমাজব্যবস্থায় অনেক টানা-পোড়েন সহ্য করতে হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি নিরলস কাজ করে গিয়েছে। এবং এটি পরিষ্কার যে নতুন রাষ্ট্র তার সহজাত সুস্থত এবং আভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতার গুণে সময়ের এই আক্রমণের মোকাবিলা করেছে সংসদই হলো ভারতের সর্বোচ্চ সংস্থা। এর মাধ্যমে জনসাধারণ তাঁদের আশা আকাঙ্খা বাস্তবে পরিণত করেছেন; আবার নিজেদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরেছেন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনগুলি দেখলেই অনুভব করা যায় যে, সংসদীয় সরকারের প্রতি দেশের কী গভীর আস্থা। প্রজাতন্ত্রের পঁচিশবর্ষ পূর্তিতে ডাকবিভাগ সেইজন্যে চমৎকার একটি ডাকটিকিট প্রচার করেন। ছবিতে সংসদ ভবনের চিত্র নীল, কাল আর রূপোলী রঙের সাহায্যে মহিমময় হয়ে ধরা পড়েছে। প্রকাশ কাল, ২৬শে, জানুয়ারী, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ভারতীয় সংসদ দুটি অঙ্গ—লোকসভা এবং রাজ্যসভা। এই দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থায় সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব। বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনের জন্যে প্রবহমান জনমত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিপারিষদে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব সহজ। এই সব কারণে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ৩রা এপ্রিল, ১৯৫২ সালে রাজ্যসভা

৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর

কৃষ্ণ ধর

১৯৪৭-এর মধ্যরাতে আমরা শুনেছিলুম জওহরলালের কন্ঠে সেই বিখ্যাত 'ট্রিষ্ট উইথ ডেস্টিনি'র ভাষণ। অঙ্গীকার পূরণের সেই উজ্জ্বল শব্দাবলী সেদিনকার যুবকদের মনে নিশ্চিতই সঞ্চার করেছিল অনেক আশা আর স্বপ্নের রঙীন চিত্র। মধ্যরাতে স্বাধীন হলুম আমরা। পৃথিবীর অন্য সবাই যখন গভীর নিদ্রামগ্ন তখনই ছিল আমাদের বহুশতাব্দীর তন্দ্রাভঙ্গ। সে এক আশ্চর্য জাগরণ। কীভাবে আমরা সেই স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছিলুম? আশা নিশ্চয় ছিল, সংশয়ও ছিল কম নয়। আনন্দের উল্লাসধ্বনি ছিল। অশ্রুভরা বেদনাও ছিল তার পাশাপাশি।

হাতের শেকল ছিড়ে সেদিন আমাদের ডাক দিয়েছিল চার অক্ষরের এই শব্দ—স্বাধীনতা। আমরা মুক্ত, আমরা বন্ধনহীন। আমরা এত দিন পর বুঝি বিশ্বসভায় আসন নিতে পেলুম ছাড়পত্র। বিনারক্তে তা উপার্জিত হয়নি। তার জন্য ভারতকে মূল্য দিতে হয়েছিল অসামান্য।

যদি সরাসরি কামান বন্দুকের লড়াইয়ে এই ঘটনা ঘটে যেত তাহলে যে রক্তপাত হত তার চেয়ে কম কিছু হয়নি। আমাদের বিপ্লবীরা বারবার বিদ্রোহ করেছেন। তার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা তারা দেখে যেতে পারেননি। ইংরেজরা তাঁদের হত্যা করেছে। আমরা তাঁদের দিয়েছি শহীদের সম্মান। কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেল তখন আমরা দেখলুম দেশটা দুভাগ হয়ে গেছে। কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, দেশছাড়া। হাজার হাজার মানুষ নিহত। সে এক নৃশংস গৃহযুদ্ধ।

সেই বেদনাতেই আচ্ছন্ন ছিল মহাত্মা-গান্ধীর সমস্ত মনপ্রাণ। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর উৎসব তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি; তিনি তখন বিহারের দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে পথ পরিক্রমা করছেন তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য। তাঁকে ডাকছিল তখন নোয়াখালির নিঃস্ব ভয়ার্ত মানুষ। তাঁকে ডাকছিল শাণিত ছুরির তলায় শায়িত কলকাতার বেলেঘাটা বস্তি। তাঁর মন্ত্রশিষ্য সেই অকুতোভয় দীর্ঘকায় পাঠান আব্দুল গফ্ফর খাঁ ভাবতেই পারেননি যে এমনটা হবে। তিনি বলে উঠলেন, কংগ্রেস আমাদের ঠেলে দিয়েছে নেকড়ের মুখে। আমাদের ভাষায় নতুন শব্দ চালু হল শরণার্থী। পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে চলল মানুষের দীর্ঘ, বেদনার্ত যাত্রা।

এই মূল্য দিয়ে কেনা স্বাধীনতার জয়ধ্বনিতে সেদিন পতাকা উঠল। আমরা পেলুম জাতীয় সঙ্গীত, পেলুম নতুন পতাকা। কী আশা ছিল আমাদের স্বাধীনতার কাছে? এ প্রশ্ন তো আমাদের কাছেও করতে পারে স্বাধীনতা নামক সামগ্রী? যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাঁদের হাতেই অর্পিত হল দেশকে চালাবার ভার। বিদেশী শাসন দেশকে শোষণই করেছে, তার বৈষয়িক উন্নয়নে উৎসাহ তার ছিলনা। সে তার শাসন ও শোষণের প্রয়োজনেই দেশে বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন চালু করেছিল, রেল লাইন পেতেছিল সারা দেশজোড়া। অল্পস্বল্প শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু মূলধনের সিংহভাগ ছিল তাদেরই হাতে। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন তারা করেছিল তাদের শাসনের সহযোগী শ্রেণী তৈরী করার জন্য। নিরক্ষরতা দূর করার কোনো প্রোগ্রাম তার ছিল না। সুতরাং স্বাধীনতার কাছে বিস্তর প্রত্যাশা নিয়ে দেশের মানুষ যাত্রা সুরু করে ১৯৪৭ সালে।

গণপরিষদ বসানো হল ইংরেজ আমলেরই সীমিত নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে। দেশের নায়ক যাঁরা সবাই তাঁরা ছিলেন সেই গণপরিষদে। স্বয়ং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন গণ পরিষদের সভাপতি। তিন বছর অনেক চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রম করে হরিজন আইনমন্ত্রী ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর তৈরী করলেন লোকতান্ত্রিক ভারতের প্রথম সংবিধান। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতবর্ষ সেই সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ রিপাব্লিক রূপে ঘোষণা করল নিজেকে। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হলেন তার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

যে কোনো স্বাধীন দেশের মানুষের কতকগুলো ন্যূনতম আশা আকাঙ্খা থাকে। ভারতবর্ষ ইংরেজ কলোনিয়াল শাসকদের কাছ থেকে পেয়েছিল একটা সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা, চরম নিরক্ষরতা, রুগ্ন শিল্প, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আর মুমূর্ষু অর্থনীতি। স্বাধীন হবার পর স্বভাবতই দেশের মানুষ ভাবল এবার তার পরিবর্তন হবে। গান্ধী মহারাজের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবার। সংবিধানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের বাক্ স্বাধীনতা জাতীয় বহুবাঞ্ছিত সমস্ত অধিকারই স্বীকৃত হল। সুরু হল ভারতের নতুন যাত্রা।

এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হল ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে। পরাধীনতার জ্বালা ভারত জানত। তাই এশিয়া আফ্রিকা থেকে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য পঞ্চাশের দশকে সে নেয় মুখ্যভূমিকা। বিদেশনীতিতেও তার ভূমিকা হয় জোট-নিরপেক্ষতা। কোনো শক্তিশিবিরে সে থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আর জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন বিদেশনীতি—এই দুই ভূমিকাতেই ভারত সর্বত্র অভিনন্দন পায়। চীনের সঙ্গেও তখন থেকেই মৈত্রীর সূত্রপাত। আমরা মনে করতে পারি সে সময়টাই ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে সবচেয়ে সুসময়। তার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকত। ভারতবর্ষের মানুষেরও তখন গৌরব। ভারত তখন পঞ্চশীলের উদ্‌গাতা। আফ্রিকার প্রতিটি দেশ সাগ্রহে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতের দিকে। আফ্রিকার নেতারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন ভারতবর্ষই আমাদের স্বাধীনতার প্রেরণা। ভারতবর্ষই আমাদের পথ দেখিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। আফ্রো-এশীয় মহামৈত্রীর স্বপ্ন তখন সার্থক হতে চলেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে একে একে পশ্চাদপসরণ করছে ঔপনিবেশিক শক্তি। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতিরই সার্থকতা তাতে প্রমাণিত হল।

কিন্তু শুধু বাইরের হাততালিতে তো সব কিছু নিষ্পন্ন হয় না। ভারতকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার অন্য জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসের তাগিদও ছিল সমান জরুরী। পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনাও সেই তাগিদ থেকেই। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের নানা অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য অকাতরে অর্থব্যয়ও করেছেন। কলকারখানার পরিমাণও বেড়েছে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার মুখে জওহরলাল নেহরুকে তখন আক্ষেপ করতে শোনা গেছে, সেই টাকাগুলো গেল কোথায়? যতটুকু উন্নতি আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। সমাজের নিচুতলাতে যাদের বাস তাদের কাছে কি সেই হাজার হাজার কোটি টাকার তলানিটুকুও পৌঁছেচে? এর সুস্পষ্ট জবাব: না তা পৌঁছয়নি। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের সত্তরভাগ লোক এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে যাদের মাসিক আয় ১৯৬১ সালের মূল্যসূচক অনুযায়ী ২০ টাকার কম। এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার হার বেড়েছে, অথচ নিরক্ষরতার কোনো সমাধান হয়নি। ভারতবর্ষে এখন প্রায় ২২ কোটি লোক নিরক্ষর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরদের সংখ্যাও বাড়বে। সংবিধানে বলা ছিল, ১৯৫০ থেকে দশ বছরের মধ্যে দেশে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য নিঃশুল্ক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। এটা ১৯৭৭ সাল। ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যেই তা হয়নি। যতটুকু হয়েছে তা দায়সারা গোছের। এই বিপুল নিরক্ষরতা ও শিশু কিশোরদের অশিক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষকে চলতে হচ্ছে। এতে গৌরবের কিছু আছে কি?

অথচ এই ত্রিশ বছরে য়ুনিভার্সিটির সংখ্যা বেড়েছে, স্কুল কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার প্রতি যতটা নজর দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও সর্বজনীন করার দিকে সেই মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তার ফলে উচ্চশিক্ষার বিস্ফোরণ যত প্রবলভাবে ঘটেছে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা বয়স্ক শিক্ষার নিঃশব্দ প্রসার সে তুলনায় কিছুই হয়নি। অথচ এর প্রয়োজনই ছিল সবচেয়ে বেশি। অগ্রাধিকার কোনটাকে দেওয়া হবে তা নিয়ে গোড়াতেই ছিল দ্বিধা। তার জন্যই এই পরিণতি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মূলে রয়েছে এই ব্যাপক নিরক্ষরতার অভিশাপ। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ সম্ভব হত না যদি দেশের মানুষকে গত ত্রিশ বছরে মোটামুটিভাবে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া যেত। শিক্ষাব্যতিরেকে গণতন্ত্র বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন এমারজেন্সির পরবর্তীকালীন দুঃখজনক ও ভয়াবহ ঘটনায় তার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।

অনেক ঠেকে আমরা শিখেছি আর পরের দুয়ারে হাত পাতা নয়। স্বনির্ভরতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কেননা বিনাস্বার্থে কেউ সাহায্য দেয়না। নিজের মাথা উঁচু করে চলতে হলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা চাই। কীভাবে তা সম্ভব তা নিয়েই অধুনা চর্চা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আমাদের পরিকল্পনাকে চেলে সাজানো হবে। কোন জিনিষটা আগে দরকার তারই বিচার আগেভাগে করতে হবে। বৃহৎশিল্প নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষের উপায় যাতে হয় তার জন্য গ্রামভিত্তিক ছোটখাটো শিল্প না হলে এই অসম সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব? আমাদের দেশে এখনও মাল পরিবহণের প্রধান বাহন গরুরগাড়ি। দূর-দূরান্তরের গ্রামাঞ্চলে এছাড়া অন্য বাহন নেই। তাহলে বিদেশ থেকে সোনার দামে তেল কিনে এনে যান্ত্রিক পরিবহণ আর কতকাল আমরা চালাতে পারব? গরুর গাড়িকে কীভাবে আরও গতিশীল এবং ভারবাহী পশুর পক্ষে কম যন্ত্রণাদায়ক করে তোলা যায় তার একটা উপায় বার করা কি খুবই হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে গণ্য হবে? গরিব দেশের জন্য পশ্চিমী দেশের অতি আধুনিক প্রয়োগবিদ্যার পরিবর্তে দেশের সমাজের বাস্তব অবস্থার উপযোগী প্রয়োগবিদ্যারই প্রয়োজন বেশি। এসব তত্ত্ব এখন পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরাও বলছেন।

এখনও আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কৃষি ব্যবস্থা। জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে গ্রামের জোতদাররা। ট্র্যাক্টর, কৃত্রিম সার, জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করছে

তারাই। ভূমিহীন খেতমজুর বর্গাদার চাষীর ভাগ্যের পরিবর্তন তাতে হয়নি। আইনের আড়ালে বেনামী জমির পরিমাণ বেড়েছে। সুতরাং কৃষিপ্রধান এবং মূলত জমির উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল দেশে ন্যায্য ভূমিসংস্কার যতদিন না হচ্ছে ততদিন মানুষের দুঃখ ঘুচবে না। ত্রিশ বছর পরও আমাদের এই কথাই বলতে হচ্ছে।

আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের সদিচ্ছার কোনো অভাব ছিল না। তাঁরা ভারতবর্ষকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণয় করার প্রেরণা নিয়েই এই সংবিধান উত্তরকালের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল কথা পরমত সহিষ্ণুতা এবং বিরোধী দলের সমালোচনার প্রতি সযত্ন মনোযোগ। গত ত্রিশ বছরে একটি বিকল্প শক্তিশালী বিরোধী দলের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব শাসক দলকে আত্মম্ভরিতার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছিল। বিশেষ একজনের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার মারাত্মক প্রবণতাও সেই ব্যাধিরই প্রতিক্রিয়া।

তা বলে এতকাল কি ভাল কাজ কিছুই হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। এশিয়ার অন্য অনেক দেশে গণতন্ত্রের শ্মশানবন্ধুরা যখন কফিনে করে তার শব নিয়ে গেছে গোরস্থানে, ভারতরাষ্ট্রের নিরক্ষর সাধারণ মানুষ তখন ব্যালটপত্র হাতে নিয়ে নিয়ে আত্মম্ভরী একনায়কতন্ত্রী সরকারকে গদীচ্যুত করে এসেছে। এটাই ভারতবর্ষের পক্ষে বাঁচোয়া। গত ত্রিশ বছরে যা কিছু ভাল কাজ হয়েছে তার মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধরণ ধারণ ও কাঠামো বজায় রাখার জন্য সাধারণ মানুষের এই সাহসী এবং সহজাত বিশ্বাস আমাদের দেশকে বিনাশ ও বিশৃংখলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আজ সেই সাধারণ মানুষকে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি। তাঁরাই গণতন্ত্রের রক্ষক এবং ভয় থেকে মুক্তির পথ তাঁরাই দেখিয়েছেন।

এই কিছুদিন আগেও তৎকালীন শাসকদের মুখে শোনা যেত আমাদের মতো দরিদ্র দেশে পাশ্চাত্যের মতো 'নরম' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাকি চলবেনা। সে কারণেই একে ওরা লোহার মত শক্ত করতে চেয়েছিলেন। কার স্বার্থে? এর উত্তর পাওয়া যাবে তদন্ত কমিশনগুলোর রায় যখন বেরুবে তখন। আমাদের দেশে লিবারেল ডেমোক্র্যাসি থাকবে কি না তা জনসাধারণই ঠিক করবে। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমতায় চিরস্থায়ী আসন দেবার জন্য তাকে দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত করার অধিকার কারো থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ সেই সরল সত্য আবার উচ্চারণ করেছে সুস্পষ্ট ভাষায়। নিঃশব্দ কণ্ঠে। এখানেই তার জয়। ত্রিশ বছরের স্বাধীনতার সবচেয়ে সার্থক উচ্চারণ এটাই।

স্বাধীনতার আবহাওয়ায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আশা আকাঙ্খার পরিপূর্তি কী ভাবে হয় সে প্রশ্নও মনে জাগতে পারে। সাহিত্যিকরা ভাষা নিয়ে কাজ করেন, শিল্পীদের হাতে তুলি, চোখে স্বপ্ন। সাহিত্য আকাদমি বা সঙ্গীত নাটক আকাদমি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে শিল্প সাহিত্যের পোষকতা করার সৎপ্রেরণা, কারই বা সমর্থন না পাবে: কিন্তু বৎসরান্তে কিছু পুরস্কার বা কাঞ্চনমূল্যে কোনো সাহিত্যকীর্তির উৎকর্ষ নিরূপণ তার শেষ কথা নয়। এর ভিতরকার চিত্র ততটা আলোকিত নয়। পুরস্কার দিয়ে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আনুগত্য আদায় করার গোপন ইচ্ছাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল গত এমারজেন্সির সময়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন যে শিল্পী সাহিত্যিকদের জন্য সরকার এত পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন, আকাদমি করেছেন, কিন্তু তাঁরা সরকারকে যথেষ্ট সমর্থন করছেন না। কী সাংঘাতিক কথা। এর প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী দুর্গা ভগৎ তাঁর আকাদমি পুরস্কার ফিরিয়ে দেন এবং আকাদমির সদস্য পদও ছেড়ে দেন। যেমন করেছিলেন ফণীশ্বর নাথ রেণু তাঁর পদ্মশ্রী খেতাব ফিরিয়ে দিয়ে।

আসলে শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রশাসনের মানসিক তরঙ্গ সমান্তরাল নয়, এটা সরকারকে বুঝতে হবে। এদেশে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করেন, শিশির ভাদুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেন খেতাব। শিল্পীর স্বাধীন মর্যাদার প্রতি তাই আরও শ্রদ্ধাশীল আচরণই আকাঙ্ক্ষিত। ভাষা নিয়েও পরিষ্কার কোনো নীতি গড়ে না ওঠার ফলে প্রায়ই দেখা দেয় অবাঞ্ছিত ভাষা বিরোধ। খুবই আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি আমাদের দেশেরই একটি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশীলে স্বীকৃতি পাবার জন্য আন্দোলন করতে হয়। আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছুই সরকারের স্বীকৃতি পায়না।

বহুভাষী দেশে সুয়োরাণী দুয়োরাণী ভাষানীতি সামাজিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভকেই জড়িয়ে রাখে। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ভাষা নিয়ে বোঝাপড়া এখনও সম্ভব হয়নি। এতে কিন্তু সম্ভাব্য বিরোধের বীজ রয়েই গেল। এ সমস্তই আমাদের ত্রিশ বছরের স্বাধীনতার জমানো সমস্যা। তার যেখানে উজ্জ্বলতা সেখানে দাঁড়িয়ে ওই আবৃত অন্ধকারের দিকে তাকাই আমরা—তা দূর না হওয়া পর্যন্ত তার উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণ হতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের আগেই ভারতবর্ষকে তার এই সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলতে হবে, যদি আমরা পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি

সুভাষ সমাজদার

আমাদের দাবী—
—মানতে হবে—মানতে হবে—

দীর্ঘ মিছিল এগিয়ে চলেছে। থেকে থেকে তারা তীব্র উত্তেজনায় মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উচ্চারণ করছে কঠিন অপরাজেয় শপথ—তেলেগুভাষাভাষীদের জন্য আমরা একটা আলাদা অন্ধ্ররাজ্য চাই। তার জন্যে প্রয়োজন হলে আমরা খুন দেব—

আমাদের দাবী—

মানতে হবে—মানতে হবে—জনতার গগনভেদী সমর্থনের রোলে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। সেদিন বিশাখাপত্তনম, গুণ্টুর, বিজয়ওয়াড়া, রাজমুন্দ্রী, মাদ্রাজের পূর্বাঞ্চলের আরও অন্যান্য শহরের হাজারো জনতার কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এই দাবী—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী থেকে তেলেগুস্পিকিং জেলাগুলোকে নিয়ে পৃথক করে সম্পূর্ণ পৃথক একটা প্রদেশ তৈরি করতে হবে—

এসব ১৯১৩ সালের কথা।

সেদিন এই আন্দোলনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির, তা জানা যায় না। কিন্তু সেই তীব্র উত্তেজনাময় আগ্নেয় পরিবেশে মহীশূরের পূর্বে কৃষ্ণ-মৃত্তিকার দেশ অনন্তপুর জেলার ইল্লুরু গ্রামের এক দরিদ্র আর নগণ্য কৃষকের ঘরে জন্ম নিয়েছিল এক শিশু—

১৯শে মে, ১৯১৩। বলাবাহুল্য সেদিন নবজাতকের উদ্দেশ্যে শঙ্খধ্বনি হয় নি; মুখরিত হয় নি ইল্লুরুর বাতাস প্রতিবেশিনীদের উলুধ্বনিতে! নিতান্তই সাদামাটা ভাবে আর পাঁচটা ছেলের মতই সে গ্রামের পাঠশালায় পড়ে আর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হতে লাগল।

ইল্লুরুর চারিদিকে দিগন্তবিসারী প্রান্তর। তার মাঝে মাঝে অসুরমুণ্ডের মত ছড়ানো ছোট ছোট টিলা, থেকে থেকে বেঁটে বেঁটে গাছের এলোমেলো জঙ্গল। সেই কৃষক বালক লক্ষ্য করতো সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের অহল্যা মাটিতে চাষীরা লাঙ্গল দেয়। রোদে পুড়ে জলে ভিজে কৃষকরা তাদেরই রক্তে সেই বন্ধ্যা মাটিতেই সবুজ ফসলের বিপুল সম্ভারে দিগন্ত পর্যন্ত তরঙ্গ তোলে। কিন্তু—হায় কে জানে কোন কারবারী হাতের মার-প্যাঁচে সেই ফসল কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। অজগর সাপের মত মহাজনের ঋণ-তাদের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে আর দুঃখে দারিদ্র্যে জীর্ণ হয়ে এক অবক্ষয়ী জীবনের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাদেরই দুঃখে গভীর সহানুভূতিতে বালকের মন কেমন ভারী—খুব ভারী হয়ে ওঠে আর তার চেতনার ভেতরে একটা স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে ওঠে একটি বলিষ্ঠ শপথ—বড় হয়ে সে এই মেহনতী মানুষের দুঃখ দূর করবে—তখন তার বয়স বারো।

তার সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর ১৯৬০ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসল মহীশূরের সদাশিব-নগরে (বাঙ্গালোর)। সেই সভায় এ. আই. সি. সি.র প্রেসিডেন্ট যাঁর ভাষণে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, **In a country that is mainly agricultural like India, agriculture must play a dominant role** কৃষির উন্নতি না হলে ভারতের সমৃদ্ধি কিছুতেই হতে পারে না। কে এই সভাপতি?

আর কেউ নয়। তিনিই সেই অনন্তপুর জেলার ইল্লুর গ্রামের কৃষক বালক। আসমুদ্র হিমাচলের আজ সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক। দেশের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত—রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি।

বাবার নাম নীলম চিন্নাপ্পা রেড্ডি। গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করেই ইল্লুরু থেকে অনেক-অনেক দূরে আদ্যারের (মাদ্রাজ) থিয়োসফিক্যাল হাইস্কুলে। পিতৃদেব চিন্নাপ্পার খুব নজর ছিল ছেলের লেখাপড়ার দিকে। তার চোখে স্বপ্ন নেমে আসতো—উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার এই ছেলে একদিন অনেক—অনেক বড় হবে—কিন্তু—

তাঁর স্বপ্নকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে সঞ্জীব পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের কাজে। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মত্ত বন্যায় সারা দেশ

তখন আলোড়িত। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস ঘোষণা করল পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প। গান্ধীজী সারা দেশকে আইন অমান্য আন্দোলনে আহ্বান জানালেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে শুরু হলো বিলেতী বস্ত্রের বহ্নুৎসব। শুরু হলো মদের দোকানে দোকানে পিকেটিং। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী শুরু করলেন ডাণ্ডী মার্চ। সারা ভারতের উপমহাদেশ জুড়ে দেখা দিল ঝড়-বজ্র-বিদ্যুতের আগ্নেয় সূচনা। সঞ্জীব সেই সময় তাঁর কলেজে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে কারাবরণ করেন।

সেই শুরু।

তারপর যে কতবার তিনি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে গিয়েছেন তার কোন লেখাজোখা নেই। সেই থেকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভিক সৈনিক। নিষ্ঠাবান, সৎ দেশ-প্রেমিক। তাই তিনি হলেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯৩৭)। এই পদে থেকে সঞ্জীব একটানা দশবছর ধরে দক্ষিণ ভারতের স্বদেশী আন্দোলনকে একটু একটু করে পুষ্ট করে তুলেছেন। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে আবার অনন্তপুরে এক আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব করার অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। দক্ষিণ ভারতের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো তরুণ সত্যাগ্রহী নেতা সঞ্জীব রেড্ডি। তাই তাঁকে জেল থেকে রিলিজ করে বাইরে রাখা তারা নিরাপদ মনে করল না। পাঠিয়ে দিল ভেলোর জেলে 'ডেটিনিউ' করে। দীর্ঘ দুই বছর পর যখন মুক্তি পেলেন তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ধুরন্ধর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস দৌত্য ব্যর্থ হলো। গান্ধীজী বজ্রকণ্ঠে সমগ্র জাতিকে মরণপণ করে সংগ্রামে আহ্বান করলেন—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—Do or die ব্রিটিশ শাসকদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন—সারি হিন্দুস্থানমে জ্বালামুখী ফুটেগী....শুরু হয়ে গেল ১৯৪২-এর গণ-আন্দোলন। বলাবাহুল্য মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা সঞ্জীবকে আন্দোলনের শুরুতেই গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৯৪৫ সালে সঞ্জীব যখন মুক্তি পেলেন তখন দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদহিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার চলছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাদের দুইশো বছরের জমিদারী ছেড়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাই পালাই করছে। ১৯৪৬ সালে জনতার নেতা শুধু যে সঞ্জীব জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত হলেন মাদ্রাজ বিধান সভায়—তা নয় কংগ্রেসী দলের (বিধান সভায়) সম্পাদকও মনোনীত হলেন। তারপর—তারপর ভারতের গণ-পরিষদের সভ্য থেকে শুরু করে কখনো অবিভক্ত মাদ্রাজ প্রদেশের মন্ত্রী (১৯৪৯-৫১), কখনো অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি (১৯৫১-৫২) হয়ে ধাপে ধাপে দৃঢ়পায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন তিনি। ইল্লুরু গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে পেনার আর চিত্রবতী নদীর জলবায়ু পুষ্ট অনন্তপুর জেলার পরিধি পেরিয়ে তিনি একটু একটু ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিশাল বিস্তীর্ণ আর বহুবচনাবৃত ভারতে। তাঁর ভেতরে পারিবারিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। পাঁচ বছরের ছেলে মারা গিয়েছে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে। কিন্তু যাঁর রক্তের ভেতরে দেশসেবার প্রেরণা আগুণ ধরিয়ে দিয়েছে, তাঁর অগ্রগতিকে রুখতে পারে না কোন ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি।

সেই তাঁর জন্মলগ্নে (১৯১৩) তেলেগু ভাষাভাষী জেলাগুলো নিয়ে যে পৃথক প্রদেশের দাবী ছিল তা বাস্তবে রূপায়িত হলো তেতাল্লিশ বছর পরে (১৯৫৬) আর সেই নবগঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন ইল্লুরুর কৃষকের ছেলে নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। যেই নিখিল ভারত

৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

উদাসীন মাঠে কে বেহালা বাজায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আসলে স্বাধীনতা ব্যাপারটাই ভারি গোলমেলে। কতটা স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করতে পারে, কতটা পারেনা তার একটা সীমারেখা টেনে দিতেই হয়। বিশেষ করে এই ভারতবর্ষে সম্পদ যেখানে খুবই সীমিত, প্রজনন যেখানে অপরিমিত সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনে নিরাপদের প্রশ্নটারই গলা বাড়িয়ে দেওয়া স্বাভাবিক। সমষ্টিগত ভাবনা কাজ করে না। করলেও তা গোষ্ঠবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে পড়তে দেখা গেছে বার বার। তখন ধর্মঘট চলে। যে যত বেশি সংঘবদ্ধ তার আশু পাওনা তত বেশি। তলাকার লোকেদের কথা তারা আদৌ ভাবে না।

আর তখনই আমি এক দুঃখী বালকের মুখ দেখি ফুটপাথে। সে ঘাড় হেঁট করে চলে যাচ্ছে না। মাথা উঁচু করে একের পর এক সুখী জানালায় ভেংচি কেটে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একদিন তাকে হাতের নাগালে পেয়ে বললাম, এই তোর কী নাম রে। সে নাম বলল, নুটু। শহরে সে তার মায়ের খোঁজে এসেছে। সে বলল, দেখছি, আপনারা আমার মাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? ভারি উদ্ধত তার কথা বলার ভঙ্গী। তারপরই চোখ কেমন তার সজল হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন পর নুটুকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যায় না। তখন রেল-ধর্মঘট চলছিল। রেলে মাঝারি ধরনের কাজ করে এমন এক বিজয় নামে ব্যক্তির সঙ্গে তখন বেশ সুসম্পর্ক ছিল আমার। মাঝে মাঝে দেখা হলেই বলতাম, কী মনে হচ্ছে? সাকসেসফুল অর আনসাকসেসফুল। সে প্রথম দিকে জোর দিয়ে বলত, সেন্ট পার্সেন্ট। তারপর ক'দিন যেতে না যেতেই সে একদিন হন্তদন্ত হয়ে হাজির। বলল, ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। ইউনিয়নের পাণ্ডা, ফ্যাসাদ হতেই পারে— বললাম, তাহলে আনসাকসেসফুল। সে বলল, ধুস, আমাদের চারু, চারুকে চেননা। তখন, কি ভালমানুষ। কেউ নেই বাবু। ঝাড়া হাত : পা। বাড়ির কাজে এত বিজ্ঞাপনটন দিয়ে ঝাড়া হাত পা লোক চাইলাম, তাই সেই শেষ পর্যন্ত....। বললাম, কেন তুমিতো বলেছিলে, মেয়েটি বেশ, কেউ নেই। ছুটিছাটা চায় না। বিশ্বাসী। চারু না হলে তোমারতো একদিন চলে না শুনেছি। রীতিমতো ইণ্টারভিউ নিয়ে চাকরি।

—তোমার সত্যি বলছ কেউ নেই? —না। ছেলে? না। ভাই? না। কারো ওপর কোনো টান নেইত। না বাবু। তোমার স্বামী আছে? খোঁজ নেই। —খোঁজ নেই কেন? চারু বলতে পারত মানুষটা বিষয়ী ছিল না বাবু। আপনাদের মত চালাক ছিল না বাবু। কি করে দু পয়সা বেশি কামাতে হয় জানত না। সরল হাবা গোবা হলে যা হয় মানুষের। এ-সব কথাও আমার মনে এসে গেল কেন জানি। বিজয়ের স্ত্রী অধ্যাপিকা। সংসারে স্ত্রী এক ছেলে এক মেয়ে। ইতিমধ্যেই সে শহরের একটু বাইরে বেশ সুন্দর ছিমছাম বাড়ি করেছে। এমন একজন সুখী লোকের কি আবার ফ্যাসাদ হল।

বিজয় বলল, চারুর একটা বখাটে ছেলে আছে। কি যে মুসকিল, যতবার দিয়ে আসি দেশে, ততবার এসে দেখি আমার আগেই পৌঁছে গেছে। লাথি মারব এমন মাজায়! বেশ গালাগাল দিতে গিয়ে বলল, তোমার বৌদি বলছে বাড়ি বেচে দেবে। খাচ্ছেনা দাচ্ছেনা। রাতে ঘুমোচ্ছে না।

—ঘুমোচ্ছে না কেন?

—চারুর আজকাল রাতে চুরি করার স্বভাব দাঁড়িয়েছে। কখন জানালায় এসে খাবার চুরি করে নিয়ে যায় ছেলেটা আমরা ধরতে পারছি না। ভারি তাঁদর।

বললাম, তাড়িয়ে দাও।

—তাড়িয়ে দেব, এমন বিশ্বাসী লোক পাব কোথায়।

—তা অবশ্য মুশকিলেই পড়েছ।

—মুশকিল বলতে, যত বলি তোর কি চাই, কি পেলে তুই আর আসবি না, তত বায়নাক্কা বেড়ে যায়। বলল, পিঠে পায়েস খাওয়ান, খাওয়ালাম। বলল, ঘুড়ি লাটাই পেলে সে ঠিক দেশে চলে যাবে--দিলাম। কিন্তু যায়না। ঘুরে ফিরে চলে আসে। নোংরা। ঘর দোর সব আমার যেতে বসেছে।

বললাম, তা হলে সেন্ট পার্সেন্ট সাকসেস।

—সেন্ট পার্সেন্টের ওপরে। তবে মাজায় এমন একদিন লাথি কষাব না! ধরতে পারলে হয়। এখন কখন আসে কখন যায় টেরই পাই না। তোমার বৌদি কলেজে, আমি অফিসে, ছেলে মেয়ে স্কুলে, বল স্বাধীনতা এর চেয়ে আর কত বেশি দরকার চারুর। সে সবই এখন দিয়ে দিতে পারে। তোমার বৌদির মাথাটা এখনও ঠিক রাখতে পেরেছে সেই রক্ষে। পাগল টাগল না হয়ে যায়। তারপর বলল, আমাকে একটা তালপাতার টুপি কিনে দেবেন বাবু? রাগে শরীর কাঁপছিল। সব সামলে বললাম, চল কোথায় পাওয়া যায় দেখি এবং সারা টেরিটিবাজার ঘুরে অবশেষে টুপি কিনে দিয়ে বললাম দেশে গিয়ে ভাল হয়ে থাকলে আরও পাবি। সেই যে গিয়েছিল আর আসে নি। ভেবেছিলাম সত্যি সংস্বভাবের মানুষ হয়ে গেছে নুটু। আর আসবে না। আজ বাড়ি ফিরে শুনি, তোমার বৌদি বলছে, এসেছে।

বিজয় ফের বলল, আমাকে যে বলে গেল আর আসবেনা। জবাবে তোমার বৌদি বলল, আমাকে বাজে বকিওনা মাথা ধরেছে। বিজয়ের কেমন হুঁশ ছিল না। সংসারের সঞ্চিত ঐশ্বর্য কেউ তার কেড়ে নিচ্ছে যেন।

—কোথায়। পায়ের রক্ত বিজয়ের মাথায় উঠে এসেছে। প্রায় অতিকায় জীবনহানিকর কিছু একটা ঘটনা। সব সুখ কেড়ে নিতে আসছে। সে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে চিৎকার করে ডেকেছিল, চারু চারু। চারু এলে সে বুঝতে পারল, মুখ সাদা ফ্যাকাশে। ভয়ে চারু একটা কথা বলতে পারছে না।

বিজয় বলল, কোথায়! কোথায় সে! তুমি কি ভেবেছ!

চারু কিছু ভাবেনি। চারু বুঝতে পারছে তার দোষের শেষ নেই। কেন যে মরতে সে চুরি করে কিছু খাবার অথবা নুটু এলে দু এক দিন থেকে যাক আর্জি জানাতেই, পরে বিজয় অথবা তার বউ রাণী দু একাদন কেন, প্রায় একবার এক নাগাড়ে সাতদিন থাকার অনুমতি দিয়েছিল। রাণী তখন বার বার বুঝিয়েছে নুটুকে, আর আসবি না। মনে থাকবে তো। তখন নুটু ঘাড় কাত করে বাধ্য ছেলের মতো বলছে, আর আসব না। পুরস্কার হিসাবে খোকনের পুরানো জামা প্যাণ্ট পেয়েছে। মা তাকে বেলুন কিনে দিয়েছে। এবং নুটু একজন সামন্ত রাজার মতো আদেশ করেছে চারুকে, জিলিপি খাব মা। জিলিপি কিনে দিয়েছে। আমি রাধাবল্লভী খাব মা। চারু তাকে রাধাবল্লভী খাইয়েছে। বলেছে, মামীর সঙ্গে ভাল হয়ে থাকতে। এখানে আসা বারণ। এলে বাবুরা খুব রাগ করে।

নুটু বড় বড় চোখে তাকিয়েছে। সে কি করে বোঝাবে মাকে ছেড়ে তার থাকতে খুব কষ্ট হয়। মামী খেতে দেয় না। দূর দূর ছার ছার করে। কিন্তু সে একটা কথাও বলে নি।

তারপর আবার এলে নুটুকে কান মলে দিয়েছিল রাণী।

আর একবার নুটুকে বিজয় কান ধরে টানতে টানতে সদর রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। এবং সে বাড়ি ফিরে দেখেছে তার আগেই নুটু চারুর কাছে পৌঁছে গেছে। তারপর একবার বিজয় নুটুকে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে। যাক যেদিকে খুশি চলে যাক। পরদিন অফিস থেকে ফিরে দেখেছে ভাল মানুষটি হয়ে বসে আছে দরজার গোড়ায়। শেষবার বিজয় ভাবল ভাল ব্যবহার করে দেখা যাক—নতুন জামা প্যাণ্ট কিনে দিয়ে বলল, আবার বছর পার করে আসবি। আবার নতুন জামা প্যাণ্ট পাবি।

নুটু সেই যে গিয়েছিল আর বেশ মাস খানেক হল আসে নি।

বিজয় ভেবেছিল সত্যি সংস্বভাবের হয়ে গেছে নুটু। মান সম্ভ্রমবোধ বেড়েছে। আর আসবে না।

বিজয় হুংকার দিয়ে উঠল, কোথায়! কোথায় সে।

রাণী বলেছে, বাজে বকিও না। মাথা ধরেছে। কেবল চেঁচাচ্ছে।

চারু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলছে না। ঘরে ফ্লোরোসেন্ট বাতি। রাণী একদম আলো সহ্য করতে পারছে না। পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

রাণী ভীষণ বিরক্ত গলায় বলল, আলোটা আবার জ্বেলেছ কেন? নিভিয়ে দাও।

বিজয় এবার তিক্ততায় ফেটে পড়ছে। রাণীর গায়ে আজ আর হাতই রাখা যাবে না। অথচ আজ সে উৎফুল্ল হয়ে ভেবেছিল—সারা রাত রাণীকে সে কি যে সব করবে। রাণীর মুখে ভয়ংকর কঠিন সব রেখা। কখনও রিক্ততায় অথবা কখনও নিষ্কর্মা মানুষের হাতে পড়লে যা হয়—এমন ঘৃণায় যেন রাণী আর ওর দিকে তাকাবেই না। সে তারপর সারা ঘর কাঁপিয়ে বলল, তোমরা ভেবেছ কি! কেউ কিছু বলবে না। কোথায় শুয়োরের বাচ্চা। বলে সে প্রায় হুংকার ছেড়ে বের হয়ে পড়বে এমন সময়ে রাণীর কেমন হুঁশ ফিরে এল। মানুষটারও

মাথা ঠিক নেই। রেল ধর্মঘট চলছে। দাবী দাওয়া সরকার কিছুতেই মেনে নিচ্ছেন না। ধর্মঘট বানচাল হবার মুখে। তবু নিষ্কর্মা মানুষের গলায় পুরুষের হুংকার উঠেছে দেখে রাণী উঠে বসল। বলল, যাও দ্যাখোগে মোড়ে বোধ হয় আছে। পাশের বাড়ীর বউটি বলেছে, আমরা যখন বাড়ি থাকিনা, চারুর কাছে আসে। চারু জানালায় হাত বাড়িয়ে কিছু দেয়। কি দেয় যখন দেখিনি, তখনতো বলতে পারিনা ভাত রুটি দেয়। অথচ চারুর সামনে বলতে সাহস পাচ্ছিল না রাণী। চোরের দায়ে অভিযুক্ত করার সাহসও এ ক'মাসে চারু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। চারুও জানে সে না থাকলে এরা সবাই চোখে অন্ধকার দেখবে।

বিজয় বের হয়ে যাচ্ছিল।

রাণী বলল, একেবারে পার করে দিয়ে আসবে।

চারু বুঝতে পারল না সেটা কতদূরে।

চারু জানালায় দেখল একজন দৈত্য ছুটে যাচ্ছে।

চারু দেখল, একজন নাবালক হাত তুলে বলছে, মা আমি।

বিজয় এত রাতে আমার বাড়ির পাশে টর্চ মারছে কেন। সে একবার এসে শুধু বলেছে, খুঁজছি। কেমন পাগলের মতো তার চোখ মুখ। সামান্য নুটু তার জীবনে কি এমন সমস্যা সৃষ্টি করেছে বুঝতে পাচ্ছিল না।

খুঁজছি। সে শীতের মাঠে টর্চ মারতে থাকল শুধু! ঠিক কোথাও অন্ধকারে শীতের মাঠে ঘাপটি মেরে আছে।

আর তখনই মনে হল ভাঙা পাঁচিলের পাশে বসে কেউ কি খাচ্ছে। নুটু! নুটুর চোখ দুটো টর্চের আলোতে চক চক করছে। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল—সেই দৈত্যটা, নিজে সব খাবে, কাউকে কিছু দেবে না।

বিজয়ের মাথা ঠিক ছিল না। অন্ধকারেই দৌড়াল।

নুটু দৌড়োচ্ছে।

দু জনই বেশ এখন দৌড়বাজ হয়ে গেছে।

এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শীতের মাঠে তারা হারিয়ে গেল।

এখন কেবল কুয়াশা।

এই অসুস্থতার নাম কি আমি জানিনা।

এর নাম ব্যক্তি স্বাধীনতা কিনা জানিনা?

ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের জন্য কতটা দরকার?

আমার সামনে হাজার লক্ষ মানুষ ভূতের মতো নেত্য করছিল। আমি বুঝতে পারছি—পৃথিবীর গরীব মানুষের ওটা একটা ভুখা মিছিল।

আমার কাছে নুটুর জীবন ভীষণ রহস্যময় মনে হয়েছিল। ঠিক কুয়াশায় পথ হাঁটলে যেমন হয়। কোনটা ঠিক কোনা বেঠিক বুঝতে পারছি না।

নুটু কি শেষ পর্যন্ত পালাতে পেরেছে?

বিজয় কি শেষ পর্যন্ত নুটুর নাগাল পেয়েছে?

এরা কি কেউ কখনও সত্যিকারের নাগাল পায়?

জানালায় আমি একা। শীত করছিল।

একটি তালপাতার টুপি পরে এখন বোধ হয় পাঁচিলের ওপর দিয়ে নুটু দৌড়াচ্ছে। আর পাশে পাশে বিজয়। বিজয়ের জামা কাপড় খুলে পড়েছে সব। গায়ের লোম শক্ত হয়ে গেছে। সে উলঙ্গ। বিজয়কে একটা বন্য রাক্ষসের মতো লাগছিল।

তারপরই বড় রাস্তায় চিৎকার কোলাহল। কোনো দুর্ঘটনা। লোকজন ছুটে যাচ্ছে। সেই ভুতুড়ে আকাশের নিচে কোনো অন্ধকার নেই। নিয়নের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেল একটা তালপাতার টুপি। বাসের তলায় থেতলে গেছে। দুঃখী মানুষের এক জ্যান্ত ফসিল হয়ে গেছে নুটু। ভিড় বাড়ছে। মানুষেরা ছুটোছুটি লাগিয়েছে। বিজয় দেখছিল উবু হয়ে। যেন এক ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। অথবা কোনো পাথরে খোদাই দুর্ভাগা ভূমিহীন মানুষের মুখ। হাতের মুঠিতে সামান্য রুটি গুড়। ভুতুড়ে আকাশের নিচে সে উঁচু করে ধরে রেখেছে। রুটি গুড় চুরি করে কে পালাচ্ছিল। বাসের চাকা ওর হাতের মুঠো বিনষ্ট করতে পারেনি। অবিকল, সেই শক্ত মুঠিতে কথাবার্তা ফুটে উঠেছে। সামান্য রুটি গুড়ের জন্য আপনারা বাবুরা এমন করেন!

চুপি চুপি ফিরে আসছিলাম। আততায়ীকে আমি চিনি। অথচ আঙুল তুলে স্পষ্ট চিহ্নিত করার সাহস আমার নেই! গভীর নিশীথে কোনো দিন জেগে যাই—ভেতরে কে যেন তড়া করে, অথবা যেন কেউ ডাকে, বাবু আমি। আমাকে দেখুন। ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীর। সরে যাই জানালা থেকে। শুনতে পাই তখন উদাসীন মাঠে কে যেন বেহালা বাজায়।
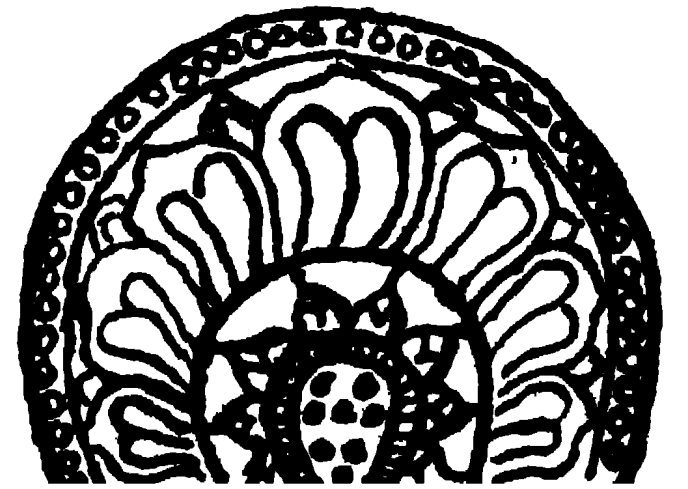
কৃষি সংবাদ

বেশী ফলন পেতে অধিক ফলনশীল ধান রোয়ার সময় কি করবেন ?

১। রোয়ার জন্য নীরোগ, সতেজ ও সবল চারা ব্যবহার করুন।

২। প্রয়োজনবোধে যৌথ বীজতলা থেকে চারা যোগাড় করুন।

৩। সবটা ফসফেট ও পটাশ সার এবং মোট নাইট্রোজেন সারের ভাগ জমি কাদা করার সময়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

৪। রোয়ার আগে কাদান জমি মই দিয়ে ভালভাবে সমান করুন। যাতে সমস্ত জমিতে জল সমানভাবে দাঁড়ায়।

৫। চারার ৪-৫টি পাতা হলে রোয়ার উপযুক্ত হয়। জলদি জাতের বেলায় তিন সপ্তাহ, মাঝারি জাতের বেলায় চার সপ্তাহ এবং নাবি জাতের বেলায় পাঁচ সপ্তাহের চারা রোয়া চলে।

৬। আট ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে ৪—৬ ইঞ্চি অন্তর ২—৩টি চারা লাগান। এন-সি ১২৮১ এবং ৪-সি ১৩৯৩ নাবি জাতে ৯ × ৯ ইঞ্চি দূরত্বে ৩— ৪টি চারা লাগান।

৭। চারা আলগাভাবে রুইবেন। দুই ইঞ্চির বেশী গভীরে চারা রুইবেন না।

রোয়ার ৮-১০ দিন বাদে ক্ষেত ঘুরে দেখে মরা চারার জায়গায় নতুন চারা বসিয়ে দিন।

বিশদ জানতে আপনার এলাকায় গ্রামসেবক বা কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের (এ-ই-ও) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

ঝাপান উৎসবে বিষ্ণুপুর

প্রশান্তকুমার রায়

গাইডকে সঙ্গে নিয়ে গড়দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। কত প্রাচীন অথচ কী বিশাল দৃষ্টি। মুসলমান স্থাপত্যের শিল্প নৈপুণ্য এখানে নেই। পোড়া মাটির নিদর্শনও নেই। এই স্বপ্নময়ী বিষ্ণুপুরের প্রধান দরজার সামনে দাঁড়ালে মনটাকে কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর কোন একটি বিশেষ যুগে। গাইড বললেন আসুন, আমার হাত ধরেই আসুন ঐ গড়দরজার মাথায়, দাঁড়িয়ে শুধু দেখবেন, চোখ মেলে দেখবেন, সারা বিষ্ণুপুর শহরকে; বিষ্ণুপুরের মন্দির-গুলির চূড়ো, দেখবেন রাজপ্রাসাদের কার্ণিশগুলিকে।

"মনে করুন, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমনই এক শ্রাবণ সংক্রান্তির প্রদোষ কালের পূর্ব মুহূর্তে বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদে এসেছেন ঝাপান উৎসব দেখতে। আপনার পাশেই দ্বাররক্ষী। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে ধুলো উড়িয়ে রাজা বীর হাম্বির আসছেন পার্শ্ববর্তী সীমান্ত রাজ্যের দুর্বল দস্যু সর্দারদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। দ্বাররক্ষী তা দেখে সংকেত দিতে থাকে। নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে গাইড গাইতে শুরু করলেন—

"গজপৃষ্ঠে ধাঙ ধাঙ বাজে জোড়া দামা
সাজিল ভূপতি রায় মাল্লদ্যার মামা।
আগে চলে বার ঘণ্টা পতাকা নিশান
ছাব্বিশ হাজার ঘোড়া চলে কানে কান।
সাজিল প্রধান ঢালি বুড়া কুম্ভকার
মত্ত ধানুকি কালসার।"

গানটি যদিও রণাঙ্গনে যাবার মুহূর্তের গান তবুও তাৎপর্য আছে। কারণ যে যে ভাবে গিয়েছিল সে সে ভাবেই ফিরেছে।

রাজ্যে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বীর হাম্বিরের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হল। সেনাপতি ঘোষণা করলেন সমবেত সকলের সামনে, "বিষ্ণুপুরের মহান রাজা বীর হাম্বিরের সম্মান রক্ষার্থে আজ শ্রাবণ সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে আগের বছরের ন্যায় এবছরেও মা-খল উৎসব উপলক্ষ্যে দেবী মা মনসার বন্দনা স্বরূপ বিষ্ণুপুরের লোক-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান নিদর্শন ঝাপান উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপন আপন দলের সাপগুলিকে খেলা দেখিয়ে প্রতিটি দল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন এবং আমাদের মহান রাজা কর্তৃক প্রদত্ত বিজয়ীর বরমাল্য গ্রহণ করবেন।"

নেমে এলাম ছাদ থেকে। রাজবাড়ীতে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। বাহিরে বারান্দায়, ছাদে, সব জায়গাতেই লোকের ভীড়। কখন ঝাপান দল আসবে। গরুর গাড়ীতে চেপে মাথায় সিঁদুরের বড় টিপ দিয়ে অল্প বয়সী এবং প্রৌঢ় দুজনকে দেখা গেল। ওদের সঙ্গে আসছে ঢাক, ঢোল ইত্যাদি। দেখে মনে হল বাগদী কিংবা কেওড়া জাতের লোক। সকলেই যেন ভাবে বিভোর। অল্পবয়সী যে জন হাতে ডমরু নিয়ে নিজের মনেই গান গেয়ে চলেছে, চোখের কোনে দুফোঁটা জল দেখলেও অতিরঞ্জিত করা হয় না, ওর নাম লক্কা। বয়স ত্রিশের মধ্যেই হবে। লক্কার বিয়েও হয়েছে অনেক দিন। রাত থাকতে জাল হাতে মাছ ধরা, দিনের বেলায় ঘর সংসার দেখা আর রাতের বেলায় বাগদীপাড়ায় গিয়ে আর পাঁচটা ছেলে ছোকরাদের নিয়ে হৈহুল্লোড় করা, তাড়ি খাওয়া ইত্যাদি চলে। এরা যে যাই করুক না কেন শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে রাজবাড়ীতে ঝাপান উৎসব উপলক্ষে সাপ খেলা দেখানোর সময়ে কিন্তু ওরা সবাই মা মনসার পরম ভক্ত হয়ে যায়। লক্কা আপন মনে গান গেয়ে চলেছে বেহুলা লখিন্দরের জীবন কাহিনী। সাপের কামড়ে মৃত লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা চলেছে স্বর্গে, ভেলায় চেপে। কাহিনী অতি প্রাচীন, সকলেরই জানা কিন্তু লক্কাতো গাইয়ে নয় যে ওর গলায় এত করুণ রসের সঞ্চার হবে। ওদের গরুর গাড়ী তখন লালমাটির রাস্তা দিয়ে একপা একপা করে এগিয়ে চলেছে অজস্র ভীড় ঠেলে। আর লক্কার করুণ সুর দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে:—

"ওরে-ও-নিঠুর-কালিয়া-য়া-য়া,
মনসাকে তোরা দেখিলিনা।
ভাইরে-রে, বাসরেতে খেলি পতি
পুহাইলো সারা রাতি
এই কি ছিল রে মনের বাসনা-য়া।
আ-আমায় কেন খেলি না।
ওরে-ও-নিঠুর কালিয়া-য়া-য়া,
মনসাকে তোরা দেখিলি না।।"

দেখতে দেখতে আর একদল, তারপর আর একদল এসে উপস্থিত। ভীড়ও রীতিমত পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল। এবার গরুর গাড়ীগুলি একে একে দাঁড়ালো। সাপ খেলা দেখানো হবে। সাপের ঝাঁপির ঝুপড়ি খুলে জ্যান্ত সাপগুলিকে যে বার করছে, তার নাম হারান। হরগ যাত্রির কোঠায়। ঝুপড়ি খুলে সাপগুলিকে বার করে হারান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। তারপর দু-একবার সাপের মাথায় টোকা মারতেই ওদের ফোঁস ফোঁসানি শুরু হয়ে যায়। উত্তেজিত হারান সাপটির

মুখ ফাঁক করে হাতের চেটোয় ধরিয়ে দেয়। বিষাক্ত সাপটি তখনই কামড়ে ধরে। দর দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ে চেটো থেকে। হারানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঝুপড়ি থেকে তারপর আরো দুটি সাপ বার করল হারান। তারমধ্যে একটিকে হাতের চেটোয় আর অপরটি নিজের জীব বার করে তাতেই কামড়াতে ধরিয়ে দেয়। জীব কামড়ে সাপটি রীতিমত ঝুলতে থাকে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সকলেই যখন চোখ নামিয়ে নিয়েছে হারান তখন দিব্বি মেজাজে খেলা দেখাচ্ছে। নজর পড়ল যখন ও দেখলো নিজের কাপড় চোপড় রক্ত মাখা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য যখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আমি তখন লক্ষ্য করলাম অপর এক বৃদ্ধকে। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে ও। একটা পেতলের ঘটির বাইরে মুখগুজে ও মন্ত্র পড়ছিল। যাই হোক হারানের ঐ অবস্থা দেখে বৃদ্ধ ঘটির জল হারানের মুখে, হাতে স্পর্শ করিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়া বন্ধ।

হারানের খেলা দেখানো শেষ হতে না হতে এলো একটি মেয়ে। এই খেলাগুলি কিন্তু গরুর গাড়ীর ওপরেই দেখানো হচ্ছে। এবার যে মেয়েটি খেলা দেখাতে এসেছে ও হারানেরই মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। বাপ বললে, ওরে ও লক্ষ্মী, বার করতো মনসাটাকে, ওর আবার বড় তেজ। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী বার করলো ঝুপড়ি ফাঁক করে একটি জাত কেউটেকে। রাগে গজরাতে গজরাতে অভিমানী তেড়ে আসে। লক্ষ্মী ভয় পেলে হবে কি—ওর ধারণা যে মন্ত্রপুত: এ শরীরে সাপের বিষ লাগবেই না। খেলা দেখানোর সাথে সাথে লক্ষ্মী গান গাইতে শুরু করে:

"বিষ—বান্দা—অমৃতকুণ্ডের বিষ
জল সারে বাট।
মহাদেবের আজ্ঞায় বিষ
কুণ্ডলী দিয়ে থাক।।"

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না, যুক্তি বা তর্কের আশ্রয় নিলে একে শ্রেফ বুজরুগি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না অর্থচ এই শ্রেণীর লোক যেমন বাগদী, মেটে, কেওড়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো চূড়ান্ত বিশ্বাস সাপের কামড়ে আর ডাক্তার বদ্যির দরকার নেই, শ্রেফ মন্ত্র পড়লেই এর বিষ কাটানো যায়। আর তার জন্যই ঝাপানের আয়োজন। কে কত বড় গুণীন এখানেই দেখা যাবে। সঙ্গীরা একসময় আলাপ করিয়ে দিলেন ঐতিহাসিক, বিদ্যোৎসাহী এক শিক্ষকের সঙ্গে। নাম মাণিক লাল সিংহ। বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে।

উনিই জানালেন, ঝাপান দক্ষিণ রাঢ়ের মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর উৎসব। মৎস্যজীবীগোষ্ঠী বলতে যেমন ধরুন, বাগদি, মেটে, খয়ড়া, লায়েক ইত্যাদি জাতি। বহুপূর্বে এই গোষ্ঠীর লোকেরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করত। তারপর জীবিকার সন্ধানে এরা ক্রমশ বাংলাদেশের দিকে এগুতে থাকে। কাঁসাই নদীর দুই তীর সিজুয়া আর মাজুরিয়া গ্রামে এরা বসতি স্থাপন করে। তারপর ক্রমশ ব্যবসা বৃদ্ধির ফলে নতুন করে জীবিকার সন্ধানে এদের মধ্যে অনেকে দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে, এমনকি অজয় ও দামোদর নদীর ধারেও বসতি স্থাপন করে।

মৎস্যব্যবসায়ে এইসব গোষ্ঠীর লোকেদের সর্পাঘাতজনিত মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটত। যেহেতু সর্পদেবী হলেন মা মনসা তাই ঝাপান উৎসবের মাধ্যমে মনসা বন্দনা মল্লভূমে বহুকাল প্রচলিত হয়ে আসছে। মহারাজা বীর হাম্বিরের রাজত্বকালেই এই ঝাপান উৎসবের সূচনা।

স্থানীয় কয়েকটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওরা বললে, এ উৎসবের আর কোন জৌলুসই নেই। বিষদাঁত ভেঙে এরা সাপ খেলা দেখাতে নিয়ে আসে। এমন কি সাপের ছোবল খেয়ে বিষক্ষয় করতে ওরা খেলা দেখাতে আসে। কিন্তু মাণিকবাবুর ধারণা অন্যরকম।

তিনি বললেন, দেখুন, যখন ডাক্তার বদ্যির প্রচলন ছিল না তখন লোকে তো এই সব গুণীন শ্রেণীর ওপরেই বিশ্বাস রাখত বেশী এবং এও দেখা গেছে যে লোকে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় নিরাময়ও হয়েছে আশাতীতভাবে। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন এইসব মন্ত্র পড়া, মন্ত্রচালনার একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ঠাকুরদাদার মুখেই শুনেছি একবার এই বিষ্ণুপুরেই থানার মধ্যে একটি বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। সাপটিকে ধরার জন্য যখন গুণীনকে নিয়ে আসা হয় তখন সেই গুণীন মন্ত্র পড়ে অনায়াসেই সাপটিকে ঝুপড়িতে পুরে রাখল। তখন থানার দারোগাবাবু গুণীনটিকে সাপ খেলা দেখানোর জন্যে অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু সাপটিকে বার করার মুহূর্তেই সাপের ছোবলে মৃতবৎ হয়ে পড়ে সেই গুণীন। আমার ঠাকুরদাদা ঘটনাটি আদ্যপান্ত দেখেছিলেন। তাই তিনি মন্ত্রপড়ে আর খড়ের বিড়ে এনে তাকে জ্বালিয়ে মৃতের সপাশে ঘুরতে থাকেন। ক্ষতস্থানে প্রজ্বলিত বিঁড়েটিকে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে ও আরোগ্যলাভ করে।

'আচ্ছা, হঠাৎ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনেই বা এই ঝাপান উৎসব পালন করা হল কেন?'

মাণিকবাবু বললেন, "আমাদের মল্ল-ভূমে অধিকাংশ উৎসবই তিথি ধরে। আবার অনেকগুলি বিশেষ দিন ধরে। যেমন, শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে ঝাপান উৎসব, কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিনে কার্ত্তিক দেবতার পুজো, চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গাজন, মকর সংক্রান্তির দিনে মকরের পুজো ইত্যাদি। তবে এই চারিটি দেবদেবীর আরাধনার পেছনে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন এইসব দেবদেবীর উপাসনার অর্থই হল জমির উর্বরতা এবং বংশবৃদ্ধি। দেখেননি, আমাদের দেশের বিবাহিতা মেয়েরা রাত্রে সাপের স্বপ্ন দেখলে বলে সন্তান হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং মল্লভূমে সর্পদেবীর অর্থাৎ মা মনসার পুজো মানেই হল বংশবৃদ্ধি এবং জমির উর্বরতা। ঝাপানের অর্থ চতুর্দোলা। চতুর্দোলায় চেপে গুণীনরা খেলা দেখাতে আসে। চতুর্দোলায় বসেই ওরা ঝুপড়ি ফাঁক করে সাপ বার করে।"

দলমাদল কামান আজ নিস্তব্ধ, শক্তির পূজারী বিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বিরের রাজত্ব এখন ঐতিহাসিক স্মৃতির ভগ্নস্তূপে বিরাজ করছে। কিন্তু তার সংস্কৃতি, তার উৎসব, তার গান, তার আচার বিচার, বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে ঝাপান উৎসব না দেখলে বোঝা যাবে না।

ঘর সাজানো ঃ অল্প খরচে

দুর্গা বসু

আজকের দিনে ঘর সাজানো বা ইন্‌টিরিওর ডেকরেশান যেন প্রত্যেক পরিবারে সামাজিকতার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে আর নিজের পরিবেশকে সাজানোর নেশা মানুষের স্মরণাতীত কাল থেকে। প্রমাণ প্রাগৈতিহাসিক শিলাচিত্র আর দেওয়াল অঙ্কন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো থেকে অজন্তা, ইলোরা সবই সেই একই সাক্ষ্য বহন করছে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারেও আজ চল হয়েছে ঘর সাজানোর। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে—এ সম্বন্ধে বাংলায় বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য বই পাওয়া যায় না। ইংরেজী যা দু'চার খানা মেলে, ভাষার অন্তরায় ছাড়াও তার বেশীর ভাগের দাম মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে। তাই অধিকাংশ বাঙালী পরিবারেই ইন্‌টিরিওর ডেকরেশান সম্বন্ধে একটা ভয় আছে যে ওটা হচ্ছে একটা বিরাট খরচের ব্যাপার, শুধু বড়-লোকদেরই ওতে এক্তিয়ার; যাঁরা মোটা ফি দিয়ে ডাকতে পারেন ইন্‌টিরিওর ডিজাইনারদের: কথায় কথায় বাতিল করতে পারেন বাড়ীর সমস্ত ফার্নিচার কিম্বা তাবৎ পর্দা-চাদর-সুজনী-ওয়াড়-কুশন-কার্পেট।

ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। ঘর সাজানোর সঙ্গে রুচির যতটা সম্পর্ক, খরচের সম্পর্ক তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। রুচির খাতিরে খুব কম খরচেই তারিফ করার মত করে ঘর সাজানো চলে। খরচ আরো কমবে যদি সেই ঘর সাজানোয় পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ না করে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে বেছে নেওয়া যায়। যেমন সোফাসেটের বদলে জলচৌকি, পিঁড়ি, ডানলোপিলো কুশনের বদলে তুলোর কাজ করা তাকিয়া, কার্পেটের বদলে আলপনা আর 'রঙ্গোলীর' প্রয়োগ করে। এই শিল্পী সুলভ বৈচিত্র শুধু যে খরচ কমাবে তাই নয়, আপনার অতিথির মনেও চমক্ লাগাবে। খরচ আরো কমবে যদি এর কিছু কাজে নিজের হাত লাগান। প্রত্যেক পরিবারেই দেখা যায় কতকগুলো গুণের সমাবেশ। বড়দা ফটো তোলেন, ন'দা পারেন ছবি আঁকতে, সেজদি এব্রয়ডারীর ওস্তাদ, দিদিভাই-এর নেশা বাটিকের কাজ কিম্বা ফেব্রিক পেনটিং, ছোট খুকির আলপনা দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, মেজ কাকু পারেন কাগজের ফুল তৈরী বা অরিওগ্যামি, জেঠু কলেজে পড়তে ক্লে মডেলিংএ হাত পাকিয়েছিলেন —এমনি কত কি! কার্ডবোর্ডের মডেল তৈরী, পুতুল বানানো, পুঁথির কাজ, খই দিয়ে গাছ সাজানো, দেওয়ালে রঙ্গীন চকের নক্সা, বাগান করা, রঙ্গীন মাছের চাষ, নকসী-কাঁথা তৈরী, চামড়ার কাজ, বেতের কাজ এমন কি লেস বোনার বিদ্যাকেও সুন্দর ভাবে ঘর সাজানোর কাজে লাগানো যায় একটু মাথা খাটালেই। এতে খরচও কম হবে, সৃষ্টির আনন্দও পাবেন অসীম।

ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব রাখবেন না। আজকালকার ঘর, বিশেষ করে ফ্ল্যাটের ঘর সাইজে ছোট। বাড়তি ফার্নিচারের চাপে তা যে শুধু জবড়জঙ্গই দেখাবে তা নয়: আপাত দৃষ্টিতে আরো ছোট দেখাবে। মনে আসবে একটা দমবন্ধ করা চাপা ভাব। আলনা এমন একটা আসবাব যার মধ্যে কোন শ্রী আর শৃঙ্খলা আনা শক্ত। পর্দা বা ছোট আলমারী দিয়ে একে রাখুন দৃষ্টির আড়াল। এই আড়ালটুকু শ্রীমতীর কাপড় বদলানোরও কাজে লাগবে।

কাঠের মিস্ত্রি ডাকিয়ে সাবেকি আমলের খাট-পালঙ্ক, চেয়ার টেবিলের অলঙ্করণ বা মোটিকগুলো খুলিয়ে নিন বা সেগুন পাই দিয়ে ঢাকিয়ে নিন। চেহারা ছিমছাম হবে, ধুলো ময়লা জমবে কম, ঝাড়া মোছাও সহজ হবে। টার্নিং করা পায়ার অলঙ্করণ ঢাকা শক্ত। প্রয়োজন বোধ করলে পুরানো পায়া কাটিয়ে, আধুনিক 'ট্যাপারিং' পায়া লাগিয়ে নিন। লোহার (স্কোয়ার বার) চৌক পায়াও লাগাতে পারেন।

এবার পালিশ। ঘর সাজাতে হলে ঘরের সব আসবাবের মধ্যে একটা সমতা বা 'ম্যাচ' আনতে হবে। সেগুন কাঠের পালিশ করা টেবিলের সঙ্গে বেতের বা পলিয়েষ্টারিন চেয়ার বেমানান। পলিয়েষ্টারিন চেয়ার থাকলে টেবিলের ওপরটা সেই রংএর ল্যামিনেট প্লাষ্টিক (যেমন ফরমাইকা বা সানমাইকা) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অর্থাৎ শুধু ডিজাইনের সমতা নয়, রং বা পালিশেরও সমতা আনতে হবে। যদি তেল রংএর স্কীম করতে চান—একই শেড ও ব্র্যাণ্ডের সিনথেটিক এনামেল ব্যবহার করুন। যদি চান পালিশ করতে, নজর রাখতে হবে পালিশের রং আর গাঢ়ত্বের ওপর।

কেবল সুষ্ঠু রং-এর নির্বাচনেই ঘরের ভোল একেবারে পাল্টে দেওয়া সম্ভব। কোন রং-এর সঙ্গে কোন রং মানাবে তার একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। ঘরে কতটা আলো কোন দিক দিয়ে

আসে তার উপরেও খানিকটা নির্ভর করে রং-এর নির্বাচন। এছাড়া শোবার ঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর বা পড়ার ঘর—ঘরের ব্যবহার হিসাবেও রং-এর অদল বদল হয়। এক একটা রং যেমন নীল শুধু ছায়াতে ব্যবহার করা চলে। সরাসরি রোদ পড়লে এ রং জ্বলে বিবর্ণ হয়ে যাবে। সবদিক বিচার করে রং নির্বাচন করলে তবেই তার যাদুকরী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রামধনুর তাবৎ রংকে দুভাগে ভাগ করা যায়—চড়া রং (যেমন লাল, হলদে, কমলা, গাঢ় গোলাপী) আর ঠাণ্ডা রং (যেমন নীল, সবুজ, মভ, ফ্যাকাশে গোলাপী)। এছাড়া আর এক ভাবেও ভাগ করা যায়, 'শেড' হিসাবে। যে কোন রং এর ফিকে বা গাঢ় শেড হতে পারে।

(ক) চড়া রং মনে স্ফূর্তি আনে। লাল রং মানুষের কর্ম স্পৃহা বাড়ায়। হলদে প্রাণে আনে খুশীর জোয়ার। কমলা রং উদ্দীপক। এদের বলা চলে 'কাজের রং'।

(খ) ঠাণ্ডা রং মানুষকে শান্ত ও সজীব করে। নীল আর কচিকলাপাতা রং শ্রান্ত মনকে সজীব করে তোলে। আকাশী রং বা মুক্তোর রং প্রশান্তি আনে। গাঢ় সবুজ বা গাঢ় নীল ঘুমের সহায়ক। এদের বলা চলে 'বিশ্রামের রং'।

(গ) গাঢ় শেডে ঘর ছোট দেখায়। পুরানো আমলের প্রকাণ্ড ঘর বা খুব উঁচু ছাদ থাকলে—দূরের দেওয়ালে বা সিলিংএ গাঢ় রং ব্যবহার করা হয়—ঘর আনুপাতিক ভাবে ছোট দেখাতে।

(ঘ) ফিকে শেডে ঘর বড় দেখায়। ফ্ল্যাটের ছোট ঘরে ফিকে শেড ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

এছাড়া হলুদ, সাদা, গোলাপী প্রভৃতি রং ব্যবহার করলে ঘরে আলো বেড়ে যায়। অন্ধকার ঘর যেখানে সূর্যের আলো বিশেষ ঢুকতে পায় না বা কড়িডোর কিম্বা সিঁড়ি যেখানে আলোর অপ্রতুলতায় দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব সেখানে এই সব রং দেওয়া উচিত।

আলোচনা শেষ করার আগে ঘর সাজানোর দুটি স্কীম দেব। বসার ও শোবার ঘরের জন্য। নিজের প্রয়োজন মত ঈষৎ অদল বদল করে ঘর সাজাতে লেগে যান। শেষ হলে দেখবেন খরচ হয়েছে অল্প কিন্তু লোকে তারিফ করছে বহুৎ।

বসবার ঘর :

বসবার ব্যবস্থা সোফাতেই হোক বা ফরাসেই হোক—পেছনদিকের দেওয়ালটি (এই দেওয়ালে জানালা না থাকাই বাঞ্ছনীয়) এবং সিলিং (সিলিং এ ফ্যান থাকলে সেটিকে একই রং করবেন) হালকা গেরুয়া রং করুন। বাকি তিনটি দেওয়াল থাকবে সাদা। পর্দা, কুশন, তাকিয়া, সোফা বা ফরাসের কাপড় বাদামী রং হোক। তাতে বা প্রিন্ট সুতোর কাজ থাকলে তা সাদা ও ব্রাউন মেশানো হওয়া উচিত। পেলমেট ও ফার্নিচারের কাঠের অংশগুলি হবে পালিশ করা 'ট্যান', 'ব্রাউন' বা চকোলেট রং এর। গেরুয়া দেওয়ালের উপর একটি বড় (২ ফুট × ৪ ফুট) সাইজের পেন্টিং থাকবে সাদা ফ্রেমে। লক্ষ্য করে কিনবেন বা আঁকাবেন পেন্টিংটি যাতে খয়েরী ও সবুজ রং-এর আধিক্য থাকে। অল্প হলদে ও লাল রংও থাকতে পারে। পেন্টিং এর বদলে যদি ফটোগ্রাফ টাঙাতে চান, বেছে নিন তিন চার খানা ল্যাণ্ডস্কেপ কোন বিলিতী দামী পুরোনো বড় ক্যালেণ্ডার থেকে। গেরুয়া দেওয়ালে টাঙাবেন সরু সাদা ফ্রেমে বাঁধিয়ে।

ফরাস থাকলে, যাতে দেওয়ালে মাথার তেল না লাগে, আড়াই ফুট চওড়া করে শীতল পাটি বা মাদুর কেটে আড়ি ভাবে দেওয়ালে আটকে দিন পাতলা কাঠের বিড দিয়ে চেপে। ইচ্ছে করলে গেরুয়া রংএর বদলে পুরো দেওয়াল জুড়ে শীতল পাটির প্যানেল লাগিয়ে, সুতো দিয়ে তা থেকে ঝুলিয়ে দিন হরেক রকম পুতুল। এক্ষেত্রে দুপাশের দেওয়াল গেরুয়া রং করতে পারেন। সামনের দেওয়াল আর সিলিং থাকবে সাদা। দরজা ও জানালা সাদা হওয়া উচিত। গ্রীল গেরুয়া। কার্পেট যদি পাতেন তার রং হবে গাঢ় কালচে লাল। ঘরের এক কোণে একটি সাদা নক্সা আঁকা ব্রাউন টবে লাগান লতানো মানি প্ল্যান্ট। বাজী রেখে বলতে পারি অতিথিদের তারিফে আপনার মন ভরে উঠবেই।

শোবার ঘর :

খাটের যেদিকে মাথা (এই দেওয়ালে জানালা না থাকাই বাঞ্ছনীয়) সেই দেওয়াল ও সিলিং করুন মাঝারী শেডের নীল। বাকি তিনটি দেওয়াল খুব ফিকে নীল। ঘরের আসবাব যদি রং করা হয় তবে তাও করুন নীল-মাঝারী শেডে। আর পালিশ করা হলে, মিস্ত্রিকে বলুন—যতটা সম্ভব সাদা করে পালিশ করতে। পর্দা, বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকা, ড্রেসিং টেবিলের কভার, গালচে ও টেবিল ল্যাম্পের শেড হবে গাঢ় নীল। মাথার দেওয়ালে ঝোলানো থাকবে একটা পেন্টিং যাতে নীল, সবুজ আর কালো রং-এর আধিক্য। জ্যোৎস্না রাতের ল্যাণ্ডস্কেপ পাওয়া যায় কিনতে। তাই লাগান, রং-এর সামঞ্জস্য আপনি হয়ে যাবে। ফ্রেম অবশ্যই সরু ও সাদা। ফটোগ্রাফ টাঙাতে হলে রঙীন সমুদ্রের দৃশ্য বা সী-স্কেপ টাঙান। ঘরের এক কোনে নীল চাদরে ঢাকা ট্যাণ্ডে একটা সাদা মার্বেলের ষ্ট্যাচু রাখুন। এ ঘরে দু দণ্ড কাটালে মন শান্ত ও সজীব হয়ে উঠবে। ঘরের মানুষটি দেখবেন ঘর ছেড়ে বেরুতেই চাইছেন না।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

খাদ্যের অপ্রচলিত উৎস সন্ধানে

নিশীথ চৌধুরী
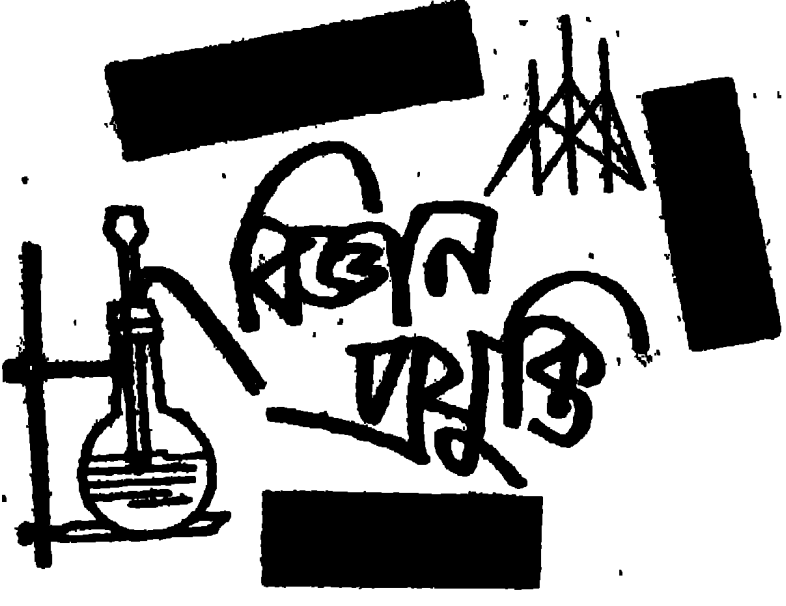
অসুখ সারানো কঠিন কাজ না খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো সহজ? অতি সহজে এই রকম একটা প্রশ্নের উত্তর নাও পেতে পারি, কিন্তু বাস্তব বলে যে—ক্ষুধিতের সংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে তাদের অন্নদান করা অনেক দুরূহ। ভেষজ শিল্পের উন্নতি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রগতির হাওয়া পালে লাগিয়ে আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়ে চলেছে, মৃত্যুর হারকে বিপুল বিক্রমে হারিয়ে দিয়ে। বিশ্বের চারশ কোটি লোক সংখ্যা দু হাজার খৃষ্টাব্দে সাতশ কোটিতে দাঁড়াবে বলে অনেকেই মনে করেন।

খাদ্য উৎপাদন ও ক্ষুধার্তের সংখ্যার মধ্যে ফারাক বিস্তর। বিশেষ করে খাদ্যের আমিষ জাতীয় উপাদান (প্রোটিন)-এর অভাব সারা পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি বিষয়ক সংস্থা (FAO)-র বিবরণীতে জানা যায় যে সাধারণভাবে একজন সুস্থ স্বাভাবিক সক্ষম ব্যক্তির দৈনিক আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হলো ৪১ গ্রাম। অদূর ভবিষ্যতে বর্ধিত জন-সংখ্যার জন্য প্রোটিনের সঙ্কুলান করতে হলে গড়ে প্রতিবছর ৩৫ মিলিয়ান মেট্রিক টন আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু খুব বেশী করেও বছরে মাত্র ১৫ মিলিয়ান মেট্রিক টন প্রোটিন খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব। এখনই পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক মানুষই প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগছেন। ২০০০ খৃষ্টাব্দে আমিষ খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি না পেলে বিশ্ব-অপুষ্টির মাত্রাটা কোথায় পৌঁছাবে তা অনুমান করা শক্ত নয়। তাই অপ্রচলিত উৎস থেকে আমিষ জাতীয় খাবার তৈরীর চেষ্টা সব দেশেই চলেছে।

আমাদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে প্রাণীজগত এবং উদ্ভিদ জগৎ। সাধারণত প্রোটিন অণুর কাঠামোতে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন প্রভৃতি মৌল থাকতেই হবে, উপরন্তু সালফার, ফসফরাস প্রভৃতিও থাকতে পারে। আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে একান্তভাবে দরকার হয় আটটি অ্যামাইনো এসিডের। এই সব উপাদান হল নাইট্রোজেনের জটিল যৌগ বিশেষ। মানব দেহ এদের তৈরী করে নিতে পারে না, তাই নির্ভর করতে হয় অন্যের সরবরাহের উপর। প্রাণীজ প্রোটিন আবার সেই দিক দিয়ে বেশী উপযোগী, কেন না উদ্ভিদ প্রোটিনের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিডগুলোর সব কটা পরিমাণ মতো থাকে না। ডিম, দুধ বা মাংসের মধ্যে লাইসিন, মেথিওনাইন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো থাকে যথেষ্ট পরিমাণে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং কিছু শীতপ্রধান রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সব দেশের প্রধানত উদ্ভিদ প্রোটিনই প্রধান ভরসা। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা উনসত্তর ভাগ প্রোটিন যোগায় গৃহপালিত গবাদি পশুপাখীরা। গরম আবহাওয়ার গরীব দেশগুলোতে সেখানে সত্তর শতাংশ প্রোটিন সংগৃহীত হয় উদ্ভিদ জগৎ থেকে। দু ধরনের প্রোটিন সরবরাহের শতাংশ মাত্রাগুলো কাছাকাছি হলেও গুণগত উৎকর্ষে তাদের পার্থক্য আছে অনেক। শরীর ঠিক মতো বেড়ে উঠতে লাইসিনের প্রয়োজন অত্যধিক। ডিমের মধ্যে লাইসিনের মাত্রাকে ১০০ ধরলে ধানের ভিতর এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ, গমের মধ্যে ৪৪ শতাংশ, ভুট্টাতে থাকে ৩৮ শতাংশ। অবশ্য সোয়াবীনের মধ্যে লাইসিন থাকে ডিমের তুলনায় ১১১ শতাংশ। কিন্তু মেথিওনাইনের পরিমাণে ঘাটতি দেখা যায় সোয়াবীনে। সোয়াবীনের সংগে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী মিশিয়ে প্রোটিনের চাহিদা মেটানো চলে।

প্রাণী জগতের প্রোটিন সরবরাহের মূল ভাণ্ডার হলো উদ্ভিদ জগৎ। উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড, মাটির রস, নাইট্রোজেন প্রভৃতিকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। এই উদ্ভিজ প্রোটিন ভক্ষণ করে যে সব প্রাণী বাঁচে তাদের আবার মাংসাশী জীব আহার করে 'প্রোটিন'-ক্ষুধা মেটায়। হিসেব থেকে দেখা যাবে যে এক কিলোগ্রাম গৃহপালিত গবাদি পশুর মাংস আহরণ করতে হলে পশুখাদ্যে প্রায় চার কিলোগ্রাম উদ্ভিজ প্রোটিনের দরকার হয়।

সারা বিশ্বে কৃষির উপযোগী জমি মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। শতকরা ২২ ভাগ জমি কাজে লাগে গোচারণ ক্ষেত্ররূপে আর ৩০ শতাংশ মতো স্থান বনানী পরিবৃত হয়ে আছে। বাকী ৩৭ শতাংশ প্রায় জমি হয় খুব শুষ্ক আর নয়তো উঁচু জায়গায় তুষার মণ্ডিত হয়ে আছে। কর্ষণযোগ্য জমি এবং গোচারণ ক্ষেত্র এমন পর্যায়ে এসেছে যে তার থেকে বেশী সুবিধে পাওয়া যাবে না, আবার অকৃষি জমিকে কর্ষণযোগ্য করে তুলতেও আয়ত্তের বাইরে খরচ পড়ে যাবে।

সুতরাং গৃহপালিত গবাদি পশুর খাদ্যের এবং মানবকুলের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা কি করে মেটানো যায়—তার উপায় খুঁজতে গিয়ে অপ্রচলিত উৎস থেকে আমিষ খাবার আহরণের চেষ্টা চলেছে সারা জগৎ জুড়ে।

একাধিক অ্যামাইনো এসিড অণুযুক্ত হয়ে জটিল প্রোটিন অণু গঠন করে। এক এক ধরনের প্রোটিনের ধর্ম নির্ভর করে থাকে তাদের উপাদান অ্যামাইনো এসিডে এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগের রীতি প্রকৃতির উপর। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের প্রয়োজন মেটাতে আমরা প্রাণীজ প্রোটিন আহরণ করি। এই সব জটিল প্রোটিন অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার এক বিশেষ পদ্ধতি--আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে ভেঙে যায়। তৈরী হয় অ্যামাইনো এসিডের ছোট ছোট অণু। পালাক্রমে এগুলোই আবার দরকার মতো একত্রিত হয়, শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন সৃষ্টি করে এবং পুরানোর জায়গায় নতুন জীবকোষ তৈরী করতে সাহায্য করে।

কলেরা, টাইফয়েড বা পেটের ব্যামো হলে আমরা এক কথায় অতি ক্ষুদ্র বীজানুদের দায়ী করি, খাবার শেষে পাতের উপাদেয় দই তাও জমে এক রকম বীজানুর সাহায্যেই। জমির উর্ব্বরতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে বিভিন্ন বীজানুকুল। বীজানুরা খুবই ছোট আকারের, এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের একভাগ মতো হয়ে থাকে। এক ধরনের বীজানু আছে যারা সেলুলোজ থেকে কার্বণ সংগ্রহ করে নিজেদের দল বাড়ায় আর প্রোটিন উৎপাদন করে চলে। ঈষ্ট, ছত্রাক প্রভৃতি এককোষী ও বিশেষ অবস্থায় অ্যামাইনো এসিড, ভিটামিন তৈরীর সাথে সাথেই বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। আবার বিশেষ বিশেষ প্রকারের এক কোষী সজীব বস্তু খনিজ তেলের অণুর বিশ্লেষণ থেকে অঙ্গার সংগ্রহ করেও প্রোটিন সংশেষণ করে থাকে। এই সব 'এক কোষী প্রোটিন' (Single Cell Protein) সেলুলোজ অথবা খনিজ তেলের মাধ্যম থেকে 'সেন্ট্রিফিউজ' করে সংগ্রহ করা হয়। তখন এগুলো থেকে পশুখাদ্য অথবা মানুষের খাবারের প্রোটিন-চাহিদা পূরণ হতে পারে।

গাছপালার অন্তর্গঠনে উদ্ভিদ কোষের রাজ্য, তার সীমানা প্রাচীর গড়ে তোলে সেলুলোজ। সেলুলোজ হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ জটিল যৌগ বিশেষ। এর দ্রবণের থেকে ঈষ্ট অথবা উপযুক্ত এক কোষী জীব বিশেষ বিশেষ উৎসেচক (Enzyme) সৃষ্টি করে, বিক্রিয়ার ফলে সেলুলোজ অণু ভেঙে যায়। শর্করা জাতীয় পদার্থ হয় তার ফলশ্রুতি। ঈষ্ট বা ঐ ধরনের এক কোষী জীব শর্করা খাদ্যের মধ্যে খুব সহজেই বংশবৃদ্ধি ঘটায়। পরিমাণ মতো নির্মল বাতাস চালনা করলে এখান থেকে নাইট্রোজেন, পটাশ প্রভৃতি সারের উপস্থিতিতে সেলুলোজ দ্রবণ থেকে খুব সহজেই এক কোষী জীব কোষ তথা প্রোটিন জন্মাতে থাকে। এদের আলাদা করে, ধুয়ে শুকিয়ে নিলে একটা বাদামী রংয়ের গুঁড়ো পাওয়া যায় যার ভিতর প্রোটিন আছে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ। লাইসিন, মেথিওনাইন এর মতো অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিডের মাত্রা থাকে এর মধ্যে সোয়াবীনের চেয়ে বেশী।

এই প্রোটিনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সুগন্ধিদ্রব্য মিশিয়ে নানা রকমের খাবার বানানো হয়—চকোলেট, সুপ আর নয়তো আইসক্রীম, যা কিছু হতে পারে। গবাদি পশুখাদ্যে অথবা পোলট্রির খাবারের প্রোটিন সমৃদ্ধির জন্যও এর ব্যবহার আছে।

সেলুলোজ থেকে প্রোটিন তৈরী করবার পদ্ধতি এবং উপযুক্ত উৎসেচক (Enzyme) প্রস্তুত করবার কারিগরীতে ভারতবর্ষও এগিয়ে চলেছে। বোম্বাইয়ের Cotton Textile Research Institute 'পেনিসিলিয়াম ফ্যুনিকুলাম' থেকে উৎসেচক আহরণের গবেষণা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কৃষি গবেষণা পর্ষদ তত্ত্বাবধান এবং আর্থিক আনুকূল্য প্রসারিত করেছেন এই প্রকল্পে। এঁদের প্রচেষ্টায় কাঠের গুঁড়ো, আখের ছিবড়া; সুতোর পরিত্যক্ত অংশ বিশেষ, পাটকাঠির মণ্ড, অব্যবহৃত কাগজ, ভুষি প্রভৃতি সহজলভ্য জিনিসকে কাজে লাগিয়ে আমিষ উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাঠের গুঁড়ো থেকে আমিষ খাদ্য উৎপাদনের উপায় ঠিক করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ এক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থাও এবিষয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

অপ্রচলিত উৎস থেকে প্রোটিন তৈরীর অন্য এক পদ্ধতিতে খনিজ তেলের ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খনিজ তেল কাঁচা মাল হিসেবে কাজ করে, এই কাজ করায় আবার সেই বীজানুর দল। তৈল শোধনাগার, তৈলবাহী জলযান অথবা স্থলযান খালাসের মঞ্চ অথবা তৈল খনি অঞ্চলের আশপাশের মাটি থেকে বিশেষ ধরনের এক কোষী জীবের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা খনিজ তেলের থেকে কার্বন নিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ অ্যামাইনো এসিড, প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি তৈরী করতে পারে। এইসব এক কোষী প্রোটিনের থেকেও আমিষ খাদ্যের সরবরাহ বাড়ানো যায়।

প্রকৃতিতে যে খনিজ তেল পাওয়া যায় তা হ'ল পাঁচমেশালি এক জটিল জিনিস। প্রয়োজনীয় পেট্রল, কেরোসিন, মবিল তেল, গ্রীজ প্রভৃতি পাওয়া যায় এই খনিজ তেল থেকেই। তার জন্য অবশ্য অবিশুদ্ধ খনিজ তেলের বিশোধন দরকার, তা করা হয় 'তৈল-বিশোধন' কেন্দ্রে। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় খনিজ প্রাকৃতিক তেলের নানান উপাদান পাতিত করে আলাদা করে নেওয়া হয়। এই আংশিক পাতন প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে কেরোসিন এবং মবিল তেলের মাঝামাঝি অবস্থায় পাওয়া যায় 'গ্যাস অয়েল' (Gas Oil)।

গ্যাস অয়েল জলের সংগে মিশিয়ে রাখা থাকে একটা বিক্রিয়া কক্ষে। এই মিশ্রণকে খুব দ্রুত আলোড়িত করা

৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্রন্থ আলোচনা
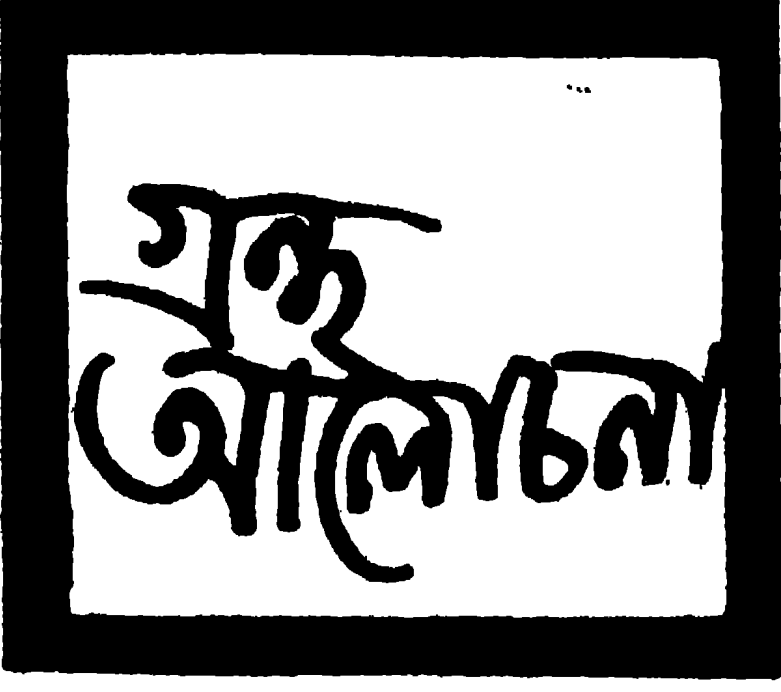
পঞ্চশর। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর। কলকাতা-১২ দাম : তিন টাকা।

পাঁচজন তরুণতর কবির মিলিত কণ্ঠস্বর 'পঞ্চশর'। কবিদের মধ্যে আছেন কমল চক্রবর্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, অরণি বসু ও শ্যামলকান্তি দাশ।

কমল চক্রবর্তীর মোট যে ন'টি কবিতা 'পঞ্চশরে' বেছে নেওয়া হয়েছে, বলাবাহুল্য, তার মূল সেই আদিবাসী পটভূমি, মানসিকতায় এক অন্যতর স্বাদ, পাঠকের মনে চকিত চমক আনে। শব্দচয়নে প্রতীকের ব্যবহারে কবির দূরন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস পাঠক লক্ষ্য করবেন, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্তপনার জন্য তার প্রকাশ হৃদয়কে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু ছন্দদোলায় এবং অন্যতর ভাব-ভাবনায় 'ভুলং' স্মরণীয়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িকপত্রে মোটামুটি পরিচিত নাম। তার একটি দীর্ঘ কবিতা 'সন্ধিসময়' বর্তমান সংকলনে সংগ্রথিত হয়েছে। আত্মমগ্নতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা 'সন্ধিসময়ের' কাব্যিক অবয়বে পাঠক আবিষ্কার করবেন।

বর্তমান সংকলনে মোট এগারোটি কবিতা আছে শংকর চক্রবর্তীর। ভাবনায় কবি অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ। কুয়াশার মধ্যে চোখ মেলেননি তিনি; রৌদ্রের সংসারে চোখের আলোয় অনুভব করেছেন জীবনকে, যন্ত্রণাকে। কবি বিষয় কিন্তু উল্লেখযোগ্য অস্থির নন।

পরবর্তী কবি অরণি বসু সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য 'মনের গূঢ় রহস্য উন্মোচনের গভীর সাধনায় ব্যাপৃত অরণি বসুর কবিতা এক স্বতন্ত্র ভাবনার অবকাশ আনে, তাঁর কবিতা সারল্যের আবরণে প্রকৃতই টেনে নিয়ে যায় অসীম গাঢ়তার দিকে' ইত্যাদি কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি বলেই মনে হতে পারে। সারল্যের আবরণ কি জিনিষ পাঠককে সেকথা ভেবে কিছুটা ভাবনায় পড়তে হয়। অরণি বসুর বাচনরীতি অনেকাংশে ঋজু, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোথাও কোথাও জড়তা লক্ষ্য করা যায়।

সর্বশেষ, শ্যামলকান্তি দাশ অপেক্ষাকৃত পরিচিত নাম। 'মেজাজে অদ্ভুত এলোমেলো, অগোছালো অথচ এলোপাথারি গ্রামীণ শব্দের নির্ভুল ব্যবহারে পারঙ্গম' শ্যামলকান্তি দাশ বর্তমান সংকলনে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিকে মাঝে মাঝে বেশ দৃঢ়বিশ্বস্ত মনে হয়েছে। শ্যামলকান্তির 'উত্তরাধিকার', 'উড়িয়ে দেবার বাসনা', 'জাগরণ', 'গাধা' ইত্যাদি অন্যতর ভাবনায় পাঠককে প্রভাবিত করে।

সুদূর মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত বর্তমান কাব্য সংকলন 'পঞ্চশর'-এর মুদ্রণ-পরিসজ্জা পরিচ্ছন্ন। তবে ছড়িয়ে থাকা কিঞ্চিৎ মুদ্রণপ্রমাদ পাঠকের ক্লান্তির কারণ হতে পারে। সংকলনের নাম 'পঞ্চশর' কেন, পাঁচ কবির কবিতার সংকলন বলেই নাকি। নামকরণ হিসেবে পঞ্চস্বর কি আরো অর্থবহ হতো না?

ইন্দ্রনীল সেন

নতুন গল্প। সুব্রত নিয়োগী, সমীর কান্তি বিশ্বাস। নতুন গল্প প্রকাশ, কলিকাতা-৭০০০২৭। এক টাকা

যাঁরা গল্প পড়তে চান, সংস্কৃতিসম্পন্ন তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুই গল্পকারের মোট চারটি গল্পের সংকলন। সুব্রত নিয়োগীর দুটি স্থলপদ্ম/হনন কাহিনী, সমীর কান্তি বিশ্বাস এর দুটি—ভয়/অন্যরকম কথামালা।

বলরাম বসাক ও সুধাংশুর মুখোপাধ্যায় নতুন আঙ্গিকে লিখিত লেখক পরিচিতি বর্ণনের রীতিটি গল্পগ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ। সুব্রত নিয়োগী সম্পর্কে বলরাম বসাকের মন্তব্য—শ্রী নিয়োগী নতুন গল্পলেখার জন্য কখনই বিদেশীয় বা বিজাতীয় নীতি গ্রহণ করেন নি।... তার মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের সংস্কার সুপ্তবীজের আকারে আছে। সেজন্যে গল্পকারের স্বতোৎসারিত আবেগ। নিজের মতন করে গুছিয়ে বলার কায়দা—গল্প দুটিকে বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছে।

উগ্র আধুনিকতার অবলম্বনই দুটি গল্পে পরিস্ফুট। দেহবাদের পুংখানুপুংখ বর্ণনা ও যৌনচেতনার অত্যাধুনিক প্রবণতা লেখক সযত্নে আয়ত্ত করেছেন। তবে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যা উল্লেখ্য—তাহ'ল গল্পের শেষে দার্শনিক দ্যোতনা, ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনদর্শনের অপূর্ব বিশ্লেষণ। এই জীবনদর্শন প্রকাশে বাক্‌সংযমের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারলে এ ধরণের গল্প প্রথমশ্রেণীর গল্পে রূপান্তরিত হতে পারে এ সত্য আশা করি গল্পকার শীঘ্র অনুধাবন করতে পারবেন।

সমীর কান্তির 'ভয়' গল্পের মানসিকতা মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং বিশ্লেষণ যথাযথ হলেও গল্পরস জমে ওঠেনি। ভয় গল্পে ভয়ের অনুভূতি বা ইমেজ গড়ে তোলার অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ছোট গল্পের আমেজ মাত্রাতিরিক্ত মনোবিশ্লেষণের চাপে জমে উঠতে পারেনি।

'অন্যরকম কথামালায়' সমীরকান্তি বিশ্বাস একটি বিশ্বাসযোগ্য অ্যাবসার্ড বিষয়বস্তু সংযোজন করে একটি গভীর জীবনবোধের বিশৃঙ্খল বাস্তব কাহিনী প্রতীকের মাধ্যমে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। লেখকের অনুভূতির আন্তরিকতা ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য গল্পটির দিকে খুব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষি

বন্যাপ্লাবিত এলাকায় চাষবাস

বরুণ মাইতি

নদী নালার দেশ পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলায় প্রতি বছর বন্যা প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। ফলে বেশ কিছু এলাকার ফসল বিশেষ করে আমন ধান নষ্ট হয়ে যায় বা চারার অভাবে এবং জমি চাষবাসের অনুকূল অবস্থায় না থাকায় শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞ-গণ কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। এর ফলে বন্যা প্লাবিত এলাকায় শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বন্যা দেখা যায় সাধারণত আষাঢ় থেকে আশ্বিন বা জুন মাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে।

(ক) যদি জুন বা জুলাই মাসে বন্যা আসে এবং জুলাই মাসের শেষাশেষি জল মাঠ থেকে নেমে যায় তবে পুনরায় চারা রোয়া যেতে পারে। বীজতলা চলতি নিয়মে অথবা অবস্থা বিশেষে ডেপগ পদ্ধতিতে করা যাবে। তবে আই-আর-২০, পুসা ২-২১, এন. সি ১২৮১, পলমন, সি এন এম ২৫, ওসি ১৩৯৩ জাতের ধানই বীজ হিসাবে নেওয়া ভালো।

(খ) আগষ্ট মাসে যদি বন্যা হয় বা. জুন-জুলাইয়ের বন্যার জল ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আগষ্ট মাসে শেষাশেষি জল নেমে যায় তবে বীজতলা অন্যস্থানে আগেই করে নিয়ে চারা রোয়া করতে হবে। এই সময়ে আই আর-২০, এন সি ১২৮১, ওসি ১৩৯৩ জাতের ধান বীজ হিসাবে উপযুক্ত।

অথবা যে জমির ধান বন্যায় নষ্ট হয়নি সে জমি থেকে ধানগাছের সবল পাশকাঠি (যদি বেশি থাকে) তুলে রোয়া যেতে পারে। এই নিয়মে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোয়া সম্ভব।

(গ) যদি সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা আসে তবে জগন্নাথ, সি আ'র ১০১৪, এন সি ১২৮১, ও সি ১৩৯৩ জাতের ধানের বেশি দিনের চারা (৬০-৮০ দিনের) রোয়া করে মোটামুটি ফলন পাওয়া যায়। অবস্থা অনুকূল না থাকলে কলাই খেসারি, প্রভৃতি শস্য চাষের প্রতি নজর দেওয়া ভালো।

(ঘ) অক্টোবর মাসের বন্যায় ধানের ক্ষতি হলে রবি শস্য চাষে নজর দিতে হবে। সেচ সুবিধা থাকলে গম, আলু, প্রভৃতি শস্যচাষ এবং সেচহীন এলাকা হলে ছোলা, মসুর, তৈলবীজ জাতীয় শস্যের চাষ করা যেতে পারে।

বন্যায় জমি জায়গা সব ডুবে যায় বলে বীজতলা করার ভীষণ অসুবিধা দেখা যায়। আবার অল্প সময়ের মধ্যে চারা করতে না পারলেও চাষের অসুবিধা। অল্প সময়ে এবং অল্প জায়গায় বেশি জমির জন্য চারা করতে হলে ডেপগ পদ্ধতিতে বীজতলা করা খুবই যুক্তিযুক্ত। জায়গা উঁচুনীচু থাকলে সমতল করে পরিচর্য্যার সুবিধার জন্য ৪ ফুট চওড়া এবং সুবিধামত লম্বা করে বীজতলা করা যেতে পারে। বীজতলার চারদিকে দু' ইঞ্চির মত উঁচু এবং দু ইঞ্চি পুরু কাদার আইল দিয়ে ঘিরে রাখা প্রয়োজন।

এরপর পলিথিন চাদর বা কলাপাতা এমনভাবে বিছিয়ে দিতে হবে যাতে সেচের জল ঐ স্তর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে না পারে ও চারা গাছের শেকড় মাটি স্পর্শ করতে না পারে। এবার এই স্তরে শোধন করা ও কল বের হওয়া বীজধান সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ৪ ফুট চওড়া এবং ১১ ফুট লম্বা এমন একটি বীজতলায় ৬ কেজি বীজ বোনা যায় এবং তা থেকে তৈরী চারায় এক বিঘে জমি রোয়া যাবে। এক কাঠা ডেপগ বীজতলার চারায় ১৬ বিঘে জমি রোয়া যায়।

বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার পর যাতে সরে না যায় অথচ সব-সময় ভিজে থাকে সেজন্য সকালে ও সন্ধ্যায় জল ঝারি (ওয়াটারিং ক্যান) দিয়ে সেচ করতে হবে, অল্প বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু বৃষ্টি বেশি হলে এবং বীজ-তলায় জল জমে গেলে সেই জল ধীরে ধীরে বের করে দিতে হবে। প্রখর রৌদ্র এবং বৃষ্টির সময় বীজতলা পলিথিনের চাদর বা কলা পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া ভালো। চারার শেকড় শক্ত স্তর ভেদ করে নীচের দিকে যেতে পারবে না, ফলে প্রথম অবস্থায় চারাকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দিতে থাকবে। তাই প্রথম ৪।৫ দিন সকালে ও বিকালে হাত বা কাঠের হাতা দিয়ে চারাগুলিকে চেপে দিতে হবে। কয়েকদিন পর চারা একটু বড় হলে বীজতলাতে আধ ইঞ্চি পরিমাণ জল জমিয়ে রাখতে হবে।

সাধারণত ১০।১৫ দিনে চারা রোয়ার উপযুক্ত হয়। তখন ৩।৪ টি পাতাই জন্মায়। এই সময় প্রয়োজন বোধে কাজের সুবিধার জন্য বীজতলা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে মাদুরের মত জড়িয়ে মাঠে রোয়ার জন্য নেওয়া যায়। চারা বেশি বড় করা হয় না বলে জমিতে ছিপছিপে জল রেখে রোয়া দরকার। রোয়ার জমিতে জল বেশি থাকলে চারা বড় করার জন্য প্রথমে কোন উঁচু জমিতে ঘন করে লাগিয়ে চারা বড় হলে কিছুদিন পর তুলে আসল রোয়ার জমিতে রোয়া যাবে।

রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী

২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কংগ্রেসের সভাপতি হবার আহ্বান এল অমনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিলেন তিনি (১৯৬২)। জননায়ক লালবাহাদুর জানতেন রেড্ডি কী ধাতুতে গড়া। তাই তাঁর মন্ত্রীসভায় রেড্ডীর ডাক পড়ল (১৯৬৪)। তারপর কখনো তাঁর মাতৃভূমি অন্ধ্রে—কখনো দিল্লীতে যখন যেখানে যে কাজে প্রয়োজন হয়েছে সদাপ্রস্তুত সৈনিকের মতই রেড্ডী সেখানে ছুটে গিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে হলেন সংসদের স্পীকার। কিন্তু ১৯শে জুলাই ১৯৬৯ সালে ভি. ভি. গিরির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করলেন—দিল্লীর জটিল রাজনীতির আবর্তে পদমর্যাদা নিয়ে যত লড়াই রয়েছে ততটা দেশ সেবার মনোভাব নেই। তাই ঘৃণায় রাজনীতি ছেড়ে কৃষকের সন্তান ফিরে গেলেন ইল্লুরুতে মাটির টানে। মত্ত হয়ে রইলেন কৃষি নিয়ে।

এল ১৯৭৭। দেশজুড়ে বিক্ষোভ, অসন্তোষ আর সন্ত্রাসের বিভীষিকার সঙ্গে মোকাবিলায় ফিরে এলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। লোকসভার সদস্য থেকে স্পীকার, স্পীকার থেকে দেশের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন জনগণ বন্দিত মহানায়ক—নীলম সঞ্জীব রেড্ডি।

রাজনীতিতে তাঁর ফিরে আসার কারণটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রপতির ভাষণে—বিভীষিকা আর ত্রাসের আতঙ্ক দূর করে গণতন্ত্রের ওপর দেশবাসীর বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে আসবো—

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, জনগণের ওপরে শ্রদ্ধাশীল জননেতা রেড্ডির যোগ্য উক্তি সন্দেহ নেই। বিশ্বাস রাখি তাঁর সুযোগ্য ও বহুদর্শী নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে।

খাদ্যের অপ্রচলিত উৎস সন্ধানে

৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ

হয়। এতে দুধের মতো তরল জাতীয় এক অবদ্রব (Emulsion) বেরিয়ে আসে। দ্রবণের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ প্রভৃতি থাকে সার হিসাবে। এর সঙ্গে নানা রকমের খনিজ লবণ এবং খাদ্যপ্রাণ মিশ্রিত হয় প্রয়োজন অনুসারে। বিক্রিয়া কক্ষে ঈষ্টের দ্রবন মিশিয়ে দিয়ে উপযুক্ত তাপ এবং দ্রবণের অম্লত্বের নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিশেষভাবে। এরপর মিশ্রণের মধ্যে নির্মল বায়ু পরিচালিত হতে থাকে। সন্ধান কাজ (Fermentation) চলে, ঈষ্ট কোষগুলো সংখ্যায় বেড়ে ওঠে তাড়াতাড়ি। বিক্রিয়া শেষে এক কোষী সজীব বস্তুগুলোকে (Uni Cellular Organisms) বিশেষ ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। এই এককোষী পদার্থগুলোকে ভালভাবে ধুয়ে শুকনো করলে পাওয়া যায় ঘিয়ে রংয়ের এক রকম গুঁড়ো। এই গুঁড়ো পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'টপ্রিণা' (Toprina)। এর মধ্যে প্রোটিনের ভাগ হলো শতকরা ৬৫ ভাগ, জিভে দিলে এর স্বাদ পাওয়া যায় না বল্লেই চলে।

কার্বন সমন্বিত উদ্ভিজ পদার্থ (সেলুলোজ কার্বোহাইড্রেট) এবং খনিজ তেল—এদের প্রত্যেকটি থেকেই এককোষী প্রোটিন পাওয়া যায়। কিন্তু শেষোক্ত পদ্ধতির একটা বিশেষ সুবিধে আছে। যেখানে এক কিলোগ্রাম পরিমাণ খনিজ তেল থেকে এক কিলোগ্রাম ঈষ্ট-কোষ উৎপন্ন হয়, সেখানে শর্করা জাতীয় পদার্থ থেকে অর্দ্ধেক পরিমাণ এক কোষী প্রোটিন পাওয়া যায়। আবার শেষের প্রক্রিয়াতে খনিজ তেল প্যারাফিন মুক্ত হয় এবং তার ফলে নানান এঞ্জিনের উপযোগী ডিজেল তেল উপজাত দ্রব্য হিসাবে বেরিয়ে আসে। তা দিয়ে জল গরম করা চলে, আবার জল সেচের এঞ্জিনের কাজেও লাগে।

আলো, হাওয়া, বৃষ্টিপাত, মাটি প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে কোন এক আবদ্ধ পাত্রে এই ধরনের আমিষ খাবার বাড়িয়ে তোলা যাবে, অতি দ্রুত তালে বংশ বৃদ্ধির জন্য সময়ও বাঁচবে। দেখা গেছে যে, এই রকম এক কোষী সজীব বস্তু দু'ঘন্টায় বেড়ে গিয়ে হয় দ্বিগুণ। এই বৃদ্ধির তুলনায় তৃণভোজী গবাদি পশুর বৃদ্ধির হার এক লক্ষ ভাগ মতো কম। গৃহ পালিত গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে নিরাপদ বলে এই সব এককোষী প্রোটিন পরীক্ষার গণ্ডী পেরিয়েছে। অবশ্য মানুষের উপযোগী খাদ্য কিনা তার নিশ্চিত উত্তর পাবার জন্য এখনও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন আছে।

ফ্রান্স, ক্যানাডা, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলোতে খনিজ তেল থেকে এক কোষী আমিষ খাদ্য তৈরী করবার জন্য বড় বড় প্রকল্পে উৎপাদন চলেছে। আমাদের দেশেও এই রকম আমিষ খাবার তৈরী করবার জন্য দেরাদুনের Indian Institute of Petroleum এক পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ করেছেন, দিনে এর উৎপাদন ক্ষমতা হলো পঞ্চাশ কিলোগ্রাম প্রোটিন। পরীক্ষামূলক কার্যসূচীর সাফল্যের পর এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি গুজরাট শোধনাগারে স্থানান্তরিত করে উৎপাদন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াস চলেছে।

রাজ্যসভার ডাকটিকিট

১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

গঠিত হয় এবং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে রাজ্যসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৩ই মে, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছর রাজ্যসভার গৌরবময় ২৫ বছর পূর্ণ হলো। রাজ্যসভার শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিলো ২১৬ জন; বর্তমানে ২৪৪ জন। রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয় পরোক্ষভাবে, কিছু সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। প্রতি দু'বছর অন্তর রাজ্যসভার মাত্র এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। সুতরাং রাজ্যসভা কখনোই লোকসভার মতো একেবারে ভেঙ্গে যায় না। এবং লোকসভা ভেঙ্গে যাওয়া কালীন রাজ্যসভাই সংসদের দায়িত্ব বহন করে, জাতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে। গত ২৫ বছরে রাজ্যসভা তার কর্তব্য পূর্ণভাবেই পালন করেছে। ভারতের ডাকবিভাগ রাজ্যসভার ২৫ বছর পূর্তিকে স্মরণে রেখে, রাজ্যসভার ১০১ তম অধিবেশন চলাকালীন গত ২১শে জুন একটি বহুবর্ণ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। নকশায় দেখা যাচ্ছে সংসদ ভবনের রাজ্যসভা-কক্ষটির একাংশ।

ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের সহযোগী ডাকটিকিটগুলি ভবিষ্যতে মূল্যবান দলিল বলেই গৃহীত হবে।

মহিলা মহল

শিশুর পরিচর্য্যা

উমা সরকার

নবজাত শিশুর যত্ন পরিচর্য্যার ব্যাপারে মা বাবা উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। যাঁরা নতুন মা হয়েছেন তাঁরা সন্তান পালন বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন। নতুন পিতা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। অথচ ডাক্তারী ফরমুলার চাইতেও পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসা, উদ্বেগ ইত্যাদি সহজাত প্রবণতাই শিশুর যত্নপরিচর্য্যার শ্রেষ্ঠ সহায়।

দরকারী কয়েকটি জিনিস

বাচ্চার জন্মের পরই কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। প্রথমেই দরকার বিছানা। সম্ভব হলে বাচ্চার জন্য একটি ছোট খাট (বেবীকট), এক সেট ছোট তোষক, বালিশ, লেপ ইত্যাদি। তোষক ও বালিশ খুব নরম হবে কিন্তু বেশী পুরু না হওয়াই ভাল। একটি অয়েলক্লথ, ফ্লানেল কাপড়ের আধমিটার সাইজের এক ডজন কাপড়ের টুকরা। এগুলো বাচ্চার অয়েলক্লথের উপর বিছানো হবে। নবজাত শিশুকে প্রথমেই সেলাই করা শক্ত কাঁথা না দেওয়াই ভাল। একমাস বয়স হলে কাঁথা ব্যবহার চলবে। আর ছোট একটি মশারী, স্নানের বাথ টব, দুধের বোতল, কয়েকটি নিপল, একটি নতুন অ্যালুমিনিয়াম বা ষ্টিলের পাত্র যাতে বাচ্চার খাওয়ার বা দুধের জল গরম করা হবে। একটি নতুন বাটি ও চামচ। স্নানের জন্য নরম তোয়ালে একটি, এক ডজন জামা কাপড়। বাচ্চাদের সাবান একটি, বেবী পাউডার একটি এবং গায়ে মাখার জন্য ভিটামিনযুক্ত অলিভঅয়েল।

বাচ্চার খাদ্য

জন্মের পর বাচ্চার প্রধান খাবার হচ্ছে দুধ। নবজাত শিশুর পক্ষে মায়ের দুধই শ্রেষ্ঠ। কারণ মায়ের দুধে প্রয়োজনীয় সবরকম ভিটামিন থাকে। মায়ের দুধে বাচ্চার পেটের কোন গোলমাল বা ইন্ফেক্‌শন হওয়ার ভয় থাকে না। দুধ চুষে খাওয়ার যে জন্মগত ইচ্ছা বাচ্চাদের থাকে তার পরিতৃপ্তি ঘটে। মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে দুধ খেতে পায় বলে মানসিক দিক দিয়েও বাচ্চা তৃপ্ত থাকে। মায়ের শরীরের পক্ষেও ভাল বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো।

মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে পরিমাণের কোন হিসাবের দরকার নেই। বাচ্চার যতটা দুধ প্রয়োজন ততটাই সে পান করে ঘুমিয়ে পড়বে। সাধারণত ১০ মিনিট থেকে ২০ মিনিট বাচ্চা দুধ পান করে। কোন কোন বাচ্চা ৩০ মিনিট সময়ও নেয়। বাচ্চার ওজন যদি ঠিকমত বাড়ে তাহলে অন্য দুধের আর দরকার নেই। কিন্তু মায়ের দুধে যদি বাচ্চার কম পড়ে তাহলেই তাকে তোলা দুধ দিতে হবে।

বোতলে খাওয়া

বাচ্চাকে সাধারণত জন্মের ১২ ঘন্টা পরেই বোতল দেওয়া যেতে পারে। বোতলে করে বাচ্চাকে গরুর দুধ বা বেবীফুড খাওয়ানো হয়। গরুর দুধের সঙ্গে প্রথমে সমপরিমাণ বা আরও বেশী জল মিশিয়ে নিতে হবে। এর সঙ্গে চিনি মেশাতে হবে। কিন্তু বেবীফুড খাওয়ালে চিনি মেশানোর দরকার নেই। এক চামচ দুধের সঙ্গে ১ আউন্স জল হিসাবে দুধটা গুলে নিয়ে খাওয়াতে হবে। প্রথমে বাচ্চাকে আধ আউন্স দুধ দিয়ে খাওয়ানো আরম্ভ করে আস্তে আস্তে দুধের পরিমাণ বাড়াতে হবে। নইলে বাচ্চা হজম করতে পারবে না। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় ঈষৎ গরম অবস্থাতে দুধটা খাওয়াতে হবে। বাচ্চা নিজেই নিজের দুধের পরিমাণ ঠিক করে নেবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চার ওজন ঠিকমত বাড়ছে কিনা। অনেক বাচ্চা খেতে খেতে কাঁদে তখন বাচ্চার খাওয়ানো বন্ধ করে বাচ্চার পেট থেকে হাওয়া বের করে দিতে হবে। বাচ্চাকে কাঁধের উপরে রেখে পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারলে বাচ্চার মুখ দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবে তখন আবার দুধ দিলে বাচ্চা খেতে শুরু করবে। দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চার পেটে হাওয়া ঢুকে বাচ্চার পেট ভর্ত্তি করে ফেলে। এই কারণে অনেক সময় বাচ্চা আর খেতে চায় না। খাওয়া শেষ হলে পুনরায় বাচ্চার পেট থেকে অনুরূপ ভাবে হাওয়া বের করে দেওয়া প্রয়োজন। এতে বাচ্চার অস্বস্তি দূর হবে এবং হজম ভাল হবে। বোতলের দুধ বাচ্চাকে মোটামুটি নিয়ম মেনে দেওয়াই উচিত।

ডাক্তারের মতে খাওয়ানোর সময় সকাল ৬টা, ৯টা, দুপুর ১২ টা, ৩টা, সন্ধ্যা ৬টা, রাত ১০টা এবং রাত ২টা। খুব ছোট বাচ্চা ও কম ওজনের বাচ্চাদের হয়ত আরও তাড়াতাড়ি খাওয়াতে হতে পারে। প্রয়োজনে সময় এদিক ওদিক করে নিলেও কোন ক্ষতি নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চা কাঁদলে প্রথমে দেখতে হবে সে খিদেয় কাঁদছে কিনা, খেতে না

চাইলে বুঝতে হবে পেটের ব্যাথা বা অন্য কোন কারণে বাচ্চা কাঁদছে। বাচ্চার পেট না ভরলে সে বোতল ছাড়তে চাইবে না, তখন বুঝতে হবে বাচ্ছার দুধ আরও বাড়ানো দরকার। বাচ্চা নিজের ইচ্ছেমত খাওয়ার পর অবশিষ্ট দুধটুকু খাওয়ানোর জন্য বেশী জোর না করাই ভাল। বাচ্চা একটু বড় হলে ৪ ঘণ্টা পরে পরে দুধ দিলেও চলবে। রাত ১১ টার পরে আর বাচ্চাকে দুধ দেওয়ার দরকার হবে না। রাত দুটোর দুধ আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রত্যেক বার দুধ খাওয়ানোর পর বাচ্চার দুধের বোতল খুব ভালভাবে ব্রাস করে ধুয়ে ফেলতে হবে। দিনে একবার সাবান জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলা উচিত। প্রত্যেক বার ধোয়ার শেষে গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে। বাচ্চার চামচ, বাটি, নিপল ইত্যাদিও এই সঙ্গে ভালভাবে গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। কোনরকম জীবাণু যাতে বোতল বা নিপুলে জন্মাতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ভিটামিন

ছোট বাচ্চার অতিরিক্ত ভিটামিন 'ডি' এবং ভিটামিন 'সি' অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ গরুর দুধ বা অন্যান্য খাবার যা বাচ্চাকে দেওয়া হয় তাতে এই ভিটামিনগুলো পরিমাণে খুব বেশী থাকে না। আবার মায়ের দুধে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে থাকলেও ভিটামিন 'ডি' থাকে না। ভিটামিন 'এ' খুবই প্রয়োজন বাচ্চাদের। তাই ডাক্তারের পরামর্শমত ভিটামিন ড্রপ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। মালটিভিটামিনের কোন দরকার নেই।

ফলের রস

বাচ্চা কয়েক মাসের হলে বাচ্চাকে কমলা লেবুর রস বা মুসাম্বির রস দেওয়া যায়। প্রথমে ১ চামচ কমলালেবুর রসের সঙ্গে একচামচ ফোটানো ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। পরে দিনে দু চামচ রস ও দু চামচ জল, তৃতীয় দিনে তিন চামচ রস ও সম পরিমাণ জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এমনি করে ১ আউন্স পর্যন্ত বাড়িয়ে ক্রমে জল কমিয়ে কমিয়ে শুধু রসটাই দিতে হবে। দুই আউন্স থেকে চার আউন্স পর্যন্ত রস বাচ্চাকে দেওয়া যেতে পারে। পাঁচ, ছ' মাস পর্যন্ত বাচ্চা বোতলেই রসটা খাবে পরে কাপে খাওয়াতে অভ্যাস করতে হবে। পরবর্তী দুধ বা খাবার খাওয়ার ১ ঘণ্টা আগে রসটা দিতে হবে। সাধারণত বাচ্চার স্নানের আগেই রসটা দেওয়া ভাল।

খাবার জল

অনেকে বাচ্চাকে দু'বেলা সাদা জল খাওয়াতে বলেন। বাচ্চাদের এক বছর বয়স পর্যন্ত আলাদা জলের দরকার হয় না। প্রয়োজন হলে বাচ্চাকে ফোটানো পরিষ্কার ঈষৎ উষ্ণ জল

বা মিছরির জল খাওয়াতে পারেন। বিশেষ করে বাচ্চা অসুস্থ হলে বা রাত্রের দুধ ছাড়াতে চাইলে দুধের বদলে প্রথমে জল খাওয়াতে হবে। খুব গরম পড়লেও বাচ্চাকে জল খাওয়াতে পারেন।

শক্ত খাবার

বাচ্চার যখন ৩ মাস বয়স হবে তখন বাচ্চাকে শক্ত খাবার দিতে হবে। শক্ত খাবার বলতে প্রথমে বাচ্চাকে কোন Cereal দিতে হবে যেমন ফ্যারেক্স বাল আমুল ইত্যাদি। প্রথমে ১ চামচ Cereal এর সঙ্গে দুধ মিশিয়ে বেশ পাতলা নরম করে বাচ্চাকে চামচে করে মুখে দিতে হবে। বাচ্চা খেতে পছন্দ করলে এবং সহ্য করতে শিখলে আস্তে আস্তে ১ চামচ করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ২চটা পারে খেতে দিন।

ফল

ফলটা সাধারণত দ্বিতীয় শক্ত আহার হিসাবে গণ্য করা হয়। Cereal খাবার আরম্ভ করার পর ফল দিতে হবে। ৬ থেকে ৮ মাস পর্য্যন্ত বাচ্চাদের সেদ্ধ করে ফলটা দিতে হবে। অবশ্য পাকা কলা বাদে। পাকা কলা ভাল করে চটকে প্রথমে অল্প পরিমাণে, ক্রমশ পরিমাণ বাড়িয়ে গোটা একটা কলা খাওয়ানো চলবে। বাচ্চাকে দু'বার করে ফল দেওয়া যেতে পারে যদি সে খেয়ে হজম করতে পারে। এক বছর বয়স হলে সিদ্ধ না করেই পাতলা করে কাটা ফল দেওয়া যেতে পারে।

সব্জি

সিদ্ধ সব্জি Cereal এর সঙ্গেই বাচ্চাকে দিতে হবে। তাছাড়া তাজা সব্জি সেদ্ধ করে সামান্য নুন মিশিয়ে বাচ্চাকে আলাদা করে খাওয়ানো যেতে পারে। সব্জির মধ্যে আলু, গাজর, বীট, টমেটো, বিন, কাঁচকলা মটরশুঁটি ইত্যাদি দেওয়া ভাল।

ডিম

ছ'মাসের পর থেকে ডিম দেওয়া ভাল। প্রথমে ডিমের কুসুমটা দিয়ে অভ্যাস করাতে হবে। কারণ এতে এলার্জির ভয় থাকেনা। ডিমের সাদা অংশেই এলার্জি হয়। ক্রমে পুরো ডিমটাই দিতে হবে।

মাছ-মাংস

ছ'মাসের পর থেকে বাচ্চাকে মাছ মাংস দেওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে সুপ তৈরী করে দিতে হবে। ক্রমে সুসিদ্ধ মাছ বা মাংস খেতে শিখবে।

এক বছরের বাচ্চার মোটামুটি এইরূপ খাবারের চার্ট হবে। সকালে—Cereal, ডিম, টোষ্ট ও দুধ। দুপুরের খাবার—ভাত বা রুটি, সবজি, আলু, মাছ বা মাংস, ফল ও দুধ। রাত্রের খাবার হবে—Cereal, দুধ ও ফল। Cereal-এর বদলে রুটি বা মাখন টোষ্টও দেওয়া যেতে পারে। কলা ছাড়া অন্য ফলের সঙ্গে সামান্য চিনি মেশাতে হবে। পরে আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে চিনি মেশানো বন্ধ করে দিতে হবে। ২ বছর থেকে বাচ্চা সাধারণ সব রকম খাবার পরিমাণ মত খাবে।

প্রতিদিনের পরিচর্য্যা

প্রতিদিনের পরিচর্য্যার মধ্যে স্নান একটি বড় কাজ। প্রতিদিন বাচ্চাকে ১০টার সময় ভাল করে তেল মাখিয়ে সামান্য গরম জলে নির্দিষ্ট টবে স্নান করাতে হবে। স্নান করানোর আগে হাতের কাছে বাচ্চার সাবান, স্নানের তোয়ালে, গা মোছানোর তোয়ালে, জামা ইত্যাদি রাখুন। গা মাথা মুছিয়ে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নিন। পরে গায়ে সামান্য পাউডার ছড়িয়ে জামা পরিয়ে দিন। বেশী ঠাণ্ডা পড়লে বা শীত বেশী হলে, বৃষ্টির দিনে, বাচ্চাকে স্নান না করিয়ে গরম জলে গা মুছিয়ে দিন। একেবারে ছোট বাচ্চাকে স্নানের সময় বা-হাতের উপর মাথাটি রেখে বাচ্চার শরীর জলে ডুবিয়ে আস্তে আস্তে নরম কাপড়ে বাচ্চার গা ধুয়ে দিয়ে মাথায় জল দিন। সাবান কখনই যেন চোখে না দেওয়া হয় তাহলে বাচ্চা খুব চিৎকার করবে। কান, চোখ, নাক, মুখ এবং নখেরও প্রতিদিন পরিচর্য্যা করা দরকার। বাচ্চার কান, চোখ, নাক, মুখ যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বাচ্চার নখ নিয়মিত কেটে ফেলতে হবে। বাচ্চা ঘুমুলে বাচ্চার নখ কাটার প্রশস্ত সময়।

বাচ্চার পোষাক

বাচ্চার পোষাক ঢিলেঢালা হওয়া দরকার। এগুলো সুতীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাচ্চার জামা পুরো পিঠের দিকে কাটা হলে ভাল হয়। গরম সোয়েটার পরানোর সময় হাত আগে ঢুকিয়ে পরে মাথা ঢুকিয়ে পরাতে হবে। বাচ্চাকে জাঙ্গিয়া না পরিয়ে প্রথম মাস ছোট কাপড়ের টুকরো কোমরে জড়িয়ে রাখা ভাল এতে বাচ্চার গায়ে আঘাত লাগবে না।

বাচ্চার জামা কাপড়, কাঁথা ইত্যাদি প্রতিদিন সাবান জলে কেঁচে ভালভাবে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। খোলা রৌদ্রে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। রৌদ্রে শুকালে কাপড় চোপড় জীবাণু মুক্ত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাচ্চার কাঁথা, কাপড় ডেটল জলে চুবিয়ে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া দরকার।

বাচ্চা যেন কখনই প্রস্রাবে ভিজে কাপড়ে না থাকে। এতে বাচ্চা অস্বস্তি বোধ করে এবং গায়ে ফুস্কুড়ি বেরিয়ে ঘা হতে পারে।

ঘুম

বাচ্চাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া উচিত। বাচ্চা যে ঘরে ঘুমাবে সে ঘরটি খোলামেলা আলোবাতাস যুক্ত হওয়া একান্ত দরকার। বাচ্চার ঘরে যেন বেশী শব্দ বা চীৎকার গণ্ডগোল না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাচ্চারা সাধারণত ছোট বেলায় খাওয়ার সময় ছাড়া সর্বক্ষণ ঘুমায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও কমতে থাকে।

বেড়ানো

ছ'মাসের সময় থেকে বাচ্চাদের সকাল বিকালে বাইরে খোলা মাঠে বা পার্কে একঘণ্টা করে বেড়িয়ে আনলে বাচ্চা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই সুস্থ থাকবে।

নূতন বাজেটঃ বাংলা ছবির সংকট

অমলেন্দু শূর

১৯৭৭-এর অর্থনৈতিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন—তাতে চলচ্চিত্রের ওপর নতুনভাবে লেভি ধার্য করা হয়েছে। বিষয়টি কার্যকর হলে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে—একথা নির্দ্বিধায় বলছেন এই শিল্পে নিয়োজিত প্রত্যেকটি মানুষ। এই লেভির ফলে শুধু বাংলা ছবিই নয়, সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক ছবি এক মহা-সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এবং সেই মহা-সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবীকালের মহা-দুর্দিনের দুঃস্বপ্ন দেখছেন আঞ্চলিক ছবির প্রযোজক, পরিবেশক, পরিচালক, কলাকুশলী-শিল্পী, স্টুডিও মালিক এবং কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের ওপর বাংলা তথা আঞ্চলিক ছবির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার যদি লেভি-বিষয়কে কোনো সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করেন—তাহলে আঞ্চলিক ছবি, সার্বিকভাবে এই শিল্পের মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে অবশ্যই।

প্রস্তাবিত নতুন বাজেটে বলা হয়েছে, ছবি নির্মাণের সম্পূর্ণ খরচের ওপর ১০% হিসাবে লেভি দিতে হবে। বস্তুত, এই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। তদুপরি পৃথিবীর কোনো দেশেই চলচ্চিত্রের ওপর এরূপ অতিরিক্ত লেভি ধার্যের কথা শোনা যায়নি। এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশে এরূপ অস্বাভাবিক-অসম্ভব চিন্তা করেন কিনা সন্দেহ।

আঞ্চলিক ছবি একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা-কেন্দ্রিক। সেকারণে এই ছবির বাজার খুবই সীমিত। যেমন, বাংলা ছবির বড় বাজার একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়া একটি সাধারণ ছবি পিছু গড়ে পরিচালক-প্রযোজক শেয়ারে (ক) আসাম থেকে পাওয়া যায় ৩০।৩৫ হাজার টাকা। (খ) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, দিল্লি, কানপুর, বেনারস প্রভৃতি শহর এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে পাওয়া যায় ১০।১৫ হাজার টাকা। (গ) ভারতের বাইরে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত হয় ১০/১২ হাজার টাকা। সুতরাং একমাত্র বাজার কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলি।

সুতরাং একটি সাধারণ বাংলা ছবি অসাধারণ বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করলে প্রযোজক ও পরিবেশক এই নির্দিষ্ট বাজার থেকে যা সংগ্রহ করেন তার গড় পরিমাণ:

(ক)	কলকাতা	১,৫০,০০০ টাকা
(খ)	বিভিন্ন জেলা	৩,০০,০০০ টাকা
(গ)	আসাম	৩৫,০০০ টাকা
(ঘ)	ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল	১৫,০০০ টাকা
(ঙ)	ভারতের বাইরে	১২,০০০ টাকা
	মোট	৫,১২,০০০ টাকা

বর্তমানে খুব সাদামাটা এবং সাদা-কালোয় নির্মিত একটি বাংলা ছবিতে মোট ব্যয় হয় গড়ে ৫,০০,০০০ টাকা। রঙিন হলে ন্যূনকল্পে ১০,০০,০০০ টাকা। এছাড়া যাঁরা ছবিতে কিছু উপভোগ্য করে পরিবেশন করতে চান, অর্থাৎ কোনোরকম কম্প্রোমাইজ না করলে ছবির ব্যয় হয় ৮।৯,০০,০০০ টাকা। সুতরাং প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী ১০% হিসাবে লেভি দিতে গেলে বিভিন্ন বাজেটের ছবির মাথা পিছু ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এইরূপ:

(টাকার হিসেবে)

বাজেট	নতুন লেভি ১০% হারে	মোট খরচ
৫,০০০০০	৫০,০০০	৫,৫০,০০০
৮,০০০০০	৮০,০০০	৮,৮০,০০০
৯,০০০০০	৯০,০০০	৯,৯০,০০০
১০,০০০০০	১,০০০০০	১১,০০০০০

এছাড়া আছে প্রিণ্ট প্রতি ধার্য লেভি যা বর্তমানে প্রচলিত আছে। এই লেভি বাবদ বর্তমানে যা সরকারকে দিতে হয় তা হলো:

প্রিণ্ট	৪,০০০ মিঃ কম দৈর্ঘের ছবি	৪,০০০ মিঃ বেশি
১—১২টি	×	×
১৩—১৫টি	১৫ পঃ প্রঃ মিঃ	২৫ পঃ প্রঃ মিঃ
১৬—২৫টি	৩৫ ,, ,,	৬০ ,, ,,

এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১২ টির বেশি প্রিণ্ট করলে অতিরিক্ত ৩১৪,০০০ টাকা আরো দিতে হবে। অর্থাৎ ১৫ টি প্রিণ্টের হিসাব ধরে পুরোনো লেভি দিতে হতো, ৫,০০,০০০ টাকার ছবিতে:

১৫ টি প্রিণ্ট = পুরোনো লেভির হার = ১,২০০ টাকা।

নতুন লেভির ফলে দিতে হবে, ১৫ টি প্রিণ্ট = নতুন লেভির হার = ৫০,০০০ + ১,২০০ টাকা = ৫১,২০০ টাকা।

বাস্তবিক, এ এক অসহনীয় অবস্থা। কেননা, বাংলা ছবির প্রযোজক-পরিবেশকরা কেউই বড়ো ব্যবসায়ী নন। তদুপরি ছবি বাণিজ্যিক সফল হলেও ছবি প্রতি যে ব্যবসা হয়—তার একটা পরিসংখ্যান আগেই দিয়েছি। বহু ক্ষেত্রেই বাংলা ছবির প্রযোজকরা সামান্য কিছু টাকা নিয়ে ছবির নির্মাণ কার্য সুরু করেন। তারপর ছবি নির্মিত হয় সুদে কর্জ করা টাকার ওপর নির্ভর করে। প্রায় ৯০% ছবির ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছবির সুটিং কোনোক্রমে শেষ হয়, তারপর প্রিণ্ট এবং বিজ্ঞাপনের টাকা যোগাড়ের জন্যে প্রযোজক পরিবেশক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান। অতপর উপায়ান্তর না দেখে অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ করে এনে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত লেভি ছবি মুক্তির পূর্বেই, ছবির অদৃষ্ট কী হবে না জেনেই সম্পূর্ণ খরচের ওপর দিতে

...। অথচ প্রযোজক ছবি বিক্রির প্রতি ১০০ টাকায় যে শেয়ার পান, তা অতি নগণ্য। একটা পরিসংখ্যান দেওয়া গেলো:

	টা: প:
প্রমোদ কর	৫০.০০
প্রদর্শক শেয়ার	২৫.০০
পরিবেশক শেয়ার	৫.০০
প্রিণ্ট এবং বিজ্ঞাপন	৫.৫২
সুদ (মোট খরচের ৫% হারে)	১.৩০
প্রযোজক শেয়ার	১৩.১৮

৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি ছবির মোট খরচ তুলতে হলে যে ব্যবসা করতে হবে তার পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৩৮,০০,০০০ টাকা। বক্স অফিস থেকে এই ৩৮,০০,০০০ টাকা সংগ্রহ করলে প্রযোজক তাঁর ৫,০০,০০০ টাকা ফেরৎ পাবেন। এই ৩৮,০০,০০০ টাকায় প্রযোজক কিভাবে ৫,০০,০০০ টাকা পান:

প্রমোদ কর	১৯,০০,০০০ টাকা
প্রদর্শক	৯,৫০,০০০ টাকা
পরিবেশক	১,৯০,০০০ টাকা
প্রিণ্ট এবং বিজ্ঞাপন	২,১০,০০০ টাকা
সুদ	৫০,০০০ টাকা
প্রযোজক	৫,০০,০০০ টাকা
মোট	৩৮,০০,০০০ টাকা

পরিশেষে সংযোজন: এর পরেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে ওয়াকেবহাল হবেন কিনা জানা নেই। শুধুমাত্র বলা যায় যে, একটি সাধারণ বাংলা ছবি যার বর্তমানে ব্যয় হবে ৫,০২,০০০ টাকা। সেই টাকা তুলতে ৩৮,০০,০০০ টাকার ওপর ৩,০০,০০০ টাকার ব্যবসার প্রয়োজন। কিন্তু সেই টাকা সংগ্রহ হবে কোথা থেকে? বাংলা তথা আঞ্চলিক ছবির বাজার বিস্তার না ঘটলে কিংবা বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেলে বাংলা তথা আঞ্চলিক ছবি, সামগ্রিকভাবে এই শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের বাজার কলাকুশলী-শ্রমিক-শিল্পী বেকার হবেন। বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি বিপন্ন হবে।

চলচ্চিত্রের অ্যাড-ভালোরাম বা লেভি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সংশোধনগুলো: এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন করেছে। বলা হয়েছে, আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে ১২টি প্রিণ্ট পর্যন্ত কোনো লেভি দিতে হবে না। ১২টির বেশি প্রিণ্ট করলে নূতন প্রবর্তিত বর্ধিত হারে লেভি দিতে হবে।

বিষয়টি সম্পর্কে বাংলা ছবির প্রযোজক পরিবেশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তাঁরা বললেন, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই সংশোধন যথেষ্ট নয়। তাঁরা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জানা গেলো, অর্থমন্ত্রী বিষয়টি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন। এ বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় অর্থমন্ত্রী এক বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে সরকারীভাবে বিভিন্ন খোঁজ খবর নিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে আরো কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো গৃহীত হতে পারে।

আশা করা যায়, ৬ সপ্তাহ পরে আঞ্চলিক ছবি লেভি-সম্পর্কিত নূতন সংশোধনের মাধ্যমে আরো কিছু সুযোগ সুবিধা পাবে।

আজকের নাটক

লুল্লু
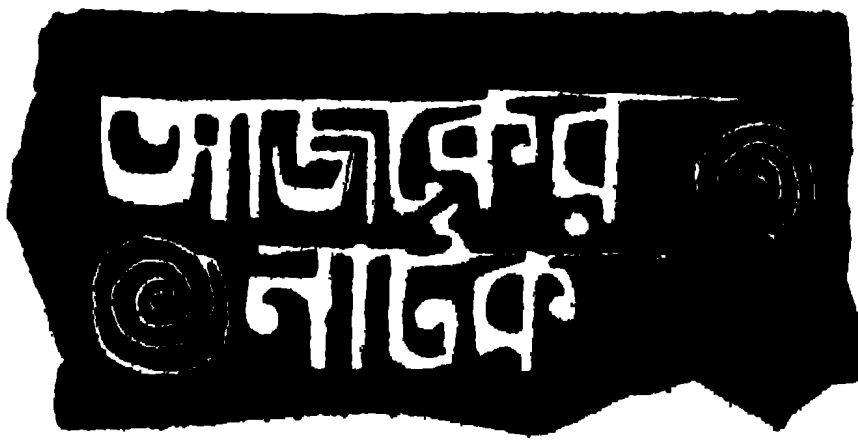
ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে সম্প্রতিকালের সাহিত্য-পাঠকের পরিচয় খুবই যৎসামান্য। আজ একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে কজন বিরল হাস্যরসিক বাংলাভাষায় রসসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের বাঘা বাঘা সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য ও আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বর্গীয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতির লোভ সামলান গেলো না। "বাংলা গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে বড়ো স্রষ্টা এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের মতো কেউই আর কোনদিন আসবেন না। সে সামাজিক অবস্থার পুনরাবর্তন সম্ভব নয়। Ideal এবং Real-এর দ্বন্দ্বে বারে বারে কৌতুক-রঙ্গ-শ্লেষ-রসিকের আবির্ভাব ঘটবে, কিন্তু বাঙালীর ফরাস-বিছানো বৈঠকখানায় গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে এমন গল্পের আসর ভবিষ্যতে আর কেউ জমাতে পারবে না। তাই ত্রৈলোক্যনাথের মতো গল্পকারেরও আর জন্ম হবে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যে কোনো সমালোচকই চিরদিন ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যাবেন—তার দ্বারা বাঙালীর রসবোধ এবং ঐতিহ্যনিষ্ঠাই প্রকাশিত হবে।"

বস্তুত, বাঙালীর রসবোধ এবং ঐতিহ্যনিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া গেলো সম্প্রতি 'সময়' নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নেতাজীমঞ্চে 'লুল্লু' নাটকের অভিনয় দেখে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়া বাস্তবিক দুরূহ নিঃসন্দেহে। একথা নির্দ্বিধায় বর্তমান প্রতিবেদক স্বীকার করছেন যে, সাম্প্রতিককালে ত্রৈলোক্যনাথের চরিত্রগুলি পুঁথীবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মঞ্চে সশরীরে ঘুরে বেড়াবে—এমন কল্পনা নাটক দেখার পূর্বে তার পক্ষে কল্পনা পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে 'সময়' নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যকার নির্দেশক অমল শূর অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। তিনিই সম্ভবত প্রথম, যিনি

DHANADHANYE | YOJANA | REGD. No. [illegible]-315
Price One rupee | (Bengali) | August 1—31, 1977

ত্রৈলোক্যনাথকে মঞ্চে টেনে নিয়ে এসেছেন।

'সময়' গোষ্ঠী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রতিবেদন রেখেছেন যে, ত্রৈলোক্যনাথের লুল্লু কাহিনীতে নাট্যমূল্য আছে কিংবা আদৌ আছে কিনা তার বিচার করবেন বিদগ্ধ রসিকজন। আমরা আজকে মঞ্চে যা উপস্থাপিত করলাম—তাকে কি বল[illegible] নাটিকা, নাট্যরূপ নাকি সংলাপবিনিময়?—বস্তুত এই প্রতিবেদ[illegible]টি সর্বাংশে সত্য। লুল্লু নাট্যসাহিত্যের বিচারে নাটক হিসাবে কতখানি সার্থক, কিংবা আলংকারিক নির্দেশনামায় এটি আদৌ [illegible]মে চিহ্নিত হবে কিনা, [illegible] আলোচনায় না গিয়েও অনা[illegible]লা যায় অমল শূর কৃত 'সম[illegible]'র নাটক লুল্লু সংলাপ বিনিময় [illegible]লেও মঞ্চে লুল্লুর প্রযোজনা ও পরিবেশনা [illegible]বশ্যই অভিনব।

ত্রৈলোক্যনাথের 'ভূত ও মানুষ' গল্প-[illegible]টি থেকে লুল্লু গল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। গল্পের মুখ্য চরিত্র আমাদের বি[illegible]মুখী কর্মপ্রয়াস ও পরিশেষে স্ত্রীকে উদ্ধারই গল্পের মুখ্য বিষয়। কিন্তু লেখক এই গল্পটিতে মুখ্য কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে অক্লেশে আরো অনেক গল্প এনে ফেলেছেন। তাঁতি ও তার সঙ্গীতপ্রিয়তা, কিংবা ঘ্যাঁঘো ভূত ও নাকেশ্বরীর পেত্নীর সঙ্গে তার প্রণয় ও বিরহ প্রভৃতি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। নাট্যকার নির্দেশক এই কাহিনীগুলিকে গ্রথিত করেছেন বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে আধুনিক চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশব্যাক রীতির প্রয়োগের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড়ো কথা, নাটকের কোথাও একঘেয়েমি বা ক্লান্তি আসেনি। ম[illegible] ভূত এবং কিছু মানুষের উদ্ভট কর্মকাণ্ড দেখে দর্শক প্রতিমুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত হেসেছেন, করতালিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে নাট্যক্রিয়ার কাহিনী গ্রন্থনায় মাঝে মাঝে কিছু সঙ্গতি হারিয়েছে—যার ফলে নাটকটির কিছুকিছু অংশ এলোমেলো মনে হতে পারে।

লুল্লু নাটকের একটি বিশেষ দৃশ্য

প্রয়োগের ক্ষেত্রে নূতনত্ব চোখে পড়লো। মঞ্চে একটিমাত্র সেট আমীরের বাড়ী। তারপর সাদা পর্দায় বিভিন্ন স্থানে ছায়া ফেলে অভিনয় রীতিটি বাস্তবিক প্রশংসার্হ। এ ব্যাপারে শিল্প নির্দেশক বাসু ভট্টাচার্যের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। পল্লব ঘোষের আলো আরও অভিনব হলে ভাল হত। মঞ্চে ভূতদের আবির্ভাব-কালে আলোর ব্যবহারে আরো সতর্কতার প্রয়োজন ছিলো।

অভিনয়াংশ উত্তম না হলেও এককথায় ভালো। তবে আরো বেশকিছু অনুশীলন সাপেক্ষ। তবু চোখে পড়ার মতন অভিনয় করেছেন, মিহির চৌধুরী, সরোজ রায়, পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, গৌর নাগ, পরেশ হাজরা, নৃপেন মাইতি, রমেন শীল, কাশীনাথ কোলে, আশীষ দাস, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শিল্পীরা।

সঙ্গীত এবং শব্দকে এত উপেক্ষা করা হলো কেন? এই নাটকের প্রাণ সঙ্গীত এবং শব্দ। জানিনা নির্দেশক হাসির নাটক হিসাবেই এটিকে গ্রহণ করেছেন কিনা। হাসিতো আছেই, কিন্তু রহস্যময়তাও তো আছে। নির্দেশক এব্যাপারে ত্রুটি সংশোধন করবেন। আশা করি।

কলাকুশলের বিভিন্ন কাজের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় তা হলো পোষাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা। বিভিন্ন পোষাকের বিশেষত ভূতদের পোষাক পরিকল্পনা অবশ্যই অভিনব। বাস্তবিক মঞ্চে কতকগুলি অবিকল ভূত দেখতে পাওয়া আশ্চর্য বৈকি।

'সময়'-এর লুল্লু সম্প্রতিকালের এক উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা।

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

যোজনা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক কে. জি. রামকৃষ্ণান
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে প্রকাশিত
এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং [illegible] প্রাইভেট লিঃ হাওড়া কর্তৃক মুদ্রিত।